৩০শ বর্ষ] ১৩৫৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

সূচীপত্র

ক থা মৃ ত

আমার যখন প্রথম এই অবস্থা হ'ল, তখন বিষয়ী লোক [illegible] আসতে দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ করতাম।

পূর্ণজ্ঞানীর আর একটি লক্ষণ পিশাচবৎ! খাওয়া-দাওয়ার বিচার নাই—শুচি-অশুচির বিচার নাই। পূর্ণজ্ঞানী ও পূর্ণমূর্খ; দু'জনেরই বাইরে[illegible] লক্ষণ এক রকম। পূর্ণজ্ঞানী হয়ত গঙ্গাস্নানে মন্ত্র পাঠ করলে না, ঠাকুর পূজা করবার সময় [illegible] ফুলগুলি হয়ত একসঙ্গে ঠাকুরের চরণে দিয়ে চলে এল, কোনও তন্ত্র-মন্ত্র নাই।

[illegible] রুর কাছে [illegible] দিতে হয়, তবে ফল পাওয়া যায়,—তবে ফল তরুর মূলে পড়ে,—তখন কুড়িয়ে লওয়া যায়। চা[illegible] ফল,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান? অনন্ত আকাশ, তাতে পাখী আনন্দে উড়ছে, পাখা বিস্তার ক'রে। চিদাকাশ, আত্মা পাখী। পাখী খাঁচায় নাই, চিদাকাশে উড়ছে। আনন্দ ধরে না।

যেমন ঠিক সূর্য্যোদয়ের সময়ে সূর্য্য। সে সূর্য্যকে অনায়াসে দেখতে পারা যায়;—চক্ষু ঝলসে যায় না,—বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্যে ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়—তিনি ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে ভক্তের কাছে আসেন।

সাধনার প্রয়োজন বটে; কিন্তু দু' রকম সাধক আছে;—এক রকম সাধকের বানরের ছা'র স্বভাব, আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছা'র স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো-সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা করে ভগবানকে ধরতে যায়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আটত্রিশ

মথুরায় গেল রামকৃষ্ণ। দাঁড়াল ধ্রুব ঘাটে। স্পষ্ট দেখল সেই জন্মাষ্টমীর দৃশ্য। শিশু-কৃষ্ণকে বুকে করে যমুনা পার হয়ে যাচ্ছে বসুদেব।

দিন পনেরো ছিল মোট বৃন্দাবনে। ছিল বৈষ্ণববেশে। গায়ে আলখাল্লা, পরনে ডোর-কোপনি। কপালে-গলায় বুকে-বাহুতে তিলক আঁকা। কাঁধে কাঁথার ঝুলি। কণ্ঠে তুলসী কাঠের মালা।

বামনিকে বললে, 'কোথায় মরবে? কাশী না বৃন্দাবন?'

'কাশী।'

তবে ফিরে চলো কাশীতে। স্বস্থানে গিয়ে অধিষ্ঠিত হও।

কাশীতে এসে রামকৃষ্ণ বললে, 'বীণ শুনব।'

মদনপুরায় মহেশ সরকার ও[illegible]কার। দেশ-বিদেশে প্রচণ্ড নাম-ডাক। হৃদয় খবর নিয়ে এল। চল্ তবে যাই ওস্তাদের বাড়িতে। বীন শুনে আসি।

মথুর বাবু বললেন, 'ওখানে যাবে কেন? তাঁকে এখানে ডেকে আনি, ফরমাস মতো শোনো তোমার যতো ইচ্ছে—

রাখো তোমার মিথ্যে মর্যাদার চটকদারি। উনি বড় যে বাজিয়ে সে তো প্রকাণ্ড সাধক, তার খেয়াল রাখো? স্বয়ং বিশ্বযন্ত্রী ঈশ্বর তার স্পর্শে এসে ঝংকৃত হচ্ছেন। সে তো বিভূতি-ভূষিত। চল রে হৃদু, শুনে আসি। যা-ই শোনা তাই দেখা।

"যাহা শুনি কর্ণপুটে সকলি মার মন্ত্র বটে।"

দুজনে এসে হাজির হল মদনপুরায়। সটান মহেশ সরকারের বাড়িতে। মহেশ সরকার বাইরের ঘরেই বসেছিল। রামকৃষ্ণ বললে, 'বীণ শোনাও।'

এ যেন স্বয়ং বীণাবাদিনীর আদেশ। মহেশ সরকার বীণ তুলে নিল। ঝংকার তুললে।

সুর-সাগরে অমৃতের ঢেউ খেলে গেল। মুহূর্তে ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে পড়ল রামকৃষ্ণ। বললে, 'মা গো, আমায় বেহুঁস করে রাখিস নে, আমায় হুঁস দে! আমি ভালো করে বীণা শুনি।'

রামকৃষ্ণ সমাধি-ভূমি থেকে নেমে এল। নেমে এল অনুভূতির ভূমিতে। বাহ্যজ্ঞানের শেষ প্রান্তে। ঠায় তিন ঘণ্টা বীণ শুনলে এক টানা।

শুধু কি বীণা শুনলাম? শুনলাম এই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিটাই একটা অপূর্ব সুরঝংকার। গ্রহে-নক্ষত্রে বৃক্ষে-তৃণে, নীহারিকা থেকে ধূলিকণায়, প্রত্যেকটি পলায়মান মুহূর্তকণায়, বাজছে এই গীতছন্দ। ছুটেছে ভুবনপ্লাবিনী সুরশৈবলিনী।

যা শোনা তাই আবার দেখা।

রামকৃষ্ণ দেখল সেই সুরশব্দ যেন একটা উজ্জ্বল চৈতন্যের মত প্রতিভাত। যেন সূর্য উঠেছে রাত্রির আকাশে। ইন্দ্রিয়ের জগতে চৈতন্যের আবির্ভাব। হৃদাকাশে চিদাদিত্য।

বীণার সঙ্গে-সঙ্গে রামকৃষ্ণ গলা মিলিয়ে গান [illegible]ল।

[illegible] 'বার গয়া যাব। তুমি যাবে?'

সর্বনাশ[illegible] গয়ায় গেলে এ দেহ কি আর থাকবে? জানো না আমার বাবার সেই স্বপ্নের কথা?

তাই গয়ায় আর নামলেন না মথুর বাবু। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সবাইকে নিয়ে ফিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বর।

আবার সেই অনন্ত আনন্দ-তীর্থ।

রামপ্রসাদ গেয়েছে, এ সংসার ধোঁকার টাটি। রামকৃষ্ণ গাইলে, 'এ সংসার মজার কুটি। ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি।'

বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড আর শ্যামকুণ্ড থেকে ধুলো

নিয়ে এসেছে রামকৃষ্ণ। কিছুটা পঞ্চবটীর চার দিকে ছড়িয়ে দিল আর কতক পুঁতলে তার সাধন-কুটিরের মধ্যে। এই সেই কুটির যেখানে বসে হয়েছিল তার নির্বিকল্পসমাধি। হয়েছিল ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার।

'ব্রহ্ম কেমন বল না?'

'ঘি খেয়েছিস তো? বল তো কেমন ঘি? কেমন ঘি, না, যেমন ঘি। তেমনি ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম। তাকে বোঝাব কি দিয়ে?

সেই পণ্ডিতের গল্প জানো না? এক রাজাকে রোজ ভাগবত শোনাত। আর পড়ার শেষে রোজই রাজাকে জিগগেস করত, রাজা, বুঝেছ? আর রাজাও রোজ বলত, আগে তুমি বোঝো। পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে ভাবত, রাজা অমন ধারা রোজ বলে কেন? ভাবতে-ভাবতে জ্ঞান হয়ে গেল—শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য সব মিথ্যে, আসল হচ্ছে হরিপাদপদ্ম। বিবাগী হয়ে চলে গেল সংসার ছেড়ে। রোজ কত বক্তৃতা ঝাড়ত, আজ যাবার আগে বলে গেল দুটি কথা: 'এবার বুঝেছি।'

তাই বলি, কলকলানি ছাড়ো। যতক্ষণ ঘি কাঁচা থাকে ততক্ষণই কলকল করে। পাকা ঘিয়ে আর শব্দ নেই। খালি গাড়ুতে জল ভরতে গেলেই ভকভকানি ওঠে। কিন্তু ভরে গেলে আর শব্দ হয় না। বিচারবুদ্ধি কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁর আনন্দের খবর পাওয়া যায়। মধুপানের আনন্দ পেলে মৌমাছি আর ভনভন করে না।

'আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা, বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক। [illegible]'

শশধর পণ্ডিত [illegible]। বললে, 'সে কি? আপনারো তবে ছিল বিচারবুদ্ধি?'

'তা, একটু-আধটু ছিল বৈ কি।'

উৎফুল্ল হয়ে উঠল শশধর। বললে, 'তবে বলে দিন আমাদেরো যাবে। আপনার কেমন করে গেল?'

ঠাকুর বললেন, 'অমনি এক রকম করে গেল।'

আমি দু হাত ছেড়ে দিয়েছি। আমি বগলে হাত দিয়ে টিপি না।

সেই এক বেয়ান এসেছিল আরেক বেয়ানের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরের বেয়ান তখন নানা রঙের সুতো কাটছে, বাইরের বেয়ানকে দেখে ভারি খুশি। কত দিন পরে এলে, যাই তোমার জন্যে কিছু জলখাবার আনি গে। যেই জলখাবার আনতে গেছে সেই ফাঁকে বাইরের বেয়ান এক তাড়া রঙিন সুতো বগলের তলায় লুকিয়ে ফেলেছে। জলখাবার নিয়ে এসে ঘরের [illegible] বুঝতে পারলে বাইরের বেয়ানের কাণ্ডখানা। তখন সে এক ফন্দি ঠাওরালে। বললে, কত দিন পরে এলে, এস আজ দুজনে একটু আনন্দ করি। কি আনন্দ? এস দুই বেয়ানে নৃত্য করি। ভালো কথা। দুই বেয়ানে নাচতে লাগল। ঘরের বেয়ান দেখল বাইরের বেয়ান হাত না তুলেই নৃত্য করছে। হাত না তুলে নাচ কি একটা নাচ? ঘরের বেয়ান তখন বললে, এমন আনন্দের দিনে এস আজ হাত তুলে নাচি। ভালো কথা। কিন্তু বাইরের বেয়ান এক হাতে বগল টিপে আরেক হাত তুলে নাচতে লাগল। ও আবার কেমন নৃত্য? এস, দু হাত তুলে নাচি। এই দেখ—ঘরের বেয়ান দু হাত তুললে। বাইরের বেয়ান যে-কে-সে। তেমনি বগল টিপে এক হাত তুলেই সে নাচতে লাগল। বললে, যে যেমন জানে বেয়ান—

আমি কিছুই জানি না। আমি তাই দু হাত ছেড়ে দিয়েছি। আমার সরল শরণাগতি।

তীর্থ থেকে ফিরে এসে রামকৃষ্ণের শুধু সেই তীর্থের [illegible] সরল। তা ছাড়া আবার কি। মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দেরই কথা কয়।

কী পেলেন তীর্থ করে?

কী পেলাম? জ্ঞান পেলাম। যতক্ষণ বোধ হয় ঈশ্বর সেথা ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান। যা মন চায় তারই পিছে ধায়। কিন্তু ছুটতে হবে কেন? যা মন চায় তাই মনের মাঝখানে। যা হাত চায় ধরতে তাই হাতের কাছাকাছি।

তামাক খাবে, তাই গেছে প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে। ঢের রাত হয়েছে, প্রতিবেশী ঘুমে অচেতন। অনেক ধাক্কাধুক্কি, অনেক হাঁক-ডাক। ঘুম ভেঙে গেল প্রতিবেশীর। দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল—এ কি, এত রাতে কি মনে ক'রে। আর কি মনে ক'রে! তামাক খাব কিন্তু টিকে ধরাবার দেশলাই নেই। তারি জন্যে এত কষ্ট, এত হৈ-হল্লা। তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে—সে আছে কি করতে?

হৃদাকাশে চিদাদিত্য। চলেছি আমরা তবে আর কোন দেশে কোন সূর্যের সন্ধানে?

কথাটা এই, বুড়ি ছুঁয়ে যা ইচ্ছে কর—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ... লালা-আস্বাদন করে বেড়াও। সাধু শহরে এসে হেথা-হোথা ঘোরাঘুরি করে নানা রকম আমোদ করে বেড়াচ্ছে। পথে আরেক মুসাফির সাধুর সঙ্গে দেখা। মুসাফির বললে, এত যে চার দিকে রঙ দেখে বেড়াচ্ছ, তা তোমার পোঁটলাপুঁটলি কোথায় রাখলে? কেন,—আগে বাসা ঠিক করলাম, তালা-চাবি কিনলাম, পরে পোঁটলাপুঁটলি ঘরের মধ্যে চাবি দিয়ে বন্ধ করলাম। বন্ধ করে রেখে তবে আমোদ করতে বেরিয়েছি।

জানো শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলুম। সেখানে খুব সংকীর্তন হল। বহু লোকের আসর বসল। মাকে বললুম, মা এ সব কি সত্য? সত্য যদি হয় তবে দেশের জমিদার কেন আসবে না? এসে গেল জমিদার। সেধে গায়ে পড়ে আদর করে কথা কইলে।

ওরে হৃদু, একটি সুন্দরী ধরে নিয়ে আয়।

হৃদয় তো অবাক।

ওরে নিয়ে আয়। আমি পূজো করব।

বুঝি মামীর কথা মনে পড়ল হৃদয়ের। সেই তার পদ্মদল দিয়ে পাদপদ্ম পূজো ... কথা। কিন্তু কোথায় মামী!

চৌদ্দ বছরের একটি সুন্দরী সধবা কন্যা জোগাড় করল হৃদয়। কোন বাড়ির বউ বা মেয়ে।

কিন্তু রামকৃষ্ণ দেখল সাক্ষাৎ ভগবতী। পূজো করলে। প্রণাম করলে। ওরে তোরা কেউ প্রণামীর টাকা এনে দে মাকে।

তাতেও তৃপ্তি নেই রামকৃষ্ণের। যখন যে কুমারী মেয়ে কাছে পায় তাকে ধরে এনে পূজো করে। হোক সে যত অকুলীন যত অপরিচ্ছন্ন।

শুদ্ধাত্মা কুমারীতেই ভগবতীর বেশি প্রকাশ।

রামলীলা দেখতে গেল রামকৃষ্ণ। যারা রাম-লক্ষ্মণ সেজেছিল, হনুমান-বিভীষণ সেজেছিল সবাইকে পূজো করতে বসল। মনে হল আসলে-নকলে ভেদ নেই। নারায়ণই এ সব মানুষের রূপ ধরে রয়েছেন।

বৈষ্ণবচরণও তাই বলত। বলত, নরলীলায় বিশ্বাস হলেই তবে পূর্ণ জ্ঞান হবে।

বকুলতলার ঘাটের কাছে এক দিন দেখল নীলাম্বরী পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মেয়ে না পথের মেয়ে নজর করে দেখতেও চাইল না। মুহূর্তে সীতার উদ্দীপন এসে গেল। দেখল সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার পেয়ে রামের কাছে যাচ্ছে।

'এমন ভাবও দেখিনি, এমন রোগও দেখিনি।' বলে হৃদয়রাম।

বললে কি হয়, কেবল জমি-জমি করে। এত যার সেবা-পূজা করছে তার সঙ্গ-স্পর্শেও যেন কিছু সুফল হচ্ছে না। রামকৃষ্ণ তার হাতের জিনিস, রামকৃষ্ণের পায়ে কাউকে হাত ঠেকাতে দিতে পর্যন্ত সে নারাজ, তবু হাতে পেয়েও আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। হৃদয় টাকা খুঁজছে, জমি খুঁজছে, গরু খুঁজছে।

এক দিন ধরল গিয়ে শম্ভু মল্লিককে। বললে, 'আমায় কিছু টাকা দাও।'

শম্ভু মল্লিকের ইংরিজি মত। বললে, 'তোমায় কেন টাকা দিতে যাব? তোমার তো দিব্যি শরীর আছে, তুমি তো খেটে খেতে পারো।'

'দিব্যি শরীর?'

যা হোক কিছু রোজগার তো করছ। তোমায় দেব কেন? যারা খুব গরিব, কিংবা কাণা-খোঁড়া তাদের দিলে কাজ হয়।'

থাক মশাই, ঢের হয়েছে।' হৃদয় ঝলসে উঠল: 'আমার টাকায় কাজ নেই। ঈশ্বর করুন আমায় যেন কাণা-খোঁড়া হতদরিদ্দির না হতে হয়। আপনারো দিয়ে কাজ নেই, আমারো নিয়ে কাজ নেই। ...

রামকৃষ্ণ ... । কি এমন ভাবের ঢেউ দিয়েছ। তোমার মার কাছে গিয়ে কিছু সিদ্ধাই চাইতে পার না? যাতে করে কিছু খাঁটি দ্রব্য লাভ হয় তার দিকে দৃষ্টি দিতে পারো না? তোমার এ ভাব দিয়ে কি অভাব মিটবে?

আবার? ধমকে উঠল রামকৃষ্ণ। তোর পাল্লায় পড়ে সিদ্ধাই চাইতে গিয়ে আমি যা দেখেছিলাম তা আমি ভুলিনি। জানিস তো, 'মাগনেসে ছোটা হো যাতা'। এমন যিনি ভগবান তিনি যখন ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিলেন, তাঁকে বামন রূপ ধরতে হয়েছিল। কেন মিছিমিছি চাইতে গিয়ে ছোট হবি?

রাখো ওসব তত্ত্ব কথা। তত্ত্ব কথায় পেট ভরে না।

হৃদয় একটা এঁড়ে বাছুর কিনলে।

ঘাস খাওয়াবার জন্যে নিত্যি সেটাকে বাগানে বেঁধে রাখে। কত যত্ন-আত্তি করে। সোহাগ করে গলায়-পিঠে হাত বুলোয়।

"রোজ ওটাকে ওখানে বেঁধে রাখিস কেন রে?' জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ।

'ওটাকে দেশে পাঠিয়ে দেব '

'কেন, সেখানে কী?'

'বড় হলে সেখানে ও লাঙল টানবে।'

কোথায় কামারপুকুর, শিওড়, আর কোথায় কলকাতা। বাছুরটা সেখানে যাবে ঐ পথ ভেঙে। সেখানে গিয়ে বড় হবে। বড় হয়ে লাঙল টানবে।

মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল রামকৃষ্ণ।

এরই নাম মায়া, এরই নাম সংসার।

চালের আড়তে বড়-বড় ঠেকের মধ্যে চাল থাকে। যাতে ইঁদুর ঐ চালের সন্ধান না পায়, আড়তদার একটা কুলোতে করে খই-মুড়কি রেখে দেয়। ঐ খই-মুড়কি খেতে মিষ্টি, ইঁদুরগুলো তাই সমস্ত রাত কড়র-মড়র করে খায়। চালের সন্ধান আর পায় না।

ওরে, মায়াকে চিনতে চেষ্টা কর। মায়াকে যদি চিনতে পারিস, মায়া আপনি লজ্জায় পালাবে। হরিদাস বাঘের ছাল পরে একটা ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছিল। ছেলেটা বললে, আমি চিনেছি, তুই আমাদের হরে। হরিদাস তখন হাসতে-হাসতে চলে গেল। [illegible]

হরিদাসকে চিনবে না [illegible] তার বাঘের ছালেই সে মাতোয়ারা।

উনচল্লিশ

আমার তো মামাই আছে। আমার আবার ভাবনা কী। আমার আবার কিসের সাধন-ভজন।

হৃদয় ডঙ্কা মেরে বেড়ায় আর বিষয়-আশয়ের ফিকির খোঁজে। কোথায় একখানা জমি, কোথায় একটা গরু, কোথায় কটা টাকা। পরিবারের জন্যে একখানা গয়না, নিজের জন্যে একখানা শাল।

সাধক-ভক্তদের কাছ থেকে শোনে যখন রামকৃষ্ণের অলৌকিকত্বের কথা, তখন বলে, ভালোই তো, আমার মেহনৎ কমল। ঐ যে কথায় বলে না, মামার হলেই ভাগনের হল। আমারো হয়েছে তাই। ওর হওয়াতেই আমার ষোল আনা হয়ে আছে। মহাদেব যখন পার হবেন তখন নন্দী-ভৃঙ্গীকেও নিয়ে যাবেন [illegible] করে।

তার পরে পরিচর্যা কম করছি? আমি না হলে ওর সাধুগিরি বেরিয়ে যেত। আমি আছি বলেই ওর এত জেল্লা-জমক। আমাকে কি আর ও ফেলতে পারে?

আমি তাই খাই-দাই আর তুড়ি মারি। আর আর যদি পারি তো এই ফাঁকে কিছু গুছিয়ে নিই চাল-কলা।

এমনি সময় তার স্ত্রী মরল।

মুহূর্তে মন কেমন উলটো-মুখো হয়ে গেল। সংসার যেন উড়ে গেল তাসের ঘরের মত। টাকার তোড়া মনে হল ধূলোর ঝোড়ার মত।

সেও খুলে ফেলল পরনের কাপড়, ছুঁড়ে ফেলল গলার পৈতে। উগ্র ভঙ্গি করে বসল ধ্যানাসনে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে এক দিন ধরল গিয়ে রামকৃষ্ণকে। বললে, 'তোমার যেমন ভাব-টাব হত, তেমনি আমার করে দাও। আমাকে ডুবিয়ে দেও অতলে। দেখাও তোমার মহামায়াকে—'

[illegible] বললে, 'তোর ও সবে দরকার নেই।'

'আলবৎ আছে।' গর্জে উঠল হৃদয়। বললে, 'তুমিই ফল পাবে আর কেউ পাবে না? মা কি তোমার একলার?'

'ওরে, শুধু আমাকে সেবা করলেই তোর ফল হবে।'

'ঢের সেবা করেছি এত দিন। কিছু হয়নি। আমার এখন ভাব চাই। আমাকে ভাব দাও।'

'কী বলিস পাগলের মত!' রামকৃষ্ণ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। 'আমরা যদি দু জনেই ভাবে বিভোর হয়ে থাকি, তখন কে কাকে দেখবে?'

'তা আমি জানি না।' হৃদয় ছাড়বার পাত্র নয়। তাকে তখন বৈরাগ্যে পেয়ে বসেছে। বললে, 'আমাকে তুমি বলে দিয়ে যাও, কি করে কি হবে—'

'আমার ইচ্ছায় কিছুই হবার নয়। সব মার ইচ্ছে। মাকে গিয়ে ধর, মার যদি ইচ্ছে হয়, তোরও হবে। যদি ইচ্ছে করেন নিঃস্বকেও তিনি বিশ্বজয়ী করতে পারেন।'

বেশ, তবে মাকেই ধরব। এই ধরলাম। এই বসলাম দৃঢ়াসনে।

আস্তে-আস্তে দর্শন হতে লাগল হৃদয়ের। পুজায় বা ধ্যানে বসে সুরু হল অর্ধবাহ্যদশা। কখনো বা নিবিড় ভাবাবেশ।

মথুর বাবু প্রমাদ গণলেন। জিগগেস করলেন রামকৃষ্ণকে, 'হৃদয়ের আবার এ সব কী হচ্ছে? ঢং না কি?'

'না। খুব ব্যাকুল হয়ে মাকে ধরেছিল, মা-ই এই ভাব এনে দিয়েছেন।'

'সর্বনাশ। তা হ'লে কী হবে হৃদয়ের?'

'কিছু ভয় নেই। মা-ই সব দেখিয়ে-বুঝিয়ে দু দিনে তাকে ঠাণ্ডা করে দেবেন।'

মথুর বাবু বুঝলেন এ সবই রামকৃষ্ণের খেলা। বললেন, 'বাবা, তুমিই ওকে ভাব দিয়েছ, তুমিই আবার ওকে ঠাণ্ডা করে দাও। আমরা তোমার দুই ভৃত্য, নন্দী আর ভৃঙ্গী, আমরা তোমার কাছে-কাছে থাকব, তোমার সেবা-চর্যা করব। আমাদের আবার এ ছাড়া ভাব কি, এ ছাড়া কাজ কি। আমাদের আবার কিসের অদ্বৈত অবস্থা।'

পঞ্চবটীর দিকে চলেছে রামকৃষ্ণ। হয় তো দরকার হতে পারে, হৃদয় গাড়ু-গামছা নিয়ে চলল পিছু-পিছু। যেতে-যেতে অপূর্ব দর্শন হল তার। অলোক-অবলোকিত দর্শন। দেখল রামকৃষ্ণ দেহ-ধারী মানুষ নয়, একটি চলমান জ্যোতি-বর্তিকা। দিব্যকলেবরে অরুণরক্তিমরুচি। সেই আলোতে পঞ্চবটী প্লাবিত, উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় দুখানি পা যেন মাটি স্পর্শ করছে না, শূন্যের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। যেন শূন্য সরোবরে রক্ত পদ্ম চলেছে ফুটতে-ফুটতে।

হৃদয় চোখ মুছল। সব ঠিক আছে। শুধু রামকৃষ্ণই আর দেহে নেই, শিখাময় হয়ে গিয়েছে।

তাকালো সে নিজের দিকে। এ কি! তারও দেখি দিব্যসত্তা, সেও দেখি নিরঙ্গ-উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে যেন ঐ সম্মুখবর্তী দিব্য-অঙ্গেরই অংশস্বরূপ। দেবতার পশ্চাতে দেবানুচর। দেবতার সেবা-সঙ্গ করবার জন্যে দেববেশে তার এই পৃথকস্থিতি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল হৃদয়, 'ও রামকৃষ্ণ! শুনছ? আমরা মানুষ নই, আমরা দেবতা।'

একবার চেঁচিয়ে ক্ষান্তি নেই হৃদয়ের। দিগ বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আবার সে চেঁচিয়ে উঠল অবোধের মত: 'ও রামকৃষ্ণ! দাঁড়াও! দেখছ আমরা কে! আমরা তবে কেন এখানে পড়ে আছি?'

'ওরে থাম, থাম—চেঁচাস নে—' রামকৃষ্ণ মিনতি করল।

'কেন থামতে যাব? তুমিও যা আমিও তাই। আমরা দু জনেই অবতার।'

'ওরে থাম, লোকজন সব এখুনি ছুটে আসবে।'

'আসুক না লোকজন।' হৃদয় তবু থামবে না কিছুতেই। সমানে চেঁচাতে লাগল। 'এ দেশে থেকে আর আমাদের লাভ কি? চলো অন্য দেশে যাই। দেশে দেশে গিয়ে জীবোদ্ধার করি।'

কিছুতেই স্তব্ধ হবে না হৃদয়।

রামকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ছুটে এল হৃদয়ের কাছে। তার বুকে হাত ঠেকিয়ে দিলে। বললে, 'দে মা, শালাকে জড় করে দে।'

দিব্যদর্শন ছুটে গেল মুহূর্তে। আনন্দের সাগর এক শ্বাসে শুকিয়ে গেল। সেই শরীরী শিখা নিবে গিয়ে মূর্ত হল রক্ত-মাংসের দেহ।

'মামা, এ কী করলে?' কেঁদে ফেলল হৃদয়। 'আমাকে জড় বানিয়ে নিলে?'

'তোকে শুধু একটু স্তব্ধ করে দিলাম।'

'আমি আর দেখতে পাব না সেই দৃশ্য?' নিঃস্বের মত তাকিয়ে রইল হৃদয়।

'তুই যে বড্ড গোল করিস। একটু কি দর্শন দেখেই একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলি। দেশশুদ্ধ লোক [illegible] জড়ো [illegible]।'

দরকার নেই [illegible]। আমি একাই পারব। রামকৃষ্ণ যদি পেরে থাকে, আমিই বা কম কিসে। ধ্যান-জপের মাত্রা বাড়িয়ে দিল হৃদয়। গভীর রাত্রে উঠে-উঠে যেতে লাগল পঞ্চবটী।

ঠিক করল রামকৃষ্ণ যেখানে বসে জপধ্যান করত সেখানেই আসন করতে হবে। হয় তো সেই জায়গাটিই পয়মন্ত। হয় তো বা মাটির কোনো গুণ আছে। দেখি না কি ফল হয়!

যেই সেই জায়গাটিতে বসেছে আসন করে, অমনি চীৎকার করে উঠল: 'মামা গো, পুড়ে মলাম, পুড়ে মলাম। শিগগির বাঁচাও।'

সে আর্তনাদ শুনতে পেল রামকৃষ্ণ। ত্রস্ত পায়ে

ছুটে এল ঘর ছেড়ে। মুখে এক করুণ জিজ্ঞাসা: 'কি রে, কি হয়েছে?'

'এইখানে ধ্যান করতে বসা মাত্র কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢেলে দিলে।' যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল হৃদয়। 'সারা গা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে।'

'তুই কেন এ সব করিস বল তো? তোকে বলেছি না আমার সেবা করলেই তোর সব হবে। কেন তবে এ সব ঝামেলা করছিস? নে, ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি তোকে—' রামকৃষ্ণ তার গায়ে স্নেহকরুণ হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সেই স্পর্শে শান্তি হয়ে গেল হৃদয়ের। গঙ্গাস্নানের মত এল যেন শীতল নির্মলতা।

বুঝলে সেবা ছাড়া আর তার পথ নেই। শুশ্রূষা ছাড়া নেই তার আর কোনো জিজ্ঞাসা।

বেশ আছি। যেখানে আছি, সেখানেই আমার রামের অযোধ্যা। 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে হাততালি দিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় আমার শুধু হরিনাম। তা হলেই সব পাপ-তাপ চলে যাবে। পাপ-হরণ করেন বলেই তো তিনি হরি। দেহবৃক্ষে পাপ হচ্ছে পাখি আর নামকীর্তন হচ্ছে হাততালি। যেমন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে পাখি উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহ থেকে পালিয়ে যায় অবিদ্যা।

যা আমার হবার নয় তার পিছনে ছুটি কেন? আমার শুধু ডাকের আশায় দাঁড়িয়ে থাকা। "হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছি করপুটে।"

এই সব ভাবে বটে কিন্তু মনের আনাচে কোথায় একটু অহং থেকে যায়। [illegible] কে কোথায় লুকিয়ে থাকে অশ্বত্থের বীজ, তা [illegible] কে ফেঁকড়ি বেরোয়।

হৃদয় বললে, বাড়িতে এবার দুর্গোৎসব করব। মা আমার পূজো নেন কি না দেখতে হবে। মথুর বাবুকে বললে, 'কিছু টাকা দিন।'

'তা দিচ্ছি।' মথুর বাবু রাজি হলেন একবাক্যে। বললেন, 'কিন্তু বাবাকে নিয়ে যেতে পাবে না।'

সে কি কথা? আমার বাড়িতে প্রথম পূজো, মামা থাকবে না?

'নাই বা থাকলাম। তুই তার জন্যে ক্ষুণ্ণ হোস নে হৃদু।' সান্ত্বনা দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আমি রোজ সূক্ষ্ম দেহে তোর পূজো দেখতে যাব। আর তোকে বলছি, আর-কেউ দেখতে পাবে না আমাকে, কিন্তু তুই পাবি।'

আরো শোন, বলে দিই, কাকে দিয়ে প্রতিমা গড়াবি, কে হবে তন্ত্রধারক। নিজের ভাবে নিজেই পূজো করবি। আর শোন, একেবারে উপোস করে থাকিস না, দুধ গঙ্গাজল আর মিছরির সরবৎ খাবি। বুঝলি?

হলও তাই। রোজ পূজো-সাঙ্গের পর রাতে আরতি করবার সময় হৃদয় দেখতে পেত রামকৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছে প্রতিমার পাশে।

আশ্চর্য, প্রতিমা প্রতিমাই থাকে। কিন্তু করুণাঘন রামকৃষ্ণ দাঁড়ায় এসে ভক্তের আঙিনায়।

চল তবে সেই করুণা-নিলয়ের কাছে। সেখানে গিয়ে তারই সেবারাধনায় মন দিই।

হৃদয়ও তাই ফিরে গেল দক্ষিণেশ্বরে। শুধু মাঝখান থেকে আরেকবার বিয়ে করে নিলে।

চল্লিশ

সতেরো বছরের সুরূপ ছেলে এই অক্ষয়। মা-বাপ-মরা ছেলে। বসেছে বিষ্ণুমন্দিরের পূজারি হয়ে। ধ্যানে নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে দু-তিন ঘণ্টা। নিজের হাতে রান্না করে খায়। সারা দিন গীতা পড়ে। [illegible] সরই

শুধু ভাই-পো বলে নয়, ভক্তির জোর দেখে তাকে বড় ভালোবাসে রামকৃষ্ণ।

সেই অক্ষয়ের বিয়ে হল। বিয়ের পরেই অসুখে পড়ল। ডাক্তার বললে, সামান্য জ্বর, সেরে যাবে।

কিন্তু হৃদয়কে ডেকে নিয়ে বললে রামকৃষ্ণ, 'হৃদু, লক্ষণ বড় খারাপ। ছোঁড়া বাঁচবে না।'

'ছি মামা। তোমার মুখ দিয়ে এ কথা বেরুলো কেন?'

'তার আমি কি জানি। মা যেমন বলান তেমনি বলি। নইলে, বল্, আমার কি ইচ্ছা অক্ষয় চলে যায়?'

হৃদয় উঠে-পড়ে লাগল কি করে ভালো করা যায় অক্ষয়কে। যত ডাক্তার আছে কাউকে বাদ দিলে না। কিন্তু যার ডাক পড়েছে ডাক্তার তার কী করবে।

মাস খানেক ভুগে এমন জায়গায় এসে ঠেকল যখন সলতে আর উস্কে দেওয়া যায় না। এল সেই

অন্তিম মুহূর্ত। রামকৃষ্ণ পাশে বসে অক্ষয়কে সম্বোধন করে বললে গাঢ়স্বরে, 'অক্ষয়, বলো, গঙ্গা, নারায়ণ, ওঁ রাম।' ঐ মন্ত্র তিন-তিন বার আবৃত্তি করল অক্ষয়। তার পর ধীরে-ধীরে লীন হয়ে গেল।

মাটিতে আছাড় খেয়ে কাঁদতে লাগল হৃদয়। রামকৃষ্ণ চলে গিয়েছে ভাবভূমিতে। হৃদয় যত কাঁদে, তত হাসে রামকৃষ্ণ। নাচে, গান গায়। অমৃততীর্থে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে অক্ষয়। ক্ষয়হীন আনন্দধামে। এ দেখে যদি আনন্দ না হয় তবে কী দেখে হবে!

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বেশ স্পষ্ট দেখল চোখের উপর। দেখল কি করে মানুষ মরে, কি করে আত্মা বেরিয়ে আসে দেহ থেকে, কোথায় যায় সে আত্মা। দেখল খাপের ভিতর থেকে ঝকঝকে তরোয়াল এল বেরিয়ে। তরোয়ালের কিছু হল না, শুধু খাপটা পড়ে রইল। সেই উজ্জ্বল নির্ভীক তরোয়াল এই মায়া-মিথ্যার তমসা ভেদ করে চলে গেল লোকাতীত আলোকতীর্থে।

কিন্তু সেই ভাবলোক ছেড়ে নেমে আসতে হল ফের স্থূল মাটিতে পর দিন কালীবাড়ির উঠোনের সামনের বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ, দেখল, অক্ষয়ের নর-দেহ পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে ফিরে আসছে শ্মশানযাত্রীরা। যেমনি দেখা অমনি বুক-ফাটা কান্না পেল রামকৃষ্ণের। গামছা যেমন নিঙড়োয়, মনে হল বুকের ভিতরটা তেমনি কে নিঙড়োচ্ছে। সমস্ত দুঃখ অবুঝ অশ্রুর উচ্ছ্বাসে উথলে উঠল।

সে জলতরঙ্গ কে রোধ করে।

'মা, এখানে পরনের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল। এখানেই যখন এ রকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কী না হয়! তাই দেখাচ্ছিস বটে।'

কখনো আমি-আমার বলে না রামকৃষ্ণ। সব 'এখানে', 'এখানকার':

'আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল।'

'কৃষ্ণকিশোরের ভবনাথের মত দুই ছেলে। দুটো-আড়াইটে পাশ। মারা গেল। অতো বড়ো জ্ঞানী। প্রথম-প্রথম সামলাতে পারলে না। আমায় ভাগ্যিস ঈশ্বর দেননি।' ঠাকুর বললেন আত্মগতের মত।

কে এক জন ভক্ত বললে, 'ঈশ্বরে খুব ভক্তি হয় তো বেশ হয়। শোক-টোক থাকে না।'

'উঁহু। শোক ঠেলে দেয় ভক্তিকে।'

বিধবা ব্রাহ্মণী—তার একমাত্র মেয়ে, নাম চণ্ডী। খুব বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছে মেয়ের। জামাই প্রকাণ্ড জমিদার, খেতাব পেয়েছে রাজা বলে। থাকে কলকাতায়, জাঁক-জমকের সংসার। মেয়েটি যখন বাপের বাড়ি আসে, সামনে-পিছে সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে আসে। মায়ের বুক দশ হাত হয়। কিন্তু পলতের বাতি নিবে গেল এক ফুঁয়ে। কি একটা সামান্য অসুখে অল্প ক'দিন ভুগে মেয়েটি চোখ বুজল।

বিধবা থাকে সেই বাগবাজার। কি করে এই অসাধ্য শোক শান্ত করবে তারই জন্যে বাগবাজার থেকে থেকে-থেকে ছুটে আসে পাগলের মত। যদি ঠাকুর কিছু উপায় বলে দেন। যদি সেই শীতল শান্তমূর্তি দেখে বুক জুড়োয়।

ব্রাহ্মণীর দিকে তাকালেন একবার ঠাকুর। বললেন, 'সেদিন এক জন মজার লোক এসেছিল। খানিকক্ষণ বসে থেকে বললে, যাই এখন একবার ছেলের চাঁদমুখটি দেখি গে। আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, তবে রে শালা! ওঠ্ এখান থেকে। ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের চাঁদমুখ?

বাগবাজারে নন্দ বোসের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন ঠাকুর। কথা আছে নন্দ বোসের বাড়ি থেকে যাবেন ব্রাহ্মণীর বাড়ি।

সেই ঠাকুর আর আসেন না। ব্রাহ্মণী কেবল ঘর-বার [illegible] আর এলেন না। অভাগিনীর অঙ্গনে [illegible] ভগবানের পদার্পণের স্থান আছে?

শেষকালে উচাটন হয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। গেল সটান নন্দ বোসের বাড়ির দিকে। খবর নিতে, চলে গেলেন না কি দক্ষিণেশ্বর? না কি নন্দ বোসের আনন্দ ভবন পেয়ে ভুলে গেলেন দুঃখিনীর শোকম্লান ঘরের কোণটি?

ব্রাহ্মণীও গেছে, আর অমনি ঠাকুর এসে পড়লেন ভক্তদের নিয়ে।

বাড়িতে ব্রাহ্মণীর ছোট বোন, সেও বিধবা। বললে, 'দিদি এই গেলেন নন্দ বোসের বাড়ি খবর নিতে। এই এলেন বলে।'

ছাদের উপর সবাইকে নিয়ে বসেছেন ঠাকুর। ছেলে-বুড়ো পুরুষ মেয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণে-প্রাণে বয়ে চলেছে ভক্তির স্রোতস্বতী। এত লোক, তবু মনে হচ্ছে, এক জন কে নেই।

'ঐ দিদি আসছেন।' ছোট বোন উছলে উঠল।

ছাদে উঠে ঠাকুরকে দেখে ব্রাহ্মণী কি বলবে কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। অস্থিরের মত এদিক-ওদিক করছে। বলছে, 'আমি নিশিদিশি কাঁদি, কিন্তু, ওগো, আমি যে এখন আহ্লাদে আর বাঁচি না। তোমরা সব বল গো আমি কেমন করে বাঁচি। ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল—সঙ্গে সেপাই-শাস্ত্রী—পাহারা দিচ্ছিল বাড়ির দরজায়, তখনো যে আমার এত আহ্লাদ হয়নি গো। আমার এ কি হোল, চণ্ডীর শোক আর আমার এখন একটুও নেই গো। মনে করেছিলাম তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন করেছি সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব। আর ওঁর সঙ্গে আলাপ করব না, যেখানে আসবেন একবার অন্তর থেকে দেখে আসব। তাই, সকলকে বলি, আয় রে আমার সুখ দেখে যা, আমার ভাগ্যি দেখে যা দেখে যা আমার ঘরে আজ কে এসেছে। ওগো, আমি মরে যাব, আমার এত সুখ সইবে না। তোমরা সবাই মিলে আশীর্বাদ করো আমাকে, নইলে মরে যাব সত্যি-সত্যি -'

অক্ষয়ের মৃত্যুর পর থেকে রামকৃষ্ণ কেমন বিষণ্ণ। মথুর বাবু বললেন, চলো একবার আমার জমিদারিটা ঘুরে আসবে।

তাই চলো। ওরে হৃদু, জমিদারি দেখবি চল।

চূর্ণীর খালে নৌকোয় করে বেড়াচ্ছে তিন জন। রানাঘাটের কাছাকাছি কলাইঘাটায় এসে রামকৃষ্ণের চোখ পড়ল দারিদ্র্যদলিত জনগণের উপর। রামকৃষ্ণ বললে, 'এই তোমার জমিদারির চেহারা? এই হাল তোমার মহালের?'

কেন, কী হল?

দেখ দেখি ঐ লোকগুলোর দিকে। পরনে ট্যানা, পেটে-পিঠে এক হয়ে রয়েছে। শোনো, সবাইকে একখানা করে কাপড় দাও, আর খাইয়ে দাও এক বেলা।

যেমন চিরদিনের অভ্যেস, তানা-না-না করতে লাগলেন মথুর বাবু।

তবে তোমার জমিদারি জাহান্নমে যাক। চল রে হৃদু, আর জমিদারি দেখে না। ফিরে চল দক্ষিণেশ্বর।

মথুর বাবুকে আবার তাঁর থলের মুখ ফাঁদালো করতে হল। গ্রামের লোকদের অন্নবস্ত্র বিতরণ করলেন।

সাতক্ষীরার কাছে সোনাবেড়ে গ্রামে মথুর বাবুর পৈত্রিক ভিটে। তারই কাছাকাছি তালামাগরো গ্রাম। সে-গ্রামে তাঁর গুরুঘর। গুরুবংশে সরিকি অংশ নিয়ে ঝগড়া বেধেছে। আপোষনিষ্পত্তি করবার জন্যে তলব পড়েছে মথুর বাবুর।

এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। রামকৃষ্ণ আর হৃদয় চলেছে পাল্কিতে। আর মথুর বাবু হাতীর হাওদায়।

সহসা শিশুর মত হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আমি হাতী চড়ব।'

মথুর বাবু বাহন বদলালেন। রামকৃষ্ণ আর হৃদয়কে হাতীতে চাপিয়ে নিজে এলেন পাল্কিতে। হাতীতে চড়ে রামকৃষ্ণের আনন্দ তখন দেখে কে!

সর্বভূতে নারায়ণের গল্প জানিস তো? গুরু শিখিয়ে দিয়েছে শিষ্যকে, শিষ্যকে আর পায় কে। পথ দিয়ে হাতী চলেছে, উপর থেকে মাহুত বললে, সরে যাও। শিষ্যের তখন সর্বভূতে নারায়ণ—সে ভাবলে, সরব কেন? আমিও নারায়ণ, হাতীও নারায়ণ, আমাদের মধ্যে বিরোধ নেই সরাসরি হাতীর সামনে এসে দাঁড়াল, সরল না এক চুল। হাতী তাকে শুঁড়ে করে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেললে। ঘা-ব্যথা সারবার পর গুরুর কাছে এসে নালিশ করলে। গুরু বললে—ভালো কথা, তুমিও নারায়ণ হাতীও নারায়ণ, আর মাহুতটি নারায়ণ নয়? মাহুত নারায়ণের কথা শুনবে না?

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এল দলবল। কলুটোলায় কালী দত্তর বাড়ি বৈষ্ণবদের প্রকাণ্ড হরিসভা বসে। সেখানে এক দিন নেমন্তন্ন হল রামকৃষ্ণের। আর, যেখানেই রামকৃষ্ণ, সেখানেই তরুচ্ছায়ার মত হৃদয়রাম।

ভাগবত পাঠ হচ্ছে। তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই ভাগবত। রামকৃষ্ণও বসে পড়ল একধারে।

সামনে মহাপ্রভুর আসন। তার মানে বেদীতে যে আসন বিছানো তা হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের আসন। বৈষ্ণবদের পূজা-পাঠের সময় থাকে এমনি আসন বিছানো। কল্পনা করা হয় সেখানে গৌরাঙ্গ দেব

এসে বসেছেন, শুনছেন হরিকথা। ভক্তের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান, এই ভাবটিরই প্রতীক ঐ আসনখানি।

রামকৃষ্ণকে পেয়ে ভক্তির স্রোত আরো উত্তরঙ্গ হয়ে উঠল। হরিকথায় এল আরো অতলতরো অনুরক্তি।

কোথা থেকে কি হয়ে গেল কেউ টের পেল না, রামকৃষ্ণ হঠাৎ সেই চৈতন্যাসনের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ। একখানি হাত ঊর্ধ্বে তোলা আর তার আঙুলে সেই বাক্যাতীত ভাবলোকের নির্দেশ। সর্বাঙ্গ নির্বায়ু-নিশ্চল দীপ-শিখার মত স্থির, মুখে প্রেমপূর্ণ প্রসাদ-শান্তি। চৈতন্যদেবের সমস্ত চিহ্ন অঙ্গে-ভঙ্গে দেদীপ্যমান।

শ্রোতা-বক্তা সকলেই স্তম্ভিত হয়ে রইল। ভালো-মন্দ কোনো কথাই কারু মুখ দিয়ে বেরুল না। ভয়ে-বিস্ময়ে কাঠ হয়ে রইল সবাই।

এ কি অঘটন।

জনতার উগ্র দৃষ্টি শান্ত হয়ে এল ক্রমে ক্রমে। বিমূঢ় দৃষ্টিতে এল কোমল মুগ্ধতা।

যেই নাম শুনে সমাধি সেই নাম শুনেই আবার বহির্জ্ঞান। সুতরাং কীর্তন লাগাও। কীর্তন শুনিয়ে প্রভুর ধ্যান ভাঙাও।

বৈষ্ণবের দল কীর্তন সুরু করল। নাম-ঝংকারে জ্ঞান এল রামকৃষ্ণের। দু হাত তুলে সুরু করল নাচতে। মাধুর্যে উচ্ছল আবার উদ্দামতায় উত্তাল সেই যে নৃত্য সে-নৃত্য নটশ্রেষ্ঠ মহাদেবের। সবাই নামসৌরভে বিভোর হয়ে উঠল, নয়নরঞ্জনকে দেখে হয়ে রইল নিষ্পলক।

চৈতন্যদেবের আসন অধিকার করা রামকৃষ্ণের পক্ষে ন্যায় হয়েছে কি অন্যায় হয়েছে এ প্রশ্নের বাষ্পটুকুও কারু মনে রইল না।

কিন্তু ভাবের গিরিচূড়ায় কতক্ষণ থাকবে। নেমে আসতে হল দৈনন্দিন জীবনের সমতলতায়। তখন তর্ক উঠল এই আসন-অধিকারের ঔচিত্য নিয়ে। এক দল বললে, ঘোরতর অন্যায় হয়েছে। শুধু অন্যায় নয়, আস্পর্ধা। আরেক দল বললে, প্রাণ যেমন চায় ঠিক তেমনটি হয়েছে। শুধু ন্যায্য নয়, বাঞ্ছনীয়।

মীমাংসা হল না। সমস্ত বৈষ্ণব সমাজে বিষম আলোড়ন উঠল। এ যে ধর্মের কলঙ্কীকরণ। এর প্রতিকার কি?

সবাই গেল তখন কালনায়, ভগবানদাস বাবাজীর কাছে। ঘটনা শুনে ভগবানদাস তো রেগে কাঁই।

'ভণ্ড, ধূর্ত কোথাকার।' রামকৃষ্ণের উদ্দেশে তপ্ত-অঙ্গার গালাগাল ছুঁড়তে লাগল বাবাজী। পারে তো নখে-দাঁতে ছিঁড়ে ফেলে। বললে, 'আর কোনো দিন ঢুকতে দিও না ওকে হরিসভায়।'

এ কি অঘটন।

আর যে অঘটনের ঘটয়িতা, রামকৃষ্ণ, সে সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সে কিছু জানতেও পেল না।

সে এখন বসে আছে তৃণাসনে। সমস্ত তৃণাসনই তার চৈতন্যাসন। [ক্রমশঃ।

উল্টো বিপত্তি

এক জন বৈদেশিক, যে ভারতবর্ষের কোন ভাষার অক্ষর পর্য্যন্ত চেনে না, তার এক জন ভৃত্য ছিল যে ভারতবর্ষের অধিবাসী। বৈদেশিকটির ঘরের সকল কাজ করতো এই লোকটি। এক দিন কিছু উপহার এলো বৈদেশিকটির। কোন বন্ধু তাকে পাঠিয়েছে। উপহারের ভেতর অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে ছিল একখানা তোয়ালে। ভৃত্যটি তোয়ালেখানি বিছিয়ে রাখলে টেবিলের ওপর। তোয়ালের গায়ে কি যেন ইংরেজীতে লেখা। লেখা রয়েছে "TAM HTAB." বৈদেশিকটি কিছুতেই কথা দু'টির অর্থ বুঝতে পারে না। বহু ক্ষণ পরে আবিষ্কৃত হ'ল লেখাটি "BATH MAT", অর্থাৎ "স্নানের পাপোষ"।

ইংরেজী-অনভিজ্ঞ ভৃত্যটি তোয়ালেখানা উল্টে রেখেছিল, তাই এই বিপত্তি।

ওলোট-পালোট

অ, আ, ই

ইতিহাসের ধারা বদল হয়ে গেল।

এত দিন চলেছিল যে ধারায়, রাতারাতি পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। যে-দিকে সূর্য্য উঠছিল, সেদিকে যেন আর উঠলো না। বন্ধন ছিঁড়ে গেছে আপনা থেকেই। ছেলেকে ত্যাগ ক'রে গেছেন মা। বজ্রের মত শাসন যাঁর কঠোর, কুসুমের মত মৃদু হয় না সে একটি বারের মত? দয়া-মায়ার লেশ মাত্র নেই, এমনই ক্ষমাহীন। সেই সদাগম্ভীর আর স্বল্পভাষীর কঠিন দৃষ্টির সম্মুখে আর যেতে হবে না, স্বস্তির বাতাস লাগে যেন গায়ে। পাঠশালা, যেখানে আর কিছু নয়, শুধু লেখা আর পড়া, ব্যাকরণের সেই বিরস হাওয়ার সঙ্গে চুকে গেছে সম্পর্ক। দেবভাষার ধাতু-শব্দের জটিলতায় আর ভারাক্রান্ত করতে হবে না মন আর মস্তিষ্ক। ভট্টি, ভাস, বাণ আর মল্লিনাথের শরণাপন্ন হওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। সন্ধির ঘন-ঘন বিচ্ছেদেরও চিন্তা নেই আর।

এখন যা মন চায় করতে পারো। বলবার কেউ আর রইলো না।

জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর দৃঢ় বিশ্বাস ভেঙ্গে গেল খান-খান হয়ে। তাদের কেউ বিশ্বাস করতেই চাইলে না, বিধবা বৌটার এই সেদিনের ছেলেটা মদ আর মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়লো এই কাঁচা বয়সেই! একটা রাত যেতে না যেতেই হাওয়ায় হাওয়ায় জানলো কেউ কেউ। আর আর শরিকদারেরা, নসিরুদ্দিনের ছেলে বসিরই যত নষ্টের মূল জানলো। জানলো, সেই পথ দেখিয়েছে। কেউ কেউ বললো,—জিতা রও বেটা!

ঘুমটা ভেঙ্গেছে টম কুকুরের লাফালাফিতে। ভোর হ'তে না হ'তেই কোথা থেকে এসে কি একখানা বই দাঁত আর নখের সাহায্যে ছিঁড়েছে কুটি-কুটি। বেড়ালে তেলাপোকা হত্যা করে যে প্রক্রিয়ায়, ঠিক সেই ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে ছিঁড়েছে। কাগজের খড় মড় শব্দে চোখ মেলতেই দেখলো টমের কীর্ত্তি। টুকরো-টুকরো বইয়ের পাতা। ঘরের মেঝেয় ছড়াছড়ি।

বললে না কিছু। দেখেও।

বিছানার কাছাকাছি কোথায় পড়েছিল সরকারের কাষ্ঠ বুকখানা! কে জানে, কিসের রাগে টম তার এই শতছিন্ন অবস্থা ক'রেছে। রাজভাষা ধূলায় লুণ্ঠিত করেছে।

জানলার ওপরে রঙীন কাচের নক্সা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে। ভোরের প্রথম আলোয় যে যার রঙ বিকিরণ করে। ফুল আর লতা-পাতার ডিজাইনে দেখা যায় সূর্য্যোদয়ের ইঙ্গিত। অনেক দূরের থেকে ভেসে আসে মুরগীর ডাক। আস্তাবলে সইসদের পোষা-মুরগীর পাল। গমের কুটো খুঁটছে আর ডাকছে থেকে থেকে।

ঝড়-বৃষ্টির রাত গেছে। ভিজে বাতাস বইছে এখনও। বর্ষার আমেজে এখনও যেন ঘুমিয়ে আছে কলকাতা। শুধু মুরগী ডাকছে। মুন্সিপালের গাড়ী যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে।

কিন্তু টম এ কি করলো! আর মনিবও দেখে বললে না কিছু।

বিছানা থেকে উঠে ঘরের বাইরের দালানে বেরিয়ে পড়লো মিষ্টি ভোরবেলায়। দালানে যেতেই দৃষ্টি পড়লো একখানা গাড়ী যেন রয়েছে ফটকের মুখে।

হাওড়া ষ্টেশনের একখানা ছ্যাকরা গাড়ী কোন্ কেলাশের। এই ভোরের ট্রেনে ফিরেছেন ম্যানেজার বাবু। বিহার থেকে পুণ্যাহ সেরে আদায়-পত্র ক'রে ফিরেছেন প্রচুর মাল সঙ্গে নিয়ে। একখানা গাড়ীর প্রয়োজন হয়েছে তাই। সিপাই আর পাইকরা মাল নামাচ্ছে গাড়ীর মাথা থেকে।

মহলের ফেরতা ম্যানেজার বাবু। শুধু হাতে আসবেন? কলসী কলসী দই, ঘিয়ের মটকী, বালুসাই গজার চ্যাঙ্গারী, বস্তা বস্তা কড়াই আর অড়র। আরও কত কি। টাকার থলি, কারেন্সী নোট আর রৌপ্যমুদ্রা। বিহারী প্রজাদের মাটির তলায় পুঁতে-রেখে-দেওয়া টাকা। চৈত্র মাসের নগদান খাজনা আদায়ের টাকা। কিছু বা বকেয়া খাজনার।

সম্পত্তির মালিকানার গর্ব্ব বোধ। অহঙ্কার হয়। যা-কিছু দেখছি সব আমার। এমন কি চাবিটিও। কুমুদিনী কত কষ্টে বাড়ী ছাড়া হলেন, তাতে কোন দুঃখ নেই। তাঁকে ফিরিয়ে আনার চিন্তা নেই। বরং যেন স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। নিজস্ব দখলের জমিজমা হাতে পাওয়ার তৃপ্তিতে কৃতকর্ম্মের ক্ষোভ আর থাকে না মনে। এখন যা-খুশী তাই করবে। আর তো মাত্র কয়েকটা দিন, যেমন তেমন ক'রে কাটিয়ে দিতে পারলেই একেবারে মালিক হয়ে বসবে গদীতে। জমিদারীর রূপোর সিংহাসনে বসবে, যেটা আসন নয়, সিংহও নয়, তবুও রূপার। মা যেন ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। নাগাল পাওয়া যায় না। না পাওয়া যাক, গেছে যখন তখন আপদ গেছে। শাসনের কে কার ধার ধারে!

অনন্তরাম এসে বললে,—ম্যানেজার বাবু সদর থেকে ফিরেছেন। কত মাল-মশলা এনেছেন। তোলা-পাড়া করবার লোক কৈ? যে করতো সে তো—

অনন্তরাম বুঝতে পারে যে, রাতারাতি ভোল পালটে গেছে। চোখে আর মুখে যেন ফুটে উঠেছে প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতা। চালাক চতুর নয়, মুখে যেন মূর্খামি মাখানো। জন্মাবধি দেখছে অনন্তরাম, চিনে ফেলেছে যখনই দেখেছে তখনই। যেখানে ঝাঁটা থাকে সেদিক পানে চলে অনন্তরাম। ঘর-দোর পরিষ্কার করবে।

দালান থেকে দূরের একটা জানলা, অন্ত কাদের, দেখা যায়।

চোখ প'ড়ে যেতেই লক্ষ্য করে অনন্তরাম, সেই মেয়েটা না ? ভোরের আলোয় ঝলসে গেছে জানলাটা। নতুন গুণ্ঠনে মুখখানার খানিক ঢাকা। তবুও চেনা যায়। সেই ভঙ্গী যাবে কোথায়। সেই অঙ্গভঙ্গী। রামধনু রঙের কি একখানা সাড়ী পরেছে, তায় সূর্য্যালোক।

ঘরে ঢুকে দেখলো অনন্তরাম, ঘরের মেঝেয় কাগজের ছেঁড়া পাতা উড়ে বেড়াচ্ছে। টুকরো-টুকরো কাগজ। কি একখানা বই ; যেন দাঁতে কামড়ে কে ছিঁড়েছে কুটি-কুটি। পাতাগুলো দেখেই বুঝলে অনন্তরাম, ম্লেচ্ছ ভাষার সেই প্রথম-ভাগখানা। ছেঁড়া কাগজের বুকে কত টুকরো কথা, মূক হয়ে রয়েছে। হুজুরের দেশী নয়, সখের বিদেশী কুকুরের খেলা, আন্দাজ করে অনন্তরাম।

—যাক্, বাঁচা গেছে। স্বগত করলে অনন্তরাম। হাসলে কৃত্রিম হাসি।

গৃহের যিনি কর্ত্রী তিনিই নেই।

এক জন নারী। সারা বাড়ী ফাঁকা হয়ে গেছে। যে দিকে দেখো সে দিকেই যেন তার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার অভাব যেমন মর্ম্মান্তিক তেমনি চক্ষুর পক্ষে পীড়াদায়ক। তবুও যেন তার চলা-ফেরা আর নিশ্বাসের শব্দ অনুভূত হচ্ছে। কুমুদিনী আছে যেন অশরীরী কোথায়। যেন যায়নি।

খোদ জমিদারকে দেখেই ম্যানেজার বাবু যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে একটি নমস্কার করলেন। বললেন,—মা চণ্ডীর কৃপায় অনুমান করি, সকলে কুশলেই আছেন।

ভদ্রতার খাতিরে প্রতি-নমস্কার জানালো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—হ্যাঁ! কিন্তু ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন ?

ম্যানেজার বাবু হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন,—হুজুর, নির্ব্বিঘ্নেটেই মিটে যাচ্ছিল, চলেও আসছিলাম নির্দ্ধারিত দিনে। সহসা, চণ্ডীপীঠ মৌজার প্রজারা হুজুর খাজনা দিতে অস্বীকার করলে। হুজুর, সে একেবারে একজোট হয়েই। তিন-চারটে গ্রামের প্রজা, সর্ব্বসমেত শতাবধি হবে।

—কেন ? জিজ্ঞেস করলে যার প্রজা সে। কাছারীর দালানে বেতের আরাম-কেদারা টেনে নিয়ে বসলো।

ঠোঁটের কোণে চাপা-হাসির স্বর টেনে বললেন ম্যানেজার-বাবু,—সে আর বলেন কেন হুজুর। আপনাদের সব শরিকদারী ব্যাপার। আপনার প্রতিপক্ষ, যারা হুজুর আপনার গিয়ে ন' পয়সার মালিক, তারাই না কি চণ্ডীপীঠ মৌজার মোড়লদের হাত করেছিল। খাজনা দিতে মানা করেছিল। বলেছিল, চণ্ডীপীঠ মৌজার স্বত্ব না কি তাঁদের। খাজনা তাঁরাই আদায় করবেন।

—তার পর ? যেন এ্যাডভেঞ্চারের আভাস পেয়ে বললে যার প্রজা।

নৌকা আর ট্রেনের ধকলে ক্লান্ত ম্যানেজার বাবু। বিহারের রৌদ্রে মুখখানা যেন পুড়ে গেছে। তামাটে রঙ মুখের। কিছুই যেন হয়নি এমনি একটা ভাব তাঁর কথায়। বললেন,—সরকারের হাতে এষ্টেট হুজুর আপনার গিয়ে। সোজা গিয়ে নর্থব্রুককে সকল বৃত্তান্ত জানাতেই বারোটা আর্মড-গার্ড দিলে সঙ্গে। একবারে হুজুর আপনার গিয়ে তক্‌মা-আঁটা। তা হুজুর আপনার গিয়ে ঐ বারোটা দোনলা দেখেই তারা আর টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলে না। যে যার দেনা মিটিয়ে দিলে।

নর্থব্রুক সাহেব হচ্ছেন বিহারের একচ্ছত্র কমিশনার। একে খাস-সাহেব, তায় আই-সি-এস্ দেশের বাইরে ইংরেজের এমন স্বজাতি-বন্ধু আর দু'টি আছে কি না, ইংরেজই জানে না। রাজভক্ত নর্থব্রুক, আগে নেটিভ ল্যাণ্ড, তার পর অন্য কিছু। বৃটেনের পক্ষ থেকে কার্য্যভার গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষে এসেছে। পলিটিকাল ডিপার্টমেণ্ট থেকে বদলী হয়েছে বিহারে। রেল .কোম্পানির লাল নিশেনের ট্রলিতে চেপেই গোটা বিহার দেখে নিয়েছে। আর দেখেছে একখানা ম্যাপ সরকারী ছাপাখানায়। বিহারের মানচিত্র। ভৌগোলিক।

নর্থব্রুকরা জানে রাজত্ব করতে হ'লে কোন দেশের ম্লান, মূঢ় আর মূকদের সঙ্গে মিতে পাতিয়ে কোন ফয়দা নেই। জাহাজ থেকে নেমেই দূরবীক্ষণের সাহায্যে ভারতবর্ষকে দেখেছে নর্থব্রুক। দেখতো না, তার পূর্ব্বপুরুষদের দেওয়া শিক্ষায় দেখেছে। রাজত্ব করতে হ'লে চোখ মেলে রাখতে হয়।

দূরবীক্ষণের ভেতর থেকে দেখেছে নর্থব্রুক, ভারতবর্ষের জল আর মাটিতে পাশাপাশি দু'রকমের বসতি। আকাশ-চুমী নগরসৌধ আর পর্ণকুটির। বন্দরে নেমেই দূরবীক্ষণের ভেতর মুসলিম রাজত্বের নিশানা দেখতে পেয়েছে। মহমেডান আর্কিটেকচর, মুসলমিন স্থপতি—শেষ মুসলমান রাজত্বের বাকী অবশিষ্ট।

আর এদের গায়ে গা মিলিয়ে কত যেন শঙ্কায় রয়েছে শত শত ঐ পর্ণকুটির। যত সব ম্লান, মূঢ় আর মূক দেশবাসী। এই রাজ্যেরই আসল অধিবাসী।

ম্যানাজার বাবুর প্রোক্ত নর্থব্রুকরা বেছে নিয়েছিল দেখে দেখে।

যাদের চাল-চুলো আছে তাদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। যাদের সাত-পুরুষের বৈঠকখানা আছে তাদের সঙ্গে ভাব। আর যাদের ঐ পাতার ঘর, তাদের সঙ্গে আড়ি নয়, কাজের সম্পর্ক। এসো, চাকরী কর', মাইনে নাও। চাকর হও।

ম্যানেজার বাবুর লিখিত আবেদন-পত্রখানা পেয়ে নর্থব্রুক একবার শুধু জেলাটার মানচিত্র দেখেছে। তার পর কি একখানা সরকারী কেতাব দেখেই পেয়াদা পাঠিয়ে দিয়েছে ম্যানেজার বাবুর কাছে। সঙ্গে একখানা লেফাফা। 'আর্মড্ গার্ড দাও, জমিদারের পক্ষ থেকে।' ফাঁড়ির অফিসারকে চিঠি দিয়ে দিয়েছে।

নর্থব্রুক আপীল শুনেই বুঝে নিয়েছে এ দেশের ঐ নগর-সৌধের মালিক এরা।

বকলমের মালিক। কিন্তু মুসলমান নয়, হিন্দু।

জমিদারীর মালিক দেখে দেখে না ব'লে আর পারলে না। কাছারীর দালানের অর্দ্ধেকটা ভ'রে আছে জিনিষ-পত্রে। বললে,—কত কি এনেছেন!

ম্যানেজার বাবু বললেন,—সে হুজুর আপনার গিয়ে যাকে বলে নাছোড়বান্দা। মানা শুনলে না।

কয়েকটা বাঁশের অদ্ভুত ঝুড়ি? কি আছে তাতে। খাজা না গজা। বললে,—ঐ চ্যাঙারীতে কি আছে ম্যানেজার বাবু?

ম্যানেজার বাবু যেন বলতে ভুলে গেছেন। বলতে মনে পড়তেই বললেন,—সে আর বলবেন না হুজুর। ক' ঘর প্রজা দু'টো খাসি কেটে ছ'ড়ে পাঠিয়েছে হুজুরের জন্যে। জিনিষটা আর বেলা হয়ে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। একটা কিছু ব্যবস্থা করতে জানিয়ে দিন মা-ঠাকরুণকে।

তাঁবেদারের দল বাস্তব নজরাণার দ্রব্যাদি নিয়ে যায়। যেদিকে ভাঁড়ার সেদিকে।

কৃষ্ণকিশোর ম্যানেজার বাবুকে বলে,—কাছারীতে আক্রামুদ্দিনের ঠিকানা আছে? নায়েব মশাইয়ের কাছে খোঁজ করুন। তাকে ডাকতে পাঠাতে বলুন।

আক্রামুদ্দিন আবার কে?

অনন্তরাম কোথা থেকে এসে হাজির হ'ল। একেবারে মুখোমুখি হয়ে ফিস্‌ফিস্ বললে যেন কি। শেষে জোড় হাত করে মিনতির ঢঙে বললে,—দোহাই, দাদু যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারেন। তিনি এই এলেন ব'লে! ফটকের সামনে আসতে দেখেই এসেছি।

দাদু আসছেন। জানবাজারের দাদু। জীবনে যিনি কখনও কাঁদেননি। হেসেছেন। জানবাজারের সেই আঙটি-দাদু আসছেন। হাসতে হাসতে।

—দাদু! ছেলেবেলার খেলার হাসির সম্পর্ক দাদুর সঙ্গে। জানবাজারের দাদুর ঠিক সাহেবদের মত চেহারা। বয়সের আধিক্যের কোন পরিচয় নেই, সদাহাস্যে সদাই যেন মুখর হয়ে আছেন। সাহেবদের মত ফর্সা রঙ দাদুর, রঙীন আদ্দির বুটিদার বেনিয়ান পরেন। মাথায় একটা অর্গাণ্ডির মুসলমানী নক্সা-তোলা টুপি। হাতের দশ আঙুলে দশ-দু'গুণে পঁচিশটা আঙটি পরেন জানবাজারের দাদু। দেখলেই হাসেন। হাসান যাকে যখন দেখেন তাকেই।

—দাদু, পেস্তা লিবি? বাদাম লিবি? মতিয়া লিবি? আসমান লিবি? দুনিয়া লিবি?

দাদু এই কথাগুলি বলেন আর হাসতে হয় নাতিকে। দাদু বলেন আর সেই সঙ্গে হাসেন অট্টহাসি। দেখা হ'লেই বলেন। সেই ছেলেবেলার খেলা, হাসি-হাসি-খেলা দাদুর সঙ্গে।

এখনও দাদু ভুলতে পারেননি। দেখা হ'তেই বললেন শুধু,—দাদু, পেস্তা লিবি? কেমন আছো দাদু?

প্রণাম করতে হয় এই দাদুকে। দাদুর অনেক বয়স। মাথার চুল একেবারে পেকে গেছে। তবু সিঁথি আছে। পাকা চুল হ'লে কি হবে, ঢেউ খেলানো।

—চলুন, সদরের ঘরে চলুন। এখানে গরমে আপনি কষ্ট পাবেন।

—না দাদু। আর যাবো না। তোমার একখানা চিঠি আছে সেখানি পৌঁছতে এলাম। এই নাও তোমার চিঠি। বিয়াঙ্কি হোটেল থেকে পিটার পাঠিয়েছে তোমাকে। আমার চিঠির ভেতর পুরে দিয়েছে!

ইংলণ্ডের এক মহলের একটা হোটেলের নাম বিয়াঙ্কি। পিটার আছে সেখানে। পিটার হ'ল দাদুর কনিষ্ঠ পুত্র। কন্টিনেন্টে কৈশোর থেকে যৌবন অতিক্রান্ত করছে। পিটার যে গেছে আর একটি বারও দেশমুখো হয়নি। পত্র-ব্যবহারের সম্পর্ক রেখেছে এখানে। টাকা ফুরোলেই পত্র আসে ঘন ঘন। জাহাজে ভাসতে ভাসতে চিঠি আসে সেই সাত সমুদ্রের ওপার থেকে।

—ফুলকাকা চিঠি দিয়েছেন? চিঠিখানা দাদুর হাত থেকে নিয়েই খামের মুখ ছিঁড়ে ফেললে। চিঠি বের করতেই এক টুকরো কাগজ পড়লো মাটিতে। কাগজ নয়, একটি মুখ। আবক্ষ ছবি কার আবার।

দাদু মুখখানা ঘুরিয়ে নিলেন। আর দেখলেন না। ছবির পেছনে লেখা রয়েছে 'তোমার ফুলকাকীমা'। বরফ-নীল রঙের চোখের তারা, তাদেরই এক জনের ফটো। এক জন বিদেশিনীর। লজ্জা আর ব্রীড়ায় আনত মুখভঙ্গী; ঘন কেশের বিচিত্র কবরী দু'পাশের বুকে এসে নেমেছে। বুকের কাছে মরশুমী ফুলের তোড়া ধরা রয়েছে দু'হাতে। বিদেশিনীর বিম্বাধরে বিনম্র হাসির ক্ষীণ রেখা।

দাদু সত্যিই আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে থাকলেন না। অনেক দূরে গিয়ে একবার ফিরে বললেন,—দাদু, আমি ভাই আসলাম।

আসলেন না, সত্যিই চলে গেলেন কি এক মনের দুঃখে। দাদুর কানেও এসেছে ঐ ছবির অধিকারিণীর কথা। পিটার গীর্জ্জায় গিয়ে বিয়ে করেছে যে তাকে। মন-উদাসী বিদেশিনী এক জন ইণ্ডিয়ানকে বিয়ে করেছে। পয়সাওলা লোকের মেয়ে। বিয়াঙ্কিতে স্বামি-স্ত্রী রয়েছে। পিটারের কিছুর অভাব হয় না, মেয়েটির বাবা-মা সব কিছুর ভার নিয়েছে। অক্সফোর্ডে পড়তে গিয়েছিল পিটার। পড়া-শুনা আর হয়নি। পিটার তার বাবাকে টাকা পাঠাতে পত্র দেয়, পিটারের যখন মদের আর টাকা থাকে না। পিটার তখন ঘন ঘন পত্র ছাড়ে।

পিটারের এই কীর্ত্তিতেই যত লজ্জা দাদুর। যেন সহ্য করতে পারেননি। পিটার খৃশ্চান হয়েছে, পিটার এক জন শ্বেতাঙ্গিনীকে—

সত্যি চলে গেলেন দাদু। পিটারের দুঃখে তিনি এখন আর হাসেন না। হাসেন যখন তখন সে-হাসিতে যেন মনের উল্লাস নেই। পিটার দাদুর কলঙ্ক-স্বরূপ।

ফুলকাকা। শুধুই কি সে কলঙ্ক।

কৈ, কেউ বিলেতে গিয়ে রইলো না? ফুলকাকা সেই ছেলে-বেলা থেকেই কেমন যেন যাযাবরী মনোবৃত্তির, বাঙলা দেশে পড়া শেষ ক'রে অক্সফোর্ডে পড়বেন স্থির করেছিলেন। ফুলকাকা পড়তে গিয়ে কিন্তু পড়লেন পাঠ্য-পুস্তক নয়। যত সব পড়ার বাইরের অপাঠ্য পুস্তক। ফুলকাকা সেখানে বই কিনে আর মদ খেয়েই ফতুর হচ্ছেন। বই আর মদ, মদ আর বই। আর এখন সেই সঙ্গে জুটেছে এক বিদেশিনীর সাহচর্য্য—যার রূপে না কি প্রাচ্যের লাবণ্য; প্রতীচ্যের রঙের সঙ্গে অদ্ভুত অসামঞ্জস্য।

ফুলকাকার পড়ার সখ অসাধারণ।

বাঙলা সাহিত্যের খোঁজ রাখে না, অথচ কেমব্রিজের সর্ব্বশেষ ক্যাটালগও সঙ্গে রাখে। ক্ল্যাসিক হোক, আধুনিক হোক, বই

ছাপা হলেই কিনে ফেলেন। ফুলকাকার পৃথিবী বই-পড়া বিদ্যায় গ'ড়ে উঠেছে, বাস্তবের সঙ্গে তাই পদে পদে বাধে বিভ্রাট। ফুল-কাকা বাঙলার জল আর বায়ু পান করতে পায়নি, লণ্ডনের কি এক বিয়াল্লি হোটেলে গিয়ে বসবাস করছে। তিনিই পত্র দিয়েছেন তাঁর অভ্যাস মত। লিখেছেন :

'আয় চ'লে আয় এখানে। একবার দেখলে আর ভুলতে পারবি নে। তুষারের রাজ্যে শুধু মদ নয়, মার্ভেলাস সাইট দেখতে দেখতেই দিন কেটে যাবে। সভ্যতার শিখরে এরা বাস করছে; জীবন-যাত্রায় আমাদের মত স্বাদেশিকতা বজায় রাখতে যেয়ে স্বদেশ হারায়নি। রাজার জাতকে এসে একবার দেখে যা। তোমার ফুলকাকীমা'র ফটো পাঠালাম, কনসার-ভেটিভ কুমুকাকী যেন না দেখে। অন্তরের ভালবাসা রইলো।

ইতি—'

চিঠি পাঠের পরেই চোখ তুলে দেখলে জানবাজারের দাদু কখন অদৃশ্য হয়ে গেছেন। চ'লে গেছেন। বিপথগামী সন্তানের অপকীর্ত্তিতে যেন ম্রিয়মাণ হয়ে আছেন সেই সদাহাস্যমুখর মানুষ। যেন হাসতেই ভুলে গেছেন।

কনসারভেটিভ কুমুদিনী! ফুলকাকার স্বপ্নে আচ্ছন্ন মন নিয়ে সদরের দিকে চলেছিল কৃষ্ণকিশোর। হঠাৎ বসিরুদ্দিনের কণ্ঠস্বর পেয়েই থমকে যেন পেছন ফিরলো। বসিরুদ্দিন! আবার এসেছে বসিরুদ্দিন? সূর্য্য ধীর গতিতে কখন এগিয়ে এসেছে আকাশের শেষ সীমা থেকে। রৌদ্রে উষ্ণতা যেন।

—কেমন গান শুনলে বল' গহরের? বসিরুদ্দিন সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো।

গহর, গহরজান? এতক্ষণ যেন মন থেকে মুছে গিয়েছিল গত দিনের সেই গায়িকার হাসি আর গান, গান, হাসি, আর—

বসিরুদ্দিন কাছাকাছি আসে। বলে,—লাখ, লাখ, রূপেয়া দিয়েও শুনতে পাওয়া যায় না গহরজান বাইয়ের গান। নাম শুনলে নেচে ওঠে কত লোক। গহরজানকে—

থামলো কেন বসিরুদ্দিন? কি বলতে চাইছিল। এমনই দুষ্প্রাপ্য যে, টাকা দিয়েও পাওয়া যায় না গহরজানকে? তার মানে কি যার-তার পাওয়ার সৌভাগ্য হয় না!

গত দিনের কিছু কিছু ছবির মত ভেসে ওঠে মনশ্চক্ষে বসিরুদ্দিনকে দেখে। খুশী হওয়ার চেয়ে যেটা হয় সেটা এক রকমের লজ্জাই।

উত্তরের অপেক্ষায় থাকবার পাত্র বসিরুদ্দিন? এ-কথা থেকে সে-কথায় চলে যায়। বলে,—অর্গান না শুনিয়ে যাচ্ছি না। কিন্তুক হুজুর, শুধু বাজাবো। গাইতে বল' না।

অর্গান শোনাবে বসির? কথা কইবে না মনে করেও কথা বললে গীত-পিয়াসী। বললে,—অর্গান শোনাবে?

—বলছি তো শোনাবো। বসিরুদ্দিন এদিক-সেদিক দেখে আর বলে,—শোনাবো আর খাবো। দুপুর বেলায়। কি খাওয়াবে বল'। কিমার বড়া খাওয়াবে? কাঁকড়া খাওয়াবে? চিংড়ী না খাওয়াও, দাড়ার ঝাল? কি খাওয়াবে বল'।

মুখ ফুটে খেতে চাইছে বসিরুদ্দিন। কিন্তু ভাঁড়ারে এদের মিলবে না যে।

—হ্যাঁ, খাওয়াবো। বাজনা শোনার কথায় সে সব আর মনে থাকে না।

বসিরুদ্দিন কথায় কথায় কাছারীর আওতা থেকে সরে যায়। একশো আটটা সিঁড়ি দেখে বলে বসিরুদ্দিন। বলে,—যেন হিন্দুদের স্বগ্যের সিঁড়ি! তা খাওয়াবো, মুখে বললে তো আর হবে না, তার বন্দোবস্তের হুকুমটাও হয়ে যাক।

অনন্তরাম এলো কোথা থেকে। রুখে যেন দাঁড়ালো। কথায় হাসির রেশ টেনে কথা বললে বসিরুদ্দিন। অনন্তরামের সঙ্গে। বললে,—কোথায় থাকা হয়?

—যেখানে দেখতে পাচ্ছেন সেখানে। অনন্তরাম বলে।

—ইটি কে আছেন হুজুরের? বসিরুদ্দিন অনন্তরামের এমন উত্তরটা আশা করেনি। কথার ধরণ দেখে কে আছেন জানতে ব্যস্ত হয়। অথচ লোকটার পরনে ময়লা বসন।

অনন্তরাম কে তাই বলতে গিয়ে অনন্তরাম কে তা আর বলতে পারে না যেন। মাইনের চাকর, বলতে পারে না। অনন্তরাম কে?

কে অনন্তরাম? অনন্তরামই বললে,—আমি এক জন তাঁবেদার।

—তবে তুমি তো চুপ ক'রে থাকবে। তুমি বুঝি হুজুরের নগিচ নগিচ ছাড়া থাকতে পারো না?

—চল' বসির, বাজনার ঘরে চল'। অনন্তদা, বসির এখানে খাবে, ওর জন্তে কাঁকড়া, কিমা আর চিংড়ি মাছের দাড়া বানাতে বল।

হোতা বোঝে না এই সব খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদ যে-সে চায় না। যখন-তখন। আবার যারা চায় তারা আর অন্তের আস্বাদ চায় না। এদেরই ভালবাসে। বসিরুদ্দিনের আহারের মেনু শুনে অনন্তরাম বললে,—আমি তরজা শুনতে যাচ্ছি। ছুটি নিতে এসেছি এক দিনের। ফিরতে রাত হবে।

অনন্তরাম সত্যিই হয়তো তরজা শুনতে চলে যায়। সত্যিই অনন্তরামের ভাল লাগে না এই ওস্তাদী কথা আর ঐ ওস্তাদকে। সে আর এক মুহূর্ত্ত থাকে না ওদের কাছে। মুখখানা গম্ভীর হয়ে যায় অনন্তরামের। অসম্ভব গম্ভীর।

—তাই যাও। আর যাওয়ার আগে ব'লে যাও পাক-ঘরে। নকল হাসিতে মাখানো বসিরুদ্দিনের কথা। বলে,—অর্গান শুনবেন হুজুর। ঘরের চাবিটা আনতে বল'।

বসিরুদ্দিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি অনন্তরাম। আর এক মুহূর্ত্ত থাকে না সে সেখানে। তরজা শুনতে চলে যায়।

—তুমি চল' বসির, আমি চাবি আনতে বলছি। অনন্তরামের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে সলজ্জায় বললে কৃষ্ণকিশোর।

বসিরুদ্দিন চললো যেদিকে বাজনার ঘর সেদিকে। বসিরুদ্দিন জানতো, আগে দেখেছে কয়েক বার। যন্ত্রের একজিবিশন দেখে তাজ্জব ব'নে গেছে।

তখন অর্গান চলেছিল পূরা দমে।

একখানা পাল্কী এসে অন্দরের মুখে ভিড়েছে, শ্রোতা আর বাজকার, কেউ জানতে পারেনি। কে এসেছেন? কুমুদিনী? না পিশীমা, হেমনলিনী। কি একটা কথা বলতে এসেছেন। কি একটা কথা নিতে এসেছেন। কুমুদিনীকে আশ্বস্ত ক'রে এসেছেন, —ছেলের পাকা কথা আমি এনে দেবো। সে জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি সে ভার নিচ্ছি।

অর্গানের সুরে তখন বাজনার ঘর মাতোয়ারা। বসিরুদ্দিন বাছা বাছা কতকগুলো গানের সুর বাজিয়ে চলেছে। এমন সময় এক জন তাঁবেদার এসে বললে,—হুজুর, পিশীমা এসেছেন। ডাকছেন আপনাকে।

বসিরুদ্দিন অর্গান থামায় না। কৃষ্ণকিশোর পিশীমার আগমন-বার্ত্তা শুনে তক্ষুণি উঠে পড়লো। বসিরুদ্দিন থামলো না কিন্তু। বাজিয়ে চললো যে-সুর ধরেছিল সেই সুর।

অন্দরের মুখেই ছিলেন হেমনলিনী। বাপের বাড়ী, তাঁর এত লজ্জা নেই। অপেক্ষা করছিলেন। দেখা হ'তেই বললেন,—কি আরম্ভ করেছো? মাকে রাখতে পারলে না? একটা কথা বলতে এসেছি। ব'লেই চলে যাবো।

স্নেহময়ী পিশীমার কথার সুর এমন রুক্ষ কেন? এমন অশ্রুতপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে-ভরা। কৃষ্ণকিশোর চুপ-চাপ চেয়ে রইলো পিশীমার দিকে। ভয়ে-ভয়ে।

হেমনলিনী বললেন,—তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে। অনুরোধ রাখতে হবে তোমাকে। আমি একটি পাত্রী দেখেছি, তোমাকে বিয়ে করতে হবে এই মাসেই। মনের মত মেয়ে, দেখে তুমিও খুশী হ'বে। বিয়ে করবে তো?

—হ্যাঁ। শুধু ঐ একটা কথা হঠাৎ বলে কৃষ্ণকিশোর। যদি পিশীমা তাতেই খুশী হন, কথা বলেন আগের মত। পিশীমার কথার ধরণ শুনে বেশী কথা বেরোয় না মুখ থেকে। শুধু বলে,—হ্যাঁ।

হেমনলিনীর মুখে যেন হাসির রেখা দেখা দেয়। নিশ্চিন্ত হওয়ার খুশীভরা হাসি। বলেন,—আর কোন কথা নেই। তুমি যেতে পারো। আমি চলে যাচ্ছি এখন। আমি বিয়ের সব জোগাড় করি?

—হ্যাঁ। আবার ঐ একটা কথা বললে কৃষ্ণকিশোর। গমনোদ্যত পিশীমার পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। প্রণাম করলে। হেমনলিনী চিবুক স্পর্শ করলেন। বললেন,—তবে আমি যাচ্ছি এখন। দেখো, যেন মত বদলে যায় না। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারবো না আমি।

হেমনলিনী কথার শেষে নিজের পাল্কীতে উঠে বসলেন ঘেরাটোপ সরিয়ে। আট জন বেয়ারায় পাল্কী তুলে নিয়ে গেল কি একটা বলতে বলতে। বাজনার ঘর থেকে তখন অর্গানের তরঙ্গায়িত ধ্বনি ভেসে আসছে। ভারী মিঠে সুর ধরেছে বসিরুদ্দিন। একটা ইংরেজী সুর। বিদেশী যন্ত্রে বিদেশী গান।

কথা দেওয়ার পরে কথাটা যেন মনে পড়লো।

বিয়ের কথা দেওয়া হয়ে গেছে পিশীমার কাছে, সে-কথা আর ফেরানো চলবে না। আর হলেই বা বিয়ে। বিয়ে তো জানা-শুনা সকলেরই হচ্ছে।

হেমনলিনীও কুমুদিনীর কথায় সায় দিয়েছেন। বিয়ে দিয়ে দেওয়ার তিনিও পক্ষপাতী। ছেলেকে রাজী করাবার ভারও নিয়েছেন তিনি। কুমুদিনী মনে মনে শুধু স্থির করেছেন, বিয়েটা দিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়বেন। কাশী কিংবা বৃন্দাবন কিংবা লছমনঝোলায় চ'লে যাবেন। তীর্থবাস করবেন।

কিন্তু বসিরুদ্দিন কেন যাচ্ছে না। বসিরুদ্দিনের সঙ্গ যেন আর ভাল লাগে না। অর্গান কেন থামছে না?

মুখে কাকেও বলা যায় বিদায় গ্রহণ করতে?

বসিরুদ্দিনকেও বলতে পারে না। বাজনার ঘরে গিয়ে বসে বসিরুদ্দিনের পাশে। নায়েবদের এক জনকে ডেকে বলে দেয়, বসিরুদ্দিন যা খেতে চেয়েছে তার ব্যবস্থা করতে। বসিরুদ্দিন অর্গান বাজিয়ে যায় ইংরিজী সুরে—মূর্চ্ছনায় ঘরখানা সরগরম হয়ে উঠেছে। বসিরুদ্দিনকে দেখেই বারে বারে মনে পড়ছে গত দিনের কল্পনাতীত অলৌকিক কাহিনী—আরব্য উপন্যাসের মত মনে পড়ছে। এক জন বিবি, বেদুইনের মত—চোখ দু'টোতে ইন্দ্রজাল যেন। মাদকতা রূপশ্রীতে।

ওস্তাদে বাবুকে নষ্ট করলে এমন কত কত দেখেছে কত কে। কাছারীতে তাই একটা চাপা গুঞ্জরণ চলতে থাকে। সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ঐ মুসলমান ওস্তাদের প্রতি। কুগ্রহের মত এসে জুটলো কোথা থেকে।

বাজনার সুর কমিয়ে কথা কইলে বসিরুদ্দিন। বললে,—আবার যে দেখতে চেয়েছে নাগরী। না দেখে মন না কি তার আনচান লেগে গেছে। হুজুর যেন ভুলে না যান, বলতে বলেছে আমাকে।

বিবি গহরজান। তার মন আনচান।

লজ্জা আর বিস্ময়ের সঙ্গে বসিরুদ্দিনের কথাগুলো শুনতে থাকে। সত্যিই কি বলেছে গহরজান এই সব মন-ভোলানো কথা। বসিরুদ্দিন বলে,—খাওয়া-দাওয়া হোক্, রোদটা মরলেই বেলাবেলি একবার চল' না ঘুরে আসা যাবে। কে আর জানছে? আরে হেসে লাও, দু'দিন বইতো লয়।

বসিরুদ্দিন হাসতে হাসতে শেষের ক'টা কথা বললে। কৃষ্ণকিশোর শুনলে শুধু এই বিচিত্র কথা। গহরজানকে দেখতে পেলে যেন চোখের সামনে। দেখতে পেলে গহরজানের যৌবনসম্ভার। কাঁচুলীর দয়াহীন বন্ধন থেকে উন্মুক্ত।

হেমনলিনী পাল্কীতে উঠেই পরমানন্দে হেসেছেন একবার। তিনি জানতেন তাঁর কথা উপেক্ষা করতে পারবে না। হেমনলিনী একটি রূপার বাক্স খুলে কয়েকটা পান খেলেন। আর দুর্দ্দি। পাল্কীর ভেতরে ছিল একখানা হাতপাখা। পাখীর লেজের। হাওয়া খেতে খেতে চললেন হেমনলিনী। কখনও বা ঘেরাটোপের ফাঁক থেকে দেখছেন দু'পাশের রাস্তা। কোথায় এলো পাল্কী।

কুমুদিনীও জানতেন ঠাকুরঝি একটা হেস্তনেস্ত ক'রে আসবে। তিনি থাকবেন অন্তরালে। নেপথ্যে। তার পর তিনিও বিদায় নেবেন। থাকতে তিনি আসেননি, এসেছেন উপায়হীন হয়ে। উপায় হলেই যথাসময়ে তিনি যাত্রা করবেন। তাই দিনের আলো ফুটতেই পাঠিয়েছেন হেমনলিনীকে। একটা হেস্তনেস্ত ক'রে আসতে।

গত রাত্রির মধ্যযামে যে-আশাতীত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন কুমুদিনী, স্বচক্ষে যা দেখেছেন, তা দেখেও আর থাকবেন এই ভিটের ত্রিসীমানায়! কুমুদিনী দেখেছেন যা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি। দেখেছেন ঐ ঠাকুরঝি হেমনলিনীকে। দেখেছেন গভীর রাত্রে, যখন তাঁর তন্দ্রা ভেঙ্গে গিয়েছিল কি যেন কিসের শব্দে। খুটখাট দরজা খোলার শব্দে।

দেখতে দেখতে চোখ দু'টোকে বন্ধ ক'রে ফেলেছিলেন কুমুদিনী। কি দেখলেন তিনি? কাকে দেখলেন, ঠাকুরঝি হেমকে? দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও ক'বার ক্ষণেকের জন্যে কুমুদিনীও ভেবেছিলেন, ঠাকুরঝি যে স্বামীর সোহাগ পায়নি কোন দিন।

দ্বিজপদ নামে এক জন যুবক। মাঝে মাঝে আসে, এসে বেশ কয়েক দিনের জন্যে কাটিয়ে যায় এ-বাড়ীতে। হেমনলিনীর কি সম্পর্কের দেওর দ্বিজপদ। শিক্ষিত যুবক এক জন। বেশ দেখতে। মাথায় কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল। গালপাট্টা দু'ই গালে। কুমুদিনী কিছু কিছু শুনেছিলেন ইতিপূর্ব্বে। শুনেছিলেন অন্য রকম। স্বচক্ষে দেখলেন।

হেমনলিনী দ্বিজপদকে ঠিক যে কোন্ চক্ষে দেখেন অনেকেই জানে না। জানে শিক্ষিত এক জন, লক্ষও একটা যা মেলে না, দ্বিজপদ তাই। সবাই জানে হেমনলিনী তার শিক্ষার সমর্থক, আর কিছু নয়। শুনা যায় দ্বিজপদ সাহিত্যিক, সাহিত্যের সভা-সমিতির আমন্ত্রণ আসে দ্বিজপদর নামে।

দরজার বাইরে লণ্ঠনের আলো-অন্ধকারে দেখেছেন কুমুদিনী গত রাত্রির মধ্যযামে, ঐ দ্বিজপদ আর হেমনলিনী প্রেম-নিবেদন করছে যেন পরস্পরকে। হেমনলিনীর বসনের অবাধ্যতাও দেখেছেন। দেখেই চোখ দু'টোকে বন্ধ ক'রে ফেলেছিলেন। আর চোখ মেলেননি সারা রাত। ঠাকুরঝির রূপের জৌলসও দেখেছিলেন, এখনও যেন যৌবনভারাক্রান্তা। ধপধপে রঙ, নিটোল স্বাস্থ্য।

এই সব দেখেই, আরও মন যেন ছটফট করছে কুমুদিনীর।

রৌদ্র যথা সময়েই মরে। সূর্য্য অস্তাচলে নামে।

সাপের চামড়ার সেলিমের বদলে কুমীরের চামড়ার পাম্প বেরোয়। আলমারী থেকে জরির কল্কা-দেওয়া বেনারসী পিরাণ। একখানা উড়ুনী। চুলের টেরী বাগাতেই আধ ঘণ্টা লাগে। প্যারিসের কি-একটা এসেন্সের শিশি প্রায় খালি হয়ে যায়। চুনট-করা লাটিম পাড় ধুতির কোঁচা লুটোপুটি খেতে থাকে। দিন-শেষের প্রথম সন্ধ্যায় ভাড়া-গাড়ীতে আর নয়, নিজেদের জুড়ীতেই বেরিয়ে পড়ে দু'জন। ওস্তাদ আর মক্কেল।

দূর থেকে শোনা যায় বেলফুল আর মালাইওলার চীৎকার। জুড়ী এগোয় সেদিকে।

সন্ধ্যা ঘন হতেই কাছারীর দালানে যখন এক জন ফিরিঙ্গির আবির্ভাব হয় তখন গাড়ী প্রায় পৌঁছে গেছে। ফিরিঙ্গীকে বিতাড়িত ক'রে দিয়েছে বাড়ী থেকে তার পিতা। নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র সরকারী ট্রান্সলেটর, ছেলের রাজদ্রোহমূলক মতিগতিতে ওপর থেকে হুড়ো খেয়েছেন। ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তবেই সরকারী চাকরীতে থাকতে পাবে, ওপর থেকে পরোয়ানা এসেছে। নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র ছেলেকে তাই মানে মানে সরে পড়তে বলেছেন। নর্ম্মাণ অরুণেন্দ্র সহাস্যে বরণ ক'রে নিয়েছে পিতৃ-আজ্ঞা। বেরিয়ে প্রথমে তাই এখানে এসেছে। কয়েকটা দরকারী কথা ব'লে যেতে এসেছে। কাছারীর দালানে তারই বুটের মশ-মশ শব্দ হচ্ছে। বলতেই হবে কথাগুলো, তাই বন্ধুর প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু বন্ধুর চোখে আর নেই নর্ম্মাণ অরুণেন্দ্রর বিচিত্র পৃথিবীর স্পষ্ট কোন ছবি।

সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রতীক্ষা-ব্যাকুল নর্ম্মাণ অরুণেন্দ্রর বুটের মশ-মশ শব্দ হচ্ছে কাছারীর দালানে। আজে-বাজে কি সব বলছে। বলছে:

'Twill vex thy soul to hear what I shall speak ;
For I must talk of murders, rapes, and massacres,
Acts of black night, abominable deeds,
Complots of mischief, treason, villanies,
Ruthful to hear, yet piteously performed.

মশালচিরা লণ্ঠন জ্বালতে বেরিয়েছে এদিকে-সেদিকে। ফুরফুরে বাতাস বইছে বৈশাখী দিনের। ভোঁ-ভোঁ মশা উড়ছে। গোধূলির পর রাত্রি নেমেছে কলকাতার শহরে। কয়েকটা নতুন তারা জ্বল-জ্বল করছে আকাশে।

[ক্রমশঃ।

বৈশাখের প্রচ্ছদ

এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে সশিষ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিত্র মুদ্রিত হইল। এই ছবিতে আছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রথম সারি) ঠাকুরের ডান হইতে বামে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমা; (দ্বিতীয় সারি) স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ; (তৃতীয় সারি) স্বামী যোগানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ; (চতুর্থ সারি) স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ; (পঞ্চম সারি) স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ ও স্বামী অদ্বৈতানন্দ; (ষষ্ঠ সারি) স্বামী নির্ম্মলানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। শিল্পী এন সি দাস অঙ্কিত। চিত্রখানি দুষ্প্রাপ্য।

যাযাবর

পূর্ব্বভাষণ

পারস্যদেশীয় উপকথায় একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে। গল্পের নায়ক,—বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন ও বিত্তহীন এক রাখাল বালক সমুদ্রের বেলাভূমিতে ক্রীড়াচ্ছলে শুক্তি আহরণ করতো প্রতিদিন। জানতো না, তার মধ্যে ছিল লক্ষহীরা মানিক। সে মানিক যার ঘরে আসে, তাকে রাজা করে, যার ঘর ছাড়ে, সে হয় ফকির। অপুত্রক অধিপতির মৃত্যুর পরে রাজ্যের বৃদ্ধ উজীর বের হলেন ভাবী সুলতানের সন্ধানে। বহুদিনব্যাপী ব্যর্থ অন্বেষণের পর হতাশ হয়ে এক দিন শপথ করলেন, পরদিন জুম্মার নামাজের শেষে যার সঙ্গে প্রথম দেখা হবে, তাকেই রাজপদে মনোনীত করবেন। নামাজের পরে মসজিদের বাইরে এসে উজীর দেখতে পেলেন দ্বারের পাশে মীনারের ছায়ায় এক রাখাল বালক নিদ্রামগ্ন। ক্ষুধায় ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। ঘোড়ায় চড়িয়ে উজীর নিয়ে এলেন তাকে রাজধানীতে। রাখাল বালককে বসিয়ে দিলেন বাদশাহের তক্তে। শাহজাদীর সঙ্গে ঘটলো তার পরিণয়।

নিজের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ অসামান্যতা লাভের এমন বিস্ময়কর ঘটনা শুধুমাত্র রূপকথার ভাণ্ডারেই নিবদ্ধ নয়। সত্যকার মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ইতিহাসেও এমন একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। প্রীতিপ্রদ বলেই সে অভিজ্ঞতা দীর্ঘকাল আমাদের স্মরণে থাকে না। সে আমাদের আপন সৌভাগ্যের অনুকূল, তাই তাকে আমরা আপন যোগ্যতার অবধারিত পুরস্কাররূপেই গণ্য করি, প্রসন্ন ভাগ্য-দেবতার অকারণ পক্ষপাত বলে স্বীকার করিনে।

আমি লেখক নই। গ্রন্থ রচনার কোন উচ্চাভিলাষ কোনোকালে আমার কল্পনায় ছিল না। অথচ সম্প্রতি গ্রন্থকাররূপে আমার পরিচিতি ঘটেছে। এটা একান্তই আকস্মিক। পাঠকজনের যে প্রসন্ন প্রশ্রয় লেখকজীবনের চরম 'পুরস্কাররূপে চিরকাল স্বীকৃত, সেই অভাবনীয় অনুগ্রহের দ্বারা যদি ধন্য হয়ে থাকি, তবে তাও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

কর্ম্মের প্রয়োজনে আমি দিল্লী এসেছিলেম। সে অনেক দিন আগেকার কথা। বয়স তখন অল্প, কৌতূহল প্রচুর এবং মনের স্বাভাবিক রসগ্রাহিতা পরিণত বুদ্ধি ও পরিপক্ক অভিজ্ঞতার অন্তরালে তখনও পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ার অবকাশ পায়নি। জীবনের যে-অধ্যায়ে হৃদয় সহজে উদ্বেল, কল্পনা উদ্দীপ্ত ও রসনা মুখর হয়, যৌবনের সেই প্রারম্ভকালে আর্য্যাবর্ত্তের এই মহানগরীতে আমার প্রথম পদার্পণ। আমার পক্ষে সেটা অবশ্যই অবিস্মরণীয় ঘটনা।

সর্ব্বদেশেই কাব্য ও উপকথার মধ্য দিয়ে কয়েকটি স্থান অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের খ্যাতি তাদের আপন মাহাত্ম্যে নয়, সাহিত্যিকের রচনানৈপুণ্যে। হারুন্-অল্ রসিদের রাজধানী বোগদাদের সঙ্গে সত্যিকার ভূগোলের সম্পর্ক সামান্য, তার যথার্থ পরিচয় আছে একমাত্র শেহরজাদী কথিত একাধিক সহস্র রজনীর কাহিনীতে। যে-উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-অলিন্দে একদা মৃগলোচনা জনপদবধূরা প্রবাসী প্রিয়জনের প্রতীক্ষারতা ছিলেন, তার আসল ঠিকানা সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ম্যাপে মিলে না। শুধু স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

কাব্যলোকের মহিমামণ্ডিত এই নগরমালার মধ্যে দিল্লীর স্থান নেই। রামগিরি পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত অভিশপ্ত যক্ষের বিরহ-বেদনা বহন করে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে যে-পূর্ব্বমেঘ যক্ষপ্রিয়ার কাছে উপনীত হয়েছিল, তার পরিক্রমণ-পথে দিল্লীর আকাশ ছিল কি না, সে কথা কালিদাস বলেননি। ইঙ্গ-বঙ্গ-অধ্যুষিত অতিআধুনিক দার্জ্জিলিংকেও রবীন্দ্রনাথ কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলোক থেকে গল্পের স্বপ্নলোকে উন্নীত করেছেন, কিন্তু দিল্লীপথের ধূলি ছাড়া মহানগরীর আর কিছুই তাঁর রচনায় স্থান পায়নি, যদিও বত্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁ'র পুত্রীকে জনশূন্য ক্যানিং রোড অপেক্ষা আজমিরী গেটের পাশে খুব বেমানান দেখাতো বলে মনে হয় না।

তবুও দিল্লীর গৌরব তার নিজস্ব। সে তো একটি মাত্র নগরী নয়, বহু নগরীর ধ্বংস ও বিকাশ। একটি রাজার রাজধানী নয়, বহু রাজত্বের শ্মশান ও

স্মৃতিকা। বিচিত্র সভ্যতা, বিভিন্ন ধর্ম্ম, বহুবিধ জাতির সংঘাত, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এইখানে। যুগ-যুগান্ত ধরে যে-তিনটি স্থান ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ধারণ, খ্যাতি বহন ও পরিচয় প্রসারিত করেছে, তার মধ্যে বারাণসীর পরিচিতি প্রজ্ঞায়, বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধি ভক্তিতে, দিল্লীর গুরুত্ব ইতিহাসে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও দিল্লীর ইতিবৃত্ত অনেকাংশে সমার্থক।

ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের প্রভেদ অনেক। কাব্যের আবেদন মানুষের মনে। তার নায়ক-নায়িকার বিচরণস্থল আমরা কল্পনায় অনুভব করি। চোখ বুজে তাকে ভাবা যায়। ইতিহাসের সাক্ষ্য থাকে মাটিতে। তার ঘটনাস্থল প্রত্যক্ষ। চোখ মেলে তাকে দেখা যায়। দিল্লীর প্রাচীর ও প্রান্তরে, তুর্গ-প্রাকার ও প্রাসাদ-অঙ্গনে, সমাধিক্ষেত্র ও সৌধ-মালায় অসংখ্য দর্শনীয় আছে। কিন্তু দর্শনের যে রস, সে শুধু নয়ননিবদ্ধ নয়, মননসাপেক্ষ। চক্ষু দ্বারা দেখি—একথা বাল্যকালে বিদ্যারম্ভের প্রথম পর্ব্বে পাঠ্যপুস্তকে আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু চোখ চাইলেই যে দেখা যায় না, এ তথ্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ জেনেছি। যে-দৃষ্টির সঙ্গে মনের যোগ নেই, সে তো দেখা নয়,—তাকানো। দেখার সঙ্গে আনন্দের যোগ সাধন করতে সঙ্গীর প্রয়োজন। ভোগের বেলায় সংখ্যাধিক্যের ফলে বস্তুর হ্রাস ঘটে। একের পাতে যা পরিপূর্ণ এক, তুইয়ের পাতে তা বিভক্ত অর্দ্ধেক। উপভোগের বেলায় বহু দ্বারা রসের ঘটে বৃদ্ধি। এ জন্যই ষ্টেথেস্কোপ হাতে রোগী দেখতে যাই একা, উড়নী গায়ে বিয়ের কনে দেখতে যাই সবান্ধবে।

দিল্লীতে আমি দেখেছি অনেক, শুনেছি প্রচুর এবং জেনেছিও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু সমস্তই একক। যাঁর সঙ্গে দেখলে দেখার বস্তু দর্শনীয় হয়ে ওঠে, তিনি ছিলেন অন্যত্র। তাঁকে নিয়ে দিল্লী পরিভ্রমণ সেদিন সম্ভব ছিল না। তবুও আমার চোখ দিয়েই তাঁকে দেখাবো, আমার মনে এই অভিলাষ ছিল। সে কাজটা সহজ নয়।

পুরাকালে হংসদূতের দ্বারা দূর দূরান্তরে বার্ত্তা প্রেরণের রীতি ছিল। কিন্তু এ যুগের নলরাজেরা জানেন, বার্ত্তাবাহী রাজহংস দময়ন্তীর উদ্যানে পৌঁছিতে পারবে না, মধ্যপথেই কোন সুনিপুণ পাচকের হস্তে সুপক্ক ব্যঞ্জনায় ভোজনরসিকগণের রসনাতৃপ্তির সহায়ক হবে। বর্ত্তমানের মরালগামিনীরা মরালকে বাতিল করেছেন। তাঁরা এখন উদ্দিপরা সরকারী ডাক-হরকরার উপর নির্ভর করেন। সুতরাং আমার দেখাকে আমি রূপান্তরিত করলেম পত্রে। তার সংখ্যা অনেক এবং স্ফীতি ভীতিজনক।

চিঠি জিনিষটা স্বভাবতঃই দ্বিবচনের ব্যাপার। তাঁকে বহু বচনের ব্যবহারে আনলে ব্যাকরণদুষ্টি ঘটে। চিঠি চাঁদনী রাতে তু'টিমাত্র প্রাণীর গঙ্গা-বিহরণের ছোট্ট পানসিটি। কুসুমগঞ্জের হাটের পথে বহু জনের নদী পারাপারের জন্য পাঁচ মাল্লার খেয়া নৌকা নয়। দিল্লীর রৌদ্রদগ্ধ আকাশের নীচে আমার বিস্তীর্ণ অবকাশক্ষেত্রে যে প্রচুর পত্রশস্য জন্মলাভ করেছিল, সেগুলি একটিমাত্র গৃহিণীর ভাণ্ডারে মরাই ভ'রে রইবে, এই ছিল কামনা। কোন দিন কোন কারণে সরকারী সিভিল সাপ্লাইর গুদামে সেগুলি সর্ব্বসাধারণের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করবে, এমন আশঙ্কা ছিল না। পত্রগুলি যাঁকে লেখা, তাঁর কোমল করযুগলের মধ্যে কৈবল্য লাভ করলেই তাদের মোক্ষ। তারা যে ভবিষ্যতে কম্পোজিটারের স্থূল হস্তাবলেপনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ছাপাখানার মসীলিপ্ত হয়ে সাহিত্যের বিচার-শালায় লেখকের দুষ্কৃতির অকাট্য সাক্ষ্যরূপে দেখা দেবে, তা কল্পনাও করিনি।

মুদ্রণের দ্বারা পত্রের জাতিভ্রংশ ঘটে, যেমন সিনেমাকরণের দ্বারা উপন্যাসের। পত্রের রস লজ্জানম্র নববধূর অনুচ্চ কণ্ঠে গীত সঙ্গীতের মতো, নির্জ্জন শয়নকক্ষে একমাত্র স্বামীর কাছেই তার প্রকাশ। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে জনাকীর্ণ জলসার আসরে তাকে টেনে আনলে তারও তুর্গতি, অন্যেরও তুর্ভোগ। কারণ, বঁধুর কানে যা কলস্বর, বহুর কানে তা কলরব।

অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত পত্রের অভাব নেই, যদিও সিনেমায় বেশীর ভাগ যুদ্ধ-চিত্রই যেমন প্রচ্ছন্ন প্রোপাগাণ্ডা, সাহিত্যের অধিকাংশ পত্র-সঙ্কলনও তেমনি ছদ্মবেশী প্রবন্ধসংগ্রহ। পত্র-সাহিত্য নামেও সাহিত্যের একটা বিভাগ আছে। সাধারণতঃ তু'টি কারণে তার উদ্ভব। প্রথমটা তথ্যমূলক, দ্বিতীয়টা সাহিত্যিক।

কবি বা সাহিত্যিকদের লেখা পত্রে লেখকের তু'টি

বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পায়। কাব্যজীবনের বহির্দেশে প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর নিছক মানুষরূপে যে একটা সত্তা বর্ত্তমান, এক শ্রেণীর পত্রে তারই পরিচয় থাকে। সেখানে পত্রলেখক পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী বা বন্ধু প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা পরিচিত, সাহিত্যপ্রতিভার দ্বারা নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রগুলি পত্ররচয়িতার আত্মপ্রকাশের অন্যতম উপকরণ। পত্ররচনা সেখানে একটা রীতি, ইংরেজীতে যাকে বলে ফর্ম্ম। সেখানে যাকে লেখা হয় সে গৌণ, যা লেখা হয় সেটাই মুখ্য। এই ফর্ম্ম অবলম্বন করে সার্থক কথাসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, যেমন,—রোমানফের গল্প, তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে, যথা,—লেটারস টু দি শেরিফ অব ব্রিষ্টল। নব শিক্ষার্থিনীর জন্য সংক্ষেপে পৃথিবীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে ; প্রমাণ—লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু এ ডটার। উপভোগ্য কবিতা রচিত হয়েছে, উদাহরণ—শিলংএর চিঠি। প্রথম শ্রেণীর পত্র প্রকাশের কালে প্রকাশকের একটি চোখ থাকে জীবনীকারের দিকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পশ্চাতে থাকে সৃষ্টির প্রেরণা। 'ভাই ছুটি' বলে যার আরম্ভ আর ছিন্নপত্র—এ দুই-এর রস যে আলাদা জাতের এবং গুরুত্ব যে পৃথক কারণে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

মুদ্রিত পত্রের আরও একটি শ্রেণী আছে। সেখানে লেখকের উদ্দেশ্যটা এতই সুস্পষ্ট যে, তাকে কেউ পত্র বলেই জ্ঞান করে না। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুযুধমান দুই পক্ষের মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় 'খোলা চিঠি'র গোলা বর্ষণকে পাঠকেরা কূটনৈতিক কুস্তির প্যাঁচরূপেই গণ্য করে, চিঠি বলে ভুল করে না।

দিল্লীতে লেখা পত্রগুলি মূলতঃ চিঠিই ছিল। কিন্তু সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের কালে সংকলয়িতা বাংলা চলচ্চিত্রের সেন্সার বোর্ডের উপযোগী অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে তার মধ্য থেকে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গসমূহ, এমন কি তার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত অসামান্য নিপুণতায় নিশ্চিহ্ন করেছেন। তাঁকে দোষ দিতে চাইনে। প্রত্যেক পত্রের মধ্যেই লেখক ও প্রাপকের সাংসারিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে স্নেহ, প্রীতি, রাগ, অনুরাগ প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন থাকে, সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তার উদ্ঘাটন বাঞ্ছনীয় নয়। তাতে পরিণামে উভয়েরই বিব্রত বোধ করার সম্ভাবনা। তবুও একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রন্থাকারে গ্রথিত আমার পত্রগুলি কারও কাছে যদি প্রবন্ধসমষ্টি বা অন্য আর কিছু মনে হয়ে থাকে, তবে তার জন্য একমাত্র সংকলয়িতার কাঁচিকেই দায়ী করতে হয়। ডাক্তারেরা জানেন, অস্ত্রোপচারের ফলে রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আংশিক বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী।

কী কারণে পত্রাধিকারিণী চিঠিগুলিকে তাঁর নিজস্ব অন্তঃপুরের গোপনীয়তা থেকে টেনে এনে বহির্জগতে লোক-লোচনের সমুখে তুলে ধরেছেন, তা আমার জানা নেই। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে নিশ্চয়ই এর একটি বুদ্ধিবিভ্রান্তকরী ব্যাখ্যা আছে। তাতেও আমার প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয়, মেয়েদের স্বভাবের মধ্যেই একটা স্বাভাবিক প্রচার-প্রবণতা আছে।

সংসারে পুরুষের পরিচয় কীর্ত্তিতে, সেটা স্বয়ং-প্রকাশ। নারীর গৌরব অধিকৃতির, সেটা প্রচারের অপেক্ষা রাখে। স্থায়ী আমানতে গচ্ছিত টাকার পরিমাপ প্রচুর, এই তথ্যটুকু জেনেই পুরুষ সন্তুষ্ট রয়; ব্যাঙ্কের পাশ-বই পকেটে নিয়ে বেড়ানো সে প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু অর্থের অস্তিত্বটাই নারীর কাছে যথেষ্ট নয়। তার প্রমাণটা যথোচিত পরিমাণে পরিস্ফুট না হলে তার তৃপ্তি নেই। তাই জরোয়া গহনা সিন্দুকে থাকলেই মেয়েরা খুশী নয়, নিজের সর্ব্বাঙ্গে ঐশ্বর্য্যের বিজ্ঞপ্তি বহন করে, আপন ধনসম্ভারের প্রচারকার্য্যে তাদের দুর্জ্জয় আসক্তি।

জানি, আমার পত্রগুলির প্রতি আমি অযথা মহার্ঘ্যতা আরোপ করছি, এই অভিযোগ উঠতে পারে। কিন্তু দ্রব্যের মূল্য তো শুধুমাত্র তার অন্তর্নিহিত গুণাগুণের দ্বারা নির্ণীত হয় না। এক খণ্ড ব্যবহৃত পুরাতন ডাকটিকিটের দাম আমার কাছে কানাকড়িও নয়, অথচ ডাকটিকিট সঞ্চয় যার বাতিক, তিনি তার জন্য প্রয়োজন মতো হাজার টাকা দিতেও কার্পণ্য করেন না। সুতরাং সেদিনের পত্রগুলি অন্ততঃ পত্রাধিকারিণীর কাছে একেবারে মূল্যহীন ছিল না, এ বিশ্বাস যদি পত্রলেখকের মনে কখনও দেখা দিয়ে থাকে, তবে আশা করি, তা অবিনয়ের অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

কিন্তু মূল্য এক কথা, প্রচার আর। পত্র প্রকাশের সঙ্গে আত্মপ্রকাশে আমার প্রবল আপত্তি ছিল। প্রশ্ন করলে, নিশ্চিতরূপে হেতু নির্দ্দেশ করা কঠিন। কারণ, মানুষের সকল কাজের পিছনেই

একাধিক হেতুর সমষ্টি থাকে, শুধু একটিমাত্র হেতু থাকে না, যদিও নিজের অভিরুচি, সুযোগ ও সুবিধানুযায়ী ঐ বহুবিধ কারণের মধ্যে বিশেষ একটিকেই আমরা একমাত্র কারণ বলে প্রমাণ করতে চাই। যে-সকল কারণে আত্মগোপনের প্রয়াস করেছিলাম, তার প্রধানতম বর্ত্তমানে অর্থহীন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের অভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে অন্য অনেক পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা, অন্তরায় ও অসুবিধার সঙ্গে সঙ্গে তারও অবসান ঘটেছে। সবিস্তারে আজ তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ভারতবর্ষকে শাসনব্যবস্থার স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় প্রবল প্রতিহিংসা-পরায়ণতার সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁদের পক্ষে তার পরিপূর্ণ অর্থবোধ নিশ্চয়ই কঠিন নয়।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল নিছক ভয়সঞ্জাত। মুদ্রণ সম্পর্কে আমার মনে একটা সাজ্ঘাতিক শঙ্কা আছে। স্বয়ংবর-সভার রাজকন্যার মতো একমাত্র যোগ্যতমকেই ছাপার অক্ষর সসম্মানে বাসরঘরের ভিতরে নিয়ে যায়, নিষ্করুণ নির্ম্মমতায় বাকী আর সবাইকে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিতরূপে দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে রাখে। সেই ব্যর্থকাম উপহসিতদের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে আমার উৎসাহ ছিল না।

সমালোচকদের ঔৎসুক্য ঐখানেই নিবৃত্ত হয় না। তাঁরা ঘাড় নেড়ে সংশয়ের স্বরে বলেন,—তা যেন হোল; কিন্তু ঐ মৃত্যু-সংবাদ রটনাটা কেন? জবাবে আমি বলি, সেটা রটনা নয়; ঘটনা। সেদিনের পত্রলেখকের যে নিঃশেষে মৃত্যু ঘটেছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। দেহটাই যে বেঁচে থাকার নিদর্শন নয়, মিশরের মমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আর দৈহিক মৃত্যুর পূর্ব্বেই যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে, ইতিহাসে তারও নজীর আছে। রাম্‌জে ম্যাক্‌ডোন্যালডের সত্যকার মৃত্যু কি তাঁর দেহাবসানের অনেক আগেই ঘটেনি?

দিল্লীতে নবাগত যাযাবরকে অদ্যকার লেখকের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম, ঠিক যেমন বিবাহোত্তর পত্নীর মধ্যে পূর্ব্বরাগের প্রিয়াকে দেখতে চাওয়া বিড়ম্বনা। সেদিনকার রচনার সঙ্গে আজকের লেখা যদি কোন পাঠক তুলনা করেন, তবে তিনিই আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী শত্রুতা করবেন

অনিচ্ছাকৃত শত্রুতার স্বাদ অবশ্য একেবারে অপরিজ্ঞাত নয়। মিত্রজনের মনোযোগও যে কোন কোন ক্ষেত্রে কতখানি অপ্রীতিকর হয়ে উঠতে পারে, তা ইতিপূর্ব্বে জানা ছিল না। আত্মবিলুপ্তির জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেম। তাতে লাভ হয়নি। পরিচয় গোপন রয়নি। ফলে, চায়ের নিমন্ত্রণে গেলে যথারীতি পরিচয় আদান-প্রদানের পরে অকস্মাৎ প্রশ্ন শুনতে হয়,—"ওঃ, আপনিই তো সেই—?" আত্মীয়-বাড়ীতে বিবাহ-সভায় সদ্য-পরিচিতা অতিথিরা বইর নায়ক-নায়িকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বলেন, "আচ্ছা সত্যি কি—?" বন্ধুদের আড্ডায় উৎসাহী সাহিত্য-সমালোচকেরা পুস্তকে-বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত ব্যাখ্যা দাবী করেন।

বন্ধুদের উদ্বেগ এর চাইতেও মারাত্মক। তাঁরা শুধু প্রশংসা করেই নিরস্ত নন, উপদেশদানেও সমান উৎসাহী। পরিচিত, অর্দ্ধ-পরিচিত ও অপরিচিতের দল যখন তখন বাড়ি বয়ে এসে অযাচিত পরামর্শ দেন। কেউ বলেন, এবার একখানা বড় উপন্যাস লিখুন। কেউ বা বলেন, উপন্যাস নয়,—ছোট গল্প। তাতেই আমার হাত খুলবে। আর এক দলের বিশ্বাস, প্রবন্ধ রচনাই আমার ক্ষেত্র। অধিকতর হিতাকাঙ্খীর দল বিষয়-নির্ব্বাচনের ক্লেশ পর্য্যন্ত নিজেরাই স্বীকার করেন। তাঁরা কেউ বলেন দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে, কেউ বা বলেন, দিল্লী আর নয়, এবার কলকাতার উপরে একটা বই। হু হু করে কাটবে। সংসারে ডাক্তারের সংখ্যা অগুণতি, সে কথা আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন সময়ে উপলব্ধি করেছি। মাথা ধরেছে—একথা বলা মাত্র প্রত্যেক পরিচিত বন্ধুর কাছ থেকেই একটা অষুধের বা প্রক্রিয়ার নির্দ্দেশ কে না পেয়েছি? সম্প্রতি আবিষ্কার করলেম, এ জগতে সাহিত্য-রসিকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

শুধু উপদেশেই শেষ নয়। অনুরোধ এবং অনুযোগও আছে। সদ্যঃপ্রসূত মাসিকপত্রের তরুণ সম্পাদক আসেন লেখার বায়না নিয়ে। রিক্তহস্তে ফিরে যাওয়ার কালে মনে মনে গাল দিয়ে যান, লোকটা পয়লা নম্বরের স্নব। পুরাতন পুস্তক-ব্যবসায়ী আসেন নতুন বইর দাবী নিয়ে। বিফল মনোরথ হয়ে সন্দেহ করেন, নিশ্চয়ই অপর কেউ

বেশী পারসেণ্ট কবুল করেছ। নূতন প্রকাশক অনুরূপ ব্যর্থতায় বিরক্তির সঙ্গে সিদ্ধান্ত করেন, এ লেখকের অর্থগৃধ্নুতা মেটানো তার শক্তির বাইরে।

অর্থে আসক্তি নেই যোগী ঋষির। আমি তাঁদের দলে নই। কিন্তু অর্থের কারণে গ্রন্থরচনা করেন অর্থ-বই লেখকেরা। আমি সে গোষ্ঠিরও বাইরে। নোট লেখা আমার কর্ম্ম নয়। আসল কথা এই যে, আমার লেখার পশ্চাতে কোন প্রেরণা নেই।

আমি সাহিত্যিক নই। কল্পনাশক্তির যে-প্রাচুর্য্য কথাসাহিত্যিকের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন, আমার মধ্যে তার বাষ্পমাত্র নেই। নিজকে অসাহিত্যিক প্রমাণের আগ্রহে শরৎচন্দ্র বলেছেন, আকাশের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর চোখে ব্যথা ধরে গেলেও, কারও নিবিড় কুন্তলদাম দূরে থাক, একগাছা চুলের আভাস পর্য্যন্ত কখনও তাঁর চোখে পড়েনি। শরৎচন্দ্রের খেয়াল হয়নি যে, ঐ বিনয়োক্তি লিপিবদ্ধ করার কালে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি অনবদ্য সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু আমার পক্ষে এটা নিতান্তই স্বীকারোক্তি। প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের পানে তাকালে কারো কমল-আননের কথা আমার মনে জাগে না। পদ্মমধুর কথা স্মরণ করে প্রলুব্ধ রসনা জলসিক্ত হয়ে ওঠে।

আমি সাংবাদিক। সাংবাদিকেরা চেষ্টা করলে সাহিত্যসমালোচক বা প্রবন্ধকার হতে পারেন, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর কথাসাহিত্যিক হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। উইনষ্টন চার্চ্চিলের গদ্য-রচনার ষ্টাইল যতই মনোহর হোক না কেন, Great Expectations তাঁর কাছে দুরাশা, Great Contemporaries নিয়েই তাঁর কারবার। সংবাদ-সাহিত্য নামক একটা বস্তু সম্প্রতি এদেশেও দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সত্যিকার সাহিত্যের পংক্তিতে তার আসন আজও পাকা হয়নি। সেটা বড় জোর আর্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রী।

এর কারণ সুস্পষ্ট। রস-সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যা ঘটেছে, তার চাইতে যা ঘটতে পারে তাই নিয়ে তার কারবার। সে সাহিত্যের জন্মস্থান সাহিত্যিকের মনে। সংবাদ-সাহিত্য একান্তভাবে বাস্তব-সর্ব্বস্ব। যা ঘটেনি তা তার এলাকার বাইরে। সে-সাহিত্যের সূচনা হয় সাংবাদিকের দেখায়। কথা-সাহিত্য র‍্যাফেলের চিত্র। সংবাদ-সাহিত্য সেসিল বিটনের ফটোগ্রাফ। সাহিত্যিক রচনা করেন আপন মনের প্রকাশ-ব্যাকুলতায়, কেউ পড়বে কি পড়বে না, সে-চিন্তা তাঁর পক্ষে অবান্তর। সাংবাদিক রিপোর্ট লেখেন জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে, তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে সহস্র সহস্র পাঠক।

আমার চোখের সামনেও একটি ব্যক্তি আছেন। তাঁর নাম বলা নিষেধ। দিল্লীর পত্রগুলি তাঁকেই লিখত। আজ যা লিখছি, তাও তাঁরই জন্যে। আমার কাছে তিনি অধিক প্রত্যাশা করেন না। তিনি জানেন, আমি দ্রষ্টা নই, দর্শক। আমি গল্প বানাতে পারিনে, গল্প শোনাতে পারি। বলা বাহুল্য, আমার লেখা তাঁর ভালোই লাগে। প্রশংসা যা করেন, তাতে আর যাই থাক, অপ্রমত্ত সমালোচকের নিরপেক্ষ বিচারশক্তির প্রমাণ থাকে না। নিশ্চিত জানি, তিনি আমার জীবনী রচনার ভার নিলে আক্ষেপের কারণ ঘটবে না।

অবশ্য মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, কোনো লোকই সম্পূর্ণরূপে পৃথক নয়। মৌলিক হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়ে মানুষ মাত্রই এক, অনুভূতির যোগসূত্রে অল্প-বিস্তর একের সঙ্গে বহুর সাদৃশ্য আছে। সুতরাং হয় তো এক জনের কাছে যা রুচিকর, পাঁচ জনের কাছেও তা একেবারে বিস্বাদ নয়। বিচিত্র নয় যে, আমার লেখাও সেই একটি লোকের সঙ্গে অন্য আরও দু'-এক জন পাঠকের ভাল লাগবে। অবশ্য ভাল লাগার মাত্রা নিয়ে তারতম্য ঘটা অস্বাভাবিক নয়। মায়ের স্নেহে আর মাসির আদরে তফাৎ তো অবধারিত।

লেখার ইতিহাসটা কিন্তু নিতান্তই সাধারণ। বাংলাদেশের প্রত্যেক পুরুষকেই কোন এক বিশেষ বয়সে ঘটকের আক্রমণ সইতে হয়। তাদের কেমন করে ঠেকাতে হয়, অভ্যাসের দ্বারা সে বিদ্যা আমার আয়ত্ত। শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ এবং অনুরাগী পাঠকদের কি করে রুখতে হয়, সে কৌশল আমার জানা নেই। একমাত্র তাঁদের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রেরণায়ই এক দিন এক বন্ধুর সহায়তায় আমি এই বিরাট নগরীর প্রান্তভাগে এক ক্লাবে যোগদান করলেম।

ক্লাব বস্তুটা এদেশে প্রাচীন বানপ্রস্থের আধুনিক এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তফাৎ শুধু এই যে, এর জন্য

পঞ্চাশোর্দ্ধ অবধি অপেক্ষা করতে হয় না। ক্লান্ত, মর্ম্মাহত, তৃপ্তিহীন, লক্ষ্যহীন অভিজাত নরনারীর এটা আত্মবিস্মৃতির অবলম্বন, ইংরেজীতে যাকে বলে এস্কেপ। তাই বেশীর ভাগ ক্লাবেই বিপত্নীক অফিসার, স্বামী-পরিত্যক্তা রমণী, বিগতযৌবনা কুমারী, রূপহীনা তরুণী এবং অবিবাহিত প্রৌঢ় ব্যক্তিরা আসর-জঁাকানো। এদের জীবনে সুষমা নেই, অথচ আসক্তি আছে। তাই জীবনকে অপচয় করে এরা জীবনকে ভরাতে চেষ্টা করেন। রেসকোর্সে পর পর উইন-এ হেরে-যাওয়া জুয়ারী যেমন সমস্ত ক্ষতি একেবারে পূরণের আশায় প্লেসে-এ দ্বিগুণ বাজী রাখে।

এই ক্লাবটিতেও সে-ধরণের নরনারীর অভাব ছিল না। আর ছিল বিলাত-প্রত্যাগত তরুণ ব্যারিষ্টার, নতুন বিত্তশালী ব্যবসায়ী, সদ্য আলোকপ্রাপ্ত মাড়োয়ারী নন্দন ইত্যাদি। এই ক্লাবেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো মিসেস মলী সেনের সঙ্গে।

প্রাণী-জগতের মতো নাম-জগতেও যে বিবর্ত্তন আছে, মলী সেন তার জীবন্ত সাক্ষ্য। তাঁর মাতামহ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবিরাজ। ভৈষজ্যশাস্ত্রে তাঁর যেমন অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, সংস্কৃত কাব্যেও তেমনি প্রখর অনুরাগ। দৌহিত্রীর জন্মমাত্রই মাতামহ নামকরণ করলেন শ্রদ্ধামালিনী। কিন্তু এত দীর্ঘ নাম বানভট্টের কাদম্বরীতে যদি বা শোভা পায়, বিংশ শতাব্দীর গৃহস্থ পরিবারে চলে না। অচিরেই সকলের অলক্ষিতে নামের প্রথমার্দ্ধ বিস্মৃতির গর্ভে অন্তর্হিত হলো। রইলো শুধু মালিনী। সেটা সম্বোধনে সহজ এবং শ্রবণেও মধুর।

মেয়ের জ্যাঠামশায় অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কলেজের ছাত্র ছিলেন। কার্লাইলের লেখা এখনও অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর পরম ভক্ত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যৌবনে উপনিষদের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন। দুর্নীতি সম্পর্কে তাঁর শুচিবাই প্রায় হিন্দু বিধবার আচারপরায়ণতার কাছাকাছি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক প্রবন্ধ ছাড়া অন্য কোন বাংলা বই অন্দরমহলে দেখলে তিনি আতঙ্কিত হতেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীর নামে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের গন্ধ আবিষ্কার করে আঁতকে উঠলেন। নাম পালটে করলেন মলিনা।

পরবর্ত্তী সংশোধনের ভার কন্যা স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফিজ দাখিল করার কালে ফরমে ইংরেজী ধরণে নাম লিখলেন—মলোনী। উত্তরকালে বন্ধু ও ভক্তজনের অন্তরঙ্গ সম্ভাষণে তার সর্বশেষ রূপান্তর ঘটিয়ে সোসাইটিতে আবির্ভূতা হলেন মিসেস মলী সেন। এখানে বলে দেওয়া আবশ্যক যে, বাংলা সাহিত্য-জগতে শেষের কবিতার অমিত রে তখনও জন্মগ্রহণ করেনি।

মলী সেন হচ্ছেন সেই জাতীয় মেয়ে—না, থাক, সে কাহিনী বর্ণনা না করাই ভালো। তাঁর জীবন-আলেখ্য তার আপন উক্তি, আচরণ ও কর্ম্মের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হোক্ জনসমক্ষে। বহু চরিত্র সম্বলিত ঘটনা-বহুল সুদীর্ঘ ছায়াচিত্রের মতো। আমার জবানিতে তার ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র। সবাক চিত্রের তো কমেণ্টারী প্রয়োজন হয় না। [ক্রমশঃ।

চার্চ্চিল জল পান করেন না

ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট শেষ বয়সে যেখানেই যেতেন সঙ্গে নিয়ে যেতেন নিজের পানের জন্য জলের বোতল। তেহেরাণ কনফারেন্সে এক দিন জর্জ ডিক্সন লক্ষ্য করলেন যে, উইনষ্টন চার্চ্চিল যেন আরাম বোধ করছেন না। রুজভেল্ট বললেন যে, "চার্চ্চিলের বোধ হয় তৃষ্ণা পেয়েছে।" সেই ভেবে রুজভেল্ট নিজের পানীয় জল চার্চ্চিলকে পান করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল নেতিবাচক ভঙ্গীতে বললেন,—"আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আমি পানীয় জল কখনও খাই না।"

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

দুমড়ন—ভাঁজন, মোড়ন, জড়ান, পাকান।
দুরদৃষ্ট—মন্দভাগ্য, মন্দ প্রাক্তন, দুর্ভগা, অভাগা, মন্দাদৃষ্ট।
দুরন্ত—দুষ্ট, অবাধ্য, উপদ্রবী।
দুরবস্থা—দুর্দ্দশা, দুর্গতি, আপৎ কাল, ক্লেশ, দরিদ্রতা, দুর্দিন, কুসময়।
দুরাচার—কুব্যবহারী, অধার্ম্মিক, দুর্ম্মতি, দুর্বুদ্ধি, দুষ্ট, মন্দ, খল, শঠ।
দুরাত্মা—নির্দ্দয়, পাপী, দুর্দ্দান্ত, দুর্দ্ধর্ষ, নির্লজ্জ, অত্রপ, দুর্বৃত্ত।
দুরালাপ—কটুবাক্য, গালাগালি, দুর্বাক্য।
দুরাশয়—দুষ্টমনাঃ, জিঘাংসক, দ্বেষী।
দুরাসদ—দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ্য, কষ্টে প্রাপ্য।
দুরিত—পাপ, কিল্বিষ, দুষ্কৃত।
দুরূহ—গূঢ়, কঠিন, কষ্টসাধ্য, দুর্জ্ঞেয়।
দুর্গ—গড়, পরিখা, দুর্গম্য, কষ্টগম্য।
দুর্গত—দরিদ্র, দুঃখী, দুরবস্থাগ্রস্ত।
দুর্গন্ধ—মন্দগন্ধ, কুবাস, পুতিগন্ধ।
দুর্গম—কষ্টগম্য, অগম্যপ্রায়।
দুর্গা—ভগবতী, শিবানী, শিবের পত্নী।
দুর্ঘট—মন্দ ঘটনা, কষ্টসাধ্য, দুষ্কর।
দুর্জন—দুষ্ট, খল, উপদ্রবী, ক্রূর।
দুর্জয়—কষ্টদম্য, কষ্টলব্ধ বিজয়।
দুর্দর্শ—অপ্রত্যক্ষ, অস্পষ্ট, অপ্রকাশ।
দুর্নাম—অখ্যাতি, অপযশ, নিন্দা।
দুর্নীত—অবিনীত, কষ্টপ্রাপ্ত, দুর্লব্ধ।
দুর্নীতি—মন্দনীতি, অন্যায়, অবিচার।
দুর্বর্ত্ম—কুপথ, কদাচার, দুষ্ট, ভ্রষ্টাচার।
দুর্বল—শক্তিহীন, অসমর্থ।
দুর্ভক্ষ্য—অখাদ্য, অকাল, ভক্ষাভাব।
দুর্ভগা—দুঃখিনী, মন্দভাগ্যবতী।
দুর্ভাবনা—দুশ্চিন্তা, মন্দ ভাবনা।
দুর্ভিক্ষ—শস্যাদির অভাব, আকাল।
দুর্ম্মদ—মোহিত, মত্ত, তমোগুণযুক্ত।
দুর্ম্মুখ—কটুভাষী, নিষ্ঠুরভাষী।
দুর্ম্মূল্য—মহার্ঘ্য, বহুমূল্য।
দুর্ম্মেধা—মন্দ মেধা, নির্বোধ, অনিপুণ।
দুর্যোগ—মন্দ সময়, কুৎসিত সন্ধি।
দুর্লক্ষণ—অশুভসূচক চিহ্ন, দুশ্চিহ্ন।
দুর্লভ্য—দুষ্প্রাপ্য, কষ্টপ্রাপনীয়।
দুলাল—স্নেহপাত্র, অনুরাগ, প্রেম।
দুলিয়া—যানবাহক, স্কন্ধবাহক।
দুষ্কর—ক্লেশকর, কঠিন, শক্ত, বিষম।
দুষ্কর্ম্ম—দুষ্ক্রিয়া, কুক্রিয়া, পাপ কর্ম্ম।
দুষ্কৃত—পাপ, অধর্ম্ম, কুক্রিয়া, মন্দ।
দুষ্‌খ—পীড়া, ক্লেশ, দুঃখ, কষ্ট।
দুষ্পচ—দুষ্পাচ্য, অপাচ্য।

দুষ্পার—দুস্তর, অতরনার্হ, দুস্তরণীয়।
দুষ্প্রাপ্য—দুর্লভ্য, দুরাসদ, কষ্টলভ্য।
দুস্থ—দুর্দ্দশাপন্ন, দুঃখী, দরিদ্র, দীন।
দুহিতা—কন্যা, পুত্রী, কুমারী, অঙ্গজা।
দূত—প্রেরিত, চর, ধাবক, সম্বাদবাহক।
দূর—অসন্নিকট, অন্তর, অসমীপ
দূরদর্শী—পরিণামদর্শী, বিজ্ঞ, দীর্ঘদর্শী।
দূরাদূর—সর্ব্বত্র, নিকটানিকট।
দূর্ব্বা—তৃণবিশেষ।
দূষণ—দোষী করণ, দোষ প্রকাশন।
দূষণাবহ—নিন্দনীয়, দূষ্য, অনুযোজ্য।
দূষ্য—নিন্দনীয়, বস্ত্রগৃহ, তাম্বু।
দৃক্—চক্ষুঃ, নেত্র, লোচন, দর্শন, দৃষ্টি।
দৃক্‌পাত—দৃষ্টিপাত, অবলোকন, সাক্ষাৎ।
দৃঢ়—শক্ত, কঠিন, অচল, নিষ্ঠ, স্থির।
দৃঢ়বাদী—নিষ্ঠবক্তা, সত্যভাষী, স্থিরবাক্।
দৃঢ়বোধ—প্রত্যয়, নির্ণয়, নিশ্চয়।
দৃঢ়মুষ্টি—কৃপণ, অদাতা, বদ্ধমুষ্টি।
দৃশ্য—চক্ষুগোচর, দর্শনীয়, সুশ্রী।
দৃষ্ট—ঈক্ষিত, আলোকিত, প্রত্যক্ষ।
দৃষ্টান্ত—উদাহরণ, উপমা, তুলনা।
দৃষ্টি—দর্শন, নিরীক্ষণ, আলোকন, দেখন।
দৃষ্টিগোচর—সাক্ষাৎ, নয়নগোচর।
দৃষ্টিধরা—চক্ষুতারা, নেত্রমণি।
দেউল—দেবালয়, চড়ক, পুজাকর্ত্তা।
দেউলিয়া—ঋণশোধাক্ষম, হৃতসর্ব্বস্ব।
দেওন—দান করণ, অর্পণ, বিতরণ।
দেখান—দর্শান, প্রকাশন, প্রত্যক্ষ করণ।
দেখারু—দৃশ্য, প্রত্যক্ষ, দর্শনযোগ্য।
দেড়—অর্দ্ধেকের সহিত এক, সার্দ্ধেক।
দেদীপ্যমান—জাজল্যমান, প্রকাশমান।
দেনা—দাতব্য, ধার, ঋণ, দেয়।
দেনুয়া—দানপ্রাপ্ত, দত্ত, উৎসৃষ্ট।
দেবখাত—অকৃত্রিম জলাশয়, নদ্যাদি।
দেবগর্জ্জন—মেঘগর্জ্জন, বজ্রধ্বনি।
দেবতা—সুর, স্বর্গবাসী, দেব।
দেবত্র—দেবস্ব ভূম্যাদি, ঠাকুরভূমি।
দেবদূত—দেবপ্রেরিত, দেবচর।
দেবনিষ্ঠ—ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরভক্ত।
দেবপূজা—পুত্তলিকারাধনা, প্রতিমাপূজা।

[ক্রমশঃ।

শার্লট ব্রণ্টির চিঠি

[যক্ষ্মা একবার যে গৃহে প্রবেশ করে দু'-একটি বলি না নিয়ে কখনই সে-গৃহ পরিত্যাগ করে না। যক্ষ্মাক্রান্ত এমিলিকেও অকালে চিরবিদায় নিতে হয়েছে এ পৃথিবী থেকে। "জেন আয়ারের" লেখিকা শার্লট ব্রণ্টির বোন এমিলি। এমিলিও একখানা উপন্যাস রচনা করেছিলেন—"উইদারিং হাইটস্"—এবং এই একখানি উপন্যাসেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। জনৈক বান্ধবীকে লেখা শার্লট ব্রণ্টির এই চিঠি দু'খানির কোন পরিচয় দরকার করে না।]

২৩শে নভেম্বর, ১৮৪৮

আমার শেষ চিঠিতে জানিয়েছি এমিলি অসুস্থ। এখনও সে ভাল হয়নি। অত্যন্ত পীড়িত সে। আমার বিশ্বাস, তুমি যদি তাকে দেখ তো বলবে বাঁচার আর কোনই আশা নেই। এমন ঝাঁঝরা, রক্তলেশহীন অপচিত মূর্তি আর কখনো চোখে পড়েনি। বুকের গভীর থেকে ওঠা সেই নাছোড়বান্দা কাশিটা আছেই—সামান্যতম পরিশ্রমেই হাঁপাতে থাকে সে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুকে আর পাঁজরায় ব্যথা। এই একটি মাত্র সময় সে নাড়ী দেখতে দেয় এবং তখন নাড়ীর স্পন্দন হয় মিনিটে ১১৫। এই অবস্থাতেও সে ডাক্তার দেখাতে দৃঢ় ভাবে অস্বীকার করছে। তার মনের ভাবও খুলে বলবে না—সে সম্বন্ধে কারুর ইংগিতও বরদাস্ত করতে চায় না। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আমাদের অবস্থা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। ভগবানই একমাত্র বলতে পারেন কেমন করে এই অসহনীয় অবস্থার অবসান ঘটবে। বহু বার এমিলিকে হারানোর সম্ভাবনার কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু মানুষের স্বভাবই এমন যে এ চিন্তায় সংকুচিত হয়ে ওঠে। এ পৃথিবীতে এমিলিই আমার হৃদয়ের সব চেয়ে প্রিয়জন।

মঙ্গলবার

আরো আগেই লিখতেম যদি একটু আশার ক্ষীণতম রশ্মিও দেখতে পেতাম। কিন্তু কোনই চিহ্ন নেই। দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে এমিলি। ডাক্তারের মতামত এমন অস্পষ্ট যে কোনই কাজে আসেনি। তিনি কতকগুলো ওষুধ লিখে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু এমিলি তা মুখে তুলবে না। এমন অন্ধকার মুহূর্ত আর কখনো দেখিনি জীবনে। ঈশ্বরের করুণাই এখন একমাত্র ভরসা—এত দিন তা তিনি দিতেও কার্পণ্য করেননি।

নেপোলিয়ানের চিঠি

[ফ্রান্সের রাজতক্তে আসীন হয়ে নেপোলিয়ান জোসেফিনকেও তাঁর হৃদয়-সিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তখন তিনি গৌরবের স্বর্ণশিখরে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বরে অতুল জাঁকজমক আর যথোচিত ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে নেপোলিয়ান পুনর্বিবাহ করেন জোসেফিনকে। ভবিষ্যতের দিকে শ্যেন-দৃষ্টি সুচতুর নেপোলিয়ান সেদিন ইচ্ছা করেই সমস্ত অনুষ্ঠান থেকে একটি সামান্য অঙ্গ বাদ দিয়েছিলেন। যাজক-পল্লীর কোন পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন না সে বিবাহ অনুষ্ঠানে। ছয় বছর পরে শুধু এই কারণ দেখিয়েই বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভবপর হয়েছিল। নতারদাম দুর্গে ঐতিহাসিক উৎসবের বাহ্যাড়ম্বরের মাদকতায় বিভ্রান্ত জোসেফিনের চোখে এই ত্রুটিটুকু ধরা পড়েনি। জোসেফিন তখন স্বামি-গর্বে আত্মহারা—বহু সুন্দরীর ঈর্ষা ও অভিশাপের শরজালে বিদ্ধা। নেপোলিয়ানের সম্মুখে বহু সংকট। ট্রাফালগারের যুদ্ধ আসন্ন। জেনার ভাগ্যও সূক্ষ্ম সূত্রে ঝুলছে। এই রাজনৈতিক ঝটিকা ও কূট চক্রান্তের মাঝখানেও নেপোলিয়ানের কলম মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়নি। মালমেইসন থেকে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নেপোলিয়ান লিখলেন—"...চমৎকার আবহাওয়া। বিশ্বাস কর, আমার ছোট্ট জোসেফিনের প্রতি হৃদয়াবেগের মত আর কোন কিছুই এত অকৃত্রিম নয়। আমার সবই তোমার। ইতি বি।"]

ব্রান, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৮০৫

মহারাণী, ষ্ট্রসবার্গ থেকে চলে যাওয়ার পর আর একখানিও চিঠি আসেনি তোমার। তুমি ব্যাডেন, ষ্টাটগার্ট, মিউনিকে গিয়েছিলে কিন্তু একটি ছত্রও আমায় লিখে জানাওনি। এ তো ভালবাসার, কোমলতার পরিচয় নয়। এখনও আমি ব্রানে আছি। রাশিয়ানরা চলে গেছে। আমি সন্ধি করেছি। কয়েক দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে আমি কি হতে যাচ্ছি। তোমার ঐ আড়ম্বরের স্বর্ণশীর্ষ থেকে এ অধম দাসের প্রতি একটু প্রসন্নতা-বারি বর্ষণ করো।

নেপোলিয়ান।

শেলীর চিঠি

[যক্ষ্মাক্রান্ত কীট্‌সকে শেলী পিসায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।]

পিসা, ২৭শে জুলাই, ১৮২০

প্রিয় কীট্‌স

অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে মিঃ গিসবোর্ণের নিকট তোমার ভীষণ বিপদপাতের কথা আমি শুনেছি। সে আরো বলেছে, তোমার চেহারায় না কি এখনও ক্ষয় রোগের ছাপ সুস্পষ্ট। তোমার মত যারা চমৎকার কবিতা লেখে যক্ষ্মা তাদেরই বেশী ভালবাসে, আর ইংলণ্ডের শীতের সহায়তায় পছন্দসই লোককে বেছে নিতে একটুও অসুবিধা হয় না তার। তাই বলে এ কথা বলছি না যে, তরুণ এবং অমায়িক কবিরাই যক্ষ্মার একমাত্র প্রিয়পাত্র এবং

কাব্য-লক্ষ্মীর সঙ্গে এ নিয়ে তাদের একটা চুক্তিনামা সই করা আছে। কিন্তু আন্তরিক ভাবে বলছি, যে-বিষয়ে আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত তা নিয়ে আমি পরিহাস করি না। আমার মতে শীতটা তোমার ইতালীতে কাটানই উচিত এবং এই ভাবে এই মহা অনিষ্টের হাত হতে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। যদি প্রয়োজনীয় মনে কর, তাহলে পিসা বা পিসার আশে-পাশেই যত দিন ভাল লাগবে তত দিন থাকতে পার। মিসেস্ শেলীও আমার সঙ্গে তোমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন আমাদের এখানে থাকবার জন্য। সমুদ্র হয়ে তুমি লেগহর্ণে আসতে পার। ইতালী অতি দর্শনীয় এবং দুর্বল হৃৎপিণ্ডের পক্ষে সমুদ্র সত্যই ভারী ভাল। সমুদ্র আমাদের এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। যে-কোন অবস্থাতেই তোমার ইতালী দেখা উচিত—যদি কোন উদ্দেশ্য আরোপ করতে দাও ত বলব তোমার স্বাস্থ্য তারই একটা অজুহাত। মর্মর মূর্তি, চিত্রকলা, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ—এ সব সম্বন্ধে বাগাড়ম্বর করতে বিরত রইলাম। আর পাহাড় নদী মাঠ প্রান্তর আকাশ, আকাশের বর্ণালী—এদের সম্বন্ধে মৌনতায় রীতিমত সহিষ্ণুতার দরকার।

কিছু দিন হোল, তোমার 'এণ্ডিমিয়ান' আবার নতুন করে পড়লাম এবং কাব্য-ঐশ্বর্যেরও নতুন আস্বাদ পেলাম যদিও অলক্ষ্যে তার ধারা বর্ষণ হচ্ছেই। সাধারণ পাঠকেরা সহজে এর মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারে না এবং যথেষ্ট বই বিক্রী না হওয়ার এইটাই প্রধান কারণ। তোমার মহৎ সৃষ্টির প্রতিভা আছে এ আমার দৃঢ় ধারণা এবং মহৎ সৃষ্টি তুমি করবেই। অলিয়ারকে বলা আছে আমার সব বই তোমায় পাঠিয়ে দেবে। 'প্রমিথিউস আনবাউণ্ড' হয়ত এই চিঠির সাথে এক সময়েই পাবে। 'সেন্সি' এত দিনে নিশ্চিত পেয়ে গেছ আশা করি! সম্পূর্ণ নতুন ঢংএ খুব যত্ন নিয়ে লিখেছি বইখানা।

কবিতায় আমি প্রচলিত পদ্ধতি ও ম্যানারিজম পছন্দ করি না। আমার চেয়ে যাঁরা আরো প্রতিভাবান তাঁরা এই রীতি অনুসরণ করবেন আশা করি। ইংলণ্ডেই থাক আর ইতালীতেই আস, যেখানেই যাও আর যাই কর—তোমার স্বাস্থ্য সুখ ও সাফল্যের জন্য আমি চির-উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলাম।

তোমার বিশ্বস্ত
পি, বি, শেলী।

কীট্‌সের চিঠি

[১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে ইতালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় শেলীর সঙ্গে কীটসের পরিচয় ছিল সামান্যই। পিসাতে গুছিয়ে বসার পর শেলী আবার কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। 'ওডস টু দি ওয়েষ্ট উইণ্ড', 'টু এ স্কাইলার্ক' প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত কবিতাগুলি এই সময় ছাপা হয়েছে। শেলী তখন যশের তুঙ্গ শিখরে। এই সময় লণ্ডনে কীটসের একখানি নতুন কবিতা পুস্তক আত্মপ্রকাশ করেছে এবং বইখানি সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। কবির খ্যাতির সংবাদ সাগর-পারে শেলীর কাছেও পৌঁছল এবং আরো খবর এল যে, কবির শারীরিক অবস্থা অতি শোচনীয়। কীটস তখন যক্ষ্মায় শয্যাশায়ী। শেলী কীটসকে পিসাতে আমন্ত্রণ করে লিপি পাঠালেন। শেলীর আমন্ত্রণ-লিপির উত্তরে কীটস যে পত্র লিখেছিলেন তাতে কিছুটা রহস্য, কিছুটা বিদ্রূপের আমেজ মেশান থাকলেও গুণমুগ্ধ কীটসের প্রীতি ও ভালবাসায় উজ্জ্বল চিঠিখানি। পরে এক বন্ধুর সাথে কীটস ইতালী অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু শেলীর সঙ্গে আর ইহজীবনে কীটসের দেখা হয়নি। কীটস Pizza di spanga'তে একটি বাড়ী নিয়ে বাস করতে লাগলেন। তাঁর অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যেতে লাগল। পিসাতে যাওয়ার প্রশ্নই উঠল না। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারী কীটস ছাব্বিশ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। বন্ধুর অকালমৃত্যুর দুঃখে এবং তাঁর প্রতি সমালোচকদের নির্মম নিষ্ঠুরতায় বিচলিত শেলী বন্ধুর উদ্দেশ্যে রচনা করেন তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ—এ্যাডোনিস।]

হ্যামষ্টেড, অগাষ্ট ১৮২০

প্রিয় শেলী,

পরদেশে নানা কাজের ভিড়ের মধ্যেও তুমি যে এমন চিঠি লিখতে পার, দেখে পরম প্রীত হয়েছি। যদি তোমার এই সাদর আমন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণ না করি, জানবে এমন কোন ঘটনা তার অন্তরায় হয়ে উঠেছে যার ইংগিত করতেও আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। ইংলণ্ডের শীত যে আমায় শেষ করে দেবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, আর শেষ করবে তিলে-তিলে অতি ঘৃণ্য ভাবে। কাজেই সমুদ্র-পথেই হোক আর স্থল-পথেই হোক, ইতালীতে আমাকে যেতেই হবে যে ভাবে সৈনিক মার্চ করে এগিয়ে যায় কামানের মুখে।

বর্তমানে আমার মানসিক অবস্থাই সব চেয়ে খারাপ। যত চরম অবস্থাই আসুক না কেন, চারপেয়ে শয্যাধারের একঘেঁয়ে ঘৃণিত পরিবেশে দীর্ঘ কাল কাটানো আমার ভাগ্যে নয় এ কথা ভাবি যখন মন আশ্বস্ত হয়। আমার কবিতা পড়ে তুমি আনন্দ পাও জেনে সুখী হলাম। সুনামের দিকে নজর দিয়ে যদি সম্ভব হোত আমি স্বেচ্ছায় সেগুলি নতুন করে রচনা করতাম। হান্টের কাছ থেকে তোমার 'সেন্সি' এক কপি পেয়েছি। এর মাত্র একটি অংশেরই বিচার করতে পারি আমি—সে হোল এর কাব্যরস এবং নাটকীয় আবেদন—অধুনা অনেকের মতে যা আসুরিক। আজকের যুগের দাবী হোল প্রত্যেক সৃষ্টিরই একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে—ঈশ্বরও সে উদ্দেশ্য হতে পারেন। শিল্পীকে সেবা করতে হবে কুবেরের—হতে হবে আত্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ স্বার্থপর। বন্ধনহীন কল্পনার মুক্তিকে সীমায়িত করে তুমি বড়ো শিল্পী হতে পার, ভাবের প্রতিটি বন্ধ্য ধ্যানের অমৃতে ভরিয়ে তুলতে পার। আমার এই অকপট মন্তব্যের জন্য আশা করি আমায় ক্ষমা করবে। এই সীমানা-ঘেঁসা চিন্তা নিশ্চয়ই তুহিন-শীতল ফাঁস পরিয়ে দেবে তোমার গলায়। যে তুমি ছ'মাসও এক জায়গায় ডানা গুটিয়ে নিশ্চল ভাবে বসে থাকতে পারো না।

আর এণ্ডিমিয়োনের লেখকের পক্ষেও এ রকম বলা কি খুব আশ্চর্যের নয়? যার নিজেরই মন চারি দিকে ছড়ান তাসের মতো। কিন্তু আমাকে ওরা প্যাকেটে বন্দী করে রেখেছে। আমার মন যে রাজ্যে বিহার করে সে যেন আশ্রম আর আমি সেই আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী। প্রতিদিন প্রমিথিয়ুসের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছি। ইচ্ছাকে যদি কাজে রূপায়িত করতে পারতাম এটি এখনও পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই থাকত অথবা দ্বিতীয় অংক ছাড়াই বেরুত। মনে পড়ে

Hamp Stead Heath'র উপর আমার প্রথম ব্যর্থপ্রয়াস তুমি ছাপাতে নিষেধ করেছিলে। সে উপদেশ তোমাকেই ফেরৎ দিচ্ছি। এই সাথে যে বইখানা পাঠাচ্ছি তার বেশীর ভাগ কবিতা দু'বছর আগে লেখা এবং আর্থিক লোভের আশা না থাকলে কোন দিনই এটি ছাপা হোত না। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, তোমার উপদেশ নেওয়ার দিকেই আমার ঝোঁক বেশী। চিঠি শেষ করার আগে তোমার প্রীতি ও ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মিসেস্ শেলীকেও আমার অকৃত্রিম ভালবাসা ও নমস্কার জানাইও। আশা করি, শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ইতি

জন কীটস।

সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

[১১২৫ সালের মার্চ্চ মাসে সার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী উত্তরপাড়ার রাজা ৺প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, বি, এল, সি, এস, আইর পৌত্র ও কুমার ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (মিছরী বাবু) জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এস, সি, সি, আই, ই, এম, বি, ই' (তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য) নিকট যে পত্র লিখেছিলেন, নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল। পত্রে যে পুস্তকের উল্লেখ করা হয়েছে, তার নাম "দি নেশন ইন মেকিং"। সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর রাজনীতি সম্বন্ধে যাঁরা জানতে চান তাঁরা এই চিঠিখানি পড়বেন।]

ব্যারাকপুর,
১৩ই মার্চ্চ, ১১২৫

প্রিয় তারক বাবু,

আমার বই এখনো প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবতঃ এই মাসেই প্রকাশিত হবে। প্রকাশিত হলেই আমি আপনাকে একখানি কপি পাঠিয়ে দেবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ইতোমধ্যে আপনি মন্ত্রীদের বেতন সম্বন্ধে কি করবেন। আমি আশা করি, আপনি মন্ত্রীদের বেতনের পক্ষের ভোট দেবেন: কারণ ভোট যদি না দেন এবং বেতন যদি নামঞ্জুর হয়, তাহলে বাঙ্গালায় সংস্কার (শাসন) চাপা পড়বে এবং আমাদের প্রদেশ অনুন্নত অঞ্চল বলে গণ্য হবে। আপনার স্বনামধন্য পিতামহ বেঁচে থাকলে তিনি কি করতেন তা আমি জানি। আমি বিশ্বাস করি, তাঁর স্মৃতির ও জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা আপনাকে পরিচালিত করবে ও এ বিষয়ে প্রেরণা দেবে।

আশা করি, ভালই আছেন।

অকপটে আপনার
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের উত্তর

রাজেন্দ্রভবন, উত্তরপাড়া,
১৫ই মার্চ্চ, ১১২৫

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১৩ই মার্চ্চ তারিখের পত্র পেলাম। আপনার পুস্তকের একখানি কপি আমাকে দিতে চেয়েছেন, এ জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, আমার ন্যায় বহু দেশবাসী তাদের মহান্ জাতীয় নেতার পুস্তক পাঠ করতে খুবই উদ্‌গ্রীব।

"মন্ত্রীদের বেতন" সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার মনোভাব কি, তা আপনি জানতে চেয়েছেন। আমি বলতে চাই যে, আমার মতে যাঁরা আমাকে নির্ব্বাচিত করেছেন এবং আমি যে দলের সদস্য, তাঁদের নির্দ্দেশ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করাই আমার ন্যায় তরুণের পক্ষে সঙ্গত। এ জন্য আমি আমার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করছি।

তবে আমি আপনাকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে আপনার উপদেশ আমি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবো।

অবস্থা যে খুবই সঙ্গীন, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবার জন্য আমার ন্যায় তরুণের পক্ষে বিষয়টি বারংবার বিবেচনা করা দরকার।

শ্রদ্ধা ও প্রণাম লইবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
তারকনাথ মুখার্জ্জী।

সার সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর

ব্যারাকপুর, ১৭ই মার্চ্চ,
১১২৫।

প্রিয় তারক বাবু,

আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আপনি যে কারণ জানিয়েছেন, তজ্জন্য আমি আনন্দিত, যদিও সেগুলি অচল। আপনি বলেছেন যে, আপনি আপনার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নির্দ্দেশ দ্বারা পরিচালিত হবেন এবং আপনি নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। আপনি একটি পুরাতন ও অচল নীতির পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছেন। আধুনিক কালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন বার্ক। আমি আশা করি, আপনি তাঁর বই পড়েছেন। বৃষ্টলের নির্ব্বাচকদের প্রতি এক পত্রে এই নির্দ্দেশের নীতি সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন, তার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করলাম:—

"নিজের যুক্তি ও বিবেক অনুযায়ী সুস্পষ্ট ধারণার পরিপন্থী হলেও সদস্যকে দলের আদেশ ও নির্দ্দেশ অন্ধের ন্যায় মেনে চলতে হবে—ইহা দেশের আইনে নাই এবং আমাদের শাসনতন্ত্রের সমগ্র পদ্ধতি ও তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটা মূলগত ভ্রান্ত ধারণা থেকেই এর উৎপত্তি।"

বহু বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় আবগারী বিল সম্বন্ধে ভারত সরকারের মনোভাব থেকে এই প্রশ্নটি উঠেছিলো। তাঁরা উক্ত নির্দ্দেশের নীতি দ্বারা তাঁদের আচরণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। আপনার স্বনামধন্য পিতামহ সহ আমরা সকলে তার বিরোধিতা করেছিলাম এবং নৈতিক জয় আমাদেরই হয়েছিলো। মন্ত্রীদের বেতনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে তার ফল কি হবে, তা একবার ভেবে দেখবেন। হস্তান্তরিত বিভাগগুলি স্থায়ী ভাবে সংরক্ষিত হয়ে

যাবে এবং সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের উপর বাঙ্গালার যে সামান্য কর্তৃত্ব আছে, তা নষ্ট হবে। মুহূর্তের জন্যও এ কথা মনে করবেন না যে, ভাঙ্গার কৌশল স্বরাজের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করবে। নিশ্চিত জানবেন যে, বৃটিশ গণতন্ত্র কেবল ধাপ্পা দ্বারা সন্তুষ্ট হবে না, পরন্তু বর্তমানে বাধা দানের পন্থা দ্বারা তাদের বিরোধিতা অধিকতর তীব্র হবে।

আশা করি, ভাল আছেন। ইতি—

আপনার
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

কাথারিন ম্যান্‌স্‌ফিল্ডের চিঠি

[জীবনের শেষ ক'টি বৎসর ক্যাথারিন ম্যানস্‌ফিল্ডের কেটেছিল নিঃশব্দ মৃত্যু-যন্ত্রণায়। দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি তখন স্বামী ও পরিচিত সমাজ থেকে ছিটকে গিয়ে স্বাস্থ্য লাভের আশায় দেশে-দেশে ছুটে বেড়াচ্ছেন। সার্থক ছোট গল্প লিখিয়ে ক্যাথারিনের মন ছিল প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসক। সে তীব্র সৌন্দর্যলিপ্সা তাঁর অত বড় রোগ-কাতরতাতেও লুপ্ত হয়নি। স্বামীকে লেখা এই পত্রখানিতে সেই রোগজীর্ণা রূপ-পূজারিণীর গভীর নিঃসঙ্গতা ও আকুতির যে স্নিগ্ধ রূপটি ফুটে উঠেছে, তা আমাদের চোখকে অশ্রুসজল করে, হৃদয়কে আপ্লুত করে মমতায় ও শ্রদ্ধায়।]

১৫ই মে, ১৯১৫
সন্ধ্যা বেলা

বাতিওয়ালা তার নিত্য কাজে বেরিয়েছে দেখতে পাচ্ছি অন্ধকারে বসে বসে। এই মাত্র একটু বেড়িয়ে ফিরলাম। নতরডামের গীর্জা অবধি গিয়েছিলাম আজ। একটু একটু আধা-আলোয়, সেই পড়ন্ত বিকেলে ফুটন্ত শাখার সৌগন্ধে মন যে কি অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছিল, বলতে পারি না। কেউ কোথাও নেই; শুধু একটি বেঞ্চে একটি মাত্র বৃদ্ধ বসে তাঁর দাড়ীতে হাত বুলোচ্ছিলেন। আর ক'টি দুরন্ত ছেলে-মেয়ে বল নিয়ে খেলা করছিল। তাদের হাত-পা আর দুলে-দুলে ওঠা মাথাগুলি দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই আবছা আলোয় কৃষ্ণবর্ণের শাখা আর পত্রগুলি দেখতে কি সুন্দর লাগছিল! সেই সন্ধ্যার সঙ্গীতে তারা যেন কড়ির সুর লাগিয়েছে। আর সেই কুঞ্চিত বৃক্ষগুল্মের উপরে নতরডামের গীর্জা-শীর্ষের মহিম্ন মূর্তিটি শোভা পাচ্ছে অপূর্ব। মিনারের চারি পাশে ছোট ছোট পাখীরা কলরব করে উড়ে বেড়াচ্ছে। জানো ত, সব প্রাচীন প্রাসাদের আশে-পাশে এই সব ছোট ছোট পাখীদের নিত্য আনাগোনা অবিরাম চলে। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবলাম যে, একটি সনেট রচনা করি। প্রাচীন একটি মানুষ আর তার মনে অতীত জীবনের বিচিত্র চিন্তা ও স্মৃতি-লহরী ঐ সব পাখীদের মত যাতায়াত করছে, এই সুন্দর রূপকটিকে ফুটিয়ে তুলব ভাবলাম। আজ হোল না, কিন্তু আর এক দিন লিখে ফেলব ঠিক।

বিকেলে বসে পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম। লেখার পরের ক্লান্তি কী মধুর লাগে।

নদীর ধারে প্রেমিক-প্রেমিকার দল ইতস্ততঃ বেড়াচ্ছে। নৃত্যপরা জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পুলকিত হয়ে তারা মুখ ফিরিয়ে প্রিয়া-মুখ চুম্বন করছে। দু'পায়ে এগোচ্ছে তারা হাতে হাত দিয়ে, তার পর থমকে দাঁড়িয়ে আবার চুম্বন করছে। সত্যি, আজকের রাত্রি আসঙ্গ ভোগের মধু-লগ্নই বুঝি!

আজ তোমায় চিঠি দেবার পরেই বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। কিন্তু এখনো বর্ষার রেশ কাটেনি। ঠাণ্ডা আছে মৃদু মৃদু। এক বোতল ভালো মদ কিনেছি পঁয়তাল্লিশ সেন্ট দিয়ে। রান্না-ঘরের জলের টবে সেটি ডুবিয়ে রেখেছি। সত্যি, কি যে সুন্দর আবহাওয়া এসেছে!

আমায় চিঠি লিখো। যত পারো তত। আমি জানি, আমার প্রত্যাশার তৃষ্ণা মেটানো কোন মানুষেরই সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি ত বুঝবে, ইংলণ্ডে তুমি যে একাকীত্ব ভোগ করো, তার চেয়ে কত নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা বোধ করি আমি এই দূর প্রবাসে।

গার্ট্রুড বেলের পত্র

[আরব ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করে শ্রীমতী বেল পৃথিবীর জ্ঞানি-সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। দুর্গম অঞ্চল অবধি তিনি তাঁর পর্যটনার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েও পশ্চাৎপদ হননি কখনো। প্রাচ্য দেশগুলিকে তিনি ভাল-বেসেছিলেন গভীর ভাবে। যখন তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায়, তখনো তিনি স্বদেশে ফিরতে সম্মত হননি। বাগদাদের মিউজিয়ম তাঁর নিজের হাতে সজ্জিত বললে অত্যুক্তি হয় না। সেই যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অবৈতনিক ডিরেক্টার হিসাবে তিনি বাকী জীবন কাটিয়েছিলেন প্রিয় গবেষণা-কার্যে আত্মমগ্ন থেকে। যখন মারা যান, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শ্রীমতী বেলকে কবরস্থ করা হয় বাগদাদের মৃত্তিকাভ্যন্তরে।]

গত কাল সারা দিন প্রস্তর-পথে আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম। দ্বিপ্রহরে একটি গিরি-শিরে এক ক্ষুদ্র দুর্গ আমরা দেখতে পেলাম। উটগুলিকে পাঠিয়ে, আমি একা দু'জন সঙ্গী রেখে ম্যাপ এঁকে সমস্ত অঞ্চলটির ফটো তুলে নিলাম। মোটবাহী উটেরা সঙ্গে না থাকায়, আমাদের যথাসাধ্য সঙ্গের উটগুলিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হোল। এখানে অনেকগুলি ঝরণা আছে। আর কি স্ফটিক-স্বচ্ছ তাদের জলধারা!

আজ সকালে আমরা কসর আজরাক এলাকায় এসে পৌঁছেছি। চারি পাশে পাম গাছের সারি আর মধ্যে মধ্যে ঝরণা-ধারা। উটগুলির তত্ত্বাবধানে সঙ্গের একটি মাত্র লোককে রেখে, আমি একাই গিরি-দুর্গের দিকে যাত্রা করলাম। এখানে আরবরা বাস করে। দুর্গের বাইরে এক জন লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হোলো। লোকটি পরম আতিথ্যের সঙ্গে আমায় অভ্যর্থনা করলেন। কফি পান করতে দিলেন। সেইখানে বসে দুর্গের একটি ম্যাপ প্রস্তুত করতে লাগলাম আমি। কিন্তু কাজে বসতে না বসতেই এক দল আরব আমাকে ঘিরে তুমুল তাণ্ডব সুরু করল। তারা উচ্চ কণ্ঠে সমস্বরে আমায় জানিয়ে দিলে যে, আমার নথিপত্রে যদি ঐ দুর্গ সম্বন্ধে আমি এক আঁচড়ও টানি, তবে তারা আমার সমস্ত কাগজপত্র পুড়িয়ে দেবে।

আমি তাদের আলির কাছে যেতে বললাম। আলি এখানে তিন বৎসর পিয়নের কাজ করেছে, সে আমার পথ-প্রদর্শক ও

এজেন্ট। পাম বৃক্ষের নীচে বসে আমি নির্বিবাদে সিগারেট খেতে লাগলাম, আর আলি তাদের বোঝাতে লাগল। অনেকক্ষণ বোঝানোর পর আরবরা আমায় সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিল।

আজ সারা দিন এখানে আমার কাজ করতে হবে। কালকের দিনটিও যাবে এখানে। বসে বসে ভাবছি, এই দুর্গম অঞ্চলে এসে এত পরিশ্রমের কি সার্থকতা আছে। কিন্তু কোন কিছু অসমাপ্ত ফেলে রাখা, বিশেষতঃ যে সব এলাকায় আর ফিরে আসা সহজ নয়, আমার স্বভাব নয়, তা তুমি জানো। মনে হয়, নূতন এক গ্রীক লিপি আমি আবিষ্কার করেছি এখানে। কাল সেটিকে আমি মাজনা করে দেখব কি পাওয়া যায় তার মধ্যে।

এমনি করে আর একটি বৎসর গড়িয়ে গেল কাল-সমুদ্রে।

দান্তের চিঠি

[১২৯৫ খৃষ্টাব্দের কথা—দান্তে রাজনীতির পংকিল আবর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। সম্মিলিত ইতালীর আদর্শ পূজারী দান্তে যে দলভুক্ত ছিলেন, তাদের বলা হোত গিবেলিন। এরা সাম্রাজ্যবাদী এবং এদের মূলমন্ত্র—ছোট ছোট জমিদারী ও সামন্ত রাজ্যগুলি একত্র গ্রথিত করে এক পবিত্র রোমক সম্রাটের অধীনে আনা। একতাবদ্ধ এক বিশাল রাজ্য—এক গীর্জার অধীন। এই ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল দান্তের স্বপ্ন। দুর্দান্ত গিবেলিনরা যেমন চাইত সম্রাটই হবেন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র নিয়ামক, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্যাপাল পার্টির সদস্য দুর্দান্ত গুয়েলফরা চাইত মহামান্য পোপই হবেন সর্ব ক্ষমতার অধিকারী—রাজা হবেন তাঁর অনুগত ভৃত্য মাত্র।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে দলের নেতা সপ্তম হেনরীর মৃত্যুতে গিবেলিনরা অসহায় হয়ে পড়ে—প্রতিরোধ-ক্ষমতাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তার পর তিন বছর পরে নির্বাসিত গিবেলিনদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রচারিত হয়। দান্তের বন্ধুরা তখন দান্তেকে এই আদেশের সুযোগ নেবার অনুরোধ জানান।

কিন্তু এই ক্ষমা ক্ষমাই নয়—যে সর্ত আরোপিত হয়েছিল, দান্তের মত গর্বিত আত্মসম্মানী অভিমানীর পক্ষে তা অত্যন্ত অপমানকর। যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন এবং মাথায় টুপি মাথায় পরে অনুতপ্তের দলে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা করে দেশে ফিরতে চান তবেই স্বদেশে ফিরতে পারেন। কিন্তু দান্তে আর যাই করুন, এই হীনতা—এই কলঙ্ক অপমান কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। অপরিচিত বন্ধুরা যাঁরা তাঁকে এই প্রস্তাব মেনে নিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তাঁদের তীব্র তিরস্কার করে নীচের এই চিঠিখানি লিখেছিলেন দান্তে।]

১৩১৬

সশ্রদ্ধ ও প্রীতিমুগ্ধ চিত্তে তোমার পত্রের মর্ম গ্রহণ করেছি এবং গভীর মনোনিবেশ সহকারে পত্রপাঠে অবহিত হলাম যে, আমার ফ্লোরেন্সে প্রত্যাগমনের জন্য তুমি খুবই উৎকণ্ঠিত। এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং আরো কৃতজ্ঞতা-পাশে আমায় আবদ্ধ করেছ এই জন্য যে, কচিৎ ঘটলেও নির্বাসিতেরও বন্ধু আছে, এ অবস্থা বড় আনন্দের। তোমার পত্রের উত্তর এই, রায় দানের পূর্বে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত আমার অবস্থা যেন পরীক্ষা ও বিবেচনা করা হয় এই আমার একান্ত প্রার্থনা। জানি, আমার এই উত্তর হয়ত অনেক দুর্বল-চিত্তের আশাপূরক হবে না।

তোমার ও আমার ভাগিনেয় এবং আরো অনেক বন্ধু-বান্ধবের পত্র থেকে এইটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি যে, নির্বাসিতদের ক্ষমা করা সম্বন্ধে সম্প্রতি ফ্লোরেন্সে এক আদেশ প্রচারিত হয়েছে। তার সর্ত-সাপেক্ষ আমিও মুক্তি পেতে পারি এবং এক্ষুণি আমার প্রত্যাবর্তনের অনুমতি মিলতে পারে। সর্ত এই যে, আমাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে এবং প্রায়শ্চিত্তের অপমান মাথা পেতে নিতে হবে। সত্য কথা বলতে কি, প্রস্তাব দুইটি যেমন হাস্যকর তেমনি অবিবেচনাপ্রসূত—অবিবেচনাপ্রসূত তাঁদের পক্ষে যাঁরা এই প্রস্তাব জ্ঞাত করেছেন আমায়। অবশ্য তোমার পত্র বিশেষ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সহিত লিখিত—তাতে এ রকম কোন ইংগিত নেই।

প্রায় পনের বছর নির্বাসন-বেদনা সহ্য করার পর দান্তে আলিঘেরিকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার এই কি সাদর আহ্বান! এই কি নির্দোষিতা ও নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন-তপস্যার পুরস্কার! সিয়োলো ও অন্যান্য নরাধমরা যা করেছে—বন্দী কয়েদীর মত—এই প্রকার বশ্যতার যূপকাষ্ঠে আত্মসমর্পণের নির্বোধ হীনতা স্বীকার—নৈব, নৈব চ। ন্যায়ের প্রচারক যে এত নির্যাতন ভোগ করেছে, সে দেবে অর্থদণ্ড তাদের—যাদেরই দ্বারা সে নির্যাতিত হয়েছে—যেন এ তার কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা তাদের। তা হবে না।

এ সর্তে আমি আমার মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পারব না। যদি তুমি প্রথম এবং অন্যরা আর কোন সর্তের সন্ধান দিতে পার, যে সর্তে দান্তের যশ ও সম্মান বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না, সে-পথে নিশ্চিত আমার আকুল পদধূলি পড়বে। যদি এমন পথে ফ্লোরেন্সে ফেরা সম্ভব না হয়, আমি ফ্লোরেন্সে কখনই ফিরতে চাই না। কী! অন্য কোথাও কি আমি সূর্য-তারার মুখ সন্দর্শন করতে পারব না! আমার দেশবাসীর চোখে অপমানিত, অসম্মানিত হয়ে ফ্লোরেন্সে না ফিরে কি অন্য কোন আকাশের নীচে সত্যের ধ্যান করতে পারব না! অনশনে আমাকে নিশ্চিত কালাতিপাত করতে হবে না!

[ফ্লোরেন্স থেকে এই প্রশ্নের আর কোন উত্তর আসেনি। প্রত্যাবর্তনের সর্ত মেনে না নেওয়ায় দান্তে আর জীবনে কখনো ফিরে যাননি স্বদেশে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর লোরেঞ্জো দি ম্যাগনিফিসিয়েন্ট কর্তৃক এই আদেশ নাকচ হয়। তাসকানির পুরাণনগরী ফ্লোরেন্সে নয় বাইজানটিয়ামের বিষাদ নগরী রাভেনাতে বসেই দান্তে সমাপ্ত করেন তাঁর The Divine Comedy. সপ্তম হেনরীর মৃত্যুর পরই বইখানি লেখা শুরু হয়েছিল এবং কমেডীর আদর্শের সঙ্গে তাল রেখে "প্যারাডাইস" স্বর্গটি ফ্লোরেন্সে বসে শেষ করতে পারলেই যেন মানাত সব দিক থেকে। কিন্তু তা তো হবার নয়। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে যখন তিনি চির-বিদায় নেন এ পৃথিবী থেকে, মর্তের মাপকাঠির বিচারে তিনি যেন নরকেই বন্দী ছিলেন।]

—তড়িৎ পাল

—রমা মুখোপাধ্যায়

—রেবা বোস

সূ
র্যো
দ
য়

—বিমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় (প্রথম পুরস্কার)

কুমারিকা অন্তরীপে —বিমলেন্দু সরকার (দ্বিতীয় পুরস্কার)

—মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়

—হিমাংশু ঘোষ

র্যো

দ

য়

—কিশলয় চৌধুরী

—অনিলকুমার বর্ম্মণ
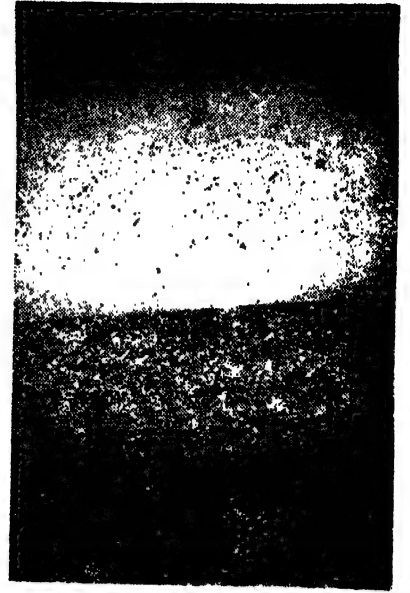
টাইগার হিল থেকে —মানস ঘোষ
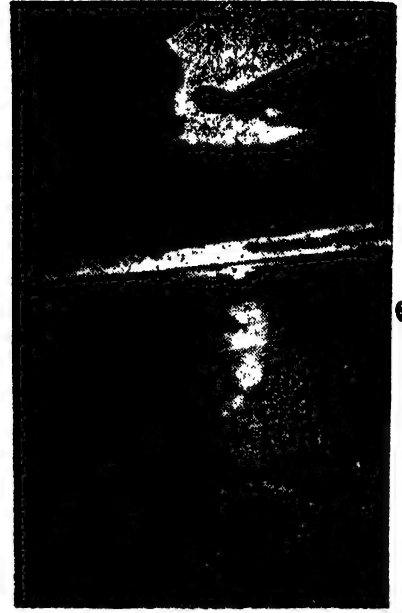
—সুনীলচন্দ্র সরকার

"The sun
rises in
the East."

সূ র্যো দ য়

—সুজিত মুখোপাধ্যায়

—মণীন্দ্রনাথ নন্দী

সূর্য্যোদয়
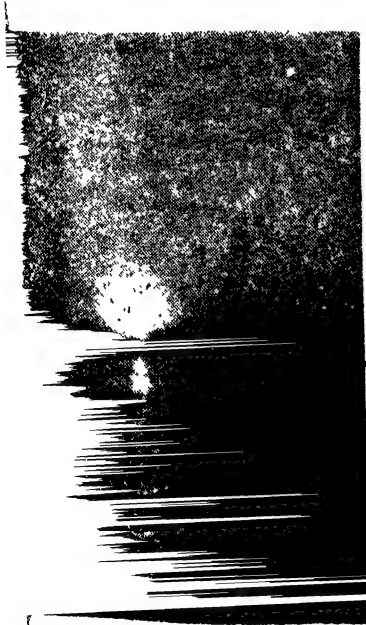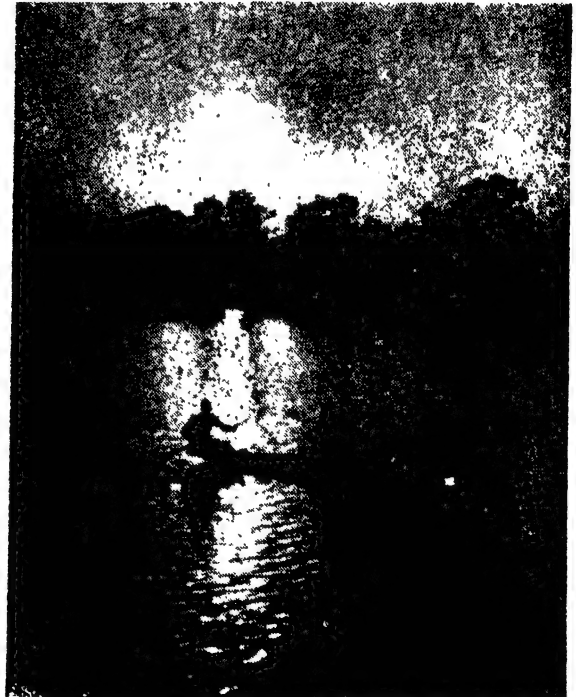
বিন্ধ্যাচলে —রবীন্দ্র নাগ (তৃতীয় পুরস্কার)
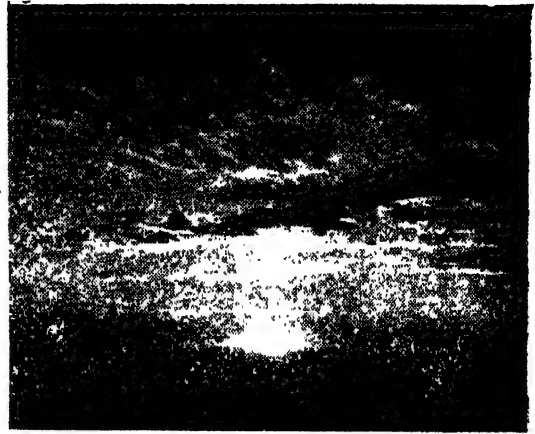
—দিলীপকুমার দাশগুপ্ত

—বীণা মুখোপাধ্যায়
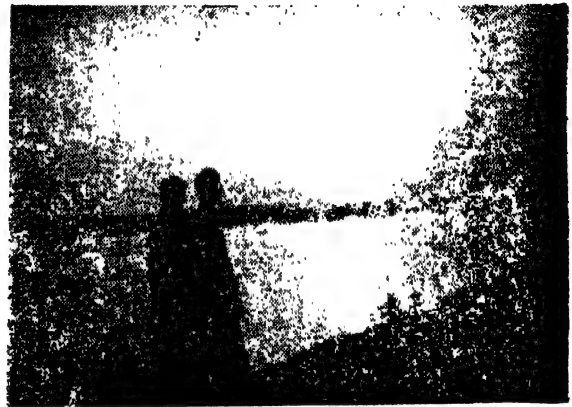
—অমল কুমার

—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

—আগামী সংখ্যার প্রতিযোগিতা—

বিষয়
শিশু

ছবি পাঠানোর শেষ দিন ১৮ই জ্যৈষ্ঠ

প্রথম পুরস্কার—১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার—১০৲

তৃতীয় পুরস্কার—৫৲

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর (শান্তিনিকেতন)

বাংলা সাহিত্যের সম্মানিত প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেছিলেন কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩৩ সালে "বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রূপ" নামক প্রথম ভাষণে তিনি সাহিত্যাধ্যাপনার আদর্শ হিসাবে অধ্যাপক মর্লির কথা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেন। তখন কবির বয়স সতেরো. বিলেত প্রবাস-কালে মাস তিনেকের জন্য লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে ছাত্র হয়ে মর্লির ক্লাসে তিনি যোগদান করেন, সেই সূত্রেই তাঁর শিক্ষাদান-রীতিও অনুসরণ করবার সুযোগ পান। মর্লি আবৃত্তি করে যেতেন, তার থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ত পাঠ্যাংশের ভাবার্থ। "সপ্তাহে এক দিন তিনি সমগ্র ভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনার ব্যাখ্যা করতেন। তার পদচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফ বিভাগ, শব্দ প্রয়োগের সূক্ষ্ম ত্রুটি বা শোভনতা সমস্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিত্য ও ভাষার স্বরূপবোধ ; তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেক্‌নিকের পরিচয় ও চর্চাই সাহিত্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই কথাটিই তাঁর ক্লাশ থেকে" কবি জেনেছিলেন। উক্ত ভাষণেই কবি বলেছিলেন, "বয়স যদি পর্যবসিত-প্রায় না হোত, আর যদি আমার কর্তব্য হোত ক্লাশে সাহিত্য শিক্ষকতা করা, তবে এই আদর্শ অনুসারেই কাজ করবার চেষ্টা করতুম।" সমর্থ বয়সে তাঁর আশ্রমের ক্লাশগুলিতে তাঁকে অধ্যাপনায় এই রীতিই অনুসরণ করতে দেখা গেছে,—এ সাক্ষ্য তখনকার অনেকেই দেবেন।

গুরু মর্লিকে ভালো লেগেছিল। একাধিক স্থলে কবি তাঁর কথা বলেছেন। কবির ছাত্রদের নিকটও কবি পরম প্রিয় ছিলেন। গুরুদেব ব'লে জেনেও কবিকে তাঁর ছাত্রেরা জানত তাদের বন্ধু ব'লে। হাস্য-পরিহাসে গল্প গুজবে তিনি সময়ে তাদেরই এক জন হয়ে যেতেন। তাদের স্বাধীন মনকে স্ফূর্তি দিয়ে তিনি তাদের অকৃত্রিম মনকে কতখানি কাছে পেয়েছিলেন, প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে কিছু-কিছু তার গল্প শোনা যায়। তাদেরই এক জন প্রৌঢ়-প্রায় শ্রীযুক্ত শিবদাস রায় বর্তমানে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা। তিনি গল্পচ্ছলে বলছিলেন,—"এক দিন বেণুকুঞ্জে বসেছেন গুরুদেব। আমরা তাঁকে ঘিরে বসেছি, ছাত্রীও আছেন দু'-এক জন। গল্প চলছে। কথায়-কথায় মেয়েদের কথাও উঠল। বিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা তখন খুবই কম। মেয়েদের বেশভূষা, চালচলন, স্বভাববৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের আলোচনা তুলনামূলক ভাবে দেশ-দেশ ধ'রে চলছিল। গুরুদেব নেপালী নরভূপ নামক ছাত্রটিকে দেখিয়ে বললেন, সকলেরই তো মত শোনা গেল, এবারে ভিন্ন প্রদেশবাসী এর কথা শোনা যাক। কী হে নরভূপ তুমি কী বল, কোন্ দেশের মেয়েরা দেখতে সুশ্রী সব চেয়ে। নরভূপের পরিচয়ের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। পুরোনো আশ্রমের অনেক মজার গল্প আছে তাকে নিয়ে। আশ্রম-উপকণ্ঠে একাকী কুকরী দিয়ে বাঘ মারা তার অন্যতম একটি কীর্তি। সাহসের কাজে সে ছিল সবার আগে। তার সরল হৃদয়ভাব ও নিঃসংকোচ সপ্রতিভ আচরণের জন্য সকলেই তাকে সমাদর করত। এই নরভূপ গুরুদেবের প্রশ্ন শুনে অবিলম্বে এবং অবলীলাক্রমে সোজা ছাত্রীদের এক জনকে দেখিয়ে বলে দিল, "যাই বলুন, এই বাঙালি মেয়েদের কাছে আর কেউ নয়।" গুরুদেব একটু হেসে সহজ ভাবেই আলোচনা চালিয়ে গেলেন। তাঁর আলোচনায় ছাত্রদেরও তিনি এমনি সহজ প্রবেশের স্বাধিকার দিয়ে রেখেছিলেন।

ছেলেদের সহজ নির্মুক্ত মনই তিনি চাইতেন। পেয়েও ছিলেন তাই। সমবয়সীর কাছে যেমন ছেলেরা মনের কথার ভালো-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামায় না, এখানেও ঘটেছে তাই, এই নির্মুক্ততাই

জানতেন কবি সকল মানসিক গ্লানির প্রতিশোধক ও প্রতিষেধক ব'লে।

সুকুমার অনেক বিষয় আছে, যার চিন্তা বা আলোচনা অনেক সময় ছোটদের মধ্যে অস্বাভাবিক গোপন পথ নিয়ে অসুস্থ মনোবৃত্তি ও দুষ্ট স্বভাবের সৃষ্টি করে। সেগুলিকে সাধারণ তত্ত্বের পর্যায়ে এনে সহজ ভাবে আলোচনার বিষয় করলে প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা যায় স্তিমিত হয়ে ; যেমন স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা-তত্ত্বের অন্তর্গত হয়ে মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সৃষ্টিক্রিয়ার কথাও সহজ ভাবেই চলে যেতে পারে,—মনে কোনো দাগ না রেখে। প্রতিক্রিয়াটি বিজ্ঞানসম্মত। উপরের ঘটনাটিতে ছাত্রদের সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গতা ছাড়াও একটি শিক্ষা-পরিবেশে কবির দিক থেকে বিজ্ঞানসম্মত এই শিক্ষা-প্রক্রিয়া অনুসরণেরও আভাস মেলে।

এই নরভূপেরই আরেকটি গল্প। মণ্ডলীতে এক দিন এরূপ কথায়-কথায় কী একটা হাল্কা মন্তব্য গুরুদেব করে ফেলেছেন, বাস্তব ভিত্তিতে যা একটু অসংলগ্ন। অমনি তাঁর এই স্পষ্টবাদী মুখর-ছাত্র গুরুর গুরুত্বকে অতিক্রম ক'রে বিনা দ্বিধায় বক্র কটাক্ষে বলে উঠল,—"বাঃ গুরুদেব, বেশ,—বেশ বলেছেন! গুরুদেবের মুখের উপর এমনি জবাব শুনে আর সবাই তো হতবাক্। ক্লাশে উপস্থিত ছিলেন তখনকার ছাত্র-পরিচালক শিক্ষক সন্তোষ মজুমদার মশায়। তিনি যেমনি তাঁর অভ্যাস মতো মুখাগ্রে অঙ্গুলি রেখে "হিস্" শব্দ উচ্চারণ দ্বারা ছাত্রটিকে সংযত ও নীরব থাকবার ইঙ্গিত করেছেন, গুরুদেব তা লক্ষ্য ক'রে বুঝতে পেরেছেন ; তিনিও অমনি বলে উঠলেন, "ও কী, ওকে ওর কথা বলতে দাও। অমনি ক'রে ওদের বোবা বানাতে চাও না কি ?"

১৯৩০ সনে লেখা কবির "রাশিয়ার চিঠি"-র অন্তর্গত ষষ্ঠ পত্রখানি এখানে উল্লেখযোগ্য। তাতে লিখছেন, "কত বার চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্ন নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার-যে যোগ আছে, সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনো দিন জানতে চাইতে শেখেনি,—প্রথম থেকেই কেবলি বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি ক'রে ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে।" এ সঙ্গেই কবি একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। মহাত্মা গান্ধি সে সময় মাত্র ফিরে এসেছেন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে। ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে লিপ্ত হওয়ার আগে কিছু দিন তিনি তাঁর এক দল ছাত্র নিয়ে বাস করছেন শান্তিনিকেতনে। সেই ছাত্রদের এক জনকে এক দিন কবি জিজ্ঞেস করেন, আশ্রমের অদূরবর্তী পারুল বনে সে বেড়াতে যেতে চায় কি না। ছাত্রটি বললে, "সে কথা আমি জানি নে, দলপতি জানেন"। নানা ব্যাপারে নানা সময়ে কবি নিজের ছাত্রদেরও মধ্যে কম হলেও কিছুটা ঐ রকমেরই মনের পরিচয় লক্ষ্য করেছিলেন। এই পরমুখাপেক্ষিতায় তিনি মন্তব্য করেন, "সংসারে এ রকম মনের মতো নিরুপায় মন আর হতে পারে না।"

মনের জড়তার প্রতিই কবির সব চেয়ে বড়ো ধিক্কার। জড় মন শিক্ষাকে ব্যাহত করে। জড় মনেই দেখা দেয় বুদ্ধির অভাব। কবি বলেন, "কৌতূহল থাকাটাই যে জাগ্রত চিত্তের পরিচয়।" একদা আমেরিকা থেকে আশ্রমের জন্য কবি একটি "বায়ুচল চক্রযন্ত্র" (উইণ্ড্ মিল্) আনিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের কুয়ো থেকে তার সাহায্যে জল তোলা হত। কিন্তু এই নূতন জিনিসটা সম্বন্ধে ছাত্রমহলে ঔদাসীন্য লক্ষ্য ক'রে কবির "মনে বড়োই ধিক্কার লাগল।" আশ্রমের বৈদ্যুতিক আলোর কারখানা সম্বন্ধেও এই একই ঔদাসীন্য কবিকে ছাত্রদের মানসিক উৎকর্ষতা বিষয়ে হতাশ করে। তিনি বলেন, "বুদ্ধির জড়তা যেখানে, সেইখানেই কৌতূহল দুর্বল।" কৌতূহল হচ্ছে ছাত্রদের মানসিক প্রগতির প্রধান সহায়ক। কবির ইঙ্গিত-মতে শিক্ষায় সযত্নপ্রযত্নে এই জিনিসটা জাগিয়ে তোলাই পরম আবশ্যক। "আশ্রমের শিক্ষা" (১১৩৬) প্রবন্ধে কবি লিখেছেন: "নিরোৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সব কিছুরই 'পরে তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।...প্রথম থেকেই আমার সঙ্কল্প ছিল, আশ্রমের ছেলেরা চারি দিকের অব্যবহিত সম্পর্কলাভে উৎসুক হয়ে থাকবে; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে; যাঁরা চক্ষুষ্মান্, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।"

সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের দায়িত্ব-বোধও জাগানো চাই। তারা বড়ো হয়ে যেমন নিজের নিজের সংসারের ভার নেবে, তেমনি দেশের দশের কাজের ভারও নিতে হবে তাদেরই। কবি সেই বড়ো দায়িত্ব-ভার সম্বন্ধেও ছাত্রদের যোগ্য শিক্ষার কথা বিশেষ ভাবেই ভেবেছেন। "রাশিয়ার চিঠি"র ষষ্ঠ চিঠিখানিতেই উল্লিখিত আছে যে, তাঁর "আশ্রমের ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের" অনেক বার এই কথাটি তিনি বলেছেন, যে,—"লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ব-বোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি ক'রে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যে তারই একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।"

আশ্রম একটি বড়ো সংসার; আবার বড়ো দেশের একটি ছোটো সংস্করণও তাকে বলা যেতে পারে তার নানাদেশীয় অধিবাসী ও বিচিত্র কর্মপ্রসার দিয়ে। "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়টি একাধারে বিদ্যালয় এবং বহু জনের দ্বারা গঠিত একটি পরিবারময় গৃহ।" —মনোবিকাশের ছন্দ, দেশ, কার্তিক ১৩৪৭। সর্বদিক দিয়েই এর শুভাশুভে দুঃখে-দৈন্যে একে ছাত্রদের নিজের ক'রে ঘনিষ্ঠ ভাবে ভাবতে শেখাতে হবে, এবং তার মধ্য দিয়েই বহুর সঙ্গে মিলে বহুর জন্য করার দায়িত্ব শিক্ষাও তাদের দেবার আছে, বহু পূর্বের রচনাতেও কবির এ ধরণের চিন্তার সূত্র পাওয়া যায়।

সতর বছর পূর্বে আশ্রমের আর্থিক দৈন্য নিয়ে এণ্ড্রুজকে লেখা একখানি ইংরেজি চিঠিতে কবি লিখেছিলেন,—"আমাদের ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিটিও যেন অনুভব করে, আশ্রমের সব সমস্যা তার নিজেরই সমস্যা।...আমাদের যা-কিছু দুঃখ-দুর্দশা, এমন কি, ক্ষুদ্র শিশুটির কাছেও যেন আমরা তা গোপন না রাখি। আশ্রমের দায়িত্ব বহনে তাদেরও অংশ আছে, এ কথা মনে করেই তারা যাতে গৌরব বোধ করে, আমাদের তাই দেখা উচিত।"

বৃষ্টিধারা শুরু হলে ছাত্রদের সঙ্গে দল বেঁধে গুরুদেব জলে ভিজতে বেরোতেন। চড়ুইভাতিতে সঙ্গী হতেন, আবার জ্বর হলে ছাত্রদের নিজ হাতে দিতেন কুইনিন খাইয়ে। রাত জেগে করতেন সেবা। এ সব গল্প শিবদাস বাবুর মুখেই শোনা। শেষ দিকেও দেখা গেছে, ছেলেদের সকালবেলার লাইনে নিয়মিত "পঞ্চতিক্ত" খাওয়ানো বিষয়ে তাঁর যত্ন ছিল জাগ্রত। খেলাধুলায়ও তাদের সঙ্গে তাঁর মনের যোগ ছিল। মাঝে-মাঝে ফুটবল ম্যাচের দিন খেলার মাঠে এক পাশে দর্শকদের পেছনে দেখা দিত তাঁর মোটরখানি। 'সর্বেশ কাপ' জিতে ছেলেরা দল বেঁধে তাঁর কাছে এসে তাঁর প্রসন্ন মনের প্রোৎসাহ নিয়ে আনন্দে মেতেছে। মেয়েরা আনত রান্নাঘর থেকে নানা সময়ে তাদের তৈরি নানা খাবার। দোরগোড়ায় এঁকে রেখে যেত আলপনা, রেখে যেত ফুল-পল্লব। তাদের রোগ-শোকে কবি যেমন থাকতেন উদ্বিগ্ন, তাদের সঙ্গে উৎসবে-অনুষ্ঠানে, নাচে-গানেও তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না।

সাধারণ লোকের ধারণায়, দুষ্ট ছাত্রদের সংশোধনাগার ছিল শান্তিনিকেতন, আর ছিল যত সব মা-মরা বাপে-তাড়ানো বড়ো লোকের ছেলের আশ্রয়-স্থল। কবি এ নিয়ে রহস্যচ্ছলে গল্প করতেন। এর পেছনে সত্য কিছু না ছিল তা নয়, তবে কবির শিক্ষাবিধি এবং স্নেহ-সান্নিধ্যই ছিল দুরন্ত ও নিঃসহায় ছাত্রের যাদুকরী সংশোধনের উপায় ও সান্ত্বনাপূর্ণ নির্ভর-স্থল। ছাত্রদের ত্রুটির থেকে শিক্ষকদের দায়িত্বই ছিল তাঁর কাছে বড়ো। বড়োদের বড়োত্ব নিহিত রয়েছে ছোটদের অত্যাচার-সহনশীলতায় ও সস্নেহ ধীর পরিচালনার মধ্যে,—এটাই কবির কাছে পাওয়া শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের শিক্ষকতার প্রথম পাঠ।

গুরুদেব ছাত্রদের ভালোবাসতেন, তেমনি তাদের জড়তা-মূঢ়তাকেও করতেন কশাঘাত। তাঁর শাসন ছিল মায়ের মতো। তিনি যে লিখেছেন,—"শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো",—তাঁর শিক্ষাবিধি ছিল সেই সত্যটিরই পরিপোষক।

কবির কাছে অহরহ অভিযোগ আসত আশ্রমের রান্নাঘরের অন্নপাত্রগুলির তলা ক্ষয়ে-যাওয়া নিয়ে। সুদীর্ঘ পংক্তিভোজনের বেলা অনবরত টানাটানি ক'রে ব্যবহার করায় মেঝের শানের সঙ্গে ঘষায়-ঘষায় এই ব্যাপারটা ঘটত। কবি এই ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে সকলের বুদ্ধি-প্রয়োগের শৈথিল্য ও কর্মতৎপরতার ত্রুটি নিয়ে যথেষ্ট কটাক্ষ করেছেন। বলেছেন, একটু তৎপর হয়ে মাথা খাটালেই বিড়ের মতো কিছু একটা শক্ত জিনিসের উপর পাত্রগুলি বসিয়ে নিয়ে ব্যবহার করবার কার্যকরী উপায় মিলত। কিন্তু উদ্যোগী হয়ে প্রতিকার করবার উদ্যমেরই ছিল অভাব।

ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়ার সম্পর্কে দেহের স্বাস্থ্য এবং তার সঙ্গে চিন্তাদর্শ সম্পর্কে মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও কবি কতখানি গভীর ভাবে ভাবতেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় আশ্রমবাসী এণ্ড্রুজকে

লেখা তাঁর একখানি ইংরেজি পত্রে। পত্রখানি সংকলিত হয়েছে কবির "Letters to a friend" নামক ইংরেজি গ্রন্থে। আশ্রমের ছাত্রেরা এক সময়ে তাদের দৈহিক বরাদ্দ খাবার থেকে ঘি ও চিনি বাদ দিয়ে তার উদ্বৃত্ত অর্থে একটি দরিদ্র-সেবাভাণ্ডার খোলে। কবি বাইরে ছিলেন, 'মডার্ণ রিভিয়ু' মার্ফৎ সে খবর পান। আগ্রা থেকে অমনি এণ্ড্রুজকে লিখছেন,—"ছেলেরা এই যে কাণ্ডটা করেছে, এটা নিশ্চিত স্বাধীন বুদ্ধিতে নয়,—পরানুকরণে, তোমাদের দেশের ছেলেদের দেখাদেখি। দ্বিতীয়ত, তোমাদের দেশে যেটা চলে, এখানে সেটা চলে না। ইংলণ্ডে চিনির পরিবর্তে আছে মাংস ও চর্বিজাতীয় আরো সব জিনিস। এ দেশে ছেলেদের খাবারে পুষ্টিকর অংশ এমনিতেই মিলে কম। পড়ার বই যেমন তারা বর্জন করতে পারে না, এই খাদ্যাংশও তেমনি,—এতই দরকারী সেটা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য। দরিদ্র-ভাণ্ডারে পয়সা দিতে চায় ভাল কথা, কিন্তু তার পথ আহার-বর্জন নয়; তারা আত্মত্যাগের একটা কিছু কাজ যদি চায় তো, আশ্রমের জল-তোলা, বাসন-মাজা, [illegible]-খোঁড়া, স্বাস্থ্যের অভিশাপ-স্বরূপ ঐ গর্তগুলি বোজানো ইত্যাদি দৈহিক খাটুনি কিছু কিছু করুক না,—তাতে ভাণ্ডারে কিছু যেমন জমাতে পারবে, তেমনি দিতে পারবে তাদের সততারও পরিচয়। পরানুকরণ না ক'রে, আরো এমনি নিজে নিজে কী কাজ উদ্ভাবন করতে পারে তাই তারা যেন ভেবে দেখে।" (১১১৪)

যে আহারের বিষয় নিয়ে এতখানি, সেই "আহারের রুচি ও অভ্যাস সম্বন্ধে···কদাচার" নিয়ে আবার তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতাকে দায়ী করতে ছাড়েননি, গোটা বাংলা দেশই তাঁর নিকট এ অপরাধে অপরাধী। বলেছেন,— "পাকশালা এবং পাকযন্ত্রকে অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রস্ত ক'রে তুলেছি।···আমাদের প্রতিদিনের খাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত দেশের কাছে দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব অতি গুরুতর—সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে এটাকে মনে রাখা পাশের মার্কার চেয়ে অনেক বড়ো।"

পূর্বোক্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনা থেকে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায় তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রণালী নয়, মানুষ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা জগতে বড়ো জিনিস। এক দীপ-শিখার থেকে যেমন আরেক দীপশিখা জ্বালানো হয়, তেমনি এক মানুষের ব্যক্তিত্ব-স্পর্শে জাগবে আরেক মানুষের ব্যক্তিত্ব। হৃদয়ের যোগে জাগবে হৃদয়। তখন ছাত্রের স্বভাব ও গ্রহণশক্তির যোগ্যতা পরিমাণ বুঝে দিতে হবে তাকে বিষয়ের পাঠ। দেহে ও মনে বৃত্তির স্বাধীন উন্মেষ, বাহ্যিক আসবাব-বহুলতা থেকে আন্তরিক সম্পদের মূল্যবোধ, বিশ্বের সর্বলোক-সমাজের মধ্য থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সংগ্রহ এবং সকলের প্রতি মৈত্রী থেকে সকলের সেবার কাজে যথাশক্তি উদ্যোগী থাকা, বলিষ্ঠ উদার এই আদর্শের লক্ষ্যেই চলেছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসাধনা।

শিক্ষাক্ষেত্রে কবির পথের বাঁক সুস্পষ্ট। ক্লাসের ইট-কাঠের বেড়া ছেড়ে তিনি শিক্ষাকে নিয়ে গেছেন উন্মুক্ত প্রান্তরে, গাছের তলায়, প্রকৃতির ক্রোড়ে। অথচ শহরের বিচিত্র মানব-কর্মোদ্যোগের সংস্পর্শ থেকে তা একেবারে বিবর্জিত নয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বসে-বসে পঠন-পাঠনের শিক্ষার চেয়ে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনে বেশি কাজের হয়ে ওঠে সেই শিক্ষাটুকুই, যার হাওয়া আশ্রমের প্রতিদিনের জীবনের চলাফেরার মধ্য থেকে এসে নিয়তই লাগে। এখানকার শিক্ষা পুঁথিগত ততটা নয়, যতটা পরিবেশগত। এ জন্য পরিবেশকে আদর্শানুযায়ী পরিমণ্ডিত রাখাতেই কর্তৃপক্ষের তৎপরতা বেশি। সেই পরিবেশে ঘরও যেমন আছে, তেমনি তার গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরের যোগও আছে সমভাবেই।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার পথ যেমন সম্প্রদায়ের গণ্ডিমুক্ত, তেমনি মুক্ত তা প্রণালীর স্বদেশী বিদেশী সংস্কার থেকে। শিক্ষাক্ষেত্রে সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে যে পরীক্ষণ চলেছে তার প্রতি মুক্তসজাগ মনে কবি ছিলেন সতত শ্রদ্ধাশীল। তাঁর আশ্রমের মুখপত্র পুরানো কালের "শান্তিনিকেতন পত্রিকা"তে নিয়মিত ভাবে এই সর্বদেশীয় শিক্ষারীতি আলোচিত হত। সুধীজন-স্বীকৃত প্রণালী মাত্রেই কবি হাতে-কলমে নিজের বিদ্যালয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতেন এবং তার প্রয়োগক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ক্ষয়ক্ষতি-ভয়মুক্ত! এ জন্য প্রথমে দেশীয় আধুনিক স্কুল-কলেজের ধারা ছেড়ে ঐতিহ্যগত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পথে গিয়েও, আবার শেষটায় নিলেন তাঁর বিশ্বভারতীয় পথ। সেখানে প্রণালী বলতে বাঁধাধরা গতানুগতিক একান্ত একটা-কিছু নেই, বিশ্ব আছে, আছে ভারতও। তাঁর আয়োজন ছিল বিচিত্র; তাঁর বেগবতী প্রেরণা ছিল বহুমুখী। যে ক'দিন বেঁচেছিলেন, তাঁর মধ্যেই অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য-বলে সব দিকেই জীবনের অদ্ভুত পরিণতি দেখিয়েছেন; কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত পথ সকল দিকে এখনো সকলের জন্য ততটা ফলদায়ক হয়ে দাঁড়ায়নি। সেই দাঁড় করাবার ভারটা রয়েছে ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের হাতে।

জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের চিন্তায় ও চেষ্টায় গড়া কর্মবিভাগ-বহুল তাঁর আশ্রম "শান্তিনিকেতন"। সেখানে যাঁরা রবীন্দ্রনাথেরই স্বভাবের ছাঁচে মানুষ, অর্থাৎ শক্তিসাধনার সহজ আগ্রহ নিয়ে যাঁরা জন্মেছেন, ফাঁকি দেওয়া বা পল্লবগ্রাহিতা যাঁদের ঘৃণার বস্তু, সেই ধরণের খাঁটি নিষ্ঠাবান স্বভাবগুণীরাই বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে একটা-নয়-একটা কোথাও মনোমত ক্ষেত্র পেতে পারেন শান্তিনিকেতনে, যেটা সচরাচর অন্যত্র দুর্লভ।

হাতে ধরে ছাত্রকে বসিয়ে কিছু করিয়ে নেবার তাগিদ এখানে অপেক্ষাকৃত কম। এখানকার পথ বাধ্যবাধকতা বা শাস্তির পথ নয়, তা হচ্ছে পরিবেশের থেকে উৎসাহ পাওয়ার পথ, স্বভাবজাত গুণ-বিকাশের সাহায্যকারী পথ।

হাতে-লেখা পত্রিকা, সাহিত্য-সভা, গানের জলসা, চিত্র-প্রদর্শনী, দৌড়-ঝাঁপ ও খেলার প্রতিযোগিতা, ছাত্রদের বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, দরিদ্রভাণ্ডার, লোকসেবা ও স্বাধীনতা আদর্শের অভিনন্দন-মূলক নানা সাময়িক অনুষ্ঠান,—এগুলি শান্তিনিকেতনের দিনগুলিকে বিচিত্র রূপে-রসে-জীবনপ্রবাহে ভ'রে নিয়ে বয়ে চলেছে। এর মধ্যে মানুষ আপনা থেকেই অনুভব করে কিছু সৃষ্টি অথবা সমজদারিতার তাগিদ। দেখতে দেখতে গড়ে ওঠে এক-এক জনের মধ্যে দিয়ে এক-একটি শক্তি বা প্রেরণা। ক্লাশের পড়ানোর চেয়ে সেটা গড়ে ওঠে আবহাওয়ার গুণেই বেশি।

নোট-সার-করা যুগে 'বই পড়া'র উপরেই এখন আমাদের ছাত্রদলে পাশ করা নির্ভর করে। অনেক স্থলে এ-ব্যাপারের মূলে আমাদের বড়রাই; "তাঁহারা কতকগুলা বই ও কতকগুলা বিষয়

বাঁধিয়া দেন—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়, ইহাকেই তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা-দেওয়া বলেন এবং যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়।" ১৩১৩ সনের "আবরণ" প্রবন্ধের পরিশেষে কবি এই প্রণালীর কুফল আলোচনা করেন। তাঁর মতে,—"বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্ততঃ হওয়া উচিত এবং সেখানে আমাদেরও অধিকার আছে, এ-কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এদেশে অতি পুরাকালে যখন লিপি প্রচলিত ছিল, তখনও তপোবনে পুঁথি ব্যবহার হয় নাই। তখনও গুরু শিষ্যকে মুখে-মুখেই শিক্ষা দিতেন, এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিক এমনটি হইতে পারে না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে—তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে, তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ।··· বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে, তখনই তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে; তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না, শিক্ষার উপর সে-ই চাপিয়া বসিবে।"

এখানকার শিক্ষার দায়িত্ব কঠিন, এর সার্থকতাও সেই কারণেই সাধারণের কাছে সুস্পষ্ট হোতে সময়ের অপেক্ষা করে। শিল্পী পাবেন—কলাভবন; জ্ঞানী পাবেন—শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, চীনা-ভবন, হিন্দীভবন; গুণী পাবেন—সংগীত ভবন; কর্মী পাবেন—শ্রীনিকেতন; শিশুরা পাবে—শিশুবিভাগ, মেয়েদের আছে শ্রীভবন, আর এঁদের সকলেই পাবেন এর গ্রন্থভবন, এর ক্রীড়াকৌতুক, আনন্দের উৎস উৎসবগুলি; সম্প্রতি বাইরে থেকে সাধারণেরও এর সংস্রব পাবার দু'টি পথ খুলেছে, একটি লোকশিক্ষা সংসদে, অন্যটি "বিশ্বভারতী পত্রিকা" থেকে। গ্রন্থনবিভাগের পথটি অবশ্য বহু-বিস্তৃত ও বহুকালের।

যিনি শান্তিনিকেতনের যেখানেই থাকুন, অল্পের মধ্যে জটিল বৃহৎ সংসারের আঁচটাও পাবেন নানা লোকের প্রাত্যহিক মেলা-মেশায়। এতে বিরাট প্রবাহময় বড়ো জীবনের অনুভবের মধ্যে সব সময়েই নিজের ক্ষুদ্র জীবনের গণ্ডিবদ্ধতাকে মুক্তি দেবার যেমন সুযোগ মিলবে, তার উল্টোটাও ঘটা কিছু বিচিত্র নয়, অর্থাৎ অসমর্থের পক্ষে আত্মসংকোচে সব সময়ে অস্বাচ্ছন্দ্যে ক্ষুব্ধ হয়ে চলাও ঘটতে পারে স্বভাবতই।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার পথ এই জন্যেই সাধারণের পক্ষে দুর্গম। তিনি তো আয়োজন করেই গেছেন, কাজে লাগাতে পারে তা ক'জন? তাঁর সঙ্গে পা ফেলে চলা সকলের কর্ম নয়।

রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেওয়া ছাত্র-জীবনের পক্ষে বিঘ্নকর বলেই কবি বরাবর দেখেছেন, 'অসহযোগ আন্দোলনে'র সময়কার লেখাগুলি থেকে তা বোঝা যায়। ১৯২১ সনের ৫ই মার্চ চিকাগো থেকে এণ্ড্রুজকে লেখা একখানি পত্রে লিখছেন,—বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় এক দল যুবক ছাত্র জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' গৃহের একতলায় কবির সামনে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে তাদের স্কুল-কলেজ-বর্জনের আদেশ দিতে বলে। বললেই তারা একযোগে তাঁর আদেশ পালন করবে, এই জ্বলন্ত উৎসাহের খরস্রোতের মুখে কবি তাদের বিমুখ করেন অধ্যয়নত্যাগে তাঁর অসম্মতি জানিয়ে। তারা কবির দেশাত্মবোধ সন্দেহ করে ফিরে যায়। কবি বলেন, "তখন আমার সম্বল বলতে পাঁচটি টাকাও হাতে নেই, অথচ কেউ জানত না যে, ঠিক তখনই হাজার টাকা দিয়েছিলেম স্বদেশী একটি দোকানের পিছে। তাতে শেষটা দেউলিয়াও হতে হয়।" কবি ঐ চিঠিতেই বলেন, আশ্রমের ছাত্রেরা তাঁর কাছে প্রহেলিকা মাত্র নয়। তাদের জীবন সকলের ও তাদের নিজেদের পক্ষে একটা বড় জিনিস! কিছু না ক'রে পাততাড়ি গুটিয়ে বসে থাকা যদি সাময়িক ভাবেও হয়, সে যে-কারণেই হোক, তাকে কবি ব্যক্তির বলিদান ব'লে মনে করেন, জগত ভ'রে মোহের মুখোস-পরা নানা আদর্শের নামে এই বলিদানই নিত্য চলছে। ছেলেদের কিছু-না-কিছু শিখতেই হবে, শেখার কাজের মধ্যে ছেলেদের নিয়ে নিয়ত রত থাকতে হবে,—এই বিপুল দায়িত্ব-বোধ সব-কিছুর উপরে রেখে কবি বলছেন, "আমি আমার পরিবেশের সঙ্গে এক হয়ে থাকতে চাই, আশে পাশের এই সহচর প্রাণীগুলিকে আমি ভালোবাসি, এদের ভালোবাসাই আমার সব। তাদের শিক্ষার ক্ষতি কিছুতেই স্বীকার্য নয়।" (Letters to a friend. P. 129—133)

স্বদেশে ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্র-স্বাধীনতার আন্দোলনের আবহাওয়ার মধ্যেই কবির শেষ দিনগুলি কেটেছে। শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও কর্মী অনেকে সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, কতক বাইরে গিয়ে, কতক ভিতরে থেকে। যারা বাইরে গেছে, তারা নানা কাজে কারাবরণও করেছে, যারা ভিতরে ছিল তারা স্বদেশী জিনিস ব্যবহার, কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ এবং আনুষ্ঠানিক সভা-সমিতিতে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার প্রেরণার দিকটি অনুধাবনেই রয়েছে বেশি নিয়োজিত। বাইরে-যাওয়া ছাত্র ও কর্মিগণ আন্দোলনের ভাঁটার মুখে আবার যখন তাদের স্থগিত পাঠ বা কাজ নিয়ে আশ্রমে যোগ দিতে এসেছে, তারা সাদরেই পেয়েছে স্থান। বাধা ছিল শুধু আশ্রমে যোগ রেখে সংগ্রামমূলক প্রত্যক্ষ আন্দোলন চালানোতে। পাঠে নিরত শৃঙ্খলাবদ্ধ ছাত্র-জীবনের কোনোরূপ ব্যাঘাত না হয়, সেই দিকে ছিল সর্বদা কবির সতর্ক লক্ষ্য। লোক-সমাগম ও আমোদ-আহ্লাদের আকর্ষণে নানা গোলযোগের আশঙ্কা ক'রেই শান্তিনিকেতনের অনতিদূরে রেলওয়ের ফ্লাগ-ষ্টেশন স্থাপন বা সিনেমা-ঘর তুলতে দিতে তাঁর আপত্তি ছিল। কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব ৭ই পৌষের মেলায় সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থা ছিল। আমোদ-আহ্লাদ তিনিও চাইতেন, রাষ্ট্র-আন্দোলনের আবশ্যকতাও তিনি বুঝতেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কিছু ব্যক্তিগত যোগ, সহানুভূতিও তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি কাজ নিয়েছিলেন শিক্ষার। তার বিঘ্নকর বিষয় তাঁর কাছে উৎসাহ পায়নি, এ কথাও সত্য।

শিক্ষার বিঘ্নকারী ছাত্র-নির্যাতক গুপ্ত পুলিশবাহন আমলাতান্ত্রিক বিদেশী শাসনের প্রতি কবির ঘৃণা ও ধিক্কার প্রকাশের ঘটনাও নিতান্ত বিরল নয়। "কালান্তর" গ্রন্থের অন্তর্গত 'ছোট ও বড়' প্রবন্ধে

লিখছেন : "দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিসের গুপ্তদলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া—এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি ! এ যে পাপকে হীনতাকে রাজপেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া। এ যেন রাত দুপুরে কাঁচা ফসলের খেতে মহিষের পাল ছাড়িয়া দেওয়া।···আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যা, যেমনি চরিত্র ; পুলিসের হাত হইতে সে বিক্ষত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে তরুণ বয়সে উন্মাদ হইয়া বহরমপুর পাগলাগারদে জীবন কাটাইতেছে।···পুলিসের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক। কিছু কাল পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা বীরভূমের জেলাস্কুলে পরীক্ষা দিতে গেলে পুলিসের লোক আর-কিছুই না করিয়া কেবল মাত্র তাহাদের নাম টুকিয়া লইত। আর-বেশি কিছু করিবার দরকার নাই। উহাদের নিশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে শুরু করে। উহাদের খাতা যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল। সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না, আজকের দিনে তেমনি পুলিসে-ছোঁওয়া মানুষকে কেহ কোনো ব্যবহারে লাগায় না। এমন কি, যে মরিয়া-মানুষকে বৃদ্ধ রুগ্ন দরিদ্র কুশ্রী কুচরিত্র কেহই পিছু হঠাইতে পারে না, বাংলা দেশের সেই কন্যাদায়িক বাপও তার কাছে ঘটক পাঠাইতে ভয় করে। সে দোকান করিতে গেলে তার দোকান চলে না, সে ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে দয়া করিতে পারি কিন্তু দান করিতে বিপদ গণি। দেশের কোনো হিতকর্মে তাহাকে লাগাইলে সে কর্ম নষ্ট হইবে।" ঐ প্রবন্ধেই আর একটি ঘটনারও উল্লেখ আছে। "আমাদের আশ্রমে দুটি ছোটো ছেলে আছে। তাদের অভিভাবকদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। বরাবর তারা এখানে থাকিবার খরচ জোগাইয়াছে। কিছুকাল হইল তাদের পরিবারের তিনজন পুরুষের একসঙ্গে অন্তরায়ণ হইয়াছে। এখন আশ্রমবাসের খরচ জোগানো ছেলে দুটির পক্ষে অসম্ভব, আশ্রমে তাদের শিক্ষা ও আহারাদির ভার এখন আশ্রমকেই লইতে হইল। এই ছেলে দুটি কেবল যে নিজের গ্লানি বহিতেছে তা নয়, তাদের মায়ের যে দুঃখ কত তা তারা জানে। যে ব্যথায় অভাবে ও নিরানন্দে তাদের ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে তা তাদের অগোচর নাই। বাপকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে, মা ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিতেছেন যাতে তাঁকে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বন্দী রাখা হয়, এই সমস্ত দুশ্চিন্তার দুঃখ এই শিশু দুটিকেও পীড়া দিতেছে। এ সম্বন্ধে ছেলে দুটির মুখে একটি শব্দ নাই, আমরাও কিছু বলি না—কিন্তু এই ছেলেরা যখন সামনে থাকে তখন ধৈর্যের কথা, প্রেমের কথা, নিত্যধর্মের প্রতি নিষ্ঠার কথা, সর্বমানবের ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলিতে আমার কুণ্ঠা বোধ হয়, তখন সেই সকল লোকের বিদ্রূপ-হাস্যকুটিল মুখ আমার মনে পড়ে যাঁরা পাঞ্জাবের লাটের মতোই সাত্ত্বিকতার অতিশৈত্যকে পরিহাস করেন। এমনি করিয়া রিপুর সহিত রিপুর চকমকি ঠোকায় আগুন জ্বলিতেছে ; এমনি করিয়া বাংলা দেশের প্রদেশে প্রদেশে দুঃখ আতঙ্কে মানুষ বাহিরের খেদকে অন্তরের নিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতেছে। শাসনকর্তার অদৃশ্য মেঘের ভিতর হইতে হঠাৎ সংসারের মাঝখানে যে বোমাগুলা আসিয়া পড়িতেছে তাহাতে মরিতেছে বিস্তর অনাথা রমণী এবং অসহায় শিশু। ইহাদিগকে কি non-combatento বলিবে না।" (১৩২৪)

কবির মৃত্যুর বছর পাঁচ-ছয় আগে একবার বোলপুর ডাক-বাংলার মাঠে ব্রিটিশ সরকারের সৈন্য-ছাউনি পড়ে। সৈন্যরা সাধারণকে কুচকাওয়াজ ও খেলা দেখাবে। পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল তার, মফঃস্বলে আতঙ্ক ধরিয়ে দিয়ে সরকার-বিরোধী কার্য থেকে জনসাধারণকে দূরে রাখা। দুর্লভ-দর্শন এই সৈন্যসমারোহ ও ক্রীড়াকৌতুকের প্রতি সাধারণের মতো ছেলে-মহলে স্বভাবতই ব্যগ্রতা জাগে অত্যধিক। এদিকে যেমন আশ্রমে যথেচ্ছ-বিচরণশীল সরকারী চরের প্রাদুর্ভাব ছিল অসহ্য, বাইরে পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী এবং পথচারীদের উপরও ফৌজী জুলুম ও বাধা-নিষেধ চলছিল তেমনি মাত্রা ছাড়িয়ে বেপরোয়া রকমে। কবির উপস্থিতিকেও একরূপ উপেক্ষা ক'রেই অহরহ আসছিল আশ্রমে ফরমানের পর ফরমান। এই অত্যাচারের কথা নিয়ে উর্ধ্বতন মহলে লেখালেখি করতে কবির মনে ঘৃণা জাগল। কাউকে কিছু না ব'লে, বর্জন করলেন তিনি সেই ফৌজী-উৎসব। একটি ছেলেকেও যেতে দিলেন না সেখানে। ব্যাপার বুঝে দলের কাপ্তেন মেজর সাহেব সানুচর আশ্রমে এসে কবির কাছে ত্রুটি স্বীকার করে যান।

অনেকবারই আশ্রমে অনেক লাট বড়লাট এসেছেন। এ সম্বন্ধে একবার আশ্রমের শিক্ষক জগদানন্দ রায়কে কবি লিখছেন,—"আমাদের আশ্রমে রাজপুরুষদের গতিবিধি হতে চলল সেজন্য মাঝে-মাঝে মন উৎকণ্ঠিত হয় কিন্তু এ কথাও ভাবি যে আশ্রমের রক্ষা-ভার যাঁর উপরে আছে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করা যেতে পারে। এর থেকে যদি কিছু ফল হয় সে ভাল ফলই হবে। কেবল একটি কথা মনে রাখা দরকার—এদের কারো মন জোগাবার ইচ্ছা যেন আমাদের প্রলুব্ধ না করে—আমরা যেন কোনো রকম ছদ্মবেশ ধারণ করবার আয়োজন না করি। আমাদের ভাবে আমাদের কাজ আমরা করে যাব, তাতে যদি আপনিই কারো ভাল লাগে ত ভালই যদি না লাগে ত ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমরা নিজের আদর্শের উচ্চতা সম্বন্ধে যেন লেশমাত্র সন্দিহান হোয়ো না।"—(বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪১, পৃঃ ২১১) লাটদের আসার আগে ১৫।২০ দিন এমন কি মাসাধিক কাল আগ থেকেই আশ্রমে গোয়েন্দার দলের আমদানী হত। হঠাৎ দেখা যেত শান্তিনিকেতন যেন বিশেষ কতকগুলি লোকের কাছে কয়েক দিনের জন্য তীর্থ হয়ে উঠেছে ; আনা-গোনা লেগেই রয়েছে অষ্টপ্রহর। মোলায়েম ভাষার আইন-জারী হত,—লাটদের আশ্রমে অবস্থিতি-কাল আশ্রমবাসীদের থাকতে হবে ঘরে বন্ধ হয়ে। তারা পথে বেরতে পাবে না। কবি অবশেষে একবার বিক্ষুব্ধ হয়ে লাটের শুভাগমন দিনটিতে পাঠিয়ে দিলেন আশ্রমিকদের দূরবর্তী শ্রীনিকেতনে। লাটসাহেব দেখে গেলেন শূন্য আশ্রম, অভ্যর্থনাও পেলেন তেমনি। কবির কথা ছিল, আশ্রমে আসবেন লাট, সে আসা কি হবে আশ্রমবাসীকে অপমান ক'রে ? এই যদি হয় ওদের ভদ্রতা, তবে ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, এরই আর-একটুকু বেশি আচরণে আপনা থেকে দাঁড়ায় গিয়ে ভদ্রতার যে সুন্দর নমুনা ! বলা বাহুল্য, এর পর থেকে বিধিনিষেধের বাড়াবাড়ি হল শিথিল, ভরপুর আশ্রমেই সকলের সুশৃঙ্খল উপস্থিতির মধ্যে চারি দিকে ঘুরে বেড়িয়ে গেলেন পরবর্তী রাজপুরুষ।

ব্রিটিশের মারফৎ পাশ্চাত্যের শিক্ষার মিলনই কবি যেটুকু চেয়েছেন, চাননি ব্রিটিশের শাসন। আবার এ-ও সত্য, ব্রিটিশের আমলাতন্ত্রী

দন্ত, আর তার কৃত অপমানকর শাসনকেই কবি বাক্যে কাজে নানা ভাবে বাধা দিয়েছেন, কিন্তু সে বাধা তার জাতি বা তার মানুষকে নয়; আশ্রমে সকল মানুষের যোগই তাঁর কাম্য ছিল।

১৯১৩ সনের ১১ অক্টোবর কলকাতা থেকে এণ্ড্রুজকেই লিখেছিলেন,—"ভারতবর্ষে আমাদের জীবনের পরিধি সংকীর্ণ ও অসংলগ্ন। এই জন্যই আমাদের মন এত প্রাদেশিকতার ভাবে বিভক্ত। আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাত্রদের ভিতর যতদূর সম্ভব প্রসার দৃষ্টি এবং বিশ্বমানবিক প্রীতি ও ঔৎসুক্য জাগাতে হবে। এ জিনিসটা বই পড়া থেকে নয়, জাগাবে তা আপনা থেকে অবলীলাক্রমে, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।"—(Letters to a friend P, 38)

কেবল আদর্শের মোট কথাগুলি ব'লেই কবি ক্ষান্ত হননি। ব'সে বোঝাবার জন্য প্রবন্ধ এবং বক্তৃতা তো আছেই, পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে কবির হাতে-কলমের কাজও রয়েছে নানা দিকেই। ইস্কুল চালানো এবং পড়ানোর সঙ্গে ঐ রকম কৃচ্ছ্র-সাধ্য কর্মের মধ্যে আরো একটি কাজ উল্লেখযোগ্য। কবি মৌলিক স্কুলপাঠ্য বইও অনেক লিখেছেন, সংকলন পুস্তকও তাঁর কৃত কয়েকখানিই আছে। অন্যের লেখা শিক্ষাগ্রন্থে তাঁর লেখা ভূমিকাও কম নেই। সংস্কৃত শিক্ষা, অনুবাদ-শিক্ষা এবং ইংরেজি-শিক্ষার প্রাথমিক প্রণালী নিয়ে তাঁর চিন্তা ও চেষ্টার ফল রয়েছে কয়েকখানি পুস্তিকায়; "শিশু" কাব্য থেকে "সহজপাঠ" অবধি লিখে তার দ্বারা বাংলার ছেলে মেয়েদের শুধু ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার পথ সুগম করে গেছেন তাই নয়,—তাদের এক উৎসব জমিয়ে রেখে গেছেন। "ছড়ার ছবি"-তে রহস্যরসপূর্ণ "যোগীনদা" কবিতায় তাঁর ভূগোল-শিক্ষার মৌলিক প্রণালী লক্ষণীয়। গল্প, গান, ছড়া, কবিতার যোগান তো আছে অসংখ্যই, বিজ্ঞানেও শিশুদের মন টেনেছেন তিনি "বিশ্বপরিচয়" গ্রন্থে।

কেবল পুঁথিগত মানসিক শিক্ষাই নয়, দৈহিক চর্চার শিক্ষা-আয়োজনও করেছিলেন তিনি নানা দিক দিয়ে। সংগীত নৃত্য কবির কাছে শুধু একটি বিদ্যা-বিশেষ ছিল না, উপরন্তু মনকে বিশুদ্ধ, রসস্নিগ্ধ ও একাগ্র করে তুলে, সর্বপ্রকার শিক্ষার অনুকূল ক'রে দেয় বলে, সে সব বিদ্যার সার্থকতা ছিল কবির কাছে আরো বেশি; পূর্বোক্ত জাপানী 'ধ্যান চর্চা'রই মতো সংগীতের এই বিশেষ ক্রিয়ার দিকটি কবি লক্ষ্য করেছেন; 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' পুস্তকখানির একটি প্রবন্ধে তা জানা যায়।

আবার ওদিকে হাতুড়ি-বাটাল, ঝাঁটা-কোদাল থেকে লাঠি-সোঁটায় হাত পাকানো এবং মুগুর-ভাঁজা, দৌড়-ঝাঁপেও ছেলে-মেয়েদের করিৎকর্মা করে তুলবার দিকে দেখা যায় তাঁর আয়োজন। এমন কি জাপানী যুযুৎসুর পিছনেও এ জন্য তিনি টাকা ঢেলেছেন এক সময়ে সাধ্যাতীত রকমে।

একটি কেন্দ্রে কয়েক জনকে গড়ে তোলা নিয়েই তাঁর চেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গেই দেশের সর্বসাধারণেরও মধ্য থেকে অশিক্ষা দূর করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রবল ছিল। বিশ্বভারতী থেকে সাধারণের শিক্ষার জন্য লোকশিক্ষা সংসদের কাজ এখন যা দেশব্যাপী হয়ে দেখা দিয়েছে, এর মূলে কবিরই প্রবর্তনা। জনশিক্ষার আয়োজন জীবদ্দশায় তেমন কিছু করে যেতে না পারলেও পরিকল্পনা এবং তীব্র মনোবেদনা রেখে গেছেন নানা ভাষণের স্থানে স্থানে একান্ত আবেদনের মধ্যে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা পাশের গ্রামগুলিতে গিয়ে নিয়মিত নৈশ বিদ্যালয় চালনা করত, ছাত্রীরা গ্রামের মেয়েদের মহলে সেলাই শেখাত। মেলায় জনতা নিয়ন্ত্রণ ও সেবা কাজেও ছেলেদের উদ্যম দেখা গেছে। গুরুদেবের প্রোৎসাহে কলেজ বিভাগের অধ্যাপকগণ ছাত্রছাত্রী নিয়ে মাঝে মাঝে পল্লীসমাজের তথ্য সংগ্রহের কাজ করেছেন। গান্ধিজীর পুণা-উপবাসের সময়ে অস্পৃশ্যতাবর্জন আন্দোলনের গঠনমূলক দিকটি নিয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীসমাজ দলে দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামের কাজ করতে যেতেন! চরখার সূত্রযজ্ঞ এবং গানের আসর উপলক্ষ ক'রেও তাঁরা সাধারণের সঙ্গে যোগ রক্ষা করেছেন। তা ছাড়া তাদের বনভোজনের ক্ষেত্র প্রায়ই হয়ে দাঁড়ায় সাধারণের যোগ-স্নিগ্ধ পল্লীপরিবেশে। এ সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, মানুষের প্রাণ ও কর্মের উষ্ণ স্পর্শে-মাখা সামাজিকতার মধ্যে রেখে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলবার চেষ্টা শান্তিনিকেতনে বরাবরই চলে আসছে। কবির শিক্ষায়তন জনতা থেকে দূরে থাকলেও, জন তার কাছে দূরের জিনিস হয়ে থাকেনি।

তাঁর শেষ দিকের এই একটি নির্দেশ দেশবাসীর চিরস্মরণীয়। ১৩৪৩ সনে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর শেষ ভাষণ "ছাত্র সম্ভাষণে" কবি বলেছেন,—"আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্ম-শক্রতার বিরুদ্ধে; প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহু শতাব্দী নির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তি মূলে।…নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের।"

পদাবলী

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

টিপ টিপ শঙ্কা বুকে, আমাকে ডাকলে যদি
টিপ টিপ নরম পায়ে ছাদের ঐ আলসে ধরে,
চুপ চুপ হাতছানিতে কতো বার নেই অবধি
ছায়া-নীল সন্ধ্যাবেলা ঝিলিমিল আঁচল ওড়ে।

এ হৃদয় আহ্লাদে জল, ছলোছল বইলো নদী—
সময়ের ক্লান্ত হাটে ভাঙা-বাঁধ জলের স্বরে,
কি কথা কইলে যেন, বাসনার ঢেউ জাগানো
দু'মুঠো সাঁঝের তারা ছড়ালে আকাশ ভরে!

তুমি তো কইলে কথা, ছড়ালে রাতের তারা—
সে ভাষায় উঠলো দুলে হৃদয়ের নিদ্রাপুরী,
এসো আজ আমরা তবে সাহসে বুক বেঁধে নি;
চাঁদিনীর জ্যোৎস্নাটুকু দু'জনায় করবো চুরি।

তোমার ঐ ঠোঁটের মতো জীবনের অনেক সময়—
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষা তার চেয়ে রয় দিগ্বলয়ে,
কিছু তার কুড়িয়ে নিয়ে, কিছু তার ছড়িয়ে দিয়ে
হাতে হাত আমরা দু'জন চলো যাই মাতাল হয়ে।

বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

(নরেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাটীর অন্দর-মহল। প্রাতঃকাল। নরেন্দ্রের মাতা, দিদি, ভ্রাতৃদ্বয়, পরে পুরাতন বন্ধুগণ, প্রতিবেশিগণ প্রভৃতি।)

মাতা। (পূজার পর ঠাকুরঘর বন্ধ করিয়া দ্বারে প্রণাম করিবার সময়) ভোলানাথ, আজ তোমার পুজোয় ভাল মন বসল না। তোমায় ধ্যান করবার সময় কেবল বিলের মুখই মনে পড়তে লাগল। ঠাকুর! তুমি অন্তর্য্যামী, মায়ের এ দুর্ব্বলতা ক্ষমা কোরো।

দিদি। (অশ্রুমতী মাতাকে তিরস্কার করিয়া) আজ এই সুখের দিনে চোখে জল কেন বল ত? আজ আমার জগজ্জয়ী বিলে ভাই ঘরে আসছে, কেবল আনন্দ কর। অনেক কেঁদেছ, এবার হাস। তাই ত, এখনও সে এলো না কেন? আজকাল তাকে নিয়ে লোকে ছেঁড়াছিঁড়ি করছে।

মা। সে নিশ্চয়ই আসবে। আমার কাছে কথা দিয়ে খেলাপ করবে না। কোন কাজের চাপে দেরী হচ্ছে। যে সব খাবার খেতে সে ভালবাসত তার ব্যবস্থা করেছিস্ তো? অনেক দিন সামনে বসে খায়নি।

ভ্রাতা। (ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করিয়া সাহ্লাদে) মা, দাদা আসছে গো!

মা। (ব্যস্ত ভাবে) কোথায় রে?

ভ্রাতা। ঐ বড় রাস্তায় মস্ত বড় গাড়ী করে, কিন্তু—

দিদি। 'কিন্তু' কি রে?

ভ্রাতা। গাড়ীতে ঘোড়া জোড়া নেই!

দিদি। (রাগত স্বরে) তবে রে, বাঁদর, জ্যাঠামি হচ্ছে? সত্যি কথা বল্।

ভ্রাতা। সত্যি কথাই তো বলছি, তবু বিশ্বাস করছ না। (অন্তরীক্ষে বহু কণ্ঠ-নিঃসৃত ধ্বনি উঠিল—'জয় গুরু মহারাজ কী জয়!' 'জয় স্বামিজী মহারাজ কী জয়!') এবার হোল?

মা। (সজল কণ্ঠে) ওরে, যা, যা, শীগ্‌গির তাকে ভেতরে নিয়ে আয়।

দিদি। (আনন্দাশ্রু মুছিয়া) আজ বাবা থাকলে তাঁর কত আনন্দ হোত, ও তাঁর নয়নের মণি ছিল। ঐ আসছে আমাদের বিলে ভাই। বাব্বা, কত লোক ঘিরে রয়েছে ও প্রণাম করছে!

গৈরিকধারী সহাস্যবদন স্বামিজী। [প্রবেশান্তে মাতা ও দিদিকে প্রণাম করিয়া একটি পিঁড়ে টানিয়া রকে বসিলেন, অদূরে পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাগণ ও দ্বারের নিকট অসংখ্য জনতা) My mother & elder sister. (তাঁরা নতভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিলেন)।

মাতা ও দিদি (ব্যস্ত ভাবে)। কাজের বেলায় বাড়ীর ছেলেগুলোর টিকি দেখতে পাওয়া যায় না। চেয়ার এনে দে।

নিবেদিতা। (মৃদু হাস্যে) আপনি ব্যস্ত হবেন না। গুরুজী যখন নীচে বসে আছেন, তখন আমরা উঁচুতে বসতে পারি?

গুডউইন। আমরা সব ঘরের লোক! (সকলে ঐ স্থানে বসিল)

দিদি। দাঁড়াও বাছারা। একটা মাদুর পেতে দিই।

মা। (পাখা দিয়া বাতাস করিতে উদ্যত হইলেন) পাগড়ি-জামা খোল না, বাপু! ঘেমে নেয়ে উঠেছিস্ যে!

দেবমাতা। আমরা থাকতে আপনি কষ্ট করেন কেন? পাখাটি দিন্।

মা। অবাক কাণ্ড! নিজের পেটের ছেলের উপরও আর জোর নেই!

স্বামিজী। (সহাস্যে) ওরা যে এখন তোমার ছেলে-মেয়ে, তাই ঠাকুমা'র কষ্ট দেখতে ইচ্ছে করে না। (দিদিকে একবার গামছা-খানা দাও না দিদি-ভাই। পান সাজা আছে? (ভ্রাতা ছুটিয়া ভিতর হইতে পানের ডিবা ও জরদার কৌটা আনিয়া দিলে) ওরে, ভুলু ভাই যে! কেমন আছিস, কাছে বস। এতক্ষণ তোকে দেখতে পাই না। তোর মেজদা কোথায়? আয় মহিম: (দ্বারের নিকট জনৈক বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া) কে, ভানু পিসি না? মা ও দিদির সঙ্গে দেখা শেষ করে পাড়ায় ঘুরে আসব ভেবেছিলাম।

বৃদ্ধা। (পৌত্রী সহ নিকটে আসিয়া কোমল স্বরে) বেঁচে ছিলুম বলেই আজ আবার সোনারচাঁদকে দেখতে পেলুম। ঘরের ছেলে ঘরে আসছে শুনে অবধি কেবল ঘর বার করেছি। তোমা বিহনে তোমার মা'র যে কি ভাবে দিন কেটেছিল, তা জানেন ঠাকুর ও এই বুড়ী। ও কেবল কেঁদে বলত—'হে মা কালী! আমার বিলেকে কোলে ফিরিয়ে দিলে, বুক চিরে তোমার পুজো দোব।'

স্বামিজী। তা আজই কালীঘাটে মাকে দর্শন করতে চল। তবে বুক চিরে রক্ত নাই বা দিলে, মা!

মাতা। তা কি কখনও হয়? মানত করে না মানলে অকল্যাণ হবে যে!

স্বামিজী। তোমাদের যা ইচ্ছা হয় কর। (পরে বৃদ্ধাকে) এ মেয়েটি কে?

বৃদ্ধা। এ যে আমাদের পটার মেয়ে। মনে নেই তাকে? ছেলেবেলায় সে রোজ এখানে খেলতে আসত?

স্বামিজী। বটে? সেই পটার বে হয়ে গেল—আবার সে মা-ও হোল!

দিদি। তা হবে না? হিন্দু-ঘরে আইবুড়ো মেয়ে বেশী দিন রাখা চলে? ঐ যে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

স্বামিজী। তাই তো, খুব বড় হয়ে গেছে যে! ওরে ও পটা, নিয়ে আয় পানের বাটা—তোর মেয়ের বিয়েতে হবে খুব ঘটা।

(হাস্য)। (পুরাতন গয়লা দুধ দিতে আসিয়া বিশিষ্ট জনতা দৃষ্টে সঙ্কোচ করিতেছে দেখিয়া) কি হে ঘোষজা, কেমন আছ? বাড়ীর খবর ভাল?

গয়লা। এজ্ঞে, আপনার কেরপায় সব কুশল। আপুনি কখন আইলেন? কেমন আছেন?

স্বামিজী। (দ্বারের নিকট পুরাতন পরামাণিক ও পশ্চাতে বৃদ্ধ রজককে লক্ষ্য করিয়া) আমাদের জীবন পরামাণিক না? পেছনে ভদুয়াও রয়েছে না? তোমরা এদিকে এস? ভজুয়া এখনও বেঁচে আছিস? (উভয়ে প্রণাম করিলে) তোমরা কর্ত্তাদের আমলের লোক। দেখলে আনন্দ হয়। কিন্তু দু'জনেই পটকে গেছ।

পরামাণিক। আমার বয়সের অনেকেরই মেয়াদ খাটা শেষ হয়ে গেছে। এখন ছুটি পেলেই বাঁচি।

স্বামিজী। (বাড়ীর পুরাতন বৃদ্ধা ঝি বাজার করিয়া ফিরিতেছে) কি গো হরির মা, কি বাজার আনলে? কুচো চিংড়ি এনেচো তো। (মাতাকে) অনেক দিন তোমার হাতের রান্না 'বাটিচচ্চড়ি' খাইনি; একটু তেল-ঝাল দিয়ে করে দিও। (পরে নিবেদিতা প্রভৃতিকে) This is my home—this is my country. These are my countrymen—poor, ignorant, but pure and simple. They are God's weak miserables। (দ্বারের নিকট পুরাতন বন্ধুগণকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে) ঐ দেখো, মা, আগে যেমন ওরা দল বেঁধে আমায় ডাকতে আসত, আজও ঠিক সেই ভাবে এসেছে। আরে চলে আও ভেইয়ারা। বৈঠিয়ে ভাই সাব। তবিয়ৎ আচ্ছা হোয়? আও, পাঞ্জা লড়ো। আমি তোদের সেই বিলেই আছি রে! কি করছিস্ এখন?

১ম বন্ধু। (বিমর্ষ ভাবে) সংসারের জোয়াল ঘাড়ে নিয়ে চলেছি তিন-তেতালায়। তোর মত কি বরাত করে জন্মেছিলুম রে, দাদা?

স্বামিজী। বুঝেছি। বে করে মরেছিস তো? ক'টা বাচ্ছা হোল?

১ম বন্ধু। তা গোটা চারেক হবে। (সহাস্যে) ছিলাম দ্বিপদ হলুম চতুষ্পদ, ক্রমশঃ পদোন্নতি। দাঁড়া হাত-পা থাকলে জগৎকে থোড়াই কেয়ার করতাম।

স্বামিজী। তা বটে! নিজের কোমরের জোর বুঝে কাজ করাই ভাল। (২য়কে) তোর খবর কি ভাই?

২য় বন্ধু। (সখেদে) মাছি-মারা কেরাণী। পান থেকে চুণ খসলেই গো টু হেল!

স্বামিজী! (করুণ ভাবে) তোদের মুখ দেখেই সব বুঝতে পারছি। সংসারে দাসখৎ লিখে দিয়েছিস্। পরমহংসদেবের কথায় আছে—'শালা এখন মেগের বাজার করছে।' কি অদ্ভুত শক্তির খেলা তিনি দেখিয়ে গেলেন। এই ফষ্টি-নষ্টি করছেন, কিন্তু তখুনিই সমাধিতে মগ্ন। (শ্রীমকে লক্ষ্য করিয়া, সাদরে) আসুন, মাষ্টার মশায়! সেই এক দিন, আর এই এক দিন! কত আসমান-জমিন তফাৎ।

শ্রীম। সবই তাঁর ইচ্ছায় হয়। তাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাটিও নড়ে না।

স্বামিজী। ঠিক কথা। সসীম মানুষের অহংকার করা বা কর্ত্তাগিরি করা উচিত নয়। (গুডউইন প্রভৃতিকে) 'Pet of our Lord, the writer of the gospel.

গুডউইন। Bless us, Sir, you have left the whole humanity to debt।

শ্রীম। Man is a humble tool in the hands of this Law।

রাম দত্ত। (প্রবেশান্তে) কি রে, বিলে ভাই, অনেক দিন পরে দেখা হোল। কেমন আছিস?

স্বামিজী। (প্রণাম করিতে বাধা পাইয়া) কেন বাধা দেবে? আমি কি সেই বিলে নেই? আমার কি বগলের পাশে চারটে হাত বেরিয়েছে, না ধড়ের ওপর আর একটা মুণ্ড গজিয়েছে? বৌদির সঙ্গে দেখা হলে এর শোধ নোব। (নিবেদিতা প্রভৃতিকে) The chosen seed of our Lord, my elder brother।

নিবেদিতা। আপনার মধ্যে তিনি আছেন। আমরা আশীর্ব্বাদ চাই।

রাম দত্ত। তিনি সবার মধ্যেই আছেন, আর তোমাদের ওপর কৃপা না হলে এমন যোগাযোগ হবে কেন?

ভদ্রলোক। (প্রবেশান্তে) মহারাজ! আজ 'এলবার্ট হলে' আমাদের একটা মিটিং হবে। আপনাকে সভাপতির আসন নিতে হবে।

স্বামিজী। কিন্তু আজ আমার মোটেই সময় হবে না। মাকে নিয়ে এখুনিই কালীঘাটে যেতে হবে। (বন্ধুদের) তোরা মঠে এক দিন যাস না ভাই! মনের মানুষের সঙ্গে মনের কথা কইলে মনটা হাল্কা হবে। গঙ্গার ধারে বসে একটু ভজন-সঙ্গীতও চলবে।

বন্ধুরা। আর ঈশ্বর-টিশ্বর মানি না।

স্বামিজী। শেষে মানতে হবে। A wild prodigal heart seeking shafe barbour.

[বন্ধুগণের প্রস্থান।

মা। (ব্যস্ত ভাবে) মস্ত ভুল হয়ে গেছে রে?

দিদি। আবার কি ফ্যাসাদ বাধালে?

মা। (নিবেদিতা প্রভৃতিকে দেখাইয়া) আহা, এরা সব এলো, এদের মিষ্টিমুখ করান হোল না যে! বিলে, তোকে পেয়ে সব এলোমেলো হয়ে গেছে।

নিবেদিতা। যিশুর জন্মস্থান জেরুসালেমে গিয়ে কেউ কি কেক্ খাবার কথা ভাবে? আত্মার তৃপ্তিই পরম ধন। আপনার আশীর্ব্বাদই বড়।

দিদি। তবু একটি খাও। (একটি থালায় রসগোল্লা আনিয়া প্রত্যেককে দিল; ভূপেন জল দিল)।

(সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। মাতা ও দিদি ভিতরে গমন করিলেন)

স্বামিজী। (শ্রীম ও রাম দত্তকে) দেখুন, খুব শীগ্‌গির আমাদের একটা মিটিং হবে, আপনাদের যেতে হবে। মঠ সংক্রান্ত সমস্ত সম্পত্তি পরমহংসদেবের নামে লিখে দলিল করা হবে। আবার বাইরে যাবার আগে এ কাজটা শেষ করা চাই। (ভিতরে

গমন করিবার কালে সহাস্যে) আমাদের মেয়েদের কোথাও যেতে হলে আঠার মাসে বছর হয়। কই, দিদি-ভাই ?

রাম দত্ত। বিলের স্বভাব কিছুই বদলায়নি। সেই আগেকার মত সরল। একটু অহঙ্কারও নেই।

শ্রীম। ঠিক কথা। ও কি সাধারণ পাত্র ? ঠাকুর ওকে দিয়ে অনেক কাজ করাচ্ছেন, ওখানে অহঙ্কার হতে পারে না। গীতাতে আছে—'বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে।'

স্বামিজী। (পুন :প্রবেশান্তে) অনেক তাড়া দিয়ে বার করতে হয়েছে। চলুম রাম দা। মাষ্টার মশায় যাবেন কিন্তু।

[মা, দিদি ভ্রাতাগণ সহ স্বামিজীর প্রস্থান।

রাম দত্ত। A soulful dynamism—মহাকম্মিরূপে ভারতে ফিরে এসে rude shape up করে দিয়েছে।

শ্রীম। তাই আনী বেশান্ত ওঁর বিষয়ে লিখেছে—'A warrior in the guise of an anchorite' শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসীর বেশে ভীষণ বিপ্লবী যোদ্ধা।

রাম। অথচ ঐ লোকই বিদ্যাসাগর মশায়ের স্কুলে মাষ্টারি করবার উপযুক্ত পাত্র হয়নি।

শ্রীম। কিন্তু আমাদের ঠাকুরের কি অদ্ভুত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল, ওকে দেখেই এক দিন উনি বলেন, কেশব সেনের মধ্যে দেখলুম আটটা বাতি জ্বলছে, কিন্তু ওর ভেতরে আঠারটা বাতি জ্বল-জ্বল করছে। চলুন, বেলা হোল।

চতুর্থ দৃশ্য

[প্রাতঃকাল। বাগবাজার—জমিদার বলরাম বসুর বাড়ীর বহির্ভাগের একটি বড় ঘরে ফরাস-পাতা বিছানার এক ধারে কয়েক জন যুবা 'বেদ' পাঠ করিতেছেন ও গত দিনের স্বামিজীর ব্যাখ্যা আলোচনা চলিতেছে। অদূরে শুর ভক্ত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ গুরুভ্রাতাগণ ও প্রতিবেশী দল মধ্যে বাক্যালাপ হইতেছে।]

১ম যুবা। (সঙ্গীকে) এ সূত্রের ব্যাখ্যা কাল ভাল ধরতে পারি নাই।

২য় যুবা। আমারও অবস্থা তথৈবচ।

৩য় যুবা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কাল মহারাজ যখন ব্যাখ্যা করলেন তখন জলবৎ তরলং মনে হোল।

৪র্থ যুবা। সেটা ওঁর অদ্ভুত তপঃ-শক্তিতে হয়েছে। আচ্ছা, গিরিশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না ? উনিও তো মস্ত আধার।

১ম যুবা। হ্যাঁ, থিয়েটারে নাটকের মধ্য দিয়ে বেদান্ত ভাবের কত ব্যাখ্যাও করেছেন।

২য় যুবা। তবে সন্দেহ হয় যে, উনি এখন রাজী হবেন কি না।

৩য় যুবা। যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

৪র্থ যুবা। (সকলে গিরিশ বাবুর নিকট আসিয়া) মশায়। একটু দায়ে ঠেকে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।

গিরিশ বাবু। কেন, কি হয়েছে ?

১ম যুবা। এই প্রশ্নটার অর্থ মাথায় আসছে না।

২য় যুবা। তোরা দেখছি ডাকাতের দল। সকাল বেলাই 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' করছিস্।

৩য় যুবা। গালাগাল দিন, কিন্তু বুঝিয়ে দিতে হবে।

৪র্থ যুবা। নইলে পড়া জিজ্ঞাসার সময় মহারাজের কাছে হাঁ করে থাকলে মারা যাবো।

গিরিশ বাবু। আলালি বাপু, সবে তামাকটা ধরেছে! বেদ আমি পড়িনি।

গুরুভ্রাতা। দাও না বলে, ছেলেগুলো বড্ড বকুনি খাবে।

গিরিশ বাবু। বেশ বলেছ। নিজের ঘাড়ে না নিয়ে বোঝাটা চাপালে। (যুবাদের) বেশ, তোদের প্রশ্ন কি ?

১ম যুবা। আজ্ঞে, জ্ঞান বড়—না প্রেম বড় ?

গিরিশ। ঠাকুর তত্ত্ব বিষয়ে ব্যাখ্যা কেমন সরল গ্রাম্য ভাষায় বলতেন। ওঁর একটি কথা ছিল—'বেশী জ্ঞান চচ্চড়ি করা ভাল নয়'। পণ্ডিত অনেক শ্লোক আওড়াতে পারে—কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ে। আর বলতেন—'ভক্তিই মুক্তির দাসী'। ভক্তি যেন রাজার বেটী, সাত মহল পর্য্যন্ত যেতে পারে। উদ্দেশ্য ভগবান লাভ তো ? তা নেতি নেতি বিচার করেই হোক, আর শুদ্ধা ভক্তি দিয়েই হোক—ফল সমান।

২য় যুবা। মশায়, বেদের ভাব ভিন্ন। এতে ভক্তির স্থান নেই। 'তুমি—আমি' নেই।

গিরিশ। জ্ঞান ও প্রেমে যদি বিভিন্নতা প্রমাণ করে থাকেন তবে অমন বেদ আমার মাথায় থাকুন।

স্বামিজী। (প্রবেশান্তে—সহাস্যে)—কি রে, ওঁর সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল ?

১ম যুবা। মহারাজ, যদিও উনি বলেন যে, বেদ পড়েননি, তবু কি সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন।

স্বামিজী। (ঈষৎ গম্ভীর ভাবে) গুরুভক্তি থাকলে সব জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। পড়বার শোনবার তত দরকার হয় না। ওঁর মত ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে বিরল। কিন্তু কাউকে নকল করা ঠিক নয়। (ক্ষণ পরে) জার্ম্মাণীতে ম্যাক্স ম্যুলারের সঙ্গ করে মনে হোল যেন সেই পূর্ব্বের সায়ন ঠাকুরই নিজের ভাষ্য উদ্ধার করতে বর্ত্তমানে ঐ রূপে ঐ দেশে আবির্ভূত হয়েছেন। এটা আমার অনেক দিনের ধারণা। তিনি আমাকে বলেন যে, পঁচিশ বছর ধরে তিনি কেবল লিখেছেন, আর বই ছাপাতে কুড়ি বছর লেগেছে। জীবনের এত সময় একটা কাজে লেগে থাকা সাধারণ মানুষের কাজ নয়।

প্রতিবেশী। বলেন কি স্বামিজী ? অদ্ভুত আদর্শ-নিষ্ঠা!

স্বামিজী। দিন কতক ওঁর বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলাম। কি যত্নটাই করত বুড়ো-বুড়ী। দু'টিকে দেখলে মনে হোত যেন বশিষ্ঠদেব ও অরুন্ধতী সংসার করছেন। আবার আমাদের পরমহংসদেবের ওপর কি অশেষ ভক্তি। ওঁকে অবতার বলে বিশ্বাসও করেন। ষ্টেশনে এসে আমাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে কাঁদতে থাকেন দু'জনে।

প্রতিবেশী। আচ্ছা, মহারাজ, সায়নদেব কি এ দেশে ফের জন্মাতে পারতেন না ?

স্বামিজী। এ দেশে ও-রকম বিরাট কাজ করা অসম্ভব হোত। বিশেষতঃ বই ছাপাবার অত টাকা এ গরীব দেশ পাবে কোথা ?

ই, আই, রেলওয়ে কোম্পানি খরচের জন্ম ন' লক্ষ টাকা দিয়েছিল। (গিরিশকে) এ সব তো পড়লে না ভাই, কেবল কেষ্ট-বিষ্টু জপে গেলে।

গিরিশ। অত পড়বার সময়ও নেই, বুদ্ধিও নেই। তবে দয়াল ঠাকুরের কৃপায় ও সব বেদ-বেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারবো। তোমাকে দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন, তাই ও-সব পড়িয়েছেন। 'জয় বেদান্তরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়'!

স্বামিজী। (ধীর ভাবে) ঠিক বলেছ ভাই! পরমহংসদেবই জীবন্ত বেদ! লেখাপড়া জানা নেই, কিন্তু মুখ দিয়ে বেদান্তের খৈ ফুটত! আর বলতেন, 'মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দিচ্ছেন।'

যোগানন্দ। গিরিশ বাবু, কথাটার মোড় ফেরাও। নইলে আজকের মিটিং এব দফা রফা।

গিরিশ। আচ্ছা, নরেন, অনেক তো বেদান্ত ঘাঁটলে, দেশের অন্নাভাব, ব্যভিচার, মহাপাতকাদি যে চোখের সামনে দিন-রাত চলেছে, তার উপায় কি বেদে কিছু লেখে?

স্বামিজী। কথাটা ঠিক ধরতে পারছি না। এখনও মাথায় বেদরূপী ঐ পাগলা বামন রয়েছে।

গিরিশ। যেমন ধর, এমন ঘটনা ঘটছে যে, অমুক বাড়ীর গিন্নীর আজ দু'দিন উনুন জ্বলেনি, অথচ আগে তার বাড়ীতে রোজ পঞ্চাশখানা পাতা পড়তো। কিম্বা অমুক বাড়ীর বৌকে কতকগুলো গুণ্ডা ধরে নিয়ে গেছে। কিম্বা কোন বড় ঘরের বিধবা গুপ্ত ভাবে ভ্রূণটা নষ্ট করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তোমার বেদে এর কোন ব্যবস্থা আছে?

স্বামিজী। থাম, থাম, আর নয়! (কিছু পরেই ঐ গৃহের বাহিরে গমন করিলেন)

১ম যুবা। মশায়, জগতের কি সব ছাই-ভস্মের কথা তুলে আজ বেদ পড়া বন্ধ করলেন।

গিরিশ। ওরে, তোরা বই পড়ে কত শিখবি? দেখলি কত বড় প্রাণ! কত বড় শক্তির পরশমাণিক! ওকে কেবল মহা পণ্ডিত বলে মানি না। জীবের দুঃখে সদা কাতর। শুধু দুঃখ-কষ্টের কথা শুনেই বেদ-বেদান্ত উড়ে গেল। ওর মত Practical Vendantist কোথা?

স্বামিজী। (প্রবেশান্তে যুবাদের) ওরে, আজ আর পড়া হবে না। উনি মস্ত বড় কথা তুলেছেন। জীব-সেবার চেয়ে আর বড় ধর্ম্ম নেই। নিষ্কাম ভাবে এটা সাধনা করলে সংসার-বন্ধনও কেটে যায়। (শিষ্য সদানন্দের প্রবেশ) ওরে, একটা সেবাশ্রম খুলতে পারিস? হিমালয়ে গিয়ে তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রীদের একটা গাছ-তলায় বসে এক ফোটা জল খাওয়াতে পারবি না?

সদানন্দ। যো হুকুম, মহারাজ!

(শ্রীম, রাম দত্ত প্রভৃতি গৃহী-ভক্তগণের প্রবেশ)

স্বামিজী। সেবা ধর্ম্মের চেয়ে আর ধর্ম্ম নেই। বেদান্তের সার কথা হাতে-নাতে কাজ করে প্রমাণ করতে হবে। জীবরূপী শিবকে সেবা করে নরজন্ম সার্থক কর। শুধু নিজের মুক্তির জন্য নিষ্ক্রিয় বৈরাগ্য ভাব আশ্রয় করা মহাপাপ। সাহায্য-কেন্দ্র খুলে গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করা চাই। রোগীদের ওষুধ ও পথ্য দিতে হবে। জাতবিচার চলবে না, উঠে-পড়ে সকলে কাজে লেগে যা। নিজের মুক্তি ছুঁড়ে ফেলে দে। সকলকে মুক্ত কর। [গিরিশকে], আচ্ছা, আমার মনে এ ভাব কেন হয় বলতে পার?

গিরিশ। ঠাকুরের খেলা। বড় আধারে বড় ভাবের ঢেউ ওঠে।

স্বামিজী। "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" এই হোল সন্ন্যাসি-জীবনের ব্রত। সন্ন্যাস নিয়ে যারা এই উদ্দেশ্য ভুলে যায়— 'বৃথৈব তস্য জীবনং'। পরের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতে, ব্যাধি-কবলে কাতর জীবকে শান্তি দিতে, সকলকে শুভবুদ্ধি দিয়ে তাজা মানুষরূপে গড়ে তোলবার জন্যই সন্ন্যাসীর জন্ম। শুধু গেরুয়া রংয়ের কাপড় পরলে মার দিয়া কেল্লা হয় না। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' এই মূল মন্ত্র। কি করছিস্ বসে বসে? ওঠ, জাগ, অপরকে জাগা। Respect the dignity of man—live and love.

বলরাম। ঠাকুরের জন্মোৎসবের দিন তো এগিয়ে আসছে। কোথা হবে?

স্বামিজী (যুবাকে) ও রে, একটু তামাক খাওয়া না। উৎসবের কথা আমি ভুলিনি। দক্ষিণেশ্বরে না করে নীলাম্বর মুকুজ্জের বাগান-বাড়ীতে বা দাঁয়েদের ঠাকুর-বাড়ীতে করলে কেমন হয়? এবার বেশ জাঁকিয়ে পূজো করতে হবে। (ক্ষণ পরে) অনেক প্ল্যান মাথার ভেতর টগবগ করে ফুটছে। জগতের অনেক স্থান ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে যে, সঙ্ঘ ছাড়া কোন বড় কাজ করা যায় না। পরমহংসদেবের নামে একটা সঙ্ঘ গড়ে দেশের ও দশের মঙ্গল করতে হবে। তোমাদের মতামত জানাও।

শ্রীম। এটা যেন বিদেশী ভাবে কাজ করা হবে।

রাম। ঠাকুরের কথায় আছে—'তোড়ে ডোবায় দল বাঁধে'। তাঁর উদার মত ছিল।

গিরিশ। ওঁর উপদেশের মধ্যে অনেক গভীর অর্থ থাকত।

যোগানন্দ। দল-টল করা ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল না।

স্বামিজী। (উত্তেজিত ভাবে) তুই কি করে জানলি যে, এই কাজে ঠাকুরের ইচ্ছা নেই? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোদের ঐ ছোট বুদ্ধিতে মাপতে যাস্‌নি। আমার রুদ্র অংশে জন্ম। অকেজো পুরানো সংস্কারগুলো ধ্বংস করে, ছোট গণ্ডীর বেড়া চুরমার করে, তাঁর উদার ভাব ছড়াতেই আমার জীবন-ব্রত। নতুন সঙ্ঘ গড়ে অপর সঙ্ঘের সঙ্গে লড়াই করতে ইচ্ছা নেই। তাঁর ভাব ছিল সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়। এই মহা ভাব কি সকলে ধরতে পারে? তোরা আমার সাহায্য করবি নি ভাই? বিবেকানন্দ কি করে গেল বুঝতে হলে আর একটা বিবেকানন্দ চাই। আমি চলে গেলে পরে একটু বুঝতে পারবি। কালে আবার শক্তির খেলা দেখবি।

গিরিশ। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে, তোমার মধ্যে প্রভুর শক্তি খেলা করছে।

স্বামিজী। ঐ শক্তির লীলা আমিও জীবনে কত বার টের পেয়েছি। বিপদে-আপদে, দুঃখ-কষ্টে সব সময়েই দেখেছি, তিনি আমার হাত ধরে আছেন, ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। এখনও তোরা এই কাজে সন্দেহ করিস্? তাঁর শক্তির ইয়ত্তা করা যায় না। মানুষের ছটাকী-বুদ্ধি চিরকাল হেরে যাবে। প্রভু, তোমারি জয়! (গৃহত্যাগ করিলেন)।

গিরিশ। নরেনকে কাজে আটকে রাখাই ভাল। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনেছি যে, যখন ওর স্বরূপ দর্শনের ব্যাকুলতা বাড়বে, তখন আর দেহ থাকবে না।

শ্রীম। আমরাও ঐ কথা শুনেছি। আত্মদর্শন হলে এ সব ফাঁকা হয়ে যাবে।

রাম। বিলে ভাই যখন আমাদের ঠাকুরের ভাব প্রচার করতে সঙ্ঘ তৈরী করতে চাইছে, তাতে আমাদের অমত হবে কেন ?

গুরুভ্রাতা। সত্যি কথা। আর ঠাকুরও বলতেন—'ও পুরুষ, আমি প্রকৃতি'।

গিরিশ। তাহলে তাঁর পবিত্র নাম নিয়ে সকলে মিলে ঐ কর্ম্ম-পাগলকে সাহায্য করাই ভাল নয় কি ?

রাম। যা ধরবে তাই করবে। Challenging every difficulty of life. In a race of 'yes' men he dares to say 'no'.

গিরিশ। নরেনের মুখ দেখলে অর্জ্জুনের কথা মনে পড়ে—'দুষ্প্রেক্ষ্যবদনং'। মহা কর্ম্মীর মূর্ত্তি।

শ্রীম। উর্ম্মিমুখর সাগর-তীরের বন্ধন গ্রাহ্য করে না—বন্দরের বাঁধনও চায় না। নির্ম্মল আত্মা মায়াতীত, সদা মুক্ত।

—

পঞ্চম দৃশ্য

[পরমহংসদেবের জন্মোৎসব দিবস—শুভ দ্বিতীয়া ফাল্গুনী, তিথি। প্রাতঃকাল। বাঁড়ুয্যেদের প্রশস্ত ঠাকুর-বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। মৃত্তিকার কৃত্রিম পর্ব্বতাকারে গঠিত উচ্চ শিখরে ফুল-মালা-শোভিত ঠাকুরের পট। ধূপ-ধূনার গন্ধে চারি দিক্ আমোদিত। বহু যাত্রি-সমাগম হইয়াছে। কোথাও কীর্ত্তন চলিতেছে, কোথাও 'চণ্ডীপাঠ' হইতেছে, কোথাও সন্ন্যাসী দল হোম করিতেছে।]

স্বামিজী। (নব-দীক্ষিত সন্ন্যাসীত্রয়কে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ)—দ্যাখ্, আজ এই শুভ দিনে তোদের নবজন্ম লাভ হোল। নরপশু-জন্ম ঘুচে গেল। আজ থেকে তোদের সব পাপের ভার নিলুম। তোরা কেবল সবার মঙ্গল করবার চেষ্টা কর। ব্রহ্মসিংহকে জাগ্রত করতে সন্ন্যাসীর জন্ম। আত্মজ্ঞানের চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান নেই। নে, ঠাকুরকে প্রণাম করে ওঁর আশীর্ব্বাদ নে। (সন্ন্যাসীকে)—ওরে, আজ যারা এখানে আসবে, তাদের পৈতে পরিয়ে দিতে হবে। ওরা সবাই ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। আর শাস্ত্রে বলেছে—'প্রায়শ্চিত্ত করলেই পতিত সংস্কার হয়'। দেশের সবাইকে ব্রাহ্মণ পদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে। 'ছোঁব না, ছোঁব না' ভাবের জন্যই হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতা চরমে উঠেছে। সাবধান, প্রতিশোধের প্রতিধ্বনি হয়। মনের জাগরণেই আসল প্রাণের বিকাশ হয়। সকলকে শোনা, মা ভৈঃ। ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক। এর ভয়কে জয় কর। দে পৈতে পরিয়ে। জয় গুরুজী !

[সকলকে পৈতা পরানো হইতেছে। শঙ্কররূপী স্বামিজী লক্ষ্য করিলেন যে, অদূরে কয়েক জন 'হরিজন' সভয়ে দাঁড়াইয়া আছে, পৈতা লইতে দ্বিধা করিতেছে।]

স্বামিজী। পৈতে পরে সকলে ঠাকুরকে প্রণাম কর।

প্রধান। ও আদেশ করো না দ্যাবতা। মোরা ছোট নোক, নীচ জাত। অধম্ম করলে সাজা হবে।

স্বামিজী। এতে যদি তোদের পাপ হয়, আমি সে পাপের বোঝা নোব। আমিই পৈতে পরালাম। তোদের ব্রাত্যদোষ ঘুচে গেল। কে বলে তোদের পতিত ? তোরাই সমাজের আসল মেরুদণ্ড। নকল মানুষ নয়। আমি দিব্যচোখে দেখছি যে, তোদের জন্য দেবতার দুয়ার আর বন্ধ নেই। A new era of the common man has dawned. যারা রিক্ত, যারা সর্ব্বহারা, যারা বঞ্চিত, তাদের সুদিন এসে গেছে। (সকলকে)—শঙ্করাচার্য্য যে ধর্ম্ম পাহাড়ে ও জঙ্গলে রেখে যান, সেই ধর্ম্মকে সংসারে ও সমাজের মধ্যে আনবার জন্যই আমার জন্ম। সভা, সমিতি ও লেকচার দিয়ে সকলকে কখনই এক করা যায় না। ইতিহাসের কাঁটা উল্টো দিকে ঘোরালে বিপদ। শিখগুরু গোবিন্দ এটা বুঝে সবাইকে নিয়ে খালসা সৈন্য গড়ে তুলে মোগল সাম্রাজ্যের ভিৎ নাড়িয়ে দেন। মহামায়ার রাজ্যে এসে জগৎ-ভেস্কীর সঙ্গে কত ভেল্কীই দেখলাম। আয়, সকলে এই মহাতীর্থে বোস।

গুরুভ্রাতা। (হস্তে ত্রিশূল, জটাজুট, বাঘছাল, রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি লইয়া সহাস্যে) আজ তোমাকে সদাশিব সাজাব।

স্বামিজী। (সহাস্যে) বেশ বাবা, পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। (সজ্জিত বেশে তানপূরায় ভজন ধরিলেন) 'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রাই'। (ভজনান্তে—গিরিশকে)—পরমহংসদেব এঁকে ভৈরবের অংশ বলতেন। ওঁকে এ সব দিয়ে সাজাও। উনি আমাদের দলের লোক। ইনি ঠাকুরের কথা শোনাবেন।

গিরিশ। (বিনীত ভাবে) ও-বেশ তোমাকেই মানায় ভাল, ভাই ! দয়াময় ঠাকুরের কথা এ অধম কি বেশী বলতে পারে ভাই ? তোমাদের মত কামকাঞ্চনত্যাগী চিরকুমার সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একাসনে বসতে দিয়ে অপার করুণার পরিচয় দিয়েছেন। জয় গুরু !

স্বামিজী। (গম্ভীর ভাবে) তাঁর ইচ্ছায় অসম্ভব সম্ভব হয়। তাঁর শুভ ইচ্ছাতেই আজ এই ধর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হোল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নেমে গেল। এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থল। Refuse to be blindfolded by superstition and prejudice—অন্ধ কুসংস্কার দূর কর। What India needs is iron muscles and strong nerves—চাই কঠোর বীর্য্যের সাধনা—চাই আত্মসুখ বলিদান। চাই আত্মবিলোপ—তবেই থামবে কামনার কোলাহল। তাজা মানুষ হয়ে দশের ও দেশের মঙ্গল কর। শেষ কথা বলি—Renueiation and service are the two channels self-immolation হলে স্বার্থত্যাগ ও জীবসেবাই জীবনের ব্রত ! (হরিজনদের দেখাইয়া)—এদের তুলতে হবে, জাগাতে হবে। ওরা চিরকাল নীচে পড়ে থাকবে না—থাকা উচিতও নয়। পথের কাঁটা বুকে তুলে নে। দুঃখকে কর পথের সাথী। দুঃখের কাঁটাই ফুল হবে ফুটবে। তিমির-ঘেরা নিশি হবে শেষ, আবার ভাতিবে নব গৌরবে রবি পূবাকাশে নব তেজে। পাবি পথ—পাবি শান্তি। ওঁ শান্তি ! শান্তি !! শান্তি !!! জয় গুরু মহারাজ কী জয় !

সকলে। জয় গুরু মহারাজ কী জয় ! জয় স্বামিজী মহারাজ কী জয় !

যবনিকা

বাংলা সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা-সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাংলা সাময়িক-পত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ইং ১৮১৮ সনে (বাং ১২২৫) প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র—'দিগ্‌দর্শন' নামে মাসিকপত্র শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় সাময়িক-পত্রের মধ্য দিয়া বাংলা দেশের সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রে নব জাগরণ আসিয়াছে, তাহার একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের প্রয়োজন আছে।

ইং ১৮১৮ সনে বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্মাবধি ১৮৬৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র উদ্ভব পর্য্যন্ত বাংলায় যে-সকল সাময়িক-পত্র আত্মপ্রকাশ করে, সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে দিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেগুলির পুনরাবৃত্তি না করিয়া, ১৮৬৮ সনের এপ্রিল মাস হইতে শতাব্দীর শেষ পাদ পর্য্যন্ত প্রকাশিত সমুদায় বাংলা পত্র-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ একটি তালিকা দিবার প্রয়াস পাইব। আলোচ্য যুগে শহর ও মফস্বলে বহু পত্র-পত্রিকা জন্মলাভ ও অকালমৃত্যু বরণ করিয়াছিল। আজিকার দিনে ইহার সকলগুলি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে,—অধিকাংশই অযত্নে ও জল-বায়ুর দোষে লোপ পাইয়াছে। এই কারণে আমাদিগকে প্রধানতঃ সরকারী রিপোর্ট ও সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত নূতন পত্রিকার সমালোচনার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। আমাদের বিবরণে অসম্পূর্ণতা থাকা মোটেই বিচিত্র নহে।

ইং ১৮৬৮

১। **সাপ্তাহিক সম্বাদ** (সাপ্তাহিক···): বৈশাখ ১২৭৫ (এপ্রিল ১৮৬৮)।

ভবানীপুর হইতে মিশনরীগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৭০ সনে ইহা পাক্ষিক পত্রে পরিণত হইয়া 'পাক্ষিক সম্বাদ' নাম ধারণ করে। পর-বৎসর ১লা মে হইতে পুনরায় সাপ্তাহিক হইয়া পূর্ব্বনামে প্রচারিত হইতে থাকে। ১৮৭৫ সনের জুলাই মাসে পত্রিকাখানি লুপ্ত হয়।

২। **সমালোচনী** (মাসিক): বৈশাখ ১২৭৫।

বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্র হইতে প্রচারিত। "ইংরেজী রিভিয়ুর ধরণে ইহার লেখা।"

৩। পদ্যপ্রকাশিকা (মাসিক): বৈশাখ ১২৭৫।

"পদ্যময়ী পত্রিকা।" পরিচালক—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

৪। প্রয়াগ দূত (পাক্ষিক···): বৈশাখ ১২৭৫।

শশিভূষণ মিত্র কর্ত্তৃক এলাহাবাদ মৌসিমগঞ্জ হইতে প্রচারিত। ১২৭৮ সালের ৫ই বৈশাখ হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়।

৫। পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক): শ্রাবণ (?) ১২৭৫।

বৈদ্যবাটী হইতে প্রকাশিত। "পল্লীগ্রামের অবস্থা ও সংবাদ প্রকাশ করাই পল্লীগ্রাম বার্ত্তাবহের প্রধানোদ্দেশ্য।"

৬। উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা: শ্রাবণ ১২৭৫।

"বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করা পত্রিকা-প্রচারকদিগের উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

৭। বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (মাসিক): শ্রাবণ ১২৭৫।

সম্পাদক—হেমলাল দত্ত, কলুটোলা।

৮। হিতসাধনী (মাসিক): আশ্বিন ১২৭৫।

সম্পাদক—কেদারনাথ ঘোষ।

৯। বোধ-বিকাশিনী (পাক্ষিক): ১ আশ্বিন ১২৭৫।

"স্বদেশীয় রীতি, নীতি ও আচার-ব্যবহারের আন্দোলন,—দেশ-সাধারণের হিতকর কার্য্যে যথাসম্ভব পরামর্শ প্রদান,···ও (পাঠক মহাশয়গণের বিরক্তিজনক হইলেও) ক্রমশঃ রচনাশক্তির অভ্যাসই আমাদিগের পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।"

১০। **কল্পলতিকা** (পাক্ষিক): ১৫ পৌষ ১২৭৫।

সম্পাদক—রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ, পটোলডাঙ্গা ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউ-শনের পণ্ডিত।

ইং ১৮৬৯

১১। হিন্দু হিতাকাঙ্ক্ষিনী (মাসিক): বৈশাখ ১২৭৬ (এপ্রিল ১৮৬৯)।

হুগলীর অন্তঃপাতী জিরাট হিন্দুহিতৈষিণী সভার মুখপত্র।

১২। মুষল মুদ্গর (সাপ্তাহিক): বৈশাখ (?) ১২৭৬।

যশহর হইতে প্রকাশিত।

১৩। **অবলা বান্ধব** (পাক্ষিক···): ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬।

ইহা ঢাকায় মুদ্রিত হইয়া লোনসিংহ হইতে প্রচারিত হইত। "সংসারে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রী-শিক্ষার আলোচনা করাই এতৎ পত্রের উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৭০ সনের প্রথম ভাগে দ্বারকানাথ কলিকাতা আগমন করিলে এখান হইতেই 'অবলা বান্ধব' প্রকাশিত হইত। ৬ষ্ঠ বর্ষের পত্রিকা মাসিক আকারে ১২৮১ সালের শ্রাবণ মাসে (জুলাই ৮৭৪) প্রকাশিত হয় ও অল্প দিন পরেই অর্থাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১২৮৬ সালের বৈশাখ মাসে পত্রিকাখানি মাসিক আকারে পুনঃপ্রকাশিত হইলেও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই।

১৪। **জ্যোতিরিঙ্গণ** (মাসিক): জুলাই ১৮৬৯।

"বালক-বালিকা ও স্ত্রীগণের এককালীন আমোদ ও নীতি-শিক্ষার নিমিত্ত" কলিকাতা ট্রাক্ট সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের পত্রিকায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের লিখিত দুইটি কবিতা—"পুরুলিয়া" ও "কবির ধর্ম্মপুত্র" মুদ্রিত হইয়াছে।

১৫। বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক): ২২ ভাদ্র ১২৭৬।

সম্পাদক—পাদরী সি, ই, ডিবর্গ, টালীগঞ্জ মিশনের অধ্যক্ষ। "দেশের উন্নতি করা ও গবর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া" পত্রিকা প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য।

১৬। জ্ঞানলহরী (মাসিক): আশ্বিন ১২৭৬।

সম্পাদক—গোপালচন্দ্র মিত্র ও বিজয়কেশব বসু।

১৭। চিকিৎসা-সংগ্রহ (মাসিক): আশ্বিন ১২৭৬।

সম্পাদক—ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ডি, এল, ডি। "ইহাতে এতদ্দেশীয় এবং ইউরোপ খণ্ডের চিকিৎসাশাস্ত্রের সারসংগ্রহ হইবে।"

১৮। জ্ঞানপ্রদায়িনী পত্রিকা (মাসিক): আশ্বিন (?) ১২৭৬।

১৯। দেশহিতৈষিণী (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৭৬।

সম্পাদক—রাজকৃষ্ণ দাস, পাথুরিয়াঘাটা।

ইং ১৮৭০

২০। **মধুকরী** (মাসিক···) : মাঘ ১২৭৬ (জানুয়ারি ১৮৭০)।

বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্র হইতে প্রচারিত। "দেশের হিতসাধন ও বিদ্বন্মণ্ডলীর মনোরঞ্জন ইহার উদ্দেশ্য।" ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ হইতে 'মধুকরী' পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়।

২১। **বরিশাল বার্ত্তাবহ** (পাক্ষিক) : ফাল্গুন ১২৭৬।

ঝালকাটি হইতে প্রচারিত। সম্পাদক—মাগুরা গ্রামনিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র কর। বরিশাল হইতে প্রকাশিত ইহাই বোধ হয় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

২২। **বঙ্গমহিলা** (পাক্ষিক) : ১ বৈশাখ ১২৭৭।

মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র, জনৈকা "খিদিরপুর-নিবাসিনী" [ডবলিউ সি· বোনার্জ্জীর ভগিনী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় ?] কর্ত্তৃক সম্পাদিত। "স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব প্রভৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য।" পরমায়ু প্রায় এক বৎসর।

২৩। পাক্ষিক প্রকাশিকা : বৈশাখ ১২৭৭।

সম্পাদক—যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

২৪। **সঙ্গীত চিত্তসন্তোষ** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৭৭।

পরিচালক—উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

২৫। আর্য্যধর্ম্মপ্রকাশিকা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৭৭।

ময়মনসিংহের হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা হইতে প্রকাশিত।

২৬। **মিত্র-প্রকাশ** (মাসিক···) : ৩০ বৈশাখ ১২৭৭।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—"পূর্ব্ববঙ্গের রাজকৃষ্ণ রায়" হরিশ্চন্দ্র মিত্র। ইহা ২য় বর্ষে অল্প দিনের জন্য পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হইয়া পুনরায় মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হয়।

২৭। রাজসাহী সম্বাদ (পাক্ষিক) : ৩১ বৈশাখ ১২৭৭।

বোয়ালিয়ার রাজসাহী প্রেস হইতে প্রকাশিত।

২৮। নিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকা (ত্রৈমাসিক) : বৈশাখ-আষাঢ় ১২৭৭।

"বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থ" ইহার আবির্ভাব।

২৯। শাস্ত্র-প্রকাশ (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৭৭।

ইহাতে পুরাণ, তন্ত্রাদি স্থান পাইত। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিশোধিত ও ভাষান্তরিত এবং কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত।

৩০। সজ্জনচিত্তবিনোদিনী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৭৭।

সম্পাদক—গোপালচন্দ্র মিত্র।

৩১। **বঙ্গবন্ধু** (পাক্ষিক···) : ১ শ্রাবণ ১২৭৭।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত সভা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বঙ্গচন্দ্র রায়। ইহা কিছু দিন পরে সাপ্তাহিক আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহাতে প্রধানতঃ রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ স্থান পাইত।

৩২। সাহিত্য-সংগ্রহ (মাসিক) : আশ্বিন ১২৭৭।

ইহাতে প্রথমে হরিবংশের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

৩৩। মাসিক প্রকাশিকা : কার্ত্তিক ১২৭৭।

পাথুরিয়াঘাটা হইতে যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩৪। নারী-শিক্ষা পত্রিকা (মাসিক) : ১ কার্ত্তিক ১২৭৭।

ঢাকা সুলভযন্ত্র হইতে "স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষোপযোগিনী" এই পত্রিকাখানি প্রচারিত হইত।

৩৫। মুরশিদাবাদ হিতৈষিণী (পাক্ষিক) : ১ কার্ত্তিক ১২৭৭।

সম্পাদক—বনোয়ারিলাল মুখোপাধ্যায়, সৈদাবাদ, বহরমপুর।

৩৬। **সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী** (মাসিক) : কার্ত্তিক ১২৭৭।

কলিকাতাস্থ ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র। "যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি হয়, সেই সকল বিষয়ের অনুশীলন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

৩৭। **সুলভ সমাচার** (সাপ্তাহিক···) : ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।

কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভা হইতে মাত্র ১ পয়সা মূল্যে এই উৎকৃষ্ট পত্রিকাখানি প্রচারিত হইত। "হিত উপদেশ, নানা সংবাদ, আমোদজনক ভাল ভাল গল্প, আমাদের দেশের এবং বিদেশের ইতিহাস, বড় বড় লোকের জীবন, যে সকল আইন সাধারণের পক্ষে জানা নিতান্ত আবশ্যক, চাল ডাল প্রভৃতির দর এবং বিজ্ঞানের মূল সত্য সকল যত দূর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে" এই পত্রিকায় স্থান পাইত। ১৮৮৬ সনের ২৭এ আগষ্ট (১৬ খণ্ড, ১ম সংখ্যা) ইহা 'কুশদহ ও ভেরি'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' নাম ধারণ করে। পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল জীবিত ছিল। নব পর্য্যায়ের 'সুলভ সমাচার' প্রকাশ করেন—নরেন্দ্রনাথ সেন; ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—১ বৈশাখ ১৩১৮; পরমায়ু এক বৎসর।

৩৮। প্রচারিকা (মাসিক···) : ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।

বর্দ্ধমান হইতে প্রচারিত। অল্প দিন পরে ইহা পাক্ষিকে পরিণত হয়। পাক্ষিক আকারে ইহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮৭৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'প্রচারিকা' সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে আবির্ভূত হয়। সম্পাদক—প্যারীলাল সিংহ।

৩৯। বিদূষক (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৭৭।

"যাঁহারা প্রকৃতির গতি ও মানুষের স্বভাব জানিতে আমোদ বোধ করেন" তাঁহাদিগের জন্য এই রহস্য-পত্রিকার জন্ম। সম্পাদক—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক : 'সংবাদ প্রভাকর'।

ইং ১৮৭১

৪০। বিশ্বদূত (মাসত্রয়িক) : পৌষ ১২৭৭।

৪১। সাহিত্য মুকুর (সাপ্তাহিক) : ৭ জানুয়ারি ১৮৭১।

"অবকাশকালে নির্দ্দোষ আমোদ উৎপাদন করিয়া পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনই" পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল।

৪২। হিতবাদী (মাসিক) : মাঘ ১২৭৭।

ধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্র। পরিচালক—নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৩। **শুভ-সাধিনী** (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন ১২৭৭।

ঢাকা, পূর্ব্ববঙ্গ শুভসাধিনী সভার মুখপত্র। সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা ব্যতীত সাহিত্যালোচনাও হইত, সংবাদও থাকিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল ১ পয়সা।

৪৪। হিতকরী (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন ১২৭৭।

ঢাকা সুলভ যন্ত্র হইতে ১ পয়সা মূল্যে প্রচারিত।

৪৫। প্রাত্যহিক সম্বাদ (দৈনিক) : ফাল্গুন (?) ১২৭৭।

এক পয়সা মূল্যের এই দৈনিক পত্র কলিকাতা অবলা বান্ধব যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইত।

৪৬। হিতমিহির (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন (?) ১২৭৭।

খড়দহ হইতে প্রকাশিত, ১ পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র।

৪৭। মদ না গরল? (মাসিক) : বৈশাখ ১২৭৮।

কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভার "সুরাপান ও মাদক নিবারণ"-বিভাগের মুখপত্র। তৎকালে কেশবচন্দ্রের অনুরক্তমণ্ডলীর অন্যতম শিবনাথ শাস্ত্রী কিছু দিন ইহার সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যেক সংখ্যা হাজার খণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইত।

৪৮। ভারত-পরিদর্শক (মাসিক) : ১ বৈশাখ ১২৭৮।

ইহাতে প্রধানতঃ সাহিত্য ও বিজ্ঞান-ঘটিত বিষয়ই স্থান লাভ করিত।

৪৯। বিভাকর (মাসিক) : বৈশাখ ১২৭৮।

সাহিত্য-সংক্রান্ত পত্রিকা।

৫০। দুর্লভ সমাচার (সাপ্তাহিক···) : বৈশাখ (?) ১২৭৮।

পুস্তক ও সংবাদপত্রের সমালোচনাই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইত। পরবর্ত্তী ১৫ই শ্রাবণ হইতে পরিবর্ত্তিত আকারে পাক্ষিক পত্রে রূপান্তরিত হয়।

৫১। চিকিৎসা-দর্পণ (মাসিক) : ১ বৈশাখ ১২৭৮।

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত, চিকিৎসা-সংক্রান্ত পত্র। সম্পাদক—যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫২। হালিশহর পত্রিকা (মাসিক···) : ১ বৈশাখ ১২৭৮।

"পল্লীগ্রামস্থ লোকদিগকে সদুপদেশ প্রদানার্থে নানা প্রকার নীতিগর্ভ ও চিত্তানন্দপ্রদ প্রবন্ধ" ইহাতে প্রকাশিত হইত। সম্পাদক—জ্ঞানেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। 'হালিশহর পত্রিকা' ১ম বর্ষে মাসিক, ২য় বর্ষে পাক্ষিক এবং ৩য় বর্ষে সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। ৩য় বর্ষ হইতে ইহাতে সংবাদ ও রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত।

৫৩। হিতসাধিনী (মাসত্রয়িক) : ১ বৈশাখ ১২৭৮।

বরিশালের কুলকাটি হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—তারপাশা গ্রাম-নিবাসী পণ্ডিত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৫৪। বিজ্ঞান-চক্রবান্ধব (মাসিক) : বৈশাখ ১২৭৮।

জোড়াসাঁকো, চাষাধোপা পাড়া হইতে সহ-সম্পাদক বিহারিলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৫৫। বরাহনগর বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮।

৫৬। হিন্দু প্রদর্শক (মাসিক) : আষাঢ় ১৭৯৩ শক।

"ইহাতে প্রধানতঃ হিন্দু-শাস্ত্র, হিন্দু-সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক প্রস্তাব সমুদায় নিবেশিত হইবে, কিন্তু কোন বিষয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, অপ্রামাণিক বা পুরাতন প্রস্তাব গৃহীত হইবে না। প্রসিদ্ধ হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে সাধ্যমত পোষকতা করাও ইহার একটি প্রধান লক্ষ্য।" সম্পাদক—(যশোহর নিবাসী?) সীতানাথ ঘোষ।

৫৭। চুঁচুড়া প্রকাশিকা (মাসিক) : শ্রাবণ (?) ১২৭৮।

৫৮। চিকিৎসা-সংগ্রহ (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৭৮।

৫৯। গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিধান (মাসিক) : জুলাই ১৮৭১।

সম্পাদক—উমাচরণ দে।

৬০। আর্য্যোদয় (মাসিক···) : শ্রাবণ ১২৭৮।

বারুইপুর হইতে প্রকাশিত। কয়েক মাস পরেই পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। সম্পাদক—প্রিয়নাথ গুপ্ত।

৬১। ধূমকেতু (মাসিক) : ৩১ শ্রাবণ ১২৭৮।

ঢাকা সুলভ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত। ইহাতে কেবলমাত্র কথা-সাহিত্যই স্থান পাইত।

৬২। দেশহিতৈষিণী (পাক্ষিক) : ১ আশ্বিন ১২৭৮।

সিরাজগঞ্জের অন্তঃপাতী ফুলকোচা চন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

৬৩। রস-তরঙ্গ (সাপ্তাহিক) : ১০ আশ্বিন ১২৭৮।

এক পয়সা মূল্যের ক্ষুদ্র-কলেবর পত্রিকা। পরিচালক—সুরেন্দ্রমোহন মজুমদার।

৬৪। বিজ্ঞান রহস্য (মাসিক) : আশ্বিন ১২৭৮।

বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্র। সম্পাদক—মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ।

৬৫। আর্য্যাবর্ত্তরীতিবোধিকা (মাসিক) : আশ্বিন ১২৭৮।

ধর্ম্ম-বিষয়ক পত্রিকা। সম্পাদক—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

ইং ১৮৭২

৬৬। বিশ্বদর্পণ (পাক্ষিক···) : মাঘ ১২৭৮।

"বালক-বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী বিজ্ঞান সাহিত্যাদি বিষয়ক প্রস্তাব এবং রাজনীতি ধর্ম্মনীতি সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করা প্রচারকদিগের অভিপ্রেত।" সম্পাদক—মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ ও তারাকুমার কবিরত্ন। ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত ৩য় সংখ্যা হইতে 'বিশ্বদর্পণ' মাসিক আকার ধারণ করে।

৬৭। জ্ঞানপ্রভা (মাসিক) : চৈত্র ১৭৯৩ শক।

ফুলকোচা চন্দ্রোদয় প্রেসে মুদ্রিত হইয়া ঘোড়াচরা হইতে প্রকাশিত। পরিচালক—চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

৬৮। **বঙ্গদর্শন** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৭৯।

সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সে-যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকবর্গের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল।" 'বঙ্গদর্শনে'র বিভিন্ন খণ্ডগুলির প্রকাশকাল :—

১২৭৯—১২৮২ সাল	১ম-৪র্থ খণ্ড	বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত
১২৮৪—১২৮৫ সাল	৫ম-৬ষ্ঠ খণ্ড	সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত
১২৮৭	৭ম খণ্ড	ঐ
১২৮৮, বৈশাখ-আশ্বিন	৮ম খণ্ড	ঐ
১২৮৯, বৈশাখ-চৈত্র	৯ম খণ্ড	ঐ
১২৯০, কার্ত্তিক-মাঘ		চন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত।

৬৯। মধ্যস্থ (সাপ্তাহিক): ২ বৈশাখ ১২৭৯।

সম্পাদক—মনোমোহন বসু। ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা। ইহাতে কবিতা, উপন্যাস, বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধ, গ্রন্থ-সমালোচনা, দেশ-বিদেশের সংবাদ, এমন কি রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত। দ্বিতীয় বর্ষের ২৭শ সংখ্যা (১ কার্ত্তিক ১২৮০) পর্য্যন্ত সাপ্তাহিকরূপে চলিবার পর 'মধ্যস্থ' পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিকপত্রে পরিণত হয়। মাসিক আকারে ইহা ১২৮২ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

৭০। সাপ্তাহিক পরিদর্শক: বৈশাখ ১২৭৯।

প্রকাশক—দুর্গাচরণ গুপ্ত ও তৎপুত্র সত্যচরণ গুপ্ত। ইহার "প্রথমাংশে পঞ্জিকা, দ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানি ও বাজারদর, যান-বাহনের ভাড়া উপায়, রাজ আইন, সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি··· আর দ্বিতীয় অংশে কেবল ব্যাপারগুলি" থাকিত।

৭১। মুর্শিদাবাদ পত্রিকা (সাপ্তাহিক): ১৫ বৈশাখ ১২৭৯।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। ইহাতে প্রধানতঃ সামাজিক ও রাজনীতি বিষয়ের অনুশীলন হইত।

৭২। ধর্ম্মসাধন (সাপ্তাহিক): ২১ বৈশাখ ১৭৯৪ শক।

সঙ্গত হইতে প্রকাশিত ১ পয়সা মূল্যের পত্রিকা। ইহাতে কেবল সঙ্গতের বিবরণ ও ব্রাহ্মমন্দিরের উপদেশের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইত।

৭৩। সর্ব্বার্থ সঙ্কলন (মাসিক): বৈশাখ (?) ১২৭৯।

ইহাতে কাব্য, নাটক, পুরাণ, বেদ, স্মৃতি, সাংখ্য, পাতঞ্জল ষড়্দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ বাগবাজার-নিবাসী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত ও সংশোধিত হইয়া বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইত।

৭৪। হিতব্রত (মাসিক): ৩ আষাঢ় ১২৭৯।

"হিন্দুদিগের বেদ দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনাই পত্রিকাখানির মুখ্য উদ্দেশ্য।"

৭৫। পরিমলবাহিনী (পাক্ষিক): শ্রাবণ, ২য় পক্ষ, ১২৭৯ (জুলাই ১৮৭২)।

বরিশালের কেওরা গ্রাম হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বৈদ্যকুলোদ্ভব পণ্ডিত হরকুমার রায়, লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার শরৎকুমার রায়ের পিতা।

৭৬। বঙ্গসুহৃদ্ (মাসিক) শ্রাবণ ১২৭৯।

পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় এই কবিতাটি মুদ্রিত হইত:—

"জন্মভূমি দুঃখে যার চক্ষে আসে জল,
জ্ঞানবান্ সেই তার জনম সফল।"

ইহা হইতেই পত্রিকাখানি কি ভাবে সম্পাদিত হইত তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। সম্পাদক—উমেশচন্দ্র মিত্র।

৭৭। ভারত ভৃত্য (সাপ্তাহিক): আগষ্ট ১৮৭২।

এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র। কিছু দিন পরে 'পিপলস্ ফ্রেণ্ডে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'পিপলস্ ফ্রেণ্ড ও ভারত ভৃত্য' নাম ধারণ করে।

৭৮। আসাম-মিহির (সাপ্তাহিক): ১৪ ভাদ্র ১২৭৯।

আসাম হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র, প্রবাসী বাঙালীদের যত্নে গৌহাটী হইতে প্রচারিত হয়। সম্পাদক যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

৭৯। আর্য্য-প্রবর (মাসিক): ১১ আশ্বিন ১৯২৯ সম্বৎ।

"তত্ত্ব-বোধক মাসিকপত্র"। সম্পাদক—জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮০। জ্ঞানাঙ্কুর (মাসিক): আশ্বিন ১২৭৯।

সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণ দাস। এই উচ্চাঙ্গের পত্রিকাখানির প্রথম দুই সংখ্যা রাজসাহী বোয়ালিয়ায় মুদ্রিত হইয়াছিল। তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' ইহাতেই ১ম বর্ষে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ব্ব রস-রচনা 'মসলা-বাঁধা কাগজ'ও ইহাতেই প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'প্রতিবিম্ব' পত্র 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের "বনফুল", "প্রলাপ" ও প্রথম গদ্য-রচনা—"ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী" স্থান পাইয়াছিল।

৮১। সঙ্গীত-সমালোচনী (মাসিক): আশ্বিন ১২৭৯।

সম্পাদক—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। পরমায়ু ৬ মাস।

৮২। বঙ্গদর্শন (সাপ্তাহিক): অক্টোবর (?) ১৮৭২।

বরিশাল হইতে প্রকাশিত।

৮৩। সমাজদর্পণ (সাপ্তাহিক): ২৯ কার্ত্তিক ১২৭৯।

চোরবাগান, সরকার-মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। সম্পাদক—যশোদানন্দন সরকার, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলস্, খুলনা, জেলা যশোহর। ছোট লাট ক্যাম্বেলের প্রবর্ত্তিত দেশীয় সিভিল সার্ভিস-সম্পর্কীয় বিধি-ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া সম্পাদক সরকারী চাকুরী হারাইয়াছিলেন।

৮৪। আর্য্যবোধক (মাসিক): পৌষ (?) ১২৭৯।

'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র আদর্শে পরিচালিত তত্ত্ববোধক পত্র। সম্পাদক—মথুরানাথ শর্ম্মা।'

ইং ১৮৭৩

৮৫। বরাহনগর পাক্ষিক সমাচার: জানুয়ারী(?) ১৮৭৩।

সম্পাদক—শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮৬। অবকাশ-সহচরী (মাসিক): জানুয়ারি ১৮৭৩।

সম্পাদক—ডেভিড রজনীকান্ত বিশ্বাস।

৮৭। সর্ব্বার্থসংগ্রহ (মাসিক): ফাল্গুন ১২৭৯।

শ্রীরামপুর আলফ্রেড প্রেস হইতে প্রকাশিত। "বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রীয় সম্বাদ ঘটিত মাসিক পুস্তক।" সম্পাদক—অতুলনাথ তর্কবাগীশ ও কালীবর বেদান্তবাগীশ।

৮৮। পুলিস গেজেট ও রঙ্গবার্ত্তাবহ (মাসিক): ১১ ফাল্গুন ১২৭৯।

পুলিস-বিভাগের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে মুখপত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

৮৯। ভারত-সংস্কারক (সাপ্তাহিক): ৭ বৈশাখ ১২৮০।

উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র। সম্পাদক—মজিলপুর-নিবাসী উমেশচন্দ্র দত্ত, 'বামাবোধিনী পত্রিকা' সম্পাদক।

৯০। দূত (সাপ্তাহিক): বৈশাখ ১২৮০।

প্রকাশক—মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেণ্টিঙ্ক প্রেসের স্বত্বাধিকারী।

৯১। বঙ্গমিহির (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮০।

"যাহাতে খ্রীষ্ট সমাজ মধ্যে পারমার্থিক জ্ঞান ও ভাব সম্বর্দ্ধিত হয়, ঈদৃশ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করাই পত্রখানির মুখ্য উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীপুর মিশন কলেজ।

৯২। বারুইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব (পাক্ষিক) : বৈশাখ ১২৮০।

বারুইপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—ডাঃ পূর্ণচন্দ্র দাস।

৯৩। মহাপাপ বাল্য বিবাহ (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮০।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। বাল্য বিবাহ নিবারণ করা পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য। সম্পাদক—নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

৯৪। গ্রামবাসী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮০।

রাণাঘাট হইতে প্রচারিত। দুই বৎসর পরে 'সাপ্তাহিক সমাচারের' সহিত মিলিত হইয়া যায়।

৯৫। বালারঞ্জিকা (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৮০।

বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত। স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকা।

৯৬। গ্রামদূত (পাক্ষিক) : বৈশাখ ১২৮০।

বাখরগঞ্জ জেলার একটি পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত।

৯৭। বিশ্বদর্শন (পাক্ষিক) : বৈশাখ ১২৮০।

কলিকাতা দ্বৈপায়ন যন্ত্র হইতে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

৯৮। বঙ্গবিধান (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮০।

৯৯। বিজ্ঞান-বিকাশ (পাক্ষিক) : ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০।

খড়দহ হইতে প্রতি পক্ষের চতুর্থীতে প্রকাশিত।

১০০। সহচর (সাপ্তাহিক) : ৩ আষাঢ় ১২৮০।

'সোমপ্রকাশে'র আদর্শে পরিচালিত। সম্পাদক—[illegible]প্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০১। জ্ঞানবিকাশিনী (সাপ্তাহিক) : আষাঢ় ১২৮০।

পাবনার সন্নিকটস্থ চাটমোহর হইতে প্রকাশিত। তত্ত্বাবধায়ক—মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১০২। সাপ্তাহিক সমাচার : ৫ শ্রাবণ ১২৮০।

"যে যে অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালিরা জাতিগত মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিবেন, শুদ্ধ সেই সমস্ত অনুষ্ঠান এতৎ পত্র সম্পাদকদিগের অনুমোদনীয়।" প্রধানতঃ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় পত্রিকা সম্পাদন করিতেন।

১০৩। সমবেদক (সাপ্তাহিক) : ভাদ্র ১২৮০।

বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত।

১০৪। তমোলুক পত্রিকা (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮০।

তমোলুক হইতে প্রকাশিত। সেযুগের একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত।

১০৫। অবকাশতোষিণী (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮০।

নিউ স্কুলবুক প্রেস হইতে প্রকাশিত।

১০৬। বঙ্গদর্শন (সাপ্তাহিক) : ভাদ্র (?) ১২৮০।

চোরবাগান, নিউ সরকার্স প্রেস হইতে এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত।

১০৭। পল্লীদর্শন (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮০।

পাবনার অন্তর্গত চাটমোহরের জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া হরিপুর হইতে ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত হইত।

১০৮। প্রমোদিনী (চাতুর্মাসিক) : ১ আশ্বিন ১২৮০।

পাকুড় প্রমোদিনী সভা হইতে প্রচারিত, কতকগুলি গদ্য-পদ্য রচনার সমষ্টি।

১০৯। সমাজ-দর্পণ (পাক্ষিক) : আশ্বিন ১২৮০।

চন্দননগর হইতে প্রকাশিত ইহাই বোধ হয় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। সম্পাদকের নিবেদনে প্রকাশ, "ইহাতে বিবিধ সংবাদ, হিতোপদেশ, ইতিহাস, জীবনচরিত ও নানা গদ্য পদ্য রচিত কাব্য সন্নিবেশিত করিব, ইহা ভিন্ন কুৎসিত গল্প বা লোকের কুৎসা লিখিয়া পাঠকগণের বিরাগভাজন হইব না।"

১১০। পূর্ণ শশী (মাসিক) : কার্ত্তিকী পূর্ণিমা ১২৮০।

প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। সম্পাদক—খ্যাতনামা সাহিত্যিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১১১। ভারত-সুহৃদ (সাপ্তাহিক) : কার্ত্তিক (?) ১২৮০।

এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

১১২। হেমলতা (পাক্ষিক) : ১ কার্ত্তিক ১২৮০।

"দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে লিখিতে উৎসাহিত করা ইহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেণ্টিঙ্ক প্রেস।

১১৩। সাধারণী (সাপ্তাহিক) ঃ ১১ কার্ত্তিক ১২৮০।

"রাজনীতি জড়িত সাহিত্যের সখ মিটাইবার জন্য" অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া হইতে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা সে যুগের একখানি উৎকৃষ্ট পত্র। বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যরথীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। এই 'সাধারণী' পত্রেই 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ও খ্যাতনামা লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর হাতেখড়ি হয়। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে 'নববিভাকর' 'সাধারণী'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। 'নববিভাকর—সাধারণী' ৪র্থ ভাগ, ২১শ সংখ্যা (১৮ ভাদ্র ১২৯৬) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া তিরোহিত হয়।

১১৪। কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা (মাসিক) : ১ অগ্রহায়ণ ১২৮০।

সম্পাদক—দেবেন্দ্রকুমার রায়।

১১৫। সুবোধিনী (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮০।

পাবনা চাটমোহর রামনগর হইতে অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

১১৬। সিহাড়সোল পত্রিকা (পাক্ষিক) : অগ্রহায়ণ (?) ১২৮০।

স্থানীয় সংবাদের সহিত ইংরেজী-বাংলা উভয়বিধ প্রবন্ধই ইহাতে স্থান লাভ করিত।

১১৭। ভারত-দর্পণ ও পুলিস বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক) : ৩ পৌষ ১২৮০।

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত। [ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন-শাস্ত্রী

যে যুগে আমরা বাস করিতেছি ইহাকে সাম্যের যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে সর্ব্বত্রই সকলের মুখে সাম্যের কথা। সাম্যের প্রতিশ্রুতি না দিয়া আজকাল কেহ কোন ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে সাহসী হন না, কাজে যত দূর হউক বা না হউক, মুখে অবশ্যই সাম্যের জয়ঘোষণা থাকা চাই। এক পক্ষে ইহা ভালো, কেন না, মুখেও অন্ততঃ সাম্যের মহিমা স্বীকার করিতে হয়। আজ মুখে সাম্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া কাল কাজে তাহা ভঙ্গ করিতেছি, কিন্তু চিরদিন এমন চলিবে না; সাম্যবাদ যখন স্বীকার করা হইয়াছে তখন এক দিন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ইহাকে মানিতে হইবে; তবে তাহা সহজ পথে হইবে, কি বিপ্লবের পথে হইবে সে কথা পৃথক্।

সাম্যবাদের সহিত আমরা পরিচিত, আমাদের দেশে তাহা অতি প্রাচীন,—এত প্রাচীন যে, তাহাকে বিস্মৃতির অন্ধকার-যুগ বলিলেই ভালো হয়। প্রজাপতি কশ্যপ অথবা আদমের যুগে এক অতি বিশুদ্ধ সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল, কিন্তু কালচক্রের আবর্ত্তনে তাহার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে তাহার সুস্পষ্ট মূর্ত্তি ধারণা করা অসম্ভব। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অপচেষ্টায় পৃথিবীময় সর্ব্বত্র অল্প-বিস্তর সাম্যনীতি বিকৃত হইলে এ যুগে ফরাসী জনসাধারণই তাহার প্রতিকারের প্রথম চেষ্টা করেন, ইতিহাসে ইহা ফরাসী বিপ্লব নামে প্রসিদ্ধ। বিপ্লবীরা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়াইয়াছিল। সেই বিপ্লবের তরঙ্গের সহিত দুনিয়ার সর্ব্বত্র সাম্যের সুঘোষিত নীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারই ফলে আজ সর্ব্বত্র—রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে, রাস্তায়, ঘাটে-পথে সাম্যের মহিমা-কীর্ত্তন শুনিতে পাই। বলা বাহুল্য, ইহা হয় রাষ্ট্রদৈবত, না হয় সমাজদৈবত, না হয় অর্থদৈবত বা কামদৈবত সাম্যবাদ। হিন্দুশাস্ত্রে ও ভগবদগীতায় যে সাম্যবাদ ঘোষিত হইয়াছে তাহা ইহাদের সকলের উপরে, যাবতীয় সাম্যবাদ তাহার অংশমাত্র।

গীতার সাম্যবাদ আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাহির হইতে রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থ, কাম ইহাদের যে কোন একটাকে ধরিয়া সাম্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, এবং তাহাই সরল এবং স্বাভাবিক পথ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুশাস্ত্রে যে সাম্যবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে না পারিলে আশ্রয়ের অভাবে কোনটাই দাঁড়াইতে পারে না। যে যোগমার্গের চরম লক্ষ্য ঈশ্বর বা আত্মোপলব্ধি তাহাও প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—অভ্যাসযোগ ও বৈরাগ্যযোগ। বৈরাগ্যযোগ জোর করিয়া অধিকার করিবার বস্তু নহে, কিন্তু অভ্যাসযোগের বেলা খানিকটা জোর-জবরদস্তিও চলে। রাষ্ট্র বা সমাজদৈবত সাম্য গীতোক্ত চরম সাম্যে পৌঁছিবারই একটা পথ মাত্র, এই পথে বিচরণ অভ্যাসযোগের চর্চ্চা মাত্র; কিন্তু যদি কেহ এই পথকেই লক্ষ্য বস্তু মনে করেন তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সাধনাও নিরর্থক হইবে এবং বাঞ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত ক্ষোভে সেই পথও পরিহার করিতে হইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বর্ত্তমানে বিভিন্ন পথে সাম্যের স্রোত প্রবাহিত, কিন্তু যদি এই সকল স্রোত সমুদ্রের ন্যায় মহান্ আধ্যাত্মিক সাম্যের সহিত মিলিত না হয়, তাহা হইলে অচিরেই ইহা বিকৃত ও দুর্গন্ধ হইয়া বিশুষ্ক হইবে,—সাম্যবাদের আর্দ্রভূমি বৈষম্যের রুক্ষ মরুকান্তারে পরিণত হইবে, এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অকুণ্ঠিত ভাবে উচ্চারণ করিতে পারি।

বেদের সকল অংশই সার নহে, বেদে মাতালের প্রলাপ আছে, জুয়ারীর বিলাপ আছে—বেদের সার ভাগ উপনিষদ্—এবং উপনিষদের সার গীতা, এই জন্যই হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের সার গীতা। যদি কোথাও গীতার বিরুদ্ধ উক্তি থাকে তবে তাহা হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, এক কথায় গীতা শাস্ত্র-পরীক্ষার নিকষ প্রস্তর। যাবতীয় শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-উপপুরাণ—গীতারই বিস্তার বা ব্যাখ্যা। ইহা বিশেষ করিয়া বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, গীতার তাৎপর্য্য বিবৃত হইলে অন্যান্য শাস্ত্রের বাক্যও উদ্ধার করিতে হইবে। মনু বা যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়াছেন তাহাও গীতা, তবে যদি কোথাও তাঁহাদের উক্তিও গীতার্থ-বিরোধিনী হয় তবে তাহা গীতাও নহে, মনুও নহে, যাজ্ঞবল্ক্যও নহে—সে কেবল বুদ্ধিপন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির রচিত কয়েকটা শ্লোক মাত্র। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলিবার আছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি যে হিসাবে শাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি যে হিসাবে ইতিহাস, গীতা সে হিসাবে শাস্ত্রও নহে ইতিহাসও নহে: গীতার যাহা অধিষ্ঠান অন্যান্য শাস্ত্র ও ইতিহাসের তাহাই লক্ষ্য, শাস্ত্র ও ইতিহাসগুলি সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ-মাত্র। এই জন্যই মনু প্রভৃতিতে এমন বহু বিষয় আছে যাহা গীতায় নাই। মানব জাতিকে একটা অভ্যাসযোগের মধ্য দিয়া, বিধানানুসারে পরিচালিত করিয়া, এই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত করাই শাস্ত্রাদির কাজ। শাস্ত্র পথ, লক্ষ্য নহে, লক্ষ্যে যাহা আছে পথে সর্ব্বত্র তাহা নাই—তবে পথ যখন লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয় তখন তাহা আর পথই নহে। গীতা মহাভারতের একটি অংশ, আবার অংশ নহে বলাও চলে। মহাভারতের যে আখ্যানাংশে ইতিহাস ভাগ অবস্থিত গীতা তাহার অংশ নহে, গীতা বাদ দিলেও আখ্যানভাগের কোনও ক্ষতি হয় না। এই জন্যই গীতার বহু টীকাকার ইহার প্রথম অধ্যায় উপেক্ষা করিয়াছেন—কেন না, ইহা আখ্যান ও আখ্যানাতিরিক্ত বস্তুর একটা সংযোগ-সূত্র মাত্র। কিন্তু গীতা ব্যতীত মহাভারতের পূর্ণতাও অসম্ভব—কেন না ইহার আখ্যান ও ইতিহাস যে সকল জীবনাদর্শকে মানব জাতির দৃষ্টির সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছে, গীতা না বুঝিলে তাহাদের বুঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর প্রভৃতিকে বুঝিতে হইলে গীতা বুঝা প্রয়োজন,—এমনি কি দুর্য্যোধনকে বুঝিতে হইলেও। যুধিষ্ঠির "ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ" আর দুর্য্যোধন "মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ"—উভয়কেই বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

সাম্যবাদ সম্বন্ধে গীতায় কি আছে মোটামুটি তাহার একটা বিবরণ দিতেছি—।

ভগবান স্বয়ং—"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্॥" ১৩।১৬ (ভূতসমূহে অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় বিরাজিত)। এবং—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ১৩।২৭-২৮

(যিনি নশ্বর ভূতসমূহে অবিনশ্বর পরমেশ্বর সমভাবে বিরাজমান এইরূপ দেখিয়া থাকেন তাঁহার দৃষ্টিই প্রকৃত দৃষ্টি। সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া যিনি স্বয়ং অন্য কাহারও হিংসা করেন না, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ৫।১৮-১৯

(যাহারা প্রকৃতই পণ্ডিত তাহারা বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও কুক্কুরমাংসভোজী অন্ত্যজ, হস্তী, গাভী ও কুক্কুর সকলে এক বস্তু দর্শন করিয়া থাকেন। যাহাদের মন সাম্যে অবস্থিত তাহারা এই পৃথিবীতে থাকিয়াই স্বর্গ জয় করিয়াছেন, কেন না সম বলিতে নির্দ্দোষ ব্রহ্মবস্তুকেই বুঝায় এবং যাহারা সাম্যে অবস্থিত তাহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।) এই সমস্ত উপলব্ধি করিতে হইলে যোগযুক্ত হইতে হয়। সে যোগ কি?—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ২।৪৮

(হে ধনঞ্জয়, আসক্তি বিবর্জ্জিত হইয়া এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া যোগস্থ হও এবং কার্য্য কর। সমত্বই যোগ।) অতএব—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ২।৩৮

(সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয় ও পরাজয় তুল্য মনে করিয়া সমত্বরূপ যোগে যুক্ত হইয়া কার্য্য কর, তোমার কোন পাপ হইবে না।) পাপ তো হইবেই না, পরন্তু—

সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে। ২।১৫

(যাহার নিকট সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।)

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৬।২৯-৩০

(যিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে ও পরমাত্মায় ভূতসমূহ সমত্বযোগযুক্ত হইয়া সমভাবে দর্শন করেন, যিনি আমাকে সর্ব্বত্র এবং যাহা কিছু আমাতে অবস্থিত অবলোকন করেন, তিনি আমাকে কখন হারান না, আমিও তাঁহাকে হারাই না।)

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ১৮।২০
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্। ১৮।৫৪

(সর্ব্বভূতে যিনি এক বুদ্ধি ও ক্ষয়হীন অব্যয় ভাব বা সত্তা দর্শন করেন, যে ভাব বিভক্ত বস্তুসমূহে ও অবিভক্তরূপে অবস্থিত, তাহাকে উপলব্ধি করেন তাঁহার জ্ঞান সাত্ত্বিক। যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন তিনি আমার আত্যন্তিকী ভক্তি লাভ করেন।)

এই সকল উদ্ধৃতি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, আজকাল বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে যে সাম্যবাদ ঘোষিত হয় গীতার সাম্যবাদ ঠিক তাহা নহে। ইহা হইতে যাহারা সকল প্রকার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বা আর্থিক অধিকার সকলের সহিত সমভাবে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র, তাহাদের আপাত পরিতৃপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। গীতার সাম্যবাদ বুঝিতে হইলে একটু ধীর ভাবে প্রণিধান করিতে হইবে।

গীতায় যে সাম্যের কথা বলা হইয়াছে, ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকের ত্রয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ খণ্ডে তাহাকেই বলা হইয়াছে ভূমা। ভূমা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি" যাহা ভূমা তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। ভূমা ও অল্প সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্; যো ভূমা তদমৃতম, যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।"

অর্থাৎ মানুষ যখন সেই পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বরকে ব্যতীত অন্য কিছু দেখে না, শুনে না বা জানে না, সেই জ্ঞানই ভূমা জ্ঞান এবং যখন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু দেখে, শুনে বা জানে সেই জ্ঞান অল্প। ভূমা অমৃত এবং অল্প মর্ত্ত্য। ইহার একটা দৃষ্টি সমরস ও বৈচিত্র্যহীন ও আর একটা দৃষ্টি বৈচিত্র্যের রসেই পুষ্ট—একটা সংশ্লেষাত্মক (Synthetic) ও একটা বিশ্লেষাত্মক (Analytic)। আমাদের আধুনিক সাহিত্য হইতে যাহা কিছু বিদ্যা তাহা এই অল্প লইয়া, অল্পের স্তুতিতেই আমরা মুখর। বিজ্ঞান ও দর্শন অল্প হইতে ভূমার দিকে যাত্রা করিয়াছে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও অল্পের কোলাহল এত বেশী যে, ভূমার সুরের সূক্ষ্ম রেশটি প্রায় হারাইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে জলে, স্থলে, আকাশে; মানব, পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গে; স্থাবরে ও জঙ্গমে; বৃক্ষে ও তৃণে; সূর্য্যে ও দীপশিখায়; পর্ব্বতে ও লোষ্ট্রে সর্ব্বত্র সেই অখণ্ড, অবিভক্ত, অদ্বয় ঈশ্বরকে দর্শন করিতে বলিলে কেই বা তাহা বুঝিবে, কেই বা তাহাতে কান দেওয়া প্রয়োজন মনে করিবে? যে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন 'সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য'—সমত্বই ভগবানের আরাধনা, তিনি পাষাণ স্তম্ভেও ঈশ্বরদর্শন করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহারই মুখে শোভা পায়, সকলে তো আর প্রহ্লাদ নহে!

এই আপত্তি সমীচীন। যাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব তাহার প্রয়োজনীয়তাও কম। দ্বিতীয়তঃ, গীতা ভগবানের উক্তি। সামান্য এক জন কৃষক ও মজুর-নেতাও যখন রামা ও শ্যামা মহামহিম রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে, পরন্তু সমান—ইহা না বলিয়া দলে লোক সংগ্রহ করিতে বা বক্তৃতা জমাইতে পারে না—তখন ভগবান্‌কেও দুই-একটা ঐ রকম কথা বলিতে হইবে বৈ কি? ইহা তো বক্তৃতার কৌশল। তৃতীয়তঃ, সকল ধর্ম্মপ্রবক্তারাই এই ধরণের কথা বলিয়াছেন, ইহাতে গীতার নূতনত্ব কি?

এই সকল কথার উত্তর দিতে হইলে আমাদের হিন্দুশাস্ত্র

অন্যত্রও একটু দৃষ্টি দিতে হইবে। দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, ভগবান্ কৃষক ও মজুর-নেতার অনুকরণ করেন নাই, ভাগবতুক্তির মধ্যে যে গভীর সত্য আছে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারেও আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে চাহি, তবে এ ক্ষেত্রে আমরা মূলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সাম্যের শাখা-প্রশাখা লইয়া টানাটানি করি মাত্র। তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে, বক্তব্য এই, গীতা ব্যতীত আর কোথাও 'যাহা কিছু সমগ্রই ঈশ্বর' এ কথা বলা হয় নাই। বাইবেল বা কোরাণে ঈশ্বর এক হইলেও ভক্ত ও ভগবান্ দুই—ভক্তও যে ভগবান্, সামান্য একটা কীট ও ঈশ্বরের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নাই এ কথা গীতা ও উপনিষদেই আছে, অন্য কোথাও নাই। বাইবেল ও কোরাণের মতে ভূমা জ্ঞান অপরাধ, 'আনালহক্' বা 'সোঽহমস্মি' বলিলে সেই অপরাধে শিরশ্ছেদ হয়। সকলে ঈশ্বরের সন্তান, অতএব ভাই ভাই ; এই জ্ঞান অপেক্ষাও সকলেই ঈশ্বর ইহা আরও উপরের কথা। ভ্রাতার মধ্যে পিতার অংশ মাত্র অবস্থিত নহে, ভ্রাতৃরূপে পিতাই অবস্থিত, ইহাই গীতার উপদেশ।

এইবার আমরা প্রথম আপত্তিটির যথাসাধ্য উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। আমাদের পিতামহেরা হাণ্টার সাহেবের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে শিখিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজে জাতিভেদ অপেক্ষা বড় কলঙ্ক নাই, ব্রাহ্মণের ন্যায় অত্যাচারী কেহ কখনও হয় নাই। আজ যদি বলা হয় যে, জাতিভেদ হিন্দুশাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে এবং হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থা গীতার লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য অভ্যাসযোগের বিধান, তাহা হইলে অনেকের কানেই তাহা নূতন শুনাইবে।

গীতার লক্ষ্য অতিশয় উচ্চ লক্ষ্য—কিন্তু সেই উচ্চ লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে তাহার জন্য প্রস্তুতি চাই, এই প্রস্তুতির জন্য চাই গুণাগুণ বা যোগ্যতা ও অযোগ্যতা দেখিয়া শ্রেণীবিভাগ। যাহা আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ (Scientilic classificatin) তাহাই প্রাচীন-কালের জাতিবিভাগ। অধিকার বিবেচনা করিয়াই জাতিভেদ, সুতরাং অধিকার-ভেদ হিন্দু-সমাজ গোড়া হইতেই স্বীকার করিয়াই লইয়াছে। যে বালক আজ পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইতেছে, কালে কালে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হউক ইহা বালকের পিতা ও শিক্ষক উভয়েরই কাম্য কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে ব্যবস্থা না করিয়া তাহাকে তো আর প্রথমেই চরম শ্রেণীতে লইয়া দেওয়া চলে না। হিন্দু জীবনের লক্ষ্য চারিভাগে ভাগ করিয়াছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। জন্মান্তরীণ সুকৃতি বা বিশেষ প্রস্তুতি ব্যতীত কেহ মোক্ষের অধিকারী হয় না—কিন্তু অপর তিনটিতে সকলেরই অধিকার, এই জন্য চতুর্বর্গ অপেক্ষা ত্রিবর্গের কথাই প্রথমে বিবেচনা করা উচিত। এ ক্ষেত্রেও হিন্দুশাস্ত্র যাহা দেখাইয়াছে—সাম্যবাদ শিক্ষার বা সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার স্থান এই স্থানে। ত্রিবর্গের মধ্যে কোনটি ছোট বা কোনটি বড় কে—এমন কি অর্থ বা কাম হইতে ধর্ম্মও বড় নহে। মনু এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ধর্ম্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়ঃস্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ॥ ২।২২৪

কাহারও মতে ধর্ম্ম ও অর্থ, কাহারও মতে কাম ও অর্থ, এবং কাহারও ধর্ম্ম বা অর্থ শ্রেয়ঃ, কিন্তু পরস্পরের অবিরোধী ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সমভাবে উপাসনাই প্রকৃত শ্রেয়ঃ।) এই বিষয়ে মহাভারতের একটি উক্তি আরও বিশদ ও সুন্দর। শ্লোকটি এই—

ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা—
যো হ্যেকসক্তঃ স নরো জঘন্যঃ।
তয়োস্তু দাক্ষ্যং প্রবদন্তি মধ্যং
স উত্তমো যোঽভিরতস্ত্রিবর্গে॥ (৪১ শ্লোক)

(ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সমভাবে সেবা করা উচিত। যে ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে কেবল একটিতে আসক্ত সে অতি নিকৃষ্ট, যে দুইটিতে আসক্ত সে মধ্যম, এবং যে তিনটির প্রতি সমভাবে আসক্ত সে উত্তম পুরুষ।) জীবনের প্রতি কর্ম্মে যদি এইরূপ সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে ভাবসাম্য রক্ষিত হয়, কেহ অসামাল (unbalanced) হইয়া পড়ে না। ইহার পর জাতি ও বর্ণানুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা। জাতি কথাটি বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্তেরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সাধারণতঃ জন্ম হইতে জাতি, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। জাতি অপেক্ষাও বর্ণ আরও প্রয়োজনীয়—কেন না শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থা রহিয়াছে, জাত্যাশ্রম বলিয়া কোন কথা নাই। এই ধর্ম সম্বন্ধে গীতায় বলা হইয়াছে যে—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ৪।১৩

(গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমিই চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। যদিও আমি কিছুই করি না, তথাপি ইহার কর্ত্তা আমাকেই বলিতে পার।) এই উক্তির তাৎপর্য্য গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে যে স্থানে ব্রাহ্মণাদির গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সে স্থানে—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম্মস্বভাবজম্॥ ১৮।৪২

এইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রত্যেকের কর্ম্মকেই স্বভাবজ বলা হইয়াছে। এ স্থলে স্বভাব বা প্রকৃতিই কর্ত্তা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥ ৬।১

(যে দেবতা এই ব্রহ্মচক্র ভ্রামিত করিতেছেন তাহাকে কোন কোন বিদ্বান্ স্বভাব, কেহ বা মোহিত হইয়া তাহাকে কাল বলিয়া থাকে, ফলতঃ এই জগদ্ব্যাপার—সেই ঈশ্বরেরই মহিমা-প্রসূত।) স্বভাবরূপী ভগবান্‌কে কর্ত্তা বলাও যায়, না-ও বলা যায়, কেন না যাহা স্বাভাবিক তাহার কর্ত্তা কল্পনা করা বৃথা।

বর্ণ—মাতা-পিতা বা বংশের উপর নির্ভর করে না, ইহা লোকের স্বাভাবিক গুণ ; পক্ষান্তরে জাতি মাতা-পিতার উপরই নির্ভর করে। গৌতম ঋষি উপনিষদ্-প্রসিদ্ধ সত্যকামকে তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই ; কিন্তু সত্যকাম যে বর্ণানুসারে ব্রাহ্মণ তাহার তিনি যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াই বলিয়াছিলেন—"অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত।" কিন্তু সাম্যভাব বিনষ্ট হইয়া যখন বৈষম্যের উদয় হইয়াছে তখন হইতে এই উদারতাও লুপ্ত হইয়াছে। "তেন তুল্যং ক্রিয়া চেদ্ বতিঃ" পাণিনির এই সূত্রে ভাষ্যকার পতঞ্জলি, 'শব্দমাত্রের অর্থ তাহার গুণ

সমূহকে বুঝাইয়া থাকে' ইহার উদাহরণ দিতে যাইয়া 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের গুণাগুণ বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"তপঃ শ্রুতং চ যোনিশ্চ এতদ্ ব্রাহ্মণকারণম্।
তপঃ শ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ।

তথা গৌরঃ শুচ্যাচারঃ পিঙ্গলঃ কপিল কেশ ইত্যেতানপ্যভ্যন্তরান্ ব্রাহ্মণ্যে গুণান্ কুর্ব্বন্তি।" (কেহ তপস্যা বলে, কেহ বিদ্যা বলে এবং কেহ ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার ফলে ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণত্বের এই তিনটিই কারণ, তবে যাহার তপস্যা বা বিদ্যা নাই সে মাত্র জাতি ব্রাহ্মণ। গৌরবর্ণ, শুদ্ধাচার, পিঙ্গল বা কপিল কেশ ইত্যাদি আভ্যন্তর গুণগুলিও ব্রাহ্মণের লক্ষণ।) বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও তপস্যা দ্বারা, কাক্ষীবান্ প্রভৃতি শূদ্রা-গর্ভে উৎপন্ন হইয়াও বিদ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহার না আছে তপস্যা, না আছে বিদ্যা সেই জাতিব্রাহ্মণ কি সত্যই ব্রাহ্মণ? ভাষ্যের টীকাকার আচার্য্য কৈয়ট ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—

"নাদৌ পরিপূর্ণো ব্রাহ্মণঃ! জাতিলক্ষণৈকদেশাশ্রয়স্তু তত্র ব্রাহ্মণশব্দপ্রয়োগঃ। অতএব চ তস্য সর্ব্বাসু ব্রাহ্মণক্রিয়াসু নাস্ত্যধিকারঃ" (অর্থাৎ মাত্র জাতি-ব্রাহ্মণ—পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ নহে, মাত্র ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্ম বলিয়া লক্ষণের একদেশানুসারে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়, অতএব ব্রাহ্মণোচিত সকল কার্য্যে তাহার অধিকার নাই।)

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য—এক জন জাতি অনুসারে ব্রাহ্মণ, কিন্তু বর্ণানুসারে নহে; আর এক জন বর্ণানুসারে ব্রাহ্মণ, কিন্তু জাতি অনুসারে নহে—ইহাদের মধ্যে কাহার গৌরব অধিক? মনু ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—

অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণমার্য্যঞ্চানার্য্যকর্ম্মণম্।
সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ না সমাবিতি। (১০।৭৩)

(ধাতা আর্য্যকর্ম্মা অনার্য্য ও অনার্য্যকর্ম্মা আর্য্য—উভয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা দুই জনে সমানও নহে, অসমানও নহে)। বলা বাহুল্য, উত্তরটিতে ধাতার দোহাই দেওয়া হইলেও ইহা স্পষ্ট নহে, বেদে তপস্যা ও বিদ্যার প্রভাবে অব্রাহ্মণকেও ব্রাহ্মণ হইতে দেখা গিয়াছে। মহাভারতের ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে (শান্তি ১৮৯ অঃ) যাহা বলা হইয়াছে তাহাও অস্পষ্ট। সে স্থলে বলা হইয়াছে যে, এরূপ অবস্থায় শূদ্রও শূদ্র নহে, ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে। যদি ইহার এইরূপ অর্থ হয় যে শূদ্র শূদ্র নহে—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে—অর্থাৎ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহা হইলে অর্থ অনেকটা পরিষ্কার হয়। বর্ত্তমান কালে যে মনুসংহিতা প্রচলিত তাহার মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে ভাঙ্গন ধরিবার যথেষ্ট পরিচয় আছে—এই যুগেই গীতার উদার আদর্শ হইতে আমাদের সমাজ একটু একটু বিচ্যুত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এ স্থানে অপ্রাসঙ্গিক।

একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গীতায় সাম্যবাদের কথা বলিতে যাইয়া জাতি ও বর্ণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলা হইল তাহা ব্যর্থ আলোচনা নহে। গীতা ভগবদুক্তি হইলেও ইহা বলিবার জন্য শ্রীভগবানকে শরীর ধারণ করিতে হইয়াছিল, একটা দেশে ও সমাজে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে তাহা বলিতে হইয়াছে। অথচ যে দেশে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণাশ্রমের দেশ, স্মৃতির বিধানে সে স্থানে এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের বিস্তর ভেদ, অতএব এত ভেদের মধ্যে কিরূপ সাম্য প্রচারিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, গীতায় জাতি অপেক্ষা বর্ণের উপর বেশী নির্ভর করা হইয়াছে, বর্ণ স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট। ভগবানের উদ্দেশ্য এমন সাম্য প্রচার করা যে, মানুষে মানুষে দূরে থাকুক—জগতের কোন পদার্থের সহিত মানুষের ভেদ-জ্ঞান না থাকে। কিন্তু এই জ্ঞান তো সহজে উৎপন্ন হইবার নহে—ইহার জন্য চাই সংস্কার বা শিক্ষা। শিক্ষা দিতে হইলেই অধিকারী ভেদ নির্ণয় করা উচিত। স্বভাবনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমে সেই ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং হীনবর্ণ বা নিম্নাধিকারীকে শিক্ষার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নীত করিয়া লইবার জন্যই বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় দেখিতে পাই, যতই উপরের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই ভোগ সঙ্কুচিত ও সংযম বর্দ্ধিত হইয়া চলে। আহার-বিহারে শূদ্র যেরূপ যথেচ্ছাচার হইতে পারে ব্রাহ্মণ তাহা পারে না। শূদ্র-পর্য্যায় হইতে ব্রাহ্মণ-পর্য্যায়ে আসিতে গেলে শেষে জ্ঞান মাত্র সম্বল ও অতি-সংযত হইতে হয়—বলা বাহুল্য, এই অবস্থাই উচ্চতম জ্ঞান ও অনুভূতির পক্ষে অনুকূল। গীতার উক্তির তাৎপর্য্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা যথোচিত সংস্কার লাভ করিলে এক বর্ণ হইতে অন্য বর্ণে গমনের উপায় ছিল। তপস্যা ও বিদ্যার সাহায্যে নীচ উচ্চের সমতা লাভ করিতে পারিত। সাম্য তখন অর্জ্জন করিতে হইত, কাজেই তাহার মূল্য ছিল—আইন করিয়া সাম্য-প্রতিষ্ঠার বিধান তখন হয় নাই। বেদে ও পুরাণে বর্ণপরিবৃত্তির যথেষ্ট উদাহরণ আছে, বাহুল্য বোধে তাহার উল্লেখ করিলাম না। পরবর্ত্তী কালে বর্ণ ও বর্ণাশ্রম মাত্র আর্য্যাবর্ত্তে সীমাবদ্ধ হইয়াছে, ইহার বাহিরে সকলেই ম্লেচ্ছ। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে দেখিতে পাই যে, আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চতুর্ব্বর্ণ ও বর্ণাশ্রম ছিল—সে স্থানে ম্লেচ্ছের প্রসঙ্গও নাই, গীতার সময়েও বোধ হয় সর্ব্বত্রই বর্ণবিভাগ ও বর্ণাশ্রম ছিল: সুতরাং ব্রাহ্মণাদির উল্লেখ থাকিলেও সমগ্র মানব জাতির পক্ষেই উহা প্রযোজ্য। আধুনিক কালে নৃতত্ত্ববিদ্গণ চক্ষুর তারকা, মস্তক, ললাট ও গণ্ডের অস্থি, কেশ ও গাত্রবর্ণ প্রভৃতি দেখিয়া যেমন মানবের শ্রেণী বিভাগ করেন ও এই শ্রেণী বিভাগে মঙ্গোলীয়, প্রোটো অষ্ট্রিক বা ককেশীয় হওয়া যেমন গুণেরও নহে, দোষেরও নহে, গীতার অভিপ্রায় অনুসারে গুণানুসারে তেমনই ব্রাহ্মণাদি শ্রেণী নির্দ্দেশ করা উচিত। মঙ্গোলীয় কিছুতেই ককেশীয় হইতে পারে না, কিন্তু শারীরিক পরিবর্ত্তন না হইলেও মানসিক পরিবর্ত্তনে শূদ্র তখন ব্রাহ্মণ হইতে পারিত। গীতার এই সাম্যনীতি আমরা বহু কাল ভুলিয়াছি। নিম্নবর্ণ হইতে ক্রমোন্নয়নের দ্বারা উচ্চবর্ণে উন্নীত করার জন্যই যে বর্ণাশ্রম-বিধির প্রবর্ত্তন হইয়াছিল—সাময়িক প্রয়োজনে বা বুদ্ধির দোষে তাহাই বর্ণবিমুখ হইয়া জাতির অনুকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত জাতি অনুসারেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম পালন করিত ও এই ভাবে জাতির সহিত বর্ণও অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এক সময় যাহা ছিল ভূষণ, কালক্রমে তাহাই শৃঙ্খলে পরিণত হইয়াছে। এই জাতীয় সামাজিক বিপ্লবের ফলেই আমরা

গীতার সাম্যবাদকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দিতে পারি নাই, এবং আমাদের জাতীয় অধঃপতন হইয়াছে।

গীতায় সাম্যবাদের প্রসঙ্গে একটা কথা বলিবার আছে। গীতার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল তো এক বটেই—স্ত্রী-পুরুষেও কোন ভেদ নাই। কথাটা হিন্দুর কানে একটু কেমন কেমন শুনাইবে, তথাপি বলিবার কারণ এই যে, অনেকে হয়তো জানেন না যে, কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে নারীদের মুক্তিতেও অধিকার নাই। অবশ্য হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীজুগুপ্সা যথেষ্ট আছে, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি উক্তি হইতে এই সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে। আসক্তি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হইতে পতনের কারণ। পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি একটা স্বাভাবিক আসক্তি আছে, এই আসক্তিকে ভাগবতে হৃদয়গ্রন্থি বলা হইয়াছে। হৃদয়গ্রন্থি হইতে মুক্তিলাভের জন্য পুরুষ ও নারীর পরস্পরের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উভয়ের অধিকারই সমান। পুরুষও নারীর পক্ষে যতটা ত্যাজ্য, নারীও পুরুষের পক্ষে ততটাই ত্যাজ্য। ভাগবতের শ্লোকটি এই—

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈঃ
জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ॥ ৫।৫।৮

(পুরুষ এবং নারীর এই যে মিথুনী ভাব ইহাকেই তাহাদের হৃদয়গ্রন্থি বলা হয়। অতএব মানবের গৃহ-ক্ষেত্র-পুত্র-আত্মীয় ও সম্পদ হেতু আমি ও আমার এইরূপ মোহ উৎপন্ন হয়)। গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৯।৩২

(হে পার্থ, আমাকে আশ্রয় করিয়া নারীগণ, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ এমন কি যাহারা পাপযোনি তাহারাও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে)। গীতোক্ত লক্ষ্যে পৌঁছিতে জাতিবর্ণসম্প্রদায়নির্বিশেষে নরনারী সকলেরই অধিকার আছে। সমাজের মধ্যে যতটা বৈচিত্র্য, যতটা ভেদের সৃষ্টি, তাহা কেবল পরম সাম্যে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুতি মাত্র।

আর্থিক সাম্য বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে নারদের উক্তিরূপে যাহা কথিত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত কোনও সাম্যবাদী তাহা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। নারদ বলিয়াছেন—

যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
যোঽধিকমভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥

(যে পর্য্যন্ত না উদর পূর্ণ হয়, সেইটুকু খাদ্যে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে। তাহারও অধিক বস্তুতে অধিকার আছে বলিয়া যিনি মনেও করেন তিনি চোর এবং দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য)। সাম্যের লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে হইলে এই সকল পথ মাত্র—গীতার সাম্যবাদের সহিত ইহার কোথাও বিরোধ নাই বলিয়া ইহাকেও গীতোক্ত সাম্যবাদ বলিতে পারা যায়।

শেষ কথা এই—গীতা বলিতেছেন সকলেই সমান। জগতে অসীম বৈচিত্র্য, কিন্তু এই অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যেও একই বস্তু অবস্থিত এবং সে বস্তু স্বয়ং ভগবান্। তিনি বিভক্তের মধ্যে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান, বস্তুতঃ তিনি অখণ্ড অবিভক্ত। সর্বভূতে ভগবদ্দর্শনই সাম্য। সম শব্দের অর্থই পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বর, তাহা ব্যতীত যাহা কিছু জ্ঞান হয় সকলেই অসম বা বিষম। সর্বত্র সম বিরাজমান, এই সমকে উপলব্ধি করা ও তাহার সেবা করাই সাম্য। দরিদ্রকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা বা দয়া করিবার অধিকারও আমাদের নাই, ধনীকে ঈর্ষা করিবার অধিকারও নাই। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, স্থাবর, জঙ্গম সকলই ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ। আমার মধ্যেও যিনি সকলের মধ্যেই তিনি। সকলকে আপনার মত দেখিতে হইবে—ইহাই যোগীর কর্ত্তব্য।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৬।৩২

গীতার সাম্যবাদে ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, যুদ্ধ বা রক্তপাতের স্থান নাই। জগতে কেহ কাহারও প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে না—ঈশ্বর জ্ঞানে, আসক্তি-বিরহিত হইয়া সকলে সকলের সেবা করিবে, ইহাই গীতার সাম্যবাদ।

পৃথিবীময় আজ যে সাম্যবাদ প্রচলিত ইহার মূলে আছে অর্থ, কাম, সমাজ, রাষ্ট্র—বড় জোর মানব; ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। এই সাম্যবাদ আসক্তি-বিরহিত নহে, তাই ইহাতে আছে ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ, হিংসা ও রক্তপাত। ইহার ভিত্তি অতি চঞ্চল—যে কোন মুহূর্ত্তে ইহার পতন হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের আবশ্যক হয় এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যও বৈষম্যকে প্রশ্রয় দান করিতে হয়। প্রাচীনদের ভাষায় ইহা হস্তি-স্নানের ন্যায় বৃথা, হস্তী স্নান করিয়াই ধূলায় গড়াগড়ি দেয়। আস্তিকতা ও প্রেমের উপর যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত নহে, যে সাম্যবাদের সহিত নানাপ্রকার স্বার্থ এবং আসক্তি বিজড়িত, তাহার স্থায়িত্বের কোন আশা নাই, বালুকার উপর গঠিত হর্ম্ম্যের ন্যায় তাহা এক দিন ভাঙ্গিয়া পড়িবেই। আধুনিক সাম্যবাদ গীতার ভাষায় আসুরিক সাম্যবাদ। আসুরিক ভাবের কথা বলিতে যাইয়া ভগবান্ বলিয়াছেন—"যাহারা অসুর-ভাবাপন্ন তাহারা ঈশ্বরকেও স্বীকার করে না এবং ঈশ্বরই যে জগতের একমাত্র প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা তাহাও মনে করে না। ইহাদের মতে জগৎ আপনা-আপনি হইয়াছে, এবং ইহা একমাত্র ভোগের জন্য। ইহাদের কামনার সীমা নাই; দম্ভ, মান ও মদেরও অবধি নাই, মোহ বশতঃ যে পথ পরিত্যজ্য তাহাই ইহারা আশ্রয় করে। ইহাদের চিন্তার শেষ নাই, আশার অন্ত নাই, কাম ও ক্রোধ ইহাদের অধিকার করিয়াই আছে, কামোপভোগই ইহাদের জীবনের লক্ষ্য। যাহা পাইয়াছে তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট নহে, মানুষের মধ্যে কাহাকেও শত্রুবোধ ও তাহাকে হত্যা করিবার বাসনাও ইহাদের প্রবল। ইহারা নিজেদের ঈশ্বর মনে করে।" (গীতা ১৬।৬—২০ দ্রষ্টব্য) "প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ"—অতিশয় উগ্রকর্ম্মা ও জগতের ক্ষয়ের জন্যই অমঙ্গলস্বরূপ ইহারা প্রাদুর্ভূত হয়।

বর্ত্তমানে জগতে সাম্যবাদের কোলাহল প্রচুর, কিন্তু যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই আসুরিক ভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। হিংসা, দম্ভ ও অনাস্তিকতার পূর্ণ—ইহা কি প্রকৃত সাম্য? অবশ্য রাষ্ট্রে ও সমাজে নানা ভাবে, নানা পথে সাম্য প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে সাম্য অন্তর হইতে বাহিরে আসে না, তাহা তো সাম্য

নহে। বাহির হইতে বলপূর্ব্বক অন্তরে সাম্য প্রবেশ করানো যায় না। সাম্য হৃদয়ের সামগ্রী, অহিংসা, আস্তিকতা ও অনাসক্তি তাহার স্বরূপ। গীতার সাম্যবাদ আমরা অনেক দিন ভুলিয়াছি, যে সাম্যবাদের ধ্বনি চারি দিকে শুনিতে পাইতেছি তাহাও অবহেলার বস্তু নহে, কিন্তু গীতোক্ত আদর্শে যে পর্য্যন্ত আমরা এই অবিশুদ্ধ সাম্যবাদকে শুদ্ধ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের ও জগতের কল্যাণ নাই। জগতের কল্যাণের জন্যই আজ গীতার সাম্যবাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে।

-দেহ-বিজ্ঞান-

দৈব চিকিৎসা, টোটকা, হাকিমী, কবিরাজী ও আরও কত রকমের ওষুধ ও অসুখ নিরাময়ের ধারাই না আছে ভারতবর্ষে। এখনও কত গৃহস্থ শিশুদের অসুখ-বিসুখে জলপড়া খাওয়ান। গ্রামে এখনও ঝাড়-ফুঁক দিয়ে কত মৃতকল্পের পুনর্জীবন লাভ হচ্ছে। কত গাছের শেকড় কত দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে তুলছে। স্বপ্নে-প্রাপ্ত ওষুধ তো আমাদের দেশে ছড়াছড়ি। তা ছাড়া, হত্যা, মানত, মানসিকের অত্যাশ্চর্য্য ফলের কথা অনেকেই জানেন। কত ওষধি বৃক্ষের দ্রব্যগুণে কত ওষুধ তৈরী হচ্ছে, তাও কারও অজানা নেই।

কিন্তু বিজ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কি প্রতীচ্য ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেয়নি মানুষের এই আদিম বিশ্বাস আর সংস্কারকে? বিজ্ঞান কি শুধু ধ্বংসের লীলাখেলায় সংহারমূর্ত্তি গ্রহণ করেছে? মারণাস্ত্র তৈরীতেই কি শেষ হয়েছে বিজ্ঞানের অভিযান? মানুষের জীবন যাতে সহজ ও সাবলীল গতিপথে আরাম ও আয়াসের জীবন হয়, বিজ্ঞানের দান তাতে পুরাপুরি, কে তা অস্বীকার করবে? আধুনিকতম চিকিৎসা-পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরণের ওষুধ আর ওষুধের ফরমুলা আবিষ্কার বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান হিসাবে গণ্য হয়েছে পৃথিবীর সকল দেশে।

আদিম সভ্যতার কত ভ্রান্ত ধারণাকে ধূলিসাৎ ক'রেছে বিজ্ঞান! বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রভাব এখনও যে-সব দেশে বর্ত্তায়নি সেই সব দেশের লোক এখনও বিশ্বাস করে ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক। নীচে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কতকগুলি সত্যাসত্য নির্ণয় করা হয়েছে মানুষের শরীর সম্বন্ধে। শেষ পর্য্যন্ত পড়লে দেখবেন, আপনারও মনের অনেক বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। পাঠের শেষে যে কোন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করলে দেখবেন তাঁরাও আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। একে একে বলে যাচ্ছি।

(১) পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দাঁত কখনও নষ্ট হয় না।

মিথ্যে কথা। ক্যালসিয়ামের অভাব হলেই দাঁত নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ হলে কিংবা রক্তাল্পতায় দাঁত বিনষ্ট হয়।

(২) সামান্য একটু এ্যালকোহল অনেক বেশী এ্যালকোহলের মতই খারাপ এবং মানুষের পরমায়ু হ্রাস করে।

মিথ্যে কথা। যারা সামান্য পরিমাণে এ্যালকোহল ব্যবহার করে তারা—যারা আদপেই ব্যবহার করে না তাদের চেয়ে কিছু বেশী দিন বাচে এবং পাঁড় মাতালদের চেয়ে অন্ততঃ ৬'বছর বেশী বাঁচে।

(৩) প্রতি রাত্রে অন্ততঃ আট ঘণ্টার জন্যে নিদ্রায় প্রয়োজন।

সত্যি কথা। খুব কম লোককে চিকিৎসকরা দেখেছেন আট ঘণ্টার চেয়ে কম সময়ের জন্যে নিদ্রা যায়। যারা তা করে, তারা দিনের বেলায় কিছুটা সময়ের জন্যে ঝিমিয়ে নেয় নিশ্চয়ই।

(৪) দুগ্ধ, সব চেয়ে বিশুদ্ধ খাদ্য সকলের পক্ষেই সমান ভাল।

মিথ্যে কথা। যদিও দুধ অধিকাংশ লোকেরই উপকারে আসে; কিন্তু কয়েক জনের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত করে ও তাদের হাঁপানিতে ভোগায়।

(৫) কৈশোরে ও যৌবনে মাথায় জল ঢাললে মাথায় টাক পড়ে। টুপী কিংবা পাগড়ী ব্যবহারেও টাক পড়ে।

মিথ্যে কথা। সাধারণতঃ টাক পড়ে তাদের যাদের বংশানুক্রমিক টাক আছে। আর কয়েক জনের টাক পড়ে মাথায় কোন রকম ক্ষত থাকলে। এই ক্ষত সারাতে পারলে টাক পড়ে না।

(৬) ইংরেজীতে একটা কথা আছে "A lean horse for a long race." মানুষের মধ্যেও যারা কৃশকায় তাদের পরমায়ু অধিক হয়।

সত্যি কথা। শতকরা ষাট জন বয়স্ক লোক হয় কৃশ। আর কৃশকায় ব্যক্তিরা ফুসফুস এবং স্নায়ুর গুণে স্থূলকায়দের চেয়ে বেশী দিন বাঁচতে পারে।

(৭) নারী কি পুরুষ অপেক্ষা বেশী কষ্টসহিষ্ণু?

মিথ্যে কথা। কয়েকটি হয়তো ব্যতিক্রম থাকতে পারে। পুরুষরাই তাদের স্বভাবজাত উচ্ছ্বাস এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রাবল্যে অধিকতম কষ্টসহিষ্ণু হয়।

(৮) ঠাণ্ডা সহ্য করবার শক্তি পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিক?

সত্যি কথা। নারীর দেহের চামড়ার ঠিক তলায় এক রকম চর্ব্বি থাকার দরুণ ঠাণ্ডাকে তাঁরা সহ্য করতে পারেন। আরও একটা কারণ, নারী পুরুষাপেক্ষা কম পোষাক ব্যবহার করেন।

(৯) অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম কি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের কারণ?

মিথ্যে কথা। কোন কারণে চিন্তাগ্রস্ত না থাকলে যে-কোন মানুষ অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন পরিশ্রম করতে পারে।

(১০) দেহের ওজন অস্বাভাবিক বেশী কি অস্বাভাবিক বেশী খাওয়া-দাওয়ার জন্যেই?

সত্যি কথা। শতকরা তিন জন হয়তো অসম্ভব মোটা হয় বংশগত শরীরিক গ্রন্থির দোষে, বাকী সকলেই অতি-ভোজনের নিমিত্তে।

(১১) বিনা কষ্টে সন্তান-জন্ম কি সম্ভব হয়?

সত্যি কথা। একেবারে স্বাভাবিক ধারায় এবং বিনা কষ্টভোগে সন্তান-জন্ম হয় কোন ওষুধ না খেয়েও। আধুনিক ওষুধের গুণেও কষ্ট না পেয়ে হচ্ছে এ যুগে।

(১২) চল্লিশের অধিক বয়সের লোকের চলন্ত ট্রেণ, বাস কিংবা ট্রাম ধরতে সচেষ্ট হওয়া উচিত নয়।

সত্যি কথা। কারণ এই বয়সে হৃদ্‌যন্ত্র এমন অবস্থায় আর থাকে না যে, হঠাৎ দৌড়ের গতির বেগ সইতে পারে। এ চেষ্টা তাদেরই করা উচিত যাদের হৃদ্‌যন্ত্রে কোন রকম দোষ নেই।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—বিয়োগান্ত, অলিভার টুইষ্ট।

অমরেন্দ্রনাথ রায়—সাহিত্যিক। সম্পাদিত গ্রন্থ—শাক্ত-পদাবলী (১৩৪৭), সমালোচনা সংগ্রহ (১১৩৭)।

অমরেন্দ্রনাথ রায়—গ্রন্থকার। নিবাস—সুখড়িয়া, হুগলী। গ্রন্থ—হিন্দুমহিমা, বীরবালাকাব্য, বসন্তরোগ-চিকিৎসা নবনারী, বঙ্গের রঙ্গকথা,] সহজ কবিরাজী শিক্ষা, দ্রব্যগুণ-তত্ত্ব, বঙ্কিম-পরিচয়।

অমরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অমিয় (১১০১)।

অমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—পণ্ডিত। গ্রন্থ—গীতাঞ্জলি (সংস্কৃতে অনুবাদ)।

অমরেশ কাঞ্জিলাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—লাভজনক কৃষি, জাতীয়তার অনুভূতি, রং ও রঙ্গন বিদ্যা, মানুষ তৈয়ারীর মসলা।

অমরেশ্বর—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিবার্চন-পদ্ধতি।

অমলচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মানচিত্রে বঙ্গদেশ ও পৃথিবী।

অমল হোম—সম্পাদক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯৩ খৃঃ ১৩ই আশ্বিন। পিতা—গগনচন্দ্র হোম। সহ-সম্পাদক—The Panjaba (লাহোর), The Tribune (লাহোর), Independent (এলাহাবাদ), Indian Daily News (কলিকাতা), অস্থায়ী সম্পাদক—The Tribune (লাহোর)। সম্পাদক—Calcutta Municipal Gazatte, রচিত গ্রন্থ—Rammohan Roy, the man & his works (১৯৩৩ খৃঃ), Some Aspects of Modern Journalism in India (১৯৩৫), অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য।

অমলা নন্দী (শঙ্কর)—নৃত্যশিল্পী। জন্ম—কলিকাতা। স্বামী—উদয়শঙ্কর। গ্রন্থ—সাত সাগরের পারে।

অমলা দেবী (ছদ্মনাম)—শ্রীললিতানন্দ গুপ্ত, অধ্যাপক বাঁকুড়া কলেজ। গ্রন্থ—ভিখারিণী, স্বাধীনতা দিবস, সমাপ্তি (গ)।

অমলানন্দ বাঈ—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—রামেশ্বর দুর্গা (হিন্দী)।

অমলানন্দ যতি—অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত। জন্ম—১৩শ শতাব্দী মহারাষ্ট্রে। গ্রন্থ—বেদান্ত কল্পতরু (প্রথম মুদ্রণ ১৯১৭ খৃঃ), শাস্ত্রদর্শন (প্রথম মুদ্রণ ১৯১৩), পঞ্চপাদিকাদর্পণ।

অমলানন্দ ব্যাসাশ্রম—দার্শনিক.পণ্ডিত। টীকাগ্রন্থ—বাচস্পতি মিশ্রের ভামতীর টীকা; শাস্ত্রদর্পণ, বেদান্তকল্পতরু, পঞ্চাদিকা-দর্পণ।

অমলানন্দ সরস্বতী—ব্যাখ্যাকার। গ্রন্থ—কল্পতরুব্যাখ্যা।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত—সাংবাদিক। গ্রন্থ—বক্সাক্যাম্প, ডেটিনিউ (উ)।

অমলেশ সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—লীলা-মুকুল।

অমিতগতি—জৈন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সুভাষিত রত্নসন্দোহ (৯৯৪ খৃঃ), শ্রাবকাচার, ভাবনাদ্বাত্রিংশতি, পঞ্চ-সংগ্রহ, জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, সার্ধদ্বয়প্রজ্ঞপ্তি, ব্যাখ্যা-প্রজ্ঞপ্তি, যোগসারপ্রাভৃত, ধর্মপরীক্ষা।

অমিতপ্রভ—আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রবিদ্। গ্রন্থ—যোগশতকটীকা।

অমিয়কুমার বাগচী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—যৌনজীবন।

অমিয়কুমার সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ।

অমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—বীণা।

সাহিত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অমিয়নাথ সান্যাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত-চিন্তা (১৩৫২)।

অমিয়বালা সরকার—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—মা ও মেয়ে।

অমীয়চন্দ্র পণ্ডিত—গ্রন্থকার। জ্যোতিষগ্রন্থ—ভাবিজ্ঞাগ্রন্থ।

অমীর সিং—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মানসকোষ (হিন্দী)। সহ-সম্পাদক—শব্দসাগর (নাগরী প্রচারিণী সভা, বেনারস)।

অমূল্যচন্দ্র বেদান্তবাগীশ—পণ্ডিত ও অনুবাদক। অনুবাদ গ্রন্থ—বেদান্তসার: (সদানন্দ যোগীন্দ্র কৃত। ১৮৬০ খৃঃ), ষট্‌চক্রনিরূপণ প্রভৃতি পুস্তকপঞ্চকঃ (পূর্ণানন্দ গোস্বামী কৃত। ১৮৫৬ খৃঃ), বৃহৎকথা (সোমদেব কৃত। ১৮৫৭ খৃঃ) মহাভারতীয় শাকুন্তলোপাখ্যান (১৮৫৭ খৃঃ)।

অমূল্যচন্দ্র সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Schools and Sects of Jain literature.

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭৭ খৃঃ ৫২।২, বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মৃত্যু—১৯৪০ খৃঃ ঘাটশিলায়। পিতা—উদয়চাঁদ ঘোষ। শিক্ষা—জেনারেল এ্যাসেম্বলী এবং কাশীধামে। ইনি দেশীয় ও বিদেশীয় মোট ছাব্বিশটি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ Translating Bureau (ভিন্ন ভিন্ন ভাষার পত্রাদি অনুবাদ কার্য্যালয়) স্থাপন। ১৯০১ খৃঃ Edward Institution (প্রথম ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়) স্থাপন ও ইহার অধ্যক্ষ। ১৯০৬-১৯০৭ খৃষ্টাব্দে The National Council of Educationএ ফ্রেঞ্চ, জর্মান, পালি, বাংলা প্রভৃতির অধ্যাপক। ১৯০৫—৪০ খৃঃ Metropolitan Institutionএর (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যাপক। গ্রন্থ—সরস্বতী ১ম খণ্ড (১৩৪০), আপিশলী শিক্ষা (১৩৪২), চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ (১৩২১), মহাভারতের গল্প, সাহিত্য-সঙ্কলন (পাঠ্য), ব্যাকরণ-প্রবেশিকা, সাহিত্য-মঞ্জরী (পাঠ্য), প্রবন্ধ-কৌমুদী; ১ম, ২য় (পাঠ্য), আধুনিক বাংলা-রচনা (পাঠ্য), সাহিত্য-বোধ (পাঠ্য)। সম্পাদিত গ্রন্থ—জৈন-জাতক (Punjab-Sansk. Series), Sheir Mutakserin, Vol. 1., শ্রীকৃষ্ণবিলাস (১৩২৬), শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত (১৩২৮), শ্রীশ্রীসংকীর্তনামৃত (১৩৩৬), বিদ্যাপতি (১৯৩১ খৃঃ)। সম্পাদিত সাময়িক পত্র—বাণী (মাসিক—১৩১১—১৩১৭), ভারতবর্ষ (১৩২০-২১), Indian Academy of Arts (১৩২১—২৩), সঙ্কল্প (১৩২১), মর্মবাণী (সাপ্তাহিক—১৩২২), গৌরাঙ্গসেবক (১৩২৬—১৩৩৪), কায়স্থ-পত্রিকা, পঞ্চপুষ্প (১৩৩৬—১৩৪০)। (শ্রীভারতী (১৩৪৪—১৩৪৭), বঙ্গীয় মহাকোষ (১৩৪১—১৩৪৭)। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ—দেবী দুর্গা, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু, জাতিবিজ্ঞান, ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা,

অগ্নি, বাঙলার প্রথম, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি, ভারতীয় অব্দ, বুদ্ধ-চরিতের অনুবাদ, শঙ্করাচার্য, মধ্বাচার্য ও মাধ্বমত।

অমূল্যচরণ সেন—সম্পাদক। সম্পাদিত পত্রিকা—পত্রিকা (১৩০৭—১৩০৯), অর্ঘ্য, অর্চনা (মাসিক। সহ—কেশবচন্দ্র গুপ্ত ; ১৩২৬—২৯)।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—বাংলা ছন্দের মূলসূত্র।

অমূল্য শাস্ত্রী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বর্ধমানের ভূগোল (পাঠ্য)

অমৃতচন্দ্র সূরি—জৈন গ্রন্থকার। জন্ম—৯৬২ সংবত। গ্রন্থ—সময়সারটীকা, প্রবচনসারটীকা, পঞ্চাস্তিকায়টীকা, তত্ত্বার্থসার, পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়, তত্ত্বদীপিকা।

অমৃতলাল—হিন্দী-গ্রন্থকার। জন্ম—উদয়পুর। গ্রন্থ—বিচার-পরিণাম (হিন্দী)।

অমৃতলাল গুপ্ত, কবিভূষণ—কবিরাজ ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আয়ুর্বেদশিক্ষা (কলি, ১৯১৩), ধাতুবিজ্ঞান, অনুপান-দর্পণ, দ্রব্যগুণপরিচয়, পথ্যাপথ্যশিক্ষা। সম্পাদক—যোগবল। (১৩২২-২৩)।

অমৃতলাল গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ছোট গল্প (১৩৪০), সোনার খনির সন্ধানে (১৩৪০)। তাপসী ; ছোটদের বই।

অমৃতলাল সরকার—সম্পাদক। সম্পাদিত মাসিকপত্র—বিজ্ঞান (১৩২১—১৩২২)।

অমৃতলাল সেনগুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মানবজীবনের লক্ষ্য ও পরকাল (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রদত্ত ২টি বক্তৃতা। কলি, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৬)।

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—মাধব-মধু-মাধুরী বা কান্তভাবে কৃষ্ণপূজা (১১০১)। স্বাস্থ্যবিধান (১২৯৪), কুসুমপত্রিকা (১২৯৭), নিকুঞ্জলীলা (১২৯৯), গোপিকা প্রেম (১৩০০), বস্ত্রহরণ (১৩০৩), রাসলীলা (১৩০৩), ব্রজলীলা অবসান (১৩০৫), রাই-উন্মাদিনী (১৩০৩), প্রভাস-মিলন (১৩০৭)।

অমৃতলাল বসু—নাট্যকার এবং নাট্যাচার্য। জন্ম—১২৬০ বঙ্গাব্দ, ৬ই বৈশাখ, ৮৮ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, কলিকাতা। মৃত্যু—১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৮ই আষাঢ়, ৩ নং শ্যামপুকুরের ভবনে। পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু। শিক্ষা—শ্যামবাজার বঙ্গ বিদ্যালয় (বর্তমান শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুল), হিন্দুস্কুল, দুই বৎসর পরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী হইতে এন্ট্রেন্স পাস (১৮৬৮ খৃঃ), কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ (তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত), হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করিতে কাশী গমন। বাঁকিপুরে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করিতে থাকেন। ১৮৭২ খৃঃ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং নটজীবন আরম্ভ (১৯ বৎসর বয়সে)। ১৮৭৭ খৃঃ পুলিসের চাকুরী লইয়া পোর্টব্লেয়ারে গমন। ১৮৭৮ খৃঃ প্রত্যাবর্তন এবং পুনরায় নটজীবন আরম্ভ।

গ্রন্থ—হীরকচূর্ণ (১২৮২), বিবাহ-বিভ্রাট (১২৯১), বিজয়-বসন্ত (১৩০০), হরিশ্চন্দ্র (১৩০৬), আদর্শবন্ধু (১৩০৭), তরুবালা, (১২৯৭), খাসদখল, (১৯১২), নব-যৌবন (১৯১৪), ব্যাপিকা-বিদায় (১৯২৬), যাজ্ঞসেনী (১৯২৮), চাটুজ্যে-বাঁড়ুয্যে (১৮৮৪), চোরের ওপর বাটপাড়ী (১৮৭৬), ডিস্‌মিস্‌ (১৮৮৩), কৃপণের ধন (১৩০৭), যাদুকরী (১৩০৭), কালাপানি (১২৯৯), বাবু (১৩০০), সাবাশ-আটাশ (১৩০৬), সাবাস-বাঙ্গালী (১৩১২), রাজা বাহাদুর (১২৯৮), গ্রাম্য-বিভ্রাট (১৩০৪), বৌমা (১৩০৩), অবতার (১৩০৮), বাহবা বাতিক (১৩০৮), তিলতর্পণ (১৮৮১), একাকার (১৩০১), সম্মতি-সঙ্কট, নবজীবন, (১৩০৮), তাজ্জব-ব্যাপার (১২৯৭), দ্বন্দ্বে মাতনম্‌ (১৩৩৩), ব্রজলীলা (১২৮১), বিলাপ (স্মৃতিনাট্য—১২৯৮), বৈজয়ন্তবাস (স্মৃতি-নাট্য—১৩০৭), কৌতুক-যৌতুক (১৯২৬), অমৃত মদিরা (কবিতা—১৩১০), নাট্যকৃতী গ্রন্থ—চন্দ্রশেখর (১৯২৫), রাজসিংহ (১৯২৬), বিষবৃক্ষ (১৯২৫), সরলা (তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা অপ্রকাশিত)। অনুবাদ গ্রন্থ—শ্রীহর্ষের রত্নাবলী (অধুনালুপ্ত 'নাট্যমন্দির' পত্রিকা)। ইহা ব্যতীত বহু প্রবন্ধ তাৎকালিক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। সম্পাদিত পত্রিকা ও গ্রন্থ—গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান (১২৯৩), বীণার ঝঙ্কার (১৩১১)।

অমৃতলাল রায়—সম্পাদক। সম্পাদক—'ট্রিবিউন' পত্রিকা, লাহোর।

অমৃতানন্দ—বৌদ্ধ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ধর্মকোষ-সংগ্রহ।

অমৃতানন্দ তীর্থ—বৈদান্তিক ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তাৎপর্য্য-দীপিকা, তারকোপদেশব্যাখ্যা, পরমপদনির্ণায়ক, ভর্গাস্ত্রিভূষণ, শিবতত্ত্ববিবেক, শিবরহস্যলীব্যাখ্যা, হরিহরোপাধিবিবেচন, অমৃতানন্দীয়।

অমৃতানন্দনাথ—প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। গ্রন্থ—তত্ত্বদীপন, অজ্ঞান-বোধিনীটীকা, যোগিনীহৃদয়দীপিকা।

অম্বালাল দামোদর যোশী—সাহিত্যিক। নিবাস—কপটগঞ্জ, বোম্বাই। গ্রন্থ—সংসার সার আনে ব্রহ্মবিচার (গুজরাতী ভাষায় ১৯১৫)।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত—অনুবাদক। গ্রন্থ—পরিত্যক্ত পল্লী (The Deserted Village-এর অনুবাদ—১৮৭১ খৃঃ), গৃহস্থজীবন (১৯০১), সম্পাদক—হিতবোধ (সাময়িকপত্র—১৮৭৪)।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত—গ্রন্থকার। নিবাস—ভাঙ্গামোড়া (হুগলী)। গ্রন্থ—পরলোকের পত্র (১৩২১), আমার চিন্তা (১২৮৭), ছোট বৌ (১২৮৮), কল্যাণী, শান্তিধাম (১৮৮৫), জয়কৃষ্ণচরিত (১৯০১), সুধাধাম, বুন্দোলাবালা, পুরাণ কাগজ, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ধর্মের সূক্ষ্মগতি, বংশাবলি, হুগলী (১৩২১), জজ দিগম্বর বিশ্বাস, কোম্পানীর রাজত্বে বাংলা-সাহিত্য।

অম্বিকাচরণ ঘোষ—ঐতিহাসিক। গ্রন্থ—বিক্রমপুরের ইতিহাস (কলি—১৮৬৯ খৃঃ)।

অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নীতিরত্ন (১৮৭১)।

অম্বিকাচরণ নাথ—সম্পাদক। মাসিকপত্র—যোগিসখা (১৩২৫—১৩২৯)।

অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নীতিরত্ন (১৮৬৮)।

অম্বিকাচরণ মজুমদার—প্রসিদ্ধ উকিল এবং জননেতা। জন্ম—১২৫৭ বঙ্গাব্দ, ২৩এ পৌষ ফরিদপুরে। মৃত্যু—১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ১০ই পৌষ। Indian National Congress-এর লক্ষ্ণৌ

অধিবেশনের সভাপতি (১৯১৬ খৃঃ)। গ্রন্থ—Indian National Evolution.

অম্বিকাচরণ রক্ষিত—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চিকিৎসা-তত্ত্ব (১ম—৭ম খণ্ড, ১৮৭৫ খৃঃ)।

অম্বিকাচরণ রায়—সাহিত্যিক ও সম্পাদক। জন্ম—চট্টগ্রাম। গ্রন্থ—কুসুমকলি (ঢাকা, ১৮৭৩), সম্পাদক—পাঞ্চজন্য (পত্রিকা)।

অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিশুরঞ্জিকা (ঢাকা, ১৮৬১), সুশ্রুত (সম্পাদিত ও অনূদিত, ১৮৭৫)।

অম্বিকাচরণ শর্মা—সম্পাদক। মাসিকপত্র—ত্রিশূল (১৩২৭-৩০)।

অম্বিকাপ্রসাদ মিশ্র—ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা। গ্রন্থ—বৈধ-হিংসাঘতিনির-মার্ত্তণ্ডোদয় (১৮৪৪ খৃঃ)।

অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী—হিন্দী সাহিত্যিক। সম্পাদক—ভারতমিত্র (হিন্দী দৈনিক), স্বতন্ত্র। হিন্দী গ্রন্থ—ব্যাকরণ, হিন্দুয়োঁ কী রাজকল্পনা, ভারতীয় শাসনপদ্ধতি, শিক্ষা, নরসিংহ।

অযোধ্যানাথ—সম্পাদক। জন্ম—১৮৪০ খৃঃ আগ্রায়। মৃত্যু—১৮৯২ খৃঃ। আইন ব্যবসায়ী, যুক্তপ্রদেশ। সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্র—Indian Herald (১৮৭৯ খৃঃ এলাহাবাদ ; Indian Union (১৮৯০ খৃঃ)।

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী—সঙ্গীত-রচয়িতা। সম্পাদক—'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'।

অযোধ্যানাথ রায়, কবিচন্দ্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সত্যনারায়ণের কথা, গঙ্গার বন্দনা, দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণা।

অযোধ্যাপ্রসাদ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রসতরঙ্গিণীটীকা, নৌকা নাম্নী বৃহৎরত্নাকর টীকা।

অযোধ্যাপ্রসাদ বাজপেয়ী—হিন্দী কবি। ছদ্মনাম—অবধ। জন্ম—যুক্তপ্রদেশের রায়বেরেলী জেলার সাতনপুর গ্রামে। ১৮৩৩ সালে ইনি জীবিত ছিলেন। কাব্যগ্রন্থ—ছন্দানন্দ, সাহিত্যসুধাসার, রামকবিতাবলী।

অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়—হিন্দী পণ্ডিত ও কবি। জন্ম—১৮৬৫ খৃঃ আজমগড়। কর্ম—কানুনগো। হিন্দী গ্রন্থ—রসিক-রহস্য, প্রিয়প্রবাস, ঠেট হিন্দী কী ঠাট, প্রদ্যুম্ন-বিজয়, ভেনিস কা ব্যাপারী, অধখিলা ফুল, রিপভ্যান্ উইন্কল, কৃষ্ণকান্ত কা দপ্তর, মহাকল্পা, কাব্যোপবন উদ্বোধন, প্রেমাম্বুবারিধি, প্রেমাম্বুপ্রস্রবণ, প্রেমপ্রপঞ্চ, প্রেমশতক, নীতিনিবন্ধ, বিনোদবাটিকা, উপদেশ-কুসুম।

অয়স্কান্ত বক্সী—নাট্যকার। নাট্যগ্রন্থ—ভোলা মাষ্টার, খুনী, ডাঃ মিস্ কুমুদ।

অরবিন্দ ঘোষ, ঋষি শ্রীঅরবিন্দ—মহাপুরুষ ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭২ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট কলিকাতা। মৃত্যু—৫ই ডিসেম্বর,১৯৫০ পণ্ডিচেরীতে। পিতা—ডাঃ কে,ডি, ঘোষ। শিক্ষা ১৮৭৯ খৃঃ—ইংলণ্ডে গমন, ১৮৯০ খৃঃ সিনিয়র ক্লাসিক্যাল বৃত্তি। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা। ১৮৯৩ খৃঃ বরোদায় কর্মগ্রহণ। ১৮৯৩ হইতে ১৯০৬ খৃঃ পর্যন্ত গাইকোবাড়ে কর্ম এবং পরে বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ। ১৯০৫ খৃঃ হইতে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান। এই সময়ে বন্দে মাতরম্ পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ১৯০৭ খৃঃ রাজদ্রোহের জন্য অভিযুক্ত। ১৯০৮ খৃঃ আলিপুর বড়যন্ত্র মামলায় ধৃত এবং ১৯০৯ খৃঃ মুক্তি। ১৯১০ সাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত পণ্ডিচেরীতে সাধনা ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন।

সম্পাদিত সাময়িক পত্র—কর্মযোগিন্ (ইংরেজি), ধর্ম (বাংলা), আর্য (১৯১৪); গ্রন্থসমূহ—Isha-upanishad, Essays on Gita, Life Divine, Synthesis of yoga. The Mother (কলি, ১৯১৮)। The Yoga and its objects, Yogic Sadhana, Ideal and Progress. The Superman, Evolution, Thoughts and Glympses, Ideals of the Karmogagin (চন্দননগর, ১৯২১)। War and self-determination, The Renaissance in India (চন্দননগর, ১৯২০)। The Brain of India (চন্দননগর, ১৯২৩)। A system of National Education, The National value of art, The need in nationalism, Rishi Bankimchandra, Uttarpara Speach, Songs to Myrt lla, Love and death, Outway of life, Baje Prabhon, The Ideal of Human unity, The age of Kalidasa, Kalidasa's season, Dayanand and the Veda, Katha-upanishad speeches, Ahava Urvasie, Hero and the nymph, Riddle of this world (কলি, ১৯৩৩)। ধর্ম ও জাতীয়তা, গীতার ভূমিকা, কারা-কাহিনী, অরবিন্দের পত্র, জগন্নাথের রথ, কর্মযোগী, ভারতের নবজন্ম। Speeches of Aurobindo Ghosh (চন্দননগর, ১৯২০)।

অরবিন্দ দত্ত—ঔপন্যাসিক। জন্ম—খুলনা জেলার খেশরা গ্রামে। পিতা—দ্বারকানাথ দত্ত। গ্রন্থ—প্রণয়-প্রতিমা (১৩২৬), যমুনাবাগ,দী (১৩৩২), রক্তের টান (১৩৩৮), পিপাসা (১৩৪৩), কামিখ্যের ঠাকুর (১৩৪৪)। যুগ্ম সম্পাদক—তপোবন (১৩৪৫)।

অরিসিংহ—প্রাচীন কবি। ১২শ শতাব্দীতে বর্তমান। কাব্যগ্রন্থ—সুকৃত সংকীর্ত্তন। এই গ্রন্থ George Buehler ১৮৮৯ খৃঃ সম্পাদনা করেন।

অরুণচন্দ্র দত্ত—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। গ্রন্থ—যুগের বাংলা (১৩৪০), প্রাচ্যের জাগরণ (১৩৩১), অরবিন্দ মন্দিরে (১৯২১), উক্তি ও উৎসর্গ গীতা (১৩২৫), অনুশীলনী, ১ম খণ্ড (১৩৪১), Spiritual Communism (১৯২২)। সম্পাদক—Standard Bearer (ইং), নবসঙ্ঘ।

অরুণচন্দ্র গুহ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীবনের বসন্ত (গল্প), রূপকথা (প্রবন্ধ। ১৩৫৭) বিজয়ী প্রাচ্য, ভাবী এসিয়া।

অরুণ দত্ত—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্। পিতা—মৃগাঙ্ক দত্ত। গ্রন্থ—'অষ্টাঙ্গহৃদয়ের' সর্বাঙ্গসুন্দর নামে টীকা, সুশ্রুতটীকা।

অরুণেন্দ্রনাথ মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রয়েল অঞ্জন ব্রিজ।

অর্চট—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। অপর নাম—ধর্মোত্তরাচার্য। আবির্ভাব কাল ৮৪৭ খৃঃ। নিবাস কাশ্মীর। গ্রন্থ—হেতুবিন্দুবিবরণ, তর্কটীকা।

অর্জ্জুন মিশ্র—টীকাকার। টীকাগ্রন্থ—ভাবদীপ, কুসুমাঞ্জলির টীকা।

অর্জুন মিশ্র—শ্রীমদ্ভগবদগীতার এক জন টীকাকার।

অর্জুন মিশ্র—টীকাকার। জন্ম—(আনুঃ ১৪০০ খৃঃ) বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের চম্পাহিট্টীয় (চম্পাটিগাক্রি) কুল। পিতা—ঈশান মিশ্র। টীকাগ্রন্থ—মহাভারতার্থসংগ্রহ (প্র) দীপিকা, ভারতার্থদীপিকা।

অলক—গ্রন্থকার। পিতা—রাজানক জয়ানক। গ্রন্থ—বিসমপ্রমোদ্দত, অলঙ্কারসর্বস্বটীকা।

অলকা মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিকা। গ্রন্থ—নিরঞ্জনা, তোমারই, নন্দিতা, বিচিত্রিতা (সম্পাদিতা)।

অবনীকৃষ্ণ বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাঙালীর সার্কাস।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিল্পী এবং সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৭১ খৃঃ কলিকাতা জোড়াসাঁকোয়। পিতা—গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষা—সংস্কৃত কলেজ এবং Signor Gilhardi ও Mr. Palmerএর নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষালাভ। কলিকাতা সরকারী চিত্রকলা বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ও কিছু কাল অধ্যক্ষ (১৯০৫—১৯১৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক। বিশ্বভারতীর আচার্য, সি, আই, ই, (১৯১২) এবং ডক্টর উপাধিলাভ। Society of Oriental Art-এর প্রতিষ্ঠাতা। ইহার শ্রেষ্ঠ শিল্প—'নির্বাসিত যক্ষ, শাহ্‌জাহানের মৃত্যু। গ্রন্থ—রাজকাহিনী ১ম, ২য়, ক্ষীরের পুতুল, ভূতপত্রীর দেশ, বাংলার ব্রত (১৩৫০), ভারতশিল্পে মূর্ত্তি (১৩৫৪), আলোর ফুলকি (গল্প), সহজ চিত্রশিক্ষা, পথে বিপথে (গল্প), ঘরোয়া (শ্রীরাণী চন্দ সহ), জোড়াসাঁকোর ধারে (শ্রীরাণী চন্দ সহ)। খাতাঞ্চীর খাতা (শিশু), আমাদের বিশ্বকবি (নৃপেন বসু সহ), আপন কথা (শি), শকুন্তলা (শি), The Parrot's training (চিত্রগ্রন্থ। নন্দলাল বসু সহ)।

অবনীনাথ রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অতীশ দি গ্রেট, পাঁচমিশেলী, বঙ্গপ্রতিভা, অনুচ্চারিত, প্রবাসী বাঙ্গালী।

অবলাকান্ত সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সংসার-নীতি (কলিঃ ১২১৬)

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল—সাহিত্যিক ও সম্পাদক। গ্রন্থ—তচনাচ (১৩৪০), ঝড়ের পরে, সব মেয়েই সমান, সম্পাদিত সাপ্তাহিক—বাতায়ন।

অবিনাশচন্দ্র দাস—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬৭ খৃঃ বাঁকুড়া জেলায় কোতলপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৯৩৬ খৃঃ ৫ই সেপ্টেম্বর। পি-এচ্, ডি—১৯২০। বাঁকুড়া গভর্ণমেন্ট স্কুলের শিক্ষকতা ও পরে স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর, আজিমগঞ্জ ষ্টেটের ম্যানেজার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। গ্রন্থ—সুকথা (প্রবন্ধ। ১৩০০ বঙ্গ), সীতা (প্রবন্ধ), পলাশপ্ন, কুমারী, অরণ্যবাসী, দুর্গারাণী (উপন্যাস), নাটক—প্রভাবতী, দেবব্রত। বৈশ্যজাতি (ইংরেজি। ১৯০৩)। সম্পাদক—স্বদেশ (সাপ্তাহিক), বেঙ্গলী সংবাদপত্র (সহ-সম্পাদক)। Rigvedic India (১৯২১), Rigvedic culture (১৯২৫)।

অবিনাশচন্দ্র নিয়োগী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—দর্শক (১৮৭৫)।

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার—অনুবাদক। জন্ম—কানপুর। কর্মক্ষেত্র—লাহোর। মৃত্যু—১৩৩২ বঙ্গ। অনুবাদ গ্রন্থ—"রূপজী"র অনুবাদ (এলাহাবাদ), জগজ্জী, রহরাস। সম্পাদিত ইংরেজি পত্র

অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গীতা, চণ্ডী।

অশোক আচার্য—বৌদ্ধ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সামান্যদূষণদিক্‌প্রকাশিকা (ন্যায়গ্রন্থ)।

অশোক গুহ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দেশ-বিদেশের লেখা ১ম, ২য়, ৩য় (১৩৫৪)। এক যে ছিল যাদুকর (গ), অগ্নিগর্ভ (উ)।

অশোক মল্ল—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—নিঘণ্টুসার।

অশোক মেটা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আঠারো শ' সাতান্নর বিদ্রোহ (ইতিহাস)।

অশ্বঘোষ—বৌদ্ধ গ্রন্থকার। জন্ম—খৃঃ ১ম শতাব্দীর শেষভাগে সাকেত নগর। পিতা—সুবর্ণাক্ষী। ইনি মহারাজ কণিষ্কের সভাকবি। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণ, পরে বৌদ্ধ হন। গ্রন্থ—বুদ্ধচরিত, মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রম্।

অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—টোটকা চিকিৎসা, ১—৫ ভাগ। শুশ্রূষা ও নার্সিং শিক্ষা, ১ম, ২য়। আকস্মিক বিপদাপদ চিকিৎসা, পাঁচন ও তাহার ব্যবহার শিক্ষা।

অশ্বিনীকুমার ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পঞ্চচন্দ্রিকা।

অশ্বিনীকুমার দত্ত—দেশভক্ত জননেতা ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫৬ খৃঃ ২৫ জানুয়ারী বরিশাল জেলার বাটাজোর গ্রামে। মৃত্যু—১৯২৩ খৃঃ ৭ই নভেম্বর কলিকাতা, ৫১ নং চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ ভবনে। পিতা ব্রজমোহন দত্ত। শিক্ষা—বি, এ (কৃষ্ণনগর কলেজ—১৮৭৮ খৃঃ), এম-এ (১৮৭৯ খৃঃ), বি-এল (১৮৮০), কর্ম—শিক্ষকতা ও ওকালতী। ১৮৮৪ খৃঃ ২৭এ জুন—ব্রজমোহন ইনস্‌টিটিউশন স্থাপন, ১৮৮৯ খৃঃ ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান (১৯০৫), কারাবাস (১৯০৮—১০)। গ্রন্থ—ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, প্রেম, দুর্গোৎসব-তত্ত্ব, ভারতগীতি।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—বরদা ডাক্তার, জমাখরচ, স্ত্রী, পথের স্মৃতি, মাটির স্বর্গ, মুক্তাঝরি। রসের নাড়ু (শি), জগদীশের দিগ্‌দারী (না), মিস্ মায়া বোর্ডিং হাউস (উ)।

অসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (ডক্টর) গ্রন্থকার। গ্রন্থ—লাভজনক কৃষি।

অসীমা চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—ভারতের বনৌষধি (১৩৫৩)।

অহিভূষণ ভট্টাচার্য—গীতিনাট্যকার। নিবাস—কল্যাণপুর (হাওড়া)। গ্রন্থ—উত্তরা পরিণয় (১৯০১), দণ্ডীপর্ব, তুলসীলীলা, রাই উন্মাদিনী, বামনভিক্ষা, সুরথউদ্ধার, রত্নাবতী, বোধনে বিসর্জন, রামাশ্বমেধ, কংসবধ (১৯০৮)।

আইনাথ—নাথপন্থী সাধু। গ্রন্থকার—আইনাথ রুদ্রকুল।

আউলিয়া মনোহর দাস—বৈষ্ণব পদকর্তা। জন্ম—১৬শ শতাব্দী। গ্রন্থ—পদসমুদ্র (সংগ্রহ গ্রন্থ), দিনমণি চন্দ্রোদয়।

আজিম আলী (মীর)—মুসলমান কবি। জন্ম—আগ্রা। গ্রন্থ—'সিকান্দার নামা'র অনুবাদ (১৮৪৪)।

আজুরি (শেখ)—কবি ও সাধু। প্রকৃত নাম—জলালুদ্দিন হামজা। জন্ম—১৩৮০ খৃঃ খোরাসান। মৃত্যু—১৪৬২ খৃঃ। গ্রন্থ—জবাহির উল অস্‌রার, তুখরাই হুমায়ুন, সম্রাটফল, বাহ্‌মন-নামা (দীবান)। [ক্রমশঃ।

জেন অস্টিনের

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মিঃ বেনেটের নিজের সম্পত্তি বছরে দু'হাজারের মতো। তাও সব ক'টি মেয়ে থাকার জন্য এবং পুরুষ-সন্তান না থাকায় কোন এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের হাতেই শেষ অবধি যাবে। মা উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছিলেন চার হাজার। কিন্তু তাতে এ সংসারের অভাব মোচন হত না।

মেয়েদের এক মেসো মশায় থাকেন অনতিদূর মেরিটন সহরে। মেরিটন থেকে লংবোর্ণ এক মাইল। সুতরাং মেয়েগুলি সপ্তাহের মধ্যে তিন-চার বার এই সামান্য পথ অতিক্রম করে মাসীর কাছে যাতায়াত করত। বিশেষ করে কনিষ্ঠ দু'টি ক্যাথরিন ও লিডিয়া এই ভাবে নিজেদের কর্মহীন দিনগুলিকে যথাসম্ভব নূতনত্বে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করত। মাসীমা'র কাছে পাওয়া নূতন নূতন খবর নিয়ে তারা ফিরত বাড়ীতে, সেখানে আলোচনা হোত সকলের মধ্যে।

সম্প্রতি সে গল্পের খোরাক বেড়েছিল। মেরিটনে সদর অফিস করে এক সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছিল। সারা শীতকাল তারা এখানে থাকবে এই রকমই খবর।

মেসো মশায় ফিলিপস এখানকার অফিসার-মহলে খুবই পরিচিত। তার মারফৎ মেয়ে দু'টি অফিসারদের সম্বন্ধে অতি ঘনিষ্ঠ সব সন্দেশ বহন করে নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে পরিবেশন করত আনন্দের সঙ্গে। এমনি করে দিনে দিনে অফিসাররা তাদের চেতন-অবচেতন মানসকে এমন গভীর ভাবে আচ্ছন্ন করে তুলল যে, ক্যাথারিন ও লিডিয়ার শয়নে-স্বপনে, ঘুমে-জাগরণে আর কোন কথা বা চিন্তা রইল না অফিসারদের বিষয় ভিন্ন। মায়ের চিত্ত-বিমোহনকারী যে নাম ও সম্পত্তির পরিমাণ, সেই বিংলে তাদের চোখে নিষ্প্রভ হয়ে গেল কখন। অফিসারদের সজ্জাড়ম্বর তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল একেবারে।

তাদের কথাবার্তায় এক দিন মিঃ বেনেট শান্ত কণ্ঠে মন্তব্য করলেন—'আগে আমার অনুমান মাত্র ছিল কিন্তু এত দিনে আমি স্থিরনিশ্চয় হলাম যে, এ গাঁয়ের সব মেয়ের মধ্যে আমার দু'টি ছোট মেয়েই অতি অর্বাচীন।'

মা স্বামীর কথার প্রতিবাদ করলেন—'কি করে যে নিজের মেয়েদের বোকা ভাবতে পার আমি ত ঠাওরাতে পারি না। নিজের মেয়েদের সম্বন্ধে—'

'নিজের মেয়েরা বোকা হলে তাদের বিষয়ে আমার মন সজাগ থাকাই উচিত আশা করি।'

'কিন্তু সত্যি ত তারা কিছু নির্বোধ নয়।'

'ঐ একটি বিষয়ে তোমায় আমায় মতে মেলে না।'

'কিন্তু এ কথা ভুলো না যে, আমাদের মত বিজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে না তারা ঐ কচি বয়সে। আমাদের বয়স যখন ওরা পাবে, তখন আর অফিসার সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল অত উদগ্র থাকবে না। আমারও এক সময় বয়স ছিল যখন একটা লাল জামার ভারী লোভ ছিল, আজও সে লোভ যায়নি মন থেকে। তা ছাড়া কোন চার-পাঁচ হাজারী কর্ণেল যদি আমার কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়, আমি তাকে বিমুখ করব না নিশ্চয়ই।'

এমন সময় এক জন বেয়ারা এসে ঘরে প্রবেশ করায় এঁদের কথাবার্তায় সাময়িক বিরতি ঘটল। নেদারফিল্ড থেকে বেয়ারা এসেছে জেনের জন্যে চিঠি নিয়ে—হাতে জবাব নিয়ে যাবার জন্যে। মিসেস্ বেনেটের দু'টি চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে। পত্র পড়ছিল যতক্ষণ জেন, তিনি মেয়েকে উদ্দেশ করে বলছিলেন—'কি মা—কে দিয়েছে? কি লিখেছে সে। বল না মা, আমি যে আর স্থির থাকতে পাচ্ছি না। কি লিখেছে পড়ে শোনা আমায়।'

'মিস্ বিংলে লিখেছে' বলে জেন চিঠিখানি উচ্চ কণ্ঠে পড়ে শোনাল—

প্রিয় বান্ধবী,

'আজ যদি তুমি ভাই এসে আমাদের সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে না বসো, তা হলে আমরা দু'টি মেয়ে এমন ঝগড়া করব যে আর চিরজন্মে আমাদের ভাব হবে না। চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে ভাই। দাদা আর আমাদের অতিথি মানুষটি আজ অফিসারদের সঙ্গে খানাপিনা করবেন। ইতি

ক্যারোলিন বিংলে।

'অফিসারদের সঙ্গে খাবেন ওরা? কই, মাসী ত আমাদের বললে না!' লিডিয়ার বিস্মিত কণ্ঠ শোনা গেল।

'বাইরে খাওয়া-দাওয়া হবে' বললে মা—'তবে আর কি হবে?'

'আমি গাড়ী নিয়ে যাবো মা।' জেনের মিনতি শোনা যায়।

'না মা, তার চেয়ে বরং ঘোড়া নিয়ে যা। যেমন করে আছে আকাশ, বৃষ্টি হতে পারে। তাহলে তোকে ত সারা রাত ওখানে থাকতে হবে।'

'সে ভারী মজার হবে' বললে এলিজাবেথ, 'যদি না ওরা ঝড়-বাদলেও ওকে বাড়ী পৌছে দিয়ে যায়।'

শেষ অবধি তাই স্থির হোল। ঘোড়ায় চড়ে যাওয়াই মনস্থ করলেন সকলে। মা জেনকে দরজা অবধি পৌছে দিয়ে গেলেন। পুলকিত মুখে ঝড়-বাদলের প্রত্যাশা করে তাকে বিদায় দিলেন।

মায়ের কথাই ফলল। কিছু দূর যাবার পরেই বৃষ্টি নামল জোরে। বৃষ্টি দেখে বোনেরা ব্যস্ত হলেও মায়ের খুশীর অন্ত রইল না। সারা সন্ধ্যা অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ হতে থাকল। আজ আর জেন ফিরতে পারবে না।

কত বার বললেন তিনি—'ঘোড়া দিয়ে পাঠিয়ে কি বুদ্ধি খাটিয়েছি বল ত?'—যেন আজকের এই খর বর্ষা তাঁরই ইচ্ছা-শক্তির সৃষ্টি!

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর জেনের চিঠি এল এলিজাবেথের নামে।

'প্রিয় বোনটি,

গত কাল ঐ পরিমাণ ভেজার ফলে আজ সকালে শরীর ভারী খারাপ হয়েছে। বেশ সুস্থ না হওয়া অবধি এরা আমায় ছাড়তে চাইছে না। এরা ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছে, এবং তিনি এসে না দেখা অবধি এরা কোন কথা আমার শুনতে চায় না। তোরা কিছু ভাবিস না, সামান্য গলায় ব্যথা আর মাথা-ধরা ভিন্ন আমি বেশ সুস্থই আছি।'

'দেখলে ত' বললেন মিঃ বেনেট চিঠির মর্মার্থ শুনে—'দেখলে ত কি হোল! এখন যদি তোমার মেয়ে ভারী অসুখে পড়ে কিংবা যদি তার ভালো-মন্দ কিছু হয়, আমি এই জেনে সুখী থাকব যে, ঐ বিংলের জন্যেই মেয়ের আমার অমন হোল আর সে তোমার বুদ্ধি মত।'

'অমন অলুক্ষণের ভয় আমার নেই। জানো। অত সামান্য অসুখে লোকে মরে না। যেখানে আছে সেখানে তার যত্নের অভাব হবে না। দরকার হলেই আমি নিজে গিয়ে তাকে দেখে আসব যদি গাড়ীর ব্যবস্থা করতে পারি।'

সব থেকে বিচলিত দেখাল এলিজাবেথকে। গাড়ী না পাওয়া গেলে সে পদব্রজেই যাবে দিদিকে দেখতে। কেন না ঘোড়ায় চেপে যাওয়া তার হবে না, ঘোড়ায় সে উঠতে পারে না।

তার কথা শুনে মা আগুন হয়ে বললেন—'কি যে বলিস তুই ছাইভস্ম! এই ধুলোয় এত পথ হেঁটে গিয়ে যে চেহারা হবে তা নিয়ে আর ভদ্রসমাজে তুই দাঁড়াতে পারবি না।'

'অন্ততঃ দিদির সামনে দাঁড়াতে আমার বাধবে না।'

বাবা বললেন—'তুমিও কি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে বলছ মা আমায়?'

'না বাবা। হেঁটেই যাব আমি। ঐটুকু পথ ইচ্ছে করলেই হেঁটে যাওয়া যায়।'

'তোমায় মেরিটন অবধি আমরা পৌছে দিতে পারি' বললে ক্যাথারিন আর লিডিয়া। সুতরাং তিন বোন যাত্রা করল।

মেরিটনে এসে তারা ভিন্ন পথ ধরল। দু'টি ছোট বোন এক অফিসারের স্ত্রীর বাসায় গিয়ে উঠল আর এলিজাবেথ একা মাঠ পেরিয়ে, খানা ডিঙিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। কত দূর যাবার পর বিংলেদের বাসা চোখে পড়ল। তখন তার পায়ে রীতিমত ব্যথা লাগছে। মোজাগুলি ধুলায় ধূসর হয়েছে। পরিশ্রমে সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে ডালিমের মতো!

এ বাড়ীতে তখন প্রাতরাশের টেবিলে সবাই সমবেত হয়েছে কেবল জেন ভিন্ন। তাকে দেখে সবাই রীতিমত চমকিত হোলেন। এলিজাবেথ যে এই দীর্ঘ তিন মাইল পথ একলা হেঁটে এসেছে এই সকাল বেলা এই বিশ্রী আবহাওয়ায়, এ যেন দু'টি স্ত্রীলোকের কাছে অবিশ্বাস্য বোধ হতে লাগল। দু'জনেই তাকে শান্ত সৌজন্যের সঙ্গে গ্রহণ করলে ভিতরের ভাব গোপন করে। বিংলে এই মেয়েটির প্রতি মমতায় ও কৌতুকে পূর্ণ হয়ে উঠল। ডারসি কথা বললে খুব কম। এই সুন্দরী মেয়েটির মুখে যে পরিশ্রমের লাবণ্য ফুটে উঠেছিল, তাই দেখতে লাগল সে চেয়ে চেয়ে নির্বাক্ মুখে।

সারা রাত ভালো ঘুম হয়নি জেনের। আজও সকালে সে ঘর ছেড়ে আসেনি বাইরে। এলিজাবেথ তখুনি ভগিনী সন্দর্শনে গিয়ে উপস্থিত হোল। এত যত্ন ও স্নেহের উপরে আরও কিছু প্রত্যাশা করে অবিচার করার ভয়ে যদিও এ অবধি জেন কোন কিছু বলেনি, কিন্তু এলিজাবেথের এই অপ্রত্যাশিত প্রীতির পরিচয়ে সে-ই সর্বাধিক খুসী হয়ে উঠল। যদিও শরীরের জন্য সে খুব বেশী আলাপ করতে পারল না কিন্তু দুই বোনে নীরবে পরস্পরকে ভালোবাসল সেই সকাল বেলা!

প্রাতরাশের পর সকলে এসে উপস্থিত হলেন। এতক্ষণে এলিজাবেথ দেখলে এরা সবাই কত ভালোবাসে জেনকে। তাই তারও ভালো লাগল এই পরিবারকে। ডাক্তার এসে তাকে পরীক্ষা করে পূর্ণ বিশ্রামের উপদেশ দিলেন। ঔষধ ও পথ্যেরও ব্যবস্থা করে দিলেন। বেলা যত বাড়তে লাগল রোগীর অস্বস্তিও বাড়তে লাগল। পুরুষেরা বাইরে গিয়েছিলেন সব। সুতরাং এলিজাবেথ আর এ-বাড়ীর দু'টি নারী—তিন জনে জেনের সেবায় আত্মমগ্ন হলো। তাদের আর কিছু কাজও ত ছিল না সংসারে।

বিকেল তিনটে বাজলে এলিজাবেথ বাড়ী ফেরার কথা তুললে। মিস্ বিংলে তৎক্ষণাৎ তার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বিদায়-ক্ষণে জেন এমন উতলা হয়ে উঠল বোনের জন্য যে বাধ্য হয়ে এলিজাবেথের সেদিন যাওয়া ঘটে উঠল না। তার পরিবর্তে এক জন চাকর লঙবর্ণে যাত্রা করল তাদের সংবাদ পৌছে দিতে ও ফেরার সময় দুই ভগিনীর কিছু পরিধেয় বাস নিয়ে আসতে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাঁচটার কিছু পরেই দুই জনে বৈকালিক প্রসাধন সেরে এলিজাবেথকে আহারে আমন্ত্রণ করলে। বিংলের কণ্ঠেই দুশ্চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ অনুভব করতে পারলে এলিজাবেথ। তাকেই বিশেষ করে জানালে সে যে, জেন বিকালের দিকেও এতটুকু সেরে উঠতে পারেনি। দুই বোনে' কত বার করে দুঃখ প্রকাশ করলে যে এমন ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার কত কষ্ট, তাদের নিজেদের হলে কি বিশ্রী লাগত তাদের। তার পর সে সব কথা ভুলে গেল, এখন তাসের মজলিস বসল বসার ঘরে। এলিজাবেথের মন বিষিয়ে গেল তাদের এই লঘু-চিত্ততায়।

খাওয়ার পরেই এলিজাবেথ দিদির ঘরে ফিরে এল। সে ঘর

থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদের মধ্যে কথাবার্ত্তা সুরু হোল এলিজাবেথকে নিয়ে।

মেয়ে দু'টি কটু কণ্ঠে এলিজাবেথকে নিন্দা করতে লাগল।

'তিন মাইল হোক, চার মাইল, পাঁচ মাইল—মাইল বংই হোক না কেন, ঐ ধূলো-কাদায় ঐ ভাবে একলা চলে আসা রীতিমত অসভ্যতা বলব আমরা। কি বোঝাতে চায় সে আমাদের? আমার ত মনে হয়, এ এক রকম আধা-সহুরে নারী-প্রগতির নমুনা। ভদ্রতার লেশ মাত্র নেই মেয়েটার।'

'দিদির প্রতি ওর প্রীতি-মমতা দেখে আমার ত ভারী ভালো লেগেছে' বললে বিংলে।

বিংলের বোন ডারসিকে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বললে—'আমার ত মনে হয় ওর, দু'টি ডাগর চোখই আপনার মনকে এমন করে আচ্ছন্ন করেছে—আর কিছু নয়।'

'না না, তা নয়। ঐ পরিশ্রান্ত মুখের আশ্চর্য সুন্দর সুষমা আমার মনে সত্যি যাদু লাগিয়েছে বলতে পারেন।'

বড় বোনটি বললে—'আমার নিজেরও ভারী ভালো লাগে জেনকে। ভারী মিষ্টি মেয়ে। ভালো ঘর-সংসারে ওর বিয়ে হোক এই আমার ইচ্ছা আন্তরিক। কিন্তু অমন মা-বাপ আর এই সব অসভ্য আত্মীয়-পরিজন থাকতে কোন অভিজাত সমাজে ওকে স্থান দেবে বলে আমার ত মনে হয় না।'

জেনকে অনেকটা সুস্থ করে ঘুম পাড়িয়ে এলিজাবেথ নেমে এল বসার ঘরে। তখন তাসের খেলা চলেছে পুরা দমে। সুতরাং ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে সে একখানা বই নিয়ে তাতে মন দিলে।

'সে কি! তাসের চেয়ে বই পড়া আপনার বেশী ভালো লাগে মিস্ বেনেট?'

বিংলের ছোট বোন শ্লেষ মিশিয়ে বললে—'মস্ত জ্ঞানী মেয়ে। বই পড়া ভিন্ন আর সব কিছুতেই ওঁর বিরক্তি, জানেন না বুঝি?'

'এ ভাবে নিন্দা-প্রশংসার যোগ্যা আমি নই। অন্য অনেক কিছুর মত বই পড়াতেও আমার মন আনন্দ পায়।' বললে এলিজাবেথ।

'কেন, বড় বোনটির সেবাতেও ত উৎসাহের কার্পণ্য দেখছি না—' উত্তর দিলে বিংলে—'সত্যি, আমরা সবাই আশা করছি যে তিনি শীঘ্রই নিরাময় হয়ে উঠবেন!'

তাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানিয়ে এলিজাবেথ আর একটু এগিয়ে গেল টেবিলের ধারে, যেখানে কয়েক খণ্ড বই এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে ছিল। বিংলে তৎক্ষণাৎ তার পাশে এসে দাঁড়াল, 'যদি অনুমতি করেন ত আমার ছোট লাইব্রেরীটুকু দেখাতে পারি আপনাকে। সত্যি, খুবই ছোট। সামান্য লোক ত আমি, তার উপর এক দম অলস ত।'

তাকে বিরত করলে এলিজাবেথ। 'ঠিক আছে। মিছিমিছি আপনি কষ্ট করবেন না মিঃ বিংলে।'

কতক্ষণ পড়ার পর এক সময় খেলার আকর্ষণে এলিজাবেথ এসে বসল টেবিলের পাশে। খেলার সঙ্গে সঙ্গেই গল্প হচ্ছিল।

'কত বড়ো হয়েছে আপনার বোন মিঃ ডারসি? আমার মতো লম্বা হয়েছে?'

'তা হয়েছে। মিস্ বেনেটের মতোই হবে কিংবা আর একটু বেশীই হবে।'

'ভারী দেখতে ইচ্ছে হয় তাকে। অমন সুন্দর মেয়ে খুব কমই দেখেছি আমি। যেমন রূপসী তেমনি গুণান্বিতা। ঐ বয়সে কি মিষ্টি হাত পিয়ানোয়।'

'আমার ত অবাক লাগে, তোমরা সবাই অল্প বয়সে কত মার্জিত হয়ে উঠতে পারো তাই দেখে,' বিংলে বোনকে বললে।

'সবাই? তার মানে?'

'কেন, সবাই নয় কেন? সবাই টেবিলে ফুল তোলে, পর্দা সাজায়, পুতিব্যাগ বোনে। এমন কোন মেয়ে আছে বলে আমি ত জানি না যে এ সব কাজ না জানে। আর এমন কোন মেয়ের কথাও আমি শুনিনি, প্রথম দর্শনে যাকে সবাই মহা রূপসী আর মার্জিতা মেয়ে বলে লোকে রায় দেয়নি।'

ডারসি এ কথায় সায় দিল না—'আমার পরিচিত মহলে তেমন মেয়ের সংখ্যা দশ জনও নয়।'

'আমারও তাই মত' বিংলের বোনও এ কথায় যোগ দিল।

'সে ক্ষেত্রে গুণবতী মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার ধারণার মর্মগ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন।' বললে এলিজাবেথ।

'নিশ্চয়ই। অনেক কিছু হলে তবেই তাকে গুণবতী বলব।'

বিংলের বোনও যোগ দিলে—'সত্যিই ত। আশে-পাশের আরও দশ জনের চেয়ে যে ভালো হবে তাকেই গুণবতী মেয়ে বলব। যে মেয়ে অত বড়ো সুখ্যাতি পাবার যোগ্যা, সে নাচ-গান-আঁকা সব বিষয়ে পারদর্শিনী হবে। তা ভিন্ন তার চলনে-বলনে-ব্যবহারে এমন একটা স্নিগ্ধতা থাকবে যা সচরাচর চোখেই পড়ে না।'

ডারসি এর সঙ্গে যোগ দিলে আবার—'আরও কিছু প্রয়োজনীয় থাকা চাই। মানসিক বৃত্তিগুলির উন্মেষের জন্য তার সুপাঠিকা হওয়াও প্রয়োজন।'

'জানা মেয়েদের মধ্যে তাই অত কম জনকে আপনার মনে ধরেছিল। অমন মেয়ে এক জনও পেলেন কি করে ভাবি?'

'কেন নিজেদের সম্বন্ধে আপনি এমন নিষ্ঠুর ভাবে নিরাশাবাদী?'

'কেন না, অমন মেয়ে আমার কখনো চোখে পড়েনি। অমন কান্তি, অমন রুচি, অমন গুণ, সর্বসমন্বিতা যেমন আপনি বর্ণনা করলেন এখুনি।'

এলিজাবেথের এ কথায় দুই বোনেই তার উপর আক্রমণ করার উপক্রম করল, কিন্তু ঠিক সেই সময় বিংলে এদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তাসের টেবিলে। সুতরাং সেইখানেই কথাবার্তা সাঙ্গ হোল।

অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে এলিজাবেথ তার দিদির ঘরের দিকে পা বাড়ালে। তার বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে ছোট বোন বললে—'এলিজাবেথ কেমন মেয়ে জানেন, মেয়ে জাতকে ছোট করে ও নিজের দাম বাড়াতে চায়। অনেক পুরুষের কাছে এ কৌশল দিব্যি খাটে। কিন্তু তা খাটলেও আমি বলব তার মধ্যে সুরুচি নেই।'

'নিশ্চয়ই।' ডারসি কথাটার ঝাঁঝ নিজের উপর টেনে নিয়ে জবাব দিলে—'মেয়েরা যত রকম ছলা-কলায় পুরুষকে ভোলায় তার সব ক'টিতেই এই কুরুচির পরিচয়। ছল-চাতুরী জিনিষটাই ত নিন্দার।'

এর পর আর সে সম্বন্ধে আলাপ অগ্রসর হল না।

সে রাত্রে জেনের অসুস্থতা হ্রাস পেল না এতটুকুও। বিংলে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সহরের বড়ো ডাক্তারকে আহ্বান করার প্রস্তাব করলে। কিন্তু স্থির হোল যে, সত্যিই যদি তেমন প্রয়োজন হয় তবে স্থানীয় ডাক্তারই কাল সকালে এসে দেখবেন, তার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। বার বার করে বিংলে সকলকে সতর্ক করে দিলে, এ বাড়ীর অসুস্থা অতিথির কোন অসুবিধা না ঘটে, তার সেবা-যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি না হয়, সেদিকে যেন সকলে লক্ষ্য রাখে।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রায় সারা রাত্রি এলিজাবেথ ভগ্নিনীর সেবায় কাটাল। প্রভাত যখন হোল অন্ততঃ এইটুকু সে আনন্দের সঙ্গে জানাতে পারলে বিংলের প্রেরিত দাসীকে যে জেন অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। দুই বোনও এসে খবর নিয়ে গেল রোগিণীর একটু পরে। কিন্তু তবু এলিজাবেথ স্বস্তি পেল না। লঙবোর্ণে মায়ের কাছে একটা খবর পাঠানো তার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হল। যেন তিনি নিজে এসে জেনকে দেখে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করেন। সেই মত পত্র পাঠান হোল। দুপুরের দিকে দুই ছোট মেয়ে সঙ্গী করে মা নিজে এসে পড়লেন।

যদি জেন সত্যিই গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়ত, মায়ের মন সত্যিই দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু জেনকে অনেকটা সুস্থ দেখে, তিনি তার পূর্ণ নিরাময়ের বিলম্ব কামনা করলেন। কেন না সুস্থ হোয়ে উঠলেই ত তাকে এ সংসার থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এদের নিকট-সান্নিধ্য থেকে। সুতরাং বাড়ী যাবার সমস্ত মিনতি জেনের মা না করলেন। ডাক্তারও এ অবস্থায় রোগীকে স্থানান্তরের উপদেশ দিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ জেনের সঙ্গে কাটিয়ে তিন মেয়েকে নিয়ে মা মিস্ বিংলের আমন্ত্রণে খাবার-ঘরে গিয়ে বসলেন। বিংলে সেখানে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এই প্রত্যাশায় যে, অন্ততঃ মিসেস্ বেনেট মেয়েকে বিপন্মুক্ত দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

'না, না, এ অবস্থায় জেনকে নড়ানোর পক্ষপাতী নই আমি। ডাক্তারও তাই বলেন। এ অবস্থায় আপনার আতিথ্যের উপর আর কিছু জুলুম আমরা করতে বাধ্য হব।'

'সে কি! ও ধারণা মন থেকে মুছে ফেলুন। আমার বড় বোন এ অবস্থায় মিস্ বেনেটকে কিছুতেই স্থানান্তরিত করতে সম্মত হবে না।'

'এখানে সকলে—' মিস্ বিংলে ঠাণ্ডা গলায় আশ্বাস দিলেন—'যত দূর সম্ভব সেবা-যত্ন হবে বলেই আমরা আশা করি। সে বিষয়ে আপনি নির্ভর করবেন আমাদের উপর।'

মিসেস্ বেনেট পর্য্যাপ্ত ধন্যবাদ দিয়ে বললেন—'সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নেই। আপনাদের মত সজ্জন সুহৃদ্ না হলে জেনের যে কি হোত তাই ভাবি। অমন যন্ত্রণা নিয়েও কি আশ্চর্য ধৈর্যের সঙ্গে যে ও সহ্য করতে পারে, তাতেই বোঝা যায় কতো শান্ত মেজাজ আমার ঐ মেয়ের। অন্য মেয়েদের আমি তাই বলি যে, জেনের যুগ্যি তোরা কেউ-ই নস। আর কি খাসা বাড়ী! এমন বাড়ী বাগান বড়ো দেখা যায় না। এমন পরিচ্ছন্ন বাসা সহজে ছাড়বেন না যে মিঃ বিংলে, তা যত অল্প মেয়াদেরই হোক না লীজ নেওয়া।'

'সে বলা যায় না, আমি ভারী ব্যস্তবাগীশ লোক। ঝোঁক হলে পাঁচ মিনিটেই আমি এ বাসা ছেড়ে চলে যাব। তবে এখন যা মনে হচ্ছে এখানেই আমি চিরস্থায়ী হলাম।'

'আপনার সম্বন্ধে আমারও তাই ধারণা।' বললে এলিজাবেথ।

'আপনি ত দেখছি আমার চরিত্র বুঝে নিয়েছেন।'

'নিশ্চয়ই। আপনাকে আমি পুরোপুরি চিনে নিয়েছি।'

'ভারী খুসী হলাম। কিন্তু এত সহজে চিনে নেওয়া আমার কাছে ভারী মর্ম্মান্তিক লাগে।'

'সত্যিই তাই। তবে আপনার মত স্বচ্ছ চরিত্রের লোককে সহজেই বোঝা যায়।'

'আমি জানতাম না মিস্ বেনেট যে আপনি এক জন মানব-চরিত্র অধ্যয়নে পারদর্শিনী মহিলা। চরিত্র-অধ্যয়ন এক মজার শাস্ত্র না?'

'জটিল যাদের চরিত্র, তারাই গবেষণার পাত্র হিসাবে অধিক আনন্দদায়ক।'

ডারসি বললে—'কিন্তু পল্লীগ্রামে তেমন বিচিত্র চরিত্র মানুষ পাওয়া যায় ক'টি। এ সকল জায়গায় মানুষ সেই ক্ষুদ্র পরিচিত গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকে।'

'তা হোক। তবু প্রত্যেকটি মানুষ এমন বদলায় যে, সব সময়ই তাদের চরিত্র বিশ্লেষণের খোরাক যুগিয়ে চলে।'

মিসেস্ বেনেট ডারসির এই পল্লীগ্রামের সংকীর্ণতার উল্লেখে ঈষৎ তপ্ত কণ্ঠে বললেন—'কিন্তু সে বদল ত সহরের মত পাড়াগাঁয়েও হয়।'

এ প্রত্যুত্তরে সবাই বিস্মিত হোল। মিসেস্ বেনেট বিজয়িনীর মত সকলের মুখে দৃষ্টিপাত করে বলে চললেন—'সহর লণ্ডন আমাদের গাঁয়ের চেয়ে কি যে আরাম-স্থল, তা বোঝা আমার বুদ্ধির অগোচর। কতকগুলো দোকান আর বাজার ছাড়া সেখানে এখান-কার চেয়ে আরামের ও সুবিধের কি আছে বলুন ত মিঃ বিংলে?

বিংলে জবাবে বললে—'আমিও যখন গাঁয়ে থাকি মনে হয় আর সহরে ফিরব না। আবার যখন নগরবাসী হই, মনে হয় না যে, আর গাঁয়ে দেশে ফিরি। সহর ও গ্রাম দুইয়েই নিজস্ব আরাম ও সুবিধা আছে। আমি ত সর্বত্র সমান সুখ পাই।'

'তার কারণ, আপনার মধ্যে সেই সুস্থ-বোধ আছে। কিন্তু ঐ ভদ্রলোক—'ডারসির দিকে অঙ্গুলি হেলন করে বললেন মিসেস্ বেনেট—'উনি ত ভাবেন যে, পাড়াগাঁ কিছুই নয়।'

মায়ের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে লজ্জিত হয়ে এলিজাবেথ দ্রুত কণ্ঠে বললে— 'তুমি ভুল করেছ মা। মিঃ ডারসি বলেন যে, সহরে মানব-চরিত্রের যত বৈচিত্র্য দেখা যায় আমাদের এখানে তা দেখা যায় না। এ কথা তুমিও নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।'

মায়ের অবাধ্য আচরণে এলিজাবেথ রীতিমত শঙ্কা বোধ করছিল। এ-কথা সে-কথায় সে মাকে আড়াল করে রাখল। তার পর এক সময় দুই বোনকে নিয়ে মা চলে গেলে এলিজাবেথ জেনের ঘরে ফিরে এসে বসল। সে জানল যে তার অবর্ত্তমানে এদের সংসারে কথার ঝড় উঠবে তাদেরই ক'জনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বিংলের ছোট বোনের সহস্র কৌতুক-পরিহাসেও ডারসি কিছুতেই এদের সকলের সঙ্গে এলিজাবেথের কটু সমালোচনায় যোগ দিল না।

দশম পরিচ্ছেদ

আর এক দিন একই ভাবে অতিবাহিত হল। দুই বোন দিনের কয়েক প্রহর রোগীর ঘরে কাটাল যেখানে জেন অতি মন্থর ভাবেই সুস্থ হয়ে উঠছিল। সারা দিন রোগীর কাছে কাটিয়ে সন্ধ্যা বেলা এলিজাবেথ বসার ঘরে এসে বসল। লেখার টেবিলের ধারে ডারসি চিঠি লিখছিল আর বিংলের ছোট বোনটি তার অতি নিকটেই বসে তার চিঠি লেখা দেখছিল এবং মধ্যে মধ্যে বড় বোনকে কোন বিষয়ে চেঁচিয়ে বলে পত্রলেখকের কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল। বিংলে ও তার ভগিনীপতি হার্ষ্ট দু'জনে তাস খেলছিল। বড় বোনটি তাই দেখছিল বসে।

সেলাই নিয়ে বসে এলিজাবেথ ডারসি ও তার সঙ্গিনীর মনোরম কথাবার্ত্তা শুনতে লাগল। যে ভাবে অবিশ্রান্ত প্রশংসা বর্ষণ করছিল মেয়েটি, সেই একতরফা সংলাপ শুনে এলিজাবেথের মনে অদ্ভুত কৌতুক সঞ্জাত হতে লাগল।

'আপনার চিঠি পেয়ে বোন খুব খুসী হবে না?'

কোন জবাব দিলে না ডারসি।

'উঃ, কি তাড়াতাড়ি লেখেন আপনি।'

'তাড়াতাড়ি কই? আমি ত বরং আস্তেই লিখি।'

'আচ্ছা, বছরে কত চিঠি লেখেন আপনি? ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠি-পত্র সমেত বলছি। উঃ, আমার ত ভাবতে ভয় লাগে।'

'বোনকে লিখবেন যে আমি তার দেখার অভিলাষিণী।'

'কলমের মুখটা ভোঁতা হয়ে গেছে। দিন না আমি ঠিক করে দি। আমি খুব সুন্দর করে কলম কাটতে পারি।'

'কি করে এত চিঠি লেখেন আপনি?'

ডারসি নিঃশব্দে আপন কাজে মগ্ন রইল।

'আপনি ওকে লিখে দিন যে বীণায় ওর হাত আরো দক্ষ হয়ে উঠেছে বলে মিস্ বিংলে আন্তরিক খুসী হয়েছে। আর যে টেবিল-ক্লথের প্যাটার্ণ পাঠিয়েছেন তিনি, সেটি ভারী চমৎকার।'

ডারসি অস্বস্তির সঙ্গে বললে—'এ সব কথা আমি পরের পত্রের জন্তে তুলে রাখলাম। এ পত্র-তরীতে আর ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই।'

'তাতে কি হয়েছে। জানুয়ারী মাসেই ত তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আচ্ছা, বোনটিকে আপনি বুঝি প্রতিবারেই এমনি দীর্ঘ লিপি পাঠান মিঃ ডারসি? আর এমন মনোহরা চিঠি?'

'মনোহর কি না জানি না, তবে অনেক লিখি এ কথা ঠিক।'

'আমার ত মনে হয়, যারা অনেক লিখতে পারে তাদের হাতের লেখাও ভাল হয়।'

বিংলে খেলা থেকে মুখ তুলে বললে—'ক্যারোলিন, তুমি থাম দেখি। ডারসি চার অক্ষরের শব্দ নির্বাচন করতে অভিধান হাতড়ে বেড়ায়। তাই নয় বন্ধু?'

'তুমি আর বলো না দাদা', বললে ক্যারোলিন, 'তোমার ত অর্দ্ধেক কথা পড়া যায় না, আর বাকী অর্দ্ধেক জ্যাবড়ে যায়।'

বিংলে হেসে বললে বোনকে, 'আমি যখন লিখি আমার মন এমন দ্রুত ছুটতে থাকে যে, অনেক সময় আমার চিঠি পড়ে কিছু বোঝা যায় না।'

'এ আপনার অতিশয় বিনয়'—এলিজাবেথ হেসে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে। 'তার চেয়ে বরং মিঃ ডারসি চিঠিখানি শেষ করে ফেলুন সুস্থ ভাবে।'

ডারসি এ মেয়েটির কথা মত কাজ করে শেষ করলে চিঠি। তার পর ক্যারোলিন আর এলিজাবেথকে একটু সঙ্গীত-উৎসবের জন্ত অনুরোধ জানাল।

তার অনুরোধে ক্যারোলিন প্রথমেই গিয়ে বসল পিয়ানোয় একটু যেন ব্যস্ত ভাবেই। মুখে একবার এলিজাবেথকে অনুরোধ করে, সে নিজে পিয়ানোয় হাত রাখলে সামান্ত প্রতিবাদ কোরেই।

ক্যারোলিন ও তার দিদি দু'জনে দ্বৈত ভাবে গান করলে। আর এলিজাবেথ টেবিলের উপর থেকে একখানি গান ও স্বরলিপির বই নাড়া-চাড়া করতে করতে আড়চোখে দেখলে যে, ডারসি তার দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে আছে। সে ত ভেবেই পায় না, অত বড়ো একটি মানুষ তার মত সামান্ত মেয়েকে এমন গভীর প্রীতির চক্ষে দেখেন কি করে! তার প্রতি যদি বিরাগী হবেনই তিনি, তবে অমন করে নানা ছলে কথার সূত্রে তাকে বাঁধবেনই বা কেন, তাকিয়ে দেখে দেখে তার আশা মিটছে নাই বা কেন? অবশেষে অনেক ভেবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল মনে মনে যে, লোকটির জীবন-দর্শনের পূর্ণ ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত বলেই হয়ত সে অত নিরীক্ষণের পাত্রী হয়েছে মানুষটির। অবশ্য এ অনুমান তার চিত্তকে এতটুকু বেদনার্ত্ত করতে পারলে না।

কয়েকটি ইতালীয় গান গেয়ে ক্যারোলিন হাল্কা স্কচ গানের সুরে ঘরের বাতাসকে লঘু করে তুলল। তার পর ডারসি এলিজাবেথের কাছে এসে বললে—'এই উৎসব-লগ্নে সকলের মন হরণ করার জন্ত একটু নাচতে লোভ হচ্ছে না আপনার?'

একটু হেসে এলিজাবেথ নিরুত্তর রইল। ডারসি পুনরায় প্রশ্ন করলে কিছুটা বিস্মিত হয়ে।

'আপনার প্রশ্ন আমি শুনেছি,' বললে সে, 'কিন্তু কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। একবার ভাবছিলাম বলব হাঁ, যাতে আপনি আমায় ঘৃণা করতে পারেন। ঘৃণা করে পৈশাচিক উল্লাস বোধ করতে পারেন। কিন্তু আমার বিশেষ আমোদ লাগে লোকের এই প্রকার বাসনাকে মার খাওয়াতে। তাই বলছি যে, আমি নাচব না আপনাদের সামনে—ইচ্ছে হয় আমায় ঘৃণা করুন, যদি সাহস থাকে।'

'না, সে সাহস আমার নেই।'

লজ্জায় ফেলার চেষ্টায় বিফল হয়ে এলিজাবেথ এই পুরুষটির সাহসিকতায় মুগ্ধ হল। তার চরিত্রে স্নিগ্ধতা ও কটুতার এমন এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ আছে যে, কাউকে সত্যি দুঃখ দেওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অপর পক্ষে, ইতিপূর্বে অন্য কোন মেয়ে এমন করে ডারসিকে কোন দিন মুগ্ধ করেনি। ডারসির এই আশংকা ছিল যে, ভাগ্যিস এই মেয়েটির জীবনে আভিজাত্যের জৌলুষ নেই, নইলে হয়ত ডারসির নিরাপদ দুর্গ বিপন্ন হত।

এ সবই লক্ষ্য করত ক্যারোলিন আর মনে মনে অসূয়াপ্রবণ হোত। প্রিয়সখী জেন সুস্থ হয়ে ওঠার শুভেচ্ছার সঙ্গে তার এলিজাবেথের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার বাসনা জড়িয়ে উঠত।

এই মেয়েটির প্রতি ডারসির চিত্তবিরাগ ঘনিয়ে তোলার জন্ত সে কখনো কখনো তার সঙ্গে এলিজাবেথের কল্পিত বিবাহের কথা উত্থাপন করত।

ক্যারোলিন বলছিল এক দিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে—'বিবাহের পর আপনি নিশ্চয়ই শাশুড়িকে একটু রসনা সংযত করতে উপদেশ দেবেন মিঃ ডারসি! আর ছোট-ছোট শালীদের একটু সতর্ক করে দেবেন ঐ ভাবে অফিসারদের মরীচিকার পিছনে ছুটতে। আর অবশ্য বলা উচিত কি না বুঝতে পারছি না, আপনার ভাবী বধূর ঐ মুখরা স্বভাব ও ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে তাকে একটু সজাগ করে দেবেন নিশ্চয়ই।'

'আমার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আর আপনার কি উপদেশ বাকী রইল মিস্ বিংলে!'

'আমি বলছিলাম যে, আপনাদের বসার ঘরে এলিজাবেথের মাসী ও মেসো মশায়ের ছবি দু'টি টাঙাবেন আপনার জ্যেঠা মশায়ের ছবির পাশে। আপনার জ্যাঠা হচ্ছেন জজ ও উনি এটর্ণি অফিসের কেরাণী। পদমর্যাদা সমান না হোক অন্ততঃ একই বিষয়ের মানুষ দু'জনেই। আর ভাবছি এলিজাবেথের কোন্ ছবিখানি আপনি রাখবেন। এ দেশের কোন শিল্পী যে ঐ সুন্দরী মেয়েটির অমন মৃগনয়ন আঁকতে পারবে ঠিক করে, তা আমার বিশ্বাস হয় না।'

ডারসি এবারে বললে, 'ঠিকই বলেছেন মিস্ বিংলে! চোখ, ভুরু, আঁখিপল্ম সবই হয়ত বা শিল্পীর রঙ-রেখায় প্রতিবিম্বিত হবে, কিন্তু সে দৃষ্টির গভীর ব্যঞ্জনা আঁকবার শিল্পী সত্যি দুর্লভ।'

অপর দিক থেকে এগিয়ে এল বিংলের বড় বোন আর এলিজাবেথ।

'আপনারাও বেরিয়েছেন! আমি ভেবেছিলাম হয়ত আপনারা আজ আর বেরোবেন না'—বললে ক্যারোলিন কিছুটা থতমত ভাবে। নিজের কথা এরা শুনেছে কি না তাই ভেবে সে আলাপের সুত্র পালটালে দ্রুত কণ্ঠে।

'তোমরা ভারী স্বার্থপরের মত বেরিয়ে এসেছ'—বললে ক্যারোলিনের দিদি। তার পর ডারসির বাহু অবলম্বন করে সে ক্যারোলিনের সঙ্গে এগিয়ে চলল সঙ্কীর্ণ উদ্যান-পথ ধরে।

তাদের ব্যবহারের রুক্ষতায় ডারসি মনে মনে অপ্রস্তুত হ'ল। সে তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানিয়ে বললে—'এ পথ বড়ো সরু। চার জনের বেড়াবার পক্ষে অসুবিধা। চলুন বড়ো রাস্তার পথ ধরি।'

এলিজাবেথের একটুও ইচ্ছা ছিল না এদের সঙ্গে বেড়াবার। সে কৌতুক হাস্যে জবাব দিল—'না, না, ঠিক আছে। আপনারা তিন জনে দিব্যি দল পেয়েছেন। এমন ছবির মত সমাবেশ এক জন বাইরের লোকের উপস্থিতিতে নষ্ট হতে দেবেন না! আমি চলি।'

লঘু পদক্ষেপে এলিজাবেথ ফিরে আসতে লাগল। তার মন এই আশায় দোল খাচ্ছে যে, দু'-এক দিনের মধ্যে সে দিদি জেনকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। ইতিমধ্যে অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছে জেন। আজ সন্ধ্যায় সে ঘরের বাইরে ঘণ্টা দুই থাকার অনুমতি পেয়েছিল ডাক্তারের কাছে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীশিশির সেনগুপ্ত ও শ্রীবসন্তকুমার ভাদুড়ী।

বিদ্রোহী নজরুল

প্রভাকর মাঝি

বিদ্রোহী ওঠো জেগে।
ধূলি ধূসরিত দীন নারায়ণ যায় যে তোমারে ডেকে।
উৎপীড়িতের ক্রন্দন-ধ্বনি
আকাশে-বাতাসে আজো উঠে রণি'
আজো ঢেকে আছে নবীন সূর্য্য হিংসার কালো মেঘে।
পাপ দানবের গর্ব্ব নাশিতে বিদ্রোহী ওঠো জেগে।
তোমার মা ভৈঃ বাণী
মহাবিশ্বের মহাকাশ ফুঁড়ি করিতেছে কানাকানি।
দুর্গম গিরি-মরু-কান্তারে,
কান্না ছুটে যায় ঘন আঁধিয়ারে—
নিরুদ্দেশের ইঙ্গিতে ছুটে কোন বাধা নাহি মানি।
দুঃসাহসীরে দুর্জ্জয় করে তোমার মা ভৈঃ বাণী।

অশান্ত ধূমকেতু।
হিন্দু-মুসলমানের পরাণে বাঁধিলে মিলন-সেতু।
গাহিলে শিকল ছিঁড়িবার গান,
ডাক শুনে এলো লক্ষ জোয়ান,—
নবীন বাঙলা উন্মাদ হোত—আজি বুঝি তার হেতু।
চকিতে আসিয়া চকিতে গেলে কি অশান্ত ধূমকেতু!
আজ তুমি নির্ব্বাক্!
কণ্ঠে তোমার আর নাহি শুনি প্রলয়ঙ্কর ডাক!
বিবশ শরীর রোগে শোকে জ্বরে
তুমি বেঁচে আজো মরণের তরে—
কোন্ সাগরের অতলে ডুবেছে বিদ্রোহী মৈনাক।
ওগো বুলবুল! মুখর কণ্ঠ কেন হোল নির্ব্বাক্!

জেগে ওঠো বিদ্রোহী!
জন্মদিনের বাসরে তোমার একান্ত মনে কহি।
প্রার্থনা করি তরুণের দল—
তুমি জেগে ওঠো দীপ্ত উজ্জ্বল,
আগ্নেয় গানে আন্দোলি দাও ভূধর-সিন্ধু-মহী।
উল্কার মতো জ্বলে ওঠো আজ, জেগে ওঠো বিদ্রোহী।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান

১০

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

গদ্য-সাহিত্য

গদ্য-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বাংলার প্রভাব ও অনুসরণ-কাহিনী দিয়েই আমার লেখা শেষ কোরব। আমরা দেখেছি যে, হিন্দী গদ্য যেদিন উর্দ্দু ও সংস্কৃতের মাঝখানে পড়ে আপনার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিল, সেদিন বাংলাকে অবলম্বন কোরেই তার আদর্শ স্থির হোয়েছিল। বাঙ্গালী ও বাংলা গদ্য হিন্দী গদ্যকে অন্ধকার হোতে আলোকের পথে পরিচালিত কেমন কোরে কোরেছে, তার বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বেই কোরেছি। হিন্দী গদ্যের বিভিন্ন শাখাতে বাঙ্গালীর দান কম নয়।

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ বা নিবন্ধ-সাহিত্য বাংলার প্রবন্ধ বা নিবন্ধ-সাহিত্যকে অবলম্বন কোরে গড়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য অত্যন্ত বিকশিত হোয়ে উঠেছিল। বাংলাতে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যে প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিচিত্র রূপ দেখিয়েছিলেন, মোটামুটি তাকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল হিন্দী প্রবন্ধ-সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র মত প্রবন্ধ এবং 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র মত শুচিশুভ্র পরিহাস-মধুর রচনা নিয়ে বাংলাকে সমৃদ্ধ কোরেছিলেন। হিন্দীতে 'ধর্মতত্ত্বে'র ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ('চৌবেকা চিট্‌ঠা') অনুবাদ হোলো হিন্দীর আদর্শ স্থির করার জন্য, হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য। হিন্দী প্রবন্ধ-সাহিত্য বাংলা হোতে আরও অনেকের অনুবাদ নিয়ে সমৃদ্ধ হোয়েছে। আর শুধু অনুবাদ নয়, মৌলিক রচনার ভিতরেও বঙ্কিমের প্রভাব রয়েছে, বাংলার অন্যান্য প্রবন্ধ-লেখকদের প্রভাব আছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর হিন্দী 'চৌবেকা চিট্‌ঠা'র পথ ধরে মৌলিক রচনা 'শিবশম্ভু কা চিট্‌ঠা' বেরোল। বাবু বালমুকুন্দ গুপ্তের 'শিবশম্ভু কা চিট্‌ঠা'র কিছু অংশ নীচে উদ্ধার কোরছি:—

"ইতনে মেঁ দেখা কি বাদল উমড় রহে হৈ। চীলেঁ নীচে উতর রহী হৈঁ। তবীয়ত ভুরভুরা উঠী। ইধর ভংগ, উধর ঘটা—বহার মেঁ বাহার। ইতনে মেঁ বায়ু কা বেগ বড়া, চীলেঁ অদৃশ্য হুই। অঁধেরা ছায়া, বূঁদে গিরনে লগী; সাথ হী তড় তড় ধড় ধড় হোনে লগী। দেখা ওলে গির রহে হৈঁ।...'বম ভোলা' কহকর শর্মাজীনে এক লোটা ভর চঢ়াঈ।...পর বহ চীল কহাঁ গঈ হোগী?... শিবশম্ভু কো ইন পক্ষিয়োঁ কী চিন্তা হৈ। পর বহ য়হ নহীঁ জানতা কি ইন অভ্রস্পর্শী অট্টালিকায়োঁ সে পরিপূরিত মহানগর মেঁ সহস্রোঁ অভাগে রাত বিতানে কো ঝোপড়ী ভী নহীঁ রখতে।"*

অনুবাদ:—

দেখিতে দেখিতে মেঘে আকাশ ছাইল। কয়েকটা চিল নামিতে লাগিল। মন মাতিয়া উঠিল—এদিকে সিদ্ধি ওদিকে মেঘ। বাহিরে কি বাহার! দেখিতে দেখিতে বায়ুর বেগ বাড়িল, চিল অদৃশ্য হইল। আঁধার করিয়া আসিল, বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে তড়-তড় তড়-তড়। দেখিল শিল পড়িতেছে। 'বম ভোলা' বলিয়া শর্মা এক লোটা ভর্ত্তি সিদ্ধি চড়াইল। কিন্তু ঐ চিল কোথায় গেল? শিবশম্ভুর এই সকল পক্ষীর জন্য চিন্তা হইল। কিন্তু তাহার জানা নাই যে, অভ্রস্পর্শী অট্টালিকা পরিপূরিত মহানগরে সহস্র অভাগার রাত কাটাইবার কুঁড়ে ঘরও নাই।'

'শিবশম্ভুকা চিট্‌ঠা' বা 'শিবশম্ভুর দপ্তর' বিশ্লেষণে ধরা পড়বে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর প্রভাব। এ প্রভাব গদ্যের styleএ, বিষয়-বস্তুতে, সমাজদর্শন-জাত প্রতিক্রিয়াতে।

চন্দ্রশেখর ও আরও অনেকে যে উচ্ছ্বাস-প্রবণ গদ্যের পথ বাংলাতে খুলে দিয়েছিলেন, তারই পথ ধরে হিন্দীতে এসেছিল 'প্রলাপ শৈলী'। এই উচ্ছ্বাস-প্রবণতার পথ ধরে অনেক হিন্দী সাহিত্যিকই সারস্বত-কুঞ্জে প্রবেশের প্রয়াস পেয়েছেন। এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিত শুক্ল অত্যন্ত সচেতন হোয়ে বলেছেন:—

"...ভাবপ্রবণতা সে প্রেরিত কল্পনা কে বিপ্লব ঔর বিক্ষেপ অংকিত করনেবালী এক প্রকার কী প্রলাপ শৈলী ভী ইন্‌হোনে নিকালী জিসমেঁ রূপবিধান কা বৈলক্ষণ্য প্রধান থা, ন কি শব্দবিধান কা। ক্যা অচ্ছা হোতা যদি ইস শৈলী কা হিন্দী মেঁ স্বতন্ত্র রূপ সে বিকাস হোতা। তব তো বঙ্গ সাহিত্য মে প্রচলতি ইস শৈলী কা শব্দ প্রধান রূপ, জো হিন্দী পর কুছ কাল সে চঢ়াঈ কর রহা হৈ ঔর অব কাব্যক্ষেত্র কা অতিক্রমণ কর কভী কভী বিষয় নিরূপক নিবন্ধো তক কা অর্থগ্রাস করনে দৌড়তা হৈ, শায়দ জগহ ন পাতা।"

কাব্যাত্মক গদ্য-প্রবন্ধের ধারা হিন্দীতে চলল কেমন কোরে সে সম্বন্ধে সমালোচক বলছেন, "যদি কিসী রূপ মেঁ গদ্য কী কোঈ নঈ গতিবিধি দিখাঈ পড়ী তো কাব্যাত্মক গদ্য প্রবন্ধো কে রূপ মেঁ। পহলে তো বঙ্গভাষা কে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' (চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় কৃত) কো দেখ কুছ লোগ উসী প্রকার কী রচনা কী ওর ঝুকে, পীছে ভাবাত্মক গদ্য কী কঈ শৈলিয়োঁ কী ওর। 'উদভ্রান্ত প্রেম' উস বিক্ষেপ শৈলী পর লিখা গয়া থা জিসমেঁ ভাবাবেশ দ্যোতিত করনে কে লিয়ে ভাষা বীচ বীচ মেঁ অসম্বদ্ধ অর্থাৎ, উখড়ী হুঈ হোতী থী। কুছ দিনোঁ তক তো উসী শৈলী পর প্রেমোদ্গার কে রূপ মেঁ পত্রিকায়োঁ মেঁ কুছ প্রবন্ধ নিকলে জিনমে ভাবুকতা কী ঝলক য়হাঁ সে বহাঁ তক রহতী থী। পীছে

---

* পরম পূজনীয় গুরুদেব ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশক্রমে হিন্দী বানানই রাখা গেল। বাংলাতে 'হয়', 'উয়হ', 'হৈ', 'ম্যয়', সর্ব্বজনবোধ্য বোলে লিখতাম, কিন্তু পরম পূজনীয় ডক্টর চট্টোপাধ্যায় আমাকে 'হৈ', 'বহ', 'য়হ', 'মৈঁ' প্রভৃতি রূপান্তরণের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। হিন্দীর 'ব' (ৱ) আসামী অক্ষর দিয়ে দেখান যেতে পারে। কিন্তু ওঁর নির্দ্দেশ pressকে বিড়ম্বিত কোরবে বলে তা আর কোরলাম না।

শ্রী চতুরসেন শাস্ত্রী কে 'অন্তস্তল' মেঁ প্রেম কে অতিরিক্ত ঔর দুসরে ভাবোঁ কী ভী প্রবল ব্যঞ্জনা অলগ অলগ প্রবন্ধোঁ মেঁ কী গঈ জিনমে কুছ দূর তক এক ঢংগ পর চলতী ধারা কে বীচ বীচ মেঁ ভাব কা প্রবল উত্থান দিখাঈ পড়তা থা। ইস প্রকার ইন প্রবন্ধো কী ভাষা তরঙ্গবতী ধারা কে রূপ মেঁ চলী থী অর্থাৎ উসমেঁ 'ধারা' ঔর 'তরঙ্গ' দোনো কা যোগ থা। য়ে দোনোঁ প্রকার কে গদ্য বঙ্গালী থিয়েটরোঁ কী রঙ্গভূমিকে ভাষণোঁ কে সে প্রভাবিত হুএ।"

সমালোচনামূলক প্রবন্ধও বাংলার দেখাদেখি সুরু হোয়েছিল হিন্দীতে। এই সমালোচনামূলক প্রবন্ধের ইতিহাসে মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীজীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। 'সরস্বতী' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে তিনি বাংলাকে আদর্শ কোরে হিন্দীর আধুনিকীকরণ সুরু কোরেছিলেন। এক রকম তাঁরই নির্দেশক্রমে হিন্দী কবিতা পুরাতন ধারা হোতে বাংলা অনুসরণ করে নূতন পথে এগুল। মৈথিলীশরণের বাংলা কবিতানুসরণের কথা বোলতে গিয়ে আমি এ প্রসঙ্গে আলোচনা কোরেছি (ভাদ্র, ১৩৫৬, বসুমতী)। আবার 'সরস্বতী' পত্রিকাতে হিন্দী ভাষায় বাংলা কবিতা অনুবাদের একটা ধারা চলছিল ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হোতে। উৎসাহ ছিল দ্বিবেদীজীর আর অনুবাদক ছিলেন পার্সনাথ সিংহ। মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীজী 'সরস্বতী' পত্রিকাতে যে সমালোচনার ধারা প্রবাহিত কোরলেন, তা বাংলারই তুলনাত্মক সমালোচনারই অনুসরণ।

পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকে আদর্শ কোরে প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস হিন্দীতে বেশ চালু হোয়েছে। সমালোচক লিখেছেন, "পীছে রবীন্দ্রবাবুকে প্রভাব সে কুছ রহস্যোন্মুখ আধ্যাত্মিকতা কা রঙ্গ লিএ জিস ভাবাত্মক গদ্য কা চলন হুয়া বহ বিশেষ অলঙ্কৃত হোকর অন্যোক্তি পদ্ধতি পর চলা।"

হিন্দী নিবন্ধসাহিত্যের ইতিহাস হোলো তাহ'লে এই যে, হিন্দী সাহিত্যিকেরা নিবন্ধ ও রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র হোতে শুরু কোরে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত একাধিক বাঙ্গালী লেখকের রচনার আদর্শ গ্রহণ কোরে হিন্দী নিবন্ধ-সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশে পরম সহায়তা কোরেছেন। এই সকল নিবন্ধের ভিতর মৌলিক লেখাও আছে, আবার মৌলিক নামে চলিত অমৌলিক লেখাও আছে। অনুবাদের কথা না হয় নাই ধরা হোলো।

নাটক

[না]টক' হিন্দীতে যে বাংলার দেখাদেখি গজিয়ে উঠেছিল তার বিস্তৃত আলোচনা আমি কোরেছি (ফাল্গুন ১৩৫৬, বসুমতী) পূর্ব্বেই। সমালোচক শুক্ল স্পষ্ট কোরে তারই স্বীকৃতি দিয়েছেন হিন্দীতে। তিনি বলেছেন, "য়হ তো স্পষ্ট হৈ কি আধুনিক কাল কে আরম্ভ সে হী বঙ্গলা কী দেখা-দেখী হমারে হিন্দী নাটকোঁ কে ঢাঁচে পাশ্চাত্য হোনে লগে।"

হিন্দীর নব জাগরণ হোলো বিশেষ কোরে নাটক ও উপন্যাসে। বিশেষ কোরে নাটক ও উপন্যাস এ দু'টিই হিন্দীর গৌরবের বস্তু। হিন্দীর কবিতা বাংলা কবিতার স্তরে উঠেনি, কারণ রবীন্দ্রনাথ একাই একশ'। উপন্যাসে প্রেমচন্দ আর নাটকে জয়শঙ্কর প্রসাদ হিন্দীর গৌরব। তাই হিন্দী আধুনিক নাটকের প্রথম যুগে বাংলার অনুসৃতির মূল্য যে কতখানি, তা সকলের স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। আধুনিক হিন্দী নাটকের প্রথম যুগে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। হরিশ্চন্দ্রের পূর্ব্বে হিন্দীতে নাটকের অস্তিত্ব বিশেষ ছিল না, ছিল 'অলীক কুনাট্য'। ভারতেন্দু বাংলা হোতে অনুবাদ কোরলেন 'বিদ্যাসুন্দর', 'পাষণ্ড বিড়ম্বন', 'ধনঞ্জয়বিজয়' প্রভৃতি নাটক। তিনি গ্রহণ কোরলেন মৌলিক নাটকেও বাংলা নাট্যাদর্শ। ভারতেন্দু-প্রবর্ত্তিত পথে চললেন বাবু রামকৃষ্ণ বর্ম্মা এবং আরও অনেকে। অনুবাদ হোতে লাগল 'বীর নারী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'পদ্মাবতী', বঙ্গবীর, 'বভ্রুবাহন', 'দেশদশা', 'খানজ'হা,' গিরিশচন্দ্রের নাটক, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলী, রবীন্দ্রনাথের নাটক, যোগেশ চৌধুরীর নাটক। হিন্দীতে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক অনুবাদ করার কারণ হোলো, "ইনসব রচনোঁ সে পাঠক জান সকতে হৈঁ কি দ্বিজেন্দ্রলাল কিস শ্রেণীকে নাট্যকার থে ঔর উনকে এসে অচ্ছে নাটক গ্রন্থোঁ সে হিন্দী ভাষাকো আভূষিত করনেকী কিতনী বড়ী আবশ্যকতা হৈ।"

এই অনুবাদের ধারাতে অবশ্য 'তেজী মন্দী' আছে। কখনও অনুবাদ বেশ জোর চলেছে। কখনও দীর্ঘ দিন আর বাংলা হোতে অনুবাদ হয়নি। কিন্তু অনুবাদ ছাড়া মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে বাংলা যে প্রভাব বিস্তার কোরল তা হোলো এই :—

(ক) তৎসম শব্দপ্রধান উচ্ছাসময়ী ভাষা।

(খ) মঙ্গলাচরণ প্রভৃতির বিলোপ। প্রবেশক-বিষ্কম্ভকাদির বিলোপ।

(গ) গর্ভাঙ্ক—Scene অর্থে ব্যবহৃত।

(ঘ) ট্র্যাজেডির প্রবর্ত্তন।

(ঙ) বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে প্রথমে হিন্দীর আদর্শ হোলো বাংলা প্রথম যুগের নাটকের বিষয়-বস্তু। পরে বাংলা স্থায় সামাজিক ও বিশেষ কোরে ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তুর প্রতি আকর্ষণ। প্রথম যুগের বাংলা নাটকে ছিল ইংরাজীয়ানার প্রতি ব্যঙ্গ আর পুরোনো টিকিওয়ালাদের ভণ্ডামি প্রকাশ। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', কালীপ্রসন্নের 'বাবু', নাটকীয়ত্ব-মণ্ডিত 'আলালের ঘরের দুলাল', সোসাইটি স্কেচ 'নববাবুবিলাস বা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রভৃতি হিন্দীর প্রথম যুগের নাটকের বিষয়-বস্তুকে অনুপ্রাণিত কোরেছে। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের মৌলিক নাটক 'বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি' প্রহসন এতে 'ধর্ম ঔর উপাসনাকে নাম সে সমাজ মেঁ প্রচলিত অনেক-অনেক অনাচারোঁ কা জঘন্য রূপ' দেখানো হয়েছে। ভারতেন্দু 'প্রেমযোগিনী' নাটকে 'পাষণ্ডময় ধার্মিক ঔর সামাজিক জীবন'চিত্র। চৌধুরী বদরীনারায়ণের 'বারাঙ্গনা রহস্য মহানাটক কিশোরীলাল গোস্বামীর 'চৌপট চপেট' প্রহসন। এতে 'চরিত্রহীনতা ঔর ছলকপট সে ভরী স্ত্রিয়োঁ তথা লুচ্চোঁ-লফংগোঁ আদি কে বীভৎস ঔর অশ্লীল চিত্র' দেখান হয়েছে। এর পর সামাজিক আর ঐতিহাসিক নাটক বাংলাতে যখন বিকশিত হোয়েছে, হিন্দীতেও তা ধারা চলেছে। হিন্দীতে ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা গিরিশচন্দ্রের নাটক গভীর প্রভাব বিস্তার কোরেছিল। অবশ্য বাংলা নাটকের অনুবাদ উপন্যাসের মত অত নির্ব্বিচারে হয়নি। তাই সমালোচ

শুক্ল বোলেছেন, 'বঙ্গলাকে নাটকোঁকে কুছ অনুবাদ বাবু রামকৃষ্ণ বর্ম্মা কে বাদ ভী হোতে রহে পর উতনী অধিকতা সে নহীঁ জিতনী অধিকতা সে উপন্যাসোঁ কে। ইসসে নাটক কী গতি বহুৎ মন্দ রহী⋯ইসকে উপরান্ত বঙ্গলা মেঁ শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে নাটকোঁ কী ধূম হুই ঔর উনকে অনুবাদ হিন্দী মেঁ ধড়াধড় হুএ। ইসী প্রকার রবীন্দ্রবাবুকে কুছ নাটক ভী হিন্দীরূপমেঁ লাএ গএ।"

আধুনিক হিন্দীর নাট্যক্ষেত্রে যিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনায় অপরিসীম শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, সেই জয়শঙ্কর প্রসাদও বাঙ্গালী দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট অল্প-বিস্তর ঋণী। অবশ্য জয়শঙ্কর প্রসাদ অপূর্ব মৌলিকত্ব দেখিয়ে একাধিক সুন্দর ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন, কিন্তু তাঁর প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে এবং দৃশ্য-পরিকল্পনার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলীর অদ্ভুত মিল দেখা যায়।

উপন্যাস

উপন্যাস হোলো ইংরাজী নভেলের বাংলা নাম। মরাঠীতে নাম নিয়েছে 'কাদম্বরী', হিন্দীতে বাংলা হোতে নাম নিল উপন্যাস (বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৫৬)। আর শুধু নাম নিয়েই ক্ষান্ত হলো না, ধড়াধড় বেরুতে লাগল অনুবাদ, অনুকরণ অনুসরণ। বাংলা অনুবাদের সম-সময়ে বা কিছু পূর্ব্বে যে 'তিলিস্ম, আইয়ারী' লেখা চলছিল, যেমন দেবকীনন্দন খত্রীর 'চন্দ্রকান্তা', 'চন্দ্রকান্তা সন্ততি', 'বীরেন্দ্রবীর' প্রভৃতি, সেগুলো এত অখাদ্য-ধরণের লেখা যে, সেগুলোকে সাহিত্য বলতে ইচ্ছা করে না। এই রচনাগুলো হিন্দীর পাঠক-পাঠিকারা গোগ্রাসে গিলেছেন সেদিন অবধি। আমি যখন থাকতাম সিউড়ীতে তখন ঐ কলেজের পুরোনো লাইব্রেরীয়ান রামচন্দ্র রায় আমাকে এই 'চন্দ্রকান্তা'র এক গাদা বই পড়তে দিয়েছিলেন হিন্দীর চমৎকার বই হিসেবে। পড়ে মনে হোলো এত গাঁজা, এত অখাদ্য রচনা কি কোরে ছাপা হোয়ে থাকে। আর শুধু ছাপাই নয়, সমাদরও পেয়ে থাকে। হিন্দীতে এখনও 'হন্টরওয়ালী', 'তুফান মেল' প্রভৃতি যে ধরণের বই প্রেক্ষাগৃহে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি এরই উন্নত সংস্করণ।

হিন্দীতে বাংলার অনুবাদ-যুগ সুরু হোলো ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের কাল থেকে বিশেষ কোরে। বাংলাতে তখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির উৎকৃষ্ট রচনা বেরিয়েছে। সুতরাং ঐ গাঁজা-গল্প মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেলল। হিন্দী সাহিত্যে এল সত্যিকার উপন্যাস, যার মধ্যে চরিত্র-চিত্রণ আছে, সমাজ-চিত্র আছে, আর আছে সাহিত্য-বোধ ও জীবনদর্শন। 'ঈশ্বর প্রদর্শিত কোরলেন সত্য-সাহিত্যের পথ এই অনুবাদের মাঝখান দিয়ে'—এমন কথা সমালোচক-প্রবর পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল নিজেই বলেছেন। তাঁর মতে, "বংগলাকে উৎকৃষ্ট সামাজিক, পারিবারিক ঔর ঐতিহাসিক উপন্যাসোঁ কে লগাতার আতে রহনে সে রুচি পরিস্কৃত হোতী রহী, জিসসে কুছ দিনোঁ কী তিলিস্ম, আইয়ারী ঔর জাসুসী কে উপরান্ত উচ্চ কোটি কে সচ্চে সাহিত্যিক উপন্যাসোঁ কী মৌলিক রচনা কা দিন ভী ঈশ্বর নে দিখায়া।"

ভারতেন্দুর যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত উপন্যাসের অনুবাদ বেরোতে লাগল। অনুবাদ হোতে লাগল 'স্বর্ণলতা', 'মরতা ক্যা ন করতা', 'ইলা', 'প্রমীলা', 'মধুমালতী', 'চতুরচঞ্চলা', 'ভানুমতী', 'নয়ে বাবু', 'বড়া ভাই', 'দেবরাণী জেঠানী', 'দো বহিন' ইত্যাদি। অনুবাদ হোতে লাগল 'দীপনির্ব্বাণে'র। অনুবাদ হোতে লাগল বঙ্কিম—শরৎ—রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু কোরে একাধিকের উপন্যাস।

'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস'-লেখক বলেছেন, "ইস উত্থান কে ভীতর বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হারানচন্দ্র রক্ষিত, চণ্ডীচরণ সেন, শরৎ বাবু, চারুচন্দ্র ইত্যাদি বংগভাষা কে প্রায় সব প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উপন্যাসকারোঁ কী বহুৎ সী পুস্তকোঁকে অনুবাদ তো হো হী গএ, রবীন্দ্রবাবুকে ভী 'আঁখ কী কিরকিরি' (চোখের বালি) আদি কই উপন্যাস হিন্দী রূপমেঁ দিখাই পড়ে জিনকে প্রভাব সে ইস উত্থানকে অন্তমেঁ আবির্ভূত হোনেবালে হিন্দী কে মৌলিক উপন্যাসকারোঁ কা আদর্শ বহুৎ কুছ উঁচা হুআ।"

উপন্যাসের ক্ষেত্রে হিন্দীর হাতেখড়ি বাংলাকে নিয়ে। আবার পরবর্তী কালের মৌলিক উপন্যাসের সাহিত্যিক উন্নতিও নির্ভর কোরেছে বাংলা আদর্শ নিয়ে। এ ছাড়া বাঙ্গালী সাহিত্যিক মৌলিক হিন্দী উপন্যাসও রচনা কোরেছেন। হিন্দীতে উষাদেবী মিত্র যুগান্তকারী উপন্যাস রচনা কোরেছেন। বাংলার দেখাদেখি হিন্দীতে 'সামাজিক', 'ঐতিহাসিক' প্রভৃতি উপন্যাস চালু হয়েছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাসের পথ দেখিয়েছিলেন বাঙ্গালী লেখক। "ঐতিহাসিক উপন্যাস জিস্ ঢংসে লিখনা চাহিএ, বহ প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়নে অপনে 'করুণা', 'শশাংক', ঔর 'ধর্মপাল' নামক উপন্যাসোঁ দ্বারা অচ্ছী তরহ দিখা দিয়া।" আজকের হিন্দী সাহিত্যিক প্রেমচন্দ, কৌশিক, সুভদ্রাকুমারী চৌহান, শ্রীবাস্তব, জৈনেন্দ্রকুমার প্রভৃতি যে সকল মৌলিক উপন্যাস লিখেছেন, সেগুলির অনেকগুলিই বাংলা উপন্যাসাদির দ্বারা গভীর প্রভাবান্বিত।

ছোট গল্প

হিন্দী ছোট গল্পও বাংলাকে অবলম্বন কোরেই এক দিন গজিয়ে উঠেছিল। হিন্দীর 'সরস্বতী' পত্রিকাতে বাংলা হোতে অনুবাদ করা গল্পের একটি ধারা দ্বিবেদীজীর নির্দেশক্রমে চলেছে দীর্ঘ দিন। এ ছাড়া ইণ্ডিয়ান প্রেসের গিরিজাকুমার ঘোষ 'লালা পার্বতী নন্দন' নামে একাধিক বাংলা গল্প অনুবাদ কোরেছেন। মৌলিক হিন্দী ছোট গল্পের ক্ষেত্রে মির্জাপুরের রামপ্রসন্ন ঘোষের কন্যা 'বংগ মহিলা' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরে আছেন।

হিন্দীতে আধুনিক কালে কত যে বাংলা গল্পের অনুবাদ হোয়েছে ও কত মৌলিক গল্প (?) যে বাংলার মাল, তা আর বলে শেষ করা যায় না। হিন্দীর সত্যিকার মৌলিক ছোট গল্প যাঁরা লিখছেন, তাঁদের লেখাতেও বাংলার প্রভাব এত স্পষ্ট যে, তাই নিয়েই মাসের পর মাস বসুমতীর পাতায় আলোচনা চালান যেতে পারে। কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক মহাশয় এই কিস্তীতেই হিন্দী সাহিত্যের ব্যাপার খতম কোরে ফেলতে চান বলে আর এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হল না।

আমার এত দিনকার লেখার মধ্যে কিছু কিছু ভুল আছে। পূজনীয় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার কিছু আমাকে দেখিয়েছেন। ১৩৫৭ অগ্রহায়ণে আমি লিখেছি যে, পণ্ডিত

যুগলকিশোর সম্পাদিত 'উদন্তমার্ত্তণ্ড' (খৃষ্টাব্দ ১৮২১) কানপুর হোতে বেরিয়েছে। এটি আমার মস্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। যুগলকিশোর কানপুরের লোক হোলেও কোলকাতা থেকেই তাঁর 'উদন্তমার্ত্তণ্ড', হিন্দীর প্রথম সংবাদপত্র, 'বেরিয়েছে। এর সন তারিখেও ভুল কোরেছি। ১৮২১ খৃষ্টাব্দ না হোয়ে হবে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় আমার এই ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন।

আরও কিছু কিছু ভুল আমার নিজের নজরে এসেছে। ১৩৫৬র আশ্বিনে বাংলা গদ্যের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য যে পত্রটি উদ্ধার কোরেছি, তা 'কার্ত্তিকপ্রসাদ খত্রীর' পত্র নয়। কার্ত্তিকপ্রসাদ খত্রীকে লিখিত ফ্রেডারিক পিঙ্কাট সাহেবের পত্র। আর একটি কথা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গাড়ীর আড়ি' বিষয়ে যিনি 'বসুমতী' অফিসে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন তাঁর চিঠি 'বসুমতী' থেকে হারিয়ে গেছে বোধ হয়। তিনি আমাকে যদি পুনরায় কষ্ট কোরে 'গাড়ীর আড়ি' বিষয়ে সংবাদ পাঠান, তাহলে খুশী হব।

বেটরো প্রচার-সঙ্ঘ

ব্রুকলিন কিংবা স্যামোয়া, বম্বে কিংবা কলকাতা, যেখানে আপনি বাজার করতে যান, সেখানেই আপনি জানতে পারবেন, ইংরেজ এসেছে, ইংরেজ আসছে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ইংরেজ যে সওদা নিয়ে আসে তার মধ্যে প্রধান হল বাইসাইকল, চুলের ব্রুস, রেডিও, টোষ্টার আর আর স্কচ হুইস্কি। তাদের, মানে ঐ ইংরেজদের এই সব সওদা বিক্রী করতেই হবে, নয় তো অনাহারে সুনিশ্চিত মৃত্যু।

ব্যবসা আর বাজার, বাজার আর ব্যবসা, এই ছুয়ের মাঝে স্থান পেতেই হবে, যেন তেন প্রকারেণ। নয় তো ইংরেজ জাতির অর্থনৈতিক মরণ অবশ্যম্ভাবী। এই দুঃসহ চিন্তায় আকুল হয়ে ইংরেজ বুঝতে পারলে রমণীয় ও চোখ-ধাঁধানো সওদা আর সস্তা দামই যথেষ্ট নয় ব্যবসার পক্ষে। এই সব কিছুর সঙ্গে প্রধান প্রয়োজন যে বস্তু, সেটি হল "সেলস্‌ম্যানসিপ। পৃথিবীর বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ "সেলস্‌ম্যান" হতে হবে। বিকি-কিনির ব্যাপারে পাকা "সেলসম্যান" না হলে আর কোন উপায় নেই।

এই চিন্তায় আকুল হয়ে এবং মনের ভেতর এই একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজরা গঠন করলো বেট্‌রো বা Betro.

বেট্‌রো বা Betro কথাটি আর কিছুই নয়, British Export Trade Research Organiationএর আদ্য অক্ষরগুলির একত্র মিলন-কথা। বেট্‌রোর মূল উদ্দেশ্য হল এবং বেট্‌রো গঠিত হল বিলেতী ব্যবসার প্রচার-মাধ্যম হিসাবে, যাতে সমগ্র ছুনিয়ার বাজারে বিলেতী পণ্যের এক নতুন চাহিদা হয়। বেট্‌রো লক্ষ্য রাখবে পৃথিবীর লোকের কি প্রয়োজন হতে পারে, কি প্রয়োজন হবে এবং কি কি প্রয়োজন হওয়াতে পারা যায়। তার পর সেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ছুনিয়ার বাজারে সরবরাহ করবে ইংরেজ ব্যবসায়ী।

বেট্‌রোর কাজ যাতে সহজে চলতে পারে সে জন্য সারা ছুনিয়াকে বেট্‌রো "সঙ্ঘের শৃঙ্খলে" জড়িয়ে ফেলতে হবে। প্রত্যেক সঙ্ঘের থাকবে উড়ন্ত একেকটি দল, যারা পৃথিবীতে উড়ে বেড়িয়ে পরীক্ষা করবে সেই সব বাজার, যাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। পোষাক-পরিচ্ছদ, আবহাওয়া, রঙ, শিক্ষা, রুচি, ধর্ম্ম এবং আশা কাদের কি রকম ভাই-বাচাই করবে বেট্‌রো সঙ্ঘ। এই ভাবে বাজারের অবস্থা বুঝে বেট্‌রো উপদেশ দেবে বিলাতী ব্যবসায়ীদের, কি করতে হবে, কোথায় কি পাঠাতে হবে এবং কত মূল্য নির্দ্ধারণ করা যাবে বিলেতী পণ্যের।

বেট্‌রোর সমগ্র পরিচালন-পদ্ধতির পেছনে আছে সমগ্র ইংরেজ সরকারের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। বেট্‌রোর টাকা-পয়সা যোগাবে সত্তর জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসাদারের দেয় চাঁদা আর কয়েক কোটি ডলারের একটি মিলিত মূলধন। প্রায় সাত বছর হল এই বেট্‌রো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা। বেট্‌রোর দু'টি চোখের একটি আমেরিকার বাজারে নিবদ্ধ, অপরটি স্বদেশের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার প্রতি। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এত দিন পরেও ব্রিটেন এখনও তার অর্থনৈতিক দুরবস্থা সামলে উঠতে পারেনি। ব্রিটেনের অধিবাসী এখনও ক্ষুধার্ত্ত। ব্রিটেনের কর্ম্মরত যন্ত্রপাতিগুলো পুরানো। তার ওপর যুদ্ধপূর্ব্ব দিনের বাজারও এখন আর নেই। তা ছাড়া, ইংরেজ যেখানেই বাজার খুঁজতে যায়, ল্যাটিন আমেরিকা, রাশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য-প্রাচ্য এবং প্রাচ্যের সব বাজারেই দেখে আমেরিকা এই সব দেশের বাজারে আগে-ভাগেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আন্তর্জ্জাতিক বাজারে এখন চলেছে ইংরেজ আর আমেরিকানদের চরম ব্যবসাদারী প্রতিযোগিতা। কার জয় আর কার পরাজয় হয়, লক্ষ্য করছে সমগ্র দুনিয়া।

আমেরিকার টাকা, সর্ব্বাধুনিক যন্ত্রপাতি আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপনের পদ্ধতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না ইংরেজ। আমেরিকার বিজ্ঞাপন-ব্যয় পৃথিবীতে সর্ব্বাধিক। ইংরেজ আমেরিকার বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করতে পেছপাও হচ্ছে না। কিছু দিন পূর্ব্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরেজ একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করে, যেটি হুবহু আমেরিকার একটি পুরাতন বিজ্ঞাপনের নকল। বিজ্ঞাপনটি নারী জাতির প্রতি আহ্বান চাকরীর জন্য। বিজ্ঞাপনটি হচ্ছে মাত্র একটি কথায়,—"Women ! Be one of fifty thousand !" অর্থাৎ নারী, তোমরা সেই পঞ্চাশ হাজারের একেক জন হও।

এই বিজ্ঞাপনটির পুনরাবৃত্তি দেখে আমেরিকানরা হেসেছে প্রচুর। হাসতে হাসতে বলেছে,—কোন নারী কখনও কি সেই পঞ্চাশ হাজার নারীর সমান হতে চায়? "Would any woman want to be the same as fifty thousand others ?"

যাই হোক, এই বেট্‌রো প্রকারান্তরে এক প্রচার পরিষদ, ইংরেজ যার প্রতিষ্ঠায় এই চরম প্রতিযোগিতার মধ্যেও দেখতে পেয়েছে আশার আলো।

POND'S
POND'S

পণ্ড্‌স

আমাদের ইংরাজী শিক্ষা—২

শ্রীসুহাসচন্দ্র রায় (অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

স্বাধীন ভারতে অন্ন-সমস্যা বস্ত্র-সমস্যার মত ভাষা-সমস্যাও অল্প-বিস্তর অস্বস্তিকর আকারে দেখা দিয়াছে। আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রভাষা, শিক্ষার মাধ্যম প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া গুরুতর বাদানুবাদ সুরু হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে ভারতের গণপরিষদ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। এখন হইতে হিন্দীই ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু শুধু গলার জোরে বা কলমের আঁচড়ে রাতরাতি একটা ভাষা প্রচলিত করা যায় না। এত দিন ইংরাজ-শাসনে ইংরাজী সারা ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল; হঠাৎ তাহাকে বিতাড়িত করিলে বিষম ফাঁক থাকিয়া যায়। সুতরাং আপাততঃ আপোষ করিয়া ইংরাজীর মেয়াদ ১৫ বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—ইতিমধ্যে হিন্দী ভাষা রীতিমত বলসঞ্চয় করিয়া নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে—এইরূপ প্রত্যাশা অনেকে করিতেছেন।

আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেও ইংরাজীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা রহিয়া গিয়াছে। ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ-জীবনে ইংরাজীর স্থান কোথায়—এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিতে না পারিলে এই অন্তর্বর্তী ১৫ বৎসর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া অত্যন্ত এলোমেলো হইয়া পড়িবে। ইংরাজী জানিতে হইবে কি না, কিসের জন্য জানিতে হইবে, এবং কতখানি জানিতে হইবে—এ বিষয়ে তাহারা যদি বড়দের নিকট হইতে একটা সুনির্দিষ্ট হদিস্ না পায়, তাহা হইলে তাহারা যে জ্ঞান-সাগরে হাবুডুবু খাইবে, কিংবা দু'নৌকায় পা দিয়া একেবারে অতল-তলে তলাইয়া যাইবে, এইরূপ সম্ভাবনা আছে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের পক্ষে ইহা বড় সঙ্কটজনক অবস্থা; এই অবস্থা হইতে তাহাদের উদ্ধার করিতে হইলে, ইংরাজীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত মীমাংসা করা দরকার।

ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ধুয়া উঠিল—ইংরাজ যখন ভারত-ছাড়া হইয়াছে, ইংরাজীকেও সাগর-পার করিয়া দাও। স্বাধীনতা লাভের প্রথম ধমকে আমাদের স্বাদেশিকতা স্বভাবতঃই একটু উগ্র ও উৎকট হইয়া উঠিল। ইংরাজ-সংশ্লিষ্ট সব কিছু তাড়াইবার জন্য আমরা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলাম। হাতের কাছে আর কিছু না পাইয়া, রাস্তা-ঘাটের নাম পাল্‌টাইয়া দিয়া, একসঙ্গে বিদেশী বিতাড়ন ও স্বদেশী বীরপূজা—এই দু'টো কাজ সস্তায় সারিয়া লইলাম। সৌভাগ্যক্রমে এই উগ্রতা বেশী দিন রহিল না। বরং এখন দেখি, অন্য অনেক বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্য রীতি-নীতির পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। শুনিতে পাই, ভারতের রাজধানীতে আজকাল সাহেবী স্যুট পরার খুব রেওয়াজ হইয়াছে। (অবশ্য, কোনও স্থলে মোজা ও নেক্‌টাই বর্জন এবং চপ্পল-সহযোগে বিলাতী স্যুট কিঞ্চিৎ শোধন করিয়া লওয়া হয়।) সিনেমার ছবিতে, বিশেষতঃ হিন্দী চিত্রে, স্যুট না পরিলে "হীরো"ই হওয়া যায় না। পুলিশ ও মিলিটারীর কথা ছাড়িয়া দিই—ধুতি-চাদর বা চোগা-চাপকান পরিহিত অফিসারের কথা তো ভাবিতেই পারি না—আজকালকার সখের ব্যাণ্ড-পার্টিরও সকলে সাহেবী পোষাকের পরম পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন।

এই সকল ব্যাপারে গ্লানিকর বা অপমানজনক কিছুই দেখি না। কারণ, দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে—নিজের সুবিধা-অসুবিধা বুঝিয়া স্বেচ্ছায় আমরা পোষাক বাছিয়া লইতে পারি; বিদেশী শাসকের কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। তাহা ছাড়া, "যুগধর্ম্মের" প্রভাব তো আছেই, স্বাদেশিকতার দোহাই দিয়া তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা সহজ নহে। বিলাতী খেলাধূলা, যথা—ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান প্রকোপ দেখিলেই সেটা সহজে অনুমান করিতে পারা যায়।

ইংরাজী সম্বন্ধেও এইরূপ আপোষের চেষ্টা কিছু কিছু দেখিতেছি। ইংরাজী New Year's Day-র বদলে Bank closing Day নাম দিয়া ছুটি ও উৎসব বাহাল রাখা হইয়াছে—ইংরাজী Calendar অনুযায়ী এখনও কাজকর্ম্ম চলিতেছে। ইংরাজী সংখ্যার অক্ষরগুলিকে "International form of Indian numerals"—এই গাল-ভরা আখ্যা দিয়া সচল করিয়া লওয়া হইয়াছে। "মনকে খ্যাঁ ঠারিবার" এই চেষ্টা কাহারও কাহারও মনে কৌতুক উদ্রেক করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাও "যুগধর্ম্ম"; বলিবার কিছু নাই। যাহা হউক, এগুলি ছোট-খাটো ব্যাপার। এখন, আসল ইংরাজী ভাষার দশা কি হইবে, তাহাই একটু অকপট ও অপ্রমত্ত ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

ইংরাজীর ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিতে হইলে গোড়ায় তাহার অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, এই অতীতের উপর তাহার ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য ইংরাজ শাসক সম্প্রদায় নিতান্ত গায়ের জোরে আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন নাই; বরং আমাদের ভারতীয়দের অনেকেই ইংরাজ-শাসনের প্রথম যুগে ইংরাজী শিখিবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ইহার ফলেই এত শীঘ্র ও এত সহজে ভারতীয় জীবনের সকল বিভাগে—ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য ও শিল্পে—পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল।

সংসারের সকল জিনিষের মত এই ইংরাজী শিক্ষাতেও আমাদের লাভ-লোকসান দুই-ই হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ধাক্কায় আমরা আমাদের জাতীয় ভাব প্রায় হারাইতে বসিয়াছিলাম। এমন দিন গিয়াছে যখন পিতা পুত্রকে চিঠি লিখিতেন ইংরাজীতে; বন্ধুতে বন্ধুতে আলাপ হইত ইংরাজী ভাষায়। হাতেখড়ি হইয়া গেলেই "অ আ ক খ"র সহিত ছেলেকে শিখিতে হইত "a b c"। ইস্কুলে সংস্কৃত বা পালির ব্যাখ্যা করিতে হইত ইংরাজীতে। যে কোনও জাতির জীবনে এইরূপ ব্যবস্থা শুধু অনাসৃষ্টি নহে—অনাচার। সুখের বিষয়, ব্রিটিশ-শাসনের শেষ যুগে এই সকল অনাচার অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। অধুনা স্বাধীন ভারতে এইগুলির পূর্ণ সংশোধন হইবে—সহজেই আশা করা যায়।

কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায় শুধু লোকসান নয়, লাভও কিঞ্চিৎ হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, ইংরাজী শিক্ষা পশ্চিমের প্রগতিশীল জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দিল। সমগ্র দেশে নূতন ভাবের বন্যা বহিয়া গেল। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনতার স্পৃহা দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল। অবশ্য, এখানেও প্রথম সংঘাতে অমৃতের সহিত হলাহলও উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অন্ধভক্তি বশতঃ পরাধীনতার চেয়েও যাহা ভয়ঙ্কর—পরনির্ভরতা ও আত্মাবমাননা কিছু দিন দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার

ভালো-মন্দ বা উৎকর্ষ-নিকর্ষ লইয়া বিতর্ক করিয়া লাভ নাই। তবে এ কথা অস্বীকার করা যাইবে না যে, ভালই হউক আর মন্দই হউক, পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন আমাদের জীবনে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। তাহাকে ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া অসম্ভব; তাহাকে মানিয়া লইয়া আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে।

ইংরাজী সাহিত্য ও সভ্যতা ছাড়া শুধু ইংরাজী ভাষারও একটি নিজস্ব অবদান আছে। ইংরাজী ভাষার সাহায্যেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম ভাবের আদান-প্রদান হইল। ইংরাজী সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের ধর্ম ও সামাজিক জীবনে ঘটিল "একাকার"—কিন্তু ইংরাজী ভাষার সাহায্যে আমাদের রাজনৈতিক জীবনে সুরু হইল—ঐক্যসাধন। "খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত" ভারত যে এক অখণ্ড হিন্দুস্থানে পরিণত হইয়াছে, তাহা কতকটা ইংরাজ-শাসনের ফল বটে, কিন্তু এ বিষয়ে ইংরাজী ভাষার কৃতিত্বও কম নহে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস আগাগোড়া ইংরাজী ভাষায় লিখিত। ইহা ছাড়া, "গোবধ-নিবারণী" হইতে আরম্ভ করিয়া দর্শন, বিজ্ঞান পর্য্যন্ত যত কিছু "নিখিল ভারতীয়" কংগ্রেস বা কন্‌ফারেন্স এ যাবৎ ঘটিয়াছে—সকলের কার্য্যকলাপই ইংরাজী ভাষায় সমাধা হইয়াছে। বস্তুতঃ, উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীর ভাববিনিময়ের ভাষা এত দিন ইংরাজীই ছিল। দেশে এতগুলি সুপরিচালিত ইংরাজী মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রের প্রচলনও ঐ কথারই সাক্ষ্য দিতেছে।

"নিখিল ভারতীয়" ব্যাপার ছাড়া সাধারণ ব্যবহারিক জীবনেও ইংরাজীর প্রসার বড় কম ছিল না। আপিস-আদালতে ইংরাজী অপরিহার্য্য। ডাক্তারী, ওকালতী, বড় ব্যবসায় প্রভৃতির জন্যও তদ্রূপ। এক কথায় ভদ্রলোকের ছেলে হইলেই তাহাকে অন্ততঃ কিছু ইংরাজী শিখিতে হইবে—এই ধারণা সর্বত্র বলবৎ ছিল। আবার, ভাল ইংরাজী বলিবার ও লিখিবার জন্ত অনেক ছাত্র প্রাণপাত চেষ্টা করিত।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ইংরাজী ভাষা আজ দেড় শত বৎসর ধরিয়া আমাদের অস্থি-চর্ম্ম ভেদ করিয়া প্রায় মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে—স্বাধীন ভারতে তাহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা যাইবে? এক পক্ষের চরমপন্থীরা বলিতেছেন, ইংরাজীকে সমূলে উৎপাটন করো। অপর পক্ষের চরমপন্থী, যাঁহারা এত কাল ইংরাজী জ্ঞানের দৌলতে অগাধ ও একচেটিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা—অনেকটা তাঁহাদের মূলধনের স্বার্থের খাতিরে—আশা করিতেছেন যে, ইংরাজীর পূর্বগৌরব হুবহু বজায় থাকিবে। পূর্বেই বলিয়াছি, অকপট ও অপ্রমত্ত ভাবে এই প্রশ্নটি বিচার করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতে ইংরাজী পূর্বের ন্যায় অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতে পারে না। ভারতীয় ভাষাগুলি অনেক স্থলেই তাহাকে স্থানচ্যুত করিবে, সন্দেহ নাই। সাধারণ, ব্যবহারিক জীবনে তাহাদের দাবী অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না। কিন্তু আবার কয়েকটি কঠিন সত্যও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যাহারা ইংরাজী শিখিয়াছে, তাহারা সহসা অধীত বিদ্যা ভুলিয়া যাইতে পারে না; কারণ ভাষা শিক্ষা করা যেমন শক্ত, ভাষা ভুলিয়া যাওয়াও তাহার চেয়ে কম শক্ত নহে। আবার যাহারা ভবিষ্যতে ইংরাজী শিখিবে, তাহাদের কাছেও ইংরাজীর সহিত অপর কোনও ভাষা প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কথায় বলে, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। এই হিসাবে কর্তারা ইংরাজীর মেয়াদ ১৫ বৎসর বাড়াইয়া দিয়া বোধ হয় ভুল করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে হয়তো তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। কিন্তু ইংরাজী বিদ্যা একবার পেটে পড়িলে আর কোনও ভাষা ধাতে সহিবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, অর্জিত বিদ্যা কেহ ধুচুনী দিয়া চাপিয়া রাখে না—উহা সময়ে-অসময়ে আত্মপ্রকাশ করিবেই। ফলে, পনেরো বৎসর পরে ইংরাজীর মেয়াদ হয়তো আরও পনেরো বা পঁচিশ বৎসর বাড়াইয়া দিতে হইবে।

আর একটি কথা। ভাষা সম্বন্ধে রাষ্ট্রসভার বিধান খুব সুস্পষ্ট ও সুসমঞ্জস নহে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার পদে উন্নীত করা হইয়াছে—ভালই হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলিকেও যথেষ্ট কৌলীন্য ও স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, কর্তারা "এক বৃন্তে দুটি ফুল" ফুটাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। শাসন ও শিক্ষা ব্যাপারে ইংরাজীকে স্থানচ্যুত করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার জন্য হিন্দী ও আঞ্চলিক ভাষা—উভয়েই সমপরিমাণে চেষ্টা করিবে। এখন এই আত্মোন্নতির প্রতিযোগিতায় যে সকল আঞ্চলিক ভাষা হিন্দীকে আগাইয়া যাইবে—বিশেষতঃ, যে ভাষাগুলি (যেমন তামিল, তেলেগু ইত্যাদি) হিন্দীর সহিত সম্পর্ক-রহিত, তাহারা যে সহজে হিন্দীর আধিপত্য মানিয়া লইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহার ফলে একটা অন্তর্বিরোধ ও মনোমালিন্য হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বৃটিশ-শাসনের চাপে ও ইংরাজী ভাষার আওতায় ভারতের যে ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে—ভাষা-বিরোধের দ্বারা যদি সেই ঐক্যে ভাঙ্গন ধরে, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। একেই তো প্রাদেশিকতার বিষ নানা দিক দিয়া রাষ্ট্রীয় জীবনে সঞ্চারিত হইতেছে, তাহার উপর আবার ভাষা লইয়া এই রেষারেষি সুরু হইলে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধন আরও শিথিল হইয়া যাওয়া সম্ভব। এরূপ পরিণাম বাঞ্ছনীয় কি না, রাষ্ট্রনেতাদের বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত।

ইংরাজীকে কিয়ৎ পরিমাণে বর্তমান অবস্থায় রাখিয়া দিলে এ বিষয়ে সব গণ্ডগোল চুকিয়া যায়। অবশ্য ইংরাজীকে ভারতের সার্বজনীন ভাষা করিবার কথা বলিতেছি না। প্রথমতঃ, ইংরাজী আমাদের মাতৃভাষা নহে, সুতরাং আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ার মত এখানে ইহা কখনই আমাদের শিক্ষা-সূচীতে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ আমলেও ইহা কখনও সার্বজনীন ভাষা হইবার স্পর্দ্ধা করে নাই। আন্তঃপ্রাদেশিক আদান-প্রদানে ইহা শুধু উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে—অন্ততঃ উত্তর ভারতে—হিন্দীই ছিল কথাবার্তার বাহন। এক প্রকার বাজার-চলন হিন্দী আমরা সকলেই ব্যবহার করিতে পারিতাম বা করিবার চেষ্টা করিতাম। এই ব্যবস্থা এখনও বাহাল রাখিলে কি ক্ষতি হইবে, বুঝিয়া উঠা দুষ্কর—বিশেষতঃ যখন ইংরাজী শিক্ষা একেবারে উঠাইয়া দিতে পারিতেছি না। University Commissionও তাঁহাদের রিপোর্টে যদিও (বোধ হয়, কতকটা মানের বা প্রাণের দায়ে) সমগ্র ভারতের

এক ভাষারূপে হিন্দীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, উচ্চতর শিক্ষায় ইংরাজী অপরিহার্য্য। ইংরাজী বর্জন করিলে আমরা বহির্বিশ্ব হইতে সংসর্গচ্যুত হইয়া আবার কূপমণ্ডুকে পরিণত হইব। সুতরাং শিক্ষার একটি স্তরে পৌঁছাইয়া আমাদের ইংরাজী শিখিতেই হইবে। কিন্তু ইংরাজী শিখিব অথচ ব্যবহার করিব না, অথবা শুধু আন্তর্জাতিক ব্যবহারের জন্য শিকায় তুলিয়া রাখিব, এরূপ যুক্তি সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

এখানে একটা কথা উঠিতে পারে—ইংরাজের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইয়া আমাদের ইংরাজী এমন উদ্ভট হইয়া পড়িবে যে, ক্রমশঃ স্বভাবতই তাহার অবসান ঘটিয়া যাইবে। কিছুটা অবনতি হয়তো ঘটিতে পারে, কিন্তু ইংরাজী আমলেও তো আমরা সকলেই কিছু সরোজিনী নাইডু বা জহরলাল নেহরুর মত ইংরাজী বলিতে বা লিখিতে পারিতাম না। সে সময়েও আপিসের কেরাণী, মাড়ওয়ারী সওদাগর, কলেজের অধ্যাপক ও আই, সি, এস অফিসার-ভেদে রং-বেরংয়ের ইংরাজী প্রচলিত ছিল। নির্ভুল ইংরাজী না জানিয়াও অনেকে উন্নতির চরম শিখরে উঠিতেন। আমরা বাঙালীরাই শুধু শুদ্ধ ইংরাজীর উপর অতিরিক্ত নির্ভর করিয়া অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। পূর্ব্বের ন্যায় চলনসই ইংরাজী এখনও অনায়াসে চলিতে পারে। তবে, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজীর বিশুদ্ধ মান অব্যাহত রাখিতে হইবে—বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ বিষয়ে একটু অবহিত থাকিলেই চিন্তার আর কোনও কারণ থাকিবে না।

আসল কথা এই যে, স্বাধীন ভারতে জনসাধারণের পর্য্যাপ্ত ও ব্যাপক শিক্ষার জন্য আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে যত দূর সম্ভব বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে। যুক্ত-ভারতের রাষ্ট্রভাষা নামতঃ হিন্দী হউক, ক্ষতি নাই; বরং ইহাতে আমাদের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে—উচ্চশিক্ষায়, উচ্চ আদালত বা আপিসের কার্য্যে এবং আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ইংরাজীকে স্থানচ্যুত না করিলে আমাদের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না। ভাবের আতিশয্যে বা উচ্চ আদর্শের প্রলোভনে যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যবংশধরদিগকে পঙ্গু ও খর্ব্ব করিয়া দিই, তাহা হইলে দেশমাতৃকা কখনই আমাদের ক্ষমা করিবেন না।

ভাষা সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতে গিয়া একটা কথা আমরা কখনও কখনও ভুলিয়া যাই। মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তুর মত ভাষারও প্রাণ আছে। আইন করিয়া বা ফরমাস দিয়া নূতন জীবন্ত ভাষার সৃষ্টি হয় না, যেমন "বোঁটায় আঘাত করিয়া ফুল ফোটাতে" পারা যায় না। আবার পুরাতন চলন্ত ভাষা স্রোতস্বতী নদীর মত নিজেই নিজের পথ কাটিয়া বহিয়া যায়। কেহ তাহার গতিরোধ করিতে গেলে "মৃণালিনী"র মনোরমার ভাষায় বলিতে হয়—"ভাই, এই গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও, গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, 'গঙ্গে, তুমি পর্বতে ফিরিয়া যাও'!"

পঞ্চকন্যার ইতিকথা

ইংরেজী ১৯৩৪ সালের মে মাসের এক ভোর চারটেয় তারা সকলে জন্মগ্রহণ করে। তিন মাইল দূরে ডাক্তারের বসবাস। ঘুম থেকে উঠে, তিনি তাঁর গাড়ী চালিয়ে এসে দেখেন দু'টি শিশু। তার পর তাঁর চোখের সমুখে আরও তিনটি শিশুর জন্ম হ'তে দেখা যায়। সর্ব্বসমেত পাঁচটি কন্যা, অর্থাৎ পাঁচ বোন পৃথিবীর আলো দেখলো।

এদের পিতা-মাতা হলেন ফরাসী-কানাডা জাতের দরিদ্র কৃষক। পঞ্চকন্যা লাভের পূর্ব্বে আরও ছ'টি সন্তান তাঁদের ছিল। মা ডিওন্নি কোমায় অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। কিন্তু পঞ্চকন্যা এবং তাদের গর্ভধারিণী ডিওন্নিও শেষ পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে বেঁচে রইলেন। ডাক্তার এ্যালান ড্যাফো দেখলেন, তিনি এবং তাঁর রুগিণীরা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণের বস্তু হয়ে পড়েছেন। "Quintuplets" কথাটি তথাকার অধিবাসীদের কথোপকথনে এক নতুন কথা হিসাবে চালু হয়ে পড়লো।

পঞ্চকন্যার বয়স তিন দিন হতে না হতেই তাদের জন্মদাতা পিতা মিঃ ডিওন্নি চিকাগো প্রদর্শনীতে তাদের দেখাবার জন্যে এক চুক্তিপত্রে সহি করলেন। বহু রকমের উপহার এসে পৌঁছতে শুরু করলো। তাদের প্রথম জন্মোৎসব পালিত হল তাদেরই জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী এক হাসপাতালে। জন্মোৎসবের উপহার-স্বরূপ ঐ পঞ্চকন্যা ৩০,০০০ পাউণ্ড অর্থ লাভ করলে। ডিওন্নি-দম্পতি কৃষকের কাজে তৎক্ষণাৎ ইস্তফা দিয়ে দিলেন।

যখন তাদের বয়স হল মাত্র দুই, তারা আয়কর দিলে ২০০০ পাউণ্ড এবং সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে ওনটারিও ষ্টেটের রাজবাড়ীতে আথিতেয়তা গ্রহণ করলে। ডাক্তার ড্যাফো, যিনি ওদের জন্ম থেকে চিকিৎসা করছেন, তিনি তো ও, বি, ই উপাধি লাভ করলেন এবং Who's Whoএর নাম-তালিকায় তাঁর নাম যুক্ত হয়ে গেল।

পঞ্চকন্যার বয়স যখন তিন, তখন তাদের মুখে কথা ফুটলো। লক্ষ লক্ষ লোক দেখতে আসে তাদের। এমন কি তারা যেখানে থাকতো সেখানে নতুন হোটেল, রাস্তা এবং গ্যারেজ তৈরী হয়ে উঠলো। ১৯৩৭ সালে প্রথম তাদের ঠাণ্ডা লাগে। এবং চার বছর বয়সে তাদের টনসিল অস্ত্রোপচারে সারিয়ে দেওয়া হয়। তাদের ভাগ্য তখন ১০০,০০০ পাউণ্ড।

পঞ্চম জন্মোৎসবের কিছু পূর্ব্বে টোরোনটোর রাজা এবং রাণীকে তাদের উপহার দেওয়া হল। ১৯৪২ সালে অনেক আবেদন-নিবেদনের পর ডিওন্নি-দম্পতি তাঁদের পঞ্চকন্যাকে ফেরৎ পেলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এলো। পঞ্চকন্যাকে ভুলে গেল সকলে। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে মুছে গেল তাদের খবরাখবর। পৃথিবীর সর্ব্বাধিক প্রচারিত এই শিশুরা এখন ষোলো বছরের। অর্থাৎ কি না ষোড়শী। এদের সর্ব্বশেষ সংবাদ শোনা যায়, মা ডিওন্নির পোপের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের পর থেকেই ঐ পঞ্চকন্যা না কি Nun বা সন্ন্যাসিনী হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়েছে।

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষে দুই শত বৎসরের বিদেশী শাসন অবসানের পর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিপ্লবের জয়গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু যে সকল আত্মভোলা মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙ্গালী সাধক ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৬ পর্য্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লবের পথে দেশমাতৃকার বন্ধন-মুক্তির সাধনায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, অপরিমিত বেদনার বিষপাত্র পান করিয়াছেন, ঐহিকের সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া যাহারা সর্ব্বভারতের মুক্তির জন্য দুশ্চর তপস্যায় আত্মনিবেদন করিয়াছেন, সেই সকল খ্যাত ও অখ্যাত কীর্ত্তিমান্ সৈনিকদের সম্পর্কে তাঁহারা সম্পূর্ণ নীরব।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য পলাশীর প্রান্তরে ডুবিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা ভারতবাসীর জীবন হইতে আলোক নিবিয়া গিয়াছিল। দুর্য্যোগের ঘনঘটা ও গাঢ় তমিস্রার ভিতর দিয়া বাঙ্গালী যে বিদ্রোহের বীজ বপন করিয়া চলিয়াছিল, তাহা এক শত বৎসর পরে ১৮৫৭ সালে দানা বাঁধিয়া ওঠে। বাংলার মাটিতেই বিপ্লবের পবিত্র হোমানল প্রজ্বলিত হইয়া দাবাগ্নিরূপে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়।

যে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল, সেই বাংলা দেশেই ১৯০৫ সালে বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ে স্বদেশীর দীক্ষা গ্রহণ করে। সাহিত্যিক, শিল্পী, ও চারণ কবি দল বাঙ্গালীকে অগ্নিমন্ত্র দীক্ষা লাভের জন্য প্রেরণা জোগায়; ধর্ম্মবিদ্, সমাজবিদ্ ও রাজনীতিকগণ বাঙ্গালীর রাষ্ট্র-চেতনাকে দাসত্বের পঙ্কতিলক-মুক্ত করিয়া রক্ততিলক পরাইয়া দেন। বাংলা দেশ সারা ভারতবর্ষকে এক নূতন জাগরণী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিল। আপন হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া বাংলার যুবক পলাশীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল, সেই আন্দোলনের ঢেউ ভারতীয় জন-সমুদ্রে এক নূতন প্রবাহ আনিল।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যর্থতার পর যে বিপ্লব-আন্দোলন ফল্গুধারার ন্যায় বহিতেছিল, তাহা ১৯৪২ সাল হইতে স্রোতস্বিনীরূপে আসমুদ্র-হিমাচল প্লাবিত করিল। ভারতের মুক্তি-সাধনায় বাংলার বিপ্লবিগণের কার্য্য সাময়িক ভাবে বাধা প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই। বিপ্লবিগণের নিকট ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা আনয়ন করা আজীবন সাধনা ও স্বপ্নের বিষয়-বস্তু ছিল। সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে '৪২ সালের বিপ্লব, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নৌ-বিদ্রোহের ভিতর দিয়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল নেতাজী সুভাষ তাহার পরিপূর্ণ রূপ দিয়াছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।

এই বাংলা দেশের তরুণেরাই বন্দরের নিরাপদ ক্রোড়কে আঁকড়াইয়া থাকেন নাই, লাভ-ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব রাখেন নাই, পাথেয় এবং পথের বিচার করেন নাই। তাঁহারা তীরের সঞ্চয়কে পিছনে ফেলিয়া তরঙ্গসঙ্কুল কূলহীন সমুদ্রের বুকে তরী ভাসাইয়াছিলেন—আপনাদের সর্ব্বস্ব বিপন্ন করিয়া। তাঁহারা আজ মরদেহে বাঁচিয়া নাই, কিন্তু তাঁহাদের রক্তের পবিত্র ধারায় জাতির ললাট হইতে দাসত্বের কালিমা মুছিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের অপরাজেয় আত্মার অগ্নিশিখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লৌহজালকে পুড়াইয়া দিয়াছে, তাঁহাদের গরিমাময় মৃত্যুবরণ পরাধীনতার তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে স্বাধীনতার সূর্য্যোদয়কে সম্ভব করিয়াছে।

পলাশী ও বক্সার যুদ্ধে বাংলার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর ইংরাজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিলেও বাংলার জনগণ এই পরাজয় সহজে স্বীকার করিয়া লয় নাই। ইংরাজ বণিক বাণিজ্য লোভে বঙ্গদেশে আসিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে চাহিয়াছিল। দেশের সহিত, শাসন-ক্ষমতার সহিত, বাংলার জনগণের সুখ দুঃখের সহিত, মোগল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সহিত কোন সংশ্রব ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পূর্ব্বেও ইংরাজ বণিক মুর্শিদাবাদের রাজপথে সভয়ে পরিভ্রমণ করিত।

বাংলার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর মীরজাফর রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ইংরাজ সেনার সহায়তা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মাসিক তন্‌খা প্রদান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। রাজমুকুটের মূল্যস্বরূপ রাজকোষের সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইল। মীরজাফরের কৃতকর্ম্মের ফলে ইংরাজের ঋণ অপরিশোধনীয় হইয়া উঠিল।

মীরকাসিম বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার পর ঋণমুক্তির মূল্যস্বরূপ ১৭৬০ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর চাকলা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরাজকে "ইজারা-বন্দোবস্ত" করিয়া দিলেন। এই তিন স্থান হইতে যাহা আদায় হইবে তাহা ইংরাজগণ পাইবে এবং নবাব-সরকার হইতে আর কিছুই পাইবে না। ১৫ই অক্টোবর এক সনন্দ প্রদান করিয়া মীরকাশিম ইংরাজ বণিকের শক্তি আরও বৃদ্ধি করিলেন। এ প্রদেশে ইংরাজ অধিকারের উহাই প্রথম দলিল। ঐ সময় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত (১) বগড়ী (২) ব্রাহ্মণভূম (৩) বরদা (৪) চন্দ্রকোণা (৫) চিতুয়া (৬) জাহানাবাদ (৭) মণ্ডলঘাট (৮) খারিজা মণ্ডলঘাট ও (৯) ভুরসুট পরগণা চাকলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ছিল এবং ৫৪ পরগণা লইয়া চাকলা মেদিনীপুর গঠিত ছিল। ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মেদিনীপুর ও বীরভূম অঞ্চলে অশান্তির দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। স্থানীয় জঙ্গল মহালের জমিদারগণ ইংরাজের অধিকার অস্বীকার করিল। ১৭৬০ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে কাপ্তেন মার্টিন হোয়াইটের অধীনে এক দল গোরা ও দেশী সিপাহী এবং কতকগুলি গোলন্দাজ সেনা মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রেরিত হইল। ১৭৬১ খৃঃ জানুয়ারী মাসে আর এক দল সৈন্য জনষ্টনের অধিনায়কত্বে প্রেরিত হইল। ঐ সময় মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান মহারাষ্ট্রদের অধীনস্থ ছিল এবং ইংরাজ-শক্তি ঐ সব অঞ্চলে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হয় নাই।

১৭৬৬ সালে কোম্পানী সাব্যস্ত করেন, জেলার উত্তর ও পশ্চিম ভাগে জঙ্গল মহালে সৈন্য পাঠাইয়া স্থানীয় জমিদারগণকে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করিতে হইবে এবং তাহাদের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সৈন্য সংগ্রহে বিলম্ব ঘটায় কার্য্যটি সত্বর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

সংবাদ দেশ মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই প্রায় এক শত ক্রোশব্যাপী সমস্ত জঙ্গল প্রদেশে ঘোরতর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন মেদিনীপুরের তৎকালীন রেসিডেন্ট গ্রেহাম সাহেবের আদেশে লেফ্‌টেনান্ট ফার্গুসন সাহেব ঐ বিদ্রোহ দমনের জন্য এক দল সৈন্য লইয়া জঙ্গল মহালে প্রবেশ করেন। কোম্পানীর সৈন্যদল নির্বিচারে জঙ্গল মহালের অধিবাসিগণের উপর অকথ্য অত্যাচার ও লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। ঝাড়গ্রাম, ঘাটশীলা, লালগড়, রামগড়, কাশীজোড়া, ময়না, নয়াগ্রাম, জামিরপাল প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ বিক্ষিপ্ত ভাবে ইংরাজ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সুশিক্ষিত কোম্পানী-সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও ইঁহারা প্রত্যেকেই পরাজিত হন। পরাজিত হইয়া ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা ইঁহারা স্বকীয় বাসস্থান ও দুর্গে অগ্নিসংযোগ করিয়া দুর্ভেদ্য অরণ্যে আত্মগোপন করেন।

গ্রেহামের নির্দ্দেশক্রমে ফার্গুসন বিদ্রোহী জমিদারগণকে দমনের জন্য অত্যাচারের তাণ্ডব সৃষ্টি করেন। ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার না করার অপরাধে অপরাধী জমিদারগণের সম্পত্তি সমূহ বাজেয়াপ্ত করিয়া কোম্পানীর সহায়তাকারী স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যে সমস্ত সৈনিক বিনা খাজনায় জমি ভোগ দখল করিতেছিল, তাহাদের সামান্য কারণে ও অজুহাতে উক্ত জমি হইতে উৎখাত করা হয়। ইহা ছাড়া দেশের স্বাধীনতাকামী মেদিনীপুরের অধিবাসিগণকে নির্বিচারে কোম্পানীর লোকেরা হত্যা করে। ১৭৬৭ সালের ৩০শে জানুয়ারীতে লিখিত গ্রেহামের এক পত্রে জানা যায় যে, কোম্পানীর দেশী সৈন্যদের ভিতর মধ্যে মধ্যে সেই সময় বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল এবং বাহাদুর সিং নামক জনৈক সৈনিক কাপ্টেন হোয়াইটের সাহত দেশীয় অধিবাসী দলনের অভিযানে যোগদান করিতে অস্বীকার করে।

ফার্গুসন সাহেব ১৭৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কল্যাণপুরে উপস্থিত হইলে স্থানীয় জমিদার কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া বর্দ্ধিত রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়েন। কিন্তু ঝাড়গ্রামের রাজার সহিত কোম্পানীর প্রবল সংঘর্ষ দেখা দিল। ফার্গুসন প্রথমে ঝাড়গ্রামের রাজাকে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে গ্রেহামের নির্দ্দেশ-সম্বলিত পত্র দিয়া তাঁহার তাঁবুতে আসিয়া বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব পাঠাইলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব রাজা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ভাবী সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। তিনি বশ্যতা স্বীকার অপেক্ষা তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন।

কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে ফার্গুসন সাহেব ঝাড়গ্রামের রাজাকে শায়েস্তা করিবার জন্য শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যানীর ভিতর দিয়া ঝাড়গ্রামরাজের প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। ঝাড়গ্রামের বৃদ্ধ তেজস্বী রাজা তাঁহার বিশ্বস্ত ও সাহসী সৈনিকদের উপর দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া, দুর্গে রক্ষিত ধন-রত্নাদি সংগ্রহ করিয়া গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। এই অভিযান ফার্গুসনের পক্ষে নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না। চুয়াড় সৈন্যদিগের বিষাক্ত তীরে কোম্পানী-সৈন্যের পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। বহু প্রচেষ্টার পর ফার্গুসন ঝাড়গ্রামরাজের দুর্গ অধিকার করিয়া উপলব্ধি করেন যে, জমিদারের সৈন্যদল অক্ষত অবস্থায় দুর্গের আশে-পাশে গোপনে লুক্কায়িত আছে। দুর্গ জয় করিয়াও তিনি এই ভাবে জয়লাভের গৌরব হইতে বঞ্চিত হন।

অবশেষে পুনরায় কোম্পানীর পক্ষ হইতে রাজার নিকট চরম পত্র প্রেরিত হয়। এই চরম পত্রে ইংরাজের সহিত অনর্থক বিবাদ ও যুদ্ধের নিষ্প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে বলা হয়। অন্যথায় তাহাকে তাঁহার জমিদারী হইতে বিতাড়িত করা হইবে, এ কথাও জানান হয়। কোম্পানীর সুশিক্ষিত সৈন্যের বিরুদ্ধে একক শক্তি হিসাবে যুদ্ধ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ১৭৬৭ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী ঝাড়গ্রাম-রাজ কোম্পানীর সহিত এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

ঝাড়গ্রাম অভিযান সপ্তাহ কালের মধ্যে নিষ্পন্ন হইলেও ঘাটশীলা অভিযান ফার্গুসনের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া উঠিল না। যখন তিনি বলরামপুর থানায় ছাউনী স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের আলোচনা অথবা ভয় দেখাইয়া বশ্যতা স্বীকার করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় ঘাটশীলার রাজার যুদ্ধের প্রস্তুতি সংবাদ আসিল। ১৭৬৭ খৃঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী ফার্গুসন গ্রেহামকে বলরামপুর থানা হইতে এক পত্রে লেখেন যে, এ পর্য্যন্ত যে সকল সংবাদ আমার হস্তগত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, ঘাটশীলার রাজা কোম্পানীর সৈন্যের আগমন সংবাদে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সংরক্ষণের জন্য সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং যাহাতে একটিও ফিরিঙ্গী সৈন্য প্রবেশ করিতে না পারে, সে সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে। পত্রের শেষাংশে ঘাটশীলার লৌহ, মোম, তৈল, ও আরণ্য সম্পদের বিষয় উল্লেখ ছিল।

জঙ্গল-জমিদারদিগের মধ্যে ঘাটশীলার জমিদার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার সৈন্যবলও অধিক ছিল এবং একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। ফার্গুসন এই দুর্গটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"উহা জঙ্গলের মধ্যভাগে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অবস্থিত। উহার ভূমি-পরিমাণ ১১৫০ বর্গ-ফিট এবং উহা সুবৃহৎ ও সুগভীর পরিখারাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত। চতুর্দ্দিকে কঙ্করময় গড়-প্রাচীর। উত্তর দিকে প্রধান দরজা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বার। দুইটি দ্বারের সম্মুখেই দুইটি কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু বিদ্যমান। প্রথম পরিখার পরেই লোকের বাস ও বাজার, তৎপরে আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিখা। দুর্গের কেন্দ্রস্থলে জমিদারের বাটী। উহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ২৮৮ ফিট এবং প্রস্থ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২৪০ ফিট। গড়টির মধ্যে তিনটি কূপ আছে এবং বাহিরের পরিখাটির উত্তর-পশ্চিম কোণে দুইটি তড়াগ আছে।"

কোন প্রকার হঠকারিতা না করিয়া ফার্গুসন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া অভিযানের এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, ঘাটশীলা অভিযান ঝাড়গ্রামের ন্যায় এত সহজে সুসম্পন্ন হইবে না। স্থানীয় জমিদারগণ যাঁহারা পূর্ব্বেই কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন তিনি তাঁহাদের সহযোগিতায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-অভিযানে বাহির হন।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ই মার্চ্চ ঘাটশীলা-রাজের সহিত প্রথম সংঘর্ষ বাধে। দুই সহস্র চুয়াড় সৈন্য বর্শা-ফলকের ন্যায় জামবুনির

নিকট সুদীর্ঘ প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ সংগ্রামের পর তাহারা নালায় পরিখার ভিতর আত্মগোপন করিয়া কোম্পানী-সৈন্যের পার্শ্বভাগ আক্রমণ করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ইংরাজ সৈন্য প্রস্তুত থাকায় ঐ আক্রমণ ব্যর্থ হয়। রাজার সৈন্যদলের সহিত এক প্রবল সংঘর্ষের পর ফার্গুসন বিন্দগ্রাম অধিকার করেন। এই গ্রাম অধিকার করার পর জঙ্গল-পথে মণ্ডলকুড়ায় উপস্থিত হইলে চুয়াড় সৈন্যদলের সহিত এক হাতাহাতি সংগ্রামের ফলে উভয় পক্ষে বিস্তর সৈন্য হতাহত হয়। রাজার সৈন্যদল পুনঃ পুনঃ কোম্পানী-সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করিয়া গভীর অরণ্যের ভিতর হইতে গুলীবর্ষণ করে। ইহা ছাড়া "গরিলা যুদ্ধে" ইংরাজ সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। প্রবল প্রতিরোধের ভিতর দিয়া কোম্পানী-সৈন্য ৩২ মাইল পর্য্যন্ত জঙ্গল-পথ অতিক্রম করিয়া পুরুগ্রামে উপস্থিত হইলে তথায় রাজার সৈন্যদলের সহিত পুনরায় সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিল না। রাজ-সৈন্যের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়া ফার্গুসন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়া পশ্চাৎ, সম্মুখ ও পার্শ্বভাগ বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত করেন।

যুদ্ধের এই পর্য্যায়ে ঘাটশীলা-রাজের পক্ষ হইতে এক জন উকিলকে দিয়া ৫০০০৲ টাকা উৎকোচ-স্বরূপ ফার্গুসনের নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ফার্গুসন উৎকোচ গ্রহণে অস্বীকার করিয়া যুদ্ধ আরও জোরে চালাইয়া গেলেন। রাজপক্ষ মরণপণ করিয়া যুদ্ধ করা সত্ত্বেও বিজয়লক্ষ্মী কোম্পানী-সৈন্যকে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

রাজা সসৈন্যে নিকটস্থ এক পাহাড়ে আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে তাঁহার দুর্গে অগ্নিসংযোগ করেন। অগ্নির লেলিহান শিখা সমগ্র দুর্গ-অঞ্চল গ্রাস করার ফলে বহু মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পর্ব্বত-কন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও রাজা কোম্পানী-সৈন্যদলের বিরুদ্ধে "গরিলা যুদ্ধ" চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে কিছু দিন পর বাংলার অন্যতম স্বাধীনতাকামী বৃদ্ধ রাজা ইংরাজের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। এই তেজস্বী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

মেদিনীপুর অঞ্চলে যে সকল জমিদারগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত হন, তন্মধ্যে খড়্‌গপুরের নরহরি চৌধুরী অন্যতম। তিনি মেদিনীপুরের রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য করিয়া স্বকীয় স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ইংরাজ সম্পর্কে তাঁহার অনমনীয় মনোভাব বর্ত্তমান ছিল। উক্ত সময়ের এক পত্রে এই জমিদারের তেজস্বিতা ও স্বাধীন মনোভাবের বিষয় জানা যায়।

"খড়্‌গপুরের নরহরি চৌধুরী সম্পর্কে নানা প্রকার অভিযোগ হস্তগত হওয়ায় আমি তাঁহাকে কাছারী-বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাই। কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেন যে, তিনি আমাদের প্রজা নন। ইহার পর আমি কোন প্রকার চরম পন্থা গ্রহণ না করিয়া আমার নাজিরকে এক পরওয়ানা সমেত পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু তিনি হাজির হওয়ার পরিবর্ত্তে দুই শত পাইক সৈন্য লইয়া জঙ্গলে আত্মগোপন করেন।"

মেদিনীপুরের বিদ্রোহী দলকে শায়েস্তা করিতে যখন কোম্পানীর সৈন্যদল ব্যস্ত ছিলেন, তখন বীরভূমের জমিদার আসদ্ জমান খাঁ প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। কাপ্তেন হোয়াইট মেদিনীপুরে অল্পসংখ্যক সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সেনাদল লইয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অপর দিকে মীরকাসিম স্বয়ং সিপাহী-সেনার অধিনায়ক হইয়া ইংরাজ সেনানায়ক মেজর ইয়র্ক ও তাঁহার সৈন্যদলের সহিত বর্দ্ধমান অঞ্চলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসদ্ জমান খাঁ বাহুবলে ইংরাজ সৈন্যকে পরাস্ত করিবার আশায় সাধ্যানুসারে সেনা সংগ্রহ করিয়া আক্রমণাশঙ্কায় সতর্ক ভাবে রাজ্য রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সেনাদল বীরভূমের দুর্গম প্রদেশ কড়েয়া নামক স্থানে গড়খাই করিয়া দানা দিয়া বসিয়াছিল। আসদ্ জমান্ খাঁ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপে বীরভূমির নাম সার্থক হইয়াছিল। তিনি বিংশতি সহস্র পদাতিক ও পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া কড়েয়াতে ছাউনী ফেলিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য, নবাব-সেনা কিছু দিনের জন্য বুধগ্রামে ছাউনী ফেলিতে বাধ্য হইল।

মীরকাসিম ও মেজর ইয়র্ক বুধগ্রামে এবং ক্যাপ্টেন হোয়াইট্ বর্দ্ধমানের উত্তরে ছাউনী ফেলিয়া বসিয়া রহিলেন। উভয় সেনাদল লইয়া আসদ্ জমান্ খাঁকে যুগপৎ আক্রমণ করা স্থির হইলে ক্যাপ্টেন হোয়াইটকে উত্তর-পূর্ব্বাংশ দিয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইবার আদেশ করা হইল। ক্যাপ্টেন হোয়াইট দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসদ্ জমান খাঁ যেখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সে স্থান স্বভাবতঃ দুর্গম; সম্মুখদেশ হইতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং তিনি সসৈন্যে একরূপ নিশ্চিন্তহৃদয়ে কালযাপন করিতেছিলেন। এমন সময় ক্যাপ্টেন হোয়াইটের সেনাদল সহসা তাঁহার শিবিরের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া শিবির মধ্যে প্রবেশলাভ করিল। সামরিক ব্যাপারে এইরূপ অকস্মাৎ শত্রুসৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইলে যাহা হইয়া থাকে আসদ্ জমান্ খাঁর সেনাদলের তাহাই হইল; তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সেই সময়ে মেজর ইয়র্ক এবং মীরকাশিম সসৈন্যে অগ্রসর হওয়ায় পলায়নপর বিদ্রোহী সেনাদলের পরাজয় সহজেই সুসম্পন্ন হইল। এই ভাবে বীরভূমি অর্থাৎ বীরভূম, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর কোম্পানীর পদানত হইল।*

[ক্রমশঃ।

* এই প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে : (1) Seir Mutakherin Vol. 2 (2) Broome's Rise and Progress of the Bengal Army, Vol. 1. (3) Aitchson, Vol. 1. (4) Firminger's Midnapore Record, 1763-64. (5) District Gazetteer, Midnapore. (6) মেদিনীপুরের ইতিহাস। (7) মীরকাশিম।

ছোটদের আসর
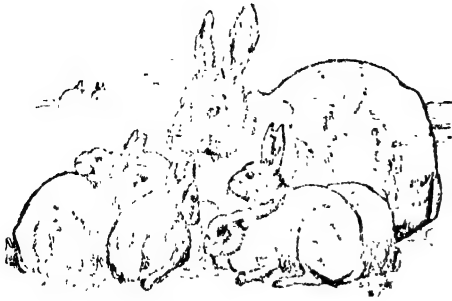
ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাল্যলীলা

ইংরেজের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। প্রায় সারা ভারতবর্ষের রাজপাটগুলি তারা দখল করে বসেছে। কলকাতা হয়েছে বৃটিশ ভারতের রাজধানী। একশো বছর আগেও এই ইংরেজ এ দেশে বণিক-বেশে এসে বাণিজ্যের বেসাতি করত—তার কুঠি নির্মাণের জন্যে স্থানের প্রত্যাশায় এ দেশের রাজাদের দরবারে হাটু গেড়ে বসে কত ধর্ণা দিত, প্রার্থনা জানাত। কিন্তু কালের এমনি আশ্চর্য্য গতি আর নিয়তির অদ্ভুত পরিহাস যে, সেই রাজাদের অপদার্থ বংশধরেরাই এখন ইংরেজের কাছে কৃপা-ভিখারী! কেউ রাজপাট রক্ষায় অসমর্থ হয়ে—রাজ্য প্রজা ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে তার বিনিময়ে বৃত্তি পেয়েই সন্তুষ্ট। কেউ বা ইংরেজের অভিপ্রেত অবমাননাকর সর্ত্তে আষ্টে-পৃষ্ঠে বদ্ধ হয়ে কোন রকমে রাজপাট বজায় রেখেছেন। কথায় কথায় এঁদের ইংরেজ রেসিডেন্টের মন যুগিয়ে চলতে হয়—পান থেকে যদি চুণটুকু খসে তাহলে আর নিস্তার থাকে না—এমনি তাঁদের অবস্থা। কিন্তু রাজ্যের মায়ায় রাজারা নত-মস্তকে ইংরেজের প্রভুত্ব স্বীকার করলেও, রাজপরিবার বা রাজসভায় এমন অনেক স্বাধীনচেতা বিচক্ষণ মনীষীও ছিলেন, যাঁরা এ ভাবে বিদেশী শাসকের মন জুগিয়ে রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ পদ আঁকড়ে পড়ে থাকতে আর রাজি হলেন না—রাজ্য ও রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে তাঁরা বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। এদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন, মুসলমানও ছিলেন। হিন্দুরা রাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে হলেন কাশীবাসী। আর মুসলমানরা মক্কায় বা ভারতের বাহিরে মুসলমান-রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

মহারাষ্ট্র-চক্রের নেতা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও যখন তাঁর রাজপাট ইংরেজকে অর্পণ করে বৃত্তি নিয়ে বিঠুরে বসবাস করতে গেলেন, তখন তাঁর রাজধানী পুণায় হাহাকার পড়ে গেল; সেই দুঃসময়ে পেশোয়ার স্নেহবদ্ধ বহু পদস্থ রাজপুরুষ রাজনীতির সংস্রব ছিন্ন করে বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় নেবার আশায় কাশী যাত্রা করলেন। এই দলে ছিলেন ভূতপূর্ব্ব পেশোয়ার অনুজ চিমনজী আপ্পা এবং তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন কর্ম্মচারী মোরপন্থ তাম্বে। এঁর পিতা বলবন্ত রাও পেশোয়ার জনৈক সেনানায়ক ছিলেন। পেশোয়ার পতনের পর পুণার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যখন বিঠুরে তাঁর অনুগমন করেন, সে সময় চিমনজীও আহূত হয়েছিলেন।

কিন্তু এই দারুণ বিপর্য্যয়ে চিমনজী এমন গভীর ব্যথা পেয়েছিলেন যে, ইংরেজের বৃত্তিভোগী অগ্রজের সংস্পর্শও তাঁর পক্ষে বিষের মত অসহ্য হয়েছিল। তিনি ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কাশীবাসই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন।

চিমনজী আপ্পার বাসভবনেই* মোরপন্থ তাম্বে বাস করতে লাগলেন। কাশীর এই নিভৃত অঞ্চলটি উদ্বাস্তু বহু মারাঠী-পরিবারের সমাগমে অল্প দিনের মধ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। মোরপন্থ সপরিবার চিমনজী আপ্পার সঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। চিমনজী আপ্পার মত মোরপন্থজীও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, উভয়েই তেজস্বী ও ধর্ম্মশীল—শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-চর্চ্চার ভিতর দিয়ে সদ্ভাবেই তাঁদের দিন কাটতে লাগল।

কিছু কাল পরে পন্থজীর পত্নী ভাগীরথী বাঈ এক পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব করলেন। এই কন্যাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধা ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। কিন্তু পিতা কন্যার নাম রাখলেন—মনুবাঈ। এই নামেই ইনি পরিচিতা হলেন।

সাধারণতঃ মারাঠী কন্যারা স্বাস্থ্যবতী, রূপসী ও বলশালিনী। কিন্তু পন্থজীর এই কন্যাটি বাল্যকালেই স্বাস্থ্য, রূপ ও শক্তিতে সমবয়স্কা মেয়েদের প্রত্যেককে অতিক্রম করে অতুলনীয় হয়ে উঠলেন। এই অপরূপা বালিকা যেন বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। শুধু রূপে নয়, দৈহিক শক্তি ও নানা প্রকার বিশিষ্ট গুণের জন্যে শৈশবেই তিনি সবার আলোচ্য হয়ে উঠলেন। কিন্তু পন্থজীর অদৃষ্টক্রমে প্রবাস-জীবনের এই সুখটুকুও আকস্মিক এক শোকের আঘাতে বিকৃত হয়ে গেল—তাঁর সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ভাগীরথী বাঈ অকালে কাশীলাভ করলেন। পন্থজী একসঙ্গে পিতা ও মাতার স্নেহ নিয়ে কন্যা মনুকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। শৈশবেই মনু ধর্ম্মশীলা ও দেব-দেবীর প্রতি ভক্তিমতী হয়ে ওঠেন। অনুকূল পরিবেশেই এ সুযোগ ঘটে। বাড়ীর সামনেই মহামায়ীর মন্দির, শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে শত শত ভক্তকণ্ঠের 'মা মা' ধ্বনি অন্তরে জাগায় ভক্তির প্রেরণা; বাড়ীতেও দেবার্চ্চনার নিত্য নিয়মিত ব্যবস্থা, পণ্ডিতদের পূজাপাঠ, শাস্ত্রালোচনা; বাড়ীর নিম্নেই কাশীর পবিত্র গঙ্গা—সেখানেও ভক্তবৃন্দের মধুর বন্দনা জলের তালে-তালে প্রাণে আনন্দের স্পন্দন তোলে। এমন বিশুদ্ধ পরিবেশের প্রভাবে বালিকার শিশু-মন যেমন ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়, পক্ষান্তরে শক্তিরূপা মহামায়ীর মন্দিরে অনুষ্ঠিত শক্তির প্রতীকগুলিও বালিকাকে শক্তিময়ী করে তোলে। শাক্ত পুরোহিত যখন তারস্বরে ভদ্রকালীর স্তোত্র পাঠ করেন, বালিকা তখন তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে চণ্ডীপাঠের সময় বালিকা মনু সব কাজ ফেলে সবার আগে সেখানে গিয়ে দাঁড়ান—মনোযোগ দিয়ে শোনেন রণচণ্ডীর রণলীলার অপূর্ব্ব আখ্যান। বালিকার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে—নিত্য নিয়মিত ভাবে শুনে-শুনে চণ্ডীর দুরূহ শ্লোকগুলিও কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। এর ফলে শিশু-বয়সেই বালিকা নিজেকে শক্তিরূপা মনে করে সমবয়স্ক সকলের উপরেই প্রভুত্ব স্থাপন করতে চাইতেন। শিশুদের সঙ্গে খেলাতেও তাঁর শক্তির লীলা প্রকাশ

* কাশীর চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের সামনে সংকীর্ণ রাস্তার অপর পারে সেই পুরাতন বাড়ী আজও বিদ্যমান। এই বাড়ীখানির মধ্যে বহু কক্ষ; নিম্নতলে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিগুলি আজও পূজিত হয়ে থাকে।

পেত ; খেলা-ঘরের খেলার ধারা মনুই মাথা খেলিয়ে বার করেন ; সেই খেলার এক জন হবে রাণী, তার পরে মন্ত্রী সেনাপতি নগরপাল পাত্র-মিত্র রাণীই দল থেকে বেছে নেবেন। তার পর থাকবে সৈন্য প্রহরী প্রজা। এদের মধ্যে অভিযোক্তা, অপরাধীও থাকা চাই—কেন না, রাণী তাদের বিচার করবেন। দলের প্রত্যেকেই চায় রাণী হোতে—কিন্তু চাইলেই ত আর রাণী হওয়া যায় না ; তার জন্তেও পরীক্ষা থাকে। পরীক্ষায় জয়ী না হলে রাণী হবার যো নেই। এর জন্তে এক-এক দিন এক-এক রকমের পরীক্ষা হয়। এক দিন হয়ত দৌড়ের ব্যবস্থা হলো। একটা স্থান ঠিক করে বলা হলো—একসঙ্গে সবাই দৌড়তে স্বরু করে সবার আগে সেই স্থানটিতে যে পৌঁছাতে পারবে—সেই হবে সেদিনের জন্তে রাণী। এর পর বালক-বালিকাদের দল বেঁধে একসঙ্গে ছোটবার কি ধুম! কিন্তু এই দৌড়-বাজীতে মনুই সবার আগে ঘুঁটি ছুয়ে সবাইকে হারিয়ে দিয়ে সেদিনের রাণীর আসনটি দখল করে নেন, আর দলের সকলেই তাঁর হুকুম মানতে বাধ্য হয়। এখানে কেউ অবাধ্য হলেই মুস্কিল ; রাণী তখন রণমুখী হয়ে তাকে এমন শাস্তি দেবেন যে, কারুর সাধ্য হয় না তাতে বাধা দিতে। এই জন্তে দলের সকলেই মনুকে ভয় করে, তাঁকে ঘাঁটাতে কেউ বড় একটা সাহস পায় না।

এক দিন এমনি একটা খেলায় রাণী হয়ে মনু একটা অবাধ্য ছেলেকে রীতিমত শাস্তি দেন। ছেলেটি তখন সরোদনে বলতে থাকে : বর্গীদের মেয়ে কি না, তাই এমনি মারকুটে।

মনুর ইচ্ছা ছিল, ছেলেটিকে ধরে এনে জিজ্ঞাসা করবেন—কেন সে তাকে বর্গীর মেয়ে বললে! কিন্তু ছেলেটি কথাটা বলেই পাথরের আসন থেকে মনুর উঠবার আগেই ছুটে পালিয়ে যায়। কথাটা কিন্তু মনুর মনে ব্যথা দেয় ; তাই তিনি তখনি খেলা ভেঙে দিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

চিমনজী আপ্পা তখন বৈঠকখানায় বসে পন্থজীর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছিলেন। সেখানে আরও কয়েক জন পণ্ডিত বসেছিলেন। এমন সময় মনু তাড়াতাড়ি সে ঘরে ঢুকে পন্থজীর কোলের কাছে বসে পড়ে বললেন : বাবা, একটা ছেলে আজ আমাকে বর্গীর মেয়ে বলেছে। আমি তাকে শাস্তি দেব ; কিন্তু তার আগে জানতে চাই—কেন আমাকে ও-কথা বললে? আমরা কি বর্গী? এ কথার মানে কি বাবা?

পাঁচ বছরের মেয়ের মুখে এই ধরণের কথা শুনে ঘরশুদ্ধ সকলেই অবাক্ হয়ে মনুর আরক্ত মুখখানার দিকে চেয়ে রইলেন। পন্থজী আস্তে-আস্তে মেয়ের মাথায় হাতখানি রেখে শ্রদ্ধেয় চিমনজীর দিকে চেয়ে স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন : তোমার কথা বাপুজী শুনেছেন, উনিই বলবেন মা—বর্গী কাদের বলা যায়, আর—ও কথার মানে কি?

চিমনজীকে মারাঠীরা সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে বাপুজী বলতেন। সৌম্যমূর্ত্তি, দীর্ঘাকৃতি, সুপুরুষ ; মিষ্টভাষী সদাশয় ব্যক্তি ইনি। মুখখানি প্রসন্নতায় ভরা, সর্ব্বক্ষণই যেন মিষ্ট হাসির আভায় ঝলমল করছে। মনু তাঁরও পরম স্নেহের পাত্রী—মহাভারতের ও মহারাষ্ট্রের যোদ্ধাদের কত গল্পই তিনি তাকে প্রত্যহ শুনিয়ে থাকেন। বালিকার কথা শুনে এখন তাঁর মনে পড়ল—এ-সম্বন্ধে কিছুই তিনি মনুকে বলেননি। তাই অপরাধীর মত মুখভঙ্গী করে তিনি মনুর দিকে চেয়ে বললেন : এর জন্তেই তোমার বাপুজীই দায়ী মা, কেন না, বর্গীদের কথা কোন দিনই তোমাকে বলিনি ; এখন বলছি মা, শোনো : শিবাজী মহারাজের গল্প তোমাকে বলেছি—মনে আছে ত?

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করে মনু সেই মহাপুরুষকে যোড়হাতে প্রণাম জানালেন। বাপুজী বলতে লাগলেন : শিবাজী মহারাজের অনেক রকমের সৈন্য ছিল। যারা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে লড়াই করত, তাদের বলা হোত পদাতিক। আবার ঘোড়ায় চড়ে যারা যুদ্ধ করতে যেত, তারা অশ্বারোহী বলে গণ্য হোত। এদের আবার দু'টো দল ছিল। যে-সব মারাঠী যোদ্ধা রাজার পরোয়া না করে দেশের খাতিরে নিজেরাই খামরাই হয়ে ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-পোষাক নিয়ে যুদ্ধের সময় হাজির হোত, তাদের নাম ছিল—'শিলাদার'। আর যারা সরকার থেকে ঘোড়া, সাজ-পোষাক, অস্ত্র-শস্ত্র ও নিয়মিত বেতন পেত, তাদের বলা হোত—'বারগীর'। এই বারগীর কথাটাই কালে 'বর্গী' হয়ে দাঁড়ায়। এদের গল্প তোমাকে পরে বলব মা।

এ সব কথা সেই বয়সে মনু কত দূর বুঝেছিলেন বলা যায় না ; কিন্তু এই প্রশ্ন থেকে বালিকার অনুসন্ধিৎসা দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হোলেন। এক মারাঠী জ্যোতিষী সেদিন চিমনজীর কাছে এসেছিলেন ; তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এতক্ষণ বালিকাকে দেখছিলেন। চিমনজীর কথায় পর তিনি মনুকে কাছে ডেকে তার হাতের রেখাগুলি নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করতে লাগলেন। খানিক পরে তিনি পন্থজীকে লক্ষ্য করে বললেন : আপনার মেয়ের হাতে যে চিহ্ন দেখছি পন্থজী, তাতে রাজরাণী হবার কথা।

পন্থজী অবিশ্যি কথাটা প্রত্যয় করলেন না ; তাঁর মত পরাশ্রিত বিত্তহীনের কন্যা রাজরাণী হবে, এ যে কল্পনারও অতীত। সাধারণত তিনি উচ্চাভিলাষী ছিলেন না, দুরাশাকেও মনে স্থান দিতেন না। মৃদু হেসে তিনি জ্যোতিষীর কথাকে উপেক্ষা করলেন। কিন্তু জ্যোতিষী তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে দৃঢ় স্বরে বললেন : আমার কথা মনে রাখবেন পন্থজী, ভবিষ্যতে এ কথা মিলিয়ে নেবেন—ঠিক সময়েই আমি দেখা করব।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে চিমনজী আপ্পা কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এ ব্যাধি থেকে এ যাত্রা আর রক্ষা পাবেন না। আশ্রয়দাতার এই অবস্থা দেখে পন্থজীও ভেঙে পড়লেন। মনু খেলা-ধুলা সব ছেড়ে বাপুজীর শিয়রে বসে অক্লান্ত ভাবে সেবা করেন ; একটু অবসর পেলেই ছুটে গিয়ে মন্দিরে দেবী প্রতিমার সামনে জানু পেতে বসে আর্ত্ত স্বরে প্রার্থনা করতে থাকেন ; তুমি ত মঙ্গলময়ী মা—সর্ব্বমঙ্গলা তুমি, আমার বাপুজীকে ভালো করে দাও!

এ কথাও বাপুজীর কানে যায়, তিনি মনুর মৃণালের মতন হাত দু'খানি ধরে গাঢ় স্বরে বলেন : আমার জন্তে না কি মন্দিরে মহামায়ীর কাছে ভারি কান্নাকাটি কর, মাথা খোঁড়! ছি মা, তাতে যে দেবী ব্যথা পান। এখানে থাকার দিন যদি শেষ হয়ে থাকে আমার, মা কি তা রদ করতে পারেন? তাঁকেও যে নিয়ম মেনে চলতে

হয়। দেখো মা, এই নিয়ে যেন মন্দিরের মায়ের উপর অভিমান কোর না, বিশ্বাস হারিয়ো না! তিনি মঙ্গলময়ী, যা করেন মঙ্গলের জন্যই।

বাপুজীর কথা শুনে মস্তুর পান মুখখানি অশ্রুধারায় ভরে যায় —তার বুকের ভিতরে কে যেন হাহাকার করে ওঠে।

মৃত্যুর আগে চিমনজী আপ্পা পন্তজীকে ডেকে স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন: আমার মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হলে তুমি মস্তুকে নিয়ে বিঠুরে যেও। অভিমান করে এখানে পড়ে থেকে কোন লাভ নেই। তুমি গেলে আমার দাদা তোমাকে সাদরে গ্রহণ করবেন। মস্তুর জন্যেই তোমাকে যেতে হবে—এ কথা মনে রেখো!

এর পর চিমনজী আপ্পা ইষ্টদেবতার নাম নিয়ে একদা দেহত্যাগ করলেন। এই সদাশয় মহাপ্রাণ ঋষিতুল্য মনীষীর মৃত্যুতে কাশীবাসী মহারাষ্ট্রীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। কাশীর মত বিঠুর ও পুণায় তাঁর আত্মীয়স্বজন ও গুণমুগ্ধগণ শোকে অভিভূত হলেন। বিঠুরে ইংরেজের বৃত্তিভোগী পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও অনুজ আপ্পাজীর মৃত্যুসংবাদে নিদারুণ আঘাত পেলেন; সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আত্মীয়স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাশীতে পাঠালেন আপ্পাজীর পরিজনদের সঙ্গে তাঁর পরিবারভুক্ত সকলকেই সাদরে বিঠুরের প্রাসাদে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। এবার তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। অনুরুদ্ধ হয়ে পন্তজীও সকন্যা আপ্পাজীর পরিজনবর্গের সঙ্গে বিঠুরে গেলেন।

[ক্রমশঃ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা

শৈলেন ভট্টাচার্য্য

রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজকাল দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের বিষয় লইয়া বিশেষ আলোচনা হইতেছে। বহু দিনকার প্রপীড়িত, নিপীড়িত ভারতবাসীরা আজ জেগেছে। যে আগুন মহাত্মা গান্ধীর আমল হতে ধিকে-ধিকে জ্বলছিল, আজ তা ভীষণ আকার ধারণ করেছে। কেউ আজ আর দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করতে পারবে না।

আমাদেরই দেশের প্রবাসীদের কথা আজ তোমাদের বলব। ভূগোলে লেখা আছে, আফ্রিকাকে বলে অন্ধকারের দেশ। আমার মনে হয়, ভূগোল-রচয়িতার আরও লেখা উচিত ছিল যে, আফ্রিকা এশিয়াবাসীদের কাছে অন্ধকারের দেশ, কারণ আফ্রিকার এমন কয়েকটি স্থান আছে, যেখানে এশিয়াবাসীর প্রবেশ নিষেধ। বর্ণ-বৈষম্যের ফলে ভারতীয় বা এশিয়ার অন্য দেশের লোকদের সেই সব স্থানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বহু ভারতীয় স্থায়ী ভাবে বাস করেন। জেনারেল স্মাটস্ যিনি না কি বিখ্যাত শান্তিবাদী এবং তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র ডাঃ মালান এশিয়া-বাসীদের উপর নিম্নলিখিত নিয়মগুলি বাধ্যতামূলক ভাবে প্রয়োগ করেন। নিয়মগুলি পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে সেখানকার ভারতীয়দের অবস্থা।

(১) এক জন অ-ইয়োরোপীয় তাহার নিজের ইচ্ছামত সিনেমার টিকিট কিনিতে পারিবে না। এশিয়াবাসীদের জন্য কয়েকটি বিশেষ সিনেমা-গৃহ আছে, সেগুলি ছাড়া অন্য সিনেমায় প্রবেশ করিলে আইনত দণ্ডনীয় হইবে।

(২) এক জন এশিয়াবাসী হোটেল বা রেষ্টুরেণ্টে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(৩) তাহাকে কোন ট্রেণের টিকিট কিনিতে হইলে ২৪ ঘণ্টা আগে রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। তাহার টিকিটে বিশেষ নম্বর থাকিবে। কোন ইয়োরোপীয়ের পাশে কদাচ বসিবে না। যদি সে প্রথম শ্রেণীতে যাইতে চায়, তবে তাহাকে সারা প্রথম শ্রেণীই ভাড়া করিতে হইবে, কেন না, একই কামরায় তাহার সহিত কোন ইয়োরোপীয় যাইবে না।

(৪) ডাইনিং রুমে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কেন না সেখানে কোন ইয়োরোপীয় তাহার পাশে বসিবে না।

(৫) রেল-ষ্টেশন বা পার্কের বেঞ্চে বসিতে পারিবে না, কারণ সেগুলি ইয়োরোপীয়দের জন্য।

(৬) পোষ্ট অফিসের সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে না, কারণ তাহা ইয়োরোপীয়দের প্রবেশ-পথ। স্থানীয় অধিবাসী বা এশিয়াবাসীদের জন্য পাশ-দরজা আছে, যেখান দিয়া তাহাদের প্রবেশ করিতে হইবে।

(৭) তাহার ছেলেমেয়েরা ইয়োরোপীয়দের স্কুলে যাইতে পারিবে না। হয় নিগ্রোদের স্কুলে, নচেৎ অন্য কোন স্কুল দেখিয়া লইতে হইবে।

(৮) এক জন ইয়োরোপীয় এক জন এসিয়াবাসী দ্বারা 'সার' বলিয়া অভিহিত হইবে; কারণ সে সাদা লোক।

(৯) একই কাজের মাহিনার তফাৎ আছে। যে কাজের জন্য এক জন ইয়োরোপীয় এক পাউণ্ড পাইবে, সেই কাজের জন্যই এক জন এসিয়াবাসী তাহার এক-তৃতীয়াংশ পাইবে।

(১০) এক জন অ-ইয়োরোপীয় এক জন ইয়োরোপীয়ের গৃহের নিকট গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। এমন কি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী ও মাননীয় ব্যক্তি মহামান্য আগা খাঁ দক্ষিণ-রোডেসিয়ার এক স্বাস্থ্যকর স্থানে গৃহ নির্ম্মাণের অনুমতি পান নাই।

(১১) বাসগুলি ইয়োরোপীয়দের জন্য।

(১২) এক জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এসিয়াবাসী ইয়োরোপীয়দের গীর্জায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদি সে প্রার্থনা করিতে চায়, তবে সে গীর্জার সীমানার বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিবে, কিন্তু প্রার্থনার সময় এই বিষয়ে সদা-সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে যেন সে রাস্তা বন্ধ করিয়া না থাকে। অসতর্ক হইলে বা কোনও ইয়োরোপীয়ের সামান্য বিরক্তির কারণ হইলে সে যে কোন মুহূর্ত্তে গ্রেপ্তার হইতে পারে।

এই নিয়মগুলি পালন করিতে কিরূপ লাগে বল ত? আমাদের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়-দের অহিংস আন্দোলন দ্বারা এই নিয়ম লংঘন করিবার প্রকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দেন। আজ মহাত্মার অবর্ত্তমানে সেখানে ভারতীয়দের চালনা করছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র মহাত্মা মণিলাল গান্ধী।

আজ দক্ষিণ-আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে সব ভারতীয় লড়ছেন, আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

মোহাম্মদ ইকবাল

ইকবাল ১৮৭৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পরিবারের আদি বাসভূমি ছিল কাশ্মীর। গোড়ার দিকে তিনি শিয়ালকোটে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। শিয়ালকোটের মারে কলেজ হইতে তিনি আই-এ পাশ করেন। ১৮৯৫ সালে উচ্চশিক্ষা লাভার্থে তিনি লাহোর গমন করেন। ১৮৯৯ সালে স্যার ইকবাল এম-এ ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। ইহার কিছু কাল পরেই তিনি লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজে ম্যাকলিয়ড আরাবিক রীডারশিপ লাভ করেন। উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯০৫ সালে ইয়োরোপ যাত্রা করেন। তিনি কেম্ব্রিজ হইতে ডিগ্রী প্রাপ্ত হন এবং লিংকনস্ ইন হইতে ব্যারিষ্টার হন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্ব্বে মিউনিকে তিনি দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পারস্যে দর্শন-শাস্ত্রের উৎকর্ষ সম্পর্কে থিসিস লিখিয়া তিনি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁহার এই থিসিস লণ্ডনে প্রকাশিত হয়।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক লাহোর হাইকোর্টে এডভোকেটরূপে তিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অবসর সময়ে কলেজে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ছাত্র-জীবনেই তাঁহার উর্দ্দুতে কবিতা লিখিবার ঝোঁক দেখা দেয়। পারসী ভাষায় কবিতা লিখিবার পূর্ব্বে উর্দ্দু ভাষায় তিনি কয়েকটি উচ্চ ধরণের কবিতা লেখেন। তাঁহার প্রথম পারসী কবিতা "আসরারে খুদী" ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর, এ, নিকোলসন ১৯২০ সালে ইহা ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি ক্রমাগত কবিতা লিখিতে থাকেন। "আসরার"-এর পর লেখেন "রুমুজে বেখুদী" ১৯১৮ সালে। "রুমুজে"র পর প্রকাশিত হয় "পায়ামে মাশরেক"। 'গেটের ওয়েষ্ট অস্ট্রলিচার দেওয়ান'-এর জওয়াবে কতিপয় কবিতায় সঞ্চয়রূপে "পায়ামে মাশরেক" প্রকাশিত হয়। ইহার পর প্রকাশিত হয় "জবুরে আজম" এবং "জাভীদনামা"। অতঃপর ইকবাল পুনরায় উর্দ্দুতে লিখিতে সুরু করেন এবং "বাল-ই-জিব্রিল" ও "যারবে কালীম" নামক দু'খানা কবিতার বই প্রকাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার "মুসাফির" ও "পাস চাহে বায়েদ কার্দ" নামক দু'টি ক্ষুদ্র পারসী কবিতাও প্রকাশিত হয়। তাঁহার শেষ কবিতার বই "আরমুগানে হেজাজ"। ইহা উর্দ্দু ও পারসী কবিতার সংগ্রহ।

ইকবাল সারা জীবন দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এ সম্পর্কে তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। তাঁহার এই বক্তৃতাসমূহ "দি রিকনস্ট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থট ইন্ ইসলাম"রূপে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে তাঁহার এই বক্তৃতাসমূহ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণরূপে পুনরায় প্রকাশিত হয়। স্যার ইকবাল সারা জীবন রাজনীতিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১৯২৭ সালে তিনি পাঞ্জাব আইন সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি পদে বৃত হন। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে ইকবাল বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি মুসলিম সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিছুকাল রোগভোগের পর ১৯৩৮ সালের ২১শে এপ্রিল স্যার মোহাম্মদ ইকবাল পরলোক গমন করেন। তাঁহার দাফন-কাফন এরূপ জাঁক-জমকের সাথে সম্পাদিত হইয়াছিল যে, তাহা রাজা-বাদশারও ঈর্ষার উদ্রেক করে।

—প্রচার বিভাগ, পাকিস্থান।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীঅমিয়কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ কয়েক দিন হল ভীষণ শীত পড়েছে।···মাঝে-মাঝে বরফও পড়ছে। রাস্তায় একটাও লোক নেই। বিরাট একটা সরীসৃপের মত প্রকাণ্ড পথটা পড়ে আছে।

রাস্তার ধারেই একখানি বাড়ি। বাড়ির সামনের ঘরটায় দু'টি মেয়ে বসেছিল। এক জন ছাত্রী, অপর জন শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষয়িত্রীটি বার বার আগুনের কাছে গিয়ে হাত দু'টি গরম করছিল। কারণ, এই প্রচণ্ড শীত নিবারণ করবার মত কোন আচ্ছাদনই তার ছিল না। সমস্ত মুখখানা সাদা হয়ে গেছে। যেন এক ফোঁটাও রক্ত নেই। ঠোঁট দু'টি থির-থির করে কাঁপছে। ছাত্রী পড়িয়ে সামান্য যে কয়টি টাকা সে পায়, তাতে তার সংসার চলে না। অনন্ত অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে সংসার চালাতে হয়।

হঠাৎ এক দিন সেই শিক্ষয়িত্রীটির জীবনে এল সম্পূর্ণ আনন্দ আর সুখের জোয়ার।

ছাত্রীর দাদা শিক্ষয়িত্রীকে ডেকে বললেন—"আমি যদি তোমায় বিয়ে করি, তোমার আপত্তি আছে ?"

—"আপত্তি!" এত বড় আনন্দের কথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। আলাপ তাদের দিন-দিন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। ভবিষ্যতের কত রঙীন ছবি আর কল্পনা ভেসে উঠল তার সামনে।···

···কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।

এই কথা শেষ পর্য্যন্ত ছাত্রীর বাবা শুনলেন। ডেকে পাঠালেন তিনি শিক্ষয়িত্রীকে। বললেন—"তোমায় দয়া করে পথের ধার থেকে কুড়িয়ে এনে উপকার করেছিলাম। তুমি এই ভাবে তার অসম্মান করলে ? আমাদের আভিজাত্যের কঠিন বাধা ভেঙ্গে তোমার মতন একটা পথের পরিচয়হীনা মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে হতে পারে না। তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, আর কোন দিন এ বাড়িতে এস না।"

বাহিরে ভীষণ বরফ পড়ছে। সোঁ-সোঁ করে বইছে হাড়-কাঁপানো ঝড়ো বাতাস।···মেয়েটি পথে এসে দাঁড়াল। আজ তার মত দুর্ভাগিনী, তার মত এক,—বোধ হয় কেউ নেই। বড়লোকের ছেলের সখ মেটাতে আজ হল সে পথের ভিখারিণী। তার একমাত্র অবলম্বন চাকরি পর্য্যন্ত গেল।···চোখের সামনে ঘনিয়ে এল তার আশাহীন কালো মেঘ।

···কিন্তু না—মেয়েটির জীবন এইখানেই শেষ হয়ে যায়নি। কারণ তা' হলে আমরা পেতাম না 'রেডিয়াম'—আমরা পেতাম না 'মাদাম কুরি'কে। সেদিনকার সেই অসহায় মেয়েটি আজকের—মাদাম কুরি।

শান্তি চাই কেন ?

আশাপূর্ণা দেবী

আজকের এই সভায় কিছু বলবার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম। বলতে আমি অভ্যস্ত নই তবু এসেছি। এসেছি শুধু এই জন্যেই—যে আবেদন নিয়ে এই সভা, সে আবেদনের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই—তা' সে যতো ক্ষুদ্রই হোক—কিছু অংশ থাকা উচিত মনে করে। কিন্তু কোন কিছু বলবার আগে এই প্রশ্নটাই মনে জাগছে—কেন এই আবেদন? কেন আমরা 'শান্তি'র প্রার্থনায় এমন করে আর্ত্ত চীৎকার তুলেছি? কেন আমরা দ্বারে-দ্বারে ডাক দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের মায়েদের ভগিনীদের কন্যাদের কাছে—এই প্রার্থনার সুরে সুর মেলাতে? কেন আমরা আসন্ন যুদ্ধের বিভীষিকায় কম্পিত কাতর?

নারীচিত্ত কি সংগ্রাম-ভীরু? সে কি কেবল মাত্র বিপ্লব-বিহীন ক্ষুদ্র গৃহসুখের কাঙাল?

শুনে হয়তো আপনারা অবাক্ হয়ে ভাববেন—এ আবার একটা প্রশ্নের বস্তু না কি? নারী কল্যাণী, নারী মমতাময়ী, নারী গৃহলক্ষ্মী, তার শান্তি প্রার্থনার মধ্যে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়?

কথাটা হয়তো ঠিক, নারীচিত্ত শান্তিকামী। তা' বলে সংগ্রাম-ভীরু নয়। সত্যকার প্রয়োজনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলে—সে বিনা দ্বিধায় বরণ করে নিতে পারে পরম দুঃখ—চরম ক্লেশ। ক্ষুদ্রের জন্য বৃহৎকে বলি দেবার ক্ষুদ্রতা তার নেই।

তাই—যুগ-যুগান্তের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই—দেশ যখন রাক্ষসের মুখে পড়ে, নারী তখন দেশকে রক্ষা করতে রাক্ষসের মুখে অনায়াসে এগিয়ে দেয় আপন স্বামীকে, সন্তানকে, প্রাণাধিক প্রিয়তমকে।

নারী শান্তি চায়, কিন্তু পলাতকের শান্তি নয়।

কবে—কোন্ জাতির পতন-উত্থানের ইতিহাসে লেখা আছে—বিপ্লবের দিনে, প্রয়োজনের দিনে, রুদ্রের নিষ্ঠুর ডাক যখন দ্বারে এসে আঘাত হেনেছে, নারী তখন পুরুষকে আটকে রাখতে চেয়েছে—প্রলোভনে? কি সাক্ষ্য দেয় বিগত কাল? কি সাক্ষ্য দিচ্ছে বর্ত্তমান পৃথিবী?

তাই বলি নারীচিত্ত যুদ্ধ-ভীরু নয়। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে যা ঘটছে এ কি যুদ্ধ?

যুদ্ধের অর্থ—মানুষে মানুষে শক্তির লড়াই, দিগ্বিজয়ীর দম্ভের সঙ্গে দেশাত্মবোধের লড়াই, সাম্রাজ্যলোভীর লুব্ধলোলুপতার সঙ্গে আত্মরক্ষার লড়াই। কিন্তু এ কী? একে কি লড়াই বলে?

এ তো—সাম্রাজ্যলোভীর সাম্রাজ্য-বিস্তারের ক্ষুধা নয়, এ যে বুদ্ধিভ্রংশ উন্মাদ মানুষের সর্ব্বনাশা ধ্বংসের ক্ষুধা।

যুক্তিহীন বিচারহীন নীতিধর্ম্মহীন রাক্ষসী ক্ষুধা।

এই সর্ব্বনাশী ক্ষুধার দুরন্ত আগুনে জ্বলে যাচ্ছে—পৃথিবী, জ্বলে যাচ্ছে—পৃথিবীর সভ্যতা।···ধ্বংস হচ্ছে—সংসার, সমাজ, সৌন্দর্য্য, সম্ভ্রম,—ধ্বংস হচ্ছে মানুষের শুভবুদ্ধির। মৃত্যু হচ্ছে—লক্ষ লক্ষ মানবেরই শুধু নয়—মৃত্যু হচ্ছে—মানবতার। যুদ্ধ আজ আর যুদ্ধক্ষেত্রেই শুধু আবদ্ধ নেই, জীবনের সকল ক্ষেত্রে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে তার লেলিহান শিখা।

পরবর্ত্তী কালের জন্য কি রেখে যাবে—আজকের বিজ্ঞান-মদমত্ত দাম্ভিক মানুষ?···যে সভ্যতার দম্ভে সে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রভু হয়ে উঠতে চায়, সেই সভ্যতার দগ্ধাবশেষ ভস্মমুষ্টি?

কিন্তু 'পরবর্ত্তী কাল' বলেই কি কিছু থাকবে?

বর্ব্বরতার প্রতিযোগিতায় নতি স্বীকার করবে কে?···

বিজ্ঞান তার সহায়। বিজ্ঞান তার দাস। তাই আণবিক বোমাও আজ তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে; মারণাস্ত্রের পর তৈরি হচ্ছে নূতনতরো মারণাস্ত্র। কি করে, আরো সহজে আরো তাড়াতাড়ি আরো বেশী মৃত্যু ঘটানো যায়, অবিরত চলছে তারই সাধনা।

বহু কোটি মানুষের শত শতাব্দীর পরিশ্রমে-গড়া বিশাল একটা দেশ মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার কৌশল শিখে নিয়েও আশ মেটেনি তার, আরো চাই।

নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক না একটা জাতি, একটা মহাদেশ। সেই তো চরম উন্নতি বিজ্ঞানের, পরম দান সভ্যতার। কেউ জানে না কে জয়ী হবে এই প্রলয়ঙ্কর খেলায়।

কেউ বলতে পারবে না—এই সর্ব্বগ্রাসী আগুনে দগ্ধ হতে হতে পৃথিবীর শেষ ভস্মকণা এক দিন মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে, না—দগ্ধাবশেষ পৃথিবীর বুকে আপন হাতে রচা শ্মশান-শয্যায় পড়ে পড়ে ধুঁকবে—এক দল মুমূর্ষু প্রেত?

কিন্তু সত্যিই কি তাই হবে?

মুষ্টিমেয় উন্মাদ দানবের এই সংহারলীলা দাঁড়িয়ে দেখবো—আর নিরুপায় আর্ত্তনাদ করবো আমরা বহু শত কোটি সুস্থ-মস্তিষ্ক মানুষ?···কারুর কিছু করবার থাকবে না? অনেকেই হয়তো বলবেন—"কিন্তু উপায় কি? করবার পথ কোথায়? ক্ষমতা যে ওদের হাতে। মুষ্টিমেয় হলেও—ওদেরই বজ্রমুষ্টির মধ্যেই যে আটক পড়ে আছে বহু শত কোটির প্রাণ-পাখী। ওদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে না পারলে—" কথাটা হয়তো ঠিক, কিন্তু ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা নেই বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেও তো চলবে না? চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে—তাদের শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে আনবার, কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেবার।

এ কাজ দেশনেতার নয়, এ কাজ মহাপুরুষের নয়, এ কাজ

মানুষকে শুভবুদ্ধির প্রেরণা দেবার। 'আমরা ক্ষীণ, আমরা দুর্ব্বল, আমাদের কী সামর্থ্য'—এ বলে বসে থাকলে চলবে না।

পৃথিবীর জনসংখ্যায় যারা অর্দ্ধেক, পৃথিবীর সমস্ত উপস্বত্বের যারা আট আনার ভাগীদার, কতো দিন আর বসে থাকবে তারা—নীরব দর্শকের ভূমিকায়? কেন স্বীকার করবে না তারা বিধ্বস্ত পৃথিবীকে রক্ষা করবার দায়িত্ব?

নারীর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হবে কি শুধু পুরুষের সঙ্গে—"সমান অধিকারের" দ্বন্দ্বে? পুরুষের সঙ্গে সমান কর্ত্তব্যবোধের দায়ে নয়?

অশান্ত বিশ্বে শান্তি ফিরিয়ে আনবার কঠিন কর্ত্তব্য সমগ্র বিশ্বের নারীর।

কর্ত্তব্যের সৌখিন চিত্তবিলাস নয়, চাই সত্যকার কর্ত্তব্যবোধ। 'যা হোক একটা কিছু করা যাক' বলে দু'দিনের হুজুগ নয়, করতে হবে সফলতার সাধনা।···অবিচলিত নিষ্ঠায় চালিয়ে যেতে হবে বিরাম-বিহীন আন্দোলন। সংগ্রামের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম।

অবশেষে যেদিন যুদ্ধ-ক্লান্ত পৃথিবী নম্র কৃতজ্ঞতায় নারীর পায়ে দেবে শ্রদ্ধার্ঘ্য, সে দিন হবে তার সংগ্রামের শেষ। সেই হবে তার সংগ্রামের পুরস্কার। শুধু উৎপীড়িত জাতির আর্ত্ত চীৎকারে কাজ হবে না, কাজ হবে না—নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের করুণ আবেদনে।

আক্রমণকারী উৎপীড়ক জাতির নারীকেই ধরতে হবে রাশ। আপন আপন ঘর শাসন করবার দায়িত্ব নিতে হবে তাদের।··· বাতাস মুখর করে তুলতে হবে 'শান্তি'র দাবীতে।

জানি—এ কাজ সহজ নয়!

জগতের কোনো দুর্য্যোধনই কখনো কোনো গান্ধারীর আবেদনে কর্ণপাত করেনি। তাই আজ কোটি গান্ধারীকে এগিয়ে আসতে হবে—'আবেদন' নিয়ে নয়—'দাবী' নিয়ে।

হত্যাকারীর রক্তরঞ্জিত কঠিন হাত চেপে ধরতে হবে নারীর প্রতিজ্ঞা-বলিষ্ঠ কঠোর মুষ্টিতে।

যে অস্ত্র দিয়ে পুরুষ তার ভবিষ্যৎ বংশধরের কবর খুঁড়ছে, কেড়ে নিতে হবে সেই অস্ত্র।

প্রমাণ দিতে হবে—নারী শুধুই মমতাময়ী কল্যাণী নয়, মহাশক্তির অংশ।

এ কাজ সহজ নয়। কিন্তু অসম্ভবও নয়।

বিশ্বের সমস্ত নারী যদি আজ 'শান্তি'র প্রশ্ন নিয়ে পুরুষের সঙ্গে অ-সহযোগিতার দ্বন্দ্বে নামে, কতো দিন আর অটল থাকতে পারবে পুরুষ?

নারীকে বাদ দিয়ে কতো দিন মেতে থাকবে তারা সর্ব্বনাশের নেশায়?

নারীর প্রসন্ন দৃষ্টির প্রসাদ না পেলে, তার সাম্রাজ্য-জয়ের মূল্য কি?

আর একটি কথা বলবার আছে—আমার কাছের বোনেদের কাছে।···এই যে 'শান্তি-আন্দোলন' এ যেন একটা মিথ্যা প্রহসনে পরিণত না হয়। এর পিছনে যেন থাকে অবিচলিত নিষ্ঠা।··· অথবা—

'শান্তি-আন্দোলন'কে হাতিয়ার করে আমরা যেন অশান্তিকে ডেকে আনবার সুড়ঙ্গ খুঁড়ি না।

মনে রাখতে হবে—

আগুন আজ আমাদের ঘরের উঠোনে এসে পৌঁছেছে। সতর্ক যদি না হই ঘর জ্বলবে আমাদেরই।···যতোই আমরা জোর-গলায় বলি—আমরা আগে 'মানুষ' পরে 'মেয়েমানুষ', তবু অস্বীকার করে লাভ নেই আমরা মেয়েমানুষই। প্রকৃতির বিধানে 'ঘরের' প্রয়োজন আমাদেরই বেশী। সেই ঘরকে সামলাবার চেষ্টার বদলে ঘর-ভাঙার বুদ্ধি যেন না আসে আমাদের।

জানি—অনেক সমস্যা অনেক প্রশ্নের আঘাতে আমরা আজ জর্জ্জরিত। এই প্রশ্ন-ক্ষত হৃদয় যুদ্ধরত জগতের মতোই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, তবু অসহিষ্ণু হলে চলবে না।

মনে রাখতে হবে—এ দুর্দ্দশা আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র।

বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হবে—বাহুল্য-প্রচারের রঙিন আলোয় দূর থেকে যা দেখি, হয়তো তার সবটাই সত্য নয়।···সেই মিথ্যা আলোয় বিভ্রান্ত হয়ে আজ যদি আমরা ক্ষমতালোভীর হাতের অস্ত্র হয়ে দাঁড়াই, সেটা হবে আত্মহত্যারই নামান্তর।

সেই আত্মঘাতী নেশায় মেতে শান্তিকে যেন আমরা চিরতরে নির্ব্বাসন না দিই।*

অযথা সমালোচনা করবেন না

ইন্দিরা দেবী

[দুপুরের অবসরে যখন আমরা কোনও ভাল বই পড়তে পারি, কিম্বা চার-পাঁচ জন প্রতিবেশিনী মিলে অবসর-মুহূর্ত্তগুলিকে নানা কাজে-কর্ম্মে, আলাপ-আলোচনায় ব্যয় করতে পারি, কিম্বা এমন কোনো শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করতে পারি যে বর্ত্তমানে মধ্যবিত্ত সাধারণ পরিবারে তার বিনিময়ে কিছু স্বচ্ছল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ তা আমরা করি না। গাল-গল্প-সমালোচনা সত্যিই বড় মুখরোচক ও আরামদায়ক—তাই এ পেলে আমরা আর কিছুই চাই নে। একটি বাড়ীর এক দিনের ঘটনার একটি ছবি আপনাদের সম্মুখে ধরবার চেষ্টা করছি।]

পানের কৌটা খুলে মোটা দেখে দু'টি পান মুখে দিয়ে এবং সুগন্ধি জরদার ক'টি দানা মুখে ফেলে সুরো দিদি বললেন: তা যাই বল ভাই, মেয়েটি কেমন ইয়ে—

এঁদের ভিতর বয়ঃকনিষ্ঠা হলেন রায়-বাড়ীর ছোট বৌরাণী, বাধা দিয়ে তিনি বলেন—তার মানে কি সুরো দিদি?

—মানে আর কি, মেয়েটা আসলে ভালো নয়—বুঝলি ছোট বউ!

—কি দেখে বুঝলেন? ছোট বৌরাণীর কণ্ঠে অনুযোগ।

—আর কি দেখে, আমি প্রমাণ করে দিতে পারি—বিকৃত কণ্ঠে সুরো দিদি এ কথা বলেই পানের পিচ ফেললেন।

এবার সুরো দিদির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী: হ্যাঁ, দেখছ না, একলা থাকে একটা ঘরে।

* গত ৮ই মার্চ্চ "আন্তর্জ্জাতিক নারীদিবস" উপলক্ষে কলিকাতা 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে' অনুষ্ঠিত 'শান্তি-আন্দোলন' সভায় পঠিত।

—তাতে হয়েছে কি? তাকে তো জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হবে— কেউ যদি না দেখে কিম্বা না থাকে, তাহলে তার অবস্থা আর কি হবে। অলকার অনেক গুণ বলতে হবে—তাই কাজ করে, নিজে লেখা-পড়া করে, আবার নিজের যা কিছু সব নিজেই করে বেচারা রাঙা মাসী বললেন: ও, তাই বলো। ও ছুঁড়ীর সঙ্গে যে ছোট গিন্নির ভাব আছে।

—তাই তো ভাল লাগছে না কথাগুলো—বলেই সুরো দিদি আবার পানের পিচ ফেললেন।

ছোট বৌরাণী দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—আপত্তি আমার ঐখানেই। কারণ আলাপ থাকুক আর না থাকুক—লোককে অযথা কেন আমরা দোষারোপ করবো বলুন তো, যার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না।

—আরে, থাম থাম—তুমি তো সেদিনের মেয়ে—কি বোঝ। লোকের কথা আর আমাদের চোখই যথেষ্ট।

—মোটেই যথেষ্ট নয়, বিশেষ এই ধরণের পরচর্চ্চা—যার সম্বন্ধে কিছুই জানি নে। কুৎসা রটান সহজ কিন্তু যার কুৎসা রটান হয় তার কত ক্ষতি করেন আপনারা? অথচ এর মূলে আছে কতকগুলি লোক আর চারটি আজগুবি গল্প।

সুরো দিদি বললেন: আর নিজে যদি কিছু সত্যি দেখে থাকি?

—কিন্তু তাতেও ভাববার আছে—আর যদি কেউ না জানতে চায়, অযথা আলোচনা করাও আপনার কর্ত্তব্য নয়।

—অনেক দেখেছি বলেই তো বলতে এলাম। আমি নিজে চোখে দেখেছি, ও রাত ১১টায় বাড়ী ফিরছে।

ছোট বৌরাণী হেসে বললেন— ওঃ, তা তার কোনো কাজ থাকবে না বুঝি? আপনারাও তো ফূর্তি করে সিনেমা দেখে বাড়ী ফেরেন সাড়ে ১১টা বারোটায়—তাহলে?

—অত যুক্তি দেখালে হবে না—তবু তো বলিনি, ও কি ভাবে একা-একা বেড়ায়। অত কম বয়স—

—কি করবে বলুন, হাত দিয়ে বয়েসটাকে টেনে বাড়ানো যায় না, কি না—ওটা নেহাৎই পঞ্জিকার চালে চলে। আর একা থাকা তো আগেই বলেছি।

সুরো দিদি আর চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী আর একবার হাসলেন। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে: বুঝলি ছোট বউ, আমরা সবই জানি, খারাপ না হলে আর কথাটা ওঠে না। আমাদের দরকার কি। কথাটা উঠলো তাই বললাম।

—কথাটা তুললো আর কে, অর্দ্ধ-পরিচিত বা অল্প-পরিচিত যে—তাকে নিয়ে কুৎসা করা ছাড়া বুঝি আর কাজ নেই?

রাঙা মাসী বললেন: তা তোরই অত রাগ কেন রে ছোট বৌ—তোর ভাব আছে বলে।

ছোট বউরাণী এবার অসহিষ্ণু হয়ে বললেন: কি যে যা-তা বলেন রাঙা মাসী, আমার সঙ্গে ওর কতটুকু পরিচয় যে বলছেন? কিন্তু সে কথা নয়, কাজ-কর্ম্ম না থাকলে যার-তার নামে কুৎসা রটাবো—এ আবার কেমন কথা! আমি ভাবছি ওকে এক দিন ডাকবো আপনাদের সামনে—জিজ্ঞাসা করবো সব।

—তাতে কি হবে? মনে ভেবেছিস কিছু বলতে পারবো না। তোর মত মেমের ইস্কুলে পড়িনি, কিন্তু কা'কে কি বলতে হয় তা আমরা জানি। [illegible] বলে আমার নামও আছে।

—তার বুঝি এই নমুনা! প্রতিবেশী একটি মেয়ে—কত দুঃখ-কষ্ট তার থাকতে পারে সে সব গেল, না খোঁজ না খবর, শুধুই নিন্দে করা—সুরো দিদি তো তাকে জানেনই না, তবে কেন এ সব বলছেন?

রাঙা মাসী বললেন—তা সত্যি কতটুকুই বা ওকে জানা আছে! তবে হাব-ভাব ভালো না বলেই হয়তো সুরো বলেছে।

সুরো দিদি তাঁর বিশাল দেহ নাড়া দিয়ে বললেন: প্রায়ই তো কত লোকজন আসে দেখি—আরো কত কি দেখি—কিছুই দৃষ্টি এড়ায় না—বোঝা যায়—বুঝলে ছোট গিন্নি!

বাধা দিলেন রাঙা মাসী: আরে দেখো দেখো—ঐ যে মেয়েটা যাচ্ছে।

ছোট বৌরাণী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন—ও ঝি, ডাক তো, ঐ যে দিদিমণি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

সুরো দিদি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী আরো ভালো ভাবে বসলেন কিছু রসাল ও তীব্র ভাষা ব্যবহারের জন্য।

—এসো অলকা, এসো—ছোট বৌরাণী অভ্যর্থনা জানালেন।

অলকা নবাগতা, সঙ্কুচিতা—বিশেষ করে এই বয়ঃজ্যেষ্ঠা নারীদের মাঝে অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে বললেন: আমাকে ডেকেছেন?

—হ্যাঁ, তোমার সম্পর্কে আমরা কথা বলি—এঁদের সকলের জানার ইচ্ছা তুমি কি কর, কেনই বা একা থাক। ছোট বৌরাণী বললেন।

—ওঃ, একা থাকি—কেউ নেই বলে। দিদি আছেন তাঁর সংসারে, অযথা ব্যয়ের বোঝা বাড়াতে চান না আমায় রেখে। বাবা মারা গেলেন—কাজেই একা না থেকে কি করবো বলুন?

—ওঃ, বেচারা! কি কর ভাই তুমি?

—সেদিন তো বলেছি, বি-এ ক্লাসে পড়ি, সকালে পড়াই, বিকেলে সংবাদপত্রের অফিসে কাজ করি।

—এত কর কি করে অলকা? সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠ ছোট বৌরাণীর।

মৃদু হেসে অলকা বললে: না করে কি করবো বলুন? বেঁচে থাকতে হবে। বাবার ইচ্ছা ছিল ভালো করে পড়াশোনা করি, সেটার চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য—তাই এ সব না করে উপায় কি?

—তা না হয় হলো বাছা—কিন্তু ঐ লোকগুলো কে? তোমার সোমত্ত বয়স—এ সব বাছা—চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর জিহ্বা বিষ উদ্গিরণ করলো।

লজ্জিতা ছোট বৌরাণী বললেন—না ভাই শোনো, ঐ যে মাঝে-মাঝে যাঁরা আসেন—তাঁদের কথাই বলছেন ওঁরা।

অপমানিতা লজ্জিতা অলকার মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—দিদির ছেলে অজিত আসে মাঝে-মাঝে, কাকামণির ছেলে নিখিলও আসে—খুব কম। আর যদি অফিসে খুব জরুরী প্রয়োজন হয় তাহলে কেউ সংবাদ আনেন—কিন্তু তা তো অত্যন্ত কম। এরাও আসে কম—আঙুলে গোণা যায়, কিন্তু—

নরম কণ্ঠে বৌরাণী বললেন—না ভাই, কিছু মনে করো না—মানুষের কৌতূহল বড্ড ভালো আর বড্ড খারাপ জিনিস—।

—আচ্ছা তুমি এখন এসো—রবিবার তোমার ছুটী থাকে, এই রবিবার তুমি নিশ্চয় আমার কাছে আসছো—দু'জনে একসঙ্গে খাবো—কেমন?

ছোট হাত দু'টি যুক্ত করে বিনীত নমস্কার করে অলকা চলে গেল। বর্ষীয়সীদের দ্বিপ্রাহরিক সভায় তখন একটা বজ্রপাত হয়ে গেছে।

বৌরাণীর চোখে তখনও ভাসছে—অপমানিতা লজ্জিতা বিনীতা অলকার মুখচ্ছবি—আর বার বার মনে হলো—

অপমানিতা জান না তুমি নিজে
মাধুরী এলো কী সে
সরম ভরা সভার মাঝখানে—

যুগাবতার

শ্রীমতী মায়া দেবী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত বহুবিধ প্রবন্ধ, জীবনী, আলোচনা ইত্যাদি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের যতগুলি আমি দেখিয়াছি সে-সকলের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য ও তাহার সার্থকতা সম্বন্ধে ঠিক পথে মূল বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসার চেষ্টা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে লিখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জ্ঞানী ব্যক্তি, তাঁহাদের ভুল দেখান বা তাঁহাদের জ্ঞানের অল্পতা নির্ণয় আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার মনে হয়, একটি বিরাট জিনিষকে প্রত্যেকেই আপন আপন শক্তি অনুসারে বিভিন্ন দিক দিয়া দেখে, উপলব্ধি করে। প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতিরও পার্থক্য আছে এবং সেই কারণেই সেই বিরাটের সম্বন্ধে যত বেশী আলোচনা হয় ততই মানুষের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পায়, উপলব্ধির চেষ্টা অগ্রসর হয়। তাই আজ আমি আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই বিরাটকে দেখিবার চেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছি।

যুগাবতার বা মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় কেন, তাহা আর এক মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি"—শুধু তখনই ভগবানকে আসিতে হয় ধর্ম্মকে গ্লানিমুক্ত করিয়া সংস্থাপিত করিতে, আর যাহারা স্বধর্ম্ম পালন না করিয়া ধর্ম্মকে গ্লানিযুক্ত করার পাপে লিপ্ত, সেই দুষ্কৃতকারীদের ধ্বংসের জন্য। ইহার পর প্রশ্ন ওঠে—কোন্ ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে ভগবানকে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিতে হয়? যে ধর্ম্মে অবতার নাই সে ধর্ম্মে কি কখনও গ্লানি দেখা দেয় নাই এবং যে ধর্ম্মে যত বেশী অবতার সে ধর্ম্মে তত গ্লানি ঘটিয়াছে? কিন্তু তাহা নহে, কারণ, সকল ধর্ম্মের মধ্যে অবতারের কথা নাই, কিন্তু গ্লানি সকল ধর্ম্মেই ছিল এবং আছে। তবে এ কোন্ ধর্ম্ম? এ ধর্ম্মের রূপ কি? আমার মনে হয়, এ প্রশ্নের উত্তরটিও ভগবান সরল ভাষাতেই দিয়াছেন গীতায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম পালন করিতে উপদেশ দিতেছেন। এ স্বধর্ম্ম পালন করিতে হইলে মুক্তকচ্ছ বা শিখা ধারণ কিছুই করিতে হয় না কিংবা জর্ডনের জল মাথায় দিয়া গির্জ্জায়ও যাইতে হয় না। আর কেহ নমাজ পড়িতে গেলে কোন্ বারের নমাজে কয় বার উবু হইয়া বসিতে হইবে বা কয় বার হাঁটু গাড়িতে হইবে কিম্বা কোন্ দেবতার পূজায় কোন ফুল প্রয়োজন আর কোন দেবীর উপাসনায় ঘণ্টা বাজাইতে হয় কি কাঁসর বাজাইতে হয়, সে-সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জ্ঞান লাভ করিয়া যথাযথ নির্ভুল ভাবে করিলেও এ স্বধর্ম্ম পালন করা হয় না।

তবে এ স্বধর্ম্ম কিরূপ? গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—আপনার কর্ত্তব্যই আপনার স্বধর্ম্ম এবং তাহা পালনই স্বধর্ম্ম পালন। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা জানিবার উপায় কি? আপনার জন্য অর্থ উপার্জ্জন করা, না পরের জন্য প্রাণ দান—কোন্‌টি আমার কর্ত্তব্য হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে দেখিতে হইবে আমি কে? আমি প্রথমে একটি জীব, অতএব আমার স্বধর্ম্ম জীবের স্বধর্ম্ম! সেই স্বধর্ম্ম আত্মরক্ষা। তাহার পরেই আমি শুধু জীব নহি, জীবের মধ্যে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সবই আছে। কীটের স্বধর্ম্ম কীটত্ব, পশুর পশুত্ব—তেমনি আমি জীবের মধ্যে মানব জাতি, আমার স্বধর্ম্ম মানবত্ব। অন্য সকল জীবের সঙ্গে মানুষের বিশেষরূপে পার্থক্য আছে। মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানে, তাহার কারণ মানুষের অন্যান্য জীবের অপেক্ষা বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি আছে আর আছে হৃদয়। এই হৃদয় জিনিষটিই মানুষকে অনেক উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে। যে মানব যত হৃদয়কে প্রচারিত করিয়াছে সে ততই উন্নতি লাভ করিয়াছে, তত মহৎ হইয়াছে। মানব-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক মানবের হৃদয়কে বিস্তৃত করিতে হইবে। হৃদয়কে সঙ্কুচিত ও নিষ্ক্রিয়, শক্তিহীন করিলেই মানুষ আর মানুষ থাকিবে না।

—মনো মিত্র গৃহীত

• নিখিল এসিয়া ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের এঁরা তিন জন মাল্যদান করেছেন।

মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য আত্মরক্ষা। সেই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তাহাকে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হয়। প্রত্যেক মানুষের নিজেকে রক্ষা করিবার জন্ম এই সমাজকে রক্ষা করিতে হয়। নিজের প্রতি যেমন কর্ত্তব্য আছে, তাহার পর পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, মাতা, পিতা ইত্যাদি আত্মীয়-পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, তেমনি সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যও মানবের ধর্ম্ম। প্রত্যেক মানুষই অপর মানুষের সুখ-সুবিধা, জীবন-মরণের জন্ম দায়ী। যত দিন মানুষ সমাজের প্রতি এই দায়িত্ব পালন করে তত দিন পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য আছে, আর আছে কয়েকটি রিপু, তার মধ্যে লোভ রিপুটিই প্রবল। মানুষের এই লোভ তাহাকে সর্ব্বদাই অন্যায়ের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে যদি এই লোভকে সংযত করা না হয়, তাহা হইলে সে ক্রমেই প্রবল হইয়া মানুষকে প্রকৃত হিতের দিকে অন্ধ করিয়া ফেলে, তার মানবত্বের সারবস্তু হৃদয় তখন শক্তিহীন হইয়া পড়ে। তখন সেই লোভোন্মত্ত শক্তিমান ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ দুর্ব্বল ও অক্ষমদের প্রতি কর্ত্তব্য ত্যাগ করে, তখনই ধর্ম্মে গ্লানি জন্মায়। সেই হৃদয়হীন, স্বধর্ম্মচ্যুত দানবেরা দুর্ব্বলদের ক্রমে আরও দুর্ব্বল করিয়া অক্ষমতার দিকে ঠেলিয়া দিয়া আপনি অধিকতর সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লয় তাহাদিগকেই শোষণ করিয়া। এইরূপে ক্রমে এই লোভীদের ক্ষমতা এতই বৃদ্ধি পায় যে, তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইয়াও মনুষ্য-সমাজের অধিকাংশকেই শোষণ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতে থাকে। আর লোভীদের ঐশ্বর্য্যের কোন পরিমাপ থাকে না, তাহাদের ভাণ্ডারে সম্পদ ধরে না।

এই নিদারুণ অসামঞ্জস্য ক্রমে ক্রমে পৃথিবীকে জীর্ণ করিয়া আনে। মানব-সমাজের মধ্যে আনে নিতান্ত বিশৃঙ্খলা। দিকে দিকে অশান্তির ধূম পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, মাঝে-মাঝে বিপ্লবের আগুনের শিখা চমকিয়া উঠিতে থাকে। মাতা ধরিত্রী ব্যথিত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এই নিদারুণ সঙ্কটের মহা মুহূর্ত্তেই প্রয়োজন হয় ভগবানের আবির্ভাবের। তখনই তিনি আসেন ধর্ম্মের এই গ্লানি দূর করিয়া মানব-সমাজকে আবার স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করিতে আর যাহারা ধর্ম্মে গ্লানি আনিয়াছে, সেই স্বধর্ম্মচ্যুত দুষ্কৃতকারীদের ধ্বংস করিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সকলেই মহাপুরুষ ও যুগাবতার বলিয়াই স্বীকার করেন। তাঁহার আবির্ভাবের কাল এখন হইতে এক শতাব্দীর কিছু বেশী। সে সময়ে ঠিক এতখানি না প্রকাশ হইলেও, বর্ত্তমান সঙ্কটময় যুগের আগমনবার্ত্তা তখনই অল্প অল্প অনুভূত হইতেছিল। বহু বিচক্ষণ ব্যক্তি এই মহা সঙ্কটের জন্ম সতর্কতার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু লোভের কাছে এ সতর্কতার কোন মূল্য নাই। তাই প্রয়োজন হইল যুগাবতারের।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকলকে শুনাইলেন—মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। ধর্ম্ম অর্থ কিছুই কোন মানুষকে অপর মানুষ হইতে পৃথক্ করিতে পারে না। প্রত্যেকেই সেই একই ভগবানের অংশ, একই স্থান হইতে প্রত্যেকের আগমন ও একই ভাবে বিলয়। কোন মানুষকেই ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা যায় না, সকলকেই করিতে হয় শ্রদ্ধা। একে অপরকে সাধ্য নহে। দয়া করিও না, তোমার মতন তাহার মধ্যেও নারায়ণ বাস করেন তাই প্রত্যেককে শ্রদ্ধা কর আর সেবা কর। হীন পতিত যে, সে-ও সেই মহাশক্তির অংশ, তাহাকে তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবার দ্বারায় তাহার আপন অবস্থা প্রদান কর, স্বমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত কর, সেও মানব-ধর্ম্ম পালন করিতে পারিবে। এই তোমার ধর্ম্ম, এই মানব-প্রীতিই মানবের স্বধর্ম্ম। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, ক্রীশ্চান সকল মানবের এই একই স্বধর্ম্ম—এই সত্যই তিনি নিজের সাধনার দ্বারা লাভ করিয়া জগতে দান করিয়া গেলেন।

তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় বা অন্য সমস্ত উপদেশের মধ্যে এই একটি কথাই বার বার ধ্বনিয়া উঠিয়াছে—"ওরে, মানুষ কি কম্ রে? তুই তাকে দয়া করবি কি, সেবা!—সেবা করিয়া ধন্য হ'!" তাই তিনি দীন কাঙালীর উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহারা হীন নহে, তাহাদের মধ্যেও সেই একই শক্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু তাঁর এই বাণী, এই পরম সত্য জগতকে শুনাইতে হইবে, উহা ভারতের এক ক্ষুদ্রতম গ্রামে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, অথচ মহাপুরুষের স্থিতিকাল বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না। লগ্ন ফুরাইয়া আসিতেছে, এদিকে ধরণী ব্যাকুলা হইয়া থর-থর কম্পমানা, দিকে দিকে আগুনের আভাস দেখা যাইতেছে, কখন জ্বলিয়া উঠিয়া সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া দেয়। তাই তিনি ব্যাকুল ভাবে আহ্বান করিলেন—"ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্ আয় না রে, আর যে সময় নাই।" সেই আহ্বানে আসিলেন যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শক্তিধর নরেন্দ্রনাথ। তিনি সেই মহাসত্য প্রচারের ভার আপন মস্তকে ধারণ করিলেন। নারায়ণের পাঞ্চজন্য তপস্যায় অর্জ্জন করিয়া তিনি জগতে বাহির হইলেন এই মহাসত্য বিশ্ববাসীকে শুনাইতে। দুঃখী, হীন, পতিত, উৎপীড়িত মানবগোষ্ঠীকে তিনি মহা শঙ্খরবে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই, ওঠ, জাগ্রত হও। এই ভগবানের রাজত্বে পক্ষপাতিত্ব নাই, কেহ হীন নাই, কেহ ক্ষুদ্র নাই! ক্ষমতা অর্জ্জন কর। নিজেকে ছোট মনে করিও না। চাহিয়া দেখ, সকলের মধ্যে একই শক্তি বিরাজ করিতেছে, অতএব কিসে তুমি হীন?" আর লোভীদের সেই মহাশঙ্খের গর্জ্জনে শুনাইলেন সতর্কবাণী,—"ঐ দেখ, দিকে দিকে অশান্তির আগুনের আভা, কান পাতিয়া শোন রুদ্রদেবের আগমনের রথধ্বনি! এখনও সাবধান হও। যাহাদের হীন পদদলিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহাদের মধ্য হইতেই তোমার ধ্বংসের বজ্রদণ্ড উত্থিত হইবে, তাহারই আয়োজন দিকে দিকে লক্ষিত হইতেছে। এই বেলা সংযত হও, বিলাইয়া দাও পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্য্য, নিজেকে মিশাইয়া দাও এই সমস্ত নরনারায়ণের মধ্যে—যাহাদের তুমি হীন বলিয়া ঘৃণা কর আর যাহাদের শোণিত হইতে তোমার ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়, তাহাদেরই এক জন হইয়া তুমি বাঁচিতে পার, তাহা না হইলে তোমার পরিত্রাণ নাই।"

ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একমাত্র বাণী। আজিকার এই বিশ্বব্যাপী অগ্নির মধ্য হইতে সেই মঙ্গল-শঙ্খের ধ্বনি কানে বাজিয়া উঠিতেছে! উৎপীড়িতের নারায়ণ ঐ জাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর রক্ষা নাই! তাই আজ লোভী দানবকুল ব্যগ্র-ব্যাকুলতায় দুই হাত বাড়াইয়া তাহাদের ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার রক্ষা করিতে, আরও সঞ্চয় করিতে বিপুল আগ্রহে ছুটিতেছে। কি করিয়া এই জাগ্রত

কিম্বা বলের দ্বারা আবার ধ্বংস করিবে, সেই চেষ্টায় দিশাহারা হইয়া পথের সন্ধান করিতেছে। কিন্তু বৃথা এ সব, সময় থাকিতে সাবধান হও নাই, আজ তোমাদের ধ্বংস হইতে পরিত্রাণের কোন পথই নাই! যাহাদের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী অত্যাচার চালাইয়াছ আজ তাহাদের অন্তরস্থ নারায়ণ জাগিয়াছেন, কে তোমায় রক্ষা করিবে তাঁহার সমুত্থিত মহাচক্রের হাত হইতে?

অ্যাটম বোমার দেশে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অমিতা দত্ত-মজুমদার

ওয়াশিংটন যাত্রা

প্রায় ১টায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ সহযাত্রীদের মধ্যে একটা ব্যস্ততার সাড়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘড়িতে দেখি সাড়ে ৪টা বেজেছে। ভাবলাম রাত ২টায় আমাদের দামাস্কাস্ পৌঁছবার কথা ছিল, তা তো পৌঁছলাম না। তা হলে বোধ হয় আমরা সময় মতন যেতে পারছি না। যা হোক্, সবাই নামবার জন্য তৈরী হচ্ছে দেখে আমিও ঠিকঠাক হয়ে বসলাম। আলোর অক্ষরে আবার সেই নির্দ্দেশ ফুটে উঠলো—Fasten your seat belts. No smoking. আমরা এবার দামাস্কাসে নামছি। নামবার সময়ে প্রত্যেক বারেই লক্ষ্য করছি যে, এরোপ্লেনটা কেমন একটা বাঁশীর মত আওয়াজ করে, মনে হয় যেন কোথাও হাওয়া ভরা ছিল, সেই হাওয়া কোনো ফাঁক দিয়ে বের করে দেওয়া হচ্ছে ধীরে ধীরে। নামবার পরে কানে তালা-লাগা আরেকটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার। প্রথম দিন যত বার নেমেছি, দেখেছি যে কানে-তালা লেগে গেছে। দ্বিতীয় দিন সেটা কমে গেল, বোধ হয় সয়ে গেল। শুনলাম ওটা blood pressureএর উপর বায়ুর চাপের আকস্মিক পরিবর্ত্তনের দরুণ হয়।

দামাস্কাস! সেই আরব্যোপন্যাসের দামাস্কাস্ নগর। সহরটা দেখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু রাত দুপুরে তো আর তা সম্ভব নয়। রাত দুপুর বলছি এই জন্য যে, যদিও আমার ঘড়িতে তখন ৫টা বেজে গেছে, কিন্তু এ জায়গার সময় তখন দেড়টা মাত্র। যা হোক্, সব যাত্রীরা প্লেন থেকে নেমে চলেছি চা খেতে। যেতে যেতে পাশ থেকে হঠাৎ এক জন ইংরাজীতে বললেন, "আপনি কি বাঙালী?" আমি বললাম, "হাঁ"। তখন তিনিও বাংলায় কথা বলতে লাগলেন। তিনি চট্টগ্রামবাসী মুসলমান; কি একটা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারের অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি-স্বরূপ যাচ্ছেন আমেরিকায়। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন "পাকিস্তানী" বলে, কিন্তু বিদেশী বলে ভাবতে পারলাম না মোটেই; বিশেষতঃ যখন অতগুলো বিদেশী মানুষের মাঝে তিনি আমার মাতৃভাষায় কথা কইতে লাগলেন। এরোড্রোমের প্রাঙ্গণ স্বল্পালোকিত; কয়েকটা পাকা ইমারতের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গিয়ে আমরা একটা আলোকিত কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেখানে গোটা কয়েক চায়ের টেবিল সাজানো রয়েছে। যে যেখানে পারেন বসে গেলেন। আমি যে টেবিলে বসলাম তাতে সেই বাঙালী ভদ্রলোক, আর এক পশ্চিম-ভারতীয় মুসলমান এবং এক ইংরাজ ভদ্রলোক, এই ক'জন ছিলাম। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি বললেন, "এই শেষ ভাল চা খাওয়া। এর পর আর কোথাও ভাল চা খেতে পাবেন না। দার্জ্জিলিং চায়ের সৌরভ আর বেশী দূর পশ্চিমে পৌঁছয় না।" যাক্, চা খেতে খেতে হঠাৎ দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখি ঘড়িতে দেড়টা বেজেছে। সঙ্গের ভদ্রলোকরা বললেন—"এখানে বাস্তবিকই এখন রাতে দেড়টা, ঘড়ি বন্ধ নয়। আমরা ফাঁকি দিয়ে সাড়ে তিন ঘন্টা সময় বাড়তি পেয়ে গিয়েছি।" ব্যাপারটা অবশ্য কাগজে-কলমে জানতাম আগেই, এখন প্রত্যক্ষ দেখে খুব আমোদ উপভোগ করলাম। শুনলাম, দামাস্কাস্ সহরটি তার পুরানো রূপ অনেকটাই বজায় রেখেছে, আবার পাশ্চাত্যের ধরণের সঙ্গেও অপরিচিত নয়। ভাবছিলাম সেই গম্বুজ ও মিনারের সহরটি আকাশ থেকে দেখতে পেলে বেশ হোতো। রাত্রির অন্ধকারে তা অবশ্য দেখতে পাইনি, তবে আকাশ থেকে যা দেখেছি তা-ও স্বপ্নপুরীর মত। এক পাহাড়ের পায়ের কাছে থেকেই আমরা উঠলাম; দামাস্কাস্ সহরের আলো পাহাড়টির কোল ঘেঁসে মালার মত ঝলমল্ করছিল; সেই পাহাড়েই আর খানিক উঁচুতে আবার সারি সারি আলো,—বোধ হয় আরেকটা সহর! তার পরে পাহাড় গেছে নেমে, তার পিছনে আরেকটা পাহাড় অন্ধকারে মাথা উঁচু করে উঠেছে;—দুই পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে আবার আলোর মালা,—এ বোধ হয় আরেকটি সহর। সম্ভবতঃ তিন ধাপে সাজানো এই সহরগুলি একই দামাস্কাস্ সহরের বিভিন্ন অংশ; আবার তা না-ও হতে পারে। নিজের মনে এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এর পর নামলাম ইস্তাম্বুলে। তুরস্কের প্রাচীন রাজধানী, ইয়োরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত—কনষ্ট্যান্টিনোপল্; তার পরে কামাল আতাতুর্কের দেশের বড় সহর। এরও নামের সঙ্গে কিছু ইন্দ্রজাল জড়িত আছে। ভিতরে আমাদের ঘড়িতে তখন সাড়ে ১টা কিন্তু বাইরে তখনো ফরসা হয়নি! এরোপ্লেনের সিঁড়ি দিয়ে নেমেই উঠলাম একটা বাসে। সেই বাস আমাদের নিয়ে গেল এরোড্রোমের বাইরে সহরের মধ্যে এক হোটেলে। সেখানে প্রাতর্ভোজনের আয়োজন তৈরী ছিল। দামাস্কাস ও ইস্তাম্বুলের সময় একই; সুতরাং এখানেও আমাদের ঘড়ির সঙ্গে সময়ের পার্থক্য সাড়ে ৩ ঘন্টাই। এখানে এখন ৬টা বেজেছে—প্রাতরাশের পক্ষে একটু বেশী সকাল বটে; কিন্তু এর পর আমাদের দিতে হবে সুদীর্ঘ পাড়ি; তাই এখানে প্রাতরাশের আয়োজন।

প্রাতরাশের পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। কাছেই কোথাও ছলাৎ-ছলাৎ করে জল আছড়ে পড়ার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে আমরা সবাই সেদিকে অগ্রসর হলাম; দেখলাম যে, বসফোরাসের জল হোটেলের পাথর-বাঁধানো ভিত্তিগাত্রে আছড়ে পড়ার শব্দটা হচ্ছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে জলের খেলা দেখে আমরা আবার বাসে উঠে রওনা হলাম। এবার ভোরের আলোয় সহরটির চেহারা কিছু দেখতে পেলাম। পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত রাস্তার দু'পাশে ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছের মত সাদা-সাদা গাছ

সারি-সারি দাঁড়িয়ে। বাড়ি-ঘর ও রাস্তা বেশ ঝকঝকে ও গোছানো। অল্পক্ষণের মধ্যেই এরোড্রোমে পৌঁছে গেলাম। আবার যাত্রা সুরু হোলো।

এবার দিনের আলো। আকাশে রোদ ঝলমল করছে। পরিষ্কার দিন, মেঘমুক্ত আকাশ থেকে নীচে দেখতে পেলাম, কোথাও নীল সমুদ্র, কোথাও জমি। বহু ঊর্দ্ধে ছিলাম বলে সমুদ্রের বিরাট বিস্তৃতি সংক্ষিপ্ত আকারে বহুক্ষণ ধরে দৃষ্টির গোচর রইল। দক্ষিণ ইয়োরোপের উপদ্বীপগুলোর উপর দিয়ে আমরা তখন যাচ্ছি। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভূমধ্য সাগরের গাঢ় নীলের সঙ্গে শ্যামল উপকূলের মেশামেশির নয়নমোহন রূপ দেখলাম।

এরোপ্লেনের একটানা দোলানীতে ঘুম আসে সহজেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল; শুনলাম আমরা আল্পসের উপর দিয়ে যাচ্ছি। নীচে চেয়ে দেখি অপূর্ব্ব। অনেক নীচে—যত দূর দৃষ্টি যায় তত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত উঁচু-নীচু পর্ব্বত-স্তূপ একেবারে ঝাঁক বেঁধে রয়েছে—সারি বেঁধে রয়েছে বললে ভুল হয়। সে-দৃশ্যের মহিমা ও শোভা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, সে শুধু দেখেই বোঝবার। অনেকক্ষণ এই দৃশ্য উপভোগ করার পর মেঘের আবরণ এসে পৃথিবীর দৃশ্যকে আমাদের দৃষ্টির অন্তরাল করে দিল। এর ঘণ্টা চারেক পরে, ইস্তাম্বুল ছাড়বার ১ ঘণ্টা পরে লণ্ডনের সময় বেলা দেড়টাতে আমরা লণ্ডনে নামলাম। ঘন কুয়াশার আবরণে ঢাকা লণ্ডন সহরের কিছুমাত্র আভাস উপর থেকে আমরা পাইনি। প্লেন ছিল মেঘরাশির ঊর্দ্ধে রৌদ্র-দীপ্ত আকাশে। এক সময়ে সে মেঘ-সমুদ্রের কাছাকাছি এসে হঠাৎ ডুব দিল একেবারে মেঘের মধ্যে। তার পর মাটির কাছাকাছি এসে দেখতে পেলাম এরোড্রোমের ঘর-দুয়ার। নামলাম যখন, তখন টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, হাওয়া কন্‌কনে ঠাণ্ডা, আর কুয়াশায় এত অন্ধকার হয়ে রয়েছে চারি দিক্ যে, মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা হয়ে এল। লণ্ডনের যে mist-এর গল্প শুনেছি সে এই। লণ্ডন সহরে নামলাম, ঘণ্টা দুই সময় বিলাতের মাটিতে কাটালামও, কিন্তু ঐ কুয়াশা আর এরোড্রোমটি ছাড়া লণ্ডনের আর কিছুই দেখা হোলো না। এই এরোড্রোমটির নাম "ক্রয়ডন এয়ারপোর্ট।" মস্ত বড় ব্যাপার; দমদমের চেয়ে অনেক বড় সে কথা বলাই বাহুল্য; করাচী বন্দরের চেয়েও ঢের বেশী বড়। এখানে কয়েক বার এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী আনা-গোনা করতে হোলো একটা বাসে চড়ে; একবার পাশপোর্টটাও দেখাতে হোলো। শেষে একটা tea-room-এ আমাদের পৌঁছে দিল। বেশ গরম ঘরটি, ঢুকে বেশ আরাম লাগছিল। এখানে কিন্তু কোম্পানীর খরচে চা খাওয়ালো না। দেখলাম সবাই নিজে নিজে কিনে খাচ্ছেন। এখানে ডলারও চলে না, টাকাও চলে না; আগেও সে কথা জানতাম, তাই কিছু শিলিং সংগ্রহ করে এনেছিলাম। তাই দিয়ে চা কিনে খাব ভাবছি এমন সময়ে পূর্ব্ব-পরিচিত পাকিস্তানী বন্ধু এক পেয়ালা চা এনে দিলেন। বহু ধন্যবাদের সঙ্গে তা গ্রহণ করলাম। ইনি আপাততঃ লণ্ডনেই নেমে গেলেন, কয়েক দিন পরে আমেরিকা যাবেন। আরো অনেক যাত্রী এখানে নামলেন এবং অনেক নতুন যাত্রী উঠলেন। এবার

লণ্ডনের পর আয়ার্ল্যাণ্ডের শ্যানন্ বন্দরে নামলাম। এখানে খুব আরামের বন্দোবস্ত আছে। ক্রয়ডন এরোড্রোমের খালি পাথরের মেঝে ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের মত। আর বসতেও দিয়েছিল কাঠের বেঞ্চিতে। শ্যাননে চমৎকার গরম ও আলোকোজ্জ্বল ঘর। তাতে পুরু কার্পেট পাতা ও ভালো ভালো আসবাব দিয়ে সাজানো প্রশস্ত ওয়েটিং-রুম। তার পরে প্রকাণ্ড খাবার ঘর, আলোয় ও সুঘ্রাণে মনোহারী। এখানে আমাদের ডিনারের বন্দোবস্ত ছিল। আমি সারা দিন কিছুই খেতে পারিনি। ভোরে ইস্তাম্বুলে যে খাদ্যটুকু গ্রহণ করেছিলাম, তাও ধারণ করতে পারিনি। ক্ষুধার মুখে এখানকার লঘুপাক খাদ্য বেশ সুস্বাদু বোধ হোলো। খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আবার এরোপ্লেনে উঠলাম। গত রাত্রির মত আজও আমার পাশের চেয়ারটি এই সময়ে খালি হয়ে গিয়েছিল; আমিও তাই পূর্ব্ব রাত্রির মতই আরামে ঘুমোলাম। কয়েক ঘণ্টা ঘুমানোর পরে আমরা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে এসে পৌঁছলাম। ঘুমের মধ্যেই কখন আমরা অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এসেছি। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ভয়ানক শীতের দেশ। তার উপর গভীর রাত্রি—সেখানে তখন রাত প্রায় আড়াইটা। বাইরে বেরিয়ে দেখি খড়ির গুঁড়োর মত গুঁড়ো-গুঁড়ো বরফ মাটিতে পড়ে রয়েছে। যে সব লোকেরা বাইরে কাজ করছে তাদের মাথায় কান-ঢাকা চামড়ার টুপি, পায়ে হাঁটু অবধি চামড়ার জুতো, আর গায়ে চামড়ার কোট। আমি কলকাতা থেকে যে পোষাকে উঠেছিলাম লণ্ডনের কিছু আগে পর্য্যন্ত তাই পরেই ছিলাম। লণ্ডনে পৌঁছবার আগে গরম জামা আর মোজা পরে নিয়েছিলাম; ওভারকোটটা প্রত্যেক জায়গাতেই নামবার সময়ে ব্যবহার করতে হয়েছিল। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে নামবার পূর্ব্বে আমার নূতন-কেনা চামড়ার দস্তানা জোড়াও পরে নিলাম। অনেকক্ষণ আমরা একটা বড় ওয়েটিং-রুমে বসে রইলাম। সেখানে একটি অল্পবয়সী আইরিশ মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হোলো। সে প্রথম বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে অ্যামেরিকায়; সেখানে শিকাগোতে ওর মাসী না পিসী কে আছেন—তাঁর কাছে যাচ্ছে। যদি ভালো লাগে ওখানেই কাজ-কর্ম্মে ঢুকে পড়বে ও, ওদেশেই থেকে যাবে। রুমে থেকে এক বুড়ো মেম আসছিলেন; তাঁর সঙ্গে পথে আরো দুয়েক জায়গায় দু'-চারটে কথা বলেছি। তিনি এখন সেই মেয়েটিকে ও আমাকে কফি ও স্যাণ্ডুইচ খাওয়ালেন। তার পরে বসে ভাবছি কতক্ষণে আবার যাত্রা সুরু হবে; হঠাৎ সেই ঘরের দেওয়ালে সংলগ্ন লাউড্-স্পীকারে ঘোষণা শোনা গেল—"প্যান্ আমেরিকানের যাত্রীদের ব্রেকফাষ্ট খাবার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি; পাশেই হোটেল আছে, সবাই চলে আসুন।" শ্যাননেও এমনি ডাইনিং হলে ও ওয়েটিং রুমে দেওয়াল-সংলগ্ন লাউড্-স্পীকার মারফৎ খানিক পরে পরেই যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঘোষণা করা হচ্ছিল শুনেছিলাম। এখন কিন্তু এই ঘোষণা শুনে পার্শ্ববর্ত্তী হোটেলে প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ খেতে যেতে লোভ হোলো না মোটেই; কারণ এই centrally heated waiting roomটির বাইরেই জল-জমানো শৈত্য ও মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণটি ঝুরো বরফে আবৃত—সেটা এক-বার দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে নিয়েছিলাম। কাজেই যখন অন্যান্য

গরম গৃহটির কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম। এরোপ্লেনের বদ্ধ বায়ুতে দীর্ঘ সময় কাটানোর পরে আমি বড় অস্বস্তি বোধ করছিলাম সারা দিনই; তাই সুযোগ পেলেই ভাল করে চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে নিচ্ছিলাম। এখানেও সেই উদ্দেশ্যে লেডীজ রুমে গেলাম। গিয়ে দেখি গ্যাণ্ডারের (এই বন্দরের নাম) লেডীজ রুমটি বেশ বড় একটি মহল। অনেকগুলো বাথরুম ও হাত-মুখ ধোবার বেসিন তো আছেই; তাছাড়া দেওয়াল-জোড়া আয়না, এ-কোণে ও-কোণে হাত-পা ছড়িয়ে শোবার মত বড় বড় ডিভানও রয়েছে। সেখানে বিশ্রাম করবার সময়ে ইচ্ছা করলে চারি দিকে পর্দা ঘিরে দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে দেখলাম। সহযাত্রীরা সবাই আহার সেরে এলেন; আবার প্লেনের কোটরে গিয়ে বসলাম। অসীম শূন্যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, তারি ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা, নীচে উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গমালা, আর চার পাশে তীব্র হিমবায়ু। কিন্তু আমরা বেশ আরামেই আছি; দোলানিতে ঘুম আসছে; শয়ন-ঘরের উপযুক্ত ম্লান আলো জ্বলছে, ঈষদুষ্ণ কোটরে পশমী কম্বল গলা অবধি টেনে দিয়ে ঝিমোচ্ছি। ঘণ্টা চারেক পরে নিউ ইয়র্কের উপর পৌঁছলাম। বাইরে তখন আলো হয়ে উঠেছে, শীতের প্রভাতের কুয়াশা-ম্লান আলো। তারি মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্কের আকাশভেদী বাড়ীগুলোর কিছু-কিছু দৃষ্টিগোচর হোলো। তার পরেই একটা মৃদু ঝাঁকুনীতে টের পেলাম মাটিতে নেমেছি। এইখানে এই বড় প্লেনের যাত্রা শেষ হলো। প্রথমটা আমাদের প্লেনের ভিতর বসিয়ে রাখা হোলো। মেডিক্যাল অফিসার এসে আমাদের প্রত্যেকের টিকা নেবার সার্টিফিকেট দেখে গেলে পরে নামবার অনুমতি পেলাম। আমাদের সঙ্গে যা ছোট জিনিস ছিল তা সঙ্গে নিয়ে নামতে হবে। দেশে হলে কুলী ডাকতাম, কিন্তু এখানে কুলী ডাকতে কাউকেই দেখলাম না। কুলীর মত চেহারার কাউকে দেখতেও পেলাম না। যাক্, নামবার আগে থেকেই এক চিন্তা ছিল যে, এতক্ষণ তো কোম্পানীর লোকেরাই আমাদের তত্ত্বাবধান করেছে; এর পরে কাষ্টমসের পরীক্ষার পর এরা যখন আমাদের ছুটি দেবে তখন স্বাধীন হয়ে যাব কোথায়। আমার শেষ গন্তব্য ওয়াশিংটন। এরোপ্লেনের টিকিট সে পর্য্যন্তই; কিন্তু এই প্লেন ওয়াশিংটন যাবে না; অন্য প্লেনে যেতে হবে এবং সে প্লেন কয়েক ঘণ্টা পরে ছাড়বে অপর এরোড্রোম থেকে। এ খবর আগেই জানতাম; সেই জন্য আমি কলকাতা থেকেই ডাঃ দত্ত-মজুমদারকে ফোন করে জানিয়েছিলাম নিউ ইয়র্কে এসে আমাকে নিয়ে যেতে। ভাবনা হচ্ছিল সেই বেতারবার্ত্তা যথাসময়ে ওঁর কাছে পৌঁছেছে কি না। যা হোক, দলের সঙ্গে সঙ্গে কাষ্টমসের পরীক্ষা গৃহে গিয়ে বসলাম। সেখানে গিয়ে বসবার মিনিট পাঁচেক পরেই এক জন আমার নাম বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করল; আমি উঠে দাঁড়াতে সেই মেয়েটি ছোট এক খণ্ড কাগজ আমায় দিল; দেখলাম কর্ত্তা লিখেছেন—বাইরে অপেক্ষা করছেন, কাষ্টমস্-এর ঘরের ভিতর আসবার নিয়ম নেই। পড়ে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, তাহলে এই বিরাট নগরে একলা চলার দায় আমার রইল না।

তার পর আরম্ভ হোলো কাষ্টমস্-এর পরীক্ষা। ইতিপূর্ব্বেই আমাদের পাশপোর্টগুলো ওরা নিয়েছিল, এবং শ্বেতকায় যাত্রীদের সেগুলো ফেরৎ দিয়ে আমার ও বর্ম্মা থেকে আগত দুই ভদ্রলোকের পাশপোর্ট রেখে দিয়েছিল। খানিক পরে আমাদের তিন জনকে ডাকলো। যে ডাকলো তাকে অনুসরণ করে আমরা অন্য একটা কক্ষে গেলাম; দেখলাম সেখানে মুখে থার্ম্মোমিটার নিয়ে অনেকে বসে আছেন। আমাদের তিন জনের মুখেও তিনটি থার্ম্মোমিটার দেওয়া হোলো। তার পর আবার টিকে-নেওয়ার সার্টিফিকেটখানা দেখাতে হোলো। তখন আবার আগে যেখানে বসেছিলাম সেখানে ফিরে এসে বসলাম। এবার যেতে হবে অন্য দিকের দুয়ার দিয়ে। প্রথমে কলকাতার অ্যামেরিকান্ কনসালেট্ থেকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছিল সেখানা দিতে হোলো,—সে মস্ত একতাড়া কাগজ। তার পর সেখানকার কাউণ্টার থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে এক জন গম্ভীর চেহারার অফিসারের সামনে বসতে হোলো। তিনি ঐ সব কাগজপত্র ও পাশপোর্টখানা মিলিয়ে দেখে পোষ্টকার্ড সাইজের একটি হলদে রঙের কার্ড দিলেন। পাশপোর্টটাও দিলেন, কিন্তু অনেকগুলো টাকার বদলে ও অনেক ঘোরাঘুরি করে কলকাতার American Consulate থেকে সংগ্রহ-করা কাগজের তাড়াটি রেখে দিলেন। তার পর তিনি একটা দরজা দেখিয়ে দিলেন। নিজের তল্পিতল্পা বয়ে সেই দরজার কাছে গিয়া দেখলাম যে, দরজার মুখ আটকে একটি চাকাওয়ালা টেবিল নিয়ে এক জন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আট ডলার দিতে হোলো, একে বলে Head Tax; তখন সে একটি রসিদ দিয়ে অতি বিনীত ভাবে পথ থেকে টেবিল সরিয়ে নিয়ে আমাকে বেরিয়ে আসতে দিল। এর পরে মাল-পরীক্ষা। লম্বা একটা ঘরের এক দিকের দেওয়াল লম্বালম্বি জুড়ে দীর্ঘ কাউণ্টার, তার উপর যাত্রীদের মাল—যা এরোপ্লেনের নীচেকার hold-এ ছিল—সাজানো রয়েছে। নিজেরটি চিনে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাউণ্টারের অপর পার্শ্ববর্ত্তী এক জন লোককে মালের রসিদখানা দিতে সে বলল "অপেক্ষা কর, নাম ডাকা হবে।" অপেক্ষা করতে লাগলাম; পাশেই এক মেমের মাল-পরীক্ষার ব্যাপারটা দেখলাম। তিনি বিলেত থেকে আসছেন; কয়েকটি আপেল ও কিছু মাংসের পাই ছিল তাঁর বাক্সে। সেগুলো ওরা বের করে দিল; বাইরের খাদ্যদ্রব্য দেশের ভিতর আনবার নিয়ম নেই জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে। আমারও ছিল কিছু বে-আইনী জিনিস,—কিছু ভাজা মসলা, লেবুর আচার, জোয়ানের বড়ী; মনে মনে এ সবের আশা ছেড়ে দিলাম। একটু পরে সুরু হোলো আমার মাল-পরীক্ষা। জিজ্ঞাসা করলাম, "বড় ব্যাগটা খুলব না কি?" সে বলল, "না, ছোটটার ভিতর দেখতে চাই। তাতেই ছিল আমার মশলা ইত্যাদি, শাল ও দস্তানা ছিল তার উপর চাপা দেওয়া। ব্যাগের মুখটি খুললাম—সেই মুহূর্ত্তে লোকটির নজর পড়ল কালো কাপড়ের থলেতে আমার সেতারটির উপর। বলল ওটার চেহারাটা একবার দেখতে চাই। ধীরে ধীরে শক্ত বাঁধন খুলে থলের মুখ উন্মোচন করলাম; ততক্ষণে লোকটির মন ব্যাগ থেকে সরে এসেছে, আমার রসনা-তৃপ্তিকর জিনিসগুলোও বেঁচে গেল। পরীক্ষার পালা শেষ হলে এক জন নিগ্রো পোর্টার তার ঠেলাগাড়িতে

আমার মালগুলো তুলে নিল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে সদর ওয়েটিং-রুমে পৌঁছলাম—যেখানে উনি অপেক্ষা করছিলেন। এই ঘরটারও মাঝে গোল কাউণ্টার ও চারি দিকের দেওয়ালেই কাউণ্টারে অনেক লোক বসে কাজ করছেন ও অনেক যাত্রী বা সম্ভাব্য যাত্রিগণ সেখানে নানা কাজে ভীড় করে রয়েছেন। আমাদেরও কাজ ছিল সেখানে। ওয়াশিংটন যাবার plane কখন ছাড়ে সেই সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া হোলো। জানা গেল ৩।৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। এই ৩।৪ ঘণ্টা শুধু শুধু অপেক্ষা করার মত শরীরের অবস্থা তখন নয়। আর প্রায় ৫৬ ঘণ্টা এরোপ্লেনে কাটাবার পরে আবার সেই অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় বদ্ধ অবস্থায় শূন্যমার্গে ভ্রমণ করতে দেহ-মন চাইছিল না। ঠিক হোলো, এখন এখানে এরোপ্লেনের টিকিট refund করার ব্যবস্থা করে আমরা দিনের বেলা নিউ ইয়র্কে স্নানাহার বিশ্রাম করে বিকেল বেলা ট্রেণে ওয়াশিংটন যাব। টিকিটের ব্যাপারে স্বভাবতঃই অনেকটা সময় কাটলো। তার পর আমরা ট্যাক্সি করে সহরের এক হোটেল অভিমুখে চললাম। পথে নিউ ইয়র্ক সহরের যেটুকু নমুনা দেখলাম তাতেই তাক লেগে যায়। তার পর সহরের প্রধান অংশে "ট্যাফ্‌ট হোটেলে" আমরা গিয়ে উঠলাম। এখানে উনি এসে উঠেছেন ও আমার জন্ত অপেক্ষায় দুই রাত্রি কাটিয়েছেন। আজ সকালে এখানে আর ফিরবেন না এই হিসাব করেই এখানকার দেনাপত্র চুকিয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু সে ঘর তখন পর্য্যন্ত খালিই ছিল, আমরা সে ঘরের চাবী নিয়ে লিফ্‌টে চড়লাম। এই বাড়ীটি কুড়ি তলা। আমরা যে ঘরটি পেলাম সেটি সপ্তদশতম তলায়। লিফ্‌ট (এ দেশে বলে এলিভেটর) বিদ্যুৎ-বেগে এই ১৭ তলা উঠে দাঁড়াল। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল হোটেলের ভৃত্য বা "বেলবয়"। কোরিডর কয়েকটি পেরিয়ে যেতে যেতে উনি এক জায়গায় জানলা দিয়ে আমাকে বাইরের দৃশ্য দেখালেন—উঁচু উঁচু স্কাইস্ক্রেপারে সমাকীর্ণ সহরের আকাশ।

হোটেলের ঘরে মার্বেল-বাঁধানো স্নানাগার, গরম ও ঠাণ্ডা জলের শাওয়ার ও টবের ব্যবস্থা। দু'দিন পরে স্নানটি খুব উপভোগ্য হোলো। তার পর আহার্য্য সংগ্রহের প্রয়োজন। বাঙালীর নাড়ী অন্ন বিহনে কাতর হয়ে উঠেছিল। অন্নের ব্যবস্থাও হয় শুনলাম। সিংহলী হোটেল একটি কাছেই আছে, সেখানে গেলাম। সুন্দর প্রাচ্য আসবাবপত্রে সাজানো খাবার-ঘরটি। সেখানে ভাতের সঙ্গে ডাল তরকারী মাংস ইত্যাদি বেশ তৃপ্তিকর খাদ্য পরিবেষণ করলে। শেষে মিষ্ট তিন-চার রকম ছিল, তার মধ্যে আইসক্রীমই আমার পছন্দ হোলো। বলতে ভুলে গিয়েছি যে, পানীয় জলও ছিল বরফ-শীতল। আমার ক্ষুধার চেয়ে পিপাসার উদ্রেকই বেশী হয়েছিল, প্রচুর বরফ-জল পান করেছিলাম, তার পর আইসক্রীম খেলাম। এ সব দেশে প্রত্যেক আহারের পর কফি বা কখনও কখনও চা খাওয়ার রীতি আছে। আমি তাতে অনভ্যস্ত, সুতরাং শীতল জল ও আইসক্রীমই আমার শেষ খাওয়া। তার পর যখন হোটেলে ফিরব বলে রাস্তায় নামলাম তখন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এবং বৃষ্টির কণার সঙ্গে বরফের কণাও দেখা যাচ্ছে। বাইরে এই বরফকণা-মিশ্রিত বৃষ্টি এবং ভিতরে বরফ-জল ও আইসক্রীম; ভিতর ও বাহিরের এই যুগপৎ আক্রমণে আমি বাস্তবিকই কাঁপতে লাগলাম। হোটেলের Revolving gate-এ যখন পৌঁছেছি তখন শীতাধিক্যে আমার দাঁতে-দাঁতে লেগে যাচ্ছে। উষ্ণ লবীতে ঢুকে মুহূর্ত্তের মধ্যে অত্যন্ত আরাম বোধ করলাম।

ঘণ্টা-দেড়েক বিশ্রাম করার পর ওয়াশিংটনগামী ট্রেণ ধরবার জন্ত ষ্টেশনে গেলাম। এই ষ্টেশনটির নাম পেনসিলভ্যানিয়া ষ্টেশন। সহরের মাঝখানে অথচ সাধারণ রাস্তা-ঘাটের নীচে মাটির তলায় সমস্ত ষ্টেশনটি। একটি ঢালু পথ বেয়ে ট্যাক্সি নেমে গেলো, প্রবেশ করলাম পাতালে। সে এক পাতালপুরী—ষ্টেশনের ভিতরে গিয়ে দেখে অবাক হলাম। ট্যাক্সি থেকে নেমে কুলির জন্ত অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হোলো। বাইরে অনেক কুলি ছিল কিন্তু তারা ষ্টেশনের ভিতরে যেতে পারে না। ভিতরের কুলিরা ঠ্যালা-গাড়ী করে মাল নিয়ে যায়। কাচের আবরণের বাইরে মুক্ত গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ভিতরে কুলিরা জিনিসপত্র ঠেলে আনাগোনা করছে। কিন্তু ঠ্যালাগাড়ীর অপ্রতুলতার জন্ত অনেকক্ষণ কেউ এল না। বাইরের শীতল বায়ু অনেকক্ষণ ভোগ করার পর এক জন এল আমাদের মোট বয়ে নিয়ে যেতে; তখন ষ্টেশনের উষ্ণ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখলাম যদিও পাতালে প্রবেশ করেছি, তবু এ জায়গা অন্ধকারও নয় হিমও নয়। এত চমৎকার সাজানো আলো-ঝলমল দোকানপাট—একেবারে মস্ত বাজার! ষ্টেশনের খাওয়ার দোকান, অফিস ইত্যাদি তো আছেই, তা ছাড়াও বহু দোকানপাট। ট্রেণ চলে আরো একতলা নীচে দিয়ে। আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে প্ল্যাটফর্ম্ম পেলাম, টিকিট প্রবেশ-পথেই পাওয়া গেল। ট্রেণ এলে চড়ে বসলাম।

খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত ট্রেণ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়েই চলতে থাকল। তার পর সহর ছাড়াবার পর মাটির তলার পথ শেষ হোলো; ট্রেণ খোলা জায়গায় এলো, কিন্তু অপরাহ্ণের আলো ম্লান, কুয়াশার ঘোমটা-পরা। দেখে মনটা দমে যায়। ক্রমে সন্ধ্যা হোলো প্রায় বেলা ৫টাতেই। রাত্রি সাড়ে ৭টায় ওয়াশিংটন পৌঁছলাম। বাসায় পৌঁছতে আটটা বাজল। [ক্রমশঃ।

ষ্টালিন-পুত্রের দম্ভোক্তি

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকাল। এক দল রুশ-সৈন্ত জার্ম্মাণদের হাতে বন্দী হয়ে বন্দিশালায় চলেছে লুবেক শহরে। তাদের মধ্যে এক জন রয়েছে অত্যাচারের কষ্টে রুগ্ন ও শীর্ণ, তার নাম জেকব জুগাসভিলি, জোসেফ ষ্টালিনের পুত্র। সৈন্তরা চলেছে। পথে এক জন জার্ম্মাণীর সামরিক অফিসারের সঙ্গে দেখা। সকলে তাকে সেলাম জানালে, শুধু ঐ জেকব জুগাসভিলি জানালে না, অথচ সামরিক রীতি সেলাম করা।

জুগাসভিলি কেন সেলাম করলে না জিজ্ঞেস করাতে সে উত্তর দিলে, আমি মাত্র বন্দী হয়েছি, কিন্তু আমাকে এখনও জয় করতে পারেনি। "I am only captured, not conquered."

হালখাতা

শ্রীকামিনীকুমার রায়

হালখাতা ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। বণিক সম্প্রদায় তাহাদের ব্যবসায়ের এক-একটি বৎসরের হিসাব পৃথক এক-একটি খাতায় রক্ষা করেন; চলতি বৎসরের হিসাব যে খাতায় থাকে তাহাকে বলা হয় হালখাতা। এই অর্থে 'হাল' শব্দটি আরবী এবং 'খাতা' শব্দটি ফারসী হইতে গৃহীত হইয়াছে। আরব ও পারস্যের বণিকদের সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের এক কালে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং এই দুইটি দেশের ভিতর দিয়া ভারতীয় পণ্যসম্ভার ইউরোপের বাজারে এবং ইউরোপীয় দ্রব্যসামগ্রী ভারতের বাজারে প্রবেশ লাভ করিত। তদুপরি ••• বৎসরের মুসলমান রাজত্বের প্রভাবে বহু শত আরবী ফারসী শব্দ, বিভিন্ন রীতি-নীতি আমাদের ভাষা-সাহিত্য, সংসারে সমাজে, কারবারে ও দরবারে অধিকার লাভ করিয়াছে। হালখাতা মহরৎ প্রভৃতি কথাগুলি এই সকল সূত্রেই পাওয়া।

হিন্দুদের প্রত্যেক কার্য্যই ঈশ্বরোদ্দিষ্ট। 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি',—নিষ্ঠাবান্ হিন্দুমাত্রেরই ইহা হৃদয়ের কথা। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ ছাড়া ক্ষুদ্র-শক্তি মানুষের কিছুই করিবার নাই,—তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র—এই ধারণা তাঁহাদের মজ্জাগত। তাই শুভদিনে শুভক্ষণে দেবতার পূজা-অর্চনা না করিয়া তাঁহারা কোনও শুভকার্য্য আরম্ভ করেন না; শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের সে কার্য্যে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা থাকা চাই। এ জন্য তাঁহাদের সামান্য ব্যক্তিগত ব্যাপারটিও সমষ্টিগত হইয়া উৎসবের আকার ধারণ করে। হালখাতাও বৎসরের প্রথম যেদিন লিখিতে আরম্ভ করা হয়, সেদিন হয় সংশ্লিষ্ট বিপণিতে বিপণিতে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, ব্যবসায়ী সকলের প্রীতি-সম্মেলন। হাল-খাতা সেদিন তাহার ব্যুৎপত্তিগত নীরস অর্থ হারাইয়া আনন্দঘন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

কোন কারবারই দুই-এক দিনে বড় হইয়া উঠে না। আজ যে-দোকানের দৈনিক বিক্রয় দশ হাজার টাকা, প্রারম্ভে হয়তো তাহার দশ টাকাও ছিল না। এইরূপ অসামান্য সাফল্যের জন্য ব্যবসায়ীকে দীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয়; শুধু অপেক্ষা করিলেই হয় না; ব্যবসায়িক বুদ্ধি, স্থান-নির্ব্বাচন, ক্রেতাদের প্রয়োজন ও ক্রয়ক্ষমতানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন, সুনাম, সততা, ভদ্র-ব্যবহার, ব্যক্তিগত প্রভাব প্রভৃতি অনেক কিছুই একক এবং সম্মিলিত ভাবে এক-একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতির পথে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রত্যহের কেবল নূতন নূতন খরিদদার দ্বারা দোকান চলে না, চলিলেও তেমন জাঁকিয়া বসিতে পারে না; উহার পশ্চাতে থাকা চাই বিরাট এক স্থায়ী ক্রেতা-গোষ্ঠী। কিরূপে এই গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়? আমরা সাধারণতঃ কি করি? প্রথম বার একটি জিনিষ যে-দোকান হইতে কিনি, সে জিনিষটি ভাল হইলে, সেখানে ব্যবহার ভাল পাইলে, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে তাহা আবার সেই দোকানেই কিনিতে যাই, পরিচিত আরও দশ-পাঁচ জনকে সেখানে কিনিতে অনুরোধ করি। যে-স্বর্ণকারের দোকানে একবার চার গাছা চুড়ি গড়ানো হইল, কোনও অনুযোগ-অভিযোগ না থাকিলে গৃহিণী আবার সেই দোকানেই নেকলেসের অর্ডার দেন, বিবাহের গহনা গড়াইবার ভারও সেখানেই দেওয়া হয়; এক মাসে যে-দোকান হইতে ডাল-তেল-মসলা আনা হইল,—ডালটি সুসিদ্ধ হইলে, তেলটা ভেজাল বলিয়া মনে না হইলে, মসলায়ও কোনরূপ ধূলা-পোকা না থাকিলে পরবর্ত্তী মাসেও আমরা একরূপ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই সেই দোকানেই ফর্দ্দ পাঠাই। এইরূপে কালক্রমে এক-এক জন ব্যবসায়ীর পশ্চাতে এক-একটি স্থায়ী ক্রেতা-গোষ্ঠী দাঁড়াইয়া যায়; অন্য দোকানে কিঞ্চিৎ সুলভে পাইলেও, তাঁহারা পুরাতনটি আর পাল্টাইতে ইচ্ছা করেন না; দীর্ঘ দিনের কারবার-দরবারে, মিষ্টি-মধুর ব্যবহারে ক্রেতাদের মনটা যেন কেমন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে; ইহাই হইতেছে কোনও প্রতিষ্ঠানের Good-will. এই Good-willএর জন্যই এক জন ক্রেতা রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া বালিগঞ্জ হইতে কলেজ স্কোয়ারে ছুটিয়া যান, অথচ অনেক সুবিধা পাইয়াও পার্শ্বস্থ বিপণি হইতে তুল্য-মূল্যে জিনিষ ক্রয় করেন না। এই স্থায়ী ক্রেতা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া অনেক সময় তাঁহারা বিশেষ উপকৃতও হন। অনেক দোকানেই বড় বড় হরফে লেখা থাকে, "ধারে বিক্রয় নাই", "ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না" ইত্যাদি। কিন্তু ব্যবসায়ী মাত্রেই জানেন, ব্যবসায়ের প্রসারের খাতিরে সর্ব্বদা এই নীতি-বাক্যে অচল থাকা যায় না, অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করিতে হয়; স্থায়ী পুরাতন ক্রেতাদের সাময়িক প্রয়োজনে আদায় হইয়া আসিবে স্থলে ধারও দিতে হয় এবং দশ টাকার ধারে কখনো কখনো শত টাকার কাজও হইয়া থাকে। জীবনে কখনো অভাব ঘটিবে না,—অবস্থা চির দিন সচ্ছল থাকিবে, ইহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। প্রত্যেকেরই কোনও সময়ে ধারে জিনিষ নিবার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু নিত্য-নূতন দোকান হইতে সওদা করিলে সে-প্রয়োজন মিটাইতে বেগ পাইতে হয়।

এই যে ক্রেতা-গোষ্ঠীর কথা বলা হইল, প্রতি বৎসর শুভ হাল-খাতা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া বণিক্-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের বৈষয়িক বন্ধন আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়া উঠে, শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লাভের আরও নূতন নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই উপলক্ষে এক-একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান উহার স্থায়ী গ্রাহকবর্গকে সুরম্য লিপিতে আমন্ত্রণ করেন,—"মদীয় গদিতে শুভাগমন-পূর্ব্বক হালখাতা মহরতাদি করাইয়া বাধিত করিবেন।" এই আহ্বান-লিপি ক্রেতা-গোষ্ঠী উপেক্ষা করিতে পারেন না; যাঁহার পঞ্চাশ টাকা ধার আছে, তিনি এই সময়ে ১০-১৫ টাকাও শোধ করিতে চেষ্টা করেন। আবার যিনি কিছুই ধারেন না, তিনিও ভদ্রতার খাতিরে শুধু হাতে যান না, কয়েক টাকা আমানত জমা রাখিয়া আসেন। এইরূপে কারবার চলে—বছরের পর বছর, ক্রেতা ও বিক্রেতার বন্ধন সূত্র আর ছিন্ন হইতে চায় না। হালখাতায় প্রতি বৎসর তাঁহাদের প্রত্যেকের হিসাব নূতন করিয়া তোলা হয়। কিন্তু ব্যবসায়ী সেদিন কেবল টাকা-আনার হিসাবই করেন না,—যাঁহাদের লইয়া তাঁহার নিত্য কারবার, যাঁহারা তাঁহার ঐশ্বর্য্য-প্রতিপত্তির মূলে, তাঁহাদের মিষ্টি-মুখেরও যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেন, আদর-আপ্যায়নের সীমা থাকে না, গান-বাজনাও বাদ যায় না; দোকানে মনে হয় যেন এক সামাজিক কৃত্য চলিয়াছে।

হালখাতা-অনুষ্ঠানের পূর্ব্বদিন ব্যবসায়ীদের সালতামামি।

taking,—কোন পদ কি আছে, তাহার গণনা, ওজন ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে দোকানটি ঝাড়িয়া-মুছিয়া জিনিষপত্রগুলিকে আবার যথাস্থানে সুন্দর ও সুসজ্জিত করিয়া রাখা হয়।

হালখাতার দিন সকালে হয় দোকানে গদির উপরে শ্রীশ্রীগণেশ-পূজা। গণপতির মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, ধূপ-দীপ জ্বালিয়া, আম্রপল্লব সহ জলঘট বসাইয়া, মালা-চন্দন দিয়া যথারীতি পূজা করা হয়। অতঃপর মূল ব্যবসায়ী দেবমূর্ত্তির পদপ্রান্ত হইতে 'খাতাটি' গ্রহণ করিয়া তাহাতে সিন্দূর-রঞ্জিত টাকার ছাপ ও সিন্দুরের ফোঁটা দেন, স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকেন, শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ লিখিয়া প্রণতি জানান, সিদ্ধি কামনা করেন। বিকালে হয় পূর্ব্বোক্ত আমন্ত্রিত ক্রেতাদের শুভাগমন, প্রীতি-সম্মেলন।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, ব্যবসায়ীরা এই উপলক্ষে গণেশের পূজা করেন কেন! ধনৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তো লক্ষ্মী! অবশ্য হিন্দুদের কোন কোন সম্প্রদায় হালখাতা-অনুষ্ঠানে লক্ষ্মীরও পূজার্চনা করিয়া থাকেন; কিন্তু দেখা যায়, গণেশের পূজাই সর্ব্বত্র মুখ্য স্থান লাভ করে।

গণেশের গজমুণ্ডের পৌরাণিক কাহিনী সকলেই জানেন। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মস্তক উড়িয়া গেলে বিষ্ণু, কাহারো মতে শিব হস্তি-মুণ্ড আনিয়া তাঁহার স্কন্ধে সংযোজিত করেন এবং সকল দেবতার পূজার আগে তাঁহার (গজাননের) পূজা হইবে,—এই বিধান দেন। পুরাণে উক্ত হইয়াছে, গণেশ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশকারী, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহাকে পূজা করিয়া কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে সে-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, অচিরেই সিদ্ধিলাভ ঘটে। গণপতিতত্ত্ব গ্রন্থে গণেশকে পরমাত্মা পরব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহা হইতেই উদ্ভূত, তাঁহাতেই লয় পাইবে; ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলই তাঁহার করায়ত্ত, বিভিন্ন মূর্ত্তিতে তিনি বিভিন্ন জীব-গোষ্ঠীকে প্রতিপালন করেন। তন্ত্রে গণেশের পঞ্চাশটি রূপ ও পঞ্চাশটি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। গণেশের আরাধনা করিলে ইঁদুরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তন্ত্রসারে ইহারও উল্লেখ আছে। গণেশ পৃথিবীর আদি লিপিকার, Modern stenographer, সংক্ষেপ-লিখনের প্রবর্ত্তক, বেদব্যাসকে তিনি মহাভারতের পাণ্ডুলিপি রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি আর নাই করি, তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতি ছাড়া গণেশ সম্বন্ধে অবহিত হইবার আমাদের আর কি-ই বা আছে!

পুরাণের কথা—গণেশ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক, সর্ব্ব কার্য্যে সিদ্ধিদাতা। যদি তাহাই হয়, ব্যবসায়ীরা যে ইঁহার পূজা করেন, আমার তো মনে হয়, ঠিকই করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যেই তো বাধা-বিঘ্ন সব চেয়ে বেশী; দেশ-বিদেশের অবস্থার সঙ্গে উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কখন যে সেই অবস্থা কোন্ ব্যবসায়ের অনুকূলে কিংবা প্রতিকূলে যাইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নেই বলা কঠিন। কিন্তু ইহা চিন্তা করিলে আর ব্যবসায় করা চলে না, বড় কারবার তো মোটেই নয়। ব্যবসায় চালাইতে হইলে যাবতীয় বাধা-বিঘ্নের, বাজারের উঠতি-পড়তির ঝুঁকি লইতেই হইবে। ব্যবসায়ীরা তাই কার্য্যারম্ভে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশকারী দেবতা শ্রীগণেশের পূজা করেন। তাঁহার কৃপায় বাণিজ্য-পথের সমস্ত বাধা বিদূরিত

[illegible]

গণেশ শুধু বিঘ্ননাশকারী নহেন, তিনি গণসমূহের তথা জনগণের অধিপতি—জননেতা! নেতা হইবার অনেক গুণই তাঁহার মধ্যে আছে। তিনি যেমন বীর, তেমনি স্থির ধীর। করিমুণ্ড দ্বারা তাহাই কতকটা অনুমিত হয়। ইঁদুর যে গণেশের বাহন, তাহারও একটা তাৎপর্য্য আছে। ইঁদুর একটি ভীষণ রকমের খল প্রকৃতির জীব; আড়ালে আবডালে অনিষ্ট করিয়া বেড়ানই তাহার কাজ। গণপতি এই ইঁদুরকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ সমস্ত দুষ্ট-শক্তি ও বিরুদ্ধ-শক্তিকে আপন বশে রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে এইরূপ এক জন জননেতার পূজা আকস্মিক নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ লইয়াই তাঁহাদের কারবার; জনগণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার উপরই ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব ও প্রসার-প্রতিপত্তি নির্ভর করে। এমতাবস্থায় স্বয়ং গণপতি যদি তুষ্ট থাকেন, তাঁহার অধীন জনসমূহ আপনিই আকৃষ্ট হইবে। 'যস্মিন্ পক্ষে জনার্দ্দনঃ' জনার্দ্দনকে পক্ষে আনিতে পারিলে ভক্তেরা আপনিই আসিবে, ইহাই হয়তো ব্যবসায়ীদের মনোভাব।

এইবার আমি বিভিন্ন ব্যবসায়ী মহলে 'হালখাতা' বৎসরের যে যে দিন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

হালখাতা-অনুষ্ঠান সকলে এক তারিখে করেন না; বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যিনি যে-তারিখে কারবার প্রথম আরম্ভ করেন, প্রতি বৎসর সেই তারিখেই তাঁহার হালখাতা হয়। এই হিসাবে 'হালখাতা'কে এক-এক জনের ব্যবসায়ের জন্মবার্ষিকী বা প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবও বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই ১লা বৈশাখ তারিখে শুভ হালখাতা (মহরৎ) করেন। বাঙ্গালী মাত্রেই এই দিনটিকে শুভ ও পবিত্র মনে করে এবং সর্ব্বতোভাবে ইহার সদ্ব্যবহার করিতে চায়; এই দিনটি বাঙ্গালীর নববর্ষের প্রথম দিন। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই অনেকে এই দিন ব্যবসায়াদি শুভকার্য্য আরম্ভ করেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, ১লা বৈশাখ হইতে বৎসর গণনার রীতি খুব প্রাচীন নয়। আমাদের বর্ত্তমান পাঁজির গণনা ২৪১ শকে ইংরেজি ৩১৯ সালে আরম্ভ হইয়াছে; সৌর-বৈশাখ হইতে বৎসর গণনার রীতিও সেই সময়েই প্রবর্ত্তিত হয়; কিন্তু ভারতের সকলে তাহা গ্রহণ করে নাই। পূর্ব্ব-ভারতে ও দ্রাবিড় অঞ্চলে সৌরমাসই ব্যবহৃত হয়, পশ্চিম-ভারতে চান্দ্রমাস গণিত হইয়া থাকে। শুক্লা-প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা, কিংবা কৃষ্ণা-প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমান্ত পর্য্যন্ত কাল এক চান্দ্রমাস। সূর্য্যের এক-একটি রাশি-স্থিতিকাল এক-একটি সৌরমাস। শকাব্দ এবং বঙ্গাব্দ দুই-ই সৌরবর্ষ,—দুইয়েরই আরম্ভ সৌর-বৈশাখে। অনেকে বলেন, কোনও এক শক-সম্রাট্—(শকাদিত্য, শালিবাহন কিংবা কনিষ্ক) হইতে শকাব্দের প্রচলন হয় এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে বরাহ-মিহির সর্ব্বপ্রথম এই অব্দ প্রবর্ত্তন করেন; ৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা গণিত হইয়া আসিতেছে। পশ্চিম ও উত্তর-ভারতে যে 'সংবৎ' প্রচলিত আছে, তাহা চান্দ্রবর্ষ; চৈত্রের শুক্লা প্রতিপদ হইতে [illegible] ৫৭ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহার

গণনা প্রচলিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে ২০০৮ সংবৎ চলিতেছে। মানবগণই না কি এই সংবৎ-এর প্রবর্ত্তক।

বাঙ্গালী আজ নববর্ষের প্রথম দিনে হালখাতা করে, নববর্ষ-উৎসবে সাড়া দেয়। কিন্তু এক কালে—এই সেদিন পর্য্যন্তও বঙ্গাব্দ বলিয়া তাহার নিজস্ব কোন বৎসর ছিল না। লৌকিক ব্যাপারে এবং ধর্ম্মীয় ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদিতে তাহারা সৌরমাস ও সৌরবর্ষ শকাব্দ অনুসরণ করিত; কিন্তু অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে ও সরকারী কাজে মুসলমান আমলে চান্দ্রবর্ষ হিজরীর শরণাপন্ন হইতে হইত। বাংলার সুলতান তখন বাংলাকে আপনার দেশ এবং নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ৯০৩ হিজরী সালে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাংলার মসনদে উপবেশন করেন। তিনি বাঙ্গালী জনসাধারণের অসুবিধার কথা হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং অচিরেই (খৃঃ ১৬শ শতকের প্রারম্ভে) পণ্ডিতদিগকে ডাকাইয়া বঙ্গদেশে প্রচলিত সৌরমাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া হিজরী চান্দ্রবর্ষকে সৌর-বঙ্গাব্দে পরিণত করিলেন। বাঙ্গালীর এক সৌরবর্ষ হয় ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে; আর হিজরীর এক চান্দ্রবর্ষ ৩৫৫ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে। ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই রাত্র হইতে হিজরী সাল গণনা করা হইতেছে কিন্তু বাংলা সাল আজ ১৩৫৮ হইলেও প্রায় ১ শত বৎসর তাহাকে অজ্ঞাতবাসেই কাটাইতে হইয়াছে। বাঙ্গালীর নববর্ষ-উৎসবের সূচনাও খুব বেশী দিনের নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় কবি ঈশ্বর গুপ্তই না কি এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইংরেজ আমলে আমরা ১লা জানুয়ারীতেই নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানাইতাম, ১লা বৈশাখের তখন তেমন কোন আকর্ষণ ছিল না। বঙ্গাব্দের পর্য্যাপর ব্যবহৃত 'সন' এবং 'সাল' কথা দুইটিও মুসলমানী; 'সন' শব্দটি আরবী এবং 'সাল' শব্দটি ফারসী।

পূর্ব্বোক্ত মালবীর অব্দ সংবৎ-এর অনুগামী যাঁহারা, তাঁহাদের অনেকে শ্রীশ্রীরামনবমী দিবসে হালখাতা করেন। চৈত্রের এই শুক্লা-নবমীতে বাসন্তীপূজা এবং রামনবমী ব্রত হইয়া থাকে; এই দিনে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দিনটিকে হিন্দু মাত্রেই শুভপ্রদ ও পবিত্র মনে করে।

গুজরাত এবং পশ্চিম ও উত্তর-ভারতের অপর বহু ব্যবসায়ী দেওয়ালীর পরদিন অর্থাৎ কার্ত্তিকের শুক্লা-প্রতিপদ হইতে তাঁহাদের বৎসর গণনা আরম্ভ করেন, সেদিন হয় তাঁহাদের কারবারের নূতন খাতাপত্র, হালখাতা মহরৎ। এক সময়ে আর্য্য ঋষিরা শরৎ ঋতুর প্রবেশ হইতে বর্ষারম্ভ ধরিতেন, তাহাকে বলা হইত শরৎ বর্ষ। এখনো আশীর্ব্বাদ করা হয় 'শতং শরদঃ জীবতু।' প্রাচীন কালে যে যে তিথিতে এই বর্ষের আরম্ভ ধরা হইত, তাহাদের মধ্যে কার্ত্তিকের শুক্লা-প্রতিপদ একটি। বণিকদের হালখাতার ভিতর দিয়া সে-স্মৃতি এখনো রক্ষিত হইতেছে।

অনেকে অপর বিশেষ বিশেষ শুভদিনেও তাঁহাদের হালখাতা করিয়া থাকেন। হয়তো সেই দিনটি তাঁহাদের বাণিজ্যিক বৎসরের (financial year) প্রথম দিন। শুভ অক্ষয় তৃতীয়াতে, অর্থাৎ বৈশাখের শুক্লা-তৃতীয়াতে অনেক ব্যবসায়ীকে হালখাতা অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। এই দিনটি বাস্তবিকই অতি পবিত্র, এই দিনে কোন সে অতীতে সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহারই স্মৃতি বহন করিয়া এখনো স্থানে স্থানে উৎসব হয়, মেলা বসে।

রথযাত্রা-দিবসেও কেহ কেহ কারবার আরম্ভ করেন এবং প্রতি বৎসর সেই দিনে তাঁহাদের হালখাতা হয়। স্বয়ং ভগবানের যাত্রা-দিবস কখনো অশুভ হইতে পারে না, এই মনোভাবই অনেককে শুভ কার্য্যারম্ভে প্রেরণা দেয়। এতদ্ব্যতীত জ্যোতিষ বচন অনুযায়ী শুভদিন, শুভক্ষণ এবং ব্যক্তিগত চন্দ্র তারা শুদ্ধ দেখিয়া অনেকে ব্যবসায় আরম্ভ করেন, হালখাতাও তদনুযায়ীই হয়।

ইংরেজ বণিকরা এবং অনেক বড় বড় সওদাগরী প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের বাণিজ্যিক বৎসরের প্রথম দিন উপলক্ষে উৎসব করেন না বটে, কিন্তু প্রতি বৎসর তাঁহাদেরও হালখাতা হয়, নূতন খাতায় নূতন বৎসরের হিসাব উঠে। অনেকেরই সে-বৎসর আরম্ভ হয় ১লা এপ্রিল হইতে এবং সাল-তামামি হয় ৩১শে মার্চ্চ তারিখে।

হালখাতা-অনুষ্ঠানের সহিত 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের তুলনা করা যাইতে পারে। নূতন বৎসর উপলক্ষে নিজ নিজ প্রজা-গোষ্ঠী হইতে জমিদার তালুকদারদের প্রথম খাজনা-আদায়-অনুষ্ঠানের নাম পুণ্যাহ। অনেকে প্রতি বৎসর একই নির্দ্দিষ্ট দিনে এই উৎসব করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা আদায়-তহশীলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তারিখের পরিবর্ত্তন করেন। এই উপলক্ষে প্রজাসাধারণকে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহাদের হাল-বকেয়া হিসাব নূতন খাতায় লেখা হয়; প্রত্যেকে সে-হিসাবে কতক টাকা জমা দেন। জমিদার সেদিন প্রজাদের হৃদ্যতার সহিত অভ্যর্থনা করেন, মিষ্টিমুখ করাইয়া তাহাদিগকে বিদায় দেন।

-জেনে রাখুন-

১৩৫৭ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র সংখ্যা মাসিক বসুমতীর একখানিও আর অবশিষ্ট নেই। উক্ত সংখ্যাগুলি পাওয়ার জন্য আমাদের নিকট কেউ আর আবেদন জানাবেন না—এই অনুরোধ।

বাজে লোক

ভাস্কর

হরিহর বাবু একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন। তাঁহার একটি নিকট-আত্মীয়া একটি বিষয়-সংক্রান্ত মামলায় জড়াইয়া-পড়িয়াছেন এবং এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, দুই-এক দিনের মধ্যেই নগদ বয় হাজার টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিছু দিন পরে অবশ্য তাহার দ্বিগুণ টাকা আত্মীয়াটির হস্তগত হইবে, কিন্তু বর্তমান সঙ্কট কাটাইয়া উঠিবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না। হরিহর বাবু ধনী না হইলেও এই টাকার দায়িত্ব লইতে সমর্থ, কিন্তু তাঁহার কাছেও বর্তমানে টাকা নাই। হরিহর বাবু আত্মীয়াটিকে বলিলেন, আমি নিজে তো এখন এত টাকা দিতে পারব না, তবে আমি জামিন হয়ে তোমার জন্য এই টাকা জোগাড় করতে পারি কি না, একবার চেষ্টা করে দেখি। তোমার গহনা বন্ধক দেবার আমার মোটেই ইচ্ছে নেই।

হরিহর বাবু প্রথমে গেলেন তাঁহার পরিচিত একটি জমিদার মহাশয়ের বাড়ী। তিনি মনোযোগ দিয়া সব শুনিয়া বলিলেন, টাকাটা তো তেমন বেশি কিছু নয়, তবে কি না মেয়েছেলের ব্যাপার, বড় গোলমেলে।

হরিহর বাবু বলিলেন, সে জন্য তো আমিই জামিন হচ্ছি। ছ'মাসের মধ্যেই আপনি টাকা নিশ্চয় ফেরত পাবেন।

তা তো বুঝলুম, কিন্তু মেয়েছেলের ব্যাপার কি না। দেখি, ম্যানেজার বাবু কি বলেন।

এই বলিয়া তিনি ম্যানেজার বাবুকে ডাকাইলেন এবং হরিহর বাবুকে একটু বাহিরের ঘরে বসিতে বলিয়া ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হরিহর বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন শুনেছি মেয়েটির গয়নাগাটি অনেক আছে। তা হাজার কুড়ি টাকার গহনা যদি বন্ধক রাখে, তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

সুষমার কাছে—মেয়েটির নাম সুষমা—তাহার গহনাগুলির মূল্য যে কতখানি, এবং তাহার মূল্য যে শুধু টাকার দ্বারা নির্ণীত হয় না, এ কথা আর কেহ না জানিলেও হরিহর বাবু জানিতেন। তিনি জমিদার বাবুকে বলিলেন, দেখুন, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার জামিনে টাকাটা দেন, তাহলেই খুব ভাল হয়।

জমিদার বাবুর সহিত আরো দুই-চারটি কথা হইবার পর হরিহর বাবু নিরাশ হইয়া সেথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

এর পর হরিহর বাবু তাঁহার বহু দিনের পরিচিত আর একটি বন্ধুর নিকট গেলেন। ইনি বিত্তশালী এবং ধার্মিক। পূজা, গঙ্গাস্নান, হরিনাম-কীর্তন প্রভৃতি লইয়াই সময় অতিবাহিত করেন। হরিহর বাবুর নিকট সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, ব্যাপার তো সবই বুঝছি, কিন্তু অতগুলো টাকা একটা মেয়েছেলেকে—

আমি তো জামিন হচ্ছি, আপনার কোন চিন্তা নেই।

তোমার সম্পর্কে অবশ্য আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই, কিন্তু—

আপনার ন্যায় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, মেয়েটির বিপদের কথা মনে করে যদি একটু বিবেচনা করে দেখেন তো খুব উপকার হয়। আপনার কাছে ও-ক'টা টাকা এমন আর বেশি কি? ধার্মিকতা, আপনার উদারতা কে না জানে? এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে মেয়েটি আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

তা তো বটেই, তা তো বটেই। কিন্তু—

আপনি আর বার বার কিন্তু-কিন্তু করবেন না। রাজি হোন, আমি রসিদের কাগজ-টাগজ নিয়ে আসি। আপনি যদি চান, তবে ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখে রেজিষ্ট্রীও করে নিতে পারেন।

সে তো হতেই পারে, সে তো হতেই পারে, কিন্তু—

হরিহর বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া ধার্মিক বন্ধুর ধর্মভাব বিকশিত করিয়া তাঁহার অন্তর্লোকে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার কিন্তুর নিরসন কিছুতেই হইল না। তিনি সর্বশেষে বলিলেন, সবই বুঝছি, আমার টাকাটা যে যথাসময়ে ফেরত পাব, সে সম্বন্ধে আমার মনে কোন সংশয় নেই, কিন্তু—

হরিহর বাবু, 'আচ্ছা, নমস্কার' বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

হরিহর বাবু বড়ই বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি সুষমাকে এক প্রকার কথা দিয়াছিলেন যে, ও-টাকাটা তিনি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন। তিনি অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহার পরিচিত একটি ধনী ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহেশ বাবুর সহিত হরিহর বাবুর পরিচয় বিশেষ ঘনিষ্ঠ নহে। তবে পরস্পরকে চেনেন এবং ব্যবসায়-সংক্রান্ত অনেকগুলি ব্যাপারে ইঁহারা একযোগে কাজ-কর্ম করিয়াছেন। এই ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি এত ধনী যে, নয় হাজার টাকা ইঁহার নিকট অতি তুচ্ছ। হরিহর বাবু ইঁহার নিকট সব কথা বলিলেন। তিনিও মনোযোগ দিয়া সব শুনিলেন। পরে বলিলেন, অবশ্য টাকাটা কিছুই নয়, সামান্য নয় হাজার টাকা। কিন্তু—

হরিহর বাবু মনে-মনে বলিলেন, আবার সেই কিন্তু।

মহেশ বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, দেখুন, এ টাকাটা দিতে পারলে খুবই খুসী হতুম। কিন্তু সম্প্রতি সাড়ে পঁচিশ লাখ টাকার কয়েকটা কনট্রাক্ট হাতে এসেছে। তাতেই আমাকে খুব বিব্রত হতে হচ্ছে। এ সময়ে আমার পক্ষে কাহাকেও টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।

হরিহর বাবু বলিলেন, এই সামান্য টাকা, তাও আপনি ছয় মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই পাবেন। এতে আপনার বড় বড় কন্ট্রাক্টের গায়ে একটুও আঁচড় পড়বে না। আমার এই বর্তমান বিপদ থেকে আপনি একটু উদ্ধার করুন।

আজ্ঞে, আমি খুবই দুঃখিত। আপনাকে এ বিষয়ে আমি কোন সাহায্য করতে পারলুম না।

হরিহর বাবু নমস্কার করিয়া সেখান হইতে বিদায় লইলেন।

সুষমা মাঝে-মাঝে খবর লইতেছে, হরিহর বাবু কিছু করিতে পারিলেন কি না। হরিহর বাবু কুণ্ঠিত ভাবে জানাইতেছেন, এখনও কিছু কিনারা করিতে পারেন নাই।

কোথায় কাহার নিকট যাওয়া যাইতে পারে, হরিহর বাবু শুধু এই চিন্তাই করিতেছেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল এই অঞ্চলের তিনকড়ির কথা! তিনকড়ি লোকটাকে সবাই বলে, লোকটা একেবারে বাজে, তবে মনটা ভাল। তিনকড়ি কি করে, এবং কি করে না, তৎসম্বন্ধে কাহারই মনে কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। সকলেই দেখে তিনকড়ি সর্বদাই খুব ব্যস্ত। আবার ভীষণ আড্ডাধারীও বটে। তাসের আড্ডা, গানের জলসা, নাচের আসর, সর্বত্রই তিনকড়ি। ধনী না হইলেও

আনন্দও আছে। হরিহর বাবু ভাবিলেন, তিনকড়িকে একবার কথাটা জানাইলে কেমন হয়। অত টাকা তাহার আদৌ আছে কি না এবং তাহা শুধু হরিহর বাবুর জামিনে ধার দিবে কি না, সে বিষয়ে হরিহর বাবুর মনে খুবই সন্দেহ। তবু অনন্যোপায় হইলে মানুষ অসম্ভবকেও সম্ভব মনে করে।

হরিহর বাবু গেলেন তিনকড়ির বাসায়। শুনিলেন, তিনকড়ি একটা নাচের জলসায় গিয়াছে। কখন ফিরিবে কেহ বলিতে পারে না। গরজ বড় বালাই। হরিহর বাবু ঠিকানা জানিয়া লইয়া সেই নাচের আসরে গিয়া তিনকড়ির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনকড়ি সব শুনিয়া হরিহর বাবুর সহিত বাহিরে আসিয়া একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। হরিহর বাবুকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর গেল এবং স্ত্রীকে বলিল, চেক-বইখানা দাও তো।

কেন, এখন চেক বই কি হবে?

দাও না, আমার কথা বলবার সময় নেই।

কেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

আবার দেরি করে! চেক-বইটা দাও, আর তুমি তৈরি হয়ে নাও। নাচটা বেশ জমেছে। তুমিও দেখে আসবে চল।

তিনকড়ির স্ত্রী চেক-বই আনিয়া দিয়া কাপড় পরিতে গেল।

তিনকড়ি বাহিরে আসিয়া হরিহর বাবুকে বলিল, ক্রস্‌ড্‌ চেক দেবো, না অমনি বেয়ারার চেক দেবো।

বেয়ারারই দাও।

এই নিন।

একটা রসিদ—

কি যে বলেন, আপনার কাছ থেকে আবার রসিদ! আপনি আমাকে না চিনলেও আমি আপনাকে চিনি।

সত্যিই তোমাকে চিনতুম না, তিনকড়ি।

তিনকড়ির স্ত্রী সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়া পড়িতেই হরিহর বাবু চেকখানি পকেটে করিয়া বিদায় লইলেন। তিনকড়ি সস্ত্রীক জলসা অভিমুখে যাত্রা করিল।

নির্দ্ধারিত দিনে হরিহর বাবু সুরমার নিকট হইতে টাকা লইয়া তিনকড়িকে দিয়া আসিয়াছেন। টাকা শোধ হইয়াছে। কিন্তু ঋণ শোধ হইয়াছে কি?

আর কে নারায়ণ

[ইংরেজী ভাষায় গল্প লিখে যে কয়জন ভারতীয় লেখক খ্যাতিলাভ করেছেন, আর কে নারায়ণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীযুক্ত নারায়ণ ভারত ছেড়ে ইংলণ্ডের দিকে কোন দিন পাড়ি না জমালেও সম্প্রতি তিনি ইংলণ্ডে বেশ প্রশংসা অর্জন করছেন।]

ঠিক দুপুরে সে তার থলিটি খুলে সাজ-সরঞ্জামগুলো বিছিয়ে বসলো। সরঞ্জাম যৎসামান্যই—ডজন খানেক কড়ি, এক টুকরো চৌকো কাপড়, তাতে দুর্বোধ্য রহস্যময় ছক আঁকা, একটি নোটবই আর এক গোছা পুঁথি। কপালে তার সিঁদুর আর পূত বিভূতির রেখা, চোখে তীক্ষ্ণ অস্বাভাবিক জ্যোতি। অবিরাম খরিদ্দার অন্বেষণের ফলেই দৃষ্টিতে এই অস্বাভাবিকত্ব দেখা দিয়েছে, কিন্তু খরিদ্দারদের ধারণা, এ মহাপুরুষের দৃষ্টি আর এই ধারণা নিয়ে তারা খুসীই হত। তিলক-চর্চিত কপালে আর মুখের দু'পাশে ঘন কালো গালপাট্টা—এর মাঝখান থেকে চোখ জোড়া যেন আরও দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। তার ওপর আবার মাথায় জাফরাণী রঙের পাগড়ী জড়ানো। রঙের এই খেলা কখনও ব্যর্থ হত না। মৌমাছি যেমন ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনি লোকে ছুটে আসতো তার কাছে। প্রকাণ্ড একটা তেঁতুল গাছের নীচে তার আস্তানা। পাশেই একটি সরু রাস্তা টাউন হল পার্কের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। বহু দিক থেকে জায়গাটির বৈশিষ্ট্য আছে। অজস্র লোক দিবারাত্রি এই সঙ্কীর্ণ পথটির ওপর দিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে চলাফেরা করে। পথটির দু'ধারে নানা জাতের ব্যবসায়ী দোকানে পসরা সাজিয়ে বসে আছে—ঔষধ-ব্যবসায়ী, লৌহ-ব্যবসায়ী ইত্যাদি। এক জায়গায় সস্তা কাপড়ের নীলাম [illegible] সারা দিন ভর বিকট কোলাহলে সারা সহর মুখরিত হয়ে থাকে। এদিক থেকে এর পরই নাম করতে হয় চীনাবাদামওয়ালাটির। সে তার পণ্যের নিত্য-নূতন গালভরা নাম দেয়। এক দিন হয়ত হাঁক পাড়ে 'বোম্বাই আইসক্রীম' বলে, কোন দিন বলে 'দিল্লীকা লাড্ডু', আবার কোন দিন বা হাঁকে 'রাজার খানা চাই বাবু'! লোকে ভীড় করে ঘিরে দাঁড়ায় তার চার ধারে।

জ্যোতিষীকে ঘিরেও এমনি ভীড় জমে। মিউনিসিপ্যালিটি এ অঞ্চলটিতে আলোর ব্যবস্থা করেনি, দোকানের আলোগুলো যেটুকু আঁধার দূর করতে পেরেছে মাত্র; ফলে জায়গাটি যেন একটু রহস্যময় হয়ে উঠেছে। দু'-একটি দোকানে গ্যাসের আলো সোঁ-সোঁ শব্দ করে চলেছে, কতকগুলো দোকানে পুরানো সাইকেলের আলো মিটমিট করছে, আবার জ্যোতিষীর মত আরও দু'-এক জন বিনা আলোতেই চালিয়ে দিচ্ছে। আলো-ছায়ার খেলায় এখানে বিহ্বলতা জাগে।

জ্যোতিষীর পক্ষে জায়গাটা বেশ জুতসই, কারণ জীবন-সংগ্রাম সুরু করার সময় জ্যোতিষী হওয়ার বাসনা তার আদৌ ছিল না। পরমুহূর্তে নিজের কি ঘটবে, এ বিষয়ে যেমন সে কিছু বলতে পারে না, অপরের ভবিষ্যৎও তেমনি তার কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তার নিরীহ মক্কেলরা যেমন গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়, তেমনি সে নিজেও এদের সঙ্গে পরিচিত নয়। তবুও সে যা বলে দিত, লোকে তাতে মুগ্ধ হত, বিস্মিত হত! এমন কিছু কঠিন নয়—একটু অভ্যাস, তীক্ষ্ণ নিরীক্ষণ-শক্তি আর অনুধাবন-ক্ষমতা চাই এর জন্যে। সে যা হোক, আর সব পেশার মত তারও এ সৎপথে উপার্জন; তাই দিনের শেষে যা দু'পয়সা সে বাড়ী নিয়ে যায়, সে তার রোজগার।

কোন কিছু চিন্তা না করেই সে গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। য় থাকতে হ'লে তাকে বাপ-পিতাম'র পেশাই আঁকড়ে থাকতে —চাষ করতে হত, ক্ষেত-খামার আর বাপ-পিতাম'র ভিটের া-শুনো করেই বুড়িয়ে যেতে হত।···কিন্তু তা হবার নয়। ই তাকে ভিটে ছাড়তে হয়েছিল, অথচ কেউ এ কথা ঘুণাক্ষরেও নতে পারেনি, আর কয়েক শ' মাইল দূরে সরে না গিয়ে সে শ্চিন্ত হতেও পারেনি।

মানুষের সুখ-দুঃখ তার নখদর্পণে: বিবাহ, অর্থযোগ, মামলা- বনের জটিলতা, সব নিয়েই তার কারবার। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের ল জ্যোতিষীর অনুভূতি-বৃত্তি শাণিত হয়ে উঠেছে। গোল খায় মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সে তা ধরে ফেলতো। প্রশ্ন- ত্তি তিনটি পয়সা তার প্রণামী; কিন্তু প্রশ্নকর্তা মিনিট দশেক র কথা না বললে সে নিজে মুখ খুলতোই না, কারণ এ থেকে নেকখানেক উত্তরের হদিস তার মিলে যেত। মক্কেলের দিকে কিয়ে যখন সে বলে যেত: 'আপনি যে ভাবে কাজ করে ছেন, তার পুরো ফল কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না', তখন র অধিকাংশ উক্তিগুলোই মিলে যেতো। হয়ত সে প্রশ্ন রে বসে: 'আচ্ছা, আপনার সংসারে কি এমন কোন স্ত্রীলোক ছেন, যিনি আপনাকে খুব প্রীতির চোখে দেখেন না? তিনি ান দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও হতে পারেন', অথবা সে চরিত্র শ্লেষণ করে: 'আপনার প্রকৃতির জন্যই আপনি যা-কিছু কষ্ট চ্ছেন। শনি যেখানে রয়েছে, তাতে অন্য রকম হবার জো ই। কি জানেন, প্রকৃতিটি আপনার অনুভূতিশীল, আবেগময়, থচ বাইরেটা আপনার রুক্ষ।' মক্কেলের অন্তর জয় করবার একেবারে মোক্ষম অস্ত্র, কারণ অতি শান্ত প্রকৃতির াককেও যদি বলা যায়, বাইরেটা তার খুব কঠোর, তাহলে সে ুসীই হবে।

বাদামওয়ালা তার আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বাড়ী যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। জ্যোতিষীর কাছে এটা পাততাড়ি গুটাবার সংকেত! বাদামওয়ালা চলে গেলে জ্যোতিষী একেবারে অন্ধকারে পড়ে যায়, শুধু কোথা থেকে সরু একফালি সবুজ আলো এসে পড়ে তার সামনে জমিটার ওপর। জ্যোতিষী তার কড়ি আর অন্য সাজ- সরঞ্জামগুলো থলির মধ্যে ভরতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে সবুজ আলোর ফালিটা কোথায় মুছে গেল। মুখ তুলে তাকালো জ্যোতিষী; তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক। ভাবলো কোন মক্কেলই হবে। "আপনাকে বড় চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে। আসুন না, আমার সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ গল্প করুন, তাতে ভালই হবে আপনার", বললো জ্যোতিষী। লোকটি বিরক্তির সঙ্গে অস্পষ্ট ভাবে কি বললে। জ্যোতিষী আবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। এবারে লোকটি তার হাতখানা জ্যোতিষীর নাকের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বললো: 'জ্যোতিষী বলে নিজের পরিচয় দাও?' জ্যোতিষীর গর্বে আঘাত লাগলো। লোকটির হাতখানা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে বললো: 'আপনার প্রকৃতি···'

—'আরে থামো, থামো,' লোকটি বাধা দিয়ে বলে, 'পারো জ্যোতিষী কষ্ট হয়। 'প্রশ্ন-প্রতি তিন পয়সা আমি নিয়ে থাকি। পয়সা যেমন দেবেন উত্তরও মিলবে তেমনি।'

আগন্তুক এবার ওর দিকে একটি আনি ছুঁড়ে দিয়ে বলে: 'গোটাকতক প্রশ্ন করবো। তোমার উত্তর মিথ্যে প্রমাণ হলে সুদ সমেত ঐ আনিটা ফেরৎ দিতে হবে।'

—'কিন্তু আমার উত্তর সত্যি হলে আমাকে পাঁচ টাকা দেবেন?'

—'না।'

—'আচ্ছা বেশ, আট আনা দেবেন?'

—'আচ্ছা রাজী, কিন্তু ভুল হ'লে তোমাকে দ্বিগুণ ফেরৎ দিতে হবে।' বলে আগন্তুক।

একটা চুরুট ধরালো আগন্তুক। দেশলাইয়ের আলোয় জ্যোতিষী একবার লোকটির মুখখানা দেখে নেয়। জনতার কোলাহলে আধ- অন্ধকার পার্কটা মুখরিত হয়ে ওঠে। লোকটি বসে বসে চুরুট টানতে থাকে। জ্যোতিষী কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে।

—'আপনার আনি ফিরিয়ে নিন···আজ আমার দেরী হয়ে গেছে···' বলে সে নিজের তল্পি বাঁধতে আরম্ভ করে।

আগন্তুক ওর হাতটা চেপে ধরে বলে: 'তা হবে না। এখন তুমি যেতে পারো না। তুমিই আমাকে ডেকে বসিয়েছো।'

জ্যোতিষী ওর হাতের মধ্যে কাঁপতে থাকে। ভগ্ন স্বরে বলে: 'আজ আমাকে ছেড়ে দিন, কাল বলবো।'

লোকটি বললো, 'তা হয় না।'

জ্যোতিষী শুষ্ক কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করে, 'আপনার সংসারে এমন কোন স্ত্রীলোক···'

—'থামো', ধমক দিয়ে ওঠে আগন্তুক, 'ও-সব কথা আমি শুনতে চাই না। বল দেখি যা খুঁজে বেড়াচ্ছি তাতে সফল হব কি না? না হলে তোমাকে যেতে দেবো না।'

জ্যোতিষী বিড়-বিড় করে কি বললো, তার পর উত্তর দিল, 'আচ্ছা বলছি। কিন্তু যা বলবো বিশ্বাসযোগ্য হলে একটা টাকা দিতে রাজী আছেন? না হলে আমি মুখ খুলছি না।'

কিছু সময় বাক্-বিতণ্ডার পর আগন্তুক রাজী হল।

—'একবার আপনি ছুরিকাহত হয়েছিলেন', জ্যোতিষী বললো। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে লোকটি নিজের বুকখানা খুলে ক্ষতচিহ্ন দেখালো।

জ্যোতিষী বলে চলে, 'তার পর কাছেই মাঠের মাঝখানে একটা কুয়োর মধ্যে আপনাকে ফেলে দেওয়া হয়। আততায়ী আপনাকে মৃত ভেবে চলে যায়।'

আগন্তুক এবার উৎসাহের আতিশয্যে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটি লোক সেই সময় কুয়োর মধ্যে উঁকি মেরে না দেখলে আমি মারা যেতাম বৈ কি।' মুষ্টি দৃঢ়-সংবদ্ধ আগন্তুক জিজ্ঞেস করে, 'কবে তার দেখা পাবো বল তো?'

—'পরলোকে,' জ্যোতিষী উত্তর দেয়, 'চার মাস আগে দূরে কোন এক সহরে তার মৃত্যু হয়। তার দেখা আর পাবেন না।'

একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল আগন্তুকের মুখ থেকে। জ্যোতিষী এবার আগন্তুককে নাম ধরে সম্বোধন করলো: 'গুরু নায়ক···'

—'তুমি আমার নাম জান!' আগন্তুক বললো। বিস্ময়ের

—'হ্যাঁ, যেমন অন্য সব কিছুই আমি জানি। শুনুন গুরু নায়ক, যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। এই সহর থেকে উত্তরে দু'দিনের পথ আপনার গ্রাম। পরের ট্রেণেই বাড়ী চলে যান। দেশের বাইরে গেলে আবার আর একবার আপনার জীবনে দারুণ বিপদ আছে দেখছি।' অল্প একটু ভস্ম নিয়ে লোকটিকে দিয়ে জ্যোতিষী বললো, 'এটা কপালে মেখে বাড়ী যান। দক্ষিণে যাবেন না কোন দিন, তাহলে আপনি শতায়ু হবেন।'

—'দেশের বাইরে যাবার কি দরকার আমার?' আগন্তুক কতকটা নিজের মনেই বলতে থাকে, 'মাঝে মাঝে কেবল সেই লোকটার খোঁজেই বেরোই। একবার যদি তার দেখা পেতাম গলা টিপে শেষ করতাম'—আফ্‌শোসের সঙ্গে আগন্তুক মাথা নাড়তে থাকে, 'আমার হাত থেকে পালালো। যাক, সমুচিত ভাবেই সে মরেছে।'

—'হ্যাঁ, একটা লরীর নীচে দেহটা তার গুঁড়ো হয়ে যায়', জ্যোতিষী বলে। শুনে আগন্তুক খুসী হয়।

জ্যোতিষী তার মালপত্র তুলে নিয়ে থলির মধ্যে ভরতে থাকে। স্থানটি ইতিমধ্যে নির্জন হয়ে গেছে। সবুজ আলোর ফালিটাও অদৃশ্য হয়েছে। চারি দিক নিঝুম অন্ধকার। জ্যোতিষীকে এক মুঠো পয়সা দিয়ে আগন্তুক রাতের আঁধারে মিশিয়ে গেল।

প্রায় মাঝরাতে জ্যোতিষী বাড়ী ফিরলো। তার বউ দরজায় দাঁড়িয়েছিল···কৈফিয়ৎ চাইলো। জ্যোতিষী পয়সাগুলো তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, 'গুণে দেখ। এক জনের কাছ থেকে পেয়েছি।'

—'সাড়ে বারো আনা', বউ গুণে বললো। ভারী খুসী হয়েছে ও। 'গুড় আর নারকেল কিনবো কাল। মেয়েটা ক'দিন থেকে মিষ্টির জন্যে আব্দার ধরেছে।'

—'ব্যাটা আমাকে ঠকিয়েছে। এক টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল', জ্যোতিষী বললো।

বউ ওর দিকে তাকালো, 'তোমাকে যেন বড় চিন্তিত মনে হচ্ছে। কি হয়েছে?'

—'কিছু না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর জ্যোতিষী স্ত্রীকে বললো, 'জান, আজ একটা ভারী বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেল। রক্তমাখা হাতে এ ক'বছর ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই জন্যেই তো বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে এখানে বাসা বেঁধেছিলাম।···যাক সে বেঁচে আছে।'

—'তুমি খুন করতে গিয়েছিলে!' জ্যোতিষীর বউ রুদ্ধশ্বাসে বলে।

—'হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ে। এক দিন মদ আর জুয়ায় ডুবে থেকে আমাদের দু'জনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধে···যাক, সে সব কথা আর এখন ভেবে লাভ কি? চল, রাত অনেক হল, ঘুমোই।' জ্যোতিষী দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দেয়।

অনুবাদক : শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্প-সামগ্রী

অ্যাণ্টন শেখভ্‌

খবরের কাগজে মোড়া কী একটা জিনিষ বগলে পুরে এক মায়ের এক ছেলে শাশা স্মির্ণভ সসংকোচে ডাক্তার কোশেলকভের অফিসে ঢোকে।

ডাক্তার সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন: "এই যে খোকা! আজ কেমন আছ? সুখবর কিছু আছে?"

শাশা চোখ পিট-পিট করে উঠলো—তার পর হাতটা ওর বুকের ওপর রেখে অপ্রতিভ ভাবে তোতলাতে থাকে; "আমার মা আপনাকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছেন······ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আমি মায়ের একমাত্র ছেলে আর আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। জানি না কেমন করে আপনাকে ধন্যবাদ দেব।"

আহ্লাদে গলে গিয়ে ডাক্তার বাধা দিয়ে ওঠেন: "হয়েছে—হয়েছে। ও-সব কথা আবার কেন? আমার জায়গায় অন্য এক জন ডাক্তার যা করতেন, আমিও ঠিক সেটুকুই করেছি।"

—"আমি মায়ের একমাত্র···আমরা গরীব লোক। আপনার কষ্টের ঋণ শোধ করি এমন অবস্থা আমাদের নয়।···তবু ব্যাপারটা আমাদের বড় পীড়া দিচ্ছে। ডাক্তার বাবু? মা আর তাঁর একমাত্র ছেলে আমি দু'জনেই আমাদের কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসাবে এই জিনিষটা গ্রহণ করতে আপনাকে অনুরোধ করছি···জিনিষটা দুর্মূল্য, সেকেলে ব্রোঞ্জের তৈরী এক অপরূপ সৃষ্টি।"

ডাক্তার মুখ বিকৃতি করলেন: "না ভাই। এ জিনিষে কোন দরকার নেই আমার।" শাশা তোতলিয়ে বলে: "না ন্‌-না-ন্‌ না—। দয়া করে নিন্‌ এটা···" মোড়কটা খুলতে খুলতে সে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো। "আপনি যদি এটা না নেন তবে আমি আর আমার মা দু'জনেই খুব আঘাত পাবো। এ এক দুর্লভ কারুশিল্প—সেকেলে ব্রোঞ্জের জিনিষ। বাবা মারা যাবার সময় এই স্মারক রেখে গেছেন। বহুমূল্য স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবেই আমরা এর দাম দেই। আমার বাবা পুরানো ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র কিনে ও-সব জিনিষ যারা ভালবাসে তাদের কাছে বিক্রী করতেন। উনি মারা যাবার পর আমি আর আমার মা এই কারবার চালাচ্ছি।"

মোড়কটা খুলে শাশা সোৎসাহে জিনিষটা টেবিলের ওপর রাখে। সেকেলে ব্রোঞ্জের নীচু এক বাতিদান—সত্যিকারের শিল্প-সামগ্রী···দেখা যাচ্ছে এক দল লোক। একটা বেদীর ওপর দু'জন স্ত্রীলোক ইভ্‌ মাতার পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। ···এমন ভঙ্গীতে তারা দাঁড়িয়ে আছে যা বর্ণনা করার মতো ঔদ্ধত্য বা মেজাজ আমার নেই। চটুল হাসি হেসে এই মূর্তিগুলো এমন ভাব দেখাচ্ছে যে মনে হয়, তারা যদি বাতিদানটা না ধরে রাখতো তবে তাদের বেদী থেকে ঝুঁকে পড়ে এমন কর্ম

করতো···পাঠক-পাঠিকা মাপ করবেন এমন চিন্তা করতেও আমি লজ্জা পাচ্ছি।

ডাক্তার উপহারটি দেখে মাথা চুলকোলেন। তার পর নাক ঝেড়ে গলা-খাঁকারী দিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেন,—"হ্যাঁ, সত্যিই খুব সুন্দর জিনিসটা। কিন্তু কী করে বলি···মানে এটা তো ঠিক প্রথা মত নয়···অর্থাৎ কি না···তুমি তো জানোই সব···"

—"কী রকম ?"

—"বেলজাবাস নিজেও এর চাইতে কুৎসিত কিছু কল্পনা করতে পারবেন না। এই রকমের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া জিনিষ যদি টেবিলে রাখি, তবে সমস্ত বাড়ীটাকে কলুষিত করা হবে।"

শাশা আহত হয়ে বলে: "ডাক্তার বাবু! শিল্প সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী অদ্ভুত! সত্যি সত্যি অনবদ্য সৃষ্টি এটা। চেয়ে দেখুন! এর সুসমঞ্জস সৌন্দর্য এমন যে, এর কথা ভাবলেও আনন্দে মন ভরে ওঠে—উথলে-ওঠা কান্না থামিয়ে দেয়। এ রকম সৌন্দর্য্য পার্থিব সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। দেখুন—দেখুন! কী প্রাণ-আবেগ—কী গতি-চাঞ্চল্য—কী অপূর্ব প্রকাশভংগী।

ডাক্তার বাধা দিয়ে বল্লেন: "আমি বুঝি সব। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমি বিবাহিত। ছোট ছেলেমেয়েরা এখানে যাওয়া-আসা করে ত। আর মহিলারা তো অনবরতই আসছেন।"

শাশা বলে: "অবশ্য ইতর লোকের চোখ দিয়ে দেখলে এই মহৎ সৃষ্টি একবারে অন্য আলোকে দেখা যায়। কিন্তু ডাক্তার বাবু! আপনি তো সে সবের উর্দ্ধে, বিশেষ করে আপনি এই উপহার প্রত্যাখ্যান করলে মা আর তাঁর একমাত্র ছেলে আমি দু'জনেই গভীর আঘাত পাবো। আপনি আমার জীবন দিয়েছেন তারই প্রতিদানে আমাদের সব চাইতে প্রিয় জিনিষ আপনাকে দিচ্ছি···দুঃখ রইলো এরই জোড়া বাতিদানটা আনতে পারলাম না।"

—"ধন্যবাদ বন্ধু! অনেক ধন্যবাদ। তোমার মাকে আমার কথা বোলো। কিন্তু ভগবানের দোহাই···আর তুমি তো নিজেই দেখতে পাচ্ছো···ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা এখানে আসা-যাওয়া করে···মেয়েরা সব সময়ই এখানে আসেন···যাক্ গে রেখে যাও। তোমার সংগে তর্কে পারবো না।"

শাশা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো: "আর কথাটি নয়। এইখানে ঠিক এই পাত্রের পাশে বাতিদানটা রাখুন। কিন্তু কী দুঃখের কথা বলুন তো। এরই জুড়ীটা আনতে পারলুম না। যাক, আর তো কিছু করার নেই। আচ্ছা ডাক্তার বাবু। এখন আসি। বিদায়!"

শাশা চলে গেলে ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে বাতিদানটার দিকে চেয়ে রইলেন···মাথা চুলকোতে লাগলেন। ভাবলেন: "সত্যি চমৎকার! জিনিষটা ফেলতে মায়া হয় অথচ রাখতেও সাহস করি না। হুঁ···পৃথিবীতে আর আমার কে আছে যাকে এটা উপহার পাঠাতে পারি বা দিয়ে দিতে পারি।"

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে এক জন লোককে ঠিক করলেন। তিনি ওঁর বন্ধু উকীল উখভ,—এঁর কাছে আইনের ব্যাপারে ডাক্তার ঋণী ছিলেন।

ডাক্তারের মন ভরলো। ভাবলেন: "বেশ হোলো। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আমি তো ওকে টাকা দিতে পারি না। এর বদলে তাই এই অশোভন জিনিষটা দেই।···এর যোগ্য লোকই হচ্ছে সে···অবিবাহিত মানুষ আর বেশ দিলখোলাও বটে।"

যেমন ভাবা তেমনি করা। কাপড়-চোপড় পরে বাতিদানটা নিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে পড়েন উখভের বাড়ীর দিকে।

—"সুপ্রভাত! তোমার কষ্টের জন্যে ধন্যবাদ দিতে এসেছি··· টাকা তো তুমি নেবে না। কাজে কাজেই এই অপরূপ শিল্প-সামগ্রী দিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করবো। এবার নিজেই বলো··· এটা কী স্বপ্নের মত সুন্দর নয়?"

উকীল ভদ্রলোক এর দিকে চোখ ফেরাতেই সৌন্দর্যে তাঁর চোখ ঝলসিয়ে যায়! তিনি উচ্চহাস্য করে উঠলেন: "ওহো কী, অপূর্ব সৃষ্টি! ওঃ ভগবান, শিল্পীরা কী ভাবই না পারে! কী মনোরম শ্রী! এটা তুমি পেলে কোথায়?"

কিন্তু একটু পরেই তাঁর উচ্ছ্বাস মিলিয়ে গেল। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চুপিসাড়ে দোরের দিকে দেখে নিয়ে বলেন: "কিন্তু আমি তো এটা নিতে পারবো না। তুমি এ এখনই ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

সভয়ে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন: "কেন?"

—"কারণ···কারণ···মা প্রায়ই এখানে আসেন। মক্কেলরাও আছেন···এ ছাড়া এটা থাকলে চাকর-বাকরদের চোখেও আমি ছোটো হয়ে যাবো।"

ডাক্তার অংগভংগী করে বিকট চীৎকার করে উঠলেন: "কোন কথা আর শুনছি না। সিধে কথা, তোমাকে এটা নিতে হবে। এ রকম অপূর্ব শিল্প! কী গতিবেগ! কী তার ভাব··· যদি এটা না নাও তবে খুবই আঘাত পাবো।"

—"[illegible]। নিতাম, যদি কোন-কিছু দিয়ে এটা ঢাকা দেওয়া যেত।"

কিন্তু ডাক্তার ওঁর কথা আর শুনতে রাজী হন না। বিকটতর অংগভংগী করে তিনি উখভের বাড়ী থেকে ছুটে বার হয়ে গেলেন। ভাবলেন, জিনিষটার হাত থেকে এবার মুক্তি পেলেন।

ডাক্তার চলে গেলে, উকীল বাবু সযত্নে জিনিষটা পরীক্ষা করলেন। তার পর ডাক্তারের মত তিনিও ভাবতে লাগলেন: এটা নিয়ে কী করা যায়।

—"এমন চমৎকার জিনিষটা ফেলে দিলেও মনে লাগে কিন্তু রাখাও হচ্ছে অসম্মানজনক। তার চাইতে কারুকে উপহার দেওয়া যাক্···ঠিক! এ-ই করতে হবে। আজ-ই সন্ধ্যে বেলা শাশকিনকে দিয়ে আসবো। বোকাটা এ সব জিনিষ ভালোবাসে। তা ছাড়া তার নাটকের এখন অভিনয় চলছে।"

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সেদিন বিকেলে বাতিদানটা ভালো করে মোড়া অবস্থায় কমেডিয়ান শাশকিনের কাছে এলো।

সারাটা সন্ধ্যে ধরে কমেডিয়ান শাশকিনের ড্রেসিং-রুম লোকে ভরা···সবাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উপহারটা দেখতে এসেছে···আর সর্বক্ষণ ঘোড়ার ডাকের মত অট্টহাস্যে ঘরটি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। অভিনেত্রীদের মধ্যে কেউ যদি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে: "ঢুকতে পারি?" অমনি শাশকিনের কর্কশ গলা শোনা যায়—"না, না। ঢুকবেন না। এখনও আমার কাপড়-পরা হয়নি।"

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে, কমেডিয়ান কাঁধ-ঝাঁকুনী দিয়ে হাত

নাড়া-চাড়া করেন। তার পর বলেন: "এখন এ জিনিষটাকে নিয়ে কী করা যায়? আমি নিজের আলাদা ঘরে থাকি। অভিনেত্রীরা প্রায়ই সে ঘরে আসেন। আর জিনিষটা একটা ফটোগ্রাফও নয় যে ড্রয়ারে লুকোনো যায়।"

পরচুলা বসায় যে লোকটি সে বলে: "বিক্রী করে দিন না। স্মির্ণভা বলে এক বুড়ী পুরোনো ব্রোঞ্জের জিনিষ কেনে। ওর কাছে সোজা চলে যান। সবাই তাকে জানে···বললেই দেখিয়ে দেবে।"

কমেডিয়ান ওর পরামর্শ শুনলেন।

দু'দিন বাদে কোশেলকভ হাতে মাথা ভর দিয়ে নিজের অফিসে বসে ওষুধের পিল তৈরী করছিলেন। হঠাৎ দোর খুলে গেল। শাশা ছুটে ঘরে ঢোকে···মুখে তার উজ্জ্বল হাসি··আনন্দে ওর বুক ফুলে উঠেছে···কাগজে-মোড়া কী একটা জিনিষ সে হাতে করে নিয়ে এসেছে।

দম বন্ধ হওয়া উচ্ছ্বাসে ও চেঁচিয়ে ওঠে: "ডাক্তার বাবু! দেখুন—দেখুন, কী আনন্দ! ভাগ্যবলে আপনার বাতিদানটার জোড়া পেয়ে গেছি। মা এতো খুশী হয়েছেন কী বলবো! মায়ের একমাত্র ছেলে আমি···আর আপনি আমায় প্রাণ দিয়েছেন।"

শাশা কৃতজ্ঞতার আবেগে কাঁপতে কাঁপতে ডাক্তারের সামনে একটি বাতিদান নামিয়ে রাখে। আর ডাক্তার বাবু কিছু বলবার জন্যেই যেন ঠোঁট দুটো ফাঁক করেন···কিন্তু একটা শব্দও মুখ দিয়ে বেরোয় না···কথা বলার শক্তি ওঁর চলে গেছে।

অনুবাদক—অংশু দত্ত।

সম্মোহন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(সংক্ষিপ্ত চিত্রকাহিনী)

হৃষীকেশ হালদার

অন্ধকার আর অন্ধকার! পুঞ্জীভূত অন্ধকার। সেই অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে দু'টি ছায়ামূর্ত্তি—আগের ছায়ামূর্ত্তিটিকে তাড়া করে পিছনের ছায়ামূর্ত্তিটি ছুটে আসছে একটা অমানুষিক গর্জ্জনের সঙ্গে। ব্যবধান তাদের ক্রমেই কমে আসছে······! এমন সময় হঠাৎ পথের ধারে একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রথম ছায়ামূর্ত্তিটি—পিছনের ছায়ামূর্ত্তিটি গলির মুখে এসে এক মুহূর্ত্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায়।

তাদের আরো পিছনে ছুটে আসতে দেখা যায় আর দু'টি ছায়ামূর্ত্তিকে। তারা বিভাস আর দেবব্রত। গলির মোড়ে এসে দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তিটি যখন থমকে দাঁড়ালো—তারা তখন তার অনেক কাছে এসে পড়েছে।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তিটি এবার গলির মধ্যে প্রবেশ করলো—গতি তার মন্থর, লম্বা লম্বা পা দু'খানা টেনে টেনে সে চলেছে প্রথম ছায়ামূর্ত্তিটির সন্ধানে। গলির ভিতর একটা ঝোপের মধ্য থেকে একটা মাথা বেরিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছিলো পথের দিকে। দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তিটিকে গলির মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেই মাথাটি ঝোপের মধ্যে অন্তর্হিত হলো।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তিটি ঝোপটা অতিক্রম করে এগিয়ে চললো—ক্রমে ক্রমে তার মূর্ত্তি মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে। দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তিটি ঝোপ অতিক্রম করে চলে যেতেই প্রথম ছায়ামূর্ত্তিটি নিঃশব্দে ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে একবার তার অনুসরণকারীর গমন-পথের দিকে ফিরে চাইলো—তার পর নিঃশব্দে, ত্রস্তপদে যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে চলতে সুরু করলো।

বিভাস আর দেবব্রত গলির মধ্যে এসে পড়েছিলো। ঠিক গলির মুখে দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তিটির সঙ্গে হলো তাদের মুখোমুখি দেখা। বিভাস তার মুখের ওপর টর্চের আলো ফেললো। মুহূর্ত্তের জন্যে বিস্ময় হতবাক্ হয়ে গেলো বিভাস আর দেবব্রত। গুম্ফশ্মশ্রু-মুণ্ডিত একখানি শান্ত সৌম্য প্রৌঢ়ের মুখ—কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে নিদারুণ উৎকণ্ঠা!

বিভাস বলে উঠলো: কে, কে আপনি?

দেবব্রত বলে উঠলো: চৌধুরী মশাই! কী আশ্চর্য্য! আপনি তা'হলে বেঁচে আছেন? তবে আপনার বাগান-বাড়ীতে খুন হয়েছিলো কে? আর আপনিই বা এখানে এলেন কোথা থেকে?

চৌধুরী মশাই কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পিছনে অদূরে শোনা গেলো ভারী পদশব্দ আর গর্জ্জন-ধ্বনি। প্রথম ছায়ামূর্ত্তিটা আবার এদিকেই ফিরে আসছে! চৌধুরী মশাই ভীত কণ্ঠে বললেন: সব কথা পরে শুনো দেবব্রত! এখন আর কোন কথা নয়। তাড়াতাড়ি এখান থেকে না পালালে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে!

তিনি বিভাস আর দেবব্রতর হাত ধরে টেনে নিয়ে পালাবার উদ্যোগ করলেন! কিন্তু বিভাস বা দেবব্রত—কেউই তাঁর এই ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিলে না।

দেবব্রত দৃঢ় কণ্ঠে বললে: টর্চটা জ্বালো বিভাস। লোকটার স্বরূপ আমরা দেখতে চাই।

দীর্ঘ ছায়ামূর্ত্তি তখন গর্জ্জন করতে করতে এসে পড়েছে একেবারে ওদের সামনে। বিভাসের টর্চের আলো সহসা প্রতিফলিত হলো তার জলজ্বলে দু'টো চোখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে একটা মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদ······আকাশ-বাতাস যেন সেই আর্ত্তনাদে কেঁপে উঠলো! ছায়ামূর্ত্তিটি দু'হাতে চোখ-মুখ চাপা দিয়ে সামনের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো। চৌধুরী মশাই তার গতিরোধ করতে গিয়ে ধূল্যবলুণ্ঠিত হলেন।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেলো মাত্র দু'একটি মুহূর্ত্তের মধ্যেই। এত দ্রুত ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটলো যে বিভাস বা দেবব্রত, কেউই ভালো করে দেখতে পারলো না চৌধুরী মশায়ের আক্রমণকারীর মুখ। দেবব্রত আততায়ীর মূর্ত্তির অনুসরণ করতে যাচ্ছিলো—কিন্তু চৌধুরী মশাই ততক্ষণে ধূলিশয্যা থেকে উঠে পড়েছেন। দেবব্রতর হাত দুটি ধরে অনুনয়ভরা স্বরে তিনি বললেন: আমার কথা শোনো দেবব্রত, তোমরা ওকে অনুসরণ কোরো না। আমাদের আক্রমণকারীকে আমি চিনতে পেরেছি—যে-কোন মুহূর্ত্তে, যখন ইচ্ছা আমরা তাকে হাতের কাছে পেতে পারি। কিন্তু এখন, এই গভীর রাতে নয়। সবার আগে আমার সব কথা তোমাদের শোনা দরকার। আমাকেও একটু বিবেচনা করতে হবে, অতঃপর আমি কি করবো, আমার কি করা উচিত। তোমরা বাড়ী ফিরে চলো!

আকুল আগ্রহে মলয়া বৈঠকখানা ঘরে বসে প্রতীক্ষা করছিলো বিভাস আর দেবব্রতর। অনেকক্ষণ হয়ে গেলো, ওরা ফিরছে না কেন? তবে কি ওরা কোন বিপদে পড়লো? তবে কি ওদের প্রাণনাশের হলো?······কি হবে তাহলে মলয়ার? দুনিয়ায় এক বিভাস ছাড়া আর কেউ যে তার নেই? আর দেবব্রত? তরুণ মনে তার যে রং ধরালো প্রথম, তাকে হারালে সে কি করে বাঁচবে? কি হবে তার এই অভিশপ্ত সম্পদে? তার চেয়ে যে তার সেই গ্রাম্য-জীবন ছিলো অনেক ভালো! সে জীবনে ছিলো কঠোর দারিদ্র্য, বেঁচে থাকবার জন্যে তীব্র সংগ্রাম, কিন্তু সেখানে ছিলো না এমন প্রতি পদে পদে বীভৎস মৃত্যুর আশঙ্কা, এমন শ্বাসরোধকারী রহস্যময় পরিস্থিতি। এই ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে কি ফিরিয়ে পাওয়া যায় না সেদিনের সেই নিরুদ্বেগ সহজ সরল জীবন?

গোবিন্দও ঘর বার করে পায়চারী করছে দেবব্রতর জন্যে। কোথাও একটু সামান্য শব্দ হলেই সে ছুটে যায় দরজার দিকে, ভাবে—ওরা বুঝি ফিরে এলো। এমনি ভাবে বহুক্ষণ পরে এক সময় তাদের প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটলো। ফিরে এলো বিভাস আর দেবব্রত। সঙ্গে তাদের চৌধুরী মশাই। মলয়া আকুল আবেগে ছুটে গিয়ে বললে: দাদা, দেবব্র····

গোবিন্দ সানন্দে চীৎকার করে উঠে: দাদাবাবু! এমন সময় মলয়ার লক্ষ্য পড়ে সবার পিছনে কুণ্ঠিতভাবে দণ্ডায়মান চৌধুরী মশাইয়ের দিকে। মলয়া একটু ইতস্ততঃ করে বলে: ইনি আবার কে? আমাদের বাগানের নতুন মালীটা বোধ হয়···

দেবব্রত একটু কৌতুকভরে বলে: আঃ! কি যে বলো মলয়া, ইনিই তোমাদের মামা অতুল চৌধুরী—আমাদের চৌধুরী মশাই!

দেবব্রতর কথা শুনে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো মলয়ার ডাগর কালো চোখ দুটি। গোবিন্দ কিন্তু সভয়ে মলয়ার আঁচল ধরে তার পিছনে আত্মগোপন করলো। এতগুলো লোকের উপস্থিতিতেও সে মনে কোন ভরসা পায় না! যে মানুষ খুন হয়ে গেছে, তার প্রত্যাবর্ত্তন সে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারে না। এ সব অপদেবতার মায়া নয় তো! অস্ফুট স্বরে সে বলে উঠে: দোহাই চৌধুরী মশাই, ফিরে যাও বাপু, তোমার গয়ায় পিণ্ডি দেবো!

—হতভাগা! ধমকে উঠে দেবব্রত গোবিন্দকে। তার পর চৌধুরী মশাইকে লক্ষ্য করে বলে: আসুন, এইবার আপনার ইতিহাস শোনা যাক। তার পর যা সুবিবেচনা হয়, করা যাবে।

চৌধুরী মশাই একটা সোফায় উপবেশন করেন তাঁর আশ-পাশ ঘিরে বসে পড়ে বিভাস, মলয়া আর দেবব্রত। চৌধুরী মশাই তাঁর কাহিনী সুরু করেন:

—সংসারে আপনার বলতে শুধু এক ছোট বোন, আর এক খুড়-তুতো ভাই চিরঞ্জীব। ছোট বোন সরলাকে আমি ভালবাসতাম প্রাণের চেয়ে, তাই যখন তার বিয়ে হলো এক সুন্দর সচ্চরিত্র গরীবের ছেলের সঙ্গে, তখন আমি তাকে প্রচুর টাকা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই আমার কোন রকম সাহায্য নিতে রাজী হলো না। তার স্বামী সুরঞ্জনও ছিলো তেমনি একগুঁয়ে মানুষ। কারো দয়ার দান নিতে সে রাজী নয়! বললে: নিজের স্ত্রীকে যদি ভরণ-পোষণ নাই করতে পারলাম, তবে জীবনই বৃথা! দিল্লীতে একটা চাকরী নিয়ে সরলাকে সঙ্গে করে সে চলে গেলো বিদেশে। বাড়ীটা একেবারে খালি হয়ে গেলো। এত বড় বাড়ীতে আর মন বসছিলো না। চিরঞ্জীব—আমার চাকর বল, মালী বল, সব কিছু ছিলো সেই—তাকে বললুম: চল, দিন কতক বিদেশে ঘুরে আসি। বেড়াতে বেড়াতে সোজা গিয়ে হাজির হলাম বৃন্দাবনে!

চিরঞ্জীবের নিজেরও টাকাকড়ি কম ছিলো না। কিন্তু রেস খেলার নেশায় সব খুইয়ে সে হঠাৎ এক দিন নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলো। তার আর কোন খোঁজই আমরা পাইনি। বৃন্দাবনে এসে দেখলাম, সে মস্ত এক সাধু বনে গেছে। মুখে লম্বা-লম্বা দাড়ি-গোঁফ, মাথায় জটা। প্রথমটা তো চিনতেই পারিনি। তার পর চিনতে পেরে প্রশ্ন করলুম: কি ব্যাপার রে? খাসা সাধু বনে গেছিস্ দেখছি!

সে বললে: কি করি দাদা! পেটের দায়ে। কোন কাজকর্ম্ম তো শিখিনি, সম্পত্তি যা ছিলো তাও ফুঁকে দিয়েছি, এখন চলে কি করে? ভেক নইলে আজকাল ভিক্ষেও যে কেউ দেয় না!

বললুম: ফিরে চল্ আমার সাথে। আমি একা থাকি, তোর কোন কষ্ট হবে না সেখানে। আমিও অন্ততঃ দু'দণ্ড কথা বলবার মতো একটা সঙ্গী পাবো।

সে তখনি রাজী হয়ে গেলো। বৃন্দাবন থেকে সোজা চলে এলো কলকাতায় আমারই সঙ্গে। জীবনে এই একটা ভুল—মহা ভুল আমি করেছিলাম—যার ফলে আমার জীবনটাই বিষিয়ে উঠলো। চিরঞ্জীবই। হতভাগা যে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার পর সম্মোহন বিদ্যার চর্চ্চা করেছে, এ কথা কে জানতো বলো! এখানে আসার পরই সে তার ঐ বিদ্যের অপপ্রয়োগ আরম্ভ করলে আমার ওপর। আমায় সম্মোহিত করে সে তিলে তিলে আমার অর্থ শোষণ করতে শুরু করলো। আমারই টাকায় সে গড়ে তুললে নিজের বাড়ী, কিনলে গাড়ী। আবার শুরু করলে রেস খেলতে আর নিজের বদখেয়াল চরিতার্থ করতে। যখনি আমার সামনে থেকে সে চলে যায়, তখনি আমার সম্বিৎ ফিরে আসে। ভাবি আর তাকে আমার সামনে আসতে দেবো না। কিন্তু যখনি সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তখনি আমি যেন কেমন হয়ে যাই। তার সব আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করি। আর একটা কথাও বেশ ভালো করেই বুঝতে

পারলুম—হতভাগা সরলাকে রীতিমত শত্রু বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে। আমার অবর্তমানে সরলাই সব সম্পত্তি পাবে। আমাকে দিয়ে সব কিছু সে লিখিয়ে নিয়েছে, আর উপায় নেই, সব স্থাবর সম্পত্তিই দেবত্র করা। সুতরাং পাছে সে সরলার কোন ক্ষতি করে, এই ভয়ে আমি সরলাকে চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ করে দিলাম। তাদের চিঠির কোন উত্তর তো দিতামই না, এমন কি, সুরঞ্জন যখন ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে আমার সঙ্গে দেখা করতে দিল্লী থেকে ছুটে এলো বেহালায়, তখন তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলাম না। চিরঞ্জীব এতে খুশীই হলো। সে মনে করলে, আমি বোধ হয় কোন কারণে সরলার উপর খুব বিরক্ত হয়েছি, যাতে করে তার সঙ্গে সব সম্পর্কই শেষ হয়ে গেছে। এতে আমি ব্যথা পেয়েছি যথেষ্ট, কিন্তু মনে মনে সান্ত্বনাও পেয়েছি কম নয়,—চিরঞ্জীব অন্ততঃ সরলার কোন অনিষ্ট করবে না।

মলয়া চৌধুরী মশায়ের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলো: পুলিশের কোন সাহায্য নেননি কেন মামা?

—প্রমাণ যে কিছুই ছিলো না মা! করুণ স্বরে বল্লেন চৌধুরী মশাই: আইন-আদালতে প্রমাণ ছাড়া কথা গ্রাহ্য হয় না। আমি নালিশ করলে কেউ এ সব কথার এতটুকুও দাম দিতো না!

চৌধুরী মশাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরব হলেন। বিভাস বললো: তার পর কি হলো মামা?

—তার পর? চৌধুরী মশাই বললেন: তার পর যখন তার শোষণ আর অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠলো, তখন তার হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে লাগলাম। আমার এক জন মাত্র বন্ধু ছিলো এ অঞ্চলে, অকৃত্রিম বন্ধু। সে হলো ডাক্তার সেন। তাকে সব কথা খুলে বললাম। প্রথমে সে আমার কোন কথাই বিশ্বাস করতে চায়নি, ভাবলে বুঝি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার পর যখন তাকে আমার ব্যাঙ্কের খাতা দেখালাম, দেখালাম যে দীর্ঘ কয় বছর ধরে সে কেমন করে জোঁকের মত আমাকে শোষণ করে চলেছে, তখন ডাক্তারের বোধ হয় বিশ্বাস হলো। ডাক্তার আমাকে উপদেশ দিলে তার বাড়ীতে বাস করবার। ডাক্তারের উপদেশ মেনে নিয়ে তার বাড়ীতেই রয়ে গেলাম কয়েক দিন।

—আমার বাড়ীতে আমার কোন খোঁজ না পেয়ে চিরঞ্জীব ছুটলো ডাক্তারের বাড়ী। প্রথম প্রথম ডাক্তার তাকে দরজা থেকেই দিলে তাড়িয়ে। তবু তার লজ্জা নেই। সে বার বার ডাক্তারের কাছে আবেদন করতে লাগলো একবার আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। ডাক্তার সে কথায় কান দিলে না।

—যত বার চিরঞ্জীব ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে গেছে, আমার বোধ হয় তত বারই সে সম্মোহিত করবার চেষ্টা করেছে ডাক্তারকে। কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি আমার চেয়ে প্রবল, তার মানসিক গঠন আমার চেয়ে দৃঢ়। তাই বোধ হয় প্রথম প্রথম সুবিধা করতে পারেনি চিরঞ্জীব। কিন্তু শীগগিরই লক্ষ্য করলাম, ধীরে ধীরে ডাক্তার কেমন হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নিজের মনে বিড়-বিড় করে বকে, মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হাত দু'টো কোন অদৃশ্য শত্রুকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে থাকে আর বলে: না, না, শয়তান, তোর এত শক্তি নেই যে আমাকে সম্মোহিত করবি। আমাকে করবি তোর দাস। হাঃ হাঃ হাঃ···

—ভয় হয়ে গেলো আমার। এ কি করছি আমি? ডাক্তারের স্ত্রী আছে, সংসার আছে। আমার জন্যে চিরঞ্জীব কেন ধ্বংস করবে তাকে? এমন ভাবে তাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেবার কি অধিকার আছে আমার? ডাক্তারের বাধা সত্ত্বেও আবার চলে এলাম নিজের বাড়ীতে, আবার চললো তার নির্মম শোষণ।

—কিছু দিন পরেই শুনি ডাক্তার আর বাড়ী থেকে সন্ধ্যার পর বেরোয় না রাত্রির ডাক পেলেও। ব্যাপার কি? এক দিন জিজ্ঞাসা করলাম তাকে। সে হেসে উত্তর দিলে: সে নাকি নিজে এই সময়ে হিপনোটিজমের চর্চা করছে। লোকের কাঁধ থেকে সম্মোহনের ভূত নামাতে হলে, নিজেকেও তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে সম্মোহন বিদ্যাটা জানা থাকা দরকার।

—তার পর এক দিন আমার বাড়ীতে গভীর রাত্রে কে এসে হরভজনকে খুন করে গেলো। তাকে গলা টিপে মেরে তার পর তার মুখ এমন ভাবে থেঁতলে দিয়ে গেলো খুনী, যাতে লাশ সনাক্ত করার আর কোন উপায়ই ছিলো না। বেচারা গরীব হরভজন! তাকে মেরে কার কি লাভ হবে? হয়তো আমাকে মারতে এসে চিরঞ্জীব ওকেই ভুল করে মেরে রেখে গেছে। আমি বেঁচে থাকতে এক সঙ্গে সব সম্পত্তি গ্রাস করবার সুবিধা হচ্ছিলো না তার। উচ্চতায় আর দৈহিক গঠনে আমার আর হরভজনের সাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট, প্রায় এক রকম। মুখখানা যে রকম বীভৎস হয়ে গেছে, তাতে কারু পক্ষে তা সনাক্ত করার কোন উপায় নেই যখন, তখন হরভজনকে আমার বলেই চালিয়ে দেওয়াই ঠিক করলাম। নইলে প্রমাণ অভাবে পুলিশ আমাকেই হত্যাকারী বলে মনে করবে। আর, যদি বা পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পাই, চিরঞ্জীব যখন জানতে পারবে আমি মরিনি, মরেছে হরভজন, তখন নিশ্চয়ই আবার সে আমাকে খুন করবার চেষ্টা করতে পারে। অগত্যা আমার জামা-কাপড় তাকে পরিয়ে, তার জামা-কাপড় নিজে পরে, আমার বিছানায় তাকে শুইয়ে, ঘরের জিনিষপত্র ফেলে ছড়িয়ে বিশৃঙ্খল করে সরে পড়লাম। পুলিশ তদন্তে সাব্যস্ত হলো, আমিই খুন হয়েছি। হরভজন আমাকে খুন করে সরে পড়েছে।

—সরলাকে কোন চিঠিপত্র না লিখলেও গোপনে তার সব খবরই রাখতাম। সুরঞ্জনের মৃত্যু আমার বুকে শেলের মতো বিঁধেছিলো, সরলা অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছে শুনে এক একবার আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে পর্যন্ত জাগতো আমার মনে। কিন্তু তবু কোন সাহায্য করবার ভরসা পাইনি। পাছে সেই সূত্র ধরে হতভাগা চিরঞ্জীব সরলার সন্ধান পায়। তার পর সরলাও মারা গেলো। আগেই এটর্নী দত্তকে দিয়ে একখানা উইল করিয়ে রেখেছিলাম, যাতে অন্ততঃ আমার অবশিষ্ট সম্পত্তিটুকু বিভাস আর মলয়াই পায়। আমি মারা গেছি মনে করে এটর্নী দত্ত ওদের টেলিগ্রাম করে আনালেন। কিন্তু আমি পৈতৃক ভিটের মায়া ছাড়তে পারলাম না। তাছাড়া হতভাগা চিরঞ্জীব যাতে বিভাস আর মলয়ার কোন অনিষ্ট করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও দরকার। কাজেই মালী হয়ে চাকরীতে চুকলাম এখানে!

—আজ রাত্রে যা ঘটলো তোমরা সবই দেখেছো। কিন্তু আততায়ীকে চিনতে পেরেছো কি না জানি না। আমি কিন্তু চিনতে

পেরেছি, আর চিনতে পেরে অবাক্ হয়ে গেছি। এখনো বুঝে উঠতে পারছি না, এর পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে!

—কে, কে সেই হতভাগা? বিভাস প্রশ্ন করলো। চিরঞ্জীব?

—না। চৌধুরী মশাই ম্লান হাসির সঙ্গে বললেন: সে এমন এক জন লোক, যে ছিলো এত দিন সব সন্দেহের অতীত।

—তার নাম বলুন মামা, বিভাস ব্যগ্র কণ্ঠে বললে: সেই শয়তানের মুখোস খুলে দিয়ে আমরা তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করি।

চৌধুরী মশাই কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো ক্রিং-ক্রিং করে। এত রাত্রে ফোন করে কে?

বিস্মিত ভাবে মলয়া রিসিভারটা তুলে নিল।

—কে, ডাক্তার সেন? হ্যাঁ, আমি মলয়া। মলয়া উত্তর দেয়: কি বলছেন, ফোনটা দাদার হাতে দেবো? আচ্ছা···

মলয়া রিসিভারটা বিভাসের হাতে দেয়। বিভাস ফোন ধরে: হ্যাঁ, আমি বিভাস। কি সর্ব্বনাশ, কি সব যা-তা বলছেন?

ফোনের ওধারে শোনা যায় দৃঢ় কণ্ঠ: হ্যাঁ বিভাস! আমি বিষ পান করেছি! তীব্র বিষ! বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হতে আরো কিছুক্ষণ দেরী আছে! তুমি দেবব্রতকে আর মলয়া মাকে সঙ্গে নিয়ে শীগ্‌গির এখানে এসো। চৌধুরী মশাইকেও দয়া করে এখানে আসতে বলবে। পৃথিবীর সঙ্গে সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে দেবার আগে আমি শেষ বার তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আর দেরী নয়, শীগ্‌গির! আমি পুলিস আর ম্যাজিষ্ট্রেটকেও ফোন করেছি আমার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী নেবার জন্যে।

সকলে উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি ডাক্তার সেনের বাড়ী যাবার জন্তে।

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে দেবব্রত বলে: আমাদের আততায়ীর নাম কিন্তু এখনো জানতে পারিনি চৌধুরী মশাই!

—তোমার প্রশ্নের উত্তর এখনি পাবে দেবব্রত, চৌধুরী মশাই বলেন: আগে ডাক্তার সেনের বাড়ীতে চলো।

ডাক্তার সেনের বাড়ী। তাঁর শোবার ঘর। ম্যাজিষ্ট্রেট আর পুলিস ইন্সপেক্টর ঘরের এক কোণে বসে। বিছানায় শুয়ে আছেন ডাক্তার সেন। এক কোণে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন ডাক্তারের স্ত্রী অপর্ণা।

ডাক্তার সেন সান্ত্বনার স্বরে বললেন: কেঁদো না, কেঁদো না অপর্ণা! আমার জন্তে মিথ্যে শোক করে লাভ নেই। আর এ দ্বৈত-জীবন বইতে পারছি না। শান্তি চাই, শান্তি! আর সে শান্তি মৃত্যু ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না। উঃ, বড় যন্ত্রণা, বিষের ক্রিয়া সুরু হয়ে গেছে, হা-হা-হা—বড় যন্ত্রণা······

ডাক্তার সেন উপেক্ষার হাসি হাসতে গিয়ে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করেন। একটু নীরব থেকে আবার বলেন: কিন্তু ওরা যে এখনো এলো না। বিভাস, দেবব্রত, মলয়া আর চৌধুরী মশাই। আর তো দেরী করা চলে না। সময় যে বড় সংক্ষেপ। আপনারা লিখতে সুরু করুন। আমি ডাক্তার পরেশ সেন, এম-ডি, কৃতবিদ্য চিকিৎসক, কত খ্যাতি, কত সম্মান, কত প্রতিপত্তি······ হা-হা-হা······কিন্তু—কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি একজন ক্রিমিন্যাল, সমাজের এক দুষ্ট ক্ষত! হ্যাঁ, আমি খুনী, আমি পিশাচ, আমি······

—কি বলছো তুমি···আর্ত্ত স্বরে চীৎকার করে উঠলেন অপর্ণা দেবী।

বাধা দিয়ো না অপর্ণা! আমাকে সব কথা খুলে বলতে দাও। ডাক্তার সেন যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বলেন: আর একটু পরেই আমার কণ্ঠ নীরব হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের এমন এক শত্রু নিষ্কণ্টক হয়ে উঠবে, যার ধরা-ছোঁয়া আর কেউ কোন দিন পাবে না। আমি যদি আজ সব কথা না বলে যাই, তাহলে আমার মতো, চৌধুরীর মতো আরো অনেকের সর্ব্বনাশই সে করবে!

ডাক্তার সেনের কথার মাঝখানে সদলে প্রবেশ করলেন চৌধুরী মশাই।

ডাক্তার খুশী কণ্ঠে বলে উঠলেন: এই যে অতুল, এসেছো! বসো, বসো। বসো মা মলয়া, বসো বিভাস। আমার সময় বড় অল্প। সব কথা গুছিয়ে বলতে পারবো না। অতুল, তুমি এদের বলো কেমন করে মেসমেরিজমের সাহায্য নিয়ে দিনের পর দিন চিরঞ্জীব তোমায় শোষণ করে গেছে, কেমন করে নষ্ট করে দিয়েছে তোমার জীবনের সুখ-শান্তি। আমার বক্তব্য তার পরের ঘটনা নিয়ে—যখন তার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্তে আমি তোমায় নিয়ে এলাম আমার নিজের বাড়ীতে, চিরঞ্জীব এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসার পর তাকে বার বার দিলাম তাড়িয়ে। যখন সে বুঝলে, আমার জন্তেই তোমার মত সোনার হরিণ তার হাতছাড়া হতে বসেছে, তখন সে আমাকে তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে নিজের বশীভূত করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

—আমি হয়ত রোগী দেখতে বেরিয়ে যাচ্ছি, দেখি পথে সে দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে এক অদ্ভুত রহস্যময় দৃষ্টি নিয়ে। কোন পার্টি, উৎসব সম্মেলন—এমন কি রোগী দেখতে আমি যেখানেই যাই, দেখি ছায়ার মত পিছনে পিছনে সে আমার অনুসরণ করছে। এই ভাবেই কেটেছে দিনের পর দিন। এক এক সময় এক অদ্ভুত তন্দ্রাবেশে আমার শরীর ঝিম্-ঝিম্ করে উঠতো, কি যেন একটা আত্মবিস্মৃতির ভাব এসে ভুলিয়ে দিতো আমার অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—এমন কি পারিপার্শ্বিক সব কিছুই। তার পর আবার মনের সমস্ত শক্তি এক করে সে ভাবটা কাটিয়ে উঠতাম অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টার পর।

—সেই সময়ে অতুল আমার বাড়ী ছেড়ে চলে গেলো। সে হয়তো ভেবেছিলো, চিরঞ্জীব যখন তার জন্তেই আমার অনিষ্টের চেষ্টায় আছে তখন সে আমাকে ছেড়ে গেলেই আমি রেহাই পাবো। কিন্তু সে ভুল বুঝেছিলো। শয়তানের দৃষ্টি একবার যার ওপর পড়ে, সে কি অত সহজে রেহাই পায়!

—শীগ্‌গিরই আমার অবস্থা হয়ে উঠলো আরো শোচনীয়। আমি উন্মাদ হয়ে গেলাম—হ্যাঁ, বদ্ধ উন্মাদ। সে উন্মত্ততা এক অদ্ভুত, বিচিত্র ধরণের—যার কোন উদাহরণ আমাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে মেলে না।

—সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে যেন একটা রক্তলোলুপ পশুর আত্মার আবির্ভাব ঘটতো। সেই দুর্দ্দান্ত পশুবৃত্তি কিন্তু রাতের অন্ধকার মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার শান্ত সমাহিত হয়ে যেতো—আমি ফিরে পেতাম আমার নিজের সত্তা। আরো একটা বিচিত্র জিনিষ লক্ষ্য করেছি। সন্ধ্যার পরই আমার

সমস্ত শরীরে এমন এক অসহ্য যন্ত্রণা দেখা দিতো, যার ফলে আমি আর্ত্তনাদ করতে থাকতাম। তখন আমার মনে কোন জিঘাংসা স্থান পেতো না। কিন্তু আলো নিবিয়ে দিলেই সে যন্ত্রণার অবসান ঘটতো—সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব হতো এক বিচিত্র উন্মত্ততার। ঘরের জিনিষ ভেঙে-চুরে, হিংস্র পশুর মতো গর্জ্জন করে যাকে সামনে পেতাম, তাকেই হত্যা করতে যেতাম। অথচ যদি কেউ সে সময় আলো জ্বালতো, আমি তখনি ফিরে পেতাম আমার পূর্ণ জ্ঞান, আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর চেয়ে কঠিন সেই যন্ত্রণাও আবার হতো সুরু। উন্মাদ অবস্থায় কি যে করতাম আমি, নিজেই সে কথা জানতাম না। বুঝলাম, শয়তান আমার চৈতন্য আচ্ছন্ন করে আমাকে ক্রমশঃ বেশী করে তার করতলগত করছে।

—এমন অদ্ভুত কথা কেউ কখনো শুনেছেন যে, নিজেকে বেঁধে রাখবার জন্যে কেউ নিজেই তৈরী করিয়েছে তার বন্ধন-শৃঙ্খল? আমি কিন্তু করিয়েছি। সন্ধ্যার সময় আলো জ্বলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন আমি চীৎকার করে উঠেছি: বাঁধো, বাঁধো আমাকে! বেঁধে অন্ধকারে ভরিয়ে দাও ঘর: এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। তার পর অপর্ণা আর আমার পুরোনো চাকর হলধর—দু'জনে আমাকে বেঁধে নিবিয়ে দিয়েছে ঘরের আলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি উন্মত্ত রক্তপিপাসু রাক্ষসের মতো গর্জ্জন সুরু করেছি—আর কি যে করেছি, কি না করেছি, কিছুই স্মরণ করতে পারিনি পরের দিন। ভোরের আলো দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে নেমে এসেছে ঘুম। কিন্তু ঘুম আমার ভাগ্যে লেখা নেই। ভোর হতে না হতেই রোগীর দল আসতে সুরু করেছে। তারা যে জানে ডাক্তার সেন সুচিকিৎসক, ডাক্তার সেন সদাশয়, মহৎ লোক! হা-হা-হা······ডাক্তার আবার দরা-গলায় হেসে উঠলেন—দু'চোখ তাঁর অশ্রুসজল!

—সন্ধ্যার পর কোন রোগী দেখতে না যাওয়ায় আর বাড়ী থেকে না বেরোনোর ফলে চার দিকে একটা হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছিলো। ডাক্তার একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন: অনেকে দেখা করতে এসে ফিরেও গেছে সদর থেকেই। বাধ্য হয়ে গুজব রটাতে হলো, একটা গবেষণার কাজেই রাতটা আমাকে কাটাতে হয়। লোকে সহজেই বিশ্বাস করলে সে কথা। নইলে সত্যি কথা প্রচার হলে আমার পশার তো যেতোই, তার ওপর এত দিন ধরে গড়ে তুলেছি যে সম্মান-প্রতিপত্তি, তার সব কিছুই হারাতে হতো।

—এমনি সময়ে এক রাতে বাড়ীর সকলে যখন নিদ্রায় অচেতন, তখন আমি শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলাম বাড়ী থেকে। কোথায় গিয়েছিলাম জানি না। পরের দিন ভোর বেলা যখন চৈতন্য হলো, দেখলাম আমি একটা বাগানের ধারে ঝোপের আড়ালে পড়ে আছি। বাগানটা আমার বন্ধু অতুলের। হাতের হাতকড়া আর নিজের অবিন্যস্ত বেশ দেখে বড় ভয় হলো। যদি এই অবস্থায় কেউ দেখে ফেলে। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম নিজের বাড়ী। ভোরের আলো তখন সবে ফুটে উঠছে। রাস্তায় লোকজন চলাচলও তেমন সুরু হয়নি। কাজেই আমার দিকে লক্ষ্য পড়লো না কারো। বাড়ীতে এসে চুপি-চুপি নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। অপর্ণা আর হলধরও তখন ঘুমোচ্ছে। সুতরাং কেউ জানলো না আমার নিশীথ-ভ্রমণের কথা। তারা শুধু আমার বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলো।

—খানিক পরেই যখন রোগী দেখতে চেম্বারে এলাম, তখন কানে গেলো এক বিষম দুঃসংবাদ। অতুলকে কে না কি খুন করেছে। চমকে উঠলাম! সে কি আমি? সে কি আমি? হে ঈশ্বর, আমি কি খুনী? আমি আমার মনের সমস্ত শান্তি, সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেললাম। সারা জীবনে জানি যে কখনো কারো অনিষ্ট চিন্তাও করিনি—কিন্তু উন্মত্ত অবস্থায় এ কি করলাম! কাউকেই বলতে পারলাম না কোন কথা—এমন কি অপর্ণাকেও না। কে বিশ্বাস করবে, সম্মোহিত অবস্থায় অপরের ইচ্ছাকেই আমি কাজে রূপ দিয়েছি? বাধ্য হয়ে নিজের মনের আগুনে নিজেই পুড়ে মরতে লাগলাম।

—কিন্তু এর পরই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম। সন্ধ্যার পর আলোয় না দেখা দিতো কোন যন্ত্রণা—অন্ধকারেও উন্মত্ততার কোন লক্ষণ নেই। অপর্ণা খুব খুশী হলো আমাকে আবার সুস্থ হতে দেখে। বোধ হয় তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর কেউ-ই তার নমস্কার আর মানত থেকে বাদ পড়েন নি।

—তবুও আমি সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাইরে যাই না। কি জানি, যদি কোন দিন আবার উন্মত্ততা দেখা দেয়। হঠাৎ এক দিন ঠিক সন্ধ্যা বেলা রোগী দেখে ওপরে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় চিরজীব এলো আমার চেম্বারে। ভয় পেয়ে গেলাম। কি ব্যাপার? হতভাগাটা আবার আমার চেম্বারে কি মনে করে?

—সে বললে, রাত্রে তার ঘুম হয় না, একটা ওষুধ চায়।

—আমি ধমক দিয়ে বললাম: তার জন্যে এত দূরে ডাক্তার দেখাতে আসবার দরকার ছিলো না। তোমার চিকিৎসা করবো না আমি। এই সামান্য রোগে যে-কোন ডাক্তারের সাহায্য নিতে পারো তুমি।

—কিন্তু তোমাকে আমার চিকিৎসা করতেই হবে ডাক্তার, অন্য কারো ওপর আমার বিশ্বাস নেই। চিরজীব বললে: আমাকে তুমি পছন্দ না করো, তাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু মনে রেখো তুমি চিকিৎসাব্রতী। লোকটা ভাল কি মন্দ, তাতে তোমার কি আসে-যায়? রোগটা ভালো কি মন্দ বিচার করে ওষুধ দেওয়াই তোমার পবিত্র কর্ত্তব্য।

—হতভাগাটা নাছোড়বান্দা। কাজেই তাড়াতাড়ি তাকে বিদায় করবার জন্যে ওষুধ দিয়ে দিলাম। চলে গেল সে। কিন্তু যাবার আগে আমার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ এক রহস্যময় দৃষ্টিতে। তার চোখের ভাষায় কি ছিলো জানি না, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠলো একটা অজ্ঞাত ভয়ে।

—তাড়াতাড়ি ওপরে এসে বললাম: আমায় বেঁধে রাখো অপর্ণা, আমায় বেঁধে রাখো।

—অপর্ণা ভয়ে শিউরে উঠে জিজ্ঞাসা করলে: আবার কি তোমার সেই অসুখ করলো না কি?

—এখনো করেনি, উত্তর দিলাম আমি: কিন্তু ভয় হচ্ছে, আবার সেই অসুখটা দেখা দিতে পারে।

—আমার পীড়াপীড়িতে সেই সুস্থ অবস্থাতেই আমাকে বেঁধে

রাখলে ওরা। রাত আটটা পর্য্যন্ত সেদিন জেগেছিলাম আমি। তার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। বাইরে সেদিন সন্ধ্যা থেকেই ভয়ানক দুর্য্যোগ। ঝড়, জল আর বিদ্যুতের চমক। অপর্ণাও পড়েছে ঘুমিয়ে, হলধরও। তারা বোধ হয় সেদিন আমাকে ঘুমোতে দেখে সকাল সকালই শুয়ে পড়েছিলো। তার পর কি ঘটেছে জানি না। হঠাৎ আমার চমক ভাঙলো—আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। দেখি আমি দু'হাত তুলে হত্যা করতে যাচ্ছি কাকে, আর কে আমার চোখে টর্চের আলো ফেলেছে। ভয়ে চীৎকার করে দু'হাতে চোখ চেপে পালিয়ে এলাম নিজের বাড়ীতে। বার বার স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম—কখন, কেমন করে লোহার শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছি বাড়ী থেকে—কেমন করে পৌঁছলাম আবার অতুলদেরই বাগান-বাড়ীতে? কিছুই মনে পড়লো না। পরের সকালে আমার আহ্বান এলো তাকেই চিকিৎসা করবার, যাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলাম আমিই।

—মাঝে মাঝে মনে হতো পাগলো, এ ছদ্মবেশ আর নয়—এবার আত্মহত্যা করে সব জ্বালা জুড়োবো। কিন্তু তাতেই বা কি লাভ? আমাকে যন্ত্র করে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করবার চেষ্টা করছে যে, সে আমার অভাবে ক্ষান্ত হবে না। আমার পরিবর্ত্তে আর এক জনকে যন্ত্র করবে ওই নির্ম্মম যন্ত্রী। তার ওপর লক্ষ্য করলাম, চিরঞ্জীব ও-বাড়ীতেও হানা দিয়েছে বিভাসের কাছে। এটর্ণী দত্ত তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বিভাসের সঙ্গে। তিনি তো আর জানেন না, চিরঞ্জীব মানুষ নয়, সাক্ষাৎ শয়তান! সেদিন বার বার বিভাসকে আর দেবব্রতকে বারণ করেছিলাম ওদের সঙ্গে মিশতে। নইলে, হয়তো আমারই মতো ওদের জীবনও এক দিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

—এই ঘটনার পরই সম্মোহন বিদ্যা নিয়ে নিজে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করি। উদ্দেশ্য ছিলো, চিরঞ্জীবের অপপ্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করা, আর সেই সঙ্গে সম্ভব হলে তার শয়তানীর কবল থেকে রক্ষা করা দু'টি ফুলের মত সুন্দর নিরীহ তরুণ-তরুণীকে। কিন্তু সম্মোহন বিদ্যা চর্চ্চা করতে করতে দেখলাম নিজের শক্তি দিয়ে অপরকে এর প্রভাবমুক্ত করা গেলেও নিজেই নিজের কোন উপকার করা সম্ভব নয়। তাই যেদিন মনসা চিরঞ্জীবের বাড়ী গিয়ে সম্মোহিত হয়ে খুন করতে গিয়েছিলো বিভাসকে, সেদিন বাড়ী ফেরার পর তাকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ করতে পেরেছিলাম; কিন্তু সুস্থ করতে পারিনি নিজেকে।

—অনেক, অনেক বার ভেবেছি, যেমন করে হোক মুখোস খুলে দেবো শয়তানটার। কিন্তু তা আমি পারিনি। আমার হাতে তখন কোন প্রমাণ ছিলো না—আজও নেই। কিন্তু আজ যখন আবার উন্মত্ততার ঘোরে বাড়ীর সকলের অজ্ঞাতে জানলার গরাদ ভেঙে পথে বেরিয়ে পড়ে হানা দিই নিজের অজ্ঞাতেই অতুলের বাগান-বাড়ীতে, তখনও আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন ছিলো। আবছা-আবছা মনে পড়ে, কাকে যেন তাড়া করে চলেছি। তার পর কি যে হলো, চোখে একটা আলোর ঝলক—সম্মোহনের প্রভাব কেটে গেলো মুহূর্ত্তের মধ্যে। মুহূর্ত্তের মধ্যে অনুভব করলাম—বিভাস আর দেবব্রত আমার সামনে দাঁড়িয়ে, পাশে অতুল—যাকে আমরা মৃত বলেই জানতাম, জানতাম খুন হয়েছে।

—চোখে আলোর ঝলক লাগার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলাম, অমনি শুরু হলো আবার সেই অস্বাভাবিক যন্ত্রণা। ছুটে চলে এলাম বাড়ীতে। তার পর সকলের অজ্ঞাতে বিষপান করেছি। বাঁচবার আর সম্ভাবনা ছিলো। আজ আমার শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে আমি অন্ততঃ এটুকু আশা করে যাবো, আমার প্রতিটি কথার সাক্ষী যারা আছে, অপর্ণা, অতুল, হলধর, বিভাস, দেবব্রত, মনসা—তারা সবাই চিরঞ্জীবের মুখোস খুলে দেবার জন্যে আমার কথাগুলো যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ দেবে। অন্ততঃ সকলে আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করবে। মনে করবে—ডাক্তার সেন খুনী নয়, পাষণ্ড নয়—সে মানুষ, সাধারণ ভদ্র এক জন মানুষ মাত্র। সম্মোহনের প্রভাবে সে যা করেছে, তা তার নিজের কাজ নয়—নিজের স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তিও নয়—তার জন্যে দায়ী চিরঞ্জীব। বিদায়, বিদা-য়······

ডাক্তার সেনের শেষের কথাগুলো যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিলো। শ্বাস নেবার জন্যে বারে বারে তিনি থামছিলেন। মৃত্যুর সঙ্গে যেন নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করছিলেন শেষ কথা ক'টি বলে যাবার জন্যে।

কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিকারের ঘোরে ডাক্তার উঠে বসতে গেলেন—কিন্তু পারলেন না। অর্দ্ধোত্থিত দেহ তাঁর বিছানার ওপরই লুটিয়ে পড়লো। শেষ হয়ে গেলো এক মহৎ জীবন অতি শোচনীয় ভাবে।

ঘরের এক কোণে রোরুদ্যমানা অপর্ণা—কেউ মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইতে পারলো না। সকলের চোখের পাতাই তখন ভিজে গেছে এক অভূতপূর্ব্ব বেদনায়। [ক্রমশঃ।

ট্রামে-বাসে

সুখেন্দু দত্ত

সেই তখন থেকে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে মিনিট গুনছে সুকান্ত। কিন্তু শিয়ালদহের বাসের আর দেখা নেই। দশ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে লোকও জমতে শুরু করল মোড়টায়। এর পর বাস যখন আসবে, আসবে বোঝাই হয়ে। তার পর আগে ওঠা নিয়ে লাগবে মারামারি, ঠেলাঠেলি আর গুঁতোগুঁতি। উঃ, জীবনটা একেবারে দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠেছে সব দিক দিয়েই! বিরক্ত হল সুকান্ত।

সামনেই কোন হলে যেন সিনেমা ভাঙলো। উচ্ছ্বসিত আলোচনা করতে করতে এক দল সিনেমা-ফেরতা যুবক ফুটপাথ দিয়ে চলেছে। তাদের কারো হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, কারো ঠোঁটে সদ্য-শোনা-আসা সিনেমার গান—লারে লাপ্পা—

আরো দু'জন এসে ভিড়টা বাড়ায় বাস-ষ্টপেজে।

অনেক পরে পরে এক-একটা ট্রাম বা বাস শীতের জড়তা আর নিঃশব্দতা ভেঙে দেখা দিচ্ছে! কুয়াশায় একটু দূর থেকে

ট্রামের আলোটা দেখায় মরণাপন্ন রোগীর ঘোলাটে চোখের মত। হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ছোটে সেগুলো।

কিন্তু শিয়ালদহের বাসের কি হল আজ? অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সুকান্ত।

এরই মধ্যে দু'জন ভদ্রলোক আবার পলিটিক্‌স্ নিয়ে আলোচনা সুরু করে দেন এক সময়। সুকান্ত হাসে মনে-মনে। শীতের রাত্রে বাসের অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শরীর গরম রাখার সহজ উপায়ই বটে!

···কোরিয়া···চীন···আমেরিকা···এটম বোমা···বৃহৎ পঞ্চ-শক্তি···

যাক্, আশ্বস্ত হল সুকান্ত—বাস আসছে এতক্ষণে। অনেক কষ্টে আগের ষ্টপেজগুলোর মায়া কাটিয়ে একটা বাস কর্কশ চীৎকারে আত্মঘোষণা করে শেষ পর্য্যন্ত এসে দাঁড়ায় মোড়টায়। অপেক্ষমান লোকগুলোর মধ্যে একটা সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। কোরিয়ার সমস্যায় চিন্তিত এবং বিচলিত ভদ্রলোক দু'জন তাঁদের সেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থগিত রেখে বাসের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড বেগে ছুটলেন এবার। আগে থেকেই বোঝাই গাড়ী। হাতলটা কোন রকমে ধরে সিঁড়িতে একটা পা রেখেই আশ্চর্য্য কৌশলে শরীরটা ভেতরে ছুঁড়ে দেন তারা। ওদিকে কণ্ডাক্টার হাঁকতে সুরু করে—ইস্‌প্লানেড···ধর্মতল্লা···শিয়ালদা···হ্যারিসন রো—ড্!

উঠবার জন্য প্রস্তুত হয় সুকান্ত। কিন্তু সে আয়োজনটুকুই শুধু সার হয় তার। সিঁড়ির দিকে একটা পা বাড়াতে গিয়েই হঠাৎ ছিটকে এক পাশে গিয়ে পড়ে সে। আর পেছন থেকে কয়েক জন এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে পা মাড়িয়ে উঠে পড়েন বাসটায়। দেখতে দেখতে সিঁড়িতে লোক ঝুলতে সুরু করে। উঃ, এতক্ষণ বাদে যাও বা একটা বাস পাওয়া গেল তা-ও শেষ পর্য্যন্ত পাদানিতে ··· উঠতেই পাওয়া গেল না ছাই! মহা বিরক্ত হয় সুকান্ত।

ওদিকে পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টার তখনও হাঁকছে—আইয়ে, আইয়ে, মোল্লালি···হ্যারিসন রোড···খালি গাড়ী···আইয়ে!···

পঞ্চনদবাসীর সেই উদাত্ত আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে আর এক জন এগিয়ে গিয়ে আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে বাসের হ্যাণ্ডেলটা ধরে ঝুলে পড়ে। তার পর কয়েক জন হতভাগ্যের বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে দিয়ে ঝুলন্ত মানুষ সহ বাসটা এক সময় দেয় ছেড়ে। আবার শুনতে পাওয়া যায় পাইজীর মধুর কণ্ঠস্বর—আগে বঢ় যাইয়ে, আগে বঢ় যাইয়ে! এবার অবশ্য রাস্তার লোকগুলোর উদ্দেশ্যে নয়, বাসের যাত্রীদেরই উদ্দেশ্যে। পরের ষ্টপেজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে পাইজী!

বিষম বিরক্ত ধরে সুকান্তর। আবার যে কখন আসবে বাস! মিনিক দশেক তো নিশ্চয় বটেই। ঝকমারি আর কি! বাস-ষ্টপেজটায় আরো কয়েক জন দাঁড়িয়ে ছিলেন—সুকান্তর মতই হতভাগ্য। হঠাৎ করুণ স্বরে আর্তনাদ করে ওঠেন তাঁদের মধ্যে এক জন—আমার মানিব্যাগ!

তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়াতে থাকেন তিনি বার বার।

ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত। বাস আসতেই সেটার দিকে এগিয়ে যান উনি, সিঁড়ির কাছে গিয়েও পৌছান ভিড় ঠেলে। কিন্তু তার পরই ধাক্কা পেয়ে আবার পেছনে হটে আসেন। আর এরই মধ্যে কোন সুযোগান্বেষী···

তাড়াতাড়ি নিজের বুক-পকেটটায় হাত দেয় সুকান্ত। না, ঠিকই আছে—নিশ্চিন্ত হয় সে। ভদ্রলোকের জন্য দুঃখ হয় তার। সমবেদনাও জানান দু'-এক জন। কেউ প্রশ্ন করেন—কত ছিল মশাই ব্যাগে? কেউ বা অযাচিত উপদেশ দান করেন রাস্তা-ঘাটে আর একটু সাবধান হয়ে চলবার। ভদ্রলোক কিন্তু কারো কথাই শুনছেন বলে মনে হয় না।

আর একটা বাস আসছে বলে মনে হয় যেন? এত তাড়াতাড়ি তো আসবার কথা নয়? কিন্তু জোড়া লাইট দেখেই বোঝা যায় যে, শিয়ালদহগামী বাসই বটে। কাছে আসতে নিশ্চিন্ত হয় সুকান্ত। বুঝতে পারে, আগের বাসটাকে তাড়া করে চলেছে এটা, তাই এত তাড়াতাড়ি।

এবার আগে থাকতেই তৈরী হয়ে নেয় সুকান্ত। এটাকে মিস্ করা চলবে না কোন মতেই। সত্যি, ট্রামে-বাসে উঠবার জন্য যত কায়দা করতে হয় আজকাল, সেটা আগে থেকে জানা থাকলে ছেলেবেলায় জিমনাষ্টিকটা শিখে রাখত সুকান্ত, বেশ কিছুটা কাজ দিত এই দুঃসময়ে!

কিন্তু ভাবনার সময় নেই আর, বাস এসে পড়ে মোড়টায়। চটপট উঠে পড়ে এবার সুকান্ত। শুধু তাই নয়, রীতিমত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেই ওঠে! দুর্গন্ধ ধোঁয়া ছেড়ে আর কর্কশ চীৎকার করে বাস আবার ষ্টপেজ ছেড়ে এগোয়।

এতক্ষণ শুধু কোন মতে বাসে উঠবার কথাটাই ভাবছিল সুকান্ত। উঠতে পেরে এখন আবার মনে হল, একটু বসতে পেলে বেশ হত কিন্তু। এত দূরের রাস্তা!

বাসের ভেতর নানা ধরণের মানুষ। গোটা দুই মাতালও আছে আবার। যাত্রীদের মধ্যে কয়েক জনের সংগে গাঁটরি, বোঁচকা আর টিনের সুটকেশ। শিয়ালদহ ষ্টেশনের যাত্রী নিশ্চয়ই। কণ্ডাক্টরের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়েই মাল সংগে নিয়ে উঠেছে মনে হয়। উঠবার সময় এই সব গাঁটরি-বোঁচকা পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টারের চোখে পড়লে এগুলো সে ড্রাইভারের পাশে চালান না করে ছাড়ত বলে মনে হয় না। ভাড়াও আদায় করত তার জন্য।

—গোপাইল্যা, তুয় টিকট আমি লইসি রে! বোঁচকাধারী এক জন অকস্মাৎ সিঁড়ির কাছে দাঁড়ান 'গোপাইল্যা'র উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে ওঠে।

—বাবু টিকিট?···টিকিট আপ্‌কা?···টিকিট ভ্যাই?

—টিকট দাদা?···টিকট সা'ব?

কণ্ডাক্টার সাহেব তাঁর নিজস্ব হিন্দুস্থানীতে নিজস্ব বাংলা মিশিয়ে তাতে পাঞ্জাবী সুর দান করে সাবিনয়ে টিকিট প্রার্থনা করতে থাকে যাত্রীদের কাছ থেকে।

যারা বসেছিলেন তাদের কারো হাতে এক আনার টিকিট দেখা যায় কি না লক্ষ্য করতে থাকে সুকান্ত। উদ্দেশ্য, সে রকম কাউকে পেলেই তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, তার পর তিনি উঠলেই জায়গাটা দখল করে বসবে। এ সব ব্যাপারে আগে থেকে তৈরী হয়ে থাকলে সুবিধা হয় অনেক।

এক আনার টিকিট কাটেন এক ভদ্রলোক। তাঁর হাতে টিকিটটার নীল রঙে মুগ্ধ না হয়ে পারে না সুকান্ত।

মাতাল দু'টোর একটা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে। ওর বিব্রত সঙ্গী বৃথাই চেষ্টা করে ওকে থামাবার। পাশের সিটে বসা লোকটা বিড়ি ধরায় একটা, সঙ্গীকেও একটা দান করে। প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলল দেখছি! হাঁপিয়ে ওঠে সুকান্ত।

এক সময় ওদিকে তাকিয়ে হঠাৎ বড় বিরক্ত হয়ে ওঠে সুকান্ত। এক আনার টিকিটধারী টিকিটটা নিয়ে অত নাড়া-চাড়া শুরু করেছে কেন? ওটা অত দেখিয়ে রাখবার কি আছে? টিকিটের নীল রঙে আকৃষ্ট হয়ে আবার এক জন হয়ত তার মত একই মতলব নিয়ে সিটটার সামনে এসে দাঁড়াতে চাইবে। তার পর সিটটা খালি হলেই তখন আবার দু'পক্ষই অত্যন্ত অশোভন ভাবে এ ওকে ঠেলে আগে বসতে চাইবে। সে আবার এক বিশ্রী ব্যাপার! কি ঝঞ্ঝাট!

—লিন্সিয়ে পোন্‌রা আনা! আর একখানা টিকিট হয় এক আনার।

অকস্মাৎ সিঁড়ির কাছে আর একটা সাধা গলা শোনা যায়—ধরমতল্লা···শিয়ালদা···হ্যারিসন রো—ড্‌···

কণ্ডাক্টার একা সব দিক সামলে উঠতে পারে না, তাই এ্যাসিষ্টান্ট হিসাবে এক ছোক্‌রাকে রেখেছে সে। পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টারের টিকিট ফাঁকি দেবার মত দুঃসাহসী যাত্রীরও অভাব নেই, তাদের জন্যেই বিশেষ করে এই ব্যবস্থা। তাছাড়া কণ্ডাক্টার ভেতরে টিকিট কাটতেই ব্যস্ত থাকে বেশীর ভাগ সময়, ওরাই তখন ষ্টপেজগুলো সামলায়। ষ্টপেজের সামনে বাস এলেই চীৎকার করে ওঠে—আইয়ে···খালি গাড়ী, খালি গাড়ী!···ধরমতল্লা···শিয়ালদা···তার পর যাত্রী তুলে নিয়েই ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড স্বরে হাঁকছে—ঠিক হ্যা-য়্! সংগে সংগে বাসের টিনের বডির ওপর সজোরে দু'টো চড়ও পড়বে। যদি ঐ কণ্ঠস্বরও যাঁ/ ড্রাইভারের কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে, তবে টিনের আওয়াজটা তো নিশ্চয়ই পৌঁছবে! কণ্ডাক্টারের কথা শুনে সুকান্ত বুঝতে পারে ছোকরার নাম 'বিরিজলাল'।

বসবার জায়গা পাওয়া যায় একটা এবার। আরাম করে বসে সুকান্ত।

মিউজিয়মের সামনে বাস থামতে এক জন মহিলা ওঠেন। সিঁড়ির বাঁ দিকের লেডিজ সিটটা চার জন পুরুষ বেদখল করে বসে আছেন। চার জনই তাঁকে দেখতে না পাবার ভাণ করে বসে থাকায় অগত্যা কণ্ডাক্টারকেই হস্তক্ষেপ করতে হয় এদিকে।

—জানানা সিট ছোড়্‌ দিজিয়ে সাব্‌!

চার জন 'জেন্টস্‌' বিরস মুখে উঠে দাঁড়ান এবার। 'লেডি' গিয়ে একা চার জনের সিটখানা দখল করে বসেন।

এক-একটা ষ্টপেজ এসে গাড়ী যেন আর ছাড়তে চায় না। অতিষ্ঠ যাত্রীদের বিরূপ মন্তব্য কানেও তোলে না ড্রাইভার। নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে ডিপোয় গিয়ে ওরা চলে না। এদিকে বাস থামাবার জন্য যখন ঘণ্টা দেওয়া হবে, তখন তারাই আবার উল্টো সুর গেয়ে বলবে, বার বার গাড়ী থামিয়ে শেষে লেট ফাইন দেবার ইচ্ছা ওদের বিন্দুমাত্র নেই। বাড়ী-বাড়ীর দরজায় যে বাস থামতে পারে না, সেটাও আপনাকে সবিনয়ে নিবেদন করতে ভুলবে না।

যাক্‌, এস্‌প্ল্যানেড এল এতক্ষণে। হঠাৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে সুকান্ত। ও কে, অনিমেষ বাবু না? এই বাসেই তো উঠছেন দেখি! সারলে এবার। ভদ্রলোকের সংগে এখন দেখা হওয়া মানেই এত কষ্টে জোটান সিটটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান আর সেই সংগে মুখে হাসি ফুটিয়ে (মনে মনে অবশ্য ভদ্রলোকের মুণ্ডপাত করে) বলা—আরে, অনিমেষ বাবু যে? বসুন, বসুন! বিপদ এড়াবার এক মাত্র উপায় হিসাবে অগত্যা জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয় সুকান্তকে। রাস্তার পাশে বাড়ীগুলোর দিকে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে ও'ঠ সে হঠাৎ।

কিন্তু ভাগ্য মন্দ।

—আরে, সুকান্ত না?

না, নিস্তার নেই। সব বুঝেও চমকে উঠবার ভাণ করে ফিরে তাকাতে হয় সুকান্তকে।

—অনিমেষ বাবু? কখন উঠলেন? আরে, বসুন বসুন!

—না, না, সে কি কথা? বস তুমি!

মুখে বলেন বটে কথাটা, কিন্তু সুকান্ত লক্ষ্য করে, বলতে বলতে একটু এগিয়েও আসেন উনি সিটটার দিকে।

—তার পর, সব ভাল তো? সুকান্তর সিটটায় গ্যাঁট হয়ে বসে সুকান্তরই কুশল প্রশ্ন করেন তিনি।

—হ্যাঁ, তা ভালই। জোর করে একটু হাসি টেনে এনে জবাব দেয় সুকান্ত।

গাড়ী এবার এসে থামে ধর্মতলায়।

—একটু জায়গা দেবেন দাদা, একটা পা রাখব শুধু! সিঁড়ির কাছে এক জনের কাকুতি শোনা যায়।

—হবে না মশাই, পরের গাড়ীতে আসুন! 'দাদা'র কণ্ঠস্বরে ভাইয়ের প্রতি বিন্দু মাত্র স্নেহের লক্ষণও দেখা যায় না। এমন কি সম্পর্কটেই অস্বীকার করে বসেন উনি সোজাসুজি।

অনিমেষ বাবু বেশ আরাম করেই বসে আছেন সিটটায়। কিন্তু ভদ্রলোকের কপালে একটা আরাম বুঝি লেখা নেই—

···ঘর্‌-র্‌-র্‌-র্‌-ঘড়াৎ-ঘট্‌-ঘট্‌···

সর্ব্বনাশ, ইঞ্জিন বিগড়েছে দেখছি! মুখ শুকিয়ে যায় সুকান্তর। এখন যদি আবার এ রকম কাণ্ড ঘটে···

বাস-ভর্ত্তি লোকের মুখ কালো হয়ে ওঠে দেখতে দেখতে।

ড্রাইভার সাহেব চিন্তিত মুখে এটা-সেটা নাড়ে কিছুক্ষণ। গাড়ীর আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ষ্টার্ট নেবার চেষ্টাও করে একবার। ফল হয় না অবশ্য তাতে কিছু। নেমে গিয়ে ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করে আসে কিছুক্ষণ। তার পর সিটে এসে বসে আবার। একটা সিংহনাদ করে অকস্মাৎ।

—আবে বি-রি-জ-লা-ল!

—জী হো-ও!

—হাণ্ডিল মার শালা!

আলোটা আর একবার নিবিয়ে দেয় পাঞ্জাবী ড্রাইভার। ইঞ্জিনের একটা বিকট শব্দ আর পেট্রোলের কটু গন্ধ।

'বিরিঞ্চলালের' সহায়তার এর পর গাড়ী চলে সত্যি। বাসশুদ্ধ লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা।

টাইম মেক-আপ করতে হবে। এতক্ষণে জোরে চলতে সুরু করে বাস। হঠাৎ এক সময় সুকান্তর কানে আসে 'বিরিঞ্চলালের' কণ্ঠস্বর।

—আ গিয়া মৌল্লালি…মৌল্লালি…

—চ্যা-লো-প্…ঠিক হ্যায়।

হঠাৎ চমকে ওঠে সুকান্ত। আরে, বাস যে বাড়ীর পথ ফেলে চলল দেখছি! হুড়মুড় করে দরজার দিকে ছোটে সে। কারো পা মাড়িয়ে দেয়, কাউকে লাগায় কনুইয়ের গুঁতো। কানে আসে—কে যেন মধুর একটা সম্বোধনে আপ্যায়িতও করে বসে। কিন্তু তখন আর অত কিছু দেখবার সময় কোথায় সুকান্তর?

—এই রোক্কে…রোক্কে কণ্ডাক্টার সাহেব…এক দম বান্কে!

আর বান্কে! কণ্ডাক্টার সাহেব নির্বিকার। এমনিতেই তো লেট অবধারিত আজ। গাড়ী থামে একেবারে সেই বহুবাজারে।

এতটা পথ এখন আবার হেঁটেই ফিরতে হবে সুকান্তকে। বাজলো ক'টা? শিয়ালদহ ষ্টেশনের বড় ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে জোরে পা চালায় সুকান্ত।

বিদ্রোহী

শ্রীঅরবিন্দকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উড়িষ্যার এক অখ্যাত গ্রাম—নাম তার চসখণ্ড। এখানে একটি পুকুর-পাড়ে আশ্রয় নিয়েছে বাঙ্গালার পাঁচটি বিপ্লবী। চারি পার্শ্বের আগাছাগুলি স্থানটিকে করে রেখেছে সুরক্ষিত দুর্গের মত। বড় ক্লান্ত আজ তারা…। সুদূর বাঙ্গালা থেকে বহু বিপদ অতিক্রম করে আজ তারা এখানে উপস্থিত, ক্ষণেক বিশ্রামের আশায়।

হঠাৎ সেই নির্জ্জন বনভূমিকে কম্পিত করে গর্জ্জে উঠল অজস্র বন্দুক। চারি দিক হোতে আসতে লাগলো ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলী…। চমকে উঠলেন বিপ্লবীরা। বুঝতে পারলো সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের দ্বারা তারা আজ পরিবেষ্টিত। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাদের ক্লান্ত দেহের মধ্যে জেগে উঠল উষ্ণ রক্ত। শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে বইতে লাগল তারই প্রবল স্রোত। বুঝলেন পলায়ন করার সমস্ত পথ রুদ্ধ। অতএব…। আত্মসমর্পণ করা তাঁরা কল্পনা করতে পারেন না। প্রত্যেকে সঙ্কল্প করলেন তাদের আত্মদানের মধ্যে দিয়ে শিখিয়ে যাবেন পরাধীনতার বন্ধন মোচন করবার জন্য দিতে আত্মবলি।

দলের নেতার আদেশে শত্রুকে তারা জানিয়ে দিলেন তারা যে-কোন অবস্থার সম্মুখীন হোতে প্রস্তুত।

যুদ্ধ চলল অবিশ্রান্ত গতিতে …।

এক দিকে বাংলার পাঁচ জন বীর বিপ্লবী সংগ্রামের উন্মাদনায় বেপরোয়া গুলী ছুড়ে চলেছে—জীবন পণ করে অত্যাচারী শাসকের মূলোচ্ছেদ করবার জন্যে, আর অন্য দিকে ব্রিটিশের পদলেহী এক দল প্রাণসর্ব্বস্ব সেপাহী।

সারা আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হোতে লাগল বন্দুকের শব্দে। গুলীর আঘাতে নিবিড় বনানীর বৃক্ষরাজির ছিন্ন পত্রাবলি ঝোরে পড়তে লাগলো। পাখীরা শাবক ফেলে পালাল ডানা ঝটপটিয়ে। সারা বনভূমি ভরে গেল বারুদের গন্ধে। বিপ্লবীদের হাতে মরতে লাগলো বহু সেপাই। সুযোগ বুঝে তারা ঢুকে পড়লো আরো গভীর জঙ্গলে। শত্রুরা আরো জোরে চেপে ধরল তাদের সাঁড়াশির মত।

এমন সময় একটি গুলী এসে বিদ্ধ হোল বিপ্লবীদের এক জনের বক্ষ-পঞ্জরে। বিপ্লবী তরুণের উষ্ণ রক্ত ছিটকে পড়ল বনভূমির সারা প্রান্তরে। সবুজ বৃক্ষ-লতার বুকে আঁকা রইল তার রক্তদানের স্বাক্ষর। তৃষ্ণার্ত্ত ধরিত্রীর কোলে লুটিয়ে পড়ল বিপ্লবী। মহাকালের কোলে আশ্রয় নেবার পূর্ব্বে বলে গেলেন দু'টি কথা—"জয়ী হতেই হবে।"

বিশ্বস্ত কর্ম্মীর মৃত্যুতে দলের নেতা একটু বিচলিত হোলেন। কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্যে। পূর্ণ উদ্যমে আবার তারা আরম্ভ করিলেন গুলী ছুড়তে। তাঁরা ভাবলেন—এই রকম আর আধ ঘণ্টা যুদ্ধ চালাতে পারলে তাঁদের পলায়নের পথ সুগম হবে…

কিন্তু বিধাতা হাসলেন ক্রূর হাসি। ধ্বসে গেল তাদের কল্পনা। একটি বুলেট এসে লাগলো নেতার ডান উরুতে। ফোয়ারার মত রক্ত ছুটলো। উষ্ণ শোণিতে ভেসে গেল তাঁর সারা অঙ্গ। কম্পিত দেহে লুটিয়ে পড়লেন তিনি বসুন্ধরার কোলে। ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়তে লাগলো রক্ত। নেতার এই অবস্থা দেখে বিপ্লবীরা একেবারে মুসড়ে পড়লেন। এক জন নিজের জামার হাতা ছিঁড়ে বেঁধে দিলেন নেতার ক্ষতস্থান। কিন্তু অত্যধিক রক্তপাতে তিনি হোয়ে পড়লেন একেবারে শক্তিহীন। আদেশ দিলেন যুদ্ধ থামাতে, আত্মসমর্পণ করতে…।

মুহূর্ত্তের মধ্যে তাদের ঘিরে দাঁড়াল বৃটিশের পদলেহীর দল। আহতদের পাঠান হোল বালেশ্বরের হাসপাতালে।

১০ই সেপ্টেম্বর…

পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী দলের নেতার জীবনের উপর যবনিকা নেমে এলো ধীরে-ধীরে। পরপারের ডাক এলো তাঁর। সাধ্য নেই তাঁর অবহেলা করবার এই আহ্বানকে। বিপ্লবী-বাংলার অমর যোদ্ধা চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হোলেন। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের উপর নেমে এলো কৃষ্ণ যবনিকা…

চিনতে পারলে কারা এই পঞ্চ বিদ্রোহী? যারা এক দিন সারা ভারতের বুকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহের লেলিহান শিখা—এ হলো তাঁদেরি কাহিনী। এঁদের নাম—চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন এবং যতীশ। আর এঁদের নেতার নাম—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। যাঁর আর এক নাম বাঘা যতীন।

মৃত্যু আজ এঁদের গ্রাস করেছে জানি, কিন্তু এঁদের আত্মা বাংলার প্রতি ধূলি-কণায়, আকাশে-বাতাসে—মানবের মনের মণিকোঠায়—পল্লী-বাউলের একতারার ঝংকারে রইবে বেঁচে।

লোলা মণ্টেজ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

নর্ত্তকী ও গণিকা থিয়োডোরা রাজপথ থেকে কেমন ক'রে পূর্ব্ব-রোম-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে উঠে বসেছিলেন, কিছু কাল আগে সবিস্তারে তা বর্ণনা করেছি।

আজ বলব আর এক জন বিজয়িনী ও যশস্বিনী নর্ত্তকীর কাহিনী। নটীর বৃত্তি ত্যাগ করবার পর যথার্থ সুশীলা নারীর মত জীবন যাপন ক'রে থিয়োডোরা ঐতিহাসিকদের অভিনন্দন লাভ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আজ যার কথা বলব, বাংলা ভাষায় তার উপাধি হওয়া উচিত 'রায়বাঘিনী'। য়ুরোপেও তার একটি উপাধি ছিল—'মেয়ে-সয়তান'।

কিন্তু তার নাম হচ্ছে, লোলা মণ্টেজ। ঔপন্যাসিকরা কল্পনায় অনেক উৎকট নারীর চিত্র এঁকেছেন। লোলা কিন্তু বাস্তব জগতে জন্ম নিয়ে পরাস্ত করেছে ঐতিহাসিকদের কল্পনাকেও।

এক দিন য়ুরোপের দেশে দেশে যার নাম ফিরবে লোকের মুখে মুখে, যার পায়ের তলায় লুটোবে রাজা-রাজড়াদের মুকুট এবং শ্রেষ্ঠ কবির দল যার নামে করবে প্রশস্তি রচনা, সেই লোলার শৈশব ও প্রথম যৌবন কেটে গিয়েছিল এই কলকাতায় এবং ভারতের অন্যান্য নগরেই। এ সময়ে তার চরিত্রে বিশেষ বিস্ময়কর কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। তবে সৌন্দর্য্যে ও লীলা-চাপল্যে চিরদিনই সে ছিল অসাধারণ।

লোলা মণ্টেজ তার পিতৃদত্ত নাম নয়। তার বাপের নাম এনসাইন গিলবার্ট, শিশু কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় এসে তিনি মারা পড়েন। তাঁর বিধবা স্ত্রী আবার বিবাহ ক'রে লোলাকে (এ নাম সে নিজেই গ্রহণ করেছিল) বিলাতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার তনুলতায় ফুটে উঠতে থাকে যৌবনের ফুল। মেয়ের বিয়ের জন্যে মা ব্যস্ত হন। হবু-জামাইরূপে নির্ব্বাচন করেন কলকাতা হাইকোর্টের এক জজকে। নাম তাঁর স্যার আব্রাহাম লামলি। ধনী, কিন্তু বয়সে লোলার ঠাকুরদাদা হবার যোগ্য। বুড়ো বর নামঞ্জুর ক'রে লোলা লেফটেনাণ্ট টমাস জেমস নামে এক যুবকের সঙ্গে চম্পট দেয়। তাকেই সে বিবাহ করে। তার পর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে আবার কলকাতায় ফিরে আসে।

আফগানিস্থানে অশান্তি। লেফটেনাণ্ট জেমস স্ত্রীকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলে। পথে মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের আমন্ত্রণে স্বামীর সঙ্গে লোলা তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির হয়।

যুদ্ধ শেষ হয়। স্বামীর সঙ্গে লোলা যায় ভারতের এ দেশে-সে দেশে। স্বামী ক্রমে কেবল মদিরা নয়, পরস্ত্রীতেও আসক্ত হয়ে পড়ে। এক দিন সে লোলাকে ফেলে আর এক নারীকে নিয়ে ... যায়। লোলা কাঁদলে না, ভয় পেলে না। সে সৌন্দর্য্যের জয় সর্ব্বত্র। নিজের কর্ত্তব্য স্থির ক'রে কালাপানি পার হয়ে আবার সে চলে গেল বিলাতে। তার পর থেকেই সুরু হ'ল লোলার জীবনের আসল রোমান্স।

লণ্ডন সহরের "হার ম্যাজেষ্টিস্ অপেরা হাউস" থেকে বিজ্ঞাপিত হ'ল—"স্পেনীয় নর্ত্তকী লোলা মণ্টেজের নৃত্য।" সেখানে লোলা নাচ দেখাতে লাগল বটে, কিন্তু বিলাতে সে বিশেষ সুবিধা ক'রে উঠতে পারলে না। কিন্তু সে দমল না। লণ্ডন থেকে বিদায় নিয়ে দেখা দিতে লাগল য়ুরোপের নানা সহরের রঙ্গালয়ে। ব্রুসেল্স্, ওয়ারস, বার্লিন, ও সেণ্টপিটার্সবার্গ। এ-সব জায়গায় তার অভিনন্দনের অভাব হ'ল না। যদিও তার নাচ দেখে লোকের চোখ ভুলত না, কিন্তু তার রূপ-লাবণ্য দেখে সকলেই হারিয়ে ফেলত হৃদয়।

ইতিমধ্যেই য়ুরোপ-বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী ফ্রান্জ লিস্জ্ট্ লোলার পায়ে লিখে দিয়েছেন দাসখৎ। য়ুরোপ সফরের সময়ে তিনি তার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ছায়ার মত। অত বড় প্রতিভাধর তার গোলাম, লোলার গর্ব্ব আর ধরে না। কিন্তু তার ব্রত মধুকরের মত, শিল্পীর আলিঙ্গনও তার কাছে ক্রমে একঘেয়ে হয়ে এল।

সে সরে পড়ল প্যারিস সহরে। রঙ্গালয়ে নেচে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল নব নব হৃদয়ের উপরে। তখন তার প্রকৃতি কেমন, লোলার নিজের লেখা এই কথাগুলি পড়লেই বুঝতে পারা যাবে: "শুনি, পুরুষকে ভালোবাসে 'ও তার কথায় ওঠে-বসে, এমন বোকা মেয়েও না কি আছে! আজব কথা, বিশ্বাস হয় না। আমি পুরুষদের শাসন করি নয়ন-বাণ দিয়ে।"

প্যারিসের অধিকাংশ পুরুষ যখন লোলার নয়ন-বাণের দ্বারা শাসিত হবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করছে, তখন এক জনের কাছে তার গর্ব্ব হ'ল খর্ব্ব। তিনি হচ্ছেন এমিল গিয়ার্ডিন, ফরাসী দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর হৃদয়কে বিগলিত করবার জন্যে লোলা বাছা-বাছা অস্ত্রপ্রয়োগ ক'রেও ব্যর্থ হয়ে নিজের ডায়েরিতে লিখে রাখলে: "আমাকে হার মানতে হ'ল। কি রকম পুরুষ এ? যত আবেগভরে আমি তাকাই, গিয়ার্ডিন মুখ ফিরিয়ে নেয় ঘৃণাভরে। সিংহের দৃষ্টি ছাড়া আর কিছু তাকে অভিভূত করতে পারবে না। আমার সাধ্যে কুলালো না।"

কিন্তু লোলার রাতুল চরণের তলায় আপন আপন প্রাণকে বিছিয়ে দিলেন আলেকজাণ্ডার ডুমা, ইউজিন সু, থিয়োফাইল গোতিয়ের, জানিন, ডুজারিয়ার ও ফিয়েরো ফিনো প্রভৃতি সুবিখ্যাত সাহিত্যিকরা।

লোলার চোখ দেখে এক ভক্ত কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন:

> Eyes as blue as vaults of heaven,
> Sunlit as the summer air!"

আর এক ভক্তের উক্তি: "বুকে তার সুধসায়রে কাঁপত দু'টি পুরন্ত আপেল।"

লোলার নাচ দেখে এক সমালোচক কটু ভাষায় নিন্দা করলেন। ক্রুদ্ধা লোলার উস্কানিতে সাহিত্যিক ডুজারিয়ার দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন সমালোচককে। ডুজারিয়ার মারা পড়লেন। গোটা সহর মারমুখো হয়ে উঠল। লোলা প্যারিস থেকে পলায়ন করলে।

তার পর সে হাজির হ'ল গিয়ে জার্ম্মাণীর বেডেন-বেডেন সহরে। সেখানে রাজা হেনরির সঙ্গে দেখা। রাজ্য ক্ষুদ্র হ'লেও তিনি ... করতেন না।

লোলা প্রাসাদে বাস করে ও রোজ চাবুক হাতে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোয়। তার অদ্ভুত সাজ-পোষাক ও ভাব-ভঙ্গি দেখে ক্ষুদে সহরের বাসিন্দারা রাস্তায় ভিড় ক'রে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। ভিড় দেখে লোলার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, জনতার যার-তার পিঠের উপরে চালাতে থাকে সপাসপ চাবুক। সবাই পালিয়ে পিঠ বাঁচায়।

রাজার চমৎকার বাগান। অনেক টাকা খরচ করেছেন তিনি বাগানের পিছনে। তাঁর সখ, সযত্নে পুষ্পশয্যা রচনা করা, কিন্তু লোলার সখ অন্য রকম।

এক দিন সে ফুলের বিছানার উপরে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রাণ ভ'রে বেড়িয়ে নিলে। দেখতে দেখতে সব ফুলগাছ সাবাড়। সখ মিটিয়ে লোলার মুখে হাসি আর ধরে না।

লোলার রূপের মোহ এত দিন রাজা হেনরিকে পেয়ে বসেছিল, তার নামে কোন নালিশ তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না। কিন্তু নিজের সাধের বাগানের চরম দুর্দ্দশা দেখে তাঁরও মোহ ছুটে গেল। লোলাকে বললেন, "বিদায় হও।"

লোলা হাসতে হাসতে বললে, "তথাস্তু!"

এই তো লিলিপুটিয় রাজ্য আর তার ক্ষুদে রাজা! এখানে বন্দী হয়ে থাকবার জন্যে তার জন্ম হয়নি। সে বিদায় নিলে।

জুটল এক ইংরেজ ভক্ত, উঠল তার সঙ্গে গিয়ে মিউনিক সহরের এক হোটেলে। সেখানেও সে যাকে-তাকে চাবুক মেরে আদর করে, সকলে শশব্যস্ত। তার উপরে সে পুষেছে মস্ত বড় একটা মাষ্টিফ কুকুর, কেমন ক'রে মানুষকে কামড়াতে হয়, তাকে তা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এক দিন কোন ধনী হোটেলের হল-ঘরে ভোজসভার আয়োজন করেছেন। অতিথিরা পান-ভোজনে নিযুক্ত, আচম্বিতে লোলার আবির্ভাব! গায়ে প'ড়ে সকলকে সে গালি-গালাজ করতে লাগল।

হোটেলের ম্যানেজার প্রতিবাদ করতে এলেন, লোলা তাঁর মুখের উপরে বসিয়ে দিলে বিষম এক ঘুসি।

অতিথিরা ক্ষাপ্পা হয়ে তেড়ে এল, লোলা দিলে কুকুর লেলিয়ে।

কিন্তু পরদিনেই লোলাকে সে হোটেল ছাড়তে হ'ল।

মিউনিক থিয়েটারে নাচবার জন্যে লোলা তোড়জোড় করতে লাগল। কিন্তু সে তখন রীতিমত কুবিখ্যাত হয়ে উঠেছে, কর্তৃপক্ষ তাকে থিয়েটার ছেড়ে দিতে রাজি হ'লেন না।

লোলা বললে, "চললুম আমি রাজার কাছে নালিস করতে।"

মিউনিক হচ্ছে বাভেরিয়ার সহর এবং সে সময়ে বাভেরিয়া হচ্ছে জার্ম্মাণীর সব চেয়ে বড় রাজ্য। রাজার নাম লাড্‌উইক, বয়স যাট বৎসর, কিন্তু তাঁর প্রাণের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় প্রেমের তুফান। রাজার পত্নী আছেন, কিন্তু তখন তাঁর উপপত্নীর আসন ছিল খালি।

আগে আবেদন ক'রে অনুমতি না পেলে কেউ রাজপ্রাসাদে ঢুকতে পায় না। দ্বারবান লোলাকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে দিলে না। লোলাও ক্ষেপে গিয়ে সুরু ক'রে দিলে গালাগালি।

এমন সময়ে সর্দ্দার-ভৃত্যের আবির্ভাব। সে সমস্ত দেখে-শুনে রাজার কাছে গিয়ে বললে, "মহারাজ, এক ছিনে জোঁক নর্ত্তকী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

—"তাকে দূর ক'রে দাও।"

—"মহারাজ, সে পরমা সুন্দরী।"

—"তবে সে আসতে পারে। আমি নিজেই তাকে ধমক দেব।"

কিন্তু লোলাকে ধমক দেবেন কি, তাকে দেখেই রাজার চক্ষুস্থির। লোলার বয়স ত্রিশ বৎসর, কিন্তু তখনও তার পেলব তনুর রূপযৌবন যেমন কচি, তেমনি কাঁচা।

সবাই বলত, লোলার দেহের মধ্যে সব চেয়ে দ্রষ্টব্য হচ্ছে, পীবর বুকের বাহার। সেই দিকে লাডউইক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু তার পরেই তাঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে জেগে উঠল যেন একটা প্রশ্ন—কোন অস্বাভাবিক উপায়ে ঐ বক্ষকে অমন উঁচু ক'রে তোলা হয়নি তো?

সে নীরব প্রশ্ন বুঝতে লোলার বিলম্ব হ'ল না, বহু পুরুষের মনের বনে-বনে এত দিন সে শিকার ক'রে এসেছে।

পাশের টেবিলে সে দেখতে পেলে একখানা কাঁচি। বিনা বাক্যব্যয়ে হাত বাড়িয়ে কাঁচিখানা নিয়ে সে তৎক্ষণাৎ নিজের জামার কাপড় কেটে বক্ষকে করলে নগ্ন।

লাডউইকের দৃষ্টি হয়ে উঠল বুভুক্ষু। মুখ তাঁর বোবা।

লোলাকে আর নাচতে হ'ল না। তার মস্ত প্রাসাদ, গাড়ী-ঘোড়া, অসংখ্য দাস-দাসী। দোকানে দোকানে সে সখের জিনিস কেনে এবং দোকানীর কাগজে সই ক'রে এই বলে নিজের পরিচয় দেয়—"মহারাজের উপপত্নী!"

নানা লোকে নানা কথা কয়। বুড়ো লাডউইক তাকে ডেকে বলেন, "মহারাজের উপপত্নী পদবী নয়। আজ থেকে তুমি হ'লে 'কাউন্টেস্ অফ ল্যাণ্ডস্‌ফেল্ড'। সই করবার সময়ে ঐ নামই ব্যবহার কোরো।"

আগে ছিল মিসেস্ জেমস, তার পর নর্ত্তকী লোলা মণ্টেজ, তার পর মহারাজের উপপত্নী, তার পর এখন সে কাউন্টেস অফ ল্যাণ্ডস্‌ফেল্ড। সে উপরে উঠেছে ধাপে-ধাপে। লাডউইকই তাকে আর একটি উপাধি দিয়েছিলেন—'মেয়ে-সয়তান'।

পরাক্রান্ত স্বাধীন ভূপতির আশ্রয় লাভ ক'রে লোলার প্রকৃতি হয়ে উঠল অধিকতর বন্য। তার হাতের চাবুক চলে আরো ঘন-ঘন, তার পোষা মাষ্টিফ কুকুর মানুষ কামড়াতে শিখেছে আরো ভালো ক'রে। লোলা পথে বেরুলে পথিকরা চটপট সরে পড়ে নিরাপদ ব্যবধানে। রাজা লাডউইক জানতেন, সুযোগ পেলে যে কোন দিন ক্রুদ্ধ ও অত্যাচারিত প্রজারা লোলাকে আক্রমণ করতে পারে। তাই তার প্রাসাদের ফটকে পাহারা দেয় সশস্ত্র পুলিশ। রাজপথেও তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে অস্ত্রধারী পাহারাওয়ালা।

লোলা রাজনীতি নিয়েও মাথা ঘামাতে ছাড়ে না। তার মুখের কথায় বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর চাকরি যায়। রাজার কাছে কোন দরখাস্ত পেশ করতে হ'লে লোকে আগে তার কাছে এসে ধরনা দেয়। বুড়ো রাজা হয়েছেন তার খেলার পুতুল, ওঠেন-বসেন তারই ইঙ্গিতে। সারা য়ুরোপ এই অভাবিত ও বিচিত্র প্রহসন দেখে অট্টহাস্য করতে লাগল। বাভেরিয়ার সম্মান লুটোতে লাগল পথের ধূলোয়।

একটা ঘৃণ্য গণিকা ও নর্ত্তকী হয়েছে মুকুটহীনা মহারাণী, তার স্বেচ্ছাচারে ও অত্যাচারে সবাই হয়ে উঠেছে জর্জ্জরিত, তার খেয়াল মেটাবার জন্যে রাজা উড়িয়ে দিচ্ছেন লাখো-লাখো টাকা,—প্রজারা

এ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলে না। অবশেষে রাজ্যব্যাপী বিদ্রোহ উপস্থিত হ'ল। কেবল লোলার তাসের প্রাসাদই ভেঙে পড়ল না, লাডউককেও ত্যাগ করতে হ'ল সিংহাসন।

মিউনিক থেকে যথাসময়ে সরে প'ড়ে লোলা আবার গিয়ে দেখা দিলে লণ্ডনে। আবার করলে এক জন সৈনিককে বিবাহ। ও দেশে এক স্বামী বর্ত্তমান থাকতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করলে শাস্তিভোগ করতে হয়। লোলার প্রথম স্বামী তখনও জীবিত ছিল। তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্তে ওয়ারেণ্ট বেরুলো। কিন্তু আবার সে চম্পট দিলে যথাসময়েই।

এবার তার আবির্ভাব হ'ল আমেরিকায়। সেখানে তৃতীয় বার বউ সেজে সংবাদপত্রের এক সম্পাদককে বিবাহ করলে। কিন্তু তাকেও তার বেশী দিন ভালো লাগল না। অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে আবার কিছু দিন ধরলে নর্ত্তকীর পেশা। তার পর দেখি পুনর্ব্বার লণ্ডনে গিয়ে সে "সৌন্দর্য্যের আর্ট" নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। লণ্ডন থেকে পুনর্ব্বার আমেরিকায়। সেখানে গিয়ে সে দুই বৎসর ধরে পতিতাদের উদ্ধার করবার ব্রত পালন করে। তার পর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে মারা পড়ে।

লোলার কার্য্য-স্থল হয়েছে ভারতবর্ষ, য়ুরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া। তার অঙ্গুলিনির্দ্দেশে শাসিত হয়েছে প্রকাণ্ড রাজ্য এবং তার জন্তে খসে পড়েছে এক স্বাধীন রাজার মুকুট। পৃথিবী-বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিকরাও তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তাকে সাধারণ নটী ব'লে ভাবলে ভুল করা হবে। সে হচ্ছে অত্যন্ত অসাধারণ নারী, একেবারেই অতুলনীয়।

১৩৫৭—১৩৫৮

বিগত ১৩৫৭ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্য্যন্ত যে সমস্ত বাঙলা ছায়াচিত্র মুক্তিলাভ করেছে তাদের জাতি-বিচার করা হয়েছে। যথা, * প্রথম শ্রেণী, * * দ্বিতীয় শ্রেণী, * * * তৃতীয় শ্রেণী, * * * * নিকৃষ্ট শ্রেণী এবং * * * * * নিকৃষ্টতম শ্রেণী বুঝতে হবে।

১।	১ বৈশাখ	কংকাল	*
২।	১ বৈশাখ	সন্ধ্যাবেলায় রূপকথা	* * * * *
৩।	২২ বৈশাখ	জাগ্রত ভারত	* * * * *
৪।	২৯ বৈশাখ	একই গ্রামের ছেলে	* * * * *
৫।	১২ জ্যৈষ্ঠ	দিগ্‌ভ্রান্ত	* *
৬।	১৯ জ্যৈষ্ঠ	পথহারার কাহিনী	* * * * *
৭।	২৬ জ্যৈষ্ঠ	বড় বৌ	* * *
৮।	২৬ জ্যৈষ্ঠ	রক্তের টান	* * * * *
৯।	১ আষাঢ়	সীমন্তিক	* * * *
১০।	৮ আষাঢ়	মহাসম্পদ	* * *
১১।	২২ আষাঢ়	কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে	* * * * *
১২।	২২ আষাঢ়	অপবাদ	* * * * *
১৩।	২৯ আষাঢ়	মাইকেল মধুসূদন	*
১৪।	২৬ শ্রাবণ	বানপ্রস্থ	* * * * *
১৫।	২ ভাদ্র	১০১ ধারা	* * * * *
১৬।	৮ ভাদ্র	সুধার প্রেম	* * * * *
১৭।	২২ ভাদ্র	দুধারা	* * * * *
১৮।	২৯ ভাদ্র	যুগদেবতা	* *
১৯।	১২ আশ্বিন	বিদ্যাসাগর	*
২০।	১৯ আশ্বিন	রূপকথা	* * * * *
২১।	১৯ আশ্বিন	সমর	* *
২২।	৩ কার্ত্তিক	পঞ্চায়েৎ	* * * *
২৩।	১৭ কার্ত্তিক	গরবিণী	* * *
২৪।	২৪ কার্ত্তিক	মেজদিদি	*
২৫।	৮ অগ্রহায়ণ	শেষ বেশ	* * * * *
২৬।	১৫ অগ্রহায়ণ	দ্বৈরথ	* * * * *
২৭।	২২ অগ্রহায়ণ	সতী সীমন্তিনী	* * * * *
২৮।	৬ পৌষ	সহোদর	* * * * *
২৯।	৬ পৌষ	মর্য্যাদা	* * * * *
৩০।	১৩ পৌষ	ইন্দ্রজাল	* * * * *
৩১।	২০ পৌষ	কূলহারা	* * *
৩২।	১২ মাঘ	ভক্ত রঘুনাথ	* * * * *
৩৩।	১৯ মাঘ	ওরে যাত্রী	* * * * *
৩৪।	১৯ মাঘ	অভিশপ্ত	* * * * *
৩৫।	১৯ মাঘ	অপরাজিতা	* * *
৩৬।	৪ ফাল্গুন	ছিন্নমূল	* * *
৩৭।	৪ ফাল্গুন	বরযাত্রী	* *
৩৮।	১১ ফাল্গুন	দর্পচূর্ণ	* * * * *
৩৯।	১১ ফাল্গুন	রত্নদীপ	*
৪০।	২৫ ফাল্গুন	রূপান্তর	* *
৪১।	২৫ ফাল্গুন	সহযাত্রী	* * * * *
৪২।	৯ চৈত্র	সে নিল বিদায়	* * * *
৪৩।	১৬ চৈত্র	ভৈরব মন্ত্র	* * * *
৪৪।	২৩ চৈত্র	পরিত্রাণ	* * * *
৪৫।	৩০ চৈত্র	নিয়তি	* * *

মানব-মানবী

(অপ্রকাশিত)

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
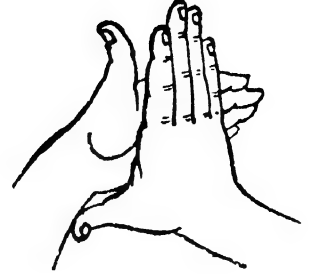
[পণ্ডিচেরীর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নাম বাঙলা দেশের সাহিত্য-রস-পিপাসুদের অজানা নয়। গত ১৪ই বৈশাখ তিনি পরলোক যাত্রা করেছেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে এই কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন। মনে হয় এই তাঁর শেষ রচনা।]

শান্ত এই মধু সন্ধ্যা বেলা
এসো বসি দু'জনায় সাগর-সৈকতে
তুমি আমি মানব-মানবী ;
আমি—দৃপ্ত জীবনের ভীম আলোড়ন,
তুমি—শান্ত সমাহিত কল্যাণরূপিণী।
দূরে কেন ? কাছে এসো—আরো কাছে—আরো কাছে,
এইখানে কাছে বসো শুভ্র আর সুকুমার হাতখানি তব
(স্নিগ্ধ আর নম্র-নত পল্লবের মতো)
লঘুভরে রাখি' মোর হাতে,
এলায়িত করি' কেশ বাতাসে বিথারি' দাও কুন্তল-সুরভি,
অঞ্চল নামায়ে রাখো বালুকার 'পরে,
তার পর শান্ত সমাহিত
কৃষ্ণতারা সুগভীর আঁখি দু'টি তব
রাখো মোর আঁখি 'পরে—
মোর দু'টি আঁখি 'পরে পুঞ্জীভূত স্মৃতির দর্পণে।
মোর দু'টি আঁখি-তারা পুঞ্জীভূত স্মৃতির দর্পণ—
সেথায় কি নেহারিছো আজি এই শান্ত সাঁঝ বেলা
কোনো দূর অতীতের ছবি অয়ি আয়ত-লোচনা ?
দেখিছো কি পৃথিবীর আদিম প্রভাতে ঘন বন-অন্তরালে কোনো
তন্বী-তনু তুমি ছিলে তরুণী রূপসী
প্রকৃতির আপন দুলালী যেন, অনাবৃত-দেহা।
আবরণ-আভরণ-হীনা ?
আমি ছিনু যাযাবর, বনে বনে ফিরি
বিজন-বিলাসে আর বাস্তবের স্পষ্টতার মাঝে,
নাই সুর নাই গান নাই কোনো ছবির আভাস
দিকে দিকে সমাপ্তির নিষ্ঠুর সীমানা ;—
কি জানি কি মনে ভাবি'
পুষ্পিত করিলে তব কুন্তল নিবিড়,
নীবিবন্ধ ঘিরি' দিলে পল্লবের জালে,
প্রকোষ্ঠ সাজায়ে নিলে বল্লরী-বলয়ে,
বনফুলে মালা গাঁথি' কণ্ঠেতে দোলায়ে দিলে
বক্ষের তারুণ্য ঘিরি' ;
তার পর এক দিন গুহা-দ্বার হ'তে তব আঁখি দু'টি তুলি'
চাহিলে আমার পানে কী এক রহস্য-ঘেরা সলজ্জ নয়নে—
কী যেন ঘটিয়া গেলো !
দিকে দিকে উঠিল সঙ্গীত,
সুরের মূর্চ্ছনা জাগি' করিল আকুল
অরণ্যানী জল স্থল আকাশ বাতাস
ফুলের সৌরভ আর পাখির কাকলি
অলির গুঞ্জন আর পত্রের মর্ম্মর,
কী যেন লাগিল দোল্ বক্ষের শোণিতে
কী যেন গহন বাণী কহিল অন্তর,
নিষ্ঠুর সমাপ্তি কোথা গেলো মিলাইয়া
একটি অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনার মাঝে,
কী যেন স্বপন ছিল সুপ্ত হ'য়ে জীবনেরে ঘিরি'
তাহারি সঙ্গীত-রেশ ছেয়ে দিল তনু-মন অপূর্ব পুলকে,
জীবন লভিল তার গভীর সন্ধান—
আজি এই শান্ত সাঁঝ বেলা
দেখিছো কি সে-কাহিনী মোর দু'টি নয়ন-দর্পণে ?

আজি এই শান্ত সাঁঝ বেলা
দেখিছো কি মোর দু'টি নয়ন-দর্পণে
অন্য এক দিন
বনানী-উপান্তে স্নিগ্ধ কুটীর-অঙ্গনে
তুমি ছিলে ব্যাধ-বালা,
আমি ছিনু বনে-ফেরা ব্যাধের বালক ?
ভীরু নত তব দু'টি নয়নের মাঝে
কী এক আলোক হেরি' লাগিল বিস্ময়,
আঁখির পল্লব ঘেরি' কী যেন কোমল মায়া রচে স্বপ্ন-তনু
জীবন-উদাস-করা,
উদাস বাঁশির সুর বাজি' ওঠে আকাশে-বাতাসে
বাজি' ওঠে দিবসে-নিশীথে
বাজে যেন জীবনের সকল অতীতে ;
ভাবি মনে—এত কাল কি ল'য়ে আছিনু মগ্ন,
কোন্ অর্থহীন যত খেলা-ধূলা আর
উপহাসে-পরিহাসে ভেবেছিনু সরস জীবন
কোন্ রিক্ততার মাঝে ভাবিতাম সার্থক সকল !
তোমারে ঘেরিয়া মন করে ঘুর-ঘুর
প্রাণ মোর ফিরি' ফিরি' যায়
তোমার অঙ্গন-তলে,
চিত্ত পায় অপূর্ব বিলাস এক কী অতুল সঙ্গীতের রেশে,
কী পুলকে মাতি' ওঠে গহন অন্তর !
তার পর এক দিন তোমার পুলক মেশে আমার পুলকে
তোমার আঁখির আলো খোঁজে তোমার নয়নের আলো
আমার জীবন মেলে তোমার জীবনে—
আজি এই শান্ত সাঁঝ বেলা
অয়ি স্বপ্ন-পসারিণি !
মনে পড়ে সে-কাহিনী চাহি' মোর নয়ন-দর্পণে ?

তার পর অন্য এক দিন,
মনে পড়ে
পাখি-ডাকা ছায়া-ঢাকা নিবিড় স্নিগ্ধতা-ঘেরা কানন-অন্তরে
ঋষির দুহিতা তুমি ফুটেছিলে বনফুল সম
লোকচক্ষু অন্তরালে আপন মাধুর্য মাঝে আপন সৌরভে ?
তুমি ছিলে আশ্রম-দুহিতা,
আমি ছিনু জ্ঞানার্জনে রত এক কিশোর তরুণ—
ষোড়শ বসন্ত তব তনু-লতা ঘিরিয়া সঙ্গীতে
বিহ্বল করেছে দিক দেশ বাসন্তী বিলাসে যেন,
ষোলটি শরৎ তার স্বর্ণাভ জ্যোতিঃর জালে
তব তনু-তটে-তটে আঁকিয়াছে সুকোমল আলিম্পন-রেখা,
বক্ষ আর নাহি রহে বন্ধন-শাসনে,
নয়ন মানে না বুঝি ব্রীড়ার বন্ধন,
গভীর পল্বল সম তব দু'টি আঁখির গহনে
কোন্ সে জগৎ এক ধীরে ধীরে জাগে
গহন ব্যথায় আর গভীর পুলকে
অনাহত গীতের ভাষায় !—
তার পর এক দিন কোন্ এক বসন্তের দিনে
কোন্ এক মধু শুভক্ষণে নিবিড় নির্জনে
বিশ্বব্যাপী এক মহা অপেক্ষার মাঝে
তোমার নয়ন মেলে আমার নয়নে :
চকিতে বিস্ময়ে
বিশ্বব্যাপী মধুর সায়রে এক ওঠে প্রভঞ্জন !
মধু মধু মধু মধু, মধুর তরঙ্গে দোলে আকাশের সীমা,
মধু ক্ষরে সমীরের দোলে,
মধু ঝরে শাখার দোলায়
পাতার কাঁপনে আর প্রসূনের বাসে,
মধু ঝরে আমের মঞ্জরী হ'তে অলির গুঞ্জন সাথে
মৃত্তিকার অণুতে অণুতে,
মধু মধু মধু মধু মধুময় মধু মহোৎসব
এ নিখিল বিশ্বের অঙ্গনে,
মধু ঝরে ঝর, ঝর, ঝর, ঝর,
হৃদয়ের গহন কন্দরে !
আজি এই শান্ত সাঁঝ বেলা
মনে পড়ে সে-কাহিনী হে স্বপ্ন-সঙ্গিনি
চাহি' মোর নয়ন-দর্পণে ?

তার পর অন্য এক কাহিনীর স্মৃতি।
তুমি ছিলে রাজবালা—আমি ছিনু রাজার কুমার,
তুরঙ্গমে চড়ি' আমি ফিরি দেশে দেশে
ফিরি আমি পথে পথে প্রান্তরে প্রান্তরে—
অনাদি অনন্ত পথ ডাকে—মোরে ডাকে—
কী এক রহস্য ঘন অসীম মায়ায়,
সে মায়া-অঞ্জন চোখে আমি চলি দিগন্তের পানে
প্রভাতে প্রদোষে বসন্তে বাদলে
শরতের সোনালী আলোকে
শীতের হিমেলী হাওয়ায়
কোন্ এক সুদূরের মরীচিকা-টানে—
আমি চলি—চলি—চলি,
মোরে ডাকে—ডাকে—ডাকে
পথের ইসারা শুধু,
প্রতিটি পথের বাঁকে কে যেন রাখিয়া গেছে হাতছানি তার,
তাহারি রহস্য মোরে করেছে উন্মনা !
সহসা একদা এক গোধূলি-বেলায়
পশ্চিম-গগন যবে ছেয়ে গেছে পদ্মরাগ-রাগে,
পাখিরা ফিরিয়া গেছে তাহাদের দূর কোন্ কানন-আবাসে,
প্রকৃতি হয়েছে মৌন,
হেরিলাম প্রাসাদ-শিখরে
আমার সকল স্বপ্ন সর্ব মরীচিকা
মূর্তিমতী হ'য়ে যেন ফুটিয়াছে একখানি মানবীর রূপে
একখানি সুকুমার তনুর সঙ্গীতে !
থামিল তুরঙ্গ মোর।
সেই রাজপথ 'পরে
তব নত নয়নের দৃষ্টি হ'তে নামে
কী যেন সান্ত্বনা এক পরমের রূপে,
পরম সান্ত্বনা সেই দেবতার আশীর্বাণী সম
জড়াইয়া ধরে যেন তনু মন প্রাণ
জুড়াইয়া দেয় যেন সকল জীবন :
ভাবি মনে—তুমি কি রাজার মেয়ে,
তুমি কি রাজার মেয়ে শুধু ?
কিম্বা যবে সুরাসুরে দোঁহে মিলি' করেছিল সাগর মন্থন,
মথিত সে সিন্ধু হ'তে উঠেছিলে লক্ষ্মীরূপে তুমি ?
উর্বশীর রূপে তুমি সুরসভা তলে
পুলক হিল্লোলে
মঞ্জীর ঝঙ্কারে আর গতির লাবণ্যে
বিচ্ছুরিয়া দিয়েছিলে ত্রিভুবনে সৌন্দর্যের গীতি ?
তপোবনে কণ্বের আশ্রমে
তুমি কি ফুটিয়াছিলে শকুন্তলারূপে
মাধুরী ও লালিত্যের চরম প্রকাশে ?
তুমি কি পার্বতীরূপে গিয়েছিলে ভুলাইতে পিনাকপাণিরে
তনুরে করিয়া পুষ্পকেতু-নিকেতন ?
তার পর নিদারুণ ক্ষোভে দুঃখে অসীম লজ্জায়
তপস্যা করিলে ঘোর
প্রেমেরে করিতে সত্য দেহের ওপারে ?
তুমিই কি শতখানে শত গৃহে শত শত রূপে
কিশোরীর মূর্তি ধরি'
ফুটিতেছ প্রেমের কমল সম যুগ-যুগান্তরে ?
সেই রাজপথ 'পরে
বচন-অতীত আমি রহিনু চাহিয়া এক গভীর বিস্ময়ে !
আজি এই শান্ত সাঁঝ বেলা
বহু বহু শতাব্দীর দীর্ঘ ব্যবধানে
মনে পড়ে সে-কাহিনী হে মৌনভাষিণি !

তার পর মনে পড়ে
শিপ্রাতীরে উজ্জয়িনী মহানগরীতে
তুমি ছিলে নাগরিকা আর আমি ছিনু নাগরিক ?
লোধ্ররেণু গণ্ডে মাখি' অলক্তক পদে,
পুষ্পদামে সাজায়ে কবরী,
কর্ণমূলে ভাসায়ে কুণ্ডল,
বাহুতে প্রকোষ্ঠে ঘিরি' কেয়ূর কঙ্কণ,
কটিতটে ঘিরিয়া কিঙ্কিণি,
শ্রোণিভারে দোলায়ে মেখলা,
চরণে সিঞ্জিনী-তালে রুণুঝুনু রুণুঝুনু তুলিয়া নিক্কণ।
তুমি চলে যেতে যবে রাজপথ 'পরে,
ভ্রমিতে শিপ্রার কূলে,
দাঁড়াইতে মন্দির-দুয়ারে
কী এক মধুর রসে তোমার সান্নিধ্যখানি উঠিত ভরিয়া ;
সন্ধ্যার রহস্যভরা প্রথম আঁধারে
তোমার নয়ন দু'টি কি-যেন-কি রহস্যের হ'ত নিকেতন ;
শর্বরীর বুকে
তব সর্ব অঙ্গ হ'তে বিচ্ছুরিত হ'ত মত্ত চম্পক-সৌরভ ;
তব কেশ-পাশ হ'তে, নয়ন-পল্লব হ'তে,
আঁখির চাহনি হ'তে,
গ্রীবার ভঙ্গিমা আর অধর-শোণিমা হ'তে,
বক্ষের তরঙ্গ হ'তে,
নীবিবদ্ধ শ্রোণিভার উরু জঙ্ঘা পদাঙ্গুল সর্বখান হ'তে
সহস্র নির্ঝর সম
ঝরিয়া পড়িত বিশ্বে রঙিন উৎসব—
উজ্জয়িনী মহানগরীতে
তুমি ছিলে নাগরিকা প্রদীপ্ত-যৌবনা
আর আমি ছিনু এক মুগ্ধ নাগরিক।
আজি এই শান্ত সাঁঝ বেলা
সে-কথা কি মনে পড়ে হে বিলোল-হিল্লোল-লোচনা ?

তার পর অন্য দিন
তুমি ছিলে এক পারে খঞ্জনা নদীর তীরে অঞ্জনা গ্রামের
কিশোরী বালিকা এক,
আমি ছিনু ওই পারে অন্য এক পল্লীর কিশোর—
দুই তীরে যেন দু'টি কপোত-কপোতী,
কোন্ স্বপ্নলোক যেন মুখরিত তাহাদের কূজনে কূজনে !
বিজন দুপুর বেলা—জ্যৈষ্ঠের দুপুর—ঘরে ঘরে রুদ্ধ দ্বার,
আমি আসি' বসিতাম ছিপ ল'য়ে হাতে
এই পারে নদীকূলে বটমূলে শীতল ছায়ায়,
তুমি সুচতুরা লাল সাড়িখানি পরি'
ওপারে নদীর কূলে কত ছলে আসিতে যাইতে :
দূরে বাজে রাখালের বেণু,
ডাহুক-ডাহুকী যত শরবনে ভাসে আর ডোবে,
বন্য কপোতের ডাকে উদাস প্রান্তর,
তারি মাঝে মধুময় রসে চলে সেতুর রচনা
এপারে ওপারে—দু'টি হৃদয়ের ব্যবধানে।
সন্ধ্যার প্রারম্ভে যবে মৃদঙ্গের ডিমি-ডিমি বোলে
ওপারে উঠিত হরি-কীর্ত্তনের রোল,
এপারে আমার চোখে উঠিত ভাসিয়া
সুচতুরা একখানি কিশোরীর মুখ,
শফরীর সম দু'টি চঞ্চল নয়ন,
একটি গ্রীবার মধু ললিত ভঙ্গিমা,
একটি মুখের হাসি নন্দন-বিজয়ী।
গভীর নিশীথে
আমি যবে এই পারে বিচ্ছুরিত বাঁশরির সুরে
উচ্ছ্বসিয়া তুলিতাম এ-পল্লীর আকাশ-বাতাস,
ওপারে কি ও-পল্লীর একটি কিশোরী মেয়ে
ঘুম ভাঙ্গি' জাগি' উঠি' হইত উন্মনা ?
তন্দ্রার উল্লাসে
মনে মনে বুনিত কি রঙিন্ স্বপন ?
খঞ্জনা নদীর তীরে অঞ্জনা গ্রামের
তুমি ছিলে কিশোরী বালিকা,
আমি ছিনু অন্য পারে কিশোর-বয়েসী।

কিন্তু থাক্ অতীতের কথা—
শান্ত এই মধু সন্ধ্যা বেলা
দিকে দিকে নামিতেছে যবে লঘু আঁধারের মায়াবিনী মায়া
সাগরের কূলে এই বসি' মোর কাছে
মোর হাতে লঘুভার রাখি' তব হাত
চাহি' মোর নয়নের পানে—দেখো,
বুঝিতে কি পারো এক মধুময় ভবিষ্যের মাধুর্য-কাহিনী।

আগামী সংখ্যায়

আত্ম-স্মৃতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রেডিও-অ্যাকটিভিটি

সাধনা মিত্র

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া (Artificial Radio Activity) প্রথম আবিষ্কৃত হয় আজ থেকে ষোল বছর আগে। কুরী আর জোলিয়ট উনিশশো চৌত্রিশ সালে বেতার ক্রিয়াশীলতা আবিষ্কার করেন। আলফা কণিকার সাহায্যে পোলোনিয়াম চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তা' থেকে অ্যালনিয়াম টেনে বার করা—এই ছিলো কুরী আর জোলিয়েটের পরীক্ষার বিষয়বস্তু, আর এই পরীক্ষা করেই তাঁরা দেখালেন যে, এই ক্রিয়াকালীন যে পজিট্রোনগুলো নির্গত হচ্ছিলো, সেগুলো আলফা কণিকাগুলো সরিয়ে নেওয়ার পর যে থেমে যায় তা নয়, সেগুলো সমভাবেই নির্গত হতে থাকে। এটা একটা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার—কারণ আলফা কণিকাগুলোর উৎসটার সাহায্যেই ওগুলো বেরোতে আরম্ভ করে অথচ উৎসটা সরিয়ে নিলেও ক্রমাগতই পজিট্রোন বেরোতে থাকে, শুধু তাই নয় সমান ভাগে আবার। এমন একটা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ক'রে তাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজে যথেষ্ট উত্তেজনার সাড়া জাগালেন। আর এই আবিষ্কারটি অনুসরণ করেই কয়েক জন বৈজ্ঞানিক আরো অনেক বেতার তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কার করলেন। নানা ধরণের খুব বেশী ভোল্ট-সম্পন্ন যন্ত্রপাতি, এক কথায় হাই ভোল্টেজ অ্যাপারেটাস ব্যবহার করলে ক্রিয়াটি খুব তাড়াতাড়ি হতে থাকে। কুরী আর জোলিয়েটের পরবর্ত্তী কালে কক্‌রফ্‌ট্‌, গিলবার্ট আর ওয়েলটন্ এই ধরণের যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। আলফা কণিকার তাড়িত নিক্ষেপণ (Charged Projectile)গুলোকে খুব বেশী ত্বরিত গতিময় করেছিলেন লরেন্স নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও তাঁর সমসাময়িক কর্ম্মীরা সাইক্লোট্রোনের মধ্য দিয়ে ওগুলোকে ব্যবহার করে। সাইক্লোট্রোন হচ্ছে চৌম্বক প্রতিধ্বনন (Magnetic Resonance) অ্যাক্‌সিলারেটর একটা। তড়িৎ-শক্তিকে জিইয়ে রাখার প্রয়োজনে টাভ্‌ আর হাফ্‌ট্টাভ্‌ নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয় একটা স্থৈতিক বিদ্যুৎ-উৎপাদক (Electro-static Generator) ব্যবহার করেছিলেন পরীক্ষা কালীন। উনিশশো চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ সালে ফার্ম্মী আর তাঁর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীর দল শুধু সোলোনিয়াম নয়, মৌলিক 'পদার্থগুলোর ভেতরকার নিউট্রন্‌গুলোকে বিধ্বস্ত করে যথেষ্ট তেজস্ক্রিয়া তৈরী করলেন। বলা বাহুল্য, এর ফলে রেডিয়ো অ্যাক্‌টিভিটি সম্বন্ধীয় আমাদের এ পর্য্যন্ত জ্ঞাতব্য তালিকাটি অনেক বড়ো হয়ে গেল—অনেক নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব জানা গেল। উনিশশো চৌত্রিশ সালের প্রথমে রেডিও অ্যাক্‌টিভিটি আবিষ্কৃত হোল মাত্র আর উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের শেষেই প্রায় হাজারটা বেতার মৌলিক পদার্থের (Radio elements) বিষয়ে জানা গেল। এই হাজারটি মৌলিক পদার্থের অন্তর্বর্ত্তী নিউট্রনকে বিধ্বস্ত করে কৃত্রিম বেতার তেজস্ক্রিয়া উৎপাদন করা আর প্রবর্ত্তিত বেতার তেজস্ক্রিয়ার একটা সম্পূর্ণ তালিকা করা হোল, যাতে পূর্ব্বোক্ত হাজারটা বস্তুর মধ্যে প্রায় আটশোটা বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হোল। আলোচ্য বিষয়টির ক্ষেত্রে এত বিরাট এবং ব্যাপক কাজ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে যে, এই ছোট্ট প্রবন্ধটিতে তাদের একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়াও অসম্ভব।

রেডিও এলিমেন্ট্‌স্‌ বা বেতার মৌলিক পদার্থগুলোর বিষয়ে কিছু জানতে হলে আগে আইসোটোপ কাকে বলে জানা দরকার। কারণ কৃত্রিম বেতার মৌলিক পদার্থগুলোর রাসায়নিক পরিচিতির ভিত্তিই হচ্ছে এই আইসোটোপের ধর্ম্মের ওপরে। দু'টো মৌলিক পদার্থ যাদের আণবিক ওজন (Atomic weight) এক, কিন্তু আণবিক সংখ্যা (Atomic Number) আলাদা—যেমন ধরা যাক, হেভি হাইড্রোজেন ও সাধারণ হাইড্রোজেন্—আইসোটোপের দৃষ্টান্ত। আইসোটোপগুলো সাধারণ রাসায়নিক ক্রিয়াতে ভালো ভাবে পৃথকীভূত হয় না—আর একটা বিশেষ মৌলিক পদার্থের বেতার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলো সাধারণ স্থায়ী আইসোটোপগুলোর মতোই গুণাগুণসম্পন্ন। Szilard and Chalmers প্রথম দেখালেন যে, ইথিল আয়োডাইডের মতো একটা নন্‌-আয়োনাইজিং জৈব (Organic) যৌগিক পদার্থ যদি নিউট্রনের সঙ্গে ইর্‌রেডিয়েট যাকে বলে দীপ্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করা যায়, তাহ'লে ইথিল আয়োডাইডের ($CH_2I.\ CH_3.$) মধ্যকার সাধারণ আয়োডিনের থেকে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন্ বিচ্ছিন্ন করা যায়। ক্রিয়াটির পরে কিছুটা অব্যবহৃত আয়োডিন্ স্বাধীন তেজস্ক্রিয় আয়োডিন বহনকারী হিসাবে যুক্ত হয়। তার 'পর আইয়োডিন আয়তনে যথেষ্ট কমে যায় এবং সিলভার আয়োডাইডে পুরো রেডিয়ো অ্যাক্‌টিভিটিটাই জমা হয়। এই ভাবে ঘনীভূত করণকে "Szilard-Chalmers" প্রক্রিয়া বলা হয়। তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলোকে ঘনীভূত করবার জন্যে এই ক্রিয়াটারই প্রচলন আছে।

দ্রবণ দু'টোর মধ্যে একটা সীমা-প্রাচীর দিলে রেডিয়ো-অ্যাকটিভ আইসোটোপ একেবারে খাঁটি অবস্থাতে পাওয়া যায়—বাহক দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না। গ্রেহাম্ আর সীবোর্গ এই পার্টিশনটা ব্যবহার করেছিলেন, ইথার আর ড' নর্ম্মাল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে—জিঙ্ক থেকে রেডিয়ো গ্যালিয়াম্ আর লোহা হতে রেডিয়ো কোবাল্ট এবং রেডিয়ো ম্যাঙ্গানিজ বিশ্লিষ্ট করার উদ্দেশ্যে।

উনিশশো উনচল্লিশ সালের জানুয়ারীতে হান্ আর ষ্ট্রাসমান নামক দুই বৈজ্ঞানিক একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে, স্লো অথবা ফাষ্ট নিউট্রন দিয়ে যদি ইউরেনিয়াম্ বিধ্বস্ত করা যায় তো মাঝারি আণবিক ওজনসম্পন্ন তেজস্ক্রিয় উৎপাদক জোড়ায় জোড়ায় বিদীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যাবে। ফার্ম্মী এবং সহকর্ম্মীরা নিউট্রন দ্বারা ইউরেনিয়াম্ বিধ্বস্ত (Bombard) করে এক পারম্পর্য্য ধারা রেডিও-অ্যাকটিভিটি পেলেন, যেগুলো রাসায়নিক পরীক্ষান্তে জানা গেল, "ট্রান্স-ইউরেনিক্" মৌলিক পদার্থ হিসাবে। মৌলিক সমস্ত ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে বেশী আণবিক সংখ্যা (atomic number) হচ্ছে তো ইউরোনিয়ামের—বিরানব্বই? কিন্তু এই পদার্থ যেগুলো পাওয়া গেল, এগুলোর আণবিক সংখ্যা বিরানব্বইয়ের চেয়ে বেশী, সুতরাং এরা ট্রান্স-ইউরেনিক্। ইউরেনিয়ামকেও ছাড়িয়ে গেছে। তেজস্ক্রিয় বেরিয়াম্ আইসোটোপ্ যে পাওয়া যায় নিউট্রন্-ইউরেনিয়ামের ক্রিয়ায় তা-ও পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হোল হানের

উইনষ্টন এস চার্চিল

বাল্যকাল

"কিন্তু আমি কখনও অমন বলি না"—সহজ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

এই হচ্ছে ক্লাসিকের (ল্যাটিনের) সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। শুনেছি, আমাদের মধ্যে অনেক চালাক লোক এই ক্লাসিক পড়ে প্রচুর লাভবান হয়েছেন এবং গভীর আনন্দলাভও করেছেন।

বার্চ গাছের বেত দিয়ে ছাত্রদের ঠেংগানো ছিল স্কুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাসের মধ্যে দু'-তিন বার স্কুলের সমস্ত ছাত্রকে লাইব্রেরীর মধ্যে ঢোকানো হত। সেখান থেকে দু'-তিন জন অপরাধীকে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে বেত মারা হত সমানে, যতক্ষণ না তাদের শরীরে বে-পরোয়া রক্তপাত হয়। বাকী ছেলেরা পাশের ঘরে বসে তাদের আর্তনাদ শুনত আর বসে বসে কাঁপত ঠকঠক করে। ওঃ, আমি যে কি প্রচণ্ড ঘৃণা করতাম এই স্কুলকে এবং দু'টি বছর কি উদ্বেগময় জীবন কাটিয়েছি! সব চেয়েও বেশী আনন্দ পেতাম পড়াশোনায়। সাড়ে ন' বছর বয়সে বাবার কাছ থেকে "ট্রেজার আয়ল্যাণ্ড" বই পেয়েছিলাম। বইটা যে কি ভীষণ আনন্দের সঙ্গে পড়েছিলাম, তা আজও মনে আছে। স্কুলের পড়ায় বেশী দূর এগোতে পারিনি। মাষ্টার মশাইরা দেখলেন, পড়াশুনায় তেমন সুবিধা করতে পারছি না কিন্তু বেশ এঁচড়ে পেকে গেছি—ফর্মের সব চেয়েও নীচু ক্লাসের ছাত্র হয়েও বড়দের বই পড়ি। তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁদের হাতে অনেক বাধ্যতামূলক আইন-কানুন ছিল, কিন্তু আমিও ছিলাম জেদী।

যাতে আমার যুক্তি, কল্পনা অথবা উৎসাহের স্থান নেই তা আমি শিখব না, শিখতে পারব না। যে বারো বছর আমি স্কুলে পড়েছিলাম, তার মধ্যে একটি দিনও কেউ আমাকে দিয়ে একটি ল্যাটিন পদও লেখাতে অথবা এক বর্ণমালা (অ্যালফাবেট) ছাড়া একটি গ্রীকও শেখাতে পারেনি। আমার শিথিল উৎসাহে উত্তেজনা দেবার জন্য তাঁরা বলতেন, মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন মজা পাওয়ার জন্য হোমর পড়তেন। আমারও মনে হয়, তাতে তিনি উপকৃতই হয়েছিলেন।

বয়স বারো বছর পেরুতে না পেরুতেই অবাঞ্ছনীয় পরীক্ষার রাজত্বে প্রবেশ করতে হল। পরীক্ষাগুলো আমার কাছে ছিল ভারী সঙ্কট-সঙ্কুল। পরীক্ষকদের কাছে যে যে বিষয়গুলি ছিল সব চেয়েও প্রিয়, খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেগুলোকে আমি সব চেয়েও বেশী অপছন্দ করতাম। আমি চাইতাম ইতিহাস কবিতা এবং রচনা লেখার ওপর পরীক্ষা নেওয়া হোক, কিন্তু শিক্ষকদের পক্ষপাতিত্ব ছিল ল্যাটিন এবং অঙ্কের ওপর। তা ছাড়া আমার ইচ্ছে হত, আমি যা জানি তার থেকে প্রশ্ন করা হোক। কিন্তু তাঁরা সব সময়ই আমার অজানা বিষয় থেকে প্রশ্ন করতেন। যখন আমি নিজেই আমার

মোটামুটি ভাবে আমার স্কুলের দিনগুলো কেটেছে যথেষ্ট নৈরাশ্যজনক ভাবে। আমার সহপাঠীরা সকলেই আমাদের ছোট জগতের পরিবেশের সঙ্গে সব রকমেই আমার চেয়েও বেশী ভাল কোরে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল বলে মনে হয়। খেলাধুলো এবং লেখাপড়া দুই ব্যাপারেই তারা আমার চেয়েও ঢের বেশী ভাল ছেলে ছিল। দৌড় প্রতিযোগিতার সুরুতেই একেবারে সকলের পেছনে পড়ে থাকা খুব আনন্দের ব্যাপার নয়।

আমার বয়স যখন সবে ন' বছর, তখনই সর্ব প্রথম আমাকে স্কুলে পাঠানো হবে বলে ভয় দেখানো হয়। বড়রা কথায় কথায় যাদের বলে 'বেয়াড়া ছেলে', ন' বছর বয়সেই আমি তেমনি বেয়াড়া হয়ে উঠেছিলাম। যদিও স্কুল সম্বন্ধে যত কথা আমি শুনেছিলাম, তাতে আমার মনে একটা বিরক্তিকর ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, এবং প্রকৃত অভিজ্ঞতায় সেই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল, তবুও আমার মনে হত বাড়ীর বাইরে অনেক ছেলের সঙ্গে একত্রে বাস করা বেশ মজার ব্যাপার হবে এবং আমরা বড় বড় অ্যাডভেঞ্চার করতে পারব। আমাকে বলা হয়েছিল যে, "জীবনে সব চেয়েও সুখের সময় হল স্কুলের দিনগুলি"। সব ছেলেই স্কুল-জীবন উপভোগ করে। আমাকে আরও বলা হয়েছিল যে, আমার মাসতুতো খুড়তুতো ভাইরা ছুটির সময়ও স্কুল ছেড়ে বাড়ী আসতে কষ্ট পায়। অবশ্য তাদের কাছে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তারা এ কথা স্বীকার করেনি, বরং দাঁত বার করে হেসেছিল।

নভেম্বরের এক ধূসর অপরাহ্নে যখন মায়ের বিদায়ী গাড়ীর আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে এল কানে, তখন আমাকে একটি ফর্ম ঘরে ঢুকিয়ে ডেস্কের সামনে বসতে বলা হল। অন্যান্য ছেলেরা সকলেই তখন ছিল বাইরে। ঘরে শুধু ফর্ম মাষ্টারের সঙ্গে আমি একা। তিনি একখানা কটা সবুজ মলাটের পাতলা বই বার করলেন।

"এটা হচ্ছে ল্যাটিন গ্রামার।" বইটা খুলে বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা পৃষ্ঠা ভাজ করে চেপে ধরে তিনি লাইনের কয়েকটি শব্দ দেখিয়ে বললেন, "এ সব তোমাকে শিখতে হবে। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসে দেখছি তুমি কতটুকু জানো।"

কল্পনা করুন একবার আমাকে। বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ব্যথিত হৃদয়ে 'মেনসা'র শব্দরূপ সামনে নিয়ে বসে আছি।

এ সবের মানে কি? আমার কাছে সবই অর্থহীন প্রলাপের মত লাগল। যাই হোক, একটা জিনিষ আমি সব সময়ই পারতাম—মনে মনে শিখে নিতে পারতাম।

যথা সময়ে মাষ্টার মশাই ফিরে এলেন।

"শিখেছ কি?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

বললাম, "আমার মনে হয় আমি ওটা পড়তে পারি সার," যা মনে এল পড়ে ফেললাম হড়বড় করে।

তিনি বেজায় খুশী হয়েছেন বলে মনে হল। আমিও সাহস পেয়ে একটা প্রশ্ন করে ফেললাম।

"এর মানে কি, সার?"

"ওতে যা বলা হয়েছে, ওর মানেটাও তাই। 'মেনসা'—একটি টেবল।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "তাহলে মেনসার মানে 'ও টেবল'ও হয় কেন, আর 'ও টেবল' মানেই বা কি?" তিনি বললেন, "মেনসা, ও টেবল, হচ্ছে ভোকেটিভ কেস। টেবলের সঙ্গে কথা বলবার সময় তুমি অমনি করে বলবে।"

জ্ঞানের বিষয় প্রকাশ করতাম, তখন তাঁরা আমার অজ্ঞানতা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতেন। এই ব্যবহারের একটি মাত্র ফল ফলত—আমি পরীক্ষায় ভাল করতে পারতাম না।

হ্যারোয় এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার সময় এই সত্য প্রকট হয়ে ওঠে। হেড-মাষ্টার ডাঃ ওয়েলডন অবশ্য আমার ল্যাটিন গদ্য সম্পর্কে উদার মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমার সাধারণ দক্ষতা বিচারে তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দেন। এ কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ ল্যাটিনের পেপারে আমি একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিনি। পাতার মাথায় নিজের নাম লিখেছিলাম। পরে লিখলাম প্রশ্ন—১। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সেই নম্বরের পাশে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম—(১)। ব্যাস! তার পর প্রাসঙ্গিক এবং সত্য বলে মনে হতে পারে, এমন কিছুর সঙ্গে এর যোগাযোগ আবিষ্কার করতে পারলাম না কিছুতেই। হঠাৎ খাতার ওপর দুই-একটা এলোমেলো দাগ পড়ল। পুরো দু'ঘণ্টা তাকিয়ে রইলাম এই করুণ দৃশ্যের দিকে। অতঃপর পরম দয়ালু শিক্ষক মশাই ফুলস্কেপের কাগজখানা চেয়ে নিলেন। ছাত্রবৃত্তির এই সামান্য আভাস থেকেই ডাঃ ওয়েলডন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, হ্যারোতে প্রবেশ করবার যোগ্যতা আমার আছে। এটা সত্যি তাঁর পক্ষে রীতিমত দক্ষতা। এর থেকেই বোঝা যায়, ভদ্রলোক বাহ্যাকার ভেদ করে ভিতরটা দেখবারও ক্ষমতা রাখতেন। কাগজে কেরামতির উপর তিনি নির্ভর করতেন না। আমি চিরকালই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল।

যথাসময়ে আমি সর্বনিম্ন ফর্মের সর্বনিম্ন ডিভিসন পাই। প্রায় বছর খানেক এই অস্বস্তিকর অবস্থায় থাকতে হয়েছিল। যাই হোক, অনেক দিন ধরে সর্বনিম্ন ফর্মে পড়ে থাকার ফলে চালাক ছেলেদের উপর টেক্কা দেবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলাম। তারা সকলেই ল্যাটিন, গ্রীক এবং ঐ ধরণের দামী দামী জিনিষ শিখতে গেল, কিন্তু আমাকে শেখানো হল ইংরাজি। আমরা এমন নির্বোধ বিবেচিত হলাম যে, ইংরাজি ছাড়া আর কিছু আমাদের শেখানো যায় না। আমি তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীতে অন্যান্য ছেলেদের চেয়েও তিন গুণ বেশী সময় কাটিয়েছি, তাই তাদের চেয়েও তিন গুণ বেশী ইংরাজি শিখেছিলাম এবং বেশ ভাল করেই শিখেছিলাম। এই ভাবে আমার অস্থিতে-অস্থিতে মজ্জায়-মজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল সাধারণ ইংরাজি বাক্য রচনার কলা-কৌশল। তাই ল্যাটিন ভাষায় কবিতা লিখে এবং গ্রীক ভাষায় ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করে পুরস্কার পাওয়া আমার স্কুলের বন্ধুদের ভরণ-পোষণের জন্য পরবর্তী কালে আবার নেমে আসতে হয়েছিল সাধারণ ইংরাজিতে, কিন্তু আমাকে তা করতে হয়নি। আমি কোন অসুবিধাই বোধ করিনি।

এটা খুবই অসঙ্গত মনে হয়েছিল সকলের কাছে যে, আমি যখন অনেক দিন ধরে সর্বনিম্ন ফর্মে ঘসটাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময় হেড-মাষ্টারের কাছে একটি মাত্র ভুল না করেও ম্যকুলের "লেইস অফ এনসিয়েণ্ট রোম" থেকে ১২০০ লাইন আবৃত্তি করে যে প্রাইজটা পেলাম, সেটার জন্য প্রতিযোগী ছিল স্কুলের সমস্ত ছেলে। তা'ছাড়া প্রাথমিক ফৌজী পরীক্ষায়ও আমি পাশ করে গেলাম, অথচ আমার চেয়েও উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা অনেকেই ফেল করে বসল। আমার বরাতটাও ছিল ভাল। আমরা জানতাম, অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে আমাদের যে কোন দেশের একটি মানচিত্র আঁকতে দেওয়া হবে। পরীক্ষার আগের দিন, কেন জানি না, আমি নিউজিল্যাণ্ডের ভূগোল এবং মানচিত্রটাকে ভাল করে তৈরী করে ফেলেছিলাম। পরদিন গিয়েই দেখি, প্রথম প্রশ্নটাই হচ্ছে "নিউজিল্যাণ্ডের একটি মানচিত্র অঙ্কন কর"। এর পর থেকে আমার সমস্ত শিক্ষাই ফৌজী ক্লাস থেকে স্যাণ্ডহার্ষ্টের দিকে পরিচালিত হয়। সরকারী ভাবে আমি হ্যারোর নিম্ন স্কুল থেকে কখনই পাশ করে বেরুইনি।

স্যাণ্ডহার্ষ্টে ঢোকবার আগে আমায় তিন-তিন বার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। পরীক্ষার বিষয় ছিল মোট পাঁচটা। তার মধ্যে অঙ্ক, ল্যাটিন এবং ইংরাজি ছিল বাধ্যতামূলক আর অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে আমার ছিল ফরাসী ভাষা এবং রসায়ন বিদ্যা। অন্তত তিনটি বিষয়ে ভাল ফল না হলে পাশ করা যাবে না। কাজেই আমাকে অঙ্ক দিকে জোর দিতে হল। ল্যাটিন আমি শিখতে পারব না। ফরাসী ভাষা মন্দ নয়, তবে তার মধ্যে বেশ একটু প্রতারণা আছে। থাকল শুধু অঙ্ক। আমি বেপরোয়া ভাবে অঙ্ক নিয়ে পড়লাম।

অবশ্য অঙ্ক বলতে সেই জিনিষই এখানে বোঝাচ্ছি যা খুব একটা প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করতে হলে জানা থাকার প্রয়োজন হয় বলে সিভিল সার্ভিস কমিশনাররা মনে করেন। যখন অঙ্ক নিয়েই লেগে পড়লাম, তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম 'সাইন' 'কোসাইন' এবং "ট্যানজেণ্টের" এক বিচিত্র দরদালানে এসে দাঁড়িয়েছি। বাইরে থেকে সেগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, বিশেষ করে যখন তাদের পরস্পরের গুণফল কষা হয়। আমার তৃতীয় এবং শেষ পরীক্ষায় এই 'কোসাইন' আর 'ট্যানজেণ্ট' নিয়ে উঁচু দরের স্কয়ার-রুট-কষা একটি প্রশ্ন ছিল। হয়ত এটি আমার সমগ্র পরবর্তী জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বয়ে আনত। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ আমি কয়েক দিন আগেই এর কুৎসিত মুখ দর্শন করেছিলাম এবং প্রথম দর্শনেই চিনতে পেরেছিলাম।

তার পর থেকে আর কখনও এই জীবগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। তৃতীয় পরীক্ষায় পাশ করার পর তারা হাওয়া হয়ে গেল দুঃস্বপ্নের ছায়াবাজির মত। শুনেছি, ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাষ্ট্রনমি এবং ঐ জাতীয় ব্যাপারে ওগুলোর একান্ত প্রয়োজন হয়। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, পৃথিবীতে এ সব সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী বহু লোক জন্ম গ্রহণ করেন, যেমন জন্মান বড় বড় দাবা-খেলোয়াড়—এক নাগাড়ে ১৬ দান খেলে মারা যান সন্ন্যাস রোগে।

আসল কথাটা হল এই যে, আমাকে যদি কেউ কোসাইন এবং ট্যানজেণ্ট নিয়ে কোন প্রশ্ন করত, তা'হলে বোধ হয় আমি সেই বয়সেই গীর্জায় গিয়ে গোঁড়া ধর্মতত্ত্ব প্রচার করে বেড়াতাম। অথবা সহরে গিয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলতাম।

এক কথায় বলা চলে, আমার স্কুলের সময়টা জীবনের সব চেয়েও নিষ্ক্রিয় এবং অসুখী অবস্থায় কেটেছে। আমি যদি রাজমিস্ত্রীর যোগানদার অথবা চিঠি-বওয়া পিওন হতাম, তা'হলে সেই হত স্বাভাবিক এবং বাস্তব। তাতে অনেক কিছু শিখতে পারতাম।

আমি পাবলিক স্কুলের পক্ষপাতী বটে, তবে আর আমি সেখানে ফিরে যেতে চাই না।

অনুবাদক—সুনীল ঘোষ।

গত ২০শে ফাল্গুন তারিখের 'বসুমতী-সাহিত্য-সভায়'—"জনসাধারণের গ্রন্থাগার" নামে যে প্রবন্ধ বার হয়েছে, তাতে গ্রন্থাগার জনসাধারণের নৈতিক উন্নতি ও পার্থিব সুখের জন্তে কত দূর প্রয়োজনীয় তা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি যাঁরা পড়েছেন, আশা করি তাঁরা অন্ততঃ এটুকু বুঝেছেন যে, গ্রন্থাগারের কাজ কেবল বই দেওয়া ও বই ফেরৎ নেওয়া নয়। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব-মনের ও মানব-সমাজের উন্নতি করা, সুতরাং গ্রন্থাগার যাতে ভালো ভাবে পরিচালনা হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার।

গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে চিন্তা করবার আগে একটা কথা মনে রাখতে হবে—গ্রন্থাগারের একটা প্রধান চরিত্র হচ্ছে যে, গ্রন্থাগার মানুষের মত ক্রমবর্দ্ধমান। শিশু জন্মায়, সে বড় হয়, ক্রমশঃ তার যৌবন ও বার্দ্ধক্য আসে এবং শেষে আসে মৃত্যু—কখনও স্বাভাবিক মৃত্যু কখনও অকাল-মৃত্যু। গ্রন্থাগারের পরিচালনার অভাবে অকাল-মৃত্যু হতে পারে কিন্তু তার স্বাভাবিক মৃত্যু নেই। সুতরাং যত দিন যাবে, পুস্তকাগারের কলেবরও বাড়তে থাকবে।

কোন গ্রন্থাগারের পরিচালনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে গেলে তা সব সময় ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে। তা না করলে পরিচালনের ব্যবস্থাকে বার বার ভেঙ্গে গড়তে হবে।

গ্রন্থাগার পরিচালনা

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

আমরা এ প্রবন্ধে গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে যা বলবো তা সকল প্রকার গ্রন্থাগারের পক্ষেই প্রযোজ্য, এমন কি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের পক্ষেও তা কাজে লাগবে।

গ্রন্থাগার পরিচালনা কার্য্যকে নিম্নলিখিত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়:—

(ক) বই কেনা বা সংগ্রহ করা।
(খ) পত্রিকার হিসাব রাখা।
(গ) বই দেওয়া ও ফেরৎ নেওয়া।
(ঘ) পুস্তকের যত্ন লওয়া।

গ্রন্থাগার পরিচালনার আরও অন্যান্য দিক্ আছে কিন্তু তাহা আমাদের উপস্থিত প্রবন্ধের বিষয়ীভূত করা ঠিক হবে না।

(ক) বই কেনা

নূতন বই যা-কিছু কেনা হয় তার বেশীর ভাগই প্রথম গ্রন্থাগারিকের দ্বারা নির্বাচিত হয়। পুস্তক নির্বাচন করা বড় সোজা কাজ নয়। বই কেনা হলো অথচ সে বই যদি কাজে না লাগে তাহলে সে রকম বই মঞ্চে ভরে রাখার কোন মানে থাকে না। পুস্তক নির্বাচন বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা পরে আর একটি প্রবন্ধে বলবো। এখানে কেবল এইটুকু মাত্র বলে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, যাদের জন্তে বই কেনা, তাদের কাজে লাগবে এরূপ বই যাতে কেনা হয়, সব সময় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

কতকাংশ বইয়ের প্রস্তাব পাঠকদের কাছ থেকে আসে।

প্রস্তাব কার্ড

প্রস্তাবিত পুস্তকের বিবরণ নিম্ন-অঙ্কিত একখানি কার্ডে লিখে রাখতে হয়। পাঠকদের প্রস্তাবের জন্ত একখানি খাতা রাখা প্রয়োজন। পাঠক নিজে হাতে তার প্রস্তাব খাতায় লিখে দেবে। গ্রন্থাগারিক তার নির্বাচিত বইয়ের বিবরণ সরাসরি "প্রস্তাব কার্ডের" উপর লিখবেন। "প্রস্তাব কার্ডে" প্রস্তাবকারীর নাম ও ঠিকানা থাকা চাই, কারণ পাঠকের দ্বারা প্রস্তাবিত বই কেনা হলে, পাঠককে সে সংবাদ দেওয়া দরকার। তাতে পাঠককে বই পড়বার জন্তে উৎসাহিত করা হয়।

প্রস্তাব কার্ডের নমুনা

কার্ডখানির অপর পিঠে থাকবে প্রস্তাবকারীর নাম, ঠিকানা ও প্রস্তাবের তারিখ।

পুস্তকের প্রস্তাবের জন্ত পর পৃষ্ঠার নমুনা অনুযায়ী কার্ড ছাপিয়ে রাখতে হয়। পুস্তকের প্রত্যেক প্রস্তাব অনুযায়ী কার্ডে লেখকের নাম, পুস্তকের নাম, প্রকাশকের নাম ও মূল্য লেখা হলো। পরে কার্ডগুলি নিম্নের নমুনা অনুযায়ী একটি ট্রে'তে রাখতে হয়।

আজ-কাল পুস্তকাগারের যা কিছু কাজ সবই কার্ডের আর ট্রের দ্বারা হয়ে থাকে। খাতা লেখার পাট অনেক দিন উঠে

ডাক নং……………প্রবেশ তাঃ……………প্রবেশ নং……………

লেখকের নাম……………………………………

বইয়ের নাম……………………………………

প্রকাশকের নাম……………………………………

মূল্য……………কমিটির মত……………

অর্ডারের তাঃ……………বিক্রেতার নাম……………

মূল্য দেওয়ার তারিখ……………মূল্য……………

গেছে, অবশ্য আমাদের দেশের গ্রন্থাগারে এখনও খাতার প্রচলন রয়েছে, তার কারণ এ দেশের জনসাধারণ এখনও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন নয়।

নিচের নমুনা অনুযায়ী একটি ট্রে'র প্রয়োজন। ট্রের ভিতর ৮টি খাপ থাকবে। প্রস্তাব কার্ডগুলি যথাযথ ভাবে পরিপূরণ করে প্রথম খাপে রাখুন কমিটির অনুমোদনের জন্যে। যে বইগুলি কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হলো, সেই বইয়ের কার্ডগুলিতে কমিটির অনুমোদনের তারিখ দিয়ে দ্বিতীয় খাপে রাখুন। যে বইগুলি অনুমোদিত হলো না, সেগুলি "বাতিল"-এর ঘরে রাখুন।

এর পর বই কেনা আরম্ভ হলো। যে যে বইগুলি কিনতে হবে সেগুলির আর একখানি করে কার্ড লিখুন। কার্ডগুলি প্রস্তাব কার্ডের মতই হবে, কেবল প্রস্তাবকের নাম-ঠিকানা কিছু থাকবার প্রয়োজন নেই। যে দোকান থেকে বই কেনা হবে, সেই দোকানের নাম দুইখানি কার্ডেই লিখুন। প্রথম কার্ডখানি তৃতীয় থাকে রাখুন এবং দ্বিতীয় কার্ডখানি অর্থাৎ দ্বিতীয় বার যে কার্ডগুলি লেখা হলো, সেগুলি একখানি পত্র সমেত বিক্রেতার নিকট পাঠিয়ে দিন।

প্রস্তাব কার্ডের ট্রে

পত্রের নমুনা

মহাশয়!

পত্র-সংলগ্ন কার্ড অনুযায়ী বইগুলি যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। প্রত্যেক বইয়ের সহিত বইয়ের কার্ডখানি ফেরৎ দিবেন। প্রত্যেক বইয়ের মূল্য নির্দেশ করা আপনার বিলের দুই প্রস্থ পাঠাইবেন। কোন পুস্তকের সংস্করণ নির্দেশ করা না থাকলে পুস্তকের নবতম সংস্করণ পাঠাবেন।

ইতি—

গ্রন্থাগারিক।

এবার বই আসতে আরম্ভ হলো। বই যেমন যেমন আসবে সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের ভিতরের কার্ডগুলি তৃতীয় খাপে রাখা কার্ডগুলির সহিত মিলাইয়া দুইখানি কার্ডেই পুস্তক প্রবেশের তারিখ ও প্রবেশ-নম্বর লিখিয়া তৃতীয় খাপের কার্ডগুলি চতুর্থ খাপে রেখে বইগুলি পুস্তকের জাতি-বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দিন। বইয়ের সহিত যে কার্ডগুলি ফেরৎ আসছে সেগুলি একটি ট্রের ভিতর পুস্তক প্রবেশের তারিখ ও প্রবেশ নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে রাখুন। এ কার্ডগুলি পরে কাজে লাগবে।

যে বইগুলি জাতি-বিচারের জন্য পাঠানো হলো, সেগুলি ফেরৎ এলে বইগুলির ডাকনাম দুইখানি কার্ডে লিখে চতুর্থ খাপের কার্ডগুলি পঞ্চম খাপে রেখে বইগুলি পাঠিয়ে দিন তালিকা প্রস্তুত করবার জন্য।

বইগুলির তালিকা প্রস্তুত হয়ে ফিরে এলে, পঞ্চম খাপের কার্ডগুলিতে ও অন্য ট্রে'তে রাখা কার্ডগুলিতে তালিকা প্রস্তুতের তারিখ (তালিকা কার্ডের পিছনে থাকবে) বসিয়ে দিন। এখন বইখানি আপনার পুস্তকাগারের মজুত বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো। বইয়ের প্রস্তাব থেকে আরম্ভ করে পুস্তকের তালিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বই সম্বন্ধে সমুদয় সংবাদ সমন্বিত হয়ে আপনার হাতে প্রত্যেক বইয়ের দরুণ দু'খানি করে কার্ড জমলো।

প্রত্যেক গ্রন্থাগারে পরিচালনার জন্য দু'টি তালিকা রাখা একান্ত প্রয়োজন: ১। পুস্তকাগমনের তালিকা ও ২। মঞ্চ-তালিকা। মঞ্চ-তালিকার কথা আমরা পরে বলবো।

১। পুস্তকাগমনের দৈনন্দিন তালিকা: এই তালিকা থেকে শেষ বইখানির সংখ্যা দেখে বলা যায়, আজ পর্য্যন্ত পুস্তকাগারে কত বই কেনা হয়েছে। শেষ সংখ্যাটি যে পুস্তকাগারের পুস্তক-সংখ্যা নির্দেশ করবে তার কোন মানে নেই, কারণ পুস্তকাগারের বই মাঝে মাঝে বাতিল করা হয়। তবে আনুমানিক সংখ্যা নির্দেশ করে বলতে পারেন।

বইয়ের আগমনের সংখ্যা কার্ডের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বই কেনার কাজ শেষ হলো। এইবার কার্ড দু'খানির একখানিকে পুস্তকাগমনের দৈনন্দিন তালিকারূপে ও আর একখানিকে শেল্ফ তালিকারূপে ব্যবহার করুন।

এই দু'টি তালিকা কাজের উপযোগী করে রাখবার জন্যে টানা-দেওয়া দু'টি দেরাজ চাই:—

একটি দেরাজে প্রত্যেক বইয়ের কার্ড পুস্তকাগমনের দৈনন্দিন সংখ্যা অনুযায়ী সাজিয়ে রাখুন।
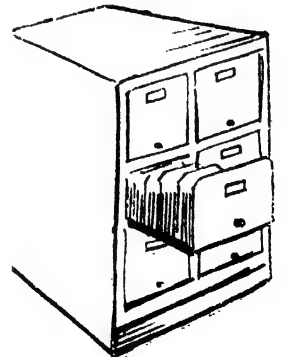
আর একটি দেরাজে কার্ডখানি পুস্তকের জাতির সংখ্যা অনুযায়ী সাজিয়ে রাখুন।

এক কাজে দু' কাজ শেষ করার এই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

আধুনিক গ্রন্থাগারের পরিচালনার বেশীর ভাগ কাজই কার্ড-ট্রে-দেরাজ এই পন্থায় হয়ে থাকে।

২। বই দেওয়া-নেওয়া

বই দেওয়া-নেওয়ার হিসাব রাখবার নানাবিধ উপায় আছে। যে রকম উপায়ই আমরা অবলম্বন করি না কেন, বই দেওয়া-নেওয়ার উপায় থেকে অন্তত তিনটি বিষয়, প্রয়োজন হলে অনতিবিলম্বে জানতে পারা যাওয়া চাই। ১। কার কাছে বই আছে; ২। কি বই কার কাছে আছে; ৩। কি বই কখন কে ফেরৎ দেবে।

বই দেওয়া-নেওয়ার হিসাব রাখবার উপায়ের প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিষ:—

ক। নির্গত বইয়ের ট্রে (১৭″×২½″×৩¾″)

খ। তারিখ নির্দেশক। প্রতি দিনের নির্গত বইয়ের পরিচয়-পত্র এই নির্দেশক-গুলির পিছনে, পুস্তকের জাতি-বিচারের সংখ্যা অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা হয়।

তারিখ নির্দেশক

গ। কাঠের ঠেকনা। কার্ডগুলিকে সোজা করে রাখবার জন্য ট্রের ভিতর এই ঠেকনা রাখার প্রয়োজন হয়।

ঘ। পুস্তকের পরিচয়-পত্র: একখানি ২″×১½″ পরিমিত পুরু ও শক্ত কার্ড বইয়ের পিছনের মলাটের ভিতর দিকে রাখা থাকবে। পরিচয়-পত্রের উপর লেখকের নাম বইয়ের নাম ও বইয়ের নম্বর থাকবে। এই কার্ডখানিকে একটি ট্রের ভিতর নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে রাখলেও চলে।
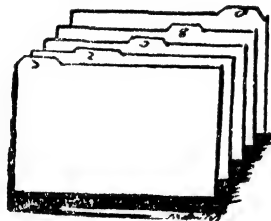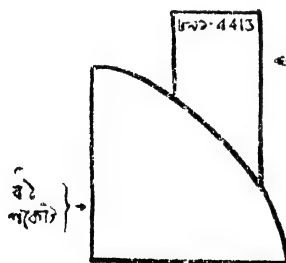
৮৯১·4413

বই-কার্ড

বই পকেট

গ্রাহকের নাম ঠিকানা

তারিখ

পুস্তকাগারের নাম

ঙ। গ্রাহকের পরিচয়-পত্র: পরিচয়-পত্রে গ্রাহকের নাম-ঠিকানা ও প্রয়োজন হলে গ্রাহকের নম্বর ও নিচের দিকে পুস্তকাগারের নাম। কার্ডের নিচের দিক থেকে কিছু উঁচুতে একটি পকেট।

চ। বইয়ের প্রচ্ছদপটের ভিতর দিকে একটি তারিখ-নির্দেশক পত্র থাকবে। এই পত্রের উপর বই-নির্গমন সম্পর্কে নিয়ম লেখা থাকবে।

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে। ১৫ দিনের বেশী রাখলে সপ্তাহে এক আনা হারে জরিমানা দিতে হবে।

এইবার মনে করুন আপনি বই দিচ্ছেন। গ্রাহক একটি ছাপা কাগজে তার কি বই চাই লিখে দিন। এই কাগজখানি এইরূপ হবে:—

পুস্তকাগারের নাম

লেখক……………………………

বইয়ের নাম…………………………

বইয়ের নম্বর…………………………

গ্রাঃ নাম……………………………

ঠিকানা……………………………

গ্রাঃ নং……………………তারিখ·

বইখানি আপনার কাছে এলো। আপনি বইখানির পিছন দিক হতে বইয়ের পরিচয়-পত্রখানি খুলে নিলেন। পুস্তকের পরিচয়-পত্র যদি বইয়ের ভিতর না রেখে ট্রেতে রাখা হয়, তাহলে ট্রেখানি আপনার পাশেই থাকবে এবং সেই ট্রের ভিতর পুস্তকের পরিচয়-পত্রগুলি বইয়ের নম্বর অনুযায়ী সাজান আছে। বইখানির নম্বর দেখে, ট্রে থেকে পুস্তকের পরিচয়-পত্রখানি বার করে নিন। গ্রাহকের পরিচয়-পত্রখানি চেয়ে নিন। তার পর বইয়ের প্রচ্ছদপটে আঁটা তারিখের লেবেলে যেদিন বই ফেরৎ দিতে হবে সেই দিনের তারিখ

দিয়ে বইখানি গ্রাহককে দিয়ে দিন। তার পর গ্রাহকের টিকিটের পকেটে বইয়ের টিকিটখানি রেখে, মিলিত পত্র দু'টি তারিখ

নির্দেশকের পিছনে রেখে দিন। পুস্তকাগার বন্ধ হবার আধ ঘণ্টা আগে মিলিত পত্রগুলিকে নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে ট্রের পিছন দিকে রেখে দিন। ট্রের পিছন দিকে নতুন ও সামনের দিকে ক্রমশঃ পুরাতন তারিখের মিলিত পত্রগুলি থাকবে। ফলে যেদিন যে বই ফেরৎ আসবার কথা, সেই সেই বইয়ের মিলিত পত্রগুলি আপনা থেকে সমুখে এসে পড়বে। সকালে পুস্তকাগারে এসে সামনের তারিখ-নির্দেশক পত্রের পিছনে যে মিলিত পত্রগুলি পাবেন, সেগুলি বার করে নিয়ে গ্রাহককে পত্র দিন। চিঠিখানি একটু মিষ্টি করে লিখবেন। রূঢ়তা যেন একটুও থাকে না। জরিমানার কথা, চিঠি পাঠানর খরচা সবই লিখবেন কিন্তু সবই মিষ্টি করে লিখবেন। চিঠিতে বিন্দুমাত্র হুকুমের ভাব থাকলে গ্রাহক চটে যাবে।

বই দেওয়ার কাজ তো শেষ হলো। এইবার বই ফেরৎ নেওয়া। গ্রাহক বই নিয়ে এলো। আপনি মিলিত পত্রখানি বার করে নিয়ে, বইয়ের পরিচয়-পত্রখানি বার করে নিয়ে গ্রাহকের পরিচয়-পত্র গ্রাহককে ফিরিয়ে দিয়ে, বইয়ের পরিচয়-পত্রখানি যথাস্থানে রেখে দিন। এইখানেই বই দেওয়া-নেওয়ার কাজ শেষ হলো। একটি কথাও আপনাকে লিখতে হলো না অথচ কার কাছে কি বই আছে এবং কবে বইখানি ফেরৎ আসবে, তার সব সন্ধানই আপনার কাছে রইলো।

গ্রাহক যে কাগজে বইয়ের জন্য প্রার্থনা করল, সে কাগজগুলি এইবার বইয়ের নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে ফেলুন। প্রতি মাসের শেষে এই কাগজগুলির (প্রার্থনা-পত্র) সাহায্যে পুস্তক নির্গমনের বিবরণী তৈরি হবে। পুস্তক নির্গমনের বিবরণী অতি প্রয়োজনীয়—ইহা সাধারণের পুস্তক-চাহিদার মাপকাঠি।

গ্রাহকের নাম রেজিষ্ট্রি

কেহ গ্রাহক হইতে চাহিলে তাকে প্রথমে একটি আবেদন করতে হবে। আবেদন-পত্র নিম্নলিখিত নমুনা অনুযায়ী ছাপা থাকবে :—

পুস্তকাগারের নাম

(গ্রাহক হবার আবেদন-পত্র)

পুরা নাম..

ঠিকানা..

কর্ম্মস্থলের ঠিকানা..

তারিখ........................

গ্রাহক নং..............জমা..................তারিখ..............

আমি গ্রাহকের পরিচয়-পত্র সম্বন্ধে সমুদয় নিয়ম পড়িয়া পরিচয়-পত্রের জন্য আবেদন করলাম। গ্রাহকের পরিচয়-পত্র সম্বন্ধীয় সমুদয় নিয়ম মানতে বাধ্য রইলাম।

আবেদন-পত্রখানি পূরণ করে দেবার পর গ্রাহককে একখানি পরিচয়-পত্র দেওয়া হবে। সেই পরিচয়-পত্রে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও

গ্রাহকের আবেদন-পত্রগুলি নামের বর্ণমালা অনুযায়ী একটি দেরাজের টানায় সাজিয়ে রাখুন।

গ্রাহকের পরিচয়-পত্র সাধারণতঃ প্রতি বৎসর নূতন করে করে নিতে হয় এবং নতুন করে নেবার সময় গ্রাহককে নূতন করে আবেদন করতে হয়। গ্রাহকের নম্বর প্রতিবার নতুন করে না করে একই নম্বর বছরের পর বছর চালানো যায়। এইরূপ করতে হলে নিম্নলিখিত নমুনা অনুযায়ী একখানি খাতা ব্যবহার করতে হয়।

নং	১১৪৮ নাম	১১৪৯ নাম	১১৫০ নাম
১	অক্ষয় নন্দী	অক্ষয় নন্দী ১, ডিসেম্বর	অক্ষয় নন্দী ৪, নভেম্বর
২	অমলা দেব	চন্দ্রনাথ বন্দ্যো ৪ঠা আগষ্ট	
৩	চিত্ত বন্দ্যো		
৪			

আবেদন-পত্রের নাম প্রথম সারির যে নং খালি আছে সেই নম্বরে লিখুন। এই নম্বরটি আবেদন-পত্রে ও গ্রাহকের পরিচয়-পত্রে দিন। তারিখ লিখুন নামের উপরে। অক্ষয় নন্দী যখন তার পরিচয়-পত্র নতুন করে নিলে, ২য় সারিতে তারই নংএ তার নাম লিখুন, তারিখ দিন তার নামের নিচে। অমলা দেব নতুন করে গ্রাহক হলো না, তার স্থানটি নতুন কোন গ্রাহককে দিন

নতুন করে গ্রাহক হবার জন্তে এখনও আবেদন করেনি—আবেদন করবার সময় আছে, সেই জন্ত তার স্থান খালি পড়ে আছে।

যে পরিচয়-পত্রগুলি নতুন করা হলো না, সেই সব গ্রাহকের আবেদন-পত্র নষ্ট করে ফেললেই কাজ মিটে গেল এবং তাদের পরিচয়-পত্রের স্থলে নূতন আবেদনকারীদের আবেদন-পত্রগুলি নাম রেজিষ্ট্রির নম্বর সমেত রেখে দিন।

টিকিট নতুন করে নেবার নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষাও অন্ততঃ আরও তিন মাস অপেক্ষা করার পর তবে গ্রাহকের নাম কেটে দিতে হয়।

পত্রিকার হিসাব

সাধারণ ছোট-খাটো পুস্তকাগারে যেখানে কয়েকখানা মাত্র পত্রিকা নেওয়া হয় সেখানে পত্রিকার হিসাব রাখা এমন কিছু একটা সমস্যা নয়, কিন্তু বড় বড় পুস্তকাগারে কিংবা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাগারে পত্রিকার হিসাব রাখা একান্ত দরকার। কোন পত্রিকা যথাসময়ে এলো কি না, পত্রিকা না আসার জন্ত প্রকাশককে

বসুমতী				মাসিক								
৭ তারিখ				১২৲ বাৎসরিক						বঃ সাঃ মঃ		
বৈশাখ—চৈত্র									সূচি চৈত্র			
	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১৯৫০	* * * * * * * * *			* * সা * *	* * প্তা * *	* * হি * *	* * ক * *					
১৯৫১	* * * * * * * * *				মা *	সি *	ক *	প *	ত্রি *	কা *	*	*
১৯৫২	* * * * * * * * *											
১৯৫৩	* * *											

পত্র লেখা, কোন্ পত্রিকার কত খণ্ড আছে—কোন্ খণ্ড নাই এ সমুদয় সংবাদ নখ-দর্পণে থাকা চাই।

পত্রিকার হিসাব রাখবার জন্ত প্রয়োজন উপরের নমুনা
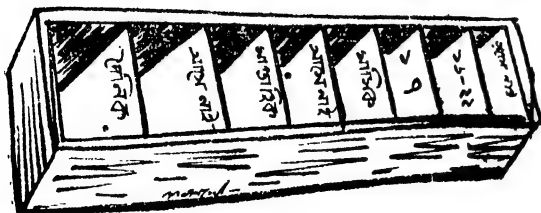
অনুযায়ী ছাপা কার্ড, আর একটি ট্রে। প্রত্যেক কার্ডে উপরের নমুনা অনুযায়ী পত্রিকার বিবরণ লেখা থাকবে। দৈনিকের কার্ডগুলি ট্রের "দৈনিকের" খাপে, সাপ্তাহিক "সাপ্তাহিকে"র খাপে থাকবে।

দৈনিকের বেলা কার্ডের ঘরগুলি উপর নিচে ব্যবহার করুন এবং প্রতিদিন যেমন কাগজ পাচ্ছেন একটি করে * চিহ্ন দিন।

দৈনিক পত্রিকার হিসাব একখানি কার্ডের উপর দুই বৎসরের রাখা যাবে।

সাপ্তাহিকের বেলায় ঘরগুলি আড়াআড়ি ভাবে ব্যবহার করুন।

মাসিক পত্রিকার বেলা প্রতি ঘরে একটি করে × দিয়ে দেওয়া মাত্র কাজ।

যে দিনের, যে সপ্তাহের ও যে মাসের যে কাগজ এলো না, সেই কাগজের কার্ডখানি তুলে নিয়ে "আসে নাই" ঘরে রাখুন এবং প্রকাশককে তাগিদ-পত্র দিন।

প্রতিদিন সকালে এসে একবার করে পত্রিকার ট্রে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, কি কাগজ আসতে বাকি আছে। মাসিক পত্রিকার খাপ; দু'টি-একটি ১ হতে ৭ তারিখের মধ্যে যে পত্রিকাগুলি আসে, আর একটি ১৬ হতে ২২ তারিখের মধ্যে যে সব পত্রিকা আসবে, আর একটি ২৩ হতে ৩১ ঘর থাকলে ভালো হয়। পত্রিকা পাবার আনুমানিক তারিখ কার্ডের উপর লেখা থাকবে এবং তারিখ অনুযায়ী কার্ডগুলি তারিখের খাপে থাকবে।

দান গ্রহণের দ্বারা পুস্তক সংগ্রহ

দান গ্রহণের দ্বারা বেশী পুস্তক সংগ্রহ হয় না সত্য, কিন্তু জনসাধারণের পুস্তকাগারে দান গ্রহণ সময়ে সময়ে বিশেষ একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণের কাছ থেকে দান গ্রহণের দ্বারা খুব বেশী মূল্যবান বই পাওয়া না গেলেও, জনসাধারণের কাছে দানের জন্ত এগিয়ে যাওয়া উচিত, এবং তাদের দানে পুস্তকাগার যে বিশেষ উপকৃত হবে এ বিষয়ও জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া

দরকার। কিন্তু মনে রাখবেন, দান করার চেয়ে দান গ্রহণ করা অনেক সমস্যা জনক। সেই জন্যে দান গ্রহণ করা না করার ক্ষমতা গ্রন্থাগার কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে। দান করে অনেকে মনে করেন পুস্তকাগার সাধারণের কাছে দাতার নাম চিরস্মরণীয় করে রেখে দেবে, কিন্তু একথা তাঁরা ভুলে যান যে, বিংশ শতাব্দীর পুস্তকাগারে খুব কম বই চিরস্থায়ী হয়। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পুস্তকের মূল্য নষ্ট হয়ে যায়। যে বইয়ের কোন মূল্য নেই এমন বই আজকালকার পুস্তকাগারে রাখার মানে থাকে না।

বই কেনার সময় আমরা যে উপায় অবলম্বন করেছি, এখানেও ঠিক সেই উপায় অবলম্বন করা দরকার। দান গ্রহণের দ্বারা যে বইগুলি পুস্তকাগারে আসবে সেগুলির একখানি করে কার্ড লিখে ফেলুন। এ কার্ডগুলি রঙীন কার্ড হলে ভালো হয়, তাতে কার্ডগুলি দেখলেই বোঝা যাবে দান গ্রহণের দ্বারা পাওয়া বইয়ের কার্ড। ছোট-খাটো পুস্তকাগারে "বই কেনা"র ট্রেই "দান গ্রহণে"র ট্রে হিসাবে ব্যবহার করা চলে। বড় পুস্তকাগারে "দান গ্রহণের" একটি আলাদা ট্রে ব্যবহার করলে ভালো হয়।

"বই কেনা"র কার্ডগুলি যেমন এক এক ধাপ উঠে শেষ পর্য্যন্ত "দৈনন্দিন" পুস্তকাগমনের তালিকা হিসাবে ব্যবহার হয়, "দান-গ্রহণের" কার্ডগুলিও ঠিক সেইরূপ ধাপে ধাপে উঠে শেষে পুস্তকাগমনের দৈনন্দিন তালিকা হিসাবে ব্যবহার হবে।

দান গ্রহণের দ্বারা পাওয়া বইগুলির জন্য গ্রন্থাগারে আলাদা কোন স্থান ঠিক না করাই ভালো। পুস্তকাগারের সাধারণ পুস্তক-সম্ভারের সঙ্গেই সে বইগুলিকে স্থান দেওয়া উচিত এবং সে বইগুলির আলাদা কোন তালিকা না করে সাধারণ তালিকাভুক্ত করা ভালো। তবে যে ক্ষেত্রে দান মূল্যবান এবং পুস্তকের সংখ্যা বেশী, সে ক্ষেত্রে অন্ততঃ দানের ও দাতার মর্য্যাদা বজায় রাখবার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করা উচিত।

বইয়ের যত্ন

পুস্তকাগারের আয়ের শতকরা সাত ভাগ বই বাঁধাই করতে খরচা হয়। পাঠকদের ও পুস্তকাগারের কর্ম্মীদের গাফিলতির জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বইয়ের ক্ষতি হয়ে যায়, সেই কারণে পাঠকদের ও কর্ম্মচারীদের বইয়ের যত্ন নেওয়া সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

বই খোলা: প্রথম দুই হাতের অনামিকা ও মধ্যমার দ্বারা কয়েকখানি পাতা-সমেত বইয়ের মলাট ধরিয়া মলাট দুইখানিকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলুন। ঠিক সেই অবস্থায় বইখানিকে বন্ধ করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা আর কিছু পাতা আলগা করে ধরুন। বইখানি আবার খুলুন—বইয়ের মাঝামাঝি এসে পড়লেই কাজ শেষ হলো।

পাতা কাটা: পাতা কাটবার জন্য খুব ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে নেই। প্লাষ্টিকের বা হাড়ের বই-কাটা ছুরি ব্যবহার করা ভালো। পাতাগুলি সম্পূর্ণ ভাবে বইয়ের শিরদাঁড়া পর্য্যন্ত কাটবেন—একটুও বাকি যেন না থাকে। বইয়ের পাতা কাটবার জন্যে পাঠক যত্ন নেবে না—সমুখে যা পাবে তাই দিয়ে সে পাতা কাটবে।

পত্র-নির্দেশক: বইয়ের পাতা মোড়া—পাতার কোণ মোড়া, দাঁত-খোঁটার কাটি পাতার মধ্যে রাখা পাঠকদের অভ্যাসগত দোষ। "পাতা মুড়িবেন না" এ কথা পাঠকদের বলায় কোন লাভ নেই। পাঠকদের অভ্যাস দূর করতে গেলে তাদের অভাব দূর করতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেক বইয়ের সঙ্গে একটি করে পত্র-নির্দেশক দিতে হয়। প্রত্যেক বইয়ের সঙ্গে পত্র-নির্দেশক বিশেষ কিছু কষ্টকর নয়। প্রকাশকদের বিজ্ঞাপন-ছাপা পত্র-নির্দেশক প্রকাশকদের কাছ থেকে চাইলেই পাওয়া যায়।

মঞ্চ হতে বই বার করা

মঞ্চে খুব ঠেসে বই রাখতে নাই।
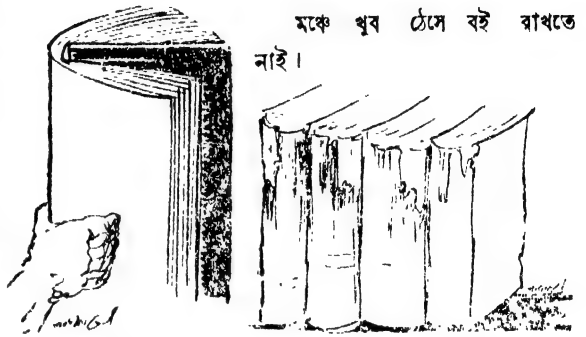
ঠেসে বই রাখলে তাড়াতাড়ি বই বার করবার সময় দ্বিতীয় নম্বরের ছবির মত বইয়ের অবস্থা হয়।

মঞ্চ হতে বই বার করবার সময় তৃতীয় নম্বরের ছবিতে বই বার করা যেমন দেখান আছে তেমনি ভাবে বার করতে হয়।
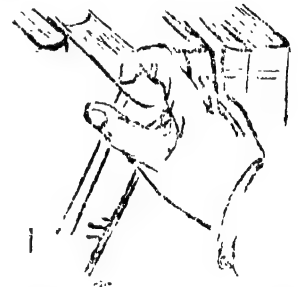
বই ধরবার নিয়ম

১ নং-এর ছবির মত বই ধরলে বইয়ের সেলাই কমজোরী হয়ে যায়, ফলে পাতাগুলি আলগা হয়ে যায় এবং শীঘ্র ছিঁড়ে যায়।

ধুলা: বইয়ের ধুলা ঝাড়া একটি নিত্য-প্রয়োজনীয় কাজ। মনে রাখবেন, ধুলা ঝাড়তে হয়—ঘসতে নাই। ধুলা ঝাড়বার জন্য ব্রাস ব্যবহার করা ভালো। ঝাড়ন ব্যবহার করলে ধুলা বইয়ের পাতার ভিতর ঢুকে যায়।

আর্দ্রতা: বইয়ের মঞ্চ কখন দেয়ালের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখতে নেই। মঞ্চের পিছন দিকে হাওয়া যাতায়াত করবার যথেষ্ট স্থান থাকা দরকার। শেল্ফের নিচেকার থাক মাটি থেকে অন্ততঃ ১½ ফুট উঁচু হওয়া চাই। আর্দ্রতা বইয়ের বাঁধাই, প্রচ্ছদপট, প্রচ্ছদপটের রং, বইয়ের পাতার পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর।

ধোঁয়া: মঞ্চের ঘরের ভিতর ধূমপান করা নিষেধ থাকা চাই, তাতে অগ্নিভীতি অনেকটা দূর হয়। আর মনে রাখবেন, তামাকের ধোঁয়ায় বাঁধাই-করা বইয়ের চামড়া নষ্ট হয়ে যায়।

আলো ও উত্তাপ: বইয়ের উপর সোজাসুজি ভাবে আলো

পড়লে বইয়ের উপর উত্তাপ বেশী লাগে—তাতে বই বাঁকিয়া যায় এবং বইয়ের নমনীয়তা ও রং খারাপ হয়ে যায়।

বইয়ের ঠেকনা

আমরা আগেই বলেছি, শেল্‌ফে বেশী ঠেসে বই রাখতে নেই। অনেক সময় একখানি বই টেনে বার করতে গিয়ে শেল্‌ফ শুদ্ধ বই মাটিতে পড়ে যেতে পারে। নূতন বইকে স্থান দিবার জন্ম শেল্‌ফে সব সময় কিছু জায়গা রাখতে হয়। শেষের বইখানিকে খাড়া করে রাখবার জন্ম একটা ঠেকনা ব্যবহার করা দরকার।

বই সারা: কোন পাতা ছিঁড়ে গেলে জোড়া দেওয়া, একটি ছবির প্লেট খুলে গেলে তা পুনরায় জোড়া দেওয়া, এই সব সামান্ত কাজ পুস্তকাগারের কর্ম্মীদের সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলা দরকার।

বই বাঁধাই: বই বাঁধাই দপ্তরীর কাজ, কিন্তু যিনি বই বাঁধাতে দিবেন তাঁর বই বাঁধাই সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান চাই। কোন্ বইয়ের কিরূপ বাঁধাই হওয়া দরকার, নিদর্শন অনুযায়ী বাঁধান হলো কি না, যুক্ত শেলাইয়ের জায়গায় ফুঁড়ে শেলাই করা হয়েছে কি না, এ সব বিষয় তাঁর জানা প্রয়োজন। পুস্তক বাঁধাই সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু বলবো না, কারণ পুস্তক বাঁধাই হচ্ছে পুস্তক-বিজ্ঞানের অঙ্গ। এখানে কেবল আমরা বলবো বই বাঁধতে দেওয়া ও তা ফেরৎ নেওয়ার হিসাব রাখার কথা:

বই বাঁধতে দেওয়ার সময় দপ্তরীকে জানিয়ে দিতে হয় কোন্ বইখানি কি রকম বাঁধাই হবে।

বই বাঁধাইয়ের হিসাব রাখবার জন্ম প্রয়োজন একটি ট্রে ও কতকগুলি নিম্নের নমুনা অনুযায়ী ছাপা কার্ড:—

গ্রন্থাগারের নাম

ছাপার আদর্শ············ ক্রমিক নং

রং············ শিরদাঁড়ার রং

মূল্য··············তারিখ

বই বাঁধাই করতে পাঠাবার আগে বইয়ের ভিতর হতে পুস্তকের পরিচয়-পত্রখানি বার করে নিয়ে একটি ট্রের ভিতর রাখুন।

প্রত্যেক বইয়ের জন্ম উপরের নমুনা অনুযায়ী দুইখানি করে কার্ড করুন, একখানি বইয়ের সঙ্গে দপ্তরিকে দিয়ে দিন। আর যে কার্ডখানি নিজের কাছে রাখলেন, তার পিছনে দপ্তরির বা তার প্রেরিত লোকের স্বাক্ষর করে নিন। পরে কার্ডগুলিকে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী একটি ট্রের ভিতর সাজিয়ে রাখুন। বই ফেরৎ এলে আপনার কাছে-রাখা কার্ডের বিবরণের সহিত বই মিলিয়ে নিয়ে, বইয়ের ভিতর পুস্তক পরিচয়-পত্রখানি যথাস্থানে রেখে দিন। এবার বই মঞ্চে পাঠিয়ে দিতে পারেন। প্রতি বৎসরের শেষে বই বাঁধাই করতে কত খরচা হলো তার হিসাব করা হলে বই বাঁধাইয়ের কার্ডগুলি নষ্ট করে ফেলতে পারেন।

পুস্তক নির্গমনের তুলনামূলক হিসাব

কোন্ জাতীয় বই কত বার হচ্ছে তার একটা তুলনামূলক হিসাব প্রতি বৎসর করা প্রয়োজন। এই হিসাব দেখে বোঝা যায় কোন্ জাতীয় বই কি রকম ব্যবহার হচ্ছে, কোন্ জাতীয় বই পুস্তকাগারে আরও বেশী রাখা দরকার, গ্রাহকের সংখ্যা অনুযায়ী বইয়ের চাহিদা হচ্ছে কি না, কোন্ বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, বইয়ের ব্যবহার অনুযায়ী পুস্তকাগারে কাজ হচ্ছে কি না, কর্ম্মী কমানো বা বাড়ানো প্রয়োজন কি না, এ সব বিষয়ই পুস্তক নির্গমনের হিসাব থেকে বোঝা যায়। পুস্তক নির্গমনের হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আমরা পুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গে বলবো।

মনে রাখতে হবে পুস্তকাগার সাধারণের, সেই জন্তে সাধারণের সব সময়েই জানবার অধিকার আছে তাদের পয়সা কি রকম ব্যয় হ'চ্ছে। প্রতি বৎসরে বই নির্গমনের হিসাব, গ্রাহকের হিসাব এবং পুস্তকাগারের কর্ম্মীদের কাজের হিসাব ছাপিয়ে বার করা প্রয়োজন।

পুস্তকাগারের পুস্তক-সম্ভারের হিসাব নেওয়া

প্রতি বৎসর পুস্তকাগারের পুস্তক-সম্ভারের হিসাব নেওয়া দরকার। মঞ্চ-তালিকার সঙ্গে, মঞ্চে সঞ্চিত বই, নির্গত বইয়ের তালিকা ও যে-সকল বই বাঁধাই করতে দেওয়া হয়েছে, তা মিলিয়ে দেখতে হয় কি কি বই হারালো বা কি কি বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দুই জন কর্ম্মচারীর দ্বারা এই কাজ সম্ভব হয়। এক জন মঞ্চে রক্ষিত বইয়ের নাম ডাকতে থাকে আর এক জন শেল্‌ফ-তালিকার কার্ডগুলি নামের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে থাকে। মঞ্চে বইগুলি ঠিক যে হিসাবে সাজান আছে, মঞ্চ-তালিকার কার্ডগুলিও ঠিক সেই হিসাবে সাজানো থাকে, সেই জন্তে মিলাবার কোন অসুবিধা হয় না। যে বইখানির নাম ডাকা হলো না, সেই বইয়ের কার্ডখানির উপর একটি (√) দাগ দিলেই হলো। মঞ্চের বই মেলানোর পর, পুস্তক নির্গমনের তালিকা ও বই-বাঁধাইয়ের তালিকার সঙ্গে শেল্‌ফ-তালিকা মেলানো হলো। পরে যে কার্ডগুলোর উপর √ চিহ্ন রইলো, সেইগুলির একটি তালিকা করে ফেললেই পুস্তক-সম্ভারের হিসাব সম্পূর্ণ হলো।

বইয়ের শিরদাঁড়ায় ডাক নাম লেখা

ডাক নং লেখা দু'রকম ভাবে হয়ে থাকে। সোজাসুজি বইয়ের আবরণের উপরই কালি দিয়ে লেখা হয়, না হয় আলাদা চৌকো বা গোল না হয় অন্য কোন আকারের কাগজের উপর ডাক নং লিখে বইয়ের শিরদাঁড়ার উপর আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে হয়। কিন্তু কাগজের ডাক নামফলক শীঘ্র ময়লা হয়ে যায় এবং অনেক সময় পালিশ করা চামড়ার উপর বা কাগজের উপর মারা মুস্কিল হয়—ঠিক আটকে থাকে না। সেই জন্যে যে স্থানে ফলকটি মারা হবে সে স্থানটিকে বেশ করে ভিজিয়ে নিতে হবে, না হয় শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘসে নিয়ে পালিশ তুলে ফেলতে হবে, তার পর ভালো করে আঠা লাগিয়ে ফলক মারতে হবে। ফলকের সংখ্যাগুলি এক রকমের হলে, এবং তলা দিক থেকে একই দূরত্বে থাকলে শেল্ফ-এর সৌন্দর্য্য বাড়ে। নিচের দিক থেকে ১" হতে ৩" দূরে ফলকগুলি মারা হয়। মোটা বইয়ের পিছনে অর্থাৎ শিরদাঁড়ায় ফলক আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া চলে, কিন্তু চটি বইয়ের পিছন দিকে উপরের দক্ষিণ কোণে লেবেল মারতে হয়; তার কারণ, কত নম্বরের বই তা দেখবার জন্যে বইখানি একটু টেনে বার করলেই নম্বর চোখে পড়বে।

বই বাঁধতে দেবার সময় স্বর্ণাক্ষরে বইয়ের ডাক নম্বর ছাপিয়ে নেওয়া ভালো।

কম খরচায় বইয়ের ডাক নম্বর লিখিয়ে নেবার উপায় হচ্ছে "Stylo lectiie" কলম ব্যবহার করা। গায়ের চামড়ায় উল্কি পরানর মত ঠিক এই কলমের দ্বারা কাজ হয়। সাত রকম রঙ্গে ছাপা ⅝" কাগজের কোটা পাওয়া যায়। এক একটি কোটায় ১২০০টি ডাক নম্বর লেখা হয়। এক একটি ডাক নম্বর লিখতে খরচ পড়ে ১ পেনির ২/৫ অংশ।

পুস্তকাগার পরিচালনার কথা এখানে শেষ হলো। শেষ জেনে রাখা প্রয়োজন যে, পরিচালনার অভাবে পুস্তকাগারের নাম খারাপ হয়ে যায়, গ্রাহক বিরক্ত হয়ে পুস্তকাগারে আসে না, এবং পুস্তকাগারের উদ্দেশ্য—জনসাধারণের সেবা—সফল হয় না। পুস্তকাগার ঠিকমত চালাতে গেলে তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত দরকার:

শৃঙ্খলা তৎপরতা কর্ত্তব্যবোধ

"শ্রীরামকৃষ্ণদেব"

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য

প্রেমের ঠাকুর তুমি।
সংসৃতি-দাব-দগ্ধ জনের ছায়াসজ্জল ভূমি।
তরাতে শ্রান্ত ভ্রান্ত বঙ্গে এসেছিলে তুমি সাধু।
অজ্ঞান-মোহ-ধ্বান্ত, আলোকে প্রোজ্জ্বল করি শুধু।
জাতি ছুটেছিল দুঃসহ পথে নিশীথ অন্ধকারে।
ধর্মের নামে স্বেচ্ছাচারিতা মুগ্ধ করেছে তারে।

নাহি প্রেম, নাহি মানব-ধর্ম উদার শান্তি গাথা।
মিথ্যার জালে বন্দী তখন আপনি মহান ধাতা।
মনোরাজ্যের উদাত্ত বাণী শ্রেষ্ঠ সে সমাধান।
ভুলেছিল সবে, হিন্দুধর্ম, ঈশ্বর প্রণিধান।
কর্মফলের অর্জিত ভারে সতত আস্থাহীন।
নাস্তিকবাদী নেমেছে অতলে শুষ্ক-প্রবাদলীন।
রিক্ত মানব করে হাহাকার এসো তুমি দয়াময়!
নবধর্মের ভিত্তি বিরচি হোক তব পুনঃ জয়।

বাঙালীর ঘরে তাই যে "তীর্থ" ভুবনমোহন শ্যাম।
ছড়ায়ে ভারত বিশ্বে ব্যাপ্ত যাঁহার পাবন নাম।
দিলে বাঁধ আসি পাপের প্রবাহে থমকি থামিল ধরা।
দেখেছি দেবতা, দেখাতেও পারি এ কথা কহিছে কারা?
আদি-প্রসূতির অঙ্ক-দুলাল মাতৃ-প্রেমিক যোগী।
আত্ম-সাধন-মহা যোগরত অদ্ভুত বৈরাগী।
যত মত আছে তত পথ হেথা কহেন পুলকভরে।
ভুল কিছু নয় একই আবাসে সকলে যাইবে ফিরে।

পথ শুধু হয় ভিন্ন ভিন্ন যাবে সেই রাজবাড়ী।
পৃথক আখ্যা, তৃষ্ণা প্রশমে ওয়াটার, পানি, বারি।
তুমি না আসিলে কি যে হতো তাহা ভাবিতে
পারে না কেহ।
আর কে জাতির শ্রেষ্ঠ ধর্মে এতই করিত স্নেহ।
যুগ-অবতার হে রামকৃষ্ণ! পরম ব্রহ্মবিৎ।
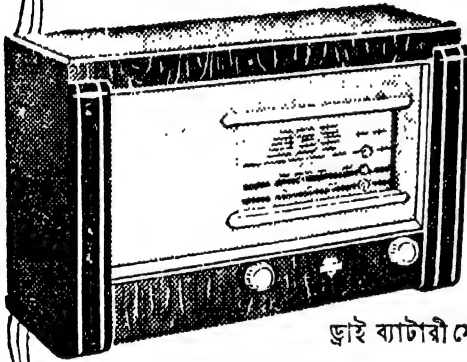
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ম্যাকআর্থারের বিদায়—

গত ১১ই এপ্রিল (১৯৫১) প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জেনারেল ম্যাকআর্থারকে পদচ্যুত করিয়াছেন। এমন আকস্মিক ভাবে এই পদচ্যুতির আদেশ প্রদান করা হইয়াছে যে, উহা নাটকীয় ঘটনার রূপ গ্রহণ না করিয়া পারে নাই। জেনারেল ম্যাক-আর্থারের অপসারণ শুধু নাটকীয় ঘটনার মতই হয় নাই, উহার গুরুত্বকে কেহ কেহ কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম কর্তৃক বিসমার্কের পদচ্যুতির সহিতও তুলনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার পদচ্যুতি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এমন একটা বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে যাহার তুলনা শুধু হিরোশিমা এবং নাগাসিকিতে পরমাণু বোমা বর্ষণের সহিতই তুলনা করা যাইতে পারে। ১১ই এপ্রিল তারিখের প্রভাতী সংবাদপত্রগুলিতেও এই পদচ্যুতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই, বরং ১১ই এপ্রিল প্রাতঃকালে সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত বিবরণ হইতে ইহাই বুঝা গিয়াছিল যে, জেঃ ম্যাকআর্থারের সহিত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বিবাদের একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই দিনই দ্বিপ্রহরের পর বিশ্ববাসী অকস্মাৎ শুনিতে পাইল, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্দ্দেশে জেঃ ম্যাকআর্থার পদচ্যুত হইয়াছেন। তিনি পদচ্যুত হইবেন, জেঃ ম্যাকআর্থারের মনে ভুলেও বোধ হয় ইহা স্থান পায় নাই। তিনি ইহার আভাস-ইঙ্গিত পর্য্যন্তও না কি পান নাই। পদচ্যুতির নির্দ্দেশ সরকারী ভাবে তাঁহার হস্তগত হওয়ার পূর্ব্বে বেতার বার্ত্তায় তিনি সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পদচ্যুতির সংবাদ পাইয়াছিলেন।

জেনারেল ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতি যে একটা অঘটন ঘটন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া রাশিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত অঞ্চলে জেঃ ম্যাকআর্থারের মত অপ্রতিহত ক্ষমতা আর কাহারও ছিল না, এমন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টেরও নয়, এ কথা বলিলে ভুল হইবে না। ১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর হইতে সুদূর প্রাচ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল ম্যাকআর্থারী সাম্রাজ্য এবং এই সাম্রাজ্যের তিনিই ছিলেন অপ্রতিহত ডিক্‌টেটর। জাপানে তিনিই হইয়া উঠিয়াছিলেন মার্কিণ মিকাডো। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাঁহার হাতে নিরঙ্কুশ ভাবে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়াছিল। তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের অধীন তাহা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। স্বাধীন ভাবে যাহা খুসী তাহাই তিনি করিতেন। তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার এক সুসময় প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাহা করেন নাই। বোধ হয় সুদূর প্রাচ্যে মার্কিণ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য জেনারেল ম্যাকআর্থারের মত জবরদস্ত লোকের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। জেঃ ম্যাকআর্থার গর্ব্ব করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, "গত ৫০ বৎসর ধরিয়া আমি প্রাচ্যবাসীর মন লইয়া গবেষণা করিয়াছি। যে-কোন রাষ্ট্রনীতিবিদ্ বা সেনাপতি অপেক্ষা প্রাচ্যবাসীর মন আমি ভাল করিয়া জানি।" এশিয়ার অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও তিনি গোপন রাখেন নাই। চারি বৎসর পূর্ব্বে 'চিকাগো টাইমসের' প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছিলেন, "The conflict between Mongol-slav hordes of the East and the civilized people of the West will be resolved in the battle field." অর্থাৎ 'মোঙ্গল-শ্লাভ দলের সহিত পাশ্চাত্য সভ্য জাতির বিরোধের মীমাংসা হইবে সংগ্রামক্ষেত্রে।' সুতরাং এ-হেন লোকের প্রয়োজনীয়তা যদি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে কেন? কিন্তু অবশেষে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানই তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ নয়।

জেনারেল ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতিতে পৃথিবীর কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট লোক সকলেই যে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে, এ কথা যেমন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তেমনি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সহিত রিপাবলিকান দলের বিরোধও তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। জেঃ ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতিতে বিশ্ববাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল কেন, কি জন্য তাহারা স্বস্তি বোধ করিল, এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। বামপন্থীরা জেঃ ম্যাকআর্থারের এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যে বিশ্বের জনমতের চাপের প্রভাব দেখিতে পাইয়া থাকেন। বিশ্বের জনমতের চাপে পড়িয়াই প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জেঃ ম্যাকআর্থারকে পদচ্যুত করিবার সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতের কোনও বামপন্থী পত্রিকা লিখিয়াছেন, "Peace-lovers the world over……rightly saw in MacArthur's downfall a victory for common people." অর্থাৎ 'বিশ্বের শান্তিকামীরা ম্যাকআর্থারের পতনের মধ্যে সাধারণ মানুষের জয়ই দেখিতে পাইবেন।' কি কারণে ইহা বিশ্বের জনমতের জয় বলিয়া মনে করা হইয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। জেঃ ম্যাকআর্থার যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে-ছিলেন তাহা চীনের মূল ভূখণ্ডে যুদ্ধ সম্প্রসারণের নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। পদচ্যুতির নির্দ্দেশ দিবার কারণ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া গত ১১ই এপ্রিল (১৯৫১) প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস, কয়েকটি গুরুতর কারণে যুদ্ধ কোরিয়ায় সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। আমাদের সৈন্যদের মূল্যবান্ জীবন যাহাতে বৃথা নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে; আমাদের দেশ এবং স্বাধীন-বিশ্বের নিরাপত্তা যাহাতে বিপর্য্যস্ত না হয়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম প্রতিরোধ করিতে হইবে। কতকগুলি ঘটনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, জেনারেল ম্যাকআর্থার এই নীতির সহিত একমত নহেন।" তাঁহার এই উক্তি হইতে ইহা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, চীনে যুদ্ধ সম্প্রসারিত করিবার যে চক্রান্ত জেঃ ম্যাকআর্থার করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের

যে, বিশ্বের জনমতের চাপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা সত্যই সম্ভব কি না, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক যে, ম্যাকআর্থারের পতনে পশ্চিম-ইউরোপ সন্তুষ্ট হইয়াছে কেন? পশ্চিম-ইউরোপ মনে করে, কম্যুনিজম নিরোধের ব্যাপারে পশ্চিম-ইউরোপেরই প্রাধান্য এবং জেনারেল মার্শাল এবং মিঃ একিসন এই মতের পৃষ্ঠপোষক। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহারা পশ্চিম-ইউরোপের এই অগ্রাধিকার নীতিই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জেঃ ম্যাকআর্থার যে নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন তাহাতে পশ্চিম-ইউরোপের এই অগ্রাধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছিল। কাজেই জেনারেল ম্যাকআর্থারের অপসারণ পশ্চিম-ইউরোপের খুসী হওয়ার কারণে পরিণত হইয়াছে! চীনে যুদ্ধ প্রসারিত হইলে সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এমন গভীর ও ব্যাপক ভাবে জড়িত হইয়া পড়িবে যে, কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে পশ্চিম-ইউরোপকে শক্তিশালী করিয়া তোলা আর সম্ভব হইবে না। জেঃ ম্যাকআর্থার অপসারিত হওয়ায় এই আশঙ্কা আর রহিল না, ইহাই পশ্চিম-ইউরোপের খুসী হওয়ার কারণ। ম্যাকআর্থারের পতনে খুসী হওয়ার আরও একটা কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে কিছু বলিবার আছে, এত দিন তাহা বুঝিবার কোন উপায়ই ছিল না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই কোরিয়া যুদ্ধের নীতি নির্দ্ধারণ করিতেছিল। অনেকে মনে করেন, জেঃ ম্যাকআর্থারের পতনে সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জেরই প্রাধান্য সূচিত হইতেছে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সুদূর প্রাচ্যের বিরোধ মীমাংসার দ্বার হইয়াছে উদ্‌ঘাটিত। কিন্তু ইহাতেও জেঃ ম্যাকআর্থারকে পদচ্যুত করিতে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান নাটকীয় সিদ্ধান্ত কেন করিলেন, তাহার কারণের সন্ধান পাওয়া যায় না।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় সুহৃদ্‌বর্গ, বিশেষ করিয়া বৃটেন চীনের সহিত সর্ব্বব্যাপী যুদ্ধ বাধাইবার বিরোধী। ইহা লইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বৃটেনের মনান্তর হওয়ার কথাও শোনা গিয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বৃটিশের এই মনান্তর দূর করাই জেঃ ম্যাকআর্থারকে পদচ্যুত করিতে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সিদ্ধান্ত করিবার প্রধান কারণ। এ সম্পর্কে বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইয়াছে ফ্রান্স। ফ্রান্স মনে করে, জেঃ ম্যাকআর্থারের অপসারণ ব্যাপারে তাহার কৃতিত্বও বড় কম নয়। ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট যখন আমেরিকা গিয়াছিলেন সেই সময় মঃ প্লুম্যান মার্কিণ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন যে, চীনের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে আটলাণ্টিক শক্তিবর্গের সংহতি নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জেনারেল মার্শাল এবং মিঃ একিসন না কি চীনের সহিত যুদ্ধ করিবারই পক্ষপাতী ছিলেন। জেঃ ম্যাকআর্থার অপসারিত হওয়ার কৃতিত্ব বৃটিশের না ফ্রান্সের, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভব নয়। ফরাসী পত্রিকা 'লি মোঁ' (Le Monde) সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন, "Great Britain and all the allies can congratulate themselves that the United Nations' policy is not made exclusively in Washington." অর্থাৎ 'গ্রেটবৃটেন এবং সমস্ত মিত্রশক্তি ইহা ভাবিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতে পারিবেন

যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতি একমাত্র ওয়াশিংটনেই নির্দ্ধারিত হয় না।' কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ম্যাক্আর্থারকে পদচ্যুত করিতে কেন সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করা বড় সহজ নয়। বৃটেন এবং ফ্রান্সের চাপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্ত্তন করিবে, ইহা স্বীকার করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এ কথা যেমন ঠিক নয়, তেমনি এ কথাও ঠিক নয় যে, জেঃ ম্যাক্আর্থারের পদচ্যুতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে।

গত আগষ্ট মাসে (১৯৫০) প্রবীণ সৈনিকদের সম্মেলনে জেঃ ম্যাকআর্থার যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার জন্তও প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে কম বিব্রত হইতে হয় নাই। ইহার জন্তই গত অক্টোবর মাসে (১৯৫০) ওয়েক দ্বীপে ট্রুম্যান-ম্যাকআর্থার সম্মেলন হইয়াছিল। এই সম্মেলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ গত ২১শে এপ্রিল (১৯৫১) প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ বিবরণে প্রকাশ যে, প্রবীণ সৈনিকদের নিকট প্রেরিত বাণীতে প্রেসিডেণ্টকে বিব্রত করা হইয়াছে বলিয়া জেঃ ম্যাকআর্থার না কি ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তিনি এখন মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের নীতি বুঝিতে পারিয়াছেন। ঐ সময় জেঃ ম্যাকআর্থার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কোরিয়ার ব্যাপারে কি কম্যুনিষ্ট চীন কি সোভিয়েট ইউনিয়ন কেহই হস্তক্ষেপ করিবে না। এই ধারণার ভিত্তিতেই অষ্টম বাহিনীকে বড়দিনের পূর্ব্বেই জাপানে ফিরাইয়া আনা, দশম করপ্‌সকে কোরিয়ায় রাখা এবং দ্বিতীয় ডিভিসনকে জানুয়ারী মাসে ইউরোপে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত করা হয়। এই সম্মেলনের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলিয়াছিলেন যে, তিনি এবং জেঃ ম্যাকআর্থার পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। ওয়েক সম্মেলনের প্রায় এক মাস পর কম্যুনিষ্ট চীন কোরিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে এবং আরম্ভ হয় নূতন যুদ্ধ। বোধ হয় সেই সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং জেঃ ম্যাক্আর্থারের মধ্যে নূতন মতভেদেও আরম্ভ হয়। এই মতভেদের ফলে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করে। গত ২৪শে মার্চ্চ জেঃ ম্যাকআর্থার কম্যুনিষ্টদের নিকট এক আপোষ-আলোচনার প্রস্তাব করেন। সেই সময় হইতেই না কি জেঃ ম্যাকআর্থারকে পদত্যাগ করিবার জন্ত অনুরোধ করার কথা উঠে এবং ইহাও না কি স্থির হয় যে, জাপ শান্তিচুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলা হইবে না। অতঃপর ৫ই এপ্রিলের (১৯৫১) সংবাদে প্রকাশ, জেঃ ম্যাকআর্থারকে মাঞ্চুরিয়ায় বোমা বর্ষণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কে ক্ষমতা দিয়াছে? প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, উহা সামরিক ব্যাপার সংক্রান্ত গোপনীয় বিষয়। ইহার পূর্ব্বেই জেঃ ম্যাকআর্থারের বাহিনী গত ৩১শে মার্চ্চ ৩৮শ অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। ৯ই এপ্রিল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কোরিয়া সম্পর্কে আর কোন রাজনৈতিক বিবৃতি দিতে বিরত থাকিবার জন্ত জেঃ ম্যাখআর্থারকে নরম-গরম ভাষায় এক নির্দ্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু দুই দিন পরেই তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। সতর্ক করিয়া দিবার পর তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল কেন? ২৪শে মার্চ্চের বিবৃতি উহার কারণ হইতে পারে না। রিপাবলিকান দলের নেতা প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য মিঃ মার্টিনের নিকট জেঃ ম্যাকআর্থার যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা ২৪শে মার্চ্চেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। ২০শে মার্চ্চ তারিখে তিনি এই পত্র লিখেন। ৫ই এপ্রিল মিঃ মার্টিন প্রতিনিধি পরিষদে এই পত্র পাঠ করেন। এই পত্রে তিনি ফরমোসাস্থিত চিয়াং কাইশেকের সৈন্তবাহিনী চীনা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিবার দাবী করেন। এই পত্রে মিত্রশক্তিবর্গ সম্পর্কেও তীব্র মন্তব্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "Here we fight Europe's wars with arms, while diplomats there still fight it with words" অর্থাৎ 'এখানে আমরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ইউরোপের যুদ্ধ করিতেছি, আর কূটনীতিবিদ্‌রা সেখানে এখনও বাক্‌যুদ্ধ করিতেছেন।' অথচ গত ডিসেম্বর (১৯৫০) মাসে ইঁহাদের নিকটেই তিনি অতি করুণ ভাষায় সাহায্যের জন্ত আবেদন করিয়াছিলেন এবং সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়াই প্রতি-আক্রমণ রোধ করা সম্ভব হইয়াছিল। এই পত্র ২০শে মার্চ্চ তারিখে লেখা হয় এবং ৫ই এপ্রিল উহা পঠিত হয় প্রতিনিধি পরিষদে। জেঃ ম্যাকআর্থারকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় ৯ই এপ্রিল। কাজেই এই পত্রের জন্তই তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে, এ কথাও স্বীকার করা কঠিন।

জেঃ ম্যাকআর্থারের বিবৃতিগুলি যেমন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে বিশ্ববাসীর কাছে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছিল তেমনি রিপাবলিকান দলও ম্যাকআর্থারের পক্ষ হইয়া প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে অপমানিত করিবার চেষ্টা করিতেও কম কসুর করে নাই। তাঁহারা এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ-সমস্যা, কম্যুনিষ্ট চীন এবং সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা অবগত হইবার উদ্দেশ্যে জেনারেল ম্যাকআর্থারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হউক। এই সকল ঘটনা মিলিয়াই যে ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতির কারণ ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্র-দপ্তর হইতেই না কি ম্যাকআর্থারকে পদচ্যুত করিবার জন্ত যথেষ্ট চাপ দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু জেঃ ম্যাকআর্থার যে-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কি মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ ও সম্মতি ব্যতীত এবং তাঁহাদের অজ্ঞাতে গৃহীত হইয়াছিল? জেঃ ম্যাকআর্থার দাবী করিয়াছেন যে, কোরিয়া যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করা সম্পর্কে তাঁহার মত মার্কিণ সেনানীমণ্ডলী (American Joint Chiefs of Staff) সামরিক দিক হইতে সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার এই দাবী প্রমাণ করিবার জন্ত দলিলপত্রও না কি তাঁহার হাতে আছে। সুতরাং এগুলি যে গোপনীয় দলিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। জেঃ ম্যাকআর্থারের এই দাবীর উত্তর দিবার জন্ত মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট না কি অনেক দলিলপত্র কংগ্রেসের নিকট উপস্থিত করিবেন। এই সকল দলীলপত্র প্রকাশিত হইলে কোরিয়া যুদ্ধের অনেক গোপন রহস্য যে প্রকাশ পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। নীতিগত দিক হইতে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট ও ম্যাকআর্থারেরর মধ্যে যদি কোন পার্থক্য না থাকে তাহা হইলে বলিতে হয়, জেঃ ম্যাকআর্থার এই নীতি কার্য্যকরী করিতে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে

পারেন নাই এবং উহাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ। কিন্তু কি কি ভাবে তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন ?

মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের নীতি এবং ম্যাকআর্থারের নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকিলে, ম্যাকআর্থারের নীতির ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুহৃদ্‌বর্গ অসন্তুষ্ট হওয়ার এবং তাঁহাদের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগের আশঙ্কা অর্থহীন। তবে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়া তিনি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে যে লোকের চক্ষে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন এবং ইহা যে আদেশ অমান্য করার গুরুতর অপরাধ তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, জেঃ ম্যাকআর্থার হয়ত এমন ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন যাহার ফলে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের ঈপ্সিত সময়ের পূর্ব্বেই তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া আমেরিকার স্বার্থ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ইহা একটা সঙ্গত যুক্তি বটে। ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া 'প্রাভদা' তাঁহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, কোরিয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হওয়ার ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়া যে সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতির মধ্যে। ইহার একমাত্র অর্থ এই যে, দশ মাসের মধ্যেও ম্যাকআর্থার সমগ্র কোরিয়া দখল করিতে না পারাই তাঁহার পদচ্যুতির কারণ। ইহাও অসম্ভব কিছু নয়। ম্যাকআর্থারকে পদচ্যুত করিবার পর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ইহাও জানাইয়াছেন, কোরিয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতির পর—

জেঃ ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতির পরেও কোরিয়া যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা দূর হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী কোরিয়া ত্যাগ করিয়া আসিবে, এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। অবশ্য আবার পূর্ব্ব অবস্থায় অর্থাৎ উত্তর-কোরিয়া ও দক্ষিণ-কোরিয়ায় ফিরিয়া আসাও যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কি চীন কেহই রাজী হইবে না। সমগ্র কোরিয়াকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনাধীনে আনার দুইটি পথ আছে। এক পথ চীনের সহিত আপোষ করা। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আসন এবং ফরমোসার অধিকার না পাইলে কম্যুনিষ্ট চীন কোন আপোষ-প্রস্তাবেই রাজী হইবে না। দ্বিতীয় পথ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী কর্ত্তৃক সমগ্র কোরিয়া দখল করা। যুদ্ধ কোরিয়ায় সীমাবদ্ধ রাখিয়া এ-পর্য্যন্ত সমগ্র কোরিয়া দখল করা সম্ভব হয় নাই। এই জন্যই জেঃ ম্যাকআর্থার যুদ্ধ চীনের ভূখণ্ডেও বিস্তৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পরিণামে কোরিয়া যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরিবর্ত্তে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামও আরম্ভ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

গত ১৪ই এপ্রিল (১৯৫১) ডেমোক্রাটিক দলের এক সমাবেশে ম্যাকআর্থারের সমর্থকদের সমালোচনার উত্তরে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন, "তাঁহারা বলেন, ইউরোপে সৈন্য পাঠাইলে রাশিয়াকে যুদ্ধে উস্কানি দেওয়া হইবে। কিন্তু তাঁহারা স্পষ্ট ভাবেই বলিতেছেন,

মাঞ্চুরিয়ায় বোমা বর্ষণ করিলে রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না। চীনারা কোরিয়া যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবে না, এই মর্ম্মে খুব প্রামাণিক অভিমত আমার কাছে প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং আমিও উহা বিশ্বাস করিয়াছিলাম।" তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, কোরিয়া যুদ্ধ চীনে বিস্তৃত হইলে রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এই আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় মনে করেন না। তিনি চীনে যুদ্ধ বিস্তৃত হইতে দিবেন কি না তাহারই উপরেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে।

ম্যাকআর্থারের সুদূর প্রাচ্য-নীতি—

মার্কিণ কংগ্রেসের সম্মুখে বক্তৃতায় এবং মার্কিণ সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটি (Foreign Relation Committee) এবং সশস্ত্র বাহিনী কমিটির (Armed Service Committee) যুক্ত অধিবেশনের নিকট সাক্ষ্যে জেনারেল ম্যাকআর্থার সুদূর প্রাচ্য সম্পর্কে তাঁহার নীতির যে-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ ছয় দফা কর্ম্মসূচীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সুদূর প্রাচ্য সম্পর্কে তাঁহার নীতি যে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের নীতি হইতে পৃথক্, তাহা অবশ্য মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে পার্থক্যটা দাঁড়াইয়াছে এই নীতিকে কার্য্যকরী করিবার কর্ম্মসূচী লইয়া। জেঃ ম্যাকআর্থারের উল্লিখিত ছয় দফা কর্ম্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের ফলে এই নীতিতে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং কি জন্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তৎসম্পর্কে জেঃ ম্যাকআর্থারের অভিমত উল্লেখ করা প্রয়োজন। জেঃ ম্যাকআর্থার গত ১১শে এপ্রিল (১৯৫১) মার্কিণ প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেটের যুক্ত অধিবেশনের সম্মুখে তাঁহার বক্তৃতায় তিনি উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, এশিয়ায় এক নূতন শক্তির অভ্যুত্থান হইয়াছে। এই শক্তি একই সঙ্গে নৈতিক এবং বৈষয়িক এবং এই শক্তি ক্রমশঃই সংহত হইয়া উঠিতেছে। এই উক্তির মধ্যে অনেকে তাঁহার প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছেন। বোধ হয়, এই জন্যই কেহ কেহ ইহাকে ক্লাসিক্যাল বক্তৃতা বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এশিয়ার এই নবজাগরণ জেঃ ম্যাকআর্থারের তথাকথিত প্রগতিশীল মনকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুদূর প্রাচ্য-নীতির কিরূপ পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী করিয়াছে, তাহাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক।

জেঃ ম্যাকআর্থার বলিয়াছেন, "ঔপনিবেশিক নীতিতে কেহ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এশিয়ার এই অগ্রগতিকে রোধ করা যাইবে না।" তিনি মনে করেন, যে-এশিয়া মহাদেশ এক দিন বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের উৎস ছিল সেই প্রবাহ আবার এশিয়াতেই কেন্দ্রীভূত হইতেছে এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক কেন্দ্রও স্থানান্তরিত হইতেছে এশিয়ায়। এশিয়ার এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া জেঃ ম্যাকআর্থার বলিয়াছেন, "এইরূপ অবস্থায় পুরাতন ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হইয়াছে এবং এশিয়াবাসী এখন স্বাধীন ভাবে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্দ্ধারণ করিতে চাহে, এই বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া থাকিয়া কোন নীতি অনুসরণ করার পরিবর্ত্তে মৌলিক বিবর্ত্তন ধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমাদের দেশকে নূতন আভাস তিনি দিয়াছেন, তাহা আসলে পুরাতন ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্ত্তে নূতন ঔপনিবেশিক নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এশিয়াবাসীর চিন্তাধারার মধ্যে বিশ্বের আদর্শবাদগুলির স্থান অতি নগণ্য, তাঁহার এই ধারণার উপরেই তিনি তাঁহার নূতন ঔপনিবেশিক নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "জনসাধারণ যাহাতে আরও কিছু বেশী খাদ্য পায় (a little more food in their stomachs), তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র যাহাতে আরও একটু ভাল হয়, তাহাদের মাথা গুঁজিবার স্থান যাহাতে আরও একটু দৃঢ় হয় এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা যাহাতে পূর্ণ হয়, এশিয়াবাসী আজ তাহারই সুযোগ চায়।" কি ভাবে এই সুযোগ তিনি দিতে চাহিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতির মধ্যে। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি এই নীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

জেঃ ম্যাকআর্থার মনে করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব সংগ্রামের ফলে সুদূর প্রাচ্যের অবস্থার বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং এই পরিবর্ত্তনের সহিত তাল রাখিয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার পন্থা তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম সীমান্ত ছিল আমেরিকার সমুদ্র উপকূল-রেখা (littoral line of Americas) এবং হাওয়াই, মিডওয়ে এবং গুয়াম হইয়া ফিলিপাইন পর্য্যন্ত বিস্তৃত দ্বীপাবলী ছিল প্রসারিত উন্মুক্ত অঞ্চল (exposd island salient)। তিনি মনে করেন, এই অঞ্চল তাঁহাদের শক্তির ঘাঁটির পরিবর্ত্তে দুর্ব্বলতার রাজপথে পরিণত হইয়াছিল। জেঃ ম্যাকআর্থারের উক্তির অর্থ এই যে, প্রশান্ত মহাসাগর আক্রমণকারী শত্রুর পক্ষে বাধা-স্বরূপ না হইয়া সীমান্তবর্ত্তী স্থানকে আঘাত করিবার সম্ভাবিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছিল। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ মার্কিণ সাম্রাজ্যের উপর আঘাত ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এই মার্কিণ সাম্রাজ্যও ছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল হইতে সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী। জাপ নৌবহর প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করিবে, এরূপ কোন আশঙ্কাই দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের সময় দেখা দেয় নাই। কিন্তু জেঃ ম্যাকআর্থার মনে করেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরে জয়লাভের পর সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি মনে করেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ষ্ট্রেটেজিক সীমান্ত সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরব্যাপী হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা ইহাকে (প্রশান্ত মহাসাগরকে) এলেটিয়ান হইতে মেরিয়ানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত দ্বীপ-শৃঙ্খল দ্বারা এশিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছি। এই দ্বীপ-শৃঙ্খলকে কেন্দ্র করিয়া আমরা ভ্লাডিভষ্টক হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বন্দরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ।" ইহা যে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টেরই সুদূর প্রাচ্য-নীতি, তাহাতেও সন্দেহ নাই। যদিও তিনি বলিয়াছেন যে, এই রক্ষা-ব্যবস্থা শুধু এশিয়া হইতে লুণ্ঠনমূলক আক্রমণ (predatory attack from Asia) প্রতিরোধের জন্যই, তথাপি এই

হওয়ার আশঙ্কা এশিয়াবাসী উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরই আজ আমেরিকার সীমান্তে পরিণত হইয়াছে জে: ম্যাকআর্থার কেন ইহা মনে করেন, তাহাও উপেক্ষার বিষয় নয়।

জে: ম্যাকআর্থার কম্যুনিষ্ট চীনের মধ্যে এশিয়ার এক নূতন প্রভাবশালী শক্তির উদ্ভব দেখিতে পাইয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে চীন ছিল সে চীন আর এখন নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে চীন ছিল ঐক্যবোধ শূন্য এবং পরস্পর বিবদমান নানা দলে ছিল চীন বিভক্ত। তাহারা অনুসরণ করিত কনফুসিয়ান শান্তির আদর্শ। কিন্তু সে-চীন আর এখন নাই। আদর্শ ও নীতির দিক হইতে এই চীন সামরিক ভাবধারায় অভিষিক্ত। চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ হইয়াছে, কম্যুনিষ্টরা তাহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছে, চীন পরিণত হইয়াছে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় শক্তিতে। তাহাদের সৈন্য সেনাপতি সকলেই উৎকৃষ্ট। এই নূতন চীনই এশিয়ার প্রভাবশালী নূতন শক্তি। কিন্তু এশিয়ায় নূতন প্রভাবশালী শক্তির উদ্ভবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তিত হওয়ার কারণ কি? জে: ম্যাকআর্থার মার্কিণ কংগ্রেস তথা আমেরিকাবাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এই নূতন চীন সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিয়াছে এবং উহার আক্রমণ-স্পৃহাও ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। নূতন চীনের অভ্যুদয় এশিয়ায় মার্কিণ সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে যে বাধা-স্বরূপ হইয়াছে এ কথা তিনি স্বীকার করিবেন তাহা আশা করা অসম্ভব। কাজেই নূতন চীনকে তিনি শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়াই নয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্বাধীন দেশগুলির স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়াও চিহ্নিত করিয়াছেন। এই স্বাধীন দেশগুলি বা আমেরিকার তাঁবেদার ছাড়া আর কিছুই নয়, এশিয়ার জনসাধারণ তাহা ভাল করিয়াই জানে। এই সুদূর প্রাচ্য-নীতির ভিত্তির উপর জে: ম্যাকআর্থার যে সামরিক রণ-কৌশল গঠন করিয়াছেন, মার্কিণ কংগ্রেসের সম্মুখে এবং সিনেটের যুক্ত তদন্ত কমিটির নিকটে তাহারই ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন। সিনেটের যুক্ত তদন্ত কমিটির নিকট তাঁহার সাক্ষ্য ৩রা মে (১৯৫১) আরম্ভ হয় এবং ৫ই মে তাঁহার সাক্ষ্য শেষ হইয়াছে।

মার্কিণ কংগ্রেসের সম্মুখে এবং যুক্ত তদন্ত কমিটির নিকট একই কথাই তিনি বলিয়াছেন। যে ছয়টি কর্ম্মসূচী তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করিলে যথাসম্ভব কম সৈন্যক্ষয় করিয়া কোরিয়া যুদ্ধের অবসান এবং সেই সঙ্গে সুদূর প্রাচ্যের সমস্ত সমস্যার সমাধানই যে সম্ভব, তাহাই জে: ম্যাকআর্থার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ছয়টি পন্থা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। কারণ রাশিয়ার সৈন্য-সংস্থাপন ব্যবস্থা শুধু আত্মরক্ষামূলক। সুতরাং রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ যদি অনিবার্য্য না হয়, তাহা হইলে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম ব্যতীতই সুদূর প্রাচ্যের সমস্যার সমাধান এবং কম্যুনিজম-নিরোধের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। শুধু তাই নয়, বিজয় লাভ হইবে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এবং সস্তায়। রাশিয়া হস্তক্ষেপ করিবে না, এই দৃঢ় ধারণাই জে: ম্যাকআর্থারের প্রদর্শিত পন্থার মূল ভিত্তি। অবশ্য এ কথাও তিনি বলিয়াছেন যে, রাশিয়া

যদি হস্তক্ষেপ করিতে চায়ও, তাহা হইলেও রাশিয়ার সামরিক শক্তি এমন নয় যে, এই বিরাট ঝুঁকি রাশিয়া লইতে পারে। রাশিয়া যদি হস্তক্ষেপ না করে, তাহা হইলে চীনকে আক্রমণ করিয়া অতি দ্রুত কোরিয়া যুদ্ধ শেষ করিতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?

মার্কিণ স্থলসৈন্য চীন আক্রমণ করিবে, এইরূপ কোন প্রস্তাব জেঃ ম্যাকআর্থার করেন নাই। তিনি চীন, ফারমোসাস্থিত চিয়াং কাইশেকের সৈন্যবাহিনীকে চীন আক্রমণে নিয়োগ করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার ছয় দফা প্রস্তাবের অন্যতম প্রস্তাব। চীনা কম্যুনিষ্টদের সহিত যুদ্ধে চিয়াং কাইশেকের বাহিনীর বিপুল পরাজয়ের কথা স্মরণ করিলে উহার উপর ভরসা করা সম্ভব নয়। এই বাহিনীর সৈন্যরা চীনা কৃষক-পরিবারের সন্তান। চীনে প্রবেশ করিবার পর তাহারা যে কম্যুনিষ্টদের পক্ষে যোগদান করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? জেঃ ম্যাকআর্থারের আর একটি প্রস্তাব—নৌবাহিনী দ্বারা চীন অবরোধ। কিন্তু কার্য্যতঃ এখনও এই অবরোধ চলিতেছে। তাঁহার তৃতীয় প্রস্তাব—চীনের অর্থনৈতিক অবরোধ। চতুর্থতঃ, তিনি চীন মাঞ্চুরিয়ায় বোমবর্ষণ এবং পঞ্চমতঃ, চীনের উপকূল ভাগের উপর এবং মাঞ্চুরিয়ায় বিমান পর্যবেক্ষণ। এই পাঁচটি কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়াতেও সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার ষষ্ঠ দফা কর্ম্মসূচী। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, মার্কিণ সেনানীমণ্ডলী তাঁহার এই কর্ম্মপন্থা অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু যুক্ত সেনেট কমিটির নিকট সাক্ষ্যে তিনি বৃটেনের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করার এবং ফরমোসা কম্যুনিষ্টদের হাতে অর্পণের নীতি অনুসরণ করার অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে, বৃটেন তাহার নিজের গলা নিজেই কাটিবার ব্যবস্থা করিতেছে। চীন আক্রমণের অজুহাত-স্বরূপ তিনি কোরিয়াবাসীদের উপর দরদ প্রদর্শন করিতেও ক্রটি করেন নাই। শত্রু এবং মিত্র উভয় পক্ষ কোরিয়াতে যে ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাতে আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ মীমাংসার উপায় হিসাবে উহা অকার্য্যকর। কিন্তু কোরিয়া ধ্বংস হওয়ার দায়িত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এবং কোরিয়ায় গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নীতি যে সকল দেশ সমর্থন করিয়াছে, তাহারাও এই দায়িত্ব হইতে মুক্ত নহে।

ইরাণের তৈলশিল্প-সমস্যা—

ইরাণের তৈলশিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করণের প্রস্তাব মজলিস কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর ব্যাপক শ্রমিক ধর্ম্মঘট যে সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার অবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করণের সঙ্কট পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। গত ১৪ই মার্চ (১৯৫১) বৃটেন ইরাণের গবর্ণমেণ্টের নিকট যে পত্র দিয়াছে, গত ৮ই এপ্রিল ইরাণ গবর্ণমেণ্ট তাহার উত্তর দিয়াছেন। এই উত্তরে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, মজলিস এবং সিনেট তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করণের নীতি অনুমোদন করিয়াছেন। এসম্পর্কে বিস্তৃত পরিকল্পনা না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ব্যতীত আর কোন উপায় তাঁহাদের নাই। অতঃপর গত ২৬শে এপ্রিল (১৯৫১) মজলিস তৈল কমিটির বিশেষ অধিবেশনে ইরাণের তৈলখনি সমূহকে অবিলম্বে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইহার পরেই ২৭শে এপ্রিল প্রধান মন্ত্রী হোসেন আলা তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ-পত্র শাহের নিকট দাখিল করেন। ২৮শে এপ্রিল মজলিস ডাঃ মহম্মদ মোসাদ্দিককে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচন করে। তিনি এক জন প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ এবং পূর্ব্বে একবার প্রধান মন্ত্রীও হইয়াছিলেন। তিনি জাতীয় ফ্রণ্টের নেতা এবং মজলিস তৈল কমিটির চেয়ারম্যান।

ইরাণের তৈলশিল্প জাতীয় করণের প্রস্তাব ২৮শে এপ্রিল মজলিস কর্তৃক এবং ৩০শে এপ্রিল সিনেট কর্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। ইরাণের শাহ ২রা মে তারিখে তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করণ বিল স্বাক্ষর করেন। গত ১লা মে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মরিসন ইরাণকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, চাপে পড়িয়া বৃটেন তৈলশিল্প সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য আলোচনা করিতে রাজী হইবে না। ইরাণ গবর্ণমেণ্টকে তৈলের মালিকানা দেওয়া বন্ধ করিবার প্রস্তাবও বৃটিশ মন্ত্রিসভায় গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বৃটেন অতঃপর কি করিবে, ইহাই প্রশ্ন। একটি বৃটিশ নৌবহর পারস্য উপসাগরে প্রেরণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইরাণ তাহাতে ভীত হয় নাই। এই ব্যাপারে বৃটেনের পক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে হস্তক্ষেপ করিবে, সে সম্বন্ধে কোন ভরসা দেখা যাইতেছে না।

বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমেরিকাবাসীরা বুঝিতে পারিতেছে না যে, আজ ইরাণে যাহা ঘটিয়াছে, কাল সৌদী আরবে তাহা ঘটিতে পারে, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইরাণের তৈলশিল্প জাতীয় করণের প্রস্তাব কতক পরিমাণে সমর্থন করিতে রাজী আছে বলিয়াই মনে হয়। কয়েকটি মার্কিণ তৈল কোম্পানী ইরাণ গবর্ণমেণ্টের নিকট না কি এই মর্ম্মে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করণের প্রস্তাবে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা হইলে তৈলখনিগুলি পরিচালনের দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিতে রাজী। আমেরিকার স্বার্থ যে কোথায় তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

ইজরাইল-সিরিয়া সংঘর্ষ—

সম্প্রতি ইজরাইল-সিরিয়া সীমান্তে যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠা খুব সহজ নয়। ১৯৪৮ সালে নবজাত ইজরাইল রাষ্ট্রের কাছে সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রসমূহের বিপুল পরাজয়ের পরেও আরব রাষ্ট্রসমূহ ইজরাইলের সহিত আর এক দফা লড়িবার আশা পরিত্যাগ করে নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য যে ঐকত্রিক নিরাপত্তা চুক্তি (Collective Security Pact) হইয়াছে, তাহা কাগজে-পত্রেই আবদ্ধ রহিয়াছে। এদিকে অর্থনৈতিক দিক হইতে ইজরাইল রাষ্ট্রকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টাও কম হইতেছে না। ইরাক তাহার তৈল হাইফাস্থিত তৈল-শোধনকেন্দ্রে প্রেরণ করা বন্ধ করিয়াছে। মিশর ইজরাইলগামী কোন জাহাজকে সুয়েজ ক্যানেলের ভিতর দিয়া যাইতে দেয় না। কিন্তু ইহাতেও ইজরাইলকে জব্দ করা সহজ হইতেছে না। কিন্তু ইজরাইলের সহিত আর এক দফা লড়িবার পক্ষে ইহা সুসময়, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। আর লড়িতে চাহিলেও আমেরিকা এবং বৃটেন তাহা সহ্য করিবে না। তবে কেন এই সংঘর্ষ?

বর্ত্তমান সংঘর্ষের কারণ সন্ধান করিলে দেখা যায়, ইহার উৎপত্তি হইয়াছে গত ৪ঠা এপ্রিল। হুলেহ হ্রদের চারি দিকে যে জলা জমি আছে, তাহার জলনিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে অল্প ব্যয়ে শস্য উৎপাদনের জন্য উর্ব্বর জমি পাওয়া যাইবে। যুদ্ধবিরতি কমিশনের নির্দ্ধারণ অনুসারে এই অঞ্চল ইজরাইল রাষ্ট্রের মধ্যে পড়িয়াছে এবং উহা সিরিয়ার সীমান্তবর্ত্তী। ইহুদী কৃষকরা যখন এই জলাভূমির জলনিকাশের কাজ করিতেছিল, সেই সময় গত ৪ঠা এপ্রিল অসামরিক অঞ্চলস্থিত সিরিয়ার সীমান্ত-রক্ষীরা তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করে। ইহার ফলে যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় তাহাতে ইজরাইলের সাত জন পুলিশ নিহত হয়। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য পরের দিন গ্যালেলী সাগরের নিকটবর্ত্তী অসামরিক অঞ্চলস্থ সুরক্ষিত স্থানের উপর ইজরাইল বিমান কর্ত্তৃক বোমা বর্ষিত হয়। সিরিয়া এই অভিযোগও করিয়াছে যে, ইজরাইল বিমান বাহিনী দামস্কাসের উপরেও বোমাবর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া সিরিয়া ও ইজরাইল উভয়েই নিরাপত্তা পরিষদের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এই অবস্থায় গত ৫ই মে তারিখে (১৯৫১) আবার সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল কেন ?

ইজরাইলের সহিত পূর্ণাঙ্গ সংগ্রাম আরম্ভ করাই এই সংঘর্ষের উদ্দেশ্য, এ কথা স্বীকার করা কঠিন। সিরিয়ার প্রধান মন্ত্রী নাজিম এল কুদসী বে আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠনের এক প্রস্তাব করিয়াছেন। নিখিল আরব কমিটি এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন এবং আগামী জুন মাসে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহাদের সুপারিশ আরব লীগের নিকট পেশ করা হইবে। এই পরিকল্পনা যাহাতে গৃহীত হয়, তাহার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই এই সংঘর্ষ বাধাইবার উদ্দেশ্য হওয়া বিচিত্র নয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, জর্ডানের রাজা আবদুল্লা ইজরাইলের সহিত একটা মীমাংসা করিতে আগ্রহশীল। ইজরাইল-সিরিয়া সংঘর্ষ এই মীমাংসার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া সিরিয়া ও মিশরের উদ্দেশ্য সিদ্ধিরও সহায় হইতে পারে।

ব্রহ্মদেশে সাধারণ নির্ব্বাচন—

ব্রহ্মদেশের নির্ব্বাচন পরিদর্শন কমিশন (The Election Supervisory Commission) গত ১০ই মার্চ্চ (১৯৫১) অবিলম্বে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালের ৪ই জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ব্রহ্মদেশের শাসনতন্ত্রে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, স্বাধীনতা লাভের আঠার মাসের মধ্যে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য এ-পর্য্যন্ত দুইবার সাধারণ নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা হইয়াছে। যদি আবার স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে আগামী ১২ই ও ১৯শে জুনের মধ্যে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। গত ৪ঠা এপ্রিল (১৯৫১) নির্ব্বাচন পরিদর্শন কমিশন এই মর্ম্মে ঘোষণা করেন যে, মোট ২৫০ নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের মধ্যে ১১২টি নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে বর্ত্তমানে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। অতঃপর উহার সংখ্যা আরও হ্রাস করিয়া ৭৬টি করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের

যে অবদান হয় নাই, নির্বাচনকেন্দ্র ভাগ করার মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, গত ১৩ই মা (১৯৫১) ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টই পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, ৩২টি জেলায় ২৮টি সহর এখনও কম্যুনিষ্টদের দখলে রহিয়াছে। ১৯৫১ সালের শেষ ভাগে কম্যুনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চলে ভোট গ্রহণ করা হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।

যদিও এই নির্বাচন আংশিক ভিত্তিতে হইবে, তথাপি ইতিমধ্যে নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে যে সকল রাজনৈতিক দল ছিল সেগুলিকে তো পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছেই, তা ছাড়া আরও নূতন দল গঠিত হইয়াছে। মহাবামা অথবা বৃহত্তর ব্রহ্ম দল, গোয়ামা দল এবং মায়োচিং দল পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পি-ভি-ও অর্থাৎ পিপলস্ ভলাণ্টিয়ার অর্গ্যানিজেশনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। ইহা ছাড়া আরও দুইটি নূতন দল গঠিত হইয়াছে। একটি ইউনিয়ন লীগ, আর একটি ব্রহ্ম ডেমোক্রাটিক দল। সোশ্যালিষ্টরা এ-এফ-পি-ই-এল'র সমর্থক। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরিয়া ব্রহ্ম শ্রমিক ও কৃষক দল গঠিত হইয়াছে। দলের সংখ্যা বেশী হওয়ায় নির্বাচনে এ-এফ-পি-ই-এল দলেরই জয়লাভের বেশী সম্ভাবনা।

কম্যুনিজম সম্পর্কে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের মনোভাব কিছু অদ্ভুত রকমের। অধিকাংশ ব্রহ্মবাসীরই না কি ধারণা যে, বৌদ্ধধর্ম কম্যুনিজমের প্রতিষেধক। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট আভ্যন্তরীণ কম্যুনিজমের সহিত লড়াই করিতেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের প্রতি তাঁহারা বন্ধুভাবাপন্ন। গত অক্টোবর মাসে (১৯৫০) রেঙ্গুনে কম্যুনিষ্ট চীনের রাষ্ট্রদূতাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি রুশ রাষ্ট্রদূতাবাসও স্থাপিত হইল। গত শরৎ কালে ইন্দো-চীনের হো চি মীন গবর্ণমেণ্টেরও একটি মিশন রেঙ্গুনে স্থাপিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে এই মিশন শ্যামের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্যামের গবর্ণমেণ্ট বাও দাই গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করার পর এই মিশন ব্যাঙ্কক হইতে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

নেপালে গণতন্ত্রের সঙ্কট—

নেপালে অন্তর্বর্তী গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুই মাস পার না হইতেই উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য ষড়যন্ত্র এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান হইয়াছিল, উহার মধ্যে আপোষ মীমাংসার দুর্বলতা বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট শুভেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া রাণা-গোষ্ঠী এবং নেপালের জনসাধারণের মধ্যে যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট গঠনে সহায় হইয়াছিলেন, সেই সামঞ্জস্যের সুযোগ লইয়াই রাণা-গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টকে প্রায় ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কেবল নেপালের স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরলার দৃঢ়তা, নেপালী মুক্তি সেনা, কাঠমাণ্ডুর জনসাধারণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহায়তার জন্যই এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইয়াছে। এই অভ্যুত্থানকে প্রাসাদ-বিপ্লবের সহিত তুলনা করিতে পারা যায় এবং উহা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। নেপালের প্রধান মন্ত্রী মোহন সমশের জঙ্গবাহাদুর রাণা যখন বুঝিলেন যে, আপোষ মীমাংসার পথে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা না করিয়া আর উপায় নাই সেই সময়েই, নূতন গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারত সমশেরজঙ্গ কুর্কী দল নামে একটি দল গঠন করেন। এই ভারত সমশের নেপালের প্রধান মন্ত্রী মোহন সমশেরের ছোট ভাই বাবর সমশেরের পৌত্র। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে প্রধান মন্ত্রী পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এবং বাবর সামশের জঙ্গ দেশরক্ষা-সচিব। প্রধান মন্ত্রী আবার নেপাল সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন।

এই কুর্কী দলের স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হয় প্রধান মন্ত্রীর শরীররক্ষী দল হইতে। ইহারা আট পাহাড়ীয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কয়েক জন সামরিক অফিসারও এই দলকে সমর্থন করে। ভারত সমশের পুলিশের নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দল গঠনে নেপাল মন্ত্রিসভার দুই জন মন্ত্রীর কার্য্যকরী সাহায্য তিনি পাইয়াছেন। এই দুই জন মন্ত্রী কে কে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। কুর্কী দলের স্বেচ্ছাসেবকরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫১) অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়। কুর্কী দলের নেতারা এক গোপন সভায় সমবেত হইয়া দলের নাম পরিবর্ত্তন করেন। কুর্কী দলের নূতন নামকরণ হয় বীর গুর্খা দল। জনসাধারণের পক্ষ হইতে অনেকেই এই দলের কার্য্যকলাপের কথা স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত কৈরলাকে জানাইয়াছিলেন। শ্রীযুত কৈরলাও গত ১ই এপ্রিল (১৯৫১) জাতীয় ঐক্য দিবস উপলক্ষে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, নবজাত গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র চলিতেছে। বীর গুর্খা দলই যে এই ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহাও তিনি উল্লেখ করেন! ইহার দুই দিন পরেই ১১ই এপ্রিল এই ষড়যন্ত্রকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার জন্য ভারত সমশের জঙ্গকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। পরদিন অর্থাৎ ১২ই এপ্রিল বীর গুর্খা দল জেলখানা ভাঙ্গিয়া ভারত সমশেরকে মুক্ত করে এবং শ্রীযুত কৈরলাকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার বাস-গৃহও আক্রমণ করিয়াছিল। এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেপালাধিপতি নেপাল সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন।

নেপালের শিশু গণতন্ত্র অল্পের জন্য ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু উহার সঙ্কট এখনও কাটে নাই। বস্তুতঃ মন্ত্রিসভায় রাণা-গোষ্ঠী যে-পর্য্যন্ত থাকিবে, সে-পর্য্যন্ত গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার শ্রেষ্ঠ সুযোগ তাঁহাদের হাতে থাকিবেই। দীর্ঘ দিন স্বৈরতন্ত্রে অভ্যস্ত হইয়া তাঁহারা গণতন্ত্রের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারিবেন, ইহা ভরসা করা যায় না। সেই জন্য নেপালী কংগ্রেস বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তে একদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য নেপালাধিপতির নিকট আবেদন করিয়াছেন। মন্ত্রিসভার সঙ্কট সমাধানের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টেরও সাহায্য চাওয়া হইয়াছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

[বসুমতীর মাননীয় কর্তৃপক্ষ আমার নাম মাসিক বসুমতীর সম্পাদক হিসাবে যুক্ত করেছেন। কিন্তু স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' লিখতে না পারলে সম্পাদকীয় লেখার অর্থ হয় না। সেজন্য আমি বাঙলা দেশের অধিকাংশ পত্র পত্রিকার সম্পাদকদিগের মূল্যবান মতামত মাসিক বসুমতীর সাময়িক প্রসঙ্গে জ্ঞাত করতে চাই। আমি বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় এমন কেউ নয় যে আমাকে তীক্ষ্ণধার ভাষায় সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতে হবে। তাই সম্পাদকীয় লেখায় বিরত থাকলাম।—স]

গুলীবর্ষণ। গুলীবর্ষণ ॥

"দেশে আজ খাদ্য-বস্ত্রের প্রচণ্ড হাহাকার দেখা দিয়াছে, দেশের লোক অভাব-অনটনে জর্জরিত এবং বিক্ষুব্ধ। পরম ত্যাগী রাষ্ট্রনেতারা নিজেদের কাজ গুছাইতে এতই ব্যস্ত যে, লোকের দুর্দ্দশা মোচনের কোন ব্যবস্থা করিবার সময় তাঁহাদের নাই। এই অবস্থায় করণীয় যাহা অবশিষ্ট থাকে, সরকারী কর্ত্তারা তাহাই করিতেছেন! বৃটিশ আমলের মত পুলিশের হাতে তাঁহারা তুলিয়া দিয়াছেন অবাধ ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতার নেশায় মাতাল হইয়া শান্তি ও শৃংখলা রক্ষায় পরম পক্ক পুলিশবাহিনী যথেচ্ছ ভাবে লোককে ঠ্যাঙ্গাইয়া বেড়াইতেছে। কোচবিহারে ভুখা মিছিলের উপর লাঠি ও গুলী চালানো এই পুলিশী স্বৈরাচারিতার নবতম দৃষ্টান্ত। কোচবিহারে চাউলের দাম সম্প্রতি ৭০্ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়া গিয়াছে। চাউল এই রকম অগ্নিমূল্য হওয়াতে জনসাধারণের অবস্থা যে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, এই কথাটাই তাঁহারা দল বাঁধিয়া সরকারী প্রতিনিধিকে জানাইতে গিয়াছিলেন। আর এই 'মহা অপরাধের' প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাদের করিতে হইয়াছে নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে। যে গভর্ণমেণ্ট মানুষের অতি প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের নিয়ম-শৃংখলার অজুহাতে, আইনের ধারা আক্ষরিক ভাবে প্রয়োগের অজুহাতে অনাহারক্লিষ্ট ক্ষুৎপীড়িত জনসাধারণকে হত্যা করিবার কোন অধিকার আছে কি? যাঁহারা দেশের মানুষের বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না—তাঁহাদের দেশ-শাসনের অধিকার তো নাই-ই, শান্তি ও শৃংখলার বুলি ঠোঁটের ডগায় নাচাইয়া বাহাদুরী দেখাইতে তাঁহাদের লজ্জিত হওয়াই উচিত।"

—দৈনিক বসুমতী।

*　　*　　*　　*

"ঘটনা যে ভাবেই বা যাহাদের দোষেই এরূপ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়া থাকুক, সারা অঞ্চলব্যাপী প্রচণ্ড খাদ্য-সঙ্কটের মুখে ভুখা মিছিলের উপর গুলী চালানো এবং তাহাতে এতগুলি লোকের হতাহত হওয়া এমনই একটি বিষম ব্যাপার যে, অতি স্থিরবুদ্ধি মানুষও ইহাকে বন্দুকের সাহায্যে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টারূপেই অভিহিত করিবেন এবং এই হঠকারিতাকে শুধু অবিবেচনার নয়, প্রগাঢ় অমানুষিকতারও পরিচায়ক বলিয়াই নিন্দা করিবেন।

"ভুখা মিছিল বাহির করিয়া খাদ্য-সঙ্কটের সমাধান হইবে এমন কথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অবশ্য বিশ্বাস করেন না। অধিকতর ধীরতার সহিত সমস্যার স্বরূপটি উপলব্ধি করা এবং ন্যায়সঙ্গত পথে তাহার সমাধান দাবী করাই সমীচীন। বিহারে নিদারুণ খাদ্যাভাব চলিতেছে, মুর্শিদাবাদ এবং জলপাইগুড়ির অনেক স্থানেও খাদ্যের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। ত্রিবাঙ্কুর এবং মাদ্রাজের কোন কোন অঞ্চলেও খাদ্যবস্তুর বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। এই দেশজোড়া খাদ্যসঙ্কটের সমাধান কি ভাবে ও কোন পথে হইতে পারে, তাহা সত্যই এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যাকে শোভাযাত্রা ও শ্লোগানের মাধ্যমে প্রকাশই কি সমাধানের একমাত্র উপায়? শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল এবং উহা শান্তিপূর্ণ ভাবেই দপ্তরখানার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, আর জনতাও নিরস্ত্র ছিল—ইহা যেমন লক্ষ্য করিবার বিষয়, তেমনি তাহারা খাদ্যাভাবজনিত ক্লেশেরই প্রতিকার চাহিতেছিল। জনসাধারণের ন্যায্য দাবী সম্বন্ধেই সরকারকে অবহিত করিতে চাহিতেছিল, ইহাও উপেক্ষা করিবার নয়। এ অবস্থায় লাঠি এবং বন্দুক চালাইয়া তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিতে যাওয়া কেন?

"এই প্রতিকারহীন দুর্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেই যদি বন্দুক বাহির হয় এবং অর্দ্ধ ডজন নিহত ও দেড় ডজন আহত হয়, তাহা হইলে মানুষ কেমন করিয়া ও কোন্ প্রাণে ক্ষমতাধীশ্বরদের দু'হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইবে? কীট-পতঙ্গদের মতো

পদে পদেই আমরা মানুষের মৃত্যু দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তথাপি এই শ্রেণীর বন্দুকবাজীকে নিঃশব্দে পরিপাক করা অসম্ভব।"

—যুগান্তর।

* * * *

"ক্ষুধার্ত্তের মিছিলের উপর গুলীবর্ষণের দ্বারা মিছিলকে ছত্রভঙ্গ এবং জনতাকে অপসারিত করা যায়, কিন্তু ক্ষুধা এবং ক্ষুধার্ত্তের দাবী অপসারিত হয় না। এই সাধারণ সত্যটি ইতিহাসের বহু ঘটনায় বার বার প্রমাণিত হইয়াছে। ক্ষমতাবান শাসকের অস্ত্রাঘাতে ক্ষুধার্ত্তের শোণিত পথের ধূলা রঞ্জিত করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ক্ষুধার্ত্তের দাবীর মীমাংসা হয় নাই, বরং দেখা গিয়াছে, জনসাধারণের দুঃখ ও ক্লেশের প্রতি উদাসীন শাসকের সকল সশস্ত্র ঔদ্ধত্যের চরম মীমাংসা করিয়া দিয়াছে অভ্যুত্থিত ক্ষুধার্ত্তের দাবী। কিন্তু কোচবিহার হইতে যে মর্ম্মান্তিক ঘটনার বিবরণ আমরা পাইয়াছি তাহাতে মনে হয় যে, কোচবিহারের সরকারী ক্ষমতার পদে সমাসীন থাকিয়া যাঁহারা জনসাধারণের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণের অধিকার উপভোগ করিতেছেন, তাঁহারা এই ঐতিহাসিক শিক্ষা বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহাও হইতে পারে যে, তাঁহারা এই শিক্ষার কোন ধার ধারেন না। 'কল্যাণ রাষ্ট্র' গঠনের নীতি লইয়া যে সরকার গণতান্ত্রিক আদর্শে রাজ্য পরিচালনা করিতেছেন বলিয়া সতত আত্মপ্রশংসা কীর্ত্তন করিতে থাকেন, সে সরকারের পুলিশকে আজ ভুখা মিছিলের উপর গুলীবর্ষণ করিতে হইতেছে। অপরঃ বা কিং ভবিষ্যতি।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

* * * *

"কোচবিহারের মাটি রাঙ্গাইয়া দিয়া যে ছয়টি অমূল্য জীবন চিতাশয্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের জীবন দান ব্যর্থ হয় নাই, হইবে না। আজ ১৪৪ ধারা কোচবিহার হইতে উঠিতে পারিল। মাইক ও চোঙ্গা ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাহৃত হইতে পারিল—সারা জেলায় আংশিক খাদ্য-বরাদ্দ-ব্যবস্থারও প্রচলন হইল। কিন্তু কি মূল্যে? কেন অর্ব্বাচীন সরকারের ভুলের খেসারৎ যোগাইতে এতগুলি অমূল্য জীবন বলি দিতে হইল? যাহাদের সংকট-ত্রাণের কাণাকড়ি বুদ্ধিও ঘটে নাই, তাহারা কোন্ লজ্জায় গদী আঁকড়াইয়া থাকিতে আজও চাহিতেছে? কোন্ সাহসে আজিও নলহাটিতে বসিয়া আজিও বলিতেছে সাড়ে তিন বৎসরে কংগ্রেস যাহা করিয়াছে, তাহাতে গৌরব করিবার কিছু না থাকিলেও লজ্জিত হইবার কিছুই নাই? বৌবাজারে নারী শোভাযাত্রাকারিণীদের বক্ষভেদ করিয়া, বীণাপাণিকে হত্যা করিয়া সর্ব্বশেষ ছয়টি তরুণ-তরুণীর বক্ষপঞ্জর ভাঙ্গিয়াও যাহারা চলিতে পারে, তাহাদের লজ্জিত হওয়ার কিছুই নাই, সেই নির্লজ্জদের যুক্তিতর্ক দ্বারা লজ্জা-ঘৃণা কাহাকে বলে বা সঙ্গত ও অসঙ্গত আচরণ কোন্‌টি তাহা কখনও বুঝানো যাইবে না। ইহারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্ট সঙ্কটজালে জড়াইয়া যাইতেছে। অশেষ দুঃখ ও দুর্গতি জনসাধারণের যে ললাটলিপি, ইহা তো দেখাই যাইতেছে। সে দুর্গতির মূলে যে এই আপকে ওয়াস্তে জনকল্যাণ কর্মীর দল, ইহাও বুঝিতে আর বাকী নাই। তবে ইহার শেষ কি জাত যাবে—ইহাই আজ জনগণের প্রশ্ন। কোচবিহার যে ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিতেছে, অন্যান্য জেলায়ও চাউলের মূল্য যে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাই কি শেষাঙ্কের সন্ধান দিতেছে?"

—লোকসেবক।

* * * *

"সারা পশ্চিম-বাংলায় আজ নানা অভাবের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে। সদ্য-প্রকাশিত সরকারী প্রেসনোটে দেখা যায় চাউলের দর জলপাইগুড়িতে ৩৫।০, শিলিগুড়ি ৩৩।০, হাওড়া ২৬৸৵, হুগলি ২৭৸০, মুর্শিদাবাদ ২৬।০, ২৪ পরগণা ২৭।৵, নদীয়া ২৬।০, সমগ্র প্রদেশে গড়ে ২৬।৶ আনা। কুচবিহারের এক সপ্তাহের মধ্যে ৪২৲ টাকা হইতে ৭০৲ টাকায় চাউলের দর উঠে, সংবাদপত্রে তাহা দেখিয়াছি। এই দারুণ অন্নাভাবের প্রতিকার দাবী করিবার অধিকার নিশ্চয়ই বুভুক্ষিত জনসাধারণের আছে। কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার গণমতের ন্যায্য ও বৈধ অভিব্যক্তিকে সব সময়ে সহ্য করিতে পারেন না। তাই কুচবিহারে শত শত নরনারী যখন তাহাদের দাবী জানাইবার জন্য শোভাযাত্রা করিয়া সেক্রেটারিয়েটের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ ও মিলিটারী লাঠি ও পরে গুলী চালায়। ফলে পাঁচ জন নিহত এবং বহু শোভাযাত্রী অল্প-বিস্তর আহত হয়। নিহতদিগের মধ্যে একটি ৭ বৎসরের বালক ও দুইটি ১৫ ও ১৬ বৎসরের বালিকাও রহিয়াছে। ইহার প্রতিবাদে বাংলার সর্ব্বত্রই বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে জনসভায় এই অনাচারের প্রতিকার দাবী করা হইয়াছে। কুচবিহারের ডেপুটি কমিশনার, এস্ ডি ও, পুলিশ সুপার ও ডেপুটি সুপারের প্রকাশ্য আদালতে বিচার দাবী করা হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের প্রেসনোটে অবশ্য বলা হইয়াছে যে, জনতার পক্ষ হইতে প্রথমে ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হইলে আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ ও মিলিটারী গুলী করিতে বাধ্য হয়। বৃটিশ আমলের মামুলী কৈফিয়তের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। ইংরাজ শাসনের অবসান হইলেও শাসন-কাঠামোর 'নলিচা ও খোল' পূর্ব্ববৎ রহিয়া গিয়াছে। সেই আমলাতান্ত্রিক মনোভাবেরও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কুচবিহারের বিশিষ্ট নাগরিকদিগের—তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেসের সভাপতি, সহ-সভাপতিও রহিয়াছেন—উক্তি অপেক্ষা আমলাতন্ত্রের কথা পশ্চিম-বাংলার মন্ত্রিসভার নিকট অধিক নির্ভরযোগ্য। আর বাংলা সম্বন্ধে নয়াদিল্লী সম্পূর্ণ উদাসীন, নতুবা স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালচারী কিরূপে পার্লিয়ামেন্টে বলিতে পারেন যে, কুচবিহার সম্বন্ধে না কি সংবাদ তিনি পান নাই। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে টেলিফোন-রেডিওর যুগে তাঁহার এই কৈফিয়তে আমরা হতবাক্ হইয়াছি। অনুগত দলবিশেষের হস্তে শাসন-ভার রাখিয়া নির্ব্বাচন-বৈতরণী সহজে পার হইবার ব্যবস্থা হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। বাংলার ভাগ্যে আর যাহাই হউক।"

—মুর্শিদাবাদ সমাচার।

* * * *

"আজ পশ্চিম বাংলার প্রতিটি মানুষের মনে এই কথাই ধ্বনিত হইতেছে—কেন কুচবিহারের এমন হয়? কুচবিহারের যা সমস্যা তা কি কুচবিহারেই সীমাবদ্ধ? না, এই সমস্যা আজ বাংলার প্রতিটি জেলার, প্রতিটি গ্রামের, প্রতিটি মানুষের জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামের প্রতীকরূপে প্রকাশিত? সাধারণ মানুষের খাওয়া-পরার যে দাবী,

তাহা প্রতিটি সভ্য দেশের সরকারেরই নিজস্ব দাবী বলিয়া চির-দিন সুপরিচিত। কিন্তু কুচবিহারের এই বাঁচার দাবীতে সেখানের সাধারণ মানুষ, শিশু ও বালিকাদের উপর গুলী চালাইয়া তাহাদিগকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হইল কেন? এই হত্যা কাহারা করিল এবং এই নিলর্জ্জ হত্যাকাণ্ডের জন্ত দায়ী কে?"

"যে কুচবিহার সহরে মাত্র ১৫ দিনের চাউল, সরকারী গুদাম হইতে বাহির করিয়া দিবার হুকুম দিলে স্থানীয় সমস্ত লোক এক সাঁঝ খোরাক খাইয়া বাঁচিবার আশায় ফিরিয়া যাইত, সেখানে গুলী করিয়া পাঁজর ভাঙ্গিয়া ফিরাইবার ব্যবস্থা কেন করা হইল? আজ বকুল তালুকদার, বন্দনা, সবিতা বসু, বাদল বিশ্বাস ও সতীশ দেবনাথের বুকের রক্ত জমাট করিয়া যে অস্ত্র তৈরী করিয়া বাঙ্গালীর হাতে তুলিয়া দিল, তাহা কি বাঙ্গালী এই যুগসন্ধিক্ষণে তাহার আপন অস্তিত্বকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রয়োগ করিবে না? তাহার কি শিক্ষা-জীবনের অবসান হইয়া শিক্ষাদানের জীবন সুরু হইবে না? নিশ্চয় হইবে। নচেৎ বাংলার মাটীতে ক্ষুদিরামের, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ও অরবিন্দের জন্ম সার্থক হয় কি করিয়া? এই জন্যই ইহার সূচনা-স্বরূপ দেখা যাইতেছে যে, কুচবিহারের দিকে আজ অত্যাচারী কংগ্রেসী সরকারের কর্মচারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে দুবিসহ করিয়া তোলা হইয়াছে, বয়কট-ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং সরকারী প্রহসনমূলক তদন্ত কমিটি দৃঢ় ভাবে বর্জ্জন করিয়া জনসাধারণের দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিটির দ্বারা তদন্ত করিয়া খুনী কর্ম্মচারীদের বিচারের দাবী উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে এবং বাংলার প্রতিটি স্বাধীনতাকামী মানুষের দ্বারা এই দাবী বজ্রকণ্ঠে সমর্থিত হইতেছে।"

—বীরভূমের ডাক।

* * * *

সুভাষচন্দ্রের বিবাহ

"সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে আলোচনা প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিবাহ সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর সমগ্র ভারতব্যাপী এ বিষয়ের জল্পনা-কল্পনার তরঙ্গ বহিয়া গেল। নেতাজীর অনুগামী বলিয়া পরিচিত কেহ কেহ বিবৃতি দিলেন, ইহা একটা অপপ্রচার; কেহ বলিলেন, সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব্বে ইহা এক কংগ্রেসী চাল—নচেৎ এত দিন চুপচাপ থাকিয়া দীর্ঘ দশ বৎসর পরে এই সংবাদ প্রকাশ করা হইল কেন এবং এত দিন তাহা চাপিয়া রাখিবারই কারণ কি?"

"সুভাষচন্দ্রের বিবাহ-সংবাদকে প্রকাশ না করার পক্ষে যে সমস্ত যুক্তিই দেখানো হউক, ভারতবর্ষের ছোট-বড় অধিকাংশের মন সংস্কার-বিমুক্ত নহে। এত দিন যাঁহাকে তাঁহারা আজন্ম সন্ন্যাসী চিরকুমার বলিয়া গোস্বামীর দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ তাহাদের পক্ষে এক জন বিদেশী মহিলার পাণিগ্রহণ যেন বিশ্বাস্য নহে এবং হইলেও তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়। যেন সুভাষচন্দ্র একটা কুকাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, অতএব তাঁহার এই অপবাদকে চাপা দিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের জন্ত এই সংবাদকে এত দিন প্রকাশ করা হয় নাই এবং বিবৃতির এই অংশের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত এবং তাহাদের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতেছি—"দৃঢ় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না মমতাময়ী এই নারী ভারতের স্বাধীনতার জন্য বহু বৎসর সংগ্রাম করিয়াছেন এবং যিনি নেতাজীর শক্তি ও উদ্দীপনার উৎস ছিলেন, তাঁহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে বরণ করায় আমরা গর্ব অনুভব করি। আমরা জানি, নেতাজী যখন দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অধিবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব করিবার জন্ত জার্ম্মাণী হইতে বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করেন, শ্রীমতী শেঙ্কল তখন দুই মাসের শিশুকন্যা ক্রোড়ে লইয়া পুরাকালের যুদ্ধযাত্রী স্বামীকে বিদায়দাত্রী নারীর মতই নেতাজীক বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। এ জন্ত আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, আমরা নেতাজীর সহধর্ম্মিণী এবং কন্যাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি।"

—দামোদর।

* * * *

"সুভাষচন্দ্রের পরিবার' অর্থাৎ নেতাজীর বিবাহিত জীবন ও তাঁহার পত্নী-কন্যা-সমন্বিত এই পরিবার রচনার সংবাদে এতখানি বিস্মিত হইবার কি হেতু আছে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে খুব সহজ বা সুখকরও হইবে না। সুভাষচন্দ্রের ন্যায় আরও বহু দেশমাতার মুক্তিব্রতী দেশকর্মী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চিহ্নিত সৈনিক অথবা সেনানীরূপে যাঁহারা দেশ হইতে বিদেশে গিয়াছেন, তথায় বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র, স্বাধীন রাজ্য হইতে অস্ত্রাদি সংগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াছেন, সেই দীর্ঘ প্রবাস-জীবনে কোথাও হৃদয়ের দায়ে, কোথাও বা ঘটনাচক্রে অর্থাৎ শীকারী রাজশক্তির সন্ধানী দৃষ্টির উপর ধূলিনিক্ষেপে উহাকে এড়াইবার জন্যই তাঁহাদের বিবাহ করিয়া সেখানে সংসার পাতিতেও হইয়াছে—ইহা আমরা জানি বটে, আর তৎসঙ্গে ইহাও জানি যে, পুরাণ-কথিত কচের ন্যায় দেবজননীর সুসন্তান যাঁহা বিদেশে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করিতে গিয়া তথায় রূপসী দৈত্যবালার অনিন্দ্য প্রেমের আকর্ষণে ধরা না দিয়া বরং তাহার জন্য দারুণ অভিশাপ কুড়াইয়াও মুক্তহৃদয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছেন—এমন প্রভাতকুসুমের মত অনাঘ্রাত জীবনের সংখ্যা দুর্লভ, অত্যল্প, অঙ্গুলির অগ্রভাগেই গণনীয়। সে ক্ষেত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলিতেই আমাদের চিত্তে এই 'কোটিতে গুটিক' শেষোক্ত অত্যল্প অসাধারণ গোষ্ঠীরই এক জন আকুমার ব্রহ্মচারী, জনবীরেরই জ্যোতির্ম্ময়ী অগ্নিমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে। তাই বিস্ময়ের উপর বিস্ময় জাগে, হৃদয় অবসাদে নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ে—যখন শুনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ও স্বরূপে সংগঠিত, আমাদের নেতাজীর কোন মানবীর প্রতি প্রেমাসক্তির কথা, তাঁহার পরিণয়-বন্ধনের কথা। মন সংশয়ের বিষবাষ্পে ভরিয়া উঠে ও অভিমানে বলিয়া উঠিতে হয়—হয়ত ইহা কোনও হীনমতি দুর্মুখেরই মিথ্যা প্রচার—কোনও বিশ্বনিন্দুকের মুখ দিয়া সুভাষচন্দ্রের শত্রু-পক্ষের তরফ হইতে অতি চমৎকার বুদ্ধিমত্তার সহিত তাঁহার অপাপ-বিদ্ধ চরিত্রে ও নামে কলঙ্ক-মসী লেপনের চক্রান্তমূলক এক কূটকৌশলী অপচেষ্টা। তাই আর্ত্তকণ্ঠেই আমরা প্রশ্ন করিতেছি—এই প্রচারিত সংবাদের সকল অনুমান ব্যঞ্জনা নিরসন করিয়া, ভারত গভর্ণমেণ্ট কি সবিস্তার সমস্ত অবগত ঘটনা প্রকাশ করিবেন?

"সুভাষচন্দ্র যদি বিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহার সে পরিণীতা পত্নী অথবা তাঁহাদের আদরিণী কন্যা-সন্তানকে দেশবাসী সমাদরেই দেশের বুকে স্থান দিবে—ইহা খুব স্বাভাবিক। এই দিক দিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু যদি শ্রীমতী বসুকে আমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি দেশের প্রতিভূরূপে যোগ্য কাজই করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। সেইরূপ সর্দ্দারজী প্যাটেল তাঁহাদের জন্ত 'নেতাজী' চলচ্চিত্রের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় আয় সংগ্রহ পূর্ব্বক বিশেষ অর্থভাণ্ডারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়া থাকেন, তাহাও সমীচীন কাজই হইয়াছে—ইহাও আমরা বলিব এবং ভুলিয়া যাইব যে, নেতাজীর কর্ম্মের জন্তই সুইজারল্যাণ্ডেরই গিরিনগরীতে এক দিন সর্দ্দারজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় বিঠলভাই প্যাটেল মহোদয় যে লক্ষ টাকার তহবিল দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া শুনা গিয়াছিল, তাহার অধিকারত্ব লইয়া পরে যে আইন-সম্পর্কিত কূট তর্কের ঝটিকা উঠিয়াছিল ও তাহার শেষ পরিণাম যাহা দাঁড়াইয়াছিল, সে সবই আমরা ভুলিয়া যাইব। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আমরা সঠিক ভাবায় জানিতে চাই—সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের সকল সন্ধান—সংবাদের মূল তথ্যগুলি তাঁহার জীবন-শেষাঙ্কের সংগৃহীত সমস্ত আসল নিছক সত্য—এই প্রামাণিক তথ্য ও সত্যের উপরই বাঙ্গালী তাহার শ্রদ্ধস্মৃতি স্বপ্নমন্দিরের 'নেতাজী'কে বুঝিয়া লইবে—কোনও কূট-কৌশল চাতুরী দিয়া সুভাষচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র মসীলিপ্ত করার অপচেষ্টা বাঙ্গালী সহ্য করিবে না।

"ভারত গবর্ণমেণ্টকে আবার আমরা জানাইতেছি—তাঁহারা সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে সকল জানা তথ্য প্রকাশ করুন—আমাদের ও দেশবাসীর হৃদয়ের সন্দেহ ভঞ্জন করুন।"   —নবসংঘ।

*

"নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে কংগ্রেসী নেতারা অনেক মিথ্যা প্রচারই এ-পর্য্যন্ত করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের সমাপ্তি-দিবসে নেতাজীর পত্নী ও শিশুকন্যার ভরণ-পোষণের প্রশ্ন তুলিয়া তাঁহারা অপপ্রচারের যে জয়ঢাক বাজাইয়াছেন, তাহার নিন্দা করিবার মত কঠোর ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাঁহাদের এই অপপ্রচার কার্য্যের আর একটি নিকৃষ্ট কৌশল এই যে, স্বর্গতঃ সর্দ্দার প্যাটেলের নাম ইহার সহিত জড়িত করা হইয়াছে। সর্দ্দারজী বাঁচিয়া নাই। কাজেই তাঁহার নাম করিয়া নেতাজীর নামে মিথ্যা প্রচার করা কত সুবিধা! ভারত গবর্ণমেণ্ট যখন নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করেন, তখন সর্দ্দারজী জীবিত ছিলেন। তিনি যদি জনৈক অষ্ট্রীয়ান মহিলাকে বিবাহ করিয়া থাকেন এবং যদি তাঁহার একটি কন্যা-সন্তান থাকিয়া থাকে, তবে সেই সময় সর্দ্দারজী তাহা প্রকাশ করেন নাই কেন? কেন তিনি তখন নেতাজীর স্ত্রী ও কন্যার ভরণ-পোষণের জন্ত আড়াই লক্ষ টাকার তহবিলের কথা বলেন নাই? শ্রীযুক্ত নেহেরু যদি নেতাজীর পত্নীকে কন্যা সহ ভারতে চলিয়া আসিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া থাকেন, তবে ইতিপূর্ব্বে তিনি সেই কথা প্রকাশ করেন নাই কেন? সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে নেতাজীর নামে এইরূপে মিথ্যা প্রচার খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হইতেছে। নির্ব্বাচনে জয়লাভের জন্ত এইরূপ পন্থা গ্রহণ করিতে কংগ্রেসী নেতারা লজ্জাবোধ করিবেন, এতখানি দুরাশা আমাদের নাই। কিন্তু দেশের লোক তাঁহাদের মিথ্যা প্রচারে ভুলিবে না।"   —দৈনিক বসুমতী।

*   *   *   *

কবিগুরুর বিশ্বভারতী

"বিশ্বভারতী এ যুগের ভারতীয় কৃষ্টিতে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীরই গৌরবের বিষয় হইয়া আছে। উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির সাহায্য করিয়া সেই ঐতিহ্যকে টিকাইয়া রাখা ও বর্দ্ধিত করার প্রচেষ্টাকে প্রত্যেকেই আন্তরিক ভাবে সমর্থন করিবে। তবে সরকারী কর্তৃত্ব ও পরিচালন বিষয়ে অযথা হস্তক্ষেপে যাহাতে বিশ্বভারতী রক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত না হয় আইন-কানুন প্রভৃতি গ্রহণ কালে তৎসম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার আবশ্যকীয় উন্নতি ও মানে পৌঁছিতে হইলে দেশে আরও অধিক সংখ্যক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যেভাবে অধিক সংখ্যক ছাত্র একই স্থানে প্রয়োজন অপেক্ষা ক্ষুদ্র সংখ্যক অধ্যাপকের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেছে বা অন্তবিধ চর্চ্চায় রত আছে—তাহারা প্রয়োজনীয় শিক্ষামানে পৌঁছিতে পারিতেছে না; অথচ গৃহ-সমস্যাদির জন্ত ক্ষুদ্র সংখ্যক ছাত্র লইয়া আবাসিক বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের সুবিধাও নগরাঞ্চলে নাই। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া নগরাঞ্চলের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির দিকে সরকার ও জনসাধারণের

উৎসাহ ও সাহায্য থাকিলে শিক্ষা-ব্যবস্থা ও মানের অনেক উন্নতিই হইতে পারে।" —লোকসেবক।

* * *

"বিশ্বভারতীকে বিশ্ববিদ্যাপীঠরূপে রক্ষা করিবার জন্য ভারত সরকার যে অগ্রসর হইয়াছেন ইহা একটা সাধারণ ব্যাপার নহে, মামুলী কর্তব্যসাধন মাত্র নহে, ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা, স্মরণীয় ঘটনা। স্বাধীন ভারত যেরূপ কার্য্যের দ্বারা আত্মপরিচয় দিতে পারে, আপনার স্বাধীনতাকে রূপ দিতে পারে ইহা সেইরূপ একটি ঘটনা। পশ্চিম বাংলার বিধান-সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, বিহারের বিধান-পরিষদে তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু ভারতীয় সংসদে বিশ্বভারতীর জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন ইহা হইতে স্বতন্ত্র ঘটনা।

"রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বা শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতিরক্ষায় বিশ্ববিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা জগতের শিক্ষার, জ্ঞানের ও অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে এক নূতন পরীক্ষা। সরকারী আইনের বাঁধা ধরা কাঠামোর মধ্যে ফেলিয়া শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা রচনা করা ইহার লক্ষ্য নহে, পরন্তু ব্যক্তিগত সাধনার প্রভাবে যাঁহারা নিজেদের জীবনে সত্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সাধনার আলোকে বিশ্বের মানব-সমাজকে নূতন পথ দেখাইবার এবং নূতন পথে পরিচালিত করিবার ইহা প্রয়াস। এই প্রয়াসের সাফল্য অবশ্যই উত্তরসাধকদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিবে, তথাপি মানব-সমাজে বিশ্বব্যাপী বিভ্রান্তির মধ্যে সত্যের ও অধ্যাত্মের আলোক বিস্তারের অধিকার যে ভারতই পাইয়াছে, ইহা তাহার পরম গৌরব।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

* * *

সমস্যাসঙ্কুল কাশ্মীর

"কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাব, দিল্লীর আকাশে অজ্ঞাত বিমান, পাকিস্তানীর দুর্থবোধক বক্তৃতা ও ভারতীয় পার্লামেণ্টে তীব্র বাদানুবাদ দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ইঙ্গ-মার্কিণী একগুঁয়েমী ও পাকিস্তানের সম্মতি জ্ঞাপনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এক রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন, নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি বি এন রাও ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাবের অসারতা ও অপ্রয়োজনীয়তা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া বৃটেন ও আমেরিকা গায়ের জোরে ভারতের উপর এই প্রস্তাব চাপাইয়া দিয়াছেন। কাশ্মীর সমস্যা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিরোধের সূচনা করিয়াছে, উভয়ের সম্মতিতেই উহার সমাধানের জন্য আপোষ প্রস্তাব আনীত হইতে পারে। বার বার আপোষ মীমাংসার চেষ্টা ও মধ্যস্থতা ব্যর্থ হইবার পরেও পুনরায় গায়ের জোরে এই প্রস্তাব ভারতের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার ফলে ইঙ্গ-মার্কিণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভারতবাসীর মনে সন্দেহ জাগরুক হওয়া স্বাভাবিক। ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিণের অন্যায় ও অভদ্র জিদের ফলে দুই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কোন পথে ধাবিত হইবে, তাহা অজ্ঞাত।" —বর্দ্ধমান।

শোক-সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী লেডী অবলা বসু আর ইহজগতে নাই। গত ২৬শে এপ্রিল বুধবার আপার সার্কুলার রোডস্থ তাঁহার বাসভবনে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল। লেডী অবলা বসু ১৮৬৪ সালের ৮ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ৺দুর্গামোহন দাশের দ্বিতীয়া কন্যা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী। তিনি ছাত্রীজীবনে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে কিছু কাল অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৭ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। বহুবার তিনি স্বামীর সহিত ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় অশেষ সহায়তা করিতেন। লেডী অবলা বসু নারী ও শিশুর সেবায় ও তাহাদের কল্যাণে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে অক্ষয় আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহা দেশের ভাবী বংশধরদিগের অনুকরণীয়। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

* * *

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, কৃতী সাহিত্যিক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আর ইহজগতে নাই। গত ২৮শে এপ্রিল রাত্রে তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর হইয়াছিল। সর্বপ্রথম শ্রীঅরবিন্দের নিকট যাঁহারা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অন্যতম ছিলেন। আধুনিক প্রগতিবাদী সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর অন্যতম চিন্তানায়ক শ্রীচক্রবর্ত্তী তাঁহার শক্তিশালী রচনা, ছোট গল্প এবং গীতি-কবিতা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। মাসিক বসুমতীতে তাঁহার বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই সংখ্যাতেও একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পরলোকগতের আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

"বারে বারে বনে বনে জন্ম লই নব নব বেশে
নব নব দেশে।"—রবীন্দ্রনাথ

—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

যু গ বা ণী

রামদয়াল। আমি কাল শশধরের কাছে গিয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কই, আমি ত বলি নাই। তা বেশ ত, তুমি গিছিলে।

রামদয়াল। এক জন খবরের কাগজের সম্পাদক (Indian Empire) আপনার নিন্দা করছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা করলেই বা।

রামদয়াল। তার পর শুনুন। আমার কথা শুনে তখন আর আমায় ছাড়ে না, আপনার কথা আরও শুনতে চায়।

*　*　*　*　*　*

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আচ্ছা, আমার কি রকম অবস্থা?

মাষ্টার (সহাস্যে)। আজ্ঞা, আপনার উপরে সহজাবস্থ'—ভিতর গভীর। আপনার অবস্থা বোঝা ভারী কঠিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাঁ; যেমন floor করা মেজে, লোকে উপরটাই দেখে, মেজের নীচে কত কি আছে, জানে না।

*　*　*　*　*　*

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। তাঁকে লাভ করতে হলে সংস্কার দরকার। একটু কিছু করে থাকা চাই। তপস্যা। তা এ জন্মেই হোক আর পূর্ব্ব জন্মেই হোক।

দ্রৌপদীর যখন বস্ত্রহরণ করছিল, তার ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন শুনে ঠাকুর দেখা দিলেন। আর বললেন—'তুমি যদি কারুকে কখনও বস্ত্র দান করে থাক, ত মনে করে দেখ—হবে লজ্জা নিবারণ হবে।' দ্রৌপদী বল্লেন, 'হাঁ, মনে পড়ছে। এক জন ঋষি স্নান করছিলেন,—তাঁর কপ্‌নী ভেসে গিছলো। আমি নিজের কাপড়ের আধখান ছিঁড়ে তাঁকে দিছলাম।' ঠাকুর বল্লেন—'[illegible]'

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একচল্লিশ

'আশ্রমে কে এল বল দেখি।' ভগবানদাস বাবাজী তাকাতে লাগলেন চার দিকে।

কে আবার আসবে!

'না, একজন কে মহাপুরুষ এসেছেন আশ্রমে। নিশ্বাসে তাঁর সুগন্ধ টের পাচ্ছি। তোরা সব একটু ছাখ দেখি এগিয়ে।'

কত লোকই তো আসছে-যাচ্ছে আশ্রমে। কালনার সিদ্ধবাবাজীর নাম ভারতপ্রসিদ্ধ। এমন কৃষ্ণভক্ত থাকতে আবার কার গায়ের গন্ধে বাতাস আমোদ হবে।

কত ঢঙের মানুষই আসে আজকাল। কে একজন দেখ না এসেছে একেবারে কাপড়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে। মুখ-হাত-পা কিছুই দেখবার উপায় নেই। পুরুষমানুষের আবার এ কোন ছিরি! কোনো অসুখ-বিসুখ নাকি?

'না, এটা ওঁর ভয়-লজ্জার ভাব।' সঙ্গের লোকটি বললে। 'ওঁর বালকস্বভাব কিনা। অচেনা নতুন জায়গায় এলে এমনি ওঁর ভাব হয়।'

'তোমার কে হন?' জিগগেস করলেন বাবাজী।

'আমার মামা। সারাক্ষণ ঈশ্বরভাবেই আছেন। আপনার এ আশ্রম ঈশ্বরভাবের আশ্রম—আপনার নামটিও ভগবান। দেখতে এসেছেন আপনাকে।'

বোসো এক পাশে। কত ভাবের লোকই আসে আজকাল। কী-না-কী একটু ভাব হল, অমনি ঈশ্বরভাব! মোগল-পাঠান হদ্দ হল ফারসি পড়ে তাঁতী!

'কিন্তু কে এল বল তো আশ্রমে! এমন দিব্য-সৌরভ টের পাচ্ছি কেন?' বাবাজী উন্মনা হয়ে উঠলেন।

কোথায় কে! তেমন আবার কে আসবে আচমকা!

বাবাজীকে প্রণাম করে এক পাশে বসল দুজনে। হৃদয় আর রামকৃষ্ণ। বসল একান্ত দীনভাবে। বিনম্র-বিনত হয়ে।

দিব্য গন্ধের উৎস কোথায় বুঝতে পারলেন না বাবাজী।

যাক, উপস্থিত প্রসঙ্গেই নেমে আসা যাক। হ্যাঁ, যা নিয়ে কথা চলছিল এতক্ষণ। সেই বৈষ্ণব সাধুটির কথা। যে গর্হিত কাণ্ড সে করে বসেছে তার সম্বন্ধে এখন কি করা উচিত। কোন শাস্তিটি বিধেয়?

'আমি বলি কি', ভগবানদাসের কণ্ঠে শাসক-রোষ গর্জে উঠল: 'আমি বলি কি, ওর গলার কণ্ঠি কেড়ে নিয়ে ওকে দল থেকে বার করে দাও।'

বাবাজীর যা অভিমত, তাই প্রত্যাদেশ।

মালা ফেরাচ্ছেন বাবাজী।

'আপনি আর অকারণ মালা রেখেছেন কেন?' জিগগেস করলে হৃদয়: 'আপনার সিদ্ধিলাভ তো কবেই হয়ে গেছে।'

এ প্রশ্ন কি হৃদয় করল, না, আর কেউ করাল তাকে দিয়ে?

'নিজের জন্যে কি আর করি? লোকশিক্ষা তো দিতে হবে আমাকে।'

'লোকশিক্ষা?'

'তা ছাড়া আবার কি। তারি জন্যেই তো আছি। আমাকে দেখে আর সবাই যদি অমনি মালা-তিলক ছেড়ে দেয় তবে দল-কে-দল গোল্লায় যাবে।'

ওরে, এ যে সোঽহং বলছে। কী সর্বনাশ! ওরে, দা লাগা। দা বসা। সোঽহং-এর আগে দা জুড়ে দে। বল দাসোঽহং। দেহবুদ্ধিতে দাসোঽহং ছাড়া পথ নেই।

বল আমি দাস, আমি ভক্ত, আমি বালক।

জ্ঞান হলে আবার অহং কি। সূর্য যদি ঠিক মাথার উপর থাকে তবে আর ছায়া কোথায়? কিন্তু অন্য সময়? সূর্য যখন এদিকে-ওদিকে? যখন চলছে দেহের ছায়াবাজি? যখন তার জ্ঞান নেই? তখন? তখন ভক্তি, তখন প্রেম, তখন সেবা। সেবা-প্রেম না নিয়ে মানুষ কী নিয়ে থাকবে? কী করে তবে তার দিন কাটে?

যার অটল আছে তার আবার টলও আছে। এই আছিস স্থির হয়ে অমনি আবার তুই কাজ করছিস। তোর স্থিরতা কতটুকু। তোর চাঞ্চল্যই বেশি। সূর্য মাথার ওপর কতক্ষণ? বেশিক্ষণই সে ডাইনে-বাঁয়ে। তাই জ্ঞান নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকবি? ভক্তিতে ছুটে চল। ভক্তিতে গলে যা। ওরে যা জ্ঞান তাই ভক্তি। জ্ঞান বলে, এ জল; ভক্তি বলে, জানি না কে—এ শুধু শীতলতা। একে ছুঁতে ঠাণ্ডা, খেতে ঠাণ্ডা।

জ্ঞান বস্তু, ভক্তি স্বাদ। কিন্তু যেখানে একা-একা নয়, জীব-জগৎ নিয়ে থাকবি সেখানে স্বাদ দিয়ে যা জনে-জনে। স্বাদ নিয়ে যা ক্ষণে-ক্ষণে।

তাই বলে এই অহঙ্কার! এত প্রতপ্ততা!

নিমেষে কি হয়ে গেল কে বলবে। মুখের কাপড় খসে পড়ল রামকৃষ্ণের। রাগের ঝঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াল আগুনের মত। বললে, 'তুমি লোকশিক্ষা দেবে? তুমি লোক তাড়াবে? তুমি ধরবে-ছাড়বে? কে তুমি? যাঁর এই জগৎসংসার তিনি যদি না শেখান, তিনি যদি না তাড়ান, তিনি যদি না ধরেন-ছাড়েন, তোমার সাধ্য কি! কেন, কিসের এত অহঙ্কার?'

কটিতট থেকে খসে পড়ল বস্ত্রখণ্ড। মুখে দিব্য জ্যোতি, দেহে দিব্য তেজ, কণ্ঠে দিব্য বাণী। সমাধিস্থ রামকৃষ্ণ।

চোখ মেলে তাকালেন একবার বাবাজী। নিশ্বাস নিলেন বুক ভরে। বুঝলেন সেই দিব্য গন্ধের উৎস কোথায়।

এ সংসারে কেউ কোনো দিন তাঁর মুখের উপর কথা বলেনি। সাহস পায়নি প্রতিবাদ করতে। তিনি যা বলেছেন তাই সবাই মেনে নিয়েছে হেঁটমুণ্ডে। কিন্তু কে এ উদ্যতদণ্ড মহাশাসন? অথচ এর প্রতি সেই স্বাভাবিক ক্রোধ হচ্ছে না কেন? কেন জাগছে না প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি? আমি কি বদলে গেলাম নিমেষে? কিন্তু এ কে?

এ সেই বিশ্বভুবনের তমোহর। তোমার অভিমানের তমোনাশ করতে এসেছেন। এসেছেন তোমার অন্তশ্চক্ষু ফুটিয়ে দিতে। বুঝিয়ে দিতে তুমি কে, তুমি কতটুকু। তোমাকে ঠাণ্ডা করে দিতে।

ভাবমোহিত হয়ে গেলেন ভগবান। বললেন, কণ্ঠে বিনয়নম্র মধুরতা: 'আমার এমনি নাম ভগবান বটে কিন্তু আজ থেকে আমার আসল নাম ভাগ্যবান। ভাগ্যবান বলেই আমি আপনাকে পেয়েছি, আমাকে দেখা দিয়েছেন—'

সত্যিই দেখা দিয়েছেন! বাবাজী দেখলেন মহাপ্রভুর মহাভাবের যে লীলাবর্ণন আছে তাই ওঁর দিব্য অঙ্গে প্রকাশিত।

বন্দনার আনন্দস্রোত বইতে লাগল আশ্রমে।

কে এ? কে এ বন্ধনমুক্ত বিভাবসু? অহঙ্কারের সংহত তুষারকে গলিয়ে দিলেন ভক্তির স্রোতস্বিনীতে!

উনিই সেই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস। কলুটোলার হরিসভায় উনিই সেদিন ভাবাবেশে দাঁড়িয়েছিলেন চৈতন্যাসনে।

করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন বাবাজী। বহু কটু-কাটব্য করেছি সেদিন। বুঝতে পারিনি। যিনি সমস্ত জীবের চৈতন্য এনে দিয়েছেন চৈতন্যাসনে তো তাঁরই একমাত্র অধিকার।

মথুর বাবু আর হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে কালনায় বেড়াতে এসেছিল রামকৃষ্ণ। এসেছিল নৌকো করে। কেন এসেছিল কেউ জানেনি। মথুর বাবু গেলেন বাসা দেখতে, রামকৃষ্ণ বললে, চল রে হৃদু, শহরটা একবার ঘুরে আসি। কত দূর এসেই পথের লোককে ডেকে জিগগেস করলে, 'আচ্ছা মশাই, ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমটি কোন দিকে?'

সেই আশ্রমে এসে এই কাণ্ড।

তোতাপুরীকে ক্রোধ জয় করতে শিখিয়ে দিয়েছিল, ভগবানদাস বাবাজীকে শিখিয়ে দিল অহঙ্কার জয় করতে, প্রতিহিংসা জয় করতে।

মথুর বাবুকে বললে, 'এইখানে একটি মচ্ছব লাগিয়ে দাও।'

মথুর বাবু বললেন, 'তথাস্তু।'

সেখান থেকে চলো এবার নবদ্বীপ। চলো একবার দেখে আসি নিমাইয়ের জন্মভূমি।

কেউ বলে নিম গাছের নিচে জন্মেছিল বলে নিমাই। কেউ বলে যমের মুখে তেতো লাগবে বলে নিমাই। কেউ বলে আট-আটটি কন্যা মরে যাবার পর নবম গর্ভে জন্মেছিল বলে নিমাই।

কিন্তু এমন কাঁদনে ছেলে, কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। পাড়ার স্ত্রীলোকদের কত জনের কত রকম চেষ্টা, কিছুতেই নিবৃত্তি নেই। অগত্যা অনুপায় হয়ে হরিনাম সুরু করে দেয় সবাই। ব্যস, শিশুর মুখের খিলখিল হাসি।

পরম সঙ্কেত পেয়ে গেল সকালে। শিশু কাঁদলেই হরিনাম করতে হবে। আর শিশুও এমন হুঁদে, তার কেবল থেকে-থেকে কান্না।

কিন্তু নেড়া-নেড়ীদের এ সব কী কাণ্ড বলো দেখি? সত্যিই কি চৈতন্য অবতার? না, নেড়া-নেড়ীরাই টেনে-বুনে বানিয়েছে একটা? চলো নিজে গিয়ে দেখে আসি।

হ্যাঁ, নিজে সেখানে গেলেই ঠিকঠাক বোঝা যাবে। চৈতন্য যদি অবতার হয়ই তবে সেখানে কিছু-না-কিছু প্রকাশ থাকবেই, আর ইসারা ঠিক মিলে যাবে চট করে।

রামকৃষ্ণ এল নবদ্বীপে। বড় গোঁসাইয়ের বাড়ি, ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ি দেখতে লাগল ঘুরে-ঘুরে। হেথা-হোথা হেন-তেন কত ঠাকুর-দেবতার থান। কোথাও কিছু দেখতে পেল না। সর্বত্রই শুকনো হাঁড়ি ঠনঠন করছে। কোথাও দেবভাব নেই। সব জায়গাতেই এক-এক কাঠের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে আছে শুধু। দূর! এখানে তবে এলুম কী করতে। চল্ ফিরে চল্ নৌকোয়।

তাই সই। ফিরে চলো।

কিন্তু নৌকোয় যেই উঠেছে রামকৃষ্ণ, অমনি বদলে গেল দৃশ্যপট। অলৌকিক দর্শন হল তার। ঐ এলো, ঐ এলো—বলতে বলতে চকিতে সমাধিস্থ হয়ে গেল।

জলে পড়ে যাচ্ছিল, হৃদয় ধরে ফেললে।

কী দেখলে অকস্মাৎ?

'দেখলুম দুটি সুন্দর ছেলে—আহা, এমন রূপ কখনো দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে আকাশ-[illegible] একেবারে ঐ খোলটার মধ্যে ঢুকে গেল, আর আমার কিছু হুঁস রইল না। ওরে, ওরাই হচ্ছে নিমাই-নিতাই। নিমাই যে অবতার, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে?'

কিন্তু এ ভাব নবদ্বীপে না এসে এই গঙ্গাবক্ষে এল কেন?

মথুর বাবু বললেন, 'যে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর জন্ম তা গঙ্গায় ভেঙে গেছে। এই যে বালুর চড়া দেখতে পাচ্ছ এই ছিল আসল নবদ্বীপ। তাই হালের শহরে না হয়ে এই বালুর চড়ার কাছে এসে তোমার ভাব হল।'

তুমি ভাবাম্বুনিধি। তুমি সর্বগুণেশ্বর।
আমি কেউ নই। আমি আবার কে।

বিয়াল্লিশ

কর্মযোগে অঙ্গারও হীরক হয়।

মথুর বাবুও ভক্তিতে-বিশ্বাসে অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

সকাতরে বললেন রামকৃষ্ণকে, 'বাবা, আমাকে ভাবসমাধি দাও।'

হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, 'দিব্যি তো আছিস। সুখে থাকতে ভূতের কিল খাবি কেন?'

'না, ও সব শুনছি না আমি—'

'না শুনলে চলবে কেন? তোর এদিক-ওদিক দুদিক চলছে। ভাব হলে যে অথৈ জলে পড়বি। সংসার থেকে মন যে তখন উঠে যাবে। তখন তোর বিষয়-আশয় কে দেখবে-শুনবে? বারো ভূতে যে লুটে খাবে সর্বস্ব।'

মথুর বাবু তবুও নাছোড়বান্দা।

'ওরে কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁততে-পুঁততেই কি গাছ হয়? আর গাছ হয়েই কি ফল পাওয়া যায়?'

ভক্ত, ভৃত্য আর ভাণ্ডারী এই মথুর বাবু। কখনো প্রভুজ্ঞানে ইষ্টপূজা, কখনো বা সন্তান-ভাবে স্নেহস্রাবণ। কখনো অভিভাবক জ্ঞানে সতর্ক সম্মান, কখনো বা মিত্রবুদ্ধিতে সমতা-মমতা। আর যিনি বিশ্বজনক, যিনি আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয় সর্বত্র যাঁর ক্ষমা, দয়া, বিশ্বাস আর আশীর্বাদ, তাঁকেই মাঝখানে রেখে দুই পাশে শুয়েছেন দুই জনে। মথুর বাবু আর জগদম্বা। একই ধৈর্যের শয্যায়।

রামকৃষ্ণ ভাব দিতে রাজি হল না বলে মরমে মরে রইলেন মথুর বাবু। মাকে বললেন, মা, আমাকে বঞ্চনা করে তোর লাভ কি।

কি খেলা দেখাবার জন্যে মথুর বাবুকে মা নিয়ে এসেছিল রামকৃষ্ণের কাছে তা কি মথুর বাবু জানেন? বারে-বারে রামকৃষ্ণকে যাচাই করে দেখবার জন্যে। সাধে কি আর মথুর বাবু লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে? দেখলেন যতই আগুন আনেন ততই সোনা টকটকে রং ধরে। একলা ঘরে সুন্দরী মেয়ে মানুষ এনে দিলেন, রামকৃষ্ণ দুর্গাস্তব সুরু করলে। শাল-দোশালা চাপিয়ে দিলেন গায়ে, তার গায়ে থুতু ছিটোতে লাগল। রূপোর সাজ আর গড়গড়া দিলেন কিনে, বললে গামছা পরে ডাবা হুঁকো খেতে দোষ হল কি। বিষয় দিতে চাইলেন, এই মারে তো সেই মারে। তাঁর নিজের সংসারের উপরে দিলেন তাকে অপ্রতিহত প্রভুত্বের অধিকার, এক নজর তাকিয়েও দেখল না। কামারপুকুরের সংসারের জন্যে কত অর্থব্যয় করলেন, এতটুকু কাতরতা-কৃতজ্ঞতা নেই!

এ কে তুমি বৈরাগ্যবারিনিধি! আমি অনেক দুষ্কার্য করেছি, জমিদারি বজায় রাখতে খুনখারাপি করতেও কসুর করিনি, এবার দাও আমাকে নৈষ্কর্ম্যের নিষ্কৃতি আমাকে ভাব দাও।

তদ্‌ভাবে তদ্‌ভাবঃ, তদভাবে তদভাবঃ।

'ওরে ঠিক-ঠিক যে ভক্ত সে কি তাঁকে দেখতে চায়? সে শুধু তাঁর সেবা করে।' প্রবোধ দিল রামকৃষ্ণ। 'তাঁর সেবাতেই তার পরমানন্দ। তার বেশি আর সে কিছু চায় না।'

তবু মন ওঠে না মথুর বাবুর।

'তা কি জানি বাপু! মাকে তবে গিয়ে বলি। দেখি তাঁর কি ইচ্ছে!'

এর দিন কয়েক পরেই হঠাৎ একদিন মথুর বাবুর ভাবসমাধি উপস্থিত। তিন দিন ধরে ঠায় জড় অবস্থা।

ডেকে পাঠালেন রামকৃষ্ণকে। দেখে যাও কোথায় এসে উঠেছি শেষ পর্যন্ত।

রামকৃষ্ণ দেখল, আশ্চর্য, এ কী হয়ে গিয়েছে মথুর! যেন আরেক দেশের মানুষ। চেনা যায় না চট করে। দু চোখ লাল, কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। মুখে শুধু ঈশ্বরের কথা। শুধু অধ্যাত্মরতি।

কিন্তু রামকৃষ্ণকে দেখেই দু' পা জড়িয়ে ধরলেন মথুর বাবু। আকুল কণ্ঠে বললেন, 'বাবা, ঘাট হয়েছে। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও।'

'কেন, কি হল?'

'সব তছনছ হয়ে গেল। তিন দিন ধরে এই অবস্থা, বিষয়কর্মে মন দিতে পারছি না, চেষ্টা করলেও মন উঠে-উঠে যাচ্ছে। তিন দিনেই বারো ভূত ছেড়ে তেত্রিশ ভূত এসে লেগেছে—'

'কেন, তখন যে খুব ভাব চেয়েছিলে সখ করে? এখন ফেরৎ দিলে চলবে কেন?'

'এদিকে সব যে যায়!'

'কেন, আনন্দ নেই?'

'আছে, কিন্তু সে আনন্দ, যিনি নিত্যানন্দ, তোমারই সাজে। আমাদের ও সবে কাজ নেই। আমাদের পদসেবা। পর-জ্ঞানে পরা-সেবা।'

হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তাই তো বলেছিলাম আগে।'

'তখন কি অতশত বুঝেছি? তখন কি জানতাম যে ভাবের গোঁয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই ফিরতে হবে? ইচ্ছে করলেও তার কিছুতেই মন দিতে পারব না?'

তখন আর রামকৃষ্ণ কি করে। মথুর বাবুর বুকে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলে। ধাতস্থ হলেন মথুর বাবু।

ওরে, কী হবে ও সব ভাব-টাবে। শুধু তাঁর নাম কর, তাঁর দয়ায় বিশ্বাস কর। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর তাঁর কাছে। কী চাইবি? শুধু আশ্রয়, শুধু শান্তি, শুধু প্রসন্নতা। ওরে ধেয়ান ধর, প্রেম লাগা।

সাধন-ভজন কেবল ডানা বেদনা করবার জন্যে। আকাশে উড়তে-উড়তে ডানায় ব্যথা হলেই পাখি কোথাও কোনো উঁচু জায়গায় এসে বসে। সেই উঁচু জায়গাটিই তিনি। আর তাঁরই জন্যে সাধন।

চিঁড়ে কোটো, মন রেখো ঢেঁকির মুষলের দিকে। তুলসীদাস পড়েছিস? তুলসী য্যাসা ধেয়ান ধর, য্যাসা বিয়ানকা গাই। মু মে তৃণ চানা টুটে চেৎ রাখয়ে বাছাই। প্রসূতি গাভী মুখে ঘাস খেলেও যেমন তার মন পড়ে থাকে বাছুরের উপর, তেমনি সংসারকর্মে লেগে থাকলেও মন ফেলে রাখ ঈশ্বরে।

মথুর বাবুর অসুখ, ফোড়ার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। হৃদয়কে দিয়ে বলে পাঠালেন, বাবা যেন একবারটি আসেন।

রামকৃষ্ণ বললে, 'আমি গিয়ে কি করব। আমি কি তার ফোড়া ভালো করতে পারব?'

গেল না রামকৃষ্ণ। মথুর বাবু আবার লোক পাঠালেন। বাতাসে পাঠালেন তার যন্ত্রণার কাতরতা।

অগত্যা যেতে হল রামকৃষ্ণকে।

অনেক কষ্টে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে উঠে বসলেন মথুর বাবু। বললেন, 'বাবা এসেছ? আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও।'

'তুমি কি ভেবেছ আমার পায়ের ধুলোয় তোমার ফোড়া ভালো হবে?'

সারা অন্তরে হি-হি করে উঠলেন মথুর বাবু। বললেন, বাবা আমি কি এমনি? আমি কি আমার ফোড়ার জন্য তোমার পায়ের ধুলো চাই?' দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। 'আমার ফোড়ার জন্যে তো ডাক্তার আছে। আমি তোমার শ্রীচরণের ধুলো চাই এই ভবসাগর পার হবার জন্যে।'

শুনতে শুনতেই ভাবাবেশ হল রামকৃষ্ণের। স্বচ্ছ ভক্তির স্পর্শে উথলে উঠল ভাবতরঙ্গ।

সেই সুযোগে মথুর বাবু রামকৃষ্ণের যুগলপদে মাথা ঠেকালেন। দেহের চিকিৎসার জন্যে আয়ুর্বেদী আছে, তুমি ভবরোগবৈদ্য।

তুমি অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বরাট-বিরাট সম্রাট হয়ে আবার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের অধিপতি। তুমি স্নেহে মাতা, পালনে পিতা, জীবনের খেলার সাথী।

একেক সময় একটা গোঁ আসে মথুর বাবুর।

যেমন সেইবার এসেছিল। বিজয়াদশমীর দিন বলে বসলেন, প্রতিমা বিসর্জন দেব না নিত্যপূজা করব।

কারু কথায়ই কান পাতেন না। স্ত্রীর কথা পর্যন্ত উড়িয়ে দিলেন। বিপদ বুঝে রামকৃষ্ণকে ডেকে পাঠালেন জগদম্বা। স্বামীর নিশ্চয় মাথা বিগড়েছে। নইলে এমনতরো চেহারা হয় আকস্মিক?

মুখ চোখ লাল, কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদিক-ওদিক। না, কিছুতেই ফেলে দিতে পারব না মাকে। মাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না।

রামকৃষ্ণের অনুরোধ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে 'মাকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ততক্ষণ কেউ নিয়ে যেতে পারবে না মাকে।'

রামকৃষ্ণ তখন তাঁর বুকে হাত বুলুতে লাগলেন। বললেন, 'মাকে ছেড়ে তোমাকে থাকতে হবে এ কথা কে বললে? আর বিসর্জন দিলেই বা মা যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি থাকতে পারেন কখনো? তিন দিন বাইরের দালানে বসে পূজো নিয়েছেন, আজ থেকে একেবারে ভিতরের দালানে বসে পূজো নেবেন। হ্যাঁ, ভিতরের দালান। তোমার অন্দর মহল। আরো নিকট হবেন তিনি। বসবেন এসে তোমার অন্তরের অন্দরে।'

ব্যস, হাতের ছোঁয়ায় নরম হয়ে গেলেন মথুর বাবু। সত্যদৃষ্টির সৌম্য শান্তি নেবে এল দু চোখে।

'কথা কইতে-কইতে অমন করে ছুঁয়ে দি কেন জানিস?' ভক্তদের বললেন এক দিন ঠাকুর। 'যে শক্তিতে ওদের ওই গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক-ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে।'

১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসের শেষ দিকে মথুর বাবু জ্বরে পড়লেন। দেখতে-দেখতেই বিকারে দাঁড়িয়ে গেল জ্বর।

রামকৃষ্ণ গিয়েছে দেখা করতে।

মথুর বাবু বললেন, "আচ্ছা বাবা, সেই যে তুমি বলেছিলে তোমার অনেক ভক্ত আসবে, কই, তারা তো আজো এল না?'

'কি জানি বাপু, কত দিনে আসবে সব। মা যত কিছু দেখিয়েছেন সব ফলেছে, শুধু এইটেই বুঝি ফলল না।' রামকৃষ্ণের মুখে পড়ল ঈষৎ বিষাদ-ছায়া।

জানো না সেই ভূতের সঙ্গী খোঁজা। ভূত একা-একা ঘোরে, সঙ্গী-সাথী জুটছে না একটাও। শনি-মঙ্গলবারে কেউ যদি অপঘাতে মরে, তাকে ধরে আনবার জন্যে দৌড়ে যায়। ভাবে যেহেতু শনি-মঙ্গলবারে মরেছে ভূত হবে নির্ঘাৎ। সঙ্গী পাওয়া যাবে এত দিনে। কিন্তু যেই সামনে ছুটে যায় দেখে, হয় লোকটা শেষ পর্যন্ত মরেনি, নয়তো বার শুনতে ভুল হয়েছে। ভূতের আর সঙ্গী মেলে না।

আমারো হয়েছে সেই দশা। আমার কথা নেবে কে? আমি তাই সঙ্গী খুঁজছি—খুঁজছি

আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয় এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। কিন্তু, না, কত দিন হতেই সে আরেক রকম হয়ে যায়। তরোয়াল দিয়ে সে দাড়ি চাঁছে।

'মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা। দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।'

কথায় কেমন যেন একটা করুণ বেদনা। মথুর বাবু বললেন, 'তারা আসুক আর না আসুক, আমি আছি। আমি একাই একশো ভক্তের সমান। তাই মা হয় তো আমাকে দেখিয়েই তোমাকে বলেছিলেন অনেক ভক্ত আসবে—'

'কে জানে বাপু, মা-ই জানেন।'

কিন্তু রামকৃষ্ণ বুঝতে পারল মা-ই এবার নিজে এসেছেন মথুরকে নিয়ে যেতে। যা, মার কাছেই যা। দেখ গে সেই দেবীলোক।

নিজে আর এল না রামকৃষ্ণ। খোঁজ নিতে রোজ পাঠায় হৃদয়কে।

কাশীতে রামকৃষ্ণের অনুরোধে মথুর বাবু কল্পতরু সেজেছিলেন। যে যা চাইল তাই দান করলেন অকাতরে। রামকৃষ্ণকে বললেন, 'তুমি কিছু চাও?'

চন্দ্রমণি এক আনার দোক্তা চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ বললে, 'আমাকে একটি কমণ্ডলু দাও।'

সেই কমণ্ডলু করে আমাকে একটু এখন গঙ্গাজল দেবে না? কৃপণ মথুরকে মুক্তহস্ত করে দিয়ে, হে কৃপানিধি, তুমি আজ নিজে কৃপণ হয়ে গেলে?

কোনো দরকার নেই। স্বয়ং গঙ্গা আসছেন তোকে নিয়ে যেতে। আসছেন সেই বেদময়ী শব্দময়ী গঙ্গা। তৃপ্তিকর্ত্রী ভবতারিণী। তাঁর এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না?

পয়লা শ্রাবণ, আজ মথুর বাবুর শেষ দিন। আজো রামকৃষ্ণ গেল না জানবাজারে। তোর ভক্তিব্রত উদ্‌যাপন হয়েছে, মা তোকে কোলে তুলে নিতে নিজে এসেছেন।

কালীঘাটে নিয়ে গেল মথুর বাবুকে। ঘনিয়ে এসেছে জীবনের অন্তিমা।

রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে সমাধিস্থ। তার সূক্ষ্ম দেহ জ্যোতির পথ ধরে চলে এল মথুরের শয্যাপার্শ্বে। চোখের পাতা শেষ বারের মত বোজবার আগে মথুর বাবু দেখলেন রামকৃষ্ণকে।

বিকেল পাঁচটার সময় ধ্যান ভাঙল। হৃদয়কে ডেকে বললে, 'ওরে, মথুর রথে উঠল। খুব বেগে উড়ে গেল সেই রথ। চলে গেল দেবীলোকে।'

অনেক রাতে খবর এল দক্ষিণেশ্বরে, বিকেল পাঁচটার সময় মথুর বাবু লোকান্তরিত হয়েছেন।

'আমাকে দেখে সে কী বলত জানিস?' ঠাকুর এক দিন বললেন ভক্তদের। 'বলত, বাবা, তোমার ভেতরে আর কিছু নেই- শুধু সেই ঈশ্বর আছেন। দেহটা একটা খোল, বাইরে কুমড়োর আকার, কিন্তু ভেতরের শাঁস-বিচি কিছু নেই। তোমায় দেখলাম, যেন কেউ ঘোমটা দিয়ে চলে যাচ্ছে।'

তবু তুমি মনে করো না, সেজ বাবু, তুমি একটা বড় মানুষ আমায় মানছ বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। মানুষ কী করবে। ঈশ্বরই তাকে মানাবেন। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়-কুটো।

কী জ্বলন্ত বিশ্বাসই ছিল! কী ঊর্জী ভক্তি! কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই। একটি আনন্দময় বিশ্বাস। মাটির নীচে মোহরের কড়া আছে এই আনন্দময় বিশ্বাস থাকলেই তো মাটি খুঁড়ব। খুঁড়তে-খুঁড়তে যদি ঠং করে একটা শব্দ হয়, বুকের ভেতরটাও আনন্দে টং করে ওঠে। তার পর যদি ঘড়ার কাণা দেখা যায়, তা হলে তীব্রতর আনন্দ। খোঁড়ার বেগ তখন আরো বাড়ে। সাধু গাঁজা সাজছে, তার সাজতে-সাজতে আনন্দ। টানবার আগে থেকেই আনন্দ।

হনুমানের রাম নামে বিশ্বাস। বিশ্বাসের গুণে সে সাগর লঙ্ঘন করলে। আর স্বয়ং রামচন্দ্র, তাঁকে সাগর বাঁধতে হল!

'আচ্ছা, মশাই, মৃত্যুর পর মথুরের কী হল?' এক দিন কে এক জন জিগগেস করল ঠাকুরকে।

'তার নিশ্চয়ই আর জন্মাতে হবে না।'

'কে বললে? সে নিশ্চয়ই কোথাও একটা রাজা-টাজা হয়ে জন্মেছে। তার মধ্যে যে ভোগবাসনা ছিল!'

যোগভ্রষ্ট হলে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়—তার পরে আবার ঈশ্বরের জন্যে সাধনা করে। পূর্বজন্মে ঈশ্বর চিন্তা করতে-করতে হঠাৎ হয় তো ভোগ করবার লালসা হয়েছে। তাকেই বলে যোগভ্রষ্ট। কামনা থাকতে, লালসা থাকতে মুক্তি নেই।

'ওরে বাসনায় আগুন দে।' এই কথা শুনেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন লালা বাবু। সাত লাখ টাকার আয়ের সম্পত্তি ছেড়ে চলে গেলেন বৃন্দাবনে।

ধর্মের সূক্ষ্ম গতি। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছ, সুতোর মধ্যে একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর আর ঢোকে না। কামনা থাকলে আর ভগবান নেই।

কী চাইবি ভগবানের কাছে? ভক্তি-মুক্তি, জ্ঞান-বৈরাগ্য—ও সব কিছু নয়। শ্রীমা বললেন, 'চাইবি শুধু নির্বাসনা।'

তেতাল্লিশ

'তোমরা সব কোথায় চলেছ?'

'কলকাতায় গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি।'

'কলকাতায়?'

'হ্যাঁ, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রকাণ্ড যোগ সেখানে। ঐ দিন জন্মেছেন গৌরাঙ্গদেব।'

'আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

'ও মা, স্নানে যাবি তুই?' আত্মীয়া বয়স্কা মহিলারা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'না, একবারটি দক্ষিণেশ্বরে যাব। তাঁকে দেখতে বড় মন কেমন করছে।'

'তোর বাবাকে গিয়ে বল। তোর বাবা না বললে যাবি কি করে?'

লজ্জায় মরে গেল সারদা। একটু বা ভয়-ভয় করতে লাগল। যদি বাবার কানে ওঠে। ছি ছি, বাবার কানে গেলে তিনি কি ভাববেন।

সেই কত দিন আগে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। চার বছর আগে। গেল পৌষে সারদার আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে। ভরন্ত বয়সের চটুল চাপল্য নেই, স্বভাবটি প্রশান্ত গম্ভীর। হৃদয়ের মধ্যে সব সময়ে আনন্দের একটি পূর্ণঘট বসানো। উল্লাসটি উচ্ছলিত নয়, উল্লাসটি নিয়তনিশ্চল।

সত্যি-সত্যি বাবার কানে উঠল কথাটা। সারদা দক্ষিণেশ্বরে যেতে চায়। মিলতে চায় তার স্বামীর সঙ্গে। তার পুরুষের সঙ্গে।

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। মনে-মনে বললে, তোমার কাছে যেতে চাই, তুমিই আমাকে রক্ষা করো।

রামচন্দ্র ডেকে পাঠালেন সারদাকে। বললেন, 'বেশ তো। যাবে। আমিই তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। গোছগাছ করে নাও চট করে।'

হৃদয়স্থ আনন্দঘটের দিকে সারদা তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। কৃতজ্ঞকরুণ চোখে প্রতীক্ষার প্রশান্তি।

কোথায় জয়রামবাটি আর কোথায় কলকাতা। পায়ে-হাঁটা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সাত রাজ্যে ইঞ্জিনের বাঁশি শোনেনি কেউ। এদিকে বিষ্ণুপুর, ওদিকে তারকেশ্বর—সব ঝাঁঝাঁ করছে। ঘাটালের যে নদী সেখানেও ইষ্টিমার আসেনি। সর্বদিকে একটা স্থান আর সময়ের বিস্তীর্ণ হাহাকার। কোথা দিয়ে কোথায় যাব, কত দিনে কোন দিকে গিয়ে পৌঁছুব—সমস্ত একটা ধূসর অস্পষ্টতা। কিছুই ধরা-ছোঁয়ার নেই, সব যেন ঐ দিগন্তের কাছাকাছি।

তবু চলো। চলা ছাড়া অনুপায়ের আর উপায় কি। শুধু এগিয়ে চলো। যেমন পদে-পদে বিপদ, তেমনি পায়ে-পায়ে উপায়।

সারদা শুধু স্বামীদর্শনে যাচ্ছে না, সে যাচ্ছে তীর্থদর্শনে। হিমালয় ডিঙিয়ে মানস সরোবরে।

কোনো দিন পথে বেরোয়নি সারদা। হাঁটেনি কোনোদিন দূরের পাড়িতে। তবু ভয় পাবে না সে। থাকবে না পেছিয়ে পড়ে। যিনি তীর্থপতি তিনিই তীর্থ পথিককে টেনে নেবেন।

কোথাও-কোথাও রাস্তার খেই হারিয়ে গেছে। ধান কাটা হয়ে গিয়েছে মাঠে, কোথাও বা সেই শুকনো মাঠ ভাঙো। ঢেলা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলো। গাছের ছায়া পাও তো, জিরিয়ে নাও একটু। তালপুকুর মিলেছে কোথাও, জল খেয়ে নাও পেট ভরে। সূর্যদেব গো, তোমার রশ্মিজাল একটু স্তিমিত করো।

কমলকোমল পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে সারদা। মুখখানি রোদে আমলে গেছে, আর যেন পারছে না চলতে। পা ভেঙে পড়ছে পথশ্রমে। শরীর ঝিমিয়ে পড়ছে।

'চলতে কষ্ট হচ্ছে রে সারু?' জিগগেস করেন রামচন্দ্র।

'না, বাবা।' মুখে হাসি আনে সারদা, পা দুটোকে টানে জোর করে।

'তবে অমন পিছিয়ে পড়ছিস কেন?'

'এই একটু দেখতে দেখতে চলেছি সব—'

মেয়ের মুখের দিকে তাকান রামচন্দ্র। ঝামরে গেছে মুখ-চোখ। যেন টলে-টলে পড়ছে। দু-তিন দিনেই এই, এখনো আছে আরো কত দিনের দীর্ঘ শ্রম। উপায় কি, এমনি করেই চটি থেকে

চটিতে বিশ্রাম নিতে-নিতে এগুতে হবে। বিশ্রামটা না-হয় আরো একটু বড় করা যায়, কিন্তু পথ তো আর ছোট করা যাবে না।

হু-হু করে জ্বর এসে গেল সারদার। মেয়ে পথের মধ্যেই এলিয়ে পড়ল। চোখে আঁধার দেখলেন রামচন্দ্র। মেয়েকে নিয়ে এখন করি কি।

আর সব সহযাত্রীরা থামতে চাইল না। তোমার মেয়ের জন্যে আমাদের গঙ্গাস্নান মারা যাক আর কি! আমরা চললুম এগিয়ে। তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে সামনের চটিতে গিয়ে ওঠো।

তা ছাড়া আর পথ নেই। রুগী মেয়ে হাঁটবে কি করে? পালকি কই এ অঞ্চলে? অগত্যা রামচন্দ্র সারদাকে নিয়ে সামনের এক চটিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

দুঃখের আর অবধি নেই সারদার। নিজে তো অসুখে পড়লুমই, বাবাকেও বিপদে ফেললুম। তোমাকে দেখবার দিনটিও পিছিয়ে গেল।

গ্রাম্য বধূ, লজ্জা-সরমের কত ছিরি-ছাঁদ। এখন জ্বরে বেহুঁস হয়ে বিদেশের চটিতে সব জলাঞ্জলি গিয়েছে। লজ্জানিবারণ হরি, তাঁর স্নেহদৃষ্টির ছায়ায়ই তার আচ্ছাদন।

সারদা দেখল, কে একটি মেয়ে তার পাশে এসে বসল।

গায়ের রঙটি কালো, কিন্তু কালো অমন অপরূপ হয়, কালোর যে অমন আলো থাকে, স্বপ্নেও কোনো দিন দেখেনি সারদা! মেয়েটি পাশে বসে ঠাণ্ডা স্নেহে সারদার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নরম হাতের ছোঁয়ায় মুছে দিতে লাগল তপ্ত গায়ের দাহ। দুটি টানা-টানা বিশাল চোখের মমতাটিও কত ঠাণ্ডা।

সারদা জিগগেস করলে, 'তুমি কোথা থেকে আসছ গা?'

'দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।'

বলো কি? দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমিও ভেবেছিলুম দক্ষিণেশ্বরে যাব। সেই আশা করেই বেরিয়েছিলুম বাড়ি থেকে। তায় রাস্তায় এই জ্বর। আচ্ছা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দেখেছ? ঠাকুরকে?'

'দেখেছি বই কি।'

'বড় সাধ ছিল, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা করব। আমার ভাগ্যে সে আশা আর মিটল না। জ্বর এসে আমার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে দিলে।'

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না, না, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি। তুমি ভালো হবে, সেখানে গিয়ে দেখবে তাঁকে। তোমার জন্যেই তো তাঁকে আটকে রেখেছি সেখানে।'

'বটে? ভালো হয়ে সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখব?' সারদা তাকাল একবার সেই মমতাময়ীর পানে। 'তুমি আমাদের কে হও গা?'

'আমি তোমার বোন হই।'

'সত্যি? তাই বুঝি তুমি এসেছ আমার অসুখ শুনে? বাঃ, বেশ!' বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়ল সারদা।

সকালে ঘুম ভেঙে দেখল বোন কোথায় চলে গেছে। বোনের সঙ্গে-সঙ্গে জ্বরও অন্তর্হিত।

আবার সুরু হল পথ হাঁটা। কত দূর এসে, কি আশ্চর্য, একটা পালকি মিলে গেল। বোনটিই হয় তো পাশের কোনো গাঁ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে পালকি।

আবার জ্বর এল দুপুরের দিকে।

'কেমন আছিস রে সারু?'

'বেশ, ভালো আছি বাবা।' পাল্‌কি পেয়েছে, আবার রোগ-বালাই কী সারদার! চলেছি তো এখন সর্বরোগপাবনের কাছে।

পথের শেষ হল এক সময়। রাত নটার সময় দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে নৌকো লাগল।

রামকৃষ্ণের কাছে খবর পৌঁছুল। রামকৃষ্ণ ডেকে পাঠাল হৃদয়কে। বললে, ও হৃদু বারবেলা নেই তো? প্রথম বার আসছে।'

এ কথা হয়ে গেছে আগেই। সারদা গঙ্গার উপরেই নৌকোতে বারবেলা কাটিয়ে এসেছে।

আর সকলে এদিক-সেদিক গেল—নহবতের ঘরে চন্দ্রমণি আছেন, সেখানে কেউ-কেউ। সারদা সটান চলে এল রামকৃষ্ণের ঘরে। মুখে সেই সলজ্জ ঘোমটা।

'তুমি এসেছ?' উৎফুল্ল হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। বেশ করেছ।' বলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল: 'ওরে, ওকে একখানা মাদুর পেতে দে। কত দূর থেকে আসছে। তার পরে আবার অসুখ করে এসেছে।' বলেই নিজের মনে খেদ করতে লাগল: 'এখন কি

আর আমার সেজ বাবু আছে যে, তোমাকে যত্ন করবে? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে। তোমাকে আমি এখন কোথায় রাখি? আমার সেজ বাবু হলে তোমাকে অট্টালিকায় রাখতেন। এলে তো এত দেরি করে এলে। আমার সেজ বাবুকে দেখতে পেলে না।'

মাদুর বিছিয়ে দিল হৃদয়। জড়সড় হয়ে বসল তাতে সারদা।

চোখ-কানের বিবাদ ভঞ্জন করল। কত কি শুনেছিল দেশে থাকতে। পাগল হয়ে গিয়েছেন, পরনে কাপড় নেই, মুখে শুধু অসম্বদ্ধ প্রলাপ। তাঁর সম্বন্ধে এই বিবরণটাই পাগলের বিবরণ। একেবারে পরমানন্দ মহাপুরুষের মত বিরাজ করছেন। আশ্চর্য, সারদাকে তিনি ভোলেননি, ঠিক মনে করে রেখেছেন। শুধু মনে করে রাখেননি নয়, তার প্রতি করুণায় অজস্র হয়ে আছেন।

ঘর ছেড়ে উঠে যেতে ইচ্ছে করে না সারদার। তবু বললে, 'আমি মার কাছে নবতের ঘরেই যাই।'

'না, না, ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধে হবে।' রামকৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'তুমি এ ঘরেই থাকো। আমি নইলে ওষুধ-পথ্য দেবে কে?'

চন্দ্রমণি আগে কুঠিঘরের একটি কোঠায় থাকতেন, অক্ষয়ও থাকত তাঁর সঙ্গে। সেই ঘরেই অক্ষয় মারা যায়। অক্ষয় মারা গেলে চন্দ্রমণি ছেড়ে দিলেন সেই কুঠিঘর। বললেন, 'আর আমি ওখানে থাকব না। আমি নিচে এই নবতের ঘরেই থাকব। গঙ্গা পানে মুখ করে রইব। কুঠিতে আর আমার দরকার নেই।'

তখন রাতের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। দু-তিন ধামা মুড়ি নিয়ে এল হৃদয়। যেমন অসময়ে এসেছ তেমনি মুড়ি চিবোও বসে-বসে।

রাত্রে সেই ঘরেই শুলো সারদা। শুলো ভিন্ন শয্যায়, সঙ্গে আরেকটি মেয়ে নিয়ে। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ভাবল সারদা, এ কি ঘুম, না, জাগরণ!

পর দিনেই ডাক্তার আনালো রামকৃষ্ণ। তিন-চার দিন সারদাকে রাখল তার খবরদারিতে। নিজের হাতে খাওয়াতে লাগল পথ্য। ঘড়ি ধরে ওষুধ। নিজের সেবা-যত্নে ভালো করে তুলল। বললে, 'এবার তুমি যেতে পারো মার কাছে।'

নহবতে চলে এল সারদা। লাগল শাশুড়ির সেবায়। যতটুকু উনি নেন ততটুকু রামকৃষ্ণের সেবায়।

সেবার মত আনন্দ আর কী আছে! সেবা ছাড়া আর কী আছে জীবনের কবিতা।

রামচন্দ্র দেখে বড় শান্তি পেলেন। ফিরে গেলেন স্বস্থানে।

কিন্তু সারদাকে নবতে পাঠিয়েই রামকৃষ্ণের মনে হল, কেন, কেন ওকে দূরে সরিয়ে রাখব। ওকে কি আমার ভয়, না, ঘৃণা? ও কি আমার তাচ্ছিল্যের, না, অনুকম্পার? প্রতিমায় ঈশ্বর পূজা হয় আর জীবন্ত মানুষে হবে না? আমি কি ফুটো কলসী যে জল রাখলে জল সব বেরিয়ে যাবে? আমি কি বালির বাঁধ যে আষাঢ়ের বন্যাকে রোধ করতে পারব না?

মনে পড়ল তোতাপুরীর কথা। তোতাপুরী বলেছিল, 'তুমি যে কাম জয় করেছ তার প্রমাণ কি? স্ত্রীকে দেশের বাড়িতে রেখে এখানে বনবাসে থেকে কামজয়ের কথা বলা সোজা। স্ত্রীকে কাছে রেখে বলতে পারো তবে বুঝি।'

এবার তো সেই পরীক্ষার সুযোগ এসেছে। জোর করে নিজের বীরত্ব জাহির করবার জন্যে তো তিনি করছেন না, তাঁর কাছে সুযোগ এসেছে বলেই তিনি পরীক্ষা করছেন। সমস্তই মহামায়ার ইঙ্গিত।

রামকৃষ্ণ বলে পাঠালো, 'সারদা আমার ঘরে এসে শোবে।'

সারদার ভয় করতে লাগল। এ আবার কী হল রামকৃষ্ণের। কিন্তু 'না' বলবার উপায় নেই। শাশুড়ী বললেন, 'যাও যখন ও বলছে।'

ঘরের মধ্যে একান্তে ডেকে এনে রামকৃষ্ণ জিগগেস করলে সারদাকে, 'তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?'

ঘোমটা-ঢাকা মুখে হেঁট হয়ে দাঁড়াল সারদা। বললে, 'না। তোমাকে সংসার পথে কেন টানতে যাব? তোমাকে ইষ্ট পথেই সাহায্য করতে এসেছি।'

তবে বোস পাশটিতে, শোনো।

খই ভাজবার সময় যে খৈটি খোলার উপর থেকে ঠিকরে বাইরে পড়ে তাতে কোনো দাগ লাগে না, কিন্তু গরম বালির খোলায় থাকলে কোনো না কোনো জায়গায় কালো দাগ লাগবেই। যা ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন বলে বোধ হবে তা মাই হোক আর

স্ত্রীই হোক, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বরের মতন কিছু নেই।

রাবণ সীতার জন্যে মায়ার নানা রূপ ধারণ করছে, তবু সীতা টলে না। এক জন বললে, "একবার রামরূপ ধরে যাও না কেন?'

রাবণ বললে, 'রামরূপ একবার হৃদয়ে ধরলে ব্রহ্মপদই তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো কোন ছার। তা রামরূপ কি ধরবো।'

'কিন্তু আমি তোমার কে?' গভীর-সরল অন্তরে জিগগেস করলে সারদা।

'তুমি আমার বিদ্যা। তুমি সারদা, সরস্বতী। তুমি রূপ নিয়ে আসোনি, বিদ্যা নিয়ে এসেছ। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছ। এসেছ বিদ্যার আলো জ্বালিয়ে। তুমি জ্ঞানদাত্রী।'

অত-শত কি বোঝে সারদা? বুঝে কাজ নেই কাণাকড়ি। তার চেয়ে সেবা করি। জ্ঞান বুঝি না, বুঝি ভক্তি, বুঝি সেবা। রামকৃষ্ণের পা টিপতে বসল সারদা।

পা টেপবার পর সারদাকে রামকৃষ্ণ প্রণাম করল।

ও কি! ছি! সর্বাঙ্গে কুণ্ঠিত হল সারদা। বললে, 'আমি তোমার দাসী।'

'তুমি আমার আনন্দময়ী। যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন। তিনিই সম্প্রতি আছেন নবতে আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। তুমি কি শুধু এই ঘরের মধ্যে আছ? তুমি আছ আমার বিশ্বব্যাপিনী হয়ে।'

[ক্রমশঃ।

কান দিয়ে শুনুন

কান না থাকলে কোন শব্দই শোনা যায় না। আবার শুধু কান থাকলে চলবে না; কর্ণপটাহ আর শ্রবণ-শক্তি না থাকলে কান থেকে কোন লাভ নেই। কানের অভাবে মধুর মিষ্টি কথাও যেমন শুনতে পাওয়া যাবে না, তেমনি বজ্রপাতের শব্দ পর্য্যন্ত কানে পৌঁছবে না। কান সম্বন্ধে কয়েকটা জ্ঞাতব্য জেনে রাখার প্রয়োজন আছে। যাঁদের কান আছে তাঁরা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন।

শব্দ-তরঙ্গের বৈজ্ঞানিক পরিমাণ হয়েছে। যে কোন একটা ফ্যাক্টরীর শব্দ-মান যদি হয় ১০০ থেকে ১১০, যে কোন জনবহুল রাস্তার শব্দ-মান হবে ৬০; নায়েগ্রা জলপ্রপাতের ১৫; রেডিওর পূর্ণমাত্রায় ঘরের ভেতর নায়েগ্রার শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে কথাটি একেবারে মিথ্যা। মর্ম্মে পশে না, মাথার ভেতর পশে। মিষ্টি শব্দে যেমন পুলকিত হওয়া যায় তেমনি বিস্ফোরণের শব্দে সাময়িক বধিরত্ব-প্রাপ্তিও অসম্ভব নয়। জ্ঞাতব্যগুলি শুনুন এবার:

১। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কি শ্রবণ-শক্তি হ্রাস পায়? সত্যি কথা। বেশীর ভাগ মানুষেরই তাই হয়। ত্রিশ বছরের পর থেকেই উচ্চ স্থানের শব্দ কম শোনা যায়। নীচ স্থানের শব্দ অধিক বয়স পর্য্যন্ত শোনা যায়।

২। আপনার কানে যদি প্রবেশ করে কিছু একটা, তখন কি করবেন আপনি? খোঁচালেই বেরিয়ে আসবে? মিথ্যে কথা। আঙুলের সাহায্যে যদি না বের করতে পারেন, ডাক্তারের কাছে যাবেন। কোন রকম ধারালো বা ছুঁচালো কিছু কানে পূরবেন না যেন। হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

৩। যে-শব্দ সচরাচর কানে শুনতে পাওয়া যায় না, তাও কি কানে পৌঁছতে পারে?

সত্যি কথা। শ্রুতিপথের বাইরের কোন-কিছুর শব্দ পর্য্যন্ত অবশ্যই কানে পৌঁছয়। উঁচু এবং নীচু স্থানের অশ্রুত শব্দও কানকে পীড়া দেয়।

৪। পর্দ্দা-ফেটে-যাওয়া কানও কি আপনা-আপনি সেরে যায়? সত্যি কথা। অনেকে হয়তো এ কথাটি বিশ্বাস করেন না। শ্রবণ-শক্তি অনেক সময়ে অতি দ্রুত ফিরে আসে। কানের কোন কোন ক্ষতের চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা কখনও কখনও স্বেচ্ছায় রোগীর কানের পর্দ্দা ফাটিয়ে দেন।

৫। কানে জল ঢোকা কি বিপদজনক? সব সময়ে নয়। কিন্তু সাঁতারের সময়ে সাবধান না হ'লে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কারণ, সব জায়গার জল পরিশ্রুত হয় না। যদিই আপনার কানে জল ঢোকে, তা হ'লে কাপড় পূরে সে-জল বের করতে সচেষ্ট হবেন না যেন। আপনার মাথাটা তখন এলিয়ে রাখবেন, জল আপনা থেকেই বেরিয়ে যাবে।

৬। কানে আঙুল দিলে কি আর শোনা যায় না? সত্যি কথা। কানের গর্ত্তে ঢাকা দিলেই আর শোনা যায় না। কানে তুলো দেওয়া কথাটি যার থেকে সৃষ্টি।

আকাশ-পাতাল

ব, আ, ই

আশা করেনি গহরজান।

দেখেই তার বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা। তবে ঈপ্সিতকে দেখলে বুকের মাঝে যে সুখানুভূতি হয়, ঠিক সেই সুখের আলোড়ন নয়। মুক্তকেশে, স্নানবেশে বসেছিল গহরজান। কোলের কাছে বসেছিল ডালিম, নিদ্রামগ্ন। স্বপ্নাতীতকে চোখের সমুখে দেখতে পেয়েই এক লাফে উঠে পড়লো। খুসী-ভরা সহাস্য সম্ভাষণ জানিয়েই বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। গেল পাশের ঘরে, একেবারে আয়নার সামনে। রূপোপজীবিনী, আসল রূপে দেখা দিতে চায় না। তাই নকল রূপের সজ্জাসম্ভার নিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি সাজতে থাকে। চোখে আর মুখে রঙের পরশ দেয়। কাজল আর খড়ির গুঁড়ো। ঠোঁটে আলতা। কাঁচা ঘুমে ব্যাঘাত হওয়ায় ডালিম বিরক্ত হয়ে পায়ের কাছে এসে মিউ-মিউ করে। আয়নার গহরজান দেখে পেছনের দরজায় মাসী এসে দাঁড়িয়েছে। পান-খাওয়া দাঁত দেখিয়ে হাসছে মিটি-মিটি। আনন্দের আতিশয্যে। আর পারে না মাসী, ঠিকে গন্দের জোগাড় করতে। দালালদের পায়ে তেল মাখাতে। গহরের একটা পাকাপাকি হিল্লে হয়ে গেলে মাসীও নিশ্চিন্ততায় বাকী দিনগুলো কাটাতে পারে একটু-আধটু পুণ্য অর্জ্জন ক'রে। গঙ্গাস্নান আর বাবা শ্মশানেশ্বরের মাথায় ফুল চাপিয়ে।

—কি প'রবো মাসী? ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক তুলে জিজ্ঞেস করে গহরজান।

মাসী চোখ দু'টো বুজে থাকে খানিক। বলে,—কেন, জঙলা পর না একখানা। সেই খয়েরী রঙের বেনারসীটা পর না। রেতের বেলায় মানাবে চমৎকার। আর সেই লাল শলমার জামাটা পর্।

আবদারের সুর গহরজানের কথায়। বলে,—তুমি তবে তোরঙ্গ থেকে বের ক'রে দাও।

মাসী পানের পিক গলাধঃকরণ করে। কড়া দোক্তার পিক। মাথাটা যেন ঝিম্-ঝিম্ করছে। বলে,—ব'স তবে, আমি বসিরকে বোতল দিয়ে আসি। ততক্ষণ বাবুকে বেতালা করুক। সাদা চোখে থাকলে—

মাসীর একটা ইতিবৃত্ত আছে। গহরজানের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

যৌবনে মাসীরও না কি দেখবার মত রূপ ছিল। এখন না হয় বয়স হয়েছে। মাথার চুলে পাক ধ'রেছে। ক'টা দাঁতও পড়েছে। নয় তো এমন দিন ছিল যখন হাসলে মাসীর গালে টোল খেতো একটা নয়, অনেকগুলো। আলসেয় দাঁড়ালে যে কোন লোকের চোখ কপালে উঠতো। মাসীকে পাওয়ার লোভে হাতাহাতি বেধে যেতো রসিক-সমাজে। ক'বার তো প্রায় [illegible] মধ্যে। চেহারা-ছবি

চলেছিল। আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল সে সব ব্যাপার। শেষ পর্য্যন্ত মাসীকে নিয়ে রাতারাতি হাওয়া কেটেছিল যে, তার সঙ্গেই সারাটা জীবন কাটিয়েছে মাসী। এক জন পাঞ্জাবী মুসলমান। অনে টাকার মালিক ছিল সে। হীরে আর মানিকে মু'ড়ে দিয়েছি মাসীর সর্ব্বাঙ্গ। মাটিতে পা ফেলতে দিতো না, দুগ্ধফেননিভ পাল বসিয়ে রাখতো সদাক্ষণ। মেওয়ার রেকাবী ধ'রে রাখতো মুখে কাছে। মসলিনের শালোয়ার-পাঞ্জাবী পরিয়ে রাখতো দিবা রাত্রি।

পাঞ্জাবী মুসলমানটি ছিল বিপত্নীক। নাম শের আহমেদ খাঁন।

একটি মাত্র কন্যা-সন্তান উপহার দিয়েই বিবি তার রক্তাল্পতা রোগে ভুগে-ভুগে অবশেষে মৃত্যুপথযাত্রী হয়। বিত্তবান স্বামী অসময়ে বিবিকে হারিয়ে কিছু দিনের জন্য বৈরাগ্যব্রত পালন করে বিবির শোকে বিহ্বল হয়ে শিশুকন্যাটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়া দেশ দেশান্তরে। দুর বেলুচ আর আফগানিস্থান থেকে পার আর তুর্কীস্থানে চলে যায় ঘুরতে-ঘুরতে। সেখান থেকে ফি এসে লাহোরে আর অমৃতসরে কাটায় কয়েক বছর। শেষ পর্য ফকিরী জীবন যাপন ক'রতে দেখে এক গুজরাটী বন্ধুর আমন্ত্র চলে আসে বরুণা আর অসির সঙ্গম-স্থল কাশীতে। কাশী চকবাজার তখন হাসি আর হল্লায় মাতোয়ারা! গুজরাটি বন্ধু চকবাজারের তখন এক জন নামডাকা মহাজন—চাল আর ডাে আড়তে বিশ-পঁচিশ লক্ষ টাকার কারবারী। গদিতে বসলে লোক ছিল না যে, যেতে-আসতে সেলাম জানাতো।

এই গুজরাটী যখন শূন্য হাতে ভাগ্যান্বেষণে যত্র তত্র ঘোরা-ফে করছে, তখন ঐ শের আহমেদ খাঁন বিনা সর্ত্তে কর্জ্জ দিয়েছি কয়েক হাজার টাকা, কেবল মাত্র বন্ধুত্বের বিনিময়ে। জাতিগ ও স্বভাবজাত ব্যবসাদারী বৃত্তির প্রেরণায় কয়েক বছরের মধ্যে গুজরাটী ঐ কয়েক হাজার টাকা কয়েক লক্ষে পরিণত করে এ ধারের টাকা পরিশোধ দিতে চায় শের আহমেদ খাঁনকে। কি বন্ধুবর প্রত্যাখ্যান করে সেই আবেদন! বলে,—প্রকারান্ত শোধ দিও ঐ অর্থ। টাকা আমি চাই না।

বন্ধু প্রকারান্তরে শোধ দিয়েছিল বন্ধুকে কোন নির্জ্জীব বস্তু ন এক জীবন্ত রমণী। কাশীর অলিতে-গলিতে কোথায় ক বয়সের কোন বারাঙ্গনার বাসা, তাদের এক জনও অজ্ঞা ছিল না এই গুজরাটীর। শের আহমেদ খাঁনকে বিপত্নী দেখে পরিচয়-সূত্রে আবদ্ধ করে দিয়েছিল মাসীর সঙ্গে। মাসী তখন পরিপূর্ণ যৌবন। কাশী শহরে রূপসী সৌদামিনী নাম তখন কোটি আর লক্ষপতিদের মুখে-মুখে। এখন ন হয় মাসী বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপ আর যৌবন হারিয়েছে, কি তখন? সৌদামিনীর জন্যে খুন, রাহাজানি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল সৌদামিনীর নাম। শেষে ঐ পাঞ্জা মুসলমান শের আহমেদ খাঁন মাসীর রূপে আত্মহারা হয়ে মৃত পত্নী

বেমালুম ভুলে গিয়ে রাতারাতি চম্পট দিয়েছিল মাসীকে নিয়ে। কাশী থেকে একেবারে লাহোরে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল বোরখায় আপাদমস্তক ঢেকে।

শিশুকন্যাটির তখনও জ্ঞান হয়নি। মাসীকেই জেনেছিল একমাত্র আপন।

শের আহমেদ খাঁন হৃদয় শুধু নয়; টাকা, পয়সা সব কিছু তুলে দিয়েছিল সৌদামিনীর হাতে। আর দিয়েছিল ঐ শিশুকন্যাকে। কিন্তু সৌদামিনী সব নিয়েও দেয়নি শুধু একটি জড় বস্তু, নিজের মন। মনটা মাসী অনেক আগে দিয়ে দিয়েছিল এক জনকে—যে মাসীকে ঘর থেকে বাইরে বের ক'রে এনেছিল তাকে। সে মাসীরই এক আত্মীয়, সম্পর্কে গ্রামতুতো দাদা। সৌদামিনীদের চালার খানকয়েক চালার ওদিকে সে থাকতো; নাম ভজহরি সামন্ত। সেই ভজহরির সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে মাসী অবশেষে শের আহমেদ খাঁনকে মদের সঙ্গে এক রাতে খাইয়ে দেয় সেঁকো বিষ! ভজহরি দারোগার হাতে ক'খানা হাজার টাকার নোট গুঁজে দিয়ে লেখায়,—অত্যধিক মদ্যপানের পরিণামে হৃদ্‌যন্ত্র ফাটিয়া মারা গিয়াছে। মৃতের সকল স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির মালিক তাহার রক্ষিতা সৌদামিনী দাসী। সে মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে মৃতের একমাত্র শিশুকন্যাকে পালন করিবার জন্য সৌদামিনীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছে। সাক্ষী কেবল মাত্র ভজহরি সামন্ত, সৌদামিনীর গ্রামের সম্পর্কের ভাই।

কিন্তু সৌদামিনীও রাখতে পারেনি এত টাকার সম্পত্তি। ভজহরিই সব ফুঁকে দিয়েছে দিনের পর দিন ব'সে ব'সে খেয়ে। তার পর এক দিন ভজহরি ম'রে গেছে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে। সৌদামিনী যখন ফতুর হয়ে যায় তখন ভজহরি তাকে এনে তুলেছিল গরাণহাটার এই বাড়ীতে। দিনে-দিনে মাসীর যৌবন ক্ষয়ে গেছে, কিন্তু তিলে-তিলে তিলোত্তমা হয়েছে শের আহমেদ খাঁনের শিশুকন্যাটি। সে কন্যা এখন আর শিশু নেই, ষোড়শীর রূপ ধারণ ক'রেছে।

সেই এই গহরজান। আর এই হ'ল মাসীর ইতিকথা। ঘটনা এবং দুর্ঘটনায় পরিণত হয়েছে এক রোমহর্ষক কাহিনীতে—যার পরিচয় জানতো শুধু ভজহরি। আর কিছু-কিছু জানে বসিরুদ্দিন। ছাড়া ছাড়া শুনেছে মাসীর কাছে, মাসী যখন মদে জ্ঞান হারিয়ে বলে ফেলেছে নেশার ঝোঁকে কিছু-কিছু।

পাশের ঘরে একটা হাসির রোল ওঠে। হো-হো শব্দে হাসে কারা যেন।

হাসছে বসিরুদ্দিন। আর হাসছে মাসী, কৃষ্ণকিশোরের কথার ধরণ শুনে। তাদের হাসির শব্দে আয়নার সামনে কাঁচলের 'পরে আঁচলের বেষ্টন দিতে দিতে গহরজানও হাসে। ডালিমের অবিরাম বিরক্তিপূর্ণ মিউ-মিউ ডাক শুনে কিছু বা দয়ার উদ্রেক হয় তার মনে। ডালিমকে পুতুলের মত এক হাতে তুলে নিয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে চেপে ধ'রে চুমু খায় পর-পর অনেকগুলো পরম স্নেহভরে। তার পর নামিয়ে দেয় ঘরের মেঝেয়। বলে,—যাও, নিদ্ যাও। ফুরসৎ নেই আবি হামারি।

পাশের ঘরে হাসির কলরোল উঠেছে মাত্র এক দিনের কাপ্তেনের ভয়-কাতর মন্তব্যে। ঘরের আবহাওয়া আর মাসীর তৈলচিক্কণ বিশ্রী মুখাকৃতি দেখে কেমন ভয় ভয় ক'রেছে। মাসীকে দেখাচ্ছে যেন রাক্ষসী। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল ঝুলছে শনের মত। ঠোঁটের দু'পাশে রক্তধারার মত পানের গড়ন্ত পিক। চোখ দু'টো কেমন ঘোলাটে; যেন এই মাত্র উঠেছে ঘুম থেকে। ঘন ঘন হাই তুলছে মাসী। পরনে একখানা ময়লা শাড়ী শুধু, আর কিছু নয়। দেওয়ালের বাতিদানের আলো-আঁধারিতে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ঘরখানার মধ্যে। কৃষ্ণকিশোর বলেছিল,—বসির, চল, এখান থেকে চ'লে চল'। আমার ভয় করছে এখানে থাকতে। কি বিশ্রী একটা গন্ধ আসছে!

এই কথাগুলিই যত হাসির উৎস। ভয় পেয়েছে শুনে বসির আর মাসী হেসে উঠেছে একসঙ্গে। নাচতে নেমে লজ্জা পাওয়া! বসিরুদ্দিন হাসতে হাসতেই বলে,—আরে ভাই, ড'রো মাৎ। বিবিজানকে দেখলে আর ভয় লাগবে না। মাসী, বিবিজান কোথায় ডুব মারলো বল তো?

মাসী তখন ফরাসের এক পাশে ব'সেছে পানের সরঞ্জাম পেড়ে। গেলাসে ঢালছে পানীয়। তারই উগ্র গন্ধে ঘরের আবহাওয়া ভরে গেছে। মাসী বললে,—গহর এই এলো ব'লে। গেছে শুধু পোষাক বদলাতে। তোমরা ততক্ষণ খাও না লেমোনেট্। ভয় কিসের? পেথম পেথম ভয় এমন করে।

মুহূর্ত্তের অপেক্ষা যেন আর সয় না। বসিরুদ্দিন একটা গেলাস তুলে নেয় ছোঁ মেরে। বলে,—পেটের ভেতরটা যেন আইঢাই করছে। হুজুর খাইয়েছে অনেক। কিমা, কাঁকড়া, চিঙ্‌ড়ী, কত কি খাইয়েছে! একটু সোডা না খেলে চলে!

কৃষ্ণকিশোর বললে,—তুমি খাও বসির, আমি আর খাবো না লেমোনেড। খেলে আমার শরীর খারাপ লাগে। মাথা ঘোরে, গা গুলোয়। লোক চিনতে পারি না।

আবার হেসে ফেললে বসিরুদ্দিন কথাগুলো শুনে। হাসি চাপতে চেষ্টা ক'রে মাসীও হেসে ফেললে ঠোঁট কামড়ে। বললে,—একেবারে ছেলেমানুষ। ও সব মনের ভুল। লেমোনেট্ খেলে কখনও কারও শরীল খারাপ হয়! খেলে বরং চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

দরজায় গহরজানের আবির্ভাব।

শেষ রাতের অন্ধকার বাগিচায় সহসা যেন ফুটলো এক গুল্। কি এক সুবাসের গন্ধ ছড়ালো বাতাসে। গহরজানের পোষাকের শলমা আর জরি বাতির আলোয় ঝলমলালো। গহরজান কয়েক মুহূর্ত্ত নির্নিমেষ তাকিয়ে বললে,—তোমরা এখান থেকে বিদেয় হও দেখি। আমি দেখছি কার মাথা ঘোরে, গা গুলোয়। কে লোক চিনতে পারে না। তোমরা দু'জনে স'রে পড়।

—সেই ভাল, সেই ভাল। কথা বলতে বলতে গেলাস হাতে উঠে পড়লো বসিরুদ্দিন। বললে,—চল মাসী, আমরা পাশের ঘরে যেয়ে দু'দণ্ড দাবা খেলি গে চল। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দাবায় বসিনি।

গানের একটা মৃদু সুর ভেসে আসছিল কোথা থেকে। সঙ্গে হারমনিয়ম আর ডুগী-তবলার সশব্দ ঝঙ্কার। বসিরুদ্দিন খানিক কান পেতে বললে,—কে এমন মিঠে সুরে ইমন ধ'রেছে মাসী?

—কে আবার, তিন তলায় পটল গাইছে। মেয়েটার আর

কিছু না থাক্, মিষ্টি গলাখানা আছে তো! মাসীও একটা গেলাস তুলে নেয়। কথার শেষে ইশারায় গহরজানকে কি একটা ব'লে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বসিরুদ্দিন পিছু নেয় তার। মাসী ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দেয় বাইরে থেকে।

এক ঝলক হেসে গহরজান ব'সে পড়ে ফরাসে। একটা তাকিয়ায় এলিয়ে প'ড়ে বুক চিতিয়ে।

গহরজানের রূপে ছিল সম্ভ্রান্ত রক্তের ছাপ; মুখাবয়বে ছিল না সাধারণ বারবনিতার স্বাভাবিক প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু তাদের আদব-কায়দা আর ব্যবহারের শিক্ষা পেয়েছিল সৌদামিনীর কাছে। পাখী-পড়া ক'রে ধাপে ধাপে শিখিয়েছিল মাসী, কখন কি বলতে হয়, কখন কি করতে হয়। কখন হাসতে হয়, আর কাঁদতে হয় কখন। নববিবির বিলাস? আজন্মের সাহচর্য্য; দিবা-রাত্রির সঙ্গ-দোষে রক্তে না থাকলেও বাধ্য হয়ে সব কিছু শিখেছে গহরজান। দিনের পর দিন দেখে আর ঠেকে শিখেছে—মাসী যেমন ভজহরির সঙ্গে পালিয়ে কাশীর চকবাজারে উঠে শিখেছিল এই জীবন-যাত্রার অভিনয়।

গেলাসটা যেমনকার তেমনি রাখা ছিল। গহরজান ঘরের মানুষের মুখের কাছে ধরলো তুলে গেলাসটা। বললে,—আমি খাইয়ে দিচ্ছি। না খেলে আমার মনে কষ্ট হবে।

গহরজানের এই কাকুতিতেও মন যেন সাড়া দেয় না কৃষ্ণকিশোরের। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে গহরজানের চোখে। আশ্চর্য্য লাগে যেন। জানা নেই, শোনা নেই, কোথাকার কে, সে এমন কেন পরমাত্মীয়ের মত কথা বলছে এত কাছাকাছি এসে! বিস্ময় বোধ করে গহরজানের এই আকুল আবেদনে। তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে গহরজানের চোখে। দয়ার সঞ্চার হয় যেন মনে। গেলাসটা হাতে নিয়ে বলে,—খেয়ে আমার কষ্ট হয় যে! কি করি, কি বলি তার ঠিক থাকে না। বাড়ী ফিরে কি সব কেলেঙ্কারী করেছিলাম।

—তাই না কি! হাসির তরঙ্গ তোলে গহরজান। হাসি থামিয়ে বলে,—সেই জিনিষ নয়, অন্য রকমের আছে। কিছু হবে না। না খেলে আমার মনে কষ্ট হবে। কি কেলেঙ্কারী হয়েছিল, খেতে খেতে বল। আমি শুনবো।

কেলেঙ্কারী? ছায়া-ছায়া ভাসতে থাকে যেন চোখের সামনে। স্পষ্ট কিছুই মনে পড়ে না। মনে পড়ে শুধু, মাকে। কুমুদিনীকে। সে গৃহত্যাগী হয়েছে তারই কি এক দুর্ব্যবহারে। বাড়ীর হাওয়া যেন বদলে গেছে একটা রাতে। মানুষগুলির চাল-চলনেও পরিবর্ত্তন দেখা গেছে। সকলেই যেন কাতর হয়ে প'ড়েছে কি এক অব্যক্ত দুঃখে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গহরজানের কথা যেন এড়াতে পারে না। কৃষ্ণকিশোর মুখে তোলে গেলাস। মুখ বিকৃত ক'রে ধীরে ধীরে পান করে ঐ রঙীন তরল পদার্থ। মদির নয়নে চেয়ে থাকে গহরজান। শাড়ীর জরিদার আঁচল পাকায় আনমনে!

রাস্তার লোকের কলকণ্ঠ আর ফেরীওয়ালাদের কণ্ঠস্বর বন্ধ দরজা-জানলা ভেদ ক'রেও পৌঁছয় ঘরের ভেতর। দিবাবসানে এ তল্লাটের কূলে-কূলে জেগেছে নিশাচর। অন্ধকারের স্বাদ পেয়ে উন্মুখ হয়েছে শীকারের সন্ধানে। পান আর সোডা-জলের দোকানীর নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই। শুঁড়ির দোকানে যেন গাঁদি লেগে গেছে যত অমৃতলোভীর। হোটেলগুলোর চুল্লীতে গম-গমে আঁচ, ডিম আর মাংসের সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হচ্ছে। যুঁই, বেল ফুল আর রশুনের মিশ্রিত উগ্র গন্ধে ঠিক যেন মৌমাছির মত ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে আসছে অগণিত লোক। কেউ কারও তোয়াক্কা করছে না, কারও দিকে কেউ দৃক্‌পাত করছে না। ছক্কড় মাতালরা মনের সুখে কেউ গান গাইছে, কেউ বা রাস্তার নর্দ্দমাকে স্বর্গভ্রমে শয্যা ক'রে নিয়েছে। জারজ কুকুরগুলোর যেন মরশুম লেগে গেছে। হাঁক-ডাক থামিয়ে এদিক সেদিক ঘোরা-ফেরা করছে। নর্দ্দমায় গড়িয়ে-পড়া চুর মাতালদের নাক-মুখ আর পা চাটছে। হোটেলের চাতালের তলায় গিয়ে কখনও বা খোঁজাখুঁজি করছে যদি কিছু খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। আর এ-পাড়ার যারা আসল মালিক, সেই সব নটী নারীরা যার যার এলাকায় অস্বাভাবিক সাজ-সজ্জায় সহাস্য বদনে লজ্জার মাথা খেয়ে বিরাজ করছে। বেলোয়ারী ঝাড় আর বেল-লণ্ঠনের হরেক রকম প্রদর্শনী দেখা যাচ্ছে যেদিকে চোখ পড়ছে সেদিকেই।

জুড়ীর চালক আবদুল এতক্ষণে যেন বুঝতে পেরেছে হুজুর কোথায় এসেছেন। গাড়ীর মাথায় ব'সে সইসের সঙ্গে একান্ত আফশোসের সুরে কি সব সে বলাবলি করছে। কিন্তু সে মাইনের চাকর, মুখে কিছু বলতে পারছে না। নয় তো আবদুলের ইচ্ছা হচ্ছে, এখনি গিয়ে হুজুরের কান ধ'রে তুলে নিয়ে আসে আসর থেকে।

গহরজান যে কখন এত কাছাকাছি স'রে এসেছে যেন বুঝতে পারেনি কৃষ্ণকিশোর। হঠাৎ লক্ষ্য করে গহরজান আর তার মধ্যের ব্যবধানের শূন্য স্থান কখন পূরণ হয়ে গেছে। নিঃশেষ হয়ে যাওয়া গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। কাচের পাত্র, সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় ঘরের দেওয়ালে ঘা খেয়ে। সামান্য গেলাস, কতই বা মূল্য। একটা গেছে, আরেকটা আসবে। গহরজান খিল-খিল শব্দে হাসে সে দৃশ্য দেখে। হাসে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে। বাতির ক্ষীণ আলোক-রশ্মিতে দাঁতগুলো তার দেখায় যেন মুক্তার সারি।

বিশ্রী লাগে এই আনন্দের মেলা। হাসি আর গান, সুরা আর নারী, অধিকাংশ মানুষের সব চেয়ে কামনার স্থান আর পাত্র—কেমন যেন বিতৃষ্ণা আসে তবুও মন থেকে। কি মনে হয়, হঠাৎ কৃষ্ণকিশোর বলে,—আমি এখন যাবো। বসিরকে ডাকো, আমাকে গাড়ীতে পৌঁছে দেবে।

—গান শুনবে না? ব্যথাহত সুরে শুধোয় গহরজান।—কি কসুর হয়েছে?

—না। গান তো শুনেছি তোমার। খুব ভাল গাও তুমি। কথা বলতে বলতে বিমুগ্ধ শ্রোতা টেনে নেয় একটা তাকিয়া। যাব বলেও এমন ভাবে এলিয়ে পড়ে যেন ভুলে গেছে নিজের পূর্ব্ব উক্তি। সত্যিই তার চোখের দৃষ্টি যেন প্রতি মুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। কথায় যেন ফুটে উঠছে জড়তা। গহরজানের চোখ থেকে চোখ

সরিয়ে দেখছে দেওয়াল-গাত্রের সারি-সারি ছবি। একখানা ছবিতেই কি নিবদ্ধ হয়ে যায় চোখের তারা। এমন কি আছে দেখবার ঐ ছবিতে?

ছবিখানা আর কিছুই নয়, বৈষ্ণব-গুরু শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের রঙীন বর্ণনা। শচী দেবী বাহুতে মাথা রেখে পালঙ্কে নিদ্রামগ্না। শিয়রের কাছে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা। যুগাবতার গৌরাঙ্গদেব গমনোদ্যত। আকর্ণবিস্তৃত আঁখিযুগলে তাঁর স্নিগ্ধ-কোমল দৃষ্টি। কৃষ্ণকিশোর দেখে সেই ছবিখানা।

কিন্তু গহরজানের তখন কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছল-ছল। শুভ্র উজ্জ্বল মুখে যেন রক্তিমবর্ণ। ঘরের মানুষ যাওয়ার নামে আর কিছু বলছে না দেখে সে বসে থাকে চুপ-চাপ। নিশ্বাসে যেন তার অভিমানের হাওয়া।

রুদ্ধ জানলা-দরজা ভেদ করেও থেকে থেকে বাতাসে ভেসে আসছে সারেঙ্গীর করুণ ক্রন্দন। কাছাকাছি কে কোথায় গাইছে কে জানে। এখন শুধু তিনতলায় পটল নয়, অনেকেই অনেকের ঘরে হাস্য-লাস্য আর গানে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গহরজান স্তিমিত নয়ন মেলে ব'সে আছে যেন স্বপনপুরীর রাজকন্যার মত। শুধু তার চোখ দু'টোতে চাকচিক্য, অশ্রুর সজল রেখা।

—গান গাইবে না? গহরজানের শাড়ীর আঁচল ধ'রে দেখতে দেখতে বললে কৃষ্ণকিশোর।—কৈ, গান গাইলে না?

শাড়ীখানা দেখবার মতই লোভনীয়। দেখলেই মনে হয় অনেক যেন দামী। সচরাচর দেখা যায় না এমনটি, এমনি তার বাহার। সাঁচ্চা জরির কাজ জমিতে। সূচীশিল্পের অনবদ্য নিদর্শন। শাড়ীখানা গহরজানের নয়, সৌদামিনীর। বহু দিনের পুরাতন, তবুও জৌলস তার হ্রাস পায়নি এত দিনেও। শের আহমেদ খাঁন এক বছর নববর্ষের দিনে উপহার দিয়েছিল সৌদামিনীকে। তখনই দাম নিয়েছিল না কি হাজার খানেক রৌপ্যমুদ্রা। উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে গহরজান।

হ্যাঁ, না, কোন কিছুই বললে না গহরজান। টেনে নিলে হারমোনিয়মটা। খানিক বাজিয়ে ধীরে-ধীরে সুর ধরলে কি একটা গানের। বৈষ্ণবী কীর্ত্তন ধরলে একখানা। শ্রোতার চোখ থেকে তখন মুছে গেছে ফিরে যাওয়ার কল্পনা। রঙীন তরল পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় দেহ আর মন বিভোর হয়ে গেছে। গহরজানের কণ্ঠে বাঙলা ভাষার আদিম যুগের বাক্যরাশ শুনে বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। গহরজান দেহ হিল্লোলিত ক'রে মৃদু স্বরে গাইলে:

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে
হমারি পিয়া কোন্ দেশ রে।
মদন শরানলে ই তু জরজর
কুশল শুনইত সন্দেহ রে।

রাত্রির মন্থর গতি। দীর্ঘদুঃখনিশা?

সন্ধ্যার অন্ধকার বিলুপ্ত হয়ে রাত্রির তামস নেমেছে দিকে দিকে। চিৎপুরের মসজিদে আজানের সমবেত ধ্বনিতে বিরাম প'ড়েছে অনেক্ষণ আগে। আলো জ্বলেছে পথের দু'পাশের আলোকস্তম্ভে। দিবান্ধ পেচকের পাল কোটর ত্যাগি উড়েছে আকাশে। তীব্র কর্কশ স্বরে ডাকছে শহরের হেথায়-সেথায়। গরাণহাটার গণজনের আনন্দমুখর আর্ত্তনাদে পেঁচাদের ডাক কানে আসছে না কারও।

গহরজান গেয়ে চলেছে অন্তরের দরদের সঙ্গে। গহরজানের এই বিচিত্র জীবনে এত দরদী সুরে বোধ করি আর কখনও সে গায়নি। কিন্তু গান গাইবে তো হাসতে-হাসতে। চোখের কোণে জলবিন্দু কেন। সৌদামিনীর দেওয়া শিক্ষা এতটা আয়ত্ত ক'রেছে গহরজান? কথায়-কথায় শিখেছে কাঁদতে, যখনই প্রয়োজন হয়েছে? যে-ক্রন্দন সত্যিকার নয়, আসল নয় যে-কান্না সেই রকম কান্না কাঁদছে গহরজান। আবার সঙ্গে সঙ্গে গানও গাইছে। বাইরের নকল আবরণ না দেখে যদি ভেতরটা দেখতে পেতো কৃষ্ণকিশোর, তা হ'লে বোধ করি সহানুভূতিতে কণামাত্র ভিজে যেতো না তার মন। গহরজানের সজল নয়ন দেখে কেমন যেন বিসদৃশ লাগে। অভিমানিনীর প্রতি বুঝি বা মনে-মনে দয়ার উদ্রেক হয়। বলে,—খুব ভাল গান গাও তুমি।

দেওয়ালের এক জায়গায় ছিল একটা সস্তা দামের ক্লক্-ঘড়ি। টিকটিকির মত টিক-টিক শব্দে তার ক্ষণ-সঞ্চরণ। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ধীর সুরের সময়-জ্ঞাপন শোনা যায়। সহসা বাজতেই ঘড়ির দিকে তাকায় কৃষ্ণকিশোর। দেখে আটটা বাজে। পানীয়ের উগ্র প্রতিক্রিয়ায় চোখে যেন ঝাপসা দেখে। কুমুদিনী বাড়ীতে নেই, তবুও মনের কোথায় যেন ভেসে ওঠে মায়ের মুখ। কানে যেন ভাসে তাঁর সস্নেহ কথা। চোখের সমুখে ছবির মত দেখতে পায় যেন, অন্দরে ভাঁড়ারের দরজার কাছে নিজের স্থানটিতে ব'সে রয়েছে কুমু। একেক বার ছ্যাৎ ক'রে ওঠে সত্যিই বুকের ভেতরটা। তবুও গহরজানের চোখের জল দেখে, মিথ্যা কান্না দেখেই তাকিয়াটা এগিয়ে নেয় খানিক। এগিয়ে আসে গহরজানের একেবারে কাছে। বলে,—গান থাক্, তুমি—

অন্দরে কেউ কোথাও নেই।

ব্রাহ্মণী শুধু উনুনের সামনে ব'সে রাতের আহার প্রস্তুত করে। গৃহের মালিক ফিরে এসে যদি দয়া ক'রে খান। ঝি আর বাউড়িরা জটলা করে কিছুকাল, সিঁড়ির তলায় ব'সে। ব্রাহ্মণী রান্না করে আর গিন্নীমা'র জন্যে চোখের জল ফেলে মধ্যে-মধ্যে। তিনি থেকেও রইলেন না।

আর সদরে, কাছারীর দালানে অপেক্ষারত নর্ম্মান অরুণেন্দ্র এতক্ষণে একটা বসবার কেদারা পায়। ম্যানেজার বাবু তাকে লক্ষ্য ক'রে দেখেন অনেক্ষণ নিজের কামরা থেকে। ফিরিঙ্গী দেখে কাছাকাছি এসে কথা বলেন। বলেন,—Who are you? What are you? Take your seat.

নর্ম্মান অরুণেন্দ্র বললে,—মালিকের বন্ধু আমি। I have few talks with him. আমাকে এই রাতের ট্রেণেই লুধিয়ানা যেতে হ'বে।

—লুধিয়ানা! বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন ম্যানেজার বাবু।—লুধিয়ানায় কেন? সেখানে কে আছে?

খানিক চুপচাপ থাকে নর্ম্মান অরুণেন্দ্র। ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত ক'রে

দেখে ম্যানেজার বাবুকে। দেখে হয়তো এ লোকটির কাছে কোন কথা ব্যক্ত করা যাবে কি না। বলে,—Secret matter. আপনাকে বলতে পারি ?

—Secret !—বাধা থাকলে কেন বলবে ? বলেন ম্যানেজার বাবু।—তবে বললে ফাঁস হবে না কথা।

নশ্মান অরুণেন্দ্র আন্দাজে বলে,—I hope, you are the appointed manager of this Estate of that minor chap ?

—Yes. you are right. ম্যানেজার বাবুর মুখে যেন কৌতূহল ফুটে ওঠে ফিরিঙ্গী বাচ্ছার কথা শুনে। পাশের চেয়ারে আসন গ্রহণ করেন তিনি। বলেন,—How do you come to touch with that chap ? মালিকের সঙ্গে কোথা থেকে আলাপ হ'ল ?

হাসলো নশ্মান অরুণেন্দ্র। বললে,—গড়ের মাঠে প্রথম আলাপ হয়। We met each other. Then I found, he comes of a rich family. আমার টাকার দরকার, And I made friends with him.

টাকার দরকার ! আরও যেন বিস্মিত হলেন ম্যানেজার বাবু।
—You need money ? Why ?

নশ্মান অরুণেন্দ্র যেন ভাবছিলো বলবে কি বলবে না। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অবশেষে বললে,—আমরা একটা Party form করেছি, just alike the Nihilists of Russia, for the freedom of our motherland. সেই Partyর কাজের জন্ম দরকার huge money, for collecting arms and ammunitions,

—তা লুধিয়ানায় যাওয়া হবে কেন ? ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞেস করেন ধীরে ধীরে।

নশ্মান অরুণেন্দ্র একটা বার্ডসাই ধরায়। এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে,—To unite the Panjabis and the Bengalees. আমাকে ভার দিয়েছে party আর—

কথা বলতে বলতে থেমে যেতে দেখে কথাটা ধরিয়ে দেন ম্যানেজার বাবু। বলেন,—আর ?

—আর আমাকে আমার father থাকতে দিলে না তার কাছে। সরকারী চাকরী। বললে যে, anarchism করলে আমার কাছে জায়গা নেই। কথার শেষে বার্ডসাই মুখে তোলে নশ্মান অরুণেন্দ্র।

এবার ম্যানেজার বাবু চুপ করেন। আর কোন বাক্যব্যয় না ক'রে ব'সে থাকেন একদৃষ্টে তাকিয়ে। সহসা কি মনে হ'তে বলেন,—বন্ধুর সঙ্গে কিসের দরকার ? What kind of secret talk ? টাকার দরকার ?

নশ্মান অরুণেন্দ্র বললে,—না, টাকার দরকার নেই। আমি কিছু Document রেখে যাবো তার কাছে, few days পরে আমাদের এক জন worker এসে নিয়ে যাবে তার কাছ থেকে। কিন্তু Where is he ? সে কেন এখনও আসছে না ? I can't wait any more. ট্রেণ ধরতে পারবো না।

মনে মনে কি বুঝলেন কে জানে, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে খানিক বসে রইলেন ম্যানেজার বাবু। তিনিও সব শুনেছেন মালিকের কীর্তি-কাহিনী। মদ্য পানে আসক্ত হয়েছে শুনে তিনিও আর খুশী নন মালিকের প্রতি। কাছারীতে হুকুম দিয়েছেন, তাঁর বিনা অনুমতিতে যেন একটি আধলাও না দেওয়া হয় মালিককে। কিন্তু যখনই ভেবেছেন, সাবালকত্ব প্রাপ্তির আর বেশী দেরী নেই, তখনই মনে মনে হতাশ হয়ে পড়েছেন। ম্যানেজার বাবু আন্তরিক স্নেহ করেন মালিককে। তাই তার দুরাচারে সত্যিই আঘাত পেয়েছেন মনে। হঠাৎ কথা বলেন তিনি,—আমাকে দিয়ে যাওয়া হোক। আমি তাকে দিয়ে দেবো।

নশ্মান অরুণেন্দ্র কথাগুলি শুনে সরল বিশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে,—Will you ? Kindly, will you ?

—Yes, yes. Rest assure, ঠিক জায়গায় যাবে। Handover to me without hesitation. কথার শেষে ম্যানেজার বাবু উঠে পড়েন কেদারা থেকে।

বার্ডসাই মুখে ধ'রে খুশীর হাসি হাসতে-হাসতে পকেট থেকে একখানা আঁটা খামের লেফাফা বের ক'রে দেয় নশ্মান অরুণেন্দ্র। ম্যানেজার বাবু সেটি নিয়ে বলেন,—Now you can go being assured.

—Many, many thanks with all my true love to you. Please do it my friend. বলতে বলতে কাছারীর সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নেমে যায় নশ্মান অরুণেন্দ্র। দ্রুতবেগে চলে যায় ম্যানেজার বাবুর দৃষ্টির অন্তরালে। পরম পরিতৃপ্তির হাসি দেখা দেয় তার মুখে। আনন্দের বিকাশ। যেতে যেতে বলে :

"True love's the gift which God has given
To man alone beneath the heaven
It is not fantasy's hot fire,
Whose wishes, soon as granted, fly ;
It liveth not in fierce desire,
With death desire it doth not die ;
It is the secret sympathy,
The silver link, the silken tie,
Which heart to heart, and mind to mind,
In body and in soul can bind."

ঘনান্ধকারে শহর তখন প্রায় সুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে। আকাশের দিগন্তে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সঞ্চয় যেন। হয়তো বর্ষণ হবে, কিছুক্ষণের মধ্যে। গাছের শাখা দোদুল্যমান। মাঝে-মাঝে হাওয়া বইছে এলোমেলো। জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্মদিনের দাবদাহের পরে স্বস্তির শ্বাস ফেলছে শহরবাসী। সঞ্চরমান ছিন্ন মেঘের আস্তরণে লুকোচুরি খেলছে নক্ষত্ররা।

লেফাফাখানা ধ'রে ম্যানেজ্যার বাবু ক্ষুব্ধ চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকেন কাছারীর দালানে। মালিক এখনও ফিরে আসে না। গৃহকর্ত্রীকে মনে পড়ে তাঁর। স্তব্ধ, গম্ভীর ও ধৈর্য্যের প্রতীক তিনি, ছেলের অপকর্ম্মে ত্যাগ ক'রে গেছেন এই গৃহ। মনে-মনে ইতস্তত করেন ম্যানেজার বাবু, লেফাফাখানা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবেন, না

[২৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

যাযাবর

অনাবৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত ও বন্যা নিতান্তই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। এদের উপদ্রব আকস্মিক, ফলাফল অনাকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু আগমন অনিশ্চিত নয়। বাংলা দেশে। দোল, দুর্গোৎসবের ন্যায় এগুলিও বাৎসরিক। কখনও বাঁকুড়ায়, কখনও বাখরগঞ্জে, কখনও বা তিস্তা কি দামোদরে। দৈনিক সংবাদ-পত্রের সচিত্র বিবরণীর মধ্য দিয়ে তাদের বহু ব্যাপ্ত ধ্বংসসাধনের সকরুণ কাহিনী দেশ দেশান্তরে পরিচিত।

দৈব দুর্বিপাকে ক্ষতি ঘটে বহুর। সে-ক্ষতি অতি বিস্তৃত। বর্ষার প্লাবনে অকস্মাৎ জলমগ্ন হয় গ্রামের পর গ্রাম, বিনষ্ট হয় স্বল্পবিত্ত জনগণের সমস্ত সম্বল, শস্যনাশে সর্ব্বস্বান্ত হয় ঋণভার-জর্জ্জরিত দরিদ্র কৃষককুল। কারো ধন যায় কারো বা জন। শোকভারাক্রান্ত অসহায় নরনারীর সম্মিলিত কণ্ঠের কাতর অভিযোগ ও ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস নির্মম ভাগ্যদেবতার রুদ্ধ দ্বারপ্রান্তে চরম নিষ্ফলতায় পুঞ্জীভূত হতে থাকে দিনের পর দিন, মাসের শেষে মাস, বৎসরান্তে বৎসর। সেই সর্ব্বব্যাপী দুঃখের তিমিরে শুধু স্বল্প সংখ্যক সেবাব্রতীরা আপন পরিমিত শক্তি ও সামর্থানুযায়ী আর্ত্তত্রাণের আয়োজন দ্বারা কোনক্রমে জ্বালিয়ে রাখেন মানব করুণার ক্ষীণ দীপশিখা, মর্ত্ত্যলোকে বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ।

কিন্তু সুযোগও আসে কারো কারো। বন্যার্ত্তদের দুঃখে সুচতুর দেশহিতৈষীরা সভা সমিতিতে সঘন করতালির মধ্যে প্রচুর অশ্রুপাত ও প্রচুরতর বাগ্‌বিস্তারের দ্বারা খবরের কাগজে নাম ও এসেম্বলীতে আসন পাকা করার ব্যবস্থা করেন, চলমান ট্রামে বাসে পেশাদার চাঁদা-প্রার্থীর দল যাত্রীদের সামনে চাঁদার বাক্স এগিয়ে ধরে বারম্বার এবং লাল শালুর কাপড়ে সাদা অক্ষরে ঘোষিত একাধিক সংকটত্রাণ সমিতির সদস্যবৃন্দ হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে ডি, এল, রায়ের একটি অতিপরিচিত সুরে রচিত সংগীত সহযোগে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহে নির্গত হয়।

দুর্গতেরা, অর্থাৎ তাদের নামটা, আরও একটা বিশেষ কাজে লাগে। অভিজাত সম্প্রদায়ের সৌখীন নাট্যাভিনয়ের সেটা বিশেষ সহায়ক। গৃহের অফুরন্ত অবসরক্লান্ত সন্তানবিহীনা প্রৌঢ়া রমণী বা আলোকপ্রাপ্তা নব্য তরুণীদের উৎসাহে

আখ্যান

অধুনা অধিকাংশ নাচের আসর, ভ্যারাইটি শো বা অভিনয়-আয়োজন হয়। কলেজে প্রক্সি দেওয়া তরুণ ছাত্র, ব্রীফহীন ব্যারিষ্টর, পিতৃবিয়োগে হঠাৎ হাতে টাকা-পাওয়া জমিদার-নন্দন ও নারীসান্নিধ্য-ব্যাকুল আর্ট-ভক্ত বেকার যুবকের দল তার কর্ম্মকর্ত্তা। গেরুয়া বস্ত্রের আবরণে ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় জনহিতৈষণার তিলক ললাটে নিয়ে এদের এই নাট্যপ্রচেষ্টাগুলি ব্যক্তিগত প্রমোদানুষ্ঠানের অকিঞ্চিৎকরতা মুক্ত হয়ে সৎকার্য্যের সনন্দ লাভ করে। উদ্যোক্তারা তাই দুর্ভিক্ষ বা বন্যার শরণ নেন, অভাবে কোন বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধান, মৃত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষা এমন কি হাতের কাছে সন্তোষজনক আর কিছুই না পাওয়া গেলে সর্ব্বশেষে কন্যাদায়গ্রস্তের উপকারার্থেও অভিনয় এবং টিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। বেশীর ভাগ মন্ত্রীদের দেশসেবার মতো এ-সকল সাহায্য-রজনীর সাহায্যটাও লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। সুতরাং বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে সম্প্রতি মিসেস মলী সেন যে নাটকাভিনয়ের প্রয়াস করেছেন আশা করি তার সার্থকতা নিয়ে অনর্থক গবেষণায় কেউ সময় নষ্ট করবেন না।

অভিনয়টা নিউ এম্পায়ারে হলেই ঠিক মানাতো। সাধারণতঃ তাই হয়। কিন্তু অধুনা সিনেমার চাপে একমাত্র সকালবেলা ছাড়া সেখানে হল খালি পাওয়ার জো নেই। সময়টা এ ধরণের অনুষ্ঠানের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। সপ্তাহে একমাত্র রবিবার ছাড়া সে সময়ে অবকাশ আছে কার? আর রবিবারেই বা সকালে স্কুল-কলেজের ছাত্র ও কিছু সংখ্যক আপিস আদালতের কেরানীবাবু ব্যতীত অভিনয় দেখতে আসবে কে? তাদের মধ্যে এক টাকা দামের উপরে টিকেট কিনবে ক'জন? তার

চাইতেও বড় কথা,—সোসাইটির সেরা নর-নারীরাই যদি না দেখলো তবে অভিনয় করে সুখ কোথায়? মলী সেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখ বেঁকিয়ে বললেন।

"সকালবেলা থিয়েটার করতে পারবো না। সে যেন রাত সাতটায় চায়ের নিমন্ত্রণ কিম্বা জানুয়ারী মাসে ফুটবল ম্যাচ। রিডিক্লাস্।"

এখানে বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, মে-জুন মাসে ফুটবলের মাঠে পশ্চিম দিকের মেম্বারস্ গ্যালারীতে সাদা ফ্রেমের সান্ গ্লাস চোখে-আঁটা রঙ্গিন ম্যাকিণ্টন হাতে মলী সেনকে প্রত্যহই দেখতে পাওয়া যায়, যদিও সেখানে তার এই নিয়মিত উপস্থিতি কতটা নিছক ক্রীড়ানুরাগপ্রণোদিত আর কতটাই বা ফ্যাশানের তাগিদে তা নিয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ বান্ধবীদের মধ্যেও মতদ্বৈধ আছে। এমন কি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি আড়ালে এমনও বলে থাকেন—

"ও তো দেখতে যায় না, দেখাতে যায়।"

অসম্ভব নয়। আপনাকে উদ্ঘাটিত করার প্রেরণা আছে বিশ্ব-প্রকৃতিতে, আছে মানব-চরিত্রে। তাই বীজ আপনাকে অঙ্কুরিত করে বৃক্ষে, তরুলতা বিকশিত হয় ফুলে-ফলে, মানুষ পরিব্যক্ত হয় স্বীয় আচার আচরণে। নিজকে ব্যক্ত করার এই স্বাভাবিক ব্যাকুলতা যখন সহজ ও সুসমঞ্জস হয় তখন তাকে বলি আত্মপ্রকাশ। আতিশয্যের দ্বারা সে যখন কলুষিত হয়, তখন তাকে বলা হয়, আত্মপ্রচার। বিকৃত বলেই সেটা ধিকৃত।

ইংরেজ কবি বলেছেন, এ জগতটা নাট্যশালা; মানুষ মাত্রই সেখানে জীবন-নাট্যের কুশীলব। মলী সেন বিলাতী কনভেণ্টের ছাত্রী ছিলেন, সিনিয়র কেম্‌ব্রিজের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সেখানে কলেজে প্রবেশের পথ মেলে। তাই যে-বয়সে বাঙ্গালী ছেলেরা নেস্‌ফিল্ডের ব্যাকরণ মুখস্ত করে, সে বয়সে তিনি ইংরেজী নাটক পড়েছেন। তাঁর কাছে ঐ কাব্যোক্তি অবিদিত নয়। কিন্তু তাতে মন ওঠে না। সুবৃহৎ পৃথিবীর বিশাল নাট্যমঞ্চে কোটি কোটি অভিনেতা অভিনেত্রীর ক্ষান্তিবিহীন অভিনয়-পর্ব্বের মধ্যে একটি মাত্র মলী সেনের পার্ট কতটুকু? নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের চরাচর বিস্তৃত সেটের মধ্যে সে তো শুধু একজন 'এক্সট্রা'; সে তো 'ষ্টার' নয়। জনতার কোন বিশেষ ভূমিকা নেই, তাদের অভিনয় নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বীর অঙ্গীভূত। কোথায় যে তার প্রস্তাবনা আর কোনখানেই বা যবনিকা পতন তা সকলের অলক্ষিত। নায়িকার জন্য চাই নির্দ্দিষ্ট নাটক—তার পরিধি পরিমিত এবং আরম্ভ ও সমাপ্তি দুই-ই সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ফুটবল সম্পর্কে যাই হোক না কেন, নাটকে দেখাবার প্রশ্নটাই প্রধান। সে-কথা মলী সেনের জানা আছে। তার জন্য আবশ্যক যথোচিত মঞ্চ ও প্রেক্ষাগার।

উত্তর কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় ভাড়া পাওয়া শক্ত নয়। কিন্তু তার কৌলীন্য নেই। সেখানে কাষ্টমস্ বা পুলিস ক্লাবের সদস্যদের মেবার পতন বা বঙ্গে বর্গী অভিনয় চলে, যাতে মিহি স্বরের পুরুষেরা নকল চুল মাথায় চাপিয়ে শাহজাদী সাজে। সেখানে অভিজাতদের অভিনয় সম্ভব নয়। স্থানমাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে তো? গুলু ওস্তাগরের গলিতে কি বাড়ি তুলবেন স্যার বীরেন মুখার্জ্জী? মির্জ্জাপুরের হোটেলে হবে চীফ মিনিষ্টারের ডিনার?

তার চাইতে বাড়িতে ষ্টেজ বেঁধে অভিনয় করা বরং ভালো। তাতে সাহেবপাড়ার থিয়েটার হলের ডিগনিটি না থাকলেও, ডিষ্টিংশান আছে। দামী জর্জ্জেটের অভাবে মোটা খদ্দরের শাড়ির মতো। অন্য লোকের কথা কী, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একাধিক অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

মলী সেনদের বাড়িটা অতিশয় প্রাচীন। চক মিলানো গড়ন। মাঝখানে বৃহৎ উঁচু দালান। চণ্ডীমণ্ডপ। সেকালে দুর্গাপূজা হতো মহা সমারোহে। সামনে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। সেখানে বসে সমবেত জনতা ভক্তিভরে শ্রবণ করতো মহাষ্টমীর দিনে পূজামণ্ডপে কুল-পুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডী পাঠ। প্রতি বৎসর রাস পূর্ণিমার রাত্রে যাত্রাভিনয় হতো। "রাই উন্মাদিনী" পালায় অধিকারী অঘোর সামন্ত নিজে আসরে বসে বৃন্দাদূতীকে ঝাঁপ তালে গানের খেই ধরিয়ে দিতেন—"গোকুল ত্যজি শ্যাম রায়, তুমি এলে মথুরায়, শ্রীরাধিকার প্রাণ যায়, তোমার বিহনে-এ-এ-এ।" প্রাঙ্গণের তিন দিকে ঘেরা দালানের দোতলার বারান্দায় চিকের আড়ালে বসে মহিলারা বিরহিণী রাধার দুঃখে ঘন ঘন চোখ মুছতেন। সে দীর্ঘ দিন আগেকার কথা।

মলী সেনের শ্বশুর বৈকুণ্ঠনাথের কুখ্যাতি ছিল অর্থগৃধ্নুতার। পাড়ার ফুটবলের ক্লাবে চাঁদাবঞ্চিত ক্রুদ্ধ যুবকের দল তাঁর নামের ঈষৎ পরিবর্ত্তন করে নব নামকরণ করেছিলো ব্যয়কুণ্ঠ সেন। তিনি প্রথমে পূজা-পার্ব্বণের রাজসিক অংশ কাট-ছাঁট করে নেহাৎ অবর্জ্জনীয় শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটুকু বজায় রাখলেন। যাত্রা হলো বন্ধ, কথকতা গেল উঠে, কাঙালী-বিদায় পেল লোপ।

পূজারও আয়ু বেশী দিন রইল না। সে-বার নবমীর দিনে বলির পশু আটকে গেল খড়্গে। শ্রীধর মাষ্টার এ বাড়ীতে খাঁড়া ধরছেন এই বাইশ বছর; এক কোপে মোষ নামিয়েছেন কতবার। তাঁর হাতে এমন দুর্ঘটনা এই প্রথম। তিনি হাতের অস্ত্র নামিয়ে রেখে, কপালের ঘাম মুছে, প্রতিমার পানে হাত জোড় করে বললেন,

"মা করুণাময়ী, রোষ করিসনে। দেখিস, কর্ত্তার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে, ভালোয় ভালোয় বছর পার হোক, আসছে বছর জোড়া মোষ মানত রইল তোর পায়ে।"

হায়, একসঙ্গে একাধিক মহিষের রুধিরপানের এমন লোভনীয় সম্ভাবনার প্রতিও মায়ের আসক্তির কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া গেল না। করুণাময়ীর করুণা রইল সম্পূর্ণই অপ্রকাশ। মাস খানেকের মধ্যে টাইফয়েডের ব্যাপক আক্রমণে মারা গেল পর পর বৈকুণ্ঠের বড় দুই ছেলে। একুশ দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর কোন মতে বেঁচে গেল অবশিষ্ট পুত্র শিবনাথ,—পটলডাঙ্গার পুরাতন সেন পরিবারের একমাত্র বংশধর। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার সঙ্গে বলিবিভ্রাটে রুষ্টা ভবানীর প্রকৃত সম্পর্ক কতখানি, সে কথা তিনিই জানেন। কিন্তু শোকে মুহ্যমান বৈকুণ্ঠনাথ রাগ করে বললেন,

"এ বাড়ীতে আর ভগবতীর পাট নেই, এবার থেকে পূজা বন্ধ।"

তার পর থেকে গৃহে আর পাতা হয়নি দেবীর আসন, স্থাপনা হয়নি অর্চ্চনার ঘট। পূজার দালান ব্যবহৃত হয়েছে বৈকুণ্ঠের ব্যবসায়ের গুদামঘর হিসাবে। পড়তি বাজারে মাল কিনে তিনি সেখানে মজুদ করেছেন উঠ্‌তি বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। এক পাশে জড়ো-করা জীর্ণ তক্তপোষ, বাণ্ডিল বাঁধা পুরানো আমলে বৃহৎ ভোজের দিনে ব্যবহৃত কুশাসনের স্তূপ, ডালাভাঙ্গা টীনের বাক্স, দেয়ালে কলি ফেরাবার পাটের মোটা তুলিসমেত চুণের কেনেস্তারা এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য বহু পরিত্যক্ত অব্যবহার্য্য উপকরণ।

সে-সমস্ত দূর করে আজ কদিন ধরে থিয়েটারের ষ্টেজ তৈরী হচ্ছে। ঠেলাগাড়ি বোঝাই আসছে শাল কাঠের তক্তা, বস্তা বোঝাই রঙ্গিন কাপড়, ইলেকট্রিকের তার, বিভিন্ন বর্ণের আলো ও নানাবিধ সাজ সরঞ্জাম। হাতুড়ি পেরেকের ঠকা-ঠক্ শব্দে দালানের কার্নিশে অতি পুরাতন বাসিন্দা মালিকহীন পারাবতের দল সচকিত ভীত ও সন্ত্রস্ত চিত্তে ইতস্ততঃ পলায়নরত।

যাঁর উপরে রঙ্গমঞ্চ তৈরীর ভার তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন, এ বাড়ির সদর দালানটা ষ্টেজের পক্ষে খুবই উপযোগী। মনে হয় যিনি বাড়ি তুলেছিলেন তিনি যেন এই অভিনয়ের কথা ভেবেই এমন উঁচু মণ্ডপ ও সামনে প্রেক্ষাগারের উপযোগী প্রাঙ্গণ পরিকল্পনা করেছিলেন।

শুনে মলী সেন খুসি হলেন। সেকেলে ধরণের এই অতি পুরাতন কক্ষগুলিও যে কোনো দিন কোনো উপলক্ষ্যে কাজে লাগতে পারে একথা এই প্রথম তাঁর মনে হলো।

এ বাড়িটার প্রতি মলী সেনের তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল। পনর বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখের এক উৎসব-মুখরিত সন্ধ্যায় বধূবেশে তিনি এই গৃহে প্রথম পদার্পণ করেন। প্রচলিত পঞ্জিকার শুভদিন-নির্ঘণ্টের তালিকা অনুসারে সে-দিনটা অবশ্যই মঙ্গলদায়ক ছিল। কিন্তু পাঁজির নিদান ও ভাগ্যের বিধান যে অনেক ক্ষেত্রেই হাতে হাত দিয়ে চলে না সদ্যবিবাহিত দম্পতির পরবর্ত্তী জীবনে তারই দুঃখজনক প্রমাণ রইল। সে-কাহিনী যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে আজ তার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথেষ্ট নয়। সুতরাং সে চেষ্টা না করাই ভালো। বরং বাড়ির প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক্।

মলী সেনের বিয়ের বছর পাঁচেক পরে এক ক্রিসমাসের রাত্রিতে ফারপোর ড্যান্স থেকে তাঁকে বাড়ি রেখে আসতে যাচ্ছিলেন সুধাংশু। ডক্টর সুধাংশু মিটার। তিনি চিকিৎসকই বটেন, তবে দেহের নয়, দাঁতের। শিবনাথের অনুজ। অতি

দূর সম্পর্কীয়। আত্মীয়তায় মলী সেনের দেবর। হৃদ্যতায় কী তা এক কথায় প্রকাশ করা কঠিন। ইংরেজীতে ফ্রেণ্ড, ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড বলে একটা কথা আছে। তার বাংলা তর্জ্জমা ঠিক জানিনে। জানলে ব্যাখ্যা করা সহজ হতো। গাড়িতে উঠে সুধাংশু বললো,

বউদি, তোমাদের এই মান্ধাতার আমলের বালাখানাটা ছাড়বে কবে?"

ঠিক বুঝতে না পেরে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন,

"কিসের কথা বলছো?"

"আর কিসের? তোমাদের এই পটলডাঙ্গার রাজমহলটির। আজকের দিনেও যে কোন ডিসেন্ট রুচির ভদ্রমহিলা এই ঘিঞ্জী পুরানো নোংরা গলির মধ্যে বাস করতে পারে এ আমার ধারণায়ই আসে না। ভাড়াটে বাড়িতে থাকে এমন সাধারণ চাকুরে, উকীল, প্রফেসারের স্ত্রীরাও তো আজকাল উত্তর কলকাতায় থাকতে চায় না। চৌরঙ্গী পাড়ায় থাকা সবার সাধ্য নয়, তবুও তাঁরা অন্তত: লেক রোড কিম্বা সাদার্ণ এভেনিউতে বাড়ী খোঁজে।"

মলী সেন ক্ষীণ স্বরে বললেন,

"পুরানো আমলের বাড়ি—"

সুধাংশু বাধা দিয়ে বললো;

"দোহাই তোমার, বউদি, ওটাকে বাড়ি বলো না। সিন্দুক বলতে চাও বলো, এমন কি গৌরবে দুর্গ বললেও আপত্তি করবো না। কিন্তু বাড়ি—কখনই নয়, নেভার।"

এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। মলী সেন নিজে কতদিন সদ্যপরিচিত বন্ধু-বান্ধবকে ঠিকানা দিতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করেছেন। লাউডন ষ্ট্রীট, মার্লিন পার্কের ড্রয়িং রুমে বসে রামকান্ত মিস্ত্রী লেনের নাম উচ্চারণ করতে হলে স্বভাবত:ই লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। বললেন,

"তোমার কথা সত্যি। আমি নিজেও যে এই দ্বাপর যুগের বাড়িটাতে একেবারে আনন্দে গদ গদ হয়ে আছি, তা ভেবো না। কিন্তু সাহেবী পাড়ায় বাড়ি পাচ্ছি কী করে?"

"অন্য আর দশজনে যেমন করে পায়। হয় ভাড়ায়, নয় কিনে। এ দুটোর একটাও না হলে তৃতীয় পন্থা আছে, সেটা সব চেয়ে ভালো,—নিজেরা তৈরী করে।"

"বাড়ি তৈরী করা কি চারটিখানি কথা হলো? তার কতো ঝামেলা।"

"টাকা ঝম ঝমালে ঝামেলা থাকে না। শিবুদা একবার মুখের কথাটি বের করুন দেখি, সাতদিনে তোমাদের বাড়ির জায়গা কিনে সাত মাসে বাড়ি তুলিয়ে দিতে পারি কিনা দেখো।"

শিবুদার অনুমতি সময়সাপেক্ষ। দেবর আর ভ্রাতৃজায়া মিলে পরামর্শ করলেন দিন দুই, গাড়ি চেপে দালালের মারফতে এখানে ওখানে জায়গা দেখলেন দিন দশেক।

এখন চৌরঙ্গীর আর সেই পুরাতন আভিজাত্য নেই। পাট কোম্পানীর সাহেব, বিলাতী ডিগ্রী ওয়ালা স্ত্রীরোগের ডাক্তার ও রেডিওলজিষ্টেরা সে অঞ্চলে ফ্ল্যাট নিয়ে তার কুলীনত্ব অনেকখানি ঘুচিয়েছে। ময়রা ষ্ট্রীট বা উড ষ্ট্রীট এখন আর ফ্যাশান নয়। এখনকার খাঁটি অভিজাত পল্লী—আলিপুর।

পোর্টল্যাণ্ড পার্কে জমি পছন্দ হলো মলী সেনের। ব্যালার্ডি টমসন-ম্যাথুসকে দিয়ে প্ল্যান করানো হলো বাড়ির। সর্ব্বাধুনিক এমেরিকান রীতির ষ্ট্রীমলাইনড ডিজাইন। স্পেগলার থেকে আসবে বাড়ির লিফট, ফিলিপস্ থেকে ফ্লুরেসেন্ট বাতি এবং স্ট্যাঙ্কস্ থেকে স্যানিটারী ফিটিংস। বার্ডস্ করবে ফ্লোর, ল্যাজারাস দেবে ফার্ণিচার। বসার ঘরে দেয়ালে দেয়ালে ছবির ডিজাইন করবেন যামিনী রায়। বাকী রইলো শুধু গৃহকর্ত্তাকে বলা। টাকার প্রয়োজনে।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ করার অভ্যাস আছে শিবনাথের। দিবাভাগে ক্রেতা-বিক্রেতার আনাগোনায় ও অন্যান্য কাজের তাড়ায় কোন কিছুতে নিরবচ্ছিন্নরূপে মন দেওয়ার উপায় থাকে না। নিশীথে নিজকক্ষের নিভৃত আবেষ্টনে ধীর চিত্তে হিসাবপত্র পরীক্ষার সুযোগ মেলে। সে-দিন তাতে বাধা পড়ল। মলী সেন এসে বললেন,—

'একটা দরকারী কথা আছে।"

তা না বললেও চলতো। দরকার না থাকলে সন্ধ্যাকালে মলী সেন সিনেমায় বা ক্লাবে না গিয়ে বাড়ি থাকবেন কেন? দরকারটা যে শিবনাথের নয়, তাও অনুমান করতে কষ্ট হয়নি। ট্রায়েল

ব্যালেন্সের পাতা থেকে মুখ তুলে স্ত্রীর পানে তাকিয়ে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—

"কী ব্যাপার" ?

ব্যাপার,—নতুন বাড়ি।

মলী সেন চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। এ বাড়ি পরিত্যাগের সংকল্প, সাহেবী পাড়ায় নতুন গৃহ নির্ম্মাণের আভিজাত্য, তার জন্য স্থান অন্বেষণ, জমি নির্ব্বাচন, নক্সা তৈয়ার ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। টেবিলের উপরে প্ল্যান খুলে সযত্নে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, কোনখানে হবে শয়নকক্ষ, কোথায় হবে অতিথির ঘর, কত বড় হবে ড্রয়িং রুম, কত দূরে থাকবে গ্যারেজ ও ভৃত্যদের বাস ব্যবস্থা ইত্যাদি। বলতে বলতে উৎসাহে, উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিলেন মলী সেন।

শিবনাথ সমুদয় প্রস্তাব অখণ্ড মনোযোগে শুনলেন, সযত্নে প্ল্যানটি দেখলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন,

"নতুন বাড়ি কার জন্য ?"

হায়, অদৃষ্ট। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠান্তে অবশেষে প্রশ্ন করে কি না "সীতা কার পিতা।"

এর পরে সংযম রক্ষা করা অন্য যে কোন মহিলার পক্ষেই শক্ত হতো। কিন্তু মলী সেন আজ স্থির করেছিলেন কিছুতেই ধৈর্য্যচ্যুত হবেন না। গম্ভীর স্বরে উত্তর করলেন,

"আমার—মানে, আমাদের জন্য।"

শিবনাথ সংক্ষেপে বললেন,

"তোমার জন্য যদি হয়, করতে পারো। আমাদের জন্য যদি হয়, তবে প্রয়োজন নেই।"

"তার মানে ?"

"খুব সহজ। আমি তো এখানেই বেশ আছি।"

"কিন্তু আমি যে এখানে সুখী নই, তা জানো ?"

"জানি। কিন্তু সুখ কি আছে রাজমিস্ত্রীদের ঝুলিতে ? নতুন বাড়িতে গেলেই কি সমস্ত দুঃখ দূর হবে ?"

"না, হবে না। তবে নিজের পছন্দ মতো একটা বাড়িতে বাস করছি, অন্ততঃ সেটুকু তো জানবো।"

"বেশ ত তুমি নতুন বাড়িতে থাকতে চাও, থাকো। আমি বাধা দেবো না।"

ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি আর থাকে না। বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করে অবজ্ঞামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন মলী সেন,—

"বাধা দিতে চাইলেই যেন বাধা দিতে পারতে। তুমি জানো আমি কারো বাধাই মানিনে, তোমার তো নয়ই।"

শিবনাথ নিরুত্তরে আপন খাতাপত্র টেনে নিয়ে পুনরায় হিসাব পরীক্ষা কার্য্যে মনোনিবেশের উদ্যোগ করলেন।

এ ভঙ্গিটুকু মলী সেনের অজানা নয়। বিতর্কের মধ্যপথে অকস্মাৎ এরূপ মৌনতার দ্বারা অপ্রীতিকর বাদানুবাদের পরিসমাপ্তি ঘটানো শিবনাথের একটি পরিচিত পুরাতন কৌশল।

কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গের একটা চূড়ান্ত পরিণতি না ঘটিয়ে মলী সেন আলোচনা বন্ধ করতে প্রস্তুত নন। তাই তিনি উদ্গত ক্রোধ দমন করে যথাসম্ভব শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,

"তোমার আপত্তি কি কারণে ? জায়গাটা কি পছন্দ নয় ?"

খাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি শিবনাথ উত্তর দিলেন— "এর চেয়ে ভালো জায়গা কলকাতায় খুব বেশী পাওয়া যাবে, মনে হয় না।"

"তবে ?

শিবনাথ নিরুত্তরে পেন্সিল চালনা করতে লাগলেন ডেবিট-ক্রেডিটের অঙ্কে।

উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পুনরায় প্রশ্ন করলেন মলী সেন,

"বাড়ির প্ল্যানটা ভালো নয় ?"

"প্ল্যানে তো কোন দোষ দেখছিনে, ডিজাইনটি চমৎকার, ড্রয়িংও নিখুঁত।"

"তা হলে ?"

"বলেছি তো, তুমি নিজে থাকতে চাও তো বাড়ি সুরু করে দাও। কনট্রাক্ট দেওয়ার আগে এষ্টিমেটটা একবার আমাদের দোকানের এঞ্জিনীয়ারকে দেখিয়ে নিও, কোন ভুল চুক থাকবে না।"

"দেখ, এ বাড়ি তৈরী তোমার ইচ্ছা নয়, সে কথা অত ঘুরিয়ে বলার দরকার কি ? সোজাসুজি বলার সাহস নেই কেন ?"

শিবনাথ উত্তর দিলেন না, আপন মনে হিসাব পরীক্ষায় ব্যাপৃত রইলেন। সাহসের কথাটা না

তোলাই ভালো ছিল। সে কথা মলী সেনও মনে মনে জানেন। যদিও মুখে স্বীকার করেন না। কথা উঠলে বলেন,

"একে সাহস বলে না, বলে গোয়ার্ত্তুমি, পিগহেডেডনেস্।"

মিনিট দুই অপেক্ষান্তে মলী সেন আপন অভিযোগের পরিশিষ্ট হিসাবে বললেন, "স্বামী স্ত্রী দুজন আলাদা বাড়িতে থাকলে আর পাঁচজনে যে তার কি ব্যাখ্যা করে তা তুমি বোঝ না এমন নয়। তুমি থাকবে পটলডাঙ্গার বাড়িতে আর আমি থাকবো পোর্টস্যাণ্ড পার্কে—লোকনিন্দায় তা হলে কান পাতা যাবে কোথাও ?"

টাকা আনা পাইর অঙ্কে লাল পেন্সিলের টিক্ দিতে দিতে প্রায় স্বগতোক্তির মতো অনুচ্চ কণ্ঠে শিবনাথ বললেন, "লোকনিন্দার কথা ভেবেই কি আমরা সব সময়ে সব কাজ করি ?"

"'আমরা' মানে আমি তো ? না করিনে। যে-নিন্দা অকারণ, যে-নিন্দার পেছনে থাকে অক্ষমের ক্ষোভ আর বঞ্চিতের ঈর্ষা, তাকে আমি কেয়ার করিনে। আমি ক্লাবে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে বসে ব্রিজ খেলি বা রেসে যাই বলে তোমার যে সকল ম'সি, পিসি, দিদি, দিদিমার দল দুবেলা আমার অখ্যাতি না করে জল স্পর্শ করেন না, তাঁদের আমি বরাবর অগ্রাহ্য করবো। কিন্তু আমি একা একটা ভিন্ন বাড়িতে গিয়ে বাস করলে কেউ যদি অপ্রিয় কিছু বলে, তাকে দোষ দেবো না।"

"অর্থাৎ যিনি আসামী তিনিই বিচারক হয়ে রায় লিখবেন। আদালতে—"

অসহিষ্ণু স্বরে বাধা দিয়ে মলী সেন বললেন,

"তোমার ওসব আইন আদালতের ব্যাখ্যান রাখো। তুমি যে ল'ক্লাশে কিছুদিন পড়েছিলে তা অত ঘটা করে প্রমাণ না করলেও চলবে। তা নিয়ে কিছু কম কাণ্ড হয়নি যে, পুরানো বলেই সে কাহিনী আমি আজ ভুলে যাবো। তুমি কষ্ট করে শুধু এইটুকু বল যে, এই পুরানো অন্ধকার কুঠ্রী ছেড়ে তুমি নতুন বাড়িতে বাস করতে রাজী আছো কি না ?"

"কষ্ট করে নয়, স্পষ্ট করে বলছি,—এ বাঁড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস আমার ইচ্ছা নয়।"

কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস, ভঙ্গিতে চরম সিদ্ধান্তের লক্ষণ।

মলী সেন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চ কণ্ঠে বললেন,

"তা হবে কেন জমির বায়না দেওয়া হয়েছে, মালিক কাল আসবে পূরো টাকা নিতে, পরশু সেল ডিড্ রেজেষ্ট্রি হবে। এখন তাকে বলতে হবে, জমি কেনা হবে না, কেন না আমার স্বামীকে না জানিয়ে এতদূর এগিয়েছিলুম। এখন দেখছি, তাঁর মত নেই। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমার। আমাকে জব্দ করার এত বড় সুযোগ কি তুমি হাতে পেয়ে ছাড়তে পারো ? তোমাকে কি আমি পনর বছরেও চিনিনি ?"

শিবনাথ এবার খাতা বন্ধ করে স্ত্রীর পানে তাকিয়ে বেদনাক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন,

"সেটাই সত্যি, মলী, এই পনর বছরে তুমি আমাকে এতটুকুও চেননি, চিনতে চাওনি। কিন্তু সে কথা থাক। তুমি যে জমির বায়না করেছ তা তো এতক্ষণ আমাকে বলোনি। আমি এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস করবো না। তোমার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করার অভিপ্রায়ে নয়। এই বাড়ি আমার পিতামহের নিজের হাতে গড়া। এ বাড়িতে আমার মা একদিন লাল চেলী পরে সিঁথিমৌর মাথায় বউ হয়ে এসেছিলেন। দেহান্তে এই বাড়ি থেকেই তাঁকে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শ্মশানে। এই বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন আমার কত প্রিয় পরিজন, এই বাড়ির প্রতি ধূলিকণায় জড়িয়ে আছে আমার ভাইদের স্পর্শ, বোনেদের চিহ্ন, বাবার স্মৃতি। কিন্তু কথা যখন দেওয়া হয়েছে, জমি নিশ্চয়ই কেনা হবে।"

মলী সেন বললেন,

"থাক, তোমাকে দয়া করতে হবে না। আমার নিজের গয়না বিক্রী করলে অন্তত হাজার পঞ্চাশ টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সে টাকা দিয়ে আপাতত জমির দাম আমি দিতে পারবো। তোমার কাছে জীবিত স্ত্রীর অনুরোধের চাইতে যখন মৃত পিতামহের স্মৃতিই বেশী মূল্যবান—"

শিবনাথ বাধা দিয়ে বললেন,

"মূল্য কম বেশী নিয়ে কথা নয়, মলী; সেন্টিমেন্টের কথা। সেটা যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, হৃদয় দিয়ে বুঝতে হয়। এ বাড়ি আমাদের পয়মন্ত। এ বাড়ি তৈরীর পরেই

নানাভাবে ঠাকুর্দ্দা মশায়ের সৌভাগ্য বেড়েছে, এ বাড়িতে থেকে বাবা ব্যবসায়ে আশাতীত উন্নতি করেছেন।"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মলী সেন মন্তব্য করলেন,

"আধুনিক কালেও যে, কোন পুরুষ মানুষের এমন কুসংস্কার, সুপারিষ্টেশন থাকতে পারে তা জানা ছিল না। বসত বাড়ির উপরে ব্যবসায়ে সাফল্য নির্ভর করে একথা যে বিশ্বাস করে তার পাড়াগাঁয়ে থাকা উচিত ছিল।"

"বোধ হয় তাই। কিন্তু সুপারিষ্টেশন তো কেবল পুরুষেরই মনোপলি নয়। বাড়ির সামনের রাস্তাটার নামের উপরই যে বাড়ির ভিতরের মানুষগুলির দাম নির্ভর করে, সে তো মেয়েরাই বিশ্বাস করে এবং এই আধুনিক কালেই।"

রোষে মলী সেনের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হতে থাকলো। কিন্তু মুখে যথোচিত কঠোর অথচ যোগ্য প্রত্যুত্তর জোগালো না। কোন কথা না বলে ক্রুদ্ধ দ্রুত পদক্ষেপে ঝড়ের বেগে নিষ্ক্রান্ত হলেন শিবনাথের কক্ষ থেকে।

তারপরে ক্রমান্বয়ে সপ্তাহখানেক ধরে একাধিকবার চেষ্টা করেছেন। পর্য্যায়ক্রমে যুক্তি, তর্ক, অনুরোধ, অনুনয়, অনুযোগ, তিরস্কার ও অশ্রুধার প্রয়োগ করেছেন মলী সেন। শিবনাথ অবিচল। তাঁর ঐ এক কথা,

"আমরা এ বাড়ি ছাড়লে লক্ষ্মীও আমাদের ছাড়বে।"

পরাজিত হয়ে অবশেষে হাল ছেড়েছেন মলী সেন। সে-জমি কেনা হয়েছে। পরিবর্ত্তিত প্লানে সেখানে বৃহৎ চারতলা বাড়ি উঠেছে সে-বছরই। তাতে বারোটা ফ্ল্যাট। বাংলা গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী, পোর্ট ট্রাষ্টের বড় সাহেব, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট প্রভৃতি ক্লাইভ ষ্ট্রীটের রথী মহারথীরা সেগুলিতে বাস করে। প্রতি মাসের পহেলা তারিখে শিবনাথের কারেণ্ট একাউণ্টে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা ভাড়া জমা হয়।

তিক্ত স্মৃতি মনে রেখে লাভ নেই, আছে মনস্তাপ। মলী সেন তা জানেন। কিন্তু বিস্মরণ তো মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। নতুন জুতার ফোস্কা যেমন প্রতি পদক্ষেপেই পথচারীকে পায়ের ক্ষতস্থানের কথা বেদনার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে, তেমনি পটলডাঙ্গার সেই পুরাতন বাড়িতে বিতৃষ্ণ অবস্থিতি ক্ষণে ক্ষণে মলী সেনের মনে আনে সেদিনকার সেই পরাভবের অপমান। তার বেদনা গভীর। জ্বালা দুঃসহ। [ক্রমশঃ

প্রথম পাঁচ জন

বই কত রকমের ছাপা হয়। কত বিষয়ের 'পরে কত রকমের বই। একটা বিষয়ের 'পরেও কত রকমের বই ছাপা হচ্ছে। কিন্তু এক জন মানুষের সম্বন্ধে কত রকমের বই ছাপা হ'তে পারে, সে-সম্বন্ধে কি কারও কিছু জানা আছে? আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই একাধিক বই আছে। কত কে লিখেছেন।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন পাঁচ জন লোকের নাম করা যায় যাঁদের সম্বন্ধে এত অধিক বই ছাপা হয়েছে যে, শুনলে বিস্মিত হতে হয়। আমাদের দেশের যে-কোন একটা গ্রন্থাগারে সব শুদ্ধ এত বই থাকে কি না সন্দেহ হয়। নীচে পাঁচ জনের নাম আর বইয়ের সংখ্যা দেওয়া হচ্ছে :

নাম	সংখ্যা
যীশুখৃষ্ট	৫,১৫২
উইলিয়াম সেক্সপীয়র	৩,১১২
আব্রাহাম লিঙ্কন	২,৩১১
জর্জ্জ ওয়াশিংটন	১,৭৫৫
প্রথম নেপোলিয়ন	১,৭৩৫

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

দেববাণী—দৈববাক্য, ঈশ্বরোক্তি।
দেবমাতৃক—বৃষ্টি দ্বারা জাত শস্য-বিশেষ।
দেবযোনি—উপদেবতা, দেবজনিত।
দেবর—পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দেঅর, দেওর।
দেবরাজ—ইন্দ্র, সুরপতি, স্বর্গরাজ।
দেবল—দেবপূজাজীবি, পূজারি ব্রাহ্মণ।
দেবলোক—স্বর্গ, দেবগণের বাসস্থান।
দেবস্থল—দেবালয়, দেবগণের বাসস্থান।
দেবস্ব—দেবতার দ্রব্য, দেবত্র ধনাদি।
দেবহিংসক—অসুর, সুরারি, দৈত্য।
দেয়—দানযোগ্য, দাতব্য, পরিশোধ্য।
দেলুকা—দীপাধার, দীপবৃক্ষ, দীপাধান।
দেশ—পৃথিবীর খণ্ড, স্থল, দেহাংশ।
দেশময়—পরিপূর্ণ, ব্যাপ্ত, সর্ব্বত্র।
দেশাধিপ—দেশাধিপতি, রাজা।
দেশান্তর—বিদেশ, অন্য দেশ, প্রবাস।
দেশীয়—দেশজাত, দেশসম্বন্ধীয়, দেশজ।
দেহ—শরীর, কায়, প্রকৃতি, অঙ্গ।
দেহপাত—শরীর পতন, মরণ, মৃত্যু।
দেহহীন—অভৌতিক, অনঙ্গ, অশরীরী।
দেহাত্মবাদী—আত্মানিষেধক, নাস্তিক।
দেহী—মনুষ্যাদি, শরীরী, জীব, প্রাণী।
দেহোদ্ভূত—শরীরজ, স্বাভাবিক।
দৈত্য—অসুর, দেবারি, দানব, সুরারি।
দৈত্যগুরু—শুক্রাচার্য্য।
দৈন্য—দরিদ্রতা, কৃপণতা, দীনতা।
দৈব—অদৃষ্ট, দেবাধীন, ঐশ্বরিক।
দৈবকর্ম্ম—যজ্ঞাদি, স্বস্ত্যয়ন।
দৈবজ্ঞ—গণক, আচার্য্য, জ্যোতিষী।
দৈবযোগ—বিধাতৃকর্ম্ম, দৈব ঘটনা।
দৈবযোগে—দৈবাৎ, হঠাৎ, অকস্মাৎ।
দৈবী—হঠাৎ ঘটনা, ঐশ্বরিক দণ্ড।
দৈবোৎপাত—কর্ম্মবিপাক, দৈবোপদ্রব।
দৈর্ঘ্য—দীর্ঘতা, দ্রাঘিমা, লম্বাই।
দোকর—পুনর্ব্বার, দ্বিগুণ, পুনঃকৃত।
দোটানা—দ্বৈধ, দুই দিকে মনাকর্ষ।
দোঠকা—শঠ, খল, প্রবঞ্চক, নিন্দুক।
দোদুল্যমান—ঝুলনিয়া, ঝুলঝুলিয়া।
দোপড়া—দ্বিবিবাহিতা, দ্বিরূঢ়া কন্যা।
দোল—ফল্গুৎসব, পর্ব্ববিশেষ।
দোলন—ঝুলন, লড়ন, হেলন, ঝোঁকন।
দোলনা—ঝোলনা, দোল্না, দোলা।
দোলা—শিবিকা, ঝোলা, ডুলী।
দোলায়মান—ঝুলনিয়া, লড়নিয়া।
দোলবাহক—দোলিয়া, ডুলীবাহক।
দোষ—অপরাধ, ত্রুটি, পাপ।
দোষকর—অনিষ্টকর, হিংস্রক।
দোষক্ষেত্র—অপরাধস্থান, অপরাধী, দোষী।
দোষগায়ক—দোষগাথা, নিন্দক।
দোষগ্রাহক—দোষগ্রাহী, অপবাদক।
দোষাদোষী—পরস্পর অপবাদ করণ।
দোসর—দ্বিতীয়, সঙ্গী, সহচর।
দোহদ—গর্ভ, স্পৃহা, বাঞ্ছা, ইচ্ছা।
দোহন—দুগ্ধ নিঃসারণ, নিঙড়ন।
দোহা—শ্লোক, পদ্যবিশেষ।
দোহার—গায়কাদির সহায়।
দৌড়ন—ধাবন, বেগে চলন।
দৌত্য—দূতের কর্ম্ম, প্রেরিতজ্ঞ।
দৌবারিক—দ্বারপাল, দ্বাররক্ষক, দ্বাঃস্থ, দ্বারস্থিত, দ্বারী।
দৌরাত্ম্য—দুরাত্মতা, উৎপাত, দুষ্টামি।
দৌর্জন্য—দুর্জ্জনতা, খলতা, অসৌজন্য।
দৌহিত্র—দুহিতার পুত্র, নাতী, নাতি।
দৌহিত্রী—দুহিতার কন্যা, নাতনী।
দ্যূত—পাশক্রীড়া, পাষ্টি।
দ্যুনিশ—দিবারাত্রি, অহোরাত্র।
দ্রব—গলিত রস, দ্রুত, তরল।
দ্রব্য—বস্তু, পদার্থ, সামগ্রী।
দ্রু—দ্রুম, বৃক্ষ, গাছ, তরু, পাদপ।
দ্রোণকাক—দাঁড়কাক, বায়স।
দ্বন্দ্ব—যুগ্ম, কলহ, যোড়, দুই।
দ্বাপর—তৃতীয় যুগ, সন্দেহ।
দ্বিকর—দুই হস্ত, দ্বিকরবিশিষ্ট।
দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, পক্ষী, দন্ত।
দ্বিজিহ্ব—সর্প, অহি, ভুজগ।
দ্বিধা—দুই প্রকার, সন্দেহ, দ্ব্যর্থ, দ্বৈধ, সংশয়, বিকল্প।
দ্বিপ—দ্বিরদ, হস্তী, গজ, হাতী।
দ্বিরাগমন—পুনরাগমন।
দ্বিরুক্তি—পুনঃকথন, আম্রেড়ন।
দ্বীপ—চড়া, জলমধ্যবর্ত্তী বৃহৎ স্থান।
দ্বেষ—হিংসা, হিংসেচ্ছা, দ্রোহ।
দ্বৈমাতুর—দ্বিমাতৃসন্তান।
দ্ব্যগ্র—অগ্রদ্বয়বিশিষ্ট, বিদীর্ণ।
দ্ব্যর্থ—অর্থদ্বয়যুক্ত, ব্যঙ্গোক্তি।

[ক্রমশঃ।

পঞ্চাশ বছর আগে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আত্মজীবন-চরিত লিখতে ব'সছি না, তবে পঞ্চাশ বছর আগে যখন দশ বছর আন্দাজ বয়স ছিল, তখনকার দিনের জীবনের আব-হাওয়ার একটা ছবি দেবার চেষ্টা ক'রবো। ১৯০১ সালের কথা, তখন ক'লকাতায় ইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার ছয় বছর আগেকার ক্লাস। আজকালকার হিসেব মত পঞ্চম শ্রেণী। তখন ক'লকাতা শহরের চেহারা ছিল একেবারে অন্য রকমের, আর জীবন-যাত্রার পদ্ধতিও ছিল আলাদা।

তিন পুরুষে ক'লকাতার বাসিন্দে আমরা—অর্থাৎ আমি। ঠাকুরদাদার বাবা, প্রপিতামহ ভৈরব চাটুজ্যে, মহাকুলীন ছিলেন। তিনি নাকি ফরিদপুর জেলার পাংশা গ্রাম থেকে এসে হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের কাছে সিংটি-শিবপুর গ্রামে বাস করেন। তাঁর নাকি ষাটটা বিবাহ ছিল। অন্ততঃ ছেলে বয়সে ঠাকুরমার মুখে সে কথা শুনেছি। কোনও কারণে ঠাকুরদাদার উপর ঠাকুরমা চ'টে গেলে তাঁকে গঞ্জনা দিতেন, তোমরা ত ষাটের বংশ, স্ত্রীর দুঃখ, ভাত-কাপড়ের কথা চিন্তা করা তোমাদের ধাতে লেখে না। ঠাকুরদাদা আপত্তি ক'রতেন—দৃঢ় ভাবে ব'লতেন, না, অতগুলি নয়, ৪।৫টা মাত্র বিয়ে ছিল, কিন্তু মনে হ'ত, যেন তাঁর আপত্তি তেমন জোরের হ'ত না। (বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহকারী কুলীনদের একটা তালিকা দিয়েছিলেন, তাতে কিন্তু ভৈরব চট্টর নাম নেই।) ঠাকুরদাদা মামার বাড়ীতেই দুঃখে-কষ্টে মানুষ হ'য়েছিলেন। সিংটি-শিবপুরে আমাদের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি কয়েক ঘর ছিলেন। "দেশ" ব'ললে, শিশুকালে এই সিংটি-শিবপুর গ্রামকেই বুঝতুম, কারণ ঠাকুরদাদা সেখান থেকেই ক'লকাতায় এসে বসবাস করেন। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে একবার এই "দেশ" দেখবার সুযোগ আমার হ'য়েছিল। ১৯০৯ সালের কথা। আমার এক মেসোমশাই ছিলেন, এক দিকে মেসোমশাই আবার অন্য দিকে জ্ঞাতি। সিংটি-শিবপুরে তাঁরও বাড়ী ছিল। তিনি ঘটা ক'রে কালীপুজো ক'রতেন। "দেশ" দেখতে তাঁর সঙ্গে একবার কালীপুজোয় আমি যাই। গ্রামে আমাদের নিজেদের কিছুই আর নেই—আমি গিয়েছিলুম মেসোমশাইয়ের বাড়ীতে। সেখানে কিন্তু আমার পরিচয় দিতে হ'ল গাঁয়ের ভদ্র-সজ্জনদের কাছে, "বাঙালদের বাড়ীর ছেলে" বলে। কথাটা আমার কাছে বড় কৌতুককর লেগেছিল—কলকাতার আর পাঁচ-জন ছেলের মত পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা ক'রেছি, আর আমিই হ'লুম নিজের দেশে "বাঙালদের বাড়ীর ছেলে"। আত্মীয়-কুটুম্বদের মধ্যে কারো কারো কথায় পূর্ববঙ্গের টান শুনতুম। ছেলে বয়েসেই আবছা-আবছা মনে হ'ত, সারা বাংলা জুড়েই আমাদের স্থান। পূর্ব্ব বঙ্গ আর পশ্চিম বঙ্গ সর্ব্বত্রই আমাদের ঘর।

ঠাকুরদাদার ছেলেবেলার বা যৌবনকালের ইতিহাস জানি না। তবে তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি ফারসী প'ড়েছিলেন আগে, পরে ইংরিজী। "গোলেস্তান," "পন্দনামা" প্রভৃতি ফারসীর বিখ্যাত বই থেকে বয়েৎ বা শ্লোক আউড়ে তিনি আমাদের শোনাতেন। আরবী বয়েৎও দু'চারটে জানতেন, তার ঝঙ্কার এখনও যেন কানের মধ্যে শুনতে পাই। "করীমা ব-বখ্শায়ে বর্ হাল-ই-মা" আর "ইন্না ইসল্ ইন্সানা তাগুল্ রসানাহু" প্রভৃতি। পরবর্ত্তী কালে প্রথম ফার্সী বয়েৎটা যে মহাকবি সা'দীর পন্দনামা'র প্রথম শ্লোকের আরম্ভ তা জেনেছি; দ্বিতীয়, আরবী ছত্রটী, যার একটা বিকৃত রূপ এখনও এইভাবে মনে আছে, সেটার মূল পাইনি।

ঠাকুরদাদা তখনকার দিনের বাঙালীর পক্ষে বোধ হয় নিজের চেষ্টায় ভালো ইংরিজীই শিখেছিলেন। তাঁর নিজের কতকগুলি ইংরিজী আর বাঙ্লা বই ছিল। ইস্কুলে প'ড়তে প'ড়তে সেই বইগুলি আমরা নাড়া-চাড়া ক'রতুম। বইগুলির মধ্যে ক্ষুদে' ক্ষুদে' কাঠ-খোদা ছবিতে ভরা একখানি "আরেবিয়ান নাইট্স্ এণ্টারটেইনমেণ্ট" ছিল—আরব্য-রজনীর অমর রোমান্সের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'য়েছিল এই বইয়ের মারফৎ। সব বুঝতে পারতুম না, কিন্তু প'ড়ে যেতুম। আর ছিল একখানি ইংরেজ কবি গোল্ডস্মিথের গ্রন্থাবলী। তা থেকে পরবর্ত্তী কালে গোল্ডস্মিথের নাটক আর গদ্য রচনা প'ড়েছিলুম। অন্য ইংরিজী বইয়ের কথা এখন তেমন মনে আস্‌ছে না—হয় তো একটু ভেবে দেখলে স্মৃতি ফিরে আসতে পারে। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" তাঁর সংগ্রহের মধ্যে একখানি ছিল, আর একখানি মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্য।" ইস্কুলের ছাত্র অবস্থায় এগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। আর ছিল, একখানি সংস্কৃত "হিতোপদেশ"—১৮৪০ সালের দিকে ছাপা, মোটা বাঙলা হরফে মূল সংস্কৃত, তার তলায় ছোট হরফে বাঙলা অনুবাদ। এখানিও খুব ছোটো বয়সে প'ড়ে ফেলেছিলুম। ঠাকুরদাদা বই পেলেই প'ড়তেন, কি ইংরিজী কি বাঙ্লা। তিনি "জন্মভূমি" পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। এই পত্রিকা আমরাও প'ড়তুম, বাড়ীতে আ-বাঁধা এর অনেকগুলি সংখ্যা ঠাকুরদাদার আলমারীতে ছিল। খুব ভাল লাগ্‌ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক রচনা "আমার জীবন"—যাতে অতি চমৎকার ভাষায় লেখক উত্তর ভারতে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা ক'রেছেন। বইয়ের সখ বাবারও ছিল, ঠাকুরদাদার পড়বার জন্য এবং নিজের পড়বার জন্য তিনি সুযোগ পেলেই বই কিনতেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত বাবা বিরাট্ তিন খণ্ডে এক সেট কিনেছিলেন, সে বই ঠাকুরদাদা প'ড়তেন, আমিও মাঝে মাঝে তার পাতা উল্‌টোতুম।

শুনেছি, ঠাকুরদাদা সিপাহী বিদ্রোহের সময় পশ্চিমে ছিলেন। ফিরে আসেন সঙ্গে নাকি অনেক টাকা নিয়ে। সে-সব ইতিহাস কিছুই জানি না। তিনি ভীষণ খরচে' লোক ছিলেন। লোক-জনকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন। সব টাকা তিনি যখন প্রায় শেষ ক'রে দেন, তখন ক'লকাতায় এক সওদাগরী আপিসে কাজ নেন। বোধ হয় ইংগ্লিস্ কোম্পানীর "হৌস"-এ। ঠাকুরমার

চেষ্টায় ক'লকাতার বাগবাজার-শিমুলিয়া বা বাঁ'র-শিমলে অঞ্চলে চালতাবাগান পল্লীতে তিন কাঠা জমিতে দু'টো কোঠাঘর আর তার সামনে খোলার চালের একটু দালান আর খোলার চালের রান্না-ঘর তৈরী করেন। এই বাড়ী আমাদের পৈত্রিক ভিটা—আগেকার ৬৪ সংখ্যক সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট, এখনকার ৩ সংখ্যক সুকিয়াস্ রো। ঠাকুরদাদা খুব দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিলেন, বিশেষ সুপুরুষ, বোধ হয় ছয় ফিট লম্বা ছিলেন, আর তেমনি গৌরবর্ণ, আর টিকোলো নাক। ঠাকুরমাও বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে বেশ লম্বা ও গৌরী ছিলেন।

আমার পিতার পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। বৃদ্ধ বয়সে ঠাকুরদাদার চোখে ছানি পড়ে। লেখাপড়ার কাজে কিছু কাল তিনি অক্ষম হ'য়ে পড়েন। সেই জন্য তাঁর চাকরী যায়। সেকেলে গ্রাম্য নাপিতকে দিয়ে তিনি চোখ অস্ত্র করান—তখন অজ্ঞান ক'রে বা চোখে ওষুধ দিয়ে ছানি কাটা হ'ত না। দু'জন লোক রোগীর হাত ধ'রে থাকত, আর কতকটা জোর কোরে রোগীর জ্ঞানতঃ চোখে অস্ত্র দেওয়া হ'ত। এতেও তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। পরে তিনি আবার চাকরীর চেষ্টা করেন, দরখাস্ত লিখে এ-আফিস সে-আফিস ঘুরে বেড়ান। বাবার বোধ হয় তখন মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনে। তিনি ভীষণ রাগারাগি ক'রতেন, তিনি নিজে উপায় ক'রতে বুড়ো বয়সে ঠাকুরদাদা যে চাকরী ক'রতে যাবেন, সেটা তাঁর পছন্দ ছিল না। বাবা যা মাইনে পেতেন, ঠাকুরমার হাতে এনে দিতেন, আর তাতে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, শাশুড়ী-বউয়ে সংসার চালাতেন। বাবার কোন ভাই ছিল না, ছয় বোনের একমাত্র ভাই ছিলেন তিনি। তিন বোন শিশু কালেই গত হন। আর তিন-জনের বিবাহ হয়, সন্তানাদি ছিল।

ঠাকুরদাদা আমাদের ছেলেবেলায় ইংরিজী পড়াতেন, সকালে। তাঁকেও মাঝে-মাঝে ইংরিজী বই বা কাগজ প'ড়ে আমাদের শোনাতে হ'ত। তিনি চাকরী করতেন না, কিন্তু ঘর-গৃহস্থালীর সব কিছু দেখতেন। আটটার মধ্যে ভাত খেয়ে বাবাকে অফিস যেতে হ'ত, আর তিনি ফিরতেন সন্ধ্যায়। সুতরাং বেশীর ভাগ আমরা ঠাকুরদাদারই সঙ্গ পেতুম। সকাল বেলা ঠাকুরমা আর মা, বাবার জন্য ভাত-তরকারী ক'রে দিতেন। দুপুর বেলার জলখাবার ক'রে দিতেন—লুচি, আলু বেগুন বা পটল ভাজা, মোহনভোগ—একটা টিনের কৌটো ক'রে বাবা নিয়ে যেতেন। একটা বিষয়ে ঠাকুরদাদা আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষায় সহায়ক হ'য়েছিলেন। তাঁর নিজের শরীর সাধারণতঃ খুবই ভালো থাকত। বাবা ছেলে-বেলায় কুস্তি ক'রতেন আর গায়ের জোরের জন্যে আর খাইয়ে ব'লে পাড়ায় তাঁর নাম ছিল। ঠাকুরদাদা সারা মাসের জন্য "মাসকাবারীর বাজার" ক'রতেন—আমাদের ছোট সংসারে সারা মাসের জন্য চা'ল, দা'ল, ঘি, তেল, মসলা, গুড়, চিনি প্রভৃতি কিনে আনা হ'ত। বাড়ীতে একটা ব্যবস্থা তিনি করেন—আর কিছু জুটুক আর না জুটুক, ছেলেদের ভাতের সঙ্গে এক খামচা ক'রে ঘি খেতে হবে। আট সের কি দশ সের ঘি প্রতি মাসেই আসত। তখন ঘিয়ের মণ ছিল ৩০ টাকার উপরে নয়। চন্দ্রকোণার মট্টকি বা হাথরাসের আমদানী টিনের ঘি—সেই সুরভি কাঁচা ভয়সা ঘি এখন দুর্লভ বস্তু। গরম ভাত, ঠাকুরমার হাতের রান্না বিউলির ডাল কিংবা সোনামুগের ডাল, বেশ বড়ো এক খামচা সুগন্ধি দানাদার ভয়সা ঘি, আর আলু ভাজা—যে তৃপ্তির সঙ্গে খেতুম তা এখনও মনে আছে। এই সারা শিশু কাল, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে এই ঘিটুকু বোধ হয় শরীর বাঁধতে খুব কাজ ক'রেছিল। উত্তর কালে কিছু কিছু শারীরিক ব্যায়াম করার অভ্যাসও হ'য়েছিল। এই দুইয়ে মিলে, মোটের উপর সারা জীবন স্বাস্থ্যটা বেশ ভালোই রেখেছে, এখনও এই ষাট বছর বয়সে শরীরে যে ধকল সয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেভাবে কাজ ক'রে যেতে পারি, তা দেখে আমার চেয়ে কমবয়সী অনেকের হিংসা হয়।

ঠাকুরদাদা ১১০৬ সালে ৮১ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন, অল্প কয়দিনের অসুখে। শেষের দিকে তাঁর ভীমরথী হ'য়েছিল, কিন্তু দেহের শক্তি অটুট ছিল। দাঁত কয়টা তাঁর সব গিয়েছিল, কিন্তু মাড়ী দিয়ে ছোলা-ভাজা চিবিয়ে খেতেন দেখেছি। আমাদের বংশ মোটের উপর বেশ দীর্ঘজীবী। ঠাকুরমা দেহরক্ষা করেন ৯১ বছর বয়সে। বাবা মারা যান ৮৪ বছর বয়সে। আর সেদিন ছোটো পিসীমা (অধ্যাপক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের মাতা) ৯৪ কি ৯৫ বছর বয়সে মারা যান—শেষ পর্যন্ত তাঁর চোখের দৃষ্টি আর জ্ঞানগোচর অক্ষুণ্ণ ছিল।

ছেলেবেলায় সব চেয়ে আগেকার কথা আমার যা মনে আছে তা হ'চ্ছে বোধ হয় আমার চার বছর বয়সের কথা, কি তারও আগেকার হ'তে পারে। বেশ মনে আছে, আমার পায়ে তখন রূপোর মল ছিল; মা চোখে কাজল পরিয়ে দিতেন; মাথার চুল লম্বা ছিল, চুলের বিনুনী ক'রে তাতে একটা সোনার পুঁটে বেঁধে দেওয়া হ'ত সব চেয়ে পুরানো স্মৃতি হ'চ্ছে মায়ের মুখের গান—

"রাঙা পায়ে রাঙা জবা কে দিলে মা মুঠো মুঠো,
সাধ হ'য়েছে, দে না মা পরিয়ে দুটো—
ঘুরে ফিরে নাচ্‌বো আমি, দেখে তুই মা হাস্‌বি কতো।"

মায়ের মুখে শুনে শুনে শিশুর কণ্ঠে এই গান আমিও গাইতুম। মায়ের মুখের সরল সুর আর তার স্বাভাবিক উচ্চারণ এখনও যেন কানে বাজছে। এই গান আধুনিক এক জন বড়ো গাইয়ে অনেক আসরেও গেয়েছেন এবং গেয়েও থাকেন, এবং তার রেকর্ডও হ'য়েছে। এই আধুনিক গানে অনেক কর্‌তব্‌ আছে। উচ্চারণের আড়ষ্টতা একটু কানে লাগে, কিন্তু যখনই এই গানের রেকর্ড শুনি, তখনই সেই অতি শিশুকালে শোনা মায়ের মুখের সুরের আর কথার জন্য প্রাণের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা আবার জেগে উঠে।

তার পরের স্মৃতি হ'চ্ছে, কি একটা কঠিন অসুখে আমায় প্রায় ছয় মাস শয্যাশায়ী হ'য়ে থাকতে হয়। এই অসুখটার একটা মস্ত বড় ডাক্তারী লাটিন নাম শুনেছিলুম। সে নাম মনে নেই। কতকটা পক্ষাঘাতের পর্য্যায়ের অসুখ। আমাদের বাড়ীর চিকিৎসা ক'রতেন সেকালের এক প্রবীণ ডাক্তার বাবু। বেশ মনে আছে, ঠনঠনের কালীবাড়ীর পশ্চিমে তাঁর বাড়ী ছিল। সপ্তাহে বোধ হয় দু'দিন, তিন দিন তিনি আসতেন। লম্বা, পাতলা চেহারার লোকটী, চোখে চশমা, গোঁফ ছিল, পায়ে হেঁটেই আসতেন,—তাঁর ভিজিট ছিল দু টাকা, বোধ হয় আমাদের কাছে এক টাকা নিতেন—মনে হ'ত বড্ড বেশী চেঁচিয়ে কথা কন। বাইরে এসে তিনি মাম ধ'রে

ভারতে শৈল্পিক লিথোগ্রাফি

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

(অধ্যক্ষ, গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস, কলিকাতা)

ভারতে এখনো শৈল্পিক লিথোগ্রাফিকে রেখা-শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মূল (original) প্রিণ্ট সংগ্রহের সখ অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এরূপ নমুনা সংগ্রহের প্রকৃত আগ্রহ না থাকলে বিভিন্ন রেখা-শিল্পের মারফৎ শিল্প-সৃষ্টির বিকাশ হতে পারে না। শিল্প কলার নিদর্শন সংগ্রহে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা প্রায়ই আমাদের বলে থাকেন যে, তাঁরা কালীতে আঁকা ছবি পছন্দ করেন না, তাঁরা চান নানা বর্ণে সুশোভিত চিত্র। চিত্রের উচ্চ মূল্যের জন্য তাঁরা মধ্যে মধ্যে বিরক্তি প্রকাশ করে থাকেন এবং এরূপ মন্তব্য করে থাকেন যে, চিত্রশিল্পীরা কেবল ধনী ব্যক্তিদের কাছেই তাঁদের ছবি বিক্রয় করতে চান। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, কম দামে অনেক ভাল ছবি পাওয়া যায়। যদি অন্ততঃ কুড়ি থেকে ত্রিশখানি ভাল মূল প্রিণ্ট বিক্রয় হয়, তাহলে মূল প্রিণ্ট অনেক কম দামে পাওয়া যেতে পারে। নইলে প্রচুর পরিশ্রমে একখানি প্লেট বা পাথর তৈরী করে তা প্রিণ্ট করা শিল্পীর পক্ষে নিরর্থক হয়ে পড়ে। কম দামে ভাল রঙ্গীন প্রিণ্টের চাহিদা হলে লিথোগ্রাফ প্রিণ্টের সাহায্য লওয়া উচিত। এগুলি সাধারণতঃ পাথরের উপর করা হয়। রঙ্গীন লিথো পেন্সিল ও কালী দিয়ে শিল্পীরা এই ছবি তৈরী করেন। শিল্পীর তত্ত্বাবধানে সতর্কতার সঙ্গে প্রিণ্ট করা হলে ছবিগুলি ঠিক পেন্সিল স্কেচের মতই হয়। সযত্ন পরীক্ষার পর অল্প কয়েকখানি প্রিণ্ট রেখে দিয়ে বাকীগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়। শিল্পী প্রত্যেকখানি প্রিণ্টের উপর স্বাক্ষর করেন ও তার নম্বর দেন। রঙ্গীন লিথোগ্রাফের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পাথর ব্যবহার করা হয়।

ভারতীয় লিথোগ্রাফ এখনো জনপ্রিয় হয়ে না উঠলেও এমন পর্য্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, উৎকৃষ্ট প্রিণ্টের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রাচ্য কলার পুনরুদ্ধার আন্দোলনের সময় অর্থাৎ ত্রিশ বছরেরও অধিক কাল আগে প্রিণ্ট তৈরীর কাজ সুরু হয়। শিল্পীরা নিজেরাই মোনোক্রোম ও রঙ্গীন মূল প্রিণ্ট তৈরী করতেন। প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু ও অন্যান্যের তৈরী প্রিণ্ট দেখতে পাওয়া যেত। পরে যামিনী রায় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য লিথোগ্রাফ সৃষ্টি করেন। আমার মনে পড়ে, সুরেন করও কয়েকখানি রঙ্গীন লিথোগ্রাফ তৈরী করেন। এগুলি খুব উঁচু দরের প্রিণ্ট এবং তিনি নিজে শান্তিনিকেতনে এগুলি প্রিণ্ট করেন। সেই সময় (১৯২২-২৩) আমি তাঁর এক জন সহকারী ছিলাম। আমরা এক সঙ্গে বহু প্রিণ্ট তৈরী করেছি। দুঃখের বিষয়, প্রিণ্টগুলি সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোন শিল্পানুরাগীও এগুলি রক্ষা করার জন্য যত্ন নেননি। তরুণ বয়সে আমরা বন্ধুদের প্রিণ্ট উপহার দিতাম, কারণ তখন পয়সা দিয়ে প্রিণ্ট কেনার কথা কেউ ভাবতেও পারতো না। মধ্যে মধ্যে আমরা মাসিকপত্রে ছাপাবার জন্য প্রিণ্ট পাঠাতাম। কিন্তু তখনকার দিনে সম্পাদকরা হাফটোন ছাড়া অন্য ছবির কোন মূল্য দিতেন না। তাঁদের কাছ থেকে প্রিণ্টগুলিও ফেরত পাওয়া যেত না।

লিথোগ্রাফির জন্য আমরা কখনও কোন দক্ষিণা পাই না, ফলে এই শিল্পটি অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদনের উপাদানে পরিণত হয়েছে। শিল্পীরা পর্য্যন্ত জানেন না যে, এই শিল্পকে যদি তাঁরা জীবিকা অর্জ্জনের পথ বলে গণ্য করেন, তাহলে এই শিল্প কত দূর সাফল্য অর্জ্জন করা যেতে পারে। আমি আজ সাহসের সঙ্গে বলতে পারি, আমাদের মধ্যে এমন কয়েক জন শিল্পী ও তরুণ ছাত্র আছেন, যাঁরা প্রকৃতই ভাল লিথোগ্রাফ সৃষ্টি করতে পারেন এবং সৃষ্টি করেছেন—যার তুলনা অপর দেশের বিশেষজ্ঞদের সৃষ্টির সঙ্গে করা যেতে পারে। এটা হয়তো না মেনে নেওয়া হতে পারে, কারণ আমরা মূল প্রিণ্টের জন্য কোন যত্ন লই না, এ বিষয়ে আমাদের ভাষায় লেখা কোন সাহিত্যও নেই এবং প্রিণ্টগুলি সংগ্রহ করেও রাখা হয়নি।

১৯৪৬-৪৭ সালে আমি যখন প্যারিস ও লণ্ডনে যাই, তখন আধুনিক ভারতীয় চিত্রাবলীর সঙ্গে কতকগুলি রেখা-চিত্রও নিয়ে গিয়েছিলাম। তার মধ্যে বোম্বাই, শান্তিনিকেতন, কলিকাতা ও দিল্লীর কতকগুলি মনোরম লিথোগ্রাফ ছিল। বহু দর্শক এবং কতিপয় বিখ্যাত শিল্পী আমাদের প্রিণ্টগুলির প্রশংসা করেন এবং লিথোগ্রাফিতে ভারতীয় শিল্পীদের দক্ষতায় বিস্ময় প্রকাশ করেন।

গত ত্রিশ বছরের মধ্যে যে সব ভাল লিথোগ্রাফ তৈরী হয়েছে, সেগুলি যদি কেউ কষ্ট স্বীকার করে সংগ্রহ করেন, তাহলে সেগুলি এ বিষয়ে একখানা ভাল প্রামাণ্য পুস্তকের উপকরণ হবে এবং প্রত্যেক দেশে তার আদর হবে।

আমাদের সমালোচকরা এবং জনসাধারণ এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেন যে, শিল্পের নিদর্শনগুলি অল্প মূল্যে পাওয়া দরকার। কিন্তু ভাল প্রিণ্টের দাম যদি কম করা হয়, তাহলে তার প্রতি কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। শিল্পানুরাগী কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখেছি যে, এই শিল্প উপলব্ধি করার মত চোখ তাদের নেই আর প্রিণ্ট কিনে তাঁরা পয়সা নষ্ট করতে চান না। সেই জন্য এখন এই ধরণের রেখা-শিল্পের প্রচারকার্য্য একটু বেশী করে চালান দরকার।

শৈল্পিক লিথোগ্রাফ ঠিক মূল চিত্র বা স্কেচের মতই সুন্দর। এই জন্য প্রিণ্টগুলিকে মূল প্রিণ্ট বলা হয়। আমাদের সাধারণ বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলি খুব অল্প দামে এই সব মূল প্রিণ্ট দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান, পাবলিক হল, লাইব্রেরী এবং বাড়ীর বৈঠকখানায় যদি কয়েকখানা ভাল প্রিণ্ট সুদৃশ্য ভাবে টাঙ্গিয়ে রাখা যায়, তবে তা দেখতে বেশ ভালই লাগবে। এতে সংস্কৃতি, মর্য্যাদা ও মার্জ্জিত রুচি প্রকাশ পাবে এবং আমাদের স্নায়ুর পক্ষে আরামদায়ক হবে।

ঠাকুরদাকে ডাকতেন, "ঈশ্বরবাবু!", আর আমি তাঁর আসার খবর পেতুম। তাঁকে বড্ড ভয় ক'রতুম, একটু সংযত হ'য়ে থাকতুম। এই ডাক্তার বাবুর মস্ত বড় এক ঘড়ী ছিল আর একটা মোটা সোনার চেন। এই চেনশুদ্ধ ঘড়ীটা আমাকে আকৃষ্ট ক'রত। সারাক্ষণ শুয়ে শুয়ে টিনের তৈরী ঘোড়া আর গাড়ী নিয়ে আমার দিন কাট্‌ত। শুনেছি, এই অসুখের ফলে একটা অঙ্গহানি হবেই। আমার চোখের দৃষ্টিক্ষীণতা—মাইওপিয়া—এই অসুখের অন্যতম ফল। এই দৃষ্টিক্ষীণতা আমার পূর্ব্বে বাড়ীতে কারও ছিল না।

ভাত —তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
(প্রথম পুরস্কার)

বিস্ময় —সুধীন্দ্রকুমার আঢ্য (কলিকাতা)

আনন্দ —দেবপ্রসাদ সরকার (বালি)

শীতের বেলায় —সত্যব্রত রায় (কলিকাতা)

মা ও শিশু

(দ্বিতীয় পুরস্কার)

—তামল দত্ত (কলিকাতা)

স্ফূর্ত্তি —বিজনকুমার মিত্র (কলিকাতা)

তন্ময় —শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

অবাক —লবকুমার বোস (কলিকাতা)

বিজ্ঞ অজয় বোস (কলিকাতা)

বিহ্বল (তৃতীয় পুরস্কার) —পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা)

—আগামী সংখ্যার প্রতিযোগিতা—

বিষয়

বিখ্যাত মূর্ত্তি

প্রথম পুরস্কার—১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার—১০৲

তৃতীয় পুরস্কার—৫৲

মাতৃস্নেহ —দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)

—প্রচ্ছদপট—

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হ'ল। তিনি সম্প্রতি বেলুড় মঠে মহাসমাধি লাভ ক'রেছেন।

রচনা প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে

রচনা প্রতিযোগিতায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লেখা না পাওয়ায় কা'কেও পুরস্কার দেওয়া হ'ল না। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান এবং আগামী কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হ'বে। এই সংখ্যায় শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব (শান্তিনিকেতন), শ্রীচিরন্তন মুখোপাধ্যায় (ভাগলপুর) এবং শ্রীপ্রভাত বসু (কলিকাতা) প্রভৃতির রচনাগুলি প্রকাশিত হ'ল।

প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ

(আলোচনা)

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর (শান্তিনিকেতন)

["প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ" বিষয়ের লেখাটি ধারাবাহিক কয়েক সংখ্যায় মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে যে-আন্দোলন চলতে থাকে এই আলোচনা তারই ব্যাখ্যা। লেখক যে-সকল পত্র পেয়েছেন তাদেরই জওয়াব আছে এই লেখাটিতে। রবীন্দ্রনাথের আত্ম-জীবনের উদ্‌ঘাটিত নতুন তথ্যে সম্বলিত। কবিগুরুর কয়েকটি আদৌ অপ্রকাশিত চিঠিও লেখাটির অন্যতম সম্পদ।—স]

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু তথ্য-সম্বলিত একটি রচনা লিখেছিলাম। 'মাসিক বসুমতী'তে তার তিন কিস্তি প'ড়ে, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মলুটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন "……'প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ' অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়ছি……একটি বিষয় জানাবার আছে—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, অধুনা জামসেদপুর-নিবাসী শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বর্গত পিতৃদেব নলহাটি-নিবাসী ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম এই প্রবন্ধের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমেও কেন উল্লিখিত হয়নি—কারণ বুঝলাম না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঘোর বাবুকে শান্তিনিকেতনের তত্ত্বাবধায়ক ও আচার্য-পদে নিযুক্ত করেন। তখন সেখানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারে অঘোর বাবু 'মেয়েলি ব্রতকথা' নামক পুস্তক প্রকাশিত করেন। এবং ইনি নানা বিষয়ে শান্তিনিকেতন তথা কবির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।……" রচনাটি তখনো ক্রমশঃ-প্রকাশ্য ছিল। পরবর্তী অংশে গত ফাল্গুন-সংখ্যাতেই অঘোরনাথ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই পিতা-পুত্রের লেখা 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' নামক বহু তথ্যপূর্ণ নব প্রকাশিত পুস্তকের কথাও বলা হয়েছে। পত্র পাওয়ার পূর্বেই, এ সম্পর্কে জ্ঞান বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তার ফলে গুরুদেবের সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে আরো কিছু আমাদের জানবার সুযোগ হয়। তাঁর পিতার লিখিত পুস্তক ও জ্ঞান বাবুকে লেখা গুরুদেবের হাতের কয়েকখানি পত্র ইতোমধ্যে দেখতে পাই। অতঃপর এই বর্তমান রচনা 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে' হস্তক্ষেপ করি। জ্ঞান বাবুর নিকট হতে শোনা অনেক তথ্যও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্যে অনুরাগের কথা সকলেই জানেন। সহজ, স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে সাধারণের আনন্দ-বেদনার সজীব অনুভূতি যেখানে শতধারায় প্রবাহিত, যার মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য ও সমাজ-ব্যবস্থার নানা তথ্য ও রসমাধুর্য নিত্য লীলায়িত, সেই ছড়া, কিংবদন্তী, কবিসংগীত, পাঁচালি ইত্যাদি নিয়ে এককালে কবি যথেষ্ট কাজ করেছেন। সেগুলি সংগ্রহ ক'রে সম্পাদনা ক'রে প্রবন্ধ ও ক্রমে গ্রন্থাকারে প্রকাশ ক'রে সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে সেগুলিকে রক্ষা করেছেন, এবং সরস ও সুগভীর ব্যাখ্যার নব নব আলোকপাতে তাদের প্রতি সর্বলোকের আগ্রহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন,—এ সব কাজেরই সাক্ষ্য বহন করে তাঁর সুবিখ্যাত 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থ। কিন্তু সে গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তাঁর একার অধ্যবসায়ের ফল। তিনি সারস্বত সম্মেলনে, ছাত্রসম্মেলনে, দেশের সাহিত্য পরিষদে, সভাসমিতি নানা স্থলেই সাধারণকে, বিশেষ ভাবে ছাত্র ও যুবকদের, এ কাজে অগ্রসর হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন ;—তিনি অন্য লোককেও এ কাজে উৎসাহিত ক'রে ব্রতী করেছিলেন এবং তা থেকেও অনেকটা কাজ হয়েছিল ; প্রসিদ্ধ সাহিত্যাচার্য দীনেশ সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনার উপলক্ষে কবির পত্রাদি ও সমালোচনা সাহিত্যিকদের কাছে সুবিদিত আছে। তা থেকে সেই কালে "বঙ্গসাহিত্যের রাজার অভিনন্দন সেই রাজ্যে নূতন প্রবেশার্থীর পক্ষে কত আদর সম্মানের, তাহা সহজেই অনুমান" করতে পারি। তাঁর পরিচিত অনেক ব্যক্তি তাঁর উৎসাহ পেয়ে লোকসাহিত্যের সেবায় অগ্রসর হয়েছিলেন,—তাঁদের এক জন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পত্রলেখক ঠিকই বলেছেন। অঘোরনাথ ব্যাপক ভাবে সাহিত্যচর্চা করতেন। পত্রলেখক 'মেয়েলি ব্রতকথা' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থখানির নাম 'মেয়েলি ব্রত'। আর, শুধু 'রবীন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারে নয়', রবীন্দ্রনাথের লিখিত একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকার সন্নিবেশ নিয়েও, পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়, ১৩০৩ সালে। বইখানির এক খণ্ড মাত্র জ্ঞান বাবুর সংগ্রহে রক্ষিত আছে। ভূমিকাপত্রখানি স্খলিত ও এমন জীর্ণ যে, তা অচিরেই চূর্ণ হয়ে যাবে। কবির রচনাটুকুরও সে সঙ্গে চির-অন্তর্ধান হবার সম্ভাবনা থাকায়, সেটুকু নিয়ে উদ্ধার করে রাখা গেল :

ভূমিকা

সাধনা পত্রিকা সম্পাদন কালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত, সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোর বাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য বর্তমান কালে বঙ্গ-সমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।

বালকদিগের এমন একটি বয়স আসে যখন তাহারা বাল্যসম্পর্কীয় সকল প্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, অথচ পরিণত বয়সোচিত কার্য সকলও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাহারা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে কোন সূত্রে কেহ তাহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গসমাজের গম্ভীর-সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গদেশ-প্রচলিত সর্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যাইবেন, এমন কোন লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই, পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা জা

যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন আমার কোন প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ব বশতঃ আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরাদের কোমল-হৃদয় পালিত মধুর কণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ী ভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোর বাবুকে এই সমস্ত মেয়েলি ব্রত গ্রন্থ আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সেজন্য গম্ভীরপ্রকৃতি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং সেই সঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, এই সকল সংগ্রহের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোন প্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, এমনও মনে করি না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি বঙ্গদেশের জনসাধারণ প্রচলিত পার্বণগুলির উজ্জ্বল ও সুন্দর চিত্র সাধনায় প্রকাশ করিয়া সাধনা সম্পাদকের প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন। সে চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী ভাবে রক্ষা করিবার যোগ্য এবং আশা করি দীনেন্দ্রকুমার বাবু সেগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

কার্সিয়াং
৭ই কার্ত্তিক
১৩০৩। } শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অঘোরনাথের লেখা আরো বই আছে। সমসাময়িক সাহিত্যে এবং সাহিত্যিকদের দ্বারা সেগুলি সমাদৃত হয়েছিল। অঘোরনাথ সাহিত্য ও ধর্ম-অনুরাগে বৈষ্ণব সাধনা ও সাধকদের জীবনী নিয়ে সশ্রদ্ধ সরস সুনিপুণ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকেও তার জন্য সাধুবাদ এসেছিল। ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সাধনা'তে 'ভক্তচরিতামৃত' গ্রন্থের সমালোচনায় কবি লিখেছেন: "সমালোচ্য গ্রন্থে অঘোর বাবু ভক্তচরিত্র অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ভক্তিতত্ত্ব ভক্তের জীবনীর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলে পাঠকের নিকট উভয়ই সজীব হইয়া উঠে। শুষ্ক শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই তত্ত্বের গভীরতা, মাধুর্য্য—মানব-জীবনের মধ্যে তাহার পরিণতি, অনুভব করিতে গেলে ভক্তচরিত্রের মধ্য হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেখিতে হয়, অতএব বৈষ্ণবধর্মের সুগভীরতত্ত্ব সকল যাঁহারা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অঘোর বাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।" অঘোরনাথ প্রচলিত অর্থে উচ্চশিক্ষা বলতে যা বোঝায় তার সুযোগ পান নাই। তাঁর সাংসারিক অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল না। তবু দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁর সাহিত্য-সাধনা আশ্চর্যরূপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল। তাঁর প্রতিভার সম্মান তিনি দিয়েছেন। কবির উপদেশ তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। 'মেয়েলি ব্রত' ছাড়াও নানা গ্রন্থ রচনাতেও সে-উৎসাহের যোগ যে অব্যাহত ছিল, এই পুস্তক সমালোচনাই তার আভাস দান করে। 'মেয়েলি ব্রত' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় অঘোরনাথ লিখেছেন ;—

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিপ্রায় ও উপদেশ অনুসারে এই গ্রন্থোল্লিখিত মেয়েলি ব্রতের বিবরণগুলির অধিকাংশই ইতঃপূর্ব্বে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারই উপদেশ মত ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থের ভূমিকাটি লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

"এস্থলে বলা আবশ্যক, হুগলি, বর্দ্ধমান ও বীরভূম প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গ-প্রচলিত কয়েকটি মেয়েলি ব্রতের বিবরণ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল। স্থানভেদে এই সমস্ত ব্রতের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও ছড়ার কিছু কিছু রূপান্তর ও পাঠান্তর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।"

অঘোরনাথের 'পরম শ্রদ্ধাস্পদ' ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু বিদ্যালয় এসেছে তার অনেক পরে। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ কবি ও সাহিত্যিক ব'লেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তা'হলেও বিচক্ষণ লোক মাত্রেরই তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। তাঁকে 'গুরুদেব' এই শব্দটি দ্বারা কে প্রথম অভিহিত করেন, এ সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। শোনা যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এ সম্বোধনের প্রবর্ত্তক। শান্তিনিকেতনের অন্যতম প্রথম ছাত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে ব্রহ্মবান্ধবের কথাই বলেন। প্রসঙ্গত, শান্তিনিকেতনের প্রাচীন যুগের অধ্যাপক স্বর্গত কবি সতীশ রায়ের লিখিত একখানি পত্রের অংশ-বিশেষ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

শান্তিনিকেতন থেকে ১৩০৯ সনের ফাল্গুন (?)এ স্বর্গত অজিতকুমার চক্রবর্তীকে উদ্দেশ ক'রে সতীশ বাবু লিখেছেন: "রবি বাবু Porse-এ কলম ধরিয়াছেন এবার আমার বাঙ্গলার আর এক চমৎকার কবিত্ব-মন্দিরের সিংহদ্বার খুলিব (খুলিবে ?)। গুরুদেবের রচনা ঠিক প্রকৃতির মত। আমি এই প্রান্তর-পারে অদ্ভুত শালবনে বেড়াইয়া প্রকৃতির যে হৃদয়হর মুখ দেখিতে পাই উঁহার লেখার ভিতরেও তাহাই দেখিতে পাই। 'গুরুদেব' বলিয়াছি—কারণ কি জান ? এই দেখ চারিদিকের দুপুরের রৌদ্রে (রৌদ্র ?) নিঃশব্দে পড়িয়া আসিতেছে—এই সময়ের এমনি একটি করুণ দৃষ্টি আছে তাহা বুঝানো যায় না—এমনি একটি নরম দৃষ্টি ঐ সুদূর আকাশ হইতে আমাদের উপবনে আমাদের প্রাণের উপর চাঁপা ফুলের জ্যোতিঃ ফেলিয়াছে—মাঠের এক দিক হইতে বাতাস নামিয়া আরেক দিকে পালাইতেছে—যে এই সময়ে কেবলমাত্র গভীর অনুরাগগুলিই হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া থাকে—কত শালবন মনে পড়িতেছে—আর মনে পড়িতেছে অন্তর-বাহির-সুন্দর আমার ললাটের দেবতা রবিবাবুকে। সেই জন্য ইচ্ছা হইতেছে উঁহাকে নানা মধুর নামে জ্ঞাপিত করি। তাই ইটি উটি বলিয়া শেষে

'গুরুদেব' বলিলাম—কিন্তু উচ্ছ্বাস থাউক।"—(বিশ্বভারতী পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা পৃঃ ১৮৭—৮৮)।

অনুমান করা যেতে পারে, লিখিত ভাবে সতীশচন্দ্রই এই প্রথমে "গুরুদেব" আখ্যা ব্যবহার করেন। এর আগে কারো লেখাতে এই আখ্যা আর চোখে পড়ে না। কিন্তু যিনিই এ নামের প্রবর্তন করে থাকুন, একটি প্রিয় এবং যথাযোগ্য শব্দের সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন। কবি সকলের কাছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই "গুরুদেব", কিন্তু আধ্যাত্মিক দীক্ষাদাতার একটি বিশেষ পরিচয়ও যে তাঁর আছে, অঘোরনাথের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগেই তা উল্লিখিত হয়েছে। কবির কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত ক'রে জ্ঞানেন্দ্রনাথ কবিকে একখানি পত্র দেন। কবি তাতে যে উত্তর দেন, তার মধ্যে এক দিকে ফুটেছে তার স্নেহ, অপর দিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার পথে সমস্ত ভয় লজ্জা সংকোচ ঘুচাইয়া অগ্রসর হবার জন্য উদাত্ত আহ্বান। কবি লিখছেন:

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

আজ তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। অনেক দিন হইতে মনে মনে যে ধর্ম্মে তুমি বিশ্বাস পোষণ করিতেছ, সেই ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ যে তোমার কর্ত্তব্য, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। অন্তঃকরণে যদি সত্যের আবির্ভাব হয় তবে সর্ব্বপ্রকারেই তাহাকে স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। সমস্ত জীবনকে সত্যের অনুগত না করার মত এমন গ্লানি আর কিছুই নাই। তুমি নিজেকে তাহা হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে প্রস্তুত হইয়াছ, ইহাতে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। যিনি জগতের ধন মান খ্যাতি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে গোপন করিব কেন? বাতি যেমন তাহার আলোকশিখাকে সকলের ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরে এবং এইরূপে চারিদিককে আলোকিত করিতে থাকে, তেমনি করিয়াই আমরা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আবির্ভাবকে কোনো কারণেই প্রচ্ছন্ন না রাখিয়া তাঁহাকেই সকলের ঊর্দ্ধে প্রকাশ করিব এবং তাঁহার আলোক চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে থাকিব। আলো যখন ভালো করিয়া না ধরে তখনই ধোঁয়া বাহির হইয়া কালিমায় সমস্ত ঢাকিয়া ফেলে—আলো যখন ধরিয়া উঠে তখন সমস্ত ধোঁয়াকে নিরস্ত করিয়া দিয়া সমস্ত সংশয় সঙ্কোচকে কাটিয়া ফেলিয়া অকুন্ঠিত তেজে দীপ্যমান হইয়া প্রকাশিত হয়। তোমার জীবনের যে শ্রেষ্ঠ সত্য তাহাও তোমার জীবন-বর্ত্তিকার মুখে উজ্জ্বল ঊর্দ্ধশিখা হইয়া প্রকাশ পাক্। তাহার সমস্ত ভয় লজ্জা সঙ্কোচ এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যাওয়ার সঙ্গে তোমার অনন্ত জীবনের প্রভু তাঁহাকেই তোমার সম্মুখে সুস্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিক্—তোমার কর্ম্ম ও আকাঙ্ক্ষা সত্য হউক—সত্যের দ্বারা সম্পূর্ণ হউক এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।

আমার যদি দান করিবার মত কোন সম্বল থাকে তবে তুমি আমার কাছে আসিলে তাহা লাভ করিবে। ইতি ৪ঠা পৌষ ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অঘোরনাথের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথের সম্পর্কে 'মলুটি'র পত্রলেখক সৌরীন্দ্র বাবু লিখেছেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। অনেকের ধারণা এইরূপই। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ এখানকার প্রাক্তন ছাত্র নন, ছাত্র ছিলেন তিনি বোলপুর স্কুলের। সে স্কুল ছিল তখন বাঁধগোড়ায়। তাঁরা শান্তিনিকেতন ত্যাগ করার পর শান্তিনিকেতনে স্কুলের ব্যবস্থা হয়। অঘোরনাথ তখন আশ্রমের কাজ নিয়ে আছেন; বালককে পড়তে হত ভুবনডাঙ্গা বাঁধের পাড় দিয়ে হেঁটে গিয়ে। তাঁর সেই দিনের স্মৃতি থেকেই জ্ঞান বাবু "প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথে"র অন্তর্গত কয়েকটি কথা সংশোধন করে দিয়েছেন। ভুবনডাঙার আদি নাম ছিল ভুবননগর। ভুবনডাঙ্গার আদি বাসিন্দা লিখেছিলেম,—দ্বারিক ডোম। জ্ঞান বাবুর কাছে জানা গেল,—গাঁয়ের পশ্চিমপাড়ার মুসলমান-পরিবারই সেখানে অধিষ্ঠিত ছিল আগে থেকে, দ্বারিক আসে পরে। দ্বারিক ডাকাত ছিল না, ছিল সাধারণ গৃহস্থ, পেশা ছিল বরকন্দাজগিরি। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়নি। সাহিত্যসাধক-চরিত গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে বেরিয়েছে মাত্র উক্ত কাব্যের কবি নবীন বাবুর পরিচয়। আর সেটি যে প্রথম সংস্করণ, এ তথ্যটিতেও জ্ঞান বাবু লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রম বিদ্যালয়ে আগমন সম্বন্ধে তাঁর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা কবির পত্রখানি নিম্নে দেওয়া গেল। এর মধ্যে অঘোরনাথের প্রতি কবির আন্তরিকতা প্রকাশমান; বীরভূমের জলকষ্টের কথা ইতঃপূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে, কিন্তু তার উপর কূপখননের লোকাভাবের কথা এখানে সুস্পষ্ট; সুতরাং এখানকার গ্রীষ্মকালের অবস্থা সহজেই অনুমেয় এবং কবির কাজের দুরূহতাও সেই সঙ্গে বোধগম্য। কবি লিখছেন:

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার

তোমার পুত্র বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম।

যে পর্য্যন্ত সে আইন শিক্ষায় প্রবৃত্ত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাকে এখানকার বিদ্যালয়ে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছ ইহাতেও আনন্দ লাভ করিলাম।

এখানে সে যখন ইচ্ছা আসিতে পারে এবং যত দিন ইচ্ছা থাকিতে পারে, কোনো বাধা নাই।

এখানে তার খরচ ত কিছুই লাগিবে না, যদি কোনো প্রয়োজন ঘটে বিদ্যালয় হইতে সাহায্য লইবে।

বিদ্যালয়ের কাজ ভালই চলিতেছে। তুমি তোমার ছেলেকে সঙ্গে লইয়া একবার দেখিয়া যাইয়ো।

তোমার সন্ধানে ওখানে ইঁদারা খননে অভিজ্ঞ ভাল লোক আছে কি? গভীর ইঁদারা খুঁড়িতে হইবে—১০০০।১২০০ টাকা খরচ হইবে কিন্তু লোক পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে। ইতি ১১ ফাল্গুন ১৩১৫।

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্ঞানেন্দ্রনাথ যৌবনে শান্তিনিকেতনের কবির প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে শিক্ষক হয়ে যোগদান করেন। প্রায় তিন বৎসর তিনি

আশ্রমের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, পরে আশ্রমের কাজেই কলকাতায় যান। আশ্রমগুরু কবির আশীর্বাদ, উপদেশ, উৎসাহ তাঁর এক জন আশ্রমকর্মীর জীবনের গতি বিশেষ-বিশেষ পর্বে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে, অতঃপর খানকয়েক পত্রের মধ্য দিয়ে সেই ইতিহাস এখানে উদ্‌ঘাটিত হবে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের উদার প্রভাব আশ্রমের গুটিকয়েক ছাত্রের জীবনেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকবে না, বাইরের বিস্তৃত সংসারের মধ্যেও যাতে তা কার্যকরী হতে পারে, সেদিকে আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি পরিকল্পনার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। সেটি প্রকাশ পেয়েছে একখানি পত্রে। শিলাইদহ থেকে আনুমানিক ১৩১৭ সালে তিনি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন—

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি—কিন্তু জবাব দেবার সময় পেয়ে উঠিনি। তারপরে কাল অজিত [৺অজিত চক্রবর্ত্তী] এসে পড়েছে—তার সঙ্গে যে রকম আলোচনার ভিড় পড়ে গেছে, তাতে শীঘ্র আর সময় পাবও না। তোমাদের বিদ্যালয়ের ভূগোল প্রভৃতির শিক্ষার ব্যবস্থা এবার ফিরে গিয়েই করব—বোধ হয় নূতন লোকের প্রয়োজনই হবে না।

* * * বলে একটি ছেলে তোমাদের ওখানে গেছে। তার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, তাকে কিছু দিন আমি আর্থিক সাহায্য করেছিলুম। তারপরে তাকে কিছুদিন তোমাদের কাছে থাকবার সম্মতিও দিয়েছিলুম। আমি মাঝে মাঝে অল্প বয়সের যুবক ও ছাত্রদের বিদ্যালয়ে অতিথিরূপে রাখতে ইচ্ছা করি। আমাদের বিদ্যালয়ের ভিতর যে spirit কাজ করছে সেটা এই রকম করে বাইরেও কতকটা বিস্তৃত হবে—এটা দরকার। আমাদের সেকালের আশ্রমেও এই আনাগোনার সূত্রে দেশে অনেক ideal ছড়িয়ে পড়বার সুবিধা পেত। এইটে হলে আমাদের আশ্রমের উপযোগিতা আরও অনেকটা বেড়ে উঠবে। এই ছেলেটিকে কিছুদিন তোমাদের মাঝখানে স্থান দিতে পারলে ভাল হয়। সবাইকে আহ্বান কর, সবাইকে টেনে নেও, সকলেরই মধ্যে উদ্বোধন হোক। আমাদের ভিতরের সঙ্গে বাইরের যোগ প্রসারিত হতে থাক—নইলে ক্রমে আমাদের এটাও একটি দলের মত সঙ্কীর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের ওখানে যারা অতিথিরূপে আসবে তাদের কেবল রান্নাঘরে খাওয়া দেওয়া বা কোথাও শুতে দেওয়া নহে—তাদের কাছে টেনে নিয়ে তাদের চিত্তের অন্ন দেবার চেষ্টা কোরো। তারা কেবল ঘরের মধ্যে নয়, যথার্থত আমাদের আশ্রমের মধ্যে আশ্রয় পায়, এইটেই আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত। কাউকে যেন আমরা দূরে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা না করি। আমাদের আশ্রমের দুই বাহু সকলের দিকে প্রসারিত হোক এই আমি কামনা করি।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এর থেকেই আমরা জানতে পারি,—শান্তিনিকেতনের শিক্ষা কোনো দল-বেঁধা নয়, স্থানের বিশেষ গণ্ডী ঘেঁষেও তা নেই; এখানে থেকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সংগঠনের প্রয়াস চলেছিল বাইরেও—যুবক ও ছাত্রমহলের সহযোগ যেচে। পত্রোল্লিখিত রূপায়িত করতে চেয়েছেন। তাঁর 'প্রসারিত দুই বাহুর প্রীতি-আহ্বান চিরদিনের মতো রয়ে গেল এই পত্র মারফৎ সকলের জন্ম। আশ্রমের ও বাহিরের বহু ছাত্র-ছাত্রী এবং অতিথি-অভ্যাগত মিলে অগণিত লোকের আসা-যাওয়া অহরহই ঘটছে শান্তিনিকেতনে। কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীসংঘও রয়েছেন সেখানে নিত্যই বহু কর্মরত। সকলের পক্ষেই সকল-কিছু সার্থকতার আগে আশ্রমগুরুর এই আহ্বানটি স্মরণীয়। আশ্রমের যোগে সকলের মধ্যে উদারতা বৃদ্ধি পেলে তবে আশ্রম সার্থক হবে।

কবির সঙ্গে এককালে আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকারের শিক্ষা-সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পাটনা থেকে কলকাতা যাবার পথে কখনো কখনো তিনি শান্তিনিকেতনে অবস্থান ক'রে যেতেন। আশ্রমে একটি ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে সেটি এনেছিলেন। কিন্তু যথোপযুক্ত শ্লাইডের অভাবে জিনিষটির তেমন ব্যবহার ছিল না। একবার যদু বাবু এলে জ্ঞান বাবু তাঁকে লণ্ঠনটি দেখান। যদু বাবু অল্পকাল পরেই সেটিকে কাজে লাগাবার জন্য ভারত-ইতিহাসের বিখ্যাত স্থাপত্য ও বিবিধ স্থানের চিত্রযুক্ত বহু শ্লাইড আশ্রমকে উপহার দেন। সন্ধ্যার বিনোদন-পর্বে শ্লাইডগুলির সাহায্যে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গল্প ব'লে ব'লে ছেলেদের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করতেন জ্ঞান বাবু। তিনি দুরবীণ সহযোগেও উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের বিনোদনের কাজ করতেন। বিনোদন-পর্বে আনন্দদাতাদের কথা প্রবন্ধান্তরে অন্যত্র ["শান্তিনিকেতনের বিনোদনপর্ব," যুগান্তর ৫, ৬, পৌষ ১৩৫৭] বলা হয়েছে; এক জনের কথা সেখানে বাদ পড়েছিল। জ্ঞান বাবু স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এঁদের এক জন ছিলেন শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন। জীবন কেটেছে তাঁর আশ্রমে শিশুদের অধ্যাপনায়। আজো শান্তিনিকেতনে 'তেজেশ'দাকে সকলের চেয়ে বেশি চেনে-জানে এবং ঘিরে থাকে শিশুর দল। গুরুদেব যে আশ্রমের শিক্ষা-ব্যাপারে খুটিনাটি কত বিষয় নিয়ে ভাবতেন, কত কাজে কত যত্ন নিতেন নানা ক্ষেত্রেই তার পরিচয় আছে। জ্ঞান বাবুকে লিখিত চিঠির আরেকখানির অংশবিশেষ থেকে তার নিদর্শন উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। ভূগোলের কথা পূর্বোক্ত চিঠিখানির মধ্যে আছে; ইতিহাস শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যাবে এইখানিতে।

পূজার ছুটিতে জ্ঞান বাবু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তাঁর সঙ্গে শিলাইদহ গিয়েছিলেন। কয়েকটি ছাত্র আশ্রমে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল; গুরুদেব তাদের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে জ্ঞান বাবুকে এক রকম জোর করেই আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছেন, ছুটির মধ্যেই। কবি ছাত্রদের ইতিহাস শিক্ষার কথা ভাবছেন, নাটক লেখার ফাঁকে ফাঁকে ঐতিহাসিক রেখালিপিও প্রস্তুত করছেন। নাটকখানি খুব সম্ভব 'অচলায়তন'। ১৩১৮ সনের আশ্বিন-সংখ্যা 'প্রবাসীতে' এটি প্রকাশিত হয়।

বিদ্যালয়ের অফিস তখনো গড়ে নাই, গুরুদেব হিসাবের কথাও ভাবছেন। এই অফিস আরম্ভ হলো, জ্ঞান বাবুকে আরো অনেক ভার নিতে হলো। তার ইতিহাস একটুখানি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন 'প্রবাসী'তে লিখেছেন। জ্ঞান বাবুর লেখা ইংরাজি প্রবন্ধ Rabindranath and His Ashram School (Visva-bharati Quarterly, Education Number) দ্রষ্টব্য।

নাম গোপন ক'রে বিষয়টির উল্লেখ তাতে আছে। আশ্রমের দৈনন্দিন জীবন-নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ঘণ্টা বাজাবার ব্যবস্থা আছে, তার প্রবর্তন করেন জ্ঞান বাবু। গণিতের শিক্ষক হয়ে এলেও তাঁর উপর ক্রমে ভূগোল এবং ইংরেজি পড়াবারও ভার পড়ে। অনুবাদের কাজেও কবির নির্দেশে অন্যান্যদের সঙ্গে জ্ঞান বাবুকেও রত থাকতে হয়েছিল, সে-প্রসঙ্গ পরে আসবে।

ছেলেদের হাত-খরচ ও খাতাপত্র টুকিটাকি কেনার খরচ বাবদ অভিভাবকগণ সামান্য কিছু অর্থ আশ্রমের কর্তৃপক্ষের হাতে জমা রাখেন। জিনিস কেনাকাটা ও হিসাবপত্র রাখার কাজ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ছেলেরাই করে থাকে। এই ব্যবস্থায় রক্ষিত অর্থ-ভাণ্ডারের নাম 'ডিপোজিট'। গুরুদেবের অসংখ্য ভাবনার মধ্যে তুচ্ছ সেই ডিপোজিটও স্থান পেয়েছে। পত্রে ইতিহাসের রেখালিপির প্রসঙ্গের পর ডিপোজিটের কথাটিরও তিনি উল্লেখ করেছেন। লিখছেন :—

শিলাইদা

"কল্যাণীয়েষু

আশ্রমে গিয়ে বেশ আনন্দে আছ শুনে সুখী হলুম। * * * * * * * ঐতিহাসিক রেখালিপির একটা শূন্য খসড়াই কাল তোমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে—ছেলেদের পূরণ করতে দিলে তাতে তাদের ইতিহাস চর্চার সুবিধা হতে পারবে। আর একটি কাজ আছে। ছেলেদের দিয়ে সমস্ত মুসলমান ও ইংরেজযুগের ভারত-ইতিহাসের একটা Synopsis আমি চাই। তার থেকে ইতিহাসের একটি Analytical Table আমি তৈরী করে দিতে চাই—তাতে খুব উপকারের আশা করি।

নাটকটাকে হাত থেকে ঝেড়ে না ফেলতে পারলে নিয়মাবলী রচনার সুবিধা হবে না। বোধ হয় সেটা আর বড় দেরী নেই।

Deposit ব্যাপারের একটা কার্যপ্রণালী ঠিক করে দাও এবং তার পর্যবেক্ষণ ও চালনার ভারটা তুমি নাও—ওটা বিদ্যালয়ের ভারি একটা উৎপাত হয়েছে।

সন্তোষ কেমন আছে ?

ছেলেদের আমার আশীর্বাদ দিয়ো। ইতি ২৭শে কার্তিক ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বা: শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিনোদনের জন্যই কবির প্রথম ঋতু-নাটকের উৎপত্তি। স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জিত ঋতু-নাট্য শারদোৎসব, ফাল্গুনী এবং অন্য ধরণের অচলায়তন, ডাকঘর ইত্যাদি বাইরেও বহু জায়গায় স্কুল-কলেজে অভিনীত হয়ে থাকে। এরূপ, 'হাস্যকৌতুক' 'ব্যঙ্গকৌতুক' আছে আরেক ধরণের, মনে হয় যেন বিশেষ ক'রে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভিনয়ের জন্যই সেগুলি লেখা। ইংরেজি ধরণের অনুকরণে এদের রচনা, সে কথা কবি ভূমিকাতেই বলেছেন ; "য়ুরোপে শারাড্, Charade নামক একপ্রকার নাট্যখেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সঙ্কুচিত করিতে হইয়াছিল—আশা করি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না। এই হেঁয়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষ ভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।"—(হাস্য-কৌতুক) ইতঃপূর্বে লিখিত পত্রাদির মধ্যেও পরিবারে 'শারাড্' অভিনয়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতা থেকে লিখছেন প্রমথ চৌধুরী মশায়কে : "গত দুদিন ধরে শারাড্ অভিনয় চলছে, তাতেও আমাদের বর্ষার সভা খুব সরগরম হচ্ছে।"—(১৬ জুন ১৮৯৪, চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৬৪)

কিন্তু ইংরেজি ধরণের নাট্যখেলা শুধু বাংলাতেই নয়, ইংরেজিতেও কবি রচনা ও অভিনয়ের সূত্রপাত করেছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য। শিক্ষকদের মধ্যে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে তিনি এ কাজের ভার দিয়েছিলেন ; নিজে আদর্শস্বরূপ ছোট একটি নাট্যের খসড়াও তৈরী করে দেন। বাঁধানো একটি ক্ষুদ্র খাতায় সেটি পেন্সিলে লেখা ছিল। খাতাখানির মালিক ছিলেন তৎকালীন শিক্ষক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। শুধু মালিক নন, ছাত্রগণকে বই-বাঁধানো শেখাবার সময়ে নিজেই সেটি তৈরি করেছিলেন। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র ভবনে জ্ঞানেন্দ্র বাবুর নাম লেখা সেই পাণ্ডুলিপির খাতাখানি রক্ষিত আছে। এ সবই জ্ঞান বাবুর শান্তিনিকেতনের শিক্ষক-জীবনের কথা।

কিছু দিন পরে কবি কর্তৃক কলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষরূপে জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিযুক্ত হন ; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রেসের পরিচালনার ভারও তাঁর উপরেই সে সময় ন্যস্ত হয়। তখন তাঁকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় হতে আদি ব্রাহ্ম-সমাজে পাঠানো বিষয়ে, ১১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ তারিখে গুরুদেব শিলাইদহ হতে একখানি পত্র লেখেন। তাঁর আশ্রমের প্রেরণাকে সমাজের মধ্যে নানা দিক দিয়ে প্রসারিত করবার আগ্রহ কীরূপ প্রবল, এবং সে জন্য কাযকরী পন্থায় তিনি কী ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথকে লেখা ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত করা একখানি পত্রে তা কিছু জানা গেছে ; সেখানে তিনি চাইছেন, বাহিরের ছাত্র ও যুবকদের আশ্রমে আহ্বান ক'রে এনে মাঝে মাঝে অতিথি-স্বরূপ রাখবেন ; তাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাই বাহিরে আশ্রমের প্রচারের কাজ করবে ব'লে তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু কবির পরিকল্পনার সেটি একটি দিক, আরেকটি দিকের কথাও তাঁর মনে ছিল। অমনিতরোই আশ্রমের ভিতরকার কর্মীদের এক-এক জনকে সুযোগমতো বাহিরে পাঠাবেন ; নানা স্থানে তাঁরা সমাজের মধ্যে জীবিকার সূত্রে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকবেন। সে সব কর্মীদের সাহায্যেও যত দূর সম্ভব আশ্রমের আদর্শ ও আচরণ দূরে দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে পারবে,—এ আকাঙ্ক্ষাটি প্রকাশ পেয়েছে নিম্নোদ্ধৃত পত্রে :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার সম্বন্ধে একটি নূতন ব্যবস্থা করা হবে। আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার তোমাকে না নিলে চলবে না। ব্রাহ্ম-সমাজের সম্বন্ধে আমাদের শৈথিল্য হচ্ছে, সেটা অত্যন্ত অন্যায়। আমার ইচ্ছা আশ্রমের সঙ্গে সমাজের একটি ঘনিষ্ঠ নাড়ির সম্পর্ক

স্থাপিত হয়—আশ্রমের কোনো লোক সমাজের ভার পেলে সেইটে সম্ভবপর হবে। ক্রমে ক্রমে সমাজকে সজীব করে তুলতে হবে—একবার তুমি ওখানে বসে জমি তৈরি করে নাও, তারপরে আমরা সকলেই ওতে লাগব। এটা একটা বড় কর্তব্য কাজ এবং আমাদের আশ্রমেরই কাজ।

* * * * *

আশ্রম থেকে দূরে যেতে হবে মনে কোরো না। ব্রাহ্মসমাজেও আমরা আশ্রমকে ক্রমশঃ বিস্তার করব—প্রথমে তার বাধা বিস্তর—ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রসাদে সমস্ত কাটিয়ে উঠতে হবে। এই মহৎ কর্তব্যের ভার তুমি প্রসন্নচিত্তে ও সমস্ত মনের শক্তিকে জাগ্রত করে তুলে আনন্দে গ্রহণ কর—ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে দাঁড়াও তিনি তোমার জীবনকে সার্থক করে তুলবেন। ইতি ১১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিম্নের চিঠিখানিও জ্ঞান বাবুকেই ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১১তে লেখা। তিনি তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের ভার নিয়েছেন। গুরুদেব শান্তিনিকেতন থেকে লিখছেন। বিষয়—আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে অব্রাহ্মণ বসা নিয়ে আলোচনা। কিন্তু এর মধ্যে সমাজ-বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথের বজ্রগম্ভীর বাণী আমাদের সচেতন করে তোলে। তাঁর ধর্ম ও সামাজিক মতের সুস্পষ্ট নির্দেশ এর সাহায্যে পাওয়া যায়। সেই অর্থে পত্রখানি বিশেষ মূল্যবান সন্দেহ নাই।

কল্যাণীয়েষু

* * *

—যদি আদি সমাজে ব্রাহ্মণপূজাই চালাতে চান তবে তেত্রিশ কোটি কি অপরাধ করল? * *কে আমার নাম করে বোলো পুতুলপূজা তেমন দোষের নয় কারণ তাকে symbol বলে গণ্য করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণকে অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে পূজ্য বলে গণ্য করা ঈশ্বরের নিকট যথার্থ পাপ—কারণ তাতে অন্যান্য মানবকে অপমান করা হয়, এই পাপ আমি আদি সমাজে কিছুতেই রাখতে দেব না।

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর একটি বিশেষ ঘটনা। জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিবাহ স্থির হয়েছে—অসবর্ণ বিবাহ—শুনে তাঁকে পত্র লিখছেন—। সামাজিক পরিবেশ বিঘ্নসঙ্কুল। কিন্তু যেমন এঁকেই উপলক্ষ্য ক'রে দীক্ষার বেলায় জীবনের শ্রেষ্ঠ 'আবির্ভাব'কে প্রকাশের জন্য কবির আশীর্বাণী অভয় ও কল্যাণের দীপ্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল, এক্ষেত্রেও জীবনের পূর্ণতাকে গ্রহণ করবার পরম সন্ধিক্ষণে সমস্ত সংগ্রামের সম্মুখে নবীন যাত্রীর প্রতি পত্রের ছত্রে ছত্রে কবির শঙ্কাহরা আনন্দবাণী প্রকাশ পেয়েছে দেখা যায়।

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

ক্ষিতিমোহন বাবুর কাছে থেকে তোমার সমস্ত সংবাদ পেয়ে খুশি হলুম। ঈশ্বর তোমার সম্মুখে যে দান উপস্থিত করেছেন তা তুমি নির্ভয়ে মাথায় তুলে লও। অবশ্য, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমাকে একটা তুমুল সাংসারিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে—তাতেও তোমার মঙ্গল হবে। যে জিনিস আমরা নিতান্ত সহজে ও নিরাপদে পাই তার মূল্য থাকে না। তোমার জীবনের যে পূর্ণতাকে তুমি সহসা দেখতে পেয়েছ, তাকে তুমি পূর্ণ মূল্য দিয়েই গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছ এ তোমার সৌভাগ্য। ঈশ্বর তোমাকে একদিক থেকে যে বেদনা দেবেন আর দিক থেকে তার চের বেশি পূরণ করে দেবেন। যে ভীরু সে যথার্থ মঙ্গলের অধিকারী নয়। তুমি নির্ভয়ে সত্যের উপরে নির্ভর করে আনন্দের সঙ্গে দুর্গম পথে যাত্রা কর—নিশ্চয়ই জয়ী হবে। ঈশ্বর যে তোমার হাতে হঠাৎ এমন দুঃসাধ্য ভার অর্পণ করেছেন, এতেই তোমার সমস্ত জীবন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠুক। যারা সংসারকে ভয় করে চলে তাদের ভয়ের অন্ত নেই—তারা সংসারকে সত্যের চেয়ে বড় মনে করে বলেই সংসারের খাতিরে সত্যকে বিসর্জন দেয়—তারপরে সত্যকে অপমানিত করে এই যে আত্মাবমাননার আশ্রয়কে অবলম্বন করে এখানে তার পদে পদে দুর্গতি। তুমি মনকে আনন্দিত রেখো—তাকে অবসন্ন হতে দিয়ো না। ঝড় যত বড়ই হোক না কেন কেটে যায় কিন্তু যে ধ্রুব পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে থাক তা স্থির থাকে। তোমার মাথার উপরে দিয়ে এক চোট ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়ে আবার সমস্ত শান্ত সুন্দর হয়ে যাবে—মনে তুমি ভয় বা সংকোচ রেখো না।

* * * * * *

ইতি ২১শে আষাঢ়, ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গুরুদেবের একখানা বই ছাপা হচ্ছে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে। গুরুদেব অনুযোগ করেছেন, বাংলা ছাপাখানায় নির্ভুল ছাপা হয় না। বিলাতী ছাপাখানায় লেখককে প্রুফও দেখতে হয় না, কিন্তু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই নির্ভুল ছাপা হয়। বাংলা ছাপাখানায় লেখককে প্রুফ দেখতে হয় ইত্যাদি। ছাপায় ভুল বের হয়েছিল, কিন্তু জ্ঞান বাবু দায়িত্ব স্বীকার করতে চান না। তিনি বলেছেন বাংলা ছাপাখানায় প্রুফ দেখার ব্যবস্থা নাই, লেখক কিম্বা পত্রিকা-সম্পাদক প্রুফ দেখার ভার নিয়ে থাকেন। এই জন্যে বাংলা ছাপাখানার দরও অত্যন্ত সস্তা। কলকাতারই অনেক বিলাতী লোকের ছাপাখানায় প্রুফ দেখার জন্যে যথাযোগ্য বেতন দিয়ে এমন লোক রাখা হয়, যাঁদের ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে আছে, এবং সেই জন্যে সে সব প্রেসের দর সাধারণ বাংলা প্রেসের দরের অন্তত তিন গুণ। এই সব 'রীডার'দের হাত দিয়ে ভুল গলতে পারে না। এইরূপ দর দিলে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রেসও নির্ভুল কাজ দেবে। এবং ভুল থেকে গেলে ছাপা পৃষ্ঠা বদলে দেবে। প্রচলিত দরে এ-সব হতে পারে না—লেখক যেমন প্রুফ দেখে দেবেন, ছাপা তেমনি হবে। দর সস্তা রাখতে গিয়ে কাজের অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে। ভালো 'রীডার' না রাখলে কাজ নির্ভুল হবে না। এই পত্র পেয়ে গুরুদেব যে পত্র লেখেন তার প্রতিশব্দে মহানুভবতার পরিচয় আছে। শেষে যে "পুঃ" যোগ করেছেন, তা জ্ঞান বাবু যে লিখেছিলেন আসন্ন বিয়ের জন্যে তিনি অন্যমনা হয়ে নেই—তারই উত্তরে। বিয়ে হয়েছিল ১৪ই বৈশাখ ১৩১৯। সকল লোকের

সঙ্গে তিনি কী সুবিচার ও দরদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন তার পরিচয় এই পত্রে আছে। সহজ সুমধুর রসের আকর রবীন্দ্রনাথ। এই সঙ্গে তাঁর রহস্য-প্রিয়তার পরিচয় বিশেষ ভাবে উপভোগ্য।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কিছুকাল থেকেই শরীরটা খারাপ চলেছে বলে মেজাজটা বিগড়ে রয়েছে—মানসিক নয়। অতএব যখন বিরক্ত হয়ে উঠি তখন মনক্ষুণ্ণ হয়ো না। * * * * না কি একটু যত্ন করে খরচ করে ছাপচে সেই জন্যে ওতে কোনো ত্রুটি থাকলে সেটা অতিরিক্ত পরিমাণে আঘাত করে। নইলে * * * এর কল্যাণে ও অন্যান্য প্রকাশকদেরও আশীর্ব্বাদে আমার গ্রন্থাবলী একেবারে আপাদমস্তক ভ্রমের শরশয্যায় শয়ান। তারপরে আমি থাকতেই যখন এই দশা, তখন আমার অগোচরে কি হবে সেই কথা স্মরণ করলে গ্রন্থকারের মন স্বভাবতই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেইজন্যেই সমুদ্রের এপারে থাকতে থাকতেই বইগুলো ছাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে মনের মধ্যে খুব একটা তাড়া আছে—অথচ তোমাদের ছাপাখানায় সে তাড়াটা দেখতে পাইনে—তাতেই শরীরের বায়ু প্রকুপিত হয় এবং পিত্তটাও উত্তাপ দিতে থাকে—সেটা আমার পক্ষেও যেমন মন্দ সম্মুখে যারা উপস্থিত থাকে তাদের পক্ষেও তেমনি অপ্রীতিকর। এরূপ ক্ষেত্রে তোমার প্রতি আমার উপদেশ এই যে, 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং'—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে—বিরক্ত না হয়ে বিরক্তিকে পরাস্ত করবে—এবং সেই সঙ্গে হাত চালিয়ে কাজ করবে এবং সতর্ক হয়ে প্রুফ দেখবে।

* * * ইতি ১৮ই চৈত্র ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুঃ—একটা কথা তুমি ভুল বুঝেছ। আসন্ন শুভবিবাহ উপলক্ষ্যে মানুষের মন যে চঞ্চল হয়ে থাকে সেটাকে আমি অপরাধ বলে গণ্য করিনে। তুমি খুব পেট ভরে বিবাহ কর এবং তা দিয়ে তোমার হৃৎপিণ্ড যুগলে যথোচিত স্পন্দন সঞ্চার হোক্ না—আমি বৃদ্ধ হয়েছি বলে এই স্বাভাবিক আন্দোলনটার পরে আমার লেশমাত্র বিদ্বেষ নেই এ তুমি নিশ্চয় জেনো—মনের মধ্যে এখনো কবিত্বের কিছু অবশেষ আছে। এমন কি ছাপাখানার আপিস পর্য্যন্তও এই তুফান যদি পৌঁছয় তাতেও আমি আতঙ্কিত হব না—তবে কি না এই ধাক্কার সময়ে আপিসটাকেও খুব একটু শক্ত হয়ে থাকতে হবে। নাই হোক্ প্রজাপতি যখন উড়ে বেড়াচ্ছেন তখন তাঁর দুই পক্ষের বর্ণচ্ছটা আমার কাছে এখনো মনোরম বলেই বোধ হয়।

গুরুদেব বিলাতে গেছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্তের সঙ্গে না বনাতে জ্ঞান বাবুকে ক্ষুণ্ণ মনে আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করতে হয়। নিশ্চয়ই গুরুদেব এটা জানেন, একটা কারণে এইরূপ ভেবে তাঁকে জ্ঞান বাবু কিছু লেখেন নাই, কিন্তু কন্যার জন্মের পর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে যে পত্র লেখেন তার এই উত্তর। আশ্রমের প্রতি বৈদেশিকদের আগ্রহ এবং গুরুদেবের কাজে এণ্ড্রুজের যোগদানের পূর্ব্বাভাস এতে পাওয়া যাবে।

ওঁ

Massers
c/o Thomas Cook & Son
Ludgate Circus
London

কল্যাণীয়েষু

জ্ঞান, তুমি আদি সমাজের কাজ থেকে কখন যে অবসর গ্রহণ করেছ তা আমি জানতেও পারিনি। বোধ হয় অজিতের পত্রে বহুকাল পরে আমি সে খবর পাই। যা হোক এখন সে বিষয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই অতএব যা ঘটেছে তাকে নিঃশব্দে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। তোমার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো বিরক্তি বা প্রতিকূলতা নেই—এবং সর্ব্বতোভাবে তোমার কল্যাণ হোক এই আমার আন্তরিক কামনা এ কথা নিশ্চয় জেনো।

তোমার একটি কন্যা জন্মেছে শুনে আনন্দিত হলুম। তোমার এই নবকুমারী তোমার সংসারে এবং জগৎ সংসারে আনন্দ ও মঙ্গল বিকীর্ণ করতে থাকুক, এই আমি আশীর্ব্বাদ করি।

আমি কিছুকাল আমেরিকায় যাপন করে সম্প্রতি লণ্ডনে ফিরে এসেছি। এখানে কতদিন থাকব এখনো কিছুই স্থির করি নি। এখানকার কাজ শেষ হলে একবার ফ্রান্স জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করে তবে দেশে ফেরবার ইচ্ছা আছে।

ইতিমধ্যে এণ্ড্রুজ সাহেব শান্তিনিকেতন গিয়ে আমাদের বিদ্যালয় দেখে এসেছেন। বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করে আমাকে দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। তিনি আমার অনুপস্থিতি কালে মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে গিয়ে আমার কর্ম্মভার গ্রহণ করবার প্রস্তাব করেছেন। আমি বিদেশীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ সহায়তা ও সহানুভূতি পেয়েছি এমন দেশের লোকের কারো কাছ থেকে পাইনি। আমেরিকাতেও বিস্তর লোক আমাদের এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যে কোনো নতুন পরীক্ষা বা সদনুষ্ঠান চলবে তার প্রতি এদের এই একান্ত চিত্তের আকর্ষণ দেখলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়। মঙ্গলের প্রতি নিষ্কাম অনুরাগ ত একেই বলে। শুধু ঘরের কোণে বসে গীতার শ্লোক আওড়ালেই ত হয় না। এদেশে এসে এই বিষয়ে আমি বিস্তর উপকার পেয়েছি। কি করে যে আপনাকে উৎসর্গ করতে হয় তা এরাই জানে—আর কি করে যে বিনা যোগ্যতায় অহঙ্কার করতে হয় এবং বিনা বক্তব্যে বক্তৃতা করা যেতে পারে, সে বিদ্যায় আমরা পারদর্শী।

তোমার স্ত্রীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ২৫ এপ্রেল ১৯১৩।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবন কাটে জামসেদপুরে। "প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি তিনিও পড়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন :—সত্যি বলতে, গুরুদেব ছিলেন শান্তিনিকেতনেরই লোক। তিনি শিলাইদহেরও। কিন্তু সেখানে ছিলেন জমিদার। চার পাশের লোকেরা তাঁকে পেয়েছিল প্রধানত বৈষয়িক যোগে।

যদিচ কোথাও তিনি বিষয়ে ডুবে থাকতেন না। সেই জন্ম তাঁর যে সব দিন জমিদারিতে কেটেছে তাও তাঁর উচ্চাঙ্গের বহু সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হয়েছিল। তবু, তিনি ছিলেন যে-মার্গের লোক, শান্তিনিকেতনই দিয়েছিল তাঁকে সেই বৈচিত্র্যময় বিশ্বমানবিক আবেষ্টন। অর্থ ও উদ্যম এখানে অজস্র ঢেলেছেন। তাঁকে এদিক দিয়ে বেহিসেবী মনে হবে। কিন্তু গুরুদেব যে কত বড়ো, কী উদার দৃষ্টিতে তিনি সব জিনিসকে দেখতেন, সে সাধারণ ধারণার বিষয় নয়। দু'-একটা ঘটনার কথা ভাবি। তাঁর বিদ্যালয়ের গোড়ার কথাটা ধরা যাক্। মহর্ষিদেবের জীবিতকালে মাসোহারা মাত্র সম্বল, তখন খুলে বসলেন এই ডাঙায় তাঁর বিদ্যালয়; বলে বসলেন, গুরুগৃহ করবেন, ছাত্রেরা বিনা পয়সায় প্রতিপালিত হবে, যেমনটি ছিল ভারতের সেই গৌরবময় জ্ঞানের যুগে। নিজের সংসার আছে, তাতে অনেক খরচ। তার উপর আছে ঋণ।* ঐ অবস্থায় ক'জন এমনটি ভাবতে পারে! এ যুগে সে কি সম্ভব? কিন্তু নিজের স্বল্প পুঁজি নিয়ে এ কথা ভাবতেও যেমন সাহস করেছিলেন,—কাজেও তো তাই দেখিয়েছিলেন। ছাত্রদের খরচ চালিয়েছিলেন।† তাতে প্রয়োজন হয়েছিল,—কেবল তাঁর নিজের ত্যাগ নয়, পরিবারের আরো অনেকের। কী সাধারণ ভাবেই না চালাতে হয়েছে জীবনযাত্রা।

এক সময়ে আশ্রম থেকে মাসে মাসে 'প্রবাসী'র জন্মে লেখা জোগানো হত; সে কেবল 'গোরা' প্রভৃতি সাহিত্যসৃষ্টি দ্বারা নয়, সাহিত্যের কুচ্ছ্রকর্মও তার অন্তর্গত ছিল। রামানন্দ বাবু সে সময় বিদ্যালয়কে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তিনি রাশি রাশি বৈদেশিক সাময়িক পত্র পাঠাতেন, শান্তিনিকেতনেও কবির কাছে কিছু কিছু জমা হত। সেগুলি প'ড়ে নানা প্রসঙ্গস্থল কবি নিজে অনুবাদ করতেন, পেন্সিলে চিহ্নিত ক'রে কিছু কিছু কয়েক জন অধ্যাপককেও দিতেন পাঠিয়ে। অধিকাংশ ছিল তার ইতিহাস, স্বাস্থ্য বা বৈজ্ঞানিক বিষয়ক বিবরণী। জগদানন্দ বাবুকেও পাঠাতেন। ৺অজিতকুমার চক্রবর্তী ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের অনূদিত যে-অনুবাদগুলি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হত,—সেগুলির নীচে যথাক্রমে 'অ' ও 'জ্ঞ' এই থাকত সাংকেতিক চিহ্ন। পরে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনূদিত লেখাও যখন ঐরূপে 'প্র' দিয়ে বেরুতে লাগল, তখন গুরুদেব রহস্য করে বলতেন, "আগে ছিল 'অজ্ঞ'দের কারবার, এবার তোমরা যা হোক 'প্রাজ্ঞ' হয়েছ।" এ বিষয়ে ১৩১৬।১৭' সালের 'প্রবাসী' দ্রষ্টব্য। ১৩১৭ সালে পুরো নামের ব্যবহারে জ্ঞান বাবুর বহু প্রবন্ধ এবং একটি গল্পও 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত রয়েছে। তাছাড়াও তৎকালীন শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই যে এ কাজে ব্রতী ছিলেন, 'প্রবাসী'তে ব্যবহৃত সাংকেতিক লেখক-নামের থেকে তার পরিচয় মেলে। 'ক্ষি,' 'তে,' 'শ' 'ব' যথাক্রমে ক্ষিতিমোহন সেন, তেজেশচন্দ্র সেন, শরৎকুমার রায় ও বঙ্কিমচন্দ্র রায় ইত্যাদি অধ্যাপকগণের কথা স্মরণ করায়।

'প্রবাসী'র অনেকগুলি পাতা এক সময়ে এই ক'রে শান্তিনিকেতন থেকেই ভরানো হতো। রামানন্দ বাবুর বন্ধু এলাহাবাদের মেজর বামনদাস বসুর লাইব্রেরীর পত্রিকা-সংগ্রহ সেদিন খুব কাজে লেগেছিল। টাকা যা পাওয়া গিয়েছিল তা উপলক্ষ মাত্র, গুরুদেব প্রভূত আনন্দ লাভ করেছিলেন নূতন নূতন লেখক সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ছাত্রও এই কাজে যোগ দিয়েছিল।

তাঁর বৈষয়িক জীবনের ঘটনাও বিস্ময়কর। জমিদারির ভার নিলেন। কিন্তু সেখানেও মামুলি ধারায় অর্থ ও প্রভুত্বই হিসাবের বড় বিষয় হল না। খারিজ ওয়াসিল নজরানায় তাঁর নজর বাঁধা পড়ল না। তিনি চাইলেন মানুষের হিত। প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে অনেক জমিদারই তো বাবুগিরি করে। তিনিও কি ধরা দেবেন তাতে? পাশ্চাত্যের সমবায়-ব্যবস্থার তখন চলছে জয়জয়কার। জমিদারির ধারাই দিলেন পাল্টে। প্রজাদের দাঁড় করাবেন স্বাবলম্বী ক'রে, পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর তাদের ত্যাগ করাবেন সেই প্রথার প্রবর্তনে,—এই হল তাঁর চেষ্টা। নানা কর্মীদের লাগালেন কাজে, নানা কেন্দ্র গড়া হল। অনেক আগে থেকেই তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। ছেলে, জামাই এবং বন্ধুপুত্রকে শিক্ষার জন্মে পাঠিয়েছেন বিদেশে। তাঁরা ফিরে এসে তাঁকে সাহায্য করবেন, এই একান্ত আশা। আজ শ্রীনিকেতনের দিকে চাইলে তাঁর হিসেবের অর্থ বোঝা যাবে। সাময়িক আলোচনায় বেহিসাবী তাঁকে যে বলবে বলুক,—হিসাব মিলবে তাঁর দূরকালে। এইখানেই তিনি বড়ো।

শিলাইদহের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত প্রজা। খাজনা বা দেনার দায়ে জোতজমি ঘরদোর সব বিকিয়ে যেতে বসেছে। এসে ধরে পড়ল সোজাসুজি গুরুদেবকে,—জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। তিনি সব শুনলেন। নিয়মানুবর্তী গুরুদেব। যৌথ-জমিদারির আইনত বিধিব্যবস্থায় হাত দিতে গেলেন না। সেখানে কর্মচারীর মান রাখলেন। ঘরের থেকে ব্যক্তিগত তহবিল ক্ষীণ করে দোরে-বসা প্রজাকে ধরে এনে দিলেন তার দায়ের টাকাগুলি। প্রজা ঋণমুক্ত হয়ে ঘরে ফিরল।

গুরুদেবের খাটুনির অন্ত ছিল না। নিজের লেখাপড়া, বিদ্যালয়ের কাজ। ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে জমিদারির দেখাশুনা, দেশবিদেশ ঘোরাঘুরি,—কত কাজ।*

কাজে রথী বাবু তখন সাহায্য করছেন। একান্ত সচিব মিলেছে পরে! কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গানগুলি রচিত হয়েছে। সে তো শুধু সাহিত্যিক প্রতিভার দান নয়। জীবনের নিগূঢ় সাধনার জিনিস। তার গভীরতা প্রত্যক্ষ হয়েছে প্রাত্যহিক ঊষাকালীন উপাসনায়। মন্দিরের বাইরে পূর্ব দিকের মেঝেতে এসে বসতেন। সে কি তন্ময়তা! পরবর্তী জীবনে বিশ্বভুবনে নানা কাজের মধ্য দিয়ে গ'লে গ'লে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর আনন্দঘন সেই দিব্য অনুভূতি।

---

* "মহাজনের এবং উইলের জেলায় যে রকম জড়িয়ে আছি"...।—চিঠিপত্র ৫ম, পৃঃ ২৩৬—লেখক।

† "ছেলেদের অনেকেই দুর্দশায় পড়ে বহুকাল বেতন মুলতুবি রেখেছে"।—চিঠিপত্র ৫ম, পৃঃ ২৩৬—লেখক।

* "এক-এক বার ক্লান্ত হয়ে ভাবি একটা সেক্রেটারি রাখা যাক্, কিন্তু সে আমিরীটুকুও হিসাবে কুলায় না দেখতে পাই।"—চিঠিপত্র ৫ম, পৃঃ ২৩২। লেখক।

স্যামুয়েল জনসনের চিঠি

[ইংরেজী ভাষার শব্দকোষ সংকলন করে যে অধ্যবসায়, ধৈর্য ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন জনসন, তার কোন মূল্য তিনি পাননি তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের অভিজাত ও তথাকথিত বিদগ্ধ সমাজের কাছ থেকে। আসলে প্রয়োজন মত স্তুতিবাদ দ্বারা তিনি বড়লোকদের কৃপা অর্জন করতে পারেননি। দারিদ্র্য, হতাদর এবং দৃষ্টিক্ষীণতা এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে একাকী নিঃশব্দে লড়াই করে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের সব থেকে প্রামাণ্য শব্দকোষ রচনা করেছিলেন, যা পরবর্তী যুগে তাকে অসামান্য কৃতিত্বমান সাহিত্যের গৌরব দান করেছে।

১৭৪৭ সালে জনসন তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করে তৎকালীন সেক্রেটারী অফ ষ্টেট লর্ড চেষ্টারফিল্ডের কাছে পত্র লেখেন। প্রত্যুত্তরে তিনি পান দশ পাউণ্ডের একটি সাহায্য উপহার। কিন্তু সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে জনসন প্রত্যাখ্যাত হন। কিন্তু তাতে অদমিত না হয়ে জনসন সাত বৎসর অমানুষিক পরিশ্রম করে আরব্ধ কার্য সমাধা করেন। শেষ হবার পর তিনি চেষ্টারফিল্ডের কাছ হতে মধুমাখা পত্র পান, যার আন্তরিক প্রত্যাশা হোল বইখানি তাঁর নামে উৎসর্গিত হোক। কিন্তু জনসন সে সম্মান দেননি এবং পরিবর্তে নীচের চিঠিখানি পাঠান লর্ডকে।]

১৭৫৫, ৭ই ফেব্রুয়ারী

পরম শ্রদ্ধাভাজন,

ওয়ার্ল্ড প্রতিষ্ঠানের কর্তারা আমায় সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, আমার অভিধানকে জনসাধারণের কাছে সুপারিশ করে দু'টি রচনা আপনি লিখেছেন। শ্রেষ্ঠ লেখকের কাছে কৃপালাভে অনভ্যস্ত আমি আপনার দেওয়া এই বিশিষ্ট সম্মানের কি ভাবে মর্যাদা রক্ষা করব অথবা কি ভাবে তার যথোচিত সমাদর করব ভেবে পাচ্ছি না।

সামান্যতম উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে যখন আমি আপনার দ্বারে প্রার্থীস্বরূপ দাঁড়িয়েছিলাম, তখন আপনার সামাজিক মর্যাদায় সাধারণ লোকের মত আমিও বিনয়াবত হয়েছিলাম। কিন্তু যে ভাবে আমি প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, তার ফলে তাতে আমার সম্মানবোধ ও মর্যাদা গভীর ভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। রাজ-দরবারের শিষ্টাচার-এ অনভিজ্ঞ এক জন বৃদ্ধ সাহিত্যসেবীর পক্ষে যতখানি স্তুতি ও প্রশংসা করা সম্ভব, তাই দিয়ে আমি আপনার কাছে প্রকাশ্য পত্র পাঠাই। আমার সাধ্যমত আমি করেছি। চেষ্টা যত সামান্যই হোক, অনাদর সহ্য করতে পারে না কোন লোকই।

আপনার দ্বার হতে প্রত্যাখ্যাত হবার পর সাত বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। দীর্ঘকাল নানা প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়ে আমি অগ্রসর হয়ে সেই সংকলন শেষ করেছি এবং এক্ষণে সেটি প্রকাশাপেক্ষায়। এই সময়ের মধ্যে অণুমাত্র সাহায্য, একটি সাহসের কথা অথবা একটি প্রশংসা-হাস্য আমি পাইনি। এ ব্যবহার আমি প্রত্যাশা করিনি।

ভার্জিলের মেষপালক অবশেষে ভালবাসার পাত্র পেল আর জানল সে পর্বতবাসী। মানুষ যতক্ষণ জলে হাবুডুবু খাচ্ছে ততক্ষণ যে সাহায্যকারী উদাসীন এবং ডাঙায় ওঠার পর যে সর্বপ্রকার সাহায্যে অগ্রসর, তার নামই কি পৃষ্ঠপোষক? এত দিনে আপনি যে আমার প্রতি সদয় হয়েছেন, তাতে আমি অতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এক্ষণে আমি ধৈর্যের শেষ প্রান্তে পৌঁচেছি, তাই আমার আগ্রহও কমে গিয়েছে। এখন আমি লোক-পরিচিত হয়েছি, পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন নেই আমার। যে উপকার আমি পাইনি, তার স্বীকৃতির অসম্মতিতে কি সিনিকের অপরাধ আমায় স্পর্শ করবে? আমার অধ্যবসায়ের পুরস্কার ঈশ্বর আমায় যা দিয়েছেন, তা কোন পৃষ্ঠপোষকের দয়া বলে আমি জনসাধারণকে জ্ঞাত করতে রাজী নই।

বিদগ্ধ শ্রেণীর উপকারী কোন লোকের অনুগ্রহভাজন না হয়েই আমি সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়েছি। যে প্রত্যাশায় এক দিন আমি দম্ভ করে বেড়াতাম, তার দুঃস্বপ্ন আমার কবে ভেঙে গিয়েছে। ইতি

আপনারই

স্যামুয়েল জনসন।

টুর্গেনিভের চিঠি

[১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল রুশিয়ার লৌহ-মানব জার প্রথম নিকোলাসের জীবনে। সিবাস্তপোল অবরোধের সময় তাঁর যুদ্ধরত সৈন্যদের দুঃখ-বেদনার কয়েকটি চিত্রণ বা আখ্যায়িকা পড়ে তিনি এত দূর বিচলিত হয়েছিলেন যে, আখ্যায়িকার রচয়িতা তরুণ লেখককে তক্ষুনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনার আদেশ দিয়েছিলেন। এমন প্রতিভাকে হেলায় হারাতে দিতে পারে না রুশিয়া। অতএব লিয়ো টলষ্টয়কে ছুটি নিয়ে ফিরে যেতে হয় সেণ্ট পিটার্সবার্গে এবং সেখানে সর্বপ্রথম তাঁর পরিচয় হয় ইভান টুর্গেনিভের সাথে। ক্রিমিয়া যুদ্ধের বহুদর্শী যোদ্ধার বয়স তখন ছাব্বিশ আর টুর্গেনিভ তখন তাঁর চেয়ে দশ বছরের বড় এবং রুশ সাহিত্য-ক্ষেত্রের একচ্ছত্র সম্রাট। দু'জনের হোল মিলন 'কিন্তু প্রাণখোলা নয়—হয়ত দশ বছরের ব্যবধানই এর জন্য দায়ী। পরে টুর্গেনিভ তাঁর এক বন্ধুকে দুঃখ করে লিখেছিলেন—'আমি টলষ্টয়কে হৃদয়ের আরো কাছে টেনে আনতে পারিনি বলে দুঃখিত—আমাদের আদর্শ এত পরস্পর-বিরোধী।

বস্তুতঃ একমাত্র রুশীয় পটভূমিকা ছাড়া দু'জনের লেখায় কোথায় মিল ছিল না। সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক থেকে তাঁরা বিচার করতেন

প্রতিটি বিষয়। টুর্গেনিভের দৃষ্টিভঙ্গিতে আচ্ছন্নতার কোন স্থান ছিল না, কিন্তু টলষ্টয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। জর্জ মুর লিখেছেন—'টুর্গেনিভ চাষীকে জানতেন যেমন এক জন ভদ্রলোক চাষীকে জানেন। তিনি ভদ্রলোককে জানতেন যেমন এক জন ভদ্রলোক আর এক জন ভদ্রলোককে জানেন। সিনিকের দৃষ্টিতে নয়, জ্ঞানী, দার্শনিকের মন নিয়ে বিচার করতেন উভয়কে।' অর্থাৎ টলষ্টয়ের আদর্শ-ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর কোনই মিল ছিল না। আকৃতিতেও টলষ্টয় তাঁর চেয়ে ঢের বেশী পেশীবহুল, সবল বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। 'যত বয়স বাড়ছে ততই একে কম ভালবাসছি।' লিখেছিলেন টলষ্টয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে টলষ্টয় আর টুর্গেনিভের মধ্যে গভীর মতান্তর ঘটে—এমন কি এক সময় মনে হয়েছিল বুঝি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে এর শেষ পরিণতি ঘটবে। এই ভাবে চৌদ্দ বছর আর দু'জনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ বা ভাবের আদান-প্রদান হয়নি। এর পর টলষ্টয় রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন এবং মৃত্যু প্রত্যাসন্ন ভেবে টুর্গেনিভের কাছে ক্ষমা চেয়ে এক পত্র লেখেন। টুর্গেনিভও তক্ষুনি তাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করে পত্রোত্তর দিতে ভোলেন না। সে-বছর কয়েকটি দিনও তাঁরা কাটিয়েছিলেন একসঙ্গে। টলষ্টয়ের মধ্যে এসেছে বিরাট পরিবর্তন—টলষ্টয় হয়ে পড়েছেন বাক-সংযত, নিঃশব্দ। মানসিক উৎকর্ষতাও সুপ্রত্যক্ষ। কিন্তু তাঁদের এ পুনর্মিলনে কৃত্রিমতা না থাকলেও কোথাও যেন একটু বাধা ছিল। জীবনের শেষ বছরগুলিতে টুর্গেনিভকে কাটাতে হয়েছে বিদেশে—তার প্রধান কারণ শেষ বছরের রচনাগুলি, বিশেষ করে পিতা-পুত্র (Father and Sons) রুশ পাঠক-মহলে তেমন সমাদৃত হয়নি বলে তিনি মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাছাড়া গীতকার পলাইন ভিয়ার্দো গার্সিয়ার নিকট-সান্নিধ্যে থাকাও তাঁর একান্ত বাসনা ছিল। পলাইনের অন্ধ পূজারী ছিলেন টুর্গেনিভ। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই অবস্থার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে। টুর্গেনিভ শয্যা নিলেন—রোগশয্যায় টলষ্টয়ের চিন্তা বারে বারে তাঁকে ক্লিষ্ট করতে লাগল। আধ্যাত্মিক অনমতার দরুণ টলষ্টয় বহু দিন লেখনী সংবরণ করেছেন, হয়ত চিরকালের মতই। টুর্গেনিভ তাই রোগশয্যা থেকে নীচের এই চিঠিখানি লিখেছিলেন টলষ্টয়কে লেখার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে।]

বুগাইভাল, ২৭শে অথবা ২৮শে জুন ১৮৮৩

লিয়ভ নিকোলাইয়েভিচ, প্রীতিনিলয়েষু—

বহু দিন আপনাকে পত্রসম্ভাষণ করিনি। তার কারণ এখনও আমি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে। আর সুস্থ হবার কোন সম্ভাবনা নেই—এমন কি সে-চিন্তাও পরাজিত। আপনাকে চিঠি লিখছি শুধু এই কথাটি জানাতে যে, আপনার সমকালীন হতে পারায় নিজেকে আমি গৌরবান্বিত মনে করছি। আপনাকে আমার শেষ এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ—'প্রিয়বন্ধু, আবার ফিরে এস সাহিত্যসাধনায়।' জানেন তো এ ক্ষমতা আপনি পেয়েছেন, সকল ক্ষমতার আদি উৎস থেকে। আমার এ অনুরোধ আপনার উপর নিশ্চিত প্রভাব বিস্তার করছে জানতে পারলে কত খুশী হব।

আমি তো নিঃশেষিত মানুষ। ডাক্তারেরা পর্যন্ত জানে না আমার রোগটা কি! না পারি হাঁটতে, না পারি খেতে বা ঘুমুতে—সুতরাং আমার আর কি করবার থাকতে পারে? এমন কি রোগের কথা পুনরাবৃত্তি করাও একঘেঁয়েমি। 'রাশিয়ার সুমহান্ লেখক, হে প্রিয় সুহৃদ! আমার এ মিনতি রেখো।'

[এই চিঠি লেখার পাঁচ সপ্তাহ পরে টুর্গেনিভ চিরবিদায় নেন এ পৃথিবী থেকে। সদ্য সদ্য না হলেও টলষ্টয় পরে তাঁর এ অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। সাহিত্য-জগতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান যা দেবার তা দেওয়া হয়ে গেছে। তবুও "রেজারেকসান", "ক্রয়জার সোনাটা"র মত জনপ্রিয় বইগুলি তখনও লিখতে বাকি। তাঁর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য বই—"হোয়াট ইজ আর্ট" লেখা হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। এটিকে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তার নবতম অবদান বলা যেতে পারে, কিন্তু যে কোন নিরপেক্ষ পাঠকই স্বীকার করবেন যে, চল্লিশ বছর আগে টুর্গেনিভ টলষ্টয়ের রচনা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন এবং যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছিল, তা কতখানি সত্যি। "টলষ্টয় তাঁর লেখায় দার্শনিকতা না মেশাতেন যদি, তা হলে খুব চমৎকার হোত।"—মন্তব্য করেছিলেন টুর্গেনিভ।]

পল গোঁগ্যের পত্র

[১৮৪৮ থেকে ১৯০৩ অবধি পল গঁগ মর্তভূমে ছিলেন। বিদ্রোহী শিল্পী গঁগ সারা জীবনে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। পৃথিবী আর সভ্যতা তাঁর আত্মাকে করে তুলেছিল শ্রান্ত। তাঁর সমালোচক ও সমসাময়িক বিদগ্ধ জন বলেন যে, শিল্পী আসলে ছিলেন আদিম যুগের মানুষ। তাঁর রক্তে ছিল যাযাবরত্ব। সমাজ সভ্যতা পরিত্যাগ করে শিল্পী তাহিতি দ্বীপে পলায়নপর অবস্থায় ষ্ট্রীনবার্গের কাছে এক পত্রে অনুরোধ পাঠান, তার শিল্প-সম্পদের এক বর্ণনাময় তালিকা প্রস্তুত করে দিতে, যাতে সেগুলি ভাল দামে বিক্রী হতে পারে। ষ্ট্রীনবার্গ পত্রোত্তরে যা লেখেন, শিল্পী তাঁর তালিকার সঙ্গে সেটিও প্রকাশ করেন। বিক্রয়-মূল্য বার হাজার ফ্রাঙ্ক নিয়ে গঁগ পালিয়ে যান তাহিতি দ্বীপে। আট বৎসর পরে একান্ত দারিদ্র্য ও হতশ্রীতার মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু জীবনের শেষ নিশ্বাস অবধি গঁগ তার কটু ক্ষুব্ধ আক্রোশ জানিয়ে গেছেন সভ্যতার উপর, যার প্রকাশ তাঁর প্রত্যেকখানি ছবিতে।]

আজ আপনার পত্র পেলাম, যে পত্র আমার তালিকার মুখবন্ধ স্বরূপ। কয়েক দিন আগে আমার ষ্টুডিয়োতে প্রাচীরের চিত্রগুলির দিকে আপনার উত্তর দেশের নীল চোখের দৃষ্টিতে তাকিয়ে গীটার বাজিয়ে গান করছিলেন, তখনই আমার শিল্প-তালিকার জন্য আপনার কাছে একটি মুখবন্ধের অনুরোধ জানানোর কথা আমার মনে আসে। তখন আমার মনে এক বিদ্রোহের প্রাক্ চেতনা জাগছিল, যা আপনার সভ্যতা ও আমার আদিমতার সংঘর্ষ।

আপনি সভ্যতার ব্যাধিতে ভুগছেন। আদিমতা আমার কাছে যৌবনকে পুনর্জ্জীবিত করে।

আমার ঈভ—অন্য এক জগতের রূপ ও ব্যঞ্জনায় যাকে আমি সৃষ্টি করেছি—হয়ত আপনার মনে অতীতের বেদনাবোধকে জাগিয়েছে। আপনাদের সভ্য কল্পনার ঈভ আমাদের সকলকে মিসোগাইনিষ্ট করে তোলে প্রায়। আমার ষ্টুডিয়োতে যে আদিম নারী ঈভ আপনাকে শঙ্কিত করে এখন, তারই হাসি হয়ত আগামী

কোন দিন আর তত তিক্ত ঠেকবে না আপনার। যে জগতকে আমি রঙে ও রেখায় সৃষ্টি করেছি, তা কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে পারবেন না বটে, কিন্তু সে হোল স্বর্গরাজ্য। এ রেখাচিত্র থেকে সেই স্বপ্ন-সম্ভব অনেক দূর। কিন্তু তাতে কি? আনন্দোপলব্ধি, সে কি নির্বাণের পূর্ণ স্বাদ নয়?

আমি যে নারী ঈভ সৃষ্টি করেছি, নগ্নতার দাবী একমাত্র তারই আছে। আপনার ক্ষেত্রে সে লজ্জায় পা বাড়াতে পারত না, হয়ত বা তার অপার সৌন্দর্যে একটি পাপ ও একটি বেদনাই মুখর হয়ে উঠত। ইতি

লুই পাস্তুরের চিঠি

["বিশ্বপ্রকৃতির মূল সূত্রগুলির অনুধাবনের দ্বারা বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত জীব-জগতের সীমানাকে দূরপ্রসারী করিয়া তুলিতেছে"—মন্তব্য করেছিলেন লুই পাস্তুর এবং এই সীমানাকে সম্প্রসারণের চেষ্টাও তিনি করে গেছেন আজীবন। বস্তুতঃ পশুরোগ (এ্যানথ্রাক্স), মুরগীর কলেরা, জলাতঙ্ক ও গুটিপোকার রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার, পচন-ক্রিয়ার কারণ নির্ণয় এবং সহজে পচনশীল খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের সূত্র-সন্ধান লুই পাস্তুরকে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও জীবাণুবিদের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের প্রতিবন্ধকতা, এমনকি প্রিয় বন্ধুবান্ধব ও এ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সের বিপক্ষীয় সদস্যগণের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নির্ভীক চিত্তে একক সাধনার দ্বারা পাস্তুর তাঁর গবেষণা-কার্য চালিয়ে গেছেন এবং জীবিত কালেই গবেষণার অসামান্য সাফল্যের দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের মুখ চিরবন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পশুরোগের কারণ ও প্রতিষেধক আবিষ্কারের গবেষণায় যখন তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, তখন অনেকেই তাঁর কার্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু একক সাধনার দ্বারা পাস্তুর যে সকল তথ্য আবিষ্কার ও প্রমাণিত করেছিলেন, তার ফলে সংশয়বাদীদের সংশয় অমূলক, ভ্রান্ত পথচালিত প্রতিপন্ন হয়েছিল। নীচের চিঠিখানি গবেষণা-কার্যের সাফল্যের বার্তা জানিয়ে পরিবারবর্গের উদ্দেশ্যে লেখা। পত্রটির মধ্যে এমন এক সরল হৃদয়ের পরিচয় আছে, যা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-তপস্বীর পক্ষেই সম্ভব।]

২রা জুন, ১৮৮১

আজ সবে মাত্র বৃহস্পতিবার, কিন্তু এর মধ্যেই চিঠি লিখতে বসেছি। গবেষণায় এক বিরাট সাফল্য লাভ হয়েছে। মিলান থেকে তারবার্তায় সে খবর পাওয়া গেল। গত মঙ্গলবার, ৩১শে মে তারিখে টিকা দেওয়া ও টিকা না-দেওয়া প্রত্যেক ভেড়ার দেহে মারাত্মক প্লীহা-জ্বরের জীবাণু প্রবিষ্ট করান হয়। আটচল্লিশ ঘণ্টার আগেই টেলিগ্রাম-বার্তায় জানতে পারলাম, আজ বিকেলে দু'টোর সময় যখন সেখানে পৌঁছব, টিকা না-দেওয়া সবগুলি ভেড়াই প্রাণত্যাগ করেছে দেখতে পাব। এর মধ্যেই আঠারটি মারা গেছে এবং বাকি ক'টিও মরণাপন্ন। কিন্তু টিকা দেওয়া সব ক'টিই সুস্থ আছে। 'অভূতপূর্ব সাফল্য'—এই মন্তব্যের দ্বারা শেষ হয়েছে টেলিগ্রামটি। তারটি পাঠিয়েছেন পশু-চিকিৎসক সার্জ্জন এম. রসিনল।

অবশ্য চূড়ান্ত রায় প্রদানের সময় এখনও আসেনি। টিকা দেওয়া ভেড়াগুলি এখনো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু রবিবার অবধি যদি সব ভাল ভাবে যায়, তবে অনুমান করা যেতে পারে যে, আর তাদের অসুখ করবে না। এ সাফল্য সত্যিই বিস্ময়কর। মঙ্গলবার চূড়ান্ত ফলের জন্য আর একবার পরীক্ষা করা হয়েছিল। শনিবার ও রবিবার টিকা দেওয়া পঁচিশটি ভেড়া থেকে দু'টিকে এবং টিকা না-দেওয়া অন্য পঁচিশটি থেকে আরো দু'টিকে নির্বাচন করে আবার তাদের দেহে মারাত্মক বীজাণু প্রবেশ করান হয়। মঙ্গলবার সকল পরীক্ষক যখন উপস্থিত হলেন, দেখা গেল টিকা না-দেওয়া ভেড়া দু'টি মারা গেছে, কিন্তু অন্য দু'টি দিব্যি সুস্থ আছে।

আমি তখন উপস্থিত ভেটারনারী সার্জ্জনদের এক জনকে বললাম—'আপনারই নামে সই-করা খবরের কাগজে কি পড়েছিলাম না?' 'তা সত্যি'—তিনি সুবোধের মত মেনে নিলেন। 'কিন্তু আমি আমার মত বদলেছি—আমি অনুতপ্ত পাপী।' আমিও তক্ষুনি বললাম—'সুসমাচারের বাণী স্মরণ করুন। নিরানব্বই জন সাধু ব্যক্তি অপেক্ষা এক জন পাপী যদি অনুতাপ করে, স্বর্গে অধিকতর জয়োল্লাস ওঠে।' উপস্থিত আর এক জন সার্জ্জন বললেন—'মিঃ কলিন নামক আর এক জন ভদ্রলোককে নিয়ে আসব।' এর উত্তরে আমি বললাম—'মিঃ কলিন প্রতিবাদের জন্যই শুধু প্রতিবাদ করেন এবং বিশ্বাস করবেন না বলেই বিশ্বাস করেন না। স্নায়ু রোগের চিকিৎসা যার করতে হবে, আপনি তার কি করতে পারেন?' প্রয়োগশালা ও গৃহে আনন্দোৎসব চলুক। তোমরা সবাই আনন্দ কর।

[টমাস হেনরী হাক্সলী একদা মন্তব্য করেছিলেন যে, পশুরোগ ও মুরগীর কলেরার প্রতিষেধক আবিষ্কারের মূল্য যদি অর্থের মাপ-কাঠিতে যাচাই করতে হয়, তবে ফরাসী-জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্স যে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল জার্মানীকে, তার চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান বলতে হবে এ আবিষ্কার। কিন্তু লুই পাস্তুর এই আবিষ্কারের খ্যাতি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেননি। তাঁর সর্বশেষ কীর্তি জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার। এই উদ্দেশ্য নিয়েই পাস্তুর ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল। এইখানে এমন এক জন লোক কাজ করত যাকে কিশোর বয়সে পাগলা কুকুরে কামড়েছিল। তার উপর দিয়েই পাস্তুর প্রথম পরীক্ষা করেন তাঁর ওষুধ। পাস্তুর ইনস্টিটিউট উদ্বোধনের দিন যুদ্ধ ও বিজ্ঞানের তুলনা করে পাস্তুর মন্তব্য করেছিলেন—'বিজ্ঞান একটি মাত্র জীবনকে সব-কিছুর ঊর্ধ্বে আসন দেয়, আর যুদ্ধ একটি মানুষের দুরাকাংখাকে সহস্র সহস্র মানুষের বলিদানের মধ্য দিয়ে সফল করবার চেষ্টা করে।'

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অন্তিম শয্যায় শায়িত পাস্তুর প্রিয় ছাত্রদের ডেকে বলেছিলেন—'কোথায় তোমরা? কি করছ? কাজ কর, কাজ কর।']

'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট'-এর রূপ ও রীতি

শ্রীমনকুমার সেন

অধুনা ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের কেহ কেহ ভারত-রাষ্ট্রের আদর্শরূপে 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট' প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিতেছেন। বস্তুতঃ কংগ্রেসের গত নাসিক অধিবেশনে এইরূপ একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই প্রস্তাবের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতের রাষ্ট্রাদর্শ কি, তাহা নূতন করিয়া ব্যাখ্যানের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অনুগামিগণ সহস্র বার এ কথাই বলিয়াছেন যে, 'শ্রেণীহীন শোষণহীন গণতন্ত্র'ই ভারতীয় রাষ্ট্র-সাধনার অভীষ্ট। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট'-এর আমদানি শুধু অনর্থকই নয়, অবাঞ্ছনীয়ও বটে। কৃষক-মজদুর-রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প অবশেষে 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট' নামীয় ভ্রান্তির অনুকূলে পরিত্যক্ত হইল কি না, এই জিজ্ঞাসাই বহু জনের মনে জাগিবে। বাস্তবিক পক্ষে, আমাদের মূল রাষ্ট্রাদর্শের সঙ্গে ওয়েলফেয়ার ষ্টেট-এর প্রচলিত সংজ্ঞার কুত্রাপি সঙ্গতি না থাকায় বরং এতদ্বারা ভ্রান্ত মনোভাব সৃষ্টিরই অবকাশ ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা। বিদেশ এবং বিদেশীর সঙ্গে তুলনামূলক নির্বিচার দোহাই তুলিবার ঝোঁক আবার নূতন করিয়া এক শ্রেণীর দায়িত্বশীল ভারতীয়ের মধ্যে দেখা যাইতেছে, যাহার ফলে আমাদিগকে শুনিতে হয় যে, অমুক অমুক দেশে ট্রেণ দুর্ঘটনার সংখ্যা অত পার্সেণ্ট বেশী, ভারতে রেলের ভাড়া অমুক অমুক দেশ হইতে এত পার্সেণ্ট কম, অমুক অমুক দেশের রেশন বরাদ্দ হইতে ভারতের রেশন বরাদ্দ গড়ে এত ছটাক অধিক ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্য হইলেও এবম্বিধ দোহাই তোলা একটা দুর্লক্ষণ বলিয়াই বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের দেশের আচার-বিচার অবস্থা-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই নূতন কর্ম্মনীতি ও সম্পূর্ণ নূতন রাষ্ট্রাদর্শ মনীষী মহাপুরুষগণ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আমরাও তাহাই সম্মুখে রাখিয়া রাষ্ট্রজীবন বিকাশের পথে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পাইতেছি। আমাদের আদর্শ অতীব দুঃসাধ্য হইতে পারে, আধুনিক পণ্ডিতম্মন্যগণ উহাকে অলীক বলিয়াও ভাবিতে পারেন। তথাপি গৃহীত কর্ম্মপন্থা ও তাহার অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রতি যদি অবিচল আস্থা থাকে, তবে আমাদের উক্তি-প্রত্যুক্তি-ঘোষণাদির সম্পূর্ণরূপে তাহার সহিত সামঞ্জস্য থাকাই সঙ্গত। আমেরিকার ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র, বৃটেনের পুঁজিবাদী 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট' কিম্বা রাশিয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাযুক্ত রাষ্ট্রশক্তি—উহার কোনটিই যে ভারতীয় আদর্শ ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত নহে, উহার কোনটিই যে ভারতের অভিপ্রেত নহে, আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের ঘোষণায় এবং নূতন ভারতীয় সংবিধানের সঙ্কল্পবাক্যে প্রকারান্তরে তাহাই স্পষ্ট করিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট' প্রভৃতির ব্যবহারে সতর্ক হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট'-এর তাৎপর্য্য ঃ 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট' কথাটি অতি সহজ ও সরল অর্থবোধক,—উহার অর্থ বলা যায়—'জনকল্যাণ রাষ্ট্র'; কিন্তু এই 'জনকল্যাণ রাষ্ট্র' কথাটির তাৎপর্য্য সুদূর-প্রসারী। টম্যান-এ্যাটলি-ষ্ট্যালিন-হিটলার-মুসোলিনী প্রমুখ রাষ্ট্র-নেতাগণের প্রত্যেকের অভিধাতেই নিজ নিজ রাষ্ট্র জনকল্যাণ রাষ্ট্ররূপে প্রতিভাত; কিন্তু রাষ্ট্রের জনসাধারণের জীবনকে গুঁড়াইয়া পিষাইয়া—কোথাও ক্ষমতার অভিসন্ধিতে সিদ্ধ করিবার জন্য, কোথাও বা একটা উদ্ধত আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য—হিটলার-মুসোলিনীর রাষ্ট্রযন্ত্র মুহূর্ত্ত কালের জন্য উল্কাবেগে আত্মপ্রকাশ করিয়া আবার আত্মবিলোপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'এক নায়ক' কিম্বা 'এক দল' রাষ্ট্রের যাবতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে করায়ত্ত করিলে যে বিষমতা ও বিভেদের সৃষ্টি হয়, তাহারই মুখে রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য। সুতরাং হিটলার-মুসোলিনীর ন্যায় অসীম শক্তিধরগণের 'জনকল্যাণ রাষ্ট্র'ও যথার্থ কল্যাণকর কর্ম্মনীতির অভাবেই ইতিহাসের পাতা হইতে দ্রুত মুছিয়া গেল। ইহা তো গেল 'জনকল্যাণ রাষ্ট্রের' আভিধানিক ও রাজনৈতিক অর্থ; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যুক্তরাজ্য বা বৃটেনকেই সমসাময়িক বুদ্ধিজীবি সমাজ একমাত্র আদর্শ 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট'রূপে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার কারণ, রাষ্ট্র-জীবনে জনকল্যাণমূলক সরকারী পরিকল্পনার প্রবর্ত্তনে বৃটেনই সর্ব্বাধিক প্রয়াস পাইয়াছে। জনসাধারণের কল্যাণমানসেই সরকারী অর্থব্যয়ে বৃটিশ নাগরিকের জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি ('from cradle to grave') কতকগুলি বিশেষ নিরাপত্তামূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে 'পুয়োর ল' প্রবর্তন হইতে শুরু করিয়া অদ্যাবধি নাগরিকের নিরাপত্তামূলক কতকগুলি বিশেষ সরকারী ব্যবস্থার সাহায্যে বৃটিশ সরকার ক্রমেই নাগরিক-জীবনে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মধারাকে প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে। ১৮৩৩ সালে নূতন শিক্ষা আইন ১৮৯৬ সালে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯০৮ সালে বৃদ্ধ বয়স পেন্সন আইন, ১৯১১ সালে প্রথম জাতীয় বীমা আইন প্রমুখ সরকারী বিধানের ফলে নাগরিক-জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে এবং তাহার ফল হয়ত ভালই হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, এইরূপ সরকারী ব্যবস্থায় শুধু ব্যাধির উপশমই হয়, মূলোচ্ছেদ হয় না। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব্বে ভাবা প্রয়োজন, আদৌ সমাজের তথা নাগরিক-জীবনের নিরাপত্তার অভাব হইবে কেন? কার্য্যত এই অভাবই দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সরকারকেও বিবিধ আইনানুগ ব্যবস্থা ও বিপুল অর্থ-সাহায্যের দ্বারা এই অভাব পূরণে অগ্রসর হইতে হইতেছে। রোগীর চিকিৎসা যদি সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন তাহার প্রশংসা করা চলে, তবে আদৌ রোগ যাহাতে দেহে প্রবেশ করিতে না পারে, তদনুযায়ী ব্যবস্থায় সরকার উদ্যোগী হইলে সেই সরকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাইবার অধিকারী। বুঝিতে হইবে সেই সরকারের দৃষ্টি দূরপ্রসারী, সরকারী নিদান একেবারে গোড়ার গলদ ধরিয়া।

বৃটেন ও আমেরিকার অবস্থা ঃ বৃটেন এবং আমেরিকাকে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শীর্ষদেশে আসীন বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এই উভয় দেশেই ব্যক্তিগত শিল্প-প্রচেষ্টা ও ও মুনাফাবৃত্তির অবাধ সুযোগ বর্ত্তমান। উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লব উৎপাদন ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন আনিয়াছে এবং যাহার ফলে যন্ত্রনির্ভর কারখানা-শিল্পের ব্যাপক প্রসার

ঘটিয়াছে, তাহাতে ব্যক্তির উদ্যোগে উৎপাদন ও প্রায় সীমাহীন মুনাফা অর্জ্জনের সুযোগ বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহারই সঙ্গে স্বাভাবিকরূপেই সরকারী রাজস্ব-তহবিলও স্ফীত হইয়াছে, এবং এই স্ফীতকায় তহবিলের সাহায্যে উভয় দেশের সরকার বিবিধ সরকারী পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপের সুযোগ পাইয়া আসিতেছেন। যদিও শিল্পোন্নতির বিচারে আজ আমেরিকা বৃটেনকে বহু দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে, 'ওয়েলফেয়ার স্কীম'এর হিসাবে কিন্তু আমেরিকা বৃটেনের পশ্চাদ্বর্ত্তী। এইরূপ বিপুল শিল্প-সমৃদ্ধি উভয় দেশের বহির্জীবনে এমন একটা চমকের সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে স্বতঃই মনে হয়, বুঝি বা উক্ত দেশদ্বয়ের প্রত্যেকটি লোকই সুখী ও সঙ্গতিপন্ন! এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যন্ত্র-বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতি শ্রমিকের মূল্যে অবনতি বা শ্রমিক-চাহিদায় অভাব সৃষ্টি করিতেছে, ফলে শিল্প-ব্যবসায়ের চরম উন্নতি হইলেও কদাপি বৃটেন, আমেরিকা তথা পৃথিবীর কোন দেশই কেন্দ্রীভূত শিল্পনীতি অক্ষুন্ন রাখিয়া বেকার-সমস্যার ষোল আনা সমাধান করিতে পারিবে না।

সরকার প্রবর্ত্তিত 'পূর্ণ কর্ম্মসংস্থান নীতি' (full employment policy) ব্যাপক ভাবে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও বৃটেনের বেকার-সমস্যার তীব্রতা মোটেই উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস পায় নাই। গত দুই যুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী কালে বৃটেনের বেকার শ্রমিকের হার ছিল মোট শ্রমিক-সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ হইতে ২২ ভাগ পর্য্যন্ত। ১৯৩১—৩৩ সালে গড়ে শতকরা ২১·৩ জন এবং ১৯৩৫—৩৮ সালে ১৩·১ জন শ্রমিক ছিল বেকার। অর্থনৈতিক দিক্ হইতে শেষোক্ত সময়টি অপেক্ষাকৃত সুসময়রূপে কাটিলেও এই সময়েও মোট শ্রমিক-সংখ্যার শতকরা ১৩ জনেরও অধিক বেকার থাকা রীতিমত কঠিন সমস্যার বিষয় বলিতে হইবে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ কালেও বৃটেনের শ্রমিক-বেকারের সংখ্যা শতকরা ১০·৩ জন বলিয়া জানা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও এই সমস্যা রীতিমত ভীতিপ্রদ—বিশ্বাস করা কঠিন বৈ কি! ১৯৩১—৩৩ সালে আমেরিকার মোট শ্রমিক-সমাজের শতকরা ২৯·৮ ভাগ বা ১ কোটি ১৮ লক্ষ জন ছিল বেকার; ১৯৩৬—৩৯ সালে ছিল শতকরা ১৬·৩ ভাগ বা ৮৬ লক্ষ জন এবং ১৯৪০ সালেও শতকরা ১৩·৮ ভাগ বা ৭৫ লক্ষ জন। সুতরাং পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় এই বেকার-সমস্যা যে একটা স্থায়ী সমস্যারূপেই রাষ্ট্রের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং যে রাষ্ট্র পুঁজিবাদী প্রথারও পরিবর্ত্তন করিবে না, আবার 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট' আখ্যাটিও পাইতে চাহে তাহাকে অবশ্যই বেকার-বীমার ব্যবস্থা করিয়া গণতন্ত্রের মুখ রক্ষা করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু নিজ হস্তেই যদি কোন রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পথে জনসাধারণের যথোপযুক্ত কর্ম্ম-সংস্থানের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত করিয়া পুনরায় জনগণেরই অর্থে কর্ম্মহীনের জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করে, তবে তাহার 'ওয়েলফেয়ার' বুদ্ধি বা দূরদর্শিতার প্রসংসা করা কঠিন নহে কি?

ইহা তো বেকারের বীমা প্রসঙ্গে—অন্য দিকের সমস্যাও আছে, যাহা আরও বহু গুণ মারাত্মক অথচ আধুনিকতার মায়াঞ্জন যাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বেকারের বীমা সংস্থানের ন্যায় অসুস্থ, উন্মাদ প্রভৃতি শ্রেণীর নাগরিকের জন্যও ওয়েলফেয়ার ষ্টেটগুলিকে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করিতে হয়। একমাত্র মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এত অধিক যে, শুধু তাহার কথা ভাবিলেও সুস্থ মানুষের মন অসুস্থ হইবার কথা। শহরকেন্দ্রিক অসুস্থ কারখানা-শিল্প সমগ্র দেশের আবহাওয়াকে এতই দূষিত, অসুস্থ ও পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে যে, সভ্যতার এই অবদানের কথা ভাবিলে বিস্মিতই হইতে হয়। আমেরিকার বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মধ্যে মানসিক ব্যাধির প্রকোপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। জানা যায়, একমাত্র আমেরিকার নিউ ইয়র্ক ষ্টেটেই প্রতি ২২ জনে এক জন উন্মাদাগারের রোগী। বিভিন্ন হাসপাতালে মানসিক দুর্ব্বলতাগ্রস্ত রোগী এবং সম্পূর্ণ মানসিক বিকারগ্রস্ত বা উন্মাদ রোগীর সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে ৮১ হাজার এবং ৪০ হাজার। প্রায় ৪ লক্ষ ছেলেমেয়ের জন্মগত বুদ্ধিবৃত্তি এত অপরিপুষ্ট যে, বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করিতেও তাহাদের কষ্ট হয়। সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যক্ষ্মা রোগী যত জন, তাহার প্রায় আট গুণ অধিক রোগী হইতেছে মানসিক পঙ্গুতাজনিত। কর্ম্মী সমাজের দেহে ও মনে কেন্দ্রীভূত কারখানা উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারা যে অস্বাভাবিক ও অপরিমিত চাপ পড়িতেছে, তাহাই এবম্বিধ মানসিক বিকারের কারণ বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই জাতীয় বিকারগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসার সরকারী ব্যবস্থা থাকিলেই আমেরিকাকে 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট'-এর আখ্যায় ভূষিত করা চলে কি না, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। মানসিক বিকৃতির মূলোচ্ছেদ না ঘটাইয়া এইরূপ বিপরীত ব্যবস্থা দ্বারা আমেরিকা প্রকৃতই 'ওয়েলফেয়ার' করিতেছে, না 'ওয়েলফেয়ার'-এর বিরুদ্ধতা করিতেছে তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিবার নীতিকে আমরা সুনীতি বলিব, না দুর্নীতি বলিয়া নিন্দা করিব? আমেরিকা পুঁজিবাদের উৎস, পুঁজিবাদিগণের নিরঙ্কুশ স্বর্গরাজ্য। তথায় পুঁজিবাদীগণ প্রভূত মুনফা অর্জ্জন করিতেছেন, সরকার তাহাদের উপর হইতে মোটা কর আদায় করিতেছেন, এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের যে মানসিক বিকৃতি ঘটিতেছে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমরা বিশেষ ভাবে বেকার-ব্যাধি এবং মানসিক ব্যাধির কথা উল্লেখ করিতেছি বলিয়া অপরাপর ব্যাধির তথায় উচ্ছেদ হইয়াছে, এরূপ মনে করিলে ভুল করা হইবে। বস্তুতঃ কারখানা-শিল্পের ধোঁয়া যে দেশে যত প্রবল, যত ব্যাপক, সেই দেশের জনগণের আধি-ব্যাধির বহরও ততই বেশী। তবে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সরকারী ব্যবস্থায় ব্যাধির চিকিৎসারও চেষ্টা হয়—ইহাই যা সান্ত্বনা!

ভারতের অবস্থাঃ ভারতে আমরা যেমন কেন্দ্রীভূত বা পুঁজিবাদী উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্য উন্নতিলাভ করিতে পারি নাই, তেমনি বিকেন্দ্রিক উৎপাদনেও এ যাবৎ কোন নূতন পথের কার্য্যকরী ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই। বৃটেন-আমেরিকার রোগ সৃষ্টি করিয়া রোগীর জন্য হাসপাতাল করিবার ক্ষমতা আছে, আমাদের উহার কোনটাই নাই। কিন্তু তজ্জন্য রোগ বসিয়া নাই, বেকার-রোগীর সংখ্যাও ক্রমবর্দ্ধমান! বস্তুতঃ আমেরিকা-বৃটেনের অনুকরণে বৃহৎ কেন্দ্রীভূত শিল্পের পথে আমাদের দেশেও বেকারসংখ্যা ক্রমেই পূর্ব্বাপেক্ষা

বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহাই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিমত। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জির মতে, ভারতে ১৯১১ সাল ও ১৯৩৬ সালের মধ্যে কারখানার সংখ্যা ২ হাজার ৭ শত হইতে ৯ হাজার ৩ শততে দাঁড়ায়, আর এই ২৫ বৎসরে কারখানা-শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমিক-সংখ্যায় শতকরা ১১ ভাগ হইতে শতকরা ৯·৪ ভাগে এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪·৫ ভাগ হইতে শতকরা ৫ ভাগে দাঁড়ায়। ওয়ার্ধার অধ্যক্ষ শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের হিসাবে দেখা যায়, ১৯৪১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী মোট লোকসংখ্যা ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষের মধ্যে বিবিধ কর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ জন এবং তন্মধ্যে উক্ত বৎসরে মাত্র ১৬ কোটি ৮০ জনের কর্ম ছিল, ২ কোটি ৭০ জন ছিল কর্মহীন বা বেকার। আংশিক কর্মে নিযুক্ত লোকের হিসাব ধরিলে উক্ত বৎসরে বেকার-শ্রমিকসংখ্যা দাঁড়ায় অন্যূন ২ কোটি। তদুপরি রহিয়াছে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ কৃষক—যাঁহাদের বৎসরে গড়ে ৫ মাস বেকার থাকিতে হয়। কাজেই আমাদের সমস্যা কয়েক সহস্র বা কয়েক লক্ষ বেকার লোকের বীমা নহে, কয়েক কোটি লোকের কর্ম-সংস্থান, জীবন যাপনের ব্যবস্থা। অগ্রে লোকসংখ্যার বৃহত্তর অংশের কর্মসংস্থান হইলে, তাহাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার স্বাভাবিক নিয়মে ব্যবস্থা হইলে তবেই শুধু অবশিষ্ট অংশের জন্য সরকারী নিরাপত্তামূলক ও সাহায্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করার চেষ্টা হইতে পারে। দেশটাকে আগাগোড়া রোগী বানাইয়া তাহার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা করার চিন্তা করাও মারাত্মক রোগের লক্ষণ। কাজেই আমাদের অগ্রে বিবেচ্য বিষয় হইতেছে, রোগীর সংখ্যা যত দূর সম্ভব নিম্ন হারে রাখা। উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার সেই মাপে পৌঁছিবার পরেই শুধু তথাকথিত ওয়েলফেয়ার স্কীমের কথা ভাবা যাইতে পারে।

গঠনমূলক পরিকল্পনায় সরকার : 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট'-এর নাম ধারণ না করিলেও আজিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই কতকগুলি মৌলিক ওয়েলফেয়ার স্কীম বা গঠনমূলক পরিকল্পনায় অগ্রণী হইতে হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার উক্ত খাতে প্রতি বৎসরই মোটা অর্থ বরাদ্দ করিয়া আসিতেছেন। নিম্নবর্ণিত হিসাবে এই বরাদ্দের একটা ফিরিস্তি পাওয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব ইহাতে ধরা হয় নাই, শুধু বিভিন্ন রাজ্য-সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, সমবায় প্রভৃতি বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহারই মোট অঙ্ক সন্নিবিষ্ট হইল :

(হাজার টাকার হিসাব)

	গঠনকর্মে ব্যয়	মোট ব্যয়	গঠনকর্মে মোট ব্যয়ের শতাংশ
১৯৩৭-৩৮	২৭,১৭,৯১	৭৭,৭০,১১	৩৪·৯৮
১৯৩৮-৩৯	২৮,৭১,০৮	৮০,৫১,৭২	৩৫·৬৬
১৯৩৯-৪০	২৯,৭৫,৬৬	৮৩,৩৪,১৬	৩৫·৭০
১৯৪০-৪১	৩১,২৭,৩৬	৮৮,২৯,৪৩	৩৫·৪২
১৯৪১-৪২	৩৩,৪০,৩৫	৯৫,৯২,২১	৩৪·৮২
১৯৪২-৪৩	২৯,২৪,৯২	৯৬,৫১,৭৪	৩০·৩০
১৯৪৩-৪৪	৪১,০৪,৯০	১,৪৭,৩২,৯৩	২৭·৮৬
১৯৪৪-৪৫	৫২,০৪,৩৭	১,৯২,৫৯,৬২	২৭·০২

(হাজার টাকার হিসাব)

	গঠনকর্মে ব্যয়	মোট ব্যয়	গঠনকর্মে মোট ব্যয়ের শতাংশ
১৯৪৫-৪৬	৫৩,৪১,৫৯	১,৮৩,১৭,৬৫	২৯·৩২
১৯৪৬-৪৭	৬৬,০০,০০	২,০৪,৫৪,০৭	৩২·২৬
১৯৪৭-৪৮	৭৫,১১,৭৮	২,১২,৪৩,৮৮	৩৫·৩৬
১৯৪৮-৪৯	১,০০,১৫,৭৭	২,৫০,৭১,৬৬	৩৯·৯৫
১৯৪৯-৫০	১,৩০,৭০,৭০	২,৯০,৫৭,৪০	৪৪·৯৮
১৯৫০-৫১	১,৩২,০৮,৭৬	২,৮৪,২৮,৮৮	৪৬·৪৬

(বাজেট বরাদ্দ)

ভারত-বিভুক্তি ও তজ্জনিত সমস্যাদির ফলে ব্যয়ের যে মাত্রাধিক বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহাও এই সঙ্গে স্মরণীয়। আবার বিভিন্ন ব্যয়-বহুল গঠনমূলক পরিকল্পনায় সতর্কতা ও দূরদর্শিতার অভাব হেতু বিপুল অপচয়ের কথা অধুনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও সমস্যার অপর একটি দিক প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আজ স্পষ্টই আমরা দেখিতেছি যে, সরকারী গঠনকর্মের ব্যাপকতা সত্ত্বেও দেশের বেকার-সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা ও শিক্ষা-সমস্যা তথা জাতির সামগ্রিক গঠন-সমস্যার এক-শতাংশও আমরা স্পর্শ করিতে সক্ষম হই নাই। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হেতু (পূর্বোল্লিখিত বেকার-সমস্যা সত্ত্বেও) আমেরিকা বৃটেন প্রভৃতি দেশে মাথা-পিছু আয় ভারতের জনসংখ্যার গড়পরতা মাথা-পিছু বার্ষিক আয় (১৯৪৭) অপেক্ষা কত বেশী, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় :

আমেরিকা	:	৪৬৪৩৲	অষ্ট্রেলিয়া	:	২১৬০৲
কানাডা	:	২৮২৬৲	সিংহল	:	৩০০৲
ডেনমার্ক	:	২৬৪৭৲	ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	:	২২৮৲
বৃটেন	:	২৩৫৬৲	পাকিস্থান	:	২২৫৲
			ভারতবর্ষ	:	২১৬৲

সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনীতির বীভৎসতাকে স্বীকার করিয়া লইলেও সরকারী রাজস্ব আদায়ের বা আয়বৃদ্ধির ক্ষেত্র ভারতে এখনও কত সঙ্কীর্ণ তাহা সহজেই উল্লিখিত তথ্য দৃষ্টে উপলব্ধি করা যাইবে। আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি দেশের সরকার পুঁজিবৃদ্ধতায় বাধার সৃষ্টি না করিয়াও 'ক্রমবর্দ্ধিত হারে কর আদায়ের ('progressive taxation policy without hindering capital formation') নীতি' বলবৎ করিতে পারিয়াছেন, ভারত সরকার সে সুবিধা হইতেও বঞ্চিত। সরকারী ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রেও ভারত আর বৃটেনের অবস্থার বিপুল পার্থক্য। বৃটেনের আয়তন অবিভক্ত ভারতের মাত্র এক-অষ্টমাংশ, আর সেই অনুপাতে এক জন বৃটিশের আয় এক জন ভারতীয় অপেক্ষা প্রায় ৭।৮ গুণ বেশী। রাষ্ট্রের নাগরিক-সমাজ সমৃদ্ধ না হইলে, তাহাদের যথোপযুক্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকিলে সরকার কেবল মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি বা লগ্নীকারকের উপর কতটুকু নির্ভর করিতে পারেন? উপরন্তু, পুঁজিপতি হইলেও বৃটিশ-পুঁজিপতিগণের নিজ দেশের উপরেও খানিকটা দরদ আছে, ভারতীয় পুঁজিপতিগণের তাহাও নাই, তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থই এক এবং অদ্বিতীয় স্বার্থ এবং এই স্বার্থেরই প্রেরণায় সরকারী ঋণে অর্থ লগ্নী করা অপেক্ষা

তাঁহারা অবৈধ পথে অধিক সুদের চিন্তাকেই অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন। দেখা যায়, ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সরকার ২ হাজার ৫ শত কোটি পাউণ্ড ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, আর তাহার আট গুণ আয়তনযুক্ত ভারতের সরকার উক্ত বৎসরেই সর্বসাকুল্যে পাউণ্ডের হিসাবে ১ শত কোটি পাউণ্ডের অধিক মূল্যের টাকা ঋণরূপে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটা উচ্চ মার্গে পৌঁছিতে পারিলেও যদি বা বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যাইত এবং তদ্দ্বারা 'ওয়েলফেয়ার স্কীমে' হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইত, বর্তমানে ভারত সে সুযোগ হইতেও বঞ্চিত। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, শিল্পোন্নতির নামে দেশের কোটি কোটি মানুষের ধন-সম্পদ জন কয়েক কোটিপতির হাতে কয়েক শত কারখানার গণ্ডীতে আবদ্ধ করিবার সুযোগ দেওয়া মারাত্মক। এইরূপ কেন্দ্রীভূত শিল্পনীতির বিষময় পরিণাম আজ আমরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যেই লক্ষ্য করিতেছি। সুতরাং এই নীতিতে দেশকে শিল্প-ব্যবসায়ে সমুন্নত করিয়া দেশের আর্থিক সঙ্গতি বাড়াইব এবং ওয়েলফেয়ার স্কীমের জন্যও তখন অর্থসংস্থানে অসুবিধা হইবে না এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি যেন আমরা বর্জন করিতে পারি। বস্তুতঃ পুঁজিবাদ বজায় রাখিয়া 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট'রূপে নাম জাহির করার মধ্যে সততা নাই, আছে বঞ্চনা ও বুদ্ধির বিকৃতি। শিল্পোন্নত দেশগুলি শুধু পুঁজিবাদের সমর্থন করিয়াই ওয়েলফেয়ার স্কীম-এর অর্থ সংগ্রহ করিতেছে এমন নহে, অপরাপর অবাঞ্ছিত পথেও সরকারী রাজস্ব আদায়ের সর্ববিধ প্রয়াস চলিতেছে। 'ওয়েলফেয়ার স্কীম' বা জনকল্যাণকর পরিকল্পনা প্রবর্তনের জন্য যদি জনগণের সর্বনাশকর পরিকল্পনায় অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তবে তেমন 'ওয়েলফেয়ার' অপেক্ষা জনগণকে মরিতে দেওয়াও শ্রেয়ঃ। সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ মিঃ জি, ডি, এইচ, কোল তাঁহার অধুনা-প্রকাশিত 'British Social Services' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, ১৯৪৬ সালে বৃটিশ সরকার বৃটেনে খাদ্য সরবরাহ ও অন্যান্য 'ওয়েলফেয়ার স্কীম' খাতে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ৩৬ কোটি পাউণ্ড, আর 'it was getting back much more than it was paying out by high taxation on beer, tobacco and other non-necessaries that are widely consumed by the working people.' আমরাও কি এইরূপ অনাবশ্যক ও অহিতকর দ্রব্যাদির জনপ্রিয়তার দ্বারা সরকারী তহবিল স্ফীত করিয়া 'ওয়েলফেয়ার স্কীম' চালাইব? অপর এক জন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ Mr. Malane এই প্রসঙ্গেই বলিতেছেন: "In short the continuation of the Welfare State which is intruded to improve the physical, mental and moral condition of the average citizen depends, to a decisive extent, upon his continuing to drink, smoke, gamble and go to the cinema." যাহার মোট অর্থ হইতেছে এই যে, যে নাগরিকের দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক কল্যাণ করাই 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেটের' আদর্শ, ষ্টেট অর্থ সংগ্রহের জন্য সেই নাগরিককেই মদ্যপান, জুয়া প্রভৃতিতে প্রেরণা দিতেছে! আমাদের রাজ্যগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঘোষিত নীতি ও আদর্শ বজায় রাখিয়া চলিতে পারিলে স্বাভাবিক নিয়মেই সমগ্র ভারতীয় অর্থনীতি একটা সংহত ও সমৃদ্ধ রূপ লাভে সমর্থ হইবে। ভারতীয় সংবিধানের 'directive principles' অধ্যায়ে রাজ্যগুলির কর্মনীতির নির্দেশ স্পষ্ট ভাবেই উল্লিখিত আছে এবং বিকেন্দ্রিক নীতিকে কেন্দ্র করিয়াই যে এই কর্মনীতি উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাও সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু কার্যতঃ রাজ্যগুলি উহাকে কতটুকু অনুসরণ করিতেছে? আজ অবধি বিকেন্দ্রিক পন্থায় উৎপাদন ও বণ্টনের কোন নব-জাগরণ লক্ষ্য করা যাইতেছে কি? গতানুগতিক কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় জনগণের আর্থিক জীবনের মান উন্নত হইবে কিরূপে, সরকারই বা তাঁহাদের জনকল্যাণ পরিকল্পনা চালু করিবার উপযোগী অর্থ পাইবেন কোথা হইতে? 'ওয়েলফেয়ার'-এর মূল আদর্শ স্বীকার করিয়া লইয়াও আমরা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি, আর সেই বিরুদ্ধাচরণের ফলে দেশ ও সমাজব্যাপী যে ব্যাপক রোগ-শোকের উদ্ভব হইতেছে, তাহা নিরাময়ের জন্য পুনরায় বিদেশী রাষ্ট্রের ছাঁচে আদর্শ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আমদানি করিতেছি!—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্?

বাক্-সংযম

কলকাতা শহরের এক পল্লীতে এক জন সাহিত্যিকের বাস। তাঁর গৃহের এক ঘরে প্রায়ই সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-রসিকদের মিলন হয়। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, সাহিত্যালোচনা। এক দিন সায়াহ্নে আগন্তুকরা এসে দেখলেন আলোচনার ঘরের দেওয়ালে একটি লিপি টাঙানো রয়েছে। লিপিতে লেখা রয়েছে, "পেন্সিল কাটিতে যাইয়া হাতের আঙুল কাটিয়া ফেলিয়াছি। টিন্‌চার আইওডিন দেওয়া হইয়াছে। ভয়ের কিছু নাই।"

আগন্তুকরা ঐ লিপি পাঠের শেষে ঘরের মালিকের প্রতি দৃকপাত করেন। দেখেন সত্যিই আঙুলে ব্যাণ্ডেজ। এই সাহিত্যিক আর কেউ নন, গড্ডালিকা, কজ্জলী ও হনুমানের স্বপ্নের রচনাকার শ্রীরাজশেখর বসু, যাঁর ছদ্মনাম 'পরশুরাম'।

সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

আত্মারাম—টীকাকার। গ্রন্থ—কামন্দকীয়টীকা, গীতগিরীশটীকা, নাগানন্দটীকা, মহাবীরচরিতটীকা, বিদগ্ধমুখমণ্ডনটীকা, বৃত্তরত্নাকরটীকা, শালিবাহনসপ্তশতীটীকা।

আত্মারাম মুখোপাধ্যায়—কবি। নিবাস—নবদ্বীপ। গ্রন্থ—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

আত্মারাম ব্যাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চণ্ডীমাহাত্ম্যটীকা।

আদিত্যরাম—কবি। কাব্যগ্রন্থ—স্যমন্তকমণিহরণ (বা কৃষ্ণবিজয়)।

আদিত্য সূরি—জৈন জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—কালাদর্শ।

আদিত্যাচার্য—ধর্মগ্রন্থকার। নামান্তর—কোশিকাচার্য। গ্রন্থ—অশৌচনির্ণয়' বা 'বড়্নীতি'।

আন্‌বার খাঁ—কবি। জন্ম—১৭২৩ খৃঃ। গ্রন্থ—'সতসঈ' বিহারীলাল-কৃত) টীকা—আন্‌বারচন্দ্রিকা।

আনন্দকৃষ্ণ বসু—সাহিত্যিক। জন্ম—১৮২২ খৃঃ কলিকাতা। মৃত্যু—১৮৯৭ খৃঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর। পিতা—মদনমোহন বসু। শিক্ষা—হিন্দু কলেজ। ইনি 'শব্দকল্পদ্রুমে' ও 'বিশ্বকোষে' বহু প্রবন্ধ লেখেন।

আনন্দ গিরি—গ্রন্থকার। শ্রীশঙ্করাচার্যের শিষ্য। গ্রন্থ—শঙ্কর-বিজয়, সূত্রভাষ্য, উপনিষদ্‌ভাষ্য।

আনন্দচন্দ্র কান্তগিরি—গ্রন্থকার। নিবাস—মালদহ। গ্রন্থ—মানব-জন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা, ১ম ও ২য় ভাগ (মালদহ, ১৮৬৯), Theory and Practice of Midwifery (১৮৬৮)।

আনন্দচন্দ্র দেব—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রত্নভাণ্ডার (কুমিল্লা, ১৯০১)।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ—অনুবাদক। গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ (মুক্তরাম বেদান্তবাগীশ সহ—১৮৫৫—৬৫ খৃঃ), তাণ্ড্যব্রাহ্মণম্ (কলি, ১৮৬৯—৭৪ খৃঃ, পৃঃ ১৮৪২), পঞ্চদশী (১৩২৪, পৃঃ ৫৬৩)।

আনন্দচন্দ্র মিত্র—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৩ বঙ্গ বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে। মৃত্যু—১৩১০ বঙ্গ। গ্রন্থ—হেলেনাকাব্য, মিত্রকাব্য, প্রেমানন্দ, ভারতমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, প্রবন্ধসার, ভিক্টোরিয়া-গীতিকা (১৯০১), বাল্যকবিতা, পদ্যসার, পাঠসার, গল্পশিক্ষাসার।

আনন্দচন্দ্র শিরোমণি—কবি ও পাঁচালীকার। জন্ম— ১২১০ বঙ্গ, ভট্টপল্লী। মৃত্যু—১৮৮৭ খৃঃ। পিতা—কাশীনাথ বিদ্যাবাচস্পতি। পাঁচালী গ্রন্থ—সুবল-সংবাদ, অক্রূর-সংবাদ, কলঙ্কভঞ্জন, উদ্ধব-সংবাদ।

আনন্দচন্দ্র সরকার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জ্ঞানাঞ্জন (কলি, ১৮৭৪ খৃঃ)।

আনন্দচন্দ্র সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গৃহস্থের কর্তব্য।

আনন্দ চার্লু, পি—ব্যবহারজীবী ও রাজনীতিবিদ্। জন্ম—১৮৪২ খৃঃ, মাদ্রাজ। মৃত্যু—১৯০১ খৃঃ। রায় বাহাদুর ও নবদ্বীপ হইতে বিদ্যাবিনোদ উপাধিলাভ। ১৮৯১ খৃঃ কংগ্রেস সভাপতি (নাগপুর), সম্পাদক—Peoples Magazine.

আনন্দ তীর্থ—বৈদান্তিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১১১৯ খৃঃ। মৃত্যু—১১৯৯ খৃঃ। গ্রন্থ—কৃষ্ণকর্ণামৃতমহার্ণব, আর্যাস্তোত্র, উপাধিখণ্ডন, উপনিষদ্ সমূহের ভাষ্য ও টিপ্পনী, জয়ন্তীকল্প, তন্ত্রসার, ন্যায়বিবরণ, প্রমাণলক্ষণ, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয় প্রভৃতি।

আনন্দ দাস—পদকর্তা। জন্ম—১৮শ শতাব্দী। গ্রন্থ—জগদীশ-চরিত্রবিজয়।

আনন্দনাথ রায়—সাহিত্যিক। জন্ম—১২৬২ বঙ্গ ফরিদপুর জেলার জেপ্‌সা গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩১ বঙ্গ। পিতা—হরনাথ রায়। গ্রন্থ—ললিতকুসুম (নাটক, ১২৮৮ বঙ্গ—ছদ্মনাম রামকান্ত সেন নামে প্রকাশিত), বারভূঞা (ইতিহাস), ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম, ২য় খণ্ড।

আনন্দ পণ্ডিত—টীকাকার। গ্রন্থ—দেবীমাহাত্ম্যটীকা।

আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর—টীকাকার। গ্রন্থ—ফক্কিকাবিভঞ্জন, ন্যায়চন্দ্রিকা, ভাবশুদ্ধি, সমন্বয়সূত্রবিবৃতি, টীকারত্ন, ন্যায়কল্পলতিকা।

আনন্দবোধ পরমহংস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ন্যায়দীপাবলী, প্রমাণরত্নমালা (টীকা), ন্যায়মকরন্দ, ন্যায়োপদেশমকরন্দ।

আনন্দবোধেন্দ্র সরস্বতী—টীকাকার। গ্রন্থ—যোগবাশিষ্ঠ তাৎপর্য-প্রকাশ।

আনন্দবোধেন্দ্র ভট্টারক—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১২২৮ খৃঃ (আনু)। গ্রন্থ—ন্যায়মকরন্দ, প্রমাণমালা, ন্যায়দীপাবলী, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ-টীকা।

আনন্দ ভট্ট—গ্রন্থকার। জন্ম—১৫শ শতাব্দী। গ্রন্থ—বল্লালচরিত (১৫১০ খৃঃ)।

আনন্দময়ী দেবী—মহিলা কবি। জন্ম—১৭৫২ খৃঃ বিক্রমপুর জপসা গ্রামে। পিতা—লালা রামগতি সেন। স্বামী—অযোধ্যারাম সেন (কবীন্দ্র)। গ্রন্থ—হরিলীলা (লালা জয়নারায়ণ সেন-সহ —১৭৭২ খৃঃ)।

আনন্দমোহন সরকার—গ্রন্থকার। নিবাস—বহরমপুর। গ্রন্থ—প্রাচীন অক্ষরাবলী (A selection of ancient nomenclature—১৮৭১)।

আনন্দরঙ্গ পিলে—ব্যবহারজীবী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৭০৯ খৃঃ মাদ্রাজ প্রদেশের পেরাম্বুরে। মৃত্যু—১৭৬১ খৃঃ। পিতা—তিরুবেঙ্কট পিলে। গ্রন্থ—হিম্মত বহাদুর (মরাঠী ভাষায়), অনুবাদ গ্রন্থ—উগাচী জমানী।

আনন্দরাম চক্রবর্তী—কবি। জন্ম—১৭৭০ খৃঃ শ্রীহট্ট। মৃত্যু—১৮৪০ খৃঃ। গ্রন্থ—পদ্মপুরাণ (কবিতা)।

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৩০ খৃঃ গৌহাটী, আসাম। মৃত্যু—১৮৫৯ খৃঃ। পিতা—হালিরাম ঢেকিয়াল। গ্রন্থ—আইন ও ব্যবস্থা, অসমীয়া লরার মিত্র।

আনন্দরাম বড়ুয়া—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫০ খৃঃ গৌহাটী। মৃত্যু—১৮৮৯ খৃঃ। পিতা—গর্গরায় বড়ুয়া। গ্রন্থ—ইংরেজি হইতে সংস্কৃত অভিধান, সংস্কৃত ব্যাকরণ, মহাবীরচরিতের জানকীরাম ভাষ্য, অমরকোষের টীকা, ধাতুরূপ, Bhavabhuti.

আনন্দরাম মুখ্‌লিস—ঐতিহাসিক। গ্রন্থ—তজ্‌কিরা (১৭৪৮ খৃঃ)। এই গ্রন্থে নাদির শাহের ভারতে অবস্থান-কালের ঘটনা বিবৃত আছে।

আনন্দরাম যাজ্ঞিক—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—যজুর্বেদীয় সংস্কারপদ্ধতি।

আনন্দ রায়—প্রসিদ্ধ কবি। মৃত্যু—১৭৫১ খৃঃ। 'দিবান-ই-সঈদে' ইহার বহু কবিতা আছে।

আনন্দরায় মখী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩শ শতাব্দী। গ্রন্থ—বিদ্যাপতি-পরিণয়, জীবানন্দ।

আনন্দরায় শাস্ত্রী—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। গ্রন্থ—শতকোটিখণ্ডন (ন্যায়গ্রন্থ)।

আনন্দ শর্মা—টীকাকার। পিতা—ত্র্যম্বক। গ্রন্থ—ব্যঙ্গার্থ-কৌমুদী নাম্নী রসমঞ্জরী টীকা।

আনন্দ সিন্ধ—আয়ুর্বেদবিদ্‌। গ্রন্থ—আনন্দমালিকা যোগশাস্ত্র।

আনন্দানুভব আচার্য—টীকাকার। গ্রন্থ—তর্কদীপিকা, ন্যায়-কলানিধি (ন্যায়সারের টীকা), রসদীপিকা (বৈদ্যকগ্রন্থ)।

আনি বেসান্ত (Annie Besant)—বিদুষী ইংরেজ মহিলা। জন্ম—১৮৪৭ খৃঃ ১লা অক্টোবর। মৃত্যু—১৯৩৩ খৃঃ ২০এ সেপ্টেম্বর। পিতা—উইলিয়ম পেজ উড। স্বামী—রেভারেণ্ড ফ্রান্স বেসান্ত। শিক্ষা—প্রবেশিকা (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭১ খৃঃ), বি, এস, সি (লণ্ডন), ডি, এল (বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)। সভাপতি—Indian National Congress (১৯১৭ খৃঃ), Theosophical Society. সম্পাদক—Theosophy (Theosophical Societyর মুখপত্র)। যুগ্ম-সম্পাদক—National Reformer. গ্রন্থ—Introduction to Yoga (মাদ্রাজ, ১৯২৭, পৃঃ ১৪৫), Indian Ideals in Education (কলি, ১৯২৫, পৃঃ ১৩৫), সম্পাদিত গ্রন্থ—Sreemad Bhagawat Gita (মাদ্রাজ, ১৯২২, পৃঃ ২৬৪), Universal Text Books of Religions & Morals, ১ম খণ্ড (লণ্ডন), ২য় খণ্ড (লণ্ডন, ১৯১১), ৩য় খণ্ড (মাদ্রাজ, ১৯১৫)।

আপদেব—দার্শনিক ও মীমাংসক। জন্ম—১৭শ শতাব্দী। পিতা—অনন্তদেব। গ্রন্থ—মীমাংসা ন্যায়প্রকাশ, বালবোধিনী (বেদান্তসারের টীকা)।

আপ্তাবুদ্দিন—বঙ্গীয় মুসলমান কবি। জন্ম—১৮শ শতাব্দী। গ্রন্থ—জামিল দিলারাম (বাংলা ভাষায়)।

আপ্তে, বামন শিবরাম—আভিধানিক গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Students Guide to Sanskrit. Composition (পুনা, ১৮৯০ খৃঃ, পৃঃ ৩৬৩), Sanskrit-English Dictionary (বোম্বাই, ১৯১০), English-Sanskrit Dictionary (বোম্বাই, ১৯১৬)।

আবদর রহমন—গ্রন্থকার। জন্ম—ঢাকা জেলার শরাফৎগঞ্জ। গ্রন্থ—গমের দরিয়া (১২৯০ বঙ্গ)।

আবদুর রউফ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পথের ডাকে, অশ্রু-সেতার।

আবদুর রহিম—গ্রন্থকার। জন্ম—ময়মনসিংহের অন্তর্গত গলাচিপা হুসেনপুরে। গ্রন্থ—দিলওয়ালী (বাংলা ভাষায়, ১২৬৮ বঙ্গ), শেক খরিদ (১২৯৯ বঙ্গ)।

আবদুল আজিজ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সংক্ষিপ্ত মহম্মদ চরিত, ১ম ভাগ (কুষ্টিয়া, ১৯৩১)

আবদুল ওদুদ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পথ ও বিপথ (না), হিন্দু মুসলমানের বিরোধ।

আবদুল করিম, মুন্সী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৯শ শতাব্দী। গ্রন্থ—তারিখ ই-অহম্মদ (ফা), ওয়াকিব-ই-দুরানী (১৮৭৫), মুহারবা-ই-কাবুল ও কান্দাহার।

আবদুল করিম মুন্সী, সাহিত্যবিশারদ—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬৫ খৃঃ শ্রীহট্ট। বি, এ (১৮৮৩), সহকারী ও পরে বিভাগীয় ইনেস্পেক্টর। গ্রন্থ—ভারতে মুসলমান রাজ্য, আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (এনামল হক সহ); সম্পাদিত গ্রন্থ—গোরক্ষবিজয় (সেখ ফয়জুল্লা প্রণীত), মৃগলুব্ধ-সংবাদ (রামরাজা বিরচিত)।

আবদুল করিম, মৌলভী—গ্রন্থকার। জন্ম—ফরিদপুর জেলার চরসিমুলিয়া গ্রামে। গ্রন্থ—নসি হতে করিমা (১৩০০ বঙ্গ), ফজায়েল হরমায়েল (১২৮৩ বঙ্গ), কজিলাতে হজ (১৩০০ বঙ্গ) মফিদল খালেয়েক (১৩০০), মফিদল ইস্‌লাম (১৩০১ বঙ্গ)।

আবদুল কাদির—গ্রন্থকার। নিবাস—লক্ষ্ণৌ দেবীগ্রাম। গ্রন্থ—(পারস্য ভাষায়) পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রের অনুবাদ।

আবদুল কাদের—গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর। গ্রন্থ—বকারবালা মাতম হুসেন (১২৯৬)।

আবদুল কাদের—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উহির অল্‌ মনসুর, মোস্‌লেম কীর্তি, ১-৩য় খণ্ড, শের শাহ, সোলতান মামুদ, তুরস্কের ইতিহাস।

আবদুল গনি—গ্রন্থকার। জন্মস্থান—ময়মনসিংহ। গ্রন্থ—শাহ কামাল সূর্যভানু বিবি (১২৯০)।

আবদুল মজিদ—গ্রন্থকার। জন্মস্থান—কটক। গ্রন্থ—রংবাহার (১২৭১), বোবাটার বমন্‌ (১২৯৬)।

আবদুল রহমন—কবি। নিবাস—মৈমনসিংহ। গ্রন্থ—কাৰামতে এবামায়েন (মৈমনসিংহ, বাংলা পদ্য, ১৮৮০ খৃঃ, পৃঃ ২৪), নূতন নছিহত্তেল মোমিন (কবিতায় নীতিকথা, মৈমনসিংহ, ১৮৮০ খৃঃ, পৃঃ ৪৮)।

আবদুল লতিফ—গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর। গ্রন্থ—মানব সংস্কারক। সংসার ও ধর্ম (মেদিনীপুর, ১২৮৫ বঙ্গ, পৃঃ ৮৬)।

আবদুল শুকুর—গ্রন্থকার। জন্মস্থান—পাবনা জেলার শাহজাদপুরে। গ্রন্থ—নূরুল বসল (১২৯৭), গোলেবকাওলি (১৩০০), গোল-সানে নওবাহার (১৩০৪)।

আবদুল হকীম—গ্রন্থকার। জন্ম—চট্টগ্রাম। গ্রন্থ—লালমতি সয়ফল মুলুক (১২৯৫), ইউসুফ দেনেসা।

আবুনাছের সৈয়দুল্লা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আফগান আমীর চরিত, ১ম—২য় খণ্ড।

আবুল কাশেম—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিজ্ঞানের জন্মরহস্য, মানসী।

আবুল হাছানাৎ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—যৌনবিজ্ঞান।

আবুল হুসেন—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬১ বঙ্গ হুগলী জেলার বাগনান গ্রামে। শিক্ষা—কলিকাতা, লণ্ডন, ও

আমেরিকা। এম-ডি (আমেরিকা)। কাব্যগ্রন্থ—স্বর্গারোহণ, যমজ ভগিনী, জীবন্ত পুতুল। পাঠ্যপুস্তক—ইংরেজি শিক্ষা সোপান, এস্লামের ইতিহাস, স্পেন বিজয়, সতীদাহ।

আমরাজ—জ্যোতির্বিদ্ ও গ্রন্থকার। ১২শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান। গ্রন্থ—খণ্ড-খাদ্য গ্রন্থের (ব্রহ্মগুপ্ত-কৃত) টীকা।

আমানত উল্লা, মৌলভী হাফেজ সৈয়দ—গ্রন্থকার। জন্ম—২৪ পরগণার বসিরহাট গ্রামে। গ্রন্থ—(বঙ্গভাষায় লিখিত) কেয়ামত নামা।

আমানত মুন্সী—বঙ্গীয় মুসলমান কবি। কাব্যগ্রন্থ—ইন্দ্রসভা।

আমীনুদ্দীন—গ্রন্থকার। নিবাস—ঢাকা। গ্রন্থ—প্রবোধ-সুধাকর, ১ম ভাগ (১৮৭১)।

আমীর আলি, সৈয়দ—ব্যবহারজীবী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪৯ খৃঃ ৬ই এপ্রিল চুঁচুড়া গ্রামে। শিক্ষা—হুগলী কলেজ, বি, এ (১৮৬৭ খৃঃ), এম, এ (১৮৬৮), বি, এল, বার এ্যট ল (১৮৭৩), অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সি-আই-ই উপাধিলাভ (১৮৮৭ খৃঃ), হাইকোর্টের বিচারপতি (১৮৯০—১৯০৪), প্রিভিকাউন্সিলের সদস্য (১৯০৯)। গ্রন্থ—The Spirit of Islam, Ethics of Islam, Life and Teachings of Mahamad, The History of Saracens, Mahamadan Law, Law of Evidence, Bengal Tenancy Act.

আমীরুদ্দিন মিএা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সচিত্র স্ত্রীপাঠ (ঢাকা, ১৯০১)।

আম্রদেব সুরি—জৈন পণ্ডিত। গ্রন্থ—মণিকোষ গ্রন্থের টীকা (১৩৩৩ খৃঃ)

আয়জদ্দিন মুন্সী—বঙ্গীয় মুসলমান কবি। জন্ম—হুগলী জেলার হরিপাল গ্রামে গ্রন্থ—গোল আন্দাম (১২৯০ বঙ্গ)।

আর্য্যদেব—বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যে ৩য় শতাব্দীতে। গ্রন্থ—চতুঃশতক, চিত্তশুদ্ধিপ্রকরণ, হস্তবলপ্রকরণ।

আর্য্যভট্ট, (প্রথম)—গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্। জন্ম—৩৭৬ খৃঃ কুসুমপুরে (বর্ত্তমান পাটনা)। গ্রন্থ—কুট্টকবিধি, আর্য্যভট্টতন্ত্র, আর্য্যসিদ্ধান্ত, বীজগণিত।

আর্য্যভট, (দ্বিতীয়)—জ্যোতির্বিদ্। জন্ম—৯৫০ খৃঃ। গ্রন্থ—আর্য্যভট্ট দশগীতিকাদি।

আর্য্যশূর—বৌদ্ধ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—৪র্থ শতাব্দীতে। গ্রন্থ—জাতক-মালা (সংস্কৃত)।

আলাওল পণ্ডিত, সৈয়দ—বঙ্গীয় মুসলমান কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৬২৫ খৃঃ ফরিদপুরের ফতেয়াবাদ পরগনার অন্তর্গত জালালপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে আরাকানে। গ্রন্থ—হপ্তপয়কর (সপ্তপদিকর। ১১৬০ বঙ্গ), সতী ময়না (কাজী দৌলত পণ্ডিত সহ—১১৪১ বঙ্গ), দারাসেকন্দরনামা (১১১৫ বঙ্গ), পদ্মাবতী (১১৮৭ বঙ্গ), সয়ফল মুলুক, বদিউজ্জমাল, লোরচন্দ্রাণী, তাউফা (বঙ্গানুবাদ), কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী।

আলিমুদ্দীন মুন্সী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দিল্লীর রাজাদিগের নাম (বরিশাল, ১৮৭৫)।

আলী মোল্লা, মৌলভী—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিক। সম্পাদিত পত্র—সভারাজেন্দ্র (বাংলা ও ফার্সী ভাষায়—১৮৩১ খৃঃ)।

আলী, মৌলভী—পত্রিকা-সম্পাদক। সম্পাদিত পত্র—জ্ঞানদীপক (বাংলা, ইংরেজি, হিন্দী ও ফার্সী ভাষায় ১৮৪৬ খৃঃ)।

আলীরাজা—গ্রন্থকার। নামান্তর—কানু ফকির। নিবাস—চট্টগ্রামের অধীন ওশাখাইন গ্রামে। গ্রন্থ—জ্ঞানসাগর, ধ্যানমালা, জ্ঞানকুলুপ, ষট্‌চক্রভেদ, সিরাজকুলুপ, কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী, শ্যামাসঙ্গীত।

আশক মুহম্মদ—কবি ও গ্রন্থকার। জন্মস্থান—রংপুর জেলায় শীতলগাড়ী। গ্রন্থ—একদিল্ শাহ (১২৪১ বঙ্গ)।

আশরফ আলি, মীর—চিকিৎসক। গ্রন্থ—ধাত্রীবিদ্যা। (১৮৬১ খৃঃ)।

আশাধর—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—গ্রহযজ্ঞ (১১৩২ খৃঃ), গ্রন্থযজ্ঞ-শাবণী।

আশাধর—জৈন কবি ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ধর্ম্মামৃত, জিন-যজ্ঞকল্প (১২১৮ খৃঃ)।

আশালতা দেবী—ঔপন্যাসিকা। গ্রন্থ—হে বন্ধু বিদায়, জীবনের যাত্রাপথে, যৌবনের সিন্ধুতটে, কলঙ্কের ফুল, কালের কপোলতলে। জনতা, ছন্দোপতন, মন নিয়ে খেলা।

আশালতা সিংহ—ঔপন্যাসিকা। গ্রন্থ—আবির্ভাব, অমিতার প্রেম, সহরের মোহ, সমর্পণ, অন্তর্যামী, বিয়ের পরে, বাস্তব ও কল্পনা, অভিমান, মুক্তি, কলেজের মেয়ে, পরিবর্ত্তন, জীবনধারা, সুরের মোহ।

আশুতোষ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কান্তারকুসুম বা হরিদাসের মৃত্যুশয্যা (কলি, ১৮৮০ খৃঃ, পৃঃ ১১২)।

আশুতোষ মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬১ খৃঃ। সব-জজ, রংপুর। গ্রন্থ—আনন্দময়ী, জেঠামহাশয়, Unity of Religion.

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যর—শিক্ষাতত্ত্ববিদ্, ব্যবহারজীবী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬৪ খৃঃ ২৯এ জুন ভবানীপুরে। মৃত্যু—১৯২৪ খৃঃ ২৫এ মে। পিতা—ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আদি নিবাস—জীরাট-বলাগড় (হুগলী)। এম্-এ (১৮৮৫), পি আর এস (১৮৮৬)। ডি এল (১৮৯৪), হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯০৪—১৯২৩)। সি এস আই (১৯০৭), নাইট (১৯১১), সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, সম্বুধাগমচক্রবর্ত্তী ইত্যাদি উপাধিলাভ। গ্রন্থ—Geometry of Conics, Law of Perpetuities in British India (Tagare Law Lecture)।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক। সম্পাদিত পত্র—অবকাশবন্ধু (১৮৭১)।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রণয়পত্রিকা, মেয়েদের ব্রতকথা। নিত্যপূজাপদ্ধতি, রাক্ষসখোক্কস, ভূতপেত্নী, বিবাহের প্রীতি উপহার, বিশ্ববৈচিত্র্য, ছেলেভুলানো ছড়া, চিত্তরঞ্জন উপন্যাস, খেলাধূলা, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য, পুরীযাত্রা, Leisure Hours.

আশুতোষ শিরোরত্ন—অনুবাদক। গ্রন্থ—রামায়ণম্ ৪ খণ্ড (অযোধ্যানাথ তত্ত্বনিধি, শ্যামচরণ তর্কবাগীশ সহ—বর্দ্ধমান. ১৮৬৬—

১১, আদি ও অযোধ্যাকাণ্ড) এই গ্রন্থ বর্ধমান মহারাজা কর্তৃক বিতরিত হয়।

আশুবোধ বিদ্যাভূষণ—পণ্ডিত ও গ্রন্থ-সম্পাদক। সম্পাদিত গ্রন্থ (নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন সহ)—সাংখ্যকারিকা (ইং, কলি, ১৯১১ খৃঃ, পৃঃ ৫২)। উত্তররামচরিত (কলি ১৯১১, পৃঃ ২৪৪), বিক্রমোর্বশী (কলি, ১৯১১, খৃঃ ১৪১), মুদ্রারাক্ষস (কলি, ১৯১১, পৃঃ ২৩৫) মৃচ্ছকটিকম্ (কলি, ১৯১১, পৃঃ ৩৫৫)। কাব্যাদর্শ (কলি, ১৯১১, পৃঃ ২৮৫)।

আসামত উল্লা খোন্দকার—গ্রন্থকার। জন্মস্থান—বগুড়া জেলা। গ্রন্থ—ফতেমার জহুরানামা (১৩০০ বঙ্গ)।

আসির উদ্দিন মৌলভী—গ্রন্থকার। জন্মস্থান—২৪ পরগনার অন্তর্বর্তী ধান্তখোলা মোহনপুর। গ্রন্থ—ঝগড়ানামা (১২৭২ বঙ্গ)।

আহম্মদ আলী খোন্দকার—গ্রন্থকার। জন্মস্থান—২৪ পরগনা। গ্রন্থ—কালুগাজী ও চম্পাবতী (১২৮৫ বঙ্গ)।

আহম্মদ খাঁ পুত্র সৈয়দ খাঁ বাহাদুর—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮১৭ খৃঃ দিল্লী। মৃত্যু—১৮৯৮ খৃঃ। গ্রন্থ—The Archeological History of Delhi.

ইন্দিরা দেবী—মহিলা সাহিত্যিক। জন্ম—১২৮৬ বঙ্গ, আষাঢ় বাগবাজারে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৩২১ বঙ্গ আশ্বিন। পিতা—মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। স্বামী—ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (হুগলী)। গ্রন্থ—ফুলের তোড়া, স্পর্শমণি (১৩২২), প্রত্যাবর্তন, স্রোতের গতি, মাতৃহীন, পরাজিতা, সৌধরহস্য (Mysteries of the blumber Hallএর অনুবাদ), নির্মাল্য (১৩১১), কেতকী, শেষ দান।

ইন্দীবরকৃষ্ণ দেবশর্মা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বুষোৎসর্গচন্দনধেনুসার (সানুবাদ। কলি, ১৩১৫)।

ইন্দুনাথ সরকার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বালকসখা, ১ম (বরিশাল, ১৯০২ খৃঃ)।

ইন্দু ভট—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্। গ্রন্থ—অষ্টাঙ্গসংগ্রহের টীকা।

ইন্দুভূষণ সেন, কবিরাজ—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নিকট হরিপুর গ্রামে ১৩০১ বঙ্গ, জ্যৈষ্ঠ। পিতা—কবিরাজ কবিরঞ্জন সত্যচরণ সেনশাস্ত্রী। শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্র পীঠের অধ্যাপক। ইনি আয়ুর্বেদশাস্ত্রী ও ভিষগ্‌রত্ন, এল. এ. এম. এস্ উপাধি লাভ করেন। গ্রন্থ—বাঙ্গালীর খাদ্য (১৯২৮), পারিবারিক চিকিৎসা, ডিস্‌পেপসিয়া, (১৩৪১) বাঙ্গালা দেশের গাছপালা, ১ম (১৩৩৮), ২য় (১৩৪১), ৩য় খণ্ড (১৩৪৫), নেশা (১৩৩৪), সরল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান। সম্পাদক—আয়ুর্বিজ্ঞান সম্মিলনী (মাসিক ১৩৩১)। সহঃ সম্পাদক—আয়ুর্বিজ্ঞান (১৩৩৩—৩৫), স্বাস্থ্য, বঙ্গীয় মহাকোষ। যুগ্ম-সম্পাদক—কুরুক্ষেত্র (মাসিক)।

ইন্দুমাধব মল্লিক—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম, এ, বি, এল, এম, ডি (কলিকাতা)। গ্রন্থ—বৈজ্ঞানিক প্রণালী, বিলাত ভ্রমণ, চীন ভ্রমণ।

ইন্দুলেখা—মহিলা কবি। গ্রন্থ—সুভাষিতাবলী, শার্ঙ্গধর পদ্ধতি।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীবনের সুখ, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার চরিত। সম্পাদক—মানসী (১৩১৫—১৩১৭)।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—আইনজীবী ও সাহিত্যিক। ছদ্মনাম—পঞ্চানন্দ। জন্ম—১৮৪৯ খৃঃ বর্ধমানের পাণ্ডু গ্রামে (মাতুলালয়ে)। নিবাস—গঙ্গাটিকুরী। মৃত্যু—১৩১৭ বঙ্গ ১ই চৈত্র। পিতা—বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—বি, এ (ক্যাথিড্রেল কলেজ), বি, এল। কর্মক্ষেত্র—হেতমপুর কলেজের প্রধান শিক্ষক। পূর্ণিয়ায় ওকালতী। মুনসেফ এবং পরে বর্ধমানে স্থায়ী ভাবে ওকালতী। গ্রন্থ—উৎকৃষ্ট কাব্যম্ (১২৭৭), কল্পতরু (১২৮১), ভারত উদ্ধার (ব্যঙ্গকাব্য, ১২৮৪), ক্ষুদিরাম, পাঁচু ঠাকুর (৫ম খণ্ড, ১২৮৬)।

ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও সম্পাদক। সম্পাদিত পত্রিকা—ধরণী (১৩০১—২)।

ইন্দ্রভূতি—তন্ত্রাচার্য ও গ্রন্থকার। জন্ম—সম্ভবতঃ ৬৮৭ খৃঃ উড়িষ্যায়। গ্রন্থ—জ্ঞানসিদ্ধি।

ইন্দ্রমুখী—বঙ্গীয় প্রাচীন পদাবলী রচয়িত্রী। ১৫শ শতাব্দীতে ইনি বর্তমান ছিলেন।

ইরুগপ—বৈয়াকরণিক। গ্রন্থ—নানার্থরত্নমালা।

ইয়াসিন মহম্মদ—গ্রন্থকার। নিবাস—নাটোর। গ্রন্থ—মাতঃ ভিক্টোরিয়া (নাটোর, ১৯০১)।

ইব্রাহিম খাঁ—নাট্যকার। নাটক—আনোয়ার পাশা।

ঈশানচন্দ্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বর্ণসুন্দর (কবিতা)।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জাতক, ৬ খণ্ড (১৩২৩—২৭, পৃঃ ২১৭৩), মহাপুরুষ-চরিত।

ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাস্তুবিদ্যা।

ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। কাব্যগ্রন্থ—চিত্তরঞ্জিকা (১৮৭২)।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬২ বঙ্গ হুগলী জেলার গুলটিয়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩০৪ বঙ্গ। আইনজীবী, হুগলী। পিতা—কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ—যোগেশ (কাব্য), সুধাময়ী (উপন্যাস)।

ঈশানচন্দ্র বসু—কবি ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ (কলি, ১৮৭৪), উপদেশ (১৮৭২), নারীনীতি (কলি, ১৯০১), চিত্তবিনোদ (কাব্য ১৮৬৮)।

ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—বৈয়াকরণিক। জন্ম—রাজশাহী জেলায় হটিয়া গ্রামে। গ্রন্থ—কাব্যচন্দ্রিকার টীকা।

ঈশানচন্দ্র বিশারদ—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্। গ্রন্থ—ভৈষজ্যবিজ্ঞান।

ঈশান নাগর—বৈষ্ণবগ্রন্থকার। জন্ম—১৪৯২ খৃঃ শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ উপবিভাগে লাউর পরগনার নবগ্রামে। গ্রন্থ—অদ্বৈতপ্রকাশ (১৫৬৮ খৃঃ)।

ঈশ্বর—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কৃষ্ণস্তুতি, রামস্তোত্র।

ঈশ্বর কৃষ্ণাচার্য—সংস্কৃত গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সাংখ্যকারিকা। ইনি ২য় খৃঃপূঃ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—কবি ও সম্পাদক। জন্ম—১২১৩ বঙ্গ (১৮১০ খৃঃ ১ই মার্চ) ২৪ পরগনার কাঁচড়াপাড়ায়। মৃত্যু—১২৬৫ বঙ্গ ১০ই মাঘ। পিতা—হরিনারায়ণ গুপ্ত। সম্পাদিত সাময়িক পত্র—সংবাদ-প্রভাকর (সাপ্তাহিক ১৮৩০), সংবাদ-রত্নমালা, দৈনিক প্রভাকর (১২৪৫ বঙ্গ, ১লা আষাঢ়), পাষণ্ড-

পীড়ন (মাসিক পত্র, ১৩৫০, ৭ই আষাঢ়), সাধুরঞ্জন (১২৫৪ বঙ্গ) প্রভাকর (মাসিক, ১২৬০, বৈশাখ)। গ্রন্থ—প্রবোধ-প্রভাকর (১২৬৪), বোধেন্দুবিকাশ, হিতপ্রভাকর (১২৬৭), ভারতচন্দ্রের জীবনী (১২৬২), কলি নাটক (অসমাপ্ত রচনা), কবিতাবলী ১ম (১৮৭০), ২য় (১৮৭১), ৩য় (১৮৭২), ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ (১৮৭৩), ৭ম (১৮৭৪)।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, গ্রন্থকার ও সমাজ-সংস্কারক। জন্ম—১৮২০ খৃঃ ২৮এ সেপ্টেম্বর, হুগলী (বর্ত্তমান মেদিনীপুর) জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে। মৃত্যু—১২৯৮ বঙ্গ ১৩ই শ্রাবণ। পিতা—ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা—ভগবতী দেবী। শিক্ষা—সংস্কৃত কলেজে (১৮২৯, ১লা জুন), বিদ্যাসাগর উপাধিলাভ (১৮৪০ খৃঃ), প্রধান পণ্ডিত, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮৪১ খৃঃ), সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ (১৮৪৬), অধ্যক্ষ, বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক (১৮৫৫), চাকুরী ত্যাগ (১৮৫৮), হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন স্থাপন (১৮৬৮ খৃঃ)। গ্রন্থ—বাসুদেব-চরিত (অপ্র), বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৬), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবন-চরিত (১৮৪৯), সীতার বনবাস (১৮৬১), ভ্রান্তিবিলাস (১২৭৭), বর্ণ পরিচয় ১ম ও ২য় (১২৬২), কথামালা (১২৬৩), বোধোদয় (১২৫৮), চরিতাবলী (১২৬৩), আখ্যানমঞ্জরী ১ম ও ২য় (১২৭১), ৩য় (১২৭৫), উপক্রমণিকা (১২৫৮), ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম—৩য় (১৮৫৩-৫৪), ৪র্থ (১৮৬২), ঋজুপাঠ ১ম (১২৫৮), ২য় (১২৫৯), ৩য় (১২৬০), সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১২৬০), বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ (১২৬০), বিধবা-বিবাহ প্রবন্ধ ২য় (১২৬১), মহাভারত (১২৬৭), শব্দমঞ্জরী (১৮৬৪), রামের রাজ্যাভিষেক (অপ্র। ১৮৬৯), বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তক ১ম, (১২৭৮), ২য় (১২৭৯), শিশুশিক্ষা ১ম ও ২য় (১২৬০), ৩য় (১২৬১), ৪র্থ (১২৬৯), পাঠমালা (১৮৫৯)। বামনাখ্যানম্ (১৮৭৩), সংস্কৃত রচনা (১৮৮৫), নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস (১৮৮৮), শ্লোকমঞ্জরী (১৮৯০), বিদ্যাসাগর-চরিত (আত্মচরিত, ১৮৯১), ভূগোলখগোলবর্ণনম্ (১৮৯২), বাল্মীকির রামায়ণ। সম্পাদিত গ্রন্থ—সর্বদর্শনসংগ্রহ (১৮৪৮), কিরাতার্জুনীয় (১৮৫৩), শিশুপালবধ (১৮৫৭), কুমারসম্ভব (১৮৬১), মেঘদূত (১৮৬৯), অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৮৭১), হর্ষচরিত (১৮৮২), কাদম্বরী (১৯৩১), অন্নদামঙ্গল ১ম ও ২য় (১৮৪৭), রঘুবংশ, উত্তরচরিত (১৮৭০) ; ইংরেজি গ্রন্থ—Selections from the writings of Goldsmith, Selections from English Literature, Poetical Selections, Marriage of Hidu Widows (১৮৫৬)।

ঈশ্বর বৈদিক—কুলগ্রন্থরচয়িতা। গ্রন্থ—সবৈদিক কুলপঞ্জিকা। সম্ভবতঃ ইনি ১৭শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক—গ্রন্থকার। নিবাস—কলিকাতা, বড়বাজার। গ্রন্থ—জ্ঞানোল্লাস (১৮৫৪ খৃঃ)।

ঈশ্বরচন্দ্র রায়, রাজা—সঙ্গীত-রচয়িতা। নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজা। গ্রন্থ—সারদামঙ্গল।

ঈশ্বরচন্দ্র সরকার—অনুবাদক। গ্রন্থ—প্রভাসখণ্ডের অনুবাদ।

ঈশ্বরচন্দ্র সার্বভৌম—তান্ত্রিক পণ্ডিত। নিবাস—নদীয়া জেলা। গ্রন্থ—দুর্গার্চনাবারিধি।

ঈশ্বরনারায়ণ সিংহ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রাজকীয় ব্যবস্থা (১৮৬৪)।

ঈশ্বরীপ্রসাদ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Short history of Muslim Rule in India (এলাহাবাদ, ১৯৩৩, পৃঃ ৭২৫), লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক (কলি, ১৯৭৮ (সং), পৃঃ ১২৪)।

উইলসন্, হোরেস হেম্যান (Horace Hayman Wilson) —সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও অনুবাদক। জন্ম—১৭৬৮ খৃঃ লণ্ডনে। মৃত্যু —১৮৬০ খৃঃ। কর্ম্মক্ষেত্র—ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক্তার (১৮০৮)। সম্পাদক, এসিয়াটিক সোসাইটী (১৮১১—৩৩), অধ্যাপক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি (১৮৩০), গ্রন্থাধ্যক্ষ, ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরী (১৮৩৬)। অনুবাদ গ্রন্থ—মেঘদূত (১৮১৩), Theatre of the Hindus (অনুবাদ গ্রন্থ—মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব, বিক্রমোর্বশী, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস), বিষ্ণুপুরাণ, উত্তররামচরিত, ঋগ্বেদ ; গ্রন্থ—Historical Account of Burmese war, Lectures on Religions & Philosophical systems of Hindu (১৮৪০), A Sanskrit Grammar, Sanskrit English Dictionary, The Ariana Antiqua, A glossary of Indian Terms. সম্পাদিত গ্রন্থ—Macnaghten's Hindu Law, Mill's History of British India.

উজ্জ্বল দত্ত—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। গ্রন্থ—উণাদিসূত্রের বৃত্তি।

উড্‌রফ, স্যর জন—বিচারপতি ও গ্রন্থকার। ছদ্মনাম আর্থার এ্যাভেলন। জন্ম—১৮৬৫ খৃঃ লণ্ডন। মৃত্যু—১৯৩৫ ডিসেম্বর। আইনজীবী কলিকাতা হাইকোর্ট (১৮৯০ খৃঃ), বিচারপতি (১৯০৪), অধ্যাপক, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি। গ্রন্থ—Sakti and Shakta, Garland of letters, The World as Power, ১—৭ খণ্ড, Is India civilised ? The Seed of Race, Bharat Shakti. (আর্থার অ্যাভেলন ছদ্মনামে)। সম্পাদিত গ্রন্থ—Hymns to the Goddess, Principles of Tantra ১ম-২য়, Wave of Bliss (আনন্দ-লহরীর অনুবাদ), Greatness of Shiva এবং ১৯খানি তন্ত্রগ্রন্থ।

উৎপল ভট্ট—জ্যোতির্বিদ। জন্মস্থান—কাশ্মীর। গ্রন্থ—বৃহৎসংহিতার টীকা (৯৬৬ খৃঃ) বৃহজ্জাতকের টীকা, বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি, প্রশ্নজ্ঞান, মূলপুলিশসিদ্ধান্ত (টীকা)।

উৎপলাচার্য—দার্শনিক পণ্ডিত। নিবাস—কাশ্মীর। ১০ম শতাব্দীতে বর্তমান। গ্রন্থ—স্পন্দপ্রদীপিকা (টীকা), প্রত্যাভিজ্ঞাকারিকা।

উদয়চরণ আঢ্য—গ্রন্থকার ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮২১ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৫৬ খৃঃ মার্চ্চ, কলিকাতা। গ্রন্থ—ইংরেজি বাঙ্গলা অভিধান, শব্দাম্বুধি, নূতন অভিধান। সম্পাদিত গ্রন্থ—'সংবাদ-পূর্ণ চন্দ্রোদয়' পত্রিকা (১৮৩৭ খৃঃ), ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত।

উদয়নাচার্য—টীকাকার। জন্ম—(৯৯৪-১০৪৪ খৃঃ) দ্বারভাঙ্গা জেলার করিয়ন-বলাহা গ্রামে। গ্রন্থ—ন্যায়তাৎপর্যপরিশুদ্ধি, আত্মতত্ত্ববিবেক, লক্ষণাবলী (৯৮৪ খৃঃ), কিরণাবলী, কুসুমাঞ্জলি বার্ত্তিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধি (টীকা)।

[ক্রমশঃ

বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কবিতা

ডাঃ মতিলাল দাশ

বৃটিশ আজ পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর ভারতের জীবনের জয়যাত্রা হইতে চিরতরে চলিয়া গিয়াছে। আজ হয়ত প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইংরেজি সাহিত্যের আলাপ ও আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু ইহা একান্তই-ভ্রান্ত ধারণা। ইংরেজী সাহিত্য আজ পৃথিবীর সেরা সাহিত্য, ইংরেজীর প্রভাব জগদ্ব্যাপী, ইহার অতুলনীয় সম্পৎ আপন মহিমায় আজিও দীপ্ত। তাই যে-সাহিত্য এক দিন আমাদের জীবনে দিয়াছিল নব জন্মের পরিকল্পনা, আমাদিগকে স্বাদেশিকতায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল, চরিত্র লাবণ্য গড়িবার জন্ম প্রেরণা দিয়াছিল, তাহাকে ভুলিতে পারি না, ভুলিব না ; বরং চির সমাদরে চিরদিনই অন্তরের নিভৃত পূজার পুষ্পাঞ্জলি দিব।

বিংশ শতাব্দীর অর্দ্ধ অবসান। আজ এই অর্দ্ধ শতাব্দীর কাব্য-সাহিত্যের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া ইহার নূতনত্ব, ইহার আশা ও আদর্শের কথঞ্চিৎ পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব।

উনবিংশ শতাব্দী সমগ্র য়ুরোপের জীবনে এক অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময়ের মত। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে সর্ব্বত্রই এক বিরাট পরিবর্ত্তন। মানুষের কল্পনার পরিধি মানুষের গভীরতম আশাকে ছাড়াইয়া দিগ্‌দিগন্তে অরুণচ্ছটা মেলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এই বিপুল পরিবর্ত্তনও বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছিয়া মানুষকে স্থির থাকিতে দিল না। আলাপ ও রচনার রীতি, বৈশিষ্ট্য ও ভঙ্গী প্রাণহীন হইয়া উঠিয়াছিল, সেখানে নূতন কালের নূতন কবিরা গাহিয়া উঠিলেন।

ও সানেসি উনবিংশ শতাব্দীর এক জন নগণ্য কবি—কিন্তু তাঁহার একটি চমৎকার কবিতায় তিনি বিগত শতাব্দীর স্বপ্নময় ভাবালুতাকে রূপ দিয়াছেন :—

> আমরা গাহি গান, আমরা রচি গীতি
> স্বপ্নলোকের মাঝে স্বপন দেখি নিতি,
> বালুবেলার তটে আমরা ঘুরি ফিরি,
> বিজন নদীতীরে আমরা রহি ঘিরি।
> জগৎ ছাড়া মোরা হারাই ধরাখানি
> চাঁদের আলো মাঝে শুনি অমর বাণী।

এই যে নিভৃত নিরালা জীবনের আশা ও আনন্দ, এই যে মাধুর্য্যের মহৎ লোকে প্রত্যহ নব জন্ম—ইহা সুন্দর, কিন্তু জীবন-সংগ্রাম আজ কঠোরতর, এই স্বপ্ন-বিলাসে মুগ্ধ হইবার সময় আমাদের নাই। কবি যুগ-মানব এবং একাধারে যুগোত্তর মানব। নিজের উপলব্ধির মোহ দিয়া তিনি আপন যুগকে রাঙান, এবং ভাবী যুগের নবীন মেঘের আবরণ জড়ান। উনবিংশ শতাব্দীর পর্য্যাপ্ত পরিতৃপ্তি, দুঃখের হাত হইতে পলায়নের মনোবৃত্তি বিংশ শতাব্দীতে চলিল না। বর্ত্তমান কালের কবি সজাগ। তিনি প্রাত্যহিক জীবনের সংশয়, বিতর্ক, ভয় ও ভাবনাকে নির্ভয়ে গ্রাস করিয়াছেন। অতিব্যস্ততার যে মোহন রূপ, তাহাই দেখিয়া বর্ত্তমানকে ভালবাসিয়াছেন—বর্ত্তমানকে গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল গোলাপই তাঁহার কাব্যে ফোটে নাই, তিনি রোলসরয়েসকে, এঞ্জিনকে, কয়লার ধূলি-ধূমকে নিঃশঙ্ক আনন্দে গ্রহণ করিয়া কবিতার অমর সুধালোক সৃষ্টি করিয়াছেন। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী দুইটি মহাযুদ্ধের বিপর্য্যয়ের মধ্যেই আপনাকে অগ্রগতির পথে চালাইতে পারিয়াছে। যুদ্ধ-পূর্ব্ব, যুদ্ধ-মধ্য এবং যুদ্ধোত্তর এই পঞ্চাশ বৎসর মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষায়, কল্পনা এবং চেষ্টায় এক বিস্ময়কর নবীনতা আনিয়াছে। অতিপরিচয়ের আবরণে আমরা যেন আধুনিক কবিতার এই বিশিষ্টতা না ভুলি।

এই অতিআধুনিক কবিতার ভঙ্গী বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব, ইহাদের মধ্যে রোমান্টিক যুগের ভাবালুতা নাই, ভক্তি-গদ্‌গদ আকুলতা নাই—ইহারা সকলেই বর্ত্তমান পরিবেশের শিশু, তাই ইহারা অবিশ্বাসী—ইহারা জিজ্ঞাসু, ইহারা তার্কিক ও সংশয়ী। ইহারা সবাই নূতন একটি মতবাদের আশ্রয়ে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। সেই মতবাদের নাম Imagism বা ছায়াবাদ। কবিতা ছায়ার মতই পাঠকের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে—চোখের তারকায় যেমন বোধের ক্ষণমুহূর্ত্তে বিরাট একটি সম্ভাবনা এবং পরিবেশ লইয়া ছায়া প্রতিফলিত হয়। ক্ষণিকের বস্তু বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে চোখ যাহা কিছু দেখে, সবই যেন রহিয়াছে।

ইহাদের আদর্শ :—"A poem is an image on a succession of images, and an image is that which presents an intellectual or emotional complex in an instant of time."

কবিতা ছবি বা চলচ্চিত্রের ছবির মত ছবির পরম্পরা। ক্ষণিকের মাঝে যাহা বুদ্ধির বা হৃদয়ের মাঝে দোলা দেয়।

এই মতবাদ আনিল ভাষার নূতন আকৃতি, গঠনের নূতন পারিপাট্য, বলার নূতন রীতি, সজ্জা ও আভরণের অপূর্ব্ব গতি—ইহার জন্য তাহাদের রূপকের আশ্রয় লইতে হইল—ব্যঞ্জনা এবং ইঙ্গিতের পরিপূর্ণ আলম্বন ইহাদের প্রকাশের পন্থা হইল। কবি যাহা বলিতে চাহেন, সোজাসুজি তাহা বলা চলে না। সরল বর্ণনায় অন্তরের নিভৃত আকুতি প্রকাশ পায় না। অতএব এমন কথা, শব্দমালা তাঁহাকে চয়ন করিতে হইবে, যাহারা ভাবানুষঙ্গে পাঠকের চিত্তে নানা কল্পনা ও ইঙ্গিত জাগাইয়া দিবে।

সেলার্মে নামক এক জন কবি লিখিয়াছেন—"My aim is to evoke an object in deliberate shadow, without ever actually mentioning it, by allusive words, never by direct words." যাহা অব্যক্ত, যাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহাকে ভাবে, ভঙ্গীতে, ছন্দে, ব্যঞ্জনায় এবং রূপকে প্রকাশ করিতে হইবে। সোজাসুজি তাহার কথা না বলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাদের ইঙ্গিত করিতে হইবে।

বর্ত্তমান জীবন সঙ্কট-আবর্ত্তে দোদুল, নানা তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্বেল, তাহার প্রতিচ্ছবি ফোটানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেই ব্যাপারে এই ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার রীতি অনেকটা সহায় হইল।

বর্ত্তমানের কবিরা বর্ত্তমান যুগের ধূলি-ধূম-ধূসর জীবনকে বাস্তব নগ্নতায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তাই চিরকালের জ্যোৎস্না, কোকিল, মলয় এবং শতদল-কোরক বিদায় লইতে বসিয়াছে। এই নব ভঙ্গীর নব মনোভাবের প্রথম বলিষ্ঠ পরিচয় পাই ইলিয়টের প্রেমের কবিতায়। কবি শুরু করিলেন—

> এস দোঁহে যাই—তুমি আর আমি
> আকাশের বুক ভরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যা—
> যেন হাসপাতালের টেবিলে ক্লোরোফর্ম-করা রোগী।

ইহার অদ্ভুতত্ব বিশ্রী লাগে, কিন্তু বর্ত্তমান নাগর-জীবনের নিকট হইতে উপমা লইতে গিয়া একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই যেন ইহা কবির কলমে আসিয়াছে। এই মনোভাব না লইয়া পড়িতে বসিলে আধুনিক কবিতা আমাদিগকে পীড়া ও ব্যথা দিবে—তাহার অন্তর্নিহিত আস্বাদ আমরা আদৌ উপভোগ করিতে পারিব না।

আধুনিক কবিদের মধ্যে ইলিয়ট রচনা-গৌরবে, স্বকীয়তায় এবং শক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার রচনার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তাঁহার কবিতায় অধিকাংশই দীর্ঘ, নীচে একটি ছোট কবিতার অনুবাদ দিতেছি—

ন্যান্সি

কুমারী ন্যান্সি এলিকট
দীর্ঘ পদক্ষেপে ডিঙ্গান শৈলমালা এবং বিদীর্ণ করেন তার বুক,
অশ্বারোহণে পার হন গিরিশিখর—পরাজিত শৈলশিখর
নূতন ইংলাণ্ডের শুষ্ক অনুর্ব্বর পাহাড়শ্রেণী,
গোশালার পাশে পাশে
চলেন সারমেয়ের দিকে।
মিস্ ন্যান্সি ছাড়েন সিগারেটের ধূমায়িত শিখা,
নাচেন আধুনিক সব ছন্দোমধুর নাচ
তার পিসীরা আর মাসীরা তাকে নিয়ে ভেবেই আকুল
শুধু এইটুকু তারা জানে—ন্যান্সি নব্যা তরুণী।
সার্সি বসানো তাকের উপর থাকে পাহারায়
ম্যাথিউ আর এয়াল্ডো—দু'জনেই ধর্ম্মধ্বজী,
যারা অপরিবর্ত্তনীয় নীতির সাহসিক যোদ্ধা।

ইলিয়টের পরে এজরা পাউণ্ডের নাম মনে আসে। তাঁহার সম্বন্ধে এক জন কবি-সমালোচক ইয়েটস যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

Ezra Pound has made flux his theme; plot characterization logical discourse, seem to him abstractions suitable to a man of his generation. He is midway in an inverse poem in verse litre called for the moment The Cantos, when the metamorphosis of Dionysus, the descent of odysseus into hades, repeat themselves in various disguises, always in association with some third that is not repeated * * There is no transmission through time, we pass in that comment from ancient Greece to modern England, from modern England to medieval Chinas, the symphony, the pattern is to me less flux eternal and therefore without movement * * style and its opposite can alternate, but form must be full, sphere-like, single. Even where there is no interruption, he is often content, if certain verses and lines have style, to leave unabridged transitions, unexplained ejaculations, that make his meaning unintelligible.

এজরা পাউণ্ডের প্রভাব ইংরেজী সাহিত্যে ইলিয়টের পরেই বহুব্যাপক ছিল। ইঁহাদের লেখার সব চেয়ে বড় দোষ যে, তাঁহাদের অধিকাংশ কবিতাই অস্পষ্ট এবং অর্থহীন। বাংলা সাহিত্যে যে-সব নবীন কবি ইলিয়ট ও পাউণ্ডের অনুকরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই দিকে অপরাধ আরও অধিক। ইংরেজী কবিদের প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত্ত আর ইঁহাদের অনুকৃতির দোষ। কাজেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার অনেকগুলিই একান্ত দুষ্পাচ্য হইয়াছে। কাল এই সব আবর্জ্জনা দূর করিবে, তথাপি ক্ষণকালের জন্যও ইহারা সাহিত্যের পবিত্র বেদী কলুষিত করিয়াছিল, তজ্জন্য ইহাদের অমার্জ্জনীয় অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

এজরা পাউণ্ডের একটি কবিতার স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ দিতেছি। পাউণ্ড লিখিতেছেন যে, কবিতাটি চৈনিক কবি রিহাকু হইতে লওয়া। কবিতাটির নাম—নৌ-সদাগরের বৌ।

যখন আমার দোদুল কেশ ছিল কপাল থেকে সোজা খণ্ডিত,
তখন আমি খেলতাম সদর দরজায়, তুলতাম ফুলের রাশি।
তুমি তখন আসতে বাঁশের চটা হাতে, ঘোড়া ঘোড়া খেলতে
আমার আসনের পাশে চুপে চুপে বসতে আর হাতের কুল দেদার ছুঁড়তে,
তখন আমরা দু'টি ছিলাম চোখান নামক গাঁয়ে
ছোট দু'টি বালক-বালিকা—ছিল না যাদের অপ্রীতি বা অপ্রণয়।
চৌদ্দ বছর বয়সে তোমায় পেলাম পতি
হাসি এল না কোনও দিন, কারণ আমি চির লজ্জাবতী।
মাথা নীচু করে চেয়ে রইতাম দেওয়ালের পানে,
ফিরতাম না সমুখ পানে পথ-ভোলানো হাজার গানে।
পঞ্চদশ বছর বয়সে আমি ভুলে গেলাম ঝগড়াঝাঁটি,
চাইলাম তোমার সাথে আত্মায় আত্মায় গভীর মিলন,
চিরদিনের তরে, চিরকালের তরে, অচ্ছেদ্য অভেদ্য
বাইরে কেন বৃথা পাবে যা চাওয়ায় অসাধ্য।
ষোল বছর যখন বয়স, তখন তুমি গেলে দূর-দূরান্তর,
তুমি গেলে কুটুয়েন, হাজার নদ-নদী হল অন্তর
তুমি গেছ পাঁচ মাসেরও বেশী,
মাথার উপর বাঁদরের শুধু অসহ কিচির-মিচির।
যে দরজা দিয়ে গেলে সেখানে রেখে গেছ চরণ-চিহ্ন,
সেখানে জমেছে শেওলা, নানা ধরণের শৈবালদাম,
এত ঘন হয়ে জমল যে তাদের যায় না তুলে ফেলা,
এবার হেমন্তেই পাতা পড়া হয়েছে সুরু;
প্রজাপতির দল, এখনই মরণ-কাতর।
পশ্চিমের কুঞ্জবনে ঘাসের উপর পড়ছে ঢলে।
তাদের দেখে বুক আমার করছে দুরু-দুরু,
ব্যথায় যেন বুড়ী হতে চলেছি,
দোহাই তোমার পায়ে পড়ি, ফিরে এস কিয়াঙ নদী বেয়ে
খবর দিও আগে বঁধুয়া, এই পাগলিনীর মুখ চেয়ে,
আমি যাব বলছি…তোমার পানে এগিয়ে
যাব চোকুসায়, যাব, চোকুসা গাঁয়ের মেয়ে।

ক্রাঙ্ক ও কনোরের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল বিলাতে—তাঁহার দীর্ঘ আয়ত চোখ, তাঁহার বিশ্বাসী আশাতুর যৌবনদৃপ্ত ভঙ্গী আজিও আমার মনে আছে। ব্যথার কবি তিনি নহেন—তিনি বীর্য্যের পূজারী। নীচের কবিতাটিতে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ নাই—ইহাতে শুধু ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার সংশয়ী আত্মা—

অয়ি চতুরিকে নারী, ফিরে লও তব কোমল পরশ,
আর ভুলিব না সখি তব প্রেমে হব না সরস।
দেখ আজ সাদা কেশ দেখ আজ গলিত এ অঙ্গ,
দেখ হিম রক্ত-ধারা, বল সখি কিবা চাহ রঙ্গ?
ভেব না কঠিন মোরে, কর না কর না শির তব নীচে
থাক স্থির ভালবাসা হে নিষ্ঠুরে অমৃতের পিছে!
ফিরে লও মুখখানি হে পিশাচী কর না চুম্বন,
আজ হোক ছাড়াছাড়ি দূরে যাক কাম আলম্বন।
তোমার কবরীখানি, আঁখি দু'টি শিশির সজল,
তব উচ্চ বক্ষতট, কামনায় করিছে বিহ্বল,
আজ যবে এল জরা ছেড়ে দাও বাসক শয়ন
অয়ি চতুরিকা বালা লহ মোর আত্মসমর্পণ।

মার্গট রাভকের একটি প্রেমের কবিতা তুলিতেছি—সংক্ষিপ্ত, রোমাঞ্চহীন অথচ আধুনিক মনোভাবের দিক দিয়া অনবদ্য।

ভাবতে আমি ভালবাসি ভালবাসি ভাবনা,
তোমায় তবু প্রাণের বাঁশী! মোটেই সখি ভাবব না।
তোমার মিষ্টি হৃদয়খানি, আমার প্রাণের বালা
তোমার আলিঙ্গনে রাণি! নাইকো কোনই জালা।
মনের গ্লানি রইবে সখি যত দিবস মনে
আসবো নাকো তোমায় দেখি ভালবাসার সনে
তার পরেতে হৃদয় যবে মুক্ত হবে মম,
ফিরে দেব তোমায় তবে ওগো অনুপম!

এই বার এক জন মহিলা কবির কথা বলি। নাম তাঁহার ডোরথি ওয়েলেসলি। তাঁহার রচনা-রীতি সুন্দর, তাহার পৌরুষময় ছন্দ হৃদয়গ্রাহী এবং প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ তাঁহার বর্ত্তমানের সংশয় ও আশায় ব্যাকুল।

বারাব্বাস আর জুডাস ইসক্যারিয়ট
যে রজনীতে মৃত্যু হ'ল বিধাতার দূত খৃষ্টের
যে রাত্রিতে তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন
"ওরা জানে না ওরা কি করছে"
তোমরা তখন কি করেছিলে
তোমরা দু'জনে মিলে?
উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল বারাব্বাস
লম্পট বারাব্বাস
খেয়েছিল মদ, করেছিল চুরি, দিয়েছিল গালি
ফিরে এল পর দিন তাই কারাগারে—নিত্য পরিচিত ভোগে
একটি বারবনিতার অভিযোগে।
জুডাস ইসক্যারিয়ট, সূর্য্য তখন অর্দ্ধেকও ওঠেনি
সেই অন্ধকারেই সে চলে গেল,
সুন্দর জুডাস, বনস্পতি
চৈত্র-লক্ষ্মীকে করে পুষ্পে মধুমতী।

বিংশ শতাব্দীর দু'টি যুদ্ধ, অনিশ্চয়তা ও বেদনা মানুষকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে বলা চলে, তাই দেশে দেশে ভাবপ্রবণ কবিরা নূতন পথে সত্যের সন্ধান করিয়াছেন এবং আচরণের এবং আদর্শের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীকে কাব্যরূপ দিয়াছেন।

ব্রাউনিং ছিলেন আশার কবি, তিনি লিখিয়াছিলেন :—

কত মধুময় মানব-জীবন, বেঁচে থাকা কত না সুন্দর,
চিরকাল চিরদিন ভরে দেয় মানুষের ব্যথিত অন্তর
কে বলে এ মিছা? আমি যে দেখেছি চোখে
আমি গাহি গান, আমি যে বুঝেছি লোকে।

এই আশার পুলক বর্ত্তমানের জীবন হইতে যেন চলিতে বসিয়াছে। রোমাণ্টিক মনোভাব মানুষের আদৌ নাই—মানুষ যাতনায় ছটফট করিতেছে। সমস্যার পর সমস্যা তাহাকে বিচলিত ও কাতর করিতেছে। তাই মানুষ সংশয়ী ও অবিশ্বাসী। এই তমসার ও দুর্ব্বলতার মাঝে জর্জ্জ বার্কারের নীচের কবিতাটি উৎসাহের দীপ্তিতে চিত্তকে পূর্ণ করিয়া তোলে।

কবে পুনরায় ধরায় মানুষ
তুলিবে অভয় হস্ত?
পলাবে না ভয়ে যাবে রণজয়ে,
একে অপরেরে সাথে লয়ে লয়ে
করিবে মহান্ ষস্ত।
অনেক মানুষ মনে মনে ভালো
তবু তারা বাধা পায়,
শোণিত ঝরিয়া ব্যথা পায় শত,
পতনের কোলে মাথা করে নত
পরাজিত বেদনায়
ওই দেখ চেয়ে পাথরের বুকে
লুটায় বিহ্বল চিতে
পাঁজর ভেঙেছে, তবু সহে মুখে
নব আশা-ভরা গীতে।
মধ্যাহ্নের রৌদ্রদীপ্তি দেয় আনি পূর্ণতার জ্যোতি
আকাশের তারা-দল মনে-প্রাণে দীপ্ত করে মোতি
বক্ষতলে অজানিতে জেগে ওঠে শুদ্ধতার আলো,
তারা কি রহিবে পিছে?
কবে পুনরায় ধরায় মানুষ
মেলিবে অভয় হস্ত
পাহাড় ডিঙাবে প্রাচীর লাফাবে
বাধা সব করি ত্রস্ত?

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীর নানা রূপের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে, অল্প যাহা দিলাম তাহাতে একটি কথা পূর্ণভাবে প্রতিভাত হইবে। তাহা এই, যুগে যুগে কালে কালে সাহিত্য-প্রতিভার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ নাই, প্রত্যেক যুগেই সমধর্ম্মা এবং সমকর্ম্মা শিল্পী এবং রূপদক্ষ জন্মগ্রহণ করে। অবশ্য সর্ব্বাতিশায়ী প্রতিভা বিরাট যুগের অবদান, তাহার কথা বলিতেছি না—তাহা বাদ দিলে বিংশ শতাব্দীর কাব্য-সম্ভারকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

কবি তাঁহার পরিবেশকে আপন প্রতিভার পরিপূর্ণ ও প্রোজ্জ্বল করিয়া তোলেন, ইহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব। আধুনিক কবিদের শ্রেষ্ঠতম ইলিয়ট লিখিয়াছেন :—

"When a poet's mind is perfectly equipped for its work, it is constantly amalgamative disparate experience; the ordinary man's experience is chaotic, irregular, fragmentary. The latter falls in love, or reads Spinoza, and these two experiences having nothing to do with each other, or with the noise of type-writer or the smell of cooking, in the mind of the poet these experiences are forming new wholes."

ইহাই কবিতার চিরকালের কথা। কবি তাঁহার অনুভূতির আবেগে সমগ্রকে দেখিতে পান, বিচ্ছিন্নের সহিত পূর্ণতার, খণ্ডের সহিত অখণ্ডতার যে ঐক্যতান তিনি গড়িয়া তোলেন, তাহাই তাঁহার রচনাকে শাশ্বত এবং চিরসুন্দর করে।

বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কবিতা টাইপ-রাইটার, কলের চিমনি, রাজপথ, মোটর, ট্রাম, বাস প্রভৃতি গদ্য জিনিষকে পদ্যে দেখিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যের সহিত সার্থক করিয়া একটি সমগ্র ভাবরূপকে ফুটাইতে পারিয়াছে—ইহাতেই তাহাদের সার্থকতা। বাংলায় নবযুগের রস-রসিকেরা এই নূতন কালের নূতন ফোটা ফুলকে সমাদর করিবেন—পদ্মফুল নহে বলিয়া তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না—এই নিবেদন করিয়াই আজিকার মত বিদায় প্রার্থনা করি।

আমেরিকায় স্বামী তুরীয়ানন্দ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

সানফ্রান্সিস্কোতে স্বামী বিবেকানন্দের শেষ বক্তৃতাবলী ১৯০০ খৃঃ মে মাসে প্রদত্ত হয়। সানফ্রান্সিস্কো হইতে স্বামিজী নিউ ইয়র্ক হইয়া প্যারিসে আসেন। সানফ্রান্সিস্কো ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি ভক্ত-বন্ধুদিগকে নম্র ভাবে বলেন, "আমি তোমাদের কাছে আমার একটি গুরুভাইকে পাঠাবো যিনি আমার চেয়েও বড়। আমি যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলাম তিনি তাহা জীবনে পরিণত করেছেন। আমি স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাঠাবো।"* স্থানীয় ভক্ত-বন্ধুগণ বিস্মিত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, সেই মহাপুরুষ কেমন, যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ এত প্রশংসা করিলেন। সকলে সাগ্রহে স্বামী তুরীয়ানন্দের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামিজী নিউ ইয়র্ক যাইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে সানফ্রান্সিস্কোতে পাঠাইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ সানফ্রান্সিস্কোতে উপস্থিত হইলেন। তিনি গেলেন শিশু-সুলভ মধুরতায় ও নম্রতায় শোভিত এবং আধ্যাত্মিক অগ্নিতে প্রদীপ্ত হইয়া, ঠাকুরের ভাষায় সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পবৎ বা প্রাতঃকালীন শিশিরবিন্দুবৎ বিমল। তিনি ভক্তগণের জীবন-ভূমিতে নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে প্রেমের প্রেরণার স্পর্শ দিলেন এবং আলোকময় অনন্তের পথে তাহাদিগকে চালিত করিলেন। জনৈক পাশ্চাত্য ভক্ত বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দের ও স্বামী তুরীয়ানন্দের অলৌকিক আধ্যাত্মিক তীব্র জ্যোতিতে বহির্মুখী জড়বাদী পাশ্চাত্যবাসিগণের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের সমগ্র ভূমির পরিচয় দিলেন। তাহাতে পাশ্চাত্য মানবের নব জন্ম লাভ হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দের পূতস্পর্শে পাশ্চাত্য-মনের সুপ্ত সম্ভাবনারাশি জাগ্রত হইয়া উঠিল।

"সংপ্রাপ্ত প্রেরণাকে জীবনে সজীব করিবার জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ পাশ্চাত্য-মনকে সুশিক্ষিত ও সঞ্চালিত করিলেন। তাঁহার শুভাগমনে শান্তি আশ্রমের উদ্ভব। সানফ্রান্সিস্কোতে নব-স্থাপিত বেদান্ত সমিতির একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই নূতন অধ্যায়ে পূর্ব্ব-প্রচারিত বেদান্ত-ভূমিকার বিভিন্ন দিক বিশদরূপে ব্যাখ্যাত ছিল না। ইহা ব্যক্তিগত সংস্পর্শকে সুস্পষ্ট করিয়া আত্মানুসন্ধানের শক্তি জাগ্রত করিল। আধ্যাত্মিক অনুরাগের মূলীভূত বিচারশক্তি ও হৃদয়াবেগ সক্রিয় করিল। আমাদের জীবন স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক যে ভাবধারার অভিমুখে ফিরিল, আমাদের মানসিক শক্তিসমূহকে সেই ভাবে শিক্ষিত করিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ।"

স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব ও প্রেরণায় আমেরিকার মনে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হইল, তাহাকে কি ভাবে স্থায়ী ও ব্যাপক করা যায়? বেদান্তের অনুরাগিগণ যখন উক্ত সমস্যার সমাধানে সমাকুল, ঠিক এমন অবস্থায় স্বামী তুরীয়ানন্দ যাইয়া সমগ্র ভার গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রাণে আশার আলোক জ্বালিলেন। কেবল বক্তৃতা শোনার দিন শেষ হইল। তাঁহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া বেদান্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয় বার আমেরিকায় যান তখন নিউ ইয়র্কে তাঁহার শিষ্যা কুমারী মিনি বুক বেদান্ত সাধনার উদ্দেশ্যে আশ্রম স্থাপনার্থ কালিফোর্ণিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলে ১৬০ একর (প্রায় ৫০০ বিঘা) নিষ্কর ভূমি দান করেন। স্বামিজী শিষ্যার বিপুল দান গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু স্থানটি পরিদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে তথায় যাইয়া আশ্রম স্থাপন করিতে বলিলেন। স্বামিজী গুরু-ভ্রাতাকে বলিলেন, 'হরি ভাই, সেখানে যাও, কাজে প্রাণ ঢালিয়া দাও, সন্ন্যাসীর মত থাক এবং ভারতকে ভুলিয়া যাও।'

স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামিজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। কিন্তু ভারতকে ভুলিতে পারিলেন না। তিনি এক দিন শান্তি আশ্রমে

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (মে, ১৯১৮) এক এস ঘোড হ্যামেল লিখিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

বলিয়াছিলেন, 'তোমরা জান, আমি তোমাদের সকলকে কিরূপ ভালবাসি, কিরূপ তোমাদিগকে অভিন্ন জ্ঞান করি, তোমাদিগকে পরমাত্মীয় মনে করি। বস্তুতঃ আমি ভুলিয়া যাই যে, আমি বিদেশে আছি। কিন্তু ভারতকে একেবারে ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' ভারতকে বিস্মৃত না হইলেও স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকাকে স্বদেশ তুল্য ভালবাসিতেন এবং উহার গুণাবলীর প্রশংসা করিতেন। কথাপ্রসঙ্গে এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের মেয়েরা কেমন সবল ও স্বাধীন। তোমাদের সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ কি সুন্দর! তোমরা চাকরদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার কর আমি তা খুব পছন্দ করি। তীব্র কর্ম সত্ত্বেও তোমরা বাক্যে কেমন সংযত! তোমাদের কথায় চীৎকার নাই, উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। তোমরা শৃঙ্খলাপ্রিয় ও সময়ানুবর্তী। তোমরা সব জিনিষ কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ।...'

আশ্রমের ভূমিদাত্রী কুমারী বুকের সহিত স্বামী তুরীয়ানন্দ কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলেসে যান। উক্ত সহরে স্বামিজী যাঁহাদের অতিথি হইয়াছিলেন তাঁহাদের বাড়ীতেই উঠিলেন। উক্ত গৃহে তিনটি সহোদরা ভগিনী থাকিতেন। তাঁহারা সকলে বেদান্তানুরাগিণী ছিলেন। স্বামিজী তাঁহাদিগকে পরিহাসচ্ছলে 'তিনটি করুণা' (three Graces) বলিতেন। ভগিনীত্রয় স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাইয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং নবাগত সন্ন্যাসীকে সমুদ্র-তীর, পার্শ্ববর্তী সহরগুলি এবং কমলা লেবুর বড় বড় বাগান দেখাইলেন। কালিফোর্ণিয়া কমলা লেবুর জন্য প্রসিদ্ধ। লস্ এঞ্জেলেসেও স্বামী তুরীয়ানন্দ জগন্মাতার চিন্তায় ও প্রসঙ্গে নিমগ্ন ছিলেন। ধর্মশিক্ষা, ধর্মালাপ ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় তাঁহার দিনগুলি কাটিত। তথায় তিনি প্রভাবশালী প্রচারকরূপে পরিগণিত হইলেন। তাঁহাকে সেখানে রাখিবার জন্য বন্ধুগণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি ত স্বামিজী কর্তৃক অন্য কার্য্যের জন্য প্রেরিত। তিনি তথায় কয়েক সপ্তাহ কাটাইয়া ১৯০০ খৃঃ ২৬শে জুলাই সানফ্রান্সিস্কোতে পৌছিলেন। উক্ত সহরে তিনি সশ্রদ্ধ সম্বর্দ্ধনা পাইলেন। কারণ, স্বামিজী এইখানেই স্থানীয় ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, 'আমি কেবল বক্তৃতাই দিলাম। কিন্তু আমি আমার এমন এক গুরুভাইকে পাঠাইব যে দেখাইবে ও শিখাইবে আমি যা বলেছি তা কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়।'

স্বামিজীর অল্পসংখ্যক অনুরাগী বন্ধু মিলিত হইয়া সানফ্রান্সিস্কোতে বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বন্ধুগণ নিয়মিত ভাবে মিলিত হইয়া উক্ত সমিতিতে বেদান্ত অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতেন। তাঁহাদের লইয়াই স্বামী তুরীয়ানন্দ কাজ আরম্ভ করেন। অচিরে তাঁহার ক্লাশে শ্রোতার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তন্মধ্যে যে বার জন বেদান্ত সাধনার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন তাঁহাদের লইয়া তিনি সান আন্তোন উপত্যকায় শান্তি আশ্রম স্থাপনার্থ যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ১৯০০ খৃঃ ৩রা আগষ্ট যাত্রার দিন নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু সানফ্রান্সিস্কো হইতে সান আন্তোন উপত্যকা বহু দূর। সানফ্রান্সিস্কো হইতে সান জোস পর্য্যন্ত ট্রেণে, তথা হইতে বাইশ মাইল চারি-ঘোড়ার গাড়িতে চড়াই-উৎরাই পথে ৪৪০০ ফুট উচ্চ হামিলটন পর্ব্বত-শিখরে অবস্থিত জগদ্বিখ্যাত লেক অবজার্ভেটারী পর্য্যন্ত। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে হামিলটন সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। সান জোস হইতে হামিলটন পাহাড়ে উঠিতে হয়। সাণ্টাক্লারা উপত্যকায় অবস্থিত আঙ্গুর, কমলা প্রভৃতি ফলের বড় বড় সুন্দর বাগান। তথা হইতে নিম্ন পথে দক্ষিণ-পূর্ব্বে আঠারো মাইল সান আন্তোন উপত্যকায় যাইতে হয়। কিন্তু এই সুদীর্ঘ যাত্রা কষ্টকর হয় নাই। রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, ক্লান্তিহর শীতল বায়ু, ফলের বাগান, অলিভ উদ্যান, আঙ্গুর বাগান, যাত্রিগণের উৎসাহ, স্বামী তুরীয়ানন্দের সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি ও চিত্তাকর্ষক ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ উক্ত যাত্রাকে সুখকর করিয়াছিল। সান জোসে শেষ রেলওয়ে ষ্টেশন ও বাজার অবস্থিত। এই স্থান হইতে সান আন্তনিয়ো পঞ্চাশ মাইল পথ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, 'পদ্মপত্রের মত হও। পদ্মপত্র জলের উপর ভাসে, কিন্তু জল উহাতে লাগিয়া থাকে না। অথবা ননীর তুল্য হও। ননী দুধের উপর ভাসে, কিন্তু উহার সহিত মিশ্রিত হয় না। চিত্ত শুদ্ধ করিয়া ঈশ্বর দর্শন কর। তখন সংসারে থাকিলেও আসক্ত হইবে না।' স্বামী তুরীয়ানন্দ সানফ্রান্সিস্কোতে এক দিন ক্লাশে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে প্রথমে ঈশ্বরলাভ করিতে এবং তদন্তে সংসারে বাস ও কর্ম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তদনুযায়ী হরি মহারাজ ঈশ্বরলাভকেই স্বীয় জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ছাত্র ছাত্রীগণকে তাহাই করিতে উদবুদ্ধ করিতেন। শান্তি আশ্রমের যাত্রী দলের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা একটি তরুণী ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ পথে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা ইডা, তুমি আমাদের সঙ্গে এলে কেন? তুমি ত অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্র? তুমি আশ্রমে যাইয়া কি করিবে?' 'ও! স্বামী, আমি ওখানে যাচ্ছি এই জন্য যে, আমি ননীর মত হইতে চাই।' তাহার সরল উত্তরে হরি মহারাজ অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, 'হাঁ, নিশ্চয়ই তুমি ননীর মত হইতে পারিবে যদি সাধ্য মত চেষ্টা কর।'

প্রীতিপ্রদ যাত্রার শেষে যাত্রী দল সান আন্তোন উপত্যকায় উপস্থিত হইল। মানব-নিবাস হইতে সুদূরে পর্ব্বতোপরি জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ-নীচ স্থান-সঙ্কুল এই উপত্যকা। ওক, পাইন, চাপারাল মানজানীতাদি বৃক্ষে উহার একাংশ পরিপূর্ণ। অন্য অংশ সমতল ও তৃণাচ্ছাদিত। সুদূরে চির-তুষারাচ্ছন্ন সমুচ্চ সিয়ারা নেবাদা পর্ব্বতশ্রেণী। শান্তি আশ্রমের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দেড় মাইল দীর্ঘ ও আধ মাইল প্রস্থ। ইহার চারি দিকে কাঁটা তারের বেড়া, ইহা জল-হীন ও অনুর্ব্বর, গ্রীষ্মে অতি উত্তপ্ত ও শীতে অতি শীতল হয়। গ্রীষ্মকালে ইহার তাপ ১১৮° ফারেনহিট অথবা তন্নিম্নেও নামে। কোন কোন বৎসর বরফ পড়ে। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়, তার পর সব শুষ্ক হইয়া যায়। একটি খাড়ী উহার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। কিন্তু উহা বৎসরের অধিকাংশ সময় শুষ্ক থাকে। এক প্রকার ছোট ঘাস সারা জমিতে হয়। এই ঘাস খাইয়া অসংখ্য পশু বাঁচিয়া থাকে। ইহা পশুচারণ মাঠরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গৃহপালিত পশুগুলি এখানে চরিয়া বেড়াইত এবং ঘাস খাইয়া বাড়িত, বড় হইলে কসাইদের কাছে বিক্রীত হইত। ক্ষীণকায় প্রস্রবণ কয়েকটি আছে দূরে দূরে। এই নির্জন আরণ্য আশ্রমে কয়েকটি নরনারী বেদান্ত সাধনের জন্য তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সান্নিধ্যে বাস করিতে গিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনে ইহা অভিনব

প্রচেষ্টা। স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে বসবাসে তাঁহাদের জীবন উন্নত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল। যে যেমনটি আসিয়াছিল সে তেমনটি ফিরিয়া যায় নাই। জ্বলন্ত অগ্নির পাশে বসিলে শীতল শরীর উত্তপ্ত হইবেই। দিব্য স্ফুলিঙ্গ প্রত্যেকের সাধন-প্রদীপ জ্বালাইল। স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমটির নাম রাখিলেন শান্তি আশ্রম।

একটি পুরাতন কাঠের ঘর ব্যতীত আশ্রম-গৃহ কোন কিছুই ছিল না। এতগুলি লোক কোথায় থাকিবে ও শুইবে? জল কোথায় পাওয়া যাইবে? অনেক দূর হইতে জল আনিতে হয়। স্বামী তুরীয়ানন্দ কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইলেন। আশ্রম-ভূমির এ-ধার হইতে ও-ধার তিনি ঘুরিয়া দেখিলেন। তিনি ভগ্ন-হৃদয়ে জনৈক ছাত্রকে বলিলেন, 'তোমরা আমাদিগকে কোথায় এনেছ?' কিন্তু আমেরিকান ছাত্র-ছাত্রীগণ হতোদ্যম হইলেন না। তাঁহারা কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী, শ্রমশীল ও কর্মঠ ছিলেন। কাহারো কাহারো তাঁবুতে বাস করার অভ্যাস ছিল। সাময়িক ব্যবস্থা অচিরে করা হইল। কিন্তু হরি মহারাজ ভয় করিলেন যে, কঠোর পরিশ্রমে তাহাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে পারে। তিনি প্রাঙ্গণে পায়চারী করিতে করিতে জগন্মাতাকে অভিযোগ পূর্বক বলিলেন, 'মা, এ কি করলে? তোমার অভিপ্রায়ই বা কি? এই লোকগুলি এরূপ কঠোরতা অভ্যাস করিলে মারা যাবে! আশ্রয় নাই, জল নাই। তারা এই অবস্থায় কি করিবে?'

একটি ছাত্রী তাঁহার গভীর ভাব বুঝিতে না পারিয়া ভাবিল, স্বামী বোধ হয় বিশ্বাস হারাইয়াছেন। সে তাঁহার নিকট যাইয়া বলিল, 'স্বামী, আপনি হতাশ হইলেন কেন? আপনি জগন্মাতার উপর বিশ্বাস হারাইলেন না কি? আপনি চিন্তিত হইবেন না। তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।' স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ গৃহে বাস এবং নাগরিক জীবন যাপন করিয়া এই রমণী এত সাহসী!' তিনি ঘাড় সোজা করিয়া সোৎসাহে বলিলেন, 'তুমি ঠিক বলেছ। মা আমাদিগকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। তোমার কি বিশ্বাস! এখন হইতে তোমার নাম হইবে 'শ্রদ্ধা'।

প্রথমে সকলেই তাঁবুতে থাকিতেন। পরে কাঁচা ইটের এবং কাঠের কেবিন নির্মিত হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দের সময়ে তিন-চারিটি কাঠের কেবিন তৈরী হইয়াছিল, বাকীগুলি ছিল ইটের। কাঠের কেবিনগুলি ব্রহ্মচারী গুরুদাস এবং মিঃ বোয়ার কর্তৃক নির্মিত। এক-একটি কেবিন মাত্র এক-এক জনের বাসযোগ্য ছিল। কাঁচা ইটের একটি কেবিনে ভগিনী বীরা ও ভগিনী প্রভৃতি একত্রে থাকিতেন। ক্রমশঃ পাকশালার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কয়েকটি তাঁবু খাটান হইল। একটি কূপ খনন করা হইল। একটি ধ্যান-ঘরও নির্মিত হইল। এক জনের সাহায্য বিশেষ ভাবে কার্য্যকরী হইল। তিনি উদ্যমশীল, আত্মত্যাগী ও শিল্পকার্য্যে নিপুণ ছিলেন। যেখানে সাহায্য দরকার সেইখানে তিনি অচিরে উপস্থিত হইতেন। তাহার সেবাপরায়ণতা দর্শনে প্রীত হইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহার নাম রাখিলেন সাধুচরণ। সুতরাং অল্প কালের মধ্যে স্থানটি বাসযোগ্য ও আরামপ্রদ হইল। দৈনন্দিন কার্য্যতালিকা প্রচলিত হইল।

আশ্রমবাসিগণ প্রাতে পাঁচটার শয্যাত্যাগ করিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ও পুরুষগণ প্রধান তাঁবু হইতে একটু দূরে স্নান সারিতেন। শীত ও গ্রীষ্মকালে প্রাতঃস্নান চলিল। শীত-কালীন প্রাতে স্নানার্থে কূপ সমীপে যাইবার সময় এত অন্ধকার থাকিত যে পথ দেখিবার জন্য লণ্ঠন লইতে হইত। শীতও তখন এত অধিক ছিল যে, স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখা যাইত, সিক্ত তোয়ালেগুলি ঠাণ্ডায় বরফ জমাতে শক্ত হইয়া গিয়াছে! তৎপরে ধ্যান-ঘরে আগুন জ্বালিয়া সকলে উহার চতুর্দিকে বসিতেন। গ্রীষ্মকালে বৃক্ষ-তলে প্রাতঃকালীন ধ্যান হইত। শীতকালে সকালের ধ্যানের পূর্বে স্বামী তুরীয়ানন্দ সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ও অর্থ করিতেন। পরে সকলকে লইয়া তিনি এক ঘণ্টা ধ্যান করিতেন। ধ্যানান্তে ছাত্রী-গণ প্রাতর্ভোজ প্রস্তুত করিতেন এবং ছাত্রগণ জল আনা, কাঠ কাটা, শাক-সব্জী লাগান ও কেবিন নির্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমের সকল কাজেই আগ্রহ দেখাইতেন ও সাধ্যমত যোগ দিতেন। বেলা আটটার সময় ক্যাম্বিস-নির্মিত আহার-কক্ষে প্রাতর্ভোজ পরিবেশিত হইত। পাহাড়ের হাওয়া ও শারীরিক পরিশ্রমে সকলের বেশ ক্ষুধা হইত এবং সকলের স্বাস্থ্যোন্নতি দেখা গেল। প্রাতর্ভোজের ঘণ্টাটি বিশেষ উপভোগ্য ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ নানা বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতেন। সকলে সেই প্রসঙ্গে যোগ দিত। আলোচনা-স্রোতের গতিটি স্বামী তুরীয়ানন্দ সযত্নে সর্বদা রক্ষা করিতেন। হাস্য ও আমোদ সত্ত্বেও জীবনের লক্ষ্য কখনও দৃষ্টির বহির্ভূত হইত না।

প্রাতরাশের পরে প্রত্যেকে স্ব স্ব কার্য্য করিতেন। দশটা হইতে এগারটা 'গীতা' ব্যাখ্যা হইত। তৎপরে পুনরায় এক ঘণ্টা ধ্যান। বেলা একটায় দ্বিপ্রহরের আহার, সন্ধ্যা সাতটায় নৈশ ভোজন এবং তৎপরে সান্ধ্য ধ্যান। রাত্রি দশটায় প্রত্যেকে স্ব স্ব তাঁবুতে শয়নার্থ যাইতেন। ইহাই ছিল আশ্রমের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দ সদা কর্মরত থাকিতেন। তিনি কখনও ইহাকে, কখনও বা তাহাকে কিছু বলিতেন। সর্বদা তিনি জগন্মাতার প্রসঙ্গই করিতেন। তিনি অন্য প্রসঙ্গ ভালবাসিতেন না। কখনো কখনো তিনি বলিয়া উঠিতেন, 'মায়ের চিন্তায় মগ্ন হও, জাগতিক বিষয় ভুলিয়া যাও। আশ্রমে কেবল মায়ের কথা, মায়ের চিন্তাই চলুক। সহরের ভাব এখানে আনিও না। সে সব ভুলিয়া মাকেই ডাক, মাকেই ভাব।'

যখন ছাত্র-ছাত্রীগণের কয়েক জন মিলিত হইয়া আলাপ করিতেন, তিনি সত্বরে তাঁহাদের কাছে যাইয়া বলিতেন, 'তোমরা কি বিষয়ে আলাপ করছ? সকলে মিলিয়া তাঁর চিন্তাই কর, তাঁর সান্নিধ্যে যাইবার চেষ্টা কর।' স্বামীর উপদেশ কোন বিশেষ ক্ষণের বা দিনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। তাঁহার ধর্ম রবিবার বা কোন নির্দিষ্ট দিনের জন্য নহে। তিনি যাহা তাহাই শিক্ষা দিতেন। তাঁহার কথা স্রোতবৎ নির্গত হইত নব নব প্রবাহে। অফুরন্ত নির্ঝরিণীর ভাবস্রোত অনর্গল প্রবাহিত হইয়া ছাত্র-ছাত্রীগণকে দিব্য ভাবে আবিষ্ট করিত। কখন্ তাঁহার ভাবাবেগ আসিবে কেহ জানিত না, ইহার জন্য সময়ের নির্দিষ্টতা ছিল না। সেই জন্য ছাত্র-ছাত্রীগণ সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চাহিতেন যাহাতে তাঁহার

অন্তর্নিহিত উৎস হইতে নির্গত সকল বাক্যই শুনিতে পান। স্বামী তুরীয়ানন্দ শান্তি আশ্রমে সদা দিব্যভাবে এত আবিষ্ট থাকিতেন যে, সকলের মনে হইত, জগন্মাতা তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হইয়া তাঁহার জিহ্বাবলম্বন পূর্ব্বক আশ্রমবাসিগণকে শিক্ষা দান করিতেছেন। তিনি আশ্রমবাসিগণকে জগদম্বার সন্তান বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাঁহার এই আহ্বান শ্রোতাদের কর্ণে মধু বর্ষণ করিত, তাহাদের হৃদয়ে আশার আলোক জ্বালিয়া দিত।

একদা রান্না-ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ দেখিলেন যে, আহার পাক করিবার সময় একটি ছাত্রী পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ আহার্য্য তুলিয়া লবণের মাত্রা ঠিক হইয়াছে কি না জানিবার জন্য আস্বাদ করিলেন। তাহা দেখিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "আমরা ভারতে কখনও আহার্য্য পাক করিবার সময় আস্বাদন করি না। কারণ, ইহা ঈশ্বরকে নিবেদিত হয়। আমরা নিজেদের জন্য বা পরিবারবর্গের জন্য রন্ধন করি না, ঈশ্বরকে নিবেদন করিবার জন্য আমরা অন্ন রন্ধন করি। ঈশ্বরকে অন্ন নিবেদিত হইলে বাড়ীর সকলের মধ্যে বিতরিত হয়। সেই জন্য আমরা রান্না ঘর ও তৎসম্পর্কিত সকল বস্তু পরিষ্কার রাখি। আমরা স্নান ও উপাসনা সমাপনান্তে ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া রান্না-ঘরে যাই। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কার্য্য ঈশ্বরকে নিবেদনার্থ সম্পাদন করা উচিত। তাহা হইলে আমরা শীঘ্রই আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হইব।" যখন তাঁহাকে ফুল উপহার দেওয়া হইত, তিনি সেইগুলি আঘ্রাণ না করিয়া বা কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির সম্মুখে স্থাপন করিতেন। একবার গুরুদাস মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামী, আপনি ফুল পছন্দ করেন না?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হাঁ, নিশ্চয়ই; নচেৎ কিরূপে সেগুলি আমি ঠাকুরকে দিতাম? কিন্তু আমরা দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ফুল আঘ্রাণ করি না।'

কখনও কখনও নূতন ছাত্র বা ছাত্রী আসিত। একবার একটি তরুণী ছাত্রী আসিল। সে শুনিয়াছিল, ভারতে শিষ্যগণ সমিৎপাণি হইয়া অরণ্যবাসী গুরুর কাছে যাইতেন। ছাত্রীটি আশ্রম-সংলগ্ন জঙ্গলে ঢুকিয়া কয়েক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বামী তুরীয়ানন্দের তাঁবুতে গেল। স্বামী বলিলেন, 'ভিতরে এস।' নবাগতা তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া কাষ্ঠখণ্ডগুলি সম্মুখে রাখিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্বামী নবাগতার ভাবটি বুঝিলেন এবং উচ্চ-শিক্ষিতা তরুণীর সরলতা ও নম্রতায় মুগ্ধ হইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের মাতৃসুলভ স্নেহে আশ্রম-জীবন মধুময় হইয়া উঠিল। নবাগত ছাত্র-ছাত্রীগণ অচিরে আশ্রমের ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন। আলস্য কাহাকেও স্পর্শ করিত না, জীবনের বাহিরে ও অন্তরে কর্ম্ম-তৎপরতা ছিল। স্বামী আধ্যাত্মিক অগ্নির হোমকুণ্ডস্বরূপ ছিলেন। সেই দিব্য অগ্নি আশ্রমবাসিগণের জীবনে জ্বলিয়া উঠিল। পরম উৎসাহ ও ঐকান্তিকতার বলে প্রত্যেকে ঈশ্বর-চিন্তায় ডুবিতে চেষ্টা করিলেন।

আশ্রমে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ছিল না, একদা একটি ছাত্র হরি মহারাজকে কয়েকটি নিয়ম নির্দ্ধারিত করিতে বলিলেন। স্বামী বলিলেন, "তোমরা নিয়ম চাও কেন? তুমি কি দেখছ না, প্রত্যেকে কেমন সময়ানুবর্ত্তী? আমরা সকলে কেমন নিয়মানুবর্ত্তী? কোন ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে বা ধ্যানে কেহ অনুপস্থিত হয় না। মা নিজেই তাঁর আশ্রমের সব নিয়ম করে রেখেছেন। তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমরা কেন আমাদের নিয়মাদি করিতে যাইব? আশ্রমে স্বাধীনতা থাকুক, কিন্তু যথেচ্ছাচারিতা যেন আশ্রমে না ঢোকে। ইহাই মায়ের শাসন-নীতি। আমাদের কোন সংঘ নাই। কিন্তু দেখ, আমরা কেমন সংঘবদ্ধ। এই প্রকার সংঘই স্থায়ী হয়। অন্য প্রকার যে কোন সংঘ কালে নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ সংঘই মানুষকে মুক্ত করে। সংঘের ইহাই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ। কারণ ইহা আধ্যাত্মিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

অন্য এক সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন। অপর এক সময় আর একটি ছাত্র মন্তব্য করিলেন, 'স্বামী, কি আশ্চর্য্য যে, এত বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারীগণ একত্রে শান্তিতে থাকিতে পারে!' স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "এর এক মাত্র কারণ এই যে, আমি প্রেমের দ্বারাই শাসন করি। তোমরা সকলে প্রীতিসূত্রে আমার সঙ্গে আবদ্ধ। অন্য কি উপায়ে ইহা সম্ভব হতে পারে? তুমি কি দেখছ না, আমি সকলকে বিশ্বাস করি এবং সকলকে স্বাধীনতা দিই। আমি যে এইরূপ করি তাহার কারণ, আমি জানি, তোমরা সকলে আমাকে ভালবাস। কোথাও সংঘর্ষ নাই, সবই নির্ব্বিঘ্নে চলে যাচ্ছে। কিন্তু মনে রেখো, এ সব মা-ই করছেন। এতে আমার কিছু করিবার নাই। তিনি আমাদিগকে সেই পারস্পরিক প্রীতি দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার কাজ ঠিক ভাবে চলে ও বাড়ে। যতক্ষণ আমরা তাঁর অনুগত থাকি ততক্ষণ কোন অনিষ্টের আশংকা নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমরা তাঁকে ভুলে যাই তখনই মহা বিপদের ভয় আসে। সেই জন্যই ত আমি তোমাদিগকে সর্ব্বদা বলি, মায়ের চিন্তা কর।"

ক্রীশ্চান সায়েন্সে বিশেষজ্ঞ একটি ছাত্র একবার স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাদের শরীরটাকে স্বাস্থ্যবান্ রাখা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়?' স্বামী উত্তর দিলেন, "হাঁ। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেহধারণ ত মহা ব্যাধি, মহা বিঘ্ন। আমরা দেহজ্ঞানের সমতীত হইয়া অনুভব করিতে চাই আমরাই অজর অমর আত্মা। সে উচ্চতর অবস্থায় আমরা জানিতে পারি, আমি এই দেহ নহি, আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা, দেহ মায়িক, মিথ্যা, সেই অবস্থা লাভের পথে দেহপ্রীতিই বড় বাধা। যত দিন আমরা দেহকে ভালবাসবো, তত দিন আমাদের আত্মজ্ঞান হবে না, এবং আমরা বার বার জন্ম গ্রহণ করবো। যখন আমরা দেহকে ঠিক ঠিক ভালবাসি তখন দেহের প্রতি ঔদাসীন্য আসা অবশ্যম্ভাবী। দেহাসক্তি দূরীভূত হইলেই মুক্তির দিব্যালোক দৃষ্টিগোচর হয়।"

একটি ছাত্রী প্রেততত্ত্ববাদিনী ছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ এক দিন দেখিলেন, তিনি যন্ত্রচালিত লেখন অভ্যাস করিতেছেন। মনকে জড়বৎ নিষ্ক্রিয় করিয়া স্বতঃচালিত লেখনের জন্য হাতে একটি পেন্সিল লইয়া বসিলেন। হাতটি প্রেত-চালিত হইয়া পড়িতে ও লিখিতে আরম্ভ করিবে এবং তিনি উক্ত লেখা স্বস্থ হইয়া দেখিবেন। এই উপায়ে কাগজে সুন্দর সুন্দর বিষয় লিখিত হয়। ছাত্রীটিকে উক্ত কর্ম্মে এবম্প্রকারে নিরত দেখিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "এ কি তোমার

বোকামী? তুমি কি প্রেত-চালিত হইতে চাও? এই নিরর্থক ব্যাপার ছেড়ে দাও। আমরা চাই মুক্তি। এই জগৎ এবং অন্যান্য সকল জগতের পারে আমরা যাইতে চাই। প্রেতাত্মাদের সহিত যোগাযোগ করিতে চাও কেন? তাদের শান্তিতে থাকিতে দাও। এই সব মায়া মাত্র। মায়ার বাহিরে যাও এবং মুক্ত হও।"

গুরুদাস মহারাজ বলেন, "স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে শান্তি আশ্রমে আমরা নিরন্তর আনন্দ ও অনুপ্রেরণা পাইতাম। তাঁহার নিকট সর্বদা সংশিক্ষা লাভ হইত। আমরা সকলেই অনুভব করিতাম, তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সদা সচেষ্ট। আধ্যাত্মিক ভাবে সদা আরূঢ় হইয়া তিনি কখনও সুকোমল, সুভদ্র ও সুশান্ত পিতৃতুল্য এবং কখনও গর্জনকারী বেদান্ত-কেশরীবৎ ব্যবহার করিতেন। আশ্রমে একটি মুহূর্ত অবসাদ বা অলসতায় ব্যয়িত হইত না।" ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই কোন না কোন কঠোরতা অভ্যাস করিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ কাহাকেও কঠোরতা অভ্যাস করিতে বলিতেন না। তাপসের তপঃপ্রভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কোন ছাত্র বা ছাত্রী তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হইতেন। কেহ আহার-সংযম, কেহ মৌনাবলম্বন, কেহ বা নির্জন-বাস করিতেন। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তপস্যায় প্রত্যেকে বিপুল আনন্দ পাইতেন। আধ্যাত্মিকতার মূর্ত্তি তপস্বীর কাছে কেহ উদাসীন বা অযত্নশীল থাকিতে পারিত না।

স্বামী তুরীয়ানন্দের সময়ে আশ্রমবাসিগণ নিরামিষাশী ছিলেন। আশ্রমে কাহাকেও পশু-পক্ষী শিকার করিতে দেওয়া হইত না। কিন্তু এই অহিংস নীতি কত দূর কি ভাবে পালন করা উচিত? বিশেষ উপলক্ষ না হওয়ায় এই বিষয়টি কাহারও মনে উঠে নাই। এক দিন অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ যে তাঁবুতে থাকিতেন উহাতে কাঠের মেজে ছিল। মেজে ও মাটির মধ্যে একটু ফাঁক ছিল। এক দিন স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন তাঁবুতে ঢুকিতেছিলেন তখন একটি বড় র‍্যাটল সর্প* মেজের নিচে লুকাইল। কি করা যায়? সাপটি ত যে কোন সময় তাঁবুর মধ্যে যাইতে পারে! লম্বা লম্বা লাঠির দ্বারা ইহাকে ইহার গুপ্ত স্থান হইতে সহজে তাড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তার পর? সাপটিকে মারা হইবে কি না? পরামর্শ-সভা বসিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ সিদ্ধান্তের ভার আশ্রমবাসীদের উপর ছাড়িয়া দিলেন। সামান্য মতভেদ হইল। কিন্তু অধিক সংখ্যক ব্যক্তি সাপটি মারিবার পক্ষে ছিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, 'এস, আমরা সাপটি ধরে পাহাড়ের উপরে ছেড়ে দিই? সেখানে আর সে আমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।' কিন্তু সাপটি ধরিবে কে? একটি বৃহৎ বিষধর সর্প ধরিয়া দূরে লইয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। অনেকে সাপটি ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সাপটিকে তাঁবুর তলা হইতে তাড়ান হইল। সকলে লাঠি হাতে করিয়া দূরে দূরে উহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সে সজোরে ঝম্-ঝম্ শব্দ করিতে লাগিল এবং ক্রুদ্ধ হইলেও আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। সে সতর্ক ও কুণ্ডলীকৃত রহিল। কেহ একটু কাছে আসিলে সে ফণা তুলিয়া ফোঁস্-ফোঁস্ শব্দ করিতে লাগিল।

প্রথমতঃ সাপটিকে লাঠির ভয় দেখাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। পরে কৌশলে উহার গলায় দড়ির ফাঁস পরাইয়া দুই জন সেই সুদীর্ঘ দড়ির দুই প্রান্ত ধরিয়া উহাকে শূন্যে তুলিয়া বহু দূরে লইয়া যাইয়া তথায় সাপটিকে নামাইয়া দড়ির দুই দিক ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলা হইল। সাধুচরণ নামক আশ্রমবাসী এই কার্যে সর্বাগ্রণী ছিলেন। সাপটি দূরে ফেলিয়া সকলে নিরাপদ ভাবিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দুই-এক দিনের মধ্যেই সাপটিকে পূর্ব স্থানে আবার দেখা গেল। উহার গলায় দড়ি থাকায় সহজে উহাকে চেনা গেল। পূর্ব প্রকারে উহাকে আরও দূরে লইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল। পরে উপহাসচ্ছলে সকলে উহাকে 'নেকটাই'-পরা সাপ বলিয়া উল্লেখ করিতেন।* এইরূপ ছোট ছোট সাময়িক ব্যতিক্রম ব্যতীত শান্তি আশ্রমে ধ্যান-তপস্যার স্রোত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বহিতে লাগিল।

* আমেরিকার এক জাতীয় বিষধর সর্প। ইহার লেজে কতকগুলি এরূপ গ্রন্থি থাকে যাহা গমন কালে ঝম্-ঝম্ শব্দ করে।

* With the Swamis in America পুস্তকে ৮০-৮১ পৃষ্ঠায় ঘটনাটি বিবৃত।

কথার মূল্য

টেলিগ্রামে কথার সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। কে কত কম কথায় কত বেশী মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে, তারই পরীক্ষা হয় টেলিগ্রামে। আর টেলিগ্রামে যত কম কথা দেওয়া যাবে তত কম তার মূল্য ধার্য্য হবে। কথা বাড়ালেই টাকার অঙ্কটাও বাড়তে থাকবে। কিন্তু আমেরিকায় পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, টেলিগ্রামে কেবল মাত্র দু'টি কথার অতি-ব্যবহারের জন্যেই বছরে ডাকঘর অতিরিক্ত ১০,০০০,০০০ ডলার আয় করে।

কথা দু'টি হচ্ছে 'অনুগ্রহপূর্ব্বক' আর 'ধন্যবাদ'। অর্থাৎ Please আর Thank you.

এগার

আহারান্তে মহিলারা অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এলিজাবেথ ছুটে গেল দিদির কাছে। দেখল, ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেকে সে বেশ সাবধানেই রেখেছে। তাকে সঙ্গে করে ড্রয়িং-রুমে নিয়ে এল এলিজাবেথ—সেখানে দুই বন্ধু তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। ভদ্রলোকদের আসার আগে এদেরকে এমন প্রীতিময়ী আর কখনো দেখেনি এলিজাবেথ। এদের আলাপের ক্ষমতা অসীম। যে-কোন গল্প সরস করে বলার, যে-কোন উৎসবের নিঁখুত বর্ণনার অসামান্য নিপুণতা আছে এদের। এক কথায় যেমন মধুসংলাপী তেমনি সুরসিকা।

পুরুষেরা ঘরে আসার পর দেখা গেল জেন আর মধ্যমণি নেই। ক্যারোলিনের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গেই ডার্সি'র উপর নিক্ষিপ্ত হোল—আরো অগ্রসর হবার আগেই তাকে কিছু বলার ইচ্ছা তার। ডার্সি ভদ্র অভিনন্দন জানাল এলিজাবেথকে। মিঃ হার্স্টও ছোট নমস্কার করে বলল—'ভারী খুশী হলাম।' কিন্তু মিস্ বিংলের জন্যই বুঝি জমা ছিল যত কিছু সরসতা, আন্তরিকতা। আজ সে আনন্দময়—সকলের প্রতি স্নিগ্ধ। প্রথম আধ ঘণ্টা আগুনটাকে জাঁকিয়ে তুলতেই কাটল, পাছে কক্ষ পরিবর্তনে জেনের ঠাণ্ডা লাগে। হার্স্টের ইচ্ছাতেই সে গনগনে আগুনের বিপরীত দিকে গিয়ে বসল দরজার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারবে বলে। হার্স্টও এসে বসল তার পাশে কিন্তু কারুর সঙ্গেই কথা বললে না সে। এলিজাবেথ সামনে বসে গভীর আনন্দে লক্ষ্য করতে লাগল সব।

চা-পানের পর হার্স্ট শ্যালিকাকে তাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল বার বার—কিন্তু বৃথাই। ডার্সির যে তাস খেলার আদৌ ইচ্ছা নেই, এ বুঝে নিতে দেরী হোল না ক্যারোলিনের। তাই সে বললে, তাস খেলায় কারুর অভিরুচি নেই—সমবেত নৈঃশব্দেই তার প্রমাণ। বাধ্য হয়ে হার্স্ট তখন একটি সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হোল। ডার্সিও একখানা বই তুলে নিলে,—ক্যারোলিনও অনুসরণ করল তাকে। এতক্ষণ সে হাতের চুড়ী আর ব্রেসলেট নিয়ে ক্রীড়ায় মত্ত ছিল—মাঝে মাঝে ভায়ের সঙ্গে এলিজাবেথের আলাপে ফোড়ন কাটছিল। মিস্ বিংলে যেমন নিজের বইতে চোখ বুলাতে লাগল তেমনি ডার্সি কত দূর পড়ছে তাও লক্ষ্য করতে লাগল। হয় নিজের বইয়ের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ, নয় ত অনবরত প্রশ্ন-বাণে জর্জরিত করতে লাগল ডার্সিকে। কিন্তু এত করেও কিছুতেই ডার্সিকে আলাপে টেনে নামাতে পারলে না। ডার্সি তার প্রশ্নের জবাব দিয়েই আবার পাঠে মন দিতে লাগল। অবশেষে বইতে নিজেকে মগ্ন করার চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে সে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে—'এই ভাবে সন্ধ্যা কাটান কত অপূর্ব। বই পড়ার মত আনন্দ আর নেই। একমাত্র বই ছাড়া আর সব কিছুতেই তাড়াতাড়ি অবসাদ আসে। নিজের যখন বাড়ী হবে সেখানে ভাল লাইব্রেরী না থাকলে একেবারে মরে যাব আমি।'

কিন্তু কেউই এ কথায় সায় দিলে না। তখন সে হাই তুলে বইটা পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিত্তবিনোদনের নতুন কিছুর সন্ধানে ঘরের চারি দিকে তাকাতে লাগল। এমন সময় ভাইকে বল নাচ নিয়ে এলিজাবেথকে কি বলতে শুনে তার দিকে ফিরে বলল—

জেন অস্টিনের

'কথাই যখন উঠল, দাদা, তুমি কি সত্যিই নেদারফিল্ডে নাচের জন্য খুব উদ্‌গ্রীব? সে ক্ষেত্রে কিছু স্থির করার আগে সকলের মতামত নিও। আমার ত ধারণা, এ দলে বল-নাচ কারুর কারুর পক্ষে আনন্দকর না হয়ে অত্যাচারে দাঁড়াতে পারে—এ আমি হলফ করে বলতে পারি।'

—'তুমি কি ডার্সি'র কথা বলছ? ইচ্ছা হলে সে নাচের আগে শুতে যেতে পারে। বল-নাচ হবেই।'

—'বল-নাচ আমিও খুব ভালবাসি'—বললে ক্যারোলিন—'যদি তা একটু আলাদা ধরণের হয়। কিন্তু সেই এক ধরণের জলসায় মন যেন তিতি-বিরক্ত হয়ে ওঠে। নাচের বদলে আলাপ-পরিচয়ের আসর হলেই যেন ভাল লাগে।'

—'তা হয়ত, কিন্তু বল-নাচের তুলনা হয় না।'

ক্যারোলিন এর আর কোনই জবাব দিলে না। একটু পরেই উঠে সে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। সুশ্রী তার তনু-দেহ—হাঁটলে অতি রমণীয় দেখায় তাকে।

কিন্তু ডার্সি যার জন্যে এত কথা, তখনও কঠোর অধ্যয়ন-তপস্যায় রত। মরীয়া হয়ে আর একবার সে শেষ চেষ্টা করলে। এলিজাবেথের দিকে ফিরে বললে—'প্রিয় এলিজা, আমার সঙ্গে আর একটু ঘরটা ঘুরে দেখি। ঠায় এক ভাবে বসে থাকার পর বেশ আরাম পাবি।'

বিস্মিত হলেও তক্ষুনি সায় দিল এলিজাবেথ। ক্যারোলিনের উদ্দেশ্য এবার সফল হোল। সঙ্গে সঙ্গে ডার্সি'ও বই থেকে মুখ

তুলে তাকাল। এলিজাবেথের মত সেও ঘরের ঐ দিকটার অভিনবত্বে সচেতন হয়ে উঠল। নিজের অজ্ঞাতসারেই বইটা কখন বন্ধ করে ফেলল। তাকেও আমন্ত্রণ করা হোল তাদের দলে যোগ দিতে। কিন্তু ডার্সি কি মনে করে সায় দিল না এ আমন্ত্রণে। কারণ, এই ভাবে ঘরে পায়চারী করার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে তার মনে হোল। সে যোগ দিলে হয়ত সিদ্ধ হবে না সে উদ্দেশ্য। ডার্সির এই প্রত্যাখানের কারণ জানবার জন্য ক্যারোলিন কৌতূহলে মরে যেতে লাগল। এলিজাবেথকে জিজ্ঞেসাও করলে, সে কিছু বুঝতে পেরেছে কি না।

'—একটুও নয়। মনে হয়, আমাদের প্রতি উনি ঔদাসীন্য দেখাতে চান। আর সে ক্ষেত্রে ওকে হতাশ করার একমাত্র উপায় ওকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেসা না করা।'

কিন্তু ক্যারোলিন ঐ লোকটিকে হতাশ করতে চায় না।

কথা বলার সুযোগ পাওয়া মাত্রই বলল ডার্সি—'বলতে আমার একটুও বাধা নেই। আপনাদের এই ধরণের সন্ধ্যা যাপনের পিছনে দু'টো কারণ থাকতে পারে। আপনাদের দু'জনের মধ্যে হয় খুব সখিত্ব এবং কোন গোপন বিষয় দু'জনে আলোচনা করতে চান। অথবা হাঁটলে আপনাকে সুন্দর দেখায় এ সম্বন্ধে সচেতন আপনি। প্রথমটা সত্যি হলে আমি সেখানে বাধা-স্বরূপ আর শেষের ক্ষেত্রে আমি বলব, আগুনের ধারে বসেই আমি তার বেশী তারিফ করতে পারি।'

—'জঘন্য! এ রকম কুৎসিত কথা আমি জীবনে কখনো শুনিনি। এ রকম কথা বলার জন্য কি শাস্তি দেওয়া যেতে পারে একে?'

—'খুবই সহজ'—মন্তব্য করে এলিজাবেথ।

—'আমরা পরস্পরকে নিন্দা বা প্রশংসা করতে পারি, হয়ত বা শাস্তিও দিতে পারি। কিন্তু ওঁকে রাগাতে মজা—ব্যঙ্গ করতেও। কিন্তু কি করে করা যাবে সে তুমি বুঝবে ভাই। তোমার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা বেশী।'

—'দিব্যি করছি, ওঁর সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠতাই নেই আমার—থাকলেও এত দূর অগ্রসর হতে পারিনি আজও। ওর মত ঠাণ্ডা মেজাজ যার আর অমন চোখে-মুখে কথা বলে যে, তাকে খ্যাপান সহজ নয়! না, না—তাহলে ও আমাদের ঠাট্টা করবে। আর বাজে হাসি-ঠাট্টায় নিজেকে হাস্যাস্পদ করতে রাজী নই আমি।'

—'ওঁকে নিয়ে ঠাট্টা করা চলবে না? উঃ, কি মহা সৌভাগ্যবান উনি। এ রকম সঙ্গী বেশী জুটলে কিন্তু আমার ভাল লাগবে না। আমি হাসি-ঠাট্টা খুবই ভালবাসি।'

ডার্সি বললে—'মিস্ বিংলে কিন্তু আমার তারিফের অতিশয়োক্তি করছেন। মানুষের মধ্যে বিজ্ঞতম ও গুণী যারা তাদের ক্রিয়াকলাপেও পরিহাস করতে পারে তারাই, যাদের জীবনের মূলমন্ত্র হোল কৌতুক-ক্রীড়া।'

—'সে লোক অবশ্যই অনেক আছে'—উত্তর দেয় এলিজাবেথ—'আমি অবশ্য সে গোষ্ঠীর নয়। সত্যি যা ভাল বা সুন্দর, তা নিয়ে আমি কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করি না। মানুষের বোকামি আর নোংরামি, খেয়াল আর অসংলগ্নতায় আমোদ পাই আমি—এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টাও করি যখন পারি। আপনার নিশ্চয়ই এ সব দোষ নেই।'

—'সকলের পক্ষে তা হয়ত সম্ভবপর নয়। লোকে আমায় পরিহাস করতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমানকে হাস্যাস্পদ করার চরিত্রের তেমন দৌর্বল্য পরিহারের চেষ্টাই আমার জীবনের সাধনা।'

—'যেমন ধরুন গর্ব আর দেমাক'—

—দেমাক দোষ বই কি। কিন্তু মানসিক উৎকর্ষতার সঙ্গে গরিমা-বোধ নিন্দনীয় নয়।'

এলিজাবেথ হাসি লুকোনোর জন্য মুখ ফেরাল।

—'মিঃ ডার্সিকে পরীক্ষা করার পালা শেষ হয়েছে? কি ফল দাঁড়াল?' জিজ্ঞেসা করলে ক্যারোলিন।

—'মিঃ ডার্সি দোষাতীত। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।' বললে এলিজাবেথ।

—'না, তেমন দম্ভ আমার নেই'—প্রতিবাদ জানায় ডার্সি। 'আমার অনেক দোষ আছে কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির খুঁত নেই আশা করি। আমার মেজাজ নিয়ে অবশ্যি আমি দিব্যি করতে পারি না। আমার মেজাজ সহজে বশ মানতে চায় না। জগতের পক্ষে তা খুব সুবিধের নয় বলতেই হবে। অন্যের দোষ বা বোকামি আমি সহজে ভুলি না, যা ভোলা উচিত আমার। আমার প্রতি অন্যায় আচরণও আমি ভুলি না। আমার অনুভূতিকে চট করে ফানুস ফাঁপান যায় না। মেজাজটা রোষপ্রবণই বলতে পারেন। আমার মতামতকে একবার উপেক্ষা করলে চিরকালের মতই হারাতে হয়।'

—'এটা অবশ্যই অন্যায়।'—বাধা দেয় এলিজাবেথ—'দুর্বাশা রোষ চরিত্রের কালিমা। কিন্তু অতি অদ্ভুত ভাবে আপনি আপনার দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। এ নিয়ে ঠাট্টা চলে না। আমার দিক থেকে আপনি নিরাপদ।'

—'প্রত্যেকেরই বিশেষ দোষ-প্রবণতা আছে যাকে প্রকৃতিগত বলা চলে—শিক্ষায়ও যাকে বশ মানান যায় না।'

—'আপনার দোষ হোল প্রত্যেককে ঘৃণা করার ঝোঁক।'

—'আর আপনার'—হাসতে হাসতে বলে ডার্সি—'ইচ্ছা করে পরকে ভুল বোঝা।'

—'এবার একটু গান হোক।' নিজের যোগ নেই যে আলোচনায়, তা ক্লান্তি আনে ক্যারোলিনের। 'হার্স্টকে জাগাতে তোর আপত্তি নেই তো লুসি।'

লুসি বাধা দেয় না। পিয়ানোর ঢাকা খোলা হয়। একটু কি ভেবে নিয়ে ডার্সিও আপত্তি করে না। এলিজাবেথের প্রতি অতি মনোযোগের বিপদের সম্ভাবনা শংকার ছায়া ফেলে মনে।

বারো

দুই বোনেতে যুক্তি করার পর পরদিন সকালে জেন মাকে গাড়ী পাঠাতে লিখল—সেই দিনের মধ্যেই আসে যেন। কিন্তু মিসেস্ বেনেট ভেবে রেখেছিলেন মেয়েরা মঙ্গলবার পর্যন্ত নেদারফিল্ডে থাকবে—তাহলে জেনের সেখানে এক সপ্তাহ থাকা হয়। তার আগেই তাদের চলে আসাটা তিনি মোটেই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। কাজেই তাঁর উত্তর বিশেষ করে এলিজাবেথের পক্ষে অনুকূল হোল না। এলিজাবে

বাড়ী ফেরার জন্ম উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছে। মিসেস্ বেনেট লিখে জানালেন, মঙ্গলবারের আগে খুব সম্ভবতঃ গাড়ী পাঠান সম্ভবপর হয়ে উঠবে না এবং এও লিখে দিলেন যে, ক্যারোলিন আর তার বোন যদি থাকার জন্ম পীড়াপীড়ি করে তাঁর আদৌ অমত নেই। কিন্তু আর থাকা সম্বন্ধে এলিজাবেথ স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে—তাদের যে আর থাকতে বলা হবে এমন প্রত্যাশাও করে না সে। বরং আরো বেশী থাকাটা অনাহূত ভাবেই থাকা হবে। মিঃ বিংলের গাড়ী চাইবার জন্ম সে বললে জেনকে এবং স্থির করা হোল, পরদিন সকলেই নেদারফিল্ড ছাড়ার কথা জানিয়ে গাড়ীটা চাওয়া হবে।

এই সংবাদ রটনার সঙ্গে সঙ্গে চারি দিক থেকে উৎকণ্ঠার সাড়া পড়ল। জেনের শরীরের কথা ভেবে অন্ততঃ সেদিনটা থেকে যাওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ এল। সুতরাং পরদিন পর্যন্ত তাদের যাওয়া মুলতবী রইল। ক্যারোলিন সব থেকে বেশী দুঃখিত হোল এই থেকে যাওয়ার ব্যাপারে, কেন না সেই তাদের থাকতে বলার জন্ম দায়ী। এক বোনের প্রতি ভালবাসার চাইতে আর এক বোনের প্রতি অসূয়া যেন বেশী উগ্ররূপে দেখা দিয়েছিল।

গৃহস্বামী তাদের চলে যাওয়ার জন্ম সত্য সত্যই দুঃখিত হলেন। নানা ভাবে তিনি জেনকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এ ভাবে যাওয়া নিরাপদ নয়—এখনও সে ভাল করে সেরে ওঠেনি। কিন্তু জেন একবার যা স্থির করে তার আর নড়-চড় হয় না।

এদের বিদায় নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে ডার্সি'র কাছে মনে হোল। এলিজাবেথ অনেক দিন নেদারফিল্ডে আছে। বড্ড বেশী সে তাকে আকৃষ্ট করেছে। মিস বিংলেও তার প্রতি অসৌজন্ম প্রকাশ করছে এবং তার বিদ্রূপ বর্ষণের মাত্রাও বেড়ে গেছে। এবার থেকে সে খুবই সতর্ক হবে যাতে না ঘুণাক্ষরেও এলিজাবেথ সম্বন্ধে কোন প্রশংসা-বাণী নিঃসৃত হয় তার মুখ থেকে। তার সম্বন্ধে সে যেন না কোন আশা পোষণ করে এবং যদিও পোষণ করে থাকে, শেষ দিনের আচরণে তা যেন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সংকল্প মত সারা শনিবার ডার্সি দশটির বেশী কথা বললে না এলিজাবেথের সঙ্গে এবং এক সময় যদিও তারা আধ ঘণ্টার চেয়ে বেশীক্ষণ একাকী ছিল, সে কঠোর ভাবে নিজেকে বইতে নিবদ্ধ রেখেছিল। এমন কি, তার দিকে ফিরেও তাকায়নি।

রবিবার উপাসনার পর বিদায়ের পালা এল। অবশেষে জেনের প্রতি ভালবাসা আর এলিজাবেথের প্রতি শিষ্টাচারের মাত্রা বেড়ে গেল বহু গুণ। লংবোর্ণে বা নেদারফিল্ডে সব সময়ই তারা স্বাগতম্। জেনকে গভীর স্নেহে আলিঙ্গন করলে ক্যারোলিন—এমন কি এলিজাবেথের সঙ্গেও করমর্দন করতে দ্বিধা বোধ করলে না। এলিজাবেথ সকলের কাছ থেকেই বেশ খুশী মনে বিদায় নিল।

বাড়ী পৌঁছলে মা কিন্তু তাদের খুব প্রসন্ন চিত্তে অভ্যর্থনা করলেন না। তাদের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন তিনি—এতখানি ঝঞ্ঝাট পাকানো অন্যায় হয়েছে তাদের। জেনের যে আবার ঠাণ্ডা লাগবে সে বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চয়। মিতভাষী পিতা কিন্তু তাদের দেখে খুসীই হয়েছেন মনে হোল। এদের অভাব বড্ড বোধ করতেন তিনি। বিকেলে সবাই একত্রিত হলে, এলিজাবেথ আর জেনের অনুপস্থিতির দরুণ সজীবতা আর আনন্দের অভাব অনুভূত হোত খুবই।

মেরী তেমনি ধারা সংগীতের সুর আর মনুষ্য-প্রকৃতি অনুধাবনে মহা মশগুল। ক্যাথারিন আর লিডিয়া কিন্তু অন্য ধরণের সন্দেশ জমিয়ে রেখেছে তাদের জন্যে। গত বুধবার থেকে অনেক কিছু ঘটে গেছে সেনা-শিবিরে। মেশো মশায়ের সঙ্গে কয়েক জন অফিসার খানাপিনা করেছে—এক জন সৈন্য চাবুক খেয়েছে—এমন কি এমন ইংগীতও করলে যে, কর্ণেল ফষ্টারের শীগ্‌গির বিয়ে হবে।

তের

পরদিন সকালে প্রাতরাশ খাওয়ার সময় মিঃ বেনেট স্ত্রীকে বললেন—'আজকের আহার-পর্ব একটু ভাল করেছ ত? এক জন অতিথির প্রত্যাশা করছি।'

—'কে, কে? কেউ আসবে বলে তো জানি না। এলে এক শার্লটি লুকাস আসতে পারে। তা আমার ডিনার তার মর্যাদার অনুপযুক্ত হবে না। বাড়ীতে সে এর চেয়ে নিত্য ভাল খায়, মনে হয় না।'

—'আমি যে অতিথির কথা বলছি তিনি এক জন অপরিচিত ভদ্রলোক।'

মিসেস্ বেনেটের চোখ ঝকঝক করে উঠল। 'অপরিচিত ভদ্রলোক! নিশ্চয়ই মিঃ বিংলে। আচ্ছা জেন, তুই তো একবারও বলিসনি এ কথা। মিঃ বিংলে এলে খুব খুশী হব। কিন্তু—হা ভগবান! ঘরেতে এক টুকরো মাছ নেই! লিডিয়া ঘণ্টাটা বাজা তো—আমি হিলের সঙ্গে এখুনি কথা বলতে চাই।'

—'মিঃ বিংলে নয়।'—স্বামী জানালেন—'ইনি এমন এক ব্যক্তি যাকে আমি কখনো চোখে দেখিনি।'

এ কথায় একটা বিস্ময়ের রোল পড়ে গেল। স্ত্রী ও পাঁচ মেয়ে সমস্বরে উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করল—'কে, কে সে?'

তাদের ঔৎসুক্য নিয়ে খানিকক্ষণ মজা করে শেষটায় বললেন মিঃ বেনেট—'এক মাস আগে এই চিঠিখানি পেয়েছি। পনের দিনের মধ্যেই উত্তর দিয়েছি। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। চিঠি এসেছে ভাইপো কলিন্সের কাছ থেকে, সে আমার মৃত্যুর পর যক্ষুনি ইচ্ছা করবে তোমাদের এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে।'

স্ত্রী আর্তনাদ করে উঠলেন—'ও অলুক্ষণে কথা শুনতে পারি না। লোকটার কথাও আর বলো না তুমি। তোমার সম্পত্তি তোমার নিজের মেয়েদের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নেবে এর চেয়ে নির্মম কথা আর কি আছে! আমি যদি পুরুষ হতাম, কবে এর বিলি-ব্যবস্থা করে ফেলতাম।'

জেন আর এলিজাবেথ মাকে সম্পত্তি বিলি-ব্যবস্থা করার ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করল—আগেও চেষ্টা করেছে কিন্তু এ এমন একটা ব্যাপার, যা নিয়ে তিনি যুক্তি-তর্কের ধার ধারতে চান না। তাঁর পাঁচ মেয়ের কাছ থেকে সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে এমন এক জনকে দেওয়া হবে যাকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র বাক্যবাণ বর্ষণ সুরু করলেন।

—'এটা অবশ্যই খুব অন্যায় ব্যাপার'—বললেন মিঃ বেনেট

—'কিন্তু লংবোর্ণের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের অপরাধ থেকে কলিন্সকে কোন মতেই বঞ্চিত করা যায় না। তবে ধৈর্য ধরে যদি তার চিঠিটা শোন, তার বক্তব্যের ধরণ দেখে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করতে পারবে।'

—'না, না—কিছুতেই স্বস্তি পাব না। চিঠি লেখাটাই তার পক্ষে ধৃষ্টতা—চরম ভণ্ডামি হয়েছে। এ রকম মিথ্যা বন্ধুদের আমি ঘৃণা করি। তার বাপের মত সেও তোমার সঙ্গে বিবাদ করুক না কেন?'

—'শোনোই না তার চিঠিটা—তাহলেই বুঝতে পারবে তার মস্তিষ্কে অপত্যসুলভ বিবেক-বুদ্ধি কিছুটা আছে।'

হান্সফোর্ড

শ্রদ্ধাভাজনেষু— ১৫ই অক্টোবর।

আপনার ও আমার পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেবের মধ্যে মনোমালিন্ত সর্বদাই আমাকে গভীর পীড়িত করিয়াছে। এক্ষণে তাঁর মৃত্যুতে সেই কলহের চিরাবসান ঘটাইবার ইচ্ছা প্রায়শঃই অনুভব করিতেছি। তবে আজীবন যার সঙ্গে তাঁর মতান্তর ছিল মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁরই সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিলে মৃতের আত্মার প্রতি অসম্মান করা হইবে—এই সন্দেহে এত দিন সে চেষ্টায় বিরত ছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আমি মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছি। ঈষ্টার হইতে আমি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। স্যার লুইস ড বুর্গের বিধবা পত্নী লেডী ক্যাথারিন ড বুর্গের দাক্ষিণ্য ও মহানুভবতায় আমি এখানকার ধর্মযাজক হইয়াছি। এক্ষণে আমার সতত এবং ঐকান্তিক চেষ্টা হইবে, সশ্রদ্ধ চিত্তে সেই মহিয়সীর অনুগৃহীত হইয়া থাকা এবং ইংলণ্ডের গীর্জার অনুশাসন-সম্মত ভাবে উৎসব ও ধর্মানুষ্ঠান কার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করা। ধর্মযাজক হইবার পর হইতে আমি আমার জানা প্রত্যেক পরিবারের সহিত সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখা উচিত মনে করিতেছি। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত আমার এই শুভেচ্ছা প্রস্তাব নিশ্চয়ই প্রশংসাই বিবেচিত হইবে এবং আপনি আমার লংবর্ণের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব উপেক্ষা পূর্বক এই শান্তি-প্রস্তাব প্রত্যাখান করিবেন না নিশ্চয়ই। আপনার সুস্মিতা তনয়াগণের ক্ষতির কারণ হওয়ায় দুশ্চিন্তিত আছি এবং এ জন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—পরে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করিবার ঐকান্তিক মানস রইল জানিবেন। যদি আপনার গৃহে আমায় গ্রহণ করিতে আপত্তি না থাকে ১৮ই নভেম্বর সোমবার চার ঘটিকার সময় আপনার গৃহে গমনের অভিলাষ আছে এবং আপনাদের আতিথ্যের উপর শনিবার পর্যন্ত জুলুম করিব। যদি রবিবারের ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদনের জন্ম অন্য কোন ধর্মযাজকের ব্যবস্থা করিতে পারি তাহা হইলে লেডী ক্যাথারিন এই সাময়িক অনুপস্থিতিতে বাধা প্রদান করিবেন না। আপনার স্ত্রী ও কন্যাগণকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার ও প্রীতি জানাইবেন। ইতি

বিনীত—

আপনার বন্ধু ও হিতাকাংখী

উইলিয়ম কলিন্স।

—'কাজেই আজ চারটের সময় এই শান্তিকামী ভদ্রলোককে আমরা আশা করতে পারি'—চিঠি ভাঁজ করতে করতে মন্তব্য করলেন মিঃ বেনেট। 'বোধ হচ্ছে, যুবক অতি বিনয়ী ও ধর্মভীরু। লেডী ক্যাথারিন তাকে আসার অনুমতি দিলে তার সাহচর্য নিঃসন্দেহ অতি মূল্যবান হবে।'

—'মেয়েদের সম্বন্ধে ও যা মন্তব্য করেছে তাতে ওর কিছুটা বিবেক-বুদ্ধি আছে বলে মনে হয়। যদি ও মেয়েদের কিছু দিতে চায় আমি নিরুৎসাহ করব না ওকে।'

—'কি ভাবে উনি প্রায়শ্চিত্ত করতে চান যদিও তা অনুমান করা কঠিন, তবুও ঐ ইচ্ছাটাই প্রশংসনীয়।'

লেডী ক্যাথারিনের প্রতি তার অত্যাশ্চর্য শ্রদ্ধাই বিশেষ ভাবে মোহিত করল এলিজাবেথকে। ওখানকার অধিবাসিগণের দীক্ষা দান, বিবাহ ও কবর অনুষ্ঠান সম্পাদনের সাধু সংকল্পও মুগ্ধ করল তাকে।

—'উনি নিশ্চয়ই এক অদ্ভুত লোক হবেন?' বললে সে—'আমি ওঁকে ঠিক বুঝতেই পারছি না। ওঁর আচরণের দাম্ভিকতা সুপ্রকট। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ায় মার্জনা চাইবার কি অর্থ থাকতে পারে? ওঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।'

—'আমার তা মনে হয় না। সম্পূর্ণ বিপরীত একটি লোককে দেখতে পাব আশা করছি। আত্মপ্রত্যয় ও চাটুকারিতার মিশ্রণ আছে চিঠিতে যা আশাপ্রদ। আমি তাকে দেখবার জন্ম অধীর হয়ে আছি।'

—'পত্র-রচনার দিক থেকে বিচার করলে'—বললে মেরী—'নিখুঁত হয়েছে চিঠি। শান্তি প্রসঙ্গেও অভিনবত্ব কিছু নেই বটে কিন্তু অতি সুচারুতার প্রকাশ হয়েছে।'

না পত্র-লেখক, না তার চিঠি কোনটিরই প্রতি লিডিয়া ও ক্যাথারিনের কোন ঔৎসুক্য দেখা গেল না। তবে কলিন্সের চিঠি তাদের মায়ের দুর্ভাবনা অনেকখানি দূর করেছে। এমন একটা বিশেষ ধৈর্যের সঙ্গে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন যে, স্বামী ও কন্যারা প্রত্যেকেই বিস্মিত হয়ে গেল।

ঠিক সময়েই মিঃ কলিন্স এসে উপস্থিত হলেন এবং প্রত্যেকে সৌজন্যের সহিত স্বাগতম্ জানাল। মিঃ বেনেট অবশ্য খুব কম কথা বললেন কিন্তু মেয়েরা কথা বলার জন্ম তৈরীই ছিল। কলিন্সের যেমন কথা বলার উৎসাহের প্রয়োজন ছিল না, তেমনি নিঃশব্দ থাকতেও ইচ্ছুক নন তিনি। ভারিক্কি চেহারা—বয়স হবে প্রায় পঁচিশের কোঠায়। স্বভাবে গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য ধরা পড়ে—আবার আচরণ অতি সাদাসিদে। এতগুলি বিদুষিণী কন্যার জননী হিসেবে সে মিসেস্ বেনেটকে অভিনন্দন জানাল, বললে—'এদের সৌন্দর্যের খ্যাতি অনেক আগেই শুনেছি—কিন্তু এখন চোখে দেখে বুঝলাম খ্যাতি রূপের অর্ধেকও নয়। যথা-সময়ে এরা যে সুযোগ্য পাত্রে অর্পিত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।' তার এই স্তুতিবাদ শ্রোত্রীদের কারুই মনতোষিণী হোল না কিন্তু মিসেস্ বেনেট যিনি প্রশংসার ভাল-মন্দ বিচার করেন না, পাল্টা উত্তর দিলেন তখুনি—'অতি হৃদয়বান তুমি, কামনা করি সেই হৃদয়ের উদারতার পরিচয় যেন দিতে পার। না হলে আমার মেয়ে ক'টি একেবারে ভেসে যাবে। সব কিছুরই এমন বিশ্রী বিলি-ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

—'আপনি বোধ হয় সম্পত্তির কথা বলছেন?'

—'হ্যাঁ। হতভাগিনী মেয়েদের পক্ষে এটা অতি দুঃখজনক

ব্যাপার রয়েছে। অবশ্য এর জন্য আমি কাউকে দোষারোপ করছি না। সবই ভাগ্যের লিখন।'

—'সুন্দরী বোনদের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। এ বিষয়ে অনেক কথাই বলতে পারি। তবে হঠকারিতা করে আগে থেকেই কিছু বলতে চাই না। তরুণী মহিলাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করতে আমি প্রস্তুত। এখন আর বেশী কিছু বলব না—পরে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে—'

খাবারের ডাক এসে পড়ায় আলোচনায় বাধা পড়ল। মেয়েরা হাসি বিনিময় করল। কিন্তু দেখা গেল, তারাই একমাত্র কলিন্সের প্রশংসার পাত্র নয়, হল-ঘর, খাবার ঘর, আসবাব-পত্র সব কিছুরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হোল। তার এই প্রশংসা মিসেস্ বেনেটের অন্তঃস্থল স্পর্শ করত যদি না কলিন্স সব কিছুই নিজের ভবিষ্যৎ সম্পত্তি বলে প্রশংসা করছে—এই মর্মান্তিক চিন্তা তাতে ব্যাঘাত ঘটাত। রান্নারও বিশেষ প্রশংসা হোল। কলিন্স জানতে চাইলে তার কোন সুন্দরী ভগ্নী এই অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারিণী। কিন্তু এইখানেই মিসেস্ বেনেট একটু কর্কশ সুরেই ভুল শুধরিয়ে দিলেন এই বলে যে, রাঁধুনি রাখবার ক্ষমতা তাঁর আছে এবং মেয়েরা রান্না-ঘরের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। তাঁর মনে দুঃখ দেওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে কলিন্স। মিসেস্ বেনেট নরম-গলায় বললেন বটে তিনি একটুও অসন্তুষ্ট হননি, তবুও পনের মিনিট ধরে এই ক্ষমা চাওয়ার পালা চলল।

চৌদ্দ

খেতে বসে মিঃ বেনেট আদৌ বাক্যব্যয় করেননি, কিন্তু চাকর-বাকররা বিদায় হলে তিনি আলাপের সংকল্প করলেন এবং এমন এক বিষয়ের অবতারণা করলেন যা অতিথির মুখরোচক। কলিন্সের আশ্রয়দাত্রীর মত লোক অনেক ভাগ্যে মেলে। তার সুখ-সুবিধে রুচি-অভিরুচির প্রতি লেডী ক্যাথারিনের মত মনোযোগ সত্যই দুর্লভ। লেডী ক্যাথারিনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললে সে, অমন সম্ভ্রান্ত মহিলার কাছ থেকে এমন অমায়িক ব্যবহার জীবনে আর পায়নি সে কখনো। যে দু'টি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতা সে দিয়েছে তাও তাঁর অনুমোদন লাভ করেছে—দু'বার তিনি তাকে রসিংসে তাঁর গৃহে আহারেরও আমন্ত্রণ করেছেন। এই তো গত শনিবারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন একটি নাচের ব্যবস্থাপনায় উপদেশ নিতে। অনেকে লেডী ক্যাথারিনকে দাম্ভিক বলে, কিন্তু সে তাঁর মধ্যে অমায়িকতা ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পায় না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলা-মেশায় মাঝে মাঝে সপ্তাহকালের ছুটি নিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতেও বাধা দেন না তিনি। এমন কি, দেখে-শুনে কাউকে বিয়ে করতে দিতেও আপত্তি নেই তাঁর। একবার তিনি তার 'পর্ণ-কুটীরেও' পদার্পণ করেছিলেন।

—'এ তো অতি সৌজন্যের পরিচয়'—বললেন মিসেস্ বেনেট—'মহিলাটি যে চমৎকার তাতে অনুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিতাপ এই যে, এদের মত লোক বিরল সংসারে। উনি কি কাছেই থাকেন?'

—'তাঁর বাড়ী রসিংস পার্ক আর আমার কুঁড়ের মধ্যে মাত্র একটি গলির ব্যবধান।'

—'বিধবা হয়েছিলেন শুনেছি। সংসারে কে কে আছে তাঁর?'

—'একটি মেয়ে—তাঁর বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।'

—'তাহলে বহু মেয়ের চেয়েই ভাগ্যবতী সে। মেয়েটি কেমন? খুব সুন্দরী দেখতে?'

—'খুবই মনোরমা মেয়েটি। লেডী ক্যাথারিন নিজে বলেন, সৌন্দর্যের দিক থেকে বিচার করলে মেয়েদের মধ্যে সে রাণী। তার চেহারায় এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা আভিজাত্যেরই পরিচায়ক। দুর্ভাগ্য বশতঃ বড়ই রুগ্না মেয়েটি—তাই সর্বগুণসমন্বিতা হয়ে উঠতে পারেননি। তবে অতি মধুভাষী—প্রায়ই নিজের ফিটনে আমার 'কুঁড়ের' পাশ দিয়ে দয়া করে যান।'

মিঃ বেনেটের ধারণাই সত্য হোল—সত্যিই ভাইপোটি অতি বেকুব। তিনি খুব উৎসাহ দেখিয়ে অথচ অটল গাম্ভীর্য বজায় রেখে তার কথা শুনতে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে অলক্ষিতে এলিজাবেথের দিকে চেয়ে তার সায় নিতে লাগলেন :

চায়ের আসরের আগেই ওষুধ ধরেছিল। মিঃ বেনেট তাকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেলেন এবং চা-পানের শেষে মেয়েদের কিছু পড়ে শোনাতে অনুরোধ করলেন। কলিন্সও সাগ্রহে রাজী হলেন। কিন্তু বই হাতে নিয়েই চমকে উঠল সে—আপত্তি জানাল যে, উপন্যাস সে স্পর্শ করে না। কেটি অবাক হয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে—লিডিয়া মুখে কি একটা শব্দ করে থেমে গেল। তার পর আরো অনেক বই নিয়ে আসা হোল—তা থেকে সে ফর্ডাইসের 'ধর্মোপদেশ'খানা বেছে নিল। বইটি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই লিডিয়া হাই তুলতে লাগল এবং ক্লান্তিকর সুরে পড়া হতে-না-হতেই সে বাধা দিয়ে বলল—'শুনেছ মা, ফিলিপ মেসো রিচার্ডকে তাড়িয়ে দেবেন। আর তাহলেই কর্ণেল ফষ্টার তাকে নিয়ে নেবেন। শনিবার মাসিমা নিজে আমায় বলেছেন। কাল মেরিটনে গিয়ে আরো খবর জেনে আসব। ডেনী কবে সহর থেকে ফিরবে তাও জেনে আসব।'

লিডিয়াকে দু'বোন চুপ করে থাকতে বললে কিন্তু কলিন্স অত্যন্ত আহত হয়ে বই বন্ধ করে রাখলে—'আমি প্রায়ই লক্ষ্য করে দেখেছি, অল্পবয়সী মেয়েদের সদুপদেশের বইতে ভারী অনিচ্ছা। আশ্চর্য লাগে আমার, অথচ এই বয়সেই ওদের শিক্ষার দরকার বেশী। অবশ্য আমি আর বোনটিকে বিরক্ত করতে চাই নে।'

—'তার চেয়ে বরং দাবায় বসা যাক্'—বললে সে মিঃ বেনেটকে। মিঃ বেনেটও তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। নিজেদের তুচ্ছ আনন্দ নিয়ে মত্ত থাকতে দেওয়াই ভাল মেয়েদের, এই মত পিতার। সুতরাং তারা তাই থাক। লিডিয়ার বাধা দেওয়ার জন্য মিসেস্ বেনেট ও অন্য মেয়েরা ক্ষমা চাইলে এবং আবার পড়া আরম্ভ করতে অনুরোধ করলে কলিন্সকে। এমন ঘটনার আর যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তারও প্রতিশ্রুতি দিলে সবাই, কিন্তু কলিন্স বললে—'কমবয়সী তার এই বোনেদের কারুর প্রতিই তার কোন অভিযোগ নেই।' এই বলে সে মিঃ বেনেটের সঙ্গে আর এক টেবিলে বসে দাবা খেলার উদ্যোগে মন দিলে।

পনের

কলিন্স নিজে কিছু জ্ঞানীও নয়; সামাজিকতা বা শিক্ষায় তার বুদ্ধিও ধারালো হতে পারেনি। তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশই কেটেছে এক নিরক্ষর ও কৃপণ পিতার কঠোর শাসনে, সে শাসনে তার মনে হীনমন্যতার শিকড় গেড়ে বসেছিল। এখন তার সঙ্গে যোগ হয়েছে দুর্বল মস্তিষ্কের অহমিকা-বোধ এবং জনসমাজ হতে নির্বাসিত জীবন যাপনের ফলে হঠাৎ বড় লোক হওয়ার দুরাশা। হান্সফোর্ডের পাদরীর পদ শূন্য হলে ভাগ্য কৃপায় সে লেডী ক্যাথারিনের সুনজরে পড়ে। তাঁর পদমর্যাদার প্রতি ভক্তি, নম্রতা এবং তাঁর অনুগ্রহভাজন হওয়ায় নিজেকে ধন্য জ্ঞান, নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ ও পাদরী হিসেবে অপ্রতিহত ক্ষমতা-বোধ—এই সব-কিছু মিলে অহমিকা ও তোষামদপ্রিয়তা, আত্মম্ভরিতা আর হীনমন্যতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণে পরিণত করেছে তাকে।

এখন একটি ভাল বাড়ী ও পর্যাপ্ত উপার্জনের ব্যবস্থা হওয়ায় বিয়ের ইচ্ছে হয়েছে কলিন্সের। লংবর্ণ-পরিবারের সঙ্গে মনোমালিন্য মিটিয়ে ফেলার উদ্দেশ্য—এই পরিবারের মেয়েদের মার্জিত-রুচি ও সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনে নিজের চোখে-কানে তা প্রত্যক্ষ করে এদের এক জনকে পত্নী হিসেবে মনোনয়ন করা। বাপকে সম্পত্তির অধিকার ভোগ করতে দেওয়াই হোল তার ক্ষতিপূরণ বা প্রায়শ্চিত্তের পরিকল্পনা। মতলবটি তার খুব মনোমত হয়েছে এবং তার তরফ থেকে নিঃস্বার্থপরতা ও মহানুভবতার চূড়ান্ত নিদর্শন বলে মনে করে সে।

মেয়েগুলোকে চাক্ষুষ দেখার পর আর মত বদলানোর কারণ ঘটল না। জেনের সুন্দর মুখশ্রী মনে রং ধরাল কলিন্সের এবং বড় থেকেই সুরু করা উচিত এই নীতির সার মর্ম উপলব্ধি করলে সে। প্রথম সন্ধ্যাতেই তার পছন্দ চূড়ান্ত হয়ে গেল, কিন্তু পরদিন সকালে আবার পছন্দের একটু অদল-বদল করতে হোল। প্রাতরাশের পূর্বে মিসেস্ বেনেটের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে লংবর্ণে পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যাবে বলায় মিসেস্ বেনেট স্মিত হাস্যে জেন সম্বন্ধে একটু সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করলেন—'ছোট মেয়েদের সম্বন্ধে এখনো কিছু স্থির করা হয়নি,—তবে বড় মেয়েটির সম্বন্ধে এ কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, সে শীগ্‌গিরই অন্য কারুর বাগদত্তা হতে যাচ্ছে।'

সে ক্ষেত্রে কলিন্সের পছন্দ জেন থেকে এলিজাবেথে নামাতে হোল। মিসেস্ বেনেট যখন আগুন উস্কে দিচ্ছিলেন তখনই শুভ লগ্ন বুঝে কলিন্স প্রস্তাব পেশ করল। বয়সে ও সৌন্দর্যে এলিজাবেথ ঠিক জেনের পরেই।

মিসেস্ বেনেট এ ইংগিত যত্নের সঙ্গে মনের মণিকোঠায় জমা করে রাখলেন। অন্ততঃ তাঁর দু'টি মেয়ের বিয়ে এক রকম পাকা হয়ে গেল। কালকে যে মানুষের নামোচ্চারণ পর্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না, আজ তাকে কত ভাল লাগছে।

মেরিটোনে হেঁটে যাওয়ার কথা লিডিয়া ভোলেনি—একমাত্র মেরী ছাড়া সবাই তার সঙ্গে যেতে সম্মত হোল। মিঃ বেনেটের অনুরোধে কলিন্সও তাদের সহযাত্রী হোল। তার কবল থেকে রেহাই পেতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন মিঃ বেনেট—তাহলে তিনি লাইব্রেরীতে নিজের পড়া নিয়ে বসতে পারেন। প্রাতরাশের পর কলিন্স সেই যে বিরাট তালিকা হাতে নিয়ে তাঁর সঙ্গে হান্সফোর্ডে তার বাড়ী ও বাগান নিয়ে এমন গল্প জুড়ে দিয়েছিল যে, তার তার বিরতি ছিল না। লাইব্রেরী-ঘরটি মিঃ বেনেটের বিশ্রাম ও শান্তির নিভৃত নিলয়। অন্য কোন কক্ষে বাজে বকুনি ও আত্মশ্লাঘার গল্প শোনা বরদাস্ত করতে পারেন তিনি—কিন্তু এই ঘরটিকে তিনি সব থেকে মুক্ত রাখতে চান। কাজেই কন্যাদের সঙ্গে কলিন্সকে বেড়াতে যেতে অনুরোধ করার সুযোগ নিতে কালবিলম্ব করলেন না তিনি। কলিন্স পড়ার চেয়ে হাঁটাই পছন্দ করে, মেয়েদের সঙ্গে যেতে পারায় খুশীই হোল সে।

কলিন্সের বড়-বড় কথা আর মেয়েদের ভদ্রতাসূচক মাথা নাড়ায় মেরিটোনে পৌঁছানর সময় কেটে গেল। সেখানে পৌঁছে ছোট বোনেরা আর তার দিকে একটু নজর দিলে না। দোকানে দোকানে সাজান মেয়েদের মাথার টুপি, ভাল ভাল মসলিনে তাদের দৃষ্টি নেচে বেড়াতে লাগল। কিন্তু রাস্তার উল্টো পথ দিয়ে ভদ্র-দর্শন সুকান্তি এক যুবককে এক জন অফিসারের সঙ্গে যেতে দেখে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হোল। যুবকটিকে আর কেউ দেখেনি এর পূর্বে। অফিসারটি হোল ডেনী, যার লণ্ডন থেকে ফেরার কথা জানতে এসেছে লিডিয়া। যেতে যেতে নমস্কার করল সে। অপরিচিতের চাল-চলন বিমুগ্ধ করল সবাইকে—কে হতে পারে এই লোকটি, ভাবতে লাগল তারা? কেটি আর লিডিয়া অফিসারটির পরিচয় জানার উদ্দেশ্যে রাস্তার অপর পারে গেল সেদিককার দোকান থেকে কিছু কেনার ভান করে। ফুটপাথে পা দেওয়া মাত্রই তারা দু'জনে কিন্তু ঠিক সেখানে এসে উপস্থিত হোল। ডেনী সোজাসুজি পরিচয় করিয়ে দিলে বন্ধুকে তাদের সঙ্গে। বন্ধুটির নাম উইকহাম—কালকে সহর থেকে একসঙ্গে এসেছেন এবং এখানকার সৈন্যদলে যোগ দিয়েছেন। এই রকমই হওয়া উচিত। চেহারাটাকে আরো সুদর্শন করার উদ্দেশ্যেই সৈন্যদলে যোগ দিয়েছেন উইকহাম। সৌন্দর্যের সব কিছুই ছিল তাঁর দেহে—সুচারু মুখাবয়ব, সুঠাম দেহ-গঠন, বাচনভঙ্গীতেও রমণীয়তা। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল অকুণ্ঠিত অকপট আলাপ তারা সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সহজ ভাবে কথা বলতে লাগল এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে তারা ফিরে দেখল ডার্সি ও বিংলে ঘোড়ায় চেপে আসছে। মেয়েদের চিনতে পেরে তারা সোজা এগিয়ে এল তাদের দিকে। সুরু হয়ে গেল সৌজন্য আদান-প্রদান। বিংলেই প্রধান বক্তা এবং এলিজাবেথই মর্ম কেন্দ্র। লংবর্ণে যাচ্ছিল তারা এলিজাবেথের খোঁজে। ডার্সি ছোট নমস্কার করে সায় দিল তার কথায় এবং মনে মনে স্থির করে ফেলল যে, কিছুতেই তাকাবে না এলিজাবেথের দিকে। হঠাৎ অপরিচিতের উপর তাদেরও নজর পড়ল এবং এলিজাবেথ লক্ষ্য করল—পরম বিস্ময়ে দৃষ্টি বিনিময় করল দু'জনে। দু'জনেরই মুখে রং দু'রকম হয়ে গেল—এক জনের শাদা আর এক জনের রক্তিম কয়েক মুহূর্ত পরে উইকহাম টুপি খুলল—ডার্সিও প্রতি-নমস্কার করলে। এ সকলের অর্থ কিছুই বুঝলে না তারা।

কয়েক মুহূর্ত পরে বিংলে বন্ধুর কাছে বিদায় নিলে—যা ঘটে গেল, কিছুই যেন লক্ষ্য করেনি তারা।

মিঃ ডেনী আর উইকহাম মেয়েদের সঙ্গে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত এলেন। কিন্তু লিডিয়ার একান্ত অনুরোধ—এমন কি মিনে

ফিলিপস্ বৈঠকখানার গবাক্ষ উন্মুক্ত করে সাদর আহ্বান জানান ত্বেও তারা নমস্কার করে বিদায় নিল।

মিসেস্ ফিলিপস্ বোনঝিদের দেখে খুশীই হলেন—অসুখের পর দু'জনকে দেখে আরো আনন্দ প্রকাশ করলেন। জেন নতুন তিথির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে, তাকে মহা সমাদরে আহ্বান নালেন—কলিন্সও ততোধিক বিনয়ের সঙ্গে প্রতি-নমস্কার করে, র্ব-পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও তাঁর বাড়ীতে আসার জন্য ক্ষমা চাইলে। বানেদের সম্পর্কে তাকেও এতখানি সমাদর করায় নিজেকে কৃতার্থ নে করছে সে। মিসেস্ ফিলিপস্ও তার কথার মাধুর্যে একেবারে বাহিত হয়ে গেলেন। অপরিচিত আগন্তুক উইকহ্যামের কথা াতে তিনি মেয়েদের জানালেন যে, ডেনীর সঙ্গে সদ্য সে এসেছে গুন থেকে—অচিরেই সামরিক কমিশন পাবে। আগামী কাল তে কয়েক জন অফিসারের এখানে খাওয়ার কথা আছে—মেয়েরা যদি আসে উইকহ্যামকেও নিমন্ত্রণ করতে বলবেন তিনি স্বামীকে। সকলেই রাজী হয়ে গেল এ প্রস্তাবে।

বাড়ী ফেরার পথে এলিজাবেথ জেনকে বলল ডার্সি ও উইকহ্যামের মধ্যে যা সে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কোনই হদিস করতে পারলে না তারা এই বিস্ময়কর আচরণের।

কলিন্স বাড়ী ফিরে ফিলিপস্-গিন্নীর উচ্চ প্রশংসা করতে লাগল মিসেস্ বেনেটের কাছে। একমাত্র লেডী ক্যাথারিন ও তাঁর মেয়ে ছাড়া এমন মার্জিত-রুচি মহিলা সে আর দেখেনি কখনো জীবনে। অশেষ সৌজন্যের সহিত তিনি সমাদর করেছেন তাকে—এমন কি, আগামী কাল সন্ধ্যায় সেখানে আহারেরও নিমন্ত্রণ করেছেন। অথচ আগে তার সঙ্গে কোন পরিচয়ই ছিল না। হয়ত এ-বাড়ীর সম্পর্কের জন্যই সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তবুও এমন আদর-আপ্যায়ন মেলেনি কখনো জীবনে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

বন্য-বিহঙ্গম

(বিভূতি বন্দ্যো)

শ্রীকরুণাময় বসু

শরতের শেষ লগ্ন :
হিমবর্ষী আকাশের গায় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্তি,
দেখলাম নক্ষত্রখচিত আকাশে একটি কহংস ডানা বিস্তার করেছে।
কতো দূর-দেশান্তর থেকে উড়ে আসছে সে,
কতো জন্মান্তর পার হয়ে,
হয়তো মঙ্গল গ্রহের লাল অরণ্য-বীথিকাচ্ছায়ায় ;
ওই দূরতম নক্ষত্রলোকের উপর দিয়ে
অশ্রান্ত অপরাজেয় ডানায় উদ্ধত গতি তার।

নিচের এই পৃথিবীলোক তার কাছে অস্পষ্ট বিন্দু হয়ে গেছে,
অসমতল পার্বত্যপথ,
ঘন শাল মহুয়া বনের বিস্তার,—
যার ভিতর দিয়ে বারম্বার সে যাওয়া-আসা করেছে ;
ঘন বাষ্পলোকে সুদূর শৈলচূড়া, স্তব্ধ অরণ্যানী
নীলাঞ্জন রেখায় দূরে, আরো দূরে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে গেল।
কতো কোটাল পূর্ণিমায় হু-হু করে উঠেছে ক্ষ্যাপা হাওয়ার ঝলক ;
বনের ডালপালার ভিতর দিয়ে কী অশ্রান্ত মর্মরাণি!

সে শুনেছে আরণ্য বাণী তার,
যে বাণী শাশ্বত, যে বাণী চিরন্তন রসে চির চিহ্নিত,
যে বাণী পুষ্পবীথিকার, যে বাণী ভালোবাসার,
যে বাণী অশ্রু-হাসির দোলনায় চির দোদুল,
সে আহরণ করেছে এই অমৃত রস।

বন্য বিহঙ্গমের আজ যাত্রা শেষ :
সে চলেছে কোন ধ্রুবতীর্থলোকে,
মানস সরোবরের উপর দিয়ে যে তীর্থপথ
চলে যায় সুদূর অমরাবতীর উদ্দেশে,—
সেই পথে শোনা যায় উদ্দাম পক্ষধ্বনি তার।
যাবার বেলায় রক্ত মেঘে ছবি এঁকে দিয়ে যায়,
বন্য কুসুমের কেশরে কেশরে মধু মৌচাকের স্বপ্ন জাগায় ;
চঞ্চল বাতাসে তার যাওয়া-আসার জলের আল্পনা দাগ
এক মুহূর্তেই উড়ে যায় ;
রেখে যায় অদ্ভুত আবেশে ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন-মদির বিহ্বলতা,
মুহূর্তের বর্ণ চিত্রে অনন্তের রক্তচিহ্ন।

সহস্র বৎসর পার হয়ে চলে যাক,
তবু বেঁচে থাক সুখ-দুঃখের এই বিচিত্র মহাকাব্য ;—
বেঁচে থাক অপুর একবিন্দু অশ্রুজল ;
মানুষের কাছে কবি হয়তো এই প্রার্থনাই রেখে গেল।

আণবিক গবেষণায় আমেরিকা

শ্রীঅমলেন্দু সেন

আজ থেকে এগার বছর আগে, ১৯৩৯ সনের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, পরমাণুকে চূর্ণ করলে যে বিপুল শক্তি উৎপন্ন হয়, তা কয়লা পেট্রল বিদ্যুৎ অথবা ডিনামাইটের শক্তির চেয়েও অনেক সহস্র গুণ বেশী। সেই থেকে এ বিষয়ে অক্লান্ত গবেষণা করা হয়ে আসছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে আজ এ বিষয়ে কাজ চলছে দেশ-জুড়ে-ছড়ানো বারোশো'র বেশী প্রতিষ্ঠানে। এর মধ্যে আছে কলেজের ছোট্ট-ছোট্ট ল্যাবরেটরী থেকে সুরু করে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড আলাদা কারখানা পর্য্যন্ত। এই কাজে আমেরিকা আজ পর্য্যন্ত ৩৫০ কোটি ডলার খরচ করেছে (আজকালকার হিসাবে এক ডলার আমাদের চার টাকা বারো আনার সমান। ১৯৪৬ সন থেকে বছরে গড়ে ৫০ কোটি ডলার খরচ করা হচ্ছে এর পিছনে। হাজার-হাজার লোক খাটছে এই কাজে। এদের কাজ হল যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ, তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন এবং পরমাণু-ভাঙা শক্তিকে শিল্প, কৃষি, চিকিৎসা, জীববিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা-ঘটিত কি কি কাজে লাগান যেতে পারে, তার গবেষণা করা।

এ ব্যাপারে কর্তৃত্ব করেন একটি সরকারী দপ্তর,—অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন (সংক্ষেপে এ-ই-সি)। ১৯৪৭ সনের গোড়াতেই এঁরা সামরিক কর্তৃপক্ষের হাত থেকে পরমাণু-শক্তিসংক্রান্ত সকল কাজের ভার নিয়ে নেন, এবং সমস্ত জিনিষটাকে ঢেলে সাজতে সুরু করেন। এক গৃহনির্মাণের কাজেই এঁরা খরচ করেছেন ৭০ কোটি ডলার। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কুড়িটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা দিয়ে, তার কোন-কোনটিতে ১৫০০০ পর্য্যন্ত লোক কাজ করে। এ-ই-সি নিজেরা কোনও গবেষণা করেন না, বেশীর ভাগ কাজই করান বেসরকারী কল-কারখানা এবং কলেজ ল্যাবরেটরী ইত্যাদির সঙ্গে চুক্তিতে। যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বড়-বড় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। ক্যান্সার রোগে, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডে এবং অন্যান্য কতকগুলি ক্ষেত্রে পরমাণু-শক্তির ক্রিয়া পরীক্ষা করান হচ্ছে অনেকগুলি হাসপাতালে। এর জন্য প্রায় ১০০ রকম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আর ১৫০ রকম তেজস্ক্রিয় পদার্থ-ঘটিত দ্রব্য নিয়মিত ভাবে উৎপাদন করে বিতরণ করা হচ্ছে শত শত গবেষণাগার থেকে। গবেষণার উদ্দেশ্যে আমেরিকার বাইরে ২২টি দেশেও তা পাঠান হচ্ছে।

এই যে পরমাণু নিয়ে গবেষণার কাজ, এর এক-এক অংশ চালান হয় এক-এক জায়গায়। ইলিনয় প্রদেশের আর্গোন সহরে যে জাতীয় গবেষণাগারটি এ-ই-সি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার পরিচালনা করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়। এ কাজে সাহায্য করেন অন্যান ৩০টি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বিশেষ করে অণুগুলিকে বিচ্ছিন্ন করবার এবং পরমাণুগুলিকে চূর্ণ করবার আধুনিকতম সব যন্ত্রপাতি। আর আছে একটি বাগান, সেখানকার সমস্ত গাছ, ফল আর পাতায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রয়োগ করে নানা রকম পরীক্ষা চালান হচ্ছে। উদ্ভিদ এবং ইতর জীবের দেহের উপরে এই ফল ইত্যাদির ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করে তা থেকে শক্তিশালী নানা রকম ঔষধ তৈয়ারী করা হয়ে থাকে এখানে। নিউ ইয়র্কের কাছে ব্রুকহ্যাভেন-এর বীক্ষণাগারেও আশপাশের সব বিশ্ববিদ্যালয় সহায়তা করেন। এখানে পরমাণু চূর্ণ করবার জন্য একটি ৩০০কোটি ভোল্ট-শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্র স্থাপিত হচ্ছে। টেনেসী প্রদেশের ওক-রিজএর গবেষণাগারে প্রধানতঃ করা হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপাদন এবং সে-বিষয়ে গবেষণা। এর প্রধান বাড়ীটি না কি এক মাইল লম্বা আর তিনশো হাত চওড়া। এর দু'হাজার বিঘা হাতার মধ্যে আরও ৭০টি বাড়ীতেও কাজ চলছে, তাতে কাজ করছেন ৪৭০০ জন কর্ম্মী। এ ছাড়াও আছে নিউ মেক্সিকো প্রদেশের লস্ আলামোস সহরের মারণাস্ত্র সম্পর্কিত গবেষণাগার; আইওআ প্রদেশে আমেস সহরে ধাতুতত্ত্বসংক্রান্ত গবেষণাগার; ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কলে সহরের ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তেজোবিকীরণ সম্পর্কিত গবেষণাগার; নিউ ইয়র্কের রচেষ্টারএর বীক্ষণাগার, যেখানে চিকিৎসা ব্যাপারে ও জীববিদ্যায় পরমাণুর ব্যবহার সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান চলছে।

যদিও অসামরিক উদ্দেশ্যে পরমাণু-শক্তিকে নিয়োগ করবার পথও খুঁজছেন এ-ই সির বৈজ্ঞানিকেরা, কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টার অধিকাংশই ব্যয়িত হচ্ছে যুদ্ধের জন্য মারণাস্ত্র নির্মাণেরই কাজে। এটা অবশ্য পরিতাপের বিষয়, কিন্তু পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও উপযুক্ত রকমের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হচ্ছে না বলেই আণবিক গবেষণাকে এই পথ নিতে হয়েছে। ফলে, আগের চেয়ে অনেক উন্নত ধরণের মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৪৮ সনের মে মাসে প্রশান্ত মহাসাগরে এনিওয়েটক নামক প্রবাল-বলয়ে যে তিনটি উন্নত ধরণের অ্যাটম-বোমা পরীক্ষিত হয়, তার তুলনায় হিরোশিমা নাগাসাকিতে ব্যবহৃত অ্যাটম-বোমা না কি নিতান্তই একটা প্রাথমিক আবিষ্কার মাত্র।

এই অ্যাটম-বোমার নানা অংশ আমেরিকার নানা জায়গা তৈয়ারী হয়ে হিসাব মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটা কেন্দ্রীয় কারখানা এসে অস্ত্রটাকে চরম রূপ দেওয়া হয়। কি নমুনায় সেটা হবে তা ঠিক করে দেওয়া হয় লস্ আলামোস গবেষণাগার থেকে। নিউ মেক্সিকোর এক জনবিরল প্রান্তে ৭৫০০ ফিট উঁচু এ পাহাড়ের মাথায় প্রায় ১১ বর্গ-মাইল জায়গা জুড়ে এই গবেষণাগার অবস্থিত। এর কাছাকাছি এক মরুভূমি, সেখানেই ১৯৪৫ সালে জুলাই মাসে প্রথম অ্যাটম-বোমা ফাটিয়ে তার কার্য্যকারি পরীক্ষা করা হয়েছিল। আলবুকার্ক বলে একটা জায়গায় একটি শাখা-গবেষণাগার আছে। এই দু'জায়গায় মিলিয়ে কাজ করেন ৫০০০ কর্ম্মী, তাঁদের অর্দ্ধেকই বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রশিল্পী।

সব পদার্থের পরমাণুকে তো ভাঙা যায় না। ভাঙবার পরমাণু পাওয়া যায় প্রধানতঃ দু'টি ধাতু থেকে,—প্লুটোনিয়াম ও ইউরেনিয়াম। প্রথমটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়

কিন্তু তাকে রসায়নাগারে তৈয়ারী করে নেওয়া যায়, এবং তা করাও হচ্ছে। ইউরেনিয়াম স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু এর ভাল-মন্দ আছে। ইউরেনিয়ামের ভাল ধাতু-প্রস্তর আমেরিকায় খুব কম আছে, কাজেই তা আনিয়ে নিতে হয় ক্যানাডা এবং বেলজিয়ান কঙ্গো থেকে। অবশ্য, আমেরিকার কলোরেডো মালভূমিতে যে নীচু জাতের ধাতু-প্রস্তর পাওয়া যায় তাকেও কাজে লাগান হচ্ছে, কিন্তু তাতে খরচ এবং কষ্ট বেশী পড়ে। তাই সারা দেশ জুড়ে প্রত্যেকটি প্রস্তর-স্তরে ইউরেনিয়ামের অনুসন্ধান করা হচ্ছে। ধাতু গালাই করবার কারখানা, নানা রকম খনি এবং তৈলকূপগুলির উপরেও দৃষ্টি রাখা হচ্ছে, কেন না সে সব জায়গাতে গৌণ ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ইউরেনিয়াম থাকবার সম্ভাবনা। যে অনুৎকৃষ্ট ধাতু-প্রস্তর পাওয়া যাচ্ছে, তা থেকে ইউরেনিয়াম বের করে নেবার জন্য এক কলোরেডো অঞ্চলেই পাঁচটি কারখানা আছে। বারো জায়গায় বারোটি রসায়নাগারে এই ধাতু-প্রস্তর শোধন করা হয়। দ্বিতীয় বার শোধন করবার জন্য চৌদ্দটি রসায়নশালা আছে, সেখানে এ থেকে বের করা হয় একটা পাটকিলে রঙের গুঁড়ো। আবার শোধন করে একে যে জিনিষে পরিণত করা হয়, তাকে বলে 'সবুজ লবণ'।

এখন মুস্কিল হচ্ছে এই যে, ইউরেনিয়াম দু'রকমের হয়। একটিকে বলে ইউরেনিয়াম-২৩৮, অপরটির নাম ইউরেনিয়াম ২৩৫। প্রথমটির পরমাণু ভাঙা যায় না, অথচ ইউরেনিয়াম পাওয়া গেলে দেখা যাবে যে, তার ১৪০ ভাগের মধ্যে ১৩৯ ভাগই এই ইউরেনিয়াম-২৩৮, বাকী মোটে এক ভাগ হচ্ছে ইউরেনিয়াম-২৩৫। দু'টোকে আলাদা করবার একটি উপায় হচ্ছে 'সবুজ লবণ'কে বাষ্পে পরিণত করে নানা প্রক্রিয়া করা। এ কাজ করা হয় দু'জায়গায়,—ওক্-রিজ গবেষণাগারে, আর ওয়াশিংটন প্রদেশের হ্যানফোর্ডের কাছে রিচল্যাণ্ড গবেষণাগারে। ওক-রিজের কথা আগেই বলেছি। অপরটি তত বড় নয়, কিন্তু এখানে ব্যবস্থা আছে ইউরেনিয়াম-২৩৮কে প্লুটোনিয়ামে পরিণত করবার। প্লুটোনিয়াম থেকে যে তেজ বিকীর্ণ হয়, তা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অনিষ্টকর বলে একে নিয়ে কাজ করবার সময় বৈজ্ঞানিকরা সীসা-সিমেন্টের তৈয়ারী পর্দ্দার আড়ালে আত্মরক্ষা করে, নকল হাতের সাহায্যে এবং পেরিস্কোপ দিয়ে দেখে তবে কাজ করতে পারেন। যে যন্ত্রে কাজ করা হয় তা এমন বিষাক্ত এবং তেজস্ক্রিয় হয়ে যায় যে, তাকে মেরামত করবার জন্য পর্য্যন্ত ছোঁয়া যায় না। অপর একটি জায়গায় এই ইউরেনিয়াম-২৩৫কে আলাদা করবার জন্য 'সবুজ লবণ'কে বাষ্প না করে অন্য এক উপায়ে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটের সাহায্যে কাজ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই কাজের জন্য যে কাঁচা মাল, অর্থাৎ, ভঙ্গুর-পরমাণুশালী ধাতু—তা তৈয়ারী করবার কাজে লিপ্ত আছে আমেরিকার ১৫টি প্রদেশের ২৫টি জায়গায় অবস্থিত ৩০টি কারখানার সহস্র সহস্র কর্ম্মী।

এই বিপুল প্রচেষ্টার সবটাই যদি মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করা যেত তাহলে কি না হতে পারত? কিন্তু তা বোধ হয় হবার নয়।

মেসন্

সাধনা মিত্র

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে, কোনো প্রসারিত (Rarefied) গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চার করলে ক্যাথোড্ হতে কণিকাস্রোত বেরিয়ে আসে। এই কণিকাস্রোতের নাম দেওয়া হয়েছে ক্যাথোড রে। এই কণিকাগুলো একক ঋণাত্মক (Negative) তড়িৎশক্তি বহন করে আর এদের আয়তন হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন্ গ্যাসের পরমাণুর ১৮৪০ ভাগ। আমরা জানি, পদার্থের সব চেয়ে ছোট সমগুণবিশিষ্ট অংশের নাম হচ্ছে অণু। যে-কোনো পদার্থকে যদি ভাঙতে আরম্ভ করা যায় তো ভাঙতে ভাঙতে আমরা এমন একটা অবস্থায় এসে পৌছোই যখন তাকে আর ভাঙতে পারা সম্ভব নয়। পদার্থের এই যে সব চেয়ে ছোট অংশ এটাই হচ্ছে অণু, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'মলিকিউল'। বিজ্ঞান কিন্তু এই অণুকেও বিশ্লিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। অবিশ্যি বলা বাহুল্য, অণুকে আরো ভেঙ্গে যে ক্ষুদ্রতম অংশ পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে আর ঐ পদার্থের গুণ অবশিষ্ট থাকে না। এটারই নাম দেওয়া হয়েছে পরমাণু অথবা "অ্যাটম্"। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 'অ্যাটমিক বম্বে'র আমরা যে অর্থ করেছি বাঙলাতে 'আণবিক বোমা', সেটা ঠিক পরিভাষাসম্মত নয়; আসলে ওটা হবে 'পরমাণবিক বোমা।'

হাইড্রোজেন্ গ্যাসের আণবিক ওজন অন্য সমস্ত পদার্থের থেকে হালকা। সুতরাং এটাকেই একক ধরা হয়েছে মান-নির্ণয়ের (standardisation) সুবিধার খাতিরে। আচ্ছা, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ক্যাথোড রে হতে উদ্ভূত কণিকাগুলো আমাদের এ-পর্য্যন্ত জানা সব থেকে হালকা গ্যাস্ হাইড্রোজেনের একটা পরমাণুর হতে অনেক অনেক বেশী হালকা, যেহেতু, এই কণিকার আয়তন হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন্ গ্যাসের পরমাণুর ১৮৪০ ভাগ। এগুলোকেই ইলেকট্রোন বলা হয় আর যে-কোনো পদার্থ হতেই এদের পাওয়া সম্ভব বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, জাগতিক যাবতীয় পদার্থের সাধারণ উপাদান হচ্ছে এই ইলেক্ট্রোন। এরা যে ঋণাত্মক ধর্ম্মবিশিষ্ট তা আগেই বলেছি। কিন্তু যেহেতু পদার্থেরা সাধারণ ভাবে তড়িৎ-নিরপেক্ষ (Electro-Neutral) সুতরাং এই ইলেক্ট্রোনের নিশ্চয়ই কোনো ধনাত্মক (Positive) অংশ আছে। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা এই ধনাত্মক অংশের অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়েছে যার নাম 'প্রোটন্'। এই প্রোটন্ কিন্তু ইলেক্ট্রোনের মতো অত ছোট নয়, এর আয়তন একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সম-আয়তনবিশিষ্ট। প্রোটনই যে সব শেষ অংশ তা নয়, কিন্তু এটাও আবার দু'টো এককে বিভক্ত—নিউট্রন আর পজিট্রোন। পজিট্রোন ইলেক্ট্রোনের সমান আয়তনের আর একক ধনাত্মক তড়িৎশক্তি বহনকারী। নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ আর একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সম-আয়তনসম্পন্ন। এক-একটা পরমাণু ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র সৌর-জগৎ। নিউক্লিয়াসরূপ সূর্য্যকে কেন্দ্র করে গ্রহরূপ ইলেকট্রোনগুলো বিভিন্ন কক্ষে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। পরমাণুর ঠিক কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসের অবস্থিতি—নিউক্লিয়াস্ বিশেষ

হাতী-ঘোড়া কিছুই নয়—প্রোটন্ আর ইলেক্‌ট্রোনে ঠাসা একটি মাত্র বস্তু। ধনাত্মক তড়িৎবহনকারী।

উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে উকাও নামক এক জন জাপানী পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্ একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। এই প্রবন্ধে নিউট্রন এবং প্রোটনের পারস্পরিক আকর্ষণের বিষয়ে একটা তথ্য জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মতানুযায়ী অ্যাটমকে একত্র করে রাখে যে শক্তিসমূহ, তাদের পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা চলে যদি ইলেকট্রোনের সমতড়িৎগুণ কিন্তু বৃহদাকার আয়তনবিশিষ্ট কোনো নতুন কণিকাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

পরবর্তী কালে 'কসমিক রে' সম্বন্ধীয় গবেষণাতে এই নতুন কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এই নতুন কণিকার নামই হচ্ছে 'মেসন্' অথবা মেসোট্রোন।

'কস্‌মিক্ রে' জিনিষটা আর কিছুই নয়—তীব্র ভেদনক্ষম শক্তি বিকীরণের এক নমুনা মাত্র। খুব বেশী বৌম্পিত তাড়িৎ চৌম্বক (electro-magnetic) বিকীর্ণ শক্তির মিশ্রণ এই 'কসমিক্ রে'। নানা রকম—যেমন কোনো তড়িৎসম্পন্ন বস্তুকে বাতাস কিংবা বাতাস-রহিত শূন্য স্থলে (Vacuum) স্থাপন করে তার ক্রমবিকীরণ লক্ষ্য করা ইত্যাদি প্রকারের পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, এই অজানিতপূর্ব বিকীরণের উৎস পৃথিবীর মধ্যে কোথাও নেই, পৃথিবীর বহির্বায়ুমণ্ডলের বাইরে আছে।

উনিশশো সালে প্ল্যাঙ্ক্‌, কোনো উত্তপ্ত বস্তু হতে তাপবিকীরণ-জনিত স্পেকট্রামের বিভিন্ন অংশে শক্তি বিতরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা বড়ো আবিষ্কার করেন এবং এই নবাবিষ্কৃত অনুশীলনের নাম দেন 'পরিমাণ তত্ত্ব' (Quantum theory)। তিনি বলেন যে, যখন কোনো পরমাণু শক্তি বিকীরণ কিংবা শোষণ করে, তখন এক-এক বারে এক বাণ্ডিলের মতো নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে শক্তি বিকীরণ কিংবা শোষণ করে। এই রকম প্রত্যেক বাণ্ডিল বা প্যাকেট পরিমাণ শক্তিকে কোয়ান্‌টাম্ বলে।

আইন্‌ষ্টাইন্ উনিশশো পাঁচ সালে এই তথ্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আরো বিস্তৃত করেছেন। তাঁর মতানুসারে কোনো উৎস হতে বিকীর্ণ শক্তি তরঙ্গাকারে বহির্গত হয় না, বরং বুলেটের মতো নিক্ষিপ্ত হয় তা হতে। আলোর শোষণ, বিকীরণের থিওরী হতে কোয়ানটাম্ থিওরীর প্রভেদ হচ্ছে এই যে, আলোর ও-দু'টো ধর্ম্মই অবিরত কিন্তু তড়িৎশক্তি সবিরাম ও প্যাকেটাকারে বার হয়। শক্তির এই প্যাকেটগুলোকে বলা হয় ফোটন্।

'কসমিক রে' অথবা জাগতিক রশ্মি দু'টো উপাদানে গঠিত—একটা নরম, আরেকটা শক্ত। নরম উপাদান ইলেকট্রোন্, পজিট্রোন্ আর ফোটন্ দিয়ে গড়া। এই তিনটে জিনিষেরই বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছি আগেই যে, এরা কী কী! "Bethe-Heitler" theory—'কসমিক রে' সম্বন্ধীয়—শুধু নরম উপাদানগুলোতেই খাটে, শক্তগুলোর বেলাতে নয়। 'কসমিক রে'র ভেদনক্ষম উপাদান হচ্ছে নতুন ভারী কণিকাগুলো—মেসোট্রোন্ অথবা মেসন। মেসোট্রোনের আয়তন খুব বেশী—প্রায় এক-একটা ইলেকট্রোনের দু'শো গুণ। এত বেশী আয়তন যে, বিকীরণজনিত তড়িৎ-শক্তির ক্ষয় ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয় এর। সম্ভবতঃ মেসন্ স্থিতিশীল নয়। উকাও আর ভাবা দু'জনেই বলেছেন যে, অন্য কোনো কণিকার উপস্থিতি ব্যতীতই মেসোট্রোন মৌলিক অংশ সমূহে বিশ্লিষ্ট হতে পারে। একটা বিশেষ মাত্রার শক্তির কম মেসোট্রোন্ এ-পর্য্যন্ত দেখা যায়নি, সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, সেই মাত্রাই অর্থাৎ ২ × ১০^{৮} ই, ভি'র নীচে পৌঁছলেই মেসোট্রোন্ বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। মেসোট্রোন্ যে ইলেকট্রোনে বিশ্লিষ্ট হয় এ-সম্বন্ধে ১৯৪০ সালে ডক্টর উইলিয়ামস্ বেশ ভালো একটা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন।

পার্থিব বা জাগতিক রশ্মিতে মেসোট্রোনের অস্তিত্ব সম্পর্কে বললাম, এবারে দেখা যাক এর উৎপত্তি সম্বন্ধে। তিনটি সম্পূর্ণ ক্রিয়ায় এর উৎপত্তি সম্ভব :

১। প্রাথমিক—ফোটন্, নিউট্রন :

২। মাধ্যমিক—নিউট্রন্ ফলতঃ মেসন্ এবং প্রোটনে পরিণত অবস্থা :

৩। সমাপ্তি স্তর—স্বাধীন মেসোট্রোন্।

দেখা যায় যে, নিউট্রটো প্রথমে নিউক্লিয়াস্থিত কণিকা দ্বারা শোষিত হয়, তার পরে সেটাই পরিবর্ত্তিত হয়ে মেসন্ উৎপন্ন করে। মেসন্ বিজ্ঞান-জগতের নবতম আবিষ্কার এবং এখনো পর্য্যন্ত এর অনেক রহস্যই তাই অজানা।

হেলেন কেলারের একমাত্র ইচ্ছা

বিদুষী হেলেন কেলার। এই জন্মান্ধ এবং জন্ম-বধির মহিলাটি একটি বিশিষ্ট আসরে আমন্ত্রিত হন তাঁর বক্তব্য জানাতে। তিনি অনেক কষ্টে জড়িত স্বরে তাঁর ভাষণ দিলেন। এমন সময় প্রধান বক্তাকে সমবেত অথিতিরা বললেন যে, হেলেন কেলারকে যদি তাঁর যে কোন একটি ইচ্ছাকে জানাতে বলা হয়, তা হ'লে তিনি কি জানাবেন?

প্রশ্ন বলার পর অথিতিরা উত্তরের আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। কেউ মনে করলেন যে, এই প্রতিভাশালী রমণী নিশ্চয়ই বলবেন যে, তিনি যাতে স্পষ্ট বাক্‌শক্তি পান; কেউ মনে করলেন যে, চোখের লুপ্তদৃষ্টি তিনি যাতে ফিরে পান। আবার কেউ মনে করলেন তিনি যাতে শ্রবণ-শক্তি লাভ করেন, সেই ইচ্ছাই জানাবেন। যাই হোক, প্রতীক্ষা-কাতর অতিথিরা বসে থাকেন স্তব্ধ-বিস্ময়ে হেলেনের উত্তরের আশায়।

এমন সময় হেলেন কেলার অতি কষ্টে বললেন,—"আমাকে যদি আমার একটি মাত্র মনোবাঞ্ছা জানাতে অনুরোধ করা হয়, তা হ'লে আমি বলবো, সমগ্র পৃথিবীতে যেন শান্তি ফিরে আসে। এই আমার একমাত্র ইচ্ছা।"

জীবাণু-সংক্রমণ কাকে বলে ডাক্তারবাবু ?

তরুণী বধূটি জিজ্ঞাসা করলেন—

ডাক্তার তখন জীবাণু-সংক্রমণের

খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন ঃ আমাদের শরীরের কোথাও কেটে গেলে বা ছড়ে গেলে রোগবাহী জীবাণুরা এই ক্ষতস্থান দিয়ে শরীরের ভেতরে গিয়ে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রথম থেকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করলে এই বিষক্রিয়া সুরু হয়ে যায় ও সারা শরীরের রক্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে। রোগবাহী জীবাণুগুলি আকারে এত ছোট হয় যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না। এই দেখুন, একজাতীয় জীবাণুর চেহারা — স্বাভাবিক আকারের চেয়ে হাজারগুণ বড়ো ক'রে এই রকম দেখা যায়।

কেটে বা ছড়ে গেলে 'ডেটল' লাগাবেন ঃ

ছাল উঠে গেলে, এমন কি আঁচড় লাগলেও অবহেলা করবেন না। চামড়া উঠলেই জীবাণুর প্রবেশের রাস্তা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'ডেটল' লাগানো হচ্ছে আত্মরক্ষার সর্বপ্রথম উপায়।

চতুর্দিকে যখন মহামারী দেখা দেয়—'ডেটল' আপনাকে নিরাপদ রাখবে ঃ

সংক্রমণের বিরুদ্ধে সব সময় সতর্ক থাকা উচিত, বিশেষতঃ চতুর্দিকে যখন মহামারী দেখা দেয়। এক গ্লাস জলে কয়েক ফোঁটা 'ডেটল' মিশিয়ে কুলকুচা করলে মুখ ও গলা জীবাণুমুক্ত হয়, গলার ঘায়ের যন্ত্রণা কমে ও ঘা শুকিয়ে যায়।

'ডেটল' জীবাণুর হাত থেকে মুক্ত রাখে এবং সংক্রমণের বিপদ ঘটতে দেয় না

মাথার চুলকানিতে ঃ

মাথার চুলকানি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ এবং তা দেখতে দেখতে পরিবারের সবার মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসা না করলে চিরদিনের মতো মাথায় টাক পড়ে যায়। এ রোগ হওয়া মাত্র 'ডেটল' ব্যবহার করবেন — ব্যবহারের নিয়ম শিশির গায়ে লেখা আছে।

এই পুস্তিকাটির জন্য লিখুন—বিনামূল্যে পাবেন ঃ

'ডেটল' এর ক্রিয়া মৃদু অথচ অব্যর্থ — এজন্য মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় এর তুলনা নেই। বিনামূল্যে "মডার্ণ হাইজিন ফর উইমেন" (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি) নামক পুস্তিকার জন্য লিখুন।

'DETTOL'

TRADE MARK

এ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড, পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা

DBI-4

ছোটদের আসর
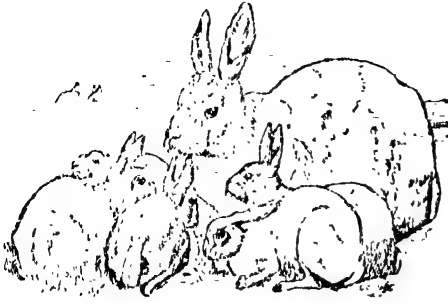
পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি

শ্রীরঞ্জিতাশ্ব মণ্ডল

৯ই কাল্গুন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠাত্রী পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির তিরোধান দিবস। তাঁর জীবনের পূর্ণ ইতিবৃত্ত আজও প্রকাশিত হয়নি। কোন কোন পুস্তকে তাঁর উল্লেখ পাই মাত্র। তাঁকে আমরা ভুলতে বসেছি। তিনি দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছেন। সত্যই বাঙ্গালী বড় আত্মবিস্মৃত জাতি। রাণীর নারীসুলভ কর্মক্ষেত্র ছিল অন্তঃপুরে। তাঁর বংশগৌরব গৃহের প্রাচীর ভেদ করে সাধারণের কানে কচিৎ পৌঁছাত। উপরন্তু যুগদেবতা পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জগদ্ব্যাপী প্রতিভায় সেদিন সবাই মুগ্ধ, তন্ময় ও অভিভূত ছিল। তাঁদের চুম্বক-আকর্ষণে লোকে তাঁকে ভুলে ছিল। কিন্তু মায়ের নীরব স্বার্থত্যাগ ও অকৃত্রিম আশীর্বাদ সন্তানের অক্ষুণ্ণ পাথেয়। এ প্রেরণাদায়ক উৎসের কোন দিন অভাব হয়নি। প্রকাশের আলো না পেলেও তাঁর অসীম আন্তরিকতার কথা ব্যাপ্ত হয়ে থাকবেই। চিরভাস্বর দিক্‌পালদ্বয়ের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি তাঁর প্রচেষ্টার স্বীকৃতিকে বহন করছে। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্রষ্টা, প্রতীক ছিলেন।

ভারতীয় জ্ঞান কৃষ্টির একনিষ্ঠ পূজারিণী ছিলেন রাণী রাসমণি। ইহা তাঁর জীবনে রূপায়িত ও প্রকটিত হয়েছিল। জীবই শিব। উপনিষদ বলেছে নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়। গীতা, ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদি ব্রহ্মের গুণগানে মুখরিত। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রাণী এ ধর্ম, নীতি ও শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসারতাকে অব্যাহত ও স্থায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি ভক্ত গদাধরকে খুঁজে বা'র করেছিলেন। পরমহংসদেবের উদার স্পর্শ লাভ করে নাস্তিক নরেন আস্তিক বিবেকানন্দে রূপায়িত হয়েছিল। রাণীর ধর্মানুরাগপুত অনুকূল ব্যবস্থা ও প্রারম্ভিক প্রস্তুতি পরবর্তী কালীন বিরাট উন্মেষ ও পবিত্র স্ফুরণকে সহায়তা করেছিল। তিনি নবীন প্রাণের আধারকে সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করেছিলেন। বীজ বপন, চারা রোপণ ও বারিসিঞ্চনের ভার তাঁর ওপর ছিল। তাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে যথাক্রমে ফুল ও ফলরূপে পেয়েছি। তাঁর মঙ্গল-ঘট প্রতিষ্ঠা সার্থক হয়েছে। সাধনাই কল্পতরু। ধর্মের অনুশাসন তাঁর দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতো। ভাবী সমাজকে তিনি অধর্ম ও অবিদ্যার প্রভাবমুক্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। অন্তরশুদ্ধি ও ধর্মজাত সমদৃষ্টিকে তিনি উচ্চ স্থান দিতেন। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র লৌকিক রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হলেও ধর্মহীন নয়। একে ধর্ম-নিরপেক্ষ বললে কোন ক্ষতি নেই। ধর্মের নামে অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হলে, এ কলুষিত ও পরিত্যক্ত হতে পারে না। মুদ্রার অপব্যয় ধনীর জঘন্য মনের পরিচয় দেয়; মুদ্রার কোন দোষ দাঁড়ায় না। মুদ্রাকে জীবন থেকে বাদ না দিয়ে এর অপচয়ের স্ফীতিকে অবকাশ না দেওয়া সমীচীন। আত্মার সবলতা ও পরিপুষ্টি আমাদের লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিকগণও এটা স্বীকার করেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জেমস্ জিনস্ বলেন, "নৈতিক সংযমের ভয়াবহ অভাব জগতে চরম সংকট সৃষ্টি করে।" "Tragedy comes from the absence of man's control over himself." বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কুফল নিবারণার্থে ধর্মের অনুকূলতা গ্রহণীয়। "Men of Science need the balance of religion," মন্দির রাণীর দূরদৃষ্টির সাক্ষ্য দিচ্ছে। ইহা আদর্শ-বিচ্যুতির মত পাপ হতে ভারতকে রক্ষা করছে এবং ভাবী কালের প্রস্তুতির দিকে অগ্রসর হতে ডাক দিচ্ছে। অতীতকে অগ্রাহ্য করে প্রগতির স্রোত স্বচ্ছতা লাভ করতে পারে না। "অতীতের গর্ভে ভবিষ্যতের জন্ম। ···পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া তাহার সলিল পান কর; তার পর সম্মুখে প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া সম্মুখ অগ্রসর হও ও ভারত প্রাচীন কালে যত দূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ়, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর ও মহিমাশালী করিবার চেষ্টা কর।···এশিয়ায় ধর্মই ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত গঠনে ধর্মের ঐক্য সাধন অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়।"—(স্বামীজী)। সকল ধর্ম একেশ্বরবাদী, এ অদ্বিতীয়ের সাধনাই ঐক্যের ভিত্তি। "যত মত—তত পথ" থাকা দোষের নয়। মধুর প্রলেপের আশ্রয় না নিয়ে মূল ধরে সমাজ-ব্যাধির চিকিৎসা করতে হবে। এ পটভূমিকায় শিক্ষামন্দির চাই। এর দ্বারা আত্মোপলব্ধি জন্মাতে পারে। এ বিষয়ে রাণী সচেতন ছিলেন। তাই মন্দিরকে তাঁর জাগ্রত কল্যাণস্পৃহার মূর্ত বাহক ও মুখপত্র বললে অত্যুক্তি হবে না। বিশ্বকবির ভাষায়—

"এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত
অপূর্ব অদ্ভুত,
ছন্দে ও গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে।"

নীতিহীন ও আত্মকেন্দ্রিক ভোগবিলাসস্পৃহাকে তিনি ঘৃণা করতেন। ধর্ম, ত্যাগ এবং সংযমের আদর্শকে তিনি মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। যে পবিত্র মন আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপুষ্ট বিলাসব্যসন-চরিতার্থে প্রমোদোদ্যান নির্মাণ না করে দেশের ও দশের হিতার্থে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে, তার পরিচয়ের স্নেহ-শীতল প্রেরণা থেকে দূরে থাকা মারাত্মক ও বিপদজনক। দেশের অশান্তি ও বিক্ষোভ আদর্শস্খলনের ফল। তাই ভারতীয় আদর্শের পূর্ণতা ও ব্যাপ্তির উদ্দেশ্যে সত্যাশ্রয়ী ও কর্মতৎপর কর্মীবৃন্দের উপস্থিতি চাই। "যারা ঐতিহ্য-উজ্জ্বল ভিতে ঘা না দিয়ে মন্দিরের স্তূপীকৃত আবর্জনা-রাশিকে অপসারিত করবে; সকলের জীবনযাত্রার পথকে প্রশস্ত ও বিঘ্নশূন্য করবে।"

সন ১২০০ সাল ১১ই আশ্বিন ত্রিবেণীর নিকটস্থ হালিসহরের পার্শ্বে কোনো গ্রামে মাহিষ্য-পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা হরেকৃষ্ণ দাস গরীব অথচ ধর্মপরায়ণ ছিলেন। রাণী অত্যন্ত গুণবতী ও রূপবতী ছিলেন। কলিকাতা-নিবাসী প্রীতিরাম দাসের দ্বিতীয়

পুত্র রাজচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শ্বশুরালয়ে পতির নিকট অল্প দিনের মধ্যে নিজ অধ্যবসায়-বলে তিনি লেখাপড়া শিক্ষা করেন। পল্লীর অশিক্ষিত মা-বোনদের এ পথ অনুসরণীয়। তাঁর পতিভক্তি ছিল অসাধারণ। পত্নীর পরামর্শ ব্যতীত রাজচন্দ্র কোন কাজে হাত দিতেন না। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য পালন করেন এবং বিপুল ঐশ্বর্য্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ঐশ্বর্য্যসঞ্জাত ক্ষমতার মাদকতা তাঁর চরিত্রের শুচিতাকে স্পর্শ করতে পারেনি। চিত্তের দৃঢ়তা ছিল তাঁর ভূষণ। পণ্ডিতগণকে আমন্ত্রণ করে তিনি শাস্ত্রালোচনা শ্রবণ করতেন। জীবনে নির্মল বৈরাগ্য থাকলেও সংসারের তুচ্ছ বিষয়টির প্রতিও তাঁর গভীর মনোযোগ আকৃষ্ট হতো। জনহিতকর কাজ করেও তিনি স্বামীর সম্পত্তির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাঁর সরল ও প্রীতিপূর্ণ গৃহিণীপণা সকলকে মুগ্ধ করতো। তিনি সংসারিণী অথচ সন্ন্যাসিনী ছিলেন।

ধর্মে অটল বিশ্বাস, দেবদেবীতে অচলা ভক্তি, জীবে দয়া, হৃদয়ে সাহস, ত্যাগ ও সংযম ইত্যাদি গুণের একত্র সমাবেশ তাঁর চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায়। কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে দায়মুক্ত করেছেন, কত ছাত্রকে আহার, বাসস্থান, বিদ্যালয়ের বেতন, পুস্তকের মূল্য ও বস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কৃষির উন্নতি ও প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি অর্দ্ধ মাইলব্যাপী টোনার খাল ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খনন করান। তাঁর মত কৃষক-দরদী জমিদারের একান্ত অভাব। তাই জমিদারীর কুফলে দেশ জর্জরিত। এর উচ্ছেদ সকলে চাইছে। তিনি দৈনিক দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করে যান। অতিথিসত্র তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এক সময় বিস্তর অর্থ ও দ্রব্যাদি নিয়ে রাণী কাশীতীর্থ ভ্রমণের আয়োজন করছেন। এমন সময় দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলো। শত শত লোক মৃত্যুর কবলে আক্রান্ত। এ শুনে তিনি কর্মচারীকে আদেশ দিলেন—"আমার তীর্থভ্রমণে যে অর্থ ব্যয়িত হইত তাহা অন্নকষ্ট-পীড়িত লোকদিগকে সাহায্যার্থ দাও। তাহা হইলে আমার তীর্থ-দর্শনের ফল হইবে।" জীবে প্রেমই ঈশ্বর-সেবা। দয়া-দাক্ষিণ্যের আলোকে উদ্ভাসিত এরূপ নজির ইতিহাসে বিরল। তিনি প্রাচীনা হলেও আধুনিক গণসেবিকা। গণদেবতার প্রদত্ত রাণী নামের সার্থকতা এখনও পল্লী-গীতিতে শুনতে পাই—

"ধন্য রাণী রাসমণি রাণীর মণি।
বাংলার ভাল যশ রাখিলে আপনি।
দীনের দুঃখ দেখে কাঁদিলে আপনি।
দিয়ে ঘরের টাকা পরের জন্য বাঁচালে প্রাণী।"

তাঁর সেবার আদর্শে প্রবল পরাক্রমশালী বৃটিশ-শক্তিও অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি "ক্ষমাহীন শক্তের অপরাধকে"ও ক্ষমা করতেন না। একবার সরকার গঙ্গায় মাছ ধরার একচেটিয়া অধিকার গর্ব করে প্রজাগণের ওপর কর ধার্য্য করে। এ অধিকার অপহরণে প্রজাগণ রাণীর শরণাপন্ন হন। অনন্যোপায় হয়ে রাণী ১০,০০০ টাকা দিয়ে গঙ্গার ইজারা গ্রহণ করেন এবং প্রজাগণকে মাছ ধরার অবাধ আদেশ দেন। বুদ্ধিমতী রাণী বয়ায় বয়ায় শিকল দিয়ে নদীমুখ বন্ধ করে দেন। এতে সরকার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কারণ দর্শাতে আদেশ দেয়। রাণী উত্তর দেন—"আমি মাছের জন্য দশ হাজার টাকায় নদী জমা লইয়াছি। নদীর উপর দিয়া নৌকা জাহাজ প্রভৃতি যাতায়াত করিলে মাছ পলাইয়া যাইবে। সুতরাং মাছ ধরিবার জন্য আমি নদীমুখ বন্ধ করিয়া রাখিব।" অবশেষে সরকার সর্তহীন ত্রুটি স্বীকার করে জলকর তুলে নেন। তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত মকিমপুর পরগণায় নীলকর সাহেবদের উৎপাত দৃঢ়হস্তে দমন করে তিনি প্রজাবৃন্দকে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচান। বাল্যের দৈন্য-দারিদ্র্যের স্মৃতি তাঁকে প্রজার দুঃখে সক্রিয় সহানুভূতিসম্পন্না করে তুলেছিল। তিনি সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও বেহুলার মত পতিপ্রাণা; গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী ও খনার মত বুদ্ধিমতী; লীলাবাঈ ও রাণী দুর্গাবতীর মত সাহসী; অহল্যাবাঈ ও রাণী ভবানীর মত প্রজারঞ্জক, ত্যাগী, সংযমী ও দানশীল এবং মীরাবাঈ-এর মত ধর্মপ্রাণা রমণী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—"রাণী রাসমণি দেবীর অষ্ট নায়িকার মধ্যে এক জন এবং কলিযুগে দেবীমাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

দেশ স্বাধীন হয়েছে। সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে। জাতি-গঠনের অপরিহার্য তাগিদ পড়েছে। এ সন্ধিক্ষণে নারী জাতির আদর্শ ভারত ভুলতে পারে না। গৃহ-জীবনই বিশ্ব-জীবনের সহায়ক ও পরিপোষক। গৃহের জননীবৃন্দ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হলে প্রকৃত নাগরিক-জীবন অচিরে গঠিত হবে। একমাত্র জননীর স্নেহ-শীতল প্রভাব মনুষ্যত্বকে মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত করতে পারে। নেপোলিয়ান বলতেন—"নারীর হাতে বলিষ্ঠ জাতির ভবিষ্যৎ নিহিত।" "Give me good mothers and I will give you a good nation." বর্ত্তমানে দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির ন্যায় মহীয়সী মহিলাবৃন্দের আদর্শের উপস্থিতিকে ঘরে-ঘরে আমরা আদরণীয়, বরণীয় ও মননীয় করবো। শুভ বুদ্ধির দ্বারাই অশুভের নাশ করবো। দরিদ্রের কুটীরে তাঁর মত শত শত নারীরত্ন উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করুক। তবে দেশ আকালমুক্ত হবে।

অপরাজিতা

বিনয়ভূষণ মজুমদার

পারস্য সীমান্তের নিকটবর্ত্তী ধুণ রাজ্য থেকে আওরঙ্গজেবের বিজয়ী সেনা দিল্লীর দিকে প্রত্যাগমন করলে শাহবুলন্দ এক্‌বাল দারা শুকোকে বন্দী করে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে শাহাজাদা দারা আর ভাগ্যবান নন, তিনি বন্দী এবং শৃঙ্খলিত। তাঁর অন্য দুই স্ত্রী ও সন্তানগণও বন্দী হয়ে চলেছেন দিল্লীর অভিমুখে। তাঁর প্রধানা বেগম পরভেজ-কন্যা নাদিরা পতির অবর্ত্তমানে আওরঙ্গজেবের অঙ্কশায়িনী হবার কল্পনায় শিউরে উঠে পূর্ব্বেই বিষপানে মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

প্রায় মাসাধিক কাল পরে বন্দিগণ দিল্লীতে উপস্থিত হলেন অস্ত্রশস্ত্র-সজ্জিত সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত হয়ে।

একটি নিরাভরণ বৃদ্ধ হস্তীপৃষ্ঠে বন্দী দারা চলেছেন শৃঙ্খলিত অপমানিত হয়ে।

"বিধর্ম্মী, ইসলামের চিরশত্রু" এই অভিযোগে দারা শুকোর

মৃত্যুদণ্ড হল এবং তাঁর শিরশ্ছেদ করে পাঠান হল বন্দী সম্রাট বৃদ্ধ শাহজাহানের নিকট আওরঙ্গজেবের উপহার-স্বরূপ। বৃদ্ধ সম্রাট মূর্চ্ছিত হলেন তাঁর প্রিয় পুত্রের এই নিষ্ঠুরতম ও নিদারুণ পরিণামে।

দারা শুকোর বন্দিনী দুই স্ত্রী—উদীপুরী বেগম ও রাণাদিল বেগম। উদীপুরী বেগম ছিলেন খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী এবং তাঁর মাতৃভূমি ছিল জর্জ্জিয়া। রাণাদিল বেগম ছিলেন নীচকুলোদ্ভবা নর্ত্তকী এবং হিন্দু-তনয়া। দারা শুকো তাঁর রূপে ও নাচে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন সম্রাট শাহজাহানের অনুমতিতে।

বিজয়ী আওরঙ্গজেব উদীপুরী বেগমকে তাঁর সহিত সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। উদীপুরী বেগম সাক্ষাৎ করলেন এবং আওরঙ্গজেবকে বিবাহ করলেন।

এক দিন বেগম রাণাদিলও আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হলেন।

রাণাদিল জানতে চাইলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমন্ত্রণের কারণ। সম্রাট জানালেন যে, তিনি রাণাদিলকে বিবাহ করতে চান। রাণাদিল আবার জানতে চাইলেন যে, তাঁর কি গুণ আছে যার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর পাণিপ্রার্থী। সম্রাট উত্তর দিলেন যে, রাণাদিলের মেঘবরণ ঘন কেশ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। প্রত্যুত্তরে রাণাদিল্ সম্রাটকে পাঠালেন তাঁর ঘন কেশের গুচ্ছ এবং লিখলেন, "জাঁহাপনা এই গ্রহণ করুন আমার ঘন কেশের গুচ্ছ—যা আপনাকে মুগ্ধ করেছিল।"

অদমনীয় ভাবে আওরঙ্গজেব আবার লিখে জানালেন যে, তিনি বেগম রাণাদিলের অতুলনীয় রূপে মুগ্ধ এবং রাণাদিলকে বিবাহ করে তাঁর অন্যতমা সম্রাজ্ঞীরূপে পেতে চান।

রাণাদিল্ পত্রপাঠ ছুরিকাঘাতে তাঁর মুখ ক্ষত-বিক্ষত করে একখানি রক্ত-রঞ্জিত বস্ত্র আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ করে জানালেন, "সম্রাট, আমার আর সেই রূপরাশি নেই—যে রূপে মুগ্ধ হয়ে আপনি আমাকে আপনার অন্যতমা সম্রাজ্ঞী করবার অভিলাষ করেছিলেন। আমার প্রেরিত এই রক্তরঞ্জিত বস্ত্রখানি তার সাক্ষ্য দেবে। আপনার নিকট আমার একান্ত অনুরোধ যে, আমাকে শান্তিতে দিন যাপন করতে দিন।"

অপরাজিতা রাণাদিলের নিকট বিজয়ী আওরঙ্গজেব পরাজিত হলেন।

কিছু দিন শোকার্ত্ত জীবন যাপন করার পর রাণাদিলের মৃত্যু ঘনিয়ে এল এবং তিনি পরপারে মিলিত হলেন তাঁর দয়িতের সঙ্গে।

রাণাদিল ছিলেন ভারতের শাশ্বত হিন্দুকন্যার প্রতীক।*

স্মরণীয় বৈশাখ

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দাস কানুনগো

এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে মাসের মত মাস—বৈশাখ, কথায় আছে—

"বৈশাখে বাঁকুড় খাবি খাবি পাকা আম,
জলেতে দিবি রে ডুব কমিবে যে ঘাম।"

শুধু যে কিশোররা আনন্দ করবে, আর কিশোরীরা শুষ্ক, শুষ্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে মাসটির দিকে—তা নয়, কিশোরীদের জন্যও তার পিতা-মাতারা বিধি-ব্যবস্থা করে দিয়েছেন—"হরি-চরণ ব্রতে"র। এ ব্রত দীর্ঘ দিন হতে প্রচলিত। ব্রত করা মানে নিয়ম-নিষ্ঠা বা আকাঙ্ক্ষা নয়, এই নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে যে শুদ্ধাচার তারই মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যনীতি। আর এই স্বাস্থ্যনীতি পালন করবার ব্যবস্থা ব্রতে, এতে শুধু আকাঙ্ক্ষাই নয়, রয়েছে সর্ব্ব দিকে উপকার। আরও তাই এ ব্রত প্রতি ঘরে ঘরে সতীত্ব হবার মন্ত্ররূপে রয়েছে চলিত। অনেকে মনে করবেন—গোলোকপতি শ্রীহরির শ্রীচরণ প্রাপ্তিই "হরিচরণ ব্রতের" উদ্দেশ্য। কিন্তু তা নয়, এ ব্রতের উদ্দেশ্য—রাজ-রাজেশ্বর স্বামী, অমর-বর-পুত্র, সভা-উজ্জ্বল জামাই, গুণবতী কন্যা ও রূপবতী বৌ প্রভৃতি সুখ-সম্পদ লাভ। তাই কুমারীদের এতে সম্পূর্ণ অধিকার, অধিক বয়স্কাদের তিলমাত্র এতে অধিকার নেই, ব্রতের বিধি না-ই বা বললাম। কেন না, গেরস্থ মাত্রই বিধি সম্বন্ধে অবহিত। এ ব্রত চলে সারা মাস ধরে। তাই প্রতিদিন প্রাতঃকালে কিশোরীরা স্নান ক'রে একটি রেকাবে শ্বেতচন্দনের লেপনের পর চন্দন-লিপ্ত রেকাবের উপর অঙ্গুলি দিয়ে দু'খানি চরণ এঁকে ধান, দূর্ব্বা ও পুষ্প দিয়ে এই পাদপদ্ম অর্চ্চনা করতে করতে ব্রত-কথা বলতে থাকে—

'হরি বোলেচেন—ওগো মা।
আজ কেন আমার শীতল পা?'
মা বোলেচেন—
'কোন সতী ভাগ্যবতী
সেই পূজেচেন তোমার পা।'
'সে কি বর চায়?'
'আপনাকে সুন্দর চায়,
রাজরাজেশ্বর স্বামী চায়,
গুণবতী ঝি চায়,
সভা-উজ্জ্বল জামাই চায়,
অমর-বর-পুত্র চায়,
মেনকার মত মা চায়,
দুর্গার মত আদর চায়।' ইত্যাদি! ইত্যাদি!

দিকে দিকে শুভ নববর্ষের প্রাতঃকালে ধ্বনিত হয় আকাঙ্ক্ষা-বাণী। এই বাণী এককালে কিশোরীদের কচি জীবনকে করে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, দৃঢ়, পূর্ণাঙ্গ!

তার পর দিকে দিকে বেজে ওঠে শঙ্খ। নূতন দিনকে দেশবাসী জানায় আহ্বান হাসিমুখে।…"অন্তরে আনন্দ ধ্বনি,
প্রাণে বাজে সুরধনী,
শুভদিন এলো ওগো লয়ে শুভবাণী।"

মানুষ কর্ম্মতৎপর হয়ে ওঠে। মুখে-চোখে ফুটে ওঠে এক আশার স্বপন। যেন মানুষের জীবনে এসেছে নূতন জীবন।

এত আনন্দের মধ্যেও কোথায় যেন অশুভ বীণার ঝঙ্কার ওঠে বেজে। বাংলার দারিদ্র্যক্লিষ্ট পল্লীর গৃহে-গৃহে নিরাশার স্বপ্নে চাষী-মজুর চলে নব উদ্দীপনা লয়ে মাঠের মাঝে; কাঁধে লাঙ্গল মাথায় পাগ্ড়ী, হাতে লাঠি, চলে গরু সাথে লয়ে। অতীতের লাঞ্ছিত জীবন হতে যেন দারিদ্র্য ধুয়ে-মুছে যায় নূতনের

---

* বিষয়-বস্তু অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী মহাশয়ের "জাহানারার আত্মকাহিনী" হইতে গৃহীত।

আবির্ভাবে। শুধু দিকে-দিকে উঠে জাগি—নূতন আশা, উঠে ধ্বনি নূতন গান! ওগো শুধু নূতনের গান!

এ হলো বাংলার আপন বৈশিষ্ট্য! এই যেন সনাতন! এই যেন শাশ্বত! এই যেন যুগে-যুগে ছড়িয়ে রেখেছে আপন কীর্ত্তি। তাই ত কবি প্রকৃতির শ্যামল ক্রোড়ে বসে "চির জ্যোতির্ম্ময়ে"র আহ্বান দিয়ে বলেছিলেন—

"হে চির নূতন আজি এ দিনের প্রথম গানে
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার প্রাণে।"

বৈশাখ মাস! পুণ্য মাস! বছরের প্রথম মাসটি বলেই নয়, এই মাসে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়েছেন ভারতের কত মনীষী। তাঁদেরই কীর্ত্তি-গাথায় বৈশাখ যেমন হয়েছে স্মরণীয়, তেমনি সামাজিক বিধি-নিয়মেও। যেদিন প্রতিটি দেশবাসী বিধি-নিয়মের মত তাঁদের কর্ম্ম-আদর্শকে মেনে চল্‌বে, সেদিন আমাদের চলার পথের বাঁকা পথ হবে সোজা। এদিক পরিহার করলে জাতির অধঃপতন অনিবার্য্য!

অল্প পরিসরে যেটুকু আলোচনা করছি এইটে বৃহৎ নয়, বৃহৎকে জানাবার জন্য এ চুম্বক মাত্র!

১লা বৈশাখ শুধু নববর্ষ নয়, এই দিনে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন অযোধ্যায় বহু বছর আগে। রাম-গাথা লিপিবদ্ধ রামায়ণে। তাই আর বিশেষ কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি না।

৩রা বৈশাখ—সুদূর পাশ্চাত্যের এক গৌরবান্বিত দেশে সারা পৃথিবীর দরিদ্র-বন্ধু মহাত্মা হানিমান জন্ম নিয়েছিলেন জার্ম্মাণীর কোন এক নগরে। বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ডাক্তারী পড়তে থাকেন ও এলোপ্যাথিক ডাক্তার হন। উপার্জ্জন করেছেন প্রচুর। খ্যাতিও পেয়েছিলেন অধিক। সুখ সম্ভোগের মধ্যে থেকেও যখন দেখলেন যে, গরীবরা ওষুধ নিতে আসে খুব কম, তখন তাঁকে নানান্ প্রশ্নে জর্জ্জরিত করেছিল ও ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে জানিয়েছিল গরীবদের অবস্থার কথা। তাই তিনি দুনিয়ার দরিদ্র, রুগ্ন, রোগাক্রান্তদের দুঃখে নূতন পথের সন্ধানে বেরুলেন 'তাদের দুঃখ নিবারণে।' পথ খুঁজে পেলেন। আবিষ্কার করলেন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। যা আজ আমাদের দৈনন্দিনের ব্যবহৃত ঔষধ—সেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আবিষ্কর্তা তিনি। এই ঔষধের আবিষ্কার করে কোটি কোটি দরিদ্রের রোগ-জ্বালা নিবারণ করেছেন। তাই ধনীরা তাঁর আবিষ্কৃত ঔষধকে বল্লেন "গরীবের জল-পড়া।" যাই হোক, তিনি আজ প্রতিটি লোকের কাছে স্মরণীয়।

১৫ই বৈশাখ—সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক দুর্গাদাস লাহিড়ী জন্ম নেন বর্দ্ধমান জেলার চক-ব্রাহ্মণগড়িয়া গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বংশে ১২৭০ সালে। দারিদ্র্যের অভিশাপ ঠেলে বাণীর একনিষ্ঠ পূজক দুর্গাদাস ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের রূপ বিশ্লেষণ করে ভারতবাসীকে করতে চেয়েছিলেন সব দিক দিয়ে বড়। তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়েছিল। এর সঙ্কেত তাঁর প্রতিটি পুস্তকে। লুপ্তপ্রায় বেদ-চর্চ্চার পথানুসরণ করবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি বেদের বঙ্গানুবাদ করেন ও একটি বেদ-সভা প্রতিষ্ঠা করে সাধারণের মধ্যে বেদ-প্রচার করতে থাকেন। ক্রমে এই বেদ-সভা ভারতের চারি দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বেদ-চর্চ্চার শ্রেষ্ঠ ভূমিরূপে নবদ্বীপে একটি বিরাট সভার স্থাপনা করেন। এই সভার সদস্যরা বাংলার দিকে-দিকে বেদ-সভা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ও কাশীতে বেদ-সভার একটি কেন্দ্র স্থাপনা করেন। শুধু এই নয়, সাহিত্যের উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে তাঁহার যথেষ্ট দান। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদনায় তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন ও হাওড়া হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে দীর্ঘকাল কাজ করেন। শাশ্বত ভারতের হিন্দু-গরিমায় তাঁর নাম রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে খচিত।

২২শে বৈশাখ—বাংলার সুপ্রসিদ্ধ ভ্রাম্যনক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু-দিবস। ইনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্ম লন। প্রথমে ডেপুটী ও পরে সাব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যের ভিত্তি-স্বরূপ। বাঙ্গালীর হীন আচরণের চিত্র তাঁর সাহিত্যের পাতায়-পাতায়। দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। "পালামৌ" এঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রচনাভঙ্গি স্বচ্ছ, সরল ও প্রাঞ্জল। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে তাঁর প্রভাব সমধিক।

২৫শে বৈশাখ—বিশ্বকবি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে ১২৬৮ সালে। স্বনামধন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যশিক্ষা পিতা ও ভ্রাতাদের নিকট। এই জন্য তাঁর উপর পারিবারিক প্রভাব অধিক ভাবে প্রতিফলিত। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম থেকে অশীতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন ছিলেন। মধ্যে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। এশিয়ার মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। 'বিশ্বভারতী' তাঁরই স্থাপিত। বিশ্বের বহু দেশে ভ্রমণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির বাণী প্রচার করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর দান অনন্যসাধারণ।

২৭শে বৈশাখ—ভারত-পথিক শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব দিবস। দাক্ষিণাত্যের মালাবার প্রদেশে কালাডি গ্রামে শিবগুরু ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। বালক-বয়সে পিতার মৃত্যু হেতু সাংসারিক গোলযোগের দরুণ তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং মাত্র আট বৎসর বয়সে ইনি সংসার ত্যাগ করেন। শোনা যায়, অষ্টম বৎসর বয়সের মধ্যে ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। গৃহত্যাগ করেই নানা দেশ, নদ, নদী, প্রান্তর, পর্ব্বত লঙ্ঘন করে ও ভ্রমণ করে ইনি ভারতের লুপ্তপ্রায় তীর্থস্থান, মন্দির উদ্ধার করেন এবং ভারতের চতুর্দ্দিকে বেদান্ত ধর্ম্মের প্রচার করেন। বহু পণ্ডিতকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করে ইনি প্রশংসা অর্জ্জন করেন। রামেশ্বর, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, জ্যোতির্ধাম প্রভৃতি চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি সোহহং ধর্ম্মের প্রচারক। ধর্ম্মপ্রচারে এই যে মঠ-ব্যবস্থা—ইনিই তা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। আজ যে দিকে-দিকে "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে, এ তাঁরই কণ্ঠ-বাণী।

বৈশাখী পূর্ণিমা—ভগবান বুদ্ধ কপিলাবস্তু নগরে আবির্ভূত হন। পিতার নাম শুদ্ধোধন, মাতার নাম মহামায়া। এঁর শৈশবের নাম সিদ্ধার্থ। ইনি বিমাতা গৌতমীর হস্তে প্রতিপালিত হন। কৈশোরে ও যৌবনে চিন্তাশীলতা, মৃগয়া প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে বিতৃষ্ণা, সংসারে বিরাগ, জীবের দুঃখে করুণা, দেবদত্ত ও হংসে

কাহিনী। সংসারে বীতস্পৃহ, দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রস্তদের দুঃখ নিবারণের সঙ্কল্পে তিনি গৃহত্যাগ করেন ও দীর্ঘকাল তপস্যার পর সিদ্ধিলাভ করেন, তখন তাঁর নাম হয় বুদ্ধ। সিদ্ধিলাভ করেন বুদ্ধগয়ায়। কাশীর উপকণ্ঠে সারনাথে পাঁচ জন শিষ্যকে দীক্ষা দেন, এবং নব ধর্ম্মমত প্রচারার্থে বহু দেশ ভ্রমণ করেন। ইঁহারই প্রচারিত ধর্ম্মের নাম—বুদ্ধধর্ম্ম।

শুধু গল্প নয়

শ্রীঅসীমকুমার বসু

প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা বলছি: বিক্রমপুরের নিকটে এক গ্রাম থেকে পনের-ষোল বছর বয়সের একটি ছেলে এক দিন পঞ্চাশটি টাকা সংগে নিয়ে চুপি-চুপি গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তার উদ্দেশ্য—প্রথমে সে যাবে বোম্বাই, তার পর সেখান থেকে জাহাজে করে একেবারে পাড়ি দেবে বিলেতে। সেখান থেকে পড়া-শুনা করে নতুন নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য শিখে নিজের দেশে ফিরে এসে নতুন করে জীবন আরম্ভ করবে। তোমরা ভাবো একবার, মাত্র পঞ্চাশটি টাকা সম্বল করে বিলেত যাওয়া! এ কি চাট্টিখানি কথা! কিন্তু ছেলেটির ছিল অদম্য উৎসাহ আর নিজের ওপর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতা। সে ঐ পঞ্চাশ টাকা নিয়েই বেরিয়ে পড়ল। আজকাল ত চার-পাঁচশ'র কম বিলেত যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যাই হোক, ছেলেটি বোম্বাই গিয়ে বিলেতগামী একটা জাহাজে কাজ জুটিয়ে নিল। জাহাজে সর্ত্ত ছিল এই: তাকে বিনা টিকিটে বিলেত নিয়ে যাবে, বিনা পয়সায় খাওয়া আর সেই সংগে সামান্য কিছু হাত-খরচা। জাহাজের কর্তৃপক্ষরা তাই তাকে দিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে জাহাজ বিলেতে নোঙ্গর করল। ছেলেটি ক'দিন শহরটা ঘুরল। সে বুঝতে পারল, তার উদ্দেশ্য এখানে সফল হবে না। উদ্দেশ্য সফলের জন্যে তাকে আমেরিকা যেতে হবে। আবার খোঁজ সুরু হ'ল—কবে কোন্ জাহাজ আমেরিকা যাবে। ক'দিন ধ'রে ছেলেটি ঘুরল প্রত্যেক জেটিতে-জেটিতে। শেষটায় সে কৃতকার্য হল। প্রথমে ক্যাপ্টেন তাকে আমেরিকা নিয়ে যেতে রাজী হলেন না। ছেলেটি অনেক মিনতি করল। শেষটায় সে জাহাজের ঘোড়াদের দেখা-শুনা করবে—এই সর্ত্তে রাজী হল। জাহাজে খাওয়া-থাকা ছাড়া প্রতি সপ্তাহে মোটা রকমের হাত-খরচাও সে পেতে লাগল।

…তার পর এক দিন সে আমেরিকার মাটিতে পা দিল। প্রথম ক'দিন ঘুরে-ঘুরে কাটল। এর মধ্যেই সে তার পূর্ব্ব উদ্দেশ্য বদলে ফেলেছে। সে দেখল, যদি সে দাঁতের ডাক্তার হতে পারে তবে সে একাধারে দেশ-সেবাও করতে পারবে, অন্য দিকে যশ, মান, খ্যাতি সবই সে পেতে পারবে। তখনকার দিনে বাঙ্গলা দেশে এক জনও ভাল দাঁতের ডাক্তার ছিলেন না। ছেলেটি শীঘ্রই একটি চাকরী খুঁজে নিল এবং রীতিমত পড়া-শুনা এবং হাতে-কলমে কাজ করতে আরম্ভ করল।

অল্প দিনের মধ্যেই সে অনেকগুলি পাশ করে ফেলল। তার পর একটা সুবিধামত জায়গা বেছে নিজে স্বাধীন ভাবে কাজে মন দিল। কিছু দিনেই আমেরিকাতেই তার পসার বেশ বেড়ে উঠল। কিন্তু ছেলেটি বেশী দিন আর সেখানে থাকতে পারল না। এক দিন ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে সে দেখল, স্বদেশ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

পরদিনেই সে স্বদেশের উদ্দেশে সমুদ্রে পাড়ী জমাল।

তোমরা বল ত—এই একাগ্রচিত্ত, অধ্যবসায়ী ছেলেটির নাম কি? ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত দন্ত-চিকিৎসক ডাক্তার এ, আহ্‌মদ।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

২

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিঠুরে এসে অসি-খেলা

আগ্রাজীর অন্তিম বাণী বর্ণে বর্ণে ফলে গেল; তাঁর অধস্তন দ্বিতীয় বাজীরাও পত্নী ও তাঁর আদরিণী কন্যা মনুবাঈকে পদমাদরে গ্রহণ করলেন। রাজ্যপাট ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে বিঠুরে এসেও ইনি বিরাট জাঁকজমকে অতীতের বাহ্যিক ঠাট-ঠমক সব বজায় রেখে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী বিলাসী রাজার মতন বিশেষ দপদপায় জীবনযাপন করছিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, দেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যে কোন রাজ্যের রাজা যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁর অদৃষ্টে নানা দুর্ভোগই ঘটে থাকে—যুদ্ধবন্দীরূপে বিজেতার কাছে পদে পদে তাঁকে অপদস্থ হতে হয়। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত রাজ্যচ্যুত পেশোয়ার সম্বন্ধে চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে পত্নী ও তাঁর কন্যা মনুবাঈ অবাক হয়ে গেলেন। বালিকা হলেও, বাপুজীর কাছে নানা দেশের যুদ্ধ-বিগ্রহের গল্প শুনে মনুর মনে এই ধারণা হয়েছিল যে, বাপুজীর মতন তাঁর দাদাও বুঝি বিঠুরে এসে খুব সাধারণ ভাবেই কালযাপন করেন। কিন্তু এখন স্বচক্ষে দেখে সে ভুল তাঁর ভেঙে গেল। বড় বড় রাজাদের রাজৈশ্বর্য্য, নানা রকম জাঁকজমক আর দপদপার যে-সব গল্প মনু বাপুজীর কাছে শুনেছিলেন, বিঠুরে এসে তার প্রত্যেকটি চাক্ষুষ দেখে চমকে উঠলেন। রাজবাড়ীর সেই প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, দ্বার-মুখে সশস্ত্র প্রহরী, বিশাল প্রাঙ্গণে পাহাড়ের মত কত সব অতিকায় হাতী, কত জাতের কত ঘোড়া; গল্পের সেই চমৎকার বাগান—কত রকমের বাহারী গাছ, কত রঙ-বেরঙের ফুটন্ত ফুলের বাহার, কৃত্রিম পাহাড়ে কেমন সুন্দর ঝরণা—যেন সত্যিকার পাহাড় থেকে ঝর্‌ঝর্ করে জল পড়ছে; কত সুন্দর সুন্দর হরিণ, ময়ূরগুলো প্যাখম তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ছুটছে—খেলা করছে। ওদিকে কত বড় বাড়ী, এক মহলের পর আর এক মহল, তার পর আর এক মহল, যেন শেষ হয় না; রাজবাড়ী ত নয়—যেন মস্ত একখানা সহর। তার পর ঘরগুলি কি সুন্দর; ঘরে ঘরে কত সব ছবি, কত দামী দামী মহার্ঘ আসবাব-পত্র—হাতীর দাঁতের খাট-পালঙ, বসবার আসন,—আরো কত কি! কত রকমের বাতিদান, দেওয়ালগিরি, ঝুলানো আলোর ঝাড়। দরজার গায়ে জানালার গরাদের উপরে কিংখাপের পরদা ঝুলছে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত বসন-ভূষণ—মণি-মুক্তার বাহার! অন্দর-মহলে যেমন অসংখ্য পরিজন, তেমনি তাদের পরিচর্য্যার জন্যে কত দাস-দাসী। বাহির মহলে কি অপূর্ব্ব মন্দির—মাথায় চুড়োগুলি

সোনা দিয়ে মোড়া, ভিতরের কারুকাজ দেখলে চোখ ঝলসে যায়; তার যেমন অনুপম দেবমূর্ত্তি, তেমনি অপরূপ তাঁর সাজ-সজ্জা—স্বর্ণখচিত রত্নালঙ্কারগুলির আভা বুঝি সূর্য্যের প্রভাকেও ম্লান করে দিচ্ছে। দেউড়ীর উপরে নহবতখানা—প্রহরে প্রহরে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে নানাবিধ বাদ্যের সুর। এক দিকে দেওয়ান সাহেবের সেরেস্তা ও মহাফেজখানা। সেখানে নানা ধরণের লোক-জন সব গিস্-গিস্ করছে। মহাফেজখানায় যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ, বিচার-সংক্রান্ত নথী ও কাগজপত্র। অন্য দিকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয়—প্রত্যহ দুই বেলা বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয়। এর পরে কিছুটা ভিতরে পেশোয়ার সভাগৃহ। রাজসভার যে সব গল্প মনু শুনেছেন—জাঁকজমকপূর্ণ এই সভাগৃহের সঙ্গে যেন মিলে যাচ্ছে। পুণায় যে রাজকীয় আসনে বসে মহাপরাক্রান্ত পেশোয়াগণ একদা আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের উপর শাসনদণ্ড চালনা করতেন, পতনের পরও রাজ্যচ্যুত পেশোয়া সেই মহান্ আসন বিঠুরের প্রাসাদে এনে নূতন করে 'পেশোয়ার গদী' স্থাপিত করেছেন। এই আসনে বসে তিনি এখন বিঠুরের জাইগীর শাসন করে দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে থাকেন।

আগেই বলা হয়েছে, পেশোয়া সকন্যা পন্থজীকে সাদরেই তাঁর এই বিপুল জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু আশ্রিত ভাবে গ্রহণ করা নয়, তাঁকে সেরেস্তার একটি বিশিষ্ট পদে নিয়োগ করে যথেষ্ট মর্য্যাদা দানেও কার্পণ্য করেননি। পেশোয়ার সভায় পন্থজীকে বিশিষ্ট সভাসদরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়, আর পন্থজীর কন্যা মনুবাঈ প্রথম দিনেই পেশোয়াকে একেবারে যেন বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলেন। বালিকাকে দেখেই সভার সকলের সামনেই পেশোয়া বলে ওঠেন: বা, বা! কি চমৎকার মেয়ে আপনার পন্থজী? এমন রূপ ত কখনো দেখিনি!

পিতার পাশেই কন্যা মনু স্থির ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। পেশোয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার নাম কি মা?

মৃদু হেসে কন্যা উত্তর দিলেন: মনুবাঈ।

পেশোয়া বললেন: এ রূপের সঙ্গে ও নাম মানায় না, তুমি যেন 'ছবেলী'—আমরা তোমাকে ছবেলী বলে ডাকব। কেমন? এ নাম তোমার পছন্দ হয়েছে মা?

তেমনি মৃদু হেসে বালিকা তাঁর সুন্দর গ্রীবাটি একটু দুলিয়ে সম্মতি জানালেন। মারাঠী ভাষায় ছবেলী শব্দের অর্থ 'ময়না'। পেশোয়ার কথা সবাই মেনে নিলেন—বিঠুরে মনু ছবেলী নামেই পরিচিতা হলেন।

পেশোয়ার সভায় তাঁর দুই পুত্রও উপস্থিত ছিলেন। আসলে পেশোয়া ছিলেন অপুত্রক। কালক্রমে আশ্রিত পরমাত্মীয়দের দু'টি পরম সুন্দর গুণবান পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হচ্ছেন—ধুন্দুপন্থ নানা, আর কনিষ্ঠ—গঙ্গাধররাও। এঁরাই পরে 'নানা সাহেব' ও 'রাও সাহেব' নামে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিখ্যাত হন। এঁরা দু'জনেই নবাগতা বালিকাকে দেখে খুশী হয়ে ভাবতে থাকেন—তাঁদের সঙ্গে খেলবার এক সঙ্গিনী এলেন!

ধুন্দুপন্থ নানা শৈশব থেকেই অত্যন্ত জেদী ও সদালাপী। পরম সুন্দর প্রিয়দর্শন বলিষ্ঠদেহ কিশোর। নানা আগেই এগিয়ে

এসে বালিকা মনুকে সম্বর্দ্ধনা করে বললেন: আমরাও তোমাকে ছবেলী বলে ডাকব, কেমন? আমাদের বোন নেই—তুমি আমাদের বোন হবে?

সুন্দর ছেলেটিকে দেখে, তার মুখে এ ভাবে মিষ্ট সম্বোধন শুনে মনুর মনটিও আনন্দে ভরে গেল; হাসিমুখে বললেন: বেশ ত, আমারো ভাই নেই, তুমি আমার ভাই হবে—কেমন?

প্রথম দেখা ও দু'টি কথাতেই দু'জনের মধ্যে দিব্য ভাব হয়ে গেল। নানা জানলেন, ছবেলী তাঁর পরম স্নেহের বোন হলেন; ছবেলীও বুঝলেন যে, এখানে এসেই সুন্দর একটি ভাই পেয়ে গেলেন। তাহ'লে কাশীর মতন এখানেও খেলতে পাবেন।

এর পরেই ছোট ভাই রাওএর সঙ্গেও মনুর আলাপ হয়ে গেল। ইনি পেশোয়ার কনিষ্ঠ দত্তক পুত্র—বয়সে নানার চেয়েও দু'-তিন বছরের ছোট। ইনিও মনুকে ছোট বোন বলে মেনে নিলেন। মনুকে সঙ্গে করে দুই ভাই বিঠুরের ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রাসাদের বিভিন্ন মহল প্রাঙ্গণ উদ্যান সব দেখালেন, দেখতে দেখতে মনু কোন কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলে নানা বেশ সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন—কোনটির কি নাম, তার পিছনের কাহিনী। শুনে মনুর কি আনন্দ!

খানিক পরে মনু দেখলেন, নানা ভাইটি আগের পোষাক বদল করে যোদ্ধার মতন আঁট-সাঁট করে পোষাক পরে প্রাঙ্গণের দিকে চলেছেন—তাঁর কোমরবন্ধে দিব্যি রঙচঙে খাপে-ভরা তলোয়ার ঝুলছে। দেখেই মনুর চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দের ঝলকে; ছুটে গিয়ে নানার হাত ধরে বললেন: গল্পের রাজপুত্রের মতন কোমরে তলোয়ার বেঁধে কোথা চলেছ ভাই?

মনুর কথাগুলি নানার বড় ভালো লাগলো। তাঁর পথটি রুখে হাসিমুখে এমন একটি মিষ্টি ভঙ্গিতে মনু কথাগুলি বললেন, নানাকে তখনি থমকে দাঁড়িয়ে কথার জবাব দিতে হলো। তিনিও বীর বালকের মতন সোজা হয়ে মুখখানি দৃপ্ত করে বললেন: লড়াই করতে চলেছি বোন! তবে সত্যিকার লড়াই নয়—কি করে তলোয়ার চালিয়ে লড়াই করতে হয়, ওস্তাদজীর কাছে তাই শিখি কি না! এই সময়ে নিত্যই আমরা তলোয়ার খেলি যে! চলো না আমার সঙ্গে ছবেলি—তলোয়ার খেলা দেখবে। যাবে?

মুখখানা অমনি গম্ভীর করে মনু বললেন: বা রে! তোমরা তলোয়ার খেলবে, আর আমি বুঝি খালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? তা হবে না ভাই, আমিও খেলব।

মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়ে নানা বললেন: তুমিও খেলবে বলছ! কিন্তু এ খেলা যে তলোয়ার নিয়ে হয়—তুমি তলোয়ার চালাতে পারবে?

মুখে মিষ্টি হাসিটুকু ফুটিয়ে মনু বললেন: কেন পারব না—তবে তোমার বোন হয়েছি কি জন্যে? শীগ্‌গির আমার জন্যে একখানা ছোট্ট তলোয়ার এনে দাও—একসঙ্গে আমরা খেলব।

ছবেলীর মুখে এ-রকম সাহসের কথা শুনে নানা খুব খুসি হলেন। ঠিক এই সময় সেজে-গুজে রাও সাহেবও এসে পড়লেন। তাঁকে দেখেই নানা বললেন: ভাই রাও, ছবেলী বলছে আমাদের সঙ্গে তলোয়ার খেলবে—তুমি ছুটে গিয়ে তোষাখানা থেকে আমাদের আগেকার একখানা ছোট তলোয়ার নিয়ে এসো।

সহর্ষে রাও সাহেব বললেন: বা, বেশ হবে তাহ'লে—আমি এখনি ছবেলীর মতন তলোয়ার আনছি।...এক-নিশ্বেসে কথাগুলি বলেই রাও সাহেব তোষাখানার দিকে ছুটলেন।

নানা এই সময় জিজ্ঞাসা করলেন: কাশীতেও কি তলোয়ার খেলতে বোন?

মনু উত্তর দিলেন: না, সেখানে বাপুজীর কাছে তলোয়ার খেলার গল্প শুনতুম। আর, আমি কি খেলতুম শুনবে—লুকোচুরি, দৌড়োদৌড়ি, দড়ি-টানাটানি—এই সব। আচ্ছা, তোমরা এখানে দৌড়োদৌড়ি খেল না?

নানা বললেন: খেলি—তবে পাওদলে নয়,—আমরা ঘোড়ার পীঠে চড়ে ঐ খেলা রোজ খেলি।

শুনেই বালিকা চোখ দু'টো বিস্ফারিত করে বললেন: তাই না কি! ঘোড়ায় চড়ে খেল? দেখো ভাই, আমি কত দিন স্বপ্ন দেখিছি, যেন ঘোড়ায় চড়ে ছুটছি...সেই থেকে ঘোড়ায় চড়তে আমার ভারি সাধ। তুমি যখন ঘোড়ায় চড়ে খেলবে, আমাকেও কিন্তু ঘোড়ার পীঠে তুলে নিতে হবে। এক ঘোড়ায় চড়ে দু'জনে ছুটবো—কি মজা!

এমন ভঙ্গিতে কথাগুলি বললেন মনু, যেন নানার সঙ্গে তেজস্বী একটা ঘোড়ার পীঠে চড়ে দু'জনে চলেছেন! এই সময় রাও সাহেব খাপে-ভরা ছোট একখানি তলোয়ার কোমরবন্ধ শুদ্ধ এনে বললেন: দাদা, তোমার ছোটবেলার তলোয়ারখানাই বেছে-বেছে এনেছি ছবেলীর জন্যে—এই নাও তুমি ওর কোমরে বেঁধে দাও।

তলোয়ার দেখে মনুর মনে আনন্দ ধরে না—বছর কয়েক আগে দশ বছর বয়সে এই তলোয়ার কোমরে বেঁধে নানা টহল দিয়ে বেড়াতেন—এই তলোয়ার নিয়েই তাঁর শিক্ষা সুরু হয়। সে ইতিহাস শোনাতে শোনাতে তিনি মনুর কোমরে সেই তলোয়ার বেঁধে দিলেন। মারাঠী মেয়েরা পুরুষদের মতন কাছা দিয়ে লম্বা সাড়ী দিব্যি গুছিয়ে আঁট-সাঁট করেই পরে থাকেন। মনু সেদিন একখানা রক্তবর্ণের কাপড় পরে বেরিয়েছিলেন। সেই কাপড়ের উপরে স্বর্ণখচিত সুদৃশ্য কোমরবন্ধের সঙ্গে বিচিত্র বর্ণের খাপে-ভরা তলোয়ারখানি ঝুলতেই তাঁর সে সজ্জা যেন আরো মনোরম হলো।

এর পর খেলার মাঠে গিয়ে মনুও সেদিন অস্ত্র-চালনার দীক্ষা নিলেন ওস্তাদের কাছে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সুরু হলো। বালিকা মনুর হাতের শক্তি ও ক্ষিপ্রতা দেখে গুরু পর্য্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন।

খেলার পর আহ্লাদে নাচতে নাচতে নিজেদের মহল্লায় এসে মনু পিতাকে বললেন: বাবা, দেখ নানা ভাই আমাকে কেমন তলোয়ার উপহার দিয়েছেন। আমিও ওঁদের সঙ্গে আজ তলোয়ার খেলিছি বাবা! এখন থেকে রোজ খেলব।

[ক্রমশঃ।

রবীন্দ্র-জন্মতিথি

শ্রীসাধনা কর

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে পদে পদে বৈষম্য—ভৌগোলিক কারণে সংকীর্ণতা, ভাষার দুর্বোধ্যতার জন্যে ভেদ, ধর্মকর্মে পার্থক্য, যুগেরও তারতম্য,—এই সব কারণে এক মানুষের সঙ্গে আর-একের মিলন দুরূহ হয়ে ওঠে। অর্থের পার্থক্য আজকের দিনে সব চেয়ে বেশি স্পষ্ট। তবু মানুষ মেলে। বৈষম্যের অন্তরালে ভিতরে-ভিতরে চলে অন্তঃসলিলা মিলনের বেগ। না হলে জগতের বিস্তৃতিই তো ঘটতো না। মিলনের এই ব্যাপকতাই প্রীতি। সেই জন্যেই বাইরে থেকে যত রকম চেষ্টা ও আয়োজন ক'রে, যতই না মানুষকে জানা যাক, ভিতরের জানাই জানা। কারণ—

সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার পরিচয়।

*　　　*　　　*

জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

অন্তরের প্রীতিতে প্রকৃতি এবং মানুষের সঙ্গে মিলনই ছিল রবীন্দ্রনাথের সাধনা। তাঁর অন্তরের নিগূঢ় কামনা ছিল—'ধন নয় মান নয় শুধু ভালোবাসা।' "আত্ম-পরিচয়" গ্রন্থেও আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন যে, অনুরাগে সৃজনই কবির কাজ এবং কবির যা প্রাপ্য—"তাহা শ্রদ্ধা নহে ভক্তি নহে, তাহা হৃদয়ের প্রীতি।"

যত সাধক যত প্রেমিক যত কবি আজ অবধি জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কম জনেরই ভাগ্যে জীবনকালে রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড় সমাদর লাভ হয়েছে। তাঁর পক্ষে দেশ-বিদেশের প্রশ্ন ছিল অবান্তর। আর সব ঘটনা বাদ দিয়েও শুধু যদি তাঁর জন্মদিনের সংবাদগুলোর কথাই ধরা যায়, বিস্ময় লাগে।

১৩১৭ সনে কবি পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেন। সে উপলক্ষেই প্রথম রবীন্দ্র-জন্মতিথি পালিত হয় শান্তিনিকেতন আশ্রমে। আশ্রমিকগণ তা ঘরোয়া ভাবে উদ্‌যাপন করেন। 'রাজা' নাটক অভিনীত হয়, কলকাতা থেকেও বেশ অতিথি-সমাগম ঘটেছিল। সেদিনকার ভাষণে কবি প্রথম বলেন,—তাঁর পারিবারিক জন্মের সংকীর্ণতা ঘুচল, তাঁর জন্ম হল নূতন ক'রে সবার মধ্যে। তার পরে ৫১তম জন্মতিথিতে তাঁর দেশের বিদ্বজ্জন আনেন প্রকাশ্যে শ্রদ্ধার ডালি। কলকাতা টাউন-হলে অনুষ্ঠানটি হয়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন সভাপতি। সেই থেকে কবির জন্মদিনের যে ধারা শুরু হল, প্রতি বছর দেশ-বিদেশে কত জায়গায় কত ভাবেই না তা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। কত বার জন্মদিন এসেছে সমুদ্রবক্ষে। জাহাজের কাপ্তেন ও বহু যাত্রীর শ্রদ্ধায় সেই উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। প্রাচ্যের পারস্য, চীন, জাপান, রেঙ্গুন এবং প্রতীচ্যের লণ্ডন, প্যারিস, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি নানা দেশে জন্মদিনের এই বিশেষ তারিখটিতে যেখানেই কবি অবস্থান করেছেন, নানা সমারোহে তাঁর দিন কেটেছে। রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ডে কবির একসপ্ততিতম জন্মতিথির বর্ণনা-স্থলে উদ্‌ধৃত আছে—"ইরাণরাজের আদেশে বাগনেয়ারের দোলেহ্‌তে সমস্ত দিন উৎসব হয়। সমস্ত দিন লোকজন খাওয়ানো, কয়েক হাজার লোকের অভিবাদন ও অভিনন্দন গ্রহণ ও দেশ-বিদেশ থেকে টেলিগ্রামের রাশি পাওয়া, প্রাসাদের সমস্ত ফুল দিয়ে সাজানো এবং বহু লোকের অভিনন্দন পত্র, ফুলের ডালি এবং অসংখ্য উপহার গ্রহণে সমস্ত দিন সকলের অবিশ্রান্ত খাটুনি চলে।"

বর্তমান 'প্রবাসী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন কবির সঙ্গে তেহারাণে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরই লেখা থেকে এ খবর জানা যায়।

যে দেশে, জন্মদিনে কবি উপস্থিত থাকেননি, সে-দেশ থেকেও এই দিনের উপলক্ষে এসেছে কত প্রীতি-উপহার, তার একটি বিশেষ নিদর্শন আছে। ১৯২১, ৬ই মে কবি লুসার্ণে থাকতে খবর পান যে, তাঁর একষষ্টিতম জন্মদিনে জার্মেনীর বিদ্বজ্জন সমাজ জারমেন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলী তাঁকে উপহার দিচ্ছেন।

শুধু বিদেশেই নয়, দেশেও তাঁর জন্মদিনের সমাদর ছিল। জন্মদিনে (১৩৩৫) রবীন্দ্রনাথের 'তুলাদান' অনুষ্ঠান ঘটে। পাল্লার এক দিকে তাঁর বই রেখে তাঁকে ওজন করা হয়। বিশ্বভারতী পরে সেই বইগুলি নানা পাবলিক লাইব্রেরীতে দান করেন। অনুষ্ঠানটি হয় কলকাতায়।

৬৫তম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান-স্থল শান্তিনিকেতনে। কিন্তু এই উৎসবে যে কত দেশের কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁদের দেশের অভিনন্দন নিয়ে এসেছিলেন, তার বিবরণ পাই রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ডে। উৎসব-ক্ষেত্রে যোগ দেন ইতালীয় অধ্যাপক তুচি, সস্ত্রীক ইতালীয়ান কন্সাল এবং সস্ত্রীক ফরাসী কন্সাল; বিশ্বভারতীর চীনা ভাষার অধ্যাপক মিঃ লীম্ চীনদেশের উপঢৌকন দেন, মিঃ এণ্ড্রুজ দক্ষিণ ও পূর্ব-আফ্রিকার অধিবাসীর প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকেন, ডাঃ কাজিনস্ আইরিশ জাতির তরফ থেকে প্রশস্তি বাণী শুনান এবং পোরবন্দরের মহারাজা কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে কলা-ভবনের জন্য অর্থ দান করেন। সেই রাত্রেই শান্তিনিকেতনে 'নটীর পূজা' প্রথম অভিনীত হয়। এবং এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, শুধু বাংলা দেশে নয়, আজ সমস্ত ভারতে যে সুষ্ঠু শালীনতাময় নৃত্যধারার প্রচলন দেখি তার সূচনা হয় 'নটীর পূজা'র অপরূপ নৃত্যে, এই দিনটি থেকেই।

দেশ-বিদেশের লোকের এই যে এত শ্রদ্ধা-প্রীতির প্লাবন, এ কী রুদ্ধিল অমনি? আপন অন্তরের প্রীতিদানের দ্বারাই কবি এ তি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। কবি "আত্ম-পরিচয়" গ্রন্থে লছেন, "বুদ্ধির জোরে নয়, বিদ্যার জোরে নয়, সাধুত্বের গৌরবে , যদি অনেক কাল বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে তাহারই কোনো কটা সুরে আপনাদের হৃদয়ের সেই প্রীতিকে পাইয়া থাকি তবে মি ধন্য হইয়াছি।"

মানুষের প্রীতির মাল্য তাঁর চিত্তকে অহংকারে স্ফীত করে লেনি, সমস্ত অন্তরকে করেছে দীন নম্র; করেছে ভালোবাসার নন্দে মধুরতরো। রিক্ত হস্তে তিনি কোনো দিন সে-প্রীতি ণ করেননি। কিছু পেলেই প্রত্যেক বার জানিয়েছেন তাঁর রো প্রীতি দেবারই দায় বাড়ল। "এই যে অজস্র ভালবাসা চ্ছি এর কি পুরো দাম কোনোদিন দিয়েছিলুম? * * * মার দ্বিতীয় জন্মের এই যে অজস্র দান পেলুম জননী ধরিত্রীর আশীর্বাদ আমি নম হয়েই গ্রহণ করব।"—চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড।

"আত্ম-পরিচয়" গ্রন্থে বলছেন, "…আজ আপনাদের নিকট হইতে সমাদর লাভ করিলাম তাহাকে এমন দুর্লভ বলিয়া শিরোধার্য রিয়া লইতেছি। ইহা স্তুতিবাক্যের মূল্য নহে, ইহা প্রীতিরই পহার।"

জার্মেনী থেকে গ্রন্থাবলী উপহার পেয়ে লিখছেন—"The enerous greeting and the gift that have come to e from Germany on the occasion of my 61st irthday are overwhelming in their significance or myself. I truly feel that I have had my econd birth in the heart of the people of that ountry who have accepted me as their own."

জীবনের শেষ বেলাতেও কবি বলে গেলেন—মানুষের জন্মদিন কটি দিনের মধ্যে নয়, একটি পরিবারের মধ্যে নয়, বিশেষ কোনো শে নয়, জন্মদিন সেই ক্ষণেই—যখন সমস্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির মিলন ঘটে—

"এ কথা বুঝিনু মনে
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।
* * *
আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা
অবারিত পায় অভ্যর্থনা।"

পারিবারিক সম্বন্ধের চেয়ে তাঁর কাছে বেশি মূল্য পেয়েছে এই আত্মার আত্মীয়তার সম্বন্ধ। এক জন্মদিনে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন—"কোন মানুষ আমার পরিবার নামক একটা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে গেছে বলেই সে যে অন্য মানুষের চেয়ে আমার কাছে মনোরম তা নয়। পরিবারের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাদের আমি বিশেষ ভালবাসি—কিন্তু সে তারা পরিবারের লোক বলে নয়। * * সেটা যথার্থ আত্মীয়তা, পারিবারিকতা নয়। * * * তাই বলে আমার মন যে কেবলমাত্র মানব সাধারণের আম-দরবারেই দিন কাটাতে ভালবাসে তা নয়—বিরাট মানবের মধ্যেই আমার আত্মা কৈবল্য লাভ করেছে তা বলতে পারি নে—আমার মধ্যে খুবই একটা প্রবল ব্যক্তিগত সত্তা আছে। বিশেষ মানুষ এবং বিশ্ব-মানুষ দুটোই আমার কাছে সব চেয়ে সত্য।"

এত যিনি দিয়েছেন, পেয়েছেনও যিনি এতখানি, জীবনের শেষ-সীমায় উপনীত হয়ে তিনি বললেন—

"আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
* * *
এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।"

বললেন:

"তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে দূরের মানুষ।
* * * *
আমি কিছু দিতে চাই, তা না হলে জীবনে জীবনে
মিল হবে কী করিয়া—আসি না নিশ্চিত পদক্ষেপে
ভয় হয়, রিক্ত পাত্র বুঝি, বুঝি তার রসাস্বাদ
হারায়েছে পূর্ব পরিচয়, বুঝি আদানে প্রদানে
রবে না সম্মান। তাই আশঙ্কার এ দুরন্ত হতে
এ নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা মাঝে তোমাদের ডেকে বলি,
* * * *
তোমরাও যোগ দিও জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে * * *।"

অনুভূতির আবেগে এই কবিই এক দিন বলেছিলেন—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে
আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া।

সে ঘর যে কত বড় হ, আর কত ছোটো খোপে তা বিভক্ত, তার উপলব্ধি কাব্যে এবং জীবনে দু'দিক দিয়েই তাঁর নিজের কাছে পরিস্ফুট হয়েছিল। সে ঘরের সর্বত্র তিনি পৌঁছতে পারলেন না। অক্ষমতার এই স্বীকৃতিই তিনি রেখে গেলেন। তাঁকে সিদ্ধির জয়পত্র পরিয়েছে সে লেখাতেই। সে রচনারই এখন বহুল সমাদর চলছে,—এক দিন এই পথেই কবির আরো বেশি পরিচয় সুগম হবে।

এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তায় অনুমিত হয়েছে যে, মানুষ এক দিন দেহের সীমায় বদ্ধ থাকবে না, তার সত্তা হবে চেতনার তেজপুঞ্জে রূপায়িত। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই পরিণতিই জীবনের পরিচয় হয়ে উঠেছিল। বৃহত্তর অনুভূতির ভূমিকাতে দৃষ্টি রেখে তিনি শেষ জীবনে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সাধনা সম্পূর্ণ হলো না। পৃথিবীর সকল শ্রেণীর সমগ্র মানুষের জীবনের সঙ্গে একীভূত হওয়া রয়ে গেল বাকি। সমস্ত মানুষের বিচিত্র ব্যথা, গভীরতম কথা তাঁর সুরে সংগত হয়ে বেজে উঠল না। ভাবীকালের মানুষ সে অসম্পূর্ণতা ক্ষমা ক'রে সত্য মূল্যে তাঁকে নিজেদের চিত্তে স্থান দেবে কি না, সেই হল তাঁর সন্দেহ। সংকীর্ণ স্থান তো তিনি চাননি মানবের মধ্যে, জয়ের মালাতেও ছিল না লোভ, চেয়েছেন তাদের বরণমালা, সে-মালা সমস্ত কালের সমস্ত মানুষের অন্তরের। তাই তিনি নিজের অসম্পূর্ণতা নিজেই স্বীকার করে বলে গেলেন "জীবনে জীবন যোগ করা,"—সে শুধু একার সাধনায় হয় না, মহামানব-মিলনের সাধনাতে চাই সমস্ত মানবের সহযোগিতা:

"তোমরাও যোগ দিও জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে।"

এ শুধু রবীন্দ্রনাথের একার আহ্বান নয়, রবীন্দ্র-বাণীতে সংহত হয়ে বেজে উঠেছে সমস্ত মৃত্যুঞ্জয় মহাপুরুষের উদাত্ত আহ্বান,—তাঁদের বিশ্বমানব সাধনায় সমস্ত মানবকে যোগ দিতে হবে। এই বিশেষ সুরটি সুস্পষ্ট হয়ে বেজে উঠেছে বর্তমান কালেরই আবহাওয়ায়। শুধু রাষ্ট্রের একীকরণের প্রস্তাবে নয়, আর্থিক অবস্থার সমন্বয়ের দাবিতে নয়, সাহিত্যে ধর্মে সর্ব ক্ষেত্রে বৈষম্যের নানা সীমার মধ্যে মিলনের নিগূঢ় সূত্রটি আবিষ্কার করার কাজই চলেছে নানা বাধা-বিপত্তি ঠেলে ঠেলে।

মহাভারতে একটি গল্প আছে। ক্ষত্রিয়-সন্তান বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন,—ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা চাই। কী সে আশ্চর্য তপশ্চর্যা, উচ্চতর আত্মপ্রকাশের কী প্রচেষ্টা! বিশ্বামিত্র সেদিনই পুনর্জন্ম লাভ করলেন, যেদিন তাঁর অহমিকা ঘুচল, যেদিন আত্মবোধের মধ্যে তিনি পরম সত্যকে পেলেন। তখন কে তাঁকে অস্বীকার করবে, কে ঘুচাবে তাঁর ব্রাহ্মণত্ব! মানুষের সাধারণ জন্মের সঙ্গে দ্বিজত্বের অর্থাৎ মহত্তর জন্মের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ আখ্যানের মধ্যে সে-জিনিসটিই ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

বিশ্বামিত্রগণ অহং জ্ঞানের তেজে জৈবিক জন্মের অবস্থায় সুখী থাকতে পারেন না, তাঁদের কেবলই চেষ্টা বড়ো হবার দিকে, তাঁদের মন কেবলই বলে—আরো চাই। মানুষের স্বাভাবিক বাধায় তাঁরা তাঁদের অহং ত্যাগ করতে পারেন না, লোভে-মোহে তাঁদের জড়িয়ে ধরে। ক্ষমা এবং নম্রতার সিদ্ধির দ্বারা ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য আর লাভ হয় না। তবু তার মধ্যেও দেখা যায় কখন্ এক-এক জন মানুষ এই জন্মেই আর এক জন্ম অর্থাৎ দ্বিজত্ব লাভ করতে সমর্থ হন, সবার সঙ্গে একাত্মতার আস্বাদনে তাঁরা পান মুক্তির আনন্দ। যুগ-যুগে সেই লোকোত্তর পুরুষদের আগমন হয়েছে। কিন্তু দিনে-দিনে দেখা গেল সেই ব্যক্তিবিশেষের প্রকাশ মানব-জীবনে সম্পূর্ণ মূল্য পেল না।

খৃষ্টের সাধনাকে বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব লাভকে মানুষ তাদের সমবেত জীবনের অনুন্নত বৈষম্যে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। অবশেষে ধীরে ধীরে সে আজ বুঝতে পারছে এককের দ্বিজত্ব-লাভে নয়, সমস্ত মানবের দ্বিজত্ব-লাভেই মানব জাতির নব জন্ম, "মানব-অভ্যুদয়" হবে বিশ্বে। কিন্তু মানুষের এই ঐক্য-চেতনার অগ্রগতির মুখেই মানুষের যত অসত্য উগ্র হয়ে উঠে পদে-পদে যত বিপর্যয় বাধিয়ে তুলছে। তার কামান গর্জাচ্ছে, তার পালিশ নষ্ট হয়ে হিংস্রতা বেরিয়ে পড়ছে উৎকট রূপ নিয়ে; তার রক্ত নাচছে মরণ-যজ্ঞে আহুতি হ'তে। কিন্তু সেই কামান-গর্জন শুনে কবি বলে গেলেন ঐ কামান গর্জন জঞ্জাল নয়, সে নবজন্মের আগমনী ডঙ্কা, দিন বদল হচ্ছে—

"দামামা ঐ বাজে
দিন-বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
পালিশ করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি।"

বললেন—
"অসন্তুষ্ট বিধাতার
ওরা দূত বুঝি
শত শত বর্ষের পাপের পুঁজি
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ-যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বী বেশে
চিতা ভস্ম শয্যাতলে এসে
নব-সৃষ্টি ধ্যানের আসনে,
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।"

ইতিহাসের বাঁকে-বাঁকে মানুষের আছে লোকোত্তর মহামানবদের দানের অমূল্য সম্বল;—সে মানব জাতি কখনো নিঃস্ব নয়, কোনো মতেই তার বিশ্বাস হারাবার কারণ নেই। এক-একটা যুগ-বিপর্যয়ের সীমা থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ দেখবে,—এক-এক বার যুদ্ধাবসানে তাদের মনে আরো অধিক মানুষের আসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, মহাপুরুষদের সাধনা ধাপে-ধাপে সফল হতে চলেছে। কবি বলে গেছেন—

"নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বার বার কেঁপে
যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদের নিত্য পরিচয়।"

যুগগুরু রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি এক সময় জনসমাজের এক অংশের চিত্তবিক্ষোভ কবি অনুমান করেছিলেন; তখনই এ কবিতাটি লেখা হয়। কিন্তু এর মধ্যে শাশ্বত সুরটি ধ্বনিত হয়ে উঠতে দেখে তিনি এইটিকে জন্মদিনের কাব্য-অর্ঘ্যে ধরে দিলেন 'জন্মদিনে' গ্রন্থে।

আজ আমরা যারা এ কাব্য পড়ছি, নানা দুঃখে চিত্তবিপর্যয়ে আমাদের জীবনের ভিত্তি সত্যই গেছে কেঁপে, আমরা আজ অন্যমনা।—এ-সময়ে কবির কথা শোনবার ধৈর্য আছে কি না সন্দেহ। তবু যখন তাঁর জন্মদিন এল, ঘাটে-ঘাটে ঘট ভরে উঠেছে দেখতে পাই—মঙ্গল-শঙ্খে সাড়া বাজল বিচ্ছেদের নয়, নির্বাণের নয়, অপরিচয়ের নয়—সাড়া বাজল একটি সৃজনশীল পরম ঐক্যের,—প্রাণের সুগভীরেও যার ধারা ফল্গুর মতো অদৃশ্য হয়ে প্রবাহিত;—তখন সবার আগে এই কথাটিই আবার মনে পড়ছে—মৃত্যুঞ্জয়দের মাঝে আমাদের যে নিত্য পরিচয় রয়েছে,—নানা দুঃখের ভিতর দিয়ে চিত্তবিক্ষেপের মধ্যেও আমাদের সাধারণ সকল মানুষের মাঝেও যেন সেই পরিচয় ফুটে ওঠে; চিন্তায় কথায় কাজে এই ভাবেই জন-জীবনের প্রতিটি ব্যক্তি আমরা তাঁদের জীবনকে আমাদের জীবনে ফুটিয়ে তুলব। তাঁদের জন্মদিনকে আমাদের প্রতিদিনের মধ্যে নূতন যুগের বৈশিষ্ট্যে সমন্বিত ক'রে মানব-ধারাকে মহোজ্জ্বল অক্ষয় পথে অগ্রসর করে চলব।

১৯২২ সন। মহাত্মাজী তখন কারারুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-ভারত ঘুরে দেখতে বেরিয়েছেন, সাবরমতি আশ্রমে গেলেন এবং মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে তাঁর আশ্রমবাসীদের উৎসাহ

য় এলেন। সেদিনকার ভাষণে ঠিক এই কথাই তাঁর কাছ কে শোনা গিয়েছিল:—"পশুর সহিত এই যে পার্থিব জীবন মরা যাপন করি, এই জড় জগতই কেবল জগৎ নহে, কিন্তু মাদের মধ্যে ইহাপেক্ষা আরও উচ্চতর যে-জীবন লুক্কায়িত আছে, ই জীবনের জন্য আরও উচ্চতর জগতের প্রয়োজন। আমাদের ই লুক্কায়িত জীবন অবিনশ্বর—অমর অক্ষয় ও অব্যয়। যে ব্যক্তি ই জড় জগতের স্বার্থকে জয় করিতে পারিয়াছে কেবল সেই ই ই অমর জীবন উপভোগ করিতে পারে। প্রত্যেক মানুষকে বজ' হইতে হইবে, একবার দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, াবার সত্যের আলোক লইয়া অমর জীবনের সন্ধান পাইয়া নূতন ন্ম লাভ করিতে হইবে। যাহারা আপনার মধ্যে অসীমকে ভোগ রিতে পারে—তাহারাই অমর হয়।" *

ফেষ্টিভ্যাল্ অব বৃটেন

শ্রীমতী শান্তি বসু

অনেকেই হয়ত শুনেছেন যে, এ বছর গ্রেট বৃটেনে Festival of Britain উৎসব হচ্ছে। Festival কথাটা চির-পরিচিত, কিন্তু Festival of Britain নামটিতে নূতনত্ব আছে না? নূতনত্ব তো থাকবেই, কেন না ঠিক এ ধরণের উৎসব পূর্ব্বে কোথাও হয়নি। 'বৃটেনের মহোৎসব' অভূতপূর্ব, অভিনব এর বিশেষত্ব। সারা দেশব্যাপী এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে যে, এটি একটি প্রচারমূলক উৎসব। অর্থাৎ কি না সকলের চিরপরিচিত ধর্ম্মসংক্রান্ত বা আনুষ্ঠানিক উৎসব নয় এটি। এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে বৃটেন আপনাকে প্রতিবিম্বিত করে তুলে ধরবে অপরের সামনে। এরূপ প্রচার করতে গেলে প্রচারের বিষয় হয় অসংখ্য, আর প্রচারের পন্থাও হয়ে যায় অনেক রকম। এই উৎসব তাই হয়েছে জটিল ও বহুমুখী। এর স্বরূপ বর্ণনা করা স্বল্প পরিসরে সম্ভবপর নয়। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি, তার থেকে বিষয়টা অনেকটা স্পষ্ট হবে। আমরা জানি যে, প্রদর্শনী (exhibition) হচ্ছে প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। লণ্ডনের টেমস্ নদীস্থিত The South Bank Exhibition হচ্ছে এই উৎসবের কেন্দ্রস্থল। সাড়ে ২৭ একর-জমির উপর উদ্যান, ফোয়ারা ও গাছপালার মধ্যে স্থান পেয়েছে এই বিরাট প্রদর্শনী। দূর থেকে দেখ্‌লে বোঝা যায় যে টেমস্ কি ভাবে প্রাণবন্ত করেছে প্রদর্শনীটিকে। জমির আয়তন শুনে মনে হয় না প্রকাণ্ড, কিন্তু কর্তৃপক্ষ বলছেন যে, দ্রষ্টব্য বিষয় এত অধিক যে সম্পূর্ণ এক দিনের কমে কেউ-ই ভাল ভাবে দেখে শেষ করতে পারবে না এটিকে। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বিজ্ঞান, আবিষ্কার ও technologyতে বৃটেন কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং সে জগতকে এ সব ক্ষেত্রে কি দান করেছে তা দেখানো, আর দেখানো বৃটিশ জাতির ইতিহাস ও তাদের স্বরূপ। প্রদর্শনীটি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়েছে—বৃটেন দেশটি, বৃটেনের অধিবাসী ও আবিষ্কার। প্রথম দু'টি বিভাগ আবার অনেকগুলি Pavilionএ বিভক্ত। এদের কতকগুলির নাম শুনলেই আমরা প্রদর্শনীটির বিরাট ব্যাপকতা এবং বৈচিত্র্য উপলব্ধি করতে পারি—The Natural Scene Pavilion; The Country Pavilion, Minerals of Island; Power and Production; Seas and Ships; Homes and Gardens; Sports ইত্যাদি। The Lion and the Unicorn Pavilionএ প্রদর্শিত হবে 'বৃটিশ চরিত্রের স্বরূপ'। বৃটিশ জাতির উৎপত্তি কি ভাগে হোল, তাদের পূর্বপুরুষ কে আর তারা কি ভাবে জীবনযাপন করত?—এই প্রশ্নের উত্তর দেবে The People of Britain Pavilion।

প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ কিন্তু তৃতীয় বিভাগটি, যার নাম হোল The Dome of Discovery, এটি এলুমিনিয়াম নির্মিত প্রকাণ্ড একটি গম্বুজ—পৃথিবীর সর্ববৃহৎ। এর তলায় চিত্রিত হবে জলীয়, স্থলীয়, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি আবিষ্কার কাহিনী। কুক, লিভিংষ্টোন প্রভৃতি ভ্রমণকারী এবং নিউটন থেকে রাদারফোর্ড পর্য্যন্ত সকল বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের কাহিনী দেখাবে এ সকল ক্ষেত্রে বৃটেনের অবদান। প্রদর্শনীতে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি অদ্ভুত জিনিষ। এটি চুরুটাকৃতি বিশিষ্ট প্রকাণ্ড বড় একটি পদার্থ, মনে হয় যেন শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। এটি যে কি দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত তা আমি জানি না, এর নাম দেওয়া হয়েছে The Skylon। প্রদর্শনীতে পাওয়া যাবে Telecinema নামক একটি নূতন জিনিষ। Televisionকে সিনেমায় রূপান্তরিত করে দর্শকদের দেখানো হচ্ছে এই সর্বপ্রথম।

লণ্ডনের Battersea Parkএ একটি প্রকাণ্ড প্রমোদ উদ্যান খোলা হবে। মে মাসের শেষের দিকে রাজকুমারী মার্গারেট এই প্রমোদ উদ্যানের উদ্বোধন করবেন। এখানে শুধু শিশুরাই আনন্দ পাবে না, সব বয়সের ব্যক্তিরাই পারবে উপভোগ করতে এর বিচিত্র আনন্দ-সম্ভার। ৩৭ একরব্যাপী এই উদ্যানে থাকবে বিভিন্ন Pavilion, Arcade, Tower, প্যাগোডা, নাট্যশালা, পুষ্করিণী, ঝর্ণা ইত্যাদি। এ ছাড়া Merry-go-round, বৈদ্যুতিক গাড়ী জাতীয় জিনিষ তো থাকবেই। সন্ধ্যা বেলায় যখন এই উদ্যান আধুনিকতম উপায়ে বৈদ্যুতিক আলোকে floodlit করা হবে ও সব ঝর্ণার জল রামধনু-ধারার মত বার হবে, তখন এই উদ্যানকে পরীদের দেশ বলে মনে হবে। চীনা ড্রাগন, পরীদের বাড়ী প্রভৃতি রূপকথা-পঠিত দ্রব্যাদি আলোকিত করা হবে ও রাত্রে বহু রকম বাজী পোড়ান হবে। অনেক সুসজ্জিত দোকানও থাকবে এর ভিতরে। শিশুদের জন্য একটি বিশেষ বিভাগে থাকবে Peter Pan রেলওয়ে নামক ছোট একটি রেলপথ, নৌকা চালাবার ছোট পুকুর, ছোট একটি চিড়িয়াখানা, ছোটদের নাট্যশালা প্রভৃতি।

লণ্ডনের অন্যান্য আকর্ষণ হচ্ছে উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ২৪০টি কনসার্ট, অসংখ্য থিয়েটার, অপেরা ও ব্যালে। এ সবের জন্য বহু বিখ্যাত শিল্পীর সমাবেশ হয়েছে লণ্ডনে। এরূপ সমাবেশ না কি পূর্বে কোথাও হয়নি। এই সংগে চল্লিশটি কলা-প্রদর্শনী (Art Exhibition) দেখানো হবে। Poplar নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড স্থাপত্য শিল্প-প্রদর্শনী হবে। স্থাপত্য প্রদর্শনের উপায়টা অভিনব। একটি ছোট-খাট অসমাপ্ত সহরের বিভিন্ন

* রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ।

আকার ও প্রকারের গৃহাদি নানাপ্রকার স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ থাকবে। সহরটি কিন্তু আসল সহর নয়, model সহর, আর এটি অসমাপ্ত রাখা হয়েছে, উৎসবকালে এটি অল্প অল্প করে সমাপ্ত করা হবে, যার ফলে দর্শকেরা এদের স্থাপত্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে। লণ্ডনে সরকারী প্রদর্শনী এ ছাড়া আরও দু'টো হবে; যথা—পুস্তক প্রদর্শনী ও কেন্‌সিংটনের বিজ্ঞান প্রদর্শনী। পুস্তক প্রদর্শনীতে থাকবে চসার থেকে ইলিয়ট পর্য্যন্ত বিখ্যাত লেখকদের বাছাই-করা পুস্তক। বিজ্ঞান প্রদর্শনীটি চমৎকার। বিজ্ঞানের কঠিন ও স্বতন্ত্র ভাষার জন্য জনসাধারণ তাকে এড়িয়ে চলে, এখানে না কি সে বাধা দূর করা হয়েছে।

এত প্রদর্শনীর নাম দিলাম, তবুও কেবল মাত্র লণ্ডনেরই তালিকা শেষ হোল না! সারা দেশে তাহলে যে কি বিরাট আয়োজন হয়েছে তা সহজে অনুমেয়। লণ্ডন ছাড়া আরও তিনটি প্রধান সহরে প্রদর্শনী হবে। গ্লাসগোতে হবে Exhibition of Industrial Power, এডিনবরাতে Exhibition of Scottish Architecture and Traditional Crafts, এবং বেলফাষ্টে হবে Ulster Farm and Factory Exhibition। কলা উৎসব হবে বাথ, কেম্‌ব্রিজ, অক্সফোর্ড, ইয়র্ক, ক্যাণ্টারবেরী ইত্যাদি তেইশটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সহরে। এই সকল কলা উৎসব হবে স্থানানুযায়ী বিভিন্ন প্রকৃতির। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎসব সমূহের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হবে প্রত্যেক স্থানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট। দু'টো প্রদর্শনী হবে ভ্রাম্যমান। এর মধ্যে একটি জলপথে ঘুরে বেড়াবে বৃটেনের সব প্রধান বন্দরে। এই প্রদর্শনীটি স্থান পেয়েছে Festival Ship "Campania"তে।

এই সব তো হোল সরকারী বা বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উৎসব পালন। এই সব বৃটেনের পার্থিব উন্নতি দেখাবার প্রয়াস পাবে। কিন্তু শুধু এই দিকটা হোল একটা জাতির অসম্পূর্ণ ছবি। একটি জাতির স্বরূপ ও ইতিহাসকে সর্বাপেক্ষা প্রাণ দিতে পারবে স্বয়ং সেই জাতিই। তাই বৃটেনের জনসাধারণ এগিয়ে এসেছে এ ভার নিতে। শত শত গ্রাম ও সহরে নানা প্রকার উৎসবের মধ্যে পাওয়া যাবে ইংরাজ জাতির পরিচয়। গ্রাম্য নৃত্য-গীত, কার্ণিভাল, হাট-বাজার, পুষ্প-প্রদর্শনী, অসংখ্য প্রকার খেলা ধূলার মধ্য দিয়ে বৃটিশ জাতি জগতকে জানাবে তার রীতি-নীতি, আদর্শ ও চরিত্র এবং তার নিজস্ব জীবনযাত্রা-প্রণালী। জগতের সামনে বৃটেন খুলে ধরবে তার প্রাকৃতিক শোভা, তার ইতিহাস। জগৎ দেখতে পাবে কর্মরত ও ক্রীড়ারত বৃটেনকে।

এই উৎসব উপলক্ষে বৃটেনে আসছে একটি বিরাট দর্শকমণ্ডলী। ইউরোপবাসী তো আসছেই; আমেরিকা, সুদূর অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড, আমাদের ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ থেকেও আসছে বহু জন। উৎসব কালে লণ্ডনে বোধ হয় সব জাতির ও সব দেশের লোক দেখতে পাওয়া যাবে। এরা উৎসব-যোগদানকারী, অনেকেই ছড়িয়ে যাবে অর্থ। সরকার তো লাভ করবেই, তা ছাড়া দোকানদার, হোটেলের মালিক ইত্যাদি ব্যবসায়ীরা লুটবে অর্থ দু'হাতে।

আর একটা প্রশ্ন হয়ত জাগতে পারে। সেটা হচ্ছে পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে উৎসব পালন কিছুটা অশোভন দেখায়। সে জন্য ঠিক এই সময়ে কেন এই উৎসবটা হচ্ছে? এ প্রশ্নের একটা উত্তর হচ্ছে যে, ঠিক একশত বর্ষ পূর্বে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে এক উৎসব হয়, তারই শতবার্ষিকী হিসাবে বর্ত্তমান উৎসব। এই হোল সময় নির্দ্ধারণের কারণ। কিন্তু এই উৎসবের সঙ্গে শতবর্ষ পূর্বের The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nation নামক প্রদর্শনীর তুলনা করা যেতে পারে না। পূর্বের উৎসবটি কেবল মাত্র লণ্ডনে হয় এবং উপরোক্ত প্রদর্শনীটি ছিল তার প্রধান এবং প্রায় একমাত্র আকর্ষণ। বর্ত্তমান প্রদর্শনীর ছায়া মাত্র ছিল এটি।

উৎসব পালনের কিন্তু আরও উদ্দেশ্য আছে। লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময়ে সেণ্ট্ পল গির্জা থেকে রাজা ষষ্ঠ জর্জ এই মহোৎসবের উদ্বোধন করলেন। এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি উৎসব সম্বন্ধে তাঁর নিজের ও সমস্ত বৃটিশ জাতির মতামত প্রকাশ করলেন। তিনি এই মর্মে বললেন যে বৃটেনের মহোৎসব বৃটিশ জাতির অক্ষুণ্ণ প্রাণশক্তি ও সাহসের প্রকাশ্য চিহ্নরূপ। উৎসবে অঙ্কিত অতীতের কীর্তি সকল বৃটেনকে অগ্রগামী হবার প্রেরণা দেবে। জগতের বর্ত্তমান দুর্য্যোগময় পরিস্থিতিতে আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এই প্রচেষ্টা, যেখানে যুদ্ধ-প্রস্তুতির সঙ্কীর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে প্রচারিত হবে শিল্প ও সৌন্দর্য্যের জয়গান।

অ্যাটম্ বোমার দেশে

[পূর্বানুবৃত্তি]

অমিতা দত্ত-মজুমদার

ওয়াশিংটনে

নতুন জগতে এসে পড়েছি। এই জগতকে শুধু বিস্মিত দুই চোখ মেলে দেখলেই হবে না, এর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে; এখানে সহজ ভাবে চলে-ফিরে বেড়ানো অভ্যাস করতে হবে। পরের দিন শনিবার; সকাল সাড়ে ৮টায় ক্লাস নিতে হবে, তাই ৮টাতেই বেরিয়ে পড়েন উনি, দুপুরে লাঞ্চের পর আমরা বেড়াব ঠিক হোলো। প্রথমে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমরা Dupont Circleএ গেলাম বাসে চড়ে। বাস আমাদের বাড়ী থেকে একটু দূরে। পথে বেরিয়ে দিনের আলোয় চারি দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। সহরটা পাহাড়ে জায়গার উপরে; কাজেই সুন্দর পীচঢালা প্রশস্ত রাস্তাগুলো উঁচু-নীচু হয়ে এগিয়ে চলেছে। গাছ দু'ধারে সারি সারি রয়েছে, কিন্তু সব পত্রহীন। শরতে এ সব দেশে গাছের পাতা ঝরতে শুরু করে, শরৎকে তাই এ দেশে বলে Fall. এখন সেই পাতা-ঝরার পালা সম্পূর্ণ হয়েছে। গাছের তলা, রাস্তার দু'পাশ শুষ্ক পত্রের স্তূপে পরিপূর্ণ। এ দেশের রোদ দেখেও মনটা প্রসন্ন হয় না, মনে হয় এইটুকু রোদ নিয়ে এরা বাঁচে কি করে। কোন্ আধুনিক বাঙালী কবি না কি "মরা চাঁদের" সম্বন্ধে কবিতা লিখেছিলেন; আমারও এ দেশের রোদকে মরা-রোদ বলতেই ইচ্ছে করছে—মৃতদেহের মত ম্লান। আমার সোনার দেশের সোনার রোদের জন্য মনটা ব্যাকুল হয়েছে।

বাসে উঠবার আগেই লক্ষ্য করলাম এ দেশের বাসগুলো খুব বড় বড়, কলকাতার বাসের দ্বিগুণ লম্বা। ভ্যাকুয়াম্ ব্রেকের তীব্র

শব্দে পথিককে সচকিত করে বাস-ষ্টপে এসে বাস থামল। উঠে দেখলাম, এত বড় বাসের টিকিট দেওয়া ও গাড়ী চালানো দুই কাজ একই লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মানুষী-শক্তি বা man power এদেশে মহার্ঘ্য, তাই খুব বুঝে-সুঝে খরচ করা হয়। মস্ত বড় বাসে দু'টো দরজা; ওঠবার নিয়ম সামনের দরজা দিয়ে, নামবার সময়ে যে দরজাটা কাছে পড়ে সে দরজা দিয়েই নামা যায়। ড্রাইভারের আসনের বিপরীত দিকে উঠবার দরজা; উঠেই সামনে পড়ে ড্রাইভারের হাতের কাছে রক্ষিত ফুটোওয়ালা কাচের বাক্স; যাত্রীরা উঠেই তাতে নির্দিষ্ট মূল্যের মুদ্রা ফেলে দেয় বা সাপ্তাহিক পাস্ দেখায়। মুদ্রার পরিবর্তে ড্রাইভার টিকিট দেয় না। তবে যদি কিছু পথ এই বাসে গিয়ে আবার একই অভিমুখে অথচ ভিন্ন রাস্তার বাসে ওঠবার উদ্দেশ্য কারো থাকে তবে সে ট্রান্সফার টিকিট চেয়ে নেয়। এই টিকিটের থাক্ ড্রাইভারের সামনে বাসের গায়ে আটকানো রয়েছে; স্থানত্যাগ না করে, এমন কি এক হাত steering wheel থেকে না সরিয়েই সে এই টিকিট দেওয়ার কাজটি সারতে পারে। এই ট্রান্সফার টিকিট দ্বিতীয় বার বা তৃতীয় বারও কাজে লাগানো যায়। শীতের দেশ—তাই বাসের জানলাগুলো ডবল কাচের কপাট দিয়ে বন্ধ, দরজাও বাস চলবার সময়ে বন্ধ থাকে এবং ভিতরে heater চলে সারাক্ষণ। দরজাগুলো যান্ত্রিক উপায়ে খোলে ও বন্ধ হয়, তার হাতল ড্রাইভারের হাতের কাছে। বাস থামিয়ে সে দরজা খুলে দেয় এবং সকল যাত্রীর ওঠা-নামা শেষ হলে দরজা বন্ধ ক'রে তার পর গাড়ী ছাড়ে। বাস-ষ্টপে যদি বেশী লোক-সমাগম হয়, যাত্রীরা আপনা থেকেই লাইন করে দাঁড়িয়ে যায়, ঠেলাঠেলি করে ওঠবার ধারা এ দেশে নেই। যদি উঠে দেখা যায় যে বসবার জায়গা নেই, তবে যত দূর সম্ভব পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় যাতে দরজার সামনে ভীড় না জমে। ড্রাইভার বসে বসেই এ সব লক্ষ্য করে তার সামনের আয়নাতে। যদি দরজা পর্য্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে যায়, অতি ভদ্র ভাবে ড্রাইভার তাদের পিছনে এগিয়ে যাবার জন্ত অনুরোধ করে।

সহরটি সুবিস্তৃত। তাই North-West, South-East প্রভৃতি ভাগে মোটামুটি প্রথমে বিভাগ করা হয়েছে। তার পর বিভিন্ন পাড়ার নাম আছে। আমরা North-West ভাগে বাস করছি। এই অংশে Dupont Circle একটি দোকান-বাজার-বহুল পাড়া; সেখানে আমরা প্রথমে নামলাম। একটি রেস্তোরাঁতে মাধ্যাহ্নিক আহার সমাপ্ত করে অল্পক্ষণ ঘুরেই ফিরে যেতে হোলো। তিনটে নাগাদ উনি Universityতে নেমে গেলেন, কাজ ছিল কিছু; আমি আমাদের আস্তানায় ফিরে এলাম। কথা রইল যে Dupont Circleএর কাছেই এক জায়গায় আবার ৫টার সময়ে আমি আসব, উনিও তখন সেখানে থাকবেন। কাছেই এক সীরীয়ান্ রেস্তোরাঁয় ওয়াশিংটনবাসী ভারতীয়দের এক সান্ধ্য-সম্মেলন হবে আজ; আমরাও সেখানে যাব। দেশ ছেড়ে এসে দেশের লোকের সঙ্গে মেলবার আগ্রহ খুব ছিল। সন্ধ্যা বেলা সেখানে যাঁদের সঙ্গে দেখা হোলো, তাঁদের মধ্যে জন কয়েক মহিলাও ছিলেন; এক জনের নাম উল্লেখযোগ্য,—স্বনামখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ জ্ঞানচাঁদের পত্নী। ডাঃ জ্ঞানচাঁদ এখানে আন্তর্জাতিক মনিটারী ব্যাঙ্কের ভারতীয় প্রতিনিধি। ভদ্রলোকদের মধ্যে দু'জন বাঙালীও ছিলেন। এঁরাও কেউ এম্ব্যাসিতে আছেন, কেউ বা অন্ত কোনো আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের ভারতীয় প্রতিনিধি বা কর্মচারী।

পরের দিন রবিবার, ছুটির দিন। আমরা সহর দেখতে বেরোলাম। প্রথমে গেলাম ক্যাপিটল দেখতে। এই বৃহৎ ও জমকালো প্রাসাদটিতে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট ও হাউস্ অব্ রিপ্রেজেণ্টেটিভস্-এর অধিবেশন হয়। অনেক বড় বড় ঘর সুন্দর করে সাজানো রয়েছে, এ দেশের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নানা ব্যক্তির মূর্ত্তি, ছবি ইত্যাদি আছে। সে সব দ্রষ্টব্য সুচারুরূপে দেখাবারও বন্দোবস্ত আছে। ক্যাপিটলের প্রবেশ-মুখের রোটেণ্ডাম্ বা গোল ঘরটিতে ঢুকেই খোঁজ-খবর নিতে নিতে জানা গেল যে, প্রতি পনেরো মিনিট পরে পরেই এখান থেকে একেকটি guided tour রওনা হয়। দশ সেণ্ট্ (প্রায় পাঁচ আনা) দিয়ে টিকিট কিনে আমরা ১০।১৫ জন এক গাইডের অনুবর্ত্তী হলাম। যুবক গাইডটি বেশ সুরসিক ও সুবক্তা ছিল। সে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রোটেণ্ডামের ছাদের গম্বুজে ও দেওয়ালে যে-সব ছবি আঁকা আছে তার দিকে। সেগুলো সব চমৎকার ফ্রেস্কো পেণ্টিং। গম্বুজের কাচের উপরকার ছবিগুলো রঙীন, যে ধরণের ফ্রেস্কো ছবি আমরা দেশে,—শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায়—দেখেছি তেমনি। কিন্তু দেওয়ালের গায়ের ছবিগুলো দেখে খোদাই করা বলে মনে হয়—সে-ও না কি ফ্রেস্কোই। বার্মিডি নামক এক বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা এই সব ছবি। ভিতরেও নানা জায়গায় তাঁর আঁকা ছবি দেখলাম।

প্রথমে যে ঘরে সেনেটের বা হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্-এর সভা হোতো, আজকাল সভ্য-সংখ্যা বাড়াতে সেখানে আর হয় না; অন্ত বড় কক্ষে হয়। পুরানো সভাগৃহগুলোও দর্শকদের জন্য সাজানো আছে। House of Representatives-এর পুরানো সভা-কক্ষটি আসবাবহীন; একে বলা হোতো Hall of Whispers. কেন বলা হোতো গাইড তা আমাদের বুঝিয়ে দিল। হলটার এক ধারে মেঝের উপরে এক জায়গায় একটি পিতলের চাক্তী বসানো রয়েছে। এই চাক্তীটির উপরের জায়গাটিতে থাকতো তদানীন্তন দলনেতা কুইন্সী অ্যাডাম্সের ডেস্ক। এই ঘরটির গঠন-প্রণালীর মধ্যে এমন দোষ ছিল যে, ঘরের মধ্যে কোনো জায়গায় ফিস্-ফিস্ করে কথা বললেও এই জায়গাটি থেকে তার প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট শোনা যেত, এখনো যায়। আমাদের সবাইকে সেই চাকতীর চারি পাশে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলে সে চলে গেল খানিকটা দূরে। প্রায় ১৪।১৫ হাত দূরে গিয়ে মাথা হেঁট করে চাপা-গলায় সে কথা বলতে সুরু করল। আশ্চর্য্য, সেই কথার প্রত্যেকটি শব্দ যেন বেতারে করে আমাদের কানে তেমনি মৃদুস্বরে পৌঁছতে লাগলো। বিভিন্ন দলের গোপন পরামর্শ সব প্রকাশ হয়ে পড়ে বলে এই সভাগৃহ অবশেষে পরিত্যক্ত হয়। নূতন সভাগৃহে যে-কোনো আইন পরিষদের মতো করে আসন ও ডেস্ক সাজানো। গাইড আমাদের এক গ্যালারীতে দাঁড়াতে বলে নীচে নেমে গেল এবং সভাতলে কোথায় কে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন তা নিজে ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলো। যুবকটির বাচনভঙ্গী সুন্দর, উচ্চারণও স্পষ্ট। আমেরিকানদের উচ্চারণ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবেই ভয় ছিল, কিন্তু

কার্য্যকালে খুব বেশী মুস্কিলে কখনো পড়তে হয়নি। Senate ও House of Representatives এর বর্ত্তমান সভাগৃহ দু'টি ধ্বংসে পড়বার উপক্রম হয়েছিল বলে steel frame structure দিয়ে ঠেকো দেওয়া আছে। প্রথমে কক্ষ মধ্যে ঢুকেই তা নজরে পড়ে এবং অত্যন্ত কুৎসিত মনে হয়। জানতে পারা গেল যে, এটাকে সুশ্রী করে মেরামতের কোনো উপায়ই নেই।

এর পর President's room বলে একটা ঘর দেখাতে নিয়ে গেল, সে ঘরে সোনা-রূপার ছড়াছড়ি। একটা বাতির ঝাড় আছে, তার ঝাড় এবং উপরকার কারুকার্য্য সমস্তই খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী—একেবারে ২৪ ক্যারেট সোনার। দেওয়ালে বড় বড় আয়না রয়েছে, তারও ফ্রেম সোনা দিয়ে বাঁধানো। সোনায় চোখ ঝল্‌সে যায়। মনে হয় আগে ছিল সোনার বাংলা, সোনার ভারত, এখন সোনার ভারতের সোনা শুধু তার সোনালী রোদটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ; আসল সোনা সব এই দেশে। আমাদের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশ থেকে এসে এ দেশের প্রাচুর্য্য দেখে অবাক্ হতে হয়। সেই সঙ্গে যখন অপচয়ও দেখি তখন কষ্ট হয়। আমরা প্রথমে এসে যখন হোটেলে খেতাম তখন খাদ্যের সঙ্গে যে পরিমাণ rolls বা রুটি দিত তা খেয়ে শেষ করতে পারতাম না; এবং সেগুলো পরিবেষণকারিণীরা এঁটো বাসনের সঙ্গেই নিয়ে যেত। কয়েক দিনের মধ্যেই অবশ্য প্রেসিডেন্টের মিতাচারী হওয়ার আদেশ প্রচারিত হওয়ায় রুটির অপচয় বন্ধ হোলো। ক্যাপিটলের আরো নানা কক্ষ ঘুরে ঘুরে আমরা দেখলাম। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রোটেণ্ডামের নীচের তলাকার Crypt নামক নামক গৃহ। এখানে এ দেশের নারী-আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়া তিনটি মহিলার মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে; এঁদের নাম লুক্রেশিয়া মট্, সুসান বি, এ্যান্টনী ও আনা ডিভেন্‌সন্।

ঘণ্টা দুই ঘুরে ক্যাপিটল্ দেখা শেষ করে আমরা ইউনিয়ন ষ্টেশনে গেলাম—বড়দিনের ছুটিতে আমরা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যাব, তার জন্য টিকিট করার উদ্দেশ্যে। সেখানে 'কিউ' এত লম্বা যে, ঘণ্টাখানেক কাটলো টিকিট কেনার ব্যাপারে। অথচ আশ্চর্য নীরবতা। প্রকাণ্ড ওয়েটিং-রুম, কত লোক—মেয়ে এবং পুরুষ—সারি-সারি বসে রয়েছে; দেওয়ালের ধারে-ধারে কত সুন্দর সুন্দর দোকান নানাবিধ মনোরম দ্রব্যে সাজানো; লোকে ঘোরাঘুরি কেনা-কাটা সবই করছে অথচ গোলমাল নেই। একমাত্র উচ্চকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, লাউডস্পীকারে ট্রেণের ছাড়বার সময় ও তার গন্তব্য ষ্টেশনগুলোর নাম ঘোষণা। ওয়েটিং-রুম থেকে প্ল্যাটফর্ম্মে ঢোকবার জন্য আরেকটি সুপ্রশস্ত কক্ষের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, সে ঘরটির নাম Concourse; এখন এই মস্ত ঘরখানি শূন্য, ট্রেণের সময়ে লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকে। অনেকগুলি প্রবেশ-পথ; প্রতি দরজার মুখে ২৫।৩০ হাত দীর্ঘ কিউ হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলে নিজের নিজের সুটকেশ হাতে করে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করে থাকে কত ক্ষণে একটু-একটু করে এগিয়ে দরজার কাছে পৌঁছবে; কিন্তু এই ভীড়ের সময়েও অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করে। সহস্র লোক-সমাগমের মধ্যেও এই নীরবতা সর্ব্বত্রই আমাকে মুগ্ধ করেছে।

Smithsonian Institution ওয়াশিংটনের একটি বড় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। ইতিহাস, প্রাকৃতবিজ্ঞান, (natural science), নৃতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব—এ সব বিজ্ঞানেরও এখানে গবেষণা হয়; কাজেই সংশ্লিষ্ট যাদুঘর বিশেষ ভাবে সাধারণের দর্শনীয়। সহরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে বিরাট চিড়িয়াখানা আছে সেটিও স্মিথসোনিয়ানেরই অন্তর্ভুক্ত। এর নৃতত্ত্ব বিভাগের ডাঃ উইলিয়াম ফেণ্টনের সঙ্গে আমার পরিচয় হোলো। ওঁর সঙ্গে অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে এঁদের। আমার আসার খবর পেয়ে ফেণ্টন-দম্পতি আমাদের নিয়ে যেতে এলেন। সহরের বাইরে ভার্জিনিয়া ষ্টেটে এঁদের বাড়ী, প্রায় মাইল দশেক দূর। তাঁদের গাড়ীতে সেখানে গেলাম বিকাল বেলা। লম্বা-চওড়া হাসিখুসী মানুষ ডাঃ ফেণ্টন; একটু জোরে কথা বলেন, হো-হো করে প্রাণ-খোলা হাসি হাসেন। দিলদরিয়া মেজাজের লোক। গৃহিণী রোগা ও ফ্যাকাশে চেহারার, চুল বব্-করা নয়, খোঁপা-বাঁধা। চেহারায় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও সহৃদয়তা দুই ফুটে উঠেছে। তিনটি সন্তানের জননী—অল্পক্ষণের আলাপেই বোঝা যায় যে, তারাই তাঁর জীবনের কেন্দ্র। আমরা বাঙালী মায়েরা সন্তানকেই জীবনে সব চেয়ে বড় স্থান দিই; কাজেই তাঁর সঙ্গে বেশ একটি যোগসূত্র পেয়ে গেলাম। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হোলো। বড় দু'টি আমার মেয়েদেরই বয়সী—দশ বছরের ও আট বছরের; ছোটটি মাত্র দু'বছরের। বাড়ীতে দাস-দাসী নেই; গৃহিণীর বিধবা মা আছেন এ-সংসারে। মা ও মেয়ে দু'জনে মিলে সংসারের যাবতীয় কাজ করেন। বড় ছেলে-মেয়ে দু'টি স্কুলে যায়। স্কুল আট মাইল দূরে। বাড়ীতে গাড়ী আছে, ড্রাইভার নেই। মায়েরই কাজ গাড়ী করে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া ও ফিরিয়ে আনা; সেই সঙ্গে হাট-বাজারও করে আনেন। গাড়ী পরিষ্কার করবার জন্যও অন্য লোক নেই, স্বামি-স্ত্রী দু'জনের মধ্যে যে কেউ করেন। রান্না-ঘরের ভার প্রায় সবটাই দিদিমার উপরে। মধুর ও শান্ত স্বভাবের এই বর্ষীয়সীকে দেখে বেশ লাগল। ছোট নাতিটিও অনেক সময়ে তাঁর কাছে থাকে যখন তাঁর মেয়ে বাইরে বেরোন। নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে গৃহকর্ম্মকে এ দেশের লোক সহজ করে নিয়েছে। ভ্যাকুয়াম্ ক্লীনার, গ্যাসের উনুন, অটোম্যাটিক ইস্ত্রী—এ সব ছাড়াও এঁদের বাড়ীতে কাপড়-কাচার বৈদ্যুতিক যন্ত্র দেখলাম। এটির একটু পরিচয় দিই। ষ্ট্যাণ্ডের উপরে একটি বৃহৎ আকারের গামলা, তার মধ্যে প্রকাণ্ড একটি ঘোল-মউনীর মত জিনিস। তার কিনারগুলো ধারালো নয়, চাপ্টা। এ দেশে সর্ব্বত্রই নিত্য-প্রবহমান উষ্ণ জল সুলভ। গরম জলে গামলাটি প্রায় পূর্ণ করে তাতে কুচো সাবান ঢেলে সুইচ টিপে দিলেই সেই বিরাট মন্থনীটি ধীরে ধীরে ঘুরতে আরম্ভ করে। এক মিনিটের মধ্যে গামলার জলে সাবান সুন্দর ভাবে মিশে ফেনায় ভর্ত্তি হয়ে যায়। তখন সুইচ টিপে সেটা থামিয়ে দিয়ে প্রয়োজন মত কাপড়-চোপড় গামলায় ফেলে দিয়ে আবার সুইচ টিপে দিয়ে চলে যাও আধ ঘণ্টা বা কুড়ি মিনিটের জন্য। আস্তে আস্তে গরম সাবান-জলের মধ্যে কাপড়-চোপড়গুলিকে নেড়ে-চেড়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি যা করবে তা ধোপার পাটে আছড়ানোর চেয়ে অনেক ভালো। তার পর এসে গামলা-সংলগ্ন নিংড়োবার যন্ত্র চালিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে একেকটি কাপড়ের

একেক প্রান্ত ধরিয়ে দিলে কাপড়গুলো নিংড়ানো হয়ে গামলার বাইরে অন্য পাত্রে ধীরে ধীরে গিয়ে পড়ে। তার পর জল বেরোবার মুখ খুলে ময়লা জলটা গামলার বাইরে ফেলে দিয়ে আবার পরিষ্কার জল ভরে কাপড়গুলো দরকার মত দ্বিতীয় বার তৃতীয় বার ধোয়া চলে। বৈদ্যুতিক শক্তি এ দেশে খুবই সস্তা, আমাদের দেশের এক-চতুর্থাংশ। অথচ এ দেশের লোকের ক্রয়শক্তি আমাদের দেশের চেয়ে চতুর্গুণ। সুতরাং আনুপাতিক হিসাবে এত সস্তা যে, সর্বসাধারণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করতে পারে। গৃহিণীদের গৃহকর্ম্মও তাই দিন-দিনই সহজ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া এ দেশে বাড়ীর পুরুষেরা গৃহকর্ম্মে সাহায্য করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ডাঃ ফেটন্ বিকেলে কাজ থেকে ফিরে যখন স্নান করেন ছোট ছেলের নিত্য-স্নানও তখন বাপের সঙ্গেই হয়। ছোট বাচ্ছার স্নানের ঝঞ্ঝাট মাকে পোয়াতে হয় না। এ রকম ভাবে যদি বিজ্ঞানের সাহায্য ও বাড়ীর পুরুষদের সজাগ দৃষ্টি থাকে, তবে আমাদের মেয়েরাও ঝি-চাকরের সঙ্গে ঝালাপালা না হয়ে স্বচ্ছন্দে ও সুচারু রূপে গৃহকর্ম্ম করতে পারেন।

ফেন্টন্-পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে অল্পক্ষণেই ভাব হয়ে গেল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা বালসুলভ প্রশ্নে তারা আমায় ব্যস্ত করে তুলল। আস্তে আস্তে তাদের সব কৌতূহল নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তাদের সঙ্গে কথোপকথন থেকে তাদের মায়ের সঙ্গে কথোপকথনে এসে পড়লাম। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁকে মোটামুটি বললাম। এ দেশের মত পাব্লিক এডুকেশনের ব্যবস্থা বৃটিশের আমলে আমাদের দেশে ছিল না; এখন স্বাধীন ভারতে লোকশিক্ষার বৃহৎ আয়োজনের উদ্যোগ-পর্ব্ব আরম্ভ হয়েছে জেনে এই আমেরিকান্ মহিলা খুব আগ্রহান্বিত হলেন। আশ্রম-বিদ্যালয়ের উদ্যোগের কথাই বিশেষ ভাবে বললাম। অ্যামেরিকা যাবার আগে আমি নিজেও এই রকম একটি আশ্রম-বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম শুনে ফেন্টন-গৃহিণী প্রস্তাব করলেন যে, এ দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বরূপ দেখাবার জন্য তিনি এক দিন আমাকে নিয়ে তাঁর ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাবেন। আমি সানন্দে সম্মত হলাম। কথা হোলো, স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে কথা বলে দিন ঠিক করে আমাকে জানাবেন। কথা-বার্ত্তা ও গল্প-সল্পের মধ্যে ক্রমে আহারও সমাপ্ত হোলো। তার পর রাত্রি দশটার পরে আমাদের বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্য এঁরা স্বামি-স্ত্রী দু'জনেই আবার চললেন গাড়ী নিয়ে। বাইরে বেরিয়ে দেখি খুব ঠাণ্ডা। সেদিন সারা দিন টিপ্-টিপ্ করে বৃষ্টি পড়েছিল। রাত্রে পথে বেরিয়ে দেখি, বৃষ্টির জল পথে ও পাশের জমিতে জমে বরফ হয়ে গেছে ও তাতে মসৃণ ও পাতলা একটি আবরণ হয়েছে। এই আবরণ বড়ই পিচ্ছিল, তাই খুব সাবধানে গাড়ী চালাতে হচ্ছিল।

সপ্তাহ খানেক পরে আবার নিমন্ত্রিত হলাম ফেন্টনদের গৃহে। এবার সেখানে আমরা ছাড়া আরো তিন দম্পতি নিমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের পরে আমার পাশে উপবিষ্টা Mrs. Oser নাম্নী মহিলার সঙ্গে বিশেষ করে কথা-বার্ত্তা হোলো। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য খুব ও নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। এক সময়ে কথোপকথনের মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠলেন যে, আমি যেন তাঁকে Mrs. Oser না ডেকে তাঁর নাম ধরে ডাকি। অ্যামেরিকান্‌দের ধরণই এমনি, ভদ্রতার লৌকিকতাকে তারা অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিহার করে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে অভ্যস্ত। কিন্তু বয়সে অনেকটা বড় এক জনকে নাম ধরে ডাকতে আমাদের ভারতীয় সংস্কারে বাধে। আমি শীঘ্রই অলিভ (Mrs. Fenton)এর সঙ্গে বিদ্যালয় দেখতে যাব শুনে গ্রেস্ আমাকে এ দেশের স্কুলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি বুঝিয়ে দিলেন। এ দেশের পাব্লিক স্কুলে মোটামুটি চারটে বিভাগ আছে। প্রথমে নার্সারী স্কুল; এখানে লেখা-পড়া শেখানো হয় না, কেবল শিশুকে কতগুলো অভ্যাস শিক্ষা দেওয়া ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চলা-ফেরা ও থাকা অভ্যাস করানো হয়। তার পর গ্রামার স্কুল; এখানে ছয়টা শ্রেণী, সাধারণতঃ ছয় বৎসর থেকে বারো বৎসর পর্য্যন্ত এখানে কাটে। তার পর হাই স্কুল,—সেখানেও দু'টো ভাগ—জুনিয়ার ও সিনিয়ার। এতে আরো ছয় বৎসর কাটে। সাধারণতঃ আঠার বৎসরে স্কুলের পড়া শেষ হয়। স্কুলের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। অবশ্য স্কুলও দুই রকম আছে —Public School ও Private School। পাব্লিক স্কুলের ব্যয় সরকার বহন করেন এবং সেটাই ছাত্রী ও ছাত্রদের পক্ষে অবৈতনিক। প্রাইভেট স্কুলগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হয় এবং বেশ উঁচু হারেই নেওয়া হয়। স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাশ করাকেও এখানে Graduation বলে। স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট্ হয়ে বেরোবার পরে তিন বৎসরে বি-এ পাশ করা যায়। এম্-এ-র জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন নিয়ম। কোথাও এক বছর, কোথাও দেড় বছর, কোথাও বা দু'বছর লাগে। তার পরে রিসার্চ বা গবেষণার জন্য দু'-তিন বৎসর তো লাগেই। এই হোলো মোটামুটি এ দেশে স্কুল-কলেজের বিভাগ-ব্যবস্থা।

[ক্রমশঃ।

প্রতিবিম্বের ব্যঙ্গরূপ

"এক দিন আমি আমার এক বন্ধুর গৃহে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেলাম আমারই এক ব্যঙ্গরূপ। আমার সঙ্গে অদ্ভুত তার সাদৃশ্য। একান্ত নিষ্ঠুর হ'লেও, কাকে ব্যঙ্গরূপ বলে তার অভিনব নমুনা দেখলাম। আবার দেখলাম সেই ব্যঙ্গরূপ নড়াচড়া করছে। অবশেষে দেখলাম, সেটি কোন মানুষ নয়, একটি আয়না। আর তাতে আমারই প্রতিবিম্ব।"

—জর্জ্জ বার্ণার্ড শ

স্বাধীন ভারতে ইংরেজি শিক্ষার স্থান—৩

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সেদিন এক জন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা। ইনি বুদ্ধিমান, কৃতবিদ্য, কালাপানি পার হইয়া বিদেশ হইতে বিশেষ বিদ্যা সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে দেখা, কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরও হাসি-হাসি মুখ। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিতেই শুনিলাম, "আজ একটা মস্ত জিনিস লাভ হয়েছে। চিরদিন তো বাইরে বাইরে কাটালাম, আজ আমাদের এক বড় সাহেব অন্য এক জন বড় সাহেবকে অফিসের কাগজপত্র যা লিখেছেন, তাতে বুঝলাম আমরা ইংরেজি কত কম জানি। একটা নতুন শব্দ শিখলাম, কলকাতার বাইরে কখনই এ শব্দটা শেখার সুবিধা হোত না।" ভাবটা এই, জীবন সার্থক, একটা ইংরেজি শব্দ নূতন শিখিয়াছি!

বলিয়া রাখা ভাল, এই স্বীকারোক্তিতে মানসিক একটা ধাক্কা খাইলাম। ইংরেজি তো আমরাও পড়ি—এবং পড়াই; ইংরেজি সাহিত্য আমাদের নিত্য-পূজার বস্তু। তবু একটা ভক্তি বরদাস্ত হইতে চাহিল না। মনে মনে গজর-গজর করিতে লাগিলাম।

অতীতের স্মৃতি; ছেলেবেলায় কি না করিয়াছি ইংরেজির জন্য! এখনও তো শৈশবের স্মৃতি One morn I met a lame man close to my farm—কাশীরামদাসের অমৃতসমান কথার মত মন-প্রাণ জুড়িয়া আছে। বি-এল-এ ব্রে কতবারই না জানি মুখস্থ করিয়াছি। 'জপ' করিয়াছি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

এখনকার মায়েরা আসিয়া বলেন, 'জানেন, বাংলা বাংলা করে কি হবে? আমার ছেলেমেয়েরা বাংলার চেয়ে ইংরেজি সহজে ধরে। আপনারা বাংলাটা একটু ছাড়ুন তো!"

চট্টগ্রামবাসী চাকর আসিয়া বলে, 'বাবু, একটু পড়াশুনা শিখবো।' বাংলার কথা বলিলে সে সবেগে মাথা-নাড়িয়া জবাব দেয়—'না বাবু, ইংরেজি শিখবো! তাহলে পরে কত কি হতে পারবো!'

চুপ করিয়া থাকি; নিজের মনেরও যে ছবি দেখি, তাহাতে আঁতকাইয়া উঠিবার কথা। নিজেও যে বাংলার চেয়ে ইংরেজি বই তাড়াতাড়ি পড়ি, ইংরেজি লেখা তাড়াতাড়ি বুঝি। বিষ কত দূর গড়াইয়াছে!

সভা-সমিতিতে যাই, মাতৃভাষার কথা বলি—তর্ক করি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা কোহিনুর, তাঁহারা বলেন, ইংরেজি না শিখিলে জীবনে কোনও কালচার থাকিবে না, জ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিব না। জবাব অবশ্য তখনকার মত দিই, 'এখনকার মত চাবি তো পাইয়াছেন, চাকুরির প্রয়োজন ভিন্ন জ্ঞানের মন্দিরে পূজা করিবার জন্য যান কি?' কিন্তু জবাব দেওয়া যথেষ্ট নয়, দেশের নেতৃবৃন্দের রুচি ও বুদ্ধির ছবি সম্মুখে প্রসারিত—বুঝি, "আমরা মরিলে হবে দেশের কল্যাণ।" এ যুগের লোকেরা (অবশ্য অহিংস ভাবে) লোকান্তরে গত না হইলে নবযুগ আসিবে না।

২

মনে পড়ে স্যর আশুতোষের কথা। মাতৃমন্দিরে তিনি মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। কত আশা করিয়া তিনি মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ, জগৎবরেণ্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ভারতীয় ভাষাকে কোন্ প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, প্রকৃত সংগঠনকর্ম করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সে আশা আমরা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। প্রতি বৎসর নিয়মিত দিনে তাঁহার মর্মর-মূর্তির সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহার মহত্ত্বের অনুধাবন করিতে বৃথাই চেষ্টা করি। মাতৃভাষাকে তিনি তো কত সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখিয়াছিলেন, অবশ্যপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং মাতৃভাষার সম্যক্ বিকাশের জন্য সর্বাঙ্গীন আয়োজনও করিয়াছিলেন। দুঃখ রহিয়া গেল, ইউলিসিসের ধনুক আর কেহ চালাইতে পারিল না। দুঃখই বা কিসের? এমনি না হইলে ইউলিসিস হইবেনই বা কেন? তাঁহার 'জাতীয় সাহিত্যে' মাতৃভাষার যে বন্দনা গম্ভীর সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, বুঝি পাঠ্য-পুস্তকের প্রতি ছাত্রসমাজের স্বাভাবিক ঔদাসীন্যে তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হইতে পারিল না! প্রশ্নপত্র বাংলায় করিতেই কত ব্যথা, কত বেদনা; এখনও আপত্তি, স্বাধীন ভারতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র বাংলায় হয় না।

তাহারও পূর্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে মাতৃভাষার আহ্বান শোনা গিয়াছিল। সেদিনকার স্বদেশী, বাংলার ভাষার উপর জোর দিয়াছিল; বাংলা ভাষায় মনের কথা কবি গাহিতে পারিয়াছিলেন; মনস্বী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির তো কথাই নাই, শুনিয়াছিলাম স্বদেশী সাধনার উন্মাদনায় তখনকার তরুণ বিনয়কুমার মাতৃভাষার গৌরব অর্জনে প্রাণপাত করিবেন বলিয়া সভায় ছুটিয়াছিলেন। তখনকার প্রথম জোয়ারে যাঁহারা গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, হয়তো আপাতদৃষ্টিতে বৈষয়িক দিক দিয়া তাঁহাদের ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কি চেষ্টা করিয়াও সে জোয়ারের পথ রুদ্ধ করিতে পারিতেন? আমি বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথার কথা মনে করিয়া এ কথা বলিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের হল কাঁপাইয়া "যজ্ঞকথার" বক্তৃতা শেষ করিয়া যখন রামেন্দ্রসুন্দর 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া উঠিলেন, সেদিনের কথা স্মরণ করিতেছি। গুরুদাস, আশুতোষ, রামেন্দ্রসুন্দর—ইঁহাদের পৃথক করিয়া দেখিতেছি না, একই কালপ্রবাহের বিভিন্ন প্রকাশরূপে দেখিবার চেষ্টা করিতেছি। সেদিন, আর এই দিন! কেন এমন হয়!

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যাহার প্রেরণা দিয়াছিলেন, আশুতোষ যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যপাঠ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করিলেন। তাঁহার দূর-প্রসারিত দৃষ্টি বাঙ্গালীর শিক্ষায় বাংলা ভাষার স্থান সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা কি আমরা মনে রাখিব না?

"আমাদের এই ভীরুতা" (বাংলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে) "কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোন দিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, এই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

"অথচ জাপানী ভাষার ধারণা-শক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশী নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার-প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে, এমন জাপানীর সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ কেবল মাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণী-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফসলাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ-পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।"

ইহা ১৩২২ সালের লেখা; আজ হইতে ৩৬ বৎসর পূর্বে। কিন্তু 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটি পড়া আজকার শিক্ষাসংকটের দিনে যতটা প্রয়োজনীয়, পূর্বে কখনও হয়তো ততটা হয় নাই।

৩

দিব্য চলিতেছিল, রবীন্দ্রনাথও আপোষের কথাই ভাবিতেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে যদি একটু জায়গা করিয়া লইয়া লোক-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায়; কিন্তু এমন সময়ে আসিল অসহযোগ আন্দোলন এবং মহাত্মাজীর ব্যাপক কর্মভাবনা। শুধু রাজনৈতিক অধিকার নয়, স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও শিক্ষা-বিষয়ক লক্ষ্য ও পাথেয় সকলই ভাবিয়া তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁহার 'বেসিক' বা বুনিয়াদি শিক্ষার মূল সূত্র হইল, মাতৃভাষায় শিক্ষা। হাতের কাজ হইবে তাহার মাধ্যম, সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা। মাতৃভাষা ভাব প্রকাশের জন্য। সেই ভাষার বাহন দিয়া হাতের কাজের মধ্য দিয়া শিশু—শুধু শিশু কেন, বয়স্কেরাও—শিক্ষা গ্রহণ করিবে। জাকির হোসেন সমিতির রিপোর্টে মাতৃভাষায় সাত বৎসরে শিশু কতখানি শিখিবে, তাহার নয় দফায় উল্লেখ আছে; আর সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি হইল মাতৃভাষা, ইহা সেখানে প্রথমেই স্বীকার করা হইয়াছে। গান্ধীজী রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় যে সে প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত থাকিবে, তাহা তাঁহার ভাবনার মধ্যে ছিল না। আজ বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার বুনিয়াদ গান্ধীজীর পরিকল্পনায় সাড়া দিয়াছে, হয়তো সে সাড়া কোথাও ক্ষীণ, কোথাও জোরালো; তবে সর্বত্রই বুনিয়াদীকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আদর্শকে খর্ব করা হইয়া থাকিতে পারে, একেবারে অস্বীকার কেহ তো করে নাই। কিন্তু সর্বত্রই ঐ একই প্রশ্ন—তাহা হইলে ইংরেজি ভাষায় কি হইবে! বেসিকে তো ইংরেজির স্থান নাই! চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যার্থী ইংরেজি না শিখিয়া মানুষ হইবে! সে রকম মানুষ হওয়া কি চলে! আমাদের চিরাভ্যস্ত পথে এ আবার কি বাধার সৃষ্টি হইল! গান্ধীজী ইহার সম্বন্ধে এতটুকু নড়চড় করিবার জো রাখেন নাই। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি হয়তো একটু-আধটু আলগা দিতে চাহিয়াছেন—বুনিয়াদি শিক্ষায় ইংরেজিকে সিনিয়র বেসিকে একটু বৈকল্পিক স্থান দেওয়ার বিধান দিয়াছিলেন, কিন্তু জুনিয়র-সিনিয়র, বেসিক বা বুনিয়াদী শিক্ষার এই পার্থক্যই যে বুনিয়াদীর

অহিতকর, সুতরাং ইংরেজি শিক্ষার এই বিকল্প-বিধান কাজে লাগানো ঠিক সুবিধার বলিয়া মনে হয় নাই।

এখন কথা হইল, ইংরেজি পড়ানো কি একেবারে তবে বাতিল করিয়া দিতে হইবে? ম্যাট্রিক পর্যন্ত, অর্থাৎ ইস্কুলের পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত কি ইংরেজি না পড়িলেও চলিবে? আমাদের এখনও বহু দিন ধরিয়া যে বাহিরের বিদ্যা-সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে। কি করিয়া তাহা সম্ভব হইবে?

ইংরেজি শিক্ষা আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাতে লাভ যে কিছু হয় নাই এমন নহে; তবে লাভের চেয়ে ক্ষতি হইয়াছে বিস্তর বেশি। মালয়ের শিক্ষা কমিশনর স্যর জর্জ এণ্ডার্সন বহু দিনের অভিজ্ঞতার ফলে বলিয়াছিলেন—যে সব ডাক্তার কম্পাউণ্ডার ইংরেজি-পড়া, তাহারা নূতন অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, আর যাহারা 'হাতুড়ে' অর্থাৎ ইংরেজি-পড়া নয় তাহাদের উপস্থিত বুদ্ধি থাকে, নূতন কিছু ঘটিতে দেখিলে তাহারা অস্থির হয় না। কথাটা আমাদেরও ভাবিয়া দেখিবার মত। যাহা হউক, স্বাধীনতার পর তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এখনো ইংরেজি রাজভাষার আদর পায় কেন? এখনো ইস্কুলের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় ইংরেজীতে ২৫০ নম্বর ও মাতৃভাষায় ২০০ নম্বর, এই বৈষম্য কেন? আই. এ., আই. এস. সি. পরীক্ষায় ইংরেজিতে ৩০০ ও বাংলায় ১০০ পূর্ণসংখ্যা,—কেন এমন হয়? বি. এ-তেও ঐ একই অবস্থা। জানি, আজ হউক কাল হউক ইংরেজির এই রাজবেশ খসিয়া পড়িবেই; কিন্তু দেশের লোককে তো সে জন্ম ব্যগ্র হইতেও দেখি না। শুনিতেছি, ব্যবস্থা হইতেছে—ইংরেজি ও বাংলার পূর্ণসংখ্যার মান যাহাতে সমান হয় তাহা করিবার; কিন্তু কল বড় ধীরে ধীরে নড়িতেছে।

বাংলার মাধ্যমে পড়াইতে গেলে বই কোথায় পাইব—এরূপ আপত্তিও কেহ কেহ করিয়া থাকেন; যদি আমরা এ বিষয়ে আগ্রহশীল হই, তাহা হইলে বই লেখানো ও ছাপানো মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। সামূহিক চেষ্টা চাই, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজের সহযোগিতা চাই। না হইলে এ সব কাজ সম্ভব হইবে না। কবিগুরুর কথা স্মরণ করিয়া বলি, জাপানে যাহা সম্ভব হইয়াছে, বাংলা দেশে তাহা আরও সহজ হইবে। সেই উৎসাহ চাই, যাহা মাতৃভাষার জন্ম মনে-প্রাণে দরদ অনুভব করিবে। আমরা এখন ভাবি, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বাংলায় কেমন করিয়া চলিবে? রবীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের উত্তর বহু পূর্বেই তাঁহার শিক্ষার বাহন প্রবন্ধে দিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজির স্থান তবে কোথায় থাকিবে? আমাদের পক্ষে বিদেশের সঙ্গে যোগসূত্র রাখিতে হইলে (এবং তাহা ব্যক্তি ও দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া রাখিতেই হইবে) কোন না কোন বিদেশী ভাষা শিখিতে হইবে, ইংরেজিই যে সকলকে শিখিতে হইবে তাহা নয়, ফরাসি, জার্মান, বা অন্য কোনও প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় ভাষা শিখিতে হইবে; আর তাহা হওয়া উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিষয়। এ দেশের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্কের কথা মনে করিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইংরেজি শেখাই বেশীর ভাগ লোক পছন্দ করিবে। যাঁহারা বিশেষ করিয়া ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদের জন্য ঐচ্ছিক পাঠ্যের ব্যবস্থা থাকিবে। এ জন্য যদি পূর্ণমান ১০০ সংখ্যার বিষয় হিসাবে ইংরেজি অবশ্য-পাঠ্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ ও বি. এ, পরীক্ষায় নির্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। সাহিত্যানুরাগী ছাত্রের জন্ম বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ পাঠ্য থাকিবেই। এম্. এ-র সম্বন্ধে তো স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, কারণ সেখানে ছাত্র ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়িতেই আসিয়াছে। পূর্বেকার প্রস্তুতি একটু-আধটু কম হইলেও বুদ্ধিমান ও আগ্রহশীল ছাত্রের পক্ষে তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

এ ছাড়া সাধারণ লোকের জন্ম Language School বা ভাষা বিদ্যালয় থাকিবে; সেখানে এক বৎসরে বা দুই বৎসরে ইংরেজি শিখাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। এখনও ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়ান প্রভৃতি শেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়ে ব্যবস্থা আছে। এবং বিদেশের লোকেরা এখানে আসিয়া বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা অল্প কালের মধ্যে শিখিয়া থাকে। হয়তো ইহাতে সাধারণ ইংরেজি আমরা এখন যাহা বলি বা লিখি, তাহার চেয়ে ভুল হইবে; কিন্তু এখনও যাহা বলি তাহা তো খুব নির্ভুল নয়; তবে তাহাতে এমন কি আর আসে-যায়? I cockroach on your time বলিলেও সময় ও শক্তির হিসাবে তাহাতে কাজ চলিয়া যাইবে, এবং ইংরেজি না শিখিলেও জ্ঞান-মন্দিরের দরজা সর্বসাধারণের পক্ষে রুদ্ধ থাকিবে না।

কিন্তু এ সব কথা কাহাকে বলি! মনে পড়িল, সেদিনও ভোলা কুলিকে গুমা ষ্টেশনে মাল বহিতে বহিতে চীৎকার করিতে শুনিয়াছি—'অংগ্রেজী নেহি পড়না!' লোকে শুনিয়া হাসিয়াছে, পাগল বলিয়াছে। স্বাধীনতা লাভ আমাদের পক্ষে ঠিক হয় নাই, এ কথা যদি কেহ বলেন তবে এখন আর প্রবল ভাবে আপত্তি করিব না, আপত্তি করিবার মুখ নাই।

কোনান ডয়েলের পরিচয়

স্বর্গত স্যর আর্থার কোনান ডয়েল একবার একটি ট্যাক্সিতে চেপে প্যারিসের এক হোটেলে পৌঁছলেন। ট্যাক্সির চালককে গাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে দিতেই চালকটি বললে,—'আপনার দয়া ডয়েল।'

—'তুমি আমার নাম কোথা থেকে জানলে?' জিজ্ঞেস করলেন ঐ খ্যাতিমান লেখক।

—'আমি কাগজে দেখলাম যে, আপনি অদ্য ফ্রান্সের দক্ষিণ থেকে এখানে আসছেন।' বিবৃত করলে চালকটি,—'আপনার সাধারণ আকৃতি দেখলেই মনে হয় আপনি এক জন ইংরেজ। আপনি বোধ হয় গত হপ্তায় আপনার চুল ছেঁটেছেন। আর, বোধ হয়, যে নাপিতের কাছে ছেঁটেছেন সে ঐ ফ্রান্সের দক্ষিণের কেউ?'

—'আশ্চর্য্য!' শার্লক হোমসএর স্রষ্টা বললেন,—'আর কিছু প্রমাণ আছে তোমার জানা?'

—'কিছু নেই', উত্তর করলে চালক—'শুধু আপনার মালপত্রে লেখা আপনার নাম ছাড়া।'

বাংলা সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-(২)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাময়িক-পত্রের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল। গত বারে ছয় বৎসরের (ইং ১৮৬৮—৭৩) মধ্যে যতগুলি পত্র-পত্রিকা জন্ম লাভ করে, দেখা যাইবে পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে শহর-মফস্বল হইতে তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক সাময়িক-পত্রের উদ্ভব হইয়াছিল।

ইং ১৮৭৪

১১৮। **হাবড়া হিতকরী** (সাপ্তাহিক): জানুয়ারি (?) ১৮৭৪।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ইহাতে মাঝে মাঝে লিখিতেন। এক বার তিনি 'হাবড়া হিতকরী'তে হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী' সমালোচনা করিয়া দেখাইয়া দেন যে, "হেমবাবুর 'কেন বা হইবে জ্ঞান, পুরুষের শত টান' ইত্যাদি বায়রণের 'Man's love of man's life is a thing apart' (Don Juan, canto I) ইত্যাদির অনুবাদ।"

১১৯। **হরবোলা ভাঁড়** (মাসিক): জানুয়ারি ১৮৭৪।

বিলাতী Punch এর অনুকরণে ব্যঙ্গচিত্র সম্বলিত মাসিকপত্র। "বঙ্গভাষায় এটি একটি নূতন পদ্ধতির কাগজ।" পরিচালক—দুর্গাদাস ধর।

১২০। **বসন্তক** (মাসিক): ৩১ জানুয়ারি ১৮৭৪।

'হরবোলা ভাঁড়ে'র ন্যায় এখানিও একখানি শ্লেষাত্মক মাসিক পত্রিকা। প্রতি সংখ্যায় 'পাঞ্চে'র অনুকরণে তিন-চারখানি ব্যঙ্গ লেখো-চিত্র থাকিত; চিত্রগুলি বোধ হয় নিমতলা-নিবাসী গিরীন্দ্রকুমার দত্ত-অঙ্কিত। প্রাণনাথ দত্ত 'বসন্তক' সম্পাদন করিতেন বলিয়া মনে হয়।

১২১। **ভ্রমর** (মাসিক): বৈশাখ ১২৮১।

সম্পাদক—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ সহোদর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "পত্রখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; ...এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন।" ইহা ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮২) পর্য্যন্ত চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। অনেকে জানেন না, ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে 'ভ্রমরে'র "নূতন পর্য্যায় ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা" ও পরবর্ত্তী আশ্বিন মাসে ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

১২২। **আর্য্যদর্শন** (মাসিক): বৈশাখ ১২৮১।

সম্পাদক—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। "জ্ঞান ও নীতির চর্চ্চা ও প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।" এই সুপরিচালিত উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্রখানি এগার বৎসর (১২৯২ সাল) চলিয়া তিরোহিত হয়। ইহার ৫ম ভাগ ১২৮৫ সালে, কিন্তু ৬ষ্ঠ ভাগ ১২৮৭ সালে বাহির হইয়াছিল।

১২৩। **ভারত শ্রমজীবী** (মাসিক): বৈশাখ ১২৮১।

বরাহনগর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য এইরূপ:—"সামান্য লোকদিগের জন্য আমাদের দেশে কোন সচিত্র পত্রিকা নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য আমাদের মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়াতেই আমরা এই পত্রিকাখানি বাহির করিতে আরম্ভ করিলাম। কারিকর, দোকানদার ও কৃষক প্রভৃতি সামান্য লোকদিগের চরিত্র ভাল করিবার জন্য যাহা আমাদের আবশ্যক বোধ হইবে, তাহাই ইহাতে প্রকাশিত হইবে।"

১২৪। **গোয়ালপাড়া-হিতসাধিনী** (পাক্ষিক...): বৈশাখ ১২৮১।

গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। আসামের রাজনীতি রাজকার্য্য প্রভৃতির আলোচনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। নানা কারণে দিনকতক বন্ধ থাকিবার পর ১২৮২ সালের শেষার্দ্ধে সাপ্তাহিক আকারে ইহা পুনঃপ্রচারিত হয়।

১২৫। **আজীজন নেহার** (মাসিক): বৈশাখ ১২৮১।

হুগলী কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবকের চেষ্টায় চুঁচুড়া হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হয়। সম্পাদক—মীর মশার্‌রফ হোসেন।

১২৬। সাহিত্য কুসুম (মাসিক): বৈশাখ ১২৮১।

হুগলী বুধোদয় যন্ত্র হইতে বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১২৭। ভারত দর্পণ প্রকাশিকা (মাসিক): বৈশাখ ১২৮১।

সাধারণের হিতার্থে বিনামূল্যে বিতরিত।

১২৮। পরিদর্শক (সাপ্তাহিক): ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮১।

চাটমোহর জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে প্রকাশিত হইবে—এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছিল।

১২৯। **বান্ধব** (মাসিক): আষাঢ় ১২৮১।

ঢাকা হইতে 'বঙ্গদর্শনে'র আদর্শে সুলভ মূল্যের এই পত্রখানি প্রচারিত হয়। ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের পত্র। সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। রমেশচন্দ্রের 'জীবন-প্রভাত' প্রথমে ইহাতেই স্থান লাভ করে। 'বান্ধব' অনিয়মিতভাবে দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। ইহার বিভিন্ন খণ্ডগুলি এইভাবে প্রকাশিত হয়:—

	১ম বর্ষ	১২৮১, আষাঢ়-চৈত্র
	২য় বর্ষ	১২৮২, বৈশাখ-চৈত্র
	৩য় বর্ষ	১২৮৩, বৈশাখ-চৈত্র
	৪র্থ বর্ষ	১২৮৫
	৫-৬-৭ম বর্ষ	১২৮৭, ১২৮৮, ১২৮৯
	৮ম বর্ষ	১২৯১
	৯ম বর্ষ	১২৯২ (বৈশাখ-আশ্বিন)-১২৯৩ (কার্ত্তিক-চৈত্র)
	১০ম বর্ষ	১২৯৪, ১ম-৫ম সংখ্যা
	১১শ বর্ষ	১২৯৫, ১ম-২য় (?)
(নব পর্য্যায়)	১ম বর্ষ	১৩০৮, ফাল্গুন—১৩০৯, মাঘ
	২য় বর্ষ	১৩১০, বৈশাখ-চৈত্র
	৩য়-৪র্থ বর্ষ	১৩১১, ১৩১২
	৫ম বর্ষ	১৩১৩, বৈশাখ-ভাদ্র।

১৩০। বাঙ্গালী খৃষ্টিয়ান (মাসিক): জুন ১৮৭৪।

পরিচালক—রজনীকান্ত বিশ্বাস।

১৩১। হিন্দুবিলাসী (মাসিক) : ৪ শ্রাবণ ১২৮১।

কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত। সাহিত্য রহস্য প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ইহাতে স্থান পাইত। সম্পাদক চুঁচুড়া মিশন বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। প্রকাশক—প্রসন্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৩২। সুহৃদ (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮১।

বিনামূল্যে বিতরিত। ১২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট হইতে ইহা প্রকাশিত হইত।

১৩৩। **হিন্দুরঞ্জন** (মাসিক) : শ্রাবণ (?) ১২৮১।

"দেশীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি সম্পূর্ণরূপে সংশোধন দ্বারা সমাজ সংস্করণ, শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল বিধান এবং আত্মোৎকর্ষ সাধনই এ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।" এই উপকারী পত্রখানি শিকদারবাগান, হিন্দু বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, হিন্দু ব্যায়াম বিদ্যালয়ের অধীন হিন্দুসভার সম্পাদক।

১৩৪। কুমুদিনী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮১।

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩৫। সত্যোদর (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮১।

ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারকে পরিহাস করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। সম্পাদক—অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জামাতা।

১৩৬। সরোজিনী (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮১।

শান্তিপুর গোস্বামীপাড়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বিহারিলাল গোস্বামী।

১৩৭। উচিত বক্তা (পাক্ষিক) : ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৪।

মুর্শিদাবাদ আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—গঙ্গাচরণ বেদান্তবাগীশ।

১৩৮। প্রতিধ্বনি (সাপ্তাহিক) : ৭ই আশ্বিন ১২৮১।

কলিকাতা ১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েক জন সুলেখক দ্বারা পরিচালিত।

১৩৯। বাঙ্গালি (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮১।

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। স্বত্বাধিকারী ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের শিক্ষক, 'হেলেনা' কাব্য-রচয়িতা আনন্দচন্দ্র মিত্র। শ্রীনাথ চন্দ 'বাঙ্গালি' সম্পাদন করিতেন বলিয়া জানা যায়।

১৪০। চিকিৎসা-তত্ত্ব (মাসিক) : আশ্বিন ১৭৯৬ শক।

"চিকিৎসাবিদ্যা-সম্বন্ধীয় বিষয়পূর্ণ মাসিকপত্র।" চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের মুখপত্রও বটে।

১৪১। হিতবোধ (মাসিক) : ৩১ আশ্বিন ১২৮১।

ভাঙ্গামোড়া হইতে প্রতি সংক্রান্তির দিন প্রকাশিত। সম্পাদক অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ভাঙ্গামোড়া স্কুলের হেডমাষ্টার।

১৪২। **সমদর্শী** or The Liberal (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮১।

ধর্ম, সমাজ ও নীতিবিষয়ক দ্বিভাষিক পত্র। রাজনারায়ণ বসু, শিবচন্দ্র দেব, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বসু প্রমুখ মনীষিবর্গের গদ্য-পদ্য রচনা ইহাতে স্থান পাইত।

১৪৩। দর্শক (সাপ্তাহিক) : ৬ অগ্রহায়ণ ১২৮১।

সাহিত্য-বিষয়ক পত্র ও সমালোচন।

১৪৪। দর্শক (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮১।

সাহিত্য-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন, কলিকাতা জ্ঞান-দীপিকা পুস্তকালয় হইতে অবিনাশচন্দ্র নিয়োগী কর্তৃক প্রকাশিত।

১৪৫। **প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ** (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮১।

চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে প্রকাশিত। ইহা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কা[ব্য] ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইত। প্রত্যেক কবির সংক্ষি[প্ত] জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদিও সন্নিবিষ্ট হইত। সম্পা[দক] —সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বরদাচরণ মিত্র।

১৪৬। হিন্দু দর্পণ (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮১।

বোড়াল হইতে সম্পাদক নারায়ণদাস তপস্বী কর্তৃক প্রকাশিত।

১৪৭। কুমুদ বান্ধব (মাসিক) : অগ্রহায়ণ (?) ১২৮১।

১৪৮। ভারত হিতৈষিণী (মাসিক) : অগ্রহায়ণ (?) ১২৮১

কলিকাতা সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

১৪৯। সত্যপ্রকাশ (পাক্ষিক) : পৌষ ১২৮১।

বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

১৫০। পারিল বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক) : পৌষ (?) ১২৮১।

ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত পারিল হইতে প্রকাশি[ত]। সম্পাদক—আনিছউদ্দীন আহাম্মদ।

ইং ১৮৭৫

১৫১। সুদর্শন (মাসিক) : পৌষ ১২৮১।

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্মনীতি-বিষয়ক মাসিকপত্র। পরিচাল[ক] —গোপালচরণ মিত্র।

১৫২। **প্রভাত সমীর** (দৈনিক) : ১৫ মা[ঘ] ১২৮১।

সম্পাদক—খ্যাতনামা সাংবাদিক ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত [ও] শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকালে[র] একখানি উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র; অর্থাভাবে মাস-চারেক পরেই প্রচা[র] রহিত হয়।

১৫৩। বঙ্গহিতৈষিণী (পাক্ষিক) : মাঘ ১২৮১।

কলিকাতা কালীঘাট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বঙ্কবিহা[রী] সান্যাল।

১৫৪। বিচারক (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন ১২৮১।

'হালিশহর পত্রিকা'র লেখকগণ কর্তৃক কলিকাতা ভিক্টোরি[য়া] যন্ত্র হইতে এই ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র প্রকাশিত হয়। পর[-] বৎসর বৈশাখ মাসে ইহা 'সমাজ-দর্পণে'র সহিত সম্মিলিত হই[য়া] যায়।

১৫৫। দুর্ল্লভ—অনাথবন্ধু (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন ১২৮১

অনাথবন্ধু ঠাকুরের নামে পত্রিকাখানির নামকরণ হইয়াছিল।

১৫৬। হিন্দু দর্পণ (পাক্ষিক) : ১৫ চৈত্র ১২৮১।

"পত্রের নাম 'হিন্দু দর্পণ' রহিল। ইহাতে ইহার উদ্দে[শ্য] প্রকাশিত রহিয়াছে। আমরা হিন্দু সন্তানদিগের সমুদয় ছবি[...]

এই দর্পণের সাহায্যে দেখিব।" সম্পাদক—যোড়শীচরণ মিত্র (৩৭ গ্রে ষ্ট্রীট)।

১৫৭। বিরীয়া পত্র (মাসিক): ৪ এপ্রিল ১৮৭৫।

'বিরীয়া পত্র' বা Berean Leaves কলিকাতা ট্রাক্ট সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ধর্ম্মমূলক পত্রিকা। সম্পাদক—রেঃ এস, সি, ঘোষ।

১৫৮। সুহৃদ্ (সাপ্তাহিক): ১ বৈশাখ ১২৮২।

ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা হইতে প্রকাশিত।

১৫৯। রাজসাহী সমাচার (সাপ্তাহিক): বৈশাখ ১২৮২।

করচমারিয়া রাজসাহী হইতে বেণীমাধব নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পরমায়ু এক বৎসর।

১৬০। ভক্তম (সাপ্তাহিক): ১২ বৈশাখ ১২৮২।

"ভক্তমের নিবেদনে" প্রকাশ :— "সামাজিক দোষাদোষ উল্লেখ করাই আমার প্রধান কর্ম্ম।...সমাজ সংস্করণ এবং ভারতভূমির উন্নতি সাধনই আমার একমাত্র সঙ্কল্প। প্রলোভন ও ভয় আমার অভিধানে নাই।" সম্পাদক—'এই কলিকাল' (ব্যঙ্গকাব্য)-রচয়িতা রাধামাধব হালদার, আহিরিটোলা।

১৬১। সাম্মিলনী (সাপ্তাহিক): ২৮ বৈশাখ ১২৮২।

কেওড়া হইতে প্রকাশিত। সাত-আট মাস পরে 'প্রতিধ্বনি'র সহিত সম্মিলিত হইয়া কলিকাতা হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৬২। প্রতিবিম্ব (মাসিক): বৈশাখ ১২৮২।

সম্পাদক—রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ, ভূতপূর্ব্ব 'কল্পলতিকা'-সম্পাদক, মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-শিক্ষক। 'প্রতিবিম্ব' একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা "প্রকৃতির খেদ" কবিতা ও ২য় সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের "পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র" প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাস হইতে পত্রিকাখানি 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নাম ধারণ করে।

১৬৩। বিনোদিনী (মাসিক): বৈশাখ ১২৮২।

"ভুবনমোহিনী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত" এই নামে বৃচার গ্রাম-নিবাসী 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নসীপুরে অবস্থানকালে বন্ধু জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্তের (ছোট তরফের রাণী অন্নপূর্ণার পোষ্যপুত্র) আনুকূল্যে 'বিনোদিনী' প্রকাশ করেন। অনেকে ইহাকে মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকারূপে উল্লেখ করিয়া ভুল করিয়াছেন।

১৬৪। বঙ্গমহিলা (মাসিক): বৈশাখ ১২৮২।

"বঙ্গবাসিনীগণের হস্তে সময়ে সময়ে নীতিগর্ভ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সকল উপহার দেওয়াই" ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সম্পাদক—ডাঃ ভুবনমোহন সরকার, প্যারীচরণ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র।

১৬৫। হিতৈষিণী (মাসিক): বৈশাখ ১২৮২।

বরিশাল হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—দীননাথ সেন।

১৬৬। প্রিয়দর্শন (মাসিক): বৈশাখ ১২৮২।

পরিচালক—গোদাপল্লী-নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ পাল।

১৬৭। শুভাকাঙ্ক্ষী (মাসিক): বৈশাখ ১২৮২।

পরিচালক—বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬৮। ভারতবর্ষীয় আর্য্য পত্রিকা (মাসিক): বৈশাখ ১২৮২।

হরিনাভিস্থ ভারতবর্ষীয় আর্য্যসভার মুখপত্র। "আর্য্যধর্ম্ম রক্ষা, প্রচার ও কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—গোপাললাল বসু বর্ম্মা।

১৬৯। মধুমক্ষিকা (মাসিক): জ্যৈষ্ঠ ১২৮২।

গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

১৭০। রাজসাহীবাসী (মাসিক): জ্যৈষ্ঠ (?) ১২৮২।

রাজসাহী, করচমারিয়া-নিবাসী রাজকুমার সরকার ইহা প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন—ইহাতে প্রধানতঃ ইতিহাস, রাজনীতি-সম্বন্ধীয় পুস্তক ও প্রস্তাবের অনুবাদ, সমালোচনা প্রভৃতি থাকিবে—সংবাদপত্রে এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

১৭১। রত্নাকর (সাপ্তাহিক): আষাঢ় ১২৮২।

সম্পাদক—নিবারণচন্দ্র গুপ্ত।

১৭২। মধুকর (সাপ্তাহিক): শ্রাবণ ১২৮২।

সম্পাদক—উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

১৭৩। ঢাকা দর্পক (সাপ্তাহিক): ২১ শ্রাবণ ১২৮২।

ঢাকা হইতে ১ পয়সা মূল্যে প্রচারিত।

১৭৪। ষ্টার অব ইণ্ডিয়া বা ভারত নক্ষত্র (সাপ্তাহিক): শ্রাবণ (?) ১২৮২।

দ্বিভাষিক—ইংরেজী-বাংলা পত্রিকা।

১৭৫। অনাথিনী (মাসিক): শ্রাবণ ১২৮২।

আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বুলিয়ান হইতে প্রকাশিত। 'অনাথিনী'ই প্রকৃত পক্ষে মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা—থাকমণি দেবী, সম্ভবতঃ 'সহোদর'-সম্পাদক অন্নকৃষ্ণ চন্দ্র চাটোপাধ্যায়ের অল্পবয়স্কা কন্যা।

১৭৬। অণুবীক্ষণ (মাসিক): শ্রাবণ ১২৮২।

"স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও তৎসহযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।" সম্পাদক—ডাঃ হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা, বউবাজার।

১৭৭। মানসমোহিনী (মাসিক): ভাদ্র (?) ১২৮২।

সম্পাদক—সীতানাথ ঘোষ।

১৭৮। ভিখারিণী (মাসিক): আশ্বিন ১২৮২।

কলিকাতার কাঁসারিপাড়া লেন হইতে প্রকাশিত। পরিচালক—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭৯। প্রমোদী (মাসিক): আশ্বিন ১২৮২।

ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা হইতে প্রকাশিত।

১৮০। সুধাকর (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৮২।

সম্পাদক—বহরমপুর-নিবাসী বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার।

১৮১। যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ (সাপ্তাহিক): ৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২।

"প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভাগমন হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত সামুদায়িক বিবরণ" সচিত্র আকারে প্রকাশ করিয়া ভ্রমণ-ঘটনাটি চিরস্মরণীয় করণ ও রাজভক্তি প্রদর্শন উদ্দেশ্যেই ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। সম্পাদক—রাধামাধব হালদার, আহিরি-টোলা।

১৮২। ভাবী সম্রাটের ভারত ভ্রমণ (সাপ্তাহিক): ১০ ডিসেম্বর ১৮৭৫।

"প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত-ভ্রমণ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণযুক্ত সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র। 'The Native Edition of the Royal Tourist." সম্পাদক—'যৌবনে যোগিনী'-রচয়িতা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৮৩। ভারতমিহির (সাপ্তাহিক): ১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫।

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—অনাথবন্ধু গুহ।

১৮৪। জ্ঞানদীপিকা পত্রিকা (সাম্বৎসরিক?): ১৭১৭ শক।

সম্পাদক—কালীচন্দ্র লাহিড়ী। ১৮৮২ সনে ইহা 'শিবদায়িকা পত্রিকা' নাম ধারণ করে।

ইং ১৮৭৬

১৮৫। একাকিনী (মাসিক): মাঘ ১২৮২।

সম্পাদক—যশোদানন্দন সরকার।

১৮৬। বঙ্গীয় ভাঁড় (মাসিক): ফাল্গুন (?) ১২৮২।

সম্পাদক—উপেন্দ্রলাল মিত্র।

১৮৭। হিন্দু হিতাকাঙ্ক্ষী (মাসিক) ফাল্গুন (?) ১২৮২।

সম্পাদক—নিত্যেন্দ্রনাথ সান্যাল।

১৮৮। হোমিওপেথি (মাসিক): ফাল্গুন ১২৮২।

সম্পাদক—বসন্তকুমার দত্ত।

১৮৯। বাঁদরামী (মাসিক): ফাল্গুন ১২৮২।

১৮৮০ সনের আগষ্ট মাসে ইহা 'বঙ্গরহস্য The Bengal Punch' নাম ধারণ করে।

১৯০। বিহার দূত (মাসিক): ফাল্গুন ১২৮২।

বাঁকিপুর হইতে প্রকাশিত।

১৯১। মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি (সাপ্তাহিক): চৈত্র ১২৮২।

মুর্শিদাবাদ হইতে প্রচারিত।

১৯২। প্রতিকার (সাপ্তাহিক): চৈত্র ১২৮২।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। 'মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি'র প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইহার আবির্ভাব।

১৯৩। চুম্বক নজীর (মাসিক): বৈশাখ ১২৮৩।

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত। "হাইকোর্টে নিষ্পন্ন মোকদ্দমার চুম্বক নজীর ইহাতে সংগৃহীত" হইত।

১৯৪। ভারত-সুহৃদ (মাসিক): বৈশাখ ১২৮৩।

ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত "রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্যামাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ও বিধুভূষণ গুহ।

১৯৫। বাঙ্গালা রাজকীয় গেজেট (সাপ্তাহিক): ১১ আষাঢ় ১২৮৩।

"গবর্ণমেণ্ট ষ্টাটিষ্টিক্যাল রিপোর্ট নামক রাজকীয় পত্রের বাঙ্গালানুবাদ এবং বঙ্গদেশীয় সমস্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় উক্তির সারসঙ্কলন ও নূতন নূতন সমাচার" ইহাতে স্থান পাইত। প্রকাশক—রাধামাধব হালদার, আহিরিটোলা।

১৯৬। ধর্ম্মপ্রকাশ (মাসিক): আষাঢ় ১২৮৩।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

১৯৭। মেদিনীপুর সমাচার (মাসিক...): শ্রাবণ ১২৮৩।

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত। ছয় মাস পরে ইহা পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়।

১৯৮। আদর্শ (মাসিক): ভাদ্র ১২৮৩।

সম্পাদক—মদনমোহন মিত্র।

১৯৯। ব্যবসায়ী (মাসিক): ভাদ্র ১২৮৩।

"কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।" সম্পাদক—শ্রীনাথ দত্ত, আণ্ডার গ্রাজুয়েট, লণ্ডন। ১২৯১ সালে 'ব্যবসায়ী'র ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়।

২০০। বিজ্ঞান দর্পণ (মাসিক): আশ্বিন ১২৮৩।

"বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিকপত্র।"

২০১। ভারত-ভাতি (মাসিক): আশ্বিন ১২৮৩।

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত।

২০২। শ্রীহট্ট প্রকাশ (পাক্ষিক): আশ্বিন ১২৮৩।

সম্পাদক—প্যারীচরণ দাস।

২০৩। মিত্রোদয় (মাসিক): আশ্বিন ১২৮৩।

সম্পাদক—হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়। পটলডাঙ্গার প্রাকৃত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

২০৪। চিত্রকর (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৮৩।

ফরিদপুরের অধীনস্থ উলপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—প্রতাপচন্দ্র রায়চৌধুরী।

২০৫। মনোহরা (পাক্ষিক): অগ্রহায়ণ ১২৮৩।

ইহাতে কেবল কবিতাই স্থান পাইত। পরিচালক—গগনচন্দ্র দে।

২০৬। বিশ্বসুহৃৎ (সাপ্তাহিক): ইং ১৮৭৬।

২০৭। দিবাকর (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১২৮৩।

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রাজেন্দ্রলাল সিংহ।

২০৮। ত্রিপুরা পত্রিকা (পাক্ষিক): পৌষ ১২৮৩।

ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত।

২০৮ক। সঞ্জীবনী (সাপ্তাহিক): ইং ১৮৭৬ (?)।

সম্ভবতঃ এই বৎসরেই শ্রীঅমলচন্দ্র হোমের পিতা গগনচন্দ্র পাঠদ্দশায় (জন্ম: ১-৪-১৮৫৬) ময়মনসিংহ হইতে 'সঞ্জীবনী' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিনি 'জীবন-স্মৃতি'তে বলিয়াছেন:— 'ভারতমিহির'-সম্পাদক অনাথবন্ধু গুহ-মহাশয়ের নিকট আমার সংবাদপত্রে লেখার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। যখন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পড়ি, তখন পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের সাহায্যে, 'সঞ্জীবনী' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করি; আমিই তাহার প্রধান লেখক ছিলাম। ময়মনসিংহের 'সঞ্জীবনী'কে কলিকাতার 'সঞ্জীবনী'র অগ্রজ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না—।

ইং ১৮৭৭

২০৯। দুরাশা (মাসিক): মাঘ ১২৮৩।

সম্পাদক—তুলসীদাস দে।

২১০। জ্ঞানদীপিকা (মাসিক): মাঘ ১২৮৩।

বর্দ্ধমান জেলার সোনাকুড় হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রাখালদাস হাজরা।

২১১। কুসুম (মাসিক): ফাল্গুন ১২৮৩।

নসীপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—অন্নদাপ্রসাদ মৈত্র।

২১২। বঙ্গহিতৈষী (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ (?) ১২৮৪।

২১৩। কুশদহ পাক্ষিক পত্রিকা : বৈশাখ ১২৮৪।

২১৪। আর্য্যপ্রতিভা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৪।

সম্পাদক—রায়না-নিবাসী কৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

২১৫। সর্ব্বার্থদায়িনী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৪।

"প্রাচীন-শাস্ত্র-প্রকাশিনী মাসিক পত্রিকা ও সমালোচিকা।" সম্পাদক—ঈশ্বরচন্দ্র কর।

২১৬। সমাজরঞ্জন (সাপ্তাহিক) : ৩ আষাঢ় ১২৮৪।

"সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক পত্র ও সমালোচন।" সম্পাদক—ফকিরচাঁদ বসু, অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন।

২১৭। আর্য্যদর্পণ (মাসিক) : আষাঢ় (?) ১২৮৪।

২১৮। **নববার্ষিকী : ১২৮৪ সাল (জুলাই ১৮৭৭)।**

"বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ও সাময়িক খ্যাতিমান ব্যক্তিদিগের সংক্ষেপ জীবনী সম্বলিত" বার্ষিক পুস্তক। সম্পাদক—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

২১৯। বঙ্গমিত্র (মাসিক) : আষাঢ় (?) ১২৮৪।

২২০। **ভারতী** (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৪।

"ভারতী উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাঁহার নামেই সপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ভাবস্ফূর্ত্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই নত-মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব।"—সম্পাদকের ভূমিকা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সাত বৎসর সুষ্ঠুভাবে 'ভারতী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনা-সম্ভারে 'ভারতী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত হইত। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্পাদকগণের নাম ও কার্য্যকাল এইরূপ :—

১২৮৪, শ্রাবণ—১২৯০	···	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২৯১—১৩০১	···	স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩০২—১৩০৪	···	হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী,
১৩০৫	···	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৬—১৩১৪	···	সরলা দেবী
১৩১৫—১৩২১	···	স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩২২—১৩৩০	···	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১৩৩১—১৩৩৩ আশ্বিন	···	সরলা দেবী

২২১। জ্ঞানভেদ (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৪।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—চন্দ্রমোহন সেন।

২২২। সুধাকর (পাক্ষিক) : ভাদ্র ১২৮৪।

সম্পাদক—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

২২৩। কোচবিহার মাসিক পত্রিকা : আশ্বিন ১২৮৪।

কুচবিহার হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রঙ্গিলনারায়ণ কুমার।

২২৪। **ধর্ম্মপ্রচারক** (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৪।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার উৎসাহে প্রতি পূর্ণিমায় এই বাংলা-হিন্দী মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। "আর্য্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা রক্ষা ও প্রচার" 'ধর্ম্মপ্রচারকে'র উদ্দেশ্য ছিল। সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরে, কৃষ্ণানন্দ স্বামী)।

২২৫। ভারত-চিকিৎসক (মাসিক) : কার্ত্তিক ১২৮৪।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন। সম্পাদক—শরচ্চন্দ্র দত্ত।

২২৬। পথিক (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮৪।

সম্পাদক—রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

ইং ১৮৭৮

২২৭। হিতৈষী (মাসিক) : জানুয়ারি ১৮৭৮।

"হিতৈষীর আদর্শ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ ঐশিক পুরুষ খ্রীষ্ট। সেই আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া হিতৈষীর তাবৎ বক্তব্য প্রকাশিত হইবে।" সম্পাদক—প্যারীমোহন রুদ্র।

২২৮। **হিন্দুললনা** (পাক্ষিক) : মাঘ ১২৮৪।

বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত, মহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় পাক্ষিক পত্রিকা।

২২৯। কালনা প্রকাশ (সাপ্তাহিক) : মাঘ (?) ১২৮৪।

২৩০। কমলিনী (মাসিক) : মাঘ ১২৮৪।

সম্পাদক—চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী।

২৩১। বিশ্বদর্শন (ত্রৈমাসিক) : গ্রীষ্মঋতু ১২৮৪।

সম্পাদক—সাকৃটিগড়-নিবাসী অমরেন্দ্রনাথ সোম। ইহা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হইত।

২৩২। **সমালোচক** (সাপ্তাহিক) : ৬ ফাল্গুন ১২৮৪।

"পত্রিকাখানির দু'টি উদ্দেশ্য আছে, একটি মুখ্য ও অপরটি গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্যটি কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া আন্দোলন করা; গৌণ উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে সাধারণের উপযোগী প্রস্তাব এবং সংবাদাদি দিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করা।" সম্পাদক—শিবনাথ শাস্ত্রী (প্রথম দুই-তিন সংখ্যা), পরে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র-সংক্রান্ত আইন :

১৮৭৮ সনের ১৪ই মার্চ্চ ভার্ণাক্যুলার প্রেস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। "দেশভাষার সংবাদপত্রসমূহের নিরঙ্কুশতা নিবারণ করা ঐ আইনের উদ্দেশ্য।"

এই আইনের ফলে কোন কোন বাংলা সাময়িক-পত্রের (যথা, 'সোমপ্রকাশ') প্রচার সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় সরকার 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র (তৎকালে বাংলা-ইংরেজী সাপ্তাহিক) প্রতিও প্রসন্ন ছিলেন না। রাজরোষ হইতে আত্মরক্ষার জন্য পত্রিকা-সম্পাদক এক কৌশল অবলম্বন করিলেন; তিনি পরবর্ত্তী ২১এ মার্চ্চ হইতে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'কে পুরাদস্তুর ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত এবং এপ্রিল মাস হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করেন।

২৩৩। **আনন্দবাজার পত্রিকা** (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৮৫।

"অমৃত বাজার পত্রিকা ইংরাজি হওয়ায়, তাহার স্থলে উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষদিগের প্রতিজ্ঞামতে এইখানি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।··· এখানি নামান্তরিত ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালা অমৃত বাজার পত্রিকা মাত্র।" ইহাই প্রকৃত পক্ষে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ১ম পর্য্যায়; এই নামে বর্ত্তমানে যে পত্রিকাখানি সগৌরবে চলিতেছে তাহা "নব পর্য্যায়"।

২৩৪। **বীণা** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৫।

"নানাবিষয়িনী কবিতাপ্রসবিনী" পত্রিকা। ইহাতে বাংলা গানের স্বরলিপি, গ্রন্থসমালোচন ও গল্পাদিও মাঝে মাঝে স্থান পাইত। বহু খ্যাতনামা লেখক ইহার লেখক-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সম্পাদক—রাজকৃষ্ণ রায়। 'বীণা'র বিভিন্ন খণ্ডগুলি এই ভাবে প্রকাশিত হয়:—

১ম খণ্ড ··· ১২৮৫, বৈশাখ-চৈত্র ··· আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত
২য় খণ্ড ··· ১২৮৬, বৈশাখ-চৈত্র ··· ঐ
৩য় খণ্ড ··· ১২৮৮, বৈশাখ··· ··· বীণা যন্ত্রে মুদ্রিত
৪র্থ খণ্ড ··· ১২৯৩, কার্ত্তিক—১২৯৪, আশ্বিন ··· ঐ

২৩৫। **বালকবন্ধু** (পাক্ষিক···) : ২০ বৈশাখ ১৮০০ শক।

বালক-পাঠ্য সচিত্র পাক্ষিক পত্র, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কেশবচন্দ্র সেন।

এই উৎকৃষ্ট পত্রখানি কিছু দিন পরে বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৮১, ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ইহা মাসিক আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এবারও কিছু দিন পরে তিরোধান ঘটে এবং ১২৯৩ সালে ১ম ভাগ পুনরায় প্রকাশিত হয়। ১২৯৮ সালের বৈশাখ মাসে 'বালকবন্ধু'র "নূতন প্রকরণ" মাসিক আকারে আবির্ভূত হইয়াছিল।

২৩৬। প্রকৃতি-রঞ্জন (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৫।

"সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক মাসিকপত্র প্রজাসাধারণের পাঠার্থ।" সম্পাদক—শারদাচরণ মিত্র, এম্-এ, বি-এল।

২৩৭। কৌমুদী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৫।

সুসঙ্গ দুর্গাপুর (ময়মনসিংহ) হইতে মহারাজ শিবকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের আনুকূল্যে প্রকাশিত "বিবিধ সঙ্গীত ও নানাবিষয়িনী কবিতাবিকাশিনী মাসিক পত্রিকা।" সম্পাদক—রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর।

২৩৮। উৎকল-ময়ুখ (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৫।

২৩৯। **বৰ্দ্ধমান সঞ্জীবনী** (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ (?) ১২৮৫।

বৰ্দ্ধমান প্রেস হইতে প্রকাশিত।

২৪০। **পরিচারিকা** (মাসিক) : ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত একখানি উচ্চাঙ্গের স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

কয়েক বৎসর পরে 'পরিচারিকা' পরিচালনের ভার পড়ে—আর্য্য নারীসমাজের উপর। সমাজের পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী ১২৯৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে পত্রিকাখানির সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৩০২ সালের বৈশাখ হইতে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী কিছু দিন এবং তাঁহার সহোদরা মণিকা দেবী শেষ এক কি দুই বৎসর পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই ভাবে ২৮ বৎসর চলিয়া 'পরিচারিকা'র প্রচার রহিত হয়।

১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে কুচবিহারের রাণী নিরুপমা দেবী সচিত্র আকারে নব পর্য্যায় 'পরিচারিকা' প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২৪১। **তত্ত্ব-কৌমুদী** (পাক্ষিক) : ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৮০০ শক।

কেশবচন্দ্রের দল ভাঙ্গিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র সৃষ্টি হইলে সমাজের মুখপত্রস্বরূপ এই পত্রিকাখানির উদ্ভব হয়। সম্পাদক—শিবনাথ শাস্ত্রী। 'তত্ত্ব-কৌমুদী' এখনও জীবিত আছে।

২৪২। **সুহৃদ** (মাসিক) : আষাঢ় ১২৮৫।

দিনাজপুর ভাটপাড়া উন্নতি-সাধিনী সভা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—তারণবন্ধু শৰ্ম্মা।

২৪৩। **কল্পদ্রুম** (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮৫।

উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্র। 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' ইহাতেই প্রথমে প্রকাশিত হয়। পরমায়ু ৫ বৎসর। সম্পাদক—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

২৪৪। **পঞ্চা-নন্দ** (মাসিক…) : ভাদ্র ১২৮৫।

স্বনামধন্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চুঁচুড়ার সাধারণী যন্ত্র হইতে 'পঞ্চা-নন্দ' নামে "একটি সরল রেখা কর্ত্তৃক সম্পাদিত বঙ্গ-প্রধান পত্র ও সমালোচন" প্রকাশ করেন। ১ম সংখ্যা প্রকাশের পর ধূমকেতুর মত ইহা সাহিত্যাকাশ হইতে সহসা অদৃশ্য হয়।

১৮৭৯ সনে ইন্দ্রনাথ কিছু দিনের জন্য ভবানীপুরে বাসা করেন। এই সময়ে স্থানীয় যুবকবৃন্দ—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ভূধর গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি 'পঞ্চা-নন্দ' পুনঃপ্রকাশের জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। পুনর্জীবিত 'পঞ্চা-নন্দ' এবার দেড় বৎসর এই ভাবে চলিয়াছিল :—

১ম কাণ্ড : ১ম সংখ্যা (পাক্ষিক), ভবানীপুর			১৬ মাঘ ১২৮৬ (২৯-১-৮০)
১১শ সংখ্যা (মাসিক), বৰ্দ্ধমান			১২৮৭ সাল (১১-১-৮১)
১২শ সংখ্যা	"	"	" (৮-২-৮১)
২য় কাণ্ড : ১ম সংখ্যা	"	"	"
৩য় সংখ্যা	"	"	১২৮৮ সাল
৪র্থ সংখ্যা	"	"	" (৩০-৮-৮১)
৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা	"	"	" (২০-৬-৮২)

'পঞ্চা-নন্দ' সত্য-সত্যই "জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, সরস ব্যঙ্গ, তীব্র বিদ্রূপ এবং পবিত্র আমোদের খনি" ছিল। ইহাতে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গচিত্রও থাকিত।

২৪৫। চন্দ্রশেখর (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৫।

চট্টগ্রাম হইতে কালীকুমার তর্কভূষণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৪৬। আর্য্য-প্রদীপ (মাসিক) : কার্ত্তিক ১২৮৫।

সুসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে প্রকাশিত। "সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনার্থ।" সম্পাদক, রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর।

২৪৭। বঙ্গদর্পণ (মাসিক) : কার্ত্তিক ১২৮৫।

ত্রিপুরা, পোষ্ট চাঁদপুর হইতে কার্ত্তিক মাসে প্রকাশিত হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

২৪৮। আর্য্য বিদ্যা সুধানিধি (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮৫।

বাংলা সংস্কৃত পত্রিকা। সম্পাদক—ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী।

২৪৯। দিবাকর (সাপ্তাহিক) : ইং ১৮৭৮।

বীরভূম হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। পর-বৎসর রাজরোষে ইহার মৃত্যু হয়। 'সোমপ্রকাশ' (৩-৫-১৮৮০) লিখিয়াছিলেন :—"দিবাকর নামে আমাদের সহযোগী একখানি সমাচারপত্র ছিল। [১৮৭৯ সনে] সোমপ্রকাশের মৃত্যু হইলে তিনি আমাদিগের সপক্ষতা করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহারও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।"

সাক্ষই সাক্ষী

সাক্ষীকে জেরা করছেন জজ। সাক্ষী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জজ জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি তোমার পবিত্র শপথ ক'রে বলছো যে, এই হস্তাক্ষর তোমার নয়?

জজের হাতে একখানি কাগজ। তাতে হস্তাক্ষর। সাক্ষী হস্তাক্ষর লক্ষ্য ক'রে খানিক ভেবে বললে,—হ্যাঁ হুজুর।

জজ আবার বললেন,—এটা তোমার হাতের লেখা নয়?

—না। সাক্ষী উত্তর দেয়।

জজ বললেন,—এই হাতের লেখার সঙ্গে কি তোমার হাতের লেখার কোন মিল দেখতে পাচ্ছো?

—না। সাক্ষী বলে।

জজের সন্দেহ যায় না। তিনি বললেন,—তুমি তোমার পবিত্র শপথ ক'রে বলছো যে, এই লেখার সঙ্গে তোমার হাতের লেখার কোন মিলই নেই?

—হ্যাঁ, হুজুর। সাক্ষী উত্তর দেয়।

জজ বিরক্ত হয়ে বলেন, এ লেখার সঙ্গে তোমার লেখার কোন ধরণের একটা মিলও দেখছো না?

—না, হুজুর। সাক্ষী উত্তর করে। নিশ্চয় নয়।

জজ তখন বললেন, তুমি নিশ্চয় ক'রে বলছো কি থেকে?

সাক্ষী তখন বললে, আমি যে লিখতেই জানি না হুজুর।

সত্য ঘটনা

রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতা

(সারাংশ)

জিম করবেট

এ এক আতঙ্কের কাহিনী—হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত গাড়োয়ালের অধিবাসীদের দীর্ঘ আট বছর এই আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। পাঁচ শত বর্গ মাইল স্থান জুড়ে চলেছিল এক নরখাদক চিতার অভিযান আর এই অভিযানে প্রাণ দিয়েছিল একশ' পঁচিশ জন হতভাগ্য। অতিশয় সন্তর্পণে সে চালাত তার কুটিল আক্রমণ, বাড়ীর নিরাপদ আশ্রয় থেকে সে তুলে নিয়ে যেত তার শিকারকে। তাকে মারবার সকল প্রচেষ্টা সে ব্যর্থ করে দিয়েছিল—বুলেট, ফাঁদ বা বিষ কিছু দিয়েই তাকে কাৎ করতে পারা যায়নি। শেষে গাড়োয়ালের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার স্যার উইলিয়ম ইবটসন "দি ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন"এর বিখ্যাত শিকারী মেজর করবেটকে আহ্বান করেন। মেজর করবেট দু'বছর ধরে রুদ্রপ্রয়াগের এই নরখাদকের অনুসরণ করেন এবং শেষে দশ সপ্তাহব্যাপী অবিরাম চেষ্টার পর তাকে বধ করেন।

নরমাংসের প্রতি এই চিতা বাঘটির লালসা কি করে জন্মাল? তার কারণ এই—১৯১৮ সালে ভারতে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভীষণ প্রকোপ হয় এবং তাতে দশ লক্ষের অধিক লোক মারা যায়। গাড়োয়ালীরা হিন্দু। মৃত ব্যক্তিকে তারা নদীতীরে দাহ করে। কিন্তু লোক যখন দলে দলে মরতে আরম্ভ করে, তখন আর দাহ করা সম্ভব হয় না। তখন তারা মৃতের মুখে একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে মৃতদেহটি পাহাড়ের উপর থেকে নীচে উপত্যকায় নিক্ষেপ করে। এই ভাবে নিক্ষিপ্ত মৃতদেহ থেকেই রুদ্রপ্রয়াগের চিতা বাঘটি প্রথম নরমাংসের স্বাদ পায়। তার পর সে মানুষ মারার কৌশলটি বেশ ভাল ভাবেই আয়ত্ত করে। কয়েক জন নিদ্রিত ব্যক্তির মধ্য থেকে সে এক জনকে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে যেতে আরম্ভ করে। রাত্রে চাষীরা দরজায় তার থাবার আঁচড়ের শব্দ শুনে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। এইরূপ চলে পুরো আটটি বছর। এই আট বছর সন্ধ্যার পর কেউ বাড়ি থেকে বেরুতে পারতো না, ভয়ে রাত্রে কেউ জানলা পর্যন্ত খুলতো না। কেউ কেউ সাধুদের দোষ দিত। হাজার হাজার লোকের বিশ্বাস ছিল, আক্রমণকারী চিতা বাঘ নয়, আসলে শয়তান—উপদেবতা। শেষে জিম করবেট প্রমাণ করেন, এই শয়তান আর কেউ নয়, অমিত শক্তিশালী এবং অতিশয় ধূর্ত আট ফুট লম্বা এক চিতা বাঘ।

করবেট সাহেব লিখছেন—"নিহত রমণীর স্বামীর মুখে সব শুনলাম। রাত্রির আহারের পর তার স্ত্রী বাসনগুলি পরিষ্কার করার জন্য দরজার কাছে যায়। সেখানটা একটু অন্ধকার ছিল। কিছুক্ষণ সাড়া-শব্দ না পেয়ে স্বামী দরজার কাছে গিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই। চীৎকার করে ডেকেও কোন উত্তর না পেয়ে সে দরজা বন্ধ করে দেয়। সে বললে, 'অন্ধকারের মধ্যে মৃতদেহ সন্ধান করতে গিয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে কি লাভই বা হত!' কথাটা হৃদয়হীন হলেও যুক্তি অকাট্য। আমি অবশ্য তার দুঃখের আসল কারণ পরে জানতে পারলাম। তার স্ত্রী ছিল আসন্নপ্রসবা। চিতা বাঘের আক্রমণের পর তার গর্ভস্থ পুত্র-সন্তানকে দেখতে পাওয়া যায়। স্ত্রীর জন্য যত না হোক, সন্তানের জন্য তার দুঃখ হয়েছিল সব চেয়ে বেশী।

একটি ক্ষেতের এক ধারে একটি খাদের মধ্যে মৃতদেহটি পড়ে ছিল। ক্ষেতের অপর প্রান্তে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে একটি পত্রহীন বাদাম গাছ। এই গাছের শাখাগুলির উপর ছিল একটি খড়ের গাদা। এটা ছিল মাটি থেকে চার ফুট উঁচুতে আর খড়ের গাদাটির উচ্চতা ছিল প্রায় দু'ফুট। আমি এই খড়ের গাদার উপর অবস্থানের সঙ্কল্প করলাম।

মৃতদেহের কাছ থেকে একটা সরু পথ খাদের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। এই পথের উপর রয়েছে চিতা বাঘের থাবার চিহ্ন। আমি যে চিতাটি দুই রাত্রি আমার পিছু নিয়েছিল, ঠিক তার থাবার চিহ্নের অনুরূপ। চিহ্নগুলি থেকে বোঝা গেল যে, বাঘটির আকার খুবই বড় এবং সে পুরুষ। তার পিছন দিকের বাঁ পায়ের থাবার চিহ্ন বিকৃত—চার বছর আগে তার এই পায়ে গুলী লেগেছিল।

আমি গ্রাম থেকে দু'টো আট ফুট লম্বা মোটা বাঁশ এনে মৃতদেহের কাছে সেই খাদের পথের উপর পুঁতে দিলাম। এই বাঁশের সঙ্গে আমার একটি রাইফেল ও একটি শট গান বেশ শক্ত করে বাঁধলাম। ট্রিগারের সঙ্গে সরু সিল্কের সুতো দিয়ে বেঁধে সুতো দু'টি একটু দূরে দু'টি খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে রাখলাম। আমার উদ্দেশ্য
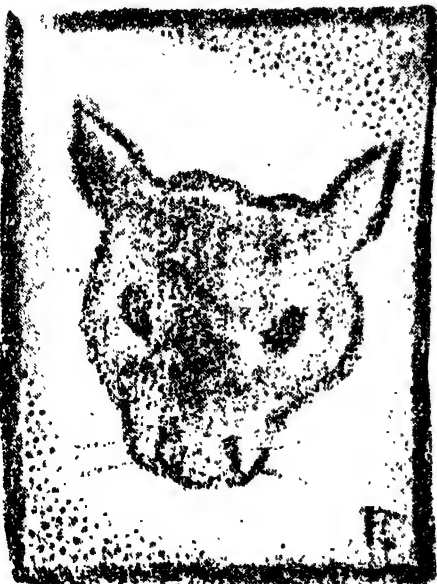
বাঘটা এই পথে আবার নিশ্চয়ই আসবে এবং যদি কোন ক্রমে সুতোয় টান পড়ে তাহলে রাইফেল ও শট গানের স্বতঃস্ফূর্ত গুলীতে সে নিহত হবে। আর যদি সে অন্য পথে আসে আর মৃতদেহ ভক্ষণের সময় আমি যদি তার উপর গুলী চালাই, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে খাদের পথ দিয়ে পালাতে হবে। আর খাদের পথে গেলেই তাকে ফাঁদে পড়তে হবে। রাত্রের অন্ধকারে বাঘ বা মৃতদেহ কিছুই দেখা যাবে না। এ জন্য গুলী করবার দিক ঠিক করার জন্য একখণ্ড সাদা পাথর এনে মৃতদেহ থেকে এক ফুট দূরে রেখে দিলাম।

সূর্য্য তখন অস্তায়মান। এক দিকে গঙ্গার উপত্যকা, অন্য দিকে তুষারমণ্ডিত হিমালয় এবং তার উপর অস্তায়মান সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হয়ে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছে। চোখ যেন আর ফেরাতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু এ দৃশ্য ভাল করে উপলব্ধি করার আগেই অন্ধকার নেমে এল। নৈশ অন্ধকারে পাহাড় উপত্যকা সব ডুবে গেল।

রাত্রির অন্ধকারের কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। কারো কাছে সামান্য অন্ধকারকে ঘন অন্ধকার বলে মনে হয়। আমার কাছে রাত্রির অন্ধকারকে অন্ধকার বলে মনে হয় না। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে রাত্রিতে আমি বেশ দেখতে পাই। দিনের মত স্পষ্ট দেখতে না পেলেও জঙ্গলের মধ্য দিয়েও চলতে আমার কোন অসুবিধা হয় না।

বাঘটিকে লক্ষ্য করার সুবিধা হবে বলে আমি মৃতদেহটির কাছে সাদা পাথর রেখেছিলাম। কিন্তু বিধি বাম। সন্ধ্যা হতে না হতেই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল এবং বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হল। খাদের মধ্যে একটা পাথর পড়ার শব্দ পেলাম আর তার এক মিনিট পরেই আমি যেখানে বসেছিলাম তার নীচের খড়ের উপর খস্‌খস শব্দ হল। বুঝলাম বাঘ এসেছে। আমি খড়ের গাদার উপর বসে জলে ভিজতে লাগলাম আর সে অর্থাৎ চিতা বাঘটা নীচে শুক্‌নো খড়ের মধ্যে আরামে সময় কাটাতে লাগলো।

এত প্রবল ঝড় আর কখনো দেখিনি। দেখলাম, সেই ঝড়ের মধ্যে কে এক জন একটা লণ্ঠন নিয়ে গ্রামের দিকে যাচ্ছে। লোকটার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে জানতে পারলাম যে, সরকার আমাকে রাত্রিতে শিকারের জন্য যে বৈদ্যুতিক টর্চ্চ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, লোকটি পাউরি থেকে তিরিশ মাইল হেঁটে সেই টর্চ্চ নিয়ে আসছিল। তিন ঘণ্টা আগে যদি এই টর্চ্চটা পেতাম তাহলে······কিন্তু দুঃখ করে লাভ নেই। এর পর যে চোদ্দ জন লোক চিতা বাঘটার হাতে প্রাণ দিল তারা বাঘের মুখে না পড়লেও যে আরও অধিক দিন বাঁচতো, সে কথা কে বলতে পারে? আর বৈদ্যুতিক টর্চ্চ যদি ঠিক সময়ে পেতাম, তাহলেও যে বাঘটাকে মারতে পারতাম, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

যাই হোক, বৃষ্টি তক্ষুনি থেমে গেল কিন্তু আমি শীতে কাঁপতে লাগলাম। আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে সাদা পাথরটা নজরে পড়ল। কিন্তু হঠাৎ সামনে কিছু পড়ায় পাথরটা আর দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম চিতা বাঘটা আহারে মন দিয়েছে। দশ মিনিট পরে সাদা পাথরটা আবার দেখা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মাচার নিচে একটা শব্দ হল। দেখলাম ফিকে হলদে রংএর একটা বস্তু খড়ের গাদার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার চলার শব্দটা একটু অদ্ভুত ধরণের—ঠিক যেন কোন মহিলার রেশমী পোষাকের খস্‌খস্ শব্দের মত।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিলাম। ঠিক করলাম, যে মহূর্ত্তে সাদা পাথরটা আড়াল পড়বে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই গুলী করবো। কিন্তু একটা ভারি রাইফেল আর কতক্ষণ কাঁধে রাখা যায়। সেই রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা আবার আড়াল হল। দু'ঘণ্টার মধ্যে এই রকম আরও তিন বার হল। চতুর্থ বার যখন বস্তুটা আমার মাচার নীচে এল তখন আর আমি থাকতে না পেরে গুলী করলাম। পরদিন সকালে দেখলাম, যেখানে গুলী করেছিলাম, সেখানে চিতা বাঘের ঘাড়ের কয়েক গাছা রোঁয়া পড়ে আছে।

রাত্রির ব্যর্থতার পর পাহাড় থেকে নেমে রুদ্রপ্রয়াগে যাবার সময় আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ব্যায়াম, গরম জল আর খাদ্য দুর্ভাবনা অনেকটা দূর করে দেয়। গরম জলে স্নান করে এবং প্রাতরাশের পর ভাবনা অনেকটা কেটে গিয়ে মাথাটা সাফ হয়ে গেল। ভেবে দেখলাম, বাঘটাকে মারার সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছে, কারণ এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিক টর্চ্চ আমার হস্তগত। কিন্তু কথা হচ্ছে, বাঘটা অলকনন্দা অতিক্রম করেছে কি না। আমার ধারণা হল যদি সে অলকনন্দা অতিক্রমণ ক'রে থাকে, তবে নিশ্চয়ই সে ঝোলান সেতুর উপর দিয়েই গেছে। এই খবরটা সংগ্রহ করার জন্য প্রাতরাশের পর বেরিয়ে পড়লাম।

রুদ্রপ্রয়াগ সেতুতে পৌঁছবার পথ তিনটে। একটা উত্তর দিক থেকে, একটা দক্ষিণ থেকে আর একটা বাজার থেকে পায়ে-চলা পথ। পথগুলি পরীক্ষার পর সেতু পার হলাম। কেদারনাথ যাবার পথ দিয়ে আধ মাইল পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলাম। ভাল ভাবে পরীক্ষার পর বুঝতে পারলাম যে, বাঘটা নদী অতিক্রম করেনি। তখন আমি সেতু দুইটি রাত্রে বন্ধ করে দেবার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে মনস্থ করলাম। সেতু-রক্ষকরা সহযোগিতা করলে আমার পরিকল্পনা সফল হতে বাধ্য। নদী পারাপারের একমাত্র অবলম্বন সেতু বন্ধ করে দেওয়া অন্যায় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অন্যায় হয়নি। কারণ আমাদের মহামান্য চিতার সান্ধ্য আদেশ জারীর ফলে কেউ সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয়ের মধ্যে সেতু ব্যবহার করে না।

কাঁটার ঝোপ দিয়ে সেতু দু'টি বন্ধ করে দেওয়া হল। সেতুর বাম তীরে একটা টাওয়ার ছিল। কুড়ি ফুট উঁচু টাওয়ার আর তার শীর্ষদেশে একটি বেদীর মত ছিল। বাঁশের মই দিয়ে তার উপর উঠতে হল। এই টাওয়ারের উপর আমাকে কুড়িটি রাত কাটাতে হয় সেতু পাহারা দেবার জন্য। এক-এক সময় এমন ঝড় দিত, যে, মনে হত বুঝি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে ৬০ ফুট নীচে অলকনন্দার বরফ-জলে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কুড়িটি রাতের মধ্যে একটা শেয়াল ছাড়া আর কাউকে সেতু অতিক্রম করতে দেখা যায়নি।

সেতু পাহারা দেবার সময় ইবটসন ও তাঁর স্ত্রী জীন পাউরি থেকে এসে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁদের বাংলো ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের উপর তাঁবু খাটালাম। আত্মরক্ষার জন্য তাঁবুর চার দিকে

কাঁটার বেড়া দেওয়া হল। তাঁবুর ঠিক উপরে একটা মস্ত বড় গাছের কয়েকটা ডাল এসে পড়েছে। তাঁবুর মধ্যে আমরা আট জন ছিলাম। রাত্রির আহার শেষ হলে কাঁটার বেড়ার যে ফাঁক দিয়ে আমরা প্রবেশ করেছিলাম, তা বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে, গাছের ডালের সাহায্যে চিতা বাঘটা অনায়াসে আমাদের তাঁবুর মধ্যে আসতে পারে। কিন্তু তখন আর কিছু করবার ছিল না। যদি চিতা বাঘের হাত থেকে একটা রাত রক্ষা পাওয়া যায়, তাহলে পরের দিন গাছটা কেটে ফেলা যাবে এই ঠিক হল।

আমার বিছানা থেকে ঠিক এক গজ দূরে আমার পাচক আর তার পাশে নৈনিতাল থেকে নিয়ে আসা ছ'জন গাড়োয়ালী তাল পাকিয়ে শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পরেই আমার পাচকটি নাক ডাকাতে শুরু করলো। পাচ থেকেই ছিল আমাদের বিপদের আশঙ্কা আর সেই কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

চন্দ্রালোকিত রাত্রি। হঠাৎ মাঝ রাত্রে চিতা বাঘের গাছে উঠার শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তক্ষুনি রাইফেলটা হাতে নিয়ে চটিটা পায়ে দিতে না দিতেই গাছের উপর চড়াৎ করে একটা শব্দ হল আর বাবুর্চিটা চিৎকার করে উঠলো—"সাহেব, বাঘ—বাঘ!"

আমি এক লাফে বাইরে এলাম, কিন্তু নিমেষের মধ্যে বাঘটা ছুটে পালালো এবং মাঠের উপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেলো—তখন আর বৃথা চেষ্টা। বাবুর্চিটা পরে আমায় বললে যে, সে চিৎ হয়ে ঘুমুচ্ছিলো, হঠাৎ শব্দ শুনে যেই না চোখ খোলা অমনি দেখে কি ছ'টো জ্বলন্ত আগুনের ভাঁটা—বাঘটা তখন তার উপর লাফ দেবার উপক্রম করছে—এই অবস্থায় সে চিৎকার করে উঠে।

পরের দিন গাছটা কেটে ফেলা হল আর বেড়াও শক্ত করে বাঁধা হলো। কিন্তু এর পর কয়েক সপ্তাহ সেই তাঁবুতে অবস্থান করা সত্ত্বেও বাঘের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

কিন্তু নিকটবর্তী গ্রাম থেকে বাঘের আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া যেতে লাগলো। ইবটসনরা আবার কয়েক দিন পরে খবর পাঠালেন যে, রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ছ'মাইল দূরবর্তী একটা গ্রামে একটা গরু মারা পড়েছে।

গ্রামে পৌঁছে আমরা দেখলাম যে, একটা চিতা বাঘ একটা ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে গরুটাকে মারে এবং তাকে টেনে দরজার কাছ পর্য্যন্ত নিয়ে আসে। কিন্তু দরজাটা ছোট বলে তাকে নিয়ে যেতে পারেনি, তবে খানিকটা উদরসাৎ করে গেছে। ছ'-এক দিন পরে অন্য একটা গ্রামে ঠিক এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। এই গ্রামে নিহত গরুটার কাছে আমরা একটা মাচান বেঁধে শিকারের অপেক্ষায় রইলাম। রাত তখন ঠিক দশটা। ব্যাঘ্ররাজ এলেন ঠিক একেবারে আমাদের মাচানের তলায়। মাচার উপর আমি আর ইবটসন আর তার তলায় বাঘ। এমন সুযোগ আর হয় না। আমি একবারে রাইফেল নিয়ে তৈরী হয়ে রইলাম—যেই বেরুবে অমনি গুলী করবো। এমন সময় মাচার উপর ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো। অনেকক্ষণ এক ভাবে বসে থাকায় ইবটসনের পা ধরে গিয়েছিল বলে তিনি একটু নড়ে বসলেন। কিন্তু সেই শব্দে চিতা বাঘটা তার আহার ফেলে পালাল।

ছ'রাত্রি পরে রুদ্রপ্রয়াগ বাজারের কাছে আর একটা গরু মারা পড়লো। যেখানে গরুটাকে মারা হয়েছিল, তার প্রায় কুড়ি গজ দূরে পাহাড়ের ঠিক ধারে একটা বড় গাছের উপর একটা মাচা বাঁধা ছিল। ইবটসন আর আমি এই মাচার উপর থেকে শিকার করতে মনস্থ করলাম।

নরখাদক চিতা শিকারে সাহায্যের জন্য সরকার কয়েক দিন আগে একটা ফাঁদ পাঠিয়েছিলেন। ফাঁদটা পাঁচ ফুট লম্বা আর তার ওজন এক মণ। এরূপ ভয়ানক ফাঁদ আমি কখনো দেখিনি। এর চব্বিশ ইঞ্চি লম্বা ছ'পাটি ধারাল দাঁত আর এক-একটা দাঁত তিন ইঞ্চি করে লম্বা। ছ'টো শক্তিশালী স্প্রিং দ্বারা এই ফাঁদ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এটা প্রয়োগ করতে ছ'জন লোক লাগে।

নিহত গরুটাকে ফেলে বাঘটা যখন ছ'টো মাঠ পার হয়ে পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো, তখন আমরা তার যাতায়াতের পথের উপর ছ'টো মাঠের ঠিক সংযোগস্থলে ফাঁদ পাতলাম। ফাঁদের ছ'দিকে কিছু গাছ-পালা দিয়ে ফাঁদটাকে একটা খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো। আর আমরা পূর্ব্বোক্ত মাচার উপর বসে ব্যাঘ্রপুঙ্গবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। রাত্রি ১টার আগে চাঁদ উঠবার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই আমাদের বৈদ্যুতিক টর্চের সাহায্য নিতে হলো। ইবটসনের কথামত আমার বন্দুকের সঙ্গেই টর্চটা বেঁধে রাখলাম।

সন্ধ্যা হওয়ার এক ঘণ্টা পরে বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে চার দিক কেঁপে উঠলো। বুঝলাম বাঘটা ফাঁদে পড়েছে। বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বেলে দেখি বাঘটা ফাঁদে পড়েছে আর মুক্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে গুলী করলাম। ফলে যে শেকল দিয়ে ফাঁদটা খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা ছিল, সেটা গেল ছিঁড়ে। বাঘটা তখন সেই ফাঁদ শুদ্ধ নিয়ে পালাতে লাগলো। আমি আবার গুলী করলাম। ইবটসনও ছ'টো গুলী ছুঁড়লেন, কিন্তু কোনোটাই বাঘের গায়ে লাগলো না। এই সময় রাইফেলে গুলী ভরতে গিয়ে বৈদ্যুতিক টর্চটা গেল খারাপ হয়ে।

চিতা বাঘের গর্জ্জন এবং আমাদের গুলীর শব্দে রুদ্রপ্রয়াগ বাজারের লোকরা ও নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসীরা আলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো। আমরা তাদের সরে যেতে বললাম, কিন্তু তারা এত গোলমাল করছিল যে, আমাদের কথা তারা শুনতে পেলো না। তখন আমি আর ইবটসন বন্দুক নিয়ে গাছ থেকে নেমে বাঘটা যে দিকে গেছে সেই অগ্রসর হলাম। আমরা মাচার উপর একটা গ্যাসের আলো নিয়ে গিয়েছিলাম। কিছু দূর এগিয়েই বাঘটার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। বাঘটা তখনো ফাঁদে জড়িয়ে গর্জ্জন করছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার রাইফেলের গুলী তার মাথার খুলি ফুটো করে দিল। ততক্ষণে এক উত্তেজিত জনতা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। তাদের বহু দিনের শত্রুর পতনে তাদের আনন্দ দেখে কে!

নিহত বাঘটা একটা বেশ বড় আকারের পুরুষ চিতা। এই বাঘটার কবলে বহু লোক প্রাণ দিয়েছিল। সকলেই ঠিক করলো যে, এই সেই বিখ্যাত নরখাদক চিতা, যে রুদ্রপ্রয়াগের অধিবাসীদে

মধ্যে বহু দিন ধরে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। আমার কিন্তু বিশ্বাস হলো না। পূর্ব্বে বর্ণিত নিহত রমণীর মৃতদেহের উপর মাচা বেঁধে অবস্থানের সময় আমি যে চিতা বাঘটাকে দেখেছিলাম, এ কিন্তু সে নয়, আমার মনে হলো।

যাই হোক, বাঘটাকে নিয়ে উৎফুল্ল জনতা শোভাযাত্রা সহকারে অগ্রসর হল। সকলের আনন্দের সীমা নেই। এই প্রথম রাত্রিতে বাজারের প্রত্যেক বাড়ীতে আলো জ্বললো। নারী ও শিশুরা পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে বাঘটাকে দেখতে লাগলো। সকলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সকলের দেখা শেষ হলে আমাদের লোক-জন বাঘটাকে বাংলোয় নিয়ে এলো। এই বাঘটা নিয়ে ইবটসনের সঙ্গে আমার তর্ক হলো। ইবটসনের ধারণা, আসল বাঘটাকেই মারা হয়েছে। শেষে স্থির হলো, আগামী পরশু রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে আমরা পাউরি যাত্রা করবো।

সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম। পরদিন প্রত্যুষে উঠে 'ছোট হাজরি' খাচ্ছি এমন সময় পথে গোলমাল শুনতে পেলাম! কি ব্যাপার! চার জন লোক এসে আমাকে জানাল যে, ছোট পিপল সেতু থেকে এক মাইল দূরে নরখাদক বাঘের আক্রমণে এক যুবতী নিহত হয়েছে। তাদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গেলাম। দেখি, যুবতীটির বয়স হবে আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে। একটা পাথরের তৈরী ঘরের মধ্যে যুবতীটি তার স্বামী ও ছ'মাসের শিশুপুত্র নিয়ে থাকতো। ঘটনার রাত্রে স্বামী বাড়ী ছিল না, কি একটা মামলায় সাক্ষী দেবার জন্ত পাউরি গিয়েছিল, স্ত্রী-পুত্রের ভার দিয়ে গিয়েছিল পিতার উপর। রাত্রে শ্বশুরের খাওয়া হলে শিশুপুত্রকে তার কোলে দিয়ে যুবতীটি দরজা খুলে বাইরে গিয়ে বসে, এমন সময় বাঘটা পিছন দিক থেকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে। বাঘটা যুবতীটিকে মুখে নিয়ে দু'টো মাঠ পার হয়। মাঠ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে বারো ফুট নীচে একটা পথ। শিকার মুখে নিয়ে সে উপর থেকে পথের উপর লাফ দেয়। যুবতীর ওজন হবে প্রায় এক মণ পঁয়ত্রিশ সের। এত ভারি দেহ মুখে করে সে বারো ফুট নীচে লাফ দিয়েছে, অথচ মৃতদেহটি মাটিতে পড়েনি। তাকে সম্পূর্ণ শূন্তে রেখেই সে লাফ দিয়ে পড়ে। প্রায় দু'মণ ওজনের একটা মৃতদেহকে যে বিড়ালছানার মত মুখে করে নিয়ে যেতে পারে, তার ক্ষমতা যে কি অসাধারণ তা কতকটা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

অপরাহ্ণ ৪টার সময় আমরা বাঘ শিকারের জন্ত প্রস্তুত হয়ে মৃতদেহের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়ে মাচায় বসবার উদ্যোগ-আয়োজন করার আগেই বাঘের সাড়া পাওয়া গেল। বাঘটা তখন পাহাড় থেকে নেমে আসছে। তখন আমরা তার দিকে বন্দুক নিয়ে অগ্রসর হলাম। ইবটসন আলো ধরলেন। কিন্তু পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে বাঘের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। রাত্রে পাহাড়ের উপর উঠে আমরা একটা বাড়ী পেলাম এবং সেই বাড়ীতেই রাত কাটালাম। বাঘটা আমাদের পিছু নিয়ে সেই বাড়ী পর্য্যন্ত এসেছিল, সেটা পরে টের পাওয়া যায়। পরদিন প্রাতে সেই যুবতীর মৃতদেহের কাছে গিয়ে দেখি বাঘ রাত্রে তার কাছে আসেনি। ইবটসন প্রাতঃরাশের পর রুদ্রপ্রয়াগ যাত্রা করলেন, আমিও নৈনিতাল যাবার জন্ত প্রস্তুত হতে লাগলাম। এমন সময় কয়েক জন লোক এসে খবর দিলে, চার মাইল দূরে এক গ্রামে চিতা বাঘ কর্ত্তৃক একটা গরু নিহত হয়েছে। সেই গ্রামে গিয়ে মরা গরুটার কাছে আমার সেই সরকারের দেওয়া ফাঁদ পাতলাম আর কিছু দূরে একটা গাছের উপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কিছুই হল না। ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসায় গ্রামে ফিরলাম। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়ে গ্রামের মোড়ল আমায় জানালে, রাত্রে সে দরজায় চিতার আঁচড়ের শব্দ শুনেছে। তার কথা মিথ্যা নয়। পরের দিন সকালে দেখা গেল, দরজায় চিতার আঁচড়ের আর চার পাশে তার থাবার চিহ্ন। বুঝতে পারলাম, বাঘ আমার পিছু নিয়েছে। তখন ১৯২৫ সালের শরৎ কাল। ব্যর্থতা ও ক্লান্তি নিয়ে আমি গাড়োয়াল ছেড়ে যাবার স্থির করলাম। গাড়োয়ালীদের নরখাদক চিতার হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া নিষ্ঠুরতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু পরিশ্রমের একটা সীমা আছে। অনির্দ্দিষ্ট কাল ধরে অত্যধিক পরিশ্রম করা যায় না। তার পর রাত্রে চিতা বাঘের হানা। নরখাদক বাঘ যদি কারও পিছু নেয়, তাহলে চাঁদের আলো যতই সুন্দর হোক না কেন, মোটেই তৃপ্তিদায়ক হয় না। আমার এই চলে যাওয়ায় সংবাদপত্রগুলি পর্য্যন্ত আমাকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি।

যাই হোক, ১৯২৬ সালের বসন্ত কালে আমি আবার ফিরে এলাম—নতুন উদ্যমে সুরু হল শিকারের অভিযান। আমার তিন মাসের অনুপস্থিতির সুযোগে বাঘটা আরও দশ জনকে মেরেছে শুনলাম। মার্চ্চ মাসের শেষ তারিখে ইবটসন পাউরি থেকে ফিরে এলেন। পরদিন সকালে প্রাতরাশের সময় সংবাদ পাওয়া গেল, রুদ্রপ্রয়াগের উত্তর-পশ্চিমে একটি গ্রামের নিকট চিতার আবির্ভাব হয়েছে। গ্রামে গিয়ে আমরা একটা ছাগল কিনলাম। গ্রামের আধ মাইল উত্তরে একটা পাহাড়ের উপর ছোট ছোট ঝোপ আর অনেক গুহা। সেখানে বাঘের অবস্থিতি খুবই সম্ভব। আমরা ছাগলটাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখলাম আর কিছু দূরে বড় বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করলাম। ছাগলটা ভীষণ চীৎকার সুরু করে দিল, কিছুক্ষণ পরে আর ছাগলের চীৎকার শোনা গেল না। বুঝলাম বাঘ এসেছে। দেখলাম, ছাগলটা সামনের জঙ্গলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে কান খাড়া করে আছে। আমি আর ইবটসন কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কিছু দেখতে পেলাম না। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসায় আমাদের ছাগল নিয়ে ফিরে আসতে হল। ফেরবার সময় আমরা ছাগলটাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ছাড়া পাবা মাত্র সে এমন ছুট দিলে যে, তার আর টিকি দেখতে পাওয়া গেল না। সে যে পথে গিয়েছিল, সেই পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে আমরা শুধু তার মৃতদেহটা পেলাম। চিতা তার টুঁটি কেটে পথের উপর ফেলে দিয়ে গেছে সম্ভবতঃ আমাদের ব্যঙ্গ করার জন্ত।

পরদিন রুদ্রপ্রয়াগ থেকে খবর এল, আমাকে সেখানে যেতে হবে, কারণ পূর্ব্ব-রাত্রে একটা লোক চিতা বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

বাংলোয় গিয়ে দেখি, ইবটসন নন্দরাম বলে একটা লোকের সঙ্গে কথা কইছেন। নন্দরামের গ্রাম আমাদের গত রাত্রের শিকারের জায়গা থেকে চার মাইল দূরে। সেই গ্রাম থেকে আধ মাইল দূরে গাইয়া নামে এক তপশীলী খানিকটা জঙ্গল সাফ করে একটা বাড়ী তৈরী করেছিল। সেখানে সে তার মা, স্ত্রী ও তিনটি সন্তানকে

নিয়ে বাস করতো। সকালে গাইয়ার বাড়ীর মেয়েদের কান্না শুনে নন্দরাম তার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে, গাইয়াকে বাবে নিয়ে গেছে। নন্দরাম সেই সংবাদই ইবটসনকে দিচ্ছিল।

আমরা গিয়ে দেখি, বাঘটা গাইয়াকে মারার পর পাঁচশ' গজ দূরে টেনে নিয়ে গেছে। মৃতদেহটা ঝোপে-ঘেরা একটা গর্ত্তের মধ্যে পড়ে আছে। কাছে কোন গাছ না থাকায় আমাদের মাচা বেঁধে শিকার করার সুবিধা হল না। বাঘটা মৃতদেহের তিন জায়গা থেকে মাংস ছিঁড়ে খেয়েছিল, আমরা সেই খাওয়া জায়গাগুলিতে সায়ানাইড বিষ মিশিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে দেখা গেল, যেখানে বিষ মেশান হয়েছিল, সেই জায়গাগুলি বাদ দিয়ে বাঘ শরীরের অন্য অংশ থেকে মাংস খেয়েছে, আর মৃতদেহটা আর একটু জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

এবার বেশী ক'রে সায়ানাইড দেওয়া হল এবং পরের দিন দেখা গেল, বাঘটা মৃতদেহের অনেকখানি খেয়ে ফেলেছে। বুঝতে পারা গেল, অনেকখানি বিষ তার শরীরে প্রবেশ করেছে। যে বিষ দেওয়া হয়েছিল, তা একটা বাঘের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট। তখন বাঘটাকে খোঁজ করার আয়োজন করা হল। গ্রামের পাটোয়ারি দুপুর নাগাদ দু'শ' লোক যোগাড় করে আনলে। এই সব লোক শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বন ঠেঙ্গাতে লাগল। এখান থেকে আধ মাইল দূরে পাহাড়ে একটা গুহা ছিল। এই গুহার মধ্যে একটা চিতা বাঘ অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। আমরা দেখলাম গুহার মুখে চিতার পায়ের আঁচড়ের দাগ। আমরা ঠিক করলাম বাঘটা নিশ্চয়ই গুহার মধ্যে ঢুকেছে। তখন আমরা পাথর এনে গুহার মুখটা বেশ ভাল ভাবে বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এলাম। পরের দিন তারের জাল দিয়ে গুহার মুখ এঁটে দেওয়া হল। তার পর দশ দিন আর বাঘের কোন পাত্তা নেই, আশ-পাশ কোথাও থেকে আর চিতার হানার সংবাদ নেই। তখন আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, বাঘটা গুহার মধ্যে নিশ্চয় মরে গেছে।

এ কথা চার দিকে প্রচার হতে দেরী হল না। সকলে একটু নিশ্চিন্ত হল এবং অসতর্ক ভাবে বাইরে বেরুতে আরম্ভ করল। আসলে বাঘটা কিন্তু মরেনি। তাকে যে সায়ানাইড দেওয়া হয়েছিল তার শক্তি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হল। বাঘটা সম্ভবতঃ বিষক্রিয়া থেকে সুস্থ হয়ে কোন রকমে অন্য পথে গুহা থেকে বার হয় এবং যারা অসতর্ক ভাবে চলাফেরা আরম্ভ করেছিল তাদের এক জনকে শেষ করে। তার এবারের শিকার ৭০ বছর বয়সের এক বুড়ী। বাঘটা তাকে ঘর থেকে মুখে করে তুলে নিয়ে যায়। বুড়ী প্রাণপণে চীৎকার করতে থাকলেও গ্রামবাসীদের এমন সাহস হয়নি যে, তাকে রক্ষা করতে অগ্রসর হয়। কিছু দূর নিয়ে গিয়ে বাঘটা বুড়ীটাকে মেরে ফেলে।

বুড়ীর মৃতদেহের কাছে মাচা বাঁধবার উপায় ছিল না। এবার আমরা এমন আয়োজন করলাম যাতে বাঘটা নিশ্চয়ই মারা পড়বে। এবার বুড়ীটার দেহে প্রচুর পরিমাণ সায়ানাইড মিশিয়ে দেওয়া হল। বুড়ীর কাছে যাবার পথের উপর গর্ত্ত খুঁড়ে তার উপর আমার সেই সাংঘাতিক ফাঁদ পাতা হল। ফাঁদের উপর গাছপালা এমন ভাবে দেওয়া হলো, যাতে উপর উপর কিছু বুঝতে না পারা যায়। এর পর মৃতদেহ থেকে কিছু দূরে দু'টো রাইফেল বসান হল। রাইফেলের মুখ রইল বুড়ীটার দিকে। ট্রিগার রেশম দড়ি দিয়ে বেঁধে সেই দড়িটা মৃতদেহের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। বাঘটা মাংস খাবার জন্য বুড়ীর শরীরে মুখ দিলেই দড়িতে টান পড়ে গুলী ছুটে যাবে এমন ব্যবস্থা করে রাখলাম। অবশ্য রাইফেল দু'টো ঢাকা দিয়ে রাখা হল। এইবার আমরা অনেকটা দূরে একটা গাছে মাচা বেঁধে অবস্থান করতে লাগলাম—উদ্দেশ্য, বাঘটা যদি ফাঁদে পড়ে চেঁচায় তখন আমরা গিয়ে বাঘটাকে মেরে ফেলবো।

রাত্রি তখন পৌনে আটটা। হঠাৎ ক্রমাগত চিতার ক্রুদ্ধ গর্জ্জন শোনা যেতে লাগল। শব্দটা আসছিল ঠিক মৃতদেহটার দিক থেকে। আমরা বুঝলাম, এত দিনে রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতা ফাঁদে পড়েছে। আমরা আনন্দে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। আমাদের ভাগ্য ভাল যে, এত উঁচু থেকে লাফ দিয়ে আমাদের অঙ্গহানি হয়নি। পেট্রোম্যাক্স জেলে নিয়ে আমরা মৃতদেহের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি পাখী উড়ে গেছে। কোথায় বাঘ আর কোথায় কে! চিতা যথারীতি আরও খানিকটা মাংস খেয়ে চম্পট দিয়েছে। কিন্তু তাহলে সে গর্জ্জন করলো কেন? বাঘটা অতি সন্তর্পণে এসে মৃতদেহের যে সব অংশে বিষ দেওয়া হয়েছিল তা বাদ দিয়ে অনেকখানি মাংস খেয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু যাবার সময় তার পিছনের একটা পা ফাঁদে আটকে যায়। তখন সে ফাঁদটাকে কিছু দূর টেনে নিয়ে যায় আর ফাঁদের একটা দাঁত ভাঙ্গা থাকায় টানাটানি করে পা টা বার করে নেয়। বন্দুকের গুলীও ছোটেনি আর সে গর্ত্তের মধ্যেও পড়েনি। তার এবারকার পলায়ন অত্যন্ত বিস্ময়জনক। এ রকম একটা ঘটনার পর বাঘটার পক্ষে অন্ততঃ দু'-এক দিন চুপচাপ থাকাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সে তা করেনি। সন্ধ্যায় সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় মাটী নরম হয়ে যাওয়ায় আমরা তার গতিবিধি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ফাঁদ থেকে মুক্তিলাভ করে সে আমরা যে গাছে মাচা বেঁধে অবস্থান করছিলাম সেই গাছের তলায় আসে। তখন আমরা নিদ্রিত। আমরা ভেবেছিলাম এরূপ ঘটনার পর আর বাঘের আশা করা বৃথা। এই জন্য আমরা একটু নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিলাম। ভাগ্যে ইবটসন গাছের গোড়ার চার দিকে তারের জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন, নইলে সেই রাত্রিই আমাদের শেষ রাত্রি হত। গাছের তলা থেকে সে সোজা রুদ্রপ্রয়াগে যায় এবং বাজারের প্রধান সড়ক দিয়ে আমাদের বাংলোর ফটক পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এখান থেকে সে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং যাবার পথে দু'টো ছাগলকে মেরে রেখে যায়।

পরের দিন আমি যখন রুদ্রপ্রয়াগের পূব দিকের গ্রামগুলি পরিদর্শন করছিলাম, তখন দেখলাম, চিতা বাঘের পায়ের দাগ একটা গ্রাম থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। সেই পথ অনুসরণ করে আমি পাহাড়ের উপর এসে হাজির হলাম। তখন সবে ভোর হয়েছে। যদি চিতাটার দেখা পাওয়া যায়, এই আশায় আমি একখানা পাথরের উপর বসে পড়লাম। আগের দিন বৃষ্টি হওয়ায় আবহাওয়া একেবারে নির্ম্মল ছিল। চতুর্দ্দিকের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হয়ে গেল। আমি যেখানে বসেছিলাম, ঠিক তার নীচে অলকনন্দার

সৌন্দর্য্যমণ্ডিত উপত্যকা, আর তার মধ্য দিয়ে রূপালি ফিতার মত অলকানন্দা নদী এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গ্রাম। বাড়ীগুলি বেশীর ভাগই খড়ের এবং তাও আবার খরচ বাঁচাবার জন্ম একটির গায়ে আর একটি। গাড়োয়ালে সমতল ভূমি বেশী নেই। যেটুকু সমতল ক্ষেত্র পাওয়া যায়, সেখানে চাষ করতে হয়, কাজেই পাহাড়ের গায়ে বাড়ী করা ছাড়া উপায় নেই।

পাহাড়ের ওপারে সুউচ্চ পর্ব্বতের চূড়া। শীতকালে ও বসন্তের প্রথম দিকে এই সব পর্ব্বত-শীর্ষ থেকে নেমে আসে স্খলিত তুষার-স্তূপ। তারও ওপারে দেখা যায়, অনন্ত তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দিগন্ত স্পর্শ করেছে। এমন শ্রী-মণ্ডিত দৃশ্যের মাঝে যখন সূর্য্য অস্ত যায়, চারি দিকে নেমে আসে রাত্রির অন্ধকার, তখন সৃষ্টি হয় আতঙ্কের। এ আতঙ্ক কল্পনা করা যায় না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া এই আতঙ্কের স্বরূপ বোঝা যাবে না। রুদ্রপ্রয়াগ এলাকার লোক এই আতঙ্কে শিউরে উঠতো সুদীর্ঘ আট বছর ধরে।

ঘণ্টা খানেক বসে থাকার পর মাইল খানেক দূর থেকে হু'জন লোক এসে খবর দিলে যে, সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ আগে তারা এই দিকে চিতা বাঘের ডাক শুনেছে। চার দিকে চেয়ে দেখলাম—কেবল মাত্র একটি দেবদারু গাছ ছাড়া কাছাকাছি আর কোন শিকারের জায়গা নেই। আমি সেই গাছ থেকেই শিকার করার মনস্থ করলাম। চিতা বাঘ যাতে ছাগলের ডাক শুনে গাছের তলায় আসে, সে জন্য একটি ছাগল আনা হল। সন্ধ্যার একটু আগেই আমি গাছে উঠে পড়লাম। গাছে উঠতে অবশ্য অনেক বেগ পেতে হল, কারণ গাছের গোড়া থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত কোন শাখা ছিল না। আমি রাইফেলটা দড়ি দিয়ে বেঁধে সেটা উপর দিকে ছুঁড়ে দিলাম। রাইফেলটা যখন একটা ডালে আটকে গেল, তখন আমি দড়ি ধরে উপরে উঠে গেলাম. নীচে ছাগলটা বাঁধা রইল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ছাগলটা একবারও চিৎকার করল না, নির্ব্বিঘ্নে ঘাস ছিঁড়ে খেতে লাগল। তখন আমি নিজেই চিতা বাঘের ডাকের অনুকরণে ডাক দেবার সিদ্ধান্ত করলাম।

পুরুষ চিতা বাঘদের স্বভাব এই যে, তারা তাদের এলাকায় অন্য কোন চিতার অনধিকার প্রবেশ সহ্য করতে পারে না। বর্ত্তমান নরখাদক চিতাটির কর্ম্মক্ষেত্রের এলাকা ছিল পাঁচ শত বর্গ মাইল জুড়ে। অবশ্য এই বিস্তৃত এলাকায় যে অন্য কোন পুরুষ চিতা ছিল না, এ কথা জোর করে বলা যায় না। যাই হোক, রাত্রির আঁধার ঘনিয়ে এলে আমি চিতা বাঘের স্বরের অনুকরণে ডাক দিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ চারশ' গজ দূর থেকে চিতা বাঘের ডাক শোনা গেল। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমার ডাক অনুসরণ করে বাঘটা বাট গজের মধ্যে এসে পড়লো। আমি ঠিক করলাম, বাঘটা যখন ছাগলটাকে খেতে আরম্ভ করবে, আমি সেই সময় গুলী করবো। আমার রাইফেলের সঙ্গে টর্চ লাগান ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি শিকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় কিছু দূরে পাহাড়ের উপর থেকে অন্য একটা চিতার ডাক শোনা গেল আর যে-চিতাটা আমার গাছের কাছে এসেছিল, সে ডাকতে ডাকতে সেই দিকে চলে যেতে লাগল। তার পর সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এই ভাবে ক্রমশঃ দিন যায়, কিন্তু কিছুতেই আর বাঘটাকে কায়দার মধ্যে পাওয়া যায় না।

১৯২৬ সালের ১৪ই এপ্রিল। গাড়োয়ালের একটি স্মরণীয় দিন—রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতার শেষ শিকারের দিন। এই দিন সন্ধ্যায় ভাঁইসোয়ারা গ্রামে এক বিধবার একটি ছোট ছেলেকে তাদের বাড়ী থেকে বাঘে নিয়ে যায়। এত সন্তর্পণে সে কাজ সারে যে, প্রথমে কেউ বুঝতেই পারেনি যে, তাকে বাঘে নিয়ে গেছে। পরদিন সকালে বাড়ী থেকে কিছু দূরে একটা পথের উপর বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আমি যখন বালকটির মৃতদেহের কাছে পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। জায়গাটার কাছে শিকারের উপযোগী স্থান না থাকায় আমি মৃতদেহটাকে বিধবার বাড়ীতে নিয়ে এলাম এবং উঠানে খুঁটো পুঁতে শিকল দিয়ে তাকে খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে দিলাম। আর আমি ঘরের বারান্দায় খড়ের গাদার আড়ালে রাইফেল নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম। আমি ভাবলাম, বাঘ যথাস্থানে তার শিকার না পেয়ে নিশ্চয়ই বিধবার বাড়ীতে আবার শিকারের আশায় আসবে।

সন্ধ্যা থেকে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল এবং ঝড়-বৃষ্টি যখন থামল তখন রাত্রি আটটা। বাঘ এতক্ষণে নিশ্চয়ই তার আশ্রয়-স্থল থেকে বেরিয়েছে তার শিকারের সন্ধানে। বিধবার বাড়ী পর্য্যন্ত আসতে মাত্র কয়েক মিনিট সময়ের ব্যবধান। কিছুক্ষণ পরেই খড়ের গাদার পাশে খস্‌খস্ শব্দ—বাঘ এসে গেছে। কোন্ দিক দিয়ে তার উদয় হবে ঠিক করতে না পেরে যেই আন্দাজে গুলী করতে যাব, এমন সময় কি একটা আমার কোলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। বাঘ নয়—একটা বেড়াল—বৃষ্টিতে একবারে ভিজে গেছে! কোথাও আশ্রয় না পেয়ে আমার কোলে আশ্রয় খুঁজতে এসেছে। যাক্ তবু ভাল। খুবই ভয় পেয়েছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভয় কাটতে না কাটতেই কিছু দূর থেকে চাপা গর্জ্জন শুনতে পেলাম। ক্রমশঃ গর্জ্জন উচ্চতর হতে লাগল। নিশ্চয়ই দু'টো বাঘে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। বোধ হয় নরখাদক চিতাটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে তার শিকার না পেয়ে বিরক্ত চিত্তে অবস্থান করছিল, তখন অপর একটি চিতা হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাকে আক্রমণ করে, ফলে লড়াই শুরু হয়ে যায়। এই ধরণের বাঘের লড়াই বড় একটা দেখা যায় না। কারণ সাধারণতঃ একটি বাঘের রাজ্যে অপর বাঘ অনধিকার প্রবেশ করে না এবং যদিও বা দৈবাৎ উভয়ের সাক্ষাৎ হয়, তারা সাক্ষাৎ মাত্রই উভয়ের শক্তির পরিমাণ বুঝতে পারে। যে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল সে লড়াইয়ের আগেই রণে ভঙ্গ দেয়।

আমাদের যিনি লক্ষ্য, তিনি প্রাচীন হলেও শক্তিতে ছিলেন অদ্বিতীয়। তার পাঁচশ' বর্গ-মাইল এলাকায় তার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী বাঘ ছিল না। কিন্তু ভাঁইসোয়ারা গ্রামে অনধিকার প্রবেশ করায় এই বিপত্তি ঘটে। ভাঁইসোয়ারার অধিপতি তার রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ সহ্য করতে না পেরে হানাদারকে আক্রমণ করে।

প্রথম রাউণ্ডে পাঁচ মিনিট ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। কোন

নিষ্পত্তি হল না। ১০।১৫ মিনিট পরে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং এবার মনে হল, যেন রুদ্রপ্রয়াগের চিতা হেরে যাচ্ছে। কয়েক মিনিট ধরে লড়াইয়ের পর চুপচাপ, তার পর আবার লড়াই। এই ভাবে ক্রমশঃ তারা লড়াই করতে করতে দূরে সরে গেল এবং শেষে আর তাদের গর্জ্জন শোনা গেল না।

ফলে আমার এবারকার চেষ্টাও ব্যর্থ হল।

রুদ্রপ্রয়াগে এক পণ্ডিতের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। বদ্রীনাথ যাত্রার পথে গোলাবরায়ে তার একটা চটি ছিল। তীর্থযাত্রীরা এই চটিতে রাত্রির জন্ম আশ্রয় নিত।

রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েও রক্ষা পেয়েছিল মাত্র দু'জন। তার মধ্যে এক জন এই পণ্ডিত, অপর জন একটি রমণী।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯২১ সালে। গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় মাদ্রাজ থেকে আগত দশ জন তীর্থযাত্রী ক্লান্ত হয়ে রাত্রির মত গোলাবরায়ের চটিতে আশ্রয় নেয়। পণ্ডিতের বাড়ীটা দোতলা। নীচে তলায় মালপত্র থাকে আর উপর তলায় তীর্থযাত্রীদের থাকতে দেওয়া হয়। উপরের ঘরের সামনে সরু এক ফালি বারান্দা আর পাথরের সিঁড়ি।

তীর্থযাত্রীরা তাড়াতাড়ি আহার সমাধা করে দরজায় খিল এঁটে দেয়। ঘরের মধ্যে অসহ্য গরম বোধ হওয়ায় পণ্ডিত রাত্রিতে এক সময় দরজা খুলে বাইরে আসে। বাইরে এসে দাঁড়াতেই অতর্কিতে চিতা বাঘের আক্রমণ। বাঘটা এসে একবারে তার টুঁটি কামড়ে ধরে, কিন্তু পণ্ডিত প্রাণপণ শক্তিতে লাথি মেরে বাঘটাকে ছিটকে ফেলে দেয়। কিন্তু ততক্ষণে তার গলা ফুটো হয়ে গেছে। বাঘটা দ্বিতীয় বার আক্রমণ করার পূর্ব্বেই চিৎকার শুনে তীর্থযাত্রীরা বাইরে আসে এবং কোন রকমে পণ্ডিতকে টেনে ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। পণ্ডিতের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। কিন্তু বাঘটা ছাড়বার পাত্র নয়। সে সারা রাত ধরে সেই বন্ধ দরজার উপর থাবা মারে আর গর্জ্জন করতে থাকে—আর ঘরের ভেতর থেকে শোনা যায় তীর্থযাত্রীদের করুণ আর্ত্তনাদ।

সকাল হলে তীর্থযাত্রীরা সংজ্ঞাহীন পণ্ডিতকে রুদ্রপ্রয়াগে কালী কমলী হাসপাতালে নিয়ে যায়।

আমি গোলাবরায়ে গিয়ে পণ্ডিতকে এই অঞ্চলে চিতার আগমনের সংবাদ দিয়ে সতর্ক থাকতে বললাম। পণ্ডিতের বাড়ী থেকে কিছু দূরে পথের ধারে একটা আম গাছের উপর মাচান বাঁধা হল আর নীচের রাখা হল ছাগশিশু। কিন্তু দশ রাত্রি অপেক্ষা করেও বাঘের দেখা পাওয়া গেল না, যদিও আশে-পাশে তার আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া যেতে লাগল।

আর এখানে দেরী করা চলে না। আফ্রিকায় আমার কাজ পড়ে রয়েছে অথচ গাড়োয়ালের অধিবাসীদের বাঘের মুখে ফেলে রেখে যেতেও মন সরছে না। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক করলাম, আর একটা রাত দেখা যাক, পরদিন সকালে যা হয় করা যাবে।

রাত্রে মাচানের উপর বসে নানা রকম চিন্তা মনে আসতে লাগল। সূচীভেদ্য অন্ধকার, চার দিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ গাছের তলায় খস্খস্ শব্দ হল আর সঙ্গে সঙ্গে নীচের বাঁধা ছাগলের গলার ঘণ্টাটা জোরে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি রাইফেল-সংলগ্ন টর্চ্চ জ্বাললাম। জ্বেলেই দেখি আমার বন্দুকের নলের সামনেই মূর্ত্তিমান নরখাদক। কালবিলম্ব না করে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলাম। বন্দুকের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর পণ্ডিত তার ঘরের দরজা খুলে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো কোন সাহায্যের দরকার আছে কি না। আমি তখন চিতা বাঘটার কি হল, তা জানবার জন্ম উৎকর্ণ হয়ে আছি, কাজেই তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। উত্তর না পেয়ে পণ্ডিত দরজা বন্ধ করে দিল।

আমি গুলী ছুঁড়েছিলাম ঠিক রাত্রি দশটায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চাঁদ উঠবার সম্ভাবনা ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও নীচে কিছু দেখতে পেলাম না, কিন্তু ছাগলের গলার ঘণ্টার শব্দ শুনে বুঝলাম সে বেঁচে আছে। কয়েক ঘণ্টা পরে কিছুক্ষণের জন্ম চাঁদ উঠলেও তাতে কোন সুবিধা হল না। ভোর হলে গাছ থেকে নামতেই ছাগলটি আমায় অভ্যর্থনা জানাল। গুলী করার জায়গা থেকে একটা মোটা রক্তের দাগ পথের বিপরীত দিকে চলে গিয়েছে। রক্তের দাগ ধরে পঞ্চাশ গজ অতিক্রম করার পর একটা খাদের মধ্যে বাঘটাকে পাওয়া গেল—সে তখন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত।

একটা কথা আমার মনে হল, এই বাঘটা প্রকৃতির কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেনি যদিও মানুষের আইন সে ভঙ্গ করেছিল। রুদ্রপ্রয়াগ এলাকায় সন্ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টিও তার উদ্দেশ্য ছিল না। তার একমাত্র অপরাধ—সে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল।

অনুবাদক—হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

সম্মোহন

[সংক্ষিপ্ত চিত্রকাহিনী]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

হৃষীকেশ হালদার

রাতের অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে ভোরের আলো। গাছে গাছে সদ্য ঘুম-ভাঙা পাখীর কাকলি। পথ তখনো জনহীন। সামনের চায়ের দোকানটা সবে ঝাঁপ খুলছে। ঝড়ের মত বেগে একখানা বাস চলে গেলো—গ্যারেজ থেকে নিষ্ক্রমণের পর তার ভাগ্যে এখনো একটিও যাত্রী জোটেনি।···

ভোরের এই শান্ত সমাহিত মাধুর্য্যের সঙ্গে মিল রেখে ভোরাই সুরে এক জন বৈষ্ণব খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে গেলো।

ডাক্তার সেনের বাড়ী থেকে একে একে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস ইন্সপেক্টর আর তাঁর সহকারী। তাঁদের পিছনে মলয়া, বিভাস আর দেবব্রত। সকলের মুখেই বিষাদের কারুণ্য, সকলেই নির্ব্বাক্।···

ইন্সপেক্টরই এই নীরবতা ভাঙলেন প্রথমে। বিভাসের দিকে চেয়ে তিনি বললেন : তাহলে আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে বিভাস বাবু। চিরঞ্জীবের বাড়ীটা আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে। অবশ্য এই সব খুন-জখমের ব্যাপারে তাকে আইনের আওতায় আনা খুব সহজ ব্যাপার হবে না। কারণ ডাক্তার সেনের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী বা চৌধুরী মশাইয়ের কথা যত সত্যিই হোক না কেন, আদালত মেসমেরিজম, মন্ত্র-তন্ত্র বা ভূত-প্রেতের কথা গ্রাহ্য করবে না নিশ্চয়ই। তবে তার বাড়ীর যে বর্ণনা পেয়েছি আপনাদের কাছে তাতে সেটা একটা ছোট-খাটো অস্ত্রাগার বললেই হয়, অথচ সে জন্যে তার যথোচিত লাইসেন্স নেই। সুতরাং বাড়ীটা একবার খানাতল্লাস করা দরকার। দেরী হলে পাখী উড়ে যেতে পারে।

বিভাস ইন্সপেক্টরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। ম্যাজিষ্ট্রেট একা প্রস্থান করলেন। দেবব্রত, মলয়া আর চৌধুরী মশাই একসঙ্গে চলে গেলেন। ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তাঁর জীপে করে বিভাস চললো চিরঞ্জীবের বাড়ীর দিকে। ইন্সপেক্টরকে অনুসরণ করলো আরো দুখানা পুলিশ 'কার'।

ঠক্ ঠক্ ঠক্···

ইন্সপেক্টর চিরঞ্জীবের বাড়ীর বন্ধ দরজায় করাঘাত করলেন। কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়া এলো না। বিরক্ত হয়ে এবার তিনি সজোরে কড়া নাড়তে সুরু করলেন।

হঠাৎ দরজাটা উন্মুক্ত হয়ে গেলো। চিরঞ্জীবের বোবা কালা চাকরটা দরজা খুলে দিয়ে সামনে পুলিশ দেখে আঁৎকে উঠলো। তার ভাষাহীন কণ্ঠ থেকে একটা অব্যক্ত ভয় আর বিস্ময় প্রকাশিত হলো শুধু একটা বিকৃত শব্দে—আউ, আউ, আউ।

ইন্সপেক্টর ধমক দিয়ে বললেন : তোর মনিব কোথায়? এ্যাঁ?

—আউ, আউ, আউ···। ইঙ্গিতে চাকরটা বোঝাতে চেষ্টা করলো যে সে কানে কালা, কথাও বলতে পারে না।

একটা বোবা আর কালা চাকরের পেছনে অযথা সময় নষ্ট করা ইন্সপেক্টর যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। তাকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। পুলিশ বাহিনীও তাঁকে অনুসরণ করলো। পুলিশ যখন দরজা দিয়ে চিরঞ্জীবের বাড়ীতে প্রবেশ করছে, তখন এক মুহূর্ত্তের জন্যে দেখা গেলো চিরঞ্জীবের মুখ দোতলার বারান্দায়। উঁকি দিয়ে তার বাড়ীতে প্রবেশোদ্যত পুলিশ বাহিনীকে দেখেই সে সরে পড়লো বারান্দা থেকে। চিরঞ্জীবের বাড়ী যেন কম্পিত হতে লাগলো পুলিশ বাহিনীর সশব্দ পাদক্ষেপে।

সিঁড়িটা ঘুরে এসে মিশেছে দোতলার একফালি সরু বারান্দায়, তার দু'ধারে দু'সারি ঘর। ইন্সপেক্টর এক এক লাফে দু'-তিনটে সিঁড়ি পার হয়ে ওপরে উঠছিলেন। হঠাৎ গুড়ুম করে একটা শব্দ। চমকে উঠলো পুলিশ বাহিনী। ইন্সপেক্টর বসে পড়লেন। চিরঞ্জীব পুলিশ বাহিনীকে বাধা দেবার জন্যে রিভলভার থেকে গুলীবর্ষণ করছে। প্রথম গুলীটার জবাবে ইন্সপেক্টর সিঁড়ির ওপর বসে বসেই তাঁর রিভলভার থেকে গুলীবর্ষণ করলেন। কিছুক্ষণ আর কোন সাড়া নেই চিরঞ্জীবের তরফ থেকে। ইন্সপেক্টর আবার উঠে সতর্ক ভাবে অগ্রসর হতে লাগলেন। সিঁড়িটার শেষ ধাপে এসে পৌঁছতেই আবার একবার গুলী বর্ষিত হলো। ইন্সপেক্টরের পাশ দিয়ে গুলীটা এসে এবার দেওয়ালে বিদ্ধ হলো। তার পর এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই পর-পর আরো দু'বার গুলী ছুড়লো চিরঞ্জীব। যে দিক থেকে চিরঞ্জীব গুলীবর্ষণ করছিলো, সেদিকের দেওয়াল ঘেঁষে তৎক্ষণে বেশ নিরাপদ অবস্থান বেছে নিয়েছিলেন ইন্সপেক্টর। তাঁর কাছ থেকে বেশ কয়েক ধাপ নীচে নিরাপদ দূরত্বে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিলো বিভাস আর পুলিশ বাহিনী—তারা আর ওপরে উঠতে সাহস পাচ্ছিলো না। প্রাণের মায়া কার না আছে?

ইন্সপেক্টর প্রত্যেক বারই চিরঞ্জীবের গুলীর প্রত্যুত্তর দিলেও চিরঞ্জীবের পক্ষে অক্ষত থাকা অসম্ভব হয়নি। কারণ ইন্সপেক্টর প্রত্যেক বারই আন্দাজে হাত বাড়িয়ে গুলী করছিলেন—জীবন বিপন্ন না করে মাথা বাড়িয়ে চিরঞ্জীবকে দেখবার কোন উপায়ই ছিলো না তাঁর। আরো দু'-চার বার দু'দিক থেকেই গুলীবর্ষণের পর হঠাৎ চিরঞ্জীবের দিক থেকে কিছুক্ষণ আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। চিন্তিত হলেন ইন্সপেক্টর। চিরঞ্জীবের ভাণ্ডারে বুলেটের অভাব হলো না কি? কিংবা সে মিছে শক্তিক্ষয় না করে অপেক্ষা করছে সুযোগের?

এ ভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়!···জীবন বিপন্ন হয় হোক, এত বড় একটা অপরাধীকে এ ভাবে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। চিরঞ্জীব কি করছে দেখবার জন্যে ইন্সপেক্টর দেওয়ালের পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে গেলেন।

কি আশ্চর্য্য। চিরঞ্জীবটা মনে করেছে কি? এক মুহূর্ত্তের জন্যে ইন্সপেক্টরের চোখে পড়লো বাড়ীর পিছন দিকের বারান্দার রেলিংএর ওপর সোজা দাঁড়িয়ে আছে চিরঞ্জীব। হতভাগাটা নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে চায় না কি? তিনি দ্রুতগতিতে ছুটলেন চিরঞ্জীবের দিকে। কিন্তু ইন্সপেক্টরের পায়ের শব্দ পাবা মাত্র চিরঞ্জীব লাফিয়ে পড়লো নীচে। ইন্সপেক্টরও ছুটে গেলেন বারান্দার দিকে। রেলিং-এ ভর দিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে তিনি দেখলেন, চিরঞ্জীব বহাল তবিয়তেই সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে যেন ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠেছে। ইন্সপেক্টরকে দেখতে পেয়েই সে লক্ষ্য স্থির করে তাঁর দিকে আবার গুলী ছুড়লো। ইন্সপেক্টরও সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা থেকে সরে এসে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করলেন। চিরঞ্জীব তখন বাড়ীর পিছন দিকের গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করে ষ্টার্ট দিয়েছে।

—আশ্চর্য্য। লোকটার রক্তে যেন অপরাধের বীজ বাসা বেঁধে আছে। ইন্সপেক্টর চিরঞ্জীবের গাড়ী ষ্টার্ট নেবার শব্দ শুনে বললেন : শীগ্‌গির সকলে নীচে নেমে ওর গাড়ীটাকে অনুসরণ করো। একটু দেরী হলে আসামী হাতছাড়া হবে।

পথের ওপর দিয়ে যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছে চিরঞ্জীবের গাড়ী দু'পাশের লোকের বিস্মিত দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে। স্পীডোমিটারের কাঁটাটা কাঁপছে থর-থর করে—পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর······লোক-জন

ভয়ে সরে যাচ্ছে পথের দু'পাশে। ট্রাফিক পুলিশ মিছেই তাকে গাড়ী থামাতে বলে শেষে ক্রোধ-রক্তিম চোখে গাড়ীর নম্বর লিখে নিচ্ছে!

পিছনে পিছনে পুলিশ 'কার' তিনখানাও তাকে অনুসরণ করে আসছে সমান বেগে। কিন্তু মাঝের মাইল খানেক ব্যবধান আর কিছুতেই কমছে না। এখানা হইতে ওখানা—অনবরত টেলিফোন করে বিভিন্ন ঘাঁটীর পুলিশ এই উন্মাদ গতিবিশিষ্ট গাড়ীগুলোর কথা জানাচ্ছে। কয়েকটা থানা থেকে মোটর সাইকেল আর পুলিশ 'কার' বেরিয়ে পড়েছে ওদের ধরবার জন্যে। সকলেই উত্তেজিত······ওরা কারা? কারা পথচারীর জীবন তুচ্ছ করে, আইন অমান্য করে সহরতলীর বুক দিয়ে অমন করে গাড়ী চালাচ্ছে?

অবশেষে ইন্সপেক্টরের গাড়ীর সঙ্গে চিরঞ্জীবের গাড়ীর ব্যবধান কমে আসতে লাগলো। চিরঞ্জীব গাড়ী চালাতে চালাতে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে ইন্সপেক্টরের গাড়ী লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। ঝন্-ঝন্ করে সামনের কাচখানা ভেঙ্গে গেল। ইন্সপেক্টরও গুলী ছুড়লেন চিরঞ্জীবের গাড়ীর টায়ার লক্ষ্য করে। কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

তেমাথার মোড়। হঠাৎ অন্য থানার একখানা গাড়ী সামনে থেকে ছুটে এলো। ইন্সপেক্টরের গাড়ীখানা পিছন থেকে তাড়া করে আসছে। চিরঞ্জীব এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করে ব্রেক করলো—তার পর ডান দিকে গাড়ীটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার সবেগে চালাতে শুরু করে দিলে। ততক্ষণে ইন্সপেক্টরের গাড়ীখানার সঙ্গে তার ব্যবধান অনেকখানিই কমে এসেছে।

পুলিশের গাড়ী দেখে অপর দিক থেকে আগত গাড়ীখানা আর কোন প্রশ্নই করলো না। ইন্সপেক্টরের গাড়ীর পেছনে সেও তার অনুসরণ করলো।

চিরঞ্জীবের সামনের পথ ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে, দু'পাশে ঝোপ-জঙ্গল, দু'-একখানা পোড়ো বাড়ী, বাঁশ-ঝাড়, উঁচু-নীচু অসমান রাস্তা। এ পথে জোরে গাড়ী চালানো সম্ভব নয়। পুলিশের গাড়ীগুলো গতি হ্রাস করতে বাধ্য হলো। চিরঞ্জীব কিন্তু তখন প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছে। পুলিশের হাতে ধরা দেওয়ার চেয়ে দুর্ঘটনায় যদি জীবন যায় যাক্। আর পালানো যদি সম্ভব হয়, তবে তো কথাই নেই। চিরঞ্জীবের গাড়ী লাফিয়ে লাফিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে সমান বেগে চললো। অবশেষে এ পথেরও শেষ হলো—দু'পাশে নীচু প্রান্তর, মাঝে সঙ্কীর্ণ মাটীর আল, কোন রকমে দু'জন লোক পাশাপাশি হাঁটতে পারে। আলটা নীচের জমি থেকে পনের-কুড়ি হাত উঁচু। বোধ হয় কোন কারণে দু'পাশের মাটী তুলে কাজে লাগানোয় এই নীচু জমিগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। চিরঞ্জীবের গাড়ী এসে সবেগে আলের ওপর উঠেই মাটী ধ্বসে গড়িয়ে পড়লো নীচে।

পুলিশ 'কার'গুলো পথের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো। পেট্রলের কটু গন্ধ বাতাসকে যেন বিষিয়ে তুলেছে। চিরঞ্জীবের গাড়ীখানা বেঁকে-চুরে বিকৃত আকার ধারণ করে পড়ে আছে নীচু প্রান্তরের ওপর। চার পাশে তার ধ্বসে-পড়া মাটীর স্তূপ। পুলিশ দল ইন্সপেক্টরের অধিনায়কত্বে সতর্ক ভাবে নেমে এলো।

চিরঞ্জীব কোথায়—চিরঞ্জীব? ইন্সপেক্টর স্তম্ভিত ভাবে দেখলেন, চিরঞ্জীবের দেহের আধখানা গাড়ীর তলা থেকে বেরিয়ে আছে বাইরে। মুখখানা থেঁৎলে এমন বিশ্রী আকার ধারণ করেছে যে, তাকে আর চেনবার উপায় নেই। ইন্সপেক্টরের মনে পড়লো চৌধুরী মশাইয়ের বাগান-বাড়ীর হত্যাকাণ্ডের কথা। তাঁর ভৃত্য ভবভঞ্জনকে হত্যার পরও আততায়ী তার মুখ এমনি ভাবে থেঁৎলে রেখে গিয়েছিলো। পৃথিবীতে কোন আঘাতই ব্যর্থ যায় না। প্রত্যাঘাত বুঝি ফিরে আসে এমনি ভাবেই।

ইন্সপেক্টর ঝুঁকে পড়ে চিরঞ্জীবের দেহ পরীক্ষা করলেন, তার পর উঠে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর পাশে দণ্ডায়মান বিভাসকে বললেন: সব শেষ! এমনি শোচনীয় ভাবে মরে চিরঞ্জীব শেষ পর্য্যন্ত আইনকে ফাঁকি দিলে।

কথা হচ্ছিলো চৌধুরী মশায়ের বাগান-বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে। মলয়া কেৎলী থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললো: ওঃ, এমন মানুষও হয়!···

—হয় বৈ কি! চৌধুরী মশাই খবরের কাগজের পাতা থেকে মুখ তুলে বললেন: অন্ধকার না থাকলে কি কেউ আলোর আদর করতো?···

—হতভাগাটা মরেছে না বাঁচা গেছে! দেবব্রত বললো: এত দিনে তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো!···

—নিশ্চিন্ত আর কই হওয়া গেলো বলো। চৌধুরী মশাই সহাস্যে বললেন: বরং একটা বিষম সমস্যায় পড়ে গেছি······

—আবার সমস্যা! সবিস্ময়ে দেবব্রত প্রশ্ন করলো।

—সমস্যা বৈ কি! চৌধুরী মশাই হাসি চেপে গম্ভীর হবার চেষ্টা করেন: মলয়া মাকে আমার একটা শুভদিন দেখে যত দিন না তোমার হাতে তুলে দিতে পারছি, তত দিন নিশ্চিন্ত হতে পারছি কই! আবার মলয়া মা চলে গেলে আমাকে এই বুড়ো বয়েসে দেখবে কে তাই ভাবছি। সমস্যা নয়?

—ধ্যেৎ···! মলয়া ঠক্ করে কেৎলীটা ঠুকে বসিয়ে দিয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে: মামা যেন কী!···

সঙ্গে সঙ্গে দেবব্রতও ঘর থেকে সলজ্জ ভাবে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে: সত্যি! চৌধুরী মশাই ভারী ইয়ে···

ঘর থেকে বেরিয়েই দেবব্রতর সঙ্গে মলয়ার মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। মলয়া মাথা নীচু করে আঙুলে আঁচলটা জড়াতে আর খুলতে থাকে। লজ্জায় মুখ তুলে দেবব্রতর দিকে চাইতেই পারে না।

দেবব্রত কিন্তু অসঙ্কোচে এসে দাঁড়ায় মলয়ার পাশে। তার কাঁধে হাত রেখে বলে: এইবার? শুনলে তো চৌধুরী মশাই কি বললেন! কেমন জব্দ······!

মলয়া ফিক্ করে একটু হেসে দেবব্রতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ছুটে পালায়। দেবব্রত পিছনে ছুটতে ছুটতে ডাকে: আরে শুনে যাও, শুনে যাও······

সমাপ্ত

২

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ও বীরভূম অঞ্চলে যখন ইংরাজ বণিক দল নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল তখন উত্তর ও পূর্ববঙ্গে সশস্ত্র সন্ন্যাসী ও ফকির দলের বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। ইহারা কখনও সম্মুখ যুদ্ধে কখনও বা গরিলা যুদ্ধে নবাব ও ইংরাজের সিপাহীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। ইংরাজ ও নবাবের অর্থ যে কোন সুযোগে ইহারা লুণ্ঠন করিত।

সন্ন্যাসী ও ফকিরের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সম্রাট আকবরের আমলে সশস্ত্র সন্ন্যাসীর সৃষ্টি হয়। রেভারেণ্ড ডাঃ ফারকুহারের এক বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, যোড়শ শতাব্দীতে সহস্র সহস্র মুসলমান ফকির যখন নিজেরা কোথাও যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত না, তখন তাহারা ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে কার্য্য করিত; তাহা ছাড়া সৎ মুসলমানের কার্য্য হিসাবে নিরস্ত্র হিন্দু সন্ন্যাসীদের হত্যা করাও তাহাদের অন্যতম কাজ ছিল। মুসলমান রাজত্বে ঐ সকল ফকির বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল। শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন হিন্দু সন্ন্যাসীদের উপর অত্যাচার প্রবল ভাবে দেখা দেয়, তখন কাশীর বিখ্যাত সন্ন্যাসী পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে বলেন। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎকালে রাজা বীরবল উপস্থিত ছিলেন. অবশেষে অনেক আলোচনার পর ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের রক্ষা করার জন্য সশস্ত্র অব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। সম্রাট এই সকল সন্ন্যাসীদের সরকারী বিধি-নিষেধের হাত হইতে অব্যাহতি দেন। অবশ্য প্রথমে এই সন্ন্যাসী দল ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীদের রক্ষা-কার্য্যেই নিযুক্ত ছিল, কিন্তু কিছু দিন পরে ইহারা নিজেদের মধ্যে জমি-জমার ব্যাপারে প্রায়ই মারামারি করিত। কেহ বা আশ্রম মঠ প্রভৃতি স্থাপিত করিয়া সন্ন্যাসি-জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু কেহ কেহ বিবাহ করিয়া সাংসারিক জীবন যাপন করিতে লাগিল। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর একবার গিরি ও পুরী সম্প্রদায়ের থানেশ্বরের যুদ্ধ পরিদর্শন করেন। ঐতিহাসিক স্মিথ যুদ্ধের কারণ বিবৃত করিয়া বলেন যে, গ্রহণ-স্নান উপলক্ষে কাহারা অগ্রে স্নান করিবে এই লইয়া যে মতভেদ সৃষ্টি হয় তাহাই ঘোর যুদ্ধের আকার ধারণ করে। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে একবার সন্ন্যাসী ও বৈরাগীদের মধ্যে এক খণ্ড-যুদ্ধে বহু বৈরাগী হতাহত হয়। একবার নাগাদের সহিত মাদারী ও জেলালী সম্প্রদায়ের মুসলমান ফকিরদের প্রবল যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায়। জেমস্ গ্রান্টের ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, একবার সশস্ত্র সন্ন্যাসী দল একটি বৃদ্ধার নেতৃত্বে আওরঙ্গজেবের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সম্রাট-সৈন্যকে পরাজিত করে এবং উক্ত দল সম্রাটের বিশেষ ভীতির কারণ হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী দলের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গগরা নদী হইতে সুদূর ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত ইহাদের গতি ছিল অবাধ। সন্ন্যাসীদের অধীনে সুদক্ষ গুপ্তচর বিভাগ ছিল। ইহারা ইংরাজ ও মুসলমান ধনী ও নবাবদের সুরক্ষিত অর্থের সন্ধান এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণে সিপাহী-সংখ্যা কিরূপ আছে তাহার বিশেষ বিবরণ সন্ন্যাসী দলপতিদের নিকট সরবরাহ করিত।

সশস্ত্র মুসলমান ফকির দলের স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা নিজে নিজেদের নামের পরে শাহ, অর্থাৎ রাজা উপাধি গ্রহণ করে। ইহারা গোঁড়া মুসলমান ছিল না। দবিস্থান গ্রন্থকারের মতে ইহারা প্রকৃত পক্ষে সুফী মতাবলম্বী হিন্দু ছিল। মাদারী ফকির দল অবধূত সন্ন্যাসীদের ন্যায় জটা রাখিত এবং সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিত। মাদারদের মধ্যে বদিতেদ্দিন মাদার বিখ্যাত যোগী পুরুষ ছিলেন। হিন্দুগণ ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। ইঁহার বহু শিষ্য ছিল এবং ইনি কানপুরের নিকটবর্ত্তী মাখনপুরে স্থায়িভাবে বাস করিতেন। ফকির দলের মধ্যে মজনু শাহ্ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইংরাজ সৈন্যদের সহিত ইহার বহুবার সংঘর্ষ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণীর উপন্যাসের বিখ্যাত ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী মজনু শাহেরই দলভুক্ত ছিলেন। দিনাজপুর অঞ্চলে যে ফকির দল বাস করিত তাহাদের সহিত ভ্রাম্যমান ফকির দলের যোগাযোগ ছিল বলিয়া জানা যায়।

ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইটের ১৭৬১ খৃঃ ২১শে ডিসেম্বরের এক পত্রে সর্ব্বপ্রথম সন্ন্যাসীদের বাংলায় আবির্ভাবের কথা জানা যায়। বর্দ্ধমান দখলের সময় ইংরাজের সহিত বর্দ্ধমানের রাজা মিস্ত্রী খান, দুধার সিং, সশস্ত্র ফকির দল এবং বীরভূম হইতে আগত এক সেনাদলের বর্দ্ধমান ও সাংতাগোলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক প্রবল যুদ্ধ হয়। ১৭৬৪ সালে সিংহাসনচ্যুত নবাব মীরকাশিম সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য সর্ব্বশেষ প্রচেষ্টায় সন্ন্যাসী দলের সাহায্য গ্রহণ করেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ অঞ্চলে এক দল সন্ন্যাসী ও ফকির দলের আবির্ভাব হয়। এই দলকে বাধা দিতে গিয়া স্থানীয় কোম্পানীর এজেন্ট মিঃ কেলীর জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। ঐ বৎসরেই সন্ন্যাসী দল কোম্পানীর ঢাকার কারখানা দখল করে। কারখানার প্রধান সচিব মিঃ লিসেষ্টার সদলবলে কারখানা হইতে পলায়ন সমর্থন করিয়া কোম্পানীর নিকট এক বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন যে, কারখানা হইতে মজুর দল পূর্ব্বেই পলায়ন করায় সিপাহীদের মজুরের কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। নদীর উপর অল্প যে কয়খানি নৌকা ছিল তাহাতে প্রথমে অসুস্থ ব্যক্তিদের, পরে অর্থ প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয়। ইহার পর ছাউনীর সৈন্য সমেত পলায়ন করা স্থির হয়। কিন্তু পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য না হওয়ায় ঘোর বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। ইহার কিছু দিন পরে ক্যাপ্টেন গ্রান্টের অধীনে এক সিপাহী দল পুনরায় উক্ত কারখানা অধিকার করে।

কৃষ্ণপুরের তদানীন্তন কালেক্টারের এক পত্রে জানা যায় যে, ১৭৬৩ সালে রামপুর বোয়ালিয়ার কারখানা সন্ন্যাসী দল কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। কারখানার প্রধান সচিব মিঃ বেনেট বন্দী হইয়া পাটনায় নীত হন। ১৭৬৩ সালের অক্টোবর মাসে পাটনায় তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

১৭৬৬ সালে কুচবিহার রাজ্যে আভ্যন্তরিক গোলযোগ দেখা দেয়। কুচবিহারের নাবালক রাজা ভুটিয়াদের রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন, কিন্তু রামানন্দ গোঁসাইয়ের প্ররোচনায় নাবালক রাজাকে হত্যা করা হয়। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর বিষয়ে ভুটিয়াদের সহিত রাজ্যের প্রধান সেনাপতি রুদ্রনারায়ণের সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে। সংঘর্ষে রুদ্রনারায়ণ পরাজিত হন এবং রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রুদ্রনারায়ণের বিপক্ষে সন্ন্যাসী দল ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে কার্য্য করে। লেঃ মরিসন এক দল সিপাহী লইয়া সন্ন্যাসী দলের পিছনে তাড়া করিয়া মোগলঘাট (বর্ত্তমানে মোগলহাট) নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথায় এক যুদ্ধে সন্ন্যাসী দল পরাজিত হয়। সন্ন্যাসী দলের পিছু ধাওয়া করিয়া লেঃ মরিসন দীনহাটায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেইখানে এক দল সন্ন্যাসী পূর্ব্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিল, হঠাৎ ইংরাজের সিপাহী আসিয়া পড়ায় তাহাদের সহিত এক সংঘর্ষ হয়। মিঃ মরিসন অক্ষত অবস্থায় পলায়ন করিতে সমর্থ হন, কিন্তু রিচার্ড ও ক্যাপ্টেন রেনেল সাংঘাতিক ভাবে আহত হন এবং এক জন আর্মেনীয় সৈন্য নিহত হয়।

এই সময় দলে দলে সন্ন্যাসী আসিয়া উত্তর-বঙ্গ ভরিয়া ফেলে। ১৭৬৯ সালে ক্যাপ্টেন ডি ম্যাকেঞ্জি সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে এক অভিযান আরম্ভ করেন। লেঃ কীথের অধীনে কয়েক দল পরগণা সিপাহী রংপুর অভিমুখে যাত্রা করে। এক সংঘর্ষের ফলে ইংরাজ সিপাহী দল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং লেঃ কীথ যুদ্ধে নিহত হন।

লেঃ কীথের মৃত্যুর ফলে সন্ন্যাসী দল আরও উৎসাহিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে বাংলার বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর পরিদর্শক নিযুক্ত হয়। রাজশাহী অঞ্চলের পরিদর্শক Mr. Boughton Rous ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর নিকট এক পত্রে জানান যে, "সংকট কালে সন্ন্যাসীদের সহিত যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট সিপাহী সৈন্য আছে। শিবগঞ্জ পর্য্যন্ত যে সন্ন্যাসী দল আসিয়াছিল তাহারা আমাদের অবস্থানের বিষয় জানিতে পারিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসীদের উপর কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব পত্রে ব্যবহৃত ভাষা হইতেই জানা যায়। এক স্থানে Mr. Rous সন্ন্যাসীদের "pernicious tribe" বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলেন যে, "ইহাদের অবস্থান সম্পর্কে আমরা কড়া নজর রাখিয়াছি।"

রংপুরের পরিদর্শক মিঃ জন গ্রোস ১৭৭০ খৃঃ ২০শে এপ্রিল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আরও অতিরিক্ত সিপাহী সৈন্য চাহিয়া পাঠান। তিনি উক্ত পত্রে লেখেন যে, "আমরা সকল সময়ের জন্য সন্ন্যাসী অথবা ভবঘুরে লুণ্ঠক দল যে কেহ আসুক না কেন তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত আছি। তাহারা গত বৎসর যে সফলতা লাভ করিয়াছিল তাহার ফলে হয়তো আরও উৎসাহিত হইয়া এই বৎসরেও আসিতে পারে।" ইহাদের ধারণা সত্যে পরিণত হয় এবং সন্ন্যাসী দল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ঐ পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে না।

ঐ বৎসরে নভেম্বর মাসে দিনাজপুরে কোম্পানীর পরিদর্শক এক দল ফকিরের আবির্ভাবের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করেন। দিনাজপুরের রাজা ফকিরদের বিরুদ্ধে দশ জন সিপাহী ও এক শত বরকন্দাজ প্রথমে প্রেরণ করেন কিন্তু পরে তিনি জানিতে পারেন যে, ফকিরদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার হইবে। এই সংখ্যাধিক্যের কথা জানিতে পারিয়া তিনি বরকন্দাজ ও সিপাহীদের ফিরাইয়া আনেন। দিনাজপুর, রংপুর ও পূর্ণিয়ার কোম্পানীর পরিদর্শকদের নিকট কাউন্সিলের কর্ত্তৃপক্ষ অতিরিক্ত দুই-এক দল সিপাহীর জন্য রাজমহলের ক্যাপ্টেন মুডসনের নিকট আবেদন করার নির্দ্দেশ পাঠান।

১৭৭১ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার অধ্যক্ষ Mr. Kelsall-এর এক রিপোর্টে প্রকাশ যে, "সন্ন্যাসী দল বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়া কর আদায় করিতেছে। সর্ব্বশেষ তাহাদের ময়মনসিংহের নিকটবর্ত্তী বাইগুনবাড়ীর নিকট দেখা গিয়াছে।" এই বৎসরে ২৫শে মার্চ্চ ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর) ও গোবিন্দগঞ্জ অঞ্চলে লেঃ টেইলার এক দল সন্ন্যাসী ও ফকিরকে পরাজিত করেন। দলপতি মজনু শাহ্ মহাস্থানগড়ে পলায়ন করেন। কোম্পানী-সৈন্য মজনু শাহ্‌কে বন্দী করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়।

১৭৭২ সালের প্রথম দিকে মজনু শাহ্ দলপুষ্ট হইয়া রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলে দেখা দেন। গত বৎসরের পরাজয়ের গ্লানি ভুলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কোম্পানীর লোক-জন তাঁহার প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করে তাহার উল্লেখ করিয়া মহারাণী ভবানীর নিকট এক পত্রে তিনি তাঁহার সহানুভূতি ভিক্ষা করেন। তিনি বলেন যে, "বাংলা দেশে তাঁহারা সদলবলে প্রতি বৎসর মন্দির ও তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়াছেন এবং বাংলার জনগণের নিকট ভাল ব্যবহার, ভিক্ষা ও অন্যান্য সাহায্য পাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে সরলে পরিভ্রমণ করিলেও কাহারও উপর কোন অত্যাচার ঘটে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গত বৎসর ১৫০ জন ফকিরকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়া তাহাদের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যসমূহ লুণ্ঠন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ফকিরগণ বিচ্ছিন্ন ভাবে চলা-ফেরা করিত, কিন্তু তাহাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাহারা বর্ত্তমানে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চলা-ফেরা করিতেছে। ইহাতে ইংরাজগণ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদের চলা-ফেরা ও দেবমন্দির দর্শনে অন্যায় ভাবে বাধা দিতেছে। আপনিই এই দেশের কর্ত্রী। আমরা ফকিরগণ সর্ব্বদাই আপনার কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি।"

এই সময়কার নথীপত্রে দেখা যায়, মজনু শাহ্ তাঁহার দলীয় লোক-জনকে গ্রামবাসীদের উপর কোন রকম খারাপ ব্যবহার বা জুলুম না হয় সেই প্রকার নির্দ্দেশ দেন। নির্দ্দেশে আরও বলা হয় যে, গ্রামবাসিগণ স্বেচ্ছায় যাহা দান করিবে তাহাই যেন গ্রহণ করা হয়।

১৭৭২ খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর পূর্ণিয়ার কালেক্টর, রংপুর সারকিট কমিটির সভ্য মিঃ গ্রেহামকে জানান যে, কয়েক দল সন্ন্যাসী রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে পুনরায় দেখা দিয়াছে। ইহারা গ্রামবাসীদের উপর কর ধার্য্য করিয়া অর্থ আদায় করিতেছে। আরও সংবাদ পাওয়া যায় যে, উক্ত সন্ন্যাসী দল রংপুরের অন্তর্গত ভবানীগঞ্জ কাছারী লুণ্ঠন করিয়াছে। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ রংপুরের কালেক্টরের উপর নির্দ্দেশ দেন যে, অবিলম্বে দিনাজপুরে অবস্থিত সিপাহী দল লইয়া যেন ব্রহ্মপুত্রের পথে সন্ন্যাসী দলকে অনুসরণ করা হয়।

ক্যাপ্টেন টমাসের অধীনে এক দল সিপাহী ২১শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে জাফরগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে। ৩০শে ডিসেম্বর ভোর বেলায় কোম্পানীর সৈন্য রংপুর সহরের পশ্চিম

দিকে শ্যামগঞ্জের সমতল ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী দলকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত সন্ন্যাসী দল প্রায় পনের শত ছিল। প্রথমে সন্ন্যাসী দল পশ্চাদপসরণ করিয়া জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। কোম্পানীর সিপাহী দল সন্ন্যাসীদের তাড়া করিয়া তাহাদের যুদ্ধের রসদ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে। ইহার পরে সন্ন্যাসীদের পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ হয়। কোম্পানী-সৈন্য সন্ন্যাসী দল দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় ক্যাপ্টেন টমাস সিপাহীদের শেষ চেষ্টা হিসাবে বেয়নেট চার্জ করিবার আদেশ দেন। সিপাহিগণ এই আদেশ সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করে। ক্যাপ্টেন টমাস যুদ্ধে নিহত হন। দেশীয় লোকেরা কোম্পানীর লোক-জনকে সাহায্য করা দূরের কথা বরং লাঠি লইয়া সন্ন্যাসী দলের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে যোগদান করে। কোম্পানীর যে-সকল লোক প্রাণভয়ে জঙ্গলে ও বড়-বড় ঘাসের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করে, গ্রামবাসিগণ তাহাদের সন্ন্যাসীদের হাতে ধরাইয়া দেয়। সিপাহিগণ গ্রামের অভিমুখে যাইবার চেষ্টা করিলে গ্রামবাসীরা সন্ন্যাসীদের ডাকিয়া সিপাহীদের ধরাইয়া দেয় এবং অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লয়।

সন্ন্যাসী দল কোম্পানী-সৈন্যকে পরাজিত করিবার পর ব্রহ্মপুত্র-স্নানে সদলবলে যাত্রা করে। সারকিট কমিটি সিদ্ধান্ত করে যে, সন্ন্যাসী দল পুনরায় এই প্রদেশে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই যেন বাধা দেওয়া হয় এবং বিহারে রক্ষিত সেনাদলের যেন সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস সেই ভাবেই কাজ করিবার জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু ইহার কিছু দিন পরেই পরগণা-সিপাহী দল পুনরায় সন্ন্যাসীদের নিকট পরাজিত হয়।

ক্যাপ্টেন টমাসের মৃত্যুর পর ১৭৭২ সালের শেষ ভাগে এক দল সন্ন্যাসী কুচবিহার অভিমুখে যাত্রা করে। তথায় গিয়া দর্পদেবের সন্ন্যাসী দলের শক্তি বৃদ্ধি করে। কুচবিহার রাজ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লইয়া দর্পদেব ও নাজিরদেবের পুরাতন কলহ তখনও চলিতেছিল। দর্পদেবের অধীনস্থ পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী-সৈন্য সন্তোষগঞ্জের দুর্গ দখল করিয়া লইল। নাজিরদেব তাহার পুরাতন বন্ধু ইংরাজের শরণাপন্ন হইল। রংপুরের কালেক্টর Mr. Purling কুচবিহারে গিয়া নাজিরদেব ও নাবালক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নাজিরদেবের অধীনেও এক দল বেতনভুক সন্ন্যাসী ছিল; অপরাধের অজুহাতে Mr. Purling সন্ন্যাসী দলকে বিদায় দিবার পরামর্শ দেন। সন্ন্যাসী দল পূর্ব্ব হইতে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিল, এই বিদায় দিবার প্রস্তাবে তাহারা বরং সন্তুষ্ট হইল।

সন্ন্যাসীদের দমন করিবার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহার সৈন্যদল পুনর্গঠিত করিলেন। সশস্ত্র সন্ন্যাসী দলকে যে কোন প্রকারে সমুচিত শাস্তি প্রদানের জন্য জেলায় জেলায় নির্দ্দেশ পাঠাইলেন। রংপুরের কালেক্টরের নির্দ্দেশক্রমে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট রাজমহল হইতে ১১ সংখ্যক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য লইয়া জলপাইগুড়ি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্যাপ্টেন জোন্স রংপুর হইতে আর এক দল সৈন্য লইয়া কুচবিহার অভিমুখে রওনা হন। হেষ্টিংসের নির্দ্দেশক্রমে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টকে সাহায্য করিবার জন্য বহরমপুর হইতে আর এক দল সৈন্য প্রেরিত হইল। দানাপুর হইতে আর এক দল সৈন্য পূর্ণিয়ার উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে সন্ন্যাসীদের যাতায়াতের পথে প্রেরিত হয়। সুযোগ-সুবিধা হইলে কুচবিহারে ক্যাপ্টেন জোন্সের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবার নির্দ্দেশও তাহাদের দেওয়া হয়। ক্যাপ্টেন জোন্স ২৭শে জানুয়ারী পাটগ্রা পৌঁছাইবার পর সংবাদ আসে যে, সন্ন্যাসী দল মাত্র আট মাইল দূরে আছে এবং তিন মাইলের মধ্যে আরও দুইটি দল আছে। দর্পদেব তখন ভুটান ও রহিমগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী লক্ষ্মীপুর নামক গিরিপথে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই গিরিপথের যুদ্ধে দর্পদেব পরাজিত হন।

২৮শে জানুয়ারী শিবগঞ্জ হইতে ক্যাপ্টেন জোন্স সন্ন্যাসীদের পরাজয়ের সংবাদ প্রেরণ করেন। যুদ্ধে কোম্পানীর পক্ষে এক জন নিহত ও ৪ জন গুরুতর ভাবে আহত হয়। সন্ন্যাসী দল বিচ্ছিন্ন ভাবে পলায়ন করে। নৌকাযোগে তিস্তা নদী পার হইয়া তাহারা সমস্ত নৌকা ডুবাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট রাজমহলে গঙ্গা পার হইয়া দিনাজপুর হইতে ৩৬ মাইল দূরে শ্রীরামপুরে পৌঁছাইবার পর সোজা জলপাইগুড়ি যাইবার নির্দ্দেশ পান। জলপাইগুড়ির যুদ্ধেও দর্পদেব ও তাঁহার সন্ন্যাসী দল পরাজিত হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে জলপাইগুড়ি ইংরাজদের দখলে আসে।

[ক্রমশঃ।

আগামী মানুষ

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

এখানে চলার পথে যবনিকা নয়
ক্ষণিক বিরতি লাগি কিছু অবকাশ
এখানে মাটীর বুকে উতলা হৃদয়
মাথার উপর শুধু অথই আকাশ।

এখানে অনেক দূরে রাতের আঁধার
দু'চোখে জড়ানো শুধু চাঁদের জোয়ার
অনাদি অসীম মাঝে ডানার বিথার
আমরা যাত্রী দল নোতুন সোওয়ার।

সুমুখ চলার পথে রাতের কুয়াশা
এখানে আমরা শুধু প্রহর গুণি
বুকের তলায় জমা কিছু ভালবাসা
দুর্গম মরুর পথে তবু গান শুনি।

এখানে আমরা শুধু আগামী মানুষ
স্বপনে নগর গড়ি মরণ ফানুস।

প্রণব রায়

আমাদের ক্রমশঃ অচল চলচ্চিত্র

কথায় বলে, ত্রিশ বৎসর পার হ'লেই মানুষ যৌবন-সীমাও পার হয়ে যায়। যদিও আমরা মনে মনে এ কথা মানি না। তা যদি মানতুম, তা'হলে আমাদের অনেকেই শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে পঞ্চাশোর্দ্ধেও অরণ্যে গমন না ক'রে আবার টোপর প'রে নতুন ক'রে ঘর বাঁধতে বসত না।

তা প্রচলিত মতানুসারে বাংলা চলচ্চিত্রও ত্রিশ বৎসরকে পিছনে ফেলে যৌবনেরও সীমা পার হয়ে গিয়েছে। দুই যুগ আগে কেউ তার দোষত্রুটি ধরতে উদ্যত হ'লেই মুরুব্বিরা হাঁ-হাঁ ক'রে ব'লে উঠতেন—'আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প আজও নাবালক, এখনো তার বিরুদ্ধে গ্লানি প্রচার করা উচিত নয়' প্রভৃতি।

বিলাতী চলৎ-ছবি পর্দার উপরে ভালো ক'রে গল্প ফুটিয়ে তুলতে শিখেছে জন্মের পর এক যুগের মধ্যেই। সে কথার মত কথা কইতে শিখেছে বিশ বৎসর আগেই। তার বেশী দিন পরে বাংলা ছবি মুখর হয়নি। তবু আমরা তাকে সাবালক ব'লে মনে করব না কেন?

এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা কৌতুকচ্ছলে বলি, কোন জাতের মানুষদের বুদ্ধি পাকে না আশী বছরের আগে। বাংলা ছবির বেলাতেও কি ঐ যুক্তি প্রযোজ্য?

এদেশী চিত্ররাজ্যে গল্পের কারবার সুরু করেন ম্যাডানদের, অরোরা সিনেমা, ইণ্ডো ব্রিটিশ ফিল্ম ও তাজমহল ফিল্ম সম্প্রদায়।

সে-সময়ে দর্শকরা ছিল সুবোধ বালক গোপালের মত। তারা যা পেত তাইতেই খুসিই কেবল হ'ত না, সেই সঙ্গে মনে করত যা পাচ্ছে তা যথেষ্টরও বেশী। বাংলা ছবি ছিল তখন 'নভেলটি' বা আজব জিনিষের মত, সাত খুনের অপরাধীর মত মাফ করা হ'ত তার সব দোষ।

তার পর গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে গেল বৎসরের পর বৎসর। তখনকার যুবক দর্শকরা আজ হয়েছে বৃদ্ধ। তখনকার অধিকাংশ বাংলা ছবিকার ভালো ক'রে গল্প বলতে পারতেন না। আজকের অধিকাংশ ছবিকারও ভালো ক'রে গল্প বলতে শেখেননি।

আজকের ছবিকাররা কতকগুলি বিষয়ে অগ্রসর হয়েছেন, এ কথা অস্বীকার করি না। তাঁরা আলোকচিত্রকে অধিকতর উন্নত ও বিচিত্র করে তুলেছেন। এবং তাঁরা হরেক রকম প্যাঁচ কষতে ও কলা-কৌশল দেখাতে শিখেছেন।

এখনকার ছবিকারদের কার্যক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত এবং কর্তব্যও অধিকতর জটিল হয়ে উঠেছে। আগে একটি মাত্র ক্যামেরা, গুটিকয় আসবাব ও মুষ্টিমেয় কর্মীদের নিয়ে ছবির পর ছবি তোলা হয়েছে। দশ হাজার টাকা ফেললে আগে তোলা যেত একখানা ছবি। সে জায়গায় আজ এক লক্ষ টাকাও যথেষ্ট নয়। এই দরিদ্র ভারতবর্ষেই আজ একখানি মাত্র ছবি তৈরি করতেই অনেকে বহু লক্ষ টাকা অকাতরে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন না। এখন এক এক জন নট নটী বৎসরে যত টাকা রোজগার করেন, আগে তারই সাহায্যে তোলা যেত কয়েকখানি ছবি। কথা কইতে শিখে পর্য্যন্ত ছবির কাজ এত বেড়ে গিয়েছে যে, এখন একখানি মাত্র ছবির জন্যে একটি মাত্র ষ্টুডিয়োর ভিতরে যত লোক কাজ করে, পূর্ব্বোক্ত চারটি চিত্র-সম্প্রদায়ের জন্যেও তত লোকের দরকার হ'ত না।

কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে উঠেছে চিত্রনির্ম্মাতাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও। ছবির সাহায্যে তাঁদের কেউ প্রচার করতে চান আদর্শবাদ; কেউ করতে চান সামাজিক সমস্যার সমাধান; কেউ চান মৃত মহাত্মা বা মহাজনদের জীবন্ত ক'রে দেখাতে; কেউ চান অমানুষিক কাণ্ড বা চিত্তোত্তেজক ঘটনা দেখিয়ে আমাদের চমকে দিয়ে দেহ রোমাঞ্চিত করতে; এবং কেউ বা চান নাচ-গান ও হাস্যকৌতুকে মুগ্ধ করতে দর্শকদের মন।

হালে বাজারে বিস্তর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে একখানি ছবি বেরিয়েছে। ছবিখানি যে অভিজাত তা প্রচার করবার জন্যে বিজ্ঞাপনে বাক্য-বন্দুক ছোঁড়া হয়েছে যথেষ্ট। এবং তা যে ফাঁকা আওয়াজ নয় তা প্রমাণ করবার জন্যে তোমরা-চোমরা ব্যক্তিদের কাছে ধরনা দিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে লোভনীয় প্রশংসাপত্র। প্রথম প্রথম লোকে যে প্রলুব্ধ হয়নি, এমন কথাও বলতে পারি না। অসাধারণ ব্যক্তিরা মনে মনে না হোক্ মুখে স্বীকার করলেন,—হ্যাঁ, ছবিখানি অভিজাত না হয়ে যায় না, কেন না এর মধ্যে আছে ভালো ভালো ভাব, বড় বড় বুলি এবং উচ্চশ্রেণীর আদর্শবাদ। কিন্তু সাধারণ দর্শকরা ছবির দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল এবং পাড়ায় ফিরে এসে ছবির যে সমালোচনা করল, তা শ্রবণ ক'রে তাদের বন্ধুরা সে-ছবির নামও আর মুখে আনতে চাইলে না। মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের চেয়ে মৌখিক বিজ্ঞাপনের মূল্য অনেক বেশী।

এটা তো গেল অভিজাত ছবির কথা। আর এক শ্রেণীর ছবি বাজারে বেরিয়েছে, যার নির্ম্মাতারা আভিজাত্যের ধার ধারেন না—না মনে, না বিজ্ঞাপনে। তাঁরা তৈরি করেন ভয়াবহ ছবি। তাঁরা জানেন এক শ্রেণীর লোক ভয় পেতে ভালোবাসে, তাই তাঁরাও ভয় দেখিয়ে বেশ দু'-পয়সা কামিয়ে নিতে চান। লোকে ছবি দেখে ভয় পায়, চমকে ওঠে, দেহকে রোমাঞ্চিত ক'রে তোলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রায় দেয়, ছবিখানা হচ্ছে নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

কেন এমন হয়? একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

উনিশ-বিশ বৎসর আগে কবি নজরুল ইসলামের "আলেয়া" নামে একখানি নাটক "নাট্য-নিকেতনে" অভিনীত হয়েছিল। ভালো কবিতা লিখে, ভালো গান লিখে এবং গানে ভালো সুর দিয়ে নজরুল অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন। তাঁর নাটকেও ছিল ভালো ভালো গান অনেকগুলি এবং সে সব গানের সুরও দিয়েছিলেন তিনি নিজে। গদ্যেও নজরুলের হাতযশ ছিল। সুতরাং নাটকের মধ্যে যে ভালো ভালো কথা থাকবে সেটা আর বলাই বাহুল্য।

উচ্চ শ্রেণীর ভাবেরও অভাব হয়নি। তার উপরে ছিল অনেকগুলি চমৎকার নাচ। কোন কোন নাচ দেখে বিশ্ববিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটারের অন্যতম কর্ম্মকর্তা সুরাবর্দ্দী সাহেব প্রভৃতি প্রশংসা না ক'রে পারেননি। তখনকার এক জন লোকপ্রিয় নৃত্যশিল্পীর (শ্যামসুন্দর) নৃত্যও দর্শকদের কাছ থেকে যথেষ্ট অভিনন্দন লাভ করত। অপূর্ব্ব দৃশ্যপট পরিকল্পনা করেছিলেন সুবিখ্যাত শ্রীসতু সেন। মঞ্চের বড় বড় নট-নটীরা নেমেছিলেন বিভিন্ন ভূমিকায় এবং তার উপরে সিনেমার প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য সেই প্রথম দেখা দেন মঞ্চের উপরে নায়কের ভূমিকায়। মোট কথা, আয়োজন হয়েছিল প্রথম শ্রেণীর।

কিন্তু সকলের চেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল, নাটকখানি একেবারেই জমল না। নজরুলের অতুলনীয় জনপ্রিয়তাও নাটকখানিকে অকাল-মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করতে পারলে না।

কেন? নজরুল উচ্চশ্রেণীর কবি বটে, কিন্তু নাটকের গল্পটিকে তিনি ভালো ক'রে গুছিয়ে বলতে পারেননি।

চিত্রজগতেও গল্প বলাটাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। এই জন্যেই হলিউডের পৃথিবী-বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ স্যামুয়েল গোল্ডউইন সাহেব প্রযোজক, পরিচালক ও নট-নটীর উপরেও লেখকের আসন নির্দ্দেশ করেছেন। গল্প যদি ভালো হয় তবেই ছবি চলবে। গল্প যদি ভালো না হয়, যদি ভালো ক'রে গুছিয়ে না বলা হয়, তবে শ্রেষ্ঠ প্রযোজক, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ নট-নটীর সম্মিলিত প্রচেষ্টাও কোন ছবিকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

মাঝে মাঝে সমালোচনায় ও বিজ্ঞাপনে দেখি, ছবিতে ক্যামেরার কারচুপিকে অত্যন্ত প্রাধান্য দিয়ে দর্শকদের আহ্বান করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে হাস্যকর। আমরা ক্যামেরার সাহায্যে নতুন কায়দায় ছবি তোলা দেখলে খুসি হ'তে পারি, কিন্তু নিতান্ত গৌণ ভাবেই। যে ছবি বলে বাজে গল্প, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রকরের কোন কলা-কৌশলই তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

বাংলা ছবি গোড়ার দিকে ভালো গল্পের প্রতি যেটুকু দৃষ্টি দিত, এখন তাও আর দেয় না। "মেজদিদি", "কঙ্কাল" ও "রত্নদীপ" প্রভৃতি ছবি আজকের দিনেও সমস্ত দর্শকের হৃদয় জয় করেছে একমাত্র কাহিনীর গুণেই। কিন্তু এটা দেখেও অন্যান্য ছবিকাররা এই সহজ সত্যটা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন।

গত বারের "মাসিক বসুমতী"তে বাংলা ছবির যে সালতামামি প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, ১৩৫৭ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বাংলা ছবি তোলা হয়েছে মোট পঁয়তাল্লিশখানা। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে মাত্র পাঁচখানি ছবি—"কঙ্কাল", "মাইকেল মধুসূদন", "বিদ্যাসাগর" "মেজদিদি" ও "রত্নদীপ"। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে স্থানলাভ করেছে যথাক্রমে চারখানি ও সাতখানি ছবি। বাকি সমস্ত ছবিই হবিই হয় "নিকৃষ্ট", নয় "নিকৃষ্টতম"।

এই সব রাবিস বা রাবিসেরও চেয়ে খারাপ ছবি উচ্চতর শ্রেণীতে উঠতে পারেনি কেবল গল্প বলার দোষেই। এই সব ছবিতে যাঁরা গল্প বলার ভার নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে পনেরো আনা লোকের নাম গল্পলেখক ব'লে কেউ জানে না। অনেকেই পেটের দায়েই যা হোক একটা কিছু খাড়া ক'রে দিয়েছেন। কেউ বা বিদেশী গল্প চুরি ক'রে বাংলার মাটিতে খাপ খাওয়াতে পারেননি এবং কেউ কেউ বা মনে করেছেন তাঁরা যখন ক খ গ ঘ পড়েছেন এবং অনায়াসেই চিঠি লিখতে পারেন তখন গল্পই বা লিখতে পারবেন না কেন?

কিন্তু নিছক পণ্ডশ্রমের জন্যে নির্ম্মাতাদের এই যে বিপুল অর্থব্যয় ও মন্দভাগ্য দর্শকদের এই যে বিপুল অর্থদণ্ড, এটা নিয়ে চিন্তা করলেও মন হয় ভারগ্রস্ত। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আমাদের চিত্র-জগতে অবাধে বিচরণ করছে যত সব নির্ব্বোধ প্রযোজক, অনভিজ্ঞ পরিচালক ও অক্ষম লেখক। যেখানে চেক সই করতে পারলেই প্রযোজক, ক্যাপ্তেন বধ করতে পারলেই পরিচালক এবং কলম ধরতে পারলেই লেখক হওয়া যায়, সেখানে চলচ্চিত্র শিল্পের অধোগতি রোধ করবার ক্ষমতা কারুর আছে ব'লে মনে করি না। বাংলা ছবি হয়েছে আনাড়ীদের হস্তগত, তার চাহিদা ক'মে যাচ্ছে দিনে দিনে, বাঙালী দর্শকের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে হিন্দী ছবির বাজারে—সেখানেও মস্তিষ্কের খেলা পাওয়া না গেলেও ধুমধড়াক্কা দেখে অর্থব্যয় কতকটা সার্থক হ'ল ভেবে মনকে খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়া যায়। এই ভাবে আরো কিছু দিন চললে বাংলা ছবি যে কত নীচে গিয়ে দাঁড়াবে, তা কল্পনা করলেও মনের ভিতরে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস।

এই অচল অবস্থা কতকটা দূর করতে পারেন আমাদের বিভিন্ন ষ্টুডিয়োর মালিকরা। যে সব নূতন বা হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা চিত্র-প্রতিষ্ঠানে কাজ করে নামগোত্রহীন প্রযোজক, পরিচালক ও লেখকরা, দ্বিগুণ ভাড়া দিলেও তাদের হাতে ষ্টুডিয়ো ছেড়ে না দেওয়া উচিত। এ ছাড়া বালখিল্যদের উপদ্রব বন্ধ করবার উপায়ান্তর নেই।

বিজ্ঞাপনের ফল

হাঁস আর মুরগীর পার্থক্য কি বলতে পারেন? হাঁস নিরীহ আর গম্ভীর; ময়লার স্তূপে চুপিসাড়ে বসবাস করে। ডিম পাড়লে কা'কেও কিছু জানায় না, চেঁচামেচি করে না। কিন্তু মুরগী যখন ডিম পাড়ে, তখন তার কণ্ঠস্বর যখন-তখন শোনা যায়। মুরগী যেন সারা দুনিয়াকে ডিম পাড়ার কথা জানাতে চায়। মুরগী যেন বিজ্ঞাপন করে চেঁচিয়ে, তারস্বরে চীৎকার করে।

ফলে এই হয় যে, সারা দুনিয়ার লোক মুরগীর ডিমই বেশী পরিমাণে খায়। আর হাঁসের ডিমের এক রকম সন্ধানই পাওয়া যায় না।

যাঁদের দেখেছি—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড। ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১, মূল্য তিন টাকা। **কল্লোল-যুগ**—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ডি, এম, লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, মূল্য পাঁচ টাকা। **বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস**—শ্রীশিবানন্দ। চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, মূল্য চার টাকা। **রোগটা যখন টি, বি**—অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়। নর-নারী পাবলিশিং কনসার্ণ, ২৬-১, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, মূল্য সাড়ে তিন টাকা। **টি, বি, থেকে সারবার পর**—অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়। নর-নারী পাবলিশিং কনসার্ণ। ২৬-১, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, মূল্য দুই টাকা। **কুমারী অ্যারস্তার-এর দিনপঞ্জী**—তরু দত্ত। অনুবাদক—শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়। এন, এস, রায় চৌধুরী প্রকাশিত। ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

গত কয়েক বছরের বাঙলা সাহিত্য পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মূল-সাহিত্যের যত না উন্নতি হয়েছে, অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস এবং সাহিত্যে যত না মৌলিক সৃষ্টির সন্ধান পাওয়া গেছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কয়েক জন সমালোচনা-সাহিত্যে। বিগত কয়েক বছরে মূল-সাহিত্যে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ধরণের গল্প, উপন্যাস এবং কবিতার সাক্ষাৎ এক রকম নেই বললেই ভাল হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও যুদ্ধ-পূর্ব্ব সময়ের বাঙলা সাহিত্যে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন কয়েক জন পুরানো এবং নূতন সাহিত্য-সেবক। কিন্তু অধুনা! আমাদের গল্প, উপন্যাস এবং কাব্য-সাহিত্যে কেন যে সহসা এমন ভাঁটা পড়লো তার কারণ আমাদের কাছে একেবারে অজ্ঞাত। পুরানো লেখকদের কয়েক জনের লেখনীতে যেন মরচে ধ'রে গেছে। তাঁদের কেউ কেউ এখনও যাঁরা সমান তালে লিখতে সচেষ্ট আছেন, বলতে বাধা নেই, তাঁদের নূতনতম সৃষ্টি হচ্ছে যেন চর্ব্বিতচর্ব্বণ। পূর্ব্বে তাঁরা যা লিখেছেন তারই পুনরাবৃত্তি পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের আধুনিকতম লেখায়। লেখায় পুনরাবৃত্তি ঘটলে যে লেখা থামাতে হয়, সে-কথা তাঁদের বুঝিয়ে পারা যায় না। বাজারের টাকা এবং যশের মোহ কি তাঁরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি? সর্ব্বদেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিকরাই stock ফুরিয়ে গেলে কোন রকম লোভের বশীভূত না হয়ে লেখায় বিরত হন, যাতে তাঁদের পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের কয়েক জন লেখককে দেখা যাচ্ছে তাঁরা তাঁদের সঞ্চিত যশরেখাকে স্বেচ্ছায় ম্লান করছেন। অথচ লেখার ধারা কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন করছেন না। অন্যান্য দেশে দেখা যায়, কোন সাহিত্যিক প্রচুর লেখার পর যখন ক্লান্ত হন তখন লেখার রীতি বদল করেন। তার মানে গল্প লিখতে লিখতে হালকা রচনার দিকে মনঃসংযোগ করেন হয়তো, উপন্যাস লেখায় ইতি দিয়ে গল্প লেখায় রত হন, কবিতা-লক্ষ্মীকে ত্যাগ ক'রে কাব্যালোচনায় লেখনী নিযুক্ত করেন। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে ঠিক তার উলটো হতে দেখা যাচ্ছে। গল্প রচনায় যাঁর নৈপুণ্য কিংবা উপন্যাস লেখায় যিনি পারদর্শী, শেষ বয়স পর্য্যন্ত যে গল্প এবং উপন্যাস লিখলেই তাঁদের রচনা সব সময়ে উৎকৃষ্ট হবে তার কোন দার্শনিক ভিত্তি নেই। বরং তার কুফল-স্বরূপ পুনরাবৃত্তি ঘটবার আশঙ্কা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। ঘটছেও তাই। তাঁদের লেখায় আর কোন আকর্ষণ থাকছে না, যদিও তাঁদের আপন আপন খ্যাতি ম্লান হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁদের গুরুদেব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনুসৃত পন্থাকে অনুসরণ করতে অনুরোধ করছি। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি বৈচিত্রপূর্ণ রেখেছিলেন, যে-জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত যে-সব রচনা তিনি দেশবাসীকে উপহার দিয়ে গেছেন তাদের একটিও অপাঠ্য তো নয়ই, বরং প্রত্যেকটি সুখপাঠ্য। প্রমথ চৌধুরী মশাইও ঐ পথের পথিক। এমন কি আধুনিক সাহিত্যের অন্নদাশঙ্কর রায় ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উক্ত ধারা রক্ষা ক'রে চলেছেন। যে জন্য তাঁদের একটিও লেখায় ধার এবং ভারের অভাব হচ্ছে না। অন্নদাশঙ্করের সাম্প্রতিক ছড়া আর অচিন্ত্যকুমারের সদ্যপ্রকাশিত কল্লোল-যুগই আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রকৃষ্ট পরিচয়। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে হয়তো সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হেমেন্দ্রকুমার রায়, তিনিও তাঁর রচনার রীতি পরিবর্ত্তন ক'রেছেন। কিছু কাল পূর্ব্বে একটি অখ্যাতনামা মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'তে দেখা যায় হেমেন্দ্রকুমারের ব্যক্তিগত সাহিত্য-স্মৃতি-কথা—'জীবনের ঝরাপাতা' নামে। কিন্তু বাঙলার নূতন পত্রিকাগুলির

স্বাভাবিক অকাল-মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হয় ঐ পত্রিকাখানি। তৎপরে 'জীবনের ঝরাপাতা'র 'যাঁদের দেখেছি' নামান্তর হয় কোন এক দৈনিক পত্রিকায় এবং প্রতি সপ্তাহে একেক কিস্তী আত্ম-প্রকাশ করতে থাকে এবং সামান্য দিনের মধ্যেই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। 'যাঁদের দেখেছি'র প্রথম খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ব্বেই বলেছি, হেমেন্দ্রকুমার আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে হয়তো বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি সেই 'ভারতী' গ্রুপের অন্যতম এক জন, যিনি নিজ সাহিত্য-ধারা ও নিজ সুব্যবহারের জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন এবং এখনও আছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ, মণিলাল (বন্দোপাধ্যায়), গগনেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির সমসাময়িক 'ভারতী' পত্রিকার যুগ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা এমন সময়, যখন সকলের নিষ্ঠা, ঐতিহ্য ও সাহিত্য-প্রীতি ছিল গভীর ও সুনিবিড়। তখন দস্তুরমত সংসাহিত্য রচনায় আত্মদান করেছিলেন একাধিক প্রতিভা—যার ফলে তখনকার বাঙলা সাহিত্যে এখনকার সাহিত্যের মত মেকী ও ভূয়ো রাজনীতির কোন রকম 'ism'এর স্থান হয়নি। যদিও তখন কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু কোন এক জন সাহিত্যিকও গড়ে তুলতে সচেষ্ট হননি এখনকার মত কোন একটিও কংগ্রেস সাহিত্য-সঙ্ঘ—যার ভেতর কংগ্রেস, সাহিত্য এবং সঙ্ঘের কোন বালাই নেই বললেই হয়। 'ভারতী' গ্রুপে এবং যুগে খাঁটি সাহিত্য এবং সাহিত্যিক তৈরী হয়েছিল একাধিক প্রতিভার সমবেত চেষ্টায়। সেই যুগের এক-এক যুগন্ধরদের সম্বন্ধে স্মৃতিকথা (ইংরেজীতে যাকে বলে Reminessence) অঙ্কিত ক'রেছেন হেমেন্দ্রকুমার, যাঁকে যেমন দেখেছেন, যাঁকে যতটুকু জেনেছেন। বাঙলা সাহিত্যে ঠিক এই ধরণের একখানি গ্রন্থের অত্যধিক প্রয়োজন ছিল এবং আশা করি, এখন হেমেন্দ্রকুমার ব্যতীত অপর কেউ আর নেই যিনি স্বার্থাতীত ধারায় এই ধরণের sketch আঁকতে সক্ষম হবেন। 'যাঁদের দেখেছি'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে চল্লিশ জন সাহিত্যিক এবং সাহিত্য রসপিপাসুর ব্যক্তিগত জীবন-স্মৃতিতে। হেমেন্দ্র-কুমারের দৃষ্টিকোণ কোন প্রকার রাজনীতির ভেজালে পরিপূর্ণ নয় বলেই প্রত্যেকটি চরিত্র এমন জীবন্ত হয়ে পাঠকদের সম্মুখে হাজির হয়েছে। 'যাঁদের দেখেছি' প্রত্যেক দেশবাসী পড়বেন এমন আশা করতে পারি। 'যাঁদের দেখেছি' বাঙলার এক সুমহান্ অতীত ইতিহাসের স্বাক্ষর হয়ে রইলো। নিউ এজ পাবলিশার্স নূতনতম রুচিবান প্রকাশক, বইখানির ছাপা বাঁধাই এবং প্রচ্ছদের উৎকৃষ্টতায় বেশ যত্ন নিয়েছেন দেখে আমরা খুশী হলাম। কিন্তু বর্ণিত চরিত্রগুলির একেকখানি ছায়াচিত্র কিংবা স্কেচ এই সঙ্গে উপহার দিলে 'রেকর্ড' হিসাবে গত অর্দ্ধ-শতাব্দীর এ্যালবাম 'যাঁদের দেখেছি' আরও অধিক আকর্ষণীয় হ'ত বলে মনে করি।

ঠিক এই ধরণের আর একখানি গ্রন্থ অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোল-যুগ'। কল্লোল-যুগ সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে অচিন্ত্যকুমার সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় দেওয়ার দরকার। 'কল্লোল-যুগে'র এক জন বহুমুখী প্রতিভা অচিন্ত্যকুমার—যাঁর লেখনী গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও অনুবাদ-সাহিত্যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং এখনও দিয়ে চলেছে। সাহিত্যিকের লেখনী তখনই থেমে যায়, যখন লেখকের ভাষার ভাণ্ডার হয় শূন্য। বাঙলা দেশের কয়েক জন খ্যাতিমান সাহিত্যিকের লেখায় দেখা যায় ভাষার কোন আদর নেই, শুধু ভাবেরই ভাষণ। আবার শুধু ভাবের ভাষণ বেশী দিন টিঁকতে পারে না, তা সে যত উচ্চ স্তরের ভাবই হোক না। ছবি আঁকতে হ'লে শুধু যেমন এ্যানাটমি জানলে ছবি উৎরোয় না, রঙের জ্ঞান থাকার বিশেষ প্রয়োজন ; তেমনি সাহিত্য রচনায় জমাট Plot ও Type চরিত্র নখ-দর্পণে থাকলেই চলে না, যদি না লিপি-কুশলতায় ভাষা-দখলের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙলা ভাষা দখল করতে হ'লে সংস্কৃত ভাষায় সামান্য জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের স্বনামধন্য কয়েক জন সাহিত্যিক সংস্কৃতের প্রথম ভাগের পাতা কখনও যে উল্টেছেন বলে মনে হয় না, যে জন্য তাঁদের লেখা বিরস ভাষার জন্য আর পড়তে চাইছে না দেশবাসী। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার একেবারে তাঁদের ব্যতিক্রম। অচিন্ত্যকুমারের শব্দ-প্রয়োগ ও ভাষা-জ্ঞান কল্পনাতীত, অভিনব ও অনবদ্য। তাঁর এই ভাষার প্রতি সযত্ন-দৃষ্টির জন্য তিনি যা-ই কেন লিখুন না, প্রত্যেক লেখাই হয় অসম্ভব সুখপাঠ্য ও সুমধুর। ভাষা-জ্ঞান বুদ্ধির পরিচায়ক। অচিন্ত্যকুমারের ভাষা বুদ্ধির দীপ্তিতে প্রখর ও মুখর।

'কল্লোল-যুগ' এমন একটা যুগ, যখন নব নব প্রতিভার সাক্ষাৎ পেয়েছে বাঙলা সাহিত্য,—যদিও সে-যুগের পূর্ব্বগামীরা এই নবাগতদের দেখে মিথ্যা সংস্কারের ভিত্তিহীন শিখরে ব'সে ব'সে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন দিনের পর দিন। সমাজ ও সাহিত্যের পঙক্তি-ভোজনে আমাদের দুর্ভাগা দেশের চূড়ামণিরা এঁদের ক'রেছে অকথ্য অপমান। অবশ্য এই নবীন যাত্রীরা নিঃশব্দে সব কিছু সহ্য ক'রে এগিয়ে চলেছিল প্রগতির পথে তাদের কালি আর কলমকে মাত্র সম্বল ক'রে। উক্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের কোন বাধা আর বিপত্তি রুখতে পারেনি নব যুগের এই কল্লোলকে। এক দল তীক্ষ্ণধার লেখনী ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়েছিল সংস্কারবাদীদের তাসের দেশকে, আর সেই ধ্বংসস্তূপের 'পরেই গ'ড়ে তুলেছিল নতুন এক সুদৃশ্য ইমারৎ—যার ভিত্তি বিদ্যা, জ্ঞান ও বুদ্ধির মিশ্রণে সুপ্রতিষ্ঠিত। গোকুল নাগ আর দীনেশ দাসের রক্তে গঠিত 'কল্লোল' পত্রিকা, যাকে বহু পরিশ্রমে গঠন করতে গিয়ে উক্ত বন্ধুদ্বয় অকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সেই কল্লোল-যুগের চিত্র এঁকেছেন অচিন্ত্যকুমার, রসিয়ে রসিয়ে ; অন্তরের অকৃপণ সহানুভূতির সঙ্গে ; কোন রকম রাজনীতির আওতা থেকে দূরে থেকে থেকে। একটা বিপ্লবী যুগের ইতিহাস, কিন্তু যেন প্রথম শ্রেণীর টেকনিকের উপন্যাসের আঙ্গিকে লিখেছেন লেখক। অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নওজোয়ান নজরুল ইসলাম, ক্ষুরধার ভাষাবিৎ প্রবোধকুমার সান্যাল, সত্যের উপাসক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অসামান্য প্রতিভা প্রেমেন্দ্র মিত্র, পরম বিপ্লবী বুদ্ধদেব বসু, মিষ্টভাষী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এক-এক রত্নের একত্র মিলনের ইতিহাস—যেন এক বৈপ্লবিক আন্দোলনের উজ্জ্বল ও উপভোগ্য কাহিনী—পড়তে পড়তে নিজেরে হারায়ে চলে যেতে হয় সেই যুগের কল্লোলে। বুকখানা যেন গর্ব্বে দশ হাত হয়ে ওঠে এই জন্য যে, মাত্র দু'শো বছরের আয়ু যে-সাহিত্যের, সেই দেশের সাহিত্যে কেমনে সম্ভব হ'ল হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত হঠাৎ এতগুলি প্রতিভার একত্র আবির্ভাব।

সুখের কথা, এই নবরত্নদের প্রতি তদানীন্তন অনেকানেক গ্রহ ও উপগ্রহ অকথ্য গালিবর্ষণ করলেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ও চিরসবুজ প্রমথ চৌধুরীর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়েছিল। অচিন্ত্যকুমারের লেখনীতে প্রস্ফুটিত কল্লোল-যুগ ঠিক যেন প্রথম শ্রেণীর ছায়াচিত্রের মত চোখের সামনে দেখা যায়। কতকগুলি চিঠি গ্রন্থখানির অমূল্য দলিল হিসাবে ধ'রে দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার। গ্রন্থখানির প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্য্যন্ত ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থপরতার প্রমাণ ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায় লেখকের; ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট মনোরম। 'কল্লোল-যুগ' বাঙলার প্রতি ঘরে স্থান লাভ করুক আমাদের এই প্রার্থনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যালোচনা অনেকেই করেছেন। এমন কি নাম লুকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সমালোচনা করেছেন নিজের লেখার, অনেকেই হয়তো সে-কথা জানেন না। লেখক লিখে যান এক মনে, অতঃপর সমালোচকবৃন্দ সেই লেখার নানান্ দিক আবিষ্কার করেন আপন আপন ধারায়। সর্ব্বদেশের সাহিত্যেই এই রীতি দৃষ্টিগোচর হয়। বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয়েছে মাত্র কয়েক জনের। তন্মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীকালিদাস রায় প্রভৃতি বিখ্যাত সমালোচকদের আলোচনাই প্রধানতম। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, সুদৃঢ় মতবাদ এবং দার্শনিক ভিত্তিতে গঠিত সেই সব আলোচনাই গ্রহণ করেছে বঙ্গদেশবাসী। শ্রীশিবানন্দ রচিত আলোচ্য 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' গ্রন্থখানি বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুটা নূতন আলোকপাত করেছে। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রজনী, রাধারাণী, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, ইন্দিরা ও রাজসিংহ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করেছেন লেখক। উপন্যাসগুলির স্তর-বিন্যাস করা হয়েছে। নায়ক-নায়িকাদের পৃথিবীর সাহিত্যের বিখ্যাত চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্থানে স্থানে মূল উপন্যাসের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে। বঙ্কিম-সাহিত্য বিষয়ে যাঁদের কৌতূহল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই আলোচ্য গ্রন্থখানি সবিশেষ কাজে লাগবে, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সমালোচকের বিস্তারিত জ্ঞান ও লেখার ভাষা সকলকে আকর্ষণ করবে। বইখানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সত্যিই নয়নাভিরাম।

অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় যক্ষ্মা এবং যক্ষ্মা-রোগীদের সম্বন্ধে বহু দিন ধ'রে অক্লান্ত গবেষণা করেছেন। যক্ষ্মা রোগ বাঙলা দেশের যেন এক দুরপনেয় কলঙ্ক, যার করাল গ্রাসে পতিত হয়ে প্রতি বছরে শত শত দেশবাসীর পরলোকত্ব প্রাপ্তি হচ্ছে। অর্থনৈতিক কারণ, দারিদ্র্য ও বংশগত দোষে যক্ষ্মা রোগের বিস্তার বাঙলা দেশে। যক্ষ্মা-রোগীকে এড়িয়ে চলেন বহু লোক। লেখক অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এই রোগ এবং রোগীদের বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। যক্ষ্মার ইতিহাস; রোগের প্রকৃতি; বক্ষের গঠন ও ক্রিয়া, জীবাণু-সংক্রমণ ও দেহের প্রতিরোধ শক্তি; জীবাণুর পরিচয়; সংক্রমণের সূত্র; যক্ষ্মার বংশানুক্রমিকতা; গতি ও লক্ষণ; রোগ-নির্ণয়; চিকিৎসা-পদ্ধতি; উপসর্গ; পালনীয় নিয়ম; থুথু ও অন্যান্য নিঃস্রাব; রোগীর পরিচর্য্যা; অস্ত্র-চিকিৎসা; ঔষধ; চিকিৎসার ফলাফল; রোগীর ভবিষ্যৎ জীবন; রোগের পুনরাবির্ভাব; রোগীর সামাজিক জীবন, কাজ-কর্ম্ম ও বায়ু-পরিবর্ত্তন; যক্ষ্মা রোগীর বিবাহ ও বিবাহিত জীবন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে লেখকের এই গ্রন্থদ্বয়ে। ভারতবর্ষের এবং পাকিস্থানের যক্ষ্মা-নিবাসের পরিচয়, বাঙলা তথা ভারতবর্ষে যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলন সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। বাঙলার ছাত্র-সমাজ ও যক্ষ্মা ব্যাধি এক মহান্ সমস্যা, এই বিষয়েও লেখক কিছু-কিছু কথা বলেছেন। সর্ব্বশেষে জনসাধারণের যক্ষ্মা রোগের সম্বন্ধে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ব্যক্ত ক'রেছেন। অপর গ্রন্থটিতে যক্ষ্মা রোগী সুস্থ হওয়ার পরে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় সেই সেই সমস্যার বিভিন্ন দিকের আলোচনা করা হয়েছে। যক্ষ্মা রোগী সুস্থ হওয়ার পরে হাসপাতালে, পরিবারে, সমাজে, যৌন-জীবনে, কর্ম্মক্ষেত্রে ও সাধারণ ভাবে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন সেই সেই বিষয়গুলি অনেকেরই অজ্ঞাত। লেখকের লেখায় তাদেরই পরিচয় মিলবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। প্রথম গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখেছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়; অপর গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখেছেন ডাঃ পি, কে, সেন। বাঙলা দেশে যক্ষ্মার কবলে পতিত হয়ে কেবল মাত্র অজ্ঞতা বশতঃ কত শত লোক মৃত্যু বরণ করছে। গ্রন্থ দু'খানি প্রত্যেকের অবশ্যপাঠ্য হিসাবে আমরা নির্দ্দিষ্ট করছি। অনেকগুলি আলোকচিত্র বই দু'খানির মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করেছে। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট লোভনীয়।

তরু দত্ত ও অরু দত্তের নাম শিক্ষিত বঙ্গদেশবাসী মাত্রেই জানেন। তরুর অসামান্য কাব্য-প্রতিভার কথাও হয়তো অনেকেই শুনেছেন, কিন্তু এই বাঙালী মেয়েটির হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়া জীবনের যা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি—ফরাসী ভাষায় লেখা তার উপন্যাস, Le Journal de Mlle d' Arvers প্রায় অজানা রয়ে গেছে বাঙালীর কাছে। তরুর কবি-প্রতিভার বিকাশ হয় মাত্র ১৪ বছর বয়সে, ইংলণ্ডে যখন সে ছাত্রী—ইং ১৮৭০ সালে। ইংরেজী ভাষায় তরুর কবিতাগুলি তখন এত অধিক আদৃত হয় যে, তদানীন্তন 'ঝানু' ইংরেজ ও ফরাসী সমালোচকেরাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। উক্ত উপন্যাসের বাংলা নামান্তর ক'রেছেন অনুবাদক "কুমারী অ্যারভার'এর দিনপঞ্জী"। নামকরণ যথার্থই হয়েছে। ১৮ বছর বয়সে তরু উপন্যাসখানি রচনা করে। তিন বছর ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে অতিবাহিত ক'রে এসে এই উপন্যাস রচনায় সে হস্তক্ষেপ করে। ফরাসী সাহিত্যে তখন জর্জ স্যাণ্ড, ষ্টেণ্ডহল, মোঁপাসার যুগ। ফরাসী সাহিত্যের এই নব যুগে, মাত্র কয়েক মাস ফ্রান্সে কাটিয়ে এসে একটি বাঙালী মেয়ের পক্ষে উপন্যাস লেখা অপূর্ব্ব শক্তি ও সাহসের পরিচায়ক। এই উপন্যাসে লেখিকা যে অসামান্য মনীষার পরিচয় দেয় তাও তখনকার ফরাসী সমালোচকরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। James Darmesteter লিখেছিলেন, "একটি ২১ বছরের হিন্দু বালিকা, যে কেবল কয়েক মাস ফ্রান্সে কাটিয়েছে, মাত্র কয়েক বছর যে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেছিল, তার পক্ষে ফরাসী ভাষায় এরূপ একখানি উপন্যাস লেখা অদ্ভুত সাহিত্য-শক্তির পরিচায়ক।" Edmond Gosse বলেছিলেন, "তরু দত্ত যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন মেয়েদের এক জন, তাতে সন্দেহ নেই। জর্জ স্যাণ্ড ও জর্জ্জ ইলিয়ট যদি তরু দত্তের মত বয়সে মারা যেতেন তা হ'লে

তাঁরা তরু দত্তের চেয়ে বেশী কিছু রেখে যেতে পারতেন ব'লে মনে হয় না।"

তরু দত্ত যখন এই উপন্যাস লিখতে শুরু করেন তখন বাঙলা উপন্যাসের আদিপর্ব। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাস তখন সবে মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র ২১ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তরু দত্ত একাধিক উপন্যাস লিখে যেতে না পারলেও এই একখানি উপন্যাস রচনা ক'রেই সে তদানীন্তন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদের পর্য্যায়ে আসন পেয়েছে। উপন্যাসখানি একটি রূপবতী তরুণীর জীবনের ব্যর্থতার মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী। যৌবনের আশায় রঙীন দিনগুলি তার ব্যর্থতায় ঝরে গেল। ভবিষ্যৎ তার সম্ভ-প্রস্ফুটিত জীবনে নিয়ে এল অপমৃত্যু। কুমারী অ্যারভারের প্রথম যৌবনের প্রেম যাকে ঘিরে ফুটে উঠল শতদলে, সে তারই ছোট ভাইয়ের প্রেমিকাকে পাওয়ার লোভে ছোট ভাইকে হত্যা করল এবং শেষ পর্য্যন্ত সেও জেলে আত্মহত্যা করল। প্রথম প্রেমে এই মর্ম্মান্তিক আঘাত কুমারী অ্যারভার সহ্য করতে পারল না। মারাত্মক অসুখে পড়ল সে। আর তার কাছে গভীর সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন লুই, যে এক দিন প্রেম নিবেদন ক'রে প্রত্যাখ্যাত হয়ে চোখের জল ফেলে ফিরে গিয়েছিল। সে দিল উজাড় ক'রে তার অকৃত্রিম ও অজস্র ভালবাসা। মাদাম অ্যারভার-এর ভাগ্যে সইল না এই সুখ, স্বামী লুইকে একটি সন্তান উপহার দেওয়ার পরেই পৃথিবী থেকে মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে গেল। কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত লেখার ধারা এমন সরল ও মর্ম্মস্পর্শী যে, অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভূত হয়। সারা ক্ষণ ধ'রে যেন এক ট্র্যাজেডির সুর কানে বাজতে থাকে। কারণ পরিস্থিতিগুলি বিশেষ বিশেষ করে অ্যারিভারের দিনের পর দিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা এক অনবদ্য সৃষ্টি—যা লেখিকার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। যক্ষ্মা রোগে বোন অরুর মৃত্যুর পর লেখিকা এই উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন এবং এর তিন বছর পরে তিনিও এই রোগে মারা যান। কুমারী অ্যারভারের জীবনীতে কি লেখিকার আত্ম-জীবনীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় না? উপন্যাসখানি বিদেশী ভাষাতে রচিত হ'লেও কেমন যেন বাঙলা উপন্যাস বলেও অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। রাজকুমার মুখোপাধ্যায় তরু দত্তের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির বাঙলা তর্জ্জমা করে বাঙালীর কাছে যে লেখিকার নূতন পরিচয় দিয়েছেন, সে-কথা বঙ্গদেশবাসী কোন দিন ভুলতে পারবে না। বইখানিতে ছাপার ভুল অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। প্রচ্ছদপট অভিনব।

প্রসঙ্গতঃ যে কথায় এই আলোচনার পত্তন করেছিলাম আবার সে কথায় ফিরে যাচ্ছি। অধুনা বাঙলার মূল-সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় যেন আর সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না, যেমনটি গত কয়েক বছর পূর্ব্বেও আমরা পেয়েছি। মাত্র দু'শো বছরের সাহিত্য এত অল্প সময়ে এত অধিক দূর অগ্রসর হয়ে সহসা মধ্যপথে কেন যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তার কারণ সন্ধান করলে এইটেই জানা যায় যে, পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সাহিত্য জাতে উঠেও মাঝে-মাঝে জাত হারাতে দেখা যায় মূল-সাহিত্যের বাজারে, যখন উৎকৃষ্ট গল্প, উপন্যাস আর কবিতা জন্মলাভ করে না, যখন সমালোচনা, ইতিহাস, স্মৃতিকথা আর অনুবাদ জাতীয় সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে। তাই বোধ হয় এখনকার বাঙলা সাহিত্যে "যাঁদের দেখেছি"; "কল্লোল-যুগ"; "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস"; "রোগটা যখন টি, বি"; "টি, বি থেকে সারবার পর" ও "কুমারী অ্যারভারের দিনপঞ্জী" জাতীয় মূল্যবান গ্রন্থের আবির্ভাব হল, আর সাময়িক তিরোভাব হল জাত-গল্প, উপন্যাস ও কবিতার।

পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে হামেশাই দেখা যায়, একেক সময়ে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকরা মূল-সাহিত্য সৃষ্টি না করে সৃষ্টি করেন ঐ ধরণের গ্রন্থ, আর তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিকরা (!) তখন নোংরামি, ছ্যাঁচড়ামি ও ছ্যাবলামির দ্বারা সাহিত্যের অঙ্গে কলঙ্কলেপন করে বাজার সচল রাখতে সচেষ্ট হয়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। একেক যুগ আসে যখন সাহিত্যের কথামালায় অ, আ, ক, খ প্রভৃতিরা গম্ভীর জাতীয় স্বরে জাতীয়-সাহিত্য রচনা করেন আর বিন্দু ও বিসর্গরা তখন ফাঁক পেয়ে সফরীর মতই কিছুটা ফর-ফর করে। এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে চাঞ্চল্যের পার্থক্য দাঁড়ীপাল্লায় ওজন হওয়ার নয়। সময়ের কষ্টি-পাথরে তার মূল্য যাচাই হবে।

সেক্সপীয়রের প্রিয়তম অভিনেত্রী কে ছিলেন?

উইলিয়াম সেক্সপীয়র নাট্যকার হিসাবেই সকল দেশে পরিচিত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু অনেকেই জানেন না। ইংলণ্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরীক্ষায় একবার একটি প্রশ্ন দেওয়া হয়। প্রশ্নটি হ'ল, 'সেক্সপীয়রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম অভিনেত্রী কে ছিলেন?' প্রশ্নটির সঠিক উত্তর এক জনও লিখতে পারেনি। অধিকাংশ ছাত্র প্রশ্নটি বাদ দিয়েছিল। কেবল মাত্র একটি ছাত্রী যথাযথ উত্তর লিখেছিল। উত্তর হচ্ছে, সেক্সপীয়রের সময়ে কেন, তাঁর মৃত্যুরও বহু দিন পরে পর্য্যন্ত তদানীন্তন নাটকে নারীর অভিনয় করতো পুরুষ কিংবা অল্পবয়স্ক সুদর্শন বালক। নারী অভিনেত্রী তখনও পর্য্যন্ত পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আবির্ভূত হয়নি।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

এশিয়ার-ভবিষ্যৎ—

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধ করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে সকল আয়োজন করিতেছে এশিয়ার ভবিষ্যৎকে উহা কোন্ পথে পরিচালিত করিবে, এশিয়ার জনসাধারণ এই প্রশ্নকে উপেক্ষা করিতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পরে এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে-পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কম্যুনিজম নিরোধের প্রয়াসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিজম নিরোধের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি এবং উহার পরিণামে এশিয়ার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ কি আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কম্যুনিজম নিরোধের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি কি পন্থা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে সে-সম্পর্কেই প্রথম উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত জাপানকেই এশিয়ায় কম্যুনিজম নিরোধের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিবার আয়োজন চলিয়াছিল, যদিও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের কথা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উপেক্ষা করে নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রাম্যমান্ রাষ্ট্রদূত ডাঃ ফিলিপ সি, জেসাপ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কতগুলি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিবার প্রাক্কালে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার সভাপতিত্বে ব্যাঙ্ককে এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে ১৭ জন উচ্চপদস্থ মার্কিণ কূটনীতিবিদ্ এবং আমেরিকার এশিয়া মিশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে কম্যুনিজম নিরোধের জন্য কি কি উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই বটে, কিন্তু ঐ সময় এইরূপ আশঙ্কাও প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, যদি অস্ত্র সাহায্য দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কক সম্মেলনের সুপারিশ অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, সুবিশাল চীন দেশ কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া যাইবার পর ব্যাঙ্কক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেই কম্যুনিজম ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য স্পেণ্ডার-পরিকল্পনা রচিত হয়। এশিয়ার যে-সকল দেশ রাশিয়ার প্রভাবের বাহিরে সেই দেশগুলিকে খাদ্য, কাঁচা মাল এবং টেক্‌নিক্যাল সাহায্য প্রদান করিয়াই কম্যুনিজমের অগ্রগতি নিরোধ করা সম্ভব, এই ধারণাই স্পেণ্ডার-পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। সম্প্রতি উহাই কলম্বো পরিকল্পনা নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিজমের অগ্রগতি নিরোধের জন্য এই পরিকল্পনার উপর নির্ভর করিয়া নাই। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত সামরিক চুক্তি করিবার অভিপ্রায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আছে, ডাঃ জেসাপ তৎকালে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, এশিয়ার দেশগুলি যদি কোন আঞ্চলিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে চায়, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ সহানুভূতির সহিত তাহা বিবেচনা করিবে। ইহার পূর্ব্বেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তির কথা উঠিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তির পথে অগ্রসর হইবার প্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে। ১৯৪৯ সালের ১১ই জুলাই বাগুইয়োতে ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ কুইরিনো এবং চিয়াং কাইশেকের মধ্যে এক আলোচনার ফলে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁহারা একমত হন। অতঃপর আগষ্ট মাসের (১৯৪৯) প্রথম ভাগে চিয়াং কাইশেক দক্ষিণ-কোরিয়ায় যাইয়া প্রেসিডেণ্ট সীঙ্গম্যান রীর সঙ্গে এ-সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং একটি যুক্ত বিবৃতিতে তাঁহারা পৃথক্ ভাবে এবং সম্মিলিত ভাবে আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার আবেদন জানান। তখনও সমগ্র চীন কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া যায় নাই এবং তখনও প্রশান্ত মহাসাগর ইউনিয়ন গঠনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনিচ্ছার কথাই আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু বাগুইয়ো সম্মেলনের পর মিঃ কুইরিনো প্রকাশ্যেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলি হইতেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইউনিয়ন গঠনের প্রেরণা আসিয়াছে। সমগ্র চীন কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া যাওয়ার পর এশিয়ায় যে অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ায় বলশেভিজম্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহিতই শুধু তাহার তুলনা করা চলে। ইউরোপে বলশেভিক রাশিয়াকে আঁতুড় ঘরেই হত্যা করিবার ('to strangle Bolshevism at the moment of its birth) জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল, এশিয়ায় কম্যুনিজম নিরোধের আয়োজনের সহিত তাহার সাদৃশ্য বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

জাপানকে কম্যুনিজম নিরোধের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক রচিত জাপ শান্তি চুক্তির খসড়া পৃথক ভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে জাপানে আবার সামরিক শক্তির অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মনে যে আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই আশঙ্কা জাপ শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পথে ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের মধ্যেই যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই জাপ শান্তি চুক্তি রচনার কাজ চলিতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্যও মিঃ ডুলেসকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গত ১৮ই এপ্রিল (১৯৫১) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে, আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরীয় নিরাপত্তার ভিত্তিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের সহিত একটি চুক্তি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই বিবৃতিতে তিনি উক্ত চুক্তি সম্পর্কে মার্কিণ কংগ্রেসের কমিটি সমূহের সহিত আলোচনা চালাইবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার জন্য মিঃ ডুলেসকে তিনি নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ একিসন এবং দেশরক্ষা-সচিব মিঃ মার্শালও এই চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় যোগদান করিবেন বলিয়াও তিনি জানাইয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এই

বিবৃতিতে আরও বলিয়াছেন, "The U S A is moving steadily forward in concert with other countries of the Pacific in its determination to make ever stronger the position of the free world in the Pacific Ocean area." অর্থাৎ 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্বাধীন দেশগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য দেশের সহিত একযোগে কাজ করিবার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।' এই উক্তির একমাত্র সহজ অর্থ কি ইহাই নহে যে, এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট শক্তি-বর্গের সহিত ভবিষ্যৎ যুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির জনবল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যাহাতে নিয়োজিত হয়, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সেই চেষ্টাই করিতেছেন? এই চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যেই কি কম্যুনিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা-ব্যবস্থার (Defence against Communist aggression) ধ্বনি তোলা হয় নাই? কম্যুনিষ্ট আক্রমণ নিরোধ করার প্রকৃত অর্থ কি তাহা যেমন এশিয়াবাসীর উপলব্ধি করা প্রয়োজন, তেমনি কি ভাবে এবং কি কি পন্থায় তথাকথিত কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করার আয়োজন করা হইতেছে তাহাও বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

হিটলার বলশেভিজমের কবল হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। আজ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও কম্যুনিজমের আক্রমণ হইতে স্বাধীন বিশ্বের স্বাধীনতা রক্ষার ধ্বনি তুলিয়াছে। এশিয়ার এই সকল স্বাধীন দেশের যথার্থ স্বরূপ কি এবং তাহাদের স্বাধীনতা কি ভাবে বিপন্ন হইতে চলিয়াছে, ইহাই আসল প্রশ্ন। প্রথম মহা-যুদ্ধের মধ্যে সংযুক্ত সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের মধ্য হইতে এই সংযুক্ত সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিরূপে বাহির হইয়াছে। ইহাতেই এশিয়া ও আফ্রিকায় শক্তি-ভারসাম্যের (balance of power) যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার উপর দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম শেষ হওয়ার কয়েক বৎসরের মধ্যে সমগ্র চীন চীনা কম্যুনিষ্টদের দখলেই শুধু চলিয়া যায় নাই, জেঃ ম্যাকআর্থারের ভাষায় বলিতে পারা যায়, কম্যুনিষ্ট চীন একটি উৎকৃষ্ট সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। মাও সে তুংয়ের চীন যদি লাল চীন না ও হইত, তাহা হইলেও এশিয়ায় একটি নূতন শক্তিশালী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইত, ইহা স্বীকার করা সত্যই খুব কঠিন। মার্কিণ কংগ্রেসের নিকট জেঃ ম্যাকআর্থার যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা হইতেও ইহা বুঝিতে পারা যায়। এশিয়ায় নব অভ্যুদিত শক্তিশালী চীন রাষ্ট্রকে ধ্বংস করাই কম্যুনিজম নিরোধের ধ্বনির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য কি না, কম্যুনিজম নিরোধের আয়োজন হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তির অনুকরণে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চশক্তির এক প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি সম্পাদনের আয়োজন করিতেছে। এই পঞ্চশক্তির নাম: মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, ফিলিপাইন

এবং ইন্দোনেশিয়া। জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তাহাকেও হয়ত এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে চিয়াং কাইশেকের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে একটি গোপন চুক্তি হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। গত মার্চ মাসে (১৯৫১) এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। বৃটেনের মনোভাবকে আঘাত না করিবার উদ্দেশ্যেই হয়ত চিয়াং কাইশেককে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তিতে গ্রহণ করা হইবে না, কিন্তু উল্লিখিত গোপন চুক্তি অনুযায়ী ফরমোসায় স্থায়িভাবে মার্কিণ সামরিক মিশন রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং চিয়াং কাইশেকের সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষাদান এবং পুনঃ অস্ত্রসজ্জিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। কম্যুনিষ্ট চীন এই চুক্তিকে চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণের জন্য ফরমোসাকে ঘাঁটি করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়াস বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। রাশিয়া উহাকে প্রাচ্যদেশে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণের আর একটি প্রমাণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সিঙ্গাপুরে মার্কিণ, বৃটিশ এবং ফরাসী সামরিক প্রধান কর্তাদের চারি দিনব্যাপী যে গোপন অধিবেশন গত ১৮ই মে (১৯৫১) শেষ হইয়াছে তাহার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সিঙ্গাপুর বৈঠক

গত ১৫ই মে (১৯৫১) বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান-বাহিনীর প্রধান কর্তাগণ এবং তাঁহাদের উপদেষ্টাদের যে বৈঠক আরম্ভ হয় তাহা শেষ হইয়াছে ১৮ই মে। এই সম্মেলনে তাঁহারা সকলেই একমত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সুপারিশ সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট প্রেরিত হইবে। তাঁহাদের এই আলোচনা ছিল সম্পূর্ণ গোপনীয় এবং সামরিক ব্যাপার। তাঁহাদের আলোচনার স্বরূপ এবং সুপারিশের বিষয় জানিতে পারা না গেলেও ইহা জানা গিয়াছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রক্ষা-ব্যবস্থাই ছিল তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়। এই রক্ষা-ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনায় নিম্নলিখিত সমস্যাগুলিও তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন: (১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যদি চীনের উপকূল ভাগ অবরোধ করে, তাহা হইলে মিত্রশক্তিবর্গের বাহিনী কি ভূমিকা গ্রহণ করিবে, (২) সমগ্র সামরিক ব্যবস্থায় হংকংএর স্থান কি, (৩) চীনা কম্যুনিষ্টরা যদি ইন্দোচীনের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সৈন্যবাহিনীর কি নূতন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, (৪) ইন্দোচীনের জন্য ক্ষুদ্র একটি আর-এফ-এ দল এবং রয়েল অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনী প্রদানের সম্ভাব্যতা এবং (৫) ভিয়েটমিনের বিরুদ্ধে টংকং অঞ্চলের যুদ্ধে জেঃ De Tassignyকে অধিকতর সাহায্য দানের বিষয়।

এই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সামরিক গোপনীয় বিষয় হইলেও এই বৈঠক সম্পর্কে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রক্ষা-ব্যবস্থা আলোচনা করিয়াছেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্সের সামরিক প্রধান কর্তারা এবং অষ্ট্রেলিয়া নিউজীল্যাণ্ডও এই বৈঠকে পর্য্যবেক্ষক প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রক্ষা-ব্যবস্থার আলোচনায় ভারত, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন তো কেহ নহেই, যে বাও দাই গবর্ণমেণ্টকে বাঁচাইবার জন্য এই সম্মেলনে আলোচনা করা হইয়াছে সেই বাও দাই গবর্ণমেণ্টও এই সম্মেলনে স্থান পায় নাই। ফ্রান্স ইহাতে মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কারণ, বাও দাই গবর্ণমেণ্টের যে কোন পৃথক্ স্বাধীন সত্তা নাই, এই ব্যাপারে বিশ্ববাসীর কাছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বাও দাই গবর্ণমেণ্ট যদি সত্যই স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট হইবে, তবে তাহার রক্ষা-ব্যবস্থার আলোচনায় তাহার কোন স্থান হইল না কেন? কম্যুনিজমকে ঠেকাইয়া রাখাই যদি এই সম্মেলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে ভারত, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেরই কি এই আলোচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবার কথা ছিল না?

ব্রহ্মদেশের অশান্ত অবস্থা

সিঙ্গাপুর সম্মেলনে ব্রহ্মদেশের অশান্ত অবস্থা সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট সম্মেলনে পেশ করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কিছু মাত্র উন্নতি হয় নাই এবং বাহির হইতে আক্রান্ত হইলে ব্রহ্মদেশের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু চীনা কম্যুনিষ্টদের ব্রহ্মের বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সম্মেলনে ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা কিছুই জানা যায় না। কিন্তু 'টাইমস্' পত্রিকার সিঙ্গাপুরস্থিত সংবাদদাতা যাহা লিখিয়াছেন তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। সম্মেলনে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। 'টাইমস্' পত্রিকার উক্ত সংবাদদাতা মনে করেন যে, এশিয়ার অধিক সংখ্যক নরনারী কম্যুনিজমকে শত্রু বলিয়া মনে না করায় কম্যুনিজম ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ফলে আত্মগোপন করিয়া কাজ করিবার পক্ষে কম্যুনিষ্টদের কোন অসুবিধা হয় না। ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব অঞ্চল এবং থাইল্যাণ্ডের সুদূর পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে কম্যুনিষ্টরা তাহাদের হেড কোয়াটার্স বা সদর কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার গণমুক্তি বাহিনীর (People's Liberation Armies) কেন্দ্রীয় কমিটির কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি মন লেন গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামটি থাইল্যাণ্ডের সীমান্তের নিকটবর্ত্তী এবং ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব অঞ্চলে অবস্থিত। এই কমিটিতে দুই জন চীনা, দুই জন মালয়ী চীনা, দুই জন শ্যামদেশের অধিবাসী, দুই জন ভিয়েটনামী, দুই জন বর্ম্মী, দুই জন ইন্দোনেশীয়, দুই জন লাওটিয় এবং এক জন কাম্বোডিয় আছেন।

ব্রহ্মদেশের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া আমরা যতই শুনিতে পাই না কেন, ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অধিকৃত অঞ্চল বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। সশস্ত্র বিদ্রোহীরা আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। বিদ্রোহীদের কার্য্যকলাপ আবার বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার সময় ব্রহ্মদেশের সাধারণ নির্ব্বাচন হয়ত শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের সংখ্যা আরও পাঁচটি হ্রাস করা হইয়াছে। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, ১১২টি নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে নির্ব্বাচন হইবে। কিন্তু তন্মধ্যে ৩৬টি নির্ব্বাচন-কেন্দ্র বিদ্রোহী দ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া ঐগুলিতে নির্ব্বাচন হইবে না বলিয়া স্থির করা হয়। সম্প্রতি আরও পাঁচটি

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হ্রাস করা হইল। এই পাঁচটি কেন্দ্রে বিদ্রোহীদের কর্ম্মতৎপরতাই ইহার কারণ। ইহাতেই ব্রহ্মদেশের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়।

শ্যামের অবস্থা

কম্যুনিজম নিরোধের জন্য শ্যাম বা থাইল্যাণ্ড প্রত্যক্ষ ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিয়াছে। অবস্থাপন্ন শ্যামীরা কম্যুনিজম পছন্দ করে না, এ কথা খুবই সত্য; কিন্তু শ্যামে বহু সংখ্যক চীনা আছে। তাহাদের অনেকেই কম্যুনিষ্ট-ভাবাপন্ন। শ্যামের প্রধান মন্ত্রী মার্শাল ফিবুন সঙ্করাম কঠোর দমন নীতি চালাইয়া আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিতেছেন। তথাপি শ্যামের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী কম্যুনিষ্টরা শ্যামদেশের মধ্য দিয়াই তাহাদের যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মদেশের বিদ্রোহীরা শ্যামদেশের ভিতর দিয়াই গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিতেছে। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট শ্যাম গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। অনেকে আশঙ্কা করেন যে, নূতন অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ পাইয়া ব্রহ্মের বিদ্রোহীরা আবার কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

ইন্দোচীনের ভবিষ্যৎ

ইন্দোচীনের সামরিক অবস্থা ফ্রান্সের অনুকূল হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করা কঠিন। সিঙ্গাপুর সম্মেলনে ফ্রান্সের দিক হইতে না কি বলা হইয়াছে যে, চীন যদি হো চী মিনকে সাহায্য না করিত, তাহা হইলে টঙ্কিন দখলে রাখা কিছুই কঠিন হইত না। কিন্তু ফ্রান্সও যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য পাইতেছে, ইহাও মনে রাখা আবশ্যক। হো চী মিনের সহিত যুদ্ধ চালাইবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সকে এ-পর্য্যন্ত ১৪০টি জঙ্গী বিমান দিয়াছে। ফ্রান্স হইতে নূতন সৈন্যও আমদানি করা হইয়াছে প্রায় ১৫ হাজার। সিঙ্গাপুর সম্মেলনে জেঃ Tassigny না কি বলিয়াছেন যে, ফরাসী সৈন্যরা ভিয়েটনামীদের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করিতেছে। এশিয়ার জনসাধারণের পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব। ভিয়েটনামীরাও বাও দাই গবর্ণমেণ্টকে স্বাধীন এবং জাতীয়তাবাদী গবর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছে না। বাও দাই গবর্ণমেণ্টকে সত্যকার গবর্ণমেণ্ট বলিয়াও স্বীকার করা কঠিন। তিনি স্বয়ং দালাতের শৈল-নিবাসে বাস করেন। তাঁহার খেয়াল-খুসী মত তিনি মন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং বরখাস্তও করেন। প্রকৃত শাসনক্ষমতা এখনও ফ্রান্সের হাতে। কম্যুনিজম নিরোধের নামে মার্কিণ অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ফ্রান্স ইন্দোচীনে যে ধ্বংস-কার্য চালাইতেছে তাহাতে ইন্দোচীনে ফ্রান্সের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে এশিয়াবাসীর কোন কষ্ট হয় না। সম্প্রতি এক জন ফরাসী নিরাপত্তা ইন্সপেক্টরের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য ফ্রান্স ২০ জন ভিয়েটনামী বন্দীকে হত্যা করিয়াছে। দীর্ঘ চারি বৎসরব্যাপী সংগ্রামের ফলে ইন্দোচীনে ব্যাপক ধ্বংস-কার্য্য সাধিত হইয়াছে। আর কত দিন এই সংগ্রাম চলিবে তাহা বলা কঠিন। এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, এই সংগ্রামের শেষ পরিণতিতে হয় ইন্দোচীন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে, না হয় আবার ফ্রান্সের উপনিবেশে পরিণত হইবে। বস্তুতঃ সমগ্র এশিয়ার ভবিষ্যৎ দ্বারাই ইন্দোচীনের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইবে। ইতিমধ্যে ভিয়েটমিনের রাজনৈতিক গঠনের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

হো চী মিনের ইন্দোচীনে লাও ডঙ্গ বা শ্রমিক দল নামে নূতন একটি দল গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫১) গঠিত হইয়াছে। রাজনৈতিক এবং সামরিক সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব এই দলের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। অতঃপর গত মার্চ্চ মাসে (১৯৫১) ভিয়েটমিন লীগ এবং লিয়েন ভিয়েট লীগকে সম্মিলিত করিয়া লিয়েন ভিট ফ্রণ্ট গঠিত হয়। লাও ডঙ্গের যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই দলকে কৃষক, শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবিদের বিপ্লবী দল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নূতন রাষ্ট্র শ্রমিক নেতৃত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফরাসী ঔপনিবেশিক এবং মার্কিণ হস্তক্ষেপকারীদিগকে পরাজিত করিবার জন্য সংগ্রামে সমস্ত ভিয়েটনামীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া পরিচালিত করাই এই দলের প্রধান কাজ। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লাও ডঙ্গ কম্বোডিয়া এবং লাওসের সহিত সহযোগিতা করিবে এবং ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া এবং লাওস এই তিনটি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক রাষ্ট্র-জাতিতে পরিণত করিবে। ফ্রান্সের সহিত সংগ্রামকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে: (১) আত্মরক্ষা, (২) সংঘর্ষ এবং (৩) প্রতি-আক্রমণ। এই নূতন দল গঠন যে ব্যাপক সংগ্রামের প্রাথমিক প্রস্তুতি তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি টঙ্কিং অঞ্চলে ফ্রান্সের সহিত ভিয়েটমিনদের সংঘর্ষ প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে।

মালয়ের সমস্যা

সিঙ্গাপুর সম্মেলনে বৃটেনের পক্ষ হইতে না কি এইরূপ আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যত্র কম্যুনিষ্টদের প্রভাব যদি বর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান ১৯৫১ সালের শেষ পর্য্যন্ত মালয়ের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইবে। ১৯৪৮ সালের মধ্য ভাগ হইতে কম্যুনিষ্টদের কর্ম্মতৎপরতার ফলে মালয়ে গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট দমনের জন্য প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া চেষ্টাতেও যখন কোন ফল হইল না, তখন জেনারেল ব্রিগসের হাতে কম্যুনিষ্টদিগকে ধ্বংস করিবার ভার দেওয়া হইল। ১৯৫০ সালের ১লা জুন হইতে ব্রিগস্-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেও ব্রিগস্-পরিকল্পনা অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পারে নাই। কম্যুনিষ্টদের সংখ্যা কোন সময়েই পাঁচ হাজারের বেশী বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। বহু কম্যুনিষ্ট নিহত এবং ধৃত হওয়ার কথা বহু বার ঘোষণা করা হইলেও, কম্যুনিষ্টদের সংখ্যা কিছুতেই পাঁচ হাজারের নীচে নামিতেছে না। বিদেশ হইতে কোন সাহায্যও তাহারা পাইতেছে না। অথচ এক লক্ষ সৈন্যের কম্যুনিষ্ট ধ্বংসের প্রচেষ্টাকে তাহারা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযান সাফল্য লাভ না করার প্রধান কারণ, এই ব্যাপারে জনসাধারণের কোন সহযোগিতা পাওয়া যাইতেছে না। তাহারা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সংবাদদাতার পরিচয় প্রকাশ না করিয়াও কম্যুনিষ্টদের সংবাদ দিবার সুব্যবস্থা করা সত্ত্বেও পুলিশের কাছে তেমন সংবাদ পৌঁছিতেছে না। জনসাধারণের

সহযোগিতা পাওয়া সহজ করিবার জন্য হোম গার্ড পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। এখানেও বড় কম অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। হোম গার্ডকে যে-সকল অস্ত্র-শস্ত্র দেওয়া হইবে সেগুলি পাছে অনভিপ্রেত লোকের হাতে পড়ে এই আশঙ্কায় হোম গার্ড গঠনের কাজও অগ্রসর হইতেছে না।

স্কোয়াটার-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি হইতেই কম্যুনিষ্টদের জনবল এবং অর্থ ও খাদ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই জন্য ব্রিগস্-পরিকল্পনায় স্কোয়াটারদের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থাও স্থান পাইয়াছে। যে সকল জমিতে নিজের কোন স্বত্ব নাই, অথবা স্বত্ব দাবী করিলেও দাবীর মূল অত্যন্ত দুর্ব্বল, সেই সকল জমিতে যে-সকল চীনা বাস করে এবং ঐ সকল জমি আবাদ করে তাহাদিগকেই স্কোয়াটার বলিয়া অভিহিত করা হয়। স্কোয়াটার-সমস্যা মালয়ে অবশ্য একেবারে নূতন নয়। জাপ আক্রমণের পূর্ব্বেও কিছু না কিছু স্কোয়াটার মালয়ে সব সময়েই ছিল। জাপানের অধিকারের সময় স্কোয়াটারের সংখ্যা অভূতপূর্ব্বরূপে বৃদ্ধি পায়। কম করিয়া ধরিয়াও স্কোয়াটরের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই সকল স্কোয়াটারের মধ্যে বহুসংখ্যক শ্রমিক আছে যাহারা জাপ আক্রমণের সময় কাজ হারাইয়াছে। ব্রিগস্-পরিকল্পনার পূর্ব্বে মালয়ের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই সকল স্কোয়াটার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ব্রিগস্-পরিকল্পনার পুনর্ব্বসতির অংশ যে-ভাবে কার্য্যকরী করা হইতেছে তাহাতেও ঔপনিবেশিক শাসনের অমানুষিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্কোয়াটারদিগকে তাহাদের বাসস্থান হইতে ধরিয়া আনিয়া ক্যাম্পে রাখা হইতেছে। ক্যাম্পের চারি দিক বার্বড তার দিয়া ঘেরা এবং পুলিশ-প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত। দিনের বেলায় পুরুষেরা নিজেদের জমিতে কাজ করিবার জন্য বাহিরে যাইতে পারে। নিজের খাওয়ার জন্য যেটুকু খাদ্য প্রয়োজন শুধু সেইটুকুই তাহারা সঙ্গে নিতে পারে। এই সকল পুনর্ব্বসতি ক্যাম্প নাৎসী কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পের অনুকরণ বলিয়াই কি মনে হয় না? স্কোয়াটারদের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা সত্ত্বেও কম্যুনিষ্টদের কর্ম্মতৎপরতা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

পুনর্ব্বসতি ক্যাম্পের পরেই ডিটেনশন ক্যাম্পের কথা বলা প্রয়োজন। ডিটেনশন ক্যাম্পগুলিতে বর্ত্তমানে কত জন বিনা বিচারে আটক রহিয়াছে সে-সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ১৯৫০ সালের শেষ ভাগে বৃটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ টম ড্রিবার্গ যখন মালয় পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, সেই সময় মালয়ের ডিটেনশন ক্যাম্পগুলিতে ১১ হাজার বন্দী আছে বলিয়া তিনি জানিতে পারেন। শুধু সন্দেহ করিয়া বিনা বিচারে ইহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিনা বিচারে আটক বন্দীর সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? মালয়ে শ্রমিকদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় এবং রবর বাগানের বৃটিশ মালিকরা মনোবৃত্তিতে যে কতখানি বুর্ব্বো রাজাদের মত, তাহার পরিচয় বাহির-বিশ্বে কিছুই পৌঁছিতে পারে না। মিঃ টম ড্রিবার্গকে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'Tell us about That Man Bevan. We do not like him. He is a Bad Egg. I mean he's all for the communist, isn't he? I mean Bevan not Mr. Bevin, he is a good chap.' অর্থাৎ 'বিভান লোকটার কথা আমাদের কিছু বলুন তো। আমরা তাহাকে পছন্দ করি না। লোকটা একেবারে নচ্ছার। অর্থাৎ আমি বলিতে চাই যে লোকটা একেবারে কম্যুনিষ্ট, তাই নয় কি? আমি বিভানের কথাই বলিতেছি, মিঃ বেভিনের কথা নয়। মিঃ বেভিন বড় ভাল লোক।' এই উক্তি হইতেই মালয়ের রবর বাগানের বৃটিশ মালিকদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারই মধ্যে মালয়ের অবস্থার আভাষ পরিস্ফুট রহিয়াছে।

যেমন ইন্দোচীনে তেমনি মালয়ে প্রকৃত সমস্যা কম্যুনিষ্ট সমস্যা নহে, প্রকৃত সমস্যা স্বাধীনতার সমস্যা। স্বাধীনতা যাহাতে না দিতে হয় তাহারই জন্য কম্যুনিষ্ট দমনের ধ্বনি উঠিয়াছে। রাজনৈতিক পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক শোষণের ফলে এশিয়ার দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ ও কম্যুনিজম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিয়া কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানবের মনকে উত্তেজিত করিয়া তোলা যে সম্ভব নয়, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ যে তাহা জানে না, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু নিজের স্বার্থের ক্ষতিকর কোন সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্যই সিঙ্গাপুর সম্মেলনে কম্যুনিজম নিরোধের জন্য সামরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ ইহাও জানে যে, শক্তিশালী নয়া চীনও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তীব্র প্রয়াস সৃষ্টি না করিয়া পারে না। কাজেই কম্যুনিজম নিরোধের প্রয়াস যদি নয়া চীন রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিয়া চিয়াং কাইশেককে চীনে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন ছাড়া আর কিছু না হয়, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে এবং নেতৃত্বে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ এশিয়া ও আফ্রিকায় আবার তাহাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছে। কিন্তু যত দিন শক্তিশালী সোভিয়েট রাশিয়া এবং নয়া চীনের অস্তিত্ব থাকিবে তত দিন তাহা সম্ভব নয়। এই জন্যই এই দুইটি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিবার জন্য কম্যুনিজম নিরোধের ধ্বনি উঠিয়াছে। এশিয়ার প্রত্যেক দেশের কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীও সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত যোগ দিয়াছে। আমেরিকার অস্ত্র-শস্ত্র এবং সামরিক নেতৃত্ব যদি এশিয়ার জনবল দ্বারা নয়া চীন এবং রাশিয়াকে ধ্বংস করিতে পারে, তাহা হইলে এশিয়ায় আবার সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য আরও এক শতাব্দীর জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। কোরিয়ার যুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি সেই পথেই পরিচালিত হইতেছে।

চীন বনাম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ—

চীনে এবং উত্তর-কোরিয়ায় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়া গত ১৭ই মে (১৯৫১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণে তাহার গুরুত্ব বিশেষ ভাবেই বিবেচনা করা আবশ্যক। গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫১) চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, আলোচ্য প্রস্তাব

তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য-সম্ভার প্রেরণ নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাবের অনুকূলে ৪৭টি ভোট হইয়াছিল। বিপক্ষে ভোট একটিও হয় নাই, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু নিম্নলিখিত ৯টি রাষ্ট্র ভোট গ্রহণের সময় নিরপেক্ষ ছিল: (১) ভারত, আফগানিস্থান, ব্রহ্মদেশ, ইকুয়েডর, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্থান, সুইডেন ও সিরিয়া। লুক্সেমবুর্গ ছিল অনুপস্থিত। সোভিয়েট ইউনিয়ন, বায়েলো রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং ইউক্রেণ ভোট দেওয়ার ব্যাপার বয়কট করিয়াছিল। চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করার প্রস্তাবে যুগোশ্লাভিয়া বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য প্রস্তাবে পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষেই ভোট দিয়াছে। সুইডেন ও সিরিয়া নিরপেক্ষ থাকিলেও তাহারা জানাইয়া দিয়াছে যে, এই প্রস্তাব তাহারা মানিয়া চলিবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, চীনকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করার প্রস্তাবের অনুকূলে ৪৪ ভোট হইয়াছিল। যুগোশ্লাভিয়া, সৌদী আরব এবং ইয়েমেন পক্ষে ভোট দেওয়ায় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য প্রেরণ নিষিদ্ধ করার অনুকূলে আরও তিনটি ভোট বেশী হইয়াছে। ভোট সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আরও দেখা যায়, সিংহল প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছে। সামরিক উপকরণ প্রেরণ নিষিদ্ধ করিবার পর বাকী রহিল শুধু মাঞ্চুরিয়ায় বোমাবর্ষণ এবং চীনের উপকূল ভাগ অবরোধ করিবার প্রস্তাব।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুদূর প্রাচ্য নীতির যে উদ্দেশ্য, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ক্রমশঃ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথেই পরিচালিত হইতেছে। চীনে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যসম্ভার প্রেরণ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত প্রথমে মার্কিণ সিনেটে গৃহীত হয়। একান্ত বশম্বদ ব্যক্তির ন্যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মার্কিণ সিনেটের সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারেও ঠিক অনুরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দ্দেশের অপেক্ষা না করিয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে। পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহাই অনুমোদন করে মাত্র। কোরিয়ার যুদ্ধের ধারা বিশ্লেষণ করিলে ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, নয়া চীনকে ধ্বংস করিবার কাজের উহা ভূমিকা মাত্র। নূতন চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইতে হইলে কতগুলি প্রাথমিক অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নয়া চীনকে আসন প্রদানের ব্যাপারে বাধা দান হইতে উহার বজ্রপাত হইয়াছে। কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোনরূপ প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে উত্তর-কোরিয়াকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করা হয়। অতঃপর কালবিলম্ব না করিয়া কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা হইল। তার পর আসিল অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করার প্রশ্ন। অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করিলে কোরিয়া যুদ্ধে চীনের হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে-প্রস্তাব গ্রহণ করিল তাহা বস্তুতঃ অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করিবার নির্দ্দেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে কোরিয়ার যুদ্ধে উত্তর-কোরিয়ার পক্ষে চীনও যোগদান করিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তখন চীনকেও আক্রমণকারী সাব্যস্ত করিলেন। চীনে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য-সম্ভার প্রেরণ নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা তাহারই ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুদূর প্রাচ্য-নীতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় প্রাথমিক কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। কোরিয়ায় যুদ্ধ না বাধিলে ইহা সম্ভব হইত না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কোরিয়া যুদ্ধ একটি ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ঘটনা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মহদভিপ্রায় সত্ত্বেও আজ বুঝা যাইতেছে যে, কোরিয়া যুদ্ধটা একটা উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষ সৃষ্টি করিবার জন্য দক্ষিণ-কোরিয়াই উত্তর-কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছিল, এইরূপ মনে করাই কি স্বাভাবিক নয়? এই উদ্দেশ্যের একটি অংশ যে কম্যুনিষ্ট চীনকে ধ্বংস করিয়া চীনে আবার চিয়াং কাইশেককে প্রতিষ্ঠিত করা, তাহা মনে করিলেও ভুল হইবে না।

চীনে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য-সম্ভার প্রেরণ নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর কোরিয়ায় যুদ্ধরত ১৬টি দেশ না কি কোরিয়া যুদ্ধের মীমাংসা করিবার জন্য পাঁচ দফা উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে একমত হইয়াছেন বলিয়া ৭ই জুনের (১৯৫১) এক সংবাদে প্রকাশ। এই উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। কোরিয়ার যুদ্ধটাই এখন অপ্রধান বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কোরিয়া যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ণ হইতে মাত্র কয়েক দিন বাকী। এই এক বৎসরের যুদ্ধে কোরিয়ার যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে কোরিয়ায় শান্তি স্থাপিত হইলেও এই শান্তি উপভোগ করিবার জন্য কয় জন কোরিয়াবাসী বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাও ভাবিবার বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, চীনে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য-সম্ভার প্রেরণ নিষিদ্ধ হওয়ায় সংগ্রামের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এই সম্ভাবনার সম্মুখে এশিয়ার দেশগুলি কি করিবে, ইহাই প্রশ্ন। আমেরিকার পক্ষ হইয়া লড়াই করিবার স্বাধীনতাই তাহাদের আছে। আমেরিকার নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিবার স্বাধীনতা তাহাদের আছে কি?

জাপ শান্তি-চুক্তি—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপ শান্তি-চুক্তির যে খসড়া রচনা করিয়াছে তাহাতে তাহার সুদূর প্রাচ্য-নীতির সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হইবে, ইহা আশা করাই খুব স্বাভাবিক। তাহা সুদূর প্রাচ্য নীতির পরিপন্থী বলিয়াই জাপ শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে রুশ-পরিকল্পনা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাহ্য করিয়াছে। জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তির জন্য রাশিয়া যে সকল প্রস্তাব করিয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, রাশিয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে, জাপ শান্তি-চুক্তির খসড়া তৈয়ার করিবার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বৃহৎ রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের এক সম্মেলন আহ্বান করিতে হইবে এবং এই বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে কম্যুনিষ্ট চীন হইবে অন্যতম। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া প্রস্তাব করিয়াছে, বৈদেশিক দখলের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপান হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে। তৃতীয়তঃ, কায়রো ঘোষণা অনুযায়ী ফরমোসা এবং পেসকাডোরেস দ্বীপ চীনকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই তিনটি প্রস্তাব হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এইগুলি স্বীকার করিয়া লইলে সুদূর প্রাচ্য মার্কিণ-নীতি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, এশিয়ার আধিপত্য রক্ষার জন্য জাপানে মার্কিণ ঘাঁটি থাকা

একান্ত প্রয়োজন। রাশিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধে এই অভিযোগও করিয়াছে যে, কোরিয়ায় সশস্ত্র হস্তক্ষেপের কাজে জাপানকে ঘাঁটি-স্বরূপ ব্যবহার করা হইতেছে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে বাদ দিয়াই জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি করিতে চায়। এই অভিযোগ দুইটিকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। জাপানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দখলকার সৈন্য ছিল বলিয়াই কোরিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা সহজ হইয়াছে এবং জাপানে মার্কিণ ঘাঁটি আছে বলিয়া কোরিয়ায় যুদ্ধ পরিচালন করা সম্ভব হইতেছে। রাশিয়াকে বাদ দিয়াই যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই এবং রাশিয়াকে বাদ দিয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি করিবেও।

জাপ শান্তি-চুক্তির মার্কিণ খসড়ার সহিত বৃটেনের প্রস্তাবেরও কিছু পার্থক্য আছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চায়, চীনের পক্ষে চিয়াং কাইশেকের গবর্ণমেন্ট এই শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবে। কিন্তু বৃটেন চায়, সুদূর প্রাচ্য-সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত চীনের স্বাক্ষর স্থগিত রাখিতে হইবে। ফরমোসা দ্বীপটি কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেন্ট পায়, ইহাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়। বৃটেন ফরমোসা সমস্যাকেও ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখিতে চায়। জাপানের পণ্য উৎপাদনের উপর কোন বাধা আরোপ করা হইবে না, এ বিষয়ে বৃটেন আমেরিকার মতেই মত দিয়াছে। চীনের পক্ষে কে স্বাক্ষর করিবে এবং ফরমোসা কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেন্ট পাইবেন কি না, এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য মিঃ ডুলেস বিলাতে গিয়াছেন। বৃটেন যে এই দুইটি বিষয়েও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মতেই মত দিবে, তাহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না। চীনকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করিতে এবং চীনে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য-সম্ভার প্রেরণ নিষিদ্ধ করিতে বৃটেন প্রথমে আপত্তি করিয়া পরে রাজী হইয়াছে। মার্কিণ নীতির প্রতিবাদে মিঃ বিভান এবং মিঃ উইলসন পদত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মিঃ এটলী, মিঃ মরিসন এবং মিঃ শিনওয়েল ইহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন যে, এশিয়ায় বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ মানিয়া না চলিলে চলিবে না। মার্কিণ নির্দেশ প্রতিপালনের পুরস্কার—এশিয়ায় বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা।

কেপটাউনে হাঙ্গামা—

দক্ষিণ-আফ্রিকায় অ-ইউরোপীয় প্রতিনিধিত্ব বিলের প্রতিবাদে শ্বেতকায় এবং বর্ণসঙ্কর প্রাক্তন সৈনিকেরা—গত ২৮শে মে (১৯৫১) এক মশাল শোভাযাত্রা বাহির করিয়া কেপটাউনের পার্লামেণ্ট ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং ইহাকে উপলক্ষ করিয়া পুলিশের সহিত এক হাঙ্গামাও সৃষ্টি হইয়াছিল। ফলে ৫১ জন লোক আহত হয়। কেপ প্রদেশের বর্ণসঙ্কর শ্রেণীর লোকেরা (coloured people) সাধারণ ধর্ম্মঘটও করিয়াছিল। আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মালান গবর্ণমেণ্ট যে বর্ণ-বৈষম্য নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, অবশেষে তাহা কেপ প্রদেশের বর্ণসঙ্করদের প্রতিও প্রয়োগ করিবার জন্য অ-ইউরোপীয় প্রতিনিধিত্ব বিল উত্থাপন করা হইয়াছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন যখন গঠিত হয় সেই সময় কোন প্রদেশে সাধারণ নির্ব্বাচন ব্যাপারে কোন বর্ণ বৈষম্য ছিল না। শ্বেতকায়, বর্ণসঙ্কর কৃষ্ণকায় সকল ভোটারদের নাম একই তালিকাভুক্ত ছিল। বর্ণসঙ্কর এবং কৃষ্ণকায়দের জন্য পৃথক্ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। এই বৈষম্যহীন নির্ব্বাচন ব্যবস্থা রক্ষা করা হইবে এবং উহার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দ্বারা পরিবর্ত্তন করা যাইবে, দক্ষিণ-আফ্রিকার শাসনতন্ত্রে এই বিভাগ সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিধানই Entrenched clauses নামে পরিচিত। দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন গঠিত হইবার ২৬ বৎসর পরে বর্ণসঙ্কর সদস্যদের ভোটের জোরে সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণকায়দের জন্য পৃথক্ নির্ব্বাচনের বিধান করা হয়। বর্ণসঙ্কর সদস্যগণ এই বিলের অনুকূলে ভোট দিয়াছিলেন বলিয়াই দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। আজ বর্ণসঙ্করদিগকে পৃথক্ করিবার বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া ইউনিয়ন এসেম্বলীর স্পীকার এই মর্ম্মে রুলিং দিয়াছেন যে, ষ্টেটিউট অব ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আইন পাশ হওয়ার পর দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন নাই। শুধু সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইলেই চলিবে।

এই বিলের দ্বারা বর্ণসঙ্করদের জন্য পৃথক নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহারা এসেম্বলীতে ৪ জন এবং সিনেটে ১ জন মাত্র শ্বেতকায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে ইউনাইটেড পার্টিও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। কারণ এই দলের ভোটারদের মধ্যে বর্ণসঙ্কর লোক বহু আছে।

প্যারী সম্মেলন—

গত ৩১শে মে (১৯৫১) বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আগামী ২৩শে জুলাই ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র-সচিবদের এক বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট একই ধরণের লিপি প্রেরণ করিয়াছে। বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণের জন্য গত ৫ই মার্চ্চ প্যারী নগরীতে সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবদের যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে, তের সপ্তাহ ধরিয়া ৬৪টি অধিবেশনে আলোচনা সত্ত্বেও কোন সর্ব্বসম্মত কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। ফলে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসানের জন্য সরাসরি সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নিকট উল্লিখিত লিপি প্রেরণ করা হইয়াছে। মস্কোস্থিত উল্লিখিত তিনটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণ সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নিকট উক্ত লিপি পেশ করিয়াছেন। সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে রাশিয়ার সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মঃ গ্রমিকোর নিকটেও উক্ত লিপির প্রতিলিপি প্রদান করা হয়। উক্ত লিপিতে বলা হইয়াছে যে, গত ২রা মে সহকারী পররাষ্ট্র সচিবত্রয় মঃ গ্রমিকোর নিকট যে-তিনটি বিকল্প কর্ম্মসূচী পেশ করিয়াছেন ঐ তিনটি কর্ম্মসূচীর মধ্যে দ্বিতীয়টিতে সর্ব্বসম্মত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে এবং তিনটি পশ্চিমী গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, উহাই পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের আলোচনার ভিত্তি হইতে পারে। এই কর্ম্মসূচীতে পাঁচটি বিষয় আছে। পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের মতে এই কর্ম্মসূচী সম্পর্কে সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবচতুষ্টয় একমত হইয়াছেন। মঃ গ্রমিকো ইহাতে আপত্তি জানাইয়া বলিয়াছেন যে, যদিও মোটামুটি একটা

মতৈক্য হইয়াছে, তথাপি উক্ত কর্মসূচীর পাঁচ দফা বিষয় কি পারম্পর্য্যে আলোচিত হইবে, সে-সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু গুরুতর মতবিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে আটলাণ্টিক চুক্তি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল সামরিক ঘাঁটি আছে সেগুলিও মঃ গ্রমিকো কর্মসূচীতে সন্নিবেশিত করিবার দাবী করিবার ফলে।

জার্ম্মাণীকে নিরস্ত্র করা সম্পর্কে আলোচনা করিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয়ের এখন আর কোন আপত্তি নাই। কারণ পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করার ব্যাপারে তাহারা নিজেরাই এখন ঢিল দিয়াছে। অস্ত্র-সজ্জা হ্রাসের প্রস্তাব আলোচনা করিতেও তাহারা রাজী। কিন্তু উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি এবং পৃথিবীব্যাপী মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি সম্বন্ধে পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় আলোচনা করিতে রাজী নয়। মঃ গ্রমিকো জানাইয়াছেন, এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে যদি আলোচনা করা না হয়, তাহা হইলে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের কোন অর্থই হয় না। পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় রুশ গবর্ণমেণ্টের নিকট যে লিপি প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিবার রুশ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার কথাই শুধু আছে, মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি সংক্রান্ত রুশ-প্রস্তাবের কোন উল্লেখ নাই। উহা উল্লেখ করিতে হঠাৎ ভুল হইয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। আটলাণ্টিক চুক্তি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা অবশ্যই যাইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী মার্কিণ সামরিক ঘাঁটিগুলিকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা বলিয়া বুঝানো সম্ভব নয়। সুতরাং ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না যে, মার্কিণ সামরিক ঘাঁটিগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনা করিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয়ের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা।

রুশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত উক্ত লিপি যে চরমপত্র নয় অথবা প্যারী সম্মেলন ভাঙ্গিয়া দেওয়ার হুমকীও নয় তাহা ভ্রাম্যমান মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ডাঃ জেসাপ অবশ্য স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। কিন্তু প্যারী সম্মেলন এ ভাবে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য চলিতে পারে না, তাহা জানাইয়া দেওয়াও উল্লিখিত লিপি প্রদানের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাতে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে ভরসা করিবার কিছু দেখা যায় না। আর সম্মেলন হইলেও কোন ফল হওয়ার আশা নাই বলিয়াই মনে হয়।

নেপাল সমস্যার মীমাংসা—

নেপালের নূতন গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবার পর প্রধান মন্ত্রী মোহন সমশের এবং স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত কৈরলা ভারত গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় মীমাংসার জন্য দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। সাত দিন আলোচনার পর যে মীমাংসা হইয়াছে, গত ১৬ই মে (১৯৫১) তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভারত গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে মীমাংসার ব্যবস্থা আমাদের কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট বলিয়াই মনে হইতেছে। নেপালের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য সহযোগিতার মনোভাব এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নেপাল মন্ত্রিসভার কাজ করা কর্তব্য, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ মতৈক্য হইয়াছে। নেপাল মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন সাধন এবং দপ্তরের পুনর্ব্বণ্টন সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং মন্ত্রিসভাকে সাহায্য করিবার জন্য ৪০ জন সদস্য লইয়া একটি উপদেষ্টা পরিষদও গঠন করা হইবে। এই উপদেষ্টা পরিষদই বর্ত্তমানে আইন সভার কাজ করিবে।

মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন কি ভাবে করা হইবে তাহা কিছুই স্থির হয় নাই। মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব ও কর্ম্মকুশলতার জন্য কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা মন্ত্রিবর্গ সহকর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন। উপদেষ্টা পরিষদ কি ভাবে গঠিত হইবে, মন্ত্রিসভার সহিত উহার সম্পর্কই বা কি হইবে তাহাও নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। অথচ ঐগুলির উপরেই গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব ও সাফল্য নির্ভর করিবে মনে করিলে ভুল হইবে না। কাজেই মূল বিষয়গুলিই অমীমাংসিত রাখিয়া যে মীমাংসা করা হইল তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা ভরসা করিবার কিছু দেখিতে পাইতেছি না। একটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। নূতন মীমাংসার ফলে ভবিষ্যৎ ষড়যন্ত্র সফল হওয়ার পথ পরিষ্কার হইল কি না তাহা অনুমান করিবার সময় এখনও আসে নাই।

তিব্বত সমস্যার সমাধান—

কম্যুনিষ্ট চীনের গবর্ণমেণ্ট এবং দলাই লামার প্রতিনিধি দলের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর একটা মীমাংসা হওয়া সম্ভব হইয়াছে। পিকিং রেডিয়োর সংবাদে জানা যাইতেছে যে, এই মীমাংসার ফলে গত ২৩শে মে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে তিব্বতের মুক্তিসাধনই এই চুক্তির উদ্দেশ্য। এই চুক্তিতে মোট ১৭ দফা সর্ত্ত আছে। এই সর্ত্তগুলি তিব্বতের মুক্তিসাধন, আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন, দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামার ক্ষমতা নির্দ্দেশ, ভবিষ্যৎ সংস্কার সাধন এবং পররাষ্ট্র ব্যাপার এই পাঁচটি অংশে বিভক্ত। সমস্ত সর্ত্ত এখানে উল্লেখ করিবার স্থান আমরা পাইব না। সংক্ষেপে কয়েকটি সর্ত্ত এখানে উল্লেখ করা হইল।

তিব্বতের জনগণ তিব্বত হইতে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণাত্মক শক্তিগুলিকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হইবে এবং তিব্বতের স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গণমুক্তি ফৌজকে তিব্বতে প্রবেশে সাহায্য করিবে। তিব্বতের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং দলাই লামা এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন। ধর্ম্মগুরুর পদ গ্রহণের জন্য পাঞ্চেন লামা তিব্বত যাইবেন। ধর্ম্মবিশ্বাস এবং প্রথা সমূহ রক্ষা করা হইবে এবং সৈন্যবাহিনীকে চীনা গণমুক্তি বাহিনীর অঙ্গ হিসাবে পুনর্গঠন করা হইবে। চীনা সামরিক ও শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য তিব্বতে একটি কমিশন ও সামরিক হেড কোয়ার্টার্স স্থাপিত হইবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারেরও সর্ত্ত আছে। চীন গবর্ণমেণ্ট তিব্বতের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং তিব্বত চীনের পিপলস্ রিপাবলিক গোষ্ঠীতে যোগদান করিবে।

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিতে এই চুক্তি যে পছন্দ হইবে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিব্বতে বৃটিশ প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে এবং মার্কিণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথও আর রহিল না। অবশেষে শান্তিপূর্ণ উপায়েই তিব্বতের সমস্যার সমাধান হইল।

ভিন্ জাতের দিদি

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব (শান্তিনিকেতন)

১

ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাচ্ছি—কান্নার সুর বেরবে বেরবে, এমন সময় মা একটা ছোট টুকরিতে করে নিয়ে এলেন ফুলের মতো সাদা ধব্‌ধবে রঙের চিড়ে। আমি চিড়েতে হাত বুলিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ এক চাকা গুড়ও আছে। কান্না থেমে গেল। মা আমাকে চোখ-মুখ ধোয়াতে নিয়ে গেলেন।

বড় ভালো লাগছিল খেতে। মাকে বললাম, 'মা, কোথেকে পেলে এই চিড়ে, মা ?'

মা বললেন, 'তোমার ন'দিদির বাড়ি থেকে এসেছে।'

আমাদের ন'দিদি আছে জানি, কিন্তু তাকে কখনও দেখিনি। মাকে বললাম, 'মা, ন'দিদি কেন আসে না মা এক দিনও ?'

মা বলেন, 'সে-যে পরের ঘরের বউ হয়ে গেছে। যখন খুশি কি আসতে পারে ?'

আমি বলি, 'আমি যদি তাকে আনতে যাই, তাহলে কি আসবে না ?'

মা বলেন, 'কেন আসবে না ? নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু'··· এটুকু বলেই মা হঠাৎ থেমে গেলেন। আমি বললাম, 'বল মা, কেন আসবে না ন'দিদি ?'

মা ছুটে গেলেন রান্না-ঘরে। ভাত উথলাচ্ছে। সকাল-সকাল আমাদের ভাত হয় কি না। আমরা ত চা'ই খাই না। সকাল বেলায় আমাদের ভাই-বোনেদের চাই গরম ভাত এক মুঠো আর একটু ঘি বা তেল, শেষে একটু দই। বেলা একটা পর্যন্ত চুপচাপ চলে যায়।

চিড়ে খাচ্ছি। প্রতিটি চিড়েয় যেন ন'দিদির মুখ আঁকা। ন'দিদি কত ভালোবেসে না-জানি দিয়েছে এই সুন্দর খাবার তার ভাইদের জন্য। আমার এমন ন'দিদিকে আমি দেখব না ? বড়দি, মেজদি, সেজদি সবাই আসতে পায় আর ন'দিদি আসতে পায় না কেন, তার শ্বশুর কি ভালো লোক নয় ?

মাকে বললাম, 'ন'দিদির বাড়ি যাব মা ?'

মা বলেন, 'যাবে ত যাবে। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? বর্ষা কাল আসুক। নৌকো চলুক। তবে ত।'

আমি বর্ষা কালের অপেক্ষা করতে থাকলাম।

বাঘের মুখ আঁকা আমার বাঁশের সুন্দর লাঠিটা চুরি করে নিয়ে গেছে পাশের বাড়ির হাবুল। আমি ত কেঁদে আকুল। মা ছুটে এসে বললেন, 'আবার হল কি ?'

বললাম, 'ঐ যে হাবলা আমার লাঠিটা নিয়ে গেছে, অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ···'

মা হাবুলকে ডেকে বললেন, 'বাবা, তোমাকে আমি একটি সুন্দর বাক্স দিচ্ছি, ঐ লাঠিটা সন্তুকে দিয়ে দাও বাপ। ওটা ওর ন'দিদি দিয়েছে। বড় আদরের লাঠি ওর। দেখছ না, একটা বাঘের মুখ আঁকা আছে লাঠিটার মাথায়। দিয়ে দাও বাপ।'

হাবুল বললে, 'জ্যেঠিমা, আগে আমাকে বাক্স দেবেন তবে আমি লাঠি দেব।'

লাঠিটা পেয়ে আমি কেবলি বাঘের মুখটাকে এদিক-ওদিক করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম। হাবুলকে বলতে লাগলাম, 'আমার ন'দিদি আমাকে দিয়েছে। তোর ন'দিদি আছে ?'

হাবলা আমাকে মুখ ভেংচে দিলে।

আমি কাঁদতে কাঁদতে উঠে চলে গেলাম মায়ের কাছে।

মাকে বললাম, 'মা, আমি ন'দিদির কাছে যাব, মা আমি···'

মায়ের কপাল থেকে ঘাম ঝরছিল। দুপুর রোদে উনুনের উপর ঝুঁকে ঝুঁকে রান্না করছিলেন। কড়াইএ ভাজা চড়চড় করছে। গন্ধ বেরচ্ছে। আমার জিবে জল আসছে। কতক্ষণে খেতে বসব।

২

পরের দিন মাকে বললাম, 'মা আমি কালকে গিয়েছিলাম ন'দিদির বাড়ি। তুমি বললে বর্ষা না এলে যাওয়া যায় না ? আমি ত দিব্যি নৌকোয় করে গেলাম। হাওর ভরতি জল থৈ-থৈ করছে। কেন আমাকে মিছে কথা বলেছিলে তুমি মা ?'

মা বললেন, 'কেমন দেখলে ন'দিদিকে ?'

'মনে নেই মা। আমাদের মতোই তার গায়ের রং। মাথায় অনেক চুল। কি রকম শাড়ি যেন পরেছিল ঠিক মনে নেই। বাঘের গায়ের মতো রং সেই শাড়ির বুঝি। আরেক বার যাব মা, অ্যাঁ ?'

মা বলেন, 'স্বপ্ন দেখেছিস্ বুঝি কাল রাতে ?'

আমি বললাম, 'স্বপ্ন ? স্বপ্ন কি রকম ?'

সে-রাত্রেই আবার ন'দিদির সঙ্গে দেখা হল আমার। কিন্তু মা'র কাছে যখন বলতে গেলাম, তখন আর কিছুই মনে আসছিল না। ভুলে গেলাম এর মধ্যেই। মা বলেন, 'যা দেখা যায় অথচ মনে থাকে না তাই স্বপ্ন।'

'দেখা যায় অথচ মনে থাকে না কেন ?

মাকে বললাম, 'মা, কবে যাব ন'দিদির বাড়ি মা ?'

মা বলেন, 'তুই যে বললি তুই গিয়েছিলি ?'

আমি বললাম, 'গিয়েছিলাম যদি তাহলে তাকে মনে থাকে না কেন ?'

মা হাসেন শুধু। পাড়া-পড়শী এলে তাদের কাছে গল্প করেন আমার কথা ন'দিদির কথা। আমি বুঝতে পারি। আমি ছুটে গিয়ে মার মুখ চেপে ধরি। মা হাত দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার বলতে সুরু করেন।

সেদিন কে একটা লোক কি নিয়ে এসেছে পোঁটলায় বেঁধে। মাকে এসে বলছে, 'এই যে মাঠান, আপনার ন'মেয়ে এই সব দিয়েছেন।'

মা এগোবার আগেই আমি এগিয়ে এসে লোকটার হাত থেকে নিলাম সেই পোঁটলা, খুলে দেখলাম—মিহি চাল আছে, সাগুদানার মতো মিহি।

দাদা-দিদিরা ছুটে এল সকলে দেখতে।

মা সেজদাকে ডেকে বলল, 'মনু, সন্তুকে নিয়ে এরই মধ্যে এক দিন গিয়ে বেড়িয়ে আয় তোর ন'দিদির বাড়ি থেকে। কেমন ?'

৩

সেদিন আমার স্বপ্ন সার্থক হচ্ছে। কত খুশি আমি। ন'দিদির বাড়ি যাচ্ছি। বড় হাওর পাড়ি দিচ্ছি নৌকোয় করে। সবুজ রঙের ধান গাছ সারা হাওর জুড়ে আছে দাম বেঁধে। মাঝি লগি দিয়ে ঠেলে নৌকো সরাতে পারছে না।

মাঝে-মাঝে ফাঁকা জলা। শাপলা শালুক ফুল, ফুলের কলি। নিচে থেকে জলের ভিতর দিয়ে যেন সাপের মতো গলা বাড়িয়ে আছে জলের উপর। বড়-বড় পাতা দেখে ইচ্ছে হয় তাতে ভাত রেখে খাই।

নৌকোর তলা থেকে ছুটে আসছে পোকা-মাকড়ের দল। বসছে গিয়ে শাপলা পাতার উপর। 'পিঁ-পিঁ' ডাকতে ডাকতে একটা ছোট্ট পাখিও উড়ে পালিয়ে গেল নৌকোর তলা থেকে। ঘস্-ঘস্ করে নৌকো এগিয়ে চলছে। ধানের গাছগুলো নুয়ে পড়ছে। নৌকো সরে যেতেই আবার সোজা হয়ে উঠছে। আমার মনে হয়, তারা বুঝি কষ্ট পায় না? আমরা তাদের উপর দিয়ে চলে যাই—তবু তারা সহ্য করে?

গলুইএ বসেছিলাম আমি। হঠাৎ দেখি, একটা ছোট্ট বাসা ভেসে যাচ্ছে তরতর করে ফাঁকা জলের উপর দিয়ে। ধান-গাছের পাতা আরও কত কি দিয়ে তৈরি একটা ছোট্ট বাসা। কয়েকটা শাদা শাদা সুন্দর ডিম উপরে। আমি লাফিয়ে উঠলাম। নৌকো একটা পাক খেল। মাঝি বললে, 'কি যে কর খোকা? এক্ষুণি আরেকটু হলে পড়ে গিয়েছিলাম আর কি? ঠিক হয়ে বসো। নড়ো-চড়ো না।'

সেজদাকে বললাম, 'সেজদা, ওগুলো কিসের ডিম?'

সেজদা বললে, 'ম্যাওকুচির।'

আমি বললাম, 'ম্যাওকুচি কি?'

দাদা বললে, 'এক রকমের পাখি।'

ম্যাওকুচিটা কি-রকম হতে পারে মনে মনে আন্দাজ করতে লাগলাম। এরই মধ্যে একটা পাখি আমার চোখের সামনা দিয়ে উড়ে গিয়ে হঠাৎ ঝপাস্ করে জলে পড়ল। দাদা বললে হঠাৎ, 'ঐ দেখ, ঐ দেখ, ম্যাওকুচি গেল।'

দাদা ত বলল, কিন্তু আরেকটু আগে বললেই আমি ম্যাওকুচি দেখতে পেতাম। ম্যাওকুচি পাখির ডিমগুলো ভেসে যাচ্ছে। ঐ পাখিটা বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছে তার ডিম। তাই এমন উড়ছে পড়ছে। দূর থেকে কানে বেজে উঠল—

'ম্যাওকুচি' 'ম্যাওকুচি' 'ম্যাওকুচি।'

দাদাকে বললাম, 'সেজদা, ঐ শোনো, ম্যাওকুচি ডাকছে, না?'

দাদা বললে, 'না, না, এ অন্য পাখির ডাক। ম্যাওকুচির ডাক আরও মিষ্টি।'

মনে মনে হতে লাগল আরও মিষ্টি ম্যাওকুচির ডাক!

৪

মাঝি বললে, 'খোকা, জামা গায়ে দাও। জুতো হাতে নাও। এবার নামতে হবে।'

আমি বললাম, 'জুতো হাতে কেন নেব?'

মাঝি বললে, 'পথে-ঘাটে কাদা-মাদা আছে কি না! বাড়ির কাছে গিয়ে পা ধুয়ে তার পর জুতো পরবে।'

একটা জমির পাশে নৌকো থামল। চাষীরা ঘরে ফিরছে এক হাঁটু কাদা নিয়ে। দুপুর হয়ে গেছে ততক্ষণে। এক হাতে হুঁকো টানছে আর হাতে পাচনবাড়ি। কাঁধে লাঙল-জোয়াল। গরুগুলি যেন এক দুপুর খাটুনির পর আর চলতে পারছে না। চাষীদেরও একই অবস্থা। আমরা চললাম তাদের পিছু-পিছু।

উঁচু-উঁচু ক্ষেতের আল। মাঝে-মাঝে পা হড়কে যায়। তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছি না। সামনে চাষীরা রয়েছে যে। তারা পথ ছেড়ে দেয় না। আমি চাই শীগ্‌গির গিয়ে পৌঁছতে ন'দিদির বাড়ি। ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

গরুগুলি জল খেতে লাগল। ছোট্ট নদীর মতো কিন্তু নদী নয়। পাহাড়ী ছড়া। ঝিরঝির করে বয়ে যায় জল। খুব পরিষ্কার। চাষীরা মুখ-হাত ধুয়ে নেয়। আমিও হাত-পা-মুখ ধুলাম। খানিকটা জল চলে গেল পেটের ভিতর। দাদা বললে, 'ও-জল খাস নে।'

এমন জল খাব না, ত খাব কি! আমাদের পুকুরের জল ত এত পরিষ্কার কোনো কালেই হয় না। পাহাড়ী ঝরণা।

৫

এখান থেকে জমি উঁচু হতে-হতে পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে। এ যেন আরেক নূতন দেশ। এখানকার মাটি লাল। পথ বালিতে বাঁধানো। কাদা নেই একেবারে। পথের দু'পাশে নানা রকমের নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। পাখিগুলি উড়ে যায় এ গাছ থেকে ও-গাছে। এমন সব পাখি আমি দেখিনি এর আগে। গাছ-গাছালির মাঝে-মাঝে হঠাৎ এক এককটা বাড়ির টিনের ঘরের মাথায় দেখা যায় হনুমান বসে আছে একটা। মনে হল, স্বপ্ন দেখছি না ত? মা যে বলেছিলেন,—'দেখা যায় কিন্তু মনে থাকে না, তাই স্বপ্ন!' কিন্তু এ যা দেখছি এ-কি কোনো দিন ভুলবো?

কানে এল মোরগের ডাক। সেজদাকে বললাম, 'সেজদা, এখানে কি মুসলমান থাকে?'

সেজদা বললে, 'হ্যাঁ রে হ্যাঁ। ও-সব বলিস্ নে।'

বলব না কি হয়েছে। এতে দোষ কি? মুসলমান থাকে খুব থাকে। হিন্দুরা ত মুরগী পোষে না। মুসলমানেরা সকালে চাষ করতে যায় ক্ষেতে। তাই ওরা মুরগী পোষে। মুরগী না কি খুব ভোরে সাত সকালে তাদের ডেকে উঠিয়ে দেয়: 'শেখ রে শেখ, রাইত পোয়াইছে, দেখ, রে—দেখ,—দেখ।' 'কুক্‌কুৎ কু; কুঁ কুঁ কুঁ!'

দু'দিকে উঁচু বাড়ি। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে নিচু পথ। আমরা সেই পথ ধরে চলছি। কোনো বাড়ি বাঁশের টাটি দিয়ে ঘেরাও করা, কোনো বাড়িতে শোলার ঘেরা। কোনোটা বা টাটি পরদা ছাড়া ন্যাংটো খোকার মতো দাঁড়িয়ে।

আমরা চলি। টাটির ভিতর থেকে কারা যেন আমাদের দেখছে লুকিয়ে লুকিয়ে। পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। আর ফিস্‌ফিসানি। কথা সবই শোনা যায়, কিন্তু বোঝা যায় না কিছুই।

ফুরুৎ করে বেরিয়ে এসেছে দু'-তিনটে ছোট ছেলে। পিছন-পিছন ঘোমটা দেওয়া একটি বউ। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলাবলি করছে—'এরা যে কমলাবাবুর ভাই। কমলাবাবুর বাড়িতে যাবে বুঝি?'

আমি সেজদার দিকে তাকালাম। সেজদা মাথা নিচু করে পথ চলছে। যেন ওদের কাউকেই দেখতে পায়নি।

হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম আমি। কেঁদে ফেললাম। পথের বালিতে চোখ-মুখ বুজে গেছে যেন।

৬

ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে ঘরে আমি কার কোলে বসে আছি? এই কি আমার ন'দিদি? সেজদা ত বলেও দিল না যে, এই তোর ন'দিদি!

আমি ভালো করে চোখ মেলে চাইতে পারছিলাম না। আমার চোখের কোণ থেকে বালি বের করছেন তিনি তাঁর শাড়ির আঁচলের কোণা দিয়ে। এমন সুন্দর মুখ আমি বুঝি এর আগে দেখিনি। এ যে আমার 'বড়দি'র 'সেজদি'র চাইতেও দেখতে সুন্দর! আমার ন'দিদি না কি?

তিনি বলে উঠলেন, 'ক্ষিদে পেয়েছে ভাই? কিছু খাবে না কি?'

আমি তাঁর দিকে তাকালাম, আবার চোখ নামিয়ে নিলাম। লজ্জা করছিল। তিনি আমাকে কোলের ভিতর দু'হাতে এমন আপ্‌টে ধরলেন যে, আমার নড়বার জো রইল না। চুমোর পর চুমো খেয়ে আমাকে অস্থির করে তুললেন। আমি শ্বাস ফেলতে পারছিলাম না। কঁকিয়ে উঠলাম। আমাকে ছেড়ে দিলেন মাটিতে। আমি তাঁর দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে বারান্দায় গেলাম। সেজদা'কে খুঁজতে লাগলাম।

ঘরের অন্ধকার কোণা থেকে বের করলেন কয়েকটা সোনালী রঙের হৃষ্ট-পুষ্ট কলা, এনে আমার হাতে দিলেন। বাইরে উঠোনের কোণে একটা পেয়ারা গাছ থেকে হাত বাড়িয়ে পেড়ে আনলেন ক'টা ডাঁসা পেয়ারা। দিলেন আমার হাতে। সবগুলি আমার হাতে ধরল না। আমি দু'হাত ভরে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খাই কি করে!

সেজদা' গেল কোথায়? ন'দিদি এতক্ষণ বুঝি কুমড়ো কাটছিল। বঁটির মুখে আধ-কাটা হয়ে লাগানো রয়েছে এক ফালি এখনও। কুমড়ো-তুমড়ো, কাজ-কর্ম সব ভুলে গেছে বুঝি আমাকে দেখে? আমার ভালো লাগল; কিন্তু তাঁকে কি করে বলব যে, 'ন'দিদি আমি তোমাকে ভালোবাসি।' দিদি কি মনে করবে? লজ্জা করতে লাগল।

আমাকে আবার কাছে টেনে নিলেন ন'দিদি। জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'মা কেমন; বাবার জ্বর হয়েছিল; সেরেছে? তোমার না কি একটা আঙুল মচ্‌কে গিয়েছিল কামিনী ফুলের গাছ থেকে পড়ে? কই দেখি?'

বলতে বলতে ন'দিদি আমার সবগুলি আঙুল একটা-একটা করে টিপে-টিপে দেখতে লাগলেন। আমার কত সংকোচ, কত লজ্জা। তিনি ত বলতে লাগলেন, 'আমি তোমার ন'দিদি, পর নই ভাই, পর নই। কথা বলছ না কেন?'

ছুটতে ছুটতে একটা মুরগী কঁ-কঁ করতে করতে এসে ঢুকল ঘরে। একেবারে ন'দিদির পায়ের কাছে এসে লুকোল। আমার মুখ থেকে বেরুল, 'মুরগীটা কার ন'দিদি?'

ন'দিদি বললে, 'তুমি নেবে একটা মুরগী?'

মনে মনে বললাম, 'সর্ব্বনাশ! বলে কি, মুরগী নেব আমি?' মা আমাকে খেয়ে ফেলবে তাহলে যে!

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছি চার দিকে। কেবলই মনে হচ্ছে—বাড়িটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবু এ ত হিন্দুর বাড়ি নয়! আমার ন'দিদির পরনেও ত মুসলমানী কাপড়। এরা কি মুসলমান হয়ে গেছে?'

ন'দিদিকে যে-সব খাবার তৈরি করে মা পাঠিয়েছিলেন আমাদের হাত দিয়ে, তার থেকে কিছু-কিছু দিয়ে এক বাটি সাজিয়েছেন দিদি। আমাকে এনে দিলেন খেতে। মনে হচ্ছিল আমার ও-সব আর এখন ভালো লাগছে না। আমাকে যদি শুধু ডাল দিয়ে ভাত খেতে দিত ন'দিদি!

একটা ফেজওয়ালা লাল টুপী মাথায়, একটা ডোরাকাটা লুঙ্গি পরনে, একটা লোক ঢুকলো বাড়িতে। কাঁধ থেকে লাঙ্গল-জোয়াল সে নামাল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার গা শিউরে উঠল। মুসলমানের মতো দাড়ি-গোঁফ তার যে!

ও মা, সে লোকটাই এসে ঢুকল ঘরে! ন'দিদিকে জিজ্ঞেস করলো সে, 'ভাত অইছে?'

ন'দিদি বললে, 'ছোট ভাই আইছে কি না, তাই একটু বিলম্ব অইতেছে।'

লোকটা রেগে আগুন হয়ে বলে উঠল, 'হারামজাদী মাগী, হগল দিন খইয়া করত্যাছস্ কি?'

লোকটার চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল। আমার প্রাণ তখন খাঁচা-ছাড়া। কোন্ পথ দিয়ে পালাব বুঝতে পারছি না।

ছুটতে আরম্ভ করছি বেদম। পথের মুখে এসে দেখি দাদাও ছুটছে। দাদা বললে, 'ছোট্ ছোট্। পাগলা ক্ষেপেছে। রক্ষে নেই।'

পেছন পেছন ছুটছে ন'দিদিও। আর ডাকছে, 'ছোট ভাই, ছোট ভাই, ও সন্তু, ও সন্তু!'

আমি শুনতে পাই, কিন্তু ঘুরে তাকালেই যেন দেখতে পাই, সেই ক্ষেপে-যাওয়া লোকটার আগুন দু'টো চোখ। আরও যায় ওখানে! ওই লোকটা কে? মনে মনে কেবলি হচ্ছিল, ও-লোকটা হবে কে?

মাঠে এসে পড়েছি। আর ছুটতে পারছি নে। জলতেষ্টা পেয়েছে। থেমে গেলাম। তখনও ন'দিদির ডাক কানে আসছে, 'ছোট ভাই, ছোট ভাই, সন্তু, সন্তু, ফিরে আয় ভাই!'

ভয় আছে, তবু তাকালাম। দেখি কি, মাঠের গায়ে যে বাড়িটা, ন'দিদি সে-বাড়ির আম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে আমাদের ডাকছে। মাথায় তার ঘোমটা নেই। আলগা খোঁপা ঝুলে পড়েছে পিঠে। দু'চোখে জলের ধারা। পাগলিনী সেজেছে সে। আমার চোখে জল এল। বুকের ভিতর কেমন করতে থাকল। দাদাকে বললাম, 'সেজদা, ন'দিদি ডাকছেন, এসো না আবার যাই?' পিছন থেকে টানছে ন'দিদি, সামনে থেকে ছুটছে সেজদা। আমি মাঝখানে। কোন্ দিকে যাই? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। একবার এদিক একবার ওদিক তাকাই। চোখে ভেসে ওঠে সেই গোঁয়ার লোকটার আগুন দু'টো চোখ। শিউরে উঠি।

৭

নৌকোয় এসে উঠলাম। মাঝি বললে, 'কই, কিছু নিয়ে এলে না যে দিদির বাড়ি থেকে?'

আমি বললাম, 'যা বিপদে···'

সেজদা আমার মুখ চেপে ধরলে।

আমি কিছুই বললাম না। সেজদা তখন বানিয়ে-বানিয়ে নানা কথা বলতে লাগল।

ফেরবার পথে মনে পড়ল না ম্যাওকুচিকে, চেয়ে দেখলাম না ধান ক্ষেতের দিকে, ম্যাওকুচির ডিমও চোখে পড়ল না, শাপলা-শালুক কোথায় কি যে হয়ে গেল। মন ভরে উঠল ন'দিদির ছবিতে। চোখে কেবলি ভাসতে লাগল, আম গাছের তলায় খোলা চুলে পাগলিনীর মতো দাঁড়িয়ে আছে ন'দিদি। দু'হাত নেড়ে ডাকছে, 'আয় ভাই, আয় সন্তু!' কিন্তু আমরা!

সন্ধ্যে হয়-হয়। বাড়ি পৌঁছলাম। মা ছুটে এলেন। বাবা কাজ করছিলেন কাছারি-ঘরে, ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ন'দিদির ভালো-মন্দ। আমার গলা দিয়ে বেরুল কান্নার সুর। কোনো কথা বলবার আগেই হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। বাবা কিছুই বললেন না। মা বললেন, 'কি হয়েছে সোনার, কি হল?'

সেজদা বলতে লাগল, 'ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন। ন'দিদির বরটা যা আস্ত পাগল। কি বড়-বড় তার আগুনের মতো চোখ'···'

এতটুকু বলতেই বাবা চোখ ইশারা করলেন। সেজদা বন্ধ করল কথা বলা।

বাবা বুঝি সব জানেন। ন'দিদির জামাইটার কথা। তাই ত উনি চুপ করে থাকেন। আমরা ন'দিদির বাড়ি যেতে চাইলে এই জন্যই বারণ করতেন। মাকে বলি, 'কেন মা, এমন একটা

পাগলার সঙ্গে ন'দিদিকে বিয়ে দিলে তোমরা ? ন'দিদি কত সুন্দর দেখতে। কত ভালো সে। বড়দি-সেজদির চাইতেও !'

সেজদা বললে, 'ব্যাটা যে খাল্লা মুছলা কি না ?'

আমি বলি, 'বলো কি, ন'দিদিও কি তাহলে মুছলমান হয়ে গেছে ?'

মা বললেন, 'হয়ে যায়নি রে। আগে থেকেই।'

আমি বলি, 'তাহলে ন'দিদি তোমার পেটের নয় ?'

মা বলেন, 'পেটের না-ই বা হল। তবু ত তোদের সকলকে মায়ের পেটের ভাই-বোনের মতই দেখে।'

আমি অধৈর্য হয়ে বলি, 'মা, ন'দিদিকে ওখান থেকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা কর না মা, বাবাকে বলে না মা ?'

মা বলেন, 'বলবো, বলবো।'

বাবা বাড়ি ঢুকলেই উৎসুক হয়ে উঠি তার পিছু পিছু ন'দিদিও আসে কি না। কিন্তু কই, বাবা ত তাকে নিয়ে এল না এখনও ! মা কি তাহলে বলেননি বাবাকে ?

৮

সাত দিনও পেরয়নি। কাছারি-ঘর থেকে আম বাগানের দিকে মুখ করে বসে আছেন বাবা মুখ কালো করে। কাগজ-পত্র এলোমেলো। কাজ আছে, কাজ করছেন না। তামাক পুড়ে যায়, হুঁকোয় টান দেন না। আমরা ডাকি, 'বাবা ,বাবা !' বাবা সাড়া দেন না।

মাকে গিয়ে বলি, 'মা, দেখ এসে, বাবার যেন কি হয়েছে। কথা বলছেন না। চোখ টলমল করছে যেন। কি হয়েছে মা ?'

মা ছুটে এলেন, বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন,' কই, আরে শুনছ ?'

বাবা তাকালেন মার দিকে। মা বললেন, 'এ কি হল তোমার ?'

বাবা বললেন, 'কমলাকে আন্‌তে গিয়েছিলাম !'

মা বললেন, 'তার পর ?'

বাবা বললেন, 'তার পর আবার কি ! সব শেষ হয়ে গেছে !'

সকল ভাই-বোন হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলাম। আমার বুঝি মাথা ঘুরে গেল।

৯

আমার অসুখ করেছে। কবিরাজ কাকা বসে আছেন শিয়রে। মা মাথায় জলপটি দিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে বুকের কাছে আমাকে কোলে তুলে কানে-কানে বলছেন, 'তোর ন'দিদি আবার আসবে রে। সে কি আমাদের ছেড়ে গিয়ে থাকতে পারবে ? তোর ন'দিদি আবার আসবে।'

একটি দিনের একটি ক্ষণের কথা বললাম। গল্প নয়। যে দেশে জন্মেছিলাম আমি, সে-দেশেই জন্মেছিল ন'দিদি। আমি হিন্দুর ঘরে। ন'দিদি মুসলমানের ঘরে। ন'দিদির ঘরে ভাত আমরা খেতাম না। ন'দিদি আমাদের বাড়িতে আসত না। তবু ত সে আমাদের আপন হয়েছিল। কেমন করে হয়েছিল ?

'কেমন করে হয়েছিল মুসলমানের মেয়ে হিন্দুর ছেলের ন'দিদি ?' এই কথার জবাব দিতে পারবে কোন্ পাকিস্তান ? কোন্ হিন্দুস্থান ?

আজকের এরা কেউ পারবে না। পারত সে দিনের ভারতবর্ষ, সেদিনের বাংলা। সেই সোনার ভারত, সেই সোনার বাংলা আবার ফিরে আসবে।

আমার ন'দিদিও ফিরে আসবে সেদিন। গল্প নয়। কল্পনাও নয়। সত্যি সত্যি।

কলাবতীর উপাখ্যান

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ (ভাস্কর)

১

বঙ্গদেশের কলিকাতা নগরীতে লেক প্লেস নামক রাজপথ পার্শ্বে গদাধর সামন্ত বাস করিতেন। গদাধর বাবু ধনী বণিক। বিবিধ প্রকার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। গদাধর বাবুর একটি প্রধান গুণ ছিল এই যে, তিনি অতীব কলা-রসিক ছিলেন। শুধু অবসরবিনোদনের জন্য নানাপ্রকার নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা করিয়াই যে তিনি তৃপ্ত থাকিতেন তাহা নহে, সঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফি, সূচীশিল্প, বিবিধ প্রকার কারুকার্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত অনুরাগ ছিল। এই সকল বিষয়ের অনুশীলন এবং প্রচারের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। এই কলা-প্রিয়তার জন্য গদাধর বাবুর নাম সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিল।

গদাধর বাবুর তিন পুত্র এবং এক কন্যা। পুত্র তিন-টিই কৃতী, সকলেই পিতার ব্যবসায়ের অংশ তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই চলিয়াছিল। কন্যাটি কনিষ্ঠ সন্তান। গদাধর বাবু আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন কলাবতী। নিজের রুচি এবং আদর্শানুযায়ী উহাকে সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার সহিত বিবিধ প্রকার শিল্পকলায় পারদর্শিনী করিয়া তুলিলেন। বিশেষ করিয়া নৃত্য ও গীতে তাহার পারদর্শিতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এবং ক্রমশঃ বহু স্থানে বহু প্রশংসা অর্জ্জন করিল। কলানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবিধ শাখার সহিত কলাবতীর পরিচয় হইল। দুই জন নিষ্ঠাবান সুপণ্ডিত শিক্ষকের নিকট ভারতের এবং পাশ্চাত্ত্য দেশের দর্শন, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেষত্ব সযত্নে শিক্ষা করিল। এইরূপে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া কলাবতী এক দিকে যেমন অসামান্য রূপলাবণ্য ও নৃত্যগীতকুশলতা লাভ করিল, তেমনি বিবিধ প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার মন-পঙ্কজ অপূর্ব শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিল।

বাংলার সমাজে যুবতী কলাবতী অতীব পরিচিতা হইয়া উঠিল। সর্বপ্রকার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে তাহার নিমন্ত্রণ এক প্রকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল।

কলাবতী ব্যতীত কোন শিল্পীই যেন তাহার স্থান পূরণ করিতে পারে না। কোন অনুষ্ঠানে কলাবতী উপস্থিত হইলেই সেখানে একটা নূতন উন্মাদনা, একটা অভিনব আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়। কন্যার কৃতিত্বে ও যশের সৌরভে পিতা গদাধর আনন্দে ও গৌরবে আত্মহারা হন।

কলাবতীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণায় গড়িয়া উঠিল বহু স্থায়ী ও অস্থায়ী সভা, সমিতি, সঙ্ঘ ও সম্মিলন। বহু শিল্প-বিদ্যালয় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিবিধ প্রকারে কলাবতীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ধন্য হইল। প্রায় প্রত্যহই নানা স্থান হইতে কলাবতীর নিকট নিমন্ত্রণ, সানুনয় আহ্বান, আন্তরিক আপ্যায়ন এবং অযাচিত সম্মান ও প্রশংসা আসে। সাধ্যমত অনুরোধ রক্ষিত হয়, আবার মাঝে মাঝে সবিনয় প্রত্যাখ্যানও করিতে হয়। তরুণ ও তরুণী সমাজে কলাবতীর নাম একটি মোহন মন্ত্রের মত হইয়া উঠিল।

কলাবতীর বয়স যখন আঠার, তখন তাহার মাতা ঠাকুরাণী পরলোক গমন করেন। কলাবতী যে শুধু একটি স্নেহময়ী জননীকেই হারাইল তাহা নহে, তাহার শিল্পী-জীবনের প্রধান সহায় ও অভিভাবককেও হারাইল। কলাবতীর প্রতি প্রচেষ্টায়, প্রতি সাধনায় তাহার মমতাময়ী মাতা ঠাকুরাণী অকুণ্ঠ ভাবে সহায়তা করিতেন। তাহার বেশ-ভূষা, তাহার আহারাদি, তাহার সময়োপযোগী আনন্দবিধান, তাহার স্বভাব ও চরিত্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। ইঁহার মৃত্যুর পর কলাবতী সহসা যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিতে লাগিল। পিতা সর্বদাই বহু কার্যে বিব্রত থাকিতেন। এখন হইতে কলাবতীকে নিজেই নিজের সমস্ত ভার লইতে হইল। তাহার ভ্রাতারা বড় হইয়াছে। তাহাদের নিজেদের সংসার হইয়াছে। কলাবতীর প্রতি সাধারণ কর্তব্য পালন ব্যতীত তাহারা আর কিছুই করিতে চাহে না। কলাবতীর জীবনের সহিত তাহাদের জীবনের কোথাও যেন ঐক্য নাই।

কলাবতীর বয়স যখন কুড়ি, তখন গদাধর বাবু উহার বিবাহের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন সর্বগুণসম্পন্না রূপসী কন্যার উপযুক্ত পাত্র সহজে পাওয়া যায় না। গদাধর বাবু প্রাণ দিয়া কলাবতীকে মানুষ করিয়াছেন, নিজের উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছেন। অনুপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিতে তাঁহার মন অগ্রসর হয় না। তাঁহার এবং তাঁহার কন্যার কল্পনা, আদর্শবাদ, শিল্প প্রীতি প্রভৃতিকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করিবে, বিবাহিত হইলেও তাঁহার কন্যাকে তাহার স্বকীয় জীবন বিকশিত করিতে সহায়তা করিবে, এমন ঘর এমন পাত্র পাওয়া অতীব কঠিন। গদাধর বাবু বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মনের মত পাত্র পাইলেন না।

এদিকে মাতৃহীনা এবং বয়ঃপ্রাপ্তা কলাবতী অনেকখানি স্বাতন্ত্র্যের অধিকারিণী হইয়া স্বভাবতই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিতামাতার স্নেহ ও কঠিন শাসনে যে চরিত্রের দৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ অটুট থাকিলেও বাহিরের ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অস্থৈর্যের লক্ষণ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইল। গদাধর বাবু ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং একটি সুপাত্রের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু নিয়তির গতি রোধ করিবে কে? এক দিন সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গদাধর বাবুর জীবনদীপ নির্বাপিত হইল এবং এই মুহূর্ত হইতেই কলাবতীর জীবনেও হতাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

কলাবতী বুদ্ধিমতী। নূতন পরিস্থিতিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল না। ভ্রাতাদের সংসারেই সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বাস করিতে লাগিল। ভ্রাতারা তাহাকে নানা ভাবে সাহায্য করিলেও তাহার শিল্পি-জীবনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে কোন দিনই পারে নাই, এখনও পারিল না। ক্রমশঃ কলাবতী সম্পূর্ণ একাকিনী হইয়া পড়িল।

বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার স্বাভাবিক পরিচয় ঘটিয়াছিল। সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া কলাবতী কিছু-কিছু উপার্জনও করিতে লাগিল। তাহার অসামান্য শিল্প-প্রতিভা বাংলার বাহিরেও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহাকে বাংলার বাহিরের কোন কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপে তাহার ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিচয় ও খ্যাতি লাভের ফলে বহু পদস্থ ব্যক্তির সহিত আলাপ হইল। কেহ কেহ কার্যব্যপদেশে বা ভ্রমণোপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে কলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কোথাও কলাবতীর নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা হইয়াছে সংবাদ পাইলে তথায় গিয়া তাহার অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। বাংলার এই রত্নটির সহিত পরিচিত হইয়া বহু দেশের বহু ব্যক্তি নিজেকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

২

এক দিন দ্বিপ্রহরে কলাবতী বিশ্রাম করিতেছিল তাহার নিজের ঘরে। দরজার পর্দার ফাঁক দিয়া বাহিরে বৌদিদিদের সাড়া পাইয়া কলাবতী উঠিয়া আসিয়া বলিল, এই যে, আপনারা, আসুন, আসুন! ঘরের মধ্যে দুইখানি সোফা ছিল, তাহাতে দুই বৌদিদি বসিলেন, ছোট বৌদিদি বসিলেন খাটের উপর, এবং কলাবতী একটি মোড়া টানিয়া লইয়া তাহাতেই বসিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে বৌদিদিদের দিকে চাহিল। তাঁহাদের মুখ দেখিয়া কলাবতী একটা ঘনায়মান দুর্যোগের আভাস পাইয়া অন্তরে অন্তরে ভীত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ সকলেই নীরব রহিলেন। পরে তিন জনের প্রতিনিধিরূপে বড় বৌদি কথা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, এখন আবার কেউ এখানে এসে পড়বে না তো? দিবারাত্রই তো লোক আসা-যাওয়া করছে।

কলাবতী বলিল, না, কারো আসবার কথা নেই তো! তাছাড়া কেই বা আসে? কখনো কখনো কোন সভা-সমিতি থেকে নিমন্ত্রণ করতে আসে। তা এমন দুপুর বেলায় কে আসবে?

কি জানি বাপু! তোমার দাদারা তো অত্যন্ত ভীত আর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

কেন?

কেন, সেটা বোঝবার বয়স তোমার হয়েছে। যাই হোক, এ নিয়ে আর বেশি কথা বাড়াতে চাই নে।

আপনারা কি বলতে চাইছেন, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি নে—

মানে, তোমার দাদারা বলছেন, তোমার এ ভাবে এ-বাড়ীতে থাকাটা—

দাদারা এই কথা বলছেন ?

বড় বৌদি অন্য দুই বৌদিদির দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, তাঁরাই তো বলছেন। আমরা কেন বলতে যাব ?

দাদারা কি বলছেন ?

বলছেন, তোমার চাল-চলন ক্রমেই অশোভনীয় হয়ে উঠছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, তাদের সামনে এ সব উদাহরণ—

কি সব উদাহরণ ?

এই সব, নাচ, গান, সভা, সমিতি, দেশ-বিদেশ বেড়ান, এই সব। তাছাড়া নানা রকম লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়।

বৌদি, এত দিন একত্র বাস করেও, আমাকে এত দিন ধরে এত ভালবেসেও, আপনারা এইটুকু সইতে পারছেন না ? আমি যে আপনাদেরই ছোট বোন, বৌদি !

কিন্তু, উপায় নেই। আমরা নিরুপায় হয়েই তোমার কাছে এ সব কথা বলতে এসেছি। আমাদের একত্র থাকা সম্ভব নয়।

আমি তো দূরে সরেই রয়েছি। শুধু একসঙ্গে বসে খাই, তাছাড়া আর কোন সম্পর্ক তো তোমরা রাখনি। বাবা মা কেউ নেই বলেই, এটুকু সান্নিধ্যও তোমাদের একেবারেই অসহ্য হয়ে উঠেছে ?

আমরা জানি, তুমি খুব আঘাত পাবে, কিন্তু উপায় নেই। এখানে থাকা তোমার হবে না।

মেজদারও কি এই মত ?

মেজ বৌদি মাথা একটু নীচু করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমরা সবার মত নিয়েই তোমার কাছে এসেছি।

ছোটদারও এই মত ?

ছোট বৌদি হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলেন, হ্যাঁ, আমরা সবার মত নিয়েই তোমার কাছে এসেছি।

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। পরে বড় বৌদি বলিলেন, দেখ, এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই।

না, কথা আমি আর বাড়াতে চাই নে। আমি কোথায় যাবো সে-সম্বন্ধে দাদারা কিছু বলেছেন ?

না, তা তো বলেননি ?

তবে ?

বড় বৌদি অপর দুই বৌদির মুখের দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন, তোমার তো বন্ধু-বান্ধব অনেক আছেন ?

ছোট বোন, কুমারী মেয়ে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে গিয়ে থাকবে, এইটেই কি দাদাদের মত ?

ঠিক তেমন কিছু বলেননি। তবে আমরা বলছি।

কলাবতীর মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। এই দাদারা তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে। কথায় আছে ভ্রাতা-ভগিনীর স্নেহই সর্বাপেক্ষা নির্মল, নিঃস্বার্থ স্নেহ। অথচ কলাবতীর ললাটের লিখন এমনই যে, তিনটি ভ্রাতা থাকিতেও সে শুধু অসহায় নয়, নিশ্চিত বিপদের করাল গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে এই ভ্রাতাদের নিষ্করুণ মনে কোন দ্বিধা নাই। আর এই তিনটি নারী। ইহাদেরও কি এতটুকু প্রাণ, এতটুকু মমতা নাই ?

সকলেই আবার নীরব হইলেন। কলাবতীর চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা অশ্রু জমিয়া উঠিল। এই অশ্রুই কি তাহার জীবনের চিরসঙ্গী হইবে ? একটু পরে কলাবতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কেহই কোন কথা বলিলেন না। কোন বৌদির নিকট হইতেই কোন সান্ত্বনার বাণী আসিল না। নিস্তব্ধ ঘরে শুধু একটি ঘড়ির টিক-টিক শব্দ কলাবতীর অসহ বেদনায় সহানুভূতি জানাইল। কিছুক্ষণ পরে বড় বৌদিদি বলিলেন, আমরা এখন আসি। শীগ্‌গিরই মানে, দুই-এক দিনের মধ্যেই যা হোক একটা ব্যবস্থা করো।

কলাবতী দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বৌদিদিরা ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

৩

কলাবতী উঠিয়া বসিল। চোখ মুছিয়া কঠিন হইয়া তাহার বিছানার 'পরে একটু শুইয়া লইল। তার পর উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া আয়নার সামনে গিয়া চুলটা সাড়ীটা একটু ঠিক করিয়া লইল। মনে মনে বলিল, দুই-এক দিনের মধ্যে নয়, আজই, এখনই। এখনই যাবো এ-বাড়ী ছেড়ে। তাহার আলমারিতে ও বাক্সে কাপড়-জামা ও গহনা যাহা কিছু ছিল, সব মেঝের উপর ছড়াইয়া ফেলিল এবং তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি একটি বড় সুটকেশে ভর্ত্তি করিল। একটি ছোট বাক্সে গহনাগুলি রাখিয়া সেটাকে সযত্নে সুটকেশের এক পাশে রাখিল। সামান্য কয়েকখানি বাসনও তাহাতে পুরিয়া লইয়া আর সব ছড়ানো জিনিষগুলি পা দিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সুটকেসটির উপর বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তার আর অভাব কি ? এখান হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইবে সে ? কিন্তু সে কথা পরে। এ স্থান এখনই ছাড়িতে হইবে এইটাই এখনকার বড় কথা।

কলাবতী উঠিয়া গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। একটি ঝাঁকামুটে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল। বলিল, ঘরের এই সব ছড়ানো জিনিষগুলো তোর ঝাঁকায় তোল।

মুটে আজ্ঞা পালন করিল। কলাবতী বলিল, এগুলো আমি তোকে দিলাম। যা, নিয়ে তোর বাসায় রেখে আয়, তার পর যাবি আমার সঙ্গে।

এ সব নিয়ে রাস্তায় বেরুলেই লোকে আমাকে ধরে থানায় নিয়ে যাবে।

কোন ভয় নেই। এই নে, এই সুজনীটা ঢাকা দিয়ে নিয়ে যা। কেউ কিছু বললে তাকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসিস।

বিস্মিত মুটে অপ্রত্যাশিত দান লইয়া চলিয়া গেল। পাছে কোন গোলমালে পড়ে এই ভয়ে সে আর ফিরিয়া আসিল না।

কলাবতী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আর একটি মুটের মাথায় সুটকেশটি চাপাইয়া ব্যাগ আর ছাতা হাতে করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

লেক প্লেস হইতে বাহির হইয়া সোজা সাদার্ন এভেনিউতে গিয়া পড়িল এবং মাঝখানের ঘাসের উপর দিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কলাবতীর সহসা মনে পড়িল, সাদার্ন এভেনিউএর বিখ্যাত জমিদার মহেন্দ্র চক্রবর্তীর কথা। বহু দিন পূর্বে সে একবার গিয়াছিল

তাঁহার বাড়ীতে একটি বড় গানের জলসায়। সে শুনিয়াছিল, মহেন্দ্র বাবু যেমন ধনী, তেমনি উদার-প্রকৃতি। তিনি নিয়মিত ভাবে অনেকগুলি বিদ্যালয়, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়, সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতিতে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। মহেন্দ্র বাবুর কাছে গেলে এই বিপদে হয়তো একটা আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে, এই আশা লইয়া কলাবতী মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

কলাবতী যখন গাড়ী-বারান্দার নীচে সামনের সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল, তখন মহেন্দ্র বাবু নীচেই বসিবার ঘরে ছিলেন। কলাবতীকে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া আসিলেন এবং বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি, এ সময়ে কি মনে করে? আসুন, আসুন! এই কথা বলিতে বলিতে কলাবতীকে লইয়া পাশের একটি ঘরে বসাইলেন। মুটে সুটকেশ রাখিয়া কলাবতীর নিকট হইতে পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, তার পর, কেমন আছেন, ভাল আছেন তো?

কলাবতী কুণ্ঠিত ভাবে বলিল একটু বিশেষ বিপদে পড়েই এখানে এসেছি। সবই বলছি। একটু জল আনিয়ে দেবেন? গলাটা শুকিয়ে গেছে।

মহেন্দ্র বাবু চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, শীগ্‌গির এক কাপ চা করে নিয়ে আয় আর সঙ্গে কিছু খাবার। কলাবতীকে বলিলেন, আপনি চা খেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। আমি একটু পরে আসছি।

চা-পানের পর মহেন্দ্র বাবু আসিলেন। বলিলেন, কি ব্যাপার বলুন তো?

কলাবতী সমস্ত ব্যাপারটি মহেন্দ্র বাবুকে জানাইল। কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সব শুনিয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, স্থায়ী ভাবে এখানে থাকা অবশ্য সম্ভব নয়, সেটা আপনিও বোঝেন। তবে আপাতত এখানেই থাকুন। আর আপনিও চেষ্টা করুন, আমিও চেষ্টা করি, একটা ভাল ব্যবস্থা হয়েই যাবে। আপনি অস্থির হবেন না।

কলাবতী বলিল, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো, জানি নে। এমন একটা বিপদে আপনি আমাকে রক্ষা করলেন, এ জন্য আপনার কাছে আমি চিরঋণী থাকবো।

কলাবতী আপাতত মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে রহিল। নীচের তলায় একখানি ঘর। অল্প অথচ রুচিসম্মত আসবাব। সঙ্গীত-বিষয়ক যে যন্ত্রগুলি সে দাদাদের বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছিল, সেগুলি লোক পাঠাইয়া আনাইয়া লইল। কলাবতী অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিল। নিয়মিতরূপে সে তাহার শিল্প ও সঙ্গীতের সাধনা করে। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে নিমন্ত্রিত হইয়া তাহার অপূর্ব গীত, নৃত্য প্রভৃতি দ্বারা সকলকে মোহিত করে। কখনও কিছু উপার্জন হয়, কখনও শুধু প্রশংসা ও ফুলের মালা লইয়াই তৃপ্ত হয়। নিউ এম্পায়ারে, ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে, থিয়েটারের ষ্টেজে এবং বড় বড় মজলিসে সর্বদাই তাহার নিমন্ত্রণ হয়। কলা-চর্চার ফাঁকে ফাঁকে কলাবতী ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী প্রভৃতি
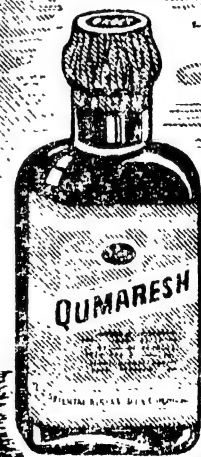
বিষয়ের বই পড়ে। পিতার নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহা তাহার জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

৪

কলাবতীর এই স্বচ্ছন্দ জীবন বেশি দিন বিধাতা সহিতে পারিলেন না। ঝড় আসিল মহেন্দ্র বাবুর অন্তঃপুর হইতে। এক দিন মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী স্বামীকে স্পষ্টই বলিলেন, কলাবতীর এ বাড়ীতে আর থাকা হবে না।

কেন?

ভাল দেখায় না।

কোথায় যাবে ও?

সে জন্য তোমার মাথাব্যথা কেন?

মাথাব্যথা ঠিক নয়, কিন্তু অসহায় একটা লোকের প্রতি কর্তব্য কি নেই?

কর্তব্য তো করেছ। আর নয়।

কিন্তু কোথায় যাবে ও? ওর আয় এমন নয়, যাতে স্বাবলম্বী হয়ে একটা বাসা ভাড়া করে থাকতে পারে। অথচ এমন একটা শিল্পী, এমন একটা প্রতিভা, এমন একটা সংস্কৃতিবান্ প্রাণ, একে তো পথে বের করে দেওয়া যায় না?

তুমিই একটা ব্যবস্থা করে দাও, কিন্তু অন্যত্র।

সে তো অনেক খরচ। একটা মাত্র মানুষের জন্য একটা ছোট বাড়ী, লোক-জন—সে তো অনেক খরচ।

কি আর এমন খরচ। কত স্কুলে, কত কলেজে, কত হাসপাতালে, অনেক টাকা তো দিচ্ছ। এটাও তেমনি—

শুধু একটা লোকের জন্য এত খরচ?

তুমিই তো বললে, এমন প্রতিভা, এমন অসামান্য শিল্পজ্ঞান, এর জন্য না হয় হ'লই বা কিছু খরচ। ও তো শুধু একটা মেয়ে নয়, ও যে বাংলার একটা রত্ন, একটা অসামান্য গৌরব।

সে তো জানি। আমার বাড়ীতে আমার তত্ত্বাবধানে থাকলে আমি ওর জন্য খরচপত্র করতে কুণ্ঠিত নই। কিন্তু ওর জন্য স্বাধীন ভাবে থাকার ব্যবস্থা করলে ও হয়তো কয় দিন পরে আর আমাকে গ্রাহ্যই করবে না।

তোমাকে গ্রাহ্য করা বা না-করাটা তো বড় কথা নয়? ওর একটা ব্যক্তিত্ব আছে, স্বকীয়তা আছে, ঐশ্বর্য আছে, যার মূল্য তোমার তত্ত্বাবধানের চেয়ে ঢের বেশি। বাংলার দেবীমূর্তি ও। বাংলার জল, বাংলার মাটি, বাংলার বাতাস ওর প্রতি অণু-পরমাণু গড়ে তুলেছে। ওর ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা একান্ত ভাবে জড়িয়ে আছে বাংলার সঙ্গে। ও স্বাধীন ভাবে যেখানেই থাকুক বাংলার বাণীমূর্তি'রূপে সর্বত্র আলো ছড়াবে।

এত যদি তোমার আগ্রহ, তবে এখানে থাকতে এত আপত্তি কেন?

এখানে থাকা হতে পারে না।

দেখা যাক, কি করতে পারি।

এদিকে কলাবতীর স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে অবস্থান ব্যাপারটা তাহার পরিচিত, অপরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এবং সভা, সমিতি ও মজলিসে আলোচিত হইতেছে। অনেকেই উহার জন্য একটা উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু কার্যত তাঁহারা কেহই কিছু করিতেছেন না।

কিছু-দিন পরে যখন মহেন্দ্র বাবুর বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন এই সকল আলোচনা আরও ব্যাপক ভাবে চলিতে লাগিল। বিশেষত তরুণ ও তরুণী সমাজে একটা বিষম আলোড়ন উপস্থিত হইল। কিন্তু আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক ব্যতীত আর কিছুই হইল না। কয়েক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি একবার মহেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎও করিলেন এবং তাঁহার বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কলাবতীর জন্য একটি সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। মহেন্দ্র বাবু তাঁহার স্ত্রীর সহিত আলোচনায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিলেন।

কলাবতীর এই অসহায় অবস্থার কথা ক্রমশঃ একটা সাধারণ আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র বাবু এক দিন নিজেই কলাবতীকে বিপদের কথাটা জানাইয়া দিলেন। কিছু দিন পূর্বে সে বৌদিদিদের কাছে যে আঘাত পাইয়াছিল, এটা যেন তাহা অপেক্ষাও গুরুতর মনে হইল। কলাবতী মনেও করিতে পারে নাই, মহেন্দ্র বাবুর মত এক জন ধনী, গুণী এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তাহাকে পথে বসাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন। এ আঘাত তাহার কাছে অসহনীয় মনে হইল। মহেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাতের পর প্রায় পনের দিন সে বাড়ীর বাহির হইল না বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না।

প্রতিবেশীরা এবং গুণানুরাগীরা নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। কলাবতীর একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকগুলি ছোট ছোট সভাও অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই হইল না। আগ্রহ অনেকেরই আছে, কিন্তু কাহারও সংকল্পের গভীরতা নাই। বৃদ্ধেরা বলিতে লাগিলেন, মেয়েটার একটা বিয়ে হওয়া দরকার। এমন ভাবে চলিতে দেওয়া ঠিক নয়। যুবকেরা বলিল, এর একটা বিহিত করিতেই হইবে। কিন্তু বিহিত করিবার মূল উপাদান কাহারও কাছে নাই। তরুণীরা সমবেদনায় ব্যাকুল, আলোচনায় মুখর, কিন্তু প্রতিকারে অক্ষম।

নিজের অসহায় অবস্থা ও অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে করিতে এবং ক্রমশঃ নানা দিক হইতে নানা প্রকার হিতোপদেশ ও আলোচনা শুনিতে শুনিতে কলাবতীর মন ক্রমশঃ ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। এক-এক সময়ে তাহার মনে হইত, সে বুঝি পাগল হইয়া যাইবে। কি অপরাধ সে করিয়াছে? সে প্রাণপণে বাংলাকে, বাংলার আকাশ-বাতাসকে ভালবাসিয়াছে, বাংলার প্রতিভাকে নিজের জীবনে বিকশিত করিয়াছে, বাংলার শিল্পকে, বাংলার কলাকে অদ্ভুত প্রাণবান্ রূপ দিয়াছে, মানুষের মনে আনন্দের ধারা বর্ষণ করিয়াছে। তবু বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারটাও সে পাইবে না? কলাবতীর মন যেন মরিয়া হইয়া উঠিল। যে সকল প্রতিষ্ঠান, সমিতি প্রভৃতি হইতে সে নিমন্ত্রণ পাইত, লজ্জা ও সম্মানের মাথা খাইয়া সে প্রায় প্রত্যক্ষ ভাবেই তাহাদিগকে তাহার অসহায়তার কথা জানাইল। কিন্তু মৌখিক সহানুভূতি ব্যতীত আর কিছুই তাহার ভাগ্যে জুটিল না। এক দিন সন্ধ্যার পরে মহেন্দ্র বাবু তাহাকে

জানাইয়া দিলেন যে, তাহার এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্ত প্রস্তুত হওয়া দরকার। কলাবতী অনেক ভাবিল, কিন্তু ভাবনার শেষ হইল না। সকালে ভাবিল, দুপুরে ভাবিল, সন্ধ্যায় ভাবিল, রাত্রে ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিন্তা করিবার শক্তিও যেন লোপ পাইল। অবশেষে স্থির করিল, সে নিজেকে পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবে। ইহাই একমাত্র পথ। সে মহেন্দ্র বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, আমি স্থির করেছি, তিন দিনের মধ্যেই আমি এখান থেকে চলে যাব।

কোথায় যাবে?

তা জেনে আপনার কি লাভ? আপনি আমার বিপদের সময়ে যে উপকার করেছেন, সে জন্ত ধন্তবাদ। আচ্ছা, নমস্কার।

কলাবতী আজ খুব সকালে উঠিয়াছে। ঘরের জিনিষপত্র সব গুছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার সংকল্প দৃঢ় হইয়াছে। আজ সে এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইবে। যাইবার পূর্বে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্তই যেন সে নামিয়া আসিল সাদার্ন এভেনিউতে। কত লোক যাইতেছে, সকলেই তাহার চেয়ে সুখী। বেশ তো! কত গাড়ী যাইতেছে, গাড়ীতে কত নর-নারী, কত যুবক-যুবতী, কত শিশু, হাসিতেছে, খেলিতেছে। ইহারা সকলেই থাকিবে, শুধু সে চলিয়া যাইবে। পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে তো তাহার কোন কষ্ট নাই? কিন্তু এই বাংলা দেশকেও যে ছাড়িতে হইবে! তাহার প্রাণটা যে ওখানেই টন-টন করিয়া ওঠে। সাদার্ন এভেনিউএর মাঝখান দিয়া কলাবতী পাদচারণা করিতে লাগিল, পূর্ব হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে পূর্বে, কিন্তু বেশি দূরে সে গেল না, বেশি হাঁটিবার উৎসাহ তাহার নাই। এই তাহার শেষ ভ্রমণ। এই দিন আর ফিরিয়া আসিবে না তাহার জীবনে।

অনেকক্ষণ এইরূপে ভ্রমণ করিয়া কলাবতী বাড়ীতে ফিরিল। ফিরিয়া দেখিল, তাহার বিছানার উপরে একখানি চিঠি পড়িয়া আছে। একটু ব্যস্ততার সঙ্গেই চিঠিখানি খুলিয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। চিঠি আসিয়াছে দিল্লী হইতে। লেখকের নাম ভকতরাম। চিঠির মর্মার্থ এই: আমার এক বাঙালী বন্ধুর নিকট জানিতে পারিলাম, আপনি বাসস্থানের অভাবে বিপদে পড়িয়াছেন। আপনার নাম ও গুণাবলী এ-অঞ্চলেও সুপরিচিত। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার আশ্রয়ে বাস করিতে পারেন। আমি আপনাকে বৎসরে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দিতে সম্মত আছি। পত্র পড়িয়া কলাবতী বিছানায় শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। বিধাতার এ কি পরিহাস! কলাবতী দিল্লী-ওয়ালার রক্ষিতা হইবে? মনে করিয়াই মনে-মনে যেন হাসিয়া ফেলিল। কি আশ্চর্য্য! বাংলা দেশের কেহ তো তাহাকে এমন পত্র লিখিল না? কিন্তু এ হয় না। কলাবতী দিল্লীওয়ালী হইতে পারে না। সে যে সংকল্প করিয়াছে, তাহাই ঠিক। বাংলা দেশ পরিত্যাগ করা আর পৃথিবী পরিত্যাগ করা একই কথা।

আহারাদির পর দুপুরে শুইয়া শুইয়া পত্রখানি হাতে লইয়া-বার বার পড়িল। চিন্তার পর চিন্তা। অনেকক্ষণ পরে একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। দিল্লীর স্বপ্ন দেখিল। একবার নৃত্যপ্রদর্শনী উপলক্ষে দিল্লী গিয়া যে-সব দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছিল, সেইগুলি মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত। শরীরটা যেন কাঁপিতেছে। একটু স্থির হইয়া আবার চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়িল। তার পরে চিঠিখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া একটি চেয়ারে শরীর এলাইয়া দিয়া আবার যেন কি ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটু হাসিয়া আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল।

বৈকালের দিকে একবার বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী পোষ্ট অফিসে গিয়া ভকতরামের নামে টেলিগ্রাম করিল, আমি সম্মত। আজই রওয়ানা হইতেছি। বাড়ী ফিরিয়া গুছানো জিনিষ-পত্রগুলি আবার ভাল করিয়া গুছাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্র বাবু একবার খোঁজ লইতে আসিয়া দেখিলেন, কলাবতী প্রফুল্ল মনে জিনিষ-পত্র নাড়া-চাড়া করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু স্থির হ'ল?

আপনাকে তো বলেছি, আজই সন্ধ্যার পরে এ বাড়ী ছেড়ে যাব।

কোথায় যাওয়া স্থির হ'ল?

পরে জানতে পারবেন। সাড়ে সাতটার সময়ে দয়া করে একখানা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন।

৬

ট্রেণ ছুটিয়াছে। কলাবতীর মন দ্বিধায়, সন্দেহে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় দুলিতেছে। গুন-গুন করিয়া বিষাদ-ভরা সুরে একবার গাহিল—

> আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,
> চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
> আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

কিন্তু এ বাঁশী তো আর বাজিবে না? কলাবতীর প্রাণের মূল উৎপাটিত হইয়াছে। তার গানের উৎসও বুঝি শুকাইয়া যাইবে। ভকতরাম কি বুঝিবে তার প্রাণের ব্যথা? বোঝা কি সম্ভব? এ সব ভাবিয়া এখন কোন লাভ নাই। যে যাত্রা সুরু হইয়াছে, তাহার শেষ পর্য্যন্ত তো তাহাকে যাইতেই হইবে।

দিল্লীতে পৌঁছিয়া অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা লাভ করিল। স্বয়ং ভকতরাম ষ্টেশনে আসিয়া কলাবতীকে মহা সমাদরে গৃহে লইয়া গেল। উহার সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল।

এখানে আসিবার পর হইতেই নানা মজলিসে উহার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। চারি দিকে কলাবতীর খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বাংলা দেশেও তাহার খ্যাতি পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।

বালীগঞ্জের প্রধানেরা মন্তব্য করিলেন, যাক্, এত দিন পরে মেয়েটার একটা হিল্লে হ'ল।

বর্ষীয়সী মহিলায়া বলিলেন, মরণ আর কি! বাংলা দেশ ছেড়ে, ছি, ছি!

তরুণ-তরুণীরা বলিলেন, এমন একটা প্রতিভাকে অনাদরে বাংলা দেশ ছেড়ে যেতে হ'লো? অহো, কি দুর্ভাগ্য! যাই হোক, ওখানে গিয়ে একটা বৃহত্তর সমাজে কলাবতী প্রতিষ্ঠা লাভ করলে, এইটেই আমাদের গৌরব।

একটি ছোকরা বলিল, আর বলিস নে। বাংলার এমন একটা রত্নকে একটু ঠাঁই কেউ দিলে না। এখন বৃহত্তর প্রতিষ্ঠার বুলি কপচান হচ্ছে।

বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে যে সহস্র-সহস্র কলা-কৃষ্টি-সম্পর্কিত সভা, সমিতি প্রভৃতির অধিবেশন হয়, তাহাতে উচ্চৈঃস্বরে কলাবতীর বিবিধ গুণের বিবিধ প্রশংসা করা হইল।

কয়েকটি সমিতি মিলিয়া কলাবতীকে একটি বিরাট অভিনন্দন দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়া তাহার নিকট পত্র লিখিল। পত্রপাঠ উত্তর আসিল, দুঃখিত। দারুণ অভিমানে কলাবতীর মন ভরিয়া রহিয়াছে। যে বাংলাকে সে অকপট ভাবে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, সেখানে আর সে কখনও ফিরিবে না। সে তো মরিতেই চাহিয়াছিল। বাংলা দেশ মনে করুক, কলাবতী মরিয়া গিয়াছে।

৭

একটি কার্য্যোপলক্ষে মহেন্দ্র বাবু দিল্লী গিয়াছিলেন। সেখানে এক জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি মহেন্দ্র বাবুকে একখানি কার্ড দিয়া বলিলেন, অবশ্য যাবেন। একটা খুব উঁচু দরের মজলিস।

মহেন্দ্র বাবু যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই যিনি গান ধরিলেন, তিনি কলাবতী। উঁহাকে দেখিয়া মহেন্দ্র বাবু আশ্চর্য হইয়া গেলেন। এই কি সেই কলাবতী! বসনে-ভূষণে বাঙালীত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি তাহার মুখের সেই অপরূপ রমণীয়তা এখনও তাহাকে একান্ত ভাবেই বাঙালী করিয়া রাখিয়াছে। সে প্রথমেই গাহিল—

> আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,
> চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
> আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

মহেন্দ্র বাবু জানিতে পারিলেন, কোন আসরে গেলেই কলাবতী না কি এই গানটি আগে গাহিয়া নেয়। দুই-এক বার বারণ করাও হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। আসর জমিয়া উঠিল। সমবেত সুরে, চৌবে, আয়ার, নাথন, কেলকার, পান্নিকর, জীবনমাম, গণেশলাল, রহমন খাঁন প্রভৃতি বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা করিতে লাগিলেন। ইঁহারাই এখন কলাবতীর ভাগ্যনিয়ন্তা। ভক্তবৃন্দের আশ্রয়ে এবং ইঁহাদের কারুণ্যে ও পোষকতায় কলাবতীর বৃহত্তর প্রতিষ্ঠা একটা বৃহত্তর, ব্যাপকতর এবং মিশ্রিততর খিচুড়ী-কৃষ্টির ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইয়াছে। কলাবতীর অন্তরের বাঙালী সত্তাটি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আরো কিছু কাল পরে। মহেন্দ্র বাবু দিল্লী গিয়াছেন, কতকটা ভ্রমণও বটে, আবার কতকটা কাজও ছিল। এক দিন কুতব মিনারের পাশে গিয়া দেখিলেন, একটি পাগলী বসিয়া আছে। একটু কাছে যাইতেই চিনিতে পারিলেন, এ তো সেই কলাবতী! কি আশ্চর্য! কোথায় সে রূপ, সে বসন-ভূষণ, সে ঐশ্বর্য? মহেন্দ্র বাবু কি ভূত দেখিলেন? কি ভয়ানক পরিণাম! পাগলী মহেন্দ্র বাবুকে বলিল, কি দেখছেন? বেশ হয়েছে, না? আমি আপনাকে চিনেছি। আপনি আমাকে বিপদে আশ্রয় দিয়েছিলেন, ধন্যবাদ! আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি—

মহেন্দ্র বাবুর চোখে জল আসিল। বলিলেন, ফিরে যাবে আমাদের কাছে? আর কখনো বলব না বাড়ী ছেড়ে যেতে।

কলাবতী হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, সে আর হয় না। টু লেট। কলাবতী মরে গেছে। বাংলা দেশ কলাবতীকে আর বাঁচাতে পারবে না।

জ্যোতিষ-বাক্য

শ্রীচিরন্তন মুখোপাধ্যায়

আনা ছয়েক খরচ করিয়া দুরু-দুরু বক্ষে গল্পটি পাঠাইয়া দিলাম।

ব্যাপারটি খুলিয়া বলা দরকার। আমি এক জন আধুনিক কবি। ধনী পিতার অর্থ ধ্বংস করিয়া দিন কাটাই। আমার বন্ধুবর্গের ধারণা, আমি হঠাৎ এক দিন মহাকাব্য রচনা করিয়া ফেলিব। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় ও পাঠকগণের সৌভাগ্যের বিষয়, আমি এখনও সেরূপ কিছু করি নাই। যাহা করিয়াছি তাহা বিবাহ— একটি সুন্দরী ধনি-কন্যাকে।

কিন্তু পত্নী আমার সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা, কবিতা রচনা অতি বাজে কাজ। সুতরাং আমার সত্ত-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটি (যেটির ২৫৲ টাকা প্রেসের বিল এখনও বাকী আছে) তাঁহার চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, তাহা বেশী বিক্রয় হয় নাই। পাঠকের পরিবর্ত্তে তাহা অসংখ্য বল্মীককে লুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে মাত্র।

গৃহিণীর ভয়ে কোন মাসিক পত্রের গ্রাহক হইতে পারি না। স্থানীয় ষ্টলে দাঁড়াইয়া পড়িয়া আসিতাম। সহসা বসুমতীতে একটি ঘোষণা চোখে পড়িল। দেখিলাম, একটি গল্প-প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। কোন প্রবেশ-মূল্য নাই। কেবল গল্প লিখিতে পারিলেই হইল। ভাবিলাম, কবিতাকে যদি বাগাইতে পারিয়া থাকি, গল্পও লিখিতে পারিব। গল্প লেখা কি আর এমন শক্ত।

দ্রুতপদে গৃহের দিকে অগ্রসর হইলাম। আজই গল্পটা লিখিয়া ফেলিতে হইবে। গতিবেগে শশককেও পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। রাস্তায় একটি নূতন sign-board দেখিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। তাহাতে লেখা আছে!

"পাকা জ্যোতিষী
আসুন! হাত দেখান!
ভবিষ্যৎকে করায়ত্ত করুন।"

আমি করকোষ্ঠী প্রভৃতিতে অবিশ্বাসী। তথাপি ভাবিলাম, দেখি লোকটা আমার ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে কি না।

অনতিবিলম্বে জ্যোতিষীর কবলে পড়িলাম। জ্যোতিষী মহাশয় সাড়ম্বরে হাতখানি টানিয়া লইলেন। বহু কিছু বলিলেন। আমার নিকট কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইল তাঁহার একটি কথা। তিনি বলিলেন, "সাহিত্য হইতে অভাবনীয় ভাবে আপনার শীঘ্রই কিছু অর্থলাভ হইবে।" উৎফুল্ল হৃদয়ে

জ্যোতিষী মহাশয়কে নগদ দুই টাকা দক্ষিণা দিয়া বাহির হইলাম। এইবার নিশ্চয় পুরস্কার-প্রাপ্তি। গৃহিণীকে দেখাইয়া দিব সাহিত্য-চর্চা একেবারে বাজে কাজ নহে। একটি গল্প অবিলম্বে লিখিয়া ফেলিলাম। একটি সরস বাস্তববাদী প্রেমের গল্প। অবশ্য গৃহিণীকে লুকাইয়া। রেজিষ্টার্ড পোষ্টে অবিলম্বে সেটি পাঠাইয়া দিলাম।

এইবার পথ চেয়ে আর কাল গুণে অপেক্ষা করিবার পালা। প্রত্যহই একবার করিয়া ষ্টলটি ঘুরিয়া আসি—কবে পরের সংখ্যা বসুমতী বাহির হইবে। এক দিন সহসা দেখিলাম কয়েক খণ্ড নূতন বসুমতী আসিয়াছে। প্রতিযোগিতার ফলও বাহির হইয়াছে। কিন্তু এ কি! আমার নাম ত নাই! কত লেখক-লেখিকার নাম বাহির হইয়াছে। আমার নাম ও গল্প কিছুই বাহির হয় নাই। জ্যোতিষী ব্যাটা কি তবে বাজে ভুজুং দিয়া টাকাটা লইল? হতাশ মনে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। বাড়ীতে গিয়া দেখি একটি অপরিচিত লোক বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে। তাহার পিছনে একটি কুলী ও তাহার মস্তকে বিরাট একটি বোঝা। বাড়ী ঢুকিয়াই গৃহিণীর কলকণ্ঠ শুনিতে পাইলাম, "বুঝলে, তোমার বইগুলো উইয়ে কাটছিল—আজ সের-দরে বেচে দিলাম। কি হবে অতগুলো বই রেখে। খালি জায়গা জোড়া করে ছিল। বিক্রী করে তবু তো কিছু টাকা পাওয়া গেল।" আবদার-তরল কণ্ঠে তিনি পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "এ-টাকা কিন্তু আমি তোমাকে দিচ্ছি না। বাঙ্গালোর সিল্ক নতুন উঠেছে, আমি একটা কিনবো।"

বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম। জ্যোতিষীর কথা মনে পড়িল, "সাহিত্য থেকে অভাবনীয় ভাবে আপনার কিছু অর্থ লাভ হবে।"

*　*　*

উপরোক্ত ঘটনাটি দুই বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ঘটনাটির নায়ক এখন জুতার ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কলেজ-ষ্ট্রীটের একটি সুবৃহৎ দোকানের তিনিই স্বত্বাধিকারী।

আন্দামান

প্রভাত বসু

বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে বামাচরণ বড় পরিতৃপ্তির হাসি হাসছিল। আয়নাটা নতুন এসেছে—লুটের মাল। এঁদো-পড়া বস্তির এই ঘরে দামী আয়না একেবারেই বেমানান। অবশ্য হাসি সে জন্ম নয়; তার আট বছরের ছেলে শ্যামাচরণ আজ বাপের নাম রেখেছে বটে! বিকেল বেলা পার্কে যখন ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল, শামু একটি মেয়ের গলা থেকে হার ছিনিয়ে এনেছে। হ্যাঁচকা টানে পড়ে গিয়ে মেয়েটির মাথা ফেটে গেছে, শামু স্বচক্ষে দেখে এসেছে। বাহাদুর ছেলে—রাস্তায় কেউ ধরতে পারেনি তাকে। তা ছাড়া তার আরও কীর্ত্তির কথা মনে পড়ে বামাচরণের। গলির ভেতর থেকে পুলিশের গাড়ীতে হাতবোমা ছুঁড়ে করকরে পাঁচটি টাকা নিয়ে এসেছিল শ্যামাচরণ। যাক্—ছেলে মানুষ হয়ে গেছে। নিশ্চিন্তে সে চোখ বুজতে পারবে। মা-মরা ছেলেটিকে নিজের হাতে তৈরী করেছে সে। এখন থেকে যে-রকম ছুরি ঘোরায় তা'তে বড় হয়ে নাম-করা গুণ্ডার সর্দ্দার বামাচরণের যশকেও হয়ত সে ম্লান করে দেবে। বামাচরণের বুক গর্ব্বে ভরে উঠল। আয়নাটার মধ্যে আর একবার সে নিজের হাসি দেখে নিল। এটাও লক্ষ্য করল যে, কপালে বড়-বড় রেখা পড়েছে। এগারো বার জেলবাসের স্মৃতি সেই রেখাগুলির সঙ্গে জড়ানো। মেয়াদ বুঝি এবার ফুরিয়ে এল। যাক্, ছেলেটার জন্যে আর ভাবনা নেই। গালের পাশের কাটা দাগটার ওপর বামাচরণ একবার হাত বুলিয়ে নিল। নাঃ, পুরোনো কথা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। একবার হরি ওস্তাদের আখড়া থেকে ঘুরে আসা যাক্। বামাচরণ ফতুয়াটা পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

*　*　*　*

সাত বছর পরের কথা। রেল-কামরায় এক মেয়েছেলেকে খুন ক'রে তার গয়না-পত্র কেড়ে নেওয়ার অপরাধে শ্যামাচরণের চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। বয়স অল্প বলে শাস্তির পরিমাণ এত কম। তার চরিত্র সংশোধনের জন্যও জেল-কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেছেন। নানা রকম উপদেশ-অনুশাসন চলেছে, এদিকে নিয়ম মাফিক পাথর ভাঙা, ঘানি ঘোরানোরও বিরাম নেই। দু'টোর প্রতিই শ্যামাচরণের নির্ব্বিকার মনোভাব। শান্ত হয়ে যখন সে উপদেশ শোনে—মনে হয়, এবার ছাড়া পেলে আর কোনো অপরাধ সে করবে না। আর যখন ঘানি ঘোরাতে ঘোরাতে তার সবল মাংসপেশী ফুলে ওঠে, অম্লান বদনে ঠিক সময়ের মধ্যে দিনের পাঁচশ' পাক শেষ ক'রে ফেলে—তখন শ্যামাচরণের গলদ্‌ঘর্ম চেহারার দিকে চেয়ে বলতে ইচ্ছে করে—হ্যাঁ, বামা সর্দ্দারের ছেলেই বটে! ইংরাজীতে যাকে বলে—born criminal.

পাশের ব্লকের রহিমের সঙ্গে শ্যামাচরণের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ডাকাতি কেসে রহিমের সাত বছর জেল হয়েছে। সে শ্যামাচরণের চেয়ে বছর দশেকের বড়। তবু দু'জনার মধ্যে মনের বেশ মিল হয়েছে। দু'-চার বছরের চুরি-বাটপাড়ির আসামী যারা তাদের সঙ্গে শামু কথাই বলে না। খুনী বলে তার নাম-ডাক হয়েছে; এই কৌলীন্য সে সযত্নে রক্ষা করে চলবে। রহিম এখনও মানুষ খুন করার গৌরব দাবী করতে পারে না বটে, তবে তার বাপের ফাঁসি হয়েছিল খুনের দায়ে। রহিমের মাকে মাংস রাঁধতে বলে গণি শেখ কোথায় যেন ঘুরতে যায়। ফিরে এসে দেখে এখনও রান্না তৈরী হয়নি। ব্যস্, মেজাজ গরম হয়ে উঠল; একটা দা এনে সজোরে বসিয়ে দিল রহিমের মা'র গলায়। এই গল্প শুনে শ্যামাচরণ তার নিজের মা'র কথা একবার মনে করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মা'র মুখ তার মনেও পড়ে না। তা ছাড়া মায়া-মমতা তার নেই বললেই হয়। বাপ মরবার সময় শামুর হাত ধরে বলে গিয়েছিল—'দেখিস্, আমার নাম রাখিস্।' সে কথা তার

মনে আছে, কিন্তু বাপের জন্ম দুঃখু সে কোন দিন করে না। মৃত্যুর কোন বেদনা বা বিভীষিকাই তার কাছে নেই।

রহিমের সঙ্গে ভাব হবার আরও একটা কারণ আছে। রহিম টাকা জাল করবার ফিকির জানে। শামুকে শিখিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে। তা ছাড়া চোরাই সিকি-আধুলি গলার মধ্যে লুকিয়ে রাখবার কায়দা ইতিমধ্যেই রহিমের কাছ থেকে সে আয়ত্ত করে ফেলেছে।

তখন বর্ষা কাল। এক দিন সন্ধ্যা বেলা আসামী 'গিন্‌তি' করার সময় ওয়ার্ডারেরা দেখল—দু'জন কম পড়ছে। সর্ব্বনাশ—কয়েদী পালিয়েছে! মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। সেদিন শামু আর রহিমের কাজ পড়েছিল বিলিতি বেগুনের ক্ষেতে। পরামর্শ আগেই করা ছিল। এক জন আরেক জনের কাঁধে উঠে কাপড় পাকিয়ে সেই দড়ির সাহায্যে জেলের পাঁচিল টপকে যে যার লক্ষ্য অভিমুখে রওনা দিল। কবে কোথায় সাক্ষাৎ হবে তারও ব্যবস্থা করা রইল। জেল থেকে পালানোর গৌরবে দু'জনের কৌলীন্য আর এক ধাপ বেড়ে গেল।

শ্যামাচরণের নাম-ধাম বার বার বদল হচ্ছে, চেহারারও রকমফের ঘটছে—কিন্তু পেশা বদলায়নি বলে আমরা তার পুরোনো নামটাই ব্যবহার করব। কয়েকটি লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও শ্যামাচরণ ফেরার হয়ে আছে। আগে শুধু তার বাহুবল ছিল, এখন তার অর্থবল এবং দল-বলও প্রচণ্ড। শামু সর্দ্দারকে ধরতে পারলে পুলিশ পুরস্কার পাবে; কিন্তু এই দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতকে আয়ত্তে আনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

তবে ধরা এক দিন পড়ল শ্যামাচরণ। পুলিশের সঙ্গে রীতিমত সংঘর্ষের পর। শামুর পায়ে গুলী লেগেছিল। দু' তিন জন সশস্ত্র পুলিশ ঘায়েল ক'রে সে বিজয়-গর্ব্বে লোহার হাতকড়া হাতে পরল। হ্যাঁ, এবার কিছু দিন বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। চির বিশ্রামের ব্যবস্থা হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে শ্যামাচরণের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা হ'ল। পিছনের কোনো টান ছিল না তার। সংসারের স্বপ্নকে সে কোন-দিনই মনে স্থান দেয়নি। তাই কালাপানি পারে যাবার সময় তার অন্তরে কোন ব্যথার আভাষ মাত্র রইল না। বরং নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আগ্রহে শামু চঞ্চল হয়ে উঠল।

* * * *

আন্দামান। কত বার এই দ্বীপের নাম শুনেছে শ্যামাচরণ। কালাপানি-ফেরৎ দু'-এক জন আসামীর কাছে অনেক গল্পও সে শুনেছে। রহস্য ঘেরা আন্দামান। শত শত বন্দীর বেদনা, অপরাধীর বিকৃত চিন্তাস্রোত, শাসকের কঠোর নির্যাতন, পাশবিকতার বিচিত্র রূপ, স্বদেশপ্রেমিকের আত্মদান—সব মিলে আন্দামান অনন্ত, অতুলনীয়। ঘন কৃষ্ণ সাগরজলে ঘেরা সবুজ নারিকেলশ্রেণী-মণ্ডিত শ্যামল এই দ্বীপটি যেন নিয়ত মৃত্যু দ্বারা আকীর্ণ নব জীবনের প্রতীক। জঘন্যতম পাপ—তার পাশেই মুক্তিকামীর আত্মবিসর্জ্জন। অপূর্ব্ব সমন্বয়!

শামু কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের ভাল চোখে দেখে না। লেখাপড়া-জানা বাবুদের কেন জানি তার ভাল লাগে না। ইংরেজকে তাড়াবি কি বাপু? ওদের কত শক্তি—তোরা পারবি কেন? শ্যামাচরণের ধারণা, ইংরেজ বাহাদুর তাদের ভাল খাওয়া-পরার জন্য এই জেলখানা বানিয়ে দিয়েছেন—ওদের শাস্তি দেয়, বেশি খাটায় বা খারাপ খাওয়ায় এই দিশি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বা ওয়ার্ডারগুলো। একবার বাগে পেলে ঘাড় থেকে ক'টার মাথা নামিয়ে দেয় শ্যামাচরণ।

হঠাৎ একটি ঘটনায় তার মত কিছুটা পরিবর্ত্তিত হ'ল। রাজ-বন্দীরা কিসের যেন প্রতিবাদে অনশন সুরু করেছে। দু'দিন নয় চার দিন নয় আঠারো দিন কেটে গেছে। জলস্পর্শ করেনি কেউ। তিন-চার জনের অবস্থা সংকটাপন্ন। তার ওপর জেল-পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করেছে; 'ষ্ট্যাণ্ডিং হ্যাণ্ডকাফ্' (ডাণ্ডা বেড়ী), 'চট কাপড়'—অনেক রকম শাস্তিরও ব্যবস্থা হয়েছে। এই ঘটনায় আন্দামানের সর্ব্বত্র একটা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। শ্যামাচরণের মেজাজও গরম হয়ে উঠল। কথায়-কথায় তর্ক বাধিয়ে বস্‌ল সে চীফ্ ওয়ার্ডার সম্পদ্ সিং-এর সঙ্গে। বেমারি আদ্‌মির ওপর লাঠি চার্জ্জ? শামুর রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। বেপরোয়া হয়ে সে একটা প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিল সম্পদ্ সিং-এর গালে। হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল অন্যান্য প্রহরীরা। বেটনের আঘাতে শামুর ঠোঁট ফেটে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। ইতিমধ্যে তার হাত দু'টো পিছমোড়া করে বাঁধা হয়ে গিয়েছে। তিন মাস অন্ধকার কুঠুরীতে বসে পাথর ভাঙার কাজ হ'ল তার—আর এক বেলা খাওয়া। পাথর ভাঙাকে শামু ভয় করে না। কিন্তু তাহার লোহার মত দেহ কি এক বেলা লপ্‌সী খেয়ে টেকে? ক্ষিদের জ্বালায় তার মনে পড়ল রাজবন্দীদের অনশনের কথা। বাবুরা না খেয়ে যে কি করে থাকে, সে কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারল না।

কয়েক দিন পরের কথা। শামুকে যে মেট্ খাবার দিতে আসে সে তার কানে কানে বলল—"স্বদেশী ডাকাতদের কর্ত্তা অমর বাবু তোর খুব সুনাম করেছে শামু। বলেছে, তোকে তাদের দলে ভর্তি করে নেবে।" কথাটা শ্যামাচরণের ভালই লাগল। সত্যিই ত—বাবুদের চেয়ে সে কম কিসে? সতেরোটা খুন করেছে সে। লেখা-পড়া নয় না-ই শিখেছে, কিন্তু ভয়-ডর সে কাউকে করে না। একটু ইতস্ততঃ করে মেটকে সে বলেই ফেল্‌ল—"বাবুদের বলিস্ আমি তোমাদের দলে ভর্ত্তি হব। দরকার হলে আমি সাহেব মারতেও পারি।"

রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে শ্যামাচরণের যোগাযোগ ক্রমে বেড়েই চলল। কিছু-কিছু লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থাও সে করে নিয়েছে। ধীরে-ধীরে একটা যেন বিরাট পরিবর্ত্তন এসে পড়ছে তার চরিত্রে। অনেক সংযত হয়েছে সে। সম্পদ্ সিংকে ডেকে শামু এক দিন বলল—"আমার কসুর মাপ কোরো ভাই, তোমাকে চড় মারা আমার অন্যায় হয়েছিল।" সম্পদ্ সিং গোঁফে চাড়া দিয়ে শুধু একবার মৃদু হাস্‌ল। মনে-মনে ভাবল, তিন মাস পাথর ভেঙেই বাছাধন কাৎ—ইয়ে হ্যায় আন্দামানকা খেল! শ্যামাচরণের সহ-কয়েদী বাবুলাল, ছোটে খাঁ, গুলু সর্দ্দার এরা ঠিক করল, শামুর জাত খোয়া গেছে। ওর বড় অহঙ্কার। চোরের ছেলে—তিনি আজ বাবু সেজেছেন। কয়েদীদের মনে একটা ঈর্ষার ভাব। কেউ চেপে রাখে, কেউ বলে। শ্যামাচরণ সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। সে ভবিষ্যতের কথা ভাবে। নিজের দেশকে সে

চিনতো না, এখন যেন একটু-একটু চিনতে পারছে। স্পষ্ট কিছু সে দেখতে পায় না, কিন্তু ভাসা-ভাসা ভাবে অনেক কথাই তার মনে উঁকি মারে। এই দেশে আর সাহেব থাকবে না, আমরাই রাজা হব, সকলে পেট পুরে খেতে পারতে পাবে—এমনি আরো কত কি!

পুরোনো দিনের কথাও যে তার একেবারে মনে পড়ে না তা নয়। নারীর সংস্পর্শে সে কয়েক বার এসেছিল। মত্ত অবস্থায় নিম্নশ্রেণীর বারবিলাসিনীদের সঙ্গ সে করেছে; কিন্তু শ্যামাচরণ কোন দিন মোহগ্রস্ত হয়নি। সংসার? না, সংসার সে করবে না। যদি ছাড়া পেয়ে দেশে ফেরার দিন আসে—তখন? বাবুরা বলেছেন, দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। সেই দেশে কি সে কোন দিন ফিরতে পারবে? নানা চিন্তা ভিড় করে আসে তার মনে।

আশা-আনন্দে শামুর দিন কেটে যাচ্ছিল। ইংরিজিতে সে নিজের নাম সই করতে শিখেছে। স্বদেশী বাবুদের সুপারিশে সে হিসাব লেখার কাজ পেয়েছে। বাবুদের কেউ হাসপাতালে গেলে শ্যামাচরণ সেখানে গিয়ে সেবার ভার নেয়। একটা বিচিত্র অনুভূতি এসেছে তার জীবনে। পুরানো দিনের সঙ্গে আজকের তুলনা করলে তার নিজেরই আশ্চর্য লাগে। মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছে শামু, ছাড়া পাবার পর সে লুটপাট করে যে টাকাকড়ি আনবে সব ঐ স্বদেশী বাবুদের হাতে তুলে দেবে। আর এবার যদি খুন করতে হয়, একেবারে গোরা সেপাইএর মুণ্ডু সে দু'ফাঁক করে দেবে।

কয়েক বছর পরে একটা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের কি একটা চুক্তি অনুসারে আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি আসন্ন হয়ে এল। বাবুরা সব ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরে যাবে। তাদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। যাদের তরুণ জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি রুদ্ধ-কারার অন্তরালে কেটেছে তারা যে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে, এ ছিল সুদূর কল্পনারও অতীত। খবরটা শ্যামাচরণ পেয়েছে। একবার ভাবল—অমর বাবুকে জিগ্‌গেস করে, তারও ছাড়া পাবার সম্ভাবনা আছে কি না। কিন্তু পাছে অন্য রকম কিছু শুনতে হয় সেই লজ্জায় সে মুখ ফুটে আর কিছু বলতে পারল না। এত দিন তার দেশের কথা মনে পড়ত না—কিন্তু আজ তার বুকের ভেতর একটা জায়গায় কেমন যেন খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। তার অন্যমনস্ক ভাব দেখে 'গ্যাং কেসে'র আসামী খোদাবক্স ঠাট্টা করে বলল—"কি রে শামু, কোট পাঞ্জাবী পরে বাবুদের সঙ্গে জাহাজ চড়ে বাড়ী যাবি না কি?" আর একটু হলেই শ্যামাচরণের মুখ দিয়ে একটা অশ্লীল গালাগাল বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু সে একেবারেই চুপ করে রইল।

রাজবন্দীদের মুক্তির দিন এল। চীফ্‌ ওয়ার্ডার সম্পদ্‌ সিং-এর কাছ থেকে শামু জেনেছে, স্বদেশী বাবুদের সুপারিশে সে জাহাজ-ঘাট পর্য্যন্ত গিয়ে তাঁদের তুলে দেবার অনুমতি পেয়েছে। মনকে ইতিমধ্যে সে ঠিক করে নিয়েছে। না-ই বা ছাড়া পেল—অন্য কয়েদীদের চেয়ে ত তার সম্মান বেশি। মেয়াদের আর ৭ বছর বাকি; দেখতে দেখতে কেটে যাবে। রামাচরণ সর্দ্দারের ছেলে না সে? এতেই কাতর হলে চলবে কেন?

'এস্‌. এস্‌. মহারাজা' দাঁড়িয়ে রয়েছে জাহাজ-ঘাটে। বাবুরা একে-একে উঠ্‌ছেন। শামুর হাত ধরে "আসি ভাই" বলতে গিয়ে অমর বাবুর চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। কালো রং-এর 'মহারাজা' জাহাজ বাঁশি বাজিয়ে কালো জলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। শামু একদৃষ্টে চেয়ে ছিল সেদিকে। ভাবছিল, তেরো বছর আগে এই জাহাজেই সে আন্দামানে এসেছিল।···হঠাৎ তার কি মনে হ'ল; শ্যামাচরণ সশব্দে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। পাহারাদাররা হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রিভলভারটা বের করে বাগিয়ে ধরলেন। শ্যামাচরণ তখন ডুব-সাঁতার দিয়ে চলেছে—কোথায় গিয়ে উঠবে কে জানে! আন্দামান জেলে ঢং-ঢং করে বিকট শব্দে 'পাগলা ঘণ্টা' বেজে উঠল!

আকাশ-পাতাল

[১৫২ পৃষ্ঠার পর]

গবর্ণমেণ্টের কাছে সরাসরি পাঠিয়ে দেবেন। পাঠিয়ে, জানিয়ে দেবেন তার বিরুদ্ধে গুপ্ত আন্দোলনের সূত্র?

নায়েবাদের এক জন এসে বলেন,—গিন্নীমা'র মাসিক খোর-পোষের টাকাটা যেন পিশীমা'র কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি জানিয়ে গেছেন।

ম্যানেজার বাবু বলেন,—নিশ্চয়ই। আগামী প্রাতেই পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

কুমুদিনী তখন ননদিনীকে নিয়ে বসেছেন ফর্দ্দ করাতে। ছেলের বিয়ের ফর্দ্দ। কুমুদিনী বলছেন আর লিখছেন হেমনলিনী। তত্ত্বের তালিকা প্রস্তুত করছেন তাঁরা। হেমনলিনীর লিখিত বাঙলা অক্ষর যেন ঠিক মুক্তার মত। হেমনলিনী যে শিক্ষা পেয়েছিলেন কিশোরী-বেলায়! ভাইদের চেষ্টায় শোভাবাজার রাজবাটীতে রাজা রাধাকান্তর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ নিয়েছিলেন বেশ কয়েক বছর। অনেক বই শেষ করেছিলেন। পরীক্ষায় পুরস্কার পর্য্যন্ত পেয়েছিলেন।

কুমুদিনী বলছেন আর লিখে চলেছেন হেমনলিনী। লিখছেন তত্ত্বের উপকরণ। কনের আত্মীয়-স্বজনের নাম। গহনা, বাসন-পত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদের ফিরিস্তি।

আর ছেলে তখন একেবারে বেহুঁস হয়ে বিবি গহরজানের কাছে—

[ক্রমশঃ।

স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণ

রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠের সভাপতি স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ ৭৮ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

প্রায় ১ বৎসর যাবৎ স্বামীজী যকৃৎ, হৃদ্‌রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতায় ভুগিতেছিলেন। প্রায় দুই মাস তাঁহার রোগ সঙ্গীন আকার ধারণ করে। মাঝে তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ তাঁহার রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গত কয়েক দিন হইতে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়। মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্বামীজীর জ্ঞান ছিল না বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকার সময় স্বামীজীর অবস্থার অত্যন্ত অবনতি ঘটে। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সময় মঠের সাধু-সন্ন্যাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

বেলা প্রায় সাড়ে ১১ ঘটিকার সময় স্বামীজীর নশ্বর-দেহ মঠ-প্রাঙ্গণস্থিত আম্রবৃক্ষের নিম্নে একখানি খাটে শায়িত করা হয়। স্বামীজীর নশ্বর-দেহ যে খাটে শায়িত করা হয় সেই খাটখানি গেরুয়া বস্ত্র ও পুষ্পে সজ্জিত করা হয়।

স্বামী বিরজানন্দের পূর্ব্বের নাম ছিল কালীকৃষ্ণ বসু। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন স্নান পূর্ণিমার দিন কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু তখনকার সময়ে পূর্ব্ব-কলিকাতার এক জন সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। ট্রেনিং একাডেমি এবং পরে রিপণ কলেজে কালীকৃষ্ণ বসু পড়াশুনা করেন। কিশোর বয়সেই তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মভাবের জাগরণ দেখা গিয়াছিল। সমভাবে ভাবুক কয়েক জন সহপাঠীর সহিত একত্রিত হইয়া তিনি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, সৎসঙ্গ, সংকীর্ত্তন প্রভৃতিতে অনেক সময় যাপন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কালীকৃষ্ণের মত শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করিয়া সঙ্ঘের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও সেবক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই যুবকবৃন্দ প্রথমে রামকৃষ্ণদেবের গৃহীশিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং ঠাকুরের জীবন ও শিক্ষা বিষয় অবগত হন। কালীকৃষ্ণের কলেজে তখন শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (পরে বিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের রচয়িতা) ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার কাছে ইঁহারা রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের এবং বরাহনগর মঠের কথা শুনিতে পাইয়া তথায় যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। শীঘ্রই কালীকৃষ্ণের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য ভাব প্রবল ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সতের বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন পরিব্রজ্যায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত কালীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল অনেক পরে—১৮৯৭ সালে স্বামীজী আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলে বরাহনগর মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী পার্ষদগণের অন্তরঙ্গ সাহচর্য্যে কালীকৃষ্ণের তরুণ হৃদয়, মন আধ্যাত্মিক চেতনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। তাপস-জীবনের বহুল কঠোরতা তাঁহার বিন্দুমাত্র বোধ হইত না। অনতিকাল পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত জননী সারদা দেবীর নিকট মন্ত্র দীক্ষা লাভ করেন এবং বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ বা বাবুরাম মহারাজের নিকট থাকিয়া ধ্যান-ভজনে কিছু কাল অতিবাহিত করেন। ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কালীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুদত্ত বিরজানন্দ নামে পরিচিত হইলেন। স্বামীজীর আদেশে তিনি দেওঘরে দুর্ভিক্ষে সেবা এবং ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য কয়েকটি স্থানে প্রচারকার্য্য অতি কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিছু কাল তিনি স্বামীজীর ব্যক্তিগত সেবক ছিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ সেবায় স্বামীজী বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছিলেন। ১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি স্বামীজী দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্য দেশে চলিয়া গেলে বিরজানন্দ তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে হিমালয়ে নব-প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কর্ম্মী হইয়া গমন করেন। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধিতে প্রবেশ করিলেন। শেষ সময় প্রিয়তম গুরুর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে বিরজানন্দ খুবই ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়েন এবং কর্ম্মজীবন হইতে সাময়িক অবসর লইয়া প্রায় তিন বৎসর তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সেবা ও সঙ্গে অতিবাহিত করেন। ১৯০৬ সালে মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষ গুরুভ্রাতা স্বামী স্বরূপানন্দ হঠাৎ দেহত্যাগ করিলে বিরজানন্দের উপর ঐ আশ্রমের কর্ম্মভার ন্যস্ত হয়। প্রায় আট বৎসর তিনি ঐ গুরু দায়িত্ব সুষ্ঠু ভাবে পালন করেন। ঐ সময়ে আশ্রমের ইংরাজী মুখপত্র "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার সম্পাদনাও তাঁহাকে করিতে হইত। স্বামী বিবেকানন্দের সুবৃহৎ জীবনী এবং রচনা ও বক্তৃতাবলী ও প্রকাশনী তাঁহার ঐ সময়কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। তৎপরে এক বৎসর মায়াবতীতে বিশ্রামান্তে বিরজানন্দ ১৯১৫ সালে হিমালয়ের গভীর অরণ্য প্রদেশে একটি নির্জ্জন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত প্রধানতঃ তপস্যাদিতেই অতিবাহিত করেন।

১৯২৬ সাল হইতে পুনরায় তাঁহার কর্ম্মজীবন শুরু হয়। ১৯৩৪ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সেক্রেটারী, ১৯৩৮ সালের মে মাসে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং ঐ বৎসরের শেষাশেষি গুরুভ্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দের শরীর ত্যাগের পর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বিরজানন্দের সর্ব্বাধ্যক্ষতাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহুল প্রসার ও গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি হইয়াছে। বিরজানন্দের কথিত ধর্ম্মোপদেশগুলি সংগৃহীত হইয়া 'পরমার্থ প্রসঙ্গ' নাম দিয়া বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী তিন সংস্করণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর নিউ ইয়র্কের হার্পার এ্যাণ্ড ব্রাদার্স বইখানির একটি মনোজ্ঞ বৈদেশিক সংস্করণও বাহির করিয়াছেন।

স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ

নামেই শুধু বামপন্থী ?
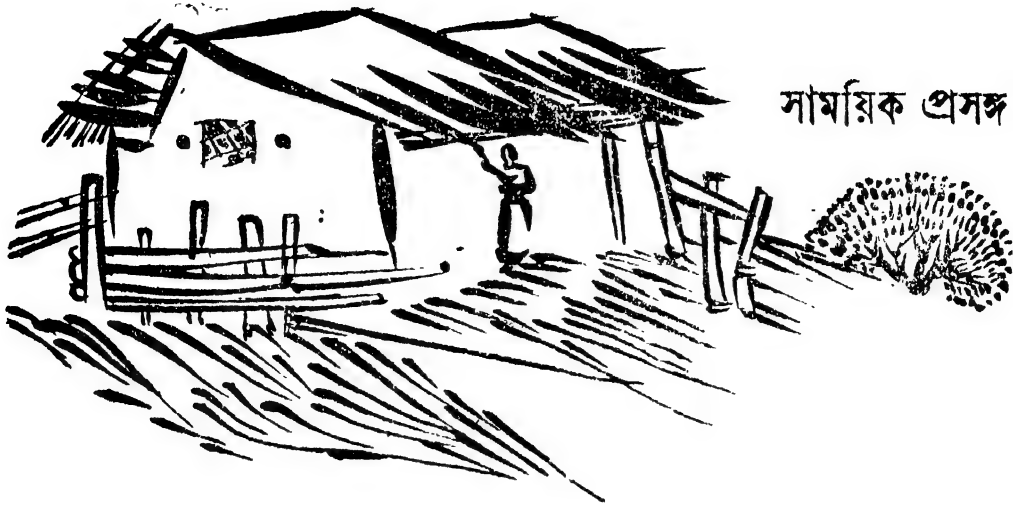
"হাওড়া নির্ব্বাচনে ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ব্লক জয়লাভ করাতে জনসাধারণ খুব আশ্বস্ত হইয়া ভাবিয়াছিল যে, দেশে নূতন নেতৃত্বের সূচনা হাওড়া হইতেই হইবে। কংগ্রেস-নেতৃত্বে লোকে একেবারে আস্থা হারাইয়াছে এবং জনসাধারণ এমন একটি নূতন দল খুঁজিতেছে—যাহার উপর তাহারা বিশ্বাস রাখিতে পারে। বামপন্থী দলগুলি একক ভাবে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। এই জন্য সকল দলের মিলিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনসাধারণ আশ্বস্ত হইয়া ভাবিয়াছিল যে, বামপন্থী দলেরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কংগ্রেসের বিরোধী সম্মিলিত দলরূপে গড়িয়া উঠিয়া একটি নূতন শক্তির সৃষ্টি করিবে এবং দেশকে সুপথে পরিচালিত করিবে। এই সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই হাওড়া মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন দক্ষিণ-কলিকাতা উপ-নির্ব্বাচনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছিল এবং আমেরিকায় পর্য্যন্ত সাড়া জাগাইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, নির্ব্বাচনের পর বামপন্থী দলেরা এই সঙ্ঘশক্তিকে সফল করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। এই নির্ব্বাচনে মন্ত্রীরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ দল যাহাতে নানারূপ বাধা পান, তাঁহারা সে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। কিন্তু নির্ব্বাচনের পর নূতন দলের যে তৎপরতা ও নেতৃত্ব লোকে আশা করিয়াছিল, তাহা পাইতেছে না বলিয়া জনসাধারণের মনে হতাশা দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্মিলিত দল এ বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত না হইলে তাঁহাদেরও অনিষ্ট হইবে, দেশেরও ক্ষতি হইবে।" —দৈনিক বসুমতী।

আচার্য্যের কংগ্রেস ত্যাগ

"আচার্য্য কৃপালনী অবশেষে কংগ্রেস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাধ্য হইয়াছেন বলিলাম এই জন্য যে, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু ও মৌলানা আজাদের মত মুরুব্বী ধরিয়াও হালে পানি পান নাই। কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন কিছুতেই কৃপালনীর কোন আবদার রক্ষা করিতে সম্মত হন নাই, এ-আই সি-সির সভায় ব্যঙ্গভরে তিনি বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস-মহীরুহের দুই-একটি শাখা-প্রশাখা যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহাতে বিচলিত হইবার কিছু নাই, বৃক্ষের কাণ্ডদেশ এত প্রকাণ্ড যে, তাহাতেই উহার জীবনীশক্তি অটুট থাকিবে।

কৃপালনী কংগ্রেস-বৃক্ষের শাখা মাত্র ছিলেন না। বাপুজীর অন্যতম বিশ্বস্ত ভক্তরূপে তিনি কংগ্রেসের কাণ্ডারীদের এক জন ছিলেন। দীর্ঘকাল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর পদটি তাঁহার একচেটিয়া ছিল এবং গান্ধীজীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত তিনি হাই-কমাণ্ডের এক জন হইয়া কংগ্রেসের যাবতীয় কর্ম্ম এবং অপকর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। সেই সময়ে মতভেদের প্রশ্ন উঠে নাই, কারণ কংগ্রেসে তখন ভাগের বিষ ছিল, মধু ছিল না। সমুদ্র মন্থনে সুধাভাণ্ড উত্থিত হইলে লোভাতুরদের কলহ ও দ্বন্দ্বে যেমন স্বর্গ-মর্ত্ত্য আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি স্বরাজের মধুভাণ্ড হস্তগত হইতেই কংগ্রেস-সেবকদের, এমন কি গান্ধীজীর নিষ্ঠাবান ভক্তদের, লোভ ও মোহ দুই রিপু অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া এক দিকে দেশকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী কলহের সৃষ্টি করিয়াছে। দেশসেবার বখরা লইয়া বিবাদে কৃপালনী হারিয়া গিয়া এবার বিদায় হইতে বাধ্য হইলেন।

কৃপালনী বলিতেছেন, কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কে বর্ত্তমান হাই-কমাণ্ডের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই। তাঁহার প্রধান অভিযোগ দুইটি: (১) বিগত প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে দুর্নীতি ঘটিয়াছে, এ জন্য তিনি পরাজিত হইয়াছেন, এবং (২) কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দলীয় মনোভাব হইতে মুক্ত নহেন, এ জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দল ন্যায়বিচার পাইতেছে না। কংগ্রেসের নির্ব্বাচনে দুর্নীতি এই প্রথম বার হয় নাই। কংগ্রেসের উপর নিজের দলের কব্জা শক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে অল-ইণ্ডিয়া হইতে গ্রামের কংগ্রেসে কিরূপ দুর্নীতি পূর্ব্বাপর অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে ভূতপূর্ব্ব জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য্য কৃপালনী তার ইতিহাস যতখানি জানেন আর কেহ তেমন জানে না। বোম্বাইয়ে নরিম্যান, মধ্যপ্রদেশে ডাঃ খারে ও বাঙ্গলায় সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিতে কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ কৃপালনীর দল কিরূপ দুর্নীতি ও শঠতার আশ্রয় লইয়াছিলেন, দেশের লোক তাহা ভুলে নাই। ভগ্নহৃদয় নরিম্যানের অকালমৃত্যু, খারের হিন্দু মহাসভায় যোগদান, সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ সেই চক্রান্তের পরিণাম! তখন

ত কৃপালনী লজ্জায় অধোবদন হন নাই, ব্যঙ্গভরা বক্র হাস্যে তাঁহার বদন সেদিন উজ্জ্বলই হইয়া উঠিয়াছিল। জেনারেল সেক্রেটারী-রূপে সেই সব দুষ্কর্ম্মে কৃপালনীর নিজের হাত কতখানি ছিল, তাহা আন্দাজ করা কঠিন নহে।

ভোটশাঠ্য এবং দুর্নীতি সত্ত্বেও পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করিয়া সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার পরেও সত্যনিষ্ঠ ও অহিংসার অবতার যে সব গান্ধীভক্ত তাঁহাকে ত্রিপুরীতে অপমান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, কৃপালনী তাঁহাদের অন্যতম। কই, তখন ত কৃপালনী ডেমোক্রাসির দুঃখে এমন অঝোরে অশ্রুবর্ষণ করেন নাই? এখন যাহারা কংগ্রেস হইতে তাঁহাকে তাড়াইল সেদিন তিনি এই দুর্নীতিপরায়ণ প্যাটেল দলের সহিত হরিহর-আত্মা ছিলেন। সুভাষচন্দ্র জয়ী হইয়াও গান্ধীশিষ্যদের তাঁহার ওয়ার্কিং কমিটিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃপালনীর দল তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। বিবৃতি দিয়া তাঁহারা সেদিন বলিয়াছিলেন, একমতাবলম্বী না হইলে একযোগে তাঁহাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নহে। আজ কৃপালনী যখন বলেন যে, কংগ্রেস কেন্দ্রীয় দপ্তরের কর্ণধার দলীয় মনোভাব-মুক্ত নহেন এই কারণে তিনি কংগ্রেসে থাকিতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহার অসহায় অবস্থা দেখিয়া যেমন দুঃখ হয়, তেমনি মনে হয় বিধাতা অলক্ষ্যে থাকিয়া পাপের কি কঠোর শাস্তি দিলেন। কংগ্রেসের বহু দুষ্কার্য্য ও দুর্নীতির পাণ্ডা কৃপালনীকে অবহেলা ও অপমানের ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া কংগ্রেস হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল, ইহা প্রকৃতির চরম প্রতিশোধ!

কংগ্রেসে বর্ত্তমানে নিষ্ঠাবান ও নিঃস্বার্থপরায়ণ লোকের থাকিবার উপায় নাই, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিতেছেন তাঁহারা নিজেদের সততা ও চরিত্রবলের প্রমাণ না দিলে দেশের লোকের আস্থা পাইবেন না। কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতি দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে, যাঁহারা উহার কর্ম্মনীতিতে বিশ্বাস করেন শুধু ঘরোয়া মনোমালিন্যের জন্য বিবাদ করিলে তাঁহারাও দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দল গঠন করিতে হইলে দলের জন্য এমন বলিষ্ঠ কর্ম্মপ্রণালী গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাহাতে দেশের লোক বুঝিতে পারে দুই দলের বিভিন্নতা কোথায়। আমি বেশী কংগ্রেসী এবং আমি বেশী সাধু ও গান্ধীভক্ত এই সব ফাঁকা বুলিতে লোককে ধাপ্পা দিবার দিন আর নাই। কংগ্রেসের ইকনমিক স্বরাজ আর কংগ্রেস-ত্যাগীদের শ্রমিক-প্রজা-রাজ উভয়েই সমান অর্থহীন হয়, যদি এক দল বিড়লা এবং অপর দল শ্রীরাম ও রাজা-মহারাজাদের উপর নির্ভর করিয়া ক্ষমতার রাজনীতি করেন। বিড়লার বিরুদ্ধে কথা বলিতে সঙ্কোচে যাঁহাদের জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যায়, রাজা মহারাজাদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য ওকালতি করিতে যাঁহাদের লজ্জা হয় না, তাঁহারা কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? রাজনীতিকে দাম্পত্য কলহের পর্য্যায়ে টানিয়া আনিলে পরিণামে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। কৃপালনী এখনও কংগ্রেসে আবার ঢুকিবার রাস্তা খোলা রাখিয়াছেন, বিভিন্ন প্রদেশে যাঁহাদের লইয়া তিনি দল করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেরই নিষ্ঠা বা সততা সম্বন্ধে সুনাম নাই, ইহাও তিনি নিজে জানেন। আবার তিনি বলিতেছেন যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াইবে তাহাকেই নির্ব্বিচারে তিনি দলে লুফিয়া লইবেন। ইহা নীতি-নিষ্ঠার পরিচয় নহে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না। পলিটিক্সেও ইহা ভুলা আমাদের উচিত নয়।"

—যুগবাণী।

পরীক্ষা আসন্ন

"বর্দ্ধমান জেলার অধিবাসীদের সম্মুখে কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে। মাত্র এক মাস পরে বর্দ্ধমান জেলাবোর্ড নির্ব্বাচন হইবে। জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়া কংগ্রেস আজ দেশের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছে। কংগ্রেসের হাতে শাসন-ক্ষমতা আসায় জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আশা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস দুর্নীতি-পরায়ণ ধনী, শিল্পপতিদের কুক্ষিগত হওয়ায় জনসাধারণ আজ কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারাইয়াছে। যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে অত্যাচারিত দুঃস্থ জনগণ একমাত্র বন্ধু বলিয়া মনে করিত আজ তাহাকে শত্রু বলিয়া মনে করে। কংগ্রেস আজ আর ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক নয় এবং বর্ত্তমান কংগ্রেসের নিকট হইতে আজ দেশের উপযোগী কোন প্রগতিশীল পরিবর্ত্তন আশা করা নিরর্থক। রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কংগ্রেস সরকার কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারেন নাই, উপরন্তু দল-পোষণ, আত্মীয়-পোষণ ও বে-পরোয়া দুর্নীতি পন্থা অবলম্বনে দেশের সকল সমস্যাকেই জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। ঐতিহ্যমণ্ডিত কংগ্রেসকে সংশোধনের জন্য বহু কংগ্রেসসেবী আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও যখন কোন আশা পাইলেন না, তখন তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়াই কংগ্রেস ছাড়িতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ভারতের বিশিষ্ট ও একনিষ্ঠ কংগ্রেসসেবীদের বৃহৎ অংশই আজ কংগ্রেসের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। তাই বর্ত্তমান কংগ্রেসের হাতে দেশ ও জাতি নিরাপদ নয়। এক্ষণে সমস্ত প্রগতিশীল ও জনসেবী প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মিগণ অগ্রসর হইয়া সমবেত ভাবে যদি দেশের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই একমাত্র দেশ রক্ষা পাইতে পারে এবং দেশের উন্নয়নও সম্ভবপর। আমরা তাই বার বার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের প্রতি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। একান্ত সুখের বিষয়, আমাদের আবেদন ব্যর্থ হয় নাই। আমাদের বর্দ্ধমানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলি একত্রিত হইয়া আগামী জেলাবোর্ড নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইতেছেন। বর্ত্তমান জনবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রার্থী দাঁড় করাইয়া দেশবাসীর সম্মুখে পরীক্ষার জন্য উপস্থিত করিতেছেন। কংগ্রেস শাসন যে দেশবাসীর জীবনকে দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে, কংগ্রেস-সমর্থিত দুর্নীতিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রথা যে দেশের দৈনন্দিন জীবনকে বিষময় করিয়াছে এবং খাদ্য থাকিতেও খাদ্য-সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়া জাতিকে অধঃপাতের পথে আগাইয়া দিয়াছে। ক্ষুধাতুর জনগণের উপর আজ কংগ্রেসী সরকার কথায়-কথায় বে-পরোয়া গুলী চালাইয়া হত্যাকাণ্ড সুরু করিয়াছে। চাষীর ক্ষুধার অন্ন মাটীর দরে কাড়িয়া লইয়া পল্লী অঞ্চলে অন্নাভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই কংগ্রেসী শাসনের তীব্র

প্রতিবাদ ও উপযুক্ত জবাব দিবার সুযোগ আসিয়াছে। জেলাবোর্ড নির্ব্বাচনে সেই কংগ্রেস পুনরায় নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাইতে লজ্জিত হয় নাই। চিরকালের প্রতিক্রিয়াশীলগণ আজ কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হইয়াছেন। প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী কংগ্রেস আজ কোন্ মুখ লইয়া আবার জনগণের ভোট হরণ করিতে যাইবেন তাহাই ভাবিতেছি। আজ 'সাধু-বেশে পাকা চোরের' দলকে কি সচেতন জেলাবাসী শিক্ষা দিবেন না? আজ তাঁহাদের সম্মুখে কঠোর পরীক্ষা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জেলাবাসী এই পরীক্ষায় সাফল্যজনক ভাবে উত্তীর্ণ হইবেন। জেলাবোর্ড নির্ব্বাচনে প্রতিটি কেন্দ্রেই কংগ্রেসপ্রার্থী যাহাতে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয় তাহার সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। আজিকার বিষময় কংগ্রেসকে বর্ত্তমান হইতে নির্ম্মূল করিতে হইবে।" —দামোদর।

—

অন্ন দাও! বস্ত্র দাও!

কাহারও অবস্থা স্বচ্ছল বুঝিতে হইলে আমরা বলিয়া থাকি, তাহার 'মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব নাই।' জীবন-যাত্রার মাণ নিরূপণে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানই প্রথম ও প্রধান। সারা ভারতে আজ এই দুইটিরই অভাব। আমাদের জীবন ধারণের মাণ আজ যে পর্য্যায়ে নামিয়া গিয়াছে—মন্ত্রীদিগের ভাষণে বা বিবৃতিতে আদর্শের বিবিধ ব্যাখ্যানের দ্বারা তাহার কোনও উন্নয়ন হইবে না। রোগের প্রতিকার করিতে হইলে উহার নিদান নির্ণয় করিতে হইবে। বাংলার আজিকার এই দুর্ভিক্ষাবস্থা (famine condition) কি সত্যই খাদ্য-শস্যের অভাব-জনিত? গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায়—এই বৎসর ১ কোটি ৭১ লক্ষ মণ আমন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে; আউস ও বোরোর পরিমাণ ১ কোটি ৬৫ লক্ষ মণের কম হইবে না। অর্থাৎ মোট চাউলের পরিমাণ ১১ কোটি ৩৬ লক্ষ মণ। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা গমের উৎপাদন এবার অনেক বেশী হইয়াছে। প্রদেশের বর্ত্তমান জনসংখ্যা ২ কোটি ৪৮ লক্ষ। প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ১১ কোটি ১৬ লক্ষ মণ। তবুও এই দেশব্যাপী অন্নাভাব কেন? ইহার কারণ কে নির্ণয় করিবে? গভর্ণমেণ্টের সংগ্রহণ নীতিই ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। যেখানে বাজারে অনায়াসে ২০৲/২২৲ দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারা যায়, directive দিয়া ১২৸০ আনা দরে চাউল সংগ্রহ করিতে গেলে জোতদার স্বভাবতঃই উৎপন্ন ফসল সরাইয়া রাখিবে ও মজুতদার পুঁজিপতি বাঁধাই করিয়া অধিক লাভের জন্য কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিবে। সংগ্রহণের দর ও বাজার-দরে কতকটা সমতা থাকিলে ও প্রদেশের মধ্যে ধান চাউল চলাচলের পথে বাধা দূর করিলে চাউলের দর একটা স্বাভাবিক অবস্থায় আপনিই আসিবে। বাহিরে রপ্তানি ও বাঁধাই গভর্ণমেণ্টকে অতি কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু সকলকে এক বেলা উপবাস করিয়া সঞ্চিত চাউল দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের এই পোড়া দেশে ২৭৲/৩০৲/৪০৲ টাকা দরে চাউল কিনিয়া কয় জন লোক দুই বেলা খাইতে পাইতেছে তাহার হিসাব কে রাখে? আমাদের খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীসেন বলিয়াছেন (Statesman, 4th May '51), চাউলের দুর্ম্মূল্যতায় খুব অল্প সংখ্যক লোকেই কষ্ট পাইতেছেন। ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের মধ্যে ২ কোটি লোক ১৬৲ হইতে ১৮৲ টাকার মধ্যে চাউল কিনিতে পাইতেছেন। এই অদ্ভুত সংবাদটি শ্রীসেন কোথা হইতে পাইলেন? শ্রীনেহরুর উক্তি ও শ্রীসেনের বিবৃতিতে মনে হয়, ক্ষমতার অধিকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে কি ভাবে বিকৃত করিতে পারে! এই সকল জন-নেতারা কি জনসাধারণের সহিত আর কোন সুযোগ রাখেন না?

এখন কাপড়ের কথা বলি। যেখানে ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত গড়ে মাসে ৫৮৪৩৬ বেল কাপড় নিয়ন্ত্রণাধীনে বণ্টনের জন্য দেওয়া হয়, সেখানে এপ্রিল মাসে ১০১৭৭৬ বেল দেওয়া হইয়াছে। সূতা ফেব্রুয়ারী মাসে ৪২৫৩২ বেল, মার্চ্চে ৫১০০০ বেল ও এপ্রিলে ৫৪০০০ বেল। উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও কাপড় তবে দুষ্প্রাপ্য কেন? গভর্ণমেণ্টের বণ্টন-ব্যবস্থায় কোথায়ও বিশেষ ত্রুটি রহিয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গজের অতিরিক্ত কাপড় উৎপাদন করিলে সেই কাপড় মিল-মালিকদিগকে বিক্রয় বা বাহিরে রপ্তানী করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ফলে মিল-মালিকেরা ৫।৭ হাত ধুতি কাপড় দ্বারা সংখ্যা পূরণ করিয়া দিতেছে। কাজেই ধুতি, সাড়ী বাজার হইতে উড়িয়া গিয়াছে। মিল-মালিকদের প্রমাণ ধুতি, সাড়ী উৎপাদনে বাধ্য করিতে হইবে। আর তুলার মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েক জন ব্যবসায়ীকে তুলা ক্রয়-বিক্রয়ের যে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সে-ব্যবস্থারও পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন।

—মুর্শিদাবাদ সমাচার।

—

চাউলের মূল্য

"পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এপ্রিল মাসে চাউলের দর কিরূপ ছিল, নিম্নে কয়েকটি স্থানের দর প্রদত্ত হইল।

স্থান—	২৫শে এপ্রিল	১৮ই এপ্রিল
বর্দ্ধমান সদর	১৮৲	১৮৲
আসানসোল	১৬৲	১৭৲
কাটোয়া	২১৲	২০।০
কাল্না	২৬।/০	২৬।০
বীরভূম	১৬৲	১৫৲
বাঁকুড়া	১৫৲	১৫৲
মেদিনীপুর দক্ষিণ	১৮৸০	১৬৸৵০
মেদিনীপুর উত্তর	১৫।৵০	১৫॥৵০
কাঁথি	১৪৲	১৩।০
তমলুক	২০৲	২০৲
নদীয়া	৩৫।০	৩২৲
কুচবিহার	৪২।০	৪৭।০
হুগলী	২৮৲	২৬।০
আরামবাগ	১৬৲	১৫।০
২৪ পরগণা	৩২।০	২৮।০"

—পল্লীবাসী।

আয়-ব্যয়

"কেন্দ্রীয় সরকার গত সপ্তাহে ১৯৪৮ সালের জাতীয় আয়ের একটা হিসাব বাহির করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, প্রত্যেক লোক-পিছু গড়ে ২৫৫ টাকা আয় হইয়াছে। ইহাতে আনন্দিত হইবার কিছুই নাই। বর্তমান ভারতে ৩৪ কোটি ১০ লক্ষ ৪০ হাজার লোকের বাস। তার মধ্যে ১৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৩১ হাজার লোক উপার্জনশীল।

গড়ে মাথা-পিছু ২৫৫ টাকা আয় হইলেও সমগ্র লোক-সংখ্যার মধ্যে বহু লোক বেকার, বহু লোক বৎসরে ১০।২০ হাজার টাকা উপার্জন করে। যাহারা বেশী উপার্জন করে তাহারা গড়ে আয়ের তুলনায় কেহ ব্যয় করে না। তাই যাহারা বেকার যাহারা সারা দিন খাটিয়াও পেট ভরিয়া আহার করিতে পায় নাই তাহারা তেমনই রহিয়া যাইবে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যূনপক্ষে ২৫৫ টাকা আয় হইত তাহা হইলে সত্যিকারের আনন্দ হইত। এখন মজুরের দল বেশী ভোগ করিবে, মজুরের দলে যেমন কম পড়ে তেমনই পড়িবে।"

—গ্রাম-সেবা।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন না, অর্থের ছিনিমিনি?

"ভারত ও বিশেষ করিয়া বঙ্গ ও পাঞ্জাব বিভাগের ফলে যে লক্ষ লক্ষ লোক নিজের পৈত্রিক বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে তাহাদের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকার মারফৎ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। জানি না এই বিরাট অর্থ ব্যয় কবে শেষ হইবে! অদূর ভবিষ্যতে ইহা হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বিভাগের পরে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গেলেও এই দীর্ঘ সময়ে এবং ঐ বিপুল অর্থে উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের কিছু হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। একমাত্র নিলোখেরী পদ্ধতিতে দিল্লীতে ও পশ্চিমবঙ্গের ফুলিয়ায় দুইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জনপদ গড়িয়া উঠিতেছে কিন্তু তাহা ভিন্ন আর স্থায়ী কাজ কিছুই হয় নাই। অর্থ যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহা হয় খয়রাতি দান আর না হয় ঋণ দানে ব্যয় হইয়াছে এবং কোথাও কোথাও উদ্বাস্তু জনপদ নির্মাণে যাহা ব্যয় হইয়াছে সে-সমস্ত জনপদ বাসোপযোগী হয় নাই এবং ঐ সমস্ত জনপদ চিরদিনের মত পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। তাহা যে কোন প্রকারে ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া অর্থ হাটে একরূপ ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে বলা চলে। রাজ্য সরকার সমূহ যদি পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতেন, দশটি নিলোখেরী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে পারিত, ২০টি চিনির কারখানা, কাপড়ের কল, বহু ছোটখাট শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিত এবং তাহাতে উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইত। টাকার যে বিরাট অঙ্ক খরচ হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহাতে ঐরূপ জনপদ ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা খুবই সহজ ছিল। কিন্তু পরিকল্পনা বিহীন ভাবে চলার ফলে অর্থ লইয়া ছিনিমিনিই খেলা হইয়াছে।"

—সংগঠনী।

শিক্ষক প্রতিনিধি

"আসন্ন নির্বাচনের তরণী পার হইবার জন্য আজ অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষক দরদী সাজিতেছেন। অথচ প্রাথমিক শিক্ষকদের দুঃসময়ে (সুসময় অবশ্য এখনও নহে) তাঁহারা কনিষ্ঠ অঙ্গুলিও হেলন করেন নাই। প্রাথমিক শিক্ষকগণ কোনরূপ রাজনৈতিক মতবাদে বিভ্রান্ত না হইয়া নির্বাচনে যাহাতে তাঁহাদের নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন তাহার জন্য সচেষ্ট হউন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৪ জন প্রতিনিধি পরিষদে পাঠাইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু যদি ১৫০০০ মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পরিষদে ৪ জন প্রতিনিধি দেওয়া সঙ্গত বিবেচিত হইয়া থাকে তবে ৩৬০০০ প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য অন্ততঃ ৮ জন প্রতিনিধিকে পরিষদে স্থান দেওয়া হইবে না কেন? শিক্ষার মূল ভিত্তিই যখন প্রাথমিক শিক্ষা তখন পরিষদে সেই মূল ভিত্তিকে কাটার ব্যবস্থা কেন হইবে? যদি সরকারের সত্যই দেশে শিক্ষার উন্নতি করার চেষ্টা থাকে তবে সর্ব্বাগ্রে প্রাথমিক শিক্ষকদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধির আসন পরিষদে বরাদ্দ করিতে হইবে। নতুবা গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়ার নীতিতে কোনো ফল হইবে না। প্রাথমিক শিক্ষকরা নিজস্ব প্রতিনিধি নিজেরা পরিষদে পাঠাইতে পারিলে তাঁহাদের পক্ষে কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভাঁওতায় পড়িবার সম্ভাবনা নাই এবং সে ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজস্ব প্রতিনিধির কাছে নিজস্ব সুখ-সুবিধার দাবী উপযুক্ত ভাবে করিতে পারেন এবং পরিষদেও তাহা উত্থাপিত করিতে পারেন।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া সরকার এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন করিবেন এই আশাই আমরা করি। এবং যাহাতে সরকার সেরূপ করিতে বাধ্য হন তজ্জন্য প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিদের তথা প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষককে উপযুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলম্বন করিতে হইবে—এবং সে জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি।"

—শিক্ষা ও কৃষি।

হিন্দু-মুসলমান মহাসভা?

"হিন্দুমহাসভা এক মজার কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছেন। ভারতের মুসলমানেরাও সভ্য হইতে পারিবেন বলিয়া ফতোয়া জারি করার ফলও হাতে-হাতে ফলিতে সুরু হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ৩৬ জন মুসলমান নেতা হিন্দু মহাসভার সভ্য হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ভারতে হিন্দুদের আস্থা অর্জ্জন করিবার জন্য শিক্ষিত মুসলমানগণ অতি সত্বর অধিক সংখ্যায় মহাসভায় যোগ দিবেন বলিয়া নূতন মুসলমান সভ্যগণ আশা প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেসের সহিত মহাসভার এখন তবে পার্থক্য রহিল কোন্‌খানে, তাহা কে বলিয়া দিবে?"

—পল্লীবাসী।

বক্সায় চালান?

"কুখ্যাত বক্সা বন্দিদুর্গের নির্বাসনে সম্প্রতি আবার রাজবন্দীদের পাঠান হচ্ছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেল থেকে দলে দলে ডেটিনিউকে প্রথম দমদম সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হচ্ছে, সেখান থেকে নিঃশব্দে

বন্দীদের বক্সা দুর্গে চালান দেওয়া চলেছে। ইতিমধ্যে দমদম থেকে প্রায় সত্তর জন ডেটেনিউকে বক্সাতে পাঠান হয়েছে, গত কয়েক দিনে আরও অধিক সংখ্যক বন্দী বক্সা দুর্গে পাঠানর পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে বলে জানা গেছে।" —জনসাধারণ।

পর্দ্দানসীনতার পুনঃপ্রচলন

"কয়েক দিন পূর্ব্বে ঢাকার একখানি ইংরেজী দৈনিকে পড়িলাম যে, উক্ত সহরের কয়েকটি মহল্লার দেওয়ালের গায়ে পোষ্টার লাগাইয়া মুসলমান মেয়েদের অন্তঃপুরের বাহিরে আসাকে বে-শরীয়তী বলিয়া নিন্দা করা হইতেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পৌছিয়া এরূপ কথা শুনিতে হইবে তাহা কল্পনা করি নাই। আমরা যখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন 'স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে কোন কোন শিক্ষক রচনা লিখিতে দিতেন। আজ কোন ছাত্রকে ঐরূপ রচনা লিখিতে কোন শিক্ষকই বলেন না, কারণ ঐরূপ রচনা লিখিবার প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়াছে এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কাহারও মনে আর জাগে না। যুগের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সব দেশে সব যুগে এমন এক দল লোকের সাক্ষাৎ পাই, যাহারা যুগ পরিবর্ত্তন ও যুগ-ধর্ম্মের লক্ষণ ধরিতে পারে না, বুঝিতে পারে না। চিন্তার জড়তা তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মুসলমান মেয়েদের ঘরের বাইরে আসা কি বে-শরীয়তী? অবরোধ-প্রথা কি শরিয়ত-সম্মত? ইতিহাস এ প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছে তাহা আমরা যাহা জানি তাহা বলিতেছি।

মুসলমানগণ ভারতে আসার সময় অবরোধ-প্রথাটা লইয়া আসে নাই, কারণ, তাহাদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা ছিল না। অনাবৃত দেহ সাধারণ পুরুষের চোখে না পড়ে, সে জন্ম মুসলমান নারী বোরখা পরিত। আরব, ইরাণ, মিশর, তুর্কী, কাবুল ইত্যাদি দেশের কুলকামিনীরা বোরখা পরিয়া প্রকাশ্য স্থানে যাইতে পারিত, প্রয়োজন মত সকলের সহিত কথা বলিত, মসজেদে পুরুষ ও নারী একত্রে নামাজ আদায় করিত,এ সব কথা ইতিহাসে লিখিত। * * *"

—বগুড়ার কথা।

সঙ্ঘ মানেই সাঙ্ঘাতিক?

"প্রকৃত কাজ—জনহিতসাধনের জন্ম দেশে কত প্রকার কমিটি, ক্লাব, সমিতি ও সঙ্ঘ আদি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যদি ঐগুলি প্রাণগত ইচ্ছা লইয়া জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অনেক প্রকৃত কাজ হইতে পারে। সম্প্রতি তমলুক সহরে চোরের উৎপাত প্রশমনকল্পে পুলিশ ও সহরবাসী একযোগে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় এবং রবীন্দ্র স্পোর্টিং ক্লাবের প্রায় ৪০ জন সভ্য অগ্রসর হইয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত সহরে রাত্রে পাহারাদি দেওয়ায় চোরের উৎপাত অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে, অধিকন্তু ঐ প্রকার তৎপরতার জন্ম দু'-একটি চোরাই মালের উদ্ধার হইয়াছে। রবীন্দ্র স্পোর্টিং ক্লাব এ জন্ম সহরবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমাদের কাঁথি সহরেও ঐ প্রকার কত ক্লাব, সমিতি ও কমিটি আদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐগুলি যদি কেবল বাক্যের দ্বারা কর্ত্তব্য শেষ না করিয়া ঐ প্রকার কার্য্যে উদ্যোগী হইতে পারে, তাহা হইলে ইহার সার্থকতার সঙ্গে সঙ্গে একটা জনকল্যাণও সাধন হইতে পারে। আজ কর্ম্মের যুগ উপস্থিত, এ সময় কোন কাজে অগ্রসর না হইয়া কেবল ধাপ্পাবাজীর দ্বারা নাম জাহির করিতে চাহিলে আর সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করা যাইবে না। এটি সব সময় সকলের স্মরণ রাখা উচিত।"

—নীহার।

গুপ্তচর বৃত্তি?

"বর্দ্ধমানের পুলিশ সুপার পুলিশ বিভাগের দুর্নীতি দূরীকরণের যে ভাবে চেষ্টা করিতেছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। পুলিশ বিভাগের দুর্নীতির বিষয় সর্বজনবিদিত। এই বিভাগটিকে দুর্নীতি-মুক্ত করিতে না পারিলে বিভাগটির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। রক্ষক হইয়া ভক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করায় এই অতি প্রয়োজনীয় সরকারী বিভাগটির উপর জনসাধারণ স্বতঃই ঘৃণা পোষণ করিয়া থাকে। সরকারী আরও কয়েকটি বিভাগ ঘুষের জন্ম জনসাধারণের নিন্দার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ঊর্দ্ধতন সরকারী কর্ম্মচারিগণ বর্দ্ধমানের পুলিশ সুপার শ্রীরণজিত গুপ্তের ন্যায় নিজ নিজ বিভাগ-গুলিকে দুর্নীতিমুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিলে সরকার ও সরকারী কর্ম্মচারিগণের উপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি হইবে। আমরা বর্দ্ধমানের পুলিশ সুপার মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার পরিচালনায় বর্দ্ধমানের পুলিশ বিভাগ দুর্নীতিমুক্ত হইয়া দেশের প্রকৃত রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হউক বলিয়া কামনা করিতেছি।"

—বর্দ্ধমান।

দল ও শত দল

সাধারণ নির্ব্বাচন যতই আগাইয়া আসিতেছে দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য দলাদলি রাজনীতির অতি গোড়ার কথা, কিন্তু তাই বলিয়া দেশ অপেক্ষা দল বড় নহে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ যেখানে সংশ্লিষ্ট সেখানে দল বা ব্যক্তির প্রশ্ন নিতান্ত তুচ্ছ। তাই মনে হয়, এই ভাবে অসংখ্য দলের সৃষ্টি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী। দেশের বৃহত্তর স্বার্থটি কি তাহাই আজ ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। দেশের অনেকে মনে করেন যে, দেশ ডুবিতে বসিয়াছে আবার অনেকের ধারণা, দেশের শ্রী ও সমৃদ্ধি দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধেও দেশবাসী একমত যে নহেন তাহাতে কোন ভুল নাই। যাহারা দেশের বর্ত্তমান সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া বলেন যে, দেশ যথাযথ ভাবে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের পথে চলিয়াছে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-সমূহের দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে আজ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা যে ভাবে বিপর্য্যস্ত হইতেছে তাহাতে দেশ কোন্ পথে চলিয়াছে তাহাও যাহারা দেখিতে পায় না তাহারা অন্ধ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমূহের প্রভাব হইতে মানুষের জীবনযাত্রাকে মুক্ত করিয়া তাহার স্বচ্ছন্দ গতি ফিরাইয়া আনিতে হইলে আজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন মানুষের সংস্পর্শে আসা এবং সত্যিকার অনুভূতি লইয়া মানুষের জন্য কাজ করা।

—ত্রিস্রোতা।

শোক-সংবাদ

মাসিক বসুমতীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ছাপার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় স্বর্গত বটকৃষ্ণ পালের সুযোগ্য পুত্র স্যর হরিশঙ্কর পাল মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইলাম। হরিশঙ্কর (বটকৃষ্ণ পালের তৃতীয় পুত্র) ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রাবস্থায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পিতার বিখ্যাত ঔষধ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ব্যবসার উন্নতির উদ্দেশ্যে ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। ব্যবসায়ী মহলে কোটিপতি হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করিবার পর তিনি জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে কলিকাতা কর্পোরেশনে যোগদান করেন এবং কলিকাতার দুই নম্বর ওয়ার্ড হইতে কাউন্সিলর নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উক্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর থাকেন। ১৯৩০ সালে তিনি স্যর উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৬-৩৭ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালে তিনি অবিভক্ত বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, কেমিষ্ট এণ্ড ড্রাগিষ্ট এসোসিয়েশন, বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং এবং অন্যান্য অনেকানেক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সদস্য হিসাবে হরিশঙ্কর স্বীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতার বহু ক্লাব ও সমিতির সভাপতি হিসাবেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হরিশঙ্করের ন্যায় ধার্ম্মিক, মিষ্টভাষী, সদালাপী, সরল, ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি অধুনা বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশের শিক্ষা প্রসারের জন্যও তিনি মুক্তহস্তে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার যোগ্য সহধর্ম্মিণী, দুই পুত্র, একমাত্র কন্যা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহরিমোহন পাল এবং বহু আত্মীয়-স্বজনকে রাখিয়া গিয়াছেন। হরিশঙ্করের পুত্রদ্বয় কমলকৃষ্ণ ও অমলকৃষ্ণ তাঁহাদের মধুর ব্যবহার এবং সরস চিত্তের জন্য অনেকের নিকট সুপরিচিত। আমরা হরিশঙ্করকে হারাইয়া আমাদের স্বজন-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। হরিশঙ্করের কীর্ত্তিই তাঁহাকে দেশবাসীর নিকট অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক, এই প্রার্থনা।

বাঙ্গালার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস ওয়াজেদ আলী গত ১০ই জুন ৪৮ নং ঝাউতলা রোডস্থ বাস-ভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। মিঃ ওয়াজেদ আলী ১৮৯০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে হুগলী জেলার বড়তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালে ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে অবসর গ্রহণ করেন। মিঃ ওয়াজেদ আলী বাঙ্গলা ও ইং[illegible]জী ভাষায় এক জন [illegible]ত লেখক। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তক বাঙ্গলা সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার "ভবিষ্যতের বাঙ্গালী" পু[illegible]খানি বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ ক[illegible]য়াছে। মিঃ ওয়াজেদ আলীর মৃত্যুতে বাঙ্গলায় এক জন সত্যিকারের সাহিত্যিকের অভাব হইল।

* * *

বিগত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ মাননীয় শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাসের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী ৫৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আকাশপোষ গ্রামের সুবিখ্যাত বসু-মল্লিক-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। চৌদ্দ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের সহিত সুহাসিনী দেবী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বামীর উচ্চ পদমর্য্যাদা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে কখনও গর্ব্বিতা বলিয়া মনে করেন নাই। ধর্ম্মকেই তিনি জীবনের একমাত্র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুহাসিনীর সংস্পর্শে যিনি আসেননি, তাঁর পক্ষে তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য, সরলতা ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। সাধুসঙ্গ তাঁহার প্রিয় ছিল।

এইরূপ আদর্শ হিন্দুনারী অধুনা বিরল, এ কথা বলিলে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুকালে তিনি শ্বশ্রূঠাকুরাণী, স্বামী, ছয় কন্যা ও দৌহিত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে জীবদ্দশায় তাঁহার অপর একটি কন্যা গত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি ও তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
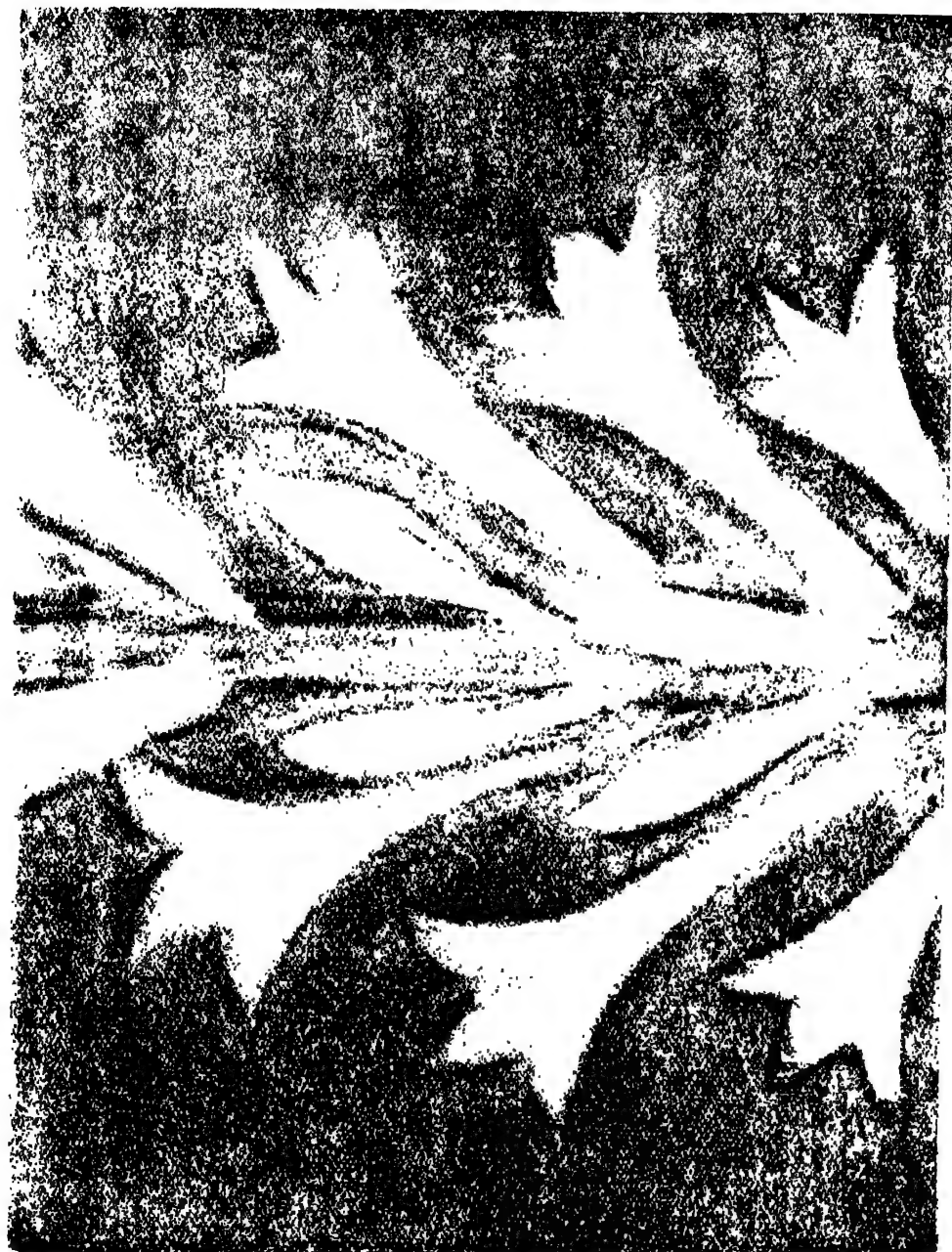
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

যুগবাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ। "সে দিন তোমায় (গিরীশকে) যা বল্লুম ভক্তির মানে কি—না কায়মনোবাক্যে তাঁর ভজনা। কায়,—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগুণ কীর্ত্তন শোনা; চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব-স্তুতি, তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন, এই সব করা।

কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্ব্বদা তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা-সকালে হাততালি দিয়ে একমনে হরিবোল-হরিবোল ব'লে তাঁর ভজনা করে।

ভক্তির আমিতে অহঙ্কার হয় না। অজ্ঞান করে না, বরং 'ঈশ্বর লাভ করে দেয়।' এ আমি আমির মধ্যে নয়। যেমন হিংচে শাক শাকের মধ্যে নয়; অন্য শাকে অসুখ হয়; কিন্তু হিংচে শাক খেলে পিত্তনাশ হয়, উল্‌টে উপকার হয়; মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়; অন্য মিষ্ট খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ করে।

নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হ'লে মহাভাব হয়। সর্ব্বশেষে প্রেম।

প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হ'লে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্য্যন্ত হয়। ঈশ্বরকোটী না হ'লে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।"

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চুয়াল্লিশ

'মন রে, চেয়ে ছাখ। দেখছিস ?'

বড় তক্তপোশটিতে বসে আছে রামকৃষ্ণ। এক-সঙ্গে লাগানো ছোট খাটটিতে শুয়ে আছে সারদা। শুয়ে আছে লজ্জায় জড়সড় হয়ে। আগাগোড়া গা ঢেকে। শুধু পদতল ছুটি অনাবৃত। পদ্মদলের মত পদতল। তাতে পদ্মরাগের আভা।

ঘরে দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। দরজায় খিল দেওয়া।

থমথম করছে নিশুতি মধ্যরাত। এটা বসন্ত কাল না ? "ঋতূণাং কুসুমাকরঃ"—সেই মধু-ঋতু না এখন ? দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গদগদ-গন্ধ ফুল ফুটেছে অনেক। গঙ্গার উপরে বাতাস মন্থর হয়ে এসেছে।

'ছাখ চোখ ভরে। দেখছিস ?'

ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলছে না একটা ? জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েনি ? দেখতে পাচ্ছিস না তোর অনুভূতির অন্তর্গূঢ় অন্ধকারে ?

'পাচ্ছি।'

'কী দেখছিস ?'

'একটি অমল ও অনুপম সৌন্দর্য। একটি অনাঘ্রাত কুসুম। একটি সর্বতোমুখী শ্রী।'

'চোখে কাব্যের অঞ্জন লাগিয়ে দেখতে হবে না। চেয়ে ছাখ চর্মচক্ষে। কী দেখছিস ?'

'একটি উদ্ভিন্নযৌবনা নারী। লাবণ্য-উর্মিলা স্রোতস্বতী।'

'শুধু তাই ?'

'স্বাস্থ্য সারল্য আর পবিত্রতার সমাবেশ। অস্পৃষ্ট, অনুপভুক্ত। বিরজ-বিশুদ্ধ বিশদ-বিশোক।'

'কে হয় বল দেখি তোর ?'

'স্ত্রী হয়। যার সম্বন্ধে কোনো নিষেধ নেই, নিবারণ নেই। বরং যার পক্ষে শাস্ত্র, যার পক্ষে সংসারসৃষ্টি।'

'সেই স্ত্রী আজ তোর নিভৃত শয্যায় এসে শুয়েছে। যে বেষ্টন করে দীপ্তি পায় সে-ই স্ত্রী। যাতে নতুন করে নিজেকে জন্মগ্রহণ করানো যায় সেই জায়া। চেয়ে ছাখ। সদ্য-প্রাণকরা স্ত্রী। এ সম্পূর্ণ তোর। তোর আয়ত্তের মধ্যে।'

'দেখছি। অনিন্দ্যকান্তি। অপরূপ-সুন্দর।'

'হ্যাঁ, একেই বলে স্ত্রী-শরীর।' রামকৃষ্ণ মনের কাছে আরো উন্মুক্ত হল। বললে, 'এরই নাম নারীমাংস। লোকে বলে এর চেয়ে ভোগ্য এর চেয়ে উপাদেয় কিছু আর নেই পৃথিবীতে। কি, আস্বাদ করবি ?'

'কিন্তু—' উন্মনা মন বিমনা হয়ে রইল।

'হ্যাঁ, তবে ঐ দেহেই যদি আবদ্ধ হয়ে থাকিস তবে আর সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে পাবি না। ছাখ বিবেচনা করে। নারী চাস না নারায়ণী চাস ?'

মন খুঁতখুঁত করে। তৃষ্ণার কুয়াশা সঞ্চিত হতে-না-হতেই জেগে ওঠে বৈরাগ্যের ত্বিষাম্পতি। বললে, 'কিন্তু কাম ভোগ করে কি কামের নিবৃত্তি হবে ?'

'তা হবে না। সেই জানিস না যযাতি কী বলেছিল ? পুত্রের যৌবন চেয়ে নিয়েও তার কামের উপশম হল না। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। যতই আহুতি ততই আকৃতি।'

'আর ঈশ্বরানন্দ ?'

'ঈশ্বরানন্দ। এখানেও যত পান তত পিপাসা। তফাৎ এই, ওখানে ক্ষয়, গ্লানি, ক্লান্তি, খেদ, অ... এখানে নিরংশ, নিরন্তর, নিরতিশয় আনন্দ। ... যা বলেছিল বিরজ-বিশোক, বিশদ-বিশুদ্ধ—'

'আমি ঈশ্বরানন্দ চাই।' মন মুখ ফেরাল।

'দেখিস, ভাবের ঘরে চুরি করিস নে। পেটে মুখে এক হ। মুখে বাহাদুরি মারবি আর পেটে খিদে থাকবে তা হতে পারবে না। যদি চ...

জাসুজি টেনে নে স্বচ্ছন্দে। তোর হাতের নাগালের মধ্যেই তো আছে। আছে তোর অধিকারের গণ্ডিতে। লুকোচুরির দরকার নেই।'

রম্য-রুচিরা শোভনা পুষ্পলতা। মন উসখুস করে উঠল। সারদার অঙ্গ স্পর্শ করবার জন্যে হাত বাড়াল রামকৃষ্ণ।

সেই উদ্যতিতেই মন বেঁকে বসল। ধীরে-ধীরে কোথায় ডুব দিল অতলে। লীন হয়ে গেল আত্ম-স্বরূপে। দেহমনোহীন অনাদ্যন্ত সচ্চিদানন্দে।

যে হৃদয়োৎসবরূপা সমানমনোরমা, সে কি এতই অল্প, এতই লঘু, এতই সহজলভ্য? তাকে আমি কী মূল্য দিলাম, তার পরীক্ষা হবে কিসে? তাকে আমি কোথায় এনে প্রতিষ্ঠিত করলাম—তাতে। তার মূল্যেই আমি মূল্যবান। তার মহত্ত্বেই আমি মহনীয়।

ধড়মড় করে উঠে বসল সারদা। কে যেন তাকে তুলে দিলে জোর করে।

এ কি! তিনি এখনো শোননি? বিছানার উপরে ঠায় বসে আছেন? বসে আছেন নিশ্চল, নিঃসংজ্ঞ হয়ে। রাত এখন কটা হল না-জানি! কতক্ষণ এমনি বসে থাকবেন! ভোর হতে বাকি কত?

এমন ভাবারূঢ় কূটস্থ মূর্তি আর দেখেনি সারদা। তার ভয় করতে লাগল। জ্যোতিঃপুঞ্জময় দিব্যমূর্তি স্পর্শ করতে তার সাহস হয় না। কিন্তু কি করে এই ভাব ভাঙাবে রামকৃষ্ণের। কি করে নিয়ে আসবে তাকে তার স্বচ্ছ স্বাভাবিকতায়? এমনি বসে থেকে-থেকেই চলে যাবেন নাকি অনন্তকালে?

ব্যস্ত হয়ে ঘরের বার হল সারদা। ঝি কালীর মাকে কাছেই পাওয়া গেল। আকুল হয়ে বললে, 'শিগগির ভাগ্নেকে ডেকে আনো। উনি যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন।'

কালীর মা গিয়ে ডাকাডাকি করে তুললে হৃদয়কে।

কেমন আর হবেন! ভাবের ঘরে বাস করেন, ভাবের ঘোরে ভব হয়ে গিয়েছেন। নিজে ভবানী হয়ে এত ভাবিনী হবার কি দরকার!

হৃদয় গিয়ে রামকৃষ্ণকে নাম শোনাতে বসল।

যে নামে টান, সেই নামে জ্ঞান। আবার সেই নামেই পরিত্রাণ।

'আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখি, গাও না রে,
ব্রহ্মকল্পতরুশাখে বসে রে পাখি, বিভু গুণগান
গাও দেখি,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সুপক্ক ফল খাও না রে।'

কাশীপুরের মহিমাচরণ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভক্ত। কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানই সব পণ্ড করেছে। ভক্তির চেয়ে শাস্ত্রের প্রতি বেশি পক্ষপাত। খুব পড়া-শোনা করেছে এমনি একটা ভাব দেখাতে সদা-ব্যস্ত। ইংরিজি আর সংস্কৃত বুকনি সর্বদা তার মুখে ফুটছে। শব্দাড়ম্বরের প্রতি তার মুগ্ধ দৃষ্টি। সে এক ইস্কুল করেছে, তার নাম প্রাচ্য-আর্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষৎ। তার ছেলের নাম রেখেছে মৃগাঙ্কমৌলি পতিতুণ্ডি। হরিণের নাম রেখেছে কপিঞ্জল। আর তার গুরুর নাম আগমাচার্য ডমরুবল্লভ।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে আসতে ঠাকুর বলে উঠলেন: 'এ কি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! এখানে ছোটখাটো ডিঙি-টিঙি আসতে পারে। এ যে একেবারে জাহাজ!'

এ শুধু তার পণ্ডিতম্মন্যতার প্রতি কটাক্ষ। সকলে হেসে উঠলেও মহিমাচরণ হয়তো খুশিই হল। সে নৌকো নয়, সে জাহাজ।

এ জাহাজকে সহজ করে দিতে চাইলেন ঠাকুর। বললেন, নাম করো। নাম করলে অহঙ্কার দূরে যাবে। পাণ্ডিত্যের বাইরে সুধাভাণ্ডটিকে দেখতে পাবে তখন।

গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষ পরে একেক দিন চলে আসে মহিমাচরণ। বাঘের ছাল পেতে বসে পঞ্চবটীতে। রুদ্রাক্ষের মালা ফিরিয়ে জপ করে। কখনো একটা তানপুরা নিয়ে গান গায়। যেন কত বড় এক জন তন্ময় সাধক।

বাড়ি যাবার আগে বাঘের ছালটি ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে।

'এ কেন রাখে জানিস? দেখলেই লোকে জিগগেস করবে এ বাঘের ছাল আবার কার। তখন আমি বলব, মহিমাচরণের, আর তাতেই ওর মান বাড়বে।'

কেবল নিজের নাম, নিজের মান। ওরে, তাঁর নাম কর। তাঁর মান রাখ।

তাঁর নামেই বন্ধন মোচন হবে। বটের বীজ দেখেছিস? লাল শাকের বীজের চেয়েও ছোট।

তা, ভগবানের নামের বীজ কতটুকু ? হয় একটি অক্ষর নয় দুটি অক্ষর। তা থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম—কত কি !

সেই নামের মন্ত্রই দিলেন মহিমাচরণকে। সহজ হবার সহজ নিয়ম। মুক্ত হবার সরল সূক্ত।

'শুধু এগিয়ে পড়ো। আরো এগোও। পাবে চন্দন কাঠ, কিন্তু ওখানে থামলে চলবে না, আরো এগোও। পাবে রূপোর খনি, থামলে চলবে না, আরো এগোও। তার পরে, সোনার খনি, পাবে হীরে-মানিকের খনি—তবু থামা নেই। এগিয়ে পড়ো। এহ বাহ্য, আগে কহ আর—'

মহিমাচরণ কাতর স্বরে বললে, 'আজ্ঞে, টেনে রাখে যে। এগুতে দেয় না।'

'কেন, লাগাম কাটো ঘোড়া ছুটিয়ে দাও।'

'কি ভাবে কাটব ?'

'শুধু তাঁর নামের গুণে কাটো। কালীর নামে যে কালপাশ কাটে।'

আর কিছু নয়, শুধু তাঁর নাম করো। একটু স্থির হয়ে বসে তাঁকে স্মরণ করো, আহ্বান করো।

যে নাম-দাতা সেই আবার নাম-শ্রোতা। হৃদয় নাম শোনাতে লাগল।

ভাবভূমি থেকে সারা রাত আর নামল না রামকৃষ্ণ। নামধ্বনিতে সমাধি ভাঙল শেষকালে। প্রভাতের সীমানায় এসে।

সারদাকে কাছে ডেকে নিল রামকৃষ্ণ।

'একা-একা ঘরে আমাকে অমনি কাঠ হয়ে বসে থাকতে দেখে তোমার খুব ভয় করছিল, না ?'

তা আর বিচিত্র কি। কোথায় শান্তিতে একটু ঘুমুবে, তা নয়, তোমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আসলে ভয় নয়, আসলে আনন্দ।

'শোনো, আরো অনেক রকম হয়তো ভাব হবে রাত্রে। ভয় পাবে না। কোন ভাবে কোন মন্ত্র শুনিয়ে আমার জ্ঞান আনতে হবে তোমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছি।'

সারদা যেন ভরসা পেল।

কিন্তু, জানো, ভাব ছাড়া লাভ নেই। 'সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ? হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।'

আমি লোহা, তিনি চুম্বক। তিনিই আমাকে ধরেছেন। মর্ত্যশয়ন থেকে নিয়ে যাচ্ছেন সেই অনন্তশয়নে। যেখানে অনন্তনাগের উপরে বিষ্ণু শয়ান।

পঁয়তাল্লিশ

শুধু প্রথম রাত্রি নয়, প্রতি রাত্রি।

ঘোমটাতে মুখখানি ঢেকে সর্বাঙ্গে কুণ্ঠিত হয়ে নিঃশব্দে শুয়ে থাকে সারদা। শুয়ে থাকে তরলিত সরলতায়। সমর্পিত প্রশান্তিতে। স্পৃহা নেই প্রতিবাদ নেই, প্রতীক্ষা করে আছে ধৈর্যের মত, তিতিক্ষার মত। তপস্যার মত।

নিদ্রাহীন নিশীথ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। শোনা যাচ্ছে গঙ্গার কলস্বর।

হাত বাড়িয়ে ধরলেই হয়। টেনে নিলেই হয় আলিঙ্গনে। বৃন্ত থেকে কুসুমচয়নে এতটুকু কণ্টক নেই। স্নানাবতরণে নেই এতটুকু পদস্খলন।

কিন্তু আমি তো জৈব প্রয়োজনে নয়, আমি দৈব প্রয়োজনে। আমি ষোল আনা করলে মানুষে যদি এক পয়সা করে।

তাই বলে গোঁ ধরে কিছু করে না। করে না কোনো অন্ধ একরোকোমি। সদসৎ বিবেচনা ক'রে করে। সারাক্ষণ মনের সঙ্গে চলে কঠিন বোঝা-পড়া। চলে জটিল বাদানুবাদ, সূক্ষ্ম বিচারমীমাংসা। মনকে সম্পূর্ণ ছুটি দেয়, নিষ্ঠুর হাতে তার টুঁটি টিপে ধরে না। বল না কি বলবি, যা না কোথায় যাবি, নে না যা তুই চাস। কিন্তু তার আগে আমার পাশে বোস একটু শান্ত হয়ে। আমার সঙ্গে দুটো কথা ক। গোঁয়ারের মতন অমন গোঁজ হয়ে থাকিস নে। স্ফূর্তি করে তর্ক কর আমার সঙ্গে। মামলায় যদি তুই জিতিস আমাকে তুই বেঁধে নিয়ে যাস জেলখানায়।

জানি, তুই কি বলবি। কিন্তু কত দিন ধরে করতে পারবি এই দেহস্তব, তাই শুধু আমাকে বল। লতাপাতাঘেরা শান্তশীতল মাটির কুটিরে যে যেতে চাস তার মাধুর্য কি আমি জানি না ? কিন্তু তার চেয়ে—তাকিয়ে ছ্যাখ দেখি এই রাত্রির আকাশের দিকে, এই অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের দিকে,—এই মহা-মৌনের মধ্যে ঈশ্বরের মন্দিরটি কি বেশি রমণীয়, বেশি মোহনীয় নয় ? আর কী তুই চাস এই শ্মশান-নাট্যের রঙ্গশালায় ? যুবতীর চর্ম-মাংস-রক্ত-বাষ্প ?

যোগবাশিষ্ঠ পড়িসনি? রামচন্দ্র কী বলছেন? বলছেন, যুবতীর চর্ম-মাংস-রক্ত-বাষ্প যদি আলাদা-আলাদা করে রেখে সৌন্দর্য দেখতে পাও, তবে দেখ তাই এক দৃষ্টে। নইলে মিছে আর কেন মুগ্ধ হওয়া?

জোয়ারের জলের মতন এই যৌবন। অল্পোচ্ছ্বসিত, অচিরস্থায়ী। কিন্তু ভুবনব্যাপী এই ঈশ্বরসিন্ধু। এ চিরকাল সমানস্রোত, অচ্ছিন্নপ্রবাহ। বল, স্নানের জন্যে কোন ঘাটে তুই অবতরণ করবি?

তোর উপরে আমি জোর খাটাতে চাই না। তুই জাগ্রত, বুদ্ধিমান, কুশাগ্রতীক্ষ্ণ। তুই নিজেই হিসেব করে ছাখ। ক্ষয়দ্বারে যাবি, না, কি যাবি অক্ষয় মন্দিরে?

বুদ্ধদেবের সংসারত্যাগের আগে কতগুলি সুন্দরী যুবতী এসেছিল তাঁকে প্রলুব্ধ করতে, প্রতিনিবৃত্ত করতে। দীর্ঘ রাত প্রমোদোৎসবে মাতামাতি করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। তাদের দিকে তাকালেন বুদ্ধদেব। নিদ্রার বিকৃতিতে কী কুৎসিত দেখাচ্ছে মেয়েগুলোকে। বুদ্ধদেব দেখলেন এ তো শ্মশান, এখানে আবার প্রমোদলীলা কোথায়!

মন, তাই বলি, তুই কি এক বেলার কাঙালী-ভোজনে যাবি, না, যাবি চিরন্তন অমৃতের নিমন্ত্রণে?

ভিক্ষু মহাতিস্‌স পর্বতচূড়ায় বসে তপস্যা করেন। পাহাড় থেকে নেমে সেদিন চলেছেন অনুরাধাপুর গ্রামের দিকে। সেই গ্রামের এক সুন্দরী যুবতী স্বামীত্যাগ করে সেদিন পথে বেরিয়েছে। সহসা দেখা হল সেই সৌম্যদর্শন ভিক্ষুর সঙ্গে। যুবতী বিলোল কটাক্ষ করে মদির অধরে হেসে উঠল। ভিক্ষু তাকালেন তাঁর দিকে। দেখলেন বিকশিত মল্লিকার মত সুন্দর দন্তপঙ্‌ক্তি। কিন্তু মনে হল যেন কঙ্কালের হাসি। এক অস্থিসার কঙ্কাল তাঁর দিকে চেয়ে বিকটবদনে হাসছে।

কিছুক্ষণ পরে সেই যুবতীর স্বামীর সঙ্গে দেখা। স্বামী জিগগেস করলে, 'এই পথে কোনো নারীকে আপনি দেখেছেন?'

'নারী?' ভিক্ষু উদাসীনের মত বললেন, 'নারী না পুরুষ বলতে পারব না। দেখলাম একটা কঙ্কাল হেঁটে যাচ্ছে।'

মন, বল, নারীকে কঙ্কালে নিয়ে যাবি, না, তাকে মনোময়ী প্রতিমা করে বসাবি হৃদয়ের পদ্মাসনে?

যুবতীর মাথার খুলিটি একবার কল্পনা কর। সেই তো তোর মহামোহের ফাঁদ। কিন্তু সেই যে মুখারবিন্দ সে এখন কোথায়? কোথায় সেই অধরমধু? কোথায় সেই আয়ত কুটিল কটাক্ষ? কোথায় সেই দন্তরুচিকৌমুদী? কোথায় বা সেই মঞ্জুগুঞ্জ আলাপন? কোথায় বা সেই মদনধনুর মত ভঙ্গুর ভ্রূবিলাস? এই করোটির বাটিতে তুই আর কী মদিরা পান করবি?

মন, শোন, একটু অমৃত-মদ খাবি? পাত্র খুঁজছিস? খুরি-খুলি লাগবে না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই সেই অমৃতের ভাণ্ড।

রামকৃষ্ণ আবার সমাধিতে বিলীন হল।

নিস্তব্ধতারও বুঝি ডাক আছে। সেই মৌনের ডাকে জেগে উঠল সারদা।

দেখল যেন কর্পূরগৌর মহাদেব বসে আছেন। পর্বতের মধ্যে মহামেরু, সরোবরের মধ্যে মহাসাগর।

তুমি সর্বধাত্রী ধরিত্রী। আমি ঋত, সত্য, ধৈর্য, শ্রেয়, শৌচ, সন্তোষ। তুমি দয়া ক্ষমা নীতি কান্তি লজ্জা সহিষ্ণুতা। আমি বিগত-বিষয়-রস-রাগ। তুমি সর্বরাগস্বরূপিণী।

তুমি দিব্যাম্বরা, আর আমি দিগম্বর।

ঠিক-ঠিক নামটি মনে আছে সারদার। এই ভাবে কোন মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাই সে নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করতে লাগল। সেই উচ্চারণে মিশল এসে তার ধৈর্যের মাধুর্য, তার সম্মতির স্নিগ্ধতা।

তুমি স্মৃতি তুমি মেধা তুমি বাক্য।

আমি উপলব্ধি আর তুমি উচ্চারণ।

সমাধি ভাঙল রামকৃষ্ণের। ঘোমটা সরিয়ে পরিপূর্ণ চোখে দেখছিল বুঝি সারদা। রামকৃষ্ণের ধ্যান ভাঙতেই ত্রস্ত হাতে মুখের উপর আবার ঘোমটা টেনে দিলে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'এবার তুমি একটু শোও। রাত পোহাতে এখনো খানিক দেরি আছে।'

কিন্তু এমনি করেই কি কাটবে রাতের পর রাত?

কে একজন স্ত্রীলোক ধরে বসল সারদাকে। তুই কি হ্যাকা না বোকা?

'কেন, কী হয়েছে?' সারদা অবাক হয়ে রইল।

'তুই কি ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানিস না?' স্ত্রীলোকটি আবার বিদ্রূপ করে উঠল: 'গাঁয়ের মেয়ে

বলে কি তুই এমনি আহাম্মক হবি? গাঁয়ের মেয়ে কি আর বিয়ে করে না? স্বামী নিয়ে ঘরসংসার করে না? তাদের ছেলেপুলে হয় না?'

'তা, আমি কী করলাম।'

'তুমি হাঁদী, তুমি আবার কী করবে? বলি, তোর স্বামীকে কি তুই ভেসে যেতে দিবি? সংসারে তার মন নেই, সে মন তুই জাগিয়ে দিবি নে? ভোগের দিকে তাকে টেনে আনবি নে? তোর কপাল তুই চিবিয়ে খাবি? ধর্মপত্নী হয়ে এমন অধর্ম ঘটাবি তুই?'

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল সারদা। অধর্ম। তার ঠাকুর তাকে দিয়ে অধর্মের অভিনয় করিয়ে নিচ্ছেন?

'তা ছাড়া আবার কি? তোকে বিয়ে করেছে অথচ তোকে তোর সংসারধর্ম করতে দিচ্ছে না, এ তো ঘোরতর অধর্ম। তুই স্ত্রী হয়েছিস, তুই এবার মা হবি নে? তুই তোর পাওনা-গণ্ডা ছাড়বি কেন? স্বামীর কাছ থেকে আদায় করে নিবি ষোল আনা। বলবি গিয়ে সোজাসুজি—আমি সন্তান চাই। আমি মা হব।'

সরলতার প্রতিমূর্তি সারদা।

রামকৃষ্ণকে সেই রাত্রে বললে তাই সে স্পষ্ট করে। ঘোমটা-ঢাকা মুখের মধ্য থেকে কেমন অদ্ভুত শোনাল কথাগুলি।

'সবাই বলছে, আমার একটাও ছেলেপুলে হবে নি? বিয়ে হয়েছে আমার, তা নইলে সংসারধর্ম বজায় থাকবে কিসে?'

কথা শুনে চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। সারদার মুখে এ কী কথা!

সারদা উপযাচিকা হয়ে পা টিপতে লাগল রামকৃষ্ণের। ছোট খাটটিতে তার শোবার কথা, বড় তক্তপোশটিতে এসে বসল।

মহামায়ার চাতুরী বুঝতে পেরেছে রামকৃষ্ণ। সে হাসল মনে-মনে। মন্দিরের ভবতারিণীকে উদ্দেশ করে বললে, 'তোর চালাকি ধরতে পেরেছি। তুই এত দিন নিজের মূর্তিতে এখানে ছিলি, আজ তোর কী খেয়াল হল, স্ত্রীর মূর্তি ধরে এলি আমার কাছে। তুই যদি তাই আসতে পারিস আয় আমার কাছে। তুই আসতে পারলে আমার ভয় কী।'

সারদা আড়ষ্ট হয়ে রইল। চকিতে কেমন যেন হয়ে গেল আরেক রকম।

রামকৃষ্ণ বললে, 'তুমি মা হতে চাও? তা মোটে একটি ছেলে খুঁজছ কি গো? দেশ-দেশান্তর থেকে তোমার কত ছেলে আসবে, সব মাতৃমন্ত্রে মাতোয়ারা। তুমি যে তখন মা-ডাকে তিষ্ঠোতে পারবে না।'

সারদার মুখে আর কথা নেই। দেহে আর দেহবোধ নেই।

ঠিকই হয়েছে। মহামায়া ঠিক ভাবটিই এনে দিয়েছেন তোমার মধ্যে। তুমি জীবের জননী হবে। যে বিশ্বজনের জননী হবে তার মধ্যে এই সন্তান-কামনাটি না এলে চলবে কেন? তোমার তো এ শুধু দেহসুখের ছলনা নয়, তোমার এ শুধু মাতৃত্ব-ভাতি। ঈশ্বরের এই সংসারে, এই পরমানন্দের মন্দিরে, তুমি লীলালাবণ্যকল্যাণী শ্রীমতী মাতা।

সারদা সরে গেল নিজের খাটে। আত্মানন্দে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতের পর রাত চলতে লাগল এই রতিহীন বিরতির পরীক্ষা। এই বিরতি দিয়ে ঈশ্বরের আরতি।

একেই বলে সহজ-অটুট অবস্থা। সহজ, কেননা স্বস্থানে নিয়তস্থিত; আর অটুট, কেননা ব্রহ্মচর্য থেকে বিচ্যুতি নেই এই এক বিন্দু।

এ হচ্ছে সেই অবস্থা—'রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।'

ঈশ্বর দর্শন হলে রমণ-সুখের কোটি গুণ আনন্দ হয়। গৌরীচরণ বলত, মহাভাব হলে শরীরের রোমকূপ পর্যন্ত মহাযোনি হয়ে যায়। একেকটি রোমকূপে আত্মার সহিত মহারমণ হয়!

পতঞ্জলি বলেছে, ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠাতেই বীর্য লাভ। যার বীর্য আছে তারই ভক্তি আছে। যার বীর্য আছে তারই আছে বজ্রবন্ধন। তারই আছে অনন্য-চিত্ততা।

রামকৃষ্ণ উত্তীর্ণ হল সেই বীর্যের পরীক্ষায়। সেই স্থৈর্যের পরীক্ষায়।

"রাঁধুনি হইবি ব্যঞ্জন রাঁধিবি হাঁড়ি না ছুঁইবি তায়,
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি সাপ না গিলিবে
তায়।
অমিয় সাগরে সিনান করিবি কেশ না ভিজিবে তায়॥"

উত্তীর্ণ হলেন সেই নির্বিকল্পের সাধনায়।

তুমি বীর্যবতী বিদ্যা। তুমি বলবতী মেধা। তুমি ধারণাবতী স্মৃতি।

সারদাকে ডেকে তুলল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তোমাকে আবার সেই কথা জিগগেস করছি, সারদা! তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে চাও?'

'না।' সারদা বললে, 'তোমাকে তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে চাই।'

'বেশ।' তৃপ্তির প্রসাদে বুক ভরে গেল রামকৃষ্ণের। বললে, 'এবার তবে ঘুমোও নিশ্চিন্ত হয়ে।'

কতক্ষণ পরে আবার ডেকে তুলল সারদাকে। বললে, 'সত্যি করে বলো তো, তোমার কী মনে হয়, আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি?'

'না, তা কেন মনে হবে? আমাকে তুমি গ্রহণ করেছ।' শান্ত সমর্পণে ঘুমুল সারদা। এ অর্পণ কে বলে? এ অর্চনা।

রামকৃষ্ণ বললে, তুমি বাণী। তুমি করুণা। তুমি আমার নামস্বাদময়ী ভিক্ষা।

যোগেন-মা বড়লোকের ঘরের বউ, কিন্তু সংসারের জ্বালায় বড় জ্বলছে। তাপহরণের খবর পেয়ে সটান চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণ তাকে স্থান দিলে। বললে, সারদার কাছে যাও। শান্তির স্পর্শটি ওর কাছে।

দুদিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল যোগেন-মা। যেখানে একনিষ্ঠ সেখানেই ঘনিষ্ঠ।

তার কাছে সারদা আক্ষেপ করল, 'ওঁর কেমন ভাব হয় দেখলে!

'দেখলুম।'

'আমার ইচ্ছে হয় আমারো এমনি ভাব হোক। তুমি ওঁকে গিয়ে একটু বলবে?'

'কি বলব?' যোগেন-মা তো অবাক।

'যাতে আমাকে একটু ভাব-টাব দেন। আমার নিজের বলতে বড় লজ্জা করে।'

একা তক্তপোশে বসে আছে রামকৃষ্ণ, যোগেন-মা প্রণাম করে দাঁড়াল এক পাশে। সারদা কি বলেছে বললে সরলের মত।

রামকৃষ্ণ কথা বলল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

নহবতে ফিরে এল যোগেন-মা। দেখল সারদা পূজায় বসেছে। সন্তর্পণে দরজাটা একটু ফাঁক করল। দেখল আপন মনে হাসছে সারদা। কতক্ষণ পরেই আবার দরবিগলিতধারে কান্না! কতক্ষণ পরে একেবারে সমাধিস্থা।

'তবে না তোমার নাকি ভাব হয় না?' সমাধি-শেষে সানন্দ কণ্ঠে প্রশ্ন করল যোগেন-মা।

সলজ্জ মুখে হাসল একটু সারদা। বললে, 'কি জানি যোগেন, কেমনতর হয়ে গেল। একটা মহানন্দের মধ্যে গিয়ে পড়লুম। তাঁর ভাবের ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তিনি আমার চর্মস্পর্শ করেননি বটে, কিন্তু তিনি যে আমার মর্মস্পর্শ করেছেন।'

তুমিই নিতে পারবে আমার ভাব। তুমিই ভবভয়শমনী সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রী।

ছেচল্লিশ

আর আমাকে ছলনা করিস নে মা। আমি তো কামজয় করেছি, কিন্তু ওর মধ্যে কামভাব আনিস নে।

আকুল হয়ে প্রার্থনা করে রামকৃষ্ণ। ও যদি কামময়ী কামিনী হয়ে ওঠে, তা হলে, কে জানে আমার এই তেজ-বীর্য ধুয়ে যাবে কি না। কে জানে, সংযমের বাঁধ ভেঙে জাগবে কি না দেহবুদ্ধি।

তাই মা, আমি তোর দুয়ার ধরে পড়ে আছি, আমাকে কৃপা কর। সারদাকে তুই সারভূতা করে দে। আমি যদি মা প্রেম, সারদা পবিত্রতা!

সংসাররঙ্গমঞ্চে এ কী অদ্ভুত প্রার্থনা। নবীন-যৌবনা স্ত্রীকে সামনে রেখে এক জন সমর্থ-সুস্থ বীর্যবান যুবকের অসাধারণ আরাধনা! আমার স্ত্রীকে কামমোহিনী করিস নে, কালমোহিনী করে দে।

আমি আর কিছু চিনি না। আমি শুধু তোকে চিনি। 'আমার মা আছেন আর আমি আছি।' আমাকে কে টলায়? 'ঝড়ে গাছ নড়ে যত, তরু বদ্ধমূল তত।'

মা কৃপা করলেন। ধরা দিলেন সেই ঘরে এসে। ধরা দিলেন সারদার মধ্যে।

লবকুশ হনূমানকে খুব কষে বাঁধলে দড়ি দিয়ে। ছোট্টটি হয়ে হনূমান বাঁধন নিলে সর্বাঙ্গে। দেখে লবকুশের মহাখুশি! মহাবীর ধরা পড়েছে।

তখন হনূমান বললে:

'ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?'

কৃপা করে মা-ই ধরা দিয়েছেন। করালেনও তিনি, পাওয়ালেনও তিনি। তিনিই সারদার মধ্যে দেখালেন জগদীশ্বরীকে।

আট মাস এক শয্যায় রাত কাটাল দুজনে। সে এক বিচিত্র সাধনা। শবসাধনার চেয়ে ভীষণতরো কঠিনতরো সাধনা—এই সজীব সাধনা। আগুন যত জ্বলে ঘি তত জমাট হয়। সূর্য যত জ্বলে তত সংহত হয় তুষার। চন্দ্র যত পূর্ণ হয় তত শান্ত হয় সমুদ্র। এ এক অভিনব সাধনা। শবসাধনা নয়, নব সাধনা।

'আমার অন্তরে আনন্দময়ী
সদা করিতেছেন কেলি,
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি
নামটি কভু নাহি ভুলি।
আবার দু' আঁখি মুদিলে দেখি
অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥'

সাধন শেষে রামকৃষ্ণ ঠিক করল সমারোহে একবার কালীপূজো করব। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা—১২৮০ সাল—ফলাহারিণী কালীপূজোর দিন। সেই দিনটিই প্রশস্ত।

কিন্তু কালীপূজো মন্দিরে হবে না। কালীর যে 'গুপ্ত ভাবে আপ্তলীলা।' তাই তার পুজোও হবে গুপ্ত ভাবে। রামকৃষ্ণের নিজের ঘরে।

পূজা হবে স্ত্রীর। ষোড়শীরূপিণী সারদার।

'মা বিরাজে ঘরে ঘরে
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।'

মন্দিরে জাঁকজমক করে মামুলি পুজো হচ্ছে। সে পূজোর পূজারি হৃদয়। তাই নিয়ে সে শশব্যস্ত। রামকৃষ্ণ বললে, 'এ দিকে একটু দৃষ্টি রাখিস।'

ঠিক আছে। সব জোগাড়যন্ত্র করে দিয়েছে হৃদয়। দীনু বলে একটি ছেলে, জ্ঞাতিসম্পর্কে ভাই-পো হয়, রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পূজো করে, ফুল-বেলপাতা জোগাড় করে আনলে। জিগগেস করলে, এ কেমনতরো পূজা?

রামকৃষ্ণ বললে, 'এ রহস্যপূজা।'

রাত নটা। কালীবাড়িতে নানা গান-বাজনা হচ্ছে, সর্বত্র হৈ-রৈ। রামকৃষ্ণের ঘর বন্ধ। রামকৃষ্ণ অনুপস্থিত।

তার খোঁজ আর কে নেয়।

সারদাকে বলা ছিল আগের থেকে। যেমন-কে-তেমন সাধারণ বেশে মুখে ঘোমটা টেনে রাত নটার সময় ঠিক এসে ভেজানো দরজায় ঘা দিলে। রামকৃষ্ণ তাকে এনে বসাল পিঁড়ির উপর।

পিঁড়ির উপরে আলপনা-আঁকা। সামনে-পাশে পূজার সমস্ত উপকরণ সাজানো।

রামকৃষ্ণ বললে, 'বোসো। পশ্চিমমুখো হয়ে বোসো।' বলতে-বলতেই বন্ধ করে দিলে দরজা।

রামকৃষ্ণের তক্তপোশের উত্তর পাশে গঙ্গাজলের যে জালা ছিল তার দিকে মুখ করে বসল সারদা। রামকৃষ্ণ বসল পুবমুখো হয়ে। যেখানে পশ্চিম দিকের দরজা তার কাছে।

প্রথমে সারদার পায়ে আলতা পরিয়ে দিল রামকৃষ্ণ। কপালে-মাথায় সিঁদুর মাখিয়ে দিলে।

স্পর্শনেই সারদার অর্ধবাহ্যদশা হয়ে গেল।

তার পর পরনের শাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে পরিয়ে দিল নববস্ত্র। থালায় করে মিষ্টি দিল খেতে। বললে, খাও। খাবার পরে পান দিল মুখে।

ষোড়শোপচারে পূজা হচ্ছে 'ষোড়শীর'। পূজার উপকরণগুলি সংশোধিত হল। মন্ত্রপূত জল দিল সামনের কলসে, যথাবিধানে অভিষিক্ত করল সারদাকে। ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ—প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল রামকৃষ্ণ:

'হে কালিকা, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী জননী, হে ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত করো। এর দেহমন পবিত্র করে এতে আবির্ভূত হও, এতে বিরাজিত থাকো। জগৎসংসারের সর্বকল্যাণকরণ সম্পূর্ণ করো।'

হে কপালিনী, আমাকে ভার্যা দাও মনোরমা। শুধু মনোরমা নয়, মনোবৃত্তি-অনুসারিণী। আমি যদি ভাবাতীত হই, ও-ও হোক তদ্‌ভাবভাবিত। আমাদের দৈহিক বিবাহ নয়, আত্মিক বিবাহ। আমাদের আত্মানন্দ।

পূজার চরম উপচার প্রণাম। জপ ধ্যান প্রার্থনা উপাসনা—সমস্ত কিছুই এই শেষ প্রণামটির জন্যে। এ প্রণিপাতটিই শেষ অর্ঘ্য। রামকৃষ্ণ বিল্বপত্রে নাম লিখল। আগে-আগে যত সাধন-ভজন করেছে তার সব বেশবাস তোলা ছিল সযত্নে—তাই নামিয়ে একসঙ্গে করলে। রুদ্রাক্ষের মালা, কবচ, যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম ছিল, তাও বাদ দিলে না। সকল

আবরণ-আভরণ, সকল সাধনসিদ্ধির ধন একত্র করে সারদার পায়ে অঞ্জলি দিলে। বললে, 'যত জপ-তপ সাধন-ভজন যত আচার-বিচার, যত কর্মকাণ্ডের মালা—সব তোমার দুটি পায়ে অর্পণ করলাম। এ পূজাতেই আমার সমস্ত পূজার ইতি হল।'

বলে সারদাকে প্রণাম করল রামকৃষ্ণ।

সারদা দেখছে সব চোখ মেলে। কিন্তু সাড় নেই, মুখে কথা ফুটছে না।

মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করেছিল এক দিন। আজ আবার অপ্রমেয়াকে প্রতিমায় নিয়ে এল।

সারদা শঙ্খকঙ্কণধারিণী লোকমাতা।

'হে সর্বমঙ্গলস্বরূপা সর্বার্থসাধিকা, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নী, সনাতনী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।'

আত্মনিবেদন করে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে গেল।

রাত্রি প্রায় তিন প্রহর, ধ্যান ভাঙল রামকৃষ্ণের। সারদা তখনো নিশ্চল হয়ে বসে আছে পিঁড়িতে। তদগত তন্ময় হয়ে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'পূজা শেষ হয়েছে। এবার যেতে পারো নবতে।'

সারদা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল পিঁড়ি ছেড়ে। উঠেই নবতের দিকে ছুট দিলে। একটা প্রণাম করে আসা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না। ছি, ছি, নিশ্চয়ই ঠিক ছিল। মনে মনে তাই এখন প্রণাম করলে রামকৃষ্ণকে। পূজ্য-পূজকে ভেদ নেই সেই ভাবাতীতের রাজ্যে।

লক্ষ্মী বললে, 'তোমার এত লজ্জা, তুমি কাপড় পরাতে দিলে কি গো।'

'কি জানি, আমি তখন যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিলুম।'

'তার পর উনি তোমাকে মিষ্টি খাওয়ালেন, পায়ে আলতা দিলেন, হাত দিলেন, তুমি ঠায়ে বসে রইলে?'

'কি জানি বাপু, বসে রইলুম। সব দেখছি বটে, কিন্তু কথা বলতে পারছি না, নড়তে-চড়তে পারছি না।'

'আর কেউ টের পেল না?'

'কি করে পাবে। দরজা বন্ধ যে।'

তুমি মহাশক্তি। মহাশক্তি না হলে এ পূজা গ্রহণ করে এমন শক্তি কার?'

সেই থেকেই ভাব হয় সারদার।

নবতের ঘরটিতে শুয়ে আছে সারদা, তারই বিছানার এক পাশে যোগেন-মা ঘুমুচ্ছে। রাত্রে কোথাও হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠল।

বাঁশির স্বরে ভাব হল সারদার। যেন সে বেণু-বিনোদিনী রাধিকা হয়ে গেছে। থেকে-থেকে হাসতে লাগল আপন-মনে। দেখতে লাগল বুঝি বা সেই বংশীবটবিহারীকে।

বিছানার এক কোণে তাড়াতাড়ি সরে বসল যোগেন-মা। বসেই রইল যতক্ষণ না ভাব ভাঙে। ভক্তিমতী হলে কি হয়, সংসারের মধ্যে তো আছে, যোগেন-মা ভাবল, যদি তার ছোঁয়া লেগে সারদার ভাব কেটে যায়।

সেই ভাবের চরম হল নীলাম্বর বাবুর বাড়িতে। ছাদে বসে ধ্যান করছিলেন শ্রীমা, পাশে গোলাপ-মা, যোগেন-মা বসে। ধ্যানের পর আর সমাধি ভাঙে না শ্রীমার। অনেক নাম শোনাবার পর হুঁস যদি বা এল, শ্রীমা উদ্‌ভ্রান্তের মত বলতে লাগলেন, 'ও যোগেন, আমার হাত কই, আমার পা কই? আমি কি করে ঢুকবো এই শরীরের মধ্যে?'

স্ত্রী-ভক্তেরা শ্রীমার হাত পা টিপে দিতে লাগল —এই যে পা, এই যে হাত। তবু, দেহটা যে কোথায় পড়ে রয়েছে, চট করে খুঁজে পাচ্ছেন না।

সারদা চলে গেল নবতে। রামকৃষ্ণ বললে, এবার শান্তিতে ঘুমোও গা মেলে। আমার কাছে থাকতে, আর সারা রাত বসে থাকতে জেগে, কখন কী ভাব হয় আমার আর কখন কী নাম-মন্ত্র বলে আমাকে সচেতন করো! এতে কি কারু সুখ থাকে না শরীর থাকে? তুমি মার কাছে নবতে গিয়ে ঘুমোও।

তাই যাব। তুমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি। যাব বিরহের মন্দিরে, সেখানেই বিশ্বনাথের আরতি করব। আমার বসন নিয়েছ, তুমি নাও আমার সমস্ত বাসনা।

বিদুরের স্ত্রী স্নান করছে, ঘরের বাইরে কৃষ্ণের ডাক শোনা গেল: বিদুর! বিদুর! কৃষ্ণকণ্ঠের স্বর শুনে বিহ্বল-ব্যাকুল হয়ে বিদুর-পত্নী ছুটে এল গৃহদ্বারে। কিন্তু, কি লজ্জা, ব্যাকুলতায় বসনখানিই ফেলে এসেছে ভুল করে। তখন আর পিছু সরবার পথ নেই, কৃষ্ণের কাছে সে সম্পূর্ণ উন্মোচিতা। কৃষ্ণ তক্ষুনি তার নিজের উত্তরীয় বিদুর-পত্নীর গায়ে ছুঁড়ে দিল। ত্রস্ত হাতে তাই দিয়ে কোন রকমে গা

ঢাকবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কৃষ্ণের চেয়ে লজ্জা তার বেশি নয়। কৃষ্ণকে ঘরে নিয়ে এল। কিন্তু কী যে খেতে দেবে ভেবে পেল না। দেখল বাড়িতে শুধু পাকা কলা ছাড়া কিছু নেই। তাই একটা ছিঁড়ে খেতে দিল কৃষ্ণকে। কিন্তু ভাবে-ভক্তিতে এমনি বিবশ হয়ে গিয়েছে যে, কলা না দিয়ে খোসা দিয়ে ফেলেছে। আর তাই কৃষ্ণ খাচ্ছে তৃপ্তি করে। ভক্তের কলা আর খোসা দুই-ই সমান ভগবানের কাছে।

আমারও তেমনি ভক্তি, তেমনি প্রীতি, তেমনি ব্যাকুলতা। হয়তো তোমাকে খোসা দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু তুমি সর্বস্বাদগ্রাহী, তুমি দেখ তা ভাবের রসে স্বাদু কি না।

প্রভু, তুমি যদি নাও, তবেই আমি পূর্ণ হব। তুমি যদি খাও তবেই আমার খিদে মিটবে।

গোলাপ-মার ভালো নাম অন্নপূর্ণা। মাঝবয়সী বিধবা। একটি মাত্র মেয়ে মারা যাবার পর দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের পায়ের কাছে কেঁদে পড়ল।

ঠাকুরের ভাব হল। বললেন, 'তুমি তো মহা ভাগ্যবতী।'

গোলাপ-মা থমকে রইল।

'সংসারে যাদের কেউ নেই কিছু নেই ঈশ্বর তো তাদেরই সহায়।'

অশরণের আশ্রয়স্থল তুমি। গোলাপ মা বসে পড়ল পদচ্ছায়ে।

ঠাকুরের তখন অসুখ, গোলাপ-মা বললে, কলকাতায় তার এক জানাশোনা ডাক্তার আছে, সে নির্ঘাৎ সারিয়ে দিতে পারবে। ছোট ছেলের মত লাফিয়ে উঠলেন ঠাকুর, বললেন, কালই চলো। পর দিন ভোরেই রওনা হলেন নৌকো করে, সঙ্গে গোলাপ, লাটু আর কালী। সারা দুপুর কেটে গেল এই ডাক্তারির ধান্দায়। ফেরবার পথে বেজায় খিদে পেল সবাইকার। সেই কোন সকালে বেরিয়েছে সকলে। এখন দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেছে। ঠাকুর জিগগেস করলেন, কারু কাছে পয়সা আছে কি না। কেবল গোলাপের কাছে আছে। তাও, চারটি মোটে পয়সা।

তাই সই। ঠাকুর কালীকে বললেন, বরানগরের বাজার থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে আয়।

ঠোঙায় করে তাই নিয়ে এল কালী।

কিন্তু, কি আশ্চর্য, কাউকে কিছু না দিয়ে সমস্ত মিষ্টিটা ঠাকুর একাই খেয়ে ফেললেন। তার পরে গঙ্গার জল খেলেন অঞ্জলি ভরে। বললেন, 'আঃ, খিদে মিটল।'

অবাক কাণ্ড। আর তিন জনেরও খিদে মিটে গেল সেই সঙ্গে। কিছু নিল না, খেল না, অথচ কারু খিদে নেই এক ফোঁটা। সেই বন্য ক্ষুধা মুহূর্তে তৃপ্ত হল কি করে?

তুমি কি সেই মহাভারতের কৃষ্ণ?

তুমি তৃষাহর। তুমি তৃপ্তিকর।

নবতের সরু বারান্দায় চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে সারদা। অতৃপ্ত চোখে চেয়ে থাকে যদি কখনো কোনো ফাঁকে দেখা যায় সেই তৃপ্তিকরকে।

রামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি দেখে সারদাকে ঠাট্টা করে হৃদয়। বলে, 'সবাই তো মামাকে বাবা বলছে, তুমিও তবে বাবা বলে ডাকো না।'

এতটুকু রুষ্ট বা অপ্রতিভ হল না সারদা। নিবিড় ভক্তির সঙ্গে গভীর প্রীতি মিশিয়ে বললে, 'উনি বাবা কী বলছ! উনি বাবা মা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন, সমস্ত। যেখানে, যে সম্পর্কে যতটুকু আনন্দ আছে, সমস্তই উনি। উনি আনন্দময়।'

সেই গান্ধারীর কথা মনে করো:

'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥'

তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছ, কিন্তু জেনো, আমি তোমার দুয়ারেই পড়ে আছি। [ক্রমশঃ ।

——আগামী সংখ্যায়——

আত্ম-স্মৃতি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

যৌবন-পাতাল

অ, আ, ই

চিৎপুরের মসজিদের মিনার দেখা যায় চকিতে।

অন্ধকার। তমসাবৃত দিক্‌চক্রে সহসা দেখা দেয় তড়িৎশিখার ...র আলো। মসজিদের পেছনে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকায় কয়েক বার! মিনারের কবুতরেরা সন্ত্রাসে কাঁপতে থাকে আসন্ন ঝঞ্ঝার আশঙ্কায়। বাতাসের বেগও কেমন দুরন্ত। শোঁ-শোঁ শব্দ। বিপ্লব ঘোষণা করে যেন প্রকৃতি, এই সৌখীন নগরীর ঠিক মাথার ওপর। চক্রাকারে পথের ধুলো উড়তে থাকে। বাতাসের দাপটে নিবে যায় অনেক দোকানের ঝুলন্ত লণ্ঠন। মালিকরা ঝাঁপ ফেলে দেয় দোকানের। কপাট বন্ধ হয়ে যায় নিশাচরীদের জানলার। তবুও বাতাসের গতি যখন হ্রাস পায় কখনও কখনও, শোনা যায় সারেঙ্গীর করুণ ঝঙ্কার। কোথা থেকে ভেসে আসে কে জানে, তবলার মৃদু-মৃদু শব্দ। আর নূপুরের রুণু-ঝুণু। রাত্রির আঁধার তার ধীর-মন্থর পদক্ষেপে কতটা অগ্রসর হয়েছে ঠিক বোঝা যায় না। আকাশের মেঘে ঘন কাজলের স্পর্শ, হাওয়ায় ঝড়ের দোলা। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। পথ প্রায় জনহীন। শুধু গলির মোড়ে-মোড়ে গাঁটকাটারা বসে আছে ওৎ পেতে। অসাবধানী মাতাল দেখলে হয় একবার। ক্রুর, নির্মম দৃষ্টি তাদের চোখে। রোজগারের আশা আর পুলিশের ...রে তাকাচ্ছে এধার-ওধার। অশ্লীল ভাষায় কথা কচ্ছে পরস্পর। শিষ দিচ্ছে থেকে-থেকে কর্কশ স্বরে, মুখে আঙুল ...রে।

রাত্তিরটা মাঠে মারা গেল বুঝি। ঝড়-বৃষ্টির রাত, নিশাচরীদের ...দিন। খদ্দের আসে না, আলসেয় দাঁড়ানো যায় না, রোজগার ...য় না,—শুধু সাজাগোজাই সার হয়। যারা রোজ আনে রোজ ...য়, তাদের আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। মওকা পেয়ে ...না-শুনারা আসে, নামমাত্র মূল্য দিয়ে রাত কাটিয়ে যায়। তাই ...র বর্ষার ইঙ্গিত পেলেই মুখের হাসি মিলিয়ে যায় তাদের। ...খিটে মেজাজ হয়ে যায়। দেবতাদের দোষে।

ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকায় আর দুড়-দাড় দরজা-জানলা পড়তে ...কে। কড়-কড় শব্দে বজ্রপাত হয় কোথায়। হঠাৎ নাম ধরে ... ডাকে শুনে আবদুল ইতি-উতি তাকায়। বসিরুদ্দিন গাড়ীর ...কাছি এসে বলে,—কোচম্যান্ সাহেব, হুজুর আর ফিরবেন না ...ই বাদলার রাতে। তুমি গাড়ী ফিরিয়ে নে যাও। ভোর নাগাদ ...স, হুকুম করলেন হুজুর।

কথাগুলো শোনে আবদুল। শোনে স্তব্ধ-বিস্ময়ে। উত্তর করে ...কিছু। কেমন হতাশার হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। দুঃখের হাসি। সাধারণ এই ক'দিনে এত বেশী উন্নতি আশা করতে পারে ...যেন। বেড়াতে এসে রাত্রি অতিবাহিত ক'রে যাবেন হুজুর, কিসের এত প্রলোভন? ক্রোধ আর উত্তেজনায় বেশী কিছু বলে না আবদুল, শুধু বলে,—যো হুকুম।

বসিরুদ্দিন বললে,—হ্যাঁ, কোচম্যান সাহেব, হুজুর এই হুকুম করেছেন। চটপট হাঁকিয়ে বেরিয়ে যাও, আসমানে যা বিজলীর ঝলক মারছে!

বসিরুদ্দিন যে এসে কথাগুলো বলতে পেরেছে তাই যথেষ্ট। মদির নেশায় তার জড়িত কণ্ঠস্বর, টলটলায়মান মূর্ত্তি। তবুও নেশার উগ্র আনন্দে নেশাকে তুচ্ছ ক'রেই সিঁড়ি বেয়ে প্রায়ান্ধকার রাস্তায় এসে হুজুরের প্রতীক্ষারত গাড়ীখানাকে খুঁজে বের করেছে। বলেছে ঠিক, যা-যা বলতে হবে। তার পর এলোমেলো দমকা বাতাসে খুশীমনেই ফিরে যায় যথাস্থানে। নেশার ঘোরে বেশ লাগে তার এই উড়ো বাতাস। তখন থেকে এখন পর্য্যন্ত মাত্র এক গেলাসেই বসিরুদ্দিন তুষ্ট থাকেনি, মাসীকে হুজুরের সম্বন্ধে অনেক আশার বাণী শুনিয়ে আদায় করেছে আরও দু'-তিন পাত্র। হুজুর গহরজানের কাকুতি-মিনতিতে নেশার ঝোঁকে রাত্রি কাটাতে সম্মত হওয়ায় মাসীও খুশীতে উপচে পড়েছে। আনন্দাতিশয্যে মুখ ফুটে ক'বার আশীর্ব্বাদও করেছে বসিরুদ্দিনকে। বলেছে,—বসির, তোকে কি ব'লে আর আশীর্ব্বাদ করব, বাবা শ্মশানেশ্বর তোর মঙ্গল করুন।

গহরজানের গতি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বসিরুদ্দিনের এত যে ব্যস্ততা কেন, তার ভেতর কিছু রহস্য না থাকলেও সহজ কথায় বলতে হয় তার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল দু'পক্ষ থেকেই কিছু-কিছু আয় করা। নগদনারায়ণের যোগাড় দেখা। বসিরুদ্দিনের গানের গলা আছে, দু'-চার রকম বাজনায় দখলও আছে, কিন্তু থাকলে কি হবে, গান-বাজনার কদর ক'টা লোক করে? বসিরুদ্দিন ক'বার চেষ্টাও করেছিল যাতে কোন করদ রাজ্যের বাঁধা গাইয়ে হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বসিরুদ্দিনের চেয়ে আরও অনেক খ্যাতিমানরা আছে। তাদের ফেলে কে ডাকবে তাকে? তবে, মাঝে-মিশেলে ডাক পড়ে তার কোথাও কোথাও থেকে। কিছু-কিছু আয়ও হয়। তবুও বসিরুদ্দিন সেই সব আহ্বান একেবারে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরে না, ছ'মাসে-ন'মাসে হয়তো এক-আধ বার। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, জলপাইগুড়ি আর সেরাইকেলার রাজকীয় গানের আসরে হয়তো গাইতে যায়। যাওয়া-আসার পাথেয় আর কিছু উপরি টাকা। তাতে দিন গেলেও বছর গড়ায় না। বসিরুদ্দিন তাই এই পল্লীর আশ্রয় নিয়েছে। রূপে আর গুণে সত্যিই যাদের বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, শুধু তাদের ঘরেই তার গমনাগমন। যৌবন যাদের বিলীয়মান, কণ্ঠস্বরে যাদের নেই আর তেমন আকর্ষণ, নৃত্যকলায় যারা পারদর্শিতা হারিয়েছে তাদের জন্যে মুখ নষ্ট ক'রে কি হবে? সময় নষ্ট ক'রে? যাদের দেখলে চরিত্র রক্ষা করা কঠিন তাদের জন্যে বসিরুদ্দিন। যাদের দেখলে চরিত্র ভাল হয়ে যায় তাদের জন্যে নয়। আর খদ্দেরও চুনো-পুঁটিদের বসিরুদ্দিন করে না, রুই-কাৎলাদের ধরে। যাদের নাম করলে উনুনে হাঁড়ি চাপে না তাদের চেনে না বসিরুদ্দিন,

যাদের নাম করলে দু'-দশটা লোক চিনতে পারে তাদের সঙ্গে তার যত দোস্তি।

ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর। বসিরুদ্দিন তাকায় আকাশের দিকে। আকাশটা যেন লাল মনে হয়। গঙ্গার ঘোলা জলের মত রঙ মেঘের। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ খেলে আকাশের তীরে। অন্ধকার সহসা হাসতে থাকে যেন। রাস্তা থেকে ভেতরে যায় বসিরুদ্দিন। সিঁড়ি বেয়ে ওঠে গহরজানের ঘরের দিকে। নেশায় কাতর হয়ে বসিরুদ্দিন টলছে; সিঁড়িটা আরও যেন টলতে থাকে বাসুকির ফণার মত।

সিঁড়ির মুখে, অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে। খুব কাছাকাছি আসতে আন্দাজে বোঝে বসিরুদ্দিন। নাকে তার ভেসে আসে মিষ্টি এক সুগন্ধি। ছিল গহরজান, অপেক্ষা করছিল বসিরুদ্দিনের। জামার বুকে মেখেছিল সে জেসমিনের এসেন্স। অতি উগ্র গন্ধ তার পেয়েছে বসিরুদ্দিন। একেবারে কাছে আসতেই ফিসফিস কথা বললে গহরজান,—বসির, একটা কাজ করতে হবে তোমায়।

—হুকুম কর' বিবিজান। কারও শির তোমার পায়ে হাজির করতে হ'বে? বসিরুদ্দিন বললে চাপা কণ্ঠে। গহরজানের চিবুক ধ'রে।

—না না। সহাস্যে আবার ফিসফিস করলে গহরজান।—এই নাও একটা টাকা। গোটা দুই যুঁইয়ের গোড়ে এনে দিতে হবে এখুনি।

—আলবৎ এনে দেবো বিবিজান। তবে পানি পড়ছে বাইরে। দাও, রুপেয়া দাও। কথার শেষে টাকাটা নিয়ে নেমে যায় বসিরুদ্দিন। কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলে,—মালাবদল হবে বুঝি বিবিজান?

গহরজান হাসে ক্ষণেক। বলে,—হ্যাঁ, মালাবদল হবে, তবে সাদি হবে না।

গহরজানের কথাগুলিতে কেন কি জানি দুঃখের সুর বেজে উঠলো। হাসলো যেন হতাশার হাসি। গহরজানের মনের গহনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা কি কথা হয়ে ফুটে উঠলো! বিয়ে যার সত্যিই হ'তে পারতো এই ভাগ্য-বিপর্য্যয় না হ'লে, তার মনে সাধির স্বাদ জাগবে না? বিয়ে আর যার কখনও হ'তে পারে না, সে খেলতে চাইবে না মালাবদলের খেলা! বসিরুদ্দিন চলে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে গহরজান। অবিন্যস্ত পোষাক ঠিকঠাক করে। বর্ষার ঠাণ্ডা বাতাস লাগে চোখে-মুখে, বেশ লাগে যেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা তীব্র আর্ত্তনাদ। চমকে ওঠে যেন গহরজান। শিউরে ওঠে ভয়ে। কার ঘরের মানুষ মাতলামি করছে। পশুর মত চিৎকার করছে। কাছাকাছি কোন্ ঘরের। গহরজানের দু'খানা ঘর আর এক ফালি বারান্দা, আর আর ঘরে আছে আর আর কত কে।

—গহর গেলি কমনে?

দরজার ফাঁক থেকে গহরজানকে দেখতে না পেয়ে সিঁড়ির মুখে খুঁজতে আসে মাসী। বয়সের প্রাচুর্য্যে দিনের বেলাতেই দূরের কিছু ঠাহর করতে পারে না, রাত্রে তো বটেই। তাই অতি সাবধানে ধীরে ধীরে এসেছে মাসী। সিঁড়ির কাছ বরাবর এসে কথা বলেছে,—গহর গেলি কমনে?

—এই যে মাসী এখানে। জানান দেয় গহরজান। বলে,—দেখো, সাবধানে এসো।

মাসী আর এগোয় না। সেখান থেকেই বলে,—তুই হেথায় এমন নিরিবিলিতে কেন?

কি উত্তর দেবে ভাবছিল গহরজান। খানিক পরেই বললে,—বসিরকে পাঠিয়েছি যুঁইয়ের গোড়ে কিনতে। এখুনি এলো ব'লে।

হ্যাঁ, এখনি আসবে বসিরুদ্দিন। এ তল্লাটে ফুলের দোকান অনেক আছে। ফুলের কদর করে এ পল্লীর প্রতিবেশী। খোঁপায় ফুল গোঁজে, ফুলের মালা পরে, ফুলদানিতে ফুল ভরে। এখানে ফুলের ছড়াছড়ি।

—তা বেশ করেছিস্। বললে মাসী,—রাতে থাকবে তো খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা করবি? ভাতের থালা তো আর ধ'রে দেওয়া যাবে না। আমি না হয় যাই একবার, দেখি যদি ডিম, মাংস কিছু পাই। দেরাজ খুলে ক'টা টাকা বের ক'রে দে দেখি।

—তুমি যাবে কেন এই রাত্তিরে আবার। রাস্তায় নেমেই তো খাবারের দোকান। বসির না হয় ব'লে আসবে। দোকানের লোকই দিয়ে যাবে'খন। গহরজান কথাগুলো ব'লে ব্যাপারটা অনেক হালকা ক'রে দেয়।

মাসীও নিশ্চিন্ত হয়। বলে,—তা বেশ কথা। বসির ফিরলে তবে তুই টাকা দিয়ে কি আনবে না আনবে ব'লে দিস। আমি ততক্ষণ গড়াচ্ছি ও-ঘরে। কোমরের বেদ্‌নাটা চাগা দিয়েছে আবার।

মাসীর কোমরে পুরানো বাত। মাঝে-মাঝেই ব্যথিয়ে ওঠে। শুয়ে-শুয়ে কাতরায়। মাসী আর মুহূর্ত্ত না দাঁড়িয়ে শয্যা নিতে যায়। গহরজান অন্ধকারে অপেক্ষা করে চুপচাপ। আশা নিরাশার অনেক স্বপ্নই দেখতে থাকে গহরজান। কেমন যেন মন থেকে বিতৃষ্ণা আসে এই দিনযাপনের ঘৃণ্য ধারার প্রতি! টাকা রোজগারের অছিলায় কত জঘন্য লোকের মুখে হাসি ফোটাতে হয়, কত হীন আর কদর্য্য অবস্থায় মানিয়ে নিতে হয় নিজেকে। বেশ মনে পড়ে গহরজানের, সেই প্রথম দিনের কথা। যেদিন মাসীর কঠোর শাসনের ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গহরজান অজানা অচেনা কোন লোকের সঙ্গে রাত্রি যাপন করেছিল। কান্নার বেগ সামলে হাসি ফুটিয়েছিল মুখে। পরিবর্ত্তে কি সে পেয়েছিল তা সে নিজেই জানে না। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের বদলে মাসীর ক'টা মিষ্টি কথা ছাড়া আর কি পেয়েছিল? তার পর থেকে এখনও পর্য্যন্ত চলেছে সেই মন নয়, দেহ দেওয়া-নেওয়ার অফুরন্ত লীলাখেলা। বিতৃষ্ণায় ভ'রে যায় গহরজানের অন্তর, তাই সে পূর্ণচ্ছেদ টানতে চায় এই হীনতম কাজে। হাজারো জনের সঙ্গসুখ লাভের চেয়ে খোঁজে যে মনের মত এক জনকে যদি পাওয়া যায়!

কড়-কড় শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে কোথায়। অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে এতক্ষণে। বাতাসে জলের কণা। শোঁ-শোঁ হাওয়া বইছে। ছাদের নালা ব'য়ে জলের তোড় নেমেছে নীচের উঠোনে গেছে আর এসেছে বসিরুদ্দিন। জলে-ভেজা যুঁইয়ের গন্ধে বর্ষার বাতাসও যেন উন্মনা হয়ে উঠলো। বসিরুদ্দিনও ভিজে গেছে জলের ধারায়। গহরজান মালাগুলো নিয়ে সহানুভূতির সুরে

বললে,—ইস্! তোমাকে জলে ভেজালাম তো? এখন কি হবে?

বসিরুদ্দিন হাসতে-হাসতে বলে,—কি আর হবে, কিছু হবে না। দু' পাত্তর চাপালেই পানি-ফানি এখুনি শুকিয়ে যাবে। তুমি এখন একটা বোতল বের ক'রে দাও দিকিন। মাসীর কাছে চাইলেই তো থ্যাক ক'রে উঠবে এখুনি।

অনেক সাধের ফুল হাতে পেয়েছে গহরজান। খুশীর হাসি হেসে বললে,—এখুনি দিচ্ছি। তুমি এইখানে থাকো, ও-ঘরে মাসী আবার বাতের বেদনায় শুয়ে প'ড়েছে এতক্ষণে। দিশী না বিলিতি খাবে? শুধু ফুল নয়, আরও কি যেন এক সুগন্ধির তীব্র গন্ধ পায় বসিরুদ্দিন গহরজানের গা থেকে। জেসমিন এসেন্সের। বসিরুদ্দিন বলে,—দিশী দিশীই সই। যেও না, একটা কথা বলি শোন'।

চ'লেই যাচ্ছিল গহরজান। বসিরুদ্দিনের কথা শুনে ফিরে দাঁড়ালো। বসিরুদ্দিন এগিয়ে গিয়ে প্রায় কানে-কানে বললে,—এমন রাত আর আসবে না। যেমন ক'রে পারো বশ মানিয়ে নিতে হবে। ফসকালে এমনটি আর আমি জোগাড় করতে পারবো না। তোমার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হ'লে আমিও এ কাজে ইস্তিফা দিয়ে চ'লে যাবো লাহোরে। এক বাঈ আমার সাকরেদ হবে ব'লে পত্তর দিয়েছে সেখান থেকে। মাসে দেড়শো টাকা, কেলোয়াতী শিখবে শুধু। বুঝলে বিবিজান?

গহরজানের মনটা যেন ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে। বসিরুদ্দিন না থাকলে,—সে যেন আর ভাবতেই পারে না। সময় অপব্যয় হচ্ছে দেখে গহরজান কেবল বলে,—হ্যাঁ। বলতে বলতেই ত্যাগ করে সেই স্থান। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ফিরে আসে আবার। শাড়ীর আঁচলের ভেতর থেকে বের ক'রে দেয় একটা বোতল। দিয়েই চ'লে যায় তৎক্ষণাৎ। যেতে-যেতে বলে,—তুমি ও-ঘরে আছো তো? আমি আসছি খানিক পরেই।

বসিরুদ্দিন সে-কথার কোন উত্তর দেয় না। বোতল পাওয়া মাত্রই মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে দাঁতে ছিপি খুলে ঢকঢকিয়ে খেতে থাকে বোতলের জলীয় পদার্থ। মুখটা শুধু বিকৃত করে।

ঘরে ঢুকে দেখলো গহরজান—ঘরের লোক তখন গহরজানেরই ওড়নাখানা নাড়াচাড়া করছে। ফিরোজা রঙের ওড়না। চুমকি-শলমার কাজ দেখছে হয়তো। যুঁইয়ের রাশি ফরাসের মাঝখানে নামিয়ে রেখে গহরজান যেন গরমে অসহ্য হয়েই খুলে ফেললে গায়ের জামাটা। যতটুকু দেহাংশ ঢাকা ছিল জামাতে, এতক্ষণে যেন মুক্ত হ'ল। তবুও এখনও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়নি, এখনও রয়েছে গোলাপী ভয়েলের কাঁচুলী। জামাটা এক পাশে ফেলে দিয়ে অত্যন্ত কাছে ঘেঁসে বসলো গহরজান।

কৃষ্ণকিশোরের নেশাচ্ছন্ন চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। বললে,—এত ফুল এলো কোথা থেকে? কি হবে?

গহরজান হাসলে, ম্লান হাসি। বললে,—বাগান থেকে। কথা বলতে-বলতে একটা মালা জড়িয়ে-জড়িয়ে পরলে নিজের খোঁপায়। আর একটা মালা সহসা পরিয়ে দিলে তার কণ্ঠে। বললে,—আমি খুলে না নিলে খুলতে পাবে না।

আগের দিন ঘর ছিল অন্ধকার। গহরজানের যে এত রূপ তা যেন চোখে পড়েনি। এত রঙ দেখতে পায়নি। এমন নিটোল গড়ন পল্লবিনী লতার মত! ঘরের আবহাওয়া যেন বদলে গেল যুঁইয়ের গন্ধে। গহরজান চোখে করুণ দৃষ্টি ফুটিয়ে কথা বলে কাতর সুরে। বলে,—মালাটা এবার পরিয়ে দাও আমার গলায়। মালা-বদল হোক। আর মালা-বদল হ'লে—

কথামত মালা খুলে সত্যিই কৃষ্ণকিশোর পরিয়ে দেয় গহরজানকে। বলে,—কি বলছিলে? আর মালা-বদল হ'লে?

খুশীর বন্যায় যেন উথলে ওঠে গহরজানের দেহ-মন। মালা প'রে তৃপ্তির আতিশয্যে দু'বাহু মেলে বক্ষে টেনে নেয় তাকে। বলে,—মালা-বদল হ'য়ে গেলে বিয়ে হ'য়ে যায়। কখনও ছাড়াছাড়ি হয় না চিরদিনের মত।

কৃষ্ণকিশোর দেখে গহরজানের অনিন্দ্য রূপ। দেখে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। গহরজানের কথাগুলো শুনে চিন্তাকুল হ'য়ে ভাবতে থাকে কি যেন। গহরজানের বাহুর অলঙ্কারটা লক্ষ্য করে। চুণী আর পান্নার তাবিজ। গহরজানের গায়ের রঙের সঙ্গে যেন মিলিয়ে গেছে। গহরজান আবদারের সুরে শুধোয়,—রাত্তিরটা থাকবে আমার কাছে, খেতে হ'বে তো কিছু? কি খাবে বল?

এখন যেন অনেক বেশী ভাল লাগে গহরজানকে, আগের দিনের চেয়ে। মনে হয়, কত যেন নিকট-সম্পর্কের। কত দিনের পরিচয়ে কত যেন আপন। কৃষ্ণকিশোর বললে,—হ্যাঁ, খাব। কথার শেষে চোখের ইশারায় দেখিয়ে দেয় গহরজানের ওষ্ঠাধর।

গহরজান ইশারার ইঙ্গিত দেখে হেসে ফেললে খিলখিল ক'রে। হাসি থামিয়ে বললে,—খেলে যদি ক্ষিধে মিটতো তা হ'লে ভাবনা ছিল! থামো, আমি খাবারের কথা ব'লে আসি। যাবো আর আসবো। বলতে-বলতে সে নিজের মুখখানাকে এগিয়ে ধরে।

কৃষ্ণকিশোর যা খেতে চাইছিল তাই পায়। খায় অনেকক্ষণ ধ'রে। যেন সুধা পান করে। গহরজান কিছুক্ষণের জন্ম নিজেকে মুক্ত ক'রে উঠে যায় খাবারের জোগাড়ে। পাশের ঘরে গিয়ে দেখে ঘুমন্ত মাসীকে। আর দেখে বসিরুদ্দিনকে। বোতল পাশে নিয়ে ব'সে আছে মাদুরের 'পরে। গহরজানকে দেখে বিস্মিত হয় যেন প্রায় নিরাবরণ গহরজান।

গহরজান বললে কাকুতির স্বরে,—বসির, দোকানে গিয়ে বলে এসো না। খাবার দিয়ে যাবে। মাংস, ডিমের ডালনা আর রুটি দিতে বলবে। এই নাও টাকা। মাসীর নাম করবে। নয় তো কার ঘরে আবার দিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

—যো হুকুম বিবিজান। বলতে-বলতে উঠে পড়লো বসিরুদ্দিন। গহরজান দেরাজ খুলে টাকা দিতেই চ'লে গেল তক্ষুনি। টলতে-টলতে।

ঘরে যেতেই বললে কৃষ্ণকিশোর,—বেড়ালটাকে বুঝি তুমি পুষেছো?

ডালিম কখন এসে ফরাসের 'পরে আরাম ক'রে বসেছে এতক্ষণ দেখতেই পায়নি। ঘুমের ভাণ ক'রে ব'সে আছে ডালিম, চোখ

দু'টোকে বন্ধ ক'রে। যেন কত ঘুমোচ্ছে। গহরজান বললে,—ও মা, তুমি এসে হাজির হয়েছো? হ্যাঁ, ওকে আমি পুষেছি। আমাকে না দেখলে ও থাকতে পারে না। তোমার কাছে একটা আর্জ্জি আছে আমার। বলবো?

এবার গহরজানকে বুকে টেনে নিয়ে বললে কৃষ্ণকিশোর,—হ্যাঁ, বল না।

—কথা রাখবে বল?

—হ্যাঁ।

তবুও যেন বিশ্বাস হয় না গহরজানের। বলে,—কিছুতেই কথার খেলাপ হবে না তো?

—না। বল না তুমি আর্জ্জিটা।

খানিক নীরবে তাকিয়ে থাকে গহরজান, মদালস দৃষ্টি মেলে। তার পর বলে,—ঐ ডালিমের বিয়ে দিয়ে দিতে হবে তোমাকে। আমি ওর বিয়ে দেওয়াবো। অনেক টাকা খরচ করতে হবে কিন্তু।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—বেশ তো। কিন্তু বিয়েটা হবে কার সঙ্গে? গহরজান সম্মতি পেয়ে উৎসাহে উপচে পড়ে যেন। বুকে তার মুখ রেখে বলে ধীরে ধীরে,—এ পাড়াতে গঙ্গামণি নামে আমার এক জন বন্ধু আছে। যার কাছে আছে, কি যে নাম তার! হ্যাঁ, ঠনঠনের মল্লিকদের বিষ্টু বাবু। কোটি টাকার মালিক। ঐ গঙ্গামণির পোষা রতনের সঙ্গে বিয়ের পাকা কথা হয়ে আছে আমার ডালিমের। এখন তুমি রাজী হ'লেই হয়।

গহরজানের রূপে মুগ্ধ হয়ে গেছে। কখনও যা দেখেনি, দেখতে পেয়েছে সামনা-সামনি।

এখন যা বলবে তাই। কৃষ্ণকিশোর নেশার ঝোঁকেই বলে,—বেশ তো। দাও না তুমি বিয়ে। এ আর এমন কি কথা!

তৃপ্তির হাসি দেখা যায় গহরজানের চোখে-মুখে। নিশ্চিন্ততার পরিতৃপ্ত হাসি। আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে কি করবে যেন ভেবে পায় না। সাপের মত আরও নিবিড় করে বাহুবন্ধন। আরও কাছে টেনে নেয়। মূর্খের মত সাত-পাঁচ না ভেবে যে সম্মতি জানায়, তারও মুখে যেন গর্ব্বের ছায়া ফুটে ওঠে। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, এমনি তাচ্ছিল্যের চাউনি তার চোখে।

ফরাসের 'পরে রূপার রেকাবীতে ছিল এলাচদানা আর মশলা। দারুচিনি, মৌরী আর লাল-সুপারী। গহরজান ক'টা এলাচদানা পূরে দেয় তার মুখে, পরম আদরে। নিজের কণ্ঠের মালাটা খুলে পরিয়ে দেয়। কৃষ্ণকিশোরও পরিয়ে দেয় গহরজানকে। এমনি মালা-বিনিময়ের খেলা চলতে থাকে কতক্ষণ। হাসতে-হাসতে।

রাত্রি আর বর্ষা তখন বাইরে যেন পাল্লা দেয় পরস্পরে। ঘোর অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন ক'রে কড়কড়িয়ে মেঘ ডাকে। বর্ষণ হয় দুরন্ত বেগে।

আর তখন ঠিক আরেক জন কিশোরী ঘুমের মাঝে দেখে কত বিচিত্র স্বপ্ন। কত রঙীন পটভূমিকায়। রাজার রাণী হবে সে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তাকে দেখে পছন্দ হয়েছে যাদের, তাদেরই গৃহের বধূ হবে। আর তাও যেমন-তেমন ঘর নয়, ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মী যাদের ঘরে বাঁধা। একমাত্র পুত্র; বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কল্পনাতেও যা কেউ ভাবতে পারে না, স্বপ্ন দেখে শুধু। ঘুমের ঘোরে সেই স্বপ্নই দেখছিল রাজেশ্বরী। নিদ্রাতুর মুখে তার মাঝে-মাঝে হাসির রেখা মিলিয়ে যায়। রাজেশ্বরী স্বপ্ন দেখে রাজ্যেশ্বরী হওয়ার।

—ও রাজো, আর কত ঘুমোবি?

—কৈ না তো, আমি তো জেগে রয়েছি।

—তোর যে বে লা। আয়, খোলো বিনুনীর খোঁপা বেঁধে দিই। কনে-চন্দন পরিয়ে দিই। পায়ে আলতা দিয়ে দিই।

রাজেশ্বরী উঠে বসে ধড়মড়িয়ে। বজ্রপাতের শব্দে তার নিদ্রা টুটে যায়। কৈ, ঠাগমা কৈ? কেউ তো নেই, শুধু বৃষ্টির ঝর-ঝর শব্দ। রাজেশ্বরী আবার শুয়ে পড়লো ক্ষুণ্ণ মনে। কত দেরী আর সেই শুভদিনের। সেই শুভলগ্নের। সেই শুভদৃষ্টির।

রাত্রির পর দিন। অন্ধকারের পরেই আলো। বর্ষার পর যেমন দেখা দেয় শুভ্র পরিচ্ছন্ন আকাশ। কুল-ছাপানো জোয়ারের পর যেমন ভাটা। তেমনি ঠিক ঘনঘোর বর্ষার রাত্রি স্তিমিত হয়ে আসে অতি ধীরে। ভিজে আকাশের পূর্ব্বাচলে সূর্য্য যেন নেই, তবু সূর্য্যের ঘোলাটে আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয় শহরাঞ্চল। কাক আর চড়াই আলো দেখে ডাকাডাকি করে। ঠাণ্ডা বাতাস বয়। বৃষ্টি থেমে গেছে কখন কে জানে, কিন্তু বাতাসে যেন জলের রেণু। শহরের পথ পিচ্ছিল।

আদেশ মত ভোরে উঠেই গাড়ী নিয়ে গিয়ে হাজির করে যথাস্থানে কোচম্যান আবদুল। ঘণ্টাটা বাজায় কয়েক বার। জানান দেয় তার উপস্থিতি। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর হুজুর আসেন, এসে গাড়ীতে বসেন উড়ু-উড়ু চেহারায়।

বিদায় দেওয়ার সময় গহরজান শুধু কাকুতির সুরে ব'লে দেয়,—আর যেন বসিরকে না আনতে হয়। এখন তো চেনা-জানা হয়ে গেছে, নিজে-নিজেই চ'লে আসবে যখন খুশী। আর, না এলে আমিই গিয়ে হাজির হবো।

কথাটা শুনে কৃষ্ণকিশোর বলে,—না, না, তুমি যেন যেও না। আমিই আসব। লোকে কি মনে করবে?

খিল-খিল শব্দে হেসেছে গহরজান লোকভীতি দেখে। হাসতে-হাসতেই বিদায় দিয়েছে। বসিরুদ্দিন কখন চ'লে গেছে জানতে পারেনি গহরজান। হয়তো দোকানে খাবারের কথা ব'লে দিয়ে চলে গেছে বসিরুদ্দিন নিজের বাসায় ঐ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই। বসিরুদ্দিনের বাসা, এখান থেকে অনেক দূর। খিদিরপুরে, মেটিয়াবুরুজে।

মাসী ভোরে উঠেই গেছে গঙ্গাস্নানে। স্নান সেরে, বাবা শ্মশানেশ্বরের পূজা দিয়ে ফিরতে মাসীর অনেক দেরী। গহরজান গিয়ে ফরাসে এলিয়ে পড়ে ঘুম-কাতর চোখে। প্রায় বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে গহরজান। চোখে এখনও যেন ঘুম লেগে রয়েছে পুরোপুরি।

ঘরের ভেতর বাসি যুঁইয়ের মিষ্টি গন্ধ। ফরাসে গেলাস আর বোতল। উচ্ছিষ্ট খাওয়ার পাত্র। মশলার রেকাবী। তাকিয়াগুলো হেথায়-সেথায় ছড়িয়ে আছে। বেশ বোঝা যায়, রাত্রে যেন তাণ্ডবলীলা হয়ে গেছে ঘরে। তারই চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে।

বাড়ীতে ফিরতে যেন মন চায় না।

নেহাৎ ফিরতে হয় তাই যেন ফিরেছে। গহরজান একটা রাতের মধ্যে কি এমন আকর্ষণের মায়ায় জড়ালে যে, আজন্ম যেখানে লালিত-পালিত হয়েছে সেই বসত-বাড়ীতে আর মন উঠছে না। কেউ যেন নেই কোথাও। যক্ষপুরীর মত শূন্য গৃহ। লোক-জন গেল কোথায় সব। পাইক, বরকন্দাজ, তাঁবেদার, ভৃত্যের দল ছুটি নিয়েছে না কি? ফটকে শুধু দ্বারপালকে দেখা যায়, পেতলের লোটায় ছাই ঘষছে। জুড়ী আসতেই সসম্রমে উঠে দাঁড়ায়। গাড়ীর মধ্যস্থিত মনিবের উদ্দেশে সেলাম ঠোকে।

মনিবকে আসতে দেখে সাহসভরে কথা বলে শুধু এক জন। অন্দরের কোথা থেকে কথা বলে কে জানে। পদক্ষেপের শব্দে খিলানের পায়রাগুলো উঠান থেকে উড়ে পালায় ঝাঁকে-ঝাঁকে। বিনোদা কথা বলে। বলে,—কোথায় কাটলো শুনি রাতটা? এ-ও দেখতে হ'ল এই পোড়াকপালে! একেবারে উচ্ছন্নয় গেলে? বিবেকে বাধলো না? ওমা কি হবে গো! কোথায় যাবো গো! এমন নচ্ছার ছেলেও পেটে ধরে মানুষ? হায়, হায়, হায়!

কোন্ অদৃশ্য উত্তরদাতার উদ্দেশে যে কথাগুলি বলে বিনোদা, বুঝতে পারে না গৃহের মালিক। অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে শুধু, যেদিক থেকে কথা ভেসে আসে সেদিকে। বলে,—যাত্রা দেখতে গিছলাম।

কথাটা কি সত্যি?

তাই যদি গিয়ে থাকে, তাতে আর দোষের এমন কি আছে। নিজের মনে ভাবে বিনোদা। আর যাত্রা দেখতে না গিয়ে যদি গিয়ে থাকে অন্য কোথাও। অস্থানে-কুস্থানে? এও মনে হয় বিনোদার, সারা রাত্রি জেগে ব'সে ব'সে যাত্রা দেখবার ছেলে ও নয়। মন থেকে যেন কেমন সায় দেয় না কথাটা। স্বগত করে চাপা-গলায়। বলে,—যাত্রা দেখতে গিছলে না আরও কিছু! জাহান্নমে গিয়েছিলে তা আর আমি জানি না? হায়, হায়, হায়, হায়! কি হবে গো! কোথায় যাবো গো! কোথা থেকে এসে জুটলো এই কুলাঙ্গার?

—মা আসেননি বিনো? ওপরে উঠতে-উঠতে জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর।

—মায়ের সাত পুরুষের কি ভাগ্যি যে খোঁজ পড়লো! মুখ খিঁচিয়ে-খিঁচিয়ে বললে বিনোদা। বললে,—কোন্ মুখে আর আসবেন বল, তোমার মতন রত্ন ছেলে যাঁর? নাঃ, আসেননি। আসবেনও না আর।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মনটা যেন আকুপাকু করে। কুমুদিনীর কুপিত মুখ নয়, হাসি-ভরা মুখ স্নেহময়ী কুমুদিনীর, চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বৈধব্যের দুঃখ-কাতর কথা যেন ভাসতে থাকে কানে। ছেলের শয়ন-ঘরে কুমুদিনীর ছবি আছে একখানা। সধবা অবস্থায় বধূবেশের কুমুদিনী। গায়ে জড়োয়া গয়না, মাথায় হীরার মুকুট আর বেণারসীর গোলাপী ভেল। ওষ্ঠে পবিত্র হাসির মৃদু আভাষ। চোখে সরল দৃষ্টি। রঙীন আবক্ষ তৈলচিত্র কুমুদিনীর। ঘরে ঢুকেই দেখতে পায় ছবিখানা। ছবির তলায় দাঁড়িয়ে দেখে, দেখে তাঁর মাকে—মায়ের যে-রূপ খুব বেশী দিন দেখবার সৌভাগ্য তার হয়নি।

মা কি কাঁদছে! ছবিতে কুমুদিনীর চোখ দু'টো কি অশ্রু-সজল। না, ছবিখানাই ঐ রকম। মনে হয়, মুখে তাঁর হাসির রেখা আর চোখে জলের। দক্ষ শিল্পীর তুলির পরশে যেন জীবন্ত হয়ে আছে।

—ম্যানেজার বাবু দেখা করতে চাইছেন। অনন্তরাম এসে বললে পেছন থেকে।—খুব জরুরী দরকার, এখুনি দেখা করতে চান।

—চল, যাচ্ছি। কিন্তু অনন্তদা, মাকে আনাবার কি ব্যবস্থা হবে? কৃষ্ণকিশোর কথা বলে কেমন যেন বাষ্পরুদ্ধ স্বরে।

খানিক চুপ করে থাকে অনন্তরাম। কুমুদিনীর ছবিখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ছবির দিকে চোখ রেখেই বললে,—তেনাকে আনতে পারে—সাধ্যি কার! তিনি আর আসবেন না। আসবার রাস্তা রাখলে কৈ? কথা বলতে-বলতে অনন্তরামের স্বরও যেন কাঁপতে থাকে। চোখ দু'টো যেন চিক-চিক ক'রে ওঠে। বলে,—আমাকেও ছুটি দিয়ে দাও।

ভৃত্যের কথার কোন উত্তর দেয় না মনিব।

ম্যানেজার বাবু জরুরী প্রয়োজনে ডাকছেন শুনে সদরের দিকে এগোয়। অনেকক্ষণ দেখা পায়নি প্রভুর, টম ছুটতে-ছুটতে আসে কোথা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে চলে। গলার বন্ধনীতে পেতলের ঘণ্টি, ঝম ঝম শব্দ হয় টমের চাঞ্চল্যে।

কাছারীর দালানে অপেক্ষা করছিলেন ম্যানেজার বাবু। মুখখানা যেন তাঁর বিষণ্ণ। চোখের দৃষ্টিতে হতাশা। দুশ্চিন্তার চিহ্ন ফুটেছে তাঁর মুখে। রাত্রে হয়তো ঘুম হয়নি, তাই চোখের তলায় মলিন রেখা। ম্যানেজার বাবু বিজ্ঞ জন, বুঝে নিয়েছেন সকল কিছু। জীবনে তাঁর দেখবার ভাগ্য হয়েছে অনেক কিছু, অভিজ্ঞতার সীমাও তাঁর নেহাৎ অল্প নয়। ইচ্ছা করলে, হুজুরকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার পন্থাও তাঁর জানা আছে, কিন্তু সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর কোথায় থাকবেন তিনি। মাত্র এই ক'দিনের জন্য বাধার সৃষ্টি করে কি ফল হবে!

প্রাঙ্গণের গাছপালা থেকে তখনও বৃষ্টির জল পড়ছিল টুপ-টাপ। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। গাছ আর লতাপাতার সবুজতা বর্ষার জলে ধৌত হয়ে আরও যেন অধিক পরিমাণে স্পষ্ট হয়েছে। ফুটন্ত ফুলের রঙ যেন চোখে পড়ছে অন্য দিনের চেয়ে।

ম্যানেজার বাবু একা নন। আরও কে এক জন বসেছিল কাছারীর দালানের কেদারায়। হুজুরের সাক্ষাৎ পেয়েই বললেন ম্যানেজার বাবু,—গত সন্ধ্যায় আপনার ফিরিঙ্গী বন্ধুটি এসে এই লেফাপাখানা দিয়ে গেছেন। ব'লে গেছেন তাঁদেরই এক জন worker এসে নিয়ে যাবে এটি। Workerটিও এসেছেন। ঐ যে ব'সে আছেন।

ম্যানেজার বাবু কথার শেষে হস্তান্তরিত করেন লেফাফাখানি। কৃষ্ণকিশোর লক্ষ্য ক'রে দেখে workerকে। দেখে যেন চেনা-চেনা মনে হয়। মনে হয় কোথায় যেন দেখেছে। মনে পড়ে নর্ম্মান অরুনেন্দ্রদের হুইং-রুমের বন্ধু-সম্মেলনের একটা সন্ধ্যা।

প্রতীক্ষারত workerটি এগিয়ে আসে কেদারা থেকে উঠে। বলে,—আমার নাম নর্ম্মান জ্ঞজয়েন্দ্র। আলাপ হয়েছিল, মনে নেই তোমার। নর্ম্মান অরুণেন্দ্রর দেওয়া টী-পার্টিতে।

যৌবনের প্রতিমূর্ত্তি যেন। কথার স্বরে তেজস্বিতা। বলিষ্ঠ দেহ, তবুও যেন কত কমনীয়। আকর্ণ চক্ষুর্দ্বয়ে উগ্র দৃষ্টি। গ্রীসীয় ধরণের তীক্ষ্ণ নাসিকা। মাথায় এলবার্ট চুল। খাঁকির সার্ট আর প্যাণ্টলুন পরনে। পায়ে ক্যাম্পের বুট।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—হ্যাঁ, মনে আছে। নর্ম্মান অরুণেন্দ্র কোথায়? এই নাও তার দেওয়া লেফাফা। কি আছে এতে?

অনেকগুলি প্রশ্ন। ম্যানেজার বাবু চলে যাচ্ছিলেন নিজের কামরায়। কামরার কাছাকাছি গিয়ে বললেন,—Secretly বলে গেছেন ফিরিঙ্গীটি, লুধিয়ানায় গেছেন গত রাত্রের ট্রেণে।

হেসে ফেললে নর্ম্মান অজয়েন্দ্র। ফিস-ফিস শব্দে বললে,—না, সেখানে যায়নি। যেখানে গেছে, কেউ জানে না সন্ধান। আমি শুধু জানি। গেছে, ট্রেণে চেপে বম্বে, সেখান থেকে জাহাজের খালাসী সেজে চ'লে যাবে জার্ম্মানী। Arms and ammunition জোগাড় করতে গেছে। ফিরতে বছর খানেক। কিন্তু don't disclose it. কেউ যেন না জানতে পারে। তোমার সঙ্গে তার friendship, তুমি তার জন্তে anxious হবে, only for that reason আমি বললাম। আর এখন জানলেও তাকে ধরা যাবে না। নর্ম্মান অরুণেন্দ্র এখন out of danger zone. আর এই লেফাফাতে আছে কয়েকটা map আর কিছু code. পরে কাজে লাগবে।

কথাগুলি শুনতে শুনতে কৃষ্ণকিশোর বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। কথার শেষে নর্ম্মান অজয়েন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত আরও অপেক্ষা করে। কৃষ্ণকিশোর আর কিছু বলছে না দেখে বলে,—If opportunity comes, আবার দেখা হবে। But don't disclose anything. কেউ যেন না কিছু জানতে পারে ঘুণাক্ষরে।

ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টা বাজতে থাকে ঢং-ঢং। ক'টা বাজে কে জানে। নর্ম্মান অজয়েন্দ্র হাসতে-হাসতে চ'লে যায় লেফাফা পকেটস্থ ক'রে। কৃষ্ণকিশোর শুধু বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। নর্ম্মান অজয়েন্দ্রকে দেখে মনে পড়ে যায় লিলিয়ানকে। অনেক দিন পরে মনে পড়ে। লিলিয়ানের কথা, আর তার মুখাকৃতি। লিলিয়ান আর নেই, এই কথাটিই বাজতে থাকে তার বুকে।

বর্ষা ঋতু। গঙ্গাজলের মত ঘোলাটে রঙ আকাশের। বাদলা পোকা উড়ছে।

চাতকের ঝাঁক উড়ছে আকাশে, অনেক উঁচুতে, এখানে-সেখানে। হিমেল হাওয়া বইছে এলোমেলো। গাছ আর লতাপাতা জড়াজড়ি করছে পরস্পরে। হাওয়ার বেগে হেলছে দুলছে। বর্ষণের অবশিষ্ট চিহ্ন—গাছের পাতা থেকে জল পড়ছে টুপ-টাপ। আর ফুটন্ত ফুলের কত যে রঙীন পাপড়ি খসে পড়ছে! বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে উড়ছে প্রজাপতির মত। [ক্রমশঃ।

কাচ

এই যুগটা প্লাষ্টিকের যুগ বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। অন্ধকার যুগের পর থেকে মানুষের সভ্যতার অনেকগুলি যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রস্তর-যুগ, লৌহ-যুগ, তাম্র-যুগ যেমন ছিল তেমনি কাচেরও একটা যুগ যদি নির্দ্দিষ্ট করা যায় তা হ'লে এমন কিছু অন্যায় হবে না। কাচ ভঙ্গুর হলেও সভ্য মানুষের জীবন যাপনের দৈনন্দিন প্রয়োজনে কাচ অপরিহার্য্য। কাচের গেলাস, বাটি, পেয়ালা, রেকাবী না হ'লে আমাদের চলে না। সব চেয়ে প্রয়োজন যে বস্তু, যার অভাবে আপনি আপনাকে কদাচিৎ দেখতেই পায়েন না, সেই আয়না কাচ বিনা কখনও সৃষ্টি হতেই পারতো না। জলেও মানুষের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু আয়নায় যেমনটি দেখা যায় তেমনটি আর কিছুতেই নয়। ভেবে দেখলে অস্বীকার করতে পারবেন না, কাচ না থাকলে কত অসুবিধায় পড়তে হয়। কাচের শিশিতে দুগ্ধপান শৈশবে প্রায় সকলেই করেন। আবার জীবনের শেষ সময়ে, মৃত্যুক্ষণের পূর্ব্বে কাচের শিশিরই ওষুধ খেতে হয়। তা হ'লে এখন বলা যেতে পারে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত কাচ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে মানুষের সঙ্গে। কাচ অঙ্গেরও সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের, চশমার কথা স্মরণ করুন। কাচের গয়না তো নারীর অঙ্গের ভূষণ।

কাচের সঙ্গে মানুষের পরিচয় যে কত দিনের তার ঐতিহাসিক সময়-নিরূপণ হয়নি এখনও। তবে ইজিপ্টের পিরামিড তৈয়ারীরও পূর্ব্বে কাচ তৈয়ারী করতে শিখেছিল ইজিপ্টের অধিবাসী। সিল্কের মত নরম এক রকমের পদার্থ থেকে কাচ তৈয়ারী হয়, যার নাম সিলিকা বা Silika. সিলিকা বালি থেকে প্রস্তুত হয়। বালি, যা এত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় এবং যার মূল্য এতই কম, যে জন্য কাচেরও মূল্য খুব বেশী হয় না। সর্ব্বসমেত ১,০০০ ধরণের কাচ আছে। বিজ্ঞান কাচের রকম-ফেরে এত আধিক্য কি থেকে করতে পারে? কিন্তু প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ। সিলিকা, সোডা আর চূণই হ'ল কাচ তৈয়ারীর মূল প্রকরণ। তার পর কাচের রঙ হওয়ার কাজ হয়। বিজ্ঞান ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, ভবিষ্যতে ব্যবসা হিসাবে ব্যবহারের জন্য সে ১০,০০০ রকমের কাচ তৈয়ারী করতে পারবে। কাচ সাধারণতঃ ভঙ্গুর, কিন্তু এমন কাচও তৈয়ারী হচ্ছে যা ভাঙ্গে না।

ল্যাবরেটরীর কাজে কাচ অপরিহার্য্য। এ্যাসিড এবং উত্তাপ, যাতে অন্যান্য ধাতু সহজেই গ'লে যায়, কাচ তাদের পরাস্ত করেছে। কাচ শুধু চশমা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, লেন্স, মাইক্রোসকোপও কাচের সৃষ্টি। আলোকচিত্র, সবাক চিত্র, টেলিভিসনও আমরা কাচ না থাকলে দেখতে পেতাম না। টেলিসকোপ না থাকলে ভূমণ্ডল মানুষের চোখে কখনও ধরা পড়তো? আর এদের সবাই কাচেরই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য। চিকিৎসা পদ্ধতিতেও কাচের ব্যবহার অতুলনীয়। অস্ত্রোপচারের ব্যবহার্য্য বস্তুগুলির অনেক কিছুই কাচের। এখন ইউরোপে গানের রেকর্ড কাচ থেকে হ'তে পারে কি না তাই নিয়ে গবেষণা চলেছে। সামরিক প্রয়োজনেও কাচ কাজে লেগেছে। কাচের এক রকম জামা তৈয়ারী হয়েছে, যে জামাতে বুলেটও মাথা গলাতে পারবে না। আর এক রকমের জামা হয়েছে, যা প'রে ০ ডিগ্রী শীতের দেশেও থাকা যায় এবং ৪০ ডিগ্রী উত্তাপ লাভ করা যায়। খাদ্যদ্রব্য, যা অন্য পাত্রে রাখলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কাচের বাক্সে সে-খাবার সহজে নষ্ট হয় না। কাচ থেকে এক ধরণের সার তৈয়ারী হচ্ছে, যার সাহায্যে কৃষিকার্য্যে অদ্ভুত ফল পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিকগণ কাচের ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ দেখছেন। ভবিষ্যতে কাচ মানুষের আরাম, আয়াস এবং সুবিধায় যে আরও কত কাজে লাগবে তার ইয়ত্তা নেই।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

ধড়—শরীর, কায়, দেহ, গাত্র।
ধড়া—জীর্ণবস্ত্র, নেকড়া, কপ্‌নী।
ধন—অর্থ, টাকা, বিত্ত, বিভব।
ধনপতি—কুবের, ধনাধিপতি, ধনী, অর্থবিশিষ্ট, ধনাঢ্য।
ধনাধ্যক্ষ—অর্থরক্ষক, কোষরক্ষক।
ধনার্জ্জন—অর্থোপার্জ্জন, অর্থোপায়চেষ্টা।
ধনিষ্ঠা—ত্রয়োবিংশতি নক্ষত্র।
ধনুঃ—চাপ, নবম রাশি, ধনুক, কার্ম্মুক, শরনিক্ষেপ যন্ত্র।
ধনুর্গুণ—জ্যা, ছিলা, মৌর্ব্বী।
ধনুর্দ্ধর—ধনুর্দ্ধারী, ধনুষ্কী, ধন্বী।
ধনুষ্টঙ্কার—বায়ুরোগবিশেষ, ধনুস্তম্ভ, জ্যাশব্দ।
ধন্দা—ভ্রম, ভ্রান্তি, অন্ধতা, ধাঁধা।
ধন্য—প্রশংসা, শ্লাঘ্য, ভাগ্যবান।
ধন্যবাদ—প্রশংসা, শ্লাঘা, গুণানুবাদ।
ধন্বন্তরি—দেবচিকিৎসক, শিবের নাম।
ধবল—শুক্ল, শুভ্র, শ্বিত্ররোগ।
ধবলী—শ্বেত গাভী।
ধমক—ভয়প্রদর্শক বাক্য, তাড়না।
ধমনী—নাড়ী, শিরা।
ধরণ—গ্রহণ, আকর্ষণ, অবলম্বন।
ধরণীধর—পর্ব্বত, রাজা, ভূপাল।
ধর্ত্তব্য—গ্রাহ্য, মান্য, দণ্ডনীয়, প্রমেয়।
ধর্ম্ম—পুণ্য, ন্যায়, জাতি ব্যবহার।
ধর্ম্মশালা—দানগৃহ, অতিথিশালা।
ধর্ম্মশাস্ত্র—স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণাদি শাস্ত্র।
ধর্ম্মশীল—পুণ্যবান, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মিষ্ঠ, ধর্ম্মাত্মা, পুণ্যাত্মা, সাধু, পুণ্যশীল।
ধর্ম্মাধিকরণ—ব্যবস্থান, বিচারালয়।
ধর্ম্মাধ্যক্ষ—দণ্ডকর্ত্তা, বিচারক।
ধর্ম্ম্য—ন্যায্য, উচিত, যথার্থ।
ধর্ষক—বিক্রমী, সাহসিক, দুরন্ত, গর্ব্বিত।
ধাই—ধাত্রী, উপমাতা, প্রসবকারিণী।
ধাড়িয়া—জলমার্জ্জার, উদ্‌বিড়াল, ধেড়িয়া।
ধাতা—বিধাতা, প্রতিপালক, ব্রহ্মা।
ধাতু—তাম্র-পিত্তলাদি, শুক্র, শ্লেষ্মাদি।
ধাতুপ—অন্নরস, ধাতুপোষক, সারভাগ।
ধান্য—ধান, ব্রীহি, শস্যবিশেষ।
ধান্যশালী—ধানবপনযোগ্য ভূমি।
ধাপ—সোপানের শ্রেণী, ঝম্প।
ধাম—শরীর, গৃহ, বসতিস্থান।
ধার—ঋণ, অস্ত্রাগ্র, তীক্ষ্ণতা, নদীর কূল।
ধারক—ঋণী, ভেদনিবারক ঔষধ।
ধারণ—প্রাপ্ত হওন, গ্রহণ, অবলম্বন।
ধারণা—অধ্যবসায়, মনঃস্থিরতা, বুদ্ধি।
ধারযুক্ত—সুশাণিত, তীক্ষ্ণ, ধারাল।
ধারা—রীতি, ব্যবহার, প্রবাহ, প্রকার।

ধারাধর—মেঘ, জলদ, খড়্গ।
ধারাবাহিক—ধারাবাহী, গতানুগতিক।
ধার্য্য—নিশ্চয়, অবধারিত, আক্রমণীয়।
ধিক—ধিক্কার, অবজ্ঞা-বোধক শব্দ, নিন্দা, তুচ্ছ করা।
ধিমা—ধীর, সাবধান, শান্ত, অলস।
ধী—বুদ্ধি, মতি, ধীরজ জ্ঞান।
ধীবর—মৎস্য-ব্যবসায়ী, কৈবর্ত্ত।
ধীর—সুস্থির, অচঞ্চল, পণ্ডিত, শান্ত।
ধীরে—আস্তে, মনঃস্থৈর্য্য পূর্ব্বক।
ধীসচিব—মন্ত্রী, অমাত্য, মন্ত্রণাদাতা।
ধুওন—বস্ত্রাদি প্রক্ষালন, ধৌতকরণ।
ধুকন—হাঁপান, শ্বাস হওন।
ধুতী—ধুতি, পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র।
ধুম—ব্যগ্রতা, আড়ম্বরী, সমারোহ।
ধুমধাম—ধুমাধুমি, গণ্ডগোল, উপদ্রব।
ধুয়া—গীতের ধ্রুবপদ।
ধুরন্ধর—ভার-বাহক, রথাদির বাহক, যোগ্য, পটুয়া।
ধুনক—ধুনা, বৃক্ষনির্য্যাস, যক্ষধূপ।
ধুনাচি—ধূপদানপাত্র, অঙ্গটা।
ধূপ—সর্জ্জরস, গন্ধবর্ত্তিকা, রৌদ্র।
ধূপিত—সুগন্ধ, বাসিত।
ধূম—ধুঁয়া, বাষ্প, ভাপ।
ধূমকেতু—শিখাবৎ নক্ষত্র-বিশেষ।
ধূম্র—কৃষ্ণরক্তমিশ্রিত বর্ণ, বেগুনিয়া।
ধূর্ত্ত—শঠ, খল, পাশাক্রীড়ক।
ধূলা—ধূলী, শুষ্কসূক্ষ্মমৃত্তিকা, রেণু।
ধূসর—ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, গৃধ্র।
ধৃতি—ধৈর্য্য, সন্তোষ, মনঃস্থৈর্য্য।
ধোওন—মার্জ্জন, ধৌতকরণ, প্রক্ষালন।
ধোকা—ভ্রম, সন্দেহ, মায়া, শঙ্কা।
ধোপা—ধোবা, বস্ত্রক্ষালনজীবী, রজক।
ধৌত—পরিষ্কৃত, শুচীকৃত, প্রক্ষালিত।
ধ্যান—চিন্তা, ভাবনা, যোগ, সমাধি।
ধ্যেয়—ধ্যানযোগ্য, বিবেচনীয়।
ধ্রুব—নিশ্চিত, তারা, বিতর্ক, স্থায়িত্ব।
ধ্বংস—ভ্রংশ, হানি, চ্যুতি, নাশ।
ধ্বজা—ধ্বজী, পতাকা, চিহ্ন, নিদর্শন।
ধ্বজিনী—সৈন্য, উন্নতচিহ্ন, বৃক্ষাদি।
ধ্বনি—শব্দ, রব, স্বর, নাদ, নিনাদ।
ধ্বস্ত—অধঃপতিত, হত, নষ্ট।
ধ্বান্ত—অন্ধকার, তিমির, তমস, আঁধার। [ক্রমশঃ

সম্রাট নেপোলিয়ানের চিঠি

[লোকচরিত্র বিশ্লেষণ ও পারিপার্শ্বিকের সূক্ষ্ম বিচার-নৈপুণ্যই নেপোলিয়ানের জীবনের অভূতপূর্ব সাফল্যের মূল রহস্য। কিন্তু ১৮১২ খৃষ্টাব্দ থেকে এই অতুলনীয় প্রতিভা তাঁর হ্রাস পেতে থাকে। নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করেছিলেন তাঁর বিচক্ষণতম উপদেষ্টাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এবং এই অভিযানে এমন কতকগুলি মারাত্মক ভুল করেছিলেন, যার পরিণাম-ফল হয়েছিল অতি ভয়াবহ। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই এ সব কথা অবগত আছেন। নেপোলিয়ানের জীবন একটি অপূর্ব মানুষের সাফল্যের ইতিহাস কিন্তু প্রাক্-যুগের সে দৃঢ়চিত্ততার অভাব ক্রমশঃ সুপরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল জীবনের শেষ অঙ্কে। তবে শেষ শত দিনে আগেকার নেপোলিয়ানের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেছে—হয়ত এই সময়ই হয়েছে তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ। ওয়াটারলুর যুদ্ধ-পরিকল্পনা অননুকরণীয়। কিন্তু তথাপি ওয়াটারলুর যুদ্ধেই পরাজয় বরণ করে নিতে হয়েছে তাঁকে। ২২শে জুন দ্বিতীয় বার সিংহাসন ত্যাগের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন নেপোলিয়ান। ১ই জুন তিনি নির্বাসিত হন ফ্রান্স থেকে। এর ঠিক চার দিন পরে নীচের এই চিঠিখানি লেখেন ইংলণ্ডের প্রিন্স রিজেণ্টকে। প্রিন্স রিজেণ্ট ইচ্ছা করলেই নেপোলিয়ানকে রক্ষা করতে পারতেন না। নেপোলিয়ানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে লর্ড লিভারপুলের মন্ত্রণা-সংসদে। তাঁরা এমন এক জায়গায় তাঁকে প্রেরণের পরিকল্পনা করেছিলেন যেখান থেকে পলায়ন অসম্ভব। কেপটাউন থেকে সতেরশো মাইল দূরে দক্ষিণ আটলাণ্টিকের সেণ্ট হেলেনা নামক দ্বীপটিই সর্ব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ মনোনীত হোল। নেপোলিয়ানের শেষ দিনগুলি এই নির্জন দ্বীপে স্বজন-স্বদেশ-পরিত্যক্ত অবস্থায় অশেষ অপমান ও দুর্গতির মধ্যে চির অবসান হয়েছে।]

১৩ই জুলাই, ১৮১৫

মহামান্য সম্রাট,

আমি দলাদলি-বিচ্ছিন্ন স্বদেশ আর ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিসমূহের শত্রুতার কোপে পতিত, আমি আমার রাজনৈতিক জীবনের যবনিকাপাত করেছি—থেমিস টোকলসের মত আজ আমিও ব্রিটিশ জনগণের বদান্যতার কৃপাপ্রার্থী। হে মহামান্য সম্রাট! আমার শত্রুদের মধ্যে আপনিই সর্বশক্তিমান, অটল ও মহানুভব—আমি আপনার ন্যায়নিষ্ঠ আইনের ছায়াতলে আশ্রয় ভিক্ষা করছি।

নেপোলিয়ান।

বৈজ্ঞানিকের চিঠি

[মেরী স্ক্লোডোভস্কাকে লেখা পিয়ারে কুরীর চিঠি]

১৪ই অগাষ্ট, ১৮৯৪

তোমার সঙ্গে দেখা করা নিয়ে আর কিছুতেই মনস্থির করে উঠতে পারছিলাম না। একটি দিন গেল শুধু ভাবনায়। যাব নাই—সাব্যস্ত করেছিলাম। কেন জান, তোমার চিঠি পড়ে প্রথম আমার যে অনুভূতি হয়েছিল সে হচ্ছে আমার না যাওয়াই যেন তুমি পছন্দ কর। কিন্তু দ্বিতীয় পাঠে তোমার স্নেহসিক্ত মনের স্পর্শ পেলাম—তোমার সাহচর্যে আমাকে তিনটি দিন কাটাতে দেবে এমন ইংগিতও যেন আছে চিঠিতে। আমি প্রায় চলেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু তক্ষুণি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করার লজ্জাজনক চেতনা অভিভূত করে ফেলল আমাকে। আমার উপস্থিতি হয়ত তোমার বাবার অস্বস্তির কারণ ঘটাতে পারে এবং তোমাদের মিলনের আনন্দ পরিম্লান করে দিতে পারে, এই নিশ্চিত সম্ভাবনায় শেষ পর্যন্ত আমাকে থেকে যেতে বাধ্য করল।

কিন্তু এখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। ভারী দুঃখিত—যাওয়া আর হোল না আমার। যদি তিনটি দিন একসঙ্গে কাটাতে পারতাম আমাদের বন্ধুত্ব কি তাতে আরো নিবিড়তর হোত না? যে দীর্ঘ দুই মাস আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব তার মধ্যে আমরা পরস্পরকে যাতে না ভুলে যাই, তার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি কি থাকত না সেই তিনটি দিনের ঘনিষ্ঠতায়।

তুমি কি ভাগ্য মান? 'Micare me'র (কারনিভ্যাল) দিনটির কথা মনে পড়ে কি? ভিড়ে হঠাৎ তোমায় হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি। ভাবছি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাদের প্রীতি-মধুর সম্পর্কের হঠাৎ হয়ত এই ভাবে ছেদ ঘটবে এক দিন। আমি অদৃষ্ট মানি না। হয়ত এ আমাদের চরিত্রেরই একটা দিক। ঠিক মুহূর্তে ঠিক মতো কাজ করতে কোন দিনই আমি শিখলাম না।

কাজেই তোমাকে তোমার দেশ, তোমার পরিজন-পরিবারবর্গ থেকে নির্বাসিত করে ফ্রান্সে ধরে রাখাই মঙ্গল হবে তোমার পক্ষে। কেন যে এ চিন্তা আমার মাথায় ঢুকেছে জানি না, যদিও এ ত্যাগের উপযুক্ত মূল্য দেবার কিছুই নেই আমার।

তুমি বল, তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন কি? এ কি আত্মপ্রবঞ্চনা নয়? অন্ততঃ হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতির দাস নই কি আমরা? যাদের ভালবাসি তাদের বিচিত্র দাবী-দাওয়ার দাস আমরা। আর জীবিকা অর্জনের জন্য দাসত্ব করতে হবে না কি? আর সেই ভাবে অর্থ-দানবের সেবক হয়ে পড়ব না?

সব চেয়ে বেদনাদায়ক—আমরা যে সমাজের বেড়াজালে বেষ্টিত তার নানা দাবীর কাছে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয় আমাদের। অবশ্য বার-বার ক্ষমতা বা দুর্বলতা অনুযায়ী ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আর এ যদি না করি আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব—যদি বাড়াবাড়ি করি বুঝতে হবে আমরা নীচ এবং ঘৃণায় ভরে উঠবে জীবন। দশ বছর আগে যে নীতির পূজারী ছিলাম আমি, তা থেকে আজ বহু দূরে সরে এসেছি। তখন ভাবতুম, সব বিষয়ে অতিরঞ্জনই বুঝি ভাল এবং পারিপার্শ্বিকের নিকট কিছুতে

...র মানব না এই ছিল প্রতিজ্ঞা। তখন ভাবতুম, নিজের গুণপনা ...মন তেমনি ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েও বাড়াবাড়ি করতে হবে। আগে ...া শুধু শ্রমিকদের মত নীল শার্ট পরতাম। ইত্যাদি।

কাজেই দেখতে পাচ্ছ, বেশ বুড়ো হয়ে পড়েছি। নিজের মনে ...রী দুর্বলতা বোধ করি আজ-কাল। আশা করি, খুব আনন্দে দিন ...টাবে। ইতি—

তোমার অনুরক্ত বন্ধু
পীয়ারে কুরী।

ডি, এইচ, লরেন্সের চিঠি

প্রফেসর ওয়েবার
ইকিং, মিউনিকের সন্নিকট
২রা জুন, ১৯১২

প্রিয় মিসেস্ হপকিন,

যদিও তোমার কাছ থেকে কোন চিঠি পাইনি তবুও আমি তোমাকে চিঠি দিচ্ছি। কারণ তোমার মত জনকে আমি সব সময় সুখবর দিতে চাই। জার্মাণীতে যখন এলাম আমার সঙ্গে ছিল মিসেস···। তার সঙ্গে মেৎসে গিয়েছিলাম। তার স্বামী সবই জানেন, কিন্তু তিনি যে ডাইভোর্সে রাজী হবেন তা মনে হয় না। বিচ্ছেদ হতে পারে। আমাকে যদি তিনি ডাইভোর্সই করেন, তাহলে আমাদের বিয়ে হতে পারে। যাই হোক অবস্থা এখন এই।

গত শুক্রবারে আমি রাইনল্যাণ্ড থেকে মিউনিকে এসেছি। ফ্রিয়েড্ডা মিউনিকে আমার সঙ্গে মিলেছে। সে ইজার উপত্যকার প্রান্তে আমাদের গ্রামের ঠিক পরের গ্রামেই তার বোনের সঙ্গে ছিল। আমরা এক রাত্রি মিউনিকে কাটিয়ে আট দিনের জন্য ব্যুয়ারবের্গে গিয়েছিলাম। ব্যুয়ারবের্গ ইজারের উজানে আল্পসের কাছাকাছি—মিউনিক থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে। এইটিই ব্যাভারিয়ান টাইরল। আমরা গেষ্ট-হাউসে উঠেছিলাম। সকালে ঘন হর্স-চেষ্টনাট গাছের নীচে আমরা প্রাতরাশ খেতাম—লাল আর সাদা ফুল গায়ে টুপটাপ ঝরে পড়ত। বাগানটি ঠিক নদীর উপরেই—নদী দিয়ে কাঠের ভেলা ভেসে যায়। নদীটার নাম লয়সাক্। জলের রং ফিকে সবুজ। গ্লেসিয়ার গলা জল কি না। কিন্তু জল যেমন ঠাণ্ডা তেমনি তার ভীষণ তোড়। এখানকার বাসিন্দারা ব্যাভেরিয়ান। ভারী অদ্ভুত। সরাইখানা, হর্স-চেষ্টনাট-ঘেরা বাগান ছাড়িয়ে—গীর্জা আর মঠ। জায়গাটি খুব নিরিবিলি। একমাত্র গীর্জার গম্বুজের কালো টুপি ছাড়া সারা বাড়ী ধবধবে শাদা রং করা। প্রতিদিন আমরা অনেক—অনেকক্ষণ বাইরে থাকি। আশে-পাশে এত ফুল যে, দেখে আনন্দে চোখে জল এসে যাবে। সবই আলপাইন ফুল। নদীর ধারেও গ্লোব ফ্লাওয়ার বন্যা। এক-একটি যেন ফিকে সোনার বুদবুদ। এদের আমরা নাম দিয়েছি আইবুড়োদের বোতাম। তাছাড়া প্রিমুলাস, কাউসলিপ, ভায়োলেট অর্কিড, হাজার-হাজার ঘণ্টা ফুল, লিলি, লার্কস্পার—খালি ফুল আর ফুল—যেন ফুলের অজস্র উপচানি চারি দিকে। এক দিন এখানকার চাষীদের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। এক দিন পাহাড়েও উঠেছিলাম এবং ফ্রিয়েড্ডার আংটি আমার পায়ের পাতার উপর রেখে পা দু'টো হ্রদের আকাশে সবুজ জলে ডুবিয়ে বসেছিলাম। কেমন দেখায় দেখতে। তার পর এক দিন বোলফ্রাৎ ষ্টেশনেও রেলেও গিয়েছিলাম। সেখানে শাদা গ্রাম ছাড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে ফ্রিয়েড্ডার বোনের বাড়ী আছে। অনেকটা রাখালদের কুঁড়ের মত।

এখন আমি আর ফ্রিয়েড্ডা দু'জনে অধ্যাপক ওয়েবারের ফ্ল্যাটে একা থাকি। সর্বোচ্চ তলায় আমরা আছি। রান্না-ঘর ছাড়া চারখানি ঘর—বেশ ছোট-ছোট। সামনে একটু ঘেরা বারান্দাও আছে। এখানে আমরা বসি, খাই—লিখি। নীচেই রাস্তা—রাস্তায় বলদে-টানা গাড়ীগুলি মাল নিয়ে মন্থর গতিতে চলে। রাস্তা পেরিয়ে গমের ক্ষেতে মেয়েরা কাজ করে। তার পরই বন আর প্রান্তরের মাঝ দিয়ে দুধ-সবুজ নদীর ধারা। আরো দূরে পাহাড়ের শ্রেণী। তাদের চূড়ায় তুষারের ঝলমলানি।

এইমাত্র রান্না-ঘরে গিয়েছিলাম। বেশ চমৎকার ছোট নিরিবিলি স্থান। ভাবলুম, ফ্রিয়েডড কি করছে দেখে আসি। তার মাথাটা তক্ষুনি তাকেতে ঠুকে গিয়েছে। আমরা দু'জনে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাহাড়ের মাথায় কালো মেঘের ওড়না। নিকটতম পর্বতশ্রেণী গাঢ় নীলে আপাদ মস্তক লেপা। এ দুয়ের ফাঁকে-ফাঁকে একটি অপূর্ব সোনালী ছেদ, আবছা অপূর্ব পাহাড়ের জটলা, চূড়ার তুষারে ফিকে সোনার স্বপ্ন—আরো আরো দূরে নিস্তব্ধ তুষারে দৃপ্ত অনন্ত এলোমেলোর রাজ্য। এইবার বজ্রপাত সুরু হয়েছে সেখানে—এখানে নেমেছে বৃষ্টির ধারা।

ফ্রিয়েড্ডাকে আমি খুব ভালবাসি—এ-সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলতে চাই না, আগে কখনো জানতুম না-ভালবাসা কি। সে আমাকে তোমায় চিঠি লিখতে বলেছে। চিরদিন তোমাদের দু'টিতে মিতালি থাকে এই আমি চাই। কোন দিন হয়ত তার—হয়ত আমাদের—প্রয়োজন হবে তোমাকে। সেদিন তুমি আমাদের বুকে তুলে নেবে ত—নেবে না?

অপূর্ব, সুন্দর আর মানুষের কল্পনার অতীত ভাল এ পৃথিবী। প্রেম কি, আগে থেকে ধারণা করা যায় না—না—না! জীবনও মহৎ হতে পারে—দেবতুল্য। হ্যাঁ, হতে পারে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আমি তা প্রমাণ করেছি।

এখানে আমাদের চিঠি লিখতে পার। আমাদের মধুযামিনীর সপ্তাহ শেষ হয়ে গেছে। ভগবান সাক্ষী—সে অপূর্ব। কেমন লেগেছে? খুব ভাল। কাউকে বলো না। এ কেবল ভালদের জানবার। চিঠি লিখো।

ডি· এইচ· লরেন্স।

স্ত্রীকে লেখা ওয়ারেন হেষ্টিংসের চিঠি

[মেরিয়ান ওয়ারেন হেষ্টিংসের দ্বিতীয় স্ত্রী। জাতিতে তিনি জার্মান ছিলেন এবং তাঁর পূর্ব-স্বামীর নাম ব্যারন ইম্‌হফ। একই জাহাজে ভারতে আসার সময় ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত হয় হৃদয় দেওয়া-নেওয়া এবং ভারতে পৌঁছেই পূর্ব বিবাহ বাতিল করে মেরিয়ান হেষ্টিংসের গলায় মাল্য অর্পণ করেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে এই মিলন সংঘটিত হয়।

এক জন ঐতিহাসিক লিখেছেন—"মেরিয়ান দেখতে ছিলেন যেমন অপূর্ব সুন্দরী তেমন তার দেহ-সৌষ্ঠবও ছিল অনুপম।"

মেরিয়ান প্রেমিক হেষ্টিংসের হৃদয়ের কতখানি জুড়ে ছিলেন, তিনি তাঁর অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন মেরিয়ানকে লেখা তাঁর অসংখ্য অনবদ্য পত্রগুচ্ছে।]

কুলপী, রবিবার সন্ধ্যা,
১১ই জানুয়ারী, ১৭৮৪

প্রিয়তমাসু

অন্তরীপ ছেড়ে যাওয়ার আগে মিসেস্ স্যাণ্ডস চিঠিখানা ঠিকমত তোমার হাতে পৌঁছে দিতে পারবেন, এই ভরসায় লিখতে বসেছি। কিন্তু কী-ই বা লেখার আছে। শুধু মনের আবেগ মেটানোর এ চেষ্টা। গত কাল সকালে তোমায় বিদায় জানিয়ে এসেছি। তোমাদের জাহাজ যতক্ষণ না দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে—চেয়েছিলাম জাহাজের দিকে। তার পর দুঃখভারাক্রান্ত একটি দুর্বিসহ দিন অতিক্রান্ত হোল। একটা অসহ্য বেদনা হাতুড়ি পিটেছে মাথার মধ্যে।

বজরায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আবার সুরু হোল নতুন করে দুঃখ-দহনের পালা। কামরা এবং কামরার ভিতরের প্রত্যেকটি জিনিষ মুহূর্তে আমার প্রিয়তমা মেরিয়ানের কথা স্মৃতিপথে জাগরিত করে তুলল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ভীষণতম বাস্তবতায় মন সচেতন হয়ে উঠল যে, আমার মেরিয়ান এখন আমার কাছ থেকে দু'শো মাইল দূরে এবং ক্রমশঃ এমন দূরে যাচ্ছে—অপার ও অসীম যার বিস্তৃতি। এই বেদনাতুর বিরতির অবসরে নিজের করুণ অবস্থার কথাটা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছি এবং এখন (ক্ষমা করো প্রিয়তমে, না বলে পারছি না) তোমায় চলে যেতে সম্মতি দিয়ে অনুশোচনাই হচ্ছে। চরমতম হঠকারিতার কাজ করেছি আমি। এবার কিসেরই বা আশায় পথ চেয়ে বসে থাকব—এ যে যুগ-যুগান্তরের বিরহ। যদি আবার কখনো দেখা হয় কি অর্ঘ্য দেব তোমায়? স্ববিরহের বোঝা আর দীর্ঘ দিনের বিরক্তি-কটু মন। কেবল নিজের কথাই আমি ভাবছি না, যদিও নিজের দুঃখের চিন্তা ও অনুভূতি অনুচিত ভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। তুমিও দুঃখ পাচ্ছ সত্যি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই মুহূর্তে আমার চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট পাচ্ছ তুমি। ভয় হয়, এ না শেষ পর্যন্ত তোমার স্বাস্থ্যের উপর আঘাত হানে। মিঃ ডভটনের মূর্তিকে ভয় করছি। হে ঈশ্বর, সে যেন সুখের খবর আনে। হয়ত বা আমাদের বিচারে ভুল হচ্ছে। প্রায়ই মনে হয়েছে হয়ত আমারই ভুল। তোমায় ফিরে আসতে বলব না এই প্রতিজ্ঞায় অটল থাকার জন্য সব কিছু প্রয়াস করছি। এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মত্যাগে গর্বও অনুভব করছি মনে…

মিসেস্ স্যাণ্ডস্ যাতে চিঠিখানা অন্তরীপের মুখে তোমার হাতে পৌঁছে দিতে পারে সেই সম্ভাবনার কথা বার বার আবৃত্তি করছি। স্যাণ্ডস্ এখন দিনেমার জাহাজে। জাহাজখানা এখানে নোঙর করে আছে—আগামী বৃহস্পতিবার নদী ছেড়ে যাবে আশা করছি। সম্ভবতঃ দেরীও হতে পারে। সহর থেকে আর একখানা চিঠি পাঠাব। রাতের জোয়ারের সঙ্গে আবার যাত্রা সুরু করব। যদি একবার কলকাতার কাছাকাছি পৌঁছতে পারি তাহলে আগামী কাল কালছোরায় যাত্রার পরিসমাপ্তি করব মনস্থ করেছি। এই বিরক্তিকর পারিপার্শ্বিক ছেড়ে এলে আমায় আশংকা হয়ত তত বিষাদময় নাও হতে পারে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত যে, সময় বা স্বভাব কোন কিছুই তোমার মূর্তিখানি আমার হৃদয়-পট থেকে মুছে ফেলতে পারবে না, আর আমি মুছতেও দেব না যদিও চিরকালের জন্য এক বেদনাময় স্মৃতি হয়ে থাকবে।

গত কাল যখন অর্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় শুয়েছিলাম হঠাৎ কেমন যেন মনে হোল, তোমার চম্পক আঙুল আমার মুখে-ঘাড়ে বুলিয়ে দিচ্ছ—তোমার গলার স্বরও শুনেছি হলফ করে বলতে পারি। হায়! যখন শোব এই মায়া-মরীচিকা যদি সত্য হোত! আর বাস্তবিকই আমার কাছে মায়া-মরীচিকার মত। কাল সকালে আমার প্রিয় মানুষটিকে বক্ষে জড়িয়ে ধরেছিলাম আর এখন যে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন—যেন তার অস্তিত্বই ছিল না কোন দিন। হায় মেরিয়ান, আমার মত এত বড় হতভাগ্য আর কে আছে! তুমি যখন এই চিঠি পড়বে তোমারও আমার মত অবস্থা হবে। তবুও কেন জানি না, চিঠিখানা পাঠাতেই হবে—যা লিখেছি তাকে লঘু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার নিজের জীবনের অধিক ভালবাসি তোমায়। তোমার সঙ্গে আবার মিলনের সম্ভাবনায় প্রাণ ধরে রাখব। হে ভগবান! পূর্ণ কর আমার এ কামনা। এই বিচ্ছেদ আমার মেরিয়ান যেন বহন করতে পারে—তাকে নিরাপদে সুস্থ দেহে গন্তব্যে পৌঁছে দিও—আবার যেন ফিরে পাই তাকে—ফিরে পাই সব কিছুকে যা আমাদের সুখ-মিলনকে সম্পূর্ণ করে তুলবে। শান্তি! শান্তি! শান্তি! ইতি—

তোমার চিরানুরক্ত
ও, হেষ্টিংস।

পুনঃ—মিস্ টিটির (টাউচেট) সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভাল আছে সে। তোমার প্রিয় বন্ধুকে আমার ভালবাসা দিও। বিদায়।

[ইণ্ডিয়া গেজেটের সংবাদ মতে ২রা জানুয়ারী গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁর স্ত্রীকে জাহাজে তুলে দেওয়ার জন্য কেডগেরী পর্যন্ত স্ত্রীর অনুগমন করেছিলেন। সেখান থেকে মিসেস্ হেষ্টিংস "এ্যাটলাস" নামক জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। হেষ্টিংস-দম্পতীর প্রেম ও ভালবাসা তদানীন্তন কালের গল্প-কথার বিষয়-বস্তু ছিল।

কুলপী—যেখান থেকে চিঠিখানা লেখা হয়েছে কলিকাতা থেকে ৪৮ মাইল ভাটিতে। এখান থেকে ডায়মণ্ড হারবার সাত মাইল দূরে। ডায়মণ্ড হারবার থেকে কলিকাতাগামী লোকেরা বজরায় উঠত এবং স্বদেশগামী যাত্রীরা জাহাজ ধরত। ডায়মণ্ড হারবার থেকে কুড়ি মাইল ভাটিতে বিপরীত তীরে এ্যাটলাস জাহাজটি নোঙর করেছিল।

মিঃ ডভটন সম্বন্ধে যত দূর জানা যায় তিনি হেষ্টিংসের পার্শ্বচর হত পারেন আবার ডঃ বাস্টীডের মতে ডাকের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হতে পারেন।

মিসেস্ স্যাণ্ডস্—হেষ্টিংসের পার্শ্বচর ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডসের স্ত্রী মহিলাটি মিসেস্ হেষ্টিংসের প্রতি গভীর অনুরক্তা ছিলেন।]

ডক্টর জনসনের

[জেমস বসওয়েল ছিলেন ডক্টর জনসনের প্রধান সহচর জনসনের যে জীবনী বসওয়েল রচনা ক'রে গেছেন তা জীবনী রচনা ইতিহাসে বিস্ময়কর সৃষ্টি। বসওয়েল টাকা ধার ক'রে একবার জনসনে সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ফলে জনসন দারিদ্র্য এবং অর্থহীন সম্পর্কে এই পত্র রচনা ক'রে পাঠান, তারিখ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ।]

মিঃ জেমস বসওয়েল সমীপে :

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি এখানে আসায় আমরা যতো আনন্দই পেয়ে থাকি ন কেন, ধার ক'রে পাথের সংগ্রহের ব্যাপারটা কী ক'রে সমর্থন কর ভেবে পাচ্ছি না। ঋণগ্রহণ শুধু যে একটা অসুবিধাজনক অভ্যা তা-ই নয়, বিপজ্জনকও বটে। ভালো কাজ করার ক্ষমতা দারিদ্র কেড়ে নেয়, মন্দকে প্রতিরোধ করার নৈতিক এবং স্বাভাবি প্রবণতারও এমন হানি ঘটায় যে, সাধ্য মতো দারিদ্র্য এড়িয়ে চলা উচিত। হীনবিত্ত একটি লোকের কথা ভেবে দেখুন, বংশমর্যাদা সে যতোই অভিজাত হোক না কেন, বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারে তা যতোই সুনাম থাক না কেন, কী করতে পারে সে? কোন মন্দে প্রতিরোধ করতে পারে? সে যে সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করতে পা না—এ তো জানা কথাই; কারণ তার সামর্থ্য নেই। সম্ভবত তা উপদেশ কিম্বা সতর্কবাণী কার্যকরী হতে পারে; কিন্তু দারিদ্র্যই তা প্রতিপত্তি নষ্ট ক'রে দেবে। সে যে বিজ্ঞ, এ কথা যত জন জানবে তা চেয়ে অনেক বেশি লোক জানবে সে বিত্তহীন। যে বুদ্ধি সে নিজে মঙ্গলেই নিয়োজিত করতে পারল না, ক'জন তার মর্যাদা দেবে? ঋণী শোচনীয় আত্ম-যন্ত্রণার কথা বাদই দিলাম, এ তো প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। অর্থের গুণ ব্যাখ্যানা করার দরকার করে না এই কথাটা শুধু মনে রাখবেন যে, ব্যয় করার মতো অর্থ যাঁর আছে অন্যের উপকার করা তাঁরই সাধ্যায়ত্ত, আর যে কোনো সৎ ব্যক্তি তো পরোপকারের জন্য উৎসুক হবেন। ভবদীয়

স্যামুয়েল জনসন

ডক্টর জনসনের চিঠি : লর্ড চেষ্টারফিল্ডকে

[ডক্টর জনসনের বিখ্যাত অভিধান প্রকাশিত হবার কিছু আগে চেষ্টারফিল্ড 'দি ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন। চেষ্টারফিল্ডের ইচ্ছে ছিল, জনসন বইটি তাঁর নামেই উৎসর্গ করেন। তখনকার কালে বদান্য ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থাদি প্রকাশিত হত এবং তাঁদেরই সেই সব গ্রন্থ উৎসর্গ করা হত। জনসনও প্রথমে চেষ্টারফিল্ডের অনুগ্রহপ্রত্যাশী হয়েছিলেন। কিন্তু দশ পাউণ্ড মাত্র সাহায্য করা ছাড়া চেষ্টারফিল্ড আর কোনো উৎসাহ প্রকাশ করেননি। অসীম দুঃখ-কষ্ট বরণ ক'রে জনসনকে কাজ চালাতে হয়েছে, স্ত্রীর মৃত্যুর ফলে পৃথিবীতে তিনি আরো একা হয়ে পড়েছেন; কেউ সাহায্য করেনি, কোনো উৎসাহ কারো কাছে পাননি। চেষ্টারফিল্ডকে লেখা এই চিঠিতে জনসনের ক্ষোভ মূর্ত হয়ে উঠেছে, বিদ্রূপের কশাঘাতে তদানীন্তন অবিবেচক অভিজাত কুলের প্রতিনিধি চেষ্টারফিল্ডকে তিনি সচেতন ক'রে দিয়েছেন যে, লেখকদেরও মর্যাদা এবং সম্ভ্রম আছে, তাঁরা বিত্তবানদের ক্রীড়নক নন। সাহিত্যের ইতিহাসে চিঠিখানি অমূল্য।]

একবার এদিকে একটু দেখুন তো মিসেস সেন,"—
়িহার্সেলের কর্তা তাঁর সমস্যা বিবৃত করে জিজ্ঞাসা
়রছেন, "এখন কী করা যায় বলো তো মলী
়াসি"—মেয়েদের সাজ-পোষাকের ভার যে মহিলার
়িনি অকপটে স্বীকার করছেন, "মলী ভাই, তুই
়েখিয়ে না দিলে আর চলছে না।"

বিস্ময়কর মলী সেনের তৎপরতা। পার্ট মুখস্ত
়রছেন, গানের সুর শিখছেন, নিজ ভূমিকা
রিহার্সেল দিচ্ছেন। এসবের মধ্যেই আবার
়্রাইভারকে ডেকে নির্দেশ দিচ্ছেন,

"সুখদেও, রিজেন্ট পার্কমে দত্ত সাবকে কোঠীমে
়াড়ি লে যাও, বড়ী মিসিবাবা আয়েঙ্গী। উসকে
়পিছে লেক প্লেস—যাঁহা পরশু গয়ে থে, মালুম
়্যায়? হ্যাঁ, পীলা মকান। বঁহাসে দো মেমসাব
়আনেওয়ালী হ্যায়। বড়ে গাড়িঠো লে জানা।"
়াউজের বুকের কাছে ক্লিপ আঁটা ফাউণ্টেন পেন
়ুলে নিয়ে চিঠি সই করছেন, কোনোটা ইলেকট্রিক
়কোম্পানীতে অভিনয়ের রাত্রে অধিক বিজলী
়সরবরাহের জন্য, কোনোটা কর্পোরেশানে প্রমোদকর
়বিভাগে, কোনোটা বা লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের
কাছে—অভিনয়ের আনুষ্ঠানিক অনুমতি প্রার্থনা।
কখনও বা আর্ট ডিরেক্টারের সঙ্গে দৃশ্য-সজ্জার
পরামর্শ করছেম, টেলীফোনে মার্কেটে ফুলের অর্ডার
দিচ্ছেন, পরিচিত পদস্থ ব্যক্তিদের ফর্দ্দ করে দিচ্ছেন
টিকেট বিক্রেতাদের সুবিধার্থে। তাঁর উদ্যম ও
কর্মশক্তি বহু পুরুষের পক্ষেও অনুকরণীয়।

ক্লাব, এসোশিয়েশান প্রভৃতি বহুজনের ব্যাপারে
মাঝে মাঝে মতদ্বৈধ ঘটে সে কথা সুবিদিত। কোন
কোন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মতানৈক্যের বীজ পরিণামে বৃহৎ
কলহের বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। বন্ধু-বিচ্ছেদ
ও আত্মীয়বিরোধ ঘটে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।
মলী সেন এ ধরণের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিবারণের
কৌশল জানেন। বিবদমান দুই পক্ষের মাঝখানে
কেমন করে তিনি স্নিগ্ধ হাসি ও সরল কথোপকথনের
যাদু বিস্তার করেন তা রীতিমতো গবেষণার ব্যাপার।
ঝড়ের রাতে পাকা মাঝি যেমন ঢেউএর আঘাত
বাঁচিয়ে অনায়াসে তরণী তীরে নিয়ে আসে তিনিও
তেমনই পরম নৈপুণ্যের সঙ্গে অপ্রিয় আলোচনার
শঙ্কাজনক ঘূর্ণাবর্ত্ত থেকে বন্ধুজনের পারস্পরিক
প্রীতির সম্পর্ককে উদ্ধার ও রক্ষা করেন। মলী
সেনের যারা সুহৃদ, আর কিছু না হোক, অন্ততঃ
এই একটি কারণেই তাঁর কাছে তাদের কৃতজ্ঞ থাকা

উচিত। কে না জানে যে, জগতে বন্ধুত্ব লাভ করা কঠিন, রক্ষা করা কঠিনতর।

আপাত-বিরোধী মতবাদের সমন্বয় সাধনেও মলী সেনের কৃতিত্ব বহুবার বহু লোককে চমৎকৃত করেছে। মলী সেনের চিন্তা ও ভাষণে গভীর জ্ঞানের পরিচয় নেই। কেউ প্রত্যাশাও করে না। কিন্তু তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধি,—ইংরেজীতে যাকে বলে কমন সেন্স—তার প্রমাণ আছে। সেইটেই যথেষ্ট।

অবশ্য অভিনয়ের পূর্ব্বে প্রেক্ষাগৃহে একটি আনুষ্ঠানিক সভার আয়োজনের প্রস্তাবটা মলী সেনের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। কিন্তু সেটাকে কী করে যথোচিত গুরুত্ব দান করা যায় তার সমুদয় পরবর্ত্তী পরিকল্পনা তাঁরই। দেশনেতা সত্যসিন্ধু বাবুকে সভাপতি করার বুদ্ধি যেমন তাঁর, বহু জটিল রাজনৈতিক সমস্যায় সদাব্যস্ত জননেতাকে একটা সাধারণ সাহায্য রজনীর আসরে দীর্ঘ তিন ঘণ্টাকাল উপস্থিত থাকা ও বক্তৃতাদানে সম্মত করার সাফল্যও তাঁরই। ঐকান্তিক দেশসেবা ত্যাগ ও দুঃখবরণের দ্বারা সত্যসিন্ধু দেশের জনগণের মনে এমন একটি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত যে, তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত যে-কোন অনুষ্ঠান সর্ব্বদাই সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ, এই একটি মাত্র ব্যবস্থা দ্বারা মলী সেনদের অভিনয় অন্যান্য সমশ্রেণীর উদ্যোক্তাদের ঈর্ষাযোগ্য বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করেছে।

ঐখানেই শেষ নয়, দৈনিক বিশ্ববন্ধু পত্রিকার সম্পাদককে আমন্ত্রণ করা হয়েছে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে। প্রতি সপ্তাহেই তিনি শহর ও শহরতলীর একাধিক সভা সমিতির হয় সভাপতিত্ব নয় তো উদ্বোধন করে থাকেন। সে সকল সভার আলোচ্য বিষয় যেমন বিভিন্ন, উদ্যোক্তা এবং শ্রোতারাও তেমনি নানা শ্রেণীর। ছাত্রদের রবীন্দ্র জয়ন্তী, বৃদ্ধদের বৈষ্ণব সম্মেলন, তরুণদের সাহিত্য সভা, হ্যানিম্যান স্মৃতি বার্ষিকী, পঞ্জিকা সংস্কার বা নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সমিতির অধিবেশন প্রভৃতি সর্ব্বত্র তাঁর সমান গতিবিধি, প্রত্যেকটিতে তাঁর সমান ওজস্বিনী বক্তৃতা। সভার উদ্যোক্তারা খুবই খুশি হয়। সারগর্ভ ভাষণের জন্য নয়, প্রচারসাফল্যের জন্য। পরদিন সম্পাদকের নিজ কাগজে ডবল কলাম হেডিংএ বক্তৃতার সঙ্গে সভার যে সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়, সেটা যথাস্থানে ছাপা হলে কলাম ইঞ্চি দরে স্থূল অঙ্কের বিল মেটাতে হতো। তাতে উদ্যোক্তাগণের হৃদরোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মুস্কিল এই যে, সংবাদপত্র জগতে বিশ্ববন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী আছে এবং তার সম্পাদকেরও অনুরাগী লোকের অভাব নেই। ফলে সভাপতির আসন নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিরোধী দলের মুখপাত্র বলল, "বিশ্ববন্ধু সম্পাদককে ডাকা ভুল হয়েছে।"

অপর পক্ষ তা মানতে রাজী নয়। তাদের জবাব,—"ভুল যে নয় তা বুঝতে পারবে অভিনয়ের পরদিন সকালের বিশ্ববন্ধু দেখলে।"

"সে সঙ্গে 'নবীন ভারতটা'ও দেখবো তো? বিশ্ববন্ধু যেমন ফলাও করে বিবরণ ছাপবে, নবীন ভারত তেমনি তার নামটুকুও উল্লেখ করবে না।"

"কেন? তাদের রিপোর্টারকে কম্প্লিমেণ্টারী টিকিট দিই নি?"

"ওঃ, তা হলে আর কি? একেবারে নবীন ভারতের মাথা কিনে বসে আছ! রিপোর্টারদের ডেকে কী হয়? তাদের রিপোর্ট তো হবে চার পাঁচ লাইন। কাগজের এক কোণে স্থানীয় সংবাদ বা আবহাওয়া খবরের নীচে ছাপা হবে। কারও চোখেও পড়বে না।"

"তা হলে আর কি করা যাবে? নবীন ভারতে না হয় নাই বেরুবে।"

"না-ই বেরুবে? নবীন ভারতের সার্কুলেশান কত জানো?"

বিশ্ববন্ধুর বন্ধু ব্যঙ্গস্বরে বলল, "সার্কুলেশান যাই হোক, পাঠক কারা? নবীন ভারত তো বেশী কেনে শুনেছি দোকানীরা। পৃষ্ঠা সংখ্যা বেশী, পরের দিন প্যাকেট বাঁধার কাজে লাগে।"

"আর তোমার বিশ্ববন্ধুর বিক্রী বুঝি সব বিশ্ববিদ্যালয়ে?"

"নবীন ভারতের সম্পাদককেই আমাদের অনুষ্ঠানে ডাকা উচিত ছিল এ কথা আমি হাজার বার বলবো, তাতে মিসেস সেন খুশি হোন আর নাই হোন।"—বলে নবীন ভারত-সেবক মলী সেনের পানে তাকালো।

মলী সেন বললেন, "আমি একটুও অখুশি হইনি, সতীশ বাবু। আমাদের এ সব ব্যাপারে যত বেশী পত্রিকার সহায়তা পাওয়া যায় ততোই

ভালো। পাবলিকের কাজে পাবলিকের সহানুভূতি না পেলে চলবে কেন? আর প্রেস পাবলিসিটি না হলে কি আজকাল লোকের সমর্থন মেলে? বিশ্ববন্ধুর সম্পাদককে ডাকা হয়েছে, হয়েছে। 'নবীন ভারতের' সম্পাদককেও ডাকলে ক্ষতি কি?"

ক্ষতি নেই। কিন্তু অসুবিধা আছে। সম্পাদকেরা তো একজন সাধারণ শ্রোতা বা দর্শক হিসাবে সভা সমিতিতে আসতে পারেন না। বিশেষতঃ এক সম্পাদক যে সভায় বিশেষ একটি অনুষ্ঠান সম্পাদনের মর্য্যাদা নিয়ে আসছেন তাতে অপর সম্পাদকের নিষ্ক্রিয় উপস্থিতি কল্পনা করাও অসম্ভব। অথচ একই সভার দু'জন উদ্বোধনকর্ত্তাও সম্ভব নয়। গৌরবে বহুবচন ব্যাকরণে আছে বটে, জীবিত ব্যক্তির বেলায় তো তা হওয়ার উপায় নেই।

মলী সেনই মীমাংসা করলেন সমস্যা'র। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী বিশ্ববন্ধুর সম্পাদক করবেন উদ্বোধন। নবীন ভারতের সম্পাদককেও আমন্ত্রণ করা হলো। তিনি হবেন প্রধান অতিথি—গেষ্ট ইন চীফ। চমৎকার!

আজকের দিনে অবশ্য এতে কিছুমাত্র মৌলিকতা নেই। হামেশাই হচ্ছে। কিন্তু সেদিন এটাকে অনায়াসেই ব্রেণ-ওয়েভ বলা যেতে পারতো। আশা করি, বাংলা দেশের সভা সমিতির উপরে পাণ্ডিত্যপূর্ণ থিসিস্ লিখে ভাবী কালে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট লাভ করবেন তিনি প্রধান অতিথির প্রথম উদ্ভাবক হিসাবে মলী সেনকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

মলী সেন পুনরায় হাতের ঘড়ির পানে তাকালেন। আর বিলম্ব করা অনুচিত। উঠে শয্যার পার্শ্ববর্ত্তী সাইড টেবিল থেকে হ্যাণ্ডব্যাগটি নিলেন। জীপ্ ফাসনারটা টেনে খুলে ব্যাগের ভিতর থেকে চাবির রিংটা বের করলেন।

ঘরের একপাশে সারিবন্দী গোটা চারেক আলমারী। একটার দরজায় বৃহদাকার আয়না বসানো যাতে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করা চলে। বাকীগুলি কাঠের। তাদের চাকচিক্যে এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে কিছুদিন মাত্র আগে কেনা হয়েছে। কাছে গেলে প্রায় মুখ দেখা যায়, গালা পালিশের গন্ধ আসে।

মলী সেন আলমারীর দরজা খুলে ভিতরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। পর-পর চারটে তাক। প্রত্যেকটাতে একটির উপরে একটি করে ভাঁজ করা শাড়ির স্তূপ। লাল, নীল, হলদে, সবুজ, পিঙ্ক, মেরুণ, হাল্কা, গাঢ় নানা রঙ্গ। ইন্দ্রধনুতেও এত বর্ণ আছে কি?

মলী সেন প্রথমে একটা শাড়ি টেনে বার করলেন। না, এটা বড় বেশী জমকালো। মনে হবে যেন বৌভাতের নিমন্ত্রণে যাচ্ছি। রেখে দিলেন। আর একটা নিলেন। মনে পড়লো গত সপ্তাহে এটা পরে দোসানীদের পার্টিতে গিয়েছিলেন। দোসানীর স্ত্রী আজ আসবে। ভাববে, শাড়ি তো নয় ইউনিয়ন জ্যাক। আলমারী বন্ধ করলেন।

পাশেরটা খুললেন। এটাতে বেশীর ভাগ টিস্যু শাড়ি। ভাঁজ করে রাখলে পাছে পাট নষ্ট হয়, তাই দীর্ঘ কাঠের সরু রোলারে জড়ানো শাড়ি একটির পর একটি আলমারীর দু'পাশে খাঁজ কাটা ব্র্যাকেটে রক্ষিত। না, এর একটাও আজকের অনুষ্ঠানে পরিধানযোগ্য নয়। প্রায় খুলতে খুলতেই বন্ধ করলেন আলমারীর কপাট।

তৃতীয় আলমারীতে স্তূপীকৃত বিভিন্ন বর্ণের মহার্ঘ বসনের মধ্যে যে বস্ত্রটির প্রতি মলী সেনের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হলো, সেটি মহীশূর সিল্কের একখানা ছাপা শাড়ি। আসমানী রং-এর জমি, তাতে গাঢ় নীল রঙ্গের পদ্ম ছাপ। বছর দুই পূর্ব্বে এগজিবিশানে সখ করে কিনেছিলেন। পরদিন সেটা পরিধান করে এক চা-এর মজলিশে গেলেন। হায়, সেখানে ব্যারিষ্টার পি, সি, চৌধুরীর স্ত্রী বান্ধবী সুরুচিকে দেখলেন প্রায় হুবহু ঐ রকম শাড়িতে। এক রং, এক ছাপ, একই ডিজাইন।

বিরক্তির আর অবধি রইল না। অপদার্থ মেয়ে কোথাকার। একটা শাড়ি নির্ব্বাচনের ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত নেই। পরের রুচি ধার না করলে চলে না যাদের তাদের আবার সাজ করার সখ কেন? মলী সেন যা কিনবেন, যা পরবেন, তাই নকল করা চাই। আর কী বুদ্ধি! সবাইকে যে সব জিনিষ মানায় না সেটুকু বুঝবার মতো কাণ্ডজ্ঞান পর্য্যন্ত নেই। ঐ তো কালো চেহারা, তাতে নীল শাড়ি, দেখাচ্ছে যেন মোটর গাড়ির ব্লু-বুক।

শাড়ি বিক্রেতার প্রতিও ক্রুদ্ধ হলেন। এদের কি সামান্য ব্যবসায় জ্ঞানও নেই। একই রকমের

পঞ্চাশখানা সিল্কের শাড়ি তৈরী করলে সে শাড়ি কিনবে কে? এ কি খাটাউ বা ক্যালিকো মিলের ধুতি যে গাঁট হিসাবে আমদানী আর জোড়া হিসাবে বিক্রী?

মলী সেনের কাছে সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা একেবারে ব্যর্থ মনে হলো, চা এর পেয়ালা বিস্বাদ লাগলো। বাড়ি ফিরে এসে সেই যে আলমারীতে তুলেছেন শাড়িটা আর কখনও পরেননি।

সবগুলি তাকের উপর থেকে নীচু পর্য্যন্ত একবার দ্রুত দৃষ্টি চালনা করলেন মলী সেন, তারপর একখানা বেছে নিয়ে রাখলেন আলনায়। ব্লাউজের ওয়ার ড্রোব থেকে বের করলেন শাড়ির সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত জামা, দেরাজ থেকে পেটিকোট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছদ।

হাতের ঘড়িটা টিপাইর উপরে রাখলেন। ঢেউ-খেলানো কালো সেলুলয়েডের কাঁটাগুলি খোঁপা থেকে একে একে খুলে রাখলেন ড্রেসিং টেবিলে। চুলের রঙীন ফিতাটা ফেলে দিলেন ময়লা জামা-কাপড়ের বাস্কেটে।

স্নানাগারে প্রবেশোদ্যোগ করছেন এমন সময় যে মেয়েটি এসে ঘরে ঢুকলো তার নাম সুধীরা, যদিও বেশীর ভাগ লোকই সংক্ষেপে ডাকে ধীরা। সম্পর্কে মলী সেনের ভাগিনেয়ী। শিবতোষের এক মামাতো বোনের মেয়ে। গত বৎসর ম্যাট্রিক পাশ করে বেথুনে ভর্ত্তি হয়েছে। তাকে ফর্সা বলা কঠিন, দেহ-সৌষ্ঠবেও নিখুঁত নয়। কিন্তু মুখে বুদ্ধিদীপ্ত এমন একটি স্নিগ্ধ লাবণ্যের আভাষ আছে যা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রূপ না থেকেও রমণী যে রমণীয়া হতে পারে ধীরা তারই দৃষ্টান্ত।

মেয়েটি মলী সেনের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। স্কুলে নীচের ক্লাসের ছাত্রদের প্রায় প্রত্যেকেরই একজন আদর্শ হিরো থাকে। কারো বিদ্যাসাগর, কারো নেতাজী, কারো বা ফুটবলার কিম্বা সিনেমা স্টার। ধীরার আছে মলী সেন। তার কলেজের সহপাঠিনী থেকে সুরু করে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে মলী মামিমার রূপ, গুণ, শিক্ষা ও বুদ্ধির সবিস্তারিত বিবরণ অন্ততঃ বার কয়েক শোনেনি। অনুরাগ ও অনুসরণের বিচারে তা প্রায় ভক্তের পর্য্যায়ে পড়ে। বৃহৎ বিষয়ের সঙ্গে ক্ষুদ্রের তুলনা যদি ক্ষমার্হ হয় তবে বলা যেতে পাবে,—বুদ্ধদেবের যেমন আনন্দ, মহাত্মা গান্ধীর যেমন বিনোবা ভাবে, মলী সেনের তেমনি ধীরা। মলী সেনের সাজসজ্জা, রুচি, মতামত, এমন কি কথা বলা থেকে সুরু করে চলার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত ধীরা অনুকরণ করে থাকে। কোনো কাজে গভীর মনোনিবেশকালে গলার সূক্ষ্ম স্বর্ণহারটি দুই ওষ্ঠাধরের মধ্যে চেপে ধরার অভ্যাস আছে মলী সেনের। মাতুলানীর এই মুদ্রাদোষটি পর্য্যন্ত ভাগিনেয়ীর চরিত্রে সযত্ন চেষ্টা দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রীতিটা উভয়তঃ। মলী সেনও ধীরাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। শনিবারে কলেজের শেষে প্রায়ই নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখেন। সোমবারে গাড়ী দিয়ে আবার কলেজে পৌঁছে দেন। দু' একটা পার্টি, পিকনিকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যান। পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ কোনো ব্যক্তি সঙ্গে না থাকলে দু'একবার সিনেমায়ও নিয়ে গেছেন। জামা, জুতা, সেন্ট প্রভৃতি উপহার দেন যখন তখন।

কতবার শাড়ি কিনতে গেছেন মার্কেটে। নিজের জন্য। সঙ্গে ছিল ধীরা। সে বলেছে "এই শাড়িটা চমৎকার, এটা কেন মামিমা।"

মলী সেন জিজ্ঞাসা করেছেন, "এটা তোর কাছে ভালো লাগছে? আচ্ছা বেশ তোর জন্যে নিচ্ছি।"

ধীরা অপ্রতিভ হয়ে বলেছে, "না, না, আমার জন্য নয়; তোমার জন্য কিনতে বলছি।"

"আচ্ছা আপাততঃ তোর জন্যেই কিনছি, আমাকে না হয় দু' একদিন ধার দিস্ পরতে।"

ধীরা মনের চাঞ্চল্য যথাসাধ্য দমন করে বলেছে "বা রে, তোমাকে যে-শাড়িতে মানায়, আমার গায়ে তা কেমন দেখাবে?"

"খুব খাশা দেখাবে। নে বাড়ি গিয়ে আবার মাকে যেন দেখাসনে। সে আমাকে কষে বকুনি দেবে।"

সেটা মোটেই সত্য নয়। বকুনি ধীরার মা দেন না। ধীরার বাবা দু' একবার মৃদু স্বরে আপত্তি করেছেন স্ত্রীর কাছে। বৌঠান বড় মানুষ, টাকার ছড়াছড়ি। কিন্তু আমাদের কি এতটা নেওয়া ঠিক? পূজা-পার্ব্বণে ভালোবেসে দু' একটা উপহার দেন সে এক কথা আর ফি মাসেই শাড়ি দিচ্ছেন, জামা দিচ্ছেন সে অন্য ব্যাপার। শিবুদা'ই বা কী ভাবছেন কে জানে?"

মেয়ের মা সে কথায় কান দেননি, তিনি মেয়েমানুষ, সংসারিক বুদ্ধি স্বভাবতঃই প্রখর। ধীরাকে মলী সেন স্নেহ করে, সে তো লাভেরই কথা। এই তো আরো কত মেয়েরা কলেজে পড়ে। তাদের মায়েরা দুঃখ করে বলে, খরচের আর পার নেই, মেয়ের জামা-কাপড়ের নিত্য নতুন ফ্যাশানের দায়ে প্রাণ যাওয়ার দাখিল। আর ধীরার জন্য আজ পর্য্যন্ত তাকে কখনও ভাবতে হয়েছে? নতুন উপহারের কথা ছেড়েই দাও। মলী সেনের নিজের ব্যবহৃত শাড়িই কি ধীরাকে তিনি কম দিয়েছেন? কি মাসেই নতুন শাড়ি কেনা মলী সেনের একটা ফ্যাশান, যেমন কি সপ্তাহে সিনেমায় যাওয়া শনিবারে ও রবিবারে! অথচ একটা শাড়ি কয়েকবার পরিধানের পরই আর আকর্ষণ থাকে না তার প্রতি। ধীরাকে দিয়ে দেন। ধীরা না নিলে নিশ্চয়ই অন্য কাউকে দিতেন। আলমারী বোঝাই করে আর কতদিন রাখতে পারতেন? তা'ছাড়া ধীরার বিয়ের কথাটাও তো একবার ভাবতে হবে। টাকা লাগবে না তখন? মামীর করুণা অক্ষুণ্ণ থাকলে সে সময়েও অনেক সুরাহার সম্ভাবনা!

অখণ্ডনীয় যুক্তি। ধীরার বাবাও ধারে ধারে মত পরিবর্তন করেন।

"কী চাই রে ধীরা?" মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন।

কিছু চায় না। এসেছে মলী মামীকে নিয়ে যাবে ড্রেসিং রুমটা একবার দেখাতে।

এ বাড়ীতে কক্ষের অভাব নেই। ঠাকুর দালানে যেখানে ষ্টেজ তৈরী হয়েছে তার পিছনে ও দু'পাশে একটা করে মাঝারি ধরণের কুঠরি। সেগুলি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সজ্জাকক্ষরূপে ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। বাঁ দিকের ঘরটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। মহিলাদের প্রসাধন ও সজ্জাপর্ব্ব অধিকতর ব্যাপক এবং সময়সাপেক্ষ। উপচার উপকরণও অনেক। সুতরাং সেটি তাঁরা দখল করবেন। বিপরীত দিকের কক্ষটি পুরুষ অভিনেতাদের পোষাক পরিবর্ত্তনের স্থান।

পিছনের দিকের ছোট ঘরটি আগের আমলে ষ্টোর ছিল। এটি মলী সেন রেখেছেন তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যবহারে। পূর্ব্বতন শৌখীনিকের অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি জানেন, এ সব সৌখীন অভিনয়ে ষ্টেজে অনাবশ্যকরূপে ভীড় জমে। রঙ্গাবতরণকারিণীদে[র] চাইতে নেপথ্যচারিণীর সংখ্যা বেশী হয় অভিনেত্রীদের আত্মীয়া, সখী এবং কর্ত্তৃস্থানীয়দে[র] শাসন কঠোর এবং দৃষ্টি প্রখর না হলে কোন কো[ন] ক্ষেত্রে পুরুষ বন্ধুদেরও উপস্থিতিতে মহিলাদের বে[শ] পরিবর্ত্তনের স্থানগুলি জনাকীর্ণ থাকে। ফলে সবা[র] পক্ষে নিশ্চিন্ত নিভৃতে আপন অঙ্গরাগে মন দেও[য়া] কঠিন হয়। দুরূহ ভূমিকায় আত্মপ্রকাশের অব্যবহি[ত] পূর্ব্বে অভিনেতা অভিনেত্রীদের পক্ষে যে এক[টু] উত্তেজনাহীন শান্ত পরিবেশে কিছুক্ষণ আত্মস্থ হওয়া[র] প্রয়োজন আছে, তারও আর কিছুমাত্র সুযোগ মে[লে] না। তাই মলী সেন এবার নিজের জন্য পৃথক এক[টি] কক্ষ নির্দ্দিষ্ট রেখেছেন। বিনা অনুমতিতে সেখা[নে] অপরের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

পৃথক সজ্জাগৃহের আরও একটা বিশেষ সুবি[ধা] আছে। অভিজাত নরনারীর এই অভিনয়গুলি[তে] অভিনেত্রীরা বেশভূষায় যে সকল অলঙ্কার ব্যবহা[র] করেন সেগুলি সাধারণ রঙ্গালয়ের কৃত্রিম গহনা ন[য়] প্রকৃত মণিমুক্তায় খচিত। যথেষ্ট মূল্যবান। হ[য়] অভিনেত্রীগণের নিজস্ব নয় তো তাঁদেরই পরিচি[ত] পরিবার থেকে সংগৃহীত। বিভিন্ন দৃশ্যোপযো[গী] রূপসজ্জা পরিবর্ত্তনকালে অতি ব্যস্ততায় অনেক সম[য়] পরিত্যক্ত অলঙ্কার যথোচিত সাবধানতায় নির্দ্দিষ্ট স্থা[নে] রক্ষিত হয় না। ফলে অভিনয় শেষে বহু অন্বেষণে[ও] কারো দামী কানের দুল, কারো জড়োয়া কঙ্কন, কা[রো] বা হীরাবসানো ব্রোচের আর সন্ধান মেলে ন[া]। ইতিপূর্ব্বে অনুরূপ পরিস্থিতিতে মলী সেনের এক[টি] মুক্তার বগ্লী হারিয়েছে; একজোড়া তাবিজে[র] জোড় ভেঙ্গে আছে। তা ছাড়া, চুলের ক্লি[প], পাউডারের কৌটা, কম্প্যাক্ট কেস ইত্যাদি ছো[ট] খাটো জিনিষও নেহাৎ কম যায়নি। নিজের ড্রে[সিং] রুম আলাদা থাকলে এ সব ক্ষতির আশঙ্কা থাকে ন[া]। তালা এঁটে তা বন্ধ রাখা যায়, নয় তো নির্ভরযো[গ্য] কোনো একজনের উপরে দায়িত্ব অর্পণ করা চলে।

ধীরাকেই দিয়েছেন মলী সেন তাঁর সাজ-ঘ[রের] ভার। বলা বাহুল্য ধীরার কাছে সেটা অনাকাং[ক্ষিত] গুরুভার মনে হয়নি। সে ষ্টেজ তৈরী হওয়ার [কয়] দিন আগে থাকতেই ছোট ঘরটিকে নিজ উপস্থিতি[তে] জঞ্জালমুক্ত করিয়েছে। নিজ তত্ত্বাবধানে প্রয়োজ[নীয়]

আসবাবপত্রে সজ্জিত করেছে। নাটিকার কোন্ দৃশ্যে মলী সেনের কিরূপ অঙ্গসজ্জা ও বেশভূষার প্রয়োজন তার বিবরণ খাতায় লিখে রেখে তার যথাযোগ্য উপাদান সংগ্রহ করেছে, সামান্যতম জিনিষের অভাব পূরণের জন্য পুনঃ পুনঃ সবাইকে তাগিদ দিয়েছে। তার উৎসাহের আতিশয্যে উদ্যোক্তারা, মায় মলী সেন পর্য্যন্ত, ব্যতিব্যস্ত। এক্ষণে অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে একবার তাঁকে দেখিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা যার জন্য এত আয়োজন, এত উদ্যম, এত পরিশ্রম।

মলী সেন বললেন, "ও আর এখন দেখতে হবে না। ঠিক আছে। একেবারে সেই গ্রীণরুমে গিয়েই দেখবো। আর কতক্ষণই বা বাকী? আমি চট্ করে গাটা ধুয়ে নিচ্ছি।"

মলী সেনের কথায় ধীরার কর্ম্মদক্ষতার প্রতি আস্থার পরিচয় ছিল। সে মনে মনে যথেষ্ট খুশি হলো। কিন্তু মুখে কিছুটা উদ্বেগের ভাব ব্যক্ত করে বললো, "না বাপু, আগে ভাগে তুমি একবার দেখে নাও। কোথায় কী চাও। শেষকালে সময়ের কাছে দরকারী জিনিষটি সময় মতো না পেলে রাগ করবে তো? তখন আমিই বা জোগাড় করবো কোত্থেকে?"

মলী সেন জানেন পূর্ব্বচিন্তা ও অনুমানের দ্বারা যতটা সম্ভব, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সাধনে ধীরা তার কোনই ত্রুটি রাখেনি। তবুও তিনি একবার স্বচক্ষে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করুন, ধীরার বিচক্ষণতা, বুদ্ধি ও কর্ম্মনৈপুণ্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করুন, এইটেই ভাগনেয়ীর অভিলাষ তা বুঝতেও বুদ্ধিমতী মাতুলানীর কষ্ট হয়নি। কিন্তু আপাততঃ সময়াভাব। ঘড়ির কাঁটাটা মনে হয় যেন ধাবমান অশ্বের গতিতে ক্রমশঃ সম্মুখাভিমুখী হচ্ছে।

সস্নেহে ধীরার গণ্ডদ্বয়ে মৃদু অঙ্গুলি-আঘাত করে মলী সেন বললেন, "হয়েছে, হয়েছে, তোকে তার জন্য ভাবতে হবে না। আমি জানি ধীরা মিসি-বাবার কাজে কখনও কোন খুঁৎ থাকে না। আমার যা চাই, না চাই, তা আমার চাইতেও তুই ভালো জানিস। এখন বরং এইখানে একটু বোস, অনেক খেটেছিস্, আমি চট করে চানটা সেরে নিচ্ছি।"

এর চাইতে বেশী প্রশংসা ধীরা নিজেও প্রত্যাশা করেনি। পরম আত্মপ্রসাদের সঙ্গে সে মলী সেনের পরিত্যক্ত সোফাটায় বসে পড়ল।

মলী সেন স্নানাগারের দিকে যেতে যেতেই আবার ফিরে এলেন। ধীরা জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন, ফিরে এলুম একটা দরকারে।—শচীনকে মানে, ব্যানার্জ্জীকে দেখেছিস এখানে?"

সংশোধনের প্রয়োজন ছিল না। ব্যানার্জ্জীকে মলী সেন যে একান্তে নাম ধরেই ডাকেন তা ধীরার কাছে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু তার কিছুমাত্র আভাষ না দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে সে উত্তর করলো, "কৈ, না তো!"

"ষ্টেজের উপরে নেই?"

"না, আমি তো ষ্টেজের দরজা দিয়েই সিঁড়ি-কোঠায় এসেছি, সেখানে অনেকেই আছেন, মিষ্টার দত্ত, নায়ার, মিসেস লাহিড়ী, টুনিদি, আরও অন্যান্য সব। কিন্তু মিষ্টার ব্যানার্জ্জী সেখানে নেই।"

মলী সেনের মুখে যেন ক্ষণেকের জন্য অনিশ্চয়তার ছায়া সঞ্চারিত হলো।

অনুপস্থিত এই ব্যক্তিটির সঙ্গে মলী সেনের সম্পর্কে যে কিঞ্চিৎ রহস্যের স্পর্শ আছে, তা ধীরা অনুমান করতে পারে। সে তো এখন আর বালিকা নয়। তার নিজের জীবনেও যে সম্প্রতি এক অভিনব অভিজ্ঞতা ঘটছে। অন্য নরনারীর হৃদয়ঘটিত আনন্দ বেদনার অনুভূতি সে যেন এখন অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। সে মলী সেনের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "খোঁজ করে দেখবো, কোথায় আছেন?" যথেষ্ট অন্যমনস্ক না থাকলে ধীরার অধরের কোণে চপল হাসির ক্ষীণ রেখাটি নিশ্চয়ই মলী সেনের দৃষ্টির অগোচর রইতো না।

"না, তার দরকার নেই।" বলে মলী সেন প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটালেন। ক্ষণেক নীরবতার পরে হঠাৎ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "ব্যানার্জ্জীর মাকে তুই কখনও দেখেছিস?"

"না। কেন, বলো তো?"

"ভাবছিলেম তাঁকে আজকের অভিনয় দেখতে নিমন্ত্রণ করলে কেমন হয়।"

"বেশ হয়, মিষ্টার ব্যানার্জ্জীকে বলে দাও না তাঁর মাকে নিয়ে আসতে।"

"না, সেটা ভালো দেখাবে না। প্রথম দিন আমাদেরই নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা উচিত। ভাবছি তুই গেলে কেমন হয়।"

"আমি তো মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর বাড়ি চিনি নে।"

"ড্রাইভার কিষণ চেনে। ছোট গাড়িটা নিয়ে যাবি। বলবি যে তিনি না এলে আমরা খুব দুঃখিত হবো। তিনি চান তো পাঁচটা নাগাদ গাড়ি পাঠাবো।"

ধীরার উৎসাহ অফুরন্ত। সে মুহূর্ত্তেই যাবার জন্য প্রস্তুত।

মলী সেন ড্রাইভারকে ডেকে যথোচিত নির্দ্দেশ দিয়ে ধীরাকে বললেন, "ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে দেখা হলে যেন বলবিনে, আমিই তোকে পাঠিয়েছি "

ধীরা বললো, "তা বলতে হবে কেন? আমাকে দেখলেই তো বুঝতে পারবেন।"

"তা যাতে না পারে সেজন্য তুই আগেই অন্য কারো কথা বলিস। দত্ত সাহেব কিম্বা বিভাদি—না, তার চাইতে ভালো হবে ক্লাবের সভাপতির নাম করা। বলবি, তিনি সদস্যদের সবারই বাড়িতে বিশেষ নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।''

ধীরা প্রস্থান করল।

শূন্য গৃহে মলী সেন কয়েক মুহূর্ত্ত মনে মনে বিষয়টির পর্য্যালোচনা করে দেখলেন। শচীনের মাকে সব বলা কি ঠিক হবে? তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিতা। কোন্ কথার কী অর্থ গ্রহণ করবেন কে জানে? হয়তো মনে করবেন,—কি মনে করবেন?—তা অনিশ্চিত। কাজ নেই, তাঁকে কিছু বলে। হঠাৎ তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ না করলেই বোধ হয় ভালো হতো। যাক্, নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তাতে আর ক্ষতি কী? অন্য আর দশজনের মতো তিনিও আসবেন, অভিনয় দেখে যাবেন। না, তাঁকে বলাই বোধ হয় ভালো। হাঁ, নিশ্চয়ই বলার প্রয়োজন আছে। শুনে এমন কী আর মনে করবেন? যাতে কিছু মনে না করেন তেমন করে বললেই হবে। আপন বাচনদক্ষতার উপরে মলী সেনের যথেষ্ট আস্থা আছে। বিগত রাত্রির ঘটনা স্মরণ করে মলী সেন মন স্থির করলেন। তারপর ধীরে ধীরে স্নানাগারের দিকে পুনরায় পদচালনা করলেন। [ক্রমশঃ।

রেডিওর জ্ঞান-বিস্তার

বোন রেডিও শুনতেই দিনরাত ব্যস্ত। অবশ্য দিন-রাত রেডিওতে অধিবেশন হচ্ছে না। দিন আর রাতের মধ্যে যতক্ষণ অধিবেশন হয়—গানই হোক্ আর ভাষণই হোক্; কথকতাই হোক্ আর গল্পপাঠই হোক্; মজদুর মণ্ডলীর আসরই হোক আর অনুরোধের আসরই হোক, 'টক'ই হোক আর নাটকই হোক্; বোন কিন্তু রেডিও খুলে সর্ব্বক্ষণ বসে আছে। কিন্তু ভাই রেডিওর তত পক্ষপাতী নয়। তবুও বোনকে রেডিও শুনতে দেখে ভাই বললে,—রেডিও আমাকে জ্ঞান-সঞ্চয় করতে বিশেষ সাহায্য করে।

বোন ভাইয়ের কথা শুনে বিস্মিত হয়। বলে,—বাজে কথা। তুমি তো রেডিও খুললেই বিরক্ত হও। জ্ঞান আবার কখন সঞ্চয় কর?

ভাই হাসতে হাসতে বলে,—তাই তো বলছি। দেখিস্ না, তুই রেডিও খুললেই আমি পাশের ঘরে গিয়ে বই খুলে পড়তে বসি?

ছবি পাঠাবার সময় ছবির পেছনে আলোকচিত্রীর নাম, ঠিকানা এবং ছবির বিষয়বস্তু স্পষ্টাক্ষরে লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ছবি ফেরৎ নেওয়ার জন্য যথাযোগ্য ডাক-ব্যয় দিতে হবে। ছবির আকার পোষ্ট-কার্ডের বা তদূর্দ্ধ হ'লে সুবিধা হয়। নেগেটিভ পাঠাবার প্রয়োজন নেই।

কণিষ্ক মূর্ত্তি (কলিকাতা যাদুঘর) —দেবপ্রসাদ সরকার
(প্রথম পুরস্কার)

—আগামী সংখ্যার প্রতিযোগিতা—

বিষয়

কলকাতার দ্রষ্টব্য

প্রথম পুরস্কার—১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার—১০
তৃতীয় পুরস্কার—৫৲

শান্তিনিকেতনে অবস্থিত রামকিঙ্কর বেইজ নির্ম্মিত মূর্ত্তি

—মনো মিত্র
(দ্বিতীয় পুরস্কার)

কানন-বালা

-সুধীরকুমার গুপ্ত (হাজারীবাগ)

যক্ষিণী মূর্ত্তি

—শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায়

(তৃতীয় পুরস্কার)

বম্বের রাজাবাই টাওয়ার —অজিতকুমার মিশ্র (বাঁকুড়া)

[উপরের এবং নীচের এই ছবি হু'খানি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাঁকুড়া আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় যথা-ক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রেছে। বিচারক ছিলেন মাসিক বসুমতীর সম্পাদক।]

ঘরামি —শান্তিপ্রসাদ দাস (ব্যারাকপুর)

উঁচু-নীচু —সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা (বাঁকুড়া)

সত্যিকার প্রজাপতি —দেবাশীষ গুহ (খড়্গপুর)

[এই সংখ্যার প্রচ্ছদে পৃথিবীবিখ্যাত ভাস্কর জ্যাকব এপ্‌ষ্টিন নির্ম্মিত রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্ত্তির ছায়াচিত্র মুদ্রিত হ'ল। চিত্রখানি শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

জ্ঞানানুরাগী

—লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী (কলিকাতা)

শ্রীহরিহর শেঠ

জীবনের যাত্রাপথ যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, পরপারের জন্য পাথেয় সংগ্রহ তহবিল অনুসন্ধানে যখন দেখি তাহা রিক্ত, তখনই মনে হয় ব্যর্থ জীবনে তবে পাইলাম কি। যাহা পাইয়াছি তাহা অমূল্য, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার করিবার আমার আর সময়ও অধিক নাই। ইহা যদি তরুণ বা ভবিষ্যৎবংশীয়দের কোন কাজে লাগে তাহা হইলেও সার্থক মনে করিব। জীবনের দীর্ঘ পথে যে সকল অঞ্চলে বিচরণ করিয়াছি তাহা ব্যবসায়, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি। এই সকল ক্ষেত্রে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে যে যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহার যতটা মনে পড়িয়াছে লিখিয়াছি। কর্ম্মজীবনের শিক্ষার কথাও সবিস্তারে লিখিয়াছি, কিন্তু শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কেন্দ্র যে সংসার সমাজ, তাহার কথা স্বতন্ত্র ভাবে লেখা হয় নাই। তাহাই আজি পারিবারিক জীবনের শিক্ষা নাম দিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র সমূহে যেমন দেখিবার শুনিবার বিষয় বহু দিকে বহু ভাবে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, পারিবারিক বিষয় তদপেক্ষা অনেক গুণে অধিক হইলেও নিজ সংসার ভিন্ন অন্যত্র দেখিবার সুযোগ তুলনায় কম। সুতরাং এই প্রবন্ধে নিজ পরিবারে লব্ধ শিক্ষার কথাই অপেক্ষাকৃত অধিক, সে জন্য এখানে আমার ও আমাদের পারিবারিক কথা সংক্ষেপে একটু লেখা সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

আমার এই জীবনে বৈশিষ্ট্য বলিতে এমন কিছুই নাই, সুতরাং অপরের নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদের কতটুকু তৃপ্তি দিতে পারিব তাহা জানি না। তবে শিক্ষা যে যথেষ্টই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার 'স্রোতের ঢেউ' নামক পুস্তকে সেই সকল শিক্ষার সার কথা যাহা দিয়াছি, তাহার মধ্যে বার আনা বোধ হয় এই পারিবারিক বা সাংসারিক জীবনেই সঞ্চয়িত হইয়াছে।

ইংরাজীতে যে একটা কথা আছে—with a silver spoon in the mouth, আমার পিতা-পিতামহ বড় ধনী না হইলেও তাঁহারা সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহাদের সমাজে মান সম্ভ্রম ছিল ও ধনী বলিয়া একটু খ্যাতি ছিল। তাহার উপর পিতা-পিতৃব্যের সন্তানাদির মধ্যে আমিই প্রথম। সুতরাং আমার সম্বন্ধে উহা বলা চলিতে পারে। আমার পর আমার দ্বিতীয় সহোদরের জন্ম প্রায় পাঁচ বৎসর পরে, কাজেই বৃদ্ধ পিতামহের ও বাটীর সকলেরই আমি বড় আদরের ছিলাম। তখনকার দিনে সহর অঞ্চলে ধনীগৃহে সন্তানদিগের যত্ন-আদর বলিতে দাস-দাসী অলঙ্কার-পোষাকের যে আড়ম্বর দেখা যাইত, আমার যত দূর মনে আছে আমার জন্য সে আড়ম্বর তেমন অধিক কিছু ছিল না। এমন কি একখানা প্যারাম্বুলেটর পর্য্যন্ত কোন দিন আইসে নাই, তাহা হইলেও যত্ন-আদরের ত্রুটি কিছুমাত্র ছিল না। তবে সত্যকার একটা রূপার ঝিনুক-বাটি আমার শৈশব-স্মৃতির নিদর্শনরূপে আজিও পুরাতন জিনিষ-পত্রের সঙ্গে একটা আলমারিতে পড়িয়া আছে দেখিতে পাই। অবশ্য এ কথাও বলা দরকার, তখনকার দিনে আমরা যে শ্রেণীর অর্থবানই হই, সমশ্রেণীর ধনবানদের তুলনায় আমাদের কর্ত্তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ গাড়ী-জুড়ির বাবুয়ানা বা বিলাসিতা কিছুই ছিল না। পরিচ্ছন্নতা ও সুভোগ্য তাঁহারা ভালবাসিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে আড়ম্বরের লেশ মাত্র ছিল না। তাঁহাদের সখের মধ্যে ছিল পূজা-পার্ব্বণ ও ক্রিয়াকলাপ। মধ্যে মধ্যে পরিতৃপ্তরূপে লোকজনকে খাওয়ানতে তাঁহাদের বড় আনন্দ ছিল। আমার মধ্যেও যদি এ সবের কিছুমাত্র থাকে তবে তাহা মনে হয় উত্তরাধিকার-সূত্রেই বর্ত্তিয়াছে।

যাক সে কথা, আমার যখন বয়স পাঁচ বৎসর, সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহার আমি আদরের পাত্র ছিলাম সেই পিতামহকে হারাইলাম। অবশ্য তাহাতে তখন আমি কি পরিমাণে সন্তপ্ত বা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম তাহা আমার স্মরণ নাই। তবে সে বয়সে আমি যে তেমন কিছু অভাব বোধ করিয়াছিলাম তাহা মনে হয় না। মা সময় সময় আমাকে তিরস্কার করিতেন, এমন কি আমার দোষের জন্য কখন কখন মৃদু প্রহারও করিতেন, আর সে জন্য আমার পিতৃদেবের এক বিধবা পিতৃস্বসা যিনি আমাদের বাটীতেই থাকিতেন, তিনি মাতা ঠাকুরাণীকে ভর্ৎসনা করিতেন, ইহা আমার মনে আছে।

যথাকালে আমার বিদ্যারম্ভের ব্যবস্থা হয়। হাতেখড়ি, বর্ণবোধ এ সব যথানিয়মেই হইয়াছিল, সে সব আমার মনে নাই। বাটী হইতে অনতিদূরে মধু মহাশয় নামে এক বৃদ্ধ গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় একটি ভৃত্যের সহিত যাইতাম এবং তাঁহার বেত্রদণ্ডের প্রভাব, পাব্বণী আনিবার হুকুম ও শ্লেট মুছিবার জন্য দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ একটি ছোট মৃৎকলসী থাকিত, ইহা আমার বেশ মনে আছে। শুনিয়াছিলাম, আমার পিতা-পিতৃব্যও তাঁহার কাছে এই পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পর কিছু দিন মাত্র চন্দননগরের সেণ্ট মেরিস্ ইনষ্টিটিউশনে—যাহার পরে ডুপ্লেক্স কলেজ নাম হয় এবং বর্ত্তমানে কানাইলাল বিদ্যামন্দির নামে খ্যাত—পড়িয়া হুগলী কলেজিয়েট স্কুল ও কলেজে এফ-এ পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল পড়ি। এখন এই কলেজের নাম হইয়াছে হুগলী মহসীন কলেজ। অল্প দিন কলিকাতার রিপন কলেজেও পড়িয়াছিলাম।

পিতৃদেব আমার লেখা-পড়া শিক্ষার জন্য চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু আমি তদনুরূপ যত্ন লইয়া কখন পড়াশুনা করি নাই। পাঠে কখনও মনোযোগ দিয়াছি মনে হয় না, সর্ব্বদাই ফাঁকি দিয়াছি। সুতরাং ফলেও কোন প্রকারে এনট্রেন্স পাশ পর্য্যন্ত, এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। কোন কোন গ্রন্থ ও পারিবারিক ইতিহাসাদিতে আমাদের বংশ-পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে—যেন পিতার বার্দ্ধক্য হেতু ব্যবসায় কার্য্য দেখিবার জন্যই বাধ্য হইয়া লেখা-পড়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা

ঠিক নহে। আমার অমনোযোগিতাতেই লেখা-পড়ায় সাফল্যলাভ হয় নাই। শিক্ষা ব্যাপারে অমনোযোগিতা ছেলে-মেয়েদের একটা ব্যাধিস্বরূপ। আমার ধারণা, এ ব্যাধি এক প্রকার দুরারোগ্য, অন্ততঃ পক্ষে আরোগ্য হওয়া কষ্টসাধ্য।

লেখা-পড়া শিক্ষা যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; সে জন্ম সময়ে বুঝি নাই, এখন আর অনুশোচনায় লাভ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট বা বড় ডিগ্রীলাভ অদৃষ্টে ঘটে নাই বলিয়াই দুঃখ নয়, শিক্ষায় মানুষের পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইবার যে সুবিধা হয়, সে সুবিধা লাভ ঘটে নাই বলিয়াই আমার অনুশোচনা। লেখা-পড়া শিক্ষা হইতে যেটুকু পাইয়াছি, সেটুকু শিক্ষার অভাব মানুষের কত বড় অভাব, তাহা বুঝা ছাড়া আর বড় কিছু নহে।

খেলা-ধুলা, মাছ-ধরা, পাখী-পোষা প্রভৃতিতে মাতিয়াই যে পড়াশুনায় আমার অমনোযোগ ছিল তাহা নহে। বেড়ান, গল্প করা এ সবও আমার বেশি ছিল না। আজি পর্য্যন্ত ফুটবল, ক্রিকেট, তাস, পাশা এ সব খেলা কখন শিখিলাম না। অভিভাবকেরা নিষেধ না করিলেও তাঁহাদের ভয়ে বাড়ির বাহিরে এখানে-ওখানে তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে কোথাও যাইতাম না। এ সব সত্ত্বেও আমার পাঠ্যজীবন কোনরূপ অসুখের ছিল না। কি বিদ্যালয়ে, কি পল্লীতে তখনকার আমার সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই আমাকে ভালবাসিত; আমিও তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম।

ছোট বেলা হইতেই আমাদের বাগানের মধ্যে একটু জায়গা লইয়া তথায় আমার ফুলবাগান রচনার একটু সখ ছিল। আর সখ ছিল বৈজ্ঞানিক খেলা, যেমন রবারের নল লইয়া ফোয়ারা, সামান্য সামান্য আতসবাজি প্রস্তুত, উড়াইবার ফানুস তৈয়ারী, কেরোসিন তৈল হইতে জ্বালাইবার গ্যাস প্রস্তুত। ভালরূপ পারি আর না পারি, ছবি আঁকা, চন্দন-কাষ্ঠের উপর খোদাই করিয়া নামের ষ্ট্যাম্প তৈয়ারী করা, ফটো তোলা, এ সবেও আমার সখ ছিল। আর একটি বাতিক জুটিয়াছিল কবিতা ও প্রবন্ধ লেখা। সত্য বলিতে কি, লেখা-পড়া শিক্ষায় মনোযোগ দেওয়ার পথে যদি বাধা বলিতে হয় ইহাই একটি প্রকৃত বাধা ছিল। অবশ্য সে বাধা আমারই সৃষ্ট। আমার দশ বৎসর বয়সে যখন আমি এখনকার ক্লাশ ফোর-এ পড়ি, তখন হইতেই এই লেখার সখ হয়। সাময়িক পত্রিকাদিতে রচনাগুলি প্রকাশ হওয়ার মোহেই পর পর এ সখ বাড়িয়া যায় এবং 'অভিশাপ' নামক আমার প্রথম পুস্তক একখানি উপন্যাস ঢাকার 'বান্ধব' নামক মাসিকে ১৩১০ সালে প্রকাশ হয়। পরে উহা পুস্তকাকারেও প্রকাশ হয়। আমার এই লেখার সখের জন্যই যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অকৃতকার্য্য হই, ইহাই আমার বিশ্বাস। একান্ত মনে সাধনা ভিন্ন কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ হয় না। তবে এই সাহিত্যসেবা হইতে মুখ্যত আমার ব্যক্তিগত কিছু প্রতিষ্ঠালাভ হইলেও গৌণত উহা আমার সামান্য কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সহায়তা আনিয়া দিয়া আমার জন্মভূমির সেবার কার্য্যে অবলম্বন-স্বরূপ হইয়াছে।

পঠদ্দশাতেই সতের বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। এখনকার দিনে ইহা যতটা অযৌক্তিক ও অশোভন দেখায় তখনকার দিনে ততটা ছিল না, বিশেষ আমাদের জাতিতে। নবপরিণীতা পত্নী আমার অমনোনীত হয় নাই, কোন দিন মুখে প্রকাশ না পাইলেও আমার বিশ্বাস, আমার স্ত্রীরও আমাকে কিছু মন্দ লাগে নাই। আমাদের তদানীন্তন প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহের পর বৎসরেক কাল আমার স্ত্রীর দ্বিরাগমন হয় নাই বা আমিও শ্বশুরালয়ে যাই নাই। বিবাহের পরও যথাপূর্ব্ব পড়াশুনা চলিতে লাগিল। এ বিষয় মনঃসংযোগ কখনই ছিল না, সুতরাং বিবাহিত জীবনের নূতন মোহে অধিক ক্ষতি কিছুই হয় নাই। নবসঙ্গিনী লাভে নূতন জীবনে আমার ভিতরটার মধ্যে যে এমন একটা কিছু বিপর্য্যয় আনিয়াছিল, তাহাও নহে। বরং এইটুকু মনে আছে, এফ-এ ফেল্ করবার পর কলেজ ছাড়িয়া যখন বাড়ীতেই বসিয়াছিলাম, তখন অল্প দিনের মধ্যেই পিতার ভগ্নশরীরে ব্যবসায়-কার্য্য পরিচালনার জন্ম নিত্য কলিকাতায় যাতায়াত ও পরিশ্রম দেখিয়া আমার বাটীতে বসিয়া থাকাটা একটু কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। কেমন একটা লজ্জা লজ্জা নিজের প্রতি ঘৃণার ভাব মনে হইত। আর তদপেক্ষা দুঃখের বিষয় হইয়াছিল, পিতৃদেব আমাকে ব্যবসায়-কার্য্যের উপযুক্ত মনে করিতেন না। সত্যই আমার এদিকে ত্রুটি ছিল, তাহা হইলেও আমাকে যে গড়িয়া লওয়া চলিতে পারিত না, এ কথা আমি মনে করিতে পারিতাম না। পরিশেষে বোধ হয় আমাদের কোন কোন আত্মীয়-বন্ধুদের পরামর্শেই বাবা আমায় কলিকাতায় কর্ম্মস্থলে পাঠাইলেন।

কলিকাতায় আমার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। কর্ম্মচারীরা ২ নম্বর রতন সরকার গার্ডেন লেনের একটি বাটীর ত্রিতলে যে বাসায় সকলে বাস ও খাতাপত্র লেখার কার্য্য করিতেন, আমিও তথায় থাকিতাম। পিতা ঠাকুর বহু কাল কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায়-কার্য্য দেখিয়াছেন, তিনি ইদানিং নিত্য যাতায়াত করিলেও আমার প্রায় সপ্তাহান্তর কখন বা এক পক্ষ পরে বাটী আসার ব্যবস্থা ছিল। পিতা-ঠাকুরের আদেশ ব্যতিরেকে তাঁহার জীবনাবসানের কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি একবারও নিজ ইচ্ছায় বাটী আসি নাই।

দিনের বেলা বাসায় বা কর্ম্মস্থানে একরকম মন্দ কাটিত না রাত্রে খাতা লেখা ও তাগাদাপত্র সারা আমাদের কার্য্যের পদ্ধতি ছিল, তাহাতে কি শীত কি গ্রীষ্ম রাত্রি ১২।১২।০টার পূর্বে কেহ কোন দিন শয্যা গ্রহণ করিতে পারিত না। আমিও ততক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যহই বিনিদ্রাবস্থায় থাকিতাম, তাহাতে আমার কো কষ্ট ছিল না। দোকান হইতে আসিয়া সন্ধ্যার সময় কোন কার্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে যতক্ষণ একাকী জানালার ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া কাটাইতাম, তখন বাড়ীর জন্ম মনটা ব্যাকুল হই উঠিত। বিবাহিত জীবনের মাদকতা তখনই আমায় এক উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিত। যে শনিবারে আমি বাড়ী আসিতাম ন আমাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকে বাটী আসিতেন, বি করিয়া আমার পিতৃস্বসা-পুত্র আমার প্রায় সমবয়স্ক আবাল্য ব ও হিতৈষী "ভূষণ দাদা" যিনি তখন ব্যবসায় ক্ষেত্রে কতক আমাদের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন—যেদিন তিনিও বাটী আসিতেন সেদি অবর্ণনীয় মনঃকষ্টে কাটিত। সত্য বলিতে কি, মনে হইত পিতৃদে ইহা আমার প্রতি অবিচার। এ জন্ম অন্তকার এই লেখার পূ কোন দিন কোন ক্ষেত্রে আমার এ মনোভাবের কথা প্রকাশ নাই। আমার স্ত্রী যে স্বাভাবিকই স্বল্পভাষী এবং বাটী

তাহার সমবয়স্ক কেহ না থাকায় লোকাভাবে কতকটা নিঃসঙ্গ, তাহার মনোভাব যে কিরূপ থাকিত তাহা আমি উপলব্ধি করিতে পারিতাম। আমার তখনকার শিশু কন্যাটিকে দেখিবার জন্য প্রাণ ছটফট করিত। আর আমার পরম স্নেহময়ী জননী, তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না বলিয়া যত না কষ্ট হইত, তিনি আমার জন্য আমায় না দেখিয়া যে ব্যথা পাইতেন তাহা ভাবিয়া মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। মনে হয়, পিতৃদেব এ বিষয়টা ভাবিতেন না। পিতৃ-ইচ্ছা পালনরূপ কর্ত্তব্য ভাবিয়া নীরবেই সে সব যাতনা সহ্য করিতাম। বাটীতে চিঠি-পত্র আমার মধ্যম সহোদর শিবরামকে ভিন্ন আর কাহাকেও কোন দরকারে লিখিতাম না। সেই আমাকে বাটীর বা পল্লীর বা অন্য কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ের খুটিনাটি খবর লিখিত। মনে হয়, সে আমার অবস্থাটা চিন্তা করিয়া যতটুকু তাহার ক্ষমতায় হয় আমাকে নিশ্চিন্ত করিতে বা শান্তি দিতে চেষ্টা করিত। তাহার সঙ্গে সময় সময় আমার মতানৈক্যের জন্য মনেরও গোলমাল হইত, কিন্তু তার চিরদরদী ও দয়ার্দ্র হৃদয়খানির কথা আমি অস্বীকার করিতে পারিব না। আমার ছোট ভাই দুর্গাদাস তখন বালক, তাহার অন্তর তখন বিশেষ ভাবে আমার সুখ-দুঃখের গণ্ডীর মধ্যে আইসে নাই।

এখানে একটা কথা বলি। কলিকাতায় থাকি, তখন টকি ছিল না বায়স্কোপের সবে আরম্ভ কিন্তু থিয়েটারের অভাব ছিল না, সার্কাস, গড়ের মাঠ, ইডেন গার্ডেন এ সব ত ছিলই। যে শনি-রবিবার কলিকাতায় থাকিতাম আমি বড় কোথাও যাইতাম না, বাসাতেই থাকিতাম। কারণ কতকটা পাছে বাবা অসন্তুষ্ট হন, কতকটা আমার তেমন ও-সব ভালও লাগিত না। কলিকাতায় থাকিতে দীর্ঘ বিশ-বাইশ বৎসরের মধ্যে বড় বেশি হয়ত আট-দশ বারের অধিক বার থিয়েটার দেখি নাই। দুই-এক বার ভিন্ন কোন নাটক সম্পূর্ণ কখন দেখি নাই। হয়ত একটি মাত্র দৃশ্য দেখিতে—যেমন 'দুর্গেশনন্দিনী'তে কারাগার, 'বলিদানে' ষোবি পাগলির গান—'পা টিপিয়ে মাথা খুঁটে মন পাবি না কি'—অথবা 'মাধবীকঙ্কনে'—'সাধ না মিটিল আশা না পূরিল'···গানটি শুনিতে গিয়াছি।

কলিকাতায় থাকিয়া পিতৃদেব প্রদত্ত কর্ম্মভার যথাসম্ভব পালন করিয়া যাইতে লাগিলাম। আমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পর অল্প কয়েক বৎসর মাত্র পিতৃদেব কলিকাতায় যাতায়াত করিয়াছিলেন। তিনি আদেশ না করিলে বাটী আসিতাম না। ক্রমে যখন তিনি স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তখন ক্রমে ক্রমে বিষয়টা শিথিল হইতে লাগিল এবং পরিশেষে তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় আমি নিত্য যাতায়াত করিতে লাগিলাম। বিষয়-কার্য্যের পরিচালনায় তাঁহাকে যে বেশ আনন্দ দিতে পারিয়াছিলাম, এমনটা ঠিক কোন দিন বুঝিতে পারি নাই।

বাবার ডায়াবিটিস্ পূর্ব্বে হইতেই ছিল, ক্রমে উহা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ব্রাইট্স্ ডিজিজে পরিণত হইল। সাধ্যমত সেবা-শুশ্রূষা-চিকিৎসাদি হইতে লাগিল। কিছুতেই কিছু হইল না, পরিশেষে কাল পূর্ণ হইলে তিনি শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার শেষ সময় বুঝিয়া তিনি নিজেই তীরস্থের আদেশ করেন এবং শেষ কথা তাঁহার মুখে যাহা উচ্চারিত হইতে শুনা গিয়াছিল তাহা 'নারায়ণ'।

বাবা চলিয়া গেলেন, আমার সাংসারিক জীবনের এক নব পর্য্যায় আরম্ভ হইল। পিতৃশোকের অপেক্ষা তাঁহার মত সাধুলোকের শেষ জীবনে, অন্তিম সময়ে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কোন অতি নিকট-জনের আচরণে তীব্র মনোবেদনার কথা এবং সারা জীবন পারিবারিক মঙ্গল ও বিষয়-কার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার সহোদরদের মুখ চাহিয়া তাঁহার কোন কোন সাধু মনোভিলাষ অপূর্ণ রহিয়া যাওয়ার কথা মনে উদয় হইয়া প্রায় সর্ব্বক্ষণ আমার মনকে অধিক পীড়া দিতে লাগিল।

বাবা কোন দিন একটি কান মলিয়া দেওয়া এমন কি জোরে তিরস্কার পর্য্যন্ত করেন নাই। কিন্তু তথাপি কখন তাঁহাকে মুখ তুলিয়া কিছু বলিতে পারি নাই। তাঁহার শেষ অবস্থায় যখন দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণপ্রায় হইয়া প্রায় শয্যাশ্রয়েই ছিলেন, সেই সময়েই মাত্র গোপনে কৌশলে তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার ফটো লইতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, কোন জনহিতকর কার্য্যের জন্য কিছু টাকা ব্যয়ের অনুমতি দান প্রার্থনা প্রসঙ্গে—খুল্লতাতদের সহিত বিষয়-সম্পত্তি নিষ্পত্তির পর নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভাল বুঝিলে তখন তাঁহার আদিষ্ট অর্থ ব্যয় করিবার কথা বলিয়াছিলেন।

এই বিষয়-সম্পত্তি নিষ্পত্তির কথায় আমায় খুবই চিন্তান্বিত করিল। জীবনের নব পর্য্যায়ে ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাবনার বিষয় হইল। ভাবনা অন্য কিছু নহে। বিষয় বলিতে আমাদের যাহা কিছু, তাহার প্রধান নগদ টাকা, গভর্ণমেণ্ট পেপার, একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বড় কারবার ও কলিকাতায় কিছু সম্পত্তি আর চন্দননগরের বাড়ী বাগানই প্রধান। কিন্তু অস্থাবর সবই তখন আমার হস্তে। আমাদের অংশীদার আমার বিধবা সেজ খুড়ীমাতা ও ছোট খুড়া মহাশয়। তাঁহারা আমাদের কতটা বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন সে বিষয় সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল। খুড়া মহাশয়েরা কখন বিষয়-আশয় দেখেন নাই, সুতরাং অবিশ্বাস যদি মনে থাকে, সন্তোষজনক ভাবে তাঁহারা কি করিয়া বুঝিবেন ইহাই আমায় চিন্তান্বিত করিল, তদুপরি আমার সহোদরদ্বয়ের অজ্ঞাতের সহিত বৈষয়িক দায়িত্বও আমার উপর ন্যস্ত ছিল।

ব্যাংকে টাকা রাখা কখন আমাদের ব্যবস্থা ছিল না। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এক দিন, তখন আমাদের যাহা কিছু নগদ ও গভর্ণমেণ্ট প্রমিসারি নোট ছিল সমস্ত লইয়া আমাদের এক জন আত্মীয় ও প্রাচীন কর্ম্মচারী এবং আমার এক পিতৃস্বসা-পুত্র সমভিব্যাহারে ছোট খুড়া মহাশয়ের কলিকাতার বাসাবাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাহা রাখিবার জন্য বলিলাম। তিনি স্বীকৃত হইলেন না, সমস্ত ফিরাইয়া আনিলাম। এই সকল রাখার দায়িত্ব গ্রহণ না করাই গ্রহণ না করার একমাত্র কারণ নহে। বৈষয়িক বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা হেতু আমার এই কার্য্যে তাঁহার কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

যথাকালে বাবার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সে শ্রাদ্ধ আমাদের পক্ষে খুবই সমারোহে অথচ বেশ সুশৃঙ্খলেই সম্পন্ন হইল। কি করিয়া যে সে-কার্য্য সহজে এবং সুখ্যাতির সহিত সমাধা হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হই।

আমি ব্যবসায়-কার্য্য পূর্ব্ববৎ দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু উৎসাহ আর আদৌ ছিল না, কারণ বৈষয়িক মীমাংসার জন্য ছোট খুড়া ও সেজ খুড়ীমাতা উভয়েই বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন এবং আমিও তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া নিজ দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে একান্ত উৎসুক হইয়াছিলাম। কি করিয়া এ কার্য্য সমাধা হইবে সে চিন্তায় আমায় নিতান্ত ব্যাকুল করিল। ক্রমে সালিশীর দ্বারা নিষ্পত্তির কথা উঠিল। তাহাতে আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, অন্য সালিশীর আবশ্যক নাই, আমাদের পক্ষে আমরা তিন সহোদরে একখানি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া দি, ছোট খুড়া মহাশয় যেরূপ বিভাগ বণ্টন করিয়া লিখিয়া দিবেন, তাহাই আমরা মানিয়া লইব। ইহাতে তিনি সম্মত হইলেন না। শেষে সালিশী দ্বারা মীমাংসাই স্থির হইল। আমরা সালিশী মনোনয়নে অংশ গ্রহণ না করায় অগত্যা ছোট কাকা মহাশয়ের অভিপ্রায় মতই তিন জন স্থির হইল। তন্মধ্যে এক জনের সহিত আমার সামান্য পরিচয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম শুনিয়াছিলাম মাত্র এবং তৃতীয় ব্যক্তির কথা পূর্ব্বে কখন শুনি নাই। আমরা স্বেচ্ছায় কোন কথা বলি নাই, অপর অংশীদারদ্বয় যাঁহাদের মনোনীত করিলেন তাহাই মানিয়া লইলাম। তাঁহারা সকলেই ভদ্রলোক সুতরাং আমার মনে এ জন্য কোন সংশয় বা দ্বিধাও ছিল না, কিন্তু দুঃখের কি সুখের বিষয় জানি না, আমাদের সালিশী মীমাংসা শেষ হইতে দুই বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছিল। প্রায় পঞ্চাশটি বৈঠক বসিয়াছিল, আমি মাত্র দুইটি বৈঠকে উপস্থিত থাকিয়া সালিশী মহাশয়দের কার্য্যপ্রণালী ঠিক সমীচীন বিবেচিত না হওয়ায় তাঁহাদের বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের বিচার মানিয়া লইয়া যোগদানে বিরত ছিলাম। আমার এই কার্য্য, আমি জানি, আমার হিতৈষী আত্মীয়-বন্ধুগণ সমর্থন করেন নাই, তাহা হইলেও আমার বিবেক-বুদ্ধিতে ইহাই যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছিল।

সময়ে সালিশীর কার্য্য শেষ হইল। বিভাগ বণ্টনের সুবিধার জন্য কারবার বন্ধ করিবার কোন নির্দ্দেশ না থাকিলেও, প্রথম মহাযুদ্ধের দরুণ আমাদের বাজারের সুযোগ লইয়া আমি ইতিমধ্যে আমাদের কারবারের সমস্ত মজুত মাল বিক্রয় করিয়া খোলসা হইয়া ছিলাম। এই সময়ে আমি স্বতন্ত্র ভাবে বিলাতে মেসার্স জন্ ব্যাট্ কোং লিমিটেড্ নামক এক নূতন এজেন্টের সহিত ও আমাদের পুরাতন এজেন্ট মেসার্স ডটন্ ম্যাসে কোম্পানির সহিত কার্য্য আরম্ভ করি। এই নূতন কার্য্যে অতি অল্প দিনের মধ্যে ভগবানের কৃপায় যথেষ্ট সাফল্য লাভ হয়।

বিভাগের ফলে যদি পৈত্রিক বাসভবন ত্যাগ করিতে হয় এই আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই নিজ অর্জ্জিত অর্থে চন্দননগরে গঙ্গার ধারে একটি সুবৃহৎ বাটী খরিদ করিয়াছিলাম। সালিশীদের ব্যবস্থায় পিতামহের প্রতিষ্ঠিত দেবসেবাদি এবং প্রকারান্তরে তাঁহার সুনাম রক্ষার সমস্ত ভার আমাদের উপর অর্পিত হইলেও যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম—পৈত্রিক বাসভবন হইতে বঞ্চিত হইলাম, কিন্তু মাতৃদেবীর ও প্রতিবেশীবর্গের ইচ্ছা নয় বুঝিয়া পূর্ব্বপুরুষদের বসবাসের স্থান ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

আমি বরাবরই ব্যস্তবাগীশ। মহাযুদ্ধের জন্য তখন গৃহনির্ম্মাণের সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য, ইটের দর ৪০৲ টাকা, ষ্টীলের দর ৩০৲।৩২৲ টাকা, তাহা হইলেও কালবিলম্ব না করিয়া এই স্থানেই বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাসের ব্যবস্থা করিলাম। আমার ব্যবসায়-জীবনের শিক্ষার কথায় বলিয়াছি, আমি যে স্বতন্ত্র কারবার আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা অবলম্বন করিয়া একরূপ বিনা পরিশ্রমে, বিনা মূলধনে, সদুপায়ে সহজেই অল্প সময়ের মধ্যে ভগবান আমাকে আশার অতিরিক্ত দিলেন।* নূতন কাজ আরম্ভ করিবার সময় আমার মধ্যম সহোদরের অভিমত জিজ্ঞাসা করায়, সে ইহাতে যোগ দিতে অনিচ্ছা জানাইয়াছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে—আমাদের সহিত অনেক বিষয় তাহার স্বতন্ত্র মনোভাব বুঝিয়া এ বিষয় আর তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

আমাদের পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি বিভাগের পর আমরা আমাদের প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে আলোচনার সময়, যখন আমার স্বতন্ত্র কারবারের দায়িত্বের কথা আর কিছু নাই, লাভই হইয়াছে আমার সম্পূর্ণ স্বোপার্জ্জিত হইলেও তখন কর্ত্তব্য বিবেচনায় ইহার অংশ গ্রহণের জন্য ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট মাতৃদেবীর সমক্ষে প্রস্তাব করি। তাহাতে তাহারা উহা গ্রহণে অসম্মতি জানায়, এমন কি পিতৃদেবের নিকট প্রার্থিত অনুমতি মত পঞ্চাশ হাজার টাকাও আমার বিবেচনা মত যে কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য আমার উপরই ভারার্পণ করে। আর তাহাদের নগদ সম্পত্তির কতক অংশ লইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ আমার কাছেই রাখিল। উদ্দেশ্য যদি পুনরায় ব্যবসায়-কার্য্য কিছু করি তাহাতে উহা নিয়োজিত করা। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় অন্যরূপ। আমার স্বনামের কারবারেই মনোনিবেশ করিলাম। ইচ্ছা ছিল, পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত আমাদের কারবার যাহার মাত্র গুডউইল্ ১০০০১৲ মূল্য সালিশী মহাশয়ের আমাদের দিয়াছিলেন, সেই নামে পুনরায় কাজ করিয়া বাজ কারব কিন্তু বিধিলিপি স্বতন্ত্র ছিল। ভাল করিয়া কাজ দূরে থাকুক সমস্ত ব্যবসাই বন্ধ করিলাম। যে কারণে করিয়াছিলাম তাহা প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এক দিন কথা প্রসঙ্গে ব্যবসায় বন্ধ করা বিষয় তিনি বলিয়াছিলেন এ সময় কাজ বন্ধ করায় কিছু মন্দ হয় নাই, কিন্তু পরে ছেলেপুলেরা করিবে কি। প্রবীণ ব্যবসা-ধুরন্ধর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সে কথা তখন ভাল করিয়া না বুঝিলেও এখন বুঝিতেছি। আর বুঝিতেছি, জীবনে যে সব ভুল করিয়াছি, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভুল।

যদিও এখানে হয়ত একটু বাড়াবাড়ি হইবে, তথাপি একটা কথা না বলিয়া পারি না। আমাদের মেসার্স শম্ভুচন্দ্র শেঠ এণ্ড সন্সের কারবারের আয়তনে ইহার স্থান খুব উচ্চে থাকার জন্যই শুধু ইহার খ্যাতি নয়। ইহার সততা, সত্যবাদিতা, কথার ঠিক প্রভৃতি গুণাবলী যেমন এক দিকে বৈদেশিক কারবারি ও কারখানাওয়ালাদিগের, তেমনি অন্য দিকে খরিদ্দার ব্যাপারি-মহলেও আকর্ষণের কারণ হইয়াছিল। আর শুধু কলিকাতায় নয়, দিল্লী কানপুর হইতে পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থানের লৌহ, ষ্টীল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের অনেকে

---

* "আমার ব্যবসায়-জীবনের শিক্ষা" প্রবন্ধে এ বিষয় বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে। বঙ্গীয় তিলি-সমাজ পত্রিকা; কার্ত্তিক ১৩৫০ দ্রষ্টব্য।

ইহা সাহায্যকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহা গৌরবান্বিত ছিল। এ প্রতিষ্ঠান ধার পাইয়া বড় নয়, অন্যকে ধারে পণ্য যোগাইয়া খ্যাতিমান ছিল। সুতরাং গুডউইলের এরূপ অযথা মূল্য হিসাবে আমাদের অংশ হইতে এই টাকাটা যাওয়ায় আমাদের একটু লাগিয়াছিল, কিন্তু প্রথম দিনের ব্যাপার হইতে কথা কিছু কহিব না ঠিক করিয়াছিলাম, সুতরাং তাঁহাদের নির্দ্দেশ মাথা পাতিয়াই লইলাম। শম্ভুচন্দ্র শেঠ এণ্ড সন্সের নামে একটি দিনের জন্যও কাজ করিতে পারিলাম না বা করিবার সৌভাগ্য হইল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার নিজ নামে কাজ করিয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি বেশ কিছু লাভবান হইয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে যে মানুষ ছিলাম তখনও সেই মানুষ; কিন্তু বলিতে কৌতূহল বোধ করি, ভগবানের এই দান হইতেই আমি দাতা। শুধু তাহাই নহে, এই মত অনেক কিছু আমার হেতুমূলক বা অহেতুকী প্রশংসা-খ্যাতিরও ইহাই মূল। তখন হইতেই বুঝি, যেমন যত কিছু উৎকৃষ্ট উপাদান সম্ভূত ব্যঞ্জনাদিই হউক একটু লবণ সংযুক্ত না হইলে তৃপ্তিকর হইতে পারে না। প্রায় সর্ব্বরোগহর মকরধ্বজ একটু মধু সংযুক্ত না হইলে যেমন তাহার গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হয় না, সেই মত অর্থের সংযোগ ব্যতিরেকে সময় সময় অনেক কিছুই খনিগর্ভে মণির ন্যায় চিরদিন লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া যায়। "দারিদ্র্যমেকং গুণরাশিনাশি" এই সংস্কৃত শ্লোকাংশ পূর্ব্বে হইতেই শুনিয়া আসিতেছি, এই সময় হইতেই ইহার সার্থকতা ভাল করিয়া উপলব্ধি করি। অর্থের কথা প্রসঙ্গে উহার আবশ্যকতা, উহার উপকারিতার কথা উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। আবার ইহাও বুঝিয়াছি, এই অর্থ হইতে বহু অনর্থের উৎপত্তি, এ কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহার দ্বারা অনেককে বিলাসিতার দাস করিয়া অলক্ষ্যে জীবনকে বিড়ম্বনাময় করিয়া তোলে। তৃণভোজী গাভী নিঃশঙ্কচিত্তে স্বচ্ছন্দে মাঠে চরিয়া বেড়ায়, কিন্তু রক্তমাংসলোলুপ শৃগাল ব্যাঘ্র এমন কি বিড়ালটিকেও যেমন রক্তমাংসের সন্ধানে সমস্ত জীবন ছুটাছুটি করিতে হয়, সেইরূপ বিলাসে যাঁহারা মগ্ন থাকেন, তাঁহাদের সেই বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বহু ভোগাভোগ সহিতে হয়।

ব্যবসায়-কার্য্য বন্ধ হইল, আমার আশৈশব সাধের সাহিত্যসেবা পুনরায় গ্রহণ করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধুদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ইতিপূর্ব্বেই যে সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংলিপ্ত হইয়াছিলাম তাহাতে এবং অন্যান্য অনুরূপ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলাম। এদিক দিয়া বরাবরই এমন কি এখন পর্য্যন্ত লোকচক্ষে কিছু মন্দ চলে নাই। বাহিরে সুবিধা-অসুবিধা আশা-নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া চন্দননগরের কতিপয় প্রতিষ্ঠানকে লইয়া কাটাইতে লাগিলাম। আমার ব্যবসায়-কার্য্যের সাফল্য যেমন কখন মুরুব্বিয়ানা করিয়া কেহ বলিয়াছেন—এ টাটের বা গদির গুণে; আবার কেহ বলিয়াছেন—ওস্তাদ ছেলে। তেমনই এ ক্ষেত্রেও সরকারী বে-সরকারী বহু উপাধি ও বিশেষণে বিশেষিত হইলেও কোথাও কোথাও নেপথ্য হইতে মৃদু গুঞ্জনের অস্ফুট ধ্বনি শ্রুত হইয়াছে—এই সবই নাম প্রতিপত্তির জন্য। সময় ও সুযোগ মনে করিলেই মিলে না। আজি এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট জানাইয়া কাহারও কাহারও অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরসন করিতে চাহি যে, যাঁহারা আমার প্রসঙ্গে দেশশ্রী, সাহিত্যাচার্য্য, ঐতিহাসিক, দানবীর প্রভৃতি অনেক প্রকার বলিয়া থাকেন, ইহার মধ্যে সত্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা আর কিছু নহে, আমি আমার চন্দননগরকে ভালবাসি। যাহা কিছু করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি তাহা ইহারই জন্য। আর উক্ত সব বিশেষণের মধ্যে যদি কোনটির একটুও সার্থকতা থাকে, তবে একটু মন দিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, তাহার মূল এই ভালবাসাতেই নিহিত আছে। তবে নাম যশ যে চাহি না, প্রশংসার কথা যে কর্ণপীড়া দেয়, এ কথা যদি বলি তাহা মিথ্যা বলাই হইবে। জীবনে কি ঘরে কি সাধারণের কাজে কর্তৃত্বের অবকাশ বহু বার আসিয়াছে, কিন্তু পরম সৌভাগ্য সে জন্য ঘৃণ্য অহমিকা কোন দিন মনে স্থান পায় নাই, তবে নিজেকে যে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দেওয়া, তাহা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে হয় নাই।

আমার পারিবারিক জীবন যাহা বহু দিন হইল পল্লবিত পুষ্পিত হইয়া ফলপ্রসূ হইয়া আসিল, আজি এই জীবন-সায়াহ্নে দেখিতেছি সকল দিকেই নৈরাশ্য। আমি ঠিক আমার আত্মজীবনী লিখিতে বসি নাই। আমার জীবন-পথে চলিতে চলিতে যে সব শিক্ষালাভ হইয়াছে তাহা একটু সবিস্তারে বিবৃত করাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহা করিতে যদি শেষে জীবনীই দাঁড়াইয়া যায় এই মনে করিয়াই আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও বহু দিন এ কাজে নিরত ছিলাম। এখন দেখিতেছি, এ অধ্যায়টিতে আমার জীবনী বা কৃতকর্মাদির পূর্ণ ইতিহাস না থাকিলেও মোটামুটি আমার জীবন যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সহিত আমার আভ্যন্তরীণ পরিচয়েই পূর্ণ হইতেছে। যে কল্পনাতীত উপলব্ধি এখান হইতে পাইয়াছি তাহা হয়ত অভিনব না হইতে পারে, কিন্তু সাংসারিক লোকের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। অবশ্য যার কর্মের ক্ষেত্র, দৃষ্টির পরিধি, জ্ঞানের পরিমাণ নিতান্তই সীমাবদ্ধ; যে স্বল্প কতিপয়কেই কর্মসহায়করূপে পাইয়া বা স্বল্প গণ্ডীর মধ্যে দেখিয়া-শুনিয়া যাহা কিছু অভিজ্ঞতা পাইয়াছে; তাহারও একটা মন্তব্য গড়িয়া উঠা অসম্ভব না হইতে পারে কিন্তু সাধারণ্যে প্রকাশ করা ধৃষ্টতার নামান্তর কি না, জানি না।

সবই যে অদৃষ্ট কর্মফল প্রারব্ধ বা ঐরূপ আর কিছু, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক সময় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে যে সাফল্যের মূলে আমার বলিতে যেমন কিছুই ছিল না, তেমনই পারিবারিক জীবনে অসাফল্যের জন্য আমার হাত কিছুই নাই। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি পরিজনবর্গের এমন কি দাস-দাসী প্রভৃতির সুখ-শান্তি বিধানের জন্য মন, শরীর ও অর্থব্যয় দ্বারা আমার সাধ্যমত কর্তব্য পালনে ত্রুটি কিছুমাত্র করিয়াছি বলিয়া মনে করি না, কিন্তু আমার সবই ব্যর্থ হইয়াছে। এই দারুণ নিষ্ফলতা ইহার অর্থ কি? অদৃষ্টের মত কোন কিছু ভিন্ন আর কি বলিতে পারি। এক দিন দৈবক্রমে মনীষিপ্রবর অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে তাঁহার মুখে কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কথা শুনিয়াছিলাম, "Youth is a folly, manhood is struggle and old age is a regret." জানি না, সত্যই বৃদ্ধ বয়সটা অনুতাপ অনুশোচনার কাল কি না। যখন ইহা শুনি তখন এই অর্থই ধরিয়া লইয়াছিলাম,—জীবন-সায়াহ্নে পরপারের চিন্তা যখন মানুষকে উদ্বেলিত করে অথচ আর সংশোধন বা প্রতিকারের দিন থাকে না, তখন যৌবনের কৃত নিজ দুষ্কৃতি বা ভুল-ভ্রান্তির জন্যই অনুশোচনা আইসে। কিন্তু আমার ত সে কথা নয়। আমার দুষ্কৃতি বা ভুল-ভ্রান্তি যে কিছু নাই সে কথা

বলিতেছি না। সে থাক আর নাই থাক, সে জন্যও মনে কখন কিছু আসে না, বরং দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, যে সব কাজ করিবার ইচ্ছা ছিল বা অসমাপ্ত কাজ শেষ করিতে পারিলাম না, সেই জন্যই অনুশোচনা। আমি বলিলাম, সংসারে সকলের সুখ-সুবিধার জন্য যাহা কিছু করিবার দেহ-মন পাত করিয়া তাহা করিয়াছি। নিজের সম্বন্ধে এমত অভিমত প্রকাশ করা, হয়ত বা মনে মনে পোষণ করার মধ্যে ভুল থাকা অসম্ভব নহে। সে বিষয় আমার কিছু বলিবার নাই, আমি যাহা মনে করি তাহাই লিখিলাম।

ভগবানের কৃপায় আমার জাজ্বল্যমান সংসার। আমার শরীর ক্লিষ্ট হইলেও এ বয়সে অনেকের অপেক্ষা ভাল, এখনও দেহ পরাধীন হইয়া পড়ে নাই। আত্মীয়-স্বজন এবং দেশবাসী প্রায় সকলেই আমায় স্নেহ-ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। যদিও আমার দেশহিতৈষণাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপের ছলে budding patriot, local patriotism এ সব কথাও বেশ জ্ঞানসম্পন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কাছ হইতে শুনিতে হইয়াছে, তাহা হইলেও যশ মান যতটা আমার প্রাপ্য নহে তাহার অনেক বেশি আমি পাইয়াছি এবং পাইতেছি, এ কথা বলিবই। আর্থিক শক্তি অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় অনেক সময় ইচ্ছানুরূপ ব্যয় দ্বারা তৃপ্ত হইতে না পারিলেও এখন পর্য্যন্ত নিত্য-প্রয়োজনীয় সাংসারিক ব্যয়ের জন্য বিশেষ অভাব হয় নাই। তথাপি অনেক দীন-দুঃখী যেমন বলিয়া থাকেন তাহার চেয়ে দুঃখী কেহ নাই, আমারও মনে হয়, ভগবান আমায় এত দিয়াও সংসার-ক্ষেত্রে বুঝি আমার অপেক্ষা দুঃখী কেহ নাই। আমার দুঃখের প্রধান কারণ সংসারে পরিজনবর্গের মুখে প্রাণ-খোলা হাসি দেখার সৌভাগ্য খুব কমই পাইয়াছি। আমার ভ্রাতা-ভগিনীদের মনের মধ্যে হীনতা কাহারও আছে বলিয়া জানি না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, ইহাদের মধ্যে বেশ মিল মত মনের পরিচয় পাইবার সৌভাগ্য হয় নাই। আমার মধ্যম ভ্রাতার পরোপকারিতা, ধর্ম্মে বিশ্বাস, নিষ্ঠা, জীবনে আড়ম্বরহীনতা প্রভৃতি এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার দেশপ্রেম পরোপকারিতা, মনের দৃঢ়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর জন্য আমার মনে একটা গর্ব্বের ভাব আসিলেও, তাঁহাদের লইয়া সংসার-পালনের সুখ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। এ জন্য হয়ত দায়ী আমি, আমারই কৃতিত্বের অভাব বা চারিত্রিক ত্রুটিই হয়ত ইহার কারণ। যদি তাহাই হয়, যে ত্রুটি এত দিনে ধরিতে পারিলাম তাহা আর ধরিবার সময় নাই।

সংসার এক বিচিত্র স্থান, এখানে একাধারে যেমন মর্ত্ত্যে অমরার সৌন্দর্য্য, তেমনই অন্য দিকে নরকের বীভৎস দৃশ্য। এক দিকে উৎসবের মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি, অন্য দিকে ক্রন্দন-রোল। এমন আশা-নিরাশা, হর্ষ-বিষাদ, আনন্দ-নিরানন্দের দ্বন্দ্ব আর কোথাও নাই। যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের হওয়া উচিত, হয়ত সেখানে ঢুকিতে ভয় হয়। যাঁহারা সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা আপন জন, হয়ত তাঁহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে পারা যায় না। সারা দিন কর্ম্মক্ষেত্রে পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সন্ধ্যার সময় বাটীতে ঢুকিতে ভয় পায়, এমন গৃহস্থও দেখা যায়। সর্ব্বত্রই যে এই কথা তাহা নহে, বহু সংসারই এই অশান্তির অনলে জ্বলিতেছে। এরূপ সংসারই অধিক যেখানে অবিরতই সংগ্রাম সংগঠনের কথা নাই। এই সংগঠন সমাজ জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়, আর ইহার পশ্চাতে একটা জীবন্ত আদর্শ থাকা আবশ্যক, যাহার লক্ষ্য হইবে সর্ব্বাঙ্গীণ মানব-কল্যাণ। সমাজ যৌথ জীবনের সমষ্টি মাত্র। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক জীবন যাপন কেবল মাত্র আহার-নিদ্রাতেই পরিসমাপ্ত হয় না। সৃজনী-শক্তির আবশ্যকতা সকলেরই। আমরা জীবন ধারণের জন্য যাহা আপন বা পুত্র-কলত্রাদির জন্য পৃথিবী হইতে গ্রহণ করি, তৎপরিবর্ত্তে আমরা কিছু দিতে বাধ্য বলিয়াই মনে করি।

পারিবারিক নীতিহীনতার ফলে কতই যে গ্লানি উদ্ভূত হইয়া থাকে, কে তাহার নির্ণয় করে? এ জন্য সমাজ-বিন্যাসের পরিবর্ত্তন ও তদনুযায়ী মনস্তত্ত্বের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। কুশিক্ষা-অশিক্ষা ভুল-ভ্রান্তি হইতেও সময় সময় কি সংসার, কি রাষ্ট্র সর্ব্বত্রই অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া মহাপ্রলয় ঘটিতে দেখা যায়। প্রত্যেক মানুষ যখন এক নয়, সংসারে ভুল-ভ্রান্তির কথা না ধরিলেও মতভেদ মতানৈক্য এ সব থাকিবেই। আমি এই বুঝিয়াছি, সংসারী লোকের পক্ষে সর্ব্বদা সব ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। চূণকাম সর্ব্বদা দরকার, যখনই যেখানে কাল দাগ দেখা যাইবে তাহাকে আর একটুও বাড়িতে না দিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় চূণকাম করা দরকার। ইহা সংসারীর পক্ষে সুবর্ণ নীতি। ইহা করিতে যিনি অক্ষম তাঁহার পক্ষে সংসারে শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, বহু ক্ষেত্রেই অশান্তির মূলে কোথাও না কোথাও আছে মূর্খতা অথবা ভ্রান্তি। সংসারের মধ্যে অন্তঃপুর প্রধান বিভাগ। তথাকার অধিষ্ঠাত্রী হইতেছেন নারী। তাঁহাদের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব হেতু বহু অনর্থই হইয়া থাকে। এই যে বহু সংসারেই শাশুড়ী-বধূর মধ্যে অতি বিরূপ সম্পর্ক দাঁড়াইতে দেখা যায়, বহু ক্ষেত্রেই বধূকে দেখিবার, তাহার হইয়া কথা কহিবার কেহ থাকেন না, ইহার মূল কারণও মনে হয় অশিক্ষা হইতেই উদ্ভূত। একটি কন্যা না হইলে পুত্রের বিবাহ হইতে পারে না, তবে বধূর প্রতিই এত নির্য্যাতন হয় কেন? মনে হয়, কন্যাকে দান করিবার সময় তাহার পিতা-মাতা জামাতার জানু স্পর্শ করিয়া কন্যা দান করেন, অলক্ষ্যে সেই গর্ব্ব বা অহঙ্কার মাথায় থাকায় অশিক্ষিতা গৃহিণীর এত দম্ভের কারণ হয়। জামাতা বা জামাতার পিতা-মাতার কাছে কন্যার পিতার বিদ্যা-বুদ্ধি, সামাজিক মর্য্যাদা, এমন কি ধন-গরিমা সবই নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আমাদের সমাজে বিবাহ-পদ্ধতির মধ্যেও কোন কোন বিষয় সংস্কার প্রয়োজন। পূর্ব্বে যাহা চলিত কাল-প্রভাবে তাহা যে ঠিক মতই চলিবে, তাহা না হইতে পারে। এই সবের জন্য অনেক স্থলেই দায়ী পুরুষ। তাঁহারা অনেকেই বাটীর মহিলাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন না। পুরমহিলাদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান বা মর্য্যাদা দিতে নারাজ। মেয়েদের যেন কথা কহিতেই নাই এই তাঁহাদের ধারণা। এখনও এমন অনেক স্থান আছে যেখানে তাঁহারা পুরুষের সম্পত্তির মতই বিবেচিত হইয়া থাকেন। এখন স্ত্রীশিক্ষা বিষয় অনেকেই অবহিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমাদের মেয়েদের যেরূপ শিক্ষা প্রয়োজন, সে দিকে লক্ষ্য বড় একটা দেখা যায় না। ঠিক ছেলেদের মত মেয়েদের শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ করানোয়

অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের সাংসারিক জীবন অশান্তিময়ই হইতে দেখা যায়। সংসারে শিক্ষাহীনা প্রবীণা ও আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তা নবীনাদের সহিত সংঘর্ষ সময় সময় অধিকই হইয়া থাকে।

সমাজে এমনও স্বভাববিশিষ্ট মানুষ পরিলক্ষিত হয়, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা নহে অর্থাৎ যাহা অনুভূতির বিষয় তাহা তাঁহাদের নিকট ধর্তব্যের মধ্যেই থাকে না। পরিজনদিগের মন যেখানে অবহেলিত বা মনের দিকে যেখানে দৃষ্টি নাই, ন্যায় ও সত্য অবমানিত হয়, যেখানে জ্ঞানী, মানী, বিদ্বান্, কর্মী প্রভৃতির জ্ঞান, মান, বিদ্যা, কর্ম স্বীকৃত না হয়, সে সংসার সুখের হইতে পারে না। পারিবারিক সুখ-শান্তি বহুলাংশে নির্ভর করে গৃহস্বামী ও গৃহিণীর ব্যবহারে। তাঁহাদের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মনে রাখা দরকার, দোষ-শূন্য সৎলোকও সময় সময় দুঃখ নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি পান না। সমদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁহারা সকল দিকে নজর রাখিয়া ক্ষমা ও ধৈর্য্য সহ হাসিমুখে সংসারের সকলকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিয়া সংসার পালন করিতে পারেন, তাঁহারাই সুকর্ত্তা ও সুগৃহিণী। সংগৃহস্থের ত্যাগের সীমা নাই। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ সংসার আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসিগণের অর্থ, সম্পদ, সংসার, ভোগ-বিলাস ত্যাগ খুবই কঠিন কাজ হইলেও, সে সব অপরের জন্য যত না হউক নিজের জন্য, পরমার্থ সন্ধানে। আর সংসারী মানুষের কর্ত্তব্য শুধু পুত্র-পরিজন পালনেই নহে, অতিথি অভ্যাগত প্রতিবেশী এমন কি জীব-জন্তু বৃক্ষ-লতার প্রতিও তাহার কর্ত্তব্য আছে। সন্ন্যাসীকে দেখাও তাহারই কর্ত্তব্যান্তর্গত। গৃহস্থের ধর্ম্ম, অপরের কল্যাণের জন্য নিজ জীবনকে বলি দিতে প্রস্তুত থাকা। আদর্শ সন্ন্যাসী অপেক্ষা আদর্শ গৃহী হওয়া যে সহজ তাহা নহে।

সংসারে স্বাভাবিক অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে যাহাতে পরিজনবর্গের স্বাভাবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না হইতে পারে, সেদিকে যত্নবান থাকা এবং যাহার যাহা অর্থাৎ যে স্নেহ, সম্মান, প্রশংসা বা শ্রদ্ধা প্রাপ্য, তাহা তাঁহাকে দেওয়া একান্ত দরকার। কথা যতটা পারা যায়, সোজা ভাবে প্রয়োগ ও গ্রহণ করাই উচিত ও অপ্রিয় উচিত কথা শুনাইয়া বাহাদুরি লওয়ার প্রবৃত্তি সংবরণ করা আবশ্যক; আর সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, বিদ্যা বীর্য্য জ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে যে কোন একটিতেও যিনি সমৃদ্ধবান, তাঁহার যদি কোন বিষয় ছোট দোষ থাকে তাহা উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। পরকে সহজে হীন মনে করা বা একের আদর্শের দ্বারা অপরকে বিচার করা সঙ্গত নহে। নিজ নিজ আদর্শে কেহই কাহারও অপেক্ষা ছোট নহে। স্বার্থপর সংকীর্ণমনা ব্যক্তি কখন নিজেও সুখী হইতে পারে না, সংসারকেও সুখী করিতে পারে না। নিজের মনকে ভাল করা, উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য শুধু একের চেষ্টায়ই শান্তি আসিতে পারে না, তবে একের মন যদি সুন্দর হয় তাহা হইলে তাঁহার চেষ্টায় সংসারকে অনেকটা সুন্দর করিতে পারেন।

মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া বা সত্যকেও কখন অমর্য্যাদা করা উচিত নহে। সত্যজ্ঞান কখন বিনষ্ট হয় না। তাহার মধ্যে এমন এক প্রাণশক্তি আছে যাহা অজেয়। ভুল বা দোষ জানিতে পারিলেই তাহা স্বীকার করিবার সৎসাহস থাকা সকলের পক্ষেই উচিত। গৃহস্বামী রিক্ত হইয়া সর্ব্বস্ব দিলেও সংসার হইতে তাঁহার ছাড়ান নাই, এ কথা মনে রাখিয়া দুর্ব্বলতা পরিহারের চেষ্টা করা উচিত। উৎসাহ সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন। যোগ্য ব্যক্তির নিকট হইতে উৎসাহ লাভ সংসারী লোকের পক্ষে মূল্যবান সামগ্রী, ইহাতে অক্ষম সক্ষম হয়, দুর্ব্বল বলীয়ান হয়। সংসারী ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনকে সার্থক করিতে হইলে সংসারকে সর্ব্বাংশে সুগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক রিপু সকলের প্রাবল্য, তন্মধ্যে ক্রোধ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি করে। দেশের কাজে বিশেষতঃ অধিকার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত, তাঁহাদের সমদৃষ্টিসম্পন্ন নিঃস্বার্থ কর্ম্মী হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনই সংসার-ক্ষেত্রে ক্ষমতা যাঁহাদের হাতে থাকে তাঁহাদের ক্রোধবিবর্জ্জিত ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন সমদর্শী এবং মিষ্টভাষী হওয়া একান্ত দরকার। পারিবারিক গণ্ডীতে হাসিমুখ ও মিষ্টভাষণ যে কত দামী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। নিজের মন কোন কারণে খারাপ থাকিলেও অপরের সঙ্গে ব্যবহারে কোন ক্রটি না ঘটে সেদিকেও সংসারী লোকের দৃষ্টি রাখিতে হয়।

জ্ঞাতি ও ভ্রাতৃবিরোধ, দাম্পত্য কলহ প্রভৃতির উৎপত্তি বুঝিবার ভুল, হিংসা, ক্রোধ, মান, অভিমান, স্বার্থ হইতেই প্রায় উদ্ভূত হইয়া থাকে। সে সময় কি করিয়া বৃত্তি চরিতার্থ হইবে তাহা না ভাবিয়া শুভ ইচ্ছা প্রণোদিত ধৈর্য্য সহ মীমাংসার অন্বেষণেই কতকটা প্রতিকার সম্ভব। যদি সে সুযোগ না থাকে, তাহা হইলে বরং তর্ক-বিতর্কের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাক্ হইয়া স্থান ত্যাগ করাও ভাল। এমন বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, মতদ্বৈধ হইলে মীমাংসার কোন পথ গ্রহণ না করিয়াই উত্তেজনা বশে অনেকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন পারিত পক্ষে তাহা না করাই উচিত, মীমাংসার দ্বারা যদি কিছু ক্ষতি বা লাভ কম হয় সেও ভাল, আদালতে জয়লাভও শেষ পর্য্যন্ত শ্রেয়ঃ নয়। অতি তুচ্ছ সামান্য বিষয় হইতে কত বড় অনিষ্ট সাধিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। অশনিপাত বা উরগ-দংশন প্রভৃতির কথা বলিতেছি না, ছোট একটি কণ্টক বিদ্ধ হইতে সেপ্‌টিক্ হইয়া প্রাণান্ত হইতে পারে, তাহার কথাই বলিতেছি। একটি আমড়া গাছ বা একটি পরিচারিকা হইতে উদ্ভূত একটি সমৃদ্ধ সংসারের পতন, ইহা অসম্ভব ব্যাপার নহে।

পিতা-মাতা পুত্র-কন্যা ভাই-ভগিনী প্রভৃতিকে লইয়া যে সংসার, সেই সংসারে পালিত হইয়া, পালন করিয়া, সেই সংসারের এক জন হইয়া যে যৌথ জীবন, মূলতঃ সেই জীবনের অভিজ্ঞতার কথা এই অধ্যায়ে লিখিত হইলেও অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে যে জ্ঞান ও ধারণা হইয়াছে, তাহাও সংযোজিত হইয়াছে। সংসার বলিতে প্রত্যেক সংসার ঠিক এক নহে। বিভিন্ন সংসারে পরিবারবর্গের সংখ্যা, সংস্থান, সুখ, সুবিধা, দুঃখের কারণ প্রভৃতি সব যদি ঠিক একও হয়, তাহা হইলেও বিভিন্ন সংসারের পরিজনবর্গ যে ঠিক এক ভাবেই দিনাতিপাত করিতে পারিবেন, এমন কথা নাই। দৈহিক গঠনের ন্যায় বিভিন্ন মানবের মনের ভাবও যে কত বিভিন্ন প্রকারের আছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। মন জিনিষটা এক রকম দুই রকম বা তিন রকম নহে, যেমন বহু বহু প্রকারের, তেমনই হিংসা, ক্রোধ, জিদ, সদ্‌গুণ প্রভৃতিও সকলের সমান নহে। সুতরাং এই জীবনে অন্যের সঙ্গে যে সব ঠিক মিলিবে, এমন সম্ভাবনা না থাকা আদৌ

বিচিত্র নহে। একের সংসারের কথা বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়ত অপরে একটা অনুমান বা ধারণা করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু তাহার ঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নহে।

সংসারকে কবি বিষবৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন, দুঃখ সংসারে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। স্বর্গের সুষমামণ্ডিত পরিবার যে নাই তাহা নহে। আমি আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্ধকার দিকটাই বেশি করিয়া দেখিয়াছি। দুঃখকে সরাইয়া সুখের বাসনা এবং তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা ইহাই দরকার। কিন্তু কি নারী কি পুরুষ এমন এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, তাঁহারা এমনই ভাবে থাকেন, যেন সুখ তাঁহাদের জন্য নহে, দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগই যেন তাঁহাদের জন্য বিধি-নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা। ইহা একটা অভিমানের মত ভাব কি না জানি না। যে দুঃখকে অতিক্রম করার চেষ্টাই আবশ্যক, সেই দুঃখকে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকাই তাঁহাদের ভাল লাগে। অনেকে আমার এই মন্তব্য ঠিক গ্রহণ করিতে পারিবেন কি না জানি না। অধুনা কোন কোন পরিবারে এরূপ দেখা যায় যে, বধূর প্রতি তিরস্কার, অন্যায় আচরণ বা অন্য কোন তাহার ব্যক্তিগত অপ্রীতি হইতে উদ্ভূত মনোভাবে তিনি তাঁহার স্নেহের দুলালী ছোট ছেলেমেয়ের উপর বিনা কারণে বা অতি সামান্য কারণে অত্যাচার করিয়া থাকেন, যেন তাহারা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। অকারণে নিজের প্রতি অবহেলা করা ইহাও সময় সময় পরিদৃষ্ট হয়। মনে হয়, এ সবই অশিক্ষা বা বিকৃত শিক্ষার ফল।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে"—সত্যই ভগবানের শ্রেষ্ঠ অবদান মানবতা লইয়া মানব-ভোগ্য সহস্র উপচার-পূরিত এই সুন্দর পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুন্দর ভাবে জীবন যাপনে স্বেচ্ছায় অবহেলা করিবেন এমনই এই প্রসঙ্গে এখনও লক্ষ শিক্ষার বহু কথাই বলা যাইতে পারে। শিক্ষার এখানে শেষ নাই, যতক্ষণ জ্ঞান থাকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে ততক্ষণই শিক্ষা পাইতে পারা যায়। আর এই সব শিক্ষাই মানব-জীবনের পরম সম্পদ, জীবনের পূর্ণতা সাধনের প্রধান সহায়। আমার পারিবারিক জীবনে সাফল্য না পাইলেও, দেবী সমীপে যদি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা হইলে এই প্রার্থনাই করিতে ইচ্ছা হয়—মা, এত দিনে যাহা দিয়াছ তাহা যেন কাড়িয়া লইও না।

কফি, বিষ না অমৃত ?

কফি আধুনিক যুগে সব চেয়ে জনপ্রিয় পানীয় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। যদি আপনি নিয়ম মত কফিপানে আসক্ত থাকেন, তা হ'লে আপনি এক দিনে ২½ থেকে ৩½ পেয়ালা কফি নিশ্চয়ই পান করেন। কফি আপনার পক্ষে ভাল না মন্দ, চিকিৎসকগণ সে-সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মতামত প্রকাশ করেন।

কফি আপনাকে জাগিয়ে রাখে। আবার নিশ্চিন্ততায় ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আপনার রক্তসঞ্চালন অব্যাহত করে। ক্ষুধা জাগ্রত করে। ক্ষুধা বর্দ্ধিত করে। হজমশক্তির সহায়তা করে, যকৃতের অতিরিক্ত 'এ্যাসিড' দূর করে। না, এদের কোনটাই করে না, এদের বিপরীত প্রতিক্রিয়া ফলায় ?

সাধারণ আকৃতির কফি বস্তুটি এত জটিল যে, রসায়নবিদেরা তাঁদের পরীক্ষা সম্বন্ধে প্রায় অস্বীকার করেন। কফিতে সব চেয়ে বিশেষ যে ভাগটি কার্য্যক্ষম তার নাম 'ক্যাফিন' বা Caffein. আসল 'ক্যাফিন হ'ল এক রকমের শুভ্র গুঁড়ো পদার্থ। এক পেয়ালা কফিতে থাকে সিকি তোলারও কম 'ক্যাফিন।' 'ক্যাফিন' মস্তিষ্কের পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রদ। অবশ্য অতিরিক্ত ব্যবহারে 'ক্যাফিনের' কুফল অনেক।

শতকরা সাতানব্বই জনের কাছে কফি ক্ষতিকর নয়। শতকরা তিন জন কফিপানে কুফল পায়। অতিরিক্ত কফি পান করলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। রাসায়নিকের গবেষণায় জানা গেছে যে, কফিপায়ী ব্যক্তিরা যদি মনে করেন, কফিই তাঁদের জাগিয়ে রাখে, তা হ'লে সামান্য পরিমাণ কফি খেয়েই তাঁরা জেগে থাকতে পারেন। অপর পক্ষে কয়েক পেয়ালা গাঢ় কফি খেলেও তাঁরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হ'তে পারেন। তবে খালি পেটে কফি খাওয়া উচিত নয়। রক্তের চাপে যাঁরা ভোগেন কফি তাঁদের বিষতুল্য। বয়স্ক লোকেরা অনায়াসে কফি পান করতে পারেন। অল্পবয়স্কদের কফি না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কফি টাটকা খাওয়াই নিয়ম। পুরানো কফিতে অনেক ক্ষতিকারক বস্তুর উদ্ভব হয়। আবার কফি প্রস্তুতের নিয়মাবলী যথাযথ পালিত না হ'লে কফি পানীয় হিসাবে গ্রহণ করা বিপদজনক। ইংরেজীতে একটি কথা আছে "Coffee boiled is coffee spoiled." সুতরাং কফি তৈয়ারীর নিয়ম জানার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। কফির উপকারিতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা থাকলেও কারও কারও পক্ষে অপরিহার্য্য পানীয় এই কফি—যার কার্য্যকারিতা অন্যান্য পানীয়কে পেছনে ফেলে রেখেছে। পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কফি ব্যবহৃত হয় কানাডাতে। সেখানে প্রতি বছরে ১৮ লক্ষ পাউণ্ড কফি ব্যবহৃত হয়। গত দশ বছরে ভারতবর্ষেও কফি ব্যবহারের রেওয়াজ হয়েছে। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা মাদ্রাজেই কফির অধিক ব্যবহার বলা যায়। এখন চা-ব্যবসায়ী আর কফি-ব্যবসায়ীদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলেছে পৃথিবীর সর্ব্বত্র।

আমাদের ইংরাজী শিক্ষা-৪

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ)

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্লাইভ শুধু যে ইংরেজের সাম্রাজ্য ও ইংরেজের বাণিজ্যই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইংরেজি সাহিত্যের জন্যও এক নূতন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হইতেছে। কার্লাইল একবার সোচ্ছাসে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ বরং তাহার ভারতীয় সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রকে ছাড়িয়া দিতে চাহিবে না। কার্লাইল একটি সম্ভাব্যতার কথা কল্পনা করিতে পারেন নাই। ইংরেজ ভারত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিলেও সেই ইংরেজ-শাসনমুক্ত ভারতবর্ষে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভুত্ব অটুট থাকিতে পারে।

আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার একটা ইতিহাস আছে। প্রথমে আমরা অল্প-স্বল্প ইংরেজি শিখিতেছিলাম রাজপুরুষদের সঙ্গে ও বিদেশী বণিক্‌দের সঙ্গে কাজ-কারবার চালাইবার জন্য। ইংরেজ রাজপুরুষের পক্ষেও ইংরেজি-জানা কেরাণীর প্রয়োজন হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া নূতন শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পশ্চাতে আর একটি প্রেরণাও ছিল। ইংরেজ যখন আমাদের দেশে আসে তখন নানা দিক দিয়া আমরা জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ন্যায়াচার্য্যের টোলে ন্যায় ও দর্শনের আলোচনা হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণের জন্য যে পাঠশালা ছিল তাহার পাঠ্য-তালিকায় পাঠ্যবস্তু খুব কমই ছিল। ইংরেজির সাহায্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে বিচিত্র জগতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করিল। তার পর চলিল অবিরাম ইংরেজি চর্চ্চা। ইংরেজি পড়া, ইংরেজিতে কথা বলা, ইংরেজিতে ভাব প্রকাশ করা, ইংরেজিতে চিন্তা করা, এমন কি ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখা—ইহাই হইল শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদর্শ।

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি চিন্তাধারা প্রবাহিত হইল যাহা ইংরেজির পরিপন্থী। প্রথম হইল স্বাদেশিকতা। ইংরেজি শিক্ষা এই ধারাকে পরিপুষ্টই করিল, কারণ ইংরেজি সাহিত্য বিশেষ ভাবে জাতীয়তাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। যাঁহারা মিল্টন, বার্ক প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা পরাধীনতার বিরুদ্ধে সজাগ হইবেন ইহা স্বাভাবিক, এবং যে পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাঁহারা সংগ্রামশীল হইলেন, সেই পরাধীনতা শুধু রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতা নহে সাংস্কৃতিক পরাধীনতাও বটে। এই আন্দোলনকে জোরাল অভিব্যক্তি দিলেন মহাত্মাজি; তিনি বলিলেন, ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মধ্যে দাস-মনোবৃত্তি জাগ্রত করিয়াছে। সুতরাং ইংরেজিতে চিন্তা করা এবং ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখা শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইল না, ইহা দাসত্বের কলঙ্ক-রেখা বলিয়া ধিক্কৃত হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে আর একটি ধারাও মিশ্রিত হইল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। যাহাদের নিজের সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে তাহারা পরমুখাপেক্ষী হইবে কেন? ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে জনৈক ইংরেজ পরিদর্শক দেশীয় বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, সেখানে পড়িবার মত কোন বস্তু তিনি দেখিতে পান নাই। কিন্তু এখন আর সেইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এক শত বৎসরের চর্চ্চার ফলে আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে; শুধু তাহাই নয়, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের লুপ্ত রত্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া আধুনিক সাহিত্যের—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য এখন আর ইংরেজির মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন নাই। বরং আমাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে, জাতীয় সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে দেশীয় সাহিত্যের মাধ্যমেই করিতে হইবে। ইংরেজিকে বর্জ্জন না করিলে আমাদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হইবে না।

২

আমার মনে হয়, ইংরেজির বিরুদ্ধে এই অভিযান কল্যাণকর হইবে না। এক দিন ইংরেজির প্রাধান্য পরাধীনতার পরিচয় বহন করিত বলিয়া তাহা আমাদের চিত্তদাহের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক দিন আমরা বিলাতী কাপড় বর্জ্জন করিয়াছিলাম একান্ত রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু আজ দেশের অর্থনীতির দিকে দৃষ্টি দিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। যদি সেই দিক্‌ দিয়া বিলাতী কাপড় কেনা ভারতবাসীর পক্ষে সঙ্গত হয়, তাহা হইলে প্রাচীন রাজনীতির দোহাই দিয়া বিলাতী কাপড় বর্জ্জন করা আত্মপ্রতারণায় পর্য্যবসিত হইবে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই যুক্তি আরও বেশী প্রযোজ্য। ভারতবর্ষ বহু জাতির বাসভূমি এবং প্রত্যেক প্রদেশেই একটি বিশিষ্ট বা একাধিক ভাষা প্রচলিত। ইহাদের কোন একটি ভাষাকে প্রাধান্য দিতে গেলে প্রাদেশিকতার বিষ কেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্ত পাঞ্জাব এবং দক্ষিণ-ভারতে পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ ভারতের একজাতীয়ত্বকে কবির কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের অভিযোগ মিথ্যা হইলেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যে-সকল শক্তির প্রক্রিয়ায় আধুনিক ভারত একজাতীয়ত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে তন্মধ্যে ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব অন্যতম। অনেকে বলেন, মেকলে যেমন এক দিন জোর করিয়া ইংরেজি চালাইয়াছিলেন তেমনি আইন করিয়া হিন্দীকে চালাইয়া দিলে তাহাই ইংরেজির স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু যে সাহিত্য ও যে ভাষা জনগণের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হইবে তাহা যদি সমৃদ্ধিমান না হয়, তাহা হইলে তাহা জাতির সংস্কৃতিকে রুদ্ধ করিবে না পরিপুষ্ট করিবে? ইহা কি অগ্রগতি না পশ্চাদ্ধাবন? ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদের দিক দিয়া হিন্দী ও ইংরেজীর তুলনা করিলে এই প্রশ্নের মাত্র একটি উত্তরই সম্ভব। বলা যাইতে পারে যে, কালক্রমে হিন্দী যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। কিন্তু সম্ভাব্যতার উপরে নির্ভর করিয়া কি আমরা সমৃদ্ধিমানকে পরিত্যাগ করিব? হিন্দী ভারতবর্ষীয় ভাষা, কিন্তু তাহা বাঙ্গালী, আসামী, মারাঠীর (মাদ্রাজীর কথা ছাড়িয়াই দিলাম) মাতৃভাষা নহে; তাহাকে অন্যতর ভাষা হিসাবে কসরৎ করিয়াই ইহা শিখিতে হইবে। যদি পরিশ্রম করিয়াই শিখিতে হয় তাহা হইলে কোন ভাষা শিখিব—শেক্‌স্‌পীয়রের না প্রেমচন্দের?

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাহা বিশেষ ভাবে ইংরেজি শেখার ফল। আমরা সচরাচর

কর্ম্মফলে বিশ্বাস করা উচিত। কর্ম্মের উপর সংসার চলছে। যে রকম মানুষ কাজ করছে সেই রকম ফল পাচ্ছে। সাধন-রাজ্যেও ঠিক তেমনি। বুদ্ধদেব কর্ম্মের উপর ধর্ম্ম স্থাপন করে গিয়েছেন।

সংস্কার

মানুষ মাত্রেই সংস্কারের পুঁটলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। সংস্কারের বশেই মানুষ ভাল-মন্দ সব রকম কাজ করে থাকে। সংস্কার সৎ এবং অসৎ দুই-ই আছে। সংস্কারবিহীন মন হওয়া বড় কঠিন। জীবের সংস্কার কি সহজে যায়? একবার সাধুসঙ্গ বা তীর্থভ্রমণ করলেই কি জন্ম-জন্মান্তরের দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার নষ্ট হয়ে যায়? এ জন্য বহু খড়-কাঠি পোড়াতে হয়।

যিনি সেই আনন্দময় ভগবানকে লাভ করে সর্ব্বদাই আনন্দে ভরপুর হয়ে রয়েছেন, এমন সাধুর সঙ্গ করতে করতে তবে মনে সত্তার প্রভাব ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অসৎ সংস্কারগুলো ক্ষীণ হতে থাকে। এই ভাবে সৎ সংস্কার প্রবল হলে অসৎ সংস্কারগুলো ক্রমশঃ নাশ হয়ে যায়। তখন মন সংস্কার-বিহীন হয়।

সংস্কার যাওয়া বড়ই কঠিন। ভগবানের কৃপা ভিন্ন হয় না। অনেক বড়লোকের ছেলে, কোনো অভাব নেই—তবুও চুরি করে। এ সব পূর্ব্বজন্মের সংস্কার। সেই জন্যেই তো জন্মান্তর মানতে হয়। জন্ম নিয়ে ভাল কাজ করলে শুভ সংস্কার হয়। তখন অশুভ সংস্কারগুলো ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যেতে থাকে।

মন

মন সম্বন্ধে সাবধান। মনের মধ্যে কামনা-বাসনা কিলবিল্ করছে। কখন যে কোন্ দিকে অধঃপাতে নেয় তার ঠিক নেই। সাধন-ভজন করে মন পবিত্র হলে অসৎ কামনা আর মনে উঠতে পারে না। তাই বলি,—সাধন কর; কোনটা সৎ, কোনটা অসৎ তখন মনই তোমাকে বলে দেবে। মন তোমার গুরু হয়ে যাবে।

মন বেশীর ভাগই বিষয়-সুখ চায়। তাই মানুষ এত দুঃখ-কষ্ট পায়। বিষয়ের চিন্তা ও বিষয়ের ধ্যান করছে বলে এত দুঃখ। বিষয়-তৃষ্ণা মন স্ত্রী, পুত্র, ধন এই সবেতেই মত্ত হয়ে থাকে। সর্ব্বদা বিষয়-চিন্তা করে করে এমন একটা সংস্কার জন্মায় যে, মন তখন আর উঁচু ধাপে উঠতে পারে না। যদি বা দৈবাৎ ওঠে তো আবার পড়ে যায়। ঠাকুর যেমন বলতেন,—বেজীর ল্যাজে আধেলা ইট দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলে সে যতই লাফ দিয়ে দেয়ালের গর্ত্তে উঠতে চেষ্টা করে ঐ ইটের ভারে ধুপ করে নীচে পড়ে যায়। সংসারীর মন ঠিক তেমনি বিষয়ের টানে ঐ বেজীর মত নীচে পড়ে যায়—উঠতে পারে না। কিন্তু সেই বিষয়-টানের মোড় ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দিলেই প্রেম হয়ে যায়। কিন্তু জীব তা না করে তার মনকে কাম-কাঞ্চনের আস্তাকুড়ে ফেলে রেখেছে। এমনি তাঁর মায়া।

মনটা মায়া-ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। এইজন্য সে বার বার এত চোট খায়। কিন্তু তবুও ঐ বিষয়েরই ধ্যান করে। ঠাকুর বলতেন—'মন বেচারার কি দোষ আছে? শ্যামা মা তাকে আঁখি দিয়েছেন। শ্যামা মা তাকে দয়া ক'রে ছেড়ে না দিলে তার আর উপায় নাই।'

ঠাকুর তো অনেককেই বলতেন—'মনের মোড় ফিরিয়ে দাও, কাম-ক্রোধের মোড় ফিরিয়ে ভগবন্মুখী করে দাও।' কিন্তু জীবের সাধ্য কি যে, বিষয়-সুখী মনকে ভুলেও ভগবানে দেয়! সে সাধ্য জীবের নেই, কারণ মন গভীর সংসার-কূপে পড়ে রয়েছে। কেউ এসে তাদের টেনে তুলতে চাইলেও উঠতে চায় না। কি মজা! দেখ, কাম-কাঞ্চনের মোহ তাদের এমনি পেয়ে বসেছে যে, টেনে তুললেও উঠতে চায় না। তারা দুঃখ ভোগ করছে তবুও তাদের কোন বোধ নেই—একেবারে বেহুঁশ।

ভোগ-বাসনা আর কু-ভাব থেকে খুব সাবধান। ভুলেও এদের মনে স্থান দেবে না। মনের যখন নিম্নগতি ক্রমশঃ হতে থাকে তখন মানুষ বুঝেও বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন ভাল ভাবে বুঝতে পারে তখন আর ওঠবার শক্তি থাকে না। সাধককে ভোগ-বাসনা অলক্ষ্যে অধোদিকে নিয়ে যায়। কামনা-বাসনার একটু কৈঁকড়ি পর্য্যন্ত মনে থাকলে সে মন ঈশ্বরের দিকে গতি করে না। ঠাকুর তো বলতেন যে, সুতোর আগে একটু কেঁসো থাকলে ছুঁচে ঢোকে না। বৈরাগ্য ও অনুরাগ দ্বারা মনকে সব সময় পবিত্র রাখবে। কথায় বলে—'মন চাঙ্গা তো কটুরী মে গঙ্গা।'

সংসার

সংসারে একটি লোকের উপর অনেক লোক নির্ভর করে। তার বিষম দায়িত্ব। তার শরীরের প্রতি বাড়ীর সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত। যদি গোলমাল হয় তবে সংসারটি ছারখার হয়ে যায়। অবস্থান্তর হলে বড়ই বিপদ। সুখে থাকতে যারা আরামে কাটিয়েছে অবস্থান্তর হলে তাদের বড়ই কষ্ট হয়। এ জন্য যখন যে অবস্থায় ঈশ্বর রাখেন সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা ভাল। ভগবানের কাছে খুব প্রার্থনা করতে হয়—যাতে সব সহ্য করতে পারি, সব অবস্থায় যেন সন্তুষ্ট থাকতে পারি। ঠাকুরের মহাবাক্য 'শ' 'ষ' 'স' অর্থাৎ সহ্য কর—সহ্য কর—সহ্য কর—প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত।

বেশী রাগ-অভিমান করতে নেই। সংসারে থাকতে হলে একটা না একটা লেগেই থাকে। সে সব ভাবতে গেলে মন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে এবং ভগবানকেও অনেকখানি সময় ভুলে যেতে হয়।

যৌবনের বেগ ও অর্থের লালসা যে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারে, সংসারে থেকেও সে অনায়াসে ভব-সাগর পার হয়ে যায়।

সংসারে সব আমার-আমার আমি-আমি করে। অহং-বোধই মূর্খতা। মানুষ একবার ভাল করে ভেবে এবং বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবে, এ সংসারে কে কার? সাধন-ভজন করলে তবে নিত্য ও অনিত্যের জ্ঞান হয়।

সংসারের আবহাওয়া বড়ই খারাপ। সদাই জীবকে প্রলোভন দেখিয়ে মুগ্ধ করে রাখছে। জীবই যে শিব, মায়া এ কথা সকলকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। মায়া রহিত মহাপুরুষদের স্মরণ করলে এ মায়ার হাত থেকে এক দিন বেঁচে যাবে। কিন্তু সংসারে থেকে যদি গিরিশ বাবুর (নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ) অনুকরণ কর,

...ভাব যে, তিনিও ত শেষে ভক্ত হয়েছিলেন—আমরাই বা ...র মত হব না কেন—" তাহলে কিন্তু সবই বিগড়িয়ে ফেলবে। ...র অনুকরণ করতে যেয়ো না, ওতে মারা পড়বে। ঠাকুর-স্বামীজির জীবন দেখে ও তাঁদের উপদেশ মেনে চললে তোমাদের নিশ্চিত কল্যাণ হবে। জীব-দুঃখে কাতর হয়ে জগতের কল্যাণের জন্যই তাঁরা দেহ ধারণ করে এসেছিলেন।

সংসারে মানুষ এত স্বার্থপর হয়ে পড়েছে বলেই ওদের এত দুঃখ-দুর্দশা। মানুষ এখন নিজের ছাড়া অন্য কারুর কথা একবার ভেবেও দেখে না। পরের মঙ্গল না চাইলে আর নিজের মঙ্গল হবে কোথেকে? যে দশের জন্য ভাবে তাকে নিজের জন্য আলাদা করে আর ভাবতে হয় না, দশের সঙ্গে তার নিজেরও ভাগ হয়ে যায়। সে তো আর দশকে বাদ দিয়ে নয়?

সংসারে থাকলে বিয়ে করতে দোষ নেই। কিন্তু বুঝে শুঝে করবে। সদ্ভাবে জীবন যাপন করার মত শক্তি আগে সঞ্চয় করে নিতে হয়। যেন কোনও অবস্থাতে তাঁকে ভুল না হয়।

সুখী লোক সংসারে নেই এ কথা কেউ বলতে পারে না। ভগবানকে যে পেয়েছে সে নিশ্চয়ই সুখী। রোগ শোক জরা মৃত্যু প্রভৃতির দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আবার বুদ্ধদেব বলেছেন যে, বাসনা-মুক্ত হলেই সুখী হওয়া যায়।

সংসারে লোককে ভালবাসলে খুব সুখী আর মন্দ বললে মনে মনে মহা অসন্তুষ্ট। সাধারণ সংসারী লোকের ভক্তি তো ঠুনকো কাচের মত, ঘা (আঘাত) দিলেই অমনি ভেঙ্গে যায়। সাধু-সন্ন্যাসীরা ভালই বলুন আর মন্দই বলুন তাতে যে কতখানি কল্যাণ হয় সে আর সকলে বুঝবে কি করে?

আজ-কাল সংসারে সমস্ত দিন খেটেও ভাল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে লোকের যায় যায় হয়েছে। তার উপর বিয়ে করলে তো আরো কত ফ্যাসাদ এসে জুটে। বিয়ের যে কত ফ্যাসাদ! যদি স্ত্রী হেসে ভাগ্নে বা ভায়ের সঙ্গ কথা কয়েছে, তা হলেই সন্দেহের ভারে বুক ভারী হয়ে যায়। বুকের যন্ত্রণায় প্রাণ আইচাই করতে থাকে।

সংসারে ভায়ে-ভায়ে মিল থাকা খুব দরকার। সকলে সমান রোজগার করতে পারে না। হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয়। সংসার ক'দিনের জন্য? বেশী ভাববে না। কোন রকমে সংসার চলে যাবেই, তিনি চালিয়ে নেবেন। নিজেকে শুধু নিমিত্ত করে রাখো। তিনিই তো সব করছেন। জীবের সাধ্য কি যে, ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করে। তাঁর ইচ্ছায় সব হচ্ছে জানবে। তা বলে কি কিছু না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? এ সব তমঃ গুণের লক্ষণ। নিজকে খাট্‌তে হবে। না খেটে কিছুই লাভ হবার যো নাই। তবে তাঁকে ধরে থেকে কাজ করলে সংসারের ... কষ্ট গায়ে লাগে না।

স্বাবলম্বী না হলে ছেলেদের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বিয়ে সম্বন্ধে ছেলেদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। কোন কোন বাপ-মা ছেলে-মেয়েদের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দেন। আবার কেউ কেউ ছেলেদের বলেন—"তোমাদের সামান্য আয়, বুঝে সংসার করবে। আমরা সংসারে থেকে অনেক দুঃখ পেয়েছি।"

ছেলে-মেয়েদের নিকট বাপ-মা'র খুব সাবধান থাকা উচিত। ছেলে মেয়েরা বাপ-মায়ের নকল করে। বাপ-মা মানুষ না হলে ছেলে-মেয়েদের মানুষ হওয়া কঠিন। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সময় দেখাবে যেন শত্রু কিন্তু অন্য সময় তাদের স্নেহ করবে।

সংসারে থেকে ভগবানকে ডাকা সোজা। কারণ যোগান দেওয়ার অনেক লোক থাকে। আর অল্প সাধন ভজন করলেই ধর্ম্মবুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হয়। সংসারীর প্রতি ভগবানের কত দয়া। আগে এদেশে ঘরে ঘরে সাধক ও ভক্ত ছিলেন। এখন আর সে দিন-কাল নেই। বিলিতি শিক্ষা পেয়ে লোক যোগ ভুলে গিয়ে ভোগের দিকে ছুটেছে। ধর্ম্মের উপর সে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা কোথায়? তাই তো এত দুর্দশা!

তোমরা খুব উঁচু আদর্শ সামনে রেখে সংসার-পথে চল্‌বে, তবে নিশ্চয়ই কল্যাণ হবে। প্রকৃত ত্যাগী মহাপুরুষদের জীবন দেখে নিজ নিজ জীবন পথে ঠিক চল্‌তে শেখো। আদর্শ ছেড়ে দিলেই ঠক্কর খেয়ে ঠিক্‌রে পড়ে যাবে। ঠাকুর বলতেন, পতনের রাস্তা বড়ই ঢালু। একবার পতন হলে কোমর সোজা করে ওঠা খুবই কষ্টকর। তবে মহাপুরুষেরা সংসারী জীবকে তুলবার জন্যই দেহ ধারণ করে আসেন। সাংসারীর প্রতি তাঁর কি কম কৃপা?

মায়া

ভগবানের দয়া তো সর্ব্বদাই সব জীবের ওপরে রয়েছে! কিন্তু জীব মায়া-মুগ্ধ, তাঁর দয়া চায় না। ভগবান বিশ্বাত্মা। সকলের মনই তিনি জানেন। যে তাঁকে চায় সে তাঁকে পায়। তিনি ধরা দিয়েও ধরা দিতে চান্ না। এই তো হয়েছে জীবের পক্ষে মুস্কিল। সব ব্যাপারই হচ্ছে তাঁর লীলা। তাঁর লীলার রহস্য সামান্য জীব কি বুঝবে! এক মাত্র মহাপুরুষেরাই তা' যথাযথ বুঝতে পারেন। আর কারো মুরোদ নেই।

মায়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব জীবকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভগবানের দয়া না হলে সেই মায়ার হাত হতে নিস্তার পাওয়ার কোনও উপায় নেই। মহামায়া জীবের মায়া-বন্ধন কেটে না দিলে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় নেই।

এ জগতে সবই মায়া। মায়ার শিকল আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। সাধন-ভজন ও অভ্যাসের দ্বারা একটু একটু করে মায়া ত্যাগ করতে হয়। নিত্য-অনিত্য, সৎ-অসৎ বিচার করে অনিত্য অসৎকে ভুলতে হয়! প্রথমে পারিপার্শ্বিক আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এদের মোহ ত্যাগ করতে হয়। বাইরে বেশ লোকদের দেখাবে যাতে তারা তোমার মনের ভাব দেখে কিছু বুঝতে না পারে। কর্ত্তব্য বোধে সবই করে যাবে কিন্তু মনে মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়। বড়লোকের ঝি মনিবের ছেলেদের নিজের ছেলে-মেয়েদের চাইতেও বেশী যত্ন করে মানুষ করে কিন্তু সে মনে জানে যে, তারা তার কেউ নয়।

পারিপার্শ্বিক বা আত্মীয়-স্বজনে মায়া ত্যাগ সোজা। সৎ-অসৎ বিচার আর তীব্র বিবেক থাকলেই ক্রমে ক্রমে হয়ে যায়। কিন্তু বাপু শরীরের মায়া ত্যাগ করা সোজা নয়। দেহ-জ্ঞান রহিত হওয়া কি চারটি কথা? বার বার বিচার করতে হয়, মনে মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করতে হয় যে, শরীরটাও আমার নয়, মনটাও আমার নয়, ইন্দ্রিয়াদি বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই আমার নয়। আমার স্বরূপ

এরও ঊর্দ্ধে। এমনি করে সূক্ষ্মের ধ্যান করতে করতে দেহের মায়া যায়, এ সব সময় ও সাধনসাপেক্ষ। এক দিনে দু'দিনে যায় না। বছরের পর বছর ধৈর্য্য ধরে বিচার ও বিবেক সহায়ে মায়া ত্যাগ করতে হয়! ব্রহ্মজ্ঞান না হলে মায়াতীত হওয়া যায় না। একটু না একটু দাগ থেকে যায়। তবে তার দ্বারা কাজ হয় না।

এই জগৎকেই কেউ "ধোঁকার টাটি" "কেহ মজার কুটী" দেখছে। আবার কেউ দেখছে এই জগৎটা তাঁর বিরাট দেহ। আমরা সবই তাঁর কোলে রয়েছি, যেমন মায়ের কোলে সন্তান থাকে। আমরা যে তাঁরই সন্তান এইটে ভুল হয়ে যায় বলে যত গণ্ডগোল বাধে। আমরা সকলেই যে মহামায়ার রাজত্বের গণ্ডীর ভিতরে। এইটে ভুল হয় কেন? এ যে মহামায়ার এলাকা। তিনি যে কি এক খেলা লাগিয়ে দিয়েছেন—খেলাতেই তাঁর আনন্দ, কত অঘটন ঘটাচ্ছেন!

জীব যতক্ষণ অবিদ্যা, অজ্ঞানের এলাকাতে রয়েছে ততক্ষণ তাঁর কাছে এগুতে পথ পায় না, কিন্তু প্রাণের ব্যাকুলতায় তাঁকে কেঁদে কেঁদে ডাকলে পরেই তাঁর দয়া হলে তিনি কাছে টেনে নেন। জীব যতক্ষণ অজ্ঞানের খেলাতে মেতে থাকে, তাঁকে কাতর ভাবে ডাকবার প্রবৃত্তি হয় না। এই গুণময়ী মায়ার বিচিত্র লীলা!

প্রচারক

আগে নিজের সাধন-সম্মান খুব বাড়াও। ক্রমে যখন আণ্ডিল হয়ে যাবে, তখন তা থেকে লোকের কল্যাণের জন্য যত দান করবে, তোমার ভাণ্ডার ফুরুবে না। কারণ তিনি তখন খুব সাপ্লাই (যোগান) দিতে থাকেন। তা না হলে নিজের কিছু জমতে না জমতে পাত্র-অপাত্র, অধিকারী, অনধিকারী বিচার না করে কেবল বাজে খরচ করতে থাকলে কি কোন কাজ হয়? নিজের কোন কালে পুঁজি বাড়াতে পারলে না, চিরকাল ভিখারীর মত সাধন-সম্মান শূন্য হয়ে বেড়াচ্ছে যে, সে আবার ধর্মশিক্ষা দিবে কি?

যে নিজেই মুক্ত হতে পারেনি সে আবার লেকচার দিয়ে অপরের বন্ধন মোচন করে মুক্তি দিতে চায়। এ কি বিড়ম্বনা! নিজে কোথায় পথ্যি করবে তার যোগাড় নেই যে নিজেই কদ্দোসী সে আবার সেই পরম ধন, পরম জ্ঞান, পরম আনন্দ ও পরম শান্তি অন্যকে দিতে চায়! এ কি পাগলামী নয়? যার যা আছে সেই জিনিষ সে দান করতে পারে। কিন্তু যা নেই সেই জিনিষ সে কি করে দান করবে?

আজ-কাল জ্ঞান-শিক্ষাদাতা পরের মুক্তির জন্য ব্যগ্র বাগীশ অনেকই হয়েছেন। তাই কোনও ফল হচ্ছে না যাঁরা লোকশিক্ষা দেবেন তাঁদের সংযম, ত্যাগ ও তপস্যার পুঁজি থাকা চাই। নইলে নিজের কিছুই হল না, কেবল পরের মুক্তির জন্য ভাবছে। সকলের কি নিত্যানন্দের মত ক্রোধশূন্য, নির্লোভ ও পরমানন্দ অবস্থা লাভ হয়েছে যে, ঘরে ঘরে যাকে-তাকে অভিমান শূন্য হয়ে হরিনাম বিলোবে? সেই অবস্থা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কোন কাজ হবে না—নকল করতে গেলে মারা যাবে।*

---

* গত চৈত্র মাসের বাণীগুলিও শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের সেবক স্বামী সিদ্ধানন্দ মহারাজ সংগৃহীত তথ্যাবলী অবলম্বনে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও লিখিত।

তোৎলামি কি সারে না?

আ-আ-আ-আ-আ-আপনি কি কথা বলতে বলতে কথা জড়িয়ে ফেলেন? তার মানে আপনি কি তোৎলা? তা যদি না হন, তা হ'লে আপনি রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের চেয়ে অনেক বেশী ভাগ্যবান। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির চেয়ে অনেক বেশী সুখী। চার্লস ডারুইনের চেয়ে বহু পরিমাণে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদপূত। আর চার্লস ল্যাম্বের চেয়ে অধিক আনন্দমুখর। কেন না এই সব পৃথিবীখ্যাত ব্যক্তিরা সকলেই তোৎলা। বাক্‌শক্তি পেয়েও তাঁরা কষ্টবাক্। খ্যাতিমানদের বাদ দিলে দেখা যাবে সাধারণ মানুষের মধ্যেও অনেকের আছে এই রোগ, অর্থাৎ তোৎলামি। এই রোগের কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, বংশগত তোৎলামির জন্যে অনেকে তোৎলা হয়। কণ্ঠের বা গলদেশের অসুখের জন্যে কেউ-কেউ এই রোগে ভোগে। আবার একটা কথা কিংবা একটা অক্ষরের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের বদ অভ্যাস থাকে কারও কারও। দাঁতের দোষেও অনেকে তোৎলা হয়।

তোৎলা যারা তাদের বোকা, মূর্খ এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনে ক'রে তামাসা পর্য্যন্ত করতে শোনা যায় অনেককে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আদপেই তা নয়। বহু তোৎলা লোককে দেখা যায় তারা অপরিসীম প্রতিভার অধিকারী। তোৎলামি অনেকের কাছে হাস্যকর মনে হ'লেও সভ্য দেশে এই রোগীদের হাসির বস্তু কেউ মনে করে না। তোৎলামি সারিয়ে তুলতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কত সভ্য জাতি। তোৎলামি সেরে যায় বৈজ্ঞানিক এবং মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে। রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের সিংহাসন লাভের পূর্ব্বে এক জন চিকিৎসক রাজার চিকিৎসার জন্যে বেশ কিছু দিনের জন্যে রাজপ্রাসাদে ছিলেন। রাজার তোৎলামি সারিয়ে একটা রাজকীয় উপাধি পর্য্যন্ত তিনি লাভ করেছিলেন। ডিমস্থেনিস্ মুখে পাথরের নুড়ি পুরে রেখে নিজের তোৎলামি সারিয়েছিলেন।

তোৎলামি শৈশবে ও কৈশোরে যতটা বেশী থাকে, বয়স হ'লে আবার অনেকের ক্রমে ক্রমে সেরেও যায়। একটি কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, তোৎলামি মূর্খামি নয়, এক রকমের ব্যাধি। তোৎলাকে দেখে হাসতে নেই, বরং সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখাই সভ্যতা। দা ভিঞ্চি ও ডারুইনের মত প্রতিভাবান যে রোগে ভুগছেন সে-রোগ যত্নের চিকিৎসায় উপশম হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তেমন অর্থ আর ধৈর্য্য কত জনের আছে! যার অভাবে তোৎলামি আমাদের কাছে এক দুরারোগ্য ব্যাধি হিসাবেই ধার্য্য হয়ে আছে। অথচ যার আরোগ্যের বহুবিধ পন্থা বিদ্যমান রয়েছে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে।

পবিত্রমোহন প্রধান

(উড়িষ্যার প্রচার ও শ্রমবিভাগের মন্ত্রী)

উড়িষ্যার গড়জাত রাজাদের অত্যাচার

এই সেদিনকার কথা। বড়লাট লর্ড উইলিংডন, লর্ড লিনলিথগো লৌহহস্তে ভারত শাসন করছিলেন। উড়িষ্যা তখন সাতাশ ভাগে বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে ছাব্বিশটি দেশীয় রাজ্য। রাজারা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। ময়ূরভঞ্জ, পাটনা, কালাহাণ্ডী, গাঙ্গপুর আর কেন্দুঝর—এই পাঁচটি বড় রাজ্যকে বাদ দিলে বাকী একুশটিতে শাসন-প্রণালী বলে কিছু ছিল না। রাজাদের সাধনা ছিল পলিটিক্যাল এজেন্টকে খুশী করা। এজেন্ট সাহেবকে হাতে রেখে রাজারা বীর-বিক্রমে নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচার করে যেতেন। প্রজাদের তাঁরা মানুষ বলে ভাবতেন না। তাঁদের চোখে প্রজাদের জীবন বা সম্পত্তির কোনও মূল্য ছিল না।

যাঁরা ফরাসী বিদ্রোহের ইতিহাস পড়েছেন—তাঁরা জানেন বিদ্রোহ কেন হয়েছিল। কু-শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ফরাসী প্রজারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ইতিহাসে তাদের কাহিনী অমর হয়ে রয়েছে। অথচ তালচের প্রজা-আন্দোলন কাহিনী কেউ জানেন না। এরোপ্লেন থেকে বোমা আর মেশিন গান থেকে গোলা বর্ষণের সামনে যে সব অশিক্ষিত গ্রামবাসী বুক পেতে দাঁড়িয়েছিল—কোনোও বইএর পাতায় তাদের নাম পাওয়া যায় না। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তারা কাপুরুষের মত পালিয়ে যায়নি। তাদের রক্তাক্ত মৃতদেহের স্তূপ ব্রাহ্মণী নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। পৃথিবীর বুক থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

তালচের রাজ্য আয়তনে খুব ছোট ছিল। মাত্র ৪০০ বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা মাত্র ৮৫,০০০। রাজ্যের রাজস্ব ছিল এক লাখের নীচে। অথচ রাজার আয় ছিল কলিয়ারী থেকে আয় বাদ দিলেও প্রায় তিন লাখ টাকা। এ টাকা তিনি আদায় করতেন প্রজাদের শোষণ করে। যে টাকা দিতে অস্বীকার করত—রাজ্যে তার স্থান ছিল না। রাজার বিষ-নজরে কেউ পড়লে তাকে সবংশে ষ্টেট ছেড়ে পালাতে হতো। রাজা যে শুধু শোষণ করতেন, তা নয়। রাজ্যের মধ্যে তিনি লোকদের মাইনে দেওয়া ছাড়া টাকা খরচ করতেন না। প্রজাদের জন্যে তো নয়ই—নিজের জন্যেও নয়। অর্থাৎ রাজা আর রাজ-পরিবারের সমস্ত খরচ প্রজারা যোগাতো। শুধু তালচের নয়, ঢেঙ্কানাল, নীলগিরি প্রভৃতি রাজ্যেও প্রজাদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। ঢেঙ্কানালে প্রজাদের উপর আরও বেশী নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হতো। রাজ্যে ছিল রাজার একচ্ছত্র আধিপত্য। অত্যাচারের বিরুদ্ধে কারও প্রতিবাদ করবার সাহস ছিল না। করলেই জরিমানা নয় জেলে পাঠিয়ে রাজা অবাধ্য প্রজাদের শাসন করতেন। এ তো গেল রাজাদের কথা। তাঁদের ছেলে, ভাই বা আত্মীয়েরা কোনও অংশে কম যেতেন না। রাজার অফিসাররা ছিলেন এক একটি মূর্ত্তিমান যমদূত। রাজা ধরে আনতে বললে বেঁধে আনতেন। রাজার তহবিল বাড়াতে পারলে তাঁরা রাজার প্রিয়পাত্র হতেন। তাঁদের সাত খুন মাপ হতো।

আমি আগেই বলেছি, রাজারা ষ্টেটের মধ্যে টাকা খরচ করতে চাইতেন না। রাজা, রাজ-পরিবারের সব কাজ প্রজারা 'বেঠি'তে অর্থাৎ বিনা মজুরীতে করে দিতে বাধ্য ছিল। রাজ্যের রাস্তা-ঘাট প্রজারা তৈরী করত। চুণ পুড়িয়ে ইট করে বাড়ী-ঘর তৈরী করে দিত। রাজা একটি পয়সাও মজুরী দিতেন না। রাজা আর রাজ-পরিবারের ক্ষেত-খামারে প্রজারা বিনা মজুরীতে কাজ করে দিয়ে আসত। নিজেদের ক্ষেতের কাজ ফেলে রেখে তাঁদের ক্ষেতে ধান কাটা থেকে ধান বোনার কাজ করত। দশহরা আর সুনিয়ার (ভাদ্রের শুক্লা-দ্বাদশী) সময় প্রত্যেক গ্রাম থেকে প্রজারা তালচের গড়ে যেত 'বেঠি' খাটবার জন্যে।

রাজা আর তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা প্রায়ই শিকারে যেতেন। কোনো ইংরেজ অফিসার (লাট সাহেব, রেসিডেন্ট বা পলিটিক্যাল এজেন্ট এলে ত কথাই নেই) এলে শিকারের ধুম পড়ে যেত। আগে থেকে রাজার তহশীলদারেরা শিকারের আয়োজন করতে ছুটতেন। জঙ্গলের রাস্তা বেঠিতে মেরামত করা হলো। ছোট ছোট নদী-নালার উপর পোল করা হতো না—খরচ কমাবার জন্যে। সুতরাং এক দল প্রজাকে ধরে আনা হতো—তারা শিকার পার্টির ট্রাক্, মোটর গাড়ী ঠেলে-ঠেলে পার করে দেবে। জঙ্গলের কাছাকাছি গ্রামগুলির লোকেরা নিজেদের কাজ-কর্ম ফেলে দিনের পর দিন beat দিত। পলিটিক্যাল এজেন্ট বাহাদুর মাচা থেকে বাঘ হরিণ মেরে রাজার সুশাসন সম্বন্ধে রেসিডেন্ট সাহেবকে রিপোর্ট দিতেন; পাছে বাঘ মারলে পলিটিক্যাল এজেন্টের জন্যে বাঘ মজুদ না থাকে, বা বুনো হাতী মারলে রাজার আয় কমে যায়—তাই প্রজাদের বাঘ, বুনো হাতী মারবার অধিকার ছিল না। বাঘ গ্রামের মধ্যে ঢুকে প্রজাদের গাই-বলদ খেয়ে যেত। বুনো হাতী, হরিণ প্রজাদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করত। কিন্তু প্রজাদের বিনা পারমিটে রিজার্ভ জঙ্গলে যাবার অধিকার ছিল না। পাছে তারা কাঠ কেটে নেয় তাই এই ব্যবস্থা ছিল। রাজারা শীতকালে হাতী ধরে বিক্রী করতেন। তাই 'হাতীখেদা' বেঠি কাজে এক দল প্রজাকে শীতকালে জঙ্গলে পড়ে থাকতে হতো।

ধরুন, রাজা বা বড় অফিসারেরা গস্তে যাবেন। আপনারা ভাবছেন—কি কর্ত্তব্যপরায়ণ শাসক এঁরা। গ্রামে-গ্রামে ঘুরে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শুনবেন। রাজা বা অফিসারেরা গ্রামে পৌঁছুবার আগে গ্রামের সরবরাকারেরা (মোড়লরা) চাল, ডাল, ঘি, দুধ, মাংস প্রজাদের কাছ থেকে জোগাড় করে রাখত। একে বলা হতো রসদ। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে প্রজারা তাঁদের পালকীতে বসিয়ে নিয়ে যেত। তাঁদের জিনিসপত্র কাঁধে করে নিয়ে যেত। বলা বাহুল্য, এ জন্য তাদের একটি পয়সা দেওয়া হতো না। এ কাজের নাম ছিল 'বেগারি'।

রাজার যত কাজ প্রজারা বিনা মজুরীতে করবে—শুধু যে এই নিয়ম ছিল তা নয়। তাঁর সংসারের সব খরচ প্রজাদের যোগাতে হতো। প্রজারা রাজার গরু, মহিষ, হাতী, ঘোড়ার দানা যোগাবে। রাজবাড়ীর রান্নার জন্যে জ্বালানী কাঠ এনে দেবে। দশহরা আর সুনিয়ার সময় দরবার হতো। গ্রামের সরবরাকারেরা প্রত্যেক গ্রাম থেকে টাকা, পয়সা, চাল, ডাল, দুধ, দই সংগ্রহ করে রাজাকে 'ভেটি' (দর্শনী) দিয়ে আসত।

অন্য সময়ে বাজার-দরের প্রায় অর্ধেক দামে প্রজাদের রাজাকে ধান, চাল, ঘি, তেল, বিক্রী করতে হতো। একে বলা হতো কর-সামগ্রী। বাজারে কোন জিনিষের দাম এক টাকা সের হলে রাজা পাবেন দু' সের হিসাবে। এই কর-সামগ্রী প্রত্যেক বর্ধিষ্ণু প্রজাকে দিতে হতো। প্রজার বাড়ী রাজ্যের এক প্রান্তে হলেও তার রেহাই ছিল না।

রাজার কোনও আত্মীয় মারা গেলে বা পৈতা, বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্মের সময় প্রজাদের 'মাগন' বা ভিক্ষা-দ্রব্য দিতে হতো। ধরুন, তালচের রাজকুমারীর বিবাহ হবে। এক টাকা খাজনার উপর নিম্নলিখিত হিসাবে 'মাগন' আদায় করা হতো—আট আনা পয়সা, দু' সের সরু চাল, তিন সের মোটা চাল, এক পো ঘি ইত্যাদি। একশ' টাকা খাজনা হলে এর অতিরিক্ত একটা পাঁঠা দিতে হতো।

এ ত গেল 'বেঠি', 'বেগার', 'মাগনে'র কথা ; এবার taxation সম্বন্ধে লিখব। জমির খাজনা ছাড়া প্রজারা টাকায় ৭ক এক আনা হিসাবে জঙ্গল-কর আর শিক্ষা-কর দিত। সংসারের নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য—যথা নুণ, কেরোসিন, পান, সুপুরি বিক্রীর জন্যে লাইসেন্স দেওয়া হতো। যার লাইসেন্স—সেই শুধু ব্যবসা করতে পারবে। ব্যবসায়ীরা আবার জিনিষের দাম বাড়িয়ে লোকদের কাছ থেকে লাইসেন্সের টাকা আদায় করে নিত। এ ছাড়া profession tax ছিল। ছুতোর, কুমোর, ধোবা, তেলিদের বার্ষিক কর দিতে হতো।

প্রজাদের জমির উপর কোন স্বত্ব ছিল না। তাদের জমির উপর গাছ কাটতে গেলে ষ্টেটকে টাকা দিতে হতো। রাজা বা তাঁর পোষ্যবর্গের দরকার হলে প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হতো। জমি বিক্রীর সময় ষ্টেটকে শতকরা পঁচিশ টাকা ফী দিতে হতো। খাজনা নিয়মিত না দিলে পেয়াদারা মার-ধর করে আদায় করত।

অধিকাংশ রাজ্যে বিচারের নামে ব্যভিচার হতো। রাজার ছেলে ভাই আত্মীয়েরা ষ্টেটের অফিসার হতেন। যাঁরা অত্যাচার করতেন—তাঁরাই অত্যাচারের বিচার করতেন। আমলাদের মাইনে খুবই কম ছিল। তারা ঘুষ নেবে—এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল। ঘুষ না দিলে মকদ্দমায় জেতা সহজ ছিল না। এ ছাড়া অনেক ষ্টেটে 'ধর্ম-আদালত' ছিল। এই আদালত লোকদের সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ করত। বিবাহ, পৈতা প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে ষ্টেটকে ফী দিতে হতো।

এই রকম অন্যায়, অত্যাচার আর শোষণের ফলে প্রজারা জ্বলে-পুড়ে মরত। এ কেবল তালচেরে সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রায় সকল ষ্টেটেই অল্প-বিস্তর প্রজাদের উপর অত্যাচার করা হতো।

তালচের রাজ্যের এক ক্ষুদ্র গ্রামে আমার জন্ম। আমার বাল্য-জীবন দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। অতি কষ্টে লেখাপড়া শিখতে পেরেছিলাম। প্রজাদের উপর রাজার অত্যাচার দেখে দেখে ধারণা হয়ে গিয়েছিল—এই বুঝি নিয়ম। এক শাসক আর তার মুষ্টিমেয় পোষ্যবর্গ হাজার হাজার প্রজাদের শোষণ করবে—তাদের বঞ্চিত করে নিজেদের ভোগ-বিলাসের উপাদান সংগ্রহ করবে। মনে হতো, প্রজাদের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই—কিছু থাকতে পারে না।

কলেজে পড়বার জন্যে কটকে গেলাম। তখন আইন অমান্য আন্দোলন চলেছে পূর্ণবেগে। সেই উদ্দীপনা দেখে উপলব্ধি করলাম—অত্যাচার করা যেমন অন্যায়, অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়াও তেমনই অন্যায়। বি-এ পাশ করে ষ্টেটে ফিরে গিয়ে তালচের স্কুলের শিক্ষক হলাম। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তালচের রাজার স্বৈরাচার উচ্ছেদের জন্যে এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করলাম। মুক্তিপথে আমার যাত্রা সুরু হলো।

হাতীর দাঁতের দর ও কদর

কথায় বলে, মরা হাতী লাখ টাকা। জ্যান্ত হাতী যত না কাজে লাগে, মৃত্যুর পর তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ দেয় হাতী। হাতী লোকান্তরে যাত্রা করলেই তাকে মাটির তলায় পুঁতে ফেলা হয়। তার মানে হাতীকে কবর দেওয়া হয় না, বেশ কিছু দিন পরে মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা হয় হাতীকে। অর্থাৎ হাতীর কঙ্কালকে আর এই কঙ্কালের মূল্য জ্যান্ত হাতীর চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশী। সেই জন্যই 'মরা হাতী লাখ টাকা' কথাটির চলন আমাদের দেশে। হাতীর দাঁত এবং হাড়ের ভাস্কর্য সভ্য দেশের পরম আদরের বস্তু। একান্ত মহার্ঘ্য হলেও এই ভাস্কর্য দেশে এবং বিদেশে সযত্নে রক্ষিত হয় গৃহসজ্জার অন্যতম সম্পদ হিসাবে।

প্রস্তর, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির তুলনায় হাতীর দাঁতই হ'ল ভাস্কর্য্যের সঠিক মাধ্যম। হাতীর দাঁতের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য অনস্বীকার্য্য। এর পরমায়ু হাজার হাজার বছরেরও অধিক। প্রস্তর কিংবা ব্রোঞ্জের কাজ সময়ের প্রভাবে বিনষ্ট হয়, কিন্তু হাতীর দাঁতের কাজ এক রকম অবিনশ্বর বলতে পারা যায়। হাতীর দাঁতের মুখাগ্র ফাঁপা এবং একেক জোড়া দাঁত পাঁচ থেকে ছয় হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। হাতীর দাঁতের শিল্প সাধারণত ক্ষুদ্রাকারের হয়ে থাকে। এই শিল্পকার্য্যের প্রারম্ভ নয় থেকে একাদশ খৃষ্টাব্দে। ইউরোপে তেরো এবং চৌদ্দ শতাব্দীতে হাতীর দাঁতের মূর্ত্তি, বই এবং ছবি তৈরীর রেওয়াজ হয়। যদিও এই শিল্পটি বিত্তশালীদের দ্বারাই কেবল মাত্র আদৃত হয়, কিন্তু যে সব শিল্পী এই শিল্পটি প্রথম চালু করেন তাঁদের কারও নাম ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষে দিল্লী, আগ্রা, নেপাল, এবং জয়পুরের হাতীর দাঁতের ভাস্কর্য্য পৃথিবীবিখ্যাত। ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদের রাজপ্রাসাদে এই শিল্পটির কদর দেখলে চক্ষু সার্থক হয়ে যায়। বাঙলা দেশে অনেকের গৃহে হাতীর দাঁতের বহুবিধ সরঞ্জাম দৃষ্টিগোচর হয়। বর্দ্ধমান ও ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদেও হাতীর দাঁতের অনেকানেক মূল্যবান শিল্প সজ্জিত আছে।

হাতীর হাড় অনেক সময়ে দাঁত হিসাবে ব্যবসায়ীরা বিক্রয় ক'রে থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে হাড় এবং দাঁতের কাজ এক মনে হ'লেও আসল দাঁতের কাজই অধিক মূল্যবান। ভারতবর্ষ থেকে এই শিল্পকার্য্য বিদেশে রপ্তানী হয়।

সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

উদয়নাচার্য ভাদুড়ী—দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—১২শ শতাব্দী, বগুড়া জেলার অন্তর্গত নিসিন্দা গ্রামে। মৃত্যু—কাশীধামে। পিতা—বৃহস্পতি আচার্য। গ্রন্থ—কুসুমাঞ্জলি (ন্যায়), কিরণাবলী, আত্মবিবেক, কণাদসূত্রের টীকা, তাৎপর্যপরিশুদ্ধি।

উদয়ননাথ ত্রিবেদী (কবীন্দ্র)—হিন্দী কবি। গ্রন্থ—রামচন্দ্রোদয়।

উদয়প্রভ সূরি—জৈন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সুকৃত-কীর্তি-কল্লোলিনী।

উদয়বীর গড়িন্—জৈন গ্রন্থকার। ১৫শ শতাব্দীতে বর্তমান। গ্রন্থ—পদ্মসুন্দর।

উদুম্বর মহাদেব—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—জাতকতত্ত্ব।

উদ্যোতকর ভারদ্বাজ—গ্রন্থকার। জন্ম—থানেশ্বর ৬ষ্ঠ শতাব্দী। রাজা প্রভাকর বর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—ন্যায়বার্ত্তিক।

উদ্যোতন—কবি। গ্রন্থ—কুবলয়মালা (প্রাকৃত ভাষায়—৭৭৯ খৃঃ রচিত)।

উদ্ধবদাস—পদকর্তা। প্রকৃত নাম—কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। নিবাস—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দী মহকুমার টেঞা গ্রামে। ইঁহার রচিত বহু পদ প্রচলিত আছে।

উপতিষ্য—বৌদ্ধভিক্ষু। গ্রন্থ—অনাগতবংস, বিমুক্তিমার্গ (পালি ভাষায়)।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—গ্রন্থকার ও শিশুসাহিত্যিক। জন্ম—১২৭০ বঙ্গ ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে। মৃত্যু—১৩২২ বঙ্গ। পিতা—কালীনাথ রায়। গ্রন্থ—ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, মহাভারতের গল্প, টুনটুনির বই। সম্পাদক—সন্দেশ (মাসিক, ১৩২১—১৩২৭)।

উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—লক্ষ্মীর বিবাহ, দিগ্‌ভ্রষ্ট, দামোদরের বিপত্তি, সাগরিকার নির্যাতন।

উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রন্থকার। ঢাকা নর্মাল স্কুলের শিক্ষক। গ্রন্থ—চরিতাভিধান (১৮৩৩ শক)।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক। জন্ম—ভাগলপুর। পিতা—মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। মাতা—মনোমোহিনী। বি, এল। গ্রন্থ—শশিনাথ, অমূলতরু, নবগ্রহ, অমলা, রাজপথ, গিরিকা, অন্তরাগ, দিক্‌শূল, অভিজ্ঞান, যৌতুক, সোনালী রং, নাস্তিক, বিদুষী ভার্যা, আশাবরী, ছদ্মবেশী, স্মৃতিকথা। সম্পাদিত মাসিক পত্র—বিচিত্রা (১৩৩৪—১৩৪৭)।

উপেন্দ্রনাথ দাস—নাট্যকার। জন্ম—১২৫৫ বঙ্গ কলিকাতা। মৃত্যু—১৩০২ বঙ্গ শ্রাবণ। পিতা—শ্রীনাথ দাস। নাট্যগ্রন্থ—শরৎ-সরোজিনী, সুরেন্দ্র-বিনোদিনী, দাদা ও আমি।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজনীতিবিদ্ ও গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। বি, এ, পর্যন্ত পাঠ, শিক্ষকতা, তৎপরে বোমার মামলায় বন্দী। গ্রন্থ—উনপঞ্চাশী, নির্বাসিতের আত্মকথা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, সিনফিন, ধর্ম ও কর্ম (১৩২১), বর্তমান সমস্যা (১৩২৮), জাতের বিড়ম্বনা (১৩২৮), অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান জগৎ। সম্পাদক—আত্মশক্তি (সাপ্তাহিক—১৩২৮)। সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী (ইং ১৯৪৫—১৯৫০)।

উপেন্দ্রনাথ মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—The law of limitation (ঢাকা, ১৮৬৪), মধুকর (১৮৭৫)।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সাময়িকপত্র পরিচালক ও গ্রন্থকার। মৃত্যু ১৩২৫ বঙ্গ চৈত্র। পিতা পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বসুমতী নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা। বসুমতীসাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদিত গ্রন্থ—হিন্দু সমাজের ইতিহাস, ১ম-২য় (১৩০৩, পৃঃ ৬৩১), রাজভাষা, পাতঞ্জলদর্শন, কালিদাসের গ্রন্থাবলী (১৩০৮, পৃঃ ৬৪০), কথাসরিৎসাগর (কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ সহ), নাদবিন্দূপনিষৎ, ব্রহ্মোপনিষৎ, গর্ভোপনিষৎ, ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি, ১ম—৩য় (১৩১৭), শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা, তন্ত্রসার, মহানির্বাণতন্ত্র, রামমোহন গ্রন্থমালা, প্রাণতোষণীতন্ত্র, প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী, ১ম, ২য় (১৩০৪) প্রভৃতি।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম. ডি। লে. কর্ণেল, আই. এম. এস। গ্রন্থ—A Dying Race, হিন্দুসমাজ।

উপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, রাজা—কবি। কাব্যগ্রন্থ—শ্রীরামবনবাস-কাব্য (বহরমপুর, ১৮৭০), বীরাবলীকাব্য (কলি, ১৮৭৩)।

উমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—কাব্যরত্নাকর (ব্যঙ্গপত্রিকা, অর্ধসাপ্তাহিক—১৮৪৭ খৃঃ)।

উমাকান্ত ভট্টাচার্য—সাহিত্যিক। সম্পাদিত পত্রিকা—সমাচার জ্ঞানদর্পণ (সাপ্তাহিক—১৮৪৬), চন্দ্রোদয় (বারাণসী, সাপ্তাহিক ১৮৪৯—১৮৫০), ভৈরবদণ্ড (সাপ্তাহিক—১৮৪৯)।

উমাচরণ দে—গ্রন্থকার। নিবাস—বরাহনগর। গ্রন্থ—Domestic Medicine & Treatment of Diseases (১৮৭৯)।

উমাচরণ ভদ্র—সাহিত্যিক। সম্পাদিত পত্রিকা—'হিন্দুবন্ধু' (মাসিক—১৮৪৭ খৃঃ)।

উমাচরণ মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চাহার দরবেশ (১৮৫৪) গোলেবকাওলী (১৮৫৪)। (ইনি ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের লেখক।)

উমাচরণ মুখোপাধ্যায়, সর্দার—অধ্যাপক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪১ খৃঃ, যশোহর। মৃত্যু—১৯০০ খৃঃ। অধ্যাপক, আগ্রা কলেজ, ঢোলপুরের রাণার প্রাইভেট সেক্রেটারী, সর্দার উপাধি লাভ (১৮৯৮)। গ্রন্থ—কোমতের দর্শন, হিন্দী-ইংরেজি ব্যাকরণ।

উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—প্রচার (মাসিক ১২৯১—৯৩ বঙ্গাব্দ)।

উমা দেবী—মহিলা কবি। গ্রন্থ—মাধুরী, বাঙ্গালী জীবন, বালিকা জীবন, সনাতন পাকপ্রণালী, নীতিগল্পিকা। কাব্যগ্রন্থ—বাতায়ন, কাজলী।

উমানাথ গুপ্ত—ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। জন্ম—১৮৭১ খৃঃ। মৃত্যু—১৯১৮ খৃঃ। সম্পাদক—সুলভ সমাচার (পত্রিকা)।

উমাপতি—জ্যোতির্বিদ। গ্রন্থ—জ্যোতিষ রত্নমালা (শ্রীপতি ভট্টকৃত)-র টীকা।

উমেশচন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যারত্ন—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে। আইন ব্যবসায়—মৈমনসিংহ। গ্রন্থ—মানবের আদি জন্মভূমি, জাতিতত্ত্ববারিধি, রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড (বর্দ্ধমান, ১৮৭৫), সম্পাদক—আরতি (১৩১৭-১৮)।

উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাংবাদিক। সম্পাদক—মনোহর (সাপ্তাহিক—১৮৬০ খৃঃ)।

উমেশচন্দ্র দত্ত- শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৪০ খৃঃ, ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৪ বঙ্গাব্দ ১১ই আষাঢ়, কলিকাতা। পিতা—হরমোহন দত্ত। শিক্ষা—প্রবেশিকা (ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী), এফ, এ, বি, এ (১৮৬৭)। কর্মক্ষেত্র—প্রধান শিক্ষক, হরিনাভী স্কুল। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ। গ্রন্থ—বামারচনাবলী (কলিঃ ১৮৭২), স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যার আবশ্যকতা (কলিঃ ১৮৭২)। সম্পাদক ও পরিচালক—বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০—১৩১০ বঙ্গাব্দ)।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল—সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। জন্ম—১৮৫২ খৃঃ হুগলী জেলার রামনগর গ্রামে। মৃত্যু—১৮৯৮ খৃঃ। পিতা—দুর্গাচরণ বটব্যাল। এম, এ, পি আর এস (১৮৭৬)। কর্ম—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৭৭ খৃঃ), বিদ্যালঙ্কার উপাধিলাভ। গ্রন্থ—সাংখ্য-দর্শন, বেদ-প্রবেশিকা।

উমেশচন্দ্র বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নবীন সন্ন্যাসী, ১ম, ২য় (১৮৭৩)।

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—দার্শনিক পণ্ডিত। গ্রন্থ—দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি (১৩৫১), ভারতদর্শনসার (১৩৫৬)।

উমেশচন্দ্র মিত্র—নাট্যকার। গ্রন্থ—বিধবা-বিবাহ (১৮৫৬ খৃঃ)।

উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কুবিচন্দ্রিকা ১ম (১৮৭১), গ্রীসদেশের ইতিহাস (১৮৭৪)।

উল্লাসকর দত্ত—রাজনীতিবিদ্। গ্রন্থ—কারাজীবনী, আমার কারাজীবনী।

উবটাচার্য—ভাষ্যকার। জন্ম—১০-১১শ শতাব্দীতে কাশ্মীরের আনন্দপুরে। পিতা—বজট। গ্রন্থ—যজুর্বেদ ও ঋক্‌প্রাতিসাখ্যের টীকা।

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর—গ্রন্থকার। জন্ম—কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ী। গ্রন্থ—সপ্তস্বরা (ক), পদ্মরাগ (ক), জয়ন্তী (প্র), মুদীর দোকান (প্র), Homage to Lord Ganes, সম্পাদক—চতুরঙ্গ (১৩৩৪—৩৬,), সারদা (১৩৩১)।

ঋষি দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শেক্‌সপীয়র, বার্নাড শ, গান্ধী-চরিত, আবুল কালাম আজাদ, ছুঁয়ে ছুঁয়ে চার (নাটক); অনূদিত গ্রন্থ—মহাত্মা গান্ধী (রোমাঁ)। রামকৃষ্ণের জীবন (রোমাঁ), জীবন প্রভাত (গর্কি) টলষ্টয়ের স্মৃতি (গর্কি)।

একাম্রনাথ অবধান সরস্বতী—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—আয়ুর্বেদসুধানিধি।

একনাথ স্বামী—সাধু ও ধর্মগ্রন্থ-অনুবাদক। জন্ম—১৬শ শতাব্দী মহারাষ্ট্রে। অনুবাদ গ্রন্থ—রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদগীতা।

একরাম উদ্দীন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কৃষ্ণকান্ত উইলে বঙ্কিমচন্দ্র নতুন মা, অনধিকার প্রবেশ, রবীন্দ্রপ্রতিভা।

এনামুল হক—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম· এ·, পি· এচ·ডি অধ্যাপক। গ্রন্থ—আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সহ), বঙ্গে সুফী প্রভাব (১৯১৫ পৃঃ ২৬০)।

এনায়েৎ উল্লা—গ্রন্থকার। জন্ম—রংপুর জেলার শীতলাবাড়ী গ্রন্থ—ফকিরবিলাস।

এমদাদ্ আলি, সৈয়দ—গ্রন্থকার। জন্ম—মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা গ্রন্থ—ডালি (১৯১২), মাধবী রাবেয়া, পয়গম্বর মহম্মদ সম্পাদক—নবনূর (১৩১০—১২)।

ওয়াজেদ আলী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯০ খৃঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার তাজপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৯৫১। শিক্ষা—বি এ· (আলিগড়), বি· এ· অনার্স (কেমব্রিজ), বারএ্যাট্‌-ল কর্ম—প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট (১৯৩৩ খৃঃ)। গ্রন্থ—মহামানু মহসীন, গুলদস্তা, মাশুকের দরবার, দরবেশের দোয়া, ভাঙ্গা বাঁধ ভবিষ্যতের বাঙ্গালী।

ওয়ার্ড, উইলিয়ম—শ্রীরামপুরের মিশনারী। জন্ম—১৭৬৯ খৃঃ মৃত্যু—১৮২৩ খৃঃ। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে আগমন। কেরী সহিত মিলিত হইয়া মিশন স্থাপন। গ্রন্থ—ইংরেজি ভাষা হিন্দুদিগের ইতিহাস, সাহিত্য ও পুরাণ বিষয়ক গ্রন্থ (১৮১১ খৃঃ কৃষ্ণদাস পালের জীবনী (১৮২৩)।

ওয়েঙ্গার, রেভা, জে—মিশনারী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সর্বত্রি পুরাবৃত্তসার (১৮১৭ খৃঃ)।

ঔফ্রেক্‌ট্, থিয়োডর (Aufrect, Theoder)—সংস্কৃত শিক্ষাবিদ্। জন্ম—১৮২২ খৃঃ সাইলেসিয়া (Silesia)। শিক্ষা—বার্লিনে এবং ইউরোপে, সংস্কৃত ও ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৮৬২ খৃঃ)। গ্রন্থ—De accent compositorum Sanskriticorum (১৮৪৭), Halayudh Abhidhanratnamala (১৮৬১), Die Hymnen de Rigweda (১৮৭৭), Bluten aus Hindostan (১৮৭৩ Das Aitareya Brahmana (১৮৭৯), Catalogue c Sans. Mss. (Bodleian Library—১৮৫৯-৬৪), Cata logus catalogorum (১৮৯১-১৩)।

কটন, স্যর হেনরী (Sir Henry Cotton)—ভারত-হিতৈ সরকারী কর্মচারী। জন্ম—১৮৪৫ খৃঃ। মৃত্যু—১৯১৫ খৃঃ চী কমিশনার, আসাম (১৮৯৬—১৯০২)। জাতীয় মহাসভা সভাপতি (১৯০৪ খৃঃ)। গ্রন্থ—New India or Ind in Transition.

কণাদ—দার্শনিক পণ্ডিত। ১২শ শতাব্দীতে বর্তমান। প্রকৃ নাম—উলুক। গ্রন্থ—বৈশেষিক দর্শন। ইহা ঔলুক্যদর্শন না খ্যাত।

কণাদ তর্কবাগীশ—দার্শনিক পণ্ডিত। ১৫শ শতাব্দীতে বর্তমা নবদ্বীপে। গ্রন্থ—ভাষারত্নম্, আপশব্দখণ্ডনম্, মণিব্যাখ্যা (টীকা)

কনকলতা ঘোষ—মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—নূতন পা পাকপ্রণালী, পত্রলেখা।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। পিতা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ—আবৃত্তি-মঞ্জুষা; মনীষীদের জীবন-স্মৃতি, মহামানব মহাত্মা গান্ধী।

কপিল—দার্শনিক মুনি। খৃঃ-পূঃ ৬৫০-৫৭৫ বর্তমান। গ্রন্থ—সাংখ্যদর্শন।

কমলকৃষ্ণ মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ-প্রসঙ্গ; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি।

কমলকৃষ্ণ সিংহ, রাজা—শিকারী, সঙ্গীতজ্ঞ ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৩১ খৃঃ মৈমনসিংহের অন্তর্গত সুসঙ্গে। মৃত্যু—১৯১২ খৃঃ। পিতা—রাজা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর (সুসঙ্গ)। গ্রন্থ—সঙ্গীত-শতক, তূর্যতরঙ্গিণী (সেতার শিক্ষা), অশ্বতত্ত্ব, গোপালন, আম্র।

কমললোচন, দ্বিজ—প্রসিদ্ধ কবি। জন্ম—খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে রংপুর জেলায়। পিতা—যদুনাথ। গ্রন্থ—চণ্ডিকা-বিজয়।

কমলাকর—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দীতে। গ্রন্থ—সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক, অপূর্বভাবনোপপত্তি।

কমলাকর ভট্ট—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। জন্ম—খৃঃ ১৭শ শতাব্দীতে আরঙ্গাবাদের নিকটবর্তী পৈঠানপুরে (প্রতিষ্ঠাপুরে)। গ্রন্থ—নির্ণয়সিন্ধু (স্মৃতিগ্রন্থ—১৬১৪ খৃঃ)।

কমলাকর ভট্ট—স্মার্তপণ্ডিত। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বর্তমান। পিতা—রামকৃষ্ণ ভট্ট। গ্রন্থ—তত্ত্বকমলাকর, পূর্ত কমলাকর।

কমলাকান্ত সার্বভৌম—ঐতিহাসিক গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দ্বিগঙ্গ রাজবংশম্।

করেজন্নেসা চৌধুরাণী, নবাব—বঙ্গীয় মুসলমান কাব্য-রচয়িত্রী। ইনি ত্রিপুরার জমিদার। গ্রন্থ—রূপজালাল।

করিমুল্লা—গ্রন্থকার। জন্ম—সীতাকুণ্ডের নিকটবর্তী কোন গ্রামে। গ্রন্থ—যামিনীবাহাল।

করুণাকান্ত ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিল্পী ও বাণিজ্যসখা, ডাকিনীমন্ত্র, দেববালা।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১২৮৪ বঙ্গাব্দ। শান্তিপুর (নদীয়া)। কর্ম—প্রথম জীবনে সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্রাবাসের পরিদর্শক। গ্রন্থ—প্রসাদী, ঝরাফুল, শান্তিজল, ধানদূর্বা, বঙ্গমঙ্গল, শতনরী, (কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক); রবীন্দ্র আরতি। সম্পাদক—শান্তিপুর (১৩৩৬—অমরনাথ প্রামাণিক সহ)।

কল্যাণরক্ষিত—বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—৮২১ খৃষ্টাব্দে ইনি বর্তমান ছিলেন। গ্রন্থ—সর্বজ্ঞ সিদ্ধিকারিকা, বাহ্যার্থ-সিদ্ধিকারিকা, শ্রুতিপরীক্ষা, অন্যাপোহবিচারকারিকা, ঈশ্বরভঙ্গ-কারিকা।

কবিচন্দ্র—প্রাচীন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রত্নাবলী (১৬৬১ খৃঃ)।

কবিচন্দ্র মিশ্র—কবি। ইনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অগ্রজ। গ্রন্থ—দাতাকর্ণ, কলঙ্কভঞ্জন।

কবিবল্লভ—গ্রন্থকার। জন্ম—খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বগুড়া জেলায় করতোয়া নদীতীরস্থ মহাস্থানের নিকট আরোড়া নামক গ্রামে। পিতা—রাজবল্লভ। গ্রন্থ—রসকদম্ব (১৫২০ শকাব্দ), আদিরস।

কবিকর্ণপূর—কবি ও পদকর্তা। জন্ম—১৫২৫ খৃঃ নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া। প্রকৃত নাম—পরমানন্দ দাস। শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহাকে কর্ণপূর আখ্যা দেন। গ্রন্থ—চৈতন্যচরিত, অলঙ্কারকৌস্তভ, আর্যশতক, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, চৈতন্য-চন্দ্রোদয়।

কবিরাজ চক্রবর্তী—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। নিবাস কামরূপ, আসাম। গ্রন্থ—ভাস্বতী।

কবিরাজ পণ্ডিত—অসমীয়া কবি। জন্ম—খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে আসামে। জয়ন্তিরাজ কামদেবের সভাপণ্ডিত। কাব্যগ্রন্থ—রাঘবপাণ্ডবীয়।

কবিশেখর—বৈষ্ণব পদকর্তা। কাব্যগ্রন্থ—গোপালবিজয়।

কবীন্দ্র—কবি। গ্রন্থ—গোরক্ষবিজয়, মীনকেতন।

কস্তুরীরঙ্গ আয়ঙ্গার, এস—দেশকর্মী। জন্ম—১৮৫৯ খৃঃ দাক্ষিণাত্যের মিলাপুরে। মৃত্যু—১৯২৩ খৃঃ। পিতা শেষ আয়ঙ্গার। শিক্ষা—বি, এল। আইনজীবী। সম্পাদক—হিন্দু (মাদ্রাজ)।

কহ্লণ—ঐতিহাসিক পণ্ডিত। জন্ম—খৃঃ ১২শ শতাব্দীতে কাশ্মীর। পিতা—চম্পক মিশ্র। গ্রন্থ—রাজতরঙ্গিণী (১১৪৯ খৃঃ)।

কাউএল, ই, বি, (Edward Byles Cowell)—ইংরেজ গ্রন্থকার। জন্ম—১৮২৬ খৃঃ। মৃত্যু—১৯০৩। অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৫৬); অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ (১৮৫৮); অধ্যাপক, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৬৭)। এল, এল, ডি ও ডি সি এল উপাধি লাভ। সম্পাদিত গ্রন্থ—The Buddha-karita of Asvaghosh (১৮৯৩)।

কাঞ্চনমালা দেবী—গ্রন্থ-রচয়িত্রী। গ্রন্থ—গুচ্ছ, স্তবক, রসির ডায়েরী, শনির দশা।

কানাইলাল দে—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কিমিতি নিগুঢ়ত্রি (chemistry—১৮৭১)।

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মন্দোদরীর কণ্ঠহার, রাজার জামাই, যক্ষ-প্রিয়া, নবদ্বীপের বৈষ্ণবী, বঙ্গের গৃহিণী, দুর্গমের সঙ্গিনী, শিশির ও সুরেন্দ্রনাথ, দেওয়ানা রাণী, রতনে রতন (প্রহসন)।

কানিংহাম, স্যর, আলেকজাণ্ডার (Sir Alexander Cunningham)—জন্ম—১৮১৪ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৯৩ খৃঃ। ভারতে সৈনিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার। গ্রন্থ—The Ancient Geography of India. The Buddhist Period, Corpus Inseritionum Indicarum, The Stupa of Bharhat, The Book of Indian Eras, Mahabodhi.

কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আর্যগৃহ চিকিৎসা, মাতার প্রতি উপদেশ, প্রসূতির কর্তব্য ও ধাত্রীশিক্ষা, শিশুপালন ও চিকিৎসা, স্ত্রীশিক্ষা, সুসন্তান লাভের উপায়।

কামিনী রায়—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৬৪ খৃঃ। মৃত্যু—১৯৩৩ খৃঃ। পিতা—চণ্ডীচরণ সেন। স্বামী—সিবিলিয়ান কেদারনাথ রায়। বি. এ. (১৮৮৬ খৃঃ), শিক্ষয়িত্রী, বীটন কলেজ। 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ। কাব্যগ্রন্থ—আলো ও ছায়া (১৮৭৯ খৃঃ), দীপ ও ধূপ, পৌরাণিকী, অশোক সঙ্গীত (১৯১৪ খৃঃ), জীবন-পথে, অম্বা, ধর্মপুত্র (টলষ্টয়ের জীবনী), ডাঃ কুমারী

যামিনী সেনের জীবনী, গুঞ্জন, মাল্য ও নির্মাল্য, প্রান্তিকী, সিতীমা, ঠাকুরমার চিঠি।

কায়কোবাদ সাহেব—মুসলমান কবি। জন্ম—১৮৬৩ খৃঃ, ঢাকা জেলা আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে। গ্রন্থ—বিরহবিলাপ, কুসুমকানন, অশ্রুমালা, মহাশ্মশান।

কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, ডাক্তার—চিকিৎসক। নিবাস—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শিক্ষা—এম. বি। সম্পাদক—Health & Happiness, স্বাস্থ্য-সমাচার (বাঙ্গালা ও হিন্দী)।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, দেওয়ান (চক্রবর্ত্তী)—গ্রন্থকার। জন্ম—১২২৭ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগর দেওয়ান বংশে। মৃত্যু—১৮৮৫ খৃঃ। পিতা—উমাকান্ত রায়। কৃষ্ণনগরের মহারাজ ভীমচন্দ্রের দেওয়ান—(১২৮১ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থ—ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত (১৮৭৫ খৃঃ), আত্মজীবন-চরিত, গীতমঞ্জরী।

কার্পেণ্টার, মেরী (Miss Mary Carpenter)—ভারত হিতৈষিণী। জন্ম—১৮০৭ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৭০ খৃঃ। ভারতে চারি বার আগমন করেন। গ্রন্থ—Last days of Rammohon Ray (১৮৬৬ খৃঃ), Six months in India (১৮৬৮ খৃঃ)।

কালাচাঁদ দত্ত—সাংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদ সৌদামিনী (সাপ্তাহিক—১৮৩৮ খৃঃ)।

কালাচাঁদ পাল—পালা-রচয়িতা। নিবাস—বিক্রমপুর। যাত্রার পালা—কালিয় দমন।

কালিদাস—মহাকবি। পশ্চিম মালবের অধিবাসী। খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মালবাধিপতি যশোধর্মদেবের সভার নবরত্নের প্রধান রত্ন। সম্ভবতঃ যশোধর্মদেবের উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য। গ্রন্থ—অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাসম্, শ্রুতবোধঃ, শৃঙ্গারতিলকম্।

কালিদাস—পাঁচালীকার। গ্রন্থ—মনসামঙ্গল, শনির পাঁচালী (১১০৪ বঙ্গাব্দ)।

কালিদাস গণক—জ্যোতির্বিদ্। জন্ম—১৩শ শতাব্দী। গ্রন্থ—জ্যোতির্বিদাভরণ।

কালিদাস গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বেতালপঞ্চবিংশতি (কবিতায়—১৮৫৮)।

কালিদাস, দ্বিজ—পাঁচালীকার। গ্রন্থ—মূর্খব্রত।

কালিদাস নাথ—সাহিত্যিক। মৃত্যু—১৩১০ বঙ্গাব্দ। সম্পাদিত গ্রন্থ—নরোত্তমবিলাস, মহানন্দ পদাবলী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মহাভারত (কাশীদাস), চৈতন্যসঙ্গম (জয়ানন্দ)।

কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—সাংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদ বর্দ্ধমান (সাপ্তাহিক—১৮৫০ খৃঃ)।

কালিদাস মালিক—হিন্দী গ্রন্থকার। ক্রীড়া পরিদর্শক সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ, বেনারস। হিন্দী গ্রন্থ—ভারত কী প্রাচীন ঝলক্, প্রফেসর রামমূর্তি ঔর উন্‌কা ব্যায়াম, সরল ব্যায়াম।

কালিদাস মিত্র মুস্তফী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিচারতরঙ্গিণী (১৮৬৮)।

কালিদাস মুখোপাধ্যায়—সঙ্গীত-রচয়িতা। ওরফে কালি মির্জা। জন্ম—হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া। মৃত্যু—১৮২০ খৃঃ। গ্রন্থ—গীত-লহরী।

কালিদাস মৈত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—খগোল বিবরণ (১৮৬৮) সম্পাদক—সংবাদ-শশধর (সাপ্তাহিক—১৮৫২), অন্যতম সম্পাদক—জ্ঞানারুণোদয় (মাসিক—১৮৫২ খৃঃ)।

কালিদাস রায়, কবিশেখর—কবি, সমালোচক ও গ্রন্থকার জন্ম—১২৯৬ বঙ্গাব্দ বর্দ্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে। শিক্ষা—বি, এ গ্রন্থ—পর্ণপুট, ১ম, ২য়, বল্লরী, গীতালহরী, ঋতুমঙ্গল, ব্রজবে[ণু] ক্ষুদকুঁড়া, রসকদম্ব, লাজাঞ্জলি, কিশলয়, গীতিমঙ্গল, কু[ন্দ] সাহিত্য-প্রসঙ্গ, ১ম, ২য়, রসচক্র, অষ্টযন্তা, কাব্যে শকুন্তলা, ব্র[জ] বাঁশরী, হৈমন্তী, আহরণী, বৈকালী, বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় (সমালোচনা) প্রাচীন সাহিত্য (সমালোচনা), রামায়ণ (সম্পাদিত)।

কালীকমল চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উপদেশাঙ্কু (১৮৬০)।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য—সাংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদ-মুক্তাব[লী] (সাপ্তাহিক—১৮৪৮ খৃঃ)।

কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—অপূর্ব কারাবা (Lady of the lakeএর ছায়া অবলম্বনে), অপূর্ব সহবা[স] চিত্রশালা।

কালীকিশোর চৌধুরী—গ্রন্থকার। নিবাস—বরিশাল। গ্রন্থ—বামারঞ্জন (১৮৭৫)।

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—সংস্কৃত পণ্ডিত। জন্ম—হুগলীর হরিনা[ভি] গ্রামে। অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ। গ্রন্থ—বঙ্গের রত্নমা[লা] বঙ্গের উপন্যাসরত্ন।

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। নিবাস—শান্তিপুর। এ[ম] এ, বি এল। আইন ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—শান্তিপুর পরিচয়।

কালীকৃষ্ণ দেব, মহারাজা—অনুবাদক। অনুবাদ গ্রন্থ—রাসেল[াস] (জনসন-কৃত Rasselus গ্রন্থ—১৮৩৩ খৃঃ), গল্পমালা (Gay fables—১৮৩৬ খৃঃ—এই গ্রন্থ অনুবাদের জন্য হল্যাণ্ডের রাজ[ার] নিকট হইতে সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন)।

কালীকৃষ্ণ মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮২২ খৃঃ সিমুলি[য়া] কলিকাতা। মৃত্যু—১৮৯১ খৃঃ বারাসাত। পিতা—শিবনারা[য়ণ] মিত্র। শিক্ষা—হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজ। অতঃপর চিকিৎ[সা] বিদ্যা, অতিপ্রাকৃতবিদ্যা প্রভৃতি চর্চা করেন। গ্রন্থ—বিধবা-বিবা[হ] কৃষিবিদ্যা, স্ত্রীশিক্ষা, মাদক-নিবারণ, গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ও শিশু-চিকিৎ[সা] হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা (১৮৭২)।

কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী—ঐতিহাসিক। গ্রন্থ—রশিনারা (১২[..] বঙ্গাব্দ)।

কালীকুমার সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মনের প্রতি উপ[দেশ] (১৮৭২ খৃঃ)।

কালীচরণ অধিকারী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কবিতাকলাপ (শ্রীরা[ম]পুর, ১৮৭১)।

কালীচরণ চৌধুরী—সঙ্গীত-রচয়িতা। ইনি রংপুরের জমিদা[র] গ্রন্থ—গীতমালা (১৮৪০ খৃঃ)।

কালীচরণ ভট্টাচার্য—কবি। গ্রন্থ—শ্রীরামচরিত (ইহা জাটদি[গের] জন্য রচিত)।

কালীচরণ মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অন্নমধুর, যূথিকা।

কালীচরণ সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ঈশ্বরের উপাসনা, ঈশ্ব[র]

স্বরূপ, বিধবা-বিবাহ, দম্পতি-সংযম, নিবেদন, বৈদ্য, বিধবা-বিবাহ পরিশিষ্ট।

কালীনাথ ঘোষ—ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। নিবাস—চন্দননগর (হুগলী)। গ্রন্থ—আত্মদান (নাটক), নামসুধা, অনুষ্ঠান-সঙ্গীত।

কালীপদ মুখোপাধ্যায়—পালা-রচয়িতা। পালা-গ্রন্থ—প্রহ্লাদ চরিত্র।

কালীপদ মুখোপাধ্যায়—সঙ্গীতজ্ঞ। গ্রন্থ—বাহুলীন-তত্ত্ব (Treatise on Violine—১৮৭৪)।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৬৮ বঙ্গাব্দ ভবানীপুর, কলিকাতা। মৃত্যু—১১°৭ খৃঃ। পিতা—রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক—হিতবাদী (পত্রিকা—১৩°১), Indian Union (এলাহাবাদ), Anti Christian Cosmo-politan, বঙ্গনিবাসী, হিন্দী হিতবাদী, সাহিত্য-সংহিতা (১৩১১)। সহ-সম্পাদক—Hindu Patriot, Amrita Bszar Patrika. সম্পাদিত গ্রন্থ—বিদ্যাপতি (টীকা সমেত)।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বিদ্যাসাগর—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৫° বঙ্গাব্দ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ভরাকর গ্রামে। ইনি রায় বাহাদুর, সি, আই, ই এবং বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। কর্ম—ম্যানেজার, ভাওয়াল এষ্টেট। গ্রন্থ—প্রভাতচিন্তা, নিশীথচিন্তা, নিভৃতচিন্তা, নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব, ভক্তির জয়, ভ্রান্তিবিনোদ, ছায়া-দর্শন, মা না মহাশক্তি, প্রমোদলহরী। সম্পাদক—'বান্ধব' পত্রিকা (১২৮১—১৩১২)।

কালীপ্রসন্ন দত্ত—গ্রন্থকার ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৬৬ বঙ্গাব্দ ২°এ আষাঢ় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চাওচা গ্রামে। মৃত্যু—১৩°৮ বঙ্গাব্দ। পিতা—ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত। শিক্ষা—এন্‌ট্রান্স (বরিশাল স্কুল—১২৮১), এফ্-এ, (প্রেসিডেন্সী কলেজ—১২৮৩)। কর্ম—বিজনী এষ্টেটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (১২৯৩-১৩°৮)। গ্রন্থ—দলিত কুসুম, বুদ্বুদ। সম্পাদক—ভারত-সুহৃদ, ভারতবণিক।

কালীপ্রসন্ন দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চুক্তির দাবী, হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞান, মহামুহূর্ত্তে, ঘরের বউ।

কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম, এ। গ্রন্থ—পুরাণ, রাজপুত-কাহিনী, রামায়ণের কথা, ভারত-নারী, লহর, হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞান, সরল চণ্ডী। সম্পাদক—মালঞ্চ।

কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বৃহৎস্তবকবচমালা ১—৪র্থ খণ্ড, অধ্যাত্ম রামায়ণ (১৮৭২), চন্দ্রহংস।

কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ঘসেটিমলের তাঁবেদারী।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬° খৃঃ। বি. এ.। অধ্যাপক, হুগলী কলেজ। গ্রন্থ—নবাবী আমলে বাঙ্গালার ইতিহাস, সেকালের চিত্র, ভারতবর্ষের ইতিহাস, শিশুবোধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, শিশুবোধ বাঙ্গালার ইতিহাস।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মধ্যযুগে বাঙ্গালা। ইংরাজি স্বরলিপি পদ্ধতি (১৮৬৭), জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭১)।

কালীপ্রসন্ন সরকার বর্মা—সাহিত্যিক। সম্পাদক—আর্য-কায়স্থ প্রতিভা (ত্রৈমাসিক—১৩১৫—১৩২১ বঙ্গাব্দ)।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—অনুবাদক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪১ খৃঃ কলিকাতা জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমীদার বংশে। মৃত্যু—১৮৭° খৃঃ। পিতা—নন্দলাল সিংহ। সাহিত্য-প্রচারের জন্য ইনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। গ্রন্থ—হুতোম প্যাঁচার নক্সা (১৮৬১ খৃঃ), নাটক—বিক্রমোর্বশী নাটক (১৮৫৭ খৃঃ), বাবু (নাটক ১৮৫৩), মালতী মাধব (১৮৫৯), সাবিত্রী-সত্যবান্ নাটক (১৮৫৮)। অনূদিত গ্রন্থ—মহাভারত (১৭৮°—১৭৮৮ শক)। সম্পাদক—পরিদর্শক (দৈনিক—১৮৬২ খৃঃ), বিবিধার্থসংগ্রহ (১২৬৮ বঙ্গ)। পরিচালনা—হিন্দু পেট্রিয়ট, বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫ খৃঃ), সর্বতত্ত্বপ্রকাশিকা (মাসিক—১৮৫৬)।

কালীময় ঘটক—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৪৭ বঙ্গাব্দ রাণাঘাট, নদীয়া। মৃত্যু—১৩°৭ বঙ্গাব্দ। পিতা—চন্দ্রকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত। শিক্ষা—নর্মাল বিদ্যালয়। কর্ম—নানা বঙ্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। গ্রন্থ—চরিতাষ্টক ১ম, ২য়, (১৮৭৪), ছিন্নমস্তা (উ), কৃষিবিদ্যা, কৃষি-প্রবেশ, সুরেন্দ্র-জীবনী, মিত্রবিলাপ, পদ্যময় (১৮৭°), মেজা।

কালীবর বেদান্তবাগীশ—দার্শনিক পণ্ডিত। গ্রন্থ—গুরুশাস্ত্র, পাতঞ্জলদর্শন, বেদান্তদর্শন, (১—৪ খণ্ড) সাংখ্যদর্শন, সাংখ্যসূত্রম্, পরলোকরহস্য, ন্যায়দর্শন, বেদান্তসার, আত্মরামায়ণ। সম্পাদক—অঙ্কুর (১৩১৩-১৪)।

কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রাণী দুর্গাবতী, রাজার কথা।

কালীমোহন বসু—সাংবাদিক। জন্ম—১২৮৪ বঙ্গাব্দ ফরিদপুর জেলার রামনগর গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪২ বঙ্গাব্দ। ইনি ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। সম্পাদক—ফরিদপুর-হিতৈষী, সম্মিলনী (পাক্ষিক—১৩২°)।

কালীমোহন বিদ্যারত্ন—অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ—ডামর-তন্ত্রম্, বশীকরণ-তন্ত্রম্।

কালীশঙ্কর দত্ত—সাংবাদিক। সম্পাদক—সম্বাদ-সুধাসিন্ধু (সাপ্তাহিক—১৮৩৭ খৃঃ)।

কাশীদাস মিত্র—সাংবাদিক। সম্পাদক— কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা (পাক্ষিক—১৮৫১ খৃঃ)।

কাশীদাস মিত্র মুস্তফী—গ্রন্থকার। জন্ম—সুখড়িয়া (হুগলী)। মৃত্যু—কাশীধামে। পিতামহ—দেওয়ান গোবিন্দচন্দ্র মিত্র। কর্ম—এলাহাবাদ। গ্রন্থ—অঞ্জনশলাকা, আত্মানুভূতি, কাশিকা, শক্তিতত্ত্বসার, গুপ্তলীলা, প্রয়াগমাহাত্ম্য, বিবেকরত্নাবলী, বিচার-দীপিকা, জ্ঞানরসায়ন, তত্ত্বপ্রকাশ, বিচারতরঙ্গিণী (১৮৬৮), প্রেমানন্দলহরী, সজ্জন-রঞ্জন, শঙ্করবিজয়জয়ন্তী (১৮৭১)।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—তান্ত্রিক গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দক্ষিণাচার, তন্ত্ররাজ, শ্যামাসন্তোষ।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—দার্শনিক পণ্ডিত। গ্রন্থ—ন্যায়দর্শন, পুরুষপরীক্ষা, হিতোপদেশ, জ্ঞানচন্দ্রিকা, প্রবোধচন্দ্রিকা।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—পণ্ডিত। মৃত্যু—১৮৫২ খৃঃ। সহকারী পণ্ডিত, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ। গ্রন্থ—পাষণ্ডপীড়ন (১৮২৩), বিধায়ক নিষেধকের সংবাদ (১৮১১), আত্মতত্ত্বকৌমুদী (১২২১ বঙ্গাব্দ)।

কাশীনাথ দাসগুপ্ত, মুন্সী,—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮°৮ খৃঃ

ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদগ্রামে। মৃত্যু—১৮৮৬ খৃঃ। গ্রন্থ—শব্দদীপিকা, পঞ্চবটীতত্ত্ব, অবলাজ্ঞানদীপিকা, কল্পাপণ-বিনাশিকা।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—সঙ্গীত এবং ইংরেজি কবিতা-রচয়িতা। জন্ম—১২১৬ বঙ্গ খিদিরপুর, কলিকাতা। মৃত্যু—১২৮০ বঙ্গ শ্যামবাজার। পিতা—শিবপ্রসাদ ঘোষ। শিক্ষা—হিন্দু কলেজ। ইংরেজি রচনা—The Shair (ক্ষুদ্র কাব্য); The Hindu Festival, The Poems, Memoirs of Indian Dynasties, Sketches of Ranjit Shing, Sketches of King Oudh, On Bengalee Poetry, On Bengalee works and writers, The Vision—a tale. সম্পাদক—The Hindu Intelligencer (সাপ্তাহিক পত্র—১৮৪৫—১৮৫৮ খৃঃ)।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—সংবাদপত্রসেবী। অন্যতম সম্পাদক—বিজ্ঞানসেবধি (মাসিক—১৮৩২ খৃ)।

কাশীরাম দাস, দেব—কবি। জন্ম—১৬৫ বঙ্গাব্দ বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকট সিঙ্গিগ্রামে। পিতা—কমলাকান্ত দাস। গ্রন্থ—মহাভারত (পদ্যানুবাদ—১০০০—১০১১ বঙ্গাব্দ), স্বপ্নপর্ব, জলপর্ব, নলোপাখ্যান।

কিরণচাঁদ দরবেশ—কবি। জন্ম—১৮৭৪ খৃঃ ফরিদপুর জেলার খালিয়া গ্রামে। ১৩১১ বঙ্গাব্দ সন্ন্যাস-গ্রহণ এবং কাশীধামে বাস। গ্রন্থ—মন্দির (১৯১৫), গানের খাতা (১৯১৪), কাবেরী, জপজী (১৯১৫), নামব্রহ্মপূজাপদ্ধতি (১৯০৪), সঙ্গীতসুধা (১৯১৫), প্রথম শতক, দ্বিতীয় শতক, সাম-সন্ধ্যাগাথা, বৃন্দাবন-শতক, সুলোমা, কুলসঙ্গীত।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১৮৮৭ খৃঃ উত্তরপাড়া, হুগলী। মৃত্যু—১৯৩১ খৃঃ। শিক্ষা—এম, এ। অধ্যাপক। কাব্যগ্রন্থ—নূতন খাতা।

কিশোরীচাঁদ মিত্র—সাহিত্যিক। জন্ম—১৮২২ খৃঃ মে মাসে। মৃত্যু—১৮৭৩ খৃঃ। পিতা—রামনারায়ণ মিত্র। শিক্ষা—হেয়ার সাহেবের স্কুল, হিন্দু কলেজ। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ম্যাজিষ্ট্রেট। গ্রন্থ—দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনচরিত। সম্পাদক—Indian Field.

কীথ—ইংরেজ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮২০ খৃঃ), Keith's Bengali Grammar (১৮৫৪ খৃঃ)

কুমারজীব—বৌদ্ধ ভিক্ষু। পিতা—কুমারায়ণ। মাতা—কুচারাজকন্যা জীবা। ইনি চীন সম্রাটের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। মৃত্যু—৪০১ খৃঃ। চীনা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ—মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র দশসহস্রিকা, বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র, প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র, বিমলকীর্তি, নির্দেশ, ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র, শূরঙ্গমসূত্র, সূত্রালঙ্কার।

কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—বর্ধমান। গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (পদ্যানুবাদ), যোগের বৈজ্ঞানিক আভাষ, সুধাকর গ্রন্থাবলী, ব্রজাঙ্গনাগীতা, গৌরাঙ্গ গীতা।

কুমারস্বামী—টীকাকার। পিতা—প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ। জন্ম—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দেবীপুরে সম্ভবতঃ ১৫শ শতাব্দীতে। টীকাগ্রন্থ—রত্নাপণ (বিদ্যানাথ প্রণীত প্রতাপ-যশোভূষণ গ্রন্থের টীকা)।

কুমারস্বামী, এ, কে,—শিল্পবিশারদ ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Message of the East (১৯০৯), Mediaeval Sinhalese Art (১৯০৯), Arts & Crafts of India & Ceylon (১৯১০), Selected Examples of Indian Art (১৯১০), Art & Swadeshi (১৯১২), Catalogue of Indian collections in museum of Fine Arts (বোষ্টন, ১৯২৩), Dance of Siva (১৯২৪), Bibliographies of Indian Arts (১৯২৫), Viswakarma (১৯১২), History of Indian & Indonesian Art (১৯২৭), Rajput Paintings etc. (১৯১৬), The Indian craftman (১৯০৯), Indian Drawings, 2 vols. (১৯১০—১২)।

কুমারিল ভট্ট—দার্শনিক আচার্য। জন্ম—৭ম শতাব্দীতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (বর্তমান গৌহাটীতে)। গ্রন্থ—তন্ত্রবার্ত্তিক, শ্লোকবার্ত্তিক, লঘুবার্ত্তিক।

কুমুদনাথ চৌধুরী—ব্যবহারজীবী ও শিকারী। মৃত্যু—১৩৪০, চৈত্র। গ্রন্থ—ঝিলে জঙ্গলে শিকার।

কুমুদনাথ মল্লিক—গ্রন্থকার। জন্ম—রাণাঘাট। গ্রন্থ—নদীয়া-কাহিনী, শ্রীচৈতন্য, হজরৎ মহম্মদ।

কুমুদবন্ধু সেন—সমালোচক ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গিরিশচন্দ্র ও নাট্যপ্রতিভা, রাজা রামমোহন রায় ও স্বাধীন ভারত।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—কবি। জন্ম—১৮৮২ খৃঃ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কোগ্রামের সন্নিকট বিখ্যাত বৈদ্যগ্রামে। শিক্ষা—বি০ এ,। কর্ম—প্রধান শিক্ষক, মাথরুণ হাই স্কুল। কাব্যগ্রন্থ—উজানী, বীথি, একতারা, বনমল্লিকা, অজয়, নূপুর, শতদল, রজনীগন্ধা, দ্বারাবতী, বনতুলসী।

কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি.এ.। গ্রন্থ—ঈষ্ট লীন, সিদ্ধিতত্ত্ব, সিন্ধুগৌরব।

কুমুদিনী বসু—গ্রন্থ রচয়িত্রী। পিতা—কৃষ্ণকুমার মিত্র। স্বামী—শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। শিক্ষা—বি, এ,। গ্রন্থ—শিখের বলিদান, পঞ্চপুষ্প, অমরেন্দ্র, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, মেরী কার্পেণ্টার। সম্পাদিকা—সুপ্রভাত (১৩১৪—১৩২১), বঙ্গলক্ষ্মী (১৩৩২—৩৪)।

কুলদাপ্রসাদ মল্লিক—গ্রন্থকার। ইনি কাশীধামে বাস করিতেন। শিক্ষা—বি, এ,। ভাগবত উপাধিলাভ। গ্রন্থ—নব্য যুগের সাধনা, শ্রীগুরুচরণে, শ্রীশ্রীসদ্গুরু প্রসঙ্গ (১৯১৫)।

কুলদারঞ্জন রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বেতালপঞ্চবিংশতি, কথা-সরিৎসাগর, ওডিসিউস, অজ্ঞাতজগৎ, আশ্চর্য দ্বীপ।

কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসা, দৈনন্দিন রোগের জলচিকিৎসা, কঙ্কহারা, স্বামীর ঋণ, পল্লীর আলো।

[ক্রমশঃ।

রডোডেনড্রন্

নির্ম্মলকান্তি চক্রবর্ত্তী

ফুল না কি প্রিয় হয় কবিদের কাছে
এমনি কী সব কথা বইয়ে লেখা আছে।
আমি তো কবি-ই নই, অকবির সেরা,
তবুও আমার কাছে প্রিয় পুষ্পেরা,
সব চেয়ে প্রিয়তম একখানি হাতে
নিশিগন্ধার দল তারাঝরা রাতে,
হৃদয়ের প্রণয়ের শেষ সঞ্চয়
আনন্দে সঁপে দিয়ে গাহে জয় জয়।

আধুনিক কৃষ্টির দৃষ্টির তলে
জানি তারা লজ্জিত প্রতি পলে পলে।
আমার তো মনে হয় ফাঁকি ওইখানে;
তবে যারা দিতে জানে তারা শুধু জানে
বাইরের সজ্জাটা সবটুকু নয়;
তারও গভীরে থাকে শেষ পরিচয়।
নীলিম আকাশ সেথা দু'-একটি তারা
অতন্দ্র জাগে কভু বুঝি দিশাহারা।

আজকের যা আমার বলবার কথা,
ফুলেদের বটানীর নয় তত্ত্ব তা।
শিল্পের মাধ্যমে পুষ্পের ভাষা
কতটা প্রকাশ পায় তার-ই জিজ্ঞাসা।

তুলি আর কাগজের মধ্যস্থতা
কিছুটা করেই রূঢ় নকলের কথা।
তবু তার রঙ্‌টুকু শিল্পী মনের
সেখানে পরশ থাকে আপন জনের।

নকলের ধকলে তো জগতের হাটে
অনেকে কিনেছে নাম, তাতে দিন কাটে।
আমিও ধরার পানে চেয়ে চেয়ে দেখি
অর্দ্ধেক ফাঁকি তার, খানিকটা মেকী।
শক্তের ভক্তের অটল আসন,
পাওয়ারের-টাওয়ারের শাসন-ত্রাসন,
বিকল শিকল আর কৃপাণের জয়
চক্ষে মূঢ়তা হানে, হানে বিস্ময়।

তবু তার পাশে দেখি বিদেশী এ ফুলে
শাখায় শাখায় প্রাণ ওঠে দুলে দুলে,
চিত্তের-বিত্তের কী আন্দোলন,—
উদ্ধত রডোডেনড্রন্।

* * *

তোমারও প্রাণের কিছু পেনু পরিচয়
গম্ভীর যেটুকু সে সুগভীর নয়।
বিশাল কাজলঘন দু'টি আঁখিতলে
খঞ্জন-চঞ্চল দুষ্টুমী জলে,
পুটুপুটে দু'টি ঠোঁটে কলকল ধ্বনি
কারণে ও অকারণে ওঠে গুঞ্জনী।

ছাড়া পেলে দু'শো গজ লম্বাটে রেসে
তোমারে জিনিতে পারে হেন বীর কে সে!
আম্রশাখারা বোঝে জ্যৈষ্ঠের ঠেলা
কলি যুগে অবতার শ্রীরামের চেলা।

হেন বীর অঙ্গনা কলকাতা এসে
ভদ্র বনিয়া গেছ ভদ্রের দেশে।
তন্বী সুগোল ছোট কোমরটি ঘিরে
সর্পিল শাড়ীখানি ওঠে ধীরে ধীরে।
বক্ষে লুটিয়ে পড়ে পৃষ্ঠে ও কাঁধে
এলায়িত চুলগুলি বাধা পেয়ে কাঁদে,
হাসি-ভরা কথাগুলি গীত-ছন্দন্—
তুমিই ফুলের দেশে রডোডেনড্রন্।

কাব্যের ছলে করি প্রেম নিবেদন,
এমন ভ্রান্তি হ'লে হবে অকারণ,
"ভালবাসি" হেন কথা কবিতার সুরে
বল্‌তো অতীত কালে অবন্তীপুরে।
সেকালের বিকালের পড়ন্ত রোদে,
লোধ্রের রেণু মুখে মাখিত অবোধে।
তোমরা যে আধুনিকা বিশ শতকের,
তোমাদের প্রণয়ের যত তেরফের
এ-টসের চা-রসের অ্যাকারিণে মিশে
কটুতায় পটুতায় হারায়েছে দিশে।

তবুও তোমার কাছে যেটুকু পেলেম
তাই মণি-কাঞ্চন শতদল হেম।
চক্ষের চাহনী ও সঙ্গের সুধা
তাতে-ই মিটেছে মোর প্রণয়ের ক্ষুধা।
তার বেশী যদি থাকে ভাগ্যের দায়
সে দান নেব না কভু কৃপা ভিক্ষায়।
আমিও যুবক জেনো বিশ শতকের
আমার প্রণয় তাই স্বদেশী ফুলের
কণ্টক-কুণ্ঠিত নম্রতা নয়,
লজ্জার সজ্জার ত্রস্ত বিনয়।

বলিষ্ঠ বক্ষের রক্তের শিরে
ঝটিকার গতিবেগে যে দুরাশা ফিরে,
মূঢ়তম চিত্তের দৃঢ়তম দাবী,
যদি বা হারাই তার দুয়ারের চাবী
তবু সেই তুচ্ছের সব শেষ গুচ্ছের
প্রতীক যে জন,
ফুটেছে সে বিশ্বের দূরতম পাহাড়ে—
উদ্ধত রডোডেনড্রন্।

হিন্দুদিগের লৌকিক ধর্ম ও দেব-দেবী

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

এ দেশের এক শ্রেণীর গবেষকের মতে হিন্দুদের লৌকিক দেব-দেবী দেশের অনার্য্য অধিবাসীদের ধর্ম হইতে গৃহীত। তাঁহাদের মতে হিন্দুদের লৌকিক ধর্ম আর্য ও অনার্য কৃষ্টির সংমিশ্রণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহারা বলেন, অনার্য্য আদিবাসীদের নিকটে প্রাপ্ত দেব-দেবীকে কল্পিত গোত্র, কুল-শীলের সাহায্যে অপাঙ্‌ক্তেয় হইতে পাঙ্‌ক্তেয় করিয়া বিশুদ্ধ হিন্দুকুলোদ্ভব বলিয়া হিন্দুরা দাবী করিয়াছে, এই দাবী ভিত্তিহীন।

হিন্দুদের লৌকিক ধর্ম ও দেব-দেবী সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের অবসর আছে কি না, এ প্রশ্ন কেহ তোলেন নাই। এখানে এই প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রথম বক্তব্য এই যে, এই সিদ্ধান্ত আমাদের গবেষকগণের স্বাধীন গবেষণা-প্রসূত সিদ্ধান্ত নহে, তাঁহারা ইহা গ্রহণ করিয়াছেন এক শ্রেণীর য়ুরোপীয় পণ্ডিতের কাছে। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, যে পথে এ-সম্পর্কে তাঁহাদের গবেষণা অগ্রসর হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে য়ুরোপীয় মতবাদের প্রেরণা ও প্রভাব।

এ দেশের মাটিতে যাঁহারা দুই-চারি দিনের জন্য পা দিয়াছেন কিংবা যাঁহাদের সে অবকাশ হয় নাই, এমন যে সকল য়ুরোপীয় ও আমেরিকান ইণ্ডোলজিষ্ট আমাদের ধর্ম ও দেব-দেবী সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মোটামুটি মত এই যে, বর্ত্তমান কালের হিন্দুধর্ম অনার্য জাতির ধর্মের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। বহু কাল এ দেশে বাস করিয়া সরকারী কাজের ফাঁকে যে সকল ইংরেজ পণ্ডিত ভারতবাসীর দেব-দেবী, ধর্মীয় ও সমাজিক অনুষ্ঠান, আচার, প্রথা লইয়া গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মত এই যে, পৌরাণিক দেব-দেবী যাহাই হউন হিন্দুদের লৌকিক দেব-দেবী প্রাক্-আর্যযুগের অনার্যদের ধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। গ্রহণ করিবার উপযুক্ত জিনিস যে কোন জাতির নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়, তাহাতে অগৌরবের কিছু নাই। কিন্তু তাঁহাদের ভাব-ভঙ্গীতে মনে হয়, গবেষণার নামে হিন্দুদের আর্যত্বের দাবীকে যে দিক দিয়া হউক যতখানি পারা যায় খোঁচা দিতে পারিলে তাঁহারা প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতেন। আরও দেখা যায়, যে সকল মত তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন নাই, শুধু তাঁহাদের যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা অসমর্থিত সিদ্ধান্তটুকু প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। কৃতজ্ঞতাবশে আমরাও কয়েক পুরুষ ধরিয়া মানিয়া আসিতেছি, শিব এক জন অনার্য দেবতা, দুর্গা ও কালী "bloodthirsty aboriginal goddess"-এর সভ্যীকৃত সংস্করণ, বৈদিক ঋষিরা গরু খাইতেন সুতরাং "Cow-worship is foregin to the Rigvedic Aryans" ইত্যাদি।

আমাদের স্তূপীকৃত কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের সময় আসিয়াছে। কঠোর শ্রম ও স্বাধীন অনুসন্ধানের দ্বারা এই পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে। আর্যদের ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তাঁহাদের প্রাচীন দলিলপত্র হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, এই দলিল-পত্রের য়ুরোপীয় ভাষ্যকারদিগের নিকটে লব্ধ ধারণায় সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের লৌকিক ধর্ম ও দেব-দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে য়ুরোপীয় মতবাদের ভিত্তি পরীক্ষা করা হইবে।

লৌকিক ধর্ম কি

শাস্ত্রীয় আচার হইতে লোকাচারের যে পার্থক্য, শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ধর্ম হইতে লৌকিক ধর্মের সেই পার্থক্য সর্বদা রক্ষিত না হইলেও লৌকিক ধর্ম কি, বুঝিতে অসুবিধা হয় না। লৌকিক ধর্মের অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের দ্বারা শাসিত নহে, ইহা আমাদের একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার। পুরাতন অভ্যাসক্রমে লৌকিক ধর্মের অনুষ্ঠানকে আমরা পুরোহিতদর্পণের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিয়াছি, সংস্কৃত মন্ত্র, ন্যাস, মুদ্রা আমদানি করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এ সকল আড়ম্বর সত্ত্বেও লৌকিক দেব-দেবীকে চিনিয়া লইতে কষ্ট হয় না। লৌকিক ধর্ম আমাদের সামাজিক বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের ধর্ম নহে, দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনের ধর্ম।

ব্যক্তিগত, সমাজগত ও জাতিগত অনাচার সত্ত্বেও মানুষ যে কতখানি ধার্মিক জীব, লৌকিক ধর্মের আলোচনা করিলে তাহা বুঝা যায়। শুধু দেব-দেবী নহে, পশু-পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, জড়বস্তুকে মানুষ নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য পূজা দিতে প্রস্তুত। লৌকিক ধর্মের অবারিত দ্বার মন্দিরে ব্যাঘ্র-দেবতা কালু রায়, দক্ষিণ রায় আসিয়াছেন, সর্প-দেবতা মনসা আসিয়াছেন, গর্দভবাহিনী শীতলা আসিয়াছেন, ওলাবিবি, ঘেঁটু, ভিটাকুমারী, বনদুর্গা আসিয়াছেন, নানা সজ্জায় ও নামে ষষ্ঠী আসিয়াছেন, সন্তানের মঙ্গলদায়িনী বৃক্ষবাসিনী রূপেশ্বরী আসিয়াছেন, প্রস্তরখণ্ডে অধিষ্ঠিতা মঙ্গলচণ্ডী আসিয়াছেন। কৃষিপ্রাণ পল্লী-কেন্দ্রিক অনাড়ম্বর জীবনকে উৎসব-মুখর করিতে আসিয়াছে কত ব্রত-পার্বণ। এই সকল ব্রত-পার্বণও দেবতার নাম লইয়া করা হয়। তাঁহাদের কেহ ক্ষেত্রদেবতা, কেহ জলদেবতা, কেহ বনদেবতা, কেহ সৌভাগ্যদায়িনী, মঙ্গলবিধায়িনী দেবতা।

দেবতার মত অপদেবতার পূজাও লৌকিক ধর্মের অঙ্গ। অপদেবতাদের সংখ্যা যেমন তাঁহাদের অনিষ্ট করিবার শক্তিও তেমন। সংসারের সুখ, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তার জন্য তাঁহাদের তুষ্ট করা অবশ্য প্রয়োজন।

দেবতা ও অপদেবতা, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ ও জড়বস্তুর উপাসনা লইয়া, ব্রত-পার্বণ লইয়া আমাদের লৌকিক ধর্ম চলিতেছে—যেমন চলিতেছে আমাদের শাস্ত্রীয় ধর্ম ও বৈদিক সংস্কার পালন।

লৌকিক দেব-দেবীর উৎপত্তি

লৌকিক দেব-দেবী বলিতে প্রাচীন দেবতাদের সহিত অপাঙ্‌ক্তেয় গোত্র, কুল-শীলহীন যে সকল ঘরোয়া দেব-দেবীর উপাসনা করা হয় তাঁহাদের বুঝায়। ইঁহাদের অনেকের অবস্থা উদ্বাস্তুদের ন্যায় পথে, ঘাটে, মাঠে, বৃক্ষতলে যত্র-তত্র একটু দাঁড়াইবার বা বসিবার স্থান মাত্র পাইয়াছেন। কাহারও মাথার উপরে

সামান্য আচ্ছাদন আছে, কাহারও তাহাও জোটে নাই। কাহারও প্রতিমা আছে কিন্তু অধিকাংশ প্রস্তরখণ্ডে মৃত্তিকা-পিণ্ডে, মাটির ঘটে, বৃক্ষপল্লবে অধিষ্ঠিত, কেহ বা আলিপনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। পূজার উপকরণের, সময়ের, পুরোহিতের সম্বন্ধে কোন কড়াকড়ি নিয়ম নাই, অভিজাত দেব-দেবীর উপেক্ষিত এই সকল লৌকিক দেব-দেবীরা কিন্তু ভক্ত সমাজের আপন জন। তাঁহাদের পূজায় আড়ম্বর না থাকিলেও প্রাণের স্পর্শ আছে।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনা জানাইবার জন্য হাতের কাছে দেবতাকে পাইবার ইচ্ছা হইতে লৌকিক দেব-দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত মানুষের দৈনন্দিন কর্মে দেবতার সহায়তা ও বিপদে আশ্রয় পাইবার ইচ্ছা হইতে নূতন নূতন লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি হইয়াছে।

সংসারে মানুষের ভয়ের, ভাবনার বস্তু কত। আকস্মিক দুর্ঘটনার ভয়, সর্পের ভয়, হিংস্র পশুর ভয়, ব্যাধির আক্রমণের ভয়, ঈর্ষাপরায়ণ, কুচক্রী শত্রুর ভয়, ব্যর্থ পরিশ্রমের হতাশার ভয় সাংসারিক মানুষকে সর্বদা সন্ত্রস্ত রাখে। কৃষক তাহার কৃষিকার্যে ও ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে সফলতা প্রত্যাশা করে, গৃহস্থ গৃহের মঙ্গল, পুত্র-কন্যা লাভ, কর্মে সফলতা, সংসারের শ্রীবৃদ্ধি প্রত্যাশা করে। সকলেই বরাভয়দাতা, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতাকে হাতের কাছে পাইতে চাহে। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য কাছে দেবতাকে পাইবার আগ্রহ হইতে নূতন নূতন লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ জানাইবার প্রয়োজনে, গ্রাম্য সরল মানুষের অলৌকিকত্বে অতিশয় বিশ্বাসপ্রবণতার ফলে, কখনও বা শুধু খেয়াল হইতে অথবা কোন কোন লোকের ব্যবসায়-বুদ্ধি হইতেও লৌকিক দেব-দেবী সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যায়। খেয়াল হইতে লৌকিক দেব-দেবী সৃষ্টির একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

উত্তর-বিহারের কোন কোন অঞ্চলে চেলওয়া গোঁসাই নামে এক দেবতার উপাসনা প্রচলিত আছে। রাস্তার ধারে এক চাঙড় মাটির স্তূপ হইতেছেন এই দেবতা। ভক্তিমান পথচারী যাইবার সময়ে অর্ঘ্যস্বরূপ এক চাঙড় মাটি দেবতাকে নিবেদন করিয়া প্রণাম জানাইয়া চলিয়া যায়। দেবতা তুষ্ট হইয়া পথিককে পথের আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করেন। মুরশিদাবাদ জেলার কোন কোন অঞ্চলে এক দেবীকে দেখা যায়। তাঁহাকে চেলওয়া গোঁসাইজির নিকট-আত্মীয় বলা যায়। দেবীর নাম চেলাই চণ্ডী। বৃক্ষমূলে স্তূপীকৃত মাটির ঢেলা হইতেছেন এই দেবী। পথচারী ভক্ত সেই পথে যাইবার সময়ে নূতন একটি মাটির ঢেলা দেবীকে নিবেদন করিয়া চলিয়া যান। উত্তর প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে চেলওয়া গোঁসাই হইয়াছেন চেলওয়া পীর। উড়িষ্যার জাজপুর অঞ্চলে ইঁহাকে দেখা যায় চেলাই সাধুরূপে।

দেব-দেবীর সৃষ্টি-প্রকরণ ; বৃক্ষ, পশু ও জড়বস্তুর উপাসনা-তত্ত্ব

আমাদের পৌরাণিক দেব-দেবীর সৃষ্টির ব্যাপারে যে প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টির ব্যাপারেও অনেক জায়গায় সেই প্রণালী অনুসরণ করা হইয়াছে। এই প্রণালীর ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

আমাদের দেব-দেবীর ইতিহাস সম্বন্ধে বৈদিক যুগের আগের কথা জানা নাই। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে রুদ্রের কথা ধরা যাউক। পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্বেদে রুদ্রের কল্পনায় এরূপ পরস্পরবিরোধী অথবা বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশ দেখা যায় যে, কয়েকটি পৃথক্ দেবতার মিলনে ঋগ্বেদীয় রুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করা অপরিহার্য হইয়া উঠে। এই ব্যাপারটিকে তাঁহারা বলেন সিনক্রেটিজম্ (Syncretism)। রুদ্রের সঙ্গে মিলিত এই সকল পৃথক দেবতাদের নাম ও গুণ রুদ্রে আরোপিত হইয়াছে। কখন এই দেবতারা আপনাদের পৃথক অস্তিত্ব লইয়া বর্তমান ছিলেন এবং কি কারণে তাঁহারা রুদ্রের মধ্যে বিলুপ্ত হইলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। এই সিনক্রেটিজম্ প্রণালীর কার্য যে ঋগ্বেদের পরেও কিছু কাল চলিয়াছিল যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় স্তোত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের বজ্রধারী, কোপনস্বভাব, সংহারকারী রুদ্র শতরুদ্রীয় স্তোত্রে হইয়াছেন শ্মশানচারী, বল্কলধারী ভিক্ষুক, তস্করদিগের দেবতা। রুদ্রের চরিত্রে পরবর্তী কালে আরও নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য আসিয়াছে।

সে যাহা হউক, সিনক্রেটিজমের অধ্যায় বৈদিক যুগেই এক রকম শেষ হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যায় যে, সিনক্রেটিক দেবতা হইতে আবার নূতন নূতন দেবতার উৎপত্তি হইতেছে। অর্থাৎ এক জন প্রধান দেবতার চরিত্রের বহু বৈশিষ্ট্যের কোন কোন বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়া পৃথক দেবতার সৃষ্টি হইতেছে। অবতারবাদ গৃহীত হইবার পর হইতে এই ভাবে নূতন নূতন দেবতার উৎপত্তি সহজ হইয়া আসিল। দেব-দেবীর সৃষ্টির ইতিহাসে সিনক্রেটিজমের পরের অধ্যায় বিশ্লেষণ এবং তার পরের অধ্যায় অবতারবাদ। অবতার-বাদের কল্যাণে ক্রমে কুল-শীলহীন নবাগত দেবতারাও প্রধান দেবতা-দের অংশ-অবতাররূপে প্রাচীন দেবসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

দেবসৃষ্টি প্রকরণের একটি অধ্যায় জড়বস্তুকে অলৌকিক শক্তির আধার জ্ঞানে পূজা করা। এই জিনিসটিকে আমরা ঘুরাইয়া অন্য ভাষায় বলি দেবতার প্রতীক বা অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র জ্ঞানে পূজা। ইহা আসলে ফেটিসিজম্। এই জড়বস্তু উপাসনা মানুষের অসভ্য বা অর্ধসভ্য অবস্থার পরিচায়ক নহে ; সকল দেশের সভ্য, অসভ্য মানুষের মধ্যে কোন না কোনরূপে এই জিনিষ রহিয়াছে। জড়বস্তুকে পৌরাণিক দেব-দেবীর আধার জ্ঞানে উপাসনা করিবার রীতি আমাদের ধর্মে রহিয়াছে। ইহা ফেটিসিজম্ হইলেও অনার্যদের নিকট গৃহীত নহে, তাহা পরে দেখা যাইবে। জড়বস্তুকে অলৌকিক শক্তি আরোপ করিবার প্রবৃত্তি হইতে নূতন নূতন লৌকিক দেব-দেবী সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

দেব-সৃষ্টি প্রকরণের অন্য দুইটি অধ্যায় পশু ও বৃক্ষ উপাসনা। পশু কখনও দেবতার বাহনরূপে, কখনও দেবতা পশুর মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করেন বলিয়া পূজা পায়। ভয় হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য হিংস্র পশুর ও সর্পের মত সরীসৃপের তুষ্টি সাধন করা হয়। বৃক্ষ ও ওষধি মানুষের পরম উপকারী। কখনও দেবতার অধিষ্ঠান-স্থানরূপে, কখনও অলৌকিক শক্তির অধিকারী-রূপে বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়।

দেব-সৃষ্টি প্রকরণের শেষ অধ্যায় মানুষে দেবত্ব আরোপ (deification of human beings)। দেবতা উপাস্য, মানুষ উপাসক, কিন্তু মানুষেরও দেবত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। পূর্বে

তপস্যা বা অসাধারণ পুণ্য কর্মের ফলে মানুষের দেবত্ব-প্রাপ্তি ঘটত। অবতারবাদ প্রচারিত হইবার পরে মানুষের দেবত্ব অর্জন অনেকখানি সহজ ব্যাপার হইয়া আসিল।

লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি প্রকরণ

মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে নহে, তাহার দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনে লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি হয়। তাহা হইলেও উপরে নূতন দেবতার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে প্রণালীর কথা বলা হইল, লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টির ব্যাপারে সেই প্রণালী মোটামুটি অনুসৃত হয় এবং লৌকিক ধর্মে বৃক্ষ, পশু ও জড়বস্তুর উপাসনায় প্রাচীন পন্থা অনুসরণ করা হয়। এই প্রণালীর মধ্যে অবতারবাদের কথা একটু বিস্তারিত ভাবে বলা হইতেছে।

পৌরাণিক যুগে নূতন দেবতা সৃষ্টির অধ্যায় এক রকম শেষ হইয়া গেলেও যেমন অবতাররূপে মানুষের মধ্যে দেবতার আবির্ভাব এখনও আমাদের সমাজে বন্ধ হয় নাই, তেমনি আমাদের প্রয়োজনে সৃষ্ট নূতন লৌকিক দেব-দেবীকে প্রাচীন দেবগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত করিবার আগ্রহের অভাব নাই। সমাজে বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে নিম্ন স্তরের মানুষের যেমন উচ্চতর স্তরের মর্যাদা লাভ হইয়া থাকে, প্রাচীন দেবগোষ্ঠীর সঙ্গে অপাঙ্‌ক্তেয় লৌকিক দেব-দেবীকে তেমনি অবতারবাদের সাহায্যে নূতন মর্যাদা দিয়া তাঁহাদিগকে পাঙ্‌ক্তেয় করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহার মধ্যে অনার্য দেবতাকে হিন্দু বানাইবার প্রশ্ন নাই, ইহা সাধারণ ব্যাপার। দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

বহু লৌকিক দেবীকে দুর্গার বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এই নাম দিবার তাৎপর্য্য এই যে, লোকে স্বীকার করুক, ইঁহারা শ্রীদুর্গার বংশ বটেন। বাংলায় দেবীর চণ্ডী এবং বিহারে ও উত্তর প্রদেশে দেবীর ভবানী নাম সমধিক প্রচলিত। বাংলার মঙ্গলচণ্ডী ও ওলাইচণ্ডীর নাম পরিচিত। এক জন গ্রামাধিষ্ঠাত্রী দেবী, অন্য জন ওলাউঠা-মারীভয়-নিবারণী দেবী। চণ্ডী উপাধি-ধারিণী আরও অনেকগুলি লৌকিক দেবীর পূজা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কয়েকটি নাম করা হইতেছে—বসনচণ্ডী, পাতাল চণ্ডী, ঘোর চণ্ডী, ধর চণ্ডী, খল চণ্ডী, ককাই চণ্ডী, বেতাই চণ্ডী, অবাক চণ্ডী, কলাই চণ্ডী, চেলাই চণ্ডী ইত্যাদি। ইঁহাদের কেহ বিশেষ বিশেষ রোগ দূর করেন, কেহ ক্ষেত্রের ফল বৃদ্ধি করেন, কেহ পশুপাল রক্ষা করেন, কেহ শিশুদের গ্রহ শান্তি করেন, কেহ শত্রুকে জব্দ করেন; কাহারও বৈশিষ্ট্য—তাঁহার আবাস-স্থান বেত্রকুঞ্জের মধ্যে।

বিহার ও উত্তর প্রদেশে এই শ্রেণীর দেবীদিগকে ভবানী উপাধি দিয়া জাতিতে উঠাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহাদের কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হইতেছে—আমিনা ভবানী, জটিয়া ভবানী, বেতী ভবানী, ভুঁইয়া ভবানী, বর্ণ ভবানী, বন্দী ভবানী, ফুলমতী ভবানী, অঙ্গারমতী ভবানী ইত্যাদি। দুর্গা উপাধিধারিণী অনেকগুলি লৌকিক দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; যথা—আর্যদুর্গা, বনদুর্গা, পাদদুর্গা, গুপ্তদুর্গা, কাব্যদুর্গা, আজদুর্গা ইত্যাদি। এই উপাধিগুলি ছাড়া ঠাকুরাণী, মাতা বা মায়ী, রাণী, ঈশ্বরী বা দেবী উপাধি-ধারিণী লৌকিক দেবীদিগকেও দেবীর সঙ্গে সংযুক্ত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতের লৌকিক দেবীগণের সাধারণ উপাধি আম্মা; যথা—পুজাআম্মা, মারীআম্মা, দুর্গাআম্মা, এল্লাআম্মা ইত্যাদি। বাবা, গোঁসাই, ঠাকুর উপাধিধারী লৌকিক দেবতাদিগের অনেককে মহাদেবের সঙ্গে সংযুক্ত করিবার চেষ্টা দেখা যায়।

লৌকিক দেব-দেবীর বিবরণ সংগ্রহ

পল্লীকেন্দ্রিক ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্মজীবনের বড় একটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য লৌকিক দেব-দেবীর পূজা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অসংখ্য লৌকিক দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। অনেক পূজা আবার অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

এক সময়ে এ দেশের অধিবাসীদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, লৌকিক দেব-দেবী ও ব্রত-পার্বণের বিবরণ সংগ্রহ করিবার দিকে ইংরাজের ঝোঁক গিয়েছিল। ড্যাল্টন, রিজলে, ক্রুক, রাসেল, থার্সটন, বিশপ হোয়াইটহেড বিভিন্ন প্রদেশের কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই চেষ্টা হাণ্টার করিয়াছেন, গেজেটিয়ারের লেখকগণ বিভিন্ন জেলার বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই সকল বিচ্ছিন্ন চেষ্টার ফল একত্র মিলাইয়া নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একখানি বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করা সম্ভব। ভারত-বর্ষের অধিবাসীদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, ধর্মসাধনা ও কৃষ্টির পরিচয় জানিবার পক্ষে, বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গীর ও কৃষ্টিগত মৌলিক ঐক্যের পরিচয় পাইবার পক্ষে এইরূপ গ্রন্থ একখানি মূল্যবান দলিল হইবে। উদ্যমশীল, পরিশ্রমী, বিচক্ষণ গবেষকগণকে বিভিন্ন রাজ্য-সরকার অর্থ সাহায্য করিয়া এই কার্যে নিযুক্ত করিতে পারেন।

এইবার আমাদের লৌকিক দেব-দেবী অনার্যদের নিকট গৃহীত—এই য়ুরোপীয় মতবাদের আলোচনা করা হইতেছে।

প্রবন্ধের প্রথমে বলা হইয়াছে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে অলৌকিক শক্তির সাহায্য পাইবার ইচ্ছা হইতে লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রয়োজনের মধ্যে আর্য-অনার্য ভেদ নাই। লৌকিক দেব-দেবীর উপাসনা বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে ছিল, এখনও আছে এবং নূতন লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি হইতেছে। বৈদিক ঋষি প্রস্তরখণ্ডে দেবত্ব আরোপ করিতেন 'সোম' পেষণের সহায়ক হিসাবে, মৃত্তিকার যজ্ঞ বেদীতে দেবীত্ব আরোপ করিতেন পবিত্র যজ্ঞাগ্নির আধাররূপে ভক্তিমান হিন্দু বিশেষ আকৃতির প্রস্তরখণ্ডে দেবত্ব আরোপ করেন শিব বা নারায়ণের প্রতীকরূপে, অনার্য আদিবাসী ভূপ্রোথিত কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ডকে পূজা করে মহাদেব, ঠাকুরাণী মায়ী বা সুরজনারায়ণ জ্ঞানে। এই তিন প্রকারের উপাসনায় পূজার উপচারের পার্থক্য থাকিলেও উপাসকের মনোবৃত্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।

এখানে বৈদিক যুগের লৌকিক ধর্ম ও লৌকিক দেব-দেবী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে জানিতে পারা যাইবে, লৌকিক দেব-দেবীর পূজা আর্য জাতির অপরিচিত ছিল না। দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজনে বৈদিক যুগে নূতন নূতন লৌকিক দেব-দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আরও জানা যাইবে, যে পশু, সর্প, বৃক্ষ ও জড় উপাসনা অনার্য কৃষ্টির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করা হয়, তাহা বৈদিক যুগে বিশেষ পরিচিত ছিল। আরও জানা যাইবে যে, হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের ধারা বৈদিক যুগ হইতে অব্যাহত রহিয়াছে।

রসায়ন-শিল্পের ক্রমোন্নতি

শ্রীঅমলকুমার বসু-রায়

বিংশ শতাব্দীর মাঝ-পথে এসে, '৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টকে প্রায় চার বছর পিছনে রেখে এসেও আজ এ কথা বলা চলে যে, ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ! Poverty in the midst of plenty এই dictumটা যেন একটা শাশ্বত সত্যে পরিণত হ'য়ে গেছে। কোন দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যা-কিছু প্রয়োজন, যা-কিছু অপরিহার্য্য সবই রয়েছে আমাদের দেশে, নেই শুধু উন্নতিটা। দেশের আয়তন ও জনসংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা যায়, তা হলেও এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে, প্রাকৃতিক সম্পদে আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ নয়, প্রকৃতি দেবী দেখাননি আমাদের প্রতি খুব বেশী কার্পণ্য। আর জনশক্তির কথা উল্লেখ নাই বা করলাম। তবে আমাদের দেশের শিল্পবুদ্ধি বা শিল্পপুঁজির অবস্থা শুধু যে শোচনীয় তাই নয়, ভয়াবহও বটে। পুঁজি ও সক্রিয় সাহায্য দিয়ে দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে চালু রাখার জন্যে ক'টা আর টাটা-বিড়লা খুঁজে পাওয়া যায়! সরকারের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সাহায্যে শিল্প-বাণিজ্যকে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে কিছু কিছু, ভাবীকালে এর সুফল আশা করা যায়। অতীতের কালো যবনিকাখানা তুলে দেখলে দেখা যায় যে, বহু বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়েও কিছু কিছু শিল্প-প্রচেষ্টা আমাদের দেশে হয়েছিল ও হচ্ছে আর নব-নব উদ্যমে শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টাও চলেছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, উপযুক্ত পুঁজি, শ্রম ও বুদ্ধির সক্রিয় সাহায্য পেলে আমাদের ভারতবর্ষ বিশ্বের অন্যতম শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হতে পারে।

আজকের দিনের জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে হলে দ্রুত শিল্পোন্নতি ছাড়া আর কোন পথই নেই। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোতে যাতে ক'রে অধিক মাত্রায় জিনিষপত্র প্রস্তুত হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর সেই সঙ্গে যাতে আরও নতুন নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান সুরু করা যায় সেই দিকে সচেষ্ট হ'তে হবে দেশের সরকারকে ও পুঁজিপতিদের। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ক'রে আমাদের প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ঠিক মত সদ্ব্যবহার হয় আর সেই সঙ্গে আমাদের কার্য্যকারিতা ঠিক পথে চালনার দিকেও সচেষ্ট হতে হবে। এই রকম সুনিয়ন্ত্রিত পথে চলতে পারলে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও দৃঢ়তার আশা নিকট থেকে নিকটতর হয়ে আসবে দিন-দিন।

আজকের পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশের সাধারণ শিল্পপ্রসার খুবই কম হয়েছে, আর রাসায়নিক শিল্পের কথা চিন্তা করলে আমাদের অবস্থা সাগরের কাছে গোষ্পদের পর্য্যায়েও পড়ে না। বেশীর ভাগ শিল্পের প্রচার ও প্রসার নির্ভর করে রাসায়নিক দ্রব্য-সামগ্রীর উপর, তাই রাসায়নিক শিল্পকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা আজকের দিনের Talk of the day হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুখের কথা, আশার কথা এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার আজ কয়েক বছর হল রাসায়নিক শিল্পকে গড়ে তোলা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন ও উঠছেন। সরকারের পক্ষ থেকে অনেকগুলো 'প্ল্যান্' ও 'স্কীম্' করা হয়েছে ও হচ্ছে, এইগুলোকে কার্য্যকরী ক'রে তুলতে পারলে দেশের বহু প্রয়োজন মিটবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এই প্ল্যান্গুলোর একটা খসড়া দেওয়া গেল:

ঔষধপত্র—একটি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তি ক'রে বোম্বাইএর সন্নিকটে পেনিসিলিন তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে। এই কারখানাতে সাধারণতঃ ১২০০ বিলিয়ন্ ইউনিট ক'রেই তৈরী হবে, তবে প্রয়োজনের সময় ৩৬০০ বিলিয়ন ইউনিট সরবরাহ করারও সুবন্দোবস্ত থাকবে। শুধু তাই নয়, এই কারখানায় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক ঔষধাদি ও সালফা-ড্রাগ প্রস্তুতিও চলবে। যক্ষার নবাবিষ্কৃত প্রতিরোধক প্যারা এ্যামাইনো স্যালিসাইলিক এ্যাসিড প্রস্তুতির জন্যও একটা বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। এ্যাসেটিক্ এ্যাসিড ও এ্যাসেটিক্ এ্যানহাইড্রাইড প্রস্তুতির জন্যে তিনটে প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং কাজ সুরু হবে অচিরেই। এখান থেকে বছরে প্রায় ৩০০০ টন ক'রে সরবরাহ করা হবে, ভারতের বর্ত্তমান প্রয়োজনের কিছু বেশী।

শিল্প সংক্রান্ত বিস্ফোরক—একটা বিলাতী প্রতিষ্ঠান এ-সম্বন্ধে সুবিধা-অসুবিধাগুলো ভাল ভাবে গবেষণা ক'রে দেখেছেন এবং এঁদের দেওয়া 'স্কীম'টা সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

কৃত্রিম জ্বালানী তৈল—ভারতীয় কয়লা থেকে কৃত্রিম তৈল তৈরী সম্ভব কি না, এই নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটা মার্কিণ প্রতিষ্ঠানকে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল ১৯৪৮এর মে মাসে। তাঁরা একটা সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত খসড়া দিয়ে গেছেন। ইত্যবসরে এই কৃত্রিম তৈল নিয়ে কতকগুলো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চলছে এবং ফলাফল খুবই আশান্বিত। বর্ত্তমানে আমাদের ভারতবর্ষের প্রতি বছরে প্রয়োজন হয় ১৮০০ লক্ষ গ্যালন যান-বাহন চালনার পেট্রল; ৬৬,০০০ টন কেরোসিন; ৩০,০০০ টন বিভিন্ন রকম ডিসেল্ তৈল; ৫৩,০০০ টন চুল্লীর তৈল আর আমাদের এখানে প্রস্তুত হয় ১৫০ লক্ষ গ্যালন যানবাহন পেট্রল; ৪,০০০ টন কেরোসিন আর প্রায় ৪,০০০ টন বিভিন্ন প্রকারের ডিসেল তৈল। অর্থাৎ "দিল্লী দূরস্ত্!"

রঞ্জন-শিল্প—দামোদরের আশে পাশে রঞ্জন-শিল্প-প্রতিষ্ঠান খোলার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্যে কিছু জার্মান বিশেষজ্ঞ আনা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে।

ফিনোল—আজকের প্ল্যাষ্টিক্স্ যুগে ফিনোল একটা অপরিহার্য্য সামগ্রী। বর্ত্তমানে কেবল মাত্র একটা কারখানাতেই ফিনোল-ফরম্যালডিহাইড রেসিন্ তৈরী হচ্ছে। একটা মার্কিণ প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে আর একটা খোলার চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশে এখন প্রায় ৪২টা প্ল্যাষ্টিক্স্ কারখানা চলছে—যাতে প্রয়োজন হয় প্রায় ৩,০০০ টন প্লাইসিউরিন এবং আরও নানান রকম ছাঁচের পাউডার।

প্লাইউড্—এই শিল্পের চাহিদা মিটতে পারে প্ল্যাষ্টিক্স্ শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে। বর্ত্তমানে প্রায় ১৪টা প্রতিষ্ঠান এই প্লাইউড তৈরী করছে, যার মধ্যে চা-সরবরাহের জন্যে প্রায় ৮০০ লক্ষ বর্গ ফুট লাগে আর অন্যান্য কাজের জন্যে ২০০ লক্ষ বর্গ-ফুট।

কাঁচা ফিল্ম্—সিনেমা প্রচারের দিক থেকে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। অর্থাৎ কাঁচা ফিল্মের প্রয়োজনীয়তা আমাদের কত বেশী সেটা আর স্পষ্ট ক'রে বলার দরকার নেই। এই বিষয়ে ৭২টা স্বদেশ প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সাহায্য থেকে আমরা বঞ্চিত হব না বলেই আশা করা যাচ্ছে।

এ্যামোনিয়াম্ সাল্‌ফেট্—আজকের "ফসল বাড়াও" আন্দোলনের দিনে সারের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী আর এ হিসেবে এ্যামোনিয়াম সালফেটের চাহিদা দিন-দিন বেড়েই চলবে বই কমবে না। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরে সারের দু'টো চালু কারখানা রয়েছে। মহীশূর থেকে বছরে ৬,০০০ টন এ্যামোনিয়াম্ সালফেট্ পাওয়া যায় আর ত্রিবাঙ্কুর থেকে ৫০,০০০ টন। সিনদ্রিতে একটা বিরাট কারখানা প্রস্তুতির পরিকল্পনা রয়েছে। এটা শুধু প্রাচ্য নয়, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সারের কারখানা হবে সম্পূর্ণ হলে পর। এখান থেকে বছরে প্রায় ৩৬০,০০০ টন এ্যামোনিয়াম্ সালফেট পাওয়া যাবে; এর কাজ কিছু কিছু সুরু হ'য়েছে এবং যত শীঘ্র পূর্ণোদ্যমে সুরু হতে পারে ততই ভাল। এ ছাড়া কোক-ওভেন গ্যাস্ থেকে বছরে প্রায় ১০,০০০ টন ক'রে এ্যামোনিয়াম্ সালফেট্ পাওয়া যেতে পারে।

ইস্পাত—যে কোন শিল্পের পক্ষে ইস্পাত একটা অপরিহার্য্য সামগ্রী। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৫এর হিসেবে আমাদের ইস্পাতের প্রয়োজনীয়তা ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ টন; কিন্তু তখন আমাদের উৎপাদন ছিল ১২ লক্ষ টন। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে চেষ্টা চলছে।

সিমেণ্ট—আমাদের বর্ত্তমানে প্রায় ৪০ লক্ষ টন সিমেণ্টের প্রয়োজন হয়। মনে হচ্ছে যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরও ২০ লক্ষ টনের চাহিদা বেড়ে যাবে। চলতি বছরের মধ্যে অন্ততঃ ৩৫ লক্ষ টন সিমেণ্ট তৈরীর স্কীম রয়েছে।

কাগজ—বছরে ২০,০০০ টন ক'রে কাগজের প্রয়োজন হয় আমাদের বিভিন্ন কাজে আর চলতি বছরের মধ্যেই সেটা তৈরীর চেষ্টা চলছে।

সাবান—প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই আমাদের দেশে সাবান শিল্পের সুরু হয়। সেই সময় বছরে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ হন্দর সাবান বিদেশ থেকে আসত। দ্বিতীয় যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেই এই হিসেব নেমে আসে প্রায় ৪২০০ হন্দরে। ঐ সময় আমাদের দেশে প্রায় ৬০,০০০ টন সাবান তৈরী হয়েছিল। এখন বছরে প্রায় ১২,০০০ টন ক'রে 'গায়ে-মাখা' সাবান এবং ৪০,০০০ টন ক'রে 'কাপড়-কাচা' সাবান তৈরী হচ্ছে। বাজারে বিদেশী সাবান একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবে এই শিল্পের আরও উন্নতির চেষ্টা চলছে।

রেয়ন—এ্যাসিটেট রেয়ন শিল্পের জন্য একটা প্রতিষ্ঠানের কাজ সুরু হয়ে গেছে এবং আরও দু'টো কাজ খুব তাড়াতাড়ি সুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

রবার—প্রাকৃতিক রবার আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় প্রায় ১৮,০০০ টন, কিন্তু রবারের কারখানাগুলোতে প্রয়োজন হয় প্রায় ২২,০০০ টন। এই শিল্পের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যসম্ভার প্রায় তিন কোটি টাকার আমদানী হয় প্রতি বছরে। তবে এগুলো আমাদের দেশে তৈরী করার খুবই চেষ্টা চলছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরই কিছু কিছু রাসায়নিক শিল্প সুরু হয়েছিল আমাদের দেশের বুকে। ১৯২১ সালে প্রায় ১৪টা কারখানা ছিল, আর তাতে লোক খাটত প্রায় ২৫০০ জন। ১৯৩৯ সালে কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮ আর শ্রমিকের সংখ্যা ৮০০০। বর্ত্তমানে দেশে প্রায় ২০০টা কারখানা চলছে আর তাতে লোক কাজ করছে প্রায় ২৫,০০০ জন।

বর্ত্তমানে আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন নিম্নোক্ত ভাবেই চলছে:—সালফিউরিক এ্যাসিড—১৫০,০০০ টন; সুপার ফস্‌ফেট্—১০,০০০ টন; এ্যামোনিয়াম্ সাল্‌ফেট্—৫৬,০০০ টন; বাইক্রোমেট্—৩০০০ টন; সোডিয়াম্ কারবোনেট্—৫৪,০০০ টন্; কষ্টিক্ সোডা—১৮,৫০০ টন; ব্লিচিং পাউডার—৫.১৬০ টন আর ব্রোমাইড—২০০ টন। ১৯১০ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা বিদেশকে প্রায় ৪০০ লক্ষ টন উচ্চাঙ্গের ম্যাঙ্গানিজ সরবরাহ করেছি। আমাদের দেশে উচ্চাঙ্গের অভ্র, ক্রোমাইট্, সিলিম্যানাইট্, ম্যাগনেসাইট্ প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং সেগুলোকে উপযুক্ত কাজে লাগাতে পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে ক্রমশঃই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ আজকের অবস্থায় আমাদের সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পথে চলাই একমাত্র পন্থা।

এই তো গেল আমাদের 'প্ল্যান্' ও 'স্কীম্'। তবে সব সময়েই আমাদের কারখানাগুলোতে বেশী উৎপাদন করার দিকেই নজর রাখতে হবে, অবশ্য শ্রমিকদের চোখের জলের বিনিময়ে নয়। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক হওয়া চাই গভীর, গান্ধীজীর আদর্শ মত। মহাত্মাজীর পুঁজিপতিদের প্রতি নির্দ্দেশ আজ আকাশ-কুসুম। আজকে এখানে ভুখা মিছিলের চোখের জলের আড়ালে পাকিয়ে উঠতে থাকে "বিড়লা বাড়ীর রহস্য"। How long, O Lord, How long!

যন্ত্র-বিজ্ঞানী মানুষ

শ্রীমনকুমার সেন

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ত বিকাশোন্মুখ। এই উন্মুখতাই মানুষকে প্রেরণা দেয় অজানাকে জানিবার, অনধিগতকে অধিগত করিবার, অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কৃত করিবার পথে। বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে জ্ঞানানুশীলন বা সভ্যতা। এই সভ্যতার গতিপথে মানুষ নিজেকে বৃহত্তর পরিধিতে প্রসারিত করিয়াছে, বৃহত্তর মানব-সমাজের সঙ্গে তাহার যে নিগূঢ় ঐক্য-সম্বন্ধ তাহাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পাইয়াছে। মানুষের এই জ্ঞানানুশীলন বা গতিশীল সভ্যতার অভীষ্ট মানব-সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিধান, বিশ্বজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা। দুর্ভাগ্য বশতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব ও দ্রুতগামী যান্ত্রিক জীবন মানব-সভ্যতা ও মানুষের কর্ম্ম প্রচেষ্টার মূলগত আদর্শকে কেবলই দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। সভ্যতার নামে অ-সভ্যতার একটা নিদারুণ ভ্রান্তি আজ মানব-সমাজে শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি, সন্তোষের পরিবর্ত্তে অসন্তোষ এবং বিকাশের পরিবর্ত্তে বিনাশকেই কায়েম করিতে চলিয়াছে। সৃষ্টির পরিবর্ত্তে অনাসৃষ্টিই হইয়াছে আজিকার এই নূতন যান্ত্রিক সভ্যতার উপজীব্য।

তাই দেখা যায়, একটা সর্বপ্রসারী পাপচক্রের আবর্তে সমগ্র পৃথিবী ঘুরপাক খাইতেছে এবং শ্রেণীগত ও জাতিগত বিদ্বেষের মুখে দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সভ্যতার নামে একটা পোষাকী বর্ব্বরতা আজ মানব-সমাজকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। ইহার শেষ কোথায়? ইহা হইতে বাঁচিবার পথই বা কোথায়?

এক অনির্দ্দেশ্য ও দুর্জ্ঞেয় শক্তির প্রেরণায় বিশ্বপ্রকৃতি কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই প্রকৃতির ধনসম্পদ ও জ্ঞানসম্ভারকে আহরণ করা, অধিগত করা, মানুষের জীবনের উপযোগিরূপে রূপান্তরিত করিয়া তোলা মূলতঃ ইহাই সভ্যতার স্বভাব-ধর্ম্ম। সুতরাং যে পরিমাণে মানুষের এই সভ্যতা বা জ্ঞানানুশীলন প্রকৃতিসম্মত, ঠিক সেই পরিমাণেই উহা বিজ্ঞানসম্মত ও খাঁটি। এই সহজ স্বাভাবিক পথকে অগ্রাহ্য করিয়া অনাসৃষ্টির মত্ততায় আজ মানুষ নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া অপ্রাকৃত কর্ম্মের অন্ধ আবেগে ছুটিয়া চলার মধ্যে যে মাদকতা আছে আজ তাহাই মানুষকে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ ও আদর্শচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে, আর পরিণামে আসিয়াছে অজ্ঞানতা, দুঃসহ শোষণ, শ্রেণী-সংঘাত, দ্বেষ-বিদ্বেষ ও ভীতিবিহ্বলতা। ইহাদের কোনটিই যে সভ্যতা বা শান্তি-সমৃদ্ধির অনুকূল নহে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আশু প্রয়োজন ও দৈনন্দিন অভাব পূরণই মানুষের কর্ম্মপ্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য নয়। আসল ও অন্তিম লক্ষ্য হইতেছে কর্ম্মের দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করা, ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বকে স্ফূর্ত করা এবং এই ভাবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সুখী মানুষের সাহায্যে যথার্থ সমৃদ্ধিশালী ও গতিশীল জগৎ গড়িয়া তোলা। সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ম্মনীতিতে কি আজ এই আদর্শের কোন হদিস আমরা পাইতেছি? ব্যক্তির যেখানে মানুষের মত বাঁচিবার সুযোগ নাই, সেখানে রাষ্ট্র ও সমাজের সমৃদ্ধি তথা বিশ্বের শান্তিপ্রয়াস কি নিছক প্রহসন বলিয়াই বোধ হয় না?

আমরা আহার্য্য গ্রহণ করি—ক্ষুন্নিবৃত্তি বা রসনা-রোচন উহার আশু লক্ষ্য হইলেও অন্তিম লক্ষ্য হইতেছে দেহের শক্তি ও স্বাস্থ্যের সমৃদ্ধি। অন্তিমের এই অভীষ্টকে অগ্রাহ্য করিলে উদর-পূরণ একটি নিরর্থক কর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। গৃহীত খাদ্য দেহের অভাব পূরণ করে, উহাকে মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী করে। আর্থিক জগতেও মানুষের যাবতীয় কর্ম্মধারা সম্বন্ধে এ কথা সত্য ও সমান ভাবে প্রযোজ্য। বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থায় বহুল পরিমাণে পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন হইলেই সেই ব্যবস্থাকে সার্থক ও সভ্যতাসম্মত বলা যায় না—যদি উহা ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজ এবং রাষ্ট্রের সমতা বিধানে সহায়ক না হয়। শিল্পবিপ্লবাগত 'যুগান্তকারী' উৎপাদন-প্রণালী ও যন্ত্র-তন্ত্র ব্যক্তি ও সমাজের এই মৌলিক আদর্শকে অতলে তলাইয়া দিয়া মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থকে উঁচাইয়া ধরিয়াছে। মানুষ কী চাহিয়াছিল, কী সে পাইয়াছে?

দুই-একটি উদাহরণ দিয়া আরও স্পষ্ট ভাবে অবস্থাটা বুঝানো যাইতেছে: মানুষের আহার্য খাদ্যশস্য, ডিম, দুধ ও ফল-মূল প্রভৃতিতে প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রচুর খাদ্যপ্রাণ সঞ্চিত আছে। চাউলের কথাই ধরা যাক,—খোসা বা 'তুষে'র মধ্যে চাউল আবৃত থাকে। এই আবরণ ছাড়াইয়া চাউল বাহির করিয়া লইয়া উহা অন্নরূপে ভোজন করাই প্রাকৃতিক বিধি। এই চাউলে এমন সব পুষ্টিকর উপাদান আছে যাহা সহজেই পোকা-মাকড়ের ঘ্রাণশক্তিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং যখন যেমন প্রয়োজন চাউল ভানিয়া লইয়া অবশিষ্টটা ধানরূপে রক্ষা করাই স্বাভাবিক নিয়ম। একমাত্র এই নিয়ম অনুসরণ করিলেই চাউলের প্রকৃত উপকারিতা আমরা পাই, উহার যথার্থ সদ্ব্যবহার হয়। কিন্তু আজ কি হইতেছে? যন্ত্র-বিজ্ঞানের কল্যাণে দ্রুত ঢেঁকির পাট উঠিয়া যাইয়া চাউলের কল দেশের সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছে। ব্যবসায়িক স্বার্থে চাউল-কলের মালিক একসঙ্গে সহস্র সহস্র মণ চাউল ভানে এবং উহাকে গোলায় পোকা মাকড়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উহার বহিরঙ্গের পুষ্টিকর উপাদান সমূহ ছাঁটিয়া ফেলে। ইহাকেই বলা হয় পালিশ পদ্ধতি। এইরূপে পালিশ-করা 'সুদৃশ্য' চাউল আমরা পরিতৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু অন্নগ্রহণের যে অন্তিম লক্ষ্য, যান্ত্রিক উৎপাদন ও ব্যবসায়িক স্বার্থে তাহাকে পূর্ব্বেই বলি দেওয়া হইয়াছে! এমতবস্থায়, চাউলের কল কি বৈজ্ঞানিক? ধান-ভানাইয়ের এই আধুনিক পদ্ধতি মানুষের মঙ্গল করিতেছে, না অমঙ্গল করিতেছে? চাউল মানুষের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির জন্য, না মুষ্টিমেয় কলওয়ালার তুষ্টিবিধানের জন্য? শুধু স্বাস্থ্যনাশই নয়, ঢেঁকি বর্জ্জনের ফলে কত সহস্র-সহস্র লোক বেকার হইয়াছে, জীবিকার্জ্জনের সঙ্গত পথ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিতেছি? বিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞানের জন্য, না মানুষের কল্যাণবিধানই বিজ্ঞানের লক্ষ্য? চাউল-কলের বিজ্ঞান মানুষের কোন্ কল্যাণে লাগিতেছে?

এবার চিনি-প্রসঙ্গে আসা যাক্। ইক্ষুরসের দ্বারা পূর্ব্বে গ্রামে-গ্রামে প্রধানতঃ গুড়ই প্রস্তুত হইত। তাহাতে রসের পুষ্টিকর রাসায়নিক উপাদানাদিও রক্ষিত হইত, আবার শত-সহস্র পুরুষ, নারী ও ছেলে মেয়ে গুড়শিল্পে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিত। চিনির কলের কল্যাণে যুগ-যুগাগত এই ধারাটি সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হইতে চলিয়াছে। আজ রস হইতে উহার প্রকৃত স্বাস্থ্যপ্রদ উপাদানগুলি বিসর্জ্জন দিয়া উহাকে কলের প্রক্রিয়ায় চিনিতে পরিণত করা হয়। এই উৎপাদন-ব্যবস্থা একান্তরূপেই মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীর করায়ত্ত। অপর দিকে, চিনি যখন আমরা খাই, উহার নিজস্ব ক্যালসিয়ামের অভাবে উহা স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের দেহের রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম টানিয়া লয়, রক্ত তাহার ক্ষতিপূরণ করে দন্ত হইতে। পরিণামে দন্তরোগের অন্ত নাই। কলের কল্যাণে আমরা গুড়ের পরিবর্তে চিনি খাইয়া 'সভ্যতা ও ভদ্রতা'র মুখোস রক্ষা করিতেছি, দন্তের গোড়ায় দিতেছি ঘা, আর পাঠ্য পুস্তকে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিবার জন্য অন্তহীন উপদেশ!

দেশের ঘানি লোপ পাইয়াছে, তেলীর জীবিকার্জ্জনের পথ বন্ধ হইয়াছে। উৎপন্ন তৈলবীজ আজ ঘানির পরিবর্তে তৈল-কল-ওয়ালার কবলে কিম্বা বৈদেশিক রপ্তানীর বহরে স্থান লাভ করিতেছে, আর দেশের জনসাধারণ ভেজাল ও নানাবিধ জমাট তৈল নামীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া অকালে গঙ্গাযাত্রা করিতেছে। তুলার চালানী যাইতেছে কাপড়ের কলে, আবার এক শ্রেণীর তুলা রপ্তানীও হইতেছে। গ্রামের লক্ষ লক্ষ তাঁত শিল্পী আজ সূতার অভাবে হাহাকার করিতেছে, নিজেদের গ্রামে তুলা উৎপাদন করিয়াও

হয়ত সূতার জন্য শহরাঞ্চলের কতিপয় ক্ষমতাশালী কাপড়-কলের মালিকের করুণার উপর অসহায় হইয়া আছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে বনস্পতি কারখানাগুলির উদরপূর্ত্তির জন্য প্রায় ২১ লক্ষ একর জমিতে চীনা-বাদামের চাষ হইয়াছিল। অন্নাভাবগ্রস্ত পরিবার-পিছু (পাঁচ-পাঁচ জনের) দুই একর করিয়া হিসাব করিলে উক্ত চীনা-বাদামের জমিতে প্রায় অর্দ্ধ কোটি লোকের অন্নসংস্থান হইত। ঐ একই সময় আমরা 'খাদ্যাভাব হেতু' বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়াছি প্রায় ১৩০ কোটি টাকার। শুধু চীনা-বাদামেই নহে, পূর্ব্বোক্তরূপে তৈল-কল, কাপড়ের কল, পাটকল এবং চিনির কলগুলির চাহিদা মিটাইবার জন্যই প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ একর জমি তৈলবীজ, তুলা, পাট ও ইক্ষুর উৎপাদনে নিয়োজিত হইয়া চলিয়াছে। এই বৃহৎ শিল্পগুলিকে বর্ত্তমান অবস্থায় অক্ষত রাখিয়া এ দেশের খাদ্যাভাব কোন দিনই দূর হইবে, ইহা ভাবা নিছক বাতুলতা। যান্ত্রিক কেন্দ্রীভূত শিল্পের মধ্যে দেশের ধনসম্পদ অল্প মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, ব্যক্তি-স্বার্থমূলক বলিয়াই উহার পরিচালনা স্বাভাবিক জনসংযোগের অভাবে জনস্বার্থবিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের কর্ম্মধারার মৌলিক আদর্শ যে শান্তিপ্রতিষ্ঠা, আজিকার বহুলোৎপাদক যন্ত্র-বিজ্ঞান পদে-পদে তাহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ধনসাম্যের অভাবে জাতির জীবন-কেন্দ্র বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে, এক দিকে মুষ্টিমেয়ের অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য আর অপর দিকে কোটি-কোটির মাত্র জীবনরক্ষার সমস্যা দেশে-বিদেশে অশান্তির ঢেউ তুলিতেছে। এই শোচনীয় অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই যন্ত্র-বিজ্ঞানী পাশ্চাত্যের প্রখ্যাতনামা দার্শনিক আলডুস হক্সলি বলিয়াছেন,—"Technological progress has merely provided us with more efficient means for going backwords"—যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রগতি আমাদের পশ্চাদপসরণের পথকেই প্রশস্ত করিয়াছে মাত্র!

গান্ধীজী এই অসম শোষণমূলক অবস্থার ভয়াবহ পরিণতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন; তাই অত্যাবশ্যক বৃহৎ শিল্পগুলিকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় রাখিয়া আর সমুদয় উৎপাদন-কার্য্য বিকেন্দ্রিক শিল্পসংস্থায় পরিচালিত রাখার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে গ্রামশিল্পগুলির পুনরুজ্জীবনের দ্বারা কোটি-কোটি সাধারণ মানুষের মধ্যে ধনসম্পদের সুসম বণ্টনই সমগ্র গান্ধী-পরিকল্পনার লক্ষ্য। একমাত্র এই ধনসাম্যের পথেই মানুষের মনসাম্যও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মানব-সভ্যতার এই সহজ সত্যটিকে আমাদের দেশের জ্ঞানী ও গুণিগণ উপেক্ষা করিয়াছেন, গান্ধী-পরিকল্পনাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন—'putting the clock back'—ভদ্রলোক ঘড়ির কাঁটাকে পিছাইয়া দিতেছেন!

এক হিসাবে এই উক্তি সত্যও!—কালের ঘড়িকে তিনি পিছাইয়া দিতে চাহেন নাই—চাহিয়াছিলেন আমাদের যন্ত্রবিজ্ঞানী-জীবনের ঘড়ি যেরূপ 'এ্যাবনর্ম্যাল' গতিতে চলিয়াছে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে। আমাদের এই অন্ধতা ও বিভ্রান্তি কবে দূর হইবে?

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা

শিবনারায়ণ রায়
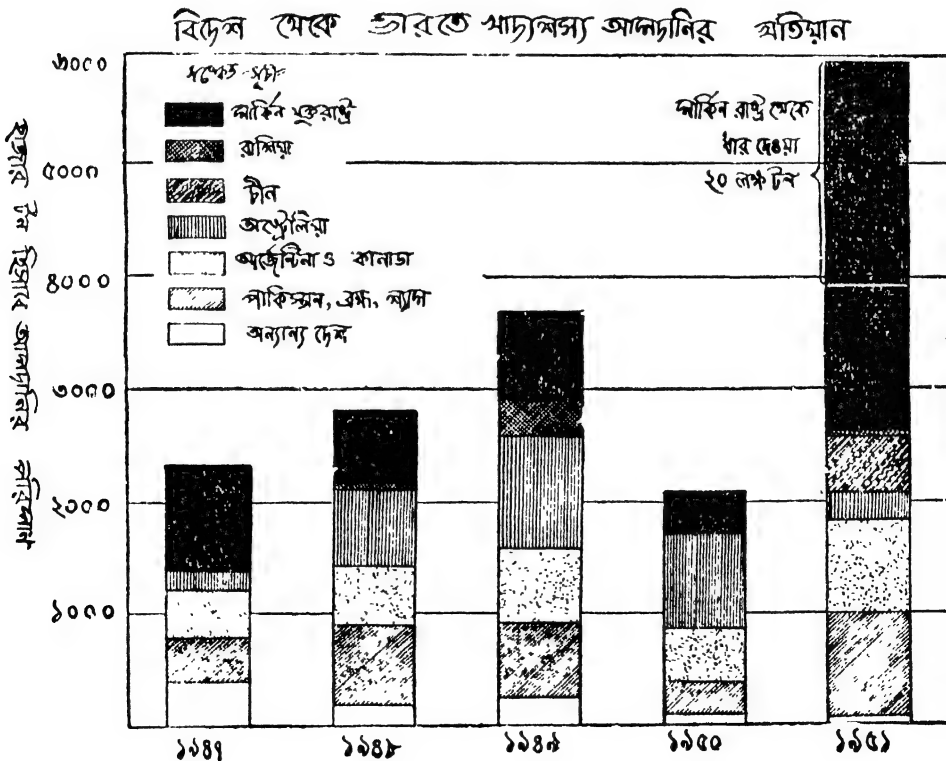
পশ্চিম ইউরোপের রেনেসাঁস এক বিস্ময়কর যুগ। তার বীজ শুধু এক মহাদেশের সীমায় আবদ্ধ থাকেনি, গত চারশ' বছর ধরে পৃথিবীর সর্বত্র কম-বেশী ছড়িয়ে পড়েছে। এই চারশ' বছরের "আধুনিক" সভ্যতা-সংস্কৃতি তারি ভালোয়-মন্দয় মেশানো বিচিত্র ফসল। সম্প্রতি সে ফসলের যুগ সমাপ্ত। দু'টো মহাযুদ্ধের মাঝখানের বিশ বছরে রেনেসাঁসোত্তর সভ্যতার ট্র্যাজিক অবসান ঘটল। যুগসন্ধির সুকঠিন চেতনার আঘাতে আমাদের বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে। ছেদের প্রত্যন্তে কি আরেক অন্ধকার যুগের সূচনা? অথবা মহত্তর নব জাগরণের? তা জানি না। কিন্তু জানি, রেনেসাঁসের যুগ আজ গতায়ু। তার ঐতিহ্য হতে আমরা আজ বিচ্ছিন্ন। আমাদের হারানো কৌমার্য্যের স্মৃতির মতই তার দিকে আমরা নিষ্ফল আর্তিতে বড় জোর কখনো বা ফিরে তাকাতে পারি, কিন্তু সেখানে আর ফিরে যেতে পারি না।

এবং তাঁর অধিকাংশ পরিণত সৃষ্টি এই আন্তঃসাময়িক দু'দশকের মধ্যে রূপ নেওয়া সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ আসলে আমাদের সেই অপহৃত কৌমার্য কালের কবি। রেনেসাঁসী ঐতিহ্যের তিনি শেষ মহাশিল্পী। আর ঐ ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য্য বিষয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন, গত চারশ' বছরের সাধনায় খুব অল্প শিল্পীর সৃষ্টিতেই তাঁর সমান সার্থক প্রকাশ লাভ করেছে। গয়েটের মত তাঁর ক্ষেত্রেও বার্দ্ধক্য কল্পনায় সমৃদ্ধি এনেছে, অনুভূতিকে সুন্দরতর করেছে, চিন্তায় এনেছে আরো ঔদার্য আর দৃঢ়তা, প্রকাশে গভীরতর ব্যঞ্জনা, প্রত্যয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাণময় বৈচিত্র্য। মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত তাঁর নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভায় অবসাদের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। বরং তাঁর শেষ দশকের রচনায় রেনেসাঁসী ঐতিহ্যের আত্মা যেন তার সব বাহ্য সাময়িক আবরণ খসিয়ে ফেলে দুঃসহ অকম্প নগ্নতায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন এই ত সেদিন, পুরো দশ বছরও হয়নি। অথচ এর ভিতরেই তাঁর জগৎ আমাদের জীবন হতে কত দূরে না সরে গেছে! আমরা যারা এই দুই যুদ্ধের মাঝখানে বড় হোয়েছি তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ গয়েটের মতই দূর-লোকের অনাত্মীয় নক্ষত্র। বলতে কি, গয়েটের চাইতেও তিনি অনাত্মীয়। কারণ, আউফ্‌ক্লারুঙ্গের (Aufklarung) ঐ মহাকবির কল্পনায় আমাদের আর্তির কিছুটা অন্তত আভাস দেখা দিয়েছিল। ব্যদলেয়র কি ডস্টয়েভস্কি হতে সুরু করে হাক্সলি-সার্ত্র প্রমুখ সমকালীনদের রচনায় রেনেসাঁসী সংস্কৃতির যে আত্মক্ষয়ী চেতনা ক্রমে প্রখর হোয়ে উঠেছে, ফাউষ্ট মহাকাব্যে তার কিছু ইঙ্গিত চোখে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গয়েটের মেফিস্টোফেলেস তত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন না। তাঁর শেষ বয়সের কোন কোন সমসাময়িকের প্রতি তিনি সকৌতুক স্নেহে স্বাগত জানিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের অন্তর্মুখী সাধনার স্বরূপটি তিনি অনুমান করতে পারেননি। আসলে আন্তঃসাময়িক আধুনিকদের সঙ্গে তার শুধু বয়সের নয়, মেজাজের অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল। এঁদের মধ্যে যাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরাও এ ব্যবধান পেরিয়ে তাঁর ঐতিহ্যের অংশভাগী হতে পারেননি। আধুনিকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ তাই মহাকাব্যের নায়কের মতই অনাত্মীয়, প্রায় গৌরীশঙ্কর চূড়ার মতই অনারোহ, শ্রদ্ধায়-বিস্ময়ে মাথা নত হয়, কিন্তু মন সঙ্গ পায় না।

অবশ্য একটা জায়গায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। সে হোল চিত্রকলার মাধ্যমে ওঁর শেষ বয়েসের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। সত্তার অস্বীকৃত অন্ধকার-লোকে এ ছবিগুলির জন্ম। কিন্তু এদের জগতের সঙ্গে আধুনিক মেজাজের যে আত্মীয়তা আছে, রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন রচনার সঙ্গেই সে আত্মীয়তা নেই। এখানেই মহাকবি অজ্ঞাতে স্বধর্মদ্রোহিতা করেছেন। ফলে এখানে শুধু যে তাঁর শিল্পের হাতই অপটু তা নয়, তাঁর কল্পনায় ধ্যানের ঐকান্তিকতাও অবর্তমান। অথচ এদের মধ্যে এমন একটা বিক্ষুব্ধ প্রাণশক্তি আছে যে, এদের কিছুতেই অবহেলা করা যায় না। কিন্তু কবি তাঁর এই বিক্ষোভকে ভাষার আত্মচেতন স্তরে পরিণতি পেতে দিলেন না। যদি দিতেন, অন্ততঃ যদি চেষ্টাও করতেন তবে হয়তো তাঁর পরিপূর্ণতা আর আমাদের আর্তির মাঝখানে মন-জানাজানির এক সেতুবন্ধ গড়ে উঠতো। মধ্যযুগ আর রেনেসাঁসের মাঝখানে সেই সেতুবন্ধ গড়েছিলেন দান্তে, রেনেসাঁস আর আমাদের কালের মাঝখানে সেতুর কিছুটা গড়ে গেছেন গয়েটে। তাঁরা শুধু আপন-কালের কবি নন, এমন কি শুধু নিত্যকালের কবি নন,—তাঁরা যুগান্তরের কবি। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর সব থেকে প্রতিভাবান কবি হোয়েও ডিভাইন কমেডি বা ফাউষ্টের মত কোন মহাকাব্য রচনা করেননি। সব মহাকাব্যের মত তাঁর কাব্যেও নিত্যকালের আবেদন আছে, কিন্তু আমাদের এই বিশেষ কালের রূপটি তাঁর সৃষ্টিতে ধরা পড়ল না।

আর ঠিক এই কারণেই এমন অতুল ঐশ্বর্য, অমিত উদ্ভাবনা-শক্তি, দুর্লভ চিত্রপ্রকর্ষ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে অগম দেশের বার্তাবহ আগন্তুক ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর সৃষ্টিকে তো আমরা জানি, কিন্তু স্রষ্টা যে শেষ পর্যন্ত রয়ে গেলেন আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জীবনের যে সব অন্ধকার রাতে আত্মোদ্‌ঘাটনের আতঙ্কিত নীল বিদ্যুতে মুখশ্রীর অন্তরালের সমত্ন-আচ্ছাদিত আত্মা আর্ত বিস্ফোরণে প্রকাশিত হয়, তাঁর জীবনে তেমনতরো রাত কি কখনো আসেনি? নিটোল, আশ্চর্য অক্ষত তাঁর কল্পনার কৌমার্য, হাইনের ভাষায় বলতে হয়—So hold und schon und rein। হয়তো সব সময়ে মধুর নয়, কিন্তু সব সময়েই সুন্দর, সব সময়েই নিষ্কলঙ্ক। অন্নদাশঙ্কর তাঁকে জীবন-শিল্পী বলেছেন। আমরাও সে কথা মানি। ধ্রুপদী, প্রায় নৈর্ব্যক্তিক সে শিল্প, কোথাও সুনীতির সীমা লঙ্ঘন করে না। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে যাকে ব্রহ্মাস্বাদ বলেছে এ শতাব্দীর কোন কবির সৃষ্টিতে যদি তার সন্ধান করতে হয়, তবে সে কবি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু আমরা, যাদের মন দুই যুদ্ধের মাঝখানে গড়ে উঠেছে, আমাদের জীবনে ব্রহ্মের কি আর কোন অর্থ আছে? আমি শুধু ধর্মে অবিশ্বাসের কথা বলছি না—এ নাস্তিক্য সর্বগ্রাসী। এ যুগের পরিণত মনে ব্রহ্মপ্রত্যয় নিতান্তই প্রাক্তন স্মৃতি। আমরা যে শুধু স্বর্গ-সান্ত্বনা হতেই বঞ্চিত

তা নয়, কোন মূল্য-বিচারের ক্ষেত্রে শাশ্বত, চিরন্তন, সর্ব্বমানবীয় এ সব বিশেষণ প্রয়োগে পর্য্যন্ত আমাদের অনিচ্ছা আত্যন্তিক। এক কথায় আমাদের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই এখন আপেক্ষিকতা-নির্ভর। আর অভ্যাসাশ্রয়ী মনের পক্ষে এই অনতিক্রম্য আপেক্ষিকতা-বোধ যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা, তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। যে সব নৈতিক নির্দ্দেশকে বিনা বিতর্কে শ্রেয়ঃ বলে মেনে মানুষের বিবেক এত কাল আশ্রয় পেয়ে এসেছে, আজ নৃতত্ত্ব, তুলনামূলক সমাজ-তত্ত্ব এবং সব থেকে বেশী মনবিকলন তত্ত্বের আঘাতে শিক্ষিত-জীবনে তারা শিথিলমূল! ফলে এ যুগের চিন্তায়, ব্যবহারে, শিল্প-কল্পনায় যে ব্যাপক শুভনাস্তিকতা দেখা দিয়েছে, তাতে দুঃখ পেলেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। যে কার্তেসীয় (cartesian) আত্মপ্রত্যয়ের জমিতে রেনেসাঁসের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, আজ সেখানে পর্য্যন্ত ভাঙন প্রকট হয়ে উঠেছে। আমরা আতঙ্কে নিজেদের প্রশ্ন করছি, আত্মার ঐক্যও কি শুধু ব্রহ্ম কল্পনার মত একটা ব্যবহারিক অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়? তবে নবলব্ধ জ্ঞানের আগুনে পুড়ে আমাদের আর কি অবশিষ্ট রইল? একরাশ প্রাণহীন যন্ত্রের স্তূপ, নির্ব্বোধদের জন্য মিথ্যা সংস্কার আর অভ্যাস, সকলের জন্যে কতগুলো আদিম অন্ধ বৃত্তি—আর প্রাজ্ঞ মনের জন্য নিশ্চিতির স্বর্গ হতে নির্ব্বাসনের নিষ্ঠুর চেতনা?

এই যে বিশিষ্ট ভাবে আন্তঃসামরিক মেজাজ, এরই প্রতিনিধি হোল এলিয়টের স্বপ্ননি আর টাইরেসিয়াম, হাক্সলির থিয়োডোর গম্‌ব্রিল, আর সার্ত্র্‌এর অধ্যাপক ম্যাথিউ। এরি পূর্ব্বাভাস ব্যদলেয়রের কাব্যে, ডস্টয়েভস্কীর উপন্যাসে। রিল্কের পুতুলেরা এরি অন্ধকার গর্ভের জ্রূণ, প্রুস্ত, এবং জয়েসের উপন্যাসে বিভিন্ন দিক হতে এই মেজাজেরই কাহিনী। রেনেসাঁস কি আউফ্‌ক্লারুঙের ঐতিহ্যে একে বোঝা যাবে না। এখানে এক আশ্চর্য্য যুগের সমাপ্তি। হয়ত (তার বেশী কি বলতে পারি) আশ্চর্য্যতর কোন ভবিষ্যৎ যুগে ভূমিকা।

এই রূপান্তরের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে আলোড়িত করেনি। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, তাঁর মনে কখনো সন্দেহ আসেনি অথবা অনিশ্চিতি কখনো তাঁর চেতনায় ছায়া ফেলেনি। কিন্তু তাঁর মনের প্রত্যয়ী সমগ্রতাকে তিনি সব সংশয়-শঙ্কার ঊর্দ্ধে রাখতে পেরেছিলেন। শ্রীমতী বোভোয়া যাকে বলেছেন "অস্তিত্বের মৌলিক অস্পষ্টতা", যার ফলে না কি আমাদের কোন জ্ঞান, বিচার, সিদ্ধান্তই আপেক্ষিক যাথার্থ্যের বেশী কিছু দাবী করতে পারে না, তার খবর তিনি রাখতেন না। ব্রহ্ম সত্য এবং বিশ্বমানবিকতায় তাঁর অটুট আস্থা ছিল। সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-কুৎসিতের সুস্পষ্ট পার্থক্যে তিনি বিশ্বাস করতেন। এ পার্থক্যবোধ তাঁর কাব্যের আলো-আঁধারিতেও এতটুকু শিথিলমূল হয়নি। এই নিঃসঙ্কোচ আত্মপ্রত্যয় ছিল বলেই তাঁর প্রকাশ প্রচারের মাত্রাচ্যুতি-মুক্ত; তাঁর লিরিক-প্রেরণা বিতর্কে বিড়ম্বিত নয়। যে অসমাধেয় বিকল্প সমস্যাকে কীর্কেগার্ড সব দর্শনের মূল উপজীব্য বলে উপস্থিত করেছিলেন, যার সুকঠিন চেতনার পীড়াতে আধুনিক মনের বয়ঃসন্ধি ঘটেছে, যার ছাপ বিশিষ্ট ভাবে এ-যুগের সমস্ত চিন্তায় শিল্পে সমাজ-জীবনে—রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের সব রচনায় আঁতি-পাঁতি করে খুঁজলেও তার আভাস মিলবে না। রিল্কের জর্নালের পাতায় পাতায় যে গ্লানির স্বাক্ষর, সার্ত্রের উপন্যাসে যে ক্বকার পীড়ার কাহিনী, জয়েস-হাক্সলীর নায়কদের যে অনতিক্রম্য নৈঃসঙ্গ —আশ্চর্য, এদের সমসাময়িক মহাকবির কল্পনাতে তার সামান্যতম ছায়াটুকুও পড়ল না।

এ রূপান্তর ইউরোপের সাহিত্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে এর সূচনা ঘটেছে আরো বছর দশেক পরে—সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতির কবিতায়; ধূর্জটি মুখুজ্যে, মানিক বাঁড়ুজ্যের উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় এঁদের শিল্প-প্রতিভা অনেক বেশী সীমাবদ্ধ, তবু নিতান্ত নির্বোধ ছাড়া সবাই স্বীকার করবে এঁদের জগৎ তাঁর জগৎ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আধুনিকদের মধ্যে অনেকেরই প্রেরণা এখন অবসিত। হয়তো বা যুগান্তরের মনকে শিল্পে প্রকাশ দেবার সামর্থ্য তাঁদের ছিল না বলেই এত দ্রুত তাঁরা ফুরিয়ে গেলেন। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল আমরা খেয়েছি, প্রাক্তন স্বর্গের নিষ্পাপ নিশ্চিতিতে আর আমাদের ফেরার উপায় নেই। যাঁরা বুদ্ধিমান সুধীন দত্তের মত তাঁরা চুপ করে গেছেন। কেউ-কেউ বা মার্কসবাদের আস্তিক্য আঁকড়ে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সে আস্তিক্যে শুধু আস্ফালনই আছে, প্রত্যয়ের সুমিতি এবং লাবণ্য তাতে অবর্ত্তমান।

হয়তো তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথও এই রূপান্তরকে অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর এই যুগের কবিতায় মাঝে-মাঝে একটা নিরাভরণ কাঠিন্য অপ্রত্যাশিত ভাবে মনে ঘা মারে কখনো কখনো কোন কোন গল্পে-প্রবন্ধেও একটা অনভ্যস্ত সংশয়ের ছায়া পড়েছে। আমার বিশ্বাস, এই অস্পষ্ট অনুভূতি হতেই তাঁর বিভৃৎকিমাকার স্কেচ ও ছবিগুলির জন্ম। কিন্তু কবি তাঁর এই অনুভূতিকে কখনো সুস্পষ্ট চেতনার স্তরে তুলে তার মুখোমুখি হলেন না। হয়ত সেটা তাঁর প্রাজ্ঞতারই পরিচয়। অনভ্যস্ত অনুভূতির অনুসরণ করে সাধ্যের সীমানা তিনি লঙ্ঘন করেননি। আমাদের দুঃসহ আত্মগ্লানির হাত হতে তিনি বাঁচলেন। আর-নিজের সামর্থ্যের সুমিতি মেনে যে চলতে পারে, সেই তো প্রাজ্ঞ।

টোয়েনের রসিকতা

মার্ক টোয়েন, পৃথিবীবিখ্যাত হাস্যরসিক। তাঁর গৃহের সর্ব্বত্র বই আর বই। টেবিলের টানা, জানলার তাক—যেদিকে তাকাও সেদিকে বিক্ষিপ্ত বইয়ের রাশি। এক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু টোয়েনকে জিজ্ঞেস করেন,—"আপনার বই রাখার বুক-কেস নেই কেন?"

তদুত্তরে রসিকপ্রবর টোয়েন বলেন,—"ভাল, তুমি কি জান না যে, বই ধার করা কত সহজ আর বুক-কেস্ ধার করা কত শক্ত?"

মাসির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ যাওয়ায় আপত্তি উঠল না কোনই। কয়েক দিনের জন্য এসে একটি সন্ধ্যাও এদের সংসারের বাইরে কাটাতে রাজী ছিল না কলিন্স। কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য হোল না। সুতরাং পাঁচ বোনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ী করে মেরীটনে এসে উপস্থিত হোল কলিন্স। মেয়েরা ড্রয়িং-রুমে পা দিয়েই শুনে আনন্দ পেলে যে, উইকহ্যাম নিমন্ত্রণ নিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত।

এ সংবাদ পরিবেশনান্তে প্রত্যেকে আসন নেবার পর কলিন্স ঘরের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করলে। এ ঘরের বিশাল আকার আর আসবাব-পত্র দেখে তার মনে হোল, বললে সে, বুঝি বা লেডী ক্যাথারিনের বসার ঘরেই বসে আছে সে। এই তুলনা প্রথমটা কারুর মনে ধরল না কিন্তু মাসি যখন লেডী ক্যাথারিনের একটি ড্রয়িং-রুমের বর্ণনা শুনলেন এবং যখন জানলেন যে, তার একটি চুল্লীর দামই আটশ পাউণ্ড তখন তিনি এই প্রশংসা-বাক্যের গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হলেন। তখন আর ক্ষুব্ধতার কারণ রইল না তাঁর।

মাসির মত এমন মনোযোগী শ্রোতাও মেলা ভার। যা তিনি শুনলেন তাতেই কলিন্সের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব বেড়ে গেল এবং সুযোগ পাওয়া মাত্রই পড়শীদের কাছে গল্প করার জন্য মুখ নিসপিস করতে লাগল। মেয়েরা কলিন্সের কথায় কেউই কর্ণপাত করছিল না—তাদের কাছে এই প্রতীক্ষা অসহ্য বোধ হচ্ছিল। অবশেষে প্রতীক্ষার পালা শেষ হোল। অতিথিরা দেখা দিলেন। উইকহ্যাম যখন ঘরে এল তখন তাকে দেখার পর সংশয় রইল না এলিজাবেথের যে, এ মানুষটিকে প্রথম দেখার পর যে-মুগ্ধতা তার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল তা অপাত্রে দেয়নি সে। অতিথিরা প্রত্যেকেই সজ্জন, এখানকার সমাজের সেরা কিন্তু চেহারায় চাল-চলনে আভিজাত্যে উইকহ্যাম সকলকে ছাপিয়ে।

এই দলে উইকহ্যামই পরম সৌভাগ্যবান যার উপর প্রত্যেক মেয়ের দৃষ্টি আর এলিজাবেথই ভাগ্যবতী মেয়ে যার পাশে এসে বসল সে। মুহূর্তে সে এমন ভরাটী আলাপ জমিয়ে তুলল যে, বাইরের আর্দ্র বাতাসে যদিও রাত যেন কেমন ভিজে সপসপে, তবুও এলিজাবেথের এই প্রথম অভিজ্ঞতা হোল কেমন করে অতি সাধারণ নীরস পানসে ব্যাপারও বক্তার নৈপুণ্যে সরস হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে।

সুদর্শন উইকহ্যাম ও অফিসারগণের মাঝখানে পড়ে কলিন্স একবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেল—তরুণীদের কাছে তার আর কোন মূল্যই রইল না। তবুও মাসি মাঝে-মাঝে হৃদ্যতার সহিত শুনছিল তার কথা এবং তারই সতর্ক গৃহিণীপনায় কফি ও মাফিন পর্যাপ্ত পরিবেশিত হচ্ছিল তার পাতে।

তাসের পাট বসলে সে মাসির সঙ্গেই হুইস্ট খেলতে বসল।—'এ খেলা আমি খুব ভাল জানি না'—বললে সে—'তবে শিখে নিতে রাজী আছি। তা ছাড়া আমার কাজের পক্ষে—'

কলিন্স খেলতে রাজী হওয়ায় মাসি কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠলেন কিন্তু তার কৈফিয়তে কান দিলেন না।

উইকহ্যাম কিন্তু হুইস্ট খেলায় যোগ দিল না—এলিজাবেথ ও লিডিয়া যে টেবিলে বসেছিল সেখানে সে সাদরে গৃহীত হোল। প্রথমটা মনে হয়েছিল লিডিয়াই বুঝি তাকে গ্রাস করে ফেলবে—এমন অশ্রান্ত বকতে পারে সে। কিন্তু তেমনি লটারী খেলায় ঝোঁক বেশী থাকায় তাস নিয়ে মেতে উঠল লিডিয়া। বাজী ধরে বাজী জিতে হৈ-চৈ করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও প্রচণ্ড উৎসাহ তার। উইকহ্যাম এলিজাবেথের সঙ্গে গল্প জমিয়ে তুললে—এলিজাবেথও তার মুখের কথা শুনতে উৎসুক। কিন্তু যে কথা সে শুনতে চায় সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারছে না। ডার্সির সঙ্গে উইকহ্যামের কি সম্পর্ক? অথচ ডার্সির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে সাহস হচ্ছে না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবেই নিরসিত হোল সমস্ত উদ্‌গ্রীব কৌতূহল। উইকহ্যাম নিজেই সূচনা করলে তার কাহিনী। নেদারফিল্ড থেকে মেরীটনের দূরত্ব কত জানতে চাইলে সে। এলিজাবেথের উত্তর শুনে ইতস্ততঃ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'ডার্সি এখানে কত দিন আছে?'

—'প্রায় মাস খানেক'—কিন্তু এলিজাবেথ কথাটা এইখানেই শেষ করে দিতে চায় না বলে আর একটু জুড়ে দিল সেই সঙ্গে—'শুনেছি, ডার্বিশায়ারে না কি তার বিরাট সম্পত্তি আছে?'

—'হ্যাঁ, সম্পত্তি ওদের বিরাটই বটে। বছরে আয় দশ হাজার। ওদের সম্বন্ধে আমার চেয়ে ভাল জানা লোক পাবেন না। ওদের পরিবারের সঙ্গে আবাল্য আমার পরিচয়।'

এলিজাবেথ বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে যায়।

—'আজকে এ রকম জোরের সঙ্গে কথা বলায় খুবই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন নিশ্চয়। বিশেষ করে কালকের নিরুত্তাপ মিলনের পর এ রকম ভাবা খুবই স্বাভাবিক। আপনার সঙ্গে ডার্সির কি খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে?'

—'ঐ খানিকটা। চার দিন মাত্র দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। ভাল লাগেনি তাকে আমার।'

—'ভাল লাগা না লাগা সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার অধিকার নেই আমার। মতামত রাখারও অধিকার নেই। তাকে এত দিন থেকে এত গভীর ভাবে জানি যে, এ দিক থেকে ভাল বিচারক হওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। নিরপেক্ষ থাকাও অসম্ভব আমার পক্ষে। কিন্তু আপনার অভিমত সকলকে আশ্চর্য করবে—আশা করি অন্যত্র আর জোর-গলায় জাহির করবেন না নিশ্চয়। এখানে আপনি নিজের বাড়ীতে আছেন!'

—'নেদারফিল্ড ছাড়া অন্যত্র যা বলতে পারি, তার বেশী তো কিছু বলিনি আমি। হার্টফোর্ডশায়ারে তাকে কেউ পছন্দ করে না। তার অহমিকায় সবাই বিরক্ত। কেউ-ই তার সম্বন্ধে ভাল কথা বলে না।'

উইকহাম বাধা দিয়ে বলল—'দুঃখ করে লাভ নেই! ওকে কেন, কাউকেই যোগ্যতার অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু ওর সম্বন্ধে সচরাচর এ রকম ঘটার অবকাশ হয় না। ওর সম্পত্তির জাঁক-জমকটাই লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে—ওর অভিজাত-গম্ভীর আচরণে ভয় পায় লোকে—যেমন চায় তেমনি ভাবেই সবাই দেখতে পায় ওকে।'

—'মুহূর্তের পরিচয়েই তাকে আমি বদমেজাজী বলব'—

এ কথায় উইকহাম শুধু মাথা নাড়ল।

—'ও হয়ত আর খুব বেশী দিন দেশে থাকবে না'—

—'তা অবিশ্যি জানি না আমি,—নেদারফিল্ডে থাকার সময় এ রকম কথা শুনিনি। সে এখানে থাকলে আশা করি আপনার পরিকল্পনার কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।'

—'না না। ডার্সি আমায় তাড়াতে পারবে না। আমাকে এড়াতে চাইলে তাকেই যেতে হবে এখান থেকে। আমার সঙ্গে তার সদ্ভাব নেই—তাকে দেখলেই আমি ব্যথা পাই মনে। তাকে অবশ্য এড়িয়ে চলার কোন কারণ নেই আমার। কিন্তু সে যে কি—জগতের সামনে তা বলা আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। তার স্বর্গগত বাবা এক জন অতি সজ্জন ব্যক্তি ও আমার অকৃত্রিম শুভাকাংখী ছিলেন। ডার্সির সঙ্গে দেখা হলেই তাঁর হাজার রকম স্মৃতি ভিড় করে আসে মনে। অথচ ডার্সি আমার প্রতি অতি জঘন্য আচরণ করেছে। তার সব অপরাধই আমি ক্ষমা করতে পারতাম যদি সে তার বাবার স্মৃতির অবমাননা না করত—তাঁর সকল আশার মূলে না কুঠারাঘাত করত।'

এলিজাবেথের কৌতূহল শাণিত হয়ে ওঠে এবং উন্মুখ হয়ে গিলতে থাকে সব কথা। কিন্তু এ এমন ঘরোয়া ব্যাপার যে, বেশী কিছু জিজ্ঞেসাও করা যায় না এ সম্বন্ধে।

উইকহাম অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে অর্থাৎ মেরীটন তার পারিপার্শ্বিক তার সমাজ প্রভৃতি নিয়ে কথা বলতে লাগল। যা কিছু দেখছে অত্যন্ত প্রীত করছে তাকে।

—'রমণীয় সামাজিক পরিবেশের লোভেই আসা এখানে'—বললে সে—'অতি ভদ্র, সুখকর পরিবেশ এখানকার। তাছাড়া ডেনী এ বাড়ীর বর্ণনার দ্বারাই আরো প্রলুব্ধ করে তুলেছিল আমায়। মেরীটনে মনোজ্ঞ সাহচর্য ও স্নিগ্ধ পরিবেশের অভাব নেই। সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজনীয় আমার পক্ষে। হতাশায় লাঞ্ছিত আমার জীবন—নির্জনতা বরদাস্ত করতে পারি না আমি। কাজ চাই—চাই সামাজিক সাহচর্য। সৈনিক-জীবন আমার পক্ষে লোভনীয় নয়, কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্যে সেই জীবনই আমাকে বেছে নিতে হয়েছে। পাদরী-বৃত্তিই হওয়া উচিত ছিল আমার—সেই ভাবেই লালিত আমি। এত দিনে হয়ত আমি শ্রীমণ্ডিত জীবনের অধিকারী হতাম যদি না এই ব্যক্তিটি—যার কথা বললাম এই মাত্র—অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত।'

—'তাই না কি?'

—'হ্যাঁ। স্বর্গগত ডার্সি আমায় প্রচুর সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমার ধর্মপিতা ছিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমায়। তাঁর মহানুভবতার ঋণ জীবনে পরিশোধ করতে পারব না কখনো। আমার ভবিষ্যতের বিশেষ ব্যবস্থা করে যাওয়াই ইচ্ছা ছিল তাঁর এবং করেও ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সাথে-সাথে সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।'

'কী সর্বনাশ? তা কি করে সম্ভব? উইলকে অস্বীকার করা কি করে সম্ভব হোল? আপনি আইনের শরণাপন্ন হননি কেন?'

—'উইলের সর্তে এমন গোলমাল আছে যে, আইনের কাছ থেকে আমি কোনই আশা করতে পারি না। কোন সত্যাশ্রয়ী লোক উইলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করবে না সত্য কিন্তু ডার্সি সন্দেহ করেছে। তার মতে উইলের সুপারিশ সর্তসাপেক্ষ এবং উচ্ছৃঙ্খল ও অপরিণামদর্শী হয়ে সম্পত্তির উপর সমস্ত অধিকার হারিয়েছি আমি। তবু এ কথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, এমন কোন কুকাজ করিনি আমি যে, সম্পত্তির দাবী-দাওয়া হারাতে পারি। আমার মেজাজ হয়ত একটু উগ্র, অসতর্ক—হয়ত তার সম্বন্ধে আমার মতামত একটু খোলাখুলি ভাবেই জাহির করেছি তার কাছে। এ ছাড়া খারাপ আর কিছু তো মনে করতে পারছি না। আসল কথা হোল, আমরা দু'জনে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আর আমাকে ও ঘৃণা করে।'

—'এ অত্যন্ত জঘন্য। সকলের সামনে ওর মুখোস খুলে দেওয়া উচিত।'

—'এক দিন না এক দিন স্ব-মূর্তি বেরিয়ে পড়বেই। তবে আমি নিজে কিছু করতে চাই নে। যত দিন ওর বাবার কথা মনে থাকবে তত দিন ওর বিরুদ্ধতা করতে বা ওকে অপদস্থ করতে পারব না আমি।'

এ কথা বলায় উইকহামের প্রতি এলিজাবেথের মন সশ্রদ্ধ হয়ে উঠল—আগের চেয়ে তাকে যেন আরো সুন্দরতর বোধ হোল। একটু কি ভেবে এলিজাবেথ বললে—'ওর এমন হৃদয়হীন আচরণের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?'

—'আমাকে সে মনে-প্রাণে অপছন্দ করে—যাকে ঈর্ষারই নামান্তর বলা যেতে পারে। ওর বাবা যদি আমায় একটু কম ভালবাসতেন তাহলে হয়ত ও আমায় একটু প্রীতির চোখে দেখত, কিন্তু আমার প্রতি তার বাবার অনন্যসাধারণ ভালবাসাই ছোট বেলা থেকে আমার প্রতি তার এত ক্রোধের কারণ বলে আমার বিশ্বাস। আমার প্রতি তার বাবার স্নেহ, তার সম্পত্তির ভাগীদার হওয়া বরদাস্ত করার মত মনোবৃত্তি নেই ডার্সির।'

—'ডার্সিকে এত খারাপ মনে হয়নি যদিও ওকে আমি একটুও পছন্দ করি না। ভাবতুম, সাধারণ ভাবে সকলকেই ঘৃণা করা লোকটার স্বভাব। কিন্তু এই প্রকার বিদ্বেষপরায়ণ প্রতিহিংসা-বৃত্তি, অসাধুতা বা অমানুষিকতার বশ হতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না।'

কয়েক মুহূর্ত ভেবে আবার বললে এলিজাবেথ—'মনে পড়েছে এবার নেদারফিল্ডে ও এক দিন ওর অনমনীয়া ক্ষমাহীন মেজাজ নিয়ে খুব বড়াই করছিল বটে। এ রকম প্রকৃতি নিশ্চয়ই ভয়ংকর।'

—'এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই নে'—উত্তর দেয় উইকহ্যাম—'তার প্রতি ন্যায় আচরণ অসম্ভব আমার পক্ষে।'

—'বাপের প্রিয়পাত্র, বন্ধু, ধর্মপুত্রের প্রতি এ রকম আচরণ?'

—'একই পল্লীতে, একই উদ্যানের ছায়ায় জন্মেছি আমরা। যৌবনের বেশীর ভাগ সময়ই একসঙ্গে কেটেছে। একই বাড়ীতে থেকেছি—একই পিতা-মাতার স্নেহাঞ্চলে হেসে-খেলে বড় হয়েছি। আপনার মেসো মশায় যা করেন আমার বাবাও সেই কাজ করতেন। পরে স্বর্গীয় ডার্সির জন্য সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে পেমবার্লি জমিদারী পরিচালনায় নিযুক্ত হন। ডার্সি বাবাকে খুব সম্মান করতেন—তাঁর পরামর্শ মত চলতেন। বাবা অতি ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন তাঁর। বাবার মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রের একটা ব্যবস্থা করবেন তিনি। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, শুধু কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের জন্যই নয়, আমার প্রতি স্নেহ বশতঃই তা করতে চেয়েছিলেন তিনি।'

—'ভারী অদ্ভুত তো! আচ্ছা, এই গর্ববোধ ডার্সিকে আপনার প্রতি ন্যায় আচরণ করতে শেখাতেও পারত তো। এ রকম অসাধু হওয়ার মত গর্ববোধ থাকা তো উচিত নয়—অসাধুতাই আমি বলব একে!'

—'ও যা-কিছু করে দম্ভের বশেই। গর্বই ওর নিত্য সহচর—এ প্রায় ওর ধর্মের সামিল। আমাদের কারুরই আচরণে সামঞ্জস্য নেই—আমার প্রতি ওর আচরণ কি যে অদ্ভুত ভেবে পাই না।'

—'এই জঘন্য অহমিকা বোধে কি ভাল হয়েছে তার?'

—'হয়েছে বই কি। এই অহমিকা-বোধ থেকেই সে হয়ে ওঠে উদার, মহানুভব—হয়ে ওঠে মুক্তহস্ত, আতিথ্যপরায়ণ। এই বোধ থেকেই সে বন্ধুকে দেয় অর্থ—প্রজাদের করে সাহায্য—মোচন করে গরীবের দুঃখ। বংশগরিমা-বোধ অর্থাৎ বাপ যা করে গেছেন তার জন্য ও গর্ববোধ করে। বংশের মুখ হেঁট করতে, লোকপ্রিয় গুণাবলীর অপহ্নবতা ঘটাতে বা পেমবার্লি-পরিবারের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করতে কিছুতেই রাজী নয় সে। তার মধ্যে ভ্রাতৃগর্ব-বোধও আছে—এই বোধ থেকেই সে বোনের প্রতি স্নেহশীল, তার সতর্ক অভিভাবক। এমন কথাও হয়ত শুনতে পাবেন যে, ভাই-বোনদের মধ্যে সেই সব চেয়ে স্নেহশীল।'

—'মিস্ ডার্সি কেমন মেয়ে?'

—'ওকে অমায়িক বলতে পারলেই খুশী হতাম। ডার্সি-পরিবারের কারুর সম্বন্ধে নিন্দা করতে আমার কষ্ট হয়। সেও তার দাদার মতই অতি দাম্ভিক। ছেলেবেলায় কিন্তু বেশ স্নেহময়ী মনোরমা ছিল—আমাকে ভালবাসত খুব—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি ওর সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছি। কিন্তু আজ আর আমি তার কেউ না। দেখতে বেশ সুন্দরী—বয়স হবে পনের কি ষোলো। খুব গুণবতী। বাপের মৃত্যুর পর লণ্ডনেই ও ঘরবাড়ী করে নিয়েছে। সেখানেই থাকে এক জন মহিলার কাছে—যিনি তার লেখাপড়ার তদারক করেন।'

অনেক বিরতি, অনেক রকম আলাপ-আলোচনার পর আবার এলিজাবেথ ফিরে আগে পূর্ব প্রসঙ্গে।

—'আশ্চর্য, মিঃ বিংলের সঙ্গে ওর এত ঘনিষ্ঠতা কিসের! বিংলের মত এমন সাদা মন, সদালাপী লোক কেমন করে যে ওর বন্ধু হোল! মিশ খায় কেমন করে? আপনি চেনেন মিঃ বিংলেকে?'

—'না তো—'

—'খুব ঠাণ্ডা মেজাজী, ভদ্র, স্নিগ্ধ স্বভাবের মানুষ। ডার্সি যে কি প্রকৃতির লোক তিনি জানতেই পারেন না।'

—হয়ত জানেন না। ডার্সি যেখানে যেমনটি দরকার মন জুগিয়ে চলতে জানে। ওর তো গুণের অভাব নেই। যদি দরকার বোধ করে ওর মত আলাপী লোক একটিও পাওয়া যাবে না। সমগোত্রীয়দের দলে সে যে-রকম, কম বিত্তশালীদের মধ্যে ঠিক তার বিপরীত। দাম্ভিকতা কোন সময়েই তাকে পরিত্যাগ করে না। ধনিকদের মহলে সে মুক্তহস্ত, ন্যায়পরায়ণ, অকপট, বিচার-বুদ্ধিমান—কিছুটা প্রীতিময়ও বটে। অর্থ ও চেহারার প্রতি সজাগ দৃষ্টি থাকে।'

তাসের আড্ডার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়রা এসে অন্য টেবিলে সমবেত হোল। কলিন্স এসে দাঁড়াল এলিজাবেথ আর মাসির মাঝখানে।

কলিন্সের পর-পর লেডী ক্যাথারিনের উল্লেখে সচকিত হয়ে কলিন্সকে কয়েক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করে উইকহ্যাম নীচু গলায় এলিজাবেথকে প্রশ্ন করল, তার এই আত্মীয়টি দ্য বুর্গ পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ কি না।

—'লেডী ক্যাথারিন সম্প্রতি ওর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কি সূত্রে লেডী ক্যাথারিনের সঙ্গে পরিচয়, জানি না—তবে পরিচয়টা খুব বেশী দিনের নয়, নিশ্চয়।'

—'জানেন তো লেডী ক্যাথারিন দ্য বুর্গ আর লেডী এ্যানি ডার্সি দু' বোন। অর্থাৎ তিনি ডার্সির মাসিমা।'

—'এ কথা জানতাম না তো! লেডী ক্যাথারিনের সঙ্গে সম্পর্কের কথা শুনিনি কখনো। কালকের আগেও তার অস্তিত্বের কথা জানতাম না।'

—'ডার্সি আর মিস্ দ্য বুর্গের বিয়েতে দুই সম্পত্তি এক হবে।'

এ কথা শুনে বিংলের বোনের কথা ভেবে হাসি পেল এলিজাবেথের। ডার্সির প্রতি তার এত মনোযোগ, তার বোনের প্রতি এত স্নেহ-মমতা সব ব্যর্থ হবে—সত্যিই যদি ডার্সির হৃদয় অন্যত্র বাঁধা পড়ে গিয়ে থেকে থাকে।

—'কলিন্স তো লেডী ক্যাথারিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি লেডী ক্যাথারিন সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তাতে আমার ধারণা, অতি কৃতজ্ঞতা-বোধই তার বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে আছে। তার আশ্রয়দাত্রী হলেও লেডী ক্যাথারিন অতি দাম্ভিক মহিলা বলেই আমার বিশ্বাস।'

—'আমারও তাই ধারণা। বহু দিন তাঁকে দেখিনি কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, তাঁকে আমি কোন দিনই পছন্দ করতুম না। তাঁর চাল-চলন ছিল অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও প্রভুত্ব-প্রয়াসী। সুচতুরা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমতী বলেও নাম আছে তাঁর। আমার মতে তাঁর এই গুণাবলী কিছুটা তাঁর পদমর্যাদা ও সৌভাগ্য এবং কিছুটা তাঁর প্রভুত্বপ্রিয় আচরণ-সঞ্জাত। আর বাকিটা তিনি পেয়েছেন তাঁর ভাগনের অহমিকা-বোধ থেকে, যার ধারণা তাদের সঙ্গে যারা সম্পর্কিত তাদের প্রথম শ্রেণীর বিচার-বুদ্ধি থাকা দরকার।'

এলিজাবেথের নিকট উইকহ্যামের প্রতিটি কথাই যুক্তিসঙ্গত মনে হোল। খাওয়ার আগে পর্যন্ত এই ধরনের ঘনিষ্ঠ আলোচনা চলল দু'জনের মধ্যে। তার পর খাওয়ার টেবিলে বসে নানা কোলাহলের মধ্যে আর কোন কথা হোল না বটে, কিন্তু এলিজাবেথের মন-প্রাণ উইকহ্যামের চিন্তাতেই পরিপূর্ণ হয়ে রইল। উইকহ্যামের কথা ছাড়া আর কোন কিছুই ভাবতে পারছিল না সে। উইকহ্যাম যা-যা বলেছে সে কথাই ভাবতে ভাবতে চলল সারা পথ। লিডিয়া, কলিন্সও এক মুহূর্ত নীরব ছিল না। লিডিয়া নিরবচ্ছিন্ন বকে চলেছে তার লটারীর টিকিট সম্বন্ধে—কিসে খেলায় কত হেরেছে, কত জিতেছে। কলিন্সের ফিলিপ্‌স দম্পতীর সৌজন্যের প্রশংসা, খেতে বসে ক' প্লেট উড়িয়েছে, তাসের আড্ডায় যা হেরেছে তার জন্য মোটেই দুঃখিত নয়—প্রভৃতি সম্বন্ধে এত কথা বলার ছিল যে, সব শেষ করার আগেই গাড়ী পৌঁছে গেল লংবর্ণে।

সতেরো

উইকহ্যামের সঙ্গে তার যেটুকু পরিচয় ঘটেছিল তার বৃত্তান্ত বললে এলিজাবেথ তার দিদির কাছে। সব শুনে জেন বিস্মিত হোল যেমন উদ্বিগ্নও হোল তেমনি। ডার্সি বিংলের শ্রদ্ধার যে এমনি ধারা অপমান করবে, এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করবে সে। অথচ উইকহ্যামের মত এমন অমায়িক ছেলের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করার মত স্বভাবও নয় তার। সহজ ভাবে যার কারণ নির্ণয় করা যায় না, তাকে 'ভুল বোঝা' বা 'দৈব দুর্ঘটনা' বলে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলে সে। বললে—'ওরা দু'জনেই একটা কোথাও ভুল করেছে যা আমরা কেউ জানি না। স্বার্থান্বেষীরা এক-এক জনের কাছে এক-এক রকম লাগিয়েছে। উভয় দিক থেকেই হয়ত সত্যিকার দোষের কারণ না থাকা সত্ত্বেও ঘটনা-পরম্পরায় ওদের মন ভেঙেছে। কিন্তু কিসে, তা আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব।'

—'তা নয় সত্যি হোল, কিন্তু স্বার্থপর লোকদের যাদের এতে হাত আছে বলছ, তাদের স্বপক্ষেও কি কিছু বলার নেই? হয় একদম সব বাজে বলে উড়িয়ে দিতে হবে, নয় ত কারুর সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করতে হবেই।'

—'যত খুশী হাসতে পার, কিন্তু হেসে আমার মত পালটাতে পারবে না। বাবার প্রিয়পাত্র যে—যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাবা ব্যবস্থা করে গেছেন, তার প্রতি এ রকম আচরণের দ্বারা ডার্সি কি নিজেকে অত্যন্ত অপমানকর অবস্থায় টেনে নামাবে না? যার সামান্যতম মনুষ্যত্ব বোধ আছে, যার চরিত্র বলে কিছু আছে—সে কখনই এ রকম কাজ করতে পারে না। তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরা তার সম্বন্ধে কি এমনি নৈরাশ্যজনক ভাবে প্রতারিত হতে পারে? না, না—তা কখনই হতে পারে না।'

—'মিঃ বিংলেকে সহজে প্রতারিত করা যায় বিশ্বাস করতে রাজী আছি, কিন্তু উইকহ্যাম কাল রাতে নিজের সম্বন্ধে অকপটে যা বলেছে তা যে সর্বৈব মিথ্যা এ কথা বিশ্বাস করতে রাজী নই আমি। সত্যি না হলে প্রতিবাদ করুক ডার্সি। তা ছাড়া তার মুখে সততার সুস্পষ্ট ছাপ ছিল।'

—'সত্যি, ভারী বিশ্রী এটা। কী যে ভাবা যায়!'

—'মাপ করতে হোল, কি ভাবতে হবে সবাই জানে।'

—'তবে একটা বিষয় স্পষ্ট ভাবতে পার যে, বিংলেকে যদি সত্যি প্রতারিত করা হয়ে থাকে সব জানাজানি হয়ে গেলে সত্যিই তা অতি দুঃখের হবে তার পক্ষে।'

তারা দু'জনে যখন কুঞ্জ-মধ্যে বসে এই ধরনের কথা-বলাবলি করছিল তাদের ডাক পড়ল—কারণ যাদের সম্বন্ধে তারা আলোচনা করছিল তাদেরই এক জন এসে উপস্থিত হয়েছে সেখানে। বিংলে আর তার বোন এসেছে বহু-প্রত্যাশিত বল-নাচের নিমন্ত্রণ জানাতে। আগামী মঙ্গলবার দিন স্থির হয়েছে। পুরোনো বন্ধুর সাথে আবার দেখা হওয়ায় দুই বোন খুশী হোল, বললে—শেষ দেখা-সাক্ষাতের পর প্রায় এক যুগ কেটে গেছে। তারা চলে আসার পর কি করেছে সে এত দিন, বারে বারে জিজ্ঞেসা করতে লাগল। পরিবারের অন্যান্যদের প্রতি কোন মনোযোগই দেখাল না তারা। মিসেস্ বেনেটকে যত দূর সম্ভব এড়িয়ে গেল—এলিজাবেথের সঙ্গে মাত্র দু'-একটি কথা-বিনিময় করলে, আর বাকি সকলের সঙ্গে কোন কথাই বললে না। তার পর আসন ছেড়ে উঠে এমন তাড়াতাড়ি চলে গেল ভাই-বোনে যে, এরা সবাই বিস্ময়ে অবাক হোল। ভাবখানা যেন মিসেস্ বেনেটের আদর-আপ্যায়ন এড়াতেই সরে গেল তারা।

নেদারফিল্ডে বল-নাচের সংবাদ শুনে মেয়েরা প্রত্যেকেই খুব খুশী হোল। মিসেস্ বেনেট তো এটাকে তার বড় মেয়ের সৌজন্যেই ঘটেছে বলে মনে করলেন। নিমন্ত্রণ-চিঠির বদলে বিংলে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে নিমন্ত্রণ করায় নিজেকে তিনি ধন্য মনে করলেন। দুই বন্ধুর সাহচর্যে ও তাদের ভায়ের অখণ্ড মনোযোগে সন্ধ্যা কাটানোর মধুর স্বপ্ন আচ্ছন্ন করল জেনকে—এলিজাবেথ উইকহ্যামের সাথে যত খুশী নাচতে পারবে আর যা-যা শুনেছে ডার্সির মুখে-চোখে-আচরণে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ভেবে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু ক্যাথারিন আর লিডিয়ার আনন্দ কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়—যদিও এলিজাবেথের মত উইকহ্যামের সঙ্গেই বেশীক্ষণ নাচবে তারা, তবুও উইকহ্যামই একমাত্র নাচিয়ে নয় যে, তাদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে পারবে! আর বল-নাচ, বল-নাচই। এমন কি মেরী পর্যন্ত আনন্দে মেতে উঠল—তারও যে আগ্রহের অভাব নেই, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করল সবাইকে।

—'সকাল বেলাটা নিজের কাজ করতে পারব এই যথেষ্ট—মাঝে মাঝে বিকেল বেলা কারুর সঙ্গে দেখা-শুনা করা মন্দ কি! সমাজেরও তো দাবী আছে প্রত্যেকের উপর। মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে আমোদ-প্রমোদের দরকার, সে আমি বিশ্বাস করি।'

এলিজাবেথ এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, যদিও সে অনাবশ্যক কথা বলে না, কলিন্সের সঙ্গে তবুও আজকে সে জিজ্ঞেসা না করে পারলে না যে, সেও বিংলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে কি না। গ্রহণ করলেও বিকেলের নাচে যোগ দেবে তো? কিন্তু এলিজাবেথকে

বিস্মিত করে জানাল কলিন্স, নাচে যোগদানে তার কোনই আপত্তি নেই—নাচে যোগ দিলে আর্চ বিশপ বা লেডী ক্যাথারিন কেউ-ই তাকে নিন্দা করবেন না। বললে সে—'সুধী জনের উদ্দেশ্যে সত্যিকার চরিত্রবান যুবক কর্তৃক প্রযোজিত নাচের মজলিসে খারাপ কিছু থাকতে পারে না। নাচে আমার আপত্তি নেই—তাছাড়া সেদিন সন্ধ্যায় আমার সব ক'টি সুন্দরী বোনের সঙ্গে নাচের সৌভাগ্য হবে। এই সুযোগে প্রথম দু'টি নাচ তোমার সঙ্গে নাচার অনুমতি চাইছি এলিজাবেথ। আশা করি, জেন এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করবে—এর দ্বারা যে তার প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করা হয়নি বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই।'

এ প্রস্তাব এলিজাবেথকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে দিল। উইকহ্যামের সঙ্গে নাচের প্রস্তাব করেছে সে, আর এখন তার বদলে কলিন্স! এমন কঠোর পরীক্ষায় তাকে আর পড়তে হয়নি কখনো। তাদের সুখের দিনগুলিকে জোর করে আরো কিছু কালের জন্য দূরে ঠেলে সরিয়ে রাখতে হবে। অতি ভদ্রতার সাথেই সে গ্রহণ করল কলিন্সের প্রস্তাব। কলিন্সের গ্যালান্টি যে তাকে খুশী করেছে তা নয়। এই তার প্রথম মনে জাগল তার বোনেদের মধ্যে তাকেই হ্যান্সফোর্ড পারসনেজের কর্ত্রী নির্বাচিত করা হয়েছে। এই ধারণা ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হতে লাগল যতই, তার প্রতি কলিন্সের সৌজন্য, মনোযোগ প্রকাশও বাড়তে লাগল। প্রায়ই সে এলিজাবেথের বুদ্ধি ও সজীবতার অজস্র প্রশংসা করতে লাগল। মা'ও জানালেন, শীগ্‌গিরই তাদের দু'জনের হাত এক হলে খুব খুশী হবেন তিনি। এলিজাবেথ এ ইংগিত গ্রাহ্যের মধ্যেই নিলে না। কিন্তু এখন প্রতিবাদ করতে গেলেই ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি হবে। কলিন্সের পক্ষে এ প্রস্তাব করা আস্পর্ধা—তবুও করেছে সে। কাজেই এখন বিবাদ বাধান বৃথা।

নেদারফিল্ডে বল-নাচের ব্যবস্থা যদি না হোত, কনিষ্ঠ তনয়াদের অবস্থা হয়ে উঠত অতি করুণ—কারণ আমন্ত্রণের দিন থেকে বল-নাচের দিন পর্যন্ত সেই যে অশ্রান্ত বারিবর্ষণ সুরু হয়েছে তার আর বিরাম নেই। মেরীটনে হেঁটে যাওয়াও অসম্ভব। না মাসিমা, না অফিসাররা, না কোন মুখরোচক সংবাদ-সন্দেশ। এলিজাবেথের ধৈর্যেরও অগ্নি-পরীক্ষা হোত। উইকহ্যামের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করে তোলার আর সুযোগ ঘটেনি। মঙ্গলবারে নাচের আয়োজন ছাড়া অন্য আর কিছুই শনিবার, রবিবার, সোমবারকে কিটি বা লিডিয়ার কাছে এমন প্রীতিদায়ক করে তুলতে পারত না।

আঠারো

নেদারফিল্ডের ড্রয়িং-রুমে সমবেত সৈনিকদের লাল পোষাকের ভিড়ের মধ্যে উইকহ্যামকে খুঁজে বের করার মিথ্যে চেষ্টা করার আগের মুহূর্ত অবধি একবার সন্দেহ হয়নি এলিজাবেথের যে, সে হয়ত না-ও আসতে পারে। যে সব কারণে উইকহ্যামের পক্ষে এ আসরে আসা দুরূহ হয়ে উঠতে পারে, সেগুলি একবারও মনে পড়েনি তার। আজ সে পরিপাটি করে সেজেছে। উইকহ্যামের চিত্তের যে ক'টি নিভৃত লোক অজেয় আছে আজ সন্ধ্যা বেলার অবসরে সেগুলির কর্তৃত্ব নেবার অভিসন্ধি নিয়েই এসেছিল এলিজাবেথ।

ডার্সি'র নিরঙ্কুশ আনন্দের জন্য বিংলে যে ইচ্ছা করে উইকহ্যামকে নিমন্ত্রণ-তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে এই জঘন্য সংশয় তার মনকে পলকের জন্য বিষাক্ত করে তুলল। বন্ধু ডেনির কাছে লিডিয়ার মারফৎ সে খবর পেল যে, বিশেষ জরুরী কারণে শহরে গেছে উইকহ্যাম গত কাল। আজও ফেরেনি।

ডেনি তাকে সুস্মিত হেসে জানাল—'ইচ্ছে থাকলে সে শহরে যাওয়া পিছিয়ে দিতে পারত। কিন্তু এই আসর থেকে সে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়েছে।'

যতটুকুই হোক ডার্সি'ই মূল কারণ আজকের সন্ধ্যায় উইকহ্যামের অনুপস্থিতির। এই বিশ্রী চিন্তা এলিজাবেথের সমস্ত সন্ধ্যা তেতো করে দিল। কোন অজুহাতেই আজ সে ডার্সি'র সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না প্রতিজ্ঞা করলে মনে-মনে। তার ফলে সদাহাস্যময় বিংলের সঙ্গে আলাপেও সে মনের মাধুরীভ্রষ্ট হোল।

কিন্তু এলিজাবেথের মত মেয়ের গোমরা মুখ থাকা স্বভাব-বিরুদ্ধ। বান্ধবী লুকাসের কাছে সে নিজের দুঃখকে বিবৃত করে অনেকখানি হাল্কা বোধ করলে। মনের মধ্যে আনন্দ-প্রোত রুদ্ধ-মুখের কবাট ভেঙে অবিরাম ধারায় বইতে লাগল আবার। কিন্তু প্রথম দু'টি নাচ হোল যখন, তখন তার মন দ্বিতীয় বার ভেঙে পড়ল। কলিন্সের কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল আগেই। সুতরাং তারই নৃত্যসঙ্গিনী হতে হোল অনিচ্ছায়। কলিন্স এমন অসভ্যের মত নাচে যে, রাগে-দুঃখে এলিজাবেথের কাঁদতে ইচ্ছা হোল। যে মুহূর্তে সে ছাড়া পেল মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল যেন।

তৃতীয় নাচে সে সঙ্গী পেল এক জন অফিসারকে। তার কাছে উইকহ্যামের প্রসঙ্গ তুলে সে জানতে পারলে যে, মানুষটিকে সৈনিক সমাজে সবাই খুব শ্রদ্ধা করে। নাচ শেষ করে বান্ধবী লুকাসের কাছে বসে গল্প করছিল এলিজাবেথ—এমন সময় ডার্সি তাকে চকিত করে দিয়ে সহাস্যে আমন্ত্রণ করলে তার সঙ্গে নৃত্যসঙ্গিনী হতে। এই ঘটনার আকস্মিকতায় এলিজাবেথ কেমন যেন বিহ্বল হয়েই ডার্সি'র আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে। ডার্সি সানন্দে বিদায় নেবার পর এলিজাবেথ রেগে উঠল নিজের অবিমৃষ্যকারিতায়। কিন্তু লুকাস তাকে সান্ত্বনা দিল—'দুঃখ করিস না ভাই, মানুষটিকে তোর খারাপ লাগবে না দেখিস।'

—'ওকে আমি ঘৃণা করি। ভাল লাগা আমার পাপ।'

যখন ডার্সি এসে আবার দাঁড়াল নাচ আরম্ভের পূর্ব মুহূর্তে, কানে-কানে লুকাস তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, রাগের বশে এলিজাবেথ যেন এমন কিছু না করে যাতে সে ডার্সি'র চোখ ছোট হয়ে যায়। উইকহ্যামের চেয়ে ডার্সি অন্ততঃ দশ গুণ সুপাত্র তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু ডার্সি'র সঙ্গে নাচের আসরে নামার সঙ্গে সঙ্গে এলিজাবেথ যেন নতুন বিস্ময় বোধ করল। প্রত্যেকটি নর-নারী তাকে ভাগ্যবতী মনে করে অসূয়ার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে তাকে। দু'জনে নীরবে নাচ সুরু করল। এলিজাবেথ ভেবেছিল দু'টি নাচ সে এমন নিঃশব্দেই কাটিয়ে দেবে নৃত্য-ছন্দে। কিন্তু মনে তার করুণা হোল। এত বড় শাস্তি কি করে দেবে সে সঙ্গীকে! তাই অনেকটা কৃপাভরেই সে নাচ সম্বন্ধে ছোট একটু মন্তব্য করলে। ডার্সি'ও ছোট উত্তর দিয়ে ক্ষান্ত হোল। বাধ্য হয়ে এলিজাবেথ বললে—'আমি নাচ নিয়ে সুরু করেছিলাম

প্রথম। এবার আপনার পালা কথা বলার। যা হোক কিছু বলুন।'

—'নাচের তালের সঙ্গে মিলিয়ে কি কথা বলেন আপনি?'

—'না বলে থাকা যায় কি? পুরো আধ ঘণ্টা নীরবে কাটান কি করে হয় আমিও ভেবে পাই না।'

—'নিজে চাইছেন আলাপ না আমায় কৃতজ্ঞতাভাজন করছেন বুঝলাম না।'

—'সে কথা নিজ মুখে কি বলব বলুন?'

কতক্ষণ আবার চুপচাপ চলল নাচ। তার পর ডার্সি জিজ্ঞাসা করল যে ওরা প্রায়ই মেরীটনে আসে কি না। জবাবে এলিজাবেথ সায় দিল। বললে—'সেদিন যখন পথে আপনার সঙ্গে দেখা হোল, তখন আমরা একটি নতুন বন্ধু পেয়েছিলাম।'

ডার্সি'র সারা মুখে একটা গর্বিত ভাব নেমে এল। কিন্তু কোন সাড়া দিল না সে। আর নিজের দুর্বলতার প্রকাশে এলিজাবেথ মনে মনে কুণ্ঠা বোধ করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে ডার্সি কথা কইলে।

—'উইকহ্যামের মধুর ব্যবহার অনেককেই তার বন্ধু করে তোলে। কিন্তু বন্ধুত্ব রাখার ক্ষমতা তার কতখানি সে বিষয়েই আমার সন্দেহ।'

—'তার নেহাৎই দুর্ভাগ্য যে, আপনার বন্ধুত্ব তিনি হারিয়েছেন'—বললে এলিজাবেথ জোর দিয়ে—'আমার মনে হয়, সারা জীবন তার জন্য তাকে দুঃখ পেতে হবে।'

এই সময় স্যার লুকাস ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাওয়ার জন্য এদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। ডার্সিকে দেখে সাগ্রহে সম্ভাষণ করে বললেন—'আশ্চর্য সুন্দর আপনার নৃত্যভঙ্গী মিঃ ডার্সি! আর যে মনোরম সঙ্গিনীটি পেয়েছেন তার জন্যও আপনাকে প্রভূত ঈর্ষা করি আমি। এমন যুগল মিলন কদাচিৎ চোখে পড়ে। যাক্, বিরক্ত করতে চাই না আর আমি। সানন্দে পান করুন রমণীর আঁখি-সুধা যা দেখে আমার নিজেরই পিপাসা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে।"

ডার্সি নাচের মধ্যেই তাঁকে প্রতি-অভিবাদন জানালে। তার পর সঙ্গিনীর দিকে ফিরে বললে—'কি বিষয়ে কথা হচ্ছিল ভুলে গেলাম। সূত্রটা ধরিয়ে দিলে বাধিত হব।'

এ-কথা সে-কথার পর এলিজাবেথ বললে—'কি আশ্চর্য আপনার চরিত্র! আমার তো মনে হয় নিজের মতামত আপনি দৃঢ় হাতে আঁকড়ে থাকেন চিরকাল, তাই না?'

—'সত্যিই তাই।'

—'কিন্তু কেন? এতে নিজের ক্ষতিই হয় না? যদি আপনার বিচার ভ্রান্ত হয়?'

—'আপনি কি বলতে চাইছেন আমি ঠিক ঠাহর করতে পারছি না মনে হয়?'

—'আপনার মানসিক গঠনটা বুঝে নেবার চেষ্টা করছি; এই মাত্র।'

—'কিন্তু কেন?'

মাথা নাড়াল এলিজাবেথ। 'আপনার সম্বন্ধে এত বিরুদ্ধ মতামত শুনি যে, তার মধ্যে সত্য আবিষ্কার করতে পারিনি আজও।'

—'সে কথা সত্যি। লোকে আমার সম্বন্ধে কত বিচিত্র ধারণাই না পোষণ করে। কিন্তু মিস্ বেনেট, আপনি অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না।'

—'কিন্তু এখন যদি আপনার চরিত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা না সঞ্জাত হয়, আর হয়ত কোন দিন তার সুযোগ হবে না।'

—'আপনাকে আমি কোন দিন বঞ্চিত করব না'—বলে ডার্সি বিদায় নিল তার কাছে।

কিন্তু এই মেয়েটির প্রতি মনের কোণে একটা মোহ ছিল, যার ফলে এর উপর কোন বিতৃষ্ণার ভাব সে পোষণ করতে পারলে না। কখন অজ্ঞাতে তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তৃতীয় ব্যক্তির উপর যে আজকের আসরে অনুপস্থিত ছিল।

এলিজাবেথ গিয়ে আসন নেবার সঙ্গে সঙ্গেই বিংলের বোন এসে তার পাশে বসল। বিনা ভূমিকায় সে বললে—'এই মাত্র জেনের কাছে শুনছিলাম যে তুমি না কি উইকহ্যামের প্রতি একান্ত মনোযোগী হয়েছ। এ অবশ্য খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নেই। উইকহ্যাম ছেলেটি ভালই। সে বোধ হয় আত্মপরিচয় দেবার সময় তোমায় বলতে ভুলেছে যে, ডার্সি'র পিতার এক কর্মচারীর ছেলে সে। তোমার বান্ধবী হিসেবেই তোমায় একটু সতর্ক করে দিচ্ছি ভাই যে, তার কথার অযথা মূল্য দান করো না। ডার্সি যে তাকে বঞ্চিত করেছে এ একেবারে মিথ্যে। ডার্সিকে আমার চেয়ে কেউ ভাল করে জানে না। বরং উইকহ্যামই ডার্সি'র সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আজকের জলসায় তাকে নিমন্ত্রণ করতে হতই, কিন্তু ভালই হয়েছে যে, এমন সামাজিক উৎসবে সে নিজেই সরে দাঁড়িয়েছে। আমার কাছে তার এখানে আসাটাই কেমন ঔদ্ধত্য বলে মনে হয়। অবশ্য তার দোষও দিই না আমি। যেমন বংশে জন্ম তেমন তো আচরণ হবে মানুষের।'

এলিজাবেথের মুখ রাগে আগুন হয়ে উঠল—'তোমার আক্রোশ তোল যে, সে মিঃ ডার্সি'র পিতার কর্মচারীর ছেলে, এই ত। তার বংশ আর তার অপরাধ দুই-ই এক পর্য্যায়ে পড়ে তোমার মতে। সে কথা সে আমার কাছে একবারও গোপন করেনি।'

ঘৃণার ভাব দেখিয়ে বিংলের বোন উঠে গেল। যাবার সময় বলে গেল—'আমায় মাপ করো ভাই। আমি তোমার ভালোর জন্যই বলতে এসেছিলাম। আর কিছু নয়।'

খুঁজে বের করল জেনকে ভিড়ের মধ্যে এলিজাবেথ। আজ সন্ধ্যায় যে অচিন্ত্য আনন্দ পেয়েছে, তারই বিকশিত প্রভা জেনের মুখে। এলিজাবেথ দেখে পরম পরিতৃপ্ত হোল। একবার ভাবলে, আজকের এই সুখের সুরটুকু তৃতীয় ব্যক্তিদের রেষারেষির ব্যাপার নিয়ে সে কেটে দেবে না। কিন্তু না বলেও থাকতে পারলে না। হাসিমুখে সে দিদিকে বললে—'কি গো মেয়ে! উইকহ্যাম সম্বন্ধে কিছু খবর পেলে না কি! নিজের মানুষটিকে নিয়ে সব ভুলে আছ?'

—'না ভুলিনি', বললে জেন—'ভুলি নি গো। তবে তেমন কিছু খবরও পাইনি। যা-কিছু শুনলাম ওর মুখে, ওর বোনেরও মুখে। তাতে মনে হয় উইকহ্যাম ছেলেটি খুব ভাল নয়। ডার্সির সঙ্গে যথোচিত ব্যবহার করেনি। ডার্সির ভালবাসা সে নিজের দোষেই ঘুচিয়েছে।'.

—'মিঃ বিংলে কি তাকে চেনে ?'

—'সে দিনের আগে তার কখনো দেখেও নি।'

—'তা ত বুঝলাম। কিন্তু সম্পত্তির ব্যাপার কি শুনলে ?'

—'সে, ও মানুষটি জানে না। তবে ডার্সির কাছে শুনেছে যে উইকহামের টাকা পাওয়া সর্তসাপেক্ষ ছিল।'

এলিজাবেথ তবু যেন নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। বললে—'যাই হোক, ব্যাপারটা খোলসা হোল না মোটেই। কার কথা কতখানি সত্যি বোঝা গেল না। দেখা যাক্।'

তার পর দুই বোন আজকের সন্ধ্যার মধুর অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। বিংলে যে স্নিগ্ধ অনুভূতি জাগিয়েছে তার মনে, সে কথা সবিস্তারে বলল জেন বোনকে। গভীর তৃপ্তির ভাব তার মুখে দেখে এলিজাবেথেরও সংশয় রইল না যে এই দু'টি প্রাণী ধীরে ধীরে একাত্ম হয়ে উঠেছে।

এমন সময় কলিন্স এসে তাদের আলাপে বিঘ্ন ঘটালে। সে এসেই সদর্পে জানাল যে, এই ভদ্র জনসমাবেশে সে তার এক পরম প্রিয়জনের সাক্ষাৎ পেয়েছে। লেডী ক্যাথারিনের ভাগ্নে যে এখানে এসেছে তা আগে জানলে কখন গিয়ে সে তার সঙ্গে আলাপ করে তার আন্তরিক প্রীতি জানিয়ে ফেলত।

এলিজাবেথ তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে। ডার্সি হয়ত এই অনাহূত আত্মীয়তার ভঙ্গীকে সুদৃষ্টিতে দেখবে না, এ সন্দেহ প্রকাশও করলে সে, কিন্তু কলিন্স তার স্বভাব-সুলভ উন্নাসিক চালে বললে—'তোমার বিচক্ষণতা ও বিচার-ক্ষমতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই জানাচ্ছি যে, আমার বিবেকের নির্ধারিত পথেই আমায় চলতে হয়, কেন না আমরা ধর্মপথের যাত্রী। যে শিক্ষা ও ধর্মানুশাসন আমাদের চরিত্রের অঙ্গ তার নির্দেশেই তোমাকে জানাচ্ছি যে, তোমার মত অনভিজ্ঞ রমণীর বুদ্ধি-চালিত হওয়া আমার পক্ষে গভীর লজ্জাকর।'

কলিন্স গম্ভীর ভাবে এগিয়ে গিয়ে ডার্সিকে অভিবাদন করল। এলিজাবেথ দূর থেকে তাদের দু'জনের ভঙ্গী নিরীক্ষণ করে মনে মনে কৌতুক অনুভব করতে লাগল। ডার্সির প্রথম বিস্ময় কাটাবার পর কলিন্স যখন দ্বিতীয় বার বক্তৃতা সুরু করেছে তখন কি এক অছিলায় ডার্সি তাকে ছোট একটু অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। কলিন্স প্রথমটা হতবুদ্ধি হলেও তার অহমিকা সে ছাড়ল না। তেমনি দর্পের সঙ্গেই এসে জানাল যে, লোকটি অতি চমৎকার। এমন মিষ্ট সম্ভাষণ ও আদব-কায়দা যে, অত বড় মহীয়সী মহিলার যোগ্যই বটে।'

আহারের টেবিলে বসল সবাই। প্রতিবেশী লুকাস-গিন্নীর সঙ্গে জেনের ভবিষ্যৎ সংসার সম্বন্ধে গল্প জমিয়েছেন মা সরবে। এই মেয়েটিকে যদি বিংলের মত অভিজাতের ঘরে গৃহিণী করে পাঠাতে পারেন, তবে তাঁর অন্য মেয়েগুলিরও ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। কেন না, এত বড় ঘরে জামাই করতে পারলে দেশের অন্যান্য বড় ঘরেও তিনি একে একে অন্য মেয়েগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, এ বিশ্বাস তার ষোল আনা। লুকাস-গিন্নীকেও তিনি শুভেচ্ছা জানালেন যে, তার মেয়েরাও যেন অমনি বড় ঘর-বর লাভ করে। যদিও মনে মনে তিনি স্থির জানেন, সে-সম্ভাবনা তাঁর প্রতিবেশিনীর কপালে নেই।

বৃথাই এলিজাবেথ মাকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। অন্ততঃ নিম্নকণ্ঠে তাঁর আলাপ চালিয়ে যাবার জন্য বার বার মিনতি করল। তাদের বিপরীত দিকেই ডার্সি বসে যে মায়ের বাক্য-বিন্যাসের অধিকাংশ শুনছে, এ তার কাছে রীতিমত বিরক্তিকর বোধ হতে লাগল। মা তাকে উল্টে ভর্ৎসনা করলেন —'ডার্সির কানে যাচ্ছে, তাতে দোষ হয়েছে কি ? ডার্সির কাছে আমাদের এমন কিছু বাধ্য বাধকতা নেই যে, তার কানে বিষ ঠেকতে পারে এমন কথা বলা আমাদের অন্যায়। তুমি চুপ কর বাছা।'

—'চুপ কর মা। ডার্সিকে ক্ষুব্ধ করে আমাদের লাভই বা কি ? তার কাছে ছোট হলে যে তার বন্ধুরও বিরাগের কারণ হব আমরা।'

কিন্তু মায়ের উচ্ছ্বসিত বাক্য-প্রবাহকে রোধ করার ক্ষমতা ছিল না তার। যতক্ষণ না তাঁর নিজের ক্লান্তি এল ততক্ষণ তিনি একবারও থামলেন না। এলিজাবেথ বসে বসে লক্ষ্য করলে, লুকাস-গিন্নী এক সময় ক্লান্ত হয়ে উঠলেন। অপরের সৌভাগ্য উদয়ের কাহিনী শুনতে শুনতে এক সময় তিনি হাই তুলে আহারে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করলেন। তার পর মাও চুপ করে গেলেন।

কিন্তু এলিজাবেথের আজ মানসিক স্বস্তি বার বার খণ্ডিত হতে লাগল। মেরী উঠল গান করতে। তার গলা গান কিছুই এত বড় আসরের উপযুক্ত নয়। তবু সে অক্ষম সামর্থ্য নিয়ে এতগুলি লোকের আনন্দবর্ধনের দায়িত্ব নিলে। এলিজাবেথের এত লজ্জা করছিল যে, দ্বিতীয় গানটির পরেই সে বাবার দিকে তাকাল মিনতির দৃষ্টিতে। মিঃ বেনেট এই বুদ্ধিমতী কন্যাটির অভিলাষ বুঝলেন—'চমৎকার হয়েছে মা মেরী। এবার অন্য সব সমাগতা মেয়েদের গাইতে দাও। তোমার পালা এখন শেষ।'

পিতার এই বক্তৃতায় মেরী হতচকিত হয়ে গেল প্রথমটা। তার পর গানের টেবিল থেকে সরে গেল। মেরীর জন্য এমন দুঃখ লাগল এলিজাবেথের।

কিন্তু বেনেট-পরিবারের সুনামকে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র করেছিল যেন আজ সবাই। হঠাৎ কলিন্স উঠে দাঁড়িয়ে অনাহূত ভাবে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা সুরু করে দিল—'আমি যদি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী হতাম, এমন সুচারু একটি সামাজিক সম্মেলনে সমবেত নরনারীকে আনন্দ পরিবেশন করার জন্য গান করতাম নিশ্চয়ই। সঙ্গীত এক নিষ্পাপ আনন্দ। এ কথা অবশ্য বলি না যে, গান-বাজনায় অধিক কালক্ষেপ করা শোভন, কেন না মানুষকে নানা কর্তব্যে ব্যাপৃত থাকতে হবেই। বিশেষ করে এক জন ধর্মযাজকের পক্ষে এ কথা আরো বেশী বাস্তব, বেশী সত্য।' বেশ দীর্ঘ এক বক্তৃতা দিয়ে ডার্সিকে অভিবাদন জানিয়ে কলিন্স ক্ষান্ত হোল।

সেদিনের সন্ধ্যা এলিজাবেথের কাছে কোন কারণেই রমণীয় হয়ে উঠল না। বিদায় নেবার কালে ডার্সি নিঃশব্দেই তাদের লক্ষ্য করল মাত্র। জেন ও বিংলে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। আজকের সন্ধ্যাটিতে তারা পরস্পরের হৃদয়ের কাছাকাছি আসতে পেরেছিল, মনে হোল এলিজাবেথের।

যাবার সময় মা বিংলেকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন যে, সামাজিকতার বালাই না রেখে সে যেন অতি অবশ্য এক দিন

তাদের বাড়ীতে এসে আহার করে। বিংলে সকৃতজ্ঞ চিত্তে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে। বিশেষ কাজে তাকে লণ্ডনে যেতে হচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যে ফিরেই সে সানন্দে এক দিন উপস্থিত হবে বেনেট-পরিবারের ভোজন-পর্বে অংশ গ্রহণ করতে।

মায়ের আর তৃপ্তির শেষ রইল না। অন্ততঃ তিন-চার মাসের মধ্যেই তিনি নেদারফিল্ডের এই বাড়ীতে তাঁর মেয়েকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবেন। তাঁর আর একটি কন্যাও যে কলিন্সের সঙ্গে বিবাহিত হবে এও তাঁর পরম আনন্দের কথা। তাঁর সব মেয়েদের মধ্যে এলিজাবেথের প্রতি তাঁর স্নেহ কম? তবু সে যে কলিন্সের মত পাত্রের হাতে পড়বে এও তাঁর কাছে ভালই মনে হোল। কিন্তু বিংলে তাঁর মনকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রইল যে, আর সব তাঁর কাছে পরিম্লান হয়ে গেল।

উনিশ

পরের দিন বেনেট-সংসারে এক নতুন দৃশ্যের অবতারণা হোল। কলিন্স অবশেষে তার প্রস্তাব পেশ করল। মাত্র আগামী শনিবার পর্যন্ত ছুটি থাকায় আর কাল হরণ না করে বিয়ের কথাটা পাকা করে ফেলার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। প্রাতরাশের পর মিসেস্ বেনেট, এলিজাবেথ ও একটি ছোট বোনকে একত্র দেখে সে সাহসী হয়ে মাকে বলল—'আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এখন এলিজাবেথের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে পারি কি?'

বিস্ময়ে এলিজাবেথ রাঙা হয়ে উঠল এবং কোন কিছু করার আগেই মিসেস্ বেনেট তাড়াতাড়ি বলে বসলেন—'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। আমার স্থির বিশ্বাস, লিজি এতে খুশীই হবে। ওর কোনই আপত্তি থাকতে পারে না। কেটি, চল্ আমরা ওপরে যাই।'

—'তুমি যেয়ো না মা—থাক। মিঃ কলিন্স ক্ষমা করবেন আমায়। আমাকে বলার এমন কিছু গোপনীয় থাকতে পারে না আপনার, যা মায়ের শোনা চলে না। আমিও চলি।'

—'না, না, অবুঝ হয়ো না লিজি। তুমি থাক এই আমি চাই।' এলিজাবেথ স্পষ্টত বিব্রত ও বিরক্ত বোধ করছিল এবং কোন অছিলায় পালাবার পথ খুঁজছিল।

—'লিজি, আমি চাই তুমি কলিন্সের কথা শোন।'

এ রকম নির্দেশ লংঘন করার সাধ্য নেই এলিজাবেথের। মুহূর্তের স্থিত চিন্তায় তার বিচার-বুদ্ধি ফিরে এল। তাড়াতাড়ি এবং ঠাণ্ডা মাথায় এর একটা হেস্ত-নেস্ত করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সে জোর করে বসে রইল এবং এটা-ওটায় নিজেকে ব্যস্ত রেখে মানসিক নিপীড়ন গোপন করতে চেষ্টা করল। মিসেস বেনেট ও কিটি চলে গেল ঘর থেকে।

তারা চলে যেতেই সুরু করল কলিন্স—'আমায় বিশ্বাস করো এলিজাবেথ, তোমার এই লজ্জাশীলতা তোমার ক্ষতি করা তো দূরে থাক তোমায় আরো গুণান্বিত করে তুলেছে। এই একটু অনিচ্ছা প্রকাশ না করতে যদি, তোমাকে আমার তত মনোরমা ঠেকত না। বিশ্বাস করো, তোমাকে আজ এ সব কথা বলার সম্পূর্ণ মত নিয়েছি তোমার মা'র। স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা যতই তোমায় সত্য-গোপনে লুব্ধ করুক, ঘুণাক্ষরেও তোমার সন্দেহ জাগতে পারে না আমার উদ্দেশ্যের। এত খোলাখুলি ভাবেই আমি অনুরাগ দেখিয়েছি যে, ভুল বোঝার উপায় নেই। এ বাড়ীতে পা দিয়েই তোমাকে আমার ভবিষ্যৎ জীবন-সঙ্গিনী করে নিয়েছি। কিন্তু ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার আগে বিয়ে করার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত আমার।'

গাম্ভীর্য সত্ত্বেও ভাব-গদগদ কলিন্সের কথাবার্তা এলিজাবেথের এতই হাসির উদ্রেক করল যে সুযোগ পেয়েও তাকে থামিয়ে দিতে পারলে না। আবার সুরু করে কলিন্স—'আমার বিয়ে করার প্রথম কারণ হোল, আমার মত স্বচ্ছল অবস্থার যে-কোন ধর্মযাজকেরই বিয়ে করে গ্রামেতে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ স্থাপন করা উচিত। দ্বিতীয়, আমার স্থিরবিশ্বাস, এতে আমার সুখ আরো বহু গুণ বর্ধিত হবে। তৃতীয় কারণ—অবশ্য কারণটা আমার আগেই বলা উচিত ছিল—অর্থাৎ যে মহীয়সী মহিলাকে আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী বলি, এ তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ও নির্দেশ। দু'বার তিনি স্বেচ্ছায় এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। হান্সফোর্ডে আসার আগের দিন রাত্রেও তিনি বলেছেন—কলিন্স, তোমার বিয়ে করা উচিত। তোমাদের মত ধর্মযাজকদের অবিবাহিত থাকা সঙ্গত নয়। এমন একটি বৌ হওয়া চাই তোমার, যে পরিশ্রমী গৃহকর্মনিপুণা হবে—বড়লোকের আদুরে দুলালী নয়, যে সামান্য আয়ে সুষ্ঠু ভাবে মানিয়ে চলতে জানে। এই রকম একটি মেয়ে যত শীগ্‌গির পার ঘরে আন—আমি নিজে গিয়ে তাকে দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ে আসব। ক্যাথারিন দ্য বুর্গের উপদেশ আমার পক্ষে অবহেলা করা অসঙ্গত। আমি একটুও অতিরঞ্জিত করছি না এলিজাবেথ, নিজে গিয়েই তুমি দেখতে পাবে তিনি কত ভাল। তোমার বুদ্ধি ও সজীবতায় তিনি খুব খুশী হবেন। এই হোল মোটামুটি কারণ। এখন বাকি রইল বলা, কেন নিজের গ্রামে খোঁজ না করে এত দূর আমি কন্যার সন্ধানে এসেছি—যদিও আমাদের ওখানে ভাল মেয়ের অভাব নেই। আসল কারণ তাহলে সুস্পষ্ট খুলেই বলি। তোমার বাবার মৃত্যুর পর আমিই এই সম্পত্তির মালিক হব (ভগবান করুন তিনি দীর্ঘায়ু হোন), কাজেই তাঁর কন্যাদের এক জনকে বিয়ে করাই আমার উদ্দেশ্য—যাতে বাবার অবর্তমানে তাদের বিশেষ কোন ক্ষতি না হয়। আশা করি টাকার কথা পাড়লাম বলে তাতে তোমার শ্রদ্ধা হারাব না। এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই আমার। ধন-সম্পত্তির প্রতি আমার কোনই লালসা নেই। সে রকম কিছু দাবী করব না তোমার বাবার কাছে—জানি, সে দাবী পূরণের ক্ষমতা নেই তাঁর। শতকরা চার পার্সেণ্টের যে হাজার পাউণ্ড তোমাদের ভাগে পড়বে তাও মায়ের মৃত্যুর আগে পাচ্ছ না। কাজেই এ বিষয়ে আমি নীরব থাকব এবং কথা দিচ্ছি তোমায়, বিয়ের পর একটি কথাও এ সম্বন্ধে উচ্চারিত হবে না আমার মুখ থেকে।'

কলিন্সকে এবার থামান দরকার বুঝলে এলিজাবেথ।

—'আপনি বড্ড তাড়াতাড়ি রায় দিয়ে ফেলছেন। ভুলে গেছেন আমার উত্তর এখনও জানান হয়নি। সেই উত্তরটাই দেব এবার। আমার সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ। আপনার প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্বন্ধেও সচেতন আমি কিন্তু আপনাকে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর আমার উপায় নেই।'

কলিন্স সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে উত্তর দিল—'আমাকে আর নতুন করে শেখাতে হবে না। অন্তর থেকে মেয়েরা যাকে চায়

তাকেই প্রত্যাখ্যান করে প্রথমে। দু'বার তিন বারও এ প্রত্যাখ্যান হতে পারে। এই মুহূর্তে যা বললে তাতে হতাশ হবার কারণ দেখছি না। আশা করি, অচিরেই মত বদলাবে তোমার।'

—'আমার শেষ কথা শোনার পরও আপনার আশা করাটা পরমাশ্চর্য। সে-দলের মেয়ে আমি নই যারা দ্বিতীয় বার প্রস্তাবের অপেক্ষায় নিজের সুখ অবধি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। আপনি আমাকে সুখী করতে পারবেন না এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মত মেয়েরও ক্ষমতা নেই আপনাকে সুখী করার। আপনার শুভার্থিনী আমায় দেখলে অযোগ্যাই মনে করবেন।'

—'ধরে নিলাম তাই সত্যি, কিন্তু তোমায় কেন তিনি অপছন্দ করবেন আমার ধারণায় আসছে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হবে আমি তোমার মিতব্যয়িতা, বিনয়নম্রতা ও অন্যান্য স্নিগ্ধ গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করব তাঁর কাছে।'

—'কিন্তু সে প্রশংসা অনাবশ্যক। আমার সম্বন্ধে বিবেচনার ভার আমার উপরেই ছেড়ে দিন—যা বললাম তাই বিশ্বাস করুন। সুখী হোন, আরো ধন লাভ হোক—কামনা করি। আপনাকে প্রত্যাখ্যান দ্বারা এর অন্যথা হওয়া প্রতিরোধ করব সকল শক্তি দিয়ে। এই প্রস্তাবের দ্বারা আপনি আমাদের পরিবারের প্রতি আপনার মনোগত ভাব প্রকাশে যে কিন্তু বোধ করছিলেন তা তো মিটেই গেছে। সুযোগ এলেই লংবোর্ণের সম্পত্তির দখল নিতে পারেন আত্মনিগ্রহের ভাব মনে না এনেই। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেল এ ব্যাপারে ধরে নিতে পারেন'—বলেই চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল এলিজাবেথ। কিন্তু কলিন্স বাধা দিল তাকে।

—'পরে এ সম্বন্ধে আবার যখন কথা হবে, আশা করি তোমার সম্মতিসূচক উত্তর পাব। এখনকার এই নিষ্ঠুরতার জন্য তোমায় নিন্দা করছি না আমি। মেয়েদের স্বভাবই হোল প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা। হয়ত আমার অভিলাষকে আরো উদগ্র করে তোলার জন্যই বিমুখ করেছ আমায়। এই লজ্জাশীলতা মেয়েদের ভূষণ'।'

—'আপনি আমায় সত্যিই বিস্মিত করেছেন মিঃ কলিন্স'—এলিজাবেথের গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠল—'এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলেছি তা যদি আপনি উৎসাহসূচক বলে মনে করে থাকেন তাহলে আপনাকে বিমুখ করার ভাষা আমার জানা নেই।'

—'তোমার এ প্রত্যাখ্যান তো কথার কথা। এ বিশ্বাসের কারণ, আমি তোমার অযোগ্য নই—তা ছাড়া আমার আর্থিক সঙ্গতিও একান্ত কাম্য। জীবনে আমার প্রতিষ্ঠা, লেডী ডু বুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তোমাদের সঙ্গে রক্তের টান—সব কিছুই আমার স্বপক্ষে। এ কথাটাও তোমার ভেবে দেখা উচিত যে, মনোহারিণী গুণাবলী সত্ত্বেও বিয়ের প্রস্তাব আর দ্বিতীয় বার না-ও আসতে পারে তোমার জীবনে। সম্পত্তিতে তোমার অধিকার এতই স্বল্প যে, তোমার সৌন্দর্য, গুণাবলী, সব কিছুই তার তুলনায় নগণ্য হয়ে যাবে। কাজেই তুমি যে সত্য সত্যই বিমুখ করছ না আমায়, ধরে নিতে পারি। বিয়ের প্রসঙ্গকে সংশয়াম্বিত করে প্রেমকে আরো গাঢ়তর হবার সুযোগ দিতে সব সময়েই রাজী আমি। এই রকমই তো প্রকৃতি সুশীলা মেয়েদের।'

—'এক জন শ্রদ্ধেয় লোককে অযথা পীড়ন করার মত শালীনতা-বোধ আমার নেই। আমার উক্তি অকপট বলে গৃহীত হলে বাধিত হব। এই প্রকারের প্রস্তাব দ্বারা আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন সে জন্য আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। আমার মনোভাব সব দিক থেকে এর বিরুদ্ধে। এর চেয়েও স্বচ্ছ করে বলার আর প্রয়োজন আছে কি? আপনি কি এখনও আমায় সুশীলা মেয়ে ভাববেন যে আপনাকে পীড়ন করতে চায়, না ভাববেন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্না মেয়ে যে হৃদয় থেকে সত্যি কথা বলেছে?'

—'কী অদ্ভুত মেয়ে তুমি, এলিজাবেথ'—বললে কলিন্স বিসদৃশ সাহসের ভাব দেখিয়ে—'কিন্তু তোমার বাবা-মা রাজী হলে তুমি তো আর আমাকে নিশ্চয়ই বিমুখ করতে পারবে না।'

এই আত্মপ্রতারণার আর কোন উত্তর দিল না এলিজাবেথ। নিঃশব্দে সে চলে গেল সেখান থেকে। যদি তার এই প্রত্যাখ্যানকে উৎসাহসূচক বলেই গ্রাহ্য হয়, শেষ পর্যন্ত সে তার বাবার শরণাপন্ন হবে—যিনি এমন সন্দেহ-নিরসক ভাষায় তাঁর বক্তব্য বলবেন যে আর ভিন্নার্থ করার সুযোগ হবে না—অন্ততঃ তার আচরণকে সুশীলা মেয়ের প্রেম বা ছলনা বলে ভুল বোঝার অবসর ঘটবে না।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও অমলকুমার ভাদুড়ী

বেঁচে থাকলে

কারখানার কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন জানালে এক জন নাতিবৃদ্ধ কর্মপ্রার্থী, ওভারসিয়ারের পদের জন্য। কারখানার কর্মসচিব আবেদনকারীর আবেদন-পত্রে যে জায়গায় পিতা এবং মাতা থাকলে তাঁদের কত বয়স উল্লেখ করতে হয়, সে জায়গায় যথাক্রমে ১২৮ এবং ১২২ সংখ্যা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়লেন।

আবেদনকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তেই জিজ্ঞেস করলেন কর্ম-সচিব,—তোমার পিতা-মাতার বয়স এত?

—না। উত্তর দেয় আবেদনকারী।—তাঁরা বেঁচে থাকলে ঠিক এই বয়স হ'ত।

নারীর রূপসজ্জা

শ্রীপরীরাণী সেন

নারীর রূপসজ্জা বলিতে কি বুঝিব ? দামী দামী শাড়ী-গয়না পরিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টাকেই রূপসজ্জা বলা হইবে, না সচরাচর সর্বসাধারণ যেমন পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া থাকে, বেশ-বিন্যাসে তাহা হইতে কিছু বেশী পরিপাটি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইতে হইবে ? এর সঙ্গে অবশ্য আর একটি দিকের রূপসজ্জা-সহায়ক প্রথাও যোগ করিয়া বুঝিতে হইবে—এক কথায় যেটিকে বলা যায় 'প্রসাধন'। রূপসজ্জার বাঁধা কোন মান নির্ণয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়, তাই সঙ্গতও নয় ; কারণ বিভিন্ন পরিবারের আর্থিক ক্ষমতার উপর ইহা অনেকখানি নির্ভরশীল।

রূপসজ্জা কে না করে। ইহা পুরুষও করে, নারীও করে। তবে নারী-পুরুষ সবাই প্রাচীন কাল হইতেই মানিয়া লইয়াছে যে, রূপসজ্জা নারীর পক্ষে যেমন প্রয়োজন পুরুষের পক্ষে ঠিক ততখানি নয়। ঐরূপ মানিয়া লইয়াছে বলিয়াই যুগ-যুগব্যাপী কবিগণ নারীর রূপ ও রূপসজ্জার প্রশস্তি গাহিয়া গিয়াছেন। যে-কোন যুগের যে-কোন কবি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠাংশে নারীর রূপ-যৌবন-সাজ-সজ্জার মহিমা কীর্তন করিয়াই যেন কাব্যের মর্যাদা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন !

বাহিরে কোমলতা, কমনীয়তা, পেলবতা এবং অন্তরে স্নেহ, প্রেম, সলজ্জতা···প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক বিশেষত্ব দিয়া ভগবান বৈচিত্র্যময়ী নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি-কল্পনার বর্ণনা-মাধুর্যে নারীর রূপ-যৌবন যেন আরও সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। নারী-হৃদয় প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টির ও পরিপুষ্টির স্বভাবতঃই উর্বর ক্ষেত্র। পুরুষের মনে যে প্রেমের জন্ম, তা বহিঃপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু নারীর মনে তা স্বচ্ছ ফল্গুধারার ন্যায় অলক্ষ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে—বাহ্যিক প্রকাশের জন্য তাহা কখনও উগ্র ভাবে লালায়িত হয় না। তাই সব দিকে কল্যাণময়ী ও প্রেমময়ী নারীর রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সাজসজ্জা ও প্রসাধনের উপযোগিতা সবাই চিরকাল স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। ইহা বোধ হয় সর্বজনগ্রাহ্য সত্য যে, নারী যে রূপচর্চা করিয়া শারীরিক সৌন্দর্যকে কমনীয় ও বরণীয় করিয়া থাকে, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া কবি তাঁহার লেখনীর মুখে, শিল্পী তাঁহার তুলির আলপনায় তাহাকে যেন আরও অপরূপ ও অপার্থিব করিয়া তোলেন।

বাগানে ফুল ফোটে, সবাই দেখিয়া বলে সুন্দর ; কারণ চোখে তাহারা সেই রূপটি দেখিল। কিন্তু যে-ফুলের সৌন্দর্যের সঙ্গে সুগন্ধও রহিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া শুধু সুন্দর বলিয়াই লোক ক্ষান্ত হয় না, সুগন্ধের অনুভূতিতে অন্তর আকুল হয় বলিয়া সে মুগ্ধও হয়, ফুলটিকে অন্তর দিয়া ভালবাসিতেও চায়। কিন্তু নারী প্রাণহীন ফুল মাত্র নয়, তাহা হইতে সে অনেক বেশী। তার প্রাণ আছে, রূপ আছে, গুণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে তার রূপসজ্জার প্রকৃত প্রয়োজন আছে ; তাই সে জন্য নানা দ্রব্য-সম্ভারও রহিয়াছে।

পুরুষ জাতি নারীর শুধু রূপের পূজারী, গুণের নয়—ঠিক এরূপ কথা কেহ নিশ্চয় বলিবে না। তবে তাহাদের প্রেম ও পূজা যে প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ রূপ-সাপেক্ষ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ফুলের বেলায় মানুষ তাহার প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্যের ও সুগন্ধের বাহিরে কিছু না চাহিলেও নারীর বেলায় পুরুষ তাহা চায় ; স্ত্রীর কাছে স্বামী তাহা অন্তরের অন্তস্তল হইতে দাবী করে। তাই তাহার রূপসজ্জার প্রয়োজন অবিসংবাদী ও অপরিহার্য।

নারীর রূপচর্চা প্রভৃতির বহু অনুপম বর্ণনা প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের বর্ণনায় পাওয়া যায় ; কালিদাসের বর্ণনায় তাহা পাওয়া যায় সব চেয়ে বেশী। অতীতে নারীর সাজসজ্জা ও প্রসাধনের ধারা ও উপকরণ ছিল সহজ ও স্বতন্ত্র। কালিদাসীয় ও প্রাক্-কালিদাসীয় যুগের নারী সম্বন্ধে কবিগুরু লিখিয়াছেন :

> "কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে,
> লীলাকমল রইত হাতে কি জানি কোন্ কাজে।
> অলক সাজত কুন্দ ফুলে, শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
> মেখলাতে দুলিয়ে দিত নব নীপের মালা।
> ধারা-যন্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
> লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখত মুখে বালা।
> কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাকত সাজে,
> কুরুবকের পরত মালা কালো কেশের মাঝে।"

আবার—

> "কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায় বক্ষ রইত ঢাকা,
> আঁচলখানির প্রান্তটিতে হংস-মিথুন আঁকা।"

কিন্তু যুগের বিপ্লবময় পরিবর্তনে ও আধুনিক সভ্যতার বিস্তারে সাবেক কালের ধূপের ধোঁয়া, লোধ্র-রেণু, শিরীষ, নীপের মালা প্রভৃতি অচল হইয়া গিয়াছে, আর সে-সবের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে আধুনিক নানা প্রসাধন-সামগ্রী। তাই বর্তমান যুগে এগুলির প্রয়োজন আজকাল আর কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এখন প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে এই যে, নারীর রূপসজ্জা কোন্‌খানে কতটুকু প্রয়োজন এবং কোন্‌খানে ও কিরূপে তাহা অপ্রয়োজন ?

সুদূর অতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত নারীর রূপসজ্জার সর্বপ্রধান সহায় হইতেছে শাড়ী ও গয়না ; তবে এ দু'টির ঢঙ ও রকমারিতে ক্রমেই নূতনত্ব আমদানী হইতেছে। তার মানে, যুগের পরিবর্তিত রুচি অনুযায়ী সব-কিছু যেন নব জন্ম লাভ করিয়া চলিয়াছে। মানুষের মন চলে, তাই পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া নূতনের পানে ছুটিতে চায়। সভ্যতা প্রগতির পথে চলে, তাই রুচির রূপান্তর

ঘটে। অতএব শাড়ী-গয়নার এ সব নূতন নূতন রূপকে নিন্দা করা চলে না। আবার আধুনিক কালের প্রসাধনের দ্রব্য-সম্ভারও রঙে-রূপে-গন্ধে বিশেষত্বপূর্ণ হইয়াই চলিয়াছে, প্রতি সভ্য-সমাজে সেগুলি সমাদর লাভও করিতেছে।

অবিবাহিতা ও বিবাহিতা তরুণীদের রূপসজ্জার ন্যায়সঙ্গত দাবী ও প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। বয়সের সঙ্গে রূপচর্চার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে ইহাদের ক্ষেত্রেও শাড়ী-গয়না-প্রসাধনের একটা শোভন সীমা থাকা চাই। এই সীমারেখাটি বুঝিয়া চলিবার উপর রূপসজ্জার সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে।

আর্থিক অবস্থা, রং, রূপ, শারীরিক স্বাস্থ্য—এ সবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বেশীর ভাগ স্থানে সাজসজ্জা ও প্রসাধন করা হয় না বলিয়াই তা সমালোচনার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। যে-মেয়েটি কলেজে পড়িতেছে, মধ্যবিত্ত পরিবারের সাংসারিক দুরবস্থার উপর আরও আঘাত হানিয়া তাহার শাড়ীর বা প্রসাধনের প্রতি অত্যধিক আনুরক্তি শুধু নিন্দনীয় নয়, উহা অপরাধও। খাদ্যের উপরে যদি ফ্যাসানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে, তেমন মূঢ়তা আর কি হইতে পারে! কিন্তু আজ-কাল স্কুল-কলেজের মেয়েদের অনেকের মধ্যেই তাহাই তো দেখা যায়। ইহারা সুখাদ্যহীন তাই সুস্বাস্থ্যহীন; কিন্তু বান্ধবীদের অনুকরণে নূতন নূতন ঢঙের শাড়ী আর নানা প্রসাধন দ্রব্যের দ্বারা রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির অবিরাম কৃত্রিম চেষ্টা একান্ত শোচনীয়। যদি তাহারা নিজ নিজ অবস্থাকে ডিঙাইয়া ক্রমাগত রুচি-বিকারই দেখাইতে থাকে, তাহা হইলে তা চরম নিন্দনীয় হইতে বাধ্য। স্নেহপুত্তলীদের ঐকান্তিক অনুরোধে আর সময়বিশেষে তাহাদের চোখের জলে বিচলিত হইয়া বহু বাপ-মা যে অমার্জনীয় ভুল করিয়া বসেন, তাহার জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে ভুক্তভোগী হয় ঐ মেয়েরাই। যে তরুণী বয়সের উদ্দাম সময়ে স্বাস্থ্য-সম্পদ হারাইয়া বসিল, তাহার মত কাঙাল আর কে আছে! এখানে অভিভাবকেরা যদি একটু শক্ত হইতে পারেন, রূপচর্চার জন্য আর্থিক ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন না করিয়া যদি মেয়েদের অপেক্ষাকৃত একটু সুখাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে এ সব তরুণীদের স্বাস্থ্যের বনিয়াদ অকালে ভাঙিয়া পড়ার সম্ভাবনা রোধ করা যাইতে পারে। বর্তমানকার পুরুষদের জন্য গড়া শিক্ষা-যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া মেয়েরা অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক শ্রমে এমনই তো অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তার উপর রুচি-বিকারের ছোঁয়াচ লাগিয়া তাহারা যদি ঐরূপ ভুল পথে পরিচালিতা হয়, তাহা হইলে তাহা আশংকার কথা বটে। তাই আর্থিক ক্ষমতার সঙ্গে যতটা সম্ভব সামঞ্জস্যবিধান করিয়া রূপসজ্জার জন্য ব্যয় করা তরুণীদের পক্ষে অতীব প্রয়োজন,—তাহারা কুমারীই হোক বা বিবাহিতাই হোক।

প্রসাধন দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে। সব রংয়ে, সব স্বাস্থ্যে এবং সব রূপে সকল রকম প্রসাধনের দ্রব্য যে মানানসই হইতে পারে না, ইহা নারীমাত্রেরই (আবার উল্লেখযোগ্য ভাবে তরুণীদের) বুঝিয়া চলা কর্তব্য। যে-মেয়েটির রং ময়লা, তাহার অঙ্গে যে-রঙের যে-শাড়ীখানি মানাইবে তাহার তাই ব্যবহার করা সুরুচিসম্মত; ঠিক তেমনি, রঙের সঙ্গে প্রসাধনের দ্রব্যগুলিও সামঞ্জস্যবিধান করিয়া ব্যবহার করা সুরুচির পরিচায়ক। এরূপ সব স্থলে বান্ধবীদের মামুলী অনুকরণ করিয়া চলা সাধারণতঃ হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়, যদিও সজ্জাকারিণীরা নিজেরা অনেকেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ঠিক ঐরূপ শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গেও শাড়ী-জামা-অঙ্গরাগের দ্রব্যাদি যথাসম্ভব খাপ খাওয়াইয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার এগুলির সঙ্গে বয়সের তারতম্যও অবশ্য বিচার্য। যে-শাড়ী বা যে-প্রসাধন দ্রব্য তরুণীদের শোভাবর্ধক, বয়স্কা গৃহিণীদের পক্ষে তাহা হইতে পারে না। অথচ বড়লোকের গৃহিণীদের মধ্যে এ শ্রেণীর রুচিবিকার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। হয়ত তাঁহারা মনে করেন, আমার টাকা আছে, নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী সাজসজ্জা করিলেই গোল চুকিয়া গেল!

কলিকাতার মত সহরে রাস্তা-ঘাটে শাড়ী-গয়না ও প্রসাধন সম্পর্কীয় নানা অশোভন রুচির অনেক বিস্ময়কর নমুনা প্রত্যক্ষ করা যায়। সিনেমা ও থিয়েটার-হলে, কলেজ ও স্কুলে রুচিহীন রূপসজ্জার ও বেমানান চাকচিক্যের যে অদ্ভুত অদ্ভুত বৈচিত্র্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যেমন বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক, তেমনি উপভোগ্য!

ঠোঁট, গাল ও নখ রাঙা করিবার দুরন্ত সখ আমাদের যত কম হয়, ততই মঙ্গল। প্রথমতঃ, রঙের সঙ্গে মানাইয়া তাহা ব্যবহার করিবার রুচি বা বুদ্ধি অধিকাংশের ক্ষেত্রেই দেখা যায় না; আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত রং মাখিয়াও অনেকে সং সাজিতে কুণ্ঠিতা হয় না। গায়ের রং যাহাদের ফর্সা, একমাত্র তাহাদেরই ঠোঁটে-গালে রংয়ের মৃদু প্রলেপ গোলাপী রঙের একটা অপরূপত্ব আনিয়া সৌন্দর্যবৃদ্ধির কিছুটা সহায়ক হইতে পারে। বে-পরিমাণ পাউডার মাখাইয়া মুখখানিকে যে সুষমামণ্ডিত করা যায় না, বরং কৌতুকাবহ কুরূপই ধারণ করে, আবার ঘামে ভিজিয়া কখন কখন তাহা আরও বিকৃত হইয়া ওঠে, এ সহজ সত্যটি প্রসাধন-প্রিয়াদের বোঝা উচিত। উগ্র গন্ধের 'সেণ্ট' (এবং তাহাও আবার অনেকেই যেমনটি করিয়া থাকে, অর্থাৎ বেশী করিয়া) ব্যবহার করাও সুরুচির পরিচায়ক বলা চলে না; কারণ বেশী পাউডারে যেমন রূপসজ্জাটি উৎকট হয় মাত্র, উগ্র গন্ধও তেমনি যেন মানুষটির হইয়া ডাকিয়া বলে, 'ওগো, তোমরা জেনে নাও, আমি যে 'সেণ্ট' মেখেছি'! তার মানে, ইহারা যেন মনে করে, গন্ধে চতুষ্পার্শ্বের লোকের নাক জ্বালাইয়া দিতে না পারিলে আর উহা ব্যবহারের সার্থকতা কি হইল!

এখানে গৃহিণীদের অকাল-বার্ধক্যের বিষয় একটু আলোচনা করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দরিদ্র সব বাঙালী পরিবারগুলিতে গৃহিণীরা দু'-তিনটি সন্তানের জননী হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু শরীরেই আধা-বার্ধক্যের ছাপ মারিয়া বসেন না, সখ সাধ-রূপচর্চায় দিকেও তাঁদের মনের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে বিস্ময়কর ভাবে। হাঁ, এ কথা খুবই সত্য যে, পনের আনা বাঙালী-পরিবারের পক্ষে আজকালিকার কঠিন বাজারে পেটের দানা সংগ্রহ করাই সুকঠিন ব্যাপার। কিন্তু তবু যেখানে যখন ও যতটুকু সম্ভব ন্যায্য সখ-সাধকে জীবিত রাখিয়া চলা নানা দিকে বুদ্ধির পরিচায়ক হইবে সন্দেহ নাই। দৈনন্দিন অভাবের নির্মম কশাঘাত যখন নিত্যকার

তাড়নায় আমাদের বিব্রত করিয়াই চলিয়াছে, তখন মনটাকে সম্ভবক্ষেত্রে একটু সজীব রাখিবার প্রয়োজন গভীর ও অনস্বীকার্য। ক্লিষ্ট মনকে উৎফুল্ল রাখিবার সহায়ক তো হইল আনন্দের প্রচলিত বাহনগুলিই, অর্থাৎ বাহিরে সিনেমা, থিয়েটার ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ এবং ঘরে কিছু কিছু তৃপ্তিদায়ক রূপসজ্জা ও প্রসাধন প্রভৃতি। নারীর মনের উপর আনন্দের আধিপত্য বিস্তারের পক্ষে শেষোক্ত দু'টির কার্যকারিতা প্রায় বাহুমন্ত্রবৎ। অভাব ও অশান্তিতে জর্জরিত মধ্যবিত্ত বাঙালী-পরিবারগুলির গৃহলক্ষ্মী যাঁহারা, গৃহ-পরিবেশে তাঁহাদের মত অভাগিনী খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য; কারণ নিজ নিজ সাংসারিক দুঃখের ঝড়-বাদলের দমকাটা প্রধানতঃ তাঁহাদের উপর দিয়াই নিষ্ঠুর ভাবে বহিয়া যায়! এমন সব স্থলে স্বল্প ব্যয় ও বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা যদি চিত্তবিনোদনের উল্লিখিত বাহনগুলির সহায়তায় অশান্তি-কলুষিত আবহাওয়াটি কখন কখন বদল করিয়া অন্তরকে একটু জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন, সেটা তাঁহাদের পক্ষে মোটেই বিলাস নয়, সবটুকুই বাহাদুরী।

ত' ছাড়া আরও একটি দিক রহিয়াছে। সন্তানবতী গৃহিণীর পর্যায়ে উন্নীত হইলেই স্বামীর মনের চাওয়া-পাওয়ার দিকটি ভুলিয়া গেলে চলিবে না। সাজসজ্জায় অত্যধিক আসক্তি ও অতি মাত্রায় প্রসাধন-প্রিয়া হইতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে না; কিন্তু ঐগুলির প্রতি যুক্তিহীন বিরোধিতা বা বিতৃষ্ণা ভাবও কখনই অনুমোদন করা যাইতে পারে না। কর্মক্লান্ত স্বামী ঘরে ফিরিয়া বাঙালী গৃহলক্ষ্মীদের মুখে 'এটা নাই, ওটা নাই, ছেলের জ্বর, মুদীর তাগাদা'...ইত্যাদি সুমধুর বুলি তো নিয়মিত ভাবে শুনিয়াই থাকেন, কারণ সেটা হইল তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের অক্ষয় কবচ-স্বরূপ! আবার তারই সঙ্গে যদি সহধর্মিণীর রুক্ষ, অপরিচ্ছন্ন ও ঘর্মসিক্ত অপরূপ মূর্তি দেখিতেও তিনি অভ্যস্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তো তাঁহার প্রতি মোটেই সুবিচার করা হইল না। টেবিলের উপর ফুলদানীতে সুগন্ধ ও সুন্দর ফুল না রাখিয়া আবর্জনা শ্রেণীর দ্রব্যাদি গুঁজিয়া রাখিলে তাহা কাহারও পক্ষে রুচিকর হইতে পারে না। প্রেম-ভালবাসার মর্যাদায় স্বামীর চিত্ত বশ থাকিবে এটি খাঁটি কথা, তাহাই আদর্শ মতবাদ; কিন্তু স্ত্রীর দৈনন্দিন নানা রুচিহীন চাল চলনে ও অশোভন পরিবেশে সে পবিত্র প্রেমের মর্মে ভৃঙ্গের কালিমা যোগ হইতে থাকে কি না, তাহাও বিচার্য। উল্লিখিতরূপ শোভন ও সঙ্গত উপায়ে স্বামীর মনের আনন্দ বর্ধন বুদ্ধিমতী ও প্রেমময়ী সহধর্মিণীর একটি পবিত্র কর্তব্য। দেখা যায়, প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই স্বামীরা ইহাতে খুশী হন, তাই মুগ্ধও হন।

প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব অর্থ সঙ্গতির দিকে তাকাইয়া এ-যুগে প্রত্যেক তরুণী ও গৃহিণীর রুচিসম্মত উপায়ে সাজসজ্জা ও অঙ্গরাগ প্রভৃতিতে পরিমিত আসক্তি থাকা কোন মতেই সমালোচনার বিষয় হইতে পারে না, বরং তাহা সর্বতোভাবে শোভন ও সুন্দর। নারী প্রেমময়ী, স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী; তার মনের এ সব অভিনব গুণরাজির সঙ্গে শারীরিক সৌন্দর্য ও সৌকুমার্যের জন্য কিছুটা রূপচর্চার সদভ্যাস যোগ হইয়া তাহার বাহিরটিও পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে থাকিলে তাহার প্রেমরূপ, স্নেহরূপ ও কল্যাণরূপ সাংসারিক জীবন মধুরতর ও অনির্বচনীয় হইয়া উঠিবে।

সত্যিকার গল্প

মীরা চট্টোপাধ্যায়

উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করছেন চিকিৎসকগণ অধিনায়কের আগমন আশায়। কিয়ৎক্ষণ পরেই চিকিৎসকগণের বহু-প্রত্যাশিত মুহূর্ত্ত এল ঘনিয়ে, দূরপ্রান্তে দেখা দিল তাঁর গাড়ী। গাড়ী হতে অবতরণ করতেই অগ্রসর হয়ে আগ্রহান্বিত চিকিৎসকবৃন্দ জানান তাঁকে সংবর্দ্ধনা।

চিকিৎসকগণ সমভিব্যাহারে অধিনায়ক প্রবিষ্ট হন চিকিৎসালয়ে। চিকিৎসালয়ের প্রতিটি কক্ষ তিনি পরিদর্শন করেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। চিকিৎসকবৃন্দের মধুরালাপ এবং চিকিৎসালয়ের সুবন্দোবস্ত তাঁকে প্রীত করে।

চিকিৎসকগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি আরোহণ করেন অপেক্ষারত গাড়ীতে। গাড়ীর অভ্যন্তর হতে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টিপাত হয় পার্শ্ববর্তী কোন এক গৃহাঙ্গনে দণ্ডায়মান শুশ্রূষাকারিণীর প্রতি। চিকিৎসকের নিকট হতে জ্ঞাত হন, রোগীর সংখ্যাধিক্য হওয়ায় চিকিৎসালয়ের কর্তৃপক্ষ দু'জন রোগীকে ঐ গৃহে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হয়েছেন। গাড়ী হতে অবতরণ করে ঐ গৃহাঙ্গন অভিমুখে অগ্রসর হতে হতে চিকিৎসকগণকে সম্বোধন করে বলেন, "একাকী যেতেই আমি বেশী পছন্দ করব, কাজেই আপনারা অনুমতি দিন আমি একাকীই যাচ্ছি।"

এক জন চিকিৎসক তাঁকে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন ঐ গৃহাভিমুখে। পশ্চাৎ ফিরে সে দৃশ্য দেখে কঠিন স্বরে তিনি বলেন, "নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, আমি একাকী যাব স্থির করেছি অতএব একাকীই যাব, আমি প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হই না।" বিমূঢ় এবং হতভম্ব চিকিৎসক করেন নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন আর অধিনায়ক প্রবেশ করেন ঐ গৃহে একাকী।

জল! জল! জল!

কোন পিপাসার্ত্তের বক্ষ বিদীর্ণ করে ঐ তিনটি কথা বেরিয়ে এসে চিকিৎসালয়ের নিস্তব্ধতা করছিল ভঙ্গ আর সকরুণ করছিল আকাশ আর বাতাসকে। এই আর্ত্ত কণ্ঠ শ্রবণ করে ত্বরিত পদে তিনি কক্ষ হতে কক্ষে ছুটতে লাগলেন। সর্ব্বশেষ কক্ষে তিনি এসে দাঁড়ান থমকে, এক মুমূর্ষু সৈনিক এক ফোঁটা জলের জন্ত আকুল কণ্ঠে চীৎকার করছে কিন্তু কোন ব্যক্তি সেখানে নেই উপস্থিত হতভাগ্য সৈনিকের মুখে ঢেলে দিতে এক ফোঁটা জল। স্তম্ভিত এবং বিমূঢ় অবস্থায় তিনি সেই স্থানে থাকেন দাঁড়িয়ে নিশ্চল হয়ে। সৈনিকের আহ্বানে ফিরে আসে তার সম্বিৎ, পার্শ্বের কক্ষ হতে এক গ্লাস জল এনে রোগীটির মুখে দেন ঢেলে।

* * * *

বাহির-দ্বারে অপেক্ষারত চিকিৎসক অধিনায়কের বিলম্ব হেতু প্রবেশ করেন ঐ কক্ষে আর তাঁর নয়নগোচর হয়, অধিনায়ক এক সৈনিকের মুখে দিচ্ছেন ঢেলে জল।

পর-পর তিন গ্লাস জল পান করে পরিতৃপ্ত সৈনিক তাকিয়ে থাকে তার ত্রাণকর্ত্তার মুখের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে। ধীরে ধীরে তার দুই নয়ন পূর্ণ হয়ে ওঠে কৃতজ্ঞতাশ্রুতে, ঝর-ঝর করে ঝরে পড়ে অশ্রু আর অধিনায়কের নিকট মনে হোল এই অশ্রু আশীর্ব্বাদের

দ্যোতক আর সেই আশীর্ব্বাদের পুণ্য ধারায় অভিষিক্ত হয়েছে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ।

* * * *

"কম্যাণ্ডার" কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ে তার এই কথায়।

"কি ভাই? একটু সুস্থ বোধ করছ কি?"

"সুস্থ? সুস্থ হয়ে কি হবে কম্যাণ্ডার? এবার যাওয়াই ভালো। আমার তো সবই পূর্ণ হয়েছে, যা-কিছু ব্যর্থ হয়েছে ভাবি, তাও ব্যর্থ হয়নি, পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে রয়েছেই"—বহু ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকবার পরে আবার বলতে থাকে ধীরে ধীরে—"যা সুখী আমি ভগবান, সত্যি আমার ন্যায় সুখী সারা পৃথিবীতে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং যাবে না। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার স্মৃতির মণিকোঠায় আজকের দিনের এ সুখস্মৃতি সযত্নে লালন করব। উঃ কম্যাণ্ডার……"

"না না ভাই, এ সব কথা নয়, এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করো……"

সেইক্ষণে পার্শ্বে দণ্ডায়মান চিকিৎসক যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে অধিনায়ক বলে ওঠেন—"বাধা দেবেন না, বাধা দেবেন না, এদের সাথে আমি কথা বলতে চাই, চাই এদের সেবা করতে—বলতে বলতে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ে সৈনিকের অঙ্গে।

"কম্যাণ্ডার, মরণে এখন আমার দুঃখ নেই! আপনি স্বহস্তে আমায় জল দিয়েছেন, এ যে আমার স্বর্গ-সুখ! আর কিছু চাই না। না, না, আর কিছু চাই না!" উত্তেজনার প্রাবল্যে শয্যার উপর উঠে বসে সৈনিক।

"এ কি ভাই, সৈনিক তুমি, তুমি তো এ কথা বলতে পার না, তুমি হতে পার না আত্মকেন্দ্রিক, দেশের প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য রয়েছে সে তো তোমার শেষ হয়নি……"

"হ্যাঁ কম্যাণ্ডার, আপনি সত্য কথা বলেছেন, আমি সৈনিক, আমায় হতে হবে সুস্থ, করতে হবে দেশের কাজ—' দারুণ উত্তেজনায় বলে যাচ্ছিল সৈনিক কিন্তু পরক্ষণেই গভীর নৈরাশ্য এসে তাকে পরিব্যাপ্ত করে—"আমারও ইচ্ছে করে কম্যাণ্ডার কিন্তু আর সে সময় নেই। স্বাধীন দেশের সূর্য্য আর তার আলোয় আমায় স্নান করিয়ে দেবে না, তার পূর্ব্বেই মিশে যাব ধরণীর ধূলায়। তাই কি সত্য?"

"না ভাই, এ তো সত্য হতে পারে না, স্বাধীন দেশ তুমি দেখবে আমি নিশ্চয় করে জানি, তোমার মত দেশপ্রেমিক ক'জন হয়! তোমরা চলে গেলে দেশ কাকে নিয়ে থাকবে ভাই? চলে যাওয়া তো তোমার হবে না"—বলতে বলতে অধিনায়কের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে আর সৈনিক স্বপ্ন দেখে স্বাধীন দেশের * * * *

কিয়ৎকাল পরে অধিনায়ক গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হন এবং এসে দাঁড়ান চিকিৎসকদের মাঝে। গাড়ীতে আরোহণ করে চিকিৎসকবৃন্দকে সম্বোধন করে বলেন—"ওদের একটু যত্ন নেবেন—" অশ্রু লুকোবার জন্য মুখ ফিরিয়ে নেন অধিনায়ক, সেই মুহূর্ত্তেই গাড়ী ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায় লাল ধূলি উড়িয়ে।

* * *

অপরাহ্ণ ঘনিয়ে আসে। অধিনায়কের মন-বিহঙ্গ পাড়ি দেয় সেই স্থানে—যে স্থানে শায়িত রয়েছে সেই সৈনিক। কাজকর্ম্মে মন দিতে পারেন না তিনি। তিনি তাঁর দেহরক্ষীকে পাঠান সৈনিকের খোঁজে।

* * *

সন্ধ্যার আঁধার আসে ঘনিয়ে। দেহরক্ষী করে প্রত্যাবর্ত্তন।

—"কেমন আছে সেই সৈনিক?" তাঁর কণ্ঠস্বরের আকুলতায় চমকে ওঠে দেহরক্ষী।

—"সে আর এই পৃথিবীতে নেই।"

—"বেঁচে নেই?"

—"না।"

—"কখন মারা গেছে?"

—"ভোর বেলায়।"

—"আমারি দোষ হয়েছে, আমারই দোষ, আমি যদি ভোরে যেতাম!"

উন্মত্তের ন্যায় তিনি ঘরময় ঘুরে বেড়াতে থাকেন। হঠাৎ গবাক্ষের নিকট দাঁড়িয়ে বলেন, "সূর্য্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই গেছে, সূর্য্য দেখেছে কিন্তু স্বাধীন দেশের সূর্য্য নয়!—তুমি কী জান, ওকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়েছে? খোঁজ নিয়ে এসো। আমি যাব, আমি ওর সমাধির…" শিশুর মত অঝোরে কেঁদে ফেলেন অধিনায়ক।

কেউ জানে কে এই অধিনায়ক? আমাদের বাঙ্গালীর ছেলে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্রষ্টা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

অ্যাটম বোমার দেশে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অমিতা দত্ত-মজুমদার

এর পরে এক দিন অলিভ টেলিফোনে জানালেন যে, পরের দিন আমাকে নিয়ে স্কুল দেখতে যাবেন। সকাল বেলা ৯টার একটু আগেই অলিভ গাড়ী নিয়ে এলেন। স্কুলটির নাম Kay School. সহরের যে অঞ্চলে এই বিদ্যালয়টি অবস্থিত সেই পাড়ার কোনো গণ্যমান্য ও স্মরণীয় ব্যক্তির নামে স্কুলটির নাম হয়েছে। এটি পাব্লিক্ গ্রামার স্কুল। জেন্টলদের ছেলে-মেয়েরা এখানে পড়ে। প্রাইভেট্ স্কুল অত্যধিক ব্যয়সাধ্য বলে অনেকের পক্ষে সন্তানদের সেখানে পড়ানো সম্ভব হয় না। তাছাড়া সঙ্গতি সত্ত্বেও অনেকে ছেলেমেয়েদের সেখানে পাঠান না, কারণ পাবলিক স্কুলে ডিমক্র্যাটিক ভাবটা যতটা অধিগত ও মজ্জাগত হয় প্রাইভেট্ স্কুলে তা হয় না! অ্যামেরিকা ধনিকের দেশ হলেও এখানকার শিক্ষিত সাধারণ কেউ-ই পাড়া-প্রতিবেশী বা পরিচিত জনের মধ্যে আভিজাত্যের ভাবটা বিশেষ পছন্দ করতে পারেন না। এদের সামাজিক সাম্যের ভাব কাগজপত্রে বা আইন সভায় যতটা, বাইরে চলা-ফেরার ক্ষেত্রেও তেমনি। অতি সহজ ভাবে সকলে মেলা-মেশা করতে অভ্যস্ত। কেবল নিগ্রোদের বেলায় ব্যাহত হয় এদের এই সাম্য ভাব; তাদের জন্য এই গণতন্ত্রের দেশেও সব বিষয়েই আলাদা বন্দোবস্ত। সাড়ে ৯টার একটু পরেই আমরা Kay School এ পৌছলাম। প্রথমেই এক শিক্ষয়িত্রীর সাথে দেখা হতে তিনি আমাদের জানালেন যে, মিনিট পাঁচেক পরেই স্কুলে Fire Parade হবে, সেটা হয়ে

গেলেই আমাদের ক্লাস দেখানো হবে। Fire Parade এ দেশের বিদ্যালয় সমূহে প্রতি সপ্তাহে একবার করানো হয়; এ দেশের শৈত্য নিবারণের জন্ম প্রতি বাড়ীকে উত্তাপ যন্ত্র দিবারাত্রি কাজ করে, তার থেকে সময়ে সময়ে অগ্নিকাণ্ড হওয়ার আশঙ্কা—হয়ও মাঝে-মাঝে! কিন্তু আগুনে মানুষ পুড়ে মরার ঘটনা বিরল। Fire brigadeএর ব্যবস্থা খুব ভাল, আর মানুষের অভ্যাসও খুব চমৎকার। এই তৎপরতার শিক্ষা স্কুল থেকেই দেওয়া হয়। এই ব্যাপারটি সেদিন প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ ঘটল! আমরা দু'জন বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা বলছি এমন সময়ে জোরে-জোরে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল; এইটেই বিপদের সঙ্কেত-ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লাসের ঘর থেকে ছেলে-মেয়েরা লাইন করে বেরিয়ে যেতে লাগল। মাত্র আড়াই মিনিট সময়ের মধ্যে দোতলা বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর থেকে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা বেরিয়ে উঠোনে জড়ো হোলো। এই সব ছেলে-মেয়েদের বয়স পাঁচ থেকে বারো পর্য্যন্ত। এরা যে রকম সুশৃঙ্খল ভাবে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল দেখে আশ্চর্য্য হলাম। মিনিট পাঁচেক পরেই আবার সকলে নিঃশব্দে ক্লাসের ঘরে-ঘরে ফিরে এল। তখন সব চেয়ে উঁচু ক্লাসের (৬ষ্ঠ শ্রেণীর) শিক্ষয়িত্রী আমাদের ডেকে নিয়ে তাঁর ক্লাসে গেলেন। সেখানে ছেলে-মেয়েদের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে তাদের জানালেন যে, আমি বিমানযোগে ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকায় পৌঁছেছি। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাবার একটা পথ পেলাম—দেয়ালে টাঙানো ম্যাপের সাহায্যে তাদের বোঝালাম, কোথা থেকে কোন্ কোন্ দেশের উপর দিয়ে আমি এসেছি। তারা আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলো আমাদের দেশের সম্বন্ধে। এখন ঠিক খৃষ্টমাসের আগে ছেলে-মেয়েদের মনে খৃষ্টমাসের কথাই জাগছে; তারা আমায় জিজ্ঞাসা করল, ভারতের ছেলে-মেয়েরা খৃষ্টমাসের সময় কি করে? অনেক বড়রাও এ প্রশ্ন করেছেন। আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ অখৃষ্টান, অতএব সেদেশে খৃষ্টমাস্ বড় পর্ব্ব নয়। অতি অল্পসংখ্যক লোক খৃষ্টান্ এবং তারাই খৃষ্টমাস উৎসব উদ্‌যাপন করে। আমাদের হিন্দুদের অন্য পর্ব্বকাল আছে এবং তখন খুব সমারোহ হয়, যেমন এখানে ক্রীসমাসে হচ্ছে। বড়দিনের সময়ে এখানে যেমন উপহার-বিনিময় হয়, দুর্গাপূজার সময়ে আমাদের দেশেও তেমনি হয়। এই কথাতে এরা খুবই আশ্চর্য্য হয়েছে। পৃথিবীতে খৃষ্টান ছাড়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বহু লোক থাকতে পারে এ ধারণা তাদের কাছে নূতন। আরো নানা প্রশ্ন তারা করল এবং আমায়ও উত্তর দিতে হোলো। মোটের উপর আমার ধারণা হোলো যে, আমাদের দেশের এই বয়সের শিশুদের চেয়ে এদের মন বেশী জাগ্রত; এদের মনে প্রশ্ন জাগে বেশী এবং অপরিচিত আগন্তুককে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে এদের সঙ্কোচ হয় না। তবে এদের বুদ্ধি বেশী এ কথা বলা চলে না। এদের বহু প্রশ্নই শিশুসুলভ এবং অনেক প্রশ্ন অর্থহীনও ছিল। প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ হলে আমি খানিকক্ষণ ক্লাসে পড়ানো দেখলাম। খুব কড়াকড়ি ভাবে ঘণ্টা ভাগ করে বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হয় না এখানে। অনেকটা শিক্ষয়িত্রীর ও ছেলে-মেয়েদের স্বাভাবিক অভিরুচি অনুসারে দৈনিক কার্য্যক্রম চলে। সেদিন তখন ঐ ক্লাসে সাহিত্য পড়া হচ্ছিল। সময়টা ঠিক খৃষ্টমাসের আগে, তাই খৃষ্টজন্ম বা nativity সম্বন্ধে বালকবালিকারা রচনা লিখে এনেছিল শিক্ষয়িত্রীর নির্দ্দেশক্রমে। কয়েক জনের রচনা শুনলাম। নৃত্য এদেশীয় সমাজে একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু; শিশুকাল থেকেই এদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে নাচের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে শেখানো হয়। অপেক্ষাকৃত ছোটদের একটা ক্লাসে শিক্ষয়িত্রী গ্রামোফোনে রেকর্ড লাগিয়ে সেটা বাজাতে আরম্ভ করলেন। শিশুরা আপন আপন ইচ্ছামত তার সঙ্গে নাচতে আরম্ভ করল। যদিও তাদের ভঙ্গি বিভিন্ন, স্বাভাবিক ছন্দবোধ কিন্তু সকলেরই জাগ্রত; এবং কারো কারো ভঙ্গিমাও বেশ লীলায়িত ও সুন্দর।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে পরিচয় হোলো। এই দক্ষ ও কর্ম্মকুশলা রমণী দুইটি বিদ্যালয়ের পরিচালনা করেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, দুইটি বিদ্যালয়ের সমস্ত শিশুর নাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তাঁর নখদর্পণে আছে। বহু পরিচিত জনের নাম মনে রাখবার ক্ষমতা এ দেশের লোকের আশ্চর্য্য, কিন্তু এই মহিলার স্মৃতিশক্তি আমাকে আশ্চর্য্য করে দিল। এ দেশের স্কুলের সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতা বললাম। কলেজের সঙ্গে পরিচয় আরো আগেই সুরু হয়েছে অধ্যাপকের পত্নী হিসাবে। এখানে পৌঁছবার তিন দিন পরেই ছাত্র-ছাত্রীরা আমার সঙ্গে পরিচয় করতে চায় বলে উনি আমাকে ওঁর ক্লাসে নিয়ে গেলেন। এই ক্লাসে সেদিন ফিল্ম দেখানোর কথা ছিল। স্কুলের ক্লাসে গ্রামোফোন শোনানো হচ্ছে, কলেজের ক্লাসে film দেখানো হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! এই ক্লাসের পাঠ্য-বিষয় "ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি"। আমেরিকানদের সব কিছুই সরস, মধুর ও হালকা করে তোলার দিকে ঝোঁক, আর তা না হলে তাদের মন পাওয়া যায় না; আমাদের ভারতীয় অধ্যাপক সে কথা বুঝে চলচ্চিত্রের সাহায্যে ভারতীয় ইতিহাসকে মুখরোচক করে তোলবার চেষ্টা করছেন। ভারতীয় দূতাবাসের দপ্তর থেকে কয়েকখানা ছোট-ছোট মনোরম চিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। ভারতীয় নৃত্য, শিল্প, স্থাপত্য, সঙ্গীত প্রভৃতির কিছু-কিছু পরিচয় পাওয়া যায় এতে। ছবিগুলি উপভোগ্য। আমেরিকার প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই সান্ধ্য ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসগুলো এবং অনেক Undergraduate ক্লাসও সন্ধ্যায় হয়; কারণ তাতে দিনের বেলায় যাঁদের জীবিকার জন্য কাজ করতে হয় তাঁরা উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পান। বেশি বয়সে স্কুল-কলেজে যাওয়াকে আমরা অনেক সময়েই সময়ের ও শক্তির অপব্যয় মনে করি—এ দেশে তা নয়। তার কারণ বোধ হয় অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন ছাড়াও শুধু জ্ঞানচর্চ্চার উৎসাহ এদের আছে। কাজেই সান্ধ্য ক্লাসে নানা বয়সের লোক সমবেত হন। সাধারণতঃ সহরের কর্ম্মকেন্দ্রের কাছাকাছি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অংশ থাকে, তাকে Downtown Campus বলে এবং সেখানে বয়স্কদের ক্লাস হয়। প্রতি সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা ক্লাস হয়, তাতে তিনটি credit hour হয়। এমনি যদি সপ্তাহে চার দিন করা যায় তাহলে বারোটি credit hour হয় এবং দু'বৎসর ধরে নিয়মিত সপ্তাহে বারো ঘণ্টা ক্লাস করলে এম্‌-এ, পরীক্ষা দেবার উপযুক্ত বিবেচিত

হন। তবে সংসারী বা চাকুরে লোকের পক্ষে সপ্তাহে বারোটা ক্লাস করা প্রায় অসম্ভব। অনেকেই ছয়টা ছয়টা করে করেন, তাতে চার বৎসরে তাঁদের এম্‌.এ, দেবার যোগ্যতা হয়। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের দুই বিভাগেই (দিনে ও রাত্রে) খুব ভীড়। যে সব ছাত্রদের যুদ্ধে টেনে নেওয়া হয়েছিল তাদের যুদ্ধান্তে আবার কলেজের পড়া সাঙ্গ করবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। পড়বার সময়ে এদের যাবতীয় ব্যয়ভার সরকার বহন করছেন,—এই বিধানের নাম G. I. bill; মূল ক্যাম্পাসে ও Downtown Campus-এ ছাত্র সমাগমের শেষ নেই, এদের বিদ্যানুরাগ দেখলে কি আনন্দই না হয়। তবে যাঁরা ভিতরের খবর রাখেন তাঁরা বলেন যে, যেমন অন্যত্র তেমনি এখানেও অধিকাংশই আসে ডিগ্রীর জন্য; নিছক বিদ্যানুরাগের জন্য আসে দু'-চার জন মাত্র। আমি নিজে যে দু'টি ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছিলাম তার একটিতে যে সব মহিলারা আসতেন তাঁরা সবাই গৃহিণী শ্রেণীর—কেউ মধ্যবয়সী কেউ বা প্রৌঢ়া। এই বয়সের গৃহিণীরা আমাদের দেশে হলে সংসার-ধর্ম্মের বাইরে আর কিছুতে মনোযোগ দেবার কোনো সুযোগ পান কি? অথচ সংসার-ধর্ম্ম এ দেশের এঁরাও কম করেন না। এক জনের কথা বলি। বয়স বছর চল্লিশ হবে; স্বামী ভাল চাকরী করেন। তিনটি সন্তান; বড়টি মেয়ে, সে ছোটবেলায় শৈশব-পক্ষাঘাত বা Intantile paralysis হয়ে অবসাঙ্গ হয়ে গেছে। স্বামী ভালো চাকরী করেন বলে তাঁর যে বাড়ীতে ঝি-চাকর আছে তা নয়। রান্না-ঘরের কাজ, বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করা এ সব তো নিজে করেনই—উপরন্তু বাগানের কাজও নিজ হাতে করেন। অবস্থার সচ্ছলতা বোঝা যায় তাঁর গাড়ী দেখে। তাও নিজে চালিয়ে আসেন। ড্রাইভার নেই। সপ্তাহে দু'টি সন্ধ্যায় তিনি সারা দিনের পরিশ্রমের পরও পড়তে আসেন স্বামী ও সন্তানদের খাইয়ে রেখে। দাসী-চাকর এ দেশে সহজে মেলে না; কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য সাহায্যকারী পাওয়া যায়। সন্ধ্যার পর ছোট শিশু রেখে যদি মায়েরা বেরোতে চান তবে যতক্ষণ তাঁরা না ফেরেন ততক্ষণ পাড়ার কোনো স্কুলের বা কলেজের ছেলে-মেয়ে সেই শিশুটিকে ভুলিয়ে-রাখা ঘুমপাড়ানো প্রভৃতি করে। অবশ্য এ কাজ তারা করে বিনামূল্যে নয়, পারিশ্রমিক নিয়েই। অনেকে হয়তো এ ভাবে অর্থোপার্জ্জন ক'রে নিজের বই-খাতার খরচটা সবটাই জোগাড় করে নেয়। এই কাজ যারা করে তাদের বলে baby-scater.

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্র ও নগর-মধ্যস্থ কেন্দ্র সম্বন্ধে যা বললাম এ তো কেবল "অ্যামেরিকান্ ইউনিভার্সিটি" সম্বন্ধে। তাছাড়া ওয়াশিংটনে আরো চারটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে—"জর্জ্জ টাউন বিশ্ব-বিদ্যালয়", "জর্জ্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়", "মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়" ও "হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়"। এর মধ্যে প্রথম তিনটি এবং "অ্যামেরিকান্ বিশ্ববিদ্যালয়" সাদা মানুষের জন্য। অতি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নিগ্রো ছাত্র এখানে ভর্ত্তি হতে পারে। "হাওয়ার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়" কেবল মাত্র "রঙীন্" অর্থাৎ নিগ্রো বা নিগ্রোসঙ্করদের জন্য।

আমরা যাকে বলি ভাইস্ চ্যান্সেলার এ দেশে তাকে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট। এ দেশে পৌঁছবার পরে এক দিন "অ্যামেরিকান্ ইউনিভার্সিটির" প্রেসিডেণ্ট ডাঃ ডগলাসের সঙ্গে আমরা দেখা করতে গেলাম। এ দেশে আগে থেকে কথাবার্ত্তা ঠিক না করে কেউ কারো বাড়ী যায় না। আমরাও দেখা করবার নির্দ্দিষ্ট সময় জানিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু ডগলাস্ দিন-রাত কাজে ব্যস্ত, তাই নির্দ্দিষ্ট সময়েও তিনি বাড়ী পৌঁছননি। শুনেছিলাম তিনি অবিবাহিত; এবং তাঁর শূন্য সংসারে তাঁর এক বিবাহিতা ভগিনী সন্তানসহ থাকেন গৃহিণীর মর্য্যাদায়। প্রেসিডেণ্টের বৃদ্ধা মা জীবিতা আছেন, কিন্তু তিনি সচরাচর বাস করেন এক পার্ব্বত্য কৃষিক্ষেত্রে। সেখানে এখন শীত বেশী তাই সহরে চলে এসেছেন। তিনিই আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন এবং আমরা যেন কত দিনের পরিচিত ও স্নেহভাজন এই ভাবে গল্প করতে লাগলেন। আমার ধারণা হয়েছিল যে, ওঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল, কিন্তু পরে জানলাম যে, উনিও এঁকে এই প্রথম দেখলেন। অপরিচিত মানুষের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতার সুরে ভদ্রমহিলা আধ ঘণ্টার অধিক আলাপ করলেন, তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। গল্প করাটাকে সত্যই এরা আর্টের মত চর্চ্চা করে। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন যে, American University থেকে Howard University-র choir দলকে খৃষ্টমাসের প্রস্তুতি সঙ্গীত গাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, আজ তারা ইউনিভার্সিটির মন্দিরে গান গাইবে। আমরা তাঁর সঙ্গে গেলে তিনি খুসী হবেন। আমরা সাগ্রহে সম্মতি জানালাম। নিগ্রোরা এ দেশে গাইয়ে হিসেবে নাম করেছে; এই গানের দলের গানও আমাদের খুবই ভাল লাগলো। নিগ্রো বলতে আমরা যা বুঝি এ দেশের নিগ্রো ঠিক তা নয়। সাদা মানুষের সঙ্গে নিগ্রোদের প্রচুর সংমিশ্রণ হয়েছে এবং তার ফলে এদের গায়ের রংয়ে আফ্রিকার নিগ্রোর মত কৃষ্ণবর্ণ থেকে আরম্ভ করে শ্বেতচর্ম্মের মত রং এবং মাঝের সব রকম শ্যামবর্ণ ও গৌরবর্ণের বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। বাঙালীর মত রং অনেকেরই থাকে। তবুও এদের চুলে এবং ঠোঁটে নিগ্রো জাতির বৈশিষ্ট্য প্রায়ই থেকে যায়। সেই জন্য এদের colored বলে পৃথক্ করা সম্ভব হয়। যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষতঃ দক্ষিণাংশে সাদা-কালোর বিভেদ বড় কড়া। গান্ধীজী না কি লুই ফিশারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আজকাল যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে কয়টা লিঞ্চিং হয়;—কথাটা আজকালও খাটে। ওয়াশিংটন ডি, সি-র ঠিক দক্ষিণে, পটোম্যাক নদীর পরপারে ভার্জ্জিনিয়া ষ্টেট দক্ষিণের অন্তর্গত। সেখানে সাধারণের গম্য স্থানে সর্ব্বত্রই এই বিভেদ দেখেছি; সে কথা পরে বলব। আজ গানের দলে নানা রঙের মানুষের মেলা দেখলাম। গাইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে, কিন্তু শ্রোতার সংখ্যা তার চেয়ে কমই ছিল। পরে শুনলাম, ইউনিভার্সিটিতে সেদিন আরেকটি খেলাধূলার অনুষ্ঠান ছিল, ছেলে-মেয়ের দল সেখানেই গেছে। গান শোনার পর আমরা আবার প্রেসিডেণ্টের বাড়ীতে ফিরে গেলাম। ইত্যবসরে প্রেসিডেণ্ট ফিরেছেন; তাঁর সঙ্গে পরিচয় হোলো। চওড়া মুখ, বড় কপাল ও উজ্জ্বল চেহারার হাসিখুসী মানুষটি। এঁর বিশেষত্ব এই যে, ইনি অসাধারণ খাটতে পারেন। আমাদের সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ গল্প সল্প করলেন। আজকের গল্প-সল্পের প্রধান বিষয় ছিল আমার আকাশ-যাত্রা। অবশেষে কফি ও মিষ্টি খেয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

২১শে ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটিতে খৃষ্টমাস্ ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধ্যা বেলা সেখানে গেলাম। ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই যথারীতি সান্ধ্য-পোষাকে সেজে এসেছেন। পাশ্চাত্য পুরুষের সব রকম পোষাকেই দেহ অতি সুচারুরূপে আবৃত হয়, সান্ধ্য-পোষাকে সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা ও রুচিবোধেরও পরিচয় মেলে। কিন্তু পাশ্চাত্য নারীর দিনের পোষাক বা কাজের পোষাক হ্রস্বতার দিক দিয়ে বিসদৃশ; আর সান্ধ্য-পোষাক নারীর স্বাভাবিক শ্রীর পরিপন্থী। পুরুষের চক্ষে নিজের যৌবনকে লোভনীয় করে তোলবার এমন প্রকট প্রচেষ্টা সমগ্র প্রাচ্য দেশে কোথাও দেখা যায় না। "মেরী গ্র্যাভিন্ হল্" এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী-আবাস। আজকের নিমন্ত্রণ ব্যাপার এখানেই হবে। এখানে দেখলাম, দলে দলে মেয়েরা অর্দ্ধাবৃতা হয়ে প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ছেলেরা মধুলোভী ভৃঙ্গের মত আশে-পাশে গুঞ্জন করছে। মেয়েরা সবাই ছাত্রীর দল; স্তাবকদের মধ্যে ছাত্রও আছেন, নবীন অধ্যাপকও আছেন। কয়েক জন অধ্যাপক ও অধ্যাপক-পত্নীর সঙ্গে পরিচয় হোলো। জন দুই অধ্যাপিকার সঙ্গেও। আলাপ-পরিচয় করতে করতে এগোতে লাগলাম দোতলার সিঁড়ির দিকে—খাবার ব্যবস্থা সেখানে। একটা ঘরে খুব জোরে অ্যামেরিকান্ জাজ্ বাজছে ও নাচ হচ্ছে। ক্রমে ভীড়ের টানে-টানে খাবার-ঘরে পৌঁছলাম। প্রবেশ-পথের মুখে দেখি ডাঃ ডগলাস্ দাঁড়িয়ে সকলকে সম্বর্দ্ধনা করছেন। কয়েক দিন আগেই সহকারী ডীন্ ডাঃ পোজনারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, আজ এখানে তাঁর পত্নীর সঙ্গেও আলাপ হোলো। আমরা তাঁদের নিয়ে এক টেবিলেই খেতে বসলাম। প্রথমে ডীন্ প্রার্থনা করলেন, তার পর সকলে মিলে একটি ধর্মসঙ্গীত (খৃষ্টমাসের উপযোগী) গাওয়া হোলো। তার পর আমরা খেতে বসলাম। মিসেস্ পোজনার আমার পাশে বসেছিলেন। মধ্যবয়স্কা মহিলা, জার্মাণী তাঁর দেশ; মাত্র বছর দশেক আগে স্বামীর সঙ্গে এ দেশে এসেছেন, এ দেশটা এখনো তাঁর ধাতস্থ হয়নি। এ দেশের ছেলে-মেয়েরা বাল্যকাল থেকেই নিজের স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা যে ভাবে পরিচালিত হয় সেটা মোটেই তিনি পছন্দ করেন না দেখলাম। এ সম্বন্ধে আমার কি ধারণা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বল্লাম, "দেখুন, আমরা প্রাচ্য দেশীয় লোক; বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান দেখানোর রীতি আমাদের দেশে যতখানি বেশী তার তুলনায় ইউরোপীয় রীতিও অনেকখানি হাল্কা; আর এ দেশের রীতির তো কথাই নাই। তবে আমি এ দেশে নূতন এসেছি এবং ইউরোপে যাই-ই নি; সুতরাং আমার এই মন্তব্য পুঁথিগত বিদ্যাপ্রসূত; অভিজ্ঞতা-লব্ধ নয়। ক্রমে যখন এ দেশের হালচাল আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখব তখন বলতে পারব। তবে যে রকম শুনেছি বাস্তবিকই যদি তাই হয় তবে আমার যে আপনার চেয়েও খারাপ লাগবে তা আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।" শুনে তিনি খুব হাসলেন। যাক্, আমরা যে টেবিলে খেতে বসেছিলাম তা খুব সুন্দর করে সাজানো ছিল। বাস্তবিক প্রত্যেকটি টেবিলই ছাত্রছাত্রীরা সাজিয়েছিলেন আর খুব সুন্দর করেই সাজিয়েছিলেন। আহারান্তে যথারীতি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সব চেয়ে সুন্দর করে সাজানো টেবিলটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হোলো, এবং সেটা যাঁরা সাজিয়েছেন তাঁদের অভিনন্দন জানানো হোলো। তার পর ছেলে-মেয়ের দল চলল নাচ-ঘরের দিকে; আমরা বিদায় নিলাম।

[ক্রমশঃ।

ভাগ্যলিপি

শ্রীসাধনা মিত্র

তুহিন শীতেল রাত।

পরিষ্কার আকাশ হতে শাদা জ্যোৎস্নার আভা আর শাদা বরফের কুচি এক তালে একসঙ্গে ক্রমাগত ঝরে চলেছে যেন গলা মোমের স্রোত। কঠিন পৃথিবীর দেহের সংস্পর্শে এসেই জমে যাচ্ছে ওগুলো একান্ত হয়ে।

স্লেটন্ কীথের একাংশ।

শহরতলী! মর্ম্মর ধ্বনির চাপা কান্নাতে মুখরিত হয়ে উঠেছে পথের দু'পাশের ত্রস্ত বিবর্ণ পপলার গাছগুলো—হিমবাহী ঝোড়ো ঝাপটার নিরবচ্ছিন্ন আঘাত সহ্য করার শক্তি হারিয়েই হয়তো। মোড়ের মাথায় মাঝারি গোছের সরাইখানাটার হট্টগোলও কেমন নিঃঝুম হয়ে এসেছে দুর্দান্ত শীতের চাপে। মিটমিটে হলদে আলোতে রং-চটা টেবিলগুলোর অস্বাভাবিক চেহারা, শরীর গরম করার অজুহাতে আকণ্ঠ মদ গিলে লুটিয়ে-পড়া বলিষ্ঠ-দেহী শ্রমিকদের কোঁচকানো মুখের ভাব—চার দিকে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে থাকা মাংসের টুকরো, সামুদ্রিক চিংড়ির পা, কাঁকড়ার দাঁড়া, ক্যাম্বিস আর রেক্সিনের খসে-যাওয়া অংশ—সব খণ্ড-খণ্ড বিস্রস্ততা মিলিয়ে কেমন একটা ভীতির ভাবই মনে জাগিয়ে তোলে।

ম্যানেজার নিজের চেয়ারে বসে বসে ঢুলছে। মোটা-সোটা ইহুদী পরিচারিকাটি সন্তর্পণে তার পাশ কাটিয়ে আসবার সময়ে একবার ম্যানেজারের দিকে তাকালো! নাঃ, এখন ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আর ও জাগছে না নিশ্চয়ই। লম্বা বেঞ্চটার একধারে পুরোনো কোটটাকে আঁকড়ে ধরে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে গুটিশুটি মেরে ইহুদী পরিচারিকাটিও কাৎ হোলো। একটু পরেই তার নাক গর্জ্জন করতে আরম্ভ করলো।

এই তন্দ্রা-পুরীর অসুস্থ আবহাওয়া থেকে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টাতেই যেন ওধারের অন্ধকার কোণে নির্দিষ্ট সিটটি ছেড়ে একটি তরুণী সজোরে দাঁড়িয়ে পড়লো। আলোর শেডেতে ওর মুখটি সম্পূর্ণ আড়াল করা। কত দিন—আর কত দিন এ ভাবে এই নারকীয় পরিবেশের মধ্যে কাটাতে হবে? দরিদ্র-কন্যা সে, এই তো উপজীবিকা! কিন্তু কেন তার মনে কেবলি উঁকি মারে বড়ো হবার, এ সব ছাড়িয়ে ঊর্দ্ধে ওঠবার আকাঙ্ক্ষা—অন্তরের গহন কোণে যে আসন রচেছে দুর্লভ যশোলিপ্সা সেখানে তো এই নগণ্য, অপরিচ্ছন্ন হোটেলের ম্যানেজার উলসনের চোখ-রাঙানী পৌঁছোয় না! কিন্তু তুচ্ছ এক পরিবেশনকারিণীর এত স্বপ্নবিলাস কেন—নিজের অবস্থাতে সন্তুষ্ট না হওয়ার প্রয়াস?

টক্ টক্ টক্।

বাইরের দরজাতে টোকা পড়লো। ঝুপ করে মেয়েটি স্বস্থানে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে—বড়ো-বড়ো কল্পনার রঙিন জাল

বোনা ছেড়ে। এত রাতে এই সরাইখানায় কি ধরণের লোক আসে জানা আছে ওর—পাঁড় মাতাল নিশ্চয়ই কোনো—এসেই পা ছড়িয়ে বসে মদের অর্ডার দেবে আর ঐ পানীয়ের অনুপান স্বরূপ লোকটার লোলুপ দৃষ্টি তার নিটোল যৌবন-ভরা সর্বাঙ্গ লেহন করে ফিরবে অথবা সরাসরি কোনো ঘৃণ্য প্রস্তাব করেই বসবে। কেন খালি এই শ্রেণীর লোক এসে ভিড় করে এখানে? কেন আসে না কোনো সুচরিত্র গুণগ্রাহী রাজার ছেলে অথবা সেনাধ্যক্ষ—যে তাকে চিনতে পারবে—স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করবে তার অন্তর, তার পর এই পাঁকের থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে একেবারে বসিয়ে দেবে যশের সিংহাসনে?

টক্ টক্ টক্ টক্। আবার টোকা পড়তে থাকে দরজাতে। মেয়েটি আরো ঘন হয়ে বসে তার জায়গাটিতে। টক্ টক্ টক্ টক্। সাড়া না পেয়ে আগন্তুক এবার বুটের ঠোক্কর দিতে থাকে বন্ধ দরজার 'পরে। সঙ্গে সঙ্গে একটা চীৎকারও শোনা যায়—ওহে কালা ম্যানেজার, হোটেল বন্ধ রেখেই ব্যবসা চালাবে না কি?

মেয়েটি এতক্ষণে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। গলার স্বর, ভাষা, কথা বলার ভঙ্গী ছোটোলোকের মতো তো নয়—যথেষ্ট ভদ্র আর শহুরে। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে সন্তর্পণে মেয়েটি দরজা খুলে দেয়—তিন জন সুবেশ ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে পড়েন। আশে-পাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে তাঁরা মেয়েটির দিকে চোখ ফেরান—সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ফুটে ওঠে তাঁদের চোখে-মুখে—এমন এক পারিপার্শ্বিকে এমন একটি উদ্ভিন্ন-যৌবনা সুশ্রী কিশোরীকে কেমন যেন মানাচ্ছে না—তাঁরা কল্পনা করেননি তো! দরজা কেন এতক্ষণ খোলা হয়নি সে কৈফিয়ৎ আর ওঁদের চাওয়া হোলো না—ওরই মধ্যে অসংস্কৃত খানিকটা জায়গা বেছে নিয়ে ওঁরা বসে পড়ে কফির ফরমাস করলেন। গরম জল চড়িয়ে মেয়েটি ইহুদী পরিচারিকা বেসাকে ডেকে তুললো। উলসন্ ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে; তার ঘরে এমন অসময়ে এতগুলি সম্ভ্রান্ত অতিথিকে দেখে হাঁক-ডাকের চোটে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। অতিথিরা তাকে ব্যস্ত হতে বারণ করে এক পাশে ডেকে নিয়ে কি একটা পরামর্শ করতে লাগলেন যেন মনে হোল। কফি আর বিস্কুট ছাড়া তাঁরা কেউ-ই আর বিশেষ কিছু নিলেন না। দ্বিতীয় বার কফি পরিবেশন করতে গিয়ে খানিকটা গরম কফি পরিবেশনকারিণী—ওঁদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁরি কোলেতে ফেলে দিলে—এত তার হাত কাঁপছিলো। ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে পড়লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ওপরের রং কোটটা খুলে ফেললেন, সেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। উলসন্ চোখ কটমট করে তাকিয়ে একটা বেয়াড়া গালাগাল দিয়ে উঠলো। মেয়েটি লজ্জায় ও ভয়ে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইলো—বসুন্ধরা দ্বিধা-বিভক্তা হলে বোধ হয় তখন সুবিধা হোতো তার। ছি ছি, অমন দামী পোষাকটা অসাবধানতা বশতঃ নষ্ট করে দিলে সে?

ভদ্রলোকটিই কিন্তু বাঁচিয়ে দিলেন তাকে। তিনি এগিয়ে এসে ওর কম্পিত হাত হতে 'ট্রে'টি নিলেন আর অন্য দু'জনকে পরিবেশন করে মিষ্টি ভাবে ওকে বুঝিয়ে দিলেন কি ভাবে পরিবেশন করতে হয়। উলসন্ প্রভৃতি সকলে হাঁ করে রইলো—এমন ঘটনা তাদের জীবনে ঘটেনি—গালাগালির বদলে এ কি? সবাইকে আশাতীত রকম বখশিষ করে তার পর তাঁরা চলে গেলেন। উলসন্ও গেল সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দিতে। ফিরে এসে উলসন্ সালঙ্কারে ভদ্রলোকত্রয়ের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে আরম্ভ করলে। ওঁরা না কি কাছাকাছি কোনো এক গ্রামে ফিল্ম তুলতে এসেছিলেন সকাল থেকেই—খুব বড়ো এক কোম্পানী। ছবি তোলা হয়ে যাওয়ার পর সব ট্রাকগুলি রওনা করে দিয়ে আসতে আসতে এঁদের এত রাত হয়ে যায়। পথের মাঝে গাড়ী খারাপ হয়ে গিয়ে আরও দেরী হয়ে গেল। ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে এক কাপ কফির জন্যেই খুঁজে-খুঁজে ওঁরা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। কথার শেষে উলসন গম্ভীর ভাবে তরুণী পরিচারিকাকে বললে, পরের দিন বিকেলে তৈরী হয়ে থাকার জন্য। আর কিছুই জানা গেল না ওর কাছ থেকে।

পরদিন ঐ ভদ্রলোকেরা আবার এলেন। মেয়েটির বুক ঢিপ ঢিপ করছে—ভাগ্য তাকে নিয়ে আবার এ কি নতুন খেলা আরম্ভ করলে—কতখানি উপহাসাস্পদ হবে সে জন-সমাজে।

উলসনও গাড়ীতে চেপে বসলো সাহস দেওয়ার প্রয়োজনে। সামান্য ছোটো একটু ভূমিকা—প্রথম দিন তো ক্যামেরা আর ফ্লাড লাইটের সামনে একটা কথাও বেরোলো না মুখ দিয়ে। কিন্তু ওর অঙ্গ-সৌষ্ঠব আর ভঙ্গিমা যথেষ্ট মুগ্ধ করলো পরিচালককে। ভাগ্যচক্র ঘুরতে আরম্ভ করলো ধীরে-ধীরে শুভ লক্ষ্যের নির্দেশে।

ষ্টুডিওতে 'এক্সট্রা' হতে ছোট-ছোট ভূমিকায় মেয়েটি দক্ষতা দেখাতে লাগলো ক্রমশঃ। সেই কফি-মাখানো পোষাকটি একবার ও উপহার পেলো ডিরেক্টরের কাছ হতে ভালো অভিনয়ের পুরস্কার-স্বরূপ। প্রথম যেদিন ওর অভিনীত ছবি মুক্তিলাভ করলো সেদিন ওর কি আনন্দ—তা সে যত ছোট পার্টই হোক না কেন।

সেদিনের সেই স্ট্রটন্ কীথের এক নগণ্য হোটেলের পরিবেশন-কারিণী এই ভাবে সুযোগ পেয়ে ধীরে ধীরে হলিউডের তারকা জগতে পরিচিত হল মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই—সেই পৃথিবী বিখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো।

জীবন-দর্পণ

"জীবনটা হ'ল একটা আয়না। তুমি যদি তাকে দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত কর, সেও তাই করবে। তুমি যদি সহাস্যে তার প্রতি তাকাও, সেও হাসতে হাসতে তোমাকে অভিনন্দন জানাবে।"

—থ্যাকারে।

বাংলা সাময়িকপত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—(৩)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইং ১৮৭৯

২৫০। রজনী-রহস্য (মাসিক) : ১ জানুয়ারি ১৮৭৯। ইহাতে কেবল মাত্র উপন্যাস স্থান পাইত। শ্যামাচরণ কুণ্ডু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৫১। কৃষি-তত্ত্ব (মাসিক) : মাঘ ১২৮৫।

পাইকপাড়া নার্শারি হইতে নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কৃষি-বিষয়ক এ ত্র প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

২৫২। ভারত-সুহৃদ (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৫।

ঢাকা, নান্নার হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—অম্বিকাচরণ রায়।

২৫৩। সাহিত্য ভাণ্ডার (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৫।

"এই পত্রিকা স্থলবিশেষে চেম্বর্স ও স্থলে স্থলে পেনি এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার অনুকরণে লিখিত হইবে। কোথাও বা অবিকল অনুবাদ করা হইবে, কোথাও বা অন্যান্য গ্রন্থকারের পুস্তক হইতে বিষয়বিশেষ সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধার করা হইবে।" কলিকাতা বড়বাজার ১৪৭ নং কটন ষ্ট্রীট হইতে মদনমোহন ভট্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৫৪। সমাচার সার (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন ১২৮৫। এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত।

২৫৫। রঞ্জনী (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৫।

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত।

২৫৬। **নব বিভাকর** (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৮৬।

সম্পাদক—গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক, ভবানীপুর এল. এম. এস. কলেজ। ইহা সেকালের একখানি উল্লেখযোগ্য সংবাদ-পত্র। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে 'নব বিভাকর' অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'সাধারণী'র সহিত সম্মিলিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র 'নব বিভাকর—সাধারণী' সম্পাদন করিতেন; ৪র্থ ভাগ, ২১শ সংখ্যা (১৮ ভাদ্র ১২৯৬) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া ইহার বিলুপ্তি ঘটে।

২৫৭। খেয়াল (পাক্ষিক) : বৈশাখ ১২৮৬।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। ইহাতে কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও রস-রচনা স্থান পাইত। সম্পাদক—নন্দলাল রায়। ১২৮৭ সালের বৈশাখ হইতে পত্রিকাখানি 'মাসিক সমালোচকে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

২৫৮। **মাসিক সমালোচক** : বৈশাখ ১২৮৬।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-রচয়িতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

২৫৯। **পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি** (পাক্ষিক) : বৈশাখ ১২৮৬।

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

২৬০। খৃষ্টীয় বান্ধব (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৬।

খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সচিত্র মাসিকপত্র। সম্পাদক—জি. এইচ. রুস (Rouse)।

২৬১। প্রভাত-পঙ্কজ (মাসিক) : আষাঢ় ১২৮৬।

বহরমপুর কলেজের জন-কয়েক ছাত্রের যত্নে প্রকাশিত। সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

২৬২। দুঃখিনী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৬।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত, কবিতাময়ী পত্রিকা। সম্পাদক—ভগবতীচরণ চক্রবর্ত্তী।

২৬৩। **প্রভাতী** (দৈনিক) : শ্রাবণ ১২৮৬।

সুসম্পাদিত পত্রিকা, শিয়ালদহ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

২৬৪। নিরামিষভোজী বালক (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৬।

ইহাতে খাদ্য-বিষয়ক—বিশেষতঃ নিরামিষ খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা থাকিত। পরিচালক—বলরাম লাহিড়ী।

২৬৫। বিশ্ববন্ধু (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৬।

বগুড়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কিশোরীলাল রায়।

২৬৬। **কল্পনা-লতিকা** (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৬।

ভবানীপুর হইতে ভূধর গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও গোপালচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৭ম সংখ্যা (মাঘ ১২৮৬) হইতে পত্রিকাখানির নামকরণ হয় **'কল্পলতা'** এবং 'স্বর্ণলতা'-রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন।

২৬৭। শারদ কৌমুদী (সাপ্তাহিক ?) : ভাদ্র ১২৮৬। ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত সংবাদ-পত্রিকা।

২৬৮। **মেদিনী** (সাপ্তাহিক) : আশ্বিন ১২৮৬।

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—হৃদয়নাথ দাস। ইহাতেই বোধ হয় কবি কামিনী রায়ের রচনা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন:—"মেদিনী নামে মেদিনীপুরে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। পিতা [চণ্ডীচরণ সেন] তাহার জন্য আমাকে কবিতা দিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে "প্রার্থনা" ও "উদাসিনী" শীর্ষক দুইটি কবিতা দিয়াছিলাম, ইহাদের একটিও 'আলো ও ছায়া'য় স্থান পায় নাই।"

২৬৯। **সংশোধনী** (সাপ্তাহিক : আশ্বিন (?) ১২৮৬।

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত।

২৭০। চিন্তা (সাপ্তাহিক) : কার্ত্তিক ১২৮৬।

সম্পাদক—ভূধর চট্টোপাধ্যায়।

২৭১। ভারতদর্পণ (মাসিক…) : অগ্রহায়ণ ১২৮৬।

কলিকাতা পটুয়াটোলা বান্ধব সভা হইতে প্রকাশিত। চারি মাস পরে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; সম্পাদক—তারকনাথ বিশ্বু।

২৭২। ভারত ভিখারিণী (মাসিক) : পৌষ ১২৮৬।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। পরিচালক—হরকুমার মুখোপাধ্যায়।

ইং ১৮৮০

২৭৩। নক্ষত্র (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৬।

শান্তিপুর, খাঁ-পাড়া হইতে প্রকাশিত।

২৭৪। আভাস (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৬।

"ইদানীন্তন বিকৃতাপ্রাপ্ত আচার-ব্যবহারাদির প্রতি লক্ষ্য করা এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। সম্পাদক—ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৭৫। **বিষ-বৈরী** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৭।

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে ব্যাণ্ড অব হোপ দ্বারা প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। সম্পাদক—নন্দলাল সেন।

২৭৬। প্রকৃতি (মাসিক): বৈশাখ ১২৮৭।

ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত "বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।" সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। ১২৯০ সাল হইতে ইহা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গলতা'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

২৭৭। কৃতজ্ঞতা-কাব্য-কুসুমোপহার (ত্রৈমাসিক):

ইহাতে কবিতাই—বিশেষতঃ মহারাণী স্বর্ণময়ীর গুণগরিমাসূচক কবিতাই স্থান পাইত। সম্পাদক—অঘোরনাথ ঘোষ।

২৭৮। নলিনী (মাসিক): বৈশাখ ১২৮৭।

সে-যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। ইহার প্রথম তিন পল্লবে 'মহিলা'র কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনেকগুলি অপ্রকাশিত গদ্য-পদ্য রচনা স্থান লাভ করিয়াছিল। সম্পাদক—নরেন্দ্রনাথ বসু।

২৭৯। ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক): বৈশাখ (?) ১২৮৭।

ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত।

২৮০। আর্য্যপ্রভা (মাসিক): বৈশাখ ১২৮৭।

ময়মনসিংহ, দুর্গাপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর। ইহা প্রকৃতপক্ষে পূর্বপ্রকাশিত 'আর্য্যপ্রদীপ' পত্রেরই নামান্তর মাত্র।

২৮১। উপহার (মাসিক): জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭।

শোভাবাজার কলিকাতা হইতে রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ইহা প্রকাশ করিতেন।

২৮২। সমীরণ (মাসিক): জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭।

পল্লীগ্রাম জণড়া হইতে প্রকাশিত। পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী—কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইহার ২য় খণ্ড মাখনলাল দত্তের সম্পাদনায় ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়।

২৮৩। কুসুম (মাসিক): শ্রাবণ ১২৮৭।

সম্পাদক—রাধামাধব হালদার।

২৮৪। বঙ্গরহস্য (সাপ্তাহিক): ২২ আগষ্ট ১৮৮০।

ইহা পূর্ব্বে 'বাঁদরামী' নামে প্রকাশিত হইত। পরিচালক—দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।

২৮৫। অপূর্ব্ব রহস্য (মাসিক): শ্রাবণ ১২৮৭।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত, হাস্য-প্রধান পত্র। পরিচালক—হরিহর নন্দী।

২৮৬। লাট্‌চৌষধি (সাপ্তাহিক): ২৬ আগষ্ট ১৮৮০।

সম্পাদক—দেবকান্ত বাগচী।

২৮৭। হিন্দুদর্শন (মাসিক): ভাদ্র ১২৮৭।

স্বল্প মূল্যের একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র। সম্পাদক—বিধুভূষণ মিত্র।

২৮৮। নব ভারতী (মাসিক): ভাদ্র ১২৮৭।

সম্পাদক—ধরণীধর সরকার।

২৮৯। জ্ঞানপ্রভা (মাসিক): ভাদ্র ১২৮৭।

সংস্কৃত-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র। সম্পাদক—কুমার উমেশচন্দ্র রায় ও শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী।

২৯০। রহস্য-মঞ্জরী (মাসিক): ভাদ্র (?) ১২৮৭।

পরিচালক—জণড়া-নিবাসী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২৯১। কল্পনা (মাসিক): আশ্বিন ১২৮৭।

সে যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা। সুলভে সাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। চতুর্থ বর্ষের (মার্চ ১৮৮৩) পত্রিকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের রচনায় অলঙ্কৃত হইয়াছিল। সম্পাদক—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৯২। ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিবাদ (মাসিক): আশ্বিন ১২৮৭।

কালীঘাটস্থ হিন্দু মিশনরী সোসাইটির মুখপত্র। খৃষ্টধর্ম্মের সহিত তুলনায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।

২৯৩। মাধবী (পাক্ষিক): কার্ত্তিক ১২৮৭।

পরিচালক—মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২৯৪। পরিদর্শক (সাপ্তাহিক): ইং ১৮৮০।

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি তাঁহার Memories of my Life and Times পুস্তকে লিখিয়াছেন —..."a new Bengalee weekly was started in Sylhet about the middle of 1880, and I was invited to be its editor...The name of our new Bengalee weekly was 'Paridarshak'...Like the 'Bharat Mihir' of Mymensingh, the 'Paridarshak' of Sylhet also almost from its birth commended public attention and soon became one of the most powerful exponents of educated public opinion not only of the district of Sylhet but more or less of the whole province of Bengal...It was my first Independent charge in journalism, and my subsequent career in this line has been very largely indebted to this first opportunity that my Sylhet friends found me."

২৯৫। আদরিণী (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১২৮৭।

সুলভ মূল্য, নিয়মিত প্রকাশ ও সাধারণের মনোরঞ্জন—এই তিনটি গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনীর আবির্ভাব হয়। সম্পাদক—তারকনাথ বিশ্বাস।

ইং ১৮৮১

২৯৬। ভিষক্ (মাসিক): জানুয়ারি ১৮৮১।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত, ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র। পরিচালক—দুর্গাদাস রায়।

২৯৭। খৃষ্টীয় মহিলা (মাসিক): মাঘ ১২৮৭।

ইহা কেবল মাত্র মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত হইত। সম্পাদিকা—কুমারী কামিনী শীল।

২৯৮। বিক্রমপুর প্রকাশ (মাসিক): মাঘ ১২৮৭।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

২৯৯। ভারতবন্ধু (সাপ্তাহিক): ইং ১৮৮১।

৩০০। চারুবার্ত্তা (সাপ্তাহিক): বৈশাখ ১২৮৮

শেরপুর হইতে প্রকাশিত। পূর্ব্ববঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক দীনেশচরণ বসু কিছু দিন ইহার সম্পাদক ছিলেন।

৩০১। **সজ্জনতোষণী** (মাসিক): বৈশাখ ১২৮৮।

বৈষ্ণব পত্রিকা। প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ হইবার প্রায় দুই বৎসর পরে (মাঘ ১২৯১) ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—কেদারনাথ দত্ত।

৩০২। **সদানন্দ** (মাসিক): বৈশাখ ১২৮৮।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। "রস-প্রধান বিদ্রূপ পত্র ও সমালোচন"। প্রকাশক—হরিহর নন্দী।

৩০৩। পাটনা ধর্ম্মসভা মাসিক পত্রিকা: বৈশাখ ১২৮৮।

বাঁকীপুর হইতে প্রকাশিত, বাংলা-ইংরেজী-হিন্দী পত্র। পরিচালক—অম্বিকাচরণ ঘোষ।

৩০৪। **রসিকরাজ** (মাসিক): জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮।

হাস্যোদ্দীপক, বিদ্রূপাত্মক সচিত্র মাসিকপত্র।

৩০৫। সাহস (সাপ্তাহিক): জুন ১৮৮১।

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। কয়েক মাস পরে ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্রে পরিণত হয়।

৩০৬। বেঙ্গল মিসলেনি (মাসিক): জুন ১৮৮১।

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত, ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র। সম্পাদক—জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩০৭। তন্ত্রকল্পতরু (মাসিক): আষাঢ় ১২৮৮।

সম্পাদক—প্রসন্নকুমার কর চৌধুরী।

৩০৮। হালিশহর প্রকাশিকা (সাপ্তাহিক): আষাঢ় (?) ১২৮৮।

কলিকাতা হইতে নবীনচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনা স্থান পাইত।

৩০৯। বিশ্বাসী (মাসিক): ভাদ্র ১২৮৮।

"যাঁহারা নববিধানের গভীর তত্ত্ব ও উচ্চ ভাব সহজে বুঝিতে চান, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশ ও গল্প পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চান, তাঁহাদিগের জন্য।" পরিচালক—নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

৩১০। চন্দ্রিকা (মাসিক): ভাদ্র ১২৮৮।

উদয়পুর হইতে প্রকাশিত, সম্ভবতঃ বাংলা সাময়িক-পত্র।

৩১১। **ধর্ম্মবন্ধু** (পাক্ষিক...): ১ আশ্বিন ১২৮৮।

"ইহাতে সাধারণের পাঠোপযোগী ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত ও সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা" স্থান পাইত। সম্পাদক—শশিভূষণ বসু। চারি বৎসর পরে—১৮০৭ শকের বৈশাখ (ইং ১৮৮৫) হইতে 'ধর্ম্মবন্ধু' মাসিক আকার ধারণ করে। ১৮৯০ সনে ইহার সম্পাদক হন—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৩১২। সরস্বতী (মাসিক): আশ্বিন ১২৮৮।

পরিচালক—নন্দলাল ঘোষ।

৩১৩। হোমিওপ্যাথিক প্রচারক (মাসিক): আশ্বিন ১২৮৮।

বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩১৪। শ্রীক্ষেত্র চিত্র (মাসিক): আশ্বিন (?) ১২৮৮।

ঢাকা হইতে ক্ষেত্রচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩১৫। উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা (মাসিক): আশ্বিন ১২৮৮।

ইহাতে উপন্যাস স্থান পাইত। প্রকাশক—রাজেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, টালা।

৩১৬। সাহিত্য-দর্শন (মাসিক): ১২৮৮ সাল।

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত।

৩১৭। **আচার্য্য** (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৮৮।

নড়াইল হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

৩১৮। বালক-হিতৈষী (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৮৮।

বালকপাঠ্য। পরিচালক—জানকীপ্রসাদ দে।

৩১৯। বঙ্গ-সুহৃদ (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৮৮।

শেরপুর, ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৩২০। আর্য্যকাহিনী (সাপ্তাহিক): ৮ নবেম্বর ১৮৮১।

বালক-বালিকাপাঠ্য। সম্পাদক—সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

৩২১। নিরপেক্ষ ধর্ম্মতত্ত্ব (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৮৮।

নিরপেক্ষ ধর্ম্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র।

৩২২। **বঙ্গবাসী** (সাপ্তাহিক...): ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮ (১০-১২-১৮৮১)।

"বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার। রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাদ-পত্র।" এই অতিপরিচিত পত্রিকাখানি যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তদীয় বন্ধু উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের সহযোগে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম সম্পাদক—জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম-এ, বি-এল।

ইং ১৮৮২

৩২৩। চিত্তরঞ্জিনী (দ্বৈমাসিক): হেমন্ত, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১২৮৮।

শ্রীবাটী সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত। "সংক্ষেপতঃ সামাজিক বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনাই এই চিত্তরঞ্জিনী বা সচিত্র ঋতু-পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র।

৩২৪। হরিভক্তিতরঙ্গিণী (মাসিক): পৌষ ১২৮৮।

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। "পত্রিকাখানির দ্বারা নববিধান প্রচার করাই উদ্দেশ্য।"

৩২৫। দি ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক রিভিয়্যু (মাসিক): জানুয়ারি ১৮৮২।

ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র। সম্পাদক—বিহারিলাল ভাদুড়ী, এল. এম. এস.।

৩২৬। অতিথি (মাসিক): মাঘ ১২৮৮।

বঙ্গের সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে আলোচনাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। বেহালার রায় এণ্ড ফ্রেণ্ডস্ ইহা প্রকাশ করিতেন।

৩২৭। অবকাশ (মাসিক): মাঘ ১২৮৮।

'কল্পনা'-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "নবন্যাসপূর্ণ মাসিকপত্র"। সম্পাদক—যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৩২৮। বঙ্গবিলাপ (মাসিক): মাঘ (?) ১২৮৮।

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। পরিচালক—কাশীনাথ চৌধুরী।

৩২৯। পারিজাত (মাসিক): ফাল্গুন (?) ১২৮৮।

পরিচালক—হরচন্দ্র দাস।

৩৩০। শিবদায়িকা পত্রিকা (মাসিক): ফাল্গুন (?) ১২৮৮।

কালীচন্দ্র লাহিড়ী-সম্পাদিত 'জ্ঞানদীপিকার' নামান্তর।

৩৩১। কল্পতরু (মাসিক): ১২৮৮ সাল।

সম্পাদক—অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত।

৩৩২। **প্রবাহ** (মাসিক): ১ বৈশাখ ১২৮৯।

উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র। সম্পাদক—দামোদর মুখোপাধ্যায়। স্থিতিকাল দুই বৎসর। ১৩১১ সালের মাঘ মাস হইতে 'প্রবাহ' পুনঃপ্রচারিত হয়; এবারও দুই বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই।

৩৩৩। **সচিত্র বিজ্ঞান-দর্পণ** (মাসিক): বৈশাখ ১২৮৯।

"ইহাতে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাষায় গ্রথিত ও সমালোচিত বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলের সরল বাঙ্গালায় অনুবাদ মাত্র সন্নিবিষ্ট হইবে।" সম্পাদক—প্রাণানন্দ কবিভূষণ; তৃতীয় বর্ষ হইতে বীরেশ্বর পাঁড়ে ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন।

৩৩৪। গোপাল ভাঁড় (মাসিক): বৈশাখ ১২৮৯।

"রহস্যজনক মাসিকপত্র।" সামাজিক কুনীতি দূরীকৃত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্পাদক—কিষণলাল বর্ম্মণ।

৩৩৫। বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক): বৈশাখ ১২৮৯।

পাবনা হইতে প্রকাশিত।

৩৩৬। ঋষিতত্ত্ব (মাসিক): বৈশাখ ১২৮৯।

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত "বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষাদি যুক্তি ও আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিকপত্র ও সমালোচন।" সম্পাদক—অন্নদাচরণ সরস্বতী।

৩৩৭। দর্পণ (মাসিক): জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯।

কুমিল্লা সুহৃদ্ সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩৩৮। ভারতহিতৈষী (পাক্ষিক): জ্যৈষ্ঠ (?) ১২৮৯।

বরিশাল হইতে প্রকাশিত।

৩৩৯। রামধনু (সাপ্তাহিক): জুন ১৮৮২।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত শিল্প বিজ্ঞানাদি বিষয়ক সচিত্র পত্রিকা। সম্পাদক—সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ, ঢাকা কলেজের ল্যাবরেটরি অ্যাসিষ্টাণ্ট।

৩৪০। নবীন (মাসিক): আষাঢ় ১২৮৯।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—প্রসন্নকুমার গুহ।

৩৪১। স্বদেশ সংস্কারক (মাসিক): আষাঢ় ১২৮৯।

সম্পাদক—হরিমোহন রায়।

৩৪২। প্রতিভা (সাপ্তাহিক): আষাঢ় (?) ১২৮৯।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

৩৪৩। প্রতিবাদ (মাসিক): শ্রাবণ ১২৮৯।

সম্পাদক—অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

৩৪৪। মালা (মাসিক): শ্রাবণ ১২৮৯।

সম্পাদক—মাখনলাল দত্ত।

৩৪৫। উষা (মাসিক): শ্রাবণ (?) ১২৮৯।

পাবনা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—তারকনাথ অধিকারী।

৩৪৬। ভারতবাসী (সাপ্তাহিক): ভাদ্র ১২৮৯।

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত।

৩৪৭। বিদ্রূপ (সাপ্তাহিক): ভাদ্র ১২৮৯।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক পত্র। সম্পাদক—কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

৩৪৮। দিল্লীকা লাড্ডু (মাসিক): ভাদ্র ১২৮৯।

সম্পাদক—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

৩৪৯। **সুরভি** (সাপ্তাহিক): ১ আশ্বিন ১২৮৯।

"এ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আলোচনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার করা 'সুরভি'র উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—যোগীন্দ্রনাথ বসু। ইহা রাজনারায়ণ বসুর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইত। বছর-চারেক পরে পত্রিকাখানি 'পতাকা'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'সুরভি ও পতাকা' নাম ধারণ করে।

৩৫০। বঙ্গবন্ধু (মাসিক): অক্টোবর ১৮৮২।

খৃষ্টতত্ত্বমূলক পত্র। সম্পাদক—রেঃ বরদাচরণ ঘোষ।

৩৫১। **প্রজাবন্ধু** (সাপ্তাহিক): আশ্বিন ১২৮৯।

গোন্দলপাড়া (ফরাসী চন্দননগর) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৫২। ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকন্যার পুঁথি (মাসিক): আশ্বিন ১২৮৯।

ইহাতে বশীকরণ ও দ্রব্যগুণ দ্বারা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রিয়া-প্রদর্শনের প্রক্রিয়াসকল স্থান পাইত। প্রকাশক—রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ, টালা।

৩৫৩। আর্য্যরঞ্জন (মাসিক): আশ্বিন ১২৮৯।

বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

৩৫৪। জাতীয় সুহৃৎ (পাক্ষিক): আশ্বিন (?) ১২৮৯।

৩৫৫। জ্ঞানবিকাশিনী (সাপ্তাহিক): অগ্রহায়ণ (?) ১২৮৯।

ঢাকা হইতে 'সুলভ সমাচারে'র আদর্শে প্রকাশিত।

৩৫৬। প্রেমপ্রচারিণী (পাক্ষিক): অগ্রহায়ণ ১২৮৯।

বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য। পরিচালক—কিশোরীমোহন পাল।

৩৫৭। সুখসরোজ (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১২৮৯।

সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি সম্বলিত মাসিকপত্র। পরিচালক—সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়।

৩৫৮। আর্য্যপ্রতিভা (মাসিক): অগ্রহায়ণ (?) ১২৮৯।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। প্রকাশক—কালীচরণ পাল।

৩৫৯। বঙ্গবন্ধু (মাসিক): পৌষ ১২৮৯।

শ্রীরামপুর হইতে রামচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

জলপাইগুড়িতে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর সন্ন্যাসী দল নিরুৎসাহ না হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। ১৭৭৩ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ইহাদের পুনরাবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া যায় এবং এই বৎসরেই বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। বগুড়ার কালেক্টার মিঃ হাচ, কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক সংবাদ পাঠান যে, চৌগাঁ অঞ্চলে জমিদারের নায়েবকে সন্ন্যাসী দল বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। উপযুক্ত মুক্তিপণ ব্যতীত তাহার উদ্ধারের আশা নাই। সেই সময় তিন সহস্র সন্ন্যাসী বগুড়া হইতে ১২ মাইল দূরে সেরপুরে অবস্থান করিতেছিল।

৮ই জানুয়ারী মিঃ হাচের আর এক পত্রে প্রকাশ যে, বগুড়ায় অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ ৮০টি গরুর গাড়ী, এক শত ঘোড়া সমেত দুই সহস্র সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত এলাকায় সশস্ত্র সন্ন্যাসী দলের আবির্ভাবে তিনি প্রমাদ গণিলেন। সন্ন্যাসীদের সহিত কোন প্রকার সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য জমিদারদের পক্ষ হইতে দুই জন নায়েব ও কোম্পানীর উকিল সমেত সন্ন্যাসী দলপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভিসন্ধি জ্ঞাত হন। বারো শত টাকার বিনিময়ে সন্ন্যাসী দল স্থানত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয়। জমিদারগণ অর্থ প্রদানে স্বীকৃত হইলে কোম্পানীর কোষাগার হইতে উক্ত অর্থ জমিদারগণকে অগ্রিম হিসাবে দেওয়া হয়। অর্থপ্রাপ্তির পর সন্ন্যাসী দল বগুড়া হইতে শিবগঞ্জে গিয়া আরও চারি সহস্র সন্ন্যাসীর এক দলের সহিত মিলিত হয়।

এই সংবাদ অবগত হইয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডকে অবিলম্বে সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে চিলমারী অভিমুখে যাত্রা করিবার আদেশ দেন। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড তিন কোম্পানী সিপাহী সৈন্য লইয়া ১৭ই জানুয়ারী রংপুর জেলার অন্তর্গত উলিপুর হইয়া পর-দিবস চিলমারীতে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিত হইয়া জানিতে পারেন যে, ১২ই তারিখে সন্ন্যাসীদের একটি ক্ষুদ্র দল তথায় পৌঁছাইয়া স্থানীয় জমিদার ও দুই জন বিশিষ্ট অধিবাসীকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদের নিকট হইতে ১৩০০৲ টাকা আদায় করে। অনুসন্ধানে আরও জানা যায় যে, সন্ন্যাসী দল দেওয়ানগঞ্জ, বসনাপুর হইয়া ময়মনসিংএর মধুপুর জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছে। উক্ত জঙ্গলে সন্ন্যাসী দলপতিদের স্থাপিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজিও পরিলক্ষিত হয়। জঙ্গলে আত্মগোপন করার পর সন্ন্যাসীদের গতিবিধি ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নাই।

২৬শে জানুয়ারীর এক পত্রে ঢাকার কালেক্টার বলেন, "আমি অদ্য ময়মনসিংএর পরগণা-জমিদার কিষেণ রায়ের নিকট হইতে ২০শে জানুয়ারী তারিখের এক পত্র পাইয়াছি। উক্ত পত্রে জানা যায় যে, দরিয়ান গিরির নেতৃত্বে ৫ হাজার সন্ন্যাসীর একটি দল জামালপুরের অন্তর্গত জাফরশাহী পরগণায় প্রবেশ করিয়াছে। স্থানীয় জমিদারের নায়েবকে আটক রাখিয়া ইহারা ১৬ শত টাকা আদায় করে। ইহার পর সন্ন্যাসিগণ মধুপুর, মুক্তাগাছা জমিদারের আলাপসিং পরগণা হইয়া ময়মনসিং অভিমুখে যাওয়ার সংবাদ পাইয়াছি।"

উক্ত পত্রে আরও জানা যায় যে, মতি গিরির অধীনে ছয় হাজার সন্ন্যাসীর আর একটি দল দরিয়ান গিরির দলের সহিত মিলিত হইবার জন্য ময়মনসিংএর দিকে যাত্রা করিয়াছে। দলের সামরিক শক্তির এক বর্ণনা করিয়া পত্রলেখক বলেন যে, ইহাদের সহিত প্রচুর গাদা বন্দুক, বল্লম ও অন্যান্য সামরিক অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে।

২১শে জানুয়ারী কালেক্টারের নিকট প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, প্রায় ৩৫০০ শত সন্ন্যাসীর একটি দল আলাপসিং পরগণায় প্রবেশ করিয়া জমিদারদের গোমস্তা কিঙ্কর সরকার ও রমাপ্রসাদ রায়ের গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি জমিদার ৩৫০০৲ টাকা খেসারত দিয়া আত্মরক্ষা করে। কোম্পানীর গুপ্তচর বিভাগের এক সংবাদে জানা যায় যে, জরওয়াল গিরির অধীনে একটি দল ১৫টি নৌকা-যোগে চিলমারীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

কোম্পানীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ঢাকার কালেক্টার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এক পত্রে জানান যে, ৫ হাজার সন্ন্যাসীর একটি দল ঢাকার নিকটবর্ত্তী কাগমারী অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের প্রতিরোধের জন্য তিনি নোয়াখালী ও যশোহর হইতে কয়েকটি সিপাহী দল চাহিয়া পাঠান। ৬ই ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, সন্ন্যাসীরা পাথরঘাটা হইয়া বংশী নদী অতিক্রম করিয়া

গোঁসাই বিদ্রোহী দল

মধুপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। গতিবিধি দেখিয়া কোম্পানীর লোকেরা সন্ন্যাসী দলের গন্তব্য-স্থল ঢাকা বলিয়া মনে করেন। সেই জন্ত ঢাকাকে উপযুক্ত ভাবে সুরক্ষিত করা হয়। কিন্তু এক দল সন্ন্যাসী ঢাকা অভিমুখে আসিয়া প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। উক্ত ঘটনার পর মনে হয়, সন্ন্যাসীদের কর্ম্মসূচীর পরিবর্ত্তন ঘটে।

৭ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, সন্ন্যাসিগণ পুনরায় বংশী নদী পার হইয়া আতিয়া পরগণা অভিমুখে গিয়াছে। সন্ন্যাসীরা যখন মধুপুরের জঙ্গলে অবস্থান করিতেছিল তখন ঢাকার কালেক্টার হরকরা মারফৎ সংবাদ পান যে, কোম্পানী সৈন্ত বাইগুনবাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

সন্ন্যাসী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংবাদ জানিতে পারিয়া দিনাজপুরের কালেক্টার ও সারকিট কমিটি জলপাইগুড়িতে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টকে অবিলম্বে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের সহিত যোগদান করিতে নির্দ্দেশ পাঠান। ইহা ছাড়া ক্যাপ্টেন জোন্সকে অবিলম্বে পাঠাইবার জন্ত রংপুরের কালেক্টারকে আদেশ পাঠান হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে জানা যায় যে, হনুমন্ত গিরির অধিনায়কত্বে এক দল সন্ন্যাসী ৬ই ফেব্রুয়ারী আতিয়া হইতে পাফুল্লা পৌছিয়াছে। মিরজাপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের জনৈক জমিদারের গোমস্তা রামলোচন বসুর নিকট হইতে ৪২০০ শত টাকা আদায় করিয়া জমিদারের উকিলকে ঢাকা যাইবার পথ জোর করিয়া দেখাইতে বাধ্য করে। উক্ত দল সেই দিনই বিহহাটি আসিয়া পৌছায়। তথায় কোম্পানীর সিপাহী সৈন্যের অবস্থানের সংবাদ পাইয়া তাহারা টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কাকনপুর, পাথরঘাটা হইয়া মধুপুর জঙ্গল অভিমুখে চলিয়া যায়। সন্ন্যাসীদের আক্রমণের ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানের ধনী জমিদার ও তালুকদারগণ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হন।

এদিকে সন্ন্যাসীদের ঢাকা অভিযান ব্যর্থ হওয়ার ফলে তাহাদের পরিকল্পনার আমূল পরিবর্ত্তন হয় এবং তাহারা পশ্চিম দিকে ফিরিয়া যায়। সন্ন্যাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয় অবগত হইয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডকে সন্ন্যাসীদের অনুসরণে নিবৃত্ত হইবার জন্ত নির্দ্দেশ পাঠান। কারণ, তাঁহার মতে দেশী সিপাহীদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা বিপজ্জনক। কিন্তু তিন সহস্র সন্ন্যাসীর এক দলের সম্মুখীন হওয়ার ফলে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের পক্ষে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই।

সন্ন্যাসীদের সহিত সংঘর্ষ আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কোম্পানীর মূল সিপাহী সৈন্ত হইতে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড ও সারজেণ্ট মেজর ডগলাস এবং ১২ জন সিপাহী সৈন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কোম্পানীর সিপাহী সৈন্তরা সন্ন্যাসীদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে বিহ্বল হইয়া যায় ও চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে। কিন্তু কোম্পানী সৈন্তের নায়ক ডগলাস ও এডওয়ার্ডের পক্ষে পলায়ন সম্ভবপর হয় নাই। তরবারি ও বল্লমের আঘাতে সার্জেণ্ট মেজর ডগলাস যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু ক্যাপ্টেন টিমোথি এডওয়ার্ডের মৃতদেহের কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেবল মাত্র তাঁহার টুপী সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বারিপুরের খালে পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসীদের সহিত যুদ্ধে কোম্পানী সৈন্তের শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ ওয়ারেণ হেষ্টিংস জ্ঞাত হইলে তাঁহার সমস্ত ক্রোধ দেশী সিপাহী সৈন্তের নায়ক জয়রাম সুবেদারের উপর গিয়া পড়িল। তিনি মেদিনীপুরের কালেক্টারকে নির্দ্দেশ পাঠাইলেন যে, "ক্যাপ্টেন ফরবেস, চতুর্দ্দশ ব্যাটেলিয়নের অধ্যক্ষ জয়রাম সুবেদারকে—যিনি সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন—যেন অবিলম্বে আটক করিয়া সামরিক পাহারায় সিপাহী জেনারেলের সম্মুখে বিচারার্থ হাজির করে।" বিচারের প্রহসনের পর জয়রাম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং কামানের তোপের মুখে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের পরাজয়ের পর দেড় হাজার সন্ন্যাসীর একটি দল কুমারখালি কারখানার আট মাইল দূরে ১১ই মার্চ্চ তাঁবু স্থাপনা করে। কোম্পানীর গুপ্তচর বিভাগের সংবাদে প্রকাশ যে, পরে উক্ত দল মামুদশাহী যশোহর অভিমুখে চলিয়া যায়।

জয়ের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আরও কয়েকটি সন্ন্যাসী দল প্রধান দল হইতে বিচ্যুত হইয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যায়। তথায় গিয়া শ্রীহট্ট আক্রমণের জন্ত জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের রাজার সাহায্য প্রার্থনা করে। ১০ই মের সংবাদে জানা যায় যে, স্থানীয় কালেক্টার মিঃ থ্যাকারে কয়েকটি কামান মাটির দুর্গে প্রোথিত করিয়া সন্ন্যাসীদের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার পর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

এই বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যখন সন্ন্যাসী দল কোম্পানীর অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ইংরাজের সিপাহী সৈন্তের সহিত বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়। সন্ন্যাসী দলের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাহারা তাহাদের রীতি অনুযায়ী গ্রামের জমিদারদের নিকট হইতে কেবল মাত্র কর আদায় করিয়া চলিয়া যাইত।

৩রা ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ঘাটালের নিকটবর্ত্তী ক্ষীরপাইএর নিকট প্রায় সাত হাজার পদাতিক ও পাঁচ শত অশ্বারোহী সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গভর্ণরের আদেশে তৎক্ষণাৎ কলিকাতা হইতে পাঁচ কোম্পানী সৈন্ত ও বর্দ্ধমান হইতে তিন কোম্পানী সৈন্ত ঘটনাস্থলে গিয়া পৌছে। কিন্তু সন্ন্যাসীরা এই সময় কোম্পানী সৈন্যের সহিত সংঘর্ষ না করিয়া তীর্থ-পরিক্রমায় পুরীর পথে যাত্রা করিয়াছিল। পরে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া হইয়া তাহারা মেদিনীপুর জঙ্গলে প্রবেশ করে।

কটকের কালেক্টার ২০শে অক্টোবর তারিখের এক পত্রে পুরী হইতে সন্ন্যাসীদের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ দিয়া বলেন, "সন্ন্যাসিগণ বাংলা দেশ অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। ইহারা সংখ্যায় প্রায় তিন সহস্র, তাহাদের সঙ্গে তিনটি কামান, গাদা বন্দুক, বর্শা ও তরবারি আছে।"

সন্ন্যাসী দল রাজসাহী অঞ্চলে পৌছিলে স্থানীয় কালেক্টার কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিকট এক পত্রে জানান যে, সন্ন্যাসীরা কোথাও কোন অত্যাচার না করিয়া জমিদার ও প্রজাদের নিকট হইতে মাত্র আবশ্যকীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

সন্ন্যাসীদের সহিত ক্রমবর্দ্ধমান সংঘর্ষের ফলে কোম্পানীর অস্তিত্ব বাংলা দেশে বিপন্ন হইয়া পড়ে। দেশী সিপাহীদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতি অনেকাংশে সন্ন্যাসীদের উপরই ছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও তাঁহার কর্ম্ম-পরিষদ সন্ন্যাসীদের হস্তে বিভিন্ন স্থানে কোম্পানী সৈন্তের পরাজয়ের ফলে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং কঠোর হস্তে ইহা

দমন করার জন্য এক সর্ব্বাত্মক পরিকল্পনা করেন। সন্ন্যাসী দমনকল্পে বাংলার বিভিন্ন জেলার জমিদার তালুকদার হইতে গ্রামের চৌকিদার পর্য্যন্ত প্রত্যেকের নিকট সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে সতর্ক করিয়া এক নির্দ্দেশনামা পাঠান হয়। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে সরকারী কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা ব্যতীত সমস্ত সন্ন্যাসীদের নিরস্ত্র ও বিতাড়িত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া ১৭৭৩ সালে জানুয়ারী মাসে কোম্পানীর পক্ষ হইতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।

এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, "যে সকল বৈরাগী, সন্ন্যাসী, পথিক ও বিদেশীয় দল এ দেশে উপস্থিত আছে তাহারা যেন অবিলম্বে এই বিজ্ঞপ্তি জারির হইবার সাত দিনের মধ্যে বাংলা ও বিহার এলাকা হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু যে সকল রামানন্দী ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের বাংলায় মঠ-আখড়া প্রভৃতি আছে অথবা জমিদারের বৃত্তিভোগী হইয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছে তাহারা এই আদেশের আমলে পড়িবে না।

কিন্তু এই আদেশনামা জারির হইবার পরেও যদি সন্ন্যাসীদের বিজ্ঞাপিত অঞ্চল সমূহে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া সারা জীবন রাস্তা নির্ম্মাণের কাজে নিয়োগ করা হইবে। ইহা ছাড়া তাহাদের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কোম্পানী সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবে।"

এই বিজ্ঞপ্তির দুই মাস পরে কালেক্টারগণ জমিদার ও কৃষকগণের প্রতি এক নির্দ্দিষ্ট আদেশ জারী করিয়া বলেন যে, সন্ন্যাসীদের গতিবিধি জানিবা মাত্র কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। যদি জমিদারগণ এই সন্ন্যাসী সম্পর্কে কোন সংবাদ পাঠাইতে অবহেলা করেন তাহা হইলে তাঁহারা কোম্পানীর বিরাগভাজন হইবেন। কৃষকগণ এই আদেশ অমান্য করিলে কঠোর শাস্তি পাইবে। ইহা ব্যতীত সন্ন্যাসীদের দমনকল্পে ভুটানের রাজার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক চুক্তি সাধিত হয়। এই চুক্তির বলে কোম্পানী-সৈন্য সন্ন্যাসীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ভুটান রাজ্যেও প্রবেশ করিতে পারিবে এবং ভুটানের রাজাও তাঁহার রাজ্যে সন্ন্যাসী প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিবেন।

বিভিন্ন নির্দ্দেশনামা জারি করার পর কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষ সিপাহী সৈন্যকে নূতন ভাবে গঠিত করার জন্য মনোনিবেশ করেন। নূতন ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক সিপাহী দলের প্রধান সেনাপতি হিসাবে ইংরাজ সেনা নিযুক্ত হয় এবং পরগণা সিপাহী দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। পরগণা-সিপাহীদের সম্পর্কে হেষ্টিংস "a rascally corps" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি এবং ফকির ও সন্ন্যাসী দলের আত্মকলহের ফলে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিদ্রোহ কালক্রমে স্তিমিত হইতে থাকে। সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আত্মঘাতী কলহ ক্রমশঃ এক তীব্র রূপ ধারণ করে। বগুড়া ও ময়মনসিংএর বিভিন্ন স্থানের সংঘর্ষের ফলে বহু ফকির ও সন্ন্যাসী হতাহত হয়।

কয়েক বৎসর পরে পুনরায় মজনু শাহের দলকে বাংলা দেশে দেখা যায়। ১৭৭৬ সালের মার্চ্চ মাসে কোম্পানী সৈন্যের সহিত কয়েকটি স্থানে খণ্ডযুদ্ধ হয়। কিন্তু কোন স্থানেই মজনু শাহের দল বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। ১৭৭৬ সাল হইতে ১৭৮৬ সাল পর্য্যন্ত কোম্পানী সৈন্য ও সন্ন্যাসীদের

সহিত ক্রমান্বয়ে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে মজনু শাহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন।

অবশেষে ১৭৮৬ সালে ৮ই আগষ্ট Lt. Ainslie এক দল সিপাহী লইয়া বগুড়া অভিমুখে যাত্রা করেন। বগুড়া হইতে ১০ ক্রোশ দূরে প্রায় আড়াই ঘণ্টা হাতাহাতি সংগ্রামের ফলে মজনু শাহের দল সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয়। পরাজিত হইয়া মজনু শাহ বগুড়া, রাজশাহী হইয়া মালদহ অভিমুখে তুলসীগঙ্গা অতিক্রম করার সময় অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া বিশেষ ভাবে আহত হন। মজনুর ইহাই শেষ অভিযান, কারণ পর-বৎসর মাখনপুরে তিনি মারা যান।

মজনু শাহের মৃত্যুর পর তাহার প্রধান শিষ্য মাদার বক্স ও মুসা শাহের নাম একমাত্র উল্লেখযোগ্য। ১৭৮৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর দিনাজপুরের নিকটে মুসা শাহের সহিত কোম্পানী সেনার এক খণ্ডযুদ্ধের ফলে ইংরাজ সেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। মুসা শাহের দলে কোম্পানী সেনায় উর্দ্দি-পরিহিত অনেক সৈনিক ছিল।

মজনু শাহের দলভুক্ত অন্যতম শিষ্য ভবানী পাঠকের নাম ১৭৮৭ সালের বিভিন্ন সরকারী কাগজ-পত্রে পাওয়া যায়। রংপুর ও ঢাকা অঞ্চলের তামাকের ব্যবসায়ী দল ঢাকার কাষ্টমের প্রধান অধ্যক্ষ মিঃ উইলিয়ামসের নিকট অভিযোগ করে যে, ভবানী পাঠক ও তাহার দল তাহাদের নৌকা লুণ্ঠন করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। মিঃ উইলিয়ামস্ বণিক দলের সহিত কয়েক জন সিপাহী ও তাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য এক পরোয়ানা বাহির করিলেন। কিন্তু পাঠক কোম্পানীর সিপাহী ও পরোয়ানা উভয়কেই উপেক্ষা করিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যে তিনি বগুড়ার নিকটবর্ত্তী শ্রীকান্দিতে আর একটি নৌকা লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন অধিকার করেন। ১৭৮৭ সালের জুন মাসে লেঃ ব্রেনান্ জানিতে পারেন যে, পাঠক রংপুরের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দগঞ্জের ১০ ক্রোশের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। তিনি ২৪ জন সিপাহী সমেত এক জন হাবিলদারকে পাঠকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তাহারা অতর্কিতে পাঠককে আক্রমণ করেন। সেই সময় তিনি ৬০ জন বরকন্দাজ সমেত নৌকাতে অবস্থান করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ সংঘর্ষের পর ভবানী পাঠক তাঁহার সহকারী প্রধান নায়ক এক জন পাঠান সহ আরও দুই জন নিহত ও আট জন আহত হন। অবশিষ্ট ৪২ জন বরকন্দাজকে বন্দী করা হয়। ইহা ছাড়া সাতটি বড় নৌকা বোঝাই অস্ত্র শস্ত্রও কোম্পানী সেনা দখল করে।

ঠিক এই সময়েই লেঃ ব্রেনানের রিপোর্টে দেবী চৌধুরাণীর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রিপোর্টে আরও প্রকাশ যে, ভবানী পাঠকের সহিত দেবী চৌধুরাণীর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। দেবী চৌধুরাণীর অধীনে অনেক বেতনভুক বরকন্দাজ ছিল। তিনি নিজে ডাকাতি করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন তাহা বাদে ভবানী পাঠকের লুণ্ঠিত অর্থেরও তিনি অংশীদারী ছিলেন। রংপুরের জেলা কালেক্টার ব্রেনানের নিকট দেবী চৌধুরাণীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফৌজদারী আদালতে হাজির করিবার জন্য নির্দ্দেশ চাহিয়া পাঠান। ইহার উত্তরে ব্রেনান লিখিয়া পাঠান যে, "তোমার প্রেরিত বাংলা কাগজ-পত্র পড়িয়া যদি গ্রেপ্তারের কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই নারীদস্যুকে গ্রেপ্তার করার আদেশ পরে পাঠাইব।" ইহার পর দেবী চৌধুরাণীর বিষয়ের উল্লেখ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৭৭৪ সালে সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল এক লিখিত ঘোষণায় বলেন যে, ফকির ও সন্ন্যাসী দল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে যে-কোন জমিদার ও তালুকদার তাহাদের হত্যা করিতে পারে— সেই জন্য হত্যাপরাধে তাহাদের কোন বিচার হইবে না।

মধুসূদন

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

আদেশ নহে ক' এ তো! শুনি যেন আকুল প্রার্থনা:
'দাঁড়াও পথিকবর'।
শ্রদ্ধানত হয়ে আসে মন।

কাহার সমাধি পার্শ্বে জাগে চিত্তে অপূর্ব্ব স্পন্দন,
আশ্চর্য্য অব্যক্ত স্বরে ভেসে আসে হৃদয়-বেদনা!
স্বাপ্নিক জীবনে কা'র রয়ে গেছে অপূর্ণ এষণা!

স্মৃতির বিভ্রমে যদি কোনো দিন ঘটে বিস্মরণ,
এ-বঙ্গবাসীরা যদি ভুলে নাম—শ্রীমধুসূদন,
মর্ম্মর-ফলকে তাই লিখিত কি কাব্য অতুলনা?

শাশ্বত হে কবি তুমি মহী-পদে মহানিদ্রাবৃত?
বিপ্লবী বাংলার তুমি সভ্যতায় ছিলে অগ্রদূত,
তুমিই বাংলায় এই—এনেছিলে নব জাগরণ,
তোমার আশায় আজ আমাদের হৃদয়ে বিধৃত,
সেথানে তোমার স্মৃতি, তব নাম অঙ্কিত অদ্ভুত;
হৃদয়ে জীবিত চির—
মহাকবি শ্রীমধুসূদন।

ছোটদের আসর

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীহরিদাস মজুমদার

এক দিন গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে সদ্য পিতৃহীন এক যুবক নগ্নপদে কৃশাসন হস্তে চাকরির অন্বেষণে অফিস হইতে অফিসান্তরে ঘুরিয়া-ফিরিয়া হতাশ চিত্তে গড়ের মাঠের পার্শ্ব দিয়া মনুমেণ্টের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। যুবকটি দুই দিন অনাহারী। কিছু কিনিয়া খাইবার মত আর্থিক সামর্থ্য তাহার ছিল না, অথচ কাহারও নিকট আপনার দুর্দ্দশার কথা জানাইয়া কিছু খাদ্যের সংস্থান করিতেও তাহার আত্মসম্মানে বাধিতেছিল। সুতরাং ক্ষুধার অসহ্য তাড়নায় এবং অনভ্যস্ত দীর্ঘ পথক্লেশে যুবকটি এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার মনে হইতেছিল যেন সে তখনই সংজ্ঞাবিলুপ্ত হইয়া রাজপথে পড়িয়া যাইবে। যুবকটি চিরসুখপালিত। তাই আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত রাজপথের উপর দিয়া চলিতে চলিতে তাহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল। আর পথ চলা অসম্ভব মনে করিয়া সে টলিতে-টলিতে মনুমেণ্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িল।

জানুর উপর মাথা রাখিয়া মুদিত চক্ষে যুবকটি যখন অবসন্নতা-ঘোর একটু কাটাইয়া উঠিল তখন দেখা গেল গৃহে তাহার আগমন-পথের দিকে চাহিয়া অপেক্ষারত অনাহারী, উপবাসী মাতা ও ভ্রাতা-ভগিনীদের কথা স্মরণ করিয়া তাহার সমস্ত মুখমণ্ডল বিষাদাচ্ছন্ন ও বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই বেদনা-করুণ বিষাদার্ত্ত ভাব মুহূর্ত্তেই কাটিয়া গিয়া সহসা একটা ভীষণ উগ্র ও কঠিন রূপ পরিগ্রহ করিল। যুবকের তেজোদ্দীপ্ত বিস্তৃত নয়নদ্বয়ে ধক্-ধক্ করিয়া যেন দুই খণ্ড অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল যেন সেই অপরিমেয় রোষবহ্নি একটা বিশ্বগ্রাসী দাবানলের সৃষ্টি করিবে। খর রৌদ্রের আগুনে দহ্যমান বিশাল নগরীর দিকে চাহিয়া যুবকটি আপনার অজ্ঞাতেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর মিথ্যা, এই সংসারটা একটা হৃদয়হীন দানবের কারখানা, এখানে স্বার্থশূন্য দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, সহানুভূতি কিছুই নাই। দরিদ্র দুর্বল অসহায়ের এখানে কোন স্থান নাই। আপনার দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা বিস্মৃত হইয়া মুহূর্ত্তেই যুবকটি সমগ্র বিশ্বের প্রপীড়িত মানব-সমাজের সহিত একাত্মতা স্থাপন করিয়া ফেলিল। আপনার অনাহারক্লিষ্ট ভ্রাতা-ভগিনীর স্থানে তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল সমগ্র পৃথিবীর হতভাগ্য দরিদ্র, অনাথ, আতুর, অসহায়, দুঃখ-দুর্দ্দশা-ভারাক্রান্ত মানব-সমাজের সকরুণ ছবি। তাহার মানস-চক্ষে দেখা দিল তাহার অগণিত মূর্খ দরিদ্র দেশবাসীর ছবি—যাহারা পুরুষানুক্রমে দেশের মাটিতে বুকের রক্ত জল করিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে অথচ এক দিনও পেট পুরিয়া আশ মিটাইয়া খাইয়া যাইতে পারিল না। দুর্গত মানবের প্রতি সহানুভূতির সুগভীর আবেগে ও অপরিসীম বেদনায় যুবকের কঠিন দৃষ্টি করুণার উত্তাপে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিগলিত হইয়া উঠিল।

সহসা কাঁধের উপর অঙ্গুলি-স্পর্শে যুবকটি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল, তাহার জনৈক বন্ধু কখন আসিয়া তাহার পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া আছে। বন্ধুটি তাহাকে বলিল—হতাশ হোস্ নে, ভগবানের অসীম দয়ার উপর নির্ভর কর। এই বলিয়াই সে বোধ হয় তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গাহিয়া উঠিল—'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে।'

বন্ধুটির সান্ত্বনা-বাক্য ও সঙ্গীত এই অবর্ণনীয় অসহায়তার মধ্যে একটা উৎকট বিদ্রূপের মত তীক্ষ্ণ আঘাত করিয়া ক্ষোভে, নিরাশায় এবং অভিমানে যুবকটিকে যেন একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। সে কর্কশ কণ্ঠে সঙ্গীতের মাঝখানে বন্ধুটিকে নিরস্ত করিয়া বলিয়া উঠিল—'নে নে, চুপ কর, ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই, টানা-পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদের নিকট ঐরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে, আমারও এক দিন লাগিত; কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম উৎকট বলিয়া বোধ হইতেছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে প্রিয় বন্ধুর এই রূঢ় ইঙ্গিতে বন্ধুটি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে উঠিয়া চলিয়া গেল।

তখন অপরাহ্নের সূর্য্য নগর-সৌধমালার অপর পার্শ্বে হেলিয়া পড়িয়াছে। যুবকটি গাত্রোত্থান করিয়া বিমূঢ়ের ন্যায় কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ পদচালনা করিয়া পথিপার্শ্বে জলের কল হইতে আকণ্ঠ পূরিয়া জল পান করিল। জলপানান্তে যুবকটির ওষ্ঠপ্রান্তে হৃদয়ের গভীর দুঃখ-বিমিশ্রিত একটা করুণ হাসি খেলিয়া মিলাইয়া গেল—হয়তো এই নিষ্ঠুর সংসারে সেই অদ্ভুত বিধায়কের উদ্দেশে লক্ষ্য করিয়া সে মনে-মনে বলিয়া উঠিয়াছিল—হে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন দানব, যাহার উদরপূর্ত্তির জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা কর নাই তাহার জন্য আবার এই অফুরন্ত পানীয়ের ব্যবস্থা করিলে কেন?

'কে ও?'—সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে অদূরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে তাহার উদ্দেশে কে যেন কহিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর হইতেই যুবকটি তাহাকে চিনিতে পারিল। নবাগত ব্যক্তিটি নিকটে আসিয়া যুবকের হস্ত ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিল—"দেখ, তোর সাংসারিক অবস্থার কথা আমি জানি, তোর শত চেষ্টা সত্ত্বেও তোর অপরিসীম দুঃখ-দৈন্যের কথা আমার নিকট হতে লুকাতে পারবি নে; এরূপ বাউণ্ডুলের মত আর কত কাল চাকরি-চাকরি করে অথবা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবি? তার চেয়ে সাধা লক্ষ্মীকে বরণ করে চিরতরে নিজের ও আত্মীয়-পরিজনের দুঃখ-দুর্দ্দশার পরিসমাপ্তি কর। আর সেও তো তার ধ্যান-জ্ঞান, তোরই চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করে দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করছে।"—এই বলিয়া লোকটি তাহার ফতুয়ার পকেট হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া যুবকটিকে পড়িতে দিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় নীরবে যুবকটি এতক্ষণ তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া যাইতেছিল। পরিশেষে কাগজখণ্ড হাতে লইয়া ঔৎসুক্যকে চরিতার্থ করিবার জন্য গ্যাসের আলোতে পড়িতে লাগিল—"হৃদয়েশ্বর, তোমার

আশা-পথ চাহিয়া কত দিন তো কাটিয়া গেল। আর যে নিজেকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারিতেছি না। আমার অফুরন্ত ধন-সম্পত্তি থাকিতেও তোমার সেবায় কিছুই লাগাইতে পারিলাম না। তোমার দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া অলক্ষ্যে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করি। এই দাসীকে তাহার অগাধ ধন-সম্পত্তির সহিত শ্রীচরণে স্থান দিয়া তোমার দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান কর।"

অপরিচিতার নিকট হইতে এইরূপ নির্লজ্জ প্রেমপত্র পাইয়া ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, বিষম অবজ্ঞার সহিত কাগজখানি সেই ব্যক্তিটির হাতে ফিরাইয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল—"তুই যদি আমার বাল্যবন্ধু না হতিস্ তাহ'লে এক মুষ্ট্যাঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করে বন্ধুর প্রতি এই উপকারের যোগ্য পুরস্কার দিতুম। তাই আজ রেহাই দিলুম, যা, চলে যা, আর কখনও যেন তোর মুখদর্শন না করি। আর তোর সেই প্রেমার্থিনী মহিলাকে বলবি যে, তার ঘৃণ্য প্রস্তাব এই হতভাগ্য দরিদ্রের পদাঘাতেরও যোগ্য নয়।" এই বলিয়া আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া যুবকটি হন্-হন্ করিয়া বিদ্যুতালোক-শোভিত রাজপথ ধরিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

অতি সন্তর্পণে জরাগ্রস্তের ন্যায় শ্লথপদে গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়া রুদ্ধদ্বারে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া যুবকটি অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনাহারে, বৃথা পর্য্যটনের পরিশ্রমে, ও দুশ্চিন্তায় যুবকটির শরীর ঝিমঝিম ঘুরাইতেছিল। সে কিছুতেই যেন নিজেকে আর স্থির রাখিতে করিতেছিল না।

'মা গো!'—পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কল্যাণময়ী স্নেহাতুরা জননী ত্রস্তপদে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। পুত্রের শুষ্ক, বিশীর্ণ মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া স্নেহময়ী মাতা যেন ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"আজ সারা দিনে পেটে বুঝি কিছু পড়েনি?" মাতার প্রশ্নকে এড়াইয়া গিয়া যুবকটিও তাঁহাকে পাল্টা প্রশ্ন করিল—"তোমরাও বুঝি এ দু'দিন না খেয়ে আছ?"

মা বলিলেন—"না, আমরা কেন না খেয়ে থাকব। তোর কোন এক বন্ধু বোধ হয় বেনামী চিঠির ভিতর কয়েকটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, তা না হলে তো আর কোন উপায়ই ছিল না!"

সেই পত্রপ্রেরক দরদী অকৃত্রিম বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়া যুবকটির কোমল চিত্ত কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে একখানা রেকাবীতে খান কয়েক রুটী ও এক গ্লাস জল লইয়া আসিয়া পুত্রের সম্মুখে রাখিয়া মাতা কহিলেন—"নে, এখন চট করে মুখটা-হাতটা ধুয়ে খেয়ে নে, পোড়া ভগবান না-খাইয়ে না-খাইয়ে চিন্তায়-ভাবনায় আমার সোনার বাছাকে মেরে ফেলবার জোগাড় করেছে। আমারও পোড়া ভাগ্যি, না হলে এই দুধের ছেলেকে আর সংসারের ভার নিতে হবে কেন?"—এই বলিয়া পরলোকগত স্বামী ও অতীতের সুখময় জীবনের কথা স্মরণ করিয়া মাতা বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুসংবরণ করিলেন।

অন্যান্য পরিজন সবাই রাত্রিকালীন আহার গ্রহণ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মাতা হয়তো নিজের আহারের জন্য কিছুই অবশিষ্ট না রাখিয়া সমস্ত খাবারই পুত্রের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া যুবকটি মাকে বলিয়া উঠিল—"কই, কোথায় তোমার খাবার রেখেছ, আমি দেখব।"

মাতা বলিলেন—'এই শেষ বেলা আমি খেয়ে উঠেছি; একরত্তি ক্ষিদেও আজ আমার নেই, এক বিন্দু জলকেও তল করার সাধ্যি আমার আর নেই।"

যুবকটির প্রজ্বলিত জঠরানলের কাছে যদিও সম্মুখের খাবারের চতুর্গুণ খাবারও পর্য্যাপ্ত ছিল না, তথাপি মাতার শত নিষেধ ও মাথার দিব্যি সত্ত্বেও খান তিনেক রুটী হাতে লইয়া অবশিষ্ট খাবার সহ প্লেটটিকে এক দিকে সরাইয়া দিয়া এক গ্লাস জল একেবারে সে নিঃশেষে পান করিয়া উঠিয়া শয়ন করিতে গেল।

* * * *

যুবকটির মৃতাশৌচ কাটিয়া গেল, তাহার পর আরও কয়েক মাস অতিবাহিত হইল, কিন্তু তাহার দুর্দ্দশার আর অবসান হইল না। শত চেষ্টা করিয়াও সে একটি কর্ম্মের সংস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যে অদৃশ্য বিধাতা এই নিখিল বিশ্বের নিয়ামক, দুর্ভাগ্যের কঠিন নিষ্পেষণে তাহার প্রতি একটা তীব্র বিতৃষ্ণা ও প্রচণ্ড অভিমান যদিও তাহার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি আস্তিক্য বুদ্ধি যুবকটির সমস্ত সত্তার সহিত এমন ভাবে বিজড়িত ছিল যে, অজ্ঞাতেই তাহার চিন্তা আসিয়া তাহার সমস্ত মন অধিকার করিয়া ফেলিল। তাই প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে ঈশ্বরকে স্মরণ-মনন পূর্ব্বক নব আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহার নাম করিতে-করিতে সে শয্যা ত্যাগ করিত। এক দিন পার্শ্বের ঘর হইতে তাহার জননী উহা শুনিতে পাইয়া আপনাদের অবর্ণনীয় দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"চুপ কর ছোঁড়া, ছেলে বেলা থেকে কেবল ভগবান, ভগবান! ভগবান্ ত সব করলেন!"

স্নেহময়ী জননীর এইরূপ কথায় বিষম আঘাত পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া যুবক ভাবিতে লাগিল—ভগবান কি বাস্তবিকই আছেন এবং থাকিলেও কি আমাদের সকরুণ প্রার্থনা কি তিনি শুনিয়া থাকেন? তবে এত যে প্রাণের আকুতি-মিনতি, তাহাতে তিনি সাড়া দেন না কেন? শিবের সংসারে এত অশিব কোথা হইতে আসিল—মঙ্গলময়ের রাজত্বে এত প্রকার অমঙ্গল কেন? কোন মহাত্মা বলিয়াছিলেন—ভগবান যদি দয়াময় ও মঙ্গলময় তবে দুর্ভিক্ষ ও দৈব দুর্বিপাকের করাল কবলে পতিত হইয়া লাখ-লাখ লোক মরিতেছে কেন? তাঁহার কঠোর ব্যঙ্গ স্বর যুবকটির কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রতি একটা কঠিন সন্দেহ আসিয়া ক্রমশঃ তাহার হৃদয় অধিকার করিল।

যুবকটি তাহার কোন ভাবই অপরের নিকট হইতে হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিতে পারিত না। সুতরাং তখন হইতেই সর্ব্বত্র সে হাঁকিয়া-ডাকিয়া সপ্রমাণ করিতে অগ্রসর হইল যে—ঈশ্বর নাই, অথবা যদি থাকেন ত তাঁহাকে ডাকিবার কোন সার্থকতা এবং প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বিষম দুর্ব্বলতা—এ কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে প্রয়োজন হইলে পাশ্চাত্য দার্শনিক হিউম, বেন, মিল, কোঁতে প্রভৃতিদের মত উদ্ধৃত করিয়া প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিত। সুযোগ ও সময় বুঝিয়া যুবকের পাড়া-প্রতিবাসীরা তাহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কালিমা আরোপ করিতে লাগিল। ফলে স্বল্প দিনেই চতুর্দ্দিকে রব উঠিল যে, সে নাস্তিক এবং দুশ্চরিত্র লোকদের সহিত মিলিত হইয়া মদ্যপানে ও বেশ্যালয়ে পর্য্যন্ত গমনে কুণ্ঠিত নহে। সঙ্গে সঙ্গে যুবকেরও আবাল্য তেজস্বী মন অযথা নিন্দায় অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিল এবং

কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সে সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—"এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে নিজ দুরদৃষ্টের কথা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য যদি কেহ মদ্যপান করে, অথবা বেশ্যাগৃহে গমন করিয়া আপনাকে সুখী জ্ঞান করে, তাহাতে আমার যে কিছুমাত্র আপত্তি নাই তাহাই নহে, পরন্তু ঐরূপ মন করিয়া আমিও তাহাদিগের ন্যায় ক্ষণিক সুখভাগী হইতে পারি—এ কথা যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিব সেদিন আমিও ঐরূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।" সকলেই মনে করিল, যুবক অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছে।

গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিয়াছে। এক দিন গৃহে পর্য্যাপ্ত আহার্য্যের সংস্থান নাই তাহা গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া লইয়া মাতাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া যুবকটি কর্ম্মের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া গেল। পথে বাহির হইবা মাত্রই এক দল ধনী বন্ধু যুবকটিকে এক রকম জোর করিয়া টানিয়া তাহাদের কাহারও বাটীতে লইয়া গেল। যুবকটি সুগায়ক ছিল। তাই তাহাদের অনুরোধ-উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিল। বেলা শেষে যখন সে স্থান হইতে উঠিয়া আসিবার উপক্রম করিল, তখন তাহার ক্ষুধাক্লিষ্ট, বিষণ্ণ শুষ্ক মুখ দেখিয়াও বন্ধুদের কেহই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনুসন্ধান করিল না যে—যে ব্যক্তি এতক্ষণ ধরিয়া তাহাদের মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত ছিল তাহার অন্তরের কথা কি!

বন্ধুর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত দেহে যুবক কিছুক্ষণ অদূরে এক উদ্যান-মধ্যে কালযাপন করিল। সহসা চারি দিক অন্ধকার ও আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে দ্রুত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু পথিমধ্যে প্রবল বারিবর্ষণ আরম্ভ হওয়ায় যুবক নিকটস্থ এক গাড়ী-বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। যুবকের আগমন লক্ষ্য করিয়া সম্মুখস্থ গৃহ হইতে এক নারীমূর্ত্তি তাহাকে প্রলোভিত করিবার জন্য সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবকটি তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—'বাছা, এই ছাই-ভস্ম শরীরটার তৃপ্তির জন্য এত দিন কত কি করিলে, মৃত্যু সম্মুখে—তখনকার সম্বল কিছু করিয়াছ কি? হীনবুদ্ধি ছাড়িয়া সৎপথ অবলম্বন কর।" চরিত্রহীন নাস্তিক, অধঃপতিত যুবকের নিকট হইতে এইরূপ কথা শুনিয়া রমণী বিস্ময় লজ্জিত ও স্তম্ভিত হইয়া চলিয়া গেল। যুবকও আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া সেই প্রবল বর্ষণের মধ্যে দ্রুতপদে তথা হইতে বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত দিন উপবাসে ও রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজিয়া অবসন্ন পদে ও ততোধিক অবসন্ন মনে যুবকটি যখন বাটীতে ফিরিতে লাগিল তখন সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া সে এমন একটা ক্লান্তি অনুভব করিল যে, আর এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর 'রকে' জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিল। অর্দ্ধচৈতন্য নেশাগ্রস্তের ন্যায় যুবক দেহে ও মনে সর্বপ্রকার সামর্থ্য-বিরহিত হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিল। অনবরত চিন্তারাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিবারও তাহার সামর্থ্য ছিল না। কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে আপনা-আপনি তাহার মনে নানা বর্ণের চিন্তা ও ছবি পর-পর উদয় ও লয় হইতেছিল। সহসা তাহার উপলব্ধি হইল, কোন এক দৈব শক্তির প্রভাবে একের পর এক করিয়া ভিতরের অনেকগুলি পর্দ্দা যেন উঠিয়া যাইতে লাগিল। শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর বিধান ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার মন এত দিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইয়া যুবক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার শারীরিক ক্লান্তি মুহূর্ত্তে বিদূরিত হইয়া মনে অমিত বল ও বিমল শান্তির উৎপত্তি হইল। যুবক চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার দুঃখ-রজনীর অবসান হইবার আর স্বল্পই বিলম্ব আছে। এই যুবকটিই হইলেন আমাদের বিশ্ববিখ্যাত বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ।

সাহসী যুবকের কীর্ত্তি

শ্রীরঞ্জিতকুমার রায়

আজ হইতে প্রায় ষাট্ বৎসর আগেকার কথা। কাহিনীটি ঘটেছিল পৃথিবী-বিখ্যাত লণ্ডন সহরের বুকে। জেমস্ ম্যাক্‌লিন তখন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সভাগৃহের এক জন সদস্য। সেই সময় এক জন কীর্ত্তিমান্ যুবক লণ্ডনে আইন শিক্ষার জন্য অবস্থিতি করিতেছিলেন। পার্লামেণ্টে সভাগৃহ বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছিল, বক্তৃতা করিতে উঠিলেন জেমস্ ম্যাকলিন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানকে চুক্তিবদ্ধ 'দাস' বলিয়া অভিহিত করিলেন। কথাটি অন্যের কাছে খুব সামান্য, কিন্তু যুবকটি ইহাকে সামান্য বলিয়া মনে করেন নাই। ইহার অন্তরালে ভারতীয়দের প্রতি একটা উপহাস ও তাচ্ছিল্য ভাব নিহিত ছিল। তাঁহার কর্ণগোচর হইল হিন্দু মুসলমানের এই নিদারুণ অপমান। তিনিও এক জন ভারতবাসী হিন্দু, ভারতবাসী হিন্দু হইয়া তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই। হিন্দু-মুসলমানের এই নিদারুণ অপমানে মনে বড় ব্যথা পাইলেন। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে তাঁহার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। পরাধীন জাতির এত লাঞ্ছনা, এত বড় অপবাদ,—এ যেন বিষাক্ত তীরের মত অন্তরের অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিল। জাগ্রত হইল দেশাত্মবোধ। ভুলিয়া গেলেন যে, এটা বিদেশ, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না ভারতবাসীর এই অপমান। মনস্থ করিলেন ইহার প্রতিবাদ করিবার—প্রতিজ্ঞা করিলেন উদ্ধত বক্তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার।

অধ্যয়ন সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখিয়া লণ্ডনস্থিত প্রবাসী ভারতবাসীকে একত্রিত ভাবে সংগঠিত করিয়া লণ্ডনের বিখ্যাত এক্সটার হলে একটি মহতী সভা আহ্বান করিলেন। ভারতবাসী নিদারুণ অপমানের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। লণ্ডনে একটি চাঞ্চল্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হইল। প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকাগুলিতে এই সাহসী যুবকের বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তুমুল আন্দোলন চলিল। উদারনৈতিক দলগুলি সমর্থন করিল এই যুবককে। কিন্তু ইহার পর আর কিছু সাড়া পাওয়া গেল না সরকারের পক্ষ হইতে। বলিষ্ঠ যুবক কিন্তু নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। অল্প দিন পরেই লণ্ডনের উদারনৈতিক দলগুলির সহায়তায় পুনরায় একটি সভা আহ্বান করিলেন — আবেদন করিলেন প্রতিকারের

জন্য। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন মহামতি গ্লাডষ্টোন্। সেই সভায় যুবকটি ওজস্বিনী ভাষায় তীব্র সমালোচনা করিলেন। টনক নড়িল পার্লামেণ্ট সভাগৃহের, নতি স্বীকার করিতে হইল জেমস্ ম্যাক্‌লিনকে স্বীয় অপরাধের জন্ত। বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, পার্লামেণ্ট সভাগৃহের সদস্ত পদ হইতে জেমস্ ম্যাক্‌লিনকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল।

সেদিনের সেই যুবকটি কে জানেন?—বাংলার ইতিহাস-বিখ্যাত বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশের পরম জ্যোতিষ্ক, 'স্বরাজ্য দলে'র প্রতিষ্ঠাতা বাংলা মায়ের সুযোগ্য সন্তান স্বনামধন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীকিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২৮৭ সাল। তিন মাসের ছুটী লইয়া ২রা অগ্রহায়ণ শিষ্য তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া মাঘ মাসে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন।......

৫ই মাঘ প্রাতঃকালে প্রথমে আশ্রমে যাইয়া স্বামীজীকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া উভয়ে পঞ্চগঙ্গায় স্নান করিতে গমন করিলেন। দুই ঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিয়া গুরুদেব জল হইতে উঠিলে শিষ্য তাঁহার সিক্ত অঙ্গ মুছাইয়া দিয়া উভয়ে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্রমে লোকচলাচল বন্ধ হইলে গুরু এবং শিষ্য একত্র হইয়া বসিলেন। নানাবিধ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

গুরু—...এই পৃথিবীর নিশ্চয়ই এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন যিনি সকল সময় সকল স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি 'ঈশ্বর'। তিনি সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, কেবল জ্ঞান ও বিচার-বলে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা চাই। ব্যাকুল হইয়া ভক্তি ভাবে যিনি তাঁহাকে ডাকিবেন তিনিই তাঁহাকে পাইবেন।

শিষ্য—সত্য সত্যই কি ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়?

গুরু—সাধনা করিলে ও গুরুর কৃপা হইলেই দর্শন পাওয়া যায়। তুমি কি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও?

শিষ্য—প্রভো! তাহা হইলে জীবন সার্থক হয়। আমার আজ পরম সৌভাগ্য যে, স্বয়ং ভগবানকে গুরুপদে বরণ করিতে পারিয়াছি। ভগবান না হইলে কেহ ভগবান দেখাইতে পারেন না।

গুরু—অদ্য রাত্রে তোমার সে আশা পূর্ণ করিব। এক্ষণে বেলা হইয়াছে, বাসায় যাও।

সন্ধ্যার সময় শিষ্য আশ্রমে যাইয়া দেবতাগণকে ও স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামিজী শিষ্যকে লইয়া একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন। ঐ ঘরে কেবল মাত্র একখানি আসন পাতা ছিল ও একটি দীপ জলিতেছিল।

স্বামিজী বলিলেন—"আমার বেদীর নিকট ছোট ঘরে যে কালী মূর্ত্তি আছেন তাঁহাকে দেখিয়া আইস।" শিষ্য যাইয়া দেখিয়া আসিলেন যে, পাষাণময়ী মা অচলা বিরাজমানা। ফিরিয়া আসিয়া গুরুকে তাহাই বলিলেন। গুরু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মাকে কি এখানে দেখিতে চাও?" শিষ্য বলিলেন, "গুরুদেব! এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছি যে, তাঁহাকে এখানে দেখিব! মাকে দেখা আর জগৎমাতাকে দেখা সমান কথা। আপনি দীনের প্রতি দয়া করিয়া দেখাইলে কৃতার্থ হই।"

শিষ্যকে স্থির ভাবে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলিয়া গুরু ধ্যানস্থ হইলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ধ্যান ভঙ্গ হইল, এবং মাকে ডাকিলেন। শিষ্য প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে, একটি কুমারী বালিকার ন্যায় সেই পাষাণময়ী মা ধীর পদ-বিক্ষেপে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অস্পষ্ট দীপালোকে চৈতন্যময়ীর আবির্ভাব এবং রূপের ছটা দেখিয়া শিষ্য অতিশয় ভীত ও চমৎকৃত হইলেন। মনে সাধ হইল, প্রণাম করিয়া একবার 'মা' বলিয়া ডাকিলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন যে, নিকটে গুরুদেব এবং সম্মুখে জগৎমাতা, এই সময় যদি তাঁহার মৃত্যু ঘটে তবে সশরীরে স্বর্গলাভ হয়। আনন্দ ও ভয়ে মুখের কথা ফুটিল না, শিষ্য জড়বৎ হইয়া রহিলেন। অচেতন পাষাণ সচেতন হইল কিন্তু শিষ্য সচেতন হইয়াও অচেতন হইলেন। স্বামিজী শিষ্যকে প্রবুদ্ধ করিয়া বলিলেন, "তুমি পুনর্ব্বার যাইয়া সেই স্থানে মায়ের মূর্ত্তি আছে কি না দেখিয়া আইস।" কম্পিত পদে ও ভয়-বিহ্বল চিত্তে শিষ্য দেখিতে গেলেন বটে কিন্তু মায়ের মূর্ত্তি আর সেখানে দেখিতে পাইলেন না। আরও ভীত হইয়া দ্রুত পদে স্বামিজীর নিকট আসিলেন। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। শিষ্য গুরুর নিকট বসিয়া মাকে একাগ্র মনে দর্শন করিলেন—দেখিলেন, পূর্ব্বের মত সবই ঠিক আছে কেবল জিহ্বা বাহিরে নাই এবং পদতলে মহাদেব নাই।

গুরুর অনুমতি ক্রমে মাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া শিষ্য নিজেকে পবিত্র ও সার্থক জ্ঞান করিলেন। মায়ের পা দু'খানি মনুষ্য-পদের মত নরম অনুভূত হইল। স্বামিজী বলিলেন—"বেশ করিয়া দেখিয়া লও, যেন পরে আর কোন প্রকার আক্ষেপ করিতে না হয়।" শিষ্য স্থির ভাবে দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গুরুদেব মাকে নিজ আসনে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। ছোট মেয়ের মত মা ধীর পদে গমন করিয়া আবার নিজ আসনে পাষাণময়ী হইয়া বিরাজমানা রহিলেন।

শিষ্যের কৌতুহল অদম্য হইয়া উঠিল, "গুরুদেব, পাষাণ কি প্রকারে চলিতে পারে? যাহা দেখিলাম তা অতীব অসম্ভব!" গুরুদেব কহিলেন—"তোমার জড়দেহ কেমন করিয়া চলে?" শিষ্য বলিলেন—"মানুষের দেহে আত্মা ও চৈতন্য আছে, সেই জন্য চলিতে ও বলিতে পারে।" তাহাতে গুরুদেব উত্তর করিলেন—"সিদ্ধ সাধকের গুণে যখন মৃত্তিকা, পাষাণ বা ধাতুতে আত্মা ও চৈতন্যের সঞ্চার হয় তখন সেই মূর্ত্তিও চলিতে, বলিতে, শুনিতে ও কার্য্য করিতে পারে।"

রাত্রি অধিক হইল। গুরুদেব বেদীতে আসিয়া শয়ন করিলেন, শিষ্য বাসায় গমন করিলেন।—

এই স্বামিজীকে কে না চেনেন! জাতির ইতিহাসে ইনি দেবতার স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ইনি জীবন্মুক্ত মাহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামী। আর শিষ্য হইতেছেন শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

পন্থজী কন্যার মাথায় সস্নেহে হাতখানি রেখে আদর করে বললেন : ভালোই ত মা ! শিবাজী মহারাজাই প্রথমে নিয়ম করেন—ছেলেদের মতন মারাঠা মেয়েরাও তলোয়ার খেলবে, ঘোড়ায় চড়বে, লড়াই শিখবে। এইটুকুই সুখের কথা মা, পেশোয়া রাজ্যপাট ছেড়ে বিঠুরে এসেও সাবেক চালগুলি বজায় রেখেছেন।

পিতার এই কথা থেকেই মনু তার মনের কতকগুলো চাপা কথা এই সময় বলে ফেলল। এখানে এসে অবধি কতকগুলি ব্যাপারে তার মনে বড় ধোঁকা লেগেছিল। পুণার মহান্ পেশোয়াদের বিপুল প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও দপদপার কথা গল্পের মতন তিনি কানেই শুনেছেন কাশীতে বাপুজীর কাছে। তিনি ভেবেছিলেন, সেই পেশোয়ার বংশধর রাজ্য হারিয়ে বিঠুরে এসে খুব সাধারণ ভাবেই, গরীবানি ভাবেই আছেন। কিন্তু বিঠুরে এসে তাঁর রাজার মতন জাঁক-জমক, রাজবাড়ীর বাহার, আদব কায়দা, চার দিকের আড়ম্বর দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যান। তিনি ভেবে পাননি যে, রাজ্য হারিয়ে রাজা না হয়েও এই পেশোয়া এ রকম করে রাজার মতন জাঁক-জমকে কি করে আছেন ? এত ঐশ্বর্য্য এখানে এলো কি করে ? আজ কথার সূত্রে সুযোগ পেয়ে পন্থজীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : হ্যাঁ বাবা, তবে যে শুনেছিলুম আমাদের পেশোয়া রাজ্য হারিয়ে ইংরেজের হাততোলা বৃত্তির উপর ভরসা করে বিঠুরে থাকেন। কিন্তু এখানে এসে যে সব কাণ্ড দেখছি—কে বলবে ইনি রাজা নন ? এর কারণ কি বাবা ?

কন্যার কথা শুনে একটু হেসে পন্থজী বললেন : এর কারণ হচ্ছে মা, আগেকার মহান্ পেশোয়াদের বিরাট প্রতিপত্তির প্রভাব। গোড়া থেকে সে সব কথা না শুনলে তুমি মা বুঝতে পারবে না। মহাত্মা শিবাজীর গল্প তুমি বাপুজীর কাছে শুনেছ। তিনি যেমন আঘাতের পর আঘাত হেনে মোগল-শক্তিকে চূর্ণ করেছিলেন, তেমনি মারাঠা জাতটাকেও শক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন। তাই শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে শম্ভুজী শক্তির অহঙ্কারে আর নিজের দোষে অকালে অপঘাতে মরলেও জাতটা বেঁচেছিল। শম্ভুজীর ছেলে শাহুজী ছিলেন ভীতু প্রকৃতির লোক। পিতার অপমৃত্যু দেখে তিনি যুদ্ধ-হাঙ্গামায় লিপ্ত হতে চাইতেন না—অথচ রাজ্যের চার দিকেই তখন যুদ্ধের হিড়িক চলেছে। এই সময় তাঁর খুল্লতাত শিবাজীর ছোট ছেলে রাজারামের বিধবা স্ত্রী তারাবাঈ তাঁকে হুমকী দিয়ে বললেন—'তুমি হোচ্ছ দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষ, রাজ্য চালানো তোমার কাজ নয়—ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি বসব ছত্রপতির সিংহাসনে।' শাহুজী ত ভেবেই অস্থির ! এমনি সময় তাঁর সেরেস্তার এক ব্রাহ্মণ কেরাণী—নাম তাঁর বালাজী বিশ্বনাথ, তিনি বললেন—'বিশ্বাস করে মহারাজ আমার হাতে রাজ্যরক্ষার সব ভার ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করব।' শাহুজী তাঁর কথা শুনে রাজি হয়ে গেলেন—তাঁরই হাতে তুলে দিলেন ছত্রপতি শিবাজীর তরবারি, আর সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব। সত্যই তিনি করলেন এক অসাধ্য সাধন—সব শত্রুদের দাবিয়ে মহারাজ শাহুজীকে করলেন নিষ্কণ্টক। কৃতজ্ঞ মহারাজও তখন করলেন কি, 'পেশোয়া' নামে এক সম্মানজনক পদ সৃষ্টি করে বালাজীকে সেই পদের বিশিষ্ট আসনে অভিষিক্ত করে রাজ্যরক্ষা ও শাসন সম্পর্কে যাবতীয় ভার তাঁর উপরে ছেড়ে দিলেন। সেই থেকে শাহু ও তাঁর বংশধরেরা হলেন ঠুঁটো জগন্নাথ আর বালাজী ও তাঁর বংশীয়েরা হলেন রাজ্যের শাসক। এঁরা রইলেন নামে মাত্র রাজা হয়ে, আর পেশোয়ারা তাঁদের সেই পেশোয়া পদকে বাদশাহী পদের মতন বিপুল প্রতিষ্ঠা ও শক্তিসম্পন্ন করে প্রকৃত পক্ষে রাজত্ব করতে লাগলেন। আগে সেতারা ছিল মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী, প্রথম পেশোয়া সেখান থেকেই রাজ্য চালাতেন। কিন্তু দ্বিতীয় পেশোয়া মহাবীর বাজীরাও পেশোয়ার গদী সেতারা থেকে পুণায় তুলে নিয়ে গেলেন ; তখন থেকে পুণাই হলো রাজধানী। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বংশপরম্পরায় পেশোয়াদের রাজত্ব চলতে লাগল। তাঁদের কত কীর্ত্তি—কত ইতিহাস ! সে সব পরে এক দিন বলব তোমাকে। শেষে এল এই পেশোয়ার আমল—আজ আমরা বিঠুরে যাঁর আশ্রয়ে এসেছি। নানা রকমের অনাচার আর গৃহবিবাদে পেশোয়ার প্রতাপেও তখন ভাঙন ধরেছে। ওদিকে বিদেশী ইংরেজরা এ দেশ থেকে বেছে বেছে লক্ষ লক্ষ সাহসী বলিষ্ঠ বীরপুরুষ সংগ্রহ করে তাদের প্রত্যেককে নূতন প্রণালীতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে ওদেশের ভীষণ ভীষণ অস্ত্র-শস্ত্রে সাজিয়ে এমন এক দুর্দ্ধর্ষ সিপাহীবাহিনী গড়ে তোলে—যুদ্ধে যারা কিছুতেই হার মানতে চায় না। ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল—প্রবল প্রতিপত্তিশালী পেশোয়া-শক্তির পতন না হলে ভারতবর্ষের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই শেষ পেশোয়ার আমলে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে মিতালী করে একযোগে পেশোয়াকে আক্রমণ করে ইংরেজ তার কাজ গুছিয়ে নিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পেশোয়া বিজয়ী ইংরেজের হাতে তাঁর সমস্ত সাম্রাজ্য তুলে দিয়ে নিজের ও পরিবারদের ভরণপোষণের জন্যে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি নিয়ে এই বিঠুরে বাস করবার অধিকার পেলেন। এ ছাড়া একটি জায়গীরও তাঁকে দেওয়া হলো। এই সঙ্গে আরো সাব্যস্ত হলো যে, বিঠুর ও পেশোয়ার জায়গীরের বাসীন্দারা পেশোয়ার শাসনাধীনেই থাকবেন—ইংরেজ সরকারের আদালতে তাঁদের মামলা-মকদ্দমার জন্য যেতে হবে না। এই সন্ধির পরেই পেশোয়া পুণার প্রাসাদের পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, যান-বাহন, সঞ্চিত ধনরত্ন ও অনুরক্ত সেনা-সামন্তদের সঙ্গে নিয়ে বিঠুরে চলে এলেন। অজস্র অর্থ ব্যয়ে এখানে বিশাল রাজভবন তৈরী করে এর নাম রাখলেন—ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রাসাদ। পেশোয়া যখন পুণা ছেড়ে এখানে আসেন, পুণার বহু পরিবার সেখান থেকে বাস তুলে পেশোয়ার সঙ্গে এখানে এসে বাস করতে থাকেন। সেই জন্যেই বিঠুর এমন জনপূর্ণ নগরী হয়ে উঠেছে।

পন্থজীর মুখে অতীতের এই সব কাহিনী শুনে মনুবাঈ বুঝতে পারলেন, যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়েও কেন পেশোয়া এখানে এখনো রাজার মতন জাঁক-জমকে বসবাস করছেন।

কথায় কথায় পন্থজী আরো বললেন : যৌবনে বরাবর যুদ্ধ-বিগ্রহ করে, প্রৌঢ় বয়সে এই ভাবে বিঠুরে এসে আগেকার সেই পেশোয়া খুবই বিলাসী আর আরামপ্রিয় হয়ে পড়েন। পাছে এই সুখ-সম্ভোগে কোন বিঘ্ন ঘটে—সেই ভয়ে এ-পর্য্যন্ত ইনি

বরাবরই ইংরেজের সঙ্গে সদ্ভাব আর সম্প্রীতি বজায় রেখেছেন—সন্ধিসর্ত লঙ্ঘন করে এমন কোন কাজ করেন না, যাতে ইংরেজের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। বরং পরম মিত্রের মতন ইংরেজের আপদে-বিপদে নিজেই উপযাচক হয়ে অনেক সাহায্য করেছেন। আফগানিস্থানের আমীরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইংরেজের টাকার টানাটানি পড়লে পেশোয়া তাঁর সঞ্চিত টাকা থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ইংরেজকে ধার দেন। এর পর পাঞ্জাবে শিখদের সঙ্গে ইংরেজের লড়াই বাধলে ইংরেজ যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, সেই সময় পেশোয়া নিজের খরচে এই বিঠুর থেকে এক হাজার পদাতিক আর এক হাজার অশ্বারোহী সেনা পাঞ্জাবে পাঠিয়ে ইংরেজকে সাহায্য করেন। এতে ইংরেজ সরকার খুব খুসি হন বটে, কিন্তু মারাঠা জাতি মনে মনে পেশোয়ার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হন। পেশোয়ার ভাই—আমাদের বাপুজী তখন কাশীতে, তিনি সেখান থেকে পাঞ্জাবে ফৌজ পাঠাতে নিষেধ করেছিলেন পেশোয়াকে—কিন্তু ইনি সে আপত্তি গ্রাহ্য করেননি। এই জন্তেই মা আমরা পেশোয়ার কাছ থেকে দূরে থাকতুম। এখন ঘটনাচক্রে এঁরই আশ্রয়ে আমাদের থাকতে হবে মা! তবে এ কথাও বলি, ইংরেজের এখন একাদশে বৃহস্পতি—এদের সঙ্গে শত্রুতা করে এ দেশে সুখে-শান্তিতে বাস করা অসম্ভব। পেশোয়া দেশের অবস্থা আর নিজের সামর্থের কথা ভেবেই ইংরেজের মন যুগিয়ে চলেছেন। পেশোয়া যখন প্রথমে বিঠুরে আসেন, আর সেই সঙ্গে হাজার হাজার মারাঠা পুণা ছেড়ে তাঁর অনুগমন করেন, ইংরেজ তখন ভয় পেয়েছিল; ভেবেছিল, তাঁর রাজ্যের সেরা সেরা লোক যখন বিঠুরে এসে তাঁর কাছেই থাকছেন, পরে যদি শক্তি সঞ্চয় করে এঁদের নিয়ে পেশোয়া আবার যুদ্ধ ঘোষণা করেন—তাহলে ত বড়ই বিপদের কথা হবে! কিন্তু তার পরেই তাঁদের সঙ্গে পেশোয়ার ব্যবহার দেখে ইংরেজের মন থেকে সে সন্দেহ মুছে যায়। এখন ওঁরা পেশোয়াকে ওঁদের পরম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী বলেই জানেন।

অতীতের কথা ও কাহিনী গল্পের মত শুনতে খুব শৈশব থেকেই মনুবাঈ অভ্যস্ত হয়েছিলেন। কাশীর চৌষট্টি মন্দিরে পুরোহিত ও কথকদের মুখে পুরাণের কাহিনী শুনে তিনি যেমন আনন্দ পেতেন, বাড়ীতে বাপুজীও দেশের বড় বড় যোদ্ধাদের গল্প বলে তাঁর মনে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করতেন। নৈলে, এই বয়সের কোন্ মেয়ে বা ছেলে ইতিহাসের কথা এমন অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনতে ভালবাসে? কিন্তু জগতে যাঁরা অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের কথাই আলাদা।

তবে মনুর মত মেয়ে পেশোয়ার সম্বন্ধে এই সব কথা শুনেই কি মনের কৌতুহল মিটিয়েছিলেন মনে কর? সেই বয়সেই কথাগুলি তাঁর মনের মধ্যে যেন আঁচড় দিতে থাকে। রাজ্য ছেড়েও রাজ্যের বাইরে এসে পেশোয়া রাজার মতন দপদপায় আর জাঁক-জমকে রয়েছেন, এ খুব ভালো কথা; কিন্তু ইংরেজ যখন দেশের আর সব রাজ্যের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার জন্তে লড়াই করতে কোমর বেঁধে দাঁড়ালো, পেশোয়া সেখানে ইংরেজকে ফৌজ পাঠাতে গেলেন কেন? পেশোয়ার এই কাজটি যেন কাঁটার মত মনুর মনে বিঁধতে লাগলো। এক দিন তিনি কথায় কথায় পেশোয়ার মুখের উপরেই কথাটা বলে ফেললেন। সেদিন পেশোয়ার সভায় কথা হচ্ছিল যে, ইংরেজরা কৌশলে পাঞ্জাব জয় করে পাঞ্জাবের সিংহ রণজিৎ সিংহের বিধবা মহিষীকে বন্দিনী করে খুবই অন্যায় করেছেন। এই কথার পীঠেই বালিকা মনু হঠাৎ বলে উঠলেন: বাপুজী, এর জন্তে আপনিও কম দায়ী নন—এই ইংরেজকে ফৌজ দিয়ে আপনি সাহায্য করেছিলেন।

বালিকার মুখে এ কথা শুনে সবাই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলেন। পেশোয়া কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনুকে কাছে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে বললেন: আমার চোখে আঙুল দিয়ে এমন করে এর আগে আর কেউ আমার অন্যায় দেখিয়ে দেয়নি মা! সত্যিই আমি অন্যায় করেছিলাম।

সেদিন খেলার মাঠে যেতে যেতে নানা মনুকে উৎসাহ দিয়ে বললেন: তুমিও দেখছি আমার মতনই তলিয়ে ভাব। সত্যি বোন, বাবার কতকগুলো কাজ আমাকেও খুব ব্যথা দেয়। কিন্তু আমি বলতে সাহস করিনি। আজ যে আমার কি আনন্দ হোচ্ছে তা বলবার নয়।

মনু বললেন: আমি যে কথা চেপে রাখতে পারি না ভাই!

দেখতে দেখতে বালিকা মনু অস্ত্র-চালনায় নানারও প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠলেন। নানার ছোট ভাই রাও সাহেব কিন্তু পেছিয়ে পড়লেন—অসি খেলার প্রতিযোগিতায় ছবেলী তাঁকে হারিয়ে দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিলেন। এক দিন নানা গম্ভীর হয়ে বললেন: ছবেলী, তোমাকে বোন বলে আমি নিজেই বড় হয়েছি। তোমার কব্জির যে রকম জোর, হয়ত এর পর আমাকেও হারিয়ে দেবে তুমি।

মনু মৃদু হেসে উত্তর করলেন: বোন কি কখনো দাদার চেয়ে বড় হতে পারে? আমি যে তোমার তলোয়ারের মান রাখতে পেরেছি, তাতেই আমার আনন্দ।

শেষে নানার সঙ্গে মনুর তলোয়ার খেলা বিঠুরে যেন একটা দর্শনীয় ব্যাপার হয়ে উঠল। খেলার মাঠে আর লোক ধরে না—সবাই অবাক-বিস্ময়ে দেখে দুই অদ্ভুত প্রতিযোগীর অস্ত্র-চালনা। এক দিকে প্রিয়দর্শন কমনীয় কান্তি ষোড়শবর্ষীয় কিশোর নানা, অন্য দিকে অনিন্দ্যসুন্দরী সুকুমারী দশমবর্ষীয়া বালিকা ছবেলী। এক-এক দিন পারিষদ্‌বর্গের সঙ্গে পেশোয়া স্বয়ং এঁদের অসি-খেলা দেখেন মুগ্ধ-বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করেন: সাবাস্—ছবেলী, চমৎকার!

ছবেলীর এই বাহাদুরী চরমে উঠল—যেদিন তিনি তেজস্বী এক টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে সমস্ত বিঠুর পরিক্রমণ করে এলেন। নানা প্রথমে ভেবেছিলেন, তলোয়ার চালাতে পারলেও ঘোড়ায় পিঠে চড়ে টহল দিতে কিছুতেই পারবেন না ছবেলী। কিন্তু প্রথম দিনেই তিনি নানার সে ভুল ভেঙে দিলেন। সুসজ্জিত ঘোড়াকে দেখেই বালিকার অঙ্গে অঙ্গে যেন অদ্ভুত এক উত্তেজনা জেগে উঠল; তিনি ছুটে গিয়ে ঘোড়ার মুখোসে হাত দিয়ে আদর করে বললেন: আমি তোমার পিঠে উঠব—আমাকে ফেলবে না!···বালিকার কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটিও ঘাড় নেড়ে তার কোমল হাতে মুখখানি ঘসতে লাগল। মনু অমনি সহাস্তে বললেন: ঘোড়া রাজি হয়েছে, আমি এর পিঠে উঠব।···বলতে বলতেই মনু রেকাবে পা রেখেই ঝাঁ করে

ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন এমন কায়দা করে—যেন ঘোড়ার পিঠে চড়া তাঁর একটা সাধা বিদ্যা, তিনি যেন কত সব ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছেন। ঘোড়াটাও যেন এই অদ্ভুত বালিকাকে চিনে ফেলেছিল, বুঝতে পেরেছিল যে, সহজাত সংস্কারের মতই এটিও তাঁর একটি সাধা বিদ্যা, আর এমনি বেপরোয়া সওয়ারকে পিঠে তুলতেই তার আনন্দ। তাই, যেমনি মনু তার পিঠের উপর পাতা মখমলের জিনের উপর বসে পড়লেন, ঘোড়াও অমনি একটা ঝাঁকুনি দিয়েই তেজস্বিনী আরোহিণীকে নিয়ে ছুটল সামনের মুক্ত পথে। নানা সাহেব, রাও সাহেব নিজের নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে চেয়েছিলেন ছবেলীর দিকে; তাঁর কাণ্ড দেখে তাঁরাও সলম্ফে ঘোড়ার পিঠে উঠে তাঁরই পিছু-পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। পিছন থেকে তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন, তেজস্বী জন্তুটির লাগাম টেনে বাধ্য করেই ছবেলী তাকে চালাচ্ছে। এ খেলাতেও মনু আশ্চর্য্য রকমের সাফল্য অর্জ্জন করলেন।

এখন থেকে ঘোড়ায় চড়ে পাল্লা দিয়ে বেড়ানোই হলো মনুর শ্রেষ্ঠ খেলা ও কসরৎ। এই খেলার মধ্যে মনু ঘোড়া চেনবার আর তাকে বশীভূত করবার কৌশলও খুঁজে বার করে ফেললেন। এমনি করে ঘোড়ায় চড়ে দৌড়বাজী করতে করতে দেশের আর একটি ভাইয়ের সঙ্গেও মনুর পরিচয় হয়ে গেলো; তাঁর নাম—তান্তিয়া তোপি। ইনি এমন এক দেশভক্ত তেজস্বী মারাঠা ব্রাহ্মণের পুত্র—যিনি মারাঠা জাতির পতনের জন্য মর্ম্মাহত হয়ে পুনরুত্থানের কামনায় তপস্যায় দেহপাত করেন—মৃত্যুকালে তিনি পুত্র তান্তিয়াকেও দেশাত্মবোধের দীক্ষা দিয়ে আদেশ করে যান, দেশের মুক্তির জন্যে সেও যেন তার জীবন উৎসর্গ করে। এই তান্তিয়ার সঙ্গে কিশোর বয়সেই নানা সাহেব সৌখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন; সেই সূত্রে নানা সাহেবের ধর্ম্ম-ভগিনী ছবেলীও নানার বন্ধু তান্তিয়া তোপিকে ভাই বলে গ্রহণ করলেন।

দেখতে দেখতে এলো ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার উৎসব। মনু পন্থজীর কাছে আবদার করলেন: ভাইফোঁটার দিন আমি নানা ভাইদের চুয়া-চন্দনের ফোঁটা দেব বাবা! আমার জিনিস-পত্র সব চাই। পন্থজী প্রসন্ন মনেই কন্যার নির্দ্দেশ মত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সব এনে দিলেন। খুব ঘটা করে মনুবাঈ ভাইফোঁটা দিলেন। ভাইয়ের বিশেষ ফোঁটা যদিও নানার অদৃষ্টেই জুটল, কিন্তু রাও সাহেব, এবং তান্তিয়াকেও তিনি আমন্ত্রণ করতে ভোলেননি—প্রত্যেককেই নূতন বস্ত্র উপহার দিয়ে ভূরি ভোজে পরিতৃপ্ত করে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উৎসব পালন করলেন মনুবাঈ।

এই ভাবে খেলায়-ধূলায়, বিদ্যা ও অস্ত্রশিক্ষায় এবং নানারূপ ব্যায়ামের ভিতর দিয়ে আরো দু'টি বৎসর কেটে গেল; এর পর এলো মনুর ভাগ্যোদয়ের বছর—১৮৪২ অব্দ। এই সময় এক দিন হঠাৎ কাশীর সেই জ্যোতিষী বিঠুরে এসে উপস্থিত। পন্থজী তাঁকে চিনতে পেরে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। জ্যোতিষী বললেন: মনে আছে পন্থজী, আমার গণনার কথা বলেছিলুম, আপনার কন্যা হবেন রাজরাণী? তারই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গারাও যশোবন্ত রাও সাহেবের জন্য সর্ব্বগুণান্বিতা সুলক্ষণা পাত্রীর প্রয়োজন হয়েছে। আমি আপনার কন্যার কথা বলেছি। মহারাজের পক্ষ থেকে তাঁর অমাত্যরা আজই পাত্রী দেখতে আসছেন। এ কন্যা যে তাঁরা পছন্দ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। আপনার কন্যা মনুবাঈ রাজরাণী হবেন পন্থজী!

পন্থজী কন্যার জন্য ভিতরে ভিতরে পাত্রের অন্বেষণ করছিলেন; এ সংবাদে আনন্দে, বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। কথাটা পেশোয়াও শুনলেন, তিনি সহর্ষে বললেন: আমি জানতুম, ছবেলী যেমন অসাধারণ মেয়ে, তেমনি কোন অসাধারণ ঘরেই হবে ওর বিয়ে।

ঝাঁসীর অমাত্যরা পাত্রী দেখে সন্তুষ্ট হয়ে জানিয়ে গেলেন, এমনি কন্যারই অনুসন্ধান তাঁরা করছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। ইনিই হবেন ঝাঁসীর মহারাণী।

এর পর শুভলগ্নে মনুর বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হলো। বিবাহের সময় ঘটল এক কৌতুকাবহ ঘটনা। পুরোহিত যখন বরবেশী মহারাজ গঙ্গাধর রাওএর অঙ্গবস্ত্রের সঙ্গে বধূ মনুবাঈএর অঞ্চলে গাঁটছড়া বাঁধতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়েছেন, সেই সময় মনু সহাস্যে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলে উঠলেন: পুরুত ঠাকুর! খুব জোরে গিঁট দিন, যেন খুলে না যায়!

কন্যার কথায় বিবাহ-স্থলে হাসির রোল উঠল। স্বয়ং মহারাজও আড়চোখে কন্যার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। পেশোয়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনিও সহাস্যে বললেন: এ রকম কথা ছবেলীই বলতে পারে—পুরুত ঠাকুরকেও হার মানিয়ে দিলে।

সত্যই, বিবাহ-বাসরেও সবার সামনে এমন কথা সহজ ভাবে বলতে পেরেছিলেন বলেই—আর এক দিন পরম সঙ্কট কালে ইংরেজ রেসিডেণ্টের মুখের উপরে সেই কণ্ঠ থেকেই অকুণ্ঠ স্বর নির্গত হয়েছিল—মেরী ঝাঁসী দেঙ্গী নেহী!

বিবাহের পর ঝাঁসীর প্রাসাদে কুলবধূরূপে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের কুলপ্রথা অনুসারে বধূ মনুবাঈয়ের নূতন নামকরণ হলো—লক্ষ্মীবাঈ।

[ক্রমশঃ

অনস্বীকার্য্য

যখন এক জন কেউ কংগ্রেসের নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তখন আপনি তাঁর বন্ধু। যখন তিনি নির্ব্বাচিত হন তখন আপনি তাঁর নির্ব্বাচক। আর যখন তিনি আইন বিধিবদ্ধ করেন তখন আপনি এক জন করদাতা ব্যতীত আর কেউ নয়।

প্রসাদ রায়

"এক শতাব্দীতে একবার।"

সম্প্রতি খবরের কাগজে বেরিয়েছে পরে পরে দু'টি সংবাদ। বার্লিনে মধ্য-ওজনের (middle-weight) দুই বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধার প্রতিযোগিতা হয়, তাঁদের এক জন জার্মান, আর এক জন নিগ্রো। কালো যোদ্ধার ঘুসি খেয়ে খেতাঙ্গ যোদ্ধা নিতান্ত কাবু হয়ে পড়ে। অমনি কালার বিরুদ্ধে মারমুখো হয়ে ওঠে ধলা দর্শকরা। বেগতিক দেখে মধ্যস্থ লড়াই থামিয়ে দেয়।

এর কিছু দিন পরে সেখানে এক জন ভারি-ওজনের (heavy-weight) জার্মান মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে বিশ্ববিজয়ী নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জে লুইসের লড়াই হবার কথা ছিল। কিন্তু উপরোক্ত খবরটা শুনে লুইস আমেরিকা থেকে তার পাঠিয়ে বলেছেন, আমি জার্মানীতে গিয়ে যুদ্ধ করতে নারাজ।

মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে এই বর্ণবিদ্বেষ ব্যাপারটা নতুন নয়। চল্লিশ বৎসর আগে আমেরিকার অপরাজিত শ্বেত যোদ্ধা জেফ্রিসকে কুপোকাৎ ক'রে নিগ্রোদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বিশ্ববিজয়ী উপাধি অর্জ্জন করেছিলেন জ্যাক জনসন। তার ফলে সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজ ক্ষেপে ওঠে। নিগ্রো পল্লী আক্রান্ত হয় এবং বিপন্ন হয় জনসনের জীবন। তিনি য়ুরোপে পালিয়ে যান প্রাণভয়ে। কিন্তু সেখানেও নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে শেষটা তিনি তাঁর চেয়ে ঢের নীচু দরের মুষ্টিযোদ্ধা জেস্ উইলার্ডের কাছে এক কৃত্রিম যুদ্ধে (mock-fight) যেচে হার মেনে (১৯১৫ খৃঃ) শ্বেতাঙ্গদের মান ও নিজের প্রাণ রক্ষা করেন।

লুইসের বিজয়-গৌরবও যে ইয়াঙ্কিদের খুসি করে, এমন মনে করবার কারণ নেই। নিরুপায় হয়ে তারা তাঁকে কোন ক্রমে সহ্য করে, এই মাত্র!

এ তো গেল গুঁতোগুঁতি, হাতাহাতির ব্যাপার। এখানে সাধারণতঃ কাজ করে প্রাকৃতজনদের নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি, সুতরাং গালে হাত দিয়ে অবাক হবার দরকার নেই। মুষ্টি বা মল্লযুদ্ধের প্রেক্ষাগৃহে বা ফুটবল খেলার মাঠে ধীমানরা কোন দিনই দলে ভারি হ'তে পারবেন না। দক্ষিণ-আমেরিকার একটি দেশে ফুটবলের মাঠে দর্শকদের ও খেলোয়াড়দের মাঝখানে জলপূর্ণ গভীর খাল কেটে রাখা হয়। কারণ? বাধা না থাকলে দর্শকদের কাছ থেকে মধ্যস্থ ও খেলোয়াড়দের উত্তম-মধ্যম লাভের প্রভূত সম্ভাবনা আছে!

কিন্তু কলাকেলির আসর প্রাকৃতজনদের জন্যে নয়। রঙ্গালয়ের গ্যালারির দেবতারা কুবিখ্যাত হ'লেও প্রধানতঃ তা এমন সব রসিকজনদেরই উপভোগের ঠাঁই, চিত্ত যাঁদের মুক্ত ও উদার এবং জাত বিচার ক'রে যাঁরা শিল্পীদের উত্তম বা অধমের কোঠায় ফেলেন না। উচ্চশ্রেণীর শিল্পী মাত্রই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ইঁদের মধ্যে কেউ নেই হরিজন।

কিন্তু সেখানেও যদি গায়ের রং দেখে কারুকে প্রশস্তি দেওয়ার এবং কারুকে লাঞ্ছনা করার প্রথা প্রচলিত হয়, তবে তেমন কুপ্রথাকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। অল্প দিন আগে আমেরিকাতে এই রকম একটি লজ্জাকর দৃশ্যই দেখা গিয়েছিল। তবে সৌভাগ্যের কথা হচ্ছে, এটাও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, খেলার মাঠের দর্শকদের মনোবৃত্তি নিয়ে যারা গর্দ্দভের মত কলা-কমলার কুঞ্জবনে প্রবেশ করে, তারা নয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। আজও তারা অধিকারচ্যুত করতে পারেনি রসিকজনদের। বাসন্তী পূর্ণিমাতেও পেচকরা কর্কশ চীৎকার করে বটে, কিন্তু তারা থামিয়ে দিতে পারে না বসন্ত-দূত কোকিলদের কলসঙ্গীত।

সলোমন হিউরক সাহেব হচ্ছেন আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমোদ-পরিবেশক। উদয়শঙ্কর, আনা পাবলোভা, ইজাডোরা ডান্কান, মেরি উইগ্‌ম্যান, শালিয়াপিন ও রুবিন্‌ষ্টিন প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর নর্ত্তক, গায়ক ও বাদকরা তাঁর আমন্ত্রণেই আমেরিকায় গিয়ে দেখা দিয়েছেন। তাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে যথেষ্ট নাম কিনেছেন একাধিক অনামা শিল্পী।

শিল্পীদের সন্ধানে একবার হিউরক গিয়াছেন ফ্রান্সের প্যারিস সহরে। এক সন্ধ্যায় রাজপথে বেড়াতে বেড়াতে তিনি একটি বিজ্ঞাপন দেখলেন, তাতে ঘোষণা করা হয়েছে—অমুক রঙ্গালয়ে আজ এক জন আমেরিকান "কন্ট্র্যাল্টো"র (মিহি সুরের গায়িকা) গানের আসর বসবে।

তিনি টিকিট কিনে প্রমোদগৃহে প্রবেশ করলেন। শ্রোতাদের আসনগুলি পরিপূর্ণ। যথাসময়ে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন একটি দীর্ঘাঙ্গী নিগ্রো যুবতী। চোখ মুদে তিনি গান ধরলেন এবং হিউরকের সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ! যাঁর কণ্ঠস্বরে এমন ইন্দ্রজাল, তাঁর নাম পর্য্যন্ত আমেরিকায় অপরিচিত, অথচ তিনি ঐ দেশেরই মেয়ে!

তরুণী গায়িকার নাম মেরিয়ান এণ্ডারসন। স্বদেশেও এখানে-ওখানে তিনি গান গেয়েছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে আমল দেয়নি। তাই তিনি য়ুরোপে এসেছেন দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে: আরো ভালো ক'রে গান শিখতে এবং ইতিমধ্যে যেটুকু শিখেছেন তার সাহায্যেই জীবিকা নির্ব্বাহ করতে।

সামান্য পুঁজি নিয়েই তিনি য়ুরোপে এসেছিলেন, অল্প দিনেই তা প্রায় ফুরিয়ে গেল। কিন্তু মেরিয়ানকে দায়ে ঠেকতে হ'ল না। বড় বড় ওস্তাদদের কাছে কণ্ঠসাধনা করতে করতে তিনি য়ুরোপের দেশে দেশে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতে লাগলেন এবং সর্ব্বত্রই লাভ করলেন উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন। ভারতের মত ওদেশের শ্রোতারা হাত গুটিয়ে কেবল মৌখিক অভিনন্দন দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, দরাজ হাত বাড়িয়ে শিল্পীর হাতেও অর্পণ করে কাঞ্চনমূল্য। মেরিয়ানের পথ হয়েছে কুসুমাস্তৃত; সঙ্গীত অনুশীলনের সঙ্গে চলেছে তাঁর যশ, মান ও অর্থ উপার্জ্জন।

ইতালীর অমর সঙ্গীতশিল্পী আর্তুরো তোস্কানিনি তাঁর গান শুনে তাঁকে বলেছেন, "তোমার মত কণ্ঠস্বর শোনবার সুযোগ পাওয়া যায় এক শত বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র।"

প্রতিভার অবতার ও নাট্যাচার্য্য ষ্টানিস্লাভ্‌স্কি তাঁর হাতে রাশীকৃত শ্বেত লাইল্যাক্ ফুল উপহার দিয়ে বলেছেন, "আপনি

রুসিয়াতেই থাকুন। মস্কো আর্ট থিয়েটারের "কারমেন" গীতিনাট্যে আপনাকে দেওয়া হবে নাম-ভূমিকাটি।"

ফিন্‌ল্যাণ্ডের অতুলনীয় সুরকার জ্যান সিবিলিয়াসের বাড়ীতে বসেছে মেরিয়ানের গানের আসর। তিনি গান শুনে গম্ভীর স্বরে বলেছেন, "আমার ঘরে তোমার কণ্ঠস্বর ধরবার জায়গা নেই।"

হিউরকের শিক্ষিত শ্রবণ সত্য উপলব্ধি করতে ভুল করলে না। মেরিয়ানকে বন্দী ক'রে আবার তিনি ফিরিয়ে আনলেন আমেরিকায়।

এবারে মেরিয়ানের ভার পড়েছিল যোগ্য হস্তে। জনতায় পরিপূর্ণ প্রমোদ-গৃহে তাঁর অপূর্ব্ব সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সৃষ্টি করলে অভাবিত বিস্ময়, উন্মাদনা ও প্রশংসা-কোলাহল। পত্রিকায় পত্রিকায় সঙ্গীত-সমালোচকরা তাঁর জন্যে অলঙ্কৃত ভাষায় প্রশস্তি রচনা করতে লাগলেন। কেউ বললেন, "এ সঙ্গীত প্রথম শ্রেণীর ও পরমোত্তম।" কেউ বললেন, "এ সঙ্গীত ভাষায় বর্ণনাতীত।" কেউ বললেন, "মেরিয়ান এণ্ডারসন তাঁর স্বদেশে ফিরে এসেছেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়িকারূপে। এখন আমাদের উচিত তাঁকে যোগ্য গৌরব দান করা।" কে তাঁকে বেশী প্রশংসা করবে, তাই নিয়ে আরম্ভ হ'ল যেন প্রতিযোগিতা।

গানের আসর—আসরের পর আসর! প্রত্যেক আসরে থাকে না তিল ধারণের ঠাঁই। যে সহরে মেরিয়ানের আবির্ভাব হয়, সেখানেই রাজপথ হয়ে যায় লোকে লোকারণ্য—সকলে ছুটে আসে কেবল তাঁকে একবার চোখে দেখবার জন্যে। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' বললে, "মেরিয়ানের কণ্ঠস্বর হচ্ছে একটা সমগ্র জাতির কণ্ঠস্বর!"

মেরিয়ানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন্‌টি তাঁর জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত্ত?

তিনি জবাব দেন, "যেদিন আমি বাড়ী ফিরে এসে মাকে বলতে পেরেছিলুম—মা, আর তোমাকে খেটে খেতে হবে না।"

বালিকা বয়সে মেরিয়ানকে দাসীবৃত্তির দ্বারা টাকা রোজগার করতে হ'ত। দয়ালু প্রতিবেশীরা চাঁদা তুলে সঙ্গীতশিক্ষার ব্যয় সংকুলান করত। সেই মেরিয়ান আজ হয়েছেন বিপুল বিত্তের অধিকারিণী—বাড়ী, গাড়ী, দাস-দাসী, তাঁর কিছুরই অভাব নেই। য়ুরোপ-আমেরিকার দেশে দেশে তাঁর নামে ওঠে জয়ধ্বনি! বাংলা দেশে নিছক আর্টের সেবা করলে ধনী হন নিঃস্ব, আর শ্বেতাঙ্গদের দেশে আর্ট দীনের অঞ্চলেও নিক্ষেপ করতে পারে বহু লক্ষ মুদ্রা। লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর বিবাদ হয় লক্ষ্মী-সরস্বতীর পূজারীদের দেশেই।

টেম্পল য়ুনিভার্সিটি, হাওয়ার্ড য়ুনিভার্সিটি ও স্মিথ কলেজ থেকে মেরিয়ান "Doctorates of Music" উপাধি লাভ করেছেন এবং আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট-পত্নী মিসেস্ রুজভেল্ট তাঁর কণ্ঠে স্বহস্তে ঝুলিয়ে দিয়েছেন স্পিনগার্ণ পদক। তাঁর জন্মস্থান ফিলাডেলফিয়ার সম্মান বাড়িয়েছেন ব'লে তাঁকে দেওয়া হয়েছে দশ হাজার ডলারের "বক্" পুরস্কার।

স্বর্গত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁকে নিজের ভবনে সাদরে আমন্ত্রণ করেন—এমন অসাধারণ সম্মানলাভ ঘটে খুব কম শিল্পীর ভাগ্যেই। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে তাঁকে কি ব'লে সম্বোধন করবেন তা ভেবে-চিন্তে মেরিয়ান একটি ছোট্ট বক্তৃতা মহলা দিয়ে তৈরি ক'রে রাখলেন। মিঃ রুজভেল্ট এসে আদর ক'রে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "ওগো বাছা, তোমাকে দেখছি ঠিক তোমার ছবির মতই দেখতে—কেমন, তাই নয় কি?" মেরিয়ান উত্তর দেবেন কি, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নিজের ছোট্ট বক্তৃতাটি পর্য্যন্ত একেবারে ভুলে গেলেন।

ইংলণ্ডের মহামান্য রাজা ও রাণী বেড়াতে গিয়েছেন আমেরিকায়। তাঁরা মেরিয়ানকে দেখবার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করলেন। মিসেস্ রুজভেল্ট তাঁকে রাজা ও রাণীর সামনে নিয়ে গেলেন। ভয়-তরাসে মেরিয়ান রাজার সঙ্গে কথা কইতে পারলেন না তো বটেই, তাঁকে প্রণত-জানু হয়ে প্রণাম পর্য্যন্ত করতে ভুলে গেলেন।

এ সব তো হচ্ছে ঢালের এক পিঠের লিখন। এবারে ঢাল উল্টে দেখা যাক্ তার অন্য পিঠে কি আছে।

মেরিয়ানকে সহ্য করতে হয় অনেক অপমান, অনেক গালি-গালাজ, অনেক টিটকারি। কিন্তু তিনি ধীর, স্থির, শান্ত মেয়ে। কোন প্রতিবাদই করেন না। এ সব বিরুদ্ধতা কেবল তাঁর গায়ের কালো রংয়ের জন্যে।

অনেক ট্যাক্সিওয়ালা তাঁকে তাদের গাড়ীতে চড়তে দেয় না। তিনি মুখ বুঁজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন এমন কোন ট্যাক্সির জন্যে, যার চালকের মন অপেক্ষাকৃত উদার।

অনেক হোটেলের শ্বেতাঙ্গ মালিক তাঁকে দরজা থেকেই খেদিয়ে দেয়। তাঁকে আশ্রয় নিতে হয় দূরবর্ত্তী কোন নিগ্রো পল্লীতে গিয়ে। তিনি কোন রকম তিক্ততা সৃষ্টি করতে চান না। একবার খালি দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, "ভগবান যখন নিগ্রোকেও গুণী করেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর কোন পক্ষপাতিত্ব নেই!"

মেরিয়ানের সঙ্গতবাদক হচ্ছেন এক জন শ্বেতাঙ্গ, গানের সঙ্গে তিনি পিয়ানো বাজান। তাই নিয়ে বারংবার প্রতিবাদ ওঠে। তাঁর ম্যানেজার হিউরককে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়—"একটা নিগ্রোর সঙ্গে সঙ্গত করবে শ্বেতাঙ্গ? দেখো, ছুঁড়ীটাকে সবাই ঢিল ছুঁড়ে মারবে, বিষম গোলমাল হবে!" আজ পর্য্যন্ত কেউ ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করেনি, কিন্তু গোলমাল হয়েছে বারংবার—তবে সে গোলমাল হচ্ছে হাততালির এবং প্রশংসাধ্বনির।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের "ইষ্টার" রবিবারে ব্যাপারটা একেবারে চরমে ওঠে। ওয়াশিংটন সহরের হাওয়ার্ড য়ুনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে মেরিয়ানের সেখানে গান গাইবার কথা। সহরের সব চেয়ে বড় প্রেক্ষাগৃহ হচ্ছে কনষ্টিটিউসন হল। কিন্তু সেখানকার কর্ত্তারা বেঁকে বসলেন, বললেন, নিগ্রো শিল্পীদের জন্যে আসর ছেড়ে দেওয়া আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ।

'দি ওয়াসিংটন হেরাল্ডে'র সম্পাদকীয় কলমে এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হ'ল: "এ রকম বর্ণবিদ্বেষ আমাদের জাতিকে তাবৎ সংস্কৃতিশীল পুরুষদের চোখে উপহাসভাজন ক'রে তুলবে এবং উল্লসিত করবে হিটলার ও তার নাজীদের।" কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এ মন্তব্য গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলেন না।

তার পর সেন্ট্রাল হাই স্কুলের প্রেক্ষাগৃহের জন্যে আবেদন করা হ'ল। কিন্তু সেখানেও নিগ্রো শিল্পীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

এখন উপায়? হিউরক লিন্‌কলন্ মেমোরিয়ালের সরকারি জমির জন্যে আবেদন ক'রে সফল হ'লেন। তিনি তখন সানন্দে ঘোষণা করলেন—"আগামী ইষ্টার রবিবারে লিন্‌কলন্

মেমোরিয়ালের খোলা মাঠে মেরিয়ান এণ্ডারসন তাঁর গানের জলসা বসাবেন।"

চারি দিকে সৃষ্টি হ'ল বিষম উত্তেজনা! শত্রু-মিত্র নানা জনের মুখে নানা গুজব। মেরিয়ান নিজেও ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, "দরকার নেই এত হাঙ্গামায়।" কিন্তু ভিউরক অটল।

নির্দিষ্ট দিনে পুলিশ-বাহিনীর দ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত হয়ে মেরিয়ান যখন আসরে গিয়ে হাজির হ'লেন, তখন সামনে দেখলেন এক অভাবিত দৃশ্য। বিস্তীর্ণ ময়দানে বিরাট জনতা! অমন সুবৃহৎ জনতার সামনে তিনি আর কখনো গান গাইবার সুযোগ পাননি। টিকিট কিনে তাঁর গান শুনতে এসেছে পঁচাত্তর হাজার শ্রোতা!

গান শেষ হ'লে উঠল আকাশভেদী প্রশংসাধ্বনি!

মেরিয়ান বললেন, "আজ আমি গান শোনালুম সমগ্র জাতিকে।"

ক্ষুদ্ররা যে গণ্ডী কাটে, তা লুপ্ত ক'রে দেয় বৃহত্তর লোকসাধারণের উচ্চতর মনোবৃত্তি।

রাশিয়ার চলচ্চিত্র

স্বখেন্দু দত্ত

মস্কোর চিত্র-প্রদর্শনী সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁ একদা বলেছিলেন:

—"সোবিয়েতের চলচ্চিত্র শিল্প জনগণের শিল্প হিসাবে অদ্বিতীয়। এই শিল্প সকলের হয়ে কথা বলে, সকলের আওয়াজকে ধ্বনিত করে তোলে এবং সকলের চোখ খুলে দেয়। সোবিয়েৎ শিল্পীদের কীর্ত্তি ইতিমধ্যেই অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, নতুন সোবিয়েৎ জগতের বৈশিষ্ট্যকে তারা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধ 'ট্রাজিডি'গুলির মত। সোবিয়েতের চলচ্চিত্র শিল্প নিজের নতুন পথ সৃষ্টি করে নিয়েছে। প্রগতির প্রতিটি ধাপকে সোবিয়েৎ চলচ্চিত্র শিল্প চিরস্মরণীয় ভাবে চিহ্নিত করে রেখে গিয়েছে।"

সোবিয়েৎ চলচ্চিত্রের জন্ম আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে। তার আগে রুশিয়ায় কোন ভাল ছবি তোলা হত না। পনের বছরের মধ্যেই সোবিয়েতের ছবি নিজের দেশে তো বটেই, বিদেশেও এই যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছিল এর পেছনে রয়েছে সোবিয়েৎ ছবির আদর্শগত উপকরণ। সোবিয়েতের নতুন জীবনের, নতুন মানুষের, ভাবী পৃথিবীর প্রতিনিধির নতুন জগৎ সৃষ্টির বীরত্বময় জীবন-সংগ্রামকে পর্দ্দায় প্রতিফলিত করে সোবিয়েতের চিত্র-প্রযোজকেরা জগতে সৃষ্টি করলেন এক নতুন ধরণের ছবি। চলচ্চিত্র শিল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে সোবিয়েৎ ছবি এক যুগান্তর এনে দিল। তাই আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষ সোবিয়েতের ছবি অসাধারণ ঔৎসুক্য ও আগ্রহ নিয়ে দেখেন। সোবিয়েৎ ছবির আদর্শগত সত্যনিষ্ঠ উপকরণ তাদের মনকে আকৃষ্ট না করে পারে না।

সোবিয়েৎ চলচ্চিত্রের জন্ম নভেম্বর বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের অগ্নিগর্ভে। বিপ্লবের সাফল্যের পরই রুশিয়ার সিনেমা-জগতের প্রগতিশীলেরা সেই সময়কার ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে রেকর্ড করতে আরম্ভ করলেন। লেনিন নিজে এই ধরণের ছবিকে অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করতেন। সোবিয়েৎ সিনেমার ইতিহাসে লেনিন ও ষ্টালিন বরাবর স্বদেশের জরুরী ঘটনাগুলোর ছবি তোলানর দিকে নজর রেখে এসেছেন দেখা যায়। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সোবিয়েতের ঘটনামূলক ছবির বিশেষ উন্নতি হয়। তার পর যতই দিন যাচ্ছে, সোবিয়েতের এই ধরণের ছবি আদর্শে ও উদ্দেশ্যে নিখুঁত হয়ে উঠছে। ঘটনামূলক ছবিকে রসপুষ্ট, তথ্যবহুল এবং দর্শকজনচিত্তজয়ী করতে সোবিয়েৎ দেশের মত আর কোন দেশই পারেনি। কয়েক মাস আগে কলকাতায় দেখান 'ফেষ্টিভ্যাল অফ্ ইউথ' ছবিখানাই তার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিচয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষার মহান্ সংগ্রামের সময় রণাঙ্গনের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইতিহাসের পাতার মতই রেকর্ড হয়ে গিয়েছে সোবিয়েতের ঘটনামূলক ছবির কল্যাণে। এই সব ছবি চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। শুধু ঘটনামূলক বলে নয়, চিত্রকলার দিক থেকেও ছবিগুলো অনবদ্য। এই সব ছবির জন্য প্রত্যেক রণাঙ্গনে, শত্রুর পিছনে, গেরিলা দলে সর্ব্বত্র আলোকচিত্রকারেরা ক্যামেরা নিয়ে তৈরী থাকতেন। অনেক সময় তাঁদের ক্যামেরা রেখে অস্ত্র হাতে নিয়ে লেগে পড়তে হয়েছে। কত শিল্পীই না এই ভাবে প্রাণ দিয়েছেন!

কিন্তু শুধু ঘটনামূলক ছবিই নয়, বর্ত্তমান যুগে চলচ্চিত্র শিল্প-জগতেও নায়কের স্থান দখল করেছে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন। আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে সোবিয়েৎ চলচ্চিত্র বরাবরই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আসছে। চিন্তার বলিষ্ঠতা এবং ছবিতে গল্প বলার কলা-কৌশলের জন্যও সোবিয়েৎ ছবি আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করেছে।

দেশ ও জনগণের সেবাব্রত গ্রহণ করে, সমাজতন্ত্রের মহান্ আদর্শকে প্রতিফলিত করে সোবিয়েতের চলচ্চিত্র শিল্প গোড়ার দিক থেকেই চমৎকার সব ছবি তুলে আসছে। এগুলোর মধ্যে বহু ছবি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে, সোবিয়েৎ ছবির সৃষ্টিশক্তি যে কতখানি বেশি, বিশ্ববাসী তা দেখেছে। দেখেছে যে, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও কর্ম্মীদল কি ভাবে জীবনের ও সমাজের উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের এই মহান্ অবদানকে ব্যবহার করেছেন।

সোবিয়েতের ছবিগুলো ওদেশের সুস্থ, সবল ও গঠনমূলক সামাজিক ব্যবস্থার পরিচয় বহন করে, জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণনির্ব্বিশেষে জীবনের ক্ষেত্রে মানবতার জন্য গভীর প্রেম ও সৌহার্দ্দের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শ্রমের মর্য্যাদা, স্বদেশপ্রীতি, যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস এবং ব্যক্তিগত জীবনে সততা প্রভৃতির আদর্শকে ফুটিয়ে তোলে অগ্রগামী জীবনের মুখর প্রতিচ্ছবি সোবিয়েৎ চলচ্চিত্র। ভারতে সোবিয়েৎ রাষ্ট্রদূত মঃ নভিকভ-এর ভাষায় "সোবিয়েৎ ছবিগুলো মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলোকে আরও নতুন ও উচ্চতর জীবনের জন্য ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। পুরান জীবন-যাত্রার চেয়ে উন্নততর জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন বোধে জীবনের যা কিছু অন্যায় বা কুৎসিত ভাব থাকে, তাকে সমালোচনা দ্বারা দূর করারও চেষ্টা হয়।"

সোবিয়েৎ মানুষের জীবন-সংগ্রামকে দেখানর সংগে সংগে সোবিয়েৎ ছবি এই জিনিষটাও ফুটিয়ে তোলে যে, সোবিয়েতের মানুষ

কোন্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন-সংগ্রামে নেমেছে। সোবিয়েতের ছবি তাই অন্যান্য দেশের জনগণকেও মুক্তি-সংগ্রামে সাহায্য করে, অনুপ্রেরণা দেয়। পনের বছর আগে সোবিয়েৎ ছবি স্পেনের জনগণকে ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রেরণা দিত। সে সময় প্রতিটি রিপাবলিকান বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সময়ে সোবিয়েৎ চলচ্চিত্র "চাপায়েফ" দেখতে চাইত। ছবি দেখে চাপায়েফের সৈনিকদের মতই বীরত্বের সংগে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিত রিপাবলিকান স্পেনের গণতন্ত্রী বাহিনীর সৈনিকেরা। চীনের দেশভক্তেরাও জাপানী আক্রমণকারী আর মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার কুওমিনতাং-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সোবিয়েৎ ছবি থেকে পেয়েছে প্রচুর অনুপ্রেরণা।

শিক্ষা ও তথ্যমূলক ছবিই সোবিয়েতের চলচ্চিত্রের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া শিল্প-উৎকর্ষের দিক থেকেও সোবিয়েৎ ছবি আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করেছে। সোবিয়েৎ চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য চিত্তাকর্ষক ভাবেই পরিস্ফুট। রঙীন চিত্ররচনার উৎকর্ষে সোবিয়েৎ চিত্রনির্ম্মাতারা আশ্চর্য্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। কিছু দিন আগে কলকাতায় সোবিয়েৎ চলচ্চিত্র উৎসবের সময় দেখান 'টেল অফ দি উড্‌স্' ছবিখানাই তার একটা পরিচয়। অতি নিখুঁত বাস্তব রঙের পরিস্ফুটনে ছবিখানা সমৃদ্ধ। বক্তব্যের বর্ণনা এবং চিত্র গ্রহণের দিক থেকে ছবিতে যেমন নিপুণ তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি রঙ যোজনার সমারোহ ও বৈশিষ্ট্য চোখ ও মনকে তৃপ্তি দেয়। সোবিয়েৎ চিত্রনির্ম্মাতাদের উদ্ভাবনী কৌশল যে কতখানি, তারই পরিচয় দেয় ছবিখানা। কলকাতায় দর্শক-সমাজের কাছ থেকে এটা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই প্রচুর প্রশংসা ও অভিনন্দন পেয়েছে, তাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।

আমাদের দেশে সোবিয়েৎ চলচ্চিত্র আসে খুব কমই। কম আসে নানা কারণে। প্রথমত, সোবিয়েৎ ছবি প্রদর্শন করার জন্য সরকারী অনুমতি লাভ করতে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। দ্বিতীয়ত, সরকারের অপ্রিয়ভাজন হওয়ার ভয়ে চিত্রগৃহের মালিকেরা সোবিয়েতের চলচ্চিত্র দেখাতে চান না। তার ওপর রুশ ভাষায় তোলা ছবি আমাদের দেশের দর্শকদের বোধগম্য নয়। কিন্তু ভাষাগত বাধা ও ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও সার্ব্বজনীন আবেগসম্পন্ন সার্থক ও রসোত্তীর্ণ ছবির মর্ম্ম ও রসোপলব্ধিতে অসুবিধার কারণ ঘটে না। তাই যাঁদের উদ্যোগ, আয়োজন এবং পরিকল্পনায় কিছু দিন আগে কলকাতায় সোবিয়েৎ চলচ্চিত্র উৎসব সম্ভব হয়, তাঁরা সিনেমারস-পিপাসু দর্শকদের বিশেষ একটা প্রয়োজন মেটাবার জন্য ধন্যবাদভাজন হয়েছেন নিশ্চয়ই। যে সব ছবি সচরাচর দেখার সুযোগ-সুবিধা নেই, সেই সব ছবি দর্শকসাধারণের কাছে সহজলভ্য করায় চলচ্চিত্রের অনুরাগী মাত্রেই তাঁদের ধন্যবাদ দেবেন।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

ভারতের প্রাচীন ঋষির হে তরুণ বংশধর,
হে আর্য মহামানব, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র!
এই বিমথিতা দেশজননীর ধূলিকণা থেকে
কি বিরাট অদৃশ্য—আশ্রম তুমি গড়ে তুলেছো।
জনতার প্রলাপ থেকে দূরে সরে গিয়ে
তুমিই সেই প্রশান্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলে,
তুমিই শুধু মুহূর্তের জন্যে এসে গভীর কেন্দ্রের দিকে তাকিয়েছিলে—
যে কেন্দ্র থেকে সেই এক প্রাণ, সূর্য-চন্দ্র-তারা,
পশু-পাখী, ধূলিকণা এমন কি পাথরেও প্রসারিত—
যেখানে এখনো একটি বিনিদ্র আত্মা নিজ ক্রোড়ে
এক অদৃশ্য সংগীতে সমগ্র পৃথিবী, সমগ্র বস্তুকে দোলা দিচ্ছে,
সমস্তই চলছে কিংবা মনে হচ্ছে সমস্তই রয়েছে স্তব্ধ হয়ে!

যখন আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের মৃত সম্মান বিস্মৃত
হয়ে মাতাল হয়েছিলাম, বিদেশী সাহিত্য, সভ্যতা, পোষাক,
বিদেশী ভাষা, বিদেশী কায়দায় আমরা অন্যকে নকল করছিলাম,
অন্ধকার কূপের মধ্যে ব্যাঙের মতো গলা ফুলিয়ে
অভব্য ভাবে পরস্পরকে গালাগাল দিচ্ছিলাম—
তখন তুমি আমাদের থেকে দূরে গিয়ে
কত দূরে, কত মহীয়ান্ ধ্যানের মধ্যে নিজেকে সমাহিত করেছিলে
তুমি, তোমার মনই সেই নিস্তব্ধ গাম্ভীর্যের মধ্যে, গভীর
প্রশান্তির মধ্যে, অদৃশ্য আত্মার মধ্যে ডুব দিয়েছিলো।
এই দৃশ্য পৃথিবীর পরপারে—যেখানে প্রাচীন ঋষিরা আছেন,
যাঁরা এই বিরাট সীমানা অতিক্রম করে গেছেন—সেইখানেও
তোমার মহীয়ান্ কীর্তি বিনম্র ভাবে বিরাট পুরুষের পাদমূলে প্রসারিত।
হে ঋষি, তুমিও সেই প্রাচীন ঋষিদের মতই উদাত্ত কণ্ঠেই বলেছিলে:
—"ওঠো, জাগো।"

তোমার সেই উদাত্ত আহ্বান ক্ষুদ্র দাম্ভিক শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের
কাছে এনেছিলো বিরাট বিস্ময়।
কিন্তু সমস্ত মানুষের কাছে এনেছিলো একতার অগ্নিবাণী।

তোমার ধ্যানের ভারত, এই প্রাচীন ভারত, আবার ফিরে আসুক,
তার নিজের আত্মার কাছে, ফিরে আসুক তার নিজস্ব ধ্যানে।
নিজস্ব কর্তব্যে, ভক্তিতে তার বিহ্বল বিরাটত্বে।
তাকে আবার বসতে হবে সমগ্র পৃথিবীর ঋত্বিকের পদে।
লোভ থেকে দূরে, সংগ্রাম থেকে দূরে, অসত্য থেকে দূরে,
তাকে আবার উঠতে হবে, জাগতে হবে, অধিকার করে নিতে হবে
এই মহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আসন।

সুলতান

আন্নাভৌ শাঠে

বন্দী সুলতান অমরাবতী কয়েদখানার কালো প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে গর্জিয়ে ব'লে উঠল—"আজ বিশ বছর ধ'রে পেট ভরে খাবার জন্যে বৃথাই চেষ্টা ক'রে আসছি। হয় আমাকে পেট ভরে খেতে হবে নতুবা কয়েদখানার দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরতে হবে। এর জন্য আমায় মরতে হয় তাও স্বীকার।" চৈত্রের মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের উত্তাপে কয়েদখানার প্রাচীর যেন জ্বলছিল। সারা কয়েদখানার বন্দীদের এই গরমে দম বন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ঠিক এমনি সময়ে সুলতান ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠে।

সুলতানের সাথে আমার দেখা অমরাবতী কয়েদখানায়। বন্দীরা তাকে বোকা ব'লেই ডাকত। দ্বিতীয় রিপুর বাহক হিসাবে সুলতানের দুর্নাম কেউ দিতে পারত না। সময়ে সময়ে সুলতান রেগে ফেটে পড়ত কিন্তু পর মুহূর্তেই সুলতান আবার ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যেত। এই জন্যেই বন্দীরা তাকে "বোকা সুলতান" বলত।

সুলতান সত্যিই বোকা ছিল। অবশ্য অন্য ধরণের বোকা। তার বিরাট দেহ কিন্তু শক্তিশালী শারীরিক গঠন, গোল মুখ, বসা নাক, রুক্ষ চুল ও কোঠরে নিমজ্জিত আঁখি দেখলেই মনে হবে যে, সুলতান সারা জীবন দুঃখের চিন্তা করতেই এসেছে। কয়েদীর পোষাকে তাকে বেশ মানাত। স্বল্পভাষী কিন্তু ধীরে ধীরে কথা বলত।

"খালি" ও তাসলা" হাতে না থাকলেই সুলতান বাঁ হাতের চেটোতে চূর্ণ-তামাক রেখে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে চাপ দিয়ে খৈনী তৈরী করত। এই কাজটায় এমনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, হাতে চূর্ণ-তামাক না থাকলেও বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মর্দন করে যেত।

খাওয়া, থাকা, পরা সকল মানুষেই চায় আর এর জন্যে মানুষ কত আশাই না পোষণ করে! সুলতানও আর দশ জনের মতই এমনি আশা করে। তার জীবনের বিশ বৎসর ধরে সে এই আশা ক'রে এসেছে কিন্তু কোনটাই সে পায় নেই। তার বাপ-মা আদর ক'রে ছেলের নাম রেখেছিলেন সুলতান। কিন্তু ছেলের জন্যে আশ্রয়, খাবারের সংস্থান—এর কোনটাই তাঁরা ক'রে যেতে পারেন নাই। সুলতানের শৈশবেই তাঁরা মারা যান। সুলতান অকুল পাথারে পড়ল। দুনিয়ায় নিজের আত্মীয় বলতে কেউ ছিল না আর নিজের জিনিষ বলতেও কিছু ছিল না। কেউ তাকে মানুষ করতেও নিল না। মনে হয়েছিল সে যেন আকাশ থেকে নীচে পড়েছে।

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সুলতানের প্রতিবেশীদের গরু-মহিষের প্রতি একটা ভালবাসা জন্মাল। গরু-মহিষের সাথে সে ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, তাদের সাথেই মাঠে যায় আর তাদের সাথেই ফিরে আসে। এর-তার বাড়ীতে চেয়ে-চিন্তে যা পায় তাই সে খায় আর গরু-মহিষের সাথে গোয়ালেই ঘুমোয়। কেউ তাকে কোন দিনই পেট ভরে খেতে দিত না। ফাঁক পেলেই রুটি মেগে বেড়াত। এই ক'রে কোন রকমে পেটের জ্বালা মেটাত।

গ্রামে আর ভাল লাগে না। সুলতান চলে যায় শহরে চাকুরীর সন্ধানে। অবশেষে সে আসে অমরাবতী শহরে। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কাজ আর পায় না। কেউ যদি তাকে পয়সা দেয় তা হ'লে সে পিঠে গাধা পর্য্যন্ত চাপিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এমনি তার অবস্থা। কে তাকে কাজ দেবে? কাজ পায় না ব'লে ত ক্ষিদে থামবে না।

সে তার কাজ ঠিকই ক'রে যায়। পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। রাস্তার দোকানে কত খাবারই না সাজান রয়েছে। সুলতান যা খেতে চায় তাই-ই দোকানে সাজান রয়েছে, কিন্তু খাবার উপায় কোথায়? চলতে চলতে একটি মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে মনে বলতে থাকে: "আল্লার দয়ায় যদি একবার এ দোকানে কাজ পাই! লুকিয়ে মুখে পুরি একখানা জেলাপী, জিবের তলায় রাখি একখানা পেড়া, আর সদ্য গিলে ফেলি একখানা বরফী। কিন্তু এখানে কাজ পাই কি করে? আমি যে মুসলমান। দোকানের মালিক হ'লো নাদুসনুদুস হিন্দু বেণে।" দোকানের সাজান জিনিসগুলোর উপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে সুলতান আগিয়ে চ'লে যায়।

বহু চেষ্টার পর অবশেষে একটা চাকুরী সুলতানের জুটে গেল। একটা পানের দোকানে। দৈনিক চার আনা বেতনের চাকুরী। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত দোকানে কাজ করতে হবে অথচ মজুরী দৈনিক চার আনা। কিছু দিন পরেই সুলতান বুঝতে পারল যে, দৈনিক চার আনায় তার চলে না। কাজেও মন বসে না। এক দিন মালিকের কাছে গিয়ে বলে ফেলল: "মালিক! আমার একটা কথা আছে।"

"কি কথা? বলে যাও।"

"আজ্ঞে—আমার এ মজুরীতে আর পোষাচ্ছে না।"

"মজুরী কম বলে মনে হচ্ছে না কি? কত চাও হে?—কি বলছ?"

"এ মজুরীতে আমার নিজেরই দিন চলছে না।"

"আমি কি করতে পারি বল?"

"আপনি কিছুই করতে পারেন না?" বিস্মিত হ'য়ে সুলতান প্রশ্ন করে।

মালিক বেশ ভারিক্কী চালে উত্তর দিলেন: "দেখ, তোমার পেট অভর। কোথাও তোমার পেট ভরবে না।"

"এ কথা আপনি কি ক'রে বলেন? আমার পেট কি অন্য লোকের পেটের চেয়ে আলাদা?"

মালিক ক্রূর হাসির রেখা টেনে বললেন: "নিশ্চয়ই। তোমার পেটের মত অভর পেট দুনিয়ায় নেই।"

"ওঃ, আপনি আমাকে নিয়ে রসিকতা করছেন বুঝি, শেঠজী।"

"তা' ছাড়া আর কি?"

"আমাকে আর কিছু খেতে দিন।"

"ও, তাই না কি? এখনি আমার কাছ থেকে দূর হ'য়ে যাও। তোমাকে দরকার করে না।" মালিক কাঁসরের ঝঙ্কার দিয়ে গর্জে উঠলেন। এই কথা ব'লেই তিনি এক গোছা পান নিয়ে কাঁচি দিয়ে বোঁটা কাটতে লাগলেন।

হারান চাকুরীটা ফিরে পাবার জন্যে সুলতান এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তার পর নিঃশব্দে সে বের হ'য়ে গেল। "আমি মুসলমান—মালিক হিন্দু। আমার মজুরী সে কি ক'রে বাড়াতে পারে?" নিজেকে সে এই প্রশ্ন করে আর মনকে সান্ত্বনা দেয় এই ব'লে যে, সে এর পর থেকে মুসলমান ছাড়া আর কারো দোকানে কাজ করবে না। বাঁ হাতের চেটোতে ডান

হাতের বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে চাপ দিতে দিতে সে বের হ'লো মুসলমান মালিকের খোঁজে।

*　*　*　*

এক রেস্তোর'ার সিঁড়িতে উঠে দাড়িওয়ালা মুসলমান মালিকের কাছে গিয়ে সুলতান জিজ্ঞেস করল: "শেঠজী! এখানে কাজ পেতে পারি কি?"

মালিক গরু কেনার মত সুলতানের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে সোজা উত্তর দিলেন! "হাঁ, পাওয়া যাবে। বেতন কত চাও?"

সুলতান উত্তর দিল: "মালিকের হাতে বিচারের ভার দিলাম।"

দাড়িতে আঙুল চালিয়ে মালিকের চালে উত্তর দিলেন: "দিন-মজুরী চার আনা। দু' বেলা খোরাক আর চা। এতে হবে ত?"

সুলতানের বড় আনন্দ হ'লো। "একটা লোকের আর কি দরকার? দু'বেলা খোরাক, চা আর তামাকের জন্তে চার আনা। ···ভালই হ'লো" এই ব'লে ভিতরে ঢুকে গেল। খিমার গন্ধে জিবে জল আসে সুলতানের। ভয়ে ভয়ে মালিকের দিকে তাকিয়ে সুলতান চুরি ক'রে একখানা খিমা মুখে পুরে দিল। টেবিলের চারি ধারে চায়ের কাপ। কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। বিরায়াণী সাজান ডিস। যেদিকে সুলতান তাকায় সেদিকেই খাবার আর খাবার। আনন্দে চোখ জ্বলে উঠে সুলতানের।

এক পক্ষ অতীত হ'য়ে গেল। এক দিন মালিক গর্জ্জন ক'রে উঠলেন: "এই জোচ্চোর! প্রত্যেক দিনই এক থালা বিরায়াণী, এক থালা খিমা আর এক থালা ভাত গিলছ। আমার দোকান ত ডকে উঠতে আর দেরী নেই।"

করুণ স্বরে সুলতান উত্তর দিল: "মালিক, যা দরকার হয় তার বেশী ত খাই না।"

"ওঃ, এই বুঝি তোমার খোরাক? তুমি যা গিলছ একটা রাক্ষসেও তা খেতে পারে না।"

মাথা ঠাণ্ডা ক'রে সুলতান বলল: "এ ত চাই।"

মুখ লাল ক'রে মালিক চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন: "এই বুঝি চাকুরী! আগামী কাল তুমি আমাকে গিলবে আর বলবে, এ-ও তোমার খোরাক।"

সুলতান জিজ্ঞাসা করল: "তাহ'লে আমি কি করব?"

মালিক বজ্রের মত গর্জ্জন ক'রে উঠলেন: "কি করবে? কিছুই করতে হবে না। দূর হ'য়ে যাও!"

"মালিক, আর বেশী খাবো না,"—কাঁদ-কাঁদ স্বরে সুলতান উত্তর দিল।

"না, না, না! দূর হ'য়ে যাও। গরুর চেয়ে বাছুর বড় চাই না।"

গোটা দোকানখানা হাসিতে ফেটে পড়ল। সুলতান অপমানিত হ'য়ে দোকান থেকে বের হ'য়ে গেল। "পরের চাকুরী করার সাধ আমার মিটে গিয়েছে! এইবার কুলি হবো"—এই ব'লে সে ষ্টেশনের দিকে হাঁটা শুরু করল।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুলতান ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কেউ-ই তাকে মোট ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্তে ডাক দিল না। ক্ষিদের জ্বালায় চোখ দিয়ে জল বের হ'য়ে আসে—চোখের সামনে তার জীবনটা ফুটে ওঠে। বিড়-বিড় ক'রে বলে, "আমি অনাথ, ভিক্ষে করেছি, মাঠে গোবর কুড়িয়েছি, পরের কাছে কাপড় চেয়ে পরেছি। কিন্তু কিসের জন্তে? সব কিছুই করতে পারি—সব কিছুই করতে প্রস্তুত কিন্তু আমার কিছুই করার নেই! আমার কুড়ি বছর বয়স হ'লো কিন্তু খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই।"

*　*　*　*

সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা অনুভব করল সুলতান। জ্বরে সর্বাঙ্গ আগুনের মত গরম হ'য়ে ওঠে। দু'দিন অচেতন অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকল সুলতান। তৃতীয় দিনে সারা রাত্রে যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন ক্ষিদের পেটে আগুন জ্বলছে। চারি দিক নিস্তব্ধ। সারা দুনিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। গোটা মানব-সমাজ ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন কি, দুনিয়ার যাবতীয় থালা-বাটি-গ্লাস পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ-ই আর জেগে নেই। শুধু জেগে আছে ঘর-বাড়ীর দেওয়াল। তারা জাগ্রত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। সবাই যেন পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে। সবই শূন্য বোধ হ'লো সুলতানের।

কিন্তু সুলতান ত ঘুমোয়নি। সে ত জেগে আছে। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায়? কেন? সে নিজেও তা জানত না। একটা মানুষকেও সে দেখতে পেলে না। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিল শুধু এক জন পুলিশ। সে জানিয়ে দিচ্ছিল—মানব জাতির অস্তিত্বের কথা—মানুষ এখনও আছে—লুপ্ত হ'য়ে যায়নি। অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় সেও রুগ্ন মুরগী-ছানার মত মাথা নাড়াতে নাড়াতে পাহারা দিচ্ছিল।

রাস্তার অপর দিকে দাঁড়িয়ে আছে একটি সিনেমা-ঘর। তার কপালের উপরে ঝোলানো ছিল "ভি শান্তরামের অমর সৃষ্টি রাম-যোশী" বুকে এঁটে নিয়ে একখানা সাইনবোর্ড। এর নীচে বসে আছে হৃষ্টপুষ্ট রামযোশী আর পাশে নৃত্য-ভঙ্গিমায় হাত তুলে আছেন নায়িকা বায়াবাঈ।

সুলতান থেমে যায়। তার ছেঁড়া প্যাণ্টের পকেটের ভিতর দু'হাত চালিয়ে দিয়ে ঘাড় নীচু ক'রে যা দেখে তা'তে তার সর্বাঙ্গ রাগে ফুলে ওঠে। অজানার উদ্দেশ্যে চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে: "চোপ্‌, রও!"

পুলিশের ঘুম ছুটে যায়। সেও চীৎকার ক'রে উঠে: "আবে, শালা কা বে।"

সুলতানের মাথা ঘুরে যায়। সামলিয়ে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত পা বাড়ায় সামনের দিকে। উত্তর দেয়: "আমি সুলতান।"

পুলিশ বেটনটি হাতে ক'ষে ধরে। ঠোঁটের কোণে শ্লেষের রেখা টেনে সুলতানকে প্রশ্ন করে: "সুলতান! কোন্ সুলতান—সুলতান মহম্মদ, সুলতান তোগলক—আকবার সুলতান, না, টিপু সুলতান? কোন্ সুলতান?"

সুলতান এদের নাম কোন দিন শোনেও নাই। শোনার সুযোগও তার মেলেনি। নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিল সুলতান: "না, না, না—আমি এদের কেউ নই।"

পুলিশটি আর একটু আগিয়ে আসে। একেবারে সুলতানের মুখের কাছে। ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করে: "তবে কিসের সুলতান? ..., রাতের সুলতান।"

নম্র ভাবে সুলতান উত্তর দিল: "আমি কুলী সুলতান। গত ... দিন ধ'রে কোন কাজই পাইনি।"

"নালহোল বইলা কাবাত্। কোন্ নরক থেকে আগমন হচ্ছে?"

পুলিশ বেটনটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে আবার ঘুমাতে যায়। শয়তান তাকে নিরাশ করেছে।

সুলতান ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল: "আমার ভীষণ জ্বর। বড় খিদে পেয়েছে—"

"সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, তার পর খেতে পাবে"—এই বলে পুলিশ উত্তর দেয়।

"আমার একটি পয়সাও নেই।"

দার্শনিকের মত গম্ভীর চালে পুলিশ জীবন-দর্শনের উপদেশ বর্ষণ করে বলে: "কাজ করলেই পয়সা পাবে।"

"কিন্তু পুলিশ সাহেব, আমি যে কাজ পাই না।"

সঠিক পথ বাতলিয়ে পুলিশ বলে: "কয়েদখানায় চলো। সেখানে আরামেই থাকবে।"

কাতর অনুনয় করে সুলতান বলে: "মেহেরবান, দয়া করে আমাকে নিয়ে চল।"

"ভেবেছ, কয়েদখানা বুঝি দাতব্যখানা? চুরি কর। নিজেই নিয়ে যাব।"

সুলতান তীব্র গলায় প্রতিবাদ জানায়: "কখনই না। কখনই চুরি করব না।"

অবজ্ঞার সুরে পুলিশ বলে: শালা, চুরি করতে পারবে না। কয়েদখানায় যাবার সখ দেখ!"

বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ টিপ্‌তে টিপ্‌তে সুলতান বলে: "মরব তবু চুরি করব না।"

পুলিশ রাগে ফেটে পড়ে বলে: "উল্লুক! তাই মর্।"

* * * *

খালি পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সুলতান চলে যায়। খালি পেট। মাথা বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরতে লাগল। নিজেকে প্রশ্ন করে: "বেঁচে থাকা সহজ, না মরা সহজ?" নিজেই উত্তর দেয়: "না, বাঁচা নয় মৃত্যুই সহজ। সূর্য্যি উঠবে। দোকান খুলবে। লোকগুলো কাপ্-কাপ্ চা গিলবে। কেউ টানবে সিগারেট—কেউ গিলবে মিষ্টি—কেউ পান্ চিবিয়ে পিক্ ফেলবে। তার পর সবাই বের হ'য়ে যাবে দোকান থেকে। আর আমি? দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাদের মুখের পানে চেয়ে থাকব পেটে ক্ষিদে নিয়ে! তার পর লোক-জন নিজের নিজের কাজে ছুটবে। টোংগাওয়ালারা টোংগায় ঘোড়া জুড়ে দেবে। তাদের ঘোড়াগুলোও আমার চেয়েও সুখে আছে। পেট ভ'রে তারা খেতে পায়—নির্মল বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। জজ ও উকিলেরা মন্থরগতিতে আদালতে ঢুকবে। আর আমি? ঘুরে বেড়াচ্ছি। কাজ নেই। কেউ কাজও দেয় না। ক্ষিদের জ্বালায় মরছি। আমি একটা অপদার্থ। যথেষ্ট হ'য়েছে! এ হতভাগ্য জীবনের আবার মূল্য কি? বেকার হ'য়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।"

বেকারী তার কাছে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে কুষ্ঠব্যাধি। সুলতানের মনে হ'তে লাগল এই দুরারোগ্য ব্যাধি শৈশব থেকেই তার সর্বাঙ্গে যেন আক্রমণ চালিয়েছে। আর সে আক্রমণের বেগ সহ্য করতে পারছে না। জীবন অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। জ্বরে কাঁপুনী আরম্ভ হ'য়েছে। কচ্ছপের মত ঘাড়টা বাড়িয়ে চলছে সুলতান। আবার নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলে চলে: "এ দুনিয়া আমার জন্যে নয়। দুনিয়া আমার চায় না। শুধু আমার মরণই দুনিয়া চায়।" এমনি কত টুকরো-টাকরা দার্শনিক তত্ত্ব তার মাথায় আজ ঢুকেছে।

গত রাত্রির শেষের দিকে এমনি কত কথাই না সুলতান চিন্তা ক'রেছে। অবশেষে এক সিদ্ধান্তেও সে উপনীত হ'য়েছে। আর ধীর পদক্ষেপ নয়। দ্রুতগতিতে সুলতান হাঁটা দেয়। অমরাবতী-বান্দেরা মেইন রোডের দিকে সুলতান চলে। পূর্ব দিক ফর্সা হ'য়েছে। রক্তিমাভা আলো ঠিকরে বের হ'য়ে আসে। নির্মল মৃদু মৃদু বাতাস আপন বেগে ব'য়ে চ'লেছে অজানার পথে। সুলতানের গায়ে লাগে। সুলতানের হাড় পর্য্যন্ত শিউরে উঠে। তার ক্রোধের মাত্রাই বেড়ে যায়।

ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল গাছ ছেড়ে দূর দূরান্তে চ'লে যায় খাদ্যের সন্ধানে—কাঠবিড়ালীগুলো উঁকি মারে কোঠর থেকে—মাঠে বের হ'য়ে আসে গরু-মোষ-ছাগল। সকলেই বের হ'য়েছে খাদ্যের সন্ধানে। তারা জানে কোথায় খাদ্য আছে। সকলেরই মুখে আনন্দ। সকলেরই স্বাধীন জীবন।

কিন্তু সুলতান? সে পাগলের মত এগিয়ে চলেছে। চোখ দিয়ে বের হচ্ছে জল।

* * * *

দূরে দেখা যাচ্ছিল একখানা বিরাট ইঞ্জিন। তার কপালে জ্বলছে এক তীব্র আলো। ধীর গতিতে বের হ'য়ে আসছে তার গহ্বর থেকে এক শব্দ। চারি দিকে ধোঁয়া ছড়িয়ে আসছে। একটানা শব্দ।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনখানা থেমে যায়। চাকাগুলো এক বিকট শব্দ ক'রে উঠল। যাত্রীরা ওলোট-পালোট হ'য়ে এর-ওর ঘাড়ে পড়ে যায়। কেউ কেউ জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ব্যাপার বুঝবার চেষ্টা করে।

"ব্যাপার কি? গরুর গাড়ী, না ট্রেন?" এক জন যাত্রী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে মন্তব্য করেন।

"ট্রেনের আর দোষ কি! এক উল্লুক লাইনের উপর শুয়ে রয়েছে।"

অপর এক জন জিজ্ঞাসা করেন: "লোকটা ওখানে পড়ে র'য়েছে কেন?"

অন্য এক জন চট্‌পট ক'রে উত্তর দিল: "আবার কেন? মরবার জন্যে! আপনি কি মনে করেন আমাদের প্রণাম করবার জন্যে না কি?"

"শয়তানটা কে?"

"সুলতান ব'লে মনে হ'চ্ছে। সে-ই ত আত্মহত্যা করবে বলে।"

এক জন শ্বেতাঙ্গ দার্শনিকের মত মন্তব্য করেন: "হতভাগা ভারতীয়েরাই ত আত্মহত্যা করতে চায়।"

রেল-লাইন থেকে সুলতানকে টেনে তুলে নিয়ে যাবার জন্তে লোক জন চেষ্টা করতে লাগল। সে কিছুতেই নড়তে চাইল না। গায়ের জোরে রেল-লাইন চেপে ধরে থাকে। চীৎকার করে বলতে লাগল: "সাহেব, গাড়ী চালিয়ে দাও—গাড়ী চালাও। মরতে চাই। মরণের ভয় আমার নেই। আমি মরতে চাই। বেঁচে থেকে আমার লাভ নেই। আমায় মরতে দাও। চালাও গাড়ী—"

খদ্দরের টুপি-পরিহিত এক জন যাত্রী বোমা ফাটার মত শব্দ ক'রে বললেন: "শালা, তুমি গাড়ী আটকালে! নইলে এতক্ষণে বাদ্নেরা পৌঁছে যেতাম।"

আরও অনেকে এক্সঙ্গে অভিযোগ জানাল: "মেল ধরতে বোধ হয় পারবনা—"

"সময় মত পৌঁছুতে না পারলে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান হ'য়ে যাবে।..."

"বোম্বাইয়ে আজ আমার বক্তৃতা দেওয়ার কথা।..."

"হতভাগাকে টেনে ফেলে দেয় না কেন?"

"অপেক্ষা করুন মশায়—পুলিশ এসে গিয়েছে। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

গোলমাল চুকে গেল। সব শান্ত।

আগের রাতের পুলিশটিই এসে গিয়েছে। সুলতানের ঘাড় ধ'রে পুলিশটি বলে: "আরে?—এ যে সুলতান। ঠিক হ্যায়। কয়েদখানায় যাবার পথ ঠিক হ'য়ে গিয়েছে। চল্ এইবার।" সুলতান তাকে আঘাত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

* * * *

অমরাবতী কয়েদখানায় সুলতান এসে গেল। এখানেও সেই একই বিপদ। কয়েদখানায় পেট ভরে খেতে পায় না। মাত্র দু'খানা পাতলা রুটি, একটু ডাল, তরকারী নামধারী কয়েকখানা অসিদ্ধ শাকপাতা। এর উপরে আছে ওয়ার্ডারদের হম্বিতম্বি—"গেট আপ, সিট ডাউন, লম্বর"—সুলতানের সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। সুলতান ভাবে বন্দীরা এদের চোখে ভেড়া না কি। অসহ্য হ'য়ে ওঠে এই অপমান।

আজ সুলতান গোটা কয়েদখানা কাঁপিয়ে তুলেছে। জেলারের সামনে সে একটা থামের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাসলা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাঁ পায়ের আঙ্গুলের ওপরে ভর দিয়ে থামের উপরে ঝাঁপিয়ে উঠতে তৈরী হয় সুলতান। চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে চীৎকার ক'রে জানিয়ে দেয়: "পেট ভ'রে খাবার জন্তে সব কিছুই চেষ্টা ক'রে আসছি। ভুলে যেও না—আমি এর জন্তে মরতে গিয়েছিলাম। এখানেও যদি পেট ভ'রে খেতে না পাই তাহ'লে আমায় পথ দেখতে হবে। যা' ইচ্ছে তাই করব। এখন কাপুরুষের মত আত্মহত্যা করব না। ভেবে দেখ আমি কি করি।"

কয়েদখানার কার্ডখানা সে ছুড়ে ফেলে দেয়। গোটা কয়েদখানা ভীত হ'য়ে ওঠে। বন্দীরা বের হ'য়ে আসে। সকলেরই চোখ জাগ্রত। পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠল। সর্বত্রই চাঞ্চল্য ভাব।

জেলার ফাঁকা বুলি আউড়ে চীৎকার ক'রে ওঠেন: "নেমে এস। যা' চেয়েছ তাই পাবে।"

কামিজটা তুলে শূন্য পেট চাপড়ে সুলতান প্রত্যুত্তর দেয়: "এই পেটের জন্তেই আমি লড়াই ক'রে প্রাণ দেব।"

আঘাত খেয়ে মানুষ যেমন পিছনে হটে, জেলারের অবস্থা তাই হয়। বিড়-বিড় ক'রে বলেন: "আহাম্মক! মূর্খেরাই মরতে চায়।" জেলার অবাক হ'য়ে যান। তাড়াতাড়ি কয়েদখানার কার্ডখানা তুলে নিয়ে লিখে দিলেন: "আরও দু'খানা রুটি।" তার পর তিনি বের হ'য়ে যান কয়েদখানার প্রাঙ্গণ থেকে।

সুলতান যখন শুনতে পেল তার জন্তে আরও দু'খানা রুটি দেবার আদেশ হ'য়েছে তখন সে হাসতে থাকে। মেজাজও শান্ত হ'য়ে গেল।

সুলতান এইবার লড়াই করছে।

কিসের লড়াই? রুটির লড়াই।

অনুবাদক—ললিত হাজরা।

ভূতের গল্প

বিষ্ণুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অরুণা অনেকক্ষণ থেকেই অস্বস্তি বোধ করছিল। শেষে মরিয়া হ'য়ে মুখ ফুটেই বলল—'চল, আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে বসি। আমার মোটেই ভাল লাগছে না।'

'—কি ভাল লাগছে না?'

—'ওই লোকটার হাব-ভাব। তখন থেকে কেমন ভাবে আমাদের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে, দেখছ না? কেন, এত কি দেখবার আছে আমাদের মধ্যে? আর এতখানি জায়গা থাকতে এত কাছ ঘেঁষেই বা এসে বসার মানে কি বাপু?'

লোকটার বিসদৃশ আচরণ যে মনুজের চোখেও পড়েনি তা নয়। কিন্তু নারীচিত্তের ভীতিপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতে নেই এমন একটা মনোবৃত্তির বশেই বলল, 'তোমার যত সব......'

অরুণা নাছোড়বান্দা—'না বাপু, ওঠ। আগ্রায় বেড়াতে এসে লোদি হোটেলে বসে বসে ঝিমানো কোন কাজের কথা নয়। আমাদের তো সবে তাজমহল আর আগ্রা ফোর্ট সারা হয়েছে। সেকেন্দ্রা, ইতমদ্উদ্দৌলা, দয়ালবাগ, মথুরা বৃন্দাবন, ফতেপুর সবই তো বাকি।'

তবু মনুজ খুঁত খুঁত করে—

—'তুমিই তো বললে, আজ আর অন্য কাজ নয়, শুধু রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতা শোন। আর যদি সময় থাকে বাজারে একটা শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তি...'

বেচারী শেষ করারও অবকাশ পেলো না। অরুণা তখন আসন ছেড়ে চলতে সুরু করে দিয়েছে—কাজেই অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় রইলো না।

লোকটি কিন্তু এবার বেয়াদবির চূড়ান্ত করলে। এক হাত বাড়িয়ে দুই জনেরই পথ রোধ করে বললে,—'এক মিনিট—'

মনুজ বিস্মিত, অরুণা বিরক্ত !

'—আচ্ছা, আমি এক ভদ্রলোককে জানতাম ঠিক আপনার মত দেখতে। তার নাম মনুজ—মনুজ গুহ—বাপের নাম বিজয় গুহ, পিতামহ শিবদাস গুহ, প্রপিতামহ···।

—'ব্যস, ব্যস, হয়েছে। আর বেশী দূর এগুবেন না, এগুলে আমি আর পেরে উঠবো না। কিন্তু, কেয়া তাজ্জব! আপনি আমার তিন পুরুষের নাম বলে উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের নাম বলার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিলেন আর আমি আপনার বাপ-ঠাকুরদাদা দূরে থাক, আপনার নামই মনে করতে পারছি না। নাঃ, অত্যন্ত লজ্জার বিষয়! ও কি, তুমি অমন করে পালাচ্ছ কেন?'

শেষের কথাটি অরুণাকে লক্ষ্য করে। মাথা-ধরার সংক্ষিপ্ত ছুতায় অরুণা সরে পড়লো।

২

'আফটারনুন টি' টেবিলে আবার দেখা। অরুণা সরে পড়ার আবদার ধরেছিল কিন্তু সে আবদার টেঁকেনি। মনুজের সব্যস্ত সঙ্কোচকে ঢাকবার জন্যে আগন্তুক বললে, 'আপনার অত ডেলিকেসি ফিল করার কোন কারণ নেই, মিঃ গুহ। মিসেস্ গুহের মাথা-ধরাটাকে আমি মোটেই সন্দেহ করিনি। আর সন্দেহজনক হলেও লজ্জার কিছু ছিল না। আমাদের দেশের আদর্শ মহিলাদের অপরিচিত পুরুষ সম্পর্কে—চাঁচাছোলা ভাষায় পরপুরুষ সম্পর্কে একটা প্রেজুডিস থেকেই যায়। ওটা ওঁদের সুষমারই একটা অঙ্গ। তা' ছাড়া আমার গায়ে-পড়া ভাবটাও অত্যন্ত বিসদৃশ হয়েছিল। পরে ভেবে দেখে নিজেই মনে-মনে বড় লজ্জা পেয়েছিল'।

অরুণা আরক্ত মুখে বললো,—'আমার কারুর সম্পর্কে কোন প্রেজুডিস নেই।'

—'না, না, আপনার লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। সংস্কার বাদ দিলে মানুষের জীবনের কিছুই থাকে না। আর সেই সংস্কারের ভাল-মন্দ সবই থাকতে পারে, থাকা স্বাভাবিক।'

দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে অরুণা বললে,—'আমার কোন কুসংস্কার নেই।'

—'কিন্তু আমার আছে। বহু কুসংস্কার আছে। যেমন ধরুন এই ক্যামেরাটা। যদি বলি, এই ক্যামেরায় আপনাদের কর্ত্তা-গিন্নীর যুগল ফটো তুললে আপনার অচিরে বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী, তবে হয়তো আপনি তাকে কুসংস্কার বলে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি। এ পর্য্যন্ত এই ক্যামেরায় বিশটা যুগলের ফটো তুলেছি—সর্ব্বত্রই এক ফল। শুধু বৈধব্য নয়, বৈধব্যের পর পুনর্বিবাহ। এতটা হয়তো আপনার ভাল লাগবে না, বাড়াবাড়ি মনে হবে।'

'—ইয়া আল্লা!' মনুজ লাফিয়ে ওঠে,—'তবে ত আপনার ক্যামেরায় আমাদের একটা ফটো তুলতেই হচ্ছে। বৈধব্যের আইডিয়াটা ভাল না লাগলেও অরুণার পুনর্বিবাহ? Nice!'

সময়ে সময়ে ভারী ছেলেমানুষি করে মনুজ। অরুণার আর বসে থাকা সম্ভব হলো না। ঢাকা বারান্দা ছেড়ে লোদি হোটেলের বাগানের দিকে বেরিয়ে পড়ে। সাদা পাথরের কৃত্রিম ঝরণার কাছে গিয়ে বসে।

সাদা পাথরের জন্ত আগ্রা বিখ্যাত। তাজমহলের বিখ্যাত শিল্পীদের বংশধরেরা আজও সন্নিহিত তাজগঞ্জ গ্রামে বাস করে। কিন্তু রাজন্য উচ্ছেদ আর জমিদারী বিলোপের ফলে তাদের ব্যবসায়ে ভাটা পড়ে গেছে। টাটা-বিড়লার জ্ঞাতি-গুষ্টীরা আয় করার বিদ্যেটা আর্ট হিসেবে আয়ত্ত করলেও ব্যয় করার বিদ্যেয় বড় কাঁচা! তা'ছাড়া তাঁদের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণের সঙ্গে ব্যয় ও কাগজে কলমে দেখানো উদ্‌বৃত্তের একটা সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়, কাজেই কথায় কথায় লাখ-লাখ টাকার গোঁয়ার্ত্তুমি তাঁদের সংযত করে চলতে হয়। কাজেই পাথর-শিল্পের প্রোলিটারিয়েট রূপ পেনি তাজমহল, ছোট ছোট ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি ইত্যাদি আজ হতভাগ্য তাজগঞ্জ শিল্পীদের জীবিকার প্রধান নির্ভর। তবু পাথরের ঝর্ণাটা দেখলে চোখ জুড়োয়।

মনুজ কখন যে এসে অরুণার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখেছে, সে মোটেই টের পায়নি।

—'লোকটা চলে গেছে তাহ'লে?'

—'না, ওই যে, ক্যামেরার তাক করছেন।'

অরুণার দুই চোখে হঠাৎ যেন আগুন খেলে যায়। লাফিয়ে ওঠে—'আপনার মতলব কি? কেন আপনি এই সর্ব্বনাশা ক্যামেরা নিয়ে আমাদের পিছু নিয়েছেন? কেন? কেন?'

তার পর হঠাৎ তার হাত থেকে ক্যামেরাটি কেড়ে নিয়ে সজোর আছাড়ে সান-বাঁধানো রাস্তায় চুরমার করে ফেলে।

৩

আগন্তুক এমন একটা ভাব দেখান যেন অরুণাই ওকে বাঁচিয়েছে। প্রিয়জনের উপহাররূপে পাওয়া এই সর্ব্বনাশা ক্যামেরার বোঝা সে অনিচ্ছায় বয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আজ সে মুক্ত। কোন ক্ষতিপূরণ দূরে থাক বরং তারই উচিত এ জন্ত অরুণাকে পুরস্কৃত করা। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়।

প্রথমটা যেন পরিবর্ত্তন করার জন্ত বললো,—'তাহ'লে এই পূর্ণ পূর্ণিমায় আপনারা জ্যোৎস্না-স্নাত তাজমহল দেখতে যাচ্ছেন? একটু রাত করেই বেরুবেন।'

মনুজ বললে—'রাত করে বেরিয়ে আর কি হবে? রাত এগারোটায় তো তাজমহলের সদর বন্ধ হয়ে যায়।'

—'নিয়ম যেমন আছে, ব্যতিক্রমও তো তেমনি আছে। আচার যেমন আছে, ব্যভিচারও তেমনি রয়েছে। জানেন তো এই তাজমহলের দ্বাররক্ষকেরা সাজাহানের শাসন থেকে বংশানুক্রমে দ্বাররক্ষা করে আসছে। ওদের কুলাচারে দাঁড়িয়ে গেছে, কাজেই মা ভৈঃ।'

মনুজ হাসে।

—'কিন্তু ভয় আছে অন্য জায়গায়। সেটাও বলে রাখা ভাল। কিছু দিন আগে এক মাদ্রাজী-যুগল রাত্রে তাজমহলের জ্যোৎস্না পান করে ফিরছিলেন। বেরসিক টাঙ্গাওয়ালা সর্ব্বস্বের সঙ্গে তাঁদের প্রাণটিও অপহরণ করে।'

মনুজ হো-হো করে হেসে উঠলো:—'আপনি দেখছি শুধু ক্যামেরার কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন, তা নয়। চোর-ডাকাত কোন কিছুতেই শ্রদ্ধার অভাব নেই। ভূতে বিশ্বাস করেন,—ভূত?'

—'নিশ্চয়—'

তার উত্তরের সুরে মনুজ ও অরুণা দু'জনেই একটু অবাক হলো, পরে হেসে উঠলো।

—'না. না, হাসির কথা নয়। আমি সত্যি ভূতে বিশ্বাস করি।'

—'কারণ?'

—'কারণ, আমি নিজেই যে একটা ভুত।'

মনুজ-অরুণা আবার হেসে উঠলো। এবার খুব জোরে।

—'বিশ্বাস হলো না? আচ্ছা দেখুন—' লোকটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

৪

মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে লোদি হোটেলে বসলো মনুজ। আগ্রা শহরে নিত্যকার আকর্ষণ কিছু নেই। যা আছে, এক সপ্তাহেই যথেষ্ট। অথচ অরুণার হার্টের যা' অবস্থা তাতে এখনও মাস খানেকের আগে আগ্রা ত্যাগের কোন সম্ভাবনাই নেই।

দিনটা অমাবস্যার কাছাকাছি। লোদি হোটেলটা এই সময়ে বেশ ফাঁকা। বাঙালী এডিশনাল ম্যানেজার জোতিষ ব্যানার্জ্জি ফুরসৎ পেয়ে মনুজের কাছাকাছি এসে বসলো। কুশল সংবাদ আদান-প্রদানের পর একটু ইতস্ততঃ করে বললো—'দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি এত দিন, কিন্তু এখন বলতে কোন বাধা নেই। বছর চার-পাঁচ আগের কথা। আমি তখন সবে এখানে চাকরীতে ঢুকেছি। নিরঞ্জন বলে আমার এক পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বন্ধু হঠাৎ এখানে এসে ওঠে। যে ঘরে আপনারা আছেন, সেখানেই তাকে থাকতে দেওয়া হয়। তখন তার বিরহ দশা চলছিল। শৈশব থেকে বি. এ. অবধি সে ছিল শান্তিনিকেতনের ছাত্র। সেখানে একটা মেয়ের সঙ্গে তার ভাব হয়। মেয়েটি মুক্তাহাটার জমিদার নিকুঞ্জ বাবুর মেয়ে, নাম সম্ভবতঃ অরুণা বা ওই ধরণের কিছু হবে। খুব ঘনিষ্ঠতা হয় ওদের কিন্তু বিয়ে হয়নি। কেন হয়নি সে কথা যাক। নিরঞ্জন ওই ঘরেই আত্মহত্যা করে। কিন্তু মৃত্যুর পর কারুর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেনি। এ কি, আপনি ও-রকম হয়ে গেলেন কেন—কি হলো—?'

এবার মনুজের পালা। ভুত দেখলো না কি ও?

বিদেশী গল্প

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

মারমেড প্যাসেজের তিন নম্বর বাড়ীর সামনের ছোট বসবার ঘরে বসে আছেন জ্যাকসন পিপার। এক কালে তিনি ছিলেন বৈমানিক। এখনও সেই প্রাক্তনীর পরিচয়েই গর্ববোধ করেন। চোখে-মুখে অন্তহীন ক্ষোভ আর হতাশা নিয়ে বসে আছেন তিনি। কিছুক্ষণ আগে ঘরের মধ্যে টর্ণেডো বয়ে গেছে। কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই এক তাঁর চোখে-মুখে ছাড়া। পিপার ভাবছিলেন টর্ণেডোর গতি-প্রকৃতির কথা। তিনি শুনেছিলেন কারো কারো কাছ থেকে যে, এই ধরণের ঝড় সামনে যা পায় তাকেই উড়িয়ে নিয়ে যায়, আঘাত ক'রে চুরমার ক'রে দেয় আর আশে-পাশে যারা থাকে তাদের ক্ষয়-ক্ষতি হয় না বললেই চলে। একটু আগে ঝড় এসেছিল; পিপারকে বিধ্বস্ত ক'রে টর্ণেডো সামনের সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় চলে গেছে। এখনো ঝড়ের দূরাগত গর্জ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঝড় যেন আবার আসবে। উদ্বেগ আর আশঙ্কায় প্রায় আধ-মরা জ্যাকসনকে সচকিত ক'রে ঝড় নেমে এল আবার সিঁড়ি বেয়ে।

'তোমার জন্ত আবার আমার অসুখ করল; আশা করি এবার খুব খুসি হয়েছ। তুমি আমাকে মারবে, মারবে, মারবে।'—হতভম্ব পিপারের দিকে কথাগুলো ছুঁড়ে মারল তাঁর স্ত্রী। পিপার একটু নড়ে বসলেন। বলবার কিছুই নেই, আর তা ছাড়া চুপ ক'রে থাকাই ভালো। জ্ঞানী লোকেরা বলেন না কি বোবার শত্রু নেই।

'তোমার বিয়ে করার যোগ্যতাটুকুও নেই। অন্য যে-কোন মেয়ে হ'লে অনেক আগেই তোমাকে ছেড়ে চ'লে যেতো'—আবার গর্জ্জন করে ওঠে পিপার-গৃহিণী।

পিপার সবিস্ময়ে জানান—'আমাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র তিন মাস আগে।'

'তুমি আর নাক নেড়ে নেড়ে কথা ব'লো না'—ধমক দেন গৃহিণী।—'আমার ত মনে হয়, সারা জীবনটাই জ্বলছি তোমাকে বিয়ে ক'রে।'

'আমারও তাই মনে হয়'—একটু সাহস ক'রে বলেন বৈমানিক।

'আচ্ছা',—শাসিয়ে ওঠে গৃহিণী আর সঙ্গে সঙ্গে কর্তা চেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়—'আচ্ছা বেশ, তুমি তা হ'লে হাঁপিয়ে উঠেছ আমাকে বিয়ে ক'রে। এখন ভাবছ বিয়েটা না করলেই হ'ত। কাপুরুষ কোথাকার, তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘেন্না করে। আহা!'—সুর পাল্টে যায় পিপার-গৃহিণীর। গলায় তরুণ কারুণ্যের আমেজ লাগে—'আহা, আজ যদি আমার প্রথম স্বামী বেঁচে থাকত আর যদি তোমার জায়গায় ঐ চেয়ারে সে ব'সে থাকত, তা হ'লে আমি যে কী সুখীই হ'তাম!'

'যদি সে আসে আমি তাকে এক্ষুনি চেয়ার ছেড়ে দেবো আর স্বাগত জানিয়ে সানন্দে বনবাসী হব এ কথা তোমাকে আমি হলফ ক'রে বলতে পারি'—বলে ওঠেন পিপার বেশ খুশি হ'য়ে। তাঁর কথা থামে না—'যদিও চেয়ারখানা এখন আমার আর আমার আগে এটা ছিল আমার বাবার সম্পত্তি, তবুও আমি এটা সানন্দে তোমার প্রথম স্বামীকে ছেড়ে দিতে রাজী আছি এ কথা আমি মাতা মেরীর নামে শপথ ক'রে বলছি। আহা! লোকটি বড় বুদ্ধিমান ছিল। যখন ডলফিন জাহাজ ডুবল তখন সে ভালো মতলবই ঠাউরেছিল। অবশ্য এর জন্য তাকে আমি কোন দোষ দিতে পারি না।'—পিপার সওয়াল শেষ করলেন।

'তার মানে?' রুখে ওঠে পিপার-গৃহিণী।

'আমার ধারণা, সে জাহাজের সঙ্গে ডুবে মরেনি।'—সহজ ভাবে বলে পিপার।

'ডুবে মরেনি ?'—গৃহিণীর স্বরে ব্যঙ্গ ফুটে ওঠে—'তা' হ'লে তার কী হ'ল ? এই তিরিশ বছর সে আছে কোথায় ?'

'লুকিয়ে আছে'—বলেই উঠে পড়েন পিপার ; আর কিছু ঘটবার আগেই সামনের সিঁড়ি বেয়ে তরতর ক'রে উপরে উঠে যান।

উপরের ঘরখানি পিপার-গৃহিণীর প্রথম স্বামীর নানান জিনিষে ভরা, মরা মিউজিয়াম। তার ছবি নানা ধরণের আর নানা আকৃতির—ছড়িয়ে আছে ঘরের দেওয়ালগুলোয়। নাবিকের সুবৃহৎ বুট দু'টিও রক্ষিত হয়েছে এক কোণে। পিপার বিছানার এক পাশে ব'সে ভাবতে লাগলেন, যদি সে ফিরে আসে ত বড় ভালো হয়। এমন ব্যাপারও ত ঘটে। আর একবার না হয় ঘটল। তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়ল গৃহিণীর চীৎকারে।

'জ্যাকসন, আমি বাইরে যাচ্ছি।'—নীচের তলা থেকে হাঁক দিলেন শ্রীমতী—'যদি তুমি রাত্রে খেতে চাও ত নিয়ে খেয়ো আর না ক্ষিদে থাকে ত খেয়ো না।' নীচের সদর দরজাটা সশব্দে বন্ধ হ'য়ে গেল।

পিপার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন যে, তাঁর অর্ধাঙ্গিনী পাল-তোলা নৌকার মত হেলে-দুলে চলেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি এসে বসলেন স্বস্থানে। নিশ্চিন্ত মনে পাইপে আগুন ধরালেন। দেখতে দেখতে ঘরের কোণে-কোণে জমে উঠল ধোঁয়ার মেঘ আর মনের আকাশে ছড়িয়ে পড়ল চিন্তার আলো।

পরের দিন সকাল বেলা। লণ্ডনগামী ট্রেনের যাত্রী পিপার। ট্রেনের চাকার সঙ্গে সময়ের চাকাও ঘুরে চলেছে। ঠিক সময়ে ট্রেণ লণ্ডন পৌঁছল। পিপার বাসে চেপে চলেন তাঁর বন্ধুর বাড়ী—তাঁর বন্ধু ক্যাপ্টেন ক্রিপেন। পিপারকে দেখে ক্যাপ্টেনের আনন্দ আর ধরে না। পিপারকে জড়িয়ে ধ'রে প্রৌঢ় ক্যাপ্টেন একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল। ছোঁড়া চাকরটাকে রাসভনিন্দিত কণ্ঠে হুকুম করল পাশের বাড়ীর বাচ্চা ছেলেটার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে—'ওরে, ষ্টাউট আর জীন মদ নিয়ে আয়, আর গোটা দুই পাইপও আনিস্।' বাচ্চা চাকরটা হুকুম তামিল করতে এসে বাবুর পেয়ারের বন্ধুটিকে একবার আড়চোখে দেখে নিল।

ক্রিপেন কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল। হঠাৎ প্রশ্ন করে—'আচ্ছা, তোমাকে একটু বিব্রত দেখছি কেন বল ত ? হয়েছে কী ? তোমার স্ত্রী ভালো ত ?'

'হ্যাঁ ভালো, তবে আমার পক্ষে মারাত্মক।'

'মানে, অসুখ-বিসুখ করেছে না কী ?'

'আরে না, না, অসুখ করেনি, মাথা খারাপ হয়েছে। আর আমার মাথাটাও ক্রমেই শ্রীমতীর মাথার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করছে। বউরাণী আমাকে যা প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে, এখন তা থেকে আমাকে স্বয়ং ভগবান এলেও রক্ষা করতে পারেন কি না সন্দেহ।'

'তুমিও তাকে পাল্টা প্যাঁচে ফেলে দাও, ব্যস্, ল্যাঠা চুকে যাবে !' বলে ক্রিপেন মুরুব্বির ভঙ্গীতে।

'আরে ভাই, সেই জন্যই ত তোমার কাছে আসা। মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান যে কত গভীর তা ত আমার অজানা নেই। এখন তুমি একটু সাহায্য করলেই বেঁচে যাই।'

'ব্যাপারটা কী ? গিন্নীর মেজাজ খারাপের কারণ সম্বন্ধে কি বুঝতে পেরেছ ? সে সম্পর্কে যথাযথ বিবরণ দিতে পারলে, ব্য[illegible] আর তোমার ভাবনা নেই। এই শর্মা সব ঠিক ক'রে দেবে'—ব[illegible] ক্রিপেন বুকে তাল ঠোকে খেলোয়াড়ী ভঙ্গীতে। পিপার বো[illegible] ওষুধ ধরেছে।

'আরে ভাই, সে কথা জানি বলেই না এত দূর আসা তোমাকে বলব না ত আর কাকে বলব ? এ পৃথিবীতে তু[illegible] ছাড়া আর কে আমার এমন হিতৈষী আছে ? আমার গিন্নী হচ্ছে একটি আস্ত শয়তান। ওঃ, ঐ নাদাপেটা গুণ্ডানীটাকে বি[illegible] ক'রে যে কী ভুলই করেছি, তা আর বলবার নয়। আমার বাবা দেওয়া দামী-দামী আসবাব-পত্রগুলো গিন্নী তার এক ভাগ্নীকে [illegible] বেটে ভাই দিয়ে দিচ্ছে, তা'তে ক'রে মনে হয় মাস দুয়েকের মধ্যে আমার বাড়ী-ঘর মুনি-ঋষির আশ্রমে পরিণত হ'য়ে যাবে। ভাগ্নীটা তোফা শয়তানী শিখেছে। সকাল বেলা আমার বাড়ীতে আসে আর যাবে সেই সন্ধ্যা বেলায়। যাবার সময় ঘড়িটা-আসটা [illegible] নিয়ে সে যাবে না। সেদিন একটা সোফা নিয়ে গেল তার না কি সোফা না হ'লে চলে না। তাই মামার ওপ[illegible] দয়া করলেন। কত আর বলব বল ? এই দেখ, আমার জন্মদি[illegible] দেওয়া তোমার সেই রূপো-বাঁধানো পাইপটা আর নেই। ভাগ্না[illegible] ভগিনীপতি বোধ হয় এত দিনে কোন বেনের দোকানে সেটা বাঁ[illegible] দিয়েছেন। দুঃখের কী আর শেষ আছে ভাই ? বুড়ো বয়[illegible] বিয়ে-রোগে ধ'রে আমাকে এক দম নাজেহাল করে দিয়েছে, এখন তুমি যা হয় একটা বন্দোবস্ত কর। পিপার বিম[illegible] ভঙ্গিতে বসেন।

'আচ্ছা, তুমি ত ভাগ্নীটাকে বেশ একটু কড়াপাকে ধমক দি[illegible] পার। তুমিও তার সম্পর্কে মামা। সেটা কর না কেন ?'—শুধা[illegible] ক্রিপেন।

'আরে ভাই ভদ্র ভাবে যেটুকু করবার সেটুকু করেছি ভাবলাম ভাগ্নীটাকে বহস্যচ্ছলে বেশ একটু ঠুকে দেবো। এই ন[illegible] মনে করে গত বৃহস্পতিবারে ভাগ্নীটাকে বেখাপ্পা রকমে প্রশ্ন ক[illegible] বসলাম—কি গো, আর কিছু নেবে না কি ? আর কিছু পছন্দ হচ্ছে না কি ? বেহায়া মেয়েটা অপমানটা মোটেই গায়ে না মে[illegible] আমার বসবার ঘরের বড় ঘড়িটা চেয়ে বসল। গিন্নী অম্নি এ[illegible] গাল হেসে বললেন—তা বেশ ত, নিয়ে যা না ; ছোট ঘড়িটা দিয়ে[illegible] আমাদের কাজ চ'লে যাবে। সন্ধ্যা বেলায় ভাগ্নী গেলেন, ঘড়ি[illegible] সঙ্গে গেল। আর আমিও প্রায় জাহান্নমে যেতে বসেছি। মামী ভাগ্নীর 'আঁতাত' আমার আঁতে ঘা দিয়েছে।'

কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল ক্যাপ্টেন। তার পর বোতল থেকে খানিকটা মদ ঢেলে নিয়ে চুমুক দিল পাত্রে। ক্যাপ্টেনে[illegible] কপালের ভাঁজটা ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। ভাবছে ক্যাপ্টে[illegible] কী করা যায় ? বন্ধুর দুঃখে তার সহানুভূতি আছে বটে কিন্তু পিপারের অমিত প্রশংসা ক্যাপ্টেনকে সজাগ ক'রে তুলেছে। সুনামটা রাখতে হবে ত !

একটু পরে পিপার আবার সুরু করলেন : 'আমার বাঁচবার একটি পথ আছে। সেটি হচ্ছে আমার স্ত্রীর প্রথম স্বামী ক্যাপ্টেন বুড়কে খুঁজে বার করা।'

'দূর বোকা, সে কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। মিছামিছি বাজে কাজে সময় নষ্ট কোরো না।'—বলল ক্রিপেন।

'আরে না, না, আমি তাকে খুঁজতে যাচ্ছি না। এই দেখ তার ছবি। সে ঠিক তোমার মতই লম্বা-চওড়া ছিল। তার চোখ এবং নাক ঠিক তোমার মতই সুন্দর ছিল। আজ যদি সে বেঁচে থাকত তা' হ'লে তার বয়সও তোমার মত হ'ত। আর তা ছাড়া, সে ত তোমার মতই এক জন সুদক্ষ নাবিক ছিল।'—বললেন পিপার খুব নিরীহ গলায়।

ক্রিপেন হঠাৎ এই ধরণের বাক্য—বিন্যাসের মর্মটা ঠিক বুঝতে না পেরে পিপারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখের ভাবে অকথিত প্রশ্ন জেগে রইল—'কি বলতে চাও?'

পিপার আবার বলে চললেন—'মেয়েদের বশ করার তার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, আর সেটা তোমার আছে আরো বেশী মাত্রায়। এদিক দিয়ে তোমার তুলনা মেলা ভার। আর তা' ছাড়া তুমি এক জন সুদক্ষ অভিনেতা। তোমার মত অভিনয়-ক্ষমতা আমি খুব কম পেশাদার অভিনেতার মধ্যেই লক্ষ্য করেছি। তবে কি জান, ঢাক পেটানোর অভাব। তোমার জন্ম সেটা ত কেউ করল না। তা'হলে আজ আর তোমায় পায় কে? দেশ-বিদেশে লোকে তোমার ছবি টাঙিয়ে রাখত ঘরে-ঘরে। আহা, তোমার সেই বন-বিড়ালের ডাক—অমন ডাক হেনরী আরভিংও ডাকতে পারে না, এ কথা আমি হলফ ক'রে বলতে পারি।'

অজস্র প্রশংসা-ধারাসিক্ত ক্রিপেন বিনয়ে-ভেজা গলায় বলল—'তুমি ত ভাই সবই জান। রুজি-রোজগারের জন্ম সারা জীবনটা ত জলে-জলেই গেল। অভিনয় করার সুযোগটা আর পেলাম কোথায়?'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পিপার বললেন—'তোমার ক্ষমতা আছে ভাই, যে ক্ষমতা ভগবান সবাইকে দেন না। এ দক্ষতা তোমার সহজাত এবং তোমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ ক্ষমতা থাকবে।'

ক্রিপেন একটু হাসল। হাসিতে তার বিচলিত হওয়ার লক্ষণ। সেটা পিপারের চোখ এড়ালো না। তিনি দেখলেন এই সুযোগ। মাহেন্দ্র লগ্ন বুঝি বয়ে যায়। তিনি আবার সুরু করলেন—'ভাই, আমাকে বাঁচাবার জন্ম তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তোমাকে ক্যাপ্টেন বুড সাজতে হবে। এ কঠিন কাজ সারা ইংলণ্ডে এক তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না, এ কথা আমি জানি এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। আর সেই জন্মই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।'

চোখ বড়-বড় ক'রে ক্রিপেন বলল—'এ তুমি কী বলছ? ক্যাপ্টেন বুড সাজতে হবে!'

'আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ আর শক্ত কী? এই নাও, এই নোট-বইটাতে তোমার জ্ঞাতব্য সমস্ত কথাই লেখা আছে। সে কী করত, কী ভালোবাসত না বাসত, তার কথাবার্তা, চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, তার বংশ ইতিহাস, তার জাহাজের কথা, সব তুমি এই বইখানিতে পাবে। তোমার বিশেষ কোন অসুবিধা হবে ব'লে আমি মনে করি না। আমার স্ত্রীর কাছে হাজার-বারোশো বার শুনে-শুনে এ সব আমার মুখস্থ হ'য়ে গেছে। আমি সব খুঁটিয়ে লিখে রেখেছি তোমার জন্ম। এটা প'ড়ে দেখ।'

হাত বাড়িয়ে বইটা নিয়ে ক্রিপেন পাতা ওল্টাতে লাগল। এর কিছুক্ষণ পরে ঘাড়টা আস্তে আস্তে নেড়ে বলল—'এ আমার দ্বারা হবে না ভাই। তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না ব'লে আমি আন্তরিক দুঃখিত।'

'তুমি ইচ্ছা করলেই করতে পার ভাই। আর তা ছাড়া ভাবো ত, কী মজাটাই না হবে? সব ব্যাপারটা আগে বুঝে নাও, নোট-বইটা পড়। মনে মনে সমঝে নাও যে, তুমিই ক্যাপ্টেন বুড। তার পর এসে আমার কাছ থেকে তোমার সুন্দরী স্ত্রীকে দাবী কর। হ্যাঁ, তোমায় ওর ডাক-নামটা ব'লে দিই—মার্থা।'

ক্রিপেন একটু ভেবে বলল—'আচ্ছা ধর আমি যদি ক্যাপ্টেন বুড সেজে যাই, তা হ'লে তোমার সুবিধাটা কী হচ্ছে?'

'আহা, বুঝতে পাচ্ছ না? তুমি এসে দাবী করলেই আমি মার্থাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে, কায়মনোবাক্যে তোমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে খ'সে পড়ব, অবশ্য পাড়ার পাঁচ জনকে জানিয়ে। তার পর তুমি এক সময় সুবিধা বুঝে পালিয়ে যাবে। সেও আর তোমায় ধরতে পারবে না।' বললেন পিপার আশ্বাস-ভরা কণ্ঠে।

'আচ্ছা, ভেবে দেখি, তোমাকে পরে লিখে জানাব।' চিন্তিত ভাবে বলে ক্রিপেন।

'আরে ভাই, এতে আর ভাববার কী আছে? মন স্থির করে ফেলো। তুমি যদি এটুকু করবার প্রতিশ্রুতি দাও, আমি ধরে নেবো যে, ব্যাপারটা ঘটে গেছে। আমি ত তোমাকে চিনি। তোমার কথার নড়চড় কখনো হয়নি, হবেও না।' প্রশংসার আর একটা বড় ঢেউ ভেঙে পড়ল ক্রিপেনের মাথায়। এবার সে বেশ খানিকটা বেসামাল হ'য়ে পড়ল।

'আচ্ছা, তোমার বউকে দেখতে কেমন?' প্রশ্ন করে ক্রিপেন।

'বেশ ভালো দেখতে, খাসা দেখতে। আর বেশ নাদুস-নুদুস মোটা-সোটা। এ বয়সে আমরা যেমনটি চাই, ঠিক তেমনিটি।' বললেন পিপার চটুল ভঙ্গীতে।

ক্রিপেন চুপ ক'রে রইল। তার পর আবার নেতিবাচক ঘাড় নাড়া। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলল—'না ভাই, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। তোমার স্ত্রীর প্রতি এত বড় একটা অবিচার করবার আমি অন্ততঃ পক্ষপাতী নই। এ অন্যায়—এ ঘোরতর অন্যায়।' শেষের দিকে গলার স্বরে দৃঢ়তা ফুটে উঠল। পিপার তখন মনে মনে প্রমাদ গুণছেন।

'আহা, অন্যায় ত আমারই হয়েছে। মার্থার প্রথম স্বামী জীবিত আছে কি না সঠিক ভাবে না জেনে মার্থাকে বিয়ে করা ত উচিত হয়নি আমার! নীতিশাস্ত্র ত আমাকে রেহাই দেবে না আমার এই অনুচিত কাজের জন্ম। আমি এখন সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাচ্ছি। তুমি শুধু আমাকে পাপমুক্ত হ'তে সাহায্য কর, ভাই!'—পিপারের গলায় আন্তরিকতার সুর গভীর হ'য়ে উঠল।

ঘরে শান্ত নিস্তব্ধতা। শুধু ধোঁয়ার মেঘ ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে ঘরের আকাশে। 'তুমি যদি এদিক থেকে বিচার করতে বল, তাহ'লে অবশ্য অনেক কিছু ভেবে দেখবার আছে,—আস্তে আস্তে বলল ক্রিপেন ভাবনা-জড়ানো কণ্ঠে।

সুচতুর বৈমানিক বুঝলেন যে, আর বেশী দেরী নেই সিদ্ধিলাভের। পিপার অকৃপণ হাতে নাবিকের গ্লাসে জীন ঢেলে দিল। তার পর কথার ঝড় উঠল—সওয়াল আর জবাব। কত সত্য বিকৃত হ'ল। নীতিশাস্ত্রের মাথা মুড়িয়ে দু'জনেই ঘোল ঢেলে দিল—দু'জনেই সে শাস্ত্রে সমান পণ্ডিত ত! অবশেষে স্থির হ'ল যে, মার্থার মত মেয়েকে ত্যাগ করার মধ্যে কোন পাপ নেই, বরং পুণ্য আছে এবং স্বয়ং যীশুখৃষ্ট এই ধরণের মেয়েদের ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন। সুরামত্ত দুই সৈনিকের হাতে সেদিন নীতি-ধর্মের শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল।

সেদিন বৃহস্পতিবার- ক্যাপ্টেন বুড়ের আসবার দিন। প্রত্যাশা-চঞ্চল পিপারের মন তাঁকে সুস্থির হ'য়ে দু'দণ্ড কোথাও বসবার অবকাশ দেয় না। তিনি কেবল এ-ঘর ও-ঘর ক'রে বেড়ান। বেলা বুঝি আর কাটতে চায় না। দুপুরটা ঢিমেতালে বৈকালের দিকে যদিও বা গেল, বৈকালটা আর সন্ধ্যা হ'তে চায় না কিছুতে। পিপারের ধৈর্য্য বুঝি আর থাকে না। তিনি বাইরের ঘরে পায়চারী করছেন আর পথের দিকে তাকাচ্ছেন বারে-বারে। পিপার-গৃহিণী ঘরে ব'সে উল বুনছে আর একমনে লক্ষ্য করছে পিপারকে। পিপারের সেদিকে খেয়াল নেই। কর্তাকে চমকে দিয়ে গৃহিণী গর্জন তুলে বললে—'এক দণ্ড কী চুপ ক'রে বসে থাকতে পার না! খালি ছুটোছুটি আর হৈ-চৈ! বলি, তোমার জ্বালায় বাড়ীতে কী আর লোক বাস করবে না?'

পিপার আজ আর কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। যে কয়েদীর ছাড়া পাবার সময় হয়ে এসেছে সে শেষ বারের মত মুখ বুজে জেলারের চাবুক খাচ্ছে। ওদিকে জানলার বাইরে জিরানিয়াম গাছের ফাঁকে জেগে উঠল ক্রিপেনের ত্রস্ত চোখ দু'টো। পিপারের সন্ধানী দৃষ্টি তাকে আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে। পিপারের ইচ্ছে হ'ল একবার 'হুররে' ব'লে চীৎকার ক'রে ওঠে। পর মুহূর্তেই শ্রীমতীর ভাঁটার মত চোখ দু'টোর কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীর কথা কান দিয়ে গিয়ে একেবারে মর্মে প্রবেশ করল: 'কী, কথা কানে গেল না। অমন হুড়োহুড়ি করা হচ্ছে কেন জানতে পারি কী?'

পিপার খুব নিরীহ ভাবে বলল, 'দেখ দেখি, কে যেন জানলা দিয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে।'

গৃহিণী নিজের কথার উত্তর না পেয়ে আরো চটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাক্যস্রোত উৎসারিত হ'ল—'আদিখ্যেতা দেখ একবার। কোথাকার কোন্ ভবঘুরে এসে জানলা দিয়ে উঁকি মারবে, আর আমি তাকে দেখতে যাব। বটে। দরকার থাকে তুমি দেখ গে।' ব'লে শ্রীমতী আবার উল বোনায় মন দিলেন।

ক্যাপ্টেনের নাটকীয় প্রবেশের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল পিপার। দুঃসহ উত্তেজনা আর দুরন্ত প্রত্যাশা বুঝি তাকে পাগল ক'রে দেবে। বাইরের প্রশান্তিটা বজায় রাখবার জন্য কাঁপা হাতে পিপার পাইপটা ধরিয়ে নিল। জানলার বাইরে গাছের ফাঁকে-ফাঁকে ক্রিপেনের চলমান মূর্তিটা মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে। বাইরে ক্রিপেন পায়চারী করছে সময়কে পায়ে-পায়ে মাড়িয়ে। এদিকে পিপার একাগ্র হ'য়ে তার বুকের ওঠা-নামার শব্দ শুনছে। ক্রিপেন কিন্তু আসছে না। প্রায় কুড়ি মিনিট কেটে গেল। পিপার অধৈর্য্য হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। জানলার কাছে গিয়ে বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল—'ব্যাটা, নিশ্চয় একটা ভবঘুরে।' —কথাগুলো কেমন যেন একটু বেসুরো শোনালো পিপারের।

শ্রীমতী এবার একটু মনোযোগ দিল এদিকে। উলের বাণ্ডিলটা পাশের মোড়ার ওপর নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করল—'তুমি কার কথা বলছ? এর মধ্যে আবার ভবঘুরের আবির্ভাব হ'ল কোথায়? তখন থেকে সেই এক কথা নিয়ে ভ্যাজ-ভ্যাজ কোরো না ব'লে দিচ্ছি। মাথা ধরে আমার।'

পিপার আজ কিছুতেই দমবে না। সে মরিয়া হয়ে ব'লে ওঠে—'আরে, ওই যে লোকটা তখন থেকে জানলা দিয়ে উঁকি মারছে গাছগুলোর ওপাশ থেকে। চোখে চোখ পড়তেই স'রে পড়ছে। লোকটাকে দেখতে ঠিক জাহাজের ক্যাপ্টেনের মত।'

'জাহাজের ক্যাপ্টেনের মত'—কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল শ্রীমতী। সঙ্গে সঙ্গে তার সন্ধানী চোখের দৃষ্টি বাতায়নপথে পথচারী হ'ল। পথচারী পথিক ধরা পড়ল সে দৃষ্টির আলোয়। ক্রিপেন ঠিক সেই লগ্নে মাথাটা তুলেছিল জিরানিয়াম ঝোপের ওপর। শ্রীমতীর সাথে শুভদৃষ্টি হ'ল। ক্যাপ্টেন আবার ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। বিড়ালাক্ষীর খরদৃষ্টি বুঝি বা ক্যাপ্টেনের সত্য পরিচয় জেনে ফেলে। মার্থার মনে অনেক দিন আগেকার জানা-চেনা একটা মুখের স্মৃতি জেগে ওঠে। এ যেন সেই মুখ। কালের কারিগরীতে সে মুখের রদবদল হ'য়েছে, তবু যেন ঠিক সেই মুখ। মার্থা একবার আড়চোখে পিপারের দিকে তাকায়। পিপার তখন পাইপে তামাক ভরছে। মুখে-চোখে তার বেজায় খুশীর ভাব। খেলা আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এবার তার ত শুধু দর্শকের ভূমিকা। মার্থা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। তার পর উঠে গেল বাইরের দরজাটা খুলে দিতে। দরজাটা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের হাওয়ায় ঘর ভরে গেল। পথে লোক-জন নেই। সেই পথিকেরও দেখা নেই।

'কাউকে দেখলে?'—জিজ্ঞাসা করলেন পিপার।

পিপার-গৃহিণী ঘাড় নাড়ে। মার্থা তার জায়গায় ফিরে এসে বসল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে। উলের বলটা হাতে তুলে নিয়ে আর একবার বাইরে তাকাল মুক্ত বাতায়ন-পথে। কেউ কোথাও নেই। সে আবার বুনতে লাগল তবে মাঝে-মাঝে তার প্রত্যাশী দৃষ্টি জানলার ওপাশে কাকে যেন খুঁজছিল বারে-বারে। এদিকে পিপার সময়ের পদধ্বনি গুণছে। ছোট ঘড়িটা টিক-টিক করছে কানের কাছে। কয়েকটা সেকেণ্ড, তার পর কয়েকটা মিনিটও কেটে গেল। উৎসুক হ'য়ে আছে দু'জনেই—তবে দু'জনের ভাবনা-ভঙ্গি ও মনন-শৈলী ভিন্ন রকমের। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল টক্ টক্ টক্। পিপার চমকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল—'ভিতরে এসো।'

আস্তে-আস্তে দরজা খুলে গেল। ক্যাপ্টেন ক্রিপেনের দীর্ঘ দেহ দীর্ঘতর ছায়া রচনা করল ঘরের কার্পেটের ওপর। অভিনেতার চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। যেন তার কথা হারিয়ে গেছে। সে শুধু শ্রীমতীর দিকে চেয়ে অতি পরিচয়ের সুনিবিড় আগ্রহে বলে ফেলল—'মার্থা, আমার মার্থা, আমাকে চিনতে পার?'

মার্থা প্রতারিত হ'ল—তার প্রথম যৌবনের ভালোবাসার স্মৃতি তার বিচার-বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিল আবেগের বন্যায়।

সে শুধু বিস্মিত কণ্ঠে একবার বলল, 'জেম, তুমি!' তার পর অশ্রু-বন্যার জলাবর্তে ভেসে গেল ইন্দ্রের ঐরাবত। সমাজ, সংসার সব ভেসে গেল। মার্থা ছুটে গিয়ে জেমকে জড়িয়ে ধরল পরম আগ্রহে, তার পর চুমায়-চুমায় ভরে দিল প্রৌঢ়ের সারাটা মুখ। পিপার গভীর শান্তিতে উপভোগ করতে লাগলেন এই মিলন-দৃশ্যের প্রহসন। প্রয়োজনবাদী পুরুষ ভাবছে আপন কার্যসিদ্ধির কথা। মার্থা জেমকে টেনে বসায় একটা সোফায়।—'জেম, জেম, এত দিন তুমি কোথায় ছিলে?' উপচে-পড়া খুশী চাপতে পারে না মার্থা। বার বার ঐ এক প্রশ্নই করে।

'সে অনেক—অনেক দেশে ঘুরেছি'—বিব্রত প্রতারক সামলে নেয়—'কিন্তু যেখানেই থাকি আমার প্রিয়তমা পত্নীর ছবি আমার চোখের সামনে সব সময়েই ভাসছিল। আমি কি তোমায় কখনো ভুলতে পারি গো?' কথাগুলো যতটা সম্ভব আর্দ্র করে বলে ক্যাপ্টেন।

'আমি তোমাকে দেখেই চিনেছি।'—তার মাথার চুলগুলো মেদবহুল আঙুল দিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে বলল মার্থা—'আচ্ছা আমি কি খুব বদলে গেছি?' প্রশ্ন করে শ্রীমতী আদর-জড়ানো কণ্ঠে।

'না না, কিছুই বদলাওনি'—বলে ক্যাপ্টেন, শ্রীমতীর সুনিবিড় সান্নিধ্য থেকে নিজেকে কিছুটা মুক্ত করে। মার্থা ছাড়বার পাত্রী নয়। সে আরো ঘেঁসে বসে ক্যাপ্টেনের কাঁধে মাথা রেখে বলে: 'এত দিন ছিলে কোথায়? আমাকে ভুলে ছিলে কি ক'রে?'

এবার ক্যাপ্টেন গল্প শুরু করে: 'ডলফিন ডুবে যাওয়ার পরে আমি ত পড়লাম অকূল সমুদ্রে। তার পর চলল অবিরাম সংগ্রাম—আমার সাথে সাগরের অগণিত ঊর্মিমালার। সে যুদ্ধে জয়ী হলাম আমি।'—এই ব'লে ক্যাপ্টেন একবার আড়চোখে পিপারের দিকে চায়। পিপার পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে আছেন। জ্বলন্ত পাইপ থেকে নীলাভ ধোঁয়ার রেখা অঋজু গতিতে উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে। তাঁর মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। তিনি সাবধান হ'য়ে গেছেন। ভেতরের কথা বাইরে যেন প্রকাশ না পায় তাই তাঁর এই সাবধানতা।

ব'লে চলে ক্যাপ্টেন—'এসে উঠলাম এক জনহীন দ্বীপে। এক গাছপালা আর জীবজন্তু ছাড়া সেখানে আমাকে সঙ্গ দেবার জন্য কেউ ছিল না। জান মার্থা, সে কী নির্জনতা। প্রতিটি মুহূর্ত্ত আমার কণ্ঠরোধ ক'রে ধরেছে। কি ক'রে যে সেখানে পুরো তিনটি বৎসর ছিলাম তা' এক ভগবানই জানেন। তার পর ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল। নিউ সাউথওয়েলসগামী এক জাহাজে আশ্রয় পেলাম। সেখানে একটি লোকের সাথে পরিচয় হ'ল—তার বাড়ী পুলে। সে আমাকে বলল যে, তুমি মারা গেছ। তোমার বিহনে আমি বিশ্ব-ভুবন অন্ধকার দেখি, এ কথা তুমি জান মার্থা।'

মার্থা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। দু'টি জল-ভরা বড় বড় চোখ তুলে ধরে ক্যাপ্টেনের চোখের একান্ত কাছে। ক্যাপ্টেন একটু বিচলিত হয়। আবার সুরু করে ক্যাপ্টেন—'তাই ভাবলাম আর দেশে ফিরব কার জন্য? কে আছে আমার সেখানে? কি হবে গিয়ে সেই দেশে যে দেশের বাতাস আমার প্রিয়ার কবরের চার পাশে দীর্ঘশ্বাস ফেলে? এমিতর কত চিন্তা মাথায় এল। তাই দেশে আর না ফিরে অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে কাটিয়ে দিলাম আরো কয়েকটা বছর। এই মাত্র সেদিন জানতে পারলাম যে, তুমি বেঁচে আছ, তাই না ছুটে চলে এলাম। এসে দেখি আমার ছোট্ট ফুলটি ঠিক তেমনি আছে।'

তিরিশ বছরের বিচ্ছেদ-বিধুর মার্থা আর মাথা তুলতে চায় না ক্যাপ্টেনের কাঁধ থেকে। ক্যাপ্টেনের মাংসল কোমরটাকে মার্থা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। এই ফাঁকে অভিনয়-দক্ষ ক্রিপেন তাকায় পিপারের দিকে। পিপার মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিনয় দেখছিলেন তাঁর বন্ধুর। দু'জনার দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। পিপার তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

'তুমি যদি আর কয়েকটা দিন আগে আসতে জেম'—অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে মার্থা—'মাত্র তিন মাস আগে আমি ঐ লোকটাকে বিয়ে করেছি।'

'বিয়ে করেছ! তবে আর কী হ'বে? তুমি আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে পারলে না, মার্থা?' ব'লে ক্যাপ্টেন একটু স'রে বসবার চেষ্টা করে। সুচতুর অভিনেতার কণ্ঠে তিরস্কারের ঝঙ্কার।

সে যাক্ গে, আমি তোমার স্ত্রী আর তুমিই আমার স্বামী। তোমাকে যাতে আর না হারাই সেদিকে আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমি না মরা পর্যন্ত আর তুমি আমার চোখের আড়াল হতে পারবে না।'—ধরা-গলায় বলে মার্থা।

পিপারের সাথে ক্যাপ্টেনের আবার দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। ক্যাপ্টেনের চোখে ভয়ের আভাষ। 'ও-সব বাজে কথা থাক্'—ব'লে ওঠে ক্যাপ্টেন।

'ওটা মোটেই বাজে কথা নয়'—বলে মার্থা আর সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে ক্যাপ্টেনের গলা জড়িয়ে ধরে। 'তুমি যা বললে তা ত সত্যি নাও হ'তে পারে। তুমিও ত অন্য মেয়েকে বিয়ে ক'রে থাকতে পার। আমি ত আর সে সব কথা তুলছি না বা জানতে চাচ্ছি না। এখন আমি যখন তোমাকে একবার পেয়েছি তখন আর ছাড়ছি না।'—শ্রীমতীর গলায় দৃঢ়তার আভাষ ফুটে ওঠে। ক্যাপ্টেন ভেতরে ভেতরে শিউরে ওঠে।

পিপারের দিকে আঙুল দেখিয়ে মার্থা আবার সুরু করে—'আর যদি ঐ পুচকে লোকটার কথা বল ত বলব যে, ও আমাকে এমন বিরক্ত ক'রে তুলেছিল যে, বিয়ে না ক'রে উপায় ছিল না। ওকে আমি কখনো ভালোবাসিনি। খালি খালি আমার পিছনে ও ঘুরে বেড়াত আর যেখানে-সেখানে বিয়ের প্রস্তাব করত। পিপার, তুমি আমার কাছে কবার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে—বারো না তেরো বার?'

পিপার বিরস মুখে বললেন—'ভুলে গেছি।'

মার্থা ক্যাপ্টেনের গালে নিজের গালটা প্রায় ঠেকিয়ে আবার বলতে সুরু করল—'আমি তোমায় সত্যি ক'রে বলছি জেম, ওকে আমি কোন দিনই ভালোবাসিনি। পিপার, তোমাকে কী আমি ভালোবেসেছি কোন দিন?'—পিপারের দিকে চেয়ে মার্থা প্রশ্ন করে।

পিপার ঘাড় নেড়ে বলেন—'না, কোন দিনও না। জানি না, অন্য কোন লোকের তোমার মত অকরুণ স্ত্রী ছিল কি না। তবে আমার প্রতি তোমার যে বিন্দুমাত্র দয়াও ছিল না, এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করব।'

পিপারের কথা শেষ হ'বার আগেই দরজায় টোকা পড়ল। পিপার উঠে তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিলেন। পাড়ার পাদ্রীর মেয়ে এসেছে কোন কাজে। সে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। শ্রীমতী পিপারকে এক জন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এ ভাবে ব'সে থাকতে দেখে সে বেশ খানিকটা হতভম্ব হ'য়ে গেল। কি ব'লে কথা আরম্ভ করবে সেটা সে কিছুকেই খুঁজে পাচ্ছিল না। হঠাৎ চলে যাওয়াও খারাপ দেখায়। মার্থা তাকে মুক্তি দিল এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থা থেকে। খুশীভরা গলায় বলল মেয়েটির উদ্দেশে—'ইনি আমার প্রথম স্বামী জেম বুড।'

জেম ততক্ষণে নিজেকে মার্থার নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিল। এই বয়সে আদি রসের এই বীভৎস প্রকাশ, বিশেষতঃ এতগুলি অপরিচিত প্রাণীর সামনে মোটেই রুচিকর ঠেকছিল না ক্যাপ্টেনের। মার্থা কিন্তু ছাড়বে না জেমকে। থাক না বাইরের লোক। সে যদি একটু ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসে তার সুদীর্ঘ দিনের হারিয়ে যাওয়া স্বামীর সঙ্গে, তাতে কার কী বলবার আছে? সে জোর ক'রে জেমের মাথাটা তার সুবিপুল স্কন্ধে চেপে ধরল বাঘের থাবার মত হাতখানা দিয়ে। ক্যাপ্টেন বুঝল, কলে পড়েছে। সে বিনা প্রতিবাদে তার কাঁধে মাথা রেখে চোখ দু'টি বুজল, বোধ হয় লজ্জায়।

পাদ্রীর মেয়ের নাম মিস্ উইনথ্রপ। সে এতক্ষণ পরে কথা বলল বেজায় উৎসাহিত হ'য়ে,—'ওরে, তাই না কি? তাই না কি? এ যে একেবারে রক্ত-মাংসে গড়া এনক্ আর্ডেন দেখছি।'

'কে, কি নাম বললেন?' প্রশ্ন করেন পিপার।

'এনক্ আর্ডেন'—বলল মিস্ উইনথ্রপ। 'আমাদের দেশের এক জন বিখ্যাত কবি একটি সুন্দর কবিতা লিখেছেন। কবিতাটির কাহিনী হচ্ছে যে, এক জন নাবিক সাত সাগরে পাড়ি দিয়ে ফিরছিল বছরের পর বছর ধ'রে। কয়েক বছর এই ভাবে কাটিয়ে দেওয়ার পরে সে ঘরে ফিরল। ইতিমধ্যে স্বামীর দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী আর এক জনের জীবনসঙ্গিনী হ'য়েছে। নাবিক তখন মনের দুঃখে বনে চ'লে গেল। কেউ জানল না তার কথা। ভগ্ন-হৃদয়ে সেখানে তার মৃত্যু হ'ল এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায়।'—কথা শেষ ক'রে সে ক্রিপেনের দিকে তাকাল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। ক্যাপ্টেন যেন ঐ নাবিকের মত বনে চলে না গিয়ে অপরাধ করেছে।

তৈরী-করা বিষণ্ণ ভঙ্গীতে পিপার বললেন আস্তে আস্তে—'আমার এখন হৃদয় ভাঙ্গবার পালা। আমি বিধাতার সে অভিশাপকে মাথা পেতে নিচ্ছি।'

মিস্ উইনথ্রপ কথার মাঝে ব'লে উঠল—'ব্যাপারটার মধ্যে একটা নাটকীয় পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা,

আপনারা একটু এই ভাবে বসুন, আমি আমার ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। একটা ছবি নেবো আমি আপনাদের দু'জনের।'—সে শেষের কথাগুলো বলল মার্থা আর ক্রিপেনকে লক্ষ্য ক'রে।

মার্থা খুসি হ'য়ে বলল—'বেশ, বেশ, তোমার ক্যামেরাটা দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এসো।'

ক্যাপ্টেন প্রায় রুখে উঠল—'সে হবে না। আমার ছবি তোলা হবে না।' প্রতারক সাবধান হচ্ছে। চোখে-মুখে তার তীক্ষ্ণ সতর্কতা।

মার্থা আব্দারের ভঙ্গীতে বলল—'হ্যাঁ গা, আমি অনুরোধ করলেও তুলতে দেবে না?'

বিরক্ত ক্যাপ্টেন মার্থার কাঁধ থেকে মাথাটা তোলবার জন্য আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। শ্রীমতী সজাগ। সে আবার জোর ক'রে মাথাটা চেপে ধরল তার সুবিস্তৃত কাঁধে। ক্যাপ্টেন ঝাঁঝিয়ে উঠল—'তুমি সারা জীবন ধ'রে অনুরোধ করলেও না।'

উইনথ্রপ পিপারের দিকে তাকিয়ে বলল—'আচ্ছা, আপনি কি বলেন? ওঁদের একটা ছবি তোলা কী উচিত নয়?'

'আমি ত কোন আপত্তির কারণ দেখি না'—অন্য কথা ভাবতে ভাবতে বলেন পিপার।

মেয়েটি তখন ক্রিপেনের দিকে ফিরে বলল 'শুনুন, মিঃ পিপার কী বলছেন। উনি মোটেই কিছু মনে করবেন না আপনারা ছবি তুললে। কাজেই আপনারও কিছু মনে না করাই উচিত।'

ক্যাপ্টেন ভারী গলায় বলল—'আচ্ছা, পরে ওঁর সঙ্গে আমি এ সম্বন্ধে কথা বলব।'

ক্যাপ্টেনের গলার স্বর শুনে পিপারের সম্বিৎ ফিরে আসছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, অন্যমনস্ক ভাবে ছবি তোলায় মত দিয়ে তিনি ভালো করেননি। তাই তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন—'আচ্ছা মিস্ উইনথ্রপ, ব্যাপারটা এখন আমাদের মধ্যেই থাক। বাইরের পাঁচ জনকে জানিয়ে কাজ নেই।'

মেয়েটি বলল—'বেশ, সেই ভালো। আচ্ছা, আর আপনাদের বিরক্ত করব না। আরে, লোকগুলো কী অসভ্য!'

সবাই উইনথ্রপের কথায় রাস্তার দিকের জানলাটার দিকে তাকালো। সেখানে একরাশ মাথার ভীড়। ওরা তাকাতেই মাথাগুলো ডুব দিল জানলার নীচে। ক্যাপ্টেন ক্রিপেনের মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। বন্ধুর উপকার করতে এসে সে এতক্ষণ ধ'রে নাজেহাল হচ্ছে। আর নয়। সে উঠছিল তার জায়গা ছেড়ে এই অসভ্য লোকগুলোকে দু'কথা শুনিয়ে দেবার জন্য। মার্থা তার হাত চেপে ধ'রে ধমকে উঠল—'প্রেম!' ক্রিপেন আর বসল না। মার্থার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। মনের ঝড় দুশ্চিন্তার মেঘগুলোকে উড়িয়ে এনেছে। তারা জমেছে ক্যাপ্টেনের মুখের ওপর। ক্ষুব্ধ ক্যাপ্টেন বৈমানিকের দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানে। পিপার রীতিমত ঘাবড়ে যান ক্রিপেনের রকম-সকম দেখে। এক ফাঁকে তিনি আস্তে-আস্তে ক্যাপ্টেনকে বলেন—'ভয় কী, তুমি একটু সহজ হও, সব ঠিক ক'রে নেবো আমি।' কিন্তু ক্যাপ্টেন আর সহজ হ'তে পারে কৈ?

পাত্রীর মেয়েটি চলে যেতেই ক্রিপেন বলে—'আমি একটু বাইরে ঘুরে আসব। মাথাটা বেজায় ধরেছে।' মার্থা তখুনি এ প্রস্তাবে রাজী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরুবার পোষাক প'রে আসে। ক্যাপ্টেন কাঁপা-গলায় বলে—'আমি একা যাব। আমাকে একা ভাবতে দাও।'

শ্রীমতী দৃঢ় স্বরে বলে—'সে হবে না, তোমাকে আর একা ছাড়ছি না। আমি এখন সব সময় তোমার পাশে-পাশে থাকতে চাই। লোকে আমাদের একসঙ্গে দেখলে তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই। আর আমার পক্ষে ত এ পরম গর্বের কথা যে, তোমার পাশে আবার দাঁড়াতে পেরেছি। চল আমরা এক-সঙ্গে বাইরে যাই। তুমি পাঁচ জনকে বল যে, তুমি আমার কে? লোককে জানতে দাও আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। যত দিন বাঁচব তোমাকে আর চোখের আড়াল করব না—চিরকালটা চোখে চোখে রাখব।' শ্রীমতী দরদ দিয়ে বলল কথাগুলো। কথার শেষে তার গাল বেয়ে কয়েকটা ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। ক্রিপেন এবং পিপার দু'জনেই বুঝতে পারলেন যে, ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হ'য়ে উঠছে।

ক্যাপ্টেন মরিয়া হ'য়ে হতভম্ব বৈমানিকের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল—'কি করা যায় বলুন ত? আপনি কি পরামর্শ দেন?'

শ্রীমতী তীক্ষ্ণ স্বরে বলল—'ও বলবার কে? ওকে আবার আমাদের মধ্যে টানছ কেন?'

ক্যাপ্টেন আমতা-আমতা ক'রে বলল—'ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার ব'লে মনে হয়।' তার পর কয়েকটা মিনিটের নিস্তব্ধতা। পিপার কোন কথাই বলল না। ওরা দু'জনেও নির্বাক্। আবার সুরু করল ক্যাপ্টেন একটু দম নিয়ে—'মিস্ উইনথ্রপ যে কবিতার কথা বলল, সেখানে মেয়েটির প্রথম স্বামীই ত ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল। তারই মত আমারও পঞ্চত্বপ্রাপ্তিই প্রাপ্য। সেটাই হত আমার স্বাভাবিক পরিণতি।' শ্রীমতী আরো কয়েকটা ফোঁটা চোখের জল দিয়ে ক্যাপ্টেনের এই কথাগুলোকে পুরোপুরি অস্বীকার করল। ক্যাপ্টেন ছাড়বার পাত্র নয়। সে আবার সুরু করল—'আমাকে যেতে দাও মার্থা, আমার মরাই ভালো। আমার মরতে দাও।'

শ্রীমতীর চোখে বর্ষার ধারা নামল। সে ধারা-সম্পাতের অন্তরে রয়েছে তীক্ষ্ণ ক্রোধের বিদ্যুৎ-সূচনা। শ্রীমতী আরো একটু নিবিড় হ'য়ে বসল, হাত দু'টো দিয়ে জড়িয়ে ধরল ক্যাপ্টেনের গলা। শ্রীমতীর চোখের জলে ক্যাপ্টেনের বুক ভেসে যেতে লাগল। নিরুপায় ক্যাপ্টেন চোখের ইসারায় পিপারকে জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ ক'রে দিতে বলল। পিপার নীরবে সে আদেশ পালন ক'রে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন।

কিছুক্ষণের নীরবতা। পিপার এবার কথা সুরু করলেন—'বাইরে একগাদা লোক জমেছে। ব্যাপারটা জানাজানি হ'য়ে গেছে ব'লে মনে হচ্ছে।'

শ্রীমতী ঝাঁঝিয়ে উঠল—'তা হোক গে। আমি একটুও গ্রাহ্য করি না। শীগ্রই ওরা জানতে পারবে, ও আমার কে?'

'তা ত পারবেই—তা ত পারবেই'—বলেন পিপার দ্ব্যর্থবোধক স্বরে।

শ্রীমতী পিপারকে আর কোন আমল দিল না। ক্যাপ্টেনের গলা

ছেড়ে সে এবার একটা হাত নিয়ে আদর করতে লাগল ক্যাপ্টেনকে। যখন ভাবের মাত্রা একটু বেশী হয় অমি শ্রীমতী ক্যাপ্টেনের দৃশ্যমান ওয়েষ্টকোটের ওপর সজোরে তার চ্যাণ্ডাড়ির মত মাথাটা ঘষতে থাকে। ক্যাপ্টেন রীতিমত ঘাবড়ে যায়। প্রেম-নিবেদনের এই ধরণের উদ্ভট রীতির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পিপারের দিকে তাকায়। পিপার বোঝেন যে, ক্রিপেনকে তিনি জাঁতিকলে ফেলে দিয়েছেন। তিনি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ভাবতে থাকেন এই পরিস্থিতির সমাধান কোন্ পথে?

দিনান্তের স্বর্ণাভা ছড়িয়ে পড়ল আকাশ-প্রান্তরে আর ছড়িয়ে পড়ল ক্যাপ্টেনের প্রত্যাগমন সংবাদ দুরান্ত পথে-ঘাটেও। মিস্ উইনথপের প্রচারবিমুখতার কল্যাণে কেউ জানতে বাকী রইল না যে, শ্রীমতী পিপার তার হারানিধি ফিরে পেয়েছে। নানান লোক আসতে লাগল। স্থানীয় এক জন রিপোর্টারও খবর পেয়ে এসে হাজির। সে ত নাছোড়বান্দা। তাকে অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রাখা হল আগামী কাল ব্যাপারটার পূর্ণ বিবরণী দেওয়া হ'বে এই আশ্বাস দিয়ে। ক্যাপ্টেন কারো সঙ্গে দেখা করতে নারাজ। শ্রীমতী সবাইকে দেখাতে চায় কিন্তু ক্যাপ্টেন কারো সামনেই বের হ'তে চায় না। ঘরে একটা থমথমে ভাব। পরের ঘটনা কি যে ঘটবে কেউ জানে না। পিপার অনুরোধ-ভরা কণ্ঠে শ্রীমতীকে বললেন—'মার্থা, একটু চা করলে হয় না?' শ্রীমতী কিছু বলবার আগেই ক্যাপ্টেনও এই প্রস্তাবের অনুমোদন করল। কাজেই শ্রীমতীকে উঠতে হল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। যাবার সময় অবশ্য সে ক্যাপ্টেনের টুপিটা হাতে ক'রে নিয়ে যেতে ভুলল না। ক্যাপ্টেন চাপা-গলায় পিপারকে বলল—'এখন কী হ'বে? এই অবস্থায় মানুষ বেশীক্ষণ মাথার ঠিক রাখতে পারে না। যা হয় একটা কিছু কর।'

'এই ভাবেই কিছুক্ষণ চলুক না'—ফিস্‌ফিস ক'রে বললেন পিপার।

ঘাড় নেড়ে ক্রিপেন বলল—'দেখ, তা হয় না। আমি রান্না-ঘরে গিয়ে ওকে সব কথা খুলে বলছি। আর এ ধরণের ব্যাপার চলতে দেওয়া উচিত নয়। তোমার জন্য যেটুকু পেরেছি করেছি, আর নয়। এসো আমার সঙ্গে।' ক্রিপেন রান্না-ঘরের দিকে চলল।

পিপার মরিয়া হ'য়ে ক্যাপ্টেনের জামার হাতা টেনে ধরল। ফিস-ফিস ক'রে বলল—'দোহাই ভাই, ও আমায় মেরে ফেলবে।'

'তার আমি কি করব?'—ব'লে ক্রিপেন জামার হাতাটা ছাড়িয়ে নেয়।—'তোমার মার খাওয়াই উচিত?'

'তোমাকেও ওরা ছাড়বে না, মনে রেখো। বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে ওরা জানতে পারলে তোমাকেও মোটা মাথা নিয়ে ফিরে যেতে হবে না, এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।'—বললেন পিপার ভয় দেখিয়ে।

এবার ক্যাপ্টেন রীতিমত ঘাবড়ে গেল। রান্না-ঘরে যাবার সমস্ত উৎসাহ তার উবে গেল কর্পূরের মত। সে বসে পড়ল। পাংশু মুখে পিপারের দিকে তাকিয়ে বলল—'তা হলে ভাই, এখন কী করা যায়?'

পিপার একটু ভেবে বললেন—'দেখ' এক কাজ কর। শেষ ট্রেণটা ছাড়ে রাত আটটায়। তুমি ওকে নিয়ে ষ্টেশনের ধারে বেড়াতে যাও। প্রায় এক মাইল দূর থেকে ট্রেণটা দেখা যায়। ট্রেণটা ছাড়বো-ছাড়বো হলে তুমি দৌড়ে গিয়ে ট্রেণে উঠে পড়বে আর ট্রেণ ছেড়ে দেবে। ও দৌড়তে পারে না। কাজেই তোমাকে ধরতে পারবে না।'

কথাগুলো মন্দ লাগল না ক্রিপেনের। সে ভাবতে লাগল সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে।

ঘরে ঢুকলেন শ্রীমতী। হাতের ট্রেতে ধূমায়িত চায়ের পাত্র। পরিবেশিত হল চা আর সামান্য আনুষঙ্গিক। তিন জনে বেশ সময় নিয়ে চা খেতে লাগল। তাড়াতাড়ি নেই কোন। দু'-চারটে অবান্তর আলোচনাও হল। ক্যাপ্টেন খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তার মুখে-চোখে একটু খুশীর ভাব। মার্থাও ক্যাপ্টেনের ভাবান্তর লক্ষ্য করে খুশী হয়েছে। ক্যাপ্টেন চা শেষ করে গল্প সুরু করল—তার তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি কথা। মাঝে-মাঝে তাদের পুরানো দাম্পত্য-জীবনের কথাও এসে পড়ছে। পিপার ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠেছে পাছে ক্যাপ্টেন কিছু বেফাঁস বলে ফেলে। গল্প গড়িয়ে চলল। ক্রমে খাবার সময় হয়ে এল। তিন জনে খাবার-ঘরে এল। মার্থা পিপার কোথায় যাবে, থাকবে কোথায়, আবার বিয়ে করবে কি না এ সব প্রসঙ্গও তুলল খাবার টেবিলে। পিপার কোন প্রশ্নেরই ঠিক মত জবাব দিলেন না।—'এখনো ও সম্বন্ধে কিছু ভাবিনি'—এই বলে পিপার প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে গেলেন।

ঘড়ির কাঁটা সাতটার ঘরে এসে পড়ল এদিকে। ক্যাপ্টেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। খাওয়া শেষ করে সে মার্থাকে বলল—'চল মার্থা, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

মার্থাও বেজায় খুশী। সে আবেগ-উচ্ছল কণ্ঠে বলল—'আমি কিন্তু আগেকার মত আর জোরে-জোরে হাঁটতে পারি না জেম, সে কথাটা মনে রেখো। তোমাকে কিন্তু আস্তে-আস্তে হাঁটতে হবে আমাকে সঙ্গে নিলে।'

ক্যাপ্টেন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলে—'বেশ, তাই হবে।'

বেরোবার সময় পিপার মার্থাকে বললেন—'দেখ, তোমরা পিছনের দরজা দিয়ে যাও। সামনের রাস্তায় এখনো লোক জমে আছে বলে মনে হয়।'

মার্থার হ'য়ে ক্রিপেন ধন্যবাদ জানাল পিপারকে তার এই উপদেশের জন্য, তার পর তারা দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে বেরিয়ে পড়ল।

পিপার খানিকক্ষণ ব'সে ব'সে পাইপ টানলেন। তাঁর চোখ দু'টো আটকে আছে ম্যাণ্টেলপিসের ঘড়িটার ওপর। কাঁটাটা বেজায় আস্তে ঘুরছে। আটটার ঘর থেকে অত দূরে কেন ছোট কাঁটাটা? বড় কাঁটাটা সবে তিনের ঘর পার হ'ল। পিপার আর ধৈর্য ধ'রে বসে থাকতে পারেন না। তিনিও পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সোজা রাস্তা ধ'রে তিনি চললেন ষ্টেশনের দিকে। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখেন যে, ট্রেণ আসতে তখনো অনেক দেরী আছে। তিনি সাইডিংএ রাখা কয়লা-ভর্ত্তি একটা মালগাড়ীর আড়ালে আত্মগোপন করলেন। নাটকীয় পরিণতিটা তাঁর স্বচক্ষে দেখা চাই।

আটটা বাজতে আর মিনিট পাঁচেক বাকী। ক্যাপ্টেনের দেখা নেই। পিপার ক্রমেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন। যে পথে ক্যাপ্টেন আসবে, সেদিকে চেয়ে আছেন পিপার অনেকক্ষণ। তাঁর চোখ দু'টো ব্যথা করছে। ক্যাপ্টেনের তবু আসবার সময় হয় না। পিপার যে কী ভীষণ রেগে উঠছেন ক্যাপ্টেনের ওপর সেটা একমাত্র তিনি জানেন আর জানেন ভগবান। এদিকে প্ল্যাটফর্মটা ক্রমেই ভর্ত্তি হ'য়ে উঠতে লাগল। জনতার তরঙ্গ। বিরাম নেই তাদের পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসার। গাড়ী আসবার ঘণ্টা বাজল। দূরে সাদা ধোঁয়ার নিশান তুলে ট্রেণ আসছে। কোথায় ক্রিপেন? তার দেখা নেই। পিপার চার দিকটা ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখে নেন। অন্ধকারে ভালো ক'রে দেখাও যায় না। মহা মুশকিল। ঐ ট্রেণ এসে পড়ল। যাত্রীদের কোলাহল বাড়ছে। ট্রেণটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ল। উত্তেজনায় পিপার উঠে দাঁড়ান। গলা বাড়িয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেনকে। দ্রুতগতি ক্যাপ্টেন আসছে ট্রেণের দিকে। অনেক দূরে থপ-থপ ক'রে আসছে মার্থা আর হাত তুলে ডাকছে জেমকে। জেম ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। জেম প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়েছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পিপার। ট্রেণে উঠল ক্রিপেন এক লাফে। গাড়ী ছাড়বার সময় হ'য়ে এসেছে। ষ্টেশন-মাষ্টার ক্রিপেনের গাড়ীর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতে দিতে বলল—'খুব একটু[illegible] জন্য গাড়ীটা পেয়ে গেলেন স্যার।' ক্রিপেন তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে। সে কিছু না ব'লে শুধু একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে নি[illegible] শ্রীমতী কত দূরে। ষ্টেশন-মাষ্টার ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি অনুসরণ ক'[illegible] শ্রীমতীকে দেখতে পেলো। মার্থা তখন দু'হাত তুলে ডাক[illegible] জেমকে আর তার সাধ্যাতীত জোরে দৌড়ে আসছে। এই বু[illegible] পড়ে যায়! ষ্টেশন-মাষ্টার ক্যাপ্টেনকে আশ্বাস দিয়ে বলে—'আপনি স্যার কিছু ভাববেন না। আপনার স্ত্রী না আ[illegible] পর্যন্ত আমরা গাড়ী ছাড়ব না।' ক্যাপ্টেনের মাথায় বজ্রাঘা[illegible] হ'ল। কামরার সবাই মুখ বাড়িয়ে শ্রীমতীর আগমন-পথের দি[illegible] চেয়ে রইল। ক্যাপ্টেন শুধু অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। [illegible] ভাবতেও আর পারছে না এর পরে কী ঘটবে! মার্থা এসে পড়[illegible] ষ্টেশন-মাষ্টার মহা সমারোহে কামরার দরজাটা খুলে ধরে তা[illegible] গাড়ীতে উঠিয়ে দিল। গাড়ী ছেড়ে দিল হুস্-হুস্ ক'রে।

ষ্টেশনের জনতা আর নেই। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আ[illegible] জ্যাকসন পিপার। এখনো অনেক দূরে ট্রেণটার পিছনের আলো দেখা যাচ্ছে। পিপার অন্যমনস্ক ভাবে ভাবছেন ওদের দু'জনের কথাবার্ত্তা হচ্ছে এখন। ক্রিপেন কী বলছে মার্থাকে আর মার্থ[illegible] বা কী বলছে? একটা কুলি লক্ষ্য করল পিপারকে এই ভ[illegible] দাঁড়িয়ে থাকতে। সে শুনেছে ক্রিপেনের আবির্ভাবের ক[illegible] পিপারের কোন দিকে খেয়াল নেই। তিনি লক্ষ্যও করলেন কুলিটাকে। কুলিটা আস্তে-আস্তে পিপারের পাশে এসে মি[illegible] দুয়েক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর সাহস করে পিপা[illegible] কাঁধে একটা হাত রেখে বলল—'আপনি আর ওঁকে দেখতে পা[illegible] না মিঃ পিপার। ওঁর জন্য আর মিছে মন খারাপ ক[illegible] না।'—তার গলার স্বর সমবেদনায় করুণ। পিপার চ[illegible] ফিরে তাকান। কুলির চোখ দু'টো চকচক করছে। বোকা[illegible] সমবেদনার অশ্রু। ভীষণ বিরক্ত হলেন পিপার। কঠোর তাকে বললেন—'তুমি একটি আস্ত গাধা!'—তার পর [illegible] ক'রে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেলেন মেঠো পথ ধ'রে।*

---

* W. W. Jacobsএর 'Benefit Performan[illegible] অনুবাদ।

রণাঙ্গনে

শ্রীযামিনীমোহন কর

শোঁ...ওঁ...। বুম্...ব্যুম্...ব্যুম্...। কট্ কট্ কট্ কট্......।

কাশ্মীর রণাঙ্গন। যুদ্ধস্থল উরি। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা দশ হাজার ফুটের ওপর। বন্ধুর পর্ব্বতরাজি। এক-হাঁটু বরফে ঢাকা। আপাদমস্তক পশমী সামরিক বস্ত্রে আবৃত যুধ্যমান সেনানী।

আকাশে বোমারু। পুষ্পবৃষ্টির মত অবিরাম বর্ষণ করছে বোমা। দূর-পাল্লার কামান থেকে উড়ে আসছে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। প্রচণ্ড শব্দ, এক ঝলক আগুন। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যারা ছিল, পরমুহূর্ত্তে তারা নেই। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবু তারই মধ্যে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, হাসিমুখে। পায়ে হিম, মাথায় আগুন। বিপদকে, মৃত্যুকে অবহেলা করে অটুট ভাবে কর্ত্তব্য পালন এদের ধর্ম্ম। ঊর্দ্ধতন নেতার আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করাই এদের জীবনের লক্ষ্য।

হেড কোয়ার্টারে বসে কম্যাণ্ডিং অফিসার। অপেক্ষা করছেন একটি বেতার সংবাদের। বিগত কয় দিন ধরে একই ব্যাটালিয়ন লড়ে চলেছে, এক-হাঁটু বরফের মধ্যে। তিন জনের পায়ে গ্যাংগ্রীন হয়েছে। দু'জনের পা কাটতে হয়েছে। আর এক জনেরও বোধ হয় হবে। ডাক্তার কোন ভরসা দিতে পারছেন না। দিনের পর দিন যুদ্ধ করতে হচ্ছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষের বিরুদ্ধে। দু'জন পাগল হয়ে গেছে। ব্যাটালিয়নকে এখনই সরিয়ে আনা প্রয়োজন। ওদের পক্ষে আর লড়াই করা সম্ভব নয়। কিন্তু উপায় নেই। আর এক দল না আসা পর্য্যন্ত থাকতেই হবে ওদের।

সিগন্যাল অফিসার ঘরে ঢুকলেন তড়িত বেগে। হাসি উপচে পড়ছে মুখে। মিলিটারী কায়দা ঘরে ঢোকবার আগে হুকুম নেওয়া। আনন্দের আতিশয্যে ভুলে গিয়েছেন আদব-কায়দা।

"ওরা এসে পড়েছে স্যার; শ্রীনগরে আছে, কাল এখানে পৌঁছে যাবে"—বলতে বলতে সংবাদের ফর্মটা এগিয়ে দিলেন কম্যাণ্ডিং অফিসারের হাতে। একবার না, দু'বার তিন বার তিনি পড়লেন। যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজের চোখকে। তার পর লাফিয়ে এসে শেকহ্যাণ্ড করলেন সিগন্যাল অফিসারের সঙ্গে।

"থ্যাঙ্ক গড্! আর দু'দিন দেরী হলে আমি পাগল হয়ে যেতুম। ব্যাটালিয়নও হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।"

নূতন দল এসে পড়েছে, ফ্রণ্টে দাঁড়িয়ে গেছে। পুরানো দল ছুটি পেয়েছে। তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত। সৈনিকদের সঙ্গে অনেক অফিসাররাও চলে যাবেন। কয়েক জনকে থাকতে হবে কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য। রণক্ষেত্রে যারা যুদ্ধ করে, তারা ছাড়া যুদ্ধ-সংক্রান্তীয় কাজে আরও অনেককে থাকতে হয়। অ্যাম্বুল্যান্স বাহিনী, রসদ বাহিনী, পরিবহন বাহিনী ইত্যাদি। আর থাকে এক দল লোক—যারা এ সব কিছুর মধ্যেই নেই। প্রেস। সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারের দল। জনসাধারণকে জানায় এরা রণাঙ্গনের বারতা। জীবন তুচ্ছ করে এরা যোগাড় করে খবর, তুলে নেয় ছবি। দু'আনার কাগজের এক পাতার একটি কলমের অর্দ্ধেকটা সংবাদ, কি একটা ছবি—মাত্র এইটুকুর পিছনে কি অমানুষিক সাহস এবং কঠোর পরিশ্রম, তা কেউ কল্পনা করতে পারে না। সব চেয়ে বিপদসঙ্কুল স্থানে তাদের যেতে হয় সব চেয়ে আগে—স্কুপ নিউজ চাই যে! মৃত্যুর উদ্যত ফণার সামনে তারা হেসে সিগারেট ধরায়।

সামরিক সংবাদদাতা হিসাবে এ-কে-রে বিখ্যাত। পূরা নাম অনিলকুমার রায়, কিন্তু এ নামে খুব কম লোকেই তাকে চেনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও গিছল সে সামরিক সংবাদদাতা হিসাবে। বার্ম্মা, অষ্ট্রেলিয়া, সিরিয়া, জার্ম্মাণী বহু স্থানেই ঘুরেছে সে। তখনই নাম করেছিল প্রচুর, আর নাম হারিয়েছিলও তখনই। শ্বেতাঙ্গরা ওর নাম দিয়েছিল এ-কে-রে। সেই নামই তার চলে গেছে লেখার মধ্যে দিয়ে।

কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল দত্ত বললেন,—"রে, অনেক দিন তো এই মারণ-যজ্ঞের দর্শক হয়ে রইলে। কষ্টও বড় কম করনি। দিন সাতেক রেষ্ট ক্যাম্পে ঘুরে এস।"

"কিন্তু এখানকার কাজ?" প্রশ্ন করলে সে।

কম্যাণ্ডিং অফিসার উত্তর দিলেন—"থাকবে তো শ্রীনগরে। এখান থেকে সংবাদ সব সময়ই পাবে। আর সব সাংবাদিকরা তো রইলেন। খবর পাবেই। ভাববার কিছু নেই।"

"বেশ। তবে ঘুরে আসি।"

"হ্যাঁ। মধ্যে-মধ্যে একটু বিশ্রাম করা দরকার। আমিও চার্জ্জ হ্যাণ্ডওভার করে দু'-এক দিনের মধ্যে শ্রীনগর যাব। আজ সব অফিসাররা যাচ্ছে। তুমিও এদের সঙ্গে চলে যাও।"

শ্রীনগর রেষ্ট ক্যাম্প। ফৌজী দিলখুস' বন্দোবস্ত করে রণক্লান্ত সৈনিকদের দিল খুস করবার। সামরিক এসট্যাব্লিশমেণ্টের এ একটা প্রয়োজনীয় বিভাগ। মন চাঙ্গা না রাখতে পারলে যু করা অসম্ভব।

বিখ্যাত নিডোজ হোটেলের হলঘরটা হয়েছে অডিটোরিয়াম এক প্রান্তে ষ্টেজ। সামনে দু'সারি সোফা অফিসারদের জ রিজার্ভড। বাকী সব চেয়ার অন্যান্য সৈনিকদের জন্য। প্রচু আয়োজন, নাচ, গান, থিয়েটার। রোজই লেগে আছে। সপ্তাহে দু'দিন সিনেমা। সৈনিকদের কাছে সিনেমার চেয়ে নাচ-গানে আদর বেশী। রক্ত-মাংসের সজীব দেহের আকর্ষণ।

গান সকল ভাষাতেই করতে হয়। সকল সৈনিকের ভাষা এ নয়। বেশীর ভাগই প্রেমের গান। অধিকাংশ কদর্থপূর্ণ। উচ্চা সঙ্গীতের বিশেষ চাহিদা নেই, তাই পরিবেশনও নেই। আর নাচ সে যে কি আর কি নয় বলা শক্ত। লম্ফ-ঝম্প আর যৌ আবেদনই তার মূল। বাকিটা অর্থাৎ সুর, তাল, ছন্দ, ল আনুসঙ্গিক মাত্র। ইঙ্গিত যত স্পষ্ট, সৈনিকদের উল্লাস ত উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু এ সবের ব্যতিক্রম ঘটল শেষ নাচে। হলশুদ্ধ দর্শক স্তম্ভ বিস্মিত। ষ্টেজে যে নর্ত্তকী এল, সে কি মানবী! অপ্সরা-মে রম্ভাও যেন লজ্জা পায় তার যৌবন-উচ্ছল দেহ-লাবণ্যে। আর কি অপূর্ব্ব নৃত্য! দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়ও বোধ করি এ নৃত্য দুর্লভ অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। পর্দ্দা পড়ে গেল। তবুও সবাই ব রইল নির্ব্বাক্ হয়ে। মোহিত চিত্ত সকল ইন্দ্রিয়কে যেন বিব করে ফেলেছে।

অনুষ্ঠানের পর রে জিগ্যেস করলে ওয়েলফেয়ার অফিসার ক্যাপ্টেন প্রকাশকে।

"অপূর্ব্ব! মেয়েটি কে হে?"

"মেয়েছেলে তো অনেক ছিল। কার কথা বলছ?"

"শেষ নৃত্য যে করল। তা ছাড়া আর সবই তো বীভৎস।"

"তোমারই দেশের মেয়ে। নাম রিণি গুপ্তা। কেমন সুন্দরী দেখলে তো। কেবল নাচ নয়, সব বিষয়েই অসামান্তা। স্যর আর জি গুপ্তার নাতনী। বিলেতে মানুষ। অপূর্ব্ব ইংরেজী বলে। আর সব চেয়ে বড় কথা—অগাধ পয়সা।"

"আলাপ হয় না?"

"হয়, তবে—"

"তবে কি?" প্রশ্ন করলে রে।

"ভয়ানক রিস্কি। অসম্ভব রকমের ফাষ্ট। রেসের মাঠের চেয়েও তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স শূন্য হয়ে যাবে ওর সঙ্গে মিশলে।"

"আমি আর ক'দিন এখানে থাকব। খুব জোর দিন তিনেক। তাতে আর কি ক্ষতি করতে পারবে? আর আমি তো ঠিক ওর সঙ্গে মিশতে যাচ্ছি না—"

"দেখো বন্ধু, প্রেমে পড়ে যেও না যেন? সাবধান করে দিচ্ছি আগে থেকে। সকলের ওয়েলফেয়ার দেখা আমার কর্ত্তব্য। প্রেমকে সে ঘৃণা করে, ন্যাকামো বলে।"

"তবে তো আলাপ করতেই হয়।"

পরিচয় হ'ল মেলা-মেশার সুবিধা হ'ল না। পরদিনই রিণি গুপ্তাকে শ্রীনগর থেকে প্লেনে চলে যেতে হ'ল নতুন দিল্লী। এক বিশেষ উৎসবে তার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। জলসাটা আধা-সরকারী। উদ্দেশ্য কূটনৈতিক। ইতিহাস সৃষ্টি হয় রাত্রে, ডিনারের পর—নাচ-গানের আসরে পানীয়ের হুল্লোড়ে। মন ভেজাতে হলে মন মজান দরকার।

সাংবাদিকরা এক বিচিত্র শ্রেণী। আড্ডা, আলাপ অথবা সামাজিক অনুষ্ঠান সব থেকেই তারা খুঁজে-পেতে বের করে নেয় জনসাধারণকে পরিবেশন করবার মত সংবাদ। এরা ঠিক রিপোর্টার নয়। ঘটনার পিছনে যা থাকে অজ্ঞাত, তারই সন্ধান দেয় এরা। একেই বলে স্কুপ নিউজ।

রিণি গুপ্তাকে ষ্টেজে দেখে, তার সম্বন্ধে গুজব শুনে এবং পাঁচ জনের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে রে লিখে ফেললে রিণির সম্বন্ধে একটা রাইট-আপ। সেন্সর পাশ করে দিলে। সামরিক গোপন কথা কিছুই নেই যখন। রে লেখাটা পাঠিয়ে দিলে নিজের কাগজের সম্পাদকের কাছে। ফ্ল্যাশ করে প্রথম পাতায় ছাপা হ'ল, রিণি গুপ্তার ছবি সহ।

সম্পাদক সেন রে'কে লিখলে,—"তুমি শুধু প্রথম শ্রেণীর সামরিক সংবাদদাতা নয়, প্রথম শ্রেণীর গসিপ-রাইটারও বটে।"

রিণি গুপ্তা কাগজ পড়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে মনে মনে বললে,—"কোন হতাশ প্রেমিক নিশ্চয়ই। স্কাউণ্ড্রেল! স্যু করব।"

কিন্তু মামলা করা চলে না। সাংবাদিকরা আইন বাঁচিয়ে লেখে, খারাপ-ভাল, সত্য-মিথ্যা, সবই।

সাফল্যের মুখে থামিয়ে দেওয়া ফ্রাষ্ট্রেশনের নিকৃষ্টতম উদাহরণ। রণক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতির হুকুম তখনই দেওয়া হয় যখন বিপক্ষ মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে বিপক্ষ পেছু হটছে আর স্বপক্ষ সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, সেখানে যুদ্ধবিরতির হুকুম কি মনস্তত্ত্ব, কি রণতত্ত্ব কোন দিক দিয়েই অনুমোদন করা চলে না। কিন্তু রাজনৈতিক কূট চাল বোঝা ব্রহ্মারও অসাধ্য।

যুদ্ধবিরতির পর রে ফিরে এল কলকাতায়। অনর্থক কাশ্মীরে থাকার কোন মানে হয় না। কি রিপোর্ট সে লিখবে? যুদ্ধ বন্ধ, কোন খবর নেই। কিন্তু তার পিছনের যে সব কথা তা লেখা চলবে না। কাশ্মীরবাসীদের মনে অবিশ্বাস, সৈন্যদের ভেতর অসন্তোষ, এ সব থাকবে লৌহ-যবনিকার অন্তরালে। সরকার এর প্রকাশ কিছুতেই সহ্য করবে না।

সম্পাদক সেন বললে,—"মাইনে কিছুটা কমবে। কিন্তু আমাদের ষ্টাফেই তুমি থাকবে। তোমার কাজ হবে 'গসিপ' লেখা।"

'ওয়ার করেসপণ্ডেণ্ট' থেকে 'গসিপ-রাইটার'। অনেকটা পতন। অর্থের দিক দিয়েও এবং সম্মানের দিক দিয়েও। তবে বেকার হয়ে পড়ার চেয়ে ভাল। খাবে কি? যা পাবে তাতে মেসে থাকা আর খাওয়া দিব্যি চলে যাবে। এমন কি কিছু হাতেও থেকে যাবে। রে সম্মত হ'ল।

হয়ত এ কাজটাও সে পেত না। কিন্তু সেনের সঙ্গে রে'র পরিচয় বহু দিনের। কলেজে একসঙ্গে পড়েছিল। কিছুটা বন্ধুত্ব ছিল বলা চলে। সেই সুবাদেই চাকরীটা। সেই সঙ্গে আরও একটা কাজের জোগাড় করে দিল সেন।

রে বরাবরই ইংরেজীতে ভাল। লেখাতে এবং বলাতে। সেনের বোন অলকাকে পড়াতে হবে হপ্তায় তিন দিন। মাইনে খুব একটা না হলেও খারাপ নয়।

উভয় কাজেই লেগে পড়ল রে।

রিণি গুপ্তা কলকাতায়। ক্যামাক ষ্ট্রীটে প্রাসাদোপম অট্টালিকা, তিনখানা গাড়ী। অভিজাত সম্প্রদায় এবং সকল সরকারী, বেসরকারী উঁচু দরের অনুষ্ঠানে সে হ'ল প্রাণ। সোসাইটি চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ। বিরাট বিরাট ধনীদের গাড়ী সব সময়েই তার বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে। তাকে বাদ দিয়ে 'গসিপ' লেখা চলে না।

রে'র কলম যেন হুল বনে গেছে। যেমন বেঁধে, তেমনই জ্বালা দেয়। সংবাদপত্রের পাঠকরা চায় এই সব মুখরোচক কাহিনী পড়তে। কাগজের কাটতি বেড়ে গেছে হু-হু করে। রে উন্নতি লাভ করেছে ক'মাসের মধ্যেই। সহকারী সম্পাদকের পদে। কিছুটা লেখার জোরে আর কিছুটা বোধ হয় অলকার সুপারিশে।

অলকা অবাক্ হয়ে যায়। বুঝতে পারে না রে'কে। সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা রিণির বিরুদ্ধে যে এমন তিক্ত, তার প্রতি সে অমন শান্ত কি করে হয়। বোঝে না সে, যে রোজগারের জন্য সাংবাদিকদের এমন অনেক কিছুই লিখতে হয় যা সে বিশ্বাস পর্য্যন্ত করে না। অলকা মনে করে বোধ হয় তার প্রতি রে'র দুর্ব্বলতা আছে। সেই ধারণায় বশে একটু কর্তৃত্বও চালায়। সে মেনে নেয় নীরবে। অর্থ

তার প্রয়োজন। যতক্ষণ সম্মানে আঘাত না লাগছে, কথা শুনতে দোষ কি? অলকার ধারণা হয়ে ওঠে আরও বদ্ধমূল।

প্রিন্স বামদেবের সঙ্গে ইদানীং রিণির মেলা-মেশাটা খুব বেড়ে গেছে। যেখানে রিণি, সেখানেই প্রিন্স। অনেক কথা, অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে ওদের নিয়ে অভিজাত সোসাইটির মধ্যে। অগাধ টাকা প্রিন্সের, বিলেত ফেরত। আর চেহারাও নেহাৎ মন্দ নয়।

সম্প্রতি ওরা গেছে দার্জিলিঙে। প্রিন্সেরই এক বাড়ীতে উঠেছে। প্রিন্স উঠেছেন অন্য এক বাড়ীতে। রিণির সঙ্গে আছেন রিণির পিসী। শ্যেনদৃষ্টি মহিলাটির। আর বিষয়-বুদ্ধিও খুব প্রখর। প্রিন্স তাঁকে তোয়াজ করছেন খুবই। যদি রিণি-রত্ন লাভ হয়।

সেন পাঠিয়েছে রে'কে দার্জিলিঙে। 'গসিপ' লেখবার এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। ঢালাও হুকুম, যত ইচ্ছে খরচ কর। ওদের সোসাইটিতে মিশে হাঁড়ির খবর জানতে হবে। তার পর হাটে হাঁড়ি-ভাঙ্গা।

দার্জিলিঙে প্রিন্সের বাড়ীর কাছাকাছি এক হোটেলে গিয়ে উঠল রে। খোঁজ ক'রে যত ক্লাবে আর আড্ডায় প্রিন্স আর রিণির যাতায়াত, সবেতেই সেও পড়ল ঢুকে। এখানে রে স্বনামে পরিচিত। অনিলকুমার রায় কিছু দিনের মধ্যে সকলের সঙ্গে বেমালুম গেল মিশে। টাকার জোরে আর পালিশ-করা ব্যবহারে সেও উঠল এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে। অনেক কিছু দেখল, জানল, শুনল। ফলে কাগজে রে'র নামীয় যে লেখা বেরোল রিণি ও প্রিন্সকে নিয়ে তা যেমন তীব্র তেমনই তিক্ত।

চায়ের টেবিলে রিণি বললে প্রিন্সকে,—"ছোটলোকের কাণ্ডটা দেখেছেন"—কাগজটা দিলে এগিয়ে প্রিন্সের দিকে।

লেখাটা পড়ে প্রিন্স উঠলেন জ্বলে। টেবিলে ঘুসি মেরে বললেন,—"কেস করব—"

রিণি বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল—"তাতে কেলেঙ্কারি বাড়বে বই কমবে না। ইগনোর করাই একমাত্র উপায়। তবে এক কাজ করা যায়।"

আগ্রহ-কণ্ঠে প্রিন্স প্রশ্ন করলেন,—"কি?"

"অনিল বাবুকে বলে একটা কাউণ্টার আর্টিকেল লেখাব। রে লোকটা যে স্কাউনড্রেল তাই প্রমাণ করাব—"

"ঐ অনিল বাবু না কে, ওর সঙ্গে তোমার বেশী মেলা-মেশাটা আমি বিশেষ পছন্দ করি না।"—রাগ আর অভিমান-মিশ্রিত স্বরে বললেন প্রিন্স। দাঁতে ঠোঁট চাপলে রিণি। মুখ হয়ে উঠল কঠোর। ধারাল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,—"আমি কার সঙ্গে মিশব, তা কি আপনি ঠিক করে দেবেন?"

কথাটা বলা যে ঠিক হয়নি, বলে ফেলেই প্রিন্স বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে অনুতাপ প্রকাশ করলেন বিনীত ভাবে।

"না, না, আমি তা মীন করিনি। বড়ই দুঃখিত। আমায় ভুল বুঝো না।"

জলা পাহাড়ের ওপর এক বেঞ্চে বসে রিণি আর অনিল। রে নয়, এখন সে অনিলকুমার রায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, আবহাওয়া, সিনেমা ইত্যাদির কথা বলতে বলতে রিণি অবতারণা করলে আসল কথার।

"আচ্ছা অনিল বাবু, আমাকে আপনার কি রকম মনে হয়?"

মাথা চুলকে অনিল বললে,—"আপনার সঙ্গে আমার বেশী দিনের পরিচয় নয়। বিশ্লেষণ করে বলবার মত জ্ঞান আমার নেই। তবে যতটুকু দেখেছি তাতে যা মনে হয়, তাই বলতে পারি।"

"বেশ, তাই বলুন।"

"আপনি সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। লোকের সঙ্গে মেশবার ক্ষমতা আপনার প্রচুর। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে পরম সৌভাগ্য।"

"ধন্যবাদ"—হেসে উত্তর দিলে রিণি,—"এইবার আপনাকে এই খবরের কাগজটা পড়তে অনুরোধ করছি। আমার সম্বন্ধে কি লিখেছে, দেখুন।"

অনিলের হাতে ধরিয়ে দিলে রিণি, তার সম্বন্ধে রে'র লেখা প্রবন্ধটি।

ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়ে গেল রে। তার লেখা তাকেই দেখান হচ্ছে সমালোচনার জন্য। অথচ রহস্য বজায় রাখতেই হবে। সুতরাং কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন। আমতা-আমতা করে বললে,—"বোধ হয় লেখক আপনাকে ঠিক বুঝতে পারেনি। দূর থেকে দেখে এবং পাঁচ জনের কথা শুনে লিখেছে। ভাল করে মিশে দেখলে এ রকম কথা লিখতেই পারত না।"

"আচ্ছা, আপনি কাগজে লেখেন কি?" হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল রিণি। চমকে উঠল অনিল। তবে কি তার গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেছে। মৃদু কণ্ঠে বললে,—"কই না তো। বিশেষ কিছু, মানে—"

রিণি নিজের থেকেই বলল,—"একটু সাহায্য করতে পারেন আমায়?"

"কি রকম বলুন। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করব।"

"আপনি আমার সম্বন্ধে যদি কিছু লেখেন এই স্কাউনড্রেলের লেখার প্রতিবাদ করে?"

এতক্ষণে যেন ধড়ে প্রাণ এল অনিলের। যাক্, রহস্য ফাঁস হয়নি। কি উৎকণ্ঠার মধ্যেই কাটছিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উত্তর দিলে,—বেশ তো। চেষ্টা করব। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখব। তবে লেখাটা পাঠাবার আগে আপনাকে একবার দেখে দিতে হবে।"

"নিশ্চয়ই।"

লেখাটা রিণির খুবই পছন্দ হ'ল। ঈষৎ ঘষে-মেজে পাঠিয়ে দেওয়া হল কাগজে। এই সূত্রে রিণির সঙ্গে অনিলের পরিচয়টা হয়ে গেল বেশ ঘনিষ্ঠ। এই ঘনিষ্ঠতা তাদের আনন্দ দিলেও পীড়িত করে তুলল প্রিন্স বামদেবকে। তিনি খরচ করে চলেছেন অঢেল পয়সা রিণির জন্য আর রিণি—রাগে রি রি করে ওঠে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ, কিন্তু কিছু করতে অথবা বলতে তাঁর সাহস হয় না। রিণির যা মেজাজ, শেষে—

প্রিন্স বন্দোবস্ত করলেন রিণিকে টাইগার হিল থেকে সূর্য্যোদয় দেখাবার। তাঁর গাড়ী হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়াতে গ্যারেজ থেকে একটা গাড়ীর বন্দোবস্ত করলেন। রিণি প্রোপোজ করলে সঙ্গে অনিল বাবুকে নিলে কেমন হয়? প্রিন্স গম্ভীর হয়ে বললেন, এখন আর তা সম্ভব নয়। গাড়ী ভাড়া করা হয়ে গেছে। খুব ছোট গাড়ী না হ'লে শেষ অবধি উঠতে পারবে না। রিণি, তার পিসী, তিনি নিজে আর ড্রাইভারের বেশী গাড়ীতে জায়গা হবে না। রিণি আর কি করে অগত্যা।

তবে রিণি অনিলকে জানালে সে কথা। অনিল হেসে বললে, "দেখে নেবেন,—শেষ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গেই আপনাকে টাইগার হিলে যেতে হবে সূর্য্যোদয় দেখতে।"

রিণি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে,—"তার মানে?"

অনিল রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বললে,—"পুরুষকারজনিত বরাত।"

সেই দিনই গ্যারেজে গিয়ে হাজির হ'ল অনিল। প্রিন্সের ভাড়া-করা গাড়ী ও ড্রাইভার খুঁজে পেতে বেশী বিলম্ব হ'ল না। অনিলের পকেটের কিছু টাকা ড্রাইভারের পকেটে স্থান পেল। ঠিক হ'ল, টাইগার হিলের পথে হঠাৎ গাড়ী খারাপ হয়ে যাবে, আর অনিলের গাড়ী চলে যাবার পর আবার গাড়ী চলতে সক্ষম হয়ে উঠবে। নিজের জন্য অনিল ভাড়া করলে একটি টু-সীটার। ড্রাইভার আর সে। অতি কষ্টে আর এক জনের স্থান হতে পারে।

রাত তিনটে। প্রিন্সের গাড়ী ছুটে চলেছে টাইগার হিলের পথে। সামনে ড্রাইভার আর প্রিন্স, পিছনে রিণি আর তার পিসী। উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রিন্স পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে গল্প করছেন রিণির সঙ্গে। হঠাৎ ক্যাঁচ করে শব্দ। ড্রাইভার ব্রেক করেছে। গাড়ীতে গোলমাল। নেমে দেখতে হবে।

ড্রাইভার গাড়ীর বনেট খুলে নিবিষ্ট মনে সারাবার চেষ্টা করছে খুঁতটা, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তার পকেটে স্থান পেয়েছে গাড়ীর ভাল প্লাগগুলো আর পকেটের ভাঙ্গা প্লাগ লাগিয়ে দিয়েছে গাড়ীতে। তাই যত বার চেষ্টা করে গাড়ী আর ষ্টার্ট নেয় না। প্রিন্স অগ্নিশর্ম্মা হয়ে হিন্দী-ইংরেজী মিশিয়ে প্রচণ্ড ভাবে গালমন্দ করছেন ড্রাইভারকে। সে মুখ কাঁচুমাচু করে নীরবে গাড়ী সারাবার ভাণ করে চলেছে। আর রিণি মধ্যে মধ্যে বলছে প্রিন্সকে,—"আহা, বেচারাকে অমন করে বকবেন না।"

প্রিন্স হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"বকবেন না! আলবৎ বকবে। তাড়াতাড়ি না পৌঁছতে পারলে সূর্য্যোদয় আর দেখা হবে না।"

পিসী বললেন, "উপায় কি! সবই বরাত। কিন্তু ড্রাইভারকে বকলে তো আর কোন সুরাহা হবে না।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা। প্রিন্স চীৎকার করছেন ক্রমাগত,—"ড্যামেজ আদায় করব, কেস করব—"

ভোঁক, ভোঁক, ক্যাঁচ—প্রিন্সের গাড়ীর পিছনে এসে একটা টু-সীটার দাঁড়াল। আরোহী নেমে এসে প্রশ্ন করলে—"কি হয়েছে?"

রিণি অবাক হয়ে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে অনিল।

প্রিন্স গর্জ্জে উঠলেন,—"আর বলেন কেন? গাড়ী মাঝ-রাস্তায় অচল হয়ে পড়েছে। যাচ্ছিলুম সূর্য্যোদয় দেখতে, তা আর হ'ল না দেখছি—"

রিণি বললে,—"প্রিন্স বড়ই দুঃখিত হয়েছেন আমার সূর্য্যোদয় দেখা হবে না বলে—"

অনিল দুঃখিত ভাবে জানালে,—"তাই ত! আপনারা ভারী বিপদে পড়ে গেছেন দেখছি। আমার গাড়ীটা আবার ভয়ানক ছোট। মেরে-কেটে এক জনের স্থান হতে পারে। আপনারা তিন জন—"

পিসী বলে উঠলেন,—"আমরা নয় পরে যাব বাবা! তুমি রিণিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। ও বেচারী এতটা এসে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যাবে—"

রিণি আপত্তি করলে,—"না না, তোমরা সবাই পড়ে থাকবে—"

পিসী বাধা দিলেন,—"আপত্তি করিসনি। উঠে পড়। দেরী হয়ে যাবে—"

রিণি প্রিন্সের দিকে চাইলে। প্রিন্সের আপত্তি করবার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও ভদ্রতার খাতিরে করা চলল না। কাষ্ঠহাসি হেসে বললে,—"হ্যাঁ, তুমি চলে যাও রিণি। অন্ততঃ এক জনের তো দেখা হবে।"

রিণি উঠে পড়ল গাড়ীতে, অনিলের পাশে। গাড়ী চলে গেল এগিয়ে। প্রিন্সের হৃৎপিণ্ড যেন মথিত করে।

রাগে ফেটে পড়লেন প্রিন্স। ঝাল ঝাড়লেন বেচারা ড্রাইভারের ওপর।

দূরে—বহু দূরে তুষার-মণ্ডিত পাহাড়ের পিছন থেকে উঠছে নতুন দিনের অগ্রদূত। বিচিত্র রাগে রঞ্জিত দিগন্ত। রূপোর পাহাড়ে যেন আগুন ধরে গেছে। রঙের মেলা বসেছে পূবে। উজ্জ্বল, প্রখর সে রঙ, চাওয়া যায় না বেশীক্ষণ। টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে দেখছে নবারুণ-ছটা অনিল আর রিণি। পাশাপাশি। মুখে এসে পড়েছে তীব্র জ্যোতি। যেন নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে ওরা নতুন দিনের সাথে-সাথে। অনিল হেসে বললে, —"দেখলেন পুরুষকার আর বরাতের যোগাযোগ—"

রিণি সলজ্জ ভাবে বললে,—"ধন্য আপনি! কিন্তু এ জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে তো। কেন?

অনিল উত্তর দিলে,—"সব কেন'র কি উত্তর দেওয়া যায়? সখ বলতে পারেন।"

"শুধু সখ? আর কিছু না?"

"জীবনে নতুন দিনের সন্ধানে মানুষ কি না করে?"

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে হাঁফাতে-হাঁফাতে পাহাড়ে উঠে এলেন প্রিন্স আর রিণির পিসী। রিণি আর অনিলকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করতে দেখে প্রিন্সের মেজাজ গেল ভীষণ তিরিক্ষি হয়ে। কি-একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় রিণি বলে উঠল,— "আমাদের একটা ছবি তুলুন না। পিছনে নবারুণরাগ-রঞ্জিত আকাশ, ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসেবে ভারী সুন্দর হবে।"

প্রিন্স আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। রিণি মধুর সুরে কাকুতি মিশিয়ে বলল,—"প্লীজ।"

প্রিন্সের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। ক্যামেরা করে উঠল 'ক্লিক্।'

সম্পাদক নিশীথ সেন হন্তদন্ত হয়ে আপিস থেকে বাড়ী ফিরে ডাক দিলে অলকাকে। অলকা এসে ঘরে ঢুকতেই নিশীথ একটা রচনা তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল,—"ফুল! গর্দ্দভ একটা। কি সব ট্র্যাশ লিখে পাঠিয়েছে।"

অলকা ভ্রাতার হঠাৎ বিস্ফোরণের কারণ বুঝতে না পেরে বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলে,—কি হ'ল? গাল-মন্দ করছ কাকে?"

নিশীথ শ্লেষপূর্ণ স্বরে উত্তর দিলে,—"কাকে আবার? তোমার মাষ্টারকে। ঐ অনিলটাকে।"

অলকা তখনও কিছু বুঝতে পারলে না। পুনরায় প্রশ্ন করলে,—"কেন? কি হয়েছে?"

নিশীথ রেগে জবাব দিলে,—"বাজে প্রশ্ন না করে ঐ ছাই-পাশ লেখাটা পড়ে দেখ। তা হলেই সব বুঝতে পারবে।"

অলকা পড়তে লাগল আর নিশীথ মত্ত হস্তীর মত ঘরময় দুপদাপ করে বেড়াতে লাগল।

তার পড়া শেষ হতেই নিশীথ বললে,—"দেখলে লোকটার কাণ্ড! তোমার কথাতেই ওকে কাগজে রেখেছিলুম, ছাড়িয়ে দিইনি। ওর যাতে সুবিধা হয় সেই জন্য তোমার প্রাইভেট টিউটরও করে দিয়েছিলুম। এখন দেখছ তো, লোকটা একেবারে অপদার্থ।"

অলকা ফোঁস করে উঠল,—"আমার কথাতে রেখেছিলে? মোটেই না। নিজের কাগজের সুবিধার জন্যই ওর চাকরী পাওনি। ওর সুবিধার কথা ভেবে তো তোমার ঘুম হচ্ছে না। আর প্রাইভেট টিউটর যে রেখেছিলে তার কারণ এত কমে আর কোন টিউটার পাওয়া যায় না।"

নিশীথ অলকার স্পষ্ট বাক্যে একটু দমে গেল। বললে,—"তা যাই হোক, অনিল নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করেছে। রিণির সম্বন্ধে এ লেখা পাঠান ঠিক হয়নি। এটাকে 'গসিপ রাইটিং' বলে না।"

"কেন বলে না শুনি?" 'গসিপ রাইটিং' মানে কি কেবল নিন্দা আর কুৎসা? ঘরের হাঁড়ির খবর টেনে বার করা আর হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা?"

একেবারে চুপসে গেল নিশীথ। এর কি উত্তর দেবে? অকাট্য যুক্তি। আমতা-আমতা করে বললে,—"তা নয়। মানে, লেখার দোষ আমি দিচ্ছি না, তবে কাগজে এ সব বিশেষ সুবিধা হবে না। লোকে চায় একটু মুখরোচক, কি বলে—মানে, একটু খেউড়।"

অলকা এইবার হেসে ফেললে। বললে,—"এই সত্যি কথাটা আগে বললেই হ'ত। লেখার কোন দোষ নেই। ভাষা সুন্দর। তবে বাজারে কাটবে না। লোকে যা চায় এতে তা নেই। কি বল দাদা?"

"হ্যাঁ, এই কথাই তো আমি বলছি।"

"তোমার এই অভিযোগ আমি মেনে নিচ্ছি। এ লেখার কোন ধার নেই। প্যানপ্যানে। এ-কে-রে'র কলম দিয়ে এ লেখা বার হওয়া ঠিক হয়নি। পড়ে মনে হয় যেন লেখকের রিণির প্রতি একটু দৌর্ব্বল্য আছে। পক্ষপাতিত্বের গন্ধ রয়েছে।"

"ভাট্‌স ইট। এ-কে-রে'র নামে এ লেখা বার হতে পারে না। এ লেখা আমি ছাপব না। আর একটা লেখা পাঠাতে লিখে দিচ্ছি।"

"তা না হয় ছাপলে না। চিঠিও না হয় দিলে। কিন্তু এর পরের লেখায়ও যদি এই দোষ থাকে? তোমার এক চিঠিতেই কি দৌর্ব্বল্য উপে যাবে?"

"তা বটে। এটা আমি ভাবিনি। কিন্তু যদি বারে বারে এই ধরণের লেখা পাঠাতে থাকে, তবে ওকে রেখে আমার লাভ কি? চাকরী ছাড়িয়ে দেব।"

"চাকরী ছাড়ান তো খুব সোজা। কলমের একটা খোঁচায় হয়ে যাবে। কিন্তু অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে দেখা দরকার। লোকটা ইচ্ছে করলে অদ্ভুত ভাল লিখতে পারে; নয় কি?"

"নিশ্চয়ই। সেই জন্যই তো ওকে রেখেছি। কিন্তু হঠাৎ এ কি?"

"হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য। এইটা কাটাতে পারলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"তা তো বুঝলুম। কিন্তু কি করে?"

"রিণি অনিলকুমারকে জানে, এ-কে-রে তার অপরিচিত। দুই নাম একই ব্যক্তির জানলে ওর ছায়া মাড়াত না। তুমি উচ্ছসিত প্রশংসা করে এ-কে-রে সম্বন্ধে কাগজে একটা লেখা বার করে দাও। সেই সঙ্গে ছবিও দিয়ে দিও। রিণি তখনই বুঝতে পারবে এই অনিলকুমারই এ-কে-রে। এই ব্যক্তিই এত দিন ধরে ওর কুৎসা করে এসেছে। তার পর স্রেফ মারতে বাকী রাখবে। দৌর্ব্বল্য কোথায় মিলিয়ে যাবে। ফলে পূর্ব্বের চেয়ে আরও ধারাল লেখা বার হবে এ-কে-রে'র কলম থেকে।"

নিশীথ আনন্দে লাফিয়ে উঠল। "অদ্ভুত বুদ্ধি! সেই জন্য বাবা তোকে কাগজের অর্দ্ধেক স্বত্ব দিয়ে গেছেন। এ বুদ্ধি আমার মাথায় কোন দিন আসত না। আমি চল্লুম আফিসে। কালই এ-কে-রে'র জীবনী কাগজে বার করে দেব।"

"খেয়ে যাবে না?"—প্রশ্ন করলে অলকা।

"ফিরে এসে"—সিঁড়ি থেকে উত্তর দিলে নিশীথ।

নিশীথ চলে গেল। অলকা দাঁতে দাঁত চেপে বললে,—"অনিল একটা স্কাউনড্রেল। আমার সঙ্গে ট্রেচারী! এর ফল ভীষণ হবে।"

প্রিন্স উত্তরোত্তর চটেই চলেছেন। খুবই স্বাভাবিক। রিণিকে তিনিই এনেছেন দার্জিলিঙে, তাঁর নিজের বাড়ী দিয়েছেন থাকতে। আর তার পিছনে টাকা খরচ করেই চলেছেন ক্রমাগত। কিন্তু কি রিটার্ণ পেয়েছেন? সবই ভস্মে ঘী ঢালা, কোথাকার কে অনিলকুমার—তাঁর পায়ের ন'খের যোগ্য নয়—সেই কি না বসল আসর জাঁকিয়ে। এক পয়সাও খরচ না করে। আর তিনি হয়ে গেলেন কোণ-ঠাসা। মেজাজ গরম এবং মন খারাপ হবারই কথা। তিনি খালি সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছেন কি করে অনিলকুমারকে অপদস্থ করা যায়। দু'-এক বার চেষ্টা করে নিজেই অপদস্থ হয়েছেন, তার কারণ রিণি যে অনিলের স্বপক্ষে। নইলে এত দিনে······

নাঃ, ওকে দার্জিলিঙ থেকে তাড়াতেই হবে, যেমন করে হোক।

ক'দিন হ'ল রিণি কার্সিয়াং গেছে। কোন এক আত্মীয়দের বাড়ী। দু'-চার দিন পরে ফিরবে। অনিলের বিশেষ কোন কাজ নেই হাতে। তাই সার্কেলের দু'-একটা মুখরোচক নিউজ মধ্যে মধ্যে লিখে পাঠায় নিশীথের কাগজে। বাকী সময়টা পথে পথে টো-টো করে কাটায়।

সেদিন ষ্টেশনে বেড়াচ্ছে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে। এমন সময় দার্জিলিং মেল এসে হাজির। সেদিনকার কাগজ নামল ট্রেন থেকে। অনিল একটা কাগজ কিনলে। তার নিজের কাগজ অর্থাৎ যে কাগজে সে লেখে। বিশেষ আগ্রহ ছিল রিণির সম্পর্কে তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখাটা ছাপার অক্ষরে দেখবার জন্য। কিন্তু অবাক হয়ে গেল। কাগজে তার প্রবন্ধ নেই, আছে তার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ। সচিত্র জীবনী।

প্রথমটা খুব খুশী হ'ল অনিল রায়। নিশীথ যে তাকে এ ধরণের পাব্লিসিটি দেবে, এটা সে আশা করেনি। ভেরি কাইণ্ড অব হিম্। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। পরেই রহস্য ভেদ করে ফেললে। এ-কে-রে আর অনিলকুমার রায় যে অভিন্ন, তারই প্রমাণ রয়েছে কাগজের ছবিতে। এর পর সে আর রিণিকে মুখ দেখাবে কি করে? ভাগ্যে আজ রিণি দার্জিলিঙে নেই। কাল আসবে। সুতরাং আজ রাত্রেই তাকে দার্জিলিঙ ত্যাগ করতে হবে। সে যে সত্যই মত বদলে রিণির সম্বন্ধে লিখেছে, এ কথা কিছুতেই রিণিকে বোঝান যাবে না। রিণি ভাববে, এও একটা কৌশল মাত্র। কোন যুক্তিই চলবে না। তার ওপর প্রিন্স···

সেই বিকেলেই কাউকে কিছু না বলে, হোটেলের প্রাপ্য মিটিয়ে অনিল দার্জিলিং ত্যাগ করল।

কথা ছিল লাঞ্চ খেয়ে রিণি কার্সিয়াং থেকে বেরোবে। তিনটা নাগাদ ঘুমে পৌঁছবে। প্রিন্স আর অনিল ঘুমে ওর জন্য অপেক্ষা করবে। তার পর সবাই বৌদ্ধ মন্দির দেখে দার্জিলিঙে ফিরবে।

সওয়া তিনটে নাগাদ ঘুরে এসে রিণি দেখলে মোড়ের মাথায় প্রিন্স একা দাঁড়িয়ে। তৃষিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাইলে কিন্তু সে নেই। আসেনি? বিশ্বাস করতে পারলে না রিণি নিজের চোখকে। প্রিন্সকে জিগ্যেস করলে,—"অনিল বাবু এলেন না?"

প্রিন্স হেসে উত্তর দিলেন,—"না, সে দার্জিলিঙে নেই।"

বিস্মিত হ'ল রিণি। "দার্জিলিঙে নেই মানে?"

"মানে খুব সরল। দার্জিলিঙ ত্যাগ করে পালিয়েছে।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে একবার দেখা পর্য্যন্ত না করে—"

বাধা দিয়ে বললেন প্রিন্স,—"দেখা করার উপায় ছিল না।"

ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ স্বরে রিণি বললে,—"হেঁয়ালী ছেড়ে একটু স্পষ্ট করে বলুন। আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। এ ভাবে হঠাৎ পালাবার কারণ? আপনি কি বলতে চান?"

প্রিন্স গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন,—"আমি কিছুই বলতে চাই না। তুমি এই খবরের কাগজটা দেখ। তাহলেই সব বুঝতে পারবে।"

রিণি এ-কে-রে'র জীবনী ও ছবির পাতাটায় চোখ বুলিয়ে কাগজটাকে দলা পাকিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। মুখ দিয়ে কেবল একটি কথা বার হ'ল—"বিশ্বাসঘাতক!" ঐ একটা কথাতেই তার মনের সকল ভাব প্রকাশ পেল।

প্রিন্স নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন।

অনিল কলকাতায় ফিরেই সম্পাদক নিশীথ সেনের সঙ্গে দেখা করলে। নিশীথের ব্যবহারে, আড়-ছাড় ভাব দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে,—"কি ব্যাপার বল তো?"

নিশীথ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলে,—"কিছু না।"

"কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। কথাবার্ত্তায় সেই রকমই মনে হচ্ছে। আমার রচনা না ছেপে হঠাৎ আমার লাইফ স্কেচ কাগজে বার হ'ল কেন?"

"সম্পাদক সে জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। তবু বলছি। রচনা আমাদের কাগজের পলিসির সঙ্গে খাপ খায় না। আর তোমার জীবনী ছাপা হ'ল এ-কে-রে'র সঙ্গে পাঠকগোষ্ঠীর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু তার ফলে আমি দার্জিলিঙ ছাড়তে বাধ্য হলুম। অনিলকুমার আর এ-কে-রে একই লোক জানতে পারবার পর আমার পক্ষে আর রিণির সম্বন্ধে "স্কুপ" নিউজ জোগাড় করা সম্ভব হবে না।"

"অমনিতেও সম্ভব হ'ত না। এত টাকা খরচ করে তোমায় দার্জিলিঙ পাঠিয়ে আমাদের কি লাভ হ'ল? যা লিখে পাঠালে তা স্রেফ রাবিশ। আমাদের কোন কাজেই লাগল না। অনর্থক পয়সা নষ্ট হ'ল। সুতরাং তোমার কাছ থেকে রিণি সম্পর্কে কোন রচনাই আশা করি না।"

"তবে এখন আমার কাজ কি?"

"কিছু নয়।"

"কিছু কাজ না থাকলে তো চাকরী থাকে না।"

"চাকরী যে থাকবেই এমন তো কোন কথা নেই। যাই হোক, তুমি আজ সন্ধ্যার সময় একবার আমাদের বাড়ী যেও। তখন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্ল্যান ঠিক করা যাবে। অলকাও এই কাগজের অংশীদার। তাকে না জিজ্ঞেস করে কিছু করা সম্ভব নয়।"

সন্ধ্যার সময় অনিল দুরু-দুরু বক্ষে নিশীথের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল। অলকা বাইরের ঘরেই বসেছিল। অনিল ঢুকতেই ছোট একটি নমস্কার করে কৃত্রিম বিস্ময় সহ বললে,—"এই যে অনিল বাবু, দার্জিলিঙ থেকে কবে ফিরলেন?"

প্রতি-নমস্কার করে অনিল উত্তর দিলে, "আজই। সকালে।"

স্মিতহাস্য সহ অলকা বললে,—"এসেই দেখা করতে এসেছেন। ভেরি কাইণ্ড অব ইউ।"

অনিল একটু দেঁতো-হাসি হাসলে। উত্তর আর কি দেবে?

অলকাই পুনরায় বললে,—"দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, এসেই অফিসে গিছলুম দেখা করতে। সে বাড়ীতে দেখা করতে বলেছে।"

"আই সী। আর নতুন কি লিখলেন? অনেক দিন আপনার কোন লেখা দেখিনি।"

"আর দেখবেনও না বোধ হয়। নিশীথ বলছিল 'গসিপ' লেখবার আর প্রয়োজন হবে না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। রিণির সম্বন্ধে কি একটা লেখা নিয়ে দাদা খুব রাগারাগি করছিল। কি লিখেছিলেন?"

"আমি একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার চরিত্র আলোচনা করেছিলুম।"

"ওঃ! দাদা যদি তার কাগজে ঐ ধরণের লেখা ছাপতে রাজী না হয়, তবে যেমন চায় সেই রকম লিখলেই ল্যাঠা চুকে যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তো কলম বন্ধ রাখা চলবে না।"

"তা তো চলবেই না। তাহলে যে পেট চলবে না। তখন ঠিক বুঝতে পারিনি কিন্তু এখন বুঝেছি যে, লেখকের নিজের মতামত বিলাস মাত্র। যাদের পয়সা আছে, তাদেরই ঐ ধরণের বিলাস-ব্যসন শোভা পায়। যাদের করে খেতে হবে তাদের পক্ষে মালিকের ইচ্ছাই শিরোধার্য্য করে নিতে হবে।"

"বেটার লেট ছান নেভার। এখন যে জ্ঞান লাভ করে ফেলেছেন সেই ভাবেই চালিয়ে যান। আমি না হয় আপনার হয়ে দাদাকে বলব।"

"ধন্যবাদ!"

"আর দেখুন, আমার পড়াশুনা আবার আগের মতই চালাতে চাই। আপনার কোন আপত্তি নেই তো?"

"না, না। বেশ, কাল থেকেই—"

"কাল কেন? আজ থেকেই। চলুন, আমার ঘরে—"

অনিলের চলে যাওয়াতে প্রিন্স খুব খুশী। যাক, একটা আপদ গেছে। কিন্তু প্রিন্স খুশী হলে কি হবে, রিণির মেজাজ বিশেষ সুবিধাজনক নয়। সব সময়ই কি রকম যেন মন-মরা। তাকে আনন্দ দেবার যত রকম চেষ্টাই প্রিন্স করেন, কোনটাতেই সে যেন প্রাণ খুলে সাড়া দিতে পারে না। প্রিন্স কিন্তু দমবার পাত্র নন। চেষ্টা অবিরত চলতে থাকে। শেষ রিণিই এক দিন হাঁফিয়ে উঠে বলে,—"কলকাতায় ফেরা যাক। আর এখানে ভাল লাগছে না। ছোট জায়গা, কিছু দিনের মধ্যেই বোরিং হয়ে পড়ে।"

দার্জ্জিলিং থেকে কলকাতাগামী ট্রেণের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে আছেন প্রিন্স বামদেব, রিণি গুপ্তা ও তার পিসী। শিয়ালদহ পৌঁছবার কিছু পূর্ব্বে রিণি বাথরুমে ঢুকল টয়লেট, মেকআপ ইত্যাদিতে ফিনিশিং টচ্ দিতে। বার হ'ল ঠিক যখন ট্রেণ ষ্টেশনে ঢুকছে। রিণিকে দেখে প্রিন্স এবং পিসী দু'জনেই থ! রিণির মাথায় অল্প একটু ঘোমটা, কপালের মাঝে সিন্দুরের টিপ। সীঁথিতে সিন্দুর, হাতে নোয়া।

প্রিন্স বিস্মিত হয়ে বললেন—"এ কি!"

রিণি মুচকি হেসে উত্তর দিলে—"যুদ্ধঘোষণা।"

আর কিছু বলবার সময় হ'ল না। গাড়ী প্ল্যাটফর্মে তখন দাঁড়িয়ে গেছে।

রিণিরা কলকাতায় হঠাৎ এলেও সে খবর সাংবাদিক মহলে চাপা ছিল না। সব কাগজওয়ালারাই উৎসুক প্রিন্স-রিণির রোম্যান্স পরিবেশন করতে। ভদ্র অথবা অভদ্র যে ভাবেই

পরদিন সকালেই নিশীথের কাগজে রিণির বিরুদ্ধে অনিলের মানহানির মোকদ্দমার কথা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হ'ল। চারি দিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল।

কেসে অনিলের হার হ'ল। রিণির কোন উক্তির ত্রুটি ধরা গেল না। তার বক্তব্য—সে আর অনিল এক দিন লেবঙ্গে গিছল। সঙ্গে আর কেউ ছিল না। সেখানে নীলকণ্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণ তার সঙ্গে অনিলের বিবাহ দেয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল তার প্রত্যেক কথাটা সত্য।

অনিলের উকীল প্রতিবাদ করেছিল,—"কিন্তু এ সব কথায় বিয়ে হয়েছে তা তো প্রমাণ হচ্ছে না।"

প্রত্যুত্তরে রিণির উকীল জানিয়েছিল,—"হয়নি তাও তো প্রমাণ হচ্ছে না। নীলকণ্ঠ বাবু কিছু দিন পূর্ব্বে মারা গেছেন, নইলে তাকেই আমরা হাজির করতে পারতুম।"

তার পর জজ, জুরী ও জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল,—"ধর্ম্মাবতার ও জুরী মহোদয়গণ, কোন হিন্দু-মহিলা কাউকে মিথ্যা ভাবে স্বামী বলতে পারে না। অবশ্য অনেক সময় অর্থ বা সম্পত্তির লোভে এমনটা যে ঘটেনি তা নয়, কিন্তু আমার ক্লায়েণ্টের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়, কারণ অনিল বাবুর এমন অর্থ বা সম্পত্তি নেই। তা ছাড়া আমার ক্লায়েণ্ট প্রচুর বিত্তশালিনী। তবে পুরুষদের স্ত্রীকে অস্বীকার করার কথা প্রায়ই শোনা যায়। হয়ত ঝোঁকের মাথায় মোহের বশে বিবাহ করে বসল কিন্তু পরে তা স্বীকার করল না—এ ঘটনা বিরল নয়। আমার ক্লায়েণ্ট স্বামীর সম্পত্তি চায় না, একসঙ্গে থাকবার জন্যও সে জোর করছে না—কেবল তার পোজিশন যাতে এ ভাবে নষ্ট না করা হয় সেই জন্য সুবিচার ভিক্ষা করছে।"

রিণির করুণ সুন্দর মুখ, তার পক্ষের উকীলের আবেগপূর্ণ বক্তৃতা, জুরীদের সেণ্টিমেণ্ট, আর জনমত—সব মিলিয়ে রায় রিণির পক্ষেই হ'ল। রিণির পক্ষের অনুরোধে অনিলকে স্রেফ বকাবকি করে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। প্রসিকিউট করা হ'ল না।

কেস হারার সঙ্গে সঙ্গে অনিলকে সব হারাতে হ'ল। নিশীথের বাড়ী যেতে অলকা দেখা পর্য্যন্ত করলে না। নিশীথ তাকে জানিয়ে দিল ভবিষ্যতে এই বাড়ীর এবং নিশীথের অফিসের দরজা দুই-ই তার জন্য বন্ধ। তার জন্য অনেক ক্ষতি ও অপমান স্বীকার করতে হয়েছে। আর নয়।

এদিকে কাগজে এবং বাজারে অনিলকে নিয়ে ঢি-ঢি পড়ে গেল। ভদ্রসমাজে মুখ দেখান মুস্কিল। মেস সে আগেই ছেড়ে এক ছোট হোটেলে উঠেছিল। সেখানকার ম্যানেজারও সাত দিনের মধ্যে উঠে যাবার জন্য নোটিশ দিলে। হাতে যৎসামান্য যা ছিল, তা আর কত দিন চলবে। মরিয়া হয়ে অনিল ছোটাছুটি আরম্ভ করলে একটা কাজ জোটা'বার জন্য।

কিন্তু কোথায় কাজ? কি কাজই বা সে করতে পারে? যত কাগজ ছিল, প্রত্যেক অফিসেই গেল আর প্রত্যেক জায়গা থেকেই সে বিতাড়িত হ'ল। একে কাজ নেই, তার ওপর অনিলকে কাজ দিতে কেউ রাজী নয়। এই স্ক্যাণ্ডালের পর আবার—

অনিল হোটেল ত্যাগ করে টালিগঞ্জের এক বস্তীতে একটা টিনের ঘর ভাড়া নিয়েছে। বাসিন্দারা অশিক্ষিত। অনিলের সম্বন্ধে কিছু জানে না। জানবার আগ্রহও নেই। সে হিসেবে অনিল যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেয়েছে।

কিন্তু অবিলম্বে একটা কাজ জোগাড় না করলেই নয়। দু'-একটা লেখা বিভিন্ন কাগজে পাঠিয়েছিল। ফেরৎ এসেছে। সম্পাদক দুঃখের সহিত জানিয়েছেন—এখন তার লেখা ছাপা সম্ভব নয়। পরে হয়ত হতে পারে।

রিণিকে প্রিন্স প্রশ্ন করলেন,—"অনিলের ব্যাপারটা কি সত্য?"

হেসে রিণি উত্তর দিলে,—"সত্যও আর মিথ্যাও।"

প্রিন্স চটে উঠলেন,—"হেঁয়ালী রাখ। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই। বিয়ের ব্যাপারটা কি সত্য? স্পষ্ট উত্তর দাও।"

রিণি গম্ভীর হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলে,—"কিন্তু আপনাকে এই ভাবে প্রশ্ন করার অধিকার কে দিল? আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আপনাকে কিছু জানাতে আমি বাধ্য নই।"

প্রিন্স নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি সুর বদলে ফেললেন: "রিণি, আমি তোমাকে ভালবাসি, সেই জন্যই—"

বাধা দিয়ে রিণি বললে,—"আমি আপনাকে বন্ধু মনে করি। সেই সম্বন্ধই থাকতে দিন। আর বেশী কিছু চাইতে যাবেন না। উভয়ের পক্ষেই তা দুঃখের হবে।"

প্রিন্স একেবারে চুপসে গেলেন। এই প্রথম তিনি স্পষ্ট ভাষায় রিণিকে প্রেম-নিবেদন করলেন, আর এই তার উত্তর। যাক্, ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে। একেবারে ছিঁড়ে ফেলে কোন লাভ নেই। তাই মনের ভাব দমন করে শান্ত ভাবে বললেন,—"আচ্ছা, এখন তাহ'লে উঠি। আজ সন্ধ্যার এনগেজমেণ্টের কথা মনে আছে তো?"

যেন কিছু হয়নি এমন ভাবে হেসে রিণি উত্তর দিল,—"নিশ্চয়ই।"

একটা হেস্তনেস্ত না করলে যে আর চলবে না অনিল সেটা বুঝতে পেরেছিল। এ অবস্থায় ব্যাপারটা পড়ে থাকলে তার পক্ষে কাজকর্ম্ম যোগাড় করা অসম্ভব। তাই সে সাহস করে সোজা গিয়ে হাজির হ'ল রিণির বাড়ী।

বেয়ারা তাকে দেখেই ঝুঁকে সেলাম করল। তার ছবি সে মেম-সাহেবের টেবিলে দেখেছে। অতি বিনয়ের সহিত ড্রইং-রুমে বসিয়ে সে গেল মেম-সাহেবকে খবর দিতে।

একলা বসে অনিল অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হয়ে সে এসে পড়েছে, কিন্তু বলবে কি? হঠাৎ পালিয়ে যাওয়াও ভাল দেখায় না। এমন সময় রিণি এসে ঘরে ঢুকল।

হেসে রিণি বললে,—"এই যে আসুন। এত দিন আসেননি কেন? আমি তো রোজই পথ চেয়ে বসে থাকি।" রিণির ঠাট্টায় অনিল যেন লুপ্ত সাহস এবং ক্রোধ খুঁজে পেল। কঠোর ভাবে প্রশ্ন করলে,—"এই সব মিথ্যার সাহায্যে আমার সর্ব্বনাশ করবার কারণ কি?"

কৃত্রিম বিস্ময় সহ রিণি বললে,—"সর্ব্বনাশ মানে! আমি তো কোথায় আপনার ভাল করতে গেলুম—"

রাগত ভাবে অনিল বাধা দিলে,—"আর ভালর কাজ নেই। আপনার এই নির্দ্দয় খেলার জন্ত আমার চাকরী গেছে, বাসস্থান গেছে, ভদ্রসমাজে মাথা তোলবার উপায় নেই। কেউ চাকরী দিতে রাজী নয়।"

শ্লেষ-ভরা কণ্ঠে রিণি উত্তর দিলে,—"এইটুকুতেই ঘাবড়ে গেছেন। কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ করার সময় তো আপনার সে খেয়াল হয়নি? তুচ্ছ কয়েকটা টাকার জন্য মিথ্যার সাহায্যে আপনি আমায় লোক-সমাজে হেয় করেছিলেন। আমি তো আপনার মত কোর্টে যায়নি, ভেঙ্গেও পড়িনি। অথচ আমি স্ত্রীলোক আর আপনি পুরুষ। যাক্, আর কিছু বলবার না থাকে তো আপনি এখন যেতে পারেন। আমাকে এখনই বেরোতে হবে। আমাকে অ্যাকিউজ করবার মুখ আপনার নেই। যদি কখনও অনুতপ্ত হন তবে আসবেন। নমস্কার।"

ঘর থেকে রিণি বেরিয়ে চলে গেল। কশাহত, লজ্জিত অনিল পথে নামল। সত্যই তো। দোষ তারই।

প্রিন্স রিণির বাড়ী থেকে বেরোবার পরেই অনিল ঢুকেছিল। অনিল প্রিন্সকে দেখেনি কিন্তু প্রিন্স অনিলকে দেখেছিলেন। কৌতূহল বশতঃ তিনি অনিলকে ফলো করে ড্রইং রুমের বাইরে বাগানে দাঁড়িয়ে রইলেন। রিণি এবং অনিলের সমস্ত কথাই তিনি শুনলেন। তার পর নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে সোজা চলে গেলেন নিশীথের কাছে।

সব শুনে নিশীথ বললে,—"এইবার ঠিক হয়েছে। রিণিকে জব্দ করা যাবে। আপনাকে কিন্তু সাক্ষী হতে হবে।"

প্রিন্স হেসে বললেন,—"নিশ্চয়ই। সব রকম ভাবে আপনাদের সাহায্য করব। আহা বেচারা অনিল।"

"কিন্তু অনিলের জন্য আপনার এতটা করার কারণ কি? তার সঙ্গে আপনার এমন কিছু বন্ধুত্ব নেই—"

"তা নেই বটে।"

"তবে? এতে আপনার লাভ?"

"সত্য প্রকাশ হলে আমার পক্ষে রিনিকে লাভ করা সম্ভব হতে পারে।"

অনেক খুঁজে-পেতে অনিলকে বার করে নিশীথ একেবারে নিজের বাড়ীতে ধরে নিয়ে গেল। অনিলের কোন ওজর-আপত্তি শুনলে না।

অলকা পূর্ব্বেই নিশীথের কাছে সব কথা শুনেছিল। অত্যন্ত মধুর অভ্যর্থনা করে চা খেতে দিল।

বিনয় সহ বললে,—"কিছু মনে করবেন না অনিল বাবু, আপনার ওপর আমরা অবিচার করেছিলুম।"

নিশীথ সায় দিলে,—"বটেই তো। আমাদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইব বলেই তো আজ তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এলুম। হ্যাঁ দেখ, তোমার কাজটা খালিই আছে। কাল থেকে অফিসে যেও।'

আবদারের সুরে অলকা বললে,—"আর কাল থেকে আমার পড়াশুনাও দেখে দিতে হবে।"

অনিল এতক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হয়ে বসেছিল। সব কিছুই তার কাছে হেঁয়ালীর মত ঠেকছিল।

প্রশ্ন করলে,—"হঠাৎ কি হ'ল যে—"

অলকা বাধা দিলে,—"সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে।"

অনিল তবুও কিছুই বুঝতে পারলে না। পুনরায় প্রশ্ন করলে, —"কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

নিশীথ উত্তর দিলে,—"তুমি কাল রিণির বাড়ী গিছলে। তোমাদের সমস্ত কথা প্রিন্স আড়ালে থেকে লুকিয়ে শুনেছেন।"

বিরক্ত হয়ে অনিল বললে,—"ভেরী মীন অব্ হিম্।"

নিশীথ তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে,—"মীন একটু হয়ত হয়েছে কিন্তু তাতে আমাদের কতটা সুবিধা হ'ল ভাব। প্রকৃত ব্যাপারটা জানতে পারলুম। মেয়েটা তোমাকে কি ভাবে ডাউন করেছে বল তো?"

অলকা বললে,—"আপনি এই অপমানের জন্য ওর নামে আবার কেস করুন। প্রিন্স নিজে আমাদের দিকে সাক্ষ্য দেবেন।"

"প্রিন্সের এত তৎপরতার কারণ কি? আমাকে উনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। বহু রকমে অপদস্থ করবার চেষ্টা করেছেন। আজ হঠাৎ এত দরদ কেন?"—প্রশ্ন করলে অনিল।

উত্তর দিলে নিশীথ। "এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা হয়ে গেলে তাঁর পক্ষে রিণিকে পাবার সুবিধা হবে।"

হাসল অনিল। বিদ্রূপের হাসি। বললে,—"আই সী। কিন্তু আমি তো আর কেস করব না।"

যেন আকাশ থেকে পড়ল অলকা।

"কি বলছেন আপনি? এই অপমান নীরবে হজম করবেন?"

"করব। কারণ এর জন্য দায়ী আমি নিজেই।'

নিশীথ প্রশ্ন করলে,—"মানে?

অনিল শান্ত ভাবে উত্তর দিলে,—"প্রোভোকড্ হয়ে রিণি আমার ক্ষতি করেছে স্বীকার করি, কিন্তু বিনা কারণে তুচ্ছ কয়েকটা টাকার জন্য আমি যা ওর ক্ষতি করেছি তার তুলনায় ওটা যৎসামান্য। আমি পুরুষ হয়ে ধৈর্য্য ধরতে পারিনি, ওর বিরুদ্ধে কেস করেছি। আর সে নারী হয়েও নীরবে তা সহ্য করেছে। দোষী আমিই, সে নয়।"

"এখনও ভেবে দেখ। মনে রেখ আমাদের কথা মত কাজ না করলে আমাদের অফার উইথড্র করতে বাধ্য হব।" নিশীথ বললে।

দৃঢ় স্বরে অনিল উত্তর দিলে,—"বেশ করে ভেবেই বলছি। না খেতে পেয়ে মরে গেলেও আর অপরাধ বাড়াতে রাজী নই।"

অন্য কোন কথার অপেক্ষা না রেখে অনিল বেরিয়ে গেল। নিশীথ আর অলকা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

সেখান থেকে অনিল সোজা রিণির বাড়ী গেল।

রিণিকে বললে,—"আমার ভুল এবং দোষ আমি বুঝতে পেয়েছি। কৃতকর্ম্মের জন্য আমি অনুতপ্ত।"

রিণি অশ্রু-কোমল কণ্ঠে উত্তর দিলে,—"আমি জানতুম, এক দিন আপনার ভুল আপনি বুঝতে পারবেন। এবং সেই দিন আমিও আমার ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। আমার অপরাধ বড় কম নয়।"

"আমি মিথ্যার উপর ভিত্তি করে লিখেছিলুম আপনার সম্বন্ধে অনেক কুকথা। কিন্তু দার্জ্জিলিঙে ভাল ভাবে আলাপ হবার পর আমার শেষ লেখাটাই ছিল সত্য। দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা ছাপা হয়নি।"

"তা না হলেও আমি দেখেছিলুম। তখনই বুঝেছিলুম এ-কে-রে-ময়ে গেছেন। অনিলকুমার রায় এ সব লিখবেন না।"

হঠাৎ রিণির পিসীমা ঘরে ঢুকলেন। এক গাল হেসে বললেন,—"যাক্, এত দিনে সব ঠিক হয়ে গেল। মেয়েটা তো কেঁদে-কেঁদে সারা।"

সলজ্জ ভাবে রিণি বললে,—"যাও, কি যে বল পিসীমা।"

পিসীমা বলে যেতে লাগলেন,—"একমাত্র আমিই সব ব্যাপারটা আর রিণির মনের খবর জানতুম। যাক, তাহ'লে কালই প্লেনে দার্জ্জিলিঙ্ চল। এবার সত্য করে গোপনে তোমাদের চার হাত এক করে দিই। তুমি এখন যেও না বাবা, এইখানেই খাবে।"—পিসীমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

অনিল বললে,—"দার্জ্জিলিঙে যখন তোমায় ভাল করে জানবার সুযোগ হ'ল, তখনই আমার ভুল বুঝতে পারলুম। সেই থেকেই—"

সলজ্জ হেসে রিণি বললে,—"আমি জানি তা—"

"কি করে জানলে?"

"টাইগার হিলে যাবার কাণ্ড দেখে। আর এ সব জিনিষ মেয়েদের চোখ এড়ায় না।"

"কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস হয়নি। কোথায় তুমি, আর কোথায় আমি! আকাশ-পাতাল পার্থক্য!"

"যারা কলমে সাহস দেখাতে পারে প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা খুব লাজুক আর মুখচোরা।"

"কিন্তু তুমি—সত্যি কি দেখলে—"

"দেখলুম, তুমি সত্যকারের পুরুষ। আমার অর্থ আর রূপ তোমাকে অন্ধ করতে পারেনি। তুমি গালমন্দ করে, উপেক্ষা করে আমাকে জয় করেছিলে। ওয়েলকাম চেঞ্জ।"

"তবে এ রকম যুদ্ধঘোষণা করেছিলে কেন?"

"তা ছাড়া তোমায় পাবার পথ ছিল না। পিসীমার'ই পরামর্শ। তোমার বিয়ের পথটা মেরে রেখে দেওয়া। আর যুদ্ধের জবাব যুদ্ধ, এ তো স্বীকার কর?"

"তা করি। কিন্তু সর্ব্বক্ষণই কি যুদ্ধের অন্তরালে আমার জন্য তোমার—"

বাধা দিয়ে রিণি বললে,—"যাও, সব কথাই কি মুখ ফুটে বলতে হয় না কি—"

এমন সময় পিসীমা ডেকে পাঠালেন, খাবার দেওয়া হয়েছে। সত্যই রণাঙ্গনে অঙ্গনাদেরই জয় হয়।

পরদিনই রিণি, তার পিসীমা আর অনিল প্লেনে করে দার্জ্জিলিঙ্ চলে গেল। দু'-এক জন রিপোর্টার খবর পেয়েছিল। বোধ হয় রিণিই দিয়েছিল। প্লেনে ওঠবার কালের ফটো তুলে নিল। কাগজে প্রকাশিত হ'ল—

"রিণি ও অনিলের মনোমালিন্য চুকে গেছে। সুখী দম্পতি মধুচন্দ্রিকা যাপনের জন্য দার্জ্জিলিঙ্ যাত্রা করেছেন।"

সঙ্গে ছবি। তলায় ক্যাপশান।

স্থাবর—বনফুল। বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪নং বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, মূল্য সাড়ে সাত টাকা।
আহরণ—কালিদাস রায়। মিত্র ও ঘোষ, ১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১০, মূল্য সাড়ে চার টাকা।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী উত্তমানন্দ। প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

জাত-সাহিত্যিক কথাটা শুধু কথার কথা না, কথাটার কোন তাৎপর্য্য আছে সাহিত্যের দরবারে? কথাটি খতিয়ে বিচার করলে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো দেখা যাবে, কথাটি কথাই। শব্দ দু'টির কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হ'তে পারে না এই জন্য যে, জন্মগত প্রতিভাকে শুধু প্রতিভা হিসাবে ধ'রে রাখলে প্রতিভার ধার নষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়। প্রতিভা জন্ম থেকে যিনি অর্জ্জন করেন, অর্থাৎ জন্মাবধি যাঁর অন্তরে সাহিত্যিক-সুলভ বৃত্তি বর্ত্তমান, তাঁর প্রতিভায় মাঝে মাঝে শাণ না প'ড়লে প্রতিভা যে তাঁকে বর্জ্জন ক'রে যাবেই তাতে আর কোন কথা উঠতে পারে না। এখানে শাণ দেওয়া অর্থে এই কথাই বোঝায়, শুধু প্রতিভার দ্বারা অধিক দিন লেখনী চালনা সম্ভব নয়, যদি না সেই সঙ্গে চলতে থাকে বিদ্যা বা জ্ঞান সঞ্চয়ের রীতিমত চেষ্টা। দুঃখের বিষয়, বাঙলা দেশের প্রতিভাবানদের অনেকেই শুধু প্রতিভার জোরে বাজার সরগরম রাখতে চেষ্টা করেন, অথচ চেষ্টা করেন না সময়ের সঙ্গে তাল রেখে নিজের প্রতিভাকে পরিণত করতে। সুখাদ্য যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর এবং যার অভাব হ'লে মানুষের অসময়ে মৃত্যু অনিবার্য্য, তেমনি ঠিক প্রতিভাকে জীইয়ে রাখতে হ'লে সুচারু বিদ্যাসঞ্চয়ও অপরিহার্য্য—যার অভাবে যে-কোন প্রতিভার অপমৃত্যু অসম্ভব নয়!

সম্প্রতি একটা কথা অনেককেই বলতে শোনা যাচ্ছে, সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে না কি জোয়ার শেষ হ'য়ে ভাটার দিন প'ড়েছে। প্রায় মানে, যে সব লেখা আত্মপ্রকাশ করছে তাতে সাহিত্যের কোন ছাপ থাকছে না, যদিও যাঁরা এই সব লেখা লিখছেন তাঁদের অধিকাংশ না হ'লেও কেউ কেউ ছাপ-মারা সাহিত্যিক। তা হ'লে এই কথাই প্রমাণ হয়, ছাপাখানায় লেখা ছাপালেই সেই লেখা সাহিত্যের পর্য্যায়ে ওঠে না। কিন্তু বাজার চালু রাখতে হ'লে এবং ছাপাখানা বজায় রাখতে হ'লে ছাপার কাজ থামিয়ে রাখলে চলে না। আর সেই ছাপার কাজ চালাতে হ'লে বিদ্যালয়ের নোট-বুক ছাপালে যদিও বা চলে, নোট-বুকের বাজার ছাড়া আর আর যে বাজার আছে, অর্থাৎ সাহিত্যের যে-বাজার আছে সে-বাজার চলে না। তাই এই ভাটার দিনেও কায়ক্লেশে সাহিত্য করতে হচ্ছে ছাপার অক্ষরে। আর এ কথা কে না জানে, গায়ের জোরের তর্ক যেমন ভিত্তিহীন, কায়ক্লেশের সাহিত্যেও তেমনি নেই কোন ভিত্তি?

কিন্তু প্রতিভাবানদের অভাবে সাহিত্যে ভাটা পড়লে কারও কিছু বলবার থাকতো না। বাঙলা সাহিত্যে এত অধিক প্রতিভা গৌরবিত থাকা সত্ত্বেও বাঙলা সাহিত্যকে যদি না জীইয়ে রাখতে পারা যায় তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু হ'তে পারে না। বাঙলার একাধিক মনীষী যখন ব'লে গেছেন, বাঙালী জাতি বিলুপ্ত হ'য়ে গেলেও বাঙলা সাহিত্যে বাঙলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর পাওয়া যাবে অদূর ভবিষ্যতেও, তখন যেন তেন প্রকারেণ যে বাঁচিয়ে রাখতে হয় বাঙলা সাহিত্যকে! আর এ কাজে অগ্রসর হ'তে পারেন তাঁরাই, যাঁদের উদর শূন্য হ'লেও যাঁরা সত্যিকার প্রতিভাবান। এবং বলতে বাধা নেই, আমাদের সাহিত্যের গণ্ডীতে সর্ব্বজন-স্বীকৃত Genius এখনও অনেকে রয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, এত অধিক Genius থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যের জাত কেন বিনষ্ট হচ্ছে ক্রমে ক্রমে? সৎসাহিত্যের অভাব হচ্ছে কেন? একটা ক্ষোভের কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, কয়েক জন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ইতিমধ্যে সাহিত্যের দরবার থেকে মালা গলায় প'রেও সেলাম ঠুকে বিদায় গ্রহণ ক'রেছেন। সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের কোন আর direct connection নেই। তাঁরা এখন ভূতপূর্ব্ব সাহিত্যিক। আর কয়েক জন দক্ষ সাহিত্যিক আছেন, যাঁরা এক সময়ে দস্তুরমত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিলেন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে। তাঁরা বেমালুম রাতারাতি সাহিত্যের আসর থেকে সোজা রাজনীতির আসরে গিয়ে হাজির হয়েছেন এবং মাঝে-মিশেলে যা লিখছেন তাতে সাহিত্যিক বৃত্তি অপেক্ষা রাজনৈতিক বৃত্তির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে ঢের বেশী। সাহিত্যে বিশেষ আদর্শের স্তুতি গাইতে শোনা গেছে অনেকানেক বিদেশী সাহিত্যিককে এবং সাহিত্যের পর্য্যায়েও উঠেছে সেই সব সাহিত্য। কিন্তু সাহিত্য-সভায় নেচে নেচে ও চিৎকার ক'রে 'গান্ধীজি কি জয়' গাইলে যে মহাত্মাজী ও সাহিত্যের কারও

জয়-জয়কার হয় না সে-কথাটি এরা স্বীকার পেতে চাইছেন না। বস্তুতঃ এ কথা তো আর অস্বীকারের উপায় নেই যে, policyর দিক দিয়ে গান্ধীজির পরাজয়ই হয়েছিল আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে। যে-ব্রত পাসনের স্থান হিমালয়ের পাদদেশে সে-ব্রত যদি রাজনীতির সীমানায় কেউ পালন করতে চায়, তাতে ব্রত পালন হ'লেও রাজনীতি রক্ষা হয় না এবং ব্রতধারীর জীবন রক্ষা হওয়াও সম্ভব নয়। তাই-ই হয়েছিল গান্ধীজির অদৃষ্টে। এবং গান্ধীজির এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের জন্ম যে তাঁর স্তাবকরাই দায়ী তা বোধ করি স্তাবকরা অস্বীকার করলেও স্বার্থাতীত জনব্যক্তিরা কেউ অস্বীকার করবেন না। তবুও এই রাজনৈতিক সাহিত্যিকদের লেখনী চালনা বার বার ব্যর্থ হয়েও যে কি কারণে থামছে না, তার কোন কারণ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

এঁদের বাদ দিয়েও আরও অনেক প্রতিভাবানদের উপস্থিতি বাঙলা সাহিত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছে। অতীত দিনের বাঙলা সাহিত্যে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে বর্ত্তমান সাহিত্যকে নিয়ে। অতীত গৌরব গাইলে যদি বর্ত্তমান সাহিত্যের লুপ্ত-গৌরব ফিরে পাওয়া যেতো তা হ'লে গত শ' দুই বছরের সুমহান্ অতীত স্মৃতি গাওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু অতীতে ঘৃত সহযোগে অন্ন ভক্ষণ করেছিলাম ব'লে বর্ত্তমানেও যে সেই ঘৃতের জয়গান শুনতে কেউ রাজী থাকবেন, তা তো মনে হয় না। কিন্তু যে Geniusরা অতীতে বাঙলা সাহিত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি এবং রক্ষা করেছিলেন তাঁরা বর্ত্তমান সাহিত্যের দুর্দ্দিনে সাহিত্যের মানরক্ষা করতে কেন সচেষ্ট হবেন না? তাই বলছিলাম, এত অধিক প্রতিভা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যের এই দুর্দ্দশা হবে কেন?

কথাটি যতটা এক কথায় সেরে দেওয়া যায়, কথাটি ততটা এক কথার বিষয় নয়। প্রতিভা থাকলেই দিনের পর দিন সেই প্রতিভা কি প্রতিভার পরিচয় দিয়ে যাবেন? এ কথার উত্তরে বলতে হয়, হাঁ। প্রতিভা যাঁর আছে তাঁকে অন্ততঃ সাহিত্যের আসরে শেষ পর্য্যন্ত আপন দক্ষতা দেখিয়ে যেতে হ'বে, নয় তো জীবিতাবস্থাতেই তাঁর সাংস্কৃতিক মৃত্যু অবধারিত। হুতোম, টেকচাঁদ, দীনবন্ধু, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কেদারনাথ প্রমথ চৌধুরী মৃত্যুর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সমতালে সাহিত্য সেবা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তো "শেষের পরিচয়" শেষ করতেই পারলেন না। কিন্তু বর্ত্তমান বাঙলার সাহিত্যিকদের কেউ কেউ যেমন লেখায় ইতি দিয়ে বসে আছেন, তেমনি আবার কেউ কেউ যা লিখছেন তাতে প্রতিভার চেয়ে পুনরাবৃত্তির অভ্যাস-দোষ প্রতিফলিত হচ্ছে। এর আসল কারণ কি?

কারণ আর কিছুই নয়, প্রথমে যে কথা বলছিলাম, সেই কথাই আবার বলছি। প্রতিভা থাকলেই শুধু প্রতিভার খাতিরে বেশী দিন লেখনী, চালানো যায় না যদি না প্রতিভাকে শাণ দেওয়ার কাজও সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত চলতে থাকে। কারও কারও আধুনিকতম লেখায় যে ধার এবং ভাবের অভাব লক্ষ্য করা হচ্ছে, তার একমাত্র কারণই হল এই শাণানোর দিকে নজর না দেওয়া। অর্থাৎ জ্ঞান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান সঞ্চয়ের অভ্যাস আয়ত্ত না করা। আর এই অভ্যাস না থাকলে জ্ঞাত-সাহিত্যিককেও যে মধ্যপথে হোঁচট খেতে হয় তা তো অনেকে দেখতেই পাচ্ছেন স্বচক্ষে। তাই বলছিলাম, শুধু প্রতিভা থাকলে যদি শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া যেতো তা হ'লে নিউটনের মত জ্ঞানীকেও শেষ বয়সে বলতে শোনা যেতো না, তিনি না কি জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে নুড়ি আহরণ করছেন। বিদ্যা বিতরণ যাঁরা করবেন তাঁরা যদি বিদ্যা আহরণের প্রতি সজাগ না থাকেন, তাতে দেশেরও যেমন ক্ষতি তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি বিদ্বান ব্যক্তিদের। তবে এই জ্ঞান সঞ্চয়ের রীতিটা যে কেমন ধারার হবে তার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়াটা সমালোচকের কাজ নয়, যিনি আহরণ করবেন তাঁর কাজ। আর এই কাজ যথাযথ পালিত হ'লে দেখা যাবে সাহিত্যের জোয়ার; সাহিত্যে তখন ভাঁটা পড়ার আর অবকাশ থাকবে না। বিদ্যালয়ে শিক্ষা না পেয়েও সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে কেউ, এ কথাটি আমি বিশ্বাস করি না। দেশ-বিদেশের গ্রাম্য-গাথা ও চারণের গান তা হ'লে তো জাত-সাহিত্যের পর্য্যায়ে উঠতে পারতো।

'বনফুল' জ্ঞানী এবং বিদ্বান। এই জ্ঞান-বিদ্যার পরিচয় মিলবে তাঁর পুরানো এবং সাম্প্রতিক রচনায়। ছোট গল্প, রস-রচনা, উপন্যাস, নাটক এবং কাব্যে বনফুলের সাহিত্য উজ্জ্বল। তাঁর প্রত্যেক লেখায় ভাষার দক্ষতা যেমন বিদ্যমান তেমনি আছে বুদ্ধির প্রখরতা—জ্ঞান এবং বিদ্যা না থাকলে যেগুলি আপনেই থাকে না। বনফুলের পুরানো রচনা 'কিছুক্ষণ' যাঁরা পড়েছেন, আধুনিকতম গ্রন্থ 'স্থাবর' পড়েও তাঁরা বিস্মিত হবেন এই জন্ম যে, লেখকের জ্ঞানের পরিধি কত দূর বিস্তৃত। 'স্থাবরে'র মত উপন্যাস, যাতে সেই আদিম অন্ধকার যুগের সন্ধান পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছায়াছবি, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যে-ছবি একেবারে বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্ত্য দেশে আলডুস্ হাক্সলি যে ধরণের পটভূমিকায় সাহিত্য রচনা ক'রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন বাঙলা সাহিত্যে বনফুল সেই খ্যাতিরই অধিকারী। মানুষ—যে-মানুষ অন্ধকার হিমশীতল অতীত সময়ে ভয়াবহ প্রকৃতির সহচর ছিল, জন্ম-বিবর্ত্তনের মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতার সে স্রষ্টা। তার অগ্রগমন এখনও থামেনি। পশুর কাঁচা মাংস ভক্ষণকারী মানুষ আধুনিকতম যুগের প্রবর্ত্তক—এই মানুষের ক্রমিক রূপ অঙ্কিত করেছেন বনফুল। পুরুষ ও নারী, পরস্পরকে অবলম্বন ক'রে ও পরস্পরকে ধ্বংস ক'রে যে পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে, 'স্থাবর' সেই রূপেরই প্রতিচ্ছবি। সামান্য জ্ঞান ও মাত্র জন্মগত-প্রতিভা স্থাবরের ন্যায় উপন্যাস রচনা সম্ভব হয় না, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ই স্থাবরের মূল প্রেরণা। 'বনফুল' ইতিহাস ও ভূগোলকে সাহিত্যের সীমানায় জলের মত তরল ক'রে হাজির ক'রেছেন, অথচ পাণ্ডিত্য মূল আখ্যানের গতি কোথাও ম্লান করেনি। 'বনফুলে'র ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বাঙলা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর 'স্থাবর' ইতিহাসের ন্যায় বাঙলার ঘরে ঘরে পঠিত হোক, তাতে দেশবাসীর জ্ঞান বৃদ্ধি হ'বে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট লোভনীয়।

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় বাঙলা সাহিত্যে সুপরিচিত রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে ক'জন কবি দীর্ঘদিন ধ'রে কবিতা লিখছেন তাঁদের মধ্যে কবিশেখর অন্যতম। ৺যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক প্রভৃতির সমসাময়িক কালিদাস রায়ও আন্তরিক

বৃত্ত-ধর্ম্মের প্রেরণায় কাব্যলক্ষ্মীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করেন বাঙলা দেশের প্রকৃতি, যার সবুজ রূপের ছবি আছে কবিশেখরের সংখ্যাতীত কবিতায়। বিদেশী সাহিত্যে কবিশ্রেষ্ঠ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ যেমন প্রকৃতির কবি, প্রকৃতির শীতল ছায়ায় তাঁর কাব্য যেমন রূপায়িত হয়েছে, বাঙলা দেশের 'কবিশেখর'ও তেমনি প্রকৃতির ক্রোড়েই লালিত-পালিত। প্রকৃতি-বর্ণনায় তাঁর কবিতার ছত্রগুলি পরিপূর্ণ। আর প্রকৃতি শুধু নয়, বাঙলা দেশের মানুষ, যারা দীন ও দরিদ্র, অনাহারের জ্বালায় যারা ক্লিষ্ট ও পিষ্ট, তাদের আসল রূপটিও খুঁজে পাওয়া যায় কবিশেখরের কাব্যে। আর এই রূপ অঙ্কনে পাওয়া যায় স্বার্থাতীত নিষ্ঠার পরিচয়। দুঃখের বিষয়, বাঙলা দেশের অনেক খ্যাতিমান কবি মূল সাহিত্যের সেবায়তন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন রাজনীতির প্ল্যাটফর্ম্মে—তাঁদের কবিতায় তাই কাব্যের সুর নেই, আছে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের জয়গান। কিন্তু কবিশেখরের লেখনী এখনও রাজনীতির মোহে মুগ্ধ হয়ে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে পরিচালিত হয়নি—যে জন্য কোন কোন আধুনিক সমালোচক সাহিত্যের দরবারে কবিশেখরকে স্বীকার করতেই পরাঙ্মুখ। এ পর্য্যন্ত বেশ কয়েকখানা কবিতার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর—যাদের মধ্যে 'ব্রজবেণু' 'পর্ণপুট' 'বৈকালী' ও 'ঋতুমঙ্গল' সর্ব্বজনপ্রিয় হয়েছে। আলোচ্য 'আহরণ' সঙ্কলন-গ্রন্থে তাঁর বিভিন্ন কাব্য-গ্রন্থ থেকে অনেকগুলি কবিতা আহরণ করা হয়েছে। এবং বলতে দ্বিধা নেই, সঙ্কলন হয়েছে যথার্থ ও যথাযোগ্য। সঙ্কলনটি বিভক্ত হয়েছে, যথাক্রমে প্রাচীন বঙ্গে, ব্রজের পথে, প্রেমের স্বপ্ন, পল্লীপথে, গার্হস্থ্য-জীবনে পুষ্পকুঞ্জে, প্রবাসপথে, প্রাচীন ভারতে, গান, ঋতুরঙ্গে ও বেলা শেষে প্রভৃতি ক'টি বিভাগে।

কবিশেখর কালিদাস রায় প্রভৃতিকে যদি রবীন্দ্র-ছায়ায় পুষ্ট বলা যায় তা হ'লে, হয়তো কথাটি আপত্তিকর হবে না। তার কারণ, কবিশেখরের অধিকাংশ কবিতায় পাওয়া যায় কবিগুরুর ছন্দোনৈপুণ্যের প্রভাব। তবুও তাঁর কাব্যে প্রাচীন বাঙলার কাব্য-ধারার যেন নূতন রূপ পরিস্ফুট হ'তে দেখা যায়। সংস্কৃতের অনুরূপ অলঙ্কার-প্রীতিও তাঁর কাব্যে Classic-ভঙ্গীর আভাষ দেয়। বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবও যেন মেলে। তবুও বাঙলা ও বাঙালীর অন্তরের রূপ কবিশেখরের কাব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুরী—যা অন্যের কাব্যে সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না। 'আহরণ'এর ন্যায় কবির একখানি কাব্য-সঙ্কলন প্রকাশের যেন অতি প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থখানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনায় প্রকাশক ধন্যবাদার্হ। 'আহরণ' গ্রন্থে বাঙলা কাব্য-প্রতিভার যথেষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। 'আহরণ' সমাদৃত হবে বাঙলার প্রতি ঘরে।

গত সংখ্যায় সাহিত্য-পরিচয় আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম যে, সম্প্রতি বাঙলা ভাষায় মূল-সাহিত্য অপেক্ষা, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর গল্প ও উপন্যাসের চেয়ে জীবনী, স্মৃতি-কথা সঙ্কলন ও অনুবাদ-গ্রন্থ অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী ব্যাখ্যাত আলোচ্য 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'ও এই দিক দিয়ে আরেক প্রমাণ। 'ভগবদ্গীতা' মহাভারতেরই একটি অংশ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হ'ল তার পটভূমি। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে নিজের আত্মীয়, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও পূজ্যপাদ গুরুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, তাঁদের হত্যা করতে হবে, এই কথা ভেবেই মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারথি, পরামর্শ-দাতা ও বন্ধু। অর্জ্জুনের হতাশা লক্ষ্য ক'রে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উৎসাহিত করতে রত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুক্তির দ্বারা বোঝালেন, মৃত বা জীবিত কারও জন্যেই পণ্ডিতেরা শোক করেন না, কারণ দেহ অবিনশ্বর, আত্মা অবিনাশী। সুতরাং তথাকথিত আত্মীয় ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে হত্যার জন্যে কাতর হবার কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণ আরও বোঝালেন: নিষ্কাম কর্ম্ম থেকে কোন পাপ হয় না। নিজের কুলধর্ম্ম রক্ষা করাই হ'ল মানুষের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য, যে কুলধর্ম্মচ্যুত, সে মহাপাপী। ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্মই হ'ল যুদ্ধ করা। অতএব অর্জ্জুন যুদ্ধ যদি না করেন তা হ'লে তিনি হ'বেন ধর্ম্মচ্যুত। 'ভগবদগীতা'র এইটিই হ'ল মর্ম্মকথা।

প্রথমে 'মহাভারত' বীরগাথা ছিল এবং বীরত্ব-শৌর্য্য-বীর্য্য ইত্যাদি মহাকাব্যের গুণগুলিই তার প্রধান বিশেষত্ব ছিল। পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগে যখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা মহাভারতের রূপান্তর করেন তখন 'গীতা' যুক্ত করা হয়। যুদ্ধের নৈতিক ব্যাখ্যা না হ'লে পাণ্ডবদের অনেক ক্রিয়াকলাপই সমর্থিত হয় না। তা ছাড়া, বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গুণগান করাও প্রয়োজন, তাই 'স্বধর্ম্মের' শ্রেষ্ঠত্ব গীতার মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব গীতার সারমর্ম্ম যে "স্বধর্ম্মপালন" তা সহজেই বোঝা যায়। এই আখ্যানের ভিত্তিতেই 'ভগবদগীতা' রচিত। উত্তমানন্দের ব্যাখ্যায় উক্ত আখ্যান অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় রূপ পেয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে অন্য কোন ভাষ্যকারের ভাষ্য ও টীকা স্থান পায়নি, কেবল মাত্র সহজবোধ্য ভাষায় ভগবদগীতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নানা মুনির নানা মত। বিভিন্ন ভাষ্যকারের কণ্টকিত ভাষ্য পড়তে পড়তে মূল গ্রন্থের আসল রসটি আমরা হারিয়ে ফেলি। সেই দিক দিয়ে এই অনুবাদটি গ্রহণযোগ্য। যদিও মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনূদিত শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসুর 'ভগবদগীতা' আমরা পূর্ব্বেই পেয়েছি এবং বইটি বাঙলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি ক'রেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট একেবারে প্রথম শ্রেণীর।

প্রথমে যে-কথায় এ আলোচনার মুখবন্ধ করেছিলাম, সেই প্রতিভার কথায় আবার ফিরে আসছি। আসল কথাটি হ'ল এই প্রতিভা কেবল মাত্র প্রতিভার দ্বারায় বিকশিত হ'তে পারে না, যদি না দিনের পর দিন প্রতিভার মার্জ্জন-কার্য্য চালানো হয়। শিক্ষা-দীক্ষাহীন প্রতিভার কোন মূল্য নেই। শিক্ষা না পেয়ে শিক্ষকতা যেমন মূল্যহীন। জ্ঞান ও শিক্ষার লেশ মাত্র নেই অথচ প্রতিভাশালী, এই প্রতিভা যে ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু প্রতিভাকে এমন কিছু সৃষ্টি করতে হবে যার আয়ু অল্প নয়, যা চিরায়ু।

শিক্ষা-দীক্ষাহীন প্রতিভাশালীদের ক্ষণস্থায়ী রচনার সাহিত্যের দরবারে সাময়িক হুল্লোড় তোলার চেয়ে, শিক্ষিত ব্যক্তিদের দীর্ঘায়ু সাহিত্য-সৃষ্টি ভাষা এবং সাহিত্যের পক্ষে অনেক অনেক বেশী লাভের—যাদের লাভ করলে শীঘ্র হারাণোর ভয় নেই, অথচ লাভ ক'রে পুরাপুরি আনন্দ উপভোগের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। যাঁদের প্রতিভা আছে তাঁরা আশা করি, অস্বীকার করবেন না এই সহজ কথাটি—দাঁত না মাজলে অসময়ে দাঁতের মর্য্যাদা যেমন হারাতে হয়, তেমনি প্রতিভা শাণিত না হ'লে প্রতিভার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ফরাসী নির্ব্বাচনের ভেল্কী—

গত জুন মাসে (১৯৫১) ফ্রান্সে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গেল তাহার ফলাফল যেমন কৌতূহলপ্রদ, তেমনি উহার আন্তর্জাতিক এবং গণতান্ত্রিক তাৎপর্য্যও গভীর অর্থপূর্ণ। নিয়মিত সময়ে এই নির্ব্বাচন হইলে যে-সময়ে হইত তাহার কয়েক মাস আগেই নির্ব্বাচন হওয়ার গুরুত্ব হয়ত খুব বেশী নয়, কিন্তু কম্যুনিষ্টদিগকে এই নির্ব্বাচনে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচন-আইনের এমন অদ্ভুত এবং গণতন্ত্রবিরোধী পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে যে, ফরাসী পত্রিকা L'Humanite এই নির্ব্বাচন আইনকে 'a machine for stealing votes' (ভোট চুরি করিবার যন্ত্র) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই নির্ব্বাচন আইন যে কম্যুনিষ্টদিগকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ ভাবে রচিত হইয়াছে তাহা বিলাতের উদারনৈতিক পত্রিকা 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' স্বীকার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই নির্ব্বাচন আইন অনুসারে একটি মাত্র ভোটের কম-বেশীতে কয়েকটি আসনের তারতম্য ঘটিতে পারে। Le monde পত্রিকা বলিয়াছেন যে, "Theoretically a candidate getting no votes could be returned." অর্থাৎ 'থিওরেটিকেলি কোন প্রার্থী যদি একটি মাত্র ভোটও না পান তাহা হইলেও তিনি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন।' যে উদ্দেশ্যে এই জটিল ও পক্ষপাতিত্বপূর্ণ নির্ব্বাচন আইন রচিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয় নাই, এ কথা অবশ্যই বলিতে পারা যায় না। নূতন ন্যাশনাল এসেম্বলীতে কমুনিষ্ট সদস্যের সংখ্যা ৮১ জন হ্রাস পাইয়া ১০১ জন হইয়াছে সত্য; কিন্তু ফ্রান্সের ৫০ লক্ষেরও অধিক ভোটার কম্যুনিষ্ট-প্রার্থীদিগকে ভোট দিয়াছেন, ইহার গুরুত্বও উপেক্ষার বিষয় নহে। দ গলের পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা 'Carrefour' হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যদি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিধান (proportional representation system) বহাল থাকিত, তাহা হইলে কম্যুনিষ্ট সদস্যের সংখ্যা দাঁড়াইত ১৫০ জন। ফ্রান্সের নূতন নির্ব্বাচন আইনের ভানুমতীর ভেল্কী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে নির্ব্বাচনের ফলাফলের কথাই প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনের সময় ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ বা ন্যাশনাল এসেম্বলীতে আসন-সংখ্যা ছিল ৬১৮টি। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের সময় উহা বৃদ্ধি করিয়া ৬২৫টি করা হইয়াছে। কোন্ দল কত সংখ্যক আসন দখল করিতে পারিয়াছে এবং মোট কত ভোট পাইয়াছে তাহার বিবরণ এবং ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনের ফলাফলের সহিত তাহার তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :

কম্যুনিষ্ট পার্টি—আসন লাভ করিয়াছে ১০১টি এবং মোট ৫০,৩৮,৫১৩ ভোট পাইয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনে তাঁহারা ১৮২টি আসন এবং ৫৪,৭০,১৪৬টি ভোট পাইয়াছিলেন।

দ গল-পন্থী—১১৭টি আসন এবং ৪১,৩৪,৮৫১টি ভোট পাইয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনের দ গল-পন্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই।

সমাজতন্ত্রী দল—আসন লাভ করিয়াছে ১০৪টি এবং ২৭,৬৪,২১৫টি ভোট পাইয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনে তাঁহারা ১০১টি আসন লাভ করিয়াছিলেন এবং মোট ভোট পাইয়াছিলেন ৩৩,৮৪,৭৭৫টি।

পপুলার রিপাবলিকান দল (এম-আর-পি)—মোট ২৩,৫৩,৪৭৫ ভোট পাইয়া ৮৬টি আসন লাভ করিয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনে ৪৮,৬৭,০৬৭ ভোট পাইয়া আসন লাভ করিয়াছিলেন ১৬৪টি।

রেডিক্যাল দল—আসন লাভ করিয়াছে ৯৫টি এবং মোট ২১,১৪,২১৩টি ভোট পাইয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনে ২২,২৮,৩২৬ ভোট পাইয়া ৬১টি আসন লাভ করিয়াছিলেন।

উদারনৈতিক রক্ষণশীল দল—মোট ২৪,১৬,৬১০ ভোট পাইয়া ৯১টি আসন লাভ করিয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনে ৭৪টি আসন এবং ২১,৩১,২১৭ ভোট পাইয়াছিলেন।

অন্যান্য দল—মোট ৩০,৩১৬ ভোট পাইয়া ২৫টি আসন লাভ করিয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনে ২৭টি আসন এবং ১১,৫৮১ ভোট পাইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে ১,৯২,৮৫,৯৬১ জন ভোটার ভোট দিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনে ১,৮৯,১০,০০০ জন ভোটার ভোট দিয়াছিলেন।

উল্লিখিত ফলাফল বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনের তুলনায় ৪,৩১,৬৫৩ হ্রাস পাওয়ায় তাহারা ৮১টি আসন হারাইয়াছে। কিন্তু সোস্যালিষ্ট পার্টি ১৯৪৬ সালে প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় ৪,২০,৫৬০ ভোট কম পাইয়াও ৩টি আসন বেশী পাইয়াছে। পপুলার রিপাবলিকান দল (এম-আর-পি) ১৯৪৬ সালে প্রাপ্ত ভোট অপেক্ষা ২৫,১৩,৫১২ ভোট কম পাইয়াছে কিন্তু ৭৮টি আসন হারাইয়াছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি ৪,৩১,৩৫০ ভোট কম পাইয়া ৮১টি আসন হারাইয়াছে, আর এম-আর-পি ২৫,১৩,৫১২ ভোট কম পাইয়া হারাইয়াছে ৭৮টি আসন। এম-আর-পি দলের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা হ্রাস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। নূতন নির্ব্বাচন আইনের জন্য এম-আর-পি দলই বিশেষ ভাবে দায়ী। তাহাদের বাধাদানের জন্যই দ্বিতীয় ব্যালট-প্রথা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই। নূতন নির্ব্বাচন আইন প্রবর্ত্তিত না হইলে এই দলের অবস্থা যে আরও কাহিল হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। ফরাসী ধর্ম্মযাজকগণ প্রকাশ্য ভাবে এম-আর পি দলকে ভোট দিতে বলিয়াছেন। তথাপি তাঁহারা ২৫ লক্ষ ভোট কম পাইয়াছেন। আলোচ্য নির্ব্বাচনের আর একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ফল দ গল-পন্থী সদস্য-সংখ্যা। তাঁহারা ৪১ লক্ষের কিছু অধিক ভোট পাইয়া ১১৭টি আসন পাইয়াছেন, কিন্তু কম্যুনিষ্টরা ৫০ লক্ষের অধিক ভোট পাইয়া পাইয়াছে ১০১টি আসন। এম-আর-পি দল যে-সকল ভোট হারাইয়াছে সেগুলি যে দ গল-পন্থীরা পাইয়াছে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

দল হিসাবে অন্যান্য দলের সদস্য-সংখ্যা অপেক্ষা দ্য গল-পন্থী সদস্যের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত ভোটের দিক হইতে বিবেচনা করিলে কম্যুনিষ্ট পার্টিই পৃথক্-পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত ভোট অপেক্ষা বেশী ভোট পাইয়াছে। কিন্তু ১৯৪৬ সালের নির্ব্বাচনে প্রাপ্ত ভোট অপেক্ষা কম্যুনিষ্ট পার্টি চারি লক্ষ ভোট কম পাইল কেন, তাহাও অবশ্য বিবেচনার বিষয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থকের সংখ্যা হ্রাসই ইহার কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু লোক যে বেতসী-মনোভাবসম্পন্ন, এ কথা বিবেচনা করিলে এই অনুমান সঠিক বলিয়াই মনে হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিজম নিরোধের উদ্দেশ্যে মার্শাল পরিকল্পনার জন্য কোটি কোটি ডলার ব্যয় করিয়াছে। ফরাসী শ্রমিকদের উপর কম্যুনিষ্টদের প্রভাব যাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় তাহার জন্যও অর্থব্যয় বড় কম করে নাই। তথাপি কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা শতকরা ২·৭ ভাগের বেশী কমে নাই। কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিবার জন্য যে নূতন নির্ব্বাচন আইন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে—তাহাকে ফরাসী রক্ষণশীল পত্রিকা Le Monde 'most dishonest in French history', (ফরাসী ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা অসাধু আইন) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'ভোট চুরি করার' এই অসাধু আইন সত্ত্বেও নূতন নির্ব্বাচনে ফরাসী জাতীয় পরিষদে কম্যুনিষ্ট পার্টি একটি শক্তিশালী দল হইয়া রহিয়াছে।

কম্যুনিষ্টদিগকে পরাজিত করিয়া গণতন্ত্রকে বিজয়ী করিবার জন্য যে নূতন নির্ব্বাচন আইন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে ইহার মত গণতন্ত্রবিরোধী আইন আর কিছুই হইতে পারে না। এই আইন দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইনকে যে ভাবে সংশোধন করা হইয়াছে, তাহা সত্যই এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার! আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইন বহাল থাকিলে যে-সকল নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সকল নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইন বাতিল করা হইয়াছে। আবার যে সকল নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে নূতন আইন কম্যুনিষ্টদের পক্ষে অনুকূল, সেই সকল নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইনই বহাল রাখা হইয়াছে। অতি চমৎকার ব্যবস্থা নয় কি? ফ্রান্সের ১০টি বিভাগীয় নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের অধিকাংশ নির্ব্বাচন-কেন্দ্রেই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইন বাতিল করিয়া apparentement প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই প্রথার মূল কথা হইল এই যে, কয়েকটি দল মিলিয়া যদি শতকরা ৫১ ভোট পায় তাহা হইলে সবগুলি আসনই ঐ দলগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইতে পারিবে। এই ব্যবস্থার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, ২৭টি বিভাগীয় নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে কম্যুনিষ্ট পার্টি ১১ লক্ষ ভোট পাইলেও এক জন কম্যুনিষ্ট প্রার্থীও নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। কারণ, বিভাগীয় নির্ব্বাচন-কেন্দ্রগুলিতে কম্যুনিষ্ট পার্টি একক এমন শক্তিশালী নয় যে, শতকরা ৫০টি ভোটের বেশী পাইতে পারে। আবার অন্য দলের সহিত মিলিত হইবারও কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন সুবিধা নাই। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যে কয়েকটি পার্টির হাতে শাসন-ক্ষমতা ছিল তাহাদের জয়লাভের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নূতন আইনে নির্ব্বাচনের জন্য apparentement বা party allianceএর ব্যবস্থাই প্রধান বিষয়। যে-সকল নির্ব্বাচন-অঞ্চলে এই নূতন আইন প্রযোজ্য, সেখানে দুই বা ততোধিক দলের প্রার্থীদের মিলিত তালিকা ভোটারদের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। ভোটারদিগকে বলা হইয়াছে যে, নির্ব্বাচনের জন্য সোশ্যালিষ্টরা পপুলার রিপাবলিকান দল বা র‍্যাডিকেল দল কিম্বা উভয় দলের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যে দলের প্রতি তাঁহাদের সমর্থন নাই তাঁহাদের ভোটে সেই দলের সুবিধা হইলে তাঁহারা সোশ্যালিষ্টদিগকে ভোট দিবেন কি না তাহা তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। কোন নির্ব্বাচন-অঞ্চলে মিলিত দলগুলির প্রার্থীদের তালিকা অথবা সংযুক্ত তালিকা-গুলি যদি শতকরা ৫১ ভোট পায়, তাহা হইলে ঐ তালিকা বা সংযুক্ত তালিকাই ঐ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর জন্য নির্দ্ধারিত সমস্ত আসন লাভ করিয়া থাকে। অতঃপর প্রশ্ন দাঁড়ায়, শুধু ঐ বিজয়ী তালিকার বা সংযুক্ত তালিকার প্রার্থীদের মধ্যে আসন বণ্টন করা। এই বিজয়ী তালিকার প্রার্থীদের মধ্যে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী আসন বণ্টন করা হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে-সকল অঞ্চলে এই নূতন আইন কম্যুনিষ্টদের অনুকূল হইতে পারে, সেখানে ১৯৪৬ সালে যে নির্ব্বাচন আইন অনুসারে নির্ব্বাচন হইয়াছিল, সেই নির্ব্বাচন আইন অর্থাৎ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইনই বলবৎ রাখা হইয়াছে। প্রধানতঃ প্যারী নগরী এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলিই এই সকল নির্ব্বাচকমণ্ডলীর। এখানেও ভোট গণনার পদ্ধতি এমন করা হইয়াছে যাহাতে কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরোধী দলগুলিরই সুবিধা হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সোশ্যালিষ্টরা দ্য গল-পন্থীদের সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী হয় নাই। অন্যান্য কেন্দ্রীয় দল দ্য গল-পন্থীদের সহিত সহযোগিতা করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছিল। কিন্তু দ্য গল-পন্থীরাই রাজী হয় নাই। অনেকে মনে করেন যে, দ্য গল-পন্থীরা যদি সহযোগিতা করিতে রাজী হইতেন, তাহা হইলে প্যারী এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলি ব্যতীত আর কোন স্থান হইতে এক জন কম্যুনিষ্ট প্রার্থীও নির্ব্বাচিত হইতে পারিতেন না।

বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে কেন্দ্রীয় দলগুলিই জয়লাভ করিয়াছে এবং কম্যুনিষ্টরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত এই নির্ব্বাচনের ফলাফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এবং অন্যান্য পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সন্তুষ্ট হইবার কিছুই নাই। ফ্রান্সে কম্যুনিষ্টবিরোধীদের শক্তিশালী সুদৃঢ় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাম্য। কারণ, পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য ফ্রান্সে কম্যুনিষ্ট বিরোধী স্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের ফলাফল দেখিয়া স্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা করা কঠিন। কম্যুনিষ্টরা যাহাতে শক্তিশালী না হইতে পারে, সেই জন্য সোশ্যালিষ্টরা দক্ষিণপন্থীদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। আবার সোশ্যালিষ্ট এবং দ্য গল-পন্থীদের মধ্যে মন্দের ভাল হিসাবেই পপুলার রিপাবলিকান দল এবং র‍্যাডিক্যাল দল সোশ্যালিষ্টদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। বিরোধী দল হিসাবে কম্যুনিষ্টরা এবং দ্য গল-পন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্টে বিরোধিতা করিবে, ইহা অসম্ভব। কিন্তু দ্য গল-পন্থীরা শুধু মন্ত্রিসভায় বসিবার আনন্দেই গবর্ণমেণ্ট গঠনে সহযোগিতা

করিতে রাজী। পপুলার রিপাবলিকান দল এবং র‍্যাডিক্যাল দল ছ গল-পন্থীদেরই সমগোত্রীয়। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় দল তিনটি অর্থাৎ তথাকথিত তৃতীয় শক্তি যদি গবর্ণমেণ্ট গঠন করেও, তাহা হইলেও উহার স্থিরতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। কম্যুনিষ্টদিগকে দাবাইয়া রাখিবার জন্ম সোশ্যালিষ্টরা তাঁহাদের আদর্শবাদের অনেক কিছুই বর্জ্জন করিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি যদি সুচিন্তিত ভাবে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সোশ্যালিষ্টরা উভয় সঙ্কটে পড়িবেন। তাঁহাদের হয় শ্রমিকদের দাবী সমর্থন করিতে হইবে, না হয় উহার বিরোধিতা করিতে হইবে। সমর্থন করিলে র‍্যাডিক্যাল, ছ গল-পন্থী এবং দক্ষিণপন্থীরা মিলিয়া সোশ্যালিষ্টদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে বিতাড়িত করিবে এবং ক্রমে গবর্ণমেণ্টে প্রাধান্য হইবে ছ গল-পন্থীদের। সোশ্যালিষ্টরা ফ্রান্সকে সেই পথেই লইয়া যাইতেছেন বলিয়া মনে হয়। তবে জার্ম্মাণীর হিটলারের সঙ্গে ফরাসী হিটলারের পার্থক্য হইবে এই যে, ফরাসী হিটলার মার্কিণ তাঁবেদার হিসাবে হিটলারী করিবেন।

কম্যুনিজমনিরোধের আয়োজন—

প্রত্যেক দেশে কম্যুনিজমনিরোধের যে-ব্যবস্থা চলিতেছে ফ্রান্সের নির্ব্বাচন আইন তাহার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কম্যুনিজমনিরোধের এই ধরণের প্রচেষ্টার আর একটি দৃষ্টান্ত ইটালীর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন। ইটালীতেও কম্যুনিষ্টরা যাহাতে জয়লাভ না করিতে পারে সেই ভাবেই নূতন নির্ব্বাচন আইন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইটালীতেও মার্শাল পরিকল্পনার মারফৎ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছে। ইহা ব্যতীত কম্যুনিষ্টবিরোধী প্রচারকার্য্যের জন্যও যথেষ্ট অর্থ দিতেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ত্রুটি করে নাই। ফলে ইটালীর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্টরা বিপুল ভাবে পরাজিত হইয়াছে। বহু সংখ্যক মিউনিসিপ্যালিটির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কম্যুনিষ্টদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। ইটালীতে কম্যুনিষ্টদের এই বিপুল পরাজয় সত্ত্বেও ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ন্যানির সোশ্যালিষ্ট পার্টি মিলিত ভাবে ১৯৪৮ সালের নির্ব্বাচনের তুলনায় বেশী ভোট পাইয়াছে। ১৯৪৮ সালে তাহারা মোট ভোটের শতকরা ৩০'৩ ভাগ ভোট পাইয়াছিল। এবার তাহারা পাইয়াছে মোট ভোটের শতকরা ৩৭'২ ভাগ। নির্ব্বাচন আইনের ভেল্কীর জন্যই বেশী ভোট পাইয়াও তাহারা পরাজিত হইয়াছে। এদিকে আবার নয়া ফ্যাসিষ্ট পার্টির প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং প্রধান মন্ত্রী গ্যাসপারির ডেমোক্রাটিক ক্রিশ্চিয়ান দলের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা কমিয়াছে। ফ্রান্সের সাধারণ নির্ব্বাচন এবং ইটালীর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের ফলাফল হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কম্যুনিজমনিরোধের চেষ্টা বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। অধিকন্তু এই চেষ্টা গণতন্ত্র ধ্বংস করিয়া ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথই প্রশস্ত করিয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট দমন

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিজমনিরোধের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে-সকল আয়োজন করিতেছে সেগুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি, পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি ও জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তির আয়োজন এবং সামরিক শক্তিবৃদ্ধি সমস্তই কম্যুনিজম-নিরোধের ব্যাপক প্রচেষ্টারই অঙ্গ। গত জুন মাসে (১৯৫১) মার্কিণ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে সিনেটর কেম যে-সকল দেশ রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখিয়াছে তাহাদিগকে মার্কিণ সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য যে-সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহাও কম্যুনিজম নিরোধের প্রচেষ্টাকে ব্যাপক ভাবে কার্য্যকরী করিবার জন্যই। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া অনেক সিনেটরই বিপজ্জনক মনে করিবেন। মার্কিণ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ এই প্রস্তাবের বিবেচনা তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করায় সিনেটার কেইন বলিয়াছেন যে, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কার্য্য দ্বারা কোরিয়ায় ১,৪১,০০০ জন নিহত এবং আহত আমেরিকাবাসীর প্রতি অবিশ্বাস্যরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে। কেম-প্রস্তাবের অনুকূলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে কম্যুনিষ্ট দমনের যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা তাৎপর্য্যপূর্ণ।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করা হয় নাই। কিন্তু বলপূর্ব্বক মার্কিণ গবর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও প্ররোচনা দানের চক্রান্ত করিবার অভিযোগে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্ক ফেডারেল গ্র্যাণ্ড জুরীর সম্মুখে ১২ জন কম্যুনিষ্ট নেতাকে অভিযুক্ত করা হয়। এক জন ব্যতীত অপর ১১ জনের বিচার হয়। দীর্ঘ শুনানীর পর ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে এই ১১ জনের প্রতি যে দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয় তাহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা হইয়াছিল। অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া গ্র্যাণ্ড জুরী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। দণ্ডিত কম্যুনিষ্ট নেতৃগণ সুপ্রীম কোর্টে আপীলের যে কারণ প্রদর্শন করেন তাহাতে বলা হয় যে, ১৯৪০ সালের স্মিথ আইন অনুসারে তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ আইন শাসনতন্ত্রবিরোধী এবং মার্কিণ শাসনতন্ত্রের প্রথম সংশোধনে যে বাক্ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে, স্মিথ আইন দ্বারা তাহার ব্যত্যয় করা হইয়াছে। গত ৪ঠা জুন (১৯৫১) সুপ্রীম কোর্টের আট জন বিচারপতির মধ্যে ছয় জন একমত হইয়া কম্যুনিষ্ট নেতাদের আপীল অগ্রাহ্য করিয়া দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন। এই ছয় জন বিচারপতির পক্ষে প্রধান বিচারপতি মিঃ ভিনসন রায় প্রদান করেন। স্মিথ আইন অনুসারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোন গবর্ণমেণ্টকে বলপূর্ব্বক বা হিংসাত্মক কার্য্য দ্বারা ধ্বংস করা কর্ত্তব্য, প্রয়োজন, অভিপ্রেত বা সঙ্গত—এইরূপ শিক্ষা দান, কিম্বা উহার সহিত সহযোগিতা করা বা সমর্থন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই আইন দ্বারা বাক্-স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইয়াছে কি না, সুপ্রিম কোর্টের বিচারে ইতিপূর্ব্বে তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু ১৯১৮ সালে বিচারপতি অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস্ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "The question of every case whether the words used are used in such circumstanes and are of such nature as to create a clear and present danger that they will bring about the

substantive evils that congress has a right to prevent." অর্থাৎ 'সুস্পষ্ট ভাবে এবং বর্ত্তমানে বিপদাশঙ্কা দেখা দিলেই উহা প্রতিরোধ করিবার অধিকার কংগ্রেসের আছে।' এগার জন কম্যুনিষ্ট নেতার আপীল অগ্রাহ্য করিয়া সুপ্রীম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের মুখপাত্র হিসাবে প্রধান বিচারপতি মিঃ ভিনসন রায়ে মন্তব্য করিয়াছেন, বিবাদিগণ যে অবস্থা অনুযায়ী দ্রুত গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিতে চান তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং যে সুস্পষ্ট এবং বর্ত্তমান বিপদ (a clear and present danger) দেখা দিলে স্মিথ আইনে কল্পিত ব্যবস্থা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গ্রহণ করা যাইতে পারে উহা সেইরূপ সুস্পষ্ট এবং বর্ত্তমান বিপদ। সুপ্রীম কোর্টের এই রায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কম্যুনিষ্ট পার্টির সকল সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ এই রায় প্রকাশিত হওয়ার পর মার্কিণ ফেডারেল গোয়েন্দা বিভাগ (F.B.I) ১৭ জন কম্যুনিষ্ট নেতাকে গ্রেফ্তার করিয়াছে। মোট ২১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

বোধ হয়, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হইয়াছে। উহার সদস্য-সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশী হইবে না। শ্রমিক ইউনিয়নগুলির উপর কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন প্রভাব নাই। সুপ্রীম কোর্টের এই রায় প্রকাশিত হওয়ায়, নামে না হইলেও কার্য্যতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট পার্টি বে-আইনীই হইয়া পড়িল। কিন্তু উল্লিখিত আপীলের বিচারে যে দুই জন বিচারপতি অধিকাংশ বিচারপতির সহিত একমত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের মন্তব্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা বিশেষ ভাবে বিবেচনা না করিয়া পারিবেন না। এই বিচারপতিদ্বয়ের মধ্যে এক জন বিচারপতি মিঃ ব্ল্যাক এবং আর এক বিচারপতি মিঃ ডগলাস।

বিচারপতি মিঃ ডগলাস তথ্যের উপরেই বেশী জোর দিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট নেতারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনুভবযোগ্য কোন কাজ করেন নাই, তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগও উপস্থাপিত হয় নাই। তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে এবং যাহা কিছু তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে তাহা এই যে, তাঁহারা মার্কস্-লেনিন মতবাদের চারিখানি ক্লাসিক্যাল পুস্তক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পুস্তকগুলির পঠন-পাঠন বন্ধ করা উচিত, এমন কথা কেহই বলেন না। তাই যদি হয়, তবে ঐ বইগুলি পড়াইবার ব্যবস্থা যাঁহারা করেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে কিরূপে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "The crime then depends not on what is taught but on who the teacher is." অর্থাৎ 'তাহা হইলে কি পড়ান হইতেছে তাহা দ্বারা নয়, কে পড়ান তাহা দ্বারাই অপরাধ গণ্য হয়।' বিচারপতি মিঃ ব্ল্যাকও অনেকটা অনুরূপ যুক্তিই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি স্মিথ আইনকে শাসনতন্ত্রবিরোধী বলিয়াই মনে করেন এবং বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদের জন্য কম্যুনিষ্ট নেতারা কিছু বলিয়াছেন বা করিয়াছেন এই অভিযোগ তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয় নাই। ভবিষ্যতে বলপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট অপসারণের জন্য পরে কোন এক সময়ে সমবেত হইতে, আলোচনা করিতে এবং ভাবধারা প্রচার করিতে তাঁহারা একমত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ের পরে আমেরিকাবাসী ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা লইয়া যে উভয় সঙ্কটে পতিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিলোপ না করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি, তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক। কম্যুনিষ্টরা মানুষের চিন্তাধারাকেও নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়া থাকে। অবশেষে গণতন্ত্রও কি চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করিবে?

অষ্ট্রেলিয়ায় কম্যুনিজমনিরোধ

কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দিয়া আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট শান্তির সময়ে এই আইন শাসনতন্ত্রবিরোধী বলিয়া সাব্যস্ত করেন। কাজেই ঐ আইন বাতিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার রক্ষণশীল প্রধান মন্ত্রী মিঃ রবার্ট মেঞ্জিস আবার নূতন করিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলনে গত ১৮ই জুন অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেঞ্জিস বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির উচ্ছেদের জন্য বর্ত্তমান মাসের মধ্যে যদি তাঁহাকে ক্ষমতা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে শাসনতন্ত্রের সংশোধনের জন্য তিনি গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার এই উক্তিকে ফাঁকা আওয়াজ মনে করিবার বোধ হয় কোন কারণ নাই। নির্ব্বাচন আইন পরিবর্ত্তন করিয়া কম্যুনিজম-নিরোধের ব্যবস্থা ফ্রান্সে ও ইটালীতে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। মিঃ মেঞ্জিস কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন্ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন।

আন্তর্জ্জাতিক সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম

৩০শে জুন (১৯৫১) ফ্রাঙ্কফুর্টে পৃথিবীর সমাজতন্ত্রীদের এক আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই সমাজতন্ত্রী আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ার পরই গত ৩রা জুলাই উক্ত প্রতিষ্ঠান যুদ্ধ-নিরোধের জন্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে অনুরোধ করিয়া এক ঘোষণা-বাণী অনুমোদন করিয়াছে। এই ঘোষণা-বাণীতে তিন হাজার শব্দ আছে। উহাতে কম্যুনিজমকে নূতন সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং কম্যুনিজম ও ক্যাপিট্যালিজমের নিপীড়ন—উভয়কেই নিন্দা করা হইয়াছে। যুদ্ধ-নিরোধের জন্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশগুলির অস্ত্রসজ্জার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জ্জাতিক সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে শান্তি অন্যতম। কোরিয়া যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, কমিনফর্ম্ম তাহার ক্ষমতার সম্প্রসারণের জন্য সশস্ত্র আক্রমণ করিতেও যে কুণ্ঠিত নয়, কোরিয়া যুদ্ধ তাহা প্রমাণ করিয়াছে এবং কোরিয়া যুদ্ধে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দ্বারা আক্রমণ নিরোধ করা এবং যুদ্ধ নিবারণ করা সম্ভব। ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, স্বাধীন বিশ্ব যদি আক্রমণ, রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ এবং অর্থনৈতিক পতন

নিরোধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম এড়ানো সম্ভব হইবে।

পৃথিবীর এক কোটি সমাজতন্ত্রীদের ৩৩টি দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র জাপানের প্রতিনিধিরাই এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন নাই। তাঁহারা মনে করেন যে, যে কোন অবস্থাতেই সমাজতন্ত্রের কর্ত্তব্য যুদ্ধায়োজনের বিরোধিতা করা। ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল এই নূতন প্রতিষ্ঠানে যোগদান না করিলেও ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই ঘোষণা-বাণীর কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান ঐকত্রিক নিরাপত্তার ধারণা গ্রহণযোগ্য নহে। তিনি প্রশ্ন করেন, কোন্ পৃথিবীকে সমাজতন্ত্র রক্ষা করিবে? ডাঃ লোহিয়া পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজম উভয়েরই দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তিনি অবশ্য বলিয়াছেন যে, একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদই পৃথিবীব্যাপী দারিদ্র্য দূর করিতে সমর্থ। কিন্তু কিরূপে সমর্থ, ইহাই মূল প্রশ্ন। ১৯৪৮ সাল হইতে পশ্চিম-ইউরোপের সমাজতন্ত্রীরা নিজদিগকে তৃতীয় শক্তি (Third force) বলিয়া দাবী করিয়া আসিতেছেন। গত তিন বৎসরে উহার পরিণাম কি হইয়াছে?

বর্ত্তমানে এই তৃতীয় শক্তির নীতিগত মূল ভিত্তি হইয়াছে নিজেদের দেশে জনকল্যাণ রাষ্ট্র গঠন এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। এই তৃতীয় শক্তি এশিয়ার নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। দরিদ্র জনগণের প্রতি তাহাদের দরদই অত্যন্ত অস্পষ্ট। মার্কিণ ডলার-সাহায্যের শক্তি সম্পর্কেও প্রথমে তাহাদের কোন জ্ঞান ছিল না। মার্কিণ ডলার-সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার ফলে পশ্চিম-ইউরোপের সমাজতন্ত্রীরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দলে ভিড়িয়া পড়িয়াছেন। অস্ত্রসজ্জার ফলে জনকল্যাণ রাষ্ট্রের স্বপ্নও তাঁহাদের ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কম্যুনিজম দমনের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সহিত সহযোগিতা করিয়া শুধু প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলিরই শক্তিবৃদ্ধি তাঁহারা করেন নাই, নিজেদের আত্মবিলুপ্তির পথও প্রশস্ত করিয়াছেন।

কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ট্রেড ইউনিয়ন

সম্প্রতি মিলানে ইণ্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইউরোপ, উত্তর-আমেরিকা এবং এশিয়ার ৬৬টি দেশের ২ কোটি ২৫ লক্ষ সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের তিন শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৪৯ সালের নবেম্বর মাসে লণ্ডনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অ-কম্যুনিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে এই স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের আন্তর্জ্জাতিক ফেডারেশন গঠিত হয়। ইহাতে বিশ্বশ্রমিক দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মিলানের অধিবেশনে গত ৫ই জুলাই (১৯৫১) স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে সুদৃঢ় কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রণ্ট গঠনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।

মিসেস্ ফেল্টনের অপরাধ

গত জুন মাসে মিসেস্ মণিকা ফেল্টন নামক বৃটেনের জনৈক সরকারী কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করার কারণটি শুধু প্রহেলিকা হইয়াই রহে নাই, বৃটিশ পার্লামেণ্টে এবং বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনিবার দাবীও করিয়াছিলেন। কমন্স সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে পরিকল্পনা-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ হিউগ ডাল্টন অবশ্য বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টদের প্রতি মিসেস্ ফেল্টনের সহানুভূতি আছে, ইহা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "যদি আমি তাহা মনেও করি তথাপি আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে (মিসেস্ ফেল্টনকে বরখাস্ত করা) ইহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।" মিসেস্ ফেল্টন বিনা ছুটিতে উত্তর-কোরিয়া ভ্রমণে গিয়াছিলেন এবং গত ৭ই জুন পাবলিক একাউণ্টস্ কমিটি যখন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান তখন তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাই কি তাঁহাকে বরখাস্ত করার আসল কারণ?

আঠারটি দেশের ২০ জন মহিলা লইয়া গঠিত তথ্য-সন্ধানী (fact finding) মিশনের সহিত তিনি উত্তর-কোরিয়ায় গিয়াছিলেন এবং ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা এতই ভয়াবহ যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।" তাঁহার যে-বক্তৃতা রেকর্ড করিয়া ১০ই জুন (১৯৫১) মস্কো হইতে বেতারযোগে প্রচার করা হইয়াছে তাহাতে মিসেস্ ফেল্টন বলিয়াছেন যে, উত্তর-কোরিয়া যখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দখলে গিয়াছিল তখন উত্তর-কোরিয়ার অধিবাসীদের উপর বিশেষ করিয়া নারী ও শিশুদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলিয়াছিল। কৃষক নারীরা মার্কিণ সৈন্যদের যে-সকল অত্যাচারের কাহিনী তাঁহাকে জানাইয়াছে তাহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "I think, I shall hear their accusation as long as I live, but the real accusation must be levelled not simply against men who committed these deeds but against all of us who allow these to be done in our names." অর্থাৎ "যত দিন বাঁচিয়া থাকিব তত দিন এই সকল অভিযোগ আমার কানে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। যাহারা এই সকল কাজ করিয়াছে প্রকৃত অভিযোগ শুধু তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করিলেই চলিবে না, আমরা যাহারা আমাদের নামে এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে দিয়াছি তাহাদের সকলের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ উত্থাপন করিতে হইবে।" কম্যুনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

প্যারী সম্মেলনের ব্যর্থতা—

গত ৩১শে মে (১৯৫১) পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় রাশিয়ার নিকট যে পত্র দেন, তাহার উত্তর গত ২১শে জুন মঃ গ্রোমিকো পশ্চিমী সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের হাতে অর্পণ করেন। রুশ গবর্ণমেণ্ট ১৫ই জুন উক্ত পত্রের উত্তর প্রদান করেন। উক্ত উত্তর পাওয়ার পর ২২শে জুন চতুঃশক্তির সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবদের সম্মেলনে পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের সহকারী পররাষ্ট্র সচিবগণ মঃ গ্রোমিকোকে জানাইয়াছেন

যে, আলোচনা চালাইয়া যাওয়ার আর কোন সার্থকতা নাই। গত ৫ই মার্চ্চ যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল, ২২শে জুন তাহার সমাপ্তি হইল ব্যর্থতার মধ্যে। এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে তাহার উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। পশ্চিমী শক্তিত্রয় রাশিয়ার ঘাড়েই দোষ চাপাইয়াছে। আবার রাশিয়া এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী করিয়াছে পশ্চিমী শক্তিত্রয়কেই। কিন্তু রাশিয়ার উত্তর বিশ্লেষণ করিলে সঠিক উত্তর পাওয়া বোধ হয় কঠিন হয় না।

রাশিয়ার উত্তর সম্পর্কে ইহাই বলা হইয়া থাকে যে, পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের প্রস্তাব রাশিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছে। আটলাণ্টিক চুক্তি এবং বিদেশস্থ মার্কিণ ঘাঁটিসমূহ সম্পর্কে আলোচনাই রাশিয়ার প্রধান দাবী। রাশিয়ার উত্তরে বলা হইয়াছে যে শুধু কৌতূহল বশতঃ এই দাবী করা হয় নাই, আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ হ্রাস করা এবং বিশ্বশান্তি অক্ষুন্ন রাখার আগ্রহেই এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। রাশিয়ার উত্তরে ইহাও বলা হইয়াছে যে, পশ্চিমী শক্তিত্রয় আটলাণ্টিক চুক্তি এবং বিদেশস্থ মার্কিণ ঘাঁটি সমূহ অসম্মত বিষয়রূপে (as a disagreed item) কর্ম্মসূচীভুক্ত করিতে রাজী হইলেই রাশিয়া পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে যোগদান করিবে। চীন, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও বৃটেনের সহিত রাশিয়া যে-সকল পরস্পর সাহায্য-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে, পশ্চিমী শক্তিবর্গ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে এই সকল চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইলে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোন বাধা সৃষ্টি করিবেন না। রাশিয়া অন্যান্য দেশের সহিত তাহার পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তিগুলির আলোচনা কর্ম্মসূচীভুক্ত করিতে রাজী হওয়ার পর আটলাণ্টিক চুক্তি ও বিদেশস্থ মার্কিণ ঘাঁটিসমূহ অসম্মত বিষয় (disagreed item) হিসাবে কর্ম্মসূচীভুক্ত করিতে পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের রাজী না হওয়া কি অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয় না?

শ্যামে ব্যর্থ বিদ্রোহ—

বিদ্রোহের দেশ শ্যামে সম্প্রতি হঠাৎ যেমন বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল, তেমনি আকস্মিক ভাবেই ব্যর্থতার মধ্যে এই বিদ্রোহের অবসান হইয়াছে। গত ২৯শে জুন (১৯৫১) একটি মার্কিণ জাহাজ শ্যাম গবর্ণমেণ্টের হাতে অর্পণের অনুষ্ঠানে যোগদানের সময় প্রধান মন্ত্রী মার্শাল পিবুল সংগ্রামকে নৌবাহিনীর এক দল সৈন্য অপহরণ করা হইতেই এই বিদ্রোহের আরম্ভ। অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় এই ঘটনা ঘটে। অতঃপর নৌবাহিনী একটি নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন করে। শ্যাম দেশের স্থল-সৈন্যবাহিনী মার্শাল পিবুল সংগ্রামের পক্ষে ছিল এবং বিমান বাহিনী তাহাদিগকে সাহায্য করে। ৩০শে জুনও স্থল-বাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলিতে থাকে। ১লা জুলাই তারিখে প্রাতে ম্যানিলা হইতে প্রচারিত ব্যাঙ্কক সরকারের ঘোষণায় বলা হয় যে, সংগ্রাম-গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদের জন্য যে নৌ-বিদ্রোহ হইয়াছিল তাহার অবসান হইয়াছে এবং প্রধান মন্ত্রী মার্শাল পিবুল সংগ্রাম অক্ষত দেহে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সংগ্রাম-গবর্ণমেণ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার অর্থসাহায্য এবং ১ কোটি ডলার মূল্যের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য পাইয়াছেন। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে শ্যামই সর্ব্বপ্রথম বাও দাই-গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়াছে। কোরিয়া যুদ্ধে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে শ্যামই সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে সর্ব্বপ্রথম। শ্যামের পূর্ব্ব-সীমায় ইন্দোচীনে হো চি মীনের সহিত ফরাসীদের সংগ্রাম চলিতেছে। দক্ষিণ-সীমায় মালয়ে চলিতেছে কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ। পশ্চিম-সীমায় বিদ্রোহে ক্ষতবিক্ষত ব্রহ্মদেশ। উত্তরে অবশ্য কম্যুনিষ্ট চীন, কিন্তু মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালায় ব্যবধান।

ইরাণী তৈল-সঙ্কটের ভবিষ্যৎ—

ইরাণের তৈল-সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসায় সাহায্য করিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যে সর্ব্বশেষ নয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, ইরাণ গবর্ণমেণ্ট উহা গ্রহণ করায় মীমাংসার সম্ভাবনা কতখানি আশাপ্রদ হইয়াছে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। তৈল-বিরোধ সম্পর্কে বৃটেনের আবেদন সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক আদালত গত ৫ই জুলাই (১৯৫১) রায় প্রদান করেন। রায়ে বলা হইয়াছে যে, মূল সমস্যা সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বে যে সকল ব্যবস্থা ছিল সেইগুলিই বহাল রাখা এবং এই বিরোধে উভয় পক্ষের স্বার্থ-রক্ষার উদ্দেশ্যে অন্তর্ব্বর্ত্তী কালের জন্য পাঁচ জন সদস্য লইয়া একটি তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড গঠন করা উচিত। ৭ই জুলাই রাত্রে ইরাণ রেডিওতে ঘোষণা করা হয় যে, ইরাণ গবর্ণমেণ্ট আন্তর্জ্জাতিক আদালতের রায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইহার দুই দিন পরে ৯ই জুলাই তেহরাণস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ডাঃ হেনরী গ্রেডী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের পত্র ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদেকের হস্তে প্রদান করেন। গত ৩০শে জুন (১৯৫১) ডাঃ মোসাদেক প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহারই উত্তরে এই পত্র দেওয়া হইলেও ইহাতে তৈল-বিরোধ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য প্রেসিডেণ্ট টুম্যান তাঁহার বিশেষ পরামর্শদাতা মিঃ হ্যারিম্যানকে প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছেন। আমাদের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই হয়ত মিঃ হ্যারিম্যানের প্রচেষ্টার ফলাফল জানা যাইতেও পারে। কিন্তু তৈল-বিরোধের মীমাংসা সম্পর্কে ইরাণ গবর্ণমেণ্টের দাবী ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দাবীর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক।

ইরাণ গবর্ণমেণ্ট তৈল-শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে চান এবং যে-সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে তৈল-শিল্প সত্যই রাষ্ট্রায়ত্ত হয় সেই সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন। ইরাণ গবর্ণমেণ্ট তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার আইন পাশ করিয়াছেন। নেশন্যাল ইরাণিয়ান অয়েল কোম্পানী নামক একটি প্রতিষ্ঠান এবং উহার কার্য্য পরি-চালনার জন্য একটি বোর্ডও গঠন করা হইয়াছে। এই বোর্ড ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিবেন। ইহা ব্যতীত তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার আইনের ২নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, তৈল বিক্রয় হইতে যে আয় হইবে, খরচ বাদে তাহার সমস্তই ইরাণ গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারীতে দিতে হইবে এবং ইরাণ গবর্ণমেণ্ট উহার শতকরা পঁচিশ ভাগ ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য পৃথক্ করিয়া রাখিবেন। তৈলবাহী জাহাজগুলিতে যে তৈল সরবরাহ করা হইবে, তাহার রসিদও জাতীয় ইরাণী তৈল কোম্পানীর নামে দাবী করা হয়। কিন্তু বৃটেন চায়, ইরাণের

তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণের নীতি নামে মাত্র স্বীকার করা হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীই পূর্ব্বের ন্যায় বহাল থাকিবে। ইহার জন্য ইরাণে সৈন্য অবতরণ করা ব্যতীত আর যত ভাবে চাপ দেওয়া সম্ভব, বৃটেন তাহা দিতে ক্রটি করিতেছে না।

আপোষ-মীমাংসার জন্য ১৪ই জুন (১৯৫১) যে আলোচনা আরম্ভ হয়, ১৯শে জুন তাহা ব্যর্থ হওয়ার পরই মধ্যপ্রাচীস্থিত সমস্ত বৃটিশ ঘাঁটিগুলিকে প্রস্তুত থাকিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ ক্রুজার মরিসাসকে আবাদান বন্দরের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। আবাদানের তৈল শোধনাগার বন্ধ করিয়া দিবার হুমকী দিতেও ক্রটি করা হয় নাই। ২৮০০ জন বৃটিশ কর্ম্মচারী ইরাণ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। ইরাণের তৈলখনি হইতে বৃটিশ কর্ম্মচারীদিগকে বৃটেন অবশ্যই সরাইয়া আনিবে না। কারণ, উহা তৈলখনিগুলি ছাড়িয়া দেওয়ারই নামান্তর হইবে। কিন্তু রসিদ সম্পর্কে গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়া আবাদান বন্দর হইতে তৈলবাহী জাহাজগুলি ফেরৎ পাঠান হইয়াছে। বৃটেনের এই অনমনীয় দৃঢ়তার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়।

ডাঃ মোসাদেক ভয়ানক রুশ-বিরোধী। রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে তিনি রাজী হইবেন না। ইরাণের এমন আর্থিক সঙ্গতি নাই যে, তৈল খনিগুলির কাজ চালাইতে পারে। ইরাণী টেক্‌নেশিয়ান আছে মাত্র ৪০ জন। তার পর ইরাণ তাহার তৈল বিক্রয় করিবে কিরূপে এবং কাহার নিকটে, ইহাও বড় সহজ সমস্যা নয়। ইরাণ যদি তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারে তাহা হইলে সমগ্র মধ্যপ্রাচীতে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। এই জন্যই বৃটেন অনমনীয় দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পারিয়াছে। উহার পরিণাম অনুমান করা সহজ নয়।

কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা—

কোরিয়া যুদ্ধের এক বৎসর পর ১০ই জুলাই (১৯৫১) কায়েসংএ যুদ্ধবিরতির আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। গত ৮ই জুলাই হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে প্রারম্ভিক আলোচনা সমাপ্ত হইলেও এবং ১০ই জুলাই সন্তোষজনক পরিস্থিতির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আরম্ভ হইলেও, আকস্মিক ভাবে ১২ই জুলাই যুদ্ধবিরতি আলোচনায় এক অচল অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং তিন দিন আলোচনা বন্ধ থাকার পর অবশেষে ১৫ই জুলাই পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও এইরূপ সাময়িক অচল অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে কোন অনুমান আমরা করিতে চাই না। কিন্তু যে-কারণে উল্লিখিত অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। কম্যুনিষ্ট বাহিনী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ২৩ জন সাংবাদিককে কায়েসংএ প্রবেশ করিতে দিতে অসম্মত হওয়াতেই এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। কম্যুনিষ্টদের পক্ষে দাবী ছিল এই যে, সত্যিকার যুদ্ধবিরতি আলোচনার জন্য প্রাথমিক আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইলেই সাংবাদিকদিগকে আলোচনায় উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু জেঃ রিজওয়ে মনে করেন যে, ইহাতে কে উপস্থিত থাকিবে কি থাকিবে না তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গত ৭ই জুলাই জেঃ রিজওয়েও এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া যুদ্ধবিরতি সম্মেলন গোপনে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সাংবাদিকদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও প্রারম্ভিক আলোচনা যদি ব্যর্থ না হইয়া থাকে, তবে পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও তাঁহাদের অনুপস্থিতির জন্য ব্যর্থ হওয়ার কোন কারণ নাই। তবে এই আপত্তি ও প্রতি-আপত্তির মূলে অন্য কোন সামরিক বা রাজনৈতিক কারণ থাকাই সম্ভব। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত যে অচল অবস্থার অবসান হইয়াছে ইহাও শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি হইলেও সুদূর প্রাচ্যের মূল সমস্যা এবং তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের আশঙ্কা বর্ত্তমানের মতই থাকিবে।

কোরিয়া যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ণ হইবার দুই দিন পূর্ব্বে গত ২৩শে জুন (১৯৫১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে রাশিয়ার প্রতিনিধি দলের নেতা মঃ মালিক বেতার-যোগে এক বক্তৃতায় অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখায় সাময়িক সন্ধি ও যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য যুযুধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করেন। অতঃপর রুশ-প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া রুশ পররাষ্ট্র-সচিব মঃ গ্রমিকো মস্কোস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূতের নিকট বলেন যে, উভয় পক্ষের সেনা-নায়কগণই আলোচনা দ্বারা যুদ্ধবিরতির সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিবেন এবং সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কোন আলোচনা হইবে না। এই জন্যই যুদ্ধবিরতির আলোচনা আরম্ভ হওয়া সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি যদিও হয়, তাহা হইলেও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা একটুকুও হ্রাস পাইবে না। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ় করিবার প্রয়াস শিথিল হইলে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইবে। গত ৫ই জুলাই পিকিং রেডিও হইতে চীনের অধিবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির ফলে সুদূর প্রাচ্যের কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না।

কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির আলোচনার ফল যাহাই হউক না কেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তথাকথিত স্বাধীন-বিশ্বের সমরসজ্জার আয়োজন চলিতেই থাকিবে—যে পর্য্যন্ত না মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে, ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের সামরিক শক্তি সোভিয়েট ব্লকের সামরিক শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইয়াছে। গত ১২ জুলাই বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুক্তভাবে রচিত জাপ শান্তি-চুক্তির যে খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং মিঃ জন ফষ্টার ডুলেস এ-সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, রাশিয়া ও চীনকে বাদ দিয়াই এই শান্তি-চুক্তি করা হইবে। জাপান ফরমোসার দাবী পরিত্যাগ করিবে বটে, কিন্তু উহার ভবিষ্যৎ অনির্দ্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। শান্তি-চুক্তির পরে যে দ্বৈত রক্ষা-ব্যবস্থার চুক্তির বিধান করা হইয়াছে তাহাতে জাপান সম্পূর্ণরূপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীন হইয়া থাকিবে। জাপ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছানুসারে চিয়াং কাইশেক অথবা মাও সে তুংয়ের সহিত সন্ধি করিতে পারিবে, এই সর্ত্তও খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তির কথাও স্মরণ করা আবশ্যক। এশিয়ার যে-রাষ্ট্রশক্তি পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জাপান আজ সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য শক্তি মার্কিণের অধীন। যুদ্ধের পর এশিয়ার নূতন শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে নয়াচীন। কম্যুনিজম নিরোধের অজুহাতে এই নয়াচীনকে বিধ্বস্ত করাই পশ্চিমী শক্তিবর্গের সুদূর প্রাচ্য-নীতি।

বাঙ্গালোরের অধিবেশন

"কংগ্রেসকে ভাঙ্গনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কার্য্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইবে এই আশা লইয়া যে সকল কংগ্রেসসেবী বাঙ্গালোরে গিয়াছিলেন তাঁহারা যদি নিরাশ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই। কংগ্রেসের ভাঙ্গন রোধ করিবার জন্ত গত মে মাসে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ২১ জন সদস্য যে প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলেন বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গোপন অধিবেশনে উহার যে দুইটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি সংশোধন প্রস্তাবে বলা হয় যে, শ্রীযুক্ত নেহরু ট্যাণ্ডনজীর সহিত পরামর্শ করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচন কমিটি এবং সাধারণ ভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠন করিবেন। উক্ত সংশোধন প্রস্তাবের পাল্টা প্রস্তাব হিসাবে ট্যাণ্ডনজীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করিয়া এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু মূল প্রস্তাবের স্বাক্ষরকারীদের দুই জন উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করায় নেহরুজী ও ট্যাণ্ডনজীর মধ্যে শক্তি পরীক্ষা আর সম্ভব হইল না। দলত্যাগী সদস্যদিগকে কংগ্রেসের মহান্ কাজে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করিয়া যে ঐক্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে মিঃ কিদোয়াইয়ের মনোবাসনা বোধ হয় অপূর্ণই থাকিয়া যাইবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে যে দুইটি সদস্য পদ খালি রহিয়াছে, তাহাতে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু উপদলের দুই জনকে গ্রহণ করা হইলেও মিঃ কিদোয়াইয়ের সন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নাই। কারণ, এই প্রস্তাব দুই মাস পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ কংগ্রেসের ভাঙ্গন রোধ করা অপেক্ষা ক্ষমতা হাতে রাখিবার চেষ্টা করাই কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের উদ্দেশ্য। ইহার জন্ত যে পন্থা তাঁহারা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাতে নিজেদের প্রতিই কংগ্রেসসেবীদের অনাস্থা প্রকাশ পাইয়াছে।

কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচন কমিটি না কি এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, যাঁহারা কংগ্রেসের সদস্য নহেন এইরূপ ব্যক্তিরা যদি কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও কংগ্রেসপ্রার্থিরূপে মনোনীত করা হইবে। নির্ব্বাচন কমিটি এইরূপ স্থির করিয়া থাকিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কংগ্রেসী শাসনের চারি বৎসরে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসসেবীদের সম্পর্কে জনসাধারণের যে ধারণা জন্মিয়াছে আমাদের শাসকবর্গের তাহা অজানা নাই। শাসন-ক্ষমতা হাতে থাকিলে দেশবাসীর উপর দমন-নীতি চালাইতে পারা যায়, তাহাদিগকে অর্দ্ধাহারে এবং অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় রাখিতে পারা যায়, কিন্তু পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করিয়া ভোট আদায় করিতে পারা যায় না। শাসনকর্ত্তার আসনে বসিয়া দেশবাসীর অন্ন-বস্ত্রের দাবীকে চোখ রাঙাইয়া ঠাণ্ডা করা যায়, দেশবাসী সম্পর্কে তীব্র শ্লেষপূর্ণ মন্তব্যও করা সহজ হয়। কিন্তু নির্ব্বাচনের সময় চোখ রাঙাইয়া কিম্বা তীব্র শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য করিয়া ভোট পাওয়া যায় না। কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে দেশবাসীকে অন্ন-বস্ত্র যোগাইবার আশ্বাস অবশ্যই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গত চারি বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসী শাসকবর্গ যে ভাবে দেশবাসীকে অর্দ্ধাহারে এবং অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের আশ্বাসে দেশবাসী আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে না। কাজেই কংগ্রেসসেবীদের পক্ষে দেশবাসীর কাছে ভোট ভিক্ষা করিয়া বিশেষ সুবিধা হইবে না। যাঁহারা কংগ্রেসসেবী নহেন, অথচ প্রভাব-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন অর্থাৎ নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে ভোট যোগাড় করিতে পারিবেন, এইরূপ লোককে বাগাইতে পারিলে অনেক সুবিধা আছে। কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা থাকিলে আখেরে সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কংগ্রেসের মনোনয়ন পাইবার জন্ত কংগ্রেস ক্রীডে একটা দস্তখত করিতে রাজী অবশ্যই হইবেন। কিন্তু আবার শাসন-ক্ষমতা হাতে পাইলে কংগ্রেসী শাসকবর্গ যে নির্ব্বাচনী ইস্তাহারকে এক টুকরা ছেঁড়া কাগজের মত ফেলিয়া দিবেন, তাহাতে দেশবাসীরও কোন সন্দেহ নাই।"

—দৈনিক বসুমতী।

চন্দননগরের শিক্ষা

"চন্দননগরের নির্ব্বাচন দেখাইয়া দিল যে, কংগ্রেসী দুঃশাসনের কবলমুক্ত হইবার জন্ত আমাদের সাধারণ মানুষ—প্রত্যেক সৎ ও দেশভক্ত নাগরিক কতখানি আগ্রহশীল।

চন্দননগর নির্ব্বাচন দেশভক্ত ও গণতন্ত্রী রাজনৈতিক দল এবং প্রতিষ্ঠান মাত্রকেই পরিষ্কার বুঝাইয়া দিল যে, যাঁহারাই দেশবাসীর ভাল করিতে চান বলিয়া গর্ব্ব করেন, এবং তাঁহাদের জন্ত কাজকর্ম্মও

করেন, তাঁহাদের সকলের দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল একতাকেই শুধু জনসাধারণ বিশ্বাস করেন। কোন একটি দল বা প্রতিষ্ঠান যদি জেদ করিয়া একক ভাবে জনসাধারণের বিশ্বাস ও আনুগত্য দাবি করেন, তবে তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে।

চন্দননগর নির্ব্বাচন ইহাও প্রমাণ করিল যে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচনে যদি শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ থাকেন এবং কংগ্রেসী গুণ্ডামী ও গোলযোগ সৃষ্টির চক্রান্তে সহায়ক না হন, তাহা হইলে কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠীকে সরকারী গদী হইতে অপসারণ করা সম্ভব।" —স্বাধীনতা।

—

এ যুগের সাংবাদিকতা

"শুধু সংবাদপত্রের মালিকদিগকে দোষী করিয়া লাভ নাই। সম্পাদক, বার্ত্তা-সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, সিনেমা সমালোচক প্রভৃতি অনেকেই প্রলোভনের ঊর্দ্ধে নহেন; আত্মসম্মান সম্পর্কে সচেতন নহেন। সরাজ হস্তে কমপ্লিমেণ্টারী বিতরণের দ্বারা স্বল্পায়ু সিনেমা-পরিচালক কি ভাবে 'যুগান্তকারী' বলিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভে সার্টিফিকেট আদায় করিতে পারেন, ফুলের মালা ও সভাপতিত্ব দান করিয়া কি ভাবে অখ্যাত পাঠাগারের বার্ষিক উৎসবের বিবরণী ডবল কলম হেডিংএ ছাপানো যায়, তাহার সঙ্কেত এক্ষণে কাহারও অবিদিত নাই। কেন যে বীমা কোম্পানীর পাবলিসিটি অফিসারগণের কবিতা, বিস্কুট কোম্পানীর প্রচার-সচিবের গল্প ও টি সেস আপিসের বিজ্ঞাপনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের প্রবন্ধ বা রসরচনা বাংলা দেশের প্রত্যেকটি পত্রিকার পূজাসংখ্যাগুলিতে ছাপা হয় তাহার রহস্য অনুমান করা কঠিন নয়।

বর্ত্তমানে ভারতীয় সংবাদপত্র-জগতের এই দুর্ব্বলতা শুধু আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিকটই নহে, ভারতে স্থিত বিদেশী দূতাবাসগুলির কর্ত্তাদের নিকট পর্য্যন্ত দিনের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত দিতেছি। কয়েক জন সম্পাদককে রাশিয়া ভ্রমণে আমন্ত্রণ করা হইবে এই সংবাদ প্রচারের ফলে এখানকার দুইখানি সংবাদপত্রে কিরূপ দীর্ঘমেয়াদী সোভিয়েট ও ষ্টালিন-প্রশস্তি সুরু হইয়াছিল তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অবশেষে উঁহাদের মধ্য হইতে এক জন সম্পাদক আমন্ত্রিত হওয়ায় অপর সম্পাদক হাল ছাড়িয়া থামিয়াছেন। দুই বৎসর যাবৎ ব্রিটিশ কাউন্সিল ছয় সপ্তাহের জন্য জন কয়েক দেশীয় ভাষার সাংবাদিককে ব্রিটেনে লইয়া যাইতেছেন। ইহার জন্য কলিকাতার সাংবাদিক-মহলে আকুলি-বিকুলি ও তৎপরতা কর্পোরেশনের ভোটদ্বন্দ্বকে পর্য্যন্ত হার মানাইয়াছে। তদ্বিরের তাড়নায় কাউন্সিলের কলিকাতা আপিসের কর্ম্মকর্ত্তাগণ উদ্ব্যস্ত ও উত্যক্ত। প্রার্থীদের মধ্যে এক জন একটি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের মাথা, অত্যন্ত রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর এক জন সাংবাদিক কাউন্সিলে বলিয়া আসিলেন, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করিলে এরোপ্লেনে করিয়া তিন কলসী গঙ্গাজল লণ্ডনে লইয়া যাইতে হইবে। যাঁহার সম্পর্কে এই অভিযোগ তিনি এ কথা জানিতে পারিয়া পরদিন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিলেন। বলিলেন—যস্মিন্ দেশে যদাচার, বিলাতে গেলে তিনি কিছু দর্ভাসন আর কাষ্ঠ-পাদুকা লইয়া যাইবেন না। রোমে যাইয়া রোমানদের ন্যায় আচরণ করিবেন। সুতরাং সাহেব যেন কুলোকের কথায় কাণ না দিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকেই ইত্যাদি ইত্যাদি। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস ফুলব্রাইট বৃত্তি দিয়া আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ দেয়। কলিকাতার কোন এক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক প্রায় বছর খানেক যাবৎ নিয়মিত ভাবে আমেরিকার অনুকূল সমুদয় সংবাদের কাটিং অযাচিত ভাবে এসপ্লেনেডের আমেরিকান কনসালের আপিসে সশরীরে হাজির হইয়া পৌঁছাইয়া দিতেছেন। শুনিতেছি, এ বৎসর বৃত্তির জন্য তাঁহার নাম সুপারিশ হয় নাই, আগামী বৎসর হইবে আশা আছে।

বিগত দশ-পনর বছরে ভারতীয় সংবাদপত্রের উন্নতি ঘটিয়াছে ইহা অস্বীকার করি না। মুদ্রণ, সংবাদ সংগ্রহ, প্রচার, রোটারী মেসিন, টেলীপ্রিণ্টার ইত্যাদি বহু ব্যাপারে আজকালকার খবরের কাগজ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। সংবাদপত্রে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে বহু গুণ, তাহাদের পারিশ্রমিক আগের তুলনায় বহুলাংশে উন্নত পরিমাণের। সংবাদপত্রের প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে, কিন্তু প্রভাব বাড়ে নাই। সাংবাদিকের শক্তি বাড়িয়াছে, কিন্তু সম্ভ্রম বাড়ে নাই। সেকালে ট্রামে বা পদব্রজে চলাফেরা করিয়া অতি পরিমিত প্রচার-সংখ্যার পত্রিকা-সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জনগণের মনে যে শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতেন, আজকালকার আশী বা নব্বই হাজারী দৈনিকের মোটরবিহারী সম্পাদকগণের পক্ষে তাহা কল্পনার অতীত। প্রাচীন সম্পাদকেরা ক্ষীণবিত্ত ছিলেন, কিন্তু ক্ষীণচিত্ত ছিলেন না। সেদিনের সম্পাদকেরা অভাবে কষ্ট পাইতেন, কিন্তু স্বভাবে নষ্ট হইতেন না।

আধুনিক সাংবাদিকের চরিত্রের এই স্খলন আমাদের পূর্ব্বগামীদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে বিলাতীবর্জ্জনের প্রস্তাব প্রথম গৃহীত হয়। তৎকালীন একটি বিশিষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকায় দীর্ঘ দিন ধরিয়া একটি নাম-করা বিলাতী কোম্পানীর ছাতার বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছিল। 'স্বদেশী' গ্রহণের সংকল্প গৃহীত হইলে উক্ত পত্রিকার বৃদ্ধ সম্পাদক কোম্পানীকে লিখিয়া জানাইলেন যে, যেহেতু তিনি তাঁহার পত্রিকায় বিলাতী বর্জ্জনের স্বপক্ষে লিখিবেন, সেহেতু অতঃপর ঐ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা আর সম্ভব হইবে না। বেশী দিনের কথা নহে, ফরোয়ার্ড পত্রিকার পি, চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে একটি বিশিষ্ট ধনী মাড়োয়ারী গৃহে বিবাহের নিমন্ত্রণ এই কারণে প্রত্যাখ্যান করিতে দেখিয়াছি যে, উক্ত মাড়োয়ারীর কারখানার তৎকালীন ধর্ম্মঘট সম্পর্কে শীঘ্রই সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশের প্রয়োজন হইতে পারে।

এ যুগে ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকগণের সম্ভ্রম দুই ই মালিক, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ও রিপোর্টারেরা আপন কুকার্য্যের দ্বারা নষ্ট করিয়াছেন। সভা-সমিতিতে সিঙ্গাড়া বা স্যাণ্ডুইচের প্লেটের উপরে রিপোর্টারেরা যদি হুমড়ি খাইয়া পড়েন, মাসে একটা 'টক' দেওয়ার আকর্ষণে সম্পাদকেরা যদি নিজের কাগজে বেতারের বিরুদ্ধে চিঠি প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন, সরকারী খরচে বিমান ভ্রমণের মোহে যদি সাংবাদিকেরা সরকারী প্রচার বিভাগের দরজায় ধর্ণা দিতে থাকেন, তবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা সাংবাদিকগণের

ঐতিহ্য ইত্যাদি বড় বড় কথা বলিয়া তাঁহারা যতই আস্ফালন করুন না কেন, একমাত্র করুণ বা হাস্যরসের উদ্রেক ব্যতীত তাহাতে আর কিছুই হইবে না।" —যুগবাণী।

কৃষকের উন্নতি কোন্ পথে ?

"আজও আমাদের সমাজে কৃষকের শোষণ-ব্যবস্থা ঠিক সাবেকী কায়দায় চলিতেছে। ১৯৩৭ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষি-ঋণের পরিমাণ আঠার শত কোটি টাকা সাব্যস্ত করিয়াছেন। ১৯৩১ সালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির হিসাব অনুসারে ঐ ঋণের পরিমাণ ছিল নয় শত কোটি টাকা। অতএব আমাদের দেশের কৃষক ঋণের মধ্যে জন্মায়, বাঁচে ও মরে। এই কৃষি-ঋণের দায় হইতে কৃষককে মুক্ত করার জন্য কয়েকটি ঋণ-সালিশী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কৃষকের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না। কারণ কৃষি ও কৃষি-ঋণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কৃষির উন্নতির চেষ্টা না করিয়া কৃষি-ঋণ দূর করার চেষ্টা করা নেহাৎ বোকামি।

অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের উৎপাদন-শক্তি কমিয়া আসিতেছে। এই সত্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। খাদ্যের অভাবে, জমির অভাবে মানুষ চোখে অন্ধকার দেখিয়া আমাদের দেশে আত্মহত্যা করিতেছে। কোটি কোটি লোকের জীবন ধারণের মান দ্রুতগতিতে নামিয়া যাইতেছে। খাদ্যের অভাবে, বস্ত্রের অভাবে, অর্থের অভাবে, শিক্ষার অভাবে কৃষকের কর্মশক্তি কমিয়া আসিতেছে এবং কৃষিজাত শস্যের উৎপাদনও হ্রাস পাইতেছে।

কৃষিজাত উৎপন্ন শস্য কেন কমিয়া যাইতেছে তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়:—

(ক) ভূমির খণ্ডীকরণ ও বিচ্ছিন্নতা সম্পাদন, (খ) সেচ ব্যবস্থার অসুবিধা (গ) সাবেকি কৃষিকার্য্য পদ্ধতি ও কৃষকের কৃষি-সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব। ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে কৃষিজ পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের অসংখ্য ত্রুটি, যাহার ফলে কৃষক ক্রমশঃই মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িতেছে। একে ত কৃষক দুর্ব্বল, তাহার উপর সরকার হইতে ফড়িয়া দালালের যদি অনবরত তাহাকে শোষণ করিতে থাকে, তবে কৃষকের বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

"অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলন আমাদের দেশে ফলদায়ক হয় নাই, কারণ অধিক খাদ্য ফলাইবার প্রণালী আমরা গ্রহণ করি নাই। রাশিয়া ও চীনে চাষের অযোগ্য জমিও বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে আবাদী জমিতে পরিণত হইতেছে। অথচ আমাদের দেশে সহস্র সহস্র একর কর্ষণোপযুক্ত জমি অনাবাদী পতিত রহিয়াছে। সহস্র সহস্র একর আবাদী জমির ফসল বানের জলে, সমুদ্রের লোণা জলে, প্লাবনে, জলাভাবে প্রতি বৎসর নষ্ট হইতেছে। হতদরিদ্র কৃষক অসহায়, এই দুরবস্থা দূর করিতে পারে না; কারণ আমাদের ভূমি-ব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণীর লোক জমির কর্তৃত্ব করে। সেই ভূমি-ব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে মুনাফা প্রবৃত্তি। ভূমির উপর কৃষকের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব স্থাপিত না হইলে সাধারণ কৃষক উৎপাদনে উৎসাহী হইতে পারে না। ভূমির উপর কর্তৃত্ব পাইলে আমাদের দেশেও কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত যৌথ খামার স্থাপিত হইতে পারিবে এবং জমির উন্নতির প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবে। আজিকার কৃষিজ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের অসংখ্য ত্রুটি দূর হইবে। কৃষক তখন নিজের স্বার্থ, স্ব-শ্রেণীর স্বার্থ, রাষ্ট্রের স্বার্থ যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে। তখনই কেবল সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি সম্ভব হইবে এবং স্বাধীন হইবে।" —বগুড়ার কথা

বামপন্থী ঐক্যের প্রয়োজন কেন ?

"স্বাধীনতার চারি বৎসর প্রায় পূর্ণ হইতে চলিল। এই চারি বৎসরে জনগণ কংগ্রেসী অপশাসনের আস্বাদ হাড়ে-হাড়ে পাইয়াছে। তাই আজ জনমন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে—সে যে কোন উপায়ে ইহার পরিবর্ত্তন চাহিতেছে—মুক্তির সন্ধান করিতেছে। জনমন আজ আর প্রকাশ্যে কংগ্রেসীর বিরোধিতা করিতে দ্বিধা করিতেছে না—সে আগামী নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

জনমনের এই বিক্ষোভের প্রকাশ আমরা দেখিলাম হাওড়ার পৌরসভার সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে এবং মালদহের আইন সভার উপনির্বাচনে। যদিও পৌরসভায় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তবুও সেখানে প্রায় সকল কংগ্রেসবিরোধী বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তি একত্রিত হওয়ায় কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীদের পরাজিত করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। ইহা কম কথা নহে! যে-কংগ্রেস ল্যাম্প-পোষ্টকে টিকিট দিয়া দাঁড় করাইয়া দিলে ল্যাম্প-পোষ্ট ভোটে জয়লাভ করিত সেই কংগ্রেস যখন আজ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত তখন তাহার অপশাসনের উপযুক্ত শিক্ষা জনগণ

দিয়াছে ইহা আশার কথা—আনন্দের কথা ইহাই যে, প্রগতিশীল শক্তি একত্রে কংগ্রেসী অপকৌশল ব্যর্থ করিতে মিলিত হইয়াছিল। মালদহের উপনির্বাচনে অবশ্য কংগ্রেসপ্রার্থী জয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, এই উপনির্বাচনে বামপন্থীরা সম্মিলিত হইতে পারে নাই—এখানে কৃষক-প্রজা-মজদুর দল ও কম্যুনিষ্ট দল পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থী দাঁড় করাইবার ফলে ভোট বিভক্ত হইয়াছিল এবং সে জন্ত কংগ্রেসপ্রার্থীর জয় হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসপ্রার্থীর জয় হইলেও অন্ত দুই দল প্রার্থীর ভোটসংখ্যার যোগফল কংগ্রেস-প্রার্থী হইতে অনেক বেশী ছিল। এই পরাজয় হইতে বামপন্থীদের চৈতন্ত হইবে আশা করি। কারণ ইহা আজ দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, কংগ্রেসী অপশাসনের পরিবর্ত্তন জনগণ মনে-প্রাণে চায়। কংগ্রেসের অপসারণ করিতে শক্তিশালী বামপন্থী দলের প্রয়োজন। বামপন্থী দল দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। কিন্তু তাহাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বামপন্থীদের নিজেদের মধ্যে দলাদলির ফলে কংগ্রেসীদের সুবিধা হইতেছে। নির্ব্বাচনের বিশেষ দেরী নাই। বৃহত্তর স্বার্থ—অর্থাৎ জনগণের স্বার্থরক্ষার্থে তাই ক্ষুদ্র দলগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া বামপন্থীদের একত্রিত হইতে হইবে এবং তবেই হইবে কংগ্রেসের পরাজয়।

অবশ্য ইহা সত্য কথা যে, কংগ্রেসবিরোধিতা মানেই বামপন্থী নয়। হিন্দু মহাসভার ন্যায় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানও কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছে এবং বহু চোরাকারবারী ও মুনাফাখোর জোট বাঁধিতেছে। ইহারা কোন দিন প্রগতিশীল বামপন্থী শক্তি হইতে পারে না। তাই ইহাদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনার কথা উঠিতে পারে না।

আমরা আশা করি, ভারতের সোস্যালিষ্ট দল, কৃপালনীর দল, ডাঃ ঘোষের কৃষক-মজদুর-প্রজা দল, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি, আর, সি, পি, ট্রেড ইউনিয়ন, কম্যুনিষ্ট এবং যে সমস্ত সমাজসেবী কর্মী কোন দলের সহিত যুক্ত না হইয়াও বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রামের সেবায় নিযুক্ত আছেন, নির্বাচনের সময় তাঁহাদের মধ্যে একটি কার্যকরী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। চূড়ান্ত ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হইলেও একটি কার্যকরী মতৈক্য প্রতিষ্ঠা খুবই সম্ভব এবং মনে হয়, এই ঐক্যের ফল সুদূরপ্রসারীও হইতে পারে। এ বিষয়ে নেতৃবৃন্দকে উদ্যোগী দেখিলে আমরা সুখীই হইব।"—সংগঠনী।

বাঁচিবার অধিকার

"কালের রথচক্রের পেষণে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ নিষ্পেষিত। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের প্রতিষ্ঠার পথ নাই। আয়ু থাকা সত্ত্বেও তাহারা মৃত্যুপথযাত্রী। সমাজে যাহারা উচ্চশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, তাহারা হয় বেকার নয় এমন আয়ের চাকুরী করেন, যাহার দ্বারা ভদ্রোচিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করা চলে না। অনেক অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহাদের চেয়ে অনেক বেশী রোজগার করেন। হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক কর্মহীন, বেকার, ছন্নছাড়া জীবনযাপন করিতেছে। ভূম্যধিকারিগণ ভূমিহীন, ঋণজালে জর্জরিত, ব্যাঙ্ক ফেইল হওয়া এবং দেশ-বিভাগের দুর্বিপাকে সর্বহারা যাযাবর হইয়া আজ এখানে কাল সেখানে আশ্রয়প্রার্থী বা 'ভগনীয়া'; জীবনযাত্রার স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ। ধ্বংসের শেষ সীমায় আসিয়া আজ তাহারা উদ্‌ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় আজ চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হইবে এই বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের বিনাশেই কি আমাদের কল্যাণ হইবে? তাহা কি আমাদের সমাজ-জীবনের পক্ষে কাম্য? আজ দিকে দিকে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও উন্মার্গগামিতা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা মুখ্যতঃ দেশের এই ভয়াবহ সমস্যারই ফল। এই বিষয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের দৃষ্টি নাই, নেতৃবৃন্দ মৌন। অপর দিকে এক দল দলগত রাজনীতির প্রয়োজনে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্ত যেন-তেন-প্রকারে সমাজের সংখ্যাধিক্যের অনুগ্রহ লাভের আশায় উন্মত্ত ও একে অন্যকে অতিক্রম করিয়া যাইবার প্রতিযোগিতায় মাত্রাজ্ঞানশূন্য। এই অবস্থায় উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তরুণ-মনকে বিভ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কঠিন কিছু নহে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, রাষ্ট্র-শাসনে, সামাজিক জীবনে স্বেচ্ছাচারিতার বিসদৃশ আচরণকে মূলধন করিয়া যে রাজনীতির খেলা চলিতেছে, তাহাতে আমাদের সমাজ-জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কিত না হইয়া পারা যায় না।" —যুগশক্তি।

সত্বর ব্যবস্থা করুন

"বর্ষা আরম্ভ হইতে না হইতেই জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে চাউলের মূল্যবৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বর্দ্ধমান সহরেই মোটা চাউল ২০৲।২২৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে ইতিমধ্যে চাউলের মূল্য ৩০৲ টাকায় উঠিয়াছে। তদুপরি 'করিডর' প্রথার প্রবর্ত্তনের ফলে চাউল সরবরাহের উন্মুক্ত পথটিও অবরুদ্ধ হইয়াছে। সত্বর বিভিন্ন ঘাটতি অঞ্চলে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা না হইলে বর্ষার দিনে চাউলের অভাবে এই সকল অঞ্চলে হাহাকার উঠিবে। আমরা খাদ্য-বিভাগের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হইবার জন্ত অনুরোধ জানাইতেছি।" —বর্দ্ধমান।

সৈনিকের বদান্যতা

"খাদ্য-সমস্যা সমাধানে ভারতীয় বাহিনী—ভারতীয় স্থল-বাহিনী—১৯৫০-৫১ সালে যে "অধিক ফসল ফলাও" প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্ত লক্ষ্ণৌস্থ আর্মি মেডিক্যাল কোর সেণ্টারকে ভারত গবর্ণমেণ্টের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় হইতে ১০০০৲ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে আম্বালাস্থ শিখ রেজিমেণ্ট সেণ্টার ও বেলগাঁওস্থ মারাঠা লাইট ইনফেণ্ট্রি রেজিমেণ্ট সেণ্টার। স্থল-বাহিনীর ৩টি কম্যাণ্ডে মোট ৬৪৩৪ একর জমিতে চাষাবাদ হইতেছে এবং ২,৩২১ একর জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ করা হইবে। ভারতীয় স্থল-বাহিনীর সৈন্যেরা মোট ১,২১৭১১ মণ ফসল ফলাইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যশস্য, ফল ও শাকসব্জীই প্রধান। খাদ্য অপচয় নিবারণ পরিকল্পনাটিও ভারতীয় স্থল-বাহিনী বিশেষ ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। ১৯৪১ সনের জুলাই মাস হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতের বীর সৈনিকগণ নিজেদের বরাদ্দ হইতে স্বেচ্ছায় ৬৮,৬১৭ মণ খাদ্যশস্য প্রত্যর্পণ করিয়াছে।" —নীহার।

কলেজ ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়

"এ বৎসর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফলাফল সত্যই প্রশংসনীয় নহে। প্রায় আর্টস্ বিভাগে এক-চতুর্থাংশ এবং বিজ্ঞান বিভাগে (সায়েন্সে) এক-তৃতীয়াংশ পাশ করিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে কৃতকার্য্য ছাত্র-সংখ্যা যাহা ছিল আজ বাংলার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঐন্দ্রজালিক ভাবে তাহা বদলাইয়া গিয়াছে। ইহার সম্যক্ কারণ নির্দ্ধারণ করা এখনও সম্ভবপর হয় নাই। কেহ বা বিশ্ববিদ্যালয়, কেহ বা ছাত্র, কেহ বা কলেজ, আবার কেহ বা সমাজ-জীবনের গ্লানিকর পরিস্থিতি, আবার কেহ কেহ আংশিক ভাবে প্রত্যেককেই দায়ী বলিয়া থাকেন।

আংশিক ভাবে যদি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ছাত্র, তদুপরি সমাজ দায়ী—তবে কলেজ এবং ছাত্ররাও এই দায়িত্ব হইতে মুক্ত পাইতেছেন না। ছাত্ররা সত্যই পড়াশুনা করেন না বা করিতে পারেন না। অনেকে বলেন যে, ছাত্ররা বাড়ীর নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় বা প্রতিকূল পরিস্থিতি না থাকায় পড়াশুনা করিতে পারেন না। কিন্তু বাংলায় প্রবাদ আছে যে, "যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?" কলেজকেও দোষী করা যাইতে পারে কারণ যে সমস্ত ছেলেকে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পাঠান, তাহারা কেন পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে না? যে সমস্ত ছেলে কলেজে পাশ করে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন পাশ করিবে না? তাহার কারণ কলেজের পরীক্ষার ফলাফল বিশেষ সুবিধাজনক না হইলেও প্রথম বর্ষ হইতে দ্বিতীয় বর্ষে, তৃতীয় বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করা যায় এবং টেষ্ট পরীক্ষায়ও পাশ না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত পরীক্ষা দেওয়া যায়, এ কথা ছাত্ররা জানেন। সুতরাং কলেজের শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে যে ছাত্রদের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দিবে এ কথায় আর আশ্চর্য্যের কি আছে?

কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ এখন হইতে যদি দৃঢ়তার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে ছাত্ররাও এই গণ্ডী পার হইবার জন্য তৎপর হইবেন এবং তাহা হইলেই এইরূপ অনিবার্য্য অস্বাভাবিক অকৃতকার্য্য ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস পাইবে বলিয়াই মনে হয়।" —আসানসোল হিতৈষী।

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল ধারণা

"বুনিয়াদী শিক্ষার মর্ম্মকথা অধুনা আবিষ্কৃত কোন তথ্য নয়, বহু দিন পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রীনিকেতনে এই ধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এই শিক্ষার পরিপূর্ণ একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং কি ভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবে কার্য্যকরী করা যায় তার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। তার চেয়েও বড় কথা সত্যিকার এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি জনমনকে আগ্রহান্বিত করে তুলেছেন তিনি।" সম্প্রতি বাণীপুর বেসিক ট্রেনিং কলেজ ও স্কুলের বর্ত্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক পুনর্মিলন সভায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী উপরোক্ত মন্তব্যটি করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দ এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

আমেরিকার সরকার বৃত্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় ছাত্রছাত্রীগণ—২৮শে জুন বম্বে থেকে জাহাজযোগে আমেরিকা যাত্রা করেছেন
এঁদের পাঠ ও বসবাসের সকল প্রকার অর্থ জোগাবেন আমেরিকা সরকার

ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন যে, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে বাস্তবের সঙ্গে সংস্পর্শ-বর্জ্জিত, আমাদের সামাজিক জীবনধারার প্রতিফলন যে সে-শিক্ষায় নেই, এই উপলব্ধিই আমাদেরকে এই নূতন শিক্ষাপ্রণালী যথাসম্ভব সত্বর গ্রহণ করতে ও তাকে বিশিষ্টতা দিতে অনুপ্রাণিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গে যে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হয়েছে, তা কৃত্রিম এবং মহাত্মাজীর পরিকল্পিত শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে এর মূলত বৈসাদৃশ্য রয়েছে ব'লে অনেকে অভিযোগ করেন, কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোন শিক্ষাব্রতীই এইরূপ অভিযোগ করেন নাই। বুনিয়াদী বিদ্যালয়-গুলির সঙ্গে এই অভিযোগের কোন সম্পর্ক নাই। একমাত্র সরকারবিরোধী রাজনীতিক দলগুলিই এই ধরণের অভিযোগ ক'রে থাকেন। সরকার আন্তরিকতার সঙ্গেই বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এসে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সেণ্ট্রাল অ্যাডভাইসরী বোর্ডের অনুমোদিত সূচী অনুযায়ী যথাযথ ভাবে হচ্ছে কি না দেখে যাবার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান।

পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষাকৃত বিলম্বে এই কার্য্যে ব্রতী হয়েছে। বস্তুত, মাত্র স্বাধীনতা লাভের পর এখানকার কাজ আরম্ভ হয়েছে। বিহারে আট বৎসর যাবৎ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কাজেই বিহার ও অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির তুলনা ক'রে লাভ নেই।" —শিক্ষা ও কৃষি।

ধান দাও—কাপড় দিব, পাকা রাস্তা দিব

এবার চাষীর ঘরে ফসল উঠ্‌তে না উঠতেই কংগ্রেস সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রত্যেক পরিবারের জন্য মাথা-পিছু মাত্র সাত মণ হিসাবে ধান বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত ধান মণ-প্রতি সাড়ে ৭ টাকা দরেই সরকার জোর পূর্ব্বক সীজ করে নেবেন। বর্দ্ধমান উদবৃত্ত জেলা। সুতরাং বর্দ্ধমানের ক্ষেত্রে এ নীতি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োগ করা হইবে। অথচ চাষীর ধানের উপর এমন একটা নির্লজ্জ খবরদারী জারী করার সময় কংগ্রেস সরকার মোটেই ভেবে দেখলেন না যে, (১) চাষীর কাছ থেকে সরকার যে দরে জোর করে ধান নিয়ে যেতে চান, সে দরে কৃষক ধান দিতে পারে না; (২) সরকার বাহাদুর যে মূল্য-হারে ধানটি নিয়ে যেতে চাইছেন, তার আনুপাতিক মূল্য-হারে চাষীর নিত্য-ব্যবহার্য্য তেল, খইল, কাপড়, তামাক প্রভৃতি দ্রব্যগুলি চাষীকে সরবরাহ করার কোন তাগিদ বা কর্ম্মতৎপরতা সরকারের নাই, এবং (৩) সরকারের সহযোগিতা ও দুর্ব্বল নীতির ফলেই গত ৪ বৎসর ধরে কালোবাজারী, চোরাবাজারী, আমলাতান্ত্রিক, ঘুষখোরী এবং একচেটিয়া পুঁজি-পতিদের অসীম লোভ আজ দেশময় এই নিদারুণ খাদ্য ও বস্ত্রসঙ্কট সৃষ্টি করেছে। ৪ বছরের কংগ্রেসী শাসন একমাত্র বিদেশী ও দেশী পুঁজি এবং বড়লোকদের স্বার্থেই সরকারের নীতি পরিচালিত হয়ে এসেছে,—সাধারণ চাষী, মজুর, মধ্যবিত্তের স্বার্থে নয়। চাষী ও মজুরের স্বার্থে এ সরকার কি করেছে, কি করে নাই, এবং কি করা যেত, তার হিসাব-নিকাশ করলেই এ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল রূপ সহজেই ধরা যায়। এখানে শুধু ধান-চালের কথাই বলব। ধান, চাল আর সাধারণ চাষীর জীবন নিয়ে গোটা ৪ বছর কাল জাতীয় কংগ্রেস সরকার নিছক বেইমানী করেছে বললে বেশী বলা হবে না। এক দিকে পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থা সমস্ত প্রকারের যন্ত্রগুলোকে সাধারণ চাষীর ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্য দিকে "মেরে নে রে রামধনা" নীতির একনিষ্ঠ পূজারী কংগ্রেসী নেতারা চারি দিকে লুঠের ব্যবসায় ফেঁদেছে। তাই সরকারের মন্ত্রীরা চিনি আমদানির নাম করে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা চুরি করলেও তার বিচার হয় না। সরকারী সাপ্লাই বিভাগ কম দরে ৩২ লক্ষ টাকার চাল কিনে সেই চাল চড়া দরে যখন মাত্র ২১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকায় বেচে, তখন এই লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসানের জন্য তার কোন কৈফিয়ৎ তলব করা হয় না; যথাসময়ে চীন ও সোভিয়েট দেশ হতে খাদ্য-শস্য আমদানী না করে যে কংগ্রেসমন্ত্রীরা বিহার ও অন্যত্র খাবার না দিয়ে বহু লোককে হত্যা করল, সেই শয়তানদের সর্ব্বনাশা কাজের কোন তদন্ত পর্য্যন্ত হয় না, অথচ কুড়মুন ও নাসিগ্রামের চাষীরা ধানের ন্যায্য দর চাইলে তাদের উপর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হ'ল, হাট-গোবিন্দপুরের কৃষককর্ম্মীরা সভা করে বাজারের দর নিয়ন্ত্রণের দাবী করলে তাদের গ্রেপ্তার করা'র জন্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হ'ল, এবং কুচবিহারে ভুখা জনতা কোন মতে বাঁচার মত খাদ্য দাবী করলে তাদের গুলী করে হত্যা করা হ'ল। —বর্দ্ধমানের ডাক

শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা

"যদি শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তবে মহাত্মাজীর চিন্তাধারায় অনাড়ম্বরে কোন দল না করিয়া সমাজ সেবায় গঠনমূলক কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। একই আদর্শে চলিতে হইবে তাঁহার সত্য, অহিংসা ও তাহার প্রতীক চরখাকে আন্তরিক বিশ্বাস করিতে হইবে ও সেই মত কার্য্য করিতে হইবে। নচেৎ শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার বুলি ছাড়িয়া দেওয়া ভাল।" —গ্রামসেবা

স্বর্গত মৃণালিনী সরকার

হিন্দুর জাতীয় উত্তরাধিকার ভক্ত বিহারীলালের স্ত্রী ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণা মৃণালিনী দেবী ৺স্নানপূর্ণিমা তিথিতে ৪ঠা আষাঢ় পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্ জজ ৺রায়বাহাদুর বিহারীলাল সরকারের সহিত চন্দননগরনিবাসী ৺আশুতোষ ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা মৃণালিনীর বিবাহ হয়। স্বামীর ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের সহিত তাঁহার ঐকান্তিক সহযোগিতা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মৃণালিনী দেবীকে নির্লোভ স্ত্রীলোক বলিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ১৪ বৎসর ভাগবতপাঠ শ্রবণ এবং দেবালয়ে গমন তাঁহার নিত্যব্রত ছিল। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

ঘাট

—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

যুগবাণী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্ম্মার্থ। মর্ম্মার্থটুকু লতে হয়; যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা, ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মা'র মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সত্ত্বগুণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, রজঃ তমোগুণে ঈশ্বর থেকে তফাৎ করে। সত্ত্বগুণকে সাদা রংএর সঙ্গে উপমা দিয়েছে; রজোগুণকে লাল রংএর সঙ্গে; আর তমোগুণকে কাল রংএর সঙ্গে। আমি এক দিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বল কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে বললে, 'নরেন্দ্রের ষোল আনা; আর আমার এক টাকা দুই আনা।' জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কত হয়েছে? তা বললে, তোমার এখনও লালচে মারছে,—তোমার বার আনা। (সকলের হাস্য)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। জানি না বাপু। অত হিসাবে কেন? আম খাও; কত আম গাছ; কত লক্ষ ডাল; কত কোটী পাতা; এ হিসাব করা আমার দরকার কি? আমি বাগানে আম খেতে এসেছি, খেয়ে যাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। আমি বলি, 'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি জড়, তুমি চেতয়িতা; যেমন করাও তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি।' যারা অজ্ঞান তারা বলে, কতক আমি করছি, কতক তিনি করছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সাতচল্লিশ

সমস্ত সাধনার ইতি করে দিলে রামকৃষ্ণ।

আর পাখা চালিয়ে কী হবে? দক্ষিণ থেকে চলে এসেছে মলয় হাওয়া। আর কী হবে দাঁড় টেনে? ব্যাঁক কাটিয়ে অনুকূল বায়তে পাল তুলে দে নৌকোর।

সাধনের প্রথম অবস্থাতেই খাটনি। তার পরে পেনসন। প্রথমে সিঁড়ি ভাঙা, পরে পাহাড়ের চূড়ায় পরেশনাথের মন্দির।

সিদ্ধি-সিদ্ধি বললে কি হয়? সিদ্ধি গায়ে মাখলেও নেশা হয় না। খেতে হয় একটু। দুধে মাখন আছে বললেই কি মাখন হবে? দুধকে দই পেতে মন্থন করো নির্জনে।

'হরিসে লাগি রহ রে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই।'

হরিতে লেগে থাকো। লেগে থাকতে থাকতেই হরি হয়ে যাবে। বলতে বলতেই হরি ব'নে যাবে।

রামকৃষ্ণ হরি হয়ে গেছে। যে আছে সে-ই হয়েছে। এই হওয়া অর্থ থাকাটিকেই প্রকাশিত করা।

এর পর আবার সাধন কি?

বাউল বৈষ্ণবরা বলে, সাঁই। 'সাঁইয়ের পর আর কিছু নাই।'

রামকৃষ্ণেরও আর কিছু নেই। রামকৃষ্ণের পরেও আর কিছু নেই।

বৈষ্ণব বাউলরা একেই বলে সহজ অবস্থা। সহজ অবস্থার দুটি লক্ষণ। প্রথম, কৃষ্ণগন্ধ গায়ে নেই। তার মানে ঈশ্বরের ভাব অন্তরে ওতপ্রোত, বাইরে কোন চিহ্ন নেই, মুখে হরিনাম পর্যন্ত বলছে না। আর দ্বিতীয়, পদ্মের উপরে অলি বসবে অথচ মধু খাবে না। তার মানে, জিতেন্দ্রিয়, কাম-কাঞ্চনে স্পৃহা নেই। রামকৃষ্ণের এখন সেই সহজ অবস্থা।

অনেক পিত্ত জমলে ন্যাবা লাগে, তখন চার দিক হলদে দেখায়। অনেক ভক্তি জমলে মধু লাগে তখন চার দিক হরি দেখায়। শ্রীমতী যখন শ্যামকে ভাবলে, সমস্ত শ্যামময় দেখলে। আর নিজেকে [illegible] শ্যাম বোধ হল। রামকৃষ্ণ সমস্ত বিশ্ব ঈশ্বরময় দেখল, দেখল সেও ঈশ্বর। পারার হ্রদে শিসে অনেক দিন থাকলে শিসেও পারা হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ ভগবানের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থেকে ভগবান হয়ে গেল। কুমুরে পোকা ভাবতে-ভাবতে আরশুলা নিশ্চল হয়ে যায়, নড়ে না, শেষে তাকে আস্তে-আস্তে কুমুরে পোকাই হতে হয়। রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম ভাবতে-ভাবতে ব্রহ্ম হয়ে গেল। যে নিরাকার ছিল সে হয়ে দাঁড়াল নরাকার।

তার আবার সাধন ভজন কি। হরি আবার কবে হরিনাম করে।

যার খোলা নেমেছে তার আবার জ্বাল কিসের?

কিন্তু খোলা নামবে কখন? এক জন বাউল এসেছে রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ তাকে শুধোল: 'তোমার খোলা নেমেছে?'

বাউল তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

'বলি রসের কাজ সব শেষ হয়ে গেছে? যত জ্বাল দেবে তত "রেফাইন" হবে রস। প্রথম আকের রস, পরে গুড়, পরে দোলো, পরে চিনি — তার পর মিছরি—। কিন্তু, জিগগেস করি, খোলা নামবে কখন? অর্থাৎ সাধন করবে [illegible] হবে?'

বাউল শুনতে লাগল মন্ত্রমুগ্ধের মত।

'যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে। তার আগে নয়। যেমন জোঁকের উপর চুন দিলে জোঁক আপনি খসে পড়ে যায় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে ইন্দ্রিয়। [illegible] আগে নয়।'

জ্বাল নিভিয়ে খোলা নামিয়ে বসে আছে

রামকৃষ্ণ। সে এখন আকাশের মৌন। সমুদ্রের শান্তি। ধরিত্রীর সমর্পণ।

ওঁকার ধনু, আত্মা শর আর ব্রহ্ম লক্ষ্য। নির্ভুল চোখে লক্ষ্য ভেদ করতে হবে, তার পর তীরের মুখে লক্ষ্যের সঙ্গে তন্ময় হতে হবে। ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

'কিন্তু জানিস, তাঁকে যখন লাভ হয়, তখন আর ওঁ উচ্চারণ করবারও জো নেই। সমাধি থেকে অনেক নিচে নেমে না এলে ওঁ বলতে পারি না।'

শাস্ত্রে যেমন বলা আছে তেমনি দর্শন হয় রামকৃষ্ণের। কখনো দেখে জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ। কখনো দেখে চার দিকে যেন পারার হ্রদ ঝকঝক করছে। কখনো বা গলিত রূপোর স্রোত। কখনো বা গ্রহতারায় রংমশালের ফুলঝুরি। নীলিমাভ্রমের ঊর্ধ্বে কখনো বা অন্তহীন অন্তরীক্ষের শুভ্রতা।

রামকৃষ্ণ এখন একটি অখণ্ড প্রাপ্তি, একটি অখণ্ড প্রত্যুত্তর।

একটি আকাশবিস্তীর্ণ প্রশান্ত স্তব্ধতা।

কিন্তু ব্রহ্ম নিয়ে আমি কতক্ষণ থাকব? ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা। কখনো লীলায় কখনো নিত্যে—যেন ঢেঁকির পাটে ওঠা-নামা করছি। এক দিক নীচু হয় তো আরেক দিক লাফিয়ে ওঠে। যেদিকে তাকাই সেদিকে তিনি। অন্তর্মুখে সমাধিস্থ হয়ে আছি তখনো তিনি, বহির্মুখে জীবজগৎ নিয়ে আছি, তখনো তিনি। যখন আরশির এ পিঠ দেখছি তখনো তিনি, আবার যখন উলটো পিঠ দেখছি তখনো তিনি।

শিব হয়ে আছি, তিনি। জীব হয়ে আছি, তিনি।

তুষের দ্বারা আবৃত থাকলেই ধান্য, তুষ থেকে মুক্ত হলেই তণ্ডুল। জীবে-শিবে ভেদ নেই। ভেদ হচ্ছে ভ্রান্তির ফল। কোরকে যেমন পুষ্পভাব, প্রস্ফুটিত পুষ্পেও তেমনি কোরকত্ব। ঈশ্বরে যেমন জীবভাব, জীবে তেমনি ঈশ্বরভাব।

কিন্তু যাই বলো বাপু, নির্বিকল্প ব্রহ্ম হয়ে বসে থাকতে পারব না। বালকের মতন থেকেছি, থেকেছি উন্মাদের মত। কখনো জড় হয়েছি, কখনো পিশাচ। তারপর আবার নিত্য থেকে চলে এসেছি লীলায়। রামলালকে কোলে নিয়ে বেড়িয়েছি, নাইয়েছি-খাইয়েছি। হনুমান সেজে গাছে উঠে বসেছি, আস্ত-আস্ত ফল খেয়েছি। তারপর শ্রীমতী হয়ে কৃষ্ণময় হয়ে গেলাম। আবার লীলা ছেড়ে নিত্যে মন উঠে গেল। ত্যাজ্য-গ্রাহ্য রইল না। সজনে তুলসী সব এক হয়ে গেল। যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলে ফেললাম। হয়ে গেলাম সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আদি পুরুষ। সেই আদি যার আর অন্ত নেই।

সব রকম সাধনই করেছি। তামসিক, রাজসিক আর সাত্ত্বিক। জয় মা কালী, দেখা দিবিনে? দেখা যদি না দিবি তো গলায় ছুরি দেব। এই হল তামসিক সাধন। রাজসিক সাধনে নানারকম ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠানের সমারোহ। এত তীর্থ করতে হবে, এত পুরশ্চরণ এত পঞ্চতপা। আর সাত্ত্বিক সাধনা শান্তশীলের সাধনা। ফলাকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু নামটি নিয়ে নির্নিমেষ হয়ে পড়ে থাকো। নাম দিয়ে দিয়ে কাম ধুয়ে ফেল।

আর কাম ঘুচলেই মনস্কাম।

আমারই মতন রূপ কে একজন প্রবেশ করলে আমার মধ্যে। দেহের ঘটপদ্ম ফুটে উঠল তার আবির্ভাবে। নিম্নমুখ ছিল, ঊর্ধ্বমুখ হয়ে উঠল।

আমি জীবের জন্যে এসেছি জীবের মধ্যেই থাকব। থাকব "ডাইলিউট" হয়ে। আমার আপন জন কত আসবে আমার কাছে, কত আহ্লাদের দিন আছে, কত ভাবের আস্বাদের দিন। গাঁজাখোরকে দেখলে গাঁজাখোরই আহ্লাদ করে। গায়ে পড়ে কোলাকুলি করে। অন্য লোক দেখলে মুখ লুকোয়। গরু আপন জনকে দেখলে গা চাটে, অন্য লোক দেখলে ঢুঁ মারে।

আমার আপন জন সব যখন আসবে তখন আমাকে আপন ভাষায় কথা বলতে হবে। ব্রহ্ম হয়ে বোবা হয়ে থাকলে আমার চলবে কেন?

পাকা ঘির কোনো শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন আবার পাকা ঘিয়ে কাঁচা লুচি পড়ে, তখন একবার কলকল করে ওঠে। কাঁচা লুচিকে পাকা করে আবার সে চুপ হয়ে যায়।

এই ঘিয়ে পড়বে অনেক কাঁচা লুচি। তাই একটু কলকল না করে উপায় নেই।

মৌমাছি যতক্ষণ ফুলে না বসে ভনভন করে। ফুলে বসে মধু খেতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধু খেয়ে যখন মাতাল হয় তখন আবার আনন্দে গুনগুন করে।

যাচ্ছে ড্রেনের দিকে। এ কি, এ কোন পথে চলেছি? পথ কই গৃহে ফেরবার? পথ সব মুছে গেল নাকি? অথচ পিছন ফিরে শম্ভু বাবুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে পথ তো দেখতে পারছি দিব্যি। তবে এ কী পথভ্রম!

রামকৃষ্ণ ফের শম্ভু বাবুর বাড়ির ফটকের কাছে ফিরে এল। এইবার ঠিক হদিস হবে পথের। সামনে গিয়ে ডাইনে। পথঘাট তো মুখস্ত। তবে কেন বেচালে পা পড়বে? আফিঙের পুঁটলি ট্যাকে গুঁজে রামকৃষ্ণ আবার রওনা হল। আস্তে আস্তে এক পা দু পা করে, মুখস্তের জের টেনে-টেনে। কিন্তু যথাপূর্ব তথাপরং। আবার দিকভ্রম আবার পথলুপ্তি। আবার কে পা ধরে টানতে লাগল পিছন দিকে। কি, কোথায় কী ভুল হল আমার!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণের। শম্ভু বলেছিল, আমার থেকে নিয়ে যেও, তাকে না বলে আমি তার কম্পাউণ্ডারের থেকে চেয়ে নিয়ে গেছি। তাই মা আমাকে যেতে দিচ্ছেন না। ঘুরিয়ে মারছেন। আমার যে সত্যচ্যুতি হয়েছে। এ ভাবে নেওয়া তো চুরি করার সামিল।

অমনি ফিরে গেল রামকৃষ্ণ। ডিসপেনসারিতে গিয়ে দেখে সেই কম্পাউণ্ডারও নেই। দরজা বন্ধ নাকি? কে জানে। জানলা একটা খোলা আছে। সেই জানলা দিয়ে আফিঙের পুঁটলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ভিতরে। বললে, 'ওগো, এই তোমাদের আফিং রইল।'

বলে ফের মন্দিরের দিকে পা বাড়াল রামকৃষ্ণ। সমস্ত পথ এখন সড়গড়। আর কেউ টানছে না পা ধরে, ঠেলছে না এদিক-ওদিক। চোখের দৃষ্টি ফর্সা হয়ে গিয়েছে।

আমার মা আছে আর আমি আছি। আমি তো মার হাত ধরিনি, মা-ই আমার হাত ধরেছেন। নিজে না ধরে তাঁকে দিয়েই ধরিয়েছি আমাকে। তাই পা এতটুকু পড়তে দেন না বেচালে।

আমি তোমাকে ছেড়ে থাকি, কিন্তু মা, তুমি আমাকে ছেড়ে থেকো না। "মুঝে তুম মৎ ছোড়ো।"

ওরে শোন, বাঁদরের বাচ্চা হবি না, বেড়ালের বাচ্চা হবি। বাঁদরের বাচ্চা তার মাকে ধরে, মা যখন এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফায়, কখনো

তার মা ঘাড়ে কামড়ে ধরে, বেড়ালের বাচ্চার আর ভয় নেই। মা-ই তাকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে যাবে যেখানে খুশি। কভু আখার ধারে, কভু বা ছাইয়ের গাদায়, কভু বা বাবুদের বিছানায়।

তুমি কোথায়, তোমাকে ধরতে পারছি না। এই হাত বাড়িয়ে দিলাম, তুমি আমাকে ধরো।

মাঠের মাঝে আলপথ, এক গাঁ থেকে আরেক গাঁ। বাপ তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সেই আলপথ দিয়ে, গ্রামান্তরে। ছোট ছেলেটিকে বাপ কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে। বড়টি সেয়ানা, সে নিজেই বাপের হাত ধরে চলেছে। সরু পথ, পড়ে যাবার ভয়, তাই দু ছেলেই বাপের আশ্রয় নিয়েছে। যাচ্ছে-যাচ্ছে, হঠাৎ একটা শঙ্খচিল উড়ে যেতে দেখল, একেবারে ঠিক মাথার উপর দিয়ে। দেখেই দু ছেলের মহা আহ্লাদ। দু জনেই আপনা ভুলে হাততালি দিয়ে উঠল। ছোট ছেলেটা জানে, বাপ আমাকে ধরে আছে, আমার ভয় কি, আমি আনন্দে হাততালি দিই। কিন্তু বড় ছেলেটি যেই বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেল, অমনি পড়ে গেল নিচে, ঘা খেয়ে কেঁদে উঠল।

মাকে অমনি কোলে নিতে বল। মার কোলে বসে হাত ছেড়ে দে।

সারদার বাবা রামচন্দ্র রামনবমী তিথিতে মারা গেলেন। সারদার মন ভেঙে পড়ল। ভাবল আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাই।

বৈশাখ মাস, ১২৮১ সাল, সারদা আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এল।

কিন্তু থাকে কোথায়?

আর কোথায়! সেই সংকীর্ণ নবত ঘরে। চন্দ্রমণির সঙ্গে।

একরত্তি ঘর। একটুখানি দরজা। ঢুকতে-বেরুতে মাথা ঠুকে যায়। একজনে থাকবার মতও তাতে জায়গা হয় না—তা দুজনে, শাশুড়ি-বৌয়ে। এটুকু ঘরের মধ্যেই হাঁড়ি-কুঁড়ি, পোঁটলা-পুঁটলি। যত হাবজা-গোবজা। ছিকেয় ঝুলছে যত কড়া-ডেকচি। রামকৃষ্ণের জন্যে জিয়ানো মাছ পর্যন্ত। এখানে থাকতে বৌর যে বেবায় কষ্ট হবে।

কথাটা শম্ভু মল্লিকের কানে উঠল। মথুর হলে হয়তো অট্টালিকায় রাখতেন, শম্ভু মল্লিক

তুলে দিলেন। তার জন্যে জমি নিতে হল মৌরসী স্বত্বে। আড়াই শো টাকা সেলামী দিলেন শম্ভু।

জমি তো হল কিন্তু কাঠ কই?

কাঠ জোগাল কাপ্তেন। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। বিশ্বনাথ নেপালরাজের কর্মচারী। কলকাতায় ও মফস্বলে নেপালের শাল কাঠের সে জোগানদার। বেলুড়ে তার কাঠের গদি। বললে, 'যত লাগে পাঠিয়ে দেব শালের চকোর।'

লড়াইয়ে বামুনের ঘরের ছেলে। বাপ ভারতীয় ফৌজের সুবাদার। এরা লড়াইও করে আবার পূজোও করে। যুদ্ধক্ষেত্রে শিব নিয়ে যায়। এক হাতে শিব অন্য হাতে তরবার।

বেদ-বেদান্ত গীতা-ভাগবত সব কণ্ঠস্থ। তারপর ভক্তি কত! যখন পূজো করে কর্পূরের আরতি করে। পূজো করতে-করতে স্তব করে আসনে বসে। সে আরেক মানুষ। পূজো করার সময় চোখের ভাব ঠিক যেন বোলতা কামড়েছে।

কী ভক্তি! নিজের মার কাছে নিচে বসে। মা যে আসনে বসে তার চেয়ে নিচু আসন। কিংবা যে আসনে সে বসবে তার চেয়ে উঁচু আসনে মাকে বসাবে।

কী ভক্তি! রামকৃষ্ণ বরানগরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ছুটে এসে মাথার উপরে ছাতা ধরে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নানা তরকারি রেঁধে খাওয়ায়। যেখানে খাওয়ায় সেখানেই আঁচাবার ব্যবস্থা করে, উঠতে দেয় না। বাতাস করে, পা টিপে দেয়। ওদের বাড়িতে গিয়ে পাইখানায় বেহুঁস হয়ে পড়েছে রামকৃষ্ণ,—এত আচারী, তবু পাইখানায় গিয়ে ঠিকমত বসিয়ে দিয়ে এল। যদি কখনো সমাধি হয় রামকৃষ্ণের, কাপ্তেন মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সে এককালে হঠযোগ করত। তাই গুণ আছে তার হাতে।

শালের চকোর পাঠিয়ে দিল বিশ্বনাথ। একখানা আবার গঙ্গার জোয়ারে ভেসে গেল একদিন। হৃদয় দুঃখ করে বললে সারদাকে, 'তোমারে যেমন অদেষ্ট, একটা শালকাঠও ঠিকমত জোটে না।'

সারদা শুধু একটু হাসল উদাসীনের মত।

গেছে-গেছে ও শালকাঠ। বিশ্বনাথ আবার নতুন পাঠিয়ে দিলে। ঘর উঠল সারদার। চালাঘর।

শালকাঠ নিয়ে বিশ্বনাথেরও বিপদ কম নয়। গঙ্গার জোয়ারে অনেকগুলি কাঠ তার ভেসে গেছে। রাজসরকারের দারুণ ক্ষতি। এখন কী কৈফিয়ৎ দেয়া যাবে এর জন্যে, কে বলবে? কাঠের হিসেব পাঠালে না এবার বিশ্বনাথ। ঠিক করলে পরের বছরের লাভে এ লোকসানের পূরণ করবে। কিন্তু হঠাৎ কাটামুণ্ডু থেকে তার তলব এল। বিকৃত কি রিপোর্ট গেছে রাজধানীতে, বিশ্বনাথের চাকরি নিয়ে টানাটানি। সংসারী লোক, ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। নেপালে যাবার আগে এল সে দক্ষিণেশ্বরে। সেই সরল সত্যশরণের কাছে।

বললে, 'এখন উপায় বলুন।'

'উপায় খুব সোজা।' বললে রামকৃষ্ণ। 'এর চেয়ে সোজা আর হতে পারে না।'

'কি?'

'সত্য কথা বলবে। কাঠ তো আর তুমি নাওনি, গঙ্গায় নিয়েছে। তাই বলবে গিয়ে দরবারে। তোমার কিচ্ছু হবে না। মা তোমাকে, তোমার সত্যকে রক্ষা করবেন। সত্যের মত সহজ আর কিছু নেই।'

বুকের ভার নেমে গেল বিশ্বনাথের। সোজা সত্য কথা বলব এ সব চেয়ে বড় আশ্বাস। অতলস্পর্শ শান্তি।

হলও তাই। সত্য কথা বলায় তার দোষক্ষালন তো হলই, তার প্রমোশন হল। কাপ্তেন ছিল কর্ণেল হল। ফিরে এল কলকাতায় নেপালের রাষ্ট্রদূত হয়ে।

বাঙালীদের নিন্দা করে বিশ্বনাথ। নিন্দা করে ইংরিজি-পড়ুয়াদের। ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে বলে, 'এমন মাণিককে ওরা চিনল না।'

সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। আর এই সত্যেই ভগবান। সত্য কথাই কলির তপস্যা। কায়মনোবাক্যে বারো বছর সত্য পালন করলে মানুষ সত্য-সঙ্কল্প হয়ে যায়।

'আমি মাকে সব দিয়েছিলুম। জ্ঞান অজ্ঞান, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, শুচি-অশুচি, সব। কিন্তু সত্য মাকে দিতে পারলুম না। বলতে পারলুম না, এই নে তোর সত্য, এই নে তোর অসত্য। ঐ সত্য যদি ত্যাগ করি তবে মাকে যে সর্বস্ব অর্পণ করলুম সেই সত্য রাখি কিসে? সত্য ভগবানকেও

দেয়া যায় না। সত্যই তো ভগবান। তা আবার দেব কাকে?'

সেই শালকাঠের ঘরে বাস করতে লাগল সারদা। একটি মেয়ে রইল তার তত্ত্ব করতে।

সেই ঘরেই রাঁধে সারদা—রামকৃষ্ণের সেই ছিনাথ হাতুড়ে। থালা-বাটি সাজিয়ে নিয়ে যায় মন্দিরে। কাছে বসিয়ে রামকৃষ্ণকে খাইয়ে আসে। মাথা থেকে ঘোমটাটি সরে না হাওয়ায়।

দিনে-দুপুরে রামকৃষ্ণ মাঝে-মাঝে যায় সেই চালাঘরে। খোঁজ-খবর নিয়ে আসে। ঘোমটার ভিতর থেকে কথা কয় সারদা।

একদিন হল কি, বিকেলের দিকে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। আর যেমনি যাওয়া অমনি মুষলধারে বর্ষণ। সে বর্ষণ আর থামে না। মন্দিরে এখন ফিরে যাই কি করে?

না, যাব না মন্দিরে। তোমার চালাঘরটিতেই থাকব আজ। কি খাওয়াবে আজ বলো?

ঝোল-ভাত তোমার পথ্য, ঝোল-ভাতই খাবে। সারদা রেঁধে দিল ঝোল-ভাত।

খেতে-খেতে রামকৃষ্ণ বললে, 'এ কেমনতরো হল? কালীঘরের বামুনরা যেমন রাত্রে বাড়ি আসে এ যেন আমি তেমনি এসেছি।'

চালাঘরেই রাত কাটাল রামকৃষ্ণ। চালাঘর নয়, কালীঘর।

উনপঞ্চাশ

চালাঘরে থেকে সারদার কঠিন আমাশা হল। শম্ভু বাবু প্রসাদ ডাক্তারকে নিয়ে এলেন। খাওয়ালেন অনেক ওষুধপত্র। কিন্তু রোগের কিছুতেই আরাম হয় না। সবাই বলে, দেশে ফিরে যাক। সেখানকার খোলা হাওয়া আর মিঠে জল ছাড়া সারবে না অসুখ।

জয়রামবাটিতে ফিরে গেল সারদা। আশ্বিন মাস, ১২৮২ সাল। শ্যামাসুন্দরী তাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

অসুখ বেড়েই চলল। কোথায় মুক্ত হাওয়া, কোথায় মিষ্টি জল! সারদা মিশে গেল বিছানার সঙ্গে। শ্যামাসুন্দরী চোখে আঁধার দেখলেন। দেশের হাতুড়ে-রোজাদের ডাকেন এমনও বুঝি তাঁর সংস্থান নেই। আছেন শুধু দয়াময়।

সারদার দেহ বুঝি আর থাকে না। খবর পৌঁছুল রামকৃষ্ণের কাছে।

'তাই তো রে হৃদু, সারদা কেবল আসবে আর যাবে।' শান্ত স্বরে বললেন রামকৃষ্ণ, 'মনুষ্যজন্মের কিছুই তার করা হবে না।'

বিছানার থেকে আস্তে-আস্তে উঠে বসল সারদা। কাছেই গ্রাম্যদেবী সিংহবাহিনীর মন্দির। ঠিক করল সিংহবাহিনীর মাড়ে গিয়ে হত্যা দেবে। হয় রোগ নাও, নয় আমাকে নাও।

গ্রাম্যদেবীর কোনো নাম-ডাক নেই। কিন্তু আমার ডাকেই তার নাম হবে।

মা-ভাইরা যেন জানতে না পারে। চুপি-চুপি যেতে হবে মন্দিরে। কিন্তু যেতে পারব তো একা-একা? নিজের পায়ে ভর করে?

কে যেন তাকে হাত ধরে নিয়ে গেল ধীরে-ধীরে। মা-ভাইরা জানতেও পেল না।

সিংহবাহিনীর মাড়ে হত্যে দিয়ে পড়ল সারদা।

খানিকক্ষণ পড়ে থাকবার পরেই সিংহবাহিনী নেমে এল সিংহাসন থেকে। বললে, 'তুমি কেন পড়ে আছ গো?' বলে হাত ধরে তাকে তুলে দিল। 'ওলতলার মাটি একটু খাও গে, আধি-ব্যাধি সেরে যাবে।'

মাটি খেয়ে অসুখ সেরে গেল সারদার। জীর্ণ দেহ সবল হয়ে উঠল।

গ্রামে-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য। দূর-দূরান্তর থেকে আসতে লাগল আর্ত-আতুর। কেউ আমরা আগে জানিনি, আগে বুঝিনি, খোঁজ করিনি আমাদের গ্রাম্যদেবীকে। সাপের বিষ পর্যন্ত নাশ হয় ঐ মাটির ছোঁয়ায়। চল চল যাই সিংহবাহিনীর দুয়ারে।

লোকমাতা লোকের কল্যাণের জন্যে ঘুমন্ত দেবীকে জাগিয়ে দিলেন। যেমন জগতের প্রভু ভুবনের কল্যাণের জন্যে জাগিয়ে দিয়েছিলেন ভবতারিণীকে।

এ দিকে শম্ভু মল্লিকের অবস্থা সঙিন হয়ে উঠেছে ঘোর বিকার। সর্বাধিকারী এসে দেখে বললে, 'ওষুধের গরম।'

দেখতে গেল রামকৃষ্ণ। শম্ভুর বিকারাচ্ছন্ন মুখে ভেসে উঠল তৃপ্তির প্রশান্তি।

'শম্ভুর প্রদীপে আর তেল নেই।'

অসুখের গোড়ার দিকে শম্ভু বলেছিল একদিন হৃদয়কে : 'হৃদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি। কাণ্ডারী এলে তার হাতে তুলে দেব পোঁটলা। বলব ফেলে দাও ভবনদীতে। ভার হালকা করো।'

ঐশ্বর্য ছিল, আসক্তি ছিল না। সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু ওগুলোর জন্যে ভাববে কে বসে-বসে? যখন আসে আসবে যখন যাবার যাবে। যদৃচ্ছা লাভ। ঈশ্বরের যারা ভক্ত, ঈশ্বরের যারা শরণাগত, তারা কিছু ভাবে না, তাদের যদৃচ্ছা লাভ। যত্র আয় তত্র ব্যয়। এক দিক থেকে আসে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। বৈরাগ্য মানে তো শুধু সংসারে বিরাগ নয়, বৈরাগ্য মানে ঈশ্বরে অনুরাগ। যার ঈশ্বরে অনুরাগ আছে তার অন্য অঙ্গরাগে দরকার নেই।

জানিস যারা ভক্ত, তারা হচ্ছে ঈশ্বরের আত্মীয়, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ। ঈশ্বরই তাদের টেনে নেন। দুর্যোধনেরা যখন গন্ধর্বের কাছে বন্দী হল যুধিষ্ঠিরই তাদের উদ্ধার করলেন। বললেন, আত্মীয়দের ঐ অবস্থা হলে আমাদেরই কলঙ্ক।

ভক্তের আবার ভয় কি! অভাবের ভয় না, আঘাতের ভয়? না, মরণের ভয়?

ওরে ভক্তের নাশ নেই। 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

শম্ভু চলে গেল। এখন কে হবে রসদদার?

ঝি কালীর মা সেবা করে চন্দ্রমণিকে। নব্বুয়ের উপর বয়স হয়েছে চন্দ্রমণির। বুদ্ধির জড়তা এসে গিয়েছে। হৃদয়কে দেখতে পারে না দু চক্ষে। কি করে তাঁর ধারণা হয়েছে অক্ষয়কে ওই মেরে ফেলেছে। এখন বলছে রামকৃষ্ণ আর সারদাকেও সে মেরে ফেলবে। মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণকে বলে গলা নামিয়ে, হৃদয়ের কথা কখখনো শুনবি না। ও শত্তুর।'

রাসমণির বাগানের কাছেই আলমবাজারের পাটের কল। দুপুরে কলে সিটি বাজে। সেই সিটিকে চন্দ্রমণি বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি বলে। ঐ সিটি না শোনা পর্যন্ত খেতে বসে না। কেউ অনুরোধ করলে বলে, 'এখন কী খাব গো? লক্ষ্মীনারাণের ভোগ হয়নি, বৈকুণ্ঠে শঙ্খ বাজেনি, এখন কি খাওয়া যায়?' যেদিন কলের ছুটি থাকে সেদিন আর বাঁশি বাজে না। সেদিন চন্দ্রমণিকে খাওয়ানো শক্ত হয়ে ওঠে। বৈকুণ্ঠের শঙ্খ নেই আমারও খাওয়া নেই।

রামকৃষ্ণ তখন নানারকম কৌশল করে। ছোট মেয়েকে যেমন করে ভোলায় তেমনি করে পাশে বসিয়ে খাওয়ায় মাকে।

রোজ ভোরে উঠে মাকে দর্শন চাই রামকৃষ্ণের। কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর কাছে থেকে তাঁকে সেবা করা চাই স্বহস্তে। আর কত দিন মার পাদপদ্ম স্পর্শ করা যাবে মা-ই জানেন।

হৃদয় দেশে যাবার জন্যে তোড়জোড় করছে। বাঁধছে বোঁচকা-বুঁচকি। হাটের থেকে নানা দ্রব্য কিনে এনেছে। না গেলেই নয়। শুনতে পেয়েছে দেশে কি-এক বেধেছে মোকদ্দমা।

রামকৃষ্ণের কাছে গেল অনুমতি চাইতে।

'মামা, যাব?'

'না।' রামকৃষ্ণ বারণ করল।

'কেন বারণ করছ?'

রামকৃষ্ণ কারণ বললে না।

হৃদয় যত জিদ করে, রামকৃষ্ণ তত স্তব্ধ হয়।

শেষকালে হৃদয় গেল খাজাঞ্চির কাছে। মামা না বললে কি হয় খাজাঞ্চি যদি ছুটি দেয়, তবেই হল। খাজাঞ্চি ছুটি মঞ্জুর করল। আর হৃদয়কে পায় কে?

সন্ধের সময় রামকৃষ্ণ নবতে এল। এল মার কাছটিতে।

সুরু করল যত সব পুরোনো কথা, গাঁ-ঘরের কথা, পাড়া-পড়শীর কথা। পুরোনো কথার মত এমন আর কী ভালো লাগে মায়েদের। ছেলেদের ছেলেবেলার কথায় এলে মায়েদের আর থামায় কে!

রাত বাড়ছে, তবু কথায় মত্ত মায়ে-পোয়ে।

মন্দির থেকে হৃদয় ডাকাডাকি সুরু করল। কি গো মামা, খাবে না? খেতে এস।

মাকে ছেড়ে তবু উঠে যেতে মন ওঠে না রামকৃষ্ণের। মার কাছটিই যেন কাশীধাম।

হৃদয়ের চীৎকার তীব্রতর হল।

'আমারটা রেখে তোরা দু জনে খা গে।' বললে রামকৃষ্ণ।

তোরা দু জনে মানে হৃদয় আর রামলাল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর রামলাল এসে পূজারী হয়েছে দক্ষিণেশ্বরে।

আমি আরো একটু বসি মার কোল ঘেঁসে। আরো একটু কথা শুনি।

রাত প্রায় দুপুর, মাকে ঘুম পাড়িয়ে রামকৃষ্ণ

ফিরে এল নিজের ঘরে। খেয়ে-দেয়ে শুলো নিজের বিছানায়।

কিন্তু হৃদয়ের চোখে ঘুম নেই। কেবল এ পাশ ও পাশ করছে। রাত যত বাড়ছে তত বাড়ছে হৃদয়ের ছটফটানি। কে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে বেঁধে ধরেছে বিছানায়, ছাড়া পাবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ছে ক্ষণে-ক্ষণে।

রামকৃষ্ণের পাশের বিছানা হৃদয়ের। রামকৃষ্ণ দেখেও দেখছে না।

এক ঝটকায় উঠে পড়ল হৃদয়। ঘরের কোণে গাঁঠরি বাঁধা, কাল ভোরেই সে রওনা হবে ঠিকঠাক। সহসা সে ক্ষিপ্র হাতে গাঁঠরির বাঁধনগুলি খুলে ফেলতে লাগল। আর বাঁধনও কি একটা দুটো! যেমন যত রাজ্যের জিনিস পেয়েছে পূরেছে তেমনি এঁটেছে দড়িদড়ার গোরপ্যাঁচ।

টেনে খিঁচে ছিঁড়ে খুলতে লাগল দড়ির জট।

রামকৃষ্ণ জিগগেস করল, 'কি হল?'

'কী হল! বিছানায় শুতে পাচ্ছি না। যতক্ষণ এ বাঁধনগুলো না যাচ্ছে ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। গাঁঠরির মতই দড়ি দিয়ে কে আমাকে বেঁধেছে নাগপাশে—'

'বাড়ি যাবি না?'

'আর গেছি! মনে একটা ইচ্ছে হলেই যদি কেউ বাগড়া দেয়, তাহলে বাঁচি কি করে?'

বন্ধন মুক্ত হয়ে হৃদয় ফের ফিরে এল বিছানায়। বললে, 'কিন্তু কেন যে বাড়ি যেতে দিলে না বুঝতে পারলুম না।'

'পারবি। ভোর হোক।'

নিজে আগে ভোরে উঠে কালীর মাকে জাগিয়ে দেয় চন্দ্রমণি। সেদিন কালীর মা-ই আগে উঠল। বেলা এক-পা হতে চলল তবু চন্দ্রমণির সাড়া নেই। ডাকাডাকি করতে লাগল কালীর মা। তবু দরজা খোলে না।

দরজায় কান পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কালীর মা। শুনতে পেল গলার একটা ঘড়ঘড় শব্দ। ছুটে গেল হৃদয়কে খবর দিতে।

বার থেকে কী কৌশলে হৃদয় খুলে ফেলল হুড়কো দেখল চন্দ্রমণির শেষ অবস্থা।

ওষুধ আর গঙ্গাজল দিতে লাগল ফোঁটা-ফোঁটা করে।

তিন দিন কাটল এমনি অবস্থায়। হৃদয় অসুরের মত যুঝতে লাগল যমের সঙ্গে।

রামকৃষ্ণ বললে, এবার অন্তর্জলি করা হোক। চন্দ্রমণিকে নিয়ে চলল গঙ্গায়। যাবার আগে ফুল চন্দন আর তুলসী দিয়ে মার পায়ে অঞ্জলি দিলে রামকৃষ্ণ।

পুত্রকে শিয়রে রেখে মা চোখ বুজলেন।

রামলাল ফুল নিয়ে এল, হৃদয় নিয়ে এল শ্বেত চন্দন। মার পা দুখানি গঙ্গাজলে ধুয়ে তাতে রামকৃষ্ণ ঘন করে চন্দন মাখিয়ে ছিল। এ জল চোখের জল আর এ চন্দন ভক্তির চন্দন, ভালোবাসার চন্দন।

'যে দেহ থেকে আমার দেহের প্রকাশ সেই দেহ আজ মিশে গেল পঞ্চভূতে।'

এঁড়েদার শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল চন্দ্রমণিকে। রামলাল মুখাগ্নি করলে, সংকার করলে। রামকৃষ্ণ যে সন্ন্যাসী।

রামলালই শ্রাদ্ধ করল বৃষোৎসর্গ।

রামকৃষ্ণ অশৌচ পর্যন্ত পালন করেনি। প্রেতপিণ্ড দেওয়া তো দূরের কথা।

পুত্রোচিত কোনো কার্যই করলাম না মার জন্যে। মনের ভিতরটা খচখচ করছে রামকৃষ্ণের। অন্তত একটু তর্পণ করি মাকে।

গঙ্গায় নামল রামকৃষ্ণ। পিছনে অগণন লোক। রামকৃষ্ণের মাতৃতর্পণ দেখবে।

জলের অঞ্জলি নেবার জন্যে গঙ্গায় হাত ডোবাল রামকৃষ্ণ। কিন্তু যেই অঞ্জলিবদ্ধ হাত উপরে তুললে অমনি হাতের আঙুলগুলি অসাড়, শিথিল হয়ে গেল। এঁকে বেঁকে ফাঁক হয়ে গেল। সব জল পড়ে গেল ফাঁক দিয়ে। যতক্ষণ জলের মধ্যে থাকে হাত ঠিক বদ্ধাঞ্জলি থাকে, যেই জল নিয়ে উপরে ওঠে আঙুলগুলি অমনি কাঠির মতন শক্ত হয়ে প্রসারিত হয়ে পড়ে। এক বিন্দু জল বন্দী হয় না। বারবার চেষ্টা করেও পারছে না কিছুতেই।

ডুকরে কেঁদে উঠল রামকৃষ্ণ। 'মা গো, তোর জন্যে কি কিছুই করতে পারব না?'

কোনো দোষ স্পর্শেনি তোমাকে। তুমি গলিত-হস্ত। বললে এসে পণ্ডিতেরা। তুমি অধ্যাত্মসাধনার চূড়ায় এসে উঠেছ।

তুমিই 'শ্রদ্ধয়াগ্নি সমিধ্যতে।' তুমিই শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ'। [ক্রমশঃ।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

নকুল—বেজী, নেউল, চতুর্থ পাণ্ডব।
নক্ত—রাত্রি, নিশি, রজনী, যামিনী।
নক্র—কুম্ভীর, কুমীর, ঘড়িয়াল, জলহস্তী।
নখ—নখর, অঙ্গুলির অগ্রভাগ।
নখরঞ্জনী—নরুণ, নখচ্ছেদনাস্ত্র।
নখশূল—আঙ্গুল-হাড়া, কুণী।
নখায়ুধ—বৃহন্নখবিশিষ্ট জন্তু, নখী।
নগ—বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি, অচল।
নগণ্য—অবজ্ঞেয়, তুচ্ছ, হেয়, অগণ্য।
নগর—নগরী, পুরী, গ্রামাদি।
নগ্নিকা—অজাতঋতুকা কন্যা, উলঙ্গিনী।
নচেৎ—নতুবা, অন্যথা, যদি নহে।
নট—নর্ত্তক, নৃত্যকারী, অভিনেতা।
নটী—নর্ত্তকী, অভিনেত্রী, বারস্ত্রী, বেশ্যা।
নট্যালয়—গণিকা-গৃহ, বেশ্যালয়।
নত—নম্র, ভূমিষ্ঠ, বক্র, বিনত, বিনম্র।
নথ—নারীর নাসিকাভরণ-বিশেষ।
নদ—নদী, গাং, স্রোতস্বতী, নিম্নগা।
ননদ—ননদী, ননদিনী, পতির ভগিনী।
ননী—নবনী, নবনীত, মাখন।
নন্দ—হর্ষ, কুশল, আমোদ, আনন্দ।
নন্দী—আহ্লাদিত, শিবের অন্যতম অনুচর।
নপ্তা—নপ্তৃ, নাতী, পৌত্র, দৌহিত্রাদি।
নব—নূতন, আধুনিক, নবীন, নবম।
নবান্ন—নূতন অন্নের উৎসর্গ পার্ব্বণ।
নভঃ—অন্তরীক্ষ, আকাশ, গগন।
নমঃ—গড়, বন্দনা, দণ্ডবৎ, নমস্কার।
নয়ন—চক্ষু, লোচন, নেত্র, আঁখি, আনয়ন।
নরক—পাপভোগের স্থান, নিরয়।
নরপতি—রাজা, ভূপতি, নরাধিপ, নরেন্দ্র।
নরম—মৃদু, শিষ্ট, নম্র, কোমল।
নর্দ্দমা—পয়নালা, নালা।
নর্ম্ম—কৌতুক, লীলা, পরিহাস।
নশ্বর—নাশ্য, অস্থায়ী, অচির।
নস্য—তাম্রকূটচূর্ণ, নাস।
নাওন—স্নান করণ, অবগাহন।
নাগ—সর্প, ভুজঙ্গ, সাপ।
নাচ—নৃত্য, নাট, অঙ্গভঙ্গি।
নাট্য—নৃত্য, নৃত্যবৃত্তি।
নাট্যমন্দির—নাট্যালয়, নাট্যশালা, নৃত্যালয়।
নাড়ী—উদরস্থ শিরা, হস্তের প্রধান শিরা।
নাতি—অপত্যের পুত্র, পৌত্র।
নাথ—স্বামী, ভর্ত্তা, প্রভু, কর্ত্তা।
নাদ—শব্দ, গর্জ্জন, গোময়।
নানা—অনেক, বিবিধ, বহু, ভিন্ন ভিন্ন।
নান্দী—প্রস্তাবনা, নাটকাদির মঙ্গলাচরণ।
নান্দীমুখ—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।
নাবিক—কর্ণধার, কাণ্ডারী, মাঝী।
নাভি—উদরের মধ্যস্থান, চক্রমধ্য।
নাম—আখ্যা, কীর্ত্তি, সংজ্ঞা, পদবী।
নামকরণ—অন্নপ্রাশন, নাম দেওন।
নামন—অধোগমন, অবরোহণ, নাবন।
নায়ক—অধ্যক্ষ, কর্ত্তা, স্বামী, পুরুষ।
নায়িকা—সখী, স্ত্রী, ভার্য্যা, পত্নী, নারী।
নারীধর্ম্ম—স্ত্রীধর্ম্ম, ঋতু, রজঃ।
নাশ—বিনাশ, ধ্বংস, হত্যা, মরণ, ক্ষতি।
নাসিকা—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাক।
নাস্তিক—অনীশ্বরবাদী, শাস্ত্রনিন্দুক।
নিঃ—বহির্গমন, বাহিত্যবোধক শব্দ।
নিঃশব্দ—নীরব, অবাক, মৌনী, স্তব্ধ।
নিঃশেষ—সম্পূর্ণ, শেষরহিত।
নিকট—অদূর, অভ্যর্ণ, কাছ।
নিকার—অপকার, নিষেধ।
নিকৃত—শঠ, ধূর্ত্ত, দুষ্ট, অধম।
নিকৃষ্ট—অবজ্ঞাত, অধম।
নিক্তি—পরিমাণ-যন্ত্র, তুলাকোটি।
নিক্ষেপ—ফেলা, আধি, নিক্ষিপ্ত করণ।
নিখুঁত—নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক।
নিগূঢ়—গুপ্ত, দুজ্ঞেয়।
নিগ্রহ—দণ্ড, দমন, ক্লেশ।
নিচয়—সমূহ, নিবহ, সকল, রাশি।
নিঠুর—নিষ্ঠুর, কঠিন, নিদারুণ, নির্দয়, কৃপাহীন।
নিত্য—অনশ্বর, জন্মমৃত্যুরহিত।
নিদর্শন—আদর্শ, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ।
নিদাঘ—গ্রীষ্ম, গুমট, ঘর্ম্ম।
নির্দ্দিষ্ট—আজ্ঞাপিত, কথিত, নিরূপিত।
নিদেশ—আজ্ঞা, কথা, উল্লেখ, নির্দ্দেশ।
নিদ্রা—ঘুম, তন্দ্রা, নিদ।
নিনাদ—রব, শব্দ, গর্জ্জন, ধ্বনি, নাদ।
নিন্দা—অপবাদ, দোষ কথন।
নিপুণ—পটু, দক্ষ, পারগ।
নিবর্ত্ত—বিরত, নিষেধ, ক্ষান্ত, দমন, শান্ত।

[ক্রমশঃ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও হিন্দী ভাষা

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা আরম্ভ হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের কয়েকটি আধুনিক বিশিষ্ট ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার ও তাহা প্রকাশের কাজে লোকে প্রেরণা পায়। যাহাতে স্বার্থবান লোকে শাসক ও শাসিত—উভয়কেই শোষণ করিতে না পারে, সেজন্য ও দেশের শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির নিমিত্ত কর্তৃপক্ষস্থানীয় লোকদিগকে দেশের লোকের ভাষা ও প্রথার সহিত পরিচিত করা আবশ্যক হয়। সেজন্য ১৭৯৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর সরকারী বিভাগ হইতে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন বাহির করা হয় ;—"দেশীয় ভাষার নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত পরীক্ষা পাশ না করিলে ১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কোন কর্ম্মচারীই তাহার পদের (কোন্ কোন্ বিভাগের, সে কথা পরে জানান হইবে) যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ঐ সকল দেশীয় ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক হইবে।" আদালতের কাজের জন্য হিন্দুস্থানী ও পারসী ভাষার জ্ঞান আবশ্যক বলিয়া জানান হয়। কোম্পানীর অধীনে নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা (রাইটারগণ) ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিশেষ ভাবে অনুমোদিত শিক্ষক ও মুন্সীদের নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে ঐ শিক্ষা নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক করিবার চেষ্টা করা হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময় অন্ততঃ কয়েক জন শিক্ষককে তাঁহাদের কাজ চালাইয়া যাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও যোগ্য দেখা যায়। সে সময় শিক্ষক ও ছাত্রদের সাহায্যার্থে কোন পাঠ্যপুস্তক ও সাহায্যকারী কোন পুস্তকও ছিল না। ঐ সকল শিক্ষকদের মধ্যে জন বি গিলক্রাইষ্টের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিলক্রাইষ্ট ১৭৮৩ সালের পরবর্ত্তী কোন সময়ে বোম্বে ডিট্যাচমেণ্টের অধীনে এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত হন। ১৭৮৫ সালে তিনি হিন্দী ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। তিনি যাহাতে হিন্দী ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার কাজ শেষ করিতে পারেন, সেজন্য তাঁহাকে ১২ মাসের ছুটী দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। ১৭৮৬ সাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার কার্য্যে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারেন। গভর্ণর জেনারেলকে তাঁহার লিখিত একখানি চিঠি হইতে তাহা জানা যায়। ১৭৮৭ সালের জুন মাসে তিনি গভর্ণর জেনারেলকে লিখেন, ৩ বৎসর অনবরত পরিশ্রম করিয়া তিনি তাঁহার পুস্তকের প্রথম খণ্ড শেষ করিয়াছেন।

তিনি তাঁহার কার্য্যে সুবিধা পাইবার আশায় বারাণসী জমীদারীতে কোন স্থানে বাস করিবার এবং তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহাতে অর্থ উপায়ের বা আর্থিক সুবিধা লাভের কোন সম্ভাবনা না থাকায় নীল চাষের অনুমতি প্রার্থনা করেন। উভয় প্রার্থনাই পূর্ণ করা হয়। বোর্ড তাঁহাকে বারাণসীতে বাস করিয়া [illegible] ঐ গিলক্রাইষ্টকে নিজের নামে নীল চাষ করিবার অনুমতি দেন। নীল চাষ এদেশে তখন নূতন। গিলক্রাইষ্ট ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে কয়েক বৎসর বাস করার ফলে নীল চাষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন।

ইহার পর গিলক্রাইষ্টকে গাজীপুর হইতে পত্র লিখিতে দেখা যায়। তিনি সে পত্রে অনুরোধ করেন যে, কাপ্তেন কার্কপ্যাট্রিকের পরিকল্পিত পুস্তকের ২ শত খণ্ড লইবার জন্য কোম্পানী যে ১২ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, সেই টাকাটা যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়। কারণ, কাপ্তেন ইতিমধ্যেই বোর্ডকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কাপ্তেন সময় ও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবার শক্তির অভাবে তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় ক্ষান্ত হন। গিলক্রাইষ্ট আরও জানান, স্থানীয় লোকে আর্থিক সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহা না পাওয়ায় তিনি তাঁহার নিজের কাজ চালাইতে পারিতেছেন না।

১৭৯১ সালের পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার অভিধান রচনার কাজ শেষ করেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়। এজন্য তিনি তাঁহার অভিধানের গ্রাহকদিগকে প্রতি খণ্ডের জন্য আরও ১০ টাকা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানান। প্রথমে মূল্য ধরা হইয়াছিল সমগ্র অভিধানের জন্য ৪০৲ টাকা। গ্রাহকরা সে অনুরোধ অনুসারে কাজ করেন। গিলক্রাইষ্ট ইহার পর অনতিবিলম্বে ব্যাকরণ ও পরিশিষ্ট প্রকাশ করেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে ভারত সরকারের কাগজ-পত্রে আবার গিলক্রাইষ্টের নাম দেখা যায়। সরকারের নূতন কর্ম্মচারীরা (জুনিয়র রাইটারগণ) হিন্দুস্থানী ও পারসী ভাষায় কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করি[illegible] মুন্সীর নিকট ঐ দুই ভাষা অধ্যয়নের উপযুক্ত হইবার প[illegible] তাহাদিগকে প্রত্যহ ঐ দুই ভাষা শিক্ষা দিবার এক প্রস্তাব [illegible] করেন। ঐ সকল কর্ম্মচারীকে মুন্সীর নিকট হইতে ভাষা শি[illegible] জন্য যে ভাতা দেওয়া হইত, গিলক্রাইষ্টকে তাঁহার পারিশ্রমিক[illegible] ঐ ভাতার টাকা লইতে দেওয়া হয়। ১৭৯৯ সালের ১লা জানু[illegible] ঐরূপ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয়। বৎসরের শেষে পরীক্ষা লওয়ার [illegible] হয়। কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংএর এক কক্ষ গিলক্রা[illegible] ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয় ; তিনি সেখানে বাস করিবে[illegible] জুনিয়র রাইটারদিগকে সপ্তাহে ৬ দিন ভাষা শিক্ষা দিবেন, [illegible] হয়। ঐ কর্ম্মচারীরা শিক্ষা গ্রহণের সময় তাহাদের নিজ নিজ অ[illegible] নির্দ্দিষ্ট কার্য্যও করিয়া যাইত। গিলক্রাইষ্টকে তাঁহার ক্লাসে ছা[illegible] উপস্থিতির হিসাব হাজিরা-বহিতে রাখিতে হইত। গভর্ণর জে[illegible] মাসে একবার করিয়া ছাত্রদের অধ্যয়নের উন্নতির অবস্থা প[illegible] করিতে যাইতেন।

গিলক্রাইষ্টের ঐ ক্লাসই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের [illegible] অবস্থা। ১৭৯৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত কোন নাম স্থির হয় [illegible] গভর্ণর জেনারেল ১৮০০ সালের প্রথম দিকে বোর্ডকে [illegible] যে, তিনি ১৮০০ সালের ১লা জুন গিলক্রাইষ্টের ছাত্র[illegible]

কোম্পানীর জুনিয়ার সিভিল সার্ভ্যাণ্টদের হিন্দুস্থানী ভাষার পরীক্ষার দিন স্থির করিয়াছেন। পরীক্ষায় যাহারা ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিতে পারিবে, তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

১৮০০ সালের ৪ঠা মে কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮০০ সালের ১৮ই আগষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়। উহার পর গিলক্রাইষ্টের ও মুন্সীদের ভাতা প্রভৃতির ও অন্যান্য ব্যয় কলেজের হিসাবে ধরা হইতে থাকে। ১৮০৩ সালের ডিসেম্বর মাসের হিসাবে দেখা যায়, প্রধান প্রতিষ্ঠানটিতে ছিলেন—হিন্দুস্থানী মুন্সীরা—৩৩ জন মুন্সী, ৩ জন অনুবাদক ও ১ জন নাগরী লেখক। কেরী তখনও বিশিষ্ট স্থান পান নাই এবং গিলক্রাইষ্টও কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন না। গিলক্রাইষ্ট ১৮০৩ সালের নভেম্বর মাসের জন্য হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক হিসাবে ১৫০০ টাকা, তাঁহার প্রথম সহকারী কাপ্তেন মাওয়াট ও তাঁহার দ্বিতীয় সহকারী এনসাইন ম্যাক ডাউগ্যাল যথাক্রমে ১০০০ ও ৮০০ টাকা, উইলিয়াম কেরী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার শিক্ষকরূপে ৫০০ টাকা মাত্র পান। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মাহিনা যদি পদ-মর্য্যাদা সূচিত করে, তাহা হইলে উক্ত হিসাব হইতে কর্তৃপক্ষের নিকট অধ্যাপকদের পদের আপেক্ষিক গুরুত্বের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ১৮০৭ সালের মধ্যে মাহিনার হারের অনেক উন্নতি করা হয় এবং কোলব্রুক পদত্যাগ করিলে কেরীকে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক করা হয়।

গিলক্রাইষ্ট জুনিয়ার রাইটারদের নিয়মিত অধ্যাপনার সময় কয়খানি পুস্তকও প্রকাশ করেন। সাদীর নৈতিক উপদেশের কবিতা-পুস্তকখানি তিনি হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাহার নাম দেন "হিন্দী মর‍্যাল প্রিসেপ্টর" বা হিন্দী নৈতিক উপদেশক। বহু প্রাচ্য ভাষার শব্দাবলীর সঠিক উচ্চারণ শীঘ্র শিখিবার নির্দ্দিষ্ট ও কার্য্যকরী নীতিসম্মত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রথার পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া তিনি আর একখানি বই লিখেন। তাহার নাম দেন "হিন্দী-রোম্যান অর্থো-এপিগ্রাফিক্যাল আলটিমেটাম" অর্থাৎ হিন্দী-রোম্যান শব্দের শুদ্ধোচ্চারণ সম্বন্ধে শেষ কথা।

"হিন্দু ষ্টোরি টেলার" পুস্তকে তিনি জনপ্রিয় এক শত প্রাচীন কাহিনী, উপাখ্যান, রহস্য, নীতি-বাক্য ও বহুল-প্রচলিত প্রবাদ রোম্যান, নাগরী ও পারসী—তিন রকম বর্ণমালায় পর পর প্রদান করেন। হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ ও অভিধান প্রভৃতির গ্রন্থকার "ষ্ট্রেঞ্জার্স ইষ্ট ইণ্ডিয়ান গাইড টু হিন্দুস্থানী" বা হিন্দুস্থানী ভাষার পথি-প্রদর্শক নামে আর একখানি বইও লিখেন। পুস্তকখানি ১৮০২ সালের জুলাই মাসে হিন্দুস্থানী প্রেসে মুদ্রিত ও প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি সার জর্জ বারলোর নামে উৎসর্গ করা হয়। হিন্দুস্থানী ভাষার উচ্চারণ ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে সার জর্জের বিশেষ পাণ্ডিত্যের কথা উৎসর্গ-পত্রে উল্লেখ করা হয়। সার জর্জের এই প্রশংসা হইতে বুঝা যায়, বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীরা সে সময় এই ভাষা শিখিবার বিষয়ে কিরূপ আগ্রহশীল ছিলেন। গিলক্রাইষ্ট তখনও হিন্দুস্থানী ও হিন্দীর পার্থক্য প্রদর্শনে ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার পুস্তকে সপ্তাহের বারগুলির নাম তিন রকম ভাষায়—হিন্দুস্থানী, হিন্দী ও ইংরেজীতে ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ এতোয়ার—রবিবার—সাণ্ডের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮০২, ১৮০৮ ও ১৮২০ সালে বইখানির ৩টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তাঁহার কাজের জন্য তাঁহাকে যে শক্তিক্ষয় করিতে হইত, তাহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৮০৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারীর নিকট তাঁহার পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করেন। কলেজ-কাউন্সিল তাঁহার পদত্যাগ-পত্র কলেজের পরিদর্শক গভর্ণর জেনারেলের নিকট পাঠাইবার সময় গিলক্রাইষ্টের উৎসাহ, কার্য্যদক্ষতা ও কলেজের কার্য্যে বরাবর তাঁহার মনোযোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্বাস্থ্যহানির জন্য ইংলণ্ড যাত্রার অনুমতি দেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালেও তিনি হিন্দী ভাষা চর্চার আগ্রহ একেবারে ত্যাগ করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি তাঁহার কতকগুলি পুরাতন পুস্তকের সংশোধন করিয়া সেগুলি প্রকাশ করেন। তাহা ছাড়া, তিনি কোম্পানীর এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জেন ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের বিনা পারিশ্রমিকে ভাষা শিখাইতেন। শীত ও গ্রীষ্ম কালের ৬ মাসের মধ্যে ২ মাসে তিনি ২৪ দিন করিয়া শিক্ষা দিতেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রণেতা এলফিনষ্টোন গিলক্রাইষ্টকে হিন্দী ফাইলোলজির (শব্দবিদ্যার) প্রতিষ্ঠাতা ও বিভিন্ন গ্রন্থ-রচয়িতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফাইলোলজির নীতি অনুসারে হিন্দুস্থানী ভাষার অনুশীলনে তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। বর্ণমালা সম্বন্ধে তাঁহার একটি নিয়মিত পরিকল্পনা ছিল। সে-সম্বন্ধে পাঠকগণকে "হিন্দুস্থানী ফাইলোলজী"র উপক্রমণিকা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহার মধ্যে ইংরেজী-হিন্দুস্থানী অভিধান ও ব্যাকরণের কথা প্রভৃতি আছে। মাদ্রাজের লেফটেন্যাণ্ট টমাস রোবাক ও বাঙ্গালার সিভিল সার্ভিসের জে বি ইলিয়ট তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার এই গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেন। ইলিয়ট পূর্ব্বে তাঁহার ছাত্র ছিলেন। গিলক্রাইষ্ট এই পুস্তকে লিখেন, "পারসী-আরবী ও নাগরী—উভয়েই নানা দিকে এত ত্রুটিপূর্ণ যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় কলেজে আমি যে সকল সংশোধন ও পার্থক্য-বোধক চিহ্নের প্রবর্ত্তন করি, সে সকল তাহাতে আবশ্যক। এই পুস্তকে সে সকল চিহ্ন প্রভৃতি আছে। ঐ সময় হইতে বাঙ্গালায় হিন্দুস্থানী প্রেস হইতে যে সকল পুস্তক প্রকাশ করা হয়, সে সকলেও ঐ সকল চিহ্ন প্রভৃতি আছে।"

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপনায় গিলক্রাইষ্ট ব্যতীত আরও অনেক ইউরোপীয় বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। তাঁহার অনেক সাহায্যকারীর মধ্যে ইউরোপীয়গণ ছিলেন। তাঁহারাও হিন্দী ভাষার উন্নতির জন্য তাঁহার সহিত একযোগে কাজ করেন। গিলক্রাইষ্ট তাঁহার পদত্যাগ-পত্রে লিখেন, কলেজের ছাপাখানা ও হিন্দুস্থানী প্রেসের দায়িত্ব অন্যান্যদের সহিত ডাঃ হাণ্টারেরও উপর ছিল। ডাঃ হাণ্টার কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও ছাপাখানা হইতে কতিপয় পুস্তক প্রকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। ১৮০৫ সালে মিঃ ম্যাকডাউগ্যালের স্বাস্থ্যহানি-জনিত অনুপস্থিতির সময় তিনি অস্থায়ী ভাবে হিন্দুস্থানী ভাষার সহকারী অধ্যাপক ছিলেন।

গভর্ণমেণ্ট ও ডাঃ উইলিয়াম হাণ্টারের মধ্যে কিছু পত্র-বিনিময় হয়। পত্রে ডাঃ হাণ্টার হিন্দুস্থানী-ইংরেজী অভিধান রচনার প্রস্তাব

করেন। নাগরীর পরিবর্ত্তে তিনি পারসী বর্ণমালার বিন্যাস পছন্দ করেন। অক্ষরান্তরিতকরণ সম্বন্ধে তিনি স্যর উইলিয়াম জোন্সের প্রথার স্থানে গিলক্রাইষ্টের প্রথা ভাল বলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হিন্দুস্থানী বিভাগে গিলক্রাইষ্টের প্রথাই প্রচলিত ছিল। কলেজ-কাউন্সিল তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু ব্যয়-বহুল বিবেচিত হওয়ায় সে কল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

তখন বিভিন্ন ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় বাৎসরিক বাদ-প্রতিবাদ হইত। হিন্দুস্থানী ভাষায় এইরূপ বাদ-প্রতিবাদের একাধিক আলোচনার বিবরণ এখনও বর্ত্তমান। সতী-প্রথা সম্বন্ধে মাদ্রাজের মিঃ ডবলিউ চ্যাপলিন ১৮০৩ সালের ২৯শে মার্চ তাঁহার অভিমত প্রকাশ করেন। উহার কয়েক ছত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"আগে মেরা কহনা বৃথা হৈ ক্যি মৈঁ জানতা হুঁ তুমহারে জীমেঁ বোহী ধ্যান হৈ জো মেরে হিরদে সমায়া হৈ ইস্ কারণ মৈঁ সুননে কো লোভ রখতা হুঁ কে মহাবাক্যোঁ মৈঁ দেখুঁ তো তুম কৈসী কৈসী পকড় করতে হো যিহ মৈঁ বিন লগাব কহতা হুঁ জো কোঈ মেরে বাদকো কুছভী হটাবে বোহী বড়া জ্ঞানী হৈ।"

লালুজীর "রাজনীতি" হইতে একটি স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা হইতে উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশের ভাষার অপরূপতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। নীচের অংশে ভাষার ভঙ্গী স্পষ্ট। ইহা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ভাল ও পড়িতেও আরামপ্রদ।

"কর্পূর দ্বীপকে মাঁহি পীদ্মাকেল নাম এক সরোবর হৈ। তাহু মধ্যে বহাঁকে সব পংছিয়ন মিলি এক হিরণ্যগর্ভ নাম হংস কো রাজা কিয়ো। সো হুঁ। রাজকরনে লাগ্যো। কাহে হৈ জহাঁ রাজা ন হোয় তহাঁ কী প্রজা সুখসে। ন রহৈ। জৈসে সমুদ্রমেঁ বিনা কেবট নাব না চলে তৈসে সংসারমেঁ ভু রাজা বিন ধর্ম ন নিভৈ। রাজা প্রজা কো নিত নিত অধিকারে চাহৈ নিজ পুত্রকো সমান জান। আক জো রাজা প্রজা কো পালন করি ন রাখে সো জগৎ মেঁ প্রতিষ্ঠা ভু ন পাবে।"

প্রধানতঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া যে সকল পুস্তক প্রকাশ করা হয়, তাহার কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

হিন্দী ম্যানুয়াল বা ভারতের রত্নপেটিকা ; হিন্দুস্থানী গ্রন্থকারদের গদ্য হইতে উদ্ধৃত কতিপয় অংশ ; ১৮০২ সালে কলিকাতায় জন গিলক্রাইষ্টের তত্ত্বাবধানে সঙ্কলিত।

হিন্দী স্টোরি টেলার ; গ্রন্থকার জন গিলক্রাইষ্ট, ২ খণ্ডে সমাপ্ত, কলিকাতা, ১৮০২ সাল। হিন্দুস্থানী ভাষায় রোম্যান, পারসী ও নাগরী বর্ণমালার ব্যবহার।

ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট ; জন গিলক্রাইষ্টের তত্ত্বাবধানে সঙ্কলিত : রোম্যান হরপ, পৃঃ ৩৭, ৩১৬ ; কলিকাতা ১৮০৩।

উর্দ্দু রিসালা অথবা কাইদ-ই-জবান-ই-উর্দ্দু ; গিলক্রাইষ্ট রচিত হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের নিয়মাবলী ; পৃঃ ১৮১, কলিকাতা, ১৮২০।

হিন্দী রোম্যান অর্থোএপিগ্রাফিক্যাল আল্টিমেটাম অথবা হিন্দী-রোম্যান শব্দের শুদ্ধোচ্চারণ সম্বন্ধে শেষ কথা। গিলক্রাইষ্ট রচিত, পৃঃ ৮৪, কলিকাতা ১৮০৪।

আখলাক-ই-হিন্দী—মির বাহাদুর আলি কর্তৃক সংস্কৃত হিতোপদেশের পারসী সংস্করণের অনুবাদ। পারসী সংস্করণটির নাম মিফতা-অল-কুতব। পৃঃ ২১৭১, কলিকাতা ১৮০৩।

আরা-ইশ মাফিল—দিল্লীর হিন্দু রাজন্যবর্গের ইতিহাস ; শের আলি কর্তৃক পারসী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত : পৃঃ ৩১০২১, কলিকাতা ১৮০৮।

বাগ ও বহার—লুই ফার্দ্দিন্যান্দ স্মিথ অনূদিত, পৃঃ ২৪৮, কলিকাতা ১৮১৩।

বেতাল পচিশি—ব্রজ ভাষা হইতে অনূদিত ; অনুবাদক মজহর আলি খাঁ ও লালু লাল। পৃঃ ১৭৯, কলিকাতা ১৮০৫।

গঞ্জ-ই-খোয়াবি—মির আম্মান কর্তৃক পারসী অখলাখ-ই মুহসিনির অনুবাদ, কলিকাতা, ১৮০৫।

গুল-ই-বকাওয়ালি—অন্য নাম মকহব-ই-ইসক ; নিহালচাঁদ লাহোরী কর্তৃক পারসী ইজ্জত-আল্লার অনুবাদ : পৃঃ ১২২০ কলিকাতা ১৮০৪।

ইখোয়ান-আল-সাফা—মৌলভী ইকরাম আলি কর্তৃক আরবী হইতে অনূদিত ; পৃঃ ২৯৯, কলিকাতা ১৮১১।

লতা-ইফ-ই-হিন্দী—হাস্যরসাত্মক গল্প-সংগ্রহ, পারসী ও নাগরী অক্ষরে ; গ্রন্থকার—লালু লাল ; পৃঃ ১২৪, ১৫৮, ৮৬ ; কলিকাতা ১৮১০।

নসর-ই-বে-নজর—সিহর-অল-বয়ানের গদ্য সংস্করণ ; লেখক মির বাহাদুর আলি। গিলক্রাইষ্ট কর্তৃক ইংরেজী ভূমিকা সহ সম্পাদিত ; পৃঃ ৬১৬৯, কলিকাতা ১৮০৩।

তোতা-কহানি—তোতার উপাখ্যান ; হায়দার বক্স কর্তৃক পারসী তুতী-নামা হইতে অনূদিত ; পৃঃ ১৬৮, কলিকাতা ১৮০৪।

সরফ-ই-উর্দ্দু—আমানৎ আল্লা, পদ্য পৃঃ ১০৯, কলিকাতা ১৮১০।

মুন্তাখাবাৎ—হিন্দী ; আক্ষরিক অনুবাদ, কোন কোন অংশের ব্যাকরণ-সম্মত বিশ্লেষণ সহ ; গ্রন্থকার—জন সেক্সপীয়ার, ২ খণ্ড, লণ্ডন ১৮১৭-১৮।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ভারতের অন্যান্য প্রধান প্রাদেশিক ভাষার মত হিন্দী ভাষার অনুশীলনে উৎসাহ দেয়, ভাষাটির শব্দ-বিদ্যা সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ সৃষ্টি করে, উহার ব্যাকরণ ও অভিধানের ব্যবস্থা করে এবং পাঠক-সমাজও গড়িয়া তুলে। হিন্দী গদ্য-সাহিত্যে কলেজের দান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রিয়ারসন তাঁহার "মডার্ণ ভার্ণাকুলার লিটারেচার অফ হিন্দুস্থান" গ্রন্থে ১৩০০-১৮৫৭ সালের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ইউরোপীয়দের নিকট হিন্দী নামে পরিচিত আশ্চর্য্যজনক মিশ্র ভাষাটির সৃষ্টি হয় ঐ সময় ; তাঁহারাই উহা আবিষ্কার করেন।"

১৮০৩ সালে গিলক্রাইষ্টের তত্ত্বাবধানে লালুজী লাল আকবরের সভাসদগণের মধ্যে প্রচলিত মিশ্র উর্দ্দু ভাষায় প্রেমসাগর নামক পুস্তকখানি লেখেন। তাঁহার পুস্তকের বিশেষত্ব, তিনি আরবী ও পারসী ভাষা হইতে উৎপন্ন বিশেষ্য পদের পরিবর্ত্তে কেবল ভারতীয় শব্দ ব্যবহার করেন। হিন্দী ভাষা উত্তর-ভারতের সর্ব্বত্র গদ্য-সাহিত্যের মাধ্যম হইয়া উঠে, কিন্তু উহা কোথাও চলিত ভাষা না থাকায় পদ্য-সাহিত্যে সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হয় নাই।

লালুজী লাল গুজরাটের অধিবাসী। তাঁহার পরিবারবর্গ আগ্রার

বাস করেন। তিনি জীবিকার্জনের জন্য মুর্শিদাবাদে আসেন। তিনি সেখানে নবাবের দরবারে ৭ বৎসর ছিলেন। তিনি কিছু দিন মহারাজ রামকৃষ্ণের নিকটও ছিলেন। তিনি ঘটনাক্রমে গিলক্রাইষ্টের দৃষ্টিতে পড়েন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ২৪ বৎসর চাকরীর পর ১৮৮১ সম্বতে তিনি অবসর লন। তিনি প্রায় এক ডজন পুস্তক লিখেন:—সিংহাসন বত্তিসি, শকুন্তলা, প্রেমসাগর, ভাব কায়দা (ব্যাকরণ), সভা-বিলাস, রাজনীতি (ব্রজভাষায়), বেতাল পচিশি (উর্দ্দু), মাধব বিলাস (গদ্য ও পদ্যে) প্রভৃতি। তিনি বিহারীলালের সৎ-সাইএর একখানি ভাষ্যও লিখেন। তাহার নাম লাল-চন্দ্রিকা। বারাণসীর বাবু শ্যামসুন্দর দাস তাঁহাকে আধুনিক হিন্দী গদ্য-সাহিত্যিকগণের অগ্রদূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সদল মিশ্র ও সৈয়দ ইনসাউল্লা খাঁও তাঁহার ন্যায় ঐ সম্মানের অধিকারী। ঐ শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ও ফোর্ট কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন। লালুজী তাঁহার প্রেমসাগরের ভূমিকায় গিলক্রাইষ্ট ও ডাঃ উইলিয়াম হাণ্টারের প্রশংসা করেন। হাণ্টার তাঁহাকে তাঁহার কাজে সাহায্য করেন। সদল মিশ্র আরার অধিবাসী; তিনি তাঁহার চন্দ্রাবতী বা নচিকেতোপাখ্যানের জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি রাম-চরিত-মানস সম্পাদন করেন। ২৪।২৫ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসেন ও ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটি সময়োপযোগী না থাকায় যথাসময়ে তুলিয়া দেওয়া হয়। কলেজটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহা ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির উন্নতিতে পরোক্ষ ভাবে যথেষ্ট সাহায্য করে। অন্যান্য অনেক ভারতীয় ভাষার মত হিন্দী কলেজটির নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে গিলক্রাইষ্ট, হাণ্টার, লালুজী লাল প্রভৃতির নাম কৃতজ্ঞতার সহিত লিপিবদ্ধ থাকিবে।

উলকী

উলকী সময় বিশেষে সকল দেশেই প্রচলিত ছিল ও অদ্যাবধি অনেক দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল দেশে সভ্যতা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তৎসমস্তের প্রধান নগরীতে উলকীর প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু ঐ সকল দেশেও গ্রাম্য পরিশ্রমজীবী লোক সকলের মধ্যে এখনও তাহা চলিত আছে। এই উলকীর উৎপত্তির কারণ সম্ভবিত কি হইতে পারে তাহা আমরা নিম্নে লিখিতেছি।

মনুষ্য যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল তৎকালে শিল্পবিদ্যা এক্ষণকার কালের মত পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হয় নাই। তখন লোক কাননে আহার করিত; লতা, পত্র, শাখাদি দ্বারা নির্ম্মিত কুটিরে বাস করিত, বল্কল্ পশুচর্ম্ম প্রভৃতিতেই বসনের কার্য্য সম্পন্ন করিত এবং তাহাদিগের অন্যান্য প্রয়োজন সমস্তও ইত্যাদি প্রকারে লব্ধ হওয়াই পূরণ হইত। এই অবস্থায় লোক যতক্ষণ আহারাদির দ্রব্য সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিত ততক্ষণ তাহাদিগের মনও তৎকার্য্যে লিপ্ত থাকিত ও তৎকালে সময় অতিবাহিত করাও তাহাদিগের পক্ষে ক্লেশকর হইত না। কিন্তু অশন বসনাদির অভাব পূরণ হইলে পর অবশিষ্ট সময় তাহাদিগের স্কন্ধে ভার স্বরূপ হইত সুতরাং সেই সময়ে কোনরূপ না কোনরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য লোক ইতস্ততঃ ভ্রমণ, নানা বস্তু দর্শন ও ক্রীড়াদি করিতে বাধ্য হইত। ক্রীড়াকালে নানা লোক—নানা কার্য্যের দ্বারা চিত্তবিনোদন ও সময়াতিপাত করিত এবং সেই ক্রীড়া হইতেই শিল্পবিদ্যার উদ্ভব হয়। অবকাশ কালে চিত্তরঞ্জনার্থ কেহ কেহ পুষ্পচয়ন করিয়া তদ্দ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিত এবং তদ্দর্শনে অপরেও ঐরূপ ভূষণাদি নির্ম্মাণ ও পরিধান করিলে ক্রমশঃ সকলেই তাহা শোভা সম্পাদক বোধে ব্যবহারারম্ভ করিয়াছিল। এইরূপে যে পুষ্প, ফল, লতা, পক্ষীর পালক প্রভৃতি দ্রব্যের ভূষণাদির নির্ম্মাণ ও চন্দন ও গৈরিক পত্র-রচনাদির আরম্ভ হয় তাহার সন্দেহ নাই। অদ্যাবধি আরণ্য ও অসভ্য জাতীয়েরা উক্ত রূপ ভূষণাদি বহু আদরে পরে ও তাহারই শোভায় মোহিত হয়। পরে পুষ্পমণ্ডনাদি অল্প কালে নষ্ট হয় দেখিয়াই অন্যরূপ মণ্ডন নির্ম্মাণের উপায় উদ্ভাবনে লোকের যত্ন হইল এবং সেই যত্নেই উলকীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সভ্যতার উন্নতির সহিত উলকীর ক্রমশঃ লোপ ও তাহার স্থানে মণিরত্নাদি নির্ম্মিত অলঙ্কারাদির ব্যবহার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তদনুসারে অসভ্য দেশ সকলেই উহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

আমাদিগের দেশে উলকী প্রচলিত এবং যদিও এক্ষণে রাজপাট কলিকাতার নব্যা কামিনীগণের দেহে তাহা দেখা যায় না তথাপি পল্লিগ্রামের অনেকে উলকী পরেন। এইরূপ ইংলণ্ড ফ্রান্স ইটালী প্রভৃতি সকল দেশেই প্রধান নগরাদিতে ইহার ব্যবহার নাই কিন্তু এখনও গ্রাম্য লোকেরা সর্ব্বদা ও যথেষ্ট পরিমাণে পরেন। কোন ইউরোপীয় পোতবাহক বা সামান্য সৈনিকের হস্তাদি দেখিলেই একথার যথার্থতা বুঝা যায়। আমাদিগের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকেদের (বিশেষতঃ সামান্যাবস্থার) কামিনীগণের বাহু, বক্ষস্থল, ললাট, চিবুকাদি স্থলে নানারূপ উলকীর পত্র-লেখা দেখা যায়। ঐ সকল পত্র-লেখ করণার্থ বাল্যকালে দেহের ইচ্ছিত স্থানে ও ইচ্ছিতরূপে কেশুরপত্রের রসের সহিত অন্যান্য বস্তু মিলাইয়া একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ রস প্রস্তুত করিয়া তাহা সূচিকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রবেশ করান হয়। প্রথমত কিছু বেদনা ও যন্ত্রণা হয়, পরে যখন দেহ পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয় তখন ঐ সকল বিদ্ধ স্থানে কৃষ্ণবর্ণের পত্র-লেখা সকল উত্তমরূপে প্রস্ফুটিত দেখা যায়। দক্ষিণ সাগরস্থ দ্বীপাবলীতে উলকীর প্রথা বহু প্রচলিত ও তথায় অস্থি নির্ম্মিত সূচিকা দ্বারা দেহে ছিদ্র করিয়া একপ্রকার বৃক্ষনির্য্যাসের মসি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়। পূর্ব্বোক্ত দ্বীপ সকলে উলকী এত অধিক প্রচলিত যে তথায় উলকী পরান একটি ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাদিগের উলকী পরিতে ইচ্ছা হয় তাহারা তৎকার্য্যের ব্যবসায়ীকে ডাকাইয়া অভিপ্রায় মত তাহা পরে। কিন্তু অধিক পত্রলেখা করা সকলের ঘটে না, যেহেতু উলকীদাতাগণ শ্রমানুযায়িক পুরস্কার লয় সুতরাং যথেষ্ট বৈভব না থাকিলে সর্ব্বাঙ্গে পত্রলেখা অসাধ্য। এই জন্য প্রধান বা দলপতিগণ সর্ব্বশরীরে উলকী করিয়া তৎকারককে উত্তম মাদুর ও অন্যান্য দ্রব্য পুরস্কার দেন।

—রহস্য-সন্দর্ভ।

আকাশ-পাতাল

অ, আ, ই

উত্তীর্ণ হয়ে গেছে আরও কয়েকটা দিন।

ফুলের পাপড়ি হাওয়ায় উড়ছে প্রজাপতির মত।

উত্তুরে বাতাসে শাখা থেকে ঝরছে বর্ষায় ভেজা ফুল। কত অজস্র ফুল। রঙরেখা বিধাতার খেয়াল-খুশীর সৃষ্টি, কত বিচিত্র রঙ! কখন কুঁড়ি ছিল, কখন আবার কেউ জানলো না হ'ল ফুটন্ত, ছড়ালো সুগন্ধ, বিকিয়ে দিলে মধু। দেখতে না দেখতে কখন ফুরালো যে আয়ু, পাপড়ি খসিয়ে ধীরে ধীরে মিশে গেল ধুলায়। সাঁজের আবছা আঁধারে যেন ঘুম ভেঙ্গে জাগলো; জেগে রইলো হাওয়ায় দুলতে দুলতে। রাতের কত কুঁড়ি ভোরের ফুল হয়ে হাসলো পরস্পরে; রূপ আর রঙের ডালি দিলে উজাড় ক'রে দিনের পর দিন। তার পর এলো ঝড়ো হাওয়ার অশুভ সময়। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া? এলো অবিশ্রান্ত বর্ষণ?

প্রজাপতির মত বাতাসে উড়লো রঙীন ফুলের ছিন্ন দল।

শীত যখন বিদায় নেয়, বসন্ত যখন আসে—সঙ্গে আনে পুষ্প-শোভা, ধরিত্রীকে রাঙিয়ে দেয় ফুলের রঙে। বাসন্তিক ফুল—যেন প্রেমের মত। ফুলের মত প্রেম? অনেক ফুলে আছে যেমন মধু, কত ফুলে আছে বিষ। যেন মিলন আর বিরহ। সুখ আর দুঃখের মত। আসে আর চলে যায়; যায় আর আসে।

একটি একটি পাপড়ি যেন একেকটি দিন।

পাখীর কূজনের সঙ্গে, ফুল প্রস্ফুটিত হয়, দিন চক্ষু মেলে। পাখীর কূজনের সঙ্গেই আবার মুদিত করে চক্ষু। ফুলও ঝরে যায়। সুখের মিষ্টি স্বপ্নরাঙা মধুময় দিন। দুঃখের মেঘাচ্ছন্ন, ভয়ঙ্কর, বিষাক্ত দিন। দুর্দ্দিন। যেমন মিলন আর বিরহ।

ফুলের উড়ন্ত ছিন্ন দলের মত দিনের পরিক্রমা।

উত্তীর্ণ হয়ে গেছে আরও কয়েকটা দিন। অলস-জনের বৈচিত্র্য-হীন দিন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মত যথা পূর্ব্বং তথা পরং একেকটি দিন। তবে, হুজুরের উন্নতি হয়েছে কয়েক বিষয়ে। নাবালকত্বের টাইম ওভার হয়ে যাওয়াতে সরকার হুজুরকে জমিদারীর মালিকানা হ্যাণ্ড-ওভার ক'রেছেন। হুজুর স্বয়ং এখন মনার্ক। রাজত্ব করবেন, অস্ত্র-চালনা না শিখলে চলে না। হুজুর আলমারীতে সজ্জিত বন্দুক আর বিভলভার বের করিয়ে দাগতে শিখেছেন। ক'দিন এ উপলক্ষে শহরের আনাচে-কানাচে যেয়ে জলা আর বাদায় উড়ন্ত বক মেরে এসেছেন। কাদাখোঁচা হত্যা ক'রে এসেছেন। আর কাপ্তেনীর যত রকম কায়দা-কানুন থাকে তাদের রপ্ত ক'রে ফেলেছেন। আক্রামুদ্দিন নামে বাপ-পিতামোর আমলের পরিচিত দর্জ্জিকে ডাকতে পাঠিয়ে কয়েক হাজার টাকার পোষাক হুজুর আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ঐ ঐ পোষাকের মাপ এবং অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন। বলতে লজ্জা হয়, বিবি গহরজানকেও কয়েকটা দামী-দামী পোষাক লুকিয়ে করিয়ে দিয়েছেন। বেনারসী আর কিংখাবের জামা পেয়ে গহরজান যেন বর্ত্তে গেছে।

অভাগা জননী দিনের পর দিন ছেলের কীর্ত্তিকাহিনী শুনে কেঁদেছেন আর দিন গুণেছেন। ছেলের খেয়াল নেই। দিন গুণেছেন তিনি—বিয়ের ধার্য্য দিন। বিয়ে দিয়েই কুমুদিনী চলে যাবেন—কোথায় যাবেন কেউ জানে না। মুখ ফুটে বলেননি। মায়ে ছেলেতে যাতে আবার পুনর্মিলন হয় হেমনলিনী তার চেষ্টার ত্রুটি করেননি, কিন্তু কুমুদিনী যেন পাষাণ, কিছুতেই ঠাকুরঝির কথায় সায় দেননি। গৃহ-দেবতার অপমানে দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে জপ-আহ্নিক নিয়ে থাকেন। সময়ে-অসময়ে কাঁদেন। কিছু মুখে তোলেন না। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন বললে হয়।

দেখতে দেখতে চ'লে গেল আরও কয়েকটা দিন।

ক্রমে বিবাহের দিন ঘনিয়ে এলো। রাজেশ্বরীর স্বপ্ন সার্থক হওয়ার শুভক্ষণ। হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দে মুখর হয়ে উঠলো বিয়ে-বাড়ী! আত্মীয়-স্বজনরা এলো; মহল থেকে এলো আমলা আর গমস্তা; শুভার্থীরা এলো, যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। হোগলার চালা উঠলো; এখানে-সেখানে ঝুললো হরেক রঙের লণ্ঠন; উঠানগুলো শামিয়ানার আবরণে প্রায়ান্ধকার হয়ে গেল। গোলাপী কাপড়ের তকমাধরা ও উর্দ্দীপরা তাঁবেদার, ভৃত্য, পাইক, বরকন্দাজ আর সিপাইরা যে যার এলাকায় মোতায়েন হ'ল। বিয়ে-বাড়ী যেন গমগম করতে লাগলো। সানাই বাজলো।

সিন্দুক থেকে নিজের গয়না বের করতে করতে হেমনলিনী বললেন,—তোমার ছেলের বে, তুমি থাকবে না? ভাঁড়ার আগলাবে কে? লোকে কি বলবে? বৌকে আশীর্ব্বাদ করবে না?

কুমুদিনীর কাতর কণ্ঠস্বর। চোখে জলের রেখা। বিবর্ণ মুখাকৃতি। বললেন,—তুমি দেখবে ঠাকুরঝি। তুমি বৌ বরণ করবে। তুমি যজ্ঞি তুলবে। লোকজন আছে, তুমি যেমন বলবে তেমন হবে। বৌকে আমি প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিনই আশীর্ব্বাদ ক'রেছি। আমাকে এসে বলবে যে বৌ ঘরে এসেছে, শুনে আমি তীর্থে বেরিয়ে পড়বো। তার পর ছেলে যা খুশী করুক।

কথার শেষে কুমুদিনীর দু'চোখ বেয়ে অঝোরে জলের ধারা নামলো। অসহ্য কষ্টের ব্যথাতুর অশ্রুপাত। কুমুদিনী চক্ষু মুদিত ক'রে বসে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত যেতে না যেতে আবার বললেন,—দেখো ঠাকুরঝি, দেখা-শুনার যেন ত্রুটি না হয়। কেউ যেন অখুশী

ই বল। বল' যে বৌঠান কাশীতে রয়েছে। ভালয়-ভালয় …পাড়টা মিটিয়ে দিয়ে এসো ভাই। বড়-বাড়ীতে গাড়ী পাঠাবে, কেউ আসে।

হেমনলিনী সিন্দুক থেকে গয়না বের করছিলেন। বিয়ে-বাড়ীতে …ছেন, গা মেলানো গয়না পরছেন তাই। বিছে, হার, মপচেন, …, বাউটি, গিনি-গাঁথা। বললেন,—জানি না বৌঠান, কেমন …বে কি করব!

কুমুদিনী বললেন,—শশীবৌকে আসতে ব'লে পাঠাবে। সে …লে তোমার অনেক সুবিধে হবে। ক'দিনের যজ্ঞি, ঠিক মিটে …য় ঠাকুরের দয়ায়।

ক'দিনের অনুষ্ঠান। প্রথম দিনে গাত্রহরিদ্রা, বরানুগমন। …র দিনে বৌ-বরণ ও প্রীতিভোজন। রাত্রি থাকতে হেমনলিনী …সে যাত্রা করলেন বৌঠানের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে। …ন এসে পৌছলেন তখন সানাইয়ের বাজনায় ভোরের রাগিণী …ছে। লোকজনের অভাব নেই, ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত হয়েছে …ছ সব কিছুর। তবুও কোথায় যেন কার অভাব বোধ …ছে। যাঁর গৃহ, সেই গৃহকর্ত্রী। যাঁর উপস্থিতি শতেক …রীর সমতুল্য, বজ্রের মত কঠিন সেই কুমুদিনীকে দেখতে …ওয়া যাচ্ছে না? এত আনন্দের মাঝেও যেন কোথায় …র বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু কারও সাহস হচ্ছে না যে, …ঁকে নিয়ে আসে, হাজির করে এখানে।

সোনালী পোষাকের বেতনভুকরা যেদিকে তাকাও সেদিকে। …থাও অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য ও দলস্থদের মধ্যে ঘোঁট পাকিয়ে …ছে—রূপোর টাকা, ছত্র, উত্তরীয় ও বস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে। …কেরো জানলা আর দরজায় ভেলভেটের পর্দা খাটাচ্ছে। …ফুরোলেই রৌপ্যতের যজ্ঞি, ভিয়েনে খাজা, গজা, পান্তুয়া …জিলাপীরা তোয়ের হচ্ছে। তাদের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে …ছে হাওয়া। সদরের ঘরে-ঘরে ফরাসে রূপোর আতরদান, …গোলাপপাশ, পানের ডিবে সাজানো হয়েছে। অন্দরে পড়শিরা …ত বসেছেন—কুটনো কোটা হচ্ছে।

ক্রমশঃ বেলা অতিক্রান্ত হচ্ছে। উত্তরোত্তর ব্যস্ততাও বর্দ্ধিত …যেন। গায়ে হলুদের ব্যবস্থা হচ্ছে। বরণডালা সাজানো …কোথাও চাল আর ডাল বাছা হচ্ছে। কুলোর শব্দ হচ্ছে …সপাং। রান্নাঘরে নাড়ু তৈরীর জোগাড় করছেন হেমনলিনী। শশী ও অন্যান্য এয়োরা যোগান দিচ্ছে। পড়শি মহিলাদের …র ফিসফিস গুঞ্জন চলেছে, কুমুদিনীকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে …কেন? তাঁদের সকলের চোখে-মুখে জিজ্ঞাসু ঔৎসুক্য। …লিনী এসে বড়-বাড়ীতে জুড়ী পাঠিয়েছিলেন বৌঠানের কথা মত …বৌদের আনতে। লোক ফিরে এসে বললে,—কেউ আসতে …েন না।

বিস্ময়ে খানিক চুপচাপ চেয়ে থাকেন হেমনলিনী। শরিকী …তা, শুভকাজে না আসা এমন কিছু বিস্ময়কর নয়। তবুও …লেন,—কেন? বৌঠান তো তাঁদের কাছে দোষ করেনি কিছু!

লোক তখন বললে,—না না, দোষের কিছু কথা হচ্ছে না। …বাড়ীতে অসুখ। এখন যায় তখন যায় অবস্থা।

মুহূর্তে সবিস্ময়ে বিস্মিত হ'লেন হেমনলিনী। বললেন,—কার আবার অসুখ হ'ল!

লোক তখন বললে,—বড়বাবুর অসুখ। গ্যাস দেওয়া হচ্ছে। লোক কথা বলতে বলতে দেখলো কেউ শুনছে কি না। বললে,—অত্যাচারে অত্যাচারে বড়বাবু শরীরটার কিছু কি আর রেখেছেন! মদ খেয়ে খেয়ে এ্যাদ্দিনে তার ফল ভোগ করলেন। পিলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। পেটের ভেতর ঘা হ'য়ে গেছে। ক'দিন ক'রাত্তির জ্ঞানহারা হয়ে আছেন। গ্যাস চলছে।

কথাগুলো শুনে হেমনলিনীর মুখখানা দেখায় যেন ভয়ার্ত্ত। কোন উত্তর দেন না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, যেন শুভকাজে বিঘ্ন না হয়। পূর্ণেন্দুর, স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে পূর্ণেন্দুদের অতিমুখ্যকারিতার পরিচয়। মদ এবং মেয়েমানুষের জন্য কত টাকা যে উড়িয়েছেন। সব থেকে গয়না বের ক'রে নিয়েছেন, ক'রা অমুক পর্যন্ত বিক্রী ক'রে ফেলেছেন। মোসাহেব, মদ ও মেয়েমানুষ ব্যতীত অন্য কিছুকে জানলেন না। এমন কি পরমা রূপবতী স্ত্রী থাকতেও ফিরে তাকালেন না। দুঃখের শ্বাস ফেললেন হেমনলিনী।

—হেম। হেম গেলে কোথায়?

নাম ধ'রে ডাক শুনে হেমনলিনী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন যিনি ডাকছেন, নাম ধ'রে ডাকবার অধিকার তাঁর আছে। বললেন,—ডাকছেন?

—হ্যাঁ, এ কি রকম কথা?

—কেন, কি হয়েছে? ভয়ে ভয়ে শুধোলেন হেমনলিনী।

—ভদ্রেশ্বরের ক'ঘর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাঁদের প্রাপ্য কেন পাবেন না? মুড়াপোড়া বামুনরা পাচ্ছে, তাঁরা কি দোষ করলেন?

বক্তার প্রশ্ন জটিল। হেমনলিনী কি উত্তর দেবেন ভেবে স্থির করতে পারেন না। বলেন,—আমি কি বলব? যা বলবেন তাই হ'বে।

প্রশ্নকর্তা লালমোহন। সন্ন্যাসী-মানুষ। যেন কিঞ্চিৎ কুপিত হয়েছেন। বলছেন,—তোমাদের সাত পুরুষ থেকে তাঁরা পাচ্ছেন। আর এখন সমস্তাদের আমল হলে তাঁরা—

কথা শেষ হওয়ার আগেই কথা বলেন হেমনলিনী।—আমার নাম নিয়ে বলুন কাছারীতে। সরকাররা হয়তো জানেন না।

লালমোহন বললেন,—পত্তর বিলির কাজ পড়েছিল মা আমার ওপর। সবসমেত সাড়ে তিনশো পত্তর বিলি ক'রেছি ক'দিনে। তোমার বেহালা থেকে বেলগেছে পর্যন্ত।

লালমোহন ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকর্ম্মে নানা কাজ করেন। আমন্ত্রণ-লিপি বিতরণ করেন। হেমনলিনীর সম্মতি পেয়ে খুশী হলেন কি না বুঝলেন না হেমনলিনী।

লালমোহন বাক্যব্যয় না ক'রে সদরের দিকে অগ্রসর হ'লেন। অন্দরের শেষ বরাবর গিয়ে বললেন,—গায়ে হলুদের সময় যেন উত্তীর্ণ হ'য়ে না যায়। আটটা ক' মিনিট পর্য্যন্ত তোমার টাইম। এখন বেজেছে প্রায় সাতটা।

রাজেশ্বরী তখন জেগেছে ঘুম থেকে অনেকক্ষণ। কাক ডাকার শব্দে।

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে তার স্বপ্ন সার্থক হওয়ার শুভদিনের। বুকের ভেতরটা গুমরে উঠছে থেকে-থেকে। এত সুখের মাঝেও অসহ্য কষ্ট হচ্ছে যেন। তোলপাড় করছে বুকটা। ঠাগ্‌মা'র জন্যে আর বাড়ীর আর আর সকলের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে ক্ষণে-ক্ষণে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যাদের কাছে লালিত-পালিত হয়েছে পরম আদরে, তাদের ছেড়ে যেতে হবে—রাতটা পোয়ালেই আর তাদের দেখতে পাওয়া যাবে না! সেখানে যাচ্ছে, হোক না সেখানে স্বর্গ, হোক না অশেষ সুখের লীলাক্ষেত্র, তবুও জন্মাবধি যাদের অকৃত্রিম স্নেহচ্ছায়ায় এতগুলো দিন কাটিয়েছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে হবে, ভাবতেও যেন চোখ ফেটে জল আসে রাজেশ্বরীর। অজান্তে কখন চোখের কোণে জমে ওঠে জলের বিন্দু, পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই আঁচলে চোখ মুছে নেয়। বুকের ভেতরটা ভয় করে বিয়ে-বাড়ীর এত কোলাহলে আর সানাইয়ের শব্দে। কেমন যেন ভয় ভয় করে। ঢিপ-ঢিপ করে বুকটা। কেঁপে ওঠে সারা শরীরটা। শুয়ে পড়ে রাজেশ্বরী।

—রাজো, ওলো রাজো!

কোথা থেকে এসে ডাকেন ঠাগ্‌মা। বার্দ্ধক্যের আধিক্যে কাঁপতে কাঁপতে। দরজা ধ'রে নিজের দেহের টাল সামলে ডাকেন,—ওলো রাজো, উঠবি না মনে ক'রেছিস। গায়ে হলুদের লগ্ন এসে পড়লো ব'লে। এখনও শুয়ে থাকবি বেআক্কেলী!

কথা বলতে বলতে এগিয়ে যান ঠাগ্‌মা। উঠে বসে রাজেশ্বরী। ঠাগ্‌মা তার হাত ধ'রে তোলেন। দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে কেন কি জানি মুখখানা তার দেখেন কতক্ষণ। দেখতে দেখতে স্বর্গে যান যেন। পদ্মবরণ চোখ রাজেশ্বরীর, স্বপ্নে মাখানো। ব'ড় ডাবের মত মুখ। চন্দনের মত রঙ। কুঞ্চিত কেশের রাশির ঢেউ নেমেছে পিঠে। মোমের মত গঠন। দেখতে দেখতে বৃদ্ধা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন শিশুর মত। ঠোঁট দু'টো তাঁর কাঁপতে লাগলো। মাথা দেহটা তো কাঁপছে সদাক্ষণ। রাজেশ্বরীও জড়িয়ে ধরলে পিতামহীকে। তারও চোখে বুঝি বা নামলো অশ্রুবন্যা। বিচ্ছেদের অন্তর্দাহে কাঁদলে দু'জনে—এক জন ফুটন্ত ও অনাঘ্রাত ফুলের মত ভরন্ত কুমারী, আর অন্য জন মৃত্যুর আহ্বানের জন্যে প্রস্তুত লোলচর্ম্মা বৃদ্ধা!

—রাজো!

—ঠাগ্‌মা!

—তুই আমাকে ফেলে চ'লে যাবি?

—না, তোমাকেও নিয়ে যাবো। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

হেসে ফেললেন ঠাগ্‌মা নাতনীর কথা শুনে। কাঁদতে কাঁদতে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন,—বে হচ্ছে তোর, আমি যেতে যাবো কেন?

চুপচাপ চেয়ে থাকে রাজেশ্বরী। ঘুমভাঙ্গা চোখে। এ কথার উত্তর খুঁজে পায় না। তবুও বলে,—হ্যাঁ, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। থাকবে আমার কাছে। খু—ব যত্ন করবো তোমাকে।

—আর এ ঘর-দোর কে দেখবে তোর? রাজো, যদ্দিন না মরি, এ ভিটেয় থাকতে দিবি তো? কথা বলতে বলতে গলা কেঁপে ওঠে বৃদ্ধার। বলেন,—এ ঘর-দোর যে তোর। তোর বাপ যে দে গেছে তোকে।

রাজেশ্বরী বলে,—এবার আমি রাগ করবো ঠাগ্‌মা। যা মুখে আসছে বলছো?

আবার হেসে ফেললেন ঠাগ্‌মা। দন্তহীন মাড়ি বের ক'রে হাসলেন দুঃখ-কাতর হাসি। বললেন,—আর ভাই দেরী করিস নে, যা মুখ-হাত ধুয়ে যা। লগ্ন এসে পড়লো বলে। যা ভাই লক্ষ্মী আমার।

সুখ আর দুঃখের মিশ্রিত অনুভূতিতে বুকটা আবার ঢিপ-ঢিপ করে উঠলো। রাজেশ্বরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অলস পদক্ষেপে। গেল মুখে-হাতে জল দিতে। পবিত্র বসনে নিজেকে পবিত্র করতে। লাল-পাড় কোরা শাড়ী পরতে। কপালে কাজললতা খোঁপায় গুঁজতে।

ঠাগ্‌মা পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকেন সেখানে। দর দর বেগে অশ্রুপাত হয় তাঁর। আসন্ন বিয়োগ-ব্যথার দুঃখে।

শহরে যেন তিটি প'ড়ে গেছে। বাসুদেব ছেলের বিয়ে।

এ যুগে টাকা না থাকলে কেউ কাকেও চিনতে চায় না। যাদের টাকা আছে তাদের কাছে অধিক লোক বিনয়াবনত হয়। তাদের নাম করে, তাদের যশের কীর্ত্তন গায়, তাদের সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে ক'রে ইষ্টের ন্যায় পূজা করে। দুর্গোৎসবে ও ছেলের বিয়েতে প্রতিযোগিতা চলে কে কত টাকা খরচ করতে পারে। বাসুদেব ছেলের বিয়েতেও ঐ ধরণের টাকার ঠাটের ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে চলতে না চলতে রাস্তায় ভয়ানক লোকারণ্য হ'তে লাগলো। ঢোল, ভোড়ং ও ভেঁপুর শব্দে তিষ্ঠানো দায় হয়ে উঠলো। চুনোগলির ইংরেজী বাজনায় পাড়া কেঁপে উঠলো। ঢুলীরা খেনো সুরা গেয়েছে, জ্ঞানগম্যি হারিয়ে বেতালা নাচতে লাগলো। বখ্‌সিসের লোভে যে যত রকম ঢঙ ও কায়দা জানে নেচে নেচে দেখাতে লাগলো।

ক্রমে দেখতে দেখতে শুভ মুহূর্ত্ত এলো।

জুড়ীতে চেপে হুজুর যাত্রা করলেন। আত্মীয়-অন্তরঙ্গ ও পুরোহিত চললেন। অন্দরের হাতকাড়, পাঙ্কা ও সিঁড়ি বাজনা দু'পাশে চললো। পেছনে পেছনে গ্যাস-বাতির গেট তক্তানামার ওপর মগের নাচ ও ফিরিঙ্গির নাচ। লাল বনাতের খাস-গেলাশ ও কপোর ডাণ্ডিতে রেশমের পতাকা-ধরা তকমাপরা মুটেরা চললো। সাজা সায়েব-তুরুক-সওয়ারের পেছনে ঝাড় ও লণ্ঠনধারীরা। ব্যাণ্ড, ঢোল ও নাগরার শব্দে, লোকের হল্লা ও অধ্যক্ষদের মিছিলের চিৎকারে কলকাতা কাঁপতে লাগলো। রাস্তার দু'ধারি বাড়ীর জানলা ও বারাণ্ডা লোকে পূরে গেল।

মা কুমুদিনী তখন হেমনলিনীর শ্বশুরালয়ে, তাঁদের পূজার ঘরে মুদ্রিত চোখে বিড়-বিড় ক'রে প্রার্থনা করছেন। শুভকাজ যাতে ভালয় ভালয় মিটে যায়, কায়মনোবাক্যে ডাকছেন, বলছেন কত কথা, আর দু'চোখ থেকে অশ্রুপাত হচ্ছে তাঁর। পুত্র এবং পুত্রবধূর মঙ্গল কামনা করছেন।

এত আনন্দ আব হাসিব মাঝেও যেন দুঃখেব ছায়া। যেন ... অভাব। মা চলে গেছেন ব'লে ছেলেব 'পবে আক্রোশ হচ্ছে ...দও কাবও। কিন্তু হাসিমুখে বিয়েয় মত দিয়েছে, বিয়ে হওয়াতে ...তো পবিবর্ত্তন হয়ে যাবে, এই কথা ভেবে কেউ আব মুখ ফুটে ...ছু বলছে না।

শাঁখ আব উলু-উলু। ছাদনা-তলা আলোয় আলো।

—ছাখ বাজো, ভাল ক'রে ছাখ।

—তাকাও, চোখ তুলে তাকাও। লজ্জা ক'বো না। ছিঃ! ...ঢুল চোখ বাজেশ্ববীব। ভয় আব লজ্জায় জড়সড়। কত লোক ...আছে তাকে। এ অবস্থায় তাকাতে পাবে কেউ, যাব বিয়ে ...ছে! বাজেশ্ববী তবুও চোখ তোলে, কাজলপবা চোখ। তাকায় ...এক মুহূর্ত্ত। কত ভয়ে আব লজ্জায়। শবীবটা কাঁপছে, ধড়াস-...ড়াস কবছে বুকটা। ঠাট্টা আর তামাসা করছে কত কে। ...কাটছে। হাসাহাসি হচ্ছে। লজ্জা কবে বাজেশ্ববীব। লাল ...প'বেছে। গয়না পবেছে কত। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত। ...ভিজে যাচ্ছে দেহটা। স্ত্রী-আচাব চলেছে। এখনও আছে ...বেব বাত।

সেখানেও যেমন এখানেও তেমন। এত উদ্যোগ-আয়োজনেব ...ও হাসিব পবিসমাপ্তি কৈ। যাবা এসেছে তাদেব মুখেব হাসিতে ...যাব কৃত্রিমতা। কাবও মুখে হিংসা, কাবও চোখে কটাক্ষ। ...বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, কত মেয়ে জ্বলছে ঈর্ষায়। ঐ ঠাগ্‌মা ...কে আছে বাজেশ্ববীব, যে কাঁদবে তাব জন্যে। শৈশবে ...ছে পিতামাতাকে—লালিত-পালিত হয়েছে ঐ ঠাগ্‌মা'ব কোল-...কে। আদবেব ত্রুটি ছিল না, কিন্তু পিতামাতাব বুকভবা ...বাসা পেলে কৈ? শুধু মুখেব ভালবাসাব মূল্য আছে? তবুও ...সম্পত্তিব অধিকাবী বাজেশ্ববী, জানবেন যেমে ক'দেও কথা ...।

...বাত্রিটা গেল কোথা দিয়ে।

পাপড়ি খসে গেল আবেকটা। মেয়ে শ্বশুবালয়ে যাবে, ভোব ...ন্যাগ-পাইপে দুঃখেব বাগিণী বাজলো। বাজেশ্ববী কাঁদতে কাঁদতে ...। সঙ্গে চললো বাক্স-প্যাঁটবা। ঠাগ্‌মা কাঁদলেন বুক ...ড়ে, বাজোকে বুকে জড়িয়ে। পবিস্থিতি বুঝে বাদ্যকববা ...খে দেখে বাজালো ব্যথা-ভবা বাগিণী। বাজেশ্ববী চললো ...ড়ায় বাঁধা প'ড়ে।

—আমাকে ফেলে যাবি বাজো? কাঁদতে কাঁদতে বললেন ...মা। বললেন,—বুকে ক'বে মানুষ কবেছি, ছেড়ে থাকবো ...ক'বে? ঠাগ্‌মা বলেন আব কাঁদেন।

বাজেশ্ববী উত্তর দেবে কোথা থেকে। ঠাগ্‌মাব বুকে মুখ বেখে ...ছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

বাজেশ্ববীর সঙ্গে চলে বাক্স-প্যাঁটবা। এলোকেশী, পুবানো ঝি, সে ...কে দেখেছে-শুনেছে শৈশব থেকে। তেসেছে খেলেছে হাসি ...নায়।

বধূকে ঘবে তুললেন হেমনলিনী। কাঁকালে ক'বে। এয়োবা হুকতাক কবলে কত বকম। ভয়ে আব লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে থাকে বাজেশ্ববী।

—তোব ভাগ্যি বটে বাজো।

কাছাকাছি এসে ফিস্ ফিস্ কবলে এলোকেশী। ফূর্ত্তিতে গদগদ হয়ে। বললে,—ঘব-দোব দেখে এলেম ঘুবে-ফিবে। ঐশ্বর্য্যি ছড়ানো বয়েছে। কিন্তু, ছেলেব মাকে দেখলেম না তো! তোব শাশুড়ীকে তো দেখতে পাচ্ছি না!

ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে বাজেশ্ববী। জানলে তবে তো বলবে। এলোকেশী বললে,—শুধোলেম নোকজনদেব। বললে না কেউ। চুপ মেবে গেল।

বাজেশ্ববী উত্তব কবে না। জানলে তবে তো বলবে, তাকে জানালে তবে তো।

—থামো তুমি এলোকেশী। কে কোথেকে শুনবে! আছেন, যাবেন আবাব কোথায়!

বিবক্ত হয় বাজেশ্ববী। কথাগুলো বলে চুপিচুপি। বলে,—পাখা কব' দেখি, গবম লাগছে।

শামিয়ানায় ঢাকা উঠোনগুলো। গুমোট হয়ে আছে। হাওয়াব লেশ নেই।

ঘবেব দেওয়ালে ছিল হাত-পাখা। এলোকেশী হাওয়া করে। বাজেশ্ববী হাফ ছেড়ে বাঁচে। বলে,—তুমি গাধাব মত যা-তা কথা বল' না যাব-তাব সঙ্গে।

—না, না, আমাকে তুই বলবি বাজো! শেখাবি আদব-কায়দা? এলোকেশীব কথায় বিজ্ঞতাব সুব। বলে,—কিন্তু, ভাগ্যি বটে তোব!

—কতক্ষণে মিটবে বল' তো। বাজেশ্ববী কথা বলে অসহিষ্ণু হয়ে। বলে,—এত গয়না, খুলে দে এলো। কষ্ট হচ্ছে যে। বিঁধছে গায়ে।

—তা বললে হয়। বলে এলোকেশী।—মিটবে আগে কুসুম-ডিঙে। ভিবো না তুই। দেখতে-দেখতে হয়ে যাবে। আমি পাখা কবছি।

কলবোল আব লোকজনেব সমাগমে গমগম কবছে বাড়ী। সাবাক্ষণ ক্রিয়াকাণ্ড। কত অতিথি আসবে। কত মান্য-গণ্য পুরুষ আব মহিলা। আত্মীয়-স্বজন, কত কে আসবে। যজ্ঞিব জোগাড় হচ্ছে। কনেব বাড়ী থেকে তত্ত্ব এসে পড়লো বলে। ফুলশয্যাব তত্ত্ব। কত সামগ্রী দেবে বাজেশ্ববীব ঠাগ্‌মা। ঘব খালি ক'বে দেবে।

প্রজাপতি ঋষি—

পুবোহিত মন্ত্রোচ্চাবণ কবেন। পুনরুক্ত হয়। হোমকুণ্ডেব ধোঁয়ায় জ্বলে বাজেশ্ববীব চোখ। সিঁদুবেব বাশিতে কপাল পবিপূর্ণ হয়ে যায়। নাটমন্দিব পুবোহিতেব মন্ত্রেব শব্দে মুখব হয়ে ওঠে। বৈবাহিক কার্য্য শেষ হ'তে বেলা হ'য়ে যায় কত।

এ আবাব কাব ঘব। ঝকঝক তকতক করছে। পবিপাটি সজ্জিত। পিশশাশুড়ীর সঙ্গে চলে বাজেশ্ববী। হেমনলিনী বললেন,—

সহযোগিতা করতে তাঁরা দুজনেই উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু কোনো কিছুই সম্পূর্ণরূপে তাঁদের হস্তে ন্যস্ত করা'র মতো নির্ভরতা নেই বীরেশ্বরের। তিনি কখনও বা মিনতির হাত থেকে তুলি কেড়ে নিয়ে আঁকতে বসেন ফুলের মঞ্জরী, কখনও বা ডলীকে সরিয়ে দিয়ে উইংসে লাগতে সুরু করেন সবুজ রংএর ওয়াস্। ফলে পরিশ্রমের পরিমাপ বিভক্ত হয়ে লঘু হওয়ার অবকাশ পায় না, পুঞ্জীভূত হয়ে কেবলি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ষ্টেজের বহির্দ্দেশে যবনিকার দুই পার্শ্বে ঘন কৃষ্ণ মখমলের উপরে কোনারকের সূর্য মন্দিরের রথচক্রের অনুকরণে রূপালী জরির দুটি চক্ররচনার পরিকল্পনা বীরেশ্বরের। চক্র দুটির কেন্দ্র থেকে দুলিয়ে দেওয়া হবে তুষারশুভ্র একজোড়া চাঁদমালা। নীচে থাকবে দুটি আম্রপল্লববাহী পূর্ণকুম্ভ। শুভকর্ম্মের চির-পরিচিত শাস্ত্রসম্মত মাঙ্গলিক। সেই মঙ্গলঘট দুটি আলিম্পনের ভঙ্গিতে সযত্নে সুচিত্রিত করছিলো ডলী।

বীরেশ্বর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

"মিস দত্ত, আপনার হাতে কী? মঙ্গলঘট? না, না, ও লাইনটা অত সরু নয়। আচ্ছা, দিন আমাকে, দেখিয়ে দিচ্ছি।" বলে নিজেই তুলি নিয়ে বসে পড়লেন। দেখিয়ে দিতে বসলেও সেটা একেবারে শেষ না করে যে উঠবেন না সে কথা সবারই জানা আছে।

"ঘরসে টেলীফোন।" অর্থাৎ সুবালা। বীরেশ্বরের স্ত্রী।

বীরেশ্বর শঙ্কিত হলেন। শঙ্কা অহেতুক নয়। কাল বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন বেলা সাড়ে চারটায়। বলে এসেছিলেন, ফিরতে একটু রাত হতে পারে। আজ সন্ধ্যা ৭টা বাজে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টারও উপরে। এখনও বাড়ি যাওয়া হয়নি। নিজের অপরাধের গুরুত্বে বীরেশ্বর নিজের কাছেই সঙ্কোচ বোধ করলেন।

এটা অভূতপূর্ব্ব নয়। ইতিপূর্ব্বে আরও একাধিকবার অনুরূপ ঘটনার ইতিহাস আছে। বীরেশ্বরের শিল্পচাতুর্য্যে যতখানি মাত্রাবোধ অন্য কিছুতে ততখানি নয়। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবেরা অনুযোগ করে,

"থিয়েটারের নামে তোমার কী আর দিগ বিদিক জ্ঞান থাকে না? এরকম নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে ষ্টেজ সাজানো তো দেখিনি কখনও।"

বীরেশ্বর প্রতিবাদ করেন,

"না, না, নাওয়া-খাওয়া ছাড়বো কেন? এই তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই উপবনের দৃশ্যটা হলেই, ব্যস্।"

তারপর কিছুটা যেন অপরাধের স্বরে মৃদু কণ্ঠে বলেন,

"ভাই, দিনের পর দিন সর্ব্বজ্বরনাশিনীর লেবেল আর বনস্পতির ক্যালেণ্ডার এঁকে এঁকে আঙুলে বাত হওয়ার দাখিল। সিনেমা, থিয়েটারের সেট ডিজাইন করার মধ্যে তবুও একটুখানি যেন হাঁফ ছাড়ার অবকাশ পাই। কিন্তু সিনেমায় তো নিজের ইচ্ছে মতো দৃশ্য পরিকল্পনার যো নেই। বেশীর ভাগ মাড়োয়ারী মালিক, তাদের লক্ষ্য হলো কী করে সস্তায় ছবি তুলে বেশী পয়সা পাওয়া যায়। বলে, 'বাবু, একঠো বাগিচা, একঠো রেল-টিশান্ ঔর একঠো জমিন্দারের মকান হোনে খুব আচ্ছা ছবি হইয়ে যায়, পন্দর, ষোল হপ্তা রান্। বেশী সেটের কুছ্ দরকার নাই।' ছবি আঁকা একটু আধটু যা শিখেছিলেম, তার কিছুটা সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পাই শুধু এই অভিজাত সম্প্রদায়ের সৌখীন অভিনয়ে। নিজের কল্পনাকে তবুও খানিকটা সার্থক করতে পারি।"

টেলীফোনের দিকে যেতে যেতে আপন মনে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা আপন বিবেক গ্লানিমুক্ত করায় প্রয়াসী হলেন বীরেশ্বর। কাল বাড়ি থেকে বেরুবার সময় তিনি কিছু ভাবেননি যে, রাত্রিতে বাড়ি ফিরতেই পারবেন না। কী করে ভাববেন? প্রথম অঙ্কে সমুদ্র-সৈকতের দৃশ্যপটটি যে হঠাৎ কর্ম্মকর্ত্তাদের অনবধানতায় ছিঁড়ে নষ্ট হবে তা কি কেউ আগে কল্পনা করেছিলো? সেখানা যে পুনরায় নতুন করে আঁকতে হবে তা কি তিনি জানতে পেরেছিলেন? হাত গুনতে তো আর জানেন না। হুঃ, কাল রাত্রিতে তক্ষুনি আঁকা সুরু না করলে আজ অভিনয়ের আগে তো শেষ হতো কি না। মিনতি, ডলী হাজার হোক ছেলেমানুষ, তাদের ভরসায় কি সেটা ফেলে রাখা চলে? তা ছাড়া, মলী সেন বার বার করে অনুরোধ

করলেন। আহা, যেরূপ মুষড়ে পড়েছিলো বেচারা, দেখলে কার না মায়া হয়? তখন কাজ ফেলে বাড়ী চলে যেতে পারে কোন ভদ্রলোক?

হ্যাঁ, সুবালাকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কাল রাত্রিতে ব্যস্ততার মধ্যে সেটা ভুল হয়ে গেছে। অন্যায়ই হয়েছে। কিন্তু আজ সকালে কী একবার চেষ্টা করেন নি? দশ মিনিটের চেষ্টায় টেলীফোনের যে রং নাম্বার পেয়েছেন সে কি তাঁর দোষ? কে না জানে যে, কলকাতার টেলীফোনে পনর মিনিটের আগে একটা নাম্বারই পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও ভুল নাম্বার। রিসিভার তুলেই একেবারে যে ঠিক লাইনটি পায় সে তো নিশ্চিন্ত মনে সেন্টলেজারের টিকিট কিনলেও পারে।

"হ্যালো, কে, সুবালা? হ্যাঁ, আমি কথা বলছি। দেখ, কাল রাত্তিরে এখানে"……বীরেশ্বর গৃহে প্রত্যাগমনের বিঘ্ন সবিস্তারে বর্ণনা করতে যাচ্ছিলেন।

সুবালা বাধা দিয়ে বললেন, "প্রিমিয়র কোম্পানী থেকে লোক এসেছিল। বললে, তাদের ডিজাইনটা কাল চাই ই।"

"কাল? আচ্ছা, ওটা তো প্রায় হয়েই আছে। আর একটু শুধু ফিনিশ দিয়ে দেওয়া বাকী। দশ মিনিটের কাজ। আমি তোমাকে কাল রাত্তিরে খবর……"

"আর নিউ বুক কোম্পানী ফোন করেছিল। তাদের ওখানে আজ কিম্বা কালের মধ্যে যেতে বলেছে, খুব জরুরী।"

"কাল যাবো'খন। আজ সকালে তোমাকে একবার টেলীফোন……"

"নীরেনবাবু এসেছিলেন কিছুক্ষণ আগে। তোমাকে একবার তাঁর বাড়ীতে টেলীফোন করতে বলে গেছেন।"

"তা এখুনি করছি। এখানে সাড়ে পাঁচটায় অভিনয় সুরু হবে। তুমি খোকনকে নিয়ে…… হ্যালো, হ্যালো,"……ঐ যাঃ, বোধ হয় লাইন কেটে দিয়েছে। না, এই টেলীফোনের মেয়েগুলিকে নিয়ে আর পারা যায় না।

"হ্যালো মিস্, হ্যালো, হ্যালো"……বীরেশ্বর টেলীফোনটা ফ্লাশ করতে সুরু করলেন। ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠ-ক্ ঠক্। বৃথা চেষ্টা। আজকাল কি আর টেলীফোনে কথা বলার জো আছে কারো সঙ্গে? গভীর বিরক্তির সঙ্গে বীরেশ্বর রিসিভারটা রেখে দিলেন।

কিন্তু সুবালাকে তো অভিনয় দেখতে আসার কথাটা বলা হলো না। সে নিজে উদ্যোগী হয়ে আসবে কি? সম্ভাবনা খুবই কম। কম কেন, একেবারে নেইই বলা যেতে পারে। বীরেশ্বরের সম্পাকিত কোনো অভিনয়, প্রদর্শনী বা শিল্পানুষ্ঠানে আজ পর্য্যন্ত কোন দিন সুবালাকে যোগ দিতে দেখা যায়নি। বড়দিনের সময়ে বীরেশ্বরের চিত্র-প্রদর্শনী দেখতে পরিচিত অপরিচিত নরনারীর ভীড় হয়েছে মিউজিয়মে। দৈনিক সংবাদপত্রে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছেন চিত্র-সমালোচকেরা। প্রসিদ্ধ রসজ্ঞের দল সুখ্যাতি করেছেন প্রকাশ্য সভায়। একমাত্র নিস্পৃহ, নিরাসক্ত, নিরুৎসুক রয়েছেন সুবালা। শিল্পীর নিজের স্ত্রী। বন্ধু-বান্ধবের দল আগ্রহ ভরে নিয়ে যেতে চেয়েছে সঙ্গে করে। অসুস্থতা বা অন্য কোন অপরিহার্য্য গৃহকর্ম্মের অজুহাতে সুবালা বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁদের নিমন্ত্রণ।

সেবার ফাইন আর্টস সোসাইটির এগজিবিশানে প্রদর্শনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য রাষ্ট্রপালের স্বর্ণপদক পেলেন বীরেশ্বর। বিশেষভাবে আহূত সভায় সহরের শ্রেষ্ঠ গুণী, জ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতি ও সঘন করতালির মধ্যে সে পদক গলায় পরিয়ে দিলেন প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী মহোদয়। স্বামীর এই সম্মান-সভায় সুবালাকে অনেক করে নিমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন সভার উদ্যোক্তাগণ। এমন কি, সোসাইটির সভানেত্রী লেডী সুধা ব্যানার্জ্জী স্বয়ং পত্র দ্বারা বীরেশ্বরকে অনুরোধ করেছিলেন শিল্পীকে সস্ত্রীক উপস্থিত হতে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে সভাস্থলে বীরেশ্বরকে আসতে হলো একক। সেদিন সকাল বেলায়ই কী এক অপরিহার্য্য কারণে সুবালার শ্রীরামপুরে যাওয়ার প্রয়োজন ঘটলো। ছোট ভাইএর বাড়ীতে। সেখান থেকে ফিরতে ট্রেণ ফেল করলেন।

অভিনয়-মঞ্চের দিকে ফিরে চললেন বীরেশ্বর। যেতে যেতে মনে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলেন। কাল রাত্রি থেকে আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গৃহে

জিনিস কল্‌কাতায় মেলে অর্থাৎ এরা বিদেশী মাল দেশে আস্‌তে দেবে না। মস্ত কর বসিয়ে দেয়—কাজেই আগুন হয়ে দাঁড়ায়! আর এরা বড় একটা কাপড় চোপড় বনায় না—এরা যন্ত্র আওড়ায় আর গম, চাল, তুলা ইত্যাদি তৈয়ার করে—তা সস্তা বটে।

ভাল কথা, এখানে ইলিস মাছ অপর্য্যাপ্ত আজকাল। ভরপেট খাও, সব হজম। ফল অনেক—কলা, লেবু, পেয়ারা, আপেল, বাদাম, কিস্‌মিস, আঙ্গুর যথেষ্ট, আরও অনেক ফল ক্যালিফোর্ণিয়া হতে আসে। আনারস ঢের—তবে আম, লিচু ইত্যাদি নাই।

একরকম শাক আছে, spinach—যা রাঁধলে ঠিক আমাদের নটে শাকের মত খেতে লাগে আর যেগুলোকে এরা asparagus বলে, তা ঠিক যেন কচি ডেঙ্গোর ডাঁটা, তবে গোপালের মার চচ্চড়ি নেই বাবা। কলায়ের দাল কি কোনও দাল নেই, এরা জানেও না। ভাত আছে, পাঁউরুটী আছেন, হর রকমের নানা রকমের মাছমাংস আছেন। এদের খানা ফরাসীদের মত। দুধ আছেন, দই কদাচ, ঘোল অপর্য্যাপ্ত। মাঠা (cream) সর্ব্বদাই ব্যবহার। চায়ে, কাফিতে, সকল তাতেই ঐ মাঠা—cream—সর না, দুধের মাঠা! আর মাখন ত আছেন, আর বরফজল—শীত কি গ্রীষ্ম, দিন কি রাত, ঘোর সর্দ্দি কি জ্বর—এন্তের বরফজল। এরা scientific (বৈজ্ঞানিক) মানুষ, সর্দ্দিতে বরফজল খেলে বাড়ে শুনলে হাসে। খুব খাও, খুব ভাল। আর কুলপি এন্তের নানা আকারের।

নায়াগারা falls (জল প্রপাত) হরের ইচ্ছায় ৭/৮ বার ত দেখলুম। খুব grand (মহান্ ও উচ্চভাবোদ্দীপক) বটে, তবে যত শুনেছ তা নয়। একদিন শীতকালে aurora borealis* হয়েছিল।

মা ঠাকুরাণীর খবরটবর কেমন চলছে, তোমরা ত কিছুই লেখ নাই। খালি childish prattle (ছেলেমী) সকল জানবার আমার এ জন্মে বড় একটা সময় নাই, next time এ দেখা যাবে।

যোগেন বোধ হয় এতদিনে সেরে গেছে। সারদার ঘুরে ঘুরে রোগ এখনও শান্তি হয় নাই। একটা power of organisation (সঙ্ঘপরিচালনাশক্তি) চাই—বুঝেছ? তোমাদের ভিতর কারুর মাথায় এতটুকু ঘি আছে কি? যদি থাকে ত বুদ্ধি খেলাও দিকি—তারক দাদা, শরৎ, হরি—এরা পারবে।—র originality (মৌলিকতা) ভারি কম, তবে খুব good workman, persevering (ভাল কাজের লোক—অধ্যবসায়শীল), সেটা বড়ই দরকার, আর শশী খুব executive (কাজের লোক), বাদবাকি এরা যা বলে তাই শুনে চলো। কতকগুলো চেলা চাই—fiery youngmen (আত্মমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক), বুঝতে পারলে?—intelligent and brave (বুদ্ধিমান ও সাহসী), যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝলে?

---

*Aurora Borealis (সুমেরু জ্যোতি) পৃথিবীর উত্তরভাগে রাত্রিকালে (তথায় ছয় মাস ক্রমাগত রাত্রি) কখনও কখনও নভোমণ্ডলে এক প্রকার কম্পমান বৈদ্যুতিক আলো দেখা গিয়া থাকে। উহা নানা আকারের এবং নানা বর্ণের। ইহাকেই অরোরা বোরিয়ালিস্ বলে।

hundreds (শত শত) ঐ রকম চাই, মেয়ে মদ্দ both (দুই)—প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর—চেলা বনাও আর আমাদের purity drilling (পবিত্রতার সাধন) যন্ত্রে ফেলে দাও।

তোমাদের আক্কেল বুদ্ধি এক পয়সাও নাই। Indian Mirrorকে পরমহংস মশায় নরেনকে কেন বলতেন কেন বলতে, কেন বলতে গেলে—আর আজগুবি ফাজগুবি যত—পরমহংস মশায়ের বুঝি আর কিছুই ছিল না? খালি thought reading আর nonsense (পরচিত্তবিজ্ঞান আর বাজে) আজগুবি ছ পয়সার brainগুলো। ঘৃণা হয়ে যায়! তোদের নিজের বড় বড় একটা খেলাতে হবে না—সাদা বাঙ্গলা বলে যা দিকি। বাবুরামের লম্বা পত্র পড়লাম। বুড়ো বেঁচে আছে—বেশ কথা। তোমাদের আড্ডাটা নাকি বড় malarious বাবুরাম আর হরি লিখ্‌ছেন। রাজাকে আর হরিকে আমার বহুৎ বহুৎ দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গ ষট্‌কবৎ ছত্তবাবৎ দিবে। বাবুরাম অনেক delirium বকেছে। সান্ন্যাল আনাগোনা করছে, বেশ বেশ। গুপ্তকে তোমরা চিঠিপত্র লেখ আমার ভালবাসা জানাও এবং করো। সব ঠিক আস্‌বে ধীরে ধীরে। আমার বড় চিঠি লেখবার সময় বড় একটা হয় না। Lecture ফেকচার ত কিছু লিখে দিই না, একটা লিখে দিয়েছিলুম যা ছাপিয়েছ। বাকি সব দাঁড়িয়ে যা মুখে আসে গুরুদেব জুটিয়ে দেন। কাগজ পত্রের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই। একবার ডিট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলুম আমি নিজে অবাক্ হয়ে যাই সময়ে সময়ে, 'মধো তোর পেটে এত ছিল'! এরা সব বলে পুঁথি লেখ, একটা এইবার লিখ্‌তে ফিকির হবে দেখ্‌ছি। ঐ ত মুস্কিল, কাগজ কলম নিয়ে কে হেঙ্গাম করে বাবা!

কোনও চিঠি বাজার হজুর করিস্ নি, খবরদার! ছেঙ্গড়া নাকি? যা করতে বলছি পারত কর, না পারত মিছে ফেচাং করো না। তোমাদের বাড়ীতে কটা ঘর আছে—কেমন করে চলছে রাঁধুনী ফাঁধুনী আছে কি না সব লিখবে। মা ঠাকুরাণীকে আমার বহুত বহুত সাষ্টাঙ্গ দিবে। তারকদাদা আর শরতের বুদ্ধি নিয়ে কাজটা কত্তে বলেছি—কররার চেষ্টা করিবে—দেখিব কেমন বাহাদুর এইটুকু যদি না করিতে পার তা হলে তোমাদের ওপর হতে আমার সব বিশ্বাস আর ভরসা চলে যাবে। মিছামিছি কর্ত্তাভজার দল বাঁধতে আমার ইচ্ছা নাই—I will wash my hands off you for ever (তোমাদের কোন দায়িত্বই আমি আর রাখব না)।

সমাজকে, জগৎকে electrify (বৈদ্যুতিক শক্তিসঞ্চারিত) করিতে হইবে। বসে বসে গল্পবাজির আর ঘণ্টা নাড়ার কাজ নয়, ঘণ্টা নাড়া গৃহস্থের কর্ম্ম, মধো—বা—করুন গে, তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought currents (ভাবপ্রবাহ বিস্তার)। * * *

Character formed (চরিত্র গঠিত) হয়ে যাক, তার পর আমি আসচি, বুঝলে? দু হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে মদ্দ বুঝলে? গৌর মা, যোগেন মা, গোলাপ মা, কি করছেন? চেলা চাই at any risk (যে কোন রকমে হোক) তাঁদের গিয়ে বলবে আর তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা করো। ***

র কাজ নয়, ত্যাগী—বুঝলে ? এক এক জনে ১০০ মাথা মুড়িয়ে young educated men—not fools (শিক্ষিত —আহাম্মক নয়), তবে বলি বাহাদুর। হুলস্থূল বাঁধাতে হবে, গাল ফুঁকো ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে যাও। তারকদাদা, কলিকাতার মাঝে বিদ্যুতের মত চক্র মার দিকি, বার কতক। জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) কর, খালি চেলা কর, মায় যে আসে সে মাথা মুড়িয়ে, তারপর আমি আসছি। spiritual tidal wave (আধ্যাত্মিক বন্যা) আসছে—নীচ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ (goal) নিবোধত।"

Life is ever expanding, contraction is death (জীবন হচ্ছে সম্প্রসারণ, আর সঙ্কোচনই মৃত্যু)। যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্য্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ (অপরে হীনবুদ্ধি)।

এই মহা সন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করিবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে, বাকি যে তা না পার তফাৎ হয়ে যাও এই বেলা ভালয় ভালয়। এই চিঠি তোমরা পড়বে—যোগেন মা, গোলাপ মা সকলকে শুনাবে। এই test (পরীক্ষা), যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ (প্রাণত্যাগ হইলেও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তাঁরা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হয়ে যাক এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম্ম চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, onward, onward (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও)। মেয়েমদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে—onward, onward. নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান্ চরিত্রের, তাঁর মহান্ জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য্য—আর কিছু নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখ না ? একি ছেলেখেলা, একি জ্যাঠামি, একি চেঙ্গড়ামি—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—হরে হরে। তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখতে পারছি না—onward, এই কথাটা খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার spirit (শক্তি) আসবে, বিশ্বাস কর। Onward, হরে হরে। চিঠি বাজার করো না। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। Onward, হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁসিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব গুরবো, পাপী তাপী, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত তাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হবে, তাদের ভিতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন। যেগুলো নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, বিলাসী তারা কি করতে আমাদের ঘরে এসেছে ? তারা চলে যাক।

আমি আর লিখতে পারছি না, বাকি তিনি নিজে বলুন গে।

ইতি—বিবেকানন্দ

পুঃ—একটা বড় খাতা রাখবে এবং তাহাতে যখন যে স্থান হইতে কোন পত্র আসে তাহার একটা চুম্বক লিখিয়া রাখিবে। তাহা হইলে উত্তর দিবার বেলায় হুলস্থূল হইবে না। Organisation শব্দের অর্থ division of labour (কর্ম্মের বিভাগ)। প্রত্যেকে আপনার আপনার কাজ করবে এবং সকল কাজ মিলে একটা সুন্দর ভাব হবে।

তোমার পড়বার জন্য দু ছত্র কবিতা পাঠাইলাম।

গাই গীত শুনাতে তোমায়······*

এখন এই পর্য্যন্ত, পরে যদি বল ত আবার পাঠাব। বিশেষ অনুধাবন করে যা যা লিখলাম তা করিবে। আমার কবিতা কপি করে রেখো—পরে আরও পাঠাব। ইতি—বি।

উৎসর্গ পত্র।

[উৎসর্গ-পত্র রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের "প্রতিভাসুন্দরী" হইতে গৃহীত।]

পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও সদ্গুণের সৌরভে
যিনি দেশ বিদেশে পূজিত,
যাঁহার তেজস্বিতা ও মনস্বিতা ও নিস্বার্থ পরোপকারিতায়
অতি মূঢ় অধমাত্মাকেও অবনত হইতে হয় ;
যাঁহার সরস মধুর অমায়িক ব্যবহারে ও
উচ্চবংশোচিত সামাজিক শিষ্টাচারে,
ধনী নির্ধন সকলেই চমৎকৃত,

বঙ্গের সেই সুসন্তান—

বাণীচরণাশ্রিত বিদ্যাবিনয়-অলঙ্কৃত,
ভারতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণের
মাননীয় বিচারপতি
পরম পূজাস্পদ—"ডাক্তার সরস্বতী"
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,—
M. A., D. L., D. Sc., F. R. A. S., F. R. S. E.
মহোদয় শ্রীচরণে,
তদীয় ভক্তের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিরূপে

প্রতিভাসুন্দরী

উৎসৃষ্ট হইল।

---

* বীরবাণী দ্রষ্টব্য

উঁচু থেকে (উল্টে দেখুন) —মনো মিত্র

কলিকাতার ট্যাক্সি —গণেশ দাশ

(দ্বিতীয় পরস্কার)

—আগামী সংখ্যার প্রতিযোগিতা—

বিষয়

সাঁকো

প্রথম পুরস্কার—১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার—১০৲

তৃতীয় পুরস্কার—৫৲

ছবি পাঠানোর শেষ দিন

ভাদ্র

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে আগ্রায় আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রার আলোকচিত্র মুদ্রিত হ'ল। চিত্রটি শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় গৃহীত।

কলিকাতার হোটেল (তৃতীয় পুরস্কার) —রণজিৎ রায়চৌধুরী

শৈব

বন্ধুর কথা

বন্ধু—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
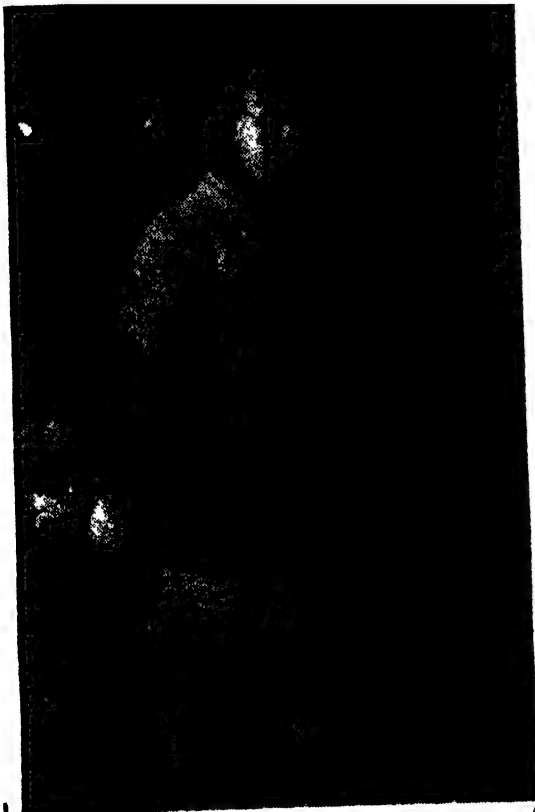
যতীন আমার সমবয়স্ক, অন্তরঙ্গ ও অভেদাত্মা বাল্যবন্ধু। এত কাল পরে সেদিন তার ইচ্ছা হয়েছে নিজের জন্মদিন নিয়ে একটা কবিতা লেখে। কিন্তু জন্মদিনটা মনে নেই, কারণ সেটার প্রয়োজন জীবনে হয়নি। আফিসের খাতায় কোন একটা খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী লেখা ছিল, তাই দিয়ে এত'দিন কাজ চ'লে আসছিল। কিন্তু তা নিয়ে কবিতা লেখা চলে না। আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'ভাই, তোর ত সবই মনে থাকে, আমার জন্ম-তারিখটা বলে দে।' আমি হেসে বললাম, 'মনে হচ্ছে, তোর কোষ্ঠীতে লেখা ছিল আষাঢ়স্য ত্রয়োদশ দিবসে।' কোষ্ঠী খুলে দেখা গেল সে জায়গাটা ছিন্ন, কীটদষ্ট। প্রায় ৬৪ বৎসরের পুরানো কাগজ, দোষ দেওয়া যায় না। যাই হোক, আমার কথায় বিশ্বাস কোরেই যতীন জন্মদিন শীর্ষক কবিতা লিখে এনে আমায় শোনাল :—

মেঘের আড়ালে তেরই আষাঢ় চুপি চুপি চ'লে যায় ;
অপরিচিতের মতন এবারও বিদায় দিবি কি তায় ?
বার বার বার তেরই আষাঢ় এসেছে গিয়েছে চলি',
নয়নধারায় করিয়া সিক্ত কোন কথাটি না বলি।
এবার সাধিয়া শুধাও তাহারে কি চাহে সে বলিবারে,
জীবনে যাহারে করিনি স্মরণ, বরণ করহ তারে।
তারি বক্ষের সজল শ্বাসে ভরি' লহ তব বুক,
এই দিনটির দর্পণে দেখ সারা জীবনের মুখ।
আজিকার কালো, রবি-শশাঙ্কে হয়নি কলংকিত,
কাল সাগরের কৃষ্ণ কমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত !
ঢল ঢল তার নির্মম শোভা সনির্বন্ধ ডাকে,
তারি গন্ধের মেদুর ছন্দে সকল গগন ঢাকে,
তারি বুকে নেমে আলোকের পাখা হ'ল গুঞ্জনহীন,
মর্মের কোষে তপন তারকা তারি মধুপানে লীন।
চির কলংকী ওরে কবি, তোর কী সৌভাগ্য বল্
এই দিনটির মৃণালে ফুটিল হেন সহস্রদল।
পেরেছিস্ কি রে চিন্‌তে ?
মরণ-কমল ফুটে আছে ওই জন্মদিনের বৃন্তে।
চেয়ে থাক্ চেয়ে থাক্
বন্দনাহীন অর্ঘ্যবিহীন নিশ্চল নির্বাক্।

এই কুড়ি ছত্রের কবিতাটি ১৩ই আষাঢ়ে আরম্ভ কোরে ১৫ই আষাঢ় শেষ হ'য়েছে ; আর জন্মদিন উপলক্ষে মৃত্যুকে টেনে এনে বরণ কোরেছে। যতীনের এই রকমই হয়। কবিতা শুনে বাহবা দিলাম ; কারণ, বুঝলাম, বন্ধু তাই চায়।

বাল্যে বা কৈশোরে যতীনের কবিতা-রোগ দেখিনি। ৮ বছর বয়সে সেই যে ম্যালেরিয়ায় ধরল, স্বরূপে বা বহুরূপী হ'য়ে আজ পর্যন্ত তাকে আর রেহাই দেয়নি। নদীয়া জেলার হরিপুর গ্রাম যার পিতৃভূমি, আর বর্দ্ধমান জেলার পাতিলপাড়া যার মাতৃভূমি এবং জন্মভূমি, সে যে এখনও বেঁচে আছে এই আশ্চর্য্য ! তার পাঁচ-ছয় ভাইবোন কেউ শৈশব উত্তীর্ণ হয়নি। ১২ বছর বয়সে গ্রামের স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ কোরে সে কলকাতায় গেল কাকার বাসায় থেকে পড়াশুনা করতে। বছর দেড়েক স্কুলে অধ্যয়ন করার পর হ'ল তার বিউবনিক প্লেগ। আমাদের পল্লীবাসীর দেহ তখনকার দিনে ম্যালেরিয়ার কাছে বন্ধক দেওয়া, সহরের প্লেগ আমল পেল না, যতীন সেরে উঠল। মাস ছয়েক পরে আবার তাকে ধরল তখনকার বাতশ্লৈষ্মিক বিকার, এখনকার টায়ফয়েড। নাড়ী-টাড়ি ছেড়ে গেল, কিন্তু প্রাণ রইল। আমরা বললাম, 'যতীন, আর কলকাতায় গিয়ে কাজ নেই, পাশের গ্রামে হাইস্কুল হয়েছে, সেইখানে পড়ি চল্।' তাই হ'ল। মাস কয়েক সেখানকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার পর যতীন আরও শীর্ণ হ'য়ে পড়ল। তার পিতা তখন বালেশ্বরে সামান্য চাকরি করেন। তিনি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি কোরে দিলেন। জল-হাওয়ার গুণে যতীন কয়েক মাসে মোটা হ'য়ে উঠল ; কিন্তু বাপের গেল চাকরি। কলকাতায় ফিরে এসে ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও ১৯০৩ খৃঃএ এনট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তরণ। বেনেটোলার মেসে যখন একসঙ্গে থাকতাম, তখন এক এক দিন বলতাম—যতীন, তোর জ্বর এলে লেপ চাপা দিয়ে স্কুলে যাই, ফিরে এসে কোন দিন দেখব মরে প'ড়ে আছিস্। সে বিস্কুট খায়, বীজগণিত কষে, আর হাসে।

সেদিনের জেনেরাল এ্যাসেম্ব্লি (এখনকার স্কটিস্ চার্চ) কলেজ থেকে ১৮ বছর বয়সে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কোন্ লাইনে যাওয়া যায় এই নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে তখন এক বন্ধু এসে বললেন, 'শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোষ্টেলে থাকতে পেলে জীবন ধন্য হ'য়ে যাবে। অভিভাবকের কোন বালাই নেই, তার উপর হোষ্টেল-প্রাঙ্গণের পুকুরে যে পদ্ম ফুটে থাকে তা তুলনাহীন।' পদ্মের লোভেই যতীন অভিভাবকদের মত করিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে গেল। এই ব্যাপারে তার কবিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আমাদের মনে প্রথম জাগে।···কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যে কি বস্তু, সে বিষয়ে যতীন বা তার অভিভাবকদের কোনই ধারণা ছিল না। পদ্মপুকুরের সন্নিকটে বসেই প্রাবেশিক পরীক্ষা করলেন সেখানকার ডাক্তার। বুকের মাপ, দেহের ওজন, সবই কম কম হ'ল। তখন ডাক্তার বাবু আর একটা পরীক্ষা করলেন। সেই তৃতীয় প্রহরের নিদাঘ-রৌদ্রে দূরের একটা অশ্বত্থ গাছ দেখিয়ে বললেন—ঐ পর্য্যন্ত জোরে ছুটে গিয়েই ছুটে ফিরে এস। হাঁপিয়ে গেলেও যতীন সেটা ভালোই পারল। কিন্তু সেই অবস্থায় তাকে যখন 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজ উল্টো কোরে পড়তে দেওয়া হ'ল তখন আর পাশ-ফেল বোঝা গেল না। ডাক্তার বললেন তুমি বি-এ পড়গে যাও। সে যখন বারান্দা ছেড়ে নেমে যাচ্ছে, তখন ডাক্তার বাবু করুণাপরবশ হয়ে পাশ কোরে দিলেন ; অর্থাৎ বুকের মাপ দেহের ওজন ইত্যাদি বাড়িয়ে লিখে দিলেন। আমরা ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্য কোমর বাঁধলাম।

লেখাপড়া যা হয় হ'তে লাগল; কিন্তু মুস্কিলে পড়া গেল ওয়ার্কশপ নিয়ে। প্রথম বৎসর ছুতারখানার কাজ। প্রথমেই প্রত্যেককে রেলের শ্লিপারের মত এক-একটা কাঠ দিয়ে হাতকরাতের সাহায্যে সেটাকে ফালা-ফালা কোরে চিরতে বলা হ'ল। সেই সামান্য কাজটুকু সুসম্পন্ন করার পর আসল কাজ শেখানো হবে। দু'-তিন দিনের মধ্যে দু'হাতে ফোস্কা প'ড়ে, গ'লে, ঘা হ'য়ে গেল, কিন্তু কাঠ বিদীর্ণ হ'ল না। দু'-চার জন তার পরই সরে পড়লেন অভিভাবকদের বহু টাকা নষ্ট কোরে। মনে হচ্ছে, বর্তমানের এক জন রাজ্যমন্ত্রী তাঁদেরই অন্যতম। ব্যাড্‌মিণ্টন খেলার মাঠে তিনি বাঁ হাতের কর্কে কিছুতেই ডান হাতের ব্যাট্‌ ঠেকাতে পারতেন না; সেও বোধ হয় কলেজ ছাড়বার আর একটা কারণ। ভালোই কোরেছিলেন; আজ তিনি ত্যাগধন্য ও দেশমান্য।

যাই হোক্‌, আমরা গরীবের ছেলে, প্রাণপণে কাজ ও পড়া চালিয়ে যেতে লাগলাম। যতীনের মাঝে-মাঝে জ্বর হয়, কিন্তু ডাক্তারখানায় কুইনাইনের দাম লাগে না, এবং কুইনাইন মিক্সচার খেয়েও যতীনের আর মুখ ধোবার বিশেষ দরকার হয় না। ডাক্তার পথ্য পাঠান—পাঁউরুটি আর মাংসের ঝোল। সে ডাক্তারটির বিশ্বাস ছিল পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই বাঙ্গালীর ছেলেদের অত ম্যালেরিয়া হয়, বিশেষতঃ শিবপুর কলেজের ঐ খাটুনির পর, মাত্র ডাল-ভাত খেয়ে। যারা সুস্থ তাদের কোন সাহায্য তিনি করতে পারতেন না, কিন্তু রোগী হ'লে তিনি ঐ প্রকার পথ্যের ব্যবস্থা করতেন।

বন্ধু মিহিরলালের সঙ্গে যতীনের তর্ক বেধেছে। মিহির বলে, রবীন্দ্রনাথের মত কবি বাংলায় জন্মায়নি। যতীন উত্তপ্ত হ'য়ে জানায়, নবীন সেনের কুরুক্ষেত্র যে প'ড়েছে সে ও-কথা বলবে না। কিছু দিন পূর্বে আমরা কুরুক্ষেত্র পড়েছিলাম, মাইকেলের 'সীতা ও সরমা' অংশ, হেমচন্দ্রের 'অশোক তরু' প্রভৃতি দশ-বিশটা কবিতাও পড়া ছিল। বাল্যকালে পিসিমার কাশীরাম দাসের মহাভারতখানি যতীন দেখিয়ে-লুকিয়ে কয়েক বার শেষ কোরেছিল। গ্রামের মুচিপাড়া ও কুলোপাড়ার বারোয়ারি পূজায় কবির গান ও তর্জার লড়াই আমারা শুনেছি। কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আমরা তখনও পড়িনি, গান দু'-দশটা শুনিছি। মিহির মৃদু হেসে বললে—নবীন সেন ও রবীন্দ্রনাথে কি তফাৎ সেটা বোঝাবার জন্য রবি বাবুর কাব্যগ্রন্থাবলী তোমাদের দেব, আগামী বর্ষাবকাশে প'ড়ে দেখ, তার পরে তর্ক কোরো। মিহির-প্রদত্ত, আড়ে-দীঘে সমান, একখানি প্রকাণ্ড রবীন্দ্রকাব্য গ্রন্থাবলী নিয়ে ছুটির সময় হরিপুরে এলাম। পড়ে দেখে আমরা ত অবাক! হায় নবীন সেন! এই বিদ্যে নিয়ে মিহিরের সঙ্গে তর্ক করা হচ্ছিল। বয়স তখন উনিশ উত্তীর্ণপ্রায়। যতীন বললে ধরিত্রী দ্বিধা হও।

যাক্‌, ছুতারশাল,—কামারশাল-কণ্টকিত বিতার পরীক্ষায় শেষ পর্য্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে পাশ কোরে যতীন ট্রেনিং নিতে ঢাকায় গেল। সেখান থেকে ফিরে পিতৃভূমি নদীয়ার জেলা-বোর্ডে চাকরি জুটল ১৯১৩ খৃঃএ। এই তার কর্মজীবনের সূত্রপাত। তখনকার জেলা-বোর্ডের প্রবীণ ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী কৃষ্ণনগরেই। প্রথম বয়সে কিছু দিন P. W. D.তে চাকরি কোরে তিনি অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁদের বংশেরও ধনখ্যাতি ছিল। তার উপর তাঁর পরিবারবর্গ বলতে তিনি ও তাঁর পরিবার। সুতরাং অর্থের প্রয়োজন তেমন নয়। তাঁরই স্নেহচ্ছায়ে ও সহকারী হিসাবে চাকরি আরম্ভ কোরে যতীনের আর উপরি-পাওনা নেবার অবকাশ বা অভ্যাস হ'ল না। আমি বলেছিলাম, 'শুকনো মাহিনায় তোমার চলবে না, যতীন! সংযম থাকলে মদ খেলেও মাতাল হয় না, চুরি করলেও চোর হয় না; আর শতকরা হিসাবে ঠিকাদারদের লাভের অংশমাত্র গ্রহণ করলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সেটা চুরি নয়।' যতীনের সাহসে কুলিয়ে উঠল না। ক্রমে দেখলাম, এ বিষয়ে তার একটা অহমিকাও জন্মে গেল।

প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের একটি প্রধান দোষ ছিল, তিনি সে সময় বিশেষ কিছু দেখতে পেতেন না। জেলা-বোর্ডের চাকরিতেই একটা এ্যাকসিডেণ্ট হ'য়ে একটি চোখ পূর্বেই নষ্ট হ'য়ে যায় এবং বাকিটিতে বেশ ঝাপ্‌সা দেখতেন। অতিশয় অমায়িক, সদাশয় পুরুষ; বোর্ডের সদস্যদের বিশেষ প্রিয়। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ অর্থাৎ বোর্ডের চেয়ারম্যান্‌ বাঙ্গালী এবং তাঁর কৈশোরের বন্ধু। কার্য্যে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। সুতরাং সেই ঝাপসা-দেখা একটি চোখেই জেলা-বোর্ডের কাজ চালিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হচ্ছিল। কার্য্যপরিদর্শনে গিয়ে পল্লীপথে সাদা গরুকে ভদ্রমহিলা মনে কোরে তিনি পথের এক পাশে দাঁড়াতেন, আবার ভদ্রমহিলাকে গরু মনে কোরে লাঠি উঁচিয়ে পূর্বের ভ্রম সংশোধন কোরে নিতেন, এমন রটনাও ওভারশিয়াররা করত। কিন্তু সে সব অবিশ্বাস্য কথা কোন দিন বোর্ডের মিটিংএ উঠেনি। এমন সময় এক জন বঙ্গবিশ্রুত দুষ্টপ্রকৃতি আধখ্যাপা ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের আগমন সম্ভাবনায় ইঞ্জিনিয়ার বিচলিত হ'য়ে উঠলেন। ঐ সাহেবের এমন বদনাম ছিল যে, পূর্বে তিনি আর এক জন ইঞ্জিনিয়ারকে প্রহার দিয়েছিলেন। তিনি সত্য সত্যই এলেন এবং প্রথমেই বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানকে ছোট এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠালেন—'এই অন্ধ ইঞ্জিনিয়ার কত দিন হইতে বোর্ডকে প্রতারিত করিতেছে এবং বোর্ড তাহার নিকট কি পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দাবী করিতে পারে, আমায় জানানো হউক।' বিষয়টি বোর্ডের অধিবেশনে পেশ করিতে হইল এবং সদস্যদের নির্বন্ধাতিশয়ে সাহেব-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ারকে ১ বৎসরের ছুটি দিলেন, আর যতীনের উপর ভার পড়ল অস্থায়ী ভাবে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার। সাহেবের ইচ্ছা, ইতিমধ্যে এক জন উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার খুঁজে নেবেন।

এ-সাহেব যে-কোন সময় দু'-চার ঘা বসিয়ে দিতে পারে; সুতরাং যতীনকে প্রাণপণে চাকরি করতে হ'ল। সাহেব খুশি হলেন এবং অন্য ইঞ্জিনিয়ার খোঁজা বন্ধ করলেন। কিন্তু নদীয়া জেলার আব-হাওয়ায় অতিপরিশ্রমে যতীনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'ল। সেটা হ'তে অব্যাহতি পেতে বেশ কিছু দিন সময় লেগেছিল। তার মধ্যে বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার ছুটি চান, ছুটি পান, আর যতীন কাজ চালিয়ে যায়। এই অবস্থায় যতীনের চাকরি যখন পাকা হওয়ার কোন বাধা দেখা যাচ্ছে না, তখন খুঁটি কেঁচে গেল। সাহেব বদলি হ'য়ে গিয়েছেন, অন্ধ ইঞ্জিনিয়ার অস্ত্রোপচারের ফলে আবার ঝাপ্‌সা দেখছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ চেয়ারম্যানের আমল পরিবর্তিত হওয়ায় বেসরকারী চেয়ারম্যান পেয়ে বোর্ড পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন করায়ত্ত কোরেছে। সুযোগ বুঝে ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়ার মাত্র ৬ মাসের জন্য কাজে যোগ দেবার প্রার্থনা জানিয়ে দরখাস্ত করলেন। কিন্তু তার একটা অন্তরায় উপস্থিত হ'ল।

বোর্ডের কাগজপত্রে দেখা গেল, তাঁর বয়ঃক্রম তখন চাকরির সীমারেখা অতিক্রম কোরেছে, অর্থাৎ আইনানুসারে তাঁর আর চাকরি করা চলে না। তিনি আর একটা সরকারী নথি থেকে নজীর দেখালেন, বয়স এখনও সীমারেখার মধ্যেই আছে। দু'টি বয়সের মধ্যে মাত্র দু বৎসর তফাৎ। আসলে, ছাপার দোষে ইংরাজি আট এক স্থানে তিন হ'য়েছে; আর আটটাই যে ঠিক সে বিষয়ে তাঁর বা অপর কারও কোন সন্দেহ ছিল না। যাই হোক, দু'টি বয়সের মধ্যে কোনটি ঠিক, তাঁকে এফিডেবিট্ করতে বলা হ'ল। তিনি এফিডেবিট না কোরে তাঁর বয়স কত, সে বিষয় সিদ্ধান্ত করবার ভার বোর্ডের উপর দিলেন। বোর্ডের অধিবেশনে ভোটে তাঁর বয়স ধার্য্য করা হ'ল এবং তাঁকে ৬ মাসের জন্য কাজে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হ'ল। যতীন পেল ঐ ছ' মাসের ছুটি।

চাকা বিপরীত দিকে ঘুরছে। ভগ্নস্বাস্থ্য যতীন নেয় ছুটি, আর আপ-সা-দৃষ্টি ইঞ্জিনিয়ার পান extension। স্বগ্রামে ব'সে যতীন চরকা চালায়, খদ্দর বোনায়, কিন্তু জেল খাটে না। একটা দেশলাইএর কারখানা কিনে গ্রামস্থ বালক-শ্রমিকের সাহায্য নিয়ে ভাবে এই ছোট কুটীরশিল্পের দৌলতে গ্রামের উপকার এবং তারও জীবিকার সংস্থান হবে। স্বাস্থ্যের যে প্রকার অবস্থা তাতে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বোর্ডের চাকরি করবার আশা বা ইচ্ছা তার আর নেই। খদ্দরে আর সেদিনকার দেশী দেশলাইএ যে পেট ভরবে না, সে কথা সবাই বুঝেছে, যতীন বুঝছে না। এমন সময়, প্রায় তিন বৎসর পরে তার জুটে গেল কাশিমবাজারাধিপতি প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের স্টেটে ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি। অত্যন্ত অনিচ্ছায়, আত্মীয়-স্বজনের আগ্রহে দেশলাই ফেলে এবং চরকা নিয়ে যতীন যোগ দিলে সেই কাজে ১৯২৩ সালে, যখন তার বয়স ৩৬ বৎসর। সেই বৎসর তার প্রথম কবিতা-পুস্তক 'মরীচিকা' প্রকাশিত হয়। এর কবিতাগুলি কৃষ্ণনগরে চাকরি করবার সময় ও তৎপূর্বে রচিত। স্বাস্থ্যভঙ্গের ও বৎসর যতীন কোন কবিতা লেখেনি।

কাশিমবাজারের চাকরিতে যোগ দিয়েই যতীনের ঘাড়ে আবার সাহেবই চাপল। ঋণগ্রস্ত মহারাজা স্থির কোরেছেন নিজের একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের পরিবর্তে এক দু'দে ও অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান সাহেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কোরে নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন। তাই হ'ল এবং সাহেব এলেন। কৃষ্ণনগরের সাহেবটির মত এঁরও সুনাম আছে, প্রয়োজন হ'লে চাবুক চালাতে দ্বিধা করেন না। কাশিমবাজারের বৈধরাজ্যে সাহেবি আমল প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কর্মচারীদের প্রায় সকলেরই চাকরি গেল, যতীন নূতন ব'লেই বোধ হয় চাকরিটা থাকল।

মহারাজা যে সাহেবটিকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন, তিনি অপ্রতিহত প্রভাবে ৬ বৎসর রাজদণ্ড চালনা করেছিলেন। সাহেব প্রথমেই পুরাতন কর্মচারী ও পদ্ধতি পরিবর্তন কোরে নূতন নূতন লোক নিযুক্ত করতে লাগলেন। জমিদারী সেরেস্তার পুরানো পদবী পতিত হ'য়ে এ্যাকাউন্টেন্ট, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, অডিটার ইত্যাদি নূতন পদে নিত্য নব লোকের আগমন সুরু হ'ল। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই গবর্ণমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ কর্মচারী। বেতন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী, যোগ্যতাও বোধ হয় বেশী। প্রত্যহ নূতন নূতন বৃদ্ধের আগমন দেখে মহারাজারই এক বৃদ্ধ সুরসিক কর্মচারী এক দিন বললেন, এমনি ঘটনা এ রাজ্যে আর একবার ঘটেছিল। সকলে বিস্মিত হ'য়ে তাঁকে ঘিরে বসলে তিনি গল্প সুরু করলেন :—

"তখনকার রাজা বর্তমান মহারাজার ন্যায় এমন খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন না, মাঝে-মাঝে একটু-আধটু শাক্তপথেও চলতেন। পূজার সময় রাজবাটীর সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে যাত্রাগান চলছে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একমনে শুনছে। রাজা চলেছেন সদর থেকে অন্দরমহলে। মাঝে নাটমন্দির পার হবার সময় দেখলেন, যাত্রার আসরে কে এক জন লম্বিতশ্মশ্রু বৃদ্ধ চমৎকার বক্তৃতা করছে। রাজা পার্শ্বস্থ পারিষদকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ও কোন্ হ্যায়?' পারিষদ করযোড়ে নিবেদন করলে—'হুজুর, ও নারদ মুনি হ্যায়।' রাজা বললেন—'ও ত বহুৎ আচ্ছা বোলতা হ্যায়, অউর মুনি হ্যায়?' চারি দিকে সাড়া প'ড়ে গেল, যাত্রার অধিকারী রাজ-ইচ্ছা বুঝে তৎক্ষণাৎ বশিষ্ঠ মুনিকে আসরে নামালেন, যদিও বশিষ্ঠ মুনির সে সময় আসবার কোন কারণ ছিল না। রাজা বশিষ্ঠকে দেখে আরও মুগ্ধ হলেন, এবং হুকুম করলেন 'অউর মুনি লে আও।' তখনি আর এক জনকে পাকা দাড়ি পরিয়ে মুনি সাজিয়ে আনা হ'ল। রাজা তখন আসরে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসেছেন এবং হুকুম দিচ্ছেন—'অউর মুনি লে আও।' যাত্রাদলে যে কয়টা পাকা, ডাঁসা দাড়ি ছিল ফুরিয়ে গেল, তখনও রাজা মুগ্ধ হয়ে বলছেন—'অউর মুনি লে আও।' শেষে রাজবাড়ীর গুদাম থেকে শণ পাট বার করে তারি সাহায্যে মুনি সাজানো আরম্ভ হ'ল, এবং ডজন কয়েক মুনি যখন সারবন্দী হ'য়ে আসরে দাঁড়াল, তখন অধিকারী শাল বখ্শিস পেলেন।

মশায়, সেই ইতিহাসই চোখের উপর পুনরাবৃত্ত হচ্ছে।"

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির কথায় আর একটা দৃষ্টান্ত মনে আসছে। শোনা যায়, দিল্লীর খেয়ালি সম্রাট্ মুহম্মদ বিন তোগলক্ তিন বার দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত কোরেছিলেন এবং প্রতিবারই হুকুমজারি হয়েছিল সমস্ত নাগরিকদের তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে। কাশিমবাজারের সাহেবটিও প্রথমে তাঁর রাজধানী কাশিমবাজার থেকে বহরমপুরে নিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে আবার তাকে কলকাতায় টেনে নিয়ে যান। তিনিও প্রত্যেক বার হুকুম দিয়েছিলেন, চেয়ার টেবিল আলমারী কাগজ-পত্র এবং আমলাবর্গ সকলে তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত হবে। আবার এমন ব্যবস্থাও করতে হবে, যাতে স্থানান্তর-করণের সময় আমলাদের একটি দিনও আফিস কামাই না হয়, অর্থাৎ শনিবারের দিন যে টেবিল-চেয়ারে ব'সে সাহেব ও আমলাবর্গ বহরমপুরে চাকরি করবেন, সোমবারে ঠিক সেই-সেই চেয়ার-টেবিলে তাঁরা কলকাতায় যথারীতি আফিস করবেন। এর ভার প্রধানতঃ ইঞ্জিনিয়ারের উপর। কাশিমবাজার মহারাজার সদর-আফিস এক বিরাট ব্যাপার; সুতরাং বানপ্রস্থ মহারাজা প্রত্যেক বারই নিষেধ কোরেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। চেয়ার-টেবিল-কাগজের পাহাড়-প্রমাণ স্তূপ, সপরিবার আমলাদের ঠেলাঠেলি, ভিড়, বর্ষার অবিশ্রাম বারিবর্ষণ ইত্যাদিতে মিলে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু জবরদস্ত সাহেবের এমনই প্রতাপ ও দক্ষতা যে প্রকৃতই শনিবারের আফিস বহরমপুরে সেরে সোমবারের আফিস কলকাতায় বসেছিল। দেশ থেকে সাহেব তাড়িয়ে ভাল কাজ হয়নি।

ক্রমে মহারাজা বিরক্ত হয়ে এই প্রচণ্ড সাহেবটিকে সরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কণ্টক তুলতে কণ্টক চাই, সাহেব তাড়াতে

সাহেবেরই প্রয়োজন। নানা কৌশলে মহারাজা এষ্টেট দিলেন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্‌এর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এবারও যে সাহেবটি কর্ণধার হয়ে এলেন তিনি হাল হাতে কোরেই বললেন, ক্লাইভ ষ্ট্রীট থেকে আফিস অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে। নিজেই চৌরঙ্গী অঞ্চলে এক বাড়ী ভাড়া করলেন—যার উপরিতলে থাকবেন স্বয়ং সপরিবারে, আর নিম্নতলে বসবে আফিস। নিজের সুবিধা অনুযায়ী, সাহেব কারও সঙ্গে পরামর্শ না কোরেই বাড়ী নির্বাচন কোরে ফেলেছেন, এখন তাঁর ইঞ্জিনিয়ারকে করতে হবে তারই মধ্যে সকলের স্থান-সঙ্কুলান। অনেক মাপ-জোপ হিসাব কোরে যতীন বললে—কোন উপায়েই এ-বাড়ীর নিম্নতলে সমস্ত আমলার বসবার স্থান করা যাচ্ছে না, উপরতলের কিছুটা না নিলে অন্ততঃ কুড়িটি লোকের স্থানাভাব ঘটছে। সাহেব অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিলেন—ঐ কুড়ি জন আমলাকে বরখাস্ত কোরে দিলেই হবে। যতীন বললে—সাহেব, আর একবার মেপে দেখি। তার পর ভগ্নপ্রায় আস্তাবল মেরামত করিয়ে, বাথরুমগুলির কমোড্, ইউরিন্যাল সরিয়ে, বারান্দায় পর্দা টাঙিয়ে, কোন রকমে ঐ কুড়ি জনের জায়গাও হ'ল। এ সাহেব রাজত্ব করলেন প্রায় পাঁচ বৎসর। এঁরই রাজত্ব কালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র দেহরক্ষা করেন।

তার পর থেকে বাঙ্গালী সাহেবের পালা। মহারাজার ঋণ শোধ না হ'য়ে ক্রমেই যেন বেড়ে যাচ্ছিল। সুতরাং বাঙ্গালী সাহেবদের বেতন খাঁটি সাহেবদের অর্দ্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এই রকম নামতে লাগল। এঁরা সকলেই অবসরপ্রাপ্ত পাকা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সাহেব হ'লেও বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোক। যিনি যখন এসেছেন তিনিই বলেছেন, পূর্ব্বসূরিগণের দোষেই এষ্টেট ঋণমুক্ত হয়নি, আমার আমলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু ক্রমেই সব বেঠিক হ'তে লাগল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪২ খৃঃএ জাপানীরা ভাবছিল কলকাতায় বোমা ফেলব কি না। বোমা তখনও পড়েনি, কিন্তু কলকাতা প্রায় জনশূন্য হ'য়ে গেল। সেই সময় রাজধানী আবার কলকাতা থেকে বহরমপুর ফিরে এল। আবার সেই আমলাদের সাথে সাথে চেয়ার টেবিল আলমারী কাগজের বস্তা সচল হ'য়ে উঠল। সেই হুড়োহুড়ি, বিশৃঙ্খলা, অর্থের শ্রাদ্ধ। দীর্ঘ ১৩ বৎসর কলকাতায় কাটিয়ে যতীনও ফিরে এল বহরমপুরে।

কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ ঋণমুক্তির কোন ব্যবস্থাই করতে পারল না। দাঁড়ি-মাঝি মিলে যতই দাঁড়ে টান্ দেইয়ো, ঋণভারে ভারী তরণী ততই যেন ভরাডুবির দিকে এগিয়ে যায়। শেষে, ১৯৪৪ খৃঃএ মহারাজা শ্রীশচন্দ্র তাঁর বহুমূল্য কয়লা খনির অংশবিশেষ বিক্রয় কোরে নিজেকে ঋণমুক্ত করলেন, এবং জমিদারীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। এখনও সেই ব্যবস্থা চলছে।

১৯২৩ থেকে ১৯৫০ ; এই দীর্ঘকাল নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে যতীন কাশিমবাজার এষ্টেটেই চাকরি কোরেছে। সেই সূত্রে তাকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করতে হ'য়েছে। তার কর্মজীবনে যে-সব দুষ্টগ্রহের দৃষ্টি পড়েছিল, যে কারণেই হোক্, তারা কেউ মারক হয়নি ; যতীনও তাদের ভ্রূকুটি-কুটিলকটাক্ষ এড়িয়ে মাঝে-মাঝে কবিতা লিখেছে, চরকাও কেটেছে। "মরীচিকা"র পরের সমস্ত কবিতাই তার কাশিমবাজারের চাকরির সময় লেখা। সে খবর মহারাজা শ্রীশচন্দ্র ব্যতীত কর্তৃপক্ষের ওপর বেহই বড় একটা রাখতেন না। কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পরই যতীন তাঁদের তার নূতন কবিতা শুনিয়ে দিল :—

ইট কাঠ চুণ বালি আনাইয়া গাড়ী গাড়ী
সারাটা জীবন শুধু গাঁথিনু পরের বাড়ী।
কত দুশ্চিন্তাই ঘটাতে বাসের সুখ,
আলো হাওয়া জল ড্রেণ,—পাছে কোন হয় চুক্।
সে সব বাড়ীতে মোর কোন অধিকার নাই,
পথে পথে খুঁজি আজ মাথা গুঁজিবার ঠাঁই।

ছন্দ অর্থ আর ঝড়ি ঝুড়ি কথা বাছি,'
সকলই পরের তরে, কবিতা যা গাঁথিয়াছি।
অশ্রুসাগর সেচি' অহেতুক কৌতুকে
গাঁথিয়া গাঁথিয়া মালা দুলায়েছি বুকে বুকে।
হায় রে, আমার বলি সে-বুক সে-মালা কোথা,
যার পরশনে মোর জুড়াবে বুকের ব্যথা ?

বরাত সঙ্গে চলে, কিছু নাই বলিবার,
মিথ্যে হইনু কবি, মিছে ইঞ্জিনিয়ার।

এই ইঞ্জিনিয়ার-কবির, বা লোহার ফুলদানির, কর্মজীবনের কিছু পরিচয় দিলাম ; কাব্যপরিচয় দেবে তার কবিতা। তবে আমি জানি, এই পরিচয়ও খাঁটি সত্য হবে না। তার অধিকাংশ কবিতার পিছনে একটি ছোট্ট সূচের ইতিহাস আছে ; সেই সূচটিই আসল সত্য ; সঙ্গে সঙ্গে যে সব সুতো ঘোরাফেরা কোরেছে তারাই যতীনকে মিথ্যা কবি-খ্যাতি দিতে বসেছে। এদিক্ দিয়ে তার বরাত ভাল। আমার এমনও মনে হয়, যতীনের বাল্যের ম্যালেরিয়াই কুইনাইন দ্বারা অবদমিত হ'য়ে পরিণত বয়সে কাব্যরূপ গ্রহণ কোরেছে। এদিক্ থেকে দেখলে তার কবিতার প্রধান উৎসটি হয়ত ধরা পড়তে পারে।—বিপ্রতীপ গুপ্ত।

স্নেহের ফ্যাঁসাদ

স্বামী আর স্ত্রী তাঁদের বছর খানেকের পুত্র-সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে তার দাদু আর দিদিমা'র কাছে গেছেন। কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের কর্ম্মস্থলে ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে আসে। এমন সময় এক দিন দাদু সস্নেহে বলেন,—বাচ্চাটাকে তাই আমরা দেবো। খুব আনন্দে থাকবে। বাচ্চাটির পিতা তখন বলেন,—ও আমাদের কাছে থাকলেই ভাল থাকে। তবে ওর এখন একটা সত্যিকার হাল-ফ্যাশনের গাড়ীর প্রতি খুব ঝোঁক হয়েছে।

দাদু আর নাতিকে নিজের কাছে রাখবার কথা আদৌ উচ্চার

হিন্দুর রাষ্ট্রবাদ

শ্রীঅজিতকুমার নন্দী

রাজনৈতিক মতবাদের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-রাষ্ট্রবাদ বিচার করা অনুচিত। কারণ, প্রাচীন কালে সুনির্দিষ্ট মতবাদ কোথাও জন্মলাভ করে নাই। যে সকল মতবাদ যুগ যুগ ধরিয়া বর্তমানে নির্দিষ্ট পরিষ্কার সংজ্ঞা ও রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা প্রাচীন সাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। সেগুলি একত্রিত হইয়া বিভিন্ন মতবাদরূপে দানা বাঁধিতে পারে নাই। হিন্দু-রাষ্ট্রবাদ বিচার করিবার সময় আর এক দিকের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে Secular State বলিতে আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন কালে তাহা কোথাও বিদ্যমান ছিল না,—প্রাচীন ভারতেও ছিল না। তখন ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। কোথাও ধর্মের প্রাধান্য বেশী, কোথাও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, যদিও নরপতিগণ আপন আপন ধর্ম-পালনে বিরত ছিলেন না, তবু তাঁহারা ধর্মের চেয়ে রাষ্ট্রনীতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন বেশী। এখানে ধর্মের অর্থ religion বলিতে যাহা বুঝি, তাহাই। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহারা ধর্ম সম্বন্ধে উদারমতাবলম্বী ছিলেন। বহু হিন্দুরাজার বৌদ্ধ মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিল; বৌদ্ধ রাজার হিন্দু মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিল। এই সকল হিন্দুরাজার রাজত্বের বহু শত বৎসর পরেও ইউরোপে ধর্ম লইয়া মারামারি হইয়াছে। পোপ ও মহান্ রোমক সাম্রাজ্যের অধিপতির মধ্যে যথেষ্ট বিবাদ-বিসম্বাদ হইয়াছে। প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হইয়াছে। ভারতবর্ষে ধর্ম লইয়া কোন দিন বিরোধ ঘটে নাই। ইউরোপীয় রাজগণ তাঁহাদের অনুসৃত ধর্ম জোর করিয়া প্রজাদিগের উপর চাপাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতে হিন্দুরাজগণ কখনো তাঁহাদের ধর্ম প্রজাদিগকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন যে, প্রজাগণ যেন স্বীয় ধর্ম পালন করে।

এই সঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রবাদের উপর ইহা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সাধারণতঃ মনে হয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস ভারতীয় রাজগণের কলহের ইতিহাস। ভারতবর্ষ রাশিয়া ব্যতীত ইউরোপের সমান। ইউরোপেও বিভিন্ন রাজগণের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধ লাগিয়া থাকিত। ইংলাণ্ডের মত একটি ক্ষুদ্র দেশেও 'হেপ্টার্কির' জন্য নৃপতিগণ উন্মুখ থাকিতেন। সেইরূপ সার্বভৌমত্ব লাভের আশা প্রত্যেক ভারতীয় রাজার মনে জাগরূক ছিল। অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ সার্বভৌমত্ব স্থাপনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল। বর্তমানে World State মতবাদ প্রাচীন ভারতের সার্বভৌমত্ব মতবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ। বিজিগীষু রাজা এই সকল মতবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া সার্বভৌমত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হইতেন। রোম নগরীকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ইউরোপে একটি বিরাট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার যে স্বপ্ন ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ্‌রা দেখিয়াছিলেন, সেই স্বপ্ন ভারতবর্ষে বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল বহু পূর্বেই। ভারতের রোম পাটলিপুত্রকে কেন্দ্র করিয়া মৌর্য, শুঙ্গ, গুপ্ত ও পাল-বংশীয় নৃপতিগণ সমগ্র ভারতকে একত্রিত করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি, এই মতবাদ প্রাচীন কাল হইতেই বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল। এই মতবাদ অনুসারে বিধাতার নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। মানব-সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করিবার জন্য বিধাতা রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজা বিধাতার প্রতিনিধি-স্বরূপ; সুতরাং রাজ-আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়। "নরপতি মানব-রূপধারী দেবতা-স্বরূপ; অতএব উহাকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা নিতান্ত অকর্তব্য। নরপতি সময়ানুসারে হুতাশন, আদিত্য, মৃত্যু, কুবের ও যম এই পাঁচটি মূর্তি ধারণ করেন।" রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি—এই মতবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া হিন্দু নরপতিগণ নিজদিগকে সূর্য-বংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া অভিহিত করিতেন। এই মতবাদ শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ঈজিপ্টের পৌরাণিক আখ্যায় আছে যে, সূর্যদেব 'রা' মর্ত্যলোক শাসন করিবার জন্য তাঁহার পার্থিব পুত্র রাজাকে সৃষ্টি করেন।

"মনুসংহিতায়" সংক্ষিপ্ত ভাবে এই মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে। মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে,—

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ ॥৩॥
ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥৪॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা ॥৫॥
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষুংষি চ মনাংসি চ।
ন চৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্ ॥৬॥
সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥৭॥

—মনুসংহিতা, সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

"যেহেতু জগৎ অরাজক হইলে প্রবলের ভয়ে সকলেই ব্যাকুল হইবে, এই জন্য ভগবান্ সমস্ত চরাচর রক্ষা করিবার জন্য রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্র, বায়ু, যম সূর্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের এই আট দেবতার সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেহেতু ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণের অংশে রাজা নির্মিত হইয়াছেন; এই জন্য শৌর্য-বীর্যের আতিশয্য দ্বারা সকলকে অভিভব করিতে পারেন। রাজা সূর্যের ন্যায় দর্শক লোকদিগের চক্ষু ও মন দাহ করেন, ফলতঃ পৃথিবীতে কোন লোক রাজাকে আভিমুখ্যে অবলোকন করিতে পারে না। রাজা প্রতাপে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের তুল্য হন। রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যবোধে অবজ্ঞা করিবে না, যেহেতু, তিনি অনির্বচনীয় মহান্ দেবতা, মনুষ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন।"

রাজা দেবতার অংশ; তাঁহার আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়। ইহাতে রাজার দেবদত্ত অধিকারের কথা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্বের ৫৯ অধ্যায়ে 'রাজন্' শব্দের উৎপত্তির কথা ভীষ্মদেব বলিয়াছেন। কৃতযুগে কোন রাজা ছিল না। ধর্মানুসারে প্রত্যেক প্রত্যেককে রক্ষা করিত। দোষী ছিল না; সুতরাং শাস্তির প্রশ্ন নাই। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা মোহ, লোভ, ক্রোধ এবং রাগের দ্বারা অভিভূত হইল। বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল

সামাজিক জীবনে। বেদ ও ধর্ম লোপ পাইল। মনুষ্য-সমাজে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য রাজার প্রয়োজন। তখন ভগবান নারায়ণ স্বইচ্ছায় নিজের তেজ দ্বারা বিরজকে সৃষ্টি করিলেন মানুষকে শাসন করিবার জন্য। কিন্তু বিরজ তাহাতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং বিষ্ণুর অধস্তন সপ্তম পুরুষ পৃথু বৈণ্যকে রাজা করা হইল। ভগবান্ বিষ্ণু পৃথুর শরীরে প্রবেশ করিলেন, এবং সে জন্য পৃথু সমস্ত বিশ্বের পূজা প্রাপ্ত হইলেন। তখন হইতে দেব ও নরদেবের পার্থক্য রহিল না; অর্থাৎ রাজা এবং দেবতা অভিন্ন। যেহেতু রাজা দেব দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, সুতরাং কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। যদিও তিনি সাধারণ মনুষ্যের মত একই সংসারে বাস করেন এবং এক প্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারণ করেন, তবু সমস্ত জনসাধারণ তাঁহার আদেশ পালন করিবে।

শান্তিপর্বের ৬৭ অধ্যায়ে পুনরায় রাষ্ট্রের উৎপত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির রাজার কর্তব্যতম কার্য সম্বন্ধে ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিম্নলিখিত কাহিনী বলিলেন। "বলবানের নিকট নত হওয়া লোকের কর্তব্য; কারণ, বলবানের নিকট নত হওয়ার অর্থ ইন্দ্রের নিকট নত হওয়া। সুতরাং রাজা-বিহীন প্রজাগণের আত্ম-মঙ্গলের জন্যই রাজাকে রক্ষা করা কর্তব্য; ধন অথবা দারাদির নিমিত্ত নহে। অরাজক হইলে দুই জনে একের বিত্ত এবং অপর বহু লোকে দুই জনের বিত্ত হরণ করে, দাস্যবৃত্তির অনর্হদিগকে বলপূর্বক দাস করিয়া থাকে এবং বলপূর্বক পরস্ত্রীগণকে হরণ করে, এই জন্যই দেবগণ প্রজাপালক রাজার নিয়ম করিয়াছেন। ভীষ্মদেব বলিলেন, "আমরা শুনিয়াছি, যেরূপ জল-মধ্যে বৃহৎকায় মৎস্যগণ কৃশায়তন মৎস্যগণকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ অরাজক রাজ্যের প্রজাগণ বিনষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ পরম্পর সকলেরই কুলক্ষয় হইতে থাকিলে, তাহারা সমবেত হইয়া শপথপূর্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছিল যে, 'আমাদের মধ্যে যে কেহ নিষ্ঠুর-ভাষী, কঠোর-দণ্ড, পরস্ত্রীগামী এবং পরস্বাপহারী হইবে, তাহারা আমাদের ত্যাজ্য হইবে'। তাহারা নির্বিশেষে সকল বর্ণের বিশ্বাসের নিমিত্ত পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নির্বিরোধে অবস্থান করিতে লাগিল। তদনন্তর তাহারা সকলে মিলিত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিল;—'হে ভগবন্! আমাদের কোন ঈশ্বর না থাকায় আমাদের অসুখ বৃদ্ধি হইতেছে এবং আমরা প্রায় বিনষ্ট হইয়াছি; অতএব আপনি আমাদিগের নিমিত্ত এরূপ এক জন ঈশ্বর নিয়োগ করুন, যিনি আমাদের সকলকে প্রতিপালন করিবেন এবং যাঁহাকে আমরা সকলে মিলিত হইয়া পূজা করিব।' তদনন্তর পিতামহ মনুকে তাহাদের রাজা হইবার জন্য আদেশ করিলে মনু তাঁহার বাক্যে অভিনন্দন প্রকাশ করিলেন না। মনু কহিলেন, 'পাপপূর্ণ কর্ম আচরণ করিতে আমার অতিশয় ভয় হয়, বিশেষতঃ মিথ্যাবৃত্ত মনুষ্যগণের মধ্যে রাজ্য জয় করা নিরতিশয় দুষ্কর'। প্রজাগণ মনুর এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিল, 'আপনি ভীত হইবেন না, পাপ হইতে আপনার কোন ভয় নাই, যাহারা পাপকর্ম করিবে, তাহারাই তাহার ফল ভোগ করিবে। আমরা আপনার কোষ-বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদের পশু ও হিরণ্যের পঞ্চাশৎ ভাগের এক ভাগ ও ধান্যের দশ

এই তিনটি মতবাদে আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা-হীন রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার পূর্বে প্রজাগণ সুখ-শান্তিতে বাস করিত। তার পর নানা রকম বিঘ্ন ও জটিলতার প্রাদুর্ভাব হইল। এই অশান্তি উপশম করিবার জন্য ভগবান রাজার সৃষ্টি করিলেন এবং নিজের প্রতিনিধিরূপে মানব-সমাজ শাসন করিবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইলেন। যেহেতু রাজা ভগবানের অংশ, সেই জন্য তাঁহার আদেশ অবশ্য পালনীয়। যদিও প্রাচীন হিন্দুগণ রাষ্ট্র-বিধাতার সৃষ্টি এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তবু তাঁহারা রাজার স্বেচ্ছাচারিতা কখনো সমর্থন করেন নাই। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ পার্লামেণ্টকে বলিয়াছিলেন, **"A King can never be monstrously vicious. Even if a King is wicked, it means God has sent him as a punishment for people's sins and it is unlawful to shake off the burden which God has laid upon them. Patience, earnest prayer and amendment of their lives are the only lawful means to move God to relieve them of that heavy curse."** রাজার এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বদাই নিন্দিত হইয়াছে। অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

রাষ্ট্র-বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ ব্যতীত সামাজিক চুক্তিবাদের বিবরণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের আবির্ভাব নূতন নহে। হব্‌স্, লক্, রুশো প্রভৃতি দার্শনিকদিগের লেখায় এই মতবাদের বিকাশ হইলেও, অতি প্রাচীন কালেই ইহা বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল। ইহার প্রাচীনতম আভাস পাওয়া যায় প্লেটোর (৪২৮—৩৪৭ খৃঃ পূঃ) Crito নামক গ্রন্থে। সামাজিক চুক্তিবাদের মূল কথা হইল, আদিম কালে মানুষের কোন রকম শাসনতন্ত্র ছিল না; তাহারা প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইত। একমাত্র প্রকৃতির রীতিনীতিগুলি তাহারা মানিয়া চলিত। তখন রাষ্ট্র ছিল না, সমাজের বন্ধন ছিল না। প্রত্যেকে নিজের নিজের ইচ্ছামত জীবন যাপন করিত। সে অবস্থাকে 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কালক্রমে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধিতে নানা প্রকার জটিলতা দেখা দিল তাহাদের জীবনে। নানা প্রকার বিঘ্ন আসিল। অন্যায় করিলে শাস্তি প্রদান করিবার কেহ নাই। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য তাহারা এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। সেই চুক্তিই 'সামাজিক চুক্তি' এবং এই চুক্তির ফলস্বরূপ রাষ্ট্রের উৎপত্তি।

এই সামাজিক চুক্তির কথা কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' উল্লিখিত হইয়াছে। "মাৎস্যন্যায়ের দ্বারা অভিভূত প্রজারা বৈবস্বত মনুকে রাজা (নির্বাচন) করিল এবং ধান্যের ষষ্ঠ ভাগ, পণ্যের দশম ভাগ ও স্বর্ণের অংশ তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া স্থির করিয়া দিল। সেই করের দ্বারা ভৃত (বর্ধিত) হইয়া রাজারা প্রজাদের কল্যাণ সাধনের [illegible] হন। তাঁহাদের প্রদত্ত দণ্ড এবং গৃহীত কর পাপ দূর করে [illegible]

আনা শস্যের ষষ্ঠ ভাগ রাজকররূপে দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—'যিনি আমাদের রক্ষক—এই অংশ তাঁহার। প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহারা নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ; অতএব তাঁহারা ইন্দ্র এবং যমের তুল্য। তাঁহাদের অবমাননাকারীদিগকে দেবদণ্ড স্পর্শ করে।" (স্ববিষয়ে কৃত্যাকৃত্যপক্ষরক্ষণম্, অর্থশাস্ত্র)। অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া প্রজাগণ বৈবস্বত মনুকে নির্বাচিত করিল এবং তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্য কর প্রদান করিল। সুতরাং রাজা প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রের ভৃত্য হইলেন।

অনুরূপ সামাজিক চুক্তির বিবরণ পাওয়া যায় বৌদ্ধশাস্ত্রে; যথা—দীঘনিকায় ও মহাবস্তু অবদানম্। বুদ্ধদেব রাষ্ট্রের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। প্রথমে ছিল সুবর্ণময় যুগ। কোথাও দুঃখ-কষ্ট ছিল না, পাপ ছিল না। সকলেই সুখ-শান্তিতে বাস করিত। মানুষের রক্ত-মাংস-গঠিত দেহ ছিল না; তাহারা ছিল মনোময় স্বয়ংপ্রভ। বায়ুর ভিতর দিয়া তাহারা চলাফেরা করিতে পারিত। দিনে দিনে আদিম পবিত্রতা-স্খলনের সঙ্গে তাহাদের অবনতি হইতে লাগিল। ক্রমে বর্ণভেদ ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদজ্ঞান জাগিল। পরিবার, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, সম্পত্তির উদ্ভব হইল। সেই সঙ্গে দেখা দিল নানা রকম পাপ। পরদ্রব্য-হরণের ভাব দেখা দিল সমাজে। তখন সকলে মিলিয়া এক জন রাজা নির্বাচন করিতে রাজী হইল। সে রাজা যথার্থ দোষীকে শাস্তি দিবেন এবং তাঁহার কার্যের বিনিময়ে উৎপন্ন ধান্যের এক অংশ পাইবেন। তখন তাহারা, তাহাদের মধ্যে যিনি সর্বাঙ্গসুন্দর ও শক্তিশালী, তাঁহার সহিত উপরি-উক্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। সেই নির্বাচিত রাজা হইলেন 'মহাজনসম্মত'। যেহেতু তিনি ক্ষেত্রের পতি (খেত্তানাম্ পতি), সে জন্য তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা হইত। আইনানুসারে প্রজাদিগকে রঞ্জন্ (রঞ্জেতি) করিতেন বলিয়া তিনি রাজন্। 'মহাবস্তু অবদানমে' উল্লিখিত হইয়াছে যে, দুষ্ট ব্যক্তিকে পীড়ন ও ঈশ্বরকে আনন্দ দানের বিনিময়ে তাঁহাকে ক্ষেত্রে উৎপন্ন ধান্যের এক ষষ্ঠাংশ দেওয়া হইত।

সুতরাং মানুষেরা নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য যে সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল, তাহার ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। সামাজিক পরিবেশ একটা যুদ্ধকালীন অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটিল এই সামাজিক চুক্তিতে। হব্‌স্-প্রবর্তিত রাষ্ট্রের জন্মবাদের সহিত হিন্দুদিগের মতবাদের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু এই সাদৃশ্যের মধ্যে একটা বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। হব্‌সের মতে সার্বভৌমিক ক্ষমতা শাসকের হস্তে পরিপূর্ণ ভাবে ন্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি প্রবর্তিত মতবাদে, এই সামাজিক চুক্তির রাজা জনসাধারণের ভৃত্য হইয়া গেলেন। কারণ, উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠ ভাগ এবং পণ্যের দশম ভাগ তাঁহার বেতন-স্বরূপ। শান্তিপর্বেও বলা হইয়াছে যে, কর-স্বরূপ ও অন্যান্য ভাবে রাজার যে আয় হইয়া থাকে, তাহা তাঁহার বেতন। এই জন্য রাজা স্বৈরাচারী হইতে পারেন না।

আধুনিক লেখকগণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরো কয়েকটি মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে একটি হইল 'প্যাট্রিআর্কাল' মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, প্রাচীন কালে কর্তা পরিবারের লোকদিগের উপর অপ্রতিহত ভাবে একাধিপত্য করিতে পারিতেন। পরিবারের কর্তার ক্ষমতা ছিল অসীম। তিনি পরিবারের কোন লোকের অঙ্গচ্ছেদ করিতে, এমন কি, তাহার প্রাণ লইতে পারিতেন। তাহাকে বিক্রয় করিবার অধিকারও কর্তার ছিল। এইরূপ বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের উল্লেখ হোমারের গ্রন্থে পাওয়া যায়। রোমান-পরিবারের কর্তার এইরূপ অধিকার ছিল। এই পরিবারের কর্তাই পরবর্তী কালে রাজার আসন গ্রহণ করিয়া রাজ্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন। যদিও এই মতবাদ ভারতীয় সাহিত্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, তবু তাহার আভাস বৈদিক উপকথায় বিক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আছে; ঋজ্রাশ্বকে তাঁহার পিতা অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়, শুনশ্‌শেপের পিতা তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন উপবাস হইতে পরিবারকে রক্ষা করিবার জন্য। ইহা হইতে বুঝা যায়, পরিবারের লোকের উপর কর্তার ক্ষমতা ছিল। প্রাচীন আর্য-সমাজ কতগুলি পরিবারে বিভক্ত ছিল; যথা—জন্মন, বিশ ও জন (ঋগ্বেদ, ২, ২৬, ৩)। খুব সম্ভবতঃ, জন্মন ছিল সেই গ্রাম, যেখানে অধিবাসিগণ এক জন পূর্ব-পুরুষকে স্বীকার করিয়াছে। এইরূপ কতগুলি জন্মন মিলিত হইয়া একটি 'বিশের' সৃষ্টি হইল। বিশের কর্তাকে বলা হইত 'বিশ্‌-পতি'। আবার কতগুলি 'বিশ' একত্র হইয়া 'জন' সৃষ্টি করিল। 'জনের' অধিপতিকে 'জন-পতি' (রাজার তুল্য) আখ্যায় ভূষিত করা হইল। এইরূপ বৈদিক যুগের সমাজ সংগঠনের সহিত প্রাচীন রোমান সমাজ গঠনের মিল আছে। কতগুলি রোমান-পরিবার মিলিত হইয়া একটা gens হইল। কতগুলি gens একত্রে curia নামে অভিহিত হইল; আবার দশটি curia মিলিত হইয়া একটি tribe বা গোষ্ঠী হইল। সুতরাং এই সকল প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছিল এইরূপ কর্তা-প্রভাবান্বিত একান্নবর্তী পরিবার হইতে।

রাষ্ট্রের স্বরূপ

(১) স্বামী, (২) অমাত্য, (৩) মিত্র, (৪) জনপদ, (৫) দুর্গ, (৬) কোষ ও (৭) দণ্ড—এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইগুলি সপ্তাঙ্গ-মতবাদ নামে প্রচারিত। রামায়ণ ও মহাভারতে, রাজগণ যাহাতে এই সপ্তাঙ্গ যত্ন-সহকারে রক্ষা করেন, এই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সপ্তাঙ্গগুলি পরস্পর নির্ভরশীল এবং রাজ্যের হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ। স্বামী অর্থাৎ রাজা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ এবং অন্যান্য অঙ্গগুলির ভিত্তি-স্বরূপ। রাজধর্মানুসারে প্রজার হিতসাধন করাই হইল রাজার কর্তব্য। মহাভারতে অনেক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজা তাঁহার স্বীয় কর্মের দ্বারা রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধি অথবা অশান্তির সৃষ্টি করেন। "ভূপালগণের ব্যবহারবশতঃই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; তন্নিবন্ধনই রাজা যুগ-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন।" স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য রাজাকে কার্যকরী নীতি অনুসরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। "অন্যের প্রতি অবিশ্বাসই নীতিশাস্ত্রকারদিগের সার মত। সুতরাং অন্যের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। যাহারা কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করে, তাহারা দুর্বল হইলেও শত্রুরা

তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না। আর, যাহারা সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাহারা বলবান্ হইলেও শত্রুরা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না।" (১৩৮ সং, শান্তিপর্ব)। যাঁহারা মনে করেন যে, ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনাই শুধু হইত, এইরূপ কূটনীতি তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবে। প্রাচীন ভারতে বহু মেকিয়াভেলির আবির্ভাব হইয়াছিল।

রাজ্যের অন্যতম অঙ্গ হইল অমাত্য। ভারতের নীতিশাস্ত্র-কারগণ বলিয়াছেন যে, রাজ্যশাসনে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীন কাল হইতেই রাজ্যশাসন ব্যাপারে অমাত্য ও মন্ত্রিগণের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা এবং মহাভারতে কিরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে অমাত্য ও মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হইবে, তাহা বিবৃত হইয়াছে। "কুলীন, সচ্চরিত্র, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়াশীল, দেশ-কালজ্ঞ ও প্রভুহিতৈষী ব্যক্তিগণকেই অমাত্যপদ প্রদান করা ভূপতির কর্তব্য।" এই সকল অমাত্য ও মন্ত্রী গুপ্তচর দ্বারা বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হইতেন। শান্তিপর্বের ৮৫ অধ্যায়ে ভীষ্মদেব অমাত্যদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "চারি জন সুপবিত্র বেদবিদ্যাবিশারদ স্নাতক ব্রাহ্মণ, আট জন অস্ত্রধারী মহাবলশালী ক্ষত্রিয়, অতুল ঐশ্বর্যশালী একবিংশতি বৈশ্য, বিনীত-স্বভাব অতি পবিত্র তিন জন শূদ্র এবং এক জন শুশ্রূষাদি অষ্টগুণ-বিশিষ্ট পুরাণ-বেত্তা সূতকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা তোমার কর্তব্য। অমাত্যগণ সকলেই যেন পঞ্চাশৎ বর্ষবয়স্ক, বিনীত, বুদ্ধিমান্, অপক্ষপাতী, বিচারক্ষম, লোভবিহীন ও মৃগয়াদি সপ্ত প্রকার দোষশূন্য হন।"

মিত্রকে সপ্তাঙ্গের একটি অঙ্গ বলা হইয়াছে। মিত্র চারি প্রকার,—এককার্য সংসাধনোদ্যত, অনুগত, সহজ ও কৃত্রিম। ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তিও নৃপতির মিত্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যদিও তাঁহারা মিত্র, তবু রাজা তাঁহাদিগের স্বভাব পরীক্ষা করিয়া লইতেন। উপরি-উক্ত চারি প্রকার মিত্রের মধ্যে অনুগত ও সহজ মিত্রই উৎকৃষ্ট। অপর দুই প্রকার মিত্রকে রাজা ভয় করিয়া চলিতেন।

জনপদ (territory) রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি-স্বরূপ। ইহা বিচার করা হইত তিনটি গুণ দ্বারা—আয়তন, জলবায়ু ও ভূমির প্রকৃতি। চাণক্য জনপদের গুণগুলি পূর্ণ ভাবে বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে আদর্শ জনপদ হইবে বিস্তৃত; আত্মনির্ভরশীল; দুঃসময়ে বহিরাগতদিগের রক্ষণে সমর্থ; আত্মরক্ষায় ও শত্রু-প্রতিরোধে সমর্থ; পার্শ্ববর্তী রাজগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় শক্তিসম্পন্ন; শিলা-বিহীন; জলাভূমি, মরুভূমি ও অসমতল ভূমি হইতে মুক্ত; তস্কর-শ্বাপদ-জঙ্গলশূন্য; উর্বর ক্ষেত্র, আকর, মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্য, হস্তী-অধ্যুষিত জঙ্গল এবং পশুচারণ-ভূমিযুক্ত; শক্তিশালী; গুপ্তপথ-যুক্ত; গবাদি পশুপূর্ণ; প্রাকৃতিক বারিবর্ষণে নির্ভরশীল নহে; স্থলপথ ও জলপথ-যুক্ত; বাণিজ্যিক দ্রব্যে পরিপূর্ণ; করভার বহনে সমর্থ; পরিশ্রমী কৃষিজীবীর আবাসস্থল; শিশু ও হীনজাতিপূর্ণ; সৎ ও রাজভক্ত প্রজাপূর্ণ।

কোষের প্রাধান্য অন্যান্য অঙ্গ হইতে কম নহে। আবার কোষ ও রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে বলের প্রয়োজন। "স্বীয় ও পরকীয় রাজ্য সংগ্রহ করিয়া বিবেচনা পূর্বক ব্যয় করাই ভূপতিদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।··· বল না থাকিলে কোষ রক্ষা হয় না; কোষরক্ষা না হইলে বল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব কোষ, বল ও মিত্র পরিবর্দ্ধিত করা রাজাদিগের নিতান্ত আবশ্যক।" রাজ্যরক্ষার জন্য দুর্গের প্রয়োজন। মহাভারত, মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার দুর্গের নাম ও গঠন বর্ণিত হইয়াছে।

এই ত গেল সপ্তাঙ্গ মতবাদের কথা। তৎকালীন বহু-প্রচারিত শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে রাজতন্ত্র নীতিশাস্ত্রকারগণ কর্তৃক অধিক সমর্থিত হইয়াছে। মহাভারত, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ রাজ্যশাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের পক্ষে মত দিয়াছে। তাহার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। শান্তিপর্বের ৮৭ অধ্যায়ে ভীষ্ম রাজ্য-পালন সম্বন্ধে বলিতেছেন, "নরপতি কাহাকে এক গ্রামের, কাহাকে দশ গ্রামের, কাহাকে বিংশতি গ্রামের, কাহাকে শত গ্রামের ও কাহাকে সহস্র গ্রামের আধিপত্য প্রদান করিবেন। ঐ সমুদায় গ্রামাধিপতি ভূপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া যথাবিধানে প্রজাপালন করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং এক গ্রামাধিপতি দশ গ্রামের অধিপতির সমীপে, দশ-গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামাধিপতির সমীপে এবং বিংশতি গ্রামের অধিপতি শত গ্রামের অধিপতির সমীপে নিজ নিজ অধিকারস্থিত মনুষ্যদিগের দোষ নির্দেশ করিবে।······ঐ সমুদায় গ্রাম-রক্ষকের সংগ্রাম ও গ্রাম-সম্পর্কীয় অন্যান্য কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য এক জন আলস্যহীন বিচক্ষণ মন্ত্রীকে এবং প্রতি নগরের কার্য-সন্দর্শনার্থ এক-এক জন সর্বাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা ভূপতির কর্তব্য। গ্রহগণ যে প্রকার নক্ষত্রদিগের উচ্চ স্থানে অবস্থান করে, সেইরূপ সর্বাধ্যক্ষবর্গ সমস্ত সভাসদের উচ্চপদে সমারূঢ় হইয়া চর দ্বারা তাঁহাদিগের ব্যবহার পরীক্ষা করিবেন।" অর্থশাস্ত্রে এই মতবাদ অধিকতর সমর্থিত হইয়াছে।

রাজতন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য প্রকারের শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সাধারণতন্ত্র কতকগুলি রাজ্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল। সাধারণ প্রজাদের অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সেখানে স্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল সাধারণতান্ত্রিক রাজ্যগুলির গঠন ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের ছিল। স্ব-রাজ্যের শাসনকর্তা স্ব-রাট্ নামে অভিহিত হইতেন। সাধারণের মধ্য হইতেই গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্বরাজ্যের সভাপতিরূপে নির্বাচন করা হইত। রাজাবিহীন শাসনতন্ত্র বৈরাজ্য নামে অভিহিত হইত। উত্তর-ভারতের কতকগুলি গোষ্ঠীর শাসনতন্ত্র বৈরাজ্য বলিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অভিহিত হইয়াছে। বৈরাজ্য ছিল পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার গণতন্ত্র ছিল,—'অরাজক'।

কিন্তু এই সকল সাধারণতান্ত্রিক রাজ্য অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে এই রাজ্য-গুলির দুর্বলতা ও ত্রুটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য প্রজাগণ চন্দ্রগুপ্তের স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছিল। ইহার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়াছিল যথেষ্ট। **Justin** সে জন্য বলিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত

servitude the very people he had rescued from foreign dominion." প্রকৃতপক্ষে, রাজ্যের যাবতীয় কর্তৃত্ব রাজার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতা কিছু পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল সভা ও সমিতির জন্য। সভা ও সমিতির মতামত রাজা মানিয়া চলিতেন, মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাহা ছাড়া ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন না করিলে নরকবাস হয়, এই ভয়ও ছিল। অত্যাচারী রাজার নিহত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কারণ মহাভারতে আছে,—

"অরক্ষিতারং হর্তারং বিলোপ্তারমনায়কম্।

তং বৈ রাজকলিং হন্যুঃ প্রজাঃ সন্নহ্যনির্ঘৃণম্।"—অনু,৬১, ৩২-৩৩

অর্থাৎ, যে রাজা রক্ষা করে না, শুধু অর্থ হরণ করে, বিলোপকারী এবং নায়কশূন্য সেই অধম রাজাকে প্রজারা মিলিত হইয়া নির্দয় ভাবে হত্যা করিবে।

রাষ্ট্রের লক্ষ্য

হিন্দুর মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল 'ধর্ম' রক্ষা করা। এই ধর্মের প্রকৃত অর্থ অতিশয় ব্যাপক। ইংরেজীতে যে অর্থে religion শব্দ ব্যবহৃত হয়, এখানে ইহা শুধু তাহাই নহে। ইহার অর্থ আরও বিস্তৃত। প্রাচীন হিন্দুগণ দেখিয়াছেন যে, এক চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মে সমস্ত বিশ্ব-চরাচর পরিচালিত হইতেছে। চন্দ্র, সূর্য ও ঋতুগুলি একই নিয়মে আবর্তিত হইতেছে। এই প্রাকৃতিক নিয়মই হইল 'ঋত'। মানুষের কার্যকলাপ এই 'ঋতের' দ্বারা নিয়মিত করা উচিত। বৈদিক যুগে 'ঋত' শব্দটির প্রচলন ছিল। পরে উপনিষদের যুগে 'ধর্ম' 'ঋতে'র স্থান গ্রহণ করিল। ন্যায়, দণ্ড, কর্তব্য প্রভৃতিকে 'ধর্ম' নির্দেশ করে। রাষ্ট্রের সৃষ্টি এই ধর্মের জন্য। ধর্ম না থাকিলে 'মাৎস্যন্যায়ের' প্রাদুর্ভাব হয়। তখন ন্যায়, শৃঙ্খলা বলিয়া কিছু থাকে না; কারণ, রাষ্ট্রই এইগুলির স্রষ্টা। এক কথায় ধর্ম বিনা রাষ্ট্র নাই। বশিষ্ঠ ও বৌধায়নের মতে, ধর্ম হইল শিষ্ট অর্থাৎ ঋষিগণের আচরিত কর্ম। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে সদাচারই ধর্ম।

আইন অর্থে ধর্মের আদর্শ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে—'রাজ্ঞাম্ আজ্ঞা'। ইহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নারদ, শুক্র ও জৈমিনির শাস্ত্রে। নারদ-স্মৃতিতে আছে, কর্তব্য পালনের অভাব লক্ষিত হওয়াতে 'ব্যবহার' প্রচলিত হইয়াছে। দণ্ড দ্বারা (শাসনের ক্ষমতা) রাজা আইন রক্ষা করেন বলিয়া তাঁহাকে দণ্ডধর বলা হইয়া থাকে। Coercive power বলিতে আমরা যাহা বুঝি, দণ্ডের অর্থ তাহাই। শুক্রাচার্য উপদেশ দিয়াছেন যে, ঢক্কা-নিনাদ করিয়া শাসন-পত্র প্রবর্তিত করিতে হইবে।

'মাৎস্যন্যায়' কালে 'মমত্ব' অর্থাৎ 'স্বত্ব' বলিয়া কিছু ছিল না। রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পর হইতে 'মমত্ব' অর্থাৎ 'স্বত্বের' সৃষ্টি হইল। দণ্ডের প্রয়োজন এই 'মমত্ব' রক্ষা করিবার জন্য। রাষ্ট্রের প্রতি প্রজার কর্তব্য ছিল। এই কর্তব্য সুচারুরূপে পালিত না হইলে, তাহাকে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইত।

"যো গ্রাম-দেশ-সঙ্ঘানাং কৃত্বা সত্যেন সংবিদম্।
বিসংবদেন্নরো লোভাত্তং রাষ্ট্রাদ্বিপ্রবাসয়েৎ।"

—মনুসংহিতা ৮, ২১৯।

গ্রাম-দেশ-সঙ্ঘের স্বার্থ রক্ষা করিবে বলিয়া শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করার পর যদি সে ব্যক্তিগত লোভের বশবর্তী হইয়া পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তবে তাহাকে রাষ্ট্র হইতে বাহির করিয়া দিবে। রাষ্ট্রের প্রতি প্রকৃতির (প্রজার) কর্তব্য বহুবিধ। শুক্রাচার্য বলিয়াছেন যে, শুধু কতকগুলি অন্যায় কার্য হইতে বিরত হওয়াই প্রকৃতির কর্তব্য নহে, তাহারা অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিগণকে ধরাইয়া দিবে অথবা প্রকাশ করিবে। দুর্জন, চোর, দুশ্চরিত্রকে আবৃত করিয়া রাখিবে না। কৌটিল্যও নাগরিকদিগকে তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল 'স্ব-ধর্ম' রক্ষা করা। কাহারো স্ব-ধর্ম নির্ণীত হইত, কোন্ বর্ণে তাহার জন্ম তাহার দ্বারা। প্রাচীন কালে বর্ণাশ্রম ধর্মের সৃষ্টি হয় শ্রম-বিভাগের জন্য। তখন গুণ অনুযায়ী কেহ তাহার বৃত্তি গ্রহণ করিত। কিন্তু কালক্রমে এই সঞ্চরণশীলতা নিষিদ্ধ হইল। তাহার ফলে যে সামাজিক অচলায়তনের সৃষ্টি হইল, তাহাতে সমাজের হানি হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রাষ্ট্রের যাবতীয় সুবিধা ভোগ করিত, আর বৈশ্য ও শূদ্র শুধু উচ্চবর্ণের সেবা করিয়া যাইত। যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, কৌটিল্য, রামায়ণ, মহাভারত, প্রভৃতি শাস্ত্র চারি বর্ণের সাধারণ ধর্ম কি, তাহার এক বিবরণ দিয়াছেন। মানুষের ধর্ম হইল অহিংসা, সত্যবাদিতা, ব্রহ্মচর্য, সংযম, পবিত্রতা, চুরি না করা, দয়া, ক্ষমা, ক্রোধ-বর্জন ইত্যাদি। এই সকল ব্যতীত উপরি-উক্ত শাস্ত্রগুলিতে প্রত্যেক বর্ণের স্বধর্ম নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম হইল ইন্দ্রিয়দমন, বেদাধ্যয়ন, দান-গ্রহণ। ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। বৈশ্যগণ দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায় দ্বারা ধনসঞ্চয় এবং পশু-পালন করিবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন কর্ম তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। শূদ্রের ধর্ম সম্বন্ধে শান্তিপর্বের ৬০ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, "ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব বর্ণত্রয়ের পরিচর্যা করাই শূদ্রের উৎকৃষ্ট ধর্ম। এই ধর্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্র পরম সুখী হইতে পারে। শূদ্র অর্থ সঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশবর্তী হইতে পারেন এবং তন্নিবন্ধন তাহাকে পাপী হইতে হয়; অতএব ভোগ-বিলাসী হইয়া তাহার ধন সঞ্চয় করা কদাচ কর্তব্য নহে।" কৌটিল্য বলিয়াছেন যে, স্বধর্ম-পালন করিলেই 'স্বর্গ' ও 'আনন্ত্য' লাভ করা যায়। ইহা লঙ্ঘন করিলে, বর্ণগুলির ও তাহাদের ধর্মের বিশৃঙ্খলার জন্য পৃথিবীর অন্তিম কাল উপস্থিত হয়। কাজেই রাজা কখনো তাহাদিগকে স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হইতে দিবেন না। কারণ, আর্যব্যবহার অবলম্বন ও বর্ণ-ধর্ম অনুসরণ করিয়া যে স্বধর্ম পালন করে, ইহলোকে ও পরলোকে সে সুখী হয়। কারণ, এই তিন বেদের বিধান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইলে, এই দুনিয়ার অবশ্যম্ভাবী উন্নতি হইবে, কখন ধ্বংস হইবে না।

ঐতিহাসিক বেণীপ্রসাদ 'ধর্মের' প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা এক দিকে সুবিধাভোগী দ্বিজগণ এবং অপর দিকে অধীন সর্বহারাদের দ্বারা গঠিত (Government in Ancient India p, 26)। প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী উচ্চবর্ণের লোকেরা তাহাদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। Richard Fick বলিয়াছেন, "The more Brahmanical

culture spread in the course of centuries, the more did the priestly classes succeed in stamping their desired physiognomy upon the Indian society through their religions and social influence." হিন্দুর আদর্শে, ধর্ম সমাজের মহান্ কল্যাণ সাধন করে। বর্তমানে আমরা Social good বলিতে যাহা বুঝি, তাহা তৎকালীন সামাজিক কল্যাণ হইতে পৃথক্। সেই সময়ে সমাজের মহান্ কল্যাণ নির্ভর করিত, প্রত্যেকে আপন আপন স্ব-ধর্ম পালন করিতেছে কি না তাহার উপর। এই সকল কারণে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের লোকেরাই শুধু সমাজের কল্যাণ উপভোগ করিতে পারিত। হীনবর্ণের লোকেরা লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া উচ্চবর্ণকে সেবা করিয়া যাইত। রাজ্যের যাবতীয় সুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত ছিল।

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হইল ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের কুফলের প্রতিবাদ-স্বরূপ। বর্ণে-বর্ণে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে যে প্রভেদ ছিল, তাহা অস্বীকৃত হইল এই ধর্মে। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এক নূতন উদ্দীপনা আসিল। বৌদ্ধ-রাজগণের মতে রাষ্ট্রের আদর্শ হইল, সকল ধর্মের সার কতকগুলি নীতি প্রজারা মানিয়া চলিতেছে কি না তাহা লক্ষ্য করা। কারণ, এইগুলি মানিয়া চলিলে প্রজাগণ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখলাভ করিবে। প্রিয়দর্শী অশোক যদিও বৌদ্ধ ছিলেন, তবু তিনি জোর করিয়া প্রজাদের উপর তাঁহার ধর্ম চাপাইয়া দেন নাই। তাঁহার মতে, বৌদ্ধ-ধর্মের 'অষ্ট-পন্থা'—যাহা সর্বকালের সর্ব-ধর্মাবলম্বী লোকের অবশ্য পালনীয়—রক্ষা করাই রাষ্ট্রের আদর্শ। তাই তিনি তাঁহার মতামতগুলি পর্বত-গাত্রে ও শিলাখণ্ডের উপর উৎকীর্ণ করিয়া প্রজাগণকে জানাইয়া দিয়াছেন—তিনি ইহা চাহেন, আর অন্যায় কার্যগুলি অপছন্দ করেন।

লটারী খেলা

ভাগ্য মানে না কে? ভাগ্য যদি কেউ না মানতো, ভাগ্য কথাটি কেন সৃষ্টি হবে? ভাগ্য কথাটি থাকবে কেন অভিধানে? এই মুহূর্তে যে রাজা, পর-মুহূর্তে তাকে হয়তো ফকির হতে হল ভাগ্যের খেলায়। ভাগ্যের জোরে কেউ হচ্ছে রাজা আবার ভাগ্যের ফেরে কেউ হচ্ছে প্রজা। ভাগ্যই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে। ভাগ্যই যত কিছু জয়-পরাজয়ের নিয়ন্তা। প্রগতিপন্থী জাতিরা আবার ভাগ্যকে কেয়ার করে না। তাদের মতে, মানুষই মানুষের ভাগ্যকর্তা। কৃতকর্মের ফলে মানুষ নিজের ভাগ্যকে ভাল এবং মন্দ দিকে পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত জাতি এ কথায় সায় দেয় না। ভাগ্যের 'পরেই তাদের নির্ভর। বাঙলা দেশেও কথায় কথায় ভাগ্যের দোহাই পাড়ে লোকে। বাঙলা দেশেই দেখা যায়, কলকাতার মত শহরে মাঠে-ময়দানে আর দীঘির ধারে মূর্খতম ব্যক্তিরা ছক কেটে আর ভাঁওতা মেরে দু'পয়সা কামাচ্ছে নিরক্ষর আর অশিক্ষিতদের ভাগ্যফল বলে দিয়ে। তাদের কণ্ঠে উপবীত আর তুলসীর কণ্ঠী, কপালে সিঁদুর-চন্দনের ফোঁটা, মুখে তুবড়ী আর পেটে কি আছে তা আর না বলাই ভাল। তবুও দু'পয়সা হচ্ছে তাদের। এত কথার কি দরকার, সম্প্রতি কলকাতার কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রকে পর্য্যন্ত মানুষের রাশি মিলিয়ে ভাগ্যফল ঘোষণা করতে দেখেছেন অনেকেই। কারণটা আর কিছুই নয়, অজ্ঞ দেশবাসীকে ঠকিয়ে কাগজের চাহিদা বাড়িয়ে দু'পয়সা কামানো। যাতে ভাগ্যনিয়ন্তাকে কেউ চিনে ফেলে সেজন্য আবার ভাগ্যকর্তার নামটা থাকে ভাঁড়ানো। আগামী হপ্তার ফলাফল জানিয়ে দেশবাসীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন ভবিষ্যদ্বক্তা।

এই ভাগ্য-খেলার অন্যতম খেলা হল লটারী। লটারীর বঙ্গার্থ কি বলতে পারেন? একটি অর্থ আছে, কথাটি একেবারেই অজ্ঞাত। লটারী অর্থে স্ফুর্তি খেলা। লটারীতে মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা হলেও, তথাকথিত জ্যোতির্বিদের মত ঠকবাজীর খেলা খেলে না লটারী। লটারী ঠিক জুয়া নয়। লটারীতে অনেক জাতীয় কীর্ত্তি হওয়ার স্বাক্ষর আছে ইতিহাসে।

লটারীর প্রথম প্রচলন হয় ইংলণ্ডে, ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। সর্ব্বসাধারণের প্রতিষ্ঠানের সেবার নিমিত্তে সর্ব্বসমেত ৪,০০,০০০ টিকিট বিক্রয় হয়। তার কিছু পরেই ব্রিটিশ মিউজিয়াম তৈয়ারী হয় লটারীর টাকায়। গ্রীনউইচ হাসপাতালও তৈয়ারী হয় লটারী খেলার অর্থে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান লণ্ডন কোম্পানী আমেরিকায় বিলেতী উপনিবেশ স্থাপনের অর্থ সঞ্চয় করে লটারী মারফৎ। ব্যবসা আর সাধারণের সেবার জন্যে ইংরেজ এবং আমেরিকান খ্যাতিমান ব্যক্তিরা লটারীর আশ্রয় গ্রহণ করেন পুরোপুরি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে। প্রায় ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ডাবলিন হাসপাতালের জন্যে জাতীয় লটারী খেলার সূত্রপাত হয়—যার সাম্প্রতিক নাম সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত, সেই 'আইরিস সুইপ ষ্টেক্‌স্'।

আমেরিকায় লটারীর চলন হয় ১৩০৮—১৪২৫ খৃষ্টাব্দে। সেই সময়ে উপনিবেশ স্থাপন ষ্টেট কিংবা কংগ্রেসের সামরিক প্রয়োজনে অর্থের দরকার হলেই লটারী খেলা হত। আমেরিকায় বিখ্যাত ফ্যানিউইল হল্, বষ্টন, ষ্টেট হাউস, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি অগ্নিকাণ্ডের পর আবার তৈয়ারী হয় লটারীর টাকায়। রাস্তা-ঘাট আর শহর নির্ম্মিত হয় আমেরিকায় ঐ লটারীর টাকায়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মাউণ্টেন রোড লটারীর অন্যতম পরিচালক ছিলেন জর্জ্জ ওয়াসিংটন। ইয়েল, হার্ভাড, প্রিন্সটন, উইলিয়াম, ম্যারী ও কলম্বিয়া কলেজ এবং পেন্সিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লটারীর অর্থে গঠিত হয়। তা ছাড়া ইউরোপে অনেক গির্জ্জা লটারীর টাকায় গঠিত হয়েছে।

প্রায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে লটারীকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছে ইউরোপ। লটারীর দ্বারা দেশ আর দেশবাসীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেখানে। ভাগ্য এখানে যেমন ঠকবাজের খেলার সামগ্রী, সেখানে ভাগ্যের খেলায় দেশসেবার কাজ হয়।

বাণী ভেসে আসছে—শুনতে পাচ্ছি। "জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক্‌, তাহারই জয় হইবে।" আমরা যাহারা ইংরাজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—

মিলি মিলি গাওব সাগর-লহরী সমানা

তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট-ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্ত চিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, যাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে কহিবে, 'পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।'

তিনি কহিবেন, 'ওঁ ইতি ব্রহ্ম';
তিনি কহিবেন, 'ভূমৈব সুখম্‌, নাল্পে সুখমস্তি';
তিনি কহিবেন, 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কদাচ ন'।

এ মন্ত্র ভারতাত্মার মন্ত্র—ধ্বনিত হয়েছে বাণীসাধক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমাদের এই যুগে। এ বাণী বহু যুগের। এ বাণী চির-পুরাতন। এ বাণী তবু নূতন। এ বাণী ভারতাত্মার আগমনী। এ বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। আজ তাঁর আবির্ভাব-তিথি। ভারতাত্মার বাণীতেই তাঁর আগমনী গীত হোক।

মানুষের মন আত্মপ্রকাশ করে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে বিভিন্ন সমাজ ও জাতিকে আশ্রয় করে চিন্তা-বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে। সভ্যতার উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিও উঠছে-পড়ছে। ইতিহাস শুধু এই উত্থান-পতনের সংবাদ পরিবেশন করেই চুপ হয়ে যায়নি, একটি মহৎ শিক্ষাও দিয়েছে যে, যে-জাতির ভিত্তিমূলে সত্য বস্তু, সে-জাতি কালপ্রবাহের ঘূর্ণিপাকে পড়েও তার সত্তা একেবারে হারিয়ে ফেলে না। পৃথিবীর ইতিহাসের উপর চোখ বুলিয়ে যদি দেখা যায়, তাহলে পুরনো দিনের গ্রীক ও আজকের য়ুরোপীয় জাতির কথায় অন্তরাত্মা শিউরে উঠে। তাই ভারত-পথিক স্বামীজী বলেছিলেন: "আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর গঠিত না হলে সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে।"

কেন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে, সে-প্রশ্নের জবাব আজকের দিনের প্রত্যক্ষদর্শীদের মনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। তবু স্মরণ করি ভারতাত্মার বাণী—নচিকেতা বলছেন যমকে, "মানবচিত্ত কেবল ঐশ্বর্যে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। আমি যখন সর্বৈশ্বর্যাধিপতি (যম) তোমার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি তখন বিত্তাদি স্বতই আসিয়া উপস্থিত হইবে—তুমি যত দিন প্রভু হইয়া রাজত্ব করিবে তত দিন জীবিতও থাকিব, সুতরাং এ ক্ষণস্থায়ী বস্তু আমার কাম্য নহে। আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় বরই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়।"

ভারতাত্মার প্রথম ও প্রধান কথা সমগ্র মানবের প্রথম ও প্রধান কথা। সে কথা তার আত্মাকে নিয়েই। কী উপায়ে পরম কল্যাণকে পাওয়া যেতে পারে—এর চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন মানব-মনে নেই। এই প্রশ্নের সমাধান-চেষ্টাই সে নিরন্তর করে আসছে এবং অনন্ত কাল ধরে করেই চলবে। উপনিষদে দেখি, যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে যাবার কালে দুই পত্নীর মধ্যে ধনাদি বণ্টন করে দেবার জন্য দু'জনকেই ডাকলেন। কিন্তু বিদুষী মৈত্রেয়ী বাইরের বিত্তবিভবে সন্তোষলাভ না করে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন:

ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব (শান্তিনিকেতন)

'যেনাহং নামৃতস্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্যাম্‌'

যদি এই সমস্ত পৃথিবী বিত্তে পূর্ণ হয়, আমি কি তাহাতে অমৃত হইতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে 'না' এই কথাই মৈত্রেয়ী শুনতে পেয়েছিলেন এবং শুনেছিলেন, "ওগো, আত্মারই দর্শন করা উচিত, আত্মারই শ্রবণ, মনন, ও ধ্যান করা উচিত।"

এই বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ দেখতে পাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের মধ্যে। তাই তাঁকে বলতে চাই যে তিনি ভারতাত্মা।

অনেক যুগের অনেক কথা রয়েছে। সকল কথা কেউই জানে না। যা জানা আছে তা-ও বলা হয়ে ওঠে না। তবু যেটুকু না বললে অপরাধ হয় সেটুকুই বলার চেষ্টা করছি। আমার নিজের কথা নয়, যিনি ভারতাত্মার মর্মবাণী শুনবার জন্যে সারা জীবন কান পেতেছিলেন—আর গেয়ে উঠেছিলেন:

'কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও—
হে অতীত?'

সেই বাণীমূর্তি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে ভারতবর্ষের মর্মোদ্‌ঘাটন যেমন সার্থক ভাবে হয়েছে, তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস নূতন প্রাণ পেয়ে তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কথা কয়ে উঠছে—সে কথা ভারতাত্মার। আজ আমরা শুনি:

"ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কি, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে—ভারতবর্ষের ইতিহাস সে-উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়-রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা। বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথামৃতে মধুবর্ষণ করেছেন:

"কি জান, সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়। সব পথ দিয়ে চলে আসতে হয়। খেলার ঘুটি সব ঘর পার না হলে কি চিকে ওঠে? ঘুটি যখন চিকে ওঠে কেউ তাকে ধরতে পারে না।

"আমার সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান; আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত—এ সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে।

"দেখলাম সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছেই সকলে আসছে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।"

"সমং পশ্যন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্‌।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌।"

সর্বত্র সমান ভাবে বিদ্যমান ঈশ্বরকে জানিয়া নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না (অর্থাৎ সবই তিনি) তখনই পরমাগতি-প্রাপ্ত হন।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছু আছে, সব-কিছুতেই পরমেশ্বর ওতপ্রোত হয়ে আছেন।

ফরাসী দেশের অধিবাসী পৃথিবীখ্যাত রোঁমা রোঁলা তাঁর বিবেকানন্দ-জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন—"No other religion has possessed it to this degree and with Vivekananda it was part of the very essence religion."

এত দূরে থেকেও তিনি জানতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের কথা। ভারতাত্মার বাণী দৈবযোগে তাঁকে জাগ্রত করেছিল—তাই তিনি উৎসুকচিত্তে বিশ্ববন্দ্য রবীন্দ্রনাথকে লিখে পাঠিয়েছিলেন এ-সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সাহায্য করতে। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে শুধু এই বলেছিলেন, "ভারতবর্ষকে যদি জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে বিবেকানন্দকে জানিতে চেষ্টা করুন।"

রোঁমা রোঁলা বিবেকানন্দকে জেনেছিলেন, তাঁকে জানতে গিয়ে জেনেছিলেন তাঁর গুরুমহারাজকে—ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণকে। মনীষী রোঁলা য়ুরোপীয় জাতিসমূহকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকের আদর্শ তাঁদের জীবনে স্থাপন করে গেছেন, এবং এই আশা নিয়ে গেছেন যে, এক দিন তাতে উপকারই হবে।

রবীন্দ্র-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিকাল উন্নতির ভিত্তি, এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ-বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে-ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে-ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক।"

তাই ত জাতির জনক গান্ধীর মুখে শুনি—'ভারতের প্রয়াস যদি বিফল হয়, এশিয়া মরিয়া যাইবে। ভারতবর্ষ বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন-ভূমি। ভারতকে এই আখ্যা সংগত ভাবেই দেওয়া যায়। ভারতবর্ষ এশিয়া, আফ্রিকা অথবা সকল স্থানের শোষিত জাতিগুলির আশাস্থল হইয়া থাকুক।"

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার জওহরলালেরও প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে একই বাণীতে—"আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, যেখানে বাকি পৃথিবীর দেশসমূহ বিফল হয়েছে প্রাচ্য জগৎ সেখানে অদ্ভুত সাফল্য লাভ করিবে। ইতিহাসে এ ব্যাপার বহু বার ঘটেছে এবং দেখা গেছে যে পূর্ব দিক থেকেই আলো আসে।"

সত্যি সত্যিই আলো পূব দিক থেকেই আসে। সে আলো প্রজ্ঞার আলো। আমরা তা দেখি গৌতমবুদ্ধে, দেখি শ্রীচৈতন্যে; এবার দেখি শ্রীরামকৃষ্ণে। এঁরা সবাই ভারতের আত্মা।

শ্রীরামকৃষ্ণের এক ভক্ত এক দিন বলছিলেন, "আমার বোধ হয় তিন জনেই এক বস্তু: যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি: এই তিনে এক।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "এক এক, এক বই কি! তিনি যেন এর উপর এমন করে রয়েছেন।" বলতে বলতে ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

Sir Humphrey Devy বলেছেন, "ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়ে না এলে মানুষ বুঝতে পারে না। আবার উপমা দিয়েছেন, যেমন সূর্যের দিকে চাওয়া যায় না, কিন্তু সূর্যের আলো যেখানে পড়ে সেদিকে চাওয়া যায়।"

পরমাত্মার আলোতেই মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণও জ্যোতির্ময় হয়েছেন। এই জ্যোতিতেই প্রকাশিত হচ্ছেন মানবাত্মা খৃষ্ট, চৈতন্য। যত মত তত পথ।

আবার শুনি রবীন্দ্র-কণ্ঠে,—"বিধাতাই ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য যে-শক্তি পাইয়াছে সেই শক্তি চর্চা করিবার অবসর ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই পাইয়াছে। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানব-জাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে—সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।"

ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখি একটি ছবি: "আমি এক দিন দেখলাম, এক চৈতন্য—অভেদ। প্রথমে দেখালে অনেক মানুষ জীবজন্তু রয়েছে—তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদ্দফরাস, কুকুর, আবার এক জন দেড়ে মুসলমান হাতে এক শানকী—তাতে ভাত রয়েছে। সেই শানকীর ভাত সব্বাইএর মুখে একটু একটু দিয়ে গেল। আমিও একটু আস্বাদ করলুম।

"আর এক দিন দেখালে বিষ্ঠা-মূত্র, অন্ন-ব্যঞ্জন, সব রকম খাবার জিনিস—সব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটি আগুনের শিখার মতো সব আস্বাদ করলে, যেন জিহ্বা লক্-লক্ করতে করতে সব জিনিস একবার আস্বাদ করলে। দেখালে যে সব এক—অভেদ।"

রবীন্দ্রনাথের সত্যদৃষ্টিতে দেখি: "বিদেশী যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে, ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই। নাসা কুঞ্চিত করে নাই। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে ব্যক্ত করিয়াছে।"

কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতা নিয়েই যত মুস্কিল। এই কথাটার না কি অর্থই বোঝা যায় না। কি করেই বা যাবে? যে যা আচরণ করেনি সে কি করে তার খবর জানবে? রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলছেন, "আমরা অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি। এই জগতের কেন্দ্রস্থলে কি রহস্য লুক্কায়িত তাহা আজও আমাদের বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু কায়িক অস্তিত্বের প্রাচীরের মধ্য দিয়া আমরা যে স্তিমিত আলো দেখিতে পাইতেছি তাহাতে কায়িক জীবন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনেই আমাদের বিশ্বাস গভীরতর বলিয়া মনে হয়। কারণ, যে অব্যক্ত সত্যকে আমরা প্রকাশ করিতে অক্ষম তাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া থাকি। যাঁহারা তাহাতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের আচরণেও প্রকাশ পায় যেন তাঁহারাও ইহাতে আস্থাবান, অন্ততঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগৎকে অধিকতর সত্য বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাঁহারাও সত্য-শিব-সুন্দরের জন্য মৃত্যুকে এই কায়িক জীবনের অবসানে বরণ করিতে প্রস্তুত। ইহাতে মানুষের আন্তরিক মুক্তিকামনা যে অসীম জগতের সত্যের সহিত

নিজের নিবিড় অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক উপলব্ধি করে সেই অসীম জগতে তাঁহার প্রয়াণের আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "অনন্ত সমুদ্র। জলেরও অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে অন্তরে বাইরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটি কি? ঘট আছে বলে জল দুই ভাগ দেখাচ্ছে, অন্তর বাহির বোধ হচ্ছে। 'আমি' ঘট থাকলে এই বোধ হয়। ঐ 'আমি'টি যদি যায় তাহলে যা আছে তাই, মুখে বলবার কিছু নাই।"

বলেন তিনিই, "চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল, শংকরাচার্য নেয়ে ফিরছিলেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেললে। শংকর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুই আমায় ছুঁয়ে ফেললি?'

সে বললে, 'ঠাকুর, আমাকেও তুমি ছোঁওনি, আমিও তোমাকে ছুঁইনি। তুমি বিচার করেই দেখ। তুমি কি দেহ; তুমি কি মন; তুমি কি বুদ্ধি?'

"শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন গুণ—কোনো গুণেই লিপ্ত নয়।

"ব্রহ্ম কিরূপ জানিস্? যেমন বায়ু। দুর্গন্ধ, ভালো গন্ধ সব বায়ুতে ভেসে আসছে—কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।"

এমনি একটি মানুষ তিনি—যিনি সত্যের সহিত নিজের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ উপলব্ধি করেছেন। তাঁর এক ভক্ত এক দিন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চক্ষে হয়?"

তিনি বললেন, "তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ, সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়—আবার প্রেমের লিঙ্গযোনি হয়।"

এ কথা শুনে ত ভক্তটি হো-হো করে হেসে উঠলেন। ঠাকুর কিন্তু শিশুর মতো সহজ মন নিয়ে আবার বললেন, "এমন একটি প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।"

ভক্তটি আবার গম্ভীর হলে ঠাকুর বললেন, "ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালোবাসা না এলে হয় না। খুব ন্যাবা হলে তবেই ত চার দিক্ হলদে দেখা যায়। তখন আবার 'তিনিই আমি' এই বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশী হলে বলে 'আমিই কালী', গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে থাকে 'আমিই কৃষ্ণ'। তাঁকে রাত-দিন চিন্তা করলে তাঁকে চার দিকে দেখা যায়।' যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক তবে খানিকক্ষণ পরে চার দিক শিখাময় দেখা যায়।"

ভক্তের মনে প্রশ্ন জাগে—ঠাকুর তা বুঝতে পারেন: বলেন, "তাঁর কৃপা না-হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। আত্মার সাক্ষাৎকার না-হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।

"ছেলে অনেক দৌড়োদৌড়ি করছে দেখে মা'র দয়া হয়। মা লুকিয়ে ছিলেন এসে দেখা দেন।"

ভক্ত ভাবছেন, কেন তিনি দৌড়োদৌড়ি করান। ঠাকুর অমনি বলছেন, "তাঁর ইচ্ছা যে, খানিক দৌড়োদৌড়ি হয়, তবে আমোদ হয়। তিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন। এরই নাম মহামায়া। তাই সেই শক্তিস্বরূপিণী মা'র শরণাগত হতে হয়। মায়াপাশে বেঁধে ফেলেছে। এই পাশ ছেদন করতে পারলে তবেই ঈশ্বরদর্শন হতে পারে।"

মায়াপাশের কথা শুনে ভক্ত শিউরে উঠেন। ঠাকুর বুঝতে পেরে বলেন, "তাঁর কৃপা পেতে হলে আদ্যাশক্তিরূপিণী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মহামায়া জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে থাকলে বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায়। সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে চিনতে পারা যায় না।

"শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই-ই আছে। অবিদ্যা মুগ্ধ করে—কামিনী কাঞ্চন; বিদ্যা ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়—ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেমের উদয় হয়। অবিদ্যাকে প্রসন্ন করতে হলে দরকার শক্তিসাধনা।"

ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "সংসার ত্যাগ করতে হবেই?"

ঠাকুর বলেন, একটা জিনিসের 'পর যদি আরেকটা জিনিস থাকে প্রথম জিনিসটা পেতে গেলে অপর জিনিসটাকে সরাতে হবে না! একটাকে না-সরালে আরেকটা কি পাওয়া যায়? তাঁকে দেখলে কি আর কিছু দেখা যায়? ধন, মান, যশ এক দিকে—আর তিনি আরেক দিকে। এক দিক ভুলে যাও, আরেক দিক খুলে যাবে।"

১৯৩৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে ভাষণ দান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "পরমহংসদেবকে আমি ভক্তি করি। ধর্মনৈতিক ধ্বংসবাদের যুগে তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ উপলব্ধি করিয়া উহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রশস্ত মন পরস্পরবিরোধী সাধন-পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করিয়াছিল। সরলতা দ্বারা তিনি ঐশ্বর্য ও পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরকে ধিক্কার দিয়াছেন।"

এই পরমহংসদেবই আমাদের ভারতাত্মা, এ-কথা তাঁর জীবন থেকে ও বাণী থেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সকল ধর্মের সমন্বয় সাধন তাঁর জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি কি ভাবে এই সমন্বয়ের উপলব্ধি করতেন তাঁর কথায়ই শুনি, —"আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল, এ মত ভাল নয়। ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে গড, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে, এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি, আরেক ঘাটের লোক বলছে ওয়াটার। কিন্তু বস্তু এক। মত—পথ। এক একটি ধর্মের এক একটি পথ ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানা দিক থেকে এসে সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়। বেদ পুরাণ তন্ত্র প্রতিপাদ্য একই সচ্চিদানন্দ। বেদে সচ্চিদানন্দ—ব্রহ্ম; পুরাণে সচ্চিদানন্দ—কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি। তন্ত্রে সচ্চিদানন্দ—শিব। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব।"

নরেন্দ্র জিজ্ঞেস করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পাগল ঠাকুরকে—"'মা' 'মা' যে কর, মাকে কি দেখতে পাও তুমি?" জিজ্ঞাসার মধ্যে অবিশ্বাসের ভাব প্রচ্ছন্ন।

সহজ সুরে ঠাকুর বলেন, "দেখতে পাই কি রে, মার সঙ্গে বসে কথা কই, খাই, পাশটিতে শুয়ে ঘুমুই।"

বিদ্রূপের সুরে নরেন্দ্র শুধোয়, "মাথা-খারাপ, ঈশ্বরকে দেখা যায় কখনও—কোথায় থাকে সে?"

ঠাকুরের সহজ ভাষা, "নিচে, উপরে, সামনে, দক্ষিণে, উত্তরে—স এবেদং সর্বমিতি। ভিতরে বাইরে—বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্। আব্রহ্মস্তম্ব, পর্যন্ত তিনি। অশরীরাং শরীরেষু অনবস্থেষু অবস্থিতম্। দেখবি বৈ কি, নিশ্চয়ই দেখবি। তোর এমন চোখ, তুই দেখবি নে ?"

ঠাকুর ফরমায়েস করলেন, "গা ত সেই গানটা—'যো কুছ হ্যায়, সো কুছ হ্যায়'।"

নরেন গান ধরল। ঠাকুরের কী আনন্দ !

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। যা কিছু তুই দেখছিস তোর চোখের সামনে সব তিনি। গাছ পাখি মানুষ সব। আকাশ মাটি বাতাস আগুন জড় চেতন—সমস্ত। নিত্যানিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। তিনি সর্বব্যাপী। সর্বাতীত স্বয়ংপ্রকাশ।"

"কে—ঈশ্বর ?"

অল্পতার শেষ সীমা পরমাণু, আর বৃহত্ত্বের শেষ সীমা আকাশ। তেমনি জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্র জীব, আর তার আতিশয্যের পরকাষ্ঠা ঈশ্বর।

নরেন বললে, "সহজ করে বলুন।"

ঠাকুর বলেন, "কি বলছিস রে নরেন ?" হাসতে হাসতে কাছে এসে নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন ঠাকুর। ছুঁতেই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন তিনি। বাহ্যজ্ঞান নেই।

পরমপুরুষের ছোঁয়া লেগে নরেনেরও কি যে হল !

কি যে হল কে বলবে ? চোখের সুমুখ থেকে একটা পর্দা উঠে গেল যেন। যেন চেতনান্তর হল। ভ্রূনিম্নস্থ দুই চোখ বুজে গিয়ে জেগে উঠল কপালের শীর্ষে তৃতীয় নয়ন। চেয়ে দেখল—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। ধূলিকণা থেকে আকাশ বিকাশ সূর্য পর্যন্ত সব কিছু ঈশ্বর। এ কি, চোখে ঘোর লাগল না ত ? চোখ বুজলে নরেন। অন্ধকারেও সেই জ্যোতি, সেই ঈশ্বর।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল নরেন। ইট কাঠ দরজা সব প্রাণময়। খেতে বসল—মনে হল থালা, বাটি, ভাত, ডাল সব-কিছুর মধ্যে ঈশ্বর বিরাজ করছেন। যিনি পরিবেশন করছেন আর যে খাচ্ছে দুই-ই তিনি—সচ্চিদানন্দ।

ভাতের থালা সামনে নিষ্পন্দের মতো বসে আছে নরেন।

মা এসে মনে করিয়ে দিলেন, 'বসে আছিস্ যে রে, খা !'

খেতে সুরু করল নরেন। কিন্তু কে খাচ্ছে, কি খাচ্ছে, যে খাচ্ছে সে কে এবং যাকে খাচ্ছে সেই বা কি।

ভোর হল তবুও ঘোর গেল না। কলেজে যাবার পথে গাড়ি এসে উঠছে গায়ের উপর। মনে হয় গাড়িও যা, সেও তাই। সব ঈশ্বরময়।

বিকেলে হেদোর ধারে বেড়াতে বেরিয়ে লোহার রেলিংএ মাথা ঠুকছে নরেন—'বল্ তুই কে ? তুই কি ঈশ্বর ?' কোথাও কি অন্ত নেই ? জাগরণে যে আছে স্বপ্নেও কি সেই ? সুষুপ্তিও কি তাঁতেই, সব-কিছুর অন্তরালেও কি সেই অখণ্ডস্বরূপ !

'শুধু ঈশ্বর দেখছি এ হলেই চলবে না। আরও চাই। তাঁকে ঘরে আনতে হবে। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। রাজাকে ত পথ থেকে দাঁড়িয়ে দেখে অনেকেই। কিন্তু আমি যে তাঁকে ঘরে আনতে চাই ? আমি কি পারব না ?'

তিনি পেরেছিলেন। ঈশ্বরকে ঘরে আনতে পেরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর সঙ্গে কথাও বলতে পেরেছিলেন। আমরা কি করে জানি ? আমরা জানি তাঁরই মর্মবাণী থেকে :

'বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

বলছেন, 'আমি সত্য দর্শন করেছি, তুমিও ইচ্ছা করলে দেখতে পার। আমি যে সাধন অবলম্বন করেছি তুমিও সেই সাধন কর, তাহলে তুমিও আমার মতো সত্য দর্শন করবে। ঈশ্বর সকলের কাছেই আসবেন সেই সমস্ত ভাব সকলেরই আয়ত্তের ভিতর রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যা উপদেশ দিয়ে গেছেন সেগুলি মানবধর্মের সারস্বরূপ, তাঁর নিজের সৃষ্ট নূতন বস্তু নয়।......

'যেমন কোনো শরীরবিশেষের সমুদয় কোষগুলি মিলে একটি মানুষ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবাত্মা যেন এক-একটি কোষস্বরূপ, এবং তাদের সমষ্টি ঈশ্বর—আর সেই অনন্ত পূর্ণ তত্ত্ব ব্রহ্ম তারও অতীত। সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন তাকে বলা যায় ব্রহ্ম, আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাকেই আমরা শক্তি বা মা বলি। সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকালনিমিত্তস্বরূপ। সেই ব্রহ্মই মা। তাঁর দুই রূপ—একটি সবিশেষ বা সগুণ, এবং অপরটি নির্বিশেষ বা নির্গুণ। প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ ; দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই নিরুপাধিক সত্তা থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্রিত্ব ভাব এসেছে। সমস্ত সত্তা যা কিছু আমরা জানতে পারি, সবই এই ত্রিকোণাত্মক, এইটিই বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব।......

'সেই জগদম্বার এক কণা, এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খৃষ্ট। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে তারই উপাসনাতে মহত্ত্ব লাভ হয়। যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।......

'জীবের মধ্যে মানুষই সর্বোচ্চ জীব, আর পৃথিবীই সর্বোচ্চ লোক। আমরা ঈশ্বরকে মানুষের চেয়ে বড় বলে ধারণা করতে পারি না, সুতরাং আমাদের ঈশ্বর মনোভাবাপন্ন—আবার মানবও ঈশ্বরস্বরূপ। যখন আমরা মনুষ্যভাবের উপরে উঠে তার অতীত কোন উচ্চ বস্তুর সাক্ষাৎকার করি, তখন আমাদের এ জগৎ ছেড়ে, দেহ মন কল্পনা—এ সবেরই বাইরে লাফ দিতে হয়। আমরা যখন উচ্চাবস্থা লাভ করে সেই অনন্তস্বরূপ হই, তখন আর আমরা এ জগতে থাকি না। আমাদের এই জগৎ ছাড়া অন্য কোনো জগৎ জানবার সম্ভাবনা নেই, আর মানুষই এই জগতের সর্বোচ্চ সীমা। পশুদের সম্বন্ধে আমরা যা জানতে পারি, তা কেবল সাদৃশ্যমূলক জ্ঞান। আমরা নিজেরা যা কিছু করে থাকি অথবা অনুভব করি, তাই দিয়ে আমরা তাদের বিচার করে থাকি। সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি সর্বদাই সমান—কেবল সেটা কখন বেশি, কখন কম অভিব্যক্ত হয় এই মাত্র। এই জ্ঞানের একমাত্র প্রস্রবণ আমাদের ভিতরে এবং কেবল সেইখানেই ঐ জ্ঞান লাভ করা যায়।......

'আর্শির উপর যে ময়লা আছে, তা পরিষ্কার করে ফেল। নিজের মনটাকে পবিত্র কর, তাহলেই দপ্ করে তোমার এই জ্ঞানের উদয় হবে যে, তুমি ব্রহ্ম।......'

'ভগবানকে আমাদের বাইরে পাওয়া অসম্ভব। বাইরে যা

ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি হয়, তা আমাদের আত্মারই প্রকাশ মাত্র। আমরাই হচ্ছি ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। বাইরে যা দেখা যায় তা আমাদের ভিতরের জিনিসেরই অতি সামান্য অনুকরণ মাত্র।……'

শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ কথায় বলি,—"ঘরের ভিতরের রত্ন যদি দেখতে চাও আর নিতে চাও তাহলে পরিশ্রম করে চাবি এনে দরজার তালা খুলতে হয়। তার পর রত্ন বার করে আনতে হয়। তা না হলে তালা-দেওয়া ঘর, দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি, ঐ আমি দরজা খুললুম, সিন্দুকের তালা ভাঙলুম, ঐ রত্ন বার করলুম। শুধু দাঁড়িয়ে ভাবলে ত হয় না—সাধনা করা চাই।"

এই সাধনার জন্যই বিবেকানন্দ ডাক দিলেন,—"ঘুমন্ত ভারতবর্ষ জাগো।"

ভারতবর্ষ কি ঘুমিয়েছিল? হ্যাঁ ঘুমিয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহিরের জৌলুসে ভারতবাসীরা নিজেদের অধ্যাত্ম সম্পদ সম্বন্ধে হয়ে উঠেছিল বীতশ্রদ্ধ ও অজ্ঞ, যার দরুণ পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতি ভারতবাসীকে কুসংস্কারাপন্ন অসভ্য মনে করবার সুবিধা পেয়ে উঠেছিল। দরকার হয়ে পড়েছিল তখন ভারতাত্মার বাণী প্রচারের। নিঃসম্বল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নিয়েছিলেন এই গুরুভার। তিনি যে সাফল্যের সহিত ভারতাত্মার বিজয়-নিশান পাশ্চাত্য দেশে উড়িয়ে এসেছিলেন—সে কথা আজ কার অজানা আছে?

আজও বাজে তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠ,—"হে ভারত, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র, ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।……

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারতবাসী আমার ভাই, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, আমার প্রাণ। ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন-রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

এই ডাক রেখে গিয়েছিলেন ভারতাত্মার শক্তিবিগ্রহ বিবেকানন্দ। আমরা দেখি এর সার্থক রূপ মহাত্মা গান্ধীর জীবনে। গান্ধীজীকে এই মহতী বাণীর জীবন্ত বিগ্রহ বলব তাই। বিবেকানন্দের উদ্দেশে গান্ধীজীর প্রণামী তুলে ধরি :—

"স্বামী বিবেকানন্দর উদ্দীপনাময়ী মহতী বাণী হইতেই আমি দেশসেবার যাহা কিছু অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি, এ জন্য আমি এবং দেশসেবক মাত্রই স্বামীজীর নিকট অপরিসীমরূপে ঋণী।"

আরও একটি কথা গান্ধীজী বলে যাননি। সে হচ্ছে তাঁর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' অনুসরণের কথা। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা বিশ্বে মৈত্রী ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তাঁর জীবনকে প্রয়োগ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীরূপ দিয়ে। এই মহাসাধনার পরীক্ষা কালেই তাঁর জীবনলীলা সংবৃত হল, এ কথা মানুষ মাত্রেই জানে, অন্তত জানা থাকলে মানুষেরই উপকার হয়। কারণ, মহাত্মাজী তাঁর জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন ভারতাত্মার সেই বাণী,—

"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।"

ছড়িয়ে গেছেন মন্ত্রের বীজ,—

"প্রেমেরই জয় হইবে, ঘৃণার নহে;
"ত্যাগের জয় হইবে, ভোগের নহে;
"চৈতন্য জয়ী হইবে, জড় নহে।"

ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনে। তিনি এক জায়গায় বলেছেন,—"মাত্র পনেরো বছর বয়সে আমার জীবনে বিবেকানন্দের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিবেকানন্দকে ভর করে আমি তাঁর গুরুমহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হই।"

নেতাজী নিজেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক উত্তরপুরুষ বলে জেনে নিয়েছিলেন। নেহাৎ বাল্যকালেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁকে হতে হবে 'An Embodiment of the past, a product of the present and prophet of the fnture.'

মাত্র আঠারো বৎসর বয়সের এই আত্মদর্শন কতখানি সার্থক হয়েছে সে বিচারের ভার রয়েছে ভারতের ইতিহাস-বিধাতার উপর। বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছেন নেতাজী নিম্নোক্ত ভাষায় :

"তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে এক জন যোদ্ধা, শক্তি-সাধনায় সিদ্ধ সাধক। তাঁহার ঐশ্বর্যশালী, উন্নত, গম্ভীর ও দুর্জ্ঞেয় ব্যক্তিত্ব সমস্ত ভারতবর্ষের অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই পৌরুষের আদর্শ বাংলার যুবকদের যেমন আকৃষ্ট করেছে তেমন আর কাহাকেও করে নাই। স্বামী বিবেকানন্দকে আমি গুরু বলিয়া মানি। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমি শিষ্যরূপে তাঁর পায়ের তলায় থাকতুম। আমি বলতে চাই যে, তাঁহার বাণী ও আদর্শই আমার জীবনকে গঠিত করিয়াছে।"

কোনো বন্ধুকে লেখা সুভাষচন্দ্রের একখানি পত্রের কয়েক ছত্র তুলে দিই :

"মনে পড়ে একটি চিত্র। কালীমন্দির দক্ষিণেশ্বরে। সম্মুখে খড়্গহস্তা মা কালী আনন্দময়ী—শিবের আসনের উপর অধিষ্ঠিতা—শতদলবাসিনী—তাঁর সম্মুখে একটি বালক—বালক হইতেও বাল-প্রকৃতি—আধ-আধ স্বরে কাঁদিতেছে এবং কা'কে যেন ডেকে-ডেকে বলিতেছে, 'মা, এই নাও তোমার ভালো, 'এই নাও তোমার মন্দ। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য।'

"করালমুখী ভীষণদংষ্ট্রা মা অল্পতে সন্তুষ্ট নয়, সব গ্রাস করতে চায়—তাই ভালোও চাই, মন্দও চাই। পাপও চাই, পুণ্যও চাই। বালক সব দিতে বসেছে। না দিলে শান্তি নাই—মা যে ছাড়িবেন না।

"বড় কষ্ট! মাকে সবই দিতে হইবে। মা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। তাই কাঁদিতেছে ও বলিতেছে, 'এই নাও, এই নাও।'

"দেখিতে দেখিতে অশ্রুধারা বন্ধ হইল, গণ্ডস্থল ও বক্ষ শুকাইল, হৃদয় জুড়াইল। হৃদয়ে আর কিছু নাই। যেখানে ভীষণ কণ্টক যন্ত্রণা দিতেছিল, তার চিহ্নও নাই, সবই শান্তিময়। হৃদয় মধুতে ভরিয়া গেল, বালক উঠিল। আপনার বলিয়া তার আর কিছু নাই—সব দিয়ে ফেলেছে। এই বালকটি রামকৃষ্ণ।"

এই 'সব-দিয়ে-ফেলবার' সাধনাই ভারতাত্মার সাধনা। প্রাচীন ভারতের নচিকেতা যে জীবনের ছবি নিয়ে এলেন আমাদের মনে, যে-ছবি নিয়ে এলেন মৈত্রেয়ী, যে-ছবি দেখি গৌতমবুদ্ধের জীবনে, তাই ধরা দিল শ্রীরামকৃষ্ণে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে বলি ভারতাত্মা। বিবেকানন্দ এঁরই জীবনের প্রতিধ্বনি। সে-প্রতিধ্বনির প্রতিমূর্তি গান্ধীজী; সুভাষচন্দ্র সে-প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি।

"এই ঘটনা সত্য যে, আলিপুর জেলের নির্জন কক্ষে ধ্যানে অবস্থান কালে আমি অনবরত এক পক্ষ কাল স্বামী বিবেকানন্দকে আমার নিকট কথা বলিতেছেন শুনিতে পাইয়াছি এবং তাঁহার দিব্য উপস্থিতি অনুভব করিয়াছি। স্বামীজীর সুস্পষ্ট বাণী কেবল এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রেই শুনিতে পাইয়াছিলাম, সেই বিষয়ে যাহা কিছু বলিবার বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন।"

এ-দিব্যদর্শন শ্রীঅরবিন্দের। তিনি বলেছিলেন,—'ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতেই হবে।'

ভগবৎপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতার ধর্মই ভারতের আত্মা। ভারতীয় সাধনার মূলসূত্র ধর্মে। আধ্যাত্মিকতা ভারতের সহজাত। ভারতবাসীর বিশ্বাস জগতের মূল রহস্য জগৎকে ছাড়িয়ে, জীবনের মূল সত্য জীবনের পারে।

সাধারণের বর্তমান তবু দেখাতে চায়, মানুষ বুঝি ভাবতেই পারে না যে, ধর্ম ও দর্শনই মানব-জীবনের সর্বপ্রধান উপজীব্য। যা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে এত সব দুঃখ-কষ্টের উৎপত্তি, তাতে ফিরে যেতেই যত ভয়। যা থেকে মুক্তি আসবে, সে যে বাইরের কিছু নয়, এ কথাটা বুঝি বোঝাবার প্রয়োজন। তাই কবি-কণ্ঠে আহ্বান ওঠে:

"যিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে মূর্তিমান্ করে তুলবেন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই ঐতিহাসিককে আমরা আহ্বান করছি। তিনি তাঁহার শ্রদ্ধা দ্বারা আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিবেন, আমাদিগকে প্রতিষ্ঠা দান করিবেন, আমাদের আত্ম-উপহাস আত্ম-অবিশ্বাস অনায়াসে তিরস্কৃত করিবেন, আমাদিগকে এমন প্রাচীন সম্পদের অধিকারী করিবেন যে পরের ছদ্মবেশে নিজের লজ্জা লুকাইবার আর প্রবৃত্তি থাকিবে না। তখন এ কথা আমরা বুঝিব যে, পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একটি মহৎ স্থান আছে, আমাদের মধ্যে মহৎ আশার কারণ আছে। আমরা কেবল গ্রহণ করিব না, অনুকরণ করিব না, দান করিব, প্রবর্তন করিব, এমন সম্ভাবনা আছে। পলিটিক্স, এবং বাণিজ্যই আমাদের চরমতম গতিমুক্তি নহে। প্রাচীন ব্রহ্মচর্যের পথে বৈরাগ্যকঠিন দারিদ্র্যগৌরব শিরোধার্য করিয়া দুর্গম নির্মল মাহাত্ম্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিবার জন্ম আমাদের ঋষি পিতামহদের সুগম্ভীর নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।

"হে ঐতিহাসিক, আমাদের সেই দিবার সংগতি কোন্ প্রাচীন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া আছে দেখাইয়া দাও, তাহার দ্বার উদ্ঘাটন কর।"

কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও আজ আহ্বান করছি তোমাকেই, ওগো আমাদের আত্মার আত্মীয়, তুমি আবার আবির্ভূত হও দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগল ঠাকুরের জ্ঞান নিয়ে, কারণ তোমার উদ্দেশে ধর্মরাজের বাণী আমাদের মর্মে মর্মে অনুরণিত হয়ে উঠেছে:

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় শ্রেষ্ঠ।"

"তুমি যে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তর্ক দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই মহাবস্তু তুমি আমাদের দান করবে, তাই তুমি এসো। তুমি অবতীর্ণ হও।"

এক হাতে মাটি আরেক হাতে টাকা নিয়ে এসো গঙ্গাতীরে। বিচার করো কোনটা বেশি ভারী। কোন্‌টার বেশি দাম। টাকা না মাটি, মাটি না টাকা। বিচার করতে করতে পেয়ে যাও, দুই-ই তুল্যমূল্য—দুই-ই সমান অসার। মাটি আর টাকা দুই-ই একসঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দাও গঙ্গায়। নিঃশেষে নির্মুক্ত হও।

তখন আমরা তোমার মন্ত্র নিই, আমরাও ঘুম থেকে জেগে উঠি আর তোমার উদ্দেশে শ্রদ্ধা-নিবেদন করি অমর কবীন্দ্রের তানে তান মিলিয়ে—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা;
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ দিল এ জগতে;
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় মোদের প্রণতি দিলাম আনি।"

স্বপ্ন ও সাহিত্য

লেখক রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের ডাঃ জেকিল এবং মিঃ হাইডের অত্যাশ্চর্য ঘটনার উৎস হল স্বপ্ন। লেখকের স্ত্রী মিসেস্ ষ্টিভেনসন বলেছিলেন: আমি এক দিন প্রাতে লুইএর চীৎকারে জেগে উঠি ঘুম থেকে। তিনি স্বপ্ন দেখছেন ভেবে আমি যখন তাঁকে ঘুম থেকে জাগাই তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,—'কেন তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গালে? আমি বেশ চমৎকার একটি গল্প স্বপ্নে দেখছিলাম।'. আমি না কি তাঁকে এক চরম মুহূর্তে জাগিয়েছিলাম।

স্বপ্ন-জীবন ষ্টিভেনসনের সাহিত্য-সৃষ্টিতে বিশেষ সাহায্য করেছে। কাহিনী যুগিয়েছে, দৃশ্য ও চরিত্রের সন্ধান দিয়েছে, কথোপকথন জানিয়েছে এবং গল্পের গতি-পথের পর্যন্ত পরিচালনা করেছে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন-শাস্ত্রী

কাব্যরসিকের নিকট বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী অতি পরিচিত। বিদ্যাসুন্দরের প্রতিপত্তি কেবল বাংলা দেশে নহে, সমগ্র ভারতে। বিদ্যাসুন্দরের অথবা অনুরূপ কাহিনী লইয়া সংস্কৃতে কয়েকখানা কাব্য আছে, এই কাব্যগুলি নিখিল ভারতের সম্পদ্। বাংলা দেশে বহু কবি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্র উভয়ে সমসাময়িক, এবং উভয়েই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিত, ইঁহারা উভয়েই বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। মনে হয়, একে অন্যের রচনায় তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাই সকলেই স্ব স্ব প্রতিভা ও কবিত্ব-সম্পদ্ দ্বারা এই জনপ্রিয় কাহিনীটিকে নূতন নূতন রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দর আদিরসাত্মক ও স্থানে স্থানে ইহার আদিরস অতিশয় উগ্র। সে কালের আদিরস পাত্র পূর্ণ করিয়া পান করিতে হইত, পাত্র ফেনায় পূর্ণ হইয়া উঠিত এবং যাঁহারা তাহা পান করিতেন তাঁহাদের সকলে তাহা সামলাইতে পারিতেন না। আধুনিক সাহিত্যের আদিরস মর্ফিয়ার মত, সূক্ষ্ম সূচি দ্বারা তাহা শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়, ইহার কার্য্যও সূক্ষ্ম, অব্যর্থ ও কখন কখন প্রাণঘাতক। যাহাই হউক, আধুনিক বিদগ্ধেরা এই জন্যই বিদ্বৎপরিষদে প্রকাশ্যে বিদ্যাসুন্দরের গুণ কীর্ত্তন করিতে প্রস্তুত নহেন, ইহার স্থূল হস্ত তাহাদের সূক্ষ্ম অনুভূতির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে, কিন্তু বহু কাল ধরিয়া রসিক-সমাজে ইহার প্রতিপত্তি এতই মহতী ছিল যে, ইহার মহত্ত্বের সেই দিক্ বিবেচনা করিয়া ইহাকে মহাকাব্য বলিলেও দোষ হইত না। যাহার প্রতিপত্তি মহতী তাহাকেও এক শ্রেণীর মহাকাব্য বলিতে দোষ কি?

অধিকাংশ বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নায়ক তাহাদের দুষ্কৃতের জন্য দণ্ডিত হইয়া শ্মশানে নীত হইয়াছেন এবং ঘাতকের উদ্যত শস্ত্র গণনার মধ্যে না আনিয়া প্রিয়ার সম্ভোগ বৃত্তান্ত কতকগুলি শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধিকাংশ লোকের মতে ইহা চোর নামক জনৈক কবির রচিত, শ্লোকের সংখ্যা পঞ্চাশ বলিয়া এই শ্লোকগুলি চৌরপঞ্চাশিকা নামে পরিচিত। কোথাও বা শ্লোকগুলির নাম 'চৌরীসুরত-পঞ্চাশিকা', অর্থাৎ যে পঞ্চাশিকায় সমাজবিধি অগ্রাহ্য করিয়া নায়ক ও নায়িকার গুপ্ত বিহার বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকগুলি কাহার রচনা তাহা বলা দুষ্কর। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কবি বররুচি প্রথম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, শ্লোকগুলি তাঁহারও হইতে পারে। কাহারও মতে ইহা চোর নামক প্রসিদ্ধ কবির রচনা; কেহ মনে করেন যে, কাশ্মীর কবি বিল্হন ও চোর অভিন্ন ব্যক্তি। আদিরসাত্মক কাব্যের মধ্যে এই শ্লোকগুলি বোধ হয় অমরু-শতকের পরেই স্থান পাইবার যোগ্য; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত চৌরপঞ্চাশিকার যতগুলি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহা পাঠভেদে ও অশুদ্ধ পাঠে পূর্ণ। যখন কোনটি মৌলিক পাঠ তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই, তখন বিভিন্ন পাঠগুলির মধ্যে যেগুলি সুন্দর ও সঙ্গত তাহা বাছিয়া লইয়া ইহাদের সংস্কার করা যায়। কোনও শ্লোকে বিদ্যার বর্ণনায় আছে "শ্বাসোত্তরং চ নিভৃতং মুমুহুঃ শশাঙ্গীম্" আবার পুস্তকান্তরে ইহার পাঠ আছে, "শ্বাসোত্তরং চ নিভৃতং চ মুহুর্মিলন্তীম্"। বলা বাহুল্য, প্রথম পুস্তকের পাঠটি কেবল অশুদ্ধ নহে অর্থশূন্য; দ্বিতীয় পুস্তকের পাঠটি শুদ্ধ ও সুন্দর। এ স্থলে প্রথম পুস্তকের পাঠটি ত্যাগ ও দ্বিতীয় পুস্তকের পাঠটি গ্রহণ করিয়া শ্লোকটির সংস্কার করা বাঞ্ছনীয়। শ্লোকগুলির প্রত্যেকটিতেই আছে "অদ্যাপি···তাং স্মরামি" অর্থাৎ আজও তাহাকে সেই অবস্থায় মনে করি। বিদ্যাসুন্দরের নায়ক শ্মশানে উদ্যতশস্ত্র ঘাতকের সম্মুখে তাহার প্রিয়াকে স্মরণ করিয়াছেন, প্রিয়াকে স্মরণ করিবাব অনুরূপ অবস্থা সকলের হয় না ও হইবারও প্রয়োজন নাই; কিন্তু অশীতিপর-বয়স্ক স্থবিরও পূজার ফুল তুলিতে তুলিতে মনে মনে আবৃত্তি করিতে পারেন 'অদ্যাপি তাং স্মরামি', তাহাব জীবনেও সেই এক দিন গিয়াছে এবং তাহা যে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে তাহাতে সন্দেহ কি? যাহারা রসসিন্ধু মন্থন করিয়া অমৃত আহরণ করিতেছেন সেই মন্থননিপুণদের 'অদ্যাপি তাং' বলিয়া স্মরণ করিবার প্রয়োজন না হইতে পারে, প্রাচীন মন্থনে অপারগ হইলেও তাহার রোমন্থনের অধিকাব আর কে হরণ করিতে পারে? এই রোমন্থনই তো তাহার একমাত্র অবলম্বন। এই শ্লোকগুলি যাহাদের প্রিয়সমাগম অপ্রাপ্ত অথচ প্রত্যাশিত তাহাদের ধ্যানের, যাহাদের ধ্যানের, যাহাদের প্রিয়া কণ্ঠলগ্না তাহাদের অনুভবের ও যাহারা গলিত-যৌবন বৃদ্ধ তাহাদের স্মরণের, সুতরাং ইহাদের জনপ্রিয়তার সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূল কোথায়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ইহা আগাগোড়াই কাল্পনিক না ইহার সহিত কোনও প্রকৃত ঘটনার কোনও সংশ্রব আছে তাহা বলাও কঠিন। যে বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে কেহ কেহ বররুচির রচনা মনে করেন তাহার ভাষা আধুনিক বলিয়া মনে হয়, কাব্যাংশেও তাহা সমৃদ্ধ নহে। আমার মনে হয়, ইহার মূল বৎসরাজ উদয়ন ও বাসবদত্তার উপাখ্যানে। পিতামাতার অজ্ঞাতে যুবক ও যুবতীর প্রেমলীলাই বিদ্যাসুন্দর জাতীয় কাব্যের মুখ্য উপাদান, বৎসরাজের উপাখ্যানেই ইহার প্রথম বীজ দেখিতে পাই। বৎসরাজের কাহিনীরও দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথম, অশ্বঘোষ-কৃত অর্থকথায়; দ্বিতীয়, বৃহৎকথায়। এই সকল উপাখ্যানের সাবাংশ এইরূপ—(১) অর্থকথায় বলা হইয়াছে যে, অবন্তিরাজ প্রদ্যোত মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, বৎসবাজ উদয়নেব সহিত কন্যা বাসবদত্তার বিবাহ দিবেন, কারণ, কুলে শীলে ও গুণে তাহার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত পাত্র আর কেহ ছিল না প্রদ্যোত কিন্তু প্রার্থনা-ভঙ্গেব ভয়ে বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিলেন না, উদয়নের মৃগয়া ব্যসন আছে বলিয়া তিনি একটি কাষ্ঠময় ও যন্ত্রযুক্ত কৃত্রিম হস্তীর গর্ভে কতকগুলি সশস্ত্র যোদ্ধা স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে মৃগয়ারত উদয়নকে বন্দী করিয়া আনিলেন। প্রদ্যোত বাসবদত্তার নিকট উদয়নের পরিচয় দিলেন যে লোকটি গীত-বাদ্যে অতিশয় নিপুণ, তবে খর্ব্বাকৃতি ও কুৎসিত এবং উদয়নের নিকট বলিলেন যে, তাহার কন্যাটি অতিশয় বুদ্ধিমতী, তবে কুব্জা। পরস্পবের নিকট পরস্পবের এই পবিচয় দিয়া তিনি উদয়নকে বাসবদত্তার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিলেন। উভয়ের মধ্যে একটি পর্দা

থাকিত, পর্দার আড়াল হইতে উদয়ন বাসবদত্তাকে বীণাবাদন শিক্ষা দিতেন। কিন্তু পর্দার আড়াল আর বেশী দিন রহিল না, এক দিন গুরু ও শিষ্যার কলহে পর্দা সরিয়া গেল, উভয়ে উভয়কে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। যিনি যুবক ও যুবতীর আরাধ্য—সেই দেবতা তাহাদের গুরু ও শিষ্যার সম্বন্ধের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিলেন, উদয়ন স্বীয় মন্ত্রীর সাহায্যে কৌশলে বাসবদত্তাকে লইয়া পলায়ন করিয়া স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও তাহাকে বিবাহ করিলেন।

(২) গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা অবলম্বন করিয়া সোমদেব কথা-সরিৎসাগর রচনা করিয়াছেন। ইহার কথামুখবলম্বকে উদয়ন ও বাসবদত্তার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অর্থকথা হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, এ স্থলে বাসবদত্তার পিতা উজ্জয়িনীপতি চণ্ডমহাসেন, চণ্ডমহাসেন উদয়নের সহিত বিবাহের প্রস্তাব না করিয়া যাহাতে তিনি তাহার রাজধানীতে আসিয়া বাসবদত্তাকে শিক্ষা দেন সেইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, উদয়ন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। উদয়ন পূর্ব্ব হইতেই বাসবদত্তার রূপ-গুণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। উদয়নকে বন্দী করিবার বৃত্তান্ত উভয় গ্রন্থেই এক প্রকার। কথাসরিৎসাগরে—উদয়ন ও বাসবদত্তার নিকট পরস্পরের মিথ্যা পরিচয় দেওয়া ও পর্দা খাটাইবার কথা নাই। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও বিদূষক বসন্তকের সাহায্যে উদয়ন বাসবদত্তাকে অপহরণ করেন।

উদয়নের উপাখ্যান কালিদাসের কালে অতিশয় প্রচলিত ছিল, কবি মেঘদূতে অবন্তির বৃদ্ধদের 'উদয়নকথাকোবিদ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কোন কোন মেঘদূতে "প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্র জহ্রে" ইত্যাদি অতিরিক্ত শ্লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, কালিদাস অর্থকথায় বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত পরিচিত ছিলেন। কালিদাসের পূর্ববর্ত্তী ভাস প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ ও স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকে কিন্তু কথাসরিৎসাগর, অর্থাৎ বৃহৎকথার উপাখ্যানই গ্রহণ করিয়াছেন। পিতা-মাতার চক্ষে ধূলি দিয়া যুবক ও যুবতীর প্রেম-লীলার এবং প্রণয়ী ও প্রণয়িণীর মধ্যে একটা বিদ্যাসম্বন্ধ বা গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের প্রথম পরিচয় উদয়ন ও বাসবদত্তার আখ্যানেই পাওয়া যায়।

সংস্কৃত কাব্যে এই জাতীয় আরও দুইটি আখ্যান প্রচলিত আছে এবং অনেকের বিশ্বাস, এই কাহিনী দুইটি কেবল কল্পনা নহে, বাস্তব ঘটনামূলক। রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া সাধুরা কিরূপে সাধনমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন তাহা দেখাইবার জন্য বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু-সাহিত্যে বহু উপাখ্যান আছে। জৈন কবি রাজশেখর সুরি তাঁহার প্রবন্ধকোষে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। রাজশেখর সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক। প্রবন্ধকোষের কাহিনীটি এই: (৩) বিশালকীর্ত্তি এক জন দিগম্বর সন্ন্যাসী ও মহাপণ্ডিত, মদনকীর্ত্তি তাঁহারই ছাত্র। মদনকীর্ত্তি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া নানা স্থানে গমন পূর্ব্বক পণ্ডিতদের জয় করিয়া জয়-পতাকা লইয়া আসিলেন ও অবশেষে গুরু নিষেধ করিলেও তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। দক্ষিণ দেশে তিনি কর্ণাট রাজ্যে রাজা কুন্তীভোজের নিকট উপস্থিত হইলেন, রাজাও তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় বংশের প্রশস্তি রচনা পূর্ব্বক একখানি কাব্য রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। মদনকীর্ত্তি বলিলেন যে তিনি মুখে শ্লোক বলিয়া যাইবেন, যদি কেহ তাহা লিখিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে তিনি রাজার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন। রাজকন্যা মদনমঞ্জরী অতিশয় বিদুষী, রাজা তাহাকেই এই কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। উভয়ে এক বাড়ীতেই বাস করেন, তবে সাক্ষাৎ হয় না। কবিতা বলিবার সময়ে উভয়ের মধ্যে একটা পর্দার আড়াল থাকে। উভয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করেন, বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় পান, কিন্তু চারি চক্ষের মিলন আর হয় না। উভয়কে দেখিবার জন্য উভয়ের আগ্রহ বাড়িয়া চলিল। অবশেষে এক দিন রাজকন্যা ইচ্ছা করিয়া মদনকীর্ত্তির ব্যঞ্জনে অধিক লবণ দিলেন, কবি খাইতে বসিয়া ব্যঞ্জন মুখে দিয়াই বলিয়া উঠিলেন "অহো লবণিমা", মদনমঞ্জরীও পর্দার আড়াল হইতে বলিলেন 'অহো নিষ্ঠুরতা'। পর্দার আড়াল সরিয়া গেল, রাজকন্যাকে দেখিয়া কবি বলিয়া উঠিলেন—

নিরর্থকং জন্ম গতং নলিন্যা
যয়া ন দৃষ্টং তুহিনাংশুবিম্বম্।

রাজকন্যাও তাহার উত্তরে বলিলেন—

উৎপত্তিবিন্দোরপি নিষ্ফলৈব
দৃষ্টা প্রবুদ্ধা নলিনী ন যেন।

বলা বাহুল্য, নলিনীর জন্ম সার্থক ও ইন্দুর উৎপত্তি সফলা হইতে বিলম্ব হইল না। কবির কাব্য রচনার কার্য্যে শৈথিল্য আসিল। কবি দিনের পর দিন নানা কৌশলে শৈথিল্যের জন্য কৈফিয়ৎ দিয়াও রাজাকে তুষ্ট করিতে পারিলেন না। অবশেষে কবির সমস্ত কীর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাজা কবিকে বধ করিবার আদেশ দিলেন, তখন রাজকন্যা ও তাহার সখীরা ছুরিকা লইয়া আসিয়া বলিলেন যে, কবিকে বধ করিলে তাঁহারা আত্মহত্যা করিবেন। রাজা আর কি করেন, অগত্যা বহু সম্পত্তির সহিত তিনি কবির হস্তে কন্যা মদনমঞ্জরীকে দান করিলেন। কবি নিশ্চিন্ত চিত্তে সংসার-সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় গুরু বিশালকীর্ত্তি শিষ্যের এই অধঃপতনের সংবাদ পাইয়া বৈরাগ্যের প্রশংসা, রমণীর নিন্দা ও তাহার আচরণের জন্য ভর্ৎসনা করিয়া এক পত্র লিখিয়া জনৈক ছাত্রকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ছাত্র মদনকীর্ত্তি তাহার উত্তরে অন্যান্য কথার মধ্যে গুরুদেবকে জানাইয়া দিলেন—

সন্দষ্টাধরপল্লবা সচকিতং হস্তাগ্রমাধুন্বতী
মা মা মুঞ্চ শঠেতি কোপবচনৈরানর্ত্তিতভ্রূলতা।
সীৎকারাঞ্চিতলোচনা সরভসং যৈশ্চুম্বিতা মানিনী
প্রাপ্তং তৈরমৃতং শ্রমায় মথিতো মূঢ়ৈঃ সুরৈঃ সাগরঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা প্রিয়াকে চুম্বন করিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, দেবতারা তাহার সন্ধানে বৃথাই সমুদ্র মন্থন করিয়াছে। এই উত্তরে গুরুর জ্ঞানোদয় কতখানি হইয়াছিল জানি না, তবে মদনকীর্ত্তি শঙ্কর বা মীননাথের মত কাব্যশাস্ত্রকে হত্যা করেন নাই, রসিকেরা অবশ্যই ইহার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

বিদ্যাসুন্দরের সহিত সংশ্লিষ্ট অপর উপাখ্যান বিল্হনের। বিল্হন রাজশেখর অপেক্ষা অনেক পূর্ববর্ত্তী। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান কুন্তল ও কর্ণাটরাজ চালুক্য নরপতি বিক্রমার্ক বা বিক্রমাঙ্কদেবকে অবলম্বন করিয়া তিনি 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিতম্' নামে বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কাব্য রচনায় সন্তুষ্ট হইয়া

বিক্রমাঙ্কদেব তাঁহাকে 'বিদ্যাপতি' উপাধিও দিয়াছিলেন। বিক্রমাঙ্কদেব-চরিতম্ ব্যতীত বিল্হন-রচিত কর্ণসুন্দরী নাটিকা ও চৌরপঞ্চাশিকা পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস, চৌরপঞ্চাশিকা বিল্হন কবিরই রচনা, পরবর্ত্তী কালে অনেকে ইহার অনুকরণ করিয়াছেন, এবং বিল্হন, কাব্যের নায়ক ও চোর কবি অভিন্ন ব্যক্তি। বিল্হন-চরিত দুইটি পাওয়া যায়, একটি ফরাসী পণ্ডিত মঁসিয়ে এরিয়েল কর্ত্তৃক প্রকাশিত, অন্যটি কাশ্মীর হইতে আহৃত ও মুম্বই নগরের নির্ণয়সাগর মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারী কর্ত্তৃক কাব্যমালার ত্রয়োদশ গুচ্ছে মুদ্রিত হইয়াছে। এই দুইটি উপাখ্যানের মধ্যেও পার্থক্য আছে। মঁসিয়ে এরিয়েল-প্রকাশিত বিল্হন-চরিত কাহার রচিত বলা যায় না, কাব্যমালায় প্রকাশিত বিল্হনকাব্য কবির স্বরচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি।

(৪) এরিয়েল-প্রকাশিত বিল্হন-চরিতের সারাংশ এই—মহাপঞ্চাল দেশের রাজধানী লক্ষ্মী-মন্দির, রাজা মদনাভিরাম, রাণী মন্দারমালা ও রাজকন্যা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা যামিনীপূর্ণতিলকা। রাজকন্যা সঙ্গীতাদি শাস্ত্রে নিপুণা হইলেও সাহিত্যশাস্ত্রে পারদর্শিনী নহেন। রাজা তাহার অনুগত পণ্ডিতদিগকে রাজকন্যাকে পড়াইতে বলিলে তাঁহারা বলিলেন যে, বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহাদের দক্ষতা থাকিলেও সাহিত্যে তাঁহাদের অধিকার নাই। অবশেষে কাশ্মীরদেশীয় সাহিত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ বিল্হন কবি রাজসভায় আগমন করিলেন, রাজাও তাঁহার পাণ্ডিত্যে তুষ্ট হইয়া তাঁহার উপর কন্যার অধ্যাপনার ভার দিলেন। রাজকন্যা অতি সুন্দরী ও যুবতী, অধ্যাপক বিল্হনও পরম রূপবান্ যুবক, সুতরাং রাজা একটু শঙ্কিত হইলেন। রাজকন্যা অন্ধদের মুখ দেখিতেন না, এবং কবি কুষ্ঠরোগীদের পরিহার করিয়া চলিতেন, উভয়ের এই পরিচয় পাইয়া রাজা কবির নিকট স্বীয় কন্যাকে কুষ্ঠিনী ও কন্যার নিকট কবিকে অন্ধ বলিয়া পরিচয় দিলেন। অধ্যাপক ও ছাত্রী একই বাড়ীতে মহাসুখে থাকিতেন; তবে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে পর্দার আড়াল ছিল। এক দিন রাত্রে চন্দ্রোদয় হইয়াছে, জ্যোৎস্নায় সমগ্র জগৎ পূর্ণ হইয়াছে, কবি চন্দ্রোদয়ের মনোহর শোভায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় শয্যায় শয়ন করিয়া শ্লোকের পর শ্লোকে সেই শোভা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পর্দার আড়াল হইলে রাজকন্যা সেই বর্ণনা শুনিয়া মনে করিলেন, অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে এই শোভা অনুভব করা অসম্ভব, আর অনুভব না হইলে এমন বর্ণনা হয় না। তাহার সন্দেহ হইল, ঔৎসুক্য বাড়িল, তিনি পর্দার উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া কবিকে দেখিতে লাগিলেন। চারি চক্ষের মিলন হইল, কবিও দেখিলেন রাজকন্যা কুষ্ঠিনী তো নহেই, পরন্তু পরমা সুন্দরী। গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধের অবসান হইল, উভয়েই নিভৃত বিহারে মত্ত হইলেন। ক্রমে রাজা সমস্ত জানিতে পারিয়া কবিকে বন্দী করিলেন ও তাহার শিরশ্ছেদ করিবার জন্য শ্মশানে পাঠাইয়া দিলেন। শ্মশানে যাইয়াও কবির কোনও দুশ্চিন্তা নাই, আনন্দ তাহাকে পরিহার করিতেছে না। ঘাতকগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কবি বলিলেন—"আমার তো ভয়ের কোন কারণ নাই, কেন না আনন্দের দেবতা আমার মধ্যে বাস করিতেছেন।" ইহার পর কবি কতকগুলি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন, শ্লোকগুলির নায়ক-নায়িকার সম্ভোগমূলক ব্যাখ্যা স্পষ্ট, কিন্তু চেষ্টা করিলে তাহাদের উল্লিখিত শক্তিমূর্ত্তির নানাবিধ প্রকারমূলক ব্যাখ্যাও করা যায়। রাজা এই সকল শুনিয়া কবিকে মার্জ্জনা করিলেন ও তাহার হস্তেই কন্যা যামিনীপূর্ণতিলকাকে দান করিলেন।

(৫) বিল্হন-রচিত বিল্হন কাব্যের বর্ণনা অন্য প্রকার। গুর্জর দেশে মহিলপত্তনের রাজা বীরসিংহ, তাঁহার ভার্য্যা অবন্তিরাজের কন্যা সুতারা ও ইঁহাদের কন্যা শশিলেখা বা চন্দ্রলেখা। রাজা কাশ্মীর হইতে আগত কবি বিল্হনের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার উপরে রাজকন্যাকে সাহিত্য ও কামশাস্ত্র অধ্যাপনার ভার দিলেন। উভয় শাস্ত্রেই রাজকন্যা পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। কিন্তু কামশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে যাইয়া আর গুরু ও শিষ্যার ব্যবধান রহিল না। কবি গান্ধর্ব-বিধি অনুসারে শশিলেখার পাণিগ্রহণ করিলেন। কবি বলিয়াছেন—

'কামী যুতা স্মরকলাকুশলা চ বালা'

অতএব

'দৈবাত্তয়োরঘটিতং ঘটিতং বভূব।'

ক্রমে রাজা জানিতে পারিলেন যে, কবি তাহার কন্যাকে উপভোগ করিতেছেন। কবি বন্দী হইলেন, কিন্তু তাহার কোন দুর্ভাবনা নাই,

নির্বাসনং স্বনগরাৎ খরপৃষ্ঠযানং
নাশং করস্য বধবন্ধনকং সমস্তম্।'

নগর হইতে নির্বাসন, গর্দভের পৃষ্ঠে আরোপণ, করচ্ছেদ, বন্ধন বা বধ সমস্তই তিনি প্রিয়ার জন্য সহিতে পারেন।

ভবৎকৃতে চাঞ্চনমঞ্জুলাক্ষি
শিরো মদীয়ং যদি যাতি জাতু।
নীতানি নাশং জনকাত্মজায়ৈ
দশাননেনাপি দশাননানি॥

অর্থাৎ—সীতার জন্য যখন রাবণ দশ-দশটা মাথা দিয়াছেন তখন প্রিয়ার জন্য একটা মাথা না হয় গেলই। শ্মশানে ঘাতকেরা কবিকে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিতে বলিলে কবি শ্লোকের পর শ্লোকে রাজকন্যার উপভোগের স্মৃতি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। এদিকে শশিলেখা শিরশ্ছেদের জন্য কবিকে শ্মশানে লইয়া গিয়াছে শুনিয়া সপ্ততল প্রাসাদের উপর আরোহণ করিয়া সেই স্থান হইতে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজকন্যার সখীরা মহিষী সুতারাকে এই সংবাদ দিলে মহিষীও যাহাতে কন্যাকে বাঁচান যায় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী ও অন্যান্য বন্ধুরাও রাজাকে বুঝাইলেন যে কবিকে হত্যা করিলে ব্রাহ্মণবধ ও নারীবধ উভয় পাতকই হইবে, রাজকন্যার জন্য কবি অপেক্ষা গুণবান্ পাত্রও পাওয়া যাইবে না, সুতরাং এ ক্ষেত্রে কবির হস্তে শশিলেখাকে প্রদান করাই ভাল। মহিষী, মন্ত্রী ও বন্ধুদের উপদেশে অবশেষে বহু সম্পদের সহিত রাজা শশিকলাকে বিল্হনের হস্তে অর্পণ করিলেন।

এই সমস্ত উপাখ্যান হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বিদ্যা-সুন্দর কাব্যের দুইটি ধারা। যেগুলি অর্থকথায় বর্ণিত বৎসরাজ ও বাসবদত্তার উপাখ্যানের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, সেইগুলিতে মিলনের পূর্ব্বে নায়ক ও নায়িকার মধ্যে একটা যবনিকা ও উভয়ের সম্বন্ধে উভয়ের ভ্রান্ত ধারণা দেখিতে পাই, যেগুলি বৃহৎকথায় বর্ণিত বৎসরাজ ও বাসবদত্তার উপাখ্যান অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে সে স্থানে কোন যবনিকা বা ভ্রান্ত ধারণা নাই। রাজশেখর সুরির প্রবন্ধ-কোষে মদনকীর্ত্তি ও মদনমঞ্জরীর উপাখ্যানের উপর এরিয়েল

প্রকাশিত বিল্হন-চরিতের ও বিল্হন-রচিত বিল্হন কাব্যের স্পষ্ট প্রভাব আছে। বিল্হন-রচিত কাব্যের উপরও অমরুকশতকের প্রভাব স্পষ্ট। এই সকল উপাখ্যানের মধ্যে যদি কোনটিতে প্রকৃত ঘটনার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে তবে বিল্হন-রচিত বিল্হন কাব্য সম্বন্ধেই তাঁহা বক্তব্য, লোকপ্রসিদ্ধিও সেইরূপ। বিল্হন বিক্রমাঙ্কদেবচরিতের রচয়িতা, এবং একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কবি। তাঁহার উপাধিও বিদ্যাপতি। বিল্হনের সময়ে মহিলপত্তন বা অনহিলপত্তনের রাজা ছিলেন কর্ণরাজ, বীরসিংহ নহেন। কাশ্মীরে বিল্হনকৃত যে চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা পাওয়া গিয়াছে,—তাহার প্রথম শ্লোকে আছে,—

সর্বস্বং গৃহবর্ত্তি কুন্তলপতিঃ গৃহ্নাতু তম্মে পুনঃ
ভাণ্ডাগারমগণ্ডমেব হৃদয়ে জাগর্ত্তি সারস্বতম্।

অর্থাৎ কুন্তলপতি, আপনার ইচ্ছা হয়তো আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন, কিন্তু আমার হৃদয়স্থিত সারস্বত নিধি আপনি হরণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে মনে হয়, কর্ণাট ও কুন্তল উভয় স্থানের অধীশ্বর চালুক্যরাজের কোপদৃষ্টিই কবির উপর পতিত হইয়াছিল। বিক্রমাঙ্কচরিতে কবি গুর্জ্জরদের যেরূপ নিন্দা করিয়াছেন তাহাতে গুর্জ্জরদের প্রতি তাঁহার দ্বেষও সুপ্রকটিত হইয়াছে। মনে হয়, কবির প্রিয়া গুর্জ্জরদেশীয়া ছিলেন না। কবিপ্রিয়া স্বয়ং বিদুষী ছিলেন, তিনি কবিকৃত গুর্জ্জর-নিন্দা সহ্য করিতেন না, অথবা প্রিয়ার অনুরোধে কবি স্বয়ংই সে কার্য্য করিতেন না। বীরসিংহ নাম ও কবিপ্রিয়ার নামও বোধ হয় কল্পিত, ইচ্ছা করিয়াই কবি হয়তো তাহা গোপন করিয়াছেন। কবিপত্নী হয়তো কর্ণাট-রাজের অথবা কর্ণাটের কোনও সামন্ত রাজার কন্যা ছিলেন। এক সময়ে কবি রাজার কোপে পড়িলেও বিবাহের পর কবি যে রাজ-পরিবারের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন ও রাজ্যে তাহার বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এমনও হইতে পারে যে, বিক্রমাঙ্কদেবের পিতা ত্রৈলোক্যমল্ল বা আহবমল্লই কবিপ্রিয়ার জনক ছিলেন। কবি পরবর্ত্তী কালে স্বীয় শ্যালক রাজাধিরাজ বিক্রমাঙ্কদেবের চরিত অবলম্বন করিয়া কাব্যরচনা করিয়াছেন।

বাংলা ভাষায় যতগুলি বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলির উপরেই সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলির অসাধারণ প্রভাব; তবে বাংলা বিদ্যাসুন্দরের একটা বৈশিষ্ট্য এই—ইহা প্রায়ই দেবীমাহাত্ম্যসূচক কোনও গল্পের অন্তর্গত। বাংলায় বিশেষ প্রচলিত চৌরপঞ্চাশিকার সহিত বিল্হন কাব্যের ও অন্যান্য চৌরপঞ্চাশিকার সাদৃশ্য অল্পই, কাব্যাংশেও বিল্হনের চৌরপঞ্চাশিকা উৎকৃষ্ট। তবে বাংলা বিদ্যাসুন্দরের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর জাতীয় কাব্যে নায়ক-নায়িকার মিলনের জন্য কোথাও দূতী বা কুটনীজাতীয় কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই, বাংলা কাব্যে সর্ব্বত্রই ইহার প্রয়োজন হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যে নায়ক-নায়িকা এক বাড়ীতেই বাস করেন, তাহাদের মধ্যে যবনিকার ব্যবধান মাত্র, কোথাও আবার সে ব্যবধানও নাই, বাংলা কাব্যে সুড়ঙ্গপথ অবশ্যই চাই। সংস্কৃত কাব্যে কোনও দেবতা নায়ককে রক্ষা করিবার জন্য পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নাই, বাংলা কাব্যে সর্ব্বত্রই দেবতার প্রভাব। সংস্কৃত কাব্যে নায়ক বেপরোয়া, তাহাকে ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতে বলিলে প্রিয়ার মূর্ত্তি ধ্যান করে, শিরশ্ছেদের ভয় দেখাইলে বলে 'রাবণ সীতার জন্য দশটি মাথা দিয়াছেন, আমি না হয় প্রিয়ার জন্য একটি মাত্র মস্তক দানই করিলাম।' বাংলা কাব্যে যত বিপদ ঘনাইয়া আসুক না কেন, নায়কের ভরসা আছে যে দেবতা তাহাকে রক্ষা করিবেন। বাংলা কাব্যে নায়ক-নায়িকার পরেই দূতী বা কুটনীর স্থান। ভারতচন্দ্রের হীরা বাংলার রসিকদের অনেক ফুল যোগাইয়াছে, এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কয়েক স্থানে ভারতচন্দ্রের উপর একটু ঝাল ঝাড়িয়াছেন, এ যেন মনে মনে ভূতের ভয় থাকিলে জোর করিয়া "ভূত নাই, ভূত নাই" বলার মত; তাহার বিষবৃক্ষেও যুগোপযোগী পরিবেশের মধ্যে হীরা আসিয়া দেখা দিয়াছে; বিমলা দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমার জননী হইলেও কবি তাহাকে দিয়াও খানিকটা হীরার কাজ করাইয়া লইয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দর নামটি কোথা হইতে আসিল বলা কঠিন। বাংলা দেশে "বিদ্যাসুন্দরচরিতম্" অথবা "সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরম্" নামে পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে অবশ্য নায়ক-নায়িকার নাম বিদ্যা ও সুন্দর, কিন্তু "সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরম্" নাম শুনিলেই মনে হয় সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায়ও যে বিদ্যাসুন্দর আছে কবি তাহা জানিতেন, তিনি সংস্কৃতের বিশেষ ভক্ত বলিয়াই সংস্কৃতে বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যাংশেও উৎকৃষ্ট নহে। মনে হয়, বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কোনও পণ্ডিত এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের কবি সম্ভবতঃ বাঙ্গালী বৈষ্ণব। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নায়ক সুন্দর দেবীভক্ত শাক্ত হইলেও কবি—

"কালিন্দীতটসন্নিধাবুপবনে গোপাঙ্গনালিঙ্গন-
ক্রীড়াকর্ষণচুম্বনাদিরসিতঃ সংমূর্চ্ছিতো বেণুনা।"

শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। বিল্হনকে তাহার পৃষ্ঠপোষক রাজা 'বিদ্যাপতি' উপাধি দিয়াছিলেন। বিল্হন-চরিত বিদ্যাসুন্দরের মূল হইলে পরবর্ত্তী কবিরা কাব্যের নায়িকার নাম বিদ্যা করিয়া থাকিবেন। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র, কেন না এই ভাবে বিদ্যাপতি হইতে বিদ্যা নামটি বাছিয়া লইলেও সুন্দর নামের অনুরূপ কোন কারণ পাওয়া যায় না। কেহ মনে করেন, কাব্যের নায়ক মহাশাক্ত ও পরম ভক্ত, তাহার প্রিয়া বিদ্যা অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত পরাবিদ্যা। এ কল্পনাও কষ্টকল্পনা, কেন না, সংস্কৃত কোন কাব্যে আধ্যাত্মিকতার গন্ধও নাই। তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্র বঙ্গদেশেই বিদ্যা দেবীর ভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রামপ্রসাদ তো তাঁহাকে দিয়া শব-সাধনাও করাইয়া লইয়াছেন। সুন্দর শ্মশানে গিয়া যে শ্লোকগুলি বলিয়াছে, তাহা চোরপঞ্চাশিকা বা যাহাই হউক, একমাত্র বঙ্গদেশেই তাহার নায়িকাপক্ষে ও দেবীপক্ষে ব্যাখ্যা অতিশয় কষ্টকল্পিত। সংস্কৃত কাব্যে দেবতার প্রসঙ্গও নাই, দেবীপক্ষে ব্যাখ্যার প্রয়োজনও হয় নাই। কবিরা সুন্দর নামটির এত প্রিয় কেন, তাহার একটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে, অবশ্য ইহাও অনুমান মাত্র। বিশেষজ্ঞদের মতে বর্ত্তমানে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রচলিত ইহার রচনা প্রাচীন নহে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ভাষা দেখিয়া এইরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। সম্ভোগের রসাল বর্ণনায়

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পরিপূর্ণ। বঙ্গদেশে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বিলক্ষণ প্রচলনও ছিল। এই পুরাণে—

বিদগ্ধেন বিদগ্ধায়াঃ সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ,
বিশিষ্টেন বিশিষ্টায়াঃ সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ,
সুন্দরেণ তু সুন্দর্য্যাঃ সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ,

এই পংক্তিগুলি বহু স্থানে আছে। বিদ্যাসুন্দরের কবিবা সম্ভোগ বর্ণনায় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কবিব নিকট শিশু। জানি না, বাঙ্গালায় প্রথম যিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন তাহার উপর উক্ত পংক্তিগুলিব কোন প্রভাব ছিল কি না। বিদ্যা—সুন্দরী, নায়ক সুন্দব হইবে না কেন?

বঙ্গদেশে বিল্হন-চরিতের বিলক্ষণ প্রচলন ছিল। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য মুক্তিবাদের ন্যায় গ্রন্থে পর্য্যন্ত বিল্হন-চরিতের শ্লোক উদ্ধৃত কবিয়াছেন। "ভবৎকৃতে চাঞ্জন-মঞ্জুলাক্ষি"—ইত্যাদি যে শ্লোকটি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, মুক্তিবাদের কোন কোন গ্রন্থে তাহার পাঠ এইরূপ—

যুষ্মৎকৃতে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি
শিরো মদীয়ং যদি যাতি জাতু।
লূনানি নূনং জনকাত্মজার্থে
দশাননেনাপি দশাননানি।

বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের উপর বিল্হন-চরিত প্রভৃতির যথেষ্ট প্রভাব। সম্প্রতি বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলির একটি সঙ্কলন প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-রসিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শিশুশিক্ষায় হস্তলিপি

শ্রীশিবনাথ বাগচী

হস্তলিপি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া একটি বিশেষ গুণ। রন্ধন উত্তম হইলে যেমন সাধারণ শাক-তরকারিই রুচিকব হয়, হস্তাক্ষরও সুন্দর হইলে তেমনি লিখিত বিষয় প্রথমেই আকর্ষণের সৃষ্টি করে। এই আকর্ষণের কারণ যে মুখ্য ভাবেই হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য্য তাহা নহে। উহার প্রধানতম কারণ, ঐরূপ হস্তাক্ষর অভ্যাস কবিতে যে যত্ন, যে অধ্যবসায়, যে স্থিব ও নিবিষ্টচিত্ততার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা। কুৎসিত হস্তলিপি যে লেখকের অযত্ন, ব্যস্ত ও অস্থির-চিত্তের পরিচায়ক, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি?

অনেকে বলিবেন—হস্তলিপি কদর্য্য এরূপ বহুসংখ্যক ব্যক্তি বিদ্বান হইতে পারিয়াছেন। শিক্ষাব ইতিহাসে উহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার সুদৃশ্য হস্তাক্ষরবিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্বান নহেন, এরূপ উদাহরণও বিরল নহে। আমরা বলি, তাহা দিয়া আমাদেব কাজ কি? হস্তলিপি সুন্দর না হওয়া শিক্ষায়—বিশেষরূপে প্রাথমিক শিক্ষায়—ত্রুটি বুঝায়। কুৎসিত দুর্বোধ হস্তলিপি ছাত্র-ছাত্রীর গুণের পরিচায়ক নহে, উহাতে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক অনুপযুক্ততার ইতিহাসই পাওয়া যায়। হস্তলিপি শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ এবং ঐ অঙ্গের যত্ন না করিলে, অতি সামান্য হইলেও, শিক্ষায় যে ত্রুটি রহিয়া যায়, উহা ত্রুটিই। উহাকে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না, করিলেও সেই যুক্তির সহিত শিক্ষার পরিপূর্ণ আদর্শের কোন সামঞ্জস্য নাই।

এখানে এই ত্রুটির উৎস কোথায় এবং কি প্রকারেই বা উহার সংশোধন সম্ভব—এই প্রশ্ন সকল চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতীই করিবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা এবং অবহেলা করিতে করিতে যে সকল অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য আমাদের কথায় রাগান্বিত হইতে পারেন; কিন্তু সেই ভয়ে শিক্ষা কখনই আদর্শচ্যুত হইতে পারে কি?

প্রত্যেক প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর হস্তাক্ষর জঘন্য অভ্যাসের পরিচয় বহন করে। শতকরা ৪০ জনের হস্তলিপি ত একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। ইহার উপরে অপরিচ্ছন্নতা, বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতিতে লিখিত বিষয় যেন কিম্ভূত-কিমাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। উহার প্রতি চাহিলেই ঘৃণা বা ক্রোধের উদ্রেক হয় ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক অযত্ন এবং অবহেলার কথা চিন্তা করিয়া। অবশ্য ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীরা হস্তলিপির অভ্যাস বেশি করিয়া থাকে এবং যে সকল ছাত্রীর হস্তাক্ষর কুৎসিত তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। তবু এই সংখ্যাও আদৌ অবহেলা করিবাব মত নহে।

হস্তাক্ষর বিকৃতির কয়েকটি হেতু দীর্ঘ অভিজ্ঞতাব ফলে আবিষ্কার কবা গিয়াছে। উহাই এখানে নিবেদন করিব এবং আশা করি, উহার অন্যান্য কারণ থাকিলেও, প্রধানরূপে ঐগুলির সংশোধনের চেষ্টা করিলেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর বিশেষ উপকার হইবে এবং শিক্ষার একটি অতি-অবহেলিত অঙ্গ পরিপুষ্টি লাভ কবিবে।

এই মন্তব্য পাঠে অনেক অভিভাবক বলিবেন—আমাদের ধন-ঐশ্বর্য্য আছে, আমাদের পুত্র-কন্যা আফিসের 'কলম-পেশা কেবাণী' বা হিসাব-রক্ষকের পদে কাজ করিবে না। তাহাদেব মহাজনী খাতা লিখিতে হইবে না যে, তাহাদের হস্তাক্ষর-শিক্ষা বিষয়ে এত চেষ্টা-যত্ন করিয়া সময়ক্ষেপ করিতে হইবে। কিন্তু এই কথায় শিক্ষক তাঁহার আদর্শচ্যুত হইলে বা নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। তাঁহাকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, অসম্পূর্ণ শিক্ষাকে প্রশ্রয় দেওয়া, আর শিক্ষা বিষয়ে অজ্ঞানীব মতামতে পরিচালিত হওয়া বা ঐ অবৈজ্ঞানিক মতামতের উপর শিক্ষাব বুনিয়াদ গড়িতে যাওয়া একইরূপে মারাত্মক। ইহার ফল অল্পাধিক সকলকেই ভুগিতে হয়। একটি সামান্য উদাহরণই এখানে দিই:

হস্তাক্ষর বুঝিতে না পারিলে পরীক্ষক ধনীব পুত্র-কন্যাকে খাতির করেন বলিয়া জানা যায় নাই, দরিদ্রেরও এই কারণে রেহাই হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় না। শিক্ষায় ধনি-দরিদ্র ভেদাভেদ নাই, শিক্ষার আদর্শ ধনী এবং দরিদ্রের জন্য যাঁহারা পৃথক্ করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই শিক্ষাকে অবনত করিয়াছেন।

প্রকৃত শিক্ষক এই মতের সমর্থক নহেন। তিনি মনে করেন না যে শিক্ষা-ক্ষেত্রে জাতি-কুলের কোন পার্থক্য আছে।

দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের, তথা জীবনের পরীক্ষায় প্রতি বৎসর যে কত ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য্য হইতেছে, তাহার হিসাব আমরা কত জন রাখি? হস্তাক্ষর দুর্বোধ্য হওয়ায় জীবনক্ষেত্রে যে কত অপযশ, কত অকৃতকার্য্যতা আসে, তাহার শতকরা হিসাব আমরা কত জন রাখিয়া থাকি? পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় যাহা পাওয়া যায়, তাহাই বা খোঁজ করিয়া আমরা কয় জন পাঠ করি?

হস্তাক্ষরের ত্রুটিকে আমরা 'প্রাথমিক বিদ্যাভ্যাস ত্রুটি' আখ্যা দিতে পারি। প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিশুগণ প্রথম হস্তলিপির অভ্যাস করিয়া থাকে, সুতরাং এই বিষয়ে শিশুর প্রাথমিক কু-অভ্যাসের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাই দায়ী। অনেক অভিভাবক হয়ত মনে করিবেন, প্রাথমিক বিদ্যালয় এই জন্য দায়ী হইলে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু নিষ্কৃতি পাইবার কথা এখানে নাই। প্রাথমিক শিক্ষালয় বলিতে শিশুর গৃহকেই প্রথম বুঝায় এবং প্রাথমিক শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী বলিতেও মাতা-পিতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগকেই প্রধানরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষার পরিধির মধ্যে শিশুর গৃহশিক্ষাকেই মুখ্যরূপে গণ্য করিতে হইবে। সর্ব্ববিষয়ে শিশুর 'হাতে খড়ি' গৃহেই হইয়া থাকে, উহার যাবতীয় দোষ-গুণের ভিত্তিও গৃহেই স্থাপিত হয়। সর্ব্বপ্রথম হস্তলিপির অভ্যাসও শিশু গৃহেই করিয়া থাকে।

এক্ষণে অনুকরণপ্রিয় শিশু গৃহে যাহাদের হস্তলিপি দেখিয়া লিপির অভ্যাস করিবে, তাঁহাদের হস্তলিপিই শিশুর আদর্শ। এই আদর্শ নিকৃষ্ট হইলে শিশু উহার অনুশীলনে কখনই উৎকৃষ্ট হস্তাক্ষর লাভ করিতে পারে না, এবং নিকৃষ্টের অভ্যাস একবার শৈশবে আরম্ভ হইলে সারা জীবনেও উহার সংশোধন দুঃসাধ্য।

সুতরাং প্রারম্ভেই শিশুকে সুন্দর আদর্শ হস্তলিপির অনুশীলন করিবার সুযোগ দিতে হইবে। এই অনুকরণ-কার্য্যে প্রাথমিক অবস্থায় তাড়াহুড়ায় সুফল লাভের আশা আদৌ থাকে না। আদর্শানুসারে ধীরে ধীরে শিশুকে হস্তাক্ষর লিখিতে অভ্যাস করাইতে হইবে। হস্তলিপির দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিতে হইবে। এ বিষয়ে 'এতগুলি লিখা প্রত্যহ প্রস্তুত করিতেই হইবে'—এই নীতি একেবারেই তাৎপর্য্যহীন। বিশেষ করিয়া অপরিপক্ক অবস্থায় শিক্ষকের প্রহারের ভয়ে শিশু তাড়াহুড়ায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেও, তাঁহার উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যাইবে। গুণানুসারেই লিখার বিচার করিতে হইবে, সংখ্যানুসারে নহে।

প্রাথমিক অবস্থায় শিশুকে হস্তলিখন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে বলাও বিপজ্জনক, পুস্তক বা হস্তলিপি দেখিয়া নিজে নিজে লিখিতে বলাও মারাত্মক। ইহাতে সে স্বকপোল কল্পিত প্রণালীতে লিখিয়া যাইবে, এবং ক্রমে ভুল শিখিয়া অভ্যাস করিবে, যাহা হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি পাওয়ান দুই-চারি বৎসর এইরূপ চলিবার পরে সুকঠিন।

হয়ত অনেকে বলিবেন—আপনার থিসিস অনুসারে শিশুকে হস্তাক্ষর শিখাইতে হইলে সে সারা জীবন ধরিয়া উহাই করিবে, অন্য কিছু শিখিবে না। এইখানে বক্তব্য এই যে, 'যে-কোন প্রকারে আঁচড় কাটিতে পারিলেই হইল'—এইরূপ মনোভাব লইয়া শিশুকে হস্তাক্ষর শিখাইতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হইলে, আমরা ঘাট স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু শিক্ষার প্রতি পদে যাঁহারা শিল্পীর ও সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া চলিতে চাহেন, আমাদের বক্তব্য তাঁহাদেরই জন্য—অপরের জন্য নহে। অবহেলায় কোন কিছুই উত্তমরূপেই শিক্ষা করা যায় না, আর শৈশবে অভ্যাসের ত্রুটি থাকিলে উহা সারা জীবনই পীড়াদায়ক হইয়া থাকে।

ভারত রাষ্ট্রের উদারতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হেন রাষ্ট্রের মিলিবে তুলনা কি?
আরংজীবের কবর হইল জাতির সম্পত্তি!
সম্রাট তবু ক্ষুদ্র যাঁহার মন
শুধু হিন্দুর করেছে নির্য্যাতন
ভাঙ্গি মন্দির করিয়াছে কুৎসিত।
ধ্বংস করেছে সাম্রাজ্যের ভিত।
তাঁহার কবর তাহারো কবর আজ
রক্ষা করাই হল ভারতের কাজ।
যত সুসভ্য হউক বৃটিশ জাতি
উদার বলিয়া নাহিক তেমন খ্যাতি।
'ক্রমওয়েলে'র কঙ্কাল বা'র করি
ফাঁসিতে টাঙালো শুনিয়া হাসিয়া মরি।
দেখুক তাহারা মোদের আদর্শ
পুণ্য ধন্য এ ভারতবর্ষ।

পেট্রোলিয়াম

শ্রীশিশিরকুমার কর

খনিজ সম্পদের দিক্ থেকে আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনের তাগিদে এবং তাদের বিভিন্ন ব্যবসায়ে কাঁচা মাল সরবরাহের প্রয়োজনে ইংরেজের প্রচেষ্টায় গত ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী এ দেশে ভূতত্ত্ব বিভাগ স্থাপিত হয়। সেই অবধি এই বিভাগের বহুমুখী প্রচেষ্টা অল্প-বিস্তর চলে আসছে। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের পক্ষে সেটা সত্যই নাম মাত্র। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ভারত সরকার অবশ্য এদিকে যথেষ্ট নজর দিয়েছেন, তাই এদিকে কাজও বেশ কিছু হচ্ছে। অন্যান্য খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট ভাগ্যবান হলেও পেট্রোলিয়ামের দিক থেকে আমরা অত্যন্ত পরমুখাপেক্ষী।

গত ১৯৪৪ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর এ দেশে মোট ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার পেট্রোলিয়াম নিষ্কাশিত হয়েছে। ঐ সময়ে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে, আসামের ডিগবয় খনি অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম্ নিষ্কাশনের কাজ চলেছিল "আসাম অয়েল্ কোম্পানী"র দ্বারা। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের আটক্ পুলের নিকটে জয়মীর, খাউড় এবং ধুলিয়ান্ নামক ছোট তিনটি খনির কাজ চল্‌ছিল "আটক্ অয়েল্ কোম্পানী"র দ্বারা। ভারত বিভাগের ফলে এই ছোট তিনটি খনি পাকিস্থানের ভাগে পড়েছে।

অবিভক্ত ভারতের মোট পেট্রোল উৎপাদন ছিল সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের ১০০ ভাগের এক ভাগের চেয়েও অনেক কম। আর বর্ত্তমান ভারতের ডিগবয় খনি অঞ্চল থেকে যে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে দেশের প্রয়োজনের ১০০ ভাগের ৫ ভাগ মাত্র। বাকি ৯৫ ভাগ বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। তার মধ্যে একমাত্র ইরাণ থেকেই আসে ৭৪ ভাগ; বাকি ২৪ ভাগ অন্যান্য দেশ থেকে আসে। এই আমদানীর হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে গত ১৯৪৯ সালে এসেছে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ গ্যালন

" ১৯৫০ " " ১৯ " ৩৫ " "

১৯৫১ সালে আনার চেষ্টা চলছে ২৩ " ৭০ " "

তার মধ্যে এসেছে জানুয়ারী মাসে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ গ্যালন।

ফেব্রুয়ারী " ৭৫ " "

এ ত গেল উচ্চ শ্রেণীর পেট্রোল (যা হাওয়াই জাহাজে ব্যবহার করা হয়) এবং সাধারণ পেট্রোল (যা মটর গাড়ী এবং পেট্রোল-ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়, এর অন্য নাম "মটর স্পিরিট্" বা "গ্যাসোলীন") তার হিসাব। এ ছাড়াও পেট্রোলিয়াম্ জাত অনেক জিনিষ, যেমন—কেরোসিন্, প্যারাফিন্ (যা দিয়ে মোমবাতি তৈরী হয়), বিভিন্ন জাতীয় লুব্রিকেটিং অয়েল, গ্রীজ, ক্রুড্ অয়েল, বিটুমেন্, অ্যাস্‌ফাল্ট, নেপথলিন্, ষ্টাইরিন প্রভৃতি বহু জিনিষ পেট্রোলিয়াম্‌কে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রণালীতে পরিশুদ্ধ করে পাওয়া যায়। এই পরিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। সামান্য আভাষ দিতে গেলে বল্‌তে হয় যে, বিভিন্ন পরিমাণের উত্তাপে এবং বিভিন্ন চাপে এর কিছুটা অংশ গ্যাসে পরিণত করা হয়। সেই গ্যাসকে তরল, কঠিন অথবা জেলীর মত অবস্থায় পরিণত করে কোন কোন জিনিষ তৈরী হয়; আবার কোন কোন জিনিষ অবশিষ্টাংশ থেকে তৈরী হয়। এ সবের জন্যও কম টাকা বিদেশে চলে যায় না।

যে অবস্থায় আমরা খনিজ পেট্রোলিয়াম্‌কে নল-কূপের মধ্যে দিয়ে উপরে তুলে এনে থাকি সেটা হচ্ছে কতকগুলি কঠিন, তরল এবং বায়বীয় অবস্থার বিবিধ হাইড্রো-কার্বন জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণ মাত্র। বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগে এগুলিকে বলা হয় "প্যারাফিন্" জাতীয় $(cn\ H2r + 2)$। তা ছাড়াও এতে অন্যান্য বহু রকমের খনিজ রাসায়নিক পদার্থ অল্পাধিক পরিমাণে মিশে থাকে। তাই বিভিন্ন তৈল-উৎপাদন কেন্দ্রের ক্রুড্ অয়েলের মধ্যে পদার্থের, গুণের এবং দোষের বিভিন্নতা দেখা যায়।

গাছ-পালা, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যে সমস্ত জৈব পদার্থ কোন কারণে মাটি চাপা পড়ে কালক্রমে ভূগর্ভস্থ উত্তাপ এবং ভূপৃষ্ঠের চাপের ফলে পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হয়, তাদের কিছুটা অংশ কয়লার মধ্যে প্রস্তরীভূত অবস্থায় (ফসীল) পাওয়া যায়। তা থেকে বেশ জান্‌তে পারা যায়, কোন্ জিনিষটা কয়লায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু পেট্রোলিয়ামের মধ্যে তেমন কোন চিহ্ন পাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া তরল পদার্থ মাত্রই যেমন স্বভাবতঃ আপন যায়গা থেকে সরে যেয়ে নিম্নতম যায়গায় সঞ্চিত হয়, তেমনি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের ফলে যেখানে পেট্রোলিয়াম্ জন্মাচ্ছে সেখান থেকে অন্যত্র সরে যেয়ে সুবিধা মত যায়গায় সঞ্চিত হয়। তাই কোথায়, কোন্ জিনিষ থেকে, কি অবস্থায় পেট্রোলিয়াম্ জন্মাচ্ছে, সেটা অনুমানের জগতেই রয়ে গেছে।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অজৈব মতবাদ প্রচলিত ছিল। তখন বৈজ্ঞানিকগণ মনে করতেন —ভূগর্ভস্থ জল পাথরের ফাটলের মধ্য দিয়ে চুইয়ে নিচে যাওয়ার সময় ভূগর্ভস্থ অত্যধিক গরমে বাষ্পে পরিণত হয়। সেই উত্তপ্ত বাষ্প কার্বাইড্, অব আয়রণ এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য ধাতব পদার্থের সহিত রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে পেট্রোলিয়ামের অর্থাৎ প্যারাফিন জাতীয় হাইড্রো-কার্বনের সৃষ্টি হয়। আজ-কালকার দিনে অবশ্য এই মতবাদের উপরে বৈজ্ঞানিকগণের আদৌ কোন আস্থা দেখা যায় না।

আজ-কাল বৈজ্ঞানিকগণ পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জৈব মতবাদে আস্থাবান্। এখনও অবশ্য ঠিক কোন জীব বা কোন উদ্ভিদ থেকে খনিজ পেট্রোললিয়াম জন্মাচ্ছে তা নিশ্চিত ভাবে জানা যায়নি। ক্ষুদ্রতম এককোষবিশিষ্ট জীব—যারা অম্লজান ছাড়াও স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারে, আর তেমনি ক্ষুদ্রতম এককোষবিশিষ্ট উদ্ভিদই হচ্ছে পেট্রোলিয়ামের স্রষ্টা। অবশ্য এদের কাউকে অণুবীক্ষণ ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না। দু'-এক জন বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক মাছের পরিত্যক্ত অংশ থেকে তাঁদের পরীক্ষাগারে বসে পেট্রোলিয়াম্ তৈরী করতে পেরেছেন। তা থেকে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সামুদ্রিক বড় বড় জীব এবং বড় বড় মাছ থেকেও পেট্রোলিয়াম্ তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের ধারণা যে, পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্রতম এককোসবিশিষ্ট জীব ও

উদ্ভিদ থেকেই এ কাজ হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশে এই সব জৈব পদার্থের বিরাট সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে তারা পচে গলে যাওয়ার আগে মাটি চাপা পড়লে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে তারা পেট্রোলিয়ামে পরিণত হয়। পাহাড়, পর্ব্বত, এবং উঁচু যায়গা যেখানে সমুদ্র-তলের অবস্থা বর্ত্তমান, অর্থাৎ যে সব যায়গা এক দিন সমুদ্রের নিচে ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে কালক্রমে উঁচু হয়ে উঠেছে—সেইরূপ বহু যায়গার মাটির নমুনা পরীক্ষা করে তার মধ্যে হাইড্রো-কার্বন্ পাওয়া গেছে।

পূর্ব্বোক্ত জীবাণুগুলিকে এল্‌বুমেন্ এবং সেলুলোজ থেকে অম্লজান্ এবং যবক্ষারজানকে সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত করে তাদের তৈলাক্ত এসিডে পরিণত করতে দেখা গেছে। তা থেকে কালক্রমে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে অজৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক।

পেট্রোলিয়ামের খনি অনুসন্ধান করে বের করা অত্যন্ত জটিল এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যাঁরা এই ব্যাপারের ভিতরে অন্ততঃ কিছুটা প্রবেশ না করেছেন তাঁদের এর সমগ্র জটিলতা হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টসাধ্য। পেট্রোলিয়ামের খনি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপারও বটে। এই অনুসন্ধান নানা ভাবে করা হয়ে থাকে। তার প্রথম পর্য্যায় হচ্ছে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান।

প্রথমে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ভূপৃষ্ঠস্থ নানা জাতীয় পাথর, মাটি, যেমন—বিটুমিনাস্ শেল্ বা অয়েল শেল পেট্রোলিয়ামের নিকট-আত্মীয় অন্যান্য খনিজ পদার্থ প্রভৃতির উপস্থিতি, তাদের অবস্থান, গঠনভঙ্গী প্রভৃতি থেকে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক অনুমান করেন। আগে বলেছি—সমুদ্র-তলের আণবিক জীব এবং উদ্ভিদ্ থেকে পেট্রোলিয়ামের সৃষ্টি হয়। তাই যেখানে ভূপৃষ্ঠে সেই সমুদ্র-তলের অবস্থা বর্ত্তমান অথবা তার কিছুটা নিদর্শন পাওয়া যায়, তেমনি যায়গাতেই তাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ করেন। তাই আশে-পাশে আস্‌ফাল্‌ট্ ডিপজিট্, প্রস্তরীভূত লবণের অস্তিত্ব, বিটুমেন্ ডিপজেট, নিউমুলেটিক্ চুন-পাথর ইত্যাদির অস্তিত্ব এবং সামুদ্রিক জীবের প্রস্তরীভূত অস্থি (ফসীল) ভূনিম্নে পেট্রোলিয়াম থাকার চিহ্ন বলে ধরে নেওয়া হয়। এমনও দেখা গেছে, কোন যায়গায় এমন বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে, অথচ দু'-একটি নিদর্শনের অভাব ঘটেছে তেমন যায়গায় পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া যায়নি। আবার এমনও দেখা গেছে, ভূপৃষ্ঠে যেখানে প্রায় সমস্ত নিদর্শনই বর্ত্তমান, তবুও সেখানে পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া যায়নি। আবার যেখানে কোন নিদর্শনই নাই, সেখানে ভূগর্ভে পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া গেছে। এর কারণ হচ্ছে—নানাবিধ কারণে পেট্রোলিয়াম্ তার উৎপত্তি-স্থান থেকে বহু দূরে সরে যায়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে পেট্রোলিয়ামের "মাইগ্রেসন্" বলে। পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি-স্থানের উপরে প্রাকৃতিক কারণে ভূপৃষ্ঠের চাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে নিচের পাথর ক্রমশঃ জমাট বাঁধতে থাকে এবং ক্রমে ভিতরকার শূন্যস্থানগুলি (pore spaces) এবং বালুসমষ্টির অভ্যন্তর ভাগ থেকে পেট্রোলিয়াম্ এবং জল নিষ্কাশিত হয়ে পড়ে। তার পর প্রাকৃতিক যে সমস্ত কারণে তরল পদার্থ এক যায়গায় থেকে অন্য যায়গায় সরে যায়; যেমন তরল পদার্থের তলটান (surface tension) মাধ্যাকর্ষণ (gravity) এবং আশে-পাশে গ্যাসের চাপ ইত্যাদি বালির ভিতর দিয়ে যেমন করে জল বয়ে যায় তেমনি ক… পেট্রোলিয়াম্ তার উৎপত্তি-স্থান থেকে বেলে-পাথরের ভিতরকা… শূন্যস্থান আর চূণ-পাথর বা ডোলোমাইট হলে তার ফাটলের মধ্যে দিয়ে অন্য যায়গায় সরে চলে যায়।

স্থানে স্থানে এই গ্যাসের চাপ অত্যন্ত বেড়ে গেলে যে কি অবস্থা দাঁড়ায় তার একটা উদাহরণ, আশা করি, পাঠকবর্গের অপ্রীতিকর হবে না। আসামের লখিমপুর জেলায় মার্ঘেরিটা এবং লেডোর মাঝামাঝি "বড় গোলাই" নামে একটা যায়গা আছে। "আসাম রেলওয়ে এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী"র রেল-লাইন মার্ঘেরিটা ছেড়ে কিছু দূর যেয়ে ভয়ানক ভাবে বেঁকে গিয়ে লেডোতে যেয়ে শেষ হয়েছে। তার থেকেই যায়গাটার নাম হয়েছে "বড় গোলাই"। পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পেয়ে "আসাম অয়েল কোম্পানী" ঐ যায়গায় দুইটা নল-কূপ বসান (১৯২৬-২৭)। তখন লেখকের সেখানে থাকবার সুযোগ হয়েছিল। যত দূর মনে আছে, প্রথমটা ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার ফুট গেলে পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ যায়গায় পারিপার্শ্বিক গ্যাসের চাপ (static pressure) এত বেশী ছিল যে, তার ফলে পাইপের ভিতর দিয়ে ক্রুড পেট্রোলিয়াম এত বেগে বেরিয়ে আসতে থাকে যে, প্রথম কিছু দিন পর্য্যন্ত পাম্প বসানই সম্ভব হয়নি। এই কূপটার নিচেকার পেট্রোলিয়াম কয়েক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় কূপটা সাত-আট হাজার ফুট যেয়েও পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় নাই। ফলে ঐ যায়গায় কোম্পানীর বহু লক্ষ টাকা নষ্ট হয়।

আবার অনেক যায়গায় এমনও দেখা যায় যে, উপরের পাথরের ভিতরকার অতি সামান্য ফাটলের মধ্যে দিয়ে তেল উপরে উঠে আসছে। সেই সব যায়গা পেট্রোলিয়াম্-বিশেষজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। তা ছাড়া কোন কোন যায়গায় এমনি অতি সূক্ষ্ম ফাটলের মধ্য দিয়ে মিথেন্ বা মার্শ গ্যাস্ অথবা কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড গ্যাস্ অথবা হাইড্রোজেন-সালফাইড গ্যাস বেরিয়ে আসার চিহ্ন পাওয়া যায়। পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের কাংড়া জেলার জ্বালামুখী তেমনি একটি যায়গা। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মনকে এই যায়গা বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে।

পূর্ব্বোক্ত নিদর্শন অনুযায়ী যে সমস্ত যায়গায় পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া যেতে পারে বলে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা হয়, সেই সব যায়গার খুটিনাটি বিবরণ সহ বিস্তৃত মানচিত্র তৈরী করা হয়। তাহাতে জমির উচ্চতা (contour)ত দেখান হয়ই, তা ছাড়া বহু খুটিনাটি তথ্যের সঙ্গে তাহাতে বিভিন্ন স্থানের পাথর, কোন দিক থেকে কোন দিকে তাদের ফাটলগুলো চলেছে, কি ভাবে তারা নিচের দিকে নেমে গেছে (dip), সেই কোণ সমূহের মাপ (**the angle it forms to the horizontal**), ডিগ্রী, মিনিট, সেকেণ্ড—এমন কি সেকেণ্ডের শতাংশের একাংশ পর্য্যন্ত অত্যন্ত নির্ভুল ভাবে সেই মানচিত্রে দেখান হয়ে থাকে। কারণ, ঐ সমস্তে সামান্য মাত্র ভুল হলে ১১।১২° হাজার ফুট যেতে যেতে সেই পার্থক্য এত বেশী বেড়ে যায় যে, শেষটা সমস্ত পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় বৃথা হয়।

এ জন্য বিশেষজ্ঞ পেলিওণ্টোলজিষ্টগণেরও সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। পূর্ব্বে যে ক্ষুদ্রতম এককোষবিশিষ্ট জীব এবং উদ্ভিদের কথা বলা হয়েছে তারা এত ক্ষুদ্র যে, এক ঘন-ইঞ্চি যায়গায়

তাদের বহু লক্ষ একসঙ্গে দানা বেঁধে থাকতে পারে। তাদের প্রস্তরীভূত দেহ ঐ যায়গার মাটি বা পাথরের মধ্যে আছে কি না তাঁরা পরীক্ষা করে বলে দিতে পারেন।

এই অনুসন্ধানের কাজে জিওফিজিসিষ্টগণের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। মাটির নিচে পেট্রোলিয়াম্ আছে কি নাই, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে বলে দেওয়া এঁদের গণ্ডীর বাইরে। তাঁরা শুধু ভূপৃষ্ঠ পরীক্ষা করে বিভিন্ন পাথর এবং মাটির স্তরগুলির উঠা-নামা, ভাঙ্গা-চুরা, তাদের সংযোগ-বিয়োগ বন্ধন এবং অবস্থান সঠিক নির্দ্ধারণ করে দিতে পারেন। তা থেকে ভূপৃষ্ঠের বহু নিচে সেই সব মাটির এবং পাথরের স্তরগুলি কোথায় আছে এবং কি ভাবে আছে তাও সঠিক বলে দিতে পারেন। অনেক যায়গায় এমনও দেখা গেছে যে, নিচে পেট্রোলিয়াম জমা আছে, কিন্তু তার উপরে মাটি বা পাথরের একটা বা কয়েকটা নূতন স্তর এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যাতে করে নিচেকার পেট্রোলিয়ামের অবস্থিতির কোন চিহ্নই উপর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। জিওফিজিসিষ্টগণের অনুসন্ধানের ফলে সেই সব ভূগর্ভস্থ নূতন এবং পুরাতন স্তরের অস্তিত্ব এবং অবস্থান জানা যায়। ফলে, ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়ামের খবরও জানা সম্ভব হয়।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে নূতন নূতন উপায় সমূহ উদ্ভাবিত হচ্ছে। এ জন্য নল-কূপ বসানর কথা পরে বলা হবে। ঐ সব নল-কূপ কিছু দূর বসানর পর তার মধ্যে বিদ্যুৎস্রোত বইয়ে দিয়ে—নিম্নস্থ বিভিন্ন পদার্থের বিদ্যুৎস্রোত নিরোধের ক্ষমতা বিশেষ যন্ত্র সাহায্যে পরিমাপ এবং নির্দ্ধারণ করে তার রেকর্ড করা হয়। তা থেকে নিচে এবং কত নিচে মাটি, বালি বা পাথর—কি রকম পাথর এবং অন্যান্য যা কিছু আছে নিশ্চিতরূপে জানতে পারা যায়।

ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণের জন্য সম্প্রতি আমেরিকায় এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রচলিত বহুবিধ উপায়ে যেখানে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব জানতে পারা সম্ভব হয়নি, এই উপায়ে তা জানা গেছে। প্রথমে সামান্য ২।১শ' ফুট গভীর নলকূপ বসিয়ে তার ভিতর জেলিগনাইট, ডিনামাইট্ অথবা টি, এন, টি নামক বিস্ফোরকের সাহায্যে বিস্ফোরণ করা হয়। সেইস্মোগ্রাফ নামের ছোট এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর যন্ত্র সেই নলকূপের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে তাহাতে বিস্ফোরণজাত কম্পনের (shock-wave) ধারা রেকর্ড করে নেওয়া হয়। তা থেকে বিশেষজ্ঞ জিওফিজিসিষ্টগণ বহু নিচে ভূগর্ভে কোন শ্রেণীর মাটি, বালি এবং পাথর ইত্যাদি আছে তা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করে তা থেকে নির্ভুল ভূচিত্র আঁকতে পেরেছেন। তা থেকে জানতে পারা গেছে যে, নিচে বিটুমিনাস্ শেল বা অয়েল্স শেল আছে কি না; অথবা টুপির আকারের একটা মাটির পরদা আছে কি না—যার নিচে পেট্রোলিয়াম্ এসে সঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে। এই ভাবে সম্প্রতি আমেরিকার টেক্সাস্ প্রদেশে নূতন পেট্রোলিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে।

এইরূপ বহু জটিল প্রণালী ও প্রক্রিয়ায়, বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় এবং বিবিধ সূক্ষ্মতম এবং জটিলতম যন্ত্রাদির সাহায্যে ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমান করা হয়।

আগে বলেছি, পেট্রোলিয়াম যেখানে জন্মে সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে অন্য যায়গায় সরে যায়। এই ভাবে যেখানে যেয়ে সঞ্চিত হতে থাকে কার্য্যকরী হিসাবে সেইটাই হচ্ছে পেট্রোলিয়ামের খনি; এবং তারই উপরিভাগটাই হচ্ছে "অয়েল-ফিল্ড"। উপর থেকে তেমন যায়গা নির্ব্বাচন করাই হচ্ছে আসল অনুসন্ধান (Exploration)।

ভূগর্ভের গভীরতম স্তরে কোথায় পেট্রোলিয়াম্ এসে জমা হয় বিশেষজ্ঞগণ সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করেছেন। ভূগর্ভের অত্যধিক উত্তাপে তরল পদার্থ গ্যাসে পরিণত হয়; এবং গ্যাসও আরও বেশী সম্প্রসারিত হতে থাকে, অর্থাৎ তার আকার (volume) বাড়তে থাকে। এইরূপে যখন চাপের পরিমাণ ভয়ানক ভাবে বেড়ে ওঠে তখন স্থানবিশেষে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গার হয়। আবার স্থান বিশেষে উপরিস্থ মাটি এবং পাথর ইত্যাদিকে উপরের দিকে কতটা ঠেলে তুলে রেখে দেয়। ভূগর্ভে যেখানে এইরূপ গ্যাস্ সঞ্চিত হতে থাকে তার উপরে সংকোচনশীল পদার্থ যেমন নরম মাটি বা শেলের পুরু স্তর থাকলে সেটা ক্রমে জমাট এবং সংকুচিত হয়ে উপরটা পাতলা হয়ে ক্রমে একটা টুপির অথবা কোণের আকার ধারণ করে। তার উপরে বালির স্তর থাকলে সেই বালি ক্রমে ক্রমে স্থানচ্যুত হয়ে টুপির আকারে মাটির ছাদকে আরও উপরে উঠতে সুযোগ দেয়। তার উপরে একটা শক্ত পাথরের স্তর থাকলে সেই ডোমের বেশ শক্ত একটা ছাদ হয়ে দাঁড়ায়। উপরের এই ছাদের প্রতিরোধ শক্তি গ্যাসের শক্তির চেয়ে বেশী হলে অগ্ন্যুদ্গার বা ভূপৃষ্ঠের আকারের কোন পরিবর্ত্তন হয় না; তাই উপর থেকে সহজে এটা ধরাও পড়ে না। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে "মাড-ভল্‌কানো" বা মাটির আগ্নেয় গিরি বলে। রাসিয়াতে পেট্রোলিয়ামের জন্য অনুসন্ধান করতে যেয়ে এমন মাড-ভল্‌কানোর খবর পাওয়া গেছে যার মাঝখানটা গ্যাসের চাপে ২৫০ ফুট উপরে উঠে গেছে।

এই মাড-ভল্‌কানো অনেক যায়গায় সমুদ্রের নিচে থেকে জলের উপর পর্য্যন্ত ঠেলে উঠতে দেখা যায়। এ জিনিষটা মাটির বলে দু'দিনেই মাটিটা জলে গলে যেয়ে ভিতরের গ্যাস্টা বেরিয়ে যায়; ফলে সদ্যোজাত দ্বীপটাও অদৃশ্য হয়ে যায়। তাই মাঝে-মাঝে সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ জেগে উঠতে, আবার দু'-চার দিন পরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। আমাদের দেশের কাছে আরাকানের নিকটে সমুদ্রের মধ্যে মাঝে-মাঝে এ দৃশ্য দেখা যায়।

যে সমস্ত গ্যাসের চাপে এই মাড-ভল্‌কানোর সৃষ্টি হয় তারা সাধারণতঃ পেট্রোলিয়ামধর্ম্মী। তাদের নাম আগে করেছি। তাই এই মাড-ভল্‌কানোর নিচে পেট্রোলিয়াম এসে জমে থাকতে দেখা যায়। বার্ম্মাতে, আসামে, আটকে, বাকুতে, মেসোপোটেমিয়ায়, ত্রিনিদাদে অয়েল-ফিল্ডের নিচে ঠিক এই অবস্থা। ভূতত্ত্ববিদ্ মিঃ এস, কে, রায় মনে করেন, পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের কাংড়া জেলা এবং তার পার্শ্ববর্ত্তী মণ্ডি ষ্টেটের নিচেও ঠিক এই অবস্থা বিদ্যমান। পারিপার্শ্বিক অবস্থার এবং গ্যাসের চাপের ব্যতিক্রম অনুসারে এই মাডভল্‌কানো বিভিন্ন আকারের হ'য়ে থাকে।

এত জায়গা থাকতে টুপির বা কোণের আকারবিশিষ্ট মাড-ভল্‌কানোর নিচে এসে পেট্রোলিয়াম জমা হয় কেন? তার কারণ কতকটা এর জন্মস্থান থেকে সরে যাওয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। জলের চেয়ে পেট্রোলিয়াম হাল্কা বলে এবং লবণাক্ত জলের

চেয়ে আরও বেশী হাল্কা বলে জলের উপর ভেসে-ভেসে দূরে চলে যায়। আবার পারিপার্শ্বিক গ্যাসের চাপে ফাঁক পেলে পাথরের রন্ধ্র এবং ফাটলের ভিতর দিয়ে উপরে উঠে এসে নষ্ট হয়ে যায়। মাটির কণা আকারে অতি ক্ষুদ্র অর্থাৎ এক ইঞ্চির ১,৫০০ ভাগের এক ভাগ অথবা '০০১৬ এবং '০০১৭ মিলিমিটারের মাঝামাঝি আকারের বলে গ্যাসের চাপে অত্যধিক জমাট বাঁধা টুপির আকারের ছাদ ভেদ করে পেট্রোলিয়াম ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে আসতে পারে না বলে ওখানেই আটকে থাকে।

নলকূপ বসানর প্রণালী বা পদ্ধতি অথবা টেকনিক্ আলোচনার স্থান এখানে নয়। পেট্রোলিয়ামের অনুসন্ধানের দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব। যা হোক, এই ভাবে ভূতত্ত্ববিদ্গণ পেট্রোলিয়াম সম্বন্ধে যখন কতকটা নিশ্চিত পূর্ব্বাভাষ দেন, তখন সেই সব জায়গায় গভীর নলকূপ বসিয়ে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হয়। এটা ঠিক জলের জন্য ১০০ বা ২০০ ফুট গভীর নলকূপ বসানর মত সহজ বা সুলভ ব্যাপার নয়। পেট্রোলিয়ামের জন্য যে সমস্ত নলকূপ বসান হয়ে থাকে তার গভীরতা ২৫০০।৩০০০ ফুট থেকে আরম্ভ করে কয়েক মাইল পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৯৪৮ সালে আমেরিকার উয়োমিং প্রদেশে ১৭,৮৩২ ফুট গভীর নল-কূপ বসিয়েও পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়নি। ভূতত্ত্ববিদ্গণের মতে ঐ যায়গায় পেট্রোলিয়াম পেতে হলে ২০,০০০ ফুটের নিচে যেতে হবে। এরই ঠিক পরের বছর কালিফোর্ণিয়াতে ১৮,৭৩৪ ফুট গভীর নল-কূপ বসিয়েও পেট্রো-লিয়াম্ পাওয়া যায়নি। আমেরিকার কর্ম্মিগণ (Drillers) এই সব নিষ্ফল নলকূপের নাম দিয়েছে "বন-বিড়াল" (Wild Cat)। হয়ত সুচতুর বন-বিড়ালগুলিকে ধরতে চেষ্টা করলে যেমন তাদের পেছন পেছন ছুটে হয়রাণ হতে হয়, এটা বোধ হয় ঠিক তেমনি ব্যাপার বলে "বন-বিড়াল" নাম দেওয়া হয়েছে। ঐ বছর জুলাই-আগষ্ট মাসে উয়োমিংএর সাবলেট অঞ্চলে ২০,৫২১ ফুট গভীর নল-কূপ বসিয়ে পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া গেছে।

আগে বলেছি, জলের জন্য নল-কূপ বসানর মত অত সহজ ব্যাপার এ নয়। বাংলার মত মাটির দেশে একটা ১০০ ফুট গভীর নল-কূপ বসাতে ফুট-প্রতি গড়ে ৩ থেকে সাড়ে ৩ টাকার মত খরচ পড়ে। আবার পাহাড়ের দেশে একটা ৫০০।৬০০ ফুট গভীর নল-কূপ বসাতে সেই যায়গায় খরচ পড়ে গড়ে ৩০ টাকা ফুট। এটা যত গভীর হতে থাকে ততই প্রতি-ফুটে খরচ বেমানান ভাবে বেড়েই চলে।

এত বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর এবং এত বেশী অর্থব্যয় করে পেট্রোলিয়ামের জন্য যে সমস্ত নল-কূপ বসান হয়ে থাকে, হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, তাদের প্রতি ১০০টির মধ্যে ৮৮ থেকে ৯০টা ঐ "বন-বিড়ালের" দলে চলে যায়। তা সত্ত্বেও ১০টার মধ্যে যে একটাতে পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া যায় সে সমস্ত খরচ-খরচা পুষিয়ে দিয়েও অতি অল্প দিনের মধ্যে কোম্পানীকে সমৃদ্ধ করে তোলে। তা ছাড়াও এক বিন্দু তেল পাওয়ার আগেই আফিস, ষ্টোর, রিফাইনারি, ওয়ার্ক-শপ ছাড়াও বাড়ী, ঘর, হাসপাতাল, স্কুল, রাস্তা-ঘাট, বাজার, পোষ্ট আফিস, আমোদ-প্রমোদের যায়গা, জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা মিলিয়ে একটা মাঝারি ধরণের আধুনিক সহর গড়ে তুলতে হয়। এই সমগ্র ব্যাপারটাকে আর্থিক দিক থেকে লক্ষ্য করলে বেশ বুঝা যাবে যে, একটা পেট্রোলিয়ামের খনি অনুসন্ধান করে বের করে তাকে তৈল-প্রসূ করে তুলতে হলে বেশ কয়েক কোটি টাকা মূলধন এবং যথেষ্ট ঝুঁকি নেওয়ার মত আর্থিক সামর্থ্য, মনোবৃত্তি এবং মনোবল থাকা প্রয়োজন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ বিষয়ে কত দূর কি করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার আগে মণ্ডিষ্টেট্ এবং কাংড়া জেলার জ্বালামুখীতে পেট্রোলিয়াম্ পাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মণ্ডিষ্টেটে, যোগীন্দ্রনগরের বিখ্যাত জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র থেকে পূর্ব্ব দিকে মাত্র ৩।৪ মাইল দূরে লবণ-পাথরের খনি আছে। স্থানীয় লোকেরা শতাধিক বছর ধরে সেই খনি থেকে লবণ তুলে নিচ্ছে। ঐ যায়গা থেকে ৫০।৬০ মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে মোনালীতে "ওয়াশিষ্ট রিখিকা আশ্রম" অর্থাৎ বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমের নীচে উষ্ণ জলের প্রস্রবণ আছে। এই যোগীন্দ্রনগর থেকে ৫০ মাইল দূরে পশ্চিম দিকে জ্বালামুখী। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের কোন কোন যায়গায় আস্ফাল্ট ডিপজিট্ আছে, কোথায়ও বা বিটুমেন পাওয়া যায়। কোথায়ও ন্যুমুলিটিক্ চূণ পাথরও আছে। এই জ্বালামুখী আমাদের পরম পবিত্র পীঠস্থান। কথিত আছে, নারায়ণ যখন শিবের স্কন্ধস্থিত সতীর মৃতদেহ সুদর্শন চক্রে কেটে ৫১ খণ্ড করে ফেলেন তখন দেবীর জিহ্বা এখানে এসে পড়ে। ঐ যায়গায় অম্বিকা দেবীর মন্দির যাঁরা দেখেছেন তাঁদের মধ্যে ভূতত্ত্ববিদ্ কেহ থাকলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, ঐ যায়গায় ভূনিম্নে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ঐ মন্দিরের মাঝখানের চতুষ্কোণ কুণ্ডটির ৪।৫ যায়গা থেকে এবং উত্তর-পশ্চিম কুণ্ডটি থেকে অনবরত যে দাহ্য গ্যাস সবেগে বেরিয়ে আসছে, তা যে ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়াম্ থেকে উদ্ভূত এবং উপরিস্থ পাথরের ভিতরকার অতি সামান্য ফাটলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে তা'তে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

পূর্ব্বে আভাষ দিয়েছি, একটা পেট্রোলিয়ামের খনির অনুসন্ধানের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। বর্ত্তমানে ভারত সরকারের যা আর্থিক অবস্থা, তার উপরে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহে যেরূপ অপর্য্যাপ্ত অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহাতে এমন একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হাতে নেওয়া সমীচীন হবে কি না সেটা যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। তবে টাটা, বিড়লা, ওয়ালচাঁদ, ডালমিয়া, জৈন সমবেত ভাবে চেষ্টা করলে দেশের এই মূল্যবান্ সম্পদ আহরণ সম্ভব হতে পারে এবং দেশের পরমুখাপেক্ষিতা দূর হতে পারে। এদিক দিয়ে পাঞ্জাবের ধনপতি লালা শ্রীরাম, করমচাঁদ থাপর, লাধাসিং বেদীরও একটা কর্ত্তব্য আছে বলে মনে হয়।

যা হোক, এ বিষয়ে ভারত সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। ১৯৪১ সাল থেকে একটা কথা শুনা যাচ্ছিল যে, বোম্বাইয়ের বেলগাম্ জেলায় সাউন্দতি নামক যায়গায় জামদগ্নীগুড়ি মন্দিরের কাছে একটা কূয়ার জলে তেল ভাসতে দেখা গেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরের বছরই ভূতত্ত্ব বিভাগ এটা নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেন যে, কূয়াটা কোয়ার্টজাইট্ পাথরের মধ্যে খোড়া হয়েছে। সেখানে পেট্রোলিয়ামের কোন চিহ্ন বা নিদর্শনই নাই। কূ

খোঁড়ার জন্য মেশিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছিল। তা'তে যে তেল দেওয়া হয়, তা থেকেই হয়ত এ কথাটার সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৪৯ সালে এ বিষয়ে বিশেষ কোন অনুসন্ধান চালান না হলেও ১৯৫০ সালে অনেক কিছু করা হয়েছে। ঐ বছর আসামের বালিপাড়া এবং আবর পাহাড়ে অনুসন্ধান চালান হয়; কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। গোয়ালপাড়া জেলায় বিজনী-রাজের জমিদারীর মধ্যে এক জায়গায় জলের উপর তেল ভাসছে বলে খবর আসে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ সেখানে যেয়ে দেখতে পান যে, জলের উপরে যে জিনিষটা ভাসছে সেটা আয়রণ-হাইড্রো-অক্সাইড মাত্র। পেট্রোলিয়াম্ নয়।

কলিকাতার "ন্যাশনাল অয়েল মাইনিং এণ্ড রিফাইনিং সিণ্ডিকেট" আসামের খাসি ষ্টেটের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে কিছুটা জায়গা লীজ নিয়েছেন। সেখানে ১৯১০ সালে একটা নলকূপ বসান হয়েছিল। এঁরা অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকারের সাহায্য চাইলে, দুই জন ভূতত্ত্ববিদ্ সেখানে যেয়ে পাথরের ফাটল দিয়ে চুইয়ে-আসা পেট্রোলিয়াম্ এবং গ্যাসের সন্ধান পান। সেখানে উপরিস্থ পাথরের যেমন অবস্থা তা'তে বহুসংখ্যক এবং প্রত্যেকটা কয়েক হাজার ফুট গভীর নলকূপ বসানর প্রয়োজন অনুভূত হয়। আর্থিক দিক থেকে এটা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং মস্ত-বড় একটা ঝুঁকি নেওয়া বলে তাঁরা মত দেন।

বম্বে পোর্ট ট্রাষ্টের জমিতে একটা বাড়ীর জন্য ৭১৮ ফুট গভীর ভিত খুড়তে যেয়ে তেল পাওয়া যায়। কয়েক বারে ঐ জায়গা থেকে মোট এক লক্ষ গ্যালন মত তেল পাওয়া গেছে। ভূতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, ঐ যায়গা থেকে ৪০ ফুট দূরে মাটির নিচে কয়েকটা পাইপ আছে। তাদের ভিতর দিয়ে তেল স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। বম্বে ডক বিস্ফোরণের সময় ঐ পাইপগুলি ফেটে যাওয়ার ফলে ঐ ভাবে তেল জমা হচ্ছে।

কচ্ছ প্রদেশে দুইটা কুয়ার মধ্যে পেট্রোলিয়াম্ আছে বলে স্থানীয় লোকের ধারণা জন্মে। ভূতত্ত্ব বিভাগের পেট্রোলিয়াম্-বিশেষজ্ঞ সেখানে অনুসন্ধান করে দেখতে পান—যে জিনিষটাকে পেট্রোলিয়াম্ বলে লোকের ধারণা হয়েছে সেটা হচ্ছে আয়রণ-অক্সাইড।

এমনি পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলার শ্যামচুরাশি গ্রামে পেট্রোল আছে বলে লোকের ধারণা জন্মে। ভূতত্ত্ব বিভাগ ঐ গ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী ৪।৫টি গ্রামে অনুসন্ধান-কার্য্য চালিয়ে দেখেন যে, জলের উপরে তেলের মত যা ভাসছে গাছ-পালা ও শাক-সব্জীর পচন থেকে তার উৎপত্তি।

উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরীতেও এমনি অনুসন্ধান চালান হয়েছে; কিন্তু কোন সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়নি।

১২।৫।৫১ তারিখের প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার খবরে প্রকাশ যে, নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে ৬০ মাইল দূরে ওখালডোঙ্গা পাহাড়ের কাছে পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেছে। নেপালের চারিটি সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যবসায়ী সমবেত হয়ে তেল নিষ্কাশনের জন্য নেপাল সরকারের কাছ থেকে ঐ যায়গাটা ১০০ বছরের জন্য লীজ নিয়েছেন। ঐ প্রতিষ্ঠান যখন তেল নিষ্কাশন আরম্ভ করবেন তখন থেকে নেপাল সরকার শতকরা ৩ টাকা হারে রাজকর পাবেন। আপাততঃ কাজ যত দূর এগিয়েছে তা থেকে মনে হচ্ছে, ঐ যায়গা থেকে রোজ ৫০০ গ্যালন তেল পাওয়া যাবে।

ভারত সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ গত ২৬।৫।৫১ তারিখে ভারতীয় পার্লিয়ামেণ্টে বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নাগা পাহাড়ে নিম্ন শ্রেণীর পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, সেখানে নল-কূপ না বসান পর্য্যন্ত এর চেয়ে অধিক তথ্য জানা সম্ভব নয়।

আসাম এবং পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সীমান্তে পাথুরিয়া পাহাড় অঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে এখনও পাকিস্থানের সঙ্গে সীমানা নিয়ে গোলমাল চলছে। এই যায়গায় পাকিস্থানের অংশেও পেট্রোলিয়াম আছে। তাই আসাম অয়েল কোম্পানী আসাম থেকে কতকগুলো মেসিনারী পাকিস্থান অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে।

—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত

—এটা একটা অল-সিজন জামা ক'রে দিলুম। শীতের সময় পরবেন, গরমের সময় খুলে রাখবেন।

শ্রীমধুসূদনের কবি-কল্পনায় নারী

দীনা মিত্র

উনবিংশ শতকে বঙ্গভাষায় প্রথম নাট্য-সাহিত্যের জন্ম হয়। কিন্তু সেই প্রথম যুগে বাঙ্গালা নাটক তেমন সুরুচিসঙ্গত বা হৃদয়গ্রাহী ছিল না; সুতরাং তাহা তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের মার্জ্জিতরুচি বা রসপিপাসু মনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। এই সময়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় শ্রীহর্ষ-প্রণীত সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটক অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় একখানি মনোজ্ঞ নাটক রচনা করেন। এই পুস্তকখানি সর্ব্বজনের আদৃত হইয়া আশাতীত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও ধনী সমাজের বিশিষ্ট অঙ্গস্বরূপ ইংরেজ, পারসী, ইহুদী ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী—যাঁহারা কলিকাতার নাট্য-জগতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহারা এই বাঙ্গালা নাটকখানির সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। সুতরাং ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ কবি মধুসূদনের উপর এই পুস্তকখানি ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিয়া দিবার ভার দেওয়া হইল। এই রত্নাবলী নাটকখানি তর্জ্জমা করিয়া দিবার পর হইতেই মধুসূদনের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবনের পথ সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বেও তিনি ইংরেজীতে কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, কিন্তু কবিযশঃপ্রার্থীর আকাঙ্ক্ষা সফল হয় নাই। কারণ, তাঁহার রচিত **Captive Lady** এবং **V sious of the Past** কাব্য দুইখানি প্রশংসা অপেক্ষা উপেক্ষা ও তীব্র সমালোচনাই লাভ করিয়াছিল বেশী। রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদের পর হইতে মধুসূদন বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য রচনায় বিশেষ আগ্রহশীল ও অনুরাগী হইয়া উঠিলেন এবং হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎসাহ ও প্রেরণায় বঙ্গভাষায় প্রায় অনভিজ্ঞ কবি স্বল্পদিনের মধ্যেই মাতৃভাষাও আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একটা বিরাট ও বিস্ময়কর প্রতিভা লইয়া বঙ্গ-সাহিত্য-গগনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার যে ভাস্বর জ্যোতির্লেখায় বঙ্গদেশের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল আজও সেই রশ্মিজাল বাঙ্গালার সাহিত্য-জগতের একাংশ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

মধুসূদন ছিলেন বিধর্ম্মী—চিরবিদ্রোহী, তবুও বাঙ্গালা মায়েরই এক দুরন্ত অশান্ত সন্তান। বঙ্গজননীর এই বিদ্রোহী সন্তান বিদেশী সাহিত্য হইতে মূল ঘটনা, ভাব, কল্পনা, বর্ণনাভঙ্গী, ছন্দ, আদর্শ ইত্যাদি আহরণ করিয়া বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যকেই নূতন রূপসজ্জায় ভূষিত করিয়াছিলেন এবং আপন সৃষ্টির ঐশ্বর্য্য ও মহিমায় শিশুর ন্যায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন এক জন প্রকৃত দরদী কবি ও নিপুণ শিল্পী, সত্য ও সুন্দর এবং ঐশ্বর্য্যের পূজারী—সঙ্গীতের অনুরাগী। তাই স্বদেশের যাহা কিছু সুন্দর বস্তু তাঁহার কবি-মনে প্রবল ভাবে সাড়া জাগাইয়াছিল তাহা লইয়াই আত্মহারা কবি স্বদেশী ও বিদেশীয় সুরে কাব্যলক্ষ্মীর বন্দনা গাহিয়াছেন। কোথায় গেল ভারতের কাব্য-জগতের চিরাচরিত বিধি-নিষেধের শাসন, পদে পদে কত না বাধা;—সর্ব্ব-সংস্কারমুক্ত শক্তিমান কবি আপনার প্রাণ-প্রাচুর্য্যের দুর্দ্দম আবেগে, নব উদ্বোধিত প্রতিভায়, নব নব সৃষ্টি দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার অমূল্য রত্ন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

করুণ রসের প্রতি কবির একটি সহজাত আকর্ষণ ছিল। সঙ্গীতপ্রিয় কবিহৃদয় বিষাদের সুরেই অপূর্ব্ব ভাবাবিষ্ট হইয়া উঠিত। এই বিষাদের সুর গাহিতে গিয়া কবির বিস্ময়কর সৃষ্টি যেন স্রষ্টাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ মাতৃপূজক, তাই ভারতের কবি চিরদিনই নারীর প্রশস্তি গাহিয়াছেন বিচিত্র সুরে। মধুসূদনের নৈপুণ্য ও কৃতিত্বও নারীর বিচিত্র রূপের মহিমা কীর্ত্তন করিতেই সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। তাই করুণ ও বিষাদের সুরে চারণ কবি বাঙ্গালার পুণ্য প্রেমের নির্ঝরধারা, আনন্দ ও শক্তিরূপিণী, চির ভাগ্য-বিড়ম্বিতা ক্রন্দসী নারীর জীবনগাথা অমর ছন্দে গাহিয়াছেন। নারীকে তিনি কত বিচিত্র রূপেই না তাঁহার ধ্যান-কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন!

এক দিকে নূতন সৃষ্ট ছন্দসঙ্গীতে নূতন কাব্যসৃষ্টির উত্তেজনা, প্রচণ্ড বলিষ্ঠ শক্তির ঐশ্বর্য্য ও ভাবের সমারোহ; অপর দিকে বাঙ্গালার চির নির্য্যাতিতা বেদনাময়ী নারীর মেঘাচ্ছন্ন শারদ-শশীর ন্যায় রূপের মহিমা, একাগ্র পতিপ্রেম, তেজস্বিতা ও পবিত্রতা—এই সব কিছুই তাঁহার কবি-প্রতিভাকে দুর্ব্বার বেগে নব নব সৃষ্টির পথে উৎসারিত করিয়া দিয়াছিল। সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশের যেখানে নারীর যা-কিছু বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য্য তাহার কবি-মনকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও ব্যথিত করিয়াছে তাহা তিল তিল করিয়া আহরণ করিয়া রূপকার ভাস্কর শিল্পী কবি তাঁহার মানসী কন্যাদিগকে নানা বিচিত্র রূপে রূপায়িত করিয়া অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

জীবনে স্বীয় জননীর অমূল্য প্রভাব তিনি আমরণ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। জননীর হৃদয়ে অনিচ্ছাকৃত বেদনা দিয়া তিনি জীবনে সুখীও হয়ত হইতে পারেন নাই। মাতাকে ভালবাসিয়া, শ্রদ্ধা করিয়া বাঙ্গালার মেয়েদের তিনি ভালবাসিয়াছিলেন। তাই নারী-চরিত্র অঙ্কন করিবার জন্য যে আদর্শ তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালার একান্ত নিজস্ব, বাঙ্গালী নারীর বৈশিষ্ট্য। খৃষ্টধর্ম্মী বাঙ্গালার কবি স্বদেশের অন্তর্নিহিত প্রাণের সহিত অচ্ছেদ্য স্নেহ ও শ্রদ্ধার সূত্রে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। তাই বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে শ্রেষ্ঠতম নারীর প্রতীকরূপে যাঁহারা চিরকাল আদর্শ হইয়া বিরাজ করিতেছেন তাঁহারাই ছিলেন মধুসূদনের কবি-কল্পনার আদর্শ। তাঁহার সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে আদর্শগত ও চরিত্রগত অল্প-বিস্তর

পার্থক্য থাকিলেও সামঞ্জস্যও আছে এবং তাহা শিল্পী কবির স্বহস্তের রূপচর্চ্চায় ও নিজস্ব ভাবাদর্শে অভিনব হইয়াছে।

'রত্নাবলী' নাটকের নায়িকা সর্ব্বাংশে একটি বাঙ্গালী নারী। এই নারী মধুসূদনের নব উন্মেষিত কাব্যপ্রতিভা, অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল কম নয়। 'রত্নাবলী' অতুলনীয়া রূপসী, সিংহলেশ্বরের একমাত্র দুহিতা কিন্তু নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসে ভাগ্যবঞ্চিতা। এই সহনশীলা, নিরভিমানিনী মেয়েটি তার অতুলনীয় রূপ, সরল প্রেমমুগ্ধ অন্তরের ঐশ্বর্য্য লইয়া কবির হৃদয়ে এক সুগভীর বেদনাময় মমতা ও সহানুভূতির স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাই দেখিতে পাই যে, তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা' রচনা কালে পাশ্চাত্য প্রভাব সত্ত্বেও তিনি রত্নাবলীকেই আদর্শ করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠার চরিত্রও বড় করুণ, বড় বেদনাময়, অথচ মধুর। উভয়ের চরিত্রই একটি অনাবিল স্নিগ্ধ ভাবরসে হৃদয় আপ্লুত করিয়া দেয়। উভয়েই রাজদুলালী সৌভাগ্য-গর্ব্বে গর্ব্বিতা, কিন্তু যে রাজ-অন্তঃপুরে সর্ব্বপ্রধানা মহিষীর গৌরব ও সম্মান লাভ করিবার যোগ্য, সেখানে তাঁহারা প্রথম জীবনে ভাবী সপত্নীর দাসী—তাহার হস্তে নিগৃহীতা। তবুও উভয়েই অতি প্রশান্ত মনে আপনাদের দুরদৃষ্টকে মানিয়া লইয়াছেন। রত্নাবলীকে মহিষী বাসবদত্তার আদেশে সম্রাট্ উদয়নের দৃষ্টির অন্তরালে সামান্য পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে; পরিশেষে রাজ-অন্তঃপুরের এক দুর্গম স্থানে নিগড়বদ্ধ অবস্থায় বন্দিনী হইয়াও থাকিতে হইয়াছে। এই গভীর দুঃখেও তিনি মনের স্থৈর্য্য, আশা ও বিশ্বাস হারান নাই, বাসবদত্তার শত অত্যাচারেও তাঁহার মনে কোন অভিযোগ নাই। বরং সম্রাট্ উদয়নকে একাগ্র অন্তরে ভালবাসিয়া তাঁহার প্রাসাদেই আশ্রয় লাভ করিতে পাইয়া জীবনকে ধন্য মনে করিতেছেন।

রাজদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠারও আপনার মন্দভাগ্যের জন্য কাহারও প্রতি কোন বিরূপ বা বিদ্বেষ নাই। মহিষী দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকার করিয়াও কখনো অদৃষ্টকে অপরাধী করেন নাই। উপরন্তু সখীর অসহিষ্ণুতায় তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—'সখি, তুমি বিধাতাকে অকারণ দোষী করিতেছ কেন? গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ বিসম্বাদ না হইলে ত আমার আজ এ দুর্দ্দশা হইত না।'

বাসবদত্তার মত দেবযানীও কোপনস্বভাবা, নিষ্ঠুরা, অভিমানিনী। কিন্তু মধুসূদনের দরদী দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনা-কৌশলে দেবযানীও প্রগাঢ় প্রেমময়ী, সাধ্বী—স্বামীর হৃদয় হইতে সামান্য বিচ্যুতির আশঙ্কায় ব্যাকুলা।

শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের পর মধুসূদন পদ্মাবতী নাটক রচনা করেন। পদ্মাবতীর মূল উপাখ্যানটি গ্রীক পুরাণের আদর্শে রচিত হইলেও পদ্মাবতীর চরিত্রটিও বড় মধুর ও কোমল। পদ্মাবতী সৌন্দর্য্য ও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু রাজকন্যা, রাজমহিষী হইয়াও নিয়তির পরিহাসে যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিনীর ন্যায় তাহাকেও আশ্রয়হীনা হইয়া বনে বনে ছুটিতে হইয়াছে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে পদ্মাবতীকে স্বামীর পার্শ্বে রাজরাজেশ্বরীরূপে দেখিতে পাইয়াও তাহার বেপথুমানা, ছিন্নবৃন্ত কমল-কলিকার ন্যায় বিপর্য্যস্ত রূপটি কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া যায় না।

নারীর ভাগ্যনিয়ন্তা 'অদৃষ্ট' নামক বিরাট শক্তিমান্ পুরুষের হস্তে লাঞ্ছিতা অসহায়া নারীর অশ্রুধারাসিক্ত রূপরাশিই ছিল মধুসূদনের ধ্যান-কল্পনায় সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের কৃষ্ণকুমারী ইঁহাদেরই সহোদরা। একই উপাদানে গঠিত। ভাগ্যবিড়ম্বিতা কৃষ্ণা শুনিলেন যে, পিতার ইচ্ছায় তাঁহাকে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে, কিন্তু বালিকা কৃষ্ণা—যাহার সম্মুখে ভবিষ্যতের বিপুল সুখ সম্ভাবনা—অকালে মৃত্যুর সংবাদেও তাহার মনে কোন দ্বিধা বা সংশয় নাই। খুল্লতাতকে কাতর দেখিয়া বলিতেছেন—'তা এর নিমিত্তে আপনি এত কাতর হচ্ছেন কেন? আপনি পিতাকে একবার ডেকে আনুন গে। আমি তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মত বিদায় হই…।'

ঈশ্বরে এমন জলন্ত বিশ্বাস, এমন অপার ধৈর্য্যশীলতা, অদৃষ্টকে নির্ব্বিচারে মানিয়া লইবার এমন দুশ্চর তপস্যা, গুরুজনে অটল ভক্তি, সুগভীর পাতিব্রত্য, প্রেম ও নির্ভরতা—এ বুঝি ভারতের হিন্দু মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের 'তিলোত্তমা' কবির প্রতিভার এক বিস্ময়কর নিদর্শন। সৌন্দর্য্যের পূজারী কবি তিলোত্তমাকে আপন হৃদয়ের রঙে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পুত্তলী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বিপন্ন দেবগণের শত্রু নিপাত করিবার জন্য বিশ্বের সৌন্দর্য্য ছানিয়া সে বরতনু গঠিত। সরসীর জলে আপন রূপের প্রতিবিম্ব

ফেষ্টিভাল অব ব্রিটেনে পোষাকের 'ফ্যাশন'ও প্রদর্শিত হয়। এই ক'জন মহিলা কতকগুলি পোষাক পরেছেন—যেগুলি লণ্ডনের সব চেয়ে খ্যাতিমান্ দর্জ্জির তৈরী।

দেখিয়া সে আপনিই মুগ্ধ ও বিস্মিত। যে দুরূহ কার্য্যসাধনের জন্য তাহার উদ্ভব সে বিষয়ে সে যেন সম্পূর্ণ সচেতন নয়। ক্ষণিকের জন্যে সৌন্দর্য্যের মোহজাল বিস্তার করিয়া দেবকার্য্য সাধন করিয়া সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, সূর্য্যালোকের প্রখর দীপ্তির মাঝে অবলুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের মায়াজাল নয়ন-মন হইতে আর অপসৃত হইল না।

'তিলোত্তমা' সৌন্দর্য্যের বরপুত্র কবির সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ। কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'মেঘনাদবধ কাব্যের' প্রত্যেকটি নারীচরিত্র স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে ও অনবদ্য সৌন্দর্য্যের গরিমায় অনবদ্য—অতুলনীয়। মেঘনাদবধ কাব্যের 'সীতা' রঘুকুলবধূ প্রেম ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি কিন্তু চির দুর্ভাগিনী; অশোকবনে নির্দ্দয় রাক্ষসের হস্তে বন্দিনী। লোকললামভূতা সীতা অদৃষ্টের হস্তে নির্ম্মম ভাবে লাঞ্ছিতা—কিন্তু মুখে নাই কোন অভিযোগ, কোন বাহ্যিক ব্যাকুলতার উচ্ছ্বাস! স্বামী, আত্মীয়-পরিজন, সুখ-সম্পদ হইতে বিচ্যুতা—তবুও অসীম ধৈর্য্যবলে নীরবে প্রিয়তম স্বামী বীরশ্রেষ্ঠ রঘুবংশতিলক রামচন্দ্রের আসার আশায় 'দুরন্ত চেড়ী'-বেষ্টিতা হইয়া দিন গণিতেছেন। ললাটে আয়ুষ্মতীর সিন্দুরবিন্দু, পরিধানে কাষায় বসন, মস্তকে রুক্ষ কেশ-সম্ভার এক বেণীতে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠদেশে অযত্নে বিলম্বিত, অসীম কৃচ্ছ্রসাধনায় সীতা তপস্বিনী—তবুও মহতী জ্যোতির্ম্ময়ী সে দেবীমূর্ত্তি। শত্রু-মিত্রভেদে অন্তরে স্বতঃউচ্ছ্বসিত করুণার প্রস্রবণ—কত না সুগভীর মমতা! শত্রুপুত্র মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদে সীতার চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। এই আদর্শ নারীই আজিও বাঙ্গালার তথা ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন গগন-ললাটে শুকতারার মত দেদীপ্যমানা হইয়া নারী-জীবনের চলার পথ নির্দ্দেশ করে।

রাক্ষসরাজমহিষী মেঘনাদজননী মন্দোদরী—স্নেহময়ী মাতা ও শ্বশ্রূ এবং স্বামি-পুত্রের গৌরবে মহিমান্বিতা সাম্রাজ্ঞীর আদর্শস্থানীয়া। মন্দোদরী ত্রিভুবনবিজয়ী লঙ্কেশ্বর রাবণের উপযুক্ত পত্নী। অটল মর্য্যাদাজ্ঞান তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর বিরুদ্ধে ধৈর্য্যহারা হইতে দেয় নাই। সীতার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হরণ করিয়া আনিবার মধ্যে স্বামীর মনোবৃত্তির যে হীনতম ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, তিনি কখনও সে দিক দিয়াও যান নাই। স্বামীর কৃতকার্য্যের অযথা আলোচনা বা স্বামী-নিন্দার কথা তাঁহার মনের কোণেও ঠাঁই পায় নাই। এই গাম্ভীর্য্য ও আত্মসম্মান জ্ঞান, সংযম, স্বামি-ভক্তি ও বিশ্বাস সাম্রাজ্ঞীরই উপযুক্ত। সাম্রাজ্ঞী মন্দোদরী মাতৃভক্ত, শৌর্য্যবীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি পুত্র ইন্দ্রজিতের মাতা এবং সুন্দরী, আদর্শ কুলবধূ, দানবরাজনন্দিনী প্রমীলার শ্বশ্রূ। কিন্তু পুত্রস্নেহে তাহার অমঙ্গল আশঙ্কায় মায়ের মন দুর্ব্বল হইয়া আসে, সাধারণ রমণীর ন্যায় মুখমণ্ডল বিবর্ণ—ভীতি-ভাবনায় উদ্বেল হইয়া ওঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীর পুত্রকে বিদায় দিতে পুত্রবৎসলা জননীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। হায়! রাম-লক্ষ্মণ, এমন কি বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ—সকলকেই যা তাঁর বড় ভয়! সেই পুত্রের অন্যায় যুদ্ধে নিদারুণ মৃত্যু-সংবাদে মায়ের হৃদয়ে যে প্রলয়ের ঝড় উঠিয়াছিল তাহার তরঙ্গে সেদিন রাক্ষস-সভায় কি প্রচণ্ড বিক্ষোভই না জাগিয়াছিল? শোকবিবশা রাণী মন্দোদরী সভায় আসিয়াই স্বামীর পদতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সাম্রাজ্ঞী মন্দোদরী বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদা নন, তাই সেদিন পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার উপযুক্ত ভাষা রাক্ষসরাজের ছিল না। প্রতিহিংসা-উন্মত্ত শোকদগ্ধ স্বামীর চরণে মর্ম্মবেদনা জানাইয়া রাণী অন্তরালে চলিয়া গেলেন। পুত্রবধূর সহমরণের কালেও আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদা কবির মৌলিক সৃষ্টি—তাঁহার মানসী কন্যা। চিত্রাঙ্গদা শোকাকুলা জননী, অভিমানিনী, বহুপত্নীক স্বামীর অবহেলিতা স্ত্রী। চিত্রাঙ্গদার একটি মাত্র পুত্রই ছিল সম্বল। সেই পুত্রই যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের উপযুক্ত মৃত্যু বরণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে মাতৃহৃদয়ে সান্ত্বনা কোথায়? চিত্রাঙ্গদা উন্মাদিনীর ন্যায় রাক্ষসরাজের সভায় প্রবেশ করিয়া পুত্রের জন্য গগনভেদী বিলাপ করিয়া উঠিলেন। রাজা রাবণ অনুতপ্ত, বেদনা ও অনুশোচনায় অভিভূত। কিন্তু শত শত পুত্র-পৌত্র ও পরিজনের মধ্যে একটি মাত্র পুত্রের মৃত্যুশোক পিতার হৃদয়ে তত গভীর নয়। এই জন্যই চিত্রাঙ্গদার দুঃখ ও অভিমানের অবধি নাই। কিন্তু এই যে নারী সম্মান, পদমর্য্যাদা ও স্বামীর সম্পূর্ণ আদরে বঞ্চিতা হইয়া ভীরু কপোতীর ন্যায় বিশাল রাজ-অন্তঃপুরের এক কোণে পড়িয়া আছেন, প্রবল পরাক্রম রাজ্যেশ্বর স্বামীর সম্মুখে যে স্বল্পভাষিণী পত্নীর মৃদু কণ্ঠস্বর হয়ত স্বামি-সোহাগের ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইত না—সেই কণ্ঠস্বরে আজ কোথা হইতে আসিল বজ্রনিনাদ—ভাষায় আসিল তরল গৈরিক নিঃস্রাবের অগ্নিজ্বালা! নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় একমাত্র পুত্রশোকের দহনে চিত্রাঙ্গদা বিদ্রোহিনীর ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে বলিতেছেন—এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত দেবগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত; মহারাজ দাশরথি রামচন্দ্র কি তোমার সিংহাসনের আশায় এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন? কে এই কাল-অনল সোনার লঙ্কাপুরীতে প্রজ্বালিত করিয়াছে? স্বামীর নিন্দনীয় কার্য্যের প্রতি তীব্র ইঙ্গিত করিয়া তীব্রস্বরে তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া শোকাকুলা উন্মাদিনী জননী একটি বিদ্যুল্লেখার ন্যায় অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। আর স্বামীর বিরাগভাজন হইবার ভয় নাই—দুঃখ-সুখ আজ তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। তাই অন্তরের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া অন্যায়কারী স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অভিমান জানাইয়া চিরদিনের জন্যই কাব্যের পটভূমিকা হইতে অপসৃতা হইলেন। কিন্তু তবুও তাহাকে ভোলা গেল না। কাব্যের প্রথম দৃশ্যেই রাক্ষসরাজের বিশাল সভা যে ধিক্কারে পূর্ণ করিয়া দিয়া গেলেন—অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া হাহাকারের ঝড় বহাইয়া দিয়া অন্তরে অসীম দুঃখের অগ্নিশিখা লইয়া অন্তরালে চলিয়া গেলেন—সেই অগ্নিশিখাই বুঝি রাবণের বক্ষে মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল—জীবনেও আর সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই!

মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলা কবির কল্পনা-সমৃদ্ধির অনবদ্য বিকাশ—আশ্চর্য্য ভাব-বিলাস। প্রমীলার চরিত্রে কুলবধূর কোমলতা ও সৌন্দর্য্যের সহিত বীরাঙ্গনার তেজ সম্মিলিত হইয়া অভিনব হইয়াছে। ভবিষ্যতের অগ্রদূত স্রষ্টা মধুসূদন তাঁহার মানসী কন্যাদের শুধু স্নেহ-কোমলা, পরনির্ভরশীলা গৃহের কল্যাণী বধূরূপে অন্তঃপুরের গণ্ডীতে আবদ্ধ দেখিয়াই সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত হন নাই। তাহাদের চরিত্রে বীরাঙ্গনা নারীর বীর্য্যবত্তা আরোপ করিয়া দুষ্কৃতকারীর দণ্ডবিধান করিবার জন্য তাহাদের শক্তিরূপিণী কল্পনা করিয়া অসীম আনন্দে উল্লসিত হইয়াছেন।

সেই আনন্দের উচ্ছ্বাস 'প্রমীলা'-চরিত্রকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে। যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিতা রণরঙ্গিণী প্রমীলার পরাক্রমে রাঘববীর রামচন্দ্র ভীরু কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পথ ছাড়িয়া দিতেছেন। প্রমীলার চরিত্র নিজস্ব ভাবাদর্শে চিত্রিত করিতে গিয়া কবি রামচন্দ্রকেও হেয় প্রতিপন্ন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

কিন্তু অসূর্য্যম্পশ্যা সুকুমারী নারীকে শক্তিরূপিণী বা বীরাঙ্গনা-রূপে রূপায়িত করিয়াই কবি ক্ষান্ত হন নাই। শত নির্য্যাতনেও যাহাদের যে কণ্ঠ ছিল নীরব, সেই চির-শান্ত মৌন কণ্ঠে দিয়াছেন বিদ্রোহের ভাষা। বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে প্রথম স্বামীর বিরুদ্ধে যে তীব্র তিরস্কারের সুর ধ্বনিত হইল, বীরাঙ্গনা কাব্যে জনার কণ্ঠে সেই তিরস্কারের সহিত বিদ্রোহিনীর অগ্নিজ্বালাময়ী ভাষা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বীরাঙ্গনা কাব্যখানিও স্বতন্ত্র আদর্শবাদী কবির বাঙ্গালা সাহিত্যে এক মৌলিক অবদান। এই কাব্যখানি বিদেশীয় আদর্শে রচিত হইলেও ইহা কবির বিরাট প্রতিভার কোমল ও গম্ভীর ভাবের নিদর্শন—বৈচিত্র্যময় কল্পনার অভুতপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা। নারীকে জীবনে বিভিন্ন অবস্থায় যে-যে রূপে দেখা সম্ভব, কবি আপনার ধ্যান-কল্পনায় তাহা যেন প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এক একখানি পত্রিকায় তাহাদের এক একখানি আলেখ্য রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেকখানি আলেখ্য শিল্পকৌশল ও চমৎকারিত্বে অতুলনীয়।

বীরাঙ্গনা কাব্যে বীর্য্যবত্তা বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগের বাণী শুনা যায় শুধু কৈকেয়ী ও জনার পত্রিকায়। আর অন্যান্য পত্রিকায় আছে শান্তনুপত্নী জাহ্নবী দেবীর স্বামীকে প্রত্যাখ্যান-পত্র, শকুন্তলা ইত্যাদির স্মরণার্থ পত্র, তারা উর্ব্বশী ইত্যাদির প্রেমপত্র। তবে সকলকেই বীরাঙ্গনা আখ্যা দিবার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, ইঁহারা সকলেই কেহ বা বিদ্রোহিনী, কেহ বা স্বামীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের সাহসে তেজস্বিনী—কেহ বা প্রেমাকুলা—অন্তরের কামনা ও গোপন প্রেমকে সূর্য্যালোকে প্রকাশিত করিয়া প্রেমাস্পদের নিকট প্রেমের বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছে নিঃসঙ্কোচে, ব্যাকুল প্রেম-নিবেদন করিয়াছে নিঃসংশয় হইয়া—ইঁহারা সকলেই প্রকাশের সাহসে বীর্য্যবতী। কোন দ্বিধা নাই, নিন্দা বা কলঙ্কের ভয় নাই, লজ্জাও নাই। ইহাতে ভারতীয় আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিন্তু কোথাও এতটুকু সৌন্দর্য্য ব্যাহত হয় নাই।

উনবিংশ শতকের বাঙ্গালা সাহিত্যে ও সমাজে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের ন্যায় একখানি পত্রিকা-কাব্য রচনা নিদারুণ দুঃসাহসের কাজ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সেই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয়, বিদ্রোহী মধুসূদন যেন সমস্ত কিছু ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে এক জন সংস্কারকের বেশে অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছিলেন। তবুও এ কথা সত্য যে, আজ হইতে প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে নারী-প্রগতির যে আভাষ শক্তিমান কবি মধুসূদন হৃদয়ের অদম্য সাহসের সহিত দিয়া গিয়াছেন—শত বৎসর পরে বাঙ্গালা সমাজে ও সাহিত্যে তাহা সম্পূর্ণ সত্যে পরিণত হইয়াছে। এই প্রগতি সর্ব্বক্ষেত্রেই হয়ত কল্যাণকর হয় নাই, তবুও শুভ যে আনিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যখানি প্রেমিক কবির অলৌকিক প্রেম-রসে সিক্ত হইয়া অনুপম—হৃদয়ের অম্লান, নিষ্কলুষ প্রেমের সঙ্গীত। এই কাব্যখানিতে যেন দুঃখ, হতাশা ও ব্যর্থতাময় কঠোর বাস্তব সংসার-ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে একান্ত নির্জ্জনে গিয়া কবি প্রেম ও বিরহের পুত্তলী শ্রীরাধিকার বিলাপের সহিত মিলাইয়া আপনার বাঁশীতে করুণ রাগিণীর মূর্চ্ছনা তুলিয়াছেন। ব্রজাঙ্গনার রাধা ভারতেরই একটি প্রেমিকা, অশ্রুসিক্ত-নয়না, বিরহ-ব্যাকুলা। কিন্তু মানবী রাধা কখন ধীরে ধীরে ধরণীর কামনা-কলুষ ধূলি-মাটি হইতে 'আরাধিকায়' রূপান্তরিত হইয়া অন্তরের প্রেমকে উর্দ্ধলোকেই উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন! তাই মধু-বসন্তে প্রিয়তমের সহিত মিলনের আশায় ব্যাকুলা রাধিকা সখীকে বলিতেছেন—

সখি রে—পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে
দুই কর-কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে
ভাবিয়া মনে।

'রত্নাবলী' নাটকের রত্নাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার নারীর অপরূপ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য মুগ্ধ-কবির অন্তরে রসতৃষ্ণাকে জাগরিত করিয়াছিল এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নব নব সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাই আমরা পাইয়াছি ভক্ত কবির এক একখানি অমূল্য কাব্য—যাহা নারীর নানা রূপের একান্ত স্তুতি-গানে মুখর।

অ্যাটম্ বোমার দেশে

অমিতা দত্ত-মজুমদার

৩

দক্ষিণ-পশ্চিমে

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা বিভিন্ন। বড়দিনের ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়ে এই বৈচিত্র্য দেখে মুগ্ধ হলাম। এক অঞ্চলে যখন রৌদ্রের রং জ্যোতির্হীন বিবর্ণ, অন্য অঞ্চলে সেই সময়েই উজ্জ্বল রৌদ্রবিধৌত শ্যামল প্রান্তর চোখে পড়ল।

Washington D, C. অ্যালিঘ্যানি পর্ব্বতমালার শেষ প্রান্তে অবস্থিত। বন্ধুরতার অবশেষ এখানে হয়েও হয়নি। কতকগুলো ছোট-বড় টিলার উপরে এই সহরটি গড়ে উঠেছে। অতি সুন্দর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সহর; চওড়া কংক্রীটের রাস্তা; রাস্তার দু'ধারে পত্রহীন (শীতকালে) গাছের সারি। রাস্তাগুলো সরল বটে কিন্তু সমতল নয়। এমন সুন্দর সোজা অথচ উঁচু-নীচু রাস্তা আর দেখিনি। রাত্রিতে যখন এর দু'ধারে আলোর মালা জ্বলে ওঠে তখন এই বন্ধুরতার রূপ আরো অপরূপ হয়ে ফুটে ওঠে। অবিশ্রান্ত চলমান মোটর গাড়ীগুলোর পিছনকার লাল বাতির সারিতে আরো মনোহর বোধ হয়। সহরের ধার দিয়ে পোটোম্যাক্ নদী বয়ে গেছে। পাহাড়ে নদী, দু'ধারে উঁচু পাথুরে পাড়ের মাঝখান দিয়ে সরু খাতে কতক পথ অতিক্রম করে তার পরে নদী এই সহরের উত্তরাংশেই চওড়া হয়ে গেছে, দুই অঞ্চলে নদীর দুই রূপ। ঔপনিবেশিক যুগে বহু যুদ্ধ ঘটেছে এর আশে-পাশে, এর বুকে; তাই ঐতিহাসিক মর্য্যাদা আছে এই

এগিয়ে চলতে লাগলো। ভারতীয় বন্ধু দু'টি প্রাতরাশের পর নেমে গেলেন; আমরা সারা দিন ট্রেণের কামরায় বন্ধ হয়ে থেকে বিকালে নামলাম। ট্রেণের কামরা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ বায়ুতে বসে কাটানোর পর খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা হোলো; আর পায়ের তলায় স্থিরা ধরিত্রীকে অনুভব করে স্নায়ুমণ্ডলী শান্ত হোলো, কিন্তু সব চেয়ে তৃপ্তি পেল চোখ—আকাশের উজ্জ্বল নীল রং আর বৈকালী রৌদ্রের স্বর্ণ-আভা দেখে। করাচীর সেই সন্ধ্যাটির পর এমনি আকাশ আর এমনি রোদ দেখিইনি এ পর্য্যন্ত। আরাম ও তৃপ্তিটিকে বেশ তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করছিলাম, এমন সময়ে ডাক শুনে সচেতন হলাম। দেখলাম, দলের সবাই এগিয়ে গেছেন, আমিই পিছনে। তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলাম।

নৃতাত্ত্বিক অধিবেশনে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সবাই **New Mexico University**র অতিথি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্ত বাস্ নিয়ে এক জন এসেছেন আমাদের নিতে। তাঁকে আমি সাধারণ ড্রাইভার বলেই মনে করেছিলাম। আমার ভুল ভাঙলো পরের দিন যখন অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে এঁকে সভ্যের ব্যাজ নিতে দেখলাম। যাক্, আমাদের জিনিসপত্র বাসে তোলা হলে পরে তিনি বললেন যে, আধ ঘণ্টা পরে আরেকটা ট্রেণ আসবে, তাতে আরো ডেলিগেট্দের আসবার কথা। আমরা যদি বিশেষ কষ্টবোধ না করি তবে তিনি সেই ট্রেণটাও দেখে যেতে চান, কারণ ক্যাম্পাস্ অনেক দূর। আমরা সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সময়টা কাটাবার জন্য ষ্টেশন-সংলগ্ন কফির দোকানে গিয়ে বসলাম।

এখানে আমাদের নজরে পড়লো তির্য্যক্-চোখ ও গোল-মুখে ঈষৎ-চ্যাপ্টা-নাকওয়ালা মানুষ। বুঝলাম, এরাই তারা—যাদের আমরা রেড ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত করে থাকি। নানা রকম পুঁতির মালা, বিশেষতঃ রূপার উপর টর্কোয়েজ বসানো আংটি ও মালা বিক্রীর জন্য নিয়ে এরা ঘুরছিল। ক্যাফিটেরিয়াতে দেখলাম ঝাড়-লণ্ঠনের মত করে শুকনো লঙ্কা গেঁথে ঝুলিয়ে রেখেছে—এরা খুব ঝাল খায়। ষ্টেশনেরই একটা ঘরে এদের হাতের কাজের জিনিসের একটা মিউজিয়াম আছে। আমরা সেটা দেখতে যাবার পরামর্শ করছিলাম, এমন সময়ে সেই ড্রাইভার এসে আমাদের ডাকলেন। আমরা বাসে উঠে ক্যাম্পাস্ অভিমুখে চললাম।

আমাদের দেশে যেমন পূজোর ছুটিতে সবাই প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বাড়ী যায়, এ দেশে তেমনি বড়দিনের সময়ে যায়। সকলেরই বাড়ীতে বড়দিনের সময়ে বিশেষ উৎসব হয়, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার ও উপহারের আদান-প্রদানের ধুম লেগে যায়। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা সবাই বেরিয়ে পড়ে; কেউ বাড়ী যায়, অনেকে আবার দল বেঁধে এদিক-ওদিক বেড়াতেও চলে যায়। কেউ-ই ছুটিটা বসে থেকে মাটি করে না। নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য ছোট-বড় বাড়ী এখন বড়দিনের ছুটিতে খালি রয়েছে। এই সব বাড়ীতেই **A. A. A. (American Anthropological Association)**এর গেলিগেটদের থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে। আমরা একটা বড় দোতলা বাড়ীর একতলার একখানি ঘর পেলাম। এই বাড়ীটা মেয়েদের হোষ্টেল—এ দেশে বলে **Girls' Dormitory**. আমাদের ঘরখানিতে দু'জনের জায়গা। যে মেয়ে দু'টি থাকে তারা তাদের জিনিসপত্র সবই রেখে বাড়ী গেছে। শেলফে সারি-সারি বই সাজানো। ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারে দেখলাম পোষাকও রয়েছে—সবই খোলা; তালা বন্ধ করে যাবার আবশ্যকতা কেউ বোধ করেনি। এ দেশের ধারাই এই। আমাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে নিজেদের জিনিসপত্র রেখে আমরা স্নান করে তৈরী হয়ে বসবার ঘরে এসে বসলাম। সেখানে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে, আমরা কয়েক জন বসে গল্প-সল্প করছি। ওয়াশিংটনের মত এখানেও **Central heating system**এর কাজ চলছে; তবুও যে বড় বড় কাঠের কুঁদো অগ্নিকুণ্ডে জ্বালানো হচ্ছে সেটা বৈঠকী আরামের একটা অঙ্গ। মেয়েদের **dormitory**র যিনি তত্ত্বাবধায়িকা **(House Mother)** তাঁরই উপর ভার ছিল এই অতিথি দলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করবার। তিনি এসে আলাপ-পরিচয় করে সকলের খোঁজ-খবর নিয়ে গেলেন। তার পর আমরা বেরিয়ে গিয়ে মেক্সিকান্ হোটেলে গরম গরম ও ঝাল—নানা সুস্বাদু রান্না খেয়ে রসনার তৃপ্তিসাধন করলাম।

[ক্রমশঃ।

স্মৃতিসভা

রাণী ঘটক-চৌধুরী

খ্যাতির আকর্ষণ বড় প্রবল। আমাদের বুদ্ধিপ্রধান মনটার কোথায় যেন দুর্বলতার অনাবিষ্কৃত বিরাট ছিদ্র আছে। প্রতিভার খ্যাতি যাদের ভাগ্যে জুটেছে তাদের জন্যে অকৃপণ ভক্তি সেখানে সঞ্চিত। কোন বিখ্যাত মানুষের নাম শুনলেই আমাদের সে ভক্তি বিনা দ্বিধায় উচ্ছ্বসিত হয়ে কণ্ঠে নেমে আসে, জিহ্বা সহজেই গুণকীর্ত্তনের ভাষা পায়, চমকপ্রদ শব্দাবলীরও অভাব ঘটে না। হয়ত সে অতিমানুষটির ভাবধারার সঙ্গে কদাচও পরিচয় হয়নি। তাঁকে মহৎ বলব কোন্ সূত্রে, সাধারণ মানুষের চাইতে তাঁর কাছ থেকে কতটুকু বেশি পেলুম—এ-সব প্রশ্নের সমাধান করে নেওয়াও যেন নিতান্তই অবান্তর। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিধি দিয়ে গেলেন:

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।

আমরা সহজেই সে বিধি মেনে নিলুম। পঞ্চকন্যাদের যথাসম্ভব স্মরণ করে পাপ বিনাশে সচেষ্ট হলুম। এ-ও এত সহজে সম্ভব হল মনের সেই প্রকৃতিগত দুর্বলতাটুকুর জন্যেই। সেখানকার মনের কোণে আঁচড় কাটবার পক্ষে একটি শ্লোকের বিধানই যথেষ্ট। পঞ্চকন্যাদের জেনে নিলুম পাঁচটি পুণ্যাত্মার অধিকারিণী বলে; মনটা অনুসন্ধানী হয়ে প্রশ্ন করবারও সাহস পেল না—এঁদের স্মরণ করবার বিধি কেন? প্রকৃতই এঁরা স্মরণীয় কি না এ-সমস্যা তুলে এখানে মীমাংসা করতে চাই নে। আমাদের মন যে খ্যাতিমান অথবা খ্যাতিমতীদের প্রতি দুর্বলতা পোষণে চির বিড়ম্বিত—তারই উদাহরণ দিতে গিয়ে পঞ্চকন্যাদের দাঁড় করালুম। পঞ্চকন্যাদের মহলে যদি কোন সুযোগে এই নির্বিচার উদার দৃষ্টির সংবাদ পৌঁছত তা হলে তাঁরা বিদ্রোহ প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না বলেই আমার বিশ্বাস। অহল্যার কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত ছুটে আসত "রামের পাদস্পর্শে যে পাষাণ রূপান্তরিত হয়ে আমি পৃথিবীতে এত

হয়ে উঠেছিলুম, তোমাদের অন্ধ-ভক্তি আমাকে আবার যে পাষাণেই পরিণত করেছে !"

আমার এই সবটুকু উক্তির মূল কথা এই যে, প্রতিভার খ্যাতিতে অন্ধ হয়ে আমরা নিজেরাই যে কেবল বিড়ম্বিত হই তাই নয়, প্রতিভাবানদেরও অযথা বিড়ম্বিত করি। মধুকরকে ফুলের জন্যে স্তুতিবাদ জানালে সেই স্তুতিতে ভক্তির পরিমাণ যত বেশিই থাক না কেন, তাতে তার খুশি হবার কোন কারণ নেই। প্রতিভাবানদের প্রতি ভক্তিপ্রকাশের এই ব্যভিচারের কারণ হচ্ছে পরের মুখ থেকে ঝালের স্বাদ পাবার অপচেষ্টা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা প্রতিভাবানদের জানতে চাই অন্যের দৃষ্টি দিয়ে—অন্যের উক্তির সূক্তিমালা ঘেঁটে। কারো বিধি থেকে এই যে কাউকে জানা, এ নিতান্তই অবৈধ জানা। অন্ধ যেমন করে চক্ষুষ্মানদের মুখের উক্তি শুনে দুগ্ধের বর্ণ সম্বন্ধে ধারণা করতে চায়, জানার এ পন্থাও তার চাইতে এক চুল এদিক্-ওদিক্ নয়।

২

বিশেষ বিশেষ তিথিতে ব্রত-পার্বণ আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে আমাদের দেশের মেয়েরা যেমন অভ্যস্ত, দেশের শিক্ষিত-সাধারণও অধুনা তেমনি বিশেষ বিশেষ তিথিতে খ্যাতিমানদের স্মৃতি-অনুষ্ঠান পালন করতে অভ্যস্ত হয়েছে। রীতিটা বিদেশীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তার নীতিটা যে প্রায় ক্ষেত্রেই এখনো পুরোপুরি স্বদেশীয়, তাতেই বা সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কোন প্রতিভার উদ্দেশে বুঝে-সুজে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করা এক কথা, আর অন্ধ সংস্কারবশে পাষাণ-প্রতিমার পায়ে পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন করা অন্য কথা। আমরা এখনো যেন শেষোক্ত পথ ধরেই চলেছি। সুতরাং কোন প্রতিভাবানের স্মৃতি অনুষ্ঠানে পুরোহিত বসিয়ে আমরা মন্ত্রের মত তাঁর বাণী উদ্ধৃত করি, জীবনীর সন-তারিখ উপস্থিত করি এবং প্রসাদ বিতরণের পর যার যার ঘরে ধোয়া-মোছা মন নিয়ে ফিরে যাই। এই যান্ত্রিক রীতি প্রতিভাকে সম্মানিত করে না, আমরাও লাভের খাতায় শূন্য অঙ্ক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি।

কোন বিরুদ্ধ সমালোচক আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, "তা হলে তুমি কি স্মৃতি-সভার বিরোধী?" এ প্রশ্নের আমার একটি মাত্র উত্তর, "আমি স্মৃতি-সভার বিরোধী নই, কিন্তু প্রীতি-সভার বিরোধী।" তিথি উপলক্ষে গীতিসভার আয়োজন হোক, প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হোক, পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ হোক তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু কোন প্রতিভাবানের স্মৃতিসভা কেবল মাত্র ওটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে ঘোরতর আপত্তির কারণ আছে বৈ কি। এতে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করি, প্রতিভাবানদের লাঞ্ছিত করি এবং সর্বোপরি দেশের জনগণের কাছে তাঁদের অবাঞ্ছিত করে রাখি।

কোন কবি অথবা সাহিত্যিকের জন্ম অথবা মৃত্যু-তিথি পালনের কথাই ধরা যাক। একশ' বার এর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও হাজার বার বলব যে, উদ্যোক্তারা যেন এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত থাকেন। সে উদ্দেশ্য কী? তা হচ্ছে অনুষ্ঠানগুলোকে এমন ভাবে পালন করা যাতে করে উপস্থিত জনগণ দেশের কবি-সাহিত্যিকদের প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে পারে। এক দিনের কয়েক ঘণ্টার সভার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই তা সম্ভব নয়, কিন্তু এ সমস্ত সভা যদি জনগণের মধ্যে দেশের কবি-সাহিত্যিকদের জানবার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে, জানার ইংগিত দিতে পারে, তবেই তার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হবে। আজকালকার বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রেরা যেমন ভাষ্য পড়ে সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে প্রয়াসী হয়, নিজেদের সংস্কৃতিসেবী বলে যাঁরা গর্ব অনুভব করেন তাঁরাও তেমনি স্মৃতিসভার বক্তৃতা শুনে কবি-সাহিত্যিকদের জানতে প্রয়াসী হন। এতে প্রকৃত জানা হয় না, অন্ধ-ভক্তির চরিতার্থতা হয় মাত্র। এই অন্ধ-ভক্তির আতিশয্যেই আমরা যুগে যুগে অতিমানুষকে ভগবানের অবতাররূপে মাটি থেকে বহু ঊর্ধ্বে তুলে দেখতে চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশের প্রত্যেক মহাপুরুষ সম্বন্ধে তাই প্রচলিত অলৌকিক গল্পের অভাব নেই। কবি-সাহিত্যিকেরাও এর থেকে বাদ পড়েননি। তাই আমরা কবির কাব্য-বিচারের চেষ্টা না করে ভক্তি-বিচারে অগ্রসর হয়েছি। জয়দেব-বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদের ভক্তিরসের অবতার জেনে প্রণাম করেই খুশি হয়েছি, অথচ তাঁদের কাব্যরসের ধারা যেখানে সহজ গতিতে প্রবহমান, সেদিকে পিছন ফিরে দাঁড়াতেও আমরা কুণ্ঠা বোধ করিনি। এই কারণেই মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনী এবং তাঁদের সম্বন্ধে ভাষ্য—জীবন-সমুদ্রে ভেসে-আসা কাষ্ঠখণ্ডের মতো আঁকড়ে ধরে অবলম্বন করে নিতে চাই; আর তাঁদের চিন্তার তরণী, কর্মজীবনের সম্পদ অলক্ষ্যেই ভাসতে থাকে।

৩

ইংরেজ কবি **W. S, Lander Robert Browning**কে উদ্দেশ করে বলেছেন:

There is delight
In praising' tho' the praiser sit alone
And see the praised far off him far above.

গভীর একাত্মতাবোধসঞ্জাত আনন্দের উপলব্ধি থেকে এই স্তুতিবাদের জন্ম; সুতরাং কবি এখানে উভয়ের মধ্যে যে-ব্যবধানের কথা বলেছেন আসলে তা ব্যবধান নয়। তাই এখানে কবি ব্রাউনিংকে যে কথা বলেছেন তা নির্বিচারে স্তুতিবাদের কথা নয়। কোন মহামানবকে অনুভূতিতে সত্য পরিচয়ে জেনে যে-স্তুতি স্বভাবতঃই কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—কবি বলেছেন তাতেই আনন্দ আছে, কারো নামকে কণ্ঠ-কবচ করে নয়। এতে যথার্থ জানার ইংগিত আছে।

মহাকবি কালিদাস প্রকৃত বিবেচক এবং মূঢ়দের ব্যবধানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন: "সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ"—অর্থাৎ বিবেচকেরা নতুন পুরাতন যাই হোক, তাকে বিচার করে গ্রহণ করেন আর মূঢ় ব্যক্তিরা পরের প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে তার অনুসরণাদিক্রমে নিজ নিজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে থাকে, কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ এ বিচার করবার ক্ষমতা তাদের নেই। সুতরাং এদের স্তুতিবাদের অমূল্য শব্দাবলীর কোনই মূল্য নেই। যাঁরা প্রকৃত কাব্যরস একান্ত ভাবে অন্তরে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁরাই প্রকৃত পক্ষে কবিদের বাঁচিয়ে রাখছেন। সে বাঁচানো বুলির মৃতসঞ্জীবনীতে ক্ষণিকের জন্য নয়, সেই হচ্ছে কবিকে চিরদিন দেশের আকাশ-আলোর নিচে বাঁচিয়ে রাখবার মহৎ উপায়। কবির প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শনও সেখানেই। সভা-সমিতির ফাঁকা

ছোটদের আসর

একটি সত্য ঘটনামূলক গোয়েন্দা কাহিনী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

[এখানে যে ডিটেকটিভ কাহিনীটি দেওয়া হ'ল, এটি গল্প নয়, একেবারে সত্য ঘটনা। ঘটনা-ক্ষেত্র হচ্ছে আমেরিকা। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।]

রাত সাড়ে তিনটে। রাস্তার এক পাশে একখানা মোটর গাড়ী। সামনের আসনের মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে ব'সে আছে একটা লোক। কনষ্টেবল লুইস-শিলি নিজের ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নজর রাখছিল গাড়ীখানার উপরে। এই ভাবে কেটে গেল ঘণ্টা খানেক। তার পর শিলি এগিয়ে এসে গাড়ীর ভিতরে ফেললে নিজের টর্চ্চের আলো। ড্রাইভারের আসনে ব'সে ব'সেই ঘুমোচ্ছে একটি ছোকরা। দুই চোখ মোদা। মাথাটি এলিয়ে পড়েছে কাঁধের উপরে। শিলির প্রথম ধাক্কায় ছোকরা নড়ে-চ'ড়ে উঠল বটে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙল না। দ্বিতীয় ধাক্কা দিয়ে শিলি হাঁকলে, "এই! কে তুমি? উঠে পড়!"

ধড়মড় ক'রে ছোকরা জেগে উঠল। তার চোখে-মুখে আতঙ্ক! তার পর ভালো ক'রে চেয়ে দেখে একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে বললে, "তবু ভালো, পুলিশ! আমি ভেবেছিলুম ডাকাত! যা ভয় পেয়েছিলুম!"

শিলি সুধোলে, "কে তুমি বাপু? এখানে কি করছিলে?"

—"ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।"

—"নাম কি?"

—"ডেভিড টিঙ্গো।"

—"বয়স?"

—"সতেরো।"

—"বাড়ী কোথায়?"

—"ক্যামডেনে।"

—"এত রাতে বাড়ীতে না গিয়ে রাস্তায় গাড়ীতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলে কেন?"

—"সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরছিলুম। হঠাৎ চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে এল।"

ছোকরা জবাবগুলো দিচ্ছিল বেশ সপ্রতিভ মুখেই। তার ভাব-ভঙ্গিও সন্দেহজনক নয়। কিন্তু শিলি ভাবলে, তবু বলা তো যায় না, দিন-কাল যা খারাপ! চারি দিকেই চুরির পর চুরি হচ্ছে, ছোকরাকে আর একটু বাজিয়ে দেখা যাক্।"

—"টিঙ্গো, তোমার গাড়ীর লাইসেন্স দেখি।"

—"একটা চামড়ার ব্যাগে পুরে লাইসেন্সখানা পকেটে রেখে দিয়েছিলুম। আজ দু'দিন হ'ল ব্যাগটা হারিয়ে গিয়েছে।"

—"বটে, বটে! তাহ'লে আমার সঙ্গে একবার থানায় চল তো বাপু!"

টিঙ্গো কোন রকম ইতস্তত না ক'রেই শিলির অনুসরণ করলে।

থানায় এসে টিঙ্গো বললে, "মা-বাবা আমার জন্যে ভাবছেন। একবার বাড়ীতে ফোন্ করতে পারি?"

—"নিশ্চয়। ঐ ঘরে ফোন্ আছে।"

টিঙ্গো চ'লে গেল। শিলি থানার 'ফাইল' ঘেঁটে দেখতে লাগল, ডেভিড টিঙ্গো নামে কোন ছোকরা আসামীর নাম খুঁজে পাওয়া যায় কি না? খোঁজা-খুঁজি ব্যর্থ হ'ল, টিঙ্গোর নাম নেই।

টিঙ্গো বলেছে তার বাসা ক্যামডেনে। শিলি অন্য একটা ফোনের সাহায্যে সেই এলাকার থানার কর্ম্মচারীকে ডাকলে। ডিটেকটিভ মর্গ্যান শিলির কাহিনী শুনে ক্যামডেন থানার 'ফাইল' খুঁজে বললেন, "ডেভিড টিঙ্গো নামে কোন ছোক্‌রা কোন দিন এ এলাকায় ধরা পড়েনি।" তখন শিলির বিশ্বাস হ'ল যে টিঙ্গো তাহ'লে দুষ্ট ছোক্‌রা নয়।

সে টিঙ্গোর কাছে গিয়ে বললে, "তোমার গাড়ী আপাতত থানাতেই থাক্। প্রায় ভোর হয়েছে। তুমি বাসে চ'ড়ে বাড়ী যেতে পারবে?"

—"অনায়াসেই।"

—"বেশ। বাড়ীতে গিয়ে তোমার বাবাকে একবার এখানে ডেকে আনো।"

টিঙ্গো চমকে উঠল। প্রস্তাবটা তার পছন্দ হ'ল না। বললে, "বাবাকে কেন? মাকে ডেকে আনলে চলবে না?"

—"বাবার নাম শুনেই তুমি চমকে উঠলে কেন?"

টিঙ্গো বললে, "এত ভোরে বাবাকে ডাকাডাকি করলে তিনি চটে যেতে পারেন।"

—"বেশ, তাহ'লে যে কেউ এলেই চলবে। তোমার বাবা কি মা এসে যদি লাইসেন্সের কথা স্বীকার করেন, তবে গাড়ী ছেড়ে দিতে আমি কোন আপত্তি করব না।"

টিঙ্গোর প্রস্থান। শিলি ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল, সাবধানের মার নেই ব'লেই এত হাঙ্গাম করলুম। ছোক্‌রা অপরাধী নয়। দেখা যাক্ ওর মা এসে কি বলে।

আধ ঘণ্টা পরে বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা। শিলি রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললে—"হ্যালো!"

—"আমি ক্যামডেন থানার ডিটেকটিভ মর্গ্যান। একটু আগেই তুমি না বলছিলে, ডেভিড টিঙ্গো নামে কে এক ছোক্‌রা তার চামড়ার ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছে?"

—"হ্যাঁ, তাই।"

—"উত্তম। সেই ব্যাগটা আমরা পেয়েছি। ছোক্‌রা এখন কোথায়?"

—"বাড়ী থেকে মাকে ডেকে আনতে গিয়েছে।"

—"সে ফিরে এলে থানায় বসিয়ে রেখ। আমরা এখনি যাচ্ছি।"

—মর্গ্যানের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত!

শিলি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এ আবার কি ব্যাপার? টিঙ্গোর ব্যাগ ক্যামডেন থানায় হাজির হ'ল কেমন ক'রে? আর ওটা যে টিঙ্গোর ব্যাগ, তাই বা মর্গ্যান জানতে পারলে কেমন ক'রে?

এমন সময়ে টিঙ্গোর পুনরাবির্ভাব—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন মর্গ্যান ও কেন্‌লি ছুই ডিটেকটিভ।

শিলি জিজ্ঞাসা করলে, "টিঙ্গো, তোমার মা কই ?"

—"এত সকালে মাকে টানাটানি করতে ভালো লাগল না। তাঁকে আর আনবারও দরকার নেই।"

—"কেন ?"

—"আমি ভুল করেছিলুম। ব্যাগে নয়, লাইসেন্সখানা ছিল আমার বাড়ীর ভিতরেই। এই নিন।"

লাইসেন্সের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শিলি বললেন, "দেখছি সব ঠিকঠাক আছে। ভালো কথা। টিঙ্গো, ক্যামডেন থানা থেকে এই ছু'জন ডিটেকটিভ এসেছেন তোমার সন্ধানে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্যাম্‌ডেনেই তার বাসা, সেখানকার ছু'-ছু'জন ডিটেকটিভ তাকে খুঁজতে এসেছে শুনে টিঙ্গোর মুখ কেমন শুকিয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ? ব্যাপার কি ?"

মর্গ্যান বললেন, "ব্যাপার কিছুই নয় বাপু। তবে তোমার কাছ থেকে হয়তো আমরা কিছু সাহায্য পেতে পারি। দেখ তো, এই চামড়ার ব্যাগটা তোমার কি না ?" তিনি টেবিলের উপরে একটি ছোট্ট ব্যাগ স্থাপন করলেন।

ব্যাগটা নকল চামড়ায় তৈরি। তার উপরে মুদ্রিত আছে এক অশ্বারোহী 'কাউ-বয়ে'র ছবি। বালকরাই এ-রকম ব্যাগ ব্যবহার করতে ভালোবাসে।

টিঙ্গো একগাল হাসি হেসে বললে, "বা:, এ তো আমারই ব্যাগ! আপনারা এটা কোথায় পেয়েছেন ?"

তীক্ষ্ণ চোখে তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে মর্গ্যান বললেন, "টিঙ্গো, তুমি ঐ চেয়ারে বোসো।"

টিঙ্গো বসল। চেয়ার টেনে তাকে ঘিরে বসলেন গোয়েন্দারাও।

মর্গ্যান বললেন, "শোনো টিঙ্গো। আজই রাশি-রাশি চোরাই মাল আমাদের হস্তগত হয়েছে। কেমন ক'রে তা বলতে চাই না, কারণ সে হচ্ছে অনেক কথা। এইটুকু খালি জেনে রাখো, সেই সব চোরাই মালের ভিতরে ছিল তোমার এই ব্যাগটাও। ফাউন্টেন পেন, বন্দুক, রিভলভার, জড়োয়া গয়না প্রভৃতি আরো অনেক কিছু দামী-দামী জিনিষের সঙ্গে এই তুচ্ছ ব্যাগটা ছিল কেন, আমরা তা বুঝতে পারছি না। এখন তুমি যদি বলতে পারো ব্যাগটা কোথায়, কেমন ক'রে হারিয়ে ফেলেছিলে, তা'হলে হয়তো চোরের সন্ধান পেতে দেরী হবে না।"

ডেভিড টিঙ্গোর মুখ দেখে মনে হ'ল, সে যেন দস্তরমত হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। তার পর সে মাথা নেড়ে বললে, "ব্যাগটা আমার কাছ থেকে চুরি যায়নি, ওটা আমি নিজেই কোথাও হারিয়ে ফেলেছিলুম। তবু চোরাই মালের সঙ্গে পাওয়া গেল আমার ব্যাগ, ভারি আজব ব্যাপার তো!"

মর্গ্যান বললেন, "ব্যাগটাও হয়তো তোমার কাছ থেকেই চুরি গিয়েছে।"

—"অথচ আমি টের পাইনি!"

—"আশ্চর্য্য কি, হয়তো চোর তোমার পকেট মেরে স'রে পড়েছিল।"

টিঙ্গো আবার মাথা নেড়ে জানালে, না।

মর্গ্যান সুধোলেন, "তোমার ব্যাগটা কবে হারিয়ে গিয়েছে ?"

—"দিন তিনেক আগে।"

—"তোমার ঠিক মনে আছে ?"

—"অন্তত গেল ছু'দিন থেকে ব্যাগটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।"

মর্গ্যান পকেট থেকে একখানা 'ট্রলি'-হস্তান্তরপত্র বার ক'রে বললেন, "এখানা কি তোমার ?"

—"নিশ্চয়! যদিও ও কাগজখানা এখনো আমি ব্যবহার করিনি।"

মর্গ্যান বললেন, "কাগজখানা তোমার ঐ ব্যাগের ভিতরেই ছিল।"

আচম্বিতে টিঙ্গোর মুখ হয়ে গেল রক্তশূন্য। সে ব'লে উঠল, "না, না, ও কাগজখানা আমার নয়! আমি কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি! আপনারা আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছেন।"

—"হ্যাঁ, তাই দিয়েছি বটে!"

—"ও কাগজ আমার হ'তে পারে না। আমি বলছি, ও কাগজ আমার নয়!"

মর্গ্যান গাত্রোত্থান ক'রে বললেন, "টিঙ্গো, তোমাকে এখন আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে। দেখছি, আমরা কোন সাধারণ চুরির মামলা হাতে পাইনি, এর ভিতরে আছে গভীর রহস্য।"

মর্গ্যানের কথাই পরে সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ডেভিড টিঙ্গো বালক মাত্র, কৈশোর অতিক্রম্ ক'রে সবে যৌবনে পা দিয়েছে বটে, কিন্তু এখনো তার মুখের উপরে আছে বালকতার সুস্পষ্ট ছাপ। অথচ তারই চারি দিক ঘিরে রচিত হয়েছিল যে জটিল ও অদ্ভুত রহস্যের জাল, তা যেমন অসাধারণ, তেমনি অভাবিত ও অতুলনীয়। আপাতত আমরাও টিঙ্গোকে পুলিশের জিম্মায় রেখে গোয়েন্দাদের সঙ্গে রহস্য-জালের খেই খোঁজবার চেষ্টা করব।

* * * *

চুরির হিড়িক সুরু হয় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট তারিখে। চোরেরা হানা দেয় কলিংস্ রোডের মি: ওটো টপাবকাবের বাড়ীতে। তারা একটা জানলা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। চুরির আগে ভারি-ভারি আসবাবগুলো টেনে এনে এমন ভাবে সদর দরজার উপরে চাপিয়ে রেখেছিল যে, বাড়ীর মালিক ভিতরে আসবার জন্যে ঠেলাঠেলি করলেই তারা স'রে পড়বার সুযোগ পাবে। চুরির পর তারা বেরিয়ে গিয়েছিল খিড়কীর দরজা দিয়ে।

তার পর থেকে সুরু হ'ল চুরির পর চুরি—ক্যাম্‌ডেন, কলিংস্‌উড, গ্লসেষ্টার, পেন্‌সকেন, ওক্‌লীন, অডুবন ও হ্যাডন হাইট্‌স্ প্রভৃতি সাউথ ডারসির সহরে-সহরে। সর্ব্বত্রই তাদের একই পদ্ধতি। তারা জানলা ভেঙে ভিতরে ঢোকে, সদর দরজার উপরে আসবাবগুলো চাপিয়ে রাখে এবং খিড়কীর দরজা দিয়ে পলায়ন করে।

এবং প্রত্যেক বারেই তাদের আবির্ভাব হয় রাত আটটার কাছাকাছি কোন একটা সময়ে। সেই জন্যে তাদের নাম রাখা হ'ল "রাত আটটার চোরের দল"। তারা যে সন্ধানী চোর, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ প্রত্যেক বারেই চুরির সময়ে বাড়ীর লোক থেকেছে অনুপস্থিত।

অনেক দিন পর্য্যন্ত জনপ্রাণী চোরেদের মুখদর্শন করবার সুযোগ

পায়নি। একবার মাত্র জনৈক ব্যক্তি একটি ঘটনা-ক্ষেত্রে তুই জন লোককে চলে যেতে দেখেছিল, কিন্তু সেও তাদের পিছন দিক ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি।

অবশেষে মিঃ জ্যাফার্টির বাড়ীতে তাদের এক জনের খানিকটা বর্ণনা পাওয়া গেল।

ডিটেকটিভ মর্গ্যান ও কন্‌লির কাছে জ্যাফার্টি বললেন : "বাড়ীর অন্যান্য লোকরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, আমি সব আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। রাত যখন আটটা পনেরো, তখন একতলায় কি একটা শব্দ হয়, আমারও ঘুম ভেঙে যায়। আমি বিছানা থেকে নেমে পা টিপে-টিপে গিয়ে সিঁড়ির আলো জেলে দিয়ে দেখি, নীচেয় একটা লোক দাঁড়িয়ে ঊর্দ্ধমুখে তাকিয়ে আছে আমার পানে। সে আমাকে শাসিয়ে বললে, 'খবর্দ্দার, টুঁ শব্দটি কোরো না!' পর-মুহূর্ত্তে সে সাঁৎ ক'রে নিজের পকেটে হাত চালিয়ে দিলে—আমি ভাবলুম, এই রে, এইবারে বার করে বুঝি রিভলভার! তার পর সে রিভলভার বার করলে না বটে, কিন্তু পকেট থেকে নিজের হাত বার ক'রে আমার দিকে একটা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে তালুতে জিভ লাগিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করলে। তার পরেই খিলখিল ক'রে হেসে উঠে এক ছুটে বাড়ীর বাইরে পালিয়ে গেল। আমি নীচেয় নেমে গিয়ে দেখি, আমার আসবাবগুলো স্থানচ্যুত হয়েছে বটে, কিন্তু চোর সেগুলো সদর দরজা পর্য্যন্ত নিয়ে যাবার সময় পায়নি। একটা জানলাও ভাঙা।"

গোয়েন্দারা চোরের চেহারার বর্ণনা জানতে চাইলেন।

জ্যাফার্টি বললেন, "তার বয়স উনিশ-বিশের মধ্যেই। মাথার উচ্চতা হবে আন্দাজ সাড়ে পাঁচ ফুট, দেহের ওজন তুই মণের বেশী হবে না। তার মাথায় লম্বা-লম্বা চুল, সরুঙ্গে নাক, তুই গালের হাড় উঁচু-উঁচু। তার চোখ তু'টো ছোট ছোট।"

সব থানাতেই জেল-খাটা বিখ্যাত বা অবিখ্যাত আসামীদের অসংখ্য ফোটো সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়।

গোয়েন্দারা বললেন, "লোকটার ছবি দেখলে আপনি চিনতে পারবেন ?"

—"পারব।"

জ্যাফার্টিকে ছবির বইগুলোর সামনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'ল—গাদা-গাদা বই। কয়েক ঘণ্টা পরে ছবি দেখা শেষ ক'রে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার বাড়ীতে যে অনাহূত অতিথি এসেছিল, এর মধ্যে তার ছবি নেই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গেল পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরের দিনের কথা। গ্লসেষ্টারের একখানা বাড়ীতে গিয়ে হানা দিলে রাত আটটার চোরের দল। তার পরের দিনেই কলিংসুউডে হ'ল আবার তাদের আবির্ভাব। এ পর্য্যন্ত তারা যে-সব নগদ টাকা, জড়োয়া গয়না, রেডিয়ো ও ঘড়ী প্রভৃতি সরিয়ে ফেলতে পেরেছে তার মোট দাম হবে পঁইত্রিশ হাজার টাকার চেয়েও বেশী।

পুলিশের অবস্থা অত্যন্ত অসহায়। তারা উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করছে, প্রাণপণ চেষ্টার ও তদন্তের কিছুই বাকি রাখছে না, তবু নিয়মিত ভাবেই চুরি হচ্ছে আজ এখানে, কাল ওখানে—যেখানে-সেখানে। পুলিশ অতঃপর কি করবে যেন তা জানতে পেরেই চোরের দল পুলিশের আগে-আগেই গিয়ে আবির্ভূত হয় যে কোন ঘটনা ক্ষেত্রে।

পুলিশের খাতায় ছাড়া-পাওয়া যত দাগী চোরের নাম আছে, তাদের ভিতর থেকে প্রত্যেক সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আবার ধ'রে এনে খোঁজ-খবর নেওয়া হ'ল—ফল কিন্তু অষ্টরম্ভা! রাত্রে পথে-পথে চৌকীদারের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। যে-সব দোকানে লোকে জিনিষপত্তর বাঁধা রাখে বা বিক্রি করে, সেখানে খানাতল্লাস ক'রেও একটিমাত্র চোরাই মাল পাওয়া গেল না।

কন্‌লি এক দিন মর্গ্যানকে ডেকে বললেন, "চোরেরা যদি না চুরির পদ্ধতি বদলায় আর রাত আটটায় চুরি করার অভ্যাস না ছাড়ে, তবে এক দিন না এক দিন আমাদের হাতের মুঠোর ভিতরে তাদের আসতে হবেই।"

তার পর ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের দোসরা জানুয়ারি তারিখে সাতষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ জর্জ্জ ব্রাউন রাজপথ দিয়ে যেতে-যেতে আক্রান্ত হ'লেন তুই জন গুণ্ডার দ্বারা।

একটা গুণ্ডা রিভলভার দেখিয়ে টাকার দাবি করে। ব্রাউন প্রতিবাদ করাতে সে রিভলভারের বাড়ি মেরে তাঁর মাথা ও মুখ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দেয় এবং তিনি মাটির উপরে প'ড়ে যান প্রায়-অচৈতন্যের মত।

পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে ব্রাউনের কাছ থেকে আততায়ীর যে বর্ণনা সংগ্রহ করলে, তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল গত পরিচ্ছেদে জ্যাফার্টির দ্বারা বর্ণিত চোরের চেহারা।

অধিকতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় রাত আটটার সময়েই।

মর্গ্যান বললেন, "একই লোকের কীর্ত্তি ব'লে সন্দেহ হচ্ছে।"

কন্‌লি মাথা নেড়ে বললেন, "কিন্তু আচমকা এই নূতন পদ্ধতিটা আমার ভালো লাগছে না। কোথায় বাড়ীতে-বাড়ীতে চুরি, আর কোথায় রাজপথে রাহাজানি! চোরেরা সাধারণতঃ নিজেদের এক-এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব'লে মনে করে, সহসা তারা নিজেদের পদ্ধতি বদলায় না। তবু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সময় আর চেহারার যে মিল দেখছি, তাও উপেক্ষা করা চলে না।"

চুরির পর চুরি চলতে লাগল, একটানা চলতে লাগল চুরির পর চুরি। চোরেদের হাত যেন দম-দেওয়া ঘড়ীর কাঁটা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে করে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালন!

হ্যাডন হাইটের একখানা বাড়ী থেকে রাত আটটার চোরেরা নিয়ে গেল সাত লক্ষ টাকার জড়োয়া গহনা!

মর্গ্যান ও কন্‌লি থানায় ব'সে চোরেদের নব-নব কীর্ত্তি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, হঠাৎ এল টেলিফোনের আহ্বান।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। সে মার্কেট ষ্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁর পরিবেশিকা। উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "শীগ্‌গির আসুন, শীগ্‌গির! এখানে একটা লোক এসেছে—"

—"কে লোক? কি বলছ তুমি?"

—"এখানে একটা লোক কোথায় রাহাজানি ক'রে এসে বন্ধুদের কাছে সেই গল্প বলছে। শীগ্‌গির আসুন, নইলে সে চ'লে যাবে।"

তখনই দুই গোয়েন্দা মোটর ছুটিয়ে দিলেন সেই রেস্তোরাঁর দিকে।

পরিবেশিকা রেস্তোরাঁর দরজাতেই দাঁড়িয়ে পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করছিল। এক ব্যক্তিকে সে দেখিয়ে দিলে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে। সে তখন বাইরে বেরিয়ে পথের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে।

তার পথরোধ করলেন গোয়েন্দারা।

সচমকে সে বললে, "কি চান আপনারা ?"

—"আমরা পুলিশ।"

সে ভয়ে ভয়ে বললে, "তাই না কি ?"

মর্গ্যান বললেন, "তুমি কোথায় গিয়ে রাহাজানি করেছ, এতক্ষণ সেই গল্প বলছিলে। আমরাও গল্পটা শুনতে চাই।"

—"রাহাজানি !"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাহাজানি। এতক্ষণ তাই নিয়ে যে খুব মুখসাবাসি করছিলে !"

—"মুখসাবাসি ? হ্যাঁ মশাই, ঠিক তাই ! বন্ধু-বান্ধবের কাছে অনেকেই মুখের কথায় রাজা-উজীর মারতে চায়, তা কি আপনারা জানেন না ? আমি যা বলছিলুম সব বাজে বানানো কথা !"

—"তোমার নাম ?"

—"অ্যাণ্ডি ক্লিং।"

—"আমাদের সঙ্গে থানায় চল।"

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় বৃদ্ধ জর্জ্জ ব্রাউনকেও থানায় ডেকে আনা হ'ল।

ক্লিংকে আরো কয়েক জন লোকের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসা করলেন, "মিঃ ব্রাউন, দোসরা জানুয়ারিতে যে লোকটা আপনাকে রিভলভার দিয়ে মেরে আহত করেছিল, সে কি এই দলের মধ্যে আছে ?"

ব্রাউন মিনিট কয়েক ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখিয়ে দিলেন অ্যাণ্ডি ক্লিংকে !

ক্লিং যেন একেবারেই স্তম্ভিত ! তার পর সে আর্ত্ত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "না, না, এ সত্য নয় ! উনি ভুল করেছেন !"

ব্রাউন বললেন, "অসম্ভব ! আমি যদি আরো দশ লক্ষ বৎসর বাঁচি, তাহ'লেও তোমার মুখ এ জীবনে ভুলতে পারব না !"

কনলির জামার হাতা চেপে ধ'রে ক্লিং বললে, "আমার কথায় বিশ্বাস করুন। এ ভদ্রলোক কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কনলি বললেন, "উনি তোমাকে সনাক্ত করেছেন। তবু তুমি দোষ স্বীকার করছ না কেন ?"

ক্লিং বললে, "যে দোষ করিনি তাই আমাকে স্বীকার করতে হবে ?"

—"সেদিন তোমার সঙ্গে আর এক জন লোক ছিল। কে সে ?"

—"কেউ নয় ! আমিই যখন ঘটনাস্থলে হাজির ছিলুম না, তখন আমার সঙ্গে আবার থাকবে কে ?"

—"এই যে সব রাত আটটার চুরি, এর সম্বন্ধে তুমি কি জানো ?"

—"আপনি কি বলতে চান ? আমার বিরুদ্ধে আরো সব চুরির মামলা আছে না কি ?"

গোয়েন্দারা এমনি সব প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন, কিন্তু ক্লিংয়ের কাছ থেকে কোন স্বীকার-উক্তিই আদায় করতে পারলেন না। তার এক কথা—সে ব্রাউনকে আক্রমণ করেনি, রাত আটটার চুরি সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানে না।

গোয়েন্দারা বুঝলেন, ব্রাউনের মামলায় ক্লিংকে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে বটে, কিন্তু রাত আটটার চুরির মামলায় তার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণিত হয়নি। তখন জ্যাফার্টিকে ডেকে আনা হ'ল, সর্ব্বপ্রথমে যাঁর সঙ্গে রাত আটটার চোরেদের এক জনের মুখোমুখি দেখা হয়ে গিয়েছিল।

তিনিও কয়েক জন লোকের ভিতর থেকে ক্লিংকে বেছে নিয়ে বললেন, "এই লোকটিকে সেই চোরটার মতন দেখতে বটে, কিন্তু এ ভিন্ন লোকও হ'তে পারে।"

—"তাহ'লে আপনি ঠিক সনাক্ত করতে পারছেন না ?"

—"প্রায় তাই-ই বটে। চোরের চেহারার সঙ্গে এর অনেকটা মিল আছে, এর বেশী আর কিছু আমি বলতে পারব না।"

ক্লিংকে রাহাজানির মামলায় বিনা জামিনে ধ'রে রাখা হ'ল।

মর্গ্যান বললেন, "ক্লিং বন্দী, এখন দেখা যাক্ এর পরেও রাত আটটার চুরি বন্ধ হয় কি না ! তা যদি হয়, তবে বুঝতে হবে, ক্লিং সত্য সত্যই ঐ চুরিগুলোর সঙ্গে জড়িত আছে।"

[ক্রমশঃ।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত

১৯০১ সালের কথা। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ শেষ হলে গান্ধীজী ভারতে ফিরবার সংকল্প করলেন। তাঁর মনে হল, ভারতেই তখন তিনি জনসেবার বিস্তৃততর ক্ষেত্র পাবেন। অতি কষ্টে ভারতীয় বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি দেশে ফিরবার অনুমতি আদায় করলেন।

গান্ধীজীকে বিদায়-অভিনন্দন জানবার জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকার নানা স্থানে সভা হল ও তাঁকে বহু মূল্যবান নানা উপহার দেওয়া হল। উপহারের মধ্যে সোনা-রূপার জিনিস ত ছিলই, দামী হীরার অলঙ্কারাদিও ছিল।

গান্ধীজীর মনে এক প্রশ্ন জাগল—তিনি কেমন করে এই সব মূল্যবান উপহার গ্রহণ করবেন ? উপহারগুলি দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাঁর জনসেবার পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল ; এগুলি গ্রহণ করলে তাঁর জনসেবার মূল্য গ্রহণ করা হবে ; তিনি আর নিজেকে নিঃস্বার্থ লোকসেবক বলে মনে করতে পারবেন না।

উপহারগুলির মধ্যে পঞ্চাশ গিনি দামের একটি সোনার নেকলেস ছিল। নেকলেসটি কস্তুরবাঈকে দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু তা-ও ত গান্ধীজীরই জনসেবার পুরস্কার !

যেদিন সন্ধ্যায় এই সব উপহার গান্ধীজীর বাড়ীতে জড় করা হল, সে রাত্রে তাঁর ঘুম হল না। বিক্ষুব্ধ মনে তিনি সারা রাত তাঁর ঘরে পায়চারি করে কাটালেন ; কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান করতে পারলেন না। বন্ধু ও সহকর্ম্মীদের প্রদত্ত উপহার ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন, কিন্তু সেগুলো আত্মসাৎ করা আরও কঠিন। স্ত্রী ও পুত্রদের তিনি সর্ব্বদা নিঃস্বার্থ জনসেবার শিক্ষাই দিয়েছেন

জনসেবার মূল্য গ্রহণ করতে নেই, এই-ই তাদের বুঝিয়েছেন। আজ কেমন করে তিনি এই সব উপহার গ্রহণ করবেন?

গান্ধীজীর গৃহের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। ঘরে কোন মূল্যবান অলঙ্কারের বালাই ছিল না। সকলেই সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। আজ সোনার ঘড়ি কে ব্যবহার করবে? সোনার চেন, হীরার আংটি কে পরবে? তিনি অপরকে অলঙ্কারের মোহ ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন; আজ এই সব অলঙ্কার নিয়ে তিনি কি করবেন?

অবশেষে গান্ধীজী মন স্থির করে ফেললেন। এই সব উপহারের কিছুই তিনি নেবেন না; সবই জনসেবার কাজে দান করবেন। পরদিন সকালে তিনি তাঁর মনের কথা স্ত্রী ও ছেলেদের বললেন। ছেলেরা সহজেই বাপুজীর প্রস্তাবে সায় দিল; কিন্তু কস্তুরবাঈ বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন যে, গান্ধীজী বা তাঁর ছেলেদের এ-সব জিনিসের কোন প্রয়োজন না থাকতে পাবে, তাঁর নিজেরও অলঙ্কারের প্রতি কোন লোভ নেই; কিন্তু ছেলেদের বিয়ের পরে বৌমারা আসবেন, তাঁদের জন্য অলঙ্কারগুলো রাখতে হবে। তা'ছাড়া এত ভালবেসে যারা উপহার দিয়েছে, ফিরিয়ে দিলে তারা মনে ব্যথা পাবে।

কিন্তু ছেলেরা দৃঢ়, গান্ধীজী নিজেও টললেন না। তিনি বললেন যে, ছেলেরা ত এখনই বিয়ে করছে না, বড় হয়ে উপার্জ্জনক্ষম হয়ে তারা বিয়ে করবে; প্রয়োজন হলে তারাই তাদের বৌদের অলঙ্কার দিতে পারবে, তা' ছাড়া অলঙ্কারের মোহ আছে, এমন বৌ ত তাঁরা ঘরে আনতে চান না।

কস্তুরবাঈ কিছুতেই অলঙ্কারগুলি ফিরিয়ে দিতে রাজী হলেন না। যখন স্বামীর সঙ্গে তর্কে কিছুতেই পারলেন না, তখন বললেন, তাঁকে যে নেকলেস উপহার দেওয়া হয়েছে তা' ফিরিয়ে দেবার অধিকার গান্ধীজীর নেই। কিন্তু গান্ধীজী ছাড়বার পাত্র নন; তিনি বললেন, সে নেকলেস ত তাঁরই লোকসেবার পুরস্কারস্বরূপে তাঁর স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে—কস্তুরবাঈয়ের নিজস্ব কোন জনসেবার জন্য নয়।

কস্তুরবাঈ এ কথা মানলেন বটে; কিন্তু বললেন যে, গান্ধীজীর জনসেবায় তাঁরও অংশ আছে। তিনি কি দিন-রাত গান্ধীজীর জন্য খাটেননি? যত লোক তাঁদের বাড়ীতে এসেছে, দাসীর মত কি তিনি তাদের সেবা করেননি?

স্ত্রীর এই কথাগুলি গান্ধীজীর মর্ম্ম বিদ্ধ করল, কিন্তু তবু উপায় নেই; উপহারগুলি তাঁকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। তিনি কোন রকমে কস্তুরবাঈয়ের সম্মতি আদায় করে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমাজের সেবার জন্য উপহারগুলি সব ফিরিয়ে দিলেন। একটি ন্যাসপত্র (Trust Deed) লিখে ন্যাসীদের হাতে সব অর্পণ করলেন। কালক্রমে উদারহৃদয়া কস্তুরবাঈও বুঝলেন যে, গান্ধীজী ঠিক কাজই করছেন।

জনসেবাই জনসেবার পুরস্কার—গান্ধীজীর এই আদর্শ লোকসেবক কর্ম্মীমাত্রেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নিঃস্বার্থ কর্ম্মীদের সাধনায় ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। এখন ভারতকে মহান্ করে তুলতে হলে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত শত-শত নিঃস্বার্থ লোকসেবক কর্ম্মীর প্রয়োজন।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম্পত্য-জীবন

৪

বিবাহের পর বিদায়ের পালা এল। বিবাহিতা মনু মহারাজা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাবেন—চললো তার আয়োজন। মনু সবিনয়ে পরিচিতদের কাছ থেকে বিদায় নিতে লাগলেন; সাশ্রুলোচনে বললেন: আমাকে মনে রাখবেন—যেন ভুলে যাবেন না। খেলার সাথী নানা সাহেব ও রাও সাহেবকে বললেন: খেলা কিন্তু আমি ভুলবো না, সেখানে গিয়েও খেলব।

নানা সাহেব বললেন: আমাদের কিন্তু ভুলে যাবে ছবেলি—রাজরাণী হয়ে!

মনু মুখখানি ভার করে উত্তর দিলেন: তবে খেলার কথা বললাম কেন? খেলতে গেলেই তোমাদের কথা মনে পড়বে; খেলার সঙ্গে তোমরা জড়িয়ে আছ যে!

রাও সাহেব বললেন: খেলা আর আমাদের জমবে না—তুমি যে ছিলে আমাদের খেলার প্রাণ!

মনুর মনটি অমনি দুলে উঠল; বললেন: ভাইফোঁটার দিনে আমি কিন্তু ফোঁটা পাঠাব—সেদিনটিতে তোমরাও আমাকে মনে ক'র।

নানা বললেন: তুমি যে একটি স্বাধীন রাজ্যের রাণী হতে চলেছ, এতেই আমাদের আনন্দ। রাণী হয়ে তুমি দেশের কত উপকার করবে।

আয়ত দু'টি চোখ বড় করে নানার মুখের উপরে তার স্বচ্ছ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মনু বললেন: রাণী হলেও আমি তোমাদের ভুলবো না, এই বিঠুরের ছবি আমি মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে চলেছি জেনো।

এর পর বাবাকে বললেন: তোমার জন্যে আমার বড্ডো মন কেমন করবে; তুমি আমাকে দেখতে যেয়ো বাবা—ওঁরা হয়ত ওঁদের রাণীকে ঘন ঘন আসতে দেবেন না।

পন্থজী একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন: এ কথা কেন বলছ মা?

মনু বললেন: ওখান থেকে যাঁরা এসেছেন, এই কথা যে তাঁরাই বলছিলেন বাবা! রাণী হলে না কি আর আসবার নিয়ম নেই। তা ব'লে ওঁরা কি আমাকে ওঁদের বাড়ীতে কয়েদ করে রাখবেন? তাহলে কিসের রাণী হতে চলেছি আমি? আগে ত যাই, তার পর বোঝাপড়া করব ওঁদের সঙ্গে। আমি কিন্তু তোমাকে ওখানে নিয়ে রাখব বাবা, এর পর।

পন্থজী হাসতে হাসতে বলেন: তোমাকে দেখতে আমি যখন তখন যাবো বই কি মা, কিন্তু তা ব'লে জামাইয়ের বাড়ীতে বরাবর থাকতে পারি না, সে চেষ্টা তুমি কর না মা—তাতে নিন্দে হবে।

শুনে মনু বলে ওঠেন: বা-রে, তা কেন? আমি বিয়ের পর রাণী হতে চলেছি, আর তুমি এখানে চাকরী করবে বাবা! সে কি কখনো হয়? তুমি দেখো, এর পর আমি কি করি! রাণী হই ত রাণীর মতন রাণী হবো আমি।

সবার শেষে পেশোয়া ও তাঁর মহিষীদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন মনু। পেশোয়া হাসতে হাসতে বললেন: আমার মনে হচ্ছে পার্বতী যেন শিবের ঘর করতে চলেছেন।

মনু অমনি খপ করে বলে উঠলেন: আপনার কথা আমি বুঝিছি। শিবের অনেক গুণ ছিল বলে পার্বতী বরের বয়েসের জন্যে দুঃখ করেননি। শিবের মতন আমার বরেরও বেশী বয়েস হয়েছে, কিন্তু আমার তাতে দুঃখ নেই এই ভেবে—তিনি একটা রাজ্যের রাজা, কত লোককে প্রতিপালন করেন, লোকের ভালো করবার উপকার করবার তাঁর কত ক্ষমতা আছে—এতেই আমার আনন্দ। আপনি আশীর্বাদ করুন পেশোয়া, আমি যেন পার্বতীর মত সুখী হই, আর উনি শিবের মত লোকের মঙ্গল করেন।

বালিকার মুখের কথা মহিষীদের সঙ্গে পেশোয়া স্তব্ধ হয়ে শোনেন। তার পর গম্ভীর মুখে বলেন: দেবতার আশীর্বাদ আর দৈবী শক্তি না থাকলে এই বয়েসে কোনো মেয়ের মুখ দিয়ে এ ধরণের কথা বার হতে পারে না।

মহা সমারোহে বিশাল মিছিল করে নববধূ স্বামীর সঙ্গে ঝাঁসীর প্রাসাদে এলেন। বধূর রূপ দেখে সকলেই সুখ্যাতি করতে লাগলেন। দুর্গ-পরিবেষ্টিত ঝাঁসীর বিশাল প্রাসাদ দেখে বধূও বিস্মিতা হলেন। প্রাসাদের মধ্যেই মনোরম উদ্যান। অন্তঃপুরে রাণীর স্বতন্ত্র মহল, আদেশ বহনের জন্য কত পরিচারিকা, মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য-গীত-পটীয়সী রূপসী কিশোরীর দল, দ্বারে দ্বারে শস্ত্রপাণি প্রতিহারিণী—একটি বালিকা বধূর পরিচর্যার জন্য কি বিপুল আয়োজনের ঘটা! পেশোয়ার বিঠুর প্রাসাদের জাঁক-জমকের কথা মনুর মনে পড়ে।

শ্বশুরালয়ে এসে মনুর পিতৃদত্ত নামের পরিবর্তন হলো—লক্ষ্মীবাঈ নামেই তিনি পরিচিতা হলেন। মারাঠাদের এটি প্রচলিত প্রথা—বিবাহের পরে শ্বশুর-শাশুড়ীরা নিজেদের ইচ্ছামত নামকরণ করেন নববধূর। এর পর পুরাতন নাম পরিত্যক্ত হয়—শ্বশুরবাড়ীর দেওয়া নূতন নামেই অতঃপর বধূ অভিহিতা হন। কাজেই পেশোয়ার আদরিণী মনু ঝাঁসীতে এসে পূর্বনাম ত্যাগ করে স্বামিদত্ত লক্ষ্মীবাঈ নাম গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

এর পর লক্ষ্মীবাঈএর দাম্পত্য-জীবনের কথা বলতে হলে তার আগে ঝাঁসী রাজ্যটির কথা বলতে হয়। কারণ, ঝাঁসীকে ভালো করে না জানলে ঝাঁসীর এই তেজস্বিনী রাণীকে জানতে অসুবিধা হবে।

ঝাঁসী হোচ্ছে মধ্য-ভারতের বুন্দেলখণ্ড বিভাগের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। অতীত কাল থেকেই ছোট-ছোট কতকগুলি রাজ্য নিয়ে বুন্দেলখণ্ড গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেক রাজ্যই এক-এক রাজবংশ বংশানুক্রমে শাসন করে আসছিলেন। মোগল আমলে ঔরংজীব বাদশার নজর পড়ল প্রথমে এই রাজ্যগুলির উপরে। তিনি চাইলেন তাদের স্বাধীনতা হরণ করে করদ রাজ্যে পরিণত করতে। কিন্তু বুন্দেলারাজ্যের তরুণ রাজা ছত্রশাল হলেন প্রতিবাদী; তিনি বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য রাজ্যগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরলেন স্বয়ং তাদের নেতারূপে। মহাবীর শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই মারাঠা ব্রাহ্মণবীর বাদশাহের প্রবল প্রতিরোধ ব্যর্থ করে বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করলেন। তখন অন্যান্য রাজ্যগুলির রাজারা বুন্দেলারাজ ছত্রশালকে মহারাজা বলে স্বীকার করে তাঁর মিত্ররূপে স্বাধীন ভাবে নিজের নিজের রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

কালক্রমে হায়দ্রাবাদের নিজাম চিন কিলিচ আসফসা প্রবল হয়ে মালবরাজ গিরিধর রাও এবং গুজরাটের নবাব সরবুলন্দ খাঁর সহযোগিতায় একযোগে বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করলেন। মহারাজ ছত্রশাল তখন বৃদ্ধ ও রুগ্ন। তাঁর ইতিহাস-বিশ্রুতা কন্যা মস্তানীর রূপ-গুণের খ্যাতি সারা ভারতে রাষ্ট্র হয়েছে। ত্রিশক্তির এই অভিযানের মূলেও ছিলেন এই মস্তানী। বৃদ্ধ রাজা ছত্রশাল তখন নিরুপায় হয়ে মহারাষ্ট্র-চক্রের নেতা মহাবীর পেশোয়া প্রথম বাজীরাওয়ের সহায়তা প্রার্থনা করলেন। বিপন্ন ব্রাহ্মণ রাজার আমন্ত্রণ ব্রাহ্মণবীর বাজীরাও সাদরে গ্রহণ করে তাঁর দিগ্বিজয়ী সেনাপতি রণজী সিন্ধিয়া ও মলহররাও হোলকারের নেতৃত্বে সেনাবল পাঠালেন সম্মিলিত ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে। ফলে, নিজাম, মালব ও গুর্জ্জরের বিপুল বাহিনী শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত হলো। তখন কৃতজ্ঞ রাজা ছত্রশাল রাজকন্যা মস্তানীকে বিজয়ী বীর বাজীরাওয়ের হাতে সমর্পণ করে বুন্দেলখণ্ডের রাজন্যবর্গের সঙ্গে একযোগে এই মর্ম্মে এক সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হলেন যে, অতঃপর পেশোয়ার আশ্রিত মিত্ররাজ্য-রূপে তাঁরা নির্ভয়ে স্ব স্ব রাজ্যশাসন করতে থাকবেন এবং কেউ আক্রান্ত হলে পেশোয়া তখন তাঁকে রক্ষা করবেন। যে সব রাজ্যের সঙ্গে পেশোয়া এই ভাবে সন্ধি করলেন, তাদের মধ্যে ঝাঁসীও এক বিশিষ্ট রাজ্য। এই রাজবংশ মহারাজ ছত্রশালের সমসাময়িক এবং আত্মীয়গোষ্ঠী-সম্ভূত। কেন না, বুন্দেলার মতন ঝাঁসীর রাজারাও ব্রাহ্মণবংশীয়।

দিন যায়। ক্রমে পেশোয়াদের অমিত পরাক্রমেও ভাঙ্গন ধরে এলো; ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী তখন ইংরেজ-শক্তির অনুকূলে। ফলে, ভারতীয় রাজ্যগুলি ক্রমে ক্রমে ইংরেজের সার্ব্বভৌম শক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এই সূত্রে বুন্দেলখণ্ডের পেশোয়া-আশ্রিত রাজ্যগুলিকেও এক পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হতে হলো। ১৮১৭ সালে বুন্দেলখণ্ড পেশোয়াদের হস্তচ্যুত হয়ে ইংরেজের হস্তগত হলো। ইংরেজ তখন পেশোয়াদের মতই রক্ষকস্বরূপ হয়ে বুন্দেলখণ্ডের প্রত্যেক রাজার সঙ্গে নতুন করে সন্ধি করলেন। এই সন্ধি সম্পর্কেই ঝাঁসীর তৎকালীন রাজা রামচন্দ্ররাও এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা পুরুষানুক্রমে ঝাঁসীরাজ্যের অধিপতি ও স্বত্বাধিকারী বলে ইংরেজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হলেন। এই সন্ধিতে কোন রাজ্যের রাজা রাজ-মর্য্যাদাচ্যুত হননি, ইংরেজের সঙ্গে রাজা-প্রজা-সূচক কোন সম্বন্ধও স্থাপিত হয়নি—উভয় পক্ষই পরস্পরের মিত্ররূপেই অভিহিত হন। এই মিত্রতার পরিচয় পেলেন ইংরেজ ১৮২৫ সালের ভরতপুর সংগ্রামের সঙ্কটকালে। ইংরেজকে সে সময় বিপন্ন দেখে বোন্দিলারা ঝাঁসীর সন্নিহিত কাল্পী নামক ইংরেজদের এক নগরী অবরোধ করে। ঝাঁসী-রাজ রামচন্দ্র রাও সে সময় চার শত অশ্বারোহী, এক হাজার পদাতি ও দু'টি কামান পাঠিয়ে কাল্পী রক্ষায় ইংরেজকে সাহায্য করেন—তাঁর সাহায্যের জন্যই তখন কাল্পী রক্ষা পায়।

এর পর এলো ১৮৩২ সালের স্মরণীয় ১৯শে ডিসেম্বর। মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক তখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল। তিনি রাজ্যের পরম সঙ্কটে ঝাঁসীর মিত্র-রাজা রামচন্দ্র রাওয়ের আচরণের

কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং সেই সন্তোষ শুধু মুখের কথাতেই শেষ করা সঙ্গত মনে করলেন না। ফলে, গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক সাহাহুর স্বয়ং ঝাঁসীতে এলেন পরম মিত্ররাজের প্রতি যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অভিপ্রায় নিয়ে। ঝাঁসীর বিশাল রাজভবনে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে এক দরবার করে গবর্ণর জেনারেল সাহাহুর ঝাঁসীরাজ রামচন্দ্র রাওকে মহারাজা উপাধির সঙ্গে ছত্র চামর প্রভৃতি উপহার দিয়ে তাঁর রাজগৌরব আরো বাড়িয়ে দিলেন এবং নূতন মহারাজার সঙ্গে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পরম সৌহৃদ্যের কথা আর একবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন। এর ফলে সারা ঝাঁসীরাজ্যে আনন্দের বান ডেকে গেলো; সকলেই জানলো, প্রবল প্রতাপ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ঝাঁসী সরকারের বন্ধুত্ব আরো নিবিড় হওয়ায় ভবিষ্যতে কোনরূপ বিপত্তি ঘটবার আর আশঙ্কা রইল না। এ থেকে বুঝতে কোন গোল বা অসুবিধা ছিল না যে, মহারাজ রামচন্দ্র রাওয়ের বংশধররূপে মহারাজ গঙ্গাধর রাও ইংরেজের মিত্র-রাজরূপেই স্বাধীন ভাবে ঝাঁসীতে রাজত্ব করছেন। কিন্তু চতুর ইংরেজ যে এর মধ্যে একটা ফাঁক রেখেছিল—রাণী লক্ষ্মীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই সেটা এক দিন ধরা পড়ে গেল। [ক্রমশঃ।

গল্প হলেও সত্যি

সুবোধকুমার নন্দী

তখন বাবাসাহেব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এক জন সুদক্ষ বিচারক। এক দিন গ্রামের কতকগুলি লোক দুইটি চোরকে ধরিয়া তাঁহার নিকট বিচারের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই জন চোর কিন্তু নিজের নিজের দোষ অস্বীকার করিল ও এক জন আর এক জনের উপর চুরির দোষ চাপাইতে লাগিল। যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে চুরি হইয়াছিল তিনি বলিলেন, "গতকাল সন্ধ্যা বেলায় একটি পথিক আমার বাড়ী আসিয়া রাত্রিটা কাটাইবার জন্য একটু আশ্রয় চাহিল। অতিথি দেখিয়া আমি যত্নের সহিত তাহার আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলাম এবং তার পর বাহিরের একটা ঘরে বিছানা করিয়া তাহার শুইবার বন্দোবস্তও করিয়া দিলাম। অনেক রাত্রে হঠাৎ 'চোর' 'চোর' শব্দ শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শশব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখি, চোর আমার ঘরে সিঁদ কাটিয়াছে। আমাদের পাশের গ্রামের এক ব্যক্তি আর সেই পথিক অতিথি পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া 'চোর' 'চোর' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। ইহাদের কাহাকেও আমি চুরি করিতে দেখি নাই। কে আসল চোর তাহা জানি না। তাই দু'জনকেই বিচারের জন্য ধরিয়া আনিয়াছি।"

তখন অতিথি বলিল, "মহাশয়, আমি বাহিরের ঘরে শুইয়াছিলাম। অনেক রাত্রে সিঁদ কাটার শব্দে জাগিয়া উঠিয়া এই চারকে ধরিলাম। উহাকে ধরিয়া যেই আমি 'চোর' 'চোর' শব্দে চিৎকার করিতে লাগিলাম, সেও অমনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া 'চোর' 'চোর' বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। হুজুর, আমি নির্দ্দোষ, আমাকে ছাড়িয়া দিন।" এই বলিয়া সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

অপর ব্যক্তি বলিল, "হুজুর, আমি রাত্রে গাড়ী না পাইয়া কারখানা থেকে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। এই ভদ্রলোকের বাড়ীর ধার দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম, চোর ইহার ঘরে সিঁদ কাটিতেছে। তখন আমি তাহাকে ধরিয়া 'চোর' 'চোর' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম। আর এই ব্যক্তি গ্রামবাসী আর কেহই নাই দেখিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল এবং 'চোর' 'চোর' শব্দে চিৎকার করিতে লাগিল। তার পর ইহারা আসিয়া সকলে মিলিয়া চোরের সহিত আমাকেও ধরিয়া আনিয়াছে। আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

গ্রামের এক ব্যক্তি বলিল, "হুজুর, আমার মনে হয়, ইহাদের কেহই চোর নয়। ইহাদের দু'জনারই চোরকে ধরিতে ভ্রম হইয়াছে। চোর হয়ত পলাইয়াছে।"

বিচারক কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তার পর বলিলেন, "আগামী কাল এই ব্যাপারের বিচার করিব।" গৃহে ফিরিয়া বিচারক তাঁহার এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রামদাসের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিলেন।

পরদিন বিচার হইবে। চোর দুই জনকে আনা হইয়াছে। বিচার আরম্ভ হইবে এমন সময় হঠাৎ বিচারকের আরদালি আসিয়া খবর দিল, "হুজুর, রামদাস মারা গিয়াছে। রাস্তার ধারে তাহার মৃতদেহ পড়িয়া আছে।" ইহা শুনিয়া বিচারক দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন, "এই চোর দুই জনকে লইয়া যাও। ইহারা মৃতদেহটি এখানে বহিয়া আনুক।"

কিছু পরেই দেখা গেল, রাস্তায় দুই চোরে মৃতদেহটি ঘাড়ে করিয়া বহিয়া আনিতেছে আর প্রহরীরা তাহাদের পিছনে একটু দূরে আসিতেছে। এমন সময় সেই অতিথি বলিল, "হায়! ভাল করিবার জন্য চোর ধরিতে গেলাম আর তাহার ফলে এই সমস্ত লোক করিতেছি। আজ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়া এই অপবিত্র মড়া বহিতেছি।" অপর ব্যক্তি তাহার কথা শুনিয়া বলিল, "ঠিকই হইয়াছে। যেমন আমাকে ধরিতে গিয়াছিলি, তেমনি তাহার ফল পাইতেছিস।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা মৃতদেহটি বিচারকের নিকট লইয়া আসিল, কিন্তু বিচারকের সম্মুখে রাখিবা মাত্র মৃতদেহটি গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পর বলিল, "হুজুর, এই ব্যক্তি চোর, আর অতিথি নির্দ্দোষ, ইহাকে ছাড়িয়া দিন।" তখন রামদাস রাস্তায় যেসব কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিল সব বলিল। এইবার সকলেই বুঝিতে পারিল রামদাস মরে নাই। বিচারকের কথায় মড়ার মত রাস্তায় পড়িয়াছিল। এই ভাবে বিচারক কৌশলে আসল চোর ধরিয়া ফেলিলেন।

এখন এই বিচারক কে? তোমাদের নিশ্চয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনি হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যুদ্ধং দেহি!

"যুদ্ধে জয়ী হওয়ার একমাত্র পথ হ'ল যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়া।"

—জর্জ মার্শাল।

কুড়ি

আপন প্রেমমুগ্ধতা নিয়ে অধিকক্ষণ একাকী কাল কাটাতে হোল না কলিন্সকে। বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন ভাবী শাশুড়ী। তিনি যখন দেখলেন, কলিন্সের সঙ্গে আলাপ করে দ্রুত-হাতে দরজার হাতল ঘুরিয়ে ততোধিক দ্রুত-পায়ে এলিজাবেথ তার পাশ দিয়ে সবেগে চলে গেল সিঁড়ির দিকে, আর অপেক্ষা না করে তিনিও ঘরে প্রবেশ করে ভাবী জামাতাকে পরম স্নেহের সঙ্গে অভিনন্দন জানালেন। সে অভিনন্দন সানন্দে গ্রহণ করে কলিন্স অতঃপর বিবৃত করল তার সঙ্গে এলিজাবেথের কথাবার্তা। এলিজাবেথ যে স্বাভাবিক ব্রীড়া ও চরিত্রের অনুপম স্নিগ্ধতার জন্যই তাকে আদ্যন্ত 'না' 'না' করেছে সে-কথাও বেনেট-গিন্নীকে সে জানাতে ভুলল না।

এলিজাবেথের এই প্রত্যাখ্যানের কথা শুনে মায়ের হৃদয় স্বস্তি পেল না। 'তা হোক' বললেন তিনি—'ওকে আমরা রাজী করাব। ঐ মেয়েটি আমার বড়ো জেদী আর বোকা। নিজের মঙ্গল কিসে তা বোঝে না। যাক্, সে আমি ওকে বুঝিয়ে দেব।'

—'মাপ করবেন'—বললে কলিন্স—'সত্যি যদি আপনার মেয়ে জেদী হয় তাকে বৌ হিসেবে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমার পাদরী-জীবনে সুখী বিবাহিত জীবনই প্রধান কাম্য। সে ক্ষেত্রে আপনার মেয়ের প্রত্যাখ্যান আমার পক্ষে শুভ। তাকে আর মিছিমিছি আপনি জোর করবেন না।'

—'সে কি কথা বলছ বাবা।' বেনেট-গিন্নী উদ্ধত আগ্রহে বললেন—'নিজের বিয়ের ব্যাপারেই ওর যত জেদ। নইলে অমন ঠাণ্ডা নরম মেয়ে তুমি কদাচিৎ দেখতে পাবে। কিছু ভাবনার নেই, ওর বাবার সঙ্গে বসে আমি সব ঠিক করে ফেলব।'

আর কোন জবাব কানে না নিয়ে তিনি সোজা গিয়ে ঢুকলেন স্বামীর ঘরে। 'হ্যাঁ গো, শুনছ। এলিজাবেথ তো কলিন্সকে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। তুমি বাপু মাঝে না দাঁড়ালে তো এমন সুপাত্র আমাদের ঘরে আসে না।'

স্ত্রীর কথা শুনে তিনি বললেন—'কিসের কথা বলছ, বুঝতে পারলে ভারী খুসী হব। একটু ভেবে বলা দরকার মনে হচ্ছে।'

—'নিজে বল মেয়েকে। বলো, তোমার ইচ্ছা যে এলিজাবেথ তাকে বিয়ে করুক।'

—'ডাক তবে তাকে।'

এলিজাবেথ ঘরে উপস্থিত হওয়া মাত্র বাপ তাকে সম্বোধন করে বললেন—'শোন মা। তোমার সঙ্গে একটা জরুরী আলোচনা করতে চাই। আমি শুনলাম, কলিন্স তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে। এ কথা কি সত্যি?'

—'হ্যাঁ, বাবা—'

—'তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছ?'

—'হ্যাঁ বাবা'—

—'কিন্তু তোমার মা'র ইচ্ছা যে তুমি কলিন্সকে গ্রহণ কর।'

বেনেট-গিন্নী কপট ক্রোধে বললেন—'নিশ্চয়ই। নইলে ও-মেয়ের মুখ আর জন্মে আমি দেখতে চাই নে।'

—'তাহলেই দেখ', বললেন বাপ—'যদি তুমি তাকে বিয়ে না কর তোমার মা আর কখনো তোমার মুখ দেখবেন না। আর যদি তুমি ওকে বিয়ে করো তবে আমি আর কখনো তোমার মুখ দেখব না।'

বেনেট-গিন্নী স্বামীর এই লঘুচিত্ততায় রাগ করে চলে গেলেন। এলিজাবেথ নীরবে হাসতে লাগল।

কলিন্সও একলা ঘরে সব বিষয়টি রোমন্থন করছিল মনে-মনে। এলিজাবেথ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে কিসের জন্যে তা তার মাথায় আসে না। পাত্র হিসেবে তার চেয়ে ভাল আর কে হতে পারে? তবু ঐ মুখরা মেয়েটির উপর কোন ক্ষোভ তার মনে জমা হোল না। সে যে তার মায়ের কাছে এর জন্যে লাঞ্ছনা ও ভর্ৎসনা লাভ করেছে, সেই কথা চিন্তা করে আর কলিন্সের মনে কোন দুঃখ রইল না।

সে বেনেট-গিন্নীকে বললে এক সময়—'আমার ভুল হয়েছে যে, আপনাদের কাছে প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত না হয়ে আপনার মেয়ের কাছে প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হলাম। কিন্তু মানুষ মাত্রেই ভুল করে। তবু সব জিনিষটাই শোভন ভাবে করতে চেয়েছিলাম আমি। আমার অভিলাষ ছিল, আপনাদের পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রেখে আপনাদের ঘর থেকেই একটি মনোরমা পত্নী নির্বাচন করা। কিন্তু আমার আচরণ যদি কোন ভাবে আপনাদের মনে দুঃখ দিয়ে থাকে, তবে তার জন্যে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

একুশ

কলিন্সের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা প্রায় ধামা-চাপা পড়ে গেছে। এলিজাবেথ শুধু মাঝে-মাঝে এক অস্বস্তিকর চিন্তায় পীড়িত হয় আর মা এই প্রসঙ্গ তুলে মাঝে মাঝে তাকে খোঁচা দেন। কলিন্সের

তার প্রতি তুই তোর কর্তব্য করেছিস—এ নিয়ে আর খুঁত-খুঁত করিস্ নে।'

—'কিন্তু সবই ভাল ধরে নিয়েও আমি কি সুখী হতে পাবব এমন এক জন লোককে পেয়ে যার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব তাকে অন্যত্র বিয়ে দিতে চায়?'

—'সে বিচারের ভার তোমার। যদি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে স্থির করো যে, তুই বোনকে অসন্তুষ্ট করার দুঃখ তার বৌ হওয়ার সুখের তুলনায় ঢের বেশী, সে ক্ষেত্রে আমার উপদেশ হোল তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা।'

—'কী যে বলিস'—ক্ষীণ হাসি দেখা দিল জেনের মুখে—'জানিস তো, তাদের অমতে দুঃখিত হব খুবই কিন্তু ওঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারব না।'

—'পারবে তা আমিও ভাবি না। আর সে জন্যই তোর অবস্থায় আমার করুণা হয়নি।'

—'কিন্তু শীতে যদি সে না ফেরে আমার বিচার-অবিচারের হয়ত আর প্রশ্নই উঠবে না। ছ'মাসে হাজারো রকম কিছু ঘটতে পারে।'

বিংলের আর ফিরে না আসাটা এলিজাবেথের কাছে অতি ঘৃণ্য মনে হোল। ক্যারোলিনের স্বার্থের গন্ধই পেলে সে এর মধ্যে। মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারে না সে, কেমন করে এক জন স্বাধীন-চিত্ত যুবক বোনের ইচ্ছায় পরিচালিত হতে পারে! এ বিষয়ে তার মতামত বিশেষ জোরের সঙ্গেই জাহির করলে এলিজাবেথ এবং শীগ্‌গিরই এর সুখময় পরিণতি দেখতে পাবে জানালে। হতাশায় মুসড়ে-পড়া জেনের প্রকৃতি নয় কোন দিনই। আশার সঞ্চার হতে লাগল ক্রমশঃ কিন্তু তবুও মাঝে-মাঝে ভালবাসায় সন্দেহ আশাকেও পরাভূত করতে লাগল। কে জানে, হয়ত বিংলে আর ফিরবে না নেদারফিল্ডে।

স্থির হোল, মাকে শুধু জানান হবে যে ওরা সবাই লণ্ডনে চলে গেছে—বিংলের ব্যাপার সম্বন্ধে কোন ইংগিতই করা হবে না। কিন্তু তিনি অর্ধেকটা শুনেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ঠিক যে মুহূর্তে তারা পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল, সেই মুহূর্তে ও-বাড়ীর লোকদের চলে যাওয়ায় অত্যন্ত মর্মাহত হলেন তিনি। কিছুক্ষণ বিলাপের পর তিনি মনকে এই বলে প্রবোধ দিলেন যে, বিংলে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে লংবোর্নে। সব শেষে ঘোষণা করলেন, এর আগে উনাদেরই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল শুধু—এবার দু'বেলাই খাওয়াবেন তাকে।

বাইশ

পরদিন বেনেটেরা লুকাস-পরিবারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। মিস্ লুকাস দিন-ভোর কলিন্সের সঙ্গে গল্পে-গল্পে কাটালে। "কী খোশ-মেজাজেই না রেখেছ ওকে ভাই তুমি। কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমায়'—বললে এলিজাবেথ বান্ধবীকে। শার্লটি জবাবে বললে যে, সখীকে সে হতাশ করবে না। কিন্তু শার্লটি যে অভিসন্ধি নিয়ে ফিরছিল তার ধারণাও ছিল না এলিজাবেথের। কলিন্সকে লাভ করার সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হতে চায়। সে রাত্রে যখন তারা বিদায় নিল পরস্পরের কাছ থেকে তখন তার মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না যে, কলিন্সকে সে জয় করতে পেরেছে যদিও লোকটি অচিরেই এ দেশ থেকে চলে যাবে মনস্থ করেছে কিন্তু শার্লটি স্বপ্নেও যা ভাবেনি তাই হোল। পরদিন ভোর না হতেই চোরের মত এ-বাড়ী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সবার অলক্ষ্যে কলিন্স লুকাসদের বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। বোনেদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্য যে, তার এই নূতন অভিযান নিয়ে তারা নানা অর্থ করে বসবে। তা ভিন্ন কিছুটা সাফল্যের নিদর্শন না পেলে সে ব্যাপারটা জানাজানি করতেও চায় না। শার্লটির স্নিগ্ধ সদয়তায় যথেষ্ট সাহসী হয়ে উঠলেও বুধবারের প্রত্যাখ্যানের আগুন তখনো নেবেনি তার হৃদয়ে। কিন্তু যে ভাবে কলিন্স এখানে সমাদৃত হলো তাতে তার আশাতিরিক্ত পুরস্কার লাভ ঘটল। মিস্ লুকাস তাকে উপরের বাতায়ন থেকে লক্ষ্য করেই নীচে নেমে এল এবং যেন হঠাৎই দেখা হোল এই ভাবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল পথে। সে-ও ভাবতে পারেনি যে, এক দিনের প্রীতিপূর্ণ আলাপে পুরুষটির হৃদয়ের এতখানি প্রেম তারই জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে।

পথের ঐটুকু নিভৃত বিশ্রম্ভালাপের মধ্যেই অনেক কিছু পাকা হয়ে গেল তাদের মধ্যে। দু'টিতে যখন বাড়ীতে প্রবেশোন্মুখ তখনই কলিন্স তাকে মিনতি করে বললে সেই পবিত্র দিনটির কথা উচ্চারণ করতে যেদিন সে নিজেকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুখী মানুষ বলে মনে করতে পারবে। এই মানুষটিকে গ্রহণ করার মূল কারণ বিষয়-বুদ্ধি সঞ্জাত হওয়ায় শার্লটিও সে বিষয়ে কোন নিরুৎসাহ করলে না তাকে।

বাপ-মা এ কথা শুনে দু'জনকে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন। নিজেদের অবস্থা-বৈগুণ্যে তাঁরা মেয়েকে অধিক কিছু যৌতুক দিতে পারতেন না। সে অবস্থায় কলিন্সের মত জামাতা লাভ পরম আনন্দের সন্দেহ নেই। তাছাড়া ছেলেটির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধিও সমুজ্জ্বল। মা তক্ষুনি মনে-মনে হিসেব করলেন, আর কত দিন মিঃ বেনেট বাঁচতে পারেন অর্থাৎ আর কত দিনের মধ্যে তাঁর মেয়ে স্বামীকে নিয়ে ঐ বাড়ী ও সম্পত্তি দখল করতে পারবে। সমস্ত পরিবারটি এই সুখবরে মুহূর্তে আনন্দ-মুখর হয়ে উঠল। আর সকলে যা-ই ভাবুক, শার্লটি নিজের মনের সঙ্গে অনেকখানি বোঝাপড়া করে নিলে। মনোমত নাই হোক তবু ত সে তার স্বামী হবে। চিরকুমারী না থেকে সে ত ঘর-বর পাবে। বিয়ে হওয়া তার সাধনা ছিল, এতদিনে তা সফল হতে যাচ্ছে। লেখাপড়া-জানা গরীব মেয়েদের পক্ষে বিয়েই একমাত্র সৎ-জীবিকার উপায়। সুখের দিক থেকে বিয়ে যতই অনিশ্চিত হোক না কেন, অভাব থেকে বাঁচার পথ নিশ্চয়ই। সাতাশ বছর অপেক্ষা করার পর অবশেষে সুদিন এলো তার। তার এই সৌভাগ্যে এলিজাবেথ কতখানি আশ্চর্য হবে তাই ভাবলে শার্লটি। এলিজাবেথের চেয়ে প্রিয়জন আর তার কেউ ছিল না পৃথিবীতে। হয়ত বা সখী তাকে দোষ দেবে। তার চেয়ে বরং নিজেই সখী-সন্দর্শনে গিয়ে তাকে সব কথা খুলে বলবে। কলিন্সকে সে অনুরোধ করলে যেন এ সম্বন্ধে কোন কথা সে বেনেট-পরিবারে না ব্যক্ত করে। কলিন্স সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলে।

পরদিন ভোরেই বিদায় নেবে কলিন্স জানাল রাত্রে আহারের সময়। বোনেদের কাছে সে সহাস্যে বিদায় নিলে। বেনেট-গিন্নী

সৌজন্যের সঙ্গে তাকে অনুরোধ করলেন যে, যখনই সুযোগ-সুবিধা ঘটবে কলিন্স যেন এ বাড়ীতে আতিথ্য নেয়।

—'আপনার এই আমন্ত্রণ আমি পরম আগ্রহে গ্রহণ করলাম। কেন না, অতি নিকট-ভবিষ্যতেই এখানে আবার ফেরার বাসনা নিয়েই এবার বিদায় নিচ্ছি।'

এ কথায় সবাই বিস্মিত হলেন। মিঃ বেনেট তার এই আশু প্রত্যাবর্তনের মানসে বিচলিত হয়ে বললেন—'কিন্তু তাতে লেডী ক্যাথারিন হয়ত বা অসন্তোষ বোধ করবেন। আমার ত মনে হয়, কাজের খাতিরে আত্মীয়-স্বজনকেও পরিহার করা উচিত।'

—'আপনাকে ধন্যবাদ স্যার।' বললে কলিন্স—'কিন্তু তাঁর চিরস্নেহের সম্মতি না নিয়ে কোন কিছুই আমি করব না সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

কিন্তু সে রাত্রের কথাবার্তায় এটুকু সবাই আভাসে বুঝলে, যে কোন কারণেই হোক, কলিন্স সত্ত প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ নিয়েই এবার বিদায় নিচ্ছে; কিন্তু তার এই বাসনার পিছনে কি প্রেরণা তা কেউই উপলব্ধি করতে পারলে না।

পরদিন সকালে মিস্ লুকাস প্রিয়সখীর কাছে এসে বসল নিভৃতে। গত দু'দিন এলিজাবেথের মনে এ মৃদু সম্ভাবনা উঁকি মারছিল যে, কলিন্স ভাবছে যে শার্লটি তাকে প্রেমের প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু শার্লটি যে সত্যিই তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে এই বাস্তব সত্যে তার মনে এমন বিস্ময়ের ধাক্কা লাগল যে, সব ভুলে গিয়ে সে চেঁচিয়ে বললে—ঐ লোকটির সঙ্গে বাগ্‌দত্তা হয়েছিস। আমি বিশ্বাস করি না। এ সম্ভব?'

বান্ধবীর এই হঠাৎ উচ্ছ্বাসে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও শার্লটি এ ভর্ৎসনার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। নিজের শান্ত ভঙ্গীটুকু বজায় রেখে সে সখীকে বললে—'এতে অবাক হচ্ছিস কেন ভাই! তোর কাছ থেকে সাড়া পায়নি বলে কোন মেয়ের কাছেই সে প্রীতি পাবে না, এমন অবিশ্বাস্য কথা কেন তুই ভাবতে পারলি!'

এলিজাবেথও নিজেকে সামলে নিয়েছে এতক্ষণে। সে নিজের ভুল স্বীকার করে বান্ধবীর পরম সুখ কামনা করলে।

—'তুই কি ভাবছিস আমি জানি'—বললে শার্লটি—'তোর অবাক হবার কারণও বুঝি আমি। কিন্তু তুই জানিস, আমি ভাবালু মেয়ে নই। কখনও ছিলামও না। আমি শুধু চাই একটি আরামের ঘর। আর এই লোকটির সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম্পত্তির কথা ভেবে দেখলে আমার ত মনে হয় যে, বিবাহোত্তর জীবনে মেয়েরা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে তার কোনটারই আমার অভাব হবে না।'

শার্লটি বিদায় নিলে নিজের ঘরে বসে এলিজাবেথ কত কি ভাবলে মনে-মনে। তিন দিনে দু'বার প্রেম-নিবেদন করে যে লোক, তার সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়ে ঐ মেয়েটি কতখানি সুখী হবে তাই ভাবতে লাগল সে। যদিও সে জানে বিয়ে সম্বন্ধে তার ধারণা, শার্লটির তা নয়। তবু।

তেইশ

মা ও বোনের সঙ্গে বসেছিল এলিজাবেথ। যে কথা সে শুনেছে তা কি তা বলা ঠিক হবে? এমন সময় স্যার লুকাস স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। মেয়ে পাঠিয়েছে তাঁকে বিয়ের কথাটা জানাতে এদের। লংবোর্ণ-পরিবারের অপরিমিত প্রশংসা করে দুই পরিবারের মধ্যে আশু আত্মীয়তার সম্ভাবনায় খুশী-চিত্ত স্যার লুকাস বিবৃত করলেন তাঁর শুভ সন্দেশ। শ্রোত্রীমণ্ডলী সব শুনে কেবল মাত্র বিস্মিতই হোল না, উড়িয়ে দিতে চাইলে কথাটা। মিসেস্ বেনেট বললেন—'আপনার নিশ্চয়ই ভুল ঘটেছে কোথাও।' লিডিয়ার অত সৌজন্যের বালাই নেই—সে ফস করে বলে বসল—'কি যে বলেন? কলিন্স তো লিজিকেই বিয়ে করতে চায়।'

কিন্তু এত প্রতিবাদেও স্যার লুকাস নিষ্প্রভ হলেন না। তাঁর সংবাদ যে স্থির, জোর-গলায় সে কথা বললেন তিনি এবং ক্ষমাশীল ধৈর্যের সঙ্গে এদের নিলর্জ্জতা হজম করতে লাগলেন।

এই অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করা কর্তব্য মনে করে এলিজাবেথ এগিয়ে এল তাঁর সাহায্যে এবং জানাল, কথাটা সত্যি—বান্ধবীর কাছ থেকে পূর্বাহ্নেই শুনেছে সে। মা ও বোনেদের বিস্ময়কে থামিয়ে দেবার জন্য সে সাগ্রহে অভিনন্দন করল ভাগ্যবতীর পিতাকে—জেনও যোগ দিল তার সাথে।

স্যার লুকাস যতক্ষণ রইলেন এদের মা আর বিশেষ কিছুই বলতে পারলেন না, এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু স্যার লুকাস চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বর্ষণ-মুখর হয়ে উঠলেন। প্রথমতঃ, সমস্ত ব্যাপারটাকেই তিনি অবিশ্বাস করলেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মাল যে, কলিন্সকে তারা বাধ্য করেছে কোন কৌশলে। তৃতীয়তঃ, তাঁর ধারণা এ বিয়ে সুখের হবে না। চতুর্থতঃ, তিনি বিশ্বাস করেন এ বিয়ে ভেঙ্গে যাবেই। আর সমস্ত কিছু থেকে সিদ্ধান্ত করলেন তিনি যে, এলিজাবেথই হোল যত অনর্থের মূল। তা ছাড়া এ-বাড়ীর সবাই মিলে অমন ভাল ছেলের সঙ্গে বর্বরোচিত ব্যবহার করেছে। কোন মতেই আর তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া গেল না—কিছুতেই প্রশমিত হবেন না তিনি। পুরো এক দিনেও তাঁর রাগ পড়ল না। না বকে এক সপ্তাহের আগে তিনি কথাই বলতে পারলেন না এলিজাবেথের সঙ্গে। এক মাসের আগে রূঢ় না হয়ে স্যার লুকাস বা লেডী লুকাসের সঙ্গে ভাল করে বাক্যালাপ করলেন না তিনি আর মেয়েকে ক্ষমা করতে অনেক,—অনেক মাস কেটে গেল।

এ বিয়ের সংবাদে জেনও সত্যি একটু বিস্মিত হোল। কিন্তু মনের ভাব সে গোপন রাখলে। এ বিয়ে যে অসম্ভব নয় এ কথা কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারলে না এলিজাবেথ। কিটি বা লিডিয়া মিস্ লুকাসের ভাগ্যে একটুও ঈর্ষান্বিত হোল না, কেন না কলিন্স তো সামান্য এক জন পাদরী ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের কাছে এ বিয়েটা মেরীটনে গল্প করার মত ঘটনা ছাড়া আর বেশী কিছু মনে হোল না।

তাঁর মেয়ের যে ভাল বিয়ে হোল বেনেট-গিন্নীকে এ কথাটা শোনাতে ছাড়লেন না লুকাস-গিন্নী। মিসেস্ বেনেটের গোমরা মুখ আর কটু মন্তব্য সত্ত্বেও আগের চেয়ে ঢের বেশী হামেশা তিনি লংবোর্ণে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন শুধু বলতে যে, খুব খুশী হয়েছেন তিনি এ বিয়েতে।

এলিজাবেথ আর শার্লটির মধ্যেও কেমন একটা সংকোচের পর্দা নেমে এল যার ফলে দু'জনেই এ সম্বন্ধে নীরব রইল।

কিছু না হলে বোন কেন দাদার স্বাধীনতায় বাধা দেবে? বিংলে যদি আমার প্রতি অনুরাগীই হয় তারা নিশ্চয়ই বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করবে না। করলেও সফল হবে না। এই রকম একটা সম্পর্কের কথা কল্পনা করেই তুই সবার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করছিস আর আমাকেও অত্যন্ত অসুখী করে তুলেছিস। এই রকম ভাবে আমাকে দুঃখ দিস নে। ভুল হয়েছে আমার, স্বীকার করতে একটুও লজ্জিত নই আমি। বরং তার সম্বন্ধে, তার বোনেদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করার তুলনায় এ অতি তুচ্ছ। প্রসন্ন চিত্তেই এটাকে গ্রহণ করতে চাই আমি—ঠিক যে ভাবে বোঝা যায়।'

এ ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করতে পারলে না এলিজাবেথ। এর পর থেকে বিংলের নাম কদাচিৎ উচ্চারিত হোত দু'জনের মধ্যে।

মিসেস্ বেনেটের এখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। বিংলের ফিরে না আসার জন্য এখনও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন। এমন এক দিনও যায় না যেদিন না এলিজাবেথকে এর কৈফিয়ৎ দিতে হয়। মেয়ে নিজে যা বিশ্বাস করে না, তাই বিশ্বাস করাতে চায় মাকে অর্থাৎ জেনের প্রতি বিংলের অনুরাগ সাময়িক এবং অসাক্ষাতের সঙ্গে-সঙ্গে তা স্তিমিত হয়ে এসেছে। এ সম্ভাবনার কথা মেনে নিলেও বারে বারে এ কথা বোঝাতে হয় তাকে। মিসেস্ বেনেটের একমাত্র আশা, বিংলে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে গ্রীষ্মে।

মিঃ বেনেট কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে বিচার করেছেন সমগ্র ব্যাপারটাকে। এক দিন এলিজাবেথকে ডেকে বললেন তিনি—'দিদিটি তোমার দেখছি ভীষণ প্রেমে পড়েছে। আমার অভিনন্দন তাকে। বিয়ের আগে মেয়েরা প্রেমে পড়তে চায়—এতে বান্ধবী-মহলে খাতির বাড়ে এবং তা নিয়ে চিন্তার জাবর কাটা যায়। তোমার পালা কবে? জেন তোমাকে টেক্কা দিয়ে যাবে বেশী দিন এ হতেই পারে না। এবার তোমার পালা। মেরীটনে অনেক অফিসার আছে যারা এখানকার সব মেয়েদের হতাশ করতে পারে। উইকহ্যাম তোমার পছন্দ হোক। বেশ ছেলে—তোমার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে।'

—'জেনের মত বড় আশা সবার করলে চলবে কেন? উইকহ্যামের চেয়ে খারাপেও চলতে পাবে আমার।'

—'তা সত্যি। তবে এটা সুখের কথা যে, তোমাদের এমন স্নেহময়ী মা আছেন যিনি তাই নিয়েই চূড়ান্ত করে ছাড়বেন।'

যে বিষণ্ণ আবহাওয়া লংবোর্ণ-পরিবারের আকাশ গুমোট করেছিল উইকহ্যামের উপস্থিতিতে তার অনেকখানি অপসৃত হোল। প্রায়ই দেখা হয় তার সঙ্গে। তার সম্বন্ধে এলিজাবেথ যা শুনেছিল, ডার্সিদের সম্পত্তিতে অধিকার এবং ডার্সির নিকট হতে যে অন্যায় ব্যবহার পেয়েছে সে—এখন তা সকলেই জেনে ফেলেছে। সকলের মধ্যেই তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেকেই খুশী হয়েছে—কারণ এ সব জানার আগে থেকেই লোকটাকে কেউ পছন্দ করত না।

একমাত্র জেনের ধারণা, সব কিছুর অন্তরালে এমন একটা অপরাধ-মূলক কিছু আছে যা অজ্ঞাত হার্টফোর্ডশায়ারের সমাজে। জেনের এমন নরম স্নিগ্ধ স্বভাব যে, সব সময়ই তার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে। কিন্তু অন্য সকলের চোখে ডার্সি জঘন্য চরিত্রের লোক বলে নিন্দিত হতে লাগল।

পঁচিশ

আর এক সপ্তাহ প্রেম-নিবেদন ও সুখ-সৌধ রচনার পর কলিন্সকে ছেড়ে যেতে হোল প্রিয় শার্লটির স্নেহপাশ ছিন্ন করে। শনিবার আগত। এই বিচ্ছেদ-বেদনার লাঘব হোল যা হোক নববধূকে অভ্যর্থনা-আয়োজনের প্রস্তুতিতে। এ আশা সে নিঃসন্দেহ করতে পারে যে, কয়েক দিন পরে হার্টফোর্ডশায়ারে ফিরে এলেই সেই শুভ-দিন নির্ধারিত হবে যা তার জীবনকে সুখময় করে তুলবে। আগের মতই ভদ্রতার সহিত বোনেদের কাছ থেকে বিদায় নিলে কলিন্স—সুন্দরী বোনেদের সুখ ও স্বাস্থ্য কামনা করলে এবং কাকাকে পত্র লেখার প্রতিশ্রুতি দিলে।

পরদিন সোমবারে মিসেস্ বেনেটের ভাই ও ভাজ ক্রিষ্টমাস কাটাতে এসে উপস্থিত হলেন লংবোর্ণে।

মিসেস্ গার্ডিনার এসে প্রথমেই উপহারগুলি বণ্টন করলেন এবং সহরের হাল-ফ্যাশানের ফিরিস্তি দিলেন। তাঁর বলার পালা শেষ হলে শোনার পালা পড়ল। বেনেট-গিন্নী ভাজের কাছে অনেক দুঃখের কাহিনী বিবৃত করলেন—অনুযোগ করলেন অনেক। শেষ দেখা-শুনার পর কত দুঃখের ঝড় বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে। দু'মেয়ের বিয়ে হতে-হতে ভেঙ্গে গেছে। তিনি বললেন—'জেনকে আমি দোষ দিই না। হলে সে বিংলকে বিয়ে করতই। কিন্তু লিজির কথা আর কি বলব? এত দিনে সে কলিন্সের বৌ হতে পারত—নিজের একগুঁয়েমিপনার জন্য সব মাটি করলে। এই ঘরে বসেই কলিন্স বিয়ের প্রস্তাব করেছিল কিন্তু সে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার ফল হোল এই যে, মিসেস্ লুকাস আমার আগে তার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। আর লংবোর্ণের সম্পত্তি আগের মতই অনিশ্চিত হয়ে রইল। লুকাসরা খুব শেয়ানা। সব সময় গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। এ সব কথা বলা ঠিক নয় জানি। সংসারে প্রতিপদে ঘা খেয়ে-খেয়ে আস্থা হারিয়ে ফেলছি নিজের উপর আর চারি ধারে এমন সব প্রতিবেশীরা জুটেছে যারা নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। যাক, তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়ায় মনে একটু ভরসা পাচ্ছি।'

জেন আর এলিজাবেথের সঙ্গে পত্র মারফৎ মিসেস্ গার্ডিনার জেনেছেন সব কথা। ননদের কথার তিনি জবাব দিলেন খুব কম। ভাগ্নীদের প্রতি মমতা বশতঃ তিনি কথাবার্তার মোড় ঘোরালেন ভিন্ন দিকে।

পরে এলিজাবেথকে একলা পেয়ে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করলেন খুঁটিনাটি। 'জেনের পক্ষে বিয়েটা খুবই বাঞ্ছনীয় ছিল'—বললেন তিনি—'দুঃখের কথা, ভেঙ্গে গেল শেষ পর্যন্ত। অবশ্য এমনিই ঘটে হামেশাই। তোমার বর্ণনা মতে বিংলের মত ছেলেরা চট করে সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে, কয়েক সপ্তাহ চলে মন-দেওয়া-নেওয়া—তার পর ঘটনাচক্রে বিচ্ছেদ ঘটলেই সহজেই বিস্মৃত হয় প্রেমিকার কথা। এমন অবিমৃষ্যকারিতা আকচার ঘটছে।'

—'সান্ত্বনা পাওয়ার পক্ষে চমৎকার যুক্তি। কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট হব না। কয়েক দিন আগে প্রেমে ভয়ংকর মজেছিল যে স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল যুবক, সে বন্ধুদের প্ররোচনায় আর ঘুণাক্ষরেও তার কথা মনে স্থান দেবে না এ রকম ঘটে না।'

—'ভয়ংকর ভালবাসা এমন একঘেয়ে, সংশয়পূর্ণ, অনিশ্চিত ব্যাপার যে, এর থেকে কোন ধারণাই করা যায় না। আধ ঘণ্টার পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে যেমন তেমনি প্রকৃত দুর্নিবার আকর্ষণের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। বলি, শুনি বিংলের ভালবাসা কেমনতর ভীষণ ভালবাসা?'

—'এ রকম অনুরাগ আমি কখনো দেখিনি। জেনের প্রতি ভালবাসায় যেমন আত্মনিমগ্ন, অন্য মেয়েদের প্রতি তেমনি মমতাহীন ঔদাসীন্য।'

—'দুর্ভাগ্য জেনের। ওর মত সহজ মনের মেয়ে—ওর জন্য দুঃখ হয়। চট করে ও মন থেকে এ মুছে ফেলতে পারবে না। বরং, ওকে কি বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে আনা যায় না? স্থান পরিবর্ত্তনে মনের ভার লাঘব হতে পারে। তাছাড়া বাড়ীর বাইরে যাওয়া এমনিতেই মনের পক্ষে উপকারী।'

এ প্রস্তাবে এলিজাবেথ অত্যন্ত প্রীত হোল। জেনও এ প্রস্তাবে যে সহজে রাজী হবে সে-সম্বন্ধে তার একটুও সন্দেহ নেই।

—'তবে বিংলে ওখানে আছে বলে অস্বীকার করবে না তো? আমরা সহরের আর এক প্রান্তে থাকি—আমাদের সম্বন্ধ সম্পর্কের সহিত মিল নেই। আর জান তো, আমরা এত কম বাড়ী থেকে বের হই যে, আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়াই অসম্ভব। অবশ্য বিংলে যদি আসেন তো সে আলাদা কথা।'

—'কিন্তু তা একেবারে অসম্ভব। সে এখন তার বন্ধুদের হেফাজতে। ডার্সি তো কিছুতেই তাকে ঐ রকম জায়গায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে দেবে না। এ রকম কথা ভাবেন কি করে? ডার্সি হয়ত গ্রেসচার্চ স্ট্রীটের নাম শুনে থাকতে পারে, কিন্তু এ রকম স্থানে পদার্পণ করলে এক মাস তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এর ময়লা থেকে নিজেকে পরিষ্কার করতে। বিংলে তো তাকে ছেড়ে এক পাও নড়ে না।'

—'তাহলে তো আরো ভাল কথা। ওদের সঙ্গে দেখাই হবে না। কিন্তু জেন কি তার বোনকে চিঠি লেখে না? সে হয়ত দেখা করতে আসতে পারে।'

—'সে তো সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করতে পারলেই বাঁচে।' এ-সম্বন্ধে এলিজাবেথের সুসংবদ্ধ ধারণা সত্ত্বেও এবং জেনের সঙ্গে বিংলেকে যে দেখা করতে দেওয়া হবে না মেনে নিলেও এলিজাবেথের মনের উপান্তে কেমন একটা ক্ষীণ আশা উঁকি মারতে লাগল যে, দেখা হওয়াটা একেবারে অসম্ভব না-ও হতে পারে। হয়ত সম্ভবই—এক-এক সময় তাই মনে হতে লাগল। হয়ত ভালবাসা আবার নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে—জেনের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ হয়ত পরাভূত করতে সক্ষম হবে বন্ধুদের অভাবকে।

মিসেস্ বেনেট সানন্দে গ্রহণ করলেন ভাজের আমন্ত্রণ।

গার্ডিনার এক সপ্তাহ লংবোর্ণে ছিলেন এবং এমন এক দিনও অতিবাহিত হয়নি যেদিন না তাঁরা হয় লুকাস, নয় ত ফিলিপস্, নয় ত বা অফিসারদের সঙ্গে খানা খেয়েছেন। বাড়ীতে যখনই ভোজের ব্যবস্থা হোত দু'-চার জন অফিসার আসতই আর উইকহ্যাম নিশ্চিত উপস্থিত থাকত সে ভোজ-সভায়। উইকহ্যামের সঙ্গে এলিজাবেথের গভীর ঘনিষ্ঠতা মিসেস্ গার্ডিনারের মনে কেমন একটা সন্দেহের রেখাপাত করল। তিনি আড়াল থেকে লক্ষ্য করলেন দু'জনকে। তাদের মধ্যে গভীর ভালবাসা দানা বেঁধে উঠছে মনে না করলেও তাদের পরস্পরের প্রতি আনুরক্তি এতই স্পষ্ট যে, তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হার্টফোর্ডশায়ার ত্যাগ করার আগে এ-সম্বন্ধে এলিজাবেথের সঙ্গে কথা বলতেই হবে এবং এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত সতর্ক করে দেবেন তাকে।

দশ বছর আগে—তখন তাঁর বিয়ে হয়নি—মিসেস্ গার্ডিনার কিছু কাল ডার্বিশায়ারে যে অংশে ছিলেন সেখানে উইকহ্যামরাও থাকত। কাজেই দু'জনের পরিচিত এমন অনেক লোক আছেন সেখানে। পাঁচ বছর আগে ডার্সির বাবার মৃত্যুর পর যদিও উইকহ্যাম কমই গেছে সেখানে, তাহলেও তারা দু'জনেই প্রায় সকলকে চেনে।

মিসেস্ গার্ডিনার পেম্বার্লিতে ছিলেন—স্বর্গত ডার্সিকেও চিনতেন ভাল ভাবেই। কাজেই এক দফা আলোচনা হোল তাঁকে ঘিরে। উইকহ্যাম যা-যা বলল নিজের জানার সঙ্গে খুঁটিয়ে মিলিয়ে নিতে লাগলেন তিনি। বর্তমান ডার্সির ব্যবহারের কথা জানান হোল তাকে। তাঁর মনে পড়ল যে, ছেলেবেলায় অহংকারী রুক্ষ ছেলে বলে ডার্সির বদনাম ছিল। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

চোর ধরার ফন্দী

(সত্য ঘটনা)

সৈনিকদের তাঁবু। ব্রিটিশ অফিসার আর ভারতীয় সৈনিক, সর্ব্বসমেত আট জন আছে তাঁবুতে। এক রাতে এক সৈনিকের একটি সৌখীন ঝুলি চুরি হয়ে গেল বেমালুম। অনেক খোঁজা-খুঁজির পরেও পাওয়া যায় না। এমন সময় ব্রিটিশ অফিসার অনন্যোপায় হয়ে অম্বিকা দাস নামে কোজাটোলির বিখ্যাত চোর-ধরাকে ডাকতে পাঠালেন।

অম্বিকা সাত জন সৈনিককেই কতকগুলি গতানুগতিক প্রশ্ন ক'রে অবশেষে বললে,—আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি একটি লাঠি দিচ্ছি, যেগুলির প্রত্যেকটি সাত ইঞ্চি লম্বা। লাঠিগুলোকে তোমরা এক রাত্রি বালিসের তলায় রেখে দেবে। সকালে এসে আমি দেখবো লাঠিগুলোকে। আর, তোমাদের মধ্যে যে চুরি ক'রেছে দেখতে পাবে, তার লাঠি দু'ইঞ্চি বেড়ে গেছে।

অফিসার এই কৌশলে তত আস্থাবান নয়। হেসেই প্রায় উড়িয়ে দিলেন অম্বিকার কথা শুনে। কিন্তু অম্বিকা বললে,—দেখোই না সাহেব, কি হয়।

পরদিন সকালে অম্বিকা দেখলো, দু'জনের লাঠি সাত ইঞ্চিই আছে। তাদের মধ্যে যে সত্যিকার চোর তার লাঠি দু' ইঞ্চি কমে গেছে। ধরা পড়ার ভয়ে চোরটি রাত্রি বেলায় লাঠিটি ভেঙ্গে দু'ইঞ্চি কমিয়ে রেখেছিল। অম্বিকা চোরকে ধরে ফেললে তৎক্ষণাৎ। অফিসার তো তখন হতবাক্।

আমাদের পল্লীকাব্যে বর্ষা

শ্রীকামিনীকুমার রায়

আমাদের পল্লীকাব্যে বর্ষা-বর্ণনা সম্পর্কে কিছু বলিবার আগে পল্লীকবিদের প্রকৃতি-বর্ণনা বিষয়ে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। বাংলার পল্লীগাথা বা কাব্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পল্লীকবিগণ স্বতন্ত্র ভাবে প্রকৃতি বর্ণনা না করিয়া অধিকাংশ স্থলেই প্রসঙ্গক্রমে উহার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কারণ এই নয় যে, প্রকৃতিকে তাঁহারা জড় পদার্থ মনে করিতেন এবং মানব-চিত্তের উপর উহার কোনই প্রভাব অনুভব করিতেন না। প্রকৃতি যে তাঁহাদের নিকট কোন স্বাতন্ত্র্য দাবী করে নাই, তাহার মূলে রহিয়াছে প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের নিবিড় যোগ, সামাজিকতা ও আত্মীয়তা-বোধ। আমরা পল্লীগাথাগুলিতে এক বৃহত্তর পল্লীসমাজের সম্মুখীন হই। এই সমাজ শুধু স্বজাতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে লইয়া নয়, মানুষের চতুষ্পার্শ্বস্থ বিশাল প্রকৃতি-জগৎ—সমস্ত জল-স্থল, আকাশ, গ্রহ-তারা, বৃক্ষ-লতা, ফল-ফুল, পশুপক্ষীও এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এখানে পল্লীকবিদের সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ ও আন্তরিক দৃষ্টির কাছে প্রকৃতির ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন পদার্থই জড় বা নিরর্থক ঠেকে নাই; সকলই গভীর অর্থপূর্ণ হইয়া মানুষের চিন্তা, চেষ্টা ও আনন্দ-বেদনার মধ্যে ধরা পড়িয়াছে এবং গ্রামের উৎসবে-ব্যসনে, সামাজিক আচার-বিচারে নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছে। তাই স্বতন্ত্র ভাবে প্রকৃতির বর্ণনা পল্লীকবিরা আবশ্যক মনে করেন নাই; পক্ষান্তরে সংসার-সমাজের যখনই কোন কথা-কাহিনী তাঁহারা বিবৃত করিয়াছেন, তখনই আপনা হইতেই সে কথা-কাহিনীর মধ্যে উহাদের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই প্রকৃতি-রাজ্যের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ, প্রকৃতিতে ও মানুষে যে যথার্থ জাতিভেদ নাই, উভয়ের মধ্যে যে নাড়ী-চলাচলের যোগ আছে, একে যে অন্যের উপর নিগূঢ় প্রভাব বিস্তার করে, তাহা পল্লীকবিদের অনেক কাব্যেরই একটি বিশিষ্ট ও সুস্পষ্ট সুর।* ইহাদের বর্ষা-বর্ণনার মধ্যেও আমরা প্রায়ই ইহার পরিচয় পাই।

বাংলার মাটিতে বর্ষার আগমন-নির্গমন ও স্থিতিকাল সম্পর্কে সুন্দর একটি লোকবচন প্রচলিত আছে :—

> "আষাঢ়ে উৎপত্তি
> শ্রাবণে যুবতী
> ভাদ্রে পোয়াতি,
> আশ্বিনে বুড়া
> কার্ত্তিকে দেয় উড়া।"

এই বচনটিতে আমরা মোটামুটি রকমে বর্ষার জীবনের আদ্যন্ত স্তরগুলি দেখিতে পাই; পল্লীবাসীদের বহু বৎসরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে কোনও কবি যে ইহা রচনা করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণতঃ ছয় ঋতুতে বৎসর ধরিয়া আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাসকে বর্ষাকাল বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কি দেখিতে পাই? বাংলা দেশে বর্ষা প্রায় পূরা চারটি মাস স্থায়ী হয়, তবে এক-এক মাসে উহা এক-এক মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে দুই-এক পসলা ভারি বৃষ্টি হইলেও প্রকৃত বর্ষা আরম্ভ হয় আষাঢ় হইতেই। আমরা শহরবাসীরা আষাঢ়ের প্রথম দিবসেই নব বর্ষাকে অভিনন্দন জানাই, 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব করি। বহু শত বৎসর পূর্ব্বেও বাংলা হইতে বহু দূরে রামগিরি পর্ব্বতে এক যক্ষ 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' নূতন বর্ষার আগমনে প্রিয়া-বিরহে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রাবণে বর্ষার এক দুর্ব্বার গতিবেগ ও যৌবন-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায় :—'পাথর ভাসাইয়া বহে শাওনিয়া ধারা।' ভাদ্রে আবার এই উন্মত্ততা থাকে না, উহা এক শান্ত-সৌম্য মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, সর্ব্বাঙ্গে তাহার পরিপূর্ণতার মন্থরতা। আশ্বিনে নদীনালায় ভাঁটা পড়িতে থাকে, প্রবল বারিপাত কদাচিৎ দেখা যায়। কার্ত্তিকে দুই-এক দিন বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু তাহাকে আর কেহ বাদল-ধারা বলে না। পল্লীকবি পূর্ব্বোক্ত বচনটির ভিতর দিয়া নারী-জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া কত সহজে কত অল্প কথায় বর্ষার সমগ্র জীবন-আলেখ্যটি আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন!

অতঃপর আমরা মৈমনসিংহ-গীতিকা, পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী-গীতিকা অনুসরণ করিয়া পল্লীকবিদের বর্ষা-বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা করিব। প্রথমে বলিব বর্ষার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কথা।

উজ্জয়িনীর রাজসভার কবি বর্ষাকে ধরাতলে রাজার বেশে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছেন; জলকণবর্ষী জলধর ইহার (বর্ষারূপী রাজার) মত্তমাতঙ্গ, তড়িল্লতা বিজয়-পতাকা এবং গুরুগম্ভীর বজ্রনাদ মাদল (রাজার আগমন-ঘোষী বাদ্যযন্ত্র)।

> "সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরস্তড়িৎপতাকাশনিশব্দমর্দলঃ।
> সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে।"

পল্লীকবিরাও মানুষের নানা মূর্ত্তিতে বর্ষাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কখনো সে আসিয়াছে সোনার ঝারি হাতে সঞ্জীবনী মূর্ত্তিতে, কখনো বা আসিয়াছে পসারিণীরূপে জলের পসরা মাথাতে, কখনো বা আসিয়াছে রাজার বেশে,—সঙ্গে রাণী তাহার কলসী কাঁখে। এক জন কবি লিখিয়াছেন :—

> হাতেতে সোনার ঝারি বর্ষা নামি আসে।
> নবীন রয়ষা জলে বসুমাতা ভাসে।
> সঞ্জীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া।
> মরা ছিল তরুলতা উঠিল বাঁচিয়া।
> শুকনা নদী ভরে উঠে কূলে কূলে পানি।
> বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তরণী।

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে। কবির মনে হইল,—নিবিড়কুন্তলা বর্ষা যেন সোনার ঝারি হস্তে চতুর্দ্দিকে জলসিঞ্চন করিতে করিতে নামিয়া আসিতেছে। সে জলের অদ্ভুত সঞ্জীবনী শক্তি! এত দিনের মৃতপ্রায় তরুলতা মুহূর্ত্তে বাঁচিয়া উঠিয়াছে। নদী-নালা কানায়-কানায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে জলের উপর দিয়া পণ্যভরা সাধুর নৌকা উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আর এক জন কবি বর্ষা-সমাগমে আনন্দ-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিতেছেন :—

> হায় তারিয়া নাইরারে ভাই দেখ জ্যৈষ্ঠ মাস গেল।
> জলের যৈবন লইয়া আষাঢ় মাস আইল।
> কাখে কলসী মেঘের রাণী ফিরুন পাড়াপাড়া।
> আশমানে খাড়ইয়া জমিনে ঢালে ধারা।

---

* বর্ত্তমান লেখকের 'পালাগানে মানুষ ও প্রকৃতি'—বিচিত্রা, ...

সায়র হায়র নদীয়ে করে কল কল।
কোথা হইতে আইল পাগল জোয়ারের জল।
ডোবা ডেঙ্গরা বাহিয়া মুলুক হইল তল।
আষাঢ়িয়া নয়া পানি হইয়াছে পাগল।
কোথা হইতে আইসেরে ঢেউ ফেনা মুখে লইয়া।
সাধুর তরণী যায় পাল উড়াইয়া।

যৌবন-মদে মত্ত বর্ষা তাহার মেঘ-রাণীকে সঙ্গে করিয়া লোকালয়ে নামিয়া আসিয়াছে। সেই রাণী যেন কাঁখে কলসী লইয়া পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর আকাশে দাঁড়াইয়া উচ্চ হইতে নিম্নে সর্ব্বত্র জল ঢালিয়া দিতেছে। সে-জলের ধারায় সাগর-হাওর, নদী-নালা, খানা-ডোবা একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কবি ভাবিয়া কূল পাইতেছেন না,—এত জল কোথায় ছিল,—সহসা কোথা হইতে আসিয়া এমন পাগলের মতো সব একাকার করিয়া দিল!

আর এক জন কবি বর্ষাকে জল-পসারিণীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন:—

"শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পসরা।
পাথর ভাসাইয়া বহে শাওনিয়া ধারা।
জলেতে কমল ফুটে আর নদীকূল।
গন্ধে আমোদিত করি ফুটে কেওয়া ফুল।
দিন রাতি ভেদ নাই মেঘ বর্ষে পানি।
কূল ছাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনি।
খাউরি বিউনি করে যত ডুমের নারী
কত দেশে যায় তারা বাহিয়া না তরী।"

শ্রাবণ যেন জলের পসরা মাথায় করিয়া মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে এবং সেই পসরা হইতে সর্ব্বত্র জল ছড়াইয়া চলিয়াছে। এই জল-ধারার কি দুর্ব্বার শক্তি! * * * এই সময়টায় যেমন বড় বড় সওদাগরেরা বাণিজ্যে বাহির হয়, তেমনি ডুম, বেদে প্রভৃতি সম্প্রদায়ও নিজেদের তৈয়ারী খাউরি বিউনি লইয়া নদী-পথে দেশ-বিদেশে যায়। কবির দৃষ্টি কিছুই এড়ায় নাই।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে তো একেবারে বর্ষার কবিই বলা যাইতে পারে! কত রূপে কত ভাবে যে তিনি বর্ষাকে দেখিয়াছেন, চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার অন্ত নাই। পল্লীকবিদের উপরি-উক্ত বর্ষা-মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে বিশ্বকবির দুই-একটি মূর্ত্তির তুলনা করিলে হয়তো ধৃষ্টতা হইবে না। তিনি বর্ষাকে কখনো প্রাসাদের শিখরে নীলবাস-পরিহিতা এলোকেশী মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন:

"ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে?
ওগো নবঘন—নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি?"

কখনো বা বলিয়াছেন:—

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া,
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল;
চরণে জড়ায়ে বনফুল।"

কখনো বা দেখিয়াছেন:

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যামগম্ভীর সরসা।"

কবিগুরুর অনন্ত অনবদ্য দানের কণিকা মাত্রই এখানে যথেষ্ট। এইবার আমরা ময়মনসিংহের ৺চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত এবং সৌরভের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কবি নয়ানচাঁদের বর্ষা-বর্ণনার (ভাদ্র বর্ণনার) আর একটি চিত্র এখানে পরিবেশন করিব। ইহা গ্রাম্যভাষায় রচিত হইলেও ভাব-সমৃদ্ধ এবং ভাদ্রের বর্ষার একটা পরিপূর্ণ রূপ ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"আধলা গাধলা দিন করেছে ভাদ্রমাসের রাতি।
ঘরের কোণে কুলের বউ জ্বালিয়া দিছে বাতি।
বেঙ ডাকিছে ঘন ঘন কচুবনের মাঝে।
ভরা গাঙে ঢেউ ছুটেছে আকাশ ভরা সাজে।
নদী-নালায় জল ধরে না পান্সী ভাসে স্রোতে।
গাঙের তলায় মাণিক জ্বালায় ভাদ্রের চান্নি রাতে।
ভোর গিয়াছে কমলবনে আনতে ফুলের মধু।
ফুলের কানে গুণগুণিয়ে গাইছে ভ্রমর-বঁধু।
সোনা-রূপার মেঘের পাহাড় কাঁদিয়ে খাচ্ছে দুল।
বন-বাদরে ফুটছে হাসি থরকে জিরার ফুল।"

ভাদ্র মাসের বাদল রাত্রি, পথ-ঘাট জনহীন। কুলবধূরা কুটীরে-কুটীরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া দিয়াছে, কচুবন হইতে ভেকের উল্লাস-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, নদী-নালায় জল ধরে না, তাহাদের বুকে ঢেউয়ের লাফালাফি, উপরে আকাশে মেঘের ছুটাছুটি, ভরা নদীতে সুরম্য পানসীর অগ্রগতি,—সকলে মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানেই শেষ নয়, ভাদ্রের জ্যোৎস্না-রাত্রিতে নদীর তল পর্য্যন্ত দেখা যায়, তারায় ভরা আকাশ তাহার বুকে প্রতিফলিত হয়, যেন লক্ষ মাণিক জ্বলিয়া উঠে। রাত্রিশেষে ভোর আসে, সঙ্গে আসে কমল, কমলের মধু; কমল-বনে উঠে অলির গুঞ্জন, কমলে অলিতে হয় প্রেমালাপন। অরুণের কিরণ পড়ে মেঘের গায়, সৃষ্টি হয়—সোনা-রূপার পাহাড়, অরুণের কিরণ পড়ে বনে-উপবনে, হাসে তরুলতা, হাসে জিরার ফুল।

প্রথমেই বলিয়াছি, পল্লীকবিরা স্বতন্ত্র ভাবে প্রকৃতি-বর্ণনা না করিয়া অন্য কথা-কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই উহার বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ষার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-বিষয়ক পূর্ব্বোদ্ধৃতিগুলিও তাহাই। বর্ষা শুধু-শুধু আসে না,—মানব-চিত্তে নানা আবেদন লইয়া সে উপস্থিত হয়। আমরা এইবার সেইগুলিরই আলোচনা করিব।

বাদল-ধারা অনেক সময় মানুষকে অন্যমনা করিয়া দেয়, বিরহীর বিরহ-বেদনা তীব্রতর করিয়া তোলে। তখন মানুষের মনে কেমন যেন একটা উদাস ভাব বিরাজ করে, কোন কার্য্যে তাহার মন বসে না। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল এক বর্ষা-দিনের তাঁহার মনের অবস্থা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন:

"চেয়ে আছি শূন্যপানে, কোন কাজ হাতে নাই
কোন কাজে নাহি বসে মন ;
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই ; দেহ আছে, মন নাই
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন !"

ছেলে-ভুলানো ছড়ায়ও আমরা একটি পল্লী-বালিকার এই উদাস ভাবটি লক্ষ্য করি :—

"ও পারেতে কালো রং
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্,
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।"

বাদল-দিনে যখন চারি দিক কালো হইয়া আসে, ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি পড়িতে থাকে, আকাশের গায় থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকায়, গুরু-গুরু মেঘ ডাকে, বনে-উপবনে এলোমেলো বাতাস বয়, তখন চিত্ত স্বভাবতঃই কেমন যেন হইয়া উঠে, কি যেন সে চায়। প্রিয়-পরিজন কাছে থাকিলে অনেক সময় সে গল্প করে; যুক্তিহীন সে-গল্প। কবিগুরু বলিয়াছেন :—

"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায় !"

মহাকবি কালিদাস এই বর্ষাকালকে 'কামিজনপ্রিয়', 'কামিনী চিত্তহারী' বলিয়াছেন। এই সময়ে পুরুষ-নারী উভয়েই চায় তাহাদের প্রিয়তম-প্রিয়তমার সান্নিধ্য। তখন অতি মানিনীর মানও অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়; সাজ-সজ্জায় তাহারা প্রিয়তমকে ভুলাইতে চায়। রাজসভার কবির দৃষ্টি যেমন এই দৃশ্য এড়ায় নাই, পল্লীকবির দৃষ্টিতেও তাহা ধরা পড়িয়াছে :—

"আইল আইল শাওন মাসের ঘন বরিষণ।
দেওয়ার গর্জ্জন শুন্যা কাঁপে নারীর মন।
উলকিয়া ফিনকি ঠাডা আশমান ভাইঙ্গা পড়ে
চমকাইয়া বেসুরা নারী আপন স্বামী ধরে।
গলায় সাফলার মালা আর শীতল পাটি।
ভালত বিছাইয়া শয্যা করি পরিপাটি।
বিভোলা বন্ধেরে লইয়া ঘুমে অচেতন।
এই কালে মলয়ার দুঃখ নিবারণ।"

অভিমানে যে নারী স্বামী হইতে মুখ ফিরাইয়া আছে (বেসুরা), আকাশভেদী বজ্রনাদে ভীত হইয়া সে স্বামীকে জড়াইয়া ধরে; যথাসাধ্য সাজসজ্জা করিয়া প্রাণপ্রিয়র সঙ্গে রজনী অতিবাহিত করে। কিন্তু প্রিয়তম যাহার ঘরে নাই, কিংবা প্রবাসে আছে যে, বর্ষাকালে তাহার বিরহ-বেদনার শেষ কোথায় ?

"কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে।
জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আশমানে ভাসে।
গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিজি ঠাডা পড়ে।
অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইড়া মরে।"

বর্ষারম্ভে কুড়াপাখীর (ডাহুক-ডাহুকী ?) ডাকে পল্লীর মাঠ-ঘাট, খাল-ঝিল, ঝোপ-ঝাড় মুখরিত হইয়া উঠে, আকাশে কাল মেঘ ভাসিয়া বেড়ায়, জমির উপর তাহার ছায়া পড়ে, মেঘের গুরু-গুরু শব্দে চারি দিক প্রকম্পিত হইতে থাকে, বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে, বৃষ্টি ঝরে। বর্ষার সুন্দর একটি দৃশ্য। কিন্তু এই দৃশ্য যে-মায়ের পুত্র বিদেশে—তাহার মনে কি ভাব জাগাইয়া তোলে? তিনি একটা দারুণ অন্তর্দাহনায় অস্থির হইয়া পড়েন।

প্রিয়-বিরহিণীর অবস্থাটাও দেখুন :—

"আশমানে থাকিয়া দেওয়া ডাকছ তুমি কারে।
ঐ না আষাঢ়ের পানি বইছে শত ধারে।
গাং ভাসে নদী ভাসে শুকনায় না ধরে পানি।
এমন রাতে কোথায় গেল কিছুই না জানি।"

ওগো মেঘ! তুমি আকাশে থাকিয়া কাহাকে ডাকিতেছ? তুমি কি আমার সেই নয়ন-ভুলানো জনের সন্ধান জান? ঐ যে শত দিকে শত ধারায় আষাঢ়ের জল গড়াইয়া চলিয়াছে, পথ-প্রান্তর নদী-নালা প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। এমন রাত্রিতে সে কোথায় গেল?

পল্লীকবির অনাড়ম্বর ভাষায় বর্ষার আর একটি চিত্র। এ চিত্রেও কাব্য-নায়িকা লীলার চিত্তে প্রিয়-বিরহ-বেদনা তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে।

"কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগন।
ময়ূর ময়ূরী নাচে ধরিয়া পেখম।
কদম্বের ফুল ফুটে বর্ষার বাহার।
লতায় পাতায় শোভে হীরামন হার।
মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।
ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা।"

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুরু-গুরু শব্দে মেদিনী কম্পিত হইতেছে, ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, ময়ূর-ময়ূরী উল্লাসে নৃত্য করিতেছে, কদম্বের ডালে, লতায়-পাতায় কত রংএর ফুল ফুটিয়া আছে। কিন্তু এমন দিনে সেই প্রাণপ্রিয় কোথায়, তাহার বিরহে যে আমার সমস্তই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে! মনের এই আগুন তো প্রকাশ করা যায় না, তাই বিরহিণী ঘরের কোণে লুকাইয়া চোখের জল ফেলিতেছে!

বর্ষা-সমাগমে আর এক জন কাব্য-নায়িকার বিরহ-যন্ত্রণা কি করুণ ভাবেই না আত্মপ্রকাশ করিয়াছে!

"আষাঢ় মাসে ত গাঙ্গরে বহিছে উজানী।
শুকনা নদীতে আইল জোয়ারের পানি।
দেয়ার ডাকে ঘন ঘন মেঘে শীতল পানি।
পিয়াসে তাতিয়া মরি অবুলা দুক্ষিনী।
এই মেঘে নাইরে পানি আমার লাগিয়া।
অশ্বখির পাতা ঢইল্যা পড়ে আসমান চাহিয়া।"

প্রিয় যাহার দূরে,—প্রবাসে, আষাঢ়ের জোয়ারের জলে তাহার কি হইবে? সে জলে তো তাহার পিপাসা মিটে না! আষাঢ়ের মেঘ তো তাহার জন্য বারিবর্ষণ করে নাই? তাহা হইলে যে প্রিয়তম তাহার কাছে আসিত! আকাশের দিকে বৃথাই চাহিয়া থাকা। বিরহিণী শেষে মেঘকে ডাকিয়া শেষ কথা বলে :—

"শুন শুন বিঘোর দেওয়ারে ডাকে কাঁপে মাটি।
দিনে দিনে যৈবন-গঙ্গা ধরিলেক ভাঁটি।

কইও কইও মনের কথা প্রাণবন্ধুর কানে।
মরিল দুঃখিনী কন্যা মরিল পরাণে।"

ওগো মেঘ, ওগো ভয়ঙ্করনাদী মেঘ! তোমার ডাকে তো মেদিনী কাঁপিতেছে! শোন! আমার যৌবন যে দিন-দিন নিঃশেষিত হইতে চলিল! তুমি বলিও, প্রাণবন্ধুকে কানে-কানে বলিও,—এ দুঃখিনীর মরিতে আর বেশী দিন বাকী নাই।

মহাকবি কালিদাসের যক্ষও এমনি এক আষাঢ়ের দিনে তাহার বিরহ-ব্যথার কথা প্রিয়াকে জানাইতে মেঘকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিল। পল্লী-নায়িকার ভাষা অমার্জ্জিত হইলেও তাহারও বার্ত্তাবহ আষাঢ়ের মেঘ।

বাদল-ধারা যে শুধু মানুষকেই অন্যমনা করিয়া দেয়, তাহার বিরহ-বেদনা তীব্রতর করিয়া তোলে, তাহা নহে। প্রকৃতির আপন ঘরেও তখন যে একটা বিরহ-ব্যথার করুণ রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, পল্লীকবির দৃষ্টি তাহাও এড়ায় নাই। এই যে—

"শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পসরা।
পাথর ভাসাইয়া বহে শাওনিয়া ধারা।"

তাহাতে চাতকের কি? পৃথিবী জলে জলময়, যেদিকে চোখ যায়—শুধু জল আর জল! কিন্তু চাতকের তাহাতে পিপাসা মিটে কই? আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া তাহার জল পান হয় কই? তাই সে চারি দিকের পূর্ণতার মধ্যে চিত্তের অপূর্ণতা লইয়া থাকিয়া-থাকিয়া গাহিয়া উঠে:—

"রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।
না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর।"

এই বাদলের দিনেই আর একটা পাখী প্রিয়া-বিরহ-বেদনায় কাতর হইয়া "বউ কথা কও", "বউ কথা কও" বলিয়া পথে-পথে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। শ্রাবণের জল অবিশ্রান্ত ঝরিতেছে, মুহুর্মুহু বাজ পড়িতেছে; কিন্তু পাখীটার সেদিকে লক্ষ্য নাই; দিন-রাত্রি একই ভাবে সে প্রাণপ্রিয়াকে খুঁজিয়া-খুঁজিয়া কাঁদিয়া চলিয়াছে! তবু ত তাহার মান ভাঙ্গে না, সে আসিয়া ধরা দেয় না! পাখীটার এই বিচ্ছেদ-যাতনা পল্লী-কাব্যের এক নায়িকা লীলা আপনার অন্তর্বেদনা দিয়া একান্ত ভাবে অনুভব করিতেছে,—নিজের দুঃখের সহিত পাখীর দুঃখের রূপটিকে এক করিয়া দেখিতেছে! পল্লীকবি রঘুসুত ইহার এক অপূর্ব্ব চিত্র আঁকিয়াছেন:

"কোন্ বা বিরহী নারী হায় অভাগিনী।
অভেদ নাহিক জানে দিবস রজনী।
শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে
'বউ কথা কও' বলি কান্দি ফিরে পথে।
কাহারে সুধাও রে পাখী আমি নাহি জানি
আমিও তোমার মত চির বিরহিণী।"

আমরা দেখিলাম, বর্ষাকাল প্রবাসী এবং প্রোষিতভর্ত্তৃকা উভয়কেই সমান পীড়া দেয়। প্রাচীন এবং আধুনিক, পল্লীর এবং রাজধানীর সকল কবিই এই বিষয়ে বলিয়াছেন বা ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু যে-সংসারে প্রবাসী বা প্রোষিতভর্ত্তৃকার প্রশ্ন নাই, স্বামি-স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সকলে সংবৎসর একত্র থাকে, বর্ষাকাল যে তাহাদের সকলের পক্ষেই আনন্দদায়ক এবং পূর্ণ ভোগের কাল, তাহা তো বলা যায় না। বিত্তহারা যাহারা, অষ্টপ্রহর তাহারা প্রিয়-পরিজনের সঙ্গে একত্রে বাস করিয়াও কষ্ট ভোগ করে এবং তাহাদের সে-কষ্টের মাত্রা চরমে উঠে এই বর্ষাকালে। পল্লীকবির দৃষ্টি শুধু বর্ষার সৌন্দর্য্য এবং মানুষের বিরহ-বেদনার প্রতিই আবদ্ধ থাকে নাই, পল্লীবাসী দরিদ্র দম্পতির অশেষ কষ্টের কথাও তাঁহারা ভাবিয়াছেন। লিখিয়াছেন:

"নাকের নথ বেচ্যা মলুয়া আষাঢ় মাস খাইল।
গলায় যে মতির মালা তাও বেচ্যা খাইল।
শায়ন মাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে।
এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে।"

বর্ষায় এই তো দরিদ্র-গৃহের চিত্র। এ স্থলে মনে পড়ে দুঃখের কবি মুকুন্দরামের ফুল্লরার সেই বর্ষা-গীতি। মুকুন্দরাম একেবারে পল্লীকবি না হইলেও প্রথম জীবনে তিনি পল্লীর সুখ-দুঃখের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কালকেতুর উপাখ্যান পল্লীর দরিদ্র ঘরেরই ছবি।

"আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘে জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল।
মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে।
কিছু ক্ষুদ কুঁড়া মিলে উদর না পূরে।
* * *
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
লঘু বৃষ্টি হইলে কুড়ায় (কুটীরে) আইসে বান।"

বাংলার বুকে বর্ষায় প্রায় প্রতি বৎসরই কোন না কোন অঞ্চলে বন্যা হয়, লোকের দুঃখ-কষ্টের অবধি থাকে না। পল্লীকাব্যে তাহারও অসংখ্য বর্ণনা আছে।

"আইল আইশনারে পানি উভে করল তল।
ক্ষেত কিষ্যি ডুবাইয়া দিল না রইল সম্বল।
দেশে আইল দুর্গাপূজা জগতজননী।
কোলের ছাল্যা বান্ধা দিয়া পূজে দুর্গারাণী।
* * *
মায়ে কান্দে পুত্র কান্দে শিরে দিয়া হাত।
সারা বছরের লাগ্যা গেছে ঘরের ভাত।
টাকায় দেড় আড়া ধান পইড়াছে আকাল।
কি দিয়া পালিব মায় কোলের ছাওয়াল।"

দেশে জলপ্লাবন হওয়ায় তিন শত বৎসর পূর্বে টাকায় যখন একবার ছয় মণ ধান বিকাইতে লাগিল, লোক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—কি করিয়া ছেলেপিলেকে বাঁচাইবে। আর আজ আমরা কোথায় আছি? দুঃখ-কষ্টের কথা আর নয়। বর্ষার আরও একটি দিক আছে।

বর্ষাকাল আর যাহার পক্ষে যাহাই হউক না কেন, সাধারণ বাঙ্গালীর ইহা অতি কাম্য কাল। বাঙ্গালীর দ্বারে বর্ষা আসে নূতন আশার বাণী লইয়া; অনেক সঞ্চিত আশাও তাহার এই সময়ে পূর্ণ হয়। কিসের এ আশা? আশা অনেক কিছুরই। বাংলা দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, তদুপরি ইহা দেবমাতৃক। দেবতার অনুগ্রহে এখানে যথাসময়ে বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে

তাহার কৃষি-সম্পদ। বাংলার প্রধান তিনটি ফসল—আউশ, পাট ও আমন। বর্ষাকালে পাট কাটা হয়, আউশ ঘরে উঠে এবং আমন বা বোরোর চারা রোপণ করা হয়। তিনটিই নির্ভর করে বর্ষার জলের উপর। সুবৃষ্টি হইবে,—এই আশাতেই বাংলার কৃষক আষাঢ়ের প্রতীক্ষা করে, যথাসময়ে বৃষ্টি না হইলে তাহার দেহ-মন ভাঙ্গিয়া পড়ে, পাগলের মতো বলিয়া উঠে :—

"কালা মেঘারে তুইন আমার ভাই।
এক ফোঁটা পানি দে শাইলের ভাত খাই।"

বাঙ্গালী কৃষকের এই সময় গৃহকোণে মুখোমুখি বসিয়া আলাপ করিবার নয়। মাঠে এক-হাটু এক-বুক জলে তখন তাহার কর্মক্ষেত্র। মা সন্তানকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তোলেন, জল-ঝড়ে ক্ষেতের কাজে ঘরের বাহির করিয়া দেন :—

"মেঘ ডাকে গুরু গুরু ডাক্যা তুলে পানি।
সকাল কইর্যা ক্ষেতে যাও আমার যাদুমণি।
আশমান ছাইল কালা মেঘে দেওয়ায় ডাকে রইয়া।
আর কতকাল থাকবে যাদু ঘরের মাঝে শুইয়া।"

বাংলা দেশ শুধু দেবমাতৃক নহে, উহা নদীমাতৃকও বটে। বর্ষার জলে বাংলার অসংখ্য নদী-নালা কানায়-কানায় ভরিয়া উঠে। সেই ভরা নদীর উপর দিয়া পাল খাটাইয়া চলে পণ্যভরা সাধুর তরণী। এক সময়ে এই নদী-পথেই বাংলার তিন-চতুর্থাংশ ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পন্ন হইত। বাংলা দেশ ধনপতির দেশ, চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গার দেশ। বর্ষার আশায় বণিকেরা সংবৎসর অপেক্ষা করিত, বর্ষার জলে তাহাদের নৌকা ভাসাইত, দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইয়া ফিরিয়া আসিত। এখনো এ নদী-পথের প্রয়োজন শেষ হয় নাই। পল্লী-কাব্যের এখানে-ওখানে কত না এই বাণিজ্য-যাত্রার বর্ণনা আছে।

"আইল আষাঢ় মাস লইয়া মেঘের বাণী
নদী-নালা বাইয়া আইসে আষাঢ়িয়া পানি।
শুকনা নদীতে ঢেউয়ে তোলপাড় করে।
বাণিজ্য করিতে সাধু যত যাহে দেশান্তরে।
পাল উড়ে পাল পড়ে রে উজান ভাসে নাইয়া।
কোন্ বা দেশে যায় সাধু উজান নদী বাইয়া।"

শুধু বাণিজ্য নয়, বাঙ্গালীর তখন দেশে-বিদেশে যাতায়াতও ছিল জলপথে। কবে বর্ষার জলে জলপথ সুগম হইবে, দূরস্থ আত্মীয়-বান্ধবের দেখা মিলিবে, প্রবাসী প্রিয়জন বাড়ী ফিরিবে, এই আশায় বাঙ্গালী দিন গণিত।

"ডিঙ্গা বাইয়া আসবে ঘরে বাপ আর ভাই।
আশায় বান্ধিয়া বুক রজনী গুয়াই।"

প্রবাসীরা অনেকেই তখন সাধু-সদাগরের তরণী বাহিয়া দেশে ফিরিত। প্রিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া থাকিত,—'সাধুর তরণী বাহি বঁধু আইব দেশে।' ভরা নদীতে 'লিলুয়ারী বাতাসে' পাল উড়াইয়া সোনার পানসী চলিত যাত্রী লইয়া।

কুড়াপাখী শিকার ছিল তখন বাঙ্গালীর একটা মস্ত আকর্ষণ। ভরা বর্ষায় যখন বিলে-ঝিলে, ঝোপে-ঝাড়ে কুড়াপাখী ডাকিয়া উঠিত, জল-বজ্র মাথায় লইয়া বাঙ্গালী হইত ঘরের বাহির ; পল্লী-কাব্যে কত না ইহার বিবরণ ছড়াইয়া আছে। কুড়া শিকার যে শুধু একটা খেয়াল বা বিলাস ছিল তাহা নহে, অনেকে কুড়া শিকার করিয়া তাহাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন সাধন করিত।

"কুড়া শীগার করিয়া বিনোদ পাইল জমীন বাড়ী।
ইনাম বকশিস্ পাইল কত কইতে নাহি পারি।
রাজ্যের রাজা দেওয়ান সাহেব সদয় হইল তারে।
কুড়ি আড়া জমীন দেওয়ান লেখ্যা দিল তারে।"

এত সব কারণেই পল্লীকবি লিখিয়াছেন,—"আইল আষাঢ় মাস লইয়া নব আশা।" কৃষক, বণিক, গৃহী, প্রবাসী, শিকারী কত জনের কত আশা বর্ষার অনুগ্রহে পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়!

বর্ষার সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান মনসা পূজা। ধনি-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে এক সময়ে বাঙ্গালীর ঘরে-ঘরে মহা সমারোহে এই পূজা সম্পন্ন হইত। এই পূজার সহিত যে করুণ কাহিনী জড়িত আছে, বাদল-ধারায় চোখের ধারা মিশাইয়া বাঙ্গালী আজও তাহা শুনে। শতাধিক কবি এই কাহিনীতে রং ফলাইয়া বাঙ্গালীর ভাষা-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মনসার ভাসান, ভাটিয়ালী গান, নৌ-শিল্প, নৌকা-বাইচ বর্ষারই দান।

মনসার ভাসান পল্লী-বাংলার বর্ষার সৌন্দর্য্যে একটা করুণ মাধুর্য্য মিশাইয়া দিয়াছে।

"কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বাজে
শাযান্যা সংক্রান্তে রাজা মনসারে পূজে।"

* * *

"শাওন বাওনা মাস আথাল পাথাল পানি
মনসা পূজিতে কন্যা হইল উদ্যোগিনী।"

বর্ষা-বর্ণনার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই এইরূপ কত কথা আমাদের পল্লী-কাব্যে ছড়ানো রহিয়াছে। আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইব না। বাংলার বুকে আজ 'বিষম নদীর ঢেউ রে অলছ তলছ পানি।' তাই ভারতের সেই গৌরবময় যুগের মহাকবির ভাষায় বাঙ্গালীর জন্য প্রার্থনা করিব :—

"বহুগুণরমণীয়ঃ কামিনীচিত্তহারী তরুবিটপিলতানাং
বান্ধবো নির্ব্বিকারঃ।
জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো দিশতু তব হিতানি
প্রায়শো বাঞ্ছিতানি।"

পোষাকী হাসি

"আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ কখনও সম্পূর্ণ হতে পাবে না যতক্ষণ
না আপনার ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠছে হাসির মৃদু রেখা।" —অজ্ঞাত।

সাহিত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

কুল্লূক ভট্ট—টীকাকার। ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজশাহী জেলার নন্দনপুর (নন্দনা) ইঁহার নিবাসভূমি। পিতা—দিবাকর ভট্ট। শিক্ষা—কাশীধামে। গ্রন্থ—মন্বর্থমুক্তাবলী (মনুসংহিতার টীকা)।

কুসুমকুমারী রায়—মহিলা কবি। কাব্যগ্রন্থ—মর্মোচ্ছ্বাস।

কুসুম দেব—কবি। উজ্জয়িনীর রাজা ভর্তৃহরির সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—দৃষ্টান্তশতক।

কৃত্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়)—কবি। জন্ম—১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে মুখোপাধ্যায় বংশে। পিতা—বনমালী। মাতা—মালিনী। গৌড়েশ্বর ইঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। গ্রন্থ—বৃহৎ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, বৃহৎ লঙ্কাকাণ্ড।

কৃপারাম মিশ্র—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত এবং টীকাকার। গ্রন্থ—পঞ্চপক্ষীপ্রকাশ (১৭৭২ খৃঃ), মুহূর্ততত্ত্বের টীকা, যন্ত্রচিন্তামণি উদাহরণ, লীলাবতী-কৌতুক (টীকা), সর্বার্থচিন্তামণির টীকা।

কৃপাশঙ্কর—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—জ্যোতিষকেদার।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী—পদকর্তা, যাত্রা-পালা রচয়িতা। নামান্তর—বড় গোঁসাই। জন্ম—১৮১০ খৃঃ ভজনঘাট, নবদ্বীপ। মৃত্যু—১৮৮৮ খৃঃ, চুঁচুড়া, হুগলী। পিতা—মুরলীধর গোস্বামী। ইনি বহু দিন ঢাকাবাসী ছিলেন। গ্রন্থ—নিমাই-সন্ন্যাস, স্বপ্নবিলাস (ঢাকা), রাই-উন্মাদিনী (ঢাকা), বিচিত্রবিলাস (ঢাকা), সুবল-সংবাদ (ঢাকা), নন্দহরণ (ঢাকা), ভরত-মিলন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৪০ খৃঃ (আনু)। মৃত্যু—১৯৩২ খৃঃ। নিবাস—মালদহ। পিতা—রামজয় তর্কালঙ্কার। এন্ট্রান্স (সংস্কৃত-কলেজ—১৮৫৭), বি-এ (১৮৬০)। শিক্ষকতা, অধ্যাপনা (প্রেসিডেন্সী কলেজ—১৮৬২), ওকালতী, পরে অধ্যক্ষ রিপণ কলেজ (১৮৯১)। গ্রন্থ—দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ (১৮৫৮), বিচিত্রবীর্য, নাগানন্দম্ (১৮৬৪)। সম্পাদক—বিচারক (সাপ্তাহিক—১৮৫৮ খৃঃ), হিতবাদী (সাপ্তাহিক—১৮৯১)।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ—স্মার্ত পণ্ডিত। পিতা—কালীচরণ ন্যায়ালঙ্কার। ইনি নদীয়ার মহারাজা গিরিশচন্দ্রের (১৮০২—১৮৪১ খৃঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থ—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা (ন্যায়), গোপাল-লীলামৃত উপমান-চিন্তামণির টীকা, চৈতন্যচিন্তামৃত (কাব্য), কামিনী-কাম-কৌতুক (কাব্য), দায়ভাগের (জীমূতবাহন-কৃত) টীকা। পদার্থতত্ত্বের (শিরোমণি-কৃত) টীকা, গৌতমসূত্রের টীকা, কাব্য-প্রকাশিকার টীকা, ন্যায়রত্নাবলী, তন্ত্ররত্নাবলী, জয়সিংহ

কৃষ্ণকান্ত মালবীয়—হিন্দী গ্রন্থকার। জন্ম—১৯৩৬ সংবত্, এলাহাবাদ। হিন্দী গ্রন্থ—প্রিয়তমা, কর্মবীর। সম্পাদক—অভ্যুদয়

কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি—কবি ও পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ। মৃত্যু—১৮৮২ খৃঃ। নবদ্বীপ মিশনারী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত। গ্রন্থ—সংকাব্যকল্পদ্রুম (সংকলন কাব্য)।

কৃষ্ণকামিনী দাসী—মহিলা কবি। গ্রন্থ—চিত্তবিলাসিনী (কাব্য—১৮৫৮ খৃঃ)।

কৃষ্ণকিশোর রায়—বঙ্গীয় কবি। গ্রন্থ—দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী (কাব্য) ১ম (১৩১২), ২য় (১৩১৬)।

কৃষ্ণকুমার মিত্র—সাংবাদিক ও ধর্মপ্রচারক। জন্ম—১৮৫৯ মৈমনসিং-টাঙ্গাইয়েলের বাঘিলগ্রামে। মৃত্যু—১৯৩৬ খৃঃ। পিতা—গুরুচরণ মিত্র। ইনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক, দেশসেবী এবং বহুবিধ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৮৭০ খৃঃ), বি, এ। শিক্ষকতা (সিটি স্কুল ও কলেজ—১৮৭৯—১৯০৮)। কারাবাস (১৯০৮—১৯১০)। গ্রন্থ—একাকাহিনী, বুদ্ধদেবচরিত, রাজা, রাণী, ভিক্টোরিয়া-চরিত, মহম্মদ-চরিত। সম্পাদক—সঞ্জীবনী (১২৮৯)।

কৃষ্ণকুমারী—গ্রন্থরচয়িত্রী। পিতা—পূর্ণানন্দ ঘোষ-রায় (পাঁচথুপী)। গ্রন্থ—দুহিতার বিলাপ।

কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী—হিন্দী গ্রন্থকার। হিন্দী গ্রন্থ—আমীচাঁদ, উত্তররামচরিত, মালতীমাধব, মহাবীরচরিত, বাল্মীকি রামায়ণ।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিলাপ-বিবৃতি-মালা, (রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'র অনুবাদ—১৭১৩ খৃঃ)।

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাংবাদিক। জন্ম—১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার শিবনিবাস। মৃত্যু—১৯১১ খৃঃ। সহ-সম্পাদক—সাধারণী, সম্পাদক—বঙ্গবাসী পত্রিকা, দৈনিক চন্দ্রিকা।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—বঙ্গীয় কবি। জন্ম—১২৪৪ বঙ্গাব্দ খুলনার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৩ বঙ্গাব্দ সেনহাটী। হেড পণ্ডিত—যশোহর জেলা স্কুল (১৩০০ বঙ্গ পর্যন্ত)। গ্রন্থ—সদ্ভাবশতক (১৭৮২ শক), রাসের ইতিবৃত্ত, মোহনভোগ, কৈবল্যতত্ত্ব। সম্পাদক—ঢাকা-প্রকাশ, বিজ্ঞাপনী, দ্বৈভাষিকী (১২৯৩-৯৪)।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অপরাধতত্ত্ব (১৮৬৭)।

কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ—স্মার্ত পণ্ডিত। গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

কৃষ্ণচরণ দাস—বৈষ্ণব কবি। গ্রন্থ—শ্যামানন্দ-প্রকাশ।

কৃষ্ণজীবন—বঙ্গীয় কবি। জন্ম—রঙ্গপুর জেলার বাহির বন্দর পরগণার বজরাগ্রামে। কাব্য-গ্রন্থ—অভয়ামঙ্গল।

কৃষ্ণজীবন সাহা—সঙ্গীতজ্ঞ। নিবাস—রাজশাহী। গ্রন্থ সঙ্গীতাবলী (১৮৭৪ খৃঃ)।

কৃষ্ণতীর্থ, ভারতী—গ্রন্থকার। অধ্যক্ষ, দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্গেরি মঠ (১৩৩৩—১৩৮০ খৃঃ)। পূর্বনাম—সোমনাথ। গ্রন্থ—বৈয়াসিক ন্যায়-মালা।

কৃষ্ণদয়াল বসু—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। শিক্ষক, মিত্র ইনষ্টিটিউশন। গ্রন্থ—ভার্জিন সয়েল (অনুবাদ), ডেভিড লিভিংষ্টোন (ঐ), মেঘদূত (বঙ্গানুবাদ)। পড়ার পরেও ভাবতে হয়।

কৃষ্ণদাস বা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর—কবি। জন্ম—বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকট সিঙ্গিগ্রামে। ইনি কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা—কমলাকান্ত দাস। গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস।

কৃষ্ণদাস—কবি। সম্ভবতঃ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে গুজরাতে বর্তমান। গ্রন্থ—প্রেমরস।

কৃষ্ণদাস—অনুবাদক। গ্রন্থ—চমৎকার-চন্দ্রিকা।

কৃষ্ণদাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রাপ্তিবর্ণদীপিকা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোস্বামী—গ্রন্থ ও পদাবলী রচয়িতা। জন্ম—আনুমানিক ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় মধ্যে অজয়নদের উপর ঝামটপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৬১৬ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন ধামে। পিতা—ভগীরথ দাস। শৈশবে সংস্কৃত ও ফার্সি শিক্ষা, নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন। পরে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ, জীবগোস্বামী প্রভৃতির পুণ্যাশ্রমে জীবন অতিবাহিত করেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। গ্রন্থ—গোবিন্দলীলামৃত (কাব্যগ্রন্থ)। কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের টীকা, ভাগবতশাস্ত্র গূঢ়রহস্য, অদ্বৈতসূত্রের কড়চা, স্বরূপবর্ণন, বৃন্দাবন-ধ্যান, ছয়গোস্বামীর সংস্কৃত-সূচক, চৌষট্টিদণ্ডনির্ণয়, প্রেম-রত্নাবলী, বৈষ্ণবাষ্টক, রায়মালা রাগময়করণ, পাষণ্ডদলন, বৃন্দাবন-পরিক্রম, রাগ-রত্নাবলী, শ্যামানন্দপ্রকাশ, সার-সংগ্রহ, শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, (১৬১৫ খৃঃ), রসভক্তিলহরী।

কৃষ্ণদাস, দীন—বৈষ্ণব পদকর্তা। জন্ম—শান্তিপুরের সন্নিকট অম্বিকা নামক গ্রামে। পিতা—কংসারি মিত্র। মাতা—কমলা দেবী। গ্রন্থ—ভক্তিরসাত্মিকা।

কৃষ্ণদাস, দুঃখী—পদকর্তা। গ্রন্থ—অদ্বৈততত্ত্ব, উপাসনা-সার-সংগ্রহ, বৃন্দাবন পরিক্রম।

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত—বঙ্গীয় কবি। নামান্তর—রামকৃষ্ণ। জন্ম—বর্ধমানের অম্বিকানগরে। পরে কলিকাতা বহুবাজারে বাস। পিতা—তারাচাঁদ। কাব্যগ্রন্থ—নারদ পুরাণ বা নারদ-সংবাদ (১০১১ বঙ্গ)

কৃষ্ণদাস পাল—সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ্। জন্ম—১৮৩৮ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৮৪ খৃঃ। পিতা—ঈশ্বরচন্দ্র পাল। শিক্ষা—ওরিএন্টাল সেমিনারী, মেট্রোপলিটান কলেজ। রায় বাহাদুর (১৮৭৭) এবং সি, আই ই, (১৮৭৮) উপাধি লাভ। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক (১৮৭১ খৃঃ)। সম্পাদক—**Hindu Patriot** (ইহা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র)।

কৃষ্ণদাস বাবাজী—অনুবাদক। অনুবাদ-গ্রন্থ—ভক্তমাল (নাভাজী কৃত হিন্দী হইতে)।

কৃষ্ণদাস, লাউড়িয়া—ভক্ত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৫শ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট সুনামগঞ্জের অন্তর্গত লাউড় পরগণার রাজা। ইঁহার প্রকৃত নাম দিব্যসিংহ। বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইনি কৃষ্ণচন্দ্র নাম গ্রহণ করেন। গ্রন্থ—বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী (সংস্কৃত পদ্যানুবাদ), বাল্যসূত্রম্।

কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য—পাঁচালীকার। জন্ম—শ্রীহট্টের মান্দারকান্দি। পিতা—দেববাচস্পতি। পাঁচালী গ্রন্থ—নিয়তমঙ্গলচণ্ডী।

কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—নবাঙ্কুর (টীকা), কল্পলতাবতার (টীকা), জাতকপদ্ধতি (টীকা), ছাদকনির্ণয়।

কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—পন্থা (১৩০৫—১৩১৫)।

কৃষ্ণধূর্জটী দীক্ষিত—গ্রন্থকার। জন্ম—১৭শ শতাব্দী কোয়ংপুর গ্রামে। পিতা—বেঙ্কটেশ্বর দীক্ষিত। গ্রন্থ—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়।

কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তাঁর চিঠি, চলার সাথী, নানা প্রসঙ্গে, মনের পথে।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—সাহিত্যিক। সম্পাদক—ধর্মপ্রচারক (১৮০১—১৮০৮ শক)।

কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ—কবি। জন্ম—১৭১৪ খৃঃ (আনু) মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দীর নিকট পাতেণ্ডা নামক গ্রামে। মৃত্যু—১৮৫৫ খৃঃ (আনু)। পিতা—কমলাকান্ত ঘোষ। গ্রন্থ—বৈষ্ণব-পদাবলী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

কৃষ্ণ ভট্ট বা কৃষ্ণং ভট্ট আর্ডে—টীকাকার। জন্ম—১৭-১৮ শতাব্দী কাশীধামে। পিতা—রঘুনাথ। গ্রন্থ—মঞ্জুষা বা জাগদীশী টীকা, দীপিকা।

কৃষ্ণ মিশ্র, কবি চূড়ামণি—পণ্ডিত ও নাট্যকার। জন্ম—১১শ শতাব্দীতে। গ্রন্থ—প্রবোধচন্দ্রোদয় (সংস্কৃত নাটক)।

কৃষ্ণমোহন দাস—সাংবাদিক। পরিচালক—সম্বাদতিমির-নাশক (১২০০—১২৩৭ বঙ্গ)।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড, ডাক্তার—বাঙ্গালী খৃষ্টীয় ধর্মযাজক ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৩১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শ্যামপুকুরে। মৃত্যু—১২৯২ বঙ্গাব্দ। পিতা—জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—হেয়ার স্কুল, হিন্দু কলেজ। ইনি বহু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন ডি এল, (১৮৭৬) খৃষ্টধর্ম গ্রহণ (১৮৩২ খৃঃ)। শিক্ষকতা, হেয়ার স্কুল (১৮২৯), অধ্যাপক, বিসপ্‌স কলেজ (১৮৫২—৬০), সম্পাদক—**Inquirer**, সর্বার্থসংগ্রহ (দ্বিভাষিক পত্রিকা—১৮৪৫ খৃঃ), সুধাংশু (সংবাদপত্র)।

কৃষ্ণলাল সাধু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আকাশ-কাহিনী।

কৃষ্ণরাম দত্ত—কবি। গ্রন্থ—রাধিকামঙ্গল।

কৃষ্ণরাম দাস—গ্রন্থকার। প্রকৃত নাম—কৃষ্ণরাম বসু। জন্ম—১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা নিমতা গ্রামে। পিতা—ভগবতী দাস। গ্রন্থ—দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যান বা রায়মঙ্গল (১৬৮৬ খৃঃ), বিদ্যাসুন্দর (কালিকামঙ্গল), অশ্বমেধপর্ব, ভজনমালিকা।

কৃষ্ণবিহারী সেন—শিক্ষাবিদ্ ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ৩০এ নবেম্বর কলুটোলা (কলিকাতা), মৃত্যু—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ ২১এ মে। পিতা—প্যারীমোহন সেন। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৮৬৪ খৃঃ), এফ এ, (প্রেসিডেন্সী—১৮৬৬ খৃঃ), বি, এ (১৮৬৮ খৃঃ), এম, এ (১৮৬৯ খৃঃ)। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ। প্রধান শিক্ষক—কলিকাতা স্কুল (১৮৭২), অধ্যক্ষ—জয়পুররাজ কলেজ, ও জয়পুর রাজ্যের **Director of Fublic Instruction.** গ্রন্থ—অশোকচরিত, বুদ্ধচরিত (১৮৯০), নববিধান কি ? (১৮৯৬), কবিতামালা, গল্পমালা, অশোকচরিত নাটক। সম্পাদক—**Sunday Mirror, The Liberal & the New Dispensation,**

কৃষ্ণানন্দ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কদ্রুবিনতাসংবাদ।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—তান্ত্রিক ও পণ্ডিত। নামান্তর—আগমবাগীশ ভট্টাচার্য। জন্ম—১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবদ্বীপে। পিতা—মহেশ্বর গৌড়াচার্য। কৃষ্ণানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। শিক্ষা—বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন, শক্তিমন্ত্র গ্রহণ ও পরে ঘোরতর তান্ত্রিক। গ্রন্থ—তন্ত্রসার (সংকলন গ্রন্থ), শ্রীতত্ত্ব-বোধিনী।

কৃষ্ণানন্দ ব্যাস, রাগসাগর—সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত-গ্রন্থ রচয়িতা। গ্রন্থ—রাগকল্পদ্রুম, ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড (১৮৩৩—১৮৪৩ খৃঃ)।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—তন্ত্র-গ্রন্থকার। নিবাস—কাশীধাম। গ্রন্থ—কাকচণ্ডেশ্বরী তন্ত্র (১২৩৬ বঙ্গ)।

কেতকা দাস—কবি। নিবাস—হুগলী জেলা। গ্রন্থ—মনসার ভাসান বা গীতি।

কেদারনাথ দত্ত, ভক্তিবিনোদ—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৪৫ বঙ্গাব্দে নদীয়া জেলার উলা গ্রামে। মৃত্যু—১৯১৪ খৃঃ। পিতা—আনন্দচন্দ্র দত্ত। কর্ম—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৬৬—৯৪ খৃঃ)। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম, প্রেমপ্রদীপ, বিজন গ্রাম, সন্ন্যাসী; সংস্কৃত ভাষায়—শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণ-মঙ্গল স্তোত্র, দত্তকৌস্তভ, আম্নায়সূত্র; উর্দুতে—বালিদে রেজিষ্ট্রী; ইংরেজিতে—Pourade, The Muts of Orissa, Our wants, The Bhagavata Speech, Gautama Speech. সম্পাদক—সজ্জনতোষিণী (মাসিক, ১২৮৮)।

কেদারনাথ দাস—গ্রন্থকার। নিবাস—বহরমপুর। গ্রন্থ—ভারতবর্ষের প্রাচীন দিগ বিচার (১৮৭২ খৃঃ)।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রস-সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক। জন্ম—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে। মৃত্যু—১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ২৯এ নভেম্বর পূর্ণিয়ায়। সরকারী চাকুরী এবং সরকারী কাজে চীনদেশে গমন। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীধাম এবং পূর্ণিয়ায় বাস করেন। ইনি জগত্তারিণী পদক লাভ করেন। গ্রন্থ—পাওনা, মা ফলেষু, কোষ্ঠীর ফলাফল, কবুলতী, আমরা কি ও কে, দুঃখের দেওয়ালী, ভাদুড়ী মশাই, চীনযাত্রী, আই হাজ, পাথেয়, শেষ খেয়া।

কেদারনাথ মজুমদার—সাংবাদিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৭৭ বঙ্গ মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জে। মৃত্যু—১৩৩৩ বঙ্গ মৈমনসিংহে। গ্রন্থ—মৈমনসিংহের ইতিহাস, মৈমনসিংহের বিবরণ, ঢাকার বিবরণ, সারস্বতকুঞ্জ, বাংলার সাময়িক সাহিত্য, রামায়ণের সমাজ; উপন্যাস—শুভদৃষ্টি, স্রোতের ফুল, সমস্যা, চিত্র। সম্পাদক—কুমার (পত্রিকা), বাসনা (১৩০৬), আরতি (১৩০৭), সৌরভ (১৩১৯)।

কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—মাসিক প্রকাশিকা (১৮৭৪)।

কেবলকৃষ্ণ বসু—পাচালীকার। জন্ম—১১৫২ বঙ্গ মৈমনসিংহের কেদারপুর গ্রামে। পিতা—বিজয়রাম বসু। গ্রন্থ—কাশীখণ্ড (১২২২ বঙ্গ), সত্যনারায়ণের পাচালী।

কেবলরাম আচার্য—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ। গ্রন্থ—গেটিকা (১৬৯৯ খৃঃ)।

কেবলরাম পঞ্চানন—গণিতজ্ঞ। গ্রন্থ—গণিতরাজ (১৭৬২ খৃঃ), রেখাপ্রদীপ।

কেরী, উইলিয়াম (William Carey, D. D.)—বিখ্যাত ধর্মযাজক ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড নর্দাম্পটনশায়ারে। মৃত্যু—১৮৩৪ খৃঃ। পিতা—এডমণ্ড কেরী। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন। শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন (১৮১৮, ১৫ই জুলাই), শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন। বাংলার অধ্যাপক, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০১), বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮০১ খৃঃ), বাঙ্গালা-ইংরেজি অভিধান (১৮১৫—১৮২৫), সংস্কৃত রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ, তেলেগু ও পাঞ্জাবী ভাষার ব্যাকরণ, বাইবেলের বাংলা অনুবাদ, ইংলণ্ডের ইতিহাস (অনুবাদ, গোল্ড স্মিথ কৃত—১৮১৩ খৃঃ)।

কেশবচন্দ্র গুপ্ত—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। এম, এ, বি, এল, আইনজীবী। গ্রন্থ—মাদাম হালিদা নদিবের জীবনস্মৃতি, অতি বোগাস, সখের শ্রমিক, বিদ্রোহী তরুণ, আসমানের ফুল। সম্পাদক—অর্চনা (মাসিকপত্র—১৩১৫)।

কেশবচন্দ্র রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শব্দাবলী (অভিধান, ১৮৬৭ খৃঃ)।

কেশবচন্দ্র সেন—ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৯এ নভেম্বর কলিকাতা। মৃত্যু—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ ৮ই জানুয়ারী, কলিকাতা। পিতা—প্যারীমোহন সেন। নিবাস, হুগলী জেলায় গৌরীভা নামক গ্রামে। শিক্ষা—হিন্দু স্কুল, মেট্রোপলিটান কলেজ। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ (১৮৫৭ খৃঃ), সভা স্থাপন—Goodwill Fraternity (১৮৫৭), সঙ্গতসভা (১৮৬৯), ব্রাহ্ম ধর্ম-প্রচারে ব্রতী। ব্রহ্মানন্দ উপাধিলাভ (১৮৬২ খৃঃ ১৩ই এপ্রিল), আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। ব্রাহ্মবন্ধুসভা, ব্রাহ্মিকা সমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (১৮৬৯)। প্রচার-উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড গমন (১৮৭০, ফেব্রুয়ারী ১৮ই সেপ্টেম্বর)। ভারত-সংস্কার সভা স্থাপন (১৮৭০, ১লা নভেম্বর), নববিধান (১৮৭৮)। গ্রন্থ—Young Bengal, this is for you (১৮৬০), যুগধর্ম মাহাত্ম্য প্রতিপাদক হরিলীলা বা বিধানভারত (১৮৮০), জীবন-বেদ, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, প্রার্থনাশীল হও (পুস্তিকা), Native Female Improvement (১৮৭২), True Faith, The New Samhita, ব্রহ্মগীতোপনিষৎ, সাধু-সমাগম, শ্লোক-সংগ্রহ, Yoga—Subjective & Objective, দৈনিক উপাসনা, আচার্যের উপদেশ (১০ খণ্ড), সেবকের নিবেদন (৫ খণ্ড), দৈনিক প্রার্থনা, প্রতিমা, Lectures in India (২ খণ্ড), Lectures in England, Essays: Theological & Ethical, Discourses & Writings. Social Reformation in India, The New Dispensation (2 Vols)। সম্পাদক—Indian Mirror (১৮৬০), ধর্মতত্ত্ব (১৮৬৪), সুলভ সমাচার, Sunday Mirror, নববিধান (পত্রিকা—১৮৭৭)।

কেশবদাস—হিন্দী কবি। গ্রন্থ—বিজ্ঞান গীতা, সুন্দরবিলাস, স্বরূপানুসন্ধান, স্বানুভবপ্রকাশ, সন্তোষসুরতরু, রত্নপ্রভাব।

কেশবদাস মিত্র—হিন্দী কবি। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান। কাব্যগ্রন্থ—রসিক প্রিয়া, কবি প্রিয়া (১৬০২ খৃঃ), রামচন্দ্র।

কেশবানন্দ মহাভারতী, স্বামী—সন্ন্যাসী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২০৩ বঙ্গাব্দে বর্ধমান জেলায়। মৃত্যু—১৩২২ বঙ্গ। পূর্বনাম—রাধিকাপ্রসাদ রায়-চৌধুরী। পিতা—রামনারায়ণ রায়-চৌধুরী। গ্রন্থ—আনন্দগীতা।

কৈয়ট—টীকাকার। জন্ম—১০-১১শ শতাব্দী কাশ্মীর। নিবাস—অবন্তিনগর। পিতা—উবটাচার্য। গ্রন্থ—প্রদীপ (কাব্য)।

কৈলাসচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। জন্ম—বর্ধমান জেলার রায়না গ্রামে। গ্রন্থ—বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা (১৮৭৯ খৃঃ)।

কৈলাসচন্দ্র নন্দী—সাহিত্যিক। জন্ম—১২২৫ বঙ্গ ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবেড়িয়ার কালীগচ্ছ গ্রামে। মৃত্যু—১৮৮৪ খৃঃ। পিতা—নন্দদুলাল নন্দী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১২৭২ বঙ্গ), ব্রাহ্মধর্মে

দীক্ষিত (১৮৬১)। সম্পাদক—বঙ্গবন্ধু পত্রিকা (১৮৭০ খৃঃ), ঈষ্ট (East)—পত্রিকা (১৮৭৫), Pilgrim Journal (১৮৮০)।

কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—সাহিত্যিক। জন্ম—১২৬৬, ২৫এ অগ্রহায়ণ। মৃত্যু—১৩০৯, ২৭এ ফাল্গুন। শিক্ষা—এম, এ, (সংস্কৃত কলেজ)। অধ্যাপক, ডফ কলেজ। সম্পাদক—সোমপ্রকাশ (সাপ্তাহিক)।

কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—নদীয়া জেলার হরিপুর। গ্রন্থ—চপলা, কবিতাপ্রসূন।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ, বিদ্যাভূষণ—ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৫৮ বঙ্গ ত্রিপুরা জেলার কালীগচ্ছ গ্রামে। মৃত্যু—১৩২১ বঙ্গ। পিতা—গোপালচন্দ্র সিংহ। গ্রন্থ—ত্রিপুর ইতিবৃত্ত, রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, সেনরাজগণ, ফরাসী বীরাঙ্গনা জোয়ানের জীবন-চরিত, শঙ্কর, শ্রীধর স্বামীর টীকা (বঙ্গানুবাদ সহ), শ্রীদারুব্রহ্ম, হস্তামলক, সাধক-সঙ্গীত, ১ম, ২য়, মোহমুদ্গর, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কাঙ্গালের গীত, কাঙ্গাল গীতা।

কৈলাস জ্যোতিষার্ণব—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। জন্ম—তারণদিয়া। গ্রন্থ—জ্যোতিষ-প্রভাকর, জ্যোতিষ-প্রদীপ।

কৌণ্ড—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দীতে। গ্রন্থ—তর্কপ্রদীপ, ন্যায়পদার্থদীপিকা।

ক্রমদীশ্বর—বৈয়াকরণিক। জন্ম—১১-১২শ শতাব্দী। গ্রন্থ—সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ।

ক্ষমানন্দ দাস—গ্রন্থকার। জন্ম—১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার ইষ্টকা গ্রামে। পিতা—রঘুনন্দন দাস। গ্রন্থ—ন্যায়রত্নাকর, তত্ত্বসমাস, মনসার ভাসান।

ক্ষিতিচাঁদ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দেবীর চৌতিশ।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী—অধ্যাপক ও পণ্ডিত। অধ্যাপক, শান্তিনিকেতন। গ্রন্থ—প্রাচীন ভারতের নারী, দাদূ (১৩৪২), কবীর, জাতিভেদ, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা (১৩৫১), হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ (১৩৫৪), বাংলার সাধনা (১৩৫২), ভারতের সংস্কৃতি (১৩৫১), ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা (১৯৩০), Mediaeval Mysticism of India (লণ্ডন, ১৯৩০)।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্যিক ও ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য। জন্ম—১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী। মৃত্যু—১৯৩৭ খৃঃ। পিতা—হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষা—বি-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ—১৮৮০ খৃঃ)। তত্ত্বনিধি উপাধি লাভ। আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য। গ্রন্থ—অভিব্যক্তিবাদ (১৩০৯), কলিকাতায় চলাফেরা, রাজা হরিশ্চন্দ্র (১৩০৩), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি, আর্য-রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা (১৯০১), আদিশূর, ভট্টনারায়ণ, আলাপ, শিক্ষা সমস্যা ও কৃষ্টি, ব্রাহ্মধর্মের বিবৃতি (১৩১৬)। অধ্যাত্মধর্ম ও অজ্ঞেয়বাদ (১৩০২), আঁখি জল (১৩১৭), শ্রীভগবৎকথা (১৩১৯), ওঁ পিতা নোঽসি (১৩২১), প্রাণের কথা (১৩২২), বঙ্গসেনা-সংগঠনে দেশের উন্নতি (১৩২৩), শিক্ষা সমস্যা ও কৃষি শিক্ষা (১৩২৩), মা (১৩২৪), মায়ে-পোয়ে (১৩২৫), তোমরা ও আমরা (১৩২৬), স্বস্তিকা (১৩২৬), জর্মনীর বর্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি (১৩২৭), ওপারে (১৩২৮), আদি ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী সংগঠনের প্রস্তাবনা (১৩২২)। সম্পাদক—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৩৭ শক—১৮৫৩ শক)।

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়—কবি। গ্রন্থ—প্রেমহার (১২৯৩)।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—সাহিত্যিক ও নাট্যকার। জন্ম—১২৭০ বঙ্গ ২৪ পরগণার খড়দহ গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩৪ বঙ্গ বাঁকুড়া শহরে। বি-এ (মেট্রোপলিটান ইন্সষ্টিটিউশন), এম-এ। অধ্যাপক, জেনারেল এ্যাসেমব্লীজ (১৮৯৩—১৯০২ খৃঃ)। পরে অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিয়া নাট্যালয়ে যোগদান। গ্রন্থ—ফুলশয্যা (কাব্য—১৮৯৪), নাট্যগ্রন্থ—প্রেমাঞ্জলি (১৮৯৬), আলিবাবা (১৩০৪), প্রমোদরঞ্জন (১৩০৫), সাবিত্রী (১৩০৯), সপ্তম প্রতিমা (১৩০৯), বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য (১৩১০), রঘুবীর (১৩১০), রঞ্জাবতী (১৩১১), উলুপী (১৩১৩), পদ্মিনী (১৩১৩), পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৩), চাঁদবিবি (১৯০৭), নন্দকুমার (১৩১৪), দাদা ও দিদি (১৩১৪), অশোক (১৯০৮), নিয়তি (১৩২০), ভূতের বেগার (১৯০৮), দৌলতে দুনিয়া (১৩১৫), বক্ষঃ ও রমণী (১৩১৩), বাঙ্গালার মসনদ (১৩১৭), মিডিয়া (১৩১৯), খাঁজাহান (১৩১৯), ভীষ্ম (১৩২০), রূপের ডালি (১৯১৩), নিয়তি (১৩২০), আলোছায়া (১৩২১), বাদশাজাদী (১৩২২), রামানুজ (১৩২৩), বঙ্গে রাঠোর (১৯১৭), কিন্নরী (১৯১৮), মন্দাকিনী (১৩২৮), আলমগীর (১৩২৮), রত্নেশ্বরের মন্দিরে (১৯২২), বিদূরথ (১৩২৯), গোলকুণ্ডা (১৯২৫) জয়ন্তী (১৯২৬), রাধাকৃষ্ণ (১৯২৬), নব-নারায়ণ (১৩৩৩)। উপন্যাস—নিবেদিতা (১৯১৯), গুহামুখে (১৩২৬), গুহামধ্যে (১৩৩০), পতিতার সিদ্ধি (১৩৩০), চাঁদের আলো (১৯২৪)। গীতিনাট্য—কবি কাননিকা (১৩০৩), কুমারী (১৩০৫), জুলিয়া (১৩০৬), নারায়ণী (১৩১১) পুনরাগমন (১৩১৯), বভ্রুবাহন (১৩০৬), বেদৌরা (১৯০৩), বৃন্দাবনবিলাস (১৯০৪), বাসন্তী (১৩১৫), বরুণা (১৩১৫), পলিন (১৩১৭), দুর্গা (১৩১৬)।

ক্ষুদিরাম দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কপিলামঙ্গল।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগনা টাকীর নিকট দণ্ডীরহাটা গ্রামে। মৃত্যু—১৮৮০ খৃঃ। শিক্ষা—জুনিয়ার স্কলারশিপ (১৮৫৪ খৃঃ), ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা (১৮৫৯ খৃঃ)। অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১৮৬০ খৃঃ)। গ্রন্থ—জরিপ ও পরিমিতি (১৮৭৩), লঘু পরিমিতি (১৮৭৮), শুভঙ্করী (১৮৭৯),। সহ-সম্পাদক—এডুকেশন গেজেট।

ক্ষেত্রকালী রায়, কবিরত্ন—গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলার সাহাগঞ্জে। গ্রন্থ—অদ্বৈততত্ত্ব (১৯০৮)।

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। মৃত্যু—১৯০৩ খৃঃ। Bengal Academy of Literatureএর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৩০০ বঙ্গ)। গ্রন্থ—চন্দ্রনাথ, হিঙ্গলা, সরলা, রুক্মা।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, সঙ্গীত-নায়ক—সঙ্গীতজ্ঞ ও গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর ১৮১৩ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৯৩ খৃঃ। পিতা—রাধাকান্ত গোস্বামী। গ্রন্থ—ঐকতানিক স্বরলিপি (১৮৬৮), মৃদঙ্গমঞ্জরী (১৮৭৪), কণ্ঠকৌমুদী (১৮৭৫), An essay on the six modes of music on the six Ragas (১৮৭০) সঙ্গীতসার।

প্রাকৃতিক বস্তুকে দেব বা দেবীরূপে কল্পনা করিবার দৃষ্টান্ত স্বরূপ জল, নদী, রাত্রি প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। শুধু দেবীরূপে কল্পনা করা নয়, ইঁহাদিগকে মাতৃ সম্বোধন করা হইয়াছে। বিশ্বদেবগণের সঙ্গে বা পৃথক ভাবে স্তোত্র দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে, যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

যজ্ঞ-সম্পর্কিত প্রায় সকল বস্তুকে,—যজ্ঞের বেদী, সোমপেষণের প্রস্তর, যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিবার জুহু বা কাঠের হাতা, অরণি বা যজ্ঞকাষ্ঠ, যজ্ঞশালার দ্বারকে দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। যজ্ঞের কুশকে দেবতারূপে সম্বোধন করা হইয়াছে। যজ্ঞদেবী ইলার সঙ্গে মহী ও ভারতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আপ্রি স্তোত্রে ইলা, সরস্বতী, মহী ও ভারতীর একত্র উল্লেখ দেখা যায়। ইলা ঘৃতপদী তরুণী দেবী, মনুর শিক্ষয়িত্রী (ঋ ৭।৩১।১১; ১০।৭০।৮)। কোন কোন ঋকে বাক্যের দেবী সরস্বতীর সঙ্গে বাক্, গৌরী ও সসর্পরী নামে কয়েক জন নূতন দেবীকে দেখা যায়। সায়নাচার্যের মতে বাক্, গৌরী, ইলা, ভারতী, সসর্পরী বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিতা।

বৃক্ষ উপাসনা সম্পর্কে অরণ্যানী ও ওষধির স্তোত্রগুলির উল্লেখ করা যায়। অশ্বত্থ বৃক্ষ দেবতার অধিষ্ঠান-স্থান। দশম মণ্ডলের ৫৮ সূক্তে মৃত সুবন্ধুর মনের বিভিন্ন গন্তব্য স্থানের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—যদোষধীর্মনো জগাম—যে মন ওষধির মধ্যে গিয়াছে। এই ঋকের ব্যাখ্যায় Plant soul-এর কথা বলা হইয়াছে। কুশকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিবার কথা বলা হইয়াছে। অরণিকে অদিতি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

দেবতাদিগের পশুরূপ ধারণের কথা পাওয়া যায়। ইন্দ্রকে বৃষ ও বরাহের সঙ্গে, রুদ্রকে বরাহের সঙ্গে, ঘোটকের অগ্নি ও সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। অনেক দেবতার পশুবাহন ছিল, পূষার ছাগ, অশ্বিদ্বয়ের গর্দভ, ইন্দ্রের ঘোটক ইত্যাদি। বৃষ ও গাভী, বথ ও অশ্বকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া স্তোত্র দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে। গাভীর স্থান এত উচ্চে যে, দেবতাদিগকে "গোজাতঃ" বলা হইয়াছে। গাভীকে অদিতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। গাভী "অঘ্ন্যা" অর্থাৎ অবধ্যা। "যস্যা দেবা উপস্থে ব্রতা বিশ্বে ধারয়ন্ত"—দেবগণ তাঁহার ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া সকল ব্রত ধারণ করেন (ঋ ৮।১৪।২)। বলা হইয়াছে—মা "গামনাগমদিতিং", গাভীরূপিণী অদিতিকে হিংসা করিও না (ঋ ৮।১০১।১৫)। ৪র্থ মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে দেখা যায়, "যে ধেনুং বিশ্বজুবং বিশ্বরূপাং", ধেনু বিশ্বের প্রেরয়িত্রী, বিশ্বরূপা। দেবতারূপী অশ্ব দধিক্রা ও এতশ এবং দেবতারূপী পক্ষী তার্ক্ষ্য, সুপর্ণ ও শ্যেনের উল্লেখ কয়েকটি ঋকে পাওয়া যায়। শ্যেন ও সুপর্ণ সোম আনয়নকারী দেবতারূপে স্তুত হইয়াছেন। পূষার বাহন ছাগ অজ একপাদ নামে দেবতারূপে স্তোত্র দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন (ঋ ১০।৬৪।৪, ৬৬।১১)। অহির্বুধ্ন্য নামে সর্পরূপী দেবতাকে স্তোত্র দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে (ঋ ১০।৯৩।১২)।

ঋগ্বেদে অবতারবাদ তেমন স্পষ্ট ভাবে নাই। স্পষ্ট ভাবে নাই বলিবার অর্থ—একটি মাত্র সূক্তে দেখা যায় ইন্দ্র বৃষণশ্চ রাজার কন্যা মেনা হইয়াছিলেন (ঋ ১।৫১।১৩)। দেবতাদিগের বিভিন্ন রূপ ধারণের, পশু ও পক্ষীর রূপ ধারণের কথা অনেক বার পাওয়া যায়। বহু প্রাচীন ঋষিকে সোজাসুজি দেবতা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে দধ্যাঙ্, মনু, কুৎস, উশনা কাব্য, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা ও অথর্বন ঋষিগণের নাম করা যাইতে পারে।

ঝাড়-ফুঁকের মত লোকসমাজে প্রচলিত মন্ত্র-তন্ত্রেরও স্থান হইয়াছে ঋগ্বেদে। সপত্নীকে ক্লেশ দিবার ও স্বামীর প্রণয় লাভের জন্য তীব্র শক্তিযুক্ত লতা ও মন্ত্রের ব্যবহারের কথা আছে। মন্ত্রপূত লতা স্বামীর উপাধানে রাখিয়া সপত্নীপীড়িতা স্ত্রী বলিতেছে—

মা মন্নু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু,

অর্থাৎ যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়। যেমন জল নিম্নপথে ধাবিত হয় (ঋ ১০।১৪৫।৬) তেমনি যেন তোমার মন আমার প্রতি ধাবিত হয়।

অলক্ষ্মী নাশের প্রক্রিয়া ও মন্ত্র আছে। জলে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড দেখাইয়া ঋষি বলিতেছেন,—এই কাষ্ঠখণ্ডের স্বত্বাধিকারী কেহ নাই। হে বিরূপাকৃতি লক্ষ্মী, উহার উপর আরোহণ করিয়া তুমি সমুদ্রপারে চলিয়া যাও। (ঋ ১০।১৫৫।৩)। দুইটি সূক্তে গর্ভরক্ষার মন্ত্র আছে। যক্ষ্মা নাশের মন্ত্র দুইটি সূক্তে পাওয়া যায়। একটি সূক্তে ঋষি বলিতেছেন,—আমি এই যে আহুতি দিলাম তাহার ফলে হে রোগী, তুমি এক শত বৎসর জীবিত থাকিবে—শতং জীব শরদো বর্ধমানঃ, শতং হেমন্তাঞ্ছতমু বসন্তান্ (ঋ ১০।১৬১)। হে রোগী, সুখে এক শত শরৎকাল জীবিত থাক, সুখে এক শত বসন্ত জীবিত থাক। দুঃস্বপ্ননাশের মন্ত্র, শত্রুবিনাশের মন্ত্র দুইটি সূক্তে আছে। শত্রুনাশে সফল ঋষি ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন, অবস্পদাম উদ্বত মণ্ডূকা ইবোদিকা মণ্ডূকা উদকাদিব (ঋ ১০।১৬৬)। আমি তোমাদের মস্তকে উঠিয়াছি। যেমন জলমধ্য হইতে ভেকেরা চিৎকার করিতে থাকে তদ্রূপ তোমরা আমার চরণতল হইতে চিৎকার করিতে থাক।

বৈদিক যুগের লৌকিক দেব-দেবী সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্য্যায়

ঋগ্বেদের দেব-সৃষ্টি প্রকরণে প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় নূতন দেবীর সংখ্যা। দ্বিতীয় লক্ষ্য করিবার বিষয় দেবত্ব প্রদানে ঋষিকুলের উদারতা। বৃক্ষ উপাসনা, সর্প উপাসনা, প্রস্তরোপাসনা, পশু উপাসনা পণ্ডিতগণের মতে প্রিমিটিভ ট্রাইব্যাল ধর্মের অর্থাৎ অনার্য জাতির ধর্মের লক্ষণ। বৌদ্ধ ধর্মের এই সকল অঙ্গকে তাঁহারা অনার্য জাতির ধর্ম হইতে গৃহীত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে ঋগ্বেদকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ আর্য জাতির সর্বপ্রাচীন দলিল বলেন, তাহাতে আর্য জাতির ধর্মে এই সকল জিনিস পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাইতেছে। তৃতীয় লক্ষ্য করিবার বিষয়, অবতারবাদ স্পষ্ট ভাবে স্বীকৃত না হইলেও প্রধান প্রধান দেবতার পার্শ্বচররূপে নূতন নূতন দেবতার (স্ত্রী-দেবতার সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য) আবির্ভাব। চতুর্থ লক্ষ্য করিবার বিষয়, প্রথমে প্রাচীন দেব-দেবীর কাছে যে সকল লৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আবেদন করা হইত, ক্রমে নূতন সৃষ্ট দেব-দেবীর কাছে সেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আবেদন করা আরম্ভ হইল। ইঁহারাই ঋগ্বেদের লৌকিক দেব-দেবী।

বৈদিক যুগের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে দেখা যায়, প্রাচীন দেবতাদিগের চরিত্র ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং এক দিকে যেমন অভিজাত

…ের দেব-দেবীর বিশেষতঃ দেবীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, অন্য দিকে এইরূপ লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রথমে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লৌকিক দেব-দেবীর কথা বলা হইতেছে। লৌকিক দেব-দেবীর শাসন প্রধানতঃ কৃষিকার্য, সন্তানের জন্ম, ব্যাধি রোগারোগ্য এবং দুষ্টগ্রহ ও কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা এই কয়েকটি ব্যাপারের মধ্যে আবদ্ধ হইলেও তাঁহাদের জন্য আরও নূতন ক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যায়।

ঋগ্বেদে কৃষিকর্ম-সম্পর্কিত লৌকিক দেব-দেবী ক্ষেত্রপতি, সীতা শুন ও সীরের কথা বলা হইয়াছে। গৃহ্যসূত্রগুলিতে আরও কয়েক জন নূতন দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গোভিল গৃহ্যসূত্রে দেখা যায়, সীতাকে কেন্দ্র করিয়া আশা, অবদা ও অনঘা নামে তিন জন দেবী আবির্ভূত হইয়াছেন। ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন, শস্য-কর্ত্তন, শস্যমাড়াই ও শস্য গোলায় তুলিবার সময়ে ইঁহাদের পূজার ব্যবস্থা আছে (৪।৪।২৭)। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে আরও তিন জন নূতন কৃষি-দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন, শস্য-কর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্যের সময়ে যজ্ঞা, শমা ও ভূতির পূজার বিধান আছে (২।১৭।১৩)। ক্ষেত্রে লাঙ্গল চালনা করিবার সময়ে সীতা ও অনুমতির পূজার বিধানও আছে। ক্ষেত্রে লাঙ্গল সংযোজনা করিবার সময়ে ইন্দ্র, পর্জ্জন্য ও অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে উদলাকাশ্যপ ও স্বাতীকারি নামে দুই জন নূতন দেবতার নিকট বলি দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। ঋগ্বেদীয় প্রাচীন দেবতা পৃথিবীর সঙ্গে ভূমি নামে এক জন নূতন দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদানের বিধান পাওয়া যায়।

শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে গোসিনী নামে এক জন পশুচারণ ক্ষেত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজার বিধান আছে (৩।৯।১)। পারস্কর, হিরণ্যকেশিন ও আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রে গোধনের মঙ্গলের জন্য পশুচারণের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপতির পূজার বিবরণ পাওয়া যায়।

শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে শ্রীর সঙ্গে দুই জন নূতন দেবী ভদ্রকালী ও সর্বান্নভূতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

হিরণ্যকেশিন গৃহ্যসূত্রে গুরুর হস্তে শিষ্যকে অর্পণ করিবার সময়ে বাচিনী ও অঘোরা নামে দুই জন নূতন দেবীর পূজার বিধান আছে (৩।৬।৫)।

অথর্ববেদে দেবপত্নীদের সঙ্গে রাট নামে এক জন নূতন দেবীর আবাহন করা হইতেছে দেখা যায়। ইঁহার কার্য ও গুণ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। অথর্ববেদে রতি নামে এক জন নূতন দেবীর উল্লেখও পাওয়া যায় (৭।১৭।৪)।

ঋগ্বেদে প্রায় সকল প্রধান দেবতার নিকট ব্যাধি রোগারোগ্যের প্রার্থনা করা হইয়াছে। চিকিৎসক হিসাবে রুদ্র ও অশ্বিদ্বয়ের কীর্ত্তি-কাহিনীর দীর্ঘ তালিকা অনেক বার দেওয়া হইয়াছে ঋগ্বেদে। পরবর্তী কালে দেব-চিকিৎসকের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন ধন্বন্তরী। শাংখ্যায়ন ও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে ধন্বন্তরির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অথর্ববেদে তকমন একটি ব্যাধির নাম। তকমনকে দেবতারূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের সিনীবালীর চরিত্র অথর্ববেদে আরও বিকশিত হইয়াছে। সিনীবালী ও ভগ দেবতার নিকটে প্রার্থনা করা হইতেছে নব বিবাহিত দম্পতিকে সন্তান দান করিবার জন্য (অ, বে, ১৪।২।১৫,২১)। অনুমতির চরিত্রও অধিকতর বিকশিত হইয়াছে। স্ত্রীলোক প্রণয়ীকে বশ করিবার জন্য তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে দেখা যায় (অ, বে, ৮।১৩।১২)। সিনীবালী, অনুমতি, রাকা ও কুহুর সঙ্গে কুহু নামে এক জন দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রাত্রিকালে তাঁহাকে তাম্রপাত্র হইতে চাউল ও যব প্রদান করিবার বিধান আছে (অ, বে, ২।৩৬ ; ৫।১।৪)।

ঋগ্বেদের নির্ঋতি পরবর্তী কালে এক জন মহা শক্তিশালিনী কুগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বদগণের সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। মহাকাব্যের যুগের যাবতীয় দুষ্ট গ্রহ, অনিষ্টকারী অপদেবতার বৃদ্ধা প্রপিতামহী হইতেছেন এই নির্ঋতি। ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, কবচ-তাবিজ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের সৃষ্টি নির্ঋতির অনুচর ও অনুচরীদিগের প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা হইতে।

ঋগ্বেদে তিন নির্ঋতির উল্লেখ আছে কিন্তু তাহাদের পৃথক্ কার্য্য-কলাপের পরিচয় নাই। (ঋ ১০।১১৪।২)। অথর্ববেদে নির্ঋতিকে কেন্দ্র করিয়া গ্রাহী, দ্রুহ, মগুন্দি, অরায়ী, অরাতি নামে নূতন স্ত্রী-অপদেবতার উদ্ভব হইয়াছে। দ্রুহকে একবার ঋগ্বেদে দেখা যায় (ঋ ৭।৫১।৮)। সন্তানের জন্মসংস্কারের সময় গ্রাহীর নিকটে প্রার্থনা করা হয় (অ, বে, ২।১৪।৬)। মগুন্দি ও তাঁহার বহু কন্যা গোশালায় উপদ্রব সৃষ্টি করে। (অ, বে, ২।১৪।১)। অরাতি নিদ্রামগ্ন শত্রুগণের নিকট স্বপ্নে নগ্নাকন্যারূপে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বুদ্ধি-ভ্রংশ করে (অ, বে, ৫।৭।৮, ১০)। গ্রাহীর উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দশবৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে দেখা যায় (অ, বে, ২।৯।১)। নির্ঋতির অনুচরী দলের মধ্যে অর্বুদি ও ন্যর্বুদির নাম পাওয়া যায়। নির্ঋতির সহচর দলের মধ্যে কণ্বনামধারী একটি দলের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহারা গর্ভস্থ ভ্রূণ খাইয়া ফেলে (অ, বে, ১১।১।১২)। কৌশিকসূত্রে উদঙ্কা, অঘোরা ও শত্রুঞ্জয় নামে তিন জন অনুচরের ও অনুচরীর নাম পাওয়া যায় (অ, বে, ৬।১৩)। মানব গৃহ্যসূত্রে বিনায়কগণের পূজার বিধান আছে। বিনায়ক ও মহাসেন পরে সকন্দের নাম হইয়াছে। ভারদ্বাজ গৃহ্যসূত্রে মহাসেন ব্যাধির নাম (৩।৯)। মহাকাব্যের যুগে সকন্দ হইতে স্ত্রী ও পুরুষ দুষ্ট গ্রহগণের সৃষ্টির উপাখ্যান পাওয়া যায়।

রাক্ষস, পিশাচ, দুষ্ট গ্রহের প্রভাব ও অনিষ্টকারী শত্রুর কুক্রিয়ার প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি এবং মন্ত্রশক্তি ও বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা অভীষ্ট লাভের উপায়ের বর্ণনায় কৌশিকসূত্র পূর্ণ।

ঋগ্বেদের সর্প-উপাসনা পরবর্তী বৈদিক-সাহিত্যে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। অহির্বুধ্ন্য নাম আরোপিত হইয়াছে। অথর্ববেদে সর্পদেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে (১১।৯)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সর্পরাজ্ঞীর স্তোত্র আছে। এই স্তোত্রে সর্পরাজ্ঞীকে পৃথিবীর সহিত অভিন্নরূপে আহ্বান করা হইয়াছে (৫।২৩)। শতপথ ব্রাহ্মণেও এইরূপ স্তোত্র রহিয়াছে (৪।৬।৯।১৭। সর্পের উদ্দেশ্যে শ্রাবণ মাসে বলিদানের বিধান সবগুলি সূত্রে আছে। সূত্র-সাহিত্যে সর্পকে প্রথমে নাগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কাজল, প্রসাধন দ্রব্য, মাল্য এবং তাহার্য্য নিবেদন করিবার ব্যবস্থা আছে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে রুদ্রদেবতার সহিত সর্পদেবতাকে রুধির দানের কথা পাওয়া যায় (৮।২৭)। হিরণ্যকেশিন গৃহ্যসূত্রে রুদ্রের আবাহন প্রসঙ্গে বলা হইতেছে, তিনি সর্পগণের সঙ্গে বাস করেন (১।৫।১১)।

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

৪

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের দাবাগ্নি নির্বাপিত হইতে না হইতেই মেদিনীপুর অঞ্চলে জঙ্গল মহালের চুয়াড়গণ পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মীরকাশিম কর্ত্তৃক মেদিনীপুর ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করার পর স্থানীয় অধিবাসিগণ ইংরাজের অধিকার কিছুতেই মানিয়া লয় নাই।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জঙ্গল মহালের চুয়াড়গণ মেদিনীপুরের পশ্চিমে শিলদা পরগণার অন্তর্গত ছুইটি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া ইংরাজ অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। মে মাসে তাহারা রায়পুরের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে তাহারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়ে। জুলাই মাসে গোবর্দ্ধন দিকপতি নামক এক বাগদী সর্দ্দারের অধীনে চারি শত বিদ্রোহী চন্দ্রকোণা থানার এলাকায় উপস্থিত হয়; পরে তাহারা কাশীজোড়া, তমলুক, জলেশ্বর, ময়না, নারায়ণগড় প্রভৃতি পরগণায় প্রবেশ করিয়া ইংরাজ-কর্ত্তৃত্ব বিপন্ন করিয়া তোলে। ক্রমশঃ সাফল্য লাভ করায় তাহাদের সাহস বাড়িয়া উঠে এবং ঐ বৎসরে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সাতখানি বৃহৎ গ্রাম সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়া লয়। মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী আবাসগড় ও কর্ণগড়ে চুয়াড়দিগের ছুইটি প্রধান আড্ডা ছিল। এই ছুইটি কেন্দ্র হইতে তাহারা অভিযানে বাহির হইত।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর সহরের উপকণ্ঠস্থিত কয়েকটি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া ও জ্বালাইয়া দিয়া চুয়াড়গণ প্রচার করিতে লাগিল যে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রজনীতে তাহারা মেদিনীপুর সহর আক্রমণ করিবে। ইংরাজ কালেক্টরের আশঙ্কা হইল যে, তাহারা তোষাখানা লুণ্ঠন করিতে পারে। কারণ তোষাখানায় তখন মাত্র ২৭ জন প্রহরী ছিল, আর আক্রান্ত হইলে তাহারা পলায়ন না করিয়া যে যুদ্ধ করিবে তাহার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। তদানীন্তন কালেক্টর Julius Mihoff ৭ই মার্চ বোর্ডের নিকট এক পত্রে লিখিলেন—"চুয়াড়দিগকে দমনের কোন চেষ্টাই হইল না, এদিকে তাহারা প্রতিদিন প্রজাদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে, তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ প্রজাবৃন্দ গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে।"

১৬ই মার্চ চুয়াড়গণ আনন্দপুর আক্রমণের ফলে ছুই জন কোম্পানী-সিপাহী ও কয়েক জন স্থানীয় অধিবাসী নিহত হয়। অবশিষ্ট সিপাহী সকল মেদিনীপুরে পলাইয়া আসে। কিন্তু মেদিনীপুরও নিরাপদ ছিল না। ১৭ই মার্চ্চ তারিখে মেদিনীপুরের কালেক্টর কর্ণেল ডনকে এক পত্রে জানান যে, ঐদিন রাত্রিকালে মেদিনীপুর সহর লুণ্ঠনের সম্ভাবনা আছে এবং সেই জন্য তিনি তোষাখানার টাকা বুরুজখানায় রাখিতে ইচ্ছা করেন।

ইহার পর ২১শে মার্চ্চ তারিখের পত্র হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত রাত্রিতে চুয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর দগ্ধ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল এবং সেই সংবাদ পাইয়া সহরবাসী অনেকেই সহর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া আশ্রয়ও লইয়াছিল; কিন্তু কোম্পানীর দেওয়ানের চতুরতায় তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তিনি প্রচার করিলেন যে, চুয়াড়দিগের সহর আক্রমণের সংবাদ পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ ছুই দল দেশীয় সিপাহী ও পঞ্চাশ জন ইংরাজ সৈন্য সহরে আনিয়া রাখিয়াছেন। সেই সংবাদ পাইয়া চুয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর আক্রমণ করিতে আর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সহরবাসীর আতঙ্ক যায় নাই; তাহাদের অনেকেই রাত্রিকালে পরিবারবর্গ ও অর্থাদি সঙ্গে লইয়া কালেক্টরের গৃহপ্রাঙ্গণে রাত্রি যাপন করিত। দিবাভাগেও সহরের বাহিরে যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মেদিনীপুরের তদানীন্তন কালেক্টর বোর্ডকে এই বিষয়ে প্রতিকারের জন্য পত্র লিখেন।

কোম্পানী-কর্ত্তৃপক্ষ চুয়াড়দিগকে দমনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিয়া কর্ণগড় ও আবাসগড় আক্রমণ করেন। চুয়াড়দিগের সহিত সহযোগিতার সন্দেহ হেতু কর্ণগড়ের জমিদার রাণী শিরোমণিকে বন্দিনী করিয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুরে আনা হইল। ২০শে মে তারিখে আরও পাঁচ দল সিপাহী মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই জেলার অন্তর্গত আনন্দপুর প্রভৃতি ছয়টি কেন্দ্রে সুবেদার, জমাদার, হাবিলদার প্রভৃতি ৩০৯ জন সৈনিক কর্ম্মচারী রক্ষিত হয়। কঠোর ব্যবস্থার ফলে চুয়াড়গণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া এক পরগণা হইতে অন্য পরগণায় বিতাড়িত হইতে লাগিল। জুন মাসের মধ্যে চুয়াড়গণের দ্বারা অধিকৃত সমস্ত গ্রাম কোম্পানী-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের দখলে আনেন। ইহার পর তাহারা দলবদ্ধ ভাবে আর কোন আক্রমণ করে নাই। চুয়াড়-বিদ্রোহের বর্ণনা প্রসঙ্গে মেদিনী-পুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর কয়ায় ও সেটেলমেণ্ট অফিসার জে. সি. প্রাইস বলেন যে, জায়গীর বাজেয়াপ্ত হওয়ায় সর্দ্দার ও পাইকগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের এই অভিযানের ফলে কোম্পানী-কর্ত্তৃপক্ষ ভীত হইয়া তাহাদের জায়গীর ফিরাইয়া দিবেন। জঙ্গল অঞ্চলের সকল ছুর্দ্দান্ত জাতিই ঐ সকল জায়গীরদারদের সহিত সম্মিলিত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটদের আক্রমণ করিত। মেদিনীপুরের স্থানীয় পুলিশ ও সৈন্যগণ তাহাদিগকে শাসন করিতে পারে নাই—বাহির হইতে অতিরিক্ত সৈন্য আমদানি করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে হইয়াছিল।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে বোর্ডের নিকট লিখিত জেলা-কালেক্টরের পত্রে জানা যায় যে, পাইকান জমি বাজেয়াপ্ত করাতেই গোলমাল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। চুয়াড়দিগকে অসভ্য ও অশিক্ষিত বলিয়া বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন যে, চুয়াড়গণ ইংরাজ শাসন প্রণালীর সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তাহারা যখন দেখিল যে, সহসা তাহাদের পুরুষানুক্রমে অধিকৃত জমি পুলিশের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হইতেছে তখন তাহারা মনে করিল, যাহাদের দ্বারা এই কাজ হইতেছে তাহাদের নিকট ইহার প্রতিকারের আশা করা বৃথা; সেই জন্য তাহারা অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতির স্বাভাবিক নিয়মে বিদ্রোহী হইয়া দেশ মধ্যে লুণ্ঠন ও অত্যাচারে

প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহার ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা, রাজস্ব আদায় এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।"

এই কারণে কাউন্সিলের সহকারী সভাপতিও পাইকান জমির ব্যবস্থা সম্পর্কে বোর্ডকে তিরস্কার করেন। রাজস্ব হ্রাস ও আদায়ের বিশৃঙ্খলা বিষয়ে অমনোযোগের জন্যও বোর্ড নিন্দিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য বোর্ড স্থির করেন, চুয়াড়দিগের বিদ্রোহ নিবারিত না হওয়া পর্য্যন্ত পাইকান জমির বন্দোবস্ত স্থগিত থাকিবে। পুলিশের দারোগাগণ চুয়াড়দিগের আক্রমণ নিবারণে অক্ষম হওয়ায় জঙ্গল মহালের জমিদারদিগের হস্তে ঐ সময় পুলিশের ক্ষমতাও প্রদত্ত হইয়াছিল। যে সকল জমিদারের প্রজারা চুয়াড়দিগের লুণ্ঠনে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই সকল মহালের রাজস্ব আদায় সম্পর্কেও কোম্পানী-কর্ত্তৃপক্ষ শৈথিল্য প্রদর্শন করেন।

জঙ্গল-খণ্ড কোম্পানীর সম্পূর্ণ দখলে আসিবার পর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বীরভূম, বর্দ্ধমান, মানভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা হইতে কয়েকটি করিয়া জঙ্গল-মহাল নামে একটি নূতন জেলা গঠন করা হয়। তৎকালে ঐ জেলার তেইশটি মহাল ছিল এবং এক জন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট তথায় সসৈন্যে অবস্থান করিতেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ জেলাটির অস্তিত্ব ছিল। পরে উহা উঠাইয়া দিয়া উহার অন্তর্গত মহালগুলি পার্শ্ববর্ত্তী জেলা কয়েকটির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

জঙ্গল-খণ্ডে চুয়াড়দিগের বিদ্রোহ নিবারিত হইতে না হইতে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের উত্তরাংশের বন্যজাতিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মেদিনীপুরের এই বিদ্রোহ "বগড়ীর নাএক হাঙ্গামা" নামে পরিচিত। নাএকগণ প্রায় চুয়াড়দিগেরই সমশ্রেণীভুক্ত। তাহারা কুক্কুট-মাংস আহার করিলেও হিন্দুধর্মে আস্থাবান ও গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিমান ছিল। বগড়ীর রাজবংশ কর্ত্তৃক উহাদের জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল। উহারা সেই জায়গীর ভোগ করিত এবং আবশ্যক হইলে রাজ-সরকারে পাইক-সৈন্যের কাজ করিত। কোম্পানীর আমলে বগড়ীর রাজা ছত্রসিংহ রাজ্যচ্যুত হইলে বগড়ীর জমিদারী ভিন্ন ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করা হয় এবং নাএকদিগের জায়গীরও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ছত্রসিংহের পতনে বহুসংখ্যক নাএক আপন বৃত্তি ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অচলসিংহ নামক জনৈক দুর্দ্ধর্ষ সৈনিক পুরুষের নেতৃত্বে ইংরাজ-শক্তির বিলোপ সাধনে বদ্ধপরিকর হয়।

নাএকগণ গড়বেতার নিকটবর্ত্তী নিবিড় বনভূমি-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বগড়ীর কেন্দ্র হইতে প্রান্তস্থল পর্য্যন্ত বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। নাএকগণ ইংরাজ-অধিকৃত বগড়ী পরগণার পার্শ্ববর্ত্তী যাবতীয় জনপদে আপতিত হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব্বজাতীয় নরনারীর আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠে। এই আক্রমণের ফলে কোম্পানীর শক্তির মূলকেন্দ্র বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়ে।

গভর্ণর জেনারেলের আদেশে ওকেলী নামক জনৈক ইংরাজ এক দল বৃটিশ সৈন্য লইয়া বগড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গণগনির অরণ্যে বন্যজাতীয় অশিক্ষিত নাএকগণের সহিত সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্যের খণ্ডযুদ্ধ অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। নাএকগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে যুদ্ধ করিত না, তাহারা জঙ্গলের মধ্যে

লুকাইয়া থাকিত আর মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে ইংরাজ সৈন্যের উপর পতিত হইয়া তাহাদের ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিত। এইরূপে ইংরাজ সৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলে পর ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ এক দিন রাত্রে কয়েকটি কামান একত্রিত করিয়া ক্রমাগত গোলাবর্ষণে সমস্ত বনভূমি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। নাএকগণ এই আক্রমণের ফলে প্রমাদ গণিল। অনেকেই প্রাণ হারাইল। যাহারা বাঁচিয়া থাকিল তাহারা গোলার সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া যে যেদিকে পারিল পলাইল। ইংরাজ সৈন্য সেই রাত্রে নাএকদিগের সমস্ত আবাস-স্থল ধ্বংস করিয়া দেয়।

পরদিন বৃক্ষশাখায়, বনান্তরালে ও নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে বহুসংখ্যক নাএক নর-নারীকে হত, আহত ও বন্দী করা হইল, কিন্তু অচলসিংহের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে বন্দী করিবার উদ্দেশে কয়েক জন সৈন্য বগড়ীতে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য হুগলী ও মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

অচলসিংহ গণগনির বন হইতে পলাইয়া গিয়া জঙ্গলময় বগড়ীর পশ্চিম প্রত্যন্ত প্রদেশে যে আর একটি বন দেখিতে পাওয়া যায় সেই বনে আড্ডা স্থাপন করেন। যে সকল নাএক ইংরাজ সৈন্যের আক্রমণে চারি দিকে পলায়ন করিয়া জীবন বাঁচাইতে পারিয়াছিল, তাহারা আবার একে একে আসিয়া অচলসিংহের নূতন শিবিরে সমাগত হইল। ইহা ছাড়া রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়গণও তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া অচলসিংহের দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। তাহারা ইংরাজ-অধিকৃত পল্লীসমূহে আপতিত হইয়া পল্লীবাসীর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। যে সকল ইংরাজ সৈন্য অচলসিংহকে বন্দী করিবার জন্য বগড়ীর জঙ্গলে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হইল। এই সুযোগে বগড়ীর রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্রসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক অচলসিংহকে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে ধরাইয়া দিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে নাএক বীর অচলসিংহ তাঁহার মস্তকে যে অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল।

অচলসিংহের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিলে নাএকগণ তাহাদের দলস্থ অন্যান্য সৈনিক পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন দলের দলপতি পদে বরণ করিয়া আরও কিছু দিন ইংরাজগণের সহিত খণ্ডযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্য নাএকগণকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত করে। তাহাদের আবাস-স্থল ধ্বংস করিয়া ১৭ জন দলপতিকে ধৃত করিয়া প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসী দেওয়া হয়। ঐ বৎসরে প্রায় ২০০ বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়।

বগড়ীর রাজা যাদবচন্দ্রের রাজত্বকালে মেদিনীপুরে মোগল-শাসন বিলুপ্ত হইয়া ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় দুই জন ইংরাজ কর্ম্মচারী বগড়ী রাজ্যের বার্ষিক কর নির্দ্ধারণের জন্য রাজপ্রাসাদে সমাগত হন। জনশ্রুতি, তাঁহারা কোন দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রে নিহত হওয়ায় কোম্পানী রাজা যাদবচন্দ্রকে বিদ্রোহী স্থির করিয়া রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেন এবং রাজাকে কারারুদ্ধ করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান। যাদবচন্দ্র সে অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ১৭৯০ সালে আত্মহত্যা করেন।

যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হইলে দশশালা বন্দোবস্তের সময় তাঁহার পুত্র ছত্রসিংহ নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ইংরাজ কোম্পানীকে দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু নিরূপিত সময়ে উহা প্রদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় ইংরাজ বণিক দল সমস্ত বগড়ী রাজ্য গ্রাস করিয়া লয়। মাত্র বার্ষিক ছয় সহস্র টাকার আয়ের "তরফ সেতালা" নামক জমিদারীর স্বত্ব রাজাকে প্রদান করেন। রাজা গড়বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পিতামহ শ্যামসেবের প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলাপোতা গ্রামের বাগান-বাড়ীতে আসিয়া বাস করেন। সেই সময় অচলসিংহের নেতৃত্বে নাএক-বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে হতভাগ্য রাজা ছত্রসিংহ সেই সুযোগে ইংরাজ-কোম্পানীর কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় এবং রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অচলসিংহকে ইংরাজ সেনাপতির হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু ছত্রসিংহ যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। ইংরাজ বণিক দল তাঁহাকেও সেই হাঙ্গামার অন্যতম নেতা স্থির করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে দশ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ করিলেন। পরে তিনি মুক্তিলাভ করিলে তাঁহাকে বার্ষিক ছয় সহস্র টাকার একটি বৃত্তি দেওয়া হয়। ছত্রসিংহের কোন পুত্র না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হন এবং আজীবন কাল বার্ষিক তিন সহস্র টাকার একটি বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

নাএকরা স্বভাবতঃই উগ্র প্রকৃতিসম্পন্ন ছিল, তাহার উপর ধৃত হইলে তাহাদের প্রাণদণ্ড যে অনিবার্য্য, ইহা জানিত বলিয়াই তাহারা শেষ রক্তবিন্দু দিয়া কোম্পানীর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিত। এই কারণে নাএক-বিদ্রোহ মেদিনীপুর জেলায় কিরূপ ভীষণ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লিখিত মিঃ হ্যামিল্টনের বিবরণ হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"বাঙ্গলার অন্যান্য প্রদেশে ব্রিটিশ শাসনে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইলেও ব্রিটিশ রাজধানী কলিকাতা হইতে মাত্র ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানের প্রজারা নিরাপদ নহে। সে দেশে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কাহারও সাক্ষী দিবার সাহস নাই, তাহা হইলে অত্যাচারিগণ সাক্ষীকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করিবে না।"*

[ক্রমশঃ।

---

* T. C. Price—The Chuar Rebellion of 1799. District Gazetteer—Midnapore. মেদিনীপুরের ইতিহাস।

"চিন্তা না ক'রে কথা বলা মানে লক্ষ্য না ক'রে বন্দুক ছোঁড়া।"

—স্পেনীয় প্রবাদ।

বাংলা সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-৪

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইং ১৮৮৩

৩৬০। **সখা** (মাসিক) : জানুয়ারি ১৮৮৩।

বালক-বালিকা-পাঠ্য সচিত্র পত্রিকা। সম্পাদক—প্রমদাচরণ সেন। ১৮৮৫ সনের ২১এ জুন প্রমদাচরণের মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী জুলাই মাসে প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা হইতে ৪র্থ বর্ষ (ইং ১৮৮৬) পর্য্যন্ত 'সখা' সম্পাদন করেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। তাহার পর অন্নদাচরণ সেন পত্রিকা-পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। শেষ তিন-চার বর্ষের—বিশেষ করিয়া ১১শ-১২শ বর্ষের (১৮৯৩-৯৪) 'সখা' নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩৬১। যশোহর প্রবাহ (মাসিক) : ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩।

এই নামের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানি মাসিক পত্রিকা যশোহর বরওয়ালি গ্রাম হইতে শশিভূষণ মোদকের সম্পাদনায় ফেব্রুয়ারি মাস হইতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

৩৬২। **ভারত-দর্পণ** (সাপ্তাহিক) : ১ ফাল্গুন ১২৮৯।

৪৬ নং পটুয়াটোলা লেন হইতে এক পয়সা মূল্যে প্রতি সোমবার প্রচারিত হইত। সম্পাদক—তারকনাথ বিষ্ণু।

৩৬৩। উত্তরবাসিনী (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৯।

সম্পাদক—দ্বারকানাথ মজুমদার।

৩৬৪। মুকুলমালা (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৯।

কাশীকুণ্ডুর ঘাট, ফরাসী চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

৩৬৫। বসন্ত সমীরণ (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন ১২৮৯।

শালকিয়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—এম, এন, বর্ম্মণ।

৩৬৬। **সঞ্জীবনী** (সাপ্তাহিক) : ৩ বৈশাখ ১২৯০।

এই সুপরিচিত সংবাদপত্রখানির প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, গগনচন্দ্র হোম ও পরেশনাথ সেন। প্রথম দিকে দ্বারকানাথই প্রধানতঃ পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। গগনচন্দ্র হোমের 'জীবন-স্মৃতি'তে প্রকাশ :—"স্বত্বাধিকারিত্ব ছাড়িয়া দিলেও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সহকারী সম্পাদক ও প্রধান প্রবন্ধ-লেখকরূপে এই সংবাদপত্রের সহিত আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম।"

৩৬৭। **সময়** (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৯০।

রাজনীতি, সাহিত্য, সংবাদ এবং বাণিজ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র ; 'সঞ্জীবনী'র ন্যায় ইহারও নগদ মূল্য ছিল দুই পয়সা। সম্পাদক—জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, এম-এ, বি-এল।

৩৬৮। **সারস্বত পত্র** (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ (?) ১২৯০।

ঢাকা সারস্বত সমাজ হইতে প্রকাশিত। প্রথম সম্পাদক—রাজবিহারী দাস ; পরে উমেশচন্দ্র বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষের জামাতা।

৩৬৯। বঙ্গমহিলা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

"জ্ঞানের অধিকার বর্দ্ধন ও গৌরব খ্যাপন ইহার উদ্দেশ্য।··· বাঙ্গালির অন্তঃপুরে যেখানে অজ্ঞানতিমির চিরবিরাজমান, যেখানে জীবকর পণ্ডিতগণের বিতরিত জ্ঞানালোক নন্দপ্রবেশ হয় না, সেই স্থানে থাকিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবে।" সম্পাদক—নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

৩৭০। কিরণ (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

নাম্নার ভারত-সুহৃৎ যন্ত্র হইতে এই পদ্যময়ী পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইত। পরিচালক—কালীশচন্দ্র দে।

৩৭১। হানিমান (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

"সদৃশ-চিকিৎসা বিষয়ক সচিত্র মাসিকপত্র।" সম্পাদক—বসন্তকুমার দত্ত।

৩৭২। হোমিওপ্যাথিক প্রচারক (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

সম্পাদক—পূর্ণচন্দ্র সেন।

৩৭৩। বৈষয়িক তত্ত্ব (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

তাহিরপুর দাতব্য-কৃষিকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বঙ্কবিহারী খাঁ। ১ম ভাগ মাসিক আকারে অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষে 'বৈষয়িক তত্ত্ব' ত্রৈমাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়।

৩৭৪। তরঙ্গিণী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

মজঃফরপুর হইতে প্রচারিত। বিহারে ইহাই প্রথম বাংলা মাসিকপত্র। সম্পাদক—রামসত্য মুখোপাধ্যায়।

৩৭৫। দ্রব্যগুণতত্ত্ব (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

৩৭৬। মুকুলমালা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

সম্পাদক—কেদারনাথ ঘোষাল।

৩৭৭। **নব্যভারত** (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯০।

উচ্চাঙ্গের পত্রিকা। সম্পাদক—দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। ১৩২৭ সালের ১৮ই আশ্বিন দেবীপ্রসন্ন পরলোকগমন করিলে প্রভাত-কুসুম রায় চৌধুরী পিতার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাখানির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। সম্বৎসরমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপত্নী ফুল্লনলিনী ১৩২৮ সালের আশ্বিন-কার্ত্তিক যুগ্ম-সংখ্যা হইতে 'নব্যভারতে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্পাদনায় পত্রিকাখানি ৪৩শ বর্ষ (বঙ্গাব্দ ১৩৩২) পর্য্যন্ত চলিয়া লুপ্ত হয়।

৩৭৮। কৌমুদী (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯০।

সম্পাদক—হারাণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৭৯। যোগিনী (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯০।

পরিচালক—উমাশঙ্কর বাগচী।

৩৮০। ললনা সুন্দরী। (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯০।

পরিচালক—মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৮১। সহচরী (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯০।

সম্পাদক—বীরেশ্বর পাঁড়ে।

৩৮২। কলির নূতন অবতার (পাক্ষিক) : আষাঢ় ১২৯০।

পরিচালক—লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।

৩৮৩। সচিত্র বঙ্গীয় রহস্য (পাক্ষিক) : আষাঢ় ১২৯০।

আদরিণী প্রেস হইতে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে কেবল কথা-সাহিত্যই স্থান পাইত। স্বত্বাধিকারী—তারকনাথ বিশ্বাস।

৩৮৪। পাক-প্রণালী (মাসিক) : আষাঢ় (?) ১২৯০।

সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

৩৮৫। শক্তি (সাপ্তাহিক) : ৪ শ্রাবণ ১২৯০।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত।

৩৮৬। ভারতভূমি (সাপ্তাহিক) : ১১ শ্রাবণ ১২৯০।

শান্তিপুর হইতে প্রকাশিত।

৩৮৭। হীরাপ্রভা (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯০।

প্রকাশক—অন্নদাপ্রসাদ দাস।

৩৮৮। **দৈনিক বার্ত্তা** (দৈনিক) : ১ আগষ্ট ১৮৮৩।

প্রকাশক—গিরীন্দ্রলাল চৌধুরী, হুগলী।

৩৮৯। উদ্বোধন (সাপ্তাহিক) : ভাদ্র ১২৯০।

৩৯০। নন্দিকেশ্বর (মাসিক) : ভাদ্র ১২৯০।

সচিত্র রহস্যাত্মক মাসিকপত্র। সম্পাদক—সত্যচরণ গুপ্ত।

৩৯১। আলোক (সাপ্তাহিক) : ভাদ্র ১২৯০।

সুলভ সংবাদপত্র, নগদ মূল্য আধ পয়সা।

৩৯২। ব্রাহ্মণ (মাসিক) : ভাদ্র ১২৯০।

আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিকা মাসিকপত্র। সম্পাদক—তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ। ইহা ১৩০১ সালে 'বেদব্যাসে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ' নাম ধারণ করে।

৩৯৩। বালিকা (মাসিক) : ভাদ্র ১২৯০।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত, বালিকা-পাঠ্য পত্রিকা। সম্পাদক—দক্ষিণকুমার গুপ্ত।

৩৯৪। আন্দোলন (মাসিক) : ভাদ্র ১২৯০।

সম্পাদক—নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

৩৯৫। কলিকাতার নিগূঢ় তত্ত্ব (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯০।

পরিচালক—নন্দলাল সরকার।

৩৯৬। নদের চাঁদ (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯০।

হাস্যপ্রধান পত্র। পরিচালক—পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।

৩৯৭। ভারতবণিক (সাপ্তাহিক) : আশ্বিন ১২৯০।

ইহাতে বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি স্থান পাইত।

৩৯৮। সংসার (সাপ্তাহিক) : আশ্বিন (?) ১২৯০।

কলিকাতা, কাশীপুর হইতে প্রকাশিত।

৩৯৯। **বঙ্গবাসিনী** (সাপ্তাহিক) : কার্ত্তিক ১২৯০।

বঙ্গমহিলা-পরিচালিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। কলিকাতার টালা অঞ্চল হইতে প্রকাশিত।

৪০০। ঘাঁটাল পত্রিকা (পাক্ষিক) : কার্ত্তিক ১২৯০।

৪০১। বাল্যবন্ধু (মাসিক) : কার্ত্তিক ১২৯০।

বালকপাঠ্য খৃষ্টতত্ত্ব বিষয়ক পত্র। সম্পাদক—জে-ই-পেন।

৪০২। কৃষিপদ্ধতি (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৯০।

বরাহনগর নার্সারি হইতে প্রকাশিত কৃষি বিষয়ক পত্র। সম্পাদক—উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৪০৩। পঞ্চপ্রদীপ (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৯০।

১৭ কলেজ ষ্ট্রীট হইতে অগ্রহায়ণ মাসাবধি প্রকাশিত হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

৪০৪। চশমা (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৯০।

৪০৫। বস্তুবিদ্যা (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৯০।

নবগ্রাম হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—হরিপদ চক্রবর্ত্তী।

৪০৬। নীহার (মাসিক) : পৌষ ১২৯০।

ইং ১৮৮৪

৪০৭। মুসলমান (সাপ্তাহিক) : জানুয়ারি ১৮৮৪।

মুসলমান-সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র জানুয়ারি মাস হইতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

৪০৮। **পাক্ষিক সমালোচক** (পাক্ষিক) : ১ম পক্ষ, ফাল্গুন ১২৯০।

বিবিধ-বিষয়ক পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন। দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। 'পাক্ষিক সমালোচক' সম্বন্ধে ঠাকুরদাস লিখিয়া গিয়াছেন :—"আট মাস কাল সতেজে ও সম্মানের সহিত চলিয়া, সাহিত্যের সু-আহার্য্য অভাবে উহা এক বৎসর পরে এ দেশীয় অনেকানেক পত্রিকারই মত পিতৃলোকে বিলীন হয়।···প্রথম আট মাসের অধিক কাল উহার সঙ্গে আমার লেখনীর ও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের সংস্রব ছিল না।···'পাক্ষিকে'ই বোধ হয়, আমার প্রবন্ধ লেখার প্রথম 'হাতে-খড়ি'।

৪০৯। অদ্ভুত ইন্দ্রজাল (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৯০।

ইহাতে ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের কথাই স্থান পাইত। পরিচালক—গিরীন্দ্রলাল ঘোষ, টালা।

৪১০। সচিত্র পারস্য কুসুম (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৯০।

ইহাতে পারস্য-উপাখ্যান প্রকাশিত হইত। সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

৪১১। রত্নসিংহ (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৯০।

প্রকাশক—রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ, টালা।

৪১২। রহস্য সংগ্রহ (মাসিক) : চৈত্র ১২৯০।

প্রকাশক—রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ, টালা।

৪১৩। সোহাগিনী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯১।

সম্পাদিকা—কৃষ্ণরঙ্গিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে।

৪১৪। তপস্বিনী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯১।

প্রকাশক—জীবনচন্দ্র ভক্ত।

৪১৫। কুসুমমালা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯১।

সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ বসু।

৪১৬। চিকিৎসা-সম্মিলনী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯১।

চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকা। সম্পাদক—ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগির ও কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন।

৪১৭। ব্রাহ্মজীবন (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯১।

"যাহাতে ব্রাহ্মগণ উপাসনাশীল হন এবং পারিবারিক সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে সম্পন্ন করেন, ইহাই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য।" 'ধর্ম্মবন্ধু' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

৪১৮। সৎসঙ্গ (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯১।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে।

৪১৯। ভূষণ্ডী কাকের নক্শা (মাসিক) : আষাঢ় (?) ১২৯১।

বিদ্রূপাত্মক পত্র। প্রকাশক—অম্বিকাচরণ মোদক।

৪২০। রত্নাকর (পাক্ষিক) : আষাঢ় ১২৯১।

ঢাকা শীতল প্রেস হইতে বংশীনাথ বসাক কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়।

৪২১। ভূত (মাসিক) : আষাঢ় (?) ১২৯১।

ব্যঙ্গরচনামূলক সচিত্র পত্র।

৪২২। **জাহ্নবী** (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯১।

"সর্ব্বথা আজি মানব পশুভাবাপন্ন বা পশু হইতেও নিকৃষ্ট, সুতরাং পতিত। পতিত উদ্ধার করিবার জন্যই জাহ্নবীর অবতারণা।" সম্পাদক—বীরেশ্বর পাঁড়ে

৪২৩। **নবজীবন** (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯১।

উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র। সম্পাদক—'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার। পরমায়ু ৫ বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মহারথীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। আচার্য্য রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদীর হাতেখড়ি হয় এই 'নবজীবনে'; তাঁহার প্রথম রচনা—"মহাশক্তি" ১ম বর্ষের পৌষ-সংখ্যায় স্থান লাভ করিয়াছিল।

৪২৪। **প্রচার** (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯১।

জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোভাগে রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্রটি প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়।" 'প্রচার' ৪ বৎসর (১২৯৫ সাল পর্য্যন্ত) চলিয়া লুপ্ত হয়।

৪২৫। কালভৈরব (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯১।

বিদ্রূপাত্মক পত্র। সম্পাদক—মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

৪২৬। গৃহস্থালী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯১।

সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

৪২৭। **আলোচনা** (মাসিক) : ১৫ই ভাদ্র ১৮০৬ শক।

ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক উচ্চাঙ্গের পত্র। সম্পাদক—গগনচন্দ্র হোম। পরমায়ু ২ বৎসর। গগনচন্দ্র 'জীবন-স্মৃতি'তে বলিয়াছেন :—"বন্ধুবর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরাও 'আলোচনা' প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই মাসিক পত্রিকার পরিচালনাভার ছিল আমার উপর।"

৪২৮। আর্য্যবন্ধু (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯১।

শান্তিপুর হইতে শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। হিন্দুধর্ম্মের প্রসারকল্পে প্রতিষ্ঠিত কাল্না সভার মুখপত্র।

৪২৯। বয়স্য (মাসিক) : আশ্বিন (?) ১২৯১।

চুঁচুড়া অরুণ প্রেস হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বিপিন-বিহারী দত্ত।

৪৩০। **পতাকা** (সাপ্তাহিক) : কার্ত্তিক (?) ১২৯১।

সম্পাদক—জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম-এ, বি-এল। বছর-দুই পরে ইহা 'সুরভি'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'সুরভি ও পতাকা' নাম ধারণ করে।

৪৩১। সমাজ সংস্কার (মাসিক) : কার্ত্তিক ১২৯১ (?)।

সম্পাদক—বিহারীলাল দাসগুপ্ত।

৪৩২। আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী (মাসিক) : অগ্রহায়ণ (?) ১২৯১।

আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসা বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন। কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের অনুমতি অনুসারে কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ সেন এবং কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেনের তত্ত্বাবধানে ভগবতীপ্রসন্ন সেন ও কবিরাজ হরিপ্রসন্ন সেন কবিরাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ইং ১৮৮৫

৪৩৩। ভোজবাজী (মাসিক) : মাঘ ১২৯১।

ইন্দ্রজাল, রসায়ন ও ম্যাজিক সম্বন্ধীয় বালক-পাঠ্য পত্রিকা। সম্পাদক—অমৃতলাল বসু।

৪৩৪। ভারত (মাসিক) : মাঘ ১২৯১।

বাগবাজার বান্ধব-পাঠ-সমাজ হইতে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪৩৫। রাজ চিকিৎসক (মাসিক) : ফাল্গুন (?) ১২৯১।

চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র। সম্পাদক—রামচন্দ্র মল্লিক।

৪৩৬। পরিণাম (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৯১।

সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ইহা ক্ষুদ্র গ্রাম জয়রামপুর হইতে যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইত বটে, কিন্তু নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইত না।

৪৩৭। প্রসূতিশিক্ষা নাটক (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১২৯২।

নাটকীয় সংলাপের ধরণে লিখিত। সম্পাদক—প্রমথনাথ দাস, এম-বি।

৪৩৮। **বালক** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯২।

সম্পাদক—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—"বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজবউঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।" এক বৎসর সগৌরবে চলিবার পর 'বালক' 'ভারতী'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

৪৩৯। **ভারতবাসী** (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৯২।

কলিকাতার পি, এম, সুর কোম্পানির যত্নে প্রকাশিত। সম্পাদক—হরিদাস গড়গড়ী।

৪৪০। **দৈনিক** (প্রাত্যহিক) : বৈশাখ ১২৯২।

বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে এক পয়সা মূল্যে এই সুলভ পত্রিকাখানি কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। অল্প দিন পরেই ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন সম্পাদক হইয়া প্রায় ১৪ বৎসর 'দৈনিক' পরিচালনা করিয়াছিলেন।

৪৪১। **কৃষি গেজেট** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯২।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকা। সম্পাদক—গিরিশচন্দ্র বসু, বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

৪৪২। সীতা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯২।

সম্পাদক—ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়।

৪৪৩। শিল্প কৃষি পত্রিকা (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

তাহিরপুর হইতে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। পরিচালক—কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়।

৪৪৪। **কুশদহ** (সাপ্তাহিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

ইহ' কিছু দিন পরে 'ভেরি' পত্রিকার সহিত মিলিত হইয়া যায়। 'কুশদহ ও ভেরি' আবার ১২৯৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে 'সুলভ সমাচারে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' নাম ধারণ করে।

৪৪৫। সমাজ-দীপিকা (মাসিক) : ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

হিন্দু সমাজের পুনঃসংস্কার ও হিন্দুধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধিকরণের প্রতিই পত্রিকাখানির বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সম্পাদক—অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ।

৪৪৬। দিনাজপুর পত্রিকা (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

দিনাজপুর হইতে প্রকাশিত। ইহাতে প্রধানতঃ কৃষিতত্ত্বই আলোচিত হইত। সম্পাদক—ব্রজেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী, বি-এ, বি-এল।

৪৪৭। **শিল্পপুষ্পাঞ্জলি** (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯২।

শিল্প, সাহিত্য, সরল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক সচিত্র পত্রিকা। সম্পাদক—অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৪৮। ভারতে হরিধ্বনি (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯২।

রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটী হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শিবচন্দ্র বসু ও কালীকুমার ঘোষ।

৪৪৯। বিজলী (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯২।

বেরা, ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্যামাচরণ মজুমদার।

৪৫০। **তত্ত্ব-মঞ্জরী** (মাসিক) : ১ শ্রাবণ ১৮০৭ শক।

"নীতি, ধর্ম্ম এবং সমাজ-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।" সম্পাদক রামচন্দ্র দত্ত।

৪৫১। নব-নলিনী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯২।

আন্দুলবাড়িয়া (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

৪৫২। নির্ঝর (মাসিক) : ভাদ্র ১২৯২।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—হরিকিশোর রায়।

৪৫৩। পল্লীগ্রাম (মাসিক) : ভাদ্র (?) ১২৯২।

রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।

৪৫৪। ত্রৈমাসিক হোমিওপ্যাথিক বার্ত্তাবহ : ভাদ্র (?) ১২৯২।

সম্পাদক—অক্ষয়প্রসাদ দত্ত। প্রকাশক—কে, দত্ত এণ্ড কোম্পানী।

৪৫৫। বৈষ্ণব (মাসিক) : আশ্বিন, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০০।

বৈষ্ণব জগতের হিতসাধনার্থ ইহার আবির্ভাব। সম্পাদক—কালিদাস নাথ।

৪৫৬। **শ্রীমন্ত সওদাগর** (পাক্ষিক) : কার্ত্তিক (?) ১২৯২।

৩ নং আহীরিটোলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—ব্রজকিশোর রায়।

৪৫৭। হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৯২।

ঢাকা গিরিশ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য।

৪৫৮। বঙ্গবালা (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৯২।

সম্পাদক—কালীচরণ বসু।

৪৫৯। বিবিধ তত্ত্ব (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৯২।

চিকিৎসা, শিল্প পাকবিদ্যা ও ইন্দ্রজালাদি বিষয়ক পত্র। ৩৭ নং হরীতকী বাগান লেন হইতে রামকুমার নাথ সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

৪৬০। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১২৯২।

লাহিড়ী এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত। সম্পাদক—জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী ও বিপিনবিহারী মৈত্র, এম. বি।

৪৬১। **ভারত শ্রমজীবী** (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১২৯২।

পূর্ব্বতন 'ভারত শ্রমজীবী'র দ্বিতীয় কল্প। প্রধানতঃ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিকপত্র। সম্পাদক—শশিভূষণ বিশ্বাস।

৪৬২। মহাবিদ্যা (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১২৯২।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। তত্ত্ববিদ্যা, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও আর্য্যশাস্ত্র-প্রচারক পত্রিকা। সম্পাদক—কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য, এফ্. টি. এস। ইহা ১২৯৪ সালে ঢাকা হইতেই প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র 'গরীবে'র সহিত মিলিত হইয়া 'গরীব ও মহাবিদ্যা' নামধারণ করে।

… … …

১৮৮৫ সনে (১২৯২ সালে) আরও কয়েকখানি সাময়িক-পত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইতেছি; এগুলি সম্ভবতঃ পূর্ব্ব-বৎসরে—ইং ১৮৮৪ সনে প্রথম প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। পত্রিকাগুলি—

১। 'সুধাপান', ২। 'কুমারী পত্রিকা', ৩। 'ভারত মিহির' (মাসিক, ৪৬ পঞ্চানন তলা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত), ৪। 'পূর্ব্ববঙ্গবাসী' (সাপ্তাহিক)।

ইং ১৮৮৬

৪৬৩। **ঢাকা গেজেট** (সাপ্তাহিক): ইং ১৮৮৬ (?)

ঢাকা হইতে প্রকাশিত "অ্যাংলো ভার্ণাকুলর" সাপ্তাহিক পত্র। সম্পাদক—শশিভূষণ রায়, 'ঈষ্ট' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক।

৪৬৪। বিদূষক (মাসিক): মাঘ ১২৯২।

সম্পাদক—কালীকিঙ্কর আয্যরত্ন।

৪৬৫। **ধূমকেতু** (সাপ্তাহিক): বৈশাখ ১২৯৩।

চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শিবকৃষ্ণ মিত্র।

৪৬৬। **বেদব্যাস** (মাসিক): বৈশাখ ১২৯৩।

"হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মহিমাকীর্ত্তনই বেদব্যাসের উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—ভূধর চট্টোপাধ্যায়।

৪৬৭। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (মাসিক): বৈশাখ ১২৯৩।

"যোগ, জ্যোতিষ, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সঙ্গীত, বাস্তু, রন্ধন, কারুকার্য্য, চিত্র, মুষ্টিযোগ, ম্যাজিক, ইন্দ্রজাল, প্রভৃতি মানবের আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে" সচিত্র মাসিকপত্র। সম্পাদক—অমৃতলাল বসু, নদীয়ার অন্তর্গত নকাসিপাড়া থানার পুলিস সব্-ইনস্পেক্টর।

৪৬৮। **গ্রামবাসী** (পাক্ষিক…)। বৈশাখ ১২৯৩ (?)

উলুবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত; ঐ অঞ্চলের গ্রামবাসীকে রাজনীতি বিষয়ক শিক্ষা দেওয়াই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল। ১২৯৬ সালের বৈশাখ হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়।

৪৬৯। আর্য্যপ্রতিভা (সাপ্তাহিক): বৈশাখ ১২৯৩ (?)

হালিশহর হইতে প্রকাশিত।

৪৭০। বঙ্গরবি (মাসিক): আষাঢ় ১২৯৩।

বিবিধ বিষয়ক মাসিকপত্র।

৪৭১। বাণিজ্য-ভাণ্ডার (মাসিক): শ্রাবণ (?) ১২৯৩।

৪৭২। **আহমদী** (পাক্ষিক): শ্রাবণ ১২৯৩।

ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল হইতে করিমন্নেছা খানম চৌধুরাণীর আনুকূল্যে প্রকাশিত। সম্পাদক—আবদুল হামিদ খান্ আহমদী ইউসুফজয়ী। "মুসলমানদিগের কয়েকখানি সংবাদপত্র কলিকাতায় কিছু দিন পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু 'আখ্‌বারে এস্‌লামিয়া' ভিন্ন আর সবগুলিই লুপ্ত হইয়াছে। 'আহমদী'র অসাম্প্রদায়িকতা ও ন্যায়নিষ্ঠা সুপরিচিত ছিল।" ১২৯৬ সালে ইহার নাম 'আহমদী ও নবরত্ন' পাইতেছি। সম্ভবতঃ 'নবরত্ন' নামে স্থানীয় কোন পত্র ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়া এইরূপ নাম ধারণ করে।

৪৭৩। কারিগর-দর্পণ (মাসিক): আশ্বিন ১২৯৩।

"মেশিন, ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী বিশেষরূপে প্রচার করিবার জন্য প্রত্যেক মেশিন প্রভৃতির প্রতিকৃতি সহ" ইহা প্রকাশিত হইত। সম্পাদক—বিহারীলাল ঘোষ।

৪৭৪। **বিশ্বকর্ম্মা** বা বিজ্ঞান রহস্য (মাসিক) আশ্বিন ১২৯৩।

বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষোপযোগী প্রবন্ধমালা বিবিধ ভাষার সংবাদপত্র এবং পুস্তক হইতে বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়া এই সচিত্র মাসিক পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত। সম্পাদক—বিহারীলাল ঘোষ।

৪৭৫। ভিষক্-বন্ধু (মাসিক): আশ্বিন ১২৯৩।

সম্পাদক—ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।

৪৭৬। **উপন্যাসলহরী** (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৯৩।

সম্পাদক—তারকনাথ বিশ্বাস।

৪৭৭। **সুনীতি ও সংবাদ** (পাক্ষিক): কার্ত্তিক (?) ১২৯৩।

'বিশ্বকর্ম্মা' পত্রের মাঘ ১২৯৩-সংখ্যায় সমালোচিত। ইহা বারাণসী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। পত্রিকাখানি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের (কৃষ্ণানন্দ স্বামীর) ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার (তৎকালে কাশীতে স্থানান্তরিত) উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথমে 'সুনীতি' নামে ১২৯০ সালের ১লা কার্ত্তিক প্রকাশিত হইয়া এক বৎসর জীবিত ছিল।

গুরু মা

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

পরাশর বাবুরা আমাদের পাশের বাড়ীতে ভাড়া এসেছেন মাত্র ছ'মাস। কিন্তু এরই মধ্যে 'মা' বা 'মাঠাকুরুণে'র মহিমা শুনতে শুনতে প্রায় কান ঝালপালা হয়ে গেল। যদি ভাড়াটে বাড়ী পাওয়া ঈশ্বর দর্শনের মতই অবিশ্বাস্য ঘটনা না হ'ত, তাহ'লে হয়ত এত দিনে আর একটা বাড়ী দেখে উঠে যেতুম।

অবশ্য ঠিক গুরুমা বলতে যা বোঝায়, ইনি না কি তা নন্। অর্থাৎ গুরুর স্ত্রী নন্—ইনি নিজেই গুরু! নেহাৎ সাদা-সিদে ধরণেরও নন্—রীতিমত গেরুয়াধারিণী সন্ন্যাসিনী।

বিরক্ত-বোধও যেমন করতুম, কৌতূহলও একটু হ'ত বৈ কি! কথায় কথায় মা।

ফুটফুটে মেয়েটি পরাশর বাবুর, বছর যোল-সতেরো বয়স, এদিকেও খুব ঠাণ্ডা, ঘর-কন্নায় মন আছে, ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ছে! মানে ক্লাস টেন্ আজকালকার। বিনা মাষ্টারেই প'ড়ে গত বছর ক্লাসে ফার্ষ্ট হয়েছে। এক কথায় বেশ মেয়েটি। শালার জন্য অম্‌নিই একটি মেয়ে খুঁজছিলুম, কিছু দিন দেখে-দেখে এক দিন প্রস্তাব করেই বসলুম। শালাও এম-এ পাস, সরকারী চাকরী করছে, পাত্র হিসাবে খুবই লোভনীয়, যে কোন পাত্রীর পিতারই শুনলে চম্‌কে ওঠবার কথা।

কিন্তু পরাশর বাবু বিনীত অথচ উদাসীন ভাবে বললেন, 'এ ত আমার সৌভাগ্য রমেন বাবু, কিন্তু মা না এলে ত কিছু হবার জো নেই!'

'কথাবার্তা না হয় তিনি এলে হবে। আগে আপনারা ছেলে দেখুন, বিয়ে দেবেন কি না সেটা ভাবুন—দেনা-পাওনা।'

'কিছুই হ'তে পারবে না। যা করবেন তিনিই করবেন। ছেলে দেখতে হয় তিনি দেখবেন, বিয়ে দেবেন কি না এখন তাও তিনি জানেন। আমি কিছুই বলতে পারব না।' সহাস্যে উজ্জ্বল চোখ দু'টি মেলে চাইলেন পরাশর বাবু, পরিপূর্ণ প্রসন্নতা মুখে-চোখে।

হঠাৎ মুখে এসে গেল, 'দৈনিক খাওয়া-দাওয়াটা কি তাঁর নির্দ্দেশে করেন পরাশর বাবু? আর ছেলে-মেয়ের অসুখ হ'লে কি হয়? অনুমতি নিয়ে ডাক্তার দেখান?'

পরাশর বাবু কিন্তু একটুও ক্ষুণ্ণ হলেন না। হেসে বললেন, 'প্রায় তাই। তবে মোটামুটি এ সব ব্যাপারে তাঁর নির্দ্দেশ নেওয়াই আছে। আর ভারি অসুখ করলে ত তাঁকে জানাতেও হয় না—তিনি নিজেই এসে পড়েন। তার পর যা করবার তিনিই—'

'নিজেই এসে পড়েন? যোগবলে না কি?' কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের সুরটা চাপতে পারলুম না।

'তা জানি নে। কখনও জিজ্ঞেসও করিনি। তবে এসেও পড়েন ঠিক। সেবার বকুলের টাইফয়েডের সময় তিন দিনের দিনই এসে পড়লেন। তখন আমরা জানি সামান্য জ্বর। উনি এসেই বললেন, করছ কি, এ যে টাইফয়েড—দুধ বন্ধ করো। আট দিনের দিন রক্ত পরীক্ষা করে ডাক্তারও বললে, তাই। টাইফয়েড।··· তার পর পুতুলের যেবার রক্ত-আমাশা হ'ল—আমরা জানিও না মা কোথা—উনি নিজেই এলেন, কী সব ওষুধ দিলেন, মেয়ে দিব্যি সেরে উঠল।···কাজেই অসুখ-বিসুখ নিয়েও আর মাথা ঘামাই না আমরা।'

কথাটা যে ঠিক বিশ্বাস হ'ল না তা বলাই বাহুল্য। তবুও মুখে ভক্তি ও বিস্ময়ের ভাব টেনে আনতে হ'ল। তাঁর বলা শেষ হ'লে যখন বেশ গর্ব্বিত-স্মিত মুখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তখন বললুম, 'তাহ'লে অবিশ্যি কথাই নেই। কিন্তু মাঠাকরুণ যদি না থাকতেন কি তিনিই আপনার ওপর বিচারের ভার দিতেন তাহ'লে এ পাত্র পছন্দ হ'ত ত?'

'ও রকম ভাবে কখনই ভাবিনি রমেন বাবু। মা না এলে আমি কিছু বোধ হয় ভাবতেও পারব না। এই দেখুন না, আর একটি সম্বন্ধ এসেছে বর্দ্ধমান থেকে, তাঁদের খুব ইচ্ছা, পাত্রের বাবা আমার অফিসেই কাজ করেন, সে ছেলেও এম-এ পাস, কী একটা খুব বড় চাকরী করে, এখনই বুঝি ছ'শ' টাকা মাইনে—না কি অমনি বললেন, শুনিওনি ভাল ক'রে—মা না এলে ত শুনে লাভ নেই। বুঝলেন না?'

খুবই বুঝলুম। বুঝলুম যে এ পাত্রী আমার শালার অদৃষ্টে জুটবে না। যাক্—তবু মা'র সম্বন্ধে কৌতূহলটা যেন বেড়েই যাচ্ছে ক্রমশঃ। বললুম, 'তা মা কবে আসবেন কিছু জানেন? কিছু লিখেছেন তাঁকে?'

নিশ্চিন্ত পরাশর বাবু বললেন, 'কী করে লিখব! কোথায় আছেন তিনি তা ত জানি না। কোথাও ত বাঁধা ঠিকানা নেই। আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। শেষ শুনেছিলুম ভাগলপুরে গিছলেন—সে-ও ত মাস খানেকের কথা।'

'তবে? তিনি আসবেন কি না কি করে জানবেন?'

'দরকার মনে করলেই তিনি আসবেন। যদি না আসেন ত বুঝব—এখন দরকার নেই।'

এমন মানুষকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে যাওয়া বৃথা। সুতরাং সে চেষ্টা করলুমও না। তবে 'মা'কে দেখবার বাসনা ষোল আনার ওপর আঠারো আনা চেপে রইল।

কিন্তু তিনি ইচ্ছে না করলে ত হবার যো নেই।

দিন সাতেক পরে সকালে বসে চা খাচ্ছি, গৃহিণী এলেন প্রায় লাফাতে লাফাতে। এমন গায়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন যে, খানিকটা চা চলকে আমার লুঙ্গিতে পড়ে গেল। কিন্তু এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে কোন দিনই তাঁর লক্ষ্য নেই, এইটুকু আসবার উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'ওগো শুনেছ, ওদের সেই মা-ঠাকরুণ এসেছেন!'

কড়া রকম একটা ধমক দেব বলে মুখ তুলেছিলুম কিন্তু সে কথা আর মনে রইল না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'কবে? কখন? কে বললে তোমাকে? কী করে জানলে?'

'এইমাত্র দেখে এলুম—দেখবে এসো না—।'

চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রেই দৌড়লুম। আমাদের শোবার ঘর থেকে ওদের বাড়ীর ভেতরের উঠানটা পরিষ্কার দেখা যায়। দেখি মা-ঠাকরুণ বাইরের রকেই বসে আছেন একটা আসনের ওপর—আর পরাশর বাবুরা সপরিবারে ঘিরে ছেঁকে ধরেছেন। যে রকম ভাব-ভঙ্গী এদের, ইনিই যে সেই অদ্বিতীয়া মা সে সম্বন্ধে আর কোন সংশয় রইল না।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম। এদের মাথা বাঁচিয়ে দেখা শক্ত তবু একটু অপেক্ষা করতে সবটাই দেখা গেল। নিতান্ত বেঁটে খাটো একরত্তি মানুষটি, গায়ের বর্ণ শ্যাম, চেহারায় মধ্যে কোন অসাধারণত্বই

নেই। শুধু চোখ দু'টি আয়ত এবং তার দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর। মর্ম্মের মধ্যে পর্য্যন্ত সে চাহনি পৌঁছয়। কেমন যেন ভয়-ভয় করে সেদিকে চাইলে।

স্বামি-স্ত্রী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, মা নিজেই একবার মুখ তুলে চাইলেন, সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে পরাশর বাবুও আমাকে দেখে হৈ-চৈ ক'রে উঠলেন, 'এই যে রমেন বাবু···আসুন, আসুন, মা এসে গেছেন।'

অগত্যা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে তখনি যেতে হ'ল। অফিসের তখনও ঢের দেরী—সে অজুহাত চলবে না। তাছাড়া এম্‌নিতে ওঁরা এত ভদ্র—আঘাত দিতেও কষ্ট হয়।

গিয়ে প্রণামও করতে হ'ল। লাল কাপড় পরনে—ঠিক লাল নয়, হয়ত, রক্তাভ-গেরুয়া বলা চলে। কারণ ওরই মধ্যে আরও গাঢ় লাল পাড়টা নজরে পড়ল। হাতে রুদ্রাক্ষের বালা এবং তাগা। সীঁথিতে সিঁদুর নেই, কপালে অহল্যাবাঈ-ধরণে চওড়া রক্তচন্দনের টিকা, তারই ওপর একটু ভস্ম বা বিভূতির চিহ্ন। কোন্ সম্প্রদায়, কেমন সন্ন্যাস, তান্ত্রিক না অন্য কিছু—কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত

এই ত দেখিয়ে পঁচাশ হাজার টাকা invest কোরে দিলুম চিনিতে, তার পর কি তোল,···দেড় লাখ টাকা income taxএর দেনা ভি শোধ হয়ে গেল তাই থেকে আউর এক লাখ কাপড়ে বেরিয়ে এল। শুনতে কি রকম······আচ্ছা লাগছে না?

সধবা কি বিধবা—কিংবা কুমারী তাই বা কে জানে! পরাশর বাবুকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয়নি, করলেও সদুত্তর পেতুম কি না সন্দেহ, হয়ত শুনতুম, 'তা'ত জানি না। জিজ্ঞাসা ত করিনি—'

এসে সদ্য চা-পান শেষ করেছেন। সামনে খালি পাথরের কাপ। তার পাশে রেকাবীতে গোলাপ-জল-ভিজে-ন্যাকড়ায় ঢাকা পান।

আমি প্রণাম করতে কোন আশীর্ব্বাদও করলেন না—অন্তত ঠোঁট নড়ল না, সাধুদের ধরণে চোখ বুজে প্রতি-নমস্কারও করলেন না। বরং সেই মর্ম্মভেদী দৃষ্টি তুলে একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে রেকাবী থেকে একটা পান তুলে মুখে দিলেন।

পরাশর বাবুর একেবারে আহ্লাদে গদগদ অবস্থা। বললেন, 'মা, ইনিই সেই রমেন বাবু, এঁর কথাই আপনাকে বলছিলুম। বলুন না, সেই যা বলছিলেন—'

মা এবার কথা বললেন। মৃদু ধমক্ দিয়ে বললেন, 'ছি পরাশর! ওঁরা হলেন পাত্রপক্ষ। ওঁরা বার বার কথা পাড়বেন কি! একবার দয়া করে বলেছেন—এই ঢের। আমি দুপুর বেলা ওঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে কথা পাড়ব এখন।'

ওঁর এই বিবেচনায় খুশি না হয়ে পারলুম না। এতক্ষণ যে একটা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করছিলুম, সেটা খানিকটা কাটল। বললুম, 'না না—তাতে কি হয়েছে। এ ত আপনা-আপনির মধ্যেই। বকুল মেয়েটিকে আমার বেশ লাগে। তাই বলেছিলুম আমার শালা প্রদোষের কথা। তা সে ত শুনলুম উনি ঢের ভাল সম্বন্ধ পেয়েছেন অন্য জায়গা থেকে।'

'উহুঁ, উহুঁ—মা সে নাকচ করে দিয়েছেন যে!' সহজ ভাবেই বলেন পরাশর বাবু।

'কেন!' বিস্মিত না হয়ে পারি না, 'সে ত যা শুনেছিলুম খুব ভাল পাত্র! তবে কি সে সব মিছে কথা?'

'না বাবা।' মা-ঠাকরুণ শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মিছে কেন হবে। তাদের আমি জানি। ভাল পাত্র ঠিকই—তবে কি জান বাবা—বড্ড ভাল পাত্র। বৈবাহিক সম্পর্কটা অসমান অবস্থায় করতে নেই। তাতে কোন পক্ষই সুখী হয় না। সেখানে মেয়ের বিয়ে দিতে পরাশরের প্রাণান্ত হবে অথচ ওর তত্ত্ব-তাবাস তাদের পছন্দ হবে না। তারা নাক তুলবে। আমার ইচ্ছা সমান-সমান ঘরেই করি। অবিশ্যি আমি জানি না আপনার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা কেমন—'

'আমাকে আর আপনি কেন বলছেন মা!'···বিনয় করেই বলি, 'আমার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা চলন-সই। এখানে কালিঘাটে একটু মাথা গোঁজার জায়গা আছে—ছোট দোতালা বাড়ী—তাছাড়া দেশেও কিছু বিষয়-আশয় আছে, গিয়ে বসলে একটা ছোট সংসার চলে যায়। এম-এ পাস, সরকারী অফিসে ঢুকেছে, শ' আড়াই টাকা মাইনে পায়। ওর ছোট ভাইটি নেভিতে ঢুকেছে—তারও প্রস্‌পেক্ট ভাল—'

'এ ত বেশ ভাল সম্বন্ধ বাবা! তোমাদের পক্ষ থেকে মেয়ে পছন্দ করবেন কে?'

'ধরুন, আমি আর আমার স্ত্রী। তা দু'জনেরই আমাদের পছন্দ, কাজেই সে কথা আর উঠবে না। এখন আপনি পছন্দ করলেই কথা এগোতে পারে।'

'তাহ'লে চলো না পরাশর, এক দিন ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে ওঁর শ্বশুর-বাড়ী যাই—'

'বেশ ত, যে দিন বলবেন সেদিনই নিয়ে যাবো। আপনি তাহ'লে মন ঠিক করুন—। আমি আবার আসব এখন। আজ তাহ'লে আসি—আবার অফিস আছে ত ?'

'যাও বাবা।···নিশ্চয়—ভাতভিক্ষে আগে।' এবার প্রণাম করতে সস্নেহে তিনি দাড়িতে হাত দিয়ে গুরুজনের মতই সে হাত মুখে তুলে চুমু খেলেন।

পাত্র মা পছন্দ করলেন। পরাশর বাবু ত নির্ব্বিকার, না কি হ্যাঁ—তাঁর পছন্দ হয়েছে কি না—কিছুই বোঝা গেল না। আমি বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন করলুম, তাঁর সেই এক জবাব, 'ও আমি ভেবেও দেখিনি রমেন বাবু, আমি ত পছন্দ করতে যাইনি—সঙ্গে গিয়েছিলুম মাত্র। ভাল-মন্দ আমি বুঝি না, সব ওঁকে ছেড়ে দিয়েছি, উনি যদি ভাল বুঝে থাকেন ত নিশ্চয়ই ভাল।'

'তবু আপনার মেয়ে ত ?'

'কিছু না। সব ওঁর। আমি আমার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে সবই ওঁর সন্তান। আমার কাছে মা আর জগন্মাতা এক হয়ে গেছে রমেন বাবু, সে বিশ্বাস না থাকলে দীক্ষা নিয়ে লাভ নেই।'

যাক্—মা'র যখন পছন্দ হয়েছেই, তখন ওঁকে আর উত্যক্ত ক'রে লাভ কি! প্রশ্ন করলুম, 'তাহ'লে দেনা-পাওনা ?'

'সে-ও উনি। কী চান ওঁকেই বলুন।'

'কিন্তু আপনি কি দিতে পারবেন সে-ও কি উনি জানেন ?'

'নিশ্চয়ই। এটুকুও জানবেন না ?'

তা বটে।

তবে মাকে কিছু বলতে হ'ল না, মা নিজেই কথা পাড়লেন, 'বাবা, বকুলকে যখন তোমরা দয়া করেছই, তখন আর দেরি ক'রে লাভ কি ? তোমাদের ঘরে যাতে ও চলে যেতে পারে সেই ব্যবস্থাটাই তাড়াতাড়ি করে ফ্যালো—'

অর্থাৎ দেনা-পাওনার কথাটা। যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গেই কথাটা পাড়তে হ'ল। কিন্তু এইবার দেখলাম, মা সংসার-ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী বটে তবে উদাসিনী নন। দর-দস্তর বেশ ভালই করতে পারেন—প্রতিটি ব্যাপারে এমন কষাকষি করলেন যে, আমাদের স্বামি-স্ত্রীকে ক্রমেই তালিকা সঙ্কুচন করতে হ'ল। এমন লোকের ওপর সত্যিই সব ছেড়ে দিয়ে লাভ আছে—এত সাংসারিক বুদ্ধি পরাশর বাবুর নেই, তিনি হ'লে অনেক বেশি দিতে রাজী হয়ে যেতেন। মা-ঠাকরুণের দৃষ্টি শুধু অন্তর্ভেদী নয়—বহুদূরপ্রসারীও বটে।

এক দিন আর থাকতে পারলুম না, বলেই ফেললুম। বিয়ের তখন দিন স্থির হয়ে গেছে, দেনা-পাওনা মোটামুটি সব মিটে গেছে, তবু মাঠাকরুণ প্যাঁচ কষছেন দেখে একটু রাগও হয়েছিল বোধ হয়; ঘর থেকে সবাই চলে যেতে বললুম, 'মা, আপনি ত সন্ন্যাসিনী কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি ত আপনার কারুর চেয়ে কম নয় ?'

'কম হবে কেন বাবা—সংসার চিনে দেখে তবে ত ছেড়েছি।'

'কিন্তু এখন ত ছেড়েছেন তবে এ সব কচকচিতে থাকেন কেন ?'

'এদের ত ছাড়তে পারিনি বাবা, এদের কল্যাণের জন্যই এই সবে থাকতে হয়। এরা যে সম্পূর্ণ আমার ওপরই নির্ভর করেছে।'

'তবু—কি রকম লাগে না!'

'কেন লাগবে বাবা! আমি যদি এদের ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে থাকতুম তাহ'লে কি-রকম লাগতে পারত।...তুমি ত লেখাপড়া-জানা ছেলে বাবা, পুরাণ নিশ্চয় পড়েছ—সেকালে রাজা-রাজড়ারা যেখানে থাকতেন সঙ্গে পুরোহিত থাকত। পাণ্ডবরা বনে গিয়েছিলেন তাও পুরোহিত সঙ্গে ছিল। তাঁরা অনেকেই গৃহী ছিলেন না বাবা—কিন্তু গৃহীদের চেয়ে ভাল বুঝতেন বলেই গৃহীরা তাঁদের ওপর নির্ভর করত, তাঁরাও গৃহীদের ছাড়তে পারতেন না।'

কথাটার ভাল রকম সদুত্তর দিতে পারি না, তবু কৌতূহল বেড়েই যায়। খোঁচা দেবার লোভটাও থামে না।

প্রশ্ন করলুম, 'এমন ত আপনার অনেক শিষ্য আছে। তাদের সকলকেই ত দেখতে হয়, তবে সাধন-ভজন করেন কখন?'

'সবাই ত পরাশরের মত নির্ভর করে না বাবা। দেখতে হবে কেন? আর সাধন-ভজন?'

এই বলে হঠাৎ থেমে গিয়ে মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

তখন আমরা ঐ দু'টি মাত্র প্রাণী ঘরের মধ্যে। আমার স্ত্রী অন্যত্র ব্যস্ত, ছেলে-মেয়েরা খেলতে গেছে। মা আমাদের বাড়ীতেই বসে আছেন। সুতরাং খুবই নিস্তব্ধ চারি দিক। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে বহুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে পুনশ্চ প্রশ্ন করি, 'থামলেন কেন মা?'

'সাধন-ভজন কিছু নেই বাবা। এটা শুধু ভেক্।'

'কী যে বলেন!' আমিও পালটা বিনয় করি! যদিও মনে-মনে ঐ বিশ্বাসটাই বদ্ধমূল।

'না বাবা। অকারণ মিছে বলব না। এটা ভেকই। এ ভেক না নিয়ে কী-ই বা উপায় ছিল। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছি, নিকট-আত্মীয় বলতে কেউ নেই—যার বাড়ী যেতুম গলগ্রহ হয়ে থাকতে হ'ত। ঝিয়ের মত খাটতে হ'ত অথচ ঝিয়ের মাইনেটা পেতুম না। পাছে ঝি ছেড়ে যায় বলে ঝিকেও সমীহ ক'রে চলে আজ-কাল—সে ভয়ও থাকত না আমার সম্বন্ধে। সেই অবস্থায় দিশাহারা হয়েই গিয়েছিলাম গুরুর কাছে। তিনি এই কাপড় হাতে দিয়ে বললেন, এই তোর রক্ষা-কবচ দিলাম মা, নিরাপদে এবং সুখে থাকতে পারবি। শিউরে উঠে বললুম তাঁকে—কিন্তু বাবা, এ যে লোক-ঠকানো! তিনি বললেন—লোক-ঠকানো কেন হবে মা, তুমি রীতিমত দীক্ষা দিও, আমি তোমার সব শিখিয়ে দিচ্ছি। আর যাদের অন্ন খাবে প্রাণপণে তাদের উপকারের চেষ্টা ক'রো, তাহ'লেই আর কোন ঋণ থাকবে না।...তবু সঙ্কোচের সঙ্গেই বললুম—কিন্তু বাবা, এ ত ছদ্মবেশ? তিনি বললেন—সে ত অল্প-বিস্তর সকলেরই বটে। ভগবানের থিয়েটারে সবাই আমরা এক-একটা মুখোশ পরে নেমেছি। এক-একটা পার্টে সেজেছি বই ত নয়।—এই আমার সত্য পরিচয় বাবা।'

মা থামলেন। আমি ত অভিভূত। বললাম, 'এ সব কথা কি শিষ্যদের বলেছেন?'

'সবাই ত শুনতে চায় না। শুনলেও বিশ্বাস করে না। পরাশরকে বলেছি কিন্তু ও বিশ্বাস করেনি। ভেবেছে এই সত্যটাই আমার আশ্চর্য্য! যত দিন এঁকে সন্ন্যাসিনী বলে জানতুম তত দিন এঁর ভেক্, ছদ্মবেশ, লোক-ঠকানো ব্যবসা, এই কথাই ভেবেছি, বা আকারে-ইঙ্গিতে সেই খোঁচা দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখন ইনি সেইটে স্বীকার করাতে আর বিশ্বাস হ'ল না। এখন মনে হ'ল এটাই ওঁর বিনয়, ওঁর যথার্থ সন্ন্যাসিনী রূপটিকে আমাদের চোখের আড়ালে রাখতে চান—আমাদের এড়িয়ে বা পিছলে বেরিয়ে যেতে চান।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে বলি, 'আপনি আমাকে হয়ত পরীক্ষা করছেন। কিন্তু আমি অত বোকা নই।... পরাশর বাবু যে বলেন বিপদের সময় বা প্রয়োজনের সময় ঠিক আপনি এসে হাজির হন, সেটা ত মিছে নয়!'

মা হাসলেন। মধুর হাসি। বললেন, 'ওটা নিতান্তই দৈবের যোগাযোগ বাবা। এসে পড়েছি দু'বার এই মাত্র। অনেক দেখেছি, তাই দু'-চারটে রোগের চেহারা দেখলেই চিনতে পারি। দু'-একটা টোট্‌কা ওষুধও জানি—'

'কিন্তু এই যে বকুলের বিয়ের ব্যাপার? পরাশর বাবু বলেছিলেন, সময় হলেই আসবেন। তাই ত এলেন।'

'দূর বোকা ছেলে!...ওর আবার সময় কি? বকুলের কী-ই বা বয়স। দু' বছর পরে বিয়ে দিলেও তোমরা বলতে ঠিক সময়!'

'যখন দু'টো জায়গা থেকে সম্বন্ধ হচ্ছে তখনই বা আপনি এলেন কী ক'রে?'

'বকুল যা মেয়ে—বহু জায়গা থেকেই সম্বন্ধ আস্‌ত।'

এই বলে আর একটু হেসে তিনি উঠে পড়লেন।

অর্থাৎ মা'র সম্বন্ধে রীতিমত দ্বিধায় পড়লুম। কোন্‌টা মিছে আর কোন্‌টা সত্যি—কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না। সেদিন থেকে শ্রদ্ধার ভাবটাই বেড়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু যখন দেখলুম পরাশর বাবুর সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে বিয়ের বাজার করলেন, বিয়ের দিন সমানে হালুইকরদের পিছনে লেগে রইলেন, শেষ পর্য্যন্ত নিপুণা গৃহিণীর মত ফুলশয্যার তত্ত্ব গুছিয়ে পাঠিয়ে নিজেও পরাশর বাবুদের সঙ্গে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলেন, তখন সে ভাবটা রাখা একটু কঠিন হয়ে পড়ল। হিসাব-নিকাশ, টাকা-কড়ি সব তাঁর হাতে। মায় বিয়ে চুকলে ম্যারাপওয়ালা ডেকরেটার সকলকার বিল কেটে দাম ঠিক করে দিয়ে তবে তিনি গেলেন। ঘোর বিষয়ী এবং সংসারী। একটু কৃপণও।

আমাদের জানলা থেকে ও-বাড়ীর ঘর দেখা যেত, দেখে দেখে গৃহিণী বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'বক্ষে করো, সন্নিসীতে অরুচি! ওর চেয়ে আমরা ঢের বেশি বৈরিগী।'

কথাটায় আমার মনেও তখন সায় জাগত।

হয়ত উনি নিজের সম্বন্ধে সত্যি কথাই বলেছেন। সেইটেই একটা কৌশল। জানেন যে নিজের দোষ আগে থাকতে নিজে স্বীকার করলে লোকে বিনয় ভাবে।

বকুলের বিয়ের মাস-কতক পরে হঠাৎ একটা প্যাঁচে পড়ে গেলাম। ফেল্-মারা ব্যাঙ্কের ব্যাপার—আমারই টাকা, অথচ

আমি নানা চক্রান্তে চোরের পর্য্যায়ে পড়ে গিছি। মান-সম্ভ্রম সব বুঝি যায়, সেই সঙ্গে গৃহিণীর সবগুলি গহনাও। তাতেও পার পাব কি না সন্দেহ।

কোথাও যখন কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না, গৃহিণী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, আমারও প্রায় সেই অবস্থা—হঠাৎ শুনলুম ও-বাড়ীতে মা এসেছেন।

পরাশর বাবু আমার এই বিপদের খবরটা জানতেন কিন্তু গরীব কেরাণী, মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত, কোন সাহায্য করবার উপায় ছিল না। এখন মা আসাতে তিনি যেন অকস্মাৎ বল পেলেন, বাড়ী থেকে চেঁচামেচি ক'রে ডাকলেন, 'রমেন বাবু রমেন বাবু—শীগ্‌গির আসুন—মা এসে গেছেন, আর ভয় নেই।'

মা এসেছেন, ওঁদের মা—আমার কী-ই বা করবেন? তবু যেতে হ'ল—বিরক্তি সহকারেই গেলাম। আমি মরছি নিজের জ্বালায় এমন সময় এই সব পাগলামি কি ভাল লাগে!

যেতেই পরাশর বাবু বললেন, 'কেমন বলিনি মা ঠিক সময় আসেন। বলুন ত কী আপনার ব্যাপারটা? খুলে বলুন—কিছু সঙ্কোচ করবেন না।'

আচ্ছা মুস্কিল ত! এ সব ব্যাপারে মেয়েছেলেকে বোঝাই কী ক'রে? আর বুঝেই বা উনি করবেন কি? তবু বলতেই হ'ল। এ রকম কোণঠাসা করলে না বলে উপায় নেই।

যথাসাধ্য সংক্ষেপেই সব বললাম। মা স্থির ভাবে বসে শুনলেন। সামনে সেই প্রথম দিনকার মত খালি পাথরের কাপ আর পানের রেকাবি।

সব শুনে বললেন, 'ভৈরব ব্যাঙ্ক? আচ্ছা, থিয়েটার রোডের সতীশ সেনকে ধরলে কিছু হয়?'

সে কি! চমকে উঠলাম। পুতুল আমাকেও এক কাপ চা দিয়ে গিয়েছিল—সেটা ধাক্কা লেগে পড়ে গেল।

'সতীশ সেনই ত সব মা। ও ইচ্ছে করলে এখনই মিটে যায় ব্যাপারটা।'

'চলো দিকি এখনই একবার যাই। কিছু হয়ত একটা ব্যবস্থা হ'তে পারে।'

এ স্ত্রীলোকটি বলে কি! সতীশ সেন মহা কড়া লোক। কড়া এবং বদমাইস। সে না কি নিজের বাপকে খাতির করে না। সেই হাটে যাবে ছুঁচ বেচতে?

তবু তখন আর আমার অত বিচারের সময় নেই। এক পা জেলে। তখনই একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলুম। মা সেই ধুলো-পায়েই চললেন। বকুলের মা স্নান করে যেতে বলতে উত্তর দিলেন, 'না, সতীশ বাবু শুনেছি সকাল ক'রে বেরিয়ে যায়। ঘুরে আসি আগে—'

আমার মনে তখনও কোন আশা নেই, বরং মনে হচ্ছে যে, এই দুর্দ্দিনে ট্যাক্সী ভাড়াটাই বাজে খরচা। কিন্তু যখন দেখলুম মা বাইরে থেকে কোন এত্তেলা না দিয়েই আমাকে সঙ্গে ক'রে দোতালায় উঠে গেলেন তখন একটু বিস্মিতই হলুম। বোধ হয় সামান্য একটু ভরসাও হ'ল।

সতীশ বাবু তাঁর দোতলায় অফিস-ঘরে বসে কাজ করছিলেন। মাকে দেখে যেন লাফিয়ে উঠলেন, 'এ কী ব্যাপার, মা কতক্ষণ!' উঠে এসেই একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।

মা ঝাঁকিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন, আমাকেও ইঙ্গিত করলেন পাশে বসতে কিন্তু সতীশ বাবু আর চেয়ারে বসলেন না, কার্পেটের ওপর মা'র পায়ের কাছটিতে ঘেঁসে বসলেন।

'এবার কত দিন পরে তোমার দয়া হ'ল বল ত মা।' সতীশ বাবুর কণ্ঠে অভিমানের সুর।

'বড্ড ব্যস্ত ছিলুম বাবা। যাক্—সে কথা, তোমার অফিসের সময় আর আটকাব না বেশিক্ষণ। এই ভদ্রলোকের একটা কাজ উদ্ধার, করতে পারো কি না ছ্যাখো দিকি একবার। বিনা দোষে বড় ঠেকে পড়েছেন।'

'বিনা দোষে না ঠেকলে তুমি সুপারিশ করতে না মা, তা আমি জানি। কিন্তু তা না হ'লে ত তুমি আসতে না। আপনার কী ব্যাপার বলুন ত?'

সংক্ষেপে সব কথা বলতে সতীশ বাবু বললেন, 'এই ব্যাপার? আচ্ছা সে হয়ে যাবে।'

কী উপায়ে আমি উদ্ধার পেতে পারি তাও বলে দিলেন এবং একটা দরখাস্ত লিখে আজই অফিসে নিয়ে গেলে তিনি তখনই আমাকে দায়-মুক্ত করে দেবেন তাও প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সকৃতজ্ঞ চিত্তে নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়াতেই মা-ও উঠলেন।

—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত

ম্যাজি:—কোর্টের বাইরে মিটিয়ে নিতে পারলে না হে?
আসামী:—তাই ত চেষ্টায় ছিলুম, আপনার পুলিশই যত বাগড়া করলে।

সতীশ বাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ভেতরে যাবে না মা, তোমার বৌ যে কান্নাকাটি করবে।'

'সে পাগলীকে তুই বুঝিয়ে বলিস্ বাবা। বর্দ্ধমানের রসময় চাটুজ্জের মেয়ের খুব অসুখ, আজই একবার যেতে হবে। খবর পেলুম আমার ভরসায় একটা ডাক্তার পর্য্যন্ত দেখায়নি। কী পাগলের পাল্লায় যে পড়েছি সব।···এই এগারটার গাড়ীতে আমাকে যেতেই হবে।'

সতীশ বাবু একটু ঈর্ষিত ভাবেই আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি ত ভাগ্যবান্, আপনার জন্যে মা এত কাজের মধ্যেও কলকাতাতে ছুটে এসেছেন—'

'আবার ঐ সব পাগলামী সতীশ!' মা সস্নেহ তর্জ্জন করলেন।

গাড়ীতে যেতে যেতে আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। হেঁট হয়ে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে বললুম, 'মা, কেন যে অত ছলনা করেন। কত কী ভেবেছি আপনার সম্বন্ধে—ছি ছি, সে কথা মনে হলে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে।···কিন্তু আপনি কি দেখে আমায় এত অনুগ্রহ করলেন?'

'আবার তুমি ঐ সব পাগলামী শুরু করলে বাবা? জ্ঞানবান ছেলে দেখে তোমাকে সত্যি কথাই বলেছি! বাঁকুড়া থেকে আসছি, বর্দ্ধমান যাবো, নেহাৎ স্নানাহারের জন্যই পরাশরের বাড়ী এসেছিলুম, তুমি বিশ্বাস করো, এর ভেতর আমার কোন অলৌকিক ক্ষমতা নেই।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটি সত্যের আভাস ছিল যে, আবার সংশয়ে পড়লুম। তবু বললুম, 'কিন্তু এই ত সতীশ বাবুও ঐ কথা বললেন, এঁরা সবাই বিশ্বাস করেন যে, প্রয়োজন হলেই আপনি আসেন। সবাই কি বোকা?'

'স্রেফ যোগাযোগ বাবা। আমারই ভাগ্য হয়ত এখনও বলবান, নইলে এমনি যোগাযোগ আমার অদৃষ্টে বার বার ঘটবে কেন? কিন্তু এ মিথ্যা সম্মানের বোঝা আমি যে আর বইতে পারছি না! ক্রমশঃই মিথ্যার বোঝা ভারি হয়ে উঠছে।'

মা একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন। মনে হ'ল যেন সে চোখে জল ভরে এসেছে—

কিন্তু আর কথার সময় ছিল না। গাড়ী ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। মা তখনই স্নান ক'রে নিলেন। হয়ত তখনও কৌতূহল প্রবল, তাই দাঁড়িয়েই রইলুম। কী খান সেটা দেখে তবে যাবো—মনের অগোচরে এই চিন্তাই ছিল খুব সম্ভব। বিশেষ করে যখন শুনে ছিলাম যে, উনি ব্রাহ্মণের মেয়ে তবু পরাশর বাবুদের হাতে ভাত পর্য্যন্ত খান্—তখন ভাল-মন্দ খাবার লোভেই এই সহজ ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন এই ছিল অনুমান।

কিন্তু খেলেন দেখলাম পাখীর মত একগাল ভাত আর একটি কাঁচকলা সিদ্ধ। একটু ঘি ও একটু দুধ। তার সঙ্গে কোন রকম মিষ্টি পর্য্যন্ত নয়।

'এ কি, হয়ে গেল?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

স্মিত প্রসন্ন মুখে পরাশর বাবু বললেন, 'বারো মাসই উনি এই খান্। আর এই একবার।'

মা হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তপস্যার জন্য নয় বাবা, শরীর ভাল থাকে বলে এম্‌নি কম খাই। বেশি খেয়েই যত অসুখ।'

মা তখনই চলে গেলেন। কিন্তু আমার দ্বিধা আজও কাটল না। কোন্‌টা বিশ্বাস করব—মা'র কথা, না মা'র কাজ? অথচ গাড়ীতে সেদিন নিঃসংশয় সত্যের সুরটিই তাঁর কণ্ঠে বেজেছিল। সেই সঙ্গে একটা চাপা বেদনা; পারিপার্শ্বিকের বাঁধা মার খেয়ে নিরুপায়ের কণ্ঠে যে বেদনা বাজে।

আমার স্ত্রী কিন্তু এবার তাঁর পায়ে আছড়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। কবে যে তিনি আসবেন তা জানি না— তিন বছর গেছে সেই দিনটির পর। জানবার উপায়ও ত নেই। কাউকে কোন দিনই তিনি ঠিকানা দেন না, কোথায় কখন থাকেন তাও কেউ জানে না।

বিয়ে

(চীনা গল্প অবলম্বনে)

দু'জনে লিউ উপত্যকায় বাস করতেন, আশ-পাশের গাঁয়ের লোকেরা ওঁদের প্রেততাত্ত্বিক তুক-তাকের কথা জানত। এক জন পুরুষ; ডাক-নাম তাঁর দ্বিতীয় কুং মিং।* অপর জন স্ত্রীলোক; ডাক-নাম তৃতীয় পরী-কন্যা। দ্বিতীয় কুং মিংএর আসল নাম ছিল লিউ সিউ তে। ব্যবসা করবার সময় তিনি তখন এ নাম ব্যবহার করতেন। তুক-তাক প্রেততত্ত্বে তিনি এখন আত্মনিয়োগ করেছেন। দৈব-নির্দেশ না পেলে কোন শুভ কাজে তিনি হাত দিতে সাহস পান না। আর তৃতীয় পরী-কন্যা তো প্রতি মাসের পয়লা ও ১৫ই তারিখে মাথায় লাল রঙের এক পট্টী এঁটে নিজেকে জাহির করতে থাকেন 'দেবী' বলে। 'শস্য-বপনের পক্ষে শুভ নয়' কথাটা ভুলেও মুখে আনেন না দ্বিতীয় কুং মিং। আর তৃতীয় পরী-কন্যা ভুলেও উচ্চারণ করেন না: 'ভাতটা গলে গেল' কথাটা। বিশেষ এই দুটি সাংকেতিক উক্তির পিছনে দু'টি কাহিনী যুক্ত রয়েছে:

একবার হোল কি, সারাটা বসন্ত কাল কেটে গেল তবু যদি এক ফোঁটা বৃষ্টি হোত। পঞ্চম শুক্লপক্ষের তিন দিনের দিন সামান্য একটু জল হোল গুঁড়িগুঁড়ি। চতুর্থ দিন তাই যখন সবাই বীজ বপনের জন্য মাঠে ছুটছিল, দ্বিতীয় কুং মিং করলেন কি, তিনি তাঁর পাঁজি-পর্ত্তর বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করে আর কর-গণনা করে জানিয়ে দিলেন যে, 'শস্য-বপনের পক্ষে দিনটা আজ শুভ নয়।' পঞ্চম দিন ছিল আবার 'ড্রাগন বাচ, উৎসব'। সাধারণতঃ তিনি সেদিন বিশ্রাম নিয়ে থাকেন। ষষ্ঠ দিনটি তাঁর মতে শুভ দিন। কিন্তু দুর্ভাগ্য

* কুং মিং (?—২৩৪)—প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। সঠিক ভাবে তিনি ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারতেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

বশতঃ মাঠগুলি ইতিমধ্যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সেদিন তিনি অবশ্য তাঁর চার একর জমিতে বীজ ফেললেন। কিন্তু অর্দ্ধেকও বীজ তাতে ফলল না। আর সবাই যখন নতুন চারা নিড়ান নিয়ে ব্যস্ত, দ্বিতীয় কুং মিং আর তাঁর ছুই ছেলে তখন প্রথম বারের বীজ সব মাঠে মারা গেল বলে আবার রোপণ করতে গেল। 'রোপণের পক্ষে দিনটা শুভ নয়', তাঁর এই ভবিষ্যৎ বাণীই তাঁর সর্বনাশের মূল। সারা গাঁয়ে এ জন্য তাঁকে হ'তে হোল হাস্যাস্পদ।

তৃতীয় পরী-কন্যার বছর নয়েকের একটি মেয়ে ছিল। নাম সিয়াও চীন। প্রতিবেশী চীন ওয়াং-এর পিতার অসুখ করেছিল। তিনি তাই এক দিন তৃতীয় পরী-কন্যার ছুয়ারে এসে ধর্ণা দিলেন। তিনি এসে বসলেন তৃতীয় পরী-কন্যার ধূপ-ধুনাপূর্ণ বেদীটির সামনে জানু পেতে এবং "দেবী"র মুখ থেকে আদিষ্ট দাওয়াই-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। "দেবী" তখন বিড়-বিড় করে কি সব মন্ত্র আউড়ে চলেছেন তো চলেছেন। সিয়াও চীন ছিল রান্নাঘরে। হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছিল ছুপুরের, মাকে ঘটা করে অমন মন্ত্র-পাঠের ভড়ং করতে দেখে উনানে চাপান হাঁড়ির কথা সে ভুলে গেল একেবারে। মন্ত্র শুনতে সে দাঁড়াল থমকে। কিছুক্ষণ পর চীন ওয়াং-এর বুড়ো বাপ যখন প্রস্রাব করতে বাইরে গেলেন, তৃতীয় পরী-কন্যা করলেন কি, মাধ্যমের আনুষ্ঠানিক আসনে বসে লোক-জন কারুর সঙ্গে তাঁর যে কথা-বার্তা কওয়া নিষেধ সেটা ভুলে গিয়ে তিনি মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সিয়াও চীনকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন: 'যা যা, নিজের কাজ কর গে তুই। ভাতটা ওদিকে গলে গেল একেবারে!'

কথাটা অপ্রত্যাশিত ভাবে কানে গিয়ে পৌছল বুড়োর। এবং গাঁয়ের সকলের কানে তিনি তা পৌছে দিতে একটুও কসুর করলেন না। এর পর থেকে কৌতুকপ্রিয় গ্রামবাসীরা তৃতীয় পরী-কন্যার সামনেই 'ভাতটা গো গলে গেল' বলে টিপ্পনী কাটতে প্রায় ছাড়ত না।

২

পূরো ত্রিশ বছর ধরে তৃতীয় পরী-কন্যা দেবতা নামানোর পেশা চালিয়ে আসছেন। পনেরো বছর যখন তাঁর বয়েস, য়ুফুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। গাঁয়ের মধ্যে তিনি তখন সেরা সুন্দরী। য়ুফুও খাঁটি লোক। কর্মঠ যুবক; বাজে কথা বড় একটা বলে না।

য়ুফুর মা পূর্বে মারা গিয়েছিলেন। তাই পিতা-পুত্র যখন ক্ষেতের কাজে মাঠে চলে যেতেন, ঘরে একমাত্র নব-পরিণীতা বধূ ছাড়া আর কেউ থাকত না। বধূর এই একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে গাঁয়ের ছোকরা সব আনন্দে ছুটে আসত তাকে সঙ্গ দেবার জন্য। দিন কয়েকের মধ্যে নববধূ সে সব ছোকরাদের মস্ত একটা দল জুটিয়ে ফেললে। ওরা এসে তাকে হাসি-ঠাট্টা-মস্করায় সিঞ্চিত করে রাখত সব সময়। য়ুফুর পিতা বধূর এ সব চাল-চলন বরদাস্ত করতে পারতেন না। ধৈর্য্যের সীমা তিনি এক দিন হারিয়ে ফেললেন। রেগে আগুন হয়ে ছোঁড়াদের সব ডেকে এমন প্রচণ্ড গালাগালি করলেন, যার ফলে ওরা এ-বাড়ী আসা নিশ্চয় ছেড়ে দিত, যদি নববধূ সারা দিন-রাত্রি ধরে হুলুস্থুল একটা কাণ্ড করে না বসত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাথায় দিল না সে চিরুণী; করলে না জলস্পর্শ; তৃণটি পর্য্যন্ত কাটলে না দাঁতে; সারাটা দিন বিছানায় শুয়েই কাটিয়ে দিল। বিস্তর সাধাসাধিতেও যদি মাথা তুলত একটি বার। স্বামী আর শ্বশুর বেকুব বনে গেল একেবারে। বুঝে উঠতে পারলে না কি করবে। প্রতিবেশী এক ঠান্‌দি কোত্থেকে এক ডাইনী বুড়ী এনে হাজির করল এমন সময়। সে তো বিস্তর মন্ত্র-তন্ত্র আউড়ে এক সময় বলে উঠল: 'তৃতীয় পরী-কন্যা নববধূর স্কন্ধে ভর করেছে। নববধূও অমনি সঙ্গে-সঙ্গে বিড়বিড় করে উঠল:

'হ্যাঁ-হ্যাঁ; না-না!'

সত্যি সে যেন কারো মিডিয়াম। এর পর থেকে তিনি নিজেকে তৃতীয় পরী-কন্যা বলে জাহির করতে থাকেন। এবং প্রতি মাসের ১লা ও ১৫ই তারিখে নিয়মিত দেবতার উপাসনা করেন। মাসের এই ছুই দিন গ্রামবাসীরা তাই ধূপকাঠি আর মোমবাতি নিয়ে ধর্ণা দেয় তাঁর দরজায়। তিনি তখন যোগিনীর ঢঙে ওদের ভাগ্য আর স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় নানান্ প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকেন।

যে সব ছোঁড়া তৃতীয় পরী-কন্যার নিকট ছুটে আসত ওরা তাঁর মুখে ধর্ম-কথা শুনবার চাইতে তাঁর শ্রীমুখের কথামৃত শুনবার প্রতি সবিশেষ নজর দিত। তৃতীয় পরী-কন্যাও তা জানতেন। জানতেন তাঁর শক্তি নিহিত কোথায়। তাই তিনি পরিপাটি করে বেশভূষা করে থাকতেন; চুল আঁচড়াতেন পরিপাটি করে। মুখে একগাদা পাউডার মেখে ঐ সব ছোঁড়াদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠতেন।

এ হোল ত্রিশ বছর আগেকার কাহিনী। অধিকাংশ তাঁর ভক্তের এখন গোঁফ গিয়েছে পেকে। শ্বশুর হয়ে পড়েছে ছেলে-মেয়ের। গুটি কয়েক ঝানু আইবুড়ো ছাড়া কেউ আর তৃতীয় পরী-কন্যার কাছে আসবার বড় একটা সময় করে উঠতে পারেন না। কিন্তু তিনি তা খুব একটা গায়ে মাখে না। বয়েস পঁয়তাল্লিশের কোটা ছাড়িয়ে গেছে। তবু তিনি পরিপাটি করে সাজ-গোজ করতে ভালবাসেন। জরির কাজ-করা জুতো পরেন। পায়জামা পরেন ফুল তোলা। ছুর্ভাগ্যের কথা, মাথার এখানে-ওখানে চুল উঠে গিয়ে তাঁর টাক দেখা দিয়েছে। তিনি তাই ঢাকবার জন্য রুমাল বাঁধেন মাথায়। অত পাউডার মেখেও তিনি যদি মুখে বার্দ্ধক্যের খাঁজ ক'টা ঢাকতে পারতেন! বরং পুরু করে পাউডার মাথায় মুখখানাকে তাঁর অনেকটা এক স্তর তুষারাবৃত ডিম্বাকার গাধার নাদের মত দেখাত।

তাঁর আগেকার ভক্তবৃন্দের দল বড় একটা এদিক পানে মাড়ায় না। জন কয়েক যে আইবুড়ো মাঝে-সাঝে আসে তারাও হয়ে উঠেছে ফিকে-পানসে। তাই তিনি করলেন কি, নতুন করে আর এক দল ছোঁড়া নিলেন জুটিয়ে। ওরা তাঁর আমলের ছোঁড়াদের চাইতে সংখ্যায় ঢের বেশী; দেখতেও বেশ সুন্দর। কিন্তু ওদের মূল আকর্ষণ হোল তাঁর কুমারী মেয়ে সীয়াও চীন।

৩

সব শুদ্ধ ছ'টি কন্যা জন্মেছিল তৃতীয় পরী-কন্যার। পাঁচ জনেরই শৈশবে মৃত্যু হয়, সিয়াও চীনই তাঁর একমাত্র মেয়ে যে এখন বেঁচে

আছে। সে যে বুদ্ধিমতী দু'-তিন বছর বয়সেই তার প্রমাণ মিলল। মা'র ভক্তবৃন্দ এসে ওকে লুফে কোলে তুলে নিত। বলত: "এ আমার মেয়ে!" অমনি অপর আর এক জন হয়ত ওকে কোলে নিয়ে বলে উঠত: 'না, না, ওটি আমার মেয়ে! তার যখন বছর পাঁচ-ছয় বয়স, সিয়াও চীন তখন বুঝতে পারলে, এ সব মন্তব্য তার বেলায় মোটেই শোভন নয়। তার মা-ও তাকে শিখিয়ে দিলেন, ফের যদি কেউ অমন কথা মুখে আনে সে যেন তাকে শুনিয়ে দেয়: 'না মশাই, আমি তোমার মাসী হই!'

সকলে বলতো, সিয়াও চীন আঠারো বছর বয়সে তার মা'র চাইতে বেশী সুন্দরী। গাঁয়ের ছেলে-ছোকরারা কাজের ফাঁকতালে একটু সুযোগ পেলেই তার সাথে দু'টি মিষ্টি কথা না বলে ছাড়ত না। সিয়াও চীন কাপড় কাচতে নদীতে গেলে দল বেঁধে ওরা পিছু নিত। আগাছা বাছবার জন্য বাড়ী থেকে বেরুলেই ওরা তার সংগ নিত। দুপুর বেলা পাড়া-পড়শীরা তৃতীয় পরী-কন্যার বাড়ীতে ছুটে আসত নিজ নিজ ভাতের বাটী নিয়ে। গল্প-গুজব করে যেত কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে। ত্রিশ বছরেরও বেশী এই রীতি চলে আসছে এ-বাড়ীতে। কিন্তু ছেলে-ছোকরাদের এই উৎসাহ-আতিশয্যের ইতিহাস মাত্র দুই কি তিন বৎসরের। প্রথম প্রথম তৃতীয় পরী-কন্যা ভাবতেন, তিনি বুঝি এখনও গাঁয়ের ছোকরাদের আকর্ষণ করবার শক্তি রাখেন। পরে কিন্তু তাঁর এই ভুল ভাঙে। বুঝতে পারেন, ওরা ছুটে আসে তাঁর মেয়ের টানেই।

সিয়াও চীন মাকে আদৌ পছন্দ করে না। যা তার পক্ষে করা উচিত না এমন কিছু একটা সে করতো না, যদিও সে সকলের সঙ্গে হেসে-মেতে কথা কইত। গত দু'-তিন বছর থেকে সিয়াও-এর হিআইয়ের সঙ্গে তার আলাপটা বেশ জমে উঠেছিল। গ্রীষ্মের এক সকালে বাবা তার মাঠে গেছেন ক্ষেতের কাজে। মা-ও বেরিয়েছে পাড়ায় গল্পের মজলিশে। পাড়ার বকাটে ছোঁড়া চীন ওয়াং এমন সময় ঢুকল তাদের বাড়ীতে। দু'পাটী দাঁত দেখিয়ে এক-গাল হেসে সিয়াও চীনের কাছে সে এগিয়ে এল। বলল: 'বাঁচা গেল বাবা, ঘরে কেউ নেই! আমরা যা কিছুই করি না কেন, জানতে পারবে না কেউ।'

'চীন ওয়াং-দা, কি যে বলো তুমি ঠিক নেই।' গম্ভীর হয়ে বলে উঠল সিয়াও চীন—'আমরা কি এখনও ছেলেমানুষ?'

'হ্যা-হ্যা, ঢের হয়েছে, ছেনালী রাখো। আর ভালো মানুষ সাজতে হবে না।' বলে চলল চীন ওয়াং—'সিয়াও-এর হিআই এলে তো ঢলে পড়তে এতক্ষণে। ওর মধ্যে এমন কি পেলে শুনি যা আমার নেই? ওর উপর মন উঠতে পারে আর আমার বেলায় বুঝি ওঠে না?'

সিয়াও চীনের হাত দু'খানা সে দু'-হাতে আঁকড়ে ধরল। ওকে বুকে টেনে নিয়ে কানে কানে বলে উঠল; 'যাও, ঢের হয়েছে, আর নেকামী করতে হবে না!'

এমন একটা ঘটনা ঘটবে চীন ওয়াং স্বপ্নেও ভাবেনি। সবাই যাতে শুনতে পায় সিয়াও চীন চিৎকার করে উঠল সে জন্য। চীন ওয়াং আর করে কি? বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হোল ওকে। তার পর ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। যাবার সময় শাসিয়ে গেল: দেখে নেবে সে।

৪

চীন ওয়াংকে গাঁয়ের কেউ দেখতে পারত না দু'চক্ষে। সম্পর্কিত ভাই সীন ওয়াংই ছিল তার একমাত্র বন্ধু। বাপ তার গ্রামের ক্ষেত-মালিক। প্রতাপে তিনি বাঘের মত। এক-পুরুষ ধরে বুড়ো মোড়লগিরি করে আসছে সারা গাঁয়ে। দুঃস্থ গ্রামবাসীদের ধরে মারধর করা, আটক রাখা ইত্যাদির কলা-কৌশল রপ্ত করে নিয়েছে বেশ। চীন ওয়াং সতেরো-আঠারো বছর থেকে বাপের অপকর্মে নাক গলায়। ধর-পাকড় করতে হোলে বাপকে আর ছুটতে হয় না নিজে। বাপের মুখের কথা বেরুতে না বেরুতেই ছেলে অমনি ছুটে যায়। ধরে আনতে বললে নিয়ে আসে বেঁধে। প্রতিটি দুষ্কর্ম নিজেই হাসিল করে আসে।

প্রতিরোধ-যুদ্ধের গোড়ার দিকে বিশ্বাসঘাতক আর শত্রুপক্ষের গুপ্তচর, ছাড়িয়ে-দেয়া সৈন্য আর ডাকাতেরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াত দেশের মধ্যে। উৎপাত করে বেড়াত পল্লী অঞ্চলে। চীন ওয়াং-এর বাপ তখন মারা গেছে। দু'-ভাইকে তখন আর পায় কে? সব রকমের বিশ্বাসঘাতকতার কাজে ওরা পেয়ে গেল স্বাধীনতা। পরাজিত এক দল সৈন্য জুটিয়ে গাঁয়ের লোকদের অপহরণ করতে ওরা সহায়তা কোরত। তাদের ঘৃণ্য কার্যাবলীর এই কেবল একটা নমুনা। কমিউনিষ্ট আট-নম্বর রুট আর্মি এসে ডাকাতদের অত্যাচার যখন দূর করল, দু' ভাই তখন লিউ উপত্যকায় এল ফিরে।

লিউ উপত্যকার লোক-জন সব জন্মভীরু। চারি দিকের ডামা-ডোলের বাজারে অনেকেই যখন বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে, ওরা তখন ঘর থেকে এক পা বাড়াতে কি আর সাহস পায়? আশ-পাশের বড় বড় গ্রামগুলিতে এদিকে পর-পর শাসনতান্ত্রিক দপ্তর, দেশপ্রেমিক সমিতি, সামরিক কমিটি প্রভৃতি গড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু লিউ উপত্যকায় একমাত্র গাঁয়ের মোড়লের পদ ছাড়া—তাও আবার শাসন-কর্তা এসে নিয়োগ করে গিয়েছিলেন—কেউ আর অমন ধারা সরকারী কোন পদে অধিষ্ঠিত হ'তে সাহস করল না। গ্রাম্য প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য যখনই কোন আমলাকে সরকারী দপ্তর থেকে পাঠান হোত লিউ উপত্যকায়, গ্রামবাসীরা তখন একে অপরকে দেখিয়ে দিত। পদ-প্রার্থী হ'তে নিজেরা কিছুতেই চাইত না। 'জনগণকে সেবা করা'র এই সুযোগ হারাল না চীন ওয়াং আর সিন ওয়াং। সিন ওয়াং গ্রাম-রক্ষী দলের আর চীন ওয়াং বেসামরিক কমিসার দপ্তরের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হোল। এমন কি, চীন ওয়াং-এর স্ত্রীও বাদ গেল না। জাপবিরোধী নারী সমিতির সে সভানেত্রী নির্বাচিত হোল! বাদবাকী পদগুলি ভর্তি করা হোল যত সব বুড়ো আর অথর্বদের দিয়ে। কিন্তু জাপবিরোধী যুব বাহিনীর অধিনায়কত্ব তো আর কোন বৃদ্ধকে দিয়ে চলে না। চীন ওয়াং-এর তখন মনে পড়ল সিয়াও-এর হিআই-এর সুন্দর মুখখানা। ওকে সে ও-পদে বসিয়ে দিল। সিয়াও-এর হিআই-এর বাবা দ্বিতীয় কুং মিং এটা পছন্দ করেন না। তবে চীন ওয়াং-এর বিরাগভাজন হতেও তিনি চান না, ফলে নির্বাচন কালে সিয়াও-এর হিআই সহজে নির্বাচিত হয়ে গেল।

গাঁয়ের মোড়ল এই উপত্যকার বাসিন্দে। অনেক কিছু তাঁকে শিখে না নিলে চলে না। যতই দিন যেতে লাগল চীন ওয়াং আর আর সিন ওয়াং-এর প্রতিপত্তি বেড়ে উঠল। পূর্বের চাইতে ওরা

আরও উগ্রতর হয়ে উঠতে লাগল। ছোটখাট আমলাদের চোখে যত দিন ধুলো দেয়া যায়, গ্রামবাসীদের তখন গ্রাহ্য করে কে? ওর তো কেবল তাদের কৃপার পাত্র। গ্রাম্য-প্রতিনিধিদের যখন-তখন বদ-বদল হ'তে লাগল। দু'ভাই কিন্তু নিজ নিজ পদে কায়েমী হয়ে রইল। সকলে ওদের বিষবং বর্জন করত। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত অমন দুই শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে পারত না অর্দ্ধেকটাও।

৫

সিয়াও-এর হিআই দ্বিতীয় কুং মিংএর দ্বিতীয় পুত্র। একবার যখন শত্রুদের বিরুদ্ধে ধড়-পাকড় যুদ্ধ চলছিল, দু'জন শত্রুসৈন্যকে সে তখন ঘায়েল করে। দক্ষ নিশানাদার হিসেবে সে লাভ করেছিল পুরস্কার। চাঁদপানা তার মুখ আর সুগঠিত তার দেহাবয়ব ছিল উপত্যকার সকলের গর্বের বস্তু। প্রতি বছরের প্রথম মাসে সে যখন গ্রামে-গ্রামে খেলতে যেত, মেয়েরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত তার দিকে।

সিয়াও-এর হিআই ইস্কুলে কখনও পড়েনি। তার বয়স যখন ছয়, বাবা তাকে গুটি কয়েক অক্ষর শিখিয়ে দেন। সে খুব চালাকচতুর ছেলে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের বহু শ্লোক শীঘ্র সে কণ্ঠস্থ করে নিল। কোন আগন্তুক এলে ওর বাবা ছেলেকে তাদের নিকট এনে হাজির করত। ওরাও তার শান্ত স্বভাবের সুযোগ নিয়ে তাকে জ্বালাতন না করে ছাড়ত না। কিন্তু "শস্য-বপনের পক্ষে অশুভ দিনের" দুর্ঘটনার পর দ্বিতীয় কুং মিংকে দেখলে গ্রামবাসীরা অমনি হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দিত। তাঁর স্ত্রী আর বড় ছেলেটিও বাপের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। বেচারী সিয়াও-এর হিআইকেও বাপের নিন্দার অর্দ্ধেক ভার মাথা পেতে নিতে হোল। ছেলেমানুষ পেয়ে তাকে নিয়ে সবাই এ জন্য ঠাট্টা-তামাসা করত। তার বয়স তখন তেরো বছর। কিন্তু বড়োরা তাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ বলেই গণ্য করত। আর তার সমবয়সীরা আচ্ছা করে তাকে জব্দ করবার জন্য ফন্দি আঁটত। ওরা তার পিছু নিতো। চীৎকার করে বলে উঠত: "বীজ-বপনের পক্ষে শুভ নয় দিনটা গো, শুভ নয় দিনটা!" এমন ধারা প্রায় মাসখানেক ধরে চলল। মা'র উপদেশ মত সিয়াও-এর হিআই ভবিষ্যতে বাপের কোন ব্যাপারে আর থাকবে না ঠিক করলে।

আজ দু'বছরেরও বেশী সিয়াও চীনের সঙ্গে সিয়াও-এর হিআইয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার বয়স তখন সতেরো। পাড়ার বকাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে মিশে শীতের এক দীর্ঘ রাত্রে সে আড্ডা দিতে এসেছিল তৃতীয় পরী-কন্যাদের বাড়ীতে। সিয়াও চীনের সঙ্গে তখন হয় তার প্রথম আলাপ। আজ তা এমন নিবিড় হয়ে উঠেছে যে, প্রত্যহ একবার সিয়াও চীনকে না দেখলে প্রাণ তার আই-ঢাই করতে থাকে। প্রেমিক-প্রেমিকা দু'জনকে পরিণয়-সূত্রে বেঁধে দেবার জন্য গাঁয়ে অবশ্য ঘটকের অভাব ছিল না। কিন্তু এ বিয়েতে দ্বিতীয় কুং মিংএর আপত্তি তিন কারণে: প্রথম দফা, সিয়াও-এর হিআইয়ের রাশি হোল "ধাতু" আর সিয়াও চীনের "অগ্নি"। এখন অগ্নি ধাতুকে পেলেই যে গিলে খায়! দ্বিতীয়তঃ, সিয়াও চীনের জন্ম বছরের দশম মাসে। ও-মাসটা নিষ্ফলা। আর তিন কারণ—তৃতীয় পরী-কন্যার বিরুদ্ধে প্রচলিত বদনাম।

চ্যাংতে অঞ্চল থেকে তখন এক দল বাস্তুহারা এসেছিল। ঐ দলে লি নামে ছিল এক বৃদ্ধ, তার ছিল আট-নয় বছরের একটি ছোট মেয়ে। অনাহারের কবল থেকে বাঁচবার জন্য মেয়েটাকে কারও কাছে গছাতে পারলেই বুড়ো যেন বর্তে যায়। দ্বিতীয় কুং মিং ভাবলেন, দাঁও-এ বুঝি পাওয়া গেল মেয়েটাকে, তিনি ওর জন্ম-তারিখ আর ঠিকুজীটা চেয়ে নিলেন। তার পর বিস্তর গণনা করে ঘোষণা করলেন: 'হাজার হাজার মাইল দূরদেশে জাতক-জাতকীর জন্ম বটে, কিন্তু ওদের দু'জনের বিবাহ হ'তেই হবে—বিধাতার লিখন!' সিয়াও-এর হিআইয়ের ভাবী বধূরূপে তিনি মেয়েটাকে বাড়ীতে রেখে দিলেন।

বাপ মেয়েটাকে আদর্শ পুত্রবধূরূপে নিলেও তাঁর ছোট ছেলে কিন্তু ওকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হোল না। এ নিয়ে পিতা-পুত্রে মনোমালিন্য চলল দিনের পর দিন। দ্বিতীয় কুং মিং কিন্তু ক্ষান্ত হলেন না। নিজের জিদ বজায় রাখলেন। সিয়াও-এর হিআই তখন বলল: 'বেশ, তুমি যদি ওকে বাড়ীতে রাখতে চাও রাখো। আমি কিন্তু এর মধ্যে নেই।'

মেয়েটা শেষ পর্যন্ত থেকেই গেল। তবে বাড়ির অপর লোক-জনদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি, সঠিক বোঝা গেল না।

৬

সিয়াও চীনের নিকট প্রত্যাখ্যাত হয়ে চীন ওয়াং মনে-মনে তার উপর প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলে। যতই দিন যেতে লাগল

সংকল্প তার বাড়তে লাগল। সিয়াও-এর হিআই ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল। তাই সামরিক সদর দপ্তরের জন্য গ্রাম্য-প্রতিনিধিদের শিক্ষার এক সভায় সে পারল না উপস্থিত থাকতে। সভার পর চীন ওয়াং সিন ওয়াংকে বলল: 'সিয়াও-এর হিআইয়ের জ্বর না হাতি! আসলে ও গিয়ে প্রেম করছে সিয়াও চীনের সঙ্গে। ওর বিরুদ্ধে আমাদের এবার লড়তে হবে।'

সিন ওয়াং ছিল গ্রামরক্ষী দলের কর্তা। সিয়াও চীনের উপর তারও রাগ। সহজেই সে রাজী হোল। চীন ওয়াংকে বললে, সে যেন তার স্ত্রীকে বলে জাপবিরোধী নারী সমিতিতে সিয়াও চীনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায় এ নিয়ে। চীন ওয়াংয়ের স্ত্রী ঐ সমিতির সভানেত্রী। সিয়াও চীনের বাড়ীতে স্বামী তার ঘন ঘন যাতায়াত করত বলে ওকে সে ঘৃণা করত। কুমতলবটা শুনে সে বরং খুশীই হোল; ভাবলে, এত দিনে বুঝি গায়ের ঝাল সে মেটাতে পারবে। হাতের সেলাইএর কাজ ফেলে সে অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠল শত্রুকে জব্দ করতে। পরদিন গ্রামে দু'টি সভার আয়োজন হোল। সিয়াও-এর হিআইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সামরিক সদর দপ্তর কর্তৃক আহূত হোল একটা সভা। আর অপরটা ডাকা হোল সিয়াও চীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাপবিরোধী নারী সমিতি কর্তৃক।

যে অপরাধ সে করেনি তার কাছে নতি স্বীকার করতে সিয়াও এর হিআই কিছুতেই পারলে না। আত্মপক্ষ সমর্থনে সে অটুট রইল। ওকে বেঁধে আনবার জন্য সিন ওয়াং আদেশ দিল তার লোক-জনদের। বিচারের জন্য চালান দিল তাকে গ্রামের কর্তৃপক্ষের নিকট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গাঁয়ের মোড়লটি ন্যায়বান আর ঠাণ্ডা মেজাজী। সিন ওয়াংকে তিনি জানালেন: সিয়াও-এর-হিআই সত্যিই ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল। আর ও যদি প্রেমও করে থাকে তা আপনার বে-আইনী কেন হবে? এ জন্য আপনি খামকা ওকে বেঁধে আনতে পারেন না।'

সিন ওয়াং কিন্তু নাছোড়বান্দা। বার বার সে বলতে লাগল: 'ওর যে এক স্ত্রী বর্তমান আছে!'

'সে কি কথা! ছোট যে মেয়েটাকে ওর বাপ ছেলের বউ হিসেবে পছন্দ করেছিল, ওকে সে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। এ কথা যে গাঁয়ের সকলেই জানে!' জবাব দিলেন মোড়ল। বললেন,—'ঐ বিয়েতে ওর আপত্তির কারণ আছে বই কি! ছেলেদের ষোল বছর আর মেয়েদের পনেরো বছর না হ'লে যে বাগ্‌দত্তা করা চলে না। ছোট ওই মেয়েটা তো এখনো তেরো বছরেও পা দেয়নি। সে যখন বড়ো হবে সেও তখন আপন পছন্দ মত নিজ স্বামী বেছে নিতে চাইবে। অতএব, সিয়াও-এর হিআই নিজ পছন্দ মত কোন মেয়েকে ভালবাসতে পারে বই কি! কেউ তাতে বাধা দিতে পারে না।"

সিন ওয়াংএর মুখে কোন উত্তর জুটল না। সিয়াও-এর হিআইও পাল্টা অভিযোগ আনল। বলল: 'বিনা কারণে কাউকে বেঁধে আনা কি আপনার আইন মাফিক কাজ হচ্ছে?'

দুই জনকে শান্ত করবার জন্য মোড়ল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

পল্লী-শাসন দপ্তর থেকে সিঙন ওয়াং বিদায় নেয়নি তখনও। তার পূর্বেই সিয়াও চীনকে রণ-রঙ্গিণী বেশে ওদিকে আসতে দেখা গেল জাপবিরোধী নারী সমিতির সভানেত্রীকে হেঁচড়িয়ে টেনে আনতে। কাছারীতে ঢুকবার পূর্বেই সে মোড়লকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলে উঠল: 'আপনারাই বলুন তো, কারো নামে কোন অভিযোগ আনলে তার প্রমাণ চাই না? জাপবিরোধী নারী সমিতির সভানেত্রী বলে উনি কি মাথা কিনে নিয়েছেন? মর্জি-মাফিক যা-খুশী তাই করে যাবেন?'

সিন ওয়াং চীন ওয়াংএর স্ত্রীর দশা দেখে ভয় পেয়ে গেল মনে-মনে। আশংকা হোল, কি জানি আড়াগোড়া সব ঘটনাটাই বুঝি বেফাঁস হয়ে যায়। জড়িয়ে পড়ে সে নিজেও। তাই সে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল ওখান থেকে। গাঁয়ের মোড়ল ব্যাপারটা সব শুনলেন। কিছু অনুসন্ধানও করলেন। তার পর খানিকক্ষণ ভেবে-চিন্তে মামলাটা মিটিয়ে দিলেন অবশেষে।

৭

এদিকে তৃতীয় পরী-কন্যার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। যুবকদের সঙ্গ তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু মেয়েটাই যে পথের কাঁটা! ওরা কেউ আর তাঁকে পোঁছে না। সিয়াও চীনের সঙ্গ চায় সবাই। এটা তিনি টের পেলেন সম্প্রতি। সিয়াও-এর হিআই ছোঁড়াটা একটি তাজা ফল—ভাবেন তৃতীয় পরী-কন্যা। কিন্তু মেয়েটার জন্য একবার চোখে দেখবার কি উপায় আছে? সিয়াও চীনের জন্য তিনি বহু দিন থেকে একটা পাত্রের সন্ধান করছিলেন। মেয়েটাকে পার করতে পারলে তিনি যেন নিষ্কৃতি পান। কিন্তু তাঁর অপবাদের জন্য কোন পরিবারই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজী হয় না। পল্লী-শাসন অফিসের সেদিনকার ঘটনার পর অনেকেই তো কানাঘুষা করতে লাগল, এর-হিআই সিয়াও চীনকে বাপ-মায়ের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করতে যাচ্ছে। তৃতীয় পরী-কন্যা তখন ভাবলেন, সিয়াও-এর হিআইএর সঙ্গে তাহ'লে আর তাঁর ঢলামি করা চলে না।

কথায় বলে কি, "সৈন্য-সংগ্রহের নিশানাটা একবার তুলে ধরো, দেখবে, দলে-দলে ক্ষুধার্তরা সৈন্যদলে ভর্তি হ'তে ছুটে আসছে!" তাই হোল। উ শানসির সমরকর্তা ইয়েন সি-সানের অধীনস্থ জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মেজর। ভদ্রলোক বিপত্নীক। গ্রামের মন্দিরের নিকট ভিড়ের মধ্যে সিয়াও চীনকে দেখে ওকে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবেন, স্থির করলেন। তৃতীয় পরী-কন্যাও এটাকে ঈশ্বর-প্রদত্ত সুযোগ বলে ভাবলেন। ঘটক মশাইয়ের প্রথম আগমনের দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি মেজর উ-র কাছ থেকে পাকা-দেখার উপহার গ্রহণ করে বসলেন।

এদিকে সিয়াও চীন ভাবছিল, সিয়াও-এর হিআইয়ের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা সব যখন একরূপ ঠিক-ঠাক হয়ে রয়েছে, সে এখন মা'র প্রস্তাবে কান দেয় কি করে? তাই যেদিন পাকা-দেখার উপহার সব বাড়ীতে এল, মা'র সঙ্গে তার একপ্রস্থ ঝগড়া হয়ে গেল। অলংকার আর সিল্ক ও সাটিনের জামা-কাপড়গুলি মেঝের উপর সে দিলে ছুঁড়ে। ঘটক মশাই চলে যেতেই মাকে সে জানিয়ে দিলে: 'এ সব উপহারে তার প্রয়োজন নেই। যার প্রয়োজন সেই যেন বিয়ে করে তার পরিবর্তে।'

তৃতীয় পরী-কন্যা এবার সত্যি দুশ্চিন্তায় পড়লেন, তিনি একটা লম্বা ঘুম দিলেন। তার পর রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে বার-দুই হাই তুললেন। তার পর মন্ত্র আউড়াতে লাগলেন বিড়বিড় করে।

বলতে লাগলেন, দেবতা আবার তাঁর উপর ভর করেছে। প্রথমেই তিনি স্বামীর উপর এক-হাত নিলেন। বললেন, তিনি অমন দুর্বল বলেই তো আজ এই দুর্দশা সংসারের। তার পর তিনি জানালেন, সিয়াও চীন আর মেজর উ-র বিবাহ পূর্বজন্ম থেকে ঠিক হয়ে আছে। আরও বললেন: 'বিয়ে-সাদি সব ভগবানের হাত। এক চুল নড়-চড় হবার জো নেই! যদি কেউ ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়, সে তার সর্বনাশ ডেকে আনে; কুড়ুল হানে আপন পায়ে!…'

স্বামী সব শুনে থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে দেবীর কাছে করজোড়ে মিনতি করতে লাগলেন ক্ষমা করতে। 'দেবী' আদেশ দিলেন যেন সিয়াও চীনকে আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে দেয়। আদেশটা মেয়ের কানেও গেল। 'দেবী'র ভাণ-করা তার মাকে সে কিছুতেই বোঝাতে পারবে না, জানত। তাই সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। এবার বাজে যত খুশী বকুক গে।

সিয়াও-এর হিআইকে খুঁজতে সিয়াও চীন গ্রামের ও-মাথার দিকে ছুটে চলল। মাঝপথে এসেই সে দেখা পেল এর-হিআইয়ের। সেও বেরিয়েছিল তাকে খুঁজতে। ওরা দু'জন হাত-ধরাধরি করে প্রকাণ্ড একটা গুহার দিকে চলল। দু'জনে সেখানে বসে তৃতীয় পরী-কন্যা সম্বন্ধে কি করা যায় ভাবতে লাগল।

৮

সিয়াও চীন এর-হিআইকে সব কথা খুলে বলল। মেজর উ-কে বিয়ে করার জন্য মায়ের পীড়াপীড়ি, মার 'দেবীর' ভাণ-করার কথা, আর সে অবস্থায় তিনি যা-যা বলেছেন—সবই সে সিয়াও-এর হিআইকে জানালে।

'ওঁকে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।' সিয়াও-এর হিআই উত্তর দিলে—'শহরের অফিসে গিয়ে আমি খোঁজ করে এসেছি। ওঁরা বললেন, যে-কোন যুবক-যুবতী বিবাহ-সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে পারে। তাদের পরস্পরের সম্মতি থাকলেই হোল। কেউ আর আটকাতে পারবে না।…'

এমন সময় বাইরে ওরা কাদের পদধ্বনি শুনতে পেল। সিয়াও-এর হিআই উঁকি মেরে দেখল, চার-পাঁচ জন লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। এক জন চীৎকার করে বলছে: 'গ্রেপ্তার করবি, দু'জনকেই অমনি গ্রেপ্তার করবি।'

চীন ওয়াংএর গলা। এর-হিআই আর সিয়াও চীন দু'জনেই তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলে। এর-হিআই নিজেকে আর চেপে রাখতে পারলে না। হেঁকে বলে উঠল: 'কে কাকে গ্রেপ্তার করছে শুনি! আমাদের কথা যদি বলো, আমরা বে-আইনী কি করলাম?'

বলা বাহুল্য, সিন ওয়াংও সঙ্গে ছিল। সে আদেশ দিল: ছেড়ে দিয়ো না, ছেড়ে দিয়ো না ওকে। বে-আইনী কিছু করেছে কি না সে পরে দেখা যাবে, এখন ছেড়ে দিয়ো না। বাপস্, কি মাথা-ব্যথাটাই না গেছে ওর জন্য গেল কিছু দিন থেকে!'

'বেশ, যেখানে যেতে বলবে যাবো'—জবাব দিলে এর-হিআই—'চল, জিলা-সরকারের কাছে যদি যেতে বলো যাচ্ছি। সেখানে গিয়েও আমি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করবো।'

'অতো সহজে নিস্তার পাবে ভেবো না যাদু!—সিন ওয়াং বলে চলল—'বাঁধ ওকে আচ্ছা করে!'

সিয়াও-এর হিআই সহজে হার মানল না। বিস্তর সে ধস্তা-ধস্তি করল ওদের সঙ্গে। একা সে, পেরে উঠবে কেন? ওরা তাকে বাঁধল অবশেষে। দু'-এক ঘা দিলও বেশ।

'বাঁধ, মেয়েটাকেও বাঁধ!' সিন ওয়াং হাঁকলে।—'বাঁধ ওকেও। সেবার খুব যে বলছিল, অভিযোগের প্রমাণ কই? কেমন এবার? দু'জনকেই এখন হাতে-নাতে ধরা গেছে!'

বেচারী সিয়াও চীনকেও ওরা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বাঁধলে দড়ি দিয়ে।

পল্লীবাসীরা তখনও ঘুমতে যায়নি। গোলমাল শুনে অনেকে ছুটে এল। মশালের অস্পষ্ট আলোয় ওরা দু'জন যুবক-যুবতীকে দেখলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। এ অবস্থায় ওদের দেখে ব্যাপারখানা কেউ বলে না দিলেও সবাই আন্দাজ করে নিলে। দ্বিতীয় কুং মিংও ছুটে এসেছিলেন। ছেলেকে অমন দশায় দেখে তিনি তো সিন ওয়াংয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। করজোড়ে বলতে লাগলেন: 'সিন ওয়াং, তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের কোন প্রকার শত্রুতা নেই, বাবা! আমি বুড়ো মানুষ, আমার মুখ দেখে বাবা, ওর প্রতি তুমি সদয়…'

'ওর সম্পর্কে আমাদের এখন আর কিছু করবার নেই।'—জবাব দিলে সিন ওয়াং—'ওকে দায়রা সোপর্দ করতে হবে।'

'বাবা, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। সিয়াও-এর হিআই বলে উঠল।—'ওরা যেখানে খুশী আমায় পাঠাক না কেন, আমি তো কোন দোষ করিনি। অতো ভয় কিসের?'

"খুব যে হে ছোকরা! শেষ পর্যন্ত তোমার মুরোদ টিকলে হয়!'—সিন ওয়াং টিপ্পনী কাটলে।—'ওদের নিয়ে চল'—বলে সে হুকুম দিলে তিন জন গ্রামরক্ষীকে।

গ্রামের শাসন-দপ্তরে নিয়ে যাবো ওদের?'—রক্ষীদের এক জন বলে উঠল।

'না, ওখানে নিয়ে গিয়ে কি হবে? গ্রামের প্রধান তো সেবার ওকে অমনিই ছেড়ে দিলে।'—জবাব দিলে সিন ওয়াং। বললে—'জিলা ফৌজী সদর দপ্তরে নিয়ে যা ওদের। বিচার হবে সামরিক আদালতে।'

ওরা তাই যুবক-যুবতী দু'জনকে ফৌজী সদর দপ্তরের দিকে টেনে নিয়ে চলল।

৯

তরুণ-তরুণীর এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের কারো টুঁ শব্দটি করবার সাহস হোল না। ওরা সবাই দ্বিতীয় কুং মিংকে বাড়ী ফিরবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

সাধু পুরুষটি খালি মাথা নেড়ে চললেন সমানে: 'হায় এমন ধারা বিপদ যে ঘটবে আমি আগেই জানতাম। কাল সকালে মাঠে যাচ্ছিলাম, পথে দেখলাম, এক যুবতী পাহাড়ে চড়ছে। পরনে তার শোকের পোষাক। সে চলেছে এক গাধার পিঠে চড়ে। এটা যে অলক্ষণের চিহ্ন ঠিক জানতাম। এ বছরটা আমার রাহু-দশা। কোষ্ঠীতে লেখা আছে, সকাল বেলা শোকাতুরা কারো মুখ দর্শন করলে একটা না একটা বিপদ

ঘটবেই। তাই তো আমি কোথাও বড় যাই-টাই না। কিন্তু ভাগ্যলিপি খণ্ডাবে কে? গতকাল রাত্রে এর-হিআই-এর জননীও স্বপ্ন দেখেছেন যে, মন্দিরে খুব গান-বাজনা হচ্ছে। শুধু তাই না, আজ ভোরে একটা কাকও ঘরের চালায় বসে দশ-দশ বার ডেকে গেল কা-কা করে। হায়, কপালের লেখা কে মুছতে পারে গো!'

যাদের মাথার উপর অমন বিপদ, তাদের চোখে কি নিদ্রা আসে? একমাত্র দত্তক পুত্রবধূ ছাড়া দ্বিতীয় কুং মিংদের বাড়িতে সে রাত্রে শয্যা পাতা হোল না। দ্বিতীয় কুং মিং হাত-মুখ ধুলেন। তার পর তিনটে পয়সা বার করে টেবিলের উপর তা ছুঁড়ে দিয়ে বসলেন ধ্যানে। পয়সা কয়টাতে যা দেখলেন তাতে তাঁর নিজেরও ভয় হোল রীতিমত। মুখখানা তাঁর ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। তিনি গোঙিয়ে উঠলেন: 'ঈশ্বর, হা ঈশ্বর, বীভৎস ওই সব প্রেতাত্মা দেখলাম কেন? আমার চার দিকেই দেখছি বিপদ—খালি বিপদ! হায়, সে-বার এর-হিআই যখন গ্রাম্য যুব-বাহিনীর ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হোল, তখনই আমি ওকে পই-পই করে নিষেধ করলাম, বললাম: 'নিস নে চাকরীটা! তা বেজন্মা কি আমার কথা কানে তুলবে? এখন যে ফৌজী আদালতে বিচার হতে চলল। ক্যাপ্টেন না হ'লে কি অমন ঘটতো?'

গিন্নী এসেও নাকি-কান্না জুড়ে দিলে: 'হা ঈশ্বর, আমার এর-হিআই বাছাটাকে অমন সাজা দিলে কেন?'

বড় ছেলে তা-হিআই বাপ-মাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। বললে: 'আপনারা কিছু ভাববেন না। ও তো আর কাউকে খুন-জখম করেনি যে, সাংঘাতিক কোন অপরাধে অপরাধী সে। জিলা কর্তৃপক্ষের কাছে ওকে তো নিয়ে গেছে, আমিও যাচ্ছি। দেখি মামলা কদ্দূর গড়াল। আপনারা এখন গিয়ে শুয়ে পড়ুন গে।'

একটা লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে।

তা-হিআই চলে গেল। দ্বিতীয় কুং মিং তখনও তার ছক-কাটা ভাগ্য-চক্রের উপর ঝুঁকে পড়ে কি-সব অনুধাবন করতে লাগলেন। এমন সময় এক মহিলার কান্না তাঁর কানে এল। পর-মুহূর্তেই মহিলাটি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লো এবং ওকে চিনে উঠবার পূর্বে সে তাঁকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠল: 'আমার মেয়ে কই, লি শিউ-তে! বলো, আমার মেয়েকে কোথায় চুরি করে লুকিয়ে রাখলে তোমার ছেলে? আমি······'

দ্বিতীয় কুং মিং-এর স্ত্রী তখন গায়ের ঝাল মিটাবার জন্য এক জন কাউকে খুঁজছিল। যখন সে দেখলে আগন্তুকটি তৃতীয় পরী-কন্যা, তখন সে "ক্যাং" থেকে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। চীৎকার করে বলে উঠল: 'কপাল ভাল, হাতের কাছেই পেয়ে গেলাম। নইলে আমায় আবার খুঁজে বেড়াতে হোত। বজ্জাত মা-বেটি মিলে আমার ছেলের মাথাটি খেলে—বাছাকে অমন কাজটা করতে উস্কানি দিলে; এখন আবার পোড়া-মুখ দেখাতে এসেছে! চল মাগী, গ্রামের কর্তৃপক্ষের কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে এর বিহিত করতে হবে'

মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে ওরা তার পর এমন চুলোচুলি শুরু করলে যা কেবল মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব। দ্বিতীয় কুং মিং তাঁর ধ্যান ধারণার কথা সব ভুলে গিয়ে দু'জনকে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তৃতীয় পরী-কন্যা নিজেও ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। বুঝলেন, টের পেলেন, চুলোচুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিনীই তাঁর অধিকতর পটু। তিনি নিজেকে কোন রকমে মুক্ত করে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ও-বাড়ি ছেড়ে। দ্বিতীয় কুং মিং-গিন্নীও তাঁর পিছু নিচ্ছিলেন। কিন্তু স্বামী এসে তাকে থামালেন। তৃতীয় পরী-কন্যা চলে গেলেও কুং মিং-গিন্নী অনেকক্ষণ ধরে অভিসম্পাত করতে ছাড়ল না।

১০

দ্বিতীয় কুং মিং সারা রাত্রি জেগে কাটালেন। পরদিন ভোর হবার পূর্বেই তিনি জিলা শাসন-দপ্তরের দিকে রওনা হলেন। মাঝামাঝি যখন এলেন দেখলেন, তা-হিআই আর গ্রামরক্ষী তিন জন ফিরে আসছে। ওদের সঙ্গে এক জন সহকারী আমলাও রয়েছেন, আর আছে এক জন শাসন-দপ্তরের পাইক। দূর থেকে ছেলেকে দেখে দ্বিতীয় কুং মিং উচ্চস্বরে বলে উঠলেন: 'তা-হিআই, কি হোল রে? সাংঘাতিক কিছু ঘটেনি তো?'

'না না, তেমন কিছু না। ব্যস্ত হবেন না আপনি'—জবাব দিলে তা-হিআই।

ওরা এবার সামনা-সামনি এসে পড়ল। সহকারী আমলাটি আর গ্রাম-রক্ষী তিন জন দ্বিতীয় কুং মি-এর পাশ কেটে চলে গেল। তা-হিআই পাইকের সঙ্গে বাবার পরিচয় করিয়ে দিল। বলল: 'জিলা কর্তৃপক্ষরা আপনাকে আর য়ুফু-গিন্নীকে জিলা শাসন-দপ্তরে ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনি বরং এখনই যান। কিছু ভয় করবেন না। এর-হিআই আর সিয়াও চীনকে শাসন-দপ্তর কাছারীতে নিয়ে গিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সিন্ ওয়াং আর চীন ওয়াংএর অপকার্যের কথা কর্তৃপক্ষের কানে বহু দিন থেকে যাচ্ছিল। ওদের দু'জনকেই এখন গারদে রাখা হয়েছে, সহকারী যে আমলাটিকে আপনি এইমাত্র যেতে দেখলেন, তিনি এখন আমাদের গ্রামে যাচ্ছেন সিন ওয়াং আর চীন ওয়াং ভাইদের দুষ্কৃতি আর অবৈধ কার্যাবলীর সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে। কাল রাত্রে আমি যখন জিলা শাসন-দপ্তরে গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম, আগেই মামলা এক রকম শেষ হয়ে গেছে। জিলা-কর্তৃপক্ষ সিয়াও-এর হিআই আর সিয়াও চীনের বিয়েটা সমর্থন করেছেন।'

'যাক বাবা, শুনে সুখী হলাম ওরা অবৈধ কিছু করেনি।'—দ্বিতীয় কুং মিং বলে উঠলেন—'কিন্তু এ বিয়ে কিছুতেই হ'তে পারে না। ওদের কোষ্ঠীর যে মিল নেই। আচ্ছা, আমায় তলব করেছে কেন বলতে পারিস্?'

'না।' তা-হিআই জবাব দিলে।—'তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনি বরং একটু শীঘ্রই যান। আমি বাড়ী গিয়ে মাকে সব বলছি।'

পাইকটা এবার প্রথম কথা কইলে। বললে: 'শুনলে তো জ্যাঠা, আপনাকে তলব করা হয়েছে। আপনি এক্ষুণি যান। আমি গিয়ে অপর জনের উপর শমনজারি করে আসি।'

তা-হিআইকে নিয়ে সে চলে গেল।

জিলা শাসন-দপ্তরে গিয়ে কুং মিং দেখলেন, এর-হিআই আর সিয়াও চীন পাশাপাশি এক বেঞ্চিতে বসে আছে। ওদের দেখে

তাঁর পিত্ত জ্বলে উঠল রাগে। সিয়াও-এর হিআইকে লক্ষ্য করে তিনি গর্জে উঠলেন: 'সব নষ্টের মূল হলি বেটা তুই! খালাস পেয়েছিস কখন, এখনো বাড়ি যাসনি কেন? বেহায়া কোথাকার? ভেবে-ভেবে তোর জন্ম আর একটু হ'লে আমি প্রাণ হারাতুম, আর তুই কি না—'

'কি হোল আপনার?'—মেয়র হেঁকে উঠলেন—'এটা অফিস না বাজার?'

এ ক্ষেত্রে যে চুপ করতে হয় এ হুঁস দ্বিতীয় কুং মিং-এর ছিল। মেয়র আবার হাঁকলেন: 'আপনিই বুঝি লিউ সি-তে?'

'আজ্ঞে!' সাধু দ্বিতীয় কুং মিং জবাব দিলেন।

'আপনি কি আপনার পুত্র সিয়াও-এর হিআইয়ের জন্ম একটি শিশু-কন্যাকে পুত্রবধূ হিসেবে দত্তক নিয়েছেন?'

'আজ্ঞে।'

'মেয়েটির বয়স কত?'

'আজ্ঞে, "মর্কট" মাসে ওর জন্ম—এই বছর বারো হোল।'

'পনেরো বছর না হ'লে কোন মেয়েকে বাগ্‌দত্তা করা চলে না। যান, ওকে আপনি ওর নিজের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন গে! সিয়াও-এর হিআই আর সিয়াও চীন এখন থেকে বাগ্‌দত্ত হয়ে রইল।'

'মেয়েটার যে কেউ নেই হুজুর। খালি আছে এক বাপ, সে-ও আবার বাস্তহারা।'—দ্বিতীয় কুং মিং জবাব দিলেন—'কোথায় সে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে জানে? এমন একটা স্থান নেই যে মেয়েটাকে পাঠাই। মেয়েদের পনেরো বছর না হ'লে বাগ্‌দত্তা করা চলে না, তা সরকারের আইন আছে বটে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে যে ৭|৮ বছর বয়সেই মেয়েদের সব বিয়ের জবাব হয়ে যায়। আমার প্রতি একটু সদয় হোন হুজুর, সদয় হোন!…'

'অবৈধ এই বাগ্‌দত্তদের এক জনই যদি বিয়ে নাকচ করতে চায়, তাই হ'বে কিন্তু।'—জিলা মেয়র বললেন।

'না হুজুর, ওরা দু'জনেই এ বিয়েতে সম্মত আছে।'—দ্বিতীয় কুং মিং বলে উঠলেন।

'এর-হিআই, তুমি কি তোমার পিতার সঙ্গে একমত?'—মেয়র প্রশ্ন করলেন।

'না।' সিয়াও-এর হিআই জবাব দিল।

জবাব শুনে দ্বিতীয় কুং মিং চটে উঠলেন। চোখ রাঙিয়ে এর-হিআইকে ধমকিয়ে উঠলেন। বললেন: 'জানিস, এখন সব-কিছু নির্ভর করছে তোর উপরই!'

'আচ্ছা, বাগ্‌দত্ত কে আপনার ছেলে না আপনি?'—মেয়র টিপ্পনী কাটলেন।—'আজকাল ছেলেরা বুড়ো বাপ-মায়ের মত নিয়ে বা না-নিয়ে বৌ পছন্দ করছে। আপনি যে মেয়েটাকে দত্তক নিয়েছেন তার যদি যাবার কোন স্থান না থাকে আপনিই তাকে আপনার মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করে নেন না কেন?'

'আমার অবশ্য কোন আপত্তি নেই।'—দ্বিতীয় কুং মিং বললেন—'কিন্তু হুজুর, দয়া করুন, সিয়াও-এর হিআই আর সিয়াও চীনের এ বিয়ে কিছুতেই ঘটতে দেবেন না!'

'কিন্তু আমি যে বললাম, আপনি এ-বিয়েতে বাধ সাধতে পারেন না।'

'দয়া করুন হুজুর, দয়া করুন! ওদের কোষ্ঠীর যে মিল নেই হুজুর! এ বিয়ে যদি হয়, ওরা কিছুতেই জীবনে সুখী হ'তে পারবে না।' দ্বিতীয় কুং মিং এবার হা-হা করে উঠলেন মহা ব্যস্ত হয়ে। ছেলের দিকে ফিরে বলে উঠলেন: 'শুয়োরামী করিস নে এর-হিআই, তোর জীবনের সুখ-শান্তি সব আজ বিপন্ন!'

'আপনি আপনার শুয়োরামীটা এবার ছাড়ুন তো।'—মেয়র বলে চললেন।—'আপনি যদি আপনার উনিশ বছরের ছেলের সঙ্গে বারো বছরের এক মেয়েকে বিয়ে দিতে চান জোর করে, আপনাকে তা হোলে আজীবন অনুতাপ করতে হবে। আপনি বুড়ো মানুষ, আপনার ভালোর জন্মই এ সব বলছি। আপনার ছেলে আর সিয়াও চীন যদি দু'জনে দু'জনকে বিয়ে করতে চায় আপনি তা পছন্দ করুন আর না করুন—খুব কিছু একটা যায়-আসে না। যান, বাড়ি যান এখন। গিয়ে আপনার নতুন মেয়েটির যত্ন-আত্তি করুন গে!'

দ্বিতীয় কুং মিং নতুন করে আরেক দফা অনুনয়-বিনয় বুঝি করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এক পেয়াদা এসে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে বার করে দিল।

১১

দুই কারণে তৃতীয় পরী-কন্যা দ্বিতীয় কুং মিংএর বাড়ি এসেছিলেন। প্রথমতঃ, বাইরের লোক-জন তাঁকে কেমন ভয় করে তা পরখ করতে। আর দ্বিতীয়তঃ, অপরের স্কন্ধে সব দোষটা চাপাতে। সিয়াও চীনের প্রেপ্তারে তিনি তেমন অখুশী বড় একটা হননি। তাই দ্বিতীয় কুং মিং-গিন্নীর সঙ্গে একপ্রস্থ চুলোচুলির পর বাড়ি ফিরে তিনি দিব্যি একটা ঘুম দিলেন। পরদিন বেশ খানিকটা বেলা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বিছানা ছাড়লেন না। য়ুফু এদিকে মেয়ের জন্ম চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তবে গিন্নীর সঙ্গে প্রথমে পরামর্শ না করে তিনি যে কিছু করতে পারেন না। গিন্নীকে এদিকে জাগাতেও তাঁর সাহসে কুলোল না। তাই করেন কি, প্রাতরাশ প্রস্তুত করার দিকে তিনি মন দিলেন। খাবারটা যখন প্রায় হয়ে এল, তৃতীয় পরী-কন্যা ধীরে-সুস্থে তখন গা তুললেন। মুখ-হাত ধুতে-ধুতে আর চুলে চিরুণী দিতে-দিতেই খাবার তৈয়ারীর বাকী সময়টা কেটে গেল। য়ুফু তখন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন:

'সিয়াও চীনের কি হোল একবার খোঁজ নিতে গেলে না?'

'কোথা যাবো শুনি? তোমার মেয়ে কি কারো ধার ধারে?'

য়ুফু'র আর কিছু বলতে সাহসে কুলাল না। খাবারটা না হওয়া পর্যন্ত উনানের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। স্ত্রীর প্রসাধন-পর্ব সমাপ্ত হোল যখন তখন কেবল খেতে সুরু করলেন।

তৃতীয় পরী-কন্যা প্রাতরাশ শেষ করে নেবার পূর্বেই জিলা শাসন-দপ্তরের পাইক এল শমন জারী করতে। গলা-খাঁকারি দিয়ে গলাটা তিনি পরিষ্কার করে নিলেন, তার পর ধীরে-সুস্থে বললেন: 'মেয়ে এখন বড়ো হয়েছে, সে কি আমার কথা কানে তোলে যে, চাল-চালন আমি শেখাবো ওকে? মেয়ের কাছে আমার ছুটে যাবার কি দরকার শুনি?'

তিনি প্রাতরাশ সেরে নিলেন। তার পর সাজ-গোজ করতে বসলেন। মাথায় বাঁধলেন নতুন রুমাল; পায়ে দিলেন ফুল-তোলা জুতো; কাজ-করা একটা ইজেরও পরলেন। মুখে

এক গাদা পাউডার ঘষে চুলে গুঁজলেন আর একপ্রস্থ নতুন অলংকার। তিনি তখন যুফুকে হুকুম করলেন আস্তাবল থেকে খচ্চরটা বার করতে। খচ্চরটার পিঠে চড়ে তিনি চললেন আর স্বামী হেঁটে চললেন পিছু-পিছু তাঁর পাচন হাতে। জিলা শাসন-দপ্তরের দিকে ওরা রওনা হলেন।

গন্তব্য-স্থলে ওঁরা এসে পৌঁছলে মেয়রের ঘরের তৃতীয় পরী-কন্যাকে নিয়ে যাওয়া হোল। মেয়রকে দেখে তিনি জানু পেতে গড় করলেন। উচ্চস্বরে বলে উঠলেন: 'আমি ঠিক জানি আমার প্রভু জিলা-মেয়র যা করবেন তা আমার পক্ষে যাবে!'

মেয়র টেবিলের উপর ছুঁকে পড়ে খস-খস করে লিখছিলেন কি সব। মাথায় একরাশ রূপোর অলংকার-পরা এক মহিলাকে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে দেখে তিনি ভাবলেন, দু'-তিন দিন পূর্বে শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে যে বধূটি তাঁর কাছে ছুটে এসেছিল, এ বুঝি সে। তাই বললেন: 'তোমার শাশুড়ীর জামিনদাতা রয়েছে না? ওর কাছে গেলে না কেনো?'

ব্যাপারটা বুঝে উঠতে না পেরে তৃতীয় পরী-কন্যা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো মেয়রের দিকে। মেয়র এবার তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। চেয়ে দেখলেন, তাঁর সামনে যিনি বসে আছেন তিনি কারো বধূ নন—বয়সে প্রৌঢ়া, মুখে এক গাদা পাউডার মাখা।

পেয়াদা তাঁকে বুঝিয়ে দিলে। বললে:

'আপনি যার কথা বলছেন ইনি সে নয়। ইনি হলেন সিয়াও চীনের মা।'

মেয়র তাঁর সামনের মহিলাটির দিকে এবার তাকালেন। বললেন: 'ও, তুমিই তাহোলে! ওঠো ওঠো, এখানে আর ঢং দেখাতে হবে না। সব জানি আমি তোমার সম্বন্ধে। উঠে বসো!'

তৃতীয় পরী-কন্যা উঠে দাঁড়ালেন।

'তোমার বয়স কতো?'

'পঁয়তাল্লিশ।' দেবী জবাব দিলেন।

'আয়নাটার দিকে একবার চেয়ে দেখো তো, পঁয়তাল্লিশ বছরের ভদ্রঘরের মেয়েদের মত তুমি পোষাক পরেছো কি না?'

বছর দশেকের একটি মেয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। মেয়রের কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল। অফিসের পেয়াদাকে বলতে হোল ওকে বাইরে গিয়ে খেলতে।

'আচ্ছা, তুমি দেব-দেবতা নামাতে পারো এ কথা সত্যি না কি?'—মেয়র আবার প্রশ্ন করলেন।

তৃতীয় পরী-কন্যার মুখে কোন জবাব কুলাল না। মেয়র তাঁকে আবার প্রশ্ন করলেন: 'তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য এক জন প্রেমাস্পদ ঠিক করেছো?'

'হ্যাঁ।'

'এ জন্য কত টাকা তুমি দালালি পেলে?'

'সাড়ে তিন হাজার ডলার।'

'আর কি?'

'কিছু অলংকার আর কয়েকটা জামা-কাপড়।'

'এ সব ব্যাপারে তুমি তোমার মেয়ের মতামত নিয়েছিলে?'

'না।'

'এ সবে ওর মত আছে কি না তুমি জানো?'

'জানি না।'

'আমি ওকে এখানে ডেকে পাঠাচ্ছি। তুমি নিজে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

সিয়াও চীনকে ডাকবার জন্য মেয়র হুকুম দিলেন পেয়াদাকে।

দশ বছরের যে মেয়েটাকে বাইরে গিয়ে খেলতে বলা হয়েছিল, সে অমনি এ খবর রটিয়ে দিল যে, জিলা শাসন-দপ্তর অফিসে একটি আধ-বয়েসী স্ত্রীলোক এসেছে, ওর বয়স পঁয়তাল্লিশ বছরের কম নয়। সে কিন্তু মুখে পাউডার মাখে পুরু করে, আর রঙ-চঙে তার জুতো পরার ছিরি কি? এ শুনে আশ-পাশে যত সব স্ত্রীলোক ছিল সবাই ছুটে এল চটকদার প্রৌঢ়াকে দেখবার জন্য। অফিস-প্রাঙ্গণ দেখতে-দেখতে মেয়েতে ভর্তি হ'য়ে গেল। ফিস-ফাস করে ওরা পরস্পর কানাকানি করতে লাগল: 'বয়সটা পঁয়তাল্লিশের এক চুলও কম না ভাই, বুঝলি?'

'পায়জামাটা একবার চেয়ে দেখেছিস্ লা?'

'পায়ের ফুল-তোলা জুতো-জোড়াটা দেখেছিস্?'

তৃতীয় পরী-কন্যা ইতিপূর্বে জীবনে এমন ধারা অপ্রস্তুত হননি কখনো। তাঁর মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল; ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম দেখা দিল। এমন সময় পেয়াদা এনে হাজির করল সিয়াও চীনকে। পেয়াদা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে ইচ্ছে করে বলে উঠল: 'হাঁ করে তোমরা সব দেখছো কি হে? উনি কি আকাশ থেকে পড়লেন? অমন মেয়েমানুষ জীবনে কখখনো দেখোনি বুঝি? যাও, ভাগো ভাগো!'

শুনে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। মেয়র তখন তৃতীয় পরী-কন্যাকে শুধোলেন: 'তোমার মেয়েকে যে লোকটার সঙ্গে বিয়ে দেবার ঠিক করেছো তাকে বিয়ে করতে রাজী কি না, তুমি তোমার মেয়েকে এখন জিজ্ঞেস করতে পারো।'

তৃতীয় পরী-কন্যার কানে কোন কথাই গেল না মেয়রের। উঠানে মেয়েদের টিপ্পনীগুলিই ওর কানে কেবল অনুরণিত হ'তে লাগল: "পঁয়তাল্লিশ···ফুল-তোলা জুতো···!" লজ্জায় তাঁর মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হোল। ঘন-ঘন তিনি মুখের ঘাম মুছতে লাগলেন। তবু নিস্তার পেলেন না। মুখ দিয়ে তাঁর টুঁ শব্দটি পর্যন্ত বার হোল না। এদিকে ভীড়ের মধ্যে উঠানের মেয়েরা অন্য প্রসঙ্গ নিলে: 'ওটি ওঁর মেয়ে বুঝি?···ও মা, মেয়ে জানুক আর না জানুক মা তো বেশ চটক করে সাজতে জানে!···হ্যাঁ গা, উনি আবার অপদেবতা নামাতে পারেন শুনছিলাম না?'

তৃতীয় পরী-কন্যা সম্বন্ধে প্রচলিত 'ভাতটা গলে গেল' কাহিনীটি ভীড়ের মধ্যে কে যেন জানত। সে এক সময় কাহিনীটা সবাইকে জানিয়ে দিলে। দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে পারলেই যেন নিষ্কৃতি পান তৃতীয় পরী-কন্যা। তবু যদি মেয়রের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতেন। তিনি বলে চললেন:

'তুমি যদি তোমার মেয়েকে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করতে না চাও, আমি করছি।'

সিয়াও চীনের দিকে তিনি এবার মুখ ফেরালেন।

'সিয়াও চীন, তোমার মা যে লোকটিকে ঠিক করেছে তুমি কি তাকে বিয়ে করতে চাও?'

'না, মোটেই না। সে যে কে, তাও আমি জানি না।'

মেয়র এবার তৃতীয় পরী-কন্যার দিকে মুখ করলেন। বললেন: 'শুনলে তো?'

তিনি তখন তৃতীয় পরী-কন্যাকে বললেন.—নিজেদের পছন্দ মত বিয়ে-করা তরুণ-তরুণীদের রক্ষার জন্য এখন আইন হয়েছে। এ-ও জানালেন, সিয়াও-এর হিঅাই আর সিয়াও চীনের বিয়ে আইনে কোথাও আটকায় না। তিনি আরও জানিয়ে দিলেন, মেজর উ'র কাছ থেকে তিনি যে টাকা ও উপহার গ্রহণ করেছেন, সব কিছুই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁর। শুধু তাই না, সিয়াও-এর হিঅাই আর সিয়াও চীনের এই বিয়েতে তাঁকে দিতে হ'বে সম্মতি।'

লজ্জায় তৃতীয় পরী-কন্যা কোন কথাই বলতে পারলেন না। তবু তিনি মেয়রের কাছে শপথ করে এলেন যে, যা-যা তাঁকে করতে বলা হোল তা তিনি পালন করবেন।

১২

সিন ওয়াং আর চীন ওয়াং-এর গ্রেপ্তার-কাহিনী গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। গ্রামবাসীদের আজ আনন্দ দেখে কে? বিকেলে মন্দির-প্রাঙ্গণে গ্রামের সবাই এসে জড় হোল। গ্রামের প্রধান জন-সভায় প্রথম বক্তৃতা সুরু করলেন। তিনি বিপুল জনতাকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন: অপরাধ প্রমাণের জন্য তারা যেন দু'-ভাইয়ের অপকার্য সম্পর্কে যা-যা জানে সব বলে ফেলে। সবাই প্রথমে ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে, অপরাধ প্রমাণ না হ'লে দু'-ভাই অভিযোগকারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ছাড়বে না কিছুতেই। তাই অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোন কথাটি বললে না এবং ওদের মধ্যে যারা ভীতু তারা এমনও কানাকানি করতে লাগল: "শান্তিতে থাকতে হোলে পিঠে সইতে হয়!"

কিন্তু চীন ওয়াং-ভাইদের অত্যাচারে জর্জরিত এক যুবক সহসা উঠে দাঁড়াল। বলল: 'আমি দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরে আসছি। দেখলাম, যতই চোখ বুজে সহ্য করি ততই অধিক বিপদে পড়তে হয়। আপনারা যদি কেউ কিছু নাও বলেন, আমিই বলবো।'

সে তখন বলতে শুরু করলে চীন ওয়াং কেমন করে ডাকাতি করতে দস্যুদের নিয়ে এসেছিল তাদের ঘরে। এ ছাড়াও দু'ভায়ের আরও চার-পাঁচটি অপকার্যের কাহিনী সে শুনাল সকলকে। অবশেষে বলল: 'আমি এবার থামছি। আপনারা আর কেউ বলতে থাকুন।

এক জন একবার শুরু করলেই হোল, অপর নির্যাতিতদের তখন পায় কে? একে একে ওরা বলতে লাগল, দু'ভাই কেমন করে ঘুষ নিত; কেমন করে ওরা লোকদের আত্মহত্যা করতে বাধ্য করত, কি করে ওরা বিধবা যুবতীদের সতীত্ব নষ্ট করত; গ্রামরক্ষীদের দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করত; চাষীদের কি করে বেগার খাটিয়ে নিত নিজেদের জমিতে; নিজেদের ট্যাকের জন্য কেমন করে ট্যাক্স আদায় করত; গ্রামরক্ষীদের দিয়ে কি করে নিরীহ লোকদের বেঁধে আনতে বাধ্য করত···সূর্যাস্ত পর্যন্ত একে একে সবাই দিয়ে চলল তার দীর্ঘ ফিরিস্তি।

এই সব অভিযোগের দায়ে জিলা কর্তৃপক্ষ দু'ভাইকে প্রাদেশিক সরকারের নিকট সোপর্দ করলেন। অভিযোগগুলি যখন সত্য বলে প্রমাণ হোল, প্রাদেশিক সরকার দু'জনের তখন দীর্ঘ পনেরো বছর জেল দিলেন ঠুকে। আদেশ দিলেন—ওরা যা-কিছু চুরি করেছে যাদের কাছ থেকে, সব কিছু যেন ফিরিয়েও দেয়।

নর-শার্দুল দু'জন বিদায় নিলে গাঁয়ের ধমনীতে আবার স্বাভাবিক রক্তধারা ফিরে এল। শীঘ্র আবার নির্বাচন হোল এবং গাঁয়ের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হোল পুনরায়। বিগত অভিজ্ঞতার পর গ্রামবাসীরা এবার নির্বাচনে পুরোপুরি যোগ দিলে। কাজেই চীন ওয়াংএর স্ত্রী জাপবিরোধী নারী সমিতির সভানেত্রীর পদে পুনরায় নির্বাচিত হ'তে পারলে না। নির্বাচিত হ'তে না পারলেও দৃষ্টি-কোণ তার গেল বদলে। এখন থেকে সে প্রগতিশীল হবার চেষ্টা করবে জানিয়ে দিলে।

তান্ত্রিক আর সাধু দু'-জনেরও পরিবর্তন ঘটেছে কিছু-কিছু।

সেবার জিলা শাসন-দপ্তরের প্রাঙ্গণে সমবেত মেয়েদের ঠাট্টা-মস্করার সামনে তৃতীয় পরী-কন্যা খুব বিব্রত বোধ করেছিলেন। বাড়ী ফিরেই মেয়রের কথা মত আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। উপলব্ধি করলেন—আর না, মেয়ের এখন বিয়ে হ'তে চলল। নিজে আর ঢং দেখিয়ে কাজ নেই! তাই সাজ-ভূষা ফেলে তিনি আপন বয়সোচিত পোষাক পরে চলবেন ঠিক করলেন। চুপি-চুপি তিনি তাঁর ধূপ-ধুনো দেওয়ার 'বেদী'টি সরিয়ে ফেললেন। ত্রিশ বছরের তাঁর পুরোন বেদী। ওটার সামনে বসেই তিনি তাঁর কল্পিত অপদেবতা নামানোর চেষ্টা করতেন।

এদিকে দ্বিতীয় কুং মিং জিলা শাসন-দপ্তর থেকে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কাছে হম্বি-তম্বি শুরু করে দিলেন যে, সিয়াও-এর হিঅাই আর সিয়াও চীনের কোষ্ঠীর মিল নেই। শুনে-শুনে গিন্নীর পিত্ত জ্বলে উঠল এক সময়। রেগে বলে উঠল: 'হয়েছে—হয়েছে, তুমি তোমার ওই কর-কোষ্ঠীর বুজরুকী রাখো তো দেখি! ও-সব দিয়ে তো সারা জীবন নিজের আর অপর লোকের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করলে। এখন আর কেন? এর-হিঅাইয়ের কপাল ভালো যে, সিয়াও চীনের মত অমন লক্ষ্মী মেয়ে পেয়েছে সে। বাছার জীবনটাকে ছাই-পাঁশ ও-সব শয়তানী তুক-তাক দিয়ে নষ্ট করতে তোমার লজ্জা করে না? "শস্য-বপনের পক্ষে শুভ নয়" বলে লোকে যে ঠাট্টা করে! তা ভুলে গেলে না কি?'

গিন্নীও যখন তাঁর যাদুবিদ্যা নিয়ে অমন ধারা ঠাট্টা করতে শুরু করেছে, তিনি আর তাঁর যাদুবিদ্যা অপর লোকের সামনে প্রয়োগ করেন কোন্ মুখে?

সিয়াও-এর হিঅাই ও সিয়াও চীন বাড়ি এসে দেখে, ওদের বাপ-মায়ের জীবনের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটেছে অনেকটা। পাড়া-পড়শিদের সাহায্যে তাদের এই বিয়েতে বাপ-মায়ের মত করিয়ে নিতে তেমন বেগ পেতে হোল না।

যথাসময়ে এ বিয়ে হয়ে গেল।

অনুবাদক—নিখিল সেন।

রাজনীতি

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

হানিফ চাচা তার বলদ নিয়ে সকালে মাঠে যেতো এবং সন্ধ্যায় ফিরে এসে যা খোলছানি দিতো তাই তারা মনের আনন্দে খেতো। এই ভাবে দিন যেতে থাকলে হঠাৎ এক দিন বলদেরা খোলছানি পেতে আপত্তি জানালো। খোলছানি পাতনায় দিলে তা যেমন ভাবে দেওয়া হতো তেমনিই পড়ে থাকতো। তা ছাড়া লাঙল ও গাড়ী বওয়ার কাজেও তারা শিং-নাড়া দিতে স্নুরু করলো যখন-তখন! হানিফ চাচার মত মানুষেরও বিপদ হোয়ে পড়লো। চিরকাল গাড়ী বয়ে আর লাঙল চষে হঠাৎ কি এমন স্বরাজ এলো যে বলদেরা আগের মত কাজ করতে চাইলো না, এ কথা হানিফ বুঝতে চেষ্টা কোরেও বুঝতে পারলো না। বিপদ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে হানিফ পাড়ার এক মুরুব্বির কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লো।

—হেই ঠাকুর! আমায় আপনি বাঁচান, নইলে মারা যাব!

—সে কি! তোমার আবার কি হলো সেখের পো? তোমার মৌরুসীপাট্টার আবার কি বিপদ হোলো?

—আজ্ঞে, আমার দক্ষিণ হাত বন্ধ হোয়ে গেল ঠাকুর!

—দক্ষিণ হাত? চাষ-আবাদ বন্ধ হোয়ে গেল!

—তাই, বলদেরা আর মাঠে যেতে চাইছে না, মাঠে গেলেও চাষ-আবাদ করতে তারা রাজী নয়।

—কি বলে তারা?

—বলে স্বাধীন হয়েছি—লাঙল বইবো কেন? এত দিন দেশের অনেক জমি চাষ করেছি, অনেক ঘানি ঘুরিয়ে তেল বার করেছি, অনেক পাঁচন খেয়ে আর খোঁয়াড়ে আটক থেকে দেহ মাটি করেছি, আর তার বদলে পেয়েছি কেবল ক্ষুদের ঘণ্টের সঙ্গে লাউ সেদ্ধ। এখন আর ও-সব অখাদ্য খেতে আর খাটতে রাজী নই।

—বুঝেছি, এ ব্যারাম বাপু খুবই শক্ত ব্যারাম। ভাল হবে, তবে কিছু খরচ করতে হবে হয়ত।

—তা হয় হবে, কিছু যাবে বোলে তো আর এত বড় জমির মালিকানা ছাড়তে পারি না? বলুন কি করতে হবে।

—তুমি বরং বলদদের নেতাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

—যে আজ্ঞা!

এর পর ক্রমেই হানিফ চাচার দিন খারাপ হোতে লাগলো। এ-খামার সে-খামার থেকে খবর আসে—সব জায়গাতেই বলদেরা বিদ্রোহ করছে। আইন-কানুন কিছুই মানছে না। কেবল তাদের কথা—নিজেদের ভার নিজেরা নেব। কাউকেই আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে না। আমাদের খাবার আমরা দেখে নেব। মালিক এখন আমরাই।

হানিফ চাচা বাধ্য হোয়ে একবার মাঠ আর বাড়ী যাতায়াত স্নুরু করলো। মধ্যে মধ্যে স্বজাতীয় ও বিজাতীয়দের পার্টি আর ডিনারে খরচ করতে লাগলো। বহু দিনের চলতি ব্যবস্থা। চিরকাল যেখান থেকে মধুর স্বাদ পাওয়া গিয়েছে সেখান থেকে সরে যাওয়া যে কি কষ্টকর তা ভুক্তভোগীরাই জানে। তারা সরে গেলে এ দায়িত্ব পালন করবে কে? এমন কোন দল বা বলদদের মধ্যে এমন কোন সংগঠন নেই যারা হানিফ চাচাদের অবর্ত্তমানে দেশের কাজ চালাবে! অতএব হানিফ চাচারা চলে গেলে সমস্ত বলদ না খেয়ে আর রোগে মারা পড়বে—এ কথাই তারা তারস্বরে ঘোষণা করলো।

কিন্তু এতেও বলদেরা থামে না বরং আরো জোরে আন্দোলন চালাতে লাগলো। বলদেরা চতুর্দ্দিকে সভা-সমিতি কোরে লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াতে লাগলো। বলে—নিজের দায়িত্ব নিজেরাই নেব, খাটবে যে জমি তার। তাছাড়া দু'-চারটে বন্দুক-পিস্তলও বলদেরা পরীক্ষা করতে লাগলো। কোন রকমেই বলদেরা যখন ভয় পেল না তখন হানিফ চাচা বাধ্য হোয়েই বলদদের নেতা জুহুকে ডেকে পাঠালো।

—কি হবে দা'ঠাকুর!

—কিছু ভাবতে হবে না, তুমি আড়ালে থাক, তোমার ওপর ওরা একটু চটে গিয়েছে। তুমি বরং বিলেত থেকে মাওন ভাইকে আনাও। সে অনেক দিন মিলিটারীতে থেকে হাত চালাতে শিখেছে ভাল। এ ব্যাটাদের ওপর কিছু মিষ্টি জুতো মারুক।

—কিন্তু তাতে কি হবে?

—হবে, সে-সব ঠিক কোরে দেবে সে। যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন দিন বেশী কিছু না করে তার জন্য নতুন পলিসী ঠিক করতে হবে। বেটাদের ভাগ কোরে এক জনের বিরুদ্ধে আর জনকে লাগিয়ে দিলেই ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করতেই ব্যস্ত থাকবে বুঝলে?

—যা বলেছেন! ওঃ, কি বুদ্ধি যে আপনার! যদিও আপনি ওদেরই আত্মীয় তবু আমাদের যে উপকার করছেন তার তুলনা মেলে না। আপনার মাসোহারাটা বাড়িয়ে দেব মনে করছি!

ইতিমধ্যে মাওন ভাই এসে গেলেন। বলদদের নেতাদের ডাক পড়লো মাওন ভাইএর বিরাট প্রাসাদে। অবশ্য বলদদের পয়সায় ও পরিশ্রমে তৈরী প্রাসাদে মাওন ভাইএর জ্ঞাতি-কুটুম্বরাই বাস কোরে আসছেন। ভয়ে-ভয়ে চোরের মত ছাড়া এ প্রাসাদে কোন দিন বলদদের ওঠার স্নুযোগ হয়নি বেশী। হঠাৎ বলদদের নেতাদের ডাক পড়তেই হন্তদন্ত হোয়ে নেতারা ছুটে এলো। কেবল তারা অপেক্ষায় ছিলো কতক্ষণে ডাক পড়বে। বলদকে মানুষে ডাকছে কথা বলতে, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা!

—আসুন, আসুন! বলদদের নেতা জুহুকে অভ্যর্থনা জানালেন মাওন সাহেব।

—আপনার সাথে দেখা করতে পেরে বড়ই কৃতার্থ হোলাম। আপনার মত পণ্ডিত, স্নুশাসক আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। জুহু প্রত্যুত্তর দিয়ে দিলো হাসিমুখে।

—কি যে বলেন! আপনার পাণ্ডিত্যের কাছে আমি? আপনি একটা দেশের সমস্ত বলদদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক! আপনার তুলনা কেবল আপনিই!

—লজ্জা দেবেন না, আপনি নিজে মহৎ তাই সকলকেই মহৎ বোলে মনে করেন। আপনি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ দেশের

এক জন শাসনকর্ত্তা! সূর্য্য অস্ত-না-যাওয়া দেশের এক জন স্তম্ভস্বরূপ।

—তাই কি, বিলেতে থাকতে আপনার বুদ্ধির প্রখরতা আমাদের চমক লাগাতো। আপনার কর্ম্মকুশলতা, আপনার অমায়িক ব্যবহার, পরকে আপন করার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় জানি বলেই আপনাদের ব্যাপারে আমায় আসতে হয়েছে। জানি, আপনি শুধু ওই বলদদের মধ্যে জন্মগ্রহণের পাপ ছাড়া আর অন্য এমন কোন পাপ করেননি যার জন্য আপনার মানুষের পর্য্যায়ে উন্নীত হোতে কোন বাধা আছে।

—যাই হোক্ এখন কাজের কথায় আসা যাক্, কি বলেন?

—বেশ তো! চলুন আমার স্পেশ্যাল চেম্বারে, আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তাগুলো সেরে নিই।

ভেতরে মাওন আর জুহু দুই নেতা মুখোমুখি সোফায় বসলেন। বাইরে বলদদের অন্যান্য ক্ষুদে নেতারা বসে থাকলেন। সরবৎ আর নানাবিধ সুমিষ্ট ও সুগন্ধি পানীয় বলদ-নেতার পেটে পড়তেই সমস্ত জগতকে তাঁর আপনার মনে হতে লাগলো। মাওনের কন্যা আর মিসেস্ মাওন তাঁদের সুমিষ্ট ও সরস ব্যবহারে আর সেবার দ্বারা অতিথির আপ্যায়নে কোন ত্রুটি রাখলেন না। বাইরে নিঃশব্দে অন্যান্য বলদ-নেতারা অধীর ভাবে চেয়ে রইলেন জুহুর আশা-পথ চেয়ে। ওদিকে মাওন ও জুহুর মধ্যে কথা আরম্ভ হোলো।

—আপনার মত লোক তো বুঝতেই পারেন যে, এত বড় দেশ কি একত্রে শাসন করা যায়? দু'ভাগে ভাগ করার প্রয়োজনকে কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন? তাছাড়া আপনাদের সংখ্যালঘু নেতা জেনো তো ভাগ করা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাতে কিছুতেই রাজী নয়।

—কিন্তু জানেন তো, অনেক বিদেশী ঝড়-ঝাপটা সহ্য কোরে এই দেশ কোন দিন বিভক্ত হয়নি। তাছাড়া আমাদের সংস্কৃতি, এক-জাতিত্ববোধ সব নষ্ট হবে না কি?

—এক-জাতিত্ববোধ! এ তো জেনো স্বীকারই করেন না। দ্বিজাতি-তত্ত্বই তাঁর মূলনীতি! তাছাড়া আপনার ন্যায় বলদ জাতির সঙ্গে জেনোদের তুলনা করতে সত্যিই আমাদের কষ্ট হয়! মনে হয় যেন সূর্য্যের পাশে দীপশিখা। সারা পৃথিবীব্যাপী যার খ্যাতি, যে হচ্ছে এশিয়ার ভাবী শ্রেষ্ঠ বলদ-নেতা তার সঙ্গে কার তুলনা!

—কিন্তু বুড়ো বড় অমত করবেন।

—বুড়ো ধর্মকর্ম নিয়ে থাকুন, সন্ধ্যা-উপাসনা, চরকা, পল্লী-উন্নয়ন, হরিজন এই সবই ওঁর পক্ষে ভাল। ওঁকে আবার রাজনীতির মধ্যে আনা কেন?

—তা ছাড়া আমার নিজেরও বেশ মন সরছে না।

—কেন আপনি মিথ্যা ভাবছেন? এ আপনাদের পক্ষে খুবই ভাল। ওরা আপনাদের মানতে চাইবে না আর আপনাদেরই বা দরকার কি এত বড় দেশের বিক্ষুব্ধ বলদকুল নিয়ে রাজ্য শাসন করা! ভাগ করলে শাসনেরও সুবিধা অথচ বেশী দায়িত্ব নিতে হবে না।

—আচ্ছা, পরামর্শ করি গে অন্য নেতাদের সঙ্গে।

—আসুন। আপনার আবার পরামর্শ! আপনিই তো সব। তাছাড়া (কানে কানে) আপনার মত নেতাদের কোন ভয় নেই, একটুকু ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষতি হবে না।

বলদের দল চলে গেল আপন-আপন ডেরায়। বুড়োর কাছে জানালো সব কথা। বললে, যা আসছে তা নিয়ে নেওয়া ভাল। না হোলে এত দিন মার খেয়ে কোনই লাভ হয়নি। কেবল নির্য্যাতন আর জেল ভোগ করাই সার হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে ফাঁসিতে ঝোলা। কোন দিন স্বাধীনতা একেবারে আসে না, অল্প-অল্প করে সইয়ে নিতে হয়। তাছাড়া যদি চিরকাল জেল খাটতেই কেটে যায় তবে ভোগ হবে কবে? ভোগের জন্য কিছু ছেড়ে দিতেই হবে, আপোষ যদি করতেই হয় তবে এখনই করা ভাল। আপোষ ছাড়া পৃথিবীতে কোন কাজ হয়? মানুষের কাছে বলদের গায়ের জোর খাটে না। অতএব যা আসছে তা নিয়ে নেওয়াই ভাল।

ওদিকে জেনোকে ডেকে আনলেন মাওন। সব কথা বললেন। বললেন, আপনারা ভাগ ছাড়বেন না। তারাও জানে একসঙ্গে থাকলে জেনোকে জুহুরা প্রভুত্ব করতে দেবে না। তাছাড়া মাওনের কথার তুবড়ি জেনোকেও মোহাবিষ্ট করে ফেলে। বলে, আপনার প্রতিভার কাছে জুহুর প্রতিভা! চাঁদের আলোর কাছে জোনাকির টিপটিপুনি! দেশ ভাগ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। দেশ ভাগ করার কথা যেন তিনি কিছুতেই না ছাড়েন। সারা জীবন ধরে জুহুরা কি নির্য্যাতন চালিয়ে এসেছে তাঁদের ওপর, তা যেন তাঁরা ভুলে না যান। আর সেই প্ল্যানটার কথা যেন জেনো ভুলে না যান। শেষ অস্ত্র তোলা আছে। দেশ ভাগ মানতেই হবে। শেষ পর্য্যন্ত টাকা আর লোক।

যথারীতি দা'ঠাকুরের পরামর্শে হানিফ চাচা একটা দারুণ সমস্যা থেকে উদ্ধার পেল। অবশ্য জ্ঞাতি-ভাইরা প্রথমটায় রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার কথায় বেজায় চটে গিয়েছিল। শেষে যখন সমস্ত ব্যাপারটা তারা বুঝলো তখন মাওন ভাইয়ের বুদ্ধির তারিফ করলো। বলদদের স্বাধীনতা দিলেও তারা হানিফ বা তার উত্তরাধিকারীদের সম্পূর্ণ স্বার্থ দেখে চলবে। এ জমির স্বত্ব ফেলে যাওয়া নয়, এ যেন নিজের জমিদারীতে ম্যানেজার রেখে যাওয়া। ম্যানেজার সবই করবে প্রভুর মঙ্গলের জন্য, কাজ কেবল বলদ-কুলকে ভাঁওতা দেওয়া। ম্যানেজার বলবে, (জুহুর মতই কোন ঘরের লোক) ওহে বলদকুল! তোমরা জমি চাষ কর, ফলের দিকে তাকিও না; আমাতে তোমাদের সমস্ত বিশ্বাস অর্পণ কর।"

সবই হোল, তবু শেষ পর্য্যন্ত কাজ এগোলো না। বুড়ো এই ভাগাভাগিতে একেবারেই চটে আগুন। কিছুতেই সে মানতে রাজী নয়। এতখানি এগিয়ে শেষে পিছিয়ে আসাও সম্ভব নয়। মাওনের সঙ্গে জুহু দেখা করতে পারে না। মাওনও নিজে অত্যন্ত অস্বস্তিতে পড়েছে। সকলকে আশ্বাস দিয়ে শেষে কাজ পণ্ড হবে! হানিফ চাচাদের এত সাধের লাভের রাজ্য একটা অমীমাংসিত অবস্থায় থাকবে! মাওন তার শেষ অস্ত্র ছাড়লেন। সুরু হোল "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম"। সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়লো এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে। নদীর

এ-পার থেকে সে-পারে। ওরা শ্যামলা বলদ কেটে কচু-কাটা করলো আর এরা ধলা বলদ কেটে কুমড়োর মত ফালা করতে লাগলো। বলদের চীৎকারে আর হাম্বা ডাকে সমস্ত দেশ কেঁপে উঠলো। রক্তের নদী বয়ে যেতে লাগলো। অলক্ষ্য থেকে মাওন ও জেনো প্রাণ খুলে হেসে নিলো। অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। এ ফাঁদে জুহুকে পা দিতেই হবে। কোথায় যাবে তারা? জুহুকে আসতেই হবে আবার।

—এ কি হোলো মাওন সাহেব?

—কি খবর বলদ-শ্রেষ্ঠ?

—এই রক্তপাত, খুন!

—বলেছিলাম তো দেশ ভাগ না করলে মঙ্গল নেই। আপনার ন্যায় বিজ্ঞের পক্ষে এটা কি অজানা ছিল?

—তাই তো দেখছি!

—এ কি দেখছেন, ভাগ না করলে হয়ত এর চেয়েও কিছু বেশী হবে মনে হয়। দু' সম্প্রদায় কখনও মিলে থাকেনি, আর থাকতেও পারে না। এরা আর ওরা সম্পূর্ণ আলাদা। ওদিক দিয়ে জেনোর দ্বিজাতি-থিয়োরী নির্ভুল। আমি এ রকম হবে পূর্ব থেকেই আশঙ্কা করছিলাম। আপনাকে যে ভাগের কথা বলেছিলাম তা অনেক ভেবেই বলেছিলাম। আপনি তো পণ্ডিত-বলদ। আপনার কোন অসুবিধাই নেই। আপনি হবেন প্রধান বলদ-মন্ত্রী, আপনার আত্মীয়-স্বজন কোন দিন টের পাবে না বেকার কাকে বলে? তাছাড়া আপনি হবেন বলদ-তন্ত্রের ধারক ও বাহক। আপনিই হবেন রাষ্ট্র এবং দল।

—রাষ্ট্রচালনার এই জটিলতার মধ্যে আমাকে আবার টানা কেন?

—সে কি! আপনি হচ্ছেন নেতা! আর এর মধ্যে জটিলতা তো কোথাও নেই। আপনার দেশের নীতি পরিচালনা করব আমরাই। আপনি শুধু লক্ষ্য রাখবেন আমাদের স্বার্থ যেন কোন রকমে ক্ষুণ্ণ না হয়। আমাদের এবং আপনার নিজের জন্য যত বেশী আপনি বলদকুলের স্বার্থ বিপন্ন করবেন ততই আপনার গদী শক্ত হবে।

—আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ মিঃ মাওন। চিরকাল ঘুরে-ঘুরে লাঙ্গল ঠেলে বেড়িয়েছি, রাজনীতির কিছুই ভাল শেখা হয়নি—বিশেষ রাষ্ট্রচালনার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। এ সময় আপনার উপদেশ বিশেষ উপকারে আসবে মনে হয়।

—মনে রাখবেন, আমি বা আমরা সব সময়েই আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। রাষ্ট্র হাতে পাবার আগে আদর্শের কথা বা বড়-বড় বক্তৃতা যা আপনি দিয়েছেন তাতে খুব ভালই হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যাপারে কূটনীতির প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আমরা যে বিভেদ সৃষ্টি কোরে শাসন চালিয়েছি সেই নীতিই হবে আপনার নীতি। বলদ-সাধারণকে সব সময় বক্তৃতা দিয়ে বিভ্রান্ত রাখতে হবে, কিন্তু কাজ করার সময় অন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। বলদেরা যাতে শিক্ষা না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে আপনার একটা মস্ত কাজ। পুলিশই হবে আপনার প্রধান সহায় এবং তাদের জন্য বাজেটের বেশীর ভাগ ব্যয় করা হবে আপনার কাজ। সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে আপনার ধনী বলদদের সব সময় হাতে রাখা, তাদের আবদার মত কাজ করা এবং কোন সময়েও যেন আমাদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ থাকলো তা ছিন্ন না হয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা, লাল জুজুর কাছ থেকে দূরে থাকবেন সব সময়! এটা যেন ভুল না হয়।

—আচ্ছা, মনে থাকবে! ধন্যবাদ আপনাকে! অসুবিধা হলেই আমি যাব আপনার ওখানে। আপনার ও মিসেস্ মাওনের কথা আমি কোন দিন ভুলবো না। গুড বাই!

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। মাওন সাহেব পাড়াগাঁয়ের দিকে ছোট্ট কুটীরে বাস করছেন শান্তিতে। দেশ তাঁর দেশসেবার পুরস্কারস্বরূপ তাকে কিছু দিন বিশ্রাম করতে সময় দিয়েছে। হানিফ চাচারাও সবাই এখন বিলেতে। এখান থেকে মাসোহারা যায় এখন। তাছাড়া বেস্থলকে তাঁরা রেখে গিয়েছেন খবরদারী করতে আর আছে বিভিন্ন ইওরোপীয় ফার্মের সাহেবেরা। এক দিন মাওন, হানিফ চাচা সব এক যায়গায় বসে। এমন সময় খবর গেল, জুহুর দেশেতে দুর্ভিক্ষ লেগেছে আবার। কোথায় না কি খাবারের দাম ভীষণ চড়েছে তাই খাবার চাইতে যাওয়ায় গুলী চালিয়ে কয়েকটা শিশু ও মেয়ে-বলদকে তারা খতম করেছে।

—কি খবর হানিফ চাচা?

—আজ্ঞে, আপনার বুদ্ধির তারিফ করি! বেটারা আপনার পরামর্শ মত দেশ শাসন করছে। জানেন, ১৭১° বার এই ক'বছরে গুলী চালিয়েছে। বলদ মেরেছে তার ডবল। আর দুর্ভিক্ষ তো লেগেই আছে। তার ওপর ওখানকার স্ত্রীবলদেরাও না কি আজকাল কাপড়ের অভাবে হাফ-প্যান্ট পরছে।

—সে কি বলছো চাচা?

—তাই তো বাবাজি, তবে আমাদের মুনাফার টাকায় জুহু হাত দেয়নি। হাত দিয়েছে যত ব্যাটা গরীব বলদের পেটে! যা বুদ্ধি দিয়ে এসেছো বাবাজি! জালিয়ানাবাগ তো ছেলেমানুষ, ওরা এরই মধ্যে ২।৩টে জালিয়ানাবাগ চালিয়েছে।

—তাই না কি! মাওনের পেট থেকে হাসি যেন ফেনিয়ে-ফেনিয়ে উঠতে থাকে!

"কথা বলা এবং কিছুর মীমাংসা করতে যাওয়ার চেয়ে নীরব থাকা এবং বোকা সাজা ঢের ভাল।" —আব্রাহাম লিঙ্কন।
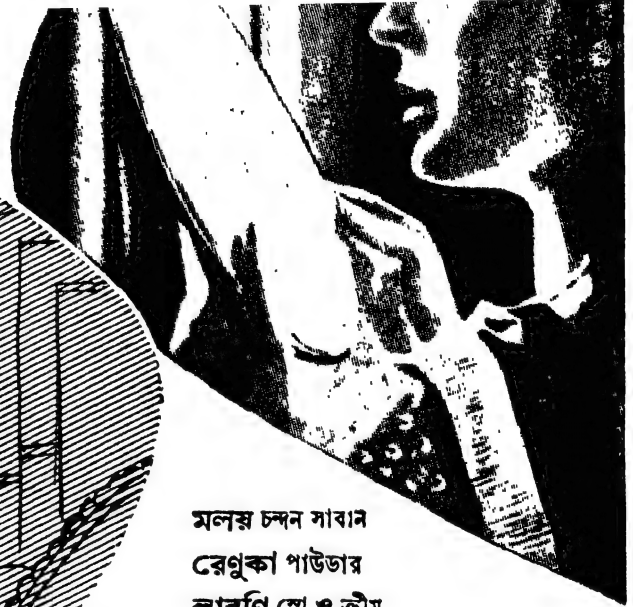
অনুকূল সমালোচনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ছবির মুলুকের জনৈক কবিংকর্মা তাঁদেরই ব্যক্তি চিত্র-সমালোচকদের নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন। সমালোচকরা না কি নিন্দুক। তাঁদের অনুকূল সমালোচনা না কি বাংলা চলচ্চিত্রের দুর্গতির অন্যতম কারণ। সেই পুরাতন অভিযোগ! এর মধ্যে আছে মুরুব্বীয়ানা, নেই কিন্তু মুন্সিয়ানা।

আত্মবিক্রেতা নিজের পণ্যের মিষ্টতা সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকে; কিন্তু আত্মভক্ষকের রসনা যদি তা দুঃসহ অম্লস্বাদে জর্জ্জরিত ক'রে তোলে, তবে তার প্রতিবাদও কি পরিবাদ ব'লে গণ্য হবে?

কাগজওয়ালাদের মুখ বন্ধ করবার জন্যে ছবিওয়ালাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন, সাদরে আমন্ত্রণ, বিনামূল্যে প্রবেশপত্র বিতরণ, জলখাবারের আয়োজন এবং সময়ে-সময়ে ভূরিভোজন।

কন্যাদায়গ্রস্তরাও মেয়ে দেখাবার জন্যে বরপক্ষকে ডেকে আনে পরম সমাদরে। লোকে মেয়ে দেখে চোখ দিয়ে, রসনা দিয়ে নয়। তথাপি সে ক্ষেত্রেও "দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্"এর অভাব হয় না। এটা উৎকোচের মত বলা চলে অসঙ্কোচে।

কিন্তু মেয়ের চোখ-মুখ যদি কিম্ভুতকিমাকার এবং তার গায়ের রং যদি হয় "গদাধরের পিসি"র চেয়ে কালো, তবে কোন রকম মিষ্ট বাক্য ও খাদ্য দিয়ে কেউ কি বরপক্ষকে স্বপক্ষে টানতে পারে?

টক আমকে মিষ্ট ব'লে মানতেই হবে—যে হেতু আমওয়ালা জিগির দিয়ে বলেছে, তার আম টক নয়। কুশ্রীকে সুশ্রী ব'লে স্বীকার করতেই হবে—যে হেতু জঠরদেশে নিক্ষিপ্ত হয়েছে কতিপয় মণ্ডা-মিঠাই। "ইরাণ-দেশের কাজী"দের যুক্তি হয়তো এই রকম, কিন্তু বাংলা দেশের সমালোচকদের তাঁদের এজলাসে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা কারুর আছে ব'লে মানি না।

এমন সব ছবিওয়ালা আছে যারা সত্যিকার ছবিকার নয়। মা লক্ষ্মী যখন অন্যমনস্ক থাকেন তখন তাঁর অলক্ষ্যে তাঁর ঝাঁপির ভিতরে হাত চালিয়ে কাঞ্চনমূল্য আদায় করবার লোভেই তারা ধারণ করে চিত্রনির্ম্মাতার ছদ্মবেশ।

এমন সব "সমালোচক" আছে যাদের বিদ্যার দৌড় সমালোচনার প্রথম পাঠ পর্য্যন্ত নয়। তবু তাদের সমালোচকের ভেক নিতে হয় নিতান্তই "পেটকা ওয়াস্তে"। তাদের পেটে অল্প-বিস্তর তরল কি নিরেট কিছু পড়লেই আনন্দে দোদুল-কলেবরে হয়ে ওঠে তারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এই শ্রেণীর ছবিকার এবং এই শ্রেণীর লিপিকারই বাংলা চলচ্চিত্রের অধোগতির অন্যতম কারণ। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের সেবক নয়, এটা হচ্ছে ব্যক্ত গুপ্তকথা। তারা ছবির চোরাবাজারে আসে নকল মালকে আসল ব'লে চালাবার ফিকিরে এবং যে কোন উপায়ে রূপচাঁদপক্ষীকে বন্দী করবার জন্যে সিন্দুক-পিঞ্জরে। তাদের উদ্দেশ্য উচ্চশ্রেণীর নয় বটে, কিন্তু তারা বুদ্ধিমান—হয়তো অতি-বুদ্ধিমান জীব। উপরচালাকদের ঘটেই থাকে অতিবুদ্ধি, তাই প্রায়ই তারা শেষ পর্য্যন্ত শেষরক্ষা করতে পারে না। তবু বলতে হবে উচ্চশ্রেণীর মানুষ না হ'লেও তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত নয়।

কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের—অর্থাৎ লিপিকারদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের নেই কোন রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষার বালাই। গুটিকয় মৌখিক মিঠা বাণী, কতিপয় দয়াদত্ত মিষ্টান্ন বা আর কিছু এবং খানকয় 'ফ্রি-পাস'—ব্যাস্, এইটুকুর বিনিময়েই এরা আত্মাকে বিক্রয় করতে প্রস্তুত!

এরা হচ্ছে কবি ঈশ্বরগুপ্ত বর্ণিত সেই জাতীয় জীব, যারা কল্পতরুর কাছে গিয়েও বলে—

"আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না।"

এ দেশে চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে যাঁরা ছবির কথা নিয়ে আলোচনা করতেন, তাঁরা ছিলেন দরদী সমালোচক। বাংলা দেশে ছবি নিয়ে নিয়মিত ভাবে আলোচনার সূত্রপাত হয় শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ও শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী সম্পাদিত "নাচঘর" পত্রিকায়। সে ছিল স্বার্থহীন আলোচনা। কারণ, ছবিওয়ালারা তখন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেন না। তাঁদের কাছ থেকে কাগজওয়ালারা কোন রকম সাদর আপ্যায়ন বা জলযোগের প্রত্যাশাও করতেন না। কাগজওয়ালারা যে ছবিকে অধিকতর লোকপ্রিয় ক'রে তুলতে পারেন, ছবিওয়ালারা তখনও পর্য্যন্ত সেটা আন্দাজ ক'রে উঠতে পারেননি। কিন্তু কোন রকম স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও সেদিনকার সমালোচকরা বাংলা ছবিগুলিকে প্রশংসা ছাড়া নিন্দা করবার কথা মনেও আনতেন না। ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলেও তার উল্লেখ করতেন না। খুব কচি ফুলের চারা রোদের ঝাঁজে মারা পড়ে। সেই জন্যেই শিশু বাংলা ছবিকে তখন বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তাপ সহ্য করতে হয়নি।

তার পর বাংলার বাংলা ছবির হামাগুড়ি দেওয়ার দিন গত হ'ল। সে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখলে। স্বাধীন ভাবে চলতে সুরু করলে। ক্রমে সে সাবালক হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু সমালোচকদের কাছ থেকে শিশুকাল থেকে আদর ও সহানুভূতি পেয়ে তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। ধেড়ে হয়েও সে দাবি করতে লাগল, সবাই যেন সব সময়েই তাকে চুমো খায়, গাল টিপে দেয়, আদর ক'রে কোলে তুলে নাচায়। যাঁরা সত্যিকার সমালোচক, তাঁদের সে রুচি হয় না। তাঁরা বলেন,—সাবালক হয়েছে, ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছে, এখন অন্যায় করলে ধমক খেতে হবে বৈ কি!

ছবিকাররা উপলব্ধি করলেন "তে হি নো দিবসা গতাঃ!" এ দিনের অভিজ্ঞতার ফলে তাঁদের ব্যবসায়-বুদ্ধি পাকা হয়ে উঠেছে, সুতরাং এটুকু বুঝতে তাঁদের বিলম্ব হ'ল না যে, ছবিকে উচিত মত চালু করতে হ'লে সমালোচকদের দলে না টানলে চলবে না। কারণ জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমাণে সমালোচকের মুখাপেক্ষী, বিজ্ঞাপনের চেয়ে অনুকূল সমালোচনা অধিকতর

আসিতেছে
জেমিনীর
সংসার
জীবন-গাথার আলোছায়া
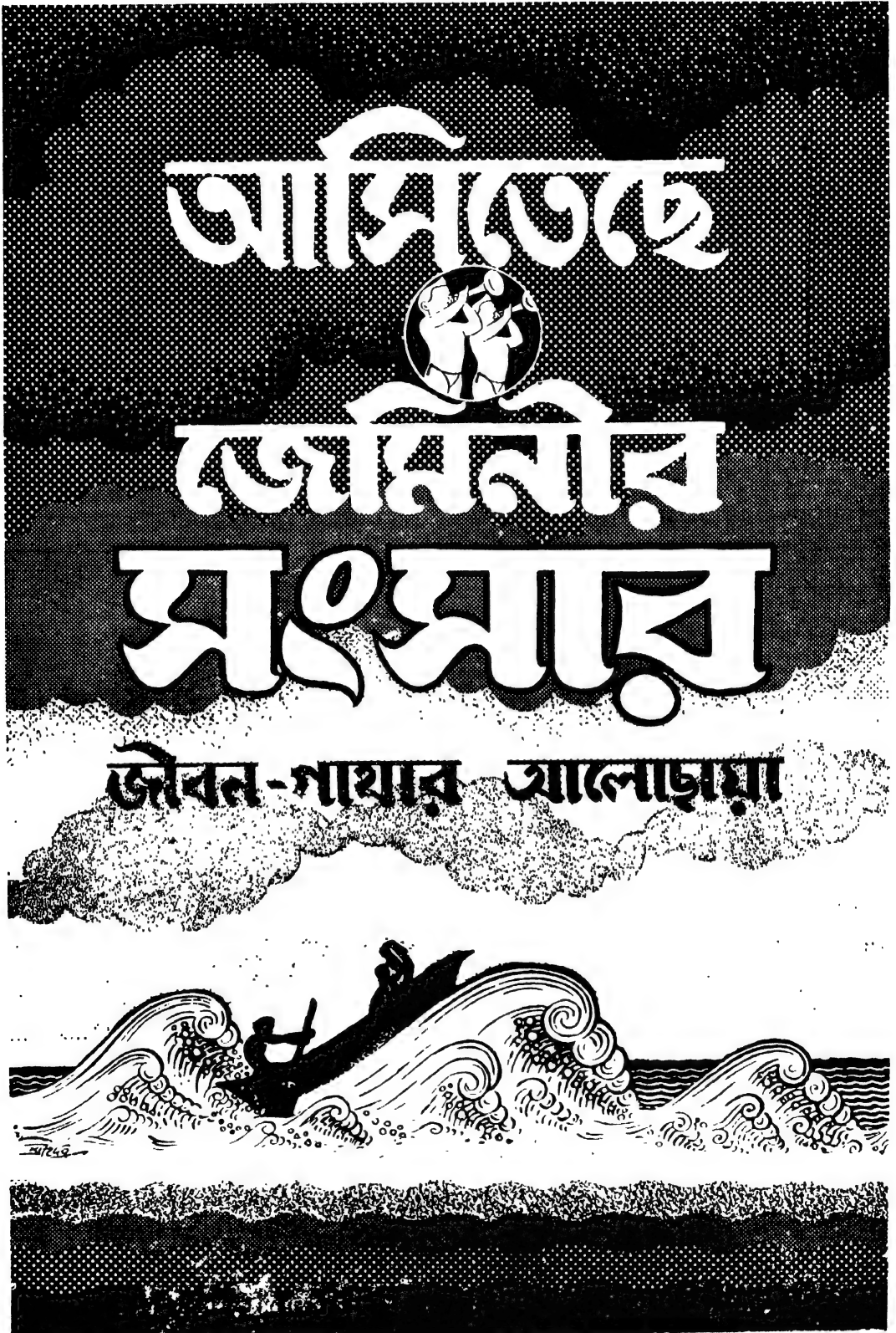
বিজ্ঞাপনের টোপ ফেলা সুরু হ'ল এবং সঙ্গে-সঙ্গে ছবির রাজ্যে দেখা যেতে লাগল নানা রকম অনাচার ও উপসর্গ।

প্রকৃত সমালোচকরা সুচতুর মাছের মত টোপ খেয়েও বঁড়শীতে আটক পড়লেন না, অবিচলিত ভাবে ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ বলতেই লাগলেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা বেশী নয়। সৎপথের পথিকরা কোন দিনই দলে ভারি হয় না।

কিন্তু মিঠা বুলি, খাবার ও বিজ্ঞাপনের টোপ খেতে গিয়ে তারাই দলে-দলে ধরা পড়ে, যাদের গায়ে আছে সমালোচকের ছদ্মবেশ এবং মনে আছে প'ড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা লাভের প্রবল লোভ। তুচ্ছ উৎকোচ পেলেই তারা তৃতীয় শ্রেণীর ছবিকেও প্রথম শ্রেণীর প্রথম ব'লে ফতোয়া দেবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

জনসাধারণ এই ছদ্মবেশী সমালোচকদের প্রথম-প্রথম চিনতে পারেনি। তাদের কথা শুনে তারা প্রেক্ষাগৃহকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলত। কিন্তু আলো দেখতে গিয়ে তারা ফিরে আসতে লাগল অন্ধকার নিয়ে। আলো তো কেউ দেখতেই পেলে না, মাঝখান থেকে ট্যাঁকের কড়িগুলি গেল মাঠে মারা। ক্রমে তাদের চোখ ফুটল। জাল সমালোচকদের চিনতে পারলে তারা। এবং ধীরে-ধীরে এটাও তারা বুঝতে পারলে, কোন্ কোন্ সমালোচক করেন না মিথ্যার পক্ষে ওকালতি। তাঁরা বিজ্ঞাপন পেলেও সত্য কথা বলেন, বিজ্ঞাপন না পেলেও বলেন। তাঁরা বন্ধুর ছবিও মন্দ হ'লে সুখ্যাতি করেন না, শত্রুর ছবিও ভালো হ'লে নিন্দা করেন না। তাঁরা জানেন, ছবি হচ্ছে আর্ট এবং একমাত্র সেই হিসাবেই তার বিচার। এক পাতা বিজ্ঞাপন বা এক থালা মিষ্টান্নের সঙ্গে আর্টের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না।

এঁরাই হয়েছেন আজ চিত্রনির্ম্মাতাদের চক্ষুশূল। তাঁদের মতে এঁরাই আধুনিক বাংলা ছবির অধঃপতনের অন্যতম কারণ। কিন্তু ব্যাপারটা কি উল্টোই নয়? বাংলা ছবি আবার যদি উন্নপথের যাত্রী হয়, তাহ'লে কি তার মূলে থাকবেন না সত্যিকার সমালোচকরাই? তাঁরা মেকীকে ধরিয়ে দিচ্ছেন, রাবিসকে চিনিয়ে দিচ্ছেন, কাচ ফেলে কাঞ্চনকে বেছে দিচ্ছেন। রাবিসের স্তূপ যত উঁচু হবে, বাংলা ছবি কি তত নীচুতে নেমে পড়বে না? রাবিস দিয়ে কেউ কোন দিন গ'ড়ে তুলতে পারে তাজমহল?

খুব হালে কলকাতার এক জন বিখ্যাত চিত্রনির্ম্মাতা ও চিত্রশালার অধিকারীর সঙ্গে বাংলা ছবি নিয়ে আমার কিছু-কিছু আলোচনা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গেই শুনলুম, তাঁর একখানি ছবি বাজারে একেবারেই চলেনি, ফলে তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। ছবির দুর্দশার জন্য তিনি কিন্তু সমালোচকদের দোষ দিলেন না, দায়ী করলেন দর্শকদের। তারা না কি সে ছবি দেখতে চায় না। প্রথম প্রথম কিছু-কিছু দর্শক-সমাগম হয়েছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই দর্শকের দল এত হালকা হয়ে পড়ে যে ছবিখানা বাজার থেকে তুলে নিতে হয়।

ব্যাপার যে কি হয়েছিল অনায়াসেই অনুমান করা যায়। নতুন ছবি দেখতে প্রথম যারা এসেছিল, পকেটের পয়সা ফেলে রাবিস দেখে তারা হতাশ হয়ে ফিরে যায়। তার পর বন্ধুদের কাছে বর্ণনা করে নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। বন্ধুরা তাই শুনে সাবধান হয়ে যায়। এই ভাবে মুখে-মুখে ছবিখানার অপকীর্ত্তির কথা ছড়িয়ে পড়ে দর্শকমহলে।

পূর্ব্বোক্ত চিত্রনির্ম্মাতা সমালোচকদের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছেন, দর্শকদের ভালো লাগেনি ব'লেই ছবিখানা হয়েছে স্বল্পায়ু। কিন্তু অধিকাংশ চিত্রনির্ম্মাতার ঘটে এটুকু বুদ্ধি নেই। স্তাবক সমালোচকরা প্রশস্তি রচনা করলেও কোন কদর্য্য ছবিকে দীর্ঘজীবী করতে পারে না। বরং তাদেরই "ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হয়, অর্থাৎ জাতও যায় পেটও ভরে না। এক দিকে যে সব দর্শক মিথ্যা সুখ্যাতির কথা পাঠ ক'রে রাবিস ছবি দেখতে যায়, তাদের কাছে তারা মার্কা-মারা হয়ে থাকে, দর্শকরা তাদের আর বিশ্বাস করে না। অন্য দিকে বিজ্ঞাপনের গুটিকয় টাকা এবং এক দিন খেয়ে ফুরিয়ে যাওয়া গুটিকয় মণ্ডা-মিঠাইয়ের স্মৃতি নিয়ে চিরদিন জীবনধারণ করা চলে না।

অধিকাংশ চিত্রনির্ম্মাতার ধারণা, যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশায় সমালোচকরা থাকবেন তাঁদের হাতের মুঠোর ভিতরে। পুতুলবাজীর পুতুলের মত তাঁদের খুসি মত নোয়াতে-ফেরাতে ওঠাতে-বসাতে পারা যাবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তাঁরা ছবি নিয়ে ছেলেখেলা খেলতে ভয় পান না। আর্ট হিসাবে ছবিকে তিলোত্তম ক'রে তোলবার দিকে দৃষ্টি রাখা তাঁরা দরকার মনে করেন না। হরেক রকম সস্তা, ভেজাল বস্তুর সাহায্যে জোড়াতাড়া দিয়ে একটা-কিছু গ'ড়ে তুলতে পারলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত হন। মনে করেন, দর্শকরা হচ্ছে শিশুর মত, মাকাল ফলের মত বাইরের রঙের বাহার দেখলেই আহ্লাদে তারা আটখানা হয়ে পড়বে। তার উপরে পোষমানা কাগজওয়ালারা যখন 'সাবাস সাবাস' রব তুলে আকাশ বিদীর্ণ ক'রে ফেলবে, তখন সে তো হবে সোনায় সোহাগা—ছবিখানা বিকিয়ে যাবে একেবারে "উত্তপ্ত পিষ্টকে"র মত। এই ভ্রান্ত ধারণাই হচ্ছে বাংলা দেশের অধিকাংশ ছবির ব্যর্থতার সর্ব্বপ্রধান কারণ। দুষ্ট বা শিষ্ট সমালোচকের প্রশ্নই এখানে ওঠে না, চিত্রনির্ম্মাতারা নিজেরাই করেন নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত।

পূর্ব্বে যে বিখ্যাত চিত্রনির্ম্মাতার একখানি ছবির ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছি, উদাহরণস্বরূপ তাঁর ছবিকেই গ্রহণ করা যাক্। জনৈক প্রবীণ লেখকের একটি চিত্রকাহিনী মাঝামাঝি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। তখন উক্ত চিত্রনির্ম্মাতার দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁকে বলা হয়, একটি নূতন গল্প ও চিত্র-নাট্য রচনা করতে। ভদ্রলোক কথামত গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা তো করলেনই, তার উপরে চাইলেন পরিচালকের কর্ত্তব্যও পালন করতে। ভদ্রলোক লেখকরূপে প্রবীণ বটে, কিন্তু চিত্রজগতে নবাগত। পরিচালক-রূপে তাঁর হাতে-খড়ি পর্য্যন্ত হয়নি। কিন্তু চিত্রনির্ম্মাতা সেদিকে নজর না দিয়ে কাজ করলেন "penny-wise and pound-foolish"এর মত। নামজাদা পরিচালক নিজের নাম হিসাবে বেশী দাম হাঁকবে, আর এই নামহীন পরিচালক বিকিয়ে যাবেন যথেষ্ট সস্তায়। অতএব চিত্র-নাট্যকারই হলেন চিত্রপরিচালক।

তার পর? তার পর আর কি, শিক্ষার্থীকে গুরুর আসনে বসালে যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়, এখানেও হ'ল তারই পুনরভিনয়। ছবিখানা মার খেলে। লোকে তার দিকে ফিরেও তাকালে না। নয়া

পরিচালক ভাঙলেন পরের মাথায় কাঁটাল। চিত্রনির্মাতার হ'ল অর্দ্ধ লক্ষ টাকা লোকসান।

যাঁরা সত্যিকার সমালোচকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের ত্রুটি সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে থাকতে চান, তাঁরা একটা মস্ত কথা ভুলে যান। লেখনীয় সমালোচনার কথনীয় সমালোচনার মূল্য ঢের বেশী। লেখক যে সমালোচনা কাগজে লেখেন, তার চেয়ে ফলপ্রদ হয় দর্শকরা যে সমালোচনা করেন মুখে-মুখে। ছবিকাররা বিবিধ উপায়ে হয়তো লেখকদের মুখ বন্ধ করতে পারেন, কিন্তু দর্শকদের মুখ বন্ধ করবেন কেমন ক'রে? তাদের একমাত্র যুক্তি হচ্ছে— মাথর তেল, ফেলব কড়ি। এখানে কড়ি যার জোর তার। সমালোচকদের cape goat বা মুক্তিছাগে পরিণত করতে পারলেই বাংলা ছবি লক্ষ্মীলাভ করবে না। ছবিকে রাখতে পারে বা মারতে পারে কেবল দর্শকরাই।

সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে দু'টি বড় দৃষ্টান্ত আছে।

"কিন্নরী" হচ্ছে ক্ষীরোদপ্রসাদের একখানি নাটিকা। সেখানি যে দুর্ব্বল ও নিম্নশ্রেণীর রচনা, সে বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ নেই। কিন্তু ওখানি ভালো কি মন্দ নাটক, তা নিয়ে দর্শকরা একটুও মাথা ঘামায় না। পালাটি তারা অত্যন্ত উপভোগ করে। অতএব তার জনপ্রিয়তা হয়েছে অসাধারণ।

"গৃহপ্রবেশ" ও "তপতী" খোদ রবীন্দ্রনাথের রচনা। সমালোচকরা একবাক্যে তাদের নাটকত্ব ও অভিনয়কে দিয়েছেন অভিনন্দন। কিন্তু দর্শকরা তাদের সহ্য করতে রাজী হয়নি। সাধারণ রঙ্গালয়ে পালা দু'টি হয়েছে একেবারেই ব্যর্থ।

সমালোচকের লিখিত নিন্দা-প্রশংসার উপরে নয়, দর্শকদের মৌখিক নিন্দা-প্রশংসার উপরেই নির্ভর করে নাটক বা ছবির ভবিষ্যৎ।

—সাহিত্য পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

শান্তিনিকেতন—
(প্রথম ও দ্বিতীয়)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রতি খণ্ডের মূল্য চার টাকা।

ধর্ম্ম—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য সাত সিকা।

সঞ্চয়—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য দেড় টাকা।

মানুষের ধর্ম্ম—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাধীনতা দিনের উপহার—
কাজী আবদুল ওদুদ। প্রকাশক—কাজী খুরশীদ বখ্‌ত, ৮ বি নং, তারক দত্ত রোড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা।

অনাগত—
প্রফুল্লকুমার সরকার। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আধুনিক আলোক চিত্রণ—
পরিমল গোস্বামী। ফটোগ্রাফিক ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সি লিঃ, ১৫৪ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাজল রেখা—
মণি বাগচী। কমলা বুক ডিপো, ১৫ নং বঙ্কিম-চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গোপন কথা—
ষ্টিফেন জুইগ। অনুবাদক—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব্বাচল প্রকাশক, ৬নং কলেজ রো, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

বিদ্যাপতি—
শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিসার্স লিঃ, ১১৯ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

প্রসাদ—
শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথ। প্রকাশক—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২।১ নং কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—
বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল, এম-এ সম্পাদিত। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

মুকুন্দ দাসের গ্রন্থাবলী—
বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী—
(মূল ও বঙ্গানুবাদ) বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য এক টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবত—
(প্রাচীন শুকদেব বঙ্গানুবাদ)—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

আমার বাঙলা—
সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ঈগল পাবলিশার্স, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

অশরীরী—
প্রমথনাথ বিশী। পি, কে, বসু এণ্ড কোং, কলিকাতা—৩১, মূল্য দেড় টাকা।

নতুন চাঁদ—
নজরুল ইসলাম। নূর লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

বিপ্লবের ডাক—
সুশীল জানা। ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

রাজা আবদুল্লার হত্যা ও মধ্য-প্রাচ্যের ভবিষ্যৎ—

গত ২০শে জুলাই (১৯৫১) জর্ডানের রাজা আবদুল্লা মধ্যাহ্ন-নামাজ পড়িবার জন্য প্রাচীন জেরুজালেম সহরের এল্-আক্সা মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় মুস্তাফা শাকির নামক জনৈক আরবের গুলীতে নিহত হইয়াছেন। আততায়ীও রাজা আবদুল্লার দেহরক্ষীর গুলীতে নিহত হইয়াছে। ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে ১৬ই জুলাই, শানিখে লেবাননের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী রিয়াদ এল সোলহ জর্ডানের রাজধানী আম্মান সহরে জনৈক আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। তাঁহার আততায়ী না কি সিরিয়ার জনৈক জাতীয়তাবাদী। এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করিয়া গত ১৯শে জুলাই রাজা আবদুল্লা এক ঘোষণায় বলিয়াছিলেন,—"এই সকল দুর্ব্বৃত্তকে আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না অথবা যে সকল প্রতিষ্ঠান নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নরহত্যা করে তাহাদিগকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না!" অদৃষ্টের এমনি নিদারুণ পরিহাস যে, ইহার পরদিন তাঁহাকেই আততায়ীর হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। রাজা আবদুল্লা নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, মধ্য-প্রাচ্যে, ইজরাইল রাষ্ট্রের সহিত আরব রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধের মধ্যে কিরূপ ভাবে দেখা দিবে তাহা অনুমান করা যেমন কঠিন, তেমনি তাঁহাকে হত্যা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিয়া উঠাও সহজ নয়।

তিনি কোন ইহুদী দ্বারা নিহত হন নাই অথবা আরব লীগের কোন শত্রু দ্বারা তিনি নিহত হইয়াছেন এমন কথাও বলা হয় নাই। জেরুজালেমের প্রাক্তন মুফ্‌তি এবং প্যালেষ্টাইন আরব উচ্চতর কমিটির প্রধান কর্ত্তা হজ আমীন এল হোসেনীর নিযুক্ত লোক দ্বারা তিনি নিহত হইয়াছেন, এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার আততায়ী মুস্তাফা শাকির জেহাদ-বাহিনীর এক জন সদস্য বলিয়া প্রকাশ। জেরুজালেমের প্রাক্তন মুফ্‌তিই এই জেহাদ-বাহিনী গঠন করিয়াছেন। প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীদের হাত হইতে রক্ষা করাই এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ। উহার একটি অপ্রকাশিত উদ্দেশ্য আছে বলিয়াও শোনা যায়। প্রাক্তন মুফ্‌তি দাবী করিয়া থাকেন যে, তিনিই প্যালেষ্টাইনের আরবদের একমাত্র এবং অকৃত্রিম নেতা। যিনিই তাঁহার এই নেতৃত্বের দাবীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন তাঁহাকেই অপসারিত করাই জেহাদ-বাহিনী গঠনের অপ্রকাশিত উদ্দেশ্য বলিয়া কথিত। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পূর্ব্বেও তাঁহার নেতৃত্বে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান জেহাদ-বাহিনীকে উহারই বংশধর বলিয়া অভিহিত করা যায়। রাজা আবদুল্লা পূর্ব্ব-প্যালেষ্টাইন তাঁহার রাজ্যের অঙ্গীভূত করায় প্রাক্তন মুফ্‌তির প্রতি তাঁহার মত্তক্যের আরও তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা আবদুল্লার হত্যাকাণ্ডে প্রাক্তন মুফ্‌তির হাত আছে, এইরূপ প্রচার-কার্য্যের তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ করিয়া গত ২১শে জুলাই কায়রো হইতে তিনি এক বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, রাজা আবদুল্লার হত্যাকারী যদি জেহাদ-বাহিনীর সদস্য হয়ও তাহা হইলেও এই হত্যাকারীর সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। উল্লিখিত প্রচার-কার্য্যের বিসময় পরিণাম এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় প্যালেষ্টাইন আরব এবং প্যালেষ্টাইন সহরগুলির উপর যে সাংঘাতিক সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপ সংঘটিত হইতে পারে সে-সম্বন্ধেও তিনি সতর্ক করিয়া দেন।

রাজা আবদুল্লার হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য প্রকাশিত হইবে কি না তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যে এইরূপ হত্যাকাণ্ড এই নূতন নয়। ১৯৪৮ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত মধ্য-প্রাচ্যে দুই জন রাজা, এক জন প্রেসিডেণ্ট এবং চারি জন প্রধান মন্ত্রী নিহত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত এক জন মন্ত্রী, এক জন প্রধান সেনাপতি, পুলিশের এক জন প্রধান কর্ত্তা, এবং ফৌজদারী বিচার বিভাগের এক জন প্রেসিডেণ্ট আততায়ীর হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যে দুই জন রাজা নিহত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লা দ্বিতীয়। ইহার পূর্ব্বে ১৯৪৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইয়েমেনের রাজা ইমাম ইয়াহায়া, তাঁহার দুই পুত্র এবং প্রধান মন্ত্রী নিহত হন। ১৯৪৯ সালের ১৪ই আগষ্ট সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট হোসেনী জাইম এবং প্রধান মন্ত্রী মহ্‌সীন বরাজী নিহত হন। মিশরের প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ নোকরোশী পাশা ১৯৪৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর, ইরাণের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী আবদুল হোসেন ১৯৪৯ সালের ৪ঠা নবেম্বর, ইরাণের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল আলী রাজমারা ১৯৫১ সালের ৭ই মার্চ্চ আততায়ীর হস্তে জীবন দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিযুক্ত প্যালেষ্টাইন-মধ্যস্থ কাউণ্ট বার্নাডোট ১৯৪৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর নিহত হইয়াছেন। সমস্ত হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়। হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এইরূপ ঘটনাও বড় কম নয়। ইরাণের শাহকে হত্যার চেষ্টা তন্মধ্যে অন্যতম। মধ্য-প্রাচ্যে হত্যাকাণ্ডের শেষ এইখানেই কি না তাহাই বা কে বলিবে?

রাজা আবদুল্লার হত্যাকাণ্ড সহ মধ্য-প্রাচ্যে যে-সকল হত্যাকাণ্ড এ-পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে সেগুলির জন্য শুধু উগ্র আরব জাতীয়তাবাদী-দিগকেই দায়ী করিলে চলিবে না। মধ্য-প্রাচ্যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণেরই ইহা প্রতিক্রিয়া। আরব-জগতে রাজা আবদুল্লা ছিলেন বৃটেনের বিশ্বস্ত বন্ধু। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মক্কা সহরে তাঁহার জন্ম হয়। তৎকালে আরবের প্রায় সমগ্র অংশই ছিল 'তুরস্কের' অধীন। হেজাজের রাজা হোসেনের তিনি দ্বিতীয় পুত্র। কনষ্টাণ্টিনোপলে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তুরস্কের পার্লামেণ্টে তিনি হেজাজের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা মক্কার শেরিফ এবং আমীর নিযুক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে আবদুল্লা প্রখ্যাত টি, ই, লরেন্সের প্রেরণায় তুরস্কের বিরুদ্ধে আরব-অভ্যুত্থানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। লরেন্সের কৌশলে আরবরা স্বাধীনতা লাভের আশায় তুরস্কের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছিল। তুরস্কের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আবদুল আজিজ ইবন সৌদ, মক্কার শেরিফ হোসেন এবং তাঁহার দুই পুত্র

ফৈজাল এবং আবদুল্লার কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের শেষে আরবরা স্বাধীনতা লাভ করিবে, মক্কার শেরিফ হোসেন দামাস্কাসে আরবের রাজা হইবেন এইরূপ অনেক কিছুরই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়লাভ করায় আরবরা তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্ত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের স্বাধীন হওয়ার আশা পূর্ণ হইল না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শেরিফ হোসেনকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ তো করিলেনই, জেড্ডা হইতে রণতরীও সরাইয়া লইলেন। এই সুযোগে ইবন সৌদ হোসেনের হেজাজ রাজ্যও দখল করিয়া লইল। তুরস্কের সাম্রাজ্য সিরিয়া, ইরাক এবং প্যালেষ্টাইন এই তিন অংশে বিভক্ত করা হইল। প্যালেষ্টাইন এবং ইরাক আসিল বৃটিশের ম্যাণ্ডেটের অধীনে এবং সিরিয়া ও লেবানন রহিল ফ্রান্সের ম্যাণ্ডেটরী রাজ্যরূপে। পিতার অবস্থা দেখিয়া আবদুল্লার মোহ দূর হইতে বিলম্ব হয় নাই। ১৯২১ সালে তিনি সিরিয়া দখলের জন্য এক সৈন্যদল গঠন করিয়া আম্মানে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বেলফুরের ঘোষণায় প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীদের জাতীয় বাসভূমিতে পরিণত করিবার আশ্বাস দেওয়ার পর জর্ডান নদীর পূর্ব্বতীরস্থ আজলুন, বল্কা এবং কারাক এই তিনটি জেলা লইয়া স্বতন্ত্র একটি অঞ্চল গঠন করা হয় এই সর্ত্তে যে, উহা প্যালেষ্টাইন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিবে, কিন্তু উহা পরিচালিত হইবে প্যালেষ্টাইনস্থিত বৃটিশ প্রতিনিধি দ্বারা। আবদুল্লা যখন সসৈন্যে আম্মানে উপনীত হইলেন, তখন বৃটিশ তাঁহাকে ট্রান্সজর্ডানের আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে রাজী হইল। আবদুল্লাও বুদ্ধিমানের মত বৃটিশের অধীনে ট্রান্সজর্ডানের আমীর হইতে স্বীকৃত হইলেন। সেই হইতে রাজা আবদুল্লা বিশ্বস্ততার সহিত সমস্ত বিষয়ে বৃটিশকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ট্রান্সজর্ডানবাসীর ক্ষতি করিয়াও তিনি বৃটিশের আনুগত্য করিয়াছেন, এই অভিযোগও একাধিক বার তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছে।

আবদুল্লা ট্রান্সজর্ডানের আমীর হওয়ার পর উহার শাসন-কার্য্যের উপর প্যালেষ্টাইনস্থিত বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯২৭ সালের নবেম্বর মাসে আমীর আবদুল্লার সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এক নূতন চুক্তি হয়। এই চুক্তির সর্ত্তানুসারে ট্রান্সজর্ডানের শাসন-ব্যবস্থার উপর বৃটিশের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চুক্তিতে একটি নির্ব্বাচনমূলক আইন সভা গঠনের এবং আবদুল্লা এই আইন সভা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেন এইরূপ সর্ত্ত অবশ্য ছিল। কিন্তু বৃটিশের ম্যাণ্ডেটরী ক্ষমতার সম্মুখে এইরূপ আইন সভা থাকার কোন অর্থই হয় না। বৃটিশের প্রেরণায় যে আরব লীগ গঠিত হয় তাহার সনদে ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসে আবদুল্লা স্বাক্ষর দান করেন। ১৯৪৬ সালে বৃটেনের সহিত তাঁহার আর একটি সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে ট্রান্সজর্ডানের উপর হইতে বৃটিশের ম্যাণ্ডেটের অবসান হয় এবং আমীর ট্রান্সজর্ডানের রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। ১৯৪৮ সালের মে মাসে প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইজরাইল রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং আরব রাষ্ট্রগুলি একযোগে এই নবজাত রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে। আরব-ইজরাইল যুদ্ধে রাজা আবদুল্লার আরব লিজিয়ন সাফল্যের সহিত অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাচীন জেরুজালেম সহর প্যালেষ্টাইনের পূর্ব্বাঞ্চলের কতক অংশ রাজা আবদুল্লার আরব লিজিয়ন দখল করিয়া লয়। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে প্যালেষ্টাইনের এই আরবী অংশে ট্রান্সজর্ডান পার্লামেণ্টের জন্য এক নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এপ্রিল মাসে জর্ডান ভূমির পূর্ব্ব ও পশ্চিম এলাকা মিলিত করিয়া রাজা আবদুল্লার অধীনে এক অখণ্ড হাশিমাইট জর্ডান রাজ্য গঠনের এক সিদ্ধান্ত ট্রান্সজর্ডান পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ব্ব-প্যালেষ্টাইন এবং ট্রান্সজর্ডনে মিলিত হইয়া যে নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইল তাহার নাম হইল জর্ডান রাজ্য। ট্রান্সজর্ডান রাজ্য বৃটিশের সৃষ্ট। রাজা আবদুল্লা উহার সহিত পূর্ব্ব-প্যালেষ্টাইন যুক্ত করিয়া উহাকে জর্ডান-রাজ্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু রাজা আবদুল্লা যেমন দাবী করেন যে, তিনি হজরত মহম্মদের পিতামহ হাসেমের বংশধর এবং এই জন্য নাম হইয়াছে হাশিমাইট বংশ, তেমনি জর্ডান নামটি বাইবেলের পুরাতন পর্য্যায় বা ওল্ড টেষ্টামেণ্টেও পাওয়া যায়। ইজরাইলগণ মুসার (Moses) নেতৃত্বে মিশর হইতে আসিয়া জর্ডান নদীর পূর্ব্বতীরস্থ মোয়াব রাজ্যের উচ্চ অধিত্যকায় কিছু দিন বাস করিয়াছিল। এইখানেই মুসার মৃত্যু হয়। তাঁহাকে কবর দেওয়া হয় দক্ষিণ-জর্ডানে।

আরব জাতীয়তাবাদীদের সহিত যে-সকল কারণে রাজা আবদুল্লার বিরোধ ঘটিয়াছিল সেগুলি উল্লেখ না করিলে মধ্য-প্রাচ্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া উঠা কঠিন। রাজা আবদুল্লা বৃটিশের তাঁবেদার ছিলেন বলিয়া জাতীয়তাবাদী আরবরা তাঁহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার আর একটি মতলব ছিল—জর্ডান, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া ও লেবাননকে একত্র করিয়া হাশিমাইট বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সিরিয়া ও লেবাননের প্রজাতন্ত্রী আরবরা চায় এই কয়েকটি রাজ্যকে একত্র করিয়া প্রজাতন্ত্রী আরব-রাষ্ট্র স্থাপন করিতে। প্যালেষ্টাইনের অনেক আরব মনে করেন যে, তিনি যে ১৯৪৮ সালে ইজরাইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার আসল উদ্দেশ্য ছিল প্যালেষ্টাইনের কতক অংশ গ্রাস করা। সৌদী আরবের রাজা আবদুল আজিজ ইবন সৌদের সঙ্গে তাঁহার শত্রুতা প্রসিদ্ধ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইবন সৌদ রাজা আবদুল্লার পিতা হোসেনের হেজাজ রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন। রাজা আবদুল্লা আবার উহা দখল করিতে চেষ্টা করিতে পারেন, রাজা ইবন সৌদের মনে এই আশঙ্কা আছে। বস্তুতঃ রাজা আবদুল্লাও হেজাজ দখলের অভিপ্রায় গোপন রাখেন নাই। বৃটিশের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করিতে রাজা আবদুল্লা কখনই লজ্জা অনুভব করেন নাই। আরব রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিতে উহা ভাল লাগে নাই। মিশর এবং ইরাকের সঙ্গে বৃটেন যে রক্ষা-ব্যবস্থামূলক চুক্তির প্রস্তাব করিয়াছিল তাহা রাজা আবদুল্লার সহিত চুক্তিরই অনুরূপ। কি মিশর, কি ইরাক কেহই এইরূপ চুক্তি স্বীকার করিতে রাজী হয় নাই। রাজা আবদুল্লার বিরুদ্ধে আর একটা বড় অভিযোগ—তিনি ইজরাইল রাষ্ট্রের সহিত শান্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়া আরব-স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এ কথা বলিলে বোধ হয় খুব ভুল হইবে না যে, ইজরাইল রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহার নীতির মধ্যেই রাজা আবদুল্লার বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ইজরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেই

আরব-ইজরাইল সম্পর্কের সমাধান যে হইতে পারে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্যালেষ্টাইন-আরবের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নয়; অন্য কারণে রাজা আবদুল্লার প্রতি সমগ্র আরব দেশগুলিতে বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রজাতন্ত্রী আরবদের আশঙ্কা, রাজা আবদুল্লা এশিয়ার আরবী ভাষাভাষী রাষ্ট্রগুলিকে হাশিমাইট বংশের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিলেও আরব জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইবে এবং রাজা আবদুল্লা বৃটেনের অনুগত বলিয়া এশিয়ার আরবী ভাষাভাষী রাষ্ট্রগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে বৃটেনের একাধিপত্য। রাজা আবদুল্লার বৃহত্তর সিরিয়া গঠনের প্রয়াসকে মিশর দেখিয়াছে ঈর্ষার চক্ষে। মিশরের আশঙ্কা ছিল, রাজা আবদুল্লার এই প্রচেষ্টা সফল হইলে মধ্য-প্রাচীতে মিশরের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইবে।

আরব-প্যালেষ্টাইনকে রাজা আবদুল্লা গ্রাস করায় মিশর এবং জেরুজালেমের প্রাক্তন মুফ্‌তি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ইহাতে এক দিকে তাঁহার রাজ্য সম্প্রসারিত এবং জেরুজালেমের পবিত্র স্থানগুলির উপর তাঁহার আধিপত্য যেমন প্রসারিত হইয়াছে, তেমনি মিশর ও প্রাক্তন মুফ্‌তির প্রতিষ্ঠিত নিখিল প্যালেষ্টাইন গবর্ণমেণ্টকে অস্বীকার করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে প্যালেষ্টাইনে মিশরের পরাজয়ের দায়িত্বও রাজা আবদুল্লার উপর চাপানো হইয়াছে। মিশর মনে করে, রাজা আবদুল্লা যদি নিশ্চেষ্ট না থাকিতেন তাহা হইলে মিশরের পরাজয় হইত না। এই নিশ্চেষ্টতাকে মিশরের সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করিবার জন্য ইঙ্গ-জর্ডানীয়ান চক্রান্ত বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। এই প্রচার-কার্য্য এখনও চলিতেছে। রাজা আবদুল্লা নিহত হওয়ার পরদিন কায়রোর এক পত্রিকায় এইরূপ হেড লাইন প্রকাশিত হইয়াছিল, "The End of the Traitor Abdullah, Enemy No 1 of Peace." আরব লীগের ঐকত্রিক নিরাপত্তা চুক্তির (Collective Security Pact) প্রস্তাব মানিয়া লইতে রাজা আবদুল্লা রাজী না হওয়াতে তাঁহার প্রতি অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মিশরীয় সংবাদপত্রে এইরূপ মন্তব্যও করা হইয়াছিল যে, জর্ডানের সৈন্যবাহিনী আরব লিজিয়নের বৃটিশ সেনাপতি গ্লব পাশা শুধু বৃটিশই নহেন, তিনি এক জন ইহুদী গুপ্তচর এবং আরবদের সমস্ত সামরিক গুপ্ত তথ্য তিনি ফাঁস করিয়া দিবেন।

রাজা আবদুল্লা নিহত হওয়ায় মধ্য-প্রাচীতে খুব গুরুতর পরিবর্ত্তন কিছু ঘটিবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। তবে মধ্য-প্রাচীতে বৃটেনের প্রভাব আরও হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। জর্ডান রাজ্যের ভবিষ্যৎ কি, তাহাও অনুমান করা কঠিন। সিরিয়া অতঃপর জর্ডান রাষ্ট্রকে তাহার অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা যে করিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এদিকে আবদুল্লার উত্তরাধিকারিত্ব লইয়াও বিরোধ বাধিবার আশঙ্কা আছে। রাজা আবদুল্লার মৃত্যুর মাত্র দশ মিনিট পরেই জর্ডান মন্ত্রিসভা তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নায়েফকে রিজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ তালাল বর্ত্তমানে চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু আসলে ইহা তাঁহার নির্ব্বাসন ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজা আবদুল্লা যখন তুরস্কে গিয়াছিলেন সেই সময় জর্ডানের প্রধান মন্ত্রী এবং আরব লিজিয়নের বৃটিশ সেনাপতির সহিত যুবরাজ তালালের ঝগড়া হইয়াছিল। অতঃপর স্নায়বিক দুর্ব্বলতার অজুহাতে প্রথমে তিনি বেইরুট হাসপাতালে চিকিৎসিত হন এবং পরে স্বাস্থ্য লাভের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শে সুইজারল্যাণ্ডে গমন করেন। রাজা আবদুল্লা তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি যদি সত্যই যুবরাজ তালালকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হইবে তাহা তিনি স্থির করিয়া যান নাই। সিংহাসনের অধিকার লইয়া গোলযোগ কিরূপ আকার ধারণ করিবে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। মিশর যুবরাজ তালালের সমর্থক। ইরাক সমর্থন করে আবদুল্লার দ্বিতীয় পুত্র নায়েফকে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবে তাঁহারা পর্দ্দার আড়াল হইতে কল টিপিবেন।

ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় স্পেন—

ফ্রাঙ্কোর স্পেনের সঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একটি দ্বৈপাক্ষিক চুক্তি করিবার জন্যই শুধু উদ্যোগী হয় নাই, স্পেনকে ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করিবার পরিকল্পনাও তাহার আছে। এই দ্বৈপাক্ষিক চুক্তি এবং ইউরোপ রক্ষা-ব্যবস্থায় স্পেন কি ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে, সে-সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য মার্কিণ নেভেল অপারেশনের প্রধান কর্ত্তা এডমিরাল শেরম্যান ১৬ই জুলাই (১৯৫১) স্পেনে গিয়াছিলেন। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সহিত আলোচনা শেষ করিয়া ফিরিবার পথে নেপলসে আকস্মিক ভাবে তাঁহার মৃত্যু হয়। আলোচনার ফলাফল হয়ত যথাসময়ে জানা যাইবে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কেন স্পেনের সহিত দ্বৈপাক্ষিক চুক্তি করিতে চায়, স্পেনকে ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গীভূতই বা কেন করিতে চায়, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রয়াসে বৃটেন ও ফ্রান্স অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে, হয়ত স্পেনকে ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করিবার প্রয়াসে বাধাও দিতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত কি করিবে, তাহাও উপেক্ষার বিষয় নয়। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রয়াস কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বস্তুতঃ ফ্রাঙ্কোকে দলে টানিবার চেষ্টার ইতিহাস এবং উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পাদনের কাহিনী সমসাময়িক মনে করিলেও ভুল হইবে না। গত তিন বৎসরে জন কয়েক মার্কিণ সিনেটার স্পেনে যাইয়া ফ্রাঙ্কোর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেশে ফিরিয়া ফ্রাঙ্কোর ফ্যালাঞ্জিষ্ট বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। শুধু মার্কিণ সিনেটররাই নয়, মার্কিণ দেশরক্ষা বিভাগেরও কয়েক জন পদস্থ ব্যক্তি স্পেনে গিয়াছিলেন, শুধু ফ্রাঙ্কোর আতিথ্য গ্রহণের জন্যই নয়, আরও বিশেষ উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল। তাঁহারা পিরানিজ পর্ব্বতমালাকে কিরূপে রক্ষা-ব্যূহে পরিণত করা যায় তাহা যেমন পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন তেমনি স্পেনের ঘাঁটিসমূহ হইতে আক্রমণের কিরূপ সুযোগ আছে তাহাও দেখিয়াছেন।

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সৌভাগ্য এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন, যদিও সোভিয়েট রাশিয়াকে ধ্বংস করিবার

উদ্দেশ্যে তাঁহার ব্লু ডিভিশনকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে ত্রুটি করেন নাই। নিরপেক্ষ না থাকিয়া যদি তিনি হিটলারের পক্ষে যোগদান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অদৃষ্টেও হিটলার ও মুসোলিনীর দশাই ঘটিত কি না, তাহা লইয়া আলোচনা করিয়া লাভ নাই। কিন্তু তাঁহার নিরপেক্ষ থাকার ফল যে এত দিনে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে সে-কথাও অনস্বীকার্য্য। সম্প্রতি যে কয়েক জন মার্কিণ সিনেটর স্পেনকে উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তিতে গ্রহণ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা, ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনী ঘোরতর কম্যুনিষ্টবিরোধী। কাজেই মিত্র-সৈন্যবাহিনীর পাশে ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনীকে দাঁড় করাইবার তাঁহারা পক্ষপাতী। ফ্রাঙ্কোকে তাঁহারা পছন্দ করেন কি করেন না, এই প্রশ্নটাই তাঁহাদের কাছে অবান্তর। কারণ, ১৯৪১ সালে রাশিয়া যখন আক্রান্ত হইয়াছিল তখন রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনের সময় ষ্টালিনকে তিনি পছন্দ করেন কি না ইহা চিন্তা করিয়া মিঃ চার্চ্চিল কাজ করেন নাই। কিন্তু ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনী শুধু কম্যুনিষ্টবিরোধী হওয়াই যথেষ্ট নয়, তাহাদের যুদ্ধ-সামর্থ্য, সমরনিপুণতা এবং অস্ত্রসজ্জা প্রভৃতির কথাও বিবেচনা করা আবশ্যক। যুদ্ধক্ষেত্রে কম্যুনিষ্টবিরোধিতা আঘাত হানিবার অব্যর্থ অস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ফ্রাঙ্কোর শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তিই যে তাঁহার সৈন্যবাহিনী, এ কথা অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু শান্তির সময় আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার যোগ্যতা দ্বারা সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ-নিপুণতা প্রমাণিত হয় না। ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনীতে মোট ৪ লক্ষ ২১ হাজার সৈনিক আছে। তন্মধ্যে অফিসারের সংখ্যাই ৩০ হাজার। এরূপ মাথা-ভারী (top-heavy) সামরিক বিভাগ বোধ হয় আর কোন দেশেই নাই। গার্ডিয়া সিভিল অর্থাৎ সিভিল গার্ড বা অসামরিক রক্ষা-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৬০ হাজার। কিন্তু এই গার্ডিয়া সিভিল আসলে সামরিক পুলিশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তথাকথিত সোশিয়াল ব্রিগেড প্রকৃত পক্ষে স্পেনের গেষ্টাপো। ইহার সদস্য-সংখ্যা ১৫ হাজার। সুতরাং স্পেনের সামরিক বাহিনীর সৈন্য-সংখ্যা দাঁড়াইতেছে ৩ লক্ষ ২০ হাজার। এই বাহিনী মোট ২২টি ডিভিশনে বিভক্ত। তন্মধ্যে ৬ ডিভিশন সৈন্য স্পেনিশ মরোক্কোতে অবস্থিত এবং অবশিষ্ট ১৬টি ডিভিশন রহিয়াছে স্পেনে। স্পেনের বিমান বাহিনীতে আছে ৪০ হাজার সৈন্য এবং বিমান আছে ১৫০টি। কিন্তু বোমারু বিমান এবং আধুনিক জঙ্গী বিমান একটিও নাই। স্পেনের নৌবাহিনীতে লস্কর আছে ২৫ হাজার। যুদ্ধ-জাহাজ বলিতে একটাও নাই। ৬টি ক্রুজার এবং ৩৬টি ডেষ্ট্রয়ার এবং ৭টা সাবমেরিণ আছে। ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনীর অর্দ্ধেক কনস্ক্রিপট (conscripts) এবং অর্দ্ধেক নিয়মিত সৈন্য। ইহাদের অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীর লোক এবং স্পেনের সাধারণ লোকদের দারিদ্র্য এমনই ভয়াবহ যে, তাহারা দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, নূতন কাপড়-চোপড় কিনিবার সামর্থ্যেও তাহাদের অভাব। শতকরা ৮০ জন স্পেনিয়ার্ডের চামড়ার জুতা কিনিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু সৈন্য হইতে পারিলে খাওয়া-পরা তো জুটিয়া যায়ই, তাছাড়া মাহিনাও পাওয়া যায় বৎসরে ৫ ডলার। অফিসারদের মাহিনা অবশ্য ইহাদের তুলনায় খুবই ভাল। কর্ণেলদের মাসিক বেতন ৮০ ডলার

এবং জুনিয়র অফিসাররা মাসে ৫০ ডলার বেতন পাইয়া থাকেন। অফিসারগণকে অনেক সস্তায় খাদ্য বিক্রয় করা হয়। সেই সস্তা খাদ্য চোরাবাজারে বিক্রয় করিয়াও তাঁহারা মোটা লাভ করিয়া থাকেন। অফিসারগণ ব্যবসা-বাণিজ্যও করিয়া থাকেন এবং শিল্পপতিরাও তাঁহাদিগকে ব্যবসায়ে গ্রহণ করিতে আগ্রহশীল। সামরিক অফিসারগণ হাতে থাকিলে শ্রমিকদিগকে শোষণ করা সহজ হয়।

ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনীর অবস্থা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা বিভাগ জানে না ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া ফ্রাঙ্কো ঘোষণা করিয়াছেন। সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট পরিমাণে মার্কিণ ডলারও পাইবেন সন্দেহ নাই। দুর্নীতিপরায়ণ ফ্যাসিষ্ট এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ডলার সাহায্যের গতি কি হইতে পারে, চিয়াং কাইসেকের চীন এবং সিং ম্যানরী'র দক্ষিণ-কোরিয়াই তাহার প্রমাণ। তথাপি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের সহিত দ্বৈপাক্ষিক চুক্তি করিতে এবং স্পেনকে উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তিতে গ্রহণ করিতে কেন চায়, তাহা কি খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হয় না?

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের সঙ্গে যে দ্বৈপাক্ষিক সামরিক চুক্তি করিতে চায় তাহা সম্পাদিত হইলে মার্কিণের আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের পরিবর্ত্তে স্পেন তাহার বিমান ও নৌ-ঘাঁটিগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করিতে দিবে। আটলাণ্টিকে আমেরিকার যে সকল নৌ-ঘাঁটি আছে সেইগুলি অপেক্ষা স্পেনের নৌ-ঘাঁটিগুলি ভাল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ফ্রান্সে এবং বৃটেনে তাহার যে-সকল বিমান-ঘাঁটি আছে সেগুলি অপেক্ষা স্পেনের বিমান-ঘাঁটিগুলি অধিকতর নিরাপদ তাহাও সত্য নয়। রাশিয়ার সঙ্গে সত্যই যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে পিরানিজ পর্ব্বতমালা রুশ-বাহিনীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে, ইহাও কেহ মনে করেন না। কিন্তু ইউরোপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র শুধু আটলাণ্টিক চুক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে চায় না। আটলাণ্টিক চুক্তি যদি কোন কারণে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উহার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্পেনের সহিত চুক্তি কাজে লাগিবে। আন্তর্জ্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তির বিশেষ সার্থকতা অনস্বীকার্য্য। বিশেষতঃ জেঃ ফ্রাঙ্কো স্পেনের ডিক্টেটর। জনমতের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া বিনা ওজর-আপত্তিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্দ্দেশ পালন করা তাঁহার পক্ষে যত সহজ, বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে তত সহজ নয়। বৃটেন ও ফ্রান্সের গভর্ণমেণ্টও বিনা আপত্তিতেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হুকুম পালন করিতে চায় বটে, কিন্তু জনমতকে ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হয় বলিয়া আমেরিকার নির্দ্দেশ পালন করিতে কিছু বিলম্ব ঘটে। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করার ব্যাপারে তাহার খুব ভাল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধাবস্থার অবসান করা হইয়াছে বটে, কিন্তু জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করার ব্যবস্থা এখনও সম্পন্ন হয় নাই। নিরাপত্তার বিধান বা Safety Clause-এর ব্যবস্থা হইলেই জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করা সম্ভব হইবে। স্পেনকে আটলাণ্টিক চুক্তিতে গ্রহণ করার ব্যাপারেও বৃটেন ও ফ্রান্সের তরফ হইতে আপত্তি উঠিয়াছে। কালক্রমে বৃটেন এবং ফ্রান্স উভয়েই যে ইহাতে রাজী হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু স্পেনকে গ্রহণ করার ব্যাপারে বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরোধী জনমতকে ভুলাইয়া শান্ত করিতে হইবে সর্ব্বপ্রথম। স্পেনকে গ্রহণ করার পরিণাম কি হইবে বলা কঠিন। ফ্রাঙ্কোর সিংহাসন যে খুব সুদৃঢ় তাহা বলা যায় না। কয়েক মাস পূর্ব্বে স্পেনে ব্যাপক শ্রমিক ধর্ম্মঘট হইয়া গিয়াছে। কঠোর দমন-নীতি এই ধর্ম্মঘটকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। স্পেনের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যাপক ভাবেই প্রধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনী তাঁহার নির্দ্দেশে যে যুদ্ধ করিবেই সে-সম্বন্ধেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। স্পেনে মার্কিণ প্রভাব বৃদ্ধির ফলে ফ্রাঙ্কোর পতন আসন্ন হইয়াও উঠিতে পারে।

মিঃ মরিসন বনাম 'প্রাভদা'—

গত ১লা আগষ্ট (১৯৫১) সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্রিকা 'প্রাভদা'য় একই সঙ্গে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ হার্ব্বার্ট মরিসনের বিবৃতি এবং ঐ সম্পর্কে প্রাভদার উত্তর প্রকাশিত হওয়ায় সুতীব্র ঠাণ্ডা-যুদ্ধের একঘেয়েমীর মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে মনে করিলে হয়ত ভুল হইবে না। কিছু দিন পূর্ব্বে এক জলযোগ বৈঠকে মিঃ মরিসন তাঁহার বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ সম্প… 'প্রাভদা'কে চ্যালেঞ্জ করিয়া এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঐ চ্যালেঞ্জের সমালোচনা করিয়া 'প্রাভদা' যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে 'প্রাভদা' উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি… তাঁহার স্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন। তদনুসারেই 'প্রাভদা' পত্রিকায় মিঃ মরিসনের দেড় হাজার শব্দ-সম্বলিত বিবৃতি পূরাপু… প্রকাশিত হইয়াছে এবং ঐ সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে আড়া… হাজার শব্দ-সম্বলিত 'প্রাভদা'র উত্তর।

মিঃ মরিসনের বিবৃতি এবং 'প্রাভদা'র উত্তরকে স্বাধীনতা সম্পর্কে বিতর্ক বলিয়া অভিহিত করা যায়। অবশ্য মিঃ মরিসন তাঁহার বিবৃতিতে বৃটেনের অস্ত্রসজ্জা এবং আটলাণ্টিক চুক্তি… পক্ষেও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। 'প্রাভদা'র উত্তরে এই যুক্তি… খণ্ডন করা হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্প… বিতর্কই এই বিবৃতি এবং উত্তরের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-বস্তু। মিঃ মরিসন তাঁহার বিবৃতিতে স্বাধীনতা সম্পর্কে বৃটিশের ধারণা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'প্রাভদা' বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন স্বাধীনতা সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার ধারণা। স্বাধীনতা সম্প… এই দুইটি ধারণার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে তাহা … বুঝিলে এই বিতর্কের তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। এই পার্থ… বুঝিবার জন্য প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড … তাহা জানা। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ডের দ্বারাই বৃটিশ-স্বাধীন… এবং সোভিয়েট-স্বাধীনতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা হইতে কতখানি বিচ্যু… হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ, যে সামাজি… শক্তি দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সেই সামাজিক শক্তি… স্বাধীনতার মধ্যে কি সম্পর্ক, তাহা না জানিলে স্বাধীন… লইয়া বিতর্কেরও কোন অর্থ হয় না। মিঃ মরিসন বৃটি… স্বাধীনতার যে স্বরূপ এবং প্রকৃতি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া… তাহা আসলে সংবাদ ও মত-প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া …

কিছুই নয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রাক্-যুদ্ধযুগে টোরী এবং উদারনৈতিকদের শাসনের সময়ে শ্রমিক দল যে স্বাধীনতাকে **'freedom to starve'** বা অনাহারে থাকিবার স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করিতেন মিঃ মরিসন তাহাকেই বৃটিশ-স্বাধীনতা বলিয়া রাশিয়ার জনগণকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ইহার উত্তরে 'প্রাভদা' বলিয়াছেন যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা ছাড়াও যে আরও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ যে-সকল স্বাধীনতা আছে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব সেগুলির কথা আদৌ উল্লেখ করেন নাই। 'প্রাভদা' মিঃ মরিসনকে এ কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, বৃটিশ শ্রমিক দলের শাসন সময়েও বৃটিশ পুঁজিপতিদের লাভ বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু শ্রমিকদের মজুরি-বৃদ্ধি রোধ করা হইয়াছে। এইখানেই যে-সামাজিক শক্তি রাষ্ট্র পরিচালন করে তাহার সহিত স্বাধীনতার সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট নিজকে সমাজতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট বলিয়া দাবী করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা বৃটিশ শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতেছেন। 'প্রাভদা' মনে করেন যে, বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকে সমাজতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট বলিয়া অভিহিত করা চলে না।

মতামত প্রকাশ এবং সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতার কোন মূল্যই নাই, এমন কথা 'প্রাভদা' বলেন নাই। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের জীবনে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার স্থান কোথায় এবং কতটুকু তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক। অন্নবস্ত্রের অভাবে ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের অন্নবস্ত্রের দাবী করিবার স্বাধীনতা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে স্বীকৃত হইলেও অন্নবস্ত্র পাওয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় নাই। এমন কি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইলেও উহা প্রকাশ করিবার কোন সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষের নাই। সংবাদপত্রগুলি প্রধানতঃ শিল্পপতিদের দ্বারাই পরিচালিত বলিয়া সাধারণ মানুষের দাবীদাওয়া ঐগুলিতে স্থান পায় না। বস্তুতঃ, মানুষের সুখে-স্বচ্ছন্দে এবং নিশ্চিন্ত মনে বাঁচিয়া থাকাই যদি স্বাধীনতার মূল ভিত্তি হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই যে স্বাধীনতার বৃহত্তম অংশ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সাধারণ মানুষের দিক হইতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই জীবন-মরণের সমস্যা এ কথা অন্নবস্ত্রের অভাবে ক্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ বুঝিবে না। এই দিক দিয়া রাশিয়ার জনসাধারণ যে বৃহত্তম স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। 'প্রাভদা' বলিয়াছেন যে, রাশিয়ার জনসাধারণ দীর্ঘ দিন ধরিয়াই শোষণ হইতে, অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে, বেকার-সমস্যা হইতে, দারিদ্র্য হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ, সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিস্ফুট হইয়াছে। রাশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান যে উন্নত হইয়াছে তাহা বৃটেন বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের জীবনযাত্রার মানের সহিত তুলনা করিবার বিষয় নহে। জার-শাসিত রাশিয়ায় জনগণের জীবনযাত্রার সহিত শুধু তাহার তুলনা করা সঙ্গত। কারণ, শতাব্দীরও অধিক কালব্যাপী সাম্রাজ্য শোষণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জনগণের জীবনযাত্রার মান কিছু উন্নত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। সমাজতন্ত্রী রাশিয়া নিজের সম্পদ দ্বারা ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়াছে, এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রাশিয়ায় আছে কি না, তাহা অবশ্যই বিচার্য্য বিষয়। ধনতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই রাশিয়াতে নাই। কিন্তু জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সোভিয়েটগুলিতে খোলাখুলি ভাবেই মতামত প্রকাশ করা হইয়া থাকে। রাশিয়ায় মতবাদকে দমন করা হয়, এ কথা না বলিয়া বলিতে হয় মতামতকে সমাজতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী গড়িয়া তোলা হয়। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও স্কুল-কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থা কি ধনতন্ত্র বজায় রাখিবার উপযোগী করিয়াই ছেলে-মেয়েদিগকে গড়িয়া তোলে না? পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে সাম্যটা শুধু মতবাদের প্রশ্ন, কিন্তু সাধারণ মানুষের দিক হইতে উহা কার্য্যে পরিণত করিবার বিষয়। কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকিতে সাম্য কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আবার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হইলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বও আর থাকে না। 'প্রাভদা' বলিয়াছেন, রাশিয়ার জনগণ সমস্ত বুর্জ্জোয়া দলগুলিকে অপসারিত করিয়া একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টিকেই গ্রহণ করিয়াছে। কারণ, এই পার্টিই একমাত্র ভূম্যধিকারী-বিরোধী এবং পুঁজিবাদ-বিরোধী। স্বাধীনতা যদি অর্থনৈতিক সাম্য এবং নিরাপদ জীবিকার মূল ভিত্তি হয়, তাহা হইলে এই সাম্য এবং নিরাপদ জীবিকার যাহারা শত্রু তাহাদের স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা গড়িবার স্বাধীনতা তাহাদিগকে দিলে রুশ-বিপ্লবের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। এই জন্যই 'প্রাভদা' বলিয়াছেন যে, রাশিয়ায় জনগণের শত্রুদের স্বাধীনতা নাই। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাতেও উহার শত্রুদের স্বাধীনতা নাই, এ কথাও অনস্বীকার্য্য।

স্বাধীনতার স্বরূপ এবং প্রকৃতি লইয়া 'প্রাভদা'-মরিসন বিতর্ক এইখানে শেষ হইল কি না তাহা আমরা জানি না। এই ধরণের বিতর্ক শুধু একাডেমিক হওয়া সম্ভব নয়। স্বাধীনতার মান নির্দ্দেশ করিতে হইলে উহার মূল উৎসের সন্ধান অবশ্যই করিতে হইবে। এই জন্য এইরূপ বিতর্কের কোন সার্থকতা নাই, এ কথা কিছুতেই বলা চলে না।

পশ্চিম-জার্ম্মাণীর অস্ত্রসজ্জার সমস্যা—

গত সাত-আট মাস ধরিয়া আলোচনার পরেও ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় পশ্চিম-জার্ম্মাণীর ভূমিকা সম্পর্কে কোন মীমাংসা এখনও সম্ভব হয় নাই। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫১) ওয়াশিংটনে বৃটিশ, ফরাসী এবং মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিবদের সম্মেলনে এ-সম্পর্কে আরও আলোচনা হইবে। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার পরিকল্পনা বন্-সম্মেলনে এবং প্যারী-সম্মেলনের আলোচনায় যে স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাতে ওয়াশিংটন-সম্মেলনে উহার চূড়ান্ত সমাধান হইতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করেন। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করা সম্পর্কে বর্ত্তমানে দুইটি প্রধান পরিকল্পনা আছে। একটি প্লেভা পরিকল্পনা (The Pleven Plan) আর একটি পিটার্সবার্গ (Petersburg) পরিকল্পনা। ওয়াশিংটন-সম্মেলনে এই দুইটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করা সম্পর্কে ফ্রান্সের আশঙ্কা

খুব সুস্পষ্ট। কম্যুনিজম অপেক্ষা সামরিক শক্তিসম্পন্ন জাম্মাণীকেই ফ্রান্স বেশী ভয় করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এই জন্য ফ্রান্স প্রথম প্রস্তাব করিয়াছিল, ছোট-ছোট কয়েকটি জাম্মাণ ইউনিট গঠনের। এই ইউনিটগুলি মিত্রপক্ষীয় সেনাপতির অধীনস্থ বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীর সহিত সংযুক্ত থাকিবে, এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ইহার পর প্রতি দলে ৬ হাজার সৈন্য লইয়া ব্রিগেড গ্রুপ বা কম্ব্যাট টিম (combat team) গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু উহাও গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়, ১ লক্ষ ৭৫ হাজার জাম্মাণ সৈন্য লইয়া ১০ ডিভিশন সৈন্য গঠন করা। এই দশটি ডিভিশন গঠনের কাজ সম্পন্ন হইতে দেড় বৎসর লাগিবে। জাম্মাণীর প্রাক্তন সেনাপতিরাও একটি পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা একটি স্মারকলিপির আকারে রচনা করা হইয়াছে। ইহাতে মিত্রশক্তিবর্গের নিকট দাবী করা হইয়াছে যে, পশ্চিম-জাম্মাণীর সৈন্যসংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার করা হইবে। প্রত্যেক কর্পে (corp) দুইটি ডিভিশন থাকিবে এবং প্রত্যেক ডিভিশনে থাকিবে ১২ হাজার সৈন্য, মোট ছয়টি আর্ম্মি কর্পস্ (corps) গঠন করিতে হইবে। কন্সক্রিপশন দ্বারা সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে এবং দুই বৎসর সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে এবং জাম্মাণ হাই কম্যাণ্ড ও যুদ্ধ-মন্ত্রিদপ্তরও গঠন করিতে হইবে।

প্লেভাঁ-পরিকল্পনার মূল কথা এই যে, ইউরোপীয় কাউন্সিলের রক্ষা-মন্ত্রিদপ্তর গঠন করিয়া উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে ইউরোপীয় বাহিনীকে রাখিতে হইবে। বৃটেন এইরূপ ব্যবস্থা পছন্দ করে না। পশ্চিম-জাম্মাণীর সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে ফ্রান্সের সহিত পশ্চিম-জাম্মাণীর মতভেদটা না কি অনেকটা সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও পশ্চিম-জাম্মাণীর অস্ত্রসজ্জা সম্পর্কে আর অধিক বিলম্ব করিতে রাজী নয়। অবশেষে মার্কিণ অভিপ্রায়ের নিকট বৃটেন এবং ফ্রান্সকে নতি স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, কম্যুনিজম নিরোধের নামে ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পরলোকে মার্শাল পেঁত্যা—

মার্শাল পেঁত্যা গত ২৩শে জুলাই (১৯৫১) ৯৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন দিন যাবৎ তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। এক দিন ফরাসী জাতির দৃষ্টিতে যিনি দেবতুল্য ছিলেন, শেষ-জীবনে তাঁহাকে সকলের ঘৃণা ও অবজ্ঞাভাজন হইতে হইয়াছিল। ১৮৫৬ সালে ফ্রান্সের এক অভিজাত, ধনী এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পুরা নাম Henri Philippe Benoni Omer Joseph Petain. প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি কর্ণেলের পদ হইতে একেবারে মার্শালের পদে উন্নীত হন। অসীম বীরত্বের সহিত তিনি ভার্দুন দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্য ৩ লক্ষ ৫০ হাজার জীবন বলি দিতে হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে তিনি প্রধান সেনাপতি হন। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী সময়ে তিনি ফ্রান্সের দেশরক্ষা-ব্যবস্থার সর্ব্বপ্রধান পরিচালক ছিলেন। ফ্রান্সের কোন মন্ত্রিসভাই তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন গুরুতর সিদ্ধান্ত করিতেন না। একমাত্র ডুমের্গ মন্ত্রিসভাতেই তিনি কিছু দিন সমর-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে এক্সিস শক্তিবর্গের আক্রমণ আশঙ্কার সম্মুখে স্পেনের নিরপেক্ষতা ফ্রান্সের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ঐ সময় তিনি ফ্রাঙ্কোর স্পেনে ফরাসী রাষ্ট্রদূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেঃ ফ্রাঙ্কোর সহিত তাঁহার কোনরূপ চুক্তি হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার বিচারের সময় যে প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহাতে বুঝা যায় যে, ফ্রান্সের পরাজয় নিশ্চিত মনে করিয়া তিনি ডিক্টেটরের আসনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

১৯৪০ সালে মে মাসে মঃ পল রেনে তাঁহাকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৬ই জুনের মধ্যে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় এবং রেনে মন্ত্রিসভা মার্শাল পেঁত্যার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেন। ফরাসী পার্লামেণ্টও তাঁহাকে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি নাৎসী জাম্মাণীর সহিত যুদ্ধবিরতি-পত্রে স্বাক্ষর করেন।

যুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে তাঁহার বিচার হয়। বিচারে তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইলেও বার্দ্ধক্যের কথা বিবেচনা করিয়া যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ায় প্রেসিডেণ্ট আরিয়ল তাঁহার দণ্ড মকুব করেন। যদি দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে ফরাসী জাতির কাছে তিনি দেবতার আসনেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। সুদীর্ঘ জীবন লাভ করার জন্যই হয়ত যশ, খ্যাতি সমস্ত হারাইয়া তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

তৈল-বিরোধ মীমাংসার আলোচনা—

তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করণ সম্পর্কে ইরাণ ও বৃটেনের মধ্যে বিরোধ-মীমাংসা করিতে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বিশেষ দূত মিঃ এভিরেল হ্যারিম্যানের প্রচেষ্টা যে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৫ই জুলাই (১৯৫১) তিনি তেহরাণে পৌছেন। তাঁহার কয়েক দিনের চেষ্টার ফলে তৈলসমস্যা সমাধানের জন্য গত ২৩শে জুলাই ইরাণ গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ প্রতিনিধি দলের সহিত আলোচনা করিতে রাজী হন। এইরূপ আলোচনায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সম্মত করাইতে মিঃ হ্যারিম্যান লণ্ডনেও গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে গত ৩১শে জুলাই আবাদানের তৈল-শোধনাগার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং চারিখানি বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার আমদানি করিয়া পারস্য উপসাগরে বৃটিশ নৌশক্তি বৃদ্ধিও করা হয়। অবশেষে মিঃ হ্যারিম্যানের চেষ্টায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও আলোচনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে রাজী হন এবং অবশেষে তিন মাসব্যাপী তৈল-সঙ্কটের অবসানকল্পে ১০ই আগষ্ট বৃটিশ মন্ত্রিসভার লর্ড প্রিভিসীল মিঃ রিচার্ড ষ্টোক্সের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিনিধি দলের সহিত ইরাণের প্রতিনিধিদের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত আলোচনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করিবার মত কিছুই পাই নাই। ১২ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, ইরাণের তৈল চালান

দেওয়া ও বাজারজাত করিবার জন্য একটি যুক্ত ইঙ্গ-পারসিক তৈল কোম্পানী গঠনের জন্য বৃটিশ প্রতিনিধি দল প্রস্তাব করিবেন।

মিঃ হ্যারিম্যান কি ভিত্তিতে আলোচনা চালাইবার জন্য উভয় পক্ষকে আলোচনায় রাজী করাইয়াছেন, সে-সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। তবে তাঁহার আলোচনা চালাইবার ফরমূলাটা না কি এই যে, ইরাণের তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করার নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে এবং তৈল চালান দেওয়ার অধিকার দেওয়া হইবে ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীকে। তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করার নীতি স্বীকৃত হইলে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠিবে। ইরাণ শেয়ারের মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দিতে চায়। বৃটেন শেয়ারের বাজার-দর অনুসারে ক্ষতিপূরণ চাহিবে।

যুদ্ধ-বিরতি আলোচনার ভবিষ্যৎ—

কায়েসাংএ যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা আরম্ভ হওয়ার পর এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই এক মাসের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা অনেক সঙ্কট কাটাইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহাতীতরূপে কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। আলোচনা আরম্ভ হয় ১০ই জুলাই (১৯৫১) এবং কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণ করাই ছিল আলোচনার প্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রথমেই বিরোধ সৃষ্টি হয় ১২ই জুলাই কম্যুনিষ্টরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ২০ জন সাংবাদিককে কায়েসাংএ যাইতে বাধা দেওয়ায়। কম্যুনিষ্টদের যুক্তি ছিল এই যে, যে-সকল বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হইয়াছে উহা তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু এডমিরাল জয় দাবী করিয়া বসিলেন, সাংবাদিকদের প্রবেশের বাধা তুলিয়া না নইলে কোন আলোচনাই আর হইবে না। শেষে ১৪ই জুলাই কম্যুনিষ্টরা কায়েসাং-এ নিরপেক্ষ এলাকা গঠনের জন্য জেঃ রিজওয়ের প্রস্তাব এবং সংবাদদাতাদের প্রবেশের দাবী মানিয়া লইলে ১৫ই জুলাই পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয়। অতঃপর কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণের কাজ অগ্রসর হইতে থাকিলেও ১৯শে জুলাই পুনরায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কম্যুনিষ্টগণ কর্ত্তৃক কোরিয়া হইতে সমস্ত বৈদেশিক সৈন্য অপসারণের বিষয়টি কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চাওয়াই এই অচল অবস্থার কারণ। অবশ্য দুর্য্যোগের জন্য ২০শে জুলাই তারিখে আলোচনা-বৈঠকের অধিবেশন হইতে পারে নাই। ২১শে জুলাই কম্যুনিষ্টদের প্রস্তাব অনুযায়ী ২৫শে জুলাই পর্য্যন্ত আলোচনা স্থগিত থাকে। ঐ তারিখে কম্যুনিষ্টরা বৈদেশিক সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে এবং উহার স্থলে উভয় পক্ষ সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্ট সমূহকে সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে সুপারিশ করিবেন, এইরূপ প্রস্তাব কর্ম্মসূচী-ভুক্ত করা সম্পর্কে মতৈক্য হয়। ইহার পরেই আর এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয় 'বাফার' অঞ্চল বা অসামরিক অঞ্চল গঠনের প্রশ্ন লইয়া। কমুনিষ্টরা অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখাতেই বাফার অঞ্চল গঠন করিতে চায়, আর তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চায় উহাকে অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখার আরও উত্তরে প্রসারিত করিতে। বস্তুতঃ, এই ব্যাপার লইয়া যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয় তাহা লইয়া ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত আলোচনায় অচল অবস্থা চলিতে থাকে, এমন কি আলোচনা ফাঁসিয়া যাইবার আশঙ্কাও দেখা দিয়াছিল। ইতিমধ্যে আবার কম্যুনিষ্টরা কায়েসাং-এর নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়াছে এই অভিযোগে আলোচনাই স্থগিত রাখা হয়। অবশেষে কায়েসাংএ ভুলক্রমে চীনা সৈন্যের উপস্থিতির জন্য কম্যুনিষ্টরা ক্ষমা প্রার্থনা করায় ১০ই আগষ্ট দুই ঘণ্টারও অধিক কালব্যাপী আলোচনা-বৈঠকের এক নীরব অধিবেশন হয়। ১২ই আগষ্টের আলোচনায় কিছু আশার লক্ষণ দেখা গেলেও আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায়, আলোচনায় ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থাই চলিতেছে।

আলোচনার ধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, কম্যুনিষ্টরা হারিয়া গিয়াছে এইরূপ একটা ভাব লইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতিরা পরাজিত শত্রুর উপর বিজেতা পক্ষের মত সর্ত্ত চাপাইয়া দিতে চাহিতেছেন। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা পরাজিত হয় নাই, কাজেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতিদের কম্যুনিষ্টদের প্রতি বিজিত শত্রুর মত আচরণ তাহারা মানিয়া লইবে না, ইহা তাঁহারা বুঝেন না এ কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবে তাঁহাদের আচরণের অর্থ কি? কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি হয়, ইহা কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চায় না?

রাশিয়ার সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট সভাপতি-মণ্ডলীর প্রেসিডেণ্ট মঃ সেভার্নিক গত ৬ই আগষ্ট (১৯৫১) শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টাকে সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে পঞ্চ-শক্তির চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব সমর্থনের জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। যদিও পঞ্চ শক্তির নাম উল্লেখ করা হয় নাই, তথাপি পঞ্চ-শক্তি বলিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র,, সোভিয়েট রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স এবং কম্যুনিষ্ট চীনকে বুঝান হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ার দিক হইতে এই ধরণের প্রস্তাব এই নূতন নয়। অতীতে এই সকল প্রস্তাবের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে এই প্রস্তাবের ভাগ্যে যে তাহাই ঘটিবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শান্তির জন্য প্রকৃত পক্ষে কে চেষ্টা করিতেছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র না সোভিয়েট রাশিয়া, এই প্রশ্ন অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য। রাশিয়ার শান্তি-প্রচেষ্টাকে কম্যুনিষ্ট প্রচার-কৌশল বলিয়া অভিহিত করা হয়। আবার রাশিয়া চুপ করিয়া থাকিলেও মনে করা হয়, না জানি রাশিয়া গোপনে-গোপনে কি করিতেছে! গত ৫ই আগষ্ট হইতে পূর্ব্ব-বার্লিনে যে বিশ্বযুব উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, উহার মধ্যে অনেকে রাশিয়ার কূটনৈতিক চাল দেখিতে পান। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি ভাবে শান্তিরক্ষায় উদ্যত হইয়াছে? মার্কিণ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন, "কোরিয়ায় যদি মীমাংসা হয়-ও তাহা হইলেও বিশ্বশান্তি বিপন্ন হওয়ার বৃহত্তম আশঙ্কা —সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল সশস্ত্র শক্তি থাকিয়া যাইবে। সুতরাং দ্রুত অস্ত্রসজ্জিত হইতে এবং অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলিকে রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের জন্য সাহায্য করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই প্রস্তুত হইতে হইবে।" রাশিয়া যদিও বলিতেছে যে, কম্যুনিজম এবং ধনতন্ত্র পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারে, তথাপি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না। ধনতন্ত্র জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিতে অসমর্থ। নিপীড়িত জনগণ কম্যুনিজমের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কাও সাম্রাজ্যবাদীরা উপেক্ষা করিতে পারে না। কাজেই জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করা নয়, কম্যুনিষ্টদিগকে ধ্বংস করাই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা কম্যুনিজম নিরোধের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন। এই অবস্থায় কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি হইলেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না।
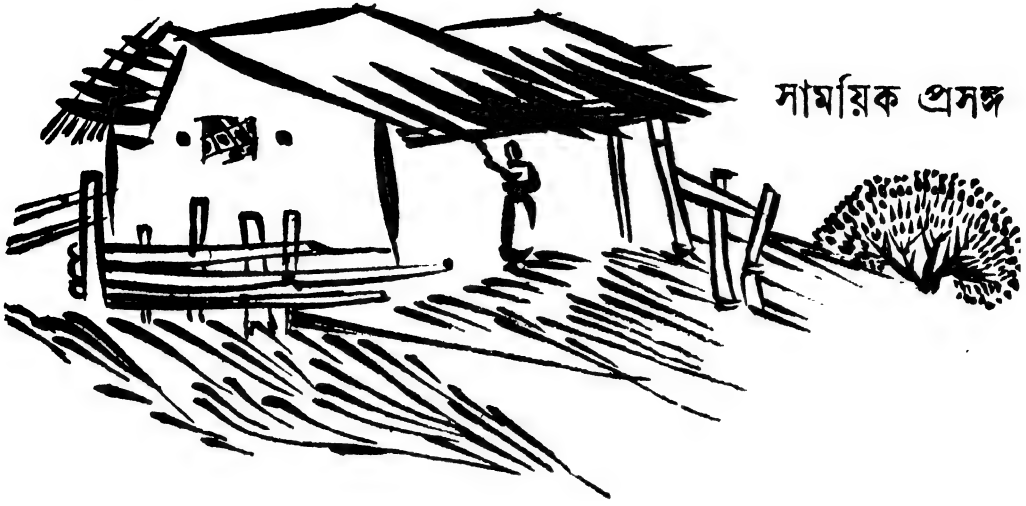
স্বাধীনতা দিবস

কংগ্রেসী নেতা, ভূতপূর্ব্ব সিভিলিয়ান, পুলিশ ও কন্‌ট্রাক্টর স্বাধীনতা পাইয়াছে, ইহা যেমন নিঃসন্দেহ, জনসাধারণ স্বাধীনতার লেশমাত্র স্বাদ পায় নাই, ইহাও তেমনি নিষ্ঠুর সত্য। ভারতের স্বাধীনতা আসিয়াছে আপোষের পথে, জননী জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহার মূল্য দিতে হইয়াছে। দিল্লীর গদী দখলের অত্যুগ্র আগ্রহে যাঁহারা ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেদিন জোর-গলায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ইহাই একমাত্র পথ। পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করিয়া লইলেও পাকিস্তান টিকিবে না, মুসলমানেরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে এবং আবার ভারতের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইবে—ভারত বিভাগের দিন যাঁহারা সুস্পষ্ট ভাষায় এই আশ্বাস দিয়া ভারত বিভাগে দেশবাসীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদের নীরব-সম্মতি আদায় করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাই বলিতেছেন, ভারত বিভাগ রহিত করিবার দাবী তোলা মহাপাপ। যে রক্তপাত রোধ করিবার জন্য ভারত বিভাগ হইয়াছে, বিভাগের পরেও সে রক্তস্রোত থামে নাই। অচিন্তনীয় অবিশ্বাস্য ভাবে দেশে রক্তনদী বহিয়াছে। কোটি-কোটি লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এক কোটি ভারতবাসী পরম অনিশ্চিত ও দূষিত আবহাওয়ায় মৃত্যুর অধিক ক্লেশ ও অপমান-জ্বালা ভোগ করিতেছে। বৎসরের পর বৎসর পাকিস্তান একটি দাবী তুলিতেছে, তাহাই স্বীকার করিয়া ভারত সরকার ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করিতেছেন। আপোষলব্ধ স্বাধীনতা যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আজ দিশাহারা।

—দৈনিক বসুমতী।

আমাদের জাতীয় অঙ্গীকার অক্ষরে-অক্ষরে পালিত হইয়াছে এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে, বরং তাহার নিতান্ত প্রাথমিক সর্ত্তগুলিই অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতিপালিত। তথাপি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, জটিল জাতীয় সমস্যাগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য দিকে দিকে তাহার ব্যগ্র-বাহু প্রসারণ; স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়, দুরূহ বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করিবার জন্য দৃঢ় ও দ্রুত পদবিক্ষেপের ধ্রুব ধ্বনি। আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথে আজ আর এক নূতন সঙ্কট মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে: বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্ররূপে যে পাকিস্তান নব জাগ্রত এশিয়ার জয়যাত্রাপথে ভারতের সাথী ও সহযাত্রী হইতে পারিত—দুষ্পূরণীয় এক দুরাকাংখার বশে সে যে শুধু এশিয়ার অগ্রগামী জাতিসমূহের শোভাযাত্রা হইতে নিঃশব্দে সরিয়া দাঁড়াইতেই মনস্থ করিয়াছে তাহা নয়, ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত করিয়া শোভাযাত্রী দলের সম্মিলিত গতিছন্দে ছেদ ও পতন ঘটাইতে চাহিতেছে। তাহার পশ্চাৎ হইতে যাহারা সে কার্য্যে প্রেরণা ও প্ররোচনা যোগাইতেছে, এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অদূরবর্ত্তী ইতিহাস তাহাদিগকে স্মরণ করিতে বলি: স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য যে জাতি একদা সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল, আজ অর্জ্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার মত সাহস ও সামর্থ্য, জাতীয় ঐক্য ও ঐকান্তিকতার তাহার অভাব হইবে না।

'বন্দে মাতরম্!'

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

গান্ধীবাদী অহিংসা মন্ত্র এই বিশ্বাসঘাতক বিভীষণদের আত্মগোপনের আবরণ মাত্র। আত্ম-প্রবঞ্চনার আদর্শগত ভিত্তি। সে আবরণ ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে জনতার ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলনে, আর সঙ্কটের তীব্রতায়। তাই মরিয়া হইয়া সে শেষে আশ্রয় লইয়াছে চরম অস্ত্রে—ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ও যুদ্ধের উস্কানিতে। আজ ১৫ই আগষ্টে শপথ লইতে হইবে আমাদের যে,—ছিনাইয়া আনিতে হইবে তাহার অনিচ্ছুক হাত হইতে এই দূষিত বিষাক্ত বাণ। চল্লিশ কোটি মানুষের বজ্র-দৃঢ় একতার আওয়াজে বাজুক এই কয়টি দাবী—কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চাই, পাক-ভারত মৈত্রী-চুক্তি চাই, কমনওয়েলথ চুক্তির অবসান চাই।

এই আওয়াজ আজ অপ্রতিরোধ্য আওয়াজ হইয়া ১৫ই আগষ্টের বিশ্বাসঘাতক দাস-চুক্তিকে টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলার পথকে প্রশস্ততর করুক। —স্বাধীনতা।

সোস্যালিষ্ট দলের নির্ব্বাচনী কর্ম্মসূচী

"সোস্যালিষ্ট দলের নির্ব্বাচনী কর্ম্মসূচীর মূল বিষয় এইরূপ:

বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ। প্রতি কৃষক-পরিবার মোট ৩০ একর জমি রাখিতে পারিবে। তদূর্দ্ধ সমস্ত জমি অন্য চাষী এবং ভূমিহীন মজুরদের দেওয়া হইবে। ক্ষুদ্র জমিদারদের পুনর্ব্বসতির

জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে এবং ৩০ একরের অধিক জমির মালিকদের ১০০ একর পর্য্যন্ত দশ বৎসরের জন্য এনুইটি দেওয়া হইবে।

সর্ব্বসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েৎ এবং মালটি-পারপাস সমবায় সমিতি কৃষি পুনর্গঠনের ভিত্তি হইবে। সরকারী কৃষি বিভাগগুলিকে একত্র করিয়া একটি ভূমি-কমিশনের অধীন করা হইবে। জমির উন্নতির জন্য ভূমি-স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হইবে। তাহারা কূপ খনন, কম্পোষ্টের গর্ত্ত খনন, জল নিষ্কাশণ প্রভৃতিতে সাহায্য করিবে। নূতন ও পতিত জমি উদ্ধারের জন্য গবর্ণমেণ্ট খাদ্য-সেনাদল তৈরি করিবে। সর্ব্বপ্রকার সমবায় প্রচেষ্টায় উৎসাহ দেওয়া হইবে। কালেকটিভ ফার্ম্ম গঠিত হইবে। ইহাতে ভূমিহীন মজুরেরা কাজ পাইবে। দেশের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে। ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে মূলধনের পরিমাণ বাড়িবে। লোহা, বিদ্যুৎ, খনি, কেমিক্যাল সার এবং চা ও কফিক্ষেত প্রভৃতি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। অপর সমস্ত শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে। সরকারী কন্ট্রোল এমন করা হইবে যাহাতে সকল প্রকার উৎপাদনের উপর হইতে সকল প্রকার বাধা উঠিয়া যায়। মূলধন বৃদ্ধি অপেক্ষা শ্রমিকের উপর বেশী ঝোঁক দিতে হইবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেকনিসিয়ানদের ডাকিয়া আনিতে হইবে। অটোনমাস পাবলিক কর্পোরেশনগুলির নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা যাহাতে একচেটিয়া ব্যবসায়ের দোষমুক্ত হইতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। এই সমস্ত কর্পোরেশন ওয়ার্কস কমিটির মারফৎ শ্রমিক-প্রতিনিধি লইতে হইবে। যৌথ ব্যবসায়ে শ্রমিক-প্রতিনিধি গ্রহণ বাধ্যতামূলক হইবে। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে দবল অডিটের সাহায্যে শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে। রোগ-বীমা, প্রসূতি-মঙ্গল এবং বৃদ্ধ বয়সের পেনসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক শ্রমিককে ইউনিয়নের সদস্য হইতে হইবে। পরিকল্পনা ব্যবস্থা গোড়া হইতে গঠন করিতে হইবে। কৃষিজীবি উদ্বাস্তদের সমবায় পদ্ধতিতে জমি দিতে হইবে। মধ্যবিত্ত ও কারিগরদের পুনর্ব্বসতি গবর্ণমেণ্ট করাইবে। সমাজের উন্নতিতে মুষ্টিমেয় সম্পত্তির মালিক বাধা হইলে তাহা দূর করিতে এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিতে রাষ্ট্রবিধি বদলাইতে হইবে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলিকে পুনর্গঠন করিতে হইবে। ভারতবর্ষ বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। শাসনযন্ত্র সংশোধনের দ্বারা দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ, অযোগ্যতা এবং দীর্ঘসূত্রতা দূর করিতে হইবে। বিচার সহজলভ্য করিতে হইবে। শাসনযন্ত্রের সহিত জনসাধারণের সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। আটলাণ্টিক ও সোভিয়েট দলের বিরোধ হইতে দূরে থাকিতে হইবে! ইন্দোনেশিয়া হইতে মিশর পর্য্যন্ত কালেকটিভ সিকিউরিটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইউ-এন-ওর যে সমস্ত সঙ্ঘ যুদ্ধ ও বুভুক্ষা দূর করিতে চাহিবে তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। ধনী ও শক্তিশালী জাতি এবং দরিদ্র ও দুর্ব্বল জাতির মধ্যে ভেদ সৃষ্টিতে বাধা দিতে হইবে। আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র সোশ্যালিষ্ট আন্দোলনে ভারতবর্ষ সাহায্য করিবে। ইহাই হইবে সোশ্যালিষ্ট দলের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।" —প্রবাসী।

আবার কেন?

"১৯৪৬ সনের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভারতের সাধারণ মানুষ জানিতে পারে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি কি ভীষণ! এই দুষ্টবুদ্ধির প্ররোচনায় মত্ত হইয়া এক দল লোক সাধারণ মানুষের বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে। এই অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব্ব বিপর্য্যয় নেতৃত্বকেও বিভ্রান্ত করে। বৃটিশের ম্যাজিকে দেশের নেতৃত্ব মোহ-গ্রস্ত হইলেন। এই উগ্র সমস্যার সমাধান আশায় এই দেশ বিভাগ হইল। বৃটিশ তাহার বিভেদ নীতির সাফল্যে আনন্দিত হয় ও দেশের শাসন-ভারও হস্তান্তরিত হয়। ক্রমে বিদ্বেষের উগ্রতা হ্রাস পাইয়া দুই নব-সৃষ্ট রাষ্ট্রের ভিতর সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল। ব্যবসা-বাণিজ্যও স্বাভাবিক গতিতে চলিতে সুরু করিল। বৃটিশ-শক্তি বাহ্যতঃ দেশ ছাড়িয়া গেলেও তার লুব্ধ দৃষ্টি এই দেশের উপর আছে। দুই রাষ্ট্রে সৌহার্দ্দই যদি চলিতেই থাকে তবে বৃটিশের স্বার্থে আঘাত হানিবেই এবং দেশ ভাগ করার অর্থই অনর্থ হইয়া যাইবে। তাই যখন ডলারের চাপে বৃটিশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ধ্বংসের মুখে পৌঁছিল তখন সাময়িক সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টায় সে তাহার 'মুদ্রার মান' পরিবর্ত্তন ঘটাইল ও ভারতকে তার লেজুড়ে জুড়িয়া লইল। কিন্তু পাকিস্থানকে মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস না করার বুদ্ধি 'ধার' দিয়া এই দুই রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্যে নূতন ভাবে আঘাত হানে। ফলে সেই

পুরাতন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আবার জ্বলিয়া উঠিল। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অতি নিরীহ সাধারণ মেহনতী হিন্দু-জনতার জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল। ইহারা নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া আজ উদ্বাস্তু নামে একে একে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে যে সব সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ চলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা পাকিস্থানে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন কি না জানা যায় নাই, তবে চাষী মুসলমান চলিয়া যাওয়ার ফলে আজ উদ্বৃত্ত কুচবিহার শুধু ঘাট্‌তি অঞ্চলে পরিণত হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, নূতন জালিয়ানওয়ালাবাগ নাম ধারণ করিয়াছে। নিরীহ বালক-বালিকা প্রাণ হারাইয়াছে। তাই আজ যখন দুই রাষ্ট্রের সীমান্তে সৈন্য-সমাবেশ ও নেতৃত্বের মুখে অসংলগ্ন হুমকির কথা সংবাদপত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে তখন মনে এই প্রশ্নই আসে—'আবার কেন'? দুই রাষ্ট্রেই কর্ণধারগণ সাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে পারেন নাই বরং দিনের পর দিন নানা সমস্যার আবর্ত্তে ফেলিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকাশ, কলিকাতা সহরেই গত ছয় মাস প্রতি তিন দিনে একটি আত্মহত্যা সংঘটিত হইয়াছে। তাই যখন দুই রাষ্ট্রের প্রগতিশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র-কর্ণধারগণের কার্য্য সমালোচনা দ্বারা জনতাকে জাগ্রত করিয়া দেশের শাসন, ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আনিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন, তখন 'গ্রাহাম' সাহেবের কাশ্মীরে পদার্পণ ও দুই রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের হঠাৎ সেই বিদ্বেষ বক্তৃতায় পুনঃ আবির্ভাবে স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠিতেছে—"আবার কেন?" গ্রাহাম সাহেব মারফৎ বৃটিশের অকল্যাণ হস্ত দুই রাষ্ট্রের জনতার জীবনে যে বিপর্য্যয় আনিতে সচেষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ব্যাহত করার জন্য দুই রাষ্ট্রেরই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক সক্রিয় চেষ্টা দ্বারা এই কাল-মেঘ বিদূরিত করিবেন তাহাই কামনা করি। জনতা আজ আর চায় না এই আত্মঘাতী সংগ্রাম, তাই এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হইবেই। তবু নিশ্চিন্তে নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত হইবে না। 'সমাজ-দ্রোহী'রা যাহাতে তাহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় অগ্রসর না হইতে পারে তাহার দিকেও নজর করিতে হইবে। একবার বহ্নি জ্বলিয়া গেলে দুই রাষ্ট্রের সহস্র সহস্র জীবন বিপন্ন হইবে, লাভ ঘটিবে মুষ্টিমেয় কয়েকটি সমাজদ্রোহীর।" —বীরভূম বার্ত্তা।

উদ্বাস্তু

"আমরা ইতিপূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলি যে, উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতি কেবল সমস্যা নহে, ইহা একটি মহাসমস্যা। সমাজ জীবন ও আজন্ম কালের পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুদের জীবনকে সুশৃঙ্খলতার সহিত সুপ্রতিষ্ঠিত করা একপ্রকার অসম্ভব। একমাত্র নিজ-নিজ আবাসে ও নিজ-নিজ পরিবেশের মধ্যে ইহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত সমস্যা সমাধানের কোন পথ নাই। তাহা কি করিয়া এবং কবে সম্ভব—প্রশ্ন ইহাই? তাহা করিতে হইলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যথেষ্ট বুঝাপড়া প্রয়োজন। দুই রাষ্ট্রের দুই জন সংখ্যালঘু মন্ত্রী নিয়োগ অথবা সংখ্যালঘু বোর্ড গঠনই যদি এই সমস্যা সমাধানের উপায় হইত তবে এত দিনে আমরা সমস্যা সমাধানের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিতে পারিতাম। দেশ ভাগ-বাঁটোয়ারা যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া এক সম্প্রদায়কে কেবল নিজ ধর্ম্মের জন্য গৃহছাড়া হইতে হইবে ইহা সত্যই অমানুষিক। এই অমানুষিক মনোবৃত্তির ফলেই আজ লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশু গৃহহারা ও ভিক্ষাপাত্র সম্বল করিয়াছে। ভিক্ষা দ্বারা এই মহাসমস্যা সমাধানের কিছু মাত্র উপায় দেখা যায় না। ইহাতে সমস্যা আরও জটিল ও কঠিন আকার ধারণ করে। এই যে দুর্গত মনুষ্য-সমাজ ইহাদেরও রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির কাজে লাগাইতে কেহই পশ্চাৎপদ হন না। গৃহহারা এই সকল বাঙ্গালীদের দেশ-দেশান্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস এ পর্য্যন্ত কত দূর সফল হইল তাহার হিসাব-নিকাশ লইবার দিন আসিয়াছে। রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে দেশকে বিভেদের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হইয়াছে এবং গোটা বাঙ্গলা দেশটা ও বাঙ্গালী জাতি হইয়াছে ইহার বলি-স্বরূপ। আজ বাঙ্গলার কথা বাঙ্গালীরও ভাবিবার অবসর নাই। যাহারা ভাবিতেছেন তাহারা অত্যন্ত করুণা করিয়া কেবল মাত্র "আহা" "আহা" করিতেছেন। ইহার ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা মহাসমস্যায় রূপ পরিগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। অবস্থা দেখিয়া ক্রমশঃই এই কথা আমাদের মনে হইতেছে যে, পুনর্ব্বসতির প্রশ্ন অবাস্তব ও অসম্ভব। স্থায়ী ভাবে ইহাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আজ বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের কথা বাঙ্গালীদের চিন্তা করিতে আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি। দেশ ভাগ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইবে কোন্ অধিকারে? দেশটা কাহার? বাঙ্গালী যদি তাহা আজও উপলব্ধি না করিতে পারে তবে এমন এক দিন আসিবে যে, গোটা বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর কোন স্থান হইবে না। স্থান-মাহাত্ম্য লইয়া দুই-দশ বৎসর বেশ কাটিবে, কিন্তু পরিণাম অতি ভয়াবহ। সেই ভয়াবহ ও ভয়াল দৃশ্যের যৎসামান্য দেখিয়াই আজ আমরা বিচলিত হইতেছি। যাহারা চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের নিজ-নিজ গৃহে কি সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না? এক দিকে যদি তাহা সম্ভব হয় অপর দিকে তাহা কেন অসম্ভব হইবে? গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য করা হইবে এমন কোন প্রকাশ্য চুক্তি তো সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় ছিল না? তবে দিনের পর দিন উদ্বাস্তুদের ভীড় বাড়িতেছে কেন? চিন্তানায়কদের ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবারও আজ অবসর নাই।" —ত্রিস্রোতা।

রাজনীতিতে নামের মোহ

"অনেক কিছু অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া-চিন্তিয়া বাংলা দেশের অধুনালুপ্ত যুগান্তর দল বলিয়া কথিত দলটি এত দিনে কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করিলেন। গত ১৮ই শ্রাবণ বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উক্ত দলের সদস্যগণ মিলিত হইয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁহাদের কংগ্রেস ত্যাগের কথা ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁহাদের নবগঠিত ক্ষুদ্র দলের নামকরণ করিতে পারেন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। আচার্য কৃপালনী কর্ত্তৃক গঠিত কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক ফ্রণ্টে ইঁহারা প্রথমে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া আচার্য কৃপালনী প্রমুখ যখন কংগ্রেস পরিত্যাগ করিলেন তখনও ইঁহারা কংগ্রেস ত্যাগ না করিয়া তাহার মধ্যে থাকিয়া গেলেন। এদিকে আবার আচার্য কৃপালনী-আহূত পাটনা সম্মেলনে ইঁহারা যোগদান করিলেন, কিন্তু উক্ত সম্মেলনে গৃহীত দলের নামকরণ লইয়াই ইঁহাদের মতভেদ

হওয়ায় তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সম্মেলন ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশবাসীর স্মরণ আছে, সর্ব্বভারতীয় কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি গঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে পশ্চিম-বাংলার কংগ্রেসত্যাগী বিশিষ্ট কর্ম্মিগণ দ্বারা কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টি গঠিত হইয়াছিল এবং সে বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, ইহাই একটি সর্ব্বভারতীয় সংস্থা গঠনে প্রেরণা জাগাইয়াছে। পাটনা সম্মেলন এই নামকরণের যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিয়া সামান্য রদ-বদল করিয়া কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি বা সংক্ষেপে প্রজা-পার্টি নামে নূতন সংস্থার নামকরণ করিয়াছেন। যেহেতু, কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টির নেতা হইয়াছেন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সেই হেতু উক্ত দলের সহিত মিশিয়া যাইলে তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায় থাকে ইহাতে আতঙ্কিত হইয়া যুগান্তর দল নবগঠিত প্রজা-পার্টিতে যোগদান না করিয়া বাংলা দেশের মধ্যে আবার একটি দলের সৃষ্টি করিলেন। উক্ত দলের সহিত তাঁহাদের আদর্শের কোন পার্থক্য আছে বলিয়া তাঁহারা কোন ঘোষণা করেন নাই, কেবল মাত্র নামের জন্যই তাঁহারা পৃথক্ দল করিতে উদ্যত, ইহা পরিষ্কার ভাবেই জানা যাইতেছে। বিশ্বস্ত মহলের সংবাদে প্রকাশ, এই নবগঠিত শিশু দলটির নাম সর্ব্বোদয় দল রাখা হইবে। মহাত্মা গান্ধীই সর্ব্বোদয় সমাজ পরিকল্পনার জনক। যুগান্তর নামক দলটি কোন দিনই গান্ধী মতবাদে বিশ্বাসী নহেন, পক্ষান্তরে আচার্য কৃপালনী প্রমুখ সর্ব্ব-ভারতীয় নেতৃবৃন্দ মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহচর ও গান্ধীবাদের উত্তরসাধক। যদি প্রকৃত সর্ব্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠাই এই দলটির কাম্য হয় তাহা হইলে আচার্য কৃপালনী পরিচালিত সর্ব্বভারতীয় এবং ইতিমধ্যেই শক্তিশালী প্রজা-পার্টির মধ্যে মিশিয়া না যাওয়ার পিছনে কি যুক্তি আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পশ্চিম-বাংলার প্রজা-পার্টি শুধু তাঁহাদের কাল্পনিক পূর্ব্বের অভয় আশ্রম দলের একচেটিয়া অধিকারে নাই। যাঁহারা কোন কালে অভয় আশ্রম দলে ছিলেন না এবং এখনো নাই তাঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বিশিষ্ট কর্ম্মী পশ্চিম-বাংলার প্রজা-পার্টিতে যোগদান করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মেদিনীপুরের কর্ম্মীদের মধ্যে নেতাজীর অনুগামী এক বিশিষ্ট অংশ আসিয়া প্রজা-পার্টিতে যোগদান করিয়াছেন। সে জন্য উক্ত দলের নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের কাতর অনুরোধ, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি চাহিয়া সর্ব্বশক্তিতে সর্ব্বভারতীয় প্রজা-পার্টিকে পুষ্ট করিয়া তুলুন। নচেৎ শক্তি বিভক্ত হইলে বর্ত্তমান কংগ্রেস-বিরোধী কাহারো অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। প্রজা-পার্টির দ্বার তাঁহাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইবার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। বিলম্বে হইলেও বর্ত্তমান জনবিরোধী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সহিত যাঁহারা সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া জনগণের মধ্যে আসিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।" —দামোদর।

বর্ষায় গ্রাম্য স্বাস্থ্য

"প্রতি বৎসর বর্ষার সময় গ্রাম্য স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় তাহা সমস্ত লোক স্বীকার করেন। উহার কারণও সুস্পষ্ট এই যে, গ্রামের রাস্তা-ঘাট-পুকুর প্রভৃতি কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায়। ঐ সময় রাস্তা-ঘাটের আবর্জ্জনা পচিয়া উঠে। তাহার দ্বারা দূষিত গ্যাস বাহির হয় এবং সেই পচা আবর্জ্জনায় মাছি-মশা প্রভৃতি ডিম পাড়ে। ইহার দ্বারা ম্যালেরিয়া, কলেরা, ডাইরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া গ্রামবাসী বেশ কষ্ট পায়, এমন কি জীবনান্ত ঘটিয়া থাকে। গ্রামবাসিগণ এই সময় যদি একটু সচেষ্ট হইয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কিছু কার্য্য করেন তাহা হইলে এই দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। যে সব পুকুরের জল যাতায়াত করে নাই, জল কালো হইয়া আছে ও তাহাতে পানা প্রভৃতি হইয়া থাকে—তাহার পানা পরিষ্কার করিতে হইবে ও সেই জলে যাহাতে মশা ডিম না পাড়ে বা ডিম পাড়িয়া থাকিলে কিছুটা কেরোসিন তৈল ঢালিয়া জলটি বিশেষ করিয়া গুলাইয়া দিলে মশার ডিম নষ্ট হইয়া যায় ও ম্যালেরিয়া রোগ হইতে পারে না। এই বর্ষার সময়েই ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহাই একমাত্র কারণ। তার পর জল মাঠে ভর্ত্তি হইয়া যাওয়ার জন্য লোক রাস্তা-ঘাটে পায়খানা করে, সেই পায়খানাতে বৃষ্টি পড়িয়া পচিয়া উঠে এবং সেই সব পচা মলের উপর মাছি ডিম পাড়ে। প্রচুর মাছি জন্মায় এবং মল দ্বারা যে সব রোগ সৃষ্টি হয় তাহা ঐ মাছির দ্বারাই ছড়াইয়া পড়ে। তাহাতে কলেরা, ডাইরিয়া প্রভৃতি হয়। সেই জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে বড় রকমের কোন পায়খানা না করিতে পারিলেও নালা-পায়খানা করিয়া তাহাতে মলত্যাগ করিয়া মাটির দ্বারা ঢাকিয়া দিলে এই সমস্ত রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। ইহাতে কোন খরচ নাই। তবে একটু পরিশ্রম করিয়া নালার চারি পাশে সামান্য আড়াল করিবার জন্য আচ্ছাদন করিয়া দিতে হইবে। শুধু যে রোগ দূর হইবে তাহা নয় ইহার দ্বারা উত্তম কৃষি উৎপাদনের সার প্রস্তুত হইবে। বিভিন্ন জায়গায় সরাইয়া সরাইয়া ঐ নালা-পায়খানা করিলে কৃষির সমস্ত ক্ষেতটি উর্ব্বর করা যাইবে। এই সব বিষয়ে গ্রামবাসীদের এইবার দৃষ্টি দিতে হইবে। নিজে করিতে হইবে ও অপরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য পরামর্শ দিতে হইবে। সমস্ত গ্রামে নলকূপ নাই। পুকুরের জল খাইতে হয়। বর্ষার জলে পুকুরের চারি ধারের আবর্জ্জনা ও লতা-পাতা ইত্যাদি জলে পচিয়া বহু রোগের বীজাণু জন্মায়। সে জন্য প্রত্যেক ঘরে-ঘরে জল উত্তমরূপে গরম করিয়া খুব ঠাণ্ডা হইলে ব্যবহার করিতে হইবে—এই বিষয়ে অবহেলা করিলে রোগ-শোকে আক্রান্ত হইয়া গরীব পল্লীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বহু দ্বন্দ্ব করিয়া আমরা স্বাধীন হইয়াছি। এবার আমাদিগকে গ্রামবাসীদের ও সমগ্র গ্রামের সুখ-স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে, নচেৎ স্বাধীন হইয়া সুখভোগ করা সম্ভব হইবে না। যে দেশে রাস্তা-ঘাট ঘর-বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যত বেশী সেই দেশ তত সভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। আমাদিগকেও রাস্তা-ঘাট পুকুর-পুষ্করিণী ঘর-বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিয়া সভ্যতার পরিচয় দিতে হইবে। এই সভ্যতার মধ্যে অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র গ্রাম সুখে-স্বাচ্ছন্দে-স্বাস্থ্যে উন্নত হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে।" —গ্রামসেবা।

প্রাদেশিক সম্মেলন

"গত ২২শে জুলাই, কলিকাতার ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে, ভারত সভা হলে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন সাফল্যের সহিত সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই সভার উদ্বোধন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিকে কৃতার্থ করেন। সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ৪০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুইটি হইতেছে যে, যদি মেদিনীপুর জেলা স্কুলবোর্ড তাহাদের অধীনস্থ শিক্ষকদের প্রাপ্য মে মাস পর্য্যন্ত বেতনাদি আগামী আগষ্ট মাস মধ্যে মিটাইয়া না দেন তবে তাহার প্রতিবাদ এবং জনগণের সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টি এই অবিচারের প্রতি আকর্ষণের জন্য প্রাদেশিক সমিতির নির্দ্ধারিত সেপ্টেম্বর মাসের একটি দিনে সমগ্র প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষকগণ প্রতীক ধর্ম্মঘট করিবেন। এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায্য দাবীকৃত বেতন বা ভাতা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাস মধ্যে সহানুভূতিসূচক কোনো ব্যবস্থা না করিলে, একটি বিশেষ প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ধর্ম্মঘট করার প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইবে। এই প্রস্তাব ২টিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা তথা প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবন-মরণ সমস্যা। আমরা আশা করি, এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দেশনেতাগণ এবং জনসাধারণ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং দেশ বা সমাজ প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে যাহাতে কোনো বিপদের সম্মুখে পতিত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।" —শিক্ষা ও কৃষি।

পাকিস্থানী আমন্ত্রণ

"পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাব (tension) দূর করিবার জন্য জনাব লিয়াকত আলি শ্রীনেহেরুকে করাচিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। অবশ্য এ আমন্ত্রণ সর্ত্তাধীন। পাক সীমান্তের নিকট আত্মরক্ষার জন্য ভারত যে সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছে, সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে তাহা অপসারণ করিতে হইবে। পাকিস্থানী প্রেসে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার, পাকিস্থানের পররাষ্ট্র-সচিব, পশ্চিম-পাঞ্জাবের শাসনকর্তা, পূর্ব্ব-বাংলার প্রধান মন্ত্রীর জেহাদের ইঙ্গিত, মাসাধিক কাল হইতে পশ্চিম-বাংলা ও আসাম সীমান্তে পাকিস্থানের ব্যাপক সৈন্য-স্থাপন—এ সবের কোনও উল্লেখ এই আমন্ত্রণপত্রে নাই। জনাব লিয়াকত আলির মতে এ সকলই অলীক, বাস্তব-ভিত্তিহীন, সকলই মায়া। বৃটিশ ফিল্ড-মার্শাল অকিন্‌লেক স্বাস্থ্য লাভের আশায় পূর্ব্ববঙ্গের ও ভারতের সীমান্ত পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। কাশ্মীরে যুদ্ধ-বিরতির পর কাশ্মীরে ভারত-সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস ও পাকিস্থানের সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধিতে একমাত্র ভারতেরই দুরভিসন্ধি সূচিত হইতেছে, ভারতের আক্রমণাত্মক নীতিরই প্রমাণ দিতেছে। পাকিস্থানের এই ন্যায় (logic)এর সহিত আমরা বহু দিন হইতে পরিচিত। আর পাকিস্থানের ধুয়া ধরিয়া পাক-বন্ধু ইংরাজও যে ভারতকেই দোষী প্রমাণিত করিতে সচেষ্ট হইবে তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া উহার অর্দ্ধাংশ পাকিস্থান এখন দখল করিয়া রহিয়াছে। তবুও জাতিসঙ্ঘ পাকিস্থানের পক্ষে বরাবর ওকালতি করিয়া আসিতেছেন। আওয়েন ডিক্সন একবার ভ্রমক্রমে অসতর্ক মুহূর্ত্তে পাকিস্থানকে আক্রমণকারী (aggressor) বলিয়া ফেলিয়াছেন। পাকিস্থানের ইংরাজ ও আমেরিকান বন্ধু এই উক্তি আমল দিতে চায় না। দক্ষিণ-কোরিয়া আক্রান্ত হইলে যে ইউনাইটেড ষ্টেটসের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে ৪৮ ঘণ্টাও লাগে নাই, সে ইউনাইটেড ষ্টেটস্ পাকিস্থানের কাশ্মীর আক্রমণের বেলায় নেলসনের ন্যায় কানা চক্ষুতে টেলিস্কোপ লাগাইতেছেন। জনাব লিয়াকত আলি আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে সেই আমেরিকা ও ইংরাজের প্রভাবান্বিত জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে আহ্বান করিয়াছেন। লিয়াকত আলি ও তাহার সমর্থক ইঙ্গ-আমেরিকা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট জাতিসঙ্ঘের পাকিস্থান ও ভারত কমিশনের ১৯৪৮এর আগষ্ট ও ১৯৪৯এর জানুয়ারী প্রস্তাব সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়াছে! সৈন্য অপসারণ সম্বন্ধে কমিশনের স্মারকলিপিতে প্রদত্ত নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা ভারত সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে প্রস্তুত। পাকিস্থান সৈন্যাপসারণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। জাতিসংঘ কিন্তু পাকিস্থানের দোষ-ত্রুটি দেখিতে পান না। আমেরিকার সারা বিশ্বে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনায় পাকিস্থান ও কাশ্মীরের প্রয়োজন। ভারত কোনও শক্তিসংঘে (Power Block)এ যোগ দিতে নারাজ। সেখানে ইঙ্গ-আমেরিকার স্বার্থের হানিকর কোন ব্যবস্থা যতই ন্যায়সঙ্গত ও বিধিসম্মত হউক না কেন, তাহা জাতিসংঘ মানিয়া লইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সুদূরপরাহত। জানি না, শ্রীনেহেরু জনাব লিয়াকত আলির আমন্ত্রণের কি উত্তর দিবেন। দেশবাসী তাঁহার নিকট হইতে দৃঢ়তার আশা করে। ভারত পাকিস্থান আক্রমণ করিবে না এই প্রতিশ্রুতিও পূর্ব্বেই দিয়াছে কিন্তু জনাব ত ব্ল্যাক-আউট প্রভৃতি যুদ্ধের মহড়াতেই ব্যস্ত। তাঁহার মুখে বলপ্রয়োগের দ্বারা সমস্যা সমাধানের নীতি পরিহারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আহ্বান আন্তরিকতাহীনই দেখাইতেছে। আশা করি, আমাদের গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থানের "ছেঁদো" কথায় বিভ্রান্ত না হইয়া দেশরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা অচিরে সম্পূর্ণ করিতে তৎপর হইবেন। আমরা কাহাকেও আক্রমণ করিতে চাহি না; কিন্তু আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ও যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে যেন আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকি।" —মুর্শিদাবাদ সমাচার।

জেহাদী জিগির

"কাশ্মীর-বিরোধ মীমাংসার জন্য 'উনো'-সালিশের দিল্লী-করাচী আনাগোনা ও আলোচনাদি করার প্রাক্কালে পাকিস্তানের সর্ব্বত্র সরকারী ও বেসরকারী মহল হইতে যুগপৎ লড়াই ও জেহাদের জিগির ক্রমাগত ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পাকিস্তানের সহিত আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করার অভিপ্রায় নাই, ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই কথা প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতে জনসভায় বা পত্রিকাদিতে যুদ্ধের কোন প্রকার প্ররোচনা বা আন্দোলনও নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পশ্চিম ও পূর্ব্ব-পাকিস্তানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও রণহুঙ্কার ক্ষান্ত হয় নাই। আমাদের প্রতিবেশী শ্রীহট্ট জেলার এক শ্রেণীর পাকিস্তানী সর্দারও (তন্মধ্যে দায়িত্বশীল এম, এল, এ-রা পর্য্যন্ত আছেন) শ্রীহট্টের গোবিন্দপার্কে সভায় সমবেত হইয়া জেহাদী জিগির ছাড়িতেছেন। এই জিগিরের

সারবস্তু ভারত সরকার ও পাকিস্তানী হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিযোদগার। কিন্তু ইহার ফলে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের মধ্যেই আতঙ্ক ও অসোয়াস্তি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ইহার পরিণতি কি হয় তাহা দেখিয়া এবং ঠেকিয়া শিখিয়া সেই শিক্ষা অল্প সময়ে ভুলিয়া বসা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। পাকিস্তানের এই শ্রেণীর উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উত্তেজনামূলক প্রচারে, বুদ্ধি-পরামর্শে ও হীন কার্য্যকলাপে মাত্র একটি বৎসর পূর্বে লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক সর্বস্বান্ত হইয়া আতঙ্কে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া বাস্তত্যাগী হইয়াছিল। সেই লজ্জাকর অধ্যায়ের কুখ্যাত নায়কেরা আবার কর্মতৎপর হইয়া উঠিতেছে। ইহার ভয়াবহ পরিণাম ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছি। ইহাদের এই প্রকার উগ্র প্রচারের ফলে আবার সেই পুরাতন খেলা আরম্ভ হইলে এ যাত্রা তাহার শেষ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না কি? ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক সঞ্চারিত হইয়াছে এবং স্থানত্যাগও আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীহট্ট গোবিন্দপার্কের সভায় একান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে সভাপতির ভাষণে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য ধৃত সমস্ত মুসলমানকে ছাড়িয়া দেওয়ার দাবীর ভিতর দিয়া অতি স্পষ্ট ভাবে পাকিস্তানী সর্দারদের যে জঘন্য মনোবৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক কোন গবর্ণমেণ্ট তাহা বরদাস্ত করিতে পারেন এ কথা আমরা ভাবিতে পারি না। সভ্য সমাজের শিক্ষিত নাগরিকের মুখ হইতে এই শ্রেণীর কথা বাহির হইতে পারে তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। ইহার দ্বারা কেবল পাকিস্তানী সংখ্যালঘুদের আতঙ্কিত করিয়া তোলা হইবে এমন নহে, ভারতীয় মুসলমানরাও উদ্বেগ বোধ করিবেন। নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিতাড়ন করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া দিবার অপকৌশল এবং তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে কোন শিক্ষাই ইঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই—ইহাই আশ্চর্যের বিষয়! নিরীহ লোকের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত, লাঠিবাজী, নারী-নির্য্যাতন, প্রকাশ্য রাজপথে নারীকে উলঙ্গ করিয়া কৌতুক অনুভব করা, ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়িয়া ধর্মান্তরিত করিয়া স্বধর্মের গৌরব (?) বৃদ্ধির আত্মপ্রসাদ লাভ, আর এই আণবিক যুগে বোমা-এরোপ্লেন লইয়া যান্ত্রিক যুদ্ধ যে এক জিনিষ নহে—তাহা পাকিস্তানের নেতারা মোটেই বুঝিতে পারেন না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। কাশ্মীর জয়ের আস্ফালন তাই আপাততঃ স্থগিত রাখিলে পাকিস্তানের লাভ বই লোকসান হইবে না। কারণ পূর্বে অনুসৃত অপকৌশলাদি এবার আর কার্যকরী হইবে না। দ্বিতীয় দিল্লী-চুক্তির মাধ্যমে এবার শান্তির সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা রহিবে না: অন্য পন্থার ভিতর দিয়াই সব সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের চেষ্টা করা হইবে এই কথাই আমরা মনে করি। পাকিস্তানের নেতারা কি সত্য সত্যই তাহাই চাহিতেছেন?" —যুগশক্তি।

মাদক-বর্জ্জন

"মাদক-বর্জ্জন সম্পর্কে "বরেন্দ্র-ভূমি"তে কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়ার পর স্থানীয় আবগারী কর্ত্তৃপক্ষ হইতে আরো কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী ১লা জুলাই হইতে এতদঞ্চলে মাদক-বর্জ্জন আরম্ভ করা সম্ভব হইবে না। নিয়ম-কানুন পরিবর্ত্তনরূপ কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে যে সময়ের আবশ্যক হইবে, তাহাতে আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে উক্ত আদেশ অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ২৭শে জুন তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ—আগামী স্বাধীনতা দিবস হইতে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে মাদক-বর্জ্জন আইন চালু করা হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে তাহার পূর্ব্বেই জেলা নিবারক সংস্থার (District Prohibition Board) কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই সংস্থার কার্য্য হইবে মাদক-বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচারকার্য্য, জনশিক্ষা, আবগারী দোকানের বেকার কর্ম্মচারীদের জীবিকার উপায় করা, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা, পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য এবং বে-আইনী মাদক দ্রব্য আমদানী ও তাহার ব্যবহার প্রতিরোধ। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত নির্দ্দেশাদি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, যথোপযুক্ত ডাক্তারী সার্টিফিকেট (সম্ভবতঃ সিভিল সার্জ্জনের নিকট হইতে) প্রদান করিতে পারিলে মদপায়িগণ বিলাতী মদ্য ক্রয় করিতে পারিবে। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী প্রকৃত রোগীদের নিকট সুরাসারযুক্ত (alcohol) ঔষধাদি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে। কিন্তু এই সমুদয় ঔষধ যাহাতে নেশা করার জন্য ব্যবহৃত না হয় তাহার জন্য ইহার বিক্রয়-ব্যবস্থা লাইসেন্স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। বিলাতী মদের দোকান সম্পূর্ণ তুলিয়া দেওয়া হইবে কি না, এ সম্পর্কে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ মহলে এ পর্য্যন্ত কোন নির্দ্দেশ আসে নাই। আদিবাসীদের মদ চোলাই করিতে কোন পারমিট দেওয়া হইবে না। তবে তাহাদের বিশেষ ক্রিয়া-কর্ম্মে—যেমন জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহের সময় সংযত ভাবে কিছু পচুই (প্রকৃত মদ নহে) প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। মাদক-বর্জ্জন কার্য্য যথারীতি সুরু হওয়ার পর কাহারো নিকট গাঁজা ও ভাং পাওয়া গেলে অথবা কেহ উহা বিক্রয় করিতেছে দেখা গেলে তাহাকে আইনতঃ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যদিও আয়ুর্ব্বেদীয় "মোদক" সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় নাই তবুও ইহার বিক্রয় ও ব্যবহার সুরাযুক্ত ঔষধাদির ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়াই মনে হয়। আয়ুর্ব্বেদোক্ত "মৃতসঞ্জীবনী" সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হইবে না। কিন্তু ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা হইবে। স্বাস্থ্য-বিষয়ক উপযুক্ত ডাক্তারী সার্টিফিকেট প্রদান করিলে মাত্র এক পাইণ্ট পর্য্যন্ত ইহা ক্রয় ও মজুতের অনুমতি পাওয়া যাইবে। আফিমের ব্যবহার এখনই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হইবে না। ইহা বিক্রয়ের জন্য মাত্র নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি দোকান অথবা সরকারী এজেন্সী থাকিবে। আফিম ব্যবহারকারীদের গণনা করিয়া পুঞ্জীভুক্ত করা হইবে এবং প্রত্যেককে উহা ক্রয় করিবার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া একখানা করিয়া রেজিষ্ট্রেশন কার্ড দেওয়া হইবে। প্রতি বৎসরই উক্ত পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইবে। এই ভাবে আফিমের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।" —বরেন্দ্রভূমি।

ট্রাম কোম্পানীর সহিত চুক্তি

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর সহিত ২০ বৎসরের একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। কলিকাতা

ট্রাম কোম্পানীকে জাতীয়করণ করিবার একটি প্রস্তাব পরিষদের আগামী সভায় উত্থাপিত হইবার কথা ছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ কি করিয়া ২০ বৎসরের চুক্তি সকলের অজ্ঞাতসারে সম্পাদিত হইল—তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। প্রথমত, এই সব বিলাতি কোম্পানী যে টাকা মুনাফা করিয়াছে—তাহার পরিমাণ তাহাদের মূলধন অপেক্ষা এত গুণ অধিক যে, ক্ষতিপূরণের কোন কথাই উঠিতে পারে না। আমাদের সরকার কিন্তু শুধু ক্ষতিপূরণ দিবার আশ্বাস দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই আরও ২০ বৎসর অবাধে লাভ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। কলিকাতা ও ২৪ পরগণার যানবাহন সমস্যার সমাধানের জন্য ট্রাম ও বাসকে জনসাধারণের একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, যত দিন না গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধা মত ব্যবস্থা হইতেছে, তত দিন সহরের জনসমষ্টির বিকেন্দ্রিকরণ সম্ভব হইবে না। গ্রামাঞ্চলে হাসপাতাল, শিক্ষা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত হইবে না। এবং গ্রামাঞ্চল হইতেও সহরের উপর লোকসংখ্যার চাপ আরও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য এবং সহরের উপর হইতে লোকসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্য যান-বাহনের প্রসার বিশেষ প্রয়োজন; এবং ট্রাম, বাস, রেলপথের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনার দ্বারাই ইহা সম্ভব। বিভিন্ন কোম্পানী, বিভিন্ন ব্যক্তি এবং কিছুটা সরকারের হাতে যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যান-বাহনের ভার থাকে তাহা হইলে কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন মত যান-বাহনের ব্যবস্থা করিতে হইলে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন এবং জনগণের সমবায় প্রতিষ্ঠান মারফৎই তাহা সম্ভব। কলিকাতা ও ২৪ পরগণার সমস্ত অঞ্চলের সাধারণের যাবতীয় যান-বাহনের স্বত্ব ও পরিচালনার ভার জনসাধারণের উপর অর্পণ করিলে আরও অর্থের যে প্রয়োজন হইবে তাহা প্রত্যেক নাগরিককে একটি করিয়া শেয়ার বিক্রয় করিলেই উঠিয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া বস্তুত তাহাদের যে কোন মত থাকিতে পারে—তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এই সব চুক্তি করার অধিকার সরকারের নাই। আজ যে পঞ্চায়েতের কথা তুলিয়াছি এবং দাবী করিতেছি যে, সরকার তাঁহার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে পঞ্চায়েত মারফৎ জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন—তাহার প্রয়োজনীয়তা ট্রাম কোম্পানীর সহিত এই চুক্তিতে আরও বেশী প্রতিপন্ন হইতেছে।" —চব্বিশ-পরগণার ডাক।

ভারত বিভাগের কুফল

"পূর্ব্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দু বিতাড়ন করে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাকে আয়ত্তের বাহিরে ঠেলে দেবার প্রচেষ্টা চলেছে সুচারু পরিকল্পনা অনুসারে আর ধর্ম্মনিরপেক্ষ ভারতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করছে মুসলমান সম্প্রদায়। আজ পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুরা যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থীরূপে এসে পশুর জীবন যাপন করছে তার পাশে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান অধিবাসীদের ছবি মিলিয়ে দেখলে পাকিস্তানের পরিকল্পনার জয়ই পরিলক্ষিত হয়। খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা গ্রহণ করে কংগ্রেস যে ভুলের বীজ রোপণ করেছিল আজ তা বিষবৃক্ষরূপে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ভারতকে বিপর্য্যস্ত করতে বসেছে। সে বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করবার জন্য আজ ভারতকে হতে হবে কর্ম্মতৎপর, সবল নীতির দিতে হবে পরিচয়, তোষণ নীতিকে বর্জ্জন করে বদ্ধ মুষ্টির বিপক্ষে তুলতে হবে বজ্রমুষ্টি; কোন প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ হবার পূর্ব্বে ভেবে দেখতে হবে ভারতের লাভ-অলাভের কথা। পাকিস্তান যতই জেহাদ তুলুক না কেন, তার এমন শক্তি ও সাহস নাই যে, ভারত আক্রমণ করে—এ কথা আজ প্রতি ভারতবাসীকে ভাবতে হবে। আর তাদের প্রস্তুত হতে হবে স্বদেশের মানসম্ভ্রম ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে আত্মবলিদান দেবার জন্য। মিথ্যা ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাবু হয়ে পড়বার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ভারত-সীমান্ত যদি আক্রান্ত হয়, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের নিরাপত্তা যদি ক্ষুণ্ণ হয় তা'হলে তার প্রতিবিধান করবার জন্য কোটি কোটি ভারতবাসী যে প্রস্তুত আছে আজ সেই কথা পাকিস্তানকে সমঝিয়ে দিতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন সর্ব্বদলগত বিভেদ ভুলে সকল ভারতবাসীর একযোগে কর্ম্মপ্রচেষ্টা। ভারত সরকার যদি সবল নীতির আশ্রয়ে ভারতের মর্যাদা রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় তাহলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী নিজের রক্তদানে সে মর্যাদা রক্ষার্থে যে অগ্রসর হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীনেহেরুর দৃষ্টি যেন সেদিকে পড়ে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অন্তরের কামনাকে পদদলিত করে তিনি যেন পুনরায় অমর্যাদাকর কোন নূতন চুক্তিতে পাকিস্তানের সঙ্গে আবদ্ধ না হন, এই আমাদের প্রার্থনা।"

—জনসঙ্ঘ।

শেঠ ইন্দ্রকুমার কর্ণানী

রায় বাহাদুর শেঠ সুখলাল চন্দনমল কর্ণানী ট্রাষ্টের প্রতিষ্ঠাতা, কলিকাতার তরুণ ব্যবসায়ী শেঠ ইন্দ্রকুমার কর্ণানী পশ্চিমবঙ্গ

সরকারকে সম্প্রতি ১৭ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। দানের উদ্দেশ্য—কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের উন্নয়ন; যথা—হৃদ্-চিকিৎসায়, শিশুদিগের পক্ষাঘাত চিকিৎসায় এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং সেণ্টার উন্মুক্ত করা। বর্ত্তমানে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে মাত্র ২৩৭টি বেড আছে, তৎস্থলে ৫০০ বেড করা হইবে এবং প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া তৎস্থলে দাতার পিতামহের নাম অনুসারে "রায় বাহাদুর সুখলাল কর্ণানী স্মৃতি-হাসপাতাল" নামকরণ হইবে।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

শ্রী শ্রীদুর্গা

যুগবাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে তুষ্ট কর, সকলেই তুষ্ট হবে। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।—ঠাকুর যখন দ্রৌপদীর হাঁড়ির শাক খেয়ে বল্লেন, আমি তৃপ্ত হয়েছি, তখন জগৎশুদ্ধ জীব তৃপ্ত—হেউ ঢেউ হয়েছিল। কই মুনিরা খেলে কি জগৎ তুষ্ট হয়েছিল—হেউ ঢেউ হয়েছিল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। শোনো! আলো জ্বাল্লে বাতুলে পোকার অভাব হয় না! তাঁকে লাভ কল্লে তিনি সব জোগাড় করে দেন—কোন অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয়মধ্যে এলে সেবা করবার লোক অনেক এসে জোটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেউ কেউ জ্ঞানচর্চ্চা করে বলে মনে করে, আমি কি হইছি! হয় ত একটু বেদান্ত পড়েছে। কিন্তু ঠিক জ্ঞান হলে অহঙ্কার হয় না; অর্থাৎ যদি সমাধি হয়, আর মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়, তা হ'লে আর অহঙ্কার থাকে না। সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না। সমাধি হলে তাঁর সঙ্গে এক হওয়া যায়। আর অহং থাকে না।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পঞ্চাশ

মথুর বাবু তখন বেঁচে, রামকৃষ্ণ তাঁকে এক দিন ধরে বসল : 'দেবেন ঠাকুরের বাড়ি যাব।'

মথুর বাবু অভিমানী লোক, আগু-পিছু করতে লাগলেন। আমরা কেন সেধে তার বাড়ি যাই? সে নিজে আসতে পারে না?

'ওগো, দেবেন্দ্র যে ঈশ্বরের নাম করে।'

নাম তো তুমিও করো। সে আসতে পারে না তোমার এখানে?

আমি নাম করলে কি হয়, আমার নিজের কি কোনো নাম আছে? তাঁর নাম দিয়ে নিজের নামটাকে মুছে ফেলেছি। তাঁর নামেই নিজের নামের নাশ হয়েছে। দেবেন্দ্রের কত বিদ্যে, কত ঐশ্বর্য। সে তো কলির জনক। সে এ দিক-ও দিক ছু দিক রেখে দুধের বাটি খায়। সে ভোগেও আছে যোগেও আছে। রাজত্বও করছে দাসত্বও করছে। সে একটা মহাতীর্থ। তাকে এখানে আসতে না দিয়ে আমার ওখানে যাওয়াই তো আমার লাভ। আমি অমন একটা তীর্থ করব না?

যেখানে ঈশ্বরের নাম সেখানেই আমি আছি। তাঁকে যে ডাকে সে যে আমাকেও ডাকে।

দেবেন্দ্র আর মথুর একসঙ্গে পড়তেন হিন্দু কলেজে। সেই সুবাদে যাওয়া সহজ হয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণকে।

দেবেন্দ্রনাথের তখন দেশজোড়া নাম। খৃষ্টানি থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম আর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করলেন। রাজা রামমোহন এসে বোঝালেন বেদান্ত-প্রাপ্তপাদিত ধর্মই সত্যধর্ম আর তাই প্রচার করবার জন্যে স্থাপন করলেন ব্রহ্মসভা। দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় সেই ধর্মই হয়ে দাঁড়াল ব্রাহ্মধর্ম, আর সেই সভাই হয়ে দাঁড়াল ব্রাহ্মসমাজ।

বিদেশের গুরুর কাছে গোটা দেশ যখন ধর্মে দীক্ষা নিতে যাচ্ছিল তখন রাজা রামমোহন দেখালেন তাকে তার আপন সত্যসম্পদ। সেই দেখানোর কাজে দেবেন্দ্রনাথ একটি দিব্য শিখা। ব্রহ্মকে তিনি শুধু অনুষ্ঠানে রাখেননি নিয়ে এসেছেন জীবনের অধিষ্ঠানে। তিনি প্রত্যগাত্মা। তিনি ঈশ্বরদর্শী।

দিব্যি ভুঁড়ি হয়েছে মথুর বাবুর, তবু তাঁকে চিনতে পারলেন দেবেন্দ্রনাথ। বিনয় বচনে জিগগেস করলেন, 'সঙ্গে ইনি কে?'

কথার সুরে একটি প্রসন্ন বিস্ময়। চোখের সম্মুখে হঠাৎ যেন দেখতে পেয়েছেন সুন্দরের মহামহিম প্রকাশ। একটি বিভান্বিত বিভূতি।

'এই এক জন আত্মভোলা মানুষ। ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল।' মথুর বাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

যেন শুধু এইটুকুই পরিচয় নয়। পাগল নয়, পারঙ্গম ; অনন্তগুণগম্ভীর। মানুষ নয়, লীলা-মানুষবিগ্রহ। তাকিয়ে রইলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'সংসারে থেকে তুমি ঈশ্বরে মন রেখেছ, তাই তোমাকে দেখতে এসেছি।' বললে রামকৃষ্ণ। 'তুমি জনক রাজার মত দুখানা তরোয়াল ঘোরাও, একখানা জ্ঞানের একখানা কর্মের। তুমি পাকা খেলোয়াড়।'

স্মিতশান্ত নেত্রে হাসলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'কিন্তু এ দেখায় চলবে না। দেখি তোমার গা দেখি।'

সহজ-সুন্দর মানুষটির এ অনুরোধ যেন গুহাহিত প্রত্যগাত্মার আদেশ। এ আবরণমুক্ত হওয়া মানেই ভারমুক্ত হওয়া, মালিন্যমুক্ত হওয়া। আবরণ খুলে ফেলতে পারলেই রইল না আর অহঙ্কার, রইল না আর অসন্তোষ।

গায়ের জামা খুলে ফেললেন দেবেন্দ্রনাথ।

রামকৃষ্ণ দেখল সেই "প্রলম্ববাহুঃ পৃথুতুঙ্গবক্ষঃ"কে। দেখল তাঁর গৌরবর্ণের উপর কে সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে। বুঝল ঈশ্বর স্পর্শ করেছে দেবেন্দ্রনাথকে। তাঁর মর্ত তনু ভাগবতী তনু হয়ে উঠেছে।

দেখে খুশি আর ধরে না রামকৃষ্ণের। তুমি তো তবে আমার দেশের লোক, আমার স্বজন-বান্ধব। রামকৃষ্ণ চেপে ধরল দেবেন্দ্রনাথকে। 'তবে আমাকে কিছু ঈশ্বরীয় কথা শোনাও।'

বেদ থেকে কিছু-কিছু শোনালেন দেবেন্দ্রনাথ। এই বিশ্বজগৎ প্রকাণ্ড একটা ঝাড়-লণ্ঠনের মতো। প্রত্যেকটি জীব ঝাড়-লণ্ঠনের বাতি এক-একটি। শুধু নিজেরা জ্বলছে না, সমস্ত কিছুকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

কী সর্বনাশ। আমি যে অমনি দেখেছিলুম এক দিন পঞ্চবটীতে। তোমার সঙ্গে আমার যে তা হলে মিল গো। কিন্তু বিষয়টার ব্যাখ্যা কি?

'ঝাড়-লণ্ঠন না হলে কে জানত কে দেখত এই জগৎসংসারকে?' দেবেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। 'ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন শুধু নিজেদের দেখাতে নয়, ঈশ্বরকে দেখাতে। শুধু নিজেদের গৌরব প্রচার করতে নয়, ঈশ্বরের গৌরব প্রচার করতে। মানুষ ছাড়া ঈশ্বরকে বোঝেই বা কে, বোঝায়ই বা কাকে। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব-কিছু অন্ধকার, স্বয়ং ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।'

বড় সুন্দর করে বললে তো। একই বহুধা হয়েছেন। গণনাহীন অনৈক্য দিয়ে দেখাচ্ছেন সেই একেকে। সেই সমগ্রকে। সেই অখণ্ডকে। তিনি যে অখণ্ডৈকরস।

'আমি'-র মধ্যে কিছু নেই। আমার মধ্যেই সমস্ত রয়েছে।

আলাপ করে উল্লাস হল দেবেন্দ্রনাথের। বললেন, 'আমাদের উৎসবে কিন্তু আসতে হবে।'

'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।' উদাসীন রামকৃষ্ণ।

'না, আপনি আসবেন।'

কিন্তু দেখছ তো আমার অবস্থা। আমার কাপড়-চোপড়ের আঁট নেই। কখন কি ভাবে তিনি রাখবেন তিনিই জানেন।'

'না, আসতে হবে।' দেবেন্দ্রনাথ পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন। 'শুধু একটা ধুতি আর উড়ুনি পরে আসবেন। আপনাকে এলোমেলো দেখে কেউ যদি কিছু বলে আমার কষ্ট হবে।'

'না বাপু, আমি তা পারব না। বাবু হতে পারব না আমি।'

দেবেন্দ্রনাথ শুধু অর্ধবস্ত্র উন্মোচন করেছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ মুক্তসমস্তসঙ্গ। রামকৃষ্ণ সর্ববিকার-বর্জিত। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। তার কাপড় থাকলেই বা কি, না-থাকলেই বা কি। নগ্ন বলেই তো সে পূর্ণ। চরম বলেই তো সে পরম।

কিন্তু শালীনতায় বাধল দেবেন্দ্রনাথের। পর দিন মথুর বাবুকে চিঠি লিখে পাঠালেন। একেবারে খালি-গায়ে এলে ভালো দেখাবে না। গায়ে অন্তত একখানা উড়ুনি—

ওরে, ওরা এখনো বস্তুকে দেখে, সত্যকে দেখে না। আমাকে দেখে না, আমার কাপড় দেখে। ওরে, এ যে হরির শরীর। হরির শরীরের জন্যে ক হাত কাপড় কিনবি, কোন বাজারে? হরিই জগৎ, জগৎই হরি—এর বাইরে আর শরীর কই? হরিরেব জগৎ, জগদেব হরিঃ, হরিতো জগতো ন হি ভিন্ন তনুঃ।

'দেবেন্দ্র এখনো ভোগে আছে। তাই সে ভাগেও আছে।'

আমার ভোগও নেই তাই ভাগও নেই। আমার ইয়ত্তাও নেই, পরিচ্ছেদও নেই। আমি সর্বোপাধি-শূন্য।

'কিন্তু গৃহস্থেরা কি একেবারে ডুবে যেতে পারে না?' জিগগেস করল কেশব সেন।

'তোমরা ডুবে যাবে কি গো? তোমরা একবার ডুব দেবে আবার উঠবে।' হাসল রামকৃষ্ণ।

তোমরা ঈশ্বরকোটি নও, তোমরা পানকৌটি।

'কিন্তু, কেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?'

মহর্ষি বলতে পারো, কিন্তু আসলে রাজর্ষি। রাজর্ষি জনক। সংসারে থেকেও থাকতেন অরণ্যে। অরণ্যের নির্জনতায়।

'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর? দেবেন্দ্র? দেবেন্দ্র? দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রণাম করল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তবে কি জানো, পর্যাপ্তকাম হতে হয়। এক জনের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় উদয়াস্ত পাঁঠা-বলি হত। এখন আর বলির সে ধুমধাম নেই। এক জন জিগগেস করলে, মশাই আপনার বাড়িতে

আর বলির সে ধূমধাম কই? বাবু বললে, আরে, এখন যে দাঁত পড়ে গিয়েছে।' থেমে আবার বললে রামকৃষ্ণ, 'দেবেন্দ্রনাথ খুব মানুষ। হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙছে। হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আর আঠা লাগে না।'

ওরে একবার পরশমানিককে ছুঁয়ে সোনা হ। তার পর হাজার বছর ধরে মাটিতে পোঁতা থাক, যে-সোনা সে-সোনাই থেকে যাবি।

মথুর বাবুকে আবার ডাকল রামকৃষ্ণ। বললে, 'চলো এবার আরেক তীর্থে।

সে আবার কোথায়?

দীননাথ মুখুজ্জের বাড়ি। বাগবাজারের পোলের কাছে থাকে। লোকটি বড় ভালো।

ভাল লোক হলেই তার বাড়ীতে যেতে হবে? মথুর বাবু ঝাড়া দিয়ে উঠলেন।

শুধু ভালো নয়, ভক্ত। সব সময়ে তাঁতে আছে, মন-প্রাণ সব তাঁতে গত হয়েছে। এমন লোককে আমি দেখতে যাব না? ভক্তকে দেখা তো তাঁকেই দেখা।

তুনিয়ার অলিতে-গলিতে কত এমন ভক্ত আছে। তাই বলে সবাইকার বাড়ি-বাড়ি ধাওয়া করতে হবে না কি?

আমাকে সে সব অলি-গলির ঠিকানা এনে দাও। আমি জনে-জনে গিয়ে প্রণাম করে আসব। ভক্ত হচ্ছে ভগবানের বৈঠকখানা। সেখানেই তিনি বিশেষরূপে প্রকাশিত। বিশেষরূপে তরঙ্গায়িত, তরলীকৃত। বৈঠকখানাতেই তো বাবু আছেন খুশমেজাজে, দিলদরিয়া হয়ে। মজা ওড়াবার মজলিশ চালাচ্ছেন চব্বিশ ঘণ্টা। আমাকে সেই আখড়ার আড্ডাধারী করে দাও।

ভক্ত ছাড়া তীর্থ নেই মহীতলে। ষোল টাকার পয়সা এক কাঁড়ি, কিন্তু ষোলটি টাকা যখন একত্র করো তখন আর কাঁড়ি দেখায় না। ষোল টাকার বদলে যদি একটি মোহর করো তখন আরো কত ছোট হয়ে গেল। আবার সেটির বদলে যদি এক কণা হীরে করো, তা হলে লোকে টেরই পায় না।

ভক্ত ছোট্টটি হয়ে আছে। শুধু ঈশ্বরের নামটি ধরে বসে আছে। তীর্থ ভ্রমণ, গঙ্গার মালা ভেক-আচার কিছু নেয় না, শুধু ভক্তি নিয়ে পড়ে থাকে। ভার নেয় না সার নেয়। জীবনে শুধু একখানি দলিল লিখে চুকিয়ে দেয় লেখা-পড়া। সে দলিল উইল বা দানপত্র নয়, নয় কোনো বন্ধক-তমশুক, শুধু একখানি আমমোক্তারি! ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোক্তারি দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বসে থাকে। সে আমমোক্তারি বিশ্বাসের খাতায় রেজেষ্টারি করা। রদ-রহিত নেই কোনো কালে।

তাঁর নাম আর তিনি তো অভেদ। যা রাম তাই নাম! তেমনি যা ভগবান তাই ভক্ত।

মথুর বাবু গাড়ি নিয়ে এলেন। তীর্থ দর্শনে বেরুল রামকৃষ্ণ।

সেদিন দীননাথের বাড়িতে দীননাথের এক ছেলের পৈতে হচ্ছে। বাড়িটি ছোট, কিন্তু হৈ-চৈ প্রচণ্ড। তার উপর কে এক জন বড়লোক এসেছে ল্যাণ্ডো করে, তাকে নিয়ে দীননাথের ঘরগুষ্টি ভীষণ ব্যস্ত। এমন সময় এদের দেখে ওদের অপ্রস্তুত অবস্থা। কোথায় বসায় এই অনাহূতকে? নিমন্ত্রণ না করলেও যে চলে আসে পথ চিনে, প্রার্থনার অপেক্ষা না করে? কোথায় বসাই? ঘরে যে অনেক জিনিস, অনেক আসবাব, সেখানে জায়গা কোথায়?

পাশের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন মথুর বাবু, ওপাশ থেকে কে ঝাঁজিয়ে উঠল: 'ও-ঘরে হবে না, ও-ঘরে সব মেয়েরা আছেন।'

মহা অপ্রস্তুত। জায়গা হল না রামকৃষ্ণের। তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন মথুর বাবু।

'কেমন? দেখলে?' চটে গিয়েছেন মথুর বাবু।

রামকৃষ্ণ হাসতে লাগল। বললে, 'কেন, দীননাথকেই দেখলাম। তিনি দীননাথ তিনি কি আমাকে ফাঁকি দিতে পারেন!'

'আর বোলো না। বসতে জায়গা দিল ঘরে?'

'ঘরে জায়গা না দিক, হৃদয়ে দিয়েছে।'

'তোমার কথা আর শুনব না। তোমার সঙ্গে যাব না আর কোথাও।' তবু রাগ যায় না মথুর বাবুর। 'তোমাকে যারা স্থান না দেয়—'

'আমাকে স্থান না দিলে স্থান কোথায় আর সংসারে?' দীননাথের মতই হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ।

তুমি, মথুর বাবু, তুমি আর নেই। তবে আমাকে এখন বেলঘরের বাগানে কেশব সেনের কাছে কে নিয়ে যাবে?

আমি আছি—এগিয়ে এল কাপ্তেন। সঙ্গে সর্বত্রগ হৃদয়।

কিন্তু গাড়ি ?

গাড়ি আমি দেব। কাপ্তেন বললে।

কাপ্তেনের সঙ্গে তার গাড়িতে চড়ে চলল রামকৃষ্ণ। চলল মাইল দুই দূরে বেলঘরে জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে। সেখানেই কেশব এসেছে। ভক্তদল নিয়ে মেতেছে সাধন-ভজনে। চল হরিকথা শুনে আসি। মা হাতছানি দিয়ে ডাকছেন সেখানে।

রামকৃষ্ণের পরনে শুধু লালপেড়ে একটি ধুতি। কোঁচার খুঁটটি বাঁ-কাঁধের উপর ফেলা। কালো বানিস-করা চটি পায়ে।

চলেছে জ্ঞানীগুণীদের মজলিশে। যেখানে হরিগুণগান, সেখানে গুণই বা কি, আর জ্ঞানই বা কি।

একান্ন

দেবেন্দ্রনাথের ডান হাত কেশব সেন।

চমৎকার চেহারা। সৌম্য, প্রশান্ত ওজঃপূর্ণ। মুখশ্রীতে ঈশ্বরবিশ্বাসের লাবণ্য মাখানো। কণ্ঠস্বরে যেমন ভক্তির মধুরতা তেমনি প্রতিজ্ঞার তেজ। দার্ঢ্য আর দীপ্তির সমাহার। বাগ্‌বজ্রে বংশীধ্বনি।

চমৎকার বক্তৃতা দেয় কেশব। যেমন ইংরিজি তেমনি বাঙলা। প্রথম-প্রথম ইংরিজি, শেষ দিকে কেবল বাঙলা। সে বক্তৃতার কী বর্ণচ্ছটা। কী বিন্যাসচাতুর্য। যে শোনে সেই তন্ময় হয়। সত্য পথের ধ্রুব জ্যোতিটি চোখের সামনে জ্বলতে দেখে।

দেশ তখন ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে মদে, খৃষ্টানিতে, ইংরিজিয়ানায়। উচ্ছন্নে যাবার জন্যে পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে চার দিকে। ছুটতে বা পারছে কই, নর্দমায় টলে পড়ছে।

কাঁচা নর্দমার পাঁকের মধ্যে সার সার শুয়ে আছে মাতালেরা। ধাঙড়দের ঝোড়াগুলোকে মাথার বালিশ করেছে। যেন একেক জন কত বড় বাহাদুর। পাহারাওয়ালা এলে বলছে, 'এ বাবা' নর্দমায়, মিউনিসিপ্যালিটিতে আছি, পুলিশ জুরিসডিকশানের বাইরে। টিকিটিও ধরতে পাবে না।'

"সধবার একাদশী"র নিমচাঁদ বলে, সে কালে ভূতে পেতো, এ কালে আমাদের মদে পেয়েছে। ভ্রান্তির নাম বোতলচারুহাসিনী। আমি তাকে ছাড়তে পারি কিন্তু সে আমাকে ছাড়ে কই ? যদি "রাইম" করতে চাও তো মদ খাও।

সে যুগে মদ না খাওয়া মানে শিক্ষিত বলে কল্‌কে না পাওয়া। যে-কলেজ থেকে বেরিয়েছে পাশ করে তার নাম ডোবানো। স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষের ভাগ্নে গ্রাজুয়েট হয়েছে কিন্তু মদ খায় না। ঘোষ মশায় দুঃখ করে তাকে বলছেন, 'তুই মদ খেতে শিখলি না, তোকে আমি সমাজে বার করি কি করে ?'

প্যারীচরণ সরকার "সুরাপাননিবারণী সভা" স্থাপন করলেন। মদিরার স্রোত তবু বন্ধ হয় না। নিমে দত্ত বলছে, ও সভা যদি ত্বরায় না নিপাত হয় আমি নিপাত হব। বড়মানষের ছেলে-ব্যাটারা এক-একটি করে সভ্য হবে আর আমি ধেনো খেয়ে মরব এ হতে দেব না। এক ব্যাটা বড়মানষের ছেলে মদ ধরলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়—

গিরিশ ঘোষ মদ খায়। তা নইলে না কি তার নেশা হয় না।

ঠাকুর বলেন, 'খা না—কত খাবি ? কত দিন খাবি ? শেষে যখন তোকে সে-নেশা ভগবৎ-নেশায় পেয়ে বসবে তখন মদ কোথায় পড়ে থাকবে টেরও পাবি না।'

সে-নেশা মদের চেয়েও দুর্মদ। সে-নেশাই সর্বনাশের নেশা।

তা ছাড়া, আরেক লক্ষণ, শিক্ষিত সমাজ সদলবলে সাহেবিয়ানার মোসাহেবি সুরু করে দিয়েছে। গায়ে বিলিতি খেলাত, মুখে বিলিতি বুকনি। যা কিছু ইংরেজি, যেমন কিছু সাহেবি তাই ওঠ-বোস মন্ত্র করো। ইংরেজের পায়ে দেশ বিকিয়ে দিয়েছ, ভাব-ভাষাও বিলিয়ে দাও।

নিমে দত্ত বলছে, I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English.

সেইখানে ঠাকুর এলেন খাঁটি দিশি বাঙলার জয়ধ্বজা উড়িয়ে। বললেন, 'চার দিকে বড় গোলমাল। কিন্তু গোলমালেও মাল আছে। গোল ছেড়ে মালটি নেবে।'

ঠাকুর যেমন আপনি অকপট তেমনি ভাষাও অকপট।

বললেন, 'তিনটে "স" হয়েছে কেন বলতে পারিস? শ, ষ, স—এই তিন "স" কেন? এই তিন "স"-র মানে হচ্ছে, স, স, স। মানে সহ্য কর্, সহ্য কর্, সহ্য কর্। যে কোনো কাজে হাত দিস, বসিস যে কোনো সাধনায়, সহ্য করতে হবে। সহ্য না করলে সিদ্ধি নেই। এই সওয়ার বা সহ্য করার উপরে জোর দেবার জন্যেই তিনটে "স" হয়েছে।' বলেই একটি ছন্দ গাঁথলেন: 'সে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।'

আগে লোকে বলত, উপমা কালিদাসস্য, এখন দেখছে, উপমা রামকৃষ্ণস্য।

তার পর পোশাকটি দেখ।

এক দিকে চাঁদনির সাহেব আরেক দিকে বাগবাজারের বাবু।

বাবুর বর্ণনা দিচ্ছে নিমচাঁদ। ভোলাচাঁদকে দেখে বলছে, "তুমি যে বাবু সেজে বাহার দিয়ে এসেছ। মাথার মাঝখানে সিঁতে, গায় নিমুর হাফ-চাপকান, গলায় বিলাতী ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগর-পেড়ে ধুতি পরা, গরমি কালে হোল্ মোজা পায়, তাতে আবার ফুল-কাটা গার্টার, জুতোয় ফিতের বদলে রুপার বগলস, হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আঙুলে দুটি আংটি—"

ভোলাচাঁদ ইংরেজিতে বলছে, 'ফাদার ইনলা গিভ সার—ইউ মাই ফাদার ইনলা সার—"

আর রামকৃষ্ণের পরনে লালপেড়ে ধুতি, গায়ে বড় জোর একটি মার্কিনের জামা, পায়ে কালো-বার্নিশ-করা চটি, বড় জোর কখনো ক্বচিৎ হাফ-মোজা।

মণি মল্লিককে বললেন, 'গোটা দু-এক মার্কিনের জামা দিও। সকলের জামা তো পরি না। কাপ্তেনকে বলব মনে করেছিলাম, তা তুমিই দিও।'

মণি বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। কৃতার্থের মত বললে, 'যে আজ্ঞে।'

কিন্তু ঠাকুর যখন ভদ্রলোক ছেড়ে ভাবলোকে আসেন তখন তিনি একেবারে দিগম্বর!

তখন তিনি মঙ্গলায়তন হরি। তখন তিনি সকলেশ্বর। তাঁর ললাটফলকে কস্তুরীতিলক, বক্ষস্থলে কৌস্তুভ, নাসাগ্রে নবমৌক্তিক, করতলে বেণু, সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দন। তিনি অহেতুক-দয়ানিধি।

তখনকার দিনের লোকেরা প্রণাম করে না। প্রণাম করাকে কুসংস্কার বলে। প্রণাম না করে বলে, গুড মর্ণিং। বলবার সময় তর্জনীটা একবার একটু কপালে ঠেকায়। ঘাড়টা মোটা করে রাখে, কারু কাছে মাথা নোয়ায় না। মাথা নোয়ালেই যেন মানটি খোয়া যাবে।

ওরে, মাথা নত কর। যেখানে যেটুকু গুণ দেখছিস সেখানেই তো ঈশ্বরকে দেখছিস। ঈশ্বর যে গুণগুরু। গুণাতীত হয়েও তিনি যে গুণবর্ধক। সে গুণের কাছে মাথা নোয়া। ঈশ্বরকে স্বীকার করলেই তো নিজেকে মান দিলি। যার এই মান সম্বন্ধে হুঁস আছে সেই তো মানুষ। যে বোঝে সে অনৃতের সন্তান নয়, অমৃতের সন্তান, সেই তো যথার্থ মানী।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির মানে প্রণাম শেখার পাঠশালা।

বাগবাজারে বোসপাড়া গলির মোড়ে বসে আছে গিরিশ ঘোষ, ঠাকুর গাড়ি করে যাচ্ছেন সেখান দিয়ে। গিরিশকে দেখেই ঠাকুর প্রথমে প্রণাম করলেন। প্রণাম ফিরিয়ে দিল গিরিশ। ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন তক্ষুনি। যতবার গিরিশ প্রণাম ফেরায় ততবার ঠাকুর আগ বাড়িয়ে নতুন আরেকটা প্রণাম করে বসেন। কাঁহাতক চালানো যায় এই প্রণামের প্রতিযোগিতা? ক্ষান্ত হল গিরিশ ঘোষ। কিন্তু প্রণামে ঠাকুরের নিবৃত্তি নেই। গিরিশের থামবার পরেও আরেক বার প্রণাম করলেন ঠাকুর।

গিরিশ ঘোষ বললে, 'দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনটার সঙ্গে প্রণামে আর টক্কর দেওয়া চলে না। ওর ঘাড় ব্যথা হয় না কিছুতে।'

ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করছেন আর বলছেন, 'ভাগবতভক্ত ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদীর চরণে প্রণাম, নিরাকার-বাদীর চরণে প্রণাম। সর্বতীর্থময় হরি। সর্বভূতে, সর্বজীবে প্রণাম।'

গিরিশ ঘোষ বলে, 'রাম অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগৎজয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে জগৎজয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে, আর রামকৃষ্ণ অবতারে জগৎজয় হবে প্রণাম-মন্ত্রে।'

নাম করো আর প্রণাম করো। প্রকৃষ্টরূপে ...মই তো প্রণাম।

আরেক হাওয়া চলছিল সে যুগে—খৃষ্টানির ...ওয়া। যেহেতু ইংরেজের ধর্ম, সেহেতু আর কথা ...ই, মেতে যাও। হিন্দুধর্ম মানে পুতুল পুজো, ...ফ ছেলেখেলা। শিক্ষার আলোতে এসে ও সব ...সংস্কার মানতে কেউ রাজি নয়।

গীতা-উপনিষদের কেউ নাম শোনেনি। চণ্ডী? সে আবার কি মাথামুণ্ডু? চৈতন্যদেবের বাড়ি কোথায় তা কে জানে? ভাগবত? ও তো 'কথকের কথা'। সে যুগে কথকের কথা মানে আষাঢ়ে গল্প। যদি কেউ কিছু আজগুবি কথা বলে, ভদ্রলোকেরা অমনি বলে বসে—এ কথকের কথা। ভদ্রলোকেরা শোনে না কথকতা। তার চেয়ে গাঁজায় দম দেওয়া ভালো।

তবে তোমরা পড় কি?

পাদরিরা বাড়ি-বাড়ি বাইবেল দিয়ে গেছে, তাই পড়ি এক আধটু। ইংরেজিতে লেখা, বেশ বোঝা যায় সহজে।

দেশের কতগুলো মাথাল লোক খৃষ্টান হয়ে গেল। দেখাদেখি আরো অনেকে। যেন একটা হুজুগ পড়ে গেল। গা ভাসিয়ে দিল গড্ডলিকায়।

বাঙালি পাদরির দল বেরুল গলির মোড়ে, হেদোর ধারে, কেষ্ট বন্দ্যোর গির্জের কোণে। কালাপাহাড় মুসলমান হয়েছিল, এরা হল শাদা-পাহাড়। এদের ধর্মের মধ্যে কর্ম শুধু হিন্দু দেবদেবীকে গাল পাড়া। সব চেয়ে ঝাল বেশি কালী আর কৃষ্ণের উপর। কালী ন্যাংটা আর কৃষ্ণ ননীচোর।

শ্রোতার দল মেতে ওঠে। এক কথায় বাপ-...পিতেমোর ধর্মকে নাকচ করে দেয়।

হিন্দুধর্ম একটা কুসংস্কার। ছত্রিশ রকম জাত ...ানে। স্ত্রীলোকে আর বাসন-কোসনে তফাৎ ...াখে না। পাল্কিতে বসিয়ে পাল্কি-শুদ্ধু জলে ...বিয়ে গঙ্গাস্নান করায় মেয়েদের। যিনি অনন্ত ...াকে কি না নিয়ে এসেছে ঘটে-পটে, মাটির ডেলায়। ...ার দেবতাও একটি-দুটি নয়, তেত্রিশ কোটি।

অত হিসেব সামলাতে পারব না। পাদরির ...থাই ঠিক। ঈশ্বর এক আর নিরাকার। আর ...শ্বরের অবতার যীশুখৃষ্টই একমাত্র সমুদ্ধর্তা।

গির্জের খাতায় নাম লেখাতে লাগল দলে-দলে। যেহেতু খৃষ্টান হলাম সেহেতু সাহেব হয়ে গেলাম। তাই নিয়ে এসো মদ, নিয়ে এসো নিষিদ্ধ মাংস।

একেই বলেছে, "জাত মাল্লে পাদরি এসে, প্যাট মাল্লে নীল বাঁদরে।"

এখন এর উপায় কি? সব যে যায়!

রামমোহন নিয়ে এলেন বেদান্তের বাণী, দেবেন ঠাকুর তাকে সংহত করলেন ব্রাহ্মধর্মে। আর কেশব লেগে গেল প্রচারণায়। বক্তৃতা দিয়ে ফিরতে লাগল। শুধু বক্তৃতা নয়, বার করল একাধিক পত্রিকা।

উন্মার্গগামীরা একটু থমকে দাঁড়াল।

খৃষ্টধর্ম আর হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা আপোষ ঘটাল কেশব সেন। মূর্তি দূর করে দাও, নিয়ে থাকো ভক্তির ভাবটি। যীশুবিহীন যীশুর ধর্ম গ্রহণ করো। তুলে দাও জাতিভেদ আর যদি দেশের মুক্তি আত্মার মুক্তি চাও, মুক্তি দাও স্ত্রীজাতিকে।

বেশ ভাব। ইংরেজের ধর্ম খৃষ্টানিও আছে, বাপ-পিতেমোর ধর্ম হিঁদুয়ানিও আছে। চলো ব্রাহ্মসমাজে গিয়েই নাম লেখাই।

কেনারাম ডেপুটিকে জিগগেস করছে নিমচাঁদ: "তুমি তো ব্রাহ্ম হয়েছ, হিন্দুশাস্ত্রের তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করেছ, না, দুটি-একটি রেখেছ, সাত দোহাই তোমার, যথার্থ করে বলো—"

কেনারাম বললে, "আমি কেতাব না দেখে উত্তর দিতে পারি না। আপনি ভারি শক্ত প্রশ্ন করেছেন—"

"দূর ব্যাটা ঘটিরাম," নিমচাঁদ ঝাঁজিয়ে উঠল: "তুমি ব্রাহ্মধর্ম যত বুঝেছ তা এক আঁচড়ে জানা গিয়েছে। যখন ব্রাহ্মধর্মের সর্ত হচ্ছে একমেবা-দ্বিতীয়ম্, তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করিচিস কি না, বলতে কতক্ষণ লাগে?"

কেনারাম চিন্তিত মুখে বললে, "একটি-আধটি ঠাকুর হলে খপ করে বলা যায়, তেত্রিশ কোটির কথা ঝাঁ করে বলা যায় না—জানি কি, যদি দুটো-একটা রাখবার মত হয়!"

ব্রাহ্মধর্ম বুঝুক আর না বুঝুক, লোক তো আগে ফিরুক পাদরিদের খপ্পর থেকে। হুজুগটা তো বন্ধ হোক।

কেশবের বাগ্মিতায় আর ধর্মসাধনায় বিশ্বাস

ফিরে এল উদ্‌ভ্রান্তদের। ঝাড়াই-বাছাই করে যদি দেশের মাঠেই পাই তবে কেন আর যাই বিদেশের মাটিতে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখলেই তো শুধু চলবে না, নিতে হবে নীতি আর পবিত্রতার পাঠ, সত্যনিষ্ঠা আর পরোপকারের ব্রত। "ব্যাণ্ড অফ হোপ" নামে এক দল খুলল কেশব। মদ-তামাক খাব না। ছোঁব না নিষিদ্ধ মাংস।

নিমচাঁদকে শাসালো রামধন: "তুমি বসো, আমি তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করে আসছি।"

নিমে বললে, "ব্রাহ্মমতে কোরো বাবা। অনেক বৃষ পার করেছি, এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভালো লাগবে না।"

এর পর আবার আরেক দল উঠল যারা ঠাকুর-দেবতাও মানে না নিরাকার ব্রহ্মও বোঝে না। তারা নাস্তিক, সংশয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। কোনটা যে ধরবে ঠিক করতে পারছে না। হাল ছাড়া নৌকোর মতো দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরেক দল উঠল, যারা প্রত্যক্ষবাদী। ধর্ম-টর্ম ধার ধারে না, ইন্দ্রিয়ের বাইরে জানে না আর কোনো অনুভূতির অস্তিত্ব।

চার দিকে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, একটা ঝোড়ো হাওয়ার এলোমেলো ধুলো।

এমন সময় ঠাকুর এলেন। সনাতন ধর্মের শাশ্বত জ্যোতির স্নিগ্ধতা নিয়ে, বিশ্ববিস্তীর্ণ উদার উন্মুক্তি নিয়ে। হিন্দুধর্মের উজ্জ্বলন্ত প্রতীক হয়ে, নির্গলিত ভাষ্য হয়ে। নিয়ে এলেন শান্তি, সাম্য, সামঞ্জস্য। নিয়ে এলেন সঙ্গতি, সংহতি, সমন্বয়। খণ্ডের ঘরে ক্ষুদ্রের ঘরে রইলেন না, এলেন একেবারে ভুবনজোড়া আসন মেলে।

নিয়ে এলেন সত্য, শৌচ, দয়া, শান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ আর আর্জব। শম দম তপ সাম্য তিতিক্ষা শ্রুত আর উপরতি। নিয়ে এলেন প্রেম। প্রেমের অমোঘ মহিমা।

ভগবান ভূতভাবন হিন্দুধর্মের মন্ত্রাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন দক্ষিণেশ্বরে। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত—। হতপ্রভ সূর্য উদ্দীপিত হল। ঠাকুর মৃতদেহে নিশ্বাস সঞ্চার করলেন। ক্রমে-ক্রমে সঞ্চার করলেন আশ্বাস। তার পর সকলে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে-ভেসে চলল। ভেসে চলল সেই অমৃতের সমুদ্রে।

দক্ষিণেশ্বরের দুর্গম অরণ্যে সরল একটি ফুল ফুটেছে। কিন্তু লোকে তার গন্ধটির খবর পাবে কি করে? ফুল তো ফুটলেই চলে না, চাই গন্ধবহ সমীরণ। যে বলবে, দেখ, কেমন ফুল ফুটেছে আর, শোনো, আমার সঙ্গ ধরো, দেখবে চলো কোথায় ফুটেছে এ ফুল! আমি নিয়ে এসেছি সেই কাননের ঠিকানা।

কেশব সেনই সেই গন্ধবহ সমীরণ।

বাগান

কেশব সেনকে রামকৃষ্ণ প্রথম দেখে আদি সমাজে, সে অনেক আগে। মসজিদ ঘুরে, গির্জে ঘুরে গিয়েছিল এক দিন ব্রাহ্মসভায়। গিয়ে দেখে বেদীর উপর চার পাশে অনেক লোক, মাঝখানে কেশব। ধ্যান করছে চোখ বুজে।

'জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম, তাকের উপর ক জন বসেছে, কেশব মাঝখানে। দেখলাম যেন কাষ্ঠবৎ। সেজ বাবুকে বললাম, যত জন ধ্যান করছে তার মধ্যে ঐ কেশব ছোকরারই ফাতনা ডুবেছে। ও কি যে সে ছেলে? লেখাপড়া নেই, বাপের ধার মেনে নিলে এক কথায়। অন্য ছেলে হলে মানত?'

কিন্তু চোখ বুজেই বা ধ্যান করতে হবে কেন? চোখ চেয়েও ধ্যান হয়। কথা কইছে তবু ধ্যান। যেমন ধরো দাঁতের ব্যথা। সব কাজ করছে কিন্তু মন রয়েছে দরদের দিকে। চোখ চেয়ে আছে, কথা কইছে, কাজ করছে, কিন্তু মন রয়েছে ভগবানে বিদ্ধ হয়ে। তিনিও আমাকে চান, আমিও তাঁকে চাই, তবু ধরতে পারছি না, মিলতে পারছি না—এ কি কম যন্ত্রণা?

এবার শুধু দূর থেকে দেখা নয়, কাছে এসে বসা, আলাপ করা, অন্তরের অঙ্গ হয়ে যাওয়া।

তার আগে কেশবকে এক দিন স্বপ্নে দেখেছিল রামকৃষ্ণ। মা-ই দেখিয়েছিলেন। কেশব যেন পেখম-মেলা ময়ূর, ময়ূরের মাথায় মুক্তো। মা-ই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পেখম হচ্ছে কেশবের শিষ্য-মণ্ডল আর মুক্তোটি হচ্ছে তার রাজসিকতার দীপ্তি।

সকাল বেলার দিকে কেশব তার শিষ্যবৃন্দ নিয়ে পুকুরের বাঁধাঘাটে বসে আছে, হৃদয় আস্তে-আস্তে কাছে এল। বললে, 'আমার মামা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

কে আপনার মামা ?

ঐ দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। হরিকথা শুনতে বড় ভালোবাসেন। সারা দিনরাত ডুবে আছেন এই হরিকথায়। যেখানে হরিনাম পান হরিভক্ত পান সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হন। হরিগুণগান শুনে তাঁর ভাবসমাধি হয়। আপনি এখানে হরিনাম করতে এসেছেন জেনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

'কোথায় তিনি ?'

'গাড়িতে বসে আছেন।'

'নিয়ে আসুন নামিয়ে।' কেশব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

হৃদয় গিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল রামকৃষ্ণকে। সবাই রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। দেখে হতাশ হবার ভাব করল। ও! এই ? এ তো এক জন সাধারণ লোক। আজে-বাজে পাঁচ জনেরই এক জন।

রামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছে কোন জন কেশব। বুকের ভিতরে তারে-তারে সুর বেজে উঠল।

কেশবের কাছে আসবার আগে নারায়ণ শাস্ত্রীকে পাঠিয়েছিল একবার রামকৃষ্ণ। বলেছিল, তুমি একবার যাও, গিয়ে দেখে এস তো কেমন লোক। নারায়ণ দেখে এসে বলেছিল লোকটা জপে সিদ্ধ।

রামকৃষ্ণ কেশবের কাছটিতে চলে এল। বললে, 'বাবু, তোমাদের কাছে ঈশ্বরের কথা শুনতে এসেছি। তোমরা না কি দেখেছ ঈশ্বরকে ? সে কেমনতরো দর্শন আমাকে একটু বলবে ?'

কেশব তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণের দিকে। এ সে কী দেখছে ? কাকে দেখছে ?

বললে, 'আপনি বলুন—'

আমি বলব ? গলা ছেড়ে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

"কে জানে কালী কেমন,
ষড়দর্শনে না পায় দরশন,
মূলাধারে সহস্রারে
সদাযোগী করে মনন।
ঘটে ঘটে বিরাজ করেন
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড
প্রকাণ্ড তা জান কেমন,
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম,
অন্য কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে
সন্তরণে সিন্ধু তরণ॥"

গাইতে-গাইতে রামকৃষ্ণের সমাধি হয়ে গেল। উপস্থিত সকলে ভাবলে এ বুঝি একটা ঢং, মস্তিষ্কের বিকার। কিংবা হয়তো লোকটার মৃগী আছে।

রামকৃষ্ণের কানে হৃদয় প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। হরি ওঁ। হরি ওঁ। হরি ওঁ।

ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণের মুখ প্রসন্ন পবিত্র হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যে আস্বাদন করে এসেছে, অবগাহন করে এসেছে এ তার মুখ। এ মুখ উপলব্ধির, সমাপত্তির। জ্ঞানানন্দ, বোধানন্দ আর মিলনানন্দের সংমিশ্রণ।

এ মুখের বিভা দেখে অভিভূত হয়ে গেল সকলে।

অন্ধেরা হাতী দেখে এল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। এক জনের হাত পড়েছিল পায়ে, সে বললে, হাতী ঠিক থামের মতো। আরেক জনের হাত পড়েছিল পেটে, সে বললে, জলের জালার মতো। দূর, কুলোর মতো—কানে হাত রেখেছিল যে তৃতীয় জন, সে বললে।

"ভাবলে ভাবের উদয় হয়।
যেমনি ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়।"

গাছে এক গিরগিটি থাকে। এক জন তাকে দেখে এসে বললে, একটা সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখলাম। আরেক জন বললে, ভুল দেখেছিস, লাল নয় নীল। তোরা তো খুব জানিস! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি আজ সকালে, বিলকুল হলদে। বললে তৃতীয় জন। কাকে যে তোরা কী রঙ বলিস কিছু ঠিক নেই। বিদ্রূপ করে হেসে উঠল চতুর্থ জন। স্রেফ সবুজ, একেবারে কচু পাতার রঙ। মহাবিরোধ উপস্থিত। সবাই মিলে চলল সেই গাছের নিচে। গিয়ে দেখে এক জন লোক বসে আছে সেখানে। তাকে সবাই ধরল। আপনি তো এখানকার বাসিন্দা, বলুন জানোয়ার-টার কী রঙ ? যে যেমন দেখ তেমনি। তোমাদের সকলের কথাই ঠিক, ও কখনো লাল কখনো

নীল কখনো হলদে কখনো সবুজ। ওটা বহুরূপী। আবার কখনো-কখনো দেখা যাবে ওটার একদম রঙ নেই। ওটা বর্ণহীন, নির্গুণ।

সবাই তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল রামকৃষ্ণকে।

ভক্ত যে রূপটি ভালোবাসে ভগবান সেই রূপটি ধরে দেখা দেন। এক জনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে আসত তার কাছে কাপড় রঙ করবার জন্যে। যে যে-রঙ চায় তার কাপড় সেই রঙে ছুপিয়ে দিত। এক জন দেখছিল এই আশ্চর্য ব্যাপার। তাকে রঙওয়ালা জিগগেস করলে, তোমার কী রঙ চাই? সে বললে, 'ভাই যে রঙে রঙেছ আমায় সেই রঙ দাও।'

কী গভীর কথা কেমন সরস করে বলছে রামকৃষ্ণ। স্নানাহারের বেলা হয়ে গেল তবু কারু ওঠবার নাম নেই।

নিরাকার জ্ঞানের সাধন, সাকার ভক্তির। ভক্তির কাছে নিরাকার এনো না, কিছু দেখতে না পেলে ধরতে না পেলে তার ভক্তির হানি হবে। সাকার থেকে চলে আসবে সে নিরাকারে। আগে হয়তো দশভুজা নিলে—সে মূর্তিতে বেশি ঐশ্বর্য। তার পর চতুর্ভুজ। তার পর দ্বিভুজ। তার পর গোপাল—বালগোপাল। ঐশ্বর্যের বালাই নেই, কেবল একটি কচি ছেলের মূর্তি। তার পরে আরো ছোট হয়ে গেল—একটি শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম। তার পর? আর দরকার নেই রূপে। প্রতীক তখন প্রত্যক্ষের বাইরে। তখন মহাব্যোমে একটি অখণ্ড জ্যোতি। সেই জ্যোতি দর্শন করেই লয়।

কিন্তু, তার পর? ধ্যান যখন ভাঙবে? জ্ঞানের পর কোথায় এসে দাঁড়াবে? দাঁড়াবে এসে প্রেমে। তখন আবার সাকারে চলে আসবে। তখন দেখবে সমস্ত জীব ঈশ্বরের প্রতিভাস। জীবের আকারে ব্রহ্ম বিচরণ করছেন। তখন ব্রহ্মোপাসনা মানে জীবোপাসনা। আর জীবে যা প্রেম ঈশ্বরে তাই ভক্তি। আর, ভক্তির প্রগাঢ় পরিপক্ক অবস্থাই প্রেম।

উপাসনার ঘণ্টা বাজল। এখন উঠতে হয় এই আড্ডা ছেড়ে।

কে ওঠে! কোথায় আবার উপাসনা! ভগবানের কাছটিতে বসাই তো উপাসনা। এ কি আমরা ভগবানের কাছটিতে বসে নেই?

বেদান্তের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কী স্বরূপ কেউ বলতে পারে না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি সত্য ততক্ষণ জগৎও সত্য। ঈশ্বরের নানা রূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

দুই-ই সত্য। নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য। কবীর বলত, নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা। তুমি কাকে ছেড়ে কাকে রাখবে?

নানা রকম পূজা তিনিই আয়োজন করেছেন, অধিকারী ভেদে। যার যেমন পেটে সয় তেমনিই তো পরিবেশন করবেন। বাড়িতে যদি বড় মাছ আসে, মা নানা রকম মাছের তরকারি রাঁধেন—যার যেটি মুখে রোচে। কারু জন্যে মাছের টক, কারু জন্যে মাছের চচ্চড়ি. কারু জন্যে মাছ ভাজা। যেটি যার ভালো লাগে, যেটি যার পেটে সয়। সর্বত্রই সেই মৎস্যস্বাদ।

আমাদের হলধারী দিনে সাকারে আর রাতে নিরাকারে থাকত। তা যে ভাবেই থাকো, ঠিক ঠিক বিশ্বাস হলেই হল। বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। গুরু বলে দিয়েছে, রামই সব হয়েছেন—'ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা।' কুকুর এসে রুটি খেয়ে যাচ্ছে। ভক্ত বলছে, 'রাম! দাঁড়াও, দাঁড়াও, রুটিতে ঘি মেখে দিই।' গুরুবাক্যে এমনি বিশ্বাস!

কিন্তু যাই বলো, সাকারই বলো নিরাকারই বলো, তিনি রয়েছেন এই খোলের মধ্যেই। হরিণের নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়, জানে না কোত্থেকে গন্ধ আসছে। তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাকে জানতে না পেরে ঘুরে-ঘুরে মরছে।

এ কি, আজ কি আর কোনো কাজ হবে না না কি? সবাই এমনি বসে থাকবে সারাক্ষণ?

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে আছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছে। চার দিকে শুধু আনন্দের ঢেউ।

'এ যেন গরুর পালে গরু এসেছে। ঝাঁকের কই মিশেছে ঝাঁকে এসে। তাই এত লহর পড়েছে চার দিকে।'

কেশব ভক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়েছে। এমনটি তো সে কই ভাবেনি। এ যে একেবারে 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।' ভূমার অখণ্ড অভ্যুদয়। প্রণামের রসে আপ্লুত হল কেশব। নিজেকে

বালকের মতন মনে হল। চিনির পাহাড়ের কাছে ক্ষুদ্র এক পিপীলিকা।

নিশ্চয়ই ঈশ্বর দেখেছে, পেয়েছে, হয়েছে। নইলে এমন সব কথা কয়! কথায়-কথায় এমন একটি ভাব আনে! এমন সব সহজ করে দেয় সহজে।

তর্কের জায়গা নেই, প্রশ্ন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্দেহ মাথা তুলতে পারছে না। চোখের সামনে বসে আছে যেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সর্বশেষ উপলব্ধি।

উঠল রামকৃষ্ণ। যাবার আগে কেশবকে বললে, 'তোমার ল্যাজ খসেছে।'

কেশব তো অবাক।

ব্যাঙাচির যদ্দিন ল্যাজ থাকে তদ্দিন জলেই থাকে, ডাঙায় উঠতে পারে না। কিন্তু ল্যাজ যখন খসে পড়ে তখন জলেও থাকতে পারে, ডাঙায়ও উঠতে পারে। তেমনি মানুষের যদ্দিন অবিদ্যার ল্যাজ থাকে তদ্দিন সে সংসার-জলেই থাকতে পারে, ব্রহ্মস্থলে উঠতে পারে না। ল্যাজ খসে পড়লেই সংসার ও সারাৎসার দুই জায়গায়ই সে থাকতে পারে। তুমি তেমনি সংসারেও আছ সচ্চিদানন্দেও আছ।

সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীরভক্ত। যে সংসার ছেড়ে এসেছে সে তো ডাকবেই—ডাকবার জন্যেই এসেছে, তাতে তার বাহাদুরি কি। সংসারে থেকে যে ডাকে, সে বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখতে চায়, সেই ধন্য, সেই বাহাদুর, সেই বীরপুরুষ।

রামকৃষ্ণ চলে গেলে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এই সহজ সুন্দরটি কে? কে এই সদয়হৃদয়? কে এই মায়ামানুষবেশী?

চল যাই সভা করে সবাইকে বলি গে। অখিল মধুরের যিনি অধিপতি তিনি এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

তুমি কি তাঁকে চোখে দেখেছ? সবাই ঘিরে ধরে কেশবকে।

চোখে দেখেছি। দুই চোখে তাঁকে কুলায় না। চল তোরাও দেখবি চল।

[ক্রমশঃ।

হিউম

জোসেফ হিউমের ছেলে অ্যালান হিউম, যাঁকে "ফাদার অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস" বলা হয়, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জোসেফ হিউম ছিলেন পার্লামেণ্টের সদস্য। তেরো বছর বয়স তখন অ্যালানের—তখনই তিনি আশা করেছিলেন নেভিতে গিয়ে জাহাজ-চালক হবেন এবং নিম্নপদস্থ কর্ম্মিরূপে জাহাজে কাজ পেলেন। কিন্তু নেভি থেকে তাঁকে যেতে হল হেইলিবেরীর কলেজে। কলেজও ছেড়ে দিলেন। শিক্ষা গ্রহণ করলেন চিকিৎসা-বিদ্যায়। যখন কুড়ি বছর বয়স, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে চাকরী পেলেন হিউম। তখনকার সিভিল সার্ভিস এখনকার চেয়ে পৃথক ছিল। প্রথমেই তিনি মুহুরী হয়ে পুলিশ-ফাঁড়িতে নিয়োজিত হলেন। দু'-তিন মাস যেতে না যেতেই হিউম অন্য এক থানার নায়েব-দারোগা হলেন। দারোগা থেকে থানার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভারও পেলেন।

থানার কাজ থেকে হিউম হলেন এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর। এটোয়াতে তিনি বদলী হলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের সময় হিউম এটোয়াতে ম্যাজিষ্ট্রেট। বয়স ছাব্বিশ বছর। সিপাই বিদ্রোহের সময় এটোয়া হয়ে উঠেছে অন্যতম প্রয়োজনীয় ...গো—যার আয়তন প্রায় সতেরোশো মাইল এবং যার লোকসংখ্যা ...ে লক্ষেরও বেশী। সমগ্র যুক্তপ্রদেশ তখন বিদ্রোহীদের কবলিত। ...টে সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছে, সংবাদ পৌছল হিউমের কাছে। ... দিনের মধ্যেই বিদ্রোহীরা এটোয়া আক্রমণ করলে এবং হিউমের ...চালিত যুদ্ধে সৈন্যরা মারা গেল। যাই হোক, সিপাই বিদ্রোহের সময় হিউমের দক্ষতায় তদানীন্তন যুদ্ধ-বিশারদরা বিস্মিত হয়ে গেলেন। হিউম এটোয়াতে শীঘ্র শান্তি ফিরিয়ে আনলেন।

অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও দরিদ্র এটোয়াবাসীর দুঃখে হিউম বিগলিত হয়ে পড়লেন। এটোয়াতে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত করলেন। পুলিশী ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি করলেন। আবগারী বিভাগের সংস্কার করলেন। তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট হিউম সম্বন্ধে লিখলেন: "হিউম অধীনস্থ এটোয়াবাসীর জন্য যথেষ্ট স্বার্থ ত্যাগ করেছেন এবং এটোয়াকে অল্প সময়ের মধ্যে উন্নত করেছেন।" ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হিউম যুক্ত-প্রদেশে বদলী হলেন শুল্ক বিভাগের কমিশনারের পদ পেয়ে। যুক্ত-প্রদেশে গিয়েই হিউম স্বাধীন রাজ্যের নৃপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত ক'রে শুল্ক বিভাগের বিবিধ অপ্রয়োজনীয় কড়া নিয়ম-কানুন উঠিয়ে দিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হিউম ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম-সেক্রেটারীর পদ পেলেন। লর্ড লিটনকে সমালোচনা করার জন্য হিউমকে চাকরীতে ইস্তফা দিতে হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। হিউম ছিলেন ঘোরতর প্রাচ্যবাদী। হিউমের গ্রন্থাগার ছিল দেখাবার মত লোভনীয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কয়েকটি পুস্তক বিভাগ হিউমের দেওয়া গ্রন্থে সৃষ্ট হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউমের নাম জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে। হিউম ভারতবর্ষকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন। হিউমের অধিকাংশ দিন কেটেছে ভারতবাসীদের উন্নতিকল্পে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই হিউম দেহত্যাগ করেন। ব্রুকউড কবরস্থানে হিউম চিরনিদ্রায় মগ্ন আছেন।

অবকাশ-পাতাল

অ, আ, ই

ঝড় বয়ে গেল হঠাৎ।

ঝড়ের বেগ তবুও থামে না। গান শেষ হ'লে গানের রেশ থাকে কানে; হাসি থেমে গিয়েও যেমন হাসি কানে বাজে; শব্দ ফুরিয়ে যায় থাকে কেবল প্রতিশব্দ; ফুল শুকোলেও পাওয়া যায় মিষ্টি সুবাস; বৃষ্টি-শেষে বয় যেমন জলো-হাওয়া—যজ্ঞি শেষ হলেও যজ্ঞির জের তবুও যায় না। কোথায় রয়েছে ঐ শুভানুষ্ঠানের চিহ্ন। কত কে দেখতে আসছে কনেকে। বিয়ে উপলক্ষে যারা এসেছিল তাদের চলে যাওয়ার পালা চলেছে। মহল থেকে আমলা-গমস্তারা এসেছিল, কয়েক জন প্রজাও এসেছিল। দূর-দেশ থেকে এসেছিল ক'ঘর আত্মীয়। আসা-যাওয়ার পাথেয় নিয়ে ঘরের মানুষরা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। নায়েবরা টাকা চুকিয়ে দিচ্ছেন যাঁর যা প্রাপ্য। হোগলার চালা এখনও রয়েছে। দরজা-জানলায় রয়েছে ভেলভেটের পর্দা। কার্য্যোপলক্ষে ঝোলানো লণ্ঠনগুলোও রয়েছে। যজ্ঞির অফুরন্ত বাসি লুচি কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। লোকজন খেয়েও ফুরোতে পাচ্ছে না। যে আসছে খাচ্ছে।

এত কিছু হ'ল, দেখলেন না শুধু কুমুদিনী।

হেমনলিনীর মুখে কাজ মিটে যাওয়ার ফিরিস্তি শুনেই বললেন,—আমি তো আর অপেক্ষা করব না ঠাকুরঝি। আমাকে যেতে হবে, আর দেরী করা চলবে না।

—যাবে কোথায় বৌঠান! যাবো বলেছ ব'লে সত্যিই যাবে তুমি? হেমনলিনীর কথায় বিস্ময়ের সুর। বলেন,—তুমি কি জেদী বৌঠান! ভুলে যাও না, ক্ষেমাঘেন্না ক'রে ভুলে যাও।

—না ঠাকুরঝি! তুমি আর বাধা দিও না। কুমুদিনীর দৃষ্টিতে কঠিন প্রতিজ্ঞা। বলেন,—কাছারীতে ব'লে পাঠাও, ট্রেনের খরচা পাঠিয়ে দেবে, পেয়াদা দেবে দু'জন। পৌঁছে দিয়ে আসবে আমাকে। যাবো আমি কাশীতে।

—কি যে বল বৌঠান! আমাকে শুনিও না, যা খুশী কর'। হেমনলিনীর কথার সুরে হতাশা। বলেন,—ক্ষমা করতে নেই?

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন কুমুদিনী। ওষ্ঠাধর কাঁপতে থাকে তাঁর। শীর্ণ মুখাকৃতি। হঠাৎ বলেন,—জানো ঠাকুরঝি, তুমি যে কিছু জানো না। ছেলে মদ ধ'রেছে, গেছে কুচ্ছিৎ জায়গায়। আমি শুনেছি ভালো লোকের কাছে।

—এ্যাঁ। বিস্মিত হ'লেন হেমনলিনী।—কে বললে কে? কি বলছ' বৌঠান? কে তোমার কান ভাঙ্গালে?

দুঃখের হাসি হাসলেন কুমুদিনী। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেন,—যে বলেছে তাকে আমি বিশ্বাস করি।

গালে হাত দিলেন হেমনলিনী। চেয়ে রইলেন বিস্ফারিত চোখে। বললেন,—আমি ভাবি আমারই কপাল পুড়েছে। আমার স্বোয়ামী আর ছেলেরা শুধু—

—থাক্ ঠাকুরঝি, থাক্। কি হবে ব'লে? যে যাবে তাকে তুমি আমি পারবো আটকাতে? তুমি দিদি অমত ক'র না। কুমুদিনীর কথায় কাকুতি। বলেন,—কাছারীতে ব'লে পাঠাও। পেয়াদার হাতে টাকা পাঠিয়ে দিক।

—ক'দিন আর বাঁচবে বৌঠান? থাকো না আমার কাছে। কোথায় আর যাবে? অনুরোধ করেন হেমনলিনী। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে।

—না ঠাকুরঝি। বেশ থাকবো আমি। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে পূজো ক'রবো। লক্ষ্মীটি দিদি আমার।

কোন ওজর-আপত্তি কানে তুললেন না কুমুদিনী।

ঐ দিন রাতের গাড়ীতেই চ'লে গেলেন। হেমনলিনীর পাল্কীতে চেপে হাওড়ায় গেলেন। দু'জন পেয়াদা পৌঁছে আসতে সঙ্গে গেল। মহিলাদের কামরায় গেলেন কুমুদিনী।

দুপুর বেলা। তত আর সাড়াশব্দ নেই।

লোকজন ফাঁক পেয়ে বিশ্রাম করছে। বিনোদা আর এলোকেশী খাওয়া-দাওয়া ক'রে দু'দণ্ড গল্প করতে বসেছে। পরস্পরের সঙ্গে ক'দিনে ভাব জমেছে বেশ। যদিও এলোকেশীকে ঠিক মনে ধরেনি বিনোদার। কুটুম-বাড়ীর লোক, নেহাৎ কথা না বললে নয়। এলোকেশীও দেখেই চিনে ফেলেছে, বুঝেছে দেমাকে মট-মট করছে মাগী। তবুও মেয়ে-তরফের ব'লে এলোকেশী খুসী হয়েই কথা বলছে।

বিনোদা বলছে,—আমি এয়েছি কুমুদিনীর সঙ্গে, যখন আমার বয়েস তিরিশ। তখন অন্য হাল ছিল। তখন কত্তাদের আমল। ঝি বলেই মনে করতো না কেউ। ঘরের মেয়ের মত ছিলুম। এখনকার মত তখন? আর বল না।

বিনোদা কথার শেষে পান খায়। দোকতা খায়।

এলোকেশী বললে,—কেন, এখনও তোমারই তো পতিপত্তি। তুমিই তো দেখাশুনো কর'। তোমাকেই তো দেখি মানে লোকজনেরা।

—আর ব'ল না। বলে বিনোদা।—লোকজনেরা মানলে কি হ'বে, ছেলে মানে? বললুম, যা মাকে ফিইরে নে আয়। শুনলে? মা তো শেস পর্য্যন্ত কাশীবাসীই হ'ল। আর বল' না।

—হয়েছিলটা কি? শুধোয় এলোকেশী। চাপা গলায়। বলে,—কি দুঃখে কাশীতে গেলো! হয়েছিলটা কি?

—পান খাবে? আপ্যায়িত করে বিনোদা। বলে,—আর ব'ল না।

—দাও খাই ! দাঁত কি আর আছে যে চিবুতে পারবো !

বিনোদা বললে পা দু'টোকে ছড়িয়ে,—দুঃখু ব'লে দুঃখু ! বলবো না, বললে বলবে যে কান ভাঙ্গালে। ব'লে কি হবে ? রূপুশী বৌ পেয়েছে, দেখি কি হয় !

কথাগুলো শুনে থতমত খেয়ে যায় এলোকেশী। সাজানো ঘর-দোর দেখে যত খুসী হয়েছিল, ক'টা কথা শুনে অন্য মেজাজ হয়ে যায়। বলে,—আমি কি আর বলতে যাবো কাউকে। বল' না দিদি, বল' না। মেয়েটাকে তো আগে থেকে ব'লে-ক'য়ে রাখতে হবে। কি হ'তে কি হয়।

বিনোদা হাসে, কৃত্রিম হাসি। হতাশা আর ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি। বলে,—তা বটে। ব'লে-ক'য়ে রাখলে তো ভালই হয়।

—শুনে যে আমার হাত-পা পেটের ভেতর সিঁদোচ্ছে দিদি ! এলোকেশী কথা বলে ভয়-কাতর কণ্ঠে। বলে,—কি হবে দিদি ?

বিনোদার মুখে পিক। কিছু বলে না। চুপচাপ চেয়ে থাকে হতাশ-চোখে। বোঝে কাজ হয়েছে, এলোকেশী ভয় পেয়েছে। কেন কে জানে বিনোদার যেন জাতক্রোধ আছে। কখনও যেন সহ্য করতে পারে না কুমুদিনীর ছেলেকে। কখনও পারতো না। তবুও এখন মায়ে-ছেলেতে শত্রু-হাসানো সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। এখন তো আরও বেশী। দেখলেই সারা শরীর জ্বলতে থাকে যেন। কথা বলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। বললে,—হুজুর কোথায় এখন ?

এলোকেশী ক্রমশঃ অবাক হয়। বলে,—কে জানে ! বল' না দিদি, তুমি যেন পেটে কথা চাপছো !

বিনোদা বলে,—বললে কি চাপা থাকবে কথা ! আমিও তো বলতে চাই। তোমারও জেনে রাখা ভাল। বৌটাকে বলে রাখলে যদি—

কথার মাঝপথে কথা থামায় বিনোদা। বিষয়টা জটিল করে তোলে এলোকেশীর কানে। এলোকেশী ভাবে এলোপাতাড়ি। গায়েব রক্ত যেন জল হয়ে যায়। কত সুখের স্বপ্ন দেখেছিল এলোকেশী রাজেশ্বরীকে জড়িয়ে। কত কল্পনা করেছিল।

—বল' না দিদি, বল' না। বললে এলোকেশী। কথায় উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে।

বিনোদা পিক গিলে ফেলে। বলে,—বলবো'খন। ব্যস্ত হও কেন ?

অনন্তরাম কোথায় ছিল। হঠাৎ আসে। বলে,—বিনোদা, বৌদি ঝিকে ডাকছে। যেতে বল্ আগে।

—যাও দিদি, ডাকছে তোমাকে। বিনোদা যেতে বলে এলোকেশীকে। এলোকেশীর শরীর যেন কাঁপছে। অশ্রুত কথার প্রারম্ভ শুনেছে এলোকেশী। শুনে পর্য্যন্ত কেমন হয়ে গেছে যেন। উঠে যায় এলোকেশী।

—আচ্ছা মানুষ তো ! তোর কি ভীমরতি ধ'রেছে ? অনন্তরাম বললে এলোকেশী চলে যেতেই। বললে,—বৌটা শুনলে রক্ষে থাকবে ভেবেছিস !

বিনোদা খিঁচিয়ে ওঠে। বলে,—কেন, দোষটা কি করেছি ?

অনন্তরাম বললে,—ত্যাখ, এতক্ষণ শুনছিলাম আমি। ঝিটাকে বিষোচ্ছিস তো ? ভালটা কি হবে শুনি ?

—জানি না অত-শত। বলেছি বেশ ক'রেছি। বিনোদা বলতে বলতে শুয়ে পড়ে আড় হয়ে। তেলচিটে বালিসটা টেনে নেয়।

অনন্তরাম বললে,—যা বলেছিস বলেছিস। বেশী কিছু বলিস তো কেটে দু'খানা করে ফেলবো তোকে। ব'লে রাখলাম। ভাল করতে পারবে না মন্দ করবে ?

—মুখ সামলে কথা ব'ল ব'লছি। তোমার খাই না আমি। বিনোদা বলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে।

—আমার খেলে বাঁচতে পেতিস্ এতক্ষণ ! যার খাচ্ছিস তাকে গাল দিবি আড়ালে ? যাতে ক্ষতি হয় করবি ? অনন্তরাম বললে ঘৃণার স্বরে।

—বেশ করবো। কথার শেষে পাশ ফিরে শোয় বিনোদা। কথায় যেন তাচ্ছিল্য। বলে,—কানের কাছে চেঁচামেচি ক'র না বলছি।

অনন্তরাম চুপচাপ তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বলে না কিছু। স্নান করতে চলে যায় পুকুরে। আকাশের ঠিক মধ্যিখানে সূর্য্য। পুকুরের জলে প্রতিবিম্ব পড়েছে।

শুয়েছিল রাজেশ্বরী। বাহুতে মাথা রেখে। আলুলায়িত চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছিল পালঙ থেকে ভূমিতে। বোধ হয় চোখ দু'টো বুজেছিল। এলোকেশী আসতেই চোখ চাইলো। বললে, —কিছু বলছো ?

এলোকেশীর চোখে বিস্ময়। বলে,—তবে যে বললে ডাকছিস তুই ?

রাজেশ্বরী বলে,—না তো। কে বললে ? যা, বিশ্রাম কর গে যা।

এলোকেশী বলে,—সোয়ামী কোথায় ?

রাজেশ্বরী হেসে ফেললে। বললে,—বেরিয়েছে। বললে তো আসছি শীগ্গি।

—কোথায় গেল বললে না ? শুধোয় এলোকেশী।

রাজেশ্বরী বলে,—না। তুই ঐ বইটা দে যা দেখি আমায়।

দেরাজের মাথায় ছিল একটা বই। পাতা-খোলা। বিয়েতে উপহার পাওয়া। বেহুলা।

এলোকেশী বই দিয়ে বিশ্রাম করতে যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে ঘরের ইদিক-সিদিক। দেওয়ালের ছবি, আসবাব-পত্র, ঝাড়-লণ্ঠন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলোকেশী। দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়, দেওয়ালের ছবিতে চোখ রেখে। যাদের ছবি তাদের মুখে-চোখে আভিজাত্য, দৃষ্টিতে পবিত্রতা !

—ঠাগমা'র কাছে যাবি কবে ? এলোকেশী জিজ্ঞেস করে। কি মনে হ'তে জিজ্ঞেস করে কে জানে।

রাজেশ্বরী বলে,—যাবো শীগ্গি। ঠাগমা ব'লেছে, ব'লে পাঠাবে। এই তো ঘুরে এলাম, ক'টা দিন যাক।

জোড়ে গেছিল রাজেশ্বরী। কাটিয়ে এসেছে ক'টা দিন। ঠাগমা বলেছেন,—শ্বশুর-ঘরে কেই বা আছে ! যা, শ্বশুর-ঘর করগে যা। মন আঁকু-পাঁকু করলে আমিই যেয়ে দেখে আসবো।

এলোকেশী খানিক বাদে, কি মনে হ'তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বিনোদার কাছে যেতেও মন চায় না, কি শোনাতে কি

শোনাবে কে জানে! বুকটা গুমরে ওঠে এলোকেশীর। দালানে গিয়ে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবে।

কাছারীতে নায়েবদের মধ্যে তখন বাক্‌বিতণ্ডা চলছিল। সাবেকী আমলের কয়েক জন কথা কইছিলেন। হুজুর বেরুবার সময় টাকা নে গেছেন। বিশ-পঁচিশ হ'লে কথা ছিল না, তবিল খুলিয়ে যা পেয়েছেন তুলেছেন। কাগজের টাকা, সব সমেত হাজার দু'য়েক হবে। নায়েবরা হতচকিত হয়ে গেছেন। কখনও এমন হয় না। এত টাকা একসঙ্গে প্রয়োজন হয় না কখনও। নায়েবরা বাধা দেবেন এমন সাধ্য কার হবে। হুজুর স্বয়ং এখন মালিক। ম্যানেজার বাবু থাকলেও বলতে পারতেন। কেন টাকা নেওয়া হচ্ছে, পারতেন জিজ্ঞেস করতে; কিন্তু সাবালক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার বাবুও কাগজ-পত্র বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ ক'রেছেন।

নায়েবরা বলাবলি করছিলেন টাকা কেন প্রয়োজন হ'তে পারে। যার যা মনে হচ্ছিল বলছিলেন।

ভাদ্রের প্রথম। চড়া রোদ্দুর দুপুরের। গুমোট হয়ে আছে।

কাছারীর প্রাঙ্গণে কতকগুলো কাক কা কা করছে। পাল পাল মুরগীর বাচ্ছা, লাফালাফি করছে হেথায়-সেথায়।

দেখতে দেখতে কতক্ষণ কেটে যায়। দুপুর গড়িয়ে যায়।

বেহুলা পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়ে রাজেশ্বরী। এলোকেশী ডাকে। ঘুম ভাঙ্গায়। বলে,—আয়, চুল বেঁধে দি। বেলা ফুইরেছে। উঠে পড়্।

ঘুম-চোখে দেখে রাজেশ্বরী। উঠে বসে। বলে,—ডাকতে হয়। কত বেলা হয়েছে বল' তো!

—ডাকছি তো। মেজাজ ভাল নয় আমার। আয় চুল বেঁধে দি। এলোকেশী কথা বলে বিরক্ত হয়ে। বলে,—মা লক্ষ্মীর কিপায় ভাল হলেই ভাল।

রাজেশ্বরী কান দেয় না এলোকেশীর কথায়। এলোকেশী সময় নেই অসময় নেই বলে এমন কত কথা। কথার শ্রোতা যে কে, কাকে উদ্দেশ্য ক'রে যে বলে এলোকেশীই জানে।

রাজেশ্বরী বললে,—শাশুড়ীর ঘর খুলিয়েছিলুম এলো। দেখলি না তো তুই!

—ডেকেছিলি আমাকে? বলে এলোকেশী।—সাজানো-গোজানো ঘর তো?

—হ্যাঁ। সাজানো ব'লে সাজানো! দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে গেলো। শ্বশুরের ছবি দেখলুম। রাজেশ্বরী কথা বলে বিহ্বল হয়ে। বলে,—কত সাড়ী-জামা শাশুড়ীর। আলমারী ঠাসা।

—তুই তো পাবি। বলে এলোকেশী, কথায় লোভ ফুটিয়ে। বলে,—শাশুড়ীকে ফেরাতে হবে রাজো। যেখানেই থাক, ফেরাতে হবে। শাশুড়ী না এলে ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি।

কি বলছে সব এলোকেশী, যে-সব কথার কোনও মানে হয় না। রাজেশ্বরী তাকিয়ে থাকে ডাগর চোখ দুটোকে তুলে। বললে,—তীর্থ করতে গেছে শাশুড়ী, গেছে কাশীতে। কথা বলতে বলতে থামে রাজেশ্বরী। কয়েক মুহূর্ত। বলে,—বললে যে আসছি শীগ্‌গির! কোথায় গেছে বল্ তো!

বুকটা গুমরে ওঠে এলোকেশীর। কোথায় গেছে, এলোকেশী জানবে কোত্থেকে। এলোকেশীও তো ভাবছে, গেছে কোথায়। কতক্ষণ কেটে গেছে। সূর্য্য প্রায় ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। ভাদ্রের বেলাশেষে মেঘ জমেছে ঈশানে। দলে দলে মেঘ। কোথায় যেন আছে কে কেশবতী, মুখ লুকিয়ে আছে আকাশে। বিছিয়ে দিয়েছে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল আকাশের বুকে। হাওয়া চলেছে মাঝে মাঝে। শিরশিরে হাওয়া।

—কোথায় গেছে বলে গেছে আমাকে? বলে এলোকেশী। কথাটা শুনে মুখটা শুকিয়ে যায়, চুপচাপ চেয়ে থাকে রাজেশ্বরী। লজ্জিত হয় কিছুটা। বলে,—ফিঁতে, কাঁটা কোথায় আছে?

এলোকেশী উত্তর দেয় না কথার। ফিঁতে-কাটা এনে জিজ্ঞেস করে,—এখানে বাঁধবি না ছাতে যাবি?

রাজেশ্বরী বললে,—চল' ছাতে চল'। অনন্তরামকে শুধোও দেখি, গাড়ীতে গেছে তো? আমি ছাতে আছি।

রাজেশ্বরী ছাদে যায়। ছাদে গিয়ে ঘোরা-ফেরা করতে ভাল লাগে। ছাদে গিয়ে বসে রাজেশ্বরী। চুল বেঁধে দেয় এলোকেশী। একেক দিন একেক ধারার খোঁপা ক'রে দেয়।

—হ্যাঁ গাড়ীতে গেছে। পেছন থেকে বললে এলোকেশী। বললে,—কাছারী থেকে টাকা নে যাওয়া হয়েছে।

ভ্রূ দু'টো কুঁচকে ওঠে। রাজেশ্বরী ভাবতে থাকে কত কথা। বলে,—পিশীমার কাছে গেছে?

—জানি নে বাবা। এলোকেশীর কথায় বিরক্তি। বলে,—ভাব-গতিক ভাল বুঝছি না বাপু!

চুপচাপ চেয়ে থাকে রাজেশ্বরী।

অনন্তরাম কোথা থেকে আসে হঠাৎ। আসে ঝড়ের মত। বলে,—বৌদিদি, বৌদিদি! চোখে দেখবে, তুমি। তবুও—

—কি হয়েছে অনন্ত? অবাক-চোখে বলে রাজেশ্বরী। বলে,—কি হয়েছে?

অনন্তরামের চোখে জল। মুখে হতাশা, কথায় কাকুতি। বলে,—চোখে দেখেও কিছু মনে করবে তুমি বৌদিদি? হিতে বিপরীত হয়ে যাবে বৌদিদি। ধৈর্য্য ধরতে হবে যে তোমাকে। বৌদিদি—

অনন্তরামের চোখে অশ্রুধারা। কথা শেষ না করেই চলে যাচ্ছিল। রাজেশ্বরী ডাকলে,—অনন্ত, কি হয়েছে ব'লে যাও।

এলোকেশী বলে,—হয়েছে যা, শুনে কি হবে? বুঝেছি আমি যা হয়েছে।

রাজেশ্বরী উঠে দাঁড়ায়। ছাদ থেকে ঘরে ফিরে আসে। এলোকেশীকে বলে,—কি হয়েছে বল' আমাকে।

এলোকেশী কিছু বলে না। বিনোদা এসে বলে,—মদে চুর হয়ে ফিরেছে যে সোয়ামী।

বজ্রাঘাত হয় মাথায়। রাজেশ্বরী চোখ দুটোকে বন্ধ করে ফেলে। কম্পিত কণ্ঠে বলে,—কি হবে এলো?

এলোকেশী কথার উত্তর দেয় না। বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। রাজেশ্বরী পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্ত্তের মধ্যে

তোলপাড় হয়ে যায়। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে ঠকঠকিয়ে। রাজেশ্বরী তাকিয়ে থাকে জানলার বাইরে। হাতের তালু দু'টো ঘেমে ওঠে। কপালের দু'পাশ ঝিম-ঝিম করে। দেরাজে ছিল আয়না। রাজেশ্বরী দেখতে পায় রাজেশ্বরীকে। শুভ্র ধপধপে রঙ, মোমের মত গড়ন, আলুলায়িত কেশরাশি। মুখটা ঘুরিয়ে নেয় রাজেশ্বরী। কি হবে দেখে রূপের ডালি? নেশা, মদ, মদ খাওয়ার নেশা! শুধু কি নেশা? মনে মনে কত প্রশ্ন জাগে। চোখ দুটোকে বিঁধে ফেলতে চায় আয়নায় দেখে। কত সুখ, কত হাসি, কত মিষ্টি কল্পনার জাল বুনেছিল রাজেশ্বরী। মুহূর্ত্তের মধ্যে কি হয়ে গেল!

হঠাৎ মনে পড়েছিল গহরজানকে।

বিয়ে হওয়ার আগে থেকে কত দিন হয়ে গেছে, যেন ভুলে গিয়েছিল গহরজানকে। হঠাৎ ভেসে উঠেছে স্মৃতির পটে, গহর আর গহরজানের কথাবার্ত্তা। কথা বলার আদব-কায়দা। দেখা হওয়ার শেষ-দিনে কত সোহাগ দেখিয়ে কথা বলেছিল গহরজান। কত হেসেছিল আর হাসিয়েছিল। আবার যাতে যায়, ভুলে যাতে না যায়, সে-জন্য কত ক'রে বলেছিল গহরজান। ঘুম থেকে জেগেই মনে পড়েছিল গহরজানকে। কা'কেও কিছু না বলে কাছারী থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল দিনমানেই। আবদুল শুধু বলেছিল,—হুজুর, ভুলে যাও। যেও না।

কথাটা শুনে ক্ষণিকের জন্য হুজুর দ্বিধা বোধ করেছিলেন। তবুও বলেছিলেন,—চল' চল', জরুরী কাজ আছে। আবদুল, কেউ যেন জানতে না পায়। শুধু তুমি জানো।

গহরজান দেখে প্রথমে কিছু বলেনি। বেশ কিছুক্ষণ মুখ ফিরিয়েছিল। রাগ ক'রে কথা বলেনি। গরজ গহরজানের, বেশীক্ষণ চুপ ক'রে থাকলে কি হয় কে জানে। কথা বলেছিল গহরজান। হাসতে হাসতেই বলেছিল। নোটের গোছা পেয়েছে গহরজান। খাওয়া-দাওয়া আর আদর-আপ্যায়িতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। লেমোনেডের মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে খাইয়েছিল বেশ দামী বিলেতী। এক-আধ গেলাশ হ'লেও কথা ছিল, পুরা একটা বোতল ক্ষণেকে ক্ষণেকে।

আবদুল ধরাধরি ক'রে গাড়ীতে তুলেছে। নেশার ঝোঁকে আবদুলকে কি বলতে কি বলেছে। বাড়ীতে যখন পৌঁছেছে তখন যে দেখেছে বুঝেছে নেশাচ্ছন্ন অবস্থা। দেখে শিউরে উঠেছে কেউ কেউ।

ঘরে আসতেই রাজেশ্বরী আঁচলে মুখ ঢাকে।

কৃষ্ণকিশোর ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে বিছানায়। অনন্তরাম শুইয়ে দেয়। অনন্তরাম পেছনে পেছনে এসেছিল। অনন্তরামকে বলে,—অনন্তদা, ক্ষমা ক'র ভাই। অন্যায় করেছি।

—ঢের হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়' দেখি। অনন্তরাম বললে ধমকের সুরে। বললে,—ভুলে যেও না, বৌ—

ডুগরে ডুগরে কাঁদে রাজেশ্বরী। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আঁচলে মুখ ঢেকে। এলোকেশী দেখে-শুনে চলে যায় সেখান থেকে। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে।

বিনোদা শুধু সিঁড়ির তলার ঘরে গিয়ে হাসে আপন মনে। মনের সুখে হাসে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। একেক বার থামে, আক্রোশের ভঙ্গীতে বলে কত কথা ফিসফিসিয়ে। কথা থামিয়ে হাসতে থাকে। বলে,—মুখে বলতে হ'ল না। চোখেই দেখতে পেয়েছে।

অশান্তির ছায়া নামে বাড়ীতে। ডেকে-আনা অশান্তি।

নায়েবরা অনন্তরামকে বলেন,—পকেটে দেখ' দেখি টাকা-পয়সা কত আছে? বেরুবার সময় হাজার দুয়েক টাকা নিয়েছিলেন।

অনন্তরাম বললে আফশোষের সুরে,—বলতে হবে না আমাকে। দেখেছি আমি। একটা পয়সা নেই। হাজার দুয়েক দূরের কথা। কথা বলতে বলতে খানিক চুপ ক'রে থাকে অনন্তরাম। বলে,—পায়ে ঢেলে দিয়ে এসেছে। দেখতে হবে না। কি করা যায় বলুন তো?

নায়েবরা কিছু বলেন না। সকলের চোখে আশাহীন দৃষ্টি। বয়োবৃদ্ধ এক জন নায়েব বললেন,—আবদুলকে ডেকে ব'লে দেওয়া হোক, গাড়ী চাইলে—

অনন্তরাম বললে,—আবদুল কি করবে! তাকে বললে যদি না যায় কলকাতার শহরে গাড়ী পাওয়া যাবে না? কিন্তু যায়টা কোথায়?

নায়েবরা তৎক্ষণাৎ বলে,—হ্যাঁ, যাওয়া হয় কোথায়?

আবদুলকে ডাক পড়ে। জেরা করা হয় যেন তাকে। আবদুল ভয়ে শিউরে বলে,—হুজুরকে আমি বলেছি, যেও না হুজুর। ভুলে যাও। সাদি হয়েছে,—

নেশার ঘোর ধীরে ধীরে কাটে।

রাজেশ্বরী বসেছিল পাশে। চোখ চাইতে রাজেশ্বরীকে দেখে মনে মনে লজ্জিত হয় কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরী তখনও কাঁদছে। চোখ দু'টো ফুলে উঠেছে। চেয়ে আছে শূন্য-দৃষ্টিতে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কোথায় ছিলাম আমি?

রাজেশ্বরী কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। বলে,—ঘুমিয়ে পড়'।

কৃষ্ণকিশোর উঠে বসে। ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে যায় মশালচি। সাঁঝের আঁধার হয়েছে। মশা উড়ছে ভোঁ ভোঁ। ডাকছে ঝিঁঝিঁ। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কে কথা কইছে বল তো?

সত্যিই ঘরের বাইরে কে কথা বলছিল। জিজ্ঞেস করছিল, —বৌ কোথায়? ডাকো বৌকে।

বিনোদা ঘরের ভেতর আসে। বলে,—বটঠাকুমা এসেছে বৌকে দেখতে। ঘরে আসবে?

—বটঠাকুমা! বললে কৃষ্ণকিশোর। উঠে পড়ে বিছানা থেকে বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রণাম করে বটঠাকুমাকে। বললে,—কত কষ্ট ক'রে এসেছেন? ঘরে চলুন।

বটঠাকুমা। ফুলকুমারী। অশীতিপর বৃদ্ধা। ধনুকের মত শরীর তাঁর বেঁকে গেছে। হাসি-খুশীর মানুষ। বললেন,—বে'তে আসতে পারলাম না ভাই। কত অসুখ গেল।

বিনোদা বললে,—কেমন আছে এখন? শুনলুম যে, কে সাধু ওষুধ দিয়ে ভাল ক'রে দিয়েছে?

ফুলকুমারী কাঁপতে কাঁপতে বললেন,—হ্যাঁ, হৃষিকেশ থেকে সাধুটি এসেছিলেন। কি টোটকা খাইয়ে ভাল করলে। এখন উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য্যি ভাল করলে বটে!

পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। বেঁচে উঠবেন ব'লে আশা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ এখন বলছেন,—নেশা ত্যাগ করলুম আমি। কখনও ছোঁব না।

বটঠাকুমা ঘরে আসতেই রাজেশ্বরী প্রণাম করলে তাঁকে। ফুলকুমারী বললেন,—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যে দেখছি। বৌ করেছে বটে কুমু। কথা বলতে বলতে আঁচল থেকে খুললেন আশীর্ব্বাদী। বললেন,—আয় তো ভাই!

রাজেশ্বরী এগিয়ে আসে। ফুলকুমারী কপালে পরিয়ে দিলেন জড়োয়া টায়রা। ঝলমলিয়ে উঠলো টায়রাটা লণ্ঠনের আলোয়। ফুলকুমারী বললেন,—মা কাশীবাসী হয়েছে?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—হ্যাঁ। বললাম কত, শুনলে না। এখন থেকে কাশীতে থাকবে।

কুমুদিনীর চলে যাওয়ার কারণটা জানতেন ফুলকুমারী। জানতেন ছেলে যে-কীর্ত্তি করেছে, কুমুদিনীর কাছে অসহ্য হয়েছে। আর কিছু বলেন না ফুলকুমারী। বলেন,—এখন আমি উঠি ভাই।

—না, না, এখন যাওয়া হবে না। বললে কৃষ্ণকিশোর।—কখনও তুমি আসো না। থাকো এখন।

—না ভাই। জপ-আহ্নিক আছে। কথা বলতে বলতে সত্যিই উঠে পড়লেন ফুলকুমারী। বললেন,—পাল্কীতে পৌঁছে দিক, বল কাউকে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—চল, আমি তোমার হাত ধ'রে পৌঁছে দিচ্ছি।

—চলি ভাই। রাজেশ্বরীকে বললেন ফুলকুমারী।—সুবিধে পেলে যেও। কাছেই তো থাকি।

রাজেশ্বরী সায় দেয় মাথা হেলিয়ে। ফুলকুমারী কাঁপতে কাঁপতে চলেন। কৃষ্ণকিশোর হাত ধ'রে নিয়ে যায়।

এলোকেশী আসে। বলে,—গা ধুতে যা। রাত হয়ে গেল যে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। টায়রাটা খুলে রেখে দেয় বিছানায়। হতাশ-চোখে চেয়ে থাকে। বলে,—কি হবে এলো?

কি বলবে ভেবে পায় না এলোকেশী। বলে,—কি হবে, কি বলবো বল। তুমি যদি—

কথা শেষ হয় না। কৃষ্ণকিশোর ফিরে আসে। এলোকেশী চুপ ক'রে যায়। বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—বটঠাকুমাকে দেখলে? দেখি কি দিলে?

—ঐ যে। ইশারায় দেখিয়ে দেয় রাজেশ্বরী। টায়রাটা তুলে দেখে কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরী গা ধুতে যাচ্ছিল। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কোথায় যাচ্ছো?

কথায় জড়তা ফুটিয়ে রাজেশ্বরী যেতে যেতে বললে,—গা ধুতে।

কৃষ্ণকিশোর দেখে বোঝে যে, রাজেশ্বরী বোধ হয় বুঝেছে কিছু কিছু। মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেছে। টায়রাটা দেখতে দেখতে কি মনে হয়। লুকিয়ে ফেলে কৃষ্ণকিশোর। রাখে এমন জায়গায় যে, কেউ দেখতে পাবে না। কি উদ্দেশ্যে রাখে কে জানে!

অনন্তরাম হঠাৎ কথা বললে,—আসব আমি?

চমকে ওঠে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—কে, অনন্তদা?

—হ্যাঁ। কাছারী থেকে ব'লে পাঠিয়েছে যে, টাকা দু'হাজারের খরচ লেখাবে না? কি কি খরচ হয়েছে বলবে আমাকে?

কথাগুলো শুনে মুখটা শুকিয়ে যায় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে। ভ্রূ দু'টো কুঁচকে ওঠে। বলে কৃষ্ণকিশোর,—খরচা লেখাতে হবে না। বল' যে দিয়ে দিয়েছি, বিলিয়ে দিয়েছি।

হেসে ফেললে অনন্তরাম। বললে,—আমাকে কিছু দেওয়া হোক না। কা'কে দেওয়াটা হ'ল?

—যাকে ইচ্ছে হয়েছে। বললে কৃষ্ণকিশোর।—কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

অনন্তরাম বললে,—ছি, ছি, কৈফিয়ৎ দেবে তুমি? তুমি এখন খোদ-কর্ত্তা হয়েছো। তবুও লেখা থাকলে কাছারীতে—

কথা শেষ করতে দেয় না অনন্তরামকে। বলে,—বলছি তো দিয়ে দিয়েছি।

হেসে ফেলে অনন্তরাম। শব্দহীন হাসি। হাসি দেখতে পায় না কৃষ্ণকিশোর। আরাম-কেদারায় দেহ এলিয়ে দিয়েছে। পেছন থেকে কথা বলছিল অনন্তরাম। বললে,—তবে, হাজার হাজার টাকা যদি ঘড়িক ঘড়িক বিলিয়ে দিতে থাকো—

কথাটা শেষ ক'রে না অনন্তরাম। খানিক দাঁড়িয়ে থাকে। হাসে শব্দহীন হাসি। মনে মনে বলে,—তুমি বলবে না, আবদুল যে ব'লে দিয়েছে!

অনন্তরাম ফিরে তাকিয়ে দেখে রাজেশ্বরী। ফিস-ফিস ক'রে বলে,—বৌদিদি তুমি!

—খরচা পেলে অনন্ত? শুধোয় রাজেশ্বরী।

—উঁহু। বললে অনন্তরাম। বললে তবে তো! বললে যে বিলিয়ে দিয়েছি।

রাজেশ্বরী বললে,—কি হবে অনন্ত? নেশা করছে কবে থেকে?

—বললে তবে তো! বলে কিছু? মা থাকতে। বলে অনন্তরাম। বলে,—আমি যাই। শুনতে পেলে—

রাজেশ্বরী ঘরে ঢুকে বললে,—কোথায় বেরিয়েছিলে?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—বিশেষ কাজ ছিল। কাছারীর কাজে।

অনন্তরাম সোজা আস্তাবলে যায়। আবদুলকে ডাকে। বলে,—মিঞা, কে জোগাড় ক'রে দিলে বল' তো? কে চেনালে?

আবদুল সাদাসিদা মানুষ। রেখে-ঢেকে কথা কয় না। বলে,—ধরতে পারলে না অনন্ত? তুমি ধরতে পারলে না? বসির জোগাড় ক'রে দিয়েছে।

অনন্তরাম বললে,—তুমি দেখেছো জেনানাকে? উঁচু জাতের না—

—হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি। আচ্ছা দেখতে আছে। বয়স ভি বেশ কমতি আছে। গরাণহাটাতে কোঠি লিয়ে আছে।

—গরাণহাটা? আড়ং যে আবদুল! বললে অনন্তরাম। বললে,—কি করা যায় বল' তো?

—আল্লা জানে। বললে আবদুল।—আমি কি বলবো? তুমি বল' না গুজুবকে। বুঝিয়ে বল' না। আমার তো মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

—বোঝালে বোঝে! বলে কি মাকেই তোয়াক্কা করলে না। অনন্তরাম বলে।—বেশী কিছু বললে বলবে যে যাও হঠ যাও।

—ঠিক বাত আছে। ডর তো ঐ আছে। আবদুল বলে।

অনন্তরাম তবুও বলে,—কি করা যায় বল' তো? মেয়েটাকে গিয়ে বলবো আমি? বলবো যে—

হেসে ফেললে আবদুল। হাসতে হাসতে বললে,—কি হ'বে ব'লে? কুছ, ফায়দা হবে না। শুনে হাসবে।

গহরজান তখন মাসীকে জড়িয়ে ধ'রে খুশীতে উপচে পড়ছে যেন। মুখে হাসির ঝিলিক তুলে বলছে,—মাসী, কইতে না কইতে টাকা! আমি ভাবি, ক'দিন হ'ল আসা-যাওয়া করলে, কৈ টাকা কৈ ফেলে!

নোটগুলো গুণছিল মাসী। বুড়ো আঙুলে থুথু মাখিয়ে গুণছিল। গুণতে গুণতে বললে,—ভাল ঘরের ছেলে। শুধু নেবে, দেবে না, হয় কখনও! দিলে তো দিলে দু'হাজার না বলতেই দিয়ে গেল। খাও এখন কদ্দিন খাবে!

গহরজানের পাশে ছিল ডালিম। থেকে থেকে চুমু খায় গহরজান ডালিমকে। বলে,—ডালিম, ডালিম, ডালিম!

মাসী বললে,—কবে আসবে কিছু বললে?

গহরজান বলে,—বললে আসবে। সুবিধে পেলেই আসবে।

নোটগুলোকে তুলে রাখতে ওঠে মাসী। বলে,—ঠিক কথা। বয়স্থ লোক হলে খুশীমত আসতো। সুবিধে-অসুবিধে দেখতে হবে তো। যা হোক, তুই মুখ-হাত ধুয়ে আয়। খেতে দি তোকে।

—সৌদামিনী আছো?

কে ডাকে। কান খাড়া ক'রে শোনে দু'জনে, গহরজান আর সৌদামিনী। সৌদামিনী বলে,—কে বল্ তো?

গহরজান আলুথালু বেশে বসেছিল। শাড়ীটা জড়িয়ে নেয় বুকে-পিঠে। বলে,—মালুম হচ্ছে না তো। দেখো না তুমি।

—সৌদামিনী। সৌদামিনী আছো?

—হ্যাঁ। কে? ঘর থেকে উত্তর দেয় সৌদামিনী। বলে,—কে ডাকছে?

—আমি ঘোষাল। বলে আগন্তুক।

—ঘোষাল, কি মনে ক'রে? সৌদামিনী বলে।

—কথা আছে। দেখা দাও, তবে তো। যাবো আমি? ঘোষাল বললে।

—হ্যাঁ। সৌদামিনী বলে।

মাধব ঘোষাল। ঘোষালকে দেখতে বেশ। মাথায় বাবরি। পাকানো গোঁফ। চোখে সুর্মা। ফর্সা রঙ। ছিপছিপে চেহারা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বয়স হ'তে না হ'তে দাঁতগুলো পড়েছে। মদ খেয়ে খেয়ে ক্ষয়ে গেছে দাঁত। বাঁধানো দাঁত। কানে আতরের তুলো। মটকার জামায় ফিরোজা পাথরের বোতাম। হাতে কোঁচানো কাঁচির ধুতির কোঁচা। সৌদামিনীকে দেখেই বললে,—গহর কোথায়? খদ্দের আছে। বসাবে?

—দেবে কত? সৌদামিনীর কথায় গুমরের সুর। বলে,—কত দেবে কত?

ঘোষাল বাবরিতে হাত বুলিয়ে বললে,—গান-বাজনা শুনবে, থাকবে রাতভোর। দু'তিন জন। দেবে হয়তো টাকা বিশ-ত্রিশ।

—খ্যাংরা মারো! মুখ ঘুরিয়ে নেয় সৌদামিনী। বলে,—তোমার কত থাকবে ঘোষাল?

ঘোষাল হাসে। বাঁধানো দাঁতগুলো দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলে ঘোষাল,—সাত-আট টাকা। বসাবে তো বল', ডাকি তবে?

—ত্রিশ টাকায় কি হ'বে? সৌদামিনী বলে,—গান শুনে যাক্, ত্রিশ টাকা দিক।

—চল্লিশ? ঘোষাল বলে।

সৌদামিনী ঘুরে দাঁড়ায়। বলে,—দেখি, গহর যদি রাজী থাকে। গহরজান উঠে গিয়েছিল পাশের ঘরে। মুখ-হাত ধুতে যাচ্ছিল গামছা হাতে ক'রে। সৌদামিনী চুপি-চুপি বললে কি যেন। গহরজান আপত্তি জানালে মাথা দুলিয়ে। বললে,—না মাসী না। যে টাকা দিচ্ছে তাকে আমি ঠকাবো? হাটিয়ে দাও ঘোষালকে।

—চল্লিশ টাকা দেবে বলছে। সৌদামিনী হাল ছাড়ে না। বলে,—চল্লিশটা টাকা!

চ'টে যায় গহরজান। বলে,—না।

সৌদামিনী বেশী জোর করে না। দু'হাজার টাকা হাতে পেয়ে জোর করবার মুখ থাকে না। বলে,—হ্যাঁ, দি বিদেয় ক'রে দি।

ঘোষাল ভেবেছিল হয়তো চল্লিশে আপত্তি হবে না। সৌদামিনী বলবে,—ডাকো লোক। কিন্তু সৌদামিনী বললে,—ঘোষাল, হ'বে না। রাস্তা দেখ'।

মাধব ঘোষাল কোঁচানো কোঁচাটা ঝাড়ে। বাবরিতে হাত বুলিয়ে বলে,—আচ্ছা, কিন্তু ঘোষালকে ভুললে চলবে না মাসী! কলকাতায় ঘোষালকে চেনে না কে আছে?

সৌদামিনীর মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে। বলে,—আঁ গেল। বলছি হবে না!

কোঁচানো কোঁচাটা ঝাড়ে মাধব ঘোষাল। কি ব'লতে গিয়ে বলে না। সিঁড়ি বেয়ে চ'লে যায়।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল গহরজান, এখন থেকে অন্য কাকেও বসতে দেবে না ঘরে। কেনা হয়ে থাকবে গহরজান। ঠিক যেমনটি চেয়েছিল পেয়ে গেছে। পেয়েছে কত প্রতীক্ষায়, খোঁজাখুঁজি করেও যা মেলে না। বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, যার অন্য কেউ ভাগীদার নেই। যাকে তুষ্ট করলে ভাবতে হবে না কখনও। যাকে পেলে অপেক্ষায় থাকতে হবে না রোজগারের আশায়। গুন-গুন গান গায় গহরজান। খুশী হয়েই গায়। গাইতে গাইতে যায় মুখ-হাত ধুতে।

মাসী টাকাটা গুণতে বসে। ভুল হ'ল না তো! মাধব ঘোষাল ভণ্ডুল ক'রে দিয়ে গেল। হয়তো গণনায় ভুল হয়ে গেছে। মাসী টাকাটা গুণতে থাকে। আঙুলে থুথু মাখিয়ে।

কাছারীতে কে এমন আছে যে, খরচা চেয়ে পাঠায়।

উগ্র নেশা। ঘোর কাটলেও আমেজ থাকে। কড়া মেজাজ হয়ে ওঠে থেকে থেকে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কাছারী থেকে আসছি।

রাজেশ্বরী বললে,—আমি যাবো নাট-মন্দিরে। লক্ষ্মীপূজো হবে।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—ডেকে দেবো এলোকেশীকে ?

রাজেশ্বরী বলে,—এলো ডাকবে বলেছে পূজো যখন হবে।

এলোকেশী আসে। বলে,—চল্ রাজো। পুরুত ডাকতে পাঠিয়েছে।

নাট-মন্দিরে যায় রাজেশ্বরী। পায়ে তোড়া। শব্দ হয় ঝম-ঝম।

হঠাৎ দেখা পেয়ে কাছারী শুদ্ধ স্তব্ধ হয়ে যায় যেন। কৃষ্ণকিশোর বলে,—খরচা কে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন ?

বয়োবৃদ্ধ নায়েবদের এক জন বললেন,—আমি হুজুর বলেছিলেম অনন্তকে। হুজুর যদি খরচাটা—

—অনন্ত বলেছে খরচা ? বলে পাঠিয়েছি ? কৃষ্ণকিশোর কথা বলে চড়া মেজাজে। বলে,—লিখেছেন খরচা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। লিখেছি দাতব্য খাতে।

লেখা-পড়া হ'ল না। বাঙলা, সংস্কৃত, ইংরেজী—শেখা হ'ল না একটা ভাষাও। শিক্ষায় জ্ঞান হয়, জ্ঞান হ'ল না কিছুতে। শিক্ষিত না হয়েও কত মানুষ আছে—যারা হয় শিষ্ট ও ভদ্র। ভদ্র রীতি-নীতিও জানলো না। ন্যায় না শিখে শিখলো শুধু অন্যায়, নম্র না হয়ে হ'ল দাম্ভিক। বিগতরা ছিলেন কত জ্ঞানী, কত বিচক্ষণ, কত শিষ্ট ও ভদ্র। বিগতদের কত কষ্টে অর্জিত টাকা-পয়সা, বর্তেছে ভাগ্যক্রমে। যথা ব্যবহার না ক'রে উড়িয়ে দিতে হবে খোলামকুচির মত।

—যদি অন্যায় হয়ে গিয়ে থাকে ক্ষমা করবেন হুজুর। বৃদ্ধ নায়েবটি বললে কম্পিত কণ্ঠে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—টাকা আমার, খরচা আমি করব। লক্ষ গণ্ডা কৈফিয়ৎ দিতে হবে ?

—ক্ষমা করবেন হুজুর। অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

অট্টহাসি। হঠাৎ বিকট শব্দে অট্টহাসে কে।

চমকে ওঠে যে যেখানে ছিল। কে হাসে এত উল্লাসে ? হাসি থামতে চায় না। অবিরাম অট্টহাসি। কাছারীর দালানে কে, যে হাসছে ? লণ্ঠনের আলো। স্পষ্ট মানুষ চেনা যায় না।

—হুজুর কাছারীতে কাজ-কর্ম দেখছো ?

কথা শেষ করে বক্তা হাসে। অট্টহাসি। হো-হো শব্দে।

—পিশেমশাই !

হ্যাঁ, শিবচন্দ্র। হেমনলিনীর স্বামী। কি খেয়াল হয়েছে হঠাৎ দেখা দিয়েছেন। আদ্দির বেনিয়ান, চুনোট-করা থান ধুতি। কোঁচা লুটোচ্ছে। তৈরী হয়ে বেরিয়েছেন শিবচন্দ্র। শিমলেয় যাচ্ছিলেন, গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়েছেন দেখা ক'রে যেতে। হাতে কতগুলো আংটি। লণ্ঠনের আলোয় চিক চিক করছে। বোধ হয় নেশা করছেন, সে জন্য হাসছেন এত অধিক। হাসতে হাসতে বললেন,—ভাল আছো তোমরা ?

—হ্যাঁ। পিশীমা ভাল আছেন ? জহর, পান্না ?

—বিলকুল ভাল। কাজ দেখছো কাছারীতে ? ড্যাম্ গ্ল্যাড হয়েছি দেখে। বলবো গিয়ে পিশীকে। কথা বলছেন পিশেমশাই জোরে জোরে।

'কাছারীতে কাজ দেখছে' কথাটা শুনে নায়েবরা হাসলেন। বিদ্রূপাত্মক হাসি। বয়োবৃদ্ধ নায়েবটি বললেন, চাপা গলায়,—কাছারীতে কাজ দেখছেই বটে।

পিশেমশাই বললেন,—মা চিঠি দিয়েছে ? কাশীতে গিয়ে কোথায় উঠেছে ?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—না। পেয়াদা দু'জন গিয়েছিল। ফিরে বললে, মা অসীতে ঘর ভাড়া করেছে। কে সাধুমা আছে, ঐ সাধুমা মাকে দেখবে বলেছে।

পিশেমশাই বললেন,—পিশীমা ব'লে দিয়েছে গাড়ীটা যখন হোক পাঠিও, আসবে। আমার গাড়ী তো কাজে খাটে।

—হ্যাঁ, পাঠাবো। কৃষ্ণকিশোর বলে।

পিশেমশাই বললেন—যাই তবে।

পিশেমশাই চলে যেতেই কাছারীতে যায় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—পিশীমা গাড়ী চেয়েছেন। আবদুলকে বলে দেওয়া হোক।

—অবশ্যই ভোরে গাড়ী যাবে হুজুর। বয়োবৃদ্ধ নায়েবটি বললেন।

নাট-মন্দির থেকে ফিরে রাজেশ্বরী ঘরে গিয়ে বসেছিল। ভূমিতে, ভেলভেটের গালচেয়। ভাবছিল কি করবে। কি কর্তব্য। ভাবছিল, বলবে স্বামীকে। বলবে, তুমি কাছে থেকে যা খুশী খাও। যেও না কোথাও। ভাবছিল বলবে, যা খেয়েছো খেয়েছো, ভবিষ্যতে—

—বৌ, ভাঁড়ার দেবে কে ? যাবে তুমি, দাঁড়াবে যেয়ে ? কথাগুলো বলে ব্রাহ্মণী। বলে ধীরে ধীরে।

—হ্যাঁ, চল যাচ্ছি। রাজেশ্বরী বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়। বলে,—এলোকেশী কোথায় ?

—ডেকে দেবো ? ব'লে ব্রাহ্মণী।—দিচ্ছি ডেকে।

এলোকেশী আসে। বলে,—কি বলছিস ?

রাজেশ্বরী চুপি চুপি বলে,—কোথায় আছে ? কাছারীতে আছে তো ? আমি যাচ্ছি ভাঁড়ার দিতে।

এলোকেশী বললে,—খোঁজ করছি।

পিশেমশাই চ'লে যেতে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে কাছারীর দালানে। চড়া মেজাজে কথা ব'লেছে। নায়েব মশাইকে ডাকে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—নায়েব মশাই !

নায়েব মশাই বলেন,—হুজুর ! কাছে এসে বলেন,—হুজুর !

কৃষ্ণকিশোর বললে,—হয়তো বেয়াদপি হয়ে গেছে। ভুলে যাবেন, যদি—

কথার মাঝেই কথা বলেন নায়েব। কাঁচুমাচু হয়ে বলেন,—হ্যাঁ, হুজুর। ভুলে গেছি।

খুশী হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। ঘরে গিয়ে দেখে, এলোকেশী রয়েছে। বিছানা করছে। বললে,—তোমাদের মেয়ে কোথায় ?

ঘোমটা টানে এলোকেশী। বলে,—ভাঁড়ার দিতে গেছে।

বলতে বলতে রাজেশ্বরী এসে দাঁড়ায়। এলোকেশী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—ভাঁড়ার দিতে গিয়েছিলে ?

মুখটা থম-থম করছে। চোখ দু'টো বুঝি ফুলে উঠেছে একটু। রাজেশ্বরী বলে,—হ্যাঁ।

কাছে এগিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরীকে টানে বুকের কাছে। জড়িয়ে ধ'রে বলে,—কত কথা আছে।

রাজেশ্বরী ফুঁপিয়ে ওঠে। চেয়ে থাকে ড্যাবা-ড্যাবা চোখ তুলে। যে-চোখে টাটকা কাজল। [ক্রমশঃ।

যাযাবর

আখ্যান

বীরেশ্বরের বিয়ে হয়েছে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। সে আজ অনেক বছর আগেকার কথা। ফুলশয্যার পরদিন দুপুরবেলা নববধূসহ শ্বশুরালয় থেকে গৃহে প্রত্যাগমন করছিলেন। বিদায়ের ক্ষণে মেয়ে যত কাঁদে মেয়ের বাপ তাঁর চেয়ে বেশী। নতুন জামাতাকে জড়িয়ে ধরে বার বার করে বললেন—

"সুবি আমার মা-মরা মেয়ে, বড্ড চাপা। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলবে না। ওর মুখ দেখে তোমাকে বুঝতে হবে ওর কখন কি চাই।"

বীরেশ্বর তখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র। মনে মনে হেসে ভেবেছিলেন, সে আর এমন শক্ত কী?

বোধ হয়, শক্ত হতোও না। কিন্তু বিপর্য্যয় ঘটলো অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার হাত ছিল বীরেশ্বরের। পাঠশালায় বিদ্যাভাসকালে শ্লেটে দিবানিদ্রারত পণ্ডিত মশায়ের প্রতিকৃতি অঙ্কনের দ্বারা সহপাঠিদের কৌতুক ও অধ্যাপকের ক্রোধ উদ্রেক করেছেন অনেক দিন। বাল্যকালের নানাবিধ বায়ুরোগ উপশমের বহুপরীক্ষিত চিকিৎসা—প্রচুর তিরস্কার ও প্রচুরতর কর্ণমর্দ্দন—হলো নিস্ফল। গুরুজনের মুষ্টিযোগের মুষ্টিযোগ ব্যর্থ করে চিত্ররোগ অনড় হয়ে রইল বীরেশ্বরের প্রকৃতিতে।

অগ্নিদাহের সঙ্গে চিরকাল যুক্ত হয় বায়ুবেগ; উচ্ছৃঙ্খল ধনীনন্দনের সঙ্গে বন্ধু। বীরেশ্বরের সঙ্গে যোগ দিলেন তার এক আত্মীয়া। মণি পিসিমা বয়সে নবীন, রুচিতে আধুনিক এবং স্বভাবে মধুর। কলেজের ছুটিতে বেড়াতে এসেছিলেন তাদের বাড়ি। ভ্রাতুষ্পুত্রের অঙ্কনচাতুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে মুখে দিলেন উৎসাহ, হাতে দিলেন উপহার,—ছবি আঁকার এক প্রস্থ রং এবং এক গুচ্ছ তুলি।

অতঃপর বীরেশ্বরকে সংযত রাখা আর কোনো মতেই সম্ভব হলো না। স্কুলের খাতা, অঙ্কের বই, মায় সংসারের ধোবার হিসাব ও দাদামশায়ের জমা-খরচের জাবেদা বিভিন্ন রেখায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল; ঘরের দেয়াল, আলমারীর কপাট, এমন কি, গৃহপালিত মার্জারশাবকগুলি পর্য্যন্ত বিচিত্র রংএর প্রলেপন থেকে রক্ষা পেল না।

ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে বীরেশ্বর এলেন কলেজে। কলকাতায়। স্কুল জীবনের আবেষ্টন ও অভ্যাস অনেক কিছুই ফেলে আসতে হলো পিছনে। ছাড়লেন না শুধু একটি। ছবি আঁকার সখ।

হোষ্টেলের অন্য ছেলেরা যখন গ্রিয়ার গার্সণ ও চার্লস বোয়ের এর জীবনী মুখস্ত করে কিম্বা ফুটবলের মাঠে রেফারীর কর্ণে কটূক্তি ও মস্তকে বিনামা বর্ষণে ব্যস্ত, বীরেশ্বর তখন নিজ কক্ষে আপন মনে তুলি দিয়ে ছবি এঁকেছেন নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগে দিনের পর দিন। অঙ্কনান্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছবির কোনোটা গবাক্ষপথে বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে পথে, কোনোটা পালঙ্কের নীচে ভূতলশায়ী হয়ে পরদিন ভৃত্যের সবেগ সংমার্জনী তাড়নায় কৈবল্য লাভ করেছে আবর্জনার আধারে। কিছু সংখ্যক একত্রিত করে এক সহাধ্যায়ী কলেজের এক উৎসব-সভার আয়োজন করলো এক ক্ষুদ্র প্রদর্শনীর। কে জানত যে তারই মধ্যে লুক্কায়িত ছিল একটি দাম্পত্য প্রেমের ভবিষ্যৎ সমাধি? গেব্রিলো প্রিনজিপ কি কখনও কল্পনা করেছিল যে সেরাজেভোয় তারই নিক্ষিপ্ত পিস্তলের গুলিতে অঙ্কুরিত ছিল ভাদুনের লোকক্ষয়, কাইজারের পতন ও ভার্সাই সন্ধি?

স্থানীয় মার্কিণ কন্‌সাল জেনারেল এসেছিলেন উৎসবে। তিনি বীরেশ্বরের ছবি দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁরই চেষ্টায় এক মার্কিণ সংস্কৃতি সমিতি বীরেশ্বরকে দিতে চাইলেন একটি বৃত্তি। ভারতবর্ষের যে কোনো সরকারানুমোদিত চিত্রবিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কন শিক্ষার সুবিধার্থে। ঐখানেই বিপদের সূত্রপাত।

ছয় শত ডলার। তখনকার দিনের মুদ্রামানে দু'হাজার টাকারও কম। তিন বৎসরের জন্য। উল্লসিত বীরেশ্বর আত্মহারা হয়ে বললেন, তিনি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে সুরু করবেন অনন্যচিত্তে শিল্পসাধনা। কলেজ ছেড়ে দিয়ে ভর্ত্তি হবেন আর্ট স্কুলে।

শুনে বন্ধুরা ক্ষুণ্ণ হয়ে বললো, মাথা খারাপ!

আত্মীয়েরা ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করলো, "আর দেড়টা বছর গেলে পরীক্ষা। কোনো মতে সেকেণ্ড ক্লাশ অনার্স নিয়ে বি, এস, সি-টা পাশ করতে

পারলে যা হোক একটা কিছু করে খাওয়ার পথ হবে।"

অভিভাবকেরা ক্ষাপ্পা হয়ে গর্জ্জন করলেন, "হতচ্ছাড়া কোথাকার; ছবি এঁকে হবে কী? তাতে পেট চলে কারো?"

কিন্তু বীরেশ্বরকে তখন পটের নেশায় পেয়েছে, পেটের কথা ভাববার অবকাশ নেই।

বীরেশ্বরের বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন। অনেককাল রেলের ষ্টেশন মাষ্টার। রেলের বর্ত্তমান অনেক বড় সাহেবকে তিনি ছোট সাহেব-কাল থেকে জানেন। তাঁরাও অনেকে তাঁকে নাম ধরেই ডাকেন। সুতরাং আশা ছিল, কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে পুত্রকে অন্ততঃ শ'দেড়েক টাকা বেতনে সিগনেলার-রূপে ভর্ত্তি করে যেতে পারবেন। ব্যস্। মন দিয়ে খাটলে আস্তে আস্তে প্রমোশন পেয়ে সেও কি আর একদিন এরকম মাষ্টারবাবু হবে না? কথায় বলে, বাপকা বেটা......।

কিন্তু বাপের বুদ্ধির সঙ্গে বেটার বুদ্ধি এ যুগে খুব বেশী যে মিলে এমন প্রমাণ নেই। অন্ততঃ বীরেশ্বরের মিলল না। তিনি তখন শিল্প-জীবনের কল্পনায় বিভোর। পুরোপুরি স্বপ্নরাজ্যে পদচারণা করছেন। সেখানে তিনি র‍্যাফেল ও লিওনার্ড দা ভিঞ্চির উত্তরসাধক, বটিচেলী ও পল্ গগার সগোত্র, অবনী ঠাকুর ও নন্দলালের সতীর্থ। রূপার বোতাম-আঁটা সাদা জিনের কোট গায়ে টুলে বসে দিনের পর দিন ফাইভ আপ আর সিক্সটিন ডাউনের লাইন ক্লিয়ার দিচ্ছেন নিজের জীবনে এমন দুর্ঘটনার কথা তিনি ভাবলেও শিউরে ওঠেন। মনে মনে বলেন, হুঃ। শরৎচন্দ্র যদি রেঙ্গুণের একাউণ্টস আপিসে কেরাণীগিরি করে দেহপাত করতেন কিম্বা সমারসেট্ মম্ যদি সেণ্ট টমাস হাসপাতালে রোগীর নাড়ী টিপে জীবন কাটাতেন তবে পৃথিবীতে দুর্গতির আর সীমা থাকতো কি?

সুবালা তখন পিত্রালয়ে। সদ্যপ্রসূত পুত্রের জননী। বীরেশ্বরের কলেজ পরিত্যাগ ও চিত্রবিদ্যা-ভ্যাসের সংকল্প তাঁর কানেও এসে পৌঁচেছে। জনশ্রুতিতে। তিনি বিশ্বাস করেননি। এর মূলে কিছুমাত্র সত্য থাকলে পত্রযোগে বীরেশ্বর সর্ব্বাগ্রে জানাতেন তাঁকেই—পত্নীপ্রাণের এই সহজাত বিশ্বাসের দৃঢ়তায় সুবালা পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন।

হঠাৎ একদিন সংবাদ এলো। দুঃসংবাদ বলাই ঠিক। সমস্ত শুভানুধ্যায়িগণের সদুপদেশ অগ্রাহ্য করে বীরেশ্বর নিজের কলেজের পাঠ্যপুস্তক সহপাঠিদের বিলিয়ে দিয়ে চলে গেছেন বরোদায়। সেখানকার কলাভবনে সুরু হয়েছে শিল্পের সাধনা। কিছুটা উৎসাহ ও উত্তেজনায়, কিছুটা বা প্রতিকূলতার আশঙ্কায় আত্মীয় স্বজনকে লেখেননি কিছু।

বর্ষীয়সী হিতাকাঙ্ক্ষিণীর দল সুবালাকে অনেক পরামর্শ দিলেন। কেউ বললেন, চিঠি লেখো। কেউ বললেন, টেলিগ্রাফ। কেউ বা উপদেশ দিলেন, একেবারে বারোদায় সশরীরে উপস্থিতির। এমন কি, তাঁর শ্বশুরেরও ইচ্ছা ছিল পুত্রবধূ কঠোর তিরস্কারের দ্বারা বীরেশ্বরকে এই অপরিণামদর্শিতা থেকে নিরস্ত করুন। সে সমস্ত অগ্রাহ্য করে সুবালা স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

সকাতর অনুরোধ, সক্রোধ ভর্ৎসনা, সখেদ অশ্রুপাত দূরে থাকুক, কখনও পত্রে বা বাচনিক আলোচনায় এ প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র করলেন না বীরেশ্বরের কাছে। জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিনে সুবালার কথা যদি বীরেশ্বরের মনে না পড়ে থাকে তবে তিনি কি উপযাচিকা হয়ে তাঁকে তা স্মরণ করাতে যাবেন? ছিঃ। যে পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি আপন স্ত্রী এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন মর্ম্মান্তিকরূপে উদাসীন হতে পারে সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তির সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হতেও তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। দুঃসহ দুঃখের সুতীব্র বেদনায় আপনার চতুর্দ্দিকে এক অপরিসীম ঔদাসীন্যের দুর্লংঘ্য প্রাচীর রচনা করলেন তিনি। আপন অভিমানের যে দুর্ভেদ্য দুর্গে নিজকে তিনি অলক্ষ্যে অপসারিত করলেন তার প্রবেশদ্বার বীরেশ্বরের কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল নিঃশব্দে। নিশ্চিতরূপে। চিরকালের জন্য।

শিল্পশিক্ষার মধ্যপথে বীরেশ্বরের ভগ্নহৃদয় পিতা লোকান্তরিত হলেন। সুবালার দাদারা দুজনেই কৃতী এবং সহোদরার প্রতি গভীর স্নেহপরায়ণ। তাঁদের আগ্রহ ছিল সপুত্র সুবালাকে নিজেদের সংসারে সমাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করা। সুবালা সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে ভর্ত্তি হলেন ট্রেনিং কলেজে। বি, টি পাশ করে এক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কর্ম্ম সংগ্রহ করলেন সম্পূর্ণ আপন উদ্যোগে।

আর্ট স্কুলে শিক্ষা সমাপনান্তে দীর্ঘ দীন বীরেশ্বরের অর্থাগমের পন্থা প্রশস্ত ছিল না। এদেশে চিত্রকরেরা যতটা নাম পায়, ততটা ইনাম পায় না। বক্তৃতা ও প্রবন্ধে তাঁদের সুখ্যাতি থাকে অজস্র। কিন্তু সে কেবলি শব্দ, তার পিছনে অর্থ নেই। ক্বচিৎ কদাচিৎ মাসিক পত্রে দু'একখানা ছবি মুদ্রণের দ্বারা যে উপার্জ্জন হয় সেটা উচ্চারণ করতে বিনা রংয়েই চিত্রকরের কর্ণদ্বয় রক্তিম হয়ে ওঠে।

বীরেশ্বরের জীবনেও সে অধ্যায় গেছে। সেই অসচ্ছলতার দিনে আপন উপার্জ্জনের দ্বারা সংসার-যাত্রাকে সুবালাই সচল রেখেছিলেন। বীরেশ্বর কখনও জানতেও পারেননি কী ভাবে সংগৃহীত হয়েছে তার নিজের ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ, পুত্রের সেণ্ট জেভিয়ার্সে অধ্যয়নের ব্যয়, কেমন করে ঘটেছে প্রাত্যহিক আহার্য্যের নিয়মিত ভদ্রোচিত আয়োজন, কোথা থেকে এসেছে রোগীর পথ্য, চিকিৎসকের দক্ষিণা, এবং প্রয়োজন হলে বায়ুপরিবর্ত্তনের সমুদয় অর্থ।

ধীরে ধীরে বীরেশ্বরের ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। আজ তাঁর মাসিক উপার্জ্জন অনেক বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টারের পক্ষেও ঈর্ষার যোগ্য। অথচ সুবালার আচরণে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটেনি। আজও তিনি তেমনি নির্ব্বাক নৈপুণ্যে সংসার পরিচালনা করেন। দশটা বাজতে না বাজতে নিয়মিত বেঁটে ছাতা ও ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে ট্রামে চেপে স্কুলে যাত্রা করেন। পাঁচটায় ক্লান্ত দেহে ফিরে এসে ব্যবস্থা করেন বৈকালিক চা-পর্ব্বের।

স্বচ্ছলতার দিনেও এই অনাবশ্যক কৃচ্ছ্রসাধনা থেকে সুবালাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়নি। বীরেশ্বর মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা দ্বারা সুবালা সে আলোচনা এড়িয়ে গেছেন সুকৌশলে।

বেশী পীড়াপীড়ি করার সাহস হয় না বীরেশ্বরের। সংসারের অন্য আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিল নেই সুবালার, একথা বীরেশ্বর পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা জেনেছেন। নিজের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থায় সবাই খুশি হয়, এটা প্রচলিত ধারণা। কিন্তু সুবালার সামান্য সহায়তার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছেন, শুধু বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছেন। আশ্চর্য্য!

সেবার পূজার সময় একদিন মার্কেটে বীরেশ্বরের দেখা হয়ে গেল তাঁর এক দূর সম্পর্কিত ভগিনী ও ভগিনীপতির সঙ্গে। তাঁরা দুজনে পূজার সওদা করছিলেন! ভগিনী প্রশ্ন করল, "বউদির জন্য এবার কি শাড়ী কিনলে, বীরেশ্বর দা'?"

বীরেশ্বর জবাব দিলেন, "বউদির শাড়ি? সে আমি কিনবো কেন?"

"বাঃ, তুমি কিনবে না তো কিনবে কে?"

"কেন, তোর বউদি। আমাদের সবার জামা কাপড়ই তো সে কেনে।"

বিস্মিত কণ্ঠে বোন বলে, "তোমাদের জামা কাপড় তিনি কিনতে পারেন। তা বলে তাঁর নিজেরটাও কি তিনি কিনবেন? আর যদি বা কেনেনও তা হলে আর তোমার দিতে নেই নাকি? তুমি কি কখনও বউদিকে কিছু কিনে দাও না?"

"না তো। টাকা পয়সা তো সবই তার কাছে থাকে। তার যখন যা দরকার তা সেই কিনে নেয়। আমি তো মাসের শেষে পূরো মাইনেটা তার হাতে তুলে দিয়েই খালাস।" বলে আত্ম-প্রসাদের হাসি হাসেন বীরেশ্বর।

"এই তোমার বুদ্ধি? এমন না হলে আর আর্টিষ্ট!" সহাস্যে মন্তব্য করলেন ভগিনীপতি।

একখান' বাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ি নির্ব্বাচন করে ভগিনী বীরেশ্বরের হাতে দিয়ে বললেন, "নাও, এই শাড়িটা নিয়ে যাও বউদির জন্য। ফিকে নীলের উপরে ঘন নীল আর সোনালী জরির আঁচলা, ফর্সা রঙ্গে বউদিকে খাশা মানাবে। তেষট্টি টাকা দাম আজকালকার হিসেবে খুব বেশী নয়। আচ্ছা, তোমার কাছে টাকা না থাকে তো, আমি দিচ্ছি। পরে পাঠিয়ে দিও, তা'হলেই হবে।"

কিন্তু যাঁর জন্যে শাড়ি তাঁর আচরণ একান্ত হতবুদ্ধিকর। খুশি হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে সুবালা বলে উঠলেন,

"শাড়ি কার জন্যে?"

"তোমার।"

"আমার? আমার জন্য শাড়ি তোমাকে কে আনতে বলেছে?"

সত্য গোপন করে বীরেশ্বর বললেন, "কেউ বলেনি। আমি নিজেই কিনেছি। ব্লু রংটা তোমাকে খুব চমৎকার······"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সুবালা বাধা দিয়ে বললেন,

"কেন, কেন, তুমি শাড়ি কিনতে গেলে আমার জন্যে ?"

অপ্রস্তুত বীরেশ্বর শাড়ির প্যাকেটটা স্ত্রীর হাতে দিতে দিতে থেমে গেলেন।

ইতস্ততঃ করে বললেন, "কিছু অন্যায় হয়েছে কি? আমি তো ঠিক বুঝতে পারিনি। রাণী আর ওর বর সীতেশের সঙ্গে দোকানে দেখা হয়েছিল। তারা বললে......তোমার কি পছন্দ......"

"অন্যায়, খুব অন্যায়। কোনো দিন যেন তুমি আর......" বলতে বলতে দর দর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়লো সুবালার দুই নেত্র থেকে কপোলে, গণ্ডে, বক্ষে। দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন কক্ষান্তরে।

প্রত্যাখ্যাত শাড়ির প্যাকেটটার পানে তাকিয়ে হতবাক বীরেশ্বর দাঁড়িয়ে রইলেন একা। ইতিপূর্ব্বে সুবালার চক্ষে জল দেখেননি তিনি কখনও। সুতরাং তার মনোবেদনার পরিমাণ অনুমান করতে পারলেন। কিন্তু হেতু খুঁজে পেলেন না। সংসারে অন্য লোকের স্ত্রীরা শাড়ির জন্য বায়না ধরে, শুনেছেন। শাড়ি উপহার দিলে আহত হয়ে অশ্রুপাত করে কোন্ রমণী ?

বীরেশ্বর ভেবে ভেবে কূল পান না।

পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত আসনে ফিরে এসে বীরেশ্বর অর্দ্ধ-সমাপ্ত ঘটচিত্রণ সম্পূর্ণ করতে লাগলেন। তুলি তুলে নিলেন হাতে। রক্তাভ গৈরিক বর্ণের মৃৎ-কুম্ভটির গায়ে চিক্কণ শ্বেত রেখায় দুগ্ধ-ধবল একটি শঙ্খলতা এঁকে দিলেন ধীরে ধীরে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, বহু বর্ষ আগে তাঁকে দিয়ে সুবালা ঠিক এমনি একটি শঙ্খলতার নক্সা আঁকিয়ে নিয়েছিলেন বালিশের ওয়াড়ে। সোনালী সিল্কের সূতায় তার উপরে স্বহস্তে রচনা করেছিলেন সুশ্রী সূচীশিল্প।

কলেজ-হোষ্টেলের অপরিপাটি শয্যায় উপাধানগাত্রে এই সীবন সৌকুমার্য বহুজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে সহপাঠিদের মধ্যে প্রচুর কৌতুক পরিহাসের কারণ হয়েছিল। বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বর থেকে ক্ষীণ ধারায় বয়ে আসে সুদূর অতীতের উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত দিনগুলির একটু আধটু আভা, বৈশাখের অরণ্যপ্রান্তে বিগত বসন্তের দ্রুত বিলীয়মান মৃদু পুষ্পবাসের মতো।

"কী হে বীরেশ্বর, তুলি হাতে নিয়ে ঊর্দ্ধমুখী হয়ে আছো যে? কার ধ্যান করছো? কলালক্ষ্মীর না গৃহলক্ষ্মীর?" বলে সিদ্ধনাথ সহাস্যে পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বীরেশ্বর চমকে উঠে পুনরায় অঙ্কনকার্যে মনোনিবেশোদ্যোগ করলেন। বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ঈষৎ চাপ দিয়ে টিউব থেকে তুলীর উপরে রং মাখিয়ে নিতে নিতে সলজ্জে উত্তর দিলেন, "দাদা, এ বয়সে কি আর কোন লক্ষ্মী বর দেবেন যে, ধ্যান করবো?"

"ঠিক বলেছ ভায়া। আমাদের বয়সে লক্ষ্মী সরস্বতীকে ডেকে আর কাজ নেই। তার চেয়ে বরং নন্দী মামাকে ভজনা করা ভালো। খুসী হয়ে যদি দু'চার হন্দর সিদ্ধি পাঠিয়ে দেন তো এই কণ্ট্রোলের দিনে ব্ল্যাক মার্কেট করে কিছু গুছিয়ে নিতে পারি। হাঃ, হাঃ হাঃ।" সিদ্ধনাথের অট্টহাস্য প্রায় সিকি মাইল দূর থেকে শোনা যায়।

বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায় সিধুদা'? মিসেস্ সেন কম করে হোক অন্ততঃ তিনবার তোমার খোঁজ করেছেন।"

"ওঃ, তাই নাকি? বড়ই অন্যায় হয়েছে দেখছি! আর বল কেন ভাই, গিন্নী সেই থিয়েটারের নাম শোনা ইস্তক আজ একমাস ধরে রোজ দুবেলা শাসাচ্ছেন, তিনি অভিনয় দেখতে আসবেনই। যতো বলি, আমার দু লাইনের পার্ট, প্রায় মৃত সৈনিকের ভূমিকা বললেই চলে। সে আর দেখে কী হবে? তত তাঁর জেদ বাড়ে। মনে মনে বোধ হয় ঠাউরেছেন যে, নিশ্চয়ই রাজপুত্র-টুত্র সেজে এই বৃদ্ধ বয়সে কোন সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে প্রেম করবো, তাই তাঁকে দেখতে দিতে চাইনে। হাঃ, হাঃ হাঃ" বলে আর একদফা উচ্চ হাস্য করলেন সিদ্ধনাথ।

সিদ্ধনাথ মিত্র একটা বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। দিলদরিয়া গোছের লোক। পঞ্চাশ অতিক্রম করেছেন বছর দু তিন হবে। কিন্তু এখনও বয়সের তর্জ্জনী সঙ্কেতের দ্বারা আপনাকে তারুণ্যের অলকাপুরী থেকে বার্দ্ধক্যের রামগিরিতে নির্ব্বাসিত করেননি। খেলাধূলা, গান-বাজনা, অভিনয়, আবৃত্তি সর্ব্ব বিষয়েই তাঁর উৎসাহ অসাধারণ। কোনটাতেই তাঁর নিজের ব্যক্তিগত পারদর্শিতা বিশেষ নেই, কিন্তু অন্য আর পাঁচজনকে একত্রিত করে একটা কিছু জাঁকিয়ে তোলার কাজে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

তুলির রেখার উপরে দৃষ্টি রেখে অঙ্কনরত বীরেশ্বর বললেন, "বেশ তো, আসুন না।"

"তুমি তো ভায়া বলেই খালাস। এদিকে আমাকে যে এখানকার ব্যবস্থা ফেলে রেখে ছুটতে হয়েছে বাড়িতে। এত করে বললাম, পাশের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে এসো। না, আমাকে নিজে গিয়ে নিয়ে আসা চাই। বলেন, অন্য কোন সাধারণ সিনেমা, থিয়েটারে আর কাউকে নিয়ে যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে আমার বন্ধুবান্ধবদের ব্যাপার, আমার সঙ্গে না এলে নাকি তাঁর সম্মানের হানি ঘটে। কী আর করি? হুজুরাণীর হুকুম তো না মেনে রক্ষে নেই।" বলে সিদ্ধনাথ অসহায় কাতরতার ভঙ্গি করলেন। কিন্তু এই কপট অভিযোগের অন্তরালে স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রীতির যে সুনিশ্চিত প্রমাণ তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হলো সেটা বীরেশ্বরের মতো অমনোযোগী মানুষের পর্যন্ত দৃষ্টি এড়ায় না।

"তোমার শ্রীমতী আসছেন কখন?" সিদ্ধনাথ জিজ্ঞাসা করেন।

বীরেশ্বর সংশয়ের স্বরে বললেন, "কী জানি, আসবেন কি না—"

"আসবেন কি না কী হে? বলেন নি তোমায় কিছু? অবাক করলে। দেখছি, ছবিতে যত রাজ্যের সুন্দরীর মুখ এঁকে এঁকেই গেলে, নিজের স্ত্রীর মুখের পানে তাকাবার বুঝি আর সময় পেলে না? ওহে, বুড়োমানুষের কথাটা মনে রেখো, বাড়ির গিন্নীটি সবার আগে। ওসব বান্ধবী-টান্ধবী হচ্ছে বিলাতী ডিনার সুট। ফিটফাট, ধোপ দুরস্ত। সন্ধ্যেবেলা পরে ক্লাবে, পার্টিতে যেতে মন্দ নয়। স্ত্রী হলো আমাদের সেকেলে দোলাই। কাট, ছাট, ইস্তিরির জৌলুস নেই বটে, কিন্তু এমন কাজের জিনিষ আর নেই ভাই। গ্রীষ্মে কাঁধে চাপালে, শীতে গায়ে জড়ালে, রোদ বৃষ্টিতে মাথায় বাঁধলে।" বলে নিজের রসিকতায় নিজেই উৎফুল্ল হয়ে আর এক প্রস্থ অট্টহাস্য করলেন সিদ্ধনাথ। তারপর বীরেশ্বরকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য আরোপ করে উপদেশ দিলেন।

"না হে, যা বলছি শোন। এক্ষুনি বাড়ি চলে যাও, বউমাকে নিয়ে এস। বুঝেছি, একটু মনান্তর হয়েছে আর কি। সে কিছু নয়। এক সঙ্গে ঘর করতে গেলে অমন হয়েই থাকে। এই আমারই দেখ না, গিন্নির সঙ্গে কথা কাটাকাটি তো এক রকম লেগেই আছে। তা বলে একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনের চলে কি? এক দণ্ডও না। শাস্ত্রকারেরা তো বলেই গেছেন,—অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে—কী হে পূরো কথাটা?"

সিদ্ধনাথ ব্যস্ত মানুষ। বেশীক্ষণ একস্থানে স্থির হয়ে থাকা তাঁর স্বভাবে নেই। ইতস্ততঃ ছুটোছুটি না করলে তাঁর মনে স্বস্তি থাকে না। "যাই দেখিগে এদিকে সাজ পোষাকগুলি ঠিকমতো এসে পৌঁছেছে কি না। মিসেস্ সেন যা উতলা মানুষ। হয় তো বা এরই মধ্যে গাড়ি নিয়ে ছুটেছেন দোকানে!" বলে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বীরেশ্বরের হলো কী? তাঁর হাতের তুলি চলতে চায় না কেন? মালতীর পদশব্দে তাঁর খেয়াল হলো প্রায় মিনিট দশেক তিনি তুলি রেখে দিয়ে নিঃশব্দে নিষ্ক্রিয় বসে আছেন। আত্মস্থ হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধকার শ্রাবণ দিনের অপরাহ্ন বেলায় ছিন্ন মেঘের অন্তরাল থেকে অকস্মাৎ বিচ্ছুরিত এক ঝলক সূর্যকিরণ যেমন মুহূর্ত্ত মধ্যে ধরণীর দিগদিগন্ত উজ্জ্বল করে তোলে, বীরেশ্বরের মনেও তেমনি হঠাৎ যেন এক বিস্ময়কর উপলব্ধির আলোকে নবীন অনুভূতি দেখা দিল। তাই তো, বাড়ি গিয়ে নিজে সুবালাকে নিয়ে এলে হয়। কী আশ্চর্য্য, একথাটা তো এর আগে খেয়াল হয়নি।

অসমাপ্ত অঙ্কনকার্য্যের ভার মালতীর হস্তে ন্যস্ত করে তিনি চললেন মলী সেনের সন্ধানে।

বেশী দূর যেতে হলো না।

মলী সেন বুঝি বীরেশ্বরের খোঁজেই আসছিলেন। এগিয়ে গিয়ে বীরেশ্বর বললেন, "মিসেস্ সেন, আমাকে একবার বাড়ি যেতে······"

বাক্য সমাপ্ত করার অবকাশ পেলেন না। মলী সেনের মুখের পানে তাকিয়ে অর্দ্ধ পথেই থেমে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,

"ব্যাপার কী মিসেস্ সেন? কী হয়েছে?"

"এই দেখুন কাণ্ড" বলে মলী সেন বীরেশ্বরের দিকে একটি পুস্তিকা এগিয়ে দিলেন।

অভিনয়ের প্রোগ্রাম।

অভিজাতগণের অভিনয়োৎসবে অভিনয়ের পরিচয় পুস্তিকা—প্রোগ্রামটি—একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। অবশ্য তাতে অভিনয় সংক্রান্ত তথ্য অতি সামান্যই

থাকে। এক পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন, কোনোটা জড়োয়া গহনার, কোনোটা বিলাতী প্রসাধন দ্রব্যের, কোনোটা বা সিগারেট বা চা বিক্রেতার। অপর পৃষ্ঠায় প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পনির্দ্দেশক ইত্যাদির নাম। পৃষ্ঠান্তরে অভিনয়ের কোন বিশেষ দু'একটি দৃশ্যের আগের ভাগে তোলা ফটোগ্রাফ এবং নায়ক-নায়িকাদের পোর্ট্রেট।

এ ধরণের অভিনয় যাঁরা হামেশাই দেখেন, তাঁরা জানেন, প্রোগ্রামে মুদ্রিত কোন কোন মহিলার ফটো-গ্রাফস্থ তন্বীদেহের সঙ্গে তাঁদের বর্ত্তমান মেদবহুল বপুর মিল অতি সামান্যই আছে। সেটা আশ্চর্য্য নয়। কারণ সেগুলি অন্ততঃ সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে তোলা ও ফটোশিল্পী কর্তৃক সংমার্জিত—ইংরেজীতে যাকে বলে রিটাচড্—ফটোগ্রাফ। প্রোগ্রামে মুদ্রণের জন্যই সযত্নে নির্ব্বাচিত। আসলে সেগুলি—মা যাহা ছিলেন ; মা যাহা হইয়াছেন নয়।

মুদ্রণ পারিপাট্যে ও গঠন সৌষ্ঠবে অনেক ক্ষেত্রে অভিনয়ের চাইতে অভিনয়ের প্রোগ্রামটিই অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষক হয় ; আধুনিক ইভিনিং পার্টিতে অধিকাংশ মেয়েদের রূপের চাইতে পোষাকের মতো।

এই অভিনয়েরও একটি মনোহারিণী পরিচয় পুস্তিকা রচনার জন্য মলী সেনের ব্যগ্রতার অবধি ছিল না। বহু দিন বীরেশ্বরের সঙ্গে তার পরিকল্পনা, আকৃতি ও মুদ্রণ সম্পর্কে তিনি বহু জল্পনা কল্পনা করেছেন। উভয়ের সম্মিলিত চিন্তা, যত্ন ও নৈপুণ্যে অবশেষে এমন একটি সুচিত্রিত পুস্তিকার পরিকল্পনা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয় যাতে রুচি এবং রূপের অতি প্রশংসনীয় সমন্বয় ঘটেছিল। মলী সেনের আশা ছিল, বহু বর্ণে চিত্রিত ক্রিস্‌মাস্ কার্ডের মতো এক টাকা মূল্যের এই সুদৃশ্য প্রোগ্রামটিও অভিনয়ান্তে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য কোনো কোনো দর্শকজনের ড্রয়িং রুমে মেণ্টেলপীসের শোভা বর্দ্ধন করবে। হায়, তার পরিণতি দেখে মলী সেনের প্রায় দুঃখে কান্না পাওয়ার উপক্রম। ক্রোধে বীরেশ্বরের বাক রোধ।

বহু ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত অতি পুরাতন আংশিক ভগ্ন টাইপে মুদ্রিত, মফঃস্বল আদালতের নীলাম ইস্তাহারের মতো অস্পষ্ট, অপরিচ্ছন্ন। অভিনে..., অভিনেত্রীগণের ছবিগুলি বিকৃত ও মসীলিপ্ত। অতীতের কোনো কোনো বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে ছবি সম্পর্কে কিম্বদন্তী এই যে, ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে একটি মাত্র ব্লকের নীচে আবশ্যকানুযায়ী কেবল মা... পরিচয় লিপি বদলিয়ে বিভিন্ন জননেতার প্রতিকৃতি চালানো হতো। বালগঙ্গাধর তিলক বক্তৃতা করিতেছেন এবং সি, কে, নাইডু ব্যাট করিতেছেন এ দুটি ছবির ব্লক একই, তফাৎ শুধু ক্যাপশানে। এই প্রোগ্রামে ছবি দেখে সে জনরবের কারণ অনুমান করা চলে। অতি নিকট আত্মীয়গণের পক্ষেও এই ছবি থেকে ছবির পাত্রপাত্রীদের সনাক্তকরণ দুঃসাধ্য। কাণ্ডই বটে। প্রায় লঙ্কাকাণ্ড বললেই হয়।

ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বীরেশ্বর বললেন, "প্রেসের ম্যানেজারকে ধরে চাবকানো দরকার। এ কি আর্ট পেপার, এ তো সিলকেশান—আসল আর্ট পেপারই নয়। ইমিটেশান। এই কাগজে আর্ট প্লেট ছাপা চলে ?"

মলী সেন এসব টেকনিক্যাল ব্যাপার সামান্যই বোঝেন। তিনি মিনতি করে বললেন, "এ প্রোগ্রাম তো কারো হাতে দিতে পারবো না। যা হয় একটা উপায় করুন, বীরেশ্বরবাবু।"

বীরেশ্বর বললেন, "সে কথা ঠিক। কিন্তু আমাকে যে এখন একবার বাড়ি যেতে হচ্ছে মিসেস্ সেন।"

"বাড়ি এখন থাক, বীরেশ্বরবাবু, আপনি একবার না হয় প্রেসেই গিয়ে দেখুন, যদি কিছু করা যায়।"

"প্রেসে অন্য কাউকে পাঠালে হয় না ? সুবালাকে—মানে আমার স্ত্রীকে একবার······"

বাধা দিয়ে কাতর কণ্ঠে মলী সেন বললেন, "অন্য আর কাউকে দিয়েই একাজ হবে না। দোহাই আপনার বীরেশ্বরবাবু। এক্ষুনি একবার গাড়িটা নিয়ে যান, এই প্রোগ্রাম নিয়ে কাউকে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না। আর দেরী করবেন না। প্লিজ।"

ঊর্দ্ধশ্বাসে বীরেশ্বরকে ছুটতে হলো ছাপাখানার উদ্দেশ্যে। সুবালা রইলেন,—কোথায় ? ঠিক যেখানে ছিলেন সেখানে। [ক্রমশঃ।

-প্রচ্ছদপট-

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কোনারকের সূর্য্য-মন্দিরের আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল। চিত্রটি জে, আর, সেনগুপ্ত (কলি-২৯) কর্ত্তৃক গৃহীত।

দু'টি অভিভাষণ

বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর অভিভাষণ

আজ এই ইনষ্টিটিউট উৎসর্গ করিলাম। ইহা শুধু গবেষণাগার নয়—মন্দির। আমাদের ইন্দ্রিয় সাহায্যে প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা কৃত্রিম উপায়ে অনুভব-গ্রাহ্য এই বিরাট বিশ্বের মধ্য দিয়া যে সত্য উপলব্ধি করা যায়, সেই সকল প্রতিষ্ঠার জন্য পদার্থ-বিজ্ঞানসম্মত শক্তি প্রয়োগ করা হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দ যখন শ্রবণশক্তির বাহিরে চলিয়া যায়, তখনও আমরা কম্পন অনুভব করিয়া থাকি। মানুষের দৃষ্টিশক্তি যেখানে চলে না, সেখানে অদৃশ্য জগতেও আমরা সত্য জানিবার চেষ্টা করি। আমরা যাহা দেখিতে পাই না, তাহাই বিরাট, তাহার তুলনায় আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা সামান্য, নগণ্য। মানুষের ইন্দ্রিয় পূর্ণ নয় বলিয়া সে বিরাট অজ্ঞাত সমুদ্রে দুঃসাহসিক অভিযান চালায়। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য বিজ্ঞান যে সমস্ত উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার বাহিরেও অনেক সত্য থাকিয়া যায়। সে সকলের জন্য আমাদের আবশ্যক বিশ্বাসের ; সে বিশ্বাসের পরীক্ষা কয়েক বৎসরে হইবার নয়, সমগ্র জীবন ভরিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে হয়। যে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বাস আবশ্যক হইয়াছিল, তাহার উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির হিসাবে এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে। যে ব্যক্তিগত—সাধারণও বটে—সত্য ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার স্মৃতি এই মন্দির, তাহা এই যে, কেহ কোন মহান্ কার্য্যে জীবন সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিলে রুদ্ধদ্বার মুক্ত হয়, যাহা প্রথমে অসম্ভব মনে হয়, তাহা তখন তাহার পক্ষে সম্ভব হয়।

৩২ বৎসর পূর্ব্বে আমি বিজ্ঞানের অধ্যাপনা পেশারূপে গ্রহণ করি। এইরূপ বলা হইত যে, ভারতবাসীদের মন অদ্ভুত ভাবে গঠিত বলিয়া তাহা প্রকৃতির তত্ত্ব পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত না হইয়া দার্শনিক গবেষণার দিকেই বরাবর আকৃষ্ট হইবে। অনুসন্ধান ও ঠিক লক্ষ্য করার ক্ষমতা থাকিলেও সে সকলের ব্যবহারের সুযোগ ছিল না। যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত ল্যাবোরেটারী অথবা দক্ষ যান্ত্রিকও ছিল না। কিন্তু আমরা সেই জাতির লোক, যাঁহারা সহজ সরল উপায়েই মহান্ কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া আমি আমার অজ্ঞাতসারে পদার্থ-বিজ্ঞান ও শারীর-বিজ্ঞানের সীমান্ত অঞ্চলে নীত হই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখি, উভয়ের সীমারেখা লোপ পাইতেছে এবং চেতন ও অচেতনের রাজ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ইন্-অরগানিক (অ-প্রাণীয়) দ্রব্য স্থিতিশীল ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া মনে হয়। সার্ব্বজনীন প্রতিক্রিয়া ধাতু, উদ্ভিদ ও জীবকে যেন একই সাধারণ নিয়মের অধীন করিতেছে বলিয়া মনে হয়। সকলের মধ্যেই যেন প্রধানতঃ শ্রান্তি ও অবসাদের একই রকম লক্ষণ দেখা যায়। সেই সঙ্গে পুনরুজ্জীবনের ও উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং মৃত্যুর সঙ্গে যে স্থায়ী সংবেদনা ভাব থাকে, তাহারও লক্ষণ দেখা যায়। আমি তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হই। আমি বিশেষ আশান্বিত হৃদয়ে রয়্যাল সোসাইটীর সমক্ষে আমার গবেষণার ফলাফল পরীক্ষা সহকারে প্রদর্শিত করি। সেখানে আমার বক্তব্য বলিবার পর শারীর বৈজ্ঞানিকরা আমাকে পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই আমার গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখিবার পরামর্শ দেন।

পরবর্ত্তী ১২ বৎসর আমাকে আশাহীন অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত করিতে হয়। আমার জীবনের এই সময়টার উল্লেখ আমি সংক্ষেপে করিলাম এই জন্য যে, যিনি সত্যের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহার জানিয়া রাখা উচিত, তাঁহার জীবন-পথ খুব সহজ হইবে না, তাঁহাকে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়াই যাইতে হইবে। তাঁহাকে লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া নিজ জীবন সত্যের সন্ধানে উৎসর্গ করিতে হইবে। আমার ক্ষেত্রে এই দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকার হঠাৎ দূরীভূত হয়। ভারত সরকার আমাকে ১৯১৪ সালে বৈজ্ঞানিকদের দরবারে পাঠান। সেখানে আমি জগতের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সোসাইটীগুলির সমক্ষে আমার আবিষ্কারগুলি উপস্থিত করিবার সুযোগ পাই। তাহার ফলে আমার নূতন মত ও গবেষণার ফল সকল স্বীকৃত হয়। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতায় জানি, ভারতে সত্যানুসন্ধিৎসুর অসুবিধা কত বেশী এবং সময় সময় তাহা কিরূপ নৈরাশ্যজনক হইয়া উঠে। ইহা সত্ত্বেও আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে, যাহারা আমার পরে এ পথে আসিবে, তাহাদের কাজ যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্টকর হয়, তাহার পথ আমি করিব এবং কয়েক বৎসরের পরিশ্রমে যাহা পাওয়া গিয়াছে, ভারতকে যাহাতে তাহা ত্যাগ করিতে না হয়, তাহারও ব্যবস্থা আমি করিব।

ভারত কি লাভ করিবে ও বজায় রাখিবে? পাশ্চাত্য তাহার পার্থিব প্রচেষ্টায় সুফল পাইয়াছে, তাহার ক্ষমতা ও অর্থ বৃদ্ধি করিয়াছে। জাগতিক ব্যাপারে জ্ঞানের প্রয়োগের জন্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেকে সচেষ্ট। কিন্তু তাহা রক্ষার জন্য ততটা নয়, যতটা ধ্বংসের জন্য। সংযমের শক্তির অভাবে সভ্যতা ধ্বংসের মুখে কম্পমান অবস্থায় উপনীত। মানুষ যে উন্মত্তের মত ছুটিতেছে, তাহার পরিণাম বিষম বিপত্তি। তাহা হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ সহায়তাকারী আদর্শ থাকা আবশ্যক। মানুষ তাহার দুরাকাঙ্ক্ষার প্রলোভন ও উত্তেজনার অনুসরণ

করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু সাফল্য কিসের—কোন্ শেষ উদ্দেশ্যের জন্য—সে-কথা চিন্তা করিবার জন্য সে এক মুহূর্ত্তও থামিতেছে না। সে ভুলিয়া গিয়াছে, জীবনে প্রতিযোগিতা অপেক্ষা পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাতেই অধিক ক্ষমতা পাওয়া যায়। এ দেশে যুগে যুগে এমন সব লোকের আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা সময়োপযোগী আশু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পরিবর্ত্তে জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ লাভের জন্য নিষ্ক্রিয় আত্মত্যাগে নয়, সক্রিয় জীবন-সংগ্রামে ব্রতী হন। যাঁহারা সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সুফল দিয়া জগৎকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন।

অন্যকে প্রদান করিবার, সমৃদ্ধ করিবার, মানব-সমাজের আহ্বানে আত্মত্যাগের এই আদর্শই মানব সভ্যতার সহায়তাকারী আদর্শ। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই আদর্শের মূলে থাকে না; সকল প্রকার ক্ষুদ্রতা-ত্যাগে—যে অজ্ঞান বলে, অন্যের ক্ষতি করিয়া যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই লাভ—সেই অজ্ঞানের মূলোচ্ছেদেই ইহার মূল।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকগণের নিকট বিভিন্ন পেশা যোগ্য কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। যে সকল মুষ্টিমেয় যুবক অন্তরের বাণী উপলব্ধি করিয়া, জ্ঞানলাভের জন্যই জ্ঞানলাভের ও সত্য নিজে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত দৃঢ় চরিত্র ও উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহাদের সমগ্র জীবনে অফুরন্ত সংগ্রাম করিয়া যাইবেন, আমি আমার ছাত্র হইবার জন্য সেইরূপ যুবকদিগকেই আহ্বান জানাইতেছি।

আমার ইহাও ইচ্ছা, যত দূর স্থান সঙ্কুলান হইবে বিভিন্ন দেশের কর্ম্মীরা এই ইনষ্টিটিউটে সুবিধা পাইবেন। এইরূপ ব্যবস্থা আমি আমার দেশের ঐতিহ্য অনুসারেই করিতেছি। ২৫ শতাব্দী পূর্ব্বে এ দেশ জগতের বিভিন্ন দেশের ছাত্রদিগকে নালন্দা ও তক্ষশিলার বিদ্যাপীঠে সাদর অভ্যর্থনা জানাইত।

পাশ্চাত্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানলাভের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার ফলে মূল সত্য—জগতে যে কেবল একটি সত্য থাকিতে পারে এবং একটি বিজ্ঞানের মধ্যেই ঐ সকল শাখা বর্ত্তমান, ইহা লক্ষ্য-পথে না পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ভারতবাসীর মন যে ভাবে ভাবিতে অভ্যস্ত, তাহাতে তাহারা এক দিন এই একতার আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিবে, তাহারা এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতে এক সুশৃঙ্খল বিশ্ব ব্যবস্থা দেখিতে পাইবে। এই ভাবে চিন্তা করিতে করিতেই আমি এক দিন নিজের অজ্ঞাতসারে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সীমারেখায় উপনীত হই। গত ২৩ বৎসরে আমি যে ১৫০টি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করি, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমি এখন তাহার মধ্যে প্রাকৃতিক অনুক্রম দেখিতে পাইতেছি।

পার্থিব দ্রব্যের স্ফুরণ, জীবনের স্পন্দন, বুদ্ধির চাঞ্চল্য, স্নায়ুর তাড়না ও তাহার ফলে অনুভূতি—এ সকল কত বিভিন্ন রকমের, কিন্তু তাহার মধ্যে কি একতা! আবার, স্নায়ুর উত্তেজনার কম্পন শুধু স্থানান্তরিতই করা যায় না, রূপান্তরিত ও দর্পণে প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় তাহার প্রতিবিম্বও গ্রহণ করা যায়। ইহার মধ্যে কোন্‌টি অধিক বাস্তব—পার্থিব বস্তু অথবা তাহার প্রতিবিম্ব? ইহার মধ্যে কোন্‌টি অবিনশ্বর—ধ্বংসের অতীত?

বৈদিক যুগে এক জন মহিলাকে তাঁহার ইচ্ছা মত ধন লইতে বলা হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা কি তাঁহাকে অমর করিবে? যদি তাহা তাঁহাকে অমর না করে, তাহা হইলে তিনি তাহা লইয়া কি করিবেন? ইহাই ভারতের আত্মার চিরন্তনী বাণী। অতীতে অনেক জাতির উদ্ভব হইয়াছে। তাহারা জগৎ-সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু এখন তাঁহাদের বংশের স্মৃতি—মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত মাত্র কিছু ভগ্ন জিনিষপত্র। পার্থিব সম্বন্ধে নয়, উন্নত চিন্তায়; সমৃদ্ধিতে নয়, আদর্শে অমরত্বের বীজ নিহিত। সম্পদ বৃদ্ধিতে নয়, মতবাদ ও আদর্শের উদার প্রচারে প্রকৃত মানব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অশোক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়া জগৎবাসীকে সুখী করিবার চেষ্টা করেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট অর্দ্ধ আমলকী ব্যতীত আর দিবার কিছুই ছিল না। কেহ যেন তাঁহার ঐ অর্দ্ধ আমলকীটি গ্রহণ করেন—ইহাই তাঁহার শেষ অনুরোধ ছিল।

এই ইনষ্টিটিউটের কার্ণিশে অশোকের সে অর্দ্ধ আমলকীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। দধীচি ঋষির অস্থি হইতে যাহাতে দেবতাদের শত্রুবিনাশের জন্য বজ্র নির্ম্মিত হইতে পারে, সে জন্য সেই পূত-চরিত্র মুনি তাঁহার জীবন দান করেন। সেই বজ্রের প্রতীক সর্ব্বোপরি স্থান পাইয়াছে। আমরা অর্দ্ধ আমলকীই কেবল দিতে পারি। কিন্তু অতীত মহত্তর ভবিষ্যৎরূপে দেখা দিবে। আমরা এখানে যে কার্য্যে ব্রতী হইতেছি, তাহার ফলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের অবিচলিত আস্থা যেন বৃহত্তর ভারত গড়িয়া তুলে।

কায়েদে আজম জিন্নার অভিভাষণ

[নিখিল ভারত মোসলেম লীগের নেতা মিঃ এম এ জিন্না ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর লণ্ডনে ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের জন্য স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করিয়া বক্তৃতা দেন।]

মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আপনার ভাষায় আমি আপনাকে আশ্বাস দিতেছি যে, সাফল্য লাভের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া আমরা এখানে সহযোগিতা করিতেই আসিয়াছি।

আমি প্রথমেই এক দিকে গ্রেট বৃটেনের নৈতিক দাবী ও অপর দিকে তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে বলিব। এ কথা স্বীকার করিতে আমি দ্বিধাবোধ করিব না যে, ভারতে আপনাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক বিপুল স্বার্থ রহিয়াছে। সে জন্য ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আপনারা বিশেষরূপ স্বার্থযুক্ত পক্ষ। কিন্তু আপনাদিগকে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতে আপনাদের যে স্বার্থ আছে, আমাদের তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ও অনেক অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রহিয়াছে। আপনাদের স্বার্থ আর্থিক বা বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক, কিন্তু আমাদের নিকট উহা সর্ব্ববিষয়ক।

এখানে প্রধানতঃ ৪টি পক্ষ আছে। আমি ক্ষুদ্রতর সংখ্যাল্পদের কথা ভুলি নাই—শিখ, খৃষ্টান ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা আছেন। কিন্তু প্রধান পক্ষ ৪টি—বৃটিশ, ভারতীয় রাজন্যগণ, হিন্দু ও মুসলমানগণ।

কিছু ভুল বুঝা হইয়াছে। লর্ড পীল বলিয়াছেন, অসহযোগ আন্দোলনের জন্য তাঁহার দল বিশেষ উত্ত্যক্ত হইয়াছে। তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন, "আমরা যদি একমত হই ও ভারতের শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে আপনাদিগকে উন্নত অবস্থা প্রদান করি, তাহা হইলে যাহারা তাহা ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক, তাহারা তাহার সুযোগ পাইবে।

পনাদিগকে এখন ভারতের অবস্থা বুঝিতে হইবে। হিন্দু বা লমান, শিখ বা খৃষ্টান, পার্শী বা অনুন্নত সম্প্রদায়, এমন কি, বণিক প্রদায় বা ব্যবসায়ী—ভারতে এমন কোন শ্রেণীর লোক নাই, হারা জোরের সহিত বলে নাই যে, ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন ান করিতে হইবে। আপনারা বলিতেছেন, ভারতের এক বিশেষ ভাবশালী বড় দল ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ধ্বংস বা উহার পব্যবহার করিতে চায়। আমি আপনাদিগকে একটি প্রশ্ন করিব। দলটি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে, তাহাদিগকে যে সকল দল বাধা প্রদান করিতেছে, আপনারা কি চান, তাহারা আপনাদের নিকট হইতে এই উত্তর লইয়া ফিরিয়া যাইবে যে, একটি শক্তিশালী দল রতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ধ্বংস বা উহার অপব্যবহার করিবে লিয়া ঐ সম্বন্ধে কিছুই করা যাইবে না? এখানে-সেখানে জন কয়েক তীত ভারতের ৭ কোটি মুসলমান সকলেই অসহযোগ আন্দোলন হইতে দূরে থাকে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের ৩½ কোটি হইতে ৪ কোটি লোক অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী; শিখ ও খৃষ্টানরাও উহাতে যোগদান করে নাই। যে দলটিকে আপনারা বড় দল বলিতেছেন, তাহারা সকল হিন্দুর সমর্থন পায় নাই। ঐ সকল দলের সকলে ফিরিয়া গিয়া অবশিষ্টদের সহিত যোগদান করে, ইহাই কি আপনারা চান? আপনারা অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করিবেন বলিয়া আশা করি।

বৃটিশ-ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে আমি আপনাদের নিকট এই বৈঠকের কার্য্যকলাপে আমরা যে মূল নীতি অনুসারে চলিব, তাহা উপস্থিত করিতেছি। ভারত তাহার নিজের ঘরের কর্তৃত্ব চাহে—এই মূলনীতিই বৈঠকে বরাবর আমাদের আলোচনা পরিচালিত করিবে। ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়ী মন্ত্রিসভা লইয়া গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়িত্ব প্রদান ব্যতীত অন্য কোনরূপ শাসনতন্ত্রের ধারণা আমি করিতে পারি না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কথা যিনিই বলিয়া থাকুন, তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন না পাওয়া পর্য্যন্ত কতকগুলি বিষয়ে বাঁধন-কষণ থাকিবে। উহাই আমাদের মূল নীতি।

লর্ড পীল ও লর্ড রীডিংএর বক্তৃতার সারমর্ম্ম—কিরূপ তৎপরতার সহিত স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে, তাহা লইয়া মতদ্বৈধ। স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান—কোনরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা। ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়ী মন্ত্রিসভার হস্তে যদি ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রথমেই বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমেই সংখ্যালঘুদের কথা ধরা হউক। আপনারা যদি সংখ্যালঘুদের মধ্যে নির্বিঘ্নতার মনোভাব আনিতে না পারেন, তাহা হইলে যেরূপ শাসনতন্ত্রই না করুন না, তাহা সাফল্যের সহিত পরিচালনা করা যাইবে না। আপনাদিগকে ভারতীয় রাজন্যগণের বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে। মুসলমানেরা যেমন তাহাদের সম্প্রদায়ের জন্য রক্ষা-কবচ চাহে, রাজন্যগণও সেইরূপ ভারতের শাসনতন্ত্রে তাহাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা চাহে।

লর্ড আরউইন তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "কতকগুলি প্রকৃত অসুবিধা আছে। তাহার মধ্যে কতক ভারতের নিজের অবস্থার জন্য তাহার ঘরোয়া ব্যাপারে, আর কতকগুলি জগতের অবস্থার জন্য। এ সকলের সম্মুখীন হইতে হইবে। বৈঠকের উদ্দেশ্য—বৃটিশ সরকারকে ভারতীয় নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে হইবে, কত দূর সম্ভব ভাল ও সুনিশ্চিত ভাবে ও খুব তৎপরতার সহিত ঐ সকল অসুবিধা অতিক্রম করা যাইতে পারে।"

ভারত কত দিনে স্বায়ত্ত-শাসন পাইতে পারে, সে-সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট আপনি ১৯২৮ সালে লণ্ডনে বৃটিশ শ্রমিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব কালে বলিয়াছিলেন—

"আমি আশা করি, কয়েক মাসের মধ্যেই বৃটিশ গণতন্ত্রের সহিত একটি নূতন ডোমিনিয়ন সংযুক্ত হইবে; সে ডোমিনিয়নটি অন্য জাতির; গণতন্ত্রের মধ্যে সমান স্থান পাইয়া তাহা আত্মসম্মান লাভ করিবে;—আমি ভারতের কথা বলিতেছি।"

আপনার ঐ কথা সত্ত্বেও লর্ড পীল ও লর্ড রীডিংএর বক্তৃতার আসল কথা—ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন লাভের সময় লইয়া এখনও মতভেদ আছে। ১৯২৮ সালের পর ২ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

লর্ড পীল বলিয়াছেন, সাইমন কমিশনের কতকগুলি সুপারিশ বিপ্লবমূলক। এদিকে কমিশনের চেয়ারম্যান বলিতেছেন, ভারতীয় রাজন্যবর্গকে গ্রহণ করিয়া আপনারা কার্য্য-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমার কথা, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অতীতের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ভারত সরকারের ডিস্প্যাচও পুরাতন হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় রাজন্যগণের যোগদানে বৃটিশ ভারতের জন্য যে ঔপনিবেশিক অধিকার দাবী করা হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত পশ্চাতে যাইয়া পড়িয়াছে। আমরা এখন সমগ্র ভারতীয় ডোমিনিয়নের কথা ভাবিতেছি। কাজেই এখন আর সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অথবা ভারত সরকারের ডিস্প্যাচের কথা ভাবিয়া কোন লাভ নাই।

পাতিয়ালার মহারাজা ও জাম সাহেব বলিয়াছেন, নিখিল ভারত ফেডারেশনের বিষয় বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে কোন বিচার বিভাগীয় ট্রাইবুনালে তাঁহাদের অধিকার স্থির করিতে হইবে। আমি সামন্ত রাজ্যের প্রতিনিধিদিগকে বলিব, ভারত সরকারের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রদত্ত আদেশের ফলে তাঁহাদের অবস্থা যাহাই হউক না, এই শাসনতন্ত্র যখন ঢালিয়া সাজা হইতেছে, তখন তাঁহাদের অধিকার স্থির করিবার জন্য কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা এখানে তাঁহাদের অধিকারের কথা বলিতে পারেন। এই বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হইবে, সে বিষয়ে সকলে যদি একমত হন এবং পার্লামেণ্ট যদি সে অনুসারে ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বাটলার রিপোর্টে যাহা আছে অথবা সিমলা বা দিল্লীর লাট-দপ্তরে যাহা স্থির হইয়াছে, তাহার জন্য কিছু আসিয়া-যাইবে না।

লর্ড পীল ও লর্ড রীডিং বলিয়াছেন, এ বিষয়ে পার্লামেণ্টকে শেষ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। আমরা যদি আশা না করিতাম যে, পার্লামেণ্ট এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এখানে দেখা যাইত না। মূল পরিকল্পনা স্মরণ রাখিবেন। স্থির হয়, বৃটিশ সরকার বৃটিশ-ভারত ও ভারতীয় সামন্ত রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিয়া যত দূর সম্ভব মতৈক্যে আসিবেন এবং যদি ঐরূপ মতৈক্য ঘটে, তাহা হইলে তাঁহারা

সে সকল প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উপস্থিত করিবেন। আপনারা কি পার্লামেণ্টের ৩টি দলেরই প্রতিনিধি নন? আপনারা যদি একমত হন, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট আপনাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না বলিয়া আপনারা কি শঙ্কিত? এ বিষয়ে লর্ড আরউইন বলেন,—

"সমস্যা সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত করিবার যে অধিকার আছে, তাহা অস্বীকার করিবার কোন লাভ নাই। আবার যে সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক ভাবতের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতি পাওয়া যাইবে, তাহাতে উপনীত হইতে চেষ্টা করার গুরুত্ব পার্লামেণ্ট কম করিয়া দেখিলে তাহা পার্লামেণ্টের দূরদৃষ্টির অভাব সূচনা করিবে।"

গোলটেবিল বৈঠকটি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে যে ভাবতেরই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতি পাওয়া সম্ভব, তাহা যে বৃটিশ প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টের ৩টি দলের প্রতিনিধি, তাঁহাদের সম্মতি পাওয়া যাইতে পারিবে। এই বৈঠকের যত দূর সম্ভব ... সমর্থনে যাহা স্থির হইবে, পার্লামেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিলে তাহা তাহার পক্ষে বিশেষ দুঃসাহসিকতারই কার্য্য হইবে।

জনপ্রিয়তা লাভ করা যায়

আপনি কি অন্যের কাছে আকৃষ্ট হ'তে চান? মানুষ মাত্রেই চায় জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে, পরিচিত হ'তে। জনপ্রিয় না হলে রাজনীতিক রাজনীতি করতে পারেন না, ব্যবসায়ী ব্যবসা চালাতে পারেন না, বিক্রেতা বিক্রী করতে পারেন না। বাস্তব জগতে জনপ্রিয়তা না থাকলে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়। জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে হ'লে কি ভাবে করা যায়, মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা সে কৌশল আবিষ্কার ক'রেছেন। ইউরোপে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন সম্বন্ধে প্রচুর গ্রন্থ লেখা হয়েছে। আমাদের দেশে শুধু গুরুগম্ভীর রচনা লেখা হয় মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে—উদ্ধৃতি এবং সাহায্যপ্রাপ্ত পুস্তক-তালিকায় কণ্টকিত লেখা প'ড়ে কিছুই জানা যায় না। ইউরোপে সহজবোধ্য অসংখ্য গ্রন্থ আছে, কোটি কোটি বিক্রী হয়েছে। দেশবাসী যাদের সাহায্য পেয়ে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক মতে জনপ্রিয় হ'তে হ'লে :

আপনি অন্যের কাছে আপনার দেখা বা পড়া বিস্ময়কর ঘটনা বিবৃত করবেন—যা শুনলে যে-কেউ খুশী হবে। আপনি অন্যকে তারিফ করতে ভুলে যাবেন না। তোষামোদী ভাল নয়, কিন্তু সত্যিকার প্রশংসা করা কৌশল জানবেন।

দেখবেন, আপনি পরিচিত লোকদের নাম যেন ভুলে না যান। নাম ভুলে গেলে যতই পরিচয় থাক, পরিচিত জন আদপেই খুশী হবে না। নাম এবং মুখ মনে রাখতে পারে যে-কেউ। সুতরাং অভ্যাস করতে হ'বে যাতে নাম এবং মুখ মনে থাকে। হেনরী ফোর্ড ফ্যাক্টরীর অধীনস্থ কুলীটিকে পর্য্যন্ত চিনতেন। নাম ধ'রে ডাকতেন।

অলস পরচর্চ্চা করবেন না কখনও। হিংসাত্মক অপবাদ ছড়াবেন না।

কথায় 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করবেন না প্রয়োজন না হ'লে। 'তুমি' বা 'আপনি' কথা দু'টিতে জোর দিতে হবে। 'আমি' 'আমাকে' ও 'আমার' শব্দ ক'টি বাতিল করতে হবে।

কাউকে লক্ষ্য ক'রে ঠাট্টা বা মস্করা করা উচিত নয়। পরিবর্ত্তে অন্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হবে সদা-সর্ব্বদা।

ভুল করলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করতে হবে। দোষ ঢাকতে চেষ্টা না ক'রে হাসতে হাসতে দোষ কবুল করা বুদ্ধির পরিচায়ক। বেশী কথা না ব'লে বেশী কথা শুনতে হবে। চুপ ক'রে থাকতে হবে, ব'লতে দিতে হবে অন্যকে। কথায় কথায় সায় দিতে হবে হাসতে হাসতে। অন্যে যখন কথা বলছে তখন কথা শুরু করা ভুল করা হবে। অন্যের মতামত অস্বীকার করলে চলবে না, মেনে নিতে না পারলেও বলতে হবে, আপনি যা বলছেন ঠিক। আমি যা বলছি, হয়তো ঠিক হ'লেও হ'তে পারে।

অর্থাৎ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন ক'রতে হ'লে অহং ত্যাগ করতে হবে। মুখে হাসি রাখতে হবে। সহিষ্ণুতা অর্জ্জন করতে হবে। ভাল শ্রোতা হতে হবে। গাল দেওয়ার চেয়ে গাল খাওয়ার অভ্যাস করতে হ'বে। অজ্ঞতা প্রকাশ করলে চলবে না। অজ্ঞতা জানিয়ে চুপ-চাপ থাকতে হবে।

অবশ্য উক্ত উপায় কয়েক দিনে আয়ত্ত হবে না, দস্তুর মত অভ্যাস করতে হবে। অভ্যস্ত হ'লে দেখা যাবে যথেষ্ট ফল পাওয়া যাচ্ছে।

হাওড়া ব্রিজ (প্রথম পুরস্কার) —[illegible]ন রায় (কলি-২৯)
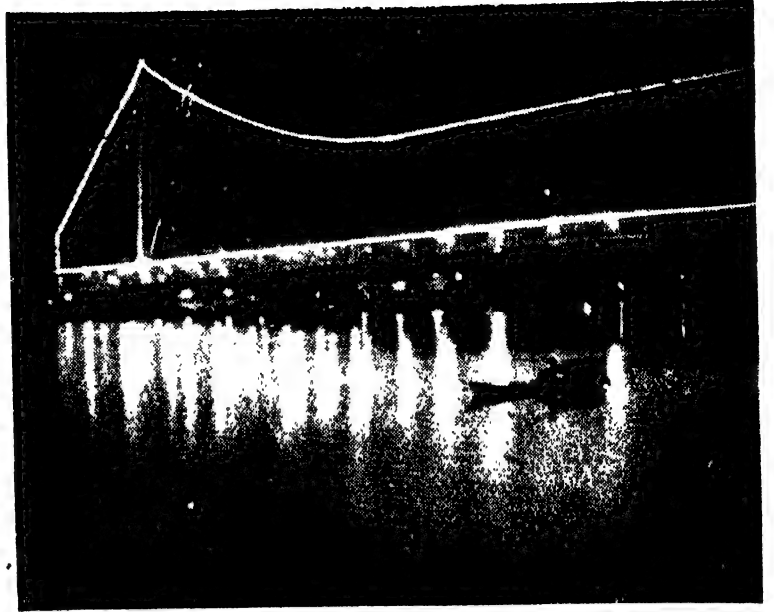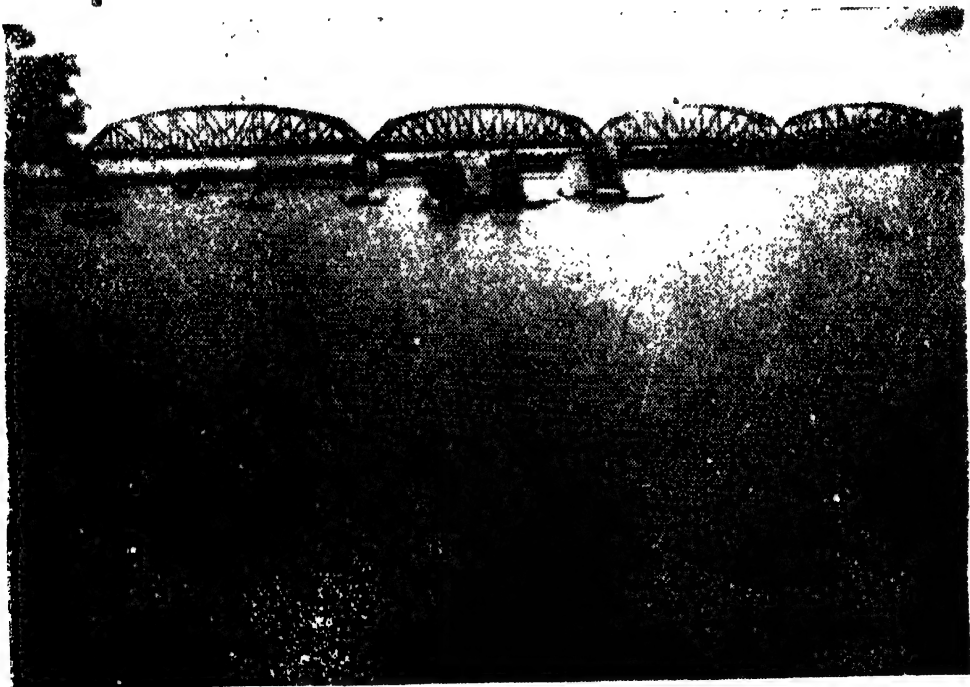
বালি ব্রিজ (দ্বিতীয় পুরস্কার —কপনারায়ণ শেঠ (কলি ৮)
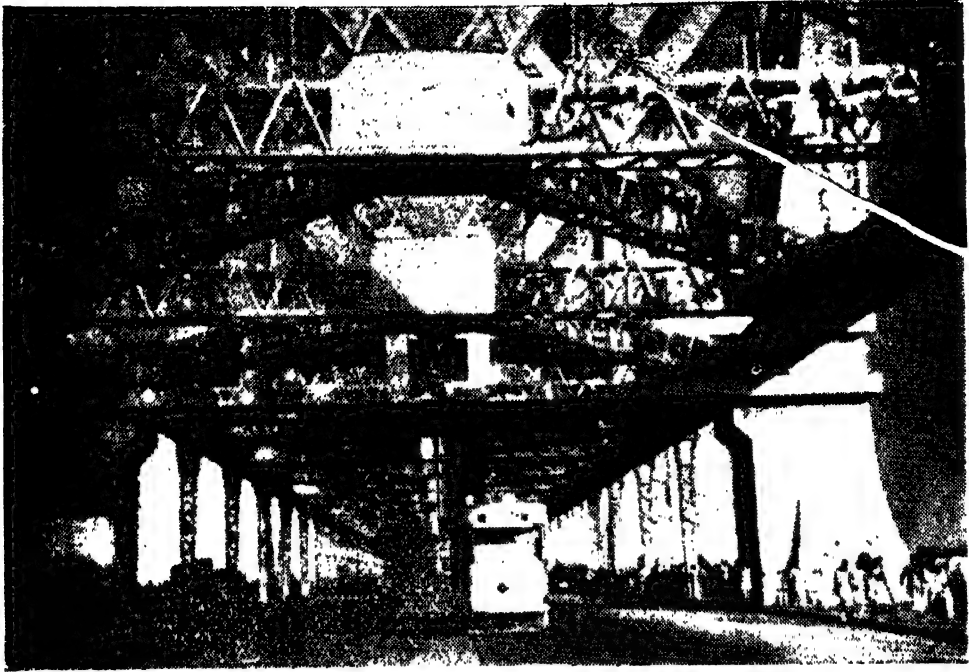
হাওড়া ব্রিজ —শান্তিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলি-৩৫)

লেক ব্রিজ (তৃতীয় পুরস্কার) —নির্ম্মলকুমার দত্ত (কলি-১)

—পুলিনবিহারী চক্রবর্তী (কলি-২৬)

পাশ থেকে

প্রতিযোগিতা

বিষয়

সিলুয়েট

প্রথম পুরস্কার ১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲

তৃতীয় পুরস্কার ৫৲

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ ২৬শে আশ্বিন

—গুণেন সিং (কলি-২৬)

শিশু-বেলা

—সুব্রত রায় (কলি-২৫)

নিবর্ত্তন—নিষেধন, খণ্ডন।
নিবাড়ন—নিষ্পত্তি, সমাপ্তি, নির্ব্বাহ।
নিবান—নির্ব্বাণ করান, মিটান, লোপকরণ।
নিবারণ—নিষেধ, প্রতিষেধ, রোধ, বারণ।
নিবিড়—ঘন, অগম্য, গুপ্ত, অবিরল।
নিবিষ্ট—উদ্যুক্ত, রত, তৎপর।
নিবৃত্ত—বিরত, ক্ষান্ত, বাধিত, দমিত।
নিবৃত্তি—বিরতি, ক্ষান্তি।
নিবেদন—সম্মানপূর্ব্বক জ্ঞাপন, উৎসর্গ।
নির্ভাঁজ—অমিশ্রিত, খাঁটি, অকৃত্রিম।
নিভৃত—গুপ্ত, নির্জ্জন, বিরল।
নিমগ্ন—ডুবিত, মজ্জিত, অবগাহিত।
নিমন্ত্রণ—আমন্ত্রণ, আহ্বান, ডাকন।
নিময়—পরিবর্ত্ত, অনুক্রম, বিনিময়।
নিমিত্ত—কারণ, জন্য, প্রয়োজন, মূল।
নিমিত্তক—হেতুক, মূলক, দ্বারা, জন্য।
নিমিষ—নিমেষ, চক্ষুর পলক, অল্পক্ষণ।
নিমীলন—নেত্র মুদ্রিতকরণ, চক্ষুমুদন।
নিম্ন—নীচ, অধঃস্থ, গভীর, নত।
নিম্নগ—অধোগামী, গম্ভীর, নদ।
নিয়ত—নিত্য, নির্ণীত, আদিষ্ট।
নিয়তি—আদেশ, অদৃষ্ট, কপাল।
নিয়ন্তা—শাসনকর্ত্তা, প্রভু, সারথি।
নিয়ম—নির্ণয়, নিরূপণ, ব্যবস্থা।
নিযুক্ত—আজ্ঞাপিত, নিরূপিত।
নিযুৎ—দশ লক্ষ, দশশত সহস্র।
নিযুদ্ধ—বাহুযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, নিরস্ত্র যুদ্ধ।
নিরঞ্জন—নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, বিসর্জ্জন।
নিরত—অনবরত, সর্ব্বদা, অত্যনুরক্ত।
নিরপরাধ—নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ।
নিরপায়—নির্ব্বিঘ্ন, অবিনাশী, নিত্য।
নিরপেক্ষ—অনপেক্ষ, স্বাধীন।
নিরবকাশ—ব্যস্ত, নিরবসর।
নিরবচ্ছিন্ন—কেবল, নিরন্তর, শুদ্ধ।
নিরবদ্য—অনিন্দ্য, উত্তম।
নিরবধি—নিরন্তর, সর্ব্বদা, নিরাধারা।
নিরবয়ব—অবয়বহীন, নিরাকার।
নিরর্থক—অফলক, বিফল, নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

নিরহ—শান্ত, অবিবাদী, নির্ব্বিরোধী।
নিরাকরণ—দূরীকরণ, বহিষ্করণ।
নিরাকাঙ্ক্ষী—শান্ত, নিস্পৃহ, সন্তুষ্ট।
নিরাকার—আকাররহিত, অমূর্ত্তিক।
নিরাট—শক্ত, দৃঢ়, নিরেট।
নিরাতঙ্ক—নির্ব্বিঘ্ন, নিষ্কণ্টক।
নিরাপদ—আপদরহিত, নির্ব্বিঘ্ন।
নিরাময়—রোগরহিত, আরোগী, সুস্থ।
নিরামিষ—মৎস্যাদিরহিত।
নিরালয়—নিরালা, বিরল, নির্জ্জন।
নিরালা—বিরল, গুপ্ত, একাকী, নির্জ্জন।
নিরাশ—হতাশ, ভগ্নোদ্যম, ভগ্নাশ।
নিরাহার—উপবাস, অভোজন, লঙ্ঘন।
নিরীক্ষণ—দর্শন, অবলোকন, দেখন।
নিরীহ—নিরুদ্যোগ, অচল, স্থির।
নিরুত্তর—প্রতিবাক্যে অসমর্থ, অবাক।
নিরুপম—অতুল্য, অসাদৃশ্য, অনুপম।
নিরুপায়—অগত্যা, উপায়াভাব।
নিরুপেক্ষা—আদর, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা।
নিরূপণ—নির্ণয়করণ, বিতর্কণ, স্থিরকরণ।
নিরোধ—বেষ্টন, ব্যাঘাত, রোধ।
নির্গত—বহির্গত, ক্ষরিত।
নির্গুণ—গুণাতীত, মূর্খ।
নির্ঘণ্ট—সূচীপত্র, আলোচনা, নিশ্চয়।
নির্ঘাত—বজ্রাঘাত, মর্ম্মব্যথাকর।
নির্জ্জর—শক্ত, দৌর্ব্বল্যহীন, অজীর্ণ।
নির্জিত—ক্ষান্ত, বশীভূত।
নির্জীব—দুর্ব্বল, মূর্চ্ছাগত।
নির্ঝর—উনুই, পর্ব্বতের ঝোরা।
নির্ণয়—নিষ্পত্তি, নিশ্চয়, মীমাংসা।
নির্ণীত—স্থিরীকৃত, নিশ্চিত।
নির্দ্দয়—নিষ্ঠুর, ক্রূর, নিদারুণ কঠিন।
নির্দ্দায়—মুক্ত, অনাপদ, দায়রহিত।

নির্দ্দিষ্ট—স্থিরীকৃত, নিরূপিত, চিহ্নিত।

নির্দ্দেশ—নিরূপণ, নিয়োজন, আজ্ঞা।

নির্দ্দোষ—দোষরহিত, নিরপরাধ।

নির্ধন—দরিদ্র, দীন।

নির্ধারণ—নির্ণয়করণ, নিষ্পাদন।

নির্ব্বংশ—বংশরহিত, সন্তানহীন, অপুত্রক।

নির্ব্বন্ধ—দাস্তকর্ম্ম, নিয়ম, আক্রম।

নির্ব্বাণ—নিভান, মোক্ষ, লয়, অন্তর্দ্ধান।

নির্ব্বাদ—নিষ্পত্তি, পরিত্যাগ, অপবাদ।

নির্ব্বাহ—জীবিকা, কার্য্যসাধন, কর্ম্মসিদ্ধ।

নির্ব্বিকার—বিকারবর্জ্জিত, শান্ত, ধীর।

নির্ব্বিঘ্ন—বিঘ্নরহিত, নিরুপদ্রব।

নির্ব্বোধ—অজ্ঞান, বুদ্ধিহীন, অবোধ।

নির্ভর্ৎসন—নিন্দা, তিরস্কার, অনুযোগ।

নির্ভয়—ভয়হীন, সাহসী।

নির্ভর—ভরসা, সম্যক্‌রূপে অবলম্বন।

নির্ভুল—অভ্রান্ত, ভ্রমহীন, শুদ্ধ।

নির্ম্মল—পরিষ্কৃত, পবিত্র, স্বচ্ছ।

নির্ম্মাণ—গঠন, গাঁথন, শিল্পকর্ম্ম।

নির্ম্মাতা—গড়নিয়া, শিল্পকারী।

নির্ম্মাপণ—নির্ম্মাণ করান, গাথান।

নির্ম্মায়ক—নির্ম্মাণকারক, রচক।

নির্ম্মাল্য—নিবেদিত পুষ্পাদি।

নির্ম্মিত—রচিত, গঠিত, কৃত, কৃত্রিম।

নির্ম্মুক্ত—খোলা, অবন্ধ।

নির্ম্মেধ—বুদ্ধিহীন, মেধাহীন, তাক্ত।

নির্যাস—আঠা, ক্বাথ, মীমাংসা।

নির্লজ্জ—নির্লাজ, অনপত্রপ, লজ্জাহীন।

নির্লয়ন—ব্রহ্মপ্রাপ্তি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ।

নিশা—রাত্রি, রজনী, তামসী, যামিনী।

নিশিত—শাণিত, তীক্ষ্ণীকৃত।

নিশীথ—অর্দ্ধরাত্র, রাত্রের মধ্যভাগ।

নিশুতি—গভীর নিদ্রা, অত্যন্ত নিদ্রাগত।

নিশ্চয়—নির্ণয়, স্থিরজ্ঞান, অবধারণ।

নিশ্চল—অনড়, স্থায়ী, অচলিষ্ণু।

নিশ্চিত—নির্ণীত, পরিজ্ঞাত, স্থির।

নিশ্চিন্ত—সুস্থির, নিরুদ্বেগ, নির্ভাবনা।

নিশ্চেষ্ট—চেষ্টারহিত, অলস।

নিশ্বাস—নাসিকার বায়ু, প্রাণবায়ু।

নিষঙ্গ—তূণ, বাণাধার, ইষুধি, তূণীর।

নিষাদ—চণ্ডাল, উৎকণ্ঠা, ম্লানতা।

নিষেধ—বারণ, প্রতিষেধ, বাধা।

নিষেবন—ঔষধ পানকরণ, সেবা।

নিষ্কণ্টক—দুঃখশূন্য, নির্বৈরি।

নিষ্কৃতি—মুক্তি, রক্ষা, উদ্ধার, ত্রাণ।

নিষ্কৃত্রিম—অগঠিত, প্রকৃত, অকৃত্রিম।

নিষ্কৃষ্ট—নিশ্চিত, স্পষ্ট, যথার্থ, সত্য।

নিষ্ক্রিয়—নিরর্থক, বিফল, মিথ্যা।

নিস্তার—রক্ষা, উদ্ধার, ত্রাণ, মুক্তি।

নিহিত—স্থাপিত, গচ্ছিত, দত্ত।

নীকাশ—তুল্য, সদৃশ, সমান, ন্যায়।

নীচা—অধোভাগ, তলা, গোড়া মূল।

নীচাশয়—ক্ষুদ্রমনাঃ, অধম, নীচস্পৃহ।

নীতি—উচিত, ব্যবহার, ন্যায়, নিয়ম।

নীয়ন্তা—গ্রহীতা, ব্যাপারী, গ্রাহক।

নুণ—লবণ, লোন, ক্ষার।

নুতি—স্তুতি, স্তব, কাকুতি, প্রার্থনা।

নূতন—নবীন, নতুন, সদ্যোজাত।

নূপুর—তুলাকোটি, পাদালঙ্কারবিশেষ।

নেংটা—উলঙ্গ, বিবস্ত্র, দিগম্বর, নগ্ন।

নেত্র—নয়ন, চক্ষুঃ, লোচন, অক্ষি।

নেবু—লেবু, জম্বীর, জামীর।

নেশা—মত্ততা, মাতলামি।

নৈবেদ্য—উপহার, বলি, নিবেদনার্হ।

নৌ—নৌকা, তরণী, তরী।

ন্যস্ত—স্থাপিত, সঞ্চিত, গচ্ছিত, নিক্ষিপ্ত।

ন্যায়—যথার্থ, তর্কশাস্ত্র।

ন্যায্য—উচিত, বিচার্য্য, উপযুক্ত।

[ক্রমশঃ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

একটা হাসির গল্প বলে আরম্ভ করি। বছর বাইশ তেইশ আগে যখন লণ্ডনে ছিলুম তখন সেখানে এক বোর্ডিং হাউসে কে এক জন সান্যাল আত্মহত্যা করেন। এই নিয়ে আমরা জটলা করছি এমন সময় এলেন শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, এত বিমর্ষ কেন? মুখে নাই হর্ষ কেন? তিনি উত্তর করলেন, কে এক জন সান্যাল আত্মহত্যা করেছে। কালকের খবরের কাগজ পড়ে দেশের লোক ধরে নেবে আমিই সেই সান্যাল। কাজেই গাঁটের কড়ি খরচ করে খান কয়েক তার করে দিতে হলো, আমি নই সেই সান্যাল যে আত্মহত্যা করেছে।

আমিও তেমনি জানিয়ে রাখছি যে, আমি স্বনামধন্য কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের আত্মীয় নই, তেওতার জমিদার বংশে আমার জন্ম নয়, আমরা বৈদ্য নই, এমন কি উপবীতধারীও নই। বিশ বছর আগে নওগাঁ মহকুমার ভার পেয়েছি, এক সাবরেজিস্ট্রার এলেন সাক্ষাৎ করতে। মুখে হাসি ধরে না। বললেন, আপনিও বৈদ্য, আমিও বৈদ্য, অমুক অমুক অমুক অমুক অমুক বৈদ্য। আমরা এখানে অনেকগুলি বৈদ্য।...নারায়ণগঞ্জের এক জনসভায় এক বক্তা আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন আঠারো বছর আগে, এঁর আর পরিচয় কী দেব! কে না জানে এঁরা এই জেলার বিখ্যাত জমিদার বংশ।...সতেরো বছর আগে বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও আমি সোনামুখীর বিদ্যালয় দেখতে গেছি। তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে সেক্রেটারি বললেন, ইনি ব্রাহ্মণ। আর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ইনিও উপবীতধারী।... এই রকম অজস্র গল্প আছে আমার ঝুলিতে। কলকাতায় মাস কয়েক আগেও এরূপ ঘটেছে। আর একটা বলে বিষয় পরিবর্তন করি।

পাঁচ বছর আগে ময়মনসিংহের সাহিত্য সভায় এক ভদ্রলোক আমার সম্বন্ধে বললেন, হবে না কেন! যত বড় বড় সাহিত্যিক সকলেই জমিদার। জমিদার না হলে সাহিত্যিক হয় কখনো! শ্রীনলিনাক্ষ সান্যালের মতো আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হলো, আমরা তেওতার রায় নই। আমাদের জমিদারি অনেক দিন গেছে।

মোগলরা যখন পাঠানদের হারিয়ে দিয়ে ওড়িশার মালিক হয় তখন সুবে ওড়িশা জরিপ করতে যান তোডর মল্লের সহকর্মী রামচন্দ্র খান্। হুগলী জেলার কোতরংনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ঘোষ। জাহাঙ্গীর বাদশাহ এঁকে একখানা তালুক দেন। সেই জাহাঙ্গীরী তালুক পেয়ে ইনি ওড়িশায় বসবাস করেন। খান্ থেকে কবে এঁরা রায় হলেন, চৌধুরী হলেন, মহাশয় হলেন সে সব আমার জানা নেই। বালেশ্বর ও কটক জেলার সাত-আটটি জায়গায় সাত-আট জন মহাশয় আছেন। বড় তরফের বড় কর্ত্তাকে বলা হয় মহাশয়। আমরা হচ্ছি রামেশ্বরপুরের মহাশয় বংশ। অন্যান্য শাখার এখনো কিছু কিছু জমিদারি আছে। আমরা কিন্তু নির্ভূম মহাশয়। থাকবার মধ্যে আছে কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি। তাও শরিকদের দখলে।

আমার ঠাকুরদাদা শ্রীনাথ রায় অত্যন্ত নিরীহ ও নির্বিরোধী ছিলেন, জ্ঞাতিদের দৌরাত্ম্য সহ্য করতে না পেরে চিরকালের মতো রামেশ্বরপুর ত্যাগ করেন। আমার বাবা নিমাইচরণ রায় অল্প বয়সে পড়াশুনা ছেড়ে চাকরি করতে বাধ্য হন। বাপ-মা, ভাই-বোন সকলের ভার তাঁর একার উপরে। সরকারী চাকরি, উন্নতির আশা ছিল, কিন্তু নিকট-ভবিষ্যতে বদলির আশা ছিল না। অনুগোল তখনকার দিনে পাণ্ডববর্জিত জেলা। শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাবঞ্চিত। তার তুলনায় ঢেঙ্কানাল দেশীয় রাজ্য হলেও সব রকমে অগ্রসর। সেখানকার হাই স্কুলে পড়তে অনুগোল থেকে ও আশেপাশের দেশীয় রাজ্য থেকে বহু ছাত্র আসত। বাবা ভেবে দেখলেন ভাইগুলিকে মানুষ করতে হলে ঢেঙ্কানালে বাস করা ভালো। তিনি সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রাজদরবারে চাকরি নিলেন। আর্থিক সুবিধা কিছুমাত্র হলো না, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ যা পাওয়া গেল তা আশাতীত। রাজা সাহেব ছিলেন

অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির গুণগ্রাহী সজ্জন। তাঁর আহ্বানে নানা প্রদেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীরা আসতেন কাজ-কর্ম নিয়ে কিছু দিন থাকতে, স্বাস্থ্য ফিরে পেতে। বাঙালীই বেশী। স্কুলের জন্যে যথেষ্ট খরচ করা হতো, অথচ ছেলেদের বেতন লাগত যৎসামান্য। লাইব্রেরীতে রাশি রাশি বাংলা, ওড়িয়া, ইংরেজী বই ছিল। স্থানীয় অফিসারদের কারো কারো ঘরোয়া লাইব্রেরী ছিল। রাজবাড়ীতে ছিল থিয়েটার ও চিড়িয়াখানা। রাজার ছিল হাতীশাল, ঘোড়াশাল। প্রায় প্রত্যেক বছর হাতী ধরা হয়ে আসত। বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস খেলা হতো। অনেকগুলো দীঘি। সাঁতার কাটতে, নৌকায় করে বেড়াতে সুযোগ পেত সকলে। পাহাড়ী জায়গা, চারদিকে জঙ্গল। রেল লাইন নেই। সেটা হয়েছিল শাপে বর।

ঢেঙ্কানালের রাজধানী নিজগড়ে আমার জন্ম। জন্মদিন ১৫ই মার্চ, ১৯০৪। সেদিন ছিল বারুণী। বংশের বড় ছেলে। আদুরে দুলাল। যে দেখে সেই একটা করে নাম রাখে। বারুণীয়া, বৃন্দাবনচন্দ্র, গদাধর, এমনি কত নাম। আমরা শাক্ত, সেই জন্যে অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ হলো অন্নদাশঙ্কর। আমার ঠাকুরদা যতদিন ছিলেন নামকরণের ধরণ ছিল শাক্ত। এক এক করে নাম রাখা হয় চার ভাইবোনের—অন্নদাশঙ্কর, অভয়াশঙ্কর, রাজরাজেশ্বরী, অজয়াশঙ্কর। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর বাবা বৈষ্ণব গুরুর কাছে দীক্ষা নেন। সেইজন্যে ছোট বোনের নাম রাখা হলো ব্রজেন্দ্রমোহিনী। রাজবাড়ীর উপর বাবার কিছু প্রভাব ছিল। বাবার কথায় রাজা সাহেব তাঁর এক ছেলের নাম রাখেন গৌরেন্দ্রপ্রতাপ। আমাদের বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হলো শ্রীশ্রীগৌরগোপাল।

আমার মা হেমনলিনী রায় কটকের প্রসিদ্ধ পালিত বংশের মেয়ে। পালিত বংশ বাংলাদেশ থেকে ওড়িশায় গেছেন উনিশ শতকে। তাঁদের চালচলন হাল ফ্যাশনের। একে তো তাঁরা শহুরে লোক, তার উপর তাঁরা কলকাতার সঙ্গে নিত্য সংযুক্ত। তাঁদের মুখের ভাষা চলতি বাংলা। আর আমাদের মুখের ভাষা অনেকটা মেদিনীপুরের আঞ্চলিক বাংলার মতো ওড়িয়া প্রভাবিত। আমরা কথায় কথায় বলতুম "কেরে।" অর্থাৎ "করিয়া।" একটা নমুনা দিচ্ছি। চলতি বাংলা: আমি খেয়ে এসেছি। আমাদের বাংলা: আমি খায়ে কেরে আসেছি। এখানে এই "কেরে" শব্দটি সম্পূর্ণ বাহুল্য। কিন্তু বাঁকুড়ায়, মেদিনীপুরে, ওড়িশায় এই শব্দ বা এর অনুরূপ শব্দ লক্ষ্য করা যায়। সাধু ভাষায় দাঁড়াবে, আমি খাইয়া করিয়া আসিয়াছি। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে আমাদের মুখের ভাষাকে পরিহাস ছলে বলা হয় কেরা বাংলা। আমাদের ঠাট্টা করে বলা হয় কেরা বাঙালী। আমরাও পাল্টা হাসতে জানি। মামাদের বলি বাংলাবালা। এই অর্থে আমার মা ছিলেন বাংলাবালী।

দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি ঠাকুমার কোলে মানুষ হয়েছি। ঠাকুমাকে বলতুম মা। মাকে বলতুম, খোকার মা। খোকা আর কেউ নয়, আমি নিজে। এসব আবিষ্কার করতে আমার অনেক দিন লেগেছিল। মাকে, বাবাকে, বরাবরই একটু পর পর মনে হতো। আমার ঠাকুমা দুর্গামণি রায় জাজপুরের সম্ভ্রান্ত সেন বংশের মেয়ে। যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি শক্তিমতী। সেকালের পক্ষে তিনি বেশ শিক্ষিতা ছিলেন। বাংলা ওড়িয়া দুটো ভাষার প্রাচীন আধুনিক অনেক বই তাঁর পড়া ছিল, কিম্বা জানা ছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী ছিল তাঁর নখদর্পণে। দেশী বিদেশী অনেক রূপকথা, কাহিনী, কিংবদন্তী, গুজব ও খবর ছিল তাঁর ঝুলিতে। তাঁর কাছে রাত্রে ও দুপুরে শুয়ে শুয়ে আমি যা শিখেছি পরে বই পড়ে তার চেয়ে এমন কী বেশী শিখেছি? তিনি আমাকে মানুষ করেছিলেন, এর চেয়ে বড় কথা তিনি আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। অল্পবয়সী রুগ্ন মায়ের প্রথম সন্তান, আমার নাকি সম্বলের মধ্যে ছিল একটি মাথা ও কয়েকখানি হাড়। মাংস লাগে ঠাকুমার অবিশ্রান্ত যত্নে। তেল-হলুদ মাখিয়ে শুইয়ে রাখতেন। খাওয়াতেন দুধ আর নরম ভাত। অনেক বয়স পর্যন্ত আমার জন্যে আলাদা রান্না হতো। উঠোনে একটা তোলা উনুনে ছোট একটা হাঁড়িতে সিদ্ধ হতো পুরোনো সরু চাল, তার সঙ্গে আলু। গলা ভাত, আলু ভাতে, কাগজী লেবু ও চিনি, হয়তো এক ফোঁটা ঘি এ ছিল আমার নিয়মিত পথ্য। এ ছাড়া দুধ সর নর্নী

খুব কম বয়সেই চা ধরি। ঠাকুরদা চা খেতে বসলে আমাদের ডেকে খাওয়াতেন। এই ভাবে ছ'সাত বছর কাটলে পর আমি সব কিছু খেতে শুরু করি, সাধারণত ঠাকুমাকে না বলে। আমার এই অনিয়মের প্রশ্রয় দিতেন আমার মা। লুকিয়ে একটা কিছু আমার হাতে মুখে গুঁজে দিতেন। প্রতিবেশীরাও আমাকে এটা-ওটা খাইয়ে খুশি হতেন। ফলে আমি হয়ে উঠি যেমন পেটুক তেমনি পেটরোগা। গায়ে গত্তি লাগছে না বলে মা আমার দুঃখ করতেন। কথা নেই বার্ত্তা নেই এক গ্লাস দুধ এনে ঢক ঢক করে গিলিয়ে দিতেন। উল্টো ফল হতো।

দশ বছর বয়সের সময় আমাদের বাড়ীতে আগুন লাগে। সব সঞ্চয় ছাই হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ঠাকুরদার মৃত্যু হয়েছিল। এর পরে একান্নবর্ত্তী পরিবার ভেঙে যায়। ঠাকুমা চলে যান বড়কাকার সঙ্গে। মাকে আর বাবাকে নতুন করে পাই। মা ছিলেন অত্যন্ত সরল, স্নেহপ্রবণ, শাসন করতে একেবারেই জানতেন না, কাঁদতেন, গৌরগোপালের কাছে প্রার্থনা করতেন। সংসারের কাজ তাঁর ভালো লাগত না, লাগত গৌরগোপালের সেবা আর পূজো আর নামকীর্ত্তন। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। ঝি-চাকর চলে যায়। মাকেই সমস্ত কাজ করতে হতো। শাশুড়ী থাকতে কম কষ্ট পাননি, কিন্তু সেটা কায়িক নয়, মানসিক। এবার পেতে হলো কায়িক কষ্ট। বৈষ্ণব দীক্ষার পর থেকে মাছ-মাংস বারণ। নিরামিষও দুর্মূল্য। বাবার পদোন্নতি হয়েছিল, কিন্তু আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী। এক দিন চা বন্ধ করে দিলেন। বাবা এক বার যা স্থির করতেন তার আর নড়-চড় হতো না। রাজ্যের লোক জানত তাঁর যে কথা সেই কাজ। সেই জন্যে রাজা-প্রজা সকলে তাঁকে বিশ্বাস করত। তেজস্বী লোক ছিলেন। কোনো দিন তাঁর সাহসের অভাব দেখিনি। মহাযুদ্ধের পেষণে আমরা প্রত্যেকেই গুঁড়িয়ে যেতে লাগলুম। কিন্তু সব চেয়ে ক্ষতি হলো মা'র। যুদ্ধের পর দেশে শান্তি এলো, কিন্তু আমাদের ঘর গেল ভেঙে। সামান্য কয়েক দিনের জ্বরে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মা'র মৃত্যু হয়। তার কয়েক দিন আগে পলিটিক্যাল এজেন্টের সঙ্গে ঝগড়া করে বাবা ইস্তফা দিয়েছিলেন। দেওয়ানের অনুরোধে ইস্তফা প্রত্যাহার করেন। নইলে আমরা পথে বসতুম। আমাদের সেই সদাশয় রাজা সাহেব তখন বেঁচে নেই। তিনিও সামান্য অসুখে হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। তাঁরও তখন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স।

বলতে গেলে মাকে আমি ছ'সাত বছরের বেশী পাইনি। তাঁর মৃত্যুর সময় আমি ছিলুম না। গেছলুম ম্যাট্রিক দিতে কটকে। তিনি আমাকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে। আমি কিন্তু বরাবরই একটু উদাসীন ছিলুম। আমি বাস করতুম মনোজগতে। আমার একখানা হাতে-লেখা মাসিকপত্র ছিল। সেটা ওড়িয়া ভাষায়। কিন্তু আমার প্রধান পাঠ্য ছিল যত রাজ্যের বাংলা বই ও বাংলা মাসিকপত্র। আমার হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয় আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। সেকালের এক জন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীতেও আমার গতিবিধি ছিল। রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ সরকার মহাশয়ের নাতিরা আমার বন্ধু। সুতরাং আমি ঢেঙ্কানালে বসেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন-আধুনিক অসংখ্য বই পড়তে পেয়েছিলুম, আর মাসে মাসে পড়তে পেতুম "প্রবাসী," "ভারতবর্ষ," "ভারতী," "সবুজপত্র," "মানসী ও মর্মবাণী," "নারায়ণ," "গৃহস্থ," "শিশু," "সন্দেশ," "মৌচাক"। এ ছাড়া ইংরেজী মাসিকের অপ্রতুল ছিল না। এমনি করে আমার সাহিত্যিক রুচি গড়ে ওঠে। একবার স্কুলের পরীক্ষায় প্রাইজ পাই টলষ্টয়ের ছোট গল্পের ইংরেজী অনুবাদ। তার থেকে একটার বাংলা অনুবাদ করে "প্রবাসী"তে পাঠিয়ে দিই। তখনো আমি স্কুলের ছাত্র। বয়স বোধ হয় ষোলো। অবিলম্বে উত্তর এলো লেখাটি "প্রবাসী"তে ছাপা হতে যাচ্ছে। উত্তরদাতা চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। "তিনটি প্রশ্ন" সেই গল্পটির নাম।

"তিনটি প্রশ্ন" আমার প্রথম প্রকাশিত বাংলা রচনা। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার আগেই আমি স্থির করে ফেলেছিলুম যে, আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সাংবাদিক হব ও ভারতের স্বাধীনতার জন্যে লিখব। ঢেঙ্কানালের শারঙ্গধর দাস ছিলেন আমেরিকায়। তিনি যখন সে দেশ থেকে ফিরলেন আমি ওড়িয়াতে

একটা গান লিখলুম ও সেই গান গেয়ে তাঁকে প্রকাশ্যে সম্বর্দ্ধনা করা হলো। তাঁর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছি শুনে মা'র মনে সন্দেহ হলো আমিও আমেরিকা যাচ্ছি। তিনি আমাকে চোখে চোখে রাখলেন। আমার কাছে কথা আদায় করে নিলেন যে, আমি পালাব না। কিন্তু ম্যাট্রিক দেবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কটক যাবার পর আমার প্ল্যান হলো কাউকে কিছু না বলে কলকাতায় পালানো, কলকাতা থেকে আমেরিকায়। কটকে বসে ছোট কাকাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছিলুম যে, সাত দিনের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে. কিন্তু সাত দিনের মধ্যে যা ঘটল তা আমার পরিকল্পিত আশ্চর্য ঘটনা নয়, বিধাতার পরিকল্পিত আশ্চর্য ঘটনা। মাকে বেশ ভালো দেখে এসেছিলুম, খবর এলো তিনি নেই। কোথায় আমি চলে যাব আমেরিকায়, না তিনি চলে গেলেন স্বর্গে। আমার আমেরিকা যাওয়া হলো না, কিন্তু আমেরিকা এলেন আমার ঘরে আমার বধূরূপে প্রায় দশ বছর পরে।

ছোট কাকাকে বলার ফল হলো এই যে, বাবা আমাকে অনুমতি দিলেন কলকাতা গিয়ে খবরের কাগজের সম্পাদনা শিখতে। ইতিমধ্যে আমি জর্নালিজমের উপর বইপত্র পড়েছিলুম। কিন্তু আমি রিপোর্টার হতে চাইনি, প্রুফরীডার হতে চাইনি, সাব এডিটর হতে চাইনি, চেয়েছিলুম ফ্রীলান্স হতে। নয়তো লীডার রাইটার হতে। আমার পরমহিতৈষী দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আমাকে পরিচয়পত্র দিলেন, দেখা করলুম "বসুমতী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি আমাকে কিছু অনুবাদ করতে দিলেন। তার পর উপদেশ দিলেন শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখতে। ঘোষ-মিত্তিরের ওখানে গ্রেগ শর্টহ্যাণ্ড আরম্ভ করে দিলুম, সঙ্গে সঙ্গে টাইপরাইটিং। সওদাগরি আপিসের বাবু তৈরি হচ্ছিল সেখানে। আমার ভালো লাগল না। "সার্ভ্যাণ্ট" সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি আমাকে বললেন প্রুফরীডিং শিখতে। তাঁর দপ্তরের এক ভদ্রলোক আমাকে শেখালেন বটে, কিন্তু এ কথাও বললেন যে আমি তাঁর দানা মারতে এসেছি। শুনে দুঃখ হলো। দেখলুম এঁরা কেউ আমাকে চিনলেন না।

সম্পাদনা শেখবার এই হয়তো সনাতন পদ্ধতি। কিন্তু এর জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না। আধপেটা খেয়ে অসুস্থ হয়ে কী করব ভাবছি এমন সময় ছোট কাকা শ্রীহরিশচন্দ্র রায় লিখলেন, তুমি আমাদের বংশের বড় ছেলে, তোমার কাছে আমরা এর চেয়ে বড় কিছু আশা করেছিলুম। ফিরে এসো, কটক কলেজে আমি তোমাকে ভর্ত্তি করে দেব। আমার কাছে থাকবে। ছোট কাকার কথামতো কাজ হলো। কিন্তু জর্নালিজমের নেশা গেল না! স্থির রইল ঐ হবে আমার পেশা।

সেটা অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। সরকারী কলেজে পড়তে হলো এই যথেষ্ট লজ্জা। সরকারী চাকরি তো অভাবনীয়। আই. এ. পরীক্ষার পর আবার কলকাতা গিয়ে সম্পাদকী ভাগ্যপরীক্ষায় নামব, এমন সময় খবর পাওয়া গেল আমি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। স্কলারশিপ পাব নিশ্চয়। মোড় ঘুরে গেল। চললুম পাটনা। স্থির হলো বি. এ. পরীক্ষার পর আবার কলকাতা গিয়ে সম্পাদনার সুযোগ খুঁজব। কিন্তু এবারেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করি। স্কলারশিপও পাই। এম. এ. পড়তে পড়তে আই.সি.এস. প্রতিযোগিতায় যোগ দিই। প্রথম বারে সারা ভারতে পঞ্চম হই। সেবার মাত্র তিন জন নেওয়া হয়। আমাকে আরেকবার পরীক্ষা দিতে হলো। এবার আমি সারা ভারতে প্রথম হই ও পূর্ববর্ত্তীদের রেকর্ড ভঙ্গ করি। এর পরে তো আর সম্পাদক হওয়ার কথা ওঠে না। দু'বছরের জন্যে সরকারী খরচে বিলেতে চলে যাই। মনকে বোঝালুম, আচ্ছা, ফিরে এসে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সম্পাদক হওয়া যাবে। তখন আমি স্বাধীন। হায়! পুরুষের ভাগ্য দেবতারও অজানা।

ইতিমধ্যে আমার সাহিত্যচর্চ্চা ধীরে ধীরে চলছিল। কলেজে আমরা জনকয়েক বন্ধু মিলে একটা ক্লাব করি। তার নাম ননসেন্স ক্লাব। তার একটা হাতে লেখা পত্রিকা ছিল। তাতে যে যা খুশি লিখত। যে কোনো ভাষায়। আমি লিখতুম ইংরেজী বাংলা ওড়িয়া তিন তিনটে ভাষায়। মাঝে মাঝে "প্রবাসী" প্রভৃতি মাসিকপত্রে লেখা দিতুম। "প্রবাসী"তে একবার আমার একটি বড় কবিতা গোড়ার দিকে ছাপা হয়। "ভারতী"তে ছাপা হয়

আমার সমাজধ্বংসী রচনা "পারিবারিক নারী-সমস্যা।" লেখকের বয়স মাত্র আঠারো বছর, এ কথা জানা থাকলে "বঙ্গনারী" তার একটা উত্তেজিত প্রতিবাদ লিখে ছাপাতেন না। কত বার তাঁকে আমি পুরীর সমুদ্রতীরে দেখেছি, ভেবেছি নিজের পরিচয় দিয়ে বলি আমিই সেই কালাপাহাড়। কিন্তু আমার সাহস যা কিছু ঐ কাগজে কলমে। মোকাবিলায় আমি একটি ভিজেবেড়াল। "ভারতী" আমার প্রতি সদয় দেখে শরৎচন্দ্রের "নারীর মূল্যে"র উপর একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিই। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। "ভারতী" তার সমস্তটাই ছাপলেন। শরৎচন্দ্রের এই নির্জলা প্রশংসা তখনকার দিনে নতুন ছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কি না জানিনে। দীর্ঘকাল পরে যখন তাঁর "শেষ প্রশ্নে"র বিরূপ সমালোচনা করি তিনি মনে করলেন আমি তাঁর নিন্দুক। তাঁর সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার অবসর হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে ওড়িয়াতেও আমার সাহিত্যের কাজ চলছিল। উৎকলের শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র "উৎকল সাহিত্য" ইবসেনের "ডল্‌স হাউস" নিয়ে লেখা আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সম্পাদক-প্রবর ব্রাহ্মনেতা বিশ্বনাথ কর মহাশয় আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে স্নেহ করতেন। আমার আরো অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা তাঁর আনুকূল্যে ছাপা হয়। সাধারণত তিনি আমাকে প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান দিতেন। আমার বন্ধুরাও তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করেন।

আমাদের সেই ননসেন্স ক্লাবের দলটি কর মহাশয়ের মাসিকপত্রে স্থায়ী আসন পেয়ে সবুজ দল বলে সুপরিচিত হয়। অন্নদাশঙ্কর রায়, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হরিহর মহাপাত্র মিলে "সবুজ কবিতা" নামে একখানি বই বার করেন। ননসেন্স ক্লাবের মেম্বর নন এমন কয়েক জন লেখক ও লেখিকা পরে এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে "বাসন্তী" নামে একখানি বারোয়ারি উপন্যাস সংরচন করেন। কর মহাশয় তাঁর মাসিকপত্রে এই উপন্যাসটিকেও আশ্রয় দেন। সবুজ দল বলতে এঁদের সবাইকে বোঝায়। বাংলায় যেমন "কল্লোল যুগ" ওড়িয়াতে তেমনি "সবুজ যুগ।" বন্ধুরা আশা করেছিলেন যে, আমি তাঁদের সঙ্গে থেকে নব নব উদ্যমের দ্বারা সবুজ সাহিত্যের খ্যাতি বর্দ্ধন করব। কিন্তু কিছু দিন থেকে আমি চিন্তা করছিলুম যে, বাংলা ওড়িয়া দুটো ভাষার দুই নৌকায় পা রেখে আমি কাল-পারাবার পাড়ি দিতে পারব না। কেউ কোনো দিন দুই ভাষায় অমর হয়নি। আমাকে দুটোর একটা বেছে নিতে হবে, যেমন নিয়েছিলেন বঙ্কিম, যেমন নিয়েছিলেন মাইকেল। ঠিক এই রকম একটা সন্ধিক্ষণ এসেছিল কবিবর রাধানাথ রায়ের জীবনে। তিনিও লিখতেন বাংলায়, ওড়িয়ায়। দুই ভাষায়। নামও হয়েছিল বেশ। এমন সময় তিনি বাংলা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র ওড়িয়ায় লেখেন। অক্লান্ত সাধনার ফলে আধুনিক উৎকলের শ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য হন।

আমি কিন্তু রাধানাথের বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। আমি বেছে নিই বাংলা। এর পরে আমি যখন ওড়িয়া লেখায় হঠাৎ ক্ষান্তি দিই আমার বন্ধুরা অবাক হন। সম্পাদক হন বিস্মিত। পাঠকেরা হন ক্ষুণ্ণ। অথচ আমি নিজেও নিশ্চিত ছিলুম না যে এক দিন আমি বাংলা সাহিত্যে যশস্বী হব। আমার পক্ষে ওটা কূল ছেড়ে অকূলে ভাসা। তখনো আমি "পথে প্রবাসে" লিখিনি। বাংলা দেশে কেউ আমাকে চেনে না। "কল্লোল" আপিসের সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করেছি, সাহস হয়নি ঢুকতে। শান্তিনিকেতনে কবিসন্দর্শন করেছি, বলিনি যে আমি এক জন সাহিত্যিক। দেখতে দেবার মতো যা আমার ছিল তা "প্রবাসী"র গুটিকয়েক কবিতা, "ভারতী"র গুটি দুয়েক প্রবন্ধ। অপর পক্ষে ওড়িশায় তখন আমি প্রথম পৃষ্ঠার অধিকারী।

বাংলায় লিখব, এই সিদ্ধান্তের পরের ধাপ বাংলা দেশে বাস করব। বিলেতে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে আমি কোন্ প্রদেশে কাজ করতে চাই আমি উত্তর দিলুম, বাংলা দেশে। তাঁরা ইচ্ছা করলে আমাকে আর কোথাও পাঠাতে পারতেন, কিন্তু দেখা গেল আমার ইচ্ছা তাঁরা মেনে নিলেন। বাংলা দেশে আমি আই. সি. এস. হয়ে আসি ১৯২৯ সালের শেষ ভাগে। তার আগে মাঝে মাঝে কলকাতা ও শান্তিনিকেতন এসেছি। সতেরো বছর বয়সের আগে বাংলা দেশ দেখিনি। পঁচিশ বছর বয়সের পর থেকে বাংলা

দেশ দেখে বেড়াচ্ছি। বাবা যতদিন ছিলেন ঢেঙ্কানালের বাড়ীতে কালেভদ্রে যেতুম। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের জন্যে যাই। পরে একবার দক্ষিণ ভারত দেখে ঢেঙ্কানাল হয়ে ফিরছি এমন সময় আমার মেজ ছেলের অসুখ করে ও চিকিৎসা-বিভ্রাটে কটক হাসপাতালে মৃত্যু হয়। বারো বছর আগে ঘটে এ ঘটনা। তার পর থেকে আর ও-মুখো হইনি। পুত্রশোকের মতো শোক নেই। আমার জীবনের প্রথম উনিশ বছর কেটেছে ওড়িশায়, প্রধানত ঢেঙ্কানালে, পুরীতে ও কটকে। তার পরের ছয় বছর কেটেছে বিহারে ও বিলেতে। তার পরের একুশ বাইশ বছর কাটল বাংলা দেশে। আর দু'মাস পরে আমার সরকারী কর্মজীবন শেষ হয়ে যাবে। আমি অকালে অবসর নিয়ে সাহিত্যে আত্ম-নিয়োগ করব। শান্তিনিকেতনে স্থির হয়ে বসব।

সাংবাদিকতার নেশা অনেক দিন ছুটে গেছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে সাহিত্যের কাজই আমার আসল কাজ। এ কাজ শেষ না করে আমার ছুটি নেই। কিন্তু শেষ হবে কী, ভালো করে আরম্ভই হয়নি। যিনি আমাকে এত দূর নিয়ে এসেছেন তিনি আমাকে বাকীটুকু এগিয়ে দেবেন, এই আমার বিশ্বাস। জীবন বড় বিচিত্র ব্যাপার। কেমন করে কী যে হয় কেউ বলতে পারে না। সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবীশ হয়ে দু'বছরের জন্যে বিলেত যাচ্ছি এমন সময় "বিচিত্রা" বেরোয়। আমার বন্ধু শ্রীকৃপানাথ মিশ্র ভাগলপুরের লোক। সেই সূত্রে "বিচিত্রা" সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কৃপানাথের কথায় "বিচিত্রা"য় ছাপতে দিই "রক্তকরবীর তিন জন।" সম্পাদক আরো লেখা চেয়ে পাঠান। তখন বলি, আচ্ছা, আমি আমার ভ্রমণকাহিনী লিখে পাঠাব মাসে মাসে কিস্তিতে কিস্তিতে। "পথে প্রবাসে" শুরু হলো বম্বেতে জাহাজ ধরতে গিয়ে। তিন চার কিস্তি ছাপা হবার পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ ভালো লাগে। তেরো চোদ্দ বছর বয়সে এঁরাই ছিলেন আমার আদর্শ কবি, আদর্শ প্রবন্ধকার। চৌধুরী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভূমিকা লিখে দিলেন। আর যা বললেন তা এক জন তরুণ সাহিত্যিকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। আকবর বাদশাহের দরবারে এক দিন এক নবীন গুণী এলেন। তাঁর আলাপ শুনে বড় বড় ওস্তাদরা মাথা থেকে পাগড়ি খুলে ফেলে দিলেন। এখন থেকে ইনিই শোনাবেন, আমরা শুনব।

হ্যাঁ, জীবন অতি বিচিত্র ব্যাপার। তন্ময় হয়ে পড়ছি দেখলেই মা ধরে নিতেন উপন্যাস পড়ছি। বলতেন, হুঁ। নভেল পড়া হচ্ছে! ছেলে তাঁর নভেল লিখছে দেখলে কী মনে করতেন জানিনে। হয়তো বলতেন, হুঁ! নভেল লেখা হচ্ছে!

আগে টাকা!

উইনষ্টন চার্চ্চিল অপবাহ্নে বন্ধুদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবতে গেছেন। ঐ দিন বাত্রে বেডিওতে তিনি ভাষণ দেবেন। চার্চ্চিল বন্ধুদেব গৃহে পৌঁছতে দেবী কবেছিলেন। গাড়ী থেকে নেমে তিনি ট্যাক্সিব চালককে বললেন,—তুমি বি-বি-সি ষ্টুডিওব ফটকে গিয়ে অপেক্ষা ক'ব। আমি ফিবব তোমাব গাড়ীতে।

চালক বললে,—আপনাকে অন্য গাড়ী দেখতে হবে। আমি এখন অত দূব যেতে পাববো না।

চার্চ্চিল বিস্মিত হ'লেন চালকেব কথা শুনে। বললেন,—কেন?

—বাত্রে বেডিওতে চার্চ্চিল কথা বলবেন। ঘবে ফিবে গিয়ে আমাকে শুনতে হবে। বললে গাড়ীব চালক।

কথাগুলো শুনে অত্যন্ত খুশী হ'লেন চার্চ্চিল। পকেট থেকে উপবি কিছু টাকা বেব ক'বে দিয়ে দিলেন তক্ষুনি চালকটিকে।

চালক তখন টাকা পেয়ে বললে খুশী হয়ে,—আপনাব কথা শুনবো। আমি অপেক্ষা কববো বি-বি-সি ষ্টুডিওতে। চার্চ্চিল তোলা থাক্ এখন।

আমাদের ইংরাজী শিক্ষা-৫

অধ্যক্ষ পি, কে গুহ

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ইংরাজি শিক্ষাকে কি ভাবে সময়োপযোগী করে নেওয়া হবে—সেই প্রশ্নই আজকের দিনে অন্যতম প্রধান সমস্যা। ইংরাজির ক্লেশকর প্রভাব থেকে ভারতীয় ছাত্রদের মনকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা যে অত্যন্ত জরুরী সে বিষয়ে সকলেই এখন একমত। প্রত্যেক ভারতবাসীই মনে করেন যে, বৈদেশিক শক্তির রাজনৈতিক কর্তৃত্বের হাত থেকে ভারতের মুক্তির অন্যতম প্রথম ফল হওয়া উচিত বিদেশী ভাষার পীড়াদায়ক শাসনের হাত থেকে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার মুক্তি-সাধন। সকলেই এখন স্বীকার করেন যে ইংরাজি জ্ঞানের উপর যে কৃত্রিম মূল্য এত দিন আরোপ করা হয়েছে, তার ফলে ভারতীয় বালক-বালিকাদের মন এবং বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ একেবারে রুদ্ধ না হলেও ব্যাহত হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে, এর ফলে যথোপযুক্ত ভাবে মাতৃভাষা অধ্যয়নের পথে তো বাধা সৃষ্টি হয়েছেই, উপরন্তু ভারতীয় মনের সাধারণ বিকাশ এবং উন্নতির মূলেও কুঠারাঘাত করা হয়েছে।

এখন সকলেই বুঝতে পারেন যে, মাতৃভাষা শিক্ষা সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ ভাবে ইংরাজী শিক্ষার যে ব্যবস্থা এত দিন চালু ছিল তার পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত ক্ষতিকর। স্কুলে শিক্ষকদের অধিকাংশ শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় হয়েছে ইংরাজি শিক্ষা দিতে। স্কুলের রুটিনে ইংরাজির জন্য অনাবশ্যক ভাবে এত বেশী সময় দিতে হয়েছে যে, তার ফলে মাতৃভাষা ও অন্যান্য বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে। তা ছাড়া একেবারে শিশু বয়সে অত্যন্ত পরিবর্তনশীল একটি বিদেশী ভাষার বানানের জটিলতা এবং উচ্চারণ ও বাক্যগঠন সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণের সমস্ত ব্যাপারটাই ভারতীয় ছাত্রদের উপর দুঃস্বপ্নের মত চেপে বসে ছাত্র-জীবনের একেবারে সুরুতেই শিক্ষার সমস্ত আনন্দ ও মাধুর্যকে খর্ব করেছে।

ভারত যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে তখন আশা করা যায়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে বহু শতাব্দীর জড়তা এবং আলস্য কেটে গিয়ে এবার তার সর্বব্যাপী নব জাগরণ হবে। ইংরাজি যখন আজ রাষ্ট্রের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা এবং সমর্থনে বঞ্চিত হয়েছে তখন স্বাধীন দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষা-ক্ষেত্রে ইংরাজির স্থান হবে কোথায়, তা বিবেচনা করবার সময় উপস্থিত। এত দিন ইংরাজি শিক্ষার জন্য যে শক্তি ও সময় মর্মান্তিক ভাবে নষ্ট হয়েছে এবং যে মানবিক সম্পদ ভয়াবহ রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আজকের ভারতে তার অবসান করতে হবে। ইংরাজিকে আজ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। কোন কৃত্রিমতা চলবে না। জাতির প্রকৃত মঙ্গলের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে ইংরাজি শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

শিক্ষা-ক্ষেত্র থেকে ইংরাজিকে একেবারে মুছে ফেলবার প্রয়োজন নেই। ইংরাজরা এ দেশ ছেড়ে চলে গেলেও যে এখানে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া এবং নেওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, এত কাল যে উঁচু বেদীতে ইংরাজিকে স্থান দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে তাকে নামিয়ে আনতে হবে। সকলেই মনে করেন যে, ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় ইংরাজি এত দিন যে গৌরবের আসনে উপবিষ্ট ছিল, সেখানে এখন মাতৃভাষাকে বসাতে হবে। এত দিন ইংরাজি ছিল লক্ষ্য, কিন্তু এখন ইংরাজিকে দেখতে হবে লক্ষ্যে উপনীত হবার পন্থা হিসাবে। এখন থেকে ইংরাজির কাজ হবে সহায়তাকারী ভাষা হিসাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় সাহায্য করা—আন্তঃপ্রাদেশিক এবং আন্তর্জাতিক যোগসূত্র রক্ষায় সাহায্য করা এবং যে পশ্চিমী সাহিত্য, চিন্তাধারা এবং বিজ্ঞান ইংরাজি গ্রন্থে প্রকাশিত হচ্ছে, তা ভারতবাসীর কাছে বোধগম্য করা।

এই গুরুত্ব হ্রাসের ঔচিত্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এবং বিশেষ মান-মর্যাদা প্রাপ্ত শিক্ষণীয় প্রধান বিষয়ের স্থান থেকে ইংরাজিকে নামিয়ে সহায়তাকারী দ্বিতীয় ভাষায় রূপান্তরিত করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মতভেদ নেই। ইংরাজির মূল্যবোধ ও শিক্ষা-ক্ষেত্রের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে এই মৌলিক পরিবর্তনের ফলে স্বভাবতই ইংরাজি শিক্ষার ধারারও আমূল সংস্কার করতে হবে। আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনায় ইংরাজির এই নূতন ভূমিকার ফলে যে সমস্ত পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হতে পারে সেগুলোকে নিম্নলিখিত শিরোনামায় আলোচনা করা যেতে পারে :—

ইংরাজি শিক্ষা সুরু হবে কোন্ ক্লাস থেকে ;
ইংরাজির প্রথম কোর্স ;
ম্যাট্রিকুলেশনের ইংরাজি কোর্স ;
ইণ্টারমিডিয়েটে ইংরাজি কোর্স ;
ডিগ্রি কোর্সে ইংরাজি।

ইংরাজি শিক্ষা সুরু হবে কোন্ ক্লাস থেকে

ভারতের সমস্ত শিক্ষাবিদ্‌ই মনে করেন, ইংরাজি এখনকার মত স্কুলের খুব নীচু ক্লাস থেকে সুরু না করে একটু উঁচু ক্লাস, যথা—ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে (অর্থাৎ ছাত্রের বয়স যখন ১২।১৩ বছর) সুরু করা উচিত। এতে সব দিক দিয়েই সুবিধে। মন এবং বুদ্ধিবৃত্তি গঠনের সূচনাতেই বিদেশী ভাষা শেখার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেয়ে মাতৃভাষা চর্চার সুবিধা হবে এবং অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগ দেবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। তাতে ইংরাজি শিক্ষাও সুদৃঢ় এবং সন্তোষজনক হবে, কারণ ইংরাজি শিক্ষা সুরু হবে এমন সময় যখন ছাত্ররা নতুন ধরণের শব্দ শেখার ক্ষমতা এবং বাক্য গঠনের নূতন পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে।

ইংরাজির প্রথম কোর্স

ছাত্ররা ১২।১৩ বছর বয়সে ইংরাজি শিখতে সুরু করছে। কাজেই ইংরাজির প্রথম কোর্স এমন ভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে তিন বছরের মধ্যে ইংরাজির বনিয়াদ এমন সুদৃঢ় হয়ে যায় যে, ১৫।১৬ বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশনের ইংরাজিকে তার উপর বেশ উপযুক্ত ভাবে দাঁড় করানো যেতে পারে। এই ত্রিবার্ষিকী প্রাথমিক কোর্স প্রণয়নে সময় এবং পরিসরের দিকে কড়া নজর রেখে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ছেলেরা এখন ছয় বছরে যা শেখে, তখন যেন তিন বছরে তাই শিখতে পারে। এ না হবার কোন কারণ নেই। আজ-কাল ছেলেরা অপরিণত বয়সে ইংরাজির উদ্দেশ্যহীন এবং অপচয়-মূলক প্রথম কোর্স ধরে এবং সুদীর্ঘ ৬ বছর তাই নিয়ে কাটায়। প্রকৃতপক্ষে বার্ষিক অগ্রগতি কিছুই হয় না। সুতরাং পরিণত

বয়সে ত্রিবার্ষিকী প্রথম কোর্স অধিকতর কার্য্যকরী না হবার কোন কারণ নেই।

কোর্স সুরু হবে বর্ণমালা দিয়ে এবং সরল প্রকাশভঙ্গির ভিত্তিতে (যেখানে অনির্দিষ্টতা এবং অস্বাভাবিকতা নেই অর্থাৎ ইংরাজি প্রকাশের অতি স্বাভাবিক পদ্ধতি) রচিত সুচিন্তিত এবং ক্রমাগ্রসর পরিকল্পনার পথ অতিক্রম করে এসে শেষ হবে সরল গদ্য রচনায়।

ম্যাট্রিকুলেশনের ইংরাজি কোর্স

ত্রৈবার্ষিকী প্রাথমিক কোর্স শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হবে ম্যাট্রিকুলেশনের দ্বি-বার্ষিকী ইংরাজি কোর্স। ম্যাট্রিকুলেশনের ইংরাজি কোর্স কি হওয়া উচিত তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, উপরে বর্ণিত প্রাথমিক কোর্স শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি কোর্স দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া উচিত। দু'টো বিকল্প কোর্স থাকবে। একটা হবে প্রধানতঃ ভাষা শেখবার বাস্তব এবং ফলপ্রসূ কোর্স। তাতে সাহিত্য হিসাবে ইংরাজি শেখবার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। অপরটি হবে সাহিত্যের কোর্স। তাতে থাকবে সাহিত্য হিসাবে ইংরাজির প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ-সৃষ্টিকারী সরল কবিতা এবং সুন্দর পরিপাটি ধরণের গদ্য। যাঁরা ম্যাট্রিক কোর্সেই ইংরাজিকে দ্বিধা-বিভক্ত করার পক্ষপাতী, তাঁরা বলেন যে, নবম শ্রেণীতে যে সমস্ত ছাত্রকে সাহিত্য অধ্যয়নের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহশীল দেখা যাবে এবং যাদের মন সাহিত্যাভিমুখী বলে মনে হবে, একমাত্র তাদেরই ইংরাজি সাহিত্যের কোর্স গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে। আর সাহিত্যের প্রতি যাদের অনুরাগ নেই এবং যারা কারিগরী এবং বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে ঝুঁকবে, তাদের শেখানো হবে ইংরাজি ভাষা।

কেউ কেউ মনে করেন, ১৪।১৫ বছরের মত অপরিণত বয়সে এক দল ছেলেকে অ-সাহিত্য পাঠের দিকে ঠেলে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। স্কুলেই ছাত্রদের পরিষ্কার দু'টো শ্রেণীতে ভাগ করতে হলে তাদের সম্বন্ধে যতটুকু জানবার দরকার হবে, ততটুকু জানা যাবে না। এমন কি, এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় যদি অষ্টম শ্রেণীর শেষে একটা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাও করেন, তাহলেও সেই সিদ্ধান্ত কিছুটা স্বৈরাচারী হবে। একটি ছাত্র যখন তার প্রকৃত ক্ষমতা, অক্ষমতা, স্বাভাবিক ধীশক্তি এবং অনুরাগ-বিরাগ সম্বন্ধে নিজেই সচেতন হয়নি, তখনই তার ভবিষ্যৎ শিক্ষার ছক কেটে দেওয়া এত বড় গুরু দায়িত্বের ব্যাপার যে, স্কুলের শিক্ষকরা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সহজে রাজি হবেন কি না সন্দেহ। যাঁরা ম্যাট্রিকুলেশনে ইংরাজিতে দ্বিবিধ কোর্সের বিরোধী, তাঁরা তাঁদের বক্তব্যকে আরো জোরালো করেন এই বলে যে, ইংরাজি সাহিত্যে বালক-বালিকাদের উপযুক্ত অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর গদ্য-পদ্যের এত প্রাচুর্য যে, তার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির সুযোগ সব ছাত্রকেই দেওয়া উচিত। তাঁরা বলেন যে, সাহিত্য হিসাবে সাহিত্যের রস উপভোগ করার মধ্য দিয়েই একটি ভাষা সম্পর্কে প্রকৃত ভাষা-জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে। তাই তাঁরা বলেন যে, নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ছাত্রদের মধ্যে ভাষা-জ্ঞানের সৃষ্টি করতে হলে ইংরাজির সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। তাঁরা মনে করেন, ছাত্রদের সঙ্গে বিদেশী ভাষার প্রথম পরিচয় আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। তার জন্য চাই ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সরল সাহিত্য উপভোগের ব্যবস্থা করা। নিছক ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াবে অত্যন্ত নীরস এবং নিরানন্দময়।

দু'টি মতামতের উপরই অনেক কিছু বলবার আছে। ম্যাট্রিকুলেশনে ইংরাজিকে দ্বিধা-বিভক্ত করণের প্রস্তাব একেবারে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। আবার যাঁরা ম্যাট্রিকুলেশন ছাত্রদের জন্য ইংরাজি ভাষা এবং সাহিত্যের মিশ্র কোর্সের পক্ষপাতী তাঁদের কথাও উপেক্ষণীয় নয়। দু'টি মতামতের সমন্বয়-সাধন করে এমন একটি কোর্স নির্ণয় করা যেতে পারে যা হবে কিছুটা সাহিত্য-যুক্ত ভাষা-প্রধান এবং বাস্তব। যারা সাহিত্যানুরাগী নয়, তাদের কাছে এই পাঠ বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না, আবার ম্যাট্রিকের পর কে কোন্ শিক্ষা গ্রহণ করবে সেই রুচি-অভিরুচিরও একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে।

এর পরেই প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির স্থান হবে কোথায়?

ইণ্টারমিডিয়েট ইংরাজি কোর্স

ইণ্টারমিডিয়েটে ঢাকার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অনুরূপ সাধারণ ইংরাজির একটা পেপারের বিশেষ প্রয়োজন। এটা হবে আই-এ, আই-এস-সি এবং আই-কম ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য এবং এই পেপারের পাঠ্য বিষয়ে থাকবে সামান্য সাহিত্য, সরল গদ্য এবং ছোট-ছোট সরল কবিতা। সেগুলো ভাবমূলক না হয়ে বর্ণনামূলক হলেই ভাল এবং এই পেপারের প্রধান বিষয়ই থাকবে রচনা শিক্ষা। আই-এ ছাত্রদের জন্য ইংরাজির এই সাধারণ পেপারের সঙ্গে থাকবে ইংরাজি সাহিত্যের একটি বাধ্যতামূলক কোর্স, কিন্তু এখানেও লক্ষ্যটা হবে ছাত্রদের মধ্যে ইংরাজি রচনা পড়ে স্বাধীন ভাবে বোঝবার দক্ষতা বাড়ানো।

ডিগ্রি কোর্সে ইংরাজি

বি-এ ক্লাসে ইংরাজি সাহিত্য হবে ইচ্ছাধীন (optional) বিষয়। তবে বি-এ ক্লাসের অন্যান্য সমস্ত ছাত্রদের জন্য থাকবে সাধারণ ইংরাজির একটি বাধ্যতামূলক কোর্স। সেটা হবে ইণ্টারমিডিয়েটের সাধারণ ইংরাজি পেপারের মত, তবে উচ্চতর মানের। বি-এস-সি এবং বি-কমের ছাত্ররাও সাধারণ ইংরাজির কোর্স নিতে পারবে, কারণ তাতে তাদের লাভই হবে।

ডিগ্রী ক্লাসে সমস্ত ছাত্রের পক্ষেই ইংরাজির সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করা বিশেষ লাভজনক হবে; কারণ, তাতে ইংরাজি পাঠ্যপুস্তক থেকে তথ্যাদি সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা তো হবেই, উপরন্তু এমন একটা ভাষায় নিজেদের তারা প্রকাশ করতে পারবে যা অন্তত আরও কিছু কাল আন্তঃপ্রাদেশিক আদান-প্রদানের প্রধান বাহন হয়ে থাকবেই। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের সর্বপ্রধান যোগসূত্র হিসাবে ইংরাজি তো থাকছেই।

যারা অনার্স নেবে দেশী সাহিত্যে, ইংরাজি সাহিত্যের কোর্স হবে তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত শিক্ষণীয় বিষয়। এ ছাড়া তাদের জন্য বিশেষ ভাবে প্রণীত ইংরাজি সাহিত্য-সমালোচনা এবং ইংরাজি সাহিত্যের গঠন-রীতি সম্পর্কীয় একটি পেপারও তাদের নিতে হবে।

ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি যাদের প্রকৃত আগ্রহ গড়ে উঠবে, একমাত্র তাদেরই বি-এ ক্লাসে ইংরাজিতে অনার্স নিতে দেওয়া হবে। কোর্সে ছাত্রের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উপর দু'টি পেপার থাকবে। তাতে সুবিধা এই যে, ছাত্রটি যে দেশী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ হতে যাচ্ছে, তার সঙ্গে ইংরাজি সাহিত্যের সৃষ্টি ও সমালোচনার তুলনামূলক অধ্যয়ন করা সম্ভব হবে।

এম-এ ক্লাসে একমাত্র তারাই ইংরাজি পড়তে পারবে, যারা ইংরাজিতে অথবা কোন দেশী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছে। এম-এ কোর্সেও বি-এ অনার্সের মত দেশী সাহিত্যের উপর দু'টি পেপার থাকবে, তবে উচ্চতর মানের। তাতে তুলনামূলক অধ্যয়নের বিশেষ সুবিধা হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এম-এ কোর্সে দেশী সাহিত্যের পাঠ্য-তালিকায় ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস, সমালোচনা-পদ্ধতি এবং ইংরাজি সাহিত্যের গঠন-প্রণালীর উপর দু'টো পেপার থাকলেও বিশেষ সুবিধা হতে পারে।

ইংরাজদের বিদায় দিলেও ইংরাজিকে আমরা রেখে দেব এবং নিজেদের কাজে ব্যবহার করব। ইংরাজি আর আমাদের উৎপীড়ক প্রভু হিসাবে থাকবে না। নিজেদের সাহিত্য অধ্যয়নে ইংরাজি হবে আমাদের সহায়ক এবং এই বিরাট উপমহাদেশ ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার প্রধান সূত্র। ইংরাজিকে আর আমরা দেবতার আসনে বসাবো না। ইংরাজদের ইংরাজি উচ্চারণ এবং লেখার অন্ধ অনুকরণ করে আমরা আর সময় ও শক্তির অপব্যয় করব না। আমরা ইংরাজির বাহ্যাকারের দিকে নজর না দিয়ে বিষয়-বস্তুর দিকে দৃষ্টি ফেরাবো এবং নিজেদের ভাষার মাধ্যমে ইংরাজি শিখব। অন্যান্য বিষয়ের মত ইংরাজি শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা—সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত।

ইংরাজদের রাজনৈতিক শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলার পর নিজেদের মঙ্গলের জন্য ভারত যদি তার শিক্ষা-পরিকল্পনায় ইংরাজিকে স্থান দেয়, তাহলে তার জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ নেই এবং এর মধ্যে কোন দাস-মনোবৃত্তিও নেই। সকলেই স্বীকার করেন, বিশ্বের মহান্ ভাষা হিসাবে আন্তঃপ্রাদেশিক এবং আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের যোগসূত্র হিসাবে ইংরাজির মূল্য অসীম। সংস্কৃতির দিক দিয়েও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরাজিকে যদি সহায়তাকারী অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে স্থান দেওয়া হয়, এবং সেই অনুযায়ী ইংরাজি শিক্ষাদান-পদ্ধতি পুনর্গঠন করা হয়, তাহলে ইংরাজি আর আজকের মত পীড়াদায়ক বোঝা হয়ে না থেকে আমাদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে। যে দেশী সাহিত্যের উন্নয়ন এবং অধ্যয়নের জন্য আমরা এত ব্যাকুল, উপরে বর্ণিত উপায়ে ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করলে তাতেও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে।

আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সেই সমস্ত ভারতীয়ই মহান্ হয়েছেন যাঁদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ হয়েছে এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এবং সংস্কৃতির পথে আমাদের একমাত্র ছাড়পত্র হচ্ছে ইংরাজি। ভারতীয় ভাষায় শ্রেষ্ঠ লেখক হয়েছেন তাঁরাই, যাঁরা সেক্সপীয়ার, মিল্টন, শেলী এবং কীট্‌সের সৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়ে ইংরাজি সাহিত্যের মূল সুরটি আয়ত্ত করেছেন। ইংরাজি ভাষা এবং সাহিত্য, ইংরাজি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবধারা এবং ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হচ্ছে আমাদের কাছে বিশ্ব-সংস্কৃতির একমাত্র না হলেও মহান্ তোরণ। ইংরাজি বৈজ্ঞানিক এবং মানবিক জ্ঞান-দীপ্তির মূল্যবান আধার।

যে দেশে ইংরাজির ব্যাপক প্রসারের ফলে এক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, ভারত কি তার সুযোগ-সুবিধা হারাতে পারে? ভারত ইংরাজিকে আয়ত্ত করেছে। রাজনৈতিক অথবা জাতীয় কুসংস্কারের খাতিরে এই বিরাট সাংস্কৃতিক বিজয়কে হাল্কা ভাবে জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীসের মত ভারত তার বিজেতাকে জয় করেছে। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, জওহরলাল নেহেরু, রাধাকৃষ্ণণ সারা বিশ্বে প্রমাণ করেছেন যে, মহান্ ভারতীয় মানস ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের সার বস্তুকে আত্মস্থ করতে পারে। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, ইংরাজি ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বিজাতীয় প্রভাব বৃদ্ধির পরিবর্তে ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি উন্নততর ও ব্যাপকতর হয়েছে।

গল্প হলেও সত্যি

তখন ভিক্টোরিয়ার আমল। বলিভিয়ার ডিক্টেটর ম্যারিয়ানো বলিভিয়াতে এক আসরে আমন্ত্রণ জানালেন অতিথি ও অভ্যাগতদের। ম্যারিয়ানোর এক পাটরাণীকে আসরে এনে অতিথিদের আদেশ করা হ'ল যাতে সকলে ঐ পাটরাণীকে সেলাম জানায়। সকলেই প্রায় সেলাম জানালে, কিন্তু বলিভিয়াস্থ ব্রিটিশ দূত সেলাম জানাতে অস্বীকার করলে। ম্যারিয়ানো তা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে আদেশ করলেন যে, ঐ দূতকে নগ্ন ক'রে গাধার পিঠে চাপিয়ে, ঢাক বাজাতে বাজাতে রাজধানীর বাইরে বের ক'রে দেওয়া হোক। আদেশ পালিত হ'ল যথাযথ।

যখন ভিক্টোরিয়া এই অপমানের কথা বিস্তারিত শুনলেন, তখন তাঁর রাজত্বের মানহানিতে ভিক্টোরিয়া ভীষণ চটে গেলেন। প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে পাঠানো হ'ল। ভিক্টোরিয়া হুকুম দিলেন যে, মানচিত্র থেকে বলিভিয়াকে বাতিল করা হোক। ভিক্টোরিয়া নিজেই কাঁচি দিয়ে মানচিত্র থেকে বলিভিয়াকে কেটে ফেললেন। পরিষদ-গৃহে পৃথিবীর ঝুলন্ত মানচিত্রে বলিভিয়া আর রইলো না। বিলেতী ভূগোলে বলিভিয়ার কোন উল্লেখ থাকলো না। ব্রিটিশের কোন কিছু থেকে বলিভিয়াকে বাদ দেওয়া হ'ল তখনকার মত।

ঔরঙ্গজেবের জিজিয়া কর

শ্রীরাম শর্ম্মা

খৃষ্টীয় ১৬৭৯ সালের এপ্রিল মাসে ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর যে জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন, সে উপলক্ষে তিনি কিরূপ নীতি অনুসারে চলেন ও কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ ব্যবস্থা করেন, সরকারী কাগজপত্র হইতে সে-সম্বন্ধে পর্য্যালোচনার কিছু চেষ্টা করা যাইতেছে।

আরবগণ কর্ত্তৃক সিন্ধু জয়ের পর হইতেই ভারতের মুসলমান রাজারা তাঁহাদের হিন্দু প্রজাদের নিকট হইতে জিজিয়া কর আদায় করিতেছিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ফিরোজ শা তোগলক ঐরূপ রেহাইএর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে পান নাই। আদর্শ মুসলমান রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা ছিল, যাহাতে তাহার সহিত দিল্লী রাজ্যের যত দূর সম্ভব সঙ্গতি থাকে, সেই জন্য সাধারণ নীতি অনুসারে তিনি ব্রাহ্মণদেরও উপর ঐ কর স্থাপন করেন। সেই হইতে মুসলমান রাজারা সকল শ্রেণীর হিন্দুদের নিকট হইতেই ঐ কর আদায় করিতেছিলেন। আকবর তাঁহার অ-মুসলমান প্রজাদের এই অপমানজনক কর-ভার হইতে রেহাই দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন। তাঁহার কয় জন উত্তরাধিকারীও তাঁহার নীতি অনুসরণ করেন; তাঁহারাও মুসলমান প্রথা অনুসরণ করেন নাই।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান ছিলেন; তিনি পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য স্থাপনে ব্যগ্র ছিলেন। তিনি গোঁড়া মুসলমান রাজা ছিলেন, কাজেই কোরাণের নির্দ্দেশ ব্যতীত অন্য ভাবে রাজ্যশাসন তিনি অযৌক্তিক মনে করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যদি অ-মুসলমান প্রথা মানিয়া লইয়া থাকেন, তাহা তাঁহার বিবেচ্য বিষয় নয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এশিয়া ও ইউরোপের সমসাময়িক রাজাদের মত তিনি তাঁহার রাজ্য ভগবানের সেবক হিসাবে শাসন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তাঁহার শাসনে যাহাতে তাঁহার ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি পায়, সে জন্য তিনি গোঁড়া মুসলমান শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরণের সিদ্ধান্ত করেন। তাই যাহা তিনি ইসলামী আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন, সেই অনুসারে তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা চালান। ঐ সময় ইংলণ্ডে দ্বিতীয় চার্লসের ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণা তাঁহার খৃষ্টান প্রজারা গর্হিত বলিয়া মনে করিতেন। সেইরূপ আকবরের পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতার নীতি ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মহানিকর বিপথগমন বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহার ভাব-গতি বিশিষ্ট ধরণের ছিল; সে জন্য যেরূপ কুসংস্কার ও আদর্শ হওয়ার কথা, তাঁহার তাহাই ছিল। পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা তখনও ভবিষ্যতের ব্যাপার ছিল। অন্য মতাবলম্বী মুসলমানরাও তাঁহার নিকট বিশেষ প্রশ্রয়ের আশা করিতে পারিতেন না। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডেও এই বিষয়ে ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই; ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের পূর্ব্বে আয়ার্লণ্ডে রোম্যান ক্যাথলিকদের নাগরিক অসুবিধা দূরীভূত হয় নাই।

আকবর সে যুগের উপযোগী লোক ছিলেন না। ঔরঙ্গজেব যুগোপযোগী আদর্শ পালন করিয়া সন্তোষ লাভ করেন। আকবরের অনেক কর্ম্মচারীই তাঁহার ঐ উদারতা স্বেচ্ছায় মানিয়া লয় নাই; তাহারা তাহাতে কোন উৎসাহ পায় নাই। কাজেই কোন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ভারতের মুসলমান রাজাদের স্বাভাবিক নীতি পুনরায় গ্রহণ করিলে মোগল কর্ম্মচারী মহলে বিরোধিতার কোন আশঙ্কা ছিল না। মুসলমান সমাজের ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা ভারতের মুসলমান রাজাদের স্বৈরাচারমূলক শাসনে কার্য্যকরী ভাবে বাধা দিতে পারিতেন, কিন্তু যে রাজা তাঁহাদের পরামর্শ ও পরিচালনা চাহিতেন, তাঁহার পরিকল্পনায় তাঁহারাই বা কিরূপে বাধা দিতে পারেন? কাজেই সব দিক দিয়াই অবস্থা নীতি-পরিবর্ত্তনের উপযোগীই ছিল।

অবশ্য ঔরঙ্গজেবের প্রজাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক হিন্দু ছিল। সে শতাব্দীতে অন্যান্যরা যেমন ভুল করিতেন, ঔরঙ্গজেবও তাহাদের ইচ্ছা ও স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকিয়া সেইরূপ ভুল করেন। কিরূপে তিনি ঐরূপ অভিমত পোষণ করিতে আরম্ভ করেন, সে কথা বুঝিবার জন্য সে সময়ের সরকারী কাগজপত্রের বিবরণ পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। যখন উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া সংগ্রাম বাধে, তখন প্রায় সকল হিন্দু রাজন্যই তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করেন। যশোবন্ত সিং অন্য পথ গ্রহণ করিলেও কিছু পরে তিনিও তাঁর পক্ষে যান। এই উত্তরাধিকারিত্বের সংগ্রামের কূটনীতি এখনও ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখা হয় নাই। তাহা না দেখা পর্য্যন্ত ঔরঙ্গজেবের মধ্যে এই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গোঁড়ামি কিরূপে ক্রমশঃ দেখা দিতে থাকে, সে সমস্যার সমাধান হইবে না।

১৬৭৯ সালের মধ্যে ঔরঙ্গজেব গোঁড়ামীর দিকে এত অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, অ-মুসলমানদের উপর জিজিয়া কর স্থাপনের আদেশ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়। ভারতবর্ষ ও রাজপুত রাজ্যগুলিতে সকলকেই—সরকারী কর্ম্মচারী, বে-সরকারী লোকজন, ব্রাহ্মণ, অ-ব্রাহ্মণ, কেরাণী ও সৈন্যবিভাগের লোকদিগকেও—উহা দিতে হইত। কখন কখন বলা হইত, সৈন্যবিভাগে কাজ করা মুসলমানদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল; সৈন্যবিভাগে চাকরীর পরিবর্ত্তে হিন্দুদিগকে এই কর দিতে হইত। ভারতের মুসলমান সম্রাটরা, বিশেষতঃ মোগল সম্রাটরা এই বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি গ্রহণে মুসলমান প্রজাদিগকে কি ভাবে বাধ্য করিতেন, সেরূপ কোন ব্যবস্থার কথা কেহই বলেন না। মতবাদের কথা বাদ দিলে কার্য্যক্ষেত্রে এমন একটিও নিদর্শন পাওয়া যায় না, যেখানে ভারতের কোন মুসলমান শাসক তাঁহার রাজ্যরক্ষার জন্য তাঁহার স্বজাতীয়দিগকে তাঁহার পতাকাতলে আহ্বান করিয়াছিলেন। যদিই ধরিয়া লওয়া হয়, কোন সময় সৈনিকবৃত্তির পরিবর্ত্তেই ঐ কর লওয়া হইত, তাহা হইলে যখন রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের রাজপুত রাজাদের উপর ঐ কর স্থাপন করা হইত, সে সময়ের সম্বন্ধে আর সে কথা বলা যায় না। মেবারের রাণা একবার মোগল কর্ম্মচারীদিগকে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা কর-স্বরূপ দিবার পর হিসাব করিয়া দেখা যায়, ৩ হাজার টাকা কম হইয়াছে। ১৬৮৭ সালের ৩রা আগষ্ট সম্রাট জয়সিংহকে ঐ টাকা মাপ করেন, তাহার কারণ, বহু দিনের শত্রুতার অবসানে সেই সময় উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। সম্রাটের দরবারের

১৭০২ সালের ১২ই জুলাইএর বুলেটিনে দেখা যায়, সৈন্যবিভাগ হইতে জিজিয়া আদায়ের জন্য আমিন নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, সম্রাটের সৈন্যদলে নিযুক্ত হিন্দুরা জিজিয়া কর দিত।

স্যার যদুনাথ সরকার এক সময় বলেন, হিন্দু সরকারী কর্ম্মচারীরা ঐ কর দিতেন না। কিন্তু প্রাদেশিক গভর্ণরের আগরার দরবারের ১৬৯৪ সালের ৮ই মে তারিখের বুলেটিনে দেখা যায়, প্রাদেশিক বক্সীর নিজস্ব সহকারী, এক জন দেওয়ান ও এক জন আমিন—এই কয় জন হিন্দু কর্ম্মচারী জিজিয়া কর প্রদানে বিলম্ব করিয়া ফেলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন কৈফিয়ৎ দেন, তাঁহার ঊর্দ্ধতন পদের মুসলমান কর্ম্মচারী বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনি সরকারী কাজে ব্যস্ত ছিলেন; সে জন্য নিজে যাইয়া জিজিয়া দিতে পারেন নাই। তিনি ঐ কর তাঁহার কোন প্রতিনিধিকে দিয়া পাঠাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করা হয়। তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হয়, যথানিয়মে তাঁহাকে নিজে যাইয়াই কর প্রদান করিয়া আসিতে হইবে। ঐ সকল কর্ম্মচারীকে আদেশ মত নিজেরা যাইয়াই জিজিয়া দিয়া আসিতে হয়। রাজন্যদের রাজ্যেও এই কর বসান হয়। ১৬৮৮ সালের ২রা মে তারিখে জয়পুর সরকারের কাগজপত্রে দেখা যায়, রাজা রাম সিংএর ডাক-পেয়াদারা বারহানপুর পৌঁছিলে তাহাদিগকে ঐ কর দিতে বলা হয়। তাহারা তাহার পূর্ব্বেই জয়পুরে ঐ কর দেওয়ায় আবার তাহা দিতে অস্বীকার করে। ফলে তাহাদিগের নিকট যে সকল চিঠিপত্র ছিল, তাহা জোরপূর্ব্বক দখল করা হয় এবং তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ব্যাপারটা সম্রাটের গোচরে আনিবার পর তবে তাহারা মুক্তি পায়। অতঃপর আদেশ দেওয়া হয়, সম্রাটের অথবা অন্য কাহারও ডাকবাহী লোকদের নিকট হইতে কেবল তাহাদের বাসস্থানেই কর আদায় করা হইবে, ডাক লইয়া যাইবার সময় তাহাদের নিকট করের দাবী করা হইবে না।

জায়গীরে জায়গীরদারদিগকে জিজিয়া আদায়ে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হইত না। সম্রাটের কর্ম্মচারীরা যাইয়া কর আদায় করিত। কর্ম্মচারীদের কাজ প্রীতিপ্রদ ছিল না। যে করকে ব্যাপক ভাবে ঘৃণা করা হইত, তাহা আদায়ে গোলমাল সর্ব্বদাই ঘটিত। ১৭০৩ সালের ২৮শে জানুয়ারী সংবাদ পাওয়া যায় যে, মালব প্রদেশের আমিন-ই-জিজিয়া বিরাম দেব সিসোদিয়ার পুত্র দেবী সিংএর জায়গীরে জিজিয়া আদায়ের জন্য এক জন সৈন্য পাঠান। সৈনিকটি সে স্থানে পৌঁছিলে দেবী সিংএর লোকরা তাহাকে আক্রমণ করে, তাহার চুল ও দাড়ি ধরিয়া টানাটানি করে। শেষে সে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায়। সম্রাট দেবী সিংএর জায়গীরের অবস্থার পরিবর্ত্তনের আদেশ দেন। ইহার পূর্ব্বে এক আমিনকে আরও বেশী বিপদে পড়িতে হয়। সে কোন মনসবদারের জায়গীরে কর্ম্মচারী না পাঠাইয়া নিজেই যায়। সে জিজিয়া আদায়ের চেষ্টা করিলে মনসবদার আমিনকে হত্যা করে। ১৬৯৪ সালের ১৮ই জুলাই ঘটনাটি সম্রাটের গোচরে আনা হইলে তিনি মনসবদারের পদাবনতির আদেশ দেন।

জিজিয়া করের পরিমাণও কম ছিল না। গুজরাটে উহা প্রাদেশিক রাজস্বের শতকরা ৪.৪২ ভাগ ছিল। দরবারের অন্য এক তারিখের বুলেটিনে জানা যায়, 'বেরারে মান্দের নামক স্থান হইতে ৩০ হাজার টাকা আদায় করা হইয়াছে, আদায় এখনও শেষ হয় নাই।' আইন-ই-আকবরীতে যে স্থানটিকে মানবা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা যদি মান্দের হয়, তাহা হইলে আকবরের সময় উহার রাজস্ব ছিল ২০ হাজার টাকা। ঔরঙ্গজেবের সময় সমগ্র বেরার প্রদেশের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৫১৮১৭৫০ টাকা। আকবরের সময়ও প্রায় ঐরূপ ছিল। আকবরের সময় বেয়ারে ১৪২টি পরগণা ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী পরগণা ৬২৭৮৬৮ টাকা রাজস্ব দিত। আলোচ্য পরগণা হইতে যে ৩০ হাজার টাকা আদায় করা হয়, তাহা ঐ রাজস্বের তুলনায় শতকরা ৪.৭৬ ভাগ। তখনও কিন্তু জিজিয়া আদায় শেষ হয় নাই।

জিজিয়া স্থাপন ও তাহা আদায়ের জন্য বিপুল ব্যবস্থা করিতে হইত। কি পরিমাণ জিজিয়া আদায় করিতে হইবে, তাহা একখানি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ থাকিত। আদায় আরম্ভ হইলে পরগণার আমিন তাহার সাহায্যের জন্য স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারী, কোতোয়াল, কানুনগো ও থানাদারদের আহ্বান করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল। সে প্রাদেশিক আমিনকে তাহার আদায়ের সংবাদ জানাইত। সম্রাট যখন সভাসদগণ সহ বাহিরে যাইতেন, সে সময় তাঁহার সঙ্গে এক জন জিজিয়া-আমিন থাকিত। কোন সৈন্যদলকে যখন অভিযানে পাঠান হইত, তখন আলাদা কর্ম্মচারীদিগকে তাহাদের সঙ্গে পাঠান হইত। তাহারা সৈন্যদের নিকট হইতে জিজিয়া আদায় করিত। এই সমস্ত কর্ম্মচারী সাধারণতঃ বিশেষ উচ্চপদস্থ হইতেন না। ১৭০২ সালে সম্রাটের সঙ্গে যে আমিন যায়, সে ৩ শত অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদার ছিল। ২ শত অশ্বারোহী সৈন্যের ভারপ্রাপ্ত আমিনও ছিল। সর্ব্বোচ্চ পদের আমিন ৬ শত অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিল। এক জন আমিন দাক্ষিণাত্যের সমস্ত প্রদেশের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিত।

৩ রকম জিজিয়া ধার্য্য করা হইত। যাহাদের ২ শত ডিরহাম (৫১ তোলা ১০ মাশা ও ৭৪ গ্রেণ রূপা) মূল্যের সম্পত্তি থাকিত, তাহারা ১২ ডিরহাম জিজিয়া দিত। অর্থাৎ মোট সম্পত্তির (আয়ের নয়) শতকরা ৬ ভাগ জিজিয়া দিতে হইত। মূলধনের উপর জিজিয়া দিতে হইত। ফলে সমগ্র মূলধন প্রায় ২০ বৎসরের মধ্যেই ঐ ভাবে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার কথা। বিল অফ্ এক্সচেঞ্জের (হুণ্ডীর) উপর বাট্টার সর্ব্বনিম্ন হার ছিল ট্যাভারনিয়ারের মতে শতকরা ৬ টাকা। ১৭০৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত টাকা-কড়ির লেন-দেনের ব্যাপার হইতে জানা যায়, সুদের হার ছিল শতকরা ৪ টাকা। অর্থাৎ যে মালিকের সম্পত্তি হইতে বৎসরে ৫২৲ টাকা আয় হইত, সেইরূপ দরিদ্র ব্যক্তির নিকট হইতে সমগ্র আয়ই জিজিয়া-স্বরূপ লওয়া হইত।

যাহাদের আয় ৫২ টাকা হইতে মোটামুটি ২½ হাজার টাকা ছিল, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর করদাতা। তাহাদিগকে জিজিয়া-স্বরূপ ২৪ ডিরহাম (৬০ টাকা) দিতে হইত। শতকরা ৪ টাকা সুদ হইলে ২½ হাজার টাকার সুদ ১ শত টাকা হয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে জিজিয়া আয়ের শতকরা ৬ টাকা হারে আদায় করা হইত। দ্বিতীয় শ্রেণীর জিজিয়া অনেক কম হইলেও বর্ত্তমানের আয়করের হার অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। যাহাদের সম্পত্তির

মূল্য ১০ হাজার ডিরহামের অধিক ছিল, তাহাদের আয়ের পরিমাণ যাহাই হইক না, তাহারা ৪৮ ডিরহাম দিয়াই নিষ্কৃতি পাইত। তাহাদিগকে মোট ১২।৴০ আনা দিতে হইত। জিজিয়া বাবদ দরিদ্রদের বাৎসরিক আয়ের বেশী দিতে হইত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়ের শতকরা ৬ ভাগ লওয়া হইত। ধনীদের নিকট হইতে যাহা লওয়া হইত, তাহা তাহাদের আয়ের অনুপাত অনুযায়ী ছিল না। ধনীরা এক সঙ্গে সমগ্র টাকাটা দিত; মধ্যবিত্তরা তাহাদের ইচ্ছামত একেবারে অথবা দুই বারে দিত; দরিদ্ররা ৪ কিস্তিতে দিতে পারিত।

অবশ্য কোন কোন শ্রেণীর লোককে জিজিয়া হইতে রেহাই দেওয়া হইত। অপ্রাপ্তবয়স্ক, নারী, সকল প্রকার ক্রীতদাস, অন্ধ, দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক, বেকার, খঞ্জ ও ভিক্ষুকদিগকে জিজিয়া দিতে হইত না। যাহারা ৬ মাসের অধিক অসুস্থ থাকিত, তাহাদিগকেও ঐ কর দিতে হইত না।

করদাতাদিগকে নিজেরা যাইয়া কর দিতে হইত। যে মঞ্চের উপর আদায়কারী বসিত, তাহার নিকট যাইয়া আদায়কারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজ হস্তে আদায়কারীর নিকট মুদ্রাগুলি ধরিতে হইত। প্রাপ্য কর যাহাতে রেহাই দেওয়া না হয়, সে সম্বন্ধে আদায়কারীকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইত। যে নীতি অনুসারে করটি আদায় করা হইত, কাহাকেও ব্যক্তিগত ভাবে রেহাই দিলে তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে বলিয়া ঔরঙ্গজেব মনে করিতেন। ঐ বিষয়ে স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকে কোন ক্ষমতা দিবার কথা তিনি কানে তুলিতেন না।

তবে সময় সময় কোন কোন অঞ্চলকে রেহাই দেওয়া হইত। স্থানীয় কর্ম্মচারীরা সুপারিশ করিলেও ঔরঙ্গজেব ২টি ক্ষেত্রে কোন রেহাই দেন নাই। পক্ষান্তরে সরকারী কাগজপত্রে দেখা যায়, বিস্তৃত অঞ্চলে ৫টি ক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেব রেহাই দেন অথবা সে জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ১৬৮১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বাহাদুরপুরের অধিবাসীদের পক্ষে জিজিয়া রেহাইএর একখানি আবেদন পেশ করা হয়। ঔরঙ্গজেব ঐ দিনই ঐ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ চান। তাহার পর সে সম্বন্ধে আর কি ব্যবস্থা হয়, সরকারী কাগজপত্র হইতে তাহা জানা যায় না। স্থানীয় অধিবাসীদের ও সরকারী কর্ম্মচারীদের আবেদনের ফলে তাহাদের কর দুই-এক বৎসরের জন্য মাপ করা হয়। ১৭০৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী দাক্ষিণাত্যের মোগল প্রদেশগুলির সর্ব্বত্র ঐ কর আদায় বন্ধ করা হয়; মারাঠাদের আক্রমণের জন্য যে অসুবিধা ঘটে, সে জন্য ঐরূপ বিশেষ ব্যবস্থা হয়। ১৭০৪ সালের ১২ই নভেম্বর দেবলঘাটের জিজিয়া কর আদায় ৩ বৎসরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। হায়দ্রাবাদ জয়ের পর উহার জিজিয়া ও অন্যান্য কর মাপ করা হয়। কত দিন সে অবস্থা ছিল, জানা যায় না। তবে ব্যবস্থাটি যে অল্প দিনের জন্য, তাহা বলাই বাহুল্য। এক সমসাময়িক লেখক বলেন, দাক্ষিণাত্য জয়ের পর সেখানে জিজিয়া বলপূর্ব্বক স্থাপন ও আদায় করা হয়। অবস্থা বিবেচনা করিয়া রেহাইএর সিদ্ধান্ত করা হইত। ঔরঙ্গজেব যে এই বিষয়ে অযথা কঠোর অথবা জেদী ছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

ঔরঙ্গজেব ইসলামী আইন অনুসারে তাঁহার রাজ্য শাসনের যে নীতি স্থির করেন, জিজিয়া তাহারই অঙ্গ। তাঁহার অ-মুসলমান প্রজারা এই করের জন্য কিরূপ অবস্থায় পড়িতে পারে, সে কথা তিনি কোন দিন চিন্তা করেন নাই। যদি কেহ এই কর প্রদান এড়াইতে চাহিত তাহা হইলে তাহার পক্ষে সে পথও উন্মুক্ত ছিল। সে "সত্যধর্ম্ম" গ্রহণ করিয়া ঐ করভার হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিত। দরবারের ঐ সময়ের বুলেটিনে প্রায়ই লোকের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের কথা দেখা যায়। ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণকারীকে দরবারে উপস্থিত করা হইত। কিন্তু কত জনে যে কেবল বা প্রধানতঃ ঐ করভারের জন্য ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা স্থির করা কঠিন। অ-মুসলমানদের জীবন যাহাতে কষ্টকর হইয়া উঠে, সে জন্য ঔরঙ্গজেব আরও অনেক উপায় অবলম্বন করেন এবং তাহাদের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের সম্বন্ধে অনেক প্রলোভনও দেখান। জিজিয়া ঐ সকল উপায়ের অন্যতম। কাজেই অ-মুসলমানদিগকে মুসলমান করার বিষয়ে জিজিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কিরূপ কার্য্যকরী হয়, তাহা বলা কঠিন।

এই সঙ্গে আরও একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার, ঔরঙ্গজেব যে সময় জিজিয়া কর স্থাপন করেন, সে সময় পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা রাষ্ট্রনায়কদের নিয়ম-বহির্ভূত ছিল। ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের বা তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন বলিয়া যে ঐ কর স্থাপন করেন, তাহা নয়। ইসলামী রাষ্ট্র সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবের ধারণা যেরূপ ছিল, তাহাই তাঁহাকে ঐ কর স্থাপনে বাধ্য করে। জিজিয়া আদায়ে তিনি সাধারণতঃ অধিক কড়াকড়ি করিতেন না। মুসলমান রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্ম্মে অবিশ্বাসীকে তাহার সহনশীলতার জন্য যে মূল্য দিতে হইতে পারে বলিয়া স্বভাবতঃ আশা করা যাইতে পারে, ঔরঙ্গজেবের নিকট জিজিয়া কর তাহার কম কিছু ছিল না।

অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষাল।

কাগজ

কাগজ পুরাতত্ত্বে 'কাগদ' নামে কথিত। কাগজ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। আরব—কর্তাস, তামিল—বরক, ডেনমার্ক—পেপির, ফরাসী ও জার্ম্মাণী—পেপিয়ার, ইটালী—চার্টা বা কার্টা, পর্ত্তুগীজ ও স্পেন—পেপেল, রাসিয়া—বুমাঙ্গনা, ইংলণ্ড—পেপার এবং বাঙলায় কাগজ। কাগজের সৃষ্টি হয় তৃণ ও বৃক্ষের অংশ থেকে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস (শান্তিনিকেতন)

আবির্ভাব

কবীরদাস ছিলেন সিদ্ধ ভক্ত, সন্তদের মধ্যে মণ্ডলেশ্বর-স্বরূপ। কবীরদাসের পরবর্তী উত্তর-ভারতের সকল সংস্কারমুক্ত ভক্ত-সম্প্রদায়ই কোনো না কোনো ভাবে তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। এই সব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কেউ কেউ সাক্ষাৎ ভাবে কবীরদাসের শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত।

হিন্দীভাষী জনসাধারণের উপর কবীরদাসের প্রভাব অসাধারণ। একমাত্র গোস্বামী তুলসীদাস ব্যতীত এদিক দিয়ে আর কারুর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। হিন্দীতে একটি কথা আছে—

ভক্তী দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ,
প্রগট কিয়া কবীরনে সপ্তদ্বীপ নব খণ্ড।

দ্রাবিড় দেশে উৎপত্তি হ'ল ভক্তির। তাকে নিয়ে এলেন রামানন্দ আর কবীরদাস, প্রকাশ করে দিলেন সপ্তদ্বীপ নবখণ্ডে, (অর্থাৎ সারা দুনিয়ায়)। এর থেকেই বোঝা যায়, হিন্দীভাষী জনসাধারণের কাছে ভক্তির ক্ষেত্রে কবীরদাসের স্থান কত উচ্চে।

কবীরদাসের আবির্ভাব-কাল সঠিক জানা যায় না। কিংবদন্তী অনুসারে ইং ১৩৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে কবীরদাসের জন্ম হয়। কবীর কসৌটী গ্রন্থে আছে কবীরদাসের মৃত্যু হয় ১৫১৮ খৃঃ এবং তিনি ১২০ বছর বেঁচে ছিলেন। সেই হিসাবে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দেই তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু অনেকে বিশেষ করে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এটি সত্য বলে মানেন না। তাঁদের মতে কবীরদাসের ইতিহাস-সম্মত জন্মকাল ইং ১৪৪০ সাল। তবে ভারতীয় পণ্ডিতেরা প্রায়ই সাহেবদের এই মত স্বীকার করেন না। ১৩৯৮ খৃঃ কবীরদাসের জন্ম হয় এই মতটিই তাঁরা সত্য মনে করেন। ভারতব্রাহ্মণে আছে, কবীরদাসের জন্ম হয় ১৩৯৮ খৃঃ ও ১৪৪৮ খৃঃ তিনি দেহরক্ষা করেন। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন ডাঃ ফ্যুরের "উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার শিলালেখমালার প্রমাণের উপর নির্ভর করে ভারতব্রাহ্মণের মতই সমর্থন করেন।

কবীরের জন্ম সম্বন্ধে একাধিক মত প্রচলিত রয়েছে। সাধারণ মত—এক গরীব মুসলমান জোলা-পরিবারে কবীরদাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম নীরু আর মায়ের নাম নীমা।

কিন্তু কবীরদাসের হিন্দু শিষ্যেরা এই মত মানেন না। কবীরের মত এত বড় মহাপুরুষ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান জোলার ঘরে জন্মাবেন এ কথা তাঁরা বিশ্বাসই করেন না। তাঁদের মতে কবীরদাসের জন্ম হয় অলৌকিক উপায়ে। তিনি গুরু রামানন্দের জনৈক ব্রাহ্মণ শিষ্যের বিধবা কন্যার সন্তান। তিনি জোলা-পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন এই মাত্র। নীরু আর নীমা তাঁর আসল পিতামাতা নয়। কবীরদাস তাদের কুড়ানো ছেলে। তাঁকে তারা শুধু পালন করেছিল।

কবীরদাসের জন্ম সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রকাশিত একটি কাহিনী।

গুরু রামানন্দের এক জন ব্রাহ্মণ শিষ্য এক দিন তাঁর বালবিধবা কন্যাকে নিয়ে স্বীয় গুরুদেবকে দর্শন করতে যান। মেয়েটি প্রণাম করলে রামানন্দ তাকে সুপুত্র লাভ কর বলে আশীর্ব্বাদ করেন। মেয়েটি যে বিধবা তা তিনি জানতেন না। এখন উপায়? সিদ্ধ মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ ত ব্যর্থ হতে পারে না? বাপ ও মেয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল গুরুর পায়ে। গুরু বললেন—আমার আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হতে পারে না। তবে ভয় নেই তোমাদের। আমার বরে পুরুষ-সংসর্গ ব্যতীতই এই কন্যা পুত্রলাভ করবে। জগতের পরিত্রাণের নিমিত্ত এর গর্ভে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে। অলৌকিক হবে এর সন্তানের জন্ম। সে মায়ের হাতের তালু দিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে।

যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে মেয়েটি লোকনিন্দার ভয়ে তাকে চুপি চুপি লহর তালাও-এ একটি পদ্মফুলের উপর রেখে দিয়ে আসে।

ছেলেটিকে প্রথম দেখতে পায় জোলা নীরু আর তার স্ত্রী নীমা। এমন সুন্দর ছেলে, না জানি কোন অভাগিনী ফেলে দিয়ে গিয়েছে! ছেলেটিকে নিয়ে কি করা যায় এ-সম্বন্ধে স্বামি-স্ত্রীতে মিলে অনেক পরামর্শ হ'ল। তাদের নিজেদের কোন ছেলে ছিল না। তাই শেষ পর্য্যন্ত তারা স্থির করল ঈশ্বরই ছেলেটিকে তাদের দিয়েছেন। তারা ছেলেটিকে নিয়ে এসে নিজের সন্তান বলেই পালন করতে লাগল।

আর একটি গল্প। এক দিন গুরু রামানন্দের শিষ্য গোঁসাই অষ্টানন্দ দেখতে পেলেন স্বর্গ থেকে একটি অদ্ভুত আলো নেমে এল লহর তালাও-এ। সেই আলোতে চারি দিক উদ্ভাসিত হ'য়ে গেল। তিনি এই অদ্ভুত আলোর কথা স্বীয় গুরুদেবকে জানালেন। রামানন্দ বললেন—ঐ আলো সাধারণ আলো নয়। এক জন মহাপুরুষ ঐ আলোর আকারে পৃথিবীতে আবির্ভূত হ'লেন। লহর তালাও-এ একটি পদ্মের উপর শিশু হয়ে আছেন তিনি। সময়ে এই শিশুর আলোয় সারা দুনিয়া উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

গল্পের এর পরের অংশ আগের গল্পের মতই। শুধু একটু পার্থক্য আছে। নীমা আর নীরু যখন ছেলেটিকে নিয়ে কি করা যায় এ সম্বন্ধে পরামর্শ করছিল, তখন ছেলেটি নিজেই এ বিষয়ের মীমাংসা করে দেয়। সে নীমাকে বলে, পূর্ব্বজন্মে তুমি বিশেষ সেবা করেছিলে তাই এবার আমি তোমাদের ঘরে ছেলে হয়ে এসেছি। আমি এবার তোমাদের মোক্ষলাভের ব্যবস্থা করে দেব।

ক্রমে ছেলেটি বড় হ'তে লাগল। সময় এল তার নামকরণের। নীরু তখন এক জন কাজিকে ডেকে নিয়ে এল নাম ঠিক করে দেবার জন্য। কাজি নাম বাছবার জন্য খুললেন কোরাণ। যে পাতা বেরুল তাতে এই ক'টি নাম পাওয়া গেল—কবীর, আকবর, কিবরা, কিবরিয়া। সব ক'টিরই অর্থ এক; একই মূল তাদের, যার অর্থ 'মহৎ'। শব্দগুলি খোদার সম্পর্কে প্রযোজ্য। কাজি ত অবাক। বই বন্ধ করে আবার খুললেন, এবারও সেই নাম ক'টাই বেরুল। কাজির বিস্ময়ের অন্ত রইল না। তিনি বার বার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু সেই ক'টি নাম ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। ভয় পেয়ে তিনি চলে গেলেন। এই অদ্ভুত খবর চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। শুনে অন্যান্য কাজিরাও এলেন নীরুর বাড়ীতে। কিন্তু তাঁরাও কোরাণ থেকে সেই চারটে নাম ছাড়া আর কিছুই বের করতে পারলেন না। তখন কাজিরা নীরুকে বললেন, এ অতি অলক্ষুণে ছেলে। একে মেরে ফেল; নৈলে তোমার ভীষণ বিপদ হবে। তাঁদের কথায় নীরু ছেলেটির বুকে ছোরা বসিয়ে

দিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাতে শিশুর কিছুই হল না, এক ফোঁটা রক্ত পর্য্যন্ত বেরুল না। এই অসম্ভব কাণ্ড দেখে নীরু অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। তখন শিশুটি একটি দোহা বললে। তার মানে হল—'রক্ত-মাংসে গড়া নয় আমার দেহ, এ বিশুদ্ধ আলো।' তখন ওরা এই অদ্ভুত শিশুর নাম রাখল কবীর।

কবীরদাসের সারা জীবনকে নিয়েই এমনি ধরণের বহু অলৌকিক কাহিনী জমে উঠেছে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে। এটা কিছু আশ্চর্য্যও নয়। সকল দেশেই অসাধারণ মানুষদের নিয়ে বিশেষ করে ধর্মগুরুদের নিয়ে তাঁদের অনুগামী বা ভক্তরা নানা অলৌকিক কাহিনী রচনা করে থাকে। এই সব কাহিনী থেকে ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় অসম্ভবই বলা চলে। কবীরদাস সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি সম্পর্কেও ঐ একই কথা।

জোলা-পরিবারে কবীরদাসের জন্ম হয়েছিল কি না নিশ্চয় করে বলা না গেলেও তিনি যে জোলা-পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন আর তাঁর নামটাও যে মুসলমানী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই।

কাজেই কবীরদাসের পরিচয় পেতে হ'লে, তাঁর বাণী বুঝতে হ'লে আগে এই জোলা জাতির একটি মোটামুটি পরিচয় লওয়া আবশ্যক। কেন না, এদের ঐতিহ্য, এদের মধ্যে প্রচলিত মত, বিশ্বাস প্রভৃতি স্বভাবতই কবীরদাসের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বাংলা জোলা শব্দের মূল ফার্সী জোলাহা শব্দ। ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন, জোলাহা শব্দটি ফার্সী হলেও সংস্কৃত পুরাণে জোলা জাতির উৎপত্তির কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে ম্লেচ্ছ (মুসলমান) পিতা আর কুবিন্দ (শিল্পকার জাতিবিশেষ) মাতা থেকে জোলা জাতির উৎপত্তি হয়। পৌরাণিক বিবরণগুলির সঙ্গে প্রায়ই ঐতিহাসিক সত্যের মিল পাওয়া যায় না। জোলা জাতির উৎপত্তির এই পৌরাণিক বিবরণও ইতিহাসের দিক দিয়ে সমর্থনযোগ্য মনে হয় না, দ্বিবেদীজীও এই পৌরাণিক মত সমর্থনযোগ্য মনে করেন না।

জোলারা মুসলমান! তাঁত বোনা এদের ব্যবসায়। এরা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। ডাঃ দ্বিবেদী তাঁর 'কবীর' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, জোলারা মুসলমান হ'লেও অন্য মুসলমানের সঙ্গে এদের মৌলিক ভেদ আছে। এরা যেখানে থাকে এক চাপে থাকে। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার আর বাঙ্গলা দেশেই জোলাদের বসতি দেখা যায়। দ্বিবেদীজী বলেন, উত্তর-পাঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে বাঙ্গলার ঢাকা ডিভিসন পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক বিস্তীর্ণ ভূভাগে জোলাদের বাস। এই অঞ্চলে এক সময়ে নাথপন্থী যোগীদের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। মধ্যযুগে এই নাথপন্থী যোগীদেরই অধিকাংশ বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়ে যায়। এরাই জোলা।

নাথধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ত্র প্রাচীন ধর্ম। নাথধর্মের সাধনা যোগমার্গের সাধনা। "নাথ-সিদ্ধাদের চরম উদ্দেশ্য ছিল 'কায়া সাধনের' দ্বারা 'জীবন্মুক্তি' লাভ।" কায়া-সাধনই এই ধর্মের প্রধান কথা আর কায়া-সাধন করতে হ'লে প্রয়োজন হঠযোগের। এই জন্যই নাথপন্থীরা হঠযোগ সাধন করত। আর সেই কারণে তাদের বলা হ'ত যোগী বা যুগী। হিন্দু তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে নাথপন্থীদের সাধনার যথেষ্ট মিল থাকলেও নাথপন্থী যোগীরা হিন্দু ছিল না। তারা বেদ, ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র মানৃত না। দীর্ঘকাল তারা প্রবল হিন্দুধর্মের সমক্ষে নিজেদের ধর্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিল। তারা হিন্দুর আচার-ব্যবহার কিছুই মানৃত না, "বর্ণাশ্রম মানৃত না, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার করত না, হিন্দুর দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কাউকেই মানত না।" তাদের মধ্যে নিরাকার ভাবের উপাসনা প্রচলিত ছিল। তাদের ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের চেয়ে মুসলমান ধর্মের মিল বেশী দেখা যায়। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃতদেহের সমাধি দিত। এদিক দিয়েও তাদের সঙ্গে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের মিল বেশী লক্ষ্য করা যায়।

এই যোগী বা যুগী-সম্প্রদায়কে হিন্দুরা অত্যন্ত হেয় মনে করত ও ঘৃণার চক্ষে দেখত। তার কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে ডাঃ দ্বিবেদী তাঁর কবীর গ্রন্থে নানা মূল্যবান তথ্য বিচার করে বলেছেন —আশ্রমভ্রষ্ট যোগী বা যোগসাধনকারী সন্ন্যাসী এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে এই যোগী জাতি গড়ে ওঠে। হিন্দুরা সন্ন্যাসীকে যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীকে তেমনি করে অত্যন্ত ঘৃণা। তাদের সন্তান-সন্ততি অস্পৃশ্য হয়ে যায়। তারা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বাইরে থাকে। উত্তর-ভারতের গোঁসাই, বৈরাগী, সাধু প্রভৃতি অনেক জাতির এই ভাবে উৎপত্তি হয়েছে।

যোগী জাতি প্রথমে নাথপন্থী হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘকাল নাথপন্থীই থাকে। তার পর মধ্যযুগে এদের অধিকাংশ মুসলমান হয়ে যায় এবং তখন এদের নাম হয় জোলা, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি।

যোগীদের মধ্যে যারা মুসলমান হ'ল না, তারা ক্রমে হিন্দুধর্ম মেনে নিল এবং বিরাট হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। তবে বহু কাল পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে প্রাচীন প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বজায় ছিল।

যোগীরা একে ছিল সমাজের নিম্নস্তরে, তার উপর ছিল বড় গরীব। তাঁত বোনা ছিল তাদের জাত-ব্যবসায়। মুসলমান হওয়ার পরও তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন হ'ল না; আর্থিক অবস্থাও ভাল হ'ল না; সামাজিক মর্য্যাদাও বাড়ল না। নতুন ধর্মও তাদের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে প্রথম প্রথম পারেনি। তারা নামে মাত্র মুসলমান ছিল। পূর্ব্বেকার অনেক ঐতিহ্য, সংস্কার, বিশ্বাস এমন কি আচার-অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে থেকে গিয়েছিল।

এমনি একটি জোলা-পরিবারে কবীরদাস জন্মেছিলেন বা মানুষ হয়েছিলেন। তখন জোলারা মনে হয় সবে মাত্র হয়ত এক-আধ পুরুষ ধরে মুসলমান হয়েছে। কাজেই তাদের মধ্যে পুরোনো সংস্কার, ঐতিহ্য প্রভৃতি পুরো মাত্রায়ই বজায় ছিল। এই সবের মধ্যেই কবীরদাস মানুষ হন। সেই জন্য তাঁর জীবনের উপর এইগুলির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।

কবীরের শৈশব বা বাল্যকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি যে তখন লেখাপড়া শেখেননি এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায়। কারণ, কবীরদাস নিরক্ষর ছিলেন। তিনি "মসী কাগদ্ ছুঅ নহী" অর্থাৎ কাগজ আর কালি ছুঁননি।

আমাদের দেশে গরীব শিল্পজীবী-পরিবারে যা হয় ছেলেরা অল্প

বয়স থেকেই জাত-ব্যবসায় শিখে এবং পিতার কাজে সাহায্য করে। তার পর ১৩।১৪ বছর বয়স থেকে বা তারও আগে থেকে তারা পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মত কাজ করতে থাকে। অনুমান করা যায়, কবীরদাসের বেলাও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। তিনিও জাত-ব্যবসায় শিখেন এবং তাঁত বুনেই জীবিকা অর্জন করতেন।

কবীরদাস বিয়ে করে সংসারী হয়েছিলেন কি না, এ নিয়েও কথা উঠেছে। সাধারণ লোক জানে কবীরদাস সংসারী ছিলেন। তাঁর মুসলমান শিষ্যেরাও তাই বলেন। মুসলমান কিংবদন্তী অনুসারে তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লুই। তাঁর একটি ছেলে এবং একটি মেয়েও ছিল। ছেলেটির নাম কমাল, মেয়েটির নাম কমালী।

কবীরদাসের হিন্দু শিষ্যেরা এ সব বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, কবীরদাস কখনও বিয়ে করেননি। লুই বলে কেউ যে ছিলেন এ কথাও তাঁরা অনেকেই স্বীকার করেন না। আর যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরাও বলেন, লুই ছিলেন কবীরদাসের শিষ্যা। কমাল কমালীকেও তাঁরা কবীরদাসের শিষ্য বলেন। আবার কেউ কেউ বলেন ওরা ঠিক শিষ্য নয়, পালিত পুত্র-কন্যা।

এ সম্বন্ধে কাদের কথা যে ঠিক বলা কঠিন। কেন না, এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। জৈন ও বৌদ্ধ প্রাধান্যের সময় থেকে বিশেষ করে শঙ্করাচার্য্যের সময় থেকে ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীরা ধর্মের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেন। বৈদিক ও পৌরাণিক কয়েক জন বিখ্যাত ঋষি ছাড়া ভারতবর্ষের বড় বড় ধর্মগুরুরা প্রায় সবাই সন্ন্যাসী। লোকের একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, সন্ন্যাসী না হ'লে কেউ বড় সাধু-সন্ত হ'তেই পারে না। কাজেই কবীরদাসের মত এত বড় এক সিদ্ধ সন্ত, এত বড় এক জন ধর্মগুরু সন্ন্যাসী ছিলেন না, এ কথা তাঁর হিন্দু শিষ্যদের পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন। এই জন্যই তাঁরা নানা ভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, কবীরদাস সংসারী ছিলেন না। এ অবস্থায় এঁদের মত সহসা মেনে নেওয়া যায় না।

কবীরদাস সংসারী ছিলেন কি না এ নিয়ে পাদ্রী কি (Keay) সাহেব বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন। কবীরদাসের পদ থেকে এ সম্পর্কে আভ্যন্তরীন প্রমাণ যা পাওয়া যায় বিশেষ করে তা বিচার করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, কবীরদাস সংসারী ছিলেন। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতদেরও তাই মত।

তবে সংসারী হ'লেও কবীরদাস সাধারণ লোকে সংসার বলতে যা বোঝে সে রকম সংসার করেননি কোনো দিনই। তাঁর সংসার ছিল সন্ন্যাসীর সংসার। তিনি ছিলেন স্বভাব-উদাসী মানুষ। বিষয়-চিন্তার চেয়ে ভগবদ্-চিন্তাই তিনি বেশী করতেন। তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণায় ও সাধুসঙ্গ করতে।

কবীরদাস ছিলেন আমরণ দরিদ্র। ধনী হবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত তাঁর হয়নি কখনো। কেন না, ধনৈশ্বর্য্যকে তিনি ভগবদ্-ভক্তির বিপন্থী মনে করতেন। জীবন ধারণের জন্য যেটুকু না হ'লে নয় তিনি তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। সেই জন্য বিষয়-কর্মও যেটুকু না করলে নয় তাই করতেন। এর থেকে কেউ যেন না মনে করেন যে, কবীরদাস শ্রমবিমুখ ছিলেন বা সাধু হ'লে কাজকর্ম করা দরকার নেই মনে করতেন। তিনি পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জনের কথাই স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন—

কহৈ কবীর অস উদ্যম কীজৈ,
আপ জীয়ৈ ঔরন কো দীজৈ।

কবীর বলছে, এমনি উদ্যম করবে যাতে করে নিজের জীবিকা চলে আর অন্যকেও কিছু দিতে পার।

কবীরদাস নিজেও যতটা সম্ভব তাই করতেন। তবে সব বিষয়েই তাঁর ছিল ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভর। পরিবার প্রতি-পালনের ভারও তিনি ঈশ্বরের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর একটি চমৎকার পদ পাওয়া গেছে—

দীন দয়াল ভরোসে তেরে
সভ পব,বারু চঢ়াইআ বেড়ে।

হে দীনদয়াল! তোমার উপরই আমার ভরসা। আমার সব পরিবারকে তোমারই নৌকায় চড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু পরিবারের অন্য লোকেরা ত আর কবীরদাসের মত ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিল না? তারা যখন দেখত কবীরদাস কাজকর্মে অবহেলা করছেন এবং ফলে তাঁদের অন্ন-সংস্থানই ভার হয়ে উঠেছে তখন তারা বিশেষ করে কবীরদাসের মা এ নিয়ে খুব দুঃখ করত এমন কি কান্নাকাটিও করত। এ সম্বন্ধে কবীরদাসের একটি পদও পাওয়া গেছে—

মুসি মুসি রোবৈ কবীর কী মায়,
ঐ বারক কৈসে জীব,হি রঘুরায়।
তননা বুননা সভ তজ্যো হৈ কবীর,
হরি কা নাম লিখি লিয়ো শরীর।

দুঃখ ক'রে ক'রে কাঁদতে লাগল কবীরের মা! হে রঘুরায়, এবার কেমন করে বাঁচব। কবীর শরীরের উপর লিখে নিয়েছে হরির নাম আর তানা দেওয়া কাপড় বোনা সব ছেড়ে দিয়েছে।

এর থেকে বোঝা যায়, কবীরদাসের পারিবারিক জীবনে শান্তি ছিল না। পারিবারিক অশান্তির আর একটি কারণও ছিল। কবীরদাস মুসলমান-পরিবারের লোক হয়ে হিন্দু গুরু রামানন্দের শিষ্য হন। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। স্বভাবতঃই তাঁর পরিবারের সবাই এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। তাদের সেই ক্ষোভও পরিবারের শান্তি নষ্ট করে। এই পারিবারিক অশান্তির ফল এই হ'ল যে, যতই অশান্তি বাড়ত ততই কবীরদাস ঈশ্বর প্রসঙ্গে আরও গভীর ভাবে মগ্ন হয়ে থাকতেন।

যদি কমালকে কবীরদাসের ছেলে বলে স্বীকার করা হয় (আর নিরপেক্ষ লোকেরা তা করেও থাকেন), তাহ'লে কবীরদাসের পুত্রভাগ্যও ভাল ছিল মনে হয় না। অন্ততঃ ছেলেকে নিয়ে তিনি সুখী হতে পারেননি। হিন্দীতে একটি বহুল-প্রচলিত কথা আছে—"ডুবা বংশ কবীরকা জো উপজা পুত্র কমাল।"—পুত্র কমালের জন্ম হওয়ায় ডুবল কবীরের বংশ।

এর থেকে মনে হয়, পিতার পথ থেকে পুত্রের পথ ভিন্ন ছিল। তিনি পিতার আধ্যাত্মিক সাধনা গ্রহণ করেননি। কারো কারো মতে কমাল বড় হ'য়ে পিতার মতের বিরোধিতা করেন। কেউ কেউ অবশ্যি এ সব কথা বিশ্বাস করেন না। উল্লিখিত দোঁহাটিরও তাঁরা অন্য

রকম ব্যাখ্যা করেন। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, "কমাল এক জন ভক্ত ও গভীর চিন্তাশীল সাধক ছিলেন। কবীরের মৃত্যুর পর যখন কমালকে সবাই বলিল, তুমি তোমার পিতার শিষ্যদের লইয়া সম্প্রদায় গড়িয়া তোলো। তখন কমাল বলিলেন, আমার পিতা চিরজীবন ছিলেন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর আমিই যদি সম্প্রদায় স্থাপন করি তবে পিতার সত্যকে হত্যা করা হইবে। ইহা এক প্রকার পিতৃহত্যা। সে কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তখন অনেকে বলিলেন, ডুব্‌া বংশ কবীরকা জো উপজা পুত্র কমাল।" প্রকৃত প্রস্তাবে কি যে ঘটেছিল তা উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

তবে যা-ই ঘটুক না কেন, কবীরদাসের পারিবারিক জীবন যে সুখের ছিল না এ কথা অনেকটা নিশ্চয় করেই বলা যেতে পারে।

যারা ভগবানকে চায় তাদের ভাগ্যে বোধ হয় এমনি ঘটে। তাদের জাগতিক সুখ-শান্তি ভগবানই বুঝি হরণ করে নেন। নৈলে, তারা যে অনন্যমনা হয়ে ভগবানকে চাইতে পারে না। আর অনন্যমনা হয়ে ভগবানকে না চাইলে তাঁকে ত পাওয়া যায় না? সাধুদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে—ভগবান বলছেন—'যে করে আমার আশ তার করি সর্বনাশ, তবু যদি না ছাড়ে আশ আমি হই তার দাসের দাস।' তাই বোধ হয় কবীরদাসও পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি পাননি।

তবে দুঃখ, অশান্তি কিছুই কবীরদাসকে বিচলিত করতে পারেনি। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এ সবের দরুণ বরং তাঁর ঈশ্বরানুরাগ আরও গভীরতর হয়েছিল। কবীরদাস ছিলেন স্বভাব-উদাসী 'মস্ত' মানুষ। হিন্দীতে 'মস্ত' বলে তাকেই, যে আপন-ভোলা মানুষ সব সময়ই কোনো ভাবে বিভোর হয়ে থাকে, সংসারের ভাবনা যে একটুও ভাবে না, অতীতে কি করেছে না করেছে তার হিসাব রাখে না, বর্তমানে কি করছে না করছে তা নিয়েও মাথা ঘামায় না আর ভবিষ্যতের কোনো ধারই ধারে না।

এমনি ধরণের ব্যোমভোলা সদানন্দ মানুষ ছিলেন কবীরদাস। কিন্তু তাই বলে তাঁর মধ্যে কোনো রকম ভাববিহ্বলতা বা দুর্ব্বলতার চিহ্ন মাত্রও ছিল না। অতি স্থির ছিল তাঁর বুদ্ধি। অনমনীয় ছিল তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা। তিনি একবার যা বিশেষ বিবেচনার পর সত্য বলে গ্রহণ করতেন, কিছুতেই কোনো কারণেই তার থেকে বিচ্যুত হতেন না। সারা দুনিয়া বিরুদ্ধে গেলেও নয়। আর একটা কথা। কবীরদাস ছিলেন বিশেষ বিচারশীল মানুষ। কোনো কিছুই তিনি বিনা বিচারে গ্রহণ করতেন না। "তিনি সত্যকে পরখ করিয়া লইতেন।

কবীরদাস ছিলেন ভক্ত আর ভক্তজনোচিত বিনয়ও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু একটি জায়গায় সাধারণ ভক্তদের সঙ্গে বিশেষ করে বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে তাঁর একটি মস্ত বড় পার্থক্য ছিল। তিনি নিজেকে কখনো হীন পতিত মনে করতেন না। কবীরদাসের আত্মবিশ্বাস ছিল অসাধারণ। নিজের সম্বন্ধে বা নিজের গুরু সম্বন্ধে বা নিজের সাধনা সম্বন্ধে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধার ভাব জাগেনি কোনো দিন। ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী বলেন—কবীর ছিলেন বীর সাধক, তাঁর এই বীরত্বের মূল হ'ল তাঁর অটুট আত্মবিশ্বাস।

ডাঃ দ্বিবেদী বলেন, কবীরদাস ছিলেন এক জন যুগাবতার। যুগাবতারের বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর ছিল যুগ-প্রবর্ত্তকের দৃঢ়তা, আর তিনি যুগ-প্রবর্ত্তনও করেছিলেন।

এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, মহাপুরুষেরা তাঁদের সমসাময়িক লোকেদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। লোকে তাঁদের কথা বুঝতে পারেনি বা ভুল বুঝেছে। এই জন্মে প্রাণপণে তাঁদের বিরুদ্ধতা করেছে, এমন কি অনেক সময় তাঁদের প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করবার চেষ্টা করেছে। কবীরদাসের বেলাও তাই হয়েছিল। তাঁর শত্রু ছিল অসংখ্য।

কবীরদাস হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মকেই অর্থাৎ তার বাহ্যানুষ্ঠানকে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি বেদ-কোরাণ, পুরোহিত-মোল্লা, মন্দির-মসজিদ, তীর্থ-হজ, ব্রতোপবাস-রোজা, সন্ধ্যাহ্নিক-নমাজ কিছুই মানতেন না। এ সমস্তই নিরর্থক মনে করতেন। এই জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠে। তারা নানা ভাবে কবীরদাসকে জব্দ করবার চেষ্টা করতে থাকে, এমন কি তাঁর নামে অত্যন্ত জঘন্য রকমের কলঙ্ক পর্য্যন্ত রটায়। কিন্তু তাতেও কবীরদাস ভয় পাননি। এদের এই হীন আক্রমণেও তাঁর চরিত্র-মহত্ত্ব খর্ব হ'ল না। পাহাড়ের মত অটল রইলেন কবীরদাস আপন চরিত্র-মাহাত্ম্যে।

কবীরদাসকে এমনি জব্দ করতে না পেরে শেষে হিন্দু-মুসলমানে মিলে বাদশা সিকন্দর লোদীর কাছে গিয়ে নালিশ করল। এ সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। তার সব ক'টিরই সার কথা এই—মুসলমান বললে—জাঁহাপনা, কবীর আমাদের ধর্ম নষ্ট করল। হিন্দুও করল সেই অভিযোগ। সব শুনে বাদশা হুকুম দিলেন, কবীরকে হাজির কর দরবারে। হুকুম তামিল হ'ল। কবীরদাস এলে বাদশার সঙ্গে তাঁর অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হ'ল। কবীরদাসের কড়া কড়া কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন বাদশা। কবীরদাসের হ'ল প্রাণদণ্ড। কিন্তু বাদশা তাঁকে বধ করতে পারলেন না। জলে ডুবিয়ে আগুনে পুড়িয়ে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে কত ভাবেই না চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। শেষে বাদশার চোখ ফুটল। কবীরদাসের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন বাদশা।

কবীরদাস সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলিতে পাওয়া যায়, তিনি নানা ভাবের সাধু-সন্তদের সঙ্গে মিলনের জন্ম বহু স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। 'কবীর-মনশূর' প্রভৃতি গ্রন্থমতে সুদূর মক্কা, বাগদাদ, সমরকন্দ, বোখারা প্রভৃতি স্থানের সাধকদের সঙ্গে পর্য্যন্ত তিনি দেখা করেছিলেন।

কাহিনীগুলি বলে, এই ভ্রমণের সময় এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে করে কবীরদাসের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে লোকে তাঁর শরণ নিয়েছে। এই সময়েই যোগী গোরখনাথ এবং সর্বানন্দ নামে 'সর্বজিত' উপাধিধারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে কবীরদাসের বিচার হয় এবং তাঁর অলৌকিক শক্তির কাছে তাঁদের পরাজয় হয়।

শিখ ধর্মের প্রবর্ত্তক গুরু নানকের সঙ্গেও কবীরদাসের সাক্ষাৎ হয় বলে কাহিনী প্রচলিত আছে।

কবীরদাসের শিষ্যকরণ সম্বন্ধেও নানা গল্প শোনা যায়, বিশেষ ক'রে সমাজের উচ্চস্তরের যে সব ব্যক্তি কবীরদাসের শিষ্য হয়েছিলেন

তাঁদের সম্বন্ধে কোনো না কোনো কাহিনী অবশ্যই শোনা যায়। রাজা বীরসিংহ, কবীরদাসের অন্যতম প্রধান শিষ্য ধর্মদাস প্রভৃতি এই শ্রেণীর শিষ্য। কবীরদাসের সম্বন্ধে আর একটি মজার গল্প শোনা যায়। সিদ্ধ সাধু হিসাবে যখন কবীরদাসের নাম ছড়িয়ে পড়ল তখন দলে দলে লোক এসে তাঁর কাছে ভিড় জমাতে লাগল। এরা সাধুর কাছে ভগবানের কথা শুনবার জন্য আসত না, এরা আসত ধন, পুত্র, রোগের ঔষধ এই সব চাইবার জন্য। জ্বালাতন হ'লেন কবীরদাস; তাঁর সাধন-ভজন সব মাথায় উঠল; কি করে এ সব লোকদের হাত এড়ানো যায় তাই তিনি ভাবতে লাগলেন, ভেবে ভেবে শেষে এক অদ্ভুত উপায় বের করলেন। কবীরদাস সুরু করলেন বেশ্যাসক্ত মাতালের অভিনয়। মাতালের মত টলতে-টলতে একটি বেশ্যার কণ্ঠলগ্ন হয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন সহরে। লোকে দেখে ছি-ছি করতে লাগল, যা মুখে আসে তাই বলে' কবীরদাসকে গালাগাল দিতে লাগল। কবীরদাস যে একটি এক নম্বরের ভণ্ড এ বিষয়ে আর কারুরই কোনো সন্দেহ রইল না। কবীরদাসের কাছে লোকের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কবীরদাসের উদ্দেশ্য সফল হ'ল।

কবীরদাস দীর্ঘজীবী ছিলেন। ঐতিহ্য অনুসারে তিনি ১১৯ বছর ৫ মাস ২৭ দিন বা মতান্তরে ১২০ বছর বেঁচেছিলেন। কবীর-কসৌটী নামক গ্রন্থ অনুসারে ১৫১৮ খৃঃ মঘর নামক স্থানে কবীরদাস দেহত্যাগ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতরা এই মত প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা ১৪৯৮ খৃঃ কবীরদাস দেহত্যাগ করেন বলে 'ভারতব্রাহ্মণে' যে উল্লেখ আছে তাই সমর্থন করেন, এ কথার আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এই মঘর বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার গোরখ-পুরের নিকট একটি জায়গা। কবীরদাসের জন্ম সম্বন্ধে যেমন সব অলৌকিক কাহিনী রয়েছে তেমনি তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়।

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, সিদ্ধ মহাপুরুষেরা কবে সংসার ছেড়ে যাবেন তা তাঁরা আগে থেকেই জানতে পারেন। কবীরদাসও জানতে পেরেছিলেন, তাই দেহ-ত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি কাশী ছেড়ে মঘরে চলে যাবার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। লোকের বিশ্বাস, কাশীতে যে মরে সে স্বর্গে যায় আর মঘরে যে মরে সে গাধা হয়। সেই জন্য কবীরদাসের ভক্ত অনুরাগী প্রভৃতি সবাই মিলে তাঁকে মঘরে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করবার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু কবীরদাস কিছুতেই মত বদলালেন না। তিনি বললেন, স্থান-বিশেষে মরলে মানুষের বিশেষ কোনো গতি হবে এ সব কোনো কাজের কথা নয়। আসল কথা হ'ল, যার হৃদয়ে রাম রয়েছেন, যেখানেই মরুক না কেন সে-ই পাবে মুক্তি। নৈলে মুক্তি মিলবে না আর কিছুতেই। এ সম্বন্ধে কবীরদাসের একটি পদও পাওয়া গেছে। (অনূদিত পদ ৫৮)।

কবীরদাস কাশী ছেড়ে মঘরে যাচ্ছেন এ খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। তাঁকে শেষ বারের মত দর্শন করবার জন্য সহরের লোক ভেঙে পড়ল। সবার চিত্ত ব্যথাতুর। কবীরদাসের প্রায় হাজার দশেক শিষ্য ও অনুগামী কাঁদতে কাঁদতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল মঘরে।

মঘরের উপর দিয়ে বয়ে চলেছিল অমী নদী। তার তীরে ছিল এক সাধুর ভজন-কুটীর। তখন কুটীরখানি শূন্য ছিল, কবীরদাস গিয়ে আসন বিছালেন সেই কুটীরে। শিষ্যদের ডেকে বললেন, তোমরা আমার জন্য কিছু শাদা পদ্মফুল আর দু'খানা শাদা চাদর নিয়ে এস। একটু সময়ের মধ্যেই এক রাশ পদ্মফুল আর চাদর দু'খানা শিষ্যেরা নিয়ে এল।

গুরু দেহরক্ষা করবেন খবর পেয়ে কবীরদাসের হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান শিষ্য মঘরে সমবেত হ'ল। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এলেন রাজা বীরসিংহ, এঁকে বলা যায় হিন্দু দলের নেতা। আর এলেন সসৈন্যে বিজলী খাঁ। ইনি মুসলমান দলের নেতা।

কবীরদাসের সময় হয়ে এল। তিনি এবার সবাইকে ডেকে বললেন,—তোমরা আর এখন এখানে ভিড় করো না, আমি একটু ঘুমব। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তোমরা সব চলে যাও।

রাজা বীরসিংহ বুঝলেন এই গুরুজীর শেষ নিদ্রা। তিনি তখন এগিয়ে এসে প্রণাম করে বললেন, গুরুজী, কৃপা ক'রে অনুমতি করুন, সত্যলোকে আপনার প্রয়াণের পর আপনার পবিত্র দেহ নিয়ে গিয়ে আমি বিশুদ্ধ হিন্দুপ্রথা অনুসারে তার সংকার করব। এ কথা শুনে প্রবল আপত্তি জানালেন বিজলী খাঁ। বললেন, এ কখনো হ'তে পারে না। আমি এই পবিত্র দেহ মুসলমান মতে কবর দেব।

কবীরদাস দেখলেন, উভয় পক্ষের সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত, তাঁর নশ্বর দেহকে নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের রক্তপাত অনিবার্য্য। তিনি উভয় পক্ষকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, তোমাদের প্রতি আমার এই আদেশ—তোমরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনো বাগ্‌বিতণ্ডা করতে পারবে না আর পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারবে না। গুরুর আদেশ যে পালন করে কল্যাণ হয় তার।

দুই দলই এই আদেশ মাথা পেতে নিল। এবার ভিড় সরে গেল। কবীরদাস তখন শেষ বারের মত ঘুমিয়ে পড়লেন। শিষ্যেরা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। খানিকক্ষণ পরে ঘরের ভিতর থেকে কেমন এক রকম শব্দ শোনা গেল। শিষ্যেরা অঝোরে কাঁদতে লাগল আর গুরুজীর জয়ধ্বনি করতে লাগল। গুরুজী সত্যলোকে প্রয়াণ করলেন।

এই অবস্থায় অনেকক্ষণ কাটল। তার পর দরজা খোলা হ'ল। ভিতরে সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কোথাও দেহ নেই। আছে শুধু দু'খানা চাদর আর প্রত্যেক চাদরের উপর একরাশি করে পদ্মফুল।

এমনি করে কবীরদাস হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে গেলেন। রাজা বীরসিংহ একখানা চাদর ও তার উপরকার ফুলগুলি কাশীতে নিয়ে গিয়ে যথারীতি দাহ করলেন, তার পর চিতাভস্ম নিয়ে বর্ত্তমানে যাকে 'কবীর চৌরা' বলে সেই জায়গায় প্রোথিত করলেন।

এদিকে বিজলী খাঁ তাঁর অংশ মঘরেই কবর দিলেন। শেষে অবশ্যি হিন্দু-মুসলমান উভয় দল মিলে মঘরে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

[ক্রমশঃ।

জেন অস্টিনের

ছাব্বিশ

এলিজাবেথকে নিভৃতে পাওয়া মাত্রই মামী তাকে সতর্ক করে দেওয়ার সুযোগ নিলেন। অনেক কথার পর তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—'মা এলিজা, তুমি এমন বোকা মেয়ে নও যে সতর্ক করে দেওয়ার পরও ভুল করে বসবে। তবু স্পষ্ট করেই তোমায় বলা ভাল। নিজেকে সামলে চলো। নিজেকে ঐ মানুষটির ভালবাসার জালে জড়িয়ে ফেলো না। আমি তার সম্বন্ধে কটু কিছু বলছি না। ছেলেটি ভারী মিশুকে আর চমৎকার। ওর যদি অনেক ধন-দৌলতও থাকত, যা ওর পাওয়া উচিত ছিল, তবু তার সম্বন্ধে আমি তোমায় সতর্ক করে দিতাম। নিজের অল্প বয়সের স্বপ্নকে যেন মাথা জাগাতে দিও না নিজের বুদ্ধির ওপর। তুমি চালক-চতুর মেয়ে, তোমার বাপ তোমার উপর অনেকখানি নির্ভর করেন। বাপের দুঃখের কারণ হবে না তুমি নিশ্চয়ই।'

—'তোমার ভয় নেই মামীমা। নিজের বিষয়ে আমি সতর্ক আছি। তার সম্বন্ধেও রইলাম। যদি পারি মিঃ উইকহ্যামের প্রেম-নিগড় আমি সহজে পরব না।'

—'তুমি বড্ড হাল্কা সুরে কিন্তু কথা কইছ এলিজা।'

—'সত্যি মামীমা। ভালবাসা আমার জন্মায়নি তার উপর। একটুও না। তবু এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমার যে, তার মত অমন চমৎকার সজ্জন মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। যদি তিনি সত্যি আমায় ভালবাসেন তবে তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না আমার জীবনে। অবশ্য এ কাজের নির্বুদ্ধিতা আমি খুব বুঝি। বুঝি যে মিঃ ডার্সিই ওজনে ভারী। আমার বাবার মতের মর্য্যাদা আমার কাছে খুব বড়ো। আর তার হানি করতে আমার বুকে কঠিন করে বাজবে। জানি, বাবা মিঃ উইকহ্যামের উপর এতখানি সহৃদয় নন। কিন্তু মামীমা, যেখানে ভালবাসাই বড়ো সত্য, সেখানে ধন-দৌলতের বাধা মেনে চলে ক'জন? আর আমিই কি তা পারব? কিন্তু তোমাদের দুঃখু দেওয়ার ব্যথা আমার আরো গভীর। যতই যা-ই হোক, আমি তাড়াহুড়ো করে কিছু করব না, তোমাদের জন্যে আমি বিলম্বিত করব আমার শেষ পদক্ষেপ। তোমায় কথা দিচ্ছি, আমার দিক থেকে সে কোন ইংগিত পাবে না কোন দিন।'

—'তাকে এত ঘন-ঘন এখানে আসায় নিবৃত্ত করতে পার না—অন্ততঃ তাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য মাকে তাগিদ না-ও দিতে পারো।'

—'যেমন করেছিলাম সেদিন'—স্মিত হেসে বললে এলিজাবেথ—'কিন্তু না, যত ঘন-ঘন দেখছ তুমি এসে, তত ঘন-ঘন মানুষটি আসেন না এ-বাড়ীতে। তুমি এসেছ বলেই তাকে নিমন্ত্রণ করছেন মা পারিবারিক অতিথি হিসেবে। তবে এখন থেকে আমি চালাক হবো। তুমি দেখো।'

মামীমা'র এই স্নিগ্ধ পরামর্শে লাভই হোল এলিজাবেথের। সে কথা অকুণ্ঠ চিত্তে সে জ্ঞাপন করলে তাকে।

অপর দিকে কলিন্সের বিবাহের দিন আসন্ন হয়ে এল। বুধবার শার্লটি এল এদের পরিবারে ঘরোয়া বিদায় নিতে। বৃহস্পতিবার তার বিয়ে। মনে মনে বান্ধবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক নাড়া-চাড়া করেছিল এলিজাবেথ। শেষে কিছু স্থির করতে না পেরে এই কথা বলে মনকে প্রবোধ দিয়েছিল যে, তারা সুখী হবে।

কিন্তু যে শীতল আপ্যায়নে অভ্যর্থনা করলেন মা শার্লটিকে যে, নিতান্ত ক্ষুব্ধ না হয়ে পারলে না এলিজাবেথ। অনেকটা তাঁর হয়ে যেন ক্ষমা প্রার্থনার জন্যই সখীর সঙ্গে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল তাকে এগিয়ে দিতে। দুই সখীতে নিভৃত কথা হতে লাগল।

—"তুই আমায় ভুলে যাবি না তো এলিজা? তোর খবর দিবি তো মাঝে মাঝে?"

—'নিশ্চয়ই দেবো। তুই দিবি তো ভাই?'

—'আর একটা মিনতি রইল আমার তোর কাছে। আমার ওখানে আসবি একবার।'

—'এখানেই তো শীগ্‌গির দেখা হবে।"

—'না, বোধ হয়। এখন বেশ কিছু দিন আমায় কেন্টে ওঁর বাসায় থাকতেই হবে। কথা দে, তুই যাবি?"

সেখানে যাওয়ার মধ্যে কোন আনন্দের আশা দেখতে না পেলেও এলিজাবেথ এই বিদায়-ক্ষণে বান্ধবীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না।

—'মার্চ মাসে বাবা আর মারিয়া আসছেন আমার ওখানে। তুই যদি তাদের সঙ্গী হোস, আমার কম আহ্লাদ হবে না তোকে পেয়ে তাদের চেয়ে।'

বিয়ের পরই বর-কনে তাদের কেন্টের বাসায় যাত্রা করল। এদের বিয়ে নিয়ে যেটুকু ফেনা উঠেছিল এই নিস্তরঙ্গ সমাজে, বর-কনে বিদায় নেবার অল্পকাল মধ্যেই আবার তা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

চিঠিপত্র আদান-প্রদান হতে লাগল রীতিমত ভাবে দুই সখীর মধ্যে। শার্লটির প্রথম চিঠিখানি সম্বন্ধে এলিজাবেথের একটা স্বাভাবিক কৌতূহল ছিল। কেমন লাগছে তার স্বামী, তার ঘর

তার নতুন সমাজ, নতুন সংসার। কিন্তু চিঠি পড়ে এলিজাবেথ নিরাশ হল। তার আশার অতিরিক্ত কিছু লিখতে পারেনি শার্লটি। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সে বর্ণনা করেছে তার সংসারের সচ্ছলতার কথা, স্বামীর জমানো আসবাব, তৈজস-পত্রাদির কথা, লেডী ক্যাথারিনের কথা। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। এলিজাবেথ ভাবলে, বাকী যা তার জানবার রইল সে স্বামি-সন্দর্শনে যাওয়ার আগে জানা সম্ভব হবে না তার পক্ষে।

লণ্ডন পৌঁছে জেন চিঠি দিয়েছে বোনকে। জানিয়েছে, পরের চিঠিতে সে বিংলেদের সম্বন্ধে হয়ত কিছু খবর পাঠাতে পাবে।

চার সপ্তাহ কেটে গেল লণ্ডনে। কিন্তু একবার মাত্র মিস্ বিংলের সঙ্গে দেখা হওয়া ভিন্ন আর কোন কিছু এমন ঘটেনি যা বোনকে চিঠিতে লিখতে পারত জেন।

কিন্তু অবশেষে অনেক প্রতীক্ষার অবসানে এক দিন বিংলের বোন জেনের কাছে পালটা সাক্ষাৎ করতে এল। কিন্তু তার স্বল্পস্থায়ী পরিচয় এবং সর্বাধিক লক্ষ্যণীয় তার আচরণের বৈসাদৃশ্য দেখে জেনের আর ভুল করবার সুযোগ রইল না। এই সমস্ত ব্যাপারটি বর্ণনা করে জেন চিঠি দিল বোনকে :

—"প্রিয় বোন এলিজা! তুই-ই জিতে গেলি। বিংলের বোন আমার প্রতি তার ব্যবহারে যে প্রকাণ্ড প্রতারণা করেছিল তা তুই আমার চেয়ে পূর্বেই অনুমান করতে পেরেছিলি। তবু বোন এ কথা আমি বলব যে, তুই যেমন তাকে গোড়া থেকে অবিশ্বাস করেছিলি, আমি তেমনি তার উপর আস্থা স্থাপন করেছিলাম। আমাদের দু'জনের বিশ্বাসের মূলেই কিন্তু ভিত্তি ছিল না।

গতকাল সন্ধ্যায় ক্যারোলিন আমাদের এখানে এসেছিল। তার আগে অবশ্য এক লাইনও লিখে আমার খবর নেয়নি বা বা দেয়নি। কিন্তু তার সেই আসা ও কথাবার্তার মধ্যেই এটুকু বুঝেছি যে, এই আসায় তার কোন আনন্দ ছিল না। কোন রকম ভণিতা করেই সে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আবার দেখা-সাক্ষাৎ হবার কোন শুভ কামনা করে যায়নি। দেখলাম তাকে। অবাক হলাম তার পরিবর্ত্তনে এই ক'মাসের মধ্যে। আমাকে এ ভাবে দুঃখু দেবার পিছনে কোন যুক্তি তার মনে ছিল তা আমি ভেবে পাই নে বলেই তাকে আমি অপরাধী বলে ভাবতে পারছি না।

যাই হোক, তার কাছে যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি সে হোল এই যে, তার দাদা আর সম্ভবতঃ কোন দিনই নেদারফিল্ডে ফিরছেন না। বাড়ী ছেড়ে দেবেন কি না জানি না কিন্তু ফিরবেন না, এ কথা নিশ্চিত। ও-কথা আর ভেবে আমাদের মন খারাপ করবার কোন প্রয়োজন নেই।

শার্লটির খবর শুনে ভারী খুশী হয়েছি ভাই! আমার ইচ্ছে যে, তার বাবা ও বোনের সঙ্গে তুইও যাস তার শ্বশুরবাড়ীতে। সেখানে গিয়ে নিশ্চয়ই তুই খুশী হবি।"

এলিজাবেথের হৃদয় ব্যথায় টন-টন করে উঠল দিদির এই পত্র পড়ে। কিন্তু এইটুকু রইল তার সান্ত্বনা যে, ভবিষ্যতে অন্ততঃ এই মেয়েটির কাছে তার দিদি আর প্রতারিত হবে না। জেনের জীবনে পুরানো অধ্যায়ের নূতন অবতারণা আর যেন না হয় এই আশা করলে এলিজাবেথ। বিংলের চরিত্রের বিশ্লেষণ করে সে তার অন্ধকার দিক্‌গুলি আরো গভীর কলঙ্কলিপ্ত করে দেখতে পেল। অন্ততঃ তার শাস্তি হিসেবে এখন বিংলের বিয়ে হওয়া উচিত ডার্সির বোনের সঙ্গে, যাতে সে ভাল মতেই উপলব্ধি করতে পারে কি ঝুটো মুক্তোর লোভে সে আসল মণি ফেলে দিলে অবহেলায়।

সাতাশ

এই ভাবে নিরুল্লেখ দিন কাটে এদের পরিবারে। শুধু মাঝে মাঝে শীত-শিহরিত দেহে অথবা ধূলি-ধূসরিত পথে মেরিটনে যাওয়া-আসা একটু যা বৈচিত্র্য আনে। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী কাটল। মার্চে এলিজাবেথের হ্যান্সফোর্ডে যাওয়ার কথা। প্রথমে সে ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামায়নি। কিন্তু শার্লটি যে তার আসার আশায় আছে এ কথা মনে করে সে খুসী হয়ে যাওয়া স্থির করে ফেলল। দীর্ঘ দিন অদর্শনে শার্লটিকে দেখার বাসনাও তীব্র হয়ে উঠেছে এবং কলিন্সের প্রতি বিতৃষ্ণাও প্রশমিত হয়েছে অনেক। তাছাড়া যে বাড়ীতে এ ধরণের মা ও বোনেরা আছে সে বাড়ী আদৌ লোভনীয় নয়। আর পরিবর্তনের জন্য একটু হাওয়া বদল খারাপ কি? এই ফাঁকে জেনের সঙ্গেও দেখা হতে পারবে। শার্লটির ব্যবস্থা মতই সব ঠিক হোল। স্যার উইলিয়াম ও তাঁর দ্বিতীয় মেয়ের সঙ্গে এলিজাবেথ যাবে। লণ্ডনেও এক রাত কাটানোর ব্যবস্থা হোল।

একমাত্র বেদনাদায়ক—বাবাকে ছেড়ে যাওয়া। তিনি তার অভাব ভারী অনুভব করবেন। আর সত্যিই যখন যাওয়ার সময় উপস্থিত হোল তিনি অখুসী ভাব দেখালেন। এলিজাবেথকে তিনি চিঠি লিখতে বললেন এবং চিঠি লিখলে চিঠির উত্তর দেবেন প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

বেশ ভদ্রতার মধ্যেই উইকহ্যামের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পালা সাঙ্গ হোল। এ কথা উইকহ্যাম কখনই ভুলতে পারবে না যে, এলিজাবেথই প্রথম তার মনে রেখাপাত করেছিল—জাগিয়েছিল তাকে। সে-ই তার কথা প্রথম মনোযোগ দিয়ে শুনেছে,—তার দুঃখে সহানুভূতি জানিয়েছে। কাজেই বিদায়-মুহূর্তে উইকহ্যাম তার শুভ কামনা করলে সব দিক থেকে। লেডী ক্যাথারিন ডি বুর্গকে কি রকম দেখবে তাও স্মরণ করিয়ে দিলে। এলিজাবেথ বিদায় নিলে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে, বিয়ে হোক আর অকৃতদারই থাকুক সে, উইকহ্যামই তার জীবনে সৌজন্যে ও স্নিগ্ধতায় আদর্শ হয়ে থাকবে চিরকাল।

মাত্র চব্বিশ মাইল পথ। খুব ভোরেই যাত্রা সুরু করেছিল তারা যাতে দুপুর নাগাদ পৌঁছে যেতে পারে গ্রেসচার্চ ষ্ট্রীটে। গাড়ী যখন গার্ডিনারদের বাড়ীর দরজায় এসে থামল জেন তখন ড্রয়িং-রুমের বাতায়নে বসেছিল। তারা ঘরে ঢুকতেই জেন তাদের স্বাগত জানাল। এলিজাবেথের উদ্‌গ্রীব চোখ মুহূর্তে বোনের উপর ন্যস্ত হোল। না—আগের মতই স্বাস্থ্যবতী লাবণ্যময়ী আছে জেন। সিঁড়িতে এক দল ছেলেমেয়ে তাদের দিদিকে দেখার জন্য উসখুস করছিল—ড্রয়িং-রুমে অপেক্ষা করার তর সয়নি তাদের। বার মাস না দেখার লজ্জা হেতু নীচেও নেমে আসতে পারছিল না। আনন্দ প্রকাশ আর আদরের পালা চলল। একটি উৎফুল্ল দিন কেটে গেল—সকাল বেলা তাড়াহুড়ায় কেনা-কাটিতে আর সন্ধ্যাটা থিয়েটারে।

এলিজাবেথ এর মধ্যেই এক সময় সুযোগ করে, মামীর পাশে আসন নিল। তাদের প্রথম কথাই সুরু হোল জেনকে নিয়ে। শুনে সে বিস্ময়ের চেয়ে দুঃখই পেল বেশী যে, নিজেকে খুশী রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে-মাঝে বিষাদ ও নৈরাশ্য মুশড়ে ফেলে জেনকে। অবশ্য এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী না হওয়াই উচিত। মিস্ বিংলের গ্রেসচার্চ ষ্ট্রীটে আসার খুঁটি-নাটি তথ্য জ্ঞাপন করলেন মামীমা। তার ও জেনের মধ্যে যে সমস্ত কথাবার্তা হয়েছে, পুনরাবৃত্তি করলেন। বিংলের বোন নিজে থেকেই সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

মামী তখন উইকহামের চলে যাওয়া নিয়ে ঠাট্টা করলেন এলিজাবেথকে এবং হাসিমুখে এ অবস্থা মেনে নেওয়ায় তারিফও করলেন তার।

—'আচ্ছা,' লেডী ক্যাথারিনের মেয়েটি কেমনতর বল ত বাপু'—প্রশ্ন করলেন তিনি—'তাকে অর্থলোভী বলা যায় না নিশ্চয়ই।'

—'কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে অর্থলোলুপতা আর হিসেবী মনোবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য কি? হিসেবীপনার শেষ আর লোভের সুরুই বা কোথায়? গেল খৃষ্টমাসে আমার বিয়ে করার ব্যাপার নিয়ে ভয় পেয়েছিলে তুমি, কেন না সেটা অপরিণামদর্শিতা হোত। আর এখন দশহাজারী মেয়েকে পেতে চেষ্টা করছে বলে তাকে অর্থগৃধ্নু বলবে?'

—'মেয়েটি কেমন বল আগে, তার পর সে লোকটির বিচার হবে।'

—'খুব ভাল মেয়ে। তার সম্বন্ধে খারাপ কিছুই জানি নে।'

—'ঠাকুরদার মৃত্যুর পর এই সম্পত্তির মালিক না হওয়ার আগে পর্যন্ত সে তার প্রতি একটুও মনোযোগ দেয়নি।'

—'কেনই বা দেবে? আমার অর্থ নেই বলে আমার ভালবাসা লাভের চেষ্টা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তবে কেনই বা সে তেমন মেয়েকে ভালবাসতে যাবে যার অর্থ নেই—যাকে সে পছন্দ করে না?'

—'কিন্তু এই সম্পত্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এত তাড়াতাড়ি তার প্রতি ঝুঁকে পড়ার মধ্যে একটু অসভ্যতা ফুটে উঠেছে না কি?'

—'বিপদে পড়লে ঐ সমস্ত ভদ্রতা-টদ্রতার বালাই থাকে না। মেয়েটি যদি বাধা না দেয় আমরাই বা পিছুবো কেন?'

—'মেয়েটির বাধা না দেওয়া তার আচরণের কৈফিয়ৎ নয়। এতে এইটে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মেয়েটির মধ্যে একটা কিছুর অভাব আছে— বুদ্ধি অথবা অনুভূতির?'

—'যাই বলুন না কেন। সে হবে অর্থলিপ্সু আর মেয়েটি নির্বোধ!'

—'না, লিজি, না। এইটাই আমি অপছন্দ করি। যে ছেলে বহু দিন ডার্বিশায়ারে কাটিয়েছে তার সম্বন্ধে এ রকম ধারণা করতে দুঃখ নাই।'

—'তাই যদি হয়, ডার্বিশায়ারে যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা বাস করে তাদের সম্বন্ধে অতি খারাপ ধারণা করতে বাধ্য। আর এদের বন্ধুরা যারা হার্টফোর্ডশায়ারে থাকে তারাও কেউ উঁচু দরের নয়। এদের একটুও পছন্দ করি না আমি। ভগবানকে ধন্যবাদ, আগামী কাল আমি এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে এমন একটি লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে যার একটিও ভাল গুণ নেই, যার না আছে প্রশংসনীয় চাল-চলন বা বুদ্ধি। দেখছি নির্বোধরাই জানার মত লোক।'

—'সাবধান লিজি, তোমার কথায় হতাশার সুর ফুটে উঠছে।'

এই নাটক অভিনয় শেষে বিদায় নেবার আগেই এলিজাবেথ মামা মামীর সঙ্গে গ্রীষ্ম কাটানোর নিমন্ত্রণ পেল।

—'কত দূর যাব এখনও ঠিক হয়নি'—বললেন মামীমা—'তবে লেক অঞ্চল অবধি যাবই।'

এর চেয়ে অন্য কোন পরিকল্পনা এলিজাবেথের নিকট এত প্রীতিদায়ক হতো না। এবং সে সাগ্রহেই এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। আনন্দাতিশয্যে সে বলল—'মামী কী আনন্দ! কী আনন্দ হচ্ছে আমার! তুমি আমায় নতুন জীবন দিলে—নবীন উদ্যম। দূর হোক বিরক্তি-হতাশা! কত আনন্দময় মুহূর্ত কাটাব পাহাড়ে-পর্বতে।'

আটাশ

পরের দিন যাওয়ার পথে প্রতিটি জিনিস সুন্দর আর নতুন ঠেকল এলিজাবেথের নিকট। মনও আনন্দে উন্মুখ। দিদিকে এত ভাল দেখে এসেছে যে, তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সমস্ত দুর্ভাবনা মন থেকে নির্বাসিত করতে পারে। উত্তরাঞ্চলে পর্যটনের সম্ভাবনা সতত আনন্দ-উৎস হয়ে রইল।

সদর রাস্তা থেকে যখন হান্সফোর্ডের গলিতে গাড়ী ঢুকল, সবাই গীর্জাটি কোথায় খোঁজ করতে লাগল। গাড়ী যেই মোড় ঘোরে তারা আশান্বিত হয়ে ওঠে এইবার বুঝি দেখা যাবে। রোজিংস পার্কের বেড়া তাদের বাড়ীর এক দিককার সীমানা। গৃহস্বামীদের সম্বন্ধে যা-যা শুনেছে মনে পড়াতে হাসি পেল এলিজাবেথের।

অবশেষে গীর্জাটি দেখা গেল। রাস্তার দিকে ঢালু হয়ে আসা বাগানটি, বাগানের মধ্যে বাড়ী, সবুজ বেড়া, লরেলের ঝোপ—সব কিছুই তারা যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেচে তার প্রমাণ জ্ঞাপন করতে লাগল। কলিন্স আর শার্লটি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করল তাদের। গাড়ী ছোট্ট গেটের মুখে এসে থেমে গেল—সেখান থেকে কাঁকর-বিছান পথটুকু পায়ে হেঁটে বাড়ীতে প্রবেশ করল তারা। পরস্পরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় প্রত্যেকেই খুশী হোল। শার্লটি গভীর আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা করল এলিজাবেথকে এবং যতই দেখল যে তাকে খুব খুশী-মনে গ্রহণ করছে ততই তার আনন্দ হতে লাগল। এটাও সে লক্ষ্য করল, বিয়ের পরও কলিন্সের স্বভাব বদলায়নি মোটেই। তার ভদ্রতা-বোধ আগের মতই আছে। গেটের মুখেই সে এলিজাবেথকে থামিয়ে কয়েক মিনিট ধরে বাড়ীর কথা জিজ্ঞেসা করলে তাকে। তার পর বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হোল তাদের—বৈঠকখানায় এসেও চলল আর এক প্রস্থ অভ্যর্থনার পালা।

এলিজাবেথ কলিন্সকে ঐশ্বর্যাড়ম্বরে দেখতে পাবে বলে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। এ কথা সে না-ভেবে পারল না যে, ঘরের বিশালতা, সৌন্দর্য, আসবাবপত্র প্রভৃতির বর্ণনা যেন তাকে উদ্দেশ্য করেই করা হচ্ছে—যেন কলিন্সকে প্রত্যাখ্যান করে সে কী যে হারিয়েছে সেইটাই সমঝিয়ে দিতে চায় এলিজাবেথকে। কিন্তু প্রতিটি জিনিষ পরিপাটী ও আরামদায়ক হলেও একটি দীর্ঘনিশ্বাসও উত্থিত হোল না বুক ভেঙ্গে, বরং তার বান্ধবী এমন সঙ্গীকে নিয়ে কি করে যে আনন্দ বজায় রেখেছে সেইটাই আশ্চর্য লাগতে লাগল তার। যখনই কলিন্স

এমন কথা বলছিল যা শুনে স্ত্রী যুক্তিসঙ্গত ভাবেই লজ্জাবোধ করতে পারে এবং হামেশাই বলছিল সে এমন কথা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এলিজাবেথের দৃষ্টি এসে পড়ছিল শার্লটির উপর। দু'-একবার ক্ষীণ আরক্তির আভাষ মিলিয়ে যেতে দেখেছে মুখে—তবে সাধারণতঃ শার্লটি বুদ্ধিমতীর মতই তার কোন কথায় কর্ণপাত করে না। দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্রের বর্ণনা করে, পথের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও লণ্ডনে যা-যা ঘটেছে তার পূর্ণ বিবরণী দিয়ে কলিন্স তাদের বাগানে বেড়াতে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাল। বাগানটি বেশ বড়, সুপরিকল্পিত এবং নিজ হাতে বাগানের পরিচর্যা করে কলিন্স। বাগান-পরিচর্যা তার কাছে একটি সম্মানজনক আনন্দ-সঞ্চয়ন। এলিজাবেথ বিস্ময়ে লক্ষ্য করলে, শার্লটিও এই স্বাস্থ্যপ্রদ শরীর-চর্চায় বেশ গর্ব অনুভব করে এবং যত দূর সম্ভব উৎসাহ দেয় কলিন্সকে। কিন্তু তাদের বাগান যতই সুন্দর হোক না কেন, রোজিংসের সঙ্গে তুলনা হয় না। দূরে সমুন্নত ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত হাল ফ্যাশানের একটি সুরম্য অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

শার্লটির বাড়ীটি ছোট কিন্তু সুন্দর—প্রতিটি জিনিষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—যথাযথ ভাবে সাজান। এলিজাবেথ শার্লটির গৃহিণীপনার তারিফ করল। কলিন্সের কথা মন থেকে মুছে ফেলা সত্যিই আরামদায়ক, শার্লটির স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা দেখে তা বুঝে নিতে ভুল হয় না এলিজাবেথের।

কথায় কথায় জানল এলিজাবেথ যে, লেডী ক্যাথারিন এখনও গ্রামে আছেন। ডীনারের সময় আবার উঠল কথাটা। কলিন্স বলল—'আগামী রোববার চার্চে লেডী ক্যাথারিন দ্য বুর্গের সঙ্গে দেখা হবে—তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাবে। অমায়িকতা আর প্রসন্নতার তিনি প্রতিমূর্তি। এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, তোমরা যত দিন এখানে থাকবে প্রতিটি নিমন্ত্রণে তোমাকে আর মেরিয়াকেও তিনি নিমন্ত্রণ করবেন। শার্লটির প্রতি তাঁর আচরণ খুবই মধুর। সপ্তাহে দু'বার রোজিংসে নিমন্ত্রণ থাকেই। তিনি কখনই আমাদের হেঁটে বাড়ী আসতে দেন না। নিজের একখানা গাড়ী করে বাড়ী পাঠিয়ে দেন—তাঁর অনেকগুলো গাড়ী আছে।'

—'সত্যিই লেডী ক্যাথারিন খুব শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিমতী মহিলা'—সায় দিল শার্লটি—'প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর করেন।'

—'ঠিক বলেছ। আমিও ঐ কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম। তিনি এমন মেয়ে যাকে সম্মান না করে পারা যায় না।'

সন্ধ্যাটা কাটল প্রধানতঃ হার্টফোর্ডশায়ারের খবর আদান-প্রদানে। যা আগেই লেখা হয়েছে পুনরাবৃত্তি করলে তার। এলিজাবেথ নিজের ঘরে যখন একলা হোল তখন শার্লটি কতখানি সুখী হয়েছে, কতটা সে স্বামীকে মানিয়ে নিতে পেরেছে জীবনে তার পরিমাপ করতে চেষ্টা করলে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হোল যে, বেশ সুষ্ঠু ভাবেই চলেছে সংসারযাত্রা। কী ভাবে এখানকার দিন কাটবে তাও মনে-মনে খতিয়ে নিলে এলিজাবেথ।

পরের দিন দুপুর বেলা এলিজাবেথ বেড়াতে যাবার জন্য প্রসাধনে ব্যস্ত—এমন সময় হঠাৎ নীচ থেকে একটা সোরগোলে সমস্ত বাড়ী তোলপাড় হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত কান পেতে শুনল, কে যেন হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ছুটে আসছে—তাকে ডাকছে গলা ফাটিয়ে। দরজা খুলতেই মেরিয়াকে দেখতে পেল—উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললে সে—'তাড়াতাড়ি নীচে খাবার-ঘরে এস—একটা মজার ব্যাপার দেখতে পাবে। কী, আমি বলব না। তাড়া-তাড়ি—তাড়াতাড়ি নীচে চল।'

এলিজাবেথ বৃথাই জিজ্ঞেসা করতে লাগল—মেরিয়া আর বেশী বলতে নারাজ। তারা ছুটে নীচে নেমে এল এই আশ্চর্য জিনিষ দেখতে। ব্যাপার আর কিছু নয় দু'জন ভদ্রমহিলা বাগানের গেটের কাছে ছোট্ট একটি ফিটনে করে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—'ওঃ এই ব্যাপার'—বললে এলিজাবেথ—'আমি ভেবেছিলাম বুঝি শুয়োরের ছানা-টানা বাগানে ঢুকেছে। এ দেখছি লেডী ক্যাথারিন আর তাঁর মেয়ে।'

—'উনি লেডী ক্যাথারিন নন। বৃদ্ধাটি হলেন মিসেস্ জেন-কিনসন—ওদের সঙ্গে থাকেন। অপরটি হলেন মিস দ্য বুর্গ। চেয়ে দেখ। কত ছোটটি। কেউ এত ছোট আর রোগা হতে পারে ভাবা যায় না।'

—'এই হাওয়ার মধ্যে শার্লটিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলাটা অত্যন্ত রূঢ় অভদ্রতা। কেন, উনি ভিতরে আসতে পারেন না?'

—'শার্লটি বলে, উনি কদাচিৎ বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেন। পায়ের ধূলো দেওয়াটা অত্যন্ত বাধিত করার ব্যাপার।'

—'চেহারাটা মন্দ নয়'—স্বগতোক্তি করলে এলিজাবেথ—'কিন্তু বড্ড রোগা আর খিটখিটে। ওর পক্ষে ভালই হবে। ওই হবে তার উপযুক্ত স্ত্রী।'

কলিন্স ও শার্লটি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। স্যার উইলিয়ামও গেটের সামনে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে এবং মিস্ দ্য বুর্গ তার দিকে তাকানো মাত্র মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলেন তিনি।

কথাবার্তা শেষ হলে ভদ্রমহিলারা গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেলেন আর শার্লটিরা ফিরে এল বাড়ীতে। কলিন্সের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র সে তাদের সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দন জানাল তাদের। শার্লটি বলল যে, আগামী কাল বাড়ী শুদ্ধ সবার রোজিংসে নেমন্তন্ন।

উনত্রিশ

এই আমন্ত্রণের ফলে কলিন্সের বুক দশ হাত ফুলে উঠল। এই বার অতিথিদের দেখাবে তার মুরুব্বির ঐশ্বর্য। কত স্নেহের চক্ষে তিনি দেখেন তাকে ও তার পত্নীকে এইবার চাক্ষুষ করবে তার অতিথিরা। ঠিক এই কামনা করছিল সে। তবে এত তাড়াতাড়ি যে তিনি সুযোগ দিলেন তা লেডী ক্যাথারিনের পরম কৃপা ভিন্ন আর কি?

—'সত্যি বলতে কি'—বললে সে—'আমি একটুও বিস্মিত হতাম না যদি তিনি রবিবারে আমাদের চা খেতে এবং বিকেলটা তাঁর ওখানে কাটাতে নেমন্তন্ন করতেন। বরং এই রকমই আশা করছিলাম আমি। কিন্তু এতখানি আমার ধারণার অতীত ছিল। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে, তোমাদের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই

তিনি সমস্ত পরিবারটিকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর আতিথেয়তার উদার পরিচয় দেবেন।'

—'আমি কিন্তু একটুও বিস্মিত হইনি'—বললেন স্যার উইলিয়াম —'সত্যিকারের বড়লোকদের সম্বন্ধে আমার যা ধারণা হবার সুযোগ ঘটেছে তার থেকে বলছি।'

সেদিন এবং পরের দিন সকাল বেলা পর্যন্ত লেডী ক্যাথারিনের গল্প ছাড়া আর কোন কথাই হোল না। কলিন্স ভাল ভাবে তাদের তালিম দিল সেখানে গিয়ে কি কি দেখতে পাবে—অত বড় ঘর, অত দাস-দাসী—অদ্ভুত ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে তারা যেন হকচকিয়ে না যায়। মেয়েরা যখন প্রসাধনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল কলিন্স এলিজাবেথকে বলল—'সাজ-পোশাকের জন্য ভেব না। লেডী ক্যাথারিন আর তাঁর মেয়ে যে সব সাজ-পোষাক পরেন তা তিনি আমাদের কাছে আশা করেন না। তোমার যে সব চেয়ে ভাল পোষাক তাই পরেই যেয়ো। সাধারণ ভাবে সেজে-গুজে গেলে লেডী ক্যাথারিন একটুও খারাপ ভাববেন না। লেডী ক্যাথারিন অবস্থার দূরত্ব বজায় রেখে চলা পছন্দ করেন।'

তারা যখন সাজগোজ করছিল তার মধ্যেই কলিন্স বার তিনেক তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নেবার জন্য তাড়া দিল। লেডী ক্যাথারিন ডীনারের জন্য অপেক্ষা করা পছন্দ করেন না। লেডী ক্যাথারিন ও তাঁর হাল-চাল সম্বন্ধে এই রকম ভয়াবহ বর্ণনা শুনে মেরিয়া তো রীতিমত ঘাবড়ে গেল, কারণ এ রকম সমাজে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত সে।

ঝরঝরে দিনটি। তারা পার্কের ভিতর দিয়ে প্রায় আধ মাইল হেঁটে গেল। এলিজাবেথ খুশী-মনেই হাঁটলে চারি দিকের স্নিগ্ধতার দিকে চোখ রেখে।

তারা যখন হল-ঘরের সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল মেরিয়ার ভয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, স্যার উইলিয়ামও অবিচলিত ছিলেন না। শুধু এলিজাবেথ ভয় পায়নি। কারণ, লেডী ক্যাথারিন সম্বন্ধে যা যা শুনেছে সে তাতে তাঁকে অনন্যসাধারণ বা বিস্ময়কর গুণসমন্বিতা বলে মনে হয়নি। আর অর্থ ও পদমর্যাদার আড়ম্বর বিনা বুক-দুর-দুরানিতেই সম্মুখীন হতে পারবে সে।

ঘরে প্রবেশের মুখেই কলিন্স বাড়ীর সৌন্দর্য, সুসামঞ্জস্যাদি সম্বন্ধে আত্মহারা বক্তৃতা সুরু করে দিল। ভৃত্যদের অনুসরণ করে তারা একটি ঘরে এল—যেখানে লেডী ক্যাথারিন, তাঁর মেয়ে ও মিসেস্ জেনকিন্সন বসেছিলেন। লেডী ক্যাথারিন মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাদের। কে পরিচয় করিয়ে দেবে পূর্বাহ্নেই শার্লটি স্বামীর সঙ্গে স্থির করে রাখায় পরিচয়-পর্ব বেশ সুচারুতায় সম্পন্ন হোল—অনর্থক ধন্যবাদ ও ক্ষমা প্রার্থনার ঝামেলা আর হোল না।

সেন্ট জেমসে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও স্যার উইলিয়াম চারি দিকের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর দেখে এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, ছোট একটি নমস্কার করে এক পাশে চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর মেয়ে তো ভয়ে এমন হতভম্ব হয়ে পড়েছে যে, চেয়ারের এক কোণে কুঁকড়ে বসে রইল—কোন্ দিকে তাকাবে ভেবে উঠতে পারলে না। এলিজাবেথ কিন্তু একটুও ঘাবড়ায়নি—সে শান্ত ভাবে সামনের মহিলা তিন জনকে লক্ষ্য করতে লাগল। লেডী ক্যাথারিন দীর্ঘাঙ্গী নিখুঁত-গড়ন মহিলা। এক কালে হয়ত সুন্দরীই ছিলেন। তাঁর আচরণে প্রসন্নতা সুস্পষ্ট নয়। অন্ততঃ এটুকু ভুলতে পারলে না যে, এই মহিলাটি সামাজিক প্রতিষ্ঠায় তাদের চেয়ে উঁচু। মৌন গাম্ভীর্যের মুখোস পরে বসেছিলেন না বটে, কিন্তু আলাপে-আচরণে তাঁর অহমিকা ও কর্তৃত্ব ভাব স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছিল। এলিজাবেথের মুহূর্তে উইকহ্যামের কথা মনে পড়ে গেল এবং উইকহ্যাম তাঁর সম্বন্ধে যা-যা বলেছিল তার একটিও অত্যুক্তি মনে হোল না।

লেডী ক্যাথারিনের দিকে দেখতে দেখতে এলিজাবেথ তার মুখাবয়বে ও আচরণে ডার্সির সঙ্গে কিছুটা মিল আবিষ্কার করল। তার পর সে মেয়ের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে। সত্যি, এত চিকণ আর সরু মেয়েটি। মায়ের সঙ্গে মেয়ের কোন দিক থেকেই মিল নেই।

আহারের ব্যবস্থা অত্যন্ত চমৎকার হয়েছিল। যতগুলি চাকর-বাকর ও আহার্য-পদের কথা উল্লেখ করেছিল কলিন্স, তার একটিও বাদ পড়েনি। লেডী ক্যাথারিনের অভিপ্রায়ে কলিন্স টেবিলের শেষ প্রান্তে উপবেশন করল। কলিন্স প্রত্যেকটি রান্নার ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগল। প্রত্যেকটি ডিস অনবদ্য হয়েছে বলে সে প্রথম অভিনন্দন জানাল; পরে স্যার উইলিয়ামও জামাতার প্রতিধ্বনি করতে লাগলেন।

স্যার উইলিয়ম অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন ইতিমধ্যে এবং এমন ভাবে প্রশংসা করছিলেন যাতে লেডী ক্যাথারিন শুনতে পান। লেডী ক্যাথারিনও এদের প্রশংসা উপভোগ করছিলেন এবং স্মিত হাস্যে স্তাবকদের আপ্যায়িত করছিলেন। পার্টির আর কেউ বিশেষ কোন কথা বলছিল না। এলিজাবেথ সুযোগ পেলে মুখ খুলছিল। সে বসেছিল শার্লটি আর মিস্ দ্য বুর্গের মাঝখানে। শার্লটি লেডী ক্যাথারিনের বাণী শ্রবণে তন্ময় আর মিস্ দ্য বুর্গ একটি কথাও উচ্চারণ করেনি সারাক্ষণ। মিসেস্ জেনকিনসন প্রধানত মিস্ দ্য বুর্গের খাওয়ার দিকে নজর রাখতে ব্যস্ত—এটা-ওটা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করছিল তাকে আর কখন চটে যায় এই ভয়ে তটস্থ হয়েছিল। মেরিয়ার কোন কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। আর পুরুষদের দু'জনের খাওয়া আর প্রশংসা করা ছাড়া আর কোন কাজই ছিল না যেন।

ড্রয়িং-রুমে এসে লেডী ক্যাথারিনের কথা শোনা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না এবং কফি পরিবেশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি অনর্গল বকে যেতে লাগলেন। প্রতিটি বিষয়ে তিনি তাঁর মতামত দিলেন এমন চূড়ান্ত ভাবে যে, তার কোন প্রতিবাদই হতে পারে না। তিনি শার্লটিকে তার গৃহস্থালী সম্বন্ধে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেসা করলেন এবং তার মত ছোট্ট সংসার কি ভাবে চালাতে হয় সে-সম্বন্ধে বহুবিধ উপদেশ বর্ষণ করলেন। এলিজাবেথ ক্রমশঃ আবিষ্কার করলে, এই মহামান্য মহিলার কোন তুচ্ছ বিষয়েই মনোযোগ এড়ায় না যে-সম্বন্ধে তিনি কোন না কোন নির্দেশ দিতে পারেন। শার্লটির সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে তিনি মেরিয়া ও এলিজাবেথকেও নানা প্রশ্ন করলেন—বিশেষ করে এলিজাবেথকেই। শার্লটিকে বললেন, এলিজাবেথের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বিশেষ কিছুই জানেন না তিনি—তাহলেও মেয়েটি বেশ নম্র ধীর—সুন্দর চেহারা। নানা সময়ে তিনি এলিজাবেথকে জিজ্ঞেসা করলেন—ক'টি বোন তারা, বোনেরা তার ছোট না বড়, কারুর বিয়ের কথা পাকা

...য়েছে কি না, তারা দেখতে সুন্দর কি না, কোথায় লেখাপড়া ...খেছে—বাবার কি গাড়ী আছে—মা'র কুমারী নাম কি? ...লিজাবেথ এই সব প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করছিল কিন্তু বেশ সমীহের ...ঙ্গেই উত্তর দিল প্রতিটি প্রশ্নের। সব শেষে লেডী ক্যাথারিন ...ন্তব্য করলেন—'তোমার বাবার সম্পত্তি ভবিষ্যতে কলিন্সেই ...র্তাবে।' শার্লটির দিকে ফিরে বললেন—'এতে আমি খুশীই ...য়েছি। আমি তো ভেবেই পাই না, কেন মেয়েদের বঞ্চিত করে সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হবে। স্যার লুইস দ বুর্গের বংশে এ ...রণের প্রয়োজন কখনো হয়নি। তুমি গাইতে-বাজাতে জান?'

—'সামান্য—'

—'ওঃ, তাহলে এক সময় শোনা যাবে তোমার গান-বাজনা। আমাদের পিয়ানোটা মস্ত বড় আর সম্ভবতঃ অতি উঁচু দরের। যাই হোক, এক দিন বাজিয়ো। তোমার বোনেরা গান-বাজনা জানে?'

—'এক জন জানে।'

—'সবাই শেখে না কেন? সকলেরই শেখা উচিত। মিস্ ওয়েবরা সবাই বাজাতে জানে—তার বাবার তোমাদের মত আয় নেই। ছবি আঁকতে পার?'

—'না, কেউ পারি না।'

—'কেউ না?'

—না—

—'আশ্চর্য! আমার মতে তোমাদের সুযোগ দেওয়া হয়নি। তোমার মা'র প্রতি গ্রীষ্মে লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে এ সব শেখান উচিত তোমাদের।'

—'মা'র হয়ত আপত্তি ছিল না কিন্তু বাবা লণ্ডনকে ঘৃণা করেন।'

—'তোমাদের গভর্ণেস চলে গেছেন?'

—'আমাদের কোন কালেই গভর্ণেস ছিল না।'

—'গভর্ণেস ছিল না, বল কি? এ কি করে সম্ভব? পাঁচটি মেয়ে বাড়ীতে মানুষ হোল, অথচ এক জনও গভর্ণেস ছিল না! এ রকম আমি শুনিনি কখনো। তোমাদের শিক্ষার জন্য তোমার মাকে তাহলে দাসীর মত খাটতে হোত।'

এলিজাবেথ না হেসে পারল না, জানালে সে রকম অবকাশ ঘটেনি।'

—তবে, কে তোমাদের পড়িয়েছে? কে দেখেছে তোমাদের? গভর্ণেস নেই, নিশ্চয়ই তোমাদের লেখাপড়ায় অবহেলা হয়েছে।'

—'কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে তুলনা করলে হয়ত সত্যিই আমাদের অবহেলা হয়েছে। তবে আমাদের যার শেখার ইচ্ছা আছে, তার উপায়ের অভাব হয়নি। লেখাপড়ায় চিরকালই আমরা উৎসাহ পেয়েছি এবং যখন যে রকম শিক্ষক দরকার হয়েছে পেয়েছি। অলস হতে কেউ চাইলে অলস হতে পারত।'

—'কিন্তু গভর্ণেস থাকলে এটিই হোত না। তোমার মা'র সঙ্গে পরিচয় থাকলে আমি এক জন গভর্ণেস রাখতে বলতাম তাঁকে। আমি সব সময় বলে এসেছি, লেখাপড়া শিখতে হলে নিয়মিত কারুর পরিচালনা ছাড়া সম্ভব নয় এবং একমাত্র গভর্ণেস থাকলেই তা সম্ভব। আমি আমার এই উপদেশ দিয়ে কত পরিবারের উপকার করেছি। তরুণ-তরুণীরা জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে পারলে আমি খুব খুশী হই। মিসেস্ জেনকিনসনের চার ভাগনী আমার সহায়তায় ভাল করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীবনে। এই তো সেদিন আর এক জন যুবকের জন্য সুপারিশ করেছি—দৈবাৎই তার নাম উল্লেখিত হয়েছিল আমার আছে। মিস্ বেনেট, তোমার আর কোন বোন সমাজে বেড়িয়েছে?'

—হ্যাঁ, সকলেই।'

—'সকলেই—পাঁচ জনই একসঙ্গে? অত্যন্ত খারাপ। আর তুমি মাত্র মেজ মেয়ে। বড়োর বিয়ে হওয়ার আগেই ছোটরা সমাজে মিশছে? তোমার ছোট বোনেরা নিশ্চয়ই খুব ছোট?'

—'আমার সব চেয়ে ছোট বোনের বয়স ষোল হয়নি। হয়ত সমাজে মেশবার মত তার পূর্ণ বয়স হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয়, অভিভাবকদের অর্থাভাব বা অন্য কোন কারণে বিয়ে হয়নি, বিয়ে করার ইচ্ছা নেই বলে ছোট বোনেদের সমাজে মেশবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলে তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে। সব চেয়ে ছোটরও জ্যেষ্ঠার মত যৌবনের আনন্দ উপভোগের ন্যায্য অধিকার আছে। শুধু এ রকম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের বঞ্চিত করলে বোনে-বোনে ভালবাসা ব্যাহত হয়—মনের স্নিগ্ধতা ক্ষুণ্ণ হয়।'

—'তোমার বয়সের আন্দাজে তুমি একটু পাকা পাকা কথা বল। তোমার বয়স কত?'

—'তিনটি ছোট বোন যার বড় হয়ে উঠেছে'—হাসতে হাসতে বললে এলিজাবেথ—'তার কাছ থেকে এ রকম উত্তর প্রত্যাশা হয়ত আপনার ধারণার অতীত।'

সোজাসুজি উত্তর না পেয়ে লেডী ক্যাথারিন একটু বিস্মিত হলেন। এলিজাবেথ বুঝতে পারলে, সে-ই প্রথম—যে এ রকম অপ্রতিহত ঔদ্ধত্যকে প্রথম অগ্রাহ্য করেছে।

—'তোমার বয়স নিশ্চয়ই কুড়ির বেশী নয়—সুতরাং বয়স গোপন করার কোন অর্থ হয় না।'

—'আমার বয়স একুশও হয়নি'—বললে এলিজাবেথ। লেডী ক্যাথারিন এই অদ্ভুত মেয়েটির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করলেন না তাকে।

অনেকক্ষণ পরে তারা সবাই গৃহাভিমুখে রওনা হোল।

ত্রিশ

স্যার উইলিয়াম মেয়ের বাড়ী রইলেন এক সপ্তাহ। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিজের কন্যার সুখ দেখে গেলেন তৃপ্ত হয়ে। দেখলেন তার স্বামীকে ও সমাজকে। খুশী হলেন এই ভেবে যে, সব মেয়েই বিয়ের পর এত ভাগ্যবতী হয় না তাঁর মেয়ের মত। জামাই তাঁকে প্রতিদিন সকালে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত গাড়ী করে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে। আর শ্বশুর মশায় চলে যাওয়ার পর কলিন্সের সকাল বেলা কাটে কিছুটা বাগানে, কিছুটা লেখাপড়ায় বা পড়ার ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পান করে।

মেয়েদের বসার ঘরটি পিছনে। এখান থেকে তারা বাইরের জগতের কোন খবরই পায় না। সুতরাং কলিন্সের প্রতীক্ষায় তাদের থাকতে হয় সদর রাস্তার সব খবরের জন্যই। বিশেষ করে যত বারই লেডী ক্যাথারিনের মেয়ে তার ফিটনে এই পথ দিয়ে যায়, কলিন্স

দ্রুতপদে এসে তাদের জানিয়ে দিয়ে যায় সে শুভ সমাচার। প্রতিদিনই ঘটে এই ঘটনা। কোন কোন দিন সে হয়ত বা থামে এদের দেউড়ীতে। শার্লটির সঙ্গে দু'-একটি বাক্যালাপ ঘটে গাড়ীতে বসেই। কদাচিৎ নামে সে গাড়ী থেকে। শত অনুনয়েও তাকে সম্মত করানো যায় না।

কলিন্স প্রায়ই লেডী ক্যাথারিনের বাসায় যায়। শার্লটির যাওয়াও বিরল নয়। লেডী ক্যাথারিন তাদের সর্ব বিষয়ে উপদেশ দেন। সাংসারিক খুঁটিনাটি বিষয়ে, তাদের ঘরের আসবাবপত্রের বিন্যাস সম্বন্ধে। এমন কি তাদের আহার্যে মাংসের টুকরো যে বড় বড় করে কাটা হয় সে-বিষয়েও তাঁর মন্তব্য করাটা ভুল হয় না।

এই মহিলাটি যে এই পল্লীর শুধু নয়—আশে-পাশের অনেকগুলি পল্লীরই শান্তিরক্ষা কর্ত্রী, এ অভিজ্ঞতা হোল এলিজাবেথের ক'দিনের মধ্যেই। কলিন্স তার কানে পৌঁছে দেয় কোথায় কাদের সংসারে অশান্তি ঘটেছে, কোথায় কলহ বেধেছে কোন কারণে। কারা নিতান্ত গরীব অবস্থায় দিনযাপন করছে। লেডী ক্যাথারিন তৎক্ষণাৎ কলিন্সকে সঙ্গে নিয়ে যান অকুস্থলে। মিটিয়ে দেন নিজে উপস্থিত থেকে এই সব বাদ-বিসংবাদ, অশান্তি। শান্তি-শৃংখলা পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করে দেন।

সপ্তাহে দু'বার করে তাঁর বাসায় এদের আমন্ত্রণ থাকে। প্রথম ক'দিন স্যার উইলিয়াম উপস্থিত থাকতেন। এখন তাঁর আসনটি শূন্য থাকে। তা নইলে প্রথম দিনের আসর, কথাবার্ত্তা ও শালীনতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে দিনের পর দিন। যতই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন হোক, এলিজাবেথ বেশ আরামেই কালক্ষেপণ করতে লাগল এখানে। যতক্ষণ কলিন্স-দম্পতী ঐ মহিলার সঙ্গে আলাপে অতিবাহিত করে, এলিজাবেথ বাগানে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। বছরের এই সময়টি অতি মনোরম। বাগানের এক নিভৃত ছায়া-ঘেরা বীথিপথে এলিজাবেথ একাকী ঘুরে বেড়ায়। পরম প্রিয় তার এই জায়গাটি।

এমনি শান্ত মৃদু পদক্ষেপে এলিজাবেথের প্রবাস-জীবনের পনেরো দিন কেটে যায়। ইষ্টারের উৎসব সমাসন্ন হয়ে আসছে। শোনা গেল যে, শীঘ্রই এখানে নূতন অতিথির দল এসে পড়বে। এখানে আসার পরই শুনেছিল এলিজাবেথ যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ডার্সির এখানে আসার আশা আছে। অন্য অতিথিদের বিষয়ে এলিজাবেথের কৌতূহল এত প্রবল নয় বটে, কিন্তু ডার্সি এলে এই পার্টিতে নূতন রং লাগবে নিঃসন্দেহে। আর লেডী ক্যাথারিনের মুখে সে ডার্সি সম্বন্ধে স্নেহপূর্ণ সুমিষ্ট নানা মন্তব্য শুনেছে ইতিমধ্যে। আর সে যে শার্লটি ও এলিজাবেথের পূর্ব পরিচিত, এ সংবাদে তিনি রীতিমত উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন।

আজ সকালে সদর রাস্তার দিকে এমন সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি রেখেছিল কলিন্স যে, আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে বার্ত্তা রটে গেল গ্রামে। গাড়ীতে উপবিষ্ট ডার্সিকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে কলিন্স দ্রুত-পায়ে গৃহে ফিরল সে-সন্দেশ পরিবেশন করতে। পরদিন সকালেই সে লেডী ক্যাথারিনের বাসায় গেল ডার্সিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। লেডী ক্যাথারিনের পরম স্নেহাস্পদ প্রিয়জন এক জন নয় দু'জন এসেছে। ডার্সি তার কাকার ছোট ছেলে—ফিজ উইলিয়ামকেও সঙ্গী করে নিয়ে এসেছে এবার। যখন কলিন্স ফিরল বাড়ীতে, দু'টি অতিথিই তার সঙ্গে এ-বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিল। স্বামীর পড়ার ঘর থেকে তাদের পথে আসতে দেখে শার্লটি ছুটে এসে ভিতরের মেয়ে-মহলে আগন্তুকদের আসার খবর জানিয়ে দিল।

—'আমি কি বলে ধন্যবাদ দেবো ওদের সৌজন্যকে। মিঃ ডার্সি যে এত তাড়াতাড়ি এসে আমাদের আপ্যায়িত করবেন ভাবতে পারি না।'

বান্ধবীর কথার প্রত্যুত্তর দেবার আগেই বাইরে আগন্তুকদের গৃহপ্রবেশের সাড়া পেল এলিজাবেথ। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিন জন পুরুষ ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। প্রথমেই ফিজ উইলিয়াম। বছর ত্রিশ বয়স। দেখতে ততি সুদর্শন না হলেও মুখে-চোখে নিখাদ ভদ্রলোকের পরিচয় প্রত্যক্ষ। ডার্সির সেই পরিচিত আত্মম্ভরী গাম্ভীর্য। মৌন মুখেই সে কলিন্স-পত্নীকে অভিবাদন করলে। এলিজাবেথের প্রতিও সে রক্ষাব্যূহের অন্তরাল থেকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলে। প্রত্যুত্তরে নিঃশব্দে গ্রীবা সঞ্চালন করলে এলিজাবেথ।

সামান্য পরিচয়ের পরই ফিজ উইলিয়াম সজ্জনের মতই এদের সঙ্গে সাধু সংলাপে ব্যাপৃত হোল। ডার্সি নীরবে বসে রইল অনেকক্ষণ। তার পর হয়ত বা নিজের সৌজন্যের দুর্নামের ভয়েই এলিজাবেথকে উদ্দেশ করে তাদের পারিবারিক কুশলতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে। সামান্য কথায় তার জবাব দিয়ে এলিজাবেথ তাকে প্রতিপ্রশ্ন করলে—'দিদি মাস তিনেক হোল লণ্ডনে গেছে। তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটেছিল না কি ইতিমধ্যে?'

ডার্সির সঙ্গে যে তার দেখা হয়নি তা জানে সে। কিন্তু বিংলে-পরিবারের সঙ্গে জেনের ইতিমধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে গেছে সে সম্বন্ধে ডার্সি কতখানি ওয়াকিবহাল তা পাল্টে জেনে নেবার কৌতূহলে এ কথা পাড়লে এলিজাবেথ। জেনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি এ কথা বলার সময় ডার্সি যে একটু বিবর্ণ হোল তা এলিজা-বেথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু এ বিষয়ে অতিরিক্ত আর কোন আলোচনা হোল না তাদের মধ্যে। অল্পকাল পরেই অতিথি দু'জন সেদিনের মত বিদায় নিল।

একত্রিশ

কর্ণেল ফিজ উইলিয়ামের স্নিগ্ধ আচরণে সকলেই—বিশেষ করে মহিলারা এবারকার আনন্দ-উৎসবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎসাহিত হলেন। কয়েক দিন কাটার পর কলিন্স-পরিবার লেডী ক্যাথারিনের বাড়ীতে আমন্ত্রণ পেলে—যে ক'দিন সেখানে অতিথিরা ছিলেন এদের উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন ছিল—দু'জন অতিথির আগমনের সাত দিন পরে ইষ্টারের দিন তারা এই নিমন্ত্রণ পেল। এই ক'দিনের ভিতর ডার্সিকে মাত্র একবার গীর্জায় দেখা গিয়াছিল—যদিও কর্ণেল ইতিমধ্যে একাধিক বার এদের এখানে আনাগোনা করেছেন।

ইতিপূর্বে যে সমাদর পেত এরা লেডী ক্যাথারিনের কাছে, আজ তাতে কিছু কার্পণ্য দেখতে পেল সকলেই। তিনি অধিকাংশ সময়েই ব্যস্ত হয়ে রইলেন প্রিয় মানুষটিকে নিয়ে। বিশেষ করে ডার্সির প্রতি তার অবিমিশ্র আলাপ-আপ্যায়ন ঘরের সব ক'জনেরই ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠল।

কর্ণেল কিন্তু এদের পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বিশেষ করে কলিন্স-গৃহিণীর প্রিয় বান্ধবীটি তার মন জুড়ে ছিল। তাকে

তেই সে নানা বিষয়ে আলাপ সুরু করে দিল। কোন নিমন্ত্রণে য়ে এত আনন্দময় মুহূর্ত ইতিপূর্বে আর কখনো অতিবাহিত করেনি লিজাবেথ। তারা এমন অকপট সোৎসাহে গল্প করতে লাগল , ডার্সি ও লেডী ক্যাথারিনের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হোল অবিলম্বেই। র্সি বিশেষ করে তীব্র কৌতূহলের সঙ্গেই তাদের এই ঘনিষ্ঠতাকে ক্ষ্য করল। লেডী ক্যাথারিনও নিজের বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—'কি নিয়ে এমন গভীর গল্প চলছে তোমাদের? কি কথা আমাদের একটু শোনাও না, ফিজ উইলিয়াম। মিস্ বেনেটকে কি লছ, শুনি না?'

তিনি যে নাছোড়বান্দা এ কথা ভেবে কর্ণেল জবাবে বললে—আমরা গানের আলোচনা করছি।'

'গানের কথা! তবে একটু জোরে আলোচনা কর ফিজ, যাতে আমরাও শুনতে পাই। ঐ একটি আলোচনা—যাতে আমার ভারী আনন্দ হয়। তোমাদের কথাবার্তায় আমাকেও অংশ নিতে দাও। দাবা ইংল্যাণ্ডে আমার চেয়ে কোন প্রিয় লোক বেশী নেই যার গানের প্রতি এমন স্বাভাবিক প্রীতি আমার মতো প্রায়শই দেখতে পাবে না তুমি। যদি গান শিখতাম খুব বড়ো গায়িকা হতে পারতাম। মেয়েও আমার কম ছিল না কিন্তু ওর শরীরটাই ও-পথের কাঁটা হয়ে রইল। তা ডার্সি, বোনটির সঙ্গীত-চর্চা এগোচ্ছে কেমন?'

বোনের প্রশংসায় ডার্সি পঞ্চমুখ। লেডী বললেন—'শুনে ভারী খুশী হলাম। তাকে বলো যে, আমি বলেছি, নিয়মিত চর্চা না রাখলে সে ওস্তাদ হতে পারবে না। আমি যে কত মেয়েকে বলেছি এ কথা। আর এ মেয়েটিও পিয়ানো বাজায় মন্দ নয়। কলিন্সের বাসায় পিয়ানো নেই, তাই এলিজাবেথকে বলি, আমার এখানে এসে একটু সাধনা করতে। কোন অসুবিধা হবে না। ও-ঘরে তো কেউ যায় না।'

কাকীর এই নির্লজ্জতায় ডার্সি যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল।

কফি খাওয়ার পর কর্ণেল এলিজাবেথকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে, আজ বাজনা শোনানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল তার। সুতরাং এলিজাবেথও এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না। লেডী ক্যাথারিন ভাইপোর সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন এই বাজনার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখিয়ে। ডার্সি এক সময় উঠে পড়ল, তার পর ধীর মন্থর পায়ে এগিয়ে পিয়ানোর নিকটবর্তী এমন একটি জায়গায় ঘাঁটি নিয়ে দাঁড়াল—যেখান থেকে সুন্দরী গায়িকার মুখখানি সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। এলিজাবেথ তার এই ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করলে আড়চোখে, তার পর মুখ ফিরিয়ে তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে একটু বাঁকা হাসি হেসে বললে—'অমন গম্ভীর মুখে সামনে দাঁড়িয়ে কি আমায় অপ্রস্তুত করতে এলেন? আপনার বোন ভাল বাজালেও আমি লজ্জা পাব না আমার বাজনায়। অন্যের মুখ চেয়ে অপ্রস্তুত না হওয়ার দৃঢ়তা আমার চরিত্রে আছে। এই সব মুহূর্তে আমি খুব সামলে নিতে পারি নিজেকে।'

—'ঠিকই ধরেছেন'—জবাবে বললে ডার্সি—'আপনি যে স্বীকারোক্তি করেছেন তা যে আপনার নিজস্ব মত নয়, তা বোঝবার বুদ্ধি আমার হয়েছে আপনার সঙ্গে এত দিনের পরিচয়ে।'

এলিজাবেথ ফিরল কর্ণেলের দিকে। ততোধিক সবল স্বরে বললে—'আপনার ভাইয়ের কাছে আমার যথার্থ পরিচয় পেতে পারবেন। উনি বলে দেবেন যে আমার কথা বিশ্বাস না করতে।'

ফিজ উইলিয়াম কৌতূহলী হয়ে বললে—'বলুন না, ডার্সির চরিত্র সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?'

—'তবে শুনুন বলছি। কিন্তু অবিনয়ী কিছু শোনবার জন্য তৈরী হয়ে থাকুন। ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে এক বল-নাচের আসরে। সেখানে খুব কমই পুরুষ ছিলেন উপস্থিত। কিন্তু উনি চারটির বেশী নাচে যোগ দেননি। আর একটি তরুণী মেয়ে সঙ্গিহীন হয়ে বসে থাকলেও উনি সৌজন্য করে তার প্রতি ভদ্রতা দেখাননি। এ সব অসৌজন্য আপনি অস্বীকার করতে পারেন না কি মিঃ ডার্সি?'

—'আমার পরিচিত ক'জন ভিন্ন অন্য কোন মেয়েকে চেনবার সুযোগ পাইনি আমি তখনো।'

—'কিন্তু ঐ ধরণের আসরে কে আর সব চেনা-জানা মেয়েদের সঙ্গ পায়? পরিচয় করে নেয় লোকে। শালীনতা তাই দাবী করে না কি?'

—'নেচে আলাপ করার প্রতিভা আমার নেই, স্বীকার করছি।' এমন সময় লেডী ক্যাথারিন এসে তাদের আলাপের সূত্র ছিন্ন করে দিলেন। বললেন—'এ মেয়েটির হাত মিষ্টি। কিন্তু লণ্ডনের কোন সঙ্গীত-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকলে ওর আরো উন্নতি সম্ভবপর হোত। আঙুল ওর চলে ভালো, তবে রুচি তত উচ্চগ্রামে ওঠেনি আমার মেয়েটির মত। আমার এ্যানি গান-বাজনায় মস্ত পারদর্শিনী হতে পারত যদি ওর শরীর একটু সুস্থ থাকত।'

এলিজাবেথের কিসে ভালো হবে সে সম্বন্ধে আরো অনেক উপদেশ তিনি দিলেন। তার পর এক সময় তাঁর গাড়ী করে এরা বাসায় ফিরে এল।

অনুবাদক—শ্রীশিশির সেনগুপ্ত ও শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

"রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বল বা ঈশ্বর বল বা অবতার বল, আপনার আপনার ভাবে নাও।" —স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলা সাময়িকপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-৫

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বারে অনবধানতা বশতঃ দুইখানি সাময়িক পত্রিকার নাম বাদ পড়িয়াছে ; উহা—

১। **তত্ত্ব-প্রকাশিকা** বা শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের উপদেশ (মাসিক ?) :

সম্পাদক—রামচন্দ্র দত্ত।

২। **পল্লীপ্রকাশ** (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯৩।

কুচবিহার হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়।

ইং ১৮৮৭

৪৭৮। বৌদ্ধ-বন্ধু (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৯৩।

সম্পাদক—কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী।

৪৭৯। **গান ও গল্প** (পাক্ষিক) : ১ বৈশাখ ১২৯৪।

সম্পাদক—মতিলাল বসু, নাট্যকার মনোমোহনের পুত্র এবং বোসের সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা। বহু বিশিষ্ট লেখকের রচনায় পত্রিকাখানি সমৃদ্ধ ছিল।

৪৮০। **কর্ণধার** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৪।

সম্পাদক—হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

৪৮১। বীণাপাণি (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৪।

"প্রধানতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা ইহার উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৮২। চিকিৎসাদর্শন (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৪।

নদীয়া, মোল্লাবেলিয়া হইতে প্রকাশিত, চিকিৎসা-বিষয়ক পত্র। সম্পাদক—রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

৪৮৩। হিন্দুধর্ম্ম (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৯৪।

৪৮৪। দীপিকা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৪।

সম্পাদক—প্যারীমোহন হালদার।

৪৮৫। **নব-যুগ** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৪।

সম্পাদক—আনন্দচন্দ্র মিত্র।

৪৮৬। কামনা (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১২৯৪।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শশিভূষণ দত্ত।

৪৮৭। সাম্যবাদী (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১২৯৪।

উড়িষ্যা হইতে প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত। ইহাতে "অতি উদারভাবে ধর্ম্ম, নীতি ও মিতাচার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত হইয়া থাকে।

৪৮৮। **কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড-বেদ।** আত্ম ও সাধন-তত্ত্ব। ১২৯৪ সাল।

কুমারখালী হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কাঙ্গাল-ফিকির-চাঁদ ফকীর (হরিনাথ মজুমদার)। ইহার ৬ ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল ; প্রত্যেক ভাগ ১২ সংখ্যায় পূর্ণ।

৪৮৯। হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনী (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯৪। সম্পাদক—মুন্‌শী গোলাম কাদের।

৪৯০। গুপ্ত জ্ঞানরত্ন সংগ্রহ (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯৪। ডাঃ এ, সি, বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪৯১। **অনুসন্ধান** (পাক্ষিক…) । ১৩ শ্রাবণ ১২৯৪।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র। নানারূপ জুয়াচুরি হইতে দেশবাসীকে সতর্ক করাই 'অনুসন্ধানে'র উদ্দেশ্য। প্রথম সম্পাদক—দুর্গাদাস লাহিড়ী। অষ্টম বর্ষ (২১ বৈশাখ ১৩০১) হইতে পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক আকার ধারণ করে।

৪৯২। **সংসার-দর্পণ** (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯৪।

সংসার, সমাজ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। পরমায়ু—দুই বৎসর। সম্পাদক—সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৯৩। সচিত্র কৃষি শিক্ষা (মাসিক) : ভাদ্র ১২৯৪।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কালীকুমার মুন্সী।

৪৯৪। সারসংগ্রহ (মাসিক) : ভাদ্র ১২৯৪।

বীরভূম জেলার মলুটি গ্রাম হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

৪৯৫। **বিভা** (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯৪।

"শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ইহার সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ; ইহার ৭ম-৮ম যুগ্ম-সংখ্যায় মুদ্রিত দাস-কবির 'প্রেম ও ফুল' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য আছে : 'প্রেম ও ফুল' বিভা প্রকাশক প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের ইহার অধিক সমালোচনা করা ভাল দেখায় না। 'বিভা' একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা। ইহার পৃষ্ঠায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনেকগুলি রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল ; দৃষ্টান্তস্বরূপ ১ম ও ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত "জাতিভেদ" প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে ; প্রবন্ধটির শেষে লেখকের নামোল্লেখ না থাকিলেও মলাটে মুদ্রিত সূচীতে আছে।

৪৯৬। ধর্ম্ম-নিগম (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯৪।

ধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা ; শশিভূষণ নন্দী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

* * * *

'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় (ভাদ্র ১২৯৪) 'খৃষ্টীয় প্রহরী' নামে একখানি পত্রিকার, এবং 'বিভা'য় (পৌষ ১২৯৪) নিম্নোক্ত পত্রিকাখানির প্রাপ্তিস্বীকার আছে। এগুলি সম্ভবতঃ ১২৯৩-৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় :—

(ক) গরীব ও মহাবিদ্যা ('গরীব' ঢাকা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র, ইহার সহিত স্থানীয় 'মহাবিদ্যা' সম্মিলিত হয়)।

ইং ১৮৮৮

৪৯৭। ভারতবন্ধু ও জাহানাবাদ পত্র (মাসিক) : ফাল্গুন (?) ১২৯৪।

সম্পাদক—আশুতোষ গুপ্ত।

৪৯৮। **অপূর্ব্ব পঞ্চায়ৎ** (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৯৫।

পরমায়ু—৬ মাস। সম্পাদক—উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, 'বঙ্গবাসী' ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ।

৪৯৯। **ক্রীড়া ও কৌতুক** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৫।

তাহিরপুর হইতে এই ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরিচালক—কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়। ১৮৮৯, ১লা জানুয়ারি হইতে

রাধেশচন্দ্র শেঠের সম্পাদকত্বে ইহা সাপ্তাহিক আকারে নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত।

৫০০। গৌড়দূত (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১২৯৫।

মালদহ হইতে প্রকাশিত।

৫০১। বিবেক (পাক্ষিক) : বৈশাখ ১২৯৫।

ব্রাহ্মসমাজকে সংস্কার করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

৫০২। ব্রহ্মাণ্ডবাজার (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৯৫।

ইহা পূর্ব্বে দিনকতক চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ১২৯৫, বৈশাখ হইতে পুস্তকাকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

৫০৩। কল্পতরু (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১২৯৫।

"আশা ও ব্যবসা সঞ্জীবনী বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।" সম্পাদক—পি, এন, [পরেশনাথ] বিশ্বাস। ইহা সাপ্তাহিক পত্রিকার আকারে ও ধরণে বাহির হইত।

৫০৪। সমীরণ (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ (?) ১২৯৫।

উলুবেড়িয়ার হিতকরী সভা হইতে প্রকাশিত।

৫০৫। শান্তি (সাপ্তাহিক) : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫।

বিমলাচরণ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত।

৫০৬। হরিভক্তিতত্ত্ব (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯৫।

সয়দাবাদ, বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—দাস হরিচরণ বন্ধু।

৫০৭। সুখী পাখী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯৫।

যশোহর হইতে প্রকাশিত, নীতিবিষয়ক বালক-পাঠ্য মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—সারদাপ্রসাদ বসু।

৫০৮। আহার-তত্ত্ব (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯৫।

নিরামিষভোজী সভার মুখপত্র। সম্পাদক—ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

৫০৯। ধন্বন্তরি (মাসিক) : ভাদ্র ১২৯৫।

সম্পাদক—সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

৫১০। গৃহী সখা (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯৫।

মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোককে গৃহকর্ম্মনির্ব্বাহে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে প্রচারিত। সম্পাদক—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

৫১১। **শক্তি** (সাপ্তাহিক) : আশ্বিন ১২৯৫।

ঢাকা আর্ম্মানিটোলা হইতে প্রকাশিত। "ইহার মত সকল বেশ উদার অথচ হিন্দুভাবাপন্ন।"

৫১২। সারস্বত-প্রসূনাঞ্জলি (মাসিক) : কার্ত্তিক ১২৯৫।

"সাধারণের মোহান্ধকার নষ্ট করাই এই ক্ষুদ্র 'সারস্বত-প্রসূনাঞ্জলি'র প্রধান উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—অঘোরনাথ ঘোষ।

৫১৩। **বিরহিণী** (মাসিক) : কার্ত্তিক ১২৯৫।

ইহাতে প্রধানতঃ গল্পই স্থান লাভ করিত। সম্পাদিকা—শৈলবালা দেবী।

৫১৪। শিক্ষা (মাসিক) : পৌষ ১২৯৫।

বনগ্রাম (যশোহর) ছাত্রসমিতি হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—প্রিয়নাথ বসু।

৫১৫। শ্রীহট্ট-সুহৃদ (মাসিক) : পৌষ ১২৯৫।

"আজ-কাল স্কুল-কলেজের বালক ও যুবকদিগের মধ্যে অধিকাংশের চরিত্র অতিশয় হীন হইতেছে, ঐ সকল হীনচরিত্র বালক ও যুবকদিগকে সৎপথে আনাই 'শ্রীহট্ট-সুহৃদে'র ব্রত।" এই ৮-পৃষ্ঠা পরিমিত মাসিক পত্রিকা (বার্ষিক মূল্য ।০) বালকদিগের যত্নে পরিচালিত হইত।

৫১৬। **মালঞ্চ** (মাসিক) : পৌষ ১২৯৫।

ভূতপূর্ব্ব 'পাক্ষিক সমালোচক'-সম্পাদক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ঝন্‌ঝারপুরে (ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে) অবস্থানকালে এই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপত্রখানি প্রকাশ করেন। ইহাতে রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত। পরমায়ু—দুই বৎসর।

*　　*　　*　　*

ইং ১৮৮৮ সনে আরও কতকগুলি পত্র-পত্রিকার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ; পত্রিকাগুলি—

(ক) চন্দ্রবিলাস (সাপ্তাহিক)।

(খ) গৌরব।

(গ) চট্টল গেজেট (সাপ্তাহিক)।

(ঘ) চন্দ্রহাস (সাপ্তাহিক), বহরমপুর।

(ঙ) কাশিপুর-নিবাসী (মাসিক…), বরিশাল। সম্পাদক—প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(চ) মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর জিহ্বা (ত্রৈমাসিক), টাঙ্গাইল।

(ছ) জগৎবাসী (সাপ্তাহিক)।

(জ) পীরগোরাচাঁদ (বিদ্রূপাত্মক মাসিকপত্র)।

এই সকল পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব খুব সম্ভব ১২৯৫ সালেই ঘটিয়াছিল।

এই বৎসর হিন্দী ভাষায় বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাখানির নাম—**'সুগৃহিণী'**; ইহা স্ত্রীলোকদিগের জন্য শিলং হইতে ১২৯৪ সালের ফাল্গুন মাসে (ইং ১৮৮৮) প্রচারিত হয়। সম্পাদিকা—হেমন্তকুমারী দেবী, রাজচন্দ্র চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী (দ্রঃ 'বামাবোধিনী পত্রিকা', বৈশাখ ১২৯৫, পৃঃ ৩)।

ইং ১৮৮৯

৫১৭। ভারত-সঞ্জীবন (মাসিক) : মাঘ ১২৯৫ (জানুয়ারি ১৮৮৯)।

হুগলী বুধোদয় প্রেস হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—ভূপতিনাথ দাস।

৫১৮। শুক-সারি (মাসিক) : মাঘ ১২৯৫।

যশোহর শুভকরী যন্ত্রে মুদ্রিত। সম্পাদক—নিবারণচন্দ্র কাব্যতীর্থ, যশোহর জেলাস্কুল।

৫১৯। **ফরিদপুর-হিতৈষিণী** (সাপ্তাহিক…) : ফাল্গুন ১২৯৫।

ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত। ১২৯৮ সালে মাসিকে রূপান্তরিত।

৫২০। আর্য্যপ্রতিভা (মাসিক) : চৈত্র ১২৯৫।

প্রকাশক—বৈষ্ণবচরণ বসাক।

৫২১। শাস্ত্রপাঠ-সম্মিলনী (মাসিক) : চৈত্র ১২৯৫।

সম্পাদক—রেঃ ডবলিউ. জি. ব্রকওয়ে, ভবানীপুর।

৫২২। সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৬।

সম্পাদক—কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৫২৩। **শিক্ষা-পরিচয়** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৬।

শিক্ষা-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন। সম্পাদক—শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, পুঁঠিয়া রাজসাহী। স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১২৯৭ সালের পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশ :—"পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, শিক্ষা-পরিচয়ের পরিচালন এবং উন্নতি বিধানে সম্পাদককে সাহায্য করিবার জন্য এখন হইতে কয়েক জন কৃতবিদ্য হিতৈষী বন্ধু সমবেত হইয়া শিক্ষা-পরিচয়-সমিতি নামে একটি সমিতি স্থাপন করিলেন।…শিক্ষা-পরিচয়-সমিতির অধিবেশন-স্থান বোয়ালিয়া, রাজসাহী, বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি-এল।" শিক্ষা-পরিচয়-সমিতি "শিক্ষা-পরিচর্য্যা এবং জাতীয় সাহিত্য-বিস্তার প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্যে স্থাপিত" হয়। 'শিক্ষা-পরিচয়' একখানি সুপরিচালিত পত্র, ৫ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ইহার সম্পাদক—'দেবীযুদ্ধ'-প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (মৃত্যু : ১৩ ফাল্গুন ১৩৩৩) সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান্ ছিলেন।

৫২৪। আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারক ব্রাহ্মণপণ্ডিত (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৬।

সম্পাদক—বেদাধ্যাপক ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি সরস্বতী।

৫২৫। **সম্মিলনী** (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৯৬।

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র পর যশোহর হইতে প্রকাশিত ইহাই উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় বাংলা সংবাদপত্র।

৫২৬। পরীক্ষা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৬।

"ইউনানী হেকিমী চিকিৎসা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, আর্য্যধর্ম্ম, উপন্যাস, ইতিহাস ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন। সম্পাদক—হৃদয়নাথ মৈত্র ও পণ্ডিত বৈদ্যনাথ বিদ্যানিধি।

৫২৭। সদৃশ-চিকিৎসা-দর্পণ (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৬।

"নূতন শিক্ষার্থীরা যাহাতে সহজে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে পারেন তদ্বিষয়ক" এই নামের এক মাসিকপত্র বৈশাখ ১২৯৬ হইতে প্রকাশিত হইবে—এই মর্ম্মে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়, বনগ্রাম, যশোহর) কর্ত্তৃক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

৫২৮। গুরুচরণ (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৯৬।

৬৫ নং মেছুয়াবাজার হইতে প্রকাশিত। "এই পত্রিকাখানির সকল বিষয়ই অদ্ভুত !—নাম 'গুরুচরণ,' ম্যানেজার পেড্‌মোর সাহেব, স্বত্বাধিকারী হাকিম নাজাতালি শা কাদিরী ; লেখা হয় বাঙ্গলা ভাষায় আর্য্যধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ।"

৫২৯। **ভারত-ভগিনী** (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১২৯৬।

"শ্রীমতী হরদেবী নাম্নী লাহোরের একটি হিন্দু মহিলা 'ভারত-ভগিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেছেন।"—'সুলভ সমাচার ও কুশদহ,' ১৫ আষাঢ় ১২৯৬।

৫৩০। ত্রাণোদয় (পাক্ষিক…) : বৈশাখ (?) ১২৯৬।

"মুক্তিতত্ত্বপ্রকাশক পাক্ষিক পত্র বিনামূল্যে বিতরিত। ১ নং ডিহি শ্রীরামপুর রোড, ইটালী হইতে প্রকাশিত। এখানি খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিষয়ক পাক্ষিক পত্র। আর্য্যদর্পণ ও স্বাধীন খৃষ্টীয়ানকে এখন আর দেখিতে পাই না কেন ?"—'সুলভ সমাচার ও কুশদহ,' ১৫ আষাঢ় ১২৯৬।

পর বৎসর বৈশাখ মাস হইতে 'ত্রাণোদয়' অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়।

৫৩১। শিলচর (পাক্ষিক) : বৈশাখ (?) ১২৯৬।

শিলচর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বিধুভূষণ রায়।

৫৩২। সুকথা (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬।

কোচবিহার ষ্টেট প্রেসে মুদ্রিত হইয়া কোচবিহার হইতে প্রকাশিত হইত।

৫৩৩। আনন্দ (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯৬।

সম্পাদক—কেদারনাথ ঘোষ।

৫৩৪। সবিতা (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯৬।

উত্তরপাড়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—যোগীন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

৫৩৫। রবি (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯৬।

ছোট জাগুলিয়া "ছাত্র-সভা"র অনুমত্যনুসারে ২০ নং হরীতকী বাগান লেন হইতে অনুকূলচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক—শশিভূষণ বসু, এম-এ।

৫৩৬। শিশু-বান্ধব (মাসিক) : ইং ১৮৮৯ (?)

১৮৭১ সনে জি, এইচ, রুজ (Rouse) 'খৃষ্টীয় বান্ধব' প্রকাশ করেন। তাঁহারই সম্পাদনায় 'শিশু-বান্ধব' প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ১৮৮৯ সনের জুলাই সংখ্যা 'শিশু বান্ধবে'র উল্লেখ আছে।

৫৩৭। **সাহিত্য-কল্পদ্রুম** (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯৬।

সম্পাদক— শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। ৩ নং বীডন স্কোয়ার, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে মুদ্রিত ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরে 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সপ্তম সংখ্যা (মাঘ ১২৯৬) হইতে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদক হন এবং নবম সংখ্যায় (চৈত্র) 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র ১ম বর্ষ শেষ হয়। অতঃপর ১২৯৭ সালের বৈশাখ হইতে 'কল্পদ্রুম'-কাটা 'সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্য' ২য় বর্ষ হইতে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র হইলে উপেন্দ্রনাথও ১২৯৮ সালের বৈশাখ হইতে ২য় বর্ষের 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' ব্যোমকেশ মুস্তফীর সম্পাদকত্বে প্রচার করেন। ইহা তিন বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

৫৩৮। গণিত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা : শ্রাবণ (?) ১২৯৬।

সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন সেন।

৫৩৯। প্রজাপতি (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯৬।

সম্পাদক—বিজয়কৃষ্ণ রাহা।

৫৪০। যমুনা (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯৬।

৭৫ নং বলরাম দে'র ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে "যমুনা-সমিতি" কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক—হরিহর চট্টোপাধ্যায়।

৫৪১। দরিদ্র-রঞ্জন (মাসিক) : কার্ত্তিক ১২৯৬।

"অনুশীলন ভিন্ন সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি হয় না। সকলেই লিখিতে না শিখিলে মাতৃভাষায় ভাল-মন্দের বিচারশক্তি জন্মে না ; লেখক, অলেখক সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য আমাদের এই আয়োজন।" ইহাতে প্রতি সংখ্যায় এক এক খানি

পুস্তক—প্রধানতঃ উপন্যাস স্থান লাভ করিত। সম্পাদক—চুণীলাল মিত্র।

৫৪২। রুচি (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৯৬।

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়।

৫৪৩। পুষ্পহার (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৯৬।

ঘোষ এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক—উমেশচন্দ্র বৈতালিক।

৫৪৪। সুধাকর (সাপ্তাহিক): কার্ত্তিক **১২৯৬**।

"কোন সুশিক্ষিত ভদ্র মুসলমান কর্ত্তৃক সম্পাদিত···লেখা বেশ বিজ্ঞতা এবং উদারতাব্যঞ্জক। মুসলমানদিগের আরও কয়েকখানি বাঙ্গলা সংবাদপত্র ছিল, কিন্তু তাহা অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।···টাঙ্গাইলের 'আহমদী' অনিয়মিত প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেছে না।"

ইং ১৮৯০

৫৪৫। নব যুবক (মাসিক): পৌষ ১২৯৬।

টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—উমেশচন্দ্র দে।

৫৪৬। চিকিৎসক (মাসিক): মাঘ ১২৯৬।

তালন্দ, রাজসাহী হইতে প্রকাশিত। উদ্দেশ্য—আয়ুর্ব্বেদের পুষ্টিবর্দ্ধন। সম্পাদক—ডাঃ বিনোদবিহারী রায়।

৫৪৭। সঙ্গিনী (মাসিক): মাঘ ১২৯৬।

বিবিধ বিষয়ক সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—রাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

৫৪৮। সাহিত্য (মাসিক): বৈশাখ ১২৯৭।

এই অতি-সুপরিচিত পত্রিকার বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে ইহার আবির্ভাব। সম্পাদক—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। ১৩২৭, ১৭ পৌষ তারিখে সমাজপতির মৃত্যু হইলে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সুহৃদের সাধের পত্রিকাখানি সহজে বিলুপ্ত হইতে দেন নাই; তিনি ১৩২৭ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা হইতে সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। 'সাহিত্য' ১৩৩০ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

৫৪৯। সুবোধিনী (সাপ্তাহিক···): ১ বৈশাখ ১২৯৭।

সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায়। ইহা প্রধানতঃ "খাঁটী বাঙ্গালায় পয়ারাদি ছন্দে লিখিত।" সাপ্তাহিক আকারে আট সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর, পরবর্ত্তী আষাঢ় মাস হইতে 'সুবোধিনী' মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। মাসিক 'সুবোধিনী' সম্পাদন করিতেন—কালিদাস মিত্র।

৫৫০। প্রতিমা (মাসিক): বৈশাখ ১২৯৭।

সে-যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। সম্পাদক—বামদেব দত্ত। ইঁহার মৃত্যুতে প্রথম বর্ষের পত্রিকার শেষার্দ্ধ সম্পাদন করেন—শ্যামলাল গোস্বামী।

৫৫১। মজ্‌লিস্ (মাসিক): বৈশাখ ১২৯৭।

বৈঠকী আলাপ, সঙ্গীত, কবিতা, খোসগল্প, চরিত্র সমালোচন, চুট্‌কী, রংতামাসাপূর্ণ মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—দুর্গাদাস দে। 'মজলিসে' গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল বসুর কিছু কিছু রচনা মুদ্রিত হইয়াছে।

৫৫২। চিকিৎসা-লহরী (মাসিক): বৈশাখ ১২৯৭।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রণালীর চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রকটিত হইত।

৫৫৩। হিতকরী (পাক্ষিক): বৈশাখ (?) ১২৯৭।

কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া হইতে প্রকাশিত। রাজসাহীর 'শিক্ষা-পরিচর' লেখেন:—"আমরা জানিয়াছি, এক জন সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী সাধারণের নিকট অদৃশ্য থাকিয়া হিতকরীর পরিচালনা করিতেছেন।" আমাদের মনে হয়, পত্রিকাখানি মীর মশাররফ হোসেনের, এবং হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) অন্তরালে থাকিয়া উহার পরিচালনায় সহায়তা করিতেন। দ্বিতীয় বর্ষে 'হিতকরী' টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হয়।

৫৫৪। সমালোচক (মাসিক): বৈশাখ (?) ১২৯৭।

কাশীপুর, চুয়াডাঙ্গা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

৫৫৫। আর্য্যকায়স্থ (মাসিক): আষাঢ় ১২৯৭।

কায়স্থ জাতির গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রচারিত। সম্পাদক—দেব কিশোরীমোহন ঘোষ বর্ম্মা।

৫৫৬। হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বপ্রকাশ (মাসিক): আষাঢ় ১২৯৭।

সম্পাদক—হরিদাস চক্রবর্ত্তী।

৫৫৭। নববিধান মৃতসঞ্জীবনী (মাসিক): আষাঢ় (?) ১২৯৭।

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শশিভূষণ তালুকদার।

৫৫৮। আশালতা (মাসিক): ভাদ্র ১২৯৭।

পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কুঞ্জবিহারী দে, বি-এল। ইহার ১ম সংখ্যায় রজনীকান্ত সেনের "আশা" নামে কবিতা স্থান পাইয়াছিল; উহাই কবির প্রকাশিত প্রথম কবিতা।

৫৫৯। চিত্রদর্শন (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৯৭।

সুলভ সচিত্র মাসিকপত্র। প্রকাশক—বিহারীলাল রায়, কলুটোলা আর্টিষ্ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী।

৫৬০। ভারতকুসুম বা পুস্তকনামাবলী (মাসিক): কার্ত্তিক ১২৯৭।

সম্পাদক—চন্দ্রকুমার কবিভূষণ।

৫৬১। সংসার চিন্তা (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১২৯৭।

পরিচালক—রসিককৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৬২। নব-মিহির (পাক্ষিক): অগ্রহায়ণ (?) ১২৯৭।

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অধীন ঘাটাইল হইতে রামগোপাল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৫৬৩। জন্মভূমি (মাসিক): পৌষ ১২৯৭ (ডিসেম্বর ১৮৯০)।

৫৬৪। বঙ্গনিবাসী (সাপ্তাহিক): ১২৯৭ সাল (ইং ১৮৯০)।

বৈষ্ণব কবি

মালবিকা রায়

পাশ্চাত্য সাহিত্যে বৈষ্ণব সাহিত্য প্রধানতঃ ভক্তিরসমূলক। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য যদি কেবল মাত্র ভক্তিরসমূলকই হইত, তাহা হইলে এই নাস্তিকতার যুগে, যখন ভক্তি ও ভক্তের একান্ত প্রাদুর্ভাব সে যুগেও ইহা মানুষকে এ ভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত না। বৈষ্ণব সাহিত্যকে ভক্তিরসমূলক না বলিয়া বরং প্রেমরসমূলক বলা চলিতে পারে। যদিও প্রেমের কবিতা বলিতে যাহা বোঝা যায়, বৈষ্ণব কবিতা ঠিক সেই জাতীয় নহে।

প্রেমের কবিতা বলিতে আমরা বুঝি, প্রেমিক পুরুষ তাহার প্রিয়তমাকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়া যে সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল সরল উক্তি করে, যা শুধু এক জনকে শোনাইবার জন্যই, এক জনকে উদ্দেশ্য করিয়া রচনা, যাহার প্রতিটি শব্দ উচ্চারিত হইয়া এক অনুচ্চারিত উদ্বেল আবেগে চিত্তকে রুদ্ধ করিতে চায়—যাহাকে একরূপ কবির আত্মজীবনীই বলা চলে, কবির মানসিক জীবনের সহিত মিলাইয়া যাহার রসাস্বাদন করা যায়।

কিন্তু লোকধর্মের ভয়েই হোক, অথবা সহজাত সংস্কারের বশেই হোক, বৈষ্ণব কবিরা ঠিক এই পন্থা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহাদের অন্তরের প্রেম-অর্ঘ্যকে তাঁহারা রাধা-কৃষ্ণের রূপকের মধ্য দিয়া প্রণয়িনীর পাদপদ্মতলে নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। তাই সর্ব্বকালের সর্ব্বযুগের মানুষ ইহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে নাই।

বৈষ্ণব কবিরা যে শুধু মাত্র প্রেমের বা ভক্তির পূজারী ছিলেন তাহাই নহে, ইঁহারা অনেকাংশে প্রেমের মধ্য দিয়া প্রকৃতিরও পূজা করিয়া গিয়াছেন। মানুষের অন্তরের সহিত প্রকৃতির যে একটি নিগূঢ় যোগাযোগ আছে, ইহা তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। বৈষ্ণব কবিরা বুঝিয়াছিলেন—বর্ষার বিরহ-সজল পথ বাহিয়া প্রকৃতি যখনই ঋতুরাজ বসন্তের মিলন-দুয়ারে আসিয়া করাঘাত করিয়াছে, অভিসারিণী রাধিকার অভিসার সেই দিনই শেষ হইয়া মিলনের উঠিয়াছে, চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার প্রেমে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছে, বিকশিত পুষ্পের সৌরভ-বিহ্বল ভ্রমরের গুঞ্জনে দিগন্ত মুখরিত হইয়াছে। মিলনের রঙে সমস্ত প্রকৃতি যখন রঙীন হইয়াছে, রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলনের গান বৈষ্ণব কবিরা শুধু সেই দিনই গাহিয়া উঠিয়াছেন :—

ফুটল কুসুম অলিকুল মেলি
কুহর কোকিল বরিহা কেলি
কপোত নাচত আপন রঙ্গে
রাই নাচত শ্যাম সঙ্গে।

* * *

ময়ূরা ময়ূরী, দুঁহু মুখ হেরি
রঙ্গেতে নাচিছে তায়
শুক শারী মেলি তরুডালে বসি
রাধা-কৃষ্ণ গুণ গায়
নবীন তান নবীন গান
নব অলিকুল বেড়িয়া
ভ্রমরা ভ্রমরী গুন-গুন করি
আনন্দেতে পড়ে মাতিয়া
নবীন যমুনা নবীন জল
নবীন তরঙ্গ তায়
নব প্রেম হেরি দাস গোবিন্দ
প্রেমানন্দে ভাসি যায়।

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের মিলন-বিরহের সুরটির সহিত তাল মিলাইয়া যাঁহারা গান গাহিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রকৃত পূজারী না বলিলে ভুল বলা হয়।

শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতির মূল রংটিকে তাঁহারা ধরিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃতির গুণ্ঠন নীল, হরিৎ চিত্রিত, তাহার অঞ্চল শ্যামল। তাই রাধিকা নীলবসনা, কৃষ্ণ শ্যাম ও পীতাম্বর। প্রকৃতির সহিত মিশিয়া রাধাকৃষ্ণ একাকার হইয়া গিয়াছেন। তাই শ্যামল-তমালের শাখাকে রাধিকা কৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম করিয়াছে। প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে কৃষ্ণ রাধিকার সৌন্দর্য্যকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

প্রকৃতি ও মানুষ, মানুষ ও প্রকৃতি, এই দুই সত্তাকে তাঁহারা এক বলিয়া ধরিয়াছেন। তাই কৃষ্ণ কখনো রাধা সাজে সাজিয়াছেন, রাধা কখনো কৃষ্ণরূপে। রাধাকৃষ্ণের এই যুগল-মিলনের মধ্য দিয়া মানুষ ও প্রকৃতির মিলন ঘটিয়াছে। এই মিলনের রূপ কীর্ত্তন আত্মভোলা বৈষ্ণব কবিরা প্রেমের পূজা করিতে গিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে কতরূপে যে প্রকৃতির পূজা করিয়া চলিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রেম

সুলতা কর

পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখছিলাম। আকাশের বুকে অস্তগামী সূর্য্যের রাঙ্গা আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে। পাহাড়ের তলায় সবুজ ধানের ক্ষেতের উপর ছড়িয়ে পড়েছে সেই আলোর আভা। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটি ছোট কালির বিন্দুর মত গাঢ় কালো মেঘের টুকরো আকাশের এক কোণে লাফিয়ে উঠল, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সেই মেঘের টুকরো

কে নিঃশেষে মুছিয়ে দিয়ে কালো মেঘের ভয়াবহ রূপ ঘনিয়ে উঠল সমস্ত আকাশ জুড়ে।

ঝড়ের আগের স্তব্ধতা জেগে উঠল পৃথিবীর বুকে। সব শব্দ থেমে গেছে, ছোট পাখীদের ডানার ক্ষীণতম শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। কি ভয়াবহ স্তব্ধতা! নিদারুণ আশঙ্কায় আমি যেন কেঁপে উঠলাম। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম—"হে ঝড়ের দেবতা, এস এস। বজ্রের নিনাদে, বিদ্যুতের কশাঘাতে দিগ্‌-দিগন্তকে ভরিয়ে দিয়ে ভেঙ্গে পড় পৃথিবীর বুকে। ধ্বংসের প্রলয়ের ঝঞ্ঝা বয়ে যাক্। এখনকার এই স্তব্ধতা, এই নিদারুণ আশঙ্কায় প্রতীক্ষা করে থাকার চেয়ে সে-ও সহস্র গুণে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমার প্রার্থনায় কোন ফল হল না। ঝড়ের মেঘ আগের মতই নিশ্চল হয়ে আকাশ জুড়ে পৃথিবীর বুকে বিরাট বোঝার মত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল থেকে-থেকে তার আয়তন বেড়ে উঠতে লাগল।

ভয়ার্ত্ত চোখে ঝড়ের মেঘের রূপ দেখেছি, এমন সময় চোখে পড়ল একমুঠো মল্লিকা ফুলের মত কি যেন ভেসে চলেছে কালো মেঘের পাশ দিয়ে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, একটি ধবধবে সাদা পাখী গ্রামের দিক থেকে উড়ে এসে গভীর জঙ্গলের দিকে চলেছে। ডানার ঝটপট শব্দ করতে করতে সোজা ঢুকে গেল ঝোড়ো মেঘের গাঢ় কালিমার ভিতরে। তার পর সেই মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল আকাশের অপর প্রান্তে। দেখতে দেখতে তার কোমল দেহ মিশে গেল গভীর অরণ্যের মাঝখানে। কয়েক মুহূর্ত্ত কেটে গেল। ঝড়ের মেঘ রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে-ফুলে উঠছে। এমন সময় দেখি, আকাশের কোলে ঝোড়ো মেঘের পাশে আবার ভেসে উঠেছে দু'টি সাদা পাখী। প্রথম পাখীটি ঝড়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বনের ভিতর থেকে তার সঙ্গিনীকে ডেকে নিয়ে এল। এবার দু'জনে মিলে ফিরে চলেছে গ্রামের পথে, তাদের নিজেদের আনন্দময় নীড়ে। আস্তে আস্তে গান গাইতে গাইতে উড়ছে তারা। ওদের ওড়ার শান্ত গতি দেখে বুঝছি যে ওদের মনে কোন আশঙ্কা নাই, কোন ব্যগ্রতা নাই। এতক্ষণ বাদে ঝড় গর্জ্জন করে উঠল, ঝঞ্ঝা প্রবল বেগে বইতে আরম্ভ করল।

পাহাড়ের উপর থেকে অতি কষ্টে নামতে লাগলাম। চার দিক অন্ধকার, চোখে কিছুই দেখছি না। ঝড়ের গর্জ্জনে কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। তুমুল বেগে বর্ষণ নেমেছে, থেকে থেকে বাজ পড়ার শব্দে আতঙ্কে শিউরে উঠছি, থেকে থেকে বিদ্যুতের কশাঘাতে আকাশ ঝলসে উঠছে।

এই ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যে বাড়ীর পথ ধরে চলেছি অতি কষ্টে। গ্রামে পৌছলাম। শতধারে বৃষ্টির জল মুখের উপর পড়ছে। মুখ মুছতে গিয়ে উপরের দিকে তাকালাম। তাকাতেই দেখি, একটি বট গাছের ডালে খড়-কুটো দিয়ে বাঁধা নিজেদের উত্তপ্ত নীড়ে বসে রয়েছে দু'টি পাখী। দেখেই চিনতে পারলাম।

একটি হল সেই সঙ্গীহারা পাখী—ঝড়ের রুদ্র আক্রোশকে অগ্রাহ্য করে বনের মাঝখান থেকে যে তার সঙ্গিনীকে ডেকে এনেছে। আর একটি হল তারই সঙ্গিনী, সঙ্গীর আহ্বানে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে গান গাইতে গাইতে যে উড়ে এসেছে নিজেদের নিভৃত নীড়ে।

চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। কী সুখী ওরা! পরস্পরের উষ্ণ সান্নিধ্য পাচ্ছে। এক জনের ডানা আর এক জনের বুকে এসে পড়েছে। প্রেমে দু'টি প্রাণ এক হয়ে গেছে। ওদের দিকে চেয়ে ভাবছি—প্রেম এ জগতে কত সুখ, কত শান্তি বহন করে আনে। প্রেম মৃত্যুকে কি ভাবে তুচ্ছ করে।

আমার বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ জীবন আজ ওই দু'টি পাখীর সুখী-জীবনকে দেখে কত তৃপ্তি পাচ্ছে। বুঝছি, প্রেমই মানুষ থেকে জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ সবাইকে সুখী করে নীড় বাঁধার প্রবৃত্তি দেয়। জীবনের রুক্ষ মরুভূমিতে আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়।

আমাদের কর্ত্তব্য

হাসিরাশি দেবী

ক'লকাতা-সহরের বস্তিবাসিনীদের নিয়ে অনেক বার মাথা ঘামানো হ'য়েছে; কিন্তু এই ক'লকাতারই এমন কতক-গুলি গৃহস্থ ঘর-সংসার, অর্থাৎ যাদের পৈতৃক ভিটেই মাত্র আছে এই সহরে, কিন্তু আর কিছু নেই,—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কায়িক ক্লেশে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান ক'রতে হয় এবং সংসারী হ'য়ে গুটি কয়েক পুত্র-কন্যারও সকল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয় বিনা আপত্তিতে, এ রকম নাগরিকের সংখ্যা এ নগরে নেহাৎ কম নয়।

আজকের দিনে নানা সঙ্ঘর্ষের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালী যে রকম শোচনীয় ভাবে আর্থিক দুরবস্থার সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে, এ রকম দুরবস্থায় আর কোনও দেশ—সেই দেশেরই অধিবাসী দাঁড়িয়েছে কি না, জানা নাই; আর, জানা থাকলেও—বক্তব্য সে বিষয় নিয়ে নয়, ব'লছি আমাদেরই সম্বন্ধে, আমাদেরই ঘর এবং সংসার নিয়ে।

উপরে যাঁদের কথা ব'লেছি, সেই সব সংসারের মেয়েদের অধিকাংশকেই আগেকার দিনে, অর্থাৎ ১৫।২০ বছর আগে সংসারের সংরক্ষণশীলতা এবং পারিবারিক কৌলীন্য ও আচার-নিষ্ঠার দোহাই দিয়ে রাখা হতো নিরক্ষর ক'রে। এতে সংসারে মায়ের হাতের কাজে সাহায্যও করা চলতো, এবং সময়ে-অসময়ে ছোট-ছোট ভাই-বোনদের তদারক-তাগাদা করারও কোনও অসুবিধা থাকতো না। কিন্তু আজকাল তার মধ্যে একটু অদল-বদল হ'য়েছে। যদিও সে অদল-বদল সামান্যই, অর্থাৎ আর সব দিকে আগেকার মত আইন-কানুন বলবৎ থাকলেও এখন বিনা বেতনের স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয় কয়েকটা বৎসরের জন্য। অন্ততঃ অক্ষর পরিচয় হ'তে যতটুকু সময় এবং দায়িত্ব সেটুকু শেষ হ'লেই মেয়ের বয়েস সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠেন পিতামাতা। বিবাহের চেষ্টায় স্কুল ছাড়িয়ে এনেও ব্যবস্থা দেন ঘর-সংসারের কাজ শিখবার এবং হাঁড়ি-হেঁসেল ধরবার।

অবশ্য এ ব্যবস্থা অন্যায় নয়, অশোভনও নয় আমাদের জীবনে। কারণ, এর পরেই আমাদের জন্য যে সংগ্রাম-ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে, সেখানে দারিদ্র্য এবং দায়িত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঁচতে হ'লে অভাবের সংসারে এই রকম শিক্ষা পাওয়ার উপকারিতা আছে, এবং এই সব সংসার, সমাজ ও দেশের আংশিক দায়িত্ব চিরকাল ধরে মেয়েরা বহন করেছেন, আজও করছেন, এবং পরেও হয়তো করবেন। কিন্তু বলবার কথা, শুধু কি দায়িত্ব বহনের এই একই পথ ছাড়া আর পরিবর্ত্তন হবে না?

এখনকার দিনের মেয়েরা এই ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে শেখে সেলাই, বোনা বা গান

নাচ—ঠিক যেটুকুর দ্বারা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণই করা চলে কেবল,। অর্থকরী হিসাবে ব্যক্তিগত জীবনেও বিশেষ কোনও কাজ দেয় না এ সব। রোগীর সেবা-শুশ্রূষার কিছুও তারা জানে না।

কিন্তু আমাদের প্রতি ঘরে ঘরে আগেই দরকার হয় সেবা-শুশ্রূষা, রান্না এবং শিশুপালন। এগুলোর জন্য কোনও স্কুল থেকে হাতে-কলমে অর্থাৎ উদ্দেশ্যমূলক ও কার্য্যকরীরূপে কোথাও শিক্ষা পেতে দেখিনি মেয়েদের। বইয়ের পৃষ্ঠায় যা লেখা থাকে, সেই অনুযায়ী এক-আধ দিন শিক্ষয়িত্রীরা রন্ধনের যে পরীক্ষা নেন, তাও সংক্ষিপ্ত। শুশ্রূষা এবং সেবা সম্বন্ধে কেবল আমাদের জাতিই নয়—দেশও নির্বিকার। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও যেন তাই ও-সব সংস্রব এড়িয়ে চলেছেন সন্তর্পণে। কাজেই সেবায় যে আনন্দ আছে, সে কথা আমরা ভুলে গেছি।

আনন্দ বলতে আমরা এখন যেটুকু বুঝি, সেটুকু জলসা, থিয়েটার এবং সিনেমার মধ্যে হয়েছে সীমাবদ্ধ। অবসর সময়ে—হাল্কা সুর ও কথার সমষ্টি, প্রেমের গান, নাচ-গানে-ভরা ছায়া-ছবি, এবং গায়কদের মুখে-মুখে অতি আধুনিক গান শুনে আমরা যে আনন্দ অনুভব করে থাকি, সে আনন্দ ক্ষণিকের হলেও মনে-প্রাণে সেই দিকেই যে আকর্ষণ অনুভব করি, তার জন্য দায়ী আমাদের সংক্ষিপ্ত সময়। আজকের যে রুচিবোধ আমাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির দিকে নিয়ে যেতে চায় না, সে রুচি-বিকৃতির মূলেও আছে এই সময়ের স্বল্পতা। ভাববার যে সময়ের দরকার, এবং চারি দিক থেকে ছড়ান মনটাকে গুটিয়ে এনে যে সাধনায় নিয়োগ করলে সিদ্ধি আসে, সে সাধনা করবার সময় আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে অর্থ নৈতিক সমস্যা।

দৈনিক আমরা কত জন পেট ভরে খেতে পাই, কত জন অর্দ্ধাহারে এবং কত জন নামমাত্র খেয়ে সময় কাটাই, তার মোটামুটি হিসাব সংগ্রহ করলেই দেখা যাবে যে, তাদের কাছে সংস্কৃতিকে বাঁচাবার, কৃষ্টিকে রক্ষা করবার এবং সুশিক্ষা দান করবার আশা রাখা সম্ভব কি না।

তবু উচ্চশিক্ষিত বলতে যাদের বুঝি, এই সব হতভাগ্যদের তুলনায় তাদের ভাগ্যে নিশ্চয় কিছু দেবতার আশীর্ব্বাদ থাকে, তাই শিক্ষার প্রারম্ভ থেকেই সংসারের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তাঁদের কোমর বাঁধতে হয় না; ফলে উন্নতিশীল মনেরও অপমৃত্যু ঘটে না অসময়ে। একমাত্র তাঁদের কাছেই দেশ এবং দশ যতটুকু আশা করতে পারে—ঘটনা-বিপর্য্যয়ে এবং নানা বিভ্রাটে তা-ও সফল হবার আশা নাই।

এই অবস্থায় কেবল এই ক'লকাতা মহানগরীর নাগরিকগণই নয়, বাংলার এই সাধারণ মানুষের বিরাট সমাজকে আধুনিক যুগ ঠেলতে ঠেলতে যেদিকে নিয়ে চ'লেছে, সেদিকের শেষে যে কি অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে, সে কথা ভাবতে গেলে ভয় হয়,—আশা হয় না।

অ্যাটম্ বোমার দেশে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অমিতা দত্ত-মজুমদার

পরের দিন ২৭শে ডিসেম্বর কারো কোনো কাজের বরাদ্দ ছিল না। অধিবেশন আরম্ভ ২৮শে থেকে। কাজেই কথা হোলো সেদিন আমরা রেড, ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে বেড়াতে যাব।

যখন প্রথম সাদা মানুষ এ দেশে আসে তখন সমস্ত দেশ রেড ইণ্ডিয়ানদেরই ছিল। ক্রমাগত যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত হয়ে এরা ক্রমে পূর্ব্বাঞ্চলের এবং দক্ষিণাঞ্চলের উর্ব্বর সমভূমি পরিত্যাগ করে মধ্য-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে এসেছে। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহে লোকক্ষয় হওয়ার দরুণ এদের সংখ্যা খুবই কমে যায়। তার পর আবার কতকাংশ শ্বেত জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণে নূতন সঙ্কর জাতির অন্তর্গত হয়ে পড়ে। বাকি যারা ছিল তারা দিন-দিন হীনবীর্য্য হয়ে ধ্বংসের দিকে চলেছে। এদের জমিজমা সবই ঔপনিবেশিকরা ক্রমশঃ অধিকার করে নিচ্ছিল; সেটা নিবারণ করা হয়েছে আইন করে কতকগুলো গ্রাম সংরক্ষণ করে। এই সব সংরক্ষিত গ্রামের জমি শ্বেতজাতীয়রা কিনতে পাবে না আইনতঃ। এখানে তাই অবিমিশ্র আদিবাসীর জীবনযাত্রা-প্রণালী ও সমাজ-ব্যবস্থার রূপ এখনো বজায় আছে। নৃতত্ত্বের তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যবিচারের পক্ষে এ স্থান বিশেষ অনুকূল। আমাদের দলের নৃতত্ত্ববিদ্‌দের তাই এত উৎসাহ।

ভোরেই সারা দিনের মত তৈরি হয়ে বেরোলাম। সকালে বাইরে এসে দেখলাম যে, যদিও বেশ উজ্জল রৌদ্র উঠেছে তবু শীতের প্রখরতা কম নয়। রাত্রিতে বরফ পড়েছিল। যেখানে যেখানে বাড়ীর বা গাছের ছায়ার জন্য রোদ লাগছে না, সে সব জায়গাতে তখনো গুঁড়ো-গুঁড়ো বরফ জমেই রয়েছে। দুই কারণে এ অঞ্চলে রৌদ্রতাপ বেশী। প্রথমত, ওয়াশিংটন বা শিকাগোর থেকে এই জায়গাটা অনেকটা দক্ষিণে। দ্বিতীয়ত, এখানকার বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের অংশ কম, তাই সূর্য্যরশ্মি ব্যাহত হয় কম, কাজেই তাপ দেয় বেশী। রাত্রিতে living roomএ central heating-এর উপরেও অগ্নিকুণ্ডের আগুন বেশ আরামদায়ক বোধ হচ্ছিল; কিন্তু আজ দুপুর বেলায় গায়ে ওভারকোট রাখা যাচ্ছিল না। ভোরের রোদটা অবশ্য বেশ মধুর লাগল।

দিনের আলোয় এই প্রথম এ দেশের ঘর-বাড়ীগুলো দেখলাম—বেশ লক্ষ্য করার মত এদের গড়ন। প্রশস্ত ক্যাম্পাসটি বেশ সাজানো-গোছানো। বড় বড় চৌকো ব্লক রেখে চওড়া-চওড়া রাস্তা ক্যাম্পাসে অনেকগুলো রয়েছে। প্রত্যেক ব্লকেই বেশ ব্যবধান রেখে রেখে কয়েকটা করে বাড়ী। বাড়ীগুলির গঠন ভিন্ন ভিন্ন ও অভিনব। সাদা মানুষের সভ্যতা এসে পৌছবার আগেই আদিম অধিবাসীরা রোদে শুকোনো কাঁচা ইট বাড়ী তৈরীর কাজে ব্যবহার করত। এই ইটকে "আদোবে" বলে। বাড়ী এ অঞ্চলে অনেক আছে। এ সব বাড়ীতে চুণ-বালির পরিবর্ত্তে কাদা দিয়ে আস্তর দেওয়া হয়। ইণ্ডিয়ান্ স্থাপত্যের পরে মেক্সিকান গঠনের বাড়ীগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাটির পাঁচীল-ঘেরা উঠোনে নীচু দোতলা বাড়ী। উঠোন থেকে মাটির সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার বারান্দা অবধি। ঘরের সামনে বারান্দা, উপরে ও নীচেও। ঝকঝকে পরিষ্কার উঠোনে গোটা কতক ফুলগাছ। এই সব ছোট ছোট বাড়ীগুলি অধ্যাপকদের বাসা। এ ছাড়া এ ক্যাম্পাসে আছে বহু আধুনিক কংক্রীটের বাড়ী, তবে সেগুলি বেশী উঁচু নয়। বহু সাময়িক অস্থায়ী ঘর আছে—যুদ্ধের সময়কার কাঠের বাড়ী। অতিরিক্ত ছাত্রাবাস হিসাবে এগুলো ব্যবহার হয়; এগুলোতেও central heating প্রভৃতি সুব্যবস্থা

আছে। ভোরের কন্‌কনে ঠাণ্ডা অথচ শুকনো হাওয়ায় এই সব লক্ষ্য করতে করতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোজনাগারে পৌছলাম। আজ থেকে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা এখানে। ক্যাফিটেরিয়া পদ্ধতিতে খাবার দেওয়া হোলো, পরিবেশন করে নয়। লম্বা গলি দিকে ঢুকে এক কাউণ্টারে পয়সা দিয়ে এগোতে লাগলাম। চলতে চলতে আহার্য্য সব মিলল পথের পাশে-পাশে—প্রথমে ট্রে, ন্যাপকিন্ ও কাঁটা-চামচ দিয়ে আরম্ভ। সাধারণ ক্যাফিটেরিয়ার চেয়ে এখানে খরচ অনেক কম অথচ খাদ্য প্রচুর। পেট ভরে খেয়ে আমরা সেখান থেকে বেরোলাম।

নর্থ-ওয়েষ্টার্ণের এক অধ্যাপকের গাড়ীতে আমরা গ্রামে চললাম। গাড়ীতে আমরা ছ'জন ছিলাম। আমি ছাড়া সকলেই নর্থ-ওয়েষ্টার্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই দলটির আরেকটি বিশেষত্ব ছিল—পৃথিবীর নানান্ দেশের লোক জুটেছিলাম আমরা এই গাড়ীতে। গাড়ীর মালিক ডাঃ ব্যাস্কম্ আমেরিকান; দু'টি ছাত্রীর মধ্যে এক জন এসেছেন কিউবা থেকে, এক জন তুরস্ক থেকে। ছাত্র ছিলেন একটি, তাঁর দেশ দক্ষিণ-আমেরিকার চিলিতে। আর আমরা দু'জন ভারতীয়। বেশ একটি আন্তর্জ্জাতিক পরিষৎ।

কাছাকাছি যে গ্রামটিতে আমরা যাব বলে ঠিক করেছিলাম সেটা চল্লিশ মাইল দূরে। তার নাম "সান্তে ফেলিপে" বা সেণ্ট ফিলিপ। নামটি স্পেনীয়; তার কারণ, ইংরাজেরা এদিকে উপনিবেশ স্থাপন করার আগে সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেনীয়রা এ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। তাদের ভাষা ও তাদের ধর্ম্ম দুই-ই এখানে প্রচলিত হয়। রোমান ক্যাথলিক সন্তের নাম গ্রামের নাম রাখা তারই উদাহরণ। রেড্ ইণ্ডিয়ানরা অন্যান্য প্রাচীন উপজাতির (tribal people) মত ভূত-প্রেত, গাছ-পাথর প্রভৃতির পূজা করতো—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় animism. খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করার পরেও এরা এদের প্রাচীন উৎসব-অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগ করেনি। Reservationএ ঢোকবার পথে গ্রামের নাম লেখা সাইনবোর্ড দেখলাম। কাছেই আরেকটা সাইনবোর্ড, দেখা গেল—"মাদক দ্রব্য আনা নিষিদ্ধ"। এরা মদ খেতে অভ্যস্ত নয়, কাজেই মাদক দ্রব্যে এরা সহজে বশীভূত হয়। লোভী ব্যবসায়ীদের তাই লোভ হয় এদের মধ্যে মদ্য বিক্রয় করে লাভবান্ হবার। অনেক কূটচক্রী এদের নেশায় বশীভূত করে জমি-জমা পর্য্যন্ত লিখিয়ে নিয়েছে। তাই সরকার থেকেই জারী করে দেওয়া হয়েছে এদের গ্রামে মদ প্রবেশ নিষেধ। গ্রামের বসতি-স্থলকে ঘিরে বিস্তৃত জমি-জমা রয়েছে, সেখানে চাষবাস ও ঘোড়া চরাবার ব্যবস্থা। সে-সব অতিক্রম করে আমাদের গাড়ী ভিতরে গিয়ে থামলো একটি আদোবের তৈরী গির্জ্জার সামনে। আমরা নেমে তার প্রাঙ্গণে ঢুকলাম। আমাদের দেখে দু'জন লোক এগিয়ে এল; এক জন বৃদ্ধ, অপর জন মধ্যবয়সী। শেষোক্ত জন ইংরাজী বলতে পারে, সেই কথাবার্ত্তা বলল। জানা গেল, বৃদ্ধটি গীর্জ্জার রক্ষক। জন-প্রতি ৫০ সেণ্ট করে দক্ষিণা দিলে আমাদের গীর্জ্জায় ঢুকে দেখবার অনুমতি দেবে। আমরা তাতে সম্মত হলাম। ভিতরটা স্পেনীয় ধরণে সাজানো, তবে খুবই সাদাসিদে সাধারণ। বাড়ীটি মজবুতও নয়। বিশেষতঃ গায়ক দল যে গ্যালারীতে বসে, সেখানে ওঠবার সিঁড়িটি তো একেবারে নড়বড়ে; আমরা তাই বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠলাম।

মন্দিরের ছাদের দুই কোণে দু'টি চূড়া আছে, সেখানে দু'টি প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলোনো: তার একটি এখনো ব্যবহার হয়, অপরটি ফেটে গেছে, আর বাজানো হয় না। কিন্তু সেটা রূপার তৈরী, মূল্যবান্ জিনিস, তাই ওটি এখনো ঝোলানোই আছে। উপর থেকে চারি দিক ভালো করে দেখে আমরা নেমে এলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি বড় তোরণ ছিল, তাতে লেখা—"ফোটো তোলা নিষেধ"। আমাদের মধ্যে এক জনের ফোটো তোলার সখ ছিল, তাঁর ক্যামেরাটি হাতেই ছিল। তিনি ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ফোটো তোলার প্রস্তাব করলেন। বিনা আপত্তিতে ওরা রাজি হোলো। সেই গেটের সামনেই ওরা দাঁড়ালো ওদের রংচঙে কম্বল গুছিয়ে নিয়ে; তাদের মাথার পিছনেই লেখা—ফোটো তোলা নিষেধ। আমরা দু'-এক জন তাই নিয়ে হাসাহাসি করছিলাম কিন্তু ওরা তখন ছবিতে চেহারা উঠবে এই আনন্দেই বিভোর। ছবি ছাপা হলে ওদের পাঠাতে হবে, নাম-ঠিকানা সব নিতে হোলো।

এর পর আমরা গাড়ী করে আরেকটা গ্রামে গেলাম, তার নাম সান্তো দোমিনিগো, ইংরাজীতে বলা যেতে পারে সেণ্ট ডোমিনিগো। এ গ্রামে ঢুকে এক জায়গায় plaza লেখা দেখে গাড়ী থামানো হোলো; সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। মস্ত বড় ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার উঠোনে রংচঙে অদ্ভুত পোষাক পরে, মাথায় ও হাতে গাছের পাতা-ফুল-ইত্যাদি নিয়ে দলে দলে মেয়ে-পুরুষ ও শিশু নাচছে। আমরা গাড়ী থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম। শুনলাম, আজ ওদের শস্য-উৎসব; হয়তো আমাদের নবান্ন ধরণের কিছু। কিছুক্ষণ একমনে নাচ দেখার পর ক্রমে চারি দিক লক্ষ্য করলাম। রেড্ ইণ্ডিয়ান্ গ্রামের গঠনটি বেশ। মাঝখানে বড় একটি চত্বর, তাকে ঘিরে চারি পাশে সারি সারি বাড়ী—সব ঐ কাঁচা ইটের। গ্রাম যত বড়, মাঝের চত্বরটিও ততই বড় হবে। ঐ চত্বরের এক পাশে একটি গোলাকার বাড়ী, তার কোনো জানলা-দরজা নেই, কেবল একটি সিঁড়ি উঠেছে ছাদ অবধি, ছাদে উঠে নীচে নেমে ভিতরে ঢুকতে হয়। এটাকে এরা Kiva বলে। একে পুরুষদের সভাগৃহ বলা যেতে পারে,—মেয়েদের এখানে প্রবেশাধিকার নেই। রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি আছে, যথা—, পুরেব্লো, হোপি, নাভাহো, ইত্যাদি। এই অঞ্চলের বাসিন্দারা নাভাহো জাতীয়। এই সব বিভিন্ন জাতি-গুলির মধ্যে আচার-ব্যবহার ও ভাষার পার্থক্য আছে। Kivaর পাশে এক দল লোক জড়ো হয়ে ঢাকের তালে তালে একটানা সুরে গান গেয়ে চলেছে; তাদের সামনে সমস্ত প্রাঙ্গণটি জুড়ে নাচের দল। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, ছোট ছোট শিশুরা অবধি সবাই নাচে যোগ দিয়েছে। এদের মেয়ে পুরুষের পোষাক এক রকমের—গোড়ালীর উপর পর্য্যন্ত ঢিলে পাজামা, তার উপর এক জামা, হাঁটু অবধি তার ঝুল। আজ উৎসবের দিনে সবাই ভালো পরিষ্কার পোষাক পরেছে; তা ছাড়া পরেছে নানা রঙের পুঁতির, কড়ির ও হাড়ের মালা অনেকগুলো করে। মাথায় বড় বড় পাতা গোঁজা, হাতেও বড় বড় ঝাউয়ের ডাল। পুরুষদের শরীরের উর্দ্ধাংশ অনাবৃত, তাতে খয়েরের রসের মত কি এক রকম রসের প্রলেপ দিয়ে চিত্র-বিচিত্র করা হয়েছে। তার উপর পৈতার মত করে পরেছে অসংখ্য কড়ির

ও হাড়ের মালা। কোমরে পাজামার উপর লুঙ্গির মত করে পরেছে এক খণ্ড রঙিন্ কাপড় হাঁটু অবধি। তার উপরে জমকালো কোমর-বন্ধ। পুরুষদের নাচ অতি-তাণ্ডব। নাচের তালে তালে তারা প্রাণপণে লাফাচ্ছে এবং লম্ফের সঙ্গে সঙ্গে কড়ির মালা বাজছে ঝম্ ঝম্ ঝম্। মেয়েরা নাচছে ধীরে ধীরে, তালে তালে পা ফেলে। শিশুদের মধ্যে যারা খুব ছোট তারা শুধুই চলে বেড়াচ্ছে। নাচের তাল খুবই সরল, কাজেই একঘেয়ে। এই নাচ দীর্ঘকাল চলতে থাকল। আমি এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। দেখলাম, ছু'পাশের বাড়ীগুলির রোয়াকে ও ছাদে অনেক লোক বসে নাচ দেখছে, তাদের কারো কারো পরনে আধুনিক পাশ্চাত্য পোষাক। তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত কম বয়সের তারা ভাঙা ভাঙা ইংরাজী বলতে পারে; প্রাচীনেরা নিজেদের ভাষা ছাড়া স্পেনীয় ভাষা বলতে জানে। নাচের একটি বিরতির সময়ে একটি যুবক এসে আমাদের "সেলাম আলায়কুম" বলে অভিবাদন করল। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ অভিবাদন কোথায় শিখেছে সে। বলল যে, যুদ্ধে যোগ দিয়ে সৈন্যদলের সঙ্গে ভারতে গিয়েছিল, সেখানে শিখেছে। আমাদের অনুরোধে সে গ্রামের বৃদ্ধ মোড়লের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল; সে বৃদ্ধ কিন্তু আমাদের ইণ্ডিয়ান্ বলে মানতে মোটেই রাজি নয়। বলল, "ইণ্ডিয়ান্ যদি তো মুখে দাঁড়ি-গোঁফের চিহ্ন কেন?" রেড্ ইণ্ডিয়ান্ পুরুষদের মুখ মেয়েদের মতই মসৃণ হয়; দাড়ি-গোঁফের চিহ্ন থাকে না। যাক্, আবার নাচ সুরু হোলো। আমরা কিন্তু তখন সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

বেলা তখন ছু'টো। জঠরে অগ্নিদেবের দহনলীলা আরম্ভ হয়েছে; অথচ লোকালয় থেকে আমরা বহু দূরে। এ দেশে লোকালয়ে বা তার আশে-পাশে কখনো ক্ষুধার্ত্ত থাকতে হয় না; ছু'-চার পা পরে পরেই আর কিছু না হোক্ Drug Store আছে, আর সেখানে মোটামুটি রকম খাদ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে এই জনহীন প্রান্তরে দোকান কোথায়? এদিক-ওদিক করে মাইল কতক যাবার পরে একটা গ্রামের দোকান দেখা গেল; আমরা সেখানে নামলাম। সামান্য কিছু খাদ্য ও পানীয় সেখানে মিলল,—বিস্কুট, ভুট্টার খই, আর বোতলে-করা কমলা লেবুর সরবৎ। তাই খেয়ে ক্ষুধাটা চাপা দেওয়া গেল। তখন বেলা পড়ে এসেছে। তার পর যখন আমরা নানা ছোট-ছোট পাহাড়ের আশ-পাশ দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে অনেক মাইল গিয়ে সহরে পৌছলাম তখন শীতের সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

এর পর ছু'দিন ধরে নৃতাত্বিক সমিতির অধিবেশন। অধিবেশনে বহু খ্যাতনামা নৃতাত্বিক ও সমাজতাত্বিকদের দেখলাম ও তাঁদের বক্তৃতা শুনলাম। কারো কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়েরও সুযোগ ঘটলো। বক্তৃতার অনেকগুলোই ছিল বৈজ্ঞানিক ধরণের, আবার অনেকগুলি বেশ সাধারণের বোধগম্য হয়েছিল। ভারতীয় অধ্যাপকের বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারতের সমাজতাত্বিক ক্রম-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে। সেটা ভালই বুঝলাম। অধিবেশনের প্রথম দিনে আমরা সারা দিনই সভাতে রইলাম। কিন্তু অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে আবার আমরা গ্রামে বেড়াতে গেলাম আরেক দম্পতীর আমন্ত্রণে তাঁদের গাড়ীতে। এঁরা স্বামি-স্ত্রী ছু'জনেই নৃতত্বের ছাত্র, খুব অল্পবয়সী; কিন্তু খুব গম্ভীর প্রকৃতির। সারাক্ষণই এঁরা কোনো না কোনো গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তুরস্কের মেয়েটি ও চিলির ছেলেটি আজও আমাদের সঙ্গেই ছিল; তাদের কাছে তাদের দেশের গল্প অনেক শুনলাম।

চিলির অধিবাসীরা স্পেনীয় বংশ-সম্ভূত ও রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। তারা অ্যামেরিকানদের মত জীবনটাকে অত লঘু ভাবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত নয়। ওদের ছেলেমেয়েদের মেলামেশাও এত অবাধ নয়, কাজেই আমাদের মত ওরাও অ্যামেরিকানদের চপল মেলামেশাটা উচ্ছৃঙ্খলতার পর্য্যায়েই ফেলে। তাদের দেশে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে, খেলাধূলো করে, বেড়ায়, কিন্তু তার মধ্যে সব সময়েই এক জায়গায় দাঁড়ি টানা থাকে। ক্যাথলিক ধর্ম্মানুসারে বিবাহের বন্ধনও তাদের কাছে দৃঢ়তর। দক্ষিণ-আফ্রিকার কোন দেশেই যুক্তরাষ্ট্রের মত অতি আধুনিকতার ঢেউ লাগেনি। ব্রাজিলে না কি এখনো বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েরা অভিভাবকহীন হয়ে বেড়াতে পারে না; ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে মেশামেশিও নিন্দনীয়।

এবার একটু তুরস্কের গল্প করি। কামাল পাশার সমাজ-সংস্কারের ঢেউ পৌছায়নি এমন প্রত্যন্ত প্রদেশও এখনো কিছু-কিছু আছে শুনলাম। সে-সব অঞ্চলে মেয়েরা এখনো সালোয়ার-কামিজ-ওড়না ব্যবহার করে, এবং আধুনিক পাশ্চাত্য-পোষাক-পরা সহরের মেয়েদের যে নামে তারা অভিহিত করে তার অর্থ "বিদেশী"। আমার বিমানযাত্রার পথে ইস্তাম্বুলের হাওয়াই বন্দরে ঘণ্টা খানেক কাটিয়েছিলাম সে কথা আগে উল্লেখ করেছি। বাসে করে সহরের ভিতরকার রেঁস্তোরায় গিয়ে প্রাতরাশ খেয়েছিলাম। তখন সবে মাত্র প্রভাত হচ্ছে, পথে জন-মানব দেখিনি। জনশূন্য পথের দৃশ্য ভালই লেগেছিল। আর যে ছু'-চারটি লোক দেখেছিলাম তাদের নজর করেই দেখেছিলাম। দেহের বর্ণ ও পোষাক তাদের "সাদা" মানুষের মতই; প্রভেদ ছিল চুলের ও চোখের রঙে। এ দেশের যৌবন উগ্র, শক্তিমদে চপল; প্রাচ্যের যৌবন কান্তিময় স্নিগ্ধ। এ দেশের বার্দ্ধক্য আবার সাধারণতই মলিন ও দীন হয়; প্রাচ্যের বার্দ্ধক্যের সৌম্য-গম্ভীর ভাব তাতে বড় থাকে না। প্রৌঢ়া নারী আমাদের দেশে মাতৃত্বের মহিমায় মণ্ডিত; এ দেশে যৌবনকে ধরে রাখার চপল প্রচেষ্টায় প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য্য হয় ক্ষুণ্ণ। অবশ্য মাতৃভাবময়ী নারীও এ দেশে দেখেছি, কিন্তু তাঁরা প্রৌঢ়ত্বের সীমা ছাড়িয়ে বার্দ্ধক্যে পৌছে গেছেন। যাক্, ছু'-তিন দিন এই ছু'টি তরুণ-তরুণীর সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গেও তাদের দেখে তাদের দেশ সম্বন্ধে আমি মোটামুটি একটি ধারণা করে নিলাম।

আমরা যেদিন অ্যাল্‌বুকার্কিতে পৌছেছিলাম সেদিন বড় সুন্দর রৌদ্রোজ্জ্বল দিন ছিল; আকাশ ছিল নীল, রাত্রিতে জ্যোৎস্না-ধৌত প্রায় ৫০০০ ফুট উঁচুতে এই সহর অবস্থিত, সুতরাং ঠাণ্ডাও কম ছিল না। কিন্তু সে ছিল শুকনো ঝর্‌ঝরে ঠাণ্ডা। বরফ পড়তো কিন্তু সে বরফ কেমন সাদা বালির মত জমে থাকৃত ছায়া-শীতল স্থানে, সে কথার উল্লেখ আগে করেছি। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। বিস্তীর্ণ প্রান্তর সমতল নয়, ঢেউ-খেলানো। মাঝে মাঝে Maces বলে এক রকম পাহাড় আছে। রিক্ত, ধূসর এর রং, আর লম্বা প্রাচীরের মত এর গড়ন—উপরিভাগ সমান, যেন কোনো দৈত্য চেঁছে ফেলে দিয়েছে। Rio Graude বলে একটা

বড় নদী এই অঞ্চলে প্রবাহিত; সে'ও এই Macesএর ফাঁকে ফাঁকে বয়ে গেছে।

অধিবেশনের তৃতীয় দিনে আমাদের আরেকটা নূতন জায়গা দেখার সুযোগ ঘটেছিল। অ্যাল্‌বুকার্কি থেকে ৬০ মাইল দূরে "সান্তা ফে" বলে একটি সহর আছে; এই অঞ্চলের প্রাচীনতম সহর এটি। পাহাড়ের উপরে এই সহর, উচ্চতা ৮০০০ ফুট। স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত মহিলা অধিবেশনে সমাগত সকলকে দুপুরের আহারের নিমন্ত্রণ করেছিলেন সেদিন। আহারের সময় ছিল বেলা ১টা। প্রাতরাশের পরে আমরা গতকালের সেই অল্পবয়স্ক দম্পতীর—তাদের নাম Thurston—গাড়ীতে রওনা হলাম। সুন্দর মসৃণ রাস্তা, যেন তেল-ঢালা; অসমতল হওয়া সত্ত্বেও গাড়ীতে এতটুকু ঝাঁকুনী লাগে না। দিনটা ছিল একটু মেঘলা ধরণের। পথে এক জায়গায় নেমে আমরা চারি দিকের দৃশ্য উপভোগ করলাম—সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়াও। একটা বড় পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের একটি গ্রুপ-ফোটো তোলা হোলো। সান্তা ফে-তে আমরা পৌছলাম বেলা ১১টায়; তখন টিপ-টিপ করে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। আমাদের হাতে দু'ঘণ্টা সময় রয়েছে তাই আমরা সহরটি ঘুরে দেখতে গেলাম। অ্যামেরিকার সব চেয়ে পুরানো গীর্জ্জা এই সহরে আছে। একটি নির্জ্জন জায়গায় এক টিলার উপরে প্রকাণ্ড এক আদোবের তৈরী গীর্জ্জা দেখলাম; সেটি না কি সব চেয়ে বড় আদোবের দালান। অ্যামেরিকার সব চেয়ে পুরোনো বাড়ী না কি এই সহরেরই এক পল্লীতে; খুঁজে খুঁজে সেটিকেও বের করা হোলো। তার পর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এখানকার সব চেয়ে বড় হোটেলে গেলাম। নাম তার লা-ফন্দা (La Fonda); ভিতরে সব স্প্যানিশ ধরণে সাজানো—খাবার টেবিল পর্য্যন্ত। খাবার-ঘরের এক কোণে উঁচু মঞ্চের উপর বাদক দল যন্ত্র নিয়ে বসেছিল। খাওয়া আরম্ভ হতে তাদের বাজনা আরম্ভ হোলো—মাঝে মাঝে গানও হতে লাগল। কালো চুল-চোখওয়ালা মেয়েরা আগুলফ-লম্বিত বিস্তৃত-ঘের-ওয়ালা পোষাক পরে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করতে লাগল। বেশ লাগছিল, মনে হচ্ছিল এ যেন আরেক রাজ্য।

খাওয়ার পরে আমরা সেখানকার মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। প্রধানতঃ এই অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত নানা রকম জিনিস এখানে রয়েছে। সন্ধ্যার সময়ে ফেরবার জন্য রওনা হলাম। বেরিয়েই দেখা গেল বরফ পড়া সুরু হয়েছে। বরফের ধারার মধ্যে দিয়ে সামনের পথ দেখা যায় না; গাড়ীর চালকদের খুব বেগ পেতে হোলো। থার্স্টন্-দম্পতী পালা করে গাড়ী চালাচ্ছিলেন। যাবার সময়ে যে পথ আমরা এক ঘণ্টায় অতিক্রম করেছিলাম, ফেরবার সময়ে সেখানে আড়াই ঘণ্টা লাগলো।

পরদিন সকালে উঠে দেখি Nex Mexico University Compus বরফে সাদা হয়ে গেছে। সেদিন সকাল ১০টায় আমাদের শিকাগো ফেরবার ট্রেণ। তাই ভোরেই বাক্স গুছিয়ে নিয়ে প্রাতরাশ খেতে বেরোলাম। জুতো-মোজার উপরে গলোশ পরা ছিল,—ঝুরো বরফের মধ্যে পায়ের পাতা সবটা এবং হাঁটুর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল। খুব আমোদ হচ্ছিল হাঁটতে। খাবার-ঘরে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টেলিফোনে ট্যাক্সী ডেকে আমরা ষ্টেশনে এলাম—আগাগোড়া সবই বরফে-ঢাকা। দক্ষিণ-পশ্চিমে যাবার সময়ে আমরা যে পথে গিয়েছিলাম, এবার অন্য পথে ফিরছি। Texas, Oklahama, Kansas, Missourie এই ক'টা রাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে আসতে হোলো। Texasএর cowboyদের দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর গল্প পড়েছিলাম। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দু'জন কাউবয় আমাদের কামরাতেই উঠল। এক অ্যামেরিকান্ বন্ধু চিনিয়ে দিলেন তাদের কাউবয় বলে। বড়োসড়ো চেহারা, রোদে-পোড়া রং, ঢিলে পোষাক, মাথায় বিশেষ রকমের কাউবয় হ্যাট; এইটুকুই তাদের চেহারায় বিশেষত্ব।

Texas, Oklahama ও Kansas এই তিন রাষ্ট্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আমাদের ট্রেণে লাউঞ্জ কারে সংশ্লিষ্ট বার আছে, সেখানে মদ্যপদের ভীড় লেগেই থাকে। কিন্তু যতক্ষণ গাড়ী এই তিন রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে চলে ততক্ষণ মদ বিক্রী বন্ধ থাকে। আমরা বেলা দশটার ট্রেণে উঠেছিলাম; সন্ধ্যার পর কখন যেন গাড়ী এই "শুষ্ক" প্রদেশে প্রবেশ করে—পরদিন সকাল ৮টা নাগাদ এর সীমা অতিক্রম করবার কথা। কিন্তু রাত পোহাতে দেখা গেল যে, সারা রাত বরফের ঝড় হওয়াতে গাড়ী খুব অল্পই এগোতে পেরেছে। শুষ্ক প্রদেশ পার হতে বেলা গড়িয়ে গেল। বেচারা মদ্যপায়ীদের কি রকম কষ্ট হয়েছিল তা বুঝতে পারা যায় পরের ব্যাপার দেখে। বিকালের দিকে হঠাৎ এক সময়ে বারের নিগ্রো "বয়" গানের সুরে "অ্যাল্কোহল, অ্যাল্কোহল" আবৃত্তি করতে করতে চলে গেল; তার পরেই দেখি কামরা প্রায় খালি করে সবাই গলা ভেজাতে গেছে। মজা দেখে আমরা হাসতে লাগলাম।

ঝড়ের জন্য আমাদের ট্রেণের গতি খুবই ব্যাহত হোলো। টেলিগ্রাফের পোষ্ট তার সব ঝড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, পথের খবর তাই পাওয়া যাচ্ছিল না। বরফের ঝড়ে সামনে মাত্র কয়েক হাত দেখা যায়; কাজেই অতি মন্থর গতিতে ট্রেণ চলছিল। দিনের বেলা এক সময়ে লক্ষ্য করলাম যে, তিন ঘণ্টায় মাত্র ত্রিশ মাইল এগিয়েছি। কাজেই যেখানে বিকাল সাড়ে তিনটায় শিকাগো পৌছবার কথা ছিল, সেখানে রাত দশটায় পৌছলাম।

[ক্রমশঃ।

"যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল যুদ্ধ মিটলেই অকল্যাণ মিটবে। যখন মিটল তখন দেখা গেল, ঘুরে-ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মুখোস প'রে।"

—রবীন্দ্রনাথ

একটি সত্য ঘটনামূলক গোয়েন্দা কাহিনী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এপারে ক্যাম্‌ডেন, ওপারে ফিলাডেল্‌ফিয়া এবং দুই সহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যায় ডেলীওয়ার নদী। নদী পার হয়ে অপরাধীরা দুই সহরে গিয়েই উৎপাত করে এবং নদী পার হয়ে গোয়েন্দাদেরও দুই সহরে গিয়েই কাজ করতে হয়।

কিন্তু ফিলাডেল্‌ফিয়ায় এ পর্য্যন্ত রাত আটটার চোরেদের কোন উপদ্রব হয়নি। তার বদলে ঘটতে লাগল অন্য রকম ঘটনা।

আদালতে যেদিন অ্যাণ্ডি ক্লিংয়ের মামলা, ঠিক সেই তারিখেই ফিলাডেল্‌ফিয়ার ডাক্তার গ্রুয়েস্ যখন নিজের ডিস্‌পেন্সারিতে ব'সে আছেন, তখন দু'জন লোক এসে তাঁর কাছে সর্দ্দি-কাশির ঔষধ চাইলে।

ডাক্তার গ্রুয়েস্ তার সঙ্গে কথা কইছেন, হঠাৎ একটা লোক রিভলভার বার ক'রে বললে, "তোমার কাছে টাকাকড়ি কি আছে দাও!"

ডাক্তার বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের ব্যাগটা (তার ভিতরে দুই শো টাকা ছিল) বার ক'রে দিলেন। তবু অকারণেই তারা তাঁকে রিভলভারের দ্বারা নির্দ্দয় ভাবে প্রহার না ক'রে অদৃশ্য হ'ল না।

পুলিস ভাবলে, স্থানীয় অপরাধীর কীর্ত্তি।

আবার দুই হপ্তা পরে ঠিক ঐ ভাবেই নিজের ডিস্‌পেন্সারিতে ব'সেই আক্রান্ত ও প্রহৃত হলেন ডাক্তার আর্ভিং রোসেনবার্গ। চোরেরা তাঁর কাছ থেকে হস্তগত করলে এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা।

গোয়েন্দারা বললেন, "একই দলের কীর্ত্তি।"

দুই হপ্তা পরে স্থানান্তরে আবার সেই কাণ্ড। এবারে ষ্টান্‌লি বক্ নামে আর এক ডাক্তারের পালা।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আবির্ভূত হয়েছিল দু'জন ক'রে লোক এবং প্রত্যেক ডাক্তারের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল তাদের চেহারার বর্ণনা। কিন্তু পুলিস তবু কোন অপরাধীরই নাগাল পেলে না।

এদিকে অ্যাণ্ডি ক্লিং যখন বাস করছে ক্যাম্‌ডেনের জেলখানায়, তখনও বন্ধ হ'ল না রাত আটটার চুরিগুলো।

সত্যি কথা বলতে কি, আদালতে যেদিন উঠল অ্যাণ্ডি ক্লিংয়ের মামলা, ঠিক সেইদিনই রাত আটটার সময়ে চোরের দল হানা দিলে কলিংসউডের একখানা বাড়ীতে এবং যাবার সময়ে পিছনে রেখে গেল নিজেদের বিখ্যাত 'ট্রেডমার্ক': সেই ভাঙা জানালা, সেই সদর দরজায় চাপানো ভারি ভারি আসবাব, সেই খোলা খিড়কীর দরজা।

কন্‌লি বললেন, "কিছুই বুঝতে পারছি না, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মর্গ্যান বললেন, "ক্লিংয়ের রাহাজানির সঙ্গে এই রাত আটটার চুরির কোন সম্পর্ক নেই।"

কন্‌লি বললেন, "ক্লিং ধরা পড়বার পরও তার জুড়িদার রাত আটটার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, এও হ'তে পারে তো?"

মর্গ্যান বললেন, "তাতে আর আমাদের কি সুরাহা হবে? ক্লিং তো তার জুড়িদারের নাম আমাদের কাছে ফাঁস ক'রে দেবে না?"

এদিকে চুরির পর চুরি, ওদিকে ডাক্তারের পর ডাক্তারের উপরে আক্রমণ! দুই কাণ্ডই চলতে লাগল একসঙ্গে। এই দুই ব্যাপারের মধ্যে যে কোন যোগাযোগ আছে, এমন সন্দেহ পুলিসের মনে ঠাঁই পেলে না। কাগজওয়ালারা ক্ষাপ্পা হয়ে উঠল। কিন্তু পুলিস নাচার।

ডাক্তার হোরেসিয়ো ক্যাম্পবেল ডিসপেন্সারিতে উপবিষ্ট। বাহির থেকে দরজায় করাঘাত হ'ল। তিনি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে দেখলেন, তিন জন লোক বাইরের বেঞ্চির উপরে পাশাপাশি ব'সে আছে।

এক জন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "বড়ই ঠাণ্ডা লেগেছে ডাক্তার! ওষুট-টষুধ দিতে পারেন?"

ডাক্তার ক্যাম্পবেলের বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। ডাক্তারদের উপরে আক্রমণের কাহিনী তাঁর জানতে বাকি নেই। আততায়ীদের চেহারার বর্ণনাও তিনি খবরের কাগজে পাঠ করেছেন। তিন জনের মধ্যে দুই জনের চেহারা সেই বর্ণনার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়!

কোন রকমে বুকের কাঁপুনি থামিয়ে শান্ত ভাবেই তিনি বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

ঘরের ভিতরে ফিরে এসেই তিনি ধারণ করলেন টেলিফোন-যন্ত্র। তার পরেই থানার লোক পেলে তাঁর বিপদের খবর।

তার পর কাটল এক মিনিট···দুই মিনিট···তিন মিনিট। প্রত্যেকটা মিনিট কি সুদীর্ঘ! প্রত্যেক মিনিটেই ডাক্তারের ভয় হয়, এই বুঝি ডাকাতের দল হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে রিভলভার হাতে ক'রে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে! চার মিনিট······ পাঁচ মিনিট!

অবশেষে ঘরের বাইরে শোনা গেল কাদের কর্ত্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। ডাক্তার বাইরে এসে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দুই জন পুলিস-কর্ম্মচারী।

পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল তিন জন সন্দেহজনক আগন্তুকের মধ্যে দুই জন হচ্ছে সহোদর—নাম ওয়াল্টার ও ডানিয়েল গ্রেনন। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে তাদের শ্যালক, নাম ওয়াল্টার থ্যাম্‌সন।

গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এখানে কি করতে এসেছ?"

—"থ্যাম্‌সনের ঠাণ্ডা লেগেছে। আমরা ওষুধ নিতে এসেছি।"

গোয়েন্দারা বললেন, "থ্যাম্‌সনের ঠাণ্ডা লাগার কোন লক্ষণই তো দেখতে পাচ্ছি না।"

থ্যামসন বললে, "ঠাণ্ডা লেগেছে আমার বুকের ভিতরে।

আপনারা তা যদি দেখতে না পান, সে জন্যে তো আমি দায়ী নই!"

—"বেশ, থানায় চল।"

যে তিন জন ডাক্তার আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুই জনের পাত্তা পাওয়া গেল। ডাক্তার বক্ কিছুক্ষণ লোক তিন জনের দিকে তাকিয়ে ওয়াল্টার গ্লেননকে সনাক্ত করলেন। এবং ওয়াল্টার থ্যাম্‌সন সম্বন্ধে বললেন, ওকেও দ্বিতীয় ব্যক্তির মত দেখতে বটে, কিন্তু আমি হলপ ক'রে কিছু বলতে পারব না।"

ডাক্তার রোসেন্‌বার্গও ওয়াল্টার গ্লেননকে সনাক্ত করলেন। এবং ডানিয়েল গ্লেনন সম্বন্ধে বললেন, "ওর সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তির মিল আছে ব'লেই মনে হচ্ছে।"

তিন জন আসামীই প্রবল প্রতিবাদ ক'রে জানালে, তারা সম্পূর্ণরূপেই নিরপরাধ এবং ঐ দুই জন ডাক্তারকে জীবনে তারা কখনো চোখেও দেখেনি।

তাদের উপরে বিনা জামিনে হাজত বাসের হুকুম হ'ল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফিলাডেল্‌ফিয়ার ওয়াল্টার গ্লেনন ক্রমাগত প্রতিবাদ করছে—"আমি নিরপরাধ! ডাক্তারদের আমি আক্রমণ করিনি!"

ক্যামডেনের অ্যাণ্ডি ক্লিংয়ের মুখেও ঐ একই কথা: "আমি নিরপরাধ! মিঃ ব্রাউনের উপরে আমি হানা দিইনি!"

অথচ আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের দু'জনকেই নিশ্চিতরূপে সনাক্ত করতে পেরেছেন।

এদিকে সাড়ে আটটার চোরের দল নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে পরিপূর্ণ উৎসাহে!

অবশেষে!

অবশেষে ক্যামডেনের মিসেস্ ক্যাথারাইন অ্যাণ্টনের কাছ থেকে টেলিফোনে থানায় খবর এল, তাঁর প্রতিবেশীর এক শিশুপুত্র একটি বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছে, তার মধ্যে আছে বন্দুক, জড়োয়া গয়না, ঘড়ী ও আরো হরেক রকম দামী জিনিষ।

কনলি তখনই যথাস্থানে গিয়ে হাজির হ'তে দেরি করলেন না। শিশুর নাম ফ্রেডি ডস্, বয়স সাত বৎসর। সে একটা নয়, পেয়েছে তিন তিনটে বাক্স।

একটা বাক্স খুলে দেখা গেল, তার ভিতরে রয়েছে অনেক ঘড়ী, ফাউণ্টেন পেন, রূপোর বাসন, আংটি, হীরকখচিত সোনার গয়না, একটা রিভলভার ও কতকগুলো কার্তুজ—

কনলির বুকের ভিতরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রক্তস্রোত! বিপুল আগ্রহে অন্য বাক্স দু'টোও তিনি খুলে ফেললেন তাড়াতাড়ি। সে দু'টো বাক্সও ঐ রকম সব দামী জিনিষে ঠাসা!

এ যে রাজার ঐশ্বর্য্য!

দু'-একখানা গয়না পরীক্ষা ক'রেই বোঝা গেল, সেগুলো হয়েছিল রাত আটটার চোরের দলের করতলগত!

এ যে স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য!

শিশুর দিকে ফিরে কনলি শুধোলেন, "খোকা বাবু, এগুলো তুমি কোথায় পেয়েছ?"

—"নদীর ধারে খুব ভোর বেলায় খেলা করতে গিয়েছিলুম। সেইখানে ছুটোছুটি খেলা করতে করতে আমি আর একটু হ'লেই বাক্সগুলোর উপরে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলুম আর কি!"

—"তুমি বাক্সগুলো খুলে দেখেছিলে?"

—"তা আবার দেখিনি? আমি ভেবেছিলুম এগুলো হচ্ছে বোম্বেটেদের গুপ্তধন!"

—"তার পরই তুমি সোজা বাড়ীতে ফিরে এলে বুঝি?"

—"উঁহু। আমার যে সব বন্ধু বাক্সগুলোকে বাড়ীতে তুলে আনবার জন্যে সাহায্য করতে চাইলে, বাক্সের কোন কোন জিনিষ নিয়ে আগে তাদের কিছু কিছু উপহার দিয়েছিলুম।

—"কি কি জিনিষ বাছা?"

—"অত কি ছাই আমার মনে আছে? যে যা চাইলে, তাই!"

ফ্রেডি ডসের মায়ের দিকে ফিরে কনলি বললেন, "আপনি পেয়েছেন এক আশ্চর্য্য সৎপুত্র। বেশীর ভাগ ছেলেই এ-রকম কিছু পেলে আর কারুর কাছে সে কথা প্রকাশ করত না।"

থানায় যখন বাক্স তিনটে নিয়ে আসা হ'ল, সবাই তখন চরম বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্!

মর্গ্যান বললেন, "এত ঐশ্বর্য্য নদীর ধারে পরিত্যক্ত হ'ল কেন? যে এমন কাণ্ড করেছে, তাকে আমরা খুঁজে বার করব কোন্ উপায়ে?"

কনলি বললেন, "আমিও ও-কথা ভেবে দেখেছি। আমার কি সন্দেহ হয় জানো? ক্লিং ধরা পড়াতে তার জুড়িদার ভয় পেয়ে এই কার্য্য করেছে।"

—"জিনিষগুলো ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক, নতুন কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না।"

রাত আটটার চোরের দল যেখান থেকে যে-সব জিনিষ চুরি ক'রেছিল, পুলিসের কাছেই ছিল তার সুদীর্ঘ তালিকা।

পরীক্ষা-কার্য্য যখন চলছে, সেই সময়ে মর্গ্যান বাক্স হাংড়ে বার করলেন একটা নকল চামড়ার ব্যাগ। একখানা 'ট্রলি'-হস্তান্তর-পত্র ছাড়া তার ভিতরে আর কিছুই ছিল না।

মর্গ্যান বললেন, "এই ব্যাগের উপরে সম্ভবত কারুর নামের দু'টো আদ্য অক্ষর লেখা আছে—ডি, এল। এ-রকম ব্যাগ তো ছোক্‌রারাই ব্যবহার করে। এর মানে কি?"

—"হ্যাঁ, এ ছোক্‌রাদের উপযোগী ব্যাগই বটে।"

—"এমন এক ছোক্‌রা, যার নামের দু'টো আদ্য অক্ষর হচ্ছে ডি, এল। যদিও তা হয়তো সম্ভবপর নয়, তবু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।"

—"কি কথা?"

—"একটু আগেই গ্লসেষ্টারের থানা থেকে ফোন্ এসেছিল, ডেভিড টিঙ্গো নামে এক ছোক্‌রার খবরাখবর নেবার জন্যে। সে-ও না কি তার একটা চামড়ার ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছে। ডি, এল তো ডেভিড টিঙ্গোরও নামের আদ্য অক্ষর হ'তে পারে।"

কনলি তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হয়ে বললেন, "চল, সেখানেই যাই।"

তার আধ ঘণ্টা পরেই গ্লসেষ্টারের থানায় গিয়ে মর্গ্যান ও কনলির সঙ্গে ডেভিড টিঙ্গোর যে-সব কথাবার্ত্তা হ'ল, আমরা তা বর্ণনা করেছি এই আখ্যায়িকার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই।

তবু এখানে একটু খেই ধরিয়ে দেওয়া দরকার।

টিঙ্গো স্বীকার করলে ব্যাগটা তারই। তিন দিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল।

গোয়েন্দারা তাকে সেই ব্যাগের ভিতরে 'ট্রলি'-হস্তান্তর-পত্রখানাও দেখালেন। প্রথমটা সেখানাও সে নিজের ব'লে মেনে নিলে। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই রক্তহীন হয়ে গেল তার মুখ। সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "না, না, ওখানা আমার নয়! আমি কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি! আপনারা আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছেন।"

হস্তান্তর-পত্রের উপরে ছিল গতকল্যকার তারিখ। অথচ টিঙ্গো বলে তার ব্যাগ খোয়া গেছে তিন দিন আগে! তার মানে, গত-কল্যও এই ব্যাগটা ছিল তার কাছেই!

কেন সে এই মিথ্যা কথাটা বললে? পুলিসের সন্দেহ হ'ল জাগ্রত। ডেভিড টিঙ্গোকে নিয়ে গোয়েন্দারা গেলেন তার বাড়ীতে। তার বাবা তখন কর্ম্মস্থলে গিয়েছেন। বাড়ীতে ছিলেন কেবল তার মা।

তাদের বাসা খানাতল্লাস ক'রে সন্দেহজনক বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না, কেবল একটা রিভলভার ছাড়া। সেটা বেলজিয়ামে প্রস্তুত এবং লুকানো ছিল ডেভিড টিঙ্গোর শোবার ঘরের বিছানার তলায়।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, রিভলভারটা কোথা থেকে সে পেয়েছে?

সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললে, "রাস্তায় একখানা আরোহীহীন মোটর গাড়ী দাঁড় করানো ছিল, ওটা প'ড়েছিল তারই পিছনের আসনে। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে একটা রিভলভার পাবার ইচ্ছা প্রবল ছিল। তাই লোভ সামলাতে পারলুম না। রিভলভারটা চুপি-চুপি তুলে নিয়ে স'রে পড়লুম। তার আগে জীবনে আর কোন দিন আমি চুরি করিনি।"

তার কাছ থেকে আর কোন তথ্য উদ্ধার করা গেল না।

রাত আটটার চোরের দল এ-পর্য্যন্ত যাঁদের বাড়ীর উপরে হানা দিয়েছিল তাঁদের প্রত্যেকেই থানায় আহ্বান করা হ'ল, তিনটে বাক্সে পাওয়া চোরাই মালগুলো সনাক্ত করবার জন্যে।

সেই বেলজিয়মে প্রস্তুত রিভলভারটা দেখেই জনৈক মহিলা বললেন, "ওটা আমাদের সম্পত্তি। চোরেরা আমাদের বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু রিভলভারের 'ক্লিপ'টা তাড়াতাড়িতে বা ভুল ক'রে নিয়ে যেতে পারেনি, এখনো আমাদের বাড়ীতেই প'ড়ে আছে।"

তৎক্ষণাৎ 'ক্লিপ'টা আনিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, রিভলভারের সঙ্গে তা খাপ, খেয়ে যায় যথাযথ ভাবেই।

কন্‌লি বললেন, "টিঙ্গো, রিভলভারটা তাহ'লে তুমি কোন মোটরগাড়ী থেকে চুরি করনি। তুমি যে রাত আটটার চোরেদেরই এক জন, এইবারে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। তুমি কি এখনো মিথ্যা কথা বলতে চাও?"

না, ডেভিড টিঙ্গো আর মিথ্যা কথা বলতে চায় না। কিন্তু সে যে-সব আজব কথা বললে, তা শ্রবণ ক'রে গোয়েন্দাদের চিত্ত একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেল।

রাত আটটার চুরিতে তার জুড়িদার ছিল না অ্যাণ্ডি ক্লিং। টিঙ্গোর একমাত্র জুড়িদার হচ্ছে তার পিতা স্বয়ং!

সে বললে, "বাবা রোজ রাত্রে চুরি করবার জন্যে আমাকে জোর ক'রে সঙ্গে নিয়ে যেতেন, আমাকে তাঁর সঙ্গী হ'তে হ'ত ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। তাই রাত্রে প্রায়ই আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতুম। যেদিন আপনারা প্রথম আমাকে থানায় নিয়ে আসেন, সেদিনও আমি বাবার ভয়ে রাত্রে রাস্তায় মোটরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলুম।"

সেই রাত্রেই ডেভিড টিঙ্গোর বাবা ধরা পড়ল। তার নাম বেঞ্জামিন টিঙ্গো। ধরা প'ড়েই সে অপরাধ স্বীকার করতে একটুও ইতস্তত করলে না। সে এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক—সত্যিকার ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড। দিনের বেলায় ভালো চাকরি করে, মাহিনা পায় হপ্তায় পাঁচশো টাকা। সকলেই তাকে অত্যন্ত সাধু, ভদ্র ও নম্র প্রকৃতির মানুষ ব'লে জানে। সে যার-পর-নাই ধর্ম্মভীরু, নিজের বাড়ীর প্রত্যেক ঘরে রাখে এক-একখানা ক'রে বাইবেল!

সে নিজের বাড়ীর একটা গুপ্তস্থান থেকে আরও চল্লিশ হাজার টাকার চোরাই মাল বার ক'রে দিয়ে বললে, "পুলিশ চারি দিকে ধরপাকড় করছে ব'লে ভয় পেয়ে আমি তিন বাক্স চোরাই মাল নদীর ধারে ফেলে দিয়ে এসেছিলুম। সেই সঙ্গে ভ্রমক্রমে গিয়েছিল আমার ছেলের চামড়ার ব্যাগটাও।"

কিন্তু এখনো গোয়েন্দাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে নূতন নূতন বিস্ময়!

বেঞ্জামিন টিঙ্গো নিজেই বললে, "ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তারদের উপরে হানা দিয়েছিলুম আমরাই!"

ডেভিড টিঙ্গো বললে, "অ্যাণ্ডি ক্লিংকে বিনা দোষে ধরা হয়েছে। বুড়ো জর্জ্জ ব্রাউনকে রিভলভারের দ্বারা আঘাত করেছিলুম আমিই!"

তাদের কথা যে মিথ্যা নয়, সে প্রমাণ পেতেও বিলম্ব হ'ল না। নির্দ্দোষ ব্যক্তিরা মুক্তিলাভ করলে। আসামীরা গেল কারাগারে।

আর সেই ছোট্ট জর্জ্জ ফ্রেডি ডম্—যে আবিষ্কার করেছিল চোরাই মালের বাক্স তিনটে। সে উপহার লাভ করলে একখানি বাইসিকেল।

শেষ

অশ্বিনীকুমার দত্ত

তারানাথ রায়

অশ্বিনীকুমারের পিতা ব্রজমোহন দত্তের উপদেশ ছিল—"যে জায়গায় থাকবে সে জায়গাটা যেন গরম হয়। কলম্বস ডুবে মরবার ভয় করলে কখনও আমেরিকা আবিষ্কার করতে পারতেন না।"

মা বাংলার সেকালের বিখ্যাত বক্তা লালমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী প্রসন্নময়ীর উপদেশ ছিল—"যে সয়, সে রয়।"

এই পিতা ও মাতার সন্তান অশ্বিনীকুমার দত্ত। ব্রজমোহন তাঁকে হাতে করে মানুষ করেছিলেন। শিশু অশ্বিনী, বাবার মুখে বেদান্ত শুনেছেন—পুরাণ, ইতিহাস শুনেছেন, বাবার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের ঢোলক বাজিয়ে হরিতলায় হরিনাম করেছেন, মায়ের দেখাদেখি ঘট পেতে ঠাকুরপূজো করেছেন।

তখন খুব শিশু। বাবা বিষ্ণুপুরে মুনসেফী করেন, অশ্বিনীকুমার সেখানে স্কুলের ছোট ক্লাশে পড়েন। এক দিন রাতে শহরে বেরুল বাঘ। বাবার কাছে শুয়ে অশ্বিনী। বাবা ডেকে শুনালেন বাঘ কি রকম করে ডাকে। বাবা তার পর ঘুমিয়ে পড়লেন। অশ্বিনীর আর ঘুমই হ'ল না। বাবার কাছে শুনে তার মনে বার বার এই ভাবনাই হ'ল—"বাবাই যদি বাঘ হয়!"

বাবা কিন্তু বাঘ হয়ে অশ্বিনীকুমারকে পাহারা দিতেন। সর্ব্বদা কাছে কাছে রেখে সেকালের পাপ আবহাওয়া থেকে তাকে মাত্র বাঁচিয়েই রাখেননি, কি করে জাতের নতুন শিশুরা গড়ে উঠে নতুন ভারতের চেহারা ফিরিয়ে দিতে পারে তার চেষ্টা করে গেছেন।

বয়স তখন তাঁর ১৪। রঙ্গপুরে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার জন্য অশ্বিনীকুমার তৈরী হচ্ছেন। বাবা-মা কাছে নেই। যাদের বাসায় থাকতেন তারা চরিত্রহীন মাতাল। এক দিন সবাই বসে মদ খাচ্ছে, অশ্বিনীকেও বলছে একটু খেয়ে দেখতে। বালক অশ্বিনী মদের গ্লাস ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন হঠাৎ তাঁর বাল্যবন্ধু ভুবনের কথা মনে পড়ল। ভুবনকে ভালবাসতেন। ভুবনের মুখ মনে পড়তে গ্লাস ফেলে পালিয়ে গেলেন।

তখন ১৬ বছর বয়স না হ'লে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া চলত না। কিন্তু বয়স ভাঁড়িয়ে অভিভাবক তাঁকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেন। পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে উত্তীর্ণ হলেও এই মিথ্যা তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় এই মিথ্যা তার পক্ষে অসহ্য হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বালয়ের রেজিষ্ট্রার পর্য্যন্ত বয়স কমিয়ে তাঁকে শাস্তি দিতে যখন চাইলেন না, পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বাবাকে একখানা চিঠি লিখে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন পায়ে হেঁটে। পুঁজি, চার পয়সা!

চৈত্রের তুপুর। তু' পয়সার আখ আর কলা পথ থেকে খেলেন। আবার চলেন! সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে বালক এক গৃহস্থের দ্বারে গিয়ে একটু জল চাইলেন। জননীরা জল মুড়ি মুড়কি দিলেন, তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—আহা, কচি বাছা বিবাগী হ'ল? অশ্বিনীকুমার সেখানে দাঁড়ালেন না, কাছের একটা হাটে গিয়ে গাছতলায় শুয়ে ঘুমুলেন। রাত প্রায় এক প্রহর। এক ভদ্রলোকের নজর পড়ল। সঙ্গে করে নিয়ে একটা তক্তপোষ দেখিয়ে বললেন, এখানে ঘুমোও।

আবার চলেন অশ্বিনীকুমার। চন্দননগরে এক বন্ধু ধরে নিয়ে গেলেন। রাতটা প্রার্থনায় কাটল। সে যুগটাই ছিল প্রার্থনার। ভোর হতে না হতে আবার চলেন চেঁচিয়ে ডাকতে ডাকতে—"আমার মন ভুলাল যে, কোথায় আছে সে।"

এক ধাঙ্গড়ের সঙ্গে দেখা, ইচ্ছে হ'ল জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করেন, তাঁর মন যে ভুলাল তার সন্ধান সে জানে কি না। একটা গাছের সঙ্গে দেখা—তাকেই জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন—"বল্ দেখি রে তরু লতা, আমার জগজ্জীবন আছে কোথা?"

আবার চলেন। মাধবপুরে এক ধনী বৃদ্ধের ঘরে রাতের অতিথি। বুড়ো বিশ্বেস করতেই পারলেন না অশ্বিনীকুমার যশোরের ছোট আদালতের জজের ছেলে। এক পুকুরের ঘাটে রাত কাটল।

আবার চলেন। পুঁজি তু'পয়সার মুড়ি-মুড়কী এ দিন খেয়ে আবার চলেন।

এমনি করে বালক অশ্বিনীকুমার সেদিন কলকাতা থেকে পদব্রজে বর্দ্ধমান গেছলেন। আর কপর্দ্দকহীন অবস্থায় বর্দ্ধমান থেকে পায়ে হেঁটে যশোরে বাবার কাছে যখন ফিরে গিয়ে তাঁর পাঠ স্থগিত রাখার কারণ জানালেন, আর পথের কাহিনী একে একে বললেন, তখন পুত্র অশ্বিনীকুমারের গর্ব্বে পিতা ব্রজমোহন গর্ব্বিত হয়ে যে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

রাজান্তঃপুরে

বর-বেশে মহারাজা গঙ্গাধর রাও বিবাহ-বাসরে সুসজ্জিতা কন্যার মুখে প্রাসঙ্গিক একটি কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন, এ বড় সাধারণ মেয়ে নয়—অসামান্য কোন মনস্বিনী মেয়ে না হোলে বিবাহ-স্থলে বরের কাপড়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার সময় বহু লোকের সামনে পরিহাসের সুরে কখনই বলতে পারতেন না—'পুরুত ঠাকুর! খুব জোরে গিঁট দিন—যেন খুলে না যায়!'

বিবাহের পর বধূরূপে ঝাঁসীর বিশাল প্রাসাদে এসে এমনি অনেক বিষয়েই কন্যা তাঁর নির্ভীক ও সপ্রতিভ ব্যবহারে প্রাসাদ-শুদ্ধ সকলকেই অবাক করে দিলেন। নববধূ রাজকন্যা নন, কোনো বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরোয়ানার মেয়েও নন, তাঁর পিতা সাধারণ এক রাজ-কর্ম্মচারী মাত্র—কিন্তু রাজরাণী ও বধূর মর্যাদা নিয়ে রাজ-প্রাসাদে আসবার পরেই তাঁর ভাবভঙ্গি কথাবার্তা আচার-ব্যবহার দেখে স্বয়ং মহারাজও স্তব্ধ হোয়ে গেলেন। তিনি ভেবে স্থির করতে পারলেন না যে, এতটুকু মেয়ে, এই বয়সে এখানে এসেই এ-সব শিখলে কোথা থেকে? সে যে এই বংশের রাণী—বিশাল অন্দর-মহলের অধিনায়িকা, তার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অত্যন্ত কঠিন—এ সব তথ্য নিজে থেকেই কেমন করে এই বালিকা বধূ জ্ঞাত হলো?

সাধারণতঃ যে-বয়সে বালিকারা খেলাধূলা করেই আনন্দ পায়—সাংসারিক কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়; নব পরিণীতা কন্যা সেই বয়সেই রাণীর গাম্ভীর্যে নিজেকে আবৃত করে রাজান্তঃপুরের কর্ত্রীত্ব ভারও নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন! এই জন্যই অন্দর-মহলের দাস-দাসী থেকে আরম্ভ করে রাজ্যেশ্বর মহারাজ পর্যন্ত বিস্ময়ে অবাক হোয়েছেন। রাজ-সংসারের জাঁক-জমকপূর্ণ অবস্থা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও এক বিরাট ব্যাপার! বিভিন্ন প্রকৃতির বহু পরিজন, নিকট ও দূর-সম্পর্কের নানা শ্রেণীর আশ্রিতা আত্মীয়-স্বজন, বহু পরিচারিকা ও প্রতিহারিণী, তাদের সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি শত শত প্রাণী বিশাল রাজান্তঃপুরে প্রতিপালিত হয়; তাদের যথাযথ পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত পরিদর্শিকা বা তত্ত্বাবধায়িকা থাকা সত্ত্বেও রাজপ্রাসাদের রাণীই মাথার উপরে থাকেন অধিনায়িকার মত। প্রাসাদের অন্দর-মহলের মত বহির্মহলেও বহু পুরুষ মহারাজার আশ্রিতরূপে বসবাস করেন, সেখানে দক্ষ পরিদর্শকদের উপরে অধিনায়ক থাকেন মহারাজা স্বয়ং। এত সব পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও নানা শ্রেণীর লোকজনদের নিত্য নিয়মিত ভাবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারও বড় সহজ কথা নয়—রাজা-রাজড়াদের কাণ্ড-কারখানাই

আলাদা। কিন্তু বালিকা হোলেও ঝাঁসীর নতুন রাণী লক্ষ্মী নিজের কর্তব্য মনে করে নির্ভয়ে এগিয়ে এলেন—অধিনায়িকার মত সব কাজের তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। বালিকার এই সাহস ও কর্তব্যজ্ঞান রাজপুরীর সকলকেই বিস্ময়ে অভিভূত করেছে।

মহারাজা গঙ্গাধর আদর করে রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন: শুনলাম, তুমি না কি অন্দর-মহলের যাবতীয় কাজকর্মের তদারক নিজেই করছ?

স্বামীর দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে একটি বার চেয়েই সে দৃষ্টি নত করে লক্ষ্মী বললেন: হাঁ। এখানে এসেই শুনেছিলাম, এ কাজ রাণীর; তাই ভরসা করে আমিও এগিয়ে গেছি। ভালো করিনি?

সাদরে বধূরাণীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরে মহারাজ বললেন: নিশ্চয়ই ভালো করেছ। কিন্তু তোমার মত এত অল্প বয়সে কোন মেয়ে রাণী হয়ে ত আসেননি, তার পর বয়স অনেক বেশী না হোলে কেউ ভরসা করে তোমার মতন এগিয়ে যেতেও পারেননি! আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে, তুমি এ-বাড়ীতে এসেই এ খবর নিয়েছিলে?

লক্ষ্মী বললেন: আমি রাজকন্যা না হোলেও রাজবাড়ীর ভিতরকার খবর সব জানি। বিঠুরের পেশোয়াজীর ভাই আপ্পাজীর কাছে আমি যে অনেক কথা শুনিছি। বিয়ের পর রাণী হোয়ে এলে রাণীরা যে বসে বসে আলস্যে দিন কাটান না, অন্দর-মহলে তাঁদের কত কাজ, আপ্পাজীর কাছে তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে সবই আমি জেনেছিলাম যে। তিনি বলতেন, পেশোয়ারা যেমন দরবার করে রাজ্য শাসন করতেন, পেশোয়ার রাণীরা তেমনি অন্তঃপুরে রাজত্ব করতেন—সেখানে পেশোয়াদের ক্ষমতা চলতো না, রাণীরাই সব কিছু করতেন। বিধাতা যখন আমায় রাণী করেছেন, রাজ্য শাসন করবার শক্তিও নিশ্চয়ই দিয়েছেন। আমি মনে করি, এই অন্দর-মহল আমার রাজ্য। আপনি যেমন ঝাঁসী রাজ্য শাসন করেন, আমারও উচিত এই রাজ্যটিও তেমনি শাসন করা। অবিশ্যি, আমি বালিকা; যদি ভুল করি—দোষ-ত্রুটি হয়, মাথার উপরে আপনি আছেন—স্বামী, তার ওপর রাজা, দোষ, ত্রুটি, ভুল দেখিয়ে দেবেন, আমি সাবধান হব। আর এতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তা-ও বলুন।

পত্নীর কথাগুলি মুগ্ধ হোয়েই মহারাজ শুনছিলেন। শেষে আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে বললেন: আমি অনেক পুণ্যের ফলেই তোমার মত কন্যারত্নকে আমার পত্নীরূপে পেয়েছি। এখানে এসে অল্প দিনেই তুমি যে রকম সুবুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছ, আর এই মাত্র যে সব কথা আমাকে বললে, তা থেকেই বুঝতে পারছি—রাণী হবার জন্যেই তুমি জন্মগ্রহণ করেছ। যে জ্যোতিষী তোমার সন্ধান দিয়েছিলেন, তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। আদর্শ নারীর গুণরাশি তোমার মধ্যে সবই আছে। আমি তোমার উপরে অন্দর মহলের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিলাম; সত্যই এ তোমার রাজ্য, আর এ রাজ্যে তুমি রাণী, তুমি সর্বময়ী। সবাই এখানে অবনত-মস্তকে তোমার শাসন স্বীকার করবে।

লক্ষ্মীও তৎক্ষণাৎ স্বামীর পদতলে অবনত-মস্তকে ভক্তি নিবেদন করে গাঢ় স্বরে বলল: আপনি আশীর্বাদ করুন—রাজান্তঃপুরের সকলকেই আমি যেন স্নেহ দিয়ে আপনার করে নিতে পারি।

স্বামীর আশীর্বাদেই হোক, বিধাতের ইচ্ছায়ই হোক, কিম্বা লক্ষ্মীর আশ্চর্য গুণের জন্যই হোক—অল্প দিনেই তার অন্তরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে উঠল আশ্চর্য ভাবে। অন্তঃপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে ধন্য, ধন্য ধ্বনি উঠল রাণীর উদ্দেশে। দেখতে দেখতে বিশাল অন্দর-মহলের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রাণী লক্ষ্মীর এক অপূর্ব রাজ্য উঠল গড়ে। অন্তঃপুরে আশ্রিতা আত্মীয়াদের কুমারী কন্যারা দলবদ্ধ হোয়ে নানারূপ খেলা ও নৃত্য-গীতে অভ্যস্ত ছিল; লক্ষ্মী এখন তাদের মনে প্রেরণা দিয়ে মারাঠা বীরাঙ্গনাদের আদর্শে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, প্রাচীরবদ্ধ রাজান্তঃপুরে সুদীর্ঘ উদ্যান, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কৃত্রিম অরণ্য, সুবৃহৎ সরোবর—সবই রয়েছে অন্তঃপুরিকাদের চিত্তবিনোদনের জন্য, হয়ত এক কালে অন্তঃপুরের মহিলারা এই সব উদ্যান অরণ্য প্রান্তর সরোবরসমূহ ব্যবহার করে চাঞ্চল্যের সাড়া তুলতেন; কিন্তু এখন এগুলি শুধু অতীতের স্মৃতিই স্মরণ করিয়ে দেয়—এদিকে পুরবাসিনীদের কোন আগ্রহই নেই। রাণী লক্ষ্মীর আদেশে উদ্যান, উপবন, সরোবর বহু দিন পরে সংস্কৃত হলো; বহু দিন অব্যবহৃত থাকায় উদ্যানগুলি দুর্গম জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল, আর উপবনগুলির ত্রিসীমায়ও কেউ ভয়ে ঘেঁসত না—মহাবনের মত ভীষণ হোয়ে ওঠায়। কিন্তু লক্ষ্মীর চেষ্টায় আবার তাঁদের পূর্বশ্রী ফিরে এলো।

এই সব সংস্কার-কার্য দেখে মেয়েদের মনে কৌতূহল জাগলো—বধূরাণীর মতলব কি? বহু কাল ধরে যে সব জমি পড়ে থেকে বন-জঙ্গলে ভরে গিয়েছিল, সেগুলির দিকে সহসা রাণীর নজর পড়ল কেন? বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে কি হবে?

এর পর রাণী এক দিন সকলকে ডেকে নিজেই বললেন: তোমাদের জন্যেই অন্দর-মহলের পিছনের ঐ-সব বন-জঙ্গল আমি পরিষ্কার করিয়েছি। ঘরে বসে তোমরা যে সব হাল্কা খেলাধূলা কর, তাতে দেহ বা মন কোনটাই শক্ত হয় না। এখন থেকে আমি তোমাদের নিয়ে খেলব, আর আমাদের খেলার জায়গা হবে ঐ সব মাঠ-ময়দান-বাগান-বন—যেগুলো পরিষ্কার করানো হয়েছে!

রাণী নিজে তাদের সঙ্গে খেলা করবেন শুনে মেয়েগুলি আনন্দে ফেটে পড়বার মত হোয়ে বলে উঠল: রাণী আমাদের সঙ্গে খেলবেন! এমন সৌভাগ্য আমাদের হবে?

মিষ্টি হেসে লক্ষ্মী বললেন: বিয়ের আগেও আমি খেলেছি—আমাদের খেলা দেখে লোকে অবাক হোয়ে চেয়ে থাকত। বিয়ে হোলেও সে খেলা আমি ভুলতে পারিনি, তোমাদের নিয়ে খেলবো স্থির করেছি। না খেললে শরীর আর মন শক্ত হবে কি করে?

এর পর লক্ষ্মী খেলার যে ব্যবস্থা করলেন, তাঁর কাছে অপূর্ব বা অদ্ভুত না হোলেও এখানকার মেয়েরা খেলবার আগে সে খেলার নাম শুনেই চমকে উঠলো—সেই সঙ্গে তাদের মনে মনেও এক বিস্ময়কর উত্তেজনার সঞ্চার হোলো।

লক্ষ্মী করলেন কি, মহারাজকে তাঁর সঙ্কল্পের কথা বলে কতকগুলো টাটু ঘোড়া আনালেন অন্দর-মহলে। কালো কালো হৃষ্টপুষ্ট তেজী ঘোড়া—গায়ের লোমগুলি এত মসৃণ যে, পিঠে মাছি বসলেও বুঝি পিছলে পড়ে। আর, দেখতে ছোট হোলেও শক্তিতে তারা কম নয়—বড় বড় লড়াইয়ে ঘোড়ার সঙ্গেও টক্কর দিয়ে ছুটতে পারে, এমনি তাদের পায়ের জোর।

যতগুলি মেয়েকে নিয়ে লক্ষ্মী তাঁর দলটি বেঁধেছিলেন, ঠিক ততগুলি ঘোড়াই যোগাড় করে আনালেন দলের মেয়েদের জন্যে; অবিশ্যি, নিজেও একটি ঘোড়া বেছে নিয়েছিলেন তিনিও খেলবেন বলে। এক-একটি ঘোড়ার এক-একটি নাম রেখে তিনি দলের প্রত্যেক মেয়েকে দিয়ে বললেন—এই নাম রইল তোমার ঘোড়ার, এই নাম ধরে তুমি ডাকবে, নিজের হাতে খাওয়াবে, তোয়াজ করবে, তার পর খেলা হোয়ে গেলে খোজা সহিস এসে ঘোড়াগুলোকে আস্তাবোলে নিয়ে যাবে, নিজের নিজের ঘোড়ার নাম সবাই মনে রাখবে।

এখানে বলা উচিত, রাজান্তঃপুরে পুরুষ পরিচালকদের প্রবেশ করবার উপায় নেই। অন্দর মহলে কাজ করবার জন্যে খুব শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ মেয়েরা নিযুক্ত থাকে। আবার যে সব কাজ মেয়েদের দ্বারা সম্ভব নয়, সেখানে খোজাদের বহাল করা হয়। লক্ষ্মী প্রথম প্রথম খোজা সহিসদেরই আনিয়ে মেয়েদের ঘোড়ায় চড়া শেখাবার ব্যবস্থা করলেও, পরে 'মাওলা' নামে অন্ত্যজ শ্রেণীর মারাঠা মেয়েদের আনিয়ে তাদের উপরে অন্দর-মহল এবং অন্দর-মহলের মহিলাদের ঘোড়াগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেন।

ঝাঁসীতে রাজবধূরূপে আসবার আগেই লক্ষ্মী বিঠুরে শুধু যে ঘোড়ায় চড়া শিখেছিলেন তা নয়, এই বিদ্যাতে তিনি এমনি পারদর্শিনী হোয়ে ওঠেন যে, প্রতিযোগিতায় এক নানা সাহেব ভিন্ন কেউ তাঁকে হারাতে পারতেন না। যাদের ঘোড়ায় চড়ে ব্যায়াম করা অভ্যাস, এক দিন ঘোড়ায় চড়তে না পেলে তাদের মন যেন নিসপিস্ করতে থাকে। রাণীরও হয়েছিল সেই দশা। বিয়ের পর ঝাঁসীতে এসে আর ত তাঁর ঘোড়ায় চড়া হয়নি; অথচ, ঘোড়ায় চড়বার জন্যে তাঁর মন সর্বক্ষণ উস্‌খুস্ করতে থাকে। শেষে বুদ্ধি খেলিয়ে তিনি শুধু নিজের জন্যে নয়—রাজপ্রাসাদের সমবয়সী মেয়েদের জন্যেও নিত্য নিয়মিত ভাবে ঘোড়ায় চড়ে খেলা করবার এই উপায় উদ্ভাবন করলেন। ফলে, ঝাঁসীর ভাবী নারীবাহিনী গঠনের এক পটভূমিকার পত্তন হলো।

লক্ষ্মী তাঁর কিশোরী সঙ্গিনীদের বললেন: এ খেলা নতুন কিছু নয়; ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী মারাঠা মেয়েদের অন্তরে বীরাঙ্গনা হবার প্রেরণা দিয়েছিলেন। তিনি যখন মারাঠা দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে সমস্ত জাতিকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, মারাঠা মেয়েরাও তখন চুপ করে ঘরের কোণে বসেছিল না। বর্ম পরে অস্ত্র হাতে করে ঘোড়ায় চড়ে তারাও পুরুষদের মত লড়াই করেছিল। সে যুগে প্রত্যেক মারাঠা মেয়ের সম্পদ গর্ব ও গৌরব বলতে ছিল—একটা ঘোড়া, একটা বর্ম আর একখানা তলোয়ার। এখন আমরা সে সব ত্যাগ করে সাড়ী কাঁচুলি অলঙ্কার সার করিছি; তাই চার দিক দিয়ে জাতির জীবনে দুর্গতিও ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমি কি ভেবেছি জানো—তোমাদের নিয়ে এই ঝাঁসী থেকে আবার পথ খুলে দেব। আমাদের দেখাদেখি মারাঠা মেয়েরা আবার আগেকার মত বর্ম পরবে, তলোয়ার খেলবে, আর ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে।

লক্ষ্মীর কথা, লক্ষ্মীর অপূর্ব মূর্তি, লক্ষ্মীর বিচিত্র ভঙ্গি মেয়েদের অন্তরে তখন প্রেরণা ঢেলে দিয়েছে, তরুণ মনগুলি উদ্দীপিত হোয়ে উঠেছে দারুণ এক উত্তেজনায়; রাণীর আদর্শে তারা প্রত্যেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এলো।

এখন থেকে রাজান্তঃপুরের প্রাচীর-বেষ্টিত বিশাল বিস্তীর্ণ স্থানটি অবলম্বন করে এই কিশোরীদের ঘোড়দৌড়ের খেলা আরম্ভ হলো। লক্ষ্মী নিজে তাদের শেখাতে লাগলেন—কেমন করে ঘোড়াকে বাধ্য করতে হয়, কি ভাবে ঘোড়ার পিঠে চড়তে হয়, কি কৌশলে ঘোড়া চালাতে হয়। সহিসরাও ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে থেকে রাণীর নির্দেশ মত কাজ করতে লাগল।

অল্প দিনের মধ্যেই কিশোরী দলটি অশ্বারোহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। ক্রমে তারা স্বাধীন ভাবে নিজে থেকেই নিজের নিজের ঘোড়াকে ইচ্ছামত চালাতে সমর্থ হলো। তখন তাদের কি আনন্দ! এত বড় একটা বিদ্যার আলো এত দিন তাদের চোখে পড়েনি—তারা যেন অন্ধকারে বসেছিল! কি শুভক্ষণেই রাণী এসেছিলেন, আর এই বিদ্যার কথা বলে, এই বিদ্যার আলো নিজের হাতে জ্বেলে দিয়ে তিনি এদের জড়তা কাটিয়ে পথ খুলে দিলেন।

এর পর এই খেলাতেই মেয়েগুলি এমনি মেতে উঠল যে, প্রাচীরের মধ্যে যেন তাদের প্রমত্ত চিত্তগুলি আর আবদ্ধ থাকতে চায় না; নবলব্ধ এই বিদ্যার আলো—প্রাচীরের বাহিরের মেয়েদের চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্য অতিষ্ঠ হোয়ে উঠলো। তাদের আগ্রহ দেখে লক্ষ্মীর মনটিও আনন্দে যেন ঝলমল করে উঠল; তিনি বললেন, এ বিদ্যার ধারাই এই; এর আলো চোখে পড়লে সে আলোয় শুধু নিজের চোখই ভরে যায় না—অপরেও যাতে সে আলোর আভা দেখে আনন্দ পায়—সেই সাধই মনে জেগে ওঠে। এই দেখ না—তোমরা অন্দর-মহল থেকে চুপি-চুপি ঘোড়ায় চড়া বিদ্যাটি শিখে এত আনন্দ পেয়েছ যে, বাহিরের মেয়েগুলিকেও এই বিদ্যা শেখাবার জন্যে অধীর হোয়ে উঠেছ। কিন্তু এর জন্যে ব্যস্ত হয়ো না, ক্রমে ক্রমে সবই হবে। জানো ত, আমি রাজবধূ—তোমাদের সঙ্গে অন্দর-মহলে খেলা করি বলে বাইরে গিয়ে ত আর ছুটোছুটি করতে পারি না! তা ছাড়া, এখানে আমাদের আরো কাজ আছে।

শুধু ঘোড়ায় চড়া নয়—শাস্ত্র পাঠ, পূজা-অর্চনা, সেবা-পরিচর্যা—এই প্রয়োজনীয় বিদ্যাগুলিও লক্ষ্মী সঙ্গিনীদের শিখাতে লাগলেন।

মহারাজা গঙ্গাধর তলে তলে খবর নিয়ে জানলেন, কিশোরী রাণী লক্ষ্মী মহীয়সী মহিষীর মত অন্তঃপুরের সর্বত্র নিপুণ লক্ষ্য রেখে এমন সুশৃঙ্খলে তাঁর কর্তব্য পালন করে চলেছেন যে, কোথাও কিছুমাত্র ত্রুটি নেই, রাণীর আচরণে সকলেই সন্তুষ্ট; যে প্রাচীন নিয়মে অন্তঃপুরের কাজগুলি চলে আসছিল, রাণী লক্ষ্মী তার দোষ-ত্রুটিগুলি তুলে দিয়ে অনেক পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু তার জন্যে কেউ কোন অভিযোগ তোলেনি, বরং মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাই করছেন।

প্রাসাদ-অলিন্দ থেকে এক দিন মহারাজ গঙ্গাধর রাণীর আশ্চর্য অশ্বচালনা দেখে স্তব্ধ হোলেন। মারাঠা বীরাঙ্গনাদের মত আঁট-সাঁট করে কাপড় পড়ে ঘোড়ায় চড়ে রাণী অন্দর-মহলের বিস্তীর্ণ উদ্যানে টহল দিচ্ছেন—অদূরে তাঁর সঙ্গিনীরা তাদের ঘোড়ার পিঠে বসে নিষ্পলক দৃষ্টিতে রাণীর অদ্ভুত অশ্বচালনা দেখছেন! কিছুক্ষণ পরেই রাণীর ইঙ্গিতে সঙ্গিনীরাও তাদের ঘোড়া নিয়ে রাণীর অনুসরণ করল—উদ্যান-পথে চলল এই অশ্বারোহিণী দলের অপূর্ব পরিক্রমণ!

[ক্রমশঃ।

ফোর্ট উইলিয়ম

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

বাংলায় ইংরেজদের প্রথম কেল্লা পুরোনো ফোর্ট উইলিয়ম খুব কম লোকেই জানেন দুর্গটি দেখতে কেমন বা তার আকার কেমন ছিল, অথবা কোথায় ছিল তার অবস্থিতি। অনেকেই হয়ত শুনে বিস্মিত হবেন যে, পুরোনো কেল্লার একটি ভগ্নাবশেষ আজো জেনারেল পোষ্ট অফিসের অভ্যন্তরে অটুট আছে। অনেক পুরোনো স্মৃতিই আজ কলিকাতার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন ও বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হতে বসেছে। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গটিকে কোনক্রমেই ভোলা চলতে পারে না। বর্তমান কলিকাতা নগরী তো তাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সমৃদ্ধির চারি পাশে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে। ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনের প্রাক্কালে এই দুর্গটি ছিল তাদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির প্রতীক।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-মন্দিরে পুরোনো কেল্লা ও সেণ্ট অ্যান (St. Anne) গীর্জার একটি মডেল রক্ষিত আছে যা দেখে আধুনিক কলিকাতাবাসিগণ বিলীয়মান অতীতের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করতে পারেন।

প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি এক দিনে বা এক বছরে একক চেষ্টায় নির্মিত হয়নি। তদানীন্তন বাংলার নবাব ও তাঁর কর্মচারীদের জুলুম থেকে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদ রক্ষা ও নিরাপদ রাখার জন্য হুগলী নদীর তীরে কোথাও একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা সর্বপ্রথম উদয় হয় উইলিয়ম হেজেসের মাথায়। ১৬৮২ থেকে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হেজেস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর এজেণ্ট ও বঙ্গোপসাগর এলাকায় কম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনার সর্বময় ছিলেন। সুতানুটি বা কলিকাতায় স্থান নির্বাচনের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ জব চার্ণকের—এই সময় তিনি সরাসরি নবাবের সহিত শত্রুতা ও সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হন। চার্ণকের মন্ত্রণায় ও নেতৃত্বে ইংরেজরা হুগলী থেকে সরে এসে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সর্বপ্রথম সুতানুটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন সাময়িক ভাবে। সুতানুটিতে দ্বিতীয় বার আশ্রয় গ্রহণ করেন ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। অবশেষে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট এইখানেই পাকাপাকি বসবাসের ব্যবস্থা স্থায়িভাবে স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ জব চার্ণকের কলিকাতার ভিত্তি স্থাপিত হোল। জব চার্ণকের মৃত্যুর পর স্যার জন গোল্ডসবরা সুতানুটিতে এসে দেখতে পেলেন সেখানে এক চূড়ান্ত বিশৃংখল অবস্থা। নবাবের নিকট হতে স্থায়িভাবে বসবাসের কোন সনন্দ পাওয়া যায়নি—অথবা দুর্গ নির্মাণেরও কোন চিহ্নমাত্র নেই। স্যার জন তখন একটি স্থান নির্বাচন করে স্থানটিকে ঘিরে ফেলার নির্দেশ দিলেন মাটির দেয়াল দিয়ে—নবাবের সম্মতি পাওয়া মাত্র কুঠী নির্মাণ করা হবে সেখানে। কম্পানীর জন্য একটি বাড়ীও খরিদ করা হোল, সেটিকে পরে দরকার মত সম্প্রসারিত করে অফিসের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে স্যার চার্লস আয়ার যখন কম্পানীর এজেণ্ট তখন নবাবের নিকট হতে বহু-প্রতীক্ষিত সম্মতি পাওয়া গেল। সুতানুটিতে কম্পানীর অধিকার স্বীকৃত হোল—পাশাপাশি তিনটি গ্রামের অর্থাৎ গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সুতানুটীর ইজারা নিল ইংরেজরা এই আশায় যে, এখান থেকে যে কর আদায় হবে তা থেকেই কম্পানীর কুঠীর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি ও সৈন্যদল পোষণের খরচ উঠে আসবে। কিন্তু তাহ'লেও দুর্গ নির্মাণের বহু দুরতিক্রম্য বাধা দেখা দিল। কম্পানী ভেবেছিল, এমন একটি দুর্গ নির্মাণ করা হবে যার দ্বারা নিজেদের লোক-লস্কর বিষয়-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা যাবে। কিন্তু তক্ষুনি আবার বিশালাকার দুর্গ নির্মাণের দ্বারা নবাবের ভীতি ও সন্দেহ উদ্রেকের সংশয়ও দেখা দিল। পরিশেষে কম্পানীর ডিরেক্টাররা পাঁচ কোণ-বিশিষ্ট একটি দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা মঞ্জুর করলেন।

কিন্তু কলিকাতাস্থ ডিরেক্টাররা সলা-পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, দুর্গের আকার হবে চতুষ্কোণ। কিন্তু এই পরিকল্পনাকেও বাস্তবে রূপ দেবার মত বিশ্বাসী ও উপযোগী কর্মচারীর যথেষ্ট অভাব দেখা দিল—দুর্গ নির্মাণের কাজ নানা কারণে বিলম্বিত হতে লাগল। কিন্তু ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে কম্পানী চূড়ান্ত চেষ্টার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোলেন। বাংলা দেশকে একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী ঘোষিত করা হোল এবং দুর্গের নামকরণ করা হোল সম্রাট তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে—ফোর্ট উইলিয়ম।

স্যার চার্লস ইতিমধ্যে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন। তাঁকে আবার নানা প্রকার নির্দেশ, অর্থ ও ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে পুনরায় ভারতে প্রেরণ করা হোল। স্যার চার্লস ভারতে বেশী দিন অবস্থান করেননি—মাত্র সাত মাসের পর দুর্গ নির্মাণের ভার তাঁর উত্তরাধিকারী জন বীয়ার্ডের হস্তে অর্পণ করে দেশে ফিরে আসেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে জন বীয়ার্ডের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হোল রোটেশান গভর্ণমেণ্ট। আট জন সদস্যে গঠিত এই রোটেশান গভর্ণমেণ্টে দু'জন সভাপতি পালা করে নেতৃত্ব করতেন হপ্তায় হপ্তায়। এদেরই শাসনকালে দুর্গের পশ্চিম দিককার গম্বুজ দু'টি ও নদী-তীরের দেয়ালের অধিকাংশ নির্মিত হয়। দুর্গ নির্মাণ শেষ হতে অ্যাণ্টনি ওয়েণ্টডেন, জন রাসেল ও রবার্ট হেজেস—এই তিন জন গভর্ণরের শাসনকালও শেষ হয়। সর্বশেষ সংযোজন সমাপ্ত হয় ১৭১৬ অথবা ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ প্রায় আঠারো বছর লেগেছে দুর্গটির চূড়ান্ত রূপ নিতে।

দুর্গের প্রথমে নির্মিত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্বের গম্বুজ ও তৎসংলগ্ন দেয়ালগুলি। উত্তর-পূর্বের গম্বুজ নির্মিত হয়েছে ১৭০১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর বীয়ার্ডের সময়ে। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে তিনি দুর্গাভ্যন্তরের কুঠি বা গভর্ণমেণ্ট হাউসও নির্মাণ আরম্ভ করে দেন এবং এই নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয় রোটেশান গভর্ণমেণ্টের আমলে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে। ঐ বছরই আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের গম্বুজ নির্মাণও তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা হয়। দুর্গ এলাকার বাইরে পুব দিকের দেওয়ালের সম্মুখে অবস্থিত সেণ্ট অ্যান্ গীর্জাটি রোটেশান গভর্ণমেণ্টের শাসনকালেই নির্মিত হয়েছে। গীর্জার অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হয় ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুন তারিখে 'এসেনশান্ ডে'র পরদিন রবিবারে। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দেই দুর্গের সামনের দীঘির (লালদীঘি) সংস্কার করা হয় অর্থাৎ দীঘিটিকে আকারে আরো বড় ও গভীরতর করা হয়। দীঘির কাটা মাটি নবনির্মিত দু'টো গম্বুজের মধ্যবর্তী স্থান ভরাট করার কাজে লাগান হয়েছিল। দীঘির পাড় শক্ত করা হয়েছিল ভাঙ্গা ইট-পাথর আর ব্যালাষ্ট দিয়ে। নদীর দিককার দেয়াল নির্মাণ সুরু হয় ১৭১০

খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাস থেকে। দুর্গের সামনে ইটের গাঁথনি দিয়ে একটি জেটি তৈরী করা হয় এবং সেই সঙ্গে আবক্ষ প্রাকার ও সারি সারি কামান বসিয়ে এই দিকটা সুরক্ষিত করার ব্যবস্থাও সম্পন্ন হয়। পশ্চিম দিককার দেওয়াল আরম্ভ করেন গভর্ণর ওয়েন্টডেন ১৭১০ কিংবা ১৭১১ খৃষ্টাব্দে এবং নির্মাণ-কার্য শেষ হতে লাগে ১৭১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে লেখা একটি পত্র পাঠে জানা যায়—"জেটি নির্মিত হয়েছে কিন্তু উপরের প্রাকারের নির্মাণ-কাজ শেষ হতে এখনো বাকি। সুদৃঢ় অবতরণ-মঞ্চ এবং মঞ্চের শেষ প্রান্তে অবস্থিত নদীর জোয়ার-ভাটার সকল সময় সক্রিয় ক্রেন নির্মাণের কাজও প্রায় শেষ হয়েছে। দুর্গাভ্যন্তর শেষ হতে আর বাকি আছে মাত্র একটি দেয়ালের ছোট টুকিটাকি কাজ আর দেয়ালের উপর প্রশস্ত পথ নির্মাণ। পূব দেয়াল থেকে পশ্চিম দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত লং রো (Long Row) বা কেন্দ্রের গৃহগুলির পুনঃসংস্কারও করতে হবে। গৃহগুলির অবস্থা ভগ্নদশা এবং যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে।"

১৭১৬ খৃষ্টাব্দে লেখা আর একটি পত্র পাঠে জানা যায়——"রাইটারদের জন্য দীর্ঘ গৃহ-সারি নির্মাণ শেষ হইয়াছে—গৃহগুলি বেশ প্রশস্ত ও আরামদায়ক। আবক্ষ প্রাকার নির্মাণও দ্রুত শেষ হবে।"

বস্তুতঃ, দুর্গ নির্মাণ কার্যের মোটামুটি পরিসমাপ্তি এইখানে। দুর্গের চারি দিকে কোন পরিখা খনন করা হয়নি—কাজেই সুরক্ষিত ব্যবস্থা হিসেবে দুর্গের গুরুত্ব ও কার্যকারিতাও সমধিক ছিল না। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অফ ডিরেক্টাররা দুর্গের সমালোচনা করে যে প্রস্তাব রচনা করেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য।

—"Very pompous show to the water side by high turrets of lofty buildings but having no real strength or power of defence.'

এর পর থেকে দুর্গের যে সমস্ত সংযোজনা হয়েছে তার দ্বারা দুর্গকে আরো সুরক্ষিত করার চেষ্টা হয়নি—মালগুদামের স্থান বৃদ্ধির চেষ্টা হয়েছে মাত্র। মাল আমদানী ও রপ্তানীর জন্য গুদাম-ঘর দক্ষিণ দিকের গম্বুজ-সংলগ্ন দেয়াল-অভ্যন্তরে তোরণের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের গুদাম-ঘরের সামনের বারান্দা নির্মিত হয় যার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের গম্বুজে যাওয়া-আসার পথ মূলতঃ ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু এত করেও স্থান-সমস্যার সমাধান হয়নি। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর ব্র্যাডিলের নির্দেশে দুর্গের দক্ষিণ প্রান্তে দুর্গ-সংলগ্ন আর একটি সুবৃহৎ গুদাম-ঘর নির্মিত হয়। গুদাম-ঘরটি দক্ষিণ-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম গম্বুজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—এর ফলে গম্বুজ দু'টির দুর্গরক্ষণের কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হয় বহুলাংশে। অধিকন্তু গম্বুজ-সংলগ্ন দেয়ালটি গুদাম-ঘরের দেয়ালে পরিণত হোল এবং গুদামে যাওয়া-আসা করার জন্য এই দেয়াল ভেঙ্গে দুর্গ ও গুদাম-ঘরে যাতায়াতের একটি প্রকাণ্ড পথেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর পর থেকে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কর্তৃক দুর্গ অধিকার পর্য্যন্ত দুর্গের আর কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, সেকালে হুগলী নদী আজকের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হোত। আজকে যেখানে জনবহুল স্ট্রাণ্ড রোডটি অবস্থিত সেদিন এটির অস্তিত্বই ছিল না—বর্তমান স্ট্রাণ্ড রোড সেদিন গঙ্গাগর্ভে বিলীন ছিল। জেনারেল পোষ্ট অফিস, নতুন সরকারী অফিস গৃহসমূহ, কাষ্টমস্ হাউস ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বাড়ীটি যেখানে অবস্থিত এই সমগ্র এলাকা নিয়েই পুরোনো ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। দুর্গের দক্ষিণ অংশ জুড়ে যে সুবৃহৎ গুদাম-ঘরগুলি নির্মিত হয়েছিল সেখান দিয়েই গেছে বর্তমান কয়লাঘাট ষ্ট্রীট। ফেয়ার্লী প্লেস উত্তর দিকের সীমানা। পূর্ব দিকে নেতাজী সুভাষ রোড ও ডালহৌসী স্কোয়ার। তখনকার দিনে এটিকে বলা হোত লাল বাগ যা কালক্রমে লালদীঘিতে রূপান্তরিত হয়েছে। দুর্গটিকে দেখাত চতুষ্কোণ। দুর্গের উত্তর দিকের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৪০ ফুট, দক্ষিণ দিকের দৈর্ঘ্য ছিল ৪৮৫ ফুট এবং পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্তের দৈর্ঘ্য ৭১০ ফুট। দুর্গের চার কোণায় চারটে সমচতুষ্কোণ গম্বুজ চারি দিকের উপর সতর্ক নজর রাখত। গম্বুজগুলি চার ফুট পুরু এবং ১৮ ফুট উঁচু দেয়াল দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন এবং দেয়ালগুলি সিমেন্টের গাঁথুনি দিয়ে জমাট বাঁধান টাইল ইটের তৈরী। গম্বুজ চারটির প্রত্যেকটির মাথায় দশটি করে কামান বসান থাকত। পূব দিকের এবং প্রধান গেটের মুখে পাচটি কামান রক্ষিত ছিল। নদীর তীর ধরেও দুর্গ-মধ্যে ভারী ভারী কামান বসান হয়েছিল। দুর্গাভ্যন্তরে পূব দিক থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত নীচু নীচু গৃহ-সারি দুর্গটিকে প্রায় সম-দ্বিখণ্ডিত করেছিল। তা ছাড়া দুর্গের চারি দিকেই দেয়াল-সংলগ্ন বহু ঘর ও খিলানযুক্ত পথ দুর্গটিকে ঘিরে রেখেছিল—ঘরগুলির ছাদ র‍্যামপার্টের কাজ করত। দুর্গের দ্বিখণ্ডিত অংশ দু'টির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করত একটি সরু পথ। দুর্গের উত্তরাংশে থাকত গোলা-বারুদ, রসদ, ওষুধ পত্তরের দোকান, কামারশালা প্রভৃতি। এই অংশেই নদীর দিকে একটি ছোট গেটের নিকটে দণ্ডায়মান থাকত পতাকা-দণ্ডটি। দুর্গের কেন্দ্রে ছিল অস্ত্রাগার ও ল্যাবরেটরী। যে গৃহ-সারি উত্তরাংশ থেকে দক্ষিণাংশকে পৃথক্ করেছিল তাদের বলা হোত লং রো (Long Row)। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় দিকে এইটিই হোল রাইটার্স বিল্ডিং বা কম্পানীর কর্মচারীদের বাসগৃহ। গৃহগুলি ছিল যেমন স্যাঁতসেতে তেমনি অস্বাস্থ্যকর।

দুর্গের দক্ষিণ দিকে দু'টো ফটক ছিল—একটি ফটক দিয়ে যাওয়া যেত নদীতে, পারঘাটায় যেখানে কম্পানীর ক্রেন সকল সময় কার্যরত থাকত। আর একটি ফটক দিয়ে এসে পড়া যেত পূব দিকে এক বিরাট এ্যাভিনিউতে—যার নাম পরে বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে যথাক্রমে ডালহৌসি স্কোয়ার নর্থ, লালবাজার, বহুবাজার, বৈঠকখানা। দক্ষিণ দিকের গৃহগুলি কম্পানীর মাল গুদামজাত করে রাখার জন্য ব্যবহৃত হোত। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ দেয়ালের বহির্ভাগে কয়লাঘাট ষ্ট্রীট ধরে কম্পানীর আমদানি-রপ্তানীর মাল-গুদাম নির্মিত হয়। মাল-গুদামের পশ্চিম দিকেই ছিল একটি ছুতারখানা। দক্ষিণাংশের কেন্দ্রে গভর্ণরের প্রাসাদ। প্রাসাদটিকে দেখাত অনেকটা ইংরেজী '[' চিহ্নের মত। এর পশ্চিম ও প্রধান অংশ দৈর্ঘ্যে ২৪৫ ফুট। এই বাহুর কেন্দ্রে ছিল এক বিরাট তোরণ এবং তোরণ থেকে নদীবক্ষের সিঁড়ি পর্য্যন্ত দু'পাশে সমদূরস্থিত স্তম্ভশ্রেণী। প্রধান ফটক-পথে প্রবেশ করে বাম পাশ দিয়ে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করলেই বিরাট হলঘর ও

প্রধান প্রধান কক্ষগুলি। দক্ষিণ-পূর্ব অংশ গভর্ণরের বাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। পূর্ব দিকের ফটকের উভয় পার্শ্ব দিয়ে পূর্ব দিকের দেয়ালের সমান্তরালে দুই সারি খিলান নির্মিত হয়েছিল। প্রথম খিলান-সারিতে দেয়াল-সংলগ্ন কুঠীগুলি অবস্থিত ছিল আর দ্বিতীয় খিলানের সারি কুঠীগুলির পশ্চিমাংশের বারান্দার কাজ করত। প্রথম খিলান-সারি ও দেয়ালের অন্তর্বর্তী স্থান মাঝে মাঝে দু'পাশে প্রাচীর-বেষ্টিত করে যে সমস্ত কক্ষ তৈরী হয়েছিল তারই একটিতে ঘটেছিল নির্লজ্জ ভাবে অতিরঞ্জিত 'অন্ধকূপহত্যালীলা'। খিলানগুলির পরিমাপ ছিল আট ফুট নয় ইঞ্চি এবং খিলান-নির্মিত কক্ষগুলি ব্যবহৃত হোত কয়েদখানা, সৈন্যদের ব্যারাক প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে।

সংক্ষেপে এই হোল গঙ্গাতীরে অবস্থিত ইংরেজদের নির্মিত প্রথম কেল্লার চেহারা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত এর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কলিকাতা আক্রমণ করেন। ঔপনিবেশিকরা প্রস্তুত ছিলেন না এই আক্রমণের জন্য। সুরু থেকেই দারুণ বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। প্রথমে ইংরেজদের বাস-এলাকা রক্ষার চেষ্টা চলে কিন্তু সে-চেষ্টা নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোল। তখন তারা বাধ্য হয়ে সরে এল দুর্গাভ্যন্তরে। সেখানেও আর এক বিশৃংখলার রাজত্ব। দুর্গ রক্ষা করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয় এবং এই বিপদে কি করা যায় সে বুদ্ধি দেবার মতও লোক ছিল না। গভর্ণর ড্রেক ও বেশীর ভাগ ইংরেজগণ 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' এই নীতি অনুসরণ করে নদীতে অবস্থিত জাহাজে পলায়ন করলেন আর অন্ধকূপহত্যার মিথ্যা কাহিনী রটনাকারী জন জেফানিয়া হলওয়েল প্রমুখ ১৭০ জন শ্বেতকায় ভাগ্যের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে দুর্গেই অবস্থান করতে বাধ্য হন। পলায়নের উপায় থাকলে এঁরাও যে পালাতেন, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সামান্য গোলাগুলী-ছোঁড়ার পর দুর্গ অধিকৃত হয়। ২০শে জু. নবাব উত্তর দিকের গেট দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন।

নবাবের অধিকারে থাকা কালীন দুর্গের কতকগুলি গৃহ ধূলিসাৎ করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং কলিকাতারও নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল আলিনগর। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী আবার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলিত হয় এবং দুর্গ আবার পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে আসে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কম্পানীর সমস্ত মালপত্তর সরিয়ে ফেলে দুর্গটিকে সম্পূর্ণ সৈনিকদের ব্যারাকে পরিণত করা হয়। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে গোটা মাল-গুদাম ও লং রোর গৃহগুলি সামান্য সংস্কার করে কর্ণেল কুটের অফিসারদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব দিকের ফাটক ও অন্ধকূপ কয়েদখানার মধ্যবর্তী স্থানে একটি সাময়িক গীর্জা নির্মিত হয়। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে দুর্গ হতে সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ অপসারণ করে স্থানটিকে কাষ্টমস হাউসে রূপান্তরের প্রস্তুতি চলে এবং এই উদ্দেশ্যে অনেক নতুন নতুন গৃহ নির্মাণও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ, এই সময় হতেই দুর্গের দ্রুত ভাগ্যবিপর্যয়ের সুরু। এদিকে হুগলী নদীরও দিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—নদী সরে এসেছে বহু দূরে। কাজেই জীবন-স্রোতের দিক্ পরিবর্তন ঘটতে লাগল।

পুরোনো কেল্লা অতীত যুগের মানুষের কর্মকুশলতার এক নগণ্য নিদর্শন—ভিক্টোরীয় যুগের লোকের মনে আর রং ধরাতে সক্ষম হোল না। হেষ্টিংসের শাসনকালে দুর্গের অবশিষ্টাংশও সম্পূর্ণ অপসারিত হয়। নতুন কাষ্টমস হাউসের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১২শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার। কলিকাতাবাসিগণ সাদর অভিনন্দন জানালেন এই নতুন পরিবর্তনকে।
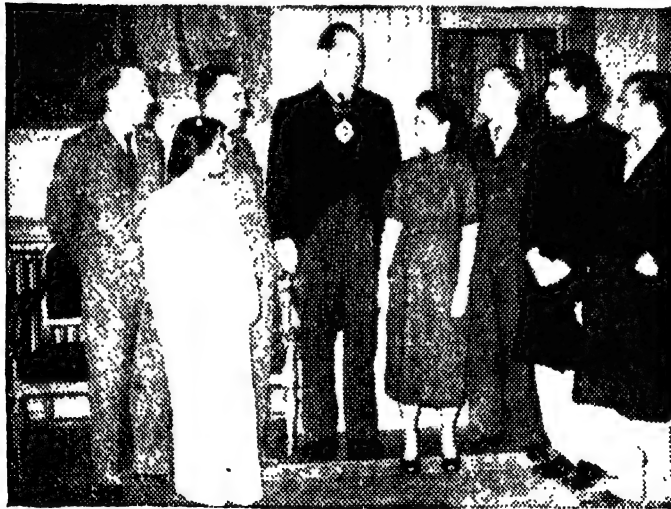
লণ্ডনে আন্তর্জাতিক যুব-সম্মেলনে লর্ড মেয়র এবং ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিদের দেখা যাচ্ছে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

গঙ্গাধর শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। গ্রন্থ—ন্যায়বার্তিক তাৎপর্য টীকা (সম্পাদিত ১৮৯৮), ন্যায়মঞ্জরী (১৮৯৫), ন্যায়রত্নমালা (কাশী, ১৯০০), রসগঙ্গাধর (কাশী, ১৯০৩)।

গঙ্গাধর সরস্বতী—পণ্ডিত। জন্ম—১৮শ শতাব্দী। গ্রন্থ—বেদান্তসিদ্ধান্ত মুক্তিমঞ্জরী।

গঙ্গানাথ ঝা, মহামহোপাধ্যায়—শিক্ষাবিদ্ ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭২ খৃঃ ২৫এ সেপ্টেম্বর, এলাহাবাদ। এম, এ, ডি-লিট। অধ্যাপক মুঙ্গের সেন্ট্রাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—ভাববোধিনী (১৯০৫), ভক্তি-কল্লোলিনী (১৮৯৬) শব্দার্থমঞ্জরী (১৮৯৪), কবিরহস্য (হিন্দী, প্রয়াগ—১৯২৯), Sloka Varttika (১৯০০), কতিপয়দিবসোদ্গমপ্রাত (১৮৯২), বেদমাহাত্ম্য (১৮৯৪), Sloka Tantra Varttika (১৯০৩), সম্পাদিত—A study of the Prabhakar School of Purba mimansa (১৯১০), Kavyaprakasa of Mammata (১৮৯৪)।

গঙ্গাপ্রসাদ অগ্নিহোত্রী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Princess of Wales, ১ম ও ২য় খণ্ড।

গঙ্গানারায়ণ বসু—সাংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদ দিবাকর (সাপ্তাহিক—১৮৩৮), সংবাদ রাজরাণী (১৮৪৪), জনসন্ধাবিণী (১৮৪৭)।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার—চিকিৎসক। জন্ম—১৮৩৬ খৃঃ জিরাট বলাগড় (হুগলী)। মৃত্যু—১৮৮৯ খৃঃ ভবানীপুর। পিতা—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ—মাতৃশিক্ষা (১৮৭১ খৃঃ), চিকিৎসা প্রকরণ, স্ত্রীচিকিৎসা (১৮৭১), Principles and Practice of Medicine, ২য় খণ্ড (১৮৬৯)। অনূদিত গ্রন্থ—নির্দেশক এবং শাস্ত্র—শারীর বিদ্যা (১৮৭১)।

গঙ্গা ভাস্কর—পণ্ডিত। গ্রন্থ—শকুনাবলী।

গঙ্গারাম—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—ভাবফল।

গঙ্গারাম—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বুদ্ধজয়োৎসব।

গঙ্গারাম দেব চৌধুরী—কবি। জন্ম—১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মৈমনসিংহে। পিতা—দুর্লভনারায়ণ। গ্রন্থ—মহারাষ্ট্র পুরাণ, শুকসংবাদ, লবকুশ চরিত্র।

গঙ্গাশরণ হরদেব সহায়—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। সম্পাদিত গ্রন্থ—নরপতি জয়চর্যা (মীরাট), ভৃগুসংহিতা ১ম, ২য় (মীরাট), প্রত্যক্ষ মূক প্রশ্ন ত্রিতয়া (ঐ মীরাট)।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১২-১৩শ শতাব্দী মিথিলায় (গৌড়)। গ্রন্থ—তত্ত্বচিন্তামণি।

গজপতি রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চন্দ্ররোহিণী (১৮৭৪)।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৩১৫ বঙ্গ, ২৬ কার্ত্তিক। গ্রন্থ—দেশ-বিদেশের ধর্ম, ইউরোপের সেরা সাহিত্যিক, মহাভারতের গীতি গল্প, স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্, স্বর্ণমুকুর, পুরুষ ও রমণী, বহু বিচিত্র, রাত্রির তপস্যা, রজনীগন্ধা, প্রেরণা, কমা ও সেমিকোলন।

গণনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায়—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও আয়ুর্বেদবিদ্। এম, এ, এল, এম, এস। চিকিৎসক। বিদ্যানিধি, সরস্বতী উপাধিলাভ। গ্রন্থ—সিদ্ধান্ত-নিদান, আয়ুর্বেদ-সংহিতা, প্রত্যক্ষ-শরীরম্, ১ম, ২য়, ৩য়, Hindu Medicine Science of Aurved, আয়ুর্বেদ-পরিচয়।

গণপতি—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। জন্ম—গুর্জর প্রদেশ। পিতা—হরিশঙ্কর জ্যোতিষী। গ্রন্থ—মুহূর্ত গণপতি (১৬৮৫ খৃঃ)।

গণপতিকৃষ্ণ গুর্জর—হিন্দী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বলভদ্রদেশকা রাজকুমার জয়ন্ত।

গণপতি ঠাকুর—মৈথিলী কবি। ইনি 'যোগীশ্বর' উপাধি লাভ করেন। পিতা—জয়দত্ত। গ্রন্থ—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

গণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলিয়াঘাটায় সরকার বংশে। গ্রন্থ—কামন্দকীয় নীতিসার। জ্যোতিষযোগতত্ত্ব, রসনির্ঝর, শ্রাদ্ধপদ্ধতি, ফলদীপিকা, পুষ্পবাণবিলাসম্। উপনয়ন সন্ধ্যাতর্পণ, মধ্যম রহস্য, কালিকাপুরাণীয় দুর্গাপূজা পদ্ধতি, যজুর সংস্কার পদ্ধতি। সম্পাদক—কায়স্থ-পত্রিকা (১৩২৭-২৮, ১৩৩১-৩২)।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সঙ্গীতকার ও অনুবাদক। জন্ম—জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর বংশে। পিতা—গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রন্থ—বিক্রমোর্বশী (বঙ্গানুবাদ)।

গণেশ দৈবজ্ঞ—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। জন্ম—১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। পিতা—কেশব দৈবজ্ঞ। গ্রন্থ—বৃহত্তিথিচিন্তামণি, গ্রহলাঘব, তিথ্যাদিপাত্র, বুদ্ধিবিনাসিনী (টীকা)।

গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (১৮৭৫)। মহাভারত (রোহিণী সরকার সহ—১৮৭১-৭৫)।

গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীবনীসংগ্রহ, ১ম, ২য়, ভ্রমণকাহিনী, বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর, সেক্সপিয়ার গ্রন্থাবলী, সৃষ্টিবৈচিত্র্য, খোকার খেলা, বালিকা ব্রতের ছড়া, Saints of India, দার্জিলিং ও চটল, Wonders of the World, A Bengali Dictionary of Court Terms.

গণেশবিহারী মিশ্র—সম্পাদক। জন্ম—লক্ষ্ণৌ। জমীদার। সম্পাদিত গ্রন্থ—দেবগ্রন্থাবলী (শ্যামবিহারী মিশ্র সহ)।

গতিগোবিন্দ—বৈষ্ণব পদকর্তা। নিবাস—মালিহাটী। পিতা—শ্রীনিবাস আচার্য। মাতা—গৌরাঙ্গপ্রিয়া। গ্রন্থ—অন্তপ্রকাশ খণ্ড, বীররত্নাবলী।

গদাধর ন্যায়বাগীশ—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—শ্রীহট্ট। গ্রন্থ—চিন্তামণি আলোক, দীধিতিটীকা।

গদাধর দাস, কাশীদাসানুজ—কবি। জন্ম—বর্ধমান জেলায় সিঙ্গিগ্রামে ১৭শ শতাব্দীতে। পিতা—কমলাকান্ত দাস। গ্রন্থ—জগৎ-মঙ্গল (১৬৪২)।

গদাধরপ্রসাদ শর্মা, বৈদ্য—হিন্দী গ্রন্থকার। জন্ম—এলাহাবাদ। হিন্দী গ্রন্থ—ব্যাকরণ দর্শন, ব্রহ্মকুল পরিবর্তন।

গদাধর ভট্টাচার্য—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দী পাবনা জেলায় লক্ষ্মীচাপড়া গ্রামে। পিতা জীবদেবাচার্য। শিক্ষা—মিথিলা গমন করিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তৎকালে অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসিত। অতঃপর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। গ্রন্থ—কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যা, মুক্তাবলীটীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি, দীধিতিব গদাধরীব্যাখ্যা, ব্রহ্মনির্ণয়, রত্নকোসবাদরহস্য, আখ্যাতবাদ, শবকবাদ, তত্ত্বচিন্তামণ্যাবোধটীকা, প্রামাণ্যবাদ দীধিতির টীকা, মুক্তিবাদ, শব্দপ্রামাণ্যবাদ রহস্য, স্মৃতি-সংস্কারবাদ।

গদাধর সিং—হিন্দী গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬৯ খৃঃ। হিন্দী গ্রন্থ—চীন মেতেরাবস্, হমারী এডওয়ার্ড তিলক যাত্রা, রুশ জাপান যুদ্ধ, লীলাবতী রমণী, জাপানী রাজব্যবস্থা।

গদাধর সিংহ রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভোগের পথে, স্বপ্নসুন্দরী, সমাজ-শাসন।

গয়াদত্ত ত্রিপাঠি—হিন্দী গ্রন্থকার। নিবাস—এলাহাবাদ। শিক্ষা—বি. এ.। গ্রন্থ—খাদ ঔর উনকা ব্যবহার, লাখকী খেতি।

গাগা ভট্ট—পণ্ডিত। নামান্তর—বিশ্বেশ্বর ভট্ট—জন্ম—১৭শ শতাব্দী। পিতা—দিনকর ভট্ট। শিবাজীর রাজ্যাভিষেকে গাগা ভট্ট পৌরোহিত্য করেন। (৬৭৪ খৃঃ)। গ্রন্থ—কায়স্থ ধর্ম—দীপ, রাকাগম (টীকাগ্রন্থ)।

গাঙ্গেয় বিদ্যাধব—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—পঞ্চাঙ্গ বিদ্যাধরী (১৬৪৩ খৃঃ)।

গান্ধী, মহাত্মা, মোহনচাঁদ করমচাঁদ—রাজনীতিবিদ্ ও দেশনেতা। জন্ম—১৮৬৯ খৃঃ ২রা অক্টোবর। মৃত্যু—১৯৪৮ খৃঃ দিল্লী নগরীতে। বার-এ্যাট-ল, আইন ব্যবসায়, বোম্বাই হাইকোর্ট, এ্যাডভোকেট, নেটাল সুপ্রীমকোর্ট, দক্ষিণ-আফ্রিকায় এসিয়াবাসীদের বহিষ্কারের আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। বুয়র যুদ্ধের সময় সেবাদল গঠন (১৮৯৯), এশিয়াটিক ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন (১৯০৬)। কারাবাস। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন (১৯১৫), কাইজার-ই-হিন্দ পদকলাভ (১৯১৫), চম্পারণ সত্যাগ্রহ (১৯১৬), সবরমতী আশ্রম স্থাপন, অসহযোগ আন্দোলন, খদ্দর প্রচার ইত্যাদি। বেলগাঁও কংগ্রেস সভাপতি (১৯২৫), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯২৯), ডাণ্ডী লবণ আইন অমান্য অভিযান (১৯৩০), কারাবাস ও মুক্তি। গান্ধী-আরউইন চুক্তি (১৯৩১), গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান (১৯৩১), পুনরায় গ্রেপ্তার, যারবেদা জেলে বাস। পুণাচুক্তি স্বাক্ষর যারবেদা জেলে। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Award) প্রতিবাদে অনশন ও মুক্তিলাভ। ইঁহারই প্রচেষ্টায় সাইমন কমিশন ও ষ্ট্রাফোর্ড ক্রিপস মিশন ভারতে আসেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর ইনি বিভিন্ন দেশে প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। দিল্লীতে এইরূপ অনুষ্ঠানে ইনি নিহত হন। সম্পাদক—Young India, নবজীবন (হিন্দী সাপ্তাহিক) গ্রন্থ—Guide to Health, Autobiography.

গিরিজাকুমার বসু—কবি। সম্পাদক—যাদুঘর (প্রেমাঙ্কুর আতর্থী সহ—১৩৩৪—৩৭), রেণু (১৩১০)।

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়—কবি ও সাংবাদিক। মৃত্যু—১৩৪১ বঙ্গ। পিতা—যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক—সাহিত্য সমাজ (পত্রিকা), পরিচালক—বার্ত্তাবহ (সংবাদপত্র)।

গিরিজানাথ রায়—চিকিৎসক। গ্রন্থ—স্বাস্থ্যবিধান ও পথ্যবিচার, মুষ্টিযোগ ও স্বাস্থ্যকথা, ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৮ বঙ্গ, চৈত্র, বরিশালের অন্তর্বর্তী সিদ্ধিকাটি গ্রামে। মৃত্যু—১৩০৫ ২২এ ভাদ্র। শিক্ষা—বরিশাল জেলা স্কুল, এন্ট্রান্স (সিটি কলেজিয়েট স্কুল), এফ, এ ও বি, এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), বি, এল। আইন ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—গৃহলক্ষ্মী ১ম ও ২য়, বঙ্কিমচন্দ্র ১—৩ খণ্ড, হিতকথা, দম্পতীর পত্রালাপ।

গিরিজাভূষণ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রবাসী বাঙ্গালী (১২৯৫ বঙ্গ)।

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী—প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। জন্ম—১৮০৫ খৃঃ (বহরমপুর)। পৈতৃক নিবাস—মৈমনসিংহ জেলার ন'পাড়া গ্রাম। পিতা—ভবানীকিশোর চক্রবর্তী। প্রথম জীবনে ইনি চিত্রশিল্পী ছিলেন। পরে বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ইনি সঙ্গীত কলাভবনের প্রতিষ্ঠাতা, সঙ্গীত সম্মিলনীর অধ্যাপক। সম্পাদক—সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (মাসিকপত্র)।

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী। সম্পাদক—দেবালয় (১৩১৮—২০)।

গিরিজাশঙ্কর সান্যাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বেদ গবেষণা।

গিরিধর কবি—কবি। গ্রন্থ—গীতগোবিন্দ (পদ্যানুবাদ, ১৮১০ শক)।

গিরিধর দাস—পণ্ডিত। ইনি সম্রাট শাহজাহানের সমসাময়িক। মৃত্যু—১০৫০ হিঃ। গ্রন্থ—তর্জমা-ই রামায়ণ (পারস্য ভাষায় অনুবাদ—১০৩৩ হিঃ)।

গিরিধর দাস—কবি। গ্রন্থ—স্মরণমঙ্গলসূত্র (পদ্যানুবাদ)

গিরিধারী মিত্র—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—দৃগ্‌গোলবর্ণন।

গিরিবালা দেবী—ঔপন্যাসিকা। গ্রন্থ—রূপহীনা, হিন্দুর মেয়ে, মুকুটমণি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার। জন্ম—১২৫০ বঙ্গ ১৫ই ফাল্গুন কলিকাতা বাগবাজারে বসুপাড়ায়। মৃত্যু—১৩১৮ বঙ্গ ২৫এ মাঘ। পিতা—নীলকমল ঘোষ। শিক্ষা—গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল ও হেয়ার স্কুল। পিতৃবিয়োগের কিছু দিন পরে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনয় ও ম্যানেজারী। ইহার পরে ষ্টার থিয়েটারে অধ্যক্ষতা ও বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনয় করেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত শিষ্য। গ্রন্থ—মাউসি (১২৭৯), Charitable Dispensary (১২৭৯), বীবর ও দৈত্য (১২৭৯), আলিবাবা (১২৭৯), দুর্গাপূজার পঞ্চরং, (Circus pantomine—১২৭৯), যামিনীচন্দ্রমাহীনা—গোপন চুম্বন (A kiss in the dark—১২৭৯), 'সহিস হইল আজি কবিচূড়ামণি' (১২৭৯)। গীতিকাব্য :—আগমনী (১২৮৪), অকালবোধন, দোললীলা (ঐ), মায়াতরু (১২৮৭), মোহিনী-প্রতিমা (ঐ), আলাদীন (ঐ), ব্রজবিহার (ঐ), মলিনমালা (১২৮৮), হীরার ফুল (১২৯০), মলিনাবিকাশ (১২৯৬), আবুহোসেন (১২৯২), স্বপ্নের ফুল (১২৯৩), ফণীর মণি (১২৯৪), হীরক জুবিলী (১২৯৫), পারস্য প্রসূন (ঐ),

নলদার (১২৯৭), মণিহরণ (১২৯৮), নন্দদুলাল (ঐ), অভিশাপ (১২৯৯), হর-গৌরী (১৩০২), বাসর (১৩০৩)। নাট্যগ্রন্থ :—আনন্দ রহো (১২৮৮), রাবণ বধ (ঐ), সীতার বনবাস (ঐ), অভিমন্যু বধ (ঐ), লক্ষ্মণ বর্জন (ঐ), সীতার বিবাহ (ঐ), রামের বনবাস (১২৮৯), সীতাহরণ (ঐ) , পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (ঐ), দক্ষযজ্ঞ (১২৯০) ধ্রুবচরিত্র (ঐ) নলদময়ন্তী (ঐ), কমলে কামিনী (ঐ), বৃষকেতু (১২৯১), শ্রীবৎসচিন্তা (ঐ), চৈতন্যলীলা (ঐ), প্রহ্লাদ-চরিত্র (ঐ) নিমাই-সন্ন্যাস (ঐ), প্রভাসযজ্ঞ (১২৯২), বুদ্ধদেব (ঐ), বিল্বমঙ্গল (ঐ), রূপসনাতন (১২৯৩), পূর্ণচন্দ্র (ঐ), নসীরাম (১২৯৪), বিষাদ (ঐ), প্রফুল্ল (১২৯৫), হারানিধি (ঐ), চণ্ড (১২৯৬), মুকুল-মঞ্জরী (১২৯৮), জনা (১২৯৯), করমেতি বাই (১৩০১), কালাপাহাড় (১৩০২), মায়াকানন (১৩০৪), পাণ্ডবগৌরব (১৩০৬), মনের মত (১৩০৮), ভ্রান্তি (১৩০৯), সৎনাম (১৩১১), বলিদান (ঐ), সিরাজদ্দৌলা (ঐ), মীরকাশিম (ঐ), ছত্রপতি শিবাজী (১৩১৪), শাস্তি কি শান্তি (১৩১৫), শঙ্করাচার্য্য (১৩১৬), অশোক (১৩১৭), তপোবল (১৩১৮)। প্রহসন :—ভোটমঙ্গল (১২৮৯), বেল্লিকবাজার (১২৯৩), মহাপূজা (১২৯৭), সপ্তমীতে বিসর্জন (১৩০০), বড়দিনের বকশিস (ঐ), সভ্যতার পাণ্ডা (১৩০১), পাঁচ কনে (১৮৯৬), অশ্রুধারা (১৩০৯), শাস্তি (১৩০৯), আয়না (ঐ), য্যায়সা-কা-ত্যায়সা (১৩১২), ম্যাকবেথ (অনুবাদ—১২৯৯), গৃহলক্ষ্মী (অসম্পূর্ণ)।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—প্রসিদ্ধ সাংবাদিক। জন্ম—১২৩৬ বঙ্গ আষাঢ়, কলিকাতা। মৃত্যু—১২৭৬ বঙ্গ, আশ্বিন। পূর্বনিবাস—নদীয়া। শিক্ষা—ওরিয়েন্টাল সেমিনারী। The Bengal Recorder (সাপ্তাহিক পত্র) প্রতিষ্ঠা (১৮৪৯ খৃঃ)। ইহা পরে হিন্দু পেট্রিয়ট নামে রূপান্তরিত হয়। তৎকালীন The Hindu Intelligencer, Library Chronicle, The Hindoo Patriot, Mukherjee's Magazine, The Calcutta Monthly প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রসমূহে নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিতেন। গ্রন্থ—Life of Ram Dulal Dey (১৮৬৮ খৃঃ)। সম্পাদিত সাময়িক পত্র—The Bengalee (১৮৬২-১৮৬৯ খৃঃ)।

গিরিশচন্দ্র চূড়ামণি—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পার্বতী-পরিণয় নাটক (১৮৭১ খৃঃ)।

গিরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীবতত্ত্ব (১৮৬২ খৃঃ)।

গিরিশচন্দ্র দেব—কবি। গ্রন্থ—ছন্দাবলী (১৮৫২ খৃঃ)।

গিরিশচন্দ্র বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ইলিয়াদ (বঙ্গানুবাদ—১৮৩৭ খৃঃ)। সম্পাদক—সম্বাদগুণাকর (দ্বিসাপ্তাহিক—১৮৩৭)।

গিরিশচন্দ্র বসু—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮২৪ খৃঃ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মালখানা গ্রামে। মৃত্যু—১৮৯৮ খৃঃ। পিতা—শম্ভুচন্দ্র বসু। ইনি বহু সাময়িক পত্রে ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধ লেখেন। সিমলার কালীপ্রসাদ ঘোষের সাহায্যে The Hindu Intelligencer নামক একখানি সাপ্তাহিক বাহির করেন। গ্রন্থ—সেকালের দারোগার কাহিনী। সম্পাদক—শক্তি (ঢাকা হইতে প্রকাশিত), সহ-সম্পাদক—The Hindoo Patriot.

গিরিশচন্দ্র বসু—শিক্ষাবিদ্। জন্ম—১২৬০ বঙ্গ বর্ধমান জেলায় বেড়্গ্রামে। প্রতিষ্ঠাতা—বঙ্গবাসী কলেজ। গ্রন্থ—উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, ১ম, ২য় খণ্ড।

গিরিশচন্দ্র বাকৃচী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—ভিষক্দর্শন। (১৯০৫-১৪)।

গিরিশচন্দ্র নাগ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বীরু, রামমোহন ও তাঁহার মাহাত্ম্য, ডেপুটি-জীবন, মনুষ্য। Appreciation of Raja Rammohan Roy.

গিরিশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অঙ্কের দৃষ্টি।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম—১২৩০ বঙ্গ আশ্বিন মাসে ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩১০ বঙ্গ ১৭ই অগ্রহায়ণ। পিতা—রামধন বিদ্যাবাচস্পতি। শিক্ষা—সংস্কৃত কলেজ। পুস্তকাধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ (১৮৪৪-১৮৮২ খৃঃ)। গ্রন্থ—দশকুমারচরিতের বঙ্গানুবাদ (১৮৫৬), বিধবা-বিষম-বিপদ (১৮৫৮), শব্দসার (অভিধান ১৮৬০), উৎকট বিধান (১৮৭০), মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ। (ঢাকা—১৮৭১), মুগ্ধবোধসার (১৮৮১, কাদম্বরী কথা (১৮৮৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ—রঘুবংশ (সঞ্জীবনী টীকাসহ—১৮৫২)।

গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বেশ্যাগাইড (The Prostitute's Act, ১৮৬৯)। নিরিক সংক্রান্ত নজীর (১৮৭০)।

গিরিশচন্দ্র সেন, মৌলবী, ভাই—প্রচারক। জন্ম—১৮৩৬ খৃঃ ঢাকা জেলায়। মৃত্যু—১৯১২ খৃঃ। পিতা—মাধবরাম সেন রায়। বাল্যকালেই ইনি সংস্কৃত ও ফার্সী অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৫ খৃঃ ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন, সাধু অঘোরনাথ প্রভৃতির সাক্ষাৎ লাভে ব্রাহ্ম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন। পরে ইনি নব বিধানের মৌলবী নামে অভিহিত হইতেন। গ্রন্থ—ধর্ম ও নীতি (১৮৭১ খৃঃ)। হিতোপাখ্যান (গোলস্তান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ), বনিতা-বিনোদ, হাদিস, মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত ইস্লাম ধর্ম (১৩২৭), এমাম হসন ও হোসয়ন (১৮৫৩ শক), কোরাণসরিফ (বঙ্গানুবাদ, ১২৯৮), চারিজন ধর্মনেতা (১৩০৭), তাপসমালা (১৯৩২)। সম্পাদক—বঙ্গবন্ধু (পত্রিকা, ঢাকা), মহিলা (১৩০৩-১৭)।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৫৭ খৃঃ ১৮ই আগষ্ট। মৃত্যু—১৯২৪ খৃঃ ১৪ই আগষ্ট। স্বামী—বহুবাজার-নিবাসী অক্রুরচন্দ্র দত্ত বংশের নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। গ্রন্থ—অশ্রুকণা, ভারত কুসুম, সন্ন্যাসিনী, শিখা (১৩০৩), অর্ঘ্য (১৩০৯) আভাষ (১২৯৭), সিন্ধুগাথা (১৩১৪), স্বদেশিনী (১৩১২)। সম্পাদিকা—জাহ্নবী (১৩১৪-১৫)।

গিরীন্দ্রশেখর বসু—মনস্তত্ত্ববিদ্ ও চিকিৎসক। গ্রন্থ—পুরাণ প্রবেশ (১৩৪১), লালকালো, স্বপ্ন।

গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—(নীলমণি বসাক সহ) পারস্য ইতিহাস (১২৫৫ বঙ্গ)।

গুণচন্দ্র গণি—জৈন আচার্য। গ্রন্থ—মহাবীরচরিত।

গুণমতি—দার্শনিক পণ্ডিত। গ্রন্থ—অভিধর্ম কোষভাষ্য (৬৩০-৬৪০ খৃঃ)।

গুণরত্ন—বৌদ্ধ পণ্ডিত। ১৪ শতাব্দী। টীকাগ্রন্থ—ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের টীকা।

গুণাকর—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—হোরামকরন্দ (১৭৯৬ খৃঃ)।

গুণাঢ্য—গ্রন্থকার। জন্ম—১ম, ২য় শতাব্দীতে মছলীপত্তনে। অন্ধ্ররাজ হাল সাতবাহনের প্রধান মন্ত্রী। গ্রন্থ—বৃহৎকথা।

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ—টীকাকার। জন্ম—১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে। গ্রন্থ—অনুমানদীধিতি টীকা, গুণবৃত্তিবিবেক, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-বিবেক, ন্যায় লীলাবতী প্রকাশ, দীধিতি বিবেক, শব্দালোক বিবেক।

গুণানন্দ সেন—কবি। গ্রন্থ—মনসার ভাসান।

গুণাভিরাম বড়ুয়া, রায় বাহাদুর—গ্রন্থকার। জন্ম—আসামে কামরূপ জেলায়। মৃত্যু—১৮৯৪ খৃঃ। গ্রন্থকার—আসাম বুরুঞ্জী (আসামের ইতিহাস)।

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অনুবাদক। জন্ম—১৮০০ খৃঃ বিখ্যাত ঠাকুরবংশে। পিতা—মহারাজা রমানাথ ঠাকুর। গ্রন্থ—বিক্রমোর্বশী (বঙ্গানুবাদ)।

গুরুচরণ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রেমামৃত।

গুরুচরণ রায়—সাংবাদিক। সম্পাদক—রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক—১৮৪৭ খৃঃ)। ইহা রঙ্গপুরের প্রথম সাপ্তাহিক।

গুরুদয়াল চৌধুরী—সাংবাদিক। সম্পাদক—মুর্শিদাবাদ সম্বাদ-পত্রী (সাপ্তাহিক—১৮৪০)।

গুরুদাস গুপ্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—বিক্রমপুরের রাজগ্রামে। গ্রন্থ—মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবনচরিত (কাব্য)।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর—শিক্ষাবিদ্ ও বিচারপতি। জন্ম—১৮৪৪ খৃঃ কলিকাতার উপকণ্ঠে নারিকেলডাঙ্গায়। মৃত্যু—১৯১৮ খৃঃ ডিসেম্বর। পিতা—রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এম-এ (১৮৬৫), বি-এল, ডি, এল, পি, এইচ, ডি। অধ্যাপক—বহরমপুর কলেজ, প্রেসিডেন্সী, জেনারেল এ্যাসেমব্লী। আইন ব্যবসায়—কলিকাতা হাইকোর্ট (১৮৭২), ঠাকুর আইন অধ্যাপক (১৮৭২), বিচারপতি (১৮৮৮—১৯০৪), ভাইস চান্সেলর (১৮৮৯—১৮৯৩)। গ্রন্থ—জ্ঞান ও কর্ম। The Elements of Arithmetic, Hindu Law of Marriage & Stridhan (১৮৭৯), A few thoughts of Education (১৯০৪), A note on the Debnagri Alphabets (১৮৯৩), Elementary Geometry (১৯০৭)।

গুরুনাথ বিদ্যানিধি—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। সম্পাদিত গ্রন্থ—ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি (১৩১৮ বঙ্গঃ), ভাষা-পরিচ্ছেদ (১৩১৭), কুমারসম্ভব (১৩১৭), ভট্টিকাব্যম্ (১৮৩৩ শক), রঘুবংশ (১৮৩২ শক), কলাপ ব্যাকরণম্ (১৩১৩), শব্দরূপকল্পদ্রুম (১৩১৬), অমরকোষ টীকা (১৩১০), মিত্রলাভ (১৩২৪), কৃদ্‌বৃত্তি, কোষসংগ্রহ, বিদ্বখোদিতবঙ্গিণী।

গুরুনাথ সেনগুপ্ত—কবি। গ্রন্থ—বীবোত্তর কাব্য (১২৯০)

গুরুপ্রসাদ সেনগুপ্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—পাবনা জেলার ভাদ্দাবাড়ী গ্রামে। মুন্সেফ। গ্রন্থ—পদচিন্তামণিমালা (কীর্ত্তনগ্রন্থ, ১২৮৩ বঙ্গ)

গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। অনুবাদ গ্রন্থ—রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, স্বপ্নবাসবদত্তা, চণ্ডকৌশিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ, উত্তরচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, মালতীমাধব, মহাবীরচরিত, বেণীসংহার, মৃচ্ছকটিক, বালচরিত, মধ্যমাব্যোগ, চারুদত্ত, দূতকাব্য, দূত-ঘটোৎকচ, অভিসারক, কর্ণবধ, পঞ্চরত্ন।

গুরুসদয় দত্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—শ্রীহট্ট জেলায়। পিতা—রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী। আই, সি, এস্। ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্ত্তক। গ্রন্থ—সরোজনলিনী, পাগলামীর পুঁথি, ভজার বাঁশী, চাঁদের তুড়ি।

গোকুলচাঁদ শর্ম্মা—হিন্দী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রাণবীর প্রতাপ (১৯১৫)।

গোকুলচন্দ্র ভবন—জ্যোতির্বিদ্। নিবাস—জয়পুর। গ্রন্থ—ভারতীয় জ্যোতিষ যন্ত্রালয়, ভেদপাঠ প্রদর্শক।

গোকুলচন্দ্র নাগ—সাহিত্যিক। ডক্টর কালিদাস নাগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। গ্রন্থ—পথিক, ঝড়ের দোলা, মায়াকুসুম। সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা—কল্লোল (মাসিক পত্র)।

গোকুলনাথ—বৈষ্ণব ভক্ত। গ্রন্থ—চৌবাশি বার্ত্তা, (ভক্তদের জীবন কাহিনী—১৫৬৮ খৃঃ)।

গোকুলমোহন রাধনী—হিন্দী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দেশভক্ত লাজপৎ রায়, শিব নবতি, নিত্যদর্শন, দেশ কা ধন।

গোকুলানন্দ সেন—গ্রন্থকার। নামান্তর—'বৈষ্ণব দাস। জন্ম—১৮শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীর অন্তর্গত টেঞা গ্রামে। পিতা—ব্রজকিশোর সেন। গ্রন্থ—পদকল্পতরু (সংকলন), গুরুকুল পঞ্জিকা।

গোখেল, গোপালকৃষ্ণ—রাজনৈতিক নেতা ও অর্থশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত। জন্ম—১৮৬৬ খৃঃ বোম্বাই প্রদেশে কোলাপুর নামক স্থানে। মৃত্যু—১৯১৫ খৃঃ ১৯এ ফেব্রুয়ারি। শিক্ষা—বি, এ (১৮৮৪), অধ্যাপক, ফার্গুসন কলেজ। সভাপতি, জাতীয় মহাসভা, বারাণসী (১৯০৫)। সম্পাদক—সুধাকর (ইঙ্গ-মরাঠি সাপ্তাহিক), সর্বজনীন সভা।

গোপবন্ধু দাস—দেশহিতব্রতী নেতা। মৃত্যু—১৯২৮ খৃঃ। সম্পাদিত সাময়িক পত্র—সমাজ।

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ—কবি। জন্ম—১৮৫০ (আনু) মালদহ শহরে। পিতা—হরচন্দ্র ঘোষ। শিক্ষা—বি, এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), বি, এল (১৮৭৬), হাইকোর্টে ওকালতী, মুন্সেফ (১৮৮২)। গ্রন্থ—কুসুমমালা (১৮৭৭), ব্রহ্মচারী (কাব্য)।

গোপালকৃষ্ণ মিত্র—সাংবাদিক। সম্পাদক—ভারত-সংস্কারক (সাপ্তাহিক—১২৮০-৮১)।

গোপাল চক্রবর্ত্তী—কবি। গ্রন্থ—ভার্গববিজয় কাব্য (১২৮০)।

গোপালচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মনোবিজ্ঞান (১৮৭৪)।

গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—টীকাকার। গ্রন্থ—গোয়ীচন্দ্র সংক্ষিপ্তসারের টীকা।

গোপালচন্দ্র দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সুলোচনা অথবা আদর্শ-ভার্য্যা (১২৮৯)।

গোপালচন্দ্র দে—সাংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদ-মনোরঞ্জন (সাপ্তাহিক—১৮৪৭)।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হেমাঙ্গিনী বা অদ্ভুতাভিনয় (১৮৯৫), শিক্ষাপ্রণালী।

গোপালচন্দ্র মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পদ্যপুষ্পহার (১৮৭২)।

[ক্রমশঃ।

আমাদের লোকসাহিত্যে নারী

শ্রীকামিনীকুমার রায়

মেয়েলী ব্রতের ছড়া ও ব্রতকথা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। সেকালে আমাদের নারীদের আদর্শ কি ছিল, কি আদর্শে তাঁহারা আপনাদিগকে গড়িয়া তুলিতেন, জীবনে কি তাঁহারা কামনা করিতেন, মেয়েলী ব্রতের অনেক ছড়াতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসে কুমারীরা 'হরির চরণ' ব্রত করে; ব্রতের ফল তাহারা কি চায়?—

"রাজ্যেশ্বর স্বামী চায়।
দরবার-জোড়া বেটা চায়।
সভাসুন্দর জামাই চায়।
ঘরণী গৃহিণী বউ চায়।
সর্ব্ব-সুন্দরী কন্যা চায়।
আলনায় কাপড় দলমল করে।
ঘরের বাসন ঝকমক্ করে।
গোয়ালে গোরু মরায়ে ধান।
বছর বছর পুত্র পান।
না দেখেন স্বামি-পুত্রের মরণ।
না দেখেন বন্ধুবান্ধবের মরণ।
এক হাঁটু গঙ্গার জলে মরে।
পায় যেন হরির চরণ।"

এই ছড়াটিতে সেকালে নারীরা কি কামনা করিতেন, কি পাইলে তাঁহারা জীবনে সুখী হইতেন, তাহারই একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন নারীরা শুধু স্বামি-পুত্রের মঙ্গলই কামনা করিতেন না, বন্ধু-বান্ধবও দীর্ঘায়ু হউক, ইহা চাহিতেন।

'দশপুত্তল' ব্রতের একটি ছড়ায় সেকালে নারীরা কি আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বালিকা-বয়স হইতেই আপনাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতেন, তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মাটিতে দশটি পুতুল আঁকিয়া, এক-একটি পুতুলে হাত রাখিয়া বালিকা বলে:—

মরিয়া মনুষ্য হব, রামের মত পতি পাব।
" " " সীতার মত সতী হব।
" " " লক্ষ্মণের মত দেবর পাব।
" " " দশরথের মত শ্বশুর পাব।
" " " কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।
" " " কুন্তীর মত পুত্রবতী হব।
" " " দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব।
" " " দুর্গার মত সোহাগী হব।
" " " পৃথিবীর মত ভার সব।
" " " ষষ্ঠীর মত জেঁওচ হব।

এই কামনার বস্তুগুলিকে সেকালের বলিলাম এই জন্য যে, একালের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-ভাসুর পরিবৃত একান্নবর্ত্তী পরিবার একালের অনেক নারীই পছন্দ করেন না; দ্রৌপদীর মত রাঁধুনীও তাঁহারা হইতে চান না, ঠাকুর-চাকরের উপর এই কাজটির ভার চাপাইতে পারিলেই যেন তাঁহারা সুখী হন।

সেকালে নারী-জীবনের আর একটি কামনা ছিল,—'সতীন যেন হয় না।' সর্ব্বকালেরই নারীদের ইহা অন্তরের কথা। কারণ, "স্ত্রীলোক ভাগের প্রেম চায় না, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের ন্যায়-অন্যায় বিচার থাকে না।" সপত্নী-কলহে কত সুখের সংসার যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, সপত্নীর দুষ্কৃতি ও দুর্ব্যবহারে কত অভিজাত পরিবারে কত সাধ্বীর যে নয়ন-জল ঝরিয়াছে, আমাদের লোকসাহিত্যে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সে যুগে এক পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আবার বার বার দারপরিগ্রহ করা যেন ধনী এবং কুলীন স্বামীদের একটা নেশা ছিল। এই নেশার ঘোরে তাঁহারা সংসারের আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিতেন। রাষ্ট্র ও সমাজ তখন এই ক্ষেত্রে নীরব ছিল। তাই স্ত্রী নিজেই অনেক সময় নানা অনুষ্ঠান-অভিচারের ভিতর দিয়া স্বামীকে বশে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। প্রাচীন সাহিত্যে আমরা ডাইনীদের অনেক তুক্-তাকের কথা পাই, কিন্তু নারীদের এই বৃত্তি অবলম্বনের জন্য তখন পুরুষেরাই দায়ী ছিল। তাহারাই সাধ্বীর চক্ষে নিজ হস্তে শলাকা বিদ্ধ করিয়া, দরদীর মত জিজ্ঞাসা করিত, "তোমার চোখে জল কেন? তুমি কি কেঁদেছ?" কোন কোন ব্রতের ছড়ায় সপত্নীর প্রতি মনোভাবটি, দেখুন, কেমন উলঙ্গ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে!

১। পাখি, পাখি, পাখি।
সতীনকে গঙ্গায় নিয়ে যায়।
আমি ঘাটে বসে দেখি॥
২। উদ্‌বেড়ালি উং যা।
স্বামী রেখে সতীন খা॥
৩। অশ্বত্থতলায় বাস করি।
সতীন কেটে নিম্মূল করি॥
সাত সতীনের সাত কৌটা।
তার মাঝে আমার এক অব্‌ভরের কৌটা।
অব্‌ভরের কৌটা নাড়িচাড়ি।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি।

একে একে সাতটি সতীন যিনি আনিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সাধ্বী কি না আবার তাঁহারই দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছেন! স্বামীর বিরুদ্ধে এতটুকু অভিযোগও নাই। ভারতীয় নারীর পক্ষেই ইহা সম্ভব।

ব্রতকথাগুলির ভিতর আমরা নারীর এক কল্যাণময়ী মূর্তির সাক্ষাৎ পাই। বালিকা-বয়স হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কত কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়া তাঁহারা চলিয়াছেন। কিসে স্বামি-পুত্রের মঙ্গল হইবে, কিসে গৃহ-সংসারের সকলের উন্নতি হইবে,—তাঁহাদের কেবলই এই চিন্তা। আজ শনির উপবাস, কাল রবির; আজ ষষ্ঠী, কাল মঙ্গলচণ্ডী; আজ বনদুর্গা, কাল সুবচনী। ব্রতানুষ্ঠানের তাঁহাদের অন্ত নাই। শুদ্ধ মনে, শুদ্ধ বসনে, কত নিয়মে, কত কি উপকরণে জীবনভর তাঁহারা এই সকল করিয়া যান। স্বামী চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্যে যাত্রা করিয়াছেন, স্ত্রী গৃহকোণে বসিয়া একমনে মঙ্গলচণ্ডীকে

ডাকিতেছেন। পুত্র প্রবাসে আছে, মা বাড়ী থাকিয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছেন! তবে কি ছেলে তাঁহার ভাল নাই? তাড়াতাড়ি মানত করিলেন, 'মা সুবচনী, ছেলে আমার ভাল আছে জানিলে কালই তোমায় পান-সুপারি দিয়া পূজা করিব।' জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্যষষ্ঠী ব্রত, মা ষষ্ঠীর ঘটে জলের ছিটা দিতে দিতে বলিতেছেন :—"জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্য ষাট্। ফিরে ঘরে এলো ষাট্। বার মাসে তের ষাট্। ষাট্ ষাট্ ষাট্। ঝি চাকর, গোরু-বাছুর, পশু-পক্ষী, কর্ত্তা, ছেলে-মেয়ে, বউ-ঝি, নাতি-নাতনী, ষাট্ ষাট্ ষাট্।" এখানে নারীর নিজের জন্য কোন প্রার্থনা নাই, অপর সকলের মঙ্গলেই তাহার মঙ্গল। লোকচক্ষুর অন্তরালে, নীরবে নিভৃতে কত যুগ ধরিয়া নারীরা এইরূপে আমাদের কল্যাণ সাধনায় ব্যাপৃতা আছেন; ব্রতানুষ্ঠান ও ব্রতকথাগুলি তাহারই সাক্ষ্য দান করে।

শিবদুর্গা-বিষয়ক গীতিগুলিতে, বিশেষ করিয়া আগমনী ও বিজয়া গানে, অনেক ছেলেভুলানো ছড়ায় আমরা আমদের সেকালের নারীসমাজের অন্তর্বেদনার একটা করুণ চিত্র দেখিতে পাই। বাংলায় মুসলমান রাজত্বের পূর্ণ আধিপত্যের কালে নিতান্ত ঠেকায় পড়িয়া আমাদের সমাজে 'অষ্টম বর্ষে গৌরীদান'-প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। সেই বয়সে স্নেহের পুত্তলিকে দূরে পরের গৃহে পাঠাইয়া জননীর অন্তর্জ্বালার সীমা থাকিত না। সংসারের প্রতি কাজে—শয়নে-ভোজনে-উপবেশনে সর্ব্বদা তিনি একটা শূন্যতা অনুভব করিতেন। তখনকার সমাজ-ব্যবস্থায় সুপাত্র প্রায়ই মিলিত না। কন্যাটি হয়তো সুন্দরী, সুশিক্ষিতা এবং গৃহকর্ম্মে নিপুণা। কিন্তু তাহার ভাগ্যে মিলিয়াছে একটি দরিদ্র কি মূর্খ স্বামী; তিনি বৃদ্ধ, মৃতদার কিংবা বহুদারও হইতে পারেন। যোগ্যতার মধ্যে তাহার হয়তো আছে বল্লালী কৌলিন্যের গর্ব্ব, আর একান্নবর্ত্তী পরিবারে কাহারও উপর নির্লজ্জ নির্ভরশীলতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরূপ পাত্রে বিবাহ দিয়া মা জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেন। প্রতিবেশীদের মুখে, ফকির-বৈষ্ণবদের কাছে মা মেয়ের সুখ-দুঃখের কথা, তাহার শ্বশুর-বাড়ীর অবস্থা-ব্যবস্থার কথা শুনিতেন। সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে বলিলেও মাতৃহৃদয়ে দুঃখ-কষ্টের চিত্রটাই বড় হইয়া দেখা দিত। মেয়েকে একটি বার দেখিবার জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত; তিনি স্বামীকে অনেক বলিয়া-কহিয়া পাঠাইতেন, মেয়েকে আনিতেন। কিন্তু আনিয়াও কি বেশি দিন রাখিতে পারিতেন? পারিতেন না। আগমনী ও বিজয়া গানে বাঙ্গালী-গৃহের সেকালের এই করুণ চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা কেমনে রয়েছে!
আমি শুনেছি শ্রবণে নারদ বচনে
মা মা বলে উমা কেঁদেছে।
ভাঙ্গেতে ভাঙ্গড় পীরিতি বড়,
ত্রিভুবনের ভাঙ্গ করেছে জড়
ভাঙ্গ খেয়ে ভোলা হয়ে দিগম্বর
আমার উমারে কত কি বলেছে।
উমার বসন ভূষণ যত আভরণ
তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে।"

এই সকল গানের মধ্যে শিব ও উমা দেবত্ব ও দূরত্ব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের একান্ত আপনার মানুষ—আদরের ধন জামাতা ও কন্যারূপে স্থান লাভ করিয়াছেন। আর মেনকা কন্যাবিরহকাতরা সমস্ত বঙ্গজননীর স্নেহ ও বাসনা-ব্যাকুলতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।

আট-নয় বৎসরের বালিকারাও যখন পিত্রালয়ের স্নেহ-শীতল সংস্পর্শ, আশৈশব পরিচিত সঙ্গি-সাথী, পাড়া-প্রতিবেশী, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত স্বামিগৃহে যাইত,—নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে, বিভিন্ন-রুচি লোকদের লইয়া, সম্পূর্ণ নূতন ভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিত, তখন তাহাদেরও কি অন্তর্বেদনা কম হইত? লোকসাহিত্যে তাহাও ধরা পড়িয়াছে। নব-পরিণীতা অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীকে লইয়া সূর্য্যাই ঠাকুর নিজ দেশে যাত্রা করিতেছেন। গৌরী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মায়ের আঁচল ধরিতেছে, আর কাঁদিতেছে,—সে যাইবে না। মা সাশ্রুনেত্রে প্রবোধ দিতেছেন—

"টাকা নয় রে কড়ি নয় রে কোচরে রাখিব।
পরের লাগ্যা হৈছে গৌরা পরেরে সে দিব।"

যাত্রাকাল আসন্ন হইয়া আসিল, গৌরী ব্যাকুল স্বরে বলিতে লাগিল,—'ওগো আমার "মাও ধন বাপ ধন", তোমরা কি আমাকে রাখিতে পার না?' মা উত্তর দিতেছেন, 'হায়! সভার মধ্যে পণের টাকা গণিয়া লইয়াছি, কিরূপে তোকে রাখিব।'

সূর্য্যাই ও গৌরী নৌকায় নদীপথে ভাসিয়া চলিয়াছে; মা বাপ ভাই বোন্ সকলের কান্না তখনো গৌরীর কানে আসিয়া পৌছিতেছে। সে মাঝিদের মিনতি করিয়া বলিতেছে :—

"ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাও রে মাঝি-ভাই মায়ের কাঁদন শুনি।
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাও রে মাঝি-ভাই ভাইয়ের কাঁদন শুনি।
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাও রে মাঝি-ভাই বুইনের কাঁদন শুনি।"

সেকালের অধিকাংশ 'গৌরী'কেই এইভাবে পিত্রালয় ছাড়িয়া যাইতে হইত। স্বামিগৃহে গিয়া সে যে প্রায়ই শান্তি-স্বস্তি পাইত না,—

"হাড় হ'ল ভাজা ভাজা, মাস হ'ল দড়ি
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।"

এই সকল ছড়ার ভিতরই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আদরের দুলালীর কপালে অনেক সময় 'বুড়ো' বর' জুটিত, মাতাপিতা উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারই হস্তে তাহাকে দান করিতেন। বড় জ্বালায় বড় দুঃখেই কন্যার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল :—

* * * *

"চোখ খাও গো বাপ মা, চোখ খাও গো খুড়ো
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক-খেগো বুড়ো
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে বুড়ো মরে কেশে
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো ম'রে রয়েছে
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেচে।"

ছড়ার রাজ্য অতিক্রম করিয়া এইবার আমরা লোকসাহিত্যের রূপকথা ও পল্লীগাথা অধ্যায়ে প্রবেশ করিব।

রূপকথা এবং পল্লীগাথা বা 'পালাগান'—এইগুলির মধ্যে আমরা নারীর এক অত্যুজ্জ্বল প্রেমময়ী মূর্ত্তির সম্মুখীন হই। এ প্রেমের বুঝি তুলনা নাই। যে একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় সীতা-সাবিত্রী ভারতীয়দের চিরপূজ্যা হইয়া আছেন, রূপকথা এবং পালাগানের নায়িকারা তাঁহাদেরই সগোত্রা। কাহারো ক্ষেত্রে কখনো বা মনে হয়, তিনি বুঝি সাধন-পথে সীতা-সাবিত্রীকেও অতিক্রম করিয়া গেলেন! অনেক স্থলেই দেখা যায়, বিবাহের মন্ত্র পড়িয়াই হউক, কিংবা হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুরাগ বশতঃই হউক, নারী একবার যাহাকে হৃদয় দান করিয়াছে, সেই দত্ত-হৃদয়ের ডালি লইয়া সে দ্বিতীয় বার আর কাহারো দ্বারে উপস্থিত হয় নাই। প্রলোভন আসিয়াছে শত বার শত পথে। রাজা, রাজৈশ্বর্য্য তাহার পায় লুটাইয়া পড়িয়াছে; মাতা-পিতা, আত্মীয়-বন্ধু, সমাজ—সকলে সসম্মানে তাহাকে আহ্বান করিয়াছে, কিন্তু সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করে নাই। যাহাকে সে একবার হৃদয়েশ্বররূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সুখে-দুঃখে, সুদিনে-দুর্দ্দিনে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় তাহারই সে অনুগত রহিয়াছে, তাহারই ধ্যানে জীবন ভোর করিয়া দিয়াছে। পুরুষ প্রায়ই ইহাদের ভালবাসার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই, রক্ষা করে নাই; সে সহজেই অন্যগামী হইয়াছে, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। কিন্তু নারী তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় শত প্রতিকূলতার মধ্যেও গৌরীশৃঙ্গের মতই অচল রহিয়াছে। কখনো বা কাহারো জীবনে আসিয়াছে প্রবল পরাক্রান্ত লম্পটের দুর্ব্বিষহ অত্যাচার, কখনো কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে কুচক্রী সপত্নীর অশ্রান্ত উৎপীড়ন, কেহ বা লাভ করিয়াছে সমাজ ও আত্মীয়-বান্ধবের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা। কিন্তু কোন প্রতিকূল শক্তিই ইহাদের কাহাকেও একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা হইতে টলাইতে পারে নাই। সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, এমন কি স্বামীর ইষ্টের জন্য স্বামি-স্বত্ব পর্য্যন্ত সপত্নীকে চিরতরে দান করিয়া দিয়াছে; কিন্তু ভালবাসা ত্যাগ করে নাই, হৃদয়-মন্দিরে অতি সাবধানে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিয়াছে। অসীম বিপদেও ইহারা ধৈর্য্য হারায় নাই, বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করিয়াছে, যেখানে সফল হয় নাই আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে, তবু অবাঞ্ছিতকে আত্মদান করে নাই। অনেক স্থলে ইহারা শুধু আত্মরক্ষাই করে নাই, অত্যাচারীকে সমুচিত শাস্তি দিতেও বদ্ধপরিকর হইয়াছে, শাস্তি দিয়াছে। অদ্ভুত ইহাদের প্রত্যুৎপন্নমতি, অদ্ভুত ইহাদের উদ্ভাবনী শক্তি, অপূর্ব্ব ইহাদের নারীত্বের মর্য্যাদা-বোধ!

লোকসাহিত্যের এই রূপকথা ও পল্লীগাথা-ভাণ্ডারে যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত প্রবেশ করিবেন, দেখিবেন কি অমূল্য সম্পদ ইহাতে নিহিত আছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশ এই সম্পদের অধিকারী হইলে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। আমরা এক সীতা-সাবিত্রী লইয়া গর্ব্ব করি, কিন্তু এই ভাণ্ডারে কত শত সীতা-সাবিত্রীর পদচিহ্ন পড়িয়া আছে! এখানে দুই-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব।

কাঞ্চনমালা একটি রূপকথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'য় ইহা স্থান পাইয়াছে। রূপকথায় অতিপ্রাকৃত কিছু থাকিবেই; কিন্তু সেগুলি অগ্রাহ্য করিয়াও আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা খাঁটি সোনা,—আমাদেরই ঘরের এককালের প্রতিচ্ছবি। 'কাঞ্চনমালা'য় আমরা কি দেখিতে পাই?

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এক সদাগর পাছে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হয় এই আশঙ্কায় ছয় মাসের এক অন্ধ শিশুকে আনিয়া স্বীয় কন্যা কাঞ্চনমালার হাতে তুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—

"আজি হৈতে এই পুত্র পালন কর তুমি।
কপালে আছিল তোমার অন্ধ ছাওয়াল স্বামী ॥"

কি ভীষণ কথা! পিতা হইয়া কন্যার প্রতি কি দারুণ নিষ্ঠুরতা! পিতার নিকট কন্যার কোনই মূল্য রহিল না, কন্যাকে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি তাঁহার চৌদ্দ ডিঙ্গা রক্ষা করিলেন।

অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাঞ্চনমালা আপনার অদৃষ্টকে স্বীকার করিয়া লইলেন, তিনি বলিলেন,—

"বাপেরে বা দোষী কেন কপাল হইল বুড়া।
সাক্ষী হও চন্দ্রসূর্য্য আসমানের তারা ॥
কোলের মধ্যে সাক্ষী হও অন্ধ ছাওয়াল স্বামী।
আজি হইতে অন্ধের তুমি যে সোয়ামী ॥"

যুগে যুগে ভারতীয় নারীরা পাতিব্রত্যের এইরূপ আদর্শই দেখাইয়া আসিতেছেন। রূপকথার নায়িকা হইলেও 'কাঞ্চন' তাঁহাদেরই সগোত্রা। তিনি সেই রাত্রিতেই অন্ধ শিশু স্বামীকে লইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন এবং এক নিঃসন্তান কাঠুরিয়ার গৃহে স্থান পাইলেন। অচিরেই এক সন্ন্যাসি-প্রদত্ত ফল খাওয়াইয়া কাঞ্চনমালা তাঁহার শিশু-স্বামীর অন্ধত্ব ঘুচাইলেন। তাঁহার প্রতিদিনের সেবা-যত্নে শিশু অপূর্ব্ব সুন্দর হইয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কাঞ্চন কাঠুরিয়া-বধূদের সঙ্গে বনে যান, ভাল ভাল বনফল তুলিয়া আনেন, শিশু-স্বামীকে সযত্নে খাওয়ান। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহার ইহাতেও বাদ সাধিল। এক দিন এক অত্যাচারী রাজা মৃগয়ায় আসিয়া ছয় বৎসরের সেই শিশুকে কাঠুরিয়ার আলয় হইতে জোর করিয়া লইয়া গেল। কাঞ্চনমালার দুঃখের নদী উজান বহিতে লাগিল।

বৎসর যায়, বৎসর আসে, কিন্তু সেই শিশুর কোনই সন্ধান মিলে না। বহু কষ্টে বহু দেশ পার হইয়া কাঞ্চনমালা শেষে 'সুমাই নগরে' গিয়া উপনীত হইলেন। সহসা একদিন শুনেন, সেই নগরের রাজা বিদ্যাধর কন্যা কুঞ্জলতার জন্য এক জন দাসী চাহিয়া ঢোল পিটাইতেছেন। পথে-প্রান্তরে চলার কষ্ট কাঞ্চনের আর সহ্য হইতেছিল না। তিনি অগত্যা রাজকন্যার দাসী হইয়া রাজ-অন্তঃপুরে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

রাজা বিদ্যাধর কাঞ্চনমালার শিশু স্বামীকে অপহরণ করিয়া আনিয়া যথাসময়ে স্বীয় কন্যা কুঞ্জমালাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সপত্নী কুঞ্জমালারই কাঞ্চন এখন দাসী। কিন্তু সুচতুরা রাজকন্যা অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিয়া লইল, সে যাহাকে দাসী করিয়া ঘরে আনিয়াছে, সে তাহার সপত্নী এবং এই সপত্নীর জন্য তাহার স্বামীর মন অহর্নিশ ঝুরিতেছে! সপত্নীকে বরদাস্ত করা সহজ নহে। অশেষ ক্লেশশালিনী রমণীরাও এই পরীক্ষায় প্রায়ই উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। কুঞ্জমালাও পারিল না। তাহার মনে হইল—ভোলা বাস করা, আর সাপের সহিত বাস

আমার উমারে ক
উমার বসন ভূষণ ... টা ফুটে গায়।
তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়ে... নাহি পায় ॥

ঘরেতে আগুন লাগলে পুইড়া করে ছাই।
সতীন থাকিলে ঘরে জন্মে সুখ নাই ॥"

সপত্নীর প্রতি এইরূপ মনোভাব আমরা মেয়েলী ব্রতের কয়েকটি ছড়ায়ও ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছি। কুঞ্জমালা শীঘ্রই মায়ের সহিত যুক্তি করিয়া কাঞ্চনমালাকে ডাকিনী প্রতিপন্ন করিল এবং রাজপ্রাসাদ হইতে তাড়াইয়া দিল। কিন্তু কুঞ্জমালার ইহাতে মনোবাসনা পূর্ণ হইল না, স্বামীর সোহাগ হইতে সে একেবারে বঞ্চিত হইল, কারণ নির্ব্বাসিতা কাঞ্চনমালার জন্য রাজকুমারও আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চক্ষু গেল, আবার তিনি অন্ধ হইলেন।

ওদিকে কাঞ্চনমালা আবার সেই সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন। সন্ন্যাসী এবার তাঁহাকে বিরাট প্রাসাদ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। এই প্রাসাদেই শেষে এক দিন অন্ধ স্বামীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। কাঞ্চন এতটুকু ক্ষোভ বা অভিমান প্রকাশ করিলেন না, কায়মনোবাক্যে অন্ধ স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ছয় মাস যায়, সন্ন্যাসী দেশ ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কাঞ্চনমালা কাঁদিয়া তাহার পায় পড়িলেন, বলিলেন, "তুমি আমার স্বামীকে চক্ষুদান কর; রাজ্য-ধন আমি কিছুই চাই না, তবু যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও, আমাকে অন্ধ করিয়া স্বামীকে ভাল করিয়া দাও।"

"ধন রাজ্য নাহি চাই করহ আছান।
আমায় অন্ধ কইরা কর স্বামীর নয়ন দান ॥"

সন্ন্যাসী মাথা নাড়িলেন, যেন রাজ্য-ধন অতি তুচ্ছ—অনেকেই করিতে পারে। স্বামীর সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিলে অন্ধ হইয়া থাকাও যেন কিছু নয়! সন্ন্যাসী দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা কর, আমি যাহা বলি তাহাই করিবে।" স্বামী চক্ষু পাইবেন, স্বামীর জীবন সুখের হইবে, ইহার জন্য কাঞ্চনের কি না করিবার আছে? তাঁহাকে যাহাই করিতে বলা হইবে, তাহাই তিনি করিবেন।

সন্ন্যাসী কাঞ্চনমালার হাতে একটি ফল দিয়া কহিলেন, "এই ফলটি লও, ইহা দ্বারা তোমার স্বামী চক্ষু ফিরিয়া পাইবে। কিন্তু শুন, সে-স্বামীর উপর তোমার কোন স্বত্ব থাকিবে না, এই ফলটির সহিত সর্ব্বস্বত্ব তোমার সতীন কুঞ্জমালাকে দান করিতে হইবে। এখানেই শেষ নয়, আরও শুন, দান করিবার সময় অন্তরে যদি বিন্দুমাত্রও ব্যথা জাগে, চোখের কোণে জল দেখা দেয়, হাত কাঁপে, বুক দুরদুর করে, কিংবা একটি দীর্ঘশ্বাসও পড়ে,—সে দান সিদ্ধ হইবে না, তোমার স্বামীর অন্ধত্ব ঘুচিবে না।"

কাঞ্চনের সম্মুখে এ কি কঠোর পরীক্ষা! কত দিনের কত সাধনার ভিতর দিয়া পাওয়া তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব-ধন স্বামীকে সপত্নীর হস্তে তুলিয়া দিতে হইবে, সুখের লেশমাত্রও তাঁহার অবশিষ্ট থাকিবে না, কিন্তু ইহার জন্য যে তিনি একটু দুঃখ করিবেন, দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া হৃদয়ের ভার একটু লঘু করিবেন,—সে অধিকারও যে তাঁহার কাড়িয়া লওয়া হইতেছে! কাঞ্চনমালা এই কঠোরতম পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইলেন। স্বামীর ইষ্টকেই তিনি শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন। এই স্বামীকে তাহার শিশুকাল হইতে কত দুঃখ-কষ্টেই না তিনি লালন-পালন করিয়াছেন! মাথায় কাঠের বোঝা, কাঁখে শিশু-স্বামী,

দরদর ধারায় ঘাম বাহিয়া পড়িয়াছে,—এই অবস্থায় কাঠুরিয়াদের সঙ্গে তিনি বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে আঁচল ঢাকা দিয়া শিশুকে রক্ষা করিয়াছেন, ক্ষুধার কান্নায় তাহাকে বনের ফল কুড়াইয়া দিয়াছেন! সেই স্বামীকে আজ তিনি পুনরায় পাইয়া "জন্মের শোধ সপত্নীকে দিয়া যাইতেছেন!" এই মহাত্যাগের তুলনা কোথায়? পল্লীকবি সে-দৃশ্য এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

দুঃখ নাই সুখ নাই অন্তর হইল খালি।
স্বামীর লাগিয়া কন্যা না হইল শোকালি॥
ফলের সহিত কন্যা পুনঃ কাম করে।
রাজ্যসহ সোয়ামীরে সমর্পণ করে॥
চক্ষে নাই সে জল কন্যার বুকে নাই দুখ।
স্বামী এড়ি যায় কন্যা মনে নাই শোক॥
কি জানি কান্দিলে পাছে স্বামী না হয় ভাল।
মনের যত শোক দুঃখ মুছিয়া ফেলিল॥
এ বড় কঠিন পণ নারী হইয়া জিনে।
না জিনিব হেন পণ পুরুষ প্রবীণে॥"

পৃথিবীর অপর কোন সাহিত্যে এরূপ মহাত্যাগের দৃষ্টান্ত আছে কি না জানি না। কবি সত্যই বলিয়াছেন, কাঞ্চন নারী হইয়া যে পণ রক্ষা করিতে পারিলেন, অতি বড় প্রবীণ পুরুষেও তাহা পারিত না।

'মলুয়া' ঐতিহাসিক ঘটনামূলক একটি পালাগান; 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'য় ইহা স্থান পাইয়াছে। মলুয়া ছিলেন আড়ালিয়া গ্রামের হীরাধর দাসের কন্যা। ধন-দৌলত, বিষয়-সম্পত্তির তাঁহাদের সীমা ছিল না। এই মলুয়ার সঙ্গে ভিন্ন গ্রামের চাঁদবিনোদের বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্ব্বেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেরণা বশতঃই উভয়ে উভয়কে ভালবাসিয়াছিলেন। বাংলায় তখন মুসলমান রাজত্বের পূর্ণ প্রভাব। কাজিরা ছিল পরগণার বিচারকর্তা। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদেরই এক জনের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে মলুয়ার উপর। দেশে তখন 'কুটনী' নামে এক শ্রেণীর সমাজ-শত্রুর সৃষ্টি হইয়াছিল। উহারা লম্পটদের অর্থ-পুষ্ট হইয়া সরল বালিকা ও কুলবধূদের নানা প্রলোভন দেখাইয়া ঘরের বাহির করিতে চেষ্টা করিত। দুষ্ট কাজি এইরূপ এক কুটনীকে দিয়া মলুয়াকে প্রলুব্ধ করিতে ও আপন বশে আনিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সাধ্য কি সাধ্বীকে কেহ টলায়? স্বামী, শাশুড়ী কেহই ঘরে নাই, এইরূপ অবস্থায় একদিন পাপিষ্ঠা কুটনী মলুয়ার কাছে আসিয়া কাজির কুপ্রস্তাব ফাঁদিল। ক্রোধে অপমানে মলুয়ার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কুটনীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন :—

"আমার সোয়ামী সে যে পর্ব্বতের চূড়া।
আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া॥
আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চান।
না হয় দুষমণ কাজি তাহার নউখের সমান॥
* * *
দুষমণ কুকুর কাজি পাপে দিল মন।
ঝাঁটার বাড়ি দিয়া তারে করতাম বিড়ম্বন॥
বাচ্যা থাকুন সোয়ামী আমার লক্ষ পরমাই পাইয়া।
থানের মোহর ভাঙ্গি কাজির পায়ের লাথি দিয়া॥"

যেমন ধৃষ্ট প্রস্তাব, তেমনি তাহার উত্তর। তার পর আরম্ভ হইল কাজির চক্রান্ত, ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেই হইবে। বিবাহের সময় দেওয়ানকে 'নজর মরেচা' দেওয়া হয় নাই বলিয়া কাজি বিনোদের বাড়ী-জমি সমস্ত বাজেয়াপ্ত করিল। দুই দিন আগে যাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-দৌলতের সীমা ছিল না, আজ তিনি কাজির কোপে পথের ভিখারী। গোরু-বাছুর ঘর-দুয়ার সব বেচিয়া খাইলেন, তবু চলে না; শেষে মলুয়ার অলঙ্কার-গুলিও একে একে শেষ হইল। বিনোদ স্ত্রীকে অনেক বুঝাইলেন, 'তোমার বাপের বাড়ীর বিরাট অবস্থা, সেখানে গিয়া তুমি কিছু দিন থাক, তাঁহারা পরম যত্নে রাখিবেন।' কিন্তু মলুয়া প্রাণ-প্রিয়কে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া কোথাও গেলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া এক দিন বিনোদ কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন।

দারুণ কষ্টের মধ্যে মলুয়ার দিন যাইতে লাগিল। কাজি ভাবিল, এইবার যদি অভীষ্ট সিদ্ধ হয়! মলুয়া এইবার নিশ্চয়ই দুঃখ-কষ্টের আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কুটনী আবার কুপ্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এ কি! দুঃখ-কষ্টের দাবদাহ যে সাধ্বীকে আরও খাঁটি সোনা করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে! কুটনীর প্রলোভনের মাথায় তিনি পদাঘাত করিয়া বলিলেন :—

"আন্ধাইরে কাটিব আমি দুঃখের দিবা রাতি।
কাজিরে কহিও তার মুখে মারি লাথি॥"

মলুয়ার মাতা এবং ভ্রাতারা এ সব শুনিয়া মলুয়াকে পিত্রালয়ে নিতে আসিল। কিন্তু তিনি তখন দুশ্চর প্রেমের তপস্যায় মগ্ন, দুঃখ-কষ্ট তাঁহাকে কি করিবে? তিনি পিতৃগৃহে যাইতে অস্বীকার করিলেন এবং ভ্রাতাদের এই বলিয়া বিদায় দিলেন :—

শ্বশুর বাড়ীৎ থাকবাম আমি করিয়াছি মন।
সেইত আমার গয়া কাশী সেই ত বৃন্দাবন॥
বুড়া শাশুড়ী আমার পুত্র নাই ঘরে।
কি দেখ্যা মায়ের কও এই দুঃখ পাশরে॥

সূতা কাটিয়া ধান ভানিয়া অনশনে অর্দ্ধাশনে মলুয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন বিনোদ প্রভূত উপার্জ্জন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং বাজেয়াপ্ত জমি-বাড়ী উদ্ধার করিলেন। চাঁদবিনোদ ও মলুয়ার কয়েক দিন বেশ সুখেই কাটিল। কিন্তু দুরন্ত কাজির ইহা সহ্য হইল না। সে তাহার উপরওয়ালা দেওয়ানকে 'সুন্দরী মলুয়া'র সংবাদ জানাইল এবং তাহার হাতে মলুয়াকে তুলিয়া দিতে বিনোদের উপর এক পরোয়ানা জারি করিল। সাত দিন পর কাজি বিনোদকে ধরিয়া নিল, এবং বিচার করিয়া 'জ্যান্ত' কবর দিতে হুকুম দিল। মলুয়া এই অবস্থায়ও ধৈর্য্য হারাইলেন না, কুড়া পাখীর মারফত ভ্রাতাদের নিকট পত্র লিখিয়া স্বামীকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন না। শূন্য গৃহ হইতে দেওয়ানের চরেরা তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।

মলুয়া এখন দেওয়ান সাহেবের অন্তঃপুরে। তবু তিনি টলিলেন না। সাধ্বী ব্রত-প্রতিষ্ঠার ছল করিয়া তাহাকে ভাঁড়াইতেছেন এবং আত্মরক্ষা করিতেছেন। কাম-বিহ্বল দেওয়ানের অবস্থা দেখিয়া মলুয়া ভাবিলেন, এইবার যদি কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা যায়। তিনি দীপ

নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেওয়ানকে বলিলেন, 'দেখুন, আপনার অধীন কাজি আমাকে বহু দুঃখ দিয়াছে ; সে আমার স্বামীকে জ্যান্ত কবর দিয়াছে। এমন কাজি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার সহিত আমার মনের মিলন হইতে পারে না।' মলুয়ার জন্য দেওয়ান কি না করিতে পারেন ? তিনি কাজিকে শূলে চড়াইবার জন্য তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন। সাধ্বীর হৃদয়ের জ্বালা এত দিনে কতকটা প্রশমিত হইল।

মলুয়া এইবার ভাবিলেন, মরিতেই যদি হয় আরো একটু নড়িয়া-চড়িয়া মরি। তিনি দেওয়ানকে বলিলেন, 'দেখুন, আমার স্বামী এক জন ভাল কুড়া-শিকারী ছিলেন, তাঁহার সহিত থাকিয়া আমিও কুড়া-শিকারের কৌশল শিখিয়াছি। আমার ব্রত-প্রতিষ্ঠার আর বার দিন বাকী আছে, চলুন এই অবসরে আমরা কুড়া-শিকারে যাই। তার পর যথাসময়ে মিলন হইবে।' দেওয়ান স্বীকৃত হইলে মলুয়া কুড়ার মারফত এক পত্র দিয়া ভ্রাতাদের 'ধলাই' বিলে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পাঠাইলেন।

'ধলাই' বিলে 'ভাওয়ালিয়া' নৌকায় মলুয়া ও দেওয়ান। হঠাৎ পান্‌সী বাহিয়া মলুয়ার ভ্রাতারা আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করিল।

> "লাঠির বাড়িতে ছিল যত দাঁড়ি মাঝি।
> উবুত হইয়া জলে পড়ে করে কাজি মাজি।
> পঞ্চ ভাইয়ের পানসীখানা দেখিতে সুন্দর।
> লম্ফ দিয়া উঠে কন্যা তাহার উপর।"

এইরূপে সেকালের এক মধ্যবিত্ত ঘরের পল্লীবালা স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও উদ্ভাবনী শক্তি এবং চরিত্রের দৃঢ়তা-বলে প্রবল প্রতাপ দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে নারীত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু সমাজ ইহার কতটুকু মূল্য দিল ? সমাজপতিরা বিনোদের উপর হুকুমজারি করিলেন,—'যে মলুয়া দীর্ঘকাল দেওয়ানের অন্তঃপুরে বন্দী ছিল, তাহাকে ঘরে রাখিলে বিনোদকে 'একঘরে' হইতে হইবে।' বিনোদ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন,—এমন মলুয়াকে তিনি কি করিয়া পরিত্যাগ করিবেন ? কিন্তু শেষে সমাজেরই জয় হইল, যেমন চিরদিন হইয়া আসিতেছে। চাঁদবিনোদ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে স্থান পাইলেন এবং মলুয়াকে পরিত্যাগ করিলেন। মলুয়ার ভ্রাতারা মলুয়াকে লইয়া যাইতে আসিল, ভগিনীকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বামীর আলয় ত্যাগ করিয়া যাইবেন না ; বাহিরের চাকরাণী (বাইর কামুলী) হইয়া থাকিবেন, উঠান আঙ্গিনা ঝাঁট দিবেন, গোবর-ছড়া দিবেন, ঘরে-দুয়ারে নাই বা গেলেন, রান্নাবান্না নাই বা করিলেন। তবু তো স্বামীর মুখ দেখিতে পাইবেন। ভ্রাতারা নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল।

চাঁদবিনোদ আবার বিবাহ করিয়াছেন, মলুয়া বাহিরের কাজকর্ম্ম করিয়া স্বামী ও সপত্নীকে যথাসাধ্য সুখী রাখিতে চেষ্টা করেন। অদৃষ্ট এই অধিকারটুকু হইতেও তাঁহাকে যেন বঞ্চিত করিতে ফন্দী আঁটিল! একদিন মাঠে সর্পদষ্ট হইয়া চাঁদবিনোদ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সকলে যখন কাঁদিয়া অস্থির, মলুয়া গাড়ুরী ওঝার বাড়ীতে মৃতপ্রায় স্বামীকে লইয়া গেলেন, অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে বাঁচাইয়া আনিলেন। চার দিকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। এইবার কেহ আর তাঁহাকে ঘরে তুলিয়া লইতে আপত্তি করিল না।

কিন্তু বিনোদের মামা ইহাতে প্রবল বাধা দিলেন, সকলকে ভয় দেখাইলেন। মলুয়ার ধৈর্য্যের সীমা তখন আর রহিল না, দুঃখ-জয়ের সমস্ত শক্তি তখন তাঁহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে স্বামী আর সুখী হইতে পারিবেন না, সমাজ কেবলই তাঁহাকে বিব্রত করিবে। ঘাটে এক 'মন পবনের নৌকা' বাঁধা ছিল ; মলুয়া আর কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সোজা গিয়া সেই নৌকায় উঠিলেন, নৌকার কাছি কাটিয়া দিলেন। ঝড়ের মুখে উত্তাল তরঙ্গের বুকে ভাঙ্গা নৌকা ডুবিতে ডুবিতে ভাসিয়া চলিল। মুহূর্ত্তে এই সংবাদ চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলে আসিয়া নদীর তীরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুই হাত বাড়াইয়া সকলে আকুল স্বরে ডাকিতে লাগিল, 'ফিরে এস, ফিরে এস।' স্বামী চীৎকার করিয়া বলিতেছেন :—

> "চান্দ সুরুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই।
> জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাই চাই।"

কিন্তু সাধ্বী তাঁহার সঙ্কল্পে অটল, তিনি থাকিতে তাঁহার স্বামীর কলঙ্ক ঘুচিবে না। তিনি একে একে সকলকে প্রবোধ দিয়া, সকলের নিকট শেষ বিদায় লইলেন। দেখিতে দেখিতে 'মন পবনের নৌকা' সেই সতীলক্ষ্মীকে লইয়া কোন্ অতলে তলাইয়া গেল! এ কি সেই চিরদুঃখিনী জনক-নন্দিনীরই সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর কোলে আশ্রয় গ্রহণ ?

আত্ম-মর্য্যাদাবোধ

জন ব্যারীমুর—বিখ্যাত অভিনেতা, গেছেন টুপীর দোকানে টুপী কিনতে—হলিউড বোলেভার্ডেতে। দেখতে চাইলেন টুপী। অগণিত টুপী দেখতে দেখতে একটি টুপী মনে ধরলো। বললেন,—পছন্দ হয়েছে। কত দাম ? বিল করুন।

দোকানী বললে,—কার নামে বিল হবে ?

বিখ্যাত দু'টি চোক পাকিয়ে উঠলো। সজোরে বললেন,—ব্যারীমুর।

দোকানী বললে,—উপাধি বললেন। প্রথম নামটি ?

অত্যধিক ঘা খেলেন যেন জন ব্যারীমুর। চিৎকার ক'রে উঠলেন,—এথেল।

এবং বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লেন জন ব্যারীমুর।

এ্যাটম

শ্রীযামিনীমোহন কর

সূচনা

খৃষ্ট জন্মাবার বহু বহু পূর্ব্বে ভারতীয় দার্শনিক কনাদ অণু-পরমাণুর কথা মোটামুটি ভাবে উল্লেখ করেছিলেন। পরে, এখন হতে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক মনীষীরাও সেই কথা বলেন। খৃ: পূ: পঞ্চম শতাব্দীতে ডেমোক্রিটাস পরমাণুর সংজ্ঞা হিসেবে বলেন যে, পরমাণু (atoma, atoms) জড়ের সর্ব্বানিম্ন অখণ্ড একক। অর্থাৎ জড়কে পরমাণুর চেয়ে ছোট অংশে বিভক্ত করা যায় না। এই মতবাদ বহু দিন বিস্মৃতির অতল গর্ভে চাপা পড়েছিল। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতালীর গ্যালিলিও, ফ্রান্সের ডেকার্টে, ইংলণ্ডের বেকন, বয়েল, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এর পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তখনও এটা দার্শনিকের মতবাদ ছিল মাত্র।

আধুনিক আণবিক সূত্র আবিষ্কার করলেন জন ডাল্টন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁর হাতে মতবাদ প্রকৃত রূপ পেল। তিনিই প্রথম দেখালেন যে, বিভিন্ন বস্তুর পরমাণুর ওজনের অনুপাত নির্ণয় করা যায়। এই হ'ল রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের ভিত্তি-প্রস্তরস্বরূপ। প্রাচীন ভারতীয় মতে ব্রহ্মাণ্ডে পাঁচটি মৌলিক পদার্থ আছে; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। গ্রীক-দর্শনও ভারতীয় ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে এই মতই স্বীকার করে নিয়েছিল। খৃ: পূ: পঞ্চম শতাব্দীতে এম্পেডোক্লস বলেন যে, বস্তু মাত্রই চারটি মৌলিক পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট এবং তাদের নাম ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ। ব্যোমটা তিনি বাদ দিলেন। দেখা যাচ্ছে, একই সময় একই দেশে দু'টো বিভিন্ন মতবাদ। একটা ডেমোক্রিটাসের আরেকটা এম্পেডোক্লসের। কিন্তু যেহেতু আরিষ্টটল প্রমুখ মনীষীরা দ্বিতীয় মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন, সেই জন্য দু'হাজার বছর ধরে ভুল মতবাদই চলল। এই মতবাদের জন্যই বহু দিন ধরে চেষ্টা চলেছিল লোহাকে সোনা করবার। কিন্তু কিছুতেই তা হয়ে ওঠেনি। আজ অবশ্য তা করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু তার মূলে আছে পূর্ব্বের ধামা-চাপা দেওয়া প্রথম মতবাদ। এ সম্বন্ধে বি... আলোচনা পরে করা হবে।

এই চার মৌলিক পদার্থ-তথ্য প্রথম ... খেল ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে রবার্ট বয়েলের হা... তিনি বললেন, মৌলিক পদার্থ মানে যা অ... কিছুর সংমিশ্রণে তৈরী নয়। মেশালে সেটা হয়ে পড়বে যৌগিক পদার্থ। আজ... মৌলিক পদার্থের সংজ্ঞার বীজ এর ... লুকিয়েছিল, কিন্তু তবু একশ' বছর ... এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। ১৭৭... খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাসায়নিক লাভোয়সিয়ে (যাঁকে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয়) প্রমাণ করে দিলেন যে, হাওয়া মৌলিক পদার্থ নয়। অন্তত: পক্ষে দু'টো বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণে হাওয়ার সৃষ্টি। তার প... ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রীষ্টলে এবং ক্যাভেণ্ডিস প্রমাণ করলেন যে, জলও মৌলিক পদার্থ নয়, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংমিশ্রণ। চার মৌলিক পদার্থের মতবাদ ধূলিসাৎ হল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে লাভোয়সিয়ে বললেন, "মৌলিক পদার্থ বলতে আমরা এমন কিছু বুঝি যাকে ভাগ অর্থাৎ বিশ্লেষণ করা যায় না অর্থাৎ যা বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হয়নি। যে পদার্থ স... বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী হয় তাদের ব... হল যৌগিক পদার্থ। জল যৌগিক পদার্থ কিন্তু হাওয়া কেবল মি... পদার্থ। একই পদার্থের সকল পরমাণু একই রকমের এবং ... পদার্থের ধর্ম্ম বজায় রাখে। কিন্তু বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পর... বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। পরমাণু সমূহের প্রকাশের জন্য ডাল্টন বি... প্রতীক ব্যবহার করেন; যেমন, অক্সিজেনের পরমাণুর প্রতীক এ... বৃত্ত, হাইড্রোজেনের পরমাণুর প্রতীক বৃত্তের সহিত কেন্দ্র-বিন্দু ইত্যা... কিন্তু এই পদ্ধতি অত্যন্ত হাঙ্গামার। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বার্জিলি... ঠিক করলেন যে, পদার্থের লাতিন নামের গোড়ার একটা দু'টো অক্ষর দিয়ে সেই পদার্থের পরমাণু প্রকাশ করা হোব... যেমন, অক্সিজেন (Oxygenium)এর প্রতীক O, হাইড্রো... ((Hydrogenium) এর প্রতীক H, সোনা (Aurum) ... প্রতীক Au, রূপো (Argentum)এর প্রতীক Ag ইত্যা... কেবল মৌলিক নয়, যৌগিক পদার্থ প্রকাশ করতেও প্র... ব্যবহার করা চলে। যেমন, জলকে H_2O প্রতীক দিয়ে প্র... করা চলে; তার অর্থ দুই পরমাণু হাইড্রোজেন এক পর... অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক ভাবে মিশে জল সৃষ্টি করে। তাহ... দেখা যাচ্ছে যে, প্রতীক দেখে যৌগিক পদার্থে কি কি মৌ... পদার্থ কতটা পরিমাণে আছে জানা যায়।

এইবার এল আণবিক ওজনের কথা। পরমাণু এতই ক্ষুদ্র সোজাসুজি তার ওজন বার করা অসম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন পদা... আণবিক ওজনের অনুপাত নির্ণয় করা যায় ডাল্টনের সূ... সাহায্যে। তিনি সব চেয়ে হাল্কা হাইড্রোজেনের পরমাণু এ... ধরে বিভিন্ন পরমাণুর আনুপাতিক ওজন করলেন। এই প... বুঝতে হলে ডাল্টনের সূত্র জানা প্রয়োজন। তিনি বললেন (ক) যে-কোন বিশুদ্ধ পদার্থের পরমাণু সমূহের আয়তন, চেহা...

ন এক; (খ) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরমাণুর কোন ধর্ম্ম যায় না, কেবল সাজানোর পরিবর্ত্তন ঘটে; (গ) পরমাণু সমূহের ন সহজতম অখণ্ড সংখ্যার অনুপাতে হয়। তাঁর সময়ে একমাত্র গিক পদার্থ জলের কথাই জানা ছিল। তিনি বললেন, নুসারে জলের প্রতীক HO হওয়া উচিত, কারণ এর চেয়ে অনুপাত হতে পারে না। কিন্তু বিশ্লেষণ করে তিনি দেখলেন ওজন হিসেবে হাইড্রোজেন এক ভাগ এবং অক্সিজেন সাত (পরে —এইটাই ঠিক) ভাগ মিশে জল সৃষ্টি করে। তার মানে জেনের পরমাণুর ওজন হাইড্রোজেনের পরমাণুর আট গুণ। ডাল্টন যা নির্ণয় করেছিলেন, তা প্রকৃত পক্ষে মৌলিক পদার্থের সমতুল্য ওজন, পরমাণুর ওজন নয়। এক ভাগ হাই-ড্রোজেনের ওজনের সঙ্গে কোন মৌলিক পদার্থের কত ভাগ রাসায়নিক ক্রিয়ায় মিশতে পারে, বা এক ভাগ হাইড্রোজেনকে সরাতে পারে তাই নাম সমতুল্য ওজন। যেমন জলের প্রতীক H_2O, অর্থাৎ হাইড্রোজেনের দু'টো পরমাণু অক্সিজেনের একটা পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিক ভাবে মেশে। অতএব অক্সিজেনের আণবিক ওজন তার সমতুল্য ওজনের দ্বিগুণ। ডাল্টন হাইড্রোজেনকে মূল ধরে মৌলিক পদার্থ-সমূহের আণবিক ওজন নির্ণয় করতে চেয়ে-ছিলেন। কিন্তু হাইড্রোজেনের সঙ্গে খুব কম পদার্থের রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটে। তাই বার্জিলিয়াস তুলনার জন্য অক্সিজেনকে মূল ধরলেন, কারণ অক্সিজেন প্রায় সকলের সঙ্গেই মিশতে পারে। অক্সিজেনের আণবিক ওজন হল 16 এবং সমতুল্য ওজন হল 8; এই স্কেলে হাইড্রোজেনের আণবিক ওজন দাঁড়ায় 1·0080, ঠিক এক হয় না।

এইবার অণু (molecule) ও পরমাণুর (atom)এর মধ্যে কি পার্থক্য জানা প্রয়োজন। ডাল্টন এই পার্থক্যটা ধরতে পারেননি। তিনি তাঁর বিখ্যাত সূত্রে আণবিক ওজন বলতে আসলে পরমাণবিক ওজন বোঝাতে চেয়েছিলেন। ১৮১১ সালে ইতালীয় পদার্থবিদ্ অ্যাভোগাড্রো এই পার্থক্য কিছুটা বুঝতে পারেন, কিন্তু তা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। ১৮৩৩ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক গ্যদাঁ প্রকৃত পার্থক্যটা কোথায় তা বুঝিয়ে দেন। কোন পদার্থের (মৌলিক অথবা যৌগিক) সূক্ষ্মতম অংশ, যা সাধারণতঃ স্বাধীন ভাবে থাকতে পারে, তাকে অণু বলা হয়। পরমাণু কিন্তু স্বাধীন ভাবে থাকতে পারে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সময় এক অণু থেকে পরমাণুগুলি বার হয়ে নিজ-নিজ স্থান বদল করে ভিন্ন বিন্যাসের ফলে শেষে ভিন্ন অণু সৃষ্টি করে। যৌগিক পদার্থ জলের (H_2O) একটি অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু আছে। কোন মৌলিক পদার্থ,—ধরুন, হাইড্রোজেন—তার একটা পরমাণু হল H; কিন্তু প্রকৃতি একে এই অবস্থায় থাকতে দেয় না। একে থাকতে হয় অণুরূপে H_2 হয়ে। গ্যাসগুলির সাধারণত এক অণুতে দু'টো করে পরমাণু থাকে। তবে হিলিয়াম ইত্যাদি কয়েকটি জড় (inert) গ্যাসের অণুতে একটি মাত্র করে পরমাণু আছে।

অ্যাভোগাড্রোর সূত্রে আছে যে, তাপ এবং চাপের কোন তারতম্য না ঘটলে বিভিন্ন গ্যাসের সমান ঘনফলে সমান সংখ্যা অণু থাকে। গ্যাসের ভরাঙ্ক হ'ল এক ঘনফলের ওজন; অর্থাৎ এক ঘনফল গ্যাসে যতগুলি অণু আছে তাদের মোট ওজন। সুতরাং কোন গ্যাসের ভরাঙ্ক তার এক অণুর ওজনের আনুপাতিক। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে—

$$\frac{\text{কোন পদার্থের আণবিক ওজন}}{\text{নির্দ্দিষ্ট গ্যাসের আণবিক ওজন}} = \frac{\text{পদার্থের ভরাঙ্ক}}{\text{নির্দ্দিষ্ট গ্যাসের ভরাঙ্ক}}$$

অনেক কারণে অক্সিজেনকে নির্দ্দিষ্ট গ্যাস ধরা হয়েছে। এর আণবিক ওজন 32; সুতরাং যে কোন পদার্থের আণবিক ওজন

$$= \frac{\text{পদার্থের ভরাঙ্ক}}{\text{অক্সিজেনের ভরাঙ্ক}} \times 32.$$

এই সূত্রে পদার্থ গ্যাস হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সকল পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত করা যায় না। সে জন্য অন্য উপায় আছে।

এইবার মৌলিক পদার্থ সমূহকে তালিকাভুক্ত করবার চেষ্টা চলল। ১৮২৯ সালে দোবেরেনার লক্ষ্য করলেন যে, একই ধর্ম্মবিশিষ্ট মৌলিক পদার্থ সমূহের পরমাণবিক ওজনের মধ্যে বেশ একটা সহজ সম্বন্ধ আছে। অন্য বৈজ্ঞানিকরা আগ্রহ দেখালেন বটে কিন্তু এর উপর বিশেষ আস্থা দিলেন না; কারণ বহু পদার্থেরই সঠিক পারমাণবিক ওজন জানা ছিল না। ১৮৫৮ সালে কানিজারো অনেকগুলি মৌলিক পদার্থের সঠিক পরমাণবিক ওজন প্রকাশ করলেন এবং দেখা গেল, দোবেরেনারের কথার সঙ্গে বেশ খাপ খাচ্ছে। ১৮৬৫ সালে নিউল্যাণ্ড অক্টেভ সূত্র বার করলেন, ধর্ম্ম ও পরমাণবিক ওজনের সম্বন্ধে। অক্টেভ বলতে সঙ্গীতের সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। এর পর সা, তার পর রে ইত্যাদি। যদি পরমাণবিক ওজনের ঊর্দ্ধক্রম হিসেবে সাতটি মৌলিক পদার্থ সাজান হয়, তবে অষ্টমটি প্রথমটির সঙ্গে, নবমটি দ্বিতীয়টির সঙ্গে সমধর্ম্মী হবে। কিন্তু সবগুলি গুছিয়ে দেখা গেল যে তা হয় না। এই সূত্রানুসারে সোনা আইয়োডিনের সঙ্গে, লোহা গন্ধকের সঙ্গে সমধর্মী হয়ে পড়ে।

১৮৭১ সালে রুশীয় বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলভ এই সম্বন্ধ নিয়ে তাঁর বিখ্যাত পর্য্যায়-সূত্র প্রকাশ করেন। তিনি এক নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ক্রমে আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি ভাবে মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজালেন। উল্লম্ব স্তম্ভগুলির নাম দিলেন গ্রুপ, আর আড়া-আড়ি থাকগুলির নাম দিলেন পর্য্যায়। তিনি দেখালেন যে, নির্দ্দিষ্ট অন্তরের পরে পরে মৌলিক পদার্থ সমূহের ধর্ম্ম একই হয়। যেখানে যেখানে এই পর্য্যায় ধর্ম্ম মিলল না, তিনি বললেন যে, সেখানে হয় পরমাণবিক ওজনে ভুল আছে, কিংবা অনাবিষ্কৃত কোন মৌলিক পদার্থ সেখানে বসবে। তিনি সেই নতুন পদার্থের আবিষ্কারের পূর্ব্বেই ধর্ম্ম নির্ণয় করে দিলেন। এ যেন রাম না হতেই রামায়ণ! ১৮৭৫ সালে গ্যালিয়াম, ১৮৭৯ সালে স্ক্যাণ্ডিয়াম, ১৮৮৬ সালে জার্ম্মানিয়াম আবিষ্কৃত হলে পর দেখা গেল যে, পর্য্যায়ক্রমে ঠিক ফাঁকে ফাঁকে বসে গেল। মেণ্ডেলভের পর্য্যায়-সূত্র বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করে নিলেন। আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের এটি যেন ভিৎ। পরে অবশ্য এতে সামান্য অদল-বদল করতে হয়েছে। আধুনিক পর্য্যায়-তালিকায় পরমাণবিক ওজনের স্থান অধিকার করেছে পরমাণবিক সংখ্যা এবং সেগুলি সব অখণ্ড সংখ্যা। তালিকায় ১৬টি গ্রুপ আছে; ১(ক), ২(ক), ৩(ক), ৪(ক), ৫(ক), ৬(ক), ৭(ক), ৮; ১(খ), ২(খ), ৩(খ), ৪(খ) ৫(খ), ৬(খ), ৭(খ) এবং O.

শেষের গ্রুপটি হয়েছে জড় (inert) পদার্থ সমূহের জন্য। আর তালিকায় পর্য্যায় আছে সাতটি; ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭। একই গ্রুপের মৌলিক পদার্থ সমস্ত সমধর্মী।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অণু-পরমাণুর কথা যা বলা হল সবই কল্পনা-রাজ্যের; কিন্তু তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দেওয়া হয়নি। যা হিসেব দেওয়া হয়েছে, সব আপেক্ষিক। অণু বা পরমাণুর প্রকৃত ওজন নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি, কারণ তাদের ওজন বা আয়তন অত্যন্ত কম।

১৮১৬ সালে ইয়ং জলের অণুর আয়তন সম্পর্কে বললেন যে, অণুটি এক ইঞ্চের ১০০০০০০০০০তম অংশ ব্যাসের একটি গোলক। অবশ্য এটা আন্দাজে। ১৮৫০ সালের জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ক্লসিয়াস, ররার্ট বয়েলের গ্যাসের গতিসূত্রের সাহায্যে অঙ্ক কষে অণুর আয়তন নির্ণয় করতে চেষ্টা করলেন। গতিসূত্রানুসারে গ্যাসের অণু সকল ক্রমাগত নড়ছে, পরস্পরের সঙ্গে এবং পাত্রের গায়ে ধাক্কাধাক্কি করছে। এই সূত্র থেকে একটি সমীকরণ পাওয়া গেল, যাতে গ্যাসের সান্দ্রতা অর্থাৎ গতির বাধা, অণুর আয়তন ও এক ঘনফলে তাদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্তু যেহেতু অণুর আয়তন ও সংখ্যা উভয়ই অজ্ঞাত, সুতরাং সমীকরণের সমাধান করা গেল না। ১৮৬৫ সালে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক লশমিড সহজেই এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন, যদিও তা একেবারে নির্ভুল বলা চলে না। তিনি বললেন যে, যদি অণু সমস্তকে গোলক ধরা হয় এবং যদি পদার্থ সমূহকে তরল অবস্থায় মনে করা যায় যাতে অণুগুলি একেবারে ঠাস করে প্যাক করা থাকে, তাহলে উপরিউক্ত অজ্ঞাত রাশি দুইটি ও তরলের ঘনাঙ্ক নিয়ে আর একটা সমীকরণ পাওয়া যেতে পারে। সমীকরণ দুইটির সমাধান থেকে অণুর আয়তন এবং এক ঘনফলে তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসগুলিকে তরলে রূপান্তরিত করে তিনি অণুর ব্যাস নির্ণয় করলেন—এক সেণ্টিমিটারের ১০০০০০০০০তম অংশ আর এক ঘন সেণ্টিমিটারের গ্যাসে 2×10^{18} অণুর সংখ্যা। অবশ্য এটা ভুল। কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টা বলে এর গৌরব ভুলের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়নি।

অ্যাভোগাড্রোর সূত্র থেকে পাওয়া যায় যে, একই ঘনফলে সকল গ্যাসের অণুর সংখ্যা সমান। যদি কোন পদার্থের অণুর ওজন গ্রামে প্রকাশ করা যায়, তবে তাকে পদার্থের গ্রামাণু (গ্রাম-মলিকিউল) বা মোল বলে। যথা হাইড্রোজেনের মোল 2·016 গ্রাম, অক্সিজেনের 32 গ্রাম, নাইট্রোজেনের 28·020 গ্রাম ইত্যাদি। বিভিন্ন গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শূন্য ডিগ্রী তাপে এবং একক বায়বীয় চাপে যে কোন গ্যাসের এক মোলের ঘনফল 22·414 লিটার (এক লিটার = 1000 ঘন সেণ্টিমিটার)। এই ঘনফলে অণুর সংখ্যা প্রত্যেক গ্যাসের জন্য এক। এই সংখ্যাকে অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা বা অ্যাভোগাড্রোর ধ্রুবক বলা হয়।

১৮২৮ সালে পদার্থবিদ্ ব্রাউন দেখালেন যে, জলের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ফুলের রেণু ফেলে দিলে, তারা ক্রমাগত চারিধারে ছুটোছুটি করতে থাকে। গ্যাসের গতিসূত্রানুসারে অণুদেরও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটে। তাহলে বলা যায় ব্রাউনের গতি গ্যাসের গতির একটা বিবর্দ্ধিত সংস্করণ। এই দিক দিয়ে ১৯০৮ সালে ফ্রান্সে পেরিন অণুদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন। ১৯০৫ সালে আবিষ্কৃত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আয়েনষ্টাইনের সমীকরণের সাহায্যে তিনি অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা নির্ণয় করেন। এই সংখ্যাটির মান হয় 6×10^{23}। বিভিন্ন গ্যাসে একই ফল পাওয়া গেল। এখন এই সংখ্যায় নির্ভুল মান ধরা হয় $6·023 \times 10^{23}$.

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, কোন পদার্থের একটি অণু বা পরমাণুর ওজন বার করতে হলে তার আণবিক বা পারমাণবিক ওজনকে অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। সব চেয়ে হাল্কা হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন $1·67 \times 10^{-24}$ গ্রাম আর প্রকৃতিজ সবচেয়ে ভারী ইউরেনিয়ামের পরমাণুর ওজন $3·95 \times 10^{-22}$ গ্রাম। বিশেষ ভাবে তৈরী তুলাযন্ত্র 10^{-8} গ্রাম ওজন পর্য্যন্ত মাপতে পারে। অণু বা পরমাণুর ওজন চাক্ষুষ ভাবে মাপা চলে না, গাণিতিক উপায় ছাড়া পথ নেই।

অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা জানা হলে এক ঘন সেণ্টিমিটার গ্যাসে অণুর সংখ্যাও জানা হয়ে গেল। তাহলে গ্যাসের গতিসূত্রের সাহায্যে অণুর আয়তনও নির্ণয় করা চলে। সব চেয়ে ছোট হাইড্রোজেন পরমাণু $1·35 \times 10^{-8}$ সেণ্টিমিটার ব্যাসের একটি গোলক। হিলিয়াম পরমাণুর ব্যাস $2·2 \times 10^{-8}$ সেঃ মিঃ এবং অক্সিজেন নাইট্রোজেন পরমাণুর ব্যাস প্রায় $1·8 \times 10^{-8}$ সেঃ মিঃ।

লশমিডের প্রকল্পের সাহায্যেও অণু-পরমাণুর আয়তন নির্ণয় করা যায়। তিনি বলেন যে, তরল বা ঘন পদার্থকে খুব চেপে প্যাক করা গোলকরূপী অণুর সমষ্টি মনে করা যায়। জলের উদাহরণ নেওয়া যাক। জলের আণবিক ওজন 18 গ্রাম, আর 18 গ্রাম জলের ঘনফল 18 ঘন সেণ্টিমিটার। সুতরাং 18 ঘন সেণ্টিমিটার জলে 6×10^{23} সংখ্যা অণু আছে (অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা)। তাহলে একটি অণুর ঘনফল হল 3×10^{-23} ঘন সেণ্টিমিটার। যদি অণুকে r ব্যাসার্দ্ধের গোলক মনে করা যায়, তবে তার ঘনফল হবে $\frac{4}{3}\pi r^3$, যেখানে $\pi = 3·1415$; সুতরাং জলের অণুর ব্যাসার্দ্ধ হল প্রায় $1·7 \times 10^{-8}$ সেঃ মিঃ। এই অতি সহজ উপায়ে অণু বা পরমাণুর আয়তন নির্ণয় করা যায়।

ব্যষ্টিগত ভাবে পরমাণুকে চাক্ষুষ দেখা সম্ভব নয়। সব চেয়ে শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ যার বিবর্দ্ধন লক্ষ গুণ, তা দিয়েও দেখা যাবে না। কোন যৌগিক পদার্থের বড় জটিল অণু দেখা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে থাকে সহস্রাধিক পরমাণু। আধুনিকতম উপায় এক্স রে, ইলেকট্রন এবং বর্ণালীর সাহায্যে অণু-পরমাণুর আয়তন ও অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা নির্ণয় করা। ব্যাসে প্রতিবার 10^{-8} না লিখে $1A^{0}$ লেখা হয়; অর্থাৎ $1A^{0} = 10^{-8}$ সেণ্টিমিটার। তাহলে হাইড্রোজেনের (নবতম নির্ণয়ের ফলে) ব্যাসার্দ্ধ হল $0·53A^{0}$ (আংষ্ট্রম)।

এ কথা সত্য যে, অণু-পরমাণুর তথ্য নির্ণীত হয় গণিতের সাহায্যে, পরীক্ষাগারে চোখে দেখে নয়। কিন্তু এ-ও স্বীকার করতে হবে, গোড়ায় পরীক্ষা না করলে গণিত সাহায্য করতে পারত না। এ বিষয়ে এখনও অনেক কিছুই রয়েছে অনাবিষ্কৃত। যতটুকু হয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে খুব কম চাপের গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালনের ফলে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

[ক্রমশঃ।

জলে

শ্রীসাধনা কর (শান্তিনিকেতন)

তখন আমি ছোট। বয়েস—আট-দশ বছর হবে। ঠিক হল ঢাকা যাব। পিসতুতো ভায়ের বিয়ে—তিন দিন পরেই। এই পিসে মশাই যখন মারা যান, পিসতুতো ভাই আঁতুড়ে। মা-ঠাকুরমা বাবা-কাকা—আমাদের বাড়ির সবার স্নেহ এই ভায়ের উপর—পিসিমায়ের উপর। সেই ভাইয়ের বিয়ে—যেতেই হবে। চিঠি এসেছে, টেলিগ্রাম এসেছে। কিন্তু সমস্যা—কী করে যাওয়া যায়? আমাদের নদী কীর্তিনাশা। রাজা রাজবল্লভের কীর্তি নাশ করেছিল। বিশ্বাস হয় না, শুকিয়ে হাঁটু-জল। বর্ষায় তিন মাস মাত্র আমাদের ষ্টেশন থেকে ষ্টীমার চলে, তার বেশী নয়। সেই তারপাশা যাওয়া, ঢাকা মেল ধরা। সারা রাত কাটবে, গহনার নৌকা চলবে, ভোরে মেল। না ধরতে পারলে সারাটা দিন ষ্টেশনে পড়ে থাকা—রাত আটটায় আরেক ষ্টীমার। নৌকাতে যাওয়া সহজ, একেবারে সদর ঘাট। দু'দিন লাগে। হাওয়া সুবিধে থাকলে দেড় দিন। উজিয়ে যায়। খরচ কম, লোক যেতে পারবে বেশি। অঘ্রাণের প্রথম। ঝড়-বিষ্টির শঙ্কা নেই। জ্যোৎস্না রাত। কিন্তু বড় কাকা বললেন—অসুবিধে তো নেই, মেলা নৌকা এই সময় যাওয়া-আসা করে। ভাবনার কেবল চর দু'টো—ট্যাকের চর, পুলিশমারার চর; গায়ে গায়ে। দিনের বেলাও তার কাছ ঘেঁসে যাওয়া—সে এক রকম দুঃসাহসই। নদীটা চওড়া। ওপারে কমলাঘাট, দেখা যায় না। তালতলা থেকে ফতুল্লা—কম দূর নয়। তার মধ্যে এমনি দু'টো চর। চরের মুসলমান—কে না জানে তাদের নাম? জান-প্রাণের তোয়াক্কা রাখে না, দয়া-মায়ারও ধার ধারে না। তাদের জীবনই যে অমনি। চরে ফসল ফলে কেবল—লঙ্কা, কলা আর মিষ্টি-কুমড়ো। তাই নিয়ে ওরা ওপারে যায়, বাজারে ঢোকে, বিক্রি করে। নুণ, তেল, কাপড়, গামছা আনে। আর করে ডাকাতি। এই ইংরেজ রাজত্বেও কেউ ওদের গায়েল করতে পারলে না। রাত্রে নদীতে যেই নৌকোর শব্দ হল, ছোটে পানসী নিয়ে। দিনমানেও সুযোগ পেলে কি আর ছাড়ে? তবে শুনবে সে গল্প?—

কাকা জুৎ করে বসে গল্প শুরু করলেন—দিনে-দুপুরে এমনি এক রাহাজানি সুরু হল! দারোগার কাছে পৌঁছোলো খবর। ঢাকার বড় দারোগা। অনেক ডাকাত ধরেছেন, ঢের পুরস্কার পেয়েছেন, দুর্দান্ত সাহস, ধারালো বুদ্ধি! বাতাসের আগে তাঁর ঘোড়ার বেগ, মনের রাগে শাণ-দেওয়া। পিছনের পুলিশ দল অনেক পিছনেই রইলো প'ড়ে, দারোগা এগিয়ে গেলেন। চরের ডাকাতের মজাই এই—দেখতে নেহাৎ ভালো মানুষ। ছেঁড়া-ময়লা কাপড়-গামছা, দীন-মলিন চেহারা। চোখ পিটপিট করছে। ডাকাতি করার সময় না কি সে চোখে আগুন বেরোয়। এই মুহূর্তে ডাকাতি করল, পর-মুহূর্তে তার চিহ্নও মেলে না। চারি দিকে জল আর জল, মধ্যে একটু চর। দিনে-রাতে ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ হাওয়া। খাড়া পাড়ে লেগে অদ্ভুত শব্দ করে, তার ঝোড়ো হাওয়ায় বালি ওড়ে। চরের মাঝখানে হয়তো খান কুড়ি-পঁচিশ ঘর, কয়েকটা কলা-ঝোপ! তার মধ্যে ওরা পুলিশ, জল-পুলিশ সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালায়। কোথায় যে লুকায়, পাত্তা পাওয়া যায় না। শুধু মেয়েরা ঘর-দোর নিকোয়, চাল ঝাড়ে, কলসী ভ'রে জল আনে, আর বুঝি আড়ালে মুচকি হাসে। প্রশ্ন শুধোও, নির্বিকার মুখে বলে—মাছ ধরতে গেছে কিংবা গেছে বাজারে। কোথাও কাউকে মেলে না! ধরা যদি বা কেউ পড়ে, জেল খাটে, শাস্তি পায়, আবার ঘরে ফিরে এসে যে-কে সেই। সে সব অভিজ্ঞতা দারোগার ছিল। তাই ছুটেছিলেন; সবাইকে পিছনে রেখেই ছুটেছিলেন। ওরা লুকিয়ে পড়বার আগেই গিয়ে পড়তে হবে। হাতে তাঁর রিভলভার, কোমরে ছোরা। জানতেন পিছনে দশ-পনেরো জন পুলিশ আসছে, সাইকেলে, বন্দুক নিয়ে। কিন্তু হিসেবে করেছিলেন ভুল। দারোগা পৌঁছবার আধ ঘন্টাটাক পরে গিয়ে পৌঁছল পুলিশ দল। তখন কেউ কোথাও নেই। মেয়েরা কাজ করছে, বাচ্চারা খেলা করছে। দারোগা গেলেন কোথায়? অনেক খোঁজে হদিশ মিলল—নদীর জলের একখানে রক্তের রঙ ঘোচেনি। একটা কলাগাছের ভেলা, গায়ে মস্ত একখণ্ড দেহ,—ইচ্ছে করেই যেন বেঁধে রাখা হয়েছে। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাসছে আর ডুবছে। সদরে খবর এল। দলে দলে পুলিশ দারোগা ছুটল। চর তোলপাড়। ওদের বাচ্চার দলের যেন মহা ফূর্তি লাগল। তারা বালি উড়িয়ে দিলে, খেলাচ্ছলে ডিগবাজি খেলে। খাড়ির মধ্যে ধুপধাপ নেমে কচ্ছপের ডিম খুঁজতে লেগে গেল। দুষমণ দু'-এক জন ধরা পড়ল। একটি কথা বার করা গেল না। শাস্তি সইলে, নিশ্চিন্ত মনে জেলে গেল। এ সব শোনা গল্প নয়, নিজের চোখে দেখা। আমি তখন ঢাকায় আমিন, পুলিশ দলের সঙ্গে চরে গিয়েছিলাম, আরো অনেকে গিয়েছিল। সেই থেকে চরের নাম পুলিশমারার চর।

কাকা থামতেই ঠাকুরমা বলে উঠলেন—তবে নৌকোয় গিয়ে কাজ নেই বাপু!

কিন্তু নোয়াবালি সেখ, জোয়ান বয়েস, হাত-পা শক্ত শক্ত, নৌকা বেয়ে আর কাঠ কেটে শিরা বের-করা। তার বাবা বাঘের হাতে মারা গিয়েছিল, লড়াই করেছিল দেড় ঘন্টা। নোয়াবালি সে গল্প প্রায়ই করত। বলতে বলতে তার বার-করা শিরা দবদব করত, মুখটা টকটক করত, কালো রঙটা হত বেগ্নি। আর চোখ দু'টো—সে যেন উল্কার টুকরো, ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইত। স্পষ্ট মনে হত সেই বাঘটাকে, না হোক বাঘের বংশের কাউকেও যদি সে পেত, দেখে নিত। বাপের মৃত্যুটা সে কখনো ভোলেনি। ছেলেবেলা থেকে সে আমাদের মজুরী খাটে। বাড়ির পাশেই বাড়ি। সে বলে উঠল—কর্তামা, তবে আমার কথা শুনুন, আমার সম্বন্ধী নুরুদ্দিন খাঁ। নাজিরাবাদ বাড়ি। নৌকো বাওয়াই তার কাজ, মস্ত দোমালাই নাও আছে, দিন দশ-বারো আগেই এসেছে ঢাকা থেকে। পথ-ঘাট তার জানা। তাকে বললে সে নিশ্চয় আপনাদের নিয়ে যাবে।

সবাই মিলে পরামর্শ হল। কাকা বললেন—চেনা-জানা মাঝি হলে অবশ্য ভয় তত থাকে না। তোমার সম্বন্ধীকেই নিয়ে এসো গে, দেখি সে কী বলে।

নোয়াবালি বললে—আমিও যাব সঙ্গে, নৌকো এমনি বাইব, যেন পক্ষীরাজের নৌকো, এক দিনে উড়ে চলে যাব ঢাকা, সদর ঘাট। নদীতে মাছ ধরব, জাল নিয়ে যাব, চরে রান্না-খাওয়া হবে—সে খুব মজার। নৌকাতেই যাব, কী বল কুট্টি ভুইএরা।

নোয়াবালি ফূর্তিবাজ লোক। আমাদের মাতিয়ে দিলে। বিকেলেই গেল নাজিরাবাদ, আর সম্বন্ধীকেই শুধু নয়, তার দোমালাই নাওটা শুদ্ধ আমাদের গ্রামের বড় খালে নিয়ে এল। নুরুদ্দিন

এসে ভরসা দিলে। এখন আর অত ভয় নেই চরে। চার পাশে জল-পুলিশ, পাহারা দেয়। তার পরে হেসে বললে—নোয়াবালি ছাড়লে না, নৌকাশুদ্ধ নিয়ে এল। কিন্তু আমি তো যেতে পারব না, আমার যে আগেই আরেক জায়গায় বায়না হয়ে গিয়েছে। নদীর ঘাটে কত নৌকা আছে, কেরায়া যাবে। সে তার অনেক চেনা মাঝির নামও বলে দিলে।

পরদিন। কাক-ভোর, মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। আমরা নদীর ঘাটে এলাম। কিন্তু চেনা মাঝি এক জনও মিলল না। যাদের মিলল তাদের নৌকা ভাড়া হয়ে গেছে, নয় তো নৌকা সারাই হচ্ছে। অগত্যা অন্য মাঝির নৌকাই ভাড়া নিতে হল। নাম তার রুস্তম। বেঁটেখাট মানুষ, নুয়ে এসেছে পিঠ, পেকে গিয়েছে জ্র। কিন্তু নৌকার কাঠের মতোই জলে ভিজে রোদে পুড়ে সে পোক্ত। সে খুব কথা শুরু করলে বাবা-কাকার সঙ্গে, প্রথম থেকেই। ঢাকা যাবার পথ-ঘাটের খবর, সদর ঘাটের কথা, চরের কথা, সব তার নখের ডগায়। বাড়ি বললে দক্ষিণ পাড়েই—সামনেই, ভাঙ্গিবার চর। নোয়াবালি বললে—তোমার কথায় একটু উত্তর পাড়ের টান আছে মনে হচ্ছে।

রুস্তম তাড়াতাড়ি বললে—আগে যে ভুইএগ উত্তর পাড়েই বাড়ি ছিল। নদীতে ভেঙে নিলে, এপারে চলে এসেছি। আর বাড়ি-ঘর কি, স্ত্রী আর দু'টো ছেলে ক'বছর গিয়েছে, ওই একটা বাকি। গণি ওর নাম, বিয়ে দিয়েছিলাম, তা বউটাও বাঁচল না। বাপ-বেটায় নাও বেয়েই দিন কাটাচ্ছি। ওরে গণি, নাও ঠিক কর।

গণির বয়েস হবে সতেরো-আঠারো। সুন্দর চেহারা—যেন তেল-কুচকুচে সতেজ বাঁশ। তার রঙে এখনো রোদে-পোড়া তামাটে রঙ ধরেনি। চোখ বড় বড়, তারায় একটু নীলচে সাদা আভা। চাউনি যেন নদীরই মতো রহস্য-ভরা। সে একটি কথা বললে না। নৌকা ঠিক করতে লাগল। রুস্তম নোয়াবালিকে হাত ধরে নৌকায় টেনে নিলে। তামাক খেতে দিলে। আমি সব থেকে ছোট, আমাকে—উঁচিয়ে তুলে নিয়ে এল। বাবা-কাকার খুবই ভাল লাগল ওকে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই নৌকা ছাড়ল। আমার আনন্দ সব চেয়ে বেশি। একে তো যাচ্ছি সুন্দরদা'র বিয়েতে—যে সুন্দরদা এতটুকু বয়েস থেকে আমাকে আদরে ও আবদারে আয়ত্ত করে নিয়েছেন। চিঠিতে লিখেছেন—আমি না গেলে তার বিয়েই হবে না। তার উপরে নৌকোতে চলেছি এতটা পথ। পাড়ে ভিড়ে উনুন খুঁড়ে রান্না হবে, কলাপাতায় খাওয়া হবে, নোয়াবালি ধরবে পদ্মার মাছ। আর কত কী যে দেখতে দেখতে যাব, সে কি এখনই জানি! আগ্রহে ঔৎসুক্যে একেবারে ছইয়ের বাইরে গলুইয়ের মাথায়। নোয়াবালির কাছ ঘেঁসে বইলাম। সে বললে—দেখবে কুট্টি ভুইএগ নদীতে কত কুমীর ভাসে, শুশুক উল্টায়।

—সত্যি, কুমীর দেখা যায়, ভাসতে?

—হ্যাঁ, হরদম। মরা গরুর মতো, সাদা। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভেসে-ভেসে যায়।

কলকাতা গিয়েছিলাম, কিছু দিন আগেই; চিড়িয়াখানায় কুমীর দেখেছিলাম। হেসে বললাম—ঠকাচ্ছ। কুমীর বুঝি সাদা? কালো যে, গিরগিটির মতো, চিড়িয়াখানায় আছে।

নোয়াবলি বললে—অমনি বটে, জলে ভাসলে সাদা দেখায়। ইলিশ মাছ ধরতে এসে কত বার দেখেছি। দূর থেকে যেই জলে মেরেছি লগির ঘা, টুপ করে ডুবে গেছে।

আমি ঔৎসুক্যে বলে উঠলাম—সত্যি, আর কি আছে নদীতে বল না?

আমরা বসেছিলাম যেদিকে গণি বৈঠা বাইছে। সে হঠাৎ আমার দিকে তাকালো। একটুখানি হাসলে। কী বলতে গিয়েও বললে না। আমার কেমন যেন লাগছিল ওকে। কেমন যেন দুর্বোধ্য চাউনি, মুচকে হাসি। ওপাশের গলুইয়ে বাবা আর বড় কাকার সঙ্গে রুস্তম মাঝি কথার জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। আমি নোয়াবালিকে ভাবলাম বলি—কেন ভালো চেনা-জানা মাঝির নৌকো নিলে না। কিন্তু ওরা যদি শুনে ফেলে। ফাঁক বুঝে বলতে হবে, গণি যে বার বারই আমার দিকে তাকাচ্ছে। ঠিক সোজা ভাবে নয়। একটু যেন আড়াল রেখে। কিন্তু প্রত্যেক বারই প্রায় আমার চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছে। আমার মনটা গুরগুর করছে। আমি ওর দিকে ঘুরে বসলাম। নোয়াবালির সঙ্গেই গল্প জমে উঠল।

নৌকাটা দোমাল্লাই। টিনের ছই, গায়ে ছোট জানালা-কাটা। মোটা-পাটাতন। তিন-চারটে লগি, পাঁচ-ছ'খানা বৈঠা। মা-ঠাকুরমা ভাই-বোনেরা ভিতরে। মা আমাকে বার বার ডাকলেন—যে ছটফটে তুই, জলে পড়ে যাবি। বাবা বকলেন। কিন্তু আমি কি ওসব কথা শুনি? আমি যে কুমীর দেখব, মাছ ধরা দেখব, নদীর আরো যত আশ্চর্য্য জিনিস! আমার ভিতরে বসে থাকা পোষায়? এমন কি নৌকা আমাদের ষ্টীমার ষ্টেশন ছাড়ল, একটা চর পড়ল, অমনি আমি বলে উঠলাম—এই বুঝি ডাকাতের চর?

গণি চোখে হেসে আমার দিকে তাকালে। কিছু বললে না। ওপাশ থেকে রুস্তম মাঝি বলে উঠল—এমনি বাতাস যদি থাকে, সে আজ বিকেলে পেরুব। বিকেল বেলাতেই পেরিয়ে যাওয়া সুবিধে। অনেক নৌকা চলে তখন—যাত্রীর, মালের, হাটুরে।

গণি বলে উঠল—আর তার সঙ্গে চরের ডাকাতদের নৌকোও ভেসে চলে।

তার গলাটা কেমন ভারী-ভারী। আমার বিস্ময়ের সঙ্গে একটা কেমন ভয়ের আভাস মিশে গেল—ডাকাতেরা বেয়ে যায়?

—ডাকাত বলে কি চিনবার জো আছে? তারা দিব্যি সবার সঙ্গে কথা বলে, গল্প করে, ভাটিয়ালী গায়। এই আমাদেরই মতো। দেখলেও চিনতে পারবে না।

তার ঠোঁটে এবং চোখের কোণে কি চাপা হাসি? আমি মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে বলে ফেললাম—চিনব না কেন, নিশ্চয় চিনতে পারব ডাকাত।

নোয়াবালি দৃঢ় স্বরে আমার কথায় সায় দিয়ে হেসে বললে—নিশ্চয় চিনব আমরা, জলে ডাঙায় কুমীর ডাকাত বাঘ যত দুষমণ সবাইকে চিনব আর লড়াই করব, কী বল কুট্টি ভুইএগ। আমি খুব খুসী। গণি নৌকা বাইছে, বাঁক ঘুরছে একটা, তার মুখ দেখলাম না।

হেমন্তের নদী। এপার ওপার দেখা যায়। শান্ত মেয়ে, চেয়ে আছে চুপটি ক'রে। মনে কিন্তু দুষ্টুমি ভরা। সুযোগ পেলেই যেন মেতে উঠতে উদ্যত। আভাস মেলে—এক-এক জায়গায়

একটু বাতাসেই নাচন জাগছে। হাসির রোল উঠছে—কল-কল খল-খল। ছোট ছোট ঢেউয়ে হাসি ছড়িয়ে পড়ছে—কাছে দূরে এপাশে ওপাশে। রেখায় রেখায় ঠিকরে ফুটছে সূর্যের আভা—লাল নীল হলদে বেগনি। এক এক জায়গায় আবার এত নিথর জল, মনে হয় পাতলা রূপোর পাতে মোড়া। পাড়ের বালি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে। ছোট ছোট কী পাখি। ডানা ঝাপটিয়ে বালিতে স্নান করে যাচ্ছে। কোনোটা জল খাচ্ছে, পাড়ে বসে, ঠোঁট ডুবিয়ে, পুচ্ছ উঁচিয়ে, ফুরুৎ করে উড়ে পালালো। গাঙ-শালিক নদী পাড়ি ধরেছে নীল আকাশ সাঁতরে। কাশের বনে ফুল ফোটা শেষ হয়নি। কেশরগুলি হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যাচ্ছে, ফুলের ঝাড় মাথা লুটিয়ে লুটোপুটি। আকাশে সাদা মেঘের টুকরা, ওরা যেন তারই জীবন্ত রূপ। মাটিতে নেবে আটকা পড়েছে। পালাতে ব্যস্ত, পারছে না। জলে হাওয়ায় মাটিতে আর ফুলে খেলা জুড়ে দিয়েছে। কোনো পাড়ে একেবারে নদীর গায়েই গ্রাম, বন্দর, হাট-বাজার। মানুষের অবিরাম স্রোত। হাঁকডাক, ঠাসঠাস। মাল বোঝাই হচ্ছে, নাবানো চলছে। চকচকে টিনের ঘর,—লম্বা, কত বড়। পাটের গুদাম—নোয়াবালি বললে। আমি দু'চোখ মেলে চেয়ে থাকি। ভুলে যাই, কুমীর ডাকাত। কেবল প্রশ্নের উপর প্রশ্ন—এটা কি, ওটা কি, কোত্থেকে নৌকা আসছে কোথায় যাচ্ছে। ওখানে আমাদের নৌকা কেন একটু ভিড়াও না। বন্দরটা একটু দেখবো।

নোয়াবালি হেসে বল্লে—এমনি ভিড়াতে ভিড়াতে গেলে যে সময় মতো ঢাকাই পৌঁছোনো হবে না। বিয়েই বা দেখবে কী করে। কালকের মধ্যেই তো পৌঁছোনো চাই। ওই যাঃ, এদিকে যে একটা শুশুক উল্টে গেল, তুমি দেখলেই না। আর ওই, ওটা কি ডুবে গেল—কুমীরের লেজটা কি?

আমি লাফিয়ে একেবারে ঝুঁকে পড়ি, সে যেদিকে তাকিয়েছে,—কোথায় কুমীর?

নোয়াবালি খপ, করে আমাকে ধরে ফেললে—আঃ, এক্ষুনি যে পড়ে যাচ্ছিলে।

বকুনির ঝড় উঠল। মা আমাকে জোর করে নিয়ে ছইয়ের তলায় বসিয়ে রাখলেন।

নোয়াবালি হেসে বললে—আচ্ছা, আরেক বার উঠুক, তোমাকে ঠিক দেখাবো। ওই যে ল্যাজ দেখিয়েই কুমীরটা ডুবল, সে কী অমনি ডুবল ভেবেছ? শিকার দেখে তাক করে ডুবেছে। ঠিক উঠবেই কোথাও।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। কুমীরটা আর উঠল না। কিন্তু সে না-ই উঠুক, আমার উত্তেজনা এতটুকু কমতি হল না। ছই ধরে দাঁড়িয়ে, নয় ঝাঁপিয়ে সামনে এসে কেবল এদিক ওদিক দেখি—যে প্রকাণ্ড কুমীরটা তার লেজের ডগা দেখিয়ে ডুব দিল, সে আমার সমস্ত মন আর কল্পনা জুড়ে সত্যির চেয়েও আশ্চর্য হয়ে জেগে রইল।

সূর্য যখন মাথার উপর, রুস্তম মাঝি বলল—এই পাড়েই নৌকা ভিড়াই, আপনারা রান্না-খাওয়া সেরে নিন, আমরাও

খেয়ে নি। এই বাঁকটা পেরুলেই আসল পদ্মা। কোণাকুণি পাড়ি ধরতে হবে। আজকে হাওয়া বেশ ভাল বইছে। সন্ধের আগে ট্যাকের চর পেরুতে পারলে সারা রাত বেয়ে কাল ভোরেই সদর ঘাটে পৌঁছানো যাবে।

বাবা বললেন—হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি যেতে পার মাঝি, ততই ভাল, তোমাকে খুসী করে দেব।

রুস্তম মাঝি বললে—সে আপনারা দেবেন বৈ কি। সে আমি জানি। আমার নাও ভালো, আমি বাইতেও কখনো কসুর করি নে, বাবুরাই আমার কদর বোঝে। ফিরবার সময়ও আমার নাও কেরায়া করবেন ভুঁইঞা, আমি দু'-তিন দিন সদর ঘাটেই থাকব।

নোয়াবালি বললে—তা কেন, আমরা তোমার ভাড়া অর্ধেক দিয়ে যাব, তুমিই আবার আমাদের নিয়ে আসবে।

গণি তার ভারী থমথমে গলায় বলে উঠল—আগে পৌঁছানোই যাক, পরে ফেরার কথা। এখানে থামাবো নাও?

তার আগের কথাটা অস্পষ্ট, সবাই শুনলে কি না সেও সন্দেহ। আমার মনটা কেমন ছমছম করে করে উঠল। বললাম—কেন, পৌঁছোতে পারব না না কি?

গণি হেসে বললে—বলা যায় কি? জলে চলছ, কখন্ কি ঘটে। এ তো আর ডাঙা নয়।

আমাকে চুপ করে যেতে দেখে নোয়াবালি হেসে বললে—ঠকলে তো কুটি ভুইঞা, ও তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। এই বুঝি তোমার সাহস।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম—দূর, মোটেই ভয় পাইনি।

গণি তেমনি চাপা হাসল, বাঁকিয়ে তাকালো আমার দিকে। নৌকা পাড়ে ভিড়েছিল, আমি আর ওর দিকে না তাকিয়ে লাফিয়ে নেবে পড়লাম।

এটা ঠিক চর নয়। ধান-ক্ষেত, বন। নদীর পাড়। একটা একটা সরু পায়ে-চলা পথ—ধান-ক্ষেত বেয়ে এসে বনের ওপাশে মিলিয়ে গেছে। কাশ বাবলা মোতরার ঝাড় আছে-কাছে কাছে। জলের কিনারে কিনারে, ঘন ঝাড়। একটি অনেক পুরোনো বট গাছ। হেলে পড়েছে জলের ধারে। নদীর পাড় ভাঙতে ভাঙতেও কী করে রয়ে গেছে, কবে বা ভেঙে পড়ে। তারই ছায়ায় সবাই গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়াল, বসল। নোয়াবালি নাবল জাল নিয়ে, এবারে মাছ ধরবে সে। পিছন পিছন ছুটলাম আমি। নদীতে দু'-চারটে নৌকা ভাসছে। মাঝিদের অস্পষ্ট গান শোনা যাচ্ছে—

মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

আমাদের পাড়ের দিকে একটা লোক মাটির গামলায় বসে জল কেটে কেটে আসছে। ভেলা ঠেলছে দু'জন। ওপাশে ছোট ছোট কতগুলি বাচ্চা খুব স্নান করছে। তাদের ডুববার ভয় নেই, কুমীরের ভয় নেই, তারা সব নদীর পাড়ের, প্রায় উলঙ্গ, কোমরে রূপার ঘুন্সী। নোয়াবালি জাল ফেলে। জল-পরীর মতো জাল আকাশে পাখা মেলে, ঝপাং শব্দে জলে পড়ে। তলিয়ে যায়। নোয়াবালির হাতে দড়ি। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে একটু; আর, আমি একাগ্রদৃষ্টি। তাকিয়েই থাকি—কী মাছ উঠবে? যদি আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের কলসীর মতো কিছু একটা উঠে আসে। মামা-বাড়ি গিয়ে ছোট মাসির কাছে গল্পটা যে শুনে এসেছি এই সেদিন। হঠাৎ মনে হয় যদি সেই কুমীরটাই জালে আটকা পড়ে জাল টানতে থাকে নোয়াবালি আর আমার কৌতুহল উত্তেজিত হতে হতে একেবারে উদ্দামতার শেষ সীমায় উপনীত হয়! খানিক এগিয়ে আসি, খানিক পিছিয়ে যাই। কী যে দেখব! জাল সাদা হয়ে উঠে এল। কত মাছ—জাল সাদা হয়ে উঠে এল। কত মাছ—বান, খল্লা, ভাঙ্না। ভয়টা কেটে গিয়ে আরেক রকম আনন্দে ছুটে যাই। মাছগুলি খুলে নিয়ে বলি—ইলিশ মাছ উঠবে না?

নোয়াবালি হেসে বলে—ইলিশ মাছ কি এ জালে ধরা যায়' তার জাল আলাদা, ধরার কায়দা আলাদা। তারা মাঝ-নদীতে ঝাঁক বেঁধে চলে। বাটা খল্লাও ঝাঁক বেঁধেই স্রোতের উজানে এগোতে থাকে, তাই তো যখন ধরা পড়ে, এতগুলি করে পড়ে।

অনেক মাছ হল। ফিরবার পথে এক সময় নোয়াবালিকে বলেই ফেললাম—গণি মাঝি কেন অমন মুচকে মুচকে হাসে? অমন ভাবে তাকায়!

নোয়াবালি অবাক হয়ে বলে—তা কি হয়েছে?

কী যে হয়েছে, সে আমি তাকে কী করে বোঝাবো! আমি চুপ করে গেলাম। নোয়াবালি বললে—কেন এ কথা বলছো, কী ভাবছ, বলো তো?

আমি কিছুই বলতে পারলাম না। চুপ। নোয়াবালিই চলতে চলতে বললে—ছেলেটা দেখতে কিন্তু ভারী সুন্দর। কী আশ্চর্য চোখ দু'টো। আর বেশ গম্ভীরগোছের।

আমি শুধু বললাম—হুঁ।

বটের তলায়, দিব্যি সংসার। মা রান্না করছেন, ঠাকুরমা আহ্নিক করছেন। গণি আর রুস্তম নৌকাতে বাঁধছে। ঘটর ঘটর মশলা-পেশার শব্দ! এত মাছ, দেখে সবাই খুসী। মা রাঁধলেন খিঁচুড়ি, মাছভাজা, মাছ-ঝাল। ওরাও রাঁধল খিচুড়ি আর মাছের ছালন,—তাদের রঙ লঙ্কায় রাঙা, গন্ধে পেঁয়াজ-রসুনের তীব্র গন্ধ। রান্না হয়ে এসেছে, আমরা নদীতে নেয়ে এসেছি। খেতে বসব;—দু'জন লোক পাড়ের সেই পায়ে-চলা পথ দিয়ে আসছে। হাট নয়তো বাজার-ফিরতি। হাতে আখ, তরকারী, মাটির হাঁড়িকুড়ি। কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল, দাঁড়াল। বললে—কোথায় যাবেন আপনারা? ঢাকা, না, নাঙ্গলবন্ধ?

নাঙ্গলবন্ধ পুণ্যিস্নানের জন্য বিখ্যাত। বাবা বললেন—ঢাকা যাব। এদিকে কি হাট-বাজার, গাঁ-বন্দর আছে?

ওরা বললে—বনের ওপাশেই জেলেপাড়া। ধান-ক্ষেতের দক্ষিণে ভদ্রলোকের গাঁ। মাইল খানেক দূরে হাট-বাজার, নদীর পাড়েই বসে।

বড় কাকা জিজ্ঞেস করলেন—এদিকে কুমীর বা চোর-ডাকাতের ভয়-টয় নেই তো?

—সে ভয় বড় নেই। তবে······।

সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকালেন। তারা বললে—এই বন আর নদীর পাড়ের কাশ-ঝোপগুলি;—এগুলিই সব সময় নিরাপদ থাকে না। বর্ষায় বাঘ আটকা পড়ে, খুব ক্বচিৎ, তবু চিতে হেড়োল এখানে লুকিয়ে থাকে। বুনো শুয়োর তো প্রতিবারই বেরোয়।

চম্‌কে বাবা বললেন—সে কী মশাই, এখান দিয়ে হাঁটা-চলা করেন কোন্ সাহসে?

—হাট-বাজার তো করতেই হবে। সাবধানে থাকি, এ সময়টাই তো ভয়ের, দল বেঁধে চলি। শুয়োরের প্রাণেও তো ভয় আছে। তবে এক-একটা বড় বেয়াড়া থাকে। গতবারের কথাই ধরুন না। হাটের বার। পথ দিয়ে লোক-জনের আসা-যাওয়া। দিন দুপুর। কথা নেই, বার্তা নেই, গোঁ-গোঁ ডাক। তাকাতে না তাকাতে তেড়ে এলো—সে যে-সে জন্তু নয়। এক দাঁতালো শুয়োর। তার কী বিকট চেহারা—যেন দু'মণ চলন্ত গাব গাছের গুঁড়ি। দাঁত দু'টো দু'পাশে—ছুঁচোলো হয়ে বেরিয়ে। গোঁ ধরে যাকে তাড়া করল তার আর ছাড়ান নেই। পেট চিঁরে দু'ফাঁক করে দিলে। এত লোকের হৈ-হৈ, লাঠির পিটুনি, দায়ের কোপ, ট্যাঁটার খোঁচা—ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকটাকে দাঁত দিয়ে চিরলে, তার পরে তাড়া খেয়ে বেসামাল। নদীর পাড় ভেঙে একেবারে জলে। আর কি তাকে পাড়ে উঠতে দেওয়া হয়? সারাটা বেলা সোরগোল। আধমরা ভাম জন্তু, তবু কি সে মরতে চায়? পাড় খুঁড়ে, গুঁতিয়ে, জল ঘুলিয়ে একাকার। গোঁ-গোঁ ডাকে ত্রাস জন্মিয়ে দিয়েছিল সবার। তাই বলছিলুম—ভয়-ডর বিশেষ নেই। তবে, ওই শুয়োর-টুয়োর যা বেরোয় মাঝে মাঝে।

গল্প করে তারা চলে গেল। আমরা খেতে বসলাম। নোয়াবালি বললে—আসুক না, কোন্ শুয়োরের পো আসবে। লগি বৈঠা নেই! মাথা গুঁড়িয়ে দাঁত ভেঙে দেব না!

ঠাকুরমা বললেন—ও সবে কী দরকার বাপু, খেয়ে-দেয়ে তাড়াতাড়ি সব নৌকোয় উঠে পড়ো।

কাকা হেসে বললেন—আর বেটা দাঁতাল শুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসে মরুক গে।

ঠাকুরমা গম্ভীর মুখে বললেন—হাসি-ঠাট্টার কথা নয়। রাস্তা-ঘাটে বেরুনো কি কম ঝক্কি!

রুস্তম মাঝি এসে দাঁড়াল—তা ঠিক কথা বলেছেন কর্তামা, জলের পথে যাওয়া সে আরো বিপদ। এই কচি বয়স থেকে নৌকোয় ঘুরছি; কত বার যে কত বিপদে পড়লাম, আল্লার মরজিতে বেঁচে আছি এখনো। একবার ভরা বর্ষায় মেঘনা পাড়ি দিতে গিয়ে যে ব্যাপার, না থাক্, সে গল্প এখন করব না। ও সব আবার আমরা মানি কি না। এই জিন্-টিন্ অপদেবতার কথা বলছিলাম। তবে আপনাদের কোনো ভয় নেই, ভার যখন নিয়ে এসেছি ঢাকা পৌঁছিয়ে দেবই।

গণি একমনে নিজেদের খিচুড়ি নাড়ছে। মুখ তুলে তাকাল না। খাবারে মন দিলাম। ঠাকুরমা খেলেন ডাব, কলা, সাবু। মা আমাদের দিলেন গরম গরম খিচুড়ি, মাছভাজা। আমাদের খাওয়া শেষ; মা খেতে বসেছেন, এমনি সময় বনের দিকটা একেবারে সরগরম। কী যেন কী আওয়াজ হল, তার পরেই কুকুরের ঘেউ-ঘেউ, মেলা লোকের চিৎকার, ঝোপ পিটুনির শব্দ। লাফিয়ে সব একেবারে নৌকায়। শুধু বাবা কাকা নোয়াবালি পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। রুস্তম নাবল বৈঠা হাতে। শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বন কাঁপছে, বাঁশঝাড় ঘন ঘন দুলছে। সবাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি—ঐ—ঐ বুঝি কী বেরুল, দু'মণ গাব গাছের গুঁড়ি, ছুঁচোলো দাঁত।

কিন্তু ক্রমে আওয়াজটা পড়ে গেল। কুকুরের ডাক হল বন্ধ, লাঠির পিটুনিও মিলিয়ে গেল। সব চুপ। ব্যাপারটা যে কী, কিছুই বোঝা গেল না। কোনোখানে একটি লোক নেই, কা'কে জিজ্ঞেস করা যায়। বাবা-কাকা একটু এদিকে এগিয়ে গেলেন, নোয়াবালি আর রুস্তম ওদিকে। হদিশ পেলেন না। ফিরে এলেন।

রুস্তম মাঝি বললে—হয়তো গোসাপ কিংবা ষাঁড়,—তার পিছনেই সব অমনি ছুটেছে!

বাবা বললেন—কী জানি, নদীপাড়ের দেশ, কী রকম, কী ধরণ, সবই অচেনা অজানা।

গণি হাসিটা এবার লুকাতে পারলে না। সূর্যের আভা পড়ে মুখ উজ্জ্বল। নোয়াবালি বললে—কী হে গণি মিঞা, তুমি অত হাসো কেন?

গণি মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। শুধু সেই বাঁকা তির্যক চোখে তাকালে। তামাক টানতে লাগল। রুস্তম কোমরে ভাল করে গামছা বাঁধলো, হাল বৈঠা নিয়ে বলে উঠল—আল্লা আল্লা নবী, বদর বদর। অনুচ্চ গম্ভীর স্বর, সেই জনশূন্য নদীর পাড়ে জলের মধ্যে থম্‌থম গম্‌গম করে বাজল। বিরাট চওড়া নদী। রোদ ইস্পাতের মতো, চোখ ঝলসে দেয়। জায়গায় জায়গায় ঈষৎ কালো কালো লাগে। সুন্দর ঢেউ। যেন অনেকগুলি কালনাগিনী চিৎ-উপুড় হয়ে নেচে নেচে চলেছে। কী নিশানা করে কোন্ দিকে

—শ্রীশৈল চক্রবর্তী অঙ্কিত।
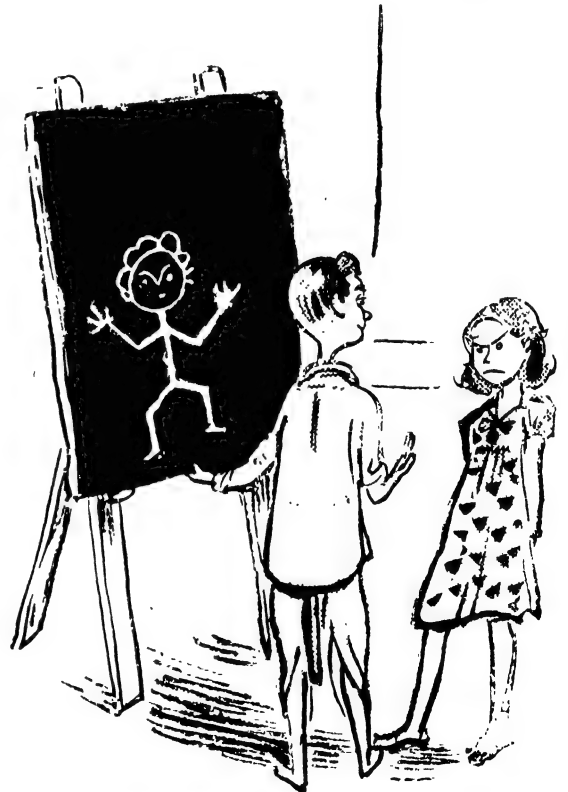
আমার দ্যাড়, ছবি আঁকতে মানা করলুম না?

কূল পাবে জেনে ওরা নৌকা ছাড়ল, বুঝে পেলাম না। অফুরন্ত অতল জল। মনটা কেমন করে উঠল। তীরে বনের আর কাশের ঝোপের আড়ালে যে দাঁতাল শুয়োরটা রইল অদেখা, কাকার কথা মতো যে আমাদের ধরতে এসে ধরতে পারত না, তীরে দাঁড়িয়ে রোষে ক্ষোভে ফুঁসত, সে যেন সম্মুখে প্রচণ্ড তরল রূপ ধরে দেখা দিল। কী রহস্য ভরা! গণির চোখের দিকে দৃষ্টি পড়ল। ঠিক ওই চাউনিতেও যেন অমনি রহস্য, নদীর সঙ্গে যেন তার গভীর যোগ। আমি মা'র কোল ঘেঁসে শুয়ে পড়লাম। রুস্তম মাঝি নায়ে পাল তুলে দিলে; বাবা-কাকার সঙ্গে তার খুব গল্প চলছে। কত কী গল্পই যে বলছে, তার আর শেষ নেই। ওর অত কথাও আমার ভালো লাগলো না। কূলহারা নিতল দরিয়ায় ওরা মাঝি, কিন্তু এই নদীর মতোই ওদের উপর আস্থা রাখতে পারছি না। কাগজের নৌকার মতো ছোট্ট নৌকাটা, দুলতে দুলতে নাচতে নাচতে চলেছে—ছল ছল ছলাং, ছল ছল ছলাং, ছল ছল। আমি মাকে আঁকড়ে ধরে কখন্ ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েই কেটে গেল।

নৌকা তালতলা ঘাটে এসে থামল। হেমন্তের সূর্য জলের গায়ে। বেলা অল্পই বাকি। ওপারে ট্যাকের চর—কালো বিন্দুর মতো। রুস্তম মাঝি বললে—এখানে আর নাও ভিড়াবো না ভুইঞা, সন্ধ্যা রাতেই ওই চরটা ছাড়িয়ে যাব।

বাবা বললেন—যেতে পারবে?

—খুব পারব। নয় তো সারাটা রাত এখানে থাকতে হবে, কাল বিকেলে সদরঘাট।

গণি এতক্ষণে কথা বললে—এত ভয় করলে দরিয়ায় চলা যায় না। জোরে বেয়ে চলে গেলে ট্যাকের চর পড়ে থাকবে কোথায়।

সে তাচ্ছিল্য ভরে হাসল একটু। নোয়াবালি বলে উঠল—হ্যাঁ চলো, বেয়েই চলো। তিন জনে দাঁড় বৈঠা বাইব, উড়ে চলে যাব, একেবারে ডাকাতদের ঘরে হানা দিয়ে, নাকের ডগা ঘষে দিয়ে, কী বল কুট্টি ভুইঞা?

রুস্তম মাঝি বললে—না, না, সে ভয় নেই, আমি চিরটা কাল নৌকা বাইছি, কত লোক নিয়ে এলাম গেলাম এখান দিয়ে।

তখন সন্ধ্যার মনোরম ছায়া, নদীতে কত নৌকা, কত রঙের খেলা। অপূর্ব! বাবা-কাকা অমত করলেন না, নৌকা এগিয়ে চলল। স্তব্ধ জল, ছোট ছোট ঢেউয়ের মালা গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে মাঝিদের গান ভাসছে। তরতর করে এগোচ্ছি। তালতলা তার হাট-বাজার, নৌকা, লোকজন, কাঠের পুল—সব নিয়ে আবছা হয়ে যেতে লাগল। এপারে তালতলা আর ওপার—জলের রেখায় আকাশে বিলীন। ডাকাতের দেশে যাচ্ছি, মনে ভয়ের লেশমাত্র নেই। বরং কৌতূহলে বাইরে নোয়াবালির কাছে বসে রইলাম,—কুমীর দেখালে না, দাঁতাল শুয়োরটাও কোথায় রইল কে জানে, এবার ডাকাত দেখাতে হবেই।—আমি বললাম।

নোয়াবালি হেসে ঠাট্টা করে বললে—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

গণি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকালো, তার সেই মোটা ভারী গলায় বললে—ডাকাত দেখবেই? তাদের কিন্তু একটুও দয়া-ময়া নেই, তারা কুমীর আর দাঁতাল শুয়োরের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তখন আর ভয় পেয়েও রেহাই পাবে না।

কথা শেষে সে আবার কেমন হাসল। সন্ধ্যার ওই কুয়াশা-ঘন ধূসর হাসির মতো, নদীর জলের আভায় যেন মিল হয়ে গেল তার। আমি ভ্রূ কুঁচকে নোয়াবালিকে বললাম—আরো জোরে বৈঠা বা[ও] না, তুমি তো বাইচে প্রথম হও।

নোয়াবালি বললে—কেন, দিব্যি তো নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে ওরাও ভাল বাইয়ে। অর্ধেকের বেশি এসে গেছে এক দিনে তোমার বুঝি ডাকাত দেখবার আর সবুর সইছে না?

আমি বললাম—দিনের বেলাই দেখতে চাই, তারা কেমন সবার সঙ্গে নৌকা বেয়ে যায়। ওই তো সেই চর, নয়?

হাত কুড়ি-পঁচিশ দূরে ট্যাকের চর। যেন একটা বিরা[ট] আদিম কচ্ছপ জলের মধ্যে পিঠ জাগিয়ে রয়েছে। গ্রাম এবং কলা গাছগুলিও দেখা গেল। আমার মনটা একটা কেমন উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে অস্থির। রুস্তম মাঝি এমন গল্প জুড়েছে, আর বাবা-কাকা এমন মন দিয়ে শুনছেন, তাঁদের বোধ হয় খেয়ালও নেই, কোন্ জায়গাটা পেরুচ্ছেন। এপারে এসে চর সমান্তরালে এগোনো, আগের পাড়ির রেখার সঙ্গে লম্ব-আঁকা। দেখতে দেখতে সূর্য ডুবল। সঙ্গে সঙ্গে হেমন্তের হিম-বাষ্প-ঢাকা রাত্রি এলো নেমে। নৌকার চার পাশে একটা সাদা সিল্কের ঘেরা-টোপ কে যেন পরিয়ে দিলে—তার বুনোট গাঢ় অথচ সূক্ষ্ম। এত যে নৌকা ভাসছিল মুহূর্তে সব অদৃশ্য হয়ে গেল। আর এদিক থেকে উত্তুরে হাওয়া কন্‌কন্ সনসন্ করে বইতে লাগল। নদীর ঠাণ্ডা, হেমন্তের ঠাণ্ডা—সব মিলিয়ে একটা অজানা শঙ্কা মূর্তিমান। হি-হি করে হাড় অবধি কাঁপিয়ে তুললে। নোয়াবালি একটু বিমর্ষ হয়ে বললে,—খুব কুয়াশা আজ।

রুস্তম মাঝি শুধু বললে—নদীতে কখন্ কী হয় বলা যায় না তো। সে নদীর খেয়াল। ওসব কি আর দেখলে চলে?

গণি বেশ একটু হেসে এবার আমাকে ডেকে বললে—কী কুট্টি ভুইঞা, এবার যদি দুষমণ আসে, কেমন হয় তখন?

ঠাকুরমা বলে উঠলেন—থাক্, ওসব কথা আর এখন বোলো না, নৌকা বেয়ে যাও। চরটা পেরুতে এখনো কত দেরী?

রুস্তম মাঝি হেসে বললে—সবে তো শুরু, দু'টো চর। তা ভয় কী ঠাকরুণ, কিচ্ছু ভয় নেই। একবার মেঘনায় ডাকাতের হাতে পড়েছিলাম, সেও বউ-ঝিয়ে নাও ভরা···চরের দুর্দ্দান্ত ডাকাত, হাতে খোলা তলোয়ার, চোখে ধূর্ত চাউনি······।

বাবা বাধা দিলেন—থাক্ মাঝি, পরে গল্প করো, নৌকো যে তোমার বেশি এগোচ্ছেই না।

নোয়াবালিও বলে উঠল—নৌকা সত্যি যে এগোচ্ছে না। জোরে বাও মাঝি।

গণি ধীরে বললে—উত্তুরে হাওয়া বইছে যে, উল্টো দিক থেকে, ভাটিয়ে নৌকা পিছে টানছে দেখছ না মিঞা!

সত্যি নৌকা এগিয়ে যেতে ভয়ানক বেগ পেতে লাগল। আধ মাইল পেরুতে আধ ঘণ্টা চলে গেল। কুয়াশাটা কেটে গিয়ে চাঁদ উঠল; ঝাপসা কাচের লণ্ঠনের মতো, নিঃসীম শূন্যে ঝুলছে। বড় কাকার হাতে ঘড়ি ছিল, রাত প্রায় আটটা। চর দু'টো এমনি ভাবে পেরুতে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক দেরি। বাবা-কাকা এতক্ষণে গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। একবার নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে

বললেন—নৌকা তালতলা থেকে ছাড়াটা ঠিক হল না। মাঝি ভরসা দিলে বটে, কিন্তু···

মা চাপা সুরে বিরক্তি ভরে বললেন—বাইরেটা দেখেই লোক চেনা যায় বুঝি?—আর, মাঝি যে গল্প জুড়েছে তোমরা একেবারে ভুলে গেছ। চেনা মাঝি তো নয়?

আমরা ভিতরে এসে চুপ করে বসে রইলাম। মা-ঠাকুরমা'র ঠোঁট ঘন-ঘন নড়ছে, ইষ্টমন্ত্রের সুর অস্ফুট শোনা যাচ্ছে। বাবা-কাকাও বার বার মাঝিকে বলতে লাগলেন—কী মাঝি, তোমার কথা তো ঠিক হল না?

রুস্তম মাঝি ঠিক আগের মতোই হেসে সাহস দিয়ে বলল—কী হয়েছে ভুইএা, উত্তুরে হাওয়াটার জন্যে এগোনো যাচ্ছে না, এক্ষুনি পেরিয়ে যাব আল্লার নামে। গণি, বৈঠার শব্দ বেশি করিস্ নে রে। ভয় নেই কিছু।

কিন্তু সেই শীতল রাত্রি, জল আর চর, যেখানে চরের মুসলমানদের বাস, সেখানে এক অচেনা মুসলমান মাঝির ভরসা মোটেই আশ্বাস জোগাল না। নোয়াবালি তার প্রাণপণ শক্তিতে বৈঠা টানছে। তার আড়ালে নায়ের মাথায় গণিকে বেশি দেখা যাচ্ছে না, তবু তার বাঁকা হাসিটা যেন আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। সে কি এখনো হাসছে? একবার এক ঝিলিক্ সে মুখ ফেরালো, আমারই দিকে, তেমনি হাসি স্পষ্ট। আমার পা থেকে মাথা অবধি শিউরে উঠল। ওকে যেন বুঝতে আর বাকি নেই। চরের সেই ধূর্ত্ত ডাকাতদের রূপ এক পলকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম। কিন্তু তখন আর কিছু করবার নেই।

আমরা কতকটা এগিয়েছি, বাতাসটা একটু কমে এসেছে, নিস্তব্ধ রাত্রি, কোত্থেকে ভেসে এলো একটা সুরের রেশ—সে কি বীণার ঝঙ্কার না বাঁশির তান, না চরের গায়ে-লাগা বাতাসের শব্দ! কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু অতি কোমল-ক্ষীণ রণন জলের গায়ে-গায়ে বেজে-বেজে সমস্ত জলটাকে যেন বাজিয়ে তুলেছে। আকাশটাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। চাঁদ যেন মত্ততায় নির্বাক্। বাতাস কান পেতে আছে। কী অপরূপ সুর—সে কী আনন্দ না বেদনা, না কী, জানি না, শুধু আমাদের সবার মন কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল। এ কোন্ অচিন্ স্বপ্নরাজ্য! এ কী মায়া! বাবা মৃদুস্বরে বললে—কিসের সুর মাঝি?

রুস্তম মাঝির কথা যেন সব হারিয়ে গেছে। বাইতেও যেন সে তাল পারছে না। অনেকক্ষণ পর উত্তরটা দিলে—জানি নে। কোথায় কি বাজছে, জলে অমনি শব্দ হচ্ছে।

নোয়াবালি দ্রুত বললে—হাওয়াটা পড়ে গেছে, এবার হাত চালাও মাঝি।

রুস্তম মাঝি বললে—হুঁ।

জনপূর্ণ জগতের বাইরে অন্তহীন বারিসমুদ্র। ম্লান চন্দ্রালোকে চরটা ধূসর, মাঝখানের গ্রামটা ঘনতরো কালো। অশ্রুতপূর্ব সুরটা কেঁপে কেঁপে ডানা মেলে কোথায় উড়ে চলেছে। আমার মনে হল, মা-ঠাকুরমা'র মুখে শোনা কোন্ রূপসী বন্দিনী রাজকন্যার দেশে চলে এসেছি। কবে লুণ্ঠিত হয়েছিল সে দুষমণদের হাতে, এমনি নৌকায় চলতে চলতে। আর মুক্তি পায়নি। কে উদ্ধার করবে? রাজকন্যা নিশুত রাতে বীণা হাতে বসে। ওরা যখন হিংস্রতায় শাণ দিতে থাকে, তৈরি হতে থাকে রক্তের লোভে, রাজকন্যা বীণায় তোলে ঝঙ্কার। এই হৃদয়হীন মানুষ, খলতায় ভরা জল, আর এই নীরস বালুর চর—এদের শ্যামল করা সুন্দর করার তপস্যাই যেন তার। ব্যথায় আশ্বাসে ভয়ে আনন্দে উত্তেজনায় সমস্ত অন্তর অনির্বচনীয় ব্যাকুলতায় আকুল হয়ে উঠল। আমাদের নৌকা কখন পাড়ের দিকেই অনেকটা এগিয়ে এসেছে কেউ টের পায়নি, এমনি সুরের জালের মোহবিস্তার। হঠাৎ ঝনন্নন্ শব্দে বীণার সব কটি তার যেন পড়ল ছিঁড়ে, সমস্ত প্রকৃতি নীরবে হায় হায় করে উঠল, গণি মাঝি শুধু ভারী গলায় বলে উঠল—সর্বনাশ!

আর কিছু বলার দরকার ছিল না। সেই রাত্রির বুক চিরে সে মুহূর্তে আওয়াজ শোনা গেল—ভোঁ, ভোঁ ভোঁ। তারই সুরে সুরে দূর থেকে দূরে আকাশে-বাতাসে জলে-স্থলে প্রতিধ্বনিত যেন হল—সর্বনাশ—সর্বনাশ!

নোয়াবালি পাগলের মতো টানের পর বৈঠার টান মারতে লাগল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—মা, ওরাই ডাকাত, চেনা মাঝি নিলে না কেন?

গণি তার টানা নীলচে ছ'চোখ মেলে তাকালো, তার মুখে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল সেই হাসি। ভারী স্বরে বললে—এখন একটুও শব্দ কোরো না।

রুস্তম মাঝি একেবারে বাঁকা পিঠ টান করে দাঁড়াল। বললে—ভুইএা ভিতরে যান। যা বলি শুনুন।

বাবা-কাকা অস্ফুটে চেঁচিয়ে উঠলেন—তুমি বেইমান, দুষমণ। ওই যে ওরা নেবে পড়ল।

মা-ঠাকুরমা ডুকরে বলে উঠলেন, রক্ষে কর, রক্ষে কর। হে মা কালী, হে মা দুর্গে!

তাঁদের গলা শুকনো, মুখ বিবর্ণ। রুস্তম মাঝি যেন একেবারে গেল বদলে। সে সজোরে বাবা-কাকাকে ধমক দিয়ে বললে—ভুইএা, অমন করলে মারা পড়বেন। ওরা এখনও কুয়াশায় আমাদের নাও দেখতে পায়নি, শব্দ শুনে তাক করে ফেলবে। নদীতে এমন কত বিপদে পড়তে হয়, ভড়্কালে নির্ঘাৎ প্রাণ হারাবেন। আমি যখন কথা দিয়েছি, আপনাদের বাঁচাবোই, মিথ্যা আশ্বাস রুস্তম সেখ দেয় না। গণি!

—হুঁ।

—পাল তুলে দে। যেদিকে নাও যায় যাক। হাওয়ায় জোর আছে।

নোয়াবালি আর গণি মাঝি দু'জনে পাল টাঙাতে লাগল। আর রুস্তম প্রাণপণে দাঁড় টানছে তো টানছেই। তবু ওরা এসে পড়ল। পান্‌সী ছোটে যেন চুম্বকের টানে। সাত-আটটা বৈঠার ছপ্‌ছপ্ শব্দ শোনা যেতে লাগল। জ্যোৎস্না, জল আর কুয়াশার সাদায় আমাদের নৌকার ছইয়ের টিনের সাদা মিশিয়ে এক। ওরা প্রথমটা ঠিক ঠাওর পেলে না। পাল পেয়ে নৌকা সাঁ-সাঁ করে দক্ষিণ দিকে চলল। সামনেই পেরিয়ে গেল ডাকাতের একটা পান্‌সী, গা ঘেঁসে প্রায়। ওরা দু'-তিনটা পান্‌সী নিয়ে নেবেছে। ছুটে এল একটা। হাত দশেক মাত্র তফাৎ। ওদের অস্পষ্ট অট্ট-হাসি ছুঁচের মতো কানে বিঁধল। আর ভাববার ছিল না। বাবা-কাকা বাড়তি বৈঠা টেনে নিয়ে ছইয়ের বাইরে এলেন।

নোয়াবালি আমাদের আজীবনের অনুগত। আমাদের সে বাড়ির লোকের চেয়েও বেশি জানত। তার অনেক দিনের সাধ ছিল বাঘের সাথে লড়াই করা। দুষমণের সঙ্গে হল মুখোমুখি। সে রোঁয়া-ফোলা বাঘের মতো উঠল ফুলে, প্রত্যেকটি পেশী গোণা যায় বুঝি জ্যোৎস্নাতে। বললে—মাঝি, জানি না, তোমাদের মনে কী দুষ্টুমি ছিল, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে কারো সাধ্যি নেই এদের কিছু করে।

গণি মাঝি তেমনি ফিরে তাকালো—তার মুখে কেমন ধূসর হাসি—তেমনি ভারী গলায় কী বলতে গেল, কিন্তু আর বলা হল না। ডাকাতের পানসী এসে নৌকা ধরো-ধরো। মা-ঠাকুরমা নিদারুণ ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। ডাকাতের দল আমাদের নৌকার পাশ ধরবার চেষ্টা করলে, সঙ্গে সঙ্গে গণি ফিরেই মারলে বৈঠার ঘা। নোয়াবালিও এলোপাথাড়ি ঘা লাগাতে লাগল। পালের টানে আমরা এগিয়ে চলেছি, ডাকাতরা নৌকায় উঠবার চেষ্টা করছে, রুস্তম মাঝির এক হাতে শক্ত করে হাল ধরা, অন্য হাতে সে লগির ঘা মারছে। ডাকাতেরাও চুপ রইল না, পাল কেটে ফেললে, তলোয়ার আর লাঠি চালাচ্ছে নিপুণ হাতে। নৌকা টালমাটোল করতে লাগল, আমাদের চিৎকার আকাশ বিদীর্ণ করতে লাগল, একটা বীভৎস কাণ্ড! আরো পানসী ছুটে আসছে। আমরা মা-ঠাকুরমাকে বাদুড়ের মতো আঁকড়ে আছি। কতক্ষণ জানি নে, দূরে হঠাৎ কুয়াশা ভেদ ক'রে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা ফুটে উঠল। তীরের দিক থেকে একটা বাঁশি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের দল চকিত হয়ে উঠল, বসে গেল পানসীতে, দু'ক্ষেপে পানসী পাঁচ হাত তফাতে চলে গেল। রুস্তম মাঝি চিৎকার করে উঠল—জলপুলিশের লঞ্চ, আল্লাহ বিসমিল্লাহ। তাই দুষমণ পালালো।

সবাই বিহ্বল হয়ে ওই দিকে তাকালাম। ঝাঁটার কাঠির মতো আলো ফেলে জলপুলিশের লঞ্চ আসছে। তারা হয়তো আমাদের চিৎকার শোনেনি, কিন্তু সন্দেহ কিছু একটা করেছে। রুস্তম মাঝি—কপাল কেটে তার রক্ত পড়ছে, এক হাতে দাঁড় টানতে টানতে অন্য হাতে কপাল মুছলে—আমাদেরও এর মধ্যে অনেক দূরে সরে পড়তে হবে। জলপুলিশের লঞ্চ পেরিয়ে গেলে ওরা যদি আবার ফিরে আসে! বাও, মিঞা বাও, মাঝ দরিয়ায় চলে যাই, ওপারে তালতলাতেই ফিরে যাই।

কিন্তু নোয়াবালি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—এ কী, গণি মিঞা কোথায়? গণি, গণি,—গণি মিঞা নৌকায় নেই। জলের আশেপাশেও তাকে দেখা গেল না। সবাই আবার হৈ-হৈ করে উঠলাম—ডাকাতরা কি তাকে নিয়ে গেল?

রুস্তম মাঝি হায় হায় করে উঠল—গণি, গণি!

বাবা বললেন—ঘা খেয়ে জলে পড়ে তো যায়নি?

কখন্ যে সে এই ব্যাপারের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেছে কেউ টের পায়নি। সবাই খানিকক্ষণ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। নৌকা বাওয়া অবধি বন্ধ। কী যে করা যায় কেউ বুঝে উঠতে পারল না; রুস্তম মাঝি আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—সে যে আমার মা-মরা ছাওয়াল, ওই যে আমার শুধু একটি। আর আমার কে আছে?

নোয়াবালি বলে উঠল—ওকে না খুঁজে আমি যাব না। ওই যে ওটা কালো কী। গণি, গণি।

নৌকা সে এগিয়ে নিয়ে গেল, কিছুই নয়। হয়তো [illegible] দেখেছে। যত দূর চোখ যায় বাবা-কাকা তাকিয়ে দেখলেন [illegible] জল, কুয়াশা ঢাকা, তারা নেই, আলো নেই, শুধু সাদা—নিছক [illegible] চার দিক! চরের থেকে আমরা তখন প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূ[illegible] জলপুলিশের লঞ্চ আলো ফেলে ওপাশে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এ[illegible] একটা বৈঠার শব্দের মতো শব্দ হল, রুস্তম মাঝি মুহূর্তে সচকি[ত] হয়ে বসল—ওরা আবার আসছে কি? নাঃ, নৌকা বাও মিঞা, [illegible] জনের জন্য এতগুলির জান দিতে পারি না।

নোয়াবালি দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তার পরে বৈঠা তুলে নিলে—হা আল্লা!

নৌকা নদীর গভীরে চলে গেল। প্রাণ বাঁচাতে কোথায় [illegible] চলেছি তার ঠিক নেই। নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ পাথার। কারু মু[খে] আর কথা নেই। যতই দূরে যাচ্ছি আর মনে হচ্ছে গণি[কে] কোথায় ফেলে আসা হল। আমার চোখে ভেসে উঠতে লাগল তা[র] সেই চাউনি আর সেই হাসি। তাকে খুব লড়তে দেখেছিলা[ম] একবার, আর খেয়াল করিনি। সমস্ত মনটা এখন কেঁদে কেঁদে উঠ[তে] লাগল। মা-ঠাকুরমা চোখ মুছছেন। বাবা-কাকা সেই জলের দি[কে] তাকিয়ে বসে আছেন, আর অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে রুস্ত[ম] মাঝি হালে বসে। নৌকা কোথায় চলেছে কে জানে!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, ভোর বেলা তাকিয়ে দে[খি] সূর্য উঠছে, কুয়াশা নেই। কমলাঘাট অদূরে। সারা রাত না [ঘুমিয়ে] রুস্তম আর নোয়াবালি মাঝ-দরিয়ায় নৌকা বেয়েছে। দিক পায়[নি] কূল দেখেনি। নৌকা এসে কমলাঘাট ভিড়ল। লোকাল[য়] যে কী, মাটি যে কী, সেদিন সে মুহূর্তে সবাই মাটিতে পা দি[য়ে] বুঝলাম। রুস্তম মাঝি যেন পাথর। বাবা থানায় খবর দি[তে] গেলেন। রুস্তম মাঝি বললে—আর ও-সব করে কী হবে ভুইএ[ঞা] আর কি সে আছে? চরের দুষমণ—যে-সে দুষমণ নয়!

পরক্ষণেই বলে উঠল—আমাকে ছেড়ে দিন এবার,—আমি এ[ক]বার তাকে খোঁজ করে আসি। সে জলেই হয়তো পড়েছিল, সা[রা] রাত হয়তো সাঁতার কেটে আমাকে খুঁজেছে। তাকে তো ভা[লো] মতো খুঁজেও আসিনি। সে তার মাকে খুব ভালোবাসতো। [illegible] কুটি ভুইঞার মতো তার একটি ভাই ছিল, সেও হারিয়েছে। ভাই[কে] হারিয়েছে বড় দুঃখ ছিল তার মনে, কিন্তু মুখের হাসি তার কথা[য়] মিলায় নাই। আমি যাবই—তাকে খুঁজতে যাব।

মা-ঠাকুরমা'র চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বাবা-কা[কা] পরামর্শ করে বললেন—না মাঝি, তোমাকে আমাদের সঙ্গে ঢা[কা] যেতে হবে, দেশে ফিরিয়ে নিতে হবে।

রুস্তম ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। নোয়াবালি বললে—তোমাকে নৌকা বাইতে হবে না, শুধু হাল ধরে বসে থাক, আ[মি] বাইব।

দুপুরের কিছু পরে আমাদের নৌকা ট্যাকের চরের কাছ দি[য়ে] ঢাকা ফিরল। তখন সোনা-গলানো জল, অনেক নৌকা আ[সা] যাওয়া করছে, জলপুলিশ ও স্থলপুলিশে মিলে তল্লাশ করছে গণি[র] কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। দিনের আলোতে মনেই হল [না] এইখানেই কাল রাত্রে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। শুধু রুস্ত[ম]... মনে হল গণি মিঞার মতোই কেমন রহস্যভরে হাসছে!

রূপ চর্চ্চার
আধুনিক প্রণালী
সকল দেশে ও সকল সময়ে রমণীরা নানা উপায়ে নিজেদের দেহশ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর সৃষ্টি হয়েছে। ক্যালকেমিকোর প্রসাধন সামগ্রী আজ রূপচর্চ্চার অন্যতম আধুনিক প্রণালী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত।
মলয় চন্দন সাবান
রেণুকা পাউডার
লাবণি স্নো ও ক্রীম
তুহিনা সৌন্দর্য্য ক্ষীর
ক্যাষ্টরল সুবাসিত ক্যাষ্টর তৈল
CASTOROL
La-bonny
কিনিবার সময় আসল জিনিষ দেখিয়া লইবেন।
ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং
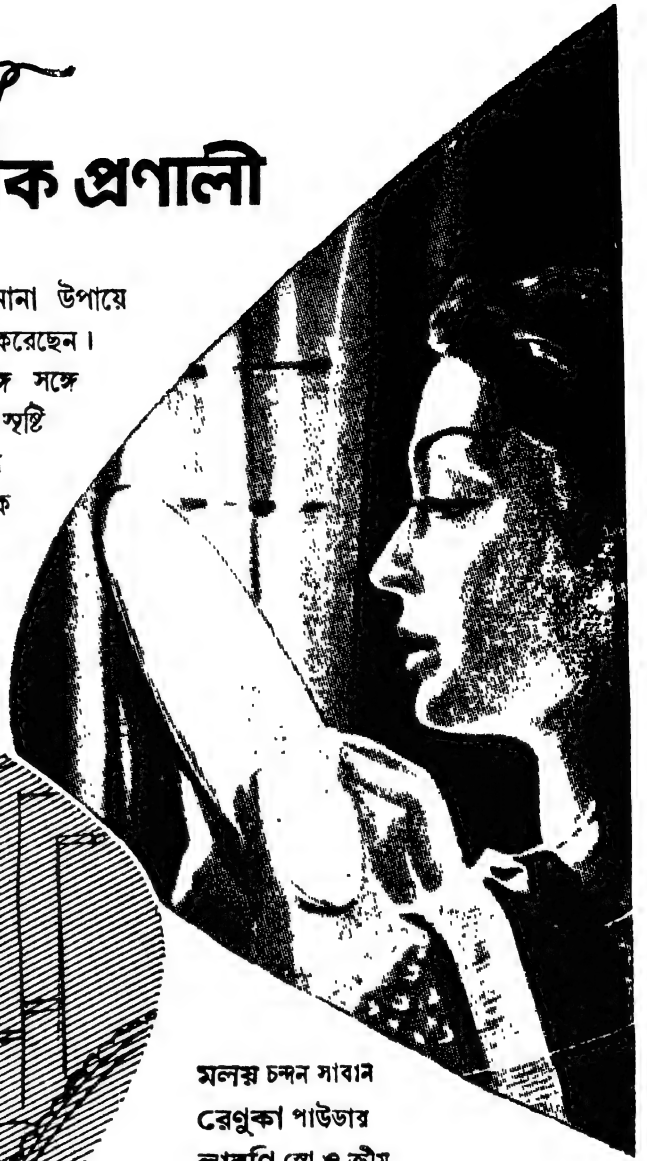
রিফিউজি

বিজন ভট্টাচার্য্য

আগে ছিল বাগান-বাড়ী, মাঝখানে হলো ভূতের বাড়ী—তার পর রিফিউজি কলোনী। দু'বছর পর এখন অবিশ্যি কলোনীও ঠিক বলা যায় না। তিরিশ-চল্লিশ ঘর উদ্বাস্তু পরিবার, কমে কমে এখন মাত্র দশ-বারো ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। জায়গাটা ঠিক বসবাসের উপযোগী নয়। বিশেষ করে খেটে-খাওয়া অভাবী মানুষের পক্ষে তো একেবারেই নয়। ধারে-কাছে কল-কারখানা নেই, দোকানপাট হাট-বাজার নেই, কাজকর্ম্ম চলে সমাজের যে স্তরের লোকের সঙ্গে, সেই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বসতিও কাছে-পিঠে খুব কম। এক আছে সসম্মান ব্যবধানের ফাঁক রেখে রেখে দু'-তিন বিঘে সাজানো বাগানের মাঝখানে ছোট ছোট দ্বীপের মত বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী। মানুষ থাকে কি থাকে না, বোঝাই যায় না। সব বড় বড় লোকের লজ ভিলা। ব্যবহারিক জীবনে লেন-দেনের কথা এখানে দূরস্থান। সমাজই নেই তার মানুষ থাকবে কি! তাই বেশীর ভাগ পরিবারই সুযোগ-সুবিধে মত রুজী-রোজগারের তাগিদে সরে নড়ে গেছে আশ-পাশ শহরতলী অঞ্চলে। অবশিষ্ট রয়ে গেছে মাত্র দশ-বারো ঘর। মাথা-মুখ গুঁজে এরা এখনও ফুটো-ফাটা ক্যানেস্তারা টীন আর হোগলা পাতার দোচালা ছাউনীর মধ্যে দায় ঠেকে পড়ে আছে। এরা একেবারেই ভাগ্যহত। ত্রিভুবনে ঠাঁই হয়নি এদের।

সেদিন ছিল উল্টোরথের মেলা। পাল-পার্ব্বণের দিন। সকাল বেলা। যে সূর্য্যের আলো আশীর্ব্বাদের মত ছড়িয়ে পড়েছে চরাচরে, সেই আলোই কলোনীর জোড়াতাড়া গুঁজিমারা দোচালা ছাউনীগুলোর ওপর এসে পড়েছে অকৃপণ ভাবে। ভোর বেলার হলদে আলো গায়ে মেখে ফাঁকে বসে পুতুল গড়ছে যশোদা কাদামাটি দিয়ে একমনে। সবই রেনে পুতুল,—ঘাগরা-পরা কাঁচুলি-আঁটা রাজপুতানীর বেশ, গোলগাল ট্যাপাটুপো। ঢং আছে কিন্তু ডৌল নেই। অবিশ্যি দামও আবার সেই রকম; মাত্র দু'-দু' পয়সা। আক্রাবার বাজার, বেলা পড়ে এলে দু'টো পুতুল তিন পয়সা দরেও ছাড়তে হয় কোন কোন দিন। দিনান্তে চার গণ্ডা পুতুল বিক্রী হলো তো খুব হলো সেদিন। টহলদার পুলিশের বাবরদারি আর রাহা খরচা বাদ দিয়ে যে ক' গণ্ডা পয়সা হাতে থাকে, তাতে করে একটা মানুষের আধ বেলার খোরাকিও হয় না।

মেলার বাজার। বেলাবেলি পুতুল পাঠাতে হবে হাট-বাজারে আজ। জোরে-জোরে হাত চালায় যশোদা।

গায়ের জামাটা কাঁধে ফেলে লক্ষ্মণও সাত-সকালে উঠে ধান্দায় বেরুচ্ছিলো রুজী-রোজগারের। পাল-পার্ব্বণের দিন বুঝে পিঁড়ি আর পিলসুজের ওপর আজ বাড়তি নিয়েছে খানকয়েক দোলমঞ্চ। মেলা বসবে বড় রাস্তার এক দিক থেকে আর এক দিক। জিনিষ-গুলো আজ তার কা সেও কাটিতে পারে ভাল দরে। বেরুবার মুখে উঠোনে যশোদাকে দেখে মস্করা করে বলে, তুই পয়া কি অপয়া, সে কথা বোঝবো আজ।

যশোদা হেসে বলে, কেন রাঙ্গা বউ এসে বাজারের পয়সা দিয়ে গেল দ্যাখলাম, কপালযশ তো আজ তারই। আমারে তো উঠোনে পরে দেখলি তুই!

—হাতে হাতে পয়সা নিলাম মুখ দ্যাখলাম কোন সময় গুপীনাথের বউ'র!

—ঐ হলো, মুখ দ্যাখোনি রূপ দেখোছো।

—না, মাইরী বলছি কালীর কিরে। পেরথম মুখ দ্যাখলাম তোর।

—তো ভালই হবে, যাঃ! আশীর্ব্বাদ করলাম।

—দূর ধুমসী, ছোট কখনও আশীর্ব্বাদ করে বড়োরে। ছোট যে সে করবে বড়োরে···

—কি করবে?

—দূর ছাই, দেরী হয়ে যাচ্ছে আমার, তুই মা'র ঠেঙ্গে শুনে নিস, আমি চল্লাম।

—কি হলো!—কথা জানে না কথা বলে বড় বড়।···কি বলে রে!—ঐ···

এই মা-মাসীর মত কথার পৃষ্ঠে কথা ধরে যশোদার মোড়লী করা একেবারেই পছন্দ হয় না লক্ষ্মণের। কথার ঠোনা খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, পুতুল না ছাই হচ্ছে ওগুলো কাদামাটি দিয়ে। পুতুল,—পুতুলির নাক হবে বাঁশীর মত টেকোলো, চোখ হবে টানা-টানা, হাত-পা'র ডৌল আসবে পিরতিমের মত—রং-এর ওপর গর্জ্জন তেলের ছোপ ধরালি চোখ-মুখ ধেঁধে যাবে খদ্দেরের—দেখবে কি কিনবে। চুনির জলে ডুবিয়ে ভুষো কালির ছোপ ধরালি যদি পুতুল হতো!—ও পুতুল তোর কেও কেনবে না।

কোথায় দু'টো রবাতজোরের কথা শোনাবে বচ্ছর-গণ্ডার দিন, তা না চোখে চোখ পড়তেই সক্কাল বেলা সাউকুড়ি করে কতকগুলো অকথা কুকথা শুনিয়ে যায় লক্ষ্মণ যশোদাকে।

কিল খেয়ে কিল চুরি করা প'টোর মেয়ের ধাতে নেই। অপযশ তো এমনিই আছে যশোদার—মুখ না যেন নাপিতির ক্ষুর! চেঁচিয়ে বলে, ছুতোর মিস্ত্রীর বেটা পট-পুতুলির কি বুঝিস রে তুই! ফের যদি মুখচোপা করবি তো তোর উকো দিয়ে নাক ঘ'সে তুলে দেবো। বেসরম ছেলে!

সরম-ইজ্জতের বালাই নেই লক্ষ্মণের। যশোদার গালাগালিগুলো গায়ে তো তার লাগেই না, বরং আস্কারা পেয়ে মস্করা করে ক্ষেপিয়ে তোলে যশোদাকে: এই ছুতোরের ব্যাটার মত নাক তুলতে পারবি যেদিন মাটির ঢেলার সেদিন দেখবি তোর পুতুল 'মনিহারী' দোকানে বিকোবে, বুঝলি! হাজার গণ্ডা মানষির হাটা-চলার রাস্তায় তখন আর তোর পুতুল ফুটপাথরের ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে না।···! দেখেছিস্ নাক!

বোঁচা নাকটা উঁচু করে তুলে ধ'রে হাসতে হাসতে চলে যায় লক্ষ্মণ তিনখানা পিঁড়ি, দু'গণ্ডা পিলসুজ আর খান চারেক দোলমঞ্চ নিয়ে। আজকের এই ক'টা জিনিষই আগামী কালের একান্ত ভরসা।

যশোদা আর কোন কথা কয় না। বুদ্ধির কাজে পরামর্শ সে তো সব সময়ই চায় লক্ষ্মণের কাছে। তা লক্ষ্মণই কোন আমল দেয় না। হাট-বাজারের কথা, মেয়েমানুষ সে কতটুকু জানে! 'মনিহারী' দোকানের কাচ-ঘরে যে পুতুল থাকে লক্ষ্মণের মুখে সে কথা এই জীবনে প্রথম শুনল। 'মনিহারী' দোকানের কাচ-ঘরে লক্ষ্মণ যদি তার পুতুল রাখবার ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে তো সে লক্ষ্মণের বাঁশীর মত নাকটাই মাটির পুতুলে তুলে দিতে পারে। পুতুল আর কাচ-ঘরের কথা ভাবতে ভাবতে যশোদা কালো কালির

ছোপধরা আঙুলে নিজের নাকটাই চেপে ধরে। ভাবে, নতুন দেশ, আনকো জায়গা, পথে-ঘাটে চলা-ফেরাবই বা কত কায়দা,—বাচ্চা কালের সেই হাত-ধরাধরি করে গোল হ'য়ে খেলার মত—এদিক দিয়ে যাবো, ঝাঁটার বাড়ি মারবো···। চৌকিদারের হাতে ঠেকে বড় বড় বাস, লরি পর্য্যন্ত মাঝপথে থেমে যায়। পুরুষ মানুষই বলে হিমসিম খেয়ে যায়,—তেমাথা কি চৌরাস্তার মাথায় পড়লেই চোখ বন্ধ করে কাছায় গেরো বেঁধে আর গেরো খুলে কলোনীতে ফেরে হয়রাণ হয়ে, আর সে তো সবলা অবলা মেয়েমানুষ। ঝাড়াঝাপটা নাড়াসাড়া হলেই কি আর পার পাবার যো আছে শহর-বাজারে! বলে প্রতি অঙ্গ প্রতি অঙ্গের বাদী যশোদার। চোখে-মুখে মানুষ টানে। কথায় বলে, মেয়েমানুষ এমনি অবলা। পথে-ঘাটে ঘরতি-ফিরতি যশোদা যেন আরও পলকা। লক্ষ্মণ যথার্থই তাকে 'বলদা' বলে গালমন্দ পাড়ে। কিন্তু একটা কথা ভেবে পায় না যশোদা লক্ষ্মণের। গালমন্দ যে অহরহ পাড়ে ভালও সে অন্ততঃ কিছুটা বাসে। সেইটাই রীতি জগতে। লক্ষ্মণের সে সব কিছু নেই। এইটাই আশ্চর্য্য! সে সব সময়ই তার নিজের তালে ব্যস্ত। কাজের ফাঁকে আনাগোনার পথেই যা হয় দু'টো-চারটে ফাঁকা কথা বলে ঠাট্টা-মস্করা করে; বাজারের হালচাল বুঝে কাজের কথায় কখনও কোন পরামর্শ দেয় না—যে না, এই দিয়ে এই কর।

এতটুকখানি সবাই করে। এমন তো না যে যশোদার জন্যেই লেগে থাকতে হ'চ্ছে লক্ষ্মণকে নিজের কাজকর্ম বিসর্জ্জন দিয়ে সারা দিনমান! একটু শুধু দেখিয়ে দেবে। আজ না হয়, কাল তো তাকে দাঁড়াতে হবেই নিজের পায়ে ভর করে। সংসারে কারো গলগ্রহ হয়ে সে এক দিনের জন্যেও বেঁচে থাকতে চায় না। মান আর অভিমান,—সকাল বেলাই মেঘ-রোদ্দুর খেলা করে যশোদার সারা চোখে-মুখে। গা-গতোর ভারী ভারী লাগে। বেনে পুতুল গড়তে বসে আর হাত ঘোরে না ছলবল করে। আর গড়েই বা লাভ কি পুতুল! হাটে-বাজারেই যদি না বিকোয়! হাতের কাছের মাটির পুতুলগুলো যশোদা দুপুর পর্য্যন্ত ঠায় বসে বসে সব ঠুকে ঠুকে ভেঙে ফেলে। তার পর বারান্দায় গিয়ে মাটি নেয়। এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো—শুয়ে শুয়ে গড়ায় যশোদা। ঠাণ্ডা মাটিতে গা ঢেলে দিয়েও সোয়াস্তি আসে না। আধ-ঘুম আধ-জাগানের মাঝখানে লক্ষ্মণ আর 'মনিহারী' দোকানে টিকোলো নাক বসানো বেনে পুতুলের কথাগুলো স্বপ্নের মত মনে হয় যশোদার;—মনের পুতুলগুলো হাত-পা ছুঁড়ে খলখল করে হাসে আর দেয়ালা করে যশোদার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। ঠাণ্ডা মাটিতে বুক চেপে শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে যশোদা।

আতুড় গা, ঠাণ্ডা মাটি, গা ঢেলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ডয়রা কলা-গাছের মত ফুলে ঢোল হয়ে ওঠে যশোদা সন্ধ্যে নাগাদ। এমন ঘুম যে, কানের কাছে ঢাক বাজালেও পছন্দ করি সে ঘুম ভাঙবে না যশোদার।

ছ'মাস আগেও দুই চোখের পাতা এক করতে পারেনি যশোদা। চোপর রাত কেটে গেছে তুতাশের গলা দু'হাতে জড়িয়ে। —জগৎ জুড়ে যশোদা!—কোথায় থেকেছে আর কোথায় থাকেনি

সে! শিয়ালদহ ষ্টেশন, সাবগাছি ক্যাম্প, বর্দ্ধমান—হরিণডাঙ্গা; সব ঠাঁই দুঃস্বপ্নের মত। দিন-রাত সমান অন্ধকার। যশোদা তখন প্রায় শুয়েই থাকতো সব সময়, কিন্তু ঘুম ছিল না চোখে। মাঝে মাঝে সারা শরীরটা তার শুধু থর-থর করে কেঁপে কেঁপে ঝিমিয়ে প'ড়তো। ঘুমেরই মতন অথচ সে ঘুম ঘুম না। কালঘুমের ছোঁয়াচ। সে সব দিনের কথা মনে করলে এখনও হাত-পা হিম হয়ে আসে যশোদার।

সন্ধ্যা উতরে অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। যশোদার সাড়া নেই। ছড়া-ঝাঁট নেই, সন্ধ্যে-বাতি নেই, আধ দামড়া মাগী সন্ধ্যে রাত্তির পর্য্যন্ত বারান্দার ওপর আড়াআড়ি ঘুমুচ্ছে পড়ে রাক্ষুসীর মত এলোচুলে,—এ একেবারে অসহ্য লাগে লক্ষ্মণের বুড়ী মা'র কাছে। কত হাঁক-ডাক, হাত ধরে টানাটানি, যশোদার ঘুম ভাঙে না। তিতিবিরক্ত হয়ে লক্ষ্মণের মা শেষ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন শুনতে চলে যায় রথতলা লাঠি ঠুকে-ঠুকে পথ-বিপথ বাছতে-বাছতে। বুড়ীর এ এক নেশা। কী-ই বা করে বুড়ী। হাতে-গড়া সোনার সংসার তার তো চোখের ওপরেই খানখান হয়ে গেল দুর্বিপাকের দাপটে। কাররারী হাতের মারপ্যাচ বোঝে না বুড়ী। লক্ষ্মণের মা জানে, 'সংসারে জন্মগ্রহণের পাঁচ দিন পর ছয় ষষ্ঠীর দিনই বিধাতাপুরুষ প্রত্যেক মানুষের কপালেই উত্তরকালে কি হবে না হবে সব ছকে দিয়ে যায়। সেই অব্যর্থ লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। জীবনের চাকা বন-বন করে ঘোরে সেই লিখনেরই অমোঘ বিধান মত,—কেউ হয় রাজা-গজা, কেউ হয় পথের ভিখারী। কেন হয় কি বৃত্তান্ত সে কথা মানুষের কথা বলে বিশ্বাসই করে না বুড়ী। ভবিতব্যের ওপর কথা নেই,—লক্ষ্মণের মায়ের শেষ কথা। তবু সংসারী মানুষ; জ্বালানি-পোড়ানি আছে;—থেকে থেকেই মনে পড়ে বুড়ীর কদমখালির চোদ্দপুরুষের ভিটে-মাটির কথা, নিজের হাতে বোনা লাল ন'টের ক্ষেত, লাউ-মাচাটা, কর্ত্তার আমলের সেই কালো পাথরের বাটিটা—বিধান মত অপ্রাপ্য হলেও বক্ষের নাড়ী ধরে টান মেরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়, আর বুড়ী অমনি ছুটে ছুটে যায় রথতলা। কীর্ত্তন না শুনে উপায় নেই বুড়ীর।

লক্ষ্মণের সেদিন কলোনীতে ফিরতে রাত হয়ে যায় বেশ কিছুটা। আশা ছিল খালি হাতেই পকেট ভরতি করে ফিরবে; ঘরের মাল আর ঘরে তুলতে হবে না। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক;—যা হলে হয় আর যা প্রকৃত হয়—দু'য়ে প্রায়ই মিল খায় না। কাজেই যে-মন নিয়ে মেলায় যায় সে-মন নিয়ে ফিরে আসে না লক্ষ্মণ। অবিশ্যি একেবারে যে হয়নি কিছু তাও না। জিনিষের মধ্যে পিঁড়ি পিলসুজ সবই প্রায় কেটে গেছে, এক দোলমঞ্চই তাকে কঠিন ঠেকায় ঠেকিয়েছে। একখানাও বিক্রী হয়নি। কি করবে!—দু'টাকার জিনিষ লক্ষ্মণের মুখের দিকে তাকিয়ে অনায়াসে ছ' আনা আট আনা বলে বসে খরিদ্দার; কাঠের দামেরই পড়তা থাকে না। মূর্ত্তি বিগ্রহের আসন বলে যে কেউ একটা ভক্তিশ্রদ্ধা করে দরদস্তুর করবে, এমন এক জন খরিদ্দারের সঙ্গেও পরিচয় হয় না লক্ষ্মণের। দোলমঞ্চ বিক্রী হয় কি করে! উল্টোরথের মেলা—পাল-পার্ব্বণের দিন,—যে দিন মানুষ বলে সখ করে দু'-চার টাকা বেশী করে ট্যাঁকে নিয়ে আসে, সেই দিনই যদি বেচা-কেনার বাজার এই রকম মন্দা যায়, তা হলে আর সব দিনের কথা তো, ভাবতেই পারা যায় না। লক্ষ্মণ ভাবে, জাত-ব্যবসার ওপর সম্বল করে আর হয়তো তার দিনই যাবে না। ভবিষ্যতের দিনগুলো অন্ধকার রাতের মতই কালো কালো মনে হয় লক্ষ্মণের।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে কলোনীর পথে পা বাড়ায় লক্ষ্মণ। আলোটা এখানে অস্পষ্ট। হোগলা পাতা আর টুকরো টিনের দোচালা ছাউনিগুলো আবছা ছবির মত দেখা যায়। পথ-ঘাট ভাল করে ঠাহর করা যায় না। লক্ষ্মণের কিন্তু তবু পথ চলতে অসুবিধে হয় না। পায়ের নীচ থেকে পথ সরে গেলেই সে অন্ধকারে ঠিক ঠ্যাওর করতে পারে। সরু সরু মেঠো হাঁটা-পথ কত অন্ধকার রাতে পাড়ি দিতে দিতে অভ্যাস হয়ে গেছে লক্ষ্মণের।

হঠাৎ আলো থেকে একেবারে অন্ধকারে পা বাড়ালে চোখ থাকতেও নজর চলে না মানুষের। দৃষ্টিটা সই হতে একটু সময় লাগে। তবু সামান্য একটু পরিসরের মধ্যে তিনশ' পয়ষট্টি দিন ঘোরাফেরা, সিদে ঘরে গিয়ে উঠতে অসুবিধা হয় না লক্ষ্মণের। পা থাবড়ে ধূলো-কাদা ঝেড়ে বারান্দায় গিয়ে ওঠে লক্ষ্মণ। ঘরের ভেতরটা আরও অন্ধকার। দু'-চার বার ডেকেও লক্ষ্মণ সাড়া পায় না কারো। কোথায় কার ঠাঁই আলো করে বসে আছে যশোদা এখন কে জানে! নিজের মনেই বকবক ক'রতে ক'রতে অন্ধকারে পা বাড়ায় লক্ষ্মণ। ঘুমকাতুরে পোটোর মেয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে মাটির ধূলোয়, লক্ষ্মণ সেটা অনুমানই করতে পারে না। এক পা দু' পা—তিন পা'তেই পড়বি তো পড় দোলমঞ্চ নিয়ে হুড়মুড় করে একেবারে যশোদার ঘাড়ের ওপর।

শালার কেলো কুকুর: রাগে ফেটে পড়ে লক্ষ্মণ! জোর বরাত বাঁশের খুঁটিটা বাঁ হাতে ধরে ফেলে সামলে নেয় লক্ষ্মণ ঝোঁকটা।

উ-হু-হু-হু-হু: আচমকা পায়ে চোট খেয়ে ছিটকে উঠে বসে যশোদা।—উ-হু-হু-হু-হু···!

কুকুর না, যশোদা।—উ-হু-হু-হু-হু······! সহানুভূতি তো আসেই না, বরং রাগ হয় লক্ষ্মণের; বলে—এই রকম ধারা মানষি শোয়! আমি ভাবলাম বলি······

বাধা দিয়ে যশোদা বলে, কেন কুকুর কি মানুষ নজরে পড়ে না! জলজ্যান্ত আস্ত একটা মানুষ শুয়ে আছে আর,—উ-হু-হু-হু-হু······

লক্ষ্মণ বিরক্ত হয়ে হেঁকে ওঠে, হ্যাঁ গা-গতোর দিয়ে হীরের নাগাল আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে কি না তোর যে নজরে পড়বে কেলো ধুমসী কোথাকার!

খুঁড়ো না বলছি হ্যাঁ!—চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে সে কথা বলে না।

ঘুম চোখে পা থাবড়ে ঘরের মেজেতে গিয়ে শোয় যশোদা।

এত আধিখ্যেতা সহ্য হয় না লক্ষ্মণের। বলে, সন্ধ্যে রাত্তিরি শুয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিস তোর লজ্জা করে না?···সন্ধ্যে পর্য্যন্ত পুতুলগুলোর জন্যি হা পিত্যেসে বসে আর এমনই নবাবের বিটি তুই যে সেই পুতুলগুলো পর্য্যন্ত পাঠাতি পারলি নে!

ঠেস মেরে কথা বলে যশোদা, কেন সে পুতুল না কি কেউ কেনবেই না হাটে-বাজারে পয়সা দিয়ে, তার পাঠিয়ে কি করবো।··· সে পুতুল আমি ভেঙে ফেলিছি।

—কি করিছি !

—ভেঙে ফেলিছি।

হতবাক্ হয়ে যায় লক্ষ্মণ যশোদার কথায়। কমসে কম দশ গুার পয়সা লোকসান! বিরক্ত হয়ে বলে, যাগ গে,······ গরু-ছাগলের সঙ্গে কথা বলারও এট্টা মানে হয় !

ভুল বুঝে আর ভুল করে লজ্জা হয় যশোদার; আবার হাসিও পায় বেহায়ার মত। অন্ধকারে একলা শুয়ে খিক্-খিক্ করে হাসে, শব্দ করে।

পিত্তির নাড়ী জ্বলে যায় রাগে লক্ষ্মণের। বলে, ফালতু ভাত খাস কি না, তাই বুঝে উঠতি পারিস নে যে কত ধানে কত চাল !··· একে হাসে ভুত-পেত্নি আর হাসিস তুই,···মরদ কাঁদা করা হাসি ;··· সাধে লোকে বলে কলঙ্কিনী !

সরম-ইজ্জতের বালাই টেনে ঘা দিয়ে কথা বলে লক্ষ্মণ। ফোঁস করে ওঠে যশোদা: তেই সামলে কথা বলিস, ছোট লোক ! আমি কোন্ বেটার মাগ না জানিস। দাসখৎ লিখে দেইনি কারো কাছে।

—পুতুলগুলো তুই ভাঙলি কোন্ আক্কেলে, বল !

—বলব না। হঠাৎ ফেটে পড়ে যশোদা: বলবো না, খাবও না আর ভাত।

—না খাবি নে। খাটবি নে যখন তখন ভাতও খাবি নে। অত সস্তা না ভাত।

—হ্যাঁ, অন্ততঃ তোর ভাতের যে খুব দাম, সেটা বোঝলাম।

—হ্যাঁ তাই বোঝ।

—আচ্ছা !

চুলের গোছা পাক দিয়ে বেঁধে বারান্দা দিয়ে হন-হন করে চ'লে যায় যশোদা। যাবার সময় বলে যায়, বুড়ী এসে যেন শোনে রাত করে আজ আমি গুপীনাথের বউ'র কাছে শোব।

—যেখানে তোর খুসী।

—অপরের খুসী-অখুসীর ধার ধারি নে রে !—ধরাকে সরা জ্ঞান করে অন্ধকারে উধাও হয়ে যায় যশোদা।

লক্ষ্মণ আর কোন হাঁক-ডাক করে না। বেয়াড়া ধরণের মেজাজ মেয়েটার, সোজা কথার উল্টো মানে ধরে মুখের ওপর অবুঝের মত মুখচোপা করে যখন-তখন, ভাল লাগে না লক্ষ্মণের। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে একটা বিড়ি ধরায় লক্ষ্মণ।

সত্যিই যশোদাকে নিয়ে এক জ্বালা হ'য়েছে লক্ষ্মণের। পদ্মাপার, চরখান্নাপুরের হিন্দু মেয়ে যশোদা, বছর ঘুরে গেল দর্শনা ষ্টেশন থেকে পাকেচক্রে সেই যে কদমখালির ক' ঘর পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে চলে এসেছে, ব্যস—রয়েই গেছে সেই থেকে। ঠাই নেই, সম্বল নেই,—যশোদা একাই এক পরিবার। সবাই পায়ে ঠেলে, দূর ছাই-বলে তাড়িয়ে দেয়,—তা ছাড়া সোমত্ত মেয়ের দায়িত্বের ঝুঁকি সাহস করে কেউ নিতেও চায় না; শেষকালে লক্ষ্মণই অনেক বলে-কয়ে কদমখালির দু'-চার ঘর পরিবারের মৌখিক আশ্বাসে সঙ্গে করে নিয়ে আসে যশোদাকে।

প্রথম প্রথম কোন কথা ওঠেনি। কোন দিন গুপীনাথের বাড়ী, কোন দিন চৈতন্য মাঝির বাড়ী, কোন দিন বিষ্টু কামারের ঠাই, কোন দিন বা লক্ষ্মণের কাছে, সুবিধে মত পাত পেড়ে পেট চলেছে যশোদার। কিন্তু এক বছর আগে আর পরে, চাকা গেছে সব উল্টে-পাল্টে ঘুরে। সবারই প্রায় দৈন্যের হাল। দায় এসে পড়ে লক্ষ্মণেরই ঘাড়ে। আছে তো আছেই,—সেই থেকে লাগা-বাঁধা রয়ে গেছে যশোদা লক্ষ্মণেরই হিস্যেয়। চৈতন্য মাঝি ওলাওঠায় মারা গেছে গত বছর। এ বছর তার পরিবারই ভাত পায় না। পথে-ঘাটে ভিক্ষে করে বেড়ায় চৈতন্যর বিধবা বউ বেটা-পুতের হাত ধরে। গুপীনাথ বাউল বৈরাগী মানুষ, স্বর ব'সে গিয়ে এখন আর সুর আসে না গলায়, কর গুণে আর হাত দেখে নিজের পরিবারকেই খাওয়াতে পারে না তার অন্য পরে কা কথা! কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। গুপীনাথের বউ'র কাছে হালে না কি দু'-একটা বেটাছেলেও আসা-যাওয়া করে। গুপীনাথ সবই জানে সবই বোঝে অথচ কোন কথা বলে না। পথে-ঘাটে চলতি-ফিরতি দেখা হতে দুঃখ করে বলে, কি করব ভাই, সবই অদেষ্টর বিড়ম্বনা! এক এক সময় মনে হয়, বউ'র মাথায় মুগুরির বাড়ি মেরে নিজে গলায় দড়ি দেই।···স্বর-বসা গলার বৃত্তান্তটা বুঝিয়ে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে বলে, এই স্বর যেদিন বসে গেছে না, সেই দিনই আমি বুঝিছি আমার অপমিত্যু হলো। আর বেশী কি বলবো! জ্যান্তে মরণ যে কা'কে বলে, তা গুপীনাথকে দেখলে বোঝা যায়। ঝড়-ঝাপটা সয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনও,—এমন আর এক জনও নেই কদমখালির। এক লক্ষ্মণই যা খেটে-খুটে কোন মতে টিকে আছে এখনও। ছত্রভঙ্গ কদমখালির একমাত্র সক্ষম উত্তরাধিকার। কিন্তু যশোদা যেন

—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত

—কবি তৈরী করা যায় না ভাই, কবিরা জন্মায়।

—এটা তোমার সেই বার্থ কন্‌ট্রোলের যুক্তি নয়তো ?

একটা দুষ্টগ্রহের মত আজ সেই উত্তরাধিকারকেও বানচাল করে দিতে চায়। কি আছে যশোদার মনে কে জানে! লক্ষ্মণ ভাবে আর বিড়ি টানে একলা বসে।

সামনেই গুপীনাথের দোচালা। ঘরে আলো জ্বলছে টিম-টিম করে। গুপীনাথের বউ'র করে বিশ্বাস নেই এক মুহূর্ত্ত। মোহিনী দিনে যোগিনী রাত্তে বাঘিনী। ইতিমধ্যে যশোদাকে আবার কি পরামর্শ দিচ্ছে কে জানে? দাওয়ায় বসে সোয়াস্তি পায় না লক্ষ্মণ। সাত-পাঁচ ভেবে যশোদার তল্লাসে বেরিয়ে পড়ে লক্ষ্মণ অন্ধকারে।

নিশুতি রাত। কোন সাড়া-শব্দ নেই। ভিজে ভিজে পায়ে হাঁটা পথ ধরে লক্ষ্মণ গুপীনাথের ছাউনীর চাচের বেড়ার গায়ে কান পেতে ধরে। বউ'র সঙ্গে ঝগড়া করছে গুপীনাথ। বিষয়টা— আন্দামান যাওয়া না যাওয়া। গুপীনাথের বউ'র আদৌ যাবার ইচ্ছে নেই আন্দামানে। বলে, আনকো আত্তান্তরের দেশ, চেনা-জানা একটা মানষির মুখ দেখতি পাবো না সারা দিনমানে, ড্যাঙার মানুষ জল-ঘেরা দেশে যেয়ে কি শেষকালে মরবো! মরে গেলিউ আমি আন্দামান যাবো না।

গুপীনাথের কাছে আন্দামান ও বর্দ্ধমান, যদিও দুই-ই সমান, তবু আন্দামান যাওয়াই সে বেশী পছন্দ করে। হয়তো ভাবে সমুদ্রমেখলা সেই দ্বীপের দেশে বউকে নিয়ে সে আবার সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করতে পারবে একাকীত্বের মাঝখানে। এক রকম পালিয়েই বাঁচতে চায় গুপীনাথ। যুক্তি দেখায়, এখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরার চাইতে তেপান্তরের সেই আন্দামান ঢের ভাল। কি আছে এখানে! আর সেখানে গেলে সরকার দেখিস্ জমি দেবে, হাল-লাঙল-বলদ দেবে, টাকাও দেবে পেরথমটা কিছু-কিছু,— সংসারী মানুষের আর কী চাই! আর তোর ফলন কি সেই মাটির, পলি মাটির ব্যাপার তো! লোকে কি না বুঝেই সব আন্দামান যাচ্ছে তুই বলতি চাস্?

গুপীনাথের বউ কিন্তু কিছুতেই সায় দেয় না। বলে, যাবার হয় তুমি একা যাও আন্দামান। এটা পেট আমার, দুঃখু-কষ্ট করে আমি চালিয়ে নেব এইখানেই। বাব্বাঃ, ভিন দেশে মানুষ যায়!

একবগ্গা কথা শুনে রেগে ক্ষেপে ওঠে গুপীনাথ: বলি সেডা না হয় ভিন দেশ হলো কিন্তু এডা তোর কোন্ বাবার দেশ! ছিলি তো পদ্মাপার!

না হয়: ঘাড় বেঁকিয়ে একোলষেঁড়ের মত তর্ক করে গুপীনাথের বউ।

এ ঝগড়া থামবার নয়। লক্ষ্মণ বুঝতে পারে, গুপীনাথ কাছেই থাক আর দূরেই থাক, ব্যবধানটা আন্দামানের মতই দুস্তর হয়ে গেছে দু' জনের মধ্যে। বেচারী গুপীনাথ!

স্বামি-স্ত্রীর এই বচসার মাঝখানে যশোদার থাকা কখনই সম্ভব নয়। অন্ধকারে পা টিপে-টিপে লক্ষ্মণ ভিন্ন পথ ধরে। কিন্তু গেলই বা কোথায় রাত মাথায় করে! খামখেয়ালী মেজাজের কি কিছু ঠিক আছে যশোদার! রাগ করে বেরুবার মুখে পর্য্যন্ত বলে গেল, গুপীনাথের বউ'র কাছে শোবে! লক্ষ্মণ নিজের মনেই গালমন্দ পাড়ে, হাড়জ্বালানে হতচ্ছাড়ী কোথাকার!

এদিক-সেদিক ঘুরে রথতলা গিয়ে হাজির হয় লক্ষ্মণ। বেশ সরগরম হ'য়ে আছে আসর তখনও। অশত্থতলার নীচেই শান-বাঁধানো পরিষ্কার চত্তরটায় দাবা প'ড়েছে দুই প্রস্থ। এগিয়েই কীর্ত্তনের আসর,—শ্রীরাধিকার লীলামাহাত্ম্য খোলের বোল সহ স্বতোৎসারিত হচ্ছে পদকর্ত্তার মুখে। থাকে তো এইখানেই আছে যশোদা, ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যায় লক্ষ্মণ কীর্ত্তনের আসরের দিকে। দেখে, সত্যিই যশোদা, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে হাতজোড় করে একেবারে পদকর্ত্তার মুখোমুখি বসে আছে। পদকর্ত্তা নকুলদাসও রসিক জন, আবেদন-নিবেদনগুলো আবার যশোদাকে লক্ষ্য করেই বেশ সুর দিয়ে বিতং করে গাইছে। দূরেই বসে আছে লক্ষ্মণের বুড়ী মা; কীর্ত্তন গান বড় ভাল লাগে বুড়ীর।

নকুলদাস গান করে আর ঘুরে-ঘুরে নাচে বেপরোয়া আনন্দে। রসের যোগান দেন শ্রীমধুসূদন, ওপর থেকে। মাটির সঙ্গে এ আনন্দ-রসের সরাসরি কোন যোগাযোগ নেই। নেই বলেই হয়তো এতটা অনাবিল, পরিমাণে এত বেশী। বেলফুলের মালা গলায় দিয়ে ধেই-ধেই করে নাচে নকুলদাস। দোল খেয়ে মালাটা কখন-সখন যশোদার কপালেও ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। ক্ষেপে লাল হয়ে ওঠে লক্ষ্মণ দূরে দাঁড়িয়ে। যশোদার কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কীর্ত্তন শুনে মধু-খাওয়া মৌমাছির মতই ঝিম ধরে আছে যশোদা; অদ্ভুত একটা রূপরাগ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে ওর তন্ময়তা ঘিরে। মেয়েমানুষের এত রূপ দেখেনি লক্ষ্মণ এর আগে কোন দিন। সে-ও পলক ফেলতে পারছে না; একদৃষ্টে যশোদার দিকে তাকিয়ে আছে।

রোজ এতক্ষণ বন্ধ হয়ে যায় কীর্ত্তন। ফুরোনির কারবার, সন্ধ্যে রাত্তির থেকে ঘণ্টা'খানেক গাওয়ার পরই সাধারণতঃ পালা শেষ করে নকুলদাস। মাস গেলে মাত্র বিশ-পঁচিশটা টাকা; দোয়ারী আছে, খোলন্দাজ আছে, ভাগের ভাগ নিজের বলতে বিশেষ কিছুই থাকে না। তবু চোখে চোখে না থাকলে লোকে ভাববে হয়তো মরেই গেছে নকুলদাস; কীর্ত্তন-টীর্ত্তন আর গায়-টায় না। মানুষের মন, ভুলতে কতক্ষণ! কাজেই ব্যবসার খাতিরেই চালিয়ে যেতে হয় সময় সংক্ষেপ করে। তবে হ্যাঁ, শ্রোতা ভাল থাকলে সত্যিই সময়ের হিসেব থাকে না নকুলদাসের। এক ঘণ্টার জায়গায় গোটা রাত্তিরটাই যে তখন কোন্ দিক দিয়ে কেটে যায়, টেরও পাওয়া যায় না। আজকের পালা-গান শেষ করতেও তেমনি দেরী হয়ে যায় নকুলদাসের। নামগান সহ সাড়ে বত্রিশকুশী মাত্রার তাল এতক্ষণে পড়তে সুরু করেছে খোলে। মহাশূন্যে আঙুল তুলে হরিধ্বনি দিচ্ছে নকুলদাস। এইবার পড়বে মুঠো-মুঠো বাতাসা। লক্ষ্মণের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে দেখছে যশোদাকে, কুণ্ঠা-কাতর ভিজে-ভিজে চোখ করে কীর্ত্তনীয়া নকুলদাসের দিকে তাকিয়ে আছে। ভাল লাগে না লক্ষ্মণের নকুলদাসের রং-ঢং। বুকের ভেতর থেকে একটা জ্বালা পাক দিয়ে মাথায় ক্ষেপে ওঠে। ইচ্ছে করে লাফিয়ে প'ড়ে যশোদার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে সে বাড়ী নিয়ে যায়।

রথতলায় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে উঠে দাঁড়ায় নকুলদাস: যশোদা পা গুটিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়ায় ভয়ে-ভক্তিতে। নকুলদাস বলে, কিছু মনে করো না মা; ও যে-রাধিকা সে-ই তুমি; ঠেকলই বা পায়ে আমার মাথা। আমি কোন প্রভেদ দেখি নে।

যশোদা কোন কথা বলে না। আজব কথা শুনে শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে নকুলদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আসর

...ও বিদায় নেবার আগে নকুলদাস বেলফুলের মালাটা যশোদার ...তে তুলে দেয়; বলে, ঘরে গৌরাঙ্গ আছেন তো মা, তা এই ...লাটা তাঁর পায়ে দিও তোমার মঙ্গল হবে। দেখো যেন ভুল ...র মালা ঠাকুরের গলায় দিও না।

ফুলের মালা গলায় দুলবে তার আবার এত বিধি-নিষেধ ...সের? সপ্রতিভ প্রশ্ন করে যশোদা: ক্যানো যতি গলায় দেই!

—যদি গলায় দাও!—নকুলদাস কুণ্ঠিত হেসে বলে, অবিশ্যি ...তে করে দেবতারও পাপ নেই তোমারও অপযশ নেই, মাঝখান ...থেকে কীর্ত্তনীয়া নকুলদাস মারা পড়বে আর কি, এই! মানুষের ...লার মালা দেবতার গলায় কি দিতে আছে মা!—তুমি পায়েই ...ও।

যশোদা কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্রী না। চোখ ঘুরিয়ে বলে, ...বে যে বললেন যে-রাধিকা সেই তুমি! মানবী কখনও দেবী হয় বাবা?

খুব সহজ অথচ কঠিন প্রশ্ন। নকুলদাস চোখ বুঁজে যেন ডুব দিয়ে ওঠে শব্দসায়র থেকে; বলে—হয়, যদি কেউ রূপারোপ করে। বুঝলে না!···মানে, তুমি তো আর তোমায় দেবী বলনি!······ আমিই তোমারে শ্রীরাধিকা সংজ্ঞা দিইছি।···এ ক্ষেত্রে আমি রূপারোপ করলাম তোমার ওপর, বুঝলে মা!

—মানে কথা নিজি বললি হয় না, পরে বললি হয়, এই তো!

—হ্যাঁ, তবে তার ভেতরেও কথা আছে।

—কি কথা?

—আছে মা আছে। অত উতলা হলি হয়।

—আচ্ছা তো আমি যদি বাবা আপনারে সেই গৌরাঙ্গ বলি···

—হ্যাঁ তা হলি আমিই সেই গৌরাঙ্গদেব। মানে কি।··· আমাতে গৌরাঙ্গদেব,—এখানে দেখছে কে!—তুমি,—তুমি আমাতে গৌরাঙ্গদেব দেখছো, কেমন কি না!—তা এখানেও কি সেই রূপারোপের কথাই উঠে পড়ে না মা!···আচ্ছা রাত হলো তা আর এক দিন এসো মা-জননী, বলবো কথা।

যশোদা দূর থেকে গড় ক'রে বলে, আচ্ছা তো আসবো এক দিন বাবা।

এত রঙ্গ জানে যশোদা জানা ছিল না লক্ষ্মণের। মাথায় তার খুন চেপে বসে। দুপুর রাতে নকুলদাসের সঙ্গে রথতলা এসে ধর্ম্মকথার মস্করা করার যে কি মানে, তা সে খুব বোঝে। এক মুহূর্ত্ত আর না দাঁড়িয়ে রথতলা থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় লক্ষ্মণ। না পালিয়ে উপায় নেই। কারণ, হাতের কাছে পেলে সে হয়তো তখন গলা টিপেই মেরে ফেলে যশোদাকে। লক্ষ্মণ ভাবে, একেই বলে কালসাপ! এক বছর ধরে পুষেছে বলেই না আজ সেই যশোদা তাকে দংশাতে এসেছে। এ দংশনের জ্বালা কালনাগিনীর বিষকেও হার মানায়। বিষদন্তী খায় একবারে, যশোদা দগ্ধাবে জীবন জুড়ে, লক্ষ্মণ যত দিন বাঁচবে তত দিন। মুখ থেকে জিবটাকে উল্টে ঠেলে বার করে ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস টানে

সে। শ্বাস-প্রশ্বাসেও তার আজ আগুনের জ্বালা। কিন্তু সে জানে, এ আগুনের এতটুকু আঁচ আজ যশোদার গায়ে লাগবে না; শুধু তার নিজের বুকের ভেতরটা পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে। একবার বসে, একবার ওঠে, পাগল-পাগল লাগে নিজেকে লক্ষ্মণের।

জলের গতি স্বাভাবিক অবস্থায় নীচের দিকেই। কথায় বলে রাগ না চণ্ডাল,—খুন চাপলে হুঁস থাকে না মাথায়। কিন্তু সেই মাথার সঙ্গে হুঁসের আবার এমনই নিকট সম্বন্ধ যে, সেই চণ্ডালের গোঁ নিয়েও খুন সেখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। নীচের দিকে নেমে আসে ফাঁক পেলেই। রাগ প'ড়ে আসে।

অন্ধকারে একলা খানিকক্ষণ চুপ-চাপ বসে থাকার পর লক্ষ্মণেরও রাগের উপশম হয়। কিন্তু তার পর দ্বিতীয় অধ্যায়েই আসে বুক ভ'রে অভিমান। প্রতিহিংসার পরই দুঃখবাদের কালীদহ। লক্ষ্মণ ভাবে, সত্যিই তো!—অনাত্মীয় এক প'টোর মেয়ে যশোদার সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক!…চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আত্মনিগতের অধ্যায়টুকু বেশ বসঘন করে তোলে লক্ষ্মণ।… যশোদাকে ভাত-কাপড় দিয়ে পুষেছে বলেই না এটা তার সেই লোকসানের জ্বালা!…হয়তো হবে, এত ছোট মন নিয়ে সে আজও পৃথিবীতে বেঁচে নেই। যশোদার মত অনাথা একটি মেয়েকে অন্ততঃ একটা বছর খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার মত হৃদয় তার আছে। কিন্তু সেই হৃদয়ের প্রশ্নই যদি হয় তা হলে তো প্রত্যাশার কোন কথা ওঠে না। দান করে প্রতিদানের প্রত্যাশা তো দাদনেরই নামান্তর। অভিশপ্ত সেই দানের মধ্যে পরোপকারের নামগন্ধ নেই। এখন এমনও যদি হয় যে সেই প্রত্যাশা নৈর্ব্যক্তিক, সামান্য একটু ভালবাসা ছাড়া কিছুই আর সে দাবী করে না যশোদার ওপর; কিন্তু তা হলেই না সেটা একেবারে নিঃস্বার্থ হয় কি যুক্তিতে? এতে করে, যার কিছু নেই, তার সেটুকু আছে সেই-টুকুই নিঃশেষে লুটে নেবার প্রবৃত্তি প্রকট হয়ে ওঠে না? ক্ষুদ্র স্বার্থের মহত্ত্বর ব্যাখ্যা দিলেই কি নিজের সব দোষ ক্ষালন হয়ে যায়? …কঠিন আত্মসমালোচনা, নিজেকে এতটুকু রেহাই দেয় না লক্ষ্মণ।

রাতের অন্ধকারে নির্জন দাওয়ার ওপর তিনমাথা এক করে চোরের মত বসে থাকে লক্ষ্মণ।

একটু পরেই লক্ষ্মণের বুড়ী-মা আসে যশোদার হাত ধরে। একেই কানা মানুষ, তায় রাত করে পথ চলতে সাপে কাটে কি বিছেয় খায়, বুড়ীকে যশোদাই আগলে আগলে নিয়ে বেড়ায় সব সময়। পাশ ফিরলেই,—কনে গেলি লো!—চেঁচাতে থাকে লক্ষ্মণের মা গলা ক'রে; নড়া-চড়াই এক দায় হয় যশোদার। বুড়ী মানুষের হাজার ফৈজত, শতেক ঝামেলা, হক না হক ক্ষয়-ক্ষতির কথা স্মরণ করে সময়-অসময়ে কানের মাথা খায় প্যাচাল তুলে: যশোদা কখনো কোন আপত্তি করে না। তার পর এটা-সেটা ফুট-ফরমায়েজ তামিল করার পর একটা সংশয়ের নিরশন করতে সত্যিই একেবারে হিমসিম খেয়ে যায় যশোদা,—লক্ষ্মণকে সে হয়তো বেহাত করে নেবে বুড়ীর কাছ থেকে। বুড়ী মানুষ, দেখতে পায় না চোখে, মনের কথা অন্তরে পুষে পুষে হঠাৎ এক দিন তুচ্ছ কারণে গণ্ডপ্রলয় বাধিয়ে বসে সংসারে। ছেলেকে বলে, তুই আগে ঐ রাক্ষুসিরে তাড়া হারামজাদা, তার পর কথা বলিস! লক্ষ্মণও কম যায় না; বুড়ীর কথার পৃষ্ঠে কথা বলে মুখচোপা করে কাঠগোঁয়ারের মত; মাঝখান থেকে যশোদাই একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে মায়ে-পোয়ে'র ঝগড়ার বিষয়বস্তু হয়ে—মনে হয়, তখনই চলে যায় ছুটে যেদিকে হয়। পদ্মাপারের মেয়ে যশোদা, পদ্মার মতই ফুলে-ফুলে ওঠে অভিমানে; কখনও রাগে, কাঁদে, ছুটে চলে যায় পাগলের মত দিগ্বিদিকে। শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণকেই তখন আবার ফিরিয়ে আনতে হয় যশোদাকে শত সাধ্য-সাধনায়। সহায়-সম্বলহীন একটা মেয়ে, আছে আছে একেবারে চলে যাবে হারা-উদ্দেশে, তাও আবার বিবেকে সহ্য হয় না লক্ষ্মণের মায়ের। বুড়ী বলে, জীবজন্তু পুষলিই কষ্ট হয়, আর এ তো মানষির বাচ্চা! তাড়াতে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বুড়ী যশোদাকে; মনের সংশয় মনেই থেকে যায় লক্ষ্মণের মায়ের। থাকে থাকে আবার এক দিন ফাটাফাটি লেগে যায় এই যশোদাকে কেন্দ্র করেই সংসারে। নিরসন আর হয় না সমস্যার। কিন্তু এ তো গেল সংশয় আর ভাবান্তরের কথা। মিলমিশও আবার কম নেই বুড়ীর যশোদার সঙ্গে। ঝগড়াই হোক আর যাই হোক, প্রাণের কথা বুড়ী আবার সময়ে যশোদাকেই বলে। বুড়ো বয়সে ছোট ছোট সূক্ষ্ম অনুভূতির বড় একটা দাম পাওয়া যায় না সংসারে! সবাই প্রায় বলে, ও-সব জরদ্গব স্নায়ুর বিকৃতি,—ভীমরতি! কিন্তু লক্ষ্মণের মা আশান্বিত হয়ে একটা কথা বলতে এলে যশোদা বুড়ীর সব কথাগুলো কান পেতে শোনে, তারিফও করে নানা ভাবে। দুঃখের জীবন বুড়ীর, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, যশোদার মত একটা উদ্দাম মেয়ের এই ভাল লাগালাগির ভেতরেই বাকি ক'টা দিন বেঁচে থাকবার একটা মানে খুঁজে পায় বুড়ী। মেয়েটার অন্তরের এই নিভৃত প্রসাদ-গুণটি ভুলতে পারে না লক্ষ্মণের মা। তাই যত কথা বুড়ীর যশোদার সঙ্গেই। বলে, কি গাওনাই করলো লো আজ নকুলদাস যশোদা, এই রকম মাথুর শুনি নাই বহু কাল! যশোদা হেসে উত্তর করে, সে তুমি যখনই রথতলা গেছ জানলাম, আমি তখনই বুঝতি পেরিছি বস্তু আছে কীর্ত্তনীয়ার মধ্যি। তা না হলি রোজ রোজ তোমার এই বুকে হেটে হেটে রথতলা যাওয়া…। পদগুলো এখনও আমার কানে বাজছে।

ঘরে ফিরেও সেই নকুলদাসের কথা। বিরক্ত বোধ করে লক্ষ্মণ। ভাবে, নকুলদাসের অন্তরের মণিমুক্তা ইতিমধ্যেই খুঁটিয়ে দেখা হয়ে গেছে যশোদার।

বেশ ছিল একলা অন্ধকারে। যশোদার মুখে পাকা পাকা কথা শুনে আবার তল্পে হয়ে ওঠে লক্ষ্মণ। বুকের অন্তস্তলে জ্বালা ধরিয়ে সেই চণ্ডাল আবার রুখে উঠছে স্নায়ুতে। সূক্ষ্ম আত্ম-বিশ্লেষণের অভিজ্ঞান ঝাপসা হয়ে আসে তার ব্যক্তিগত ভাল লাগা-না-লাগার চোরাগলি ধরে। আবার খেই হারিয়ে ফেলে লক্ষ্মণ। বুড়ী-মা ও যশোদার রসাত্মক আলোচনার মাঝখানে বেরসিকের মত চেঁচিয়ে ফেটে পড়ে: ভক্তিতে তো আর ভাত আসে না, শুধু কেত্তন শুনলি কি হবে।…সেই তো আমারেই আবার কাঠকুটো বেচে ব্যবস্থা করে আনতে হয় পিণ্ডির। তাও যদি আবার দুপুর রাতে এসে নিজির হাতে চটকাতে হয় সেই পিণ্ডি তাহলে ঘরে-দোরে আসার তো কোন দরকার নেই। তোমাদের

কি !—আছে নকুলদাস, খোলের বোলের আড়ালে মরম-কথা কয় !—সেই হলিই তো সব হয় তোমাদের !

সেই সকাল বেলা বেরিয়েছে !—সারা দিনমান হয়তো খাওয়াই হয়নি। লক্ষ্মণের মা বলে, না খেয়ে ভাত ভিজিয়ে রেখেছি তোর জন্যে হাঁড়ি করে ; এতক্ষণে বেড়ে-কুড়ে তো খেলিউ পাত্তিস্ সড়ে-নড়ে। আর নয় তো দু'পা এগিয়ে গিয়ে এট্টা ডাক দিলিই হতো, যশোদা এসে ভাত বেড়ে দিত! ম্যাও করবি নে অ'ও করবি নে তার ক্ষিদের আর দোষ কি বল ?···যা যশোদা, বেড়ে-কুড়ে দিগে যা।

—কি যশোদা ! ও ভিজো ভাত আমি খাব না। মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় ছোট ছেলের মত খম্ খম্ করে লক্ষ্মণ।

—খাবি নে তো গরম ভাত এখন আসবে কনথে শুনি ? হাঁড়িতি যে চাল বেশী, সে কথা তো সকাল বেলাই বলিছি।

—'বলিছি' তো এনেওছি, সে খবর রাখ ?

মানুষ বুড়ো হলে অনুভূতির পর্দাগুলো ভোঁতা হয়ে যায় ; কিছু চায়ও না, দেয়ও না। লক্ষ্মণের কথার উত্তরে বলে, এনিছিস ভাল করেছিস। তোর চাল তুই-ই খাবি। হাততালি বাজাবে কেডা রে তার জন্তি !···যা লো যশোদা, দু'টো চাল স্বাল দে দেগে।···এলাম একমন নিয়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে দিলে তারে খিঁচড়ে !—গুরু গুরু ! শুয়ে পড়ে লক্ষ্মণের মা।

যশোদার ক্লান্তি নেই। একটা ভাল জিনিষ আর পাঁচটা ভাল জিনিষকে জাগিয়ে তুলেছে তার গহন মনে। আজ তার খুব ভাল লাগছে। যশোদার কীর্তন মনে নেই, রাসলীলার মম মনে নেই, নকুলদাসও বিস্মরণ,—শুধু আজ সে একলা গহন বনের রাত-জাগা পাখীর মত অতন্দ্র জেগে আছে। অন্ধকারে উদ্বাস্তু কলোনীটা মনে হচ্ছে যেন নিসুপ্ত বৃন্দাবন ; নিজেকে মনে হচ্ছে বিলাসিনী রাইকিশোরী। ডান হাতে জড়ানো বেলফুলের মালাটা অনুভব করতেই মনে পড়ে তার নকুলদাস বাবাজীর কথা—মালাটা গৌরাঙ্গের পায়ে দিও মা, মঙ্গল হবে। কীর্তনীয়ার তত্ত্বকথা স্মরণ করে হাসি পায় যশোদার ;···'পায়ে দিও'···মালা কখনও পায়ে পরে ! অভিমান করে নিজেই অস্ফুটে বলে, পায়ে না হাতী !—দেই তো মালা আজ গৌরাঙ্গের গলায়ই দেবো।

নিজের মনেই স্ববভি হয়ে উঠে আনন্দে গলে গলে পড়ে যশোদা ! এদিকে লক্ষ্মণ যে মাথার ষাঁড় ক্ষেপিয়ে তুলে ঘাড় গুঁজে বসে আছে অন্ধকারে সে কথা খেয়ালই থাকে'না। বারান্দায় এসে খিল-খিল করে হেসে ভেঙে পড়ে যশোদা। রসিকতা করে বলে : ক্ষিদে পেয়েছে তাই বুঝি গোসা হয়েছে বাবুর !···ভাগ্যিস যাওনি রথতলা ! তা হলি আর কেত্তন শোনা হ'তো না।

লক্ষ্মণ কোন কথা বলে না। আহত অভিমানে দাঁত চেপে চুপ করে বসে থাকে।

যশোদার মন আজ হংসবলাকা। কথায় তার বাঁধন নেই আজ। বলে : কথা বলো না কেন ?···মরদের রাগ হবে বাঘের মত ; ধরবে চুলের মুঠি, মারবে তিন লাথি, অমনি গরম গরম ভাত এসে পড়বে থালায় ঝটপট। তা সে কপাল তো আর করে আসনি চাঁদ, রাগ করবে কার ওপর !

টেনে-টেনে কথা বলে আর কোমর বেঁকে ভেঙে ভেঙে পড়ে যশোদা লক্ষ্মণের সামনে খিলখিলিয়ে হেসে। নিজের আবেগেই বলে যায়, কেত্তন শুনে আসবার সময় নকুলদাস আমাকে এই বেলফুলের মালাটা হাতে নিয়ে বললে কি জান ?—বললে, মালাটা গৌরাঙ্গের পায়ে দিও মা, মঙ্গল হবে। তা আমি মনে মনে বলি কি সে, গৌরাঙ্গদেব তো ঘরে নেই, এক আছে কালো কিষ্ট তাও রথের মেলায় ঘরে ঘরে এসে চরণ দু'খানা তানার ধূলো-কাদা মাখা, শুনছো ?···

লক্ষ্মণ কোন রা কাড়ে না। অনেক কষ্টে নিবিয়ে ফেলেছিল সে যে আগুন, যশোদা এখন সেই আগুনেই ঘি ঢালতে সুরু করেছে। অন্ধকারে চোখ দু'টো তার চকচক্ করে জ্বলে ওঠে। যশোদার কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বেলফুলের মালাটা লক্ষ্মণের গলায় দিয়ে বলে, তা এ মালা যদি দিতিই হয় তো পায়ে কেন, গলায়ই দেই।

জ্যা'তে বাণ জোতাই ছিল, এখন টঙ্কার লেগে ছুটে গেল সেই বাণ। গলায় মালা দিতেই লক্ষ্মণ লাফিয়ে উঠে ঠাস্ করে এক। চড় বসিয়ে দেয় যশোদার নরম গালের ওপর। বেলফুলের মালা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে রুখে দাঁড়ায় দৈত্যের মত : বজ্জাত মাগী, নকুলদাস পেইছিস না ?

অপ্রত্যাশিত একটা প্রাণঘাতী অপঘাত অন্ধকারের গুহা-গর্ভ থেকে আছড়ে এসে প'ড়ে হঠাৎ যেন অবলুপ্ত করে দেয় যশোদার সমস্ত চৈতন্য-বুদ্ধি। টাল খেয়ে ঘুরতে-ঘুরতে সে বারান্দা থেকে মাটিতে পড়ে যায় দূরে। কোন সাড়া নেই যশোদার শরীরে। খড়-কুটো ধূলো-বালির ওপর লুটিয়ে থাকে মধুবৃন্দাবনের রাইকিশোরী।

একটু জোরে হয়ে গেছে চাপড়টা। হাতের ওজনটা লক্ষ্ম রাগের মাথায় একেবারেই আন্দাজ করতে পারেনি। কিন্তু হলে কি হবে ! উপায় ছিল না লক্ষ্মণেরও। একেই নকুলদাসের দেওয় মালাটা সাপের মত মনে হয়েছে লক্ষ্মণের যশোদার হাতে, তা ওপর সেই সাপ যশোদা যে আবার তারই গলায় জড়িয়ে দেবে-এ কথা ভাবতে পারেনি লক্ষ্মণ। সাপের বিষের যে কি জ্বা সে কথা যশোদা জানে না। আত্মরক্ষার তাগিদে সামান্য চড়-চাপড় কিছুই না তার কাছে। যশোদাকে টেনে তুলতে গিয়ে হা গুটিয়ে ফিরে আসে লক্ষ্মণ ;—থাক পড়ে অমনি হারামজাদী ; স্প ওর মরণ আছে।

নিঝুম রাত, বোবা অন্ধকার ; রাতের কালো চোখে টে যশোদা মাটিতে বুক চেপে গুমরে গুমরে কাঁদে।

লক্ষ্মণের কোন কথা নেই। কান পেতে সে শুধু কান্না শো যশোদার। ছলনাময়ীর ছলনা ;—রূপকথার সেই সো হরিণ।···হাসতে গিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে লক্ষ্মণের চো দিয়ে।

আত্মরতিমত্তমতিরকালোকালিন্দী,—এ চোখের জলে শুধু জ্বা আছে, শান্তি নেই।

কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হয়ে শান্ত হয় যশোদা। চোখের স নববৃন্দাবন হু-হু করে জ্বলে যায়। নকুলদাসের প্রেমলীলা গান মনে হয়। এ সংসারে কোন দিন কোথাও বৃন্দাবন ছিল শিখিপাখাশোভাগোপীমনবিমোহন শ্রীকৃষ্ণ ছিল না, ছিল না ক

লীলাময়ী সেই বরনারী শ্রীরাধিকা ; কীর্ত্তনীয়া তাকে ঠকিয়েছে। ভাবে আর মরমে মরে যায় যশোদা।—পদ্মাপারের প'ট্যোর মেয়ে সে, ঘর পুড়িয়ে ছাই খেয়ে ভিন দেশে এসে শুধু দয়াভিক্ষের ওপরে তো হা-ভাতের জীবনটা জিয়িয়ে রেখেছে। সেই তো তার সত্যিকার পরিচয়। কি ভাবতে কি ভাবলো সে, লক্ষ্মণের গলায় সাধ করে মালা দিয়ে দারুণ অপমানে জর্জ্জরিত করলো নিজেকে। কেন সে ভেবেছিল বেলফুলের একটি মালা সুখের করে তুলবে তার দুঃখের জীবনটা! সে কি ভুলে গিয়েছিল!—খাওয়া নেই, ঘুম নেই, চোখের ওপর যে বীভৎস নিগ্রহ, ভাতে কাপড়ে নুণে তেলে, দুঃস্বপ্নের মত টুঁটি টিপে ধরে তার, নখে দাঁতে সেই প্রত্যক্ষ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতেই তো তাকে হিমসিম খেতে হয় দৈনন্দিন জীবনে। এ সব কথা বিস্মরণের অবকাশ তার কতটুক্ আছে! মনে পড়ে তার সেই শক্তিগড় কলোনীর কথা, কদমগালির ছন্নছাড়া দলের সঙ্গে মালটানা লরী ভরতি করে যেখানে সে প্রথম গিয়ে ওঠে,—সাত দিন যেতে না যেতেই পরোয়ানা এল, উঠে যাও—জমিদারের ভাড়াটে লেঠেলরা মোটা লাঠি নিয়ে এসে হামলা সুরু করলে, সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক ভরতি পুলিশ এল গাছ-লাঠি উঁচিয়ে—সঙ্গীনধারী মিলিটারী এল তিন-চার গাড়ী—গুলীও চলল কয়েক রাউণ্ড ; হিন্দু-মুসলমান হামলাকারীদের গায়ে লেখা ছিল না, যশোদা ভাবলো বুঝি বা তিপ্পান্ন সালের কয়েক শ' দুর্বৃত্ত আবার আক্রমণ করে বসেছে তাদের ক্ষুদ্র বসতি। কিন্তু তখন তার মনে শুধু একটা কথাই,—বাঁচতে হবে আর বাঁচাতে হবে ; চৈতন্য মাঝির কোলের ছেলেটাকে দু' হাতে বুকে জড়িয়ে ছুটতে থাকে সামনের দিকে যশোদা। কই, সেদিনও তো প্রাণভয়ে এতটা মুষড়ে পড়েনি সে! এই তো সেদিনও, হাওড়া ষ্টেশন থেকে খানিকটা দূরে, রেল-লাইনের ওপর সেই শক্ত লৌহ যান্ত্রিক বর্থচক্রবর্ত্তে, বাক্সুসে একখানা ইঞ্জিন ভসভস শব্দে এসে যশোদার ঠিক পাঁজরার কাছটায় গর্জ্জাতে লাগলো, যশোদার পাশেই হুমড়ি খেয়ে পিঠ পেতে বসেছিল লক্ষ্মণ ;—বলে, ভয় পাসনি যশোদা, ভাগ্ করে গেছে ডাকগাড়ী! কই, ভয় তো তার একটুও করেনি সেদিনও! মৃত্যুর সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তো পায়ের তলা থেকে তার মাটি সরে যায়নি আজকের মতন! অনাথা এক উদ্বাস্তু মেয়ের ছন্নছাড়া জীবন,—এ জীবন তো সব সময়েই বায়ে ভেসে বাতাসে দোলে, এক দিন খাওয়া জুটেছে তো তিন দিন খাওয়া জোটেনি, জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি ত্রিশঙ্কু একটা থাকা-না-থাকার মতই দিন কেটে গেছে আলো-আঁধারিতে, কিন্তু তবু এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তো সেই রক্তঝরা দিনগুলো অপমানে আজকের মত কালো হয়ে ওঠেনি। রক্তক্ষরা দিন—রক্তাম্বরা পৃথিবী—নিজেকে মনে হয়েছে যশোদার ছিন্নমস্তা—নিজের রক্ত নিজে পান করে মহাশক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছে সে দানবের সাথে ময়দান নেবে বলে ; কিন্তু আজ তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়ে যেন অবসন্ন হয়ে পড়ছে নিদারুণ একটা রিক্ততায়। ভাল করে বাঁচতে গিয়েই কি সে আজ সাধ করে মরণ ডেকে আনলো জীবনে! না কি নকুলদাসের বেলফুলের মালায় পারিজাত মালার অভিশাপ ছিল!—সহ্য হলো না মানুষের গলায়!

রাতের অন্ধকারেও বুঝি কলঙ্কিনীর মুখ দেখা যায়। নিজের মুখখানা দু' হাতে চেপে ধরে যশোদা।

ঘুমোয়নি লক্ষ্মণ। হাতের ওপর মাথা রেখে দাওয়ার ওপর মটকা মেরে শুয়ে আছে। ভাবে, যশোদা মত মেয়ে, চড় খেয়ে নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না। কান্নাটা কমলেই ঝটকা মেরে উঠে তাকে উদ্ব্যস্ত করে তুলবে জবাবদিহি করে। একটা চড়ের শোধ লক্ষ কথার তুবড়ী ছুটিয়ে মুখে মুখেই সে উশুল করে নেবে। যশোদা কিন্তু একটা কথাও বলে না।' কান্না থামার পর কতক্ষণ হয়ে গেল,—তবুও না।

নিরবচ্ছিন্ন এই নীরবতা ভাল লাগে না লক্ষ্মণের। এর চাইতে যশোদা যদি তাকে একটা চড়ের জায়গায় পাঁচটা চড়ও মারতো, সেও যেন হ'তো ভাল। অন্তর্দাহের বেশ খানিকটা উপশম হতো দুঃখ সয়ে। কিন্তু এখন যেন সেই একটা চড়ই একশ'টা হয়ে উল্টে-পাল্টে পড়ে তাকে নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ দিচ্ছে না। থেকে থেকেই বুক চেপে ধরছে কঠিন চাপে। নিজের গাল ঠিক নিজে চড়ানো যায় না। অত্যন্ত বোকা বোকা মনে হয় নিজেকে। লক্ষ্মণ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ায় জোরে জোরে।

স্থৈর্য্যের বাঁধ একবার ভাঙলে ধৈর্য্য ধরে থাকা দায় হয়ে পড়ে। অনুশোচনার সঙ্গে সঙ্গে তখন আসে হার স্বীকারের মর্ম্মান্তিক অধ্যায়। জিতে-নেওয়া প্রত্যেকটা সামনের ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে তখন পেছনে হ'টে আসতে হয়। নিজের ঠোঁট নিজের দাঁতে আর কতক্ষণ কামড়ানো যায়! আত্মপীড়নের এই সব নীরব অভিব্যক্তি প্রতিপক্ষকে সহানুভূতিশীল করে তোলবার পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নয়। লক্ষ্মণ তখন পায়ের আঙুল নাড়ে, দাবনার ওপর সশব্দে মশা চাপড়ে মেরে হাবে-ভাবে যশোদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যশোদার কিন্তু তখনও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ হাত-পা ছোড়ে, উসখুস করে সারা শরীরে ; অগত্যা নিজের খেদেই আপন মনে বক-বক করে—ক্ষিদেয় শালা এদিকে পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত হজম হয়ে গেল সেদিকে কারো হুঁস নেই!······সংসারে খাসি এনে দাও, চেয়ে না কোন কিছু কারো ঠেঙ্গে ; ব্যস, তা হলিই আর কি তুমি ছোটলোক,······নেমকহারাম সংসার ;···যাঃ শালা আন্দামান তো আন্দামানই সই, চলে যাব আন্দামান···এখানেও নিজের বলতে কেউ নেই, সেখানেও কেউ থাকবে না।

ব্যবধানটা সামান্যই। আরও ছোট ছোট করে বললেও যশোদা লক্ষ্মণের সব কথাগুলোই শুনতে পেত্তো। কিন্তু জেগে ঘুমোয় যে ব্যক্তি, তার সাড়া কাড়া মানুষের সাধ্যে নাই। তাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হাজার গণ্ডা উত্তরেও লক্ষ্মণ যশোদার একটা কথার জবাব পায় না। চড় মারার পরই কিন্তু লক্ষ্মণের মনে হয়েছিল কথাটা—জাত-প'ট্যোর জেদী মেয়ে বলতে যদি সুরু করে একবার তো কথার খই ফুটবে মুখে, আর নয়তো দাঁতে দাঁত চেপে বুক ফেটে মরবে সেও ভাল তবু মুখ খুলবে না কিছুতেই।

মেয়েমানুষের অনেক জ্বালা। আড়ি করে দাঁত চেপে থাকবে বললেই চুপ করে থাকতে পারে না যশোদা, কারণ ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার অনুশোচনাগুলো লক্ষ্মণ এত গলা করে আওড়াচ্ছে রাত করে যে, এক্ষুনি হয় তো কানী বুড়ী ঘুম ভেঙ্গে উঠে যশোদাকে জবাবদিহি ক'রে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একশা করবে কলোনীর মাঝখানে। যশোদার নামে এক ঢোক জল তো সবাই প্রায় আগে খায়, মিথ্যাকে সত্যি করে তারাও হয়তো পাঁচটা অকথা-কুকথা বলতে

সুরু করবে তক্ষুনি। সুতরাং কথার উত্তরে কথা না বললেও উত্তর একটা দিতেই হয় যশোদাকে ন'ড়ে-চ'ড়েও। জীবনের দায়—সব চাইতে বড় দায়! এ দায় অস্বীকার করবার উপায় নেই যশোদার সংসারে।

এতক্ষণে উঠে দাঁড়ায় যশোদা ধূলিশয্যা থেকে। দু' হাতে মুখখানা সাপটে বিশ্রস্ত চুলটা আঁট করে বেঁধে নেয় খোঁপা করে। তার আঁচলের মুড়োটা মুহূর্ত্তে কোমরে পাক দিয়ে জড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় লক্ষ্মণের পাশ কাটিয়ে। হাঁফ ছেড়ে উঠে বসে লক্ষ্মণ। সেও যেন প্রাণ ফিরে পায় এতক্ষণে। গোটা জীবনটা হঠাৎ এই ভাবে নিজের মধ্যে গুটিয়ে কি চুপ করে বসে থাকতে পারে মানুষ! যশোদাকে উদ্দেশ ক'রে সে-ই প্রথম কথা পাড়ে: থাক আর রাত ক'রে কাত করতি হবে না। আমি আর কিছু খাব না আজ।

যশোদা কোন কথা বলে না। মুখ বুঁজে শুধু কর্ত্তব্য কাজ করে যায়। ইচ্ছে ছিল, ঐ মাটির ওপরেই অবসন্ন দেহ-মনটাকে এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্মণ তাকে সে অবকাশ দিল না। নিজের জীবনের দুঃখের পাঁচালী স্বার্থপরের মত ঘুলিয়ে তুলে বিষিয়ে তুলল আবহাওয়া; যেন লক্ষ্মণের জীবনে যা-কিছু হয়নি আর যা-কিছু হলো না, তার জন্যে যশোদাই একমাত্র দায়ী। স্বার্থবাদী মানুষের এই মনটার থই পায় না যশোদা। রাতের কালোর মতই এই দিকটা মানুষের বুঝি নিরন্ধ্র অন্ধকার! নিজেও জানে না, অপরকেও জানতে দিতে চায় না। ঠিক বুঝতে পারে না যশোদা কি রকম কি হয় ব্যাপারটা।

তাও দায়িত্ব স্বীকার করেই কি পার পাবার যো আছে! কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য—তাও তো আবার সম্পর্কিত মানুষের পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করে। যেমন, মনে যাই থাক যশোদার, ক্ষিদের জ্বালায় যার পেটের নাড়ী হজম হয়ে যাচ্ছে, তাকে ফ্যান-জল দেওয়াই যশোদার প্রথম কর্ত্তব্য। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই হাঁড়ি নিকিয়ে ভাত তুলতে যাচ্ছে যশোদা এত আয়াস স্বীকার করে; অথচ লক্ষ্মণই আবার তাকে ঠেস মেরে বলে, থাক আর রাত করে কাত করতে হবে না। লক্ষ্মণ চায় ভাত রেঁধে আনুক যশোদা গরম গরম তার জন্যে; অথচ সেই ভাত যখন হাঁড়ি করে চড়াতে যায় যশোদা তখন লক্ষ্মণের হয় ভীষণ রাগ। লক্ষ্মণ যে কি চায়, সে কথা লক্ষ্মণ নিজেই জানে না; তার যশোদা কি বুঝবে?

হাঁড়ির ভেতর চাল ছেড়ে দিলেই ভাত তৈরী হয়ে আসে না। তার জল চাই, আগুন চাই,—একটা কাজ করতে গেলেই পাঁচটা আনুসঙ্গিক কাজ এমনিতেই জড়িয়ে আসে তার সঙ্গে। তা আসুক। কাজে যশোদার ভয় নেই। জল ছিল না, ঘড়া ভরতি করে রথতলার 'টিউকল' থেকে জল নিয়ে এলো যশোদা। বিছে কামড়ায় কি সাপে কাটে তার ঠিক নেই, জল আনার পরই কাঠকুটো কুড়িয়ে নিয়ে আসে যশোদা আগান-বাগান ঘেঁটে। তাও উনুনটা খটখটে থাকলে হয়!—বৃষ্টির জল পড়ে সেই উনুনের ভেতরেও আবার এক-হাঁটু জল বেধে আছে—সে এক মহা সঙ্কট। ন্যাকড়া-কানি ডুবিয়ে ডুবিয়ে সেই জল তখন আবার তাকে নিংড়ে ফেলতে হয় নিস্বরী করে। ভিজে কাঠ-পাতায় আগুন ধরে না সহজে, পোড়া উনুনের ওপর হুমড়ি খেয়ে ফুঁ পেড়ে পেড়ে বুক ফেটে ফিক্‌-ব্যথা ধরে যায় যশোদার। তাও উনুনের পাড়ে একনাগাড়ি বেশীক্ষণ বসে থাকা যায় না। ভিজে পাতার সাদা ধোঁয়া নাকে মুখে ঢুকে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়। উবু হয়ে তখন দশ বারোটা লম্বা লম্বা ফুঁ একনাগাড়ি দিয়ে যশোদা এক ছুটে গিয়ে ফাঁকায় দাঁড়ায়! ভিজে পাতার ভারী ধোঁয়া, দম যেন একেবারে বন্ধ হয়ে আসে যশোদার।

এই ধোঁয়ার গন্ধের একটা সুবাস যশোদা আজও ভুলতে পারে না। সাঁজাল দেওয়ার মত কেমন যেন একটা বোঁটকা গন্ধ সুখ-স্মৃতির মতই ঘুর-ঘুর করে তার মনে। যশোদার মনে পড়ে, পদ্মার বুকে জাগান দিয়ে ওঠা ছেড়ে-আসা গ্রাম সেই চরখান্নাপুর, ধান-ক্ষেতের ভেতর দিয়ে হারিয়ে যাওয়া সেই উড়াল দেওয়া আল-পথ- -খেটে-খাওয়া অভাবী মানুষের প্রাণের রাজপথ; ঢেঁকিশালের ওপর লতিয়ে ওঠা কুমড়ো গাছের ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে কালো ভোমরার সেই ঘুরে-ঘুরে আসা। স্মৃতি-পুঁথির পাতায় সব কথাগুলো এখনও সোনার জলে লেখা আছে যশোদার।

সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী অন্ধকার আকাশে রাতের আমগাছের মাথার ওপর দিয়ে পাক খেয়ে উধাও হয়ে গেছে মেঘলোকে। যশোদার মনেরও ঠিকানা নেই। সে যেন এখন সেই চরখান্নাপুরের গাঁয়ের

ভিটেয় চুপ করে একলা দাঁড়িয়ে বর্ষণক্লান্ত শরতের আকাশে পূর্ব-পশ্চিম আড়াআড়ি সাতরঙা এক রামধনু দেখছে।

একটা মেয়ের একলা চিন্তা ভাল লাগে না লক্ষ্মণের। দায় যা সে তো আপনা থেকেই মনে মনে কাঁধে তুলে নিয়েছে পোটোর মেয়ের; তার আবার অত ভাবনা কিসের যশোদার!

মেয়েমানুষ গম্ভীর হয়ে থাকলে বোধ করি পুরুষকার খর্ব হয় মরদের! লক্ষ্মণ বলে, ভাবনা আর চিন্তে, চিন্তে আর ভাবনা! অত ভাবুনে হলি কি আর ভাত রাঁধা যায়! কাব্যি চলে।

লক্ষ্মণের কথায় সম্বিৎ ফিরে আসে যশোদার। এক ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েই নিবন্ত উনুনে ফুঁ দিতে থাকে জোরে জোরে। আগুনের আঁচে মুখ রাঙা করে বলে, রাঁধতি জানলে সে-ও হয় এক কাব্যি; ভাবুনে হলাম তো কি হলো?

যশোদার মুখের কথা শুনে খুসী হয়ে ওঠে লক্ষ্মণ। এগিয়ে গিয়ে বলে, হাঁ হয়, ফ্যান-ভাতের কাব্যি, তাও রাত তেরটার সময়!

—আমারে শোনাচ্ছ?

—হ্যাঁ, তো আর কারে!

—বুঝি নে।···অসুবিধের সব কথাগুলোই যে আমারে শুনতি হবে সেটাই বা কি রকম?

—বেঠিকটাই বা কি দেখছিস তুই! সামনে থাকিস, ঘুরে ঘুরে বেড়াস কাজে-কম্মে, এখন দরকারের সময় অসুবিধের কথাগুলো কি আমি ও-পাড়ার মানসির কাছে বলতি যাবো?

—সে এখন তুমি বোঝ গে।

—মানে?

—মানে, আমিই বা ও-পাড়ার না হয়ে এ-পাড়ার হলাম কবে থেকে?

—যবে থেকে আসে তোর হিসেবে।

—আমার হিসেব ভাসার হিসেব; আজও ভেসিছি কালও ভেসিছি। তার মধ্যি এ-পাড়া ও-পাড়া নেই। ভেসে এসিছি আবার ভেসে চলে যাবো।

—দিলি তো!

—ওঃ, খুব যে দরদ দেখি! এট্টু আগেই না তার হাতেনাতে প্রমাণ দেখলাম!···মস্করা করে কথা বলতি লজ্জা করে না?

—লজ্জা সে তো মেয়েমানুষির অঙ্গের ভূষণ। বেটাছেলের কি লজ্জা মানায়?

—না, বেটাছেলের হতি হয় চোমগোর; মেয়েমানুষির গালের ওপর ঠাস-ঠাস করে চড়াতি হয় তারে।···আবার কথা বলে!

অভিমানে বুকের ভেতরটা থেকে থেকে মুষড়ে ওঠে; দমকা শ্বাস টেনে টেনে ফুলে ফুলে কাঁদে চুপ করে। উনুনের আঁচে তেলা-তেলা রাঙা মুখখানা ঝিলিক মেরে ওঠে অন্ধকারে।

লক্ষ্মণ কি বলবে ভেবে পায় না। সমস্ত বক্তব্য যেন কঠিন হয়ে তার গলার মাঝখানে এইমাত্র আটকে গেল। ঢোক গিলতে গিয়েও দম পায় না লক্ষ্মণ। চোখ দু'টো কর-কর ক'রে ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি। দু'টো চোখ জুড়ে শুধু পাঁচ-পাঁচটা আঙুল একটা মেয়ের মসৃণ গালের ওপর জানোয়ারের থাবার স্বাক্ষর নিয়ে থর-থর করে কাঁপে। অন্তর্গ্লানিতে কালো হয়ে যায় তার মুখটা। সে কি মানুষ ছিল না!

যশোদা আর কোন উচ্চবাচ্য করে না। কথা তার ফুরিয়ে গেছে।

লক্ষ্মণের কিন্তু অনেক কথা কণ্ঠনালীতে ভিড় করে আসে হুড়মুড় করে। সুস্থ কামনার শপথগুলো সারি দিয়ে দাঁড়ায় বুকের ভেতরটায়: আর সে কোন দিন যশোদাকে মারবে না, বকবে না, শুধু ভালবেসে ভাল করে দেবে তার সমস্ত ক্ষতচিহ্ন।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্মণ খপ করে একখানা হাত চেপে ধরে যশোদার। মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,—কি বুঝিস! আমি তোরে মেরেচি!

লক্ষ্মণ হয়তো জানে না গনগনে উনুনের আগুন জল ঢেলে নিবোতে নেই। পোটোর মেয়ের নরম হাতে আচমকা বিদ্যুৎএর ইন্দ্রজাল খেলে: ছেড়ে দাও! ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে লক্ষ্মণ। যশোদা এক নিশ্বাসে বলে যায় কথা, গালে চড় মেরে আবার সোহাগ কাড়তে এয়েছে! বদমাইস ছেলে!···রাত করে হাত ধরতি তোর লজ্জা করে না পরের মেয়ের!···

ধুলো ঝেড়ে এগিয়ে যায় লক্ষ্মণ যশোদার দিকে। বলে, এট্টুও না। এট্টুও লজ্জা করে না আমার পরের মেয়ের হাত ধরতি। শোন!

এবারও ছুটে পালাতে যাচ্ছিল যশোদা। কিন্তু লক্ষ্মণের পাঞ্জা এবার বজ্রমুঠ। হাত কাঁপছে না, মন টলছে না; দু'হাতে জাপটে ধরে যশোদার মুখখানা আয়নার মত করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে লক্ষ্মণ।

পদ্মার ঢেউ বুকে ভাঙে যশোদার।

—কেন!

—কেন না!

হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে যশোদা। চোখের জল তো না, মুক্তাফল; গণ্ড বেয়ে পিছলে পড়ে যশোদার। অস্ফুটে বলে, কদমখালির কারিগর তোমরা, খাট-পালংএর স্বপন দেখ,—তোমার ওই কানী বুড়ী সেই পালংএ পাটরাণী এনে বসাবে।—মিথ্যে আমারে জড়াও কেন?

কান্না আর ঘামে-ভেজা তেলচিটে গালের ওপর লক্ষ্মণ নিজের মুখটা চেপে ধরে বলে, ছুতোরের ঘরে পোটোর মেয়ে, সেই তো হলো রাজযোটক;···আর পালং'এ শুলিই যদি পাটরাণী হয়তো একখান পালঙ্ক নয় বানিয়েই নেব দিনক্ষণ মত!

কথা তো না যেন গান শুনছে যশোদা চোখ বুঁজে। লক্ষ্মণ বলে যায়, য্যাও দিন দিন না; আরও দিন আসবে।···তখন দেখবি এই সব দিনির কথা আর মনেও থাকবে না।···সেও দিন অবিশ্যি এমনি আসবে না, আনতি হবে হাতে হাতে—খাটতি হবে অবচ্ছুল···বুঝলি!

লক্ষ্মণ আর কোন উত্তর পায় না। পোটোর মেয়ে যশোদা ছুতোরের ছেলে লক্ষ্মণের ঘরে খড়-কুটো ধুলো-মাটির পালঙ্কেই সেদিনকার মত ঘুমিয়ে পড়ে!

একটু পরেই মিষ্টি একটা সুঘ্রাণ পেয়ে চমকে জেগে ওঠে যশোদা। দেখে হাঁড়ি উথলে ফ্যান পড়ে নিবে যাচ্ছে উনুন। আর ফুটন্ত ভাতের সোঁদা গন্ধে ম' ম' করছে চার দিক।

অর্দ্ধেক রূপসী...

রূপচর্চ্চার রীতি-নীতি বদলায় যুগে যুগে···নূতন এসে করে পুরাতনের স্থান অধিকার। কিন্তু নারী—চিরন্তনী নারী—সে তার কেশসম্পদের নিরাপত্তা-রক্ষায় নিজের মধ্যে জেগে রয়েছে চিরদিন······কেশই যে তার অর্দ্ধেক রূপ। সে-রূপ সাধনায় এ-যুগের সর্ব্বগুণান্বিত আঙ্গিক জবাকুসুম।

পাতাল পুরী

প্রেমচন্দ অবলম্বনে

১

'ভক্তমাল' পড়তে পড়তে কখন চোখে ঘুম এসেছে জড়িয়ে।

ভক্তমালে কত মহাত্মার কাহিনী। তাঁদের কাছে ভগবৎ-প্রেমই সব কিছু, ভগবৎপ্রেমেই তাঁরা মগ্ন। এ ধরণের গভীর ভক্তি কেবল কঠোর তপস্যাতেই লাভ করা যায়। আমি কি পারি না এমন তপস্যা কোরতে? এ সংসারে আমার আর আছে কি? গয়না? লোকের ভাল লাগতে পারে কিন্তু আমার চোখে জ্বালা ধরে। ধন-দৌলত? যার প্রিয় তার থাক! আমার ত ধন-দৌলতের নামে গায়ে জ্বর আসে।

পাগলী সুশীলা! কত উচ্ছ্বাসেই না কাল আমাকে সাজিয়েছিল, কত অনুরাগেই না আমার কালো চুলের ভিতর ফুল দিয়েছিল গুঁজে। বারণ করলাম কত! মানা শুনল না সুশীলা! যা ভয় কোরেছিলাম শেষ পর্য্যন্ত তাই হোলো। দু'জনে যত হাসি হেসেছিলাম তার চেয়ে বেশী কোরেই কাঁদতে হোল। স্ত্রীর সাজসজ্জা দেখে স্বামী আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে, সংসারে এ ধরণের স্ত্রী বোধ হয় বেশী নেই। শুনলাম, 'তুমি আমার পরলোকটি নষ্ট কোরবে, আর কিছু নয়। তোমার চালচলন হাবভাব সে কথাই বলছে।' স্বামীর কাছ থেকে এ কথা শুনে কোন্ নারী না বিষ খেতে চায়? ভগবান! সংসারে এমন লোকও আছে?

অবশেষে নীচে এসে ভক্তমাল পড়তে সুরু কোরলাম। পড়তে পড়তে মনে হ'ল আর কিছু না। এবার বৃন্দাবনকুঞ্জবিহারীর চরণ-সেবাতেই বাকী দিনগুলি দেব কাটিয়ে, তাঁকেই দেখাব আমার বেশ-বাস। তিনি ত আর বিরক্ত হবেন না? আমার মনের কথা ত আর তাঁর অগোচরে নেই?

২

ভগবান! নিজের মনকে বোঝাব কি কোরে? তুমি ত অন্তর্যামী! আমার মনের আনাচে-কানাচের সকল খবরই তো তোমার জানা! ভাবি একবার, স্বামীকে মনে কোরব ইষ্টদেবতা, তাঁর চরণের সেবা কোরব, তাঁর কথা মতই চলা-ফেরা কোরব। তাঁর কোনও কথায়, কোনও ব্যবহারে স্বল্পমাত্র দুঃখ হবে না। তাঁর ত কোন দোষ নেই! কপালে যা ছিল তাই হয়েছে! এর জন্যে তাঁরই বা কি অপরাধ, আমার মা-বাবারই বা কি অপরাধ? অপরাধ আমার পোড়া কপালের! কিন্তু যখনই স্বামীকে আসতে দেখি আমার মনের উৎসাহ কোথায় যেন উড়ে যায়, মুখের উপর মৃত্যুকালিমা যেন বিস্তীর্ণ হয়ে যায়, মাথা ভারী হয়ে আসে। তাঁর চেহারাও দেখতে ইচ্ছে করে না, সামান্য কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। কোনও শত্রুকে দেখেও বোধ হয় কারুর এত ক্লান্তি বোধ হয় না। স্বামীর আসার সময় বুকে যেন হাতুড়ি পিটিতে থাকে। দু'-এক দিনের জন্যেও স্বামী যদি বিদেশে যান, আমার মনের ওপরকার ভারী বোঝাটা যাদুমন্ত্রবলে কোথায় যেন চলে যায়। আবার হাসতে থাকি, গল্প-গুজব করতে থাকি। জীবনে আবার রং ধরে।···আবার তাঁর ফিরে আসার খবর পেলেই চারি দিক অন্ধকার বলে মনে হয়।

মনের অবস্থা কেন যে এমন হয় জানি না! বোধ হয় আমাদের দু'জনের মধ্যে পূর্ব্বজন্মে শত্রুতা ছিল। সে শত্রুতার শোধ নেবার জন্যেই তিনি আমাকে বিয়ে করেছেন, আর আমার মনেও জন্মান্তরের সেই পুরোনো ভাব গভীর প্রভাব বিস্তার কোরেছে। নইলে, তাঁকে দেখলেই আমার শরীর রী-রী করে ওঠে কেন? আমাকে দেখলেই বা তাঁর গায়ের জ্বালা সুরু হয় কেন? বিয়ের ইচ্ছাটা না হোলেই হোত! বাপের বাড়ীতে আমি এর চাইতে অনেক সুখেই ছিলাম, এবং বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকতেও পারতাম। কিন্তু তা হোলো কই? বিয়ে! যে সমাজ-ব্যবস্থা অভাগিনী কন্যাকে কোনও না কোনও পুরুষের গলায় গেঁথে দেওয়া অনিবার্য্য মনে করে, সে সমাজ-ব্যবস্থার সর্ব্বনাশ হোক। এই সমাজ-প্রথার নামে কত নারীর চোখে জল আসে! কত আশায় ভরা কোমল হৃদয় এই প্রথার চরণতলে নিষ্পেষিত।

স্বামী! নারীর কত কল্পনার ধন! 'স্বামী' কথাটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে আসে, পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তমের, পুরুষ-শ্রেষ্ঠের, সুরূপ মানুষের সজীব মূর্ত্তি। কিন্তু আমার কাছে এই দু'টি অক্ষর কি বাণী বহন করে আনে—হৃদয়ের শূল, দেহের কাঁটা, চোখের জ্বালা, মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গবাণ।

সুশীলা সব সময় হাসিখুশি! দারিদ্র্যের প্রতি তার কোনও অনুযোগ নেই। তার গয়না নেই, কাপড় নেই। সামান্য একটি ভাড়ার বাড়ী। ঘরের সকল কাজ সে নিজে হাতেই করে। কিন্তু কোনও দিন তাকে কাঁদতে দেখিনি। আমার যদি হাত থাকত তাহ'লে আমার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তার দারিদ্র্য বদলে নিতাম। হাসতে হাসতে তার স্বামীকে ঘরে আসতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সুশীলার দরিদ্র জীবনের সকল জ্বালা যাদুমন্ত্রে কোথায় চলে যায়। আনন্দে তার বুক ফুলে ওঠে। সে প্রেমালিঙ্গনে কত আনন্দ! কত সুখ! ত্রিলোকের সকল ঐশ্বর্য্য বিলিয়ে দিতে পারি সে সুখের জন্য।

৩

আজ নিজেকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না।

শুধালাম: আমাকে তুমি বিয়ে কোরেছিলে কেন?

এই প্রশ্ন দীর্ঘ দিন আমার মনে জেগেছে। এত দিন কোনও রকমে জোর কোরে চেপে এসেছি। আজকে পেয়ালা উছলে উঠল।

প্রশ্ন শুনে তিনি হতবুদ্ধির মত হোয়ে গেলেন, পলায়নের পথ খুঁজতে লাগলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন: ঘর আগলাতে! ঘরের ভার ছেড়ে দিতে। নয়ত কি? ভোগ-বিলাসের জন্যে। গৃহিণী না হলে ঘর হানাবাড়ী বলে মনে হয়। চাকর-বাকর ঘরের সম্পত্তি ফাঁক করে দিত। যেখানে জিনিষ পড়ে থাকত সেখানেই পড়ে থাকত, কেউ তার দেখবার লোক ছিল না।

বুঝতে পারলাম আমাকে আনা হয়েছে ঘরের চৌকি দেবার জন্যে। আমাকে সম্পত্তি রক্ষা কোরতে হবে আর ভাবতে হবে ধন্য আমার ভাগ্য, এ সকল আমারই। সম্পত্তিই হোলো স্বামীর কাছে মুখ্য, আমি কেবল চৌকিদারণী। এ ঘরে আজই আগুন লাগুক। এত দিন ত এ সব না জেনেই ঘরের কাজ করে এসেছি।

হয়ত স্বামী যা চাইতেন ততখানি করতে পারিনি কিন্তু আমার বুদ্ধি অনুসারে নিশ্চয়ই করেছি।

কিন্তু আজ থেকে আর কোনও জিনিষ ছোঁব না, এই দিব্যি করছি। অবশ্য ঘরের চৌকি দেবার জন্যেই পুরুষ স্ত্রীকে ঘরে আনে না, এ কথা আমার জানা এবং স্বামী আমার রাগ কোরেই এ কথা বলেছেন। তবু সুশীলার কথাই ঠিক বলে মনে হয়। খাঁচায় পাখী না দেখলে খাঁচা যেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে, সে রকম ঘরে স্ত্রী না থাকলে আমার স্বামীর কাছে ঘর ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকত। সেই জন্যই তাঁর বিয়ে! স্ত্রীলোকের এই বরাত!

৪

আমার ওপর এত সন্দেহ কেন তাঁর?

যেদিন থেকে আমার কপাল এখানে আমাকে টেনে এনেছে সেদিন থেকে বরাবর তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে দেখেছি। কিন্তু কেন? একটু চুল বেঁধে বসে থাকলেই বা তাঁর এত ঠোঁট কামড়ান কেন? কোথাও যাওয়া-আসা করি না, কারুর সাথে কথাও বলি না, তবু এত সন্দেহ কেন? এ অপমান অসহ্য। আমার আবরু কি আমার নিজের কাছে প্রিয় নয়? আমাকে এত ছোট কোরে ভাবেন কেন? আমার ওপর সন্দেহ কোরতে তাঁর লজ্জাও করে না? যে লোক কানা সে কাউকে হাসতে দেখলেই ভাবে তাকে নিয়েই সবাই হাসাহাসি কোরছে। বোধ হয় এঁর মনেও এই ধরণের ভুল ধারণা হোয়ে গিয়েছে যে আমি তাঁকে ব্যঙ্গ করছি। নিজের অধিকারের বাইরে কাজ করার ফলে বোধ হয় আমার মনেও এই ধরণের প্রবৃত্তি জেগে যায়। ভিক্ষুক রাজসিংহাসনে শান্তিতে ঘুমাতে পারে না। চারি দিকে সে দেখে শত্রু আর শত্রু। মনে হয় সকল বুড়ো বরেরই বুঝি একই অবস্থা।

সুশীলার কথায় চলেছিলাম দেবদর্শনে। সবাই জানে যে মলিন বেশে রাস্তায় বেরোন মানে নিজেকে হাসির পাত্র করা। হঠাৎ কোথা থেকে সে সময় স্বামী আবির্ভূত হোলেন। তিরস্কারপূর্ণ চোখে আমাকে দেখে তিনি বললেন, এত সজ্জা কোরে কোথায়?

বললাম: একটু ঠাকুর দেখতে চলেছি।

কথাটি শোনা হতে না হতেই রাগত ভাবে বললেন: তোমার যাবার কোনও দরকার নেই। যে স্ত্রী স্বামীর সেবা করে না, দেবদর্শনে তার পুণ্য না হয়ে পাপ হয়। আমার কাছ থেকে উড়তে চলেছ? মেয়েছেলেকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

অবর্ণনীয় ক্রোধ আমার চিত্তকে অধিকার কোরল। তৎক্ষণাৎ কাপড় বদলে ফেললাম আমি। পণ করলাম দেবদর্শনে আর কোনও দিন যাব না। এ সন্দেহের কি কোনও কালে শেষ নেই? ও-কথার জবাব ছিল সেই মুহূর্ত্তে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ান, আর দেখা স্বামী কি কোরতে পারেন? কিন্তু কি জানি কেন চেপে গেলাম।

আমি উদাস আর বিমনা হোয়ে থাকলে তাঁর আশ্চর্য্য লাগে। মনে ভাবেন আমি অকৃতজ্ঞ। তাঁর বিচারে তিনি আমাকে বিয়ে কোরে বোধ হয় খুব কৃতার্থ করেছেন। এত সম্পত্তি, এত ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়ে আমার তাঁর প্রতি বিমুখ না হওয়াই উচিত ছিল, অষ্টপ্রহর তাঁর যশোগান করাই উচিত ছিল। এ-সব কিছু না কোরে আমি উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকি। কখনও কখনও বেচারার ওপর দয়াও হয়। এ কথা তাঁর জানা নেই যে, নারী-জীবনে এমন কিছু আছে, যা হারালে নারীর কাছে স্বর্গও নরকতুল্য হয়ে যায়।

৫

তিন দিন হল স্বামীর অসুখ কোরেছে।

ডাক্তার বলছে জীবনের কোনও আশা নেই, নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছে। আমার কিন্তু তাতে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। এত নিষ্ঠুর আমি আগে ছিলাম না। কি জানি এখন আমার সে কোমলতা কোথায় চলে গিয়েছে। রোগীর চেহারা দেখে আমার মন আগে কত করুণায় ব্যাকুল হয়ে যেত। কারুর কান্না আমি সইতে পারতাম না। সেই আমিই আজ তিন দিন ধরে আমার পাশের কামরাতে আমার স্বামীর কাতরানি শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু চোখের জল ফেলা ত দূরের কথা, একবারও দেখতে যাই না। ভাবি, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কি? লোকে আমাকে পিশাচিনী বলে বলুক, বলুক কুলটা! কিন্তু এ কথা বলতে আমার লেশমাত্র সঙ্কোচ নেই যে, তাঁর অসুখ দেখে আমার এক ধরণের ঈর্ষাময় আনন্দ বোধ হচ্ছে। আমাকে তিনি কারাবাস দিয়ে রেখেছেন। 'পবিত্র বিবাহ', এ নামে আমি একে অভিহিত করতে চাই না। কারাবাস ছাড়া এ আর কি? এতখানি উদার আমি নই যে, যে আমাকে বন্দী করে রেখেছে তাকে আমি পূজা কোরব, আমাকে যে লাথি মারে তার চরণ চুম্বন কোরব। মনে হল, ঈশ্বর তাঁকে তাঁর পাপের শাস্তি দিচ্ছেন। এ-কথা বলতে আমার কোনও সঙ্কোচ নেই যে, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। কারুর গলাতে কোনও মেয়েকে জোর করে ঝুলিয়ে দিলেই কি সে তাঁর স্ত্রী হয়ে যায়? সেই মিলনই ত সত্যিকার বিবাহ যখন অন্ততঃ একবারও চিত্তে প্রেম জাগে। শুনতে পাচ্ছি স্বামী তাঁর কামরায় পড়ে পড়ে আমাকে গালমন্দ কোরছেন। রোগের সমস্ত বিষ আমার ওপর ঢেলে দিচ্ছেন, কিন্তু আমার তাতে বয়েই গেল! যার খুসি সে তাঁর সম্পত্তি নিক, ঐশ্বর্য্য নিক, আমার এ সবের কোনও প্রয়োজন নেই।

৬

আজ তিন মাস আমি বিধবা, অন্ততঃ লোকে তাই বলে। যার যা খুসী তাই বলুক, আমি নিজেকে অন্য রকম ভাবি। চুড়ি আমি খুলে ফেলিনি, কেনই বা ফেলব? সিঁথিতে সিঁদুর আগেও দিইনি, এখনও দিই না। বুড়ো বাপের সকল কাজ তাঁর সুপুত্রের হাতেই হোল। আমি কাছেও যাইনি। ঘরে আমাকে নিয়ে নানা আলোচনা চলেছে। কেউ আমার মাথার খোঁপা দেখে নাক সেঁটকায়, কেউ আমার গয়না দেখে চোখ মটকায়। আমার কিন্তু কোন চিন্তাই নেই। তাদের জ্বালিয়ে দিতে রং-বেরংয়ের শাড়ী পরি, আরও সাজগোছ করি। আমার সামান্য দুঃখও নেই। আমি তো কারার বাইরে এসেছি।

ক'দিন হোল সুশীলার ঘরে গিয়েছিলাম। ছোট ঘর। কোনও ঘর সাজাবার জিনিষ নেই, চৌকি পর্য্যন্ত নেই। সুশীলা কিন্তু কত আনন্দে রয়েছে। তার আনন্দ দেখে আমার মনেও নানা রকম ইচ্ছা জেগে ওঠে। সে কল্পনাকে কুৎসিত কেন বলব? আমার মন ত তাকে কুৎসিত বলে না। জীবনে তার কত রং? চোখ দু'টি তার হাসছে, ঠোঁটের ওপর চাপা হাসির খেলা চলেছে, মনের মধ্যে বয়ে চলেছে অনুরাগের সুধাস্রোত। এ আনন্দ ক্ষণিক হোলেও জীবনকে সফল করে দেয়। সে কথা কোনও দিন কেউ ভুলতে

পারে না। সে স্মৃতি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যথেষ্ট। সে মেজরাবের আঘাতে হৃদয়তন্ত্রী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সুরে কাঁপতে থাকে।

এক দিন সুশীলাকে বলি: তোর স্বামী যদি বিদেশে যায়, তাহ'লে তুই কেঁদে কেঁদে মরে যাবি।

গম্ভীর ভাবে সুশীলা উত্তর দিল, না ভাই, মরব না। তাঁর স্মৃতি আমার মনকে আনন্দে রাখবে, যত দিন তিনি বিদেশে থাকেন না কেন?

এই প্রেমই ত আমার কাম্য। এরই জন্য আমার মনে এত ব্যাকুলতা। এমন স্মৃতিই আমি চাই যার দ্বারা আমার হৃদয়ের তার বাজতে থাকবে চিরকাল, যার নেশা আমাকে আজীবন আচ্ছন্ন কোরে থাকবে।

৭

রাত কাটে কেঁদে কেঁদে। মনের মধ্যে কিসের ব্যথা? জীবনের সামনে বন্ধুর পথ। সে পথে রয়েছে অশান্তির ঘূর্ণি হাওয়া। সবুজের শ্যাম সমারোহ কোথায়? ঘর আমাকে চিবিয়ে খাচ্ছে। মন আমার বলছে, পাখীর মত কোথায় উড়ে চলে যাই। ভক্তি-গ্রন্থের দিকে তাকাতে আজকাল আর ইচ্ছে করে না। বেড়াতে যেতেও ভাল লাগে না। মন আমার কি যে চায় আর কি যে চায় না নিজেই বুঝি না। আমার যা জানা নেই আমার প্রতি অণু-পরমাণুর কাছে কিন্তু তা জানা! নিজের ভাবনাকে প্রকাশ কোরে চলেছি আমি। অন্তরের বেদনায় প্রতি অঙ্গের কি আর্ত্তনাদ! 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।'

৮

চিত্তের চঞ্চলতা আমার সেই স্তরে এসে পৌঁছেচে, যে স্তরে মানুষের নিন্দাতে কোনও লজ্জা বা ভয় থাকে না। যে লোভী স্বার্থপর পিতা-মাতা আমাকে কুয়াতে হাত-পা বেঁধে ফেলে দিয়েছে, যে পাষাণ হৃদয় আমার সীঁথিতে সিঁদূর দিয়েছে, তাদের প্রতি আমার নানা কুচিন্তা জাগতে থাকে। তাদের মুখ আমি পুড়িয়ে দেব। নিজের মুখে কালি দিয়েও তাদের মুখে কালি দেব। নিজের প্রাণ দিয়েও তাদের ফাঁসির ব্যবস্থা কোরব। নারীত্ব এখন আমার অবলুপ্ত। জেগে উঠেছে আমার ভীষণ জ্বালা।

ঘরের সবাই ঘুমিয়ে। নিঃশব্দে নীচে নামলাম। দ্বার খুলে বাড়ীর বাইরে আসি। গরমে ব্যাকুল হয়ে কোনও প্রাণী যেন বেরিয়ে খোলা জায়গার দিকে চলেছে। ঘরে বদ্ধ হয়ে যেন আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো।

রাস্তায় নিস্তব্ধতা!

সারি সারি দোকান বন্ধ।

হঠাৎ দেখি একটি বুড়ী আসছে এদিকে। ভয় কাকে বলে কোনও দিন জানিনি। আমার দিকে বুড়ী এগিয়ে এল। আপাদ-মস্তক দেখে বললে; কাকে খুঁজছ বাছা?

ব্যঙ্গ করে বললাম: যমকে!

: জীবনের অনেক সুখভোগই তোমার বরাতে এখনও বাকী আছে। অন্ধকার রাত শেষ হয়েছে, আকাশে ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে।

হেসে বললাম: অন্ধকারেও তোমার চোখের এমন তেজ যে, আমার কপালের লেখা পড়ে ফেলচ!

: চোখ দিয়ে পড়ছি না বাছা, বুদ্ধি দিয়ে পড়ছি; পাকা মাথার বুদ্ধি। খারাপ দিন তোমার চলে গিয়েছে, আসছে ভাল দিন। হেসো না বাছা, এ কাজেই এত বছর আমার গিয়েছে। যে এক দিন ডুবতে যাচ্ছিল সে এই বুড়ীর দৌলতেই আজ ফুলের শয্যা শুয়ে আছে। এক দিন যে বিষের পেয়ালা খেতে যাচ্ছিল সে আজ দুধের কুল্লি করছে। আমার দ্বারা যদি কোনও অভাগিনীর উপকার হয় সেই জন্যেই আজ এত রাত্রে বেরিয়েছি। কারুর কাছে কিছু প্রত্যাশী নই আমি। ঈশ্বর যা দিয়েছেন তা আমার ঘরেই আছে। কেবল এই আমার ইচ্ছে কি, যত দূর সম্ভব লোকের উপকার কোরব। আমি লোককে এমন মন্ত্র বলে দিই যার ফলে যার ধনের কামনা তার ধন, যার সন্তান কামনা তার সন্তান লাভ হয়।

আমি বলি: আমার টাকা চাই না, সন্তান চাই না। আমার যা চাই তা তোমার দেবার ক্ষমতা নেই।

হাসল বুড়ী। বললে: বাছা, তুমি যা চাইছ তা আমার অজানা নেই। তুমি চাইছ সে জিনিষ যা সংসারের হোলেও স্বর্গীয়, যে জিনিষ দেবতার বরদানের চাইতেও আনন্দপ্রদ। চাইছ তুমি আকাশকুসুম, ডুমুরের ফুল, অমাবস্যার চাঁদ। কিন্তু আমার আছে সেই মন্ত্র যা অসম্ভবও সম্ভব করাতে পারে। প্রেমের পিয়াসী তুমি। তোমাকে আমি চড়িয়ে দিতে পারি প্রেমের তরণীতে। সেই প্রেম-তরণী প্রেম-সাগরের প্রেম-তরঙ্গে নাচতে নাচতে তোমাকে কূলে ভিড়িয়ে দেবে।

উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম; তোমার বাড়ী কোথায় মা?

: নিকটেই বাছা! যদি তুমি যেতে চাও তাহ'লে আদর কোরে নিয়ে যাই।

বৃদ্ধাকে মনে হোলো কোনও স্বর্গের দেবী। তাঁর পিছনে পিছনে আমি চলতে থাকলাম।

৯

হায় রে!

যে বুড়ীকে ভেবেছিলাম স্বর্গের দেবী দেখলাম সে নরকের ডাইনী। আমার শেষ সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে। 'অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।' ছিলাম স্বচ্ছ প্রেমের পিপাসী, পড়েছি দুর্গন্ধ বিষাক্ত নালাতে। সে দুর্লভ বস্তু আগেও পাইনি, এখনও না। সুশীলার মত আমি সুখ চেয়েছিলাম, বেশ্যার বিকৃত বিষয়-বাসনা নয়। কিন্তু জীবন-পথে একবার ভুল করলে আর ভুল শোধরানো যায় না।

কিন্তু আমার অধঃপতন কার জন্য? এ দোষ আমার নয়। এ দোষ আমার মা-বাপের আর ঐ বৃদ্ধের, যে আমার স্বামী হোতে চেয়েছিল। আমি এ সব লিখতাম না, কিন্তু লিখছি কেবল আমার আত্মকথা শুনে লোকের চোখ ফুটবে বলে। আবার বলি, নিজের মেয়ের জন্য ধন দেখো না, বিষয় দেখো না, বংশ দেখো না, দেখো কেবল সুপাত্র। উপযুক্ত পাত্রের হাতে যদি মেয়েকে তুলে দিতে না পার তাহ'লে মেয়েকে কুমারী রেখে দাও, বিষ দিয়ে মার, গলা টিপে দাও, কিন্তু কোনও বুড়ো বোব্বলের সঙ্গে তার বিয়ে দিও না। মেয়েছেলে সব কিছু সহ্য কোরতে পারে। সহ্য করতে পারে প্রবলতম দুঃখ, গভীরতম বিপদ কিন্তু সহ্য করতে পারে না যৌবনের আনন্দমত্ততার কণ্ঠরোধ।

'আমার কথাটি ফুরালো'।

'এবারের মত বসন্তগত জীবনে'। আর জীবনে আমার কোনও আশা নেই। তবু যে অবস্থা থেকে আমি চলে এসেছি এই জঘন্য অবস্থায়, তার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন আর আমি চাই না।

অনুবাদক—সুধাকর চট্টোপাধ্যায়।

ছেলে

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

যাচ্ছিলাম ট্রেণে। অনেক দূরের পথ, ভিড়ও খুব, গাড়ুর মত বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় যে রাত্তিরের মধ্যে হবে, আশা ছিল না। প্রায় সকলেই নামবে আমারি সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে। ভিড় যখন চরম হয়ে গেছে,—আর নতুন লোক আসার উপায় নেই, দরজা আগলাবার দরকার নেই, কেন না দরজার সামনে বাক্স-বিছানা রেখে তার ওপর লোক বসে সেটাও আগল-বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন গাড়ীশুদ্ধ লোকে কেমন ভাব হয়ে গেল। সকলে সকলের পাশের লোকের পরিচয় নিল। খবরাখবর জিজ্ঞাসা করল এবং গভীর ভাবে সুখ-দুঃখের কথা কইতে আরম্ভ করল। যারা খানিক আগে সূচ্যগ্র জায়গা নিয়ে দুর্য্যোধনের মত ঝগড়া করেছিল।

মাঝখানের সামনের বেঞ্চি ঠাসা, আমি একটা পাশের বেঞ্চির কোণে বসতে পেরেছিলাম। গাড়ী পূরো জোরে চলেছে, একেবারে পরের বড় ষ্টেশনে গিয়ে থামবে।

সহসা কানে এলো 'ছেলেপিলে ?' 'ছেলেপিলে নেই মশাই।' 'কি করা হয় ?' তার পর কানে আসে 'কত পান ?' এ সব সমাজে পরিচয় করাতে লাগে না। এবং এই সব অভব্য, অসভ্য প্রশ্নও লোকে সরল মনেই জিজ্ঞাসা করে—আর শ্রোতাও বিরক্ত হয় না—সহজ ভাবেই উত্তর দেয়। তাই এ সব জায়গায় প্রথমেই পৃথিবীর আদিম প্রশ্ন ওঠে খাদ্য-সংগ্রহের,—তার পর আসে সেই খাদ্য কাদের জন্য। কাজেই 'কত পান' 'কয়টি পুত্র' 'কোথায় থাকেন' কারুরই জানতে ও জানাতে সঙ্কোচ নেই!

শুনলাম নিঃসন্তান লোকটি বলছেন, 'বেশ আছি মশায়। যদিও বুড়ো বয়সের কথা ভাবি। তবে পরিবারের মনে সুখ নেই। তাঁর জন্যেই এই কলকাতায় যাওয়া। কে এক সাধু আছেন তিনি না কি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করান, যজ্ঞ সফল হয়।'

অন্য লোকটি অর্থাৎ প্রশ্নকর্ত্তা একটু চুপ করে রইলেন। তার পর বললেন, 'ও!'

নিঃসন্তান ভদ্রলোকের কাছাকাছি আর এক জন ছিলেন, হঠাৎ আক্রোশের সুরে বলে উঠলেন, 'ও ঝামেলা আবার লোকে সাধ করে চায়? কি করে জানবেন যে, ছেলেই হবে আর মেয়ে হবে না, আর মেয়েও একটিই হবে—সাত বা ন'টা মেয়ে হবে না। আর বুড়ো বয়সে? এক বেটা বেটিও দেখে না মশায়। সব নিজের নিয়ে থাকে। এই আমার ছ'টা মেয়ে, তিন ছেলে। পাঁচটা মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, দুই ছেলেরও দিয়েছি। গত বছর থেকে স্ত্রী একেবারে 'চৌরঙ্গি' (চতুরঙ্গ?) বাতে শয্যাগত, তা এক বেটা জামাইও মেয়ে পাঠালে না। আর বৌমারাও তাঁদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঘর-সংসার নিয়ে ছেলেদের কাছে। ছোট মেয়ে দু'বেলা রাঁধে—আমার আপিস, ভায়েদের ইস্কুলের ভাত দেয়, রুগীর সেবা করে। ধরুন, ওদেরও বিয়ে হয়ে গেছে, আর আমরা বুড়ো-বুড়ী দু'জনেই রোগে পড়েছি। তখন?' তিক্ত ভাবে চতুর্দ্দিকের শ্রোতাদের দিকে চেয়ে আবার বললেন, 'তখন কি করবেন? আসল কথা থাকতো টাকা, সবাই পিঁপড়ের মত আসতো সারি গেঁথে। তা ছেলেমেয়েই বলুন আর ভাইপো-ভাগ্নেই বলুন। কিন্তু তখন আমার আপনার লোকও লাগতো না! লোক রাখতে পারতাম! লোক রাখতাম মশাই! জানেন?'

নিজের সিদ্ধান্তে পরিতুষ্ট হয়ে দিগ্বিজয়ীর মত তিনি একবার সকলের দিকে বা গাড়ীর চার ধারে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

এক জন ক্ষীণ কণ্ঠে একটু প্রতিবাদ করতে চাইল, 'আপনার ছেলেমেয়ে আর লোকজন তুলনা হয়? আর লোকজন যে চুরি করে খুন করে পালাবে না তাই বা কে জানে?'

দিগ্বিজয়ী বললেন, 'তা করতে পারে চুরি, করবে হয়ত খুন, কিন্তু পাচ্ছি কোথায় আপনার ছেলেমেয়ে? বলুন?'

ওদিকের এক কোণ থেকে আর এক জন বলতে চাইলেন, 'তা' সব জায়গায় সমান হয় না। বেশীর ভাগ জায়গায় ছেলেমেয়েরা সেবা-যত্ন করেই থাকে।'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে দিগ্বিজয়ী বললেন, 'আর অনেক সময় যে করে না সেটা দেখতে পেয়েছেন নিশ্চয়?'

তর্কের আড়াল থেকে কানে এলো আগের 'ও' বলে নীরব প্রশ্নকর্ত্তা তাঁর পাশের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য ইচ্ছুক লোকটিকে পুরানো কথায় সূত্র ধরে বললেন, 'আমি একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার কথা জানি।'

ভদ্রলোক আবার চুপ করলেন। তাঁর যেন খানিকটা বলার পর আর না বলা অভ্যাস। লোকে প্রশ্ন করুক, করলে বলবেন। সবাই ভাবছিলেন তিনি বলবেন। তাঁরা উৎসুক ভাবে চুপ করে রইলেন।

ছেলেমেয়ের কর্ত্তব্য অপালনের বচসাটা তখন থেমে গেছে।

এক জন সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে এখনও লোকে? রামায়ণেই পড়েছি দশরথ করেছিলেন। সে তো রাজা-রাজড়ার ব্যাপার!'

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যা, করে বৈ কি। রাজা-রাজড়ার মতই কতকটা ব্যাপার বটে। তবে খরচেরও কম-বেশী তো আছে সব জিনিসের। আমি সেই পুত্রেষ্টির ছেলেটিকে দেখেছি।' আবার চুপ করলেন। যেন মনে কি দ্বিধা হচ্ছিল বলা উচিত কি না। কিন্তু কোথা থেকে যেন রূপকথা না কথকতার গন্ধ এলো ভেসে। গাড়ীশুদ্ধ সবাই চুপ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলে[n] উৎসুক ভাবে।

যিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য কলকাতায় যাচ্ছেন তিনি বললে[ন] 'দেখেছেন? তা হলে যজ্ঞ করলে ছেলে হয়?'

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যা, হয়েছিলো তো।' তাঁর এ কথা মধ্যেও যেন অর্দ্ধেক বলার মত কি ধরণ ছিল। প্রায় সকলেরই ম[নে] হচ্ছিল, তার পর কি? ছেলে তো হয়েছিল, আর ছেলেই তো ব[টে] মেয়েও নয়। তবে কি? বেঁচে নেই? না, কি?

আর এক জন একটু অসহিষ্ণু ভাবে বললেন, 'হয়েছিল [মানে] মানে? আছে তো? বলুন না মশাই ব্যাপারটা শুনি।' এক গা[ড়ী] শ্রোতা অবহিত ও উন্মুখ হয়ে ঐ লোকটির পানে চেয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক একটু বিচলিত ভাবে পুত্রেষ্টির জন্য যিনি যাচ্ছেন [তাঁর] দিকে একবার চাইলেন। কিন্তু আর গল্পটা না বলে উপায় ছিল [না।] বলতে আরম্ভ করলেন:

—"সে অনেক দিনের কথা, তখন আমারি বয়স হবে ১৭।১৮ বছর। আমার দূর-সম্পর্কের পিসেমশাই ছিলেন। কাজ করতেন বর্ম্মার কোথায়। অনেক সময় যেমন হয়, থাকতেন বিদেশে, উপায় করতেন প্রচুর, খরচও করতেন অনেক রকমে। স্ত্রী থাকতেন দেশে মা-বাবার কাছে। নিজে সেখানে থাকতেন ভীষ্মদেব বা শুকদেবের মতন নয়, বেশ খুসী মতই থাকতেন। মাঝে মাঝে দেশে আসতেন। ছ'টি মেয়ে হয়েছিল ছেলে হয়নি।

তার পর তাঁর বাবা মারা গেলেন, মা-ও কিছু দিন বাদেই গেলেন। নিজেরও বয়স পরিণত হয়েছে, মেয়েদের বিবাহ হয়েছে, আর স্ত্রীকে একলা ফেলে রাখা চলল না। ভদ্রলোক দেশে এলেন। সে একটা সমারোহ যেন। বর্ম্মার সৌখীন জিনিসে সেই পাড়াগাঁর সেকেলে বাড়ীর কাছারি-ঘর ভরে উঠল। ছোট ছোট কাঠের খেলনা, চমৎকার ছোট্ট প্যাগোডা, বুদ্ধমূর্ত্তি কত রকমের, মোম জমানো কাপড়, চীনদেশী পর্দ্দা, জাপানী চিক, ফুলদানি, 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' জপের মালা, কাঠের হালকা চমৎকার বাক্স, বাসন—কি যে নয়! তার সঙ্গে এলো ছ'টো কুকুর, ছ'টি হরিণ, একটি ময়ূর, তিনটি খাঁচা-ভরা ছোট ছোট্ট পাখী ও লালচে রং-এর কাকাতুয়া, আর একটি ছোট বাচ্চা ভাল্লুক, তখনও বড় হয়নি। তার নাম ছিল টীপু।

আর বোধ হয় অগাধ টাকা। টাকা কি রকম ভাবে অগাধ হয় তা তো বোঝবার সে বয়স নয়। পিসিমা'র গায়ে সোনার বোঝা, চাকর-বাকর-দাসীর ভিড়, গ্রামের সকলের ও-বাড়ীতে আসা-বসাতে এখন বুঝতে পারি টাকা ছিল বেশ।

মেয়ে ছ'টির বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল।

বছর খানেক কেটে গেল। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী গেছে। বাইরে পিসেমশাই-এর দাবার ও গল্পের মজলিস আর ভেতরে পিসিমার তাসের আর তোষামোদের আসর—যেন আর জমাট বাঁধছিল না। বিদেশী জিনিষ দেখে ও দেখিয়ে পুরোনো হয়ে গেছে। সে দেশের গল্পও অনেক বার করে বলা হয়েছে। পিসিমা'র গহনার জৌলুসও বোধ হয় পুরোনো হয়ে এসেছিল। কি আর কিছু কে জানে! যেন মনের কোনোখান একটু ফাঁকা ঠেকছিল।

তার পর দেখলাম, পিসিমা'র বাড়ীতে গণৎকার, জ্যোতিষী সাধু-সন্ন্যাসীর যাওয়া-আসা, ভিতরে-বাইরে কথাবার্ত্তা-আলোচনা—এত বিষয়-সম্পত্তি কে খাবে, কার ভোগে লাগবে, মেয়ে মানে তো পাথর-বাটি, মিথ্যে সন্তান। বাপ-পিতামহর জলপিণ্ড লোপ পাবে—এই সব!

মাদুলী, কবচে পিসিমা'র হাতের সোনার তাবিজ, গলার হার, কোমরের চন্দ্রহার আরো ভারি হয়ে উঠল। আর পিসেমশাইএর মুখের মসৃণতাতে রেখা দেখা দিতে লাগলো।

তার পর পিসিমা'র এক দিন রাত্রে আবার একটি মেয়ে হল। পিসেমশাইএর মুখ ভারি হয়ে উঠল। পিসিমা'র চোখ জলে ভেসে গেল। যদিও লোকেরা সকলে নানা রকম সান্ত্বনা দিতে লাগল। তবু তাদের মাঝ থেকেই অবশেষে কে এক জন বললে, 'ওঁর মেয়ে-নাড়ী। ছেলে হবে না। আবার বিয়ে করুন মুখুজ্জে মশাই।'

কথাটা অনেকের মনঃপূত হল। যাঁরা পিসিমা'র সুখ-ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষাতুর ছিল তাদের—আর যারা পিসেমশাইয়ের জন্য সত্য বংশধর চাইত তাদেরও। আবার অনেকে দুঃখিত হল। মেয়ে-জামাইরা রেগে গেল। আর পিসিমা'র চোখের জলে বিয়ের কথাটাও তখনকার মত ভেসে গেল।

বছর খানেক বাদে শুনলাম, এক না কি মহা তান্ত্রিক সাধু এসেছেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাবেন। ছেলে হবেই মেয়ে নয়।

যজ্ঞের ফর্দ্দ হতে লাগল—অনুষ্ঠানের দিন দেখা, আয়োজন, যোগাড়-যন্ত্র সব হতে লাগল। আর মোটা-মোটা হলদে পুঁথি দেখে সন্ন্যাসী ঠাকুর মন্ত্র নির্ব্বাচন করতে লাগলেন। সব ঠিকঠাক হলে তবে সূর্য্য-ঘড়িতে লগ্ন দেখে (বিলিতী ঘড়ি নয়) যজ্ঞ হবে। হোমে আহুতি দেওয়া হবে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বহু পুঁথি ঘেঁটে দেখে এক দিন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় এসে বললেন—'সবই ঠিক হ'য়েছে, পুত্র আপনার হবে। দিনও খুব ভাল পাওয়া গেছে, ক্ষণও মাহেন্দ্র। কিন্তু একটা জিনিস প্রয়োজন হবে।

শীতকাল। পিসেমশাই বৈঠকখানার গদীর ওপর পায়ের ওপর পশ্চিমী বালাপোষ ঢেকে কাত হয়ে শুয়ে দাবা খেলছিলেন। সাধুকে দেখে উঠে বসলেন সসম্ভ্রমে। সন্ন্যাসী ঠাকুর গালিচার ওপর আর একটি গালিচার আসনে বসলেন। সকলে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল সাধুর দিকে।

পিসেমশাই বললেন, 'কি জিনিষ?'

—'একটি জীবিত প্রাণী চাই।'

—'কি রকম? বলি দেবার মত পশু?'

—'হ্যাঁ, তাই অনেকটা। কিন্তু যে পশুটি উৎসর্গ করা হবে শিশু খানিকটা তার মতই আকার পেতে পারে, সেই জন্য চতুষ্পদ বা খেচর জলচর জাতীয় জীব উৎসর্গ করা সমীচীন হবে না। শাস্ত্রে বলেছে নরাকার জীব অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা চাই।'

পুরুত ঠাকুর ছিলেন, আমার বাবাও ছিলেন ঘরে, আমার তাঁদের কাছেই গল্প শোনা। তাঁরা অবাক হয়ে রইলেন, নরাকার জীব কি পাওয়া যাবে! পিসেমশাইও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

পুরুত মশাই একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'নরাকার অর্থাৎ দ্বিপদ জীব বলছেন?'

সন্ন্যাসী একটু হাসলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, এই বানর জাতীয় জীব আর কি! ভয় পাচ্ছেন কেন?'

পিসেমশাই নড়ে-চড়ে বসলেন। তার পর বললেন; 'সেই বা কোথায় পাই?'

এইবার পুরুত ঠাকুর বললেন, 'তার অভাব কি আছে? একটা বাঁদর বা হনুমান কিনে আনলেই হবে।'

সন্ন্যাসী আবার একটু হাসলেন, বললেন, 'তার দরকার নেই, সেও আমার ঠিক করা হয়েছে। এখানেই আছে। শুধু আপনার ইচ্ছা হলেই সেটি নেওয়া যাবে।'

পিসেমশাই ব্যগ্র ভাবে বললেন, 'নিশ্চয়। কোথায় আছে সেটি?'

—'আপনার ভল্লুক-শাবকটি গ্রহণ করব। দ্বিপদও বটে, নরাকারও বটে, অপ্রাপ্তবয়স্কও বটে। একেবারে সবই শাস্ত্রানুগত পাচ্ছি।'

ভালুক-ছানাটি পিসেমশাইএর খুবই প্রিয় বা আদুরে ছিল। সকাল-সন্ধ্যা তাকে নিয়ে তাঁর একটু খেলা করা চাই-ই।

পিসেমশাই একটু চুপ করে রইলেন, তার পর বললেন, 'একটা না হয় কিনে আনাই কোনো জন্তু?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'না, সে হবে না, তত সময় নেই। শুভলগ্ন —যেটি পেয়েছি, সেটি এক বছরের মধ্যে আর নেই। তাছাড়া আমি আপনার যজ্ঞটি করে দিয়েই চলে যাব কুমারিকায়। সেখানে ৮মার কাছে আমার বিশেষ পূজা আছে। যদি সেখানে আমার থাকা হয়ে যায়, আর না আসি, তবে আপনার কার্য্যোদ্ধার হওয়া শক্ত।'

পিসিমা'র কানে গেল। স্বামীর আবার বিয়ের ভয় তাঁর যায়নি। পুরুষরা যে ৭০ বছরেও বিয়ে করতে পারে তা তাঁর জানা ছিল। একবার যে পুরুষ মানুষ নিমরাজী হয়েছিল বিয়েতে, তার বিয়ে করতে কতক্ষণ? সে পুত্রার্থেই হোক, আর ভার্য্যার্থেই হোক। ওঁর স্বামীর বয়স তো মাত্র পঞ্চাশ বছর।

তিনি স্বামীর অন্য জন্তু কিনে আনার কথা কানেই তুললেন না। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সব প্রস্তাবেরই দৃঢ় ভাবে সমর্থন করলেন। ভাল্লুক-বাচ্ছা তো কিছুই নয়,—হতাশায়, ভয়ে তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্য যে কোনো জীবহত্যা করতেই রাজী হয়ে যেতেন, এমনি হয়ে উঠেছিলেন। এই মাহেন্দ্রক্ষণ, এই তিথি, এই লগ্ন আর ঐ তান্ত্রিক সাধুর ক্রিয়া একটা গৃহপালিত জন্তুর জন্য খোয়াতে রাজী নন। তাঁর নিজেরও বয়স প্রায় চল্লিশ হয়েছে যদি সাধুর ফিরে আসতে দেরী হয়, যদি না-ই আসেন? আর স্বামী যদি আবার বিবাহে সম্মতি দেন?

চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই চারি দিক ঘিরে হোগ্‌লার উঁচু চাল করে বিরাট যজ্ঞ-মণ্ডপ তৈরী হল। আশে-পাশে হাজার ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্য ঘিরে জায়গা করা হল।

তিন দিন ধরে যজ্ঞ হবে। প্রথম দিন পিতৃলোককে জলপিণ্ডদান, আভ্যুদয়িক নান্দীমুখ কৃত্য। তার পরদিন অর্দ্ধরাত্রে জীবিত পশু উৎসর্গ আর হোম। শেষ দিনে এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন।

ক'দিন ধরে আমরা আর বাড়ী যেতাম না। দ্বিতীয় দিনে রাত্রি বারোটা থেকে পূজা আরম্ভ হল।

বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কে জাগিয়ে দিল। দেখি পিসেমশাই, পিসিমা আর সন্ন্যাসী-ঠাকুর তিন জনে হোমের কুণ্ডটির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন! হোমের কুণ্ডটি সাধারণ হোমকুণ্ডের মত নয়, একটা ৩।৪ হাত গভীর গর্ত্ত।

সেই গর্ত্তটার মধ্যে সেই ভাল্লুক-ছানাটাকে কয়েক জনে এনে নামানো হল। সে প্রথমটা নামতে চায়নি। অবশেষে মস্ত একছড়া কলা হাতে নিয়ে পিসেমশাইএর একটা হাত ধরে নামল।

গর্ত্তের একধারে পিসেমশাই পিসিমা পাশাপাশি দু'টি আসনে বসলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর সামনে বসলেন তাদের। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাশে নতুন নতুন ঝুড়ি-ভরা নানা রকম ফল, নৈবেদ্য, একখানা পুষ্পপাত্র-ভরা ফুল-বেলপাতা, নতুন কাপড়, আরতির পঞ্চপ্রদীপ, পাণিশঙ্খ থেকে কাঁসর-ঘণ্টা, একটা পিলসুজ, একটা মঙ্গল-প্রদীপ, অর্থাৎ পূজার সব রকম যোগাড়ই ছিল। তার পর পূজা আরম্ভ হল।

সন্ন্যাসী মন্ত্র বলে একটা গাঁদা ফুলের মালা নিয়ে পিসেমশাইএর হাত দিয়ে ভালুকটাকে পরিয়ে দিলেন। তার পর একটা একটা করে ফল মিষ্টিও গর্ত্তের মাঝে তার হাতে দেওয়া হ'তে লাগল। নতুন কাপড়খানাও তার হাতে পিসেমশাই দিলেন। শেষ কালে

তার মাথায় একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে কি একটা বলে সন্ন্যাসী ঠাকুর কাকে যেন ইসারা করলেন।

আর দেখি ঝুড়ি ভর্ত্তি করে মাটি নিয়ে নিয়ে প্রায় দশ-বারো জন সেই গর্ত্তয় ফেলতে লাগল। ভাল্লুকটা এতক্ষণ কি করছিল, ফলগুলো খাচ্ছিল কি না অত লক্ষ্য করিনি। এখন সে গাঁক-গাঁক করে চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঝুড়ির পর ঝুড়ি মাটি পড়ে সে দেখতেই না পাক, বা চাপাই পড়ুক আমরা আর দেখতে পেলাম না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গর্ত্তটা ভরে গেল। পিসেমশাই আসনে বসে, তাঁর কপালে বিন-বিন করে ঘাম ফুটে উঠেছে। যে হাতে ভাল্লুকটির হাত ধরেছিলেন সেটা মাটিতে মাখা। এলোমেলো ভাবে ফ্যাল-ফ্যাল করে সেই গর্ত্তটির দিকে তাকিয়ে তিনি বসেছিলেন। কোনো দিকে চাইছিলেন না।

ইতিমধ্যে ঐ জায়গাটায় হোমের জন্য যজ্ঞিডুমুরের কাঠ সাজানো হতে লাগল। হঠাৎ আমাদের মনে হল মাটিটা নড়ে উঠল। কাঠগুলো চারি দিকে ছড়িয়ে গেল, না, কি যেন হল। কিন্তু বুঝতে পারলাম না। তখনি কাঠ আবার ঠিক করে দিয়ে আগুন জ্বেলে দেওয়া হল।

পিসেমশাই কি রকম ভাবে একবার চারি দিকে চাইলেন, যেন কি বলতে চাইলেন, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না।

তাঁর চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। লোকে বললে, সে জল হোমের কাঠের ধোঁয়ার জন্য।

আগুন জ্বালার পরও হোমের কাঠ আবার নড়ে গেল দু'-একবার আমাদের মনে হল।

'ওঁ স্বাহা স্বাহা' বলে আর মন্ত্র বলে বলে সেই স্তূপ-করা বেলপাতা ফুল অর্ঘ্য মাটির মালসা-ভরা গাওয়া ঘিয়ে ডুবিয়ে হোম সুরু হ'য়ে গেল। কত হাজার তা' আমি ঠিক জানি না—এক হাজার আট বোধ হয়। রাত্রিও শেষ হল হোমও শেষ হল!

লাল চেলী-পরা সাধু লাল চেলী-পরা পিসেমশাই আর পিসীমাকে নিয়ে হোমকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়ে হোমের ফোঁটা কপালে দিয়ে, শান্তিজল দিয়ে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

তার পর দিন শুনলাম, পিসেমশাই-এর খুব শরীর খারাপ, লোক-জন খাওয়ানোতে এসে দাঁড়াতে পারবেন না। কিন্তু ব্রাহ্মভোজনের সময় দেখলাম এসেছেন মালা-চন্দন, দক্ষিণার ব্যবস্থা করতে।'

বক্তা চুপ করলেন।

ট্রেণ-ভর্ত্তি ঠেসাঠেসি শ্রোতারা নির্ব্বাক্ হ'য়ে গল্প শুনছিল।

কাছের এক জন বললেন, 'তার পর?'

'তার পর পিসে মশাইকে আর আমরা বড় একটা বাইরে দেখতে পেতাম না। জন্তুদের দিকেও নয়, বাগানেও নয়, যে দিকে যজ্ঞ হ'য়েছিল সেদিকেও নয়। লোকেরা বলাবলি করত, আহা, পোষা জীব, লোকটার মনে কষ্ট হয়েছে।

আমি তো তার পর পড়া-শোনার জন্য কলকাতায় চলে গেলাম। পরে শুনেছিলাম একটি ছেলে হ'য়েছে।"

সমবেত ভাবে সকলে বললে, 'ছেলে হয়েছে তা হ'লে? আছে তো?'

বক্তা ঘাড় নেড়ে বললেন 'হ্যাঁ, আছে।'

পাশের পুত্রেষ্টি ইচ্ছুক লোকটি বললেন 'তবে কি?'

বক্তা বললেন, 'এই এইবার গ্রামে গিয়েছিলাম এত দিন পরে প্রায় ১৬ বছর পরে। পিসিমা'র বাড়ী গেলাম দেখা করতে। পিসেমশাই নেই। পিসিমা আছেন, বুড়ো হয়েছেন। বসতে বললেন, জল খেতে দিলেন। পিসেমশাই-এর কথাও বলে দুঃখ করলেন। বাড়ীতে এক বাড়ী নাতি-নাতনী মেয়ে-জামাই সব। এমন সময় একটি চোদ্দ-পনের বছরের ছেলে একটি কাপড় কোমরে জড়িয়ে হাতে করে ধরে সামনে এলো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার ছেলে কোথায়? কত বড় হ'ল?' পিসিমা বললেন—'এই তো ছেলে রে'। পিসিমা তাকে কাপড় পরিয়ে দিতে লাগলেন। অবাক হ'য়ে দেখলাম ছেলেটিকে। মাথাটি লম্বা মতন, হাতগুলো একটু বেশী লম্বা যেন, হাতে-পায়েও একটু বেশী লোম। চোখের দৃষ্টি বুদ্ধিহীনের মত। কথা অস্পষ্ট বলে। জিভটা খালি মুখের এপাশে-ওপাশে নাড়ে। মানুষের মতই সব, অথচ যেন কি একটু অন্য রকম। অবশ্য হয়ত আমার ভ্রম সেটা। পিসেমশাই ওকে সাত-আট বছরের দেখে মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে মেয়ে-জামাইদেরই আবার এনে রাখলেন ওঁদের দেখবার জন্য। গাঁয়ের লোকে কেউ কেউ বললে, তিনি না কি ছেলে হওয়ার আগে কয়েক বার ভাল্লুকটিকে স্বপ্ন দেখেছিলেন।'

প্রতিভাময় আয়ার্ল্যাণ্ড

যখন দেখবেন সুসাহিত্য রচিত হয়েছে ইংরেজীতে তখন বুঝবেন যে, ঐ সাহিত্যের রচনাকার কোন আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী। ইংরেজীতে লিখলে যে ইংরেজে লেখে না, কেউ কেউ হয়তো জানেন না। আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী লেখে, কিন্তু নাম হয় ইংরেজী সাহিত্যের। ইংরেজীতে অজস্র গ্রন্থ আছে, সমগ্র বিশ্বে পরিচিত যুগ যুগ থেকে,—লিখেছেন আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী। ধরুন জর্জ্জ বার্ণার্ড শয়ের নাম। শকে বাদ দিয়ে অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে জোনাথন সুইফ্‌ট, ষ্টার্ণ, গোল্ডস্মিথ, উইলিয়াম ব্লেক, রিচার্ড ষ্টিল, ম্যারিয়া এগওয়ার্থ, চার্লোট ব্রোণ্টি, আরব্য রজনীর অনুবাদক রিচার্ড বার্টন, রুবাইয়াতের অনুবাদক এডওয়ার্ড ফিটজারাল্ড, উইলিয়াম কনগ্রিভ, ফারকুয়ার, সেরিড্যান, উইলিয়াম লেকি, ব্রাইস, টিনডল এবং অস্কার ওয়াইল্ড। উক্ত নামধারীদের মধ্যে কেউ ঔপন্যাসিক, কেউ নাট্যকার, কেউ ঐতিহাসিক, কেউ কবি। বিগত যুগ ছেড়ে আসা যাক কিছু দূর এগিয়ে। ইয়েটস, জর্জ্জ মুর, জেমস জয়েস, ম্যাকনিশ, ও ফ্লাহার্টি, ও ক্যাসি, ষ্টিফেন্স, ওয়েষ্ট। আশ্চর্য্য, প্রতিভা বিকশিত করে আয়ার্ল্যাণ্ড, পুষ্ট হয় ইংরেজী সাহিত্য।

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

চুয়াড় বিদ্রোহের অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও ফরিদপুর অঞ্চলে ওয়াহবী সম্প্রদায়ে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হওয়ার ফলে বৃটিশ রাজশক্তির ভিত্তিমূল কম্পিত হইয়া ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবদুল ওয়াহব নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তিনি যে আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেন তাহাই পরে 'ওয়াহবী বিদ্রোহ' নামে খ্যাতি লাভ করে। ওয়াহব তাঁহার ধর্ম্মীয় লোকদের অনাচারে ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া তিনি বিভিন্ন সহরে পরিভ্রমণ করার পর অবশেষে মহম্মদ ইবন সৌদকে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন এবং পরে তাঁহাকে নিজের জামাতারূপে গ্রহণ করেন।

ইহার পর তিনি বেদুইনদের একত্রিত করিয়া এক সংস্কারবাদী সেনাদলের সৃষ্টি করেন এবং নেজ্‌দ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া নিজে ধর্ম্মগুরুর স্থান অধিকার করেন। ধর্ম্মীয় অনাচার-নিবারণকল্পে তিনি সাতটি নির্দ্দেশ দান করেন। এই মতবাদই পরে ওয়াহবী মতবাদ বলিয়া প্রচারিত হয়। এই ওয়াহবী সম্প্রদায়ই সুন্নী সম্প্রদায়ের অগ্রগামী দল—যাহারা গোঁড়া ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত।

ওয়াহবের আদর্শ ও মতবাদ আরবদের মনে গভীর রেখাপাত করে। বহির্ভাগত তীর্থযাত্রীদের মধ্যেও অনেকে এই আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ওয়াহবী আদর্শে অনুপ্রাণিত এইরূপ এক জন তীর্থযাত্রী ছিলেন যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমেদ। তাঁহার নেতৃত্বেই ভারতে ওয়াহবী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

মুসলিম কৃষক, মৌলবী ও আদালতের কর্ম্মচারী প্রভৃতি নিম্ন ও নিম্নমধ্য শ্রেণীর বিক্ষোভই ভাষা পায় ওয়াহবী আন্দোলনে। কোরাণ-সম্মত সমাজবাদের প্রেরণায় তাহারা অত্যাচারী বৃটিশরাজ, হিন্দু ও শিখের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। ইংরাজ, হিন্দু বা শিখ সকলেই তাহাদের নিকট বিধর্ম্মী, সকলেই তাহাদের নিকট ম্লেচ্ছ। ওয়াহবী নেতাগণ ধনী, ব্যবসায়ী বা উচ্চ-মধ্যবৃত্তি শ্রেণীর সমর্থনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া জনসাধারণের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিত। এই কারণেই বৃটিশের আশ্রিত হিন্দু ও মুসলমান জমিদারগণ ও ধনীরা এই আন্দোলনে আতঙ্কিত হইয়া উঠে। হাণ্টার সাহেব এই বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ওয়াহবী শক্তি কোন ধনী বা প্রভাবশালী শ্রেণীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। তাহাদের আবেদন ছিল জনগণের কাছে এবং তাহাদের ধর্ম্ম বা রাজনীতির মূল সূত্র ছিল বিক্ষুব্ধ জনগণের আশা ও আতঙ্ক।"

ওয়াহবী আন্দোলনের গুরুত্ব এই দিক দিয়া যে, তাহাদের সংগ্রাম ভারতের সাধারণ মানুষেরই সংগ্রাম। ইহার পিছনে আমীর-ওমরাহদের রাজনৈতিক কারসাজী ছিল না। অত্যাচারী ইংরাজ সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনযন্ত্রের ধ্বংস সাধন করাই ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যাপকতার দিক দিয়াও এই আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক সময় সমগ্র উত্তর-ভারতে—সুদূর সীমান্তের পার্ব্বত্য কেন্দ্র হইতে মধ্য বাঙ্গলার জেলাগুলি পর্য্যন্ত এই দুই হাজার মাইলের মধ্যে বিভিন্ন স্থলে তাহাদের শাখা ও কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ওয়াহবিগণ একাধিক বার বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রত্যেক বারই তাহারা হারিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাদের গুপ্ত অথচ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শাসকদের সর্ব্বদা সশঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতের মাটিতে বিদেশী শাসনের মূল উৎপাটনের সর্ব্বপ্রথম সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ওয়াহবী আন্দোলনের মধ্য দিয়া রূপ পরিগ্রহ করে বলিয়াই আন্দোলন পরিচালনায় প্রভূত দুর্ব্বলতা থাকা সত্ত্বেও ওয়াহবী আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের রক্তাক্ত অধ্যায়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই আন্দোলনে দুইটি প্রধান দোষ ছিল—ধর্ম্মের গোঁড়ামির প্রভাব এবং জাতীয় চেতনার একান্ত অভাব। ধর্ম্মের ভিত্তিতেই এই আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ওয়াহবীরা এই ভারতবর্ষকে "দার-উল্-হার্ব" বলিয়া অভিহিত করিত। দার-উল-হার্ব অর্থ শত্রুদের দেশ—অর্থাৎ মুসলিম কর্ত্তৃত্বের অভাবে এই দেশ শত্রু-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান-নির্ব্বিশেষে সকলেই তাহাদের শত্রু—সকলেই কাফের। এই দুর্ব্বলতার ফলাফল আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক শোচনীয় সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতে ওয়াহবী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমেদ ১৭৮৬ সালে মহরম মাসে রায়বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি আমীর খান পিণ্ডারী—পরবর্ত্তী কালে টঙ্কের নবাবের অধীন অশ্বারোহী সৈনিকের কার্য্য গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবে শিখ-রাজ্য তথা হিন্দু-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় সৈয়দ আহমেদের জীবনে এক পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ১৮১৬ সালে দিল্লীর বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত শাহ্ আবদুল আজিজের নিকট তিনি ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিন বৎসর পর তিনি নিজে ধর্ম্মপ্রচারকরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। হিন্দুদের সংস্পর্শে আসিয়া ইসলাম ধর্ম্মে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিক প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে তাহা দূর করিয়া ইহার সংস্কার সাধন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইসলামের সংস্কার সাধন ব্যাপারে তিনি যেমন গোঁড়া মৌলভীদের সমর্থন লাভ করিলেন তেমনি সাধারণ মুসলমানগণও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল। রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত ফৈজুল্লা খানের জাগীর-দারীতে সৈয়দ তাঁহার কর্ম্মস্থল বাছিয়া লন। ফৈজুল্লা খানের বংশধরগণ ওয়ারেন হেষ্টিংসের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় সৈয়দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রোহিলাদের নির্ম্মূল করার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংসের দানবীয় অত্যাচারের ইতিহাস ভারতে ইংরাজ শাসনের মসীলিপ্ত কাহিনীকে আরও কলঙ্কিত করিয়াছে।

১৮২০—২২ সালে সৈয়দ আহমেদ সমগ্র উত্তর-ভারত পরিভ্রমণ করেন। এই সময় বহু লোক তাঁহার শিষ্য হয় এবং সৈয়দ আহমেদ

তাহাদের মধ্য হইতে বিশ্বাসী লোক দেখিয়া বিভিন্ন স্থানে তাহাদের ধর্ম্ম-কর সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেন। পরে মুসলমান সম্রাটগণ যে ভাবে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিতেন ঠিক সেই অনুকরণে মৌলভী ওয়ালেয়ত আলি, মৌলভী এনায়েত আলি, মৌলভী মবহুম আলি এবং মৌলভী ফুরাত হোসেন প্রভৃতি চার জন শিষ্যকে প্রধান ধর্ম্মগুরু হিসাবে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি পাটনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে তাঁহার মতবাদ বাঙ্গলার মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁহার জনপ্রিয়তা এত দূর বৃদ্ধি পায় যে, তাঁহার পক্ষে শিষ্যত্ব গ্রহণের নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক পর্ব্ব অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই। অবশেষে তিনি তাঁহার উষ্ণীষের কাপড় বিছাইয়া দিয়া বলেন, যাহারা তাঁহার উষ্ণীষখণ্ডের যে কোন স্থানে স্পর্শ করিবে তাহারাই তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহার পর ১৮২২ সালে মক্কায় তীর্থ করিতে গিয়া ওয়াহবীদের সংস্পর্শে আসেন। এইখানেই তিনি ওয়াহবীদের দলভুক্ত হয়েন এবং পর-বৎসর অক্টোবর মাসে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮২৪ সালে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত করিলেন। উত্তর-ভারতে পাঠানদের লইয়া তিনি একটি দুর্দ্ধর্ষ দল গঠন করেন। উক্ত দলের সহায়তায় শিখ-রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগী হইলেন। ওয়াহবীদের সংগঠন দ্রুত শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং টংকের নবাবের নিকট হইতে অর্থ ও লোকবলের যথেষ্ট সাহায্য পায়। ১৮৩০ সালে পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার দখল করিয়া লয়। পেশোয়ারের পতনের পর সৈয়দ আহমেদ নিজেকে খালিফ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে টাকা প্রচলন করেন।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবার অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। বিবাহ-সম্পর্কিত এক নির্দ্দেশের ফলে তাহার সমর্থক দলের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা যায় এবং সংঘর্ষে তাঁহার দলের অনেকে নিহত হয়। অবশেষে ১৮৩১ সালে মে মাসে বালাকোটে সৈয়দ আহমেদ শিখ সৈন্যের গুলীতে নিহত হন এবং ওয়াহবীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

ইহার পর ওয়াহবী আন্দোলনের অন্যান্য নেতাগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, সৈয়দ আহমেদের মৃত্যু হয় নাই এবং আল্লার নির্দ্দেশে এবং ইসলামের স্বার্থে তিনি আত্মগোপন করিয়া আছেন এবং গোপনে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই অর্থাৎ ভারতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করিবেন। সাধারণ মুসলমানেরা তাহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। নিভৃত পার্ব্বত্য অঞ্চলে সিতানায় ওয়াহবীদের দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল।

ওয়াহবী আদর্শ বাংলা দেশে যে ভাবে ব্যাপকতা লাভ করে তাহা এক বিচিত্র কাহিনী। ওয়াহবীদের সংগ্রামের ইতিহাসে "তিতু মিঞা" বা তিতু মীরের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। সামান্য অবস্থা হইতে নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মনিষ্ঠার বলে তিনি এক বিরাট ওয়াহবী বাহিনী সংগঠিত করিতে সমর্থ হন। তিতু মিঞা বারাসতের অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার আসল নাম নিসার আলি। পেশাদার মল্লবীর হিসাবে তাঁহা যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিতু মিঞা ছিলেন চাষী-গৃহস্থের পুত্র ছোট-খাট এক জমিদার-কন্যার পাণিগ্রহণ করায় তাঁহার অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। এই সময় কিছু দিন তিনি মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে কলিকাতায় অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালের কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে তাঁহাকে জেলে যাইতে হয়।

জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি মক্কার-পথের যাত্রী হন। মক্কাতে সৈয়দ আহমেদের সংস্পর্শে আসিয়া তিতু মিঞা তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং সেই হইতে তিনি ওয়াহবী মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন; ইহারা গোপনে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল।

১৮৩০ সালে পেশোয়ার ওয়াহবীদের দখলে আসায় প্রকাশ্য ভাবে তিতু মিঞা মুসলমান ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমে ইংরাজের বিরুদ্ধে না গিয়া হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরগুলির ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় ইছামতী নদীর তীরের অধিবাসী কৃষ্ণ রায় নামক এক জমিদার ওয়াহবী সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষক ও প্রজাদের উপর ৩৲ টাকা হিসাবে এক কর ধার্য্য করেন। ইহার ফলে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দেয়। শীঘ্রই তিতু মিঞার অনুগামিগণ দলে ভারী হইয়া উঠিল। বহু হিন্দু-গ্রাম লুণ্ঠিত হইল।

ইংরাজ সরকারের সহিতও তিতু মিঞার শীঘ্রই সংঘর্ষ বাধিল। নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা তৈয়ারী করিয়া তিতু মিঞা তাঁহার দল-বল সহ সেই স্থানে সমবেত হইলেন। কলিকাতার পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের গ্রামসমূহ, ২৪ পরগণা, নদীয়া, ও ফরিদপুর অঞ্চল তিন-চার হাজার বিদ্রোহীদের করতলগত ছিল। ওয়াহবী আদর্শে অনুপ্রাণিত জনগণ তিতু মিঞাকে খাদ্য ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন।

৬ই নভেম্বর প্রায় ৫০০ ওয়াহবী সৈনিক একটি ছোট সহর আক্রমণ করিয়া ইংরাজ-শাসনের অবসান ঘোষণা করে। জেলা কর্ত্তৃপক্ষ এই বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হওয়ায় ১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর কলিকাতা হইতে এক দল শক্তিশালী কোম্পানী-সৈন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। কোম্পানী দল ওয়াহবী সৈন্যদের প্রথমে ভয় দেখাইবার জন্য ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করে। কিন্তু ইহার ফল বিপরীত হয়। বিদ্রোহী দল কোম্পানী সৈন্যের উপর প্রবল ভাবে আক্রমণ করে। ১৭ই নভেম্বর ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে আরও এক দল সৈন্য বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে। ইউরোপীয় সৈন্যগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ চালায়। কিন্তু বিদ্রোহীদের সংখ্যাধিক্যের ফলে কোম্পানী-সৈন্য পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। পরাজিত ব্রিটিশ সৈন্যদল নদীপথে পলায়ন কালে অধিকাংশই ওয়াহবী বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হয়।

তিতু মিঞার শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দমনের জন্য ইহার পর কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষ অশ্বারোহী, পদাতিক ও দেহরক্ষী সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। তিতু মিঞা আমৃত্যু সংগ্রাম করিলেন। কিন্তু বিপুল সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁহার পক্ষে বেশী দিন যুদ্ধ করা সম্ভব হইল না। শিষ্যেরা পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তিতু মিঞা শত্রুর গুলীতে নিহত হন।

ইহার পর ব্রিটিশ সৈন্য তিতুর বাঁশের কেল্লা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যুদ্ধে ৩৫০ জন ওয়াহবী সৈন্য বন্দী হয়। তন্মধ্যে ১৪০ জনের কারাদণ্ড এবং তিতুর সহকারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

তিতু মিঞার মৃত্যুর পর বাংলা দেশে ওয়াহবী সমাজ প্রত্যক্ষ ভাবে ইংরাজ শক্তির সম্মুখীন হয় নাই। কিন্তু বাংলা দেশ হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাহারা অর্থ ও লোকবল দিয়া সাহায্য করিত। বাংলা দেশে নীল কুঠীয়াল ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধেই তাহাদের অভিযান বিশেষ ভাবে চলে।

সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গ ওয়াহবী মতবাদ যাহাতে সুষ্ঠু ভাবে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় তাহার সকল প্রকার চেষ্টা করেন। সমগ্র উত্তর-ভারতে, সুদূর সীমান্ত প্রদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে মধ্য-বাংলার জেলাগুলি পর্য্যন্ত এই দুই হাজার মাইলের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

ওয়াহবীদের মধ্যে একটি যুদ্ধ-সঙ্গীতও প্রচলিত ছিল। এই সঙ্গীত যুদ্ধকালে তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রেরণা জোগাইত। নিম্নে সঙ্গীতের ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হইল।

"First I glorify God, who is beyond all prasie ;
I land his prophet and write a song on Holy War :
Holy war is a war carried on for religion, without any lust of power.
In the sacred scriptures its glories are related ; I mention a few.
War against the Infidel is incumbent on all
Musalmans ; make provision for it before all things.
He who from his heart gives one farthing to the cause,
Shall here after receive seven hundred fold ;
And he who both gives and joins in the fight,
Shall receive seven thousand fold from God.
He who shall equip a warrior in this cause of
God shall obtain a martyr's reward ;
His children dread not the trouble of the grave ;
Not the last trump ; nor the day of judgement.
Cease to be cowards ; join the divine leader, and smite the infidel.
I give thank to God that a great leader has been born in the 13th century of the Hirja.
Oh friend, since you must some time die, is not
Better to offer up your life in the service of the Lord ?
Thousands go to war and come back unhurt ;
Thousands remain at home and die.
You are filled with world-ly care, and have
Forgotten your maker in thinking of your wives and children ?
How long to escape death ?
If you give up this world for the sake of God,
You enjoy the pleasures of heaven for ever.
Fill the uttermost ends of India with Islam,
So that no sounds may be heard but "Allah ! Allah !"

ওয়াহবীরা সামরিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ১৮৫৮, ১৮৬৩ এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। প্রত্যেক বারই তাহারা পরাজিত হয়। ক্রমে সরকার তাহাদের গুপ্ত প্রচেষ্টার কথা জানিতে পারিয়া তাহাদের গুপ্ত কর্ম্মকেন্দ্রগুলির উপর কড়া নজর রাখে। কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারে যে, সাধারণ মুসলমানদের সহানুভূতি ওয়াহবীদের প্রতি; তখন তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়িয়া প্রলোভনের পথে তাহাদের আয়ত্তে আনিতে সচেষ্ট হয়।*

[ক্রমশঃ।

* Indian Mussalmans by W. W. Hunter ; Calcutta Review ; ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস।

নাট্যকার ও দর্শক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ইংরেজরা এদেশে আসবার আগে বাঙালীরা অভিনয় দেখত যাত্রার আসরে। অনেকটা এই ধরণের আসর ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ ও যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও দেখা যায়। প্রাচীন ভারতে উচ্চতর শ্রেণীর দর্শকরা দেখতেন যে শ্রেণীর রঙ্গালয়, পাশ্চাত্য থিয়েটারের সঙ্গে তার অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু এখানকার জনসাধারণ অভিনয় দেখবার সুযোগ পেত যাত্রার মত আসরেই গিয়ে। ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ ও যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে পড়েছিল প্রাচীন ভারতেরই প্রভাব। এবং খুব সম্ভব সেই প্রভাব থেকেই বাঙালীর যাত্রার উৎপত্তি। চীন দেশে থিয়েটারের পত্তন হয়েছে স্মরণাতীত কালে। কিন্তু কোন কালেই সেখানে যুরোপের কি প্রাচীন ভারতের এতটুকু প্রভাবও পড়েনি। সেখানেও বাঁধা রঙ্গমঞ্চের উপরে অভিনয় হয় বটে, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দাঁড়ালে বিদেশী দর্শকরা মনে করবে—এ যে দেখছি এক আজব কাণ্ড-কারখানা! অনেক বৎসর আগে কলকাতার দুটি রঙ্গালয়ে (বিডন স্ট্রীটে ও চীনেপাড়ায়) দুটি চৈনিক নাট্য-সম্প্রদায় নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল এবং সে অভিনয় আমি দেখেছি। চীনা রঙ্গালয়ে দৃশ্যপটের কোনই বালাই নেই। আছে বটে সাজ-পোষাকের যথেষ্ট জাঁকজমক, নেই কিন্তু বিলাতী থিয়েটারের অধিকাংশ উপসর্গ। নিদেনপক্ষে যা ব্যবহার না করলেই চলে না, এমনি দু-চারটি ছোটখাটো আসবাব ও জিনিসপত্র দিয়েই কাজ চালানো হয়। মঞ্চের এক পাশে যখন অভিনয় করে নট-নটীরা, বাইরের লোকরা এসে মঞ্চের অন্য প্রান্তটা পরের দৃশ্যের জন্যে প্রস্তুত ক'রে তোলে। কুশীলবরা একবার মঞ্চ পরিক্রমণ করলেই বুঝতে হবে যে, তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে। ক্রমাগত প্রতীকের সাহায্য নেওয়া হয়। নট যদি লণ্ঠন নিয়ে মঞ্চে আসে, বুঝতে হবে অন্ধকার রাত্রি! মুখের পাশে হাতপাখা ধরলে বুঝতে হবে, প্রখর রৌদ্রে সে নগ্ন মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। একটি মাত্র অভিনেতা পতাকা হাতে ক'রে দেখা দিলে ধ'রে নিতে হবে, মঞ্চের উপরে হাজির আছে হাজার জন সৈনিক। এক জন বর্শাদণ্ড ছুঁড়লে আর এক জন তা যদি হাতে ধ'রে ফেলে মাটির উপরে শুয়ে প'ড়েই আবার উঠে দৌড়ে মঞ্চ থেকে চ'লে যায়, তাহ'লে বোঝা যাবে যে, সে মারা পড়েছে। এমনি আরো কত কি!

জাপানে নাট্যাভিনয়ের প্রথা প্রচলিত হয়েছে চৈনিকদেরই দেখাদেখি। কিন্তু চীনা পদ্ধতির সঙ্গে জাপানী পদ্ধতির পার্থক্য আছে যথেষ্ট। বিলাতী বা ভারতীয় পদ্ধতিরও সঙ্গে পার্থক্য তার আকাশ-পাতাল। জাপানের "নো" নাট্যাভিনয়ের কথা পৃথিবীতে বিখ্যাত। সেখানে আরো কোন কোন শ্রেণীর অভিনয় আছে। কিন্তু সে সব কথা এখানে বেশী ক'রে বলবার দরকার নেই, কারণ ভারতীয় থিয়েটারের গায়ে একেবারেই লাগেনি চীন বা জাপানের থিয়েটারি হাওয়া।

বাঙলা রঙ্গালয়ের গোড়া খোঁজবার জন্যে প্রাচীন ভারত কি চীন-জাপান কি প্রাচীন গ্রীসের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। বাংলা রঙ্গালয়ের গোড়ার দিকে তার উপরে যাত্রার প্রভাব ছিল অল্প-বিস্তর,—এমন কি আমাদের বাল্যকালেও থিয়েটারি অভিনয়ের ও পালার উপরে কিছু কিছু যাত্রার ছাপ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আসলে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের মত বাংলা রঙ্গালয় ও দৃশ্যকাব্যও এসেছে বিলাতী কারখানা থেকে। ইংরেজী থিয়েটার ও বাংলা রঙ্গালয় একই ঢালের এ-পিঠ ও-পিঠ। এবং আমাদের নাট্যকাররাও নাটক রচনার সময়ে ভাস বা কালিদাস বা শ্রীহর্ষের আদর্শ গ্রহণ করতেন না; তাঁরা আগে অনুগামী হ'তেন সেক্সপিয়ার প্রভৃতির এবং এখন কাজ করেন আধুনিক পাশ্চাত্য নাট্যকারদের পরিকল্পনা অনুসারে। সকলেই জানেন, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাংলা থিয়েটারের জন্ম দিয়েছিলেন রুসিয়া থেকে আগত হেরাসিম লেবেডেফ সাহেব।

কলকাতায় তখনও ইংরেজদের নিজস্ব রঙ্গালয় ছিল। কিন্তু বাঙালীরা তখনও থিয়েটারের স্বপ্ন পর্যন্ত দেখেনি, তারা যাত্রা ও পাঁচালি প্রভৃতি নিয়েই নিযুক্ত ছিল একান্ত ভাবে।

এই সময়ে হঠাৎ লেবেডেফ সাহেবের খেয়াল হ'ল, বাঙালীদের বাংলা ভাষাতেই থিয়েটারের অভিনয় দেখাবেন। তিনি নিজে বাংলা শিখলেন এবং বাংলায় কোন থিয়েটারি নাটক নেই ব'লে তর্জমা করলেন দুখানা ইংরেজী নাটক। নির্মাণ করলেন নূতন এক নাট্যশালা। তার পর বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ সংগ্রহ ক'রে তাদের নিয়ে মহলা দিয়ে খুলে বসলেন বাংলা রঙ্গালয়। এবং সেই প্রথম ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে য়ুরোপীয় বাদ্যযন্ত্র মিলিয়ে দেশীয় সুরে বাজানো হয় দেশীয় ঐকতান।

কিন্তু সেখানকার অভিনয় বেশী দিন চলেনি জনসাধারণের আগ্রহের অভাবে। লেবেডেফ সাহেব এদেশ ছেড়ে চ'লে গেলেন, তাঁর রঙ্গালয়ের দরজা হ'ল বন্ধ। লোকে তার কথা ভুলে গেল।

দেশে ক্রমে ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য ও রীতিনীতির প্রভাব বেড়ে উঠল। জনসাধারণ যাত্রা প্রভৃতি নিয়েই মেতে রইল বটে, কিন্তু শিক্ষিত, নব্য বাঙালীর রুচি তাতে সায় দিতে পারলে না। তাঁরা সহরের ইংরেজী রঙ্গালয়ের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ক্রমে তাঁদের ঝোঁক বাড়তে লাগল, নিজেরাও সেই ভাবে অভিনয় করবার জন্যে তাঁরা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তখনকার সংবাদপত্রাদিতেও বাংলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আন্দোলন চলতে লাগল। ধনী বাঙালীরা ইংরেজদের অনুকরণে আপন আপন আলয়ে অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বেঁধে ইংরেজী নাটক অভিনয় করতে লাগলেন। কিন্তু "নানান দেশে নানান ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?" লেবেডেফ সাহেবের প্রস্থানের চল্লিশ বৎসর পরে বাঙালীরা প্রথমে নিজেদের থিয়েটারে বাংলা ভাষায় নাটকের অভিনয় দেখান—যদিও সে নাটক মৌলিক নয়। প্রথম যুগের বাঙালী নাট্যকাররা সাধারণতঃ সংস্কৃত নাটককেই ভাষান্তরিত করতেন বটে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও অভিনয়ের ব্যবস্থা হ'ত অবিকল ইংরেজদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে।

তার পর বাংলা রঙ্গালয়ের প্রধান নাট্যকার হয়ে দাঁড়ালেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। তিনি কয়েকখানি মৌলিক নাটকও রচনা করলেন। কিন্তু ইংরেজী নাট্য-সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল না ব'লে পালা রচনা করতেন তিনি এদেশের পুরাতন প্রথা অনুসারেই। শিক্ষিত বাঙালীদের মন তাদের মধ্যে তেমন স্ফূর্তি লাভ করতে পারত না।

সেই অভাব দূর করবার জন্যে কলম ধরলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সংস্কৃত নাট্যরীতি পুরোপুরি বর্জ্জন ক'রে তিনি অবলম্বন করলেন বিলাতী নাট্যরীতি। রামনারায়ণ তাঁকেও সংস্কৃত নাটকের রীতি গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা না ক'রে মাইকেল বলেছিলেন—সংস্কৃতের নিগড় আমি পরব না। আমার নাটকে বিদেশী ভাব থাকবে বটে, কিন্তু আমি লিখব কেবল তাঁদের জন্যেই, আমার মত যাঁরা পাশ্চাত্য ভাবের ভাবুক। তিনি রচনা করলেন মৌলিক নাটক "শর্ম্মিষ্ঠা"। সেটা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের কথা। তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত বাঙালা নাট্যকাররা নাটক-রচনার জন্যে আর কোন নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেননি। মাইকেলের বহু কাল পরে সাধারণ রঙ্গালয়ের সর্ব্বপ্রধান নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন: "মহাকবি সেক্ষপীরই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছি। * * * * আমি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্রবেই বেশী এসেছি।" ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকাবলীতেও আছে ঐ পাশ্চাত্য প্রভাব এবং এ প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় আরো বেশী মাত্রায় অনুভব করা যায়। তবু গিরিশচন্দ্র বলতে পেরেছিলেন: "কিন্তু মহাকবি কাশীরাম দাস কৃত্তিবাস আমার ভাষার বনিয়াদ। আমার লেখায় তাঁদের প্রভাবও বিদ্যমান।" দ্বিজেন্দ্রলাল তাও বলতে পারবেন না। তাঁর লেখাতেও আছে যথেষ্ট বিলাতী গন্ধ। আমাদের আধুনিক নাট্যকারদের কথা বলাই বাহুল্য। তাঁদের নাটক অধিকতর বিলাতী ভাবাপন্ন।

য়ুরোপের এক এক দেশের বিখ্যাত নাট্যকাররা এক এক সময়ে দেখিয়েছেন নাটক-রচনার বিশেষ পদ্ধতি ও নূতন পরিকল্পনা। সকলকার নাম করবার দরকার নেই, সেক্ষপীয়ার, হিউগো, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, শেখভ ও আন্দ্রীভের নাম উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। এঁদের পরস্পরের পদ্ধতি ও পরিকল্পনার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এঁদের প্রত্যেকেই আখ্যানবস্তু ও চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন আপন আপন বিশিষ্ট ধারণা অনুসারে।

আজ পর্য্যন্ত এক জন মাত্র বাঙালী নাট্যকার এ-রকম কোন বিশিষ্টতার পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁরা বড় জোরে য়ুরোপীয় নাট্যকারদের জনতার মধ্যে গিয়ে প'ড়ে দিশেহারার মত ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছেন, আজ অবলম্বন করেছেন এক জনকে এবং কাল ধর্ণা দিয়েছেন আর এক জনের কাছে। এমন কি কারুর কারুর রচনায় আজও পাওয়া যায় এলিজাবেথীয় নাট্যজগতের যুগধর্ম। এদেশে নাটক-রচনায় নূতন পদ্ধতি ও পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছেন কেবল রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর কথা এখানে অবান্তর। তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের গণ্ডীর ভিতরে আসেননি। এবং সাধারণ রঙ্গালয় সেচে তাঁর উচ্চতর শ্রেণীর নাটকগুলি গ্রহণ করতে গিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছে একাধিক বার।

এ জন্যে দায়ী বাংলা দেশের সাধারণ দর্শকরা। তারা হীরককে চিনতে না পেরে তুচ্ছ কাচের চাকচিক্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের অন্যতম জন্মদাতা গিরিশচন্দ্রের উক্তি উল্লেখযোগ্য: "ম্যাকবেথের অনুবাদ করে থিয়েটারে অভিনয় করতে আমার ১৬।১৭ বৎসর লেগেছিল। * * * মনে তো করেছিলাম যে ম্যাকবেথের পর ওথেলো, হ্যামলেট, কিং লিয়ার প্রভৃতি বই অনুবাদ ক'রে অভিনয় করব। কিন্তু যদিও সকলে

ম্যাকবেথ নাটকের অনুবাদের প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু দর্শকের অভাবে রঙ্গালয়ের অভিনয় সত্বর বন্ধ হ'ল। অথচ অভিনয় বেশ সুন্দর হয়েছিল। কাজে কাজেই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী প্রভৃতির অনিচ্ছা দেখে আর অনুবাদ করলাম না। ব্যবসায় কৃতকার্য্য না হ'লে আমার হাত-পা বাঁধা। * * * * বেশীর ভাগ লোক যায় নাচ দেখতে আর গান শুনতে। থিয়েটারে নাটক দেখতে খুব কম লোকেই যায়। বিশেষ শিক্ষিত লোক ছাড়া এই নাটক (ম্যাকবেথ) সাধারণের উপযোগী হয়নি। শিক্ষিত সম্প্রদায় একবার দেখে আর বড় বেশী দেখে না।"

মস্তিষ্ক এবং মনীষার দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে, বাংলা রঙ্গালয়ের সাধারণ দর্শকরা এখনো বাস করছে আঁতুড়-ঘরেই। গিরিশচন্দ্রের দ্বারা অনূদিত "ম্যাকবেথ" অভিনীত হয়েছিল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে—অর্থাৎ সাধারণ বাংলা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার তেইশ বৎসর পরে। ধ'রে নিলুম বাঙালী দর্শকদের বুদ্ধি তখনও ভালো ক'রে পাকেনি। কিন্তু তারও ছাব্বিশ বৎসর পরে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল সুলেখক দেবেন্দ্রনাথ বসুর দ্বারা অনূদিত "ওথেলো"। অনুবাদ হয়েছিল চমৎকার এবং তারক পালিত (ওথেলো), অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ইয়াগো) ও তারাসুন্দরীর (ডেসডিমোনা) অভিনয়ও হয়েছিল সত্য সত্যই অনুপম। কিন্তু বাঙালী দর্শকদের কাঁচা বুদ্ধি তখনও গ্রহণ করতে পারেনি সেক্সপিয়ারকে।

তারও বহু বৎসর পরে ষ্টার থিয়েটারে খোলা হয় রবীন্দ্রনাথের পরম উপভোগ্য নাটক "গৃহপ্রবেশ"। প্রধান দুটি ভূমিকায় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী নীহারবালা অভাবিত কৃতিত্ব প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সে পালাটিকেও একেবারেই আমল দেয়নি দর্শকরা।

রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" নাটক বহুকাল আগে বাংলা রঙ্গালয়ে রীতিমত লোকপ্রিয় হয়েছিল, কারণ তাঁর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে রচিত এই নাটকখানির মধ্যে সহজবোধ্য মেলোড্রামার উপাদান ছিল প্রভূত পরিমাণে। কিন্তু তিনি যখন তাকে পরিবর্ত্তিত করে অপূর্ব্ব এক নাট্যরূপ ("তপতী") দিলেন, তখন তাঁর পরিণত বয়সের পরিকল্পনা ও রচনানৈপুণ্য এবং শিশিরকুমারের প্রয়োগ-কৌশল ও অনবদ্য অভিনয়ও সে পালাটিকে সাধারণ দর্শকদের অনাদর থেকে রক্ষা করতে পারেনি। এ দুটি হচ্ছে আধুনিক দৃষ্টান্ত। এথেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পার হয়েও সাধারণ বাঙালী দর্শকদের মনীষা কিছুমাত্র উন্নত ও মার্জ্জিত হয়নি। সেদিন কোন রঙ্গালয়ে গিয়ে "সমুদ্রগুপ্ত" নামে একখানি জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দেখলুম। সমুদ্রগুপ্ত হচ্ছেন চতুর্থ শতাব্দীর লোক। কিন্তু তাঁর সময়েই নাটকের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে দূরবীক্ষণ যন্ত্র—যার আবিষ্কর্ত্তা গ্যালিলিও পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিলেন ষোড়শ ও সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে! কেবল তাই নয়, সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই টেনে আনা হয়েছে কবি কালিদাসকে, ঐতিহাসিকরা যাঁর কালনির্ণয় করেছেন সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কিংবা তাঁর পৌত্র কুমারগুপ্তের সময়ে। দর্শকরা অম্লানবদনে সহ্য ক'রে যাচ্ছে এই সব ঐতিহাসিক প্রলাপ বা অপলাপ। এবং এ জন্যে আমাদের নাট্যকাররাও অল্প দোষী নন। তাঁরা স্কুলপাঠ্য ইতিহাস না প'ড়েও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে লজ্জিত হন না। আধুনিক কালে কোন পাশ্চাত্য রঙ্গালয়েই এমন বিসদৃশ কাণ্ড সহ্য করা হ'ত না।

—সাহিত্য-পরিচয়—

প্রাপ্তি স্বীকার

বিংশতি মহামানব—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ। দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্যাবিনেট কোং লিঃ; ৩২-এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

সেকাল একাল—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। এ, মুখার্জ্জী এ্যাণ্ড কোং লিঃ; ২, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

বাবলা রাণীর ছড়া—শ্রীসুধা বসুজা। এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ; ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

জনগণের উপনিষৎ—শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত। আশুতোষ লাইব্রেরী; ৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

রাত্রির তপস্যা—মন্মথ রায়। সংহতি কার্য্যালয়; ২০৩।২ বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ। ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

পরবাসী—শ্রীআদিত্যশঙ্কর। বরেন্দ্র লাইব্রেরী; ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

প্রাণতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব—সন্তোষকুমার সামন্ত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং; ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

সোসালিষ্ট পার্টি কি চায়!—নরেন্দ্রনাথ দাস। পি ৩৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

মগের মুলুক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ; ২২ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য তিন টাকা।

নিত্য-সঙ্গীত-লহরী—শ্রীমৎ স্বামী নিত্যপদানন্দ অবধূত। মহানির্ব্বাণ মঠ, নবদ্বীপ। মূল্য দুই টাকা।

মৃত্যুর পরে কি হয় ও কোথায় যায়—ডাঃ শ্রীরাধারমণ বিশ্বাস। ১, সাগর ধর লেন, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

অজানার পথে—শ্রীনরেশনাথ মৈত্র। শ্রীদুর্গা লাইব্রেরী; ১৮এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চার আনা।

অভিশপ্ত বাঙলা—শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ। বীণা লাইব্রেরী; ১৫, কলেজ স্কোয়ার। মূল্য এক টাকা।

পুরাণো দশ বছরের ডায়েরী—শ্রীকানাইলাল ঘোষ। দি প্রকাশনী; ১১এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

United Nations Work And Progress Of TECHNICAL ASSISTANCE—U. N. Dept of Public Information. New York. N. Y. Price 15 cents.

বঙ্কিম মানস—অরবিন্দ পোদ্দার, এম, এ, ডি-ফিল, ইণ্ডিয়ানা লিঃ; ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা—শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পি, এইচ, ডি। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ; ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

জনগণের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। সিগনেট প্রেস; ১০।২ এলগিন রোড, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

শান্তি-চুক্তি, না, নয়া যুদ্ধের খসড়া—

পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট সময়ে গত ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) সানফ্রান্সিস্কোয় অনুষ্ঠিত জাপ শান্তি-চুক্তি সম্মেলনে জাপ শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এক পক্ষে ৪৮টি রাষ্ট্র এবং অপর পক্ষে জাপান এই শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করিয়াছে। ভারত এবং ব্রহ্মদেশ এই সম্মেলনে যোগদান করে নাই। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়া সম্মেলনে যোগদান করিলেও শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নাই। ফ্রান্সকে খুশী করার জন্য তাহার সৃষ্ট ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া এবং লাওসকেও এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আমন্ত্রিত হইয়া দক্ষিণ-কোরিয়া দর্শকরূপে উপস্থিত ছিল। অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডের জাপ শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষরের মূল্যস্বরূপ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঐ দুইটি দেশের সহিত ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৫১) তারিখে এক ত্রিপক্ষীয় শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়াকে খুশী করিবার জন্য চুক্তির চূড়ান্ত খসড়ায় জাপানের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্বের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। শুধু ইহাতেও ফিলিপাইন সন্তুষ্ট হয় নাই। ফিলিপাইনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রকে তাহার সহিতও এক রক্ষা-চুক্তি করিতে হইয়াছে। এই রক্ষা-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে ৩০শে আগষ্ট (১৯৫১) তারিখে। ফিলিপাইনের সহিত রক্ষা-চুক্তি এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের সহিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিকে জাপ শান্তি-চুক্তির ভূমিকা বলিয়াও অভিহিত করা যায়। এই শান্তি-চুক্তিতে বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এক জন সহযোগী উদ্যোক্তা। বৃটেনও শান্তি-চুক্তির একটি স্বতন্ত্র খসড়া তৈয়ার করিয়াছিল। বৃটেনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র খসড়া শান্তি-চুক্তিতে চীনদেশের স্বাক্ষরের কোন ব্যবস্থা করে নাই এবং ফরমোসা দ্বীপের ভবিষ্যৎ অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখিয়াছে। বৃটেন ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং জাপ শান্তি-চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের যুক্তভাবে রচিত, এ কথা অবশ্যই বলিতে পারা যায়। পাকিস্তানের এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার একমাত্র কারণ যে কাশ্মীর, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কাশ্মীরই হইল পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি। 'দি নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশান' লিখিয়াছেন, "Pakistan's accommodating attitude stems rather from her regrettable differences with India than from any real desire to see the present Treaty made effective." অর্থাৎ পাকিস্তানের এই মানিয়া লওয়ার মনোভাব বর্ত্তমান সন্ধিকে কার্য্যকরী হইতে দেখিবার প্রকৃত ইচ্ছা হইতে নয়, ভারতের সহিত শোচনীয় বিরোধ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু গোটা জাপ শান্তি-চুক্তিটাই একটা উপলক্ষ মাত্র। আসল উদ্দেশ্য জাপানের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা-চুক্তি সম্পাদন। জাপ শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরই জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

জাপ শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত না হইলে জাপানে সশস্ত্র মার্কিণ সৈন্য মোতায়েন রাখার জন্য জাপানের সহিত কোন চুক্তি করা সম্ভব নয়। আবার জাপ শান্তি-চুক্তিও এমন ভাবে রচিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জাপানের সহিত এইরূপ চুক্তি করা সম্ভব হয়। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই জাপানের সহিত শান্তির চুক্তিপত্র রচিত হইয়াছে। জাপ শান্তি-চুক্তির অন্যান্য সর্ত্তগুলি উহারই অনুসঙ্গী এবং বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে রচিত হইয়াছে। এই জন্যই জাপ শান্তি-চুক্তি সম্বন্ধে রাশিয়ার প্রস্তাব এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রচিত খসড়া চুক্তিপত্র সম্পর্কে রাশিয়া ও ভারতের সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্বাক্ষরিত হইয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রচিত জাপ শান্তি-চুক্তিপত্র। এইরূপ জাপ শান্তি-চুক্তি এবং জাপানের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, এশিয়ার অধিবাসীদেরই তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর জাপ শান্তি-চুক্তি সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এই চুক্তিকে 'শান্তি-প্রতিষ্ঠার সক্রিয় পন্থা' (it offers action for peace) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, যাহারা যুদ্ধনিরোধের পরিবর্ত্তে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে চায় তাহাদের স্বরূপও এই সম্মেলন উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। গত ৮ই সেপ্টেম্বর যখন শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইতেছিল, সেই সময়ে রাশিয়ার ডেপুটি পররাষ্ট্র-সচিব মঃ গ্রমিকো এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাপ শান্তি-চুক্তিকে 'একটি নূতন যুদ্ধের খসড়া' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এশিয়াবাসীর দিক হইতে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের উক্তিই সত্য, না মঃ গ্রমিকোর উক্তিই সত্য তাহা জাপ শান্তি-চুক্তি রচনার পদ্ধতি এবং উহার বিষয়বস্তু আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। 'দি নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশান' পত্রিকা পর্য্যন্ত এই শান্তি-চুক্তিকে প্রকারান্তরে 'Whiteman's treaty' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপ শান্তি-চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে তেমন আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, ১৯৪৭ সালে জাপ শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের অভিপ্রায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু রাশিয়ার জন্যই উহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা ঠিক নহে। রাশিয়া চাহিয়াছিল, বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে জাপ শান্তি-চুক্তির খসড়া রচিত হউক। ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে বলিয়াই রাশিয়া এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনেরও রহিয়াছে। পটস্‌ডাম চুক্তিতে এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট শত্রুদেশের উপরে আরোপিত সর্ত্তাবলীতে যাঁহারা স্বাক্ষরকারী, তাঁহারা শান্তি-চুক্তির প্রাথমিক রচনার কার্য্য (preparatory work of peace settlements) করিবেন। পটস্‌ডাম চুক্তির এই সর্ত্তই রাশিয়া কার্য্যকরী করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চাহিয়া

জাপানের বিরুদ্ধে যে-সকল দেশ যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিল তাহারা সকলে মিলিয়া জাপ শান্তি-চুক্তি রচনা করিবে। এই মতভেদের জন্যই জাপ শান্তি-চুক্তি রচনার কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপ শান্তি-চুক্তির জন্য তেমন গরজও প্রকাশ করে নাই। কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে জাপানের গুরুত্ব বিশেষ ভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম শেষ হওয়ার পর হইতে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা 'রাশিয়ার সম্প্রসারণ' এবং 'রুশ সাম্রাজ্যবাদ'এর ধ্বনি তুলিয়া পৃথিবী গ্রাসের যে জল্পনা করিতেছিল, কোরিয়া যুদ্ধের অজুহাতে এশিয়ায় তাহা কার্য্যকরী করিবার এক স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। জাপান একক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দখলে থাকায় রাশিয়াকে বাদ দিয়াই জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি করার পক্ষে আমেরিকার কোন অসুবিধাও নাই। এই জন্য কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ১৯৫১ সালের মধ্যেই জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হইয়া উঠে। ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে জাপ শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে একটি মার্কিণ পরিকল্পনা রচিত হইয়া যায় এবং ২৬শে অক্টোবর (১৯৫০) মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট উহা রাশিয়ার সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মালিকের হস্তে অর্পণ করেন। এ সম্পর্কে রাশিয়া যে-সকল প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার যে উত্তর প্রদান করে, সে-সম্পর্কে গত মাঘ মাসের (১৩৫৭) মাসিক বসুমতীতে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই খসড়া-চুক্তি জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ফিলিপাইনকে দিয়া গ্রহণ করাইবার জন্য মিঃ ডুলেস সুদূর-প্রাচ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। চীনের পক্ষে কে স্বাক্ষর করিবে এবং ফরমোসা দ্বীপটির কি হইবে, এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য মিঃ ডুলেস বিলাতেও গিয়াছিলেন। এই সকল আলোচনার পর জাপ শান্তি-চুক্তির পরিবর্ত্তিত খসড়া জুলাই মাসের মধ্যভাগে প্রকাশিত হয়। এই পরিবর্ত্তিত খসড়া সম্পর্কে রাশিয়া এবং ভারত যে-সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল,, সেগুলি সমস্তই যে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই খসড়ারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ১৫ই আগষ্ট (১৯৫১) জাপ শান্তি-চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত হয়। সুতরাং পটসড্যাম চুক্তি ভঙ্গ করিয়া এই শান্তি-চুক্তি-পত্র রচিত হইয়াছে, এ কথা বলিলে ভুল হইবে না। রাশিয়া যে এইরূপ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে রাজী হইবে না, তাহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও জানিত। ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে মিত্র-রাষ্ট্রবর্গের ঘোষণায় বলা হয় যে, এই ঘোষণায় স্বাক্ষরকারীদের কেহই জাপানের সহিত পৃথক্ সন্ধি করিতে পারিবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদিও মনে করে যে, ঐ ঘোষণা শুধু জয়লাভ না হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই বলবৎ ছিল, তথাপি রাশিয়া এবং চীনকে বাদ দিয়া এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় উক্ত ঘোষণাও যে লঙ্ঘিত হইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

জাপানের অধিকারে যে সকল দ্বীপ ছিল সেগুলি সম্পর্কে এই চুক্তিতে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাও খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। পার্ল হার্বারে বোমাবর্ষণের সময় যে সকল দ্বীপের উপর জাপানের অধিকার ছিল সেগুলিকে চারিটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়: (১) যে-সকল দ্বীপ জাপানের অঙ্গীভূত, (২) যে-সকল দ্বীপ জাপান ১৯১৯ সালের শান্তি সম্মেলনে ম্যাণ্ডেট হিসাবে পাইয়াছে, (৩) যে সকল দ্বীপ জাপান রাশিয়ার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল এবং (৪) যে, সকল দ্বীপ চীনের সহিত সম্পাদিত শিমোনোসেকী সন্ধি অনুসারে জাপানের রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। লীগ অব নেশানসের ম্যাণ্ডেট অনুসারে মার্শাল, কেরোলাইন প্রভৃতি যে সকল দ্বীপের উপর জাপানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেগুলি দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাষ্টিসিপের অধীনে আছে। ঐ দ্বীপগুলির উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাষ্টিসিপ তো বজায় থাকিবেই, তা ছাড়া রিউকিউ, বোনিন, ভলকেনো দ্বীপ, রোজারিও দ্বীপ, পারেস ভেলা দ্বীপ এবং মারকাস দ্বীপের উপরেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাষ্টিসিপ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা যে একরূপ রাজ্যবিস্তার তাহাতে সন্দেহ নাই। কায়রো সিদ্ধান্ত রাজ্যবিস্তারের বিরুদ্ধেই ঘোষণা করা হইয়াছে। বোনিন দ্বীপ জাপানের অঙ্গীভূত ছিল। পেস্কাডোরেস দ্বীপের নামই জাপানের অধিকারে আসার পর রিউকিউ রাখা হয়। কায়রো ও পটসড্যামের ঘোষণায় এই দ্বীপ চীনের প্রাপ্য। স্প্যাটলি দ্বীপ এবং পার্সেল দ্বীপের অধিকারও জাপান পরিত্যাগ করিল। কিন্তু এই দ্বীপ দুইটি স্বাধীন হইল, এ কথা বলা হয় নাই। এক সময়ে এই দ্বীপ দুইটি চীনের রাজ্যভুক্ত ছিল। জাপান ফরমোসা, দক্ষিণ-শাখালিন এবং কুরাইলস্ দ্বীপের উপর অধিকার পরিত্যাগ করিল, কিন্তু ফরমোসা চীনকে এবং দক্ষিণ-শাখালিন এবং কুরাইল দ্বীপ রাশিয়া পাইবে এ কথা বলা হয় নাই। পটসড্যাম চুক্তিতে শেষোক্ত দুইটি দ্বীপ রাশিয়াকে দেওয়া হইয়াছে এবং ফরমোসা ও পেস্কাডোরেস দ্বীপ দেওয়া হইয়াছে চীনকে। দক্ষিণ-শাখালিন ও কুরাইলস দ্বীপ রাশিয়ার দখলেই রহিয়াছে। কিন্তু চুক্তিপত্রে রাশিয়ার দখলে থাকা সম্বন্ধে নীরবতা রুশ-মার্কিণ সম্পর্ককে আরও তিক্ত করিয়া তুলিবে মাত্র। চীনের রাজ্য ফরমোসাকেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার দখলে রাখিতে চায়। কিন্তু উহার উদ্দেশ্য বুঝিতে কষ্ট হয় না।

জাপ শান্তি-চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই চুক্তি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে জাপানকে ঐকত্রিক নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থায় যোগদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আসলে জাপানের এই সার্ব্বভৌমত্ব একটা কথার কথা মাত্র। শান্তি-চুক্তি বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান স্বেচ্ছায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন করিতে চাহিতেছে, ইহার মত অসত্য আর কিছু নাই। জাপান আমেরিকার দখলে রহিয়াছে এবং দখলে থাকার জন্যই মার্কিণ তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট জাপানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিতেই এই গবর্ণমেণ্ট শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত নিরাপত্তা চুক্তি করিয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী জাপানের ভিতরে এবং চারি পাশে মার্কিণ স্থল-সৈন্য, বিমান ও নৌবাহিনী রাখিবার অধিকার আমেরিকা লাভ করিল। এই বাহিনীকে সুদূর প্রাচ্যে আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিয়োগ করিতে পারা যাইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতীত জাপান আর কোন রাষ্ট্রকে জাপানে ঘাঁটি স্থাপন করিতে দিবে না। জাপানে কি পরিমাণ মার্কিণ সৈন্য রাখা হইবে, চুক্তিতে তাহা কিছুই বলা হয় নাই। আমেরিকা যে যত খুশী সৈন্য জাপানে রাখিতে

পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাপ শান্তি-চুক্তিতে এইরূপ কথা অবশ্যই আছে যে, জাপান তাহার কম্যুনিষ্ট চীন অথবা চিয়াং কাইশেক যাহার সহিত ইচ্ছা চুক্তি করিতে পারিবে। কিন্তু জাপান যে চিয়াং কাইশেকের সহিতই চুক্তি করিবে, এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কম্যুনিজম ধ্বংসের জন্য রাশিয়া এবং কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত যুদ্ধ করার অভিপ্রায়েই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই শান্তি-চুক্তি করিয়াছে। এই যুদ্ধে এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীকে নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যও এই চুক্তির মধ্যে পরিস্ফুট। এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এসিয়াবাসীকে লেলাইয়া দিয়া যদি কম্যুনিষ্ট চীন এবং রাশিয়াকে ধ্বংস করা যায়, তাহা হইলে এশিয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অসপত্ন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমেরিকার দৃষ্টিতে ইহারই নাম শান্তি!

রাশিয়াকে মুক্ত করিবার আয়োজন—

গত আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে জার্ম্মানীর মার্কিণ-অধিকৃত অঞ্চলে ষ্টাটগার্টের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে রাশিয়া হইতে চলিয়া-আসা (Russian emigrant) রুশদের বিভিন্ন পাঁচটি দলের এক গোপন সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের স্থানের নামটি গোপন রাখা হইলেও উদ্দেশ্যটি গোপন রাখা হয় নাই। রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবার একটি কেন্দ্র ইউরোপে স্থাপন করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা গঠন করাই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। রাশিয়া হইতে চলিয়া-আসা যে বিশ হাজার রুশ ইউরোপ এবং আমেরিকায় বাস করিতেছেন, তাঁহাদের নেতৃবৃন্দ এই সম্মেলনে নিজেদের মধ্যে সমস্ত মতভেদের অবসান করিয়া কম্যুনিষ্টদের হাত হইতে রাশিয়াকে মুক্ত করিবার জন্য না কি ঐক্যবদ্ধ কর্ম্মসূচী গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের এই ঐক্য কিরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না বটে, কিন্তু ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের পর রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদের জন্য এইরূপ আয়োজন এই প্রথম। এই সম্মেলনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন ১৯১৭ সালের অস্থায়ী রুশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী আলেকজণ্ডার কেরেনস্কী। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যিনি রাশিয়ার জনগণের সমস্যা সমাধান করিতে নিজের অযোগ্যতা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত করিয়াছিলেন, রুশ-জনমানসের পরিচয় রাখিতেও যিনি সমর্থ হন নাই, সেই কেরেনস্কী ত্রিশ বৎসর পরে রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা করিতে কিরূপে উদ্যোগী হইলেন, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়।

গত জানুয়ারী (১৯৫১) মাসেও এইরূপ একটি সম্মেলন হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্মেলনের মত তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। রাশিয়া হইতে নূতন যাহারা আসিয়াছে তাহারা প্রধানতঃ সৈন্যদলত্যাগী এবং উদ্বাস্তু (displaced persons)। তাহারা কেরেনস্কীকে নির্ব্বিষ সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবী বলিয়া মনে করে। আবার কেরেনস্কীর দৃষ্টিতে তাহারা হয় রাজতন্ত্রী, না হয় ফ্যাসিষ্ট। কিন্তু রাশিয়া হইতে চলিয়া-আসা রুশদের বিভিন্ন দলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ মতভেদ অপেক্ষা কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদ করিয়া কিরূপ নূতন রাশিয়া গড়িয়া তোলা হইবে, তাহা লইয়াই গুরুতর মতভেদ। এই গুরুতর মতভেদের জন্যই গত জানুয়ারী মাসের (১৯৫১) সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু ব্যর্থ হইলেও উপায় নাই। রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদের এই প্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। অবশ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ ভাবে এই প্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন না। রুশ-জনমুক্তির মার্কিণ কমিটি (American Committe for the Liberation of the peoples of Russia) নামক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদের এই আয়োজনের জন্য অর্থ যোগাইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কর্ত্তা ইউজেন লিয়নস্ (Engene Lyons)। একটি শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র হইতে এই প্রতিষ্ঠান রাশিয়ার লৌহ-যবনিকার অন্তরালস্থিত জনগণের মধ্যে প্রচার-কার্য্য তো চালাইবেই, তা ছাড়া রুশ-জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্য বিভিন্ন পত্রিকা ইত্যাদিও প্রকাশ করিবে। কাজেই কিরূপ নূতন রাশিয়া গঠিত হইবে তাহা লইয়া রাশিয়া হইতে চলিয়া-আসা রুশদের মধ্যে মতভেদ হইলেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান তাহা শুনিবে কেন? কিরূপ নূতন রাশিয়া গঠিত হইবে তাহা পরের কথা। আগে চাই রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসনের উচ্ছেদ এবং উহার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন চলিয়া-আসা রুশদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। এই জন্য আগষ্ট মাসের (১৯৫১) শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আভ্যন্তরীণ মতভেদ দূর না হইয়া পারে নাই। কিন্তু ইহাতেই সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হয়ত মনে করে যে, ভাবী তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামে রাশিয়ার পরাজয় হইলে এই সকল চলিয়া-আসা রুশ দ্বারা রাশিয়ায় নূতন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। কিন্তু রাশিয়ার পরাজয়ের জন্য রুশ-জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য করা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। বেতার, পুস্তিকা ও পত্রিকার মারফৎ রুশ-জনগণের নিকট কি প্রচার করা হইবে? প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ায় পুঁজিপতিদের ভগ্নাবশেষ এখনও হয়ত রাশিয়ায় আছে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সময় রাশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করিয়া ইউক্রেন অঞ্চলে প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ার কথা জার্ম্মানরা প্রচার করিয়াছিল। তাহাদের এই প্রচার-কার্য্য সত্য হইলে বলিতে হয়, জার্ম্মানীর আক্রমণাত্মক মনোভাব এই সকল অসন্তুষ্ট রুশের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সমর আয়োজন, প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত পরমাণু বোমা, বিরাট নৌ ও বিমানবহর এবং রাশিয়ার চারি দিক বেষ্টন করিয়া পৃথিবীর সমস্ত অ-কম্যুনিষ্ট দেশে প্রতিষ্ঠিত মার্কিণ সামরিক ঘাটি কম্যুনিষ্ট শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট রুশদিগকেও মুগ্ধ করিতে পারিবে কি? এইরূপ অসন্তুষ্ট রুশের সংখ্যা কত তাহা কেহই জানে না। কিন্তু তাহারা রাশিয়ার জনগণকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীনে বাস করিবার লোভ দেখাইয়া কম্যুনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারিবে কি? আমেরিকার দখলে জাপানের অবস্থা তাহারা চক্ষের সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছে। কাজেই রাশিয়ার জনগণের নিকট চলিয়া-আসা রুশগণ কি উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদের আবেদন করিবে, সমস্যা বড় সহজ নয়। কেন্দ্রীভূত শাসনাধীনে ইউক্রেন হইতে তাজিকস্থান পর্য্যন্ত ঐক্যবদ্ধ রাশিয়া আজ পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিবর্গে

অন্যতম। বস্তুতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত রাশিয়ার সমকক্ষ শক্তি আর নাই বলিলে ভুল হয় না। পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্যতম শক্তিশালী রাশিয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত রুশ নাগরিক হিসাবেই কি রাশিয়াব জনগণের নিকট ষ্ট্যালিনকে অপসারিত করিবার জন্য আবেদন করা হইবে? ইহাই যদি আবেদনের ভিত্তি হয়, তাহা হইলে রাশিয়ার সোশ্যালাইজড্ শিল্প এবং ঐকত্রিক কৃষি-ক্ষেত্রগুলির (collective farms) কি হইবে? রাশিয়ায় কি আবার ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং গঠিত হইবে কিসাণ মালিক? উহার বিনিময়ে রুশ কৃষক ও শ্রমিক তাহাদের লব্ধ অধিকার ত্যাগ করিবার পথ প্রশস্ত করিতে রাজী হইবে কি? অবশ্য ঐক্যবদ্ধ রাশিয়ার ধারণা বর্জ্জন করিয়াও আবেদন করা যাইতে পারে। বহুসংখ্যক সংখ্যালঘু জাতি লইয়া সংযুক্ত সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (U. S. S. R.) গঠিত হইয়াছে। এই সকল সংখ্যালঘু জাতির মধ্যে মুসলমানও আছে। ঐক্যবদ্ধ রাশিয়াব পরিবর্ত্তে এই সকল সংখ্যালঘু জাতির নিকট এবং মুসলমানদের নিকট আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নামে ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার আবেদন করা হইবে কি? কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদ করিবার আবেদন করিতে হইলেই উল্লিখিত প্রশ্নগুলি না উঠিয়া পারিবে না। সংযুক্ত রাশিয়াই থাকিবে, না রাশিয়াকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হইবে, রাশিয়ার জনগণের কাছে ইহা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়? সর্ব্বোপরি প্রশ্ন থাকিবে কম্যুনিষ্ট শাসন হইতে মুক্ত হওয়ার পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে স্বাধীন হওয়ার প্রশ্ন।

উল্লিখিত প্রশ্নগুলির কোন সমাধান না হইলেও চলিয়া-আসা রুশদের চরগণ প্রশস্ত গোপন পথে (Black high ways) রাশিয়ার লৌহ-যবনিকার অন্তরালে না কি প্রচার কার্য্য চালাইতেছে। রাশিয়ার অভ্যন্তরে বহু আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেল গঠিত হইয়াছে এবং চলিয়া-আসা রুশগণ এই সকল আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছে। শুধু রাশিয়া হইতে চলিয়া-আসাদেরই নয়, পূর্ব্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলি হইতে চলিয়া-আসা লোকদেরও না কি বিভিন্ন দল গঠিত হইয়াছে। এই সকল দল এখনও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের নিকট হইতে সাহায্য পায় নাই, কিন্তু সাহায্য পাওয়ার আশা তাহাদের আছে। এই আশায় তাহাদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু চলিয়া-আসা রুশদের চরগণ যে-ভাবে গোপন পথে রাশিয়ার ভিতরে যাতায়াত করিতেছে, তাহাতে পশ্চিম-জার্ম্মানীতে কতকটা আশঙ্কার সৃষ্টি না হইয়া পারে নাই। তাহাদের আশঙ্কা, পশ্চিম-জার্ম্মানী হইতে গোপনে রাশিয়ার ভিতরে এইরূপ প্রচার-কার্য্য চলিতে থাকিলে এই অজুহাতেই রাশিয়া পশ্চিম-জার্ম্মানী আক্রমণ করিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কার সত্যই কোন কারণ আছে কি না, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসনের উচ্ছেদের জন্য মার্কিণ পৃষ্ঠপোষকতায় চলিয়া-আসা রুশদের এই আয়োজন, শুধু ঠাণ্ডা-যুদ্ধের একটা নূতন রূপ বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। ভাবী তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামে রাশিয়া পরাজিত হইবে, এই আশার ভিত্তিতেই এই আয়োজন চলিতেছে মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

ইরাণের তৈলশিল্পের ভবিষ্যৎ—

ইরাণের তৈল-সমস্যা সমাধানের জন্য বৃটেনের লর্ড প্রীভি সীল মিঃ ষ্টোক্সের নেতৃত্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি দলের সহিত ইরাণ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি দলের যে-আলোচনা গত ১০ই আগষ্ট (১৯৫১) আরম্ভ হইয়াছিল, ২২শে আগষ্ট তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মিঃ হ্যারিম্যান ও মিঃ ষ্টোকস উভয়েই অবশ্য বলিয়াছেন যে, আলোচনা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। ইহার একমাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে, মীমাংসার জন্য আবার আলোচনা আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু আবার আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্য কে উদ্যোগী হইবে—বৃটেন, না ইরাণ, এই প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে উল্লিখিত আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ কি, সে-সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। কি সর্ত্তে তৈল-সমস্যার সমাধান হইতে পারে সে-সম্পর্কে আট দফা সম্বলিত এক প্রস্তাব গত ১৩ই আগষ্ট মিঃ ষ্টোকস্ ইরাণ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি দলের হস্তে প্রদান করেন। এই আটটি দফা সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু গত ১৫ই আগষ্ট মিঃ ষ্টোকস্ বৃটিশ প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া যে বিবৃতি দেন তাহা হইতে বুঝা যায়, কি ভাবে তৈলশিল্প পরিচালিত হইবে, কি ভাবে তৈল বাজার-জাত করিতে হইবে এবং এংলো-ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানী কিরূপ ক্ষতিপূরণ পাইবে, তাহারই ভিত্তিতে আটটি দফা রচিত হয়। তৈল-শিল্প ইরাণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ রাষ্ট্রায়ত্ত করণের নীতি স্বীকার করিয়াই এই প্রস্তাব রচনা করা হইলেও কার্য্যতঃ তৈল উৎপাদন ও বাজার-জাত করিবার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব বহাল রাখাই এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ ইরাণের তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হইলেও খিড়কি পথ দিয়া তৈলশিল্পের উপর বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব কায়েম রাখিবার জন্যই এই প্রস্তাব করা হয়। ইরাণ গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরিবর্ত্তে তিন দফা সম্বলিত এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে বৃটেনের নিকট তৈল বিক্রয় করিতে, উভয় পক্ষে দাবী সম্পর্কে আলোচনা করিতে ইরাণ রাজী হওয়ার এবং তৈলশিল্পে বৃটিশ টেক্‌নেশিয়ানদিগকে বহাল রাখিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হয়। অতঃপর ২১শে আগষ্ট তারিখে মিঃ ষ্টোকস্ এক নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে আট দফার পরিবর্ত্তে একটি মাত্র সর্ত্ত আছে। এই সর্ত্তটি হইল এই যে, ইরাণের নিয়ন্ত্রণাধীনে বৃটিশ ম্যানেজার কর্ত্তৃক আবাদানের বৃটিশ কর্ম্মচারিবৃন্দ পরিচালিত হইবে। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া মিঃ ষ্টোকস্ জানান, "চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা আমি ফিরিয়া যাইব।" ইরাণ গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই।

মিঃ ষ্টোক্সের শেষ প্রস্তাবও আসলে তাঁহার আট দফা সম্বলিত প্রস্তাবের কেমোফ্লেজরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ ইরাণের তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হইলেও বৃটিশ কর্ত্তৃত্বই বহাল থাকিবে। যোগ্য পরিচালনের প্রশ্ন তুলিয়া, বৃটেন ইরাণের তৈলশিল্পের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চায় এবং এই কর্ত্তৃত্ব হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কাতেই বৃটিশ কর্ম্মচারীরাও ইরাণীদের অধীনে কাজ করিতে অস্বীকৃত। বৃটিশ প্রস্তাবের

পিছনে যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার লইয়া বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে যত বিরোধই থাকুক, ইরাণের তৈলশিল্পে বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব বিলোপ হওয়ার প্রতিক্রিয়া অন্যান্য অনগ্রসর দেশে বিদেশী মূলধনের উপর কিরূপ হইবে, তাহা কি বৃটেন, কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না। বিশেষতঃ ইরাণের তৈলশিল্পের উপর বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব বিলোপ হইলে রুশ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা মোটেই উপেক্ষার বিষয় বলিয়া তাহারা মনে করিতে পারে না। কাজেই তৈলশিল্পকে সত্য সত্যই রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার দুর্ম্মতির জন্য বৃটেন এবং আমেরিকা উভয়েই যে ইরাণকে এমন শিক্ষা দিতে চাহিবে, যাহাতে অন্য কোন দেশের এরূপ দুর্বুদ্ধি আর না হয়, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে না। উপযুক্ত টেক্‌নেশিয়ানের অভাবে ইরাণের তৈলশিল্প অচল হইয়া পড়িবে, এই যুক্তিটা যদি শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ইরাণের তৈল চালান দেওয়া অসম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য অবরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি না, তাহা অনুমান করা সহজ নয়। পারস্য উপসাগরে যে-সকল বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণ করা হইয়াছে সেগুলি কোন্ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে তাহা কে জানে? অবশ্য ইরাণের আভ্যন্তরীণ সমস্যাও বড় কম নয়।

ইরাণের তিনটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে কম্যুনিষ্টদের তুদে দলকে বে-আইনী করা হইয়াছে। এই দল তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করণের সমর্থক। কম্যুনিষ্টরা জাতীয়তাবাদীদের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবের অন্তরালে থাকিয়া প্রভাব বিস্তার করিতেছে, ধনী ও ভূম্যধিকারী শ্রেণী ইহাতে শঙ্কিত না হইয়া পারে নাই। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মহম্মদ মোসাদেকের জাতীয়তাবাদী দলের (Nationalist party) সদস্যরা সঙ্গতি-সম্পন্ন পুঁজিপতি এবং ভূম্যধিকারী। সৈয়দ আবুল কাসেম এল-কাসাইনর ফিদাইয়ন-ই-ইসলাম দলটি গোঁড়া ইসলাম দল। এই দলের সদস্যরা সকলেই ইসলামের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এই দলের জনৈক সদস্য প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী আলী রাজমারাকে হত্যা করিয়াছে। ডাঃ মোসাদেক ইহাদের হাতে নিহত হওয়ারই আশঙ্কা করেন। ইরাণ মজলিসের অনেক সদস্য গোপনে ইঙ্গ-ইরাণীয়ান তৈল কোম্পানীর নিকট হইতে বৃত্তি ভোগ করিয়া থাকেন। তৈল-শিল্পের উপর বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে ইঁহাদের এই বৃত্তি বন্ধ হইয়া যাইবে। এই জন্যই আপোষ মীমাংসার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এদিকে সম্মুখে আসিতেছে সাধারণ নির্ব্বাচন। গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন হইলেই তৈল-সমস্যার মীমাংসা বৃটেনের অনুকূলে হওয়া সহজ হইবে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু বৃটিশের অনুকূল প্রস্তাব মানিয়া লইবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে ইরাণের উপর আরও বেশী চাপ দিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বিদেশী মূলধনকে সাদরে আমন্ত্রণ করিবার পরিণাম কি হইতে পারে, ইরাণের তৈল-সমস্যা তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ।

ইঙ্গ-মিশর সমস্যা—

শুধু ইরাণেই নয়, মিশরেও বৃটিশ প্রভাব প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়াছে। ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশর সন্ধি পরিবর্ত্তনের ব্যাপারেই শুধু সমস্যা দেখা দেয় নাই, সুয়েজ ক্যানাল অবরোধ লইয়াও নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। গত ২৬শে আগষ্ট (১৯৫১) মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাশ পাশা বৃটিশকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, মিশর পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান অধিবেশন শেষ হওয়ার পূর্ব্বে বৃটেন যদি নূতন এবং গঠনমূলক কোন প্রস্তাব উত্থাপন না করে, তাহা হইলে সন্ধি পরিবর্ত্তনের আলোচনা শেষ হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে। ১৯৩৬ সালে যে ইঙ্গ-মিশর সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে এই মর্ম্মে একটি বিধান আছে যে, ১০ বৎসর পরে পরস্পরের সুবিধার জন্য এই সন্ধির পরিবর্ত্তন করা যাইবে। মিশর গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৬ সালে এই সন্ধির পরিবর্ত্তনের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই আলোচনা ফাঁসিয়া যায় এবং মিশর গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে নিরাপত্তা পরিষদে এই সমস্যা উত্থাপন করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। অতঃপর সন্ধি পরিবর্ত্তনের জন্য নূতন আলোচনার সূত্রপাত হয় ১৯৫০ সালের নবেম্বর মাসে।

মিশর পার্লামেণ্টের নূতন অধিবেশন উদ্বোধন প্রসঙ্গে ১৬ই নবেম্বর (১৯৫০) মিশরের রাজা ফারুক যে বক্তৃতা দেন তাহাতে সুয়েজ ক্যানাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ এবং মিশরের সহিত সুদান সংযুক্ত করিবার দাবী পুনরায় উত্থাপন করা হয়। মিশরের রাজার এই বক্তৃতার উত্তরে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন ২০শে নবেম্বর (১৯৫০) তারিখে কমন্স সভায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি ঘোষণা করেন। সুয়েজ ক্যানেল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইহা শুধু বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং মিশরের সমস্যা নয়। অন্যান্য দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার প্রশ্নও ইহার সহিত জড়িত। কমন্স সভায় তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে, মধ্যপ্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থাহীন হইয়া পড়িবে, এমন কোন ব্যবস্থায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইবেন না। সুদান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সুদানীরা যথাসময়ে নিজেরা স্বাধীন ভাবে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিবে, এই নীতিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অবিচলিত আছেন। এই ঘোষণা সত্ত্বেও মিঃ বেভিনের বক্তৃতায় একটা আশার সুর মিশর শুনিতে পাইয়াছিল, কারণ, তিনি এই আশাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে বৃটেন এবং মিশরের মধ্যে একটা মীমাংসা হইতে পারে। মিঃ বেভিনের এই ঘোষণার পর নূতন আলোচনা আরম্ভ হওয়ার পথ তৈয়ার হইল।

গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫০) লণ্ডনে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিবের সহিত মিশরের পররাষ্ট্র-সচিবের এক আলোচনা হয়। অতঃপর গত ১১ই এপ্রিল (১৯৫১) বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকট এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ১৯৩৬ সালের সন্ধিতে যে রক্ষা-ব্যবস্থার সর্ত্ত আছে, তাহার পরিবর্ত্তে নূতন ইঙ্গ-মিশর রক্ষা-ব্যবস্থার চুক্তির ভিত্তিতে এই প্রস্তাব রচিত হয়। মিশর গবর্ণমেণ্ট ২৪শে এপ্রিল তারিখে এই প্রস্তাব সম্পর্কে যে উত্তর দেন, তাহাতে সুয়েজ ক্যানাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ এবং মিশরের সহিত সুদানকে সংযুক্ত করার দাবী পুনরায় উত্থাপন করা হয়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাতে অবশ্যই রাজী হইতে পারেন নাই, কিন্তু আলোচনার দ্বার খোলা রাখিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

ঃদনুসারে ৬ই জুন (১৯৫১) বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে রক্ষা-ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্ন আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া সুদানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আলোচনা চালাইতে অনুরোধ করা হয়। মিশর গবর্ণমেণ্ট ৬ই জুলাই তারিখে উহার যে উত্তর দেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্ব দাবীর কোন পরিবর্ত্তন করা না হইলেও আলোচনা চলিতে থাকে। এই অবস্থায় গত ৩০শে জুলাই (১৯৫১) বর্ত্তমান বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মরিসন ইঙ্গ-মিশর সম্পর্ক সম্বন্ধে কমন্স সভায় যে বিবৃতি দেন, তাহাতেও সমস্যাটি আরও ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। মিশর মনে করে, এই বিবৃতিতে আলোচনার দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর গত ১৮ই আগষ্ট (১৯৫১) মিঃ মরিশন মিশরের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক ব্যক্তিগত বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, আলোচনার দ্বার রুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় বৃটেনের নাই। মিশর যাহাতে আলোচনার দ্বার রুদ্ধ না করে তাহার জন্যও অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহার পর ২৬শে আগষ্ট তারিখে মিঃ নাহাশ পাশা যে বিবৃতি দেন, তাহাতে বৃটিশের নিকট 'নূতন এবং গঠনমূলক প্রস্তাব' দাবী করা হইয়াছে। এই দাবী অনুযায়ী বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নূতন প্রস্তাব রচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

বৃটিশ যে মিশর ছাড়িয়া যাইবে তাহা মনে করিবার কোন্ কারণ নাই। তবে সুয়েজ ক্যানালে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীকে হয়ত কম্যুনিষ্ট-বিরোধী স্বাধীন দেশগুলির সম্মিলিত বাহিনীর অঙ্গ বা অংশ বলিয়া অভিহিত করা হইবে। হয়ত অন্যান্য দেশের সৈন্যও নামে মাত্র কিছু কিছু থাকিবে, কিন্তু কার্য্যকরী শক্তি হিসাবে থাকিবে বৃটিশ সৈন্য-বাহিনী এবং ইঙ্গ-মিশর চুক্তিকে উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তির অনুকরণে আঞ্চলিক চুক্তির রূপ দেওয়া হইবে। মিশর এইরূপ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইবে কি না, সে-সম্পর্কে কিছু অনুমান করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। কারণ, ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি বাতিল হইয়া গিয়াছে বলিয়া মিশর ঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু সুয়েজ ক্যানাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্য বলপূর্ব্বক অপসারিত করিবার ক্ষমতা মিশরের নাই।

সুয়েজ ক্যানালের ভিতর দিয়া ইজরাইলগামী বৃটিশ জাহাজ যাইতে না দিয়া মিশর ইঙ্গ-মিশর সম্পর্কের মধ্যে নূতন জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯৪৮ সাল হইতেই মিশর সুয়েজ ক্যানালের পথে হাইফার তৈল শোধনাগারে তৈলবহনকারী জাহাজ যাইতে দিতেছে না। ইহাতে ইজরাইল এবং বৃটেন দুইয়েরই ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু আবাদানের তৈল শোধনাগার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বৃটিশের কাছে হাইফার শোধনাগারের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইজরাইল মিশরের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে ইজরাইলগামী জাহাজ অবরোধ সম্পর্কে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। গত ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৫১) নিরাপত্তা পরিষদে ইজরাইলগামী জাহাজ অবরোধের নিন্দা করিয়া এবং অবিলম্বে এই অবরোধ তুলিয়া লইবার নির্দ্দেশ দিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। আটটি দেশ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। ভারত, জাতীয়তাবাদী চীন এবং রাশিয়া ভোট দেয় নাই। মিশর যে এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবে সে-সম্বন্ধে কোন ভরসা যেমন দেখা যায় না, তেমনি নিরাপত্তা পরিষদে উক্ত বিষয়ের আলোচনার সময় রাশিয়া মিশরকে সমর্থন করায় কম্যুনিষ্ট-বিরোধীদের মধ্যে বিস্ময়ের সঞ্চার না করিয়া পারে নাই। ইঙ্গ-মিশর সম্পর্কের অবনতির সুযোগে মিশরকে রাশিয়া তাহার দলে ভিড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে, বৃটেন এবং আমেরিকার পক্ষে এই আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। মিশরের কয়েকটি সংবাদপত্র এবং কয়েক জন রাজনীতিবিদ্ রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। মিশর রাশিয়ার দলে যোগ দিবে, ইহা মনে করা কঠিন। মিশরে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করা হইলেও গত ছয় মাসে এমন কতকগুলি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, যাহারা না কি ব্যাপক ভাবে কম্যুনিজম্ প্রচার করিতেছে। কিন্তু এগুলিকে সত্যই কম্যুনিজমের প্রচারক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। আসল কথা, মিশরে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে, মিশরীয় নেতারা দেশে এবং বিদেশে প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন, মিশরের রাজা ইউরোপের প্রমোদকেন্দ্রগুলিতে প্রচুর অর্থ লুটাইয়া দিতেছেন, কিন্তু মিশরের জনসাধারণ দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না। ফলে মিশরের সাধারণ মানুষের মনে যে তীব্র অসন্তোষ জাগ্রত হইয়াছে, এই পত্রিকাগুলি তাহাকেই মুখর করিয়া তুলিতেছে মাত্র।

কম্যুনিজমের বিকল্প—

ব্ল্যাকপুলে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে 'বিভানিজমের' সহিত সংগ্রামে মিঃ এটলীই জয়লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বৃটিশ শ্রমিক দল যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসে মিঃ রবার্টের বক্তৃতায় বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। অস্ত্র-সজ্জার প্রশ্ন লইয়া মতভেদের ফলে মিঃ বিভান বৃটিশ মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগের পর তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বিভানবাদ বা 'বিভানিজম্' নামে এক নূতন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। বিভান তাঁহার 'একমাত্র পথ' (One Way Only) নামক পুস্তকে তাঁহার নীতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃটিশ শ্রমিকদের মধ্যে বিভাগবাদ এত বেশী প্রসার লাভ করিয়াছে যে, বৃটিশ শ্রমিক দলের নেশন্যাল এক্জিকিউটিভের সদস্যরা অতিমাত্রায় চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রমিক দল 'প্রথম কর্ত্তব্য—শান্তি' (First Duty—Peace) শীর্ষক যে-পুস্তিকা প্রকাশ করেন যাহাকে আগামী পার্টি সম্মেলনের কার্য্যনীতির বিবরণী বলিয়া অভিহিত করা হইলেও উহা বিভানবাদের সমালোচনা এবং প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এক বৎসর পূর্ব্বে শ্রমিক দল 'শ্রমিক এবং নয়া সমাজ' (Labour and the New Society) নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকায় যে বিপুল আশাবাদের অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছিল, এক বৎসর পরে প্রকাশিত 'প্রথম কর্ত্তব্য—শান্তি'র মধ্যে তাহার বিন্দু-বিসর্গও দেখা যায় না। এই পুস্তিকায় অস্ত্রসজ্জার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবেই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু মিঃ বিভানের সহিত শ্রমিক দলের বড়কর্ত্তাদের বিরোধটার মূল কারণ অস্ত্রসজ্জা নয়। আসল বিরোধ অর্থনীতি লইয়া। কোরিয়া যুদ্ধ এবং কম্যুনিজম নিরোধের প্রয়োজনীয়তায় অস্ত্রসজ্জাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং অস্ত্রসজ্জার প্রয়োজনে 'নয়া সমাজ' গঠনের কার্য্যসূচীকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য

স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। হিটলারের অভ্যুদয়ের পর বৃটিশ শ্রমিক দল ফ্যাসিজম নিরোধের জন্য সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে রুখিয়াছিল, এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক।

বিভানবাদকে দমন করাই বৃটিশ শ্রমিক দল এবং বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একমাত্র সমস্যা নয়। পূর্ব্ব-বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-যুব সম্মেলনও শ্রমিক দলের কর্ত্তাদের মাথা খারাপ করিয়া দিয়াছে। জনৈক বৃটিশ যুবক পূর্ব্ব-বার্লিনের বিশ্ব-যুব উৎসবে যোগদানের পর কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করায় তাহার পিতা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করিবার দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না, গোপনতার অন্তরালে থাকিয়া কম্যুনিজম আরও অধিকতর প্রবল ভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে, এই আশঙ্কা বৃটিশ শ্রমিক নেতারা উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। মিঃ রবার্ট তাঁহার বক্তৃতায় শুধু বিভানবাদের নিন্দাই করেন নাই, পূর্ব্ব-বার্লিনের বিশ্ব-যুব উৎসব তরুণদের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার প্রতিরোধের উপায়ও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "The time has come when we have to rally all our spiritual forces to wrestle for the souls of these boys and girls against the principalities and powers and rulers of darkness in high places, and we may lose the battle if we rely exclusively upon a programme of national defence in form of guns, and munitions of war" অর্থাৎ 'উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অন্ধকারের শাসকবর্গ এবং শক্তির কবল হইতে আমাদের বালক-বালিকাদের আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের জাতীয় রক্ষা-ব্যবস্থার কর্ম্মসূচীকে যদি যুদ্ধের জন্য বন্দুক-কামান নির্ম্মাণের মধ্যেই আবদ্ধ রাখি, তাহা হইলে যুদ্ধে আমরা হারিয়া যাইতেও পারি।' কিন্তু পূর্ব্ব-বার্লিনের বিশ্ব-যুব উৎসব তরুণ-তরুণীদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে কেন, ইহাই কি প্রধান প্রশ্ন নয়? পূর্ব্ব-বার্লিনে যে সময়ে বিশ্ব-যুব উৎসব হইয়াছে, সেই সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়েও আর একটি বিশ্ব-যুব সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলন হইয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুপ্রেরণায়। পূর্ব্ব-বার্লিনের বিশ্ব-যুব উৎসবের প্রতিষেধকরূপে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত এই বিশ্ব-যুব সম্মেলন বিশ্বের তরুণ-তরুণীদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই কেন, তাহাও কি ভাবিবার বিষয় নয়? লণ্ডনের 'অবজারভার' পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা সেবাষ্টিয়ান হাফনার দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, 'পূর্ব্ব-বার্লিনের তৃতীয় বিশ্ব-যুব উৎসব যেরূপ প্রচার লাভ করিয়াছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব-যুব উৎসব সেরূপ প্রচার লাভ করে নাই।' কিন্তু তাঁহার দুঃখ করিবার কারণ নাই। প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে বলিয়াই পূর্ব্ব-বার্লিনের উৎসব বহুল প্রচার লাভ না করিয়া পারে নাই। কিন্তু ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রকৃত সমস্যা দাঁড়াইয়াছে কম্যুনিজম

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিজম ধ্বংসের জন্য বিপুল সমরায়োজন করিতেছে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট রাশিয়া এবং নয়া চীন ধ্বংস হইলেও আদর্শবাদ হিসাবে কম্যুনিজম ধ্বংস হইবে কি না চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাহা না ভাবিয়া পারেন না। তাঁহারা কম্যুনিজমের বিকল্প আদর্শবাদ কি হইতে পারে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য Mr. Emrys Hughes বলিয়াছেন যে, কম্যুনিজমকে পরাজিত করিবার একমাত্র উপায় উহার বিকল্প অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচী প্রদান করা। এই কর্ম্মসূচীতে শ্রমিকদিগকে সত্যিকার আশা দিতে হইবে। কিন্তু কি এই কর্ম্মসূচী? ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস করার কথা, শ্রমিকদিগকে আশ্বাস দেওয়া, এই নূতন শোনা যাইতেছে না। বৃটিশ শ্রমিক দল গত ২৭শে আগষ্ট (১৯৫১) এক মেনিফেষ্টো প্রকাশ করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য আন্তর্জ্জাতিক উদ্যমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও তাঁহাদের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের এই মেনিফেষ্টো হইতে মনে হয়, সমাজতন্ত্রবাদ বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের এবং প্রত্যেক দেশে ধনতন্ত্রবাদের রক্ষকে পরিণত হইয়াছে। ইহাই কি কম্যুনিজমের বিকল্প?

যুদ্ধবিরতি আলোচনার অচল অবস্থা—

কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা গত ২৩শে আগষ্ট (১৯৫১) ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর পুনরায় যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অবসান হওয়ার কোন লক্ষণ এ-পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। পূর্ব্ব-দিন রাত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিমান কায়েসঙএর নিরপেক্ষ অঞ্চলে 'নাপালম্' আগুনে বোমা বর্ষণ করিয়াছে, এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়া কম্যুনিষ্টদের পক্ষ হইতে যুদ্ধবিরতির আলোচনা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ইহার আগে এবং পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্য ও বিমানবাহিনী কর্ত্তৃক কায়েসঙএর নিরপেক্ষ অঞ্চল লঙ্ঘনের যে সকল অভিযোগ কম্যুনিষ্টরা উপস্থিত করিয়াছে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামরিক অধ্যক্ষ জেনারেল রীজওয়ে সেগুলি সমস্তই সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অভিযোগগুলিকে নেহাৎ বানানো গল্প বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার তাৎপর্য্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে অভিযোগের বিবরণ সম্পর্কেও সামান্য কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। ১৮ই আগষ্ট তারিখে (১৯৫১) কম্যুনিষ্টদের পক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রথম অভিযোগ করা হয় যে, যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলিতে থাকা সত্ত্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিমান হইতে উত্তর-কোরিয়ায় বিষাক্ত গ্যাস বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে। বিষবাষ্প প্রয়োগের বিরুদ্ধে [illegible] প্রবল জনমত রহিয়াছে, ইটালী-আবেসিনিয়া যুদ্ধের সময় তাহ[illegible] আমরা দেখিয়াছি। ইহার পর গত ১৯শে আগষ্ট কম্যুনিষ্টদে[illegible] পক্ষ হইতে এই অভিযোগ করা হয় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্য[illegible] নিরপেক্ষ অঞ্চলে অবস্থিত কম্যুনিষ্টদের উপর গুলীবর্ষণ করা[illegible] এক জন লোক আহত এবং এক জন লোক নিহত হইয়াছে[illegible] ইহা 'যুদ্ধবিরতি চায় না' এইরূপ কোন রাজনৈতিক দলের কা[illegible] বলিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দায়িত্ব এড়াইতে পারে না। ১৯[illegible] আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত আরও একটি অভিযোগ এই যে, কম্যু[illegible]

করা হয় এবং জীপ গাড়ীখানা ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু এই অভিযোগেরও কোন প্রতিকার হয় না। অবশেষে ২৩শে আগষ্টের পূর্ব্ব রাত্রে কায়েসঙএর নিরপেক্ষ অঞ্চলে আগুনে-বোমা বর্ষিত হওয়ার পর কম্যুনিষ্টদের পক্ষে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালানো সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধবিরতি আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরও কায়েসঙ অঞ্চলের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হইয়াছে। ২৭শে আগষ্ট কম্যুনিষ্টদের পক্ষ হইতে এই অভিযোগ করা হয় যে, চীনের মূল ভূখণ্ডের উপর মার্কিণ বিমান দুই দিন হানা দিয়াছে। আরও অভিযোগ করা হয় যে, কায়েসঙএর নিরপেক্ষ এলাকায় প্রহরারত কম্যুনিষ্ট সামরিক রক্ষী দলকে হত্যা করিবার জন্য মার্কিণ ও দক্ষিণ-কোরীয় সৈন্য উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৫১) পিকিং রেডিও হইতে বলা হয় যে, মার্কিণ বিমান বার বার কায়েসঙএর নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করিয়াছে। নিরপেক্ষতা ভঙ্গের অভিযোগগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিবার এখানে স্থানাভাব। কিন্তু জেনারেল রীজওয়ে অভিযোগগুলি শুধু সরাসরি অগ্রাহ্য করেন নাই, তিনি যে ভাষায় অভিযোগগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত রূঢ়। তিনি কেন অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় অভিযোগগুলি তদন্ত করিতে অস্বীকার করিলেন, তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই অস্বীকৃতির ফলেই কম্যুনিষ্টদের পক্ষে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ জাপ শান্তি-চুক্তি সম্মেলনের প্রাক্কালেই যুদ্ধবিরতি ভাঙ্গিয়া যাইবার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি হইল কেন?

কোরিয়া যুদ্ধে কম্যুনিষ্টরা হারিয়া যাইতেছে এবং যুদ্ধে বহু কম্যুনিষ্ট নিহত হইতেছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই দাবী সত্য হইলে কম্যুনিষ্টরা যুদ্ধবিরতি আলোচনা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য মিথ্যা করিয়া অভিযোগ তুলিয়াছে এ কথা স্বীকার করা যায় না। অচল অবস্থা জাপ শান্তি-চুক্তি সম্মেলনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না। আমেরিকা কম্যুনিজম ধ্বংস করিতে চায়। কোরিয়া যুদ্ধে বহু কম্যুনিষ্ট নিহত হইতেছে, ইহাই তাহার দাবী। সুতরাং যুদ্ধ চলিতে থাকিলে আরও বেশী করিয়া কম্যুনিষ্ট নিহত হওয়ার ফলে কম্যুনিষ্টরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং কম্যুনিজম নিরোধের কাজ অনেক সহজ হইবে, আমেরিকার মনে এরূপ ধারণা সৃষ্ট হইয়া থাকিলেও বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) জেনারেল রীজওয়ে কায়েসঙ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে যুদ্ধবিরতির আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্য কম্যুনিষ্টদের নিকট আবার এক বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অভিযোগগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পিকিং বেতারে এই প্রস্তাবকে একটা কৌশল (trick) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্রতিগণের ভারতবর্ষ পর্য্যটন

রাজাগোপালাচারী প্রেস বিল

"বৃটিশ আমলে যুদ্ধকালে অথবা বিপ্লবের দিনে তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে যেন-তেন-প্রকারেণ জনমত দাবাইয়া রাখিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের প্রয়োজন ছিল। আজ আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতেছি বলিয়া বলিতেছি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যদি সরকারী ও কংগ্রেসী নেতাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মুদ্রাযন্ত্রের উপর যত কিছু বাধা-নিষেধ আজও রহিয়াছে, সে সমস্ত অপসারিত করা উচিত। মুদ্রাযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হইলে গণতন্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। সংবাদপত্র যাহাতে বিশেষ বিশেষ ধনিকগোষ্ঠীর কবলিত না হয়, তাহা দেখাও গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। বৃটেনে 'লণ্ডন টাইমস'কে ট্রাষ্ট সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। বিলে এইরূপ কোন বিধান থাকিলে তাহা বরং দেশের উপকারে লাগিত। শ্রেষ্ঠী-সহায়তাপুষ্ট কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের নিকট হয়ত এতটা আশা করা অন্যায় হইবে, কিন্তু বৃটিশ শাসনের চরম অত্যাচারের দিনে প্রেস আইনের যে সমস্ত বিধানের বলে এই নেতারাই বিপন্ন হইয়াছেন, কাজে বাধা পাইয়াছেন, সেই বস্তাপচা আইনগুলিকে আবার জীয়াইয়া তুলিবার প্রবৃত্তিটা অন্ততঃ তাঁহাদের সংযত করা উচিত ছিল। এটা লোকে অবশ্যই আশা করিতে পারে। প্রেস বিলটিকে জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার করিবার দাবী করা হইয়াছে। রাজাজী উহাকে তাড়াতাড়ি কোন মতে সিলেক্ট কমিটি ঘুরাইয়া আনিয়া ব্রুট মেজরিটির জোরে পাশ করাইয়া লইতে চাহিতেছেন। স্বাধীন ভারতে সংবাদপত্র দমন আইনের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। বিরোধী দলের পত্রিকাগুলিও এদেশে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করে। কোথাও ভুল সংবাদ প্রকাশিত হইলে তাহার প্রতিবাদ পাঠানো মাত্র পত্রস্থ করে। স্বাধীনতার পর নিজেদের দেশ গড়িয়া তুলিবার আগ্রহ সরকারী কর্ত্তাদের যতটা আছে বলিয়া দাবী করা হয়, সংবাদ-পত্রের সম্পাদকদের তদপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নাই। সাংবাদিক বৈঠকে সম্পাদকমণ্ডলীকে আমন্ত্রণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত যতগুলি অনুরোধ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি তাঁহারা রক্ষা করিয়াছেন। সংবাদপত্র সমূহ নিজেরা যেখানে গভর্ণমেণ্টের সহিত যুক্তিসঙ্গত সহযোগিতার জন্য যত্নবান, সেখানে তাঁহাদের হাতে নূতন করিয়া শিকল পরাইবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? কোন কোন সংবাদপত্র কোন কোন মন্ত্রী বা সরকারী কর্ম্মচারীর দুর্নীতি অথবা স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়া দেন, ইহাকে সমগ্র গভর্ণমেণ্টের উপর আক্রমণ বলিয়া ধরিয়া না লইয়া যদি দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা অপসারণে যত্ন লওয়া হয়, তবেই তো আর কোন সঙ্ঘর্ষ হয় না। প্রকাশিত সংবাদে ভুল থাকিলে তাহা সংশোধনের ক্ষেত্র সব সময়েই লাভ করিবার পরেও গভর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের কণ্ঠরোধের জন্য এত উগ্র হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া লোকে ইহাই মনে করিবে যে, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট দেশে ডিক্টেটরী প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন। দুই-চারিটি সংবাদপত্র যদি সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে না চান, তবে সাংবাদিকরাই যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁহাদিগকে সাংবাদিকতার মাত্রার মধ্যে রাখিতে সক্ষম হইবেন। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট যদি সংবাদপত্রকে অবিশ্বাস করেন, গায়ের জোরে, আইনের দাপটে মুদ্রাযন্ত্র দাবাইয়া রাখিবেন বলিয়া মনে করেন, তবে খুব ভুল করিবেন। মেটারনিক, বিসমার্ক, রুশিয়ার জার যাহা পারেন নাই, চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালা-চারী তাহা সাধন করিবেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।"

—দৈনিক বসুমতী।

বর্ধিত রেশন

"পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য রেশনের কর্ত্তিত বরাদ্দ সেপ্টেম্বর মাস হইতে পুনর্বহাল হইবে, দৈনিক নয় আউন্সের স্থলে বার আউন্স করিয়া খাদ্যশস্য দেওয়া হইবে, এই ঘোষণা কয়েক দিন পূর্বেই কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত কে এম মুন্সী কলিকাতায় আসিয়া করিয়া গিয়াছেন। সেই ঘোষণা অনুযায়ী রেশনে প্রদত্ত খাদ্যশস্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট উদ্যত হইয়াছেন, ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে রেশন দোকানগুলি হইতে বর্ধিত হারে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে রেশন গ্রহণকারীদের পক্ষে পরম সুসংবাদ। কিন্তু সদ্যপ্রচারিত একখানি প্রেসনোটে বর্ধিত রেশনের প্রকার সম্বন্ধে যে বিবরণ মিলিতেছে, তাহা তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কর্ত্তিত রেশনে প্রতি সপ্তাহে এক সের চাউল এবং এক সের গম পাওয়া যাইত। বর্ধিত রেশনে প্রতি সপ্তাহে পাওয়া যাইবে এক সের চাউল এবং এক সের দশ ছটাক গম বা গমজাত দ্রব্য। 'আর' মার্কা অর্থাৎ তণ্ডুলভোজী বলিয়া চিহ্নিত ব্যক্তিগণের বর্ধিত বরাদ্দের ইহাই স্বরূপ। 'ডবলিউ' মার্কা অর্থাৎ গমভোজী বলিয়া চিহ্নিত ব্যক্তিগণের বরাদ্দ হইবে দুই সের দশ ছটাক গম বা গমজাত দ্রব্য, তাহাদের চাউল কিছুই মিলিবে না। অথচ চাউলের অপ্রচুর বরাদ্দ লইয়াই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান অভিযোগ। এই রাজ্যের অধিবাসীরা ভাত খাইতেই অভ্যস্ত। প্রতি সপ্তাহে এক সের মাত্র চাউলে ভাত খাইয়া কাটান তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর ও পীড়াদায়ক। সে কষ্ট ও পীড়ার কারণ বর্ধিত রেশনে দূর হইল না, চাউলের পরিমাণ এত আলোচনার পরেও পশ্চিমবঙ্গের রেশনে বৃদ্ধি করা হইল না, ইহা সকলেই দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিবেন। অবশ্য চাউলের পরিবর্তে আটার রুটি খাওয়া ইতোমধ্যে একপ্রকার চালু হইয়া গিয়াছে। রেশনে গোড়ার দিকে যে আটা দেওয়া হইত, সে আটা খাইয়া পরিপাক করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হইত না, সে আটা দ্বারা চেষ্টা করিয়াও ভাল রুটি তৈয়ারী করা যাইত না, ইহা ছিল অভিযোগ। তদুপরি রেশনের আটার মধ্যে নানা প্রকার ভেজালের প্রাচুর্যের অভিযোগও উঠিয়াছিল। রেশনে আটার বদলে গোটা গম দেওয়ার ব্যবস্থায় সেই সমস্ত অভিযোগ দূর হইয়াছে এবং রেশনে প্রাপ্ত গম নিজেদের ইচ্ছামত ভাঙ্গাইয়া আটা তৈয়ারী করিয়া খাইতে রেশন-গ্রহণকারীরা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং বর্তমান গমের বরাদ্দ এক সেরের স্থলে

হইয়াই তাহা লইতেন। কিন্তু বর্ধিত বরাদ্দ এক সের দশ ছটাকের সবটাই যে গোটা গম পাওয়া যাইবে, এমন কোন আশ্বাস সরকারী ঘোষণায় নাই। প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, গম বা গমজাত দ্রব্য দেওয়া হইবে। 'গমজাত দ্রব্য' কথাটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে অথবা একটি অনির্দিষ্ট ব্যাপক অর্থবোধক সংজ্ঞা—এই প্রশ্ন উঠিতেছে। গমজাত দ্রব্যের মধ্যে জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা, মাইলো ইত্যাদি শস্যও ধরা হইবে কি না তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া জানিতে চাই। মাইলো বা লাল জোয়ার যে রেশনে দেওয়া হইবে, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত মুন্সীর উক্তিতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কলিকাতার বিবৃতিতে বলিয়া গিয়াছেন যে, তণ্ডুলভোজীদের পক্ষে মাইলো উপাদেয় খাদ্যশস্য এবং এই শস্য রেশনে দেওয়া হইবে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে আনীত শস্যের উপর নির্ভর করিয়াই রেশনের বরাদ্দ বৃদ্ধিতে উদ্যত হইয়াছেন, এ কথা প্রেসনোটে খুলিয়াই বলিয়াছেন। কিন্তু মাইলো, জোয়ার, ভুট্টা ও বাজরা ইত্যাদির কথা পরিষ্কার করিয়া কিছু বলেন নাই,—গমজাত দ্রব্য বলিয়াই ব্যাপারটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট রাখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গমজাত দ্রব্য বলিতে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট গোটা গম ছাড়া আর কি কি বস্তু দিবেন, বা দিতে পারেন, তাহা সময় থাকিতে সকলকে জানাইয়া দেওয়াই উচিত।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা

"অস্বীকার করিবার উপায় নাই, বাংলার ভৌগোলিক কাঠামোটাই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; দুই-দুই বার অঙ্গচ্ছেদের ফলে বাংলা আজ পশ্চিম-বাংলার স্বল্প-পরিসর আয়তনের মধ্যে কোনক্রমে টিকিয়া আছে। তাহার আর্থিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকগণের বর্তমান সমস্যার এই ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মনে রাখিয়াই সমাধানের পথ খুঁজিতে হইবে। বিধ্বস্তপ্রায় অর্থনীতিকে সঞ্জীবিত করার পণ্ড প্রয়াসের মধ্যে সমাধানের পথ পাওয়া যাইবে না। কিংবা এই বিধ্বস্তপ্রায় আর্থিক কাঠামোর প্রত্যন্ত আঁকড়াইয়া যে-সব মধ্যবিত্ত কোন রকমে আপন অস্তিত্ব রক্ষায় তৎপর, তাহাদের আভ্যন্তরীণ স্বার্থ-সংঘাতের সুষ্ঠু মীমাংসার দ্বারাও এই সমস্যার সমাধান হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন, ইহা অনস্বীকার্য এবং এই কারণেই বর্তমান সঙ্কটের যথাযথ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সমস্যার উপলব্ধি করা প্রয়োজন। অন্যথা সমাধানের নামে সমস্যা আরও জটিল হওয়া বিচিত্র নয়। বিধ্বস্তপ্রায় অর্থনীতির পক্ষে উদ্বাস্তু সমস্যা একটি গুরুতর বোঝা সন্দেহ নাই। উদ্বাস্তু সমস্যার ঐতিহাসিক ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড সর্বজনবিদিত। পশ্চিমবঙ্গের স্বল্প-পরিসর আয়তন এবং মুমূর্ষু অর্থনীতির চৌহদ্দির মধ্যে এ রাজ্যের তথাকথিত আদিম অধিবাসীরই যথার্থ কল্যাণ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং উদ্বাস্তু সমস্যার যথার্থ সমাধানও যে প্রায় অসম্ভব, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, উদ্বাস্তুগণকে খেদাইয়া দিলেই পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সহজতর হইবে। অর্থনীতিকে নূতন কাঠামোর মধ্যে ঢালিয়া সাজাই প্রাথমিক প্রয়োজন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ অপরিহার্য এবং অত্যাবশ্যক। আঞ্চলিক প্রসারণও প্রয়োজন। সমবায়ী সংস্থার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ এবং সুসংহত জীবনযাত্রার প্রবর্তন করিতে হইবে। তবেই সমস্যার সমাধানের সূত্রটি হস্তগত হওয়া সম্ভব।"

—সত্যযুগ।

রেলে এংলো-ইণ্ডিয়ান

"স্বাধীনতার পর শিয়ালদহ, রাণাঘাট, নৈহাটি প্রভৃতি ষ্টেশনের এবং এই এলাকার রেলের গুরুত্ব খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা এখন সীমান্ত অঞ্চল, এখানে এখন দক্ষ এবং স্বদেশপ্রেমিক কর্মচারী মোতায়েন করা উচিত। প্রথমটা তাহাই করা হইয়াছিল। শিয়ালদহ ডিভিসনের সমস্ত উচ্চপদে ভারতীয় অফিসার বসানো হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের কমনওয়েলথ ভুক্তির পর হাওয়া ঘুরিয়া গেল। উচ্চপদস্থ প্রায় সমস্ত ভারতীয় অফিসারকে সরাইয়া এংলো-ইণ্ডিয়ানদের নিযুক্ত করা হইল। ইহার ফল কি হইতে পারে একটি ঘটনায় তাহা বিশেষ ভাবে বুঝা গেল। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার পাকিস্থানের ব্যবহারে বিব্রত হইয়া কয়লা বন্ধ করিলেন। রেলের চীফ কমিশনার বাখলে কলিকাতা হইয়া আসাম যাওয়ার সময় ষ্টেশনে কয়লার মালগাড়ী দেখিয়া বলিয়াছেন যে, উহা যেন না যায়, দুই-এক দিনের মধ্যেই গাড়ী বন্ধ করিবার লিখিত আদেশ আসিবে। বাখলে আসাম যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদহের

অবনীন্দ্রনাথের জন্ম-বার্ষিকীতে গৃহীত আলোকচিত্র। শিল্পাচার্য্যের পাশে শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়।

এংলো-ইণ্ডিয়ান ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মালগাড়ী রওনা করিয়া দিলেন। নৈহাটীর সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টার উহা আটকাইলেন। সংবাদ পাইয়া ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং নৈহাটি ছুটিলেন। সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহাকে বলিলেন যে, চীফ কমিশনার গাড়ী ছাড়িতে মৌখিক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, ডি-এস-এর লিখিত আদেশ ভিন্ন তিনি গাড়ী ছাড়িবেন না। ফিরিঙ্গিপুঙ্গব অতটা সাহস পাইল না। গাড়ী আটকাইয়া গেল। ইহার পর ফিরিঙ্গিরা সংযত হয় নাই, বরং ইহাদের সাহস আরও বাড়িয়া গিয়াছে। রেলের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা দখল করিয়াছে—(১) ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (পার্সোনেল), সমস্ত কর্ম্মচারীদের নিয়োগ এবং বদলী ইহার হাতে। কারমুডি নামক এংলো-ইণ্ডিয়ান বর্ত্তমানে এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। (২) ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শিয়ালদহ। ইনি শিয়ালদহ এলাকার সীমান্ত রেলের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী। গত দিন এই পদে ছিলেন বাথগেট, এখন আসিয়াছেন গিলান। (৩) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রোলিং ষ্টক। ইঞ্জিন, মালগাড়ী, যাত্রিগাড়ী প্রভৃতি সমস্ত ইহার হাতে। এই পদে এখন আছেন ডানিয়েল। এংলো-ইণ্ডিয়ানদের ধৃষ্টতা কত দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। রেল-ষ্টেশনগুলির শ্রেণীবিভাগ আছে। রাণাঘাট ছিল 'সি' শ্রেণীর ষ্টেশন, স্বাধীনতার পর উহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় উহাকে এখন 'এ' শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল।

ইংরেজ আমলে রেলে ইংরেজ ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্য ভাল বাড়ী এবং নেটিভ ভারতীয়দের জন্য বাড়ী নামক খোপ তৈরী হইত। গলষ্টন নামক এক জন লোকো ইনস্পেক্টর রাণাঘাটে বদলী হইয়া গিয়াছেন। সেখানকার ইউরোপীয়ান টাইপ বাড়ীটিতে ট্রাফিক ইনস্পেক্টর গুপ্ত বাস করেন। গলষ্টন নেটিভ কোয়ার্টারে থাকিবেন না, তিনি গুপ্তকে সরাইয়া ঐ বাড়ীতে ঢুকিতে চাহিলেন। গুপ্ত পদমর্য্যাদা-বলে ঐ বাড়ীতে থাকিতে অধিকারী। তিনি বাড়ী ছাড়িতে আপত্তি করিলেন। গলষ্টন চালাক লোক, আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া নীচের তলায় থাকিলেন। কলিকাতা হইতে পরিবার লইয়া রাণাঘাট যাইতে গলষ্টনের ইচ্ছা ছিল না বলিয়া ইহা সম্ভব হইল। ইহার পর ক্যামেরণ নামক এক হেড ট্রেন এগজামিনার রাণাঘাট বদলী হইল। ইহার পূর্ব্বে এক জন বাঙ্গালী ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অবসর গ্রহণ করায় ক্যামেরণ সেখানে বদলী হইয়াছে। ইনি ভাদ্র মাসে বাড়ী ছাড়িতে চান না বলিয়া ১৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ঐ বাড়ীতে থাকিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। এটি ভারতীয় টাইপ বাড়ী। ক্যামেরণের চামড়া সাদা, এক জন ভারতীয়ের পর ঐ পদে আসিলে কি হইবে, হেড ট্রেন এগজামিনারের কোয়ার্টার তাহার পছন্দ হইল না। একেবারে ষ্টেশন-মাষ্টারের বাড়ীর উপর তাহার নজর পড়িল। চীফ কমার্সিয়াল ম্যানেজার শ্রীজে, এন, দাস জানাইলেন যে, ওখানে যিনি আছেন তিনিই থাকিবেন। শ্রীযুক্ত দাসের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে কঠোরতার সুর লক্ষ্য করিয়া ক্যামেরণ বুঝিল আর ঘাঁটাইয়া লাভ নাই। সে তখন নৈহাটির একটি ইউরোপীয়ান টাইপ কোয়ার্টারের উপর নজর দিল। নৈহাটি 'এ' গ্রেড ষ্টেশন। ডেপুটি চীফ কমার্সিয়াল ম্যানেজারের হস্তক্ষেপে এই চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। রাণাঘাটে কুপার ক্যাম্পের কাছে তিন-চারিটি ইউরোপীয়ান বাংলো আছে, সহর হইতে দূরে বলিয়া সে সেখানে যাইতে চায় না। রাণাঘাটে ক্যামেরণের পছন্দ মত বাড়ী জুটিল না বলিয়া এবার এক মোক্ষম চাল দেওয়া হইল। কলিকাতায় চীৎপুর ইয়ার্ড 'বি' গ্রেড ষ্টেশন বলিয়া পরিগণিত। এখানে একটি চমৎকার ইউরোপীয়ান টাইপ কোয়ার্টার আছে। ক্যামেরণের নজর এই বাড়ীটির উপর পড়িল। কিন্তু 'এ' গ্রেড ষ্টেশনের কর্ম্মচারী 'বি' গ্রেড ষ্টেশনে বদলী হইতে পারে না। ধূর্ত্ত কারমুডির বুদ্ধি খেলিল—রাণাঘাটকে 'বি' গ্রেড এবং চীৎপুরকে 'এ' গ্রেড ষ্টেশন বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সুতরাং 'বি' গ্রেড রাণাঘাটের ফিরিঙ্গিকে চীৎপুরের বাড়ী দেওয়া গেল। অর্থাৎ একটা ফিরিঙ্গিকে পছন্দ মত বাড়ী পাওয়াইয়া দেওয়ার জন্য রাণাঘাটের ন্যায় একটি ষ্ট্রাটেজিক ফ্রণ্টিয়ার ষ্টেশনের গুরুত্ব কমাইয়া দেওয়া হইল! ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অসম্ভব না হইতে পারে, স্বয়ং নেহরু ইহা তাঁহার গত প্রেস কনফারেন্সে বলিয়াছেন। যদি যুদ্ধ বাধে তখন রাণাঘাট সৈন্য ও রসদ সরবরাহের একটি প্রধান ঘাঁটি হইবে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে যাহারা একটা এংলো-ইণ্ডিয়ানের আবদার রক্ষার জন্য এই ষ্টেশনের গুরুত্ব কমাইয়া দিতে পারে তাহাদিগকে বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং এক মুহূর্ত্তের জন্য রেলের গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রাখা দেশের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর হইতে পারে। এংলো-ইণ্ডিয়ানরা মাইনরটি বলিয়া তাহাদিগকে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া দেশের অনিষ্ট করিয়া ইহাদিগকে মাথায় তুলিয়া নাচিতে হইবে, এমন কোন সর্ত্ত মানিতে আমরা রাজী নই।" —যুগবাণী।

বৰ্দ্ধমানে দুর্ভিক্ষ !

"গঙ্গা অঞ্চলের চাষীদের অবস্থাটা হয়েছে ভাগের মায়ের মতন। গঙ্গার ওপরে থেকেও তারা গঙ্গা পাচ্ছে না। বর্দ্ধমান সীমানার লোকগুলো পাছে চোরাকারবারে মেতে চরিত্র নষ্ট করে বসে, তাই /৫ সের খাবার চালও তাদের কাটোয়া-দাঁইহাটের বাজার হতে নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। আর ওপারের ওরা তো ডাকসাইটে চরিত্রহীন, তার ওপর নদে জেলার লোক, অতএব তাদের দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার দায় কারো নাই। "ঘরেও নহে পারেও নহে—যে জন আছে মাঝখানে" বেচারাদের অবস্থা হয়েছে ত্রিশঙ্কুর মত।—বর্দ্ধমানের এরা বলছে, "গাঁয়ে গাঁয়ে সস্তা চালের দোকান খুলে রেশন কার্ড-পিছু চাল বিলি করে বাঁচাও আমাদের।" সরকার বলছেন :—"অশান্তি হতে দেব না,—মরো তাতে ক্ষতি নেই। আর চালের ডিলারী করার জন্য লাইসেন্স দিতে পারব না। তবে যদি তোমাদের ধৈর্য্য থাকে তাহলে যে গাঁয়ে মৃত্যুর বান ডেকেছে, সেখানে বিশেষ ব্যাপার হিসাবে দয়া করে দশ মণ পর্য্যন্ত চাল দিতে পারি—তাও সস্তা দরে নয়, যখন যা বাজার-দর হবে, সেই দরে।" তিন হাজার লোকের গাঁয়ে দশ মণ চাল! লোকগুলো বোকা হলেও কংগ্রেসী অফিসারদের মত তারা কানা নয়। অতএব গরু-বাছুর গিয়ে এবার ঘটি-বাটিও শেষ হতে চলেছে—চোরাবাজার জিন্দাবাদ! "পেট চালাই না চাষ চালাই

অবস্থায় পড়ে চাষের দিকে নজর দেবার সঙ্গতি হচ্ছে না। কৃষি-ঋণ দিয়ে সস্তা চালের দোকান খুলে—কে এদের বাঁচাবার দায়িত্ব নেবে? তার চেয়ে কমিউনিষ্টদের পেছনে ধাওয়া করে রাষ্ট্ররক্ষার দায়িত্ব অনেক জরুরী। শ্রাবণের গেঁয়ো পথে কোমর-ভর্ত্তি কাদার বদলে ধূলো ওড়ে।—চাস নেই, মুনিষের কাজ নেই, চোখের সামনে দিয়ে রাইফেল পাহারায় মুখের গ্রাস গাম হতে বিদেয় নিয়ে যায়—উলঙ্গ, হাড়পাঁজরা বের করা মানুষগুলো হা-পিত্যেশে চেয়ে থাকে। হঠাৎ বুকফাটা কান্নার আর্ত্তনাদে চারি দিকের বাতাস জমাট বেঁধে যায়। পদ্মানদের ছেলেটা মারা গেল। রোগের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? রোগ—অনাহার। গাঁয়ের মাথায় শকুন ওড়ে, পঞ্চাশের আকাল এবার ঠেকায় কে? কংগ্রেসী রাইফেলের কড়া পাহারায় এবার পঞ্চাশের আকাল ছড়িয়ে পড়বে গাঁয়ে গাঁয়ে। লজ্জার বালাই নেই—ল্যাংটো হয়েই তো সবাই জন্মেছে—তাই ল্যাংটো হয়ে, পেট কোলে ক'রেই যেতে হবে। শকুনের মন্থর গতিতে—এগিয়ে আগা মরণের আহ্বান।" —বর্দ্ধমানের ডাক।

—

ট্যাক্স বৃদ্ধি

"এসেসর মহাশয় এবার মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্স ত্রিগুণাধিক বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি কাহার ইঙ্গিতে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিলেন? যাহারা বাড়ী ভাড়া দেয়, তাহাদের ট্যাক্স বৃদ্ধিতে কেহ আপত্তি করে না। বিশেষতঃ এখন ভাড়ার হার ত্রিগুণাধিক। কিন্তু যাঁহারা এই দুর্দ্দিনে অন্ন-বস্ত্রাভাবে জীর্ণ-শীর্ণ, তাহাদের এত ট্যাক্স বৃদ্ধি হয় কি হিসাবে? তাহার উপর যাঁহারা ট্যাক্স বৃদ্ধি দরখাস্ত শুনানী করিয়া সেই হারই বজায় রাখিয়াছেন, তাঁহাদের স্বয়ং এবং তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবদের ট্যাক্সের তুলনা করিয়া তাঁহারা কি তাহাই বজায় রাখিয়াছেন? নেহাৎ নির্লজ্জ স্বার্থপর না হইলে কখনই জনসাধারণের এ সর্ব্বনাশে কেহ আনন্দ লাভ করিতে পারে না। তাঁহাদের বাড়ীর ট্যাক্সের তুলনা করিয়া দেখিলে আসল সত্য ধরা পড়িবে। আমরা আশা করি, নবীন চেয়ারম্যান ভাইস-চেয়ারম্যান এ বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণের আবেদনে কর্ণপাত করিবেন। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে জনসাধারণের পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অনেক ভদ্রলোকের ট্যাক্স বৎসরাধিকও না কি বাকি আছে, আদায় হয় নাই। এবং আদায়কারী মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারীরা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দেন। ইহা কি সত্য? এতাবৎ কাল পুরাতন চেয়ারম্যান ভাইস-চেয়ারম্যান এ বিষয়ের প্রতিকার করেন নাই কেন? তৃতীয়তঃ, এবার কাহার কত ট্যাক্স বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্বানুপাতে তাহা কত, তাহার তালিকা চেয়ারম্যান মহোদয় প্রকাশ করিবার আদেশ দিবেন কি? যদি অনুমতি দেন, তবে আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। এবং ট্যাক্স কাহার কত বাকি আছে তাহারও জায় দিলেও তাহা প্রকাশিত হইবে। মিউনিসিপ্যালিটীর গলদ অনেক। মিউনিসিপ্যাল সম্পত্তির লিষ্ট কি নূতন বোর্ড মিলাইয়া লইয়াছেন? পুরাতন চেয়ারম্যানের নামে কন্ট্রোল দরে যে সব জিনিষপত্র আসিয়াছিল, সেগুলি কোথায় গেল? তাহার সংবাদ জানা নবীন বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যানের প্রয়োজন। কর্ত্তৃপক্ষ অবহিত হইলে পর পর অন্যান্য অনেক বিষয় জানাইব।" —মেদিনীপুর হিতৈষী।

প্রতিজ্ঞা

"ইংরাজদের হাত থেকে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসার ৪ বৎসর আনুষ্ঠানিক ভাবে পূর্ণ হলো। যদিও বর্তমান কংগ্রেসী সরকারের দুঃশাসন প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর হ'তে চললো। এই দুঃশাসনের সর্বনাশা পরিণাম লিখে জানাবার কোন প্রয়োজন নেই। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, চিকিৎসাভাব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। নারী ও শিশুর হত্যার অপরাধে অপরাধী এই সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্য্যের ফিরিস্তি লিখে শেষ করা যায় না; আর তার উপর স্বাধীনতার সর্বশেষ নিদর্শন প্রতিবাদ করবার অধিকার হরণ করে শাসনতন্ত্র সংশোধন। এই দুরাচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনতার প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ১৯৪৯ সালে দক্ষিণ-কলিকাতার উপনির্বাচনে শরৎ বাবুর বিজয়ে। সেই প্রতিবাদ শক্তিশালী হয় হাওড়া মিউনিসিপালিটী থেকে চন্দননগর পৌরসভার নির্বাচনে। বাংলার সচেতন জনতা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদকে সম্মিলিত প্রগতিশীল ব্লকের মধ্যে রূপায়িত করছে, সংগঠিত করছে। বাংলার জনসাধারণের দাবীতেই আজ সমস্ত বামপন্থী দল, প্রগতিশীল সংস্থা ও ব্যক্তি মিলিত কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে এগিয়ে চলেছে—এই মিলিত কর্ম্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য, এই স্বৈরাচারী সরকারের শাসন খতম করে জনগণের প্রকৃত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে—যে সরকার বর্তমান মুনাফাবাজী অর্থনীতিকে ভেঙ্গে ফেলে জনকল্যাণকামী সাধারণের

রামকৃষ্ণ মিশনের নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি স্বামী শঙ্করানন্দ

প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে এক নূতন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। প্রত্যেকটি মানুষকে সুখে বেঁচে থাকবার সুযোগ দেবে, সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। আজ এই ৪ বৎসরের মেকী স্বাধীনতার অত্যাচারে নিষ্পেষিত বাংলার প্রত্যেকটি নর-নারীর কাছে আমাদের আবেদন এই স্বৈরাচারের অবসান করার শপথ গ্রহণ ক'রে আগামী নির্বাচনে সম্মিলিত প্রগতিশীল ব্লককে শক্তিশালী করে তুলতে ও বিজয়ী করতে নিজেরা সক্রিয় ও সংগঠিত হোন। আজ বাংলার জনসাধারণের এ হলো জীবন-মরণ সমস্যা।"

—চব্বিশ পরগণার ডাক।

কাহাকে ভোট দিব!

পূর্ব্বে কংগ্রেসে ত্যাগী পূতচরিত্র ও নিষ্ঠাবান কর্ম্মীদের সংখ্যাধিক্য ছিল, কিন্তু এখন কংগ্রেস হইয়াছে স্বার্থসর্বস্ব চরিত্রহীন ভাগ্যান্বেষীদের আড্ডা। যজ্ঞের আসরে এখন অপদেবতারা তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। অবশ্য আমরা এ কথা বলিতেছি না কংগ্রেসে খাঁটি লোক নাই। আছে বলিয়াই এখনও প্রতিষ্ঠান টিকিয়া আছে। প্রতিষ্ঠানের বিচার হয় যাঁহারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তাহাদের চরিত্র দ্বারা। কংগ্রেসে আজ দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরই প্রাধান্য। কাজেই কংগ্রেস সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কাছাড়ের কংগ্রেসের বিষয়ই আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমানে কাছাড় জিলায় যাঁহারা কংগ্রেসের কর্ণধার, তাঁহাদের অনেকেরই কংগ্রেসের সঙ্গে কস্মিন্ কালেও কোন সম্পর্ক ছিল না। কেহ পুরুষানুক্রমে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন, কংগ্রেস কার্য্যোপলক্ষে স্বগৃহে আগত নিরপরাধ ও অহিংস কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মীদের মাথা ফাটাইয়া অতিথিপরায়ণতা ও দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কাহারও সূতা চুরি, মিলিটারী কনট্রাক্ট, ব্ল্যাক মার্কেটিং প্রভৃতির উজ্জ্বল রেকর্ড আছে; আবার কাহারও বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের টাকা মারা, জাল, প্রতারণা প্রভৃতির অভিযোগ ঝুলিতেছে, কেহ বা ৪২-এর আন্দোলনে নাকে খত দিয়া কারামুক্ত হইয়া আসিয়াছেন এবং এই প্রকারে নিজের তথা কংগ্রেসের সুনাম বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ-হেন গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী যে-প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্ত্তারা, সে-প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণ যদি শ্রদ্ধায় নুইয়া না পড়ে অথবা এই সব কৃতকর্ম্মা পুরুষরা যদি স্বয়ং নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন অথবা কংগ্রেসের মার্কা দিয়া যে কোন প্রার্থীকে যদি নির্ব্বাচনের আসরে নামাইয়া দেন এবং জনসাধারণ যদি কংগ্রেসের নামে শ্রদ্ধাবিগলিত চিত্ত হইয়া তাহাদিগকে ভোট না দেয় তবে কি তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায়? কাজেই আমাদের বক্তব্য—কংগ্রেস অথবা অন্য যে কোন দলই প্রার্থী দাঁড় করান না কেন, প্রার্থীর যোগ্যতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। এইবার কোন প্রতিষ্ঠানের নামেই বাজে মাল চালানো যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, মনোনয়নের বেলায় প্রার্থীর অতীত ও বর্ত্তমান কার্য্যাবলী, শিক্ষা, দীক্ষা, চরিত্রবল, কর্ম্মক্ষমতা, স্বদেশানুরাগ ইত্যাদির বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। নির্ব্বাচকমণ্ডলীরও কর্ত্তব্য হইবে কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রতি অন্ধ ভক্তির বশবর্ত্তী না হইয়া উপরিউক্ত মাপকাঠিতে যাঁহারা যোগ্য বিবেচিত হইবেন কেবল তাঁহাদিগকেই ভোট দেওয়া।

—জনশক্তি।

পরলোকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ভা

কবি ও সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী গত ১৫ই আগষ্ট পরলোক গমন করেন। বাঙলা ১৩০২ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় কলিকাতায় তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি সরকারী কাজ

ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি পাইকপাড়া মণীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং শেষ বয়স পর্য্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বর্ত্তমান সভাপতি ছিলেন। সাহিত্যিক, বাগ্মী এবং পরম বৈষ্ণব হিসাবে তিনি বাঙলায় পরিচিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের আত্মা শান্তি লাভ করুক।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
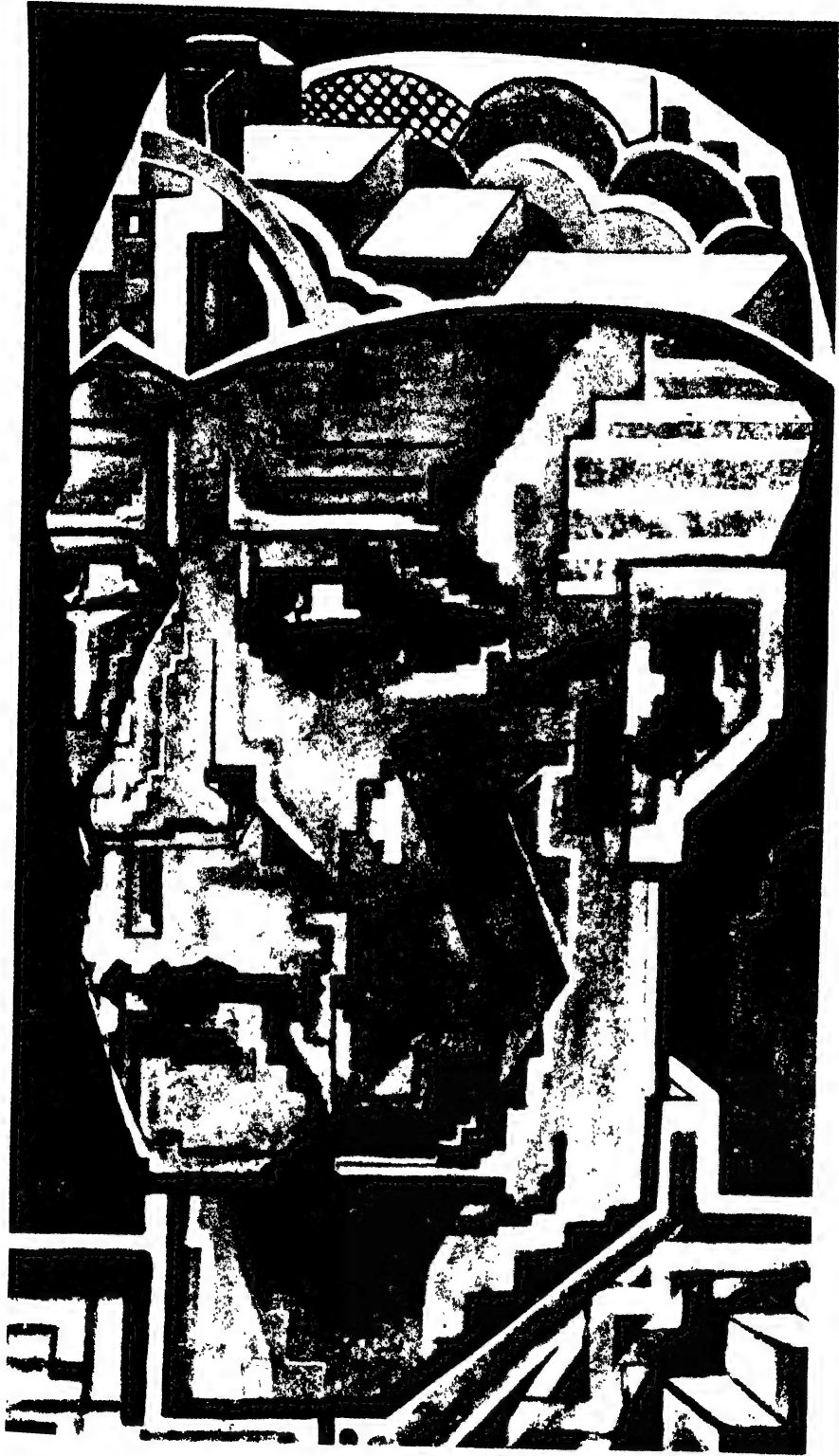
স্বাধীন ভারতবর্ষের স্থপতি—জওহরলাল

—শ্রীসুভো ঠাকুর অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

কথামৃত

"যত স্ত্রীলোক সব শক্তিরূপা। সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী হয়ে, স্ত্রী রূপ ধরে রয়েছেন।"

"যে ব্যক্তি জনশূন্য মাঠের মাঝে ষোড়শী যুবতীকে মা বলে চলে যেতে পারে, সেই প্রকৃত ত্যাগী ব্যক্তি।"

"সর্ব্বদা মনে সদসৎ বিচার করবে। বিচার ক'রে সৎকে গ্রহণ ও অসৎকে ত্যাগ করবে।"

"লোক—পোক। মানুষ বলতেও যতক্ষণ, মন্দ বলতেও ততক্ষণ, সুতরাং তাদের কথায় কাণ না দেওয়াই উচিত। মানুষের যশ ও নিন্দা উপেক্ষা করে ঈশ্বর-পথে অগ্রসর হবে।"

"জ্ঞান পুরুষ, ভক্তি স্ত্রীলোক। ঈশ্বরের বাহির বাটী পর্য্যন্ত জ্ঞান যেতে পারে, কিন্তু ভক্তি অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যায়।"

"জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞান, একই কথা।"

"ঈশ্বরের ভাব পাকলে, তাকে প্রেম বলে।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

তেপ্পান্ন

দক্ষিণেশ্বরে চর পাঠিয়ে দিল কেশব। লক্ষ্য করবে রামকৃষ্ণকে। চোখে-চোখে রাখবে। রাত-দিন পাহারা দেবে। ঠিক-ঠিক খাটি কিনা, না, আছে কিছু বুজরুকি।

হ্যাঁ, ভালো কথা, বাজিয়ে নাও, যাচাই করে নাও। পরের মুখের ঝাল খাবে কেন? কেন মেনে নেবে শোনা কথা? নিজে এসো, বসো, দেখ পরখ করে। তন্ন-তন্ন করে দেখ।

কিন্তু পরীক্ষার পর প্রমাণে যদি পরিতৃপ্ত হও, তখন কী হবে? কোন্ দিকে যাত্রা করবে?

তিন জন ব্রাহ্ম-ভক্ত এল দক্ষিণেশ্বরে। তাদের মধ্যে এক জন প্রসন্ন। পালা করে রাত-দিন দেখবে রামকৃষ্ণকে আর কেশব সেনকে রিপোর্ট দেবে। পোশাকী আর আটপৌরে এমন কিছু ভেদ আছে নাকি রামকৃষ্ণের। সে মনে-মুখে এক কি না। সে কি সত্যিই জিতাসন, জিতশ্বাস, জিতেন্দ্রিয়? সে কি সত্যিই পরিমুক্তসঙ্গ?

রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে চলে এল সটান। বললে, 'রাত্রে আমরা ও-ঘরে শোব।'

বেশ তো, শোও না! ঢালাও নিমন্ত্রণ রামকৃষ্ণের।

কিন্তু শুবি তো চুপ করে শুয়ে থাক। তা না, কেবল 'দয়াময়', 'দয়াময়' করতে লাগল। নিরাকার কিনা, তাই ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। তাঁর ঐশ্বর্যই তো দয়া। সূর্যের ঐশ্বর্যই যেমন আলো। সূর্যকে যদি 'আলোময়' 'আলোময়' বলা যায়, কিছুই বলা হয় না। নতুন কিছু বল। ডাকার মতন করে ডাক। যে-ডাকে শুধু দয়া দেখাতে আসবে না, ভালোবাসায় গলে জল হয়ে যাবে।

ব্রাহ্ম-ভক্তরা কেশবের স্তুতি আরম্ভ করল। বলল, 'কেশব বাবুকে ধরো, তা হলেই তোমার ভালো হবে।'

'কিন্তু আমি যে সাকার মানি।'

আমি যে মা বলে ডাকি। মাকে যদি নিরাকার করি তবে অমন কোলটুকু পাব কি করে? কি করে দেখব তবে সেই সুখপ্রসন্ন বদনের স্নেহময় সুষমা?

মা কি আমার সামান্য? মা আমার অনন্তরূপিণী। মা আমার কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী, বিগলিতচিকুরা, খড়্গ-মুণ্ডাভিরামা। মহামেঘপ্রভা, শ্মশানালয়বাসিনী। বলতে চাও, এমন রূপটি আমি দেখব না নয়ন ভরে? দেবেন না তো, আমার নয়ন হল কেন?

শোনো, কমলাকান্ত কি বলছে। দেখ, শুনতে-শুনতে দেখ কিনা চোখের সামনে।

> সমর আলো করে কার কামিনী!
> সজল জলদ জিনিয়া কায়
> দশনে প্রকাশে দামিনী॥
> এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ
> সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
> অট্টহাসে দানব নাশে
> রণপ্রকাশে রঙ্গিণী॥
> কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু
> ঘন তনু ঘেরি কুমুদবন্ধু
> অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু
> মলিন, এ কোন্ মোহিনী॥
> এ কি অসম্ভব ভব-পরাভব
> পদতলে শব সদৃশ নীরব
> কমলাকান্ত কর অনুভব
> কে বটে ও গজগামিনী॥

এই রণরামা নীরদবরণীকে দেখব না আমি? আহা, দেখ, দেখ, শোণিত-সায়রে যেন নীল নলিনী ভাসছে!

তবুও ব্রাহ্ম-ভক্তরা কেবল 'দয়াময়' 'দয়াময়' করে। ঘুমুতে দেবে না রামকৃষ্ণকে।

তখন রামকৃষ্ণের ভাবাবস্থা হল। সেই অবস্থায়

গরাঢ় থেকে বললে সেই ভক্তদের: 'এ ঘর থেকে চলে যাও বলছি।'

যেন বজ্রঘোষের আদেশ। ভক্তরা তখন পালিয়ে যেতে পথ পায় না। ঘর ছেড়ে তখন বারান্দায় গিয়ে শুলো।

কাপ্তেনও এমনি পরীক্ষা করে নিয়েছিল। যেদিন দিনের বেলায় প্রথম দেখলে রামকৃষ্ণকে, ঠিক করলে রাতের বেলাও দেখে যেতে হবে। দেখে যেতে হবে রাতেও এ সূর্য সমপ্রভই থাকে কিনা। কোণটিতে চুপি-চুপি রইল চোখ মেলে। দেখল এ সূর্যের উদয়াচলই আছে, অস্তাচল নেই।

আমাকে শক্ত হাতে বাজিয়ে নিবি, যেমন করে শানের উপরে মহাজনে টাকা বাজায়। বেপারী যেমন তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নেয় মালের টুটা-ফুটা। ভক্ত হয়েছিস বলে বোকা হবি কেন? বুঝে-সুঝে দেখে-শুনে নিবি। সন্দেহই যদি রাখবি তবে সন্ধান জানবি কি করে?

নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এসেছে। ঠাকুরের ঘরটিতে গিয়ে দেখে, ঠাকুর নেই। কোথায় তিনি? কলকাতায় গিয়েছেন। ফিরবেন কখন? এই এলেন বলে।

তা হোক, এই সোনার সময়। দেখা যাক কেমন তাঁর সোনার উপর বিতৃষ্ণা!

ঘর ফাঁকা হতেই পকেট থেকে একটা টাকা বের করলে নরেন। ঠাকুরের বিছানার নিচে আলগোছে লুকিয়ে রাখলে।

সে-তল্লাটেই আর রইল না তার পর। সিধে চলে গেল পঞ্চবটী। কেউ যেন ঘূণাক্ষরে না টের পায়!

কতক্ষণ পরেই ফিরে এলেন ঠাকুর। দেখতে পেয়েই নরেন এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি। এবার বোঝা যাবে কাঞ্চনত্যাগের মহিমা। ঘরের মধ্যে আগে-ভাগে ঢুকে ঠিক কোণটি বেছে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

যেমন নিত্য বসেন তেমনি বিছানায় এসে বসলেন ঠাকুর। কিন্তু গা ঠেকিয়েছেন কি না ঠেকিয়েছেন চীৎকার করে উঠলেন। যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসেছেন এমনি দগ্ধকর যন্ত্রণা। কী হল? ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল সকলে। বিষাক্ত কিছু দংশন করল নাকি? কই, বিছানায় কিছু দেখা যাচ্ছে না তো!

ঠাকুর সরে দাঁড়ালেন খাটের থেকে। কাছাকাছি যারা ছিল সবল হাতে ঝাড়তে লাগল বিছানা। টং,—টং করে হঠাৎ একটা আওয়াজ হল মেঝের উপর। ওটা কি? ওটা একটা টাকা দেখছি না? বিছানায় এল কি করে?

নরেন তাড়াতাড়ি চলে গেল ঘর ছেড়ে।

বুঝেছি, বুঝেছি। আনন্দে ঠাকুর বিহ্বল হয়ে উঠলেন। তুই আমাকে পরীক্ষা করছিস।

বেশ তো, নিবিই তো পরীক্ষা করে। কত পরীক্ষা করেছেন মথুর বাবু। ফাঁকা ঘরে মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন জমিদারির খানিকটা তোমাকে লিখে দি। তোদের যার যেমন মন চায় যাচাই করে নে। যা চাই তা পাব কিনা—এ জিজ্ঞাসায় যখন এসেছিস তখন যাচাই করা ছাড়বি কেন?

তোদের সকলের সন্দেহ নিরসন করে নে। চলে আয় সত্যের স্থিরতায়। সিদ্ধান্তের শান্তিতে।

দক্ষিণেশ্বরের জমিদার নবীন রায়চৌধুরীর ছেলে যোগীন। বিয়ে করেছে, তবু রোজ রাতে বাড়ি যায় না, প্রায়ই ঠাকুরের কাছটিতে পড়ে থাকে। যখন আর-আর ভক্তরা কাছে-ভিতে কেউ নেই, তখন ফাঁকতালে ঠাকুরের কোন কাজে লেগে যেতে পারে কিনা, তারই আশায় জেগে থাকে।

সেদিন সন্ধ্যে হতে-না-হতেই ভক্তেরা বিদায় নিয়েছে। যোগীন বসে আছে একলাটি।

'কি রে, বাড়ি যাবি না?'

'কেউ আজ নেই আপনার কাছে। ভাবছি, আমিই তবে থেকে যাই রাতখানা।'

ঠাকুর খুশি হলেন। রাত দশটা পর্যন্ত আলাপ করলেন একটানা। আলাপের বিষয়ও সেই এক-টানের বিষয়। অটনে-অনটনে সেই এক ঈশ্বরের টান।

রাত দশটায় জলযোগ করলেন ঠাকুর। যোগীনও খেয়ে নিল কালীঘরে। ঠাকুর শুয়ে পড়লেন তাঁর বড় খাটটিতে। সেই ঘরেই মেঝেতে বিছানা পাতল যোগীন।

মাঝ রাত। ঠাকুরের একটিবার বাইরে যাবার দরকার হল। তিনি তাকালেন যোগীনের দিকে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে ছেলেটা। কেমন মায়া হল ঠাকুরের, ডেকে ঘুম ভাঙালেন না। নিজেই দোর খুলে বেরিয়ে গেলেন। একা-একা চলে গেলেন ঝাউতলা।

খানিক পরেই ঘুম ভেঙে গেল যোগীনের। এ কি, ঘরের দরজা খোলা কেন? ঠাকুর কোথায়? বিছানা শূন্য। এত রাত্রে কোথায় গেলেন তিনি একা-একা? গাড়ু-গামছা তো সব ঠিক-ঠিক জায়গায়ই আছে। আর, তাই যদি যাবেন, তবে তাকে দাঁড়িয়ে দিতে নিয়ে গেলেন না কেন সঙ্গে করে? তবে বোধ হয় চাঁদের আলোয় একটু বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। গঙ্গায় ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে।

কই, গঙ্গার কাছাকাছি কোথাও তিনি নেই তো! যোগীন বাইরে এসে উৎসুক চোখে দেখতে লাগল চার দিক। কোথাও সাড়াও নেই শব্দও নেই। হঠাৎ বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল যোগীন। ঠাকুর লুকিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে নহবৎখানায় যাননি তো?

ভয় করতে লাগল যোগীনের। দিনের বেলা তিনি যা বলেন রাতের বেলা তিনি তা পালন করেন না? ডুবে-ডুবে জল খান?

না, এর একটা হেস্ত-নেস্ত দেখে যেতে হবে। নহবৎখানার কাছাকাছি এগিয়ে গেল যোগীন। নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল দরজার দিকে। ব্যাপারটা অন্যায় হচ্ছে তবু নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই।

দরজা খুলে ঠাকুর বেরিয়ে এলেই দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে যাবে যোগীন। পথ ভুলেও আসবে না এ তল্লাটে।

সমস্ত আকাশ-বাতাস যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করে আছে। একটি গাছের পাতাও নড়ছে না। উৎসুক একটা প্রতীক্ষা মুহূর্তের মালায় স্তব্ধতার মন্ত্র জপ করে চলেছে। যিনি অচ্যুত তিনি যেন এখুনি বিচ্যুত হয়ে পড়বেন!

চট চট—চটি জুতোর আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন আসছে পঞ্চবটীর ওদিক থেকে। কান খাড়া করল যোগীন। এ তো সেই পরিচিত পদশব্দ। সর্বাঙ্গে শিউরে উঠে তাকাল চন্দ্রালোকে। সত্যিই তো, ঠাকুরই তো আসছেন।

কে কাকে ধরে ফেলে! যোগীনের ইচ্ছে হল মাটির সঙ্গে মিশে যাই? যে মাটিতে তিনি পা রেখেছেন সেই পদস্পর্শনের মাটিতে।

'কি রে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?' কাছে এসে প্রশান্ত বয়ানে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

অধোমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল যোগীন।

অন্তরদর্শী বুঝেছেন এক পলকে। তবু অপরাধ নেবার নাম নেই। তবু আশ্বাসের স্নেহছত্র মেলে ধরলেন স্বচ্ছন্দে। বললেন, 'বেশ, বেশ, এই তো চাই। সাধুকে সহজে বিশ্বাস করবি নে। সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি। নে, চল, ঠিক করেছিস, এখন ঘরে আয়।'

ঠাকুরের পিছু-পিছু ঘরে ঢুকল যোগীন।

সারা রাত আর ঘুম এলো না যোগীনের। মনে-মনে বারংবার ক্ষমা চাইতে লাগল সেই ক্ষমাময়ের কাছে।

ভগবানকে ছোট করেছেন বলে ব্যাসদেব যেমন ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে জগদীশ্বর, তুমি রূপবর্জিত, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপকল্পনা করেছি। তুমি অখিলগুরু, বাক্যের অতীত, অথচ আমি স্তবস্তুতি করে তোমার অনির্বচনীয়তা নষ্ট করেছি। তুমি সর্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থভ্রমণ করে তোমার সেই সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডন করেছি। আমি ঘোরতর অপরাধী। আমার এই বিকল্পতা-দোষত্রয় মার্জনা করো।

তেমনি করেই আকুল অনিদ্রায় ক্ষমা চাইতে লাগল যোগীন। তুমি সংশয়পরিলেশশূন্য। অথচ আমি আমার আবিল মনের কুটিল সন্দেহের ছায়া ফেললাম তোমার উপর। প্রভু, আমাকে ক্ষমা করো। তোমার পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আমাদের ঘনচ্ছন্ন দৃষ্টি—সংশোধন করে দাও।

'কাকে সাধু বলে মশাই?' এক প্রতিবেশী এসে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণকে।

'যার মন-প্রাণ-অন্তরাত্মা ঈশ্বরে নত হয়েছে তিনিই সাধু। যিনি কামকাঞ্চনত্যাগী। যিনি স্ত্রীলোককে মাতৃবৎ দেখেন, পূজো করেন। সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছে জেনে আপামর সকলের সেবা করেন।'

সাধুর আশা নেই, আসক্তি নেই। সে সতত সন্তুষ্ট। সে বহির্নিশ্চেষ্ট। তার আরম্ভ-উদ্যোগ নেই। তার সর্বত্র সমবুদ্ধি। তার ফলেও যা অফলেও তাই। তার কাছে নিন্দা-নান্দী এক কথা। শত্রু-মিত্র এক জন। তার গতি চঞ্চল কিন্তু মতিটি স্থির। তার দ্বেষ-লেশ নেই। সে প্রহ্লাদ মূর্তি। হেতু নেই অথচ ভক্তি। অকারণে অবারণ ভক্তি।

প্রহ্লাদকে যখন কৃষ্ণ বর দিতে চাইলেন, প্রহ্লাদ কী বললে? বললে, 'যদি বর দেবেনই তবে এই বর দিন, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে, তাদের যেন অপরাধ না হয়। তারা যেন কষ্ট না পায়।' যে সাধু সে প্রহ্লাদের মতই সর্বভূতে হিতকামী।

তেমনি এক জন সাধু এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। অক্ষতপুণ্যলেশ। অপঙ্কতোয় অচ্ছোদ সরোবর। তাঁর নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস। অভয়প্রদ আশ্রয়কেতন। তাঁকে দেখবে চলো দলে-দলে।

ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগল কেশব সেন। সাধারণ বক্তৃতামঞ্চ থেকে, এমন কি ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে বসে। স্বশান্তরূপ স্বরূপানন্দ রামকৃষ্ণ। একেবারে বালকস্বভাব। ঘরের কাছে এই অনন্ত ধনের খবর না নিয়ে যাবে তোমরা বিদেশের বিপণিতে?

শুধু রসনা নয়, তেজস্বিনী লেখনী চালালে কেশব। সুলভ সমাচার, সানডে মিরর আর থিইষ্টিক কোয়ার্টালি রিভিয়ুতে লিখতে লাগল।

ওরে আর কেউ নয়, কেশব সেন বলছে, কেশব সেন লিখছে। যেমন তপ্ত ভাষা তেমনি দীপ্ত লেখা। এ কি ফেলা চলে? দেখছিস, বলতে-বলতে কেশবের গৌর আনন কেমন আরক্ত হয়ে উঠছে। একেই বুঝি বলে প্রত্যয়প্রতিভা। কি রে, কি বলছিস, যাবি একবার দক্ষিণেশ্বর? স্বচক্ষে দেখে আসবি?

আর, ওদিকে রামকৃষ্ণ ডাকছে আকুল কণ্ঠে: ওরে, তোরা কোথায়? তোদের ছাড়া আমি যে থাকতে পারছি না। আকাঠের মাঝে কোথায় তোরা সব চন্দন তরু? ধীরতার মাঝে বেগ, জড়তার মাঝে বল, ভীরুতার মাঝে বীর্য—কোথায় তোরা সব সৈনিক সন্ন্যাসী। চলে আয়। বন-জঙ্গল ভেদ করে নদী-নালা সাঁতরে তীরবেগে বায়ুবেগে মনোবেগে চলে আয়। আমি তোদের জন্যে কত কথা কত ভাব কত ভালোবাসা নিয়ে বসে আছি। কত গান কত সুর কত নৃত্য। কত স্বাদ কত রুচি। চলে আয়, চলে আয়।

চুয়ান্ন

কয়াপাটের হাটতলা। সারদাকে নিয়ে এসেছেন শ্যামাসুন্দরী। এসেছেন পিলে দাগাতে।

শিবমন্দিরের অঙ্গনে বহু লোকের ভিড়। জ্বরে-জ্বরে সবাই সারা হয়ে গেল। পিলে দাগানো লোকটিকে ঘিরে সবাইর কাতর ঔৎসুক্য। কার কখন ডাক পড়ে। সবাই পিলে দাগাবে।

খানিকটা আগুন, লোহার শিক আর একটা কি পাতা। এই শুধু সরঞ্জাম। এতেই পিলে পালাবে দেশ ছেড়ে। আর মাথা তুলতে পাবে না।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আবার ফিরতে হবে বাড়ি। কত রাস্তার পথ! শ্যামাসুন্দরী অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'মেয়েকে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে আছি বাবা। যদি একটু এদিক পানে হাত দাও। মেয়ে আমার জ্বরে-জ্বরে ঝুরু-ঝুরু হল।'

'এই যে যাচ্ছি, মা। দেখছ তো গাহেকের ভিড়—'

'তোমার জন্যে একখানা নতুন কাপড় এনেছি। চান করে পরো। একটু জল খাও, তা ও এনেছি তোমার জন্যে—'

লোকটি বুঝি এতক্ষণে সজাগ হল।

'কিন্তু নতুন পাতায় নতুন আগুন নাও। মেয়ে আমার গঙ্গাজলের মতন শুচি।'

তাই হল। পিলে দেগে দিল সারদার।

পিলে আরাম হল বটে, কিন্তু সংসারের দারিদ্র্য আর যায় না। শ্যামাসুন্দরী বাঁড়ুযোদের ধান ভানে। ষোল কুড়িতে এক আড়া। এক আড়া ধান ভেনে চার কুড়ি ধান পায়। মায়ের সঙ্গে সারদাও হাত লাগায়।

গাঁয়ে কালীপূজো হবে। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে পূজোর চাল জোগাড় হচ্ছে। তাদের বাড়ির বরাদ্দ চাল জোগাড় করে রেখেছেন শ্যামাসুন্দরী। কিন্তু গাঁয়ের মোড়ল নব মুখুজ্জে নিলে না সে চাল। কি নিয়ে আড়াআড়ি হয়েছে কে জানে, শ্যামাসুন্দরীর পূজোর চাল ফিরিয়ে দিলে। শ্যামাসুন্দরী সমস্ত রাত কাঁদলেন। বললেন, 'কালীর জন্যে চাল করেছি, নিলে না, ফিরিয়ে দিলে? এখন এ চাল আমার কে খায়? কাকে দিই?'

কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়েছেন। রাত হয়েছে। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখেন দোরগোড়ায় কে এক জন সুন্দরী স্ত্রী বসে আছে চুপচাপ। বসে আছে পায়ের উপর পা দিয়ে মুখ-হাত-পা সব লাল। প্রথম সূর্য উঠলে যেমন হয় তেমনি অরুণ বর্ণের ঝলস দিয়েছে চার দিকে।

স্ত্রীলোকটি কাছে এসে গা চাপড়ে-চাপড়ে ওঠালে শ্যামাসুন্দরীকে।

'তুমি কাঁদছ কেন ? তোমার কালীর চাল আমি খাব।'

শ্যামাসুন্দরী তো অবাক। মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শুধোলেন: 'তুমি কে ?'

'ঐ যে গো—এর পরেই যার পূজো হয়। সেই আমি।'

পরদিন সারদাকে জিগগেস করলেন শ্যামাসুন্দরী: 'গায়ের রঙ লাল, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে—ও কোন ঠাকুর রে সারদা ?'

'জগদ্ধাত্রী।

'আমি জগদ্ধাত্রীর পূজো করব।'

কিন্তু ওটুকু চালে হবে না। আরো চাল লাগবে। বিশ্বাসদের থেকে দু আড়া ধান আনালেন শ্যামাসুন্দরী। ধান আনালেন তো বৃষ্টিও নামল অঝোরে। এক দিনও ফাঁক নেই, সূর্জ্জি গিয়েছে বনবাসে। চাটাই বিছিয়ে ধান মেলে বসে আছি কবে থেকে।

শ্যামাসুন্দরী হতাশার সুর ধরলেন: 'কি করে তবে আর তোমার পূজো হবে মা ? ধানই শুকুতে পাল্লুম নি, তবে চাল করব কি করে ?'

চার দিকে বৃষ্টি, শ্যামাসুন্দরীর ধানের চাটাইয়ে রোদ। জগদ্ধাত্রীর আশীর্বাদ !

কাঠের আগুনে সেঁকে মূর্তি শুকিয়ে রঙ দেওয়া হল। পূজোর পর প্রতিমা বিসর্জনের সময় শ্যামাসুন্দরী মূর্তির কানে বলে দিলেন, 'মা জগাই, আবার আর বছর এসো। আমি বছর ভোর তোমার সব জোগাড় করে রাখব।'

জগদ্ধাত্রীর পূজো করেই শ্রী ফিরল সংসারের।

মেয়েকে শ্যামাসুন্দরী বললেন, 'তুমি কিছু দিও, আমার জগাইয়ের পূজো হবে।'

সারদা থমকে গেল। বললে 'আমি আবার কি দেব ! ও সব ল্যাঠা আমি পারব নি। একবার পূজো তো হল, আবার কেন ?'

রাত্রে স্বপ্ন দেখল সারদা। তিন জন কে-কে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। বলছে, 'আমরা কি তবে যাব ?'

'কে তোমরা ?'

'আমি জগদ্ধাত্রী—আর এরা জয়া-বিজয়া।'

'না মা, তোমাদের যেতে বলিনি, কোথা যাবে তোমরা ? তোমরা থাকো, যেও না।' গলায় আঁচল দিয়ে জগদ্ধাত্রীর পায়ে গড় করল সারদা।

সারদা আর কি দেবে ! শ্রম দেবে, সেবা দেবে। অন্তরের নিষ্ঠা দেবে।

জগদ্ধাত্রীর পূজোর সময় সারদা গিয়ে তাই বাসন মেজে দেয়।

'সেই থেকে বরাবর জগদ্ধাত্রীর পূজোতে জয়রামবাটি যাই—বাসন মাজতে হয় কিনা।' বললেন শ্রীমা 'শেষকালে যোগীন সব কাঠের বাসন করে দিলে। বললে, মা, তোমাকে আর যেতে হবে না বাসন মাজতে।'

প্রতিমা বিসর্জনের সময় জগদ্ধাত্রীর কানের গয়না একটি খুলে রাখলে।

'সেইটিই মনে করে মা আবার আসবেন পরের বছর।' বললেন শ্রীমা।

মা আমাদের রাজরাজেশ্বরী।

তাঁর ফিরে আসতে আভরণের আকর্ষণ লাগে না। তিনি যে দীন-দরিদ্রের মা। শুধু একটি কাতর 'মা' ডাক শুনলেই তিনি চলে আসেন। ডাকও লাগে না, অন্তরে আকুলতা থাকলেই হল। প্রার্থনার চেয়েও বড় হচ্ছে আকুলতা। মুখরের চেয়েও মৌন। মুখে বললেই শুনবেন, আর মনে বললে শুনবেন না, মা কি আমাদের বধির ?

মা আমাদের অমৃতভাষিণী অন্নপূর্ণা। 'অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান।'

কোনো ভয় নেই। মা সর্বতন্ত্রেশ্বরী শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী।

পঞ্চান্ন

তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছে সারদা। যাচ্ছে পদব্রজে।

সঙ্গে ভূষণ মণ্ডলের মা ও আরো ক'জন বর্ষীয়সী মহিলা। আর যাচ্ছে লক্ষ্মী, আর তার ভাই শিবরাম।

কামারপুকুর থেকে আরামবাগ—আট মাইলের ধাক্কা। আরামবাগ পেরিয়েই তেলোভেলোর মাঠ। সে মাঠ পেরিয়ে তারকেশ্বর। তার পরে আবার আরেক মাঠ—কৈকলার মাঠ। কৈকলার মাঠ পেরিয়ে বৈদ্যবাটি। বৈদ্যবাটি থেকে গঙ্গা পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বর।

তেলোভেলো আর কৈকলা এই দু মাঠে ডাকাতের আস্তানা। আর ঐ মাঠ ছাড়াও পথ

নেই। পথচারীদের উপর কখন যে হামলা হবে তা ডাকাতে-কালীই বলতে পারেন। তেলো আর ভেলো, পাশাপাশি দুই গ্রাম, মাঝখানের মাঠে এক ভীমদর্শনা করালবদনা কালীমূর্তি। ঐ ডাকাতে-কালী। দস্যুদের আরাধনীয়া। ধান্যদা ধনদায়িনী। ডাক-নাম 'তেলে'ভেলোর ডাকাতে-কালী। ভূতপ্রমথসেবিকা ঘোরচণ্ডী। রণরামা।

শুধু লুণ্ঠন নয়, চক্ষের পলকে খুন করে ফেলা, লাশ লোপাট করে দেওয়া। যাকে বলে গায়েবী খুন। ডাকাতের সে লাঠি বজ্রের চেয়েও নৃশংস। টাকা-কড়ি যা আছে খুলে দিচ্ছি ঝুলি ঝেড়ে—এটুকু প্রস্তুত হবারও সময় দেয় না। আগে লাঠি, শেষে লুট। কাড়ো আর মারো নয়, মারো আর কাড়ো। এর থেকে একমাত্র উপায় হচ্ছে দল পাকিয়ে পথ হাঁটা। দল দেখে ডাকাতেরা যদি ভয় পায়। দল থাকলে পথচারীদের অন্তত সাহস বাড়ে।

সন্ধের বেশ আগেই পৌঁচেছে আরামবাগ। চলতে চলতে সারদার পা দুখানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাতটা আরামবাগে কোথাও বিশ্রাম করলে হয়! কিন্তু সঙ্গীরা নারাজ। তারা বলে, আঁধার লাগবার আগেই বেলাবেলি তেলোভেলোর মাঠ পেরিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখনো দিব্যি দিন আছে, সহজেই বেরিয়ে যেতে পারব। মিছিমিছি এক রাত নষ্ট করি কেন?

পথক্লান্তির কথা কাউকেও বললে না সারদা। তোমরা যখন চলেছ, আমিও চলি তোমাদের পিছে-পিছে।

কেবলই পিছিয়ে পড়ছে থেকে-থেকে। পা টেনে-টেনে তবু চলে এসেছে চার মাইল। কিন্তু তার সঙ্গীরা কোথায়?

সঙ্গীরা থেমে পড়ছে বারে-বারে। থেমে পড়ছে যাতে পা চালিয়ে এসে সারদা তাদের সঙ্গ ধরতে পারে। কিছুতেই তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না মেয়েটা।

'কাঁহাতক তোমার জন্যে এমনি করে দাঁড়াই বলো তো!' বিরক্তি জানায় সঙ্গীরা: 'বেলা ঢলে পড়ল, এখন একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

সাধ্যমত পদক্ষেপ দ্রুত করে সারদা। কিন্তু তার সাধ্য কি, সঙ্গীদের সঙ্গে তাল রাখে। আবার সে পিছিয়ে পড়েছে। বিশ-পঁচিশ হাত নয়, প্রায় সিকি মাইল।

'এমনি করে চললে কি করে চলবে?' আবার ধমকে ওঠে সঙ্গীরা: 'তোমার জন্যে কি সবাই শেষকালে ডাকাতের হাতে মারা পড়ব? পশ্চিমের আকাশখানা একবার দেখছ?'

সন্ধ্যার শেষ লালিমাটুকুও মিলিয়ে যায় বুঝি।

সত্যিই তো! তার একলার অক্ষমতার জন্যে সবাই কেন বিপন্ন হবে? ওদের কি দোষ! ওদের দেহে যখন শক্তি আছে তখন ওরা যাবেই তো আগ বাড়িয়ে। নিজের সুবিধের জন্যে ওদের সে অসুবিধে ঘটাবে কেন?

'তোমরা আমার জন্যে আর দাঁড়িয়ো না—চলে যাও সোজাসুজি।' সঙ্গশূন্যতার ভয়ে এতটুকু কাতর নয় সারদা। নেই এতটুকু অসহায়তার সুর। বললে, 'একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে গিয়ে ওঠো। আমি সেখানে গিয়েই ধরব তোমাদের। আমার শরীর আর বইছে না—আমি যাচ্ছি আস্তে-আস্তে।'

'যত শিগগির পারিস বেরিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। চার দিক আঁধার হয়ে এল। মাঠের বড় দুর্নাম—'

পিছনে ফিরে তাকিয়েও দেখল না। সারদাকে ফেলেই দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল সঙ্গীরা। মিলিয়ে গেল চোখের বাইরে। জনমনুষ্যহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সারদা একা।

শরীরে আর দিচ্ছে না, তবু কষ্টে পা টেনে-টেনে চলেছে। অন্ধকারে পথ-ঘাটের ইসারা পাচ্ছে না। কোথায় যেতে কোথায় চলে আসছে কে জানে।

'কে যায়!' কে-একজন বাঘের গলায় হুমকে উঠল।

প্রকাণ্ড একটা কালো লোক চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দৈত্যের মতন চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে রূপোর বালা, কাঁধে মস্ত লাঠি।

'কে যায়!'

'তোমার মেয়ে গো—সারদা।'

নির্জন মাঠের মধ্যে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, আমার মেয়ে! লোকটার কানে কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল এত বছর ধরে ডাকাতি করছি, কই, এমন কথা তে কখনও শুনিনি!

সারদার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ডাকাত স্থির প্রতিমার মতই দাঁড়িয়ে রইল সারদা। প্রতিমা মতই স্থির নেত্রে।

'কে তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'বাবা, দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছিলাম। চলতে পাচ্ছিলাম না, তাই আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়েছে। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছ কেন?'

'দক্ষিণেশ্বরে যে তোমার জামাই থাকে। রাণী রাসমণির কালীবাড়ি আছে না? সেই কালীবাড়িতে তিনি থাকেন। তাঁর কাছেই আমি যাচ্ছি।'

কেমন যেন মধুময় লাগল কণ্ঠস্বর। বাগদি ডাকাতের বুকের ভিতরটা আনচান করে উঠল। শুধু ডাকাতের নয়, সেই কণ্ঠস্বরের আমেজ এসে লাগল যেন আরো এক জনের কানে। কাছেই কোথায় ছিল, ছুটে এল সে ব্যাকুল পায়ে। সারদা তো অবাক, এ যে দেখি স্ত্রীলোক। দেখেই বুঝল, বাগদি-ডাকাতের স্ত্রী।

তার হাত দুখানা চেপে ধরল সারদা। যেন অকূলে কূল পেল।

'তুমি কে গা?' ডাকাত-পত্নীর চোখে স্নেহকরুণ জিজ্ঞাসা।

'তোমার মেয়ে সারদা। চিনতে পাচ্ছ না? যাচ্ছিলুম দক্ষিণেশ্বরে, তোমার জামাইর কাছে। সঙ্গীরা পিছে ফেলে আগে-আগে পালিয়ে গিয়েছে। ফাঁকা নির্জন মাঠে অন্ধকারের মধ্যে কী বিপদেই পড়েছিলুম, মা! তোমাদের পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। তোমাদের না পেলে কী সর্বনাশ যে হত কে জানে।'

প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কঠিন পাথর ফেটে বেরুল সুধা-ধারা। দয়াহীন মরুভূমির আকাশে নম্র মেঘের মাধুর্য।

'মেয়ে আমার নেতিয়ে পড়েছে যে গো। কিছু ওকে খেতে দাও আগে।' ডাকাত-বউ বললে ডাকাতকে।

'না, আমি এগোই। তারকেশ্বরে গিয়ে ধরব আমার সঙ্গীদের।'

অসম্ভব, পথের মাঝেই পড়বে টাল খেয়ে। বাপ হয়ে মেয়েকে কেউ পাঠাতে পারে না এ বিপদের মুখে। এ ঘোর অন্ধকারে, জনশূন্য মাঠের মধ্য দিয়ে। তার শরীরের এই অবসন্ন অবস্থায়।

তার চেয়ে চলো, কাছে-পিঠে যে দোকান আছে, সেখানে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করি। রাত ফুরুলে খোঁজা যাবে ফের পথের নিশানা। তোমার সঙ্গীদের উদ্দেশ।

তেলো-ভেলোর ছোট একটি মুদি দোকান। সেখানেই নিয়ে গেল সারদাকে। নিজের হাতে শয্যা রচনা করল ডাকাত-বউ। ডাকাত নিজে গিয়ে মুড়ি-মুড়কি কিনে আনল।

বাপের দেওয়া খাবার তৃপ্তি করে খেল সারদা। মায়ের করা বিছানায় শুলো আরাম করে। ছোট মেয়েকে মা যেমন করে ঘুম পাড়ায় তেমনি করে ডাকাত-বউ ঘুম পাড়াল সারদাকে। আর সারা রাত লাঠি-হাতে দুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে রইল ডাকাত-বাবা।

কোথায় সব কিছু লুটপাট করে, চাই কি গুম খুন করে ফেলবে—তা নয়, নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি দুয়ারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে!

উপায় কি! এ যে তার মেয়ে। যে মেয়ে সেই আবার মা!

ভোরে ঘুম ভাঙতেই মেয়েকে নিয়ে এগোলো তারকেশ্বরের পথে। ক্ষেতে কড়াইশুঁটি ফলেছে। তাই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ডাকাত-বউ দিতে লাগল সারদাকে। বললে, 'তোর খিদে পেয়েছে, খা।' মুখ ধোয়া হয়নি, তবু ছোট মেয়ের মত তাই খেতে লাগল সারদা। স্বাদে অপূর্ব মাতৃস্নেহ।

চার দণ্ড বেলা হয়েছে, পৌঁছুল তারকেশ্বর।

'আমার মেয়ে কাল সারা রাত কিছু খায়নি। যাও, শিগগির-শিগগির বাবাকে পূজো দিয়ে বাজার করে নিয়ে এসো। মাছ-তরকারি দিয়ে মেয়েকে ভালো করে খাওয়াতে হবে।' ডাকাত-বউ তাগিদ দিল স্বামীকে।

বাগদি-ডাকাত বাজার করতে ছুটল। তার মেয়ে শ্বশুর-ঘরে যাচ্ছে। যাবার আগে বাপের বাড়িতে আজ তার শেষ খাওয়া।

সঙ্গীদের সন্ধান পেল সারদা। 'ওমা, তুই বেঁচে আছিস? আসতে পেরেছিস পথ চিনে? কোথায় ছিলি তুই সারা রাত?'

বাবা-মার কাছে ছিলাম। ছিলাম নির্ভয়ের আশ্রমে, নিশ্চিন্তের প্রোড়নীড়ে। বাৎসল্য-রসের সরসীতে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায়ের পালা এল। যাত্রীদল এবার বৈদ্যবাটির পথ ধরবে।

বাগদি বাপ-মা কাঁদতে লাগল অঝোরে। মেয়ে সারদাও নিজেকে সামলাতে পারল না। সেও কান্নায়

ভেঙে পড়ল। এক রাতের পরিচয়ে এক জন্মের সম্পর্ক। কণ্ঠের একটি মাতৃ সম্বোধনেই অনন্ত জীবনের বন্ধন।

এমন মেয়ের বিচ্ছেদ সয়ে কি করে বাঁচবে তারা? কাঁদতে-কাঁদতে অনেক দূর পর্যন্ত এগোল বাগদি-বাগদিনী।

বাগদিনী কড়াইশুঁটি ছিঁড়ে মেয়ের আঁচলে বেঁধে দিল যত্ন করে। বললে, 'মা সারু, রাতে যখন মুড়ি খাবি, তখন এগুলো দিয়ে খাস।' বলতে-বলতে নিজের আঁচলে চোখ চেপে ধরল।

বাগদি বললে, 'যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী না সঙ্গে থাকত, সোজা তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতাম। দেখে আসতাম জামাইকে।'

'কিন্তু বলো দক্ষিণেশ্বরে তুমি যাবে।' সারদা পিড়াপিড়ি করতে লাগল।

রাজি করাল ডাকাত-বাবাকে। মাঝে-মাঝে গিয়ে মেয়েকে না দেখে এসে কি সে থাকতে পারবে? মা কি মেয়েকে পাঠিয়ে দেবে না তার নিজের হাতে গড়া মোয়া-নাড়ু?

পথ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ডান দিকের রাস্তায় বাবা আর মা চলে গেল, সারদা আর তার সঙ্গীরা চলল বাঁ-দিকে। যত দূর দেখা যায় বাবা আর মা ফিরে-ফিরে তাকায় আর কাঁদে। সারদাও থেকে-থেকে তাকায় পিছন ফিরে আর আঁচলে চোখ মোছে।

ডাকাতের ছদ্মবেশে কে এরা বাগদি-বাগদিনী?

জানিস আমরা কী দেখলুম? গাঁয়ে ফিরে এসে বলতে লাগল বাগদি-দম্পতি। দেখলুম, স্বয়ং কালী এসে দাঁড়িয়েছেন। যে কালীর পূজো করি সেই কালী।

বলো কি গো? দেখলে? ঠিক তাই দেখলে!'

সত্যি-সত্যিই দেখলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখি এমন সাধ্য কি। আমরা যে পাপী। আমরা পাপী বলে যে রূপ গোপন করে ফেললে। সারাক্ষণ দেখতে দিলে না।

চকিতে যখন একবার দেখেছ তখন পলকেই পাপ চলে গিয়েছে। চকিতের দেখাই অনন্ত কালের দেখা। যা চকিত তাই চিরকালিক।

[ক্রমশঃ।

হায় হাবার্ড!

আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল আবিষ্কার করেছিলেন টেলিফোন। টেলিফোন যখন কথা বলার মাধ্যমরূপে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তখনও গ্রাহাম আবিষ্কারের নেশায় মগ্ন। গ্রাহাম ছিলেন উপকারী, জনগণের সেবা করতে পেলে অন্য কিছুতে দৃষ্টি থাকতো না। টেলিফোন আবিষ্কারের আগে, পিতা মেলভিলকে সাহায্য করতেন গ্রাহাম। মেলভিল তখন এক উপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত, মূকদের মুখে কথা ফোটাতে। উপায়টি হ'ল Visible speech. বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্র স্থাপিত হ'ল, মেলভিল শিক্ষা দেবেন মূকদের। গ্রাহাম পিতাকে সাহায্য করছেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গ্রাহাম ম্যাবেল জি হাবার্ডকে বিবাহ করলেন। গ্রাহাম টেলিফোন আবিষ্কারে ব্যাপৃত থাকেন, হাবার্ড পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। টেলিফোন আবিষ্কৃত হ'ল, গ্রাহাম আত্মোৎসর্গ করলেন মূকদের মুখে কথা ফোটাতে। কেন? মূকদের প্রতি গ্রাহাম কেন এত দৃষ্টি দিলেন? হাবার্ড, যিনি গ্রাহামকে সাহায্য করতে পেলে স্বর্গসুখ পেতেন তিনি যে ছিলেন শৈশব থেকে মূক। যন্ত্র কথা বললে যাঁর কৃপাদৃষ্টিতে, সেই গ্রাহাম কিন্তু স্ত্রী হাবার্ডকে কখনও কথা বলাতে সক্ষম হ'লেন না।

ভদ্দোরলোকের ছেলে

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

আমাদের এই বেঁচে থাকা
যদি বলি মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক
বিশ্বাস করবে কি ?
ভদ্দোরলোকের ছেলে আমরা
কাছা কোঁচা দিয়ে কাপড় পরি।
খোবতুরস্ত পাঞ্জাবীর তলায়
করাল দারিদ্র্যকে লুকিয়ে রাখি
আত্মনিগ্রহের দুঃসহ যন্ত্রণায়।

আমরা ভদ্দোরলোকের ছেলে !
বিন্দুমাত্র লজ্জিত হই না কথাটা উচ্চারণ করতে,
কুলি মজুর চাষাভুসো ছোটলোকদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলি
কী দুর্দমনীয় আমাদের আভিজাত্যবোধ !
কী হৃদয়বিদারক আমাদের ভদ্রতা !

কেমন আছেন ?
পরিচিতেরা পথে-ঘাটে প্রশ্ন করে
(এ ছাড়া আর কি প্রশ্নই বা আমাদের আছে ?)
মনে মনে জানি এর উত্তর
বৈদান্তিক সূত্রের মতো সংক্ষিপ্ত :
ভালো আছি !!!
আহা কী মর্মান্তিক শিষ্টাচার !
প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে বিষণ্ণ গম্ভীর মানব-সত্তা
কুঁকড়ে-মরা লজ্জার স্বগত ভাষণে।

এক জন পেশীজীবী শুষ্কমেজাজী সিংহবিক্রম মজুর
আমাদের চেয়েও সুখী
আমাদের চেয়েও মহান্‌
রূঢ় ভাষায় গর্জন কোরে ওঠে মজুরীর দাবীতে,
সভ্যতার বনিয়াদ ওরা বিপ্লবের অগ্রদূত।

আর আমরা ?
মহা মাননীয় ভদ্দোরলোকের ছেলে
চেঁচিয়ে কথা বললে জাত হারাই
ন্যায্য পরিশ্রমের দাম চাইতে মাথা কাটা যায়।
লাঞ্ছিত ভদ্রজীবনের সকরুণ অহঙ্কারে
আমাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।
উন্নাসিক পরিভাষায় মজুরীর নাম দিয়েছি সম্মান-মূল্য
ব্রাহ্মণ্য প্রথায় দক্ষিণা বললে আরো খুশি হই।
আহা আমরা ভদ্দোরলোকের ছেলে !!

ভদ্দোরলোকের ছেলে আমরা
প্রবঞ্চিত জ্ঞান-গরিমার ঔদ্ধত্যে
দারিদ্র্যকে পুষে রাখি সংসারকে পথে বসিয়ে।
আমাদের যশোগৌরবের কঙ্কাল
তিমিরগর্ভ জন্মভূমির অশ্রু-সমুদ্রে
দিশাহারা ফসফরাসের মতো জ্বলে।
আমাদের ধারালো বুদ্ধির সিঁড়ি ভেঙে
একচেটে ব্যবসায়ীদের জাতীয় শিল্পোন্নয়নের বিজয়-বৈজয়ন্তী।
আর আমরা ?
নির্লোভ নিরাসক্ত নির্বিকার
বুদ্ধিবিলাসের শুচিবায়ুগ্রস্ত অমায়িক ভদ্দোরলোকের ছেলে !

আমাদের মেকী আভিজাত্য দেখে
লাটসাহেবও লজ্জা পায় !
আর ডাষ্টবিনের কুকুরগুলো ঘেন্নায় ল্যাজ নাড়ে।
পথের মাঝখানে কোনো ওৎপাতা পাওনাদার
গলায় গামছা দিতে এলে
পথের ভিখিরীটাও সহানুভূতিতে বলে ওঠে :
আহা যেতে দাও, যেতে দাও,
হাজার হলেও ভদ্দোরলোকের ছেলে !!
পদাঘাতের ধুলো মুছে মুছেই আমাদের পরিচ্ছন্নতার মহিমা ;
আত্মধিক্কারের বৃশ্চিকদংশনেই আমাদের প্রশংসনীয় সংযম !
সত্যিই আমরা ভদ্দোরলোকের ছেলে !

ভদ্দোরলোকের ছেলে আমরা ভদ্দোরলোকের ছেলে !
আমাদের শিক্ষিতা সেবাদাসী অর্ধাঙ্গিনীদের
শতকরা নব্বই জনের টি, বি,
মনু না কি বলে গেছেন :
'নার্য্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রম্যন্তে তত্র দেবতাঃ !'
আর কাচ্ছা বাচ্ছা বংশধরগুলো যেন চলন্ত লিভার পিলে
মাথার ভারে টলে পড়ে
ঔপনিবেশিক অনাহারের ঘূর্ণী ঝড়ে।

পুরাণ ইতিহাস মহাকাব্য হাতড়ে
তাদের কী রোমাঞ্চকর নামকরণ !
আহা নাম !
আহা ভদ্দোরলোকের ছেলের নাম !
শ্মশানঘাটে মৃত্যুর নাম-খারিজের খাতায়
লিখতে লিখতে কবিযশঃপ্রার্থী কেরাণী বাবুর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে !
চিতায় অগ্নিদানের মন্ত্রোচ্চারণের মড়িপোড়া বামুন
খেকিয়ে ওঠে, আহা কী নাম !
ভদ্দোরলোকের ছেলের প্রাগৈতিহাসিক স্বর্গারোহণ পর্বে :
বলো হরি হরিবোল ! রাম নাম সত্য হ্যয় !
জ্বলন্ত চিতার শিখায় শিখায়
স্বর্গের সিঁড়ি রচনা করে।
শ্মশান-বৈরাগ্যের শান্তিশতকে
দার্শনিক হয়ে ওঠে—
শোকার্তসম্বিৎ ভদ্দোরলোকের ছেলে আহা ভদ্দোরলোকের ছেলে !

যদি বলি : কি হলে কি হতে পারতুম
এই আফশোসেই জীবনটা হাওয়াই বেলুনের মত ক্রমস্ফীত
স্বীকার করবে কী ?
দ্বিজু রায়ের নন্দলালই অধিকাংশ সুবিধাবাদী ভদ্রসন্তানের
জীবন দর্শন।
আর আমাদের মধ্যে যে সব ভদ্দোরলোকের ছেলেরা
সংস্কৃতি ও শিল্প-সাধনার ব্রত নিয়েছি
স্বাধীন ভারতের আত্মসুখপরায়ণ রাষ্ট্রনেতাদের কাছে
যাদের জীবন-যাপনের কোনো অঙ্গীকার কোনো প্রতিশ্রুতি নেই—
নিঃশব্দ রক্তক্ষরণে যাদের দীর্ঘশ্বাস শূন্যাশ্রয়ী,
তাদের ভদ্র-জীবনের সৌজন্যবোধই
আজ তাদের শ্রমশোষিত জীবনের চরম অভিশাপ !
এই নির্বিকল্প শুদ্ধাচারই তাদের সাধনার শত্রু।
তাই আজ অন্যায়ের প্রতিবাদ
সবপ্রকার শোষণের বৈপ্লবিক বিরোধিতা
সামাজিক জীবন-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী
আমাদের গলা দিয়ে বেরোয় না,
আমাদের মুষ্টিবদ্ধ বাহু জ্বলে ওঠে না
আমাদের রিক্ত বুকের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ
অগ্নিগিরির লাভা উদ্গীরণ করে না,
নিরাপদে বেচে থাকার অহংসবস্ব দীনতায় !
আমরা যে বিজ্ঞানভিক্ষু ভদ্দোরলোকের ছেলে।

আহা আমরা ভদ্দোরলোকের ছেলে ;
বনেদী আঁস্তাকুড়ের উচ্ছিষ্টভোজনেই আমরা খুশি

ইঙ্গ-ভারতীয় সভ্যতার ফুটপাতে শুয়ে
কংগ্রেসী ফুলবাগানের গন্ধ শুঁকি
আর বিকলাঙ্গ পূর্ণ স্বরাজের কূটনৈতিক আত্মবিলোপে

ভাগ্যাকাশের তারা গুণি।
আমাদের এই পোষমানা জীবন কী নিরীহ!
কী নিদারুণ বৈদগ্ধ্যপরায়ণ!
শান্তির ললিতবাণী শুনি আর স্বপ্নজাল বুনি
ছিন্নমস্তা জীবনের চট্‌চটে লালায়
নির্বিবাদী মাকড়সার মতো!
আহা ভদ্দোরলোকের ছেলে আমরা ভদ্দোরলোকের ছেলে!

তবু তুমি স্থির জেনো মনে
শতাব্দীর অগ্নি-ঝড়ে শ্রেণীচ্যুত ভদ্দোরলোকের ছেলে
আমাদেরি হাড়ে হাড়ে দধীচির অগ্নিচোখ মেলে
নিঃশেষে ভুলেছে আজ অর্থহীন ভদ্রতার মোহ
মহামানবতা মন্ত্রে মুক্তি-সাধনায়।
অদ্বিতীয় অহংকার একাকার আঘাতে আঘাতে
আমাদেরি শুভ্র চেতনায়।
ভদ্দোরলোকের ছেলে আমরা!
নির্মম নিষ্ঠুর গালাগালি
মনে হয়, এ যেন বিদ্রূপ!
হে মানুষ, খেটে-খাওয়া অসংখ্য মানুষ
আমরা আজ তোমাদেরি দলে
তোমাদেরি বন্যাস্ফীত লবণাক্ত অশ্রুর অতলে
জলস্তম্ভে পরিণত
লৌকিক বুদ্ধির বাষ্পে প্রচণ্ড টাইফুন্!
ভদ্দোরলোক! আহা ভদ্দোরলোক!
নুণের পুতুল আজ নোণাজলে ঝাঁপ দিয়ে
একাকার মানুষের বিপ্লবের সামুদ্রিক ঝড়ে।
ইতিহাস উল্টে যায়
কীটদষ্ট প্রাচীন পাতায়
লেখা থাকে বেদনার লজ্জার অক্ষরে
এক দিন পৃথিবীতে ছিল :
ভদ্দোরলোকের ছেলে আহা ভদ্দোরলোকের ছেলে!

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

পক—পাকা, সিদ্ধ, ক্লিন্ন, বয়স্থ, বয়স্ক।
পক্ষ—পার্শ্ব, মাসার্দ্ধ, দল, পাখা।
পক্ষপাত—গণতা, অনুগ্রহ, সহকারিতা।
পক্ষবান—ডানাযুক্ত, পাখাবিশিষ্ট।
পক্ষান্তরে—অন্যপক্ষে, নতুবা।
পক্ষী—পাখী, বিহঙ্গম।
পঙ্ক—কর্দ্দম, কাদা, পাঁক।
পঙ্গ—ফড়িঙ্গ, পতঙ্গ।
পট—ছবি, চিত্র, ছবিযুক্ত পত্রাদি।
পঠন—অধ্যয়ন, পাঠকরণ, পড়ন।
পড়সী—প্রতিবাসী, প্রতিবেশী, নিকটবর্ত্তী।
পণ্ডিত—বিদ্বান, গুণবান, বুধ, কোবিদ।
পত্তন—গ্রাম, নগর, বসতি, প্রারম্ভ।
পত্র—দল, লিপি, পাতা, চিঠি।
পথ—বর্ত্ম, পদবী, মার্গ।
পদাতিক—পদাতি, পদগামী, পত্তি, ভৃত্য।
পদাবলী—পদশ্রেণী, ছন্দ।
পদার্থ—বস্তু, ইন্দ্রিয়গোচর।
পদ্ধতি—পথ, শ্রেণী, রীতি, পদবী।
পদ্বী—উপাধি, নাম, কুলসংজ্ঞা।
পদ্ম—পঙ্কজ, কমল, সরোজ, ব্যূহবিশেষ।
পদ্মনাভ—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বিধাতা।
পদ্য—শ্লোক, ছন্দ, ব্যবহার, রীতি।
পন্নগ—ভুজঙ্গ, অহি, সর্প, বিষধর।
পবিত্র—শুদ্ধ, শুচি, পরিষ্কৃত, নির্ম্মল।
পয়ঃ—পয়স, দুগ্ধ, জল, সলিল।
পয়নালা—প্রণালী, নল, নর্দ্দমা।
পয়মন্ত—ভাগ্যবান, অদৃষ্টবান।
পয়সা—তাম্রমুদ্রা।
পয়োধর—মেঘ, জলধর, স্তন, বক্ষোজ।
পর—অন্য, দূরস্থ, পশ্চাৎ, শত্রু।
পরকলা—স্বচ্ছ, তেজোময়, উজ্জ্বল।
পরখ—পরীক্ষা, পরখাই, বিবেচনা।
পরছন্দ—পরাধীন, পরতন্ত্র, পরবশ।
পরত্র—পরকালে, অন্যত্র, ইতরমধ্যে।
পরব—পর্ব্ব, উৎসব।
পরভৃত—কোকিল, পিক পক্ষী।
পরমপুরুষ—পরমাত্মা, পরমেশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা, পরাৎপর।
পরমলাভ—আশ্বাস, সান্ত্বনা, উত্তম লাভ।
পরমহংস—যোগী, সিদ্ধ, ব্রহ্মনিষ্ঠ।
পরমাণু—অতি সূক্ষ্ম বস্তু, লেশ, কণা।
পরমান্ন—পায়স, ক্ষীরিকা।
পরমায়ু—জীবনকাল, আয়ু।
পরম্পর—ক্রমাগত, উত্তরোত্তর।
পরম্পরা—আনুপূর্ব্বিক, ধারাবাহিক।
পরলোক—পরকাল, উত্তরকাল।
পরশাড়া লতা, স্তাবক, চাটুবাদী।
পরশু—কুড়ালি, কুঠার, টাঙ্গী।
পরশ্ব—পরশু, আগামী বা গত তৃতীয় দিন।
পরাক্রম—বিক্রম, প্রতাপ, শক্তি।
পরাগ—পুষ্পরেণু, ধূলি, সূর্য্যগ্রহ।
পরাজয়—পরাভব, হার।
পরাজয়ী—পরাজিত, পরাস্ত, পরাভূত।
পরাবজ্ঞ—তুচ্ছকারী, অবজ্ঞাকারী।
পরামর্শ—বিবেচনা, মন্ত্রণা, যুক্তি।
পরায়ণ—পক্ষপাতী, তৎপর।
পরিকল্পনা—কৌশল, শৈলী, উপায়।
পরিকীর্ত্তন—প্রস্তাব, প্রতিষ্ঠা করা।
পরিখা—খাত, খানা, গড়।
পরিগত—জ্ঞাত, বিদিত, চেষ্টিত, প্রাপ্ত।
পরিগৃহীত—প্রাপ্ত, স্বীকৃত, লব্ধ।
পরিঘ—গদা, মুদ্গর, শূল, কাচপাত্র।
পরিচয়—জানন, জিজ্ঞাসাবাদ, জ্ঞাতসার।
পরিচর্য্যা—সেবা, অনুবৃত্তি, উপাসনা।
পরিচারক—উপাসক, সেবক, অনুচর।
পরিচিত—জ্ঞান, জানত, বিদিত, অবগত।
পরিচ্ছদ—বস্ত্র, বেশ, কাপড়, পরিধেয়।
পরিচ্ছন্ন—পরিহিত, বেষ্টিত।
পরিস্থিতি—সীমা, ব্যবধান, নিষ্পত্তি।
পরিচ্ছিন্ন—সীমাযুক্ত, পরিমিত, পরিষ্কৃত।
পরিচ্ছেদ—সীমা, বিভাগ।
পরিজন—পোষ্যবর্গ, পরিবার, স্বজন।
পরিজ্ঞাপন—জানান, বুঝান, বিজ্ঞাপন।
পরিণত—পক্ক, পাকা, অবস্থান্তর প্রাপ্ত।
পরিণয়—বিবাহ, দারপরিগ্রহ, পাণিগ্রহ।
পরিণাম—ভাবান্তর, শেষ, উত্তরকাল।
পরিণামদর্শী—দূরদর্শী, বিজ্ঞ, বিবেচক।
পরিতাপ—যাতনা, দুঃখ, অতিশয় উষ্মা।
পরিত্রাণ—রক্ষা, উদ্ধার, আত্মরক্ষা।
পরিধি—বেড়, সূর্য্যমণ্ডল, পরিবেশ।

পরিপক্ক—পরিণত, পাকা, সুজীর্ণ।
পরিপন্থী—শত্রু, বিপক্ষ, ঠগ।
পরিপাক—সম্পূর্ণতা, সুজীর্ণতা, পক্কতা।
পরিপাটী—উত্তম, যথাক্রম, ধারা, সুন্দর।
পরিপূর্ণ—পূরিত, সম্পূর্ণ, ভরা, প্রচুর।
পরিব্রাজক—সন্ন্যাসী, ভ্রমণকারী।
পরিভাষা—কথোপকথন, শাস্ত্রসঙ্কেত।
পরিমণ্ডল—চক্র, গোল, গ্রহাদির পথ।
পরিমল—সুগন্ধ দ্রব্য, চন্দনাদি চূর্ণ।
পরিমাণ—মাপ, সংখ্যা।
পরিমিত—মাপিত, সীমাযুক্ত, পরিচ্ছিন্ন।
পরিশেষ—অন্ত, সীমা, অঞ্চল, সমাপ্তি।
পরিশ্রম—উদ্যোগ, চেষ্টা, অত্যায়াস।
পরিশ্রান্ত—ক্লান্ত, অতিশ্রান্ত।
পরিষৎ—সভা, গোষ্ঠী।
পরিষ্কার—নির্ম্মল, স্বচ্ছ, শুদ্ধ।
পরিসীমা—শেষ, অবধি, অন্ত, ইয়ত্তা।
পরিহাস—কৌতুক, বিদ্রূপ, ক্রীড়া।
পরুষ—নিষ্ঠুর, কর্কশ বাক্য, কঠিন।
পরে—পশ্চাতে, শেষে।
পরেদ্যুঃ—পরদিনে, কল্য, আগামী দিনে।
পরোক্ষ—অগোচর, অসমক্ষ, অসাক্ষাৎ।
পর্ণ—পত্র, পলাশ বৃক্ষ, পাণ, তাম্বূল।
পর্ব্বত—শৈল, গিরি, অচল, অদ্রি।
পর্য্যঙ্ক—খাট, খট্টা, পালঙ্ক।
পর্য্যটন—ভ্রমণ, বেড়ান, আকুঞ্চন।
পর্য্যায়—ক্রম, পালা, যথাক্রম।
পলক—চক্ষু-পল্লব, অক্ষিপুট, নিমেষ।
পলাল—পোয়াল, খড়, বিচালী।
পলিত—যড়িত, লোলিত।
পলিতা—বর্ত্তি, বর্ত্তিকা, শলিতা।
পাংশু—ধূলি, পরাগ, রেণু, রজঃ, ভস্ম, পাঁশ।
পাঁজরা—পঞ্জর, পাঁজড়া, পশু‍র্কা।
পাঁজা—রাশি, বোঝা, আঁটি, গাদা।
পাক—পরিপাক, জীর্ণ, ঘূর্ণ, রন্ধন।
পাকনা—আবর্ত্ত, ঘূর্ণাজল, পাকচক্র।
পাকিম—পরিপক্ক, পাকল, পাকা।
পাখা—পালখ, পক্ষ, ডেনা, ডানা, ব্যজন।
পাগ—পাগড়ী, উষ্ণীষ, শিরোবেষ্টন বস্ত্র।
পাগল—উন্মত্ত, উন্মাদ, বায়ুগ্রস্ত।

পাচড়া—কণ্ডুরোগ, কচ্ছ, ক্ষতবিশেষ, পাম।
পাছ—পাছু, পশ্চাৎভাগ, পৃষ্ঠদেশ।
পাছাড়—মল্লযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ, মল্লক্রিয়া।
পাজা—ভাটী, ইষ্টক আখা, ইষ্টকস্তূপ, পাটিকেল, পাটকল
পাজী—অধম, হেয়, তুচ্ছ, নীচ।
পাটল—বর্ণবিশেষ, আশুধান্য।
পাটা—পটুকা, তক্তাবিশেষ।
পাঠ—অধ্যয়ন, পড়া, অধ্যায়, শিক্ষা।
পাঠক—অধ্যয়নকারী, অধ্যাপক।
পাঠগুরু—শিক্ষক, অধ্যাপক।
পাঠশালা—বিদ্যালয়, অধ্যয়নগৃহ।
পাড়—তট, তীর, কূল।
পাড়া—পল্লী, পল্লীগ্রাম, ক্ষুদ্র গ্রাম।
পাণ্ডা—পূজারী, পরিচারক, যাজক।
পাণ্ডিত্য—বিদ্যা, শাস্ত্রজ্ঞান, জ্ঞান।
পাণ্ডুরোগ—রোগবিশেষ, নেবা।
পাণ্ডুলিপি—পাণ্ডুলেখ্য, পাতড়া, খসড়া।
পাথর—পাষাণ, উপল, শিলা।
পাদ—পা, পদ, অংঘ্রি।
পাদাঙ্ক—পাদচিহ্ন, উদ্দেশ।
পাদুকা—বিনামা, উপানৎ, জুতা।
পাপ—অধর্ম্ম, অপরাধ, অঘ, পাতক।
পারক—সমর্থ, দক্ষ, পটু, পারগ, সক্ষম।
পারিষদ—সহচর, সভাসদ, পার্ষদ, পাষদ।
পারুষ্য—তিরস্কার, কটূক্তি, অনুযোগ।
পার্থক্য—পৃথক্ হওয়া, বিভিন্নতা, পৃথকতা।
পালকী—শিবিকা।
পাশক—অক্ষ, পাষ্টি, পাশা।
পিছল—পিচ্ছল, চিক্কণ।
পিছান—হঠান, থামান, পাছু।
পিঞ্জর—পঞ্জর, খাঁচা, বক্ষস্থল।
পিঠা—পূপ, পিষ্টক, পিঠে।
পিণ্ড—পিণ্ডি, বর্ত্তুল, গোলাকার বস্তু।
পিতা—তাত, জনক, বাপ, পিতৃদেব।
পিতৃব্য—পিতৃভ্রাতা, খুড়া, কাকা।
পিত্তল—তৈজস, ধাতুবিশেষ।
পিপীলিকা—পিঁপীড়া, পিপীলক, পিঁপড়ে।
পিপুল—পিপ্পলী, উষণ বিশেষ।
পীড়া—ব্যাধি, রোগ, ব্যথা, তাপ।
পীযুষ—অমৃত, সুধা, গোদুগ্ধ।

[ক্রমশঃ।

(শ্রীহরিহর শেঠকে লিখিত)

শ্রীশ্রীদুর্গা

বমনা, ঢাকা
জুলাই ১৩, ১৯২৩

কল্যাণবরেষু

আপনার "প্রতিভা" পড়িলাম। আগাগোড়া না পড়িলে ত গল্পের বই বা নাটক পড়া হয় না তাই সবটাই পড়িলাম। প্রতিভার চরিত্রটি খুব ফুটিয়াছে। সংসারে ওরূপ চরিত্র নাই এ কথা বলা চলে না। তবে কবি-কল্পনায় ও-চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। ঐটি বোধ হয় আপনার প্রধান চরিত্র। প্রতিভাই উমানাথের সকল সদ্‌গুণের পুরস্কার। বহির্জগতের পুরস্কার অন্তর্জগতেরও পুরস্কার।

আপনি অর্থাগমের জন্য দিনরাত্র পরিশ্রম করিয়াও কেমন করিয়া যে বই লেখেন বুঝিতে পারি না। এরূপ একখানা বই লিখিতে কম সময় যায় না, কম ভাবনা ভাবিতে হয় না। আপনি সে ভাবনার সময় পান কেমন করিয়া।

আপনার বই দু'খানি আমি যত্ন করিয়া আমার পুস্তকালয়ে রাখিয়া দিলাম।

শুভার্থী
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৪৯ লীডার রোড
এলাহাবাদ, ৬।১।১৯৩৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ১৫ই নভেম্বর তারিখের চিঠিখানি যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তাহাতে আপনি রামচন্দ্র গান্টির মৃত্যুর অনুসন্ধানের কথা জানাইয়াছিলেন। আমার কর্ম্মশক্তি কমিতেছে এবং নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এই জন্য যথাসময়ে চিঠির উত্তর দেওয়া হয় না। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষামন্দির সম্বন্ধে আমার যত কিছু লিখিয়া পাঠাইতেছি।

আপনি কিছুদিন পূর্ব্বে মেজর বামনদাস বসুর Ruin of Indian Trade and Industries বহির Introduction অনুবাদ করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ বহির বাংলা অনুবাদ অন্য এক জন ছাপিবার অনুমতি মেজর বসুর পুত্র ডাক্তার ললিত মোহন বসুর নিকট চাহিয়াছেন। কিন্তু আপনি যদি অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমি শ্রীমান ললিতকে আপনাকেই অনুবাদ প্রকাশের অধিকার দিতে বলিয়াছি। এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানাইলে বাধিত হইব।

আশা করি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমি দীর্ঘকাল চক্ষুরোগে ভুগিতেছি। ১৩ই পর্য্যন্ত এখানে থাকিব।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৪৯, লীডার রোড, এলাহাবাদ সিটি
২৫।১।১৯৩৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি কিছু দিন বিশ্রামের জন্য কল্য এখানে আসিয়াছি। দু'বাণ্ডিল চিঠির উত্তর দিতে বাকী আছে। অনেক মাস আগেকার চিঠি বাহির হইতেছে। তাহার মধ্যে একখানি আপনাকে পাঠাইতেছি। ইহা বহু পূর্ব্বে আপনাকে পাঠান উচিত ছিল। তখনও ছোকরাটির মৃত্যুর বৃত্তান্ত হয়ত পাওয়া যাইত না। কারণ তাহা ১৯৩২ সালের গোড়ার দিকে ঘটে। রামচন্দ্র গান্টির মাতা শ্রীমতী কুমুদিনী বাঙ্গালী মেয়ে (আমার পরিচিত), পিতা মান্দ্রাজী (তিনিও আমার পরিচিত)। ছোকরাটির মৃত্যু হয় চন্দননগরের Savoy Hotel-এ। আপনি দয়া করিয়া একবার খবর লইলে বাধিত হইব। যখন জবাব দিবেন তখন অনুগ্রহ করিয়া সেই সঙ্গে প্রেরিত চিঠিটি ফেরত দিবেন।

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন।

আপনাদের
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৪০

সবিনয় নিবেদন

ভারতবর্ষের বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের ধ্বংসবিষয়ক প্রবন্ধটি অনেক দিন হইতে আমার নিকট রহিয়াছে। জিনিষটি যে ভাল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আইনের অবস্থা এখন যেরূপ তাহাতে উহা বাংলা ভাষায় না ছাপাই ভাল। দেশী ভাষায় প্রকাশিত জিনিষের উপর কর্ত্তৃপক্ষের নজর খুব তীক্ষ্ণ ও কড়া।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর অভিভাষণটি সংক্ষিপ্ত করিয়া ছাপিব, তাহা তাঁহাকে বলিয়াছি। কিয়দংশ সংক্ষিপ্ত করিয়াছি। শেষ করিয়া আষাঢ়ের প্রবাসীতে ছাপিব।

নারী শিক্ষামন্দির দেখিবার খুব ইচ্ছা আছে। এখন ত ছুটি। ছুটির পর যাইব। কোন এক রবিবারে যাইব।

বিনীত নিবেদক
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কলেজ অব সাইন্স
২৬।৪।২৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু

'বসুমতীতে' "বাঙ্গালীর সামর্থ্যের অপচয়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। ক্রমশঃ ইউরোপীয় ও অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালীকে সমস্ত কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতেছে

তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। তাহার প্রধান কারণ আমাদের অলসতা, শ্রমবিমুখতা ইত্যাদি। আপনি আমাদের ব্যাধি প্রকৃত diagonisis করিতে পারিয়াছেন। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের বসুমতীতে "বঙ্গে ও বাংলা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার আরও সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

বিনীত
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

কলেজ অব সাইন্স
১০।২।২৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার ইদানীং সমস্ত বাংলা (খদ্দর প্রচার কল্পে) এমন কি ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। আমি কাল মাত্র আলিগড় হইতে আসিয়াছি, কাল আবার চট্টগ্রাম যাইতেছি—সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া নানা স্থানে এবং পরে গুজরাট যাইতে হইবে। রাশি রাশি পত্র জমা হয়, উত্তর দিয়া উঠা অসাধ্য। শরৎচন্দ্র দাস সম্বন্ধে আপনি interest লইতেছেন শুনিয়া সুখী হইলাম।

আপনারা পুরুষানুক্রমে ব্যবসায়ী—সুতরাং আপনার প্রবন্ধগুলি একসঙ্গে ছাপাইলে সমাজের উপকার হইবে—আহ্লাদ সহকারে ভূমিকা লিখিয়া দিব।

পুঃ—আপনার "প্রতিভা" পাইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।

বিনীত
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

কলেজ অব সায়েন্স
৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯২৩

প্রিয় হরিহর বাবু

এই পত্রবাহক শ্রীমান শরৎচন্দ্র দাস, বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রায় ২০ বৎসর কাজ করিতেছে ও আমার বিশেষ অনুগত এবং আশ্রিত। ইনি আপনার নিকট যাইতেছে ইঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর চন্দননগরে গত বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ গত অগ্রহায়ণ মাসে ইঁহার ভগ্নীপতির হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে ইঁহার প্রমুখাৎ উক্ত মৃত ব্যক্তির বিষয় সম্পত্তির বিষয় অবগত হইবেন—এক্ষণে যাহাতে এই বাল-বিধবার চিরকাল ভরণপোষণ হয় তাহার ব্যবস্থা আপনি এবং স্থানীয় ভদ্রলোকেরা করিয়া দিলে আমি বিশেষ বাধিত এবং সুখী হইব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং

৩০২ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা, ১১ই আগষ্ট, ১৯০৩

নমস্কারান্তে সবিনয় নিবেদনমিদং—

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল মল্লিক বৈবাহিক মহাশয় প্রভৃতির মুখে মহাশয়ের স্বজাতির প্রতি অনুরাগ ও স্বজাতীয় সামাজিক উন্নতির বলবতী ইচ্ছার বিষয় অবগত হইয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছি। মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত গুণ, উদারতা এবং মহানুভবতার সহিত মিলিত হইয়া, আপনি সাধারণ চক্ষের দর্শনীয় বস্তু হইয়াছেন। ঐরূপ দর্শনীয় বস্তুর দর্শনলাভ ইচ্ছা হৃদয়ে প্রবল হওয়ায় মহাশয়ের দর্শনলাভ সুখের অনুসন্ধান করিতেছি। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় ঐ সুযোগ ঘটিয়া উঠিতেছে না। আমি এক্ষণে কয়েক দিন কলিকাতায় অবস্থিতি করিব। মহাশয় কবে কলিকাতা আসিবেন জানিতে পারিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিব। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সংবাদ দানে সুখী করিবেন। ইতি

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

মায়াপুরী, দার্জিলিং
১৩ই জুন ১৯৩১

মান্যবরেষু,

বহু দিন পূর্ব্বে আপনার সহিত পরিচয় হইয়াছিল, আপনার আমাকে স্মরণ আছে কি না জানি না।

কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষামন্দিরে একটি শিক্ষয়িত্রীর স্থান খালি আছে কাগজে দেখিয়া আমার মামাত ভাইএর মেয়ে সেই কাজের জন্য আবেদন করিতেছে। মেয়েটি শান্ত সুশীলা, তাহার পিতা বর্ম্মা দেশে উকিল—সেই জন্য privately B. A. দেয় এবং Mathematicsএ Honours নিতে পারে নাই, নতুবা ইহার অঙ্কের মাথা খুব ভাল। চন্দননগর কাছে বলিয়া উহাকে এখানে কাজের জন্য আবেদন করিতে বলিয়াছি। যদি আপনারা নিতে পারেন তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি একটু শীঘ্র জানান তবে বাধিত হই, কারণ অন্যত্র ইহার জন্য চেষ্টা করিতেছি। কলিকাতা হইতে দূরে পাঠান আমার ইচ্ছা না।

আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

বিনীত
অবলা বসু।

এলগিন রোড, কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয় ও পুরাতন বন্ধুবরেষু—

আজ দার্জিলিঙ্গ থেকে ফিরে এসে আপনার ১১ই জুন তারিখের চিঠি পেলাম—কিন্তু তৎসঙ্গে প্রেরিত 'আমের টিপ' ফসকে গেল। আমার দুর্ভাগ্য, কিন্তু আমার মেয়ের সৌভাগ্য, ছেলে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা খেয়ে খুশী হয়েছেন।

দার্জিলিঙ্গে প্রিয় বন্ধু খগেন বাবুর সঙ্গে সমস্তক্ষণ দেখা ও কথা। যখন তাঁর কাছে শুনলাম যে তাঁকে আম পাঠিয়েছেন, সত্যি কথা বলতে কি মনে হলো তবে কি আমায় ভুলে গেছেন? সেবার আম পাঠাবার কথা তো ভুলি নি। যাই হোক আমটাই আসল নয়, আসল হচ্ছে আপনার সেই প্রেম ও প্রীতি যা ফলেষু "শরী" ও "হিমসাগর"। আন্তরিক ধন্যবাদ। এমন বন্ধু কয়জন আছেন?

বয়স হলো কত? আমার ৬৫ মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য এ বয়সে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি অনুভব করছি পূর্ব্বে কখনো তা করিনি। ক্লান্তি কাকে বলে তা জানি না। পাহাড়ে উঠতে নামতে কষ্ট নেই। ৮।৯ দিনে ৪টি বক্তৃতা ও ৬টি conference করলাম। গিয়েছিলাম না গরম এড়াতে না changeএ না restএর জন্যে। rest কাকে বলে জানি না; change of occupationই rest. রাত ২।৩টা পর্য্যন্ত জাগলেও তার পরদিন দিনে ঘুমুচ্ছি না। কেন? "মননে হি জীবতি।" আর এক সৃষ্টির তাড়না ও তাগিদ আমাকে পাগল করে তুলেছে। তাই ছুটেছিলাম পাহাড়ে, তাই ঘুরে বেড়াচ্ছি বাঙ্গলার নানা স্থানে। মে মাসের ঐ ১০৫।১০৬

গরমে ১৩০ মাইল বাসে করে ছোটনাগপুর অঞ্চলে ঘুরেছি। আমার এ কাজ আপনারই 'follow up' কাজ।

এক দিন ডাকুন আপনার চন্দননগরে। বসি আপনার নৃত্য-গোপাল স্মৃতিমন্দিরে ছেলে ও মেয়েদের কাছে। সকলের শোনা চাই। আপনি preside করবেন।

I. A. B. A. র কু নয়, বিও নয়, অ-পথ থেকে মেয়েদের ঘোরাতে হবে। M. A. পাশ করে দেশের কথা ও যা যা অবশ্য জ্ঞাতব্য, সে সব কিছু জানে না। ডিগ্রীর মোহে যাতে নম্বর বেশী পাওয়া যায় সেই রকম বিষয় বেছে নিয়ে স্বাস্থ্য যৌবন, পরীক্ষার ও দুর্ভাবনা ও মুখস্থের জাঁতায় পিশে কি হয়ে বেরোচ্ছে! কোথায় বিবাহ? কিসের আকর্ষণে! "সোনা ফেলে আঁচলে গেরো!" মোড় ফেরাতে হবে। ১৫।১৬ থেকে ১৭।১৮ এই দুই বৎসরে ভারতীয় ও যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের মূল তত্ত্ব ও তথ্যগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক অভিনব প্রণালীতে সরল ভাবে তাদের মনে মুদ্রিত করে দিতে হবে। আপনার সঙ্গে পরামর্শ যে বিশেষ আবশ্যক। কেন না শিক্ষাদান যে আপনার জীবনের প্রধানতম এক ব্রত। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।

আপনার গুণামুরক্ত
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র।

এখন কেমন আছেন? কোনোও বিশেষ অসুখ কি! জানাবেন।

(৺প্যারীচাঁদ মিত্রকে লিখিত)

প্রিয় মহাশয়,

১৮৬৪ সালে কলিকাতা ত্যাগের সময় আপনার নিকট বিদায় লইয়াছিলাম। তাহার পর এই প্রথম আপনার নিকট হইতে পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমি আমার হিন্দু বন্ধুদের ভুলি নাই। বাঙলায় যে কয়টি আনন্দময় বৎসর কাটাইয়া আসিয়াছি, তাহার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে।

আলালের ঘরের দুলালের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া বড় খুশী হইয়াছি। আমার বরাবরই মনে হয়, এই গ্রন্থখানি বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার করুণ রস ইহার হাস্যরসের মতই উল্লেখযোগ্য। কখনও কখনও কোন ইংরাজী পত্রিকায় এই পুস্তকের উপর একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা জাগে। কিন্তু কাজের এত চাপ যে সামান্য অবসরও পাই না, অন্যথায় বহু দিন পূর্বেই উহা করিতাম।

বইখানি ইংল্যাণ্ডে ছাপিলে লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এক টাকার পরিবর্তে এখানে ৫।৬ টাকা লাগিবে। এখানে বাঙলা হরফে ছাপিবার ব্যয় অত্যধিক। লোক যখন প্রাচ্যদেশীয় পুস্তক ইংল্যাণ্ডে ছাপিয়া ভারতে বেচিবার কথা বলে তখন আমি তাহাদের ভার্ণাকুলার সোসাইটির পুস্তক দেখাইয়া বুঝাইয়া দিই, কত সস্তায় বই ছাপা যায়। উহাতে পুস্তকের সৌষ্ঠব বাড়িবে বলিয়া আমি মনে করি না বরং উহাতে পুস্তকের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হইবে এবং ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। ইংরাজ শিল্পীর হাতে পড়িয়া পুস্তকখানির সাজ-সজ্জার রূপান্তর ঘটিবে এবং যে জাতীয়তা এবং সত্য পুস্তকখানির বিশেষ আকর্ষণ, তাহাতে বৈদেশিক ছাপ পড়িবে। ব্যাপারটি দাঁড়াইবে বাঙলা প্রবাদ বাক্য শ্বেত চামর আর কোষ্টা পাটের মত।

আশা করি, পুস্তকখানি আপনি কলিকাতায় পুনর্মুদ্রিত করি[illegible] লইবেন। আরও পরিষ্কার লম্বা লম্বা হরফে লাইনে লাইনে বে[illegible] ফাঁক রাখিয়া ছাপা যাইতে পারে। তাহা হইলে ইহা সুন্দ[illegible] এক খণ্ড পুস্তক হইবে।

আশা করি, আমি ভারত ত্যাগ করিয়া আসার পর হইতে আপনি ভালই আছেন। কেম্ব্রিজে সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করিতে পাইয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় আমি যে কতদূর লাভবান হইয়াছি, তাহাও এখন অনুধাবন করিতে পারি। ইতি

ফিজ উইলিয়ম ষ্ট্রীট, কেম্ব্রিজ — এডওয়ার্ড বি কউয়েল।
১১ই এপ্রিল, ১৮৭১

পূর্ণিয়া, ভট্টপাড়া
৩০।৭।৪৭

শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়

হেমেন্দ্র বাবু! তোমাদের পত্র পেয়েছি ভাই, তাতে বিপন্নই হয়েছি। শরীর আর ভাল থাকছে না। শরৎ ভায়ার ছেলের অসুখের কথা শুনে পর্য্যন্ত মনও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। টাকা ফেরৎ দিলে পাছে তা মনে আঘাত করে, তাই আজো তা পারিনি। কিন্তু ইচ্ছা মতো লেখাও আসছে না।

বইখানা নাড়াচাড়া করছিলুম। এমন সময় তোমার পত্র পেলুম। এবার পূজা-বার্ষিকীর "দেশের মাটি" নামকরণ দেখে ভারী আনন্দ পেলুম। তোমার সম্পাদনায় সে সার্থক হবেই।

কিন্তু আমি কি করি। আজ আমার টাকা ফেরতের দিন ছিল। রইলো। যদি সপ্তাহ খানেক একটু ভাল থাকি, সেই অপেক্ষায় রইলুম। লেখা আমার আনন্দের জিনিষ, তাতে ত আমার অসাধ নেই, বরং না লিখলে ভাল থাকি না। কিন্তু যা তা লিখতে পারি না। যদি একটু ভাল থাকি চেষ্টা নিশ্চয়ই পাবো ভাই। এখন প্রীতি নমস্কার জানাই। শরৎকে ভালবাসা জানালুম আর ছেলের জন্যে ভগবানের কৃপাপ্রার্থী রইলুম।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুঃ—আমার বয়স ৮৫ প্রায় শেষ হয়ে এলো। এখন ভাই ভুলচুকের দিন। তাই পরিচিতদের (বান্ধবদের) "আপনি আপনি" বলে সম্বোধন করতে নিজেই লজ্জা পাই। "তুমি-তোমার" বলে' আপনি এসে পড়ে। অপরাধ করছি না তো? সে ক্ষেত্রে ক্ষমা চাইতে আমার কিছু মাত্র সঙ্কোচ নাই। তোমার বয়স হয়েছে এবং তুমি সত্যই বড় সাহিত্যিক, তাই কথাটা জানালুম ভাই। কিছু মনে কর না। এটা আমার অ্যাপলজি বলে নিও।

তোমার একান্ত আপনার—কেঃ

ভারতী অফিস
২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিঃ ১।১২।১৯১২

ভাই হেমেন্দ্র,

তোমার চিঠি এইমাত্র পেলাম। কাল তোমার বইয়ের খব[illegible] নেবার জন্যে থিয়েটারে একবার গিয়েছিলুম। বইখানি ভালো ক[illegible] যাতে ওৎরায় তার জন্যে তুমি যতটা ব্যস্ত, তার চেয়ে আমি ক[illegible]

...। কারণ তোমার নিন্দা আমার গায়ে বাজে। থিয়েটারে ...লুম "প্রস্তাবনা" তুমি নতুন করে লিখে দিয়েছ। আমার ইচ্ছা ... প্রস্তাবনা জিনিষটা বিককুল বাদ দেওয়া, কিন্তু দেখলুম থিয়েটারওয়ালাদের ইচ্ছে ওটা রাখা এবং তুমিও একটা নতুন লিখে দিয়েছ, সেই জন্যে চুপ করে গেলুম, কিন্তু "প্রস্তাবনা"টা আমাকে একবার দেখতে দিলে ভাল করতে। হয়ত একটা নতুন ধরণের প্রস্তাবনা suggest করতে পারতুম। কিন্তু যাক্ তা নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করে কাজ নেই। এখন তোমার গানগুলোর খালি রিহার্সাল চলছে—কথা আরম্ভ হয়নি। আরম্ভ হলে একদিন শুনতে যাব। তুমি যদি দশ-বারো দিনের মধ্যে ফিরে এস, তাহলে তুমিও উপস্থিত থাকতে পারবে—কারণ তার আগে বোধ হয় বিশেষ কিছু হয়ে উঠছে না। যে-রকম দেখছি ওরা ভয়ানক তাড়াহুড়ো করে বইখানা খুলবে। এবং একসঙ্গে অনেকগুলো বই হাতে নেওয়া হয়েছে। তাই আমার ভয়-ভয় করছে।

বুড়োর সঙ্গে দেখা হয়—অবরে-সবরে। সে গোবরের বাড়ি আড্ডা গেড়েছে। সত্যেন সকাল-বিকেল হেদিয়ে বেড়াচ্ছে। চারু ছেলেদের অসুখ নিয়ে বিব্রত। কাজেই ভারতীর কুঞ্জে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না। কি করব? তার উপর আজ সকালে এই দুঃসংবাদ পেলুম যে, আমাদের বাড়িওয়ালা বাড়ি ছাড়বার জন্তে নোটিশ দিয়েছে। বোধ হয় বাড়িটা ওরা বিক্রি করে ফেলবে। এতে আমি একেবারে দমে গেছি। ছাপাখানা সম্বন্ধে আমার উৎসাহ নিবে আসছিল, কোনো রকমে তাকে জাগাবার চেষ্টা করছিলুম, এই তেতালার নীড়টিকে ছাড়তে হবে শুনে আমার সমস্ত উৎসাহ একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। এমন ঘর পাব কোথায়? তুমি জান না ছাপাখানার মতন বাড়ি পাওয়া ভারি শক্ত, অনেক কষ্টে এই বাড়ি পেয়েছিলুম। আবার যে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে মরব এমন ধৈর্য্য এখন আমার নেই, কাজেই হয় ত ঢাকিসুদ্ধ বিসর্জ্জন দিতে হবে। অদৃষ্ট কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে ভাবচি।

তুমি চিঠিতে যে interesting আলোচনার সূত্রপাত করেছ, তাতে যোগ দেবার ইচ্ছা থাকলেও আজকে মন নিবৃত্ত হচ্ছে। আজ ক'দিন থেকে সমস্ত মনটা এমন একটা অলসতায় ভরে রয়েছে যে কোনো কাজেই তার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। এই অবস্থাটা বড় মারাত্মক, একে আমি বড় ভয় করি। কিন্তু কি করব?

তোমাদের খবর কি? বেশী করে চিঠি দিয়ো। তোমার চিঠি আমার ভালো লাগে। আমরা ভালো আছি। মোহনলালের গল্প বোধ হয় পৌষে বেরোবে।

বিদায় মাগে
মণিলাল।

ভারতী অফিস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট
কলিঃ, ৫।১২।১৯১১

ভাই হেমেন্দ্র

তোমার চিঠি পেলুম। তোমার বইখানার জন্ম আমি তারি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। ওরা কি যে করচে কিছুই খবর পাচ্ছি না। গানের সুর দেওয়া হয়েছে শুনেছি, কিন্তু মাথামুণ্ডু কি সুর যে দিলে কিছুই জানি না। হয়ত এমন বেয়াড়া সুর দিয়ে বসবে যে শুনে আঁৎকে উঠতে হবে। ওরা হয়ত ভালো সুরজ্ঞ হতে পারে কিন্তু কতটা রসজ্ঞ সে বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ আছে। তুমি আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছ বলে আমি আরো উতলা হয়ে উঠেছি। আমি যে ওদের ব্যূহের মধ্যে সেঁধোতেই পারিনি। গোলেমালে কি হয়ে যাচ্ছে কিছুই টের পাচ্চি না। ওরা অবশ্য সৌরীনের পরামর্শ নিচ্চে কিন্তু জিনিষটাকে দরদ দিয়ে দেখবার মতো সৌরীনের অবসর কোথায়? সে যে ব্যস্তবাগীশ! নিজের কাজেই সে তেমন মন দিতে পারে না, তা আবার অন্যের? তার পর থিয়েটারওয়ালারা "রাণা প্রতাপ" "জীবন সন্ধ্যা" দু'-দু'খানা খোলবার জন্যে মেতে উঠেছে, তোমার বইখানার উপর কতটা মমতা রেখেছে ভগবানই জানেন। যা-হোক তা-হোক করে খুললে বইখানা মাটি হয়ে যাবে। ওর ভিতর অনেক সূক্ষ্ম জিনিষ আছে—সেগুলোকে ধ্যাব্ড়া করে ফেল্লে সর্ব্বনাশ! আমি কি করব কিছু ভেবে পাচ্চি না, অথচ সময় হুহু করে বয়ে যাচ্চে। তুমি হয়ত জান না ভিতরে ভিতরে আমি অমর বাবুকে বরাবর উস্কে আসছিলুম তোমার বইখানা নেবার জন্যে, কেবল সতীশ লোকটার বাধায় এতদিন হয়নি, সে যেমন অন্তর্দ্ধান হয়েছে, অমনি বইখানা নেবার সুবিধে হয়ে গেছে। এখন বইখানা যদি না উৎরায় তাহলে শুধু যে মনে দুঃখু পাব তা নয়, অমর বাবুর কাছে আমাকে লজ্জিত হতে হবে। সে জন্যে একটা মস্ত বড় দায় আমার রয়েছে। থিয়েটারওয়ালাদের গাফিলতিতে যে বই মাটি হল সে কথা হাজার মাথা খুঁড়েও তাদের বোঝানো যাবে না, কারণ নিজের দোষ বুঝতে পারে এমন বুদ্ধিমান লোক জগতে দুর্লভ। শেষে দোষ পড়বে বইয়ের উপর। মিসরকুমারীকে ওরা যে Successful করে তুলেছে তার কারণ ওরা অনেক দিন ধরে ঐ নিয়ে পড়ে ছিল। সময় না দিলে অভিনয় জিনিষটাকে ঠিক মতো খাড়া করে তোলা যায় না। আমাদের তো একটু-আধটু অভিজ্ঞতা আছে, তাতে দেখছি দিনে দিনে এবং যত দিন যেতে থাকে ততই নিজের মধ্যে চরিত্রের বিকাশ হতে থাকে। প্রথমটা তোতা পাখী হয়ে থাকতে হয়। শেষে অল্পে অল্পে চরিত্রের সঙ্গে একশা হতে পারা যায়। এই অবস্থায় না পৌঁছলে কিছুতেই অভিনয় করা চলে না—যে যত বড়ই অভিনেতা হোক না। দিনে দিনে দেখতে দেখতে অনেক খুঁটিনাটি জিনিষ (যা হচ্ছে অভিনয়ের প্রাণ) ক্রমশ খুলতে থাকে। এই জন্যে সময়ের দরকার। ওরা যে ভাবছে ছোট্ট জিনিষটা এক নিমেষে মেরে দেব—সেটা মস্ত ভুল। এ ক্ষেত্রে আকার নিয়ে ছোট-বড় বিচার করা চলে না। কিন্তু এ কথা কে তাদের বোঝাবে? ক্রিষ্টমাসের আর কতই বা বাকি? এখনো ওরা রীতিমত রিহার্সাল আরম্ভ করেনি। তবেই বুঝব ওরা তোমার বইয়ের জন্ম কতটুকু সময় দেবে। ওরা এ পর্য্যন্ত এই রকমই করে এসেছে, ওরা হচ্ছে অভিজ্ঞ, আমরা গায়ে পড়া হয়ে বলতে গেলে আনাড়ি বলে আমাদের কথা উড়িয়ে দেবে। তুমি এ সময় এখানে থাকলে ভালো হত—এই কথাই আমার কেবল মনে হচ্চে। তোমার বিশ্রাম-সুখে ব্যাঘাত দিতে যদিও আমার মায়া করছে, তবুও কেবল মন চাইছে তোমার এখানে থাকা দরকার।

এত কথা লিখে এখন ভাবচি তোমাকে এ সব লিখে লাভ

হল কি? তুমিই বা এর উপর করবে কি? কিন্তু কি করব? আমি এমন উতলা হয়ে আছি যে না লিখে পারলুম না। হতে পারে হয়ত এত ভাবনার কারণ নেই, বইখানা শেষে উৎরে যাবে। আপাততঃ তাই বলে মনকে অশ্বাস দেওয়া যাক। কি বল?

তুমি ঠিক কোন্ তারিখে আসছ?

ভারতীর কুঞ্জ যদি তুমি অটুট রাখতে পার তোমাকে বাহবা দেব। কিন্তু আমি দেখছি অলক্ষ্যে থেকে কে যেন আমার ভবিষ্যৎটাকে ভারি গোলাতে আরম্ভ করেছে। কোথা থেকে কোথায় টেনে নিয়ে আমায় ফেলবে—তারই একটা ষড়যন্ত্র ভিতরে ভিতরে চলছে। কারণ নানা খুঁটিনাটি আমার বিপক্ষাচরণ করছে—এবং তাদের সঙ্গে লড়বার শক্তি যেন আমার কে হরণ করে নিয়েছে। আমার ভালবাসা নিও।

মণিলাল।

শ্রীশ্রীদুর্গা

৭।১০।৩১

ভাই হেমেন্দ্র,

তুমি আচ্ছা লোককে গানের বরাত দিয়েছ—আমি কি গান লিখতে পারি? তুমি গান-রাজ্যের একটা মস্ত দিগ্‌গজ হয়ে এই ফরমাস আমাকে করলে? যাক তোমার বান্ধবতার অনুরোধ যখন আদেশেরই কাছাকাছি, তখন গান-নামে যাহোক্ কি লিখে পাঠালাম, দেখো যদি তোমার কাজ চলে। যেটা তুমি দেখে গিয়েছিলে এবং যেটা আমি 'নাচঘরে' দেব বলেছিলাম, ইতিমধ্যে তোমার তাগিদের অভাবে সেটা বেহাত হয়ে গিয়েছে—সে জন্য ক্ষমা করো।

তোমার সুর-লেখা দেখবার জন্য উৎসুক রইলাম; নূতন উপন্যাস 'পরীর প্রেম' আমাকে এই বয়সে উৎসর্গ করে ভালো করলে কি মন্দ করলে, জানি না! তবু একসঙ্গে আনন্দিত ও বাধিত হলাম, জানিয়ে রাখছি। কবে নাগাদ তাঁর দেখা মিলবে?

অনেক দিন সুর কানে যায়নি, অথচ অসুরের মোটেই অভাব নাই। এক দিন সুবিধা করে এসো না। অন্ততঃ ত্রিপুরাকুমারের শরণ নেওয়া যেতে পারবে।

কেমন আছ? উভয়ে আমাদের প্রীতি সম্ভাষণ নেবে।

তোমার স্নেহ-মুগ্ধ
যতীন বাগচী।

ইলাবাস
হিন্দুস্থান পার্ক, বদনগঞ্জ
২৬।৫।৩৭

বন্ধুবরেষু,

এদিকে অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ নাই—প্রতি সপ্তাহে কাগজের পত্রপুটে তোমার মনের খবর পাইলেও দেহের ও সাংসারিক খবর কিছুই পাই না। অথচ সে জন্য সর্ব্বদাই মন উৎকণ্ঠিত থাকে। ৬০ বছর বয়স হইয়াছে, তাহার উপর গাড়ী-ঘোড়া নাই, তাই যাতায়াতের তৎপরতা হারাইয়া নিজে ইচ্ছামত খবর লইতে পারি না। তুমিও এদিক আর বহুদিন মাড়াও না। পত্রোত্তরে বৌমার ও ছেলেপুলের খবর জানাইয়া সুখী করিবে।

আজ একটু বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, আগামী শনিবার ৫টার সময়ে একবার অতি অবশ্য আসিবে। মাত্র ৫।৬ জন সত্যকার সাহিত্য-বন্ধু ও দরদী সঙ্গী লইয়া একটি ছোট্ট মিলনের আয়োজন করিতেছি। অভিপ্রায় এখন বলিব না—সাক্ষাতে আলোচনা করিব। এই ৫।৬ জনের এক জনেরও অনুপস্থিতিতে অভিপ্রায় সিদ্ধ ত হইবে না অধিকন্তু বিশেষ অন্তরায় ঘটিবে। বিশেষতঃ তোমার অনুপস্থিতি ত কল্পনাই করিতে পারি না। এক জন বিশিষ্ট রসজ্ঞ সাহিত্যিকের সঙ্গেও তোমার সাক্ষাৎ-পরিচয় হইবে, যিনি সত্যই তোমার রস-রচনার পক্ষপাতী, তাঁহার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ-পরিচয় সম্ভবতঃ নাই। সে যাই হোক, শনিবার ৫টায় তোমার আসা চাই-ই চাই। নতুবা বিশেষ দুঃখিত ও নিরাশ হইব। এ বয়সেও একটি সাহিত্যিক কার্য্যভার লইব একরূপ স্থির করিয়াছি। তোমার পরামর্শ, সাহায্য ও শুভ ইচ্ছা না জানিলে তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। তাই তোমার শুভাগমন একান্ত ভাবেই প্রত্যাশা করিব। নিরাশ করিও না।

আমার শরীরটা একরকম করিয়া চলিতেছে—মনের অবস্থা কিন্তু শোচনীয়। তবু খানিকটা কৃষ্মবৃত্তির জন্য এই চেষ্টা। চন্দ্রার শেষ সংখ্যায় যে লেখা দেখিলাম ভালই লাগিল। সে সম্বন্ধে আলোচনাও করা যাইবে। প্রীতি সম্ভাষণ নিও।

তোমার যতীনদা।

পুনঃ—আসিবে যে তাহা এক ছত্রে জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিবে। ইতি—

যতীনদা।

হিমাদ্রি কুটীর, কার্সিয়াং
৩০।৪।৩০

ভাই হেমেন্দ্র

আমরা যথা সময়ে এখানে পৌঁছিয়া উপরের ঠিকানায় আস্তানা গাড়িয়াছি। তোমাদের জলপাইগুড়ি আসিবার কথা ছিল কি হইল? যদি জলপাইগুড়ি আসা হয়, তবে আশা করি এখানেও একবার দর্শন দিবে। 'নাচঘর' কাগজ দেখিতে পাই না। একখানা করিয়া এখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিও। আমরা ভালই আছি। প্রধান কার্য্য আহার ও ভ্রমণ। তোমাদের কুশল সংবাদ লিখিও।

তোমার
প্রভাত দাদা।

৫, যদু মিত্র লেন, শ্যামবাজার
কলিঃ ৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৯

প্রিয় হেমেন্দ্র বাবু

অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই। আপনি তো ভুলিয়াও একবার স্মরণ করেন না। আমি বার বার অসুখে ভুগিয়া একেবারে কাবু হইয়াছি! বঙ্গীয় মহাকোষের জন্য 'অভিনয়' শব্দটি লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কয়েক বার তাগিদও দিয়াছি। এখন ঠিক দেড় মাসের মাথায় 'অভিনয়' শব্দ আসিয়া পড়িবে। লিখিয়া রাখেন নাই ইহা ঠিক। অনুগ্রহ করিয়া যত সত্বর পারেন লিখিয়া দিয়া উপকৃত করিবেন। আশা করি ভালই আছেন। ইতি

ভবদীয়
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

আকাশ-পাতাল

অ, আ, ই

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কতক্ষণ।

গাঢ় অন্ধকার নেমেছে শহর কলকাতায়। অতিবাহিত হয়েছে কর্ম্মচঞ্চল দিন। বিশ্রান্তিতে মগ্ন এখন শহরবাসী। ঘরে ঘরে স্তব্ধতা! শীঘ্র শয্যাগ্রহণ এবং শীঘ্র শয্যাত্যাগে অভ্যস্ত মানুষ—নিদ্রা যাওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়েছে। অদূরে চিৎপুর পল্লী, ফেরিওয়ালাদের ডাক অস্পষ্ট শ্রুত হচ্ছে। ক্ষীণ চিৎকার। শুধু সর্ব্বসাক্ষী আকাশে দেখা যায়, ঘোলাটে চন্দ্রিকালোকে দেখা যায় চলোর্মি। চঞ্চল তরঙ্গ। সারি সারি মেঘ উড়ে চলেছে। যেন দলে দলে চলেছে অভিসারিকা, লজ্জায় আবৃত ক'রে মুখবিম্ব: কেশরাশিতে আর গুচ্ছ গুচ্ছ অলককেশে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় বৃক্ষশাখা কাঁপছে। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে শৃগাল ডেকেছিল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, স্তব্ধতাকে ভঙ্গ ক'রে।

পূজা শেষ হয়েছে, তবুও কি মন্ত্র বলছেন পুরোহিত। গৃহ-দেবতার বেদীমূল থেকে উঠে গিয়ে নাট-মন্দিরে ব'সে তখনও বুঝি পূজা করছেন। কয়েক মুহূর্ত্ত ধীর শান্ত হন, হঠাৎ সশব্দে মন্ত্রোচ্চারিত হয়। স্তব না স্তোত্র। চাণক্যশ্লোক না বাণর্য্যাষ্টক! মোহমুদ্গর না শান্তিশতক! ভক্তির উচ্ছ্বাসে ও স্বর্গীয় গীতি-ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে ওঠে নাট-মন্দির। চির অমোঘ ঋষিবাক্যে কি অপূর্ব্ব মধু। পুরোহিত বৈদিক সূক্ত বলছেন। ঋকময়ী কবিতা।

নানালঙ্কারে সুশোভিতা কে এক জন নারী।

নাট-মন্দিরে উঠে ভক্তিনম্র ভঙ্গীতে হয়তো চলেছিল প্রণাম করতে। পুরোহিত চকিত হয়ে বললেন,—কে যায়?

লালপাড়বিশিষ্ট পট্টবস্ত্র। তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর। মাথায় অল্প গুণ্ঠন, বস্ত্রাঞ্চলে বেষ্টিত কণ্ঠ। পদদ্বয়ে অলক্ত। গমনোদ্যতা বাক্যব্যয় করে না। ভূমিতে মাথা রেখে প্রণাম করে পুরোহিতের উদ্দেশে। অপরিচিতাকে দেখে বিস্ময়ে যেন হতবাক হন পুরোহিত। বলেন,—সীঁতির সিন্দুর অক্ষয় হউক। কিন্তু কি পরিচয়?

নারী তথাপি মৌন থাকে। গললগ্ন বস্ত্রাঞ্চল খুলে কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা পুরোহিতের পদপ্রান্তে রাখে। প্রণামী দেয়। পুরোহিত বলেন,—কি আকাঙ্ক্ষা?

বিনম্রভঙ্গীতে বসে নারী। সুমিষ্ট সুরে বলে,—বক্তব্য আছে। প্রতিকার জানতে চাই।

—তৎপূর্ব্বে তুমি কে জানাও। কদাপি তোমাকে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। তুমি কে মা? পুরোহিতের কথায় বিস্ময়।

—আমি এক জন প্রতিবেশী। এই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী কুমুদিনী আমাকে কন্যার মত স্নেহ করতেন।

—তথাস্তু। বক্তব্য কি? পুরোহিত শুধোলেন।

পূর্ণশশী। শশী বৌ। অপরূপ রূপময়ী পূর্ণশশী বক্তব্য বলে না। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে করজোড়ে ব'সে থাকে। পুরোহিত লক্ষ্য করেন বধূটিকে। মনে হয় অতি সুলক্ষণা, ভাগ্যবতী। ঝুলন্ত বেল-লণ্ঠনের আলোয় দেখা যায় দু' চোখে জলবিন্দু। সত্যিই কাঁদে পূর্ণশশী। কি অব্যক্ত দুঃখে কে জানে। শিশিরবিন্দুর ন্যায় টলমল করে দু' ফোঁটা জল। শুভ্র কপোলে বুঝি গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। পুরোহিত বললেন,—'লক্ষ্মী পূজার দিন, মা লক্ষ্মী বৃথা কাঁদো কেন? অভীপ্সা ব্যক্ত কর'।

বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে বললে পূর্ণশশী,—পুরোহিত মশাই, লোক পাঠাবো, দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দেবেন আমাদের গৃহে? জানাবো বক্তব্য। এখন আমি যাবো কুমুদিনীর পুত্রবধূকে দেখতে। ক'দিন দেখা নেই।

—কখন মা? কবে? পুরোহিতের কথায় কৌতূহল।

পূর্ণশশী আশ্বস্ত হয়ে বলে,—যখন সুবিধা হবে।

পুরোহিতের ভাবালু দৃষ্টি থমকে থাকে কয়েক মুহূর্ত্ত। পূর্ণশশী বলে,—যদি দয়া হয়।

পুরোহিতের কথায় আশ্বাস।—আগামী কল্য বেলা একটায়। লোক পাঠিও, আমি উপস্থিত হব।

কথা শুনে হয়তো খুশী হয় পূর্ণশশী! ভূমিতে মাথা রেখে প্রণাম করে ধীরে ধীরে ত্যাগ করে নাট-মন্দির। বলে,—যে আজ্ঞে।

পুরোহিত সবিস্ময়ে দেখেন গৃহাভিমুখে গমনোদ্যতা ঐ বধূটিকে। মনে হয়, এমন সুলক্ষণা নারী কদাচিৎ চোখে পড়ে। এমন অপূর্ব্ব রূপ। যেন সাক্ষাৎ প্রতিমা। পূর্ণশশী তখন অন্ধকারে বিলীয়মান।

তখন দু'জনে ব'সেছিল পালঙে। খুব কাছাকাছি।

বাইরে স্তব্ধ রাত্রি। ঘনান্ধকার। টুকরো কথা শোনা যায়। কোথা থেকে ভেসে আসে। গৃহলগ্ন পুকুরে মধ্যে মধ্যে শব্দ হয়, জল চলকায়। মাছ লাফাচ্ছে পুকুরে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে অবিরাম। হুগলী থেকে ক'ঘর প্রজা এসেছিল দুপুরে। খাজনা দিয়ে গেছে। কাছারীতে টাকা বাজে। লৌহখণ্ডে টাকা পরীক্ষা হচ্ছে, আওয়াজ হচ্ছে ঠং ঠং। নায়েব পরীক্ষা করছেন, দেখছেন আসল না নকল। সচল

না অচল। খাজনা আদায়কারী গমস্তা জনা কয়েক সাহায্য করছে নায়েবকে। লাল খেরোর থলিতে টাকা পূরছে। প্রজাই-পাট্টা-কবুলতি মেলাচ্ছে মুহুরী। মহল এবং প্রজাদের নাম। কত জমি, জমাই বা কত। বকেয়া কিছু আছে না নেই। একেক জমি একেক বায়নাক্কায় বিলি হয়েছে। যেমন জমি তেমন খাজনা। ফাঁকা জমি না জমিতে ঘর-বাটী। ধানজমি না সব্জীক্ষেত। জমিতে পান-তামাকের চাষ না বাঁশঝাড়। ফলবাগান না শুধু তৃণপূর্ণ জমি। অন্যান্য কাজ মিটে গেছে। ফাঁকা হয়েছে কাছারী। নায়েব এতক্ষণে টাকা গুণতে লেগেছেন। হুগলীর প্রজাদের খাজনা দেওয়া টাকা।

—কথা আছে বললে যে? বললে রাজেশ্বরী। বললে,—আমি ভুঁয়ে বসি, কে কোথায় দেখবে। বলতে বলতে পালঙ থেকে উঠে পড়ে রাজেশ্বরী। মেঝেয় বিছানো গালচেয় বসে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—কে দেখবে! বলছিলাম পিশীমা আসতে চেয়েছে, ভোরে গাড়ী যাবে। পিশে মশাই গাড়ী পাঠাতে ব'লে গেলো।

—বেশ তো। বললে রাজেশ্বরী। বললে,—পিশীমা বেশ লোক।

কৃষ্ণকিশোর বলে মৃদু হেসে,—বেশ তো বললে হবে না। তোমাকে রেঁধে খাওয়াতে হবে পিশীমাকে। পিশীমা ব'লেছে বৌ যদি রেঁধে খাওয়ায় তো যাই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে রাজেশ্বরী। কি বলবে ভেবে পায় না। বলে,—বেশ তো। তবে আমি রেঁধে দিলে হয়তো পিশীমা'র রুচবে না। আমি তো ভাল রাঁধতে জানি না। হাত পুড়ে যাওয়ার ভয়ে ঠাগ্‌মা যে উনুনের ধারে যেতে দিতো না। রাজেশ্বরী কথা বলে, কিন্তু কথায় যেন জড়তা। মুখে গাম্ভীর্য। চোখে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—পিশীমা মুখ ফুটে খেতে চেয়েছে। যা জানো রেঁধে দিও।

মাথায় বুঝি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। পিশীমার জন্যে কি রাঁধবে? ভেবে পায় না রাজেশ্বরী। রাঁধবে অথচ রুচবে না মুখে, তখন লজ্জায় যে মরে যাবে রাজেশ্বরী। শাকের ঘণ্ট, এঁচোড়ের দম না মাছ-শাক। কৈ-কপি, কৈ মাছের হরগৌরী, না পটলের দোর্ম্মা। মাছের দম-পোক্ত না মুড়োর মুড়ি-ঘণ্ট। কাঁচা ইলিশের ঝাল না দই-ইলিশ। লাউ-চিঙড়ী না চিঙড়ীর মালাইকারী।

—যাই তবে, যোগাড় দিয়ে আসি। বললে রাজেশ্বরী।—ব'লে আসি বামুনদিদিকে! বলতে বলতে প্রায় উঠে পড়ে। বলে,—ভোরে গাড়ী যাবে ব'লছো, জোগাড় ক'রে না রাখলে—

কৃষ্ণকিশোর হেসে ফেললে।—থাক্‌ থাক্‌, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। বামুনদিদিই রাঁধবে। পিশীমা বলেনি, আমিই বলছিলাম পিশীমা'র হয়ে।

কথা ক'টা শুনে বসে পড়লো রাজেশ্বরী। বললে,—তাই বল'। আমি ভাবছি সত্যিই বুঝি পিশীমা—

ক্ষণেকের জন্য অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল রাজেশ্বরী। আশৈশব লালিত-পালিত হয়েছে যাঁর কাছে তিনি তো কখনও রাঁধতে বলেননি। রেঁধেই খাইয়েছেন যখন রাজেশ্বরী যা খেতে চেয়েছে। ঠাগ্‌মাকে মনে পড়ে যায় হঠাৎ, বুকটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। রাজেশ্বরী ভাবে ঠাগ্‌মাকে, ঠাগ্‌মা'র কথাবার্ত্তা। কত সময়ে কানে শোনা যায়, যেন ডাকছে ঠাগ্‌মা। রাজেশ্বরী বসে থাকে চুপচাপ।

কৃষ্ণকিশোর লক্ষ্য করে রাজেশ্বরীকে। দেখে রূপৈশ্বর্য্য, অদৃষ্টপূর্ব্ব। আয়ত চোখ। কুঞ্চিত কেশ। গাল দুটোতে ফাগ মেখেছে বুঝি, ঠোঁটে আলতা। আকৃতিটা কৃশ, তবুও কত যে কোমল। চোখে ভ্রমরকৃষ্ণ তারা, ধীরমধুর কটাক্ষ চঞ্চল। কবরীস্পৃষ্ট শ্বেত শুভ্র গ্রীবা। অলঙ্কারখচিত সুডৌল বাহু। পদ্মারক্ত কোমল করপল্লব, অঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরীয়। রাজেশ্বরী কি পটে আঁকা ছবি! ঘরে ঘর-আলো-করা রূপপ্রভা থাকা সত্ত্বেও তবুও, তবুও অন্যে কেন আসক্তি!

খতিয়ে দেখছিল কৃষ্ণকিশোর। দেখছিল কত তফাৎ। আইভিলতা, লিলিয়ান, গহরজান ও রাজেশ্বরীতে কত পার্থক্য। প্রথমা রূপগর্ব্বে যেন অন্ধ, দ্বিতীয়া পাশ্চাত্য রূপচ্ছটায় পরিপূর্ণ হ'লেও হিমশীতল, কমলের ন্যায় কোমল; তৃতীয়া রূপবতী, তবুও বুঝি দলিত ও অনাদৃত, যে জন্য স্নেহময়ী, প্রেমভিক্ষু। রাজেশ্বরী! ঘর-আলো-করা রূপ, রূপে মুগ্ধ করে, দগ্ধ করে না। তবুও, তবুও অন্যে কেন আসক্তি! গহরজান বাইজীর স্মৃতিতে মন কেন মথিত হয়। মূল্য না দিলে যে-মুখে হাসি ফোটে না সে-মুখ না দেখায় কি ক্ষতি।

—তুমি লেখাপড়া করতে, ছেড়ে দিয়েছো? হঠাৎ কথা বললে রাজেশ্বরী। বললে দীপ্ত কণ্ঠে,—আমি চাই তুমি পাঠ ত্যাগ না কর'। অভাবের জন্যে কত কে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, তুমি কেন ছাড়বে?

কথাগুলো শুনে কিঞ্চিৎ বিস্ময় বোধ করে কৃষ্ণকিশোর। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, উত্তর দেয় না কথার। উত্তরটা খোঁজে যেন মনে মনে। বলে,—কাছারীর কাজ দেখতে হলে লেখাপড়া সম্ভব হবে না।

উত্তরটা যেন মুখে অপেক্ষা করছিল। রাজেশ্বরী বললে,—লেখাপড়া না শিখে কাছারীর কাজ দেখা যাবে?

ভাবছিল কৃষ্ণকিশোর কি বলবে এ কথার উত্তরে। ভাবছিল উত্তর দেবে, না দেবে না। বললে,—কাছারীর কাজ শিখেছি। লেখাপড়া যা শিখেছি চলে যাবে।

রাজেশ্বরী বললে একটু হেসে,—লেখাপড়া কি শেষ হয়?

—বৌ আছো? কে এয়েছে দেখো।

দাসীদের মধ্যে কে এক জন কথা বললে। লজ্জায় আত্ম-গোপন ক'রে। বাইরের দালান থেকে। বললে।—কে এয়েছে দেখো।

দালানের দেওয়ালে দেওয়াল-গিরি। ফুরফুরে হাওয়ায় আলোর শিখা কাঁপছে। দালানটাও কাঁপছে। রাজেশ্বরী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখে। দেখে সেই বৌটি, সেই পূর্ণশশী। যজ্ঞির দিন যাঁকে দেখেছিল, চেনা-জানা হয়েছিল যার সঙ্গে। একমুখ হাসে রাজেশ্বরী। বলে,—কত ভাবছি আমি। দেখাই পাওয়া যায় না। আসব বলে গেলেন, আমি রোজ ভাবি আজ বুঝি—

কথা বলতে বলতে রাজেশ্বরী এগিয়ে যায়। প্রণাম করতে যায়। পূর্ণশশী বলে,—থাক থাক। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রাজেশ্বরীকে। বলে,—কত দিন দেখতে না পেয়ে চলে এলাম। ঘরে কি হচ্ছিল? ছাবা কোথায়।

লজ্জিত হয় রাজেশ্বরী। মাথা লুকায় পূর্ণশশীর বুকে। কৃষ্ণকিশোর উঠে আসে ঘর থেকে। দেখে সেই বধূটি, কুমুদিনীর কাছে যে শ্লোক পড়তো। দৃষ্টি-বদল হয় কয়েক মুহূর্ত্ত। পূর্ণশশীর মুখে হাসি। চোখেও বুঝি হাসি। মিষ্টি মৃদু হাসি। দেওয়াল-গিরির আলোয় গা-ভর্ত্তি গয়না—ঝিলিক তুলছে বিজলীর মত।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুঝি কথা হয়, বসা হবে না? বললে রাজেশ্বরী।

পূর্ণশশী সহাস্যে বলে,—চল' ঘরে চল; বসি গে।

কৃষ্ণকিশোর ঘর থেকে বেরিয়ে যায় পড়ার ঘরের দিকে। লেখাপড়ার কথা শুনে ভাল লাগে না কিছু। লেখাপড়ার নাম শুনলে বিরক্ত হয়। পড়তে হ'লে কত কষ্ট করতে হয়। সকল কিছু ভুলে পড়তে হয় শুধু। কতগুলো বিষয়, ভাষাও নয় একটা। জ্ঞানলাভ সহজে কি হয়। লেখাপড়া—স্মৃতি থেকে যে মুছে গেছে কত দিন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ ক'রে পূর্ণশশী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। কক্ষটি প্রশস্ত, সুশোভিত। হর্ম্ম্যতল পাদস্পর্শসুখজনক গালচেয় আবৃত। গবাক্ষে পর্দ্দা। কত শত মহার্ঘ সামগ্রীতে সজ্জিত। পূর্ণশশীকে দেখে রাজেশ্বরী। পট্টবস্ত্র পরিহিতা পূর্ণশশী, পবিত্র এক আবেশে যেন বিহ্বল। রাজেশ্বরী বলে,—মন্দিরে আসা হয়েছিল?

পূর্ণশশী বললে,—হ্যা, পুরোহিত মশাইয়ের সঙ্গে কিছু কথা ছিল। কথা হয়ে যেতে দেখতে এলাম তোমাকে। ভালো আছো? শ্বশুর-ঘর ভাল লাগছে?

মুখাকৃতিতে কৃত্রিম হাসি ফোটাতে চেষ্টা করে রাজেশ্বরী। বলে,—হ্যা। ভাল লাগছে। তবে একা থাকি। দু'টো কথা কই, তেমন কে আছে?

—স্বামী তো আছে। কথা কও যত খুশী। বললে পূর্ণশশী। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে। বললে,—শাশুড়ীর চিঠি-পত্র পাও?

রাজেশ্বরী বললে,—আমি পাই কৈ? তাঁকে দেখতে সাধ হয়।

কিয়ৎক্ষণ রাজেশ্বরীকে দেখে পূর্ণশশী। দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। গয়নাগুলি দেখে। হস্ত স্পর্শ ক'রে দেখে। জিজ্ঞেস করে,—কে দিয়েছে?

রাজেশ্বরী বলে,—শাশুড়ীর গয়না, আমি পেয়েছি।

—চমৎকার। বললে পূর্ণশশী—তোমাকে বিমর্ষ দেখছি, মুখে হাসি কৈ?

রাজেশ্বরী চমকে ওঠে বুঝি। বুকের ভেতরটা কি দেখতে পেয়েছে পূর্ণশশী। রাজেশ্বরী বলে,—দিদি, দিদি—

—কি হয়েছে বল' তো। বললে পূর্ণশশী। বললে,—বল', লজ্জা কি? মুখটি যে শুকিয়ে গেছে।

চোখ দু'টো বুঝি ছলছলিয়ে ওঠে হঠাৎ। কাঁপতে থাকে ওষ্ঠাধর। রাজেশ্বরী বলে,—দিদি, নেশা করে। দেখলাম, ঐ অবস্থায় দেখলাম। কথা বলতে বলতে চোখে আঁচল চাপে রাজেশ্বরী।

হেসে ফেললে পূর্ণশশী। বিষয়টা লঘু করে দিতে চায়। রাজেশ্বরী যাতে ভেঙে না পড়ে তাই হাসতে হাসতেই বলে,—যুগের হাওয়া বউ, যুগের হাওয়া। বল' তো নেশা করে না, কত জন লোক আছে? টাকা কোথা থেকে যে আসে ভাবতে হয় না। ব'সে ব'সে দিন কাটে। নেশা তো করবেই। তবে তুমি—

—আমি যে ভয় পাই দিদি! কথার মাঝেই কথা বলে রাজেশ্বরী।—নেশাকে যে ভয় হয় দিদি।

—বল' তো শশী বৌদিদি, বুঝিয়ে বল' তো।

কোথায় ছিল অনন্তরাম। ঘরে ঢুকেই বললে কথাগুলো। কোথা থেকে শুনেছিল কে জানে! বললে,—বল' তো শশী বৌদিদি। মেয়েটা কচি যে, জানবে কোত্থেকে! জ্ঞান হয়েছে কিছু! টলতে দেখেই বেবাক্ দাঁত-কপাটি লেগে গেছে। কত দেখতে হবে, কত শুনতে হবে। সাহস দিয়ে যাও তো শশী বৌদিদি।

কথার মাঝে হঠাৎ অনন্তরামকে কথা বলতে দেখে পূর্ণশশীও কিছুটা সাহস পায় মনে। বলে,—তাই তো আমিও বলছি। তোমাকে বুক বাঁধতে হবে। শুধরোতে হবে। যাতে খারাপ-ভাল বুঝতে শেখে দেখতে হবে। ঘরে ঘরে হামেশাই হচ্ছে। ভেঙ্গে পড়লে চলে? কথা বলতে বলতে কথা থামায় পূর্ণশশী। থেমে থাকে খানিক। বলে,—লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে? ছেলে তো ভাল ব'লেই জানি। কে ধরালে কে?

রাজেশ্বরী বললে,—হ্যা ছেড়ে দিয়েছে।

অনন্তরাম বললে,—ব'ল না শশী বৌদিদি। বসিরকে জানো? তা তুমি জানবে কোত্থেকে? বেশ ছিল, বসির শেখালে খাওয়াতে, শেখালে—

কথার শেষাংশটা বলতে গিয়ে বলে না অনন্তরাম। জিব কাটে। বলে,—যাই হোক, শশী বৌদিদি, তুমি যে কথাটা বলেছো, খাটি কথা। বৌদি শুধরোতে চেষ্টা করুক, যদি কিছু হয়, ঠিক ব'লেছি কি তুমিই বল' শশী বৌদিদি? তুমিই বল'।

দাসীদের এক জন দেখা দেয় দু'হাতে দুটি পাত্র ধ'রে। বলে—হুজুর বলে পাঠিয়েছে, না খেয়ে গেলে চলবে না।

হেসে ফেললে পূর্ণশশী। মুক্তাঝরা হাসি। বললে,—কে খাবে?

অনন্তরাম বলে,—দেখো শশী বৌদিদি, দেখো, আপ্যায়িতটা দেখো। তোমাকে খেয়ে যেতে হ'বে। ব'লে পাঠিয়েছে।

দাসী পাত্র দুটি পূর্ণশশীর সম্মুখে উপস্থাপিত করে চলে যায়। আহায্য দেখে হাসতে হাসতে বললে পূর্ণশশী,—অসময়ে খাওয়া যায়?

অনন্তরাম বলে,—ত' হোক শশী বৌদিদি, যা হয় খাও।

পাত্রপূর্ণ জল। থালিতে দু'টি লবঙ্গলতিকা ও দু'টি পাটিসাপটা। হয়তো গৃহে প্রস্তুত।

রাজেশ্বরী ফিসফিসিয়ে বললে,—অনন্ত, কোথায় গেল বল' তো? দেখতে না পেলেই ভয় করে।

হেসে ফেলল অনন্তরাম। হাসতে হাসতেই বললে,—দেখো শশী বৌদিদি, দেখো। ভয় কাকে বলে দেখো। দেখেছি আমি, দেখেই আসছি। পড়ার ঘরে বসে আছে।

পড়তে ব'লেছে রাজেশ্বরী। ব'লেছে, লেখাপড়া করতে হবে।

খুশী হওয়ার চেয়ে মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে কথাগুলো শুনে। পাঠ চুকিয়ে দিয়েছে লেখাপড়ার। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে শেষে। কৃষ্ণকিশোর তবুও পড়ার ঘরে যায়। পাঠ্য গ্রন্থ তোলাপাড়া করে। বাঙলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ। ঝুলন্ত লণ্ঠনের শিখা হাওয়ায় কাঁপছে দপদপিয়ে। মনে হয় অক্ষরগুলো বুঝি কাঁপছে। গ্রন্থ-পৃষ্ঠায় লিখিত অক্ষর। স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত কয়েকটি পাঠ্য-পুস্তক। সংস্কৃত কৌমুদী ও কলাপ। অলঙ্কার, স্মৃতি, সাংখ্য ও মীমাংসা।

—আমি চাই তুমি লেখাপড়া কর'। বলেছে রাজেশ্বরী।

কথাগুলো শুনে খুশী হওয়ার চেয়ে কথাগুলোতে ঘা খেয়েছে মনে। পড়তে কি শুধু রাজেশ্বরী বলেছে! মা কুমুদিনী বলেছিলেন। পিশীমা বলেছিলেন। পণ্ডিত মশাই তো বলেই ছিলেন। কত কথা বলেছিলেন।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা বাজতে থাকে। ক'টা বাজে? বোধ করি আটটা। কথা বলতে বলতে পূর্ণশশী বলে,—উঠি ভাই আমি। আটটা বেজে গেলো। অনন্ত তুমি আমাকে পৌছে দেবে। সময় হবে?

অনন্তরাম বললে,—কি যে বল' শশী বৌদিদি!

পূর্ণশশী বললে—দেখো বউ, কিছুতে ভেঙ্গে পড়' না তুমি। কত ধকল সইতে হবে। ভেঙ্গে পড়লে চলে?

কথা বলতে বলতে উঠে পড়লো পূর্ণশশী। কাছেই থাকে সে। প্রতিবেশী। আবক্ষ গুণ্ঠন টেনে গৃহোদ্দেশে যাত্রা করে পূর্ণশশী। সদরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে অনন্তরামকে,—অনন্ত, পড়ার ঘর কৈ?

অনন্তরাম ব'লে—ঐ যে। ঐ তো আলো জ্বলছে। পড়ছে।

অদূরে ঘরটি দেখে পূর্ণশশী। দেখে কয়েক মুহূর্ত্ত। কেন দেখে কে জানে!

কলকাতা শহর হ'লে কি হবে, আঁধার হ'তে না হ'তে জনতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পথে ক্বচিৎ লোক দেখা যায়। যে যার গৃহে ফিরে অর্গল তুলে দেয়! বিশেষতঃ শহরের কয়েকটা অঞ্চলে গাঁটকাটা, সিঁদকাটা এবং মাতালদের উপদ্রবে মানুষ অতিষ্ঠ, ত্রস্ত হয়ে থাকে। দিবাপেক্ষা নিশীথে দুষ্ট ও দুর্বৃত্তদের লীলা চলে। যে জন্য লোকজন একত্র না হয়ে চলতে সাহসী হয় না। পূর্ব্বে কত ভয়াবহ ডাকাতি ও লুণ্ঠন হ'ত। যদ্যপি ইংরেজী কোম্পানি বাহাদুর কর্ত্তৃক সুব্যবস্থা হওয়াতে ঈদৃশ দস্যুবৃত্তি হ্রাস হয়েছে তথাপি শহরের কয়েক অঞ্চলে এখনও দুষ্ট লোক উৎপাত করে।

শুক্ল পক্ষ। আলোয় আলো হয়ে আছে দিগ্‌দিক। আকাশে মেঘের জটলা চলেছে। ফটক থেকে পথে পৌছতেই পূর্ণশশী বললে,—অনন্ত, তুমি পিছনে চল'। আমি আগে যাই।

পূর্ণশশীকে মনে হয় কেমন যেন ভয়ার্ত্ত। কিয়দ্দূর যেতে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে,—অনন্ত, লোকগুলো যদি যেতে বাধা দেয় তুমি আক্রমণ করবে।

বিস্মিত হয় অনন্তরাম। বলে,—কিছু তো বুঝতে পারছি না শশী বৌদিদি। তোমাকে যেতে বাধা দেবে কেনে?

—যা বলছি শোন'। সময় হ'লে ব'লবো। ভীত কণ্ঠে বললে পূর্ণশশী। কিছু দূরে পথিপার্শ্বে দেখা যায় ক'জন লোক। ভদ্র ব্যক্তি হ'লে কথা ছিল না, কিন্তু লোকগুলিকে দুর্বৃত্ত ব'লেই মনে হয়। বেশ-ভূষাও কেমন বিসদৃশ। কদাকার আকৃতি।

অনন্তরাম বললে,—ভয় নাই শশী বৌদিদি। কোন শুয়োরের বাচ্চার সাহস হবে না। তুমি চ'লে চল'।

রুদ্ধশ্বাসে পথটুকু চলে যায় পূর্ণশশী। পথিপার্শ্বে লোক ক'টি কেন যে ছিল বোঝা গেল না। লোকগুলির উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হয়েছে বোঝা যায়। নিকটবর্ত্তী হ'তেই লোকগুলির কেউ কেউ কথা বলে।

অনন্তরাম বললে,—কান দিও না শুয়োরের বাচ্চাদের কথায়।

—বডিগার্ড নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

—গয়না ক'টা খুলে দিয়ে যাও দিদি।

—মুখটা দেখিয়ে যাও।

কিছু দূরে কতকগুলো কুকুর। লোক দেখে ডাকাডাকি করে। দুর্বৃত্ত ক'জন দেখতে দেখতে কোথায় লোপাট হয়ে যায়। কুকুরগুলো শুধু ডাকে।

গৃহে পৌছে স্বস্তি-শ্বাস ফেলে পূর্ণশশী। বলে,—অনন্ত দেখলে তো?

—দেখলাম তো। বুঝলাম না তো কিছু। বললে অনন্তরাম।

—বুঝবে কোত্থেকে? সময় করে আসো তো ব'লবো। দেরী হয়ে গেছে ফিরতে, নয় তো বলতাম। বললে পূর্ণশশী। হাঁপাতে হাঁপাতে।

অনন্তরাম বললে,—বেশ কথা। তুমি যাও, আমি আসি।

পূর্ণশশী তৎক্ষণাৎ ভেতরে চলে যায় অনন্তরামকে ছেড়ে। সদ্বিদ্বারে অর্গল তুলে। আশ্চর্য্য হয়ে অনন্তরাম পথ চলে! ভেবে পায় না দৃশ্যটার তাৎপর্য্য।

ঘরে কেউ ছিল না।

রাজেশ্বরী জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে আকাশে চোখ তুলে। শৈশব থেকে আকাশ দেখতে ভালবাসে সে। ঠাগ্‌মা ছড়া ব'লতো, রূপকথা ব'লতো। ব'লতো,—সাত ভাই চম্পা জাগো রে—

রাজেশ্বরী ব'লতো,—সাত ভাই চম্পা কোথায় থাকে ঠাগ্‌মা?

ঠাগ্‌মা বলতেন,—ঐ আকাশে।

আকাশে? আকাশ দেখতো রাজেশ্বরী। শুক্ল পক্ষ। আলোয় আলো হয়ে আছে শহর কলকাতা। দূরে দূরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আলোকবিন্দু। জলছে টিম-টিম ক'রে। আকাশে রূপালী চুমকি, দপ-দপ করছে। কে দেখে না আকাশ! সুখে-দুঃখে কে দেখে না আকাশ! শিশু, যুবা, বৃদ্ধ কে দেখে না আকাশ! জানে না ঐ গোলার্দ্ধের মধ্যে কত অজ্ঞাত বিজ্ঞান। তবুও আকাশ দেখে মানুষ। বায়ুপ্রেমে কিছুই দৃষ্ট হয় না ঐ অপ্রবেশ্য আকাশে, দেখা যায় কেবল অজস্র গ্রহ-উপগ্রহ। দিগ্‌দর্শী হাওয়া-অফিস আকাশ-লীলা লক্ষ্য করে! বায়ুশকুন আবহাওয়া জানায়। আবহচিত্র দেখে মানুষ বোঝে আকাশ থেকে বারিবর্ষণ হবে। আর্দ্রতা কত? জোয়ার-ভাঁটার সময়।

ঝিঁঝির কীর্ত্তন স্পষ্টতর হয়। শহর কলকাতা হয় স্তব্ধতর। নৈশ আকাশে উড্ডীয়মান পেচক।

আকাশে চোখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। জানে না আকাশ-বিজ্ঞান, তবুও দেখে আকাশ। কত আশা ছিল মনে, মনটা বুঝি ভেঙ্গে গেছে কেন কে জানে। নেশাসক্ত স্বামী—

আকাশ যেন লাঘব ক'রে দেয় মনের আলোড়ন। আকাশ কেড়ে নেয় বুক-ফাটা কষ্ট। রাজেশ্বরী চোখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে আকাশ। দেখে মেঘের জটলা। দেখে জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্ক। নক্ষত্রমণ্ডল। আকাশ-বিজ্ঞান জানে না রাজেশ্বরী। জানে না ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, মরীচিকে। জানে না কোথায় ক্যাসিওপিয়া। কোথায় বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র! কোথায় দেখা যায় ছায়াপথ—বিচ্ছুরিত আলো। মুগ্ধ হয়ে দেখে রাজেশ্বরী। দেখে কন্যা, চিত্রা, তুলা।

হঠাৎ চোখে পড়ে দূর-দুরান্তরে নক্ষত্র খসে প'ড়লো তীরবেগে। আকাশ থেকে ধাবিত হ'ল ভূলোকে। রাজেশ্বরী জানে না, ঐটা উল্কা।

—রাত কত হ'ল, খাওয়া-দাওয়া হবে না?

এলোকেশীর কথায় বিরক্তি। ঘরে ঢুকেই বললে কথাগুলো। বললে,—ডাকতে পাঠাও স্বোয়ামীকে। ভ্যালা ছেলে তো। খেয়াল হয় না, মানুষগুলো না খেয়ে আছে।

রাজেশ্বরী জানলা ত্যাগ ক'রে পর্য্যঙ্কে বসলো। বললে, —না, ডাকতে হবে না। পড়তে গেছে যে। সময় হ'লেই আসবে।

কাছাকাছি ঘরে যেন ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলে উঠলো। শব্দ হ'ল ঠুং-ঠাং। রাজেশ্বরী বললে,—নাচ-ঘর কে খুলেছে এলো?

এলোকেশী বিরক্ত হয়েই বলে,—ঘর সাফ করছে যে। পেয়াদা দাঁড়িয়ে আছে, লোকজন সাফ করছে।

রাজেশ্বরী উঠে যায়। এত দিন শুনেছে নাচ-ঘর আছে। দেখতে যায় ঘরটা।

নাচ-ঘর। পর্ব্বোপলক্ষে বাইনাচ হ'ত নাচ-ঘরে।

অন্তঃপুরবাসীদের উপভোগের জন্য ঘরটি তৈয়ারী হয়েছে কত যুগ আগে। চব্বিশটি দ্বারযুক্ত বৃহৎ কক্ষ। উত্তম কার্পেটে আবৃত কক্ষতল। পাশাপাশি কতগুলি আলোর ঝাড়। ক্যাবিনেট আলমারী ও সোফা ধারে ধারে সজ্জিত। ব্র্যাকেটে ঝালর ঝুলছে। দেওয়াল-গাত্রে ছবি। রাজেশ্বরী কাছে গিয়ে দেখে চিত্রশোভা। অবাক হয়ে দেখে। স্টিল প্রিণ্ট ছবি। চেনে না, বোঝে না, তবুও দেখে।

বুঝবে কোত্থেকে। ছবিতে যে বিদেশী। লর্ড ক্লাইভ। ওয়াটস্। ওয়ারেণ হেষ্টিংস। ইলাইজা ইম্পে। ক্লেভারিং। ফিলিপ ফ্রান্সিস্। ভান্সিটার্ট। সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত জোন্স। কর্ণেল কিড। লর্ড কর্ণওয়ালিস। ওয়েলেসলী। হ্যালিডে। সিসিল বিডন। গ্রে। ক্যাম্বেল। রিচার্ড টেম্পল। বেলী। জে, ই, ডি বেথুন। রিপন। বেণ্টিঙ্ক। মেও, ডেভিড হেয়ার। ক্যানিং প্রভৃতিদের ছবি। বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি। পূর্ব্বপুরুষদের ইংরেজ-ভক্তির নিদর্শন।

কত যুগ পূর্ব্বে যে কক্ষটি নাচে-গানে মুখরিত থাকতো কে জানে! বাইজীদের কণ্ঠ-ঝঙ্কার, নৃত্যচ্ছন্দ কি এখনও শ্রুত হয়! কক্ষটির দুই বিপরীত দেওয়ালে দু'টি আয়না। প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। ঝাড়-লণ্ঠনের প্রতিবিম্ব। শত সহস্র ঝাড়-লণ্ঠন দেখা যায়। অন্তঃপুরবাসীদের হাস্যলাস্য কি এখনও মোহ সৃষ্টি করে? এখনও কি পাওয়া যায় আতর-গোলাবের সুগন্ধ! যে-কক্ষে পূর্ব্বে খেলার সামগ্রীরূপে পুষ্পমালা হেলাফেলা হ'ত তথায় কি দু'-একটা শুষ্ক পাপড়িও পাওয়া যাবে না! দুর্ম্মূল্য কার্পেটে কি দেখা যাবে না কিঞ্চিৎ অলক্তরেখা! মখমলের বালিসে একটি কি দু'টি চূর্ণ কেশ

পেয়াদা এবং অন্যান্য লোকজন মর্ম্মর-মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে। রাজেশ্বরী দেখছে। আয়ত আঁখি-যুগল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে কক্ষটি। নাচ-ঘর দেখছে রাজেশ্বরী।

দালানে শুয়ে পড়েছিল এলোকেশী।

ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রেছিল। কিন্তু নিদ্রা জয় করে ফেলেছে এলোকেশীকে। এলোকেশী দালানে গড়িয়ে পড়েছে ঘুমে অচেতন হয়ে।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে রাজেশ্বরী ডাকলে,—এলো, তুমি তো আচ্ছা লোক! উঠে পড়ো। লোকে কি ভাববে!

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো এলোকেশী। বললে,—ঘুমিয়েছি আমি? পড়ে আছি, কি করবো?

রাজেশ্বরী বললে,—অনন্তকে বল' ডাকতে। পড়া শেষ করতে বল'।

—বলি। বলে এলোকেশী। উঠে যায় দালান থেকে।

রাজেশ্বরী ঘরে গিয়ে বসে পর্য্যঙ্কে। মুদিত চক্ষে বসে থাকে। নাচঘর থেকে শব্দ আসে ঠুং-ঠাং। ঝাড়-লণ্ঠনের শব্দ। ঘর সাফ করছে লোকজন।

টায়রাটা লুকিয়ে রেখেছিল।

কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল কতক্ষণে ফর্সা হবে আকাশ। পাঠ্য-পুস্তক প'ড়ে থাকে। গহরজান যে মনটা অধিকার ক'রে আছে। টায়রাটা দিলে গহর কত যে খুশী হবে।

—খাওয়া-দাওয়া করতে হবে যে। ঢের পড়েছো। অনন্তরাম বললে ঘরে ঢুকে। বললে,—তোকে পড়তে দেখে আমি হাতে স্বর্গ পাই। লেখাপড়া ক'রে মানুষ হ', চোখ টাটাবে কত লোকের।

—লেখাপড়া ক'রে কি হবে! বললে কৃষ্ণকিশোর। রুক্ষ মেজাজে। বললে,—কষ্ট ক'রে পড়ে লাভটা কি হবে? পড়বে গরীব লোক, প'ড়ে চাকরী করবে। উপার্জ্জন করবে।

—লেখাপড়া গরীবদের জন্যে! কথাটা ব'লে হেসে ফেললে অনন্তরাম। হতাশ-হাসি। হাসতে হাসতে বললে,—চাকরীর জন্যে শুধু লেখাপড়া? আশ্চর্য্য! কে শেখালে?

কৃষ্ণকিশোর ভ্রূ কুঁচকে বলে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাকরীর জন্যেই লেখাপড়া। লেখাপড়া জানা লোক হ'লেই চাকরী পেয়ে যায়। আমাকে চাকরী করতে হবে না। যা আছে বেশ হেসে-খেলে চলে যাবে।

হেই-হেই ক'রে ওঠে অনন্তরাম। বলে,—ছি, ছি, অ… তা বলি নাই। বলতে চাই নাই। লেখাপড়া, বিদ্যা, বিদ্য… জ্ঞান হয় যে! বিদ্যা না থাকলে মানুষ মানুষ হয়? বিদ্ব… লোক পূজো পায়। বিদ্বান লোক—

কথার মাঝেই কথা বলে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—শি… দিতে হবে না, থাক্।

অনন্তরাম তবুও বলে—দেখো, আমাকেই দেখো লেখাপড়া জানলে চাকর হয়ে থাকতাম! দুর্ভাগ্য যে মুখ্যু হয়ে আছি। যাই হোক, চল, খাবে চল। ভাত-টা… কড়কড়িয়ে গেল।

অনন্তরাম ভাবে, যে বুঝবে না তাকে বুঝিয়ে কি হবে। কথার শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অনন্তরাম। হতাশ-মনে। অনন্তরাম বোঝে, দৃষ্টি হুজুরের বদলে গেছে, ভাব পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। সম্পত্তি পেয়ে ভোল পালটে গেছে।

খাওয়া হয়ে গেতে পর্য্যঙ্কে বসেছিল দু'জন।

রাজেশ্বরী বললে,—পণ্ডিত মশাইকে ডেকে পাঠাবে?

অবাক-চোখে তাকায় কৃষ্ণকিশোর। কৌতূহলী হয়ে বলে,—পণ্ডিত মশাইকে! তুমি জানলে কোত্থেকে?

হেসে ফেলে রাজেশ্বরী। বলে,—বল' তো কোত্থেকে?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—কে জানে। পণ্ডিত মশাইকে ডেকে কি হবে?

রাজেশ্বরী বলে,—পড়বে তুমি। বললাম যে, আমি চাই তুমি লেখাপড়া ত্যাগ না কর'।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—দেখা যাবে। পণ্ডিত মশাইকে ডাকাতে হবে? পণ্ডিত মশাইকে ডাকিয়ে পড়বো আমি

ঘুম-চোখে তাকিয়ে থাকে রাজেশ্বরী। লণ্ঠনের আলো চোখ দু'টো তবুও জ্বল-জ্বল করে। বলে,—হ্যাঁ। লেখাপড়ায় কত জ্ঞান হয়। লেখাপড়ায়—

কথাগুলো শোনে কিন্তু মন ছুটে চলে কোথায় রাজেশ্ব… জানে না। কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল, কতক্ষণে ফর্সা হবে আকাশ। কতক্ষণে আলো ফুটবে। কুঙ্কুম ছড়াবে আকাশে। কতক্ষণে দেখা দেবে গ্রহপতি আদিদেব সহস্রাংশু সূর্য্য।

জড়োয়া টায়রাটা যেন শূন্যে দেখতে পায় কৃষ্ণকিশোর আকাশ শুভ্র হ'লে টায়রাটা—

[ক্রমশঃ

——আগামী সংখ্যায়——

আত্ম-স্মৃতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

যাযাবর

আখ্যান

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নাটককে বলে দৃশ্যকাব্য। বাংলা থিয়েটার যাঁরা দেখেন, তাঁরা জানেন, বাংলা নাটকে কাব্য আছে সামান্যই, দৃশ্য আছে যথেষ্ট : সেগুলি সব সুদৃশ্য হলে ক্ষোভ ছিল না।

অভিনয়ে দৃশ্যপট ব্যবহারের প্রবল বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেটা অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁর নাটক সবই কাব্যপ্রধান। কবিতা ছিল তাঁর জীবন ধর্ম্মে। যা লিখেছেন তাই হয়েছে কাব্য। এমন কি শিশু-শিক্ষার সহজ পাঠেও তার প্রকাশ। বলা যায় না, হয়তো তিনি শুভঙ্করের ধারাপাত নূতন করে লিখলে তাতেও কাব্যের স্বাদ পাওয়া যেতো।

কবির বিশ্বাস, অভিনয় ব্যাপারটা গতিশীল, দৃশ্যপটগুলো স্থাণু। জীবন্ত মানুষের আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্যলীলার সম্মিলিত সচল অভিব্যক্তির পথে সেগুলি অচল বিঘ্নস্তূপ। সযত্নে পরিত্যাজ্য। অভিনয়ের পরিপূর্ণ উপভোগ দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে। চিত্রিত পট ও নির্ম্মিত দৃশ্য তার সেই কল্পনাশক্তিকে পদে পদে ব্যাহত করে।

মলী সেন কবি নন। নিজেকে ইণ্টেলেকচুয়াল বলেও কোন দাবি করেন না। কিন্তু সহজাত বুদ্ধি, ইংরেজীতে যাকে বলে কমনসেন্স, সেটা তীক্ষ্ণ। লোকচরিত্রে গভীর জ্ঞান নেই বটে, কিন্তু নিজ গোষ্ঠীর মনুষগুলিকে ভালো করেই চেনেন। জানেন, এদের পুরুষেরা বড় চাকরী করে, মোটা মাইনে পায়। মেয়েরা দামী গাড়ি চড়ে, ভারি গয়না গড়ায়। আর যাই করুক, এরা জেমস্ জয়েস পড়ে না। থার্ড প্রোগ্রামের নাম শুনলে থার্ড ডিগ্রির কথা ভেবে আঁৎকে উঠতে পারে। এদের জন্যে চাই অন্য ব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথেরই লেখা উদ্ধৃত করে মলী সেন বলেন, "সংসারে বেশীর ভাগ লোকই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন পা-ঝাড়া দিয়ে ; পিতামহের চারটে মুখ আছে শুধু বড় বড় কথা বলার জন্যে। তাদের জন্য গাছে জল দেওয়ার দৃশ্যে শকুন্তলার হাতে শুধু জলের ঝারি দিলেই যথেষ্ট নয়, ডালপালা শুদ্ধ গাছের গুঁড়িটাকেই ষ্টেজের উপর খাড়া করা চাই।"

কথাটা মিথ্যা নয়। আমাদের দর্শকেরা সিনেমা দেখতে গিয়ে চায় গান, নাটক দেখতে গিয়ে ম্যাজিক। তাই সিনেমার কুন্দনন্দিনী যদি বিষ খেতে খেতে একখানা করুণরসাত্মক গান না ধরে, তবে সে শুধু নিজেই মরে না, সঙ্গে সঙ্গে ছবির প্রযোজককেও মারে। প্রাণে নয়, ধনে। থিয়েটারের ইন্দ্র যদি দর্শকদের চোখের সামনে রথে চেপে ষ্টেজ থেকে শূন্যে না মিলিয়ে যায়, তবে অচিরে প্রেক্ষাগৃহটিই শূন্য হওয়ার আশঙ্কা।

আজকের অভিনয়ে ষ্টেজে গাছের গুঁড়ি খাড়া করার ভার যিনি নিয়েছেন, ইংরেজী অক্ষরে তার নামের উচ্চারণ 'রয়'। আসলে অবশ্য গাছের গুঁড়ি নয়,—সমুদ্রে ভাসমান প্রমোদ-তরণী। কারণ অভিনয়ের পালাটি অভিজ্ঞান শকুন্তলম নয়,—স্বপনকুহেলী। এতে তরুআলবালে বারিসিঞ্চনরতা সখিপরিবৃতা শকুন্তলার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না ; দেখা যাবে জ্যোৎস্না রজনীতে সমুদ্রবক্ষে বীণাবাদিনী রাজকন্যা মঞ্জুশ্রীকে।

ম্যাসাচুসেট থেকে ডিগ্রি ও ওয়েষ্টিং হাউস থেকে ট্রেণিং নিয়ে মিষ্টার এন. সি. রয়, অর্থাৎ শ্রীমান নিখিলচন্দ্র রায়, বর্ত্তমানে স্থানীয় এক নামজাদা এমেরিকান কোম্পানীর রেসিডেণ্ট ডিরেক্টার। কিন্তু সোসাইটিতে এঞ্জিনীয়র বলে তাঁর পরিচয়টা সত্য হলেও আংশিক মাত্র। এ যেন ইংলণ্ডের রাজনীতিতে উইনষ্টন চার্চ্চিলের পরিচয় দিতে বলা,—লীডার অব দি অপোজিশান।

নিখিল রায়ের স্কন্ধ মোটেই বৃষের ন্যায় নয়, তাঁর ভুজদ্বয়কেও ঠিক শালপ্রাংশু বলা চলে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গেলে তাঁকে দিব্যকান্তি বলা কঠিন। তবুও গণ্ডে কয়েকটি বসন্তের গুটিচিহ্ন বাদ দিলে বাঙ্গালী হিসাবে মোটামুটি তিনি সুপুরুষ, একথা একমাত্র স্বভাবনিন্দুক ব্যতীত আর সবাই স্বীকার করে। টেনীসে সুমন্ত মিশ্র বা দিলীপ বোসের পরেই তাঁর র‍্যাকিং হবে এমন সম্ভাবনা নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে দু'তিন বারই তিনি সেমিফাইন্যাল অবধি উঠেছেন। ক্লাব টুর্ণামেণ্টে কাপ পেয়েছেন একাধিক। ব্রিজ খেলায়ও তাঁকে পার্টনার পেলে রাবার জেতার সম্ভাবনা

থাকে। তাঁর জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত প্রমাণ এই যে, একাদিক্রমে তিন বছর তিনি ক্লাবের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও সদস্যদের মধ্যে কেউ পদত্যাগ করে নতুন ক্লাব গড়ার উদ্যোগ করেনি।

নিখিলের চরিত্রে আর একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি একজন সুদক্ষ অভিনেতা। স্বপনকুহেলীর নায়িকা সিংহল রাজকুমারী মঞ্জুশ্রীর ভূমিকায় মলী সেন। নায়ক তাঁরই প্রণয়মুগ্ধ বিদেশী রাজকুমার ইন্দ্রজিতের অংশে—নিখিল রায়। বন্ধুবান্ধবীরা ঠাট্টা করে বলেন,— "গ্রিয়ার গার্সণ অ্যাণ্ড ওয়ালটার পিজন। একেবারে ষ্টার কাষ্ট।"

অভিনয় নিখিলের নেশা, এঞ্জিনীয়রিং তাঁর পেশা। দুটোতেই তাঁর পারদর্শিতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ দিতে বদ্ধপরিকর নিখিল আলোর মালায় ছেয়ে দিয়েছেন অভিনয় মঞ্চ। মানবদেহে শিরা-উপশিরার মতো অসংখ্য দীর্ঘ বৈদ্যুতিক তার যোজনা করেছেন ষ্টেজের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। বৃহদাকার আর্ক ল্যাম্পগুলি ঝুলছে উপর থেকে। বিভিন্ন সুইচ নিয়ন্ত্রণে সেগুলির বিচ্ছুরিত আলোক বন্যায় প্লাবিত অভিনয় মঞ্চে কখনও দেখা যাবে রৌদ্রোজ্জ্বল দিবা দ্বিপ্রহর, কখনও আভাস দেবে অস্তগামী সূর্য্য-কিরণে রক্তিম আসন্ন সন্ধ্যার, কখনও বা সৃষ্টি করবে শুক্লা রজনীর মৃদুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোক। প্রয়োজন মতো সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে গভীর অন্ধকারে ঢেকে দেওয়া যাবে সম্পূর্ণ মঞ্চপীঠ।

অভিনয়ের সর্ব্বশেষ অঙ্কে আছে, সবেগে আন্দোলিত রাজপুত্রের তরণী ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গাঘাতে ভেসে যাচ্ছে কূল থেকে অকূলে, চোখের সমুখ থেকে দৃষ্টির অন্তরালে। প্লাইউড, কার্ডবোর্ড ও টিনশিট্ দিয়ে তৈরী হয়েছে ময়ূরপংখী নৌকা। তার তলদেশে গোলাকার ক্যাষ্টর আঁটা। অদৃশ্য দড়ির সাহায্যে দুলে দুলে চলবে কৃত্রিম জলের উপরে কৃত্রিম তরণী—সত্যিকার জলযাত্রার ভঙ্গিতে। সমুদ্রের ঢেউ, তার গর্জ্জন, তরণীর আন্দোলন ও গতি সমস্তই সৃষ্টি করা হবে বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তায়। তার জন্য ষ্টেজের নীচে বসানো হয়েছে বিভিন্ন অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ছোট বড় গুটিকয়েক মোটর এবং একটি ট্রান্সফর্মার। আনা হয়েছে নানা আকৃতির রেল, নানা মাপের রোলার, ছোট বড় কপিকল, দাঁতওয়ালা চাকা, সরু-মোটা শিকল, লোহার স্প্রিং, কাঠের হাতল ইত্যাদি অগণিত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম।

একটার পর একটা সুইচ টিপে শেষবারের মতো সমস্ত বৈদ্যুতিক কৌশলগুলি পরীক্ষা করে দেখছিলেন এবং দেখাচ্ছিলেন নিখিল রায়। উৎসাহের আতিশয্যে ক্ষিপ্র তাঁর ভঙ্গি, আত্মতৃপ্তির অভিব্যক্তি তাঁর মুখে, চোখে, সর্ব্বাঙ্গে। নিজের পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নে আত্মপ্রসাদ লাভ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু নিখিলের বর্ত্তমান উৎসাহ ও আনন্দের কারণ কেবলমাত্র নিজস্ব এঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধির প্রশংসনীয় পরিণতি নয়। যাকে দেখাচ্ছেন সেই বিশেষ ব্যক্তিটির উপস্থিতি এবং আগ্রহও নিখিলের মনে কম প্রভাব বিস্তার করেনি। বস্তুতঃ সুইচ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে মলী সেন প্রত্যেকটি আলোক নিয়ন্ত্রণের কৌশল এমন গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন যে, তাতে যে কোনো বিশেষজ্ঞের মনেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা জাগে। মাঝে মাঝে একটি দুটি প্রশ্নের দ্বারা মলী সেন ব্যাখ্যাকারীর সেই উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে তুলছিলেন। স্বল্প পরিসর স্থানে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সুইচ, গিয়ার, লিভার ও গ্যাজেটগুলি টিপে, টেনে, খুলে বা বন্ধ করে দেখাতে গিয়ে উৎসাহে উদ্দীপ্ত নিখিলের হাত মাঝে মাঝে অতর্কিতে মলী সেনের হাতের আঙ্গুল বা বাহুর একাংশ স্পর্শ করছিল।

সমস্ত বোঝানো ও দেখানো শেষ হয়ে গেলে মলী সেন বিস্ময় ও আনন্দে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।

ক্ষণেক অপেক্ষা করে নিখিল প্রশ্ন করলেন, "কেমন হয়েছে বলুন, মিসেস সেন।"

মলী সেন কিছু না বলে শুধু একবার নিখিলের পানে তাকালেন। বলার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর চোখের উজ্জ্বল চাহনি, তাঁর আননে আনন্দের আভা, তাঁর অধরে পরিতৃপ্তির ঈষৎ হাস্যরেখা যে কোন উচ্ছ্বসিত প্রশংসার চাইতে মুখরতর, নিখিলের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিপূর্ণ পুরস্কার।

পুনরায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নিখিল জিজ্ঞাস করলেন,

"কী ভাবছেন?"

স্মিত হাস্যে মলী সেন উত্তর করলেন, "কিছু না।

[৮৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

আকাশ-পটে

—কুমারী কৃষ্ণা (দ্বিতীয় পুরস্কার)

যাত্রা (প্রথম পুরস্কার) —মনীষিকুমার ভট্টাচার্য্য (কলি-৪)

ভোরবেলায় —ধীরাজকুমার চৌধুরী (কলি-২৭)

(তৃতীয় পুরস্কার)

উল্টাডাঙ্গা ব্রিজ —বিল্টু গুপ্ত (কলি-৩)

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে ৺রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একত্রে গৃহীত প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল।

যাত্রী

—জ্যোতিবিন্দ্রনাথ বক্সী (বর্দ্ধমান)

জল-প্রপাত

—শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য (কলি-১১)

কন্যকা
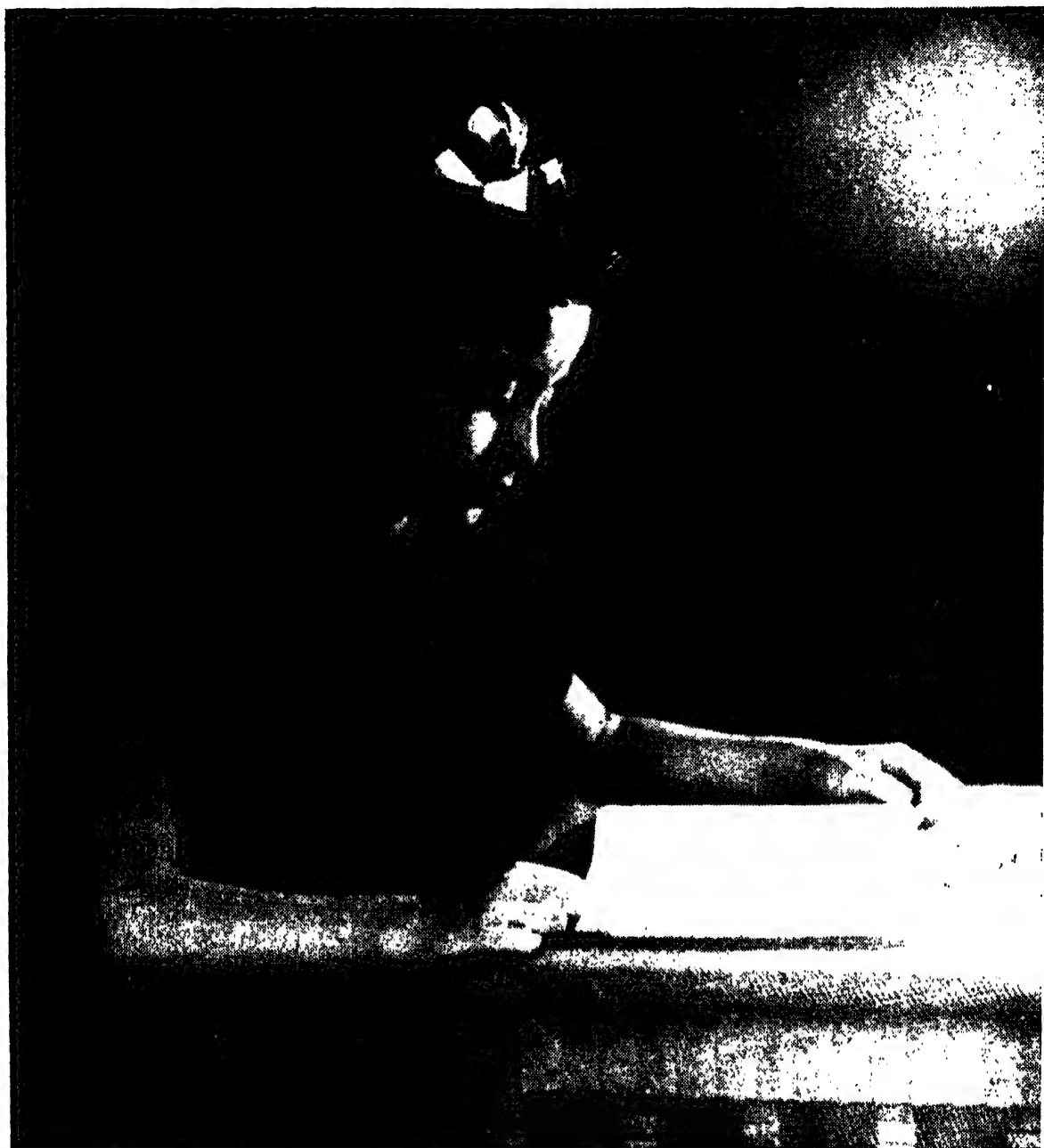
—নির্ম্মলকুমার দত্ত (কলি-৬)

প্রতিযোগিতা

বিষয়

বিখ্যাত ষ্টেশন

প্রথম পুরস্কার ১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲

তৃতীয় পুরস্কার ৫৲

ছবি পাঠাবার শেষ দিন ২৪শে কার্ত্তিক

বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

কালের আমোঘ বিধানে সবই ক্রমে বিস্মৃতির গহ্বরে চলে যায়। সেই বিস্মৃতির বন্যা থেকে বাঁচাবার জন্যে মানুষ রেখায় লেখায় প্রস্তরে মুদ্রায় অতীতকে যত্নে গেঁথে রাখবার চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহামানবের স্মৃতি-কথা এইরূপে গ্রথিত হয়ে অসংখ্য গ্রন্থমালায় পরিণতি লাভ করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এত দিন যা সঞ্চিত হয়ে আমার নিজের জীবনের একতারায় বেজেছে, তাই সকলের সঙ্গে উপভোগ করতে ইচ্ছা হয়। কি জানি কখন আমার একতারার তার ছিঁড়ে যায়; তখন আর শত চেষ্টায়ও সুরের এই কলিটি উদ্ধার করা যাবে না।

১৯৩২ সাল; রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন দু'বছরের জন্যে। আমার এ কথাটি মনে আছে তার বিশেষ কারণ, ঐ একই সময়ে আমি বাংলার 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' হয়ে নবেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করি। রবীন্দ্রনাথ 'অধ্যাপক' হওয়া পছন্দ করেননি। তাই তাঁকে বলা হতো 'আচার্য'। আচার্য ত তিনি বটেনই; তারও চেয়ে যদি কিছু বড় সম্মান থাকে, তবে সে সম্মানও যে তাঁর প্রাপ্য ছিল, এ বিষয়ে কোনও ভুল নেই।

ছাত্রাবস্থা থেকেই আমি রবীন্দ্রনাথের এক জন অনুরাগী ভক্ত ছিলাম। এবারে আরও নিকটে একই ক্ষেত্রে তাঁকে পাওয়া যাবে, এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলাম। কবি তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন; ছুটলাম শান্তিনিকেতনে। বললাম, 'আপনি যেন অস্বীকার করবেন না। কিছুই ত কাজ নয়। আপনার উপস্থিতিতেই—তাও মাঝে-সাজে—আমরা খুসী হবো। আর আপনি ত সারা জীবনই আমাদের দিয়েই এসেছেন—এমন নিঃশেষে আপনাকে উজাড় করে কেউ কোনও দিন কোনও জাতিকে দেয়নি। এখন আপনি শুধু আমাদের এক আধবার দেখা দিলেই আমরা সুখী হবো।' কবি আমার কথায় যেন সম্মত হলেন বলে বোধ হলো। কিন্তু কলকাতায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের অনুরোধে কতকগুলি প্রকাশ্য বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ভালই হলো। কিন্তু তাঁর ভগ্ন-স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে আমি ভেবেছিলাম যে, এ ব্যবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হতে পারবে না। আমার আশা ছিল, কবি জীবনের শেষভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেই কাটিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু জনসংঘটের সম্মুখে বক্তৃতা দেবার পরিশ্রম ত কম নয়। অত পরিশ্রম বেশী দিন করা চলবে না—রবি বাবুর পক্ষেও না। আমার আশঙ্কাই ফলেছিল।

তিনি মাঝে মাঝে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন, আমি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম। তারা কত সম্ভব-অসম্ভব প্রশ্ন করে তাঁকে বিব্রত করে তুলতো, কবি তাতে খুসীই হতেন। কিন্তু কবি পার পেতেন তাঁর অভ্যস্ত বক্তৃতা-ভঙ্গীর আশ্রয় নিয়ে। কখনও রাশিয়া, কখনও আমেরিকা ভ্রমণের গল্প করতেন। ছাত্র-ছাত্রীরা অবাক্ হয়ে শুনতো। এক দিন বাগ্মিবর সুরেন্দ্রনাথ সেনের কন্যা অরুন্ধতী কবিকে গানের দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করলো। অন্য দিন শিল্পী কুলদারঞ্জন রায়ের দৌহিত্রী কল্যাণী চক্রবর্ত্তী বক্তৃতায় তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল। শ্রীমতী অরুন্ধতী ও কল্যাণী এখন কলেজে অধ্যাপনা করছেন। রবীন্দ্রনাথ এই সব তরুণদের মনে কি প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন, তা কল্পনা করা যেতে পারে! তাঁরাও কবিকে তাঁদের নবীন প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং কবি যে তাতে আনন্দই পেয়েছিলেন, এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি। গল্পই হোক্ আর ভ্রমণ-কাহিনীই

হোক্, যা-ই তিনি বল্‌তেন, তারই মধ্যে এমন একটি তরুণ সজীব পরিহাস-রসিকতা থাকতো, যার জন্যে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ না হয়ে পারতো না। আমরা ছাত্রাবস্থায় তাঁর যে সব বক্তৃতা শুনেছি, তার মধ্যেও যে অদ্ভুত বেগশীলতা থাকতো, তাঁর গল্পে-আলাপে-কথায় সেই গতিচ্ছন্দের একটুও অভাব লক্ষিত হতো না। এর জন্যে শুধু বাংলা ভাষা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী নয়, আরও অনেক ছাত্র-ছাত্রী এসে জুটতেন। ফল হলো এই যে, আমার যে বিভাগ জীবনীশক্তির অভাবে এত দিন মন্থর হয়ে আসছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা পেয়ে তার দেহে নূতন কর্মশক্তির আবির্ভাব হলো। এ কথা আমি ভুলতে পারি না যে, কবি তাঁর বিরাট ব্যক্তিসত্তার আলোক যখন বাংলার তরুণদের দিকে ঘুরিয়ে ধরতেন, তখন সে আলোয় বর্ত্তমানের মূল্য অনেক বেড়ে যেতো এবং ভবিষ্যতের ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। এর প্রভাব যে কতখানি তা আমি সেদিন প্রত্যক্ষ করেছি।

'বিশ্ববিদ্যালয়' প্রভৃতি যে কয়েকটি বক্তৃতা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন, সেগুলি ভাষার চমৎকারিতায়, ভাবের শিল্পচাতুর্যে ও কণ্ঠের মাধুর্যে অপূর্ব হয়েছিল, এ কথা না বললেও চলে। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা তাঁরই মতো—অন্য উপমা দিয়ে ঠিক বোঝানো যায় না। আমি শুধু আমার অধ্যাপক-জীবনের অভিজ্ঞতাই আজ বল্‌বো। কবি মাঝে মাঝে অর্থাৎ যখন তিনি কলিকাতায় থাকতেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে উপস্থিত হতেন। এরূপ আনন্দপ্রদ উপস্থিতির সংখ্যা বেশী না হলেও, এই বহু-প্রতীক্ষিত ঘটনা বেশ একটি আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করতো। এক দিনের কথা মনে পড়ে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণকে ১৮ নং কক্ষে সমবেত হতে বলে আমি কবিকে আনতে গেলাম। কবি এসে অধ্যাপকের আসনে মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে উভয় শ্রেণীর নাম (Roll Call) ডাকলাম। আমার উদ্দেশ্য এই যে, কবিকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তিনি রীতিমতো অধ্যাপকরূপেই আমাদের মধ্যে এসেছেন এবং ছেলেমেয়েদের মনেও সেই অন্তরঙ্গতা যত দূর সম্ভব সুস্পষ্ট ভাবে ধারণা করিয়ে দেওয়া। এরূপ সুযোগ অবশ্য বেশী ঘটে উঠেনি। তার কারণ এই সময়ে তাঁর শরীর খুব ভাল যাচ্ছিল না। যা হোক্, কবি চেয়ারে বসেই কাব্য সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা শুরু করে দিলেন। আমি দাঁড়িয়েছিলাম; তার কারণ মঞ্চের উপর দু'খানা চেয়ারের স্থান ছিল না। ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, বসবার স্থানের অল্পতা ও উপস্থিতের সংখ্যাধিক্যের দরুণ। প্রায় এক ঘণ্টা কাল আলোচনা চললো। ছাত্র-ছাত্রীরা কবির 'সাজাহান' কবিতার সম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। বেশ সংযত ভাবে এবং শ্রদ্ধার সহিত কবিকে তাঁরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুললেন। আমার মনে হয়, সেদিন বাংলা ভাষার স্নাতকোত্তর বিভাগ বেশ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয়ই দিয়েছিল। কবি অসীম ধৈর্যের সহিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। কিন্তু ক্রমশঃ বিষয়টি জটিলতার চরমে উঠছে দেখে কবিই রণে ভঙ্গ দিলেন; তার প্রধান কারণ অবশ্য এই যে, অনতিদূরেই পাঠশেষের ঘণ্টাধ্বনি হলো।

তাঁর এই অধ্যাপক বা আচার্যপদ দু'বৎসরের বেশী স্থায়ী হয়নি, এই আমার ব্যক্তিগত দুঃখ। এটা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ক্ষতি। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের সুশীতল বনবীথিচ্ছায়ায় শিক্ষকতা করছিলেন বহু দিন থেকে। তাঁর নিজের রচিত শিক্ষায়তনে তিনি কি ভাবে অধ্যাপনা করতেন তার বহু ইতিহাস আছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিতান্ত অল্পপরিসর সময়ে তিনি কি ভাবে আপনাকে মানিয়ে নিয়েছিলেন, তা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এম্‌-এ পাস করার পর থেকেই তাঁর সাহচর্য লাভ করেছি। সাহিত্য পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষরূপে তাঁকে অনুরূপ পরিবেশের মধ্যে অভ্যর্থনা করেছিলাম একাধিক বার, প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ করবার সময়ও তাঁকে ছাত্রদের সংস্পর্শে নিয়ে আসবার আনন্দ লাভ করেছিলাম আমি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে যেমন 'আচার্যে'র আসনে দেখেছি এবং যেমন উন্মুক্ত অসংকোচে আলাপ-আলোচনা করতে দেখেছি; এমনটি দেখবার সুযোগ আমার আর কখনও ঘটেছে বলে মনে পড়ে না।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে বাংলা দেশ ভগ্নী নিবেদিতাকে স্মরণ করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠামণ্ডলের শুভ প্রচেষ্টায় দক্ষিণেশ্বরে যে বিরাট সভা আহূত হয়, সেখানে বিবেকানন্দ-শিষ্যার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধন্য হলাম।

তাঁর একটি মাত্র স্মৃতিমন্দির—"নিবেদিতা বিদ্যায়তন" নারী-শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হয়ে কলিকাতায় (নিবেদিতা লেন) যে গড়ে উঠেছে তার প্রতি দেশবাসীর সক্রিয় সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চাই। একমাত্র এই বিদ্যালয়েই ভগ্নী নিবেদিতাকে প্রতি বৎসর স্মরণ করা হয়; কিন্তু বাংলার তথা ভারতের প্রত্যেক নারীশিক্ষা-মন্দির ও শিশুশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে "নিবেদিতা দিবস" পালন করা উচিত। জাতির দারুণ সঙ্কটের দিনে তিনি তাঁর অধ্যাত্ম সাধনা, তাঁর নিজস্ব শিক্ষা-পদ্ধতি ও তাঁর অমূল্য জীবন আমাদের সমগ্র জাতিকে দান করে গিয়েছেন। অথচ, গভীর দুঃখের কথা এই যে, ফরাসী ভাষায় সম্প্রতি তাঁর একটি জীবনী ছাপা হয়ে গেল, কিন্তু বাংলায় তাঁর উপযুক্ত একখানিও জীবনী লেখা এ পর্য্যন্তও হোল না।—অথচ সে জীবনীর শ্রেষ্ঠ উপাদান এই বাংলা দেশের এক প্রবীণ সম্পাদক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁর 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকাদিতে রেখে গেছেন, সে কথা একালের সাংবাদিক-নায়ক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় দক্ষিণেশ্বর সভায় বলেছিলেন। আজ সংক্ষেপে বিস্মৃতপ্রায় নিবেদিতা-জীবনীর কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করি।

নিবেদিতার পিতা স্কটল্যাণ্ডবাসী Samuel Richmond Noble ইসাবেল (Isabel)-নাম্নী ধর্ম্মপ্রাণা ক্যাথলিক কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ সালে জন্মকাল থেকে, ১৮৭১ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মাত্র চার বৎসর জ্যেষ্ঠা কন্যা Margaret Noble উত্তর-আয়ারল্যাণ্ডে (Dunganon, County, Tyrone) দিদিমার বাড়ীতে কাটিয়েছিলেন। তাঁর পিতা সামান্য ব্যবসা ছেড়ে Devonshireএ পাদ্রীর কাজ নিয়ে সন্তানদের ইংল্যাণ্ডে আনেন এবং Halifax Collegeএ মার্গারেট ও তাঁর আর দু'টি ভগ্নী পড়াশুনা করেন। কিন্তু মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে পিতা রেভারেণ্ড নোবল পরলোক গমন করায়, জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি অল্প বয়সে কেস্‌উইক্ (Keswick) বিদ্যালয়ে চাকুরী নিতে বাধ্য হন।

এই যুগেই সুপ্রসিদ্ধ নূতন "শিক্ষা-আইন" প্রণয়নের ফলে—ইংল্যাণ্ডের গণশিক্ষার ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত হয়েছিল। কুমারী মার্গারেট এ সময়ে এক আদর্শবাদী ইংরাজ যুবক সহকর্ম্মীর সংগে, Ruskin, Emerson প্রভৃতিদের রচনা গভীর ভাবে পাঠ করতেন। সেই যুবকটির সংগে তাঁর বিবাহের কথা উঠবার সংগে সংগে যুবকের অকালমৃত্যু এসে নিজের ছোট সংসারটি গড়ে তোলার আশা একেবারে নির্মূল করে দিল। কিন্তু বিরাট বিশ্বমানবই যে তাঁর সংসার, সুদূর বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ যে তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি হবে—সেই জন্যই কি তরুণ জীবনের উপর এই বজ্রাঘাত? 'বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদূনি কুসুমাদপি' ভারতের এই শাশ্বত বাণী—নিবেদিতার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যাকে লেখা চিঠিতে দু'বার উল্লেখ করেছিলেন কি সেই উদ্দেশ্যেই?

যাই হোক্, মার্গারেট চেষ্টার (Chester)-এর বালিকা বিদ্যালয়ে কিছু দিন কাজ করে Londonএর অন্তঃপাতী উইম্বলডন (Wimbledon) শিশু-শিক্ষালয়ে (Nursery) যোগদান করেন। Froebel, Kindargarten প্রভৃতি নানা শিক্ষা-প্রণালী

ভ
নি বে দি তা

শ্রীকালিদাস নাগ

আয়ত্ত করে, তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করেন। এ যুগে দেখি, তিনি Ruskin School এবং Sesame Club নিয়ে মেতে আছেন। তাঁর মাতৃভূমি আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে সব আইরিশ বিপ্লবী জীবন বিপন্ন করে কাজ করতেন, তাঁদের সংগেও মার্গারেট নোবলের গভীর যোগ ছিল। ১৮৯৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ চৌদ্দ বৎসর ইংল্যাণ্ডে কাটিয়ে দেশে ফিরবার আগে এই আইরিশ বিপ্লবীদের সংগে সংযোগ রেখেছিলেন তার প্রমাণ পাই, এবং পরবর্ত্তী যুগে বরদার অধ্যাপক বিপ্লবী অরবিন্দের সংগে নিবেদিতার বন্ধুত্ব হয় সে কথা পরে বলব।

ইতিমধ্যে আর এক আধ্যাত্মিক বিপ্লবীর আবির্ভাব হোল। প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সিকাগো (Chicago) শহরে হাজির হলেন; এবং সেই বিরাট ধর্ম্ম-সম্মেলনে (Parliament of Religions) ভারতের সনাতন ঐক্য-মন্ত্র ও বেদান্তের অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রচার করে সকলকে মুগ্ধ করলেন। প্রায় দুই বৎসর আমেরিকায় প্রচার করে ১৮৯৫ সালের নভেম্বরে বিবেকানন্দ লণ্ডনে আসেন। সেইখানে মার্গারেট প্রথম স্বামিজীর ভাষণ শোনেন এবং ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৯৬ সালের এপ্রিলে স্বামিজী আর একবার লণ্ডনে এসে ঐ বছরের শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার করেন

এবং ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে সিংহল বন্দর কলম্বোতে নেমে প্রায় চার বৎসর পরে গুরুভ্রাতাদের সংগে মিলিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তিরোধানের (১৮৮৬) পর দশ বছর কেটে গেছে, মনে রাখতে হবে।

লণ্ডন ছাড়বার পূর্ব্বে স্বামিজী একখানি পত্রে লেখেন— "I have plans for the women of my country, in which you, I think could be of great help to me..." (ভারতীর নারীর উন্নতিকল্পে আমার কিছু পরিকল্পনা আছে এবং তুমি (নিবেদিতা) সেই ক্ষেত্রে আমাকে প্রভূত সাহায্য করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।)। এই সময়ে স্বামিজী তাঁর শিষ্যাকে ভারতমাতার কাছে যেন উৎসর্গ করে তাঁর নাম দেন "নিবেদিতা" এবং তিনিও সর্ব্বান্তঃকরণে "গুরু" বলে স্বামিজীকে গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত ভারতমাতার অসহায় সন্তানদের সেবা করে তাঁরই উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা নিবেদিতা দিয়ে গেছেন। নানান্ সংগ্রামের পর ১৮৯৮ সালে (২৮শে জানুয়ারী) নিবেদিতা ভারতে পদার্পণ করেন এবং স্বামিজীর আমেরিকার শিষ্য ও শিষ্যাদের সংগে বেলুড়ে থাকেন; তখন সেখানে সবে মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-"মিশনের" জন্য একটু জমি কেনা হয়েছিল। ১১ই মার্চ্চ ১৮৯৮ স্বামিজী প্রথম প্রকাশ্য সভায় ভারতবাসীর কাছে তাঁকে "নিবেদিতা" বলে পরিচয় করান এবং "The influence of Indian spiritual thought in England" (ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তার প্রভাব ইংলণ্ডে) এই বিষয়ে এক প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দেন। সেটি শুনে কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন যে, বাগ্মিতায় এমন কি এ্যানি বেসান্তকেও (Besant) হয়ত নিবেদিতা ছাড়িয়ে যাবেন। ১৬ই মার্চ্চ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে "দীক্ষা" দেন এবং একটি কবিতা উৎসর্গ করেন। মে থেকে অক্টোবর (১৮৯৮) স্বামিজী তাঁর শিষ্যাদির সংগে নিবেদিতাকে, উত্তর-ভারতের বহু তীর্থ—কুমায়ুন ও কাশ্মীর প্রভৃতি পরিদর্শন করান। স্বামিজীর দিব্য জীবনালোকে নিবেদিতা যেন নবদৃষ্টি লাভ করে ভারতমাতা ও ভারতীয় সংস্কৃতির যে অপূর্ব্ব বন্দনা ও ব্যাখ্যা লিখতে সুরু করেন, সেগুলি আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এখন সেগুলির সম্পূর্ণ অনুবাদ বাংলা ও হিন্দীতে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

কলিকাতায় ফিরে (১২ই নভেম্বর, ১৮৯৮) বোসপাড়ায় সরু গলির একটি ছোট ভাঙা বাড়ীতে প্রথম নারীশিক্ষা-মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী Albert Hallএর বিরাট সভায়—প্লেগ-বিধ্বস্ত বাংলার মানুষকে যেন সাহস দিবার জন্য—নিবেদিতা "Kali the Mothar" প্রবন্ধ পাঠ করেন—সেই সভার অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। শুনেছি, বর্ত্তমান R. G. Kar Collegeএর প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার রাধাগোবিন্দের সাহচর্য্যে নিবেদিতা প্লেগ রোগীদের নিজ হস্তে শুশ্রূষা করেছেন। তাঁর কোলেই প্লেগাক্রান্ত এক শিশু, তাঁকেই 'মা' ভেবে জড়িয়ে ধরে চক্ষু বুজেছিল।

নিবেদিতা যেন অভয় মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বাংলার যে বিপ্লবী দল তিলক ও অরবিন্দের প্রেরণায় প্রাণ দিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাদের সংগেও যোগাযোগের সূত্রপাত এ সময় হয়। কারণ পরে দেখি তাঁর নিজস্ব "বিপ্লবী সাহিত্যে"র সংগ্রহ বাংলা দেশের সর্ব্বত্যাগী দেশপ্রেমিকদেরই তিনি দিয়ে গেছেন। যদি ভারতের 'জাতীয় চিত্রশালা' কোন দিন গড়ে ওঠে, সেখানে মরকতদ্বীপদুহিতা নিবেদিতার চিত্র রামমোহন রায়ের পাশেই রাখতে হবে, কারণ নারী-প্রগতির পুরোধা রামমোহনই প্রথম উৎপীড়িত আইরিশ জাতির পক্ষ সমর্থন করে ১৯ শতকের গোড়ায় প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি রামমোহনের সহকর্মিগণ আয়র্লাণ্ডের সঙ্গে শুধু যোগ রক্ষা করেননি, প্রিন্স দ্বারকানাথ আয়র্লাণ্ড পরিভ্রমণ করেন এবং ১৮৪৫ সালে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে আয়র্লাণ্ডে প্রচুর অর্থ সাহায্যও পাঠিয়েছিলেন। সেটি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে আইরিশ নেতা ডি ভ্যালেরা, ১৯৪৩এর বাংলা দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ টাকা আমাদের সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলেন।

১৮৯৯ সালের জুন মাসে স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে "ব্রহ্মচারিণী"র পদে বরণ করেন; এবং তাঁরা সমুদ্রপথে ৩১শে জুলাই লণ্ডনে নামেন। ১৯০০ সালের ২৪শে জানুয়ারী, নিবেদিতা নিউ ইয়র্কে "ভারতীয় শিল্প" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং বোসপাড়ার সেই স্কুলটির জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে থাকেন। সেপ্টেম্বর মাসে Parisএ (Religious Congress) ধর্ম্ম-সম্মেলনের অধিবেশন শেষ করে Britteny থেকে নিবেদিতার কাছে বিদায় নিয়ে স্বামিজী ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ১৯০১ সালে দেখি, জাপানী সাহিত্যিক শিল্পী Okakura বিবেকানন্দকে জাপানে ধর্ম্ম-সম্মেলনে নিয়ে যাবার জন্য পাথেয় হিসাবে টাকা পাঠাচ্ছেন। ১৯০২ সালের গোড়াতে দেখি, Okakura বিবেকানন্দ ও ধর্ম্মপালকে সংগে নিয়ে বুদ্ধগয়া ও সারনাথ প্রভৃতি পরিদর্শন করছেন। এই বছর জানুয়ারী মাসে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের সংগে এক জাহাজে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে করতে ভগ্নী নিবেদিতা মাদ্রাজে নামেন এবং সেখানকার এক বিরাট সভায় রমেশচন্দ্র নিবেদিতার জীবন ও সাধনার গভীর ব্যাখ্যা করেছিলেন।

১৯০২ সালে জানুয়ারীতে নিবেদিতা যখন তাঁর গুরুকে দেখলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র উনচল্লিশ, অথচ জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। ১৯০০ সালে (২৬শে মে) আমেরিকা থেকে নিবেদিতাকে তিনি লেখেন, "আমার অনন্ত আশীর্ব্বাদ জেনো। কিছুমাত্র নিরাশ হোয়ো না। ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গে গৈরিকবাস ত যুদ্ধক্ষেত্রেরই মৃত্যুসজ্জা; ব্রত উদ্‌যাপন প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নয়।"

গুরুর এবং শিষ্যার দু'জনের জীবনেই এটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাঁদের শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সংগ্রাম করে গুরু উনচল্লিশে এবং শিষ্যা চুয়াল্লিশ বছরেই দেহত্যাগ করেছিলেন, অথচ কত বড় আত্মত্যাগ, সাধনা ও সিদ্ধি এই স্বল্পপরিসর দু'টি জীবনেতে দেখি!

মৃত্যুর পাঁচ মাস আগে নিবেদিতাকে স্বামিজী শেষ চিঠি লিখেছেন (১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯০২):—

"সর্ব্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্‌বুদ্ধ হোক, মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিতা হউন। অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হউক এবং সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর—এই আমার প্রার্থনা।"

নিজের জীবনের দশ বছরও বাকি নাই এটি যেন বুঝেই ভগ্নী নিবেদিতা প্রতি মুহূর্ত্তটি তাঁর গুরুর তথা ভারতমাতার সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর একান্ত নিঃসঙ্গ জীবনের চিন্তা ও ভাবনার কোনো চিহ্ন নেই, কিন্তু তাদের ছাপ আছে—"My Master as I saw him" প্রভৃতি গ্রন্থে এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দু'টি পত্রিকায়। সে কথা প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেছেন। 'প্রবাসী' এই সময়ই সুরু হয়; 'বুদ্ধ এ সুজাতা" থেকে আরম্ভ করে "ভারতমাতা" প্রভৃতি যতগুলি চিত্র শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু প্রভৃতি তাঁর শিষ্যেরা দেশকে উপহার দিয়েছেন তাদের উপযুক্ত ব্যাখ্যা সেকালে একমাত্র কলাশিল্পপ্রবীণা নিবেদিতাই করেছেন—প্রথমে 'প্রবাসী'তে এবং পরে 'Modern Review' পত্রিকায়। ১৯০২-৩ সালে নিবেদিতাকে দেখি শ্রীঅরবিন্দের নিমন্ত্রণে বরোদায়। ১৯০৪ সালে নিবেদিতা তীর্থযাত্রায় যোগ দিলেন জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকারের সঙ্গে এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্প 'কাবুলিওয়ালা'র ইংরাজী অনুবাদ ('Modern Review'এ ছাপা) এই আইরিশ লেখিকার পাশ্চাত্য জগতের কাছে শ্রেষ্ঠ অবদান। ১৯১১ সালে তাঁর অকাল-মৃত্যুর পরই রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে "ভগ্নী নিবেদিতা" প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন; তার মধ্যে কবিগুরুর কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে আজও পড়ে মুগ্ধ হতে হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (১৯০৫-৬) নিবেদিতা পূর্ব্ববঙ্গের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যার্থে গিয়ে কঠিন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এবং বুঝেছিলেন শরীর ভেঙ্গে পড়ছে আর সময় বেশী নেই। হয়ত সেই জন্যই মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি অর্থাদি সংগ্রহ করতে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে শেষ বার যান। ১৯১১ সালে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল Universal Race Congress-এ যে অপূর্ব্ব ভাষণ দেন তার প্রথম ব্যাখ্যা নিবেদিতাই এ দেশের কাগজে করেছিলেন। মেটারলিঙ্ক (Maeterlinck)-এর 'নীল পাখী' নাটিকার তাৎপর্য্যপূর্ণ আলোচনাই যেন তাঁর শেষ লেখা আমরা পড়েছি। হঠাৎ খবর এল আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের 'মায়াপুরী'ধামে নিবেদিতা শেষ শয্যা নিয়েছেন। বসুজায়া শ্রীমতী অবলা দেবী প্রাণস্পর্শী ভাষায় সে সময়ের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন:—

"আমি যখন ভগিনী নিবেদিতার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন উমা হৈমবতীর কথা আমার মনে হইয়াছিল। সে কথা তিনিই বলিয়াছিলেন (অবনীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ চিত্র 'উমা' ও নিবেদিতার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য), উমা যেমন পার্ব্বতী হইলেও পিত্রালয়ে আসেন, হিমপ্রধান দেশের এই দুহিতা তেমনই তাঁহার ভারতীয় আবাসে আসিয়াছিলেন।"

১৩ অক্টোবর ১৯১১ শেষ দিন। শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভগ্নী নিবেদিতা বললেন:—'নৌকা ডুবছে কিন্তু সূর্য্যোদয় দেখে যাবো।' "The boat is sinking..but I shall see the sun rise!"

অমর আত্মা মৃত্যুকে জয় করে যেন চিরন্তন বাণী দিয়ে গেলেন। নিবেদিতা-হৈমবতীকে তার পিত্রালয়ে আনবার জন্য কি আমরা আজও প্রস্তুত হয়েছি? স্বাধীন ভারত থেকে স্বাধীন আয়র্লণ্ডে যদি তাঁর স্মৃতিকল্পে এমন কিছু আমরা পাঠাতে পারি যার জন্য আইরিশ জাতি কিছু দিন মনে রাখবে, তবেই ভগ্নী নিবেদিতার কাছে হয়ত ঋণ শোধ হবে।

এক দিকে বোসপাড়া গলির সেই ছোট বালিকা বিদ্যালয় নিয়ে যেমন জননীর মত একনিষ্ঠ সেবা, অন্য দিকে তেমনি স্বদেশী যুগে (১৯০৪-১১) ভারতমাতার উপযুক্ত কন্যার মত কী বিচিত্র সংগ্রাম ও সিদ্ধি! যে কোনও বিরুদ্ধ সমালোচনাই আসুক, ভগ্নী নিবেদিতা যেন দেশমাতৃকার অতন্দ্র রক্ষিণী—ক্ষুরধার যুক্তির অস্ত্রাঘাতে কত প্রতিপক্ষের মতই না তিনি খণ্ড খণ্ড করেছেন; আবার তন্ময় হয়ে দেখেছেন ও আমাদের দেখিয়েছেন "স্বাধীন ভারতের" ভবিষ্যৎ গৌরবোজ্জ্বল মুখ! সত্যিই নিবেদিতা যেন জন্মে জন্মে এই দেশেতেই জন্মেছেন। অথচ তাঁর উপযুক্ত স্মৃতি ও পুণ্য জীবনী যে কেন এত কাল রচিত হয়নি, ভেবে লজ্জায় ও ব্যথায় মন আকুল হয়। শুধু শিক্ষা-দীক্ষায় নয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সংগ্রামেও ভগ্নী নিবেদিতার দান যে কত বড়, সে কথা অনেকে ভুললেও আমাদের ভোলা চলে না। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বরোদায় সাক্ষাৎ (১৯০৩) থেকে তাঁকে রাজরোষ হতে রক্ষা করার জন্য বাংলা থেকে চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচারী পাঠান (১৯১০) পর্য্যন্ত—কত অধুনা বিস্মৃতপ্রায় অথচ নিগূঢ় ইতিহাসই নিবেদিতার সঙ্গে জড়ান আছে! ভারতের অন্য সবাই মনে নাই রাখুক, কিন্তু বাংলার প্রত্যেক নর-নারীর একান্ত কর্ত্তব্য ভগ্নী নিবেদিতার পুণ্য স্মৃতি চিরজাগ্রত রাখা। তাঁর বহু সাময়িক রচনা এই কলিকাতার নানা পত্রিকাদিতেই বিক্ষিপ্ত ও অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে আছে; সেগুলির পুনরুদ্ধার করা, পুনঃপ্রচার করাও আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁর নামে যে নিবেদিতা নারী-শিক্ষায়তন বাগবাজারে প্রায় ৩০।৪০ বছর নীরবে কাজ করে চলেছে, সেখানে অনেক বিশিষ্ট সেবিকা ও শিক্ষাধর্ম্মিণী অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন নিজে দেখেছি; তাঁর হীরক-জয়ন্তী (১৮৯৮-১৯৫২) আসন্ন। তাই আশা হয়, তাঁরাই এ কাজের ভার নিয়ে ভগ্নী নিবেদিতার সমগ্র রচনাবলী ও জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা করে আমাদের জাতিকে ঋণমুক্ত করবেন। আগামী ১৯৫২ (জানুয়ারী)তে আবার স্বামী বিবেকানন্দের ৯০তম জন্মোৎসব; তাঁর মানস কন্যা ভগ্নী নিবেদিতাকেও সেই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন ও সমগ্র জাতি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করবে, এই আশায় এই রচনা উৎসর্গ করে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

"শুধু মনোপলিতে জমে না কখনও আড্ডা,
যেমন শুধু সলিলোকীতে জমে না নাটক।"

—শরৎচন্দ্র

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আয়তন অনেক বার পরিবর্তিত হইয়াছে। মৌর্য আমলে ভারতবর্ষ উত্তরে হিন্দুকুশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল অর্থাৎ ব্যাকট্রিয়া বা আফগান তুর্কিস্থান বাদে পশ্চিমে হিরাট পর্যন্ত সমগ্র আফগানিস্থান মৌর্য ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পণ্ডিতগণের মতে হিমালয় নহে, হিন্দুকুশ ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক উত্তর সীমানা। ("The first Indian Emperor (Chandra Gupta), more than two thousand years ago, entered into possession of that "Scientific frontier" sighed for in vain by his English Successors and never held in its entirety by the Mughal monarchs of the 16th and 17th centuries" —V. Smith) খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত কাবুল সহ সমগ্র পূর্ব আফগানিস্থান ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দিল্লীতে তুর্ক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে আফগানিস্থান ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মুঘল আমলে আবার আফগানিস্থান ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে নাদির শাহ আফগানিস্থান দখল করিবার পর হইতে উহা স্থায়ী ভাবে ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং বলা যায় যে, শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃত্বে, যাহা দেশের ভৌগোলিক আয়তনকে খণ্ডিত করে, এমন কোনরূপ রাজনৈতিক আয়তন পরিবর্তনের ব্যবস্থা বা সীমানা নির্দ্ধারণ স্থায়ী হইতে পারে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথা বলিতে বিদেশীরা যে সাব-কণ্টিনেণ্টের কথা বলেন আমরা সেই সাব-কণ্টিনেণ্টাল বা ভৌগোলিক ভারতবর্ষের কথা বলিব।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে ব্যক্তি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ, সে-ও বলিতে পারিবে যে সভ্যতা ও শক্তিতে এই ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ কোন সময়ে উন্নত হইয়া উঠিলে, অপরকে দান করিবার মত সম্পদ নিজের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইলে তাহাদের সম্প্রসারণের ক্ষেত্র প্রথমে উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে, পরে দক্ষিণ-পূর্বে ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইবে। উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণ অবিচ্ছিন্ন স্থলপথে সহজে পরিচালিত হইতে পারে কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণে সমুদ্র অতিক্রম করা আবশ্যক।

উত্তরে আফগানিস্থান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানা (বর্তমান নাম তাজিকীস্থান), উত্তর-পশ্চিমে ইরাণ ও উত্তর-পূর্বে চীনা তুর্কিস্থান বা সিংকিয়াং, মোঙ্গলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও কৃষ্টিগত সম্পর্কের ইতিহাস অনেকটা পরিচিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগের ইতিহাস ফরাসী ও ডাচ পণ্ডিতগণের চেষ্টায় খানিকটা উদ্ধার হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রপথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য আমাদিগকে অভিভূত করে। এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রপথে ভারতবাসীর অভিযান কাহিনী।

এই অভিযানকে দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিবার কারণ আছে। সে কারণ কি, বলা হইতেছে: দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতবাসী খৃঃ পূঃ চারি হইতে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে সুমেরিয়া ও বেবিলোনের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। এক জন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পশ্চিম-ভারতের সহিত মেসোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগ খৃঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের প্রাচীন, ইহা খৃঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন হইতে পারে। খৃঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ৪০০০ বৎসর পূর্বে এই দুই দেশের মধ্যে সেগুন কাঠ ও মসলিনের ব্যবসায় চলিত (J. R. A. S. xx. 336, 337; xxi. 204)। হিন্দুদিগের মধ্যে চান্দ্রমাস গণনার রীতি মেসোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। অনুমান করা হয়, চান্দ্রমাস গণনার রীতি মেসোপটেমিয়া হইতে আসিয়া থাকিলে উহা খৃঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের পূর্বে আসিয়াছিল; কারণ, সারগণের সময়ে (নিও-বেবিলোনীয়ান মতে সারগণের কাল খৃঃ পূঃ ৩৮০০ বৎসর) উহা প্রাচীন রীতি বলিয়া পরিগণিত হইত।

খৃঃ পূঃ অষ্টাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে মিশরের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিশরে খৃঃ পূঃ ১৭০০ বৎসরের কবরে ভারতীয় মসলিন ও নীল (indigo) পাওয়া গিয়াছে (J. R A S xx 206)। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের (খৃঃ পূঃ ১৭শ হইতে ১৬শ শতাব্দী) চতুর্থ এমেনোফিস্ চক্র প্রতীকে পূজিত 'এটেন' নামে পরিচিত সূর্য দেবতার উপাসনার প্রচলন করেন। মিশরীয় পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানী কোন কোন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন, মিশরে এই উপাসনা ছিল সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এবং ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা এমন অনুমানও করিয়াছেন যে, চতুর্থ এমোনোফিসের পিতা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষীয় ছিলেন। মিশরীয় ইতিহাসের মতে চতুর্থ এমেনোফিসের মাতা রাণী তাই-এর স্বামী ছিলেন মিশরে বৈদেশিক আগন্তুক।

খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে কার্থেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ-আমেরিকায় ভারতবর্ষের সহিত ধর্ম ও কৃষ্টিগত সম্পর্কের প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে মেক্সিকোর মায়া জাতির মধ্যে। এই সম্পর্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। মায়া জাতির নিকট হইতে অনেক ভারতবর্ষীয় জিনিষ পরে আজটেক জাতি গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপ দুই-চারিটা বিচ্ছিন্ন তথ্যের টুকরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে অধ্যায়ের কথা অস্পষ্ট আলোকের রেখার মত চোখের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতে চাহে সে অধ্যায়ের পরিচয় কবে পাওয়া যাইবে?

এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির কথায় আসা যাউক।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুইটি দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের পরিচয় তাহাদের নাম বহন করিতেছে—ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়ার অপর নাম "Insulindia" বা দ্বীপময় ভারত।

এ দুইটি দেশ ছাড়া ব্রহ্ম, মালয়, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত। ভৌগোলিক অবস্থান হিসাবে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও অষ্ট্রেলিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

সমুদ্রপথে যাতায়াত সহজ ও সাধারণ ব্যবস্থা হইলেও ব্রহ্ম-শ্যাম-মালয়-ইন্দোচীনের সঙ্গে ভারত স্থলপথে সংযুক্ত। এই স্থলপথেই আজাদ-হিন্দ বাহিনী শ্যাম হইতে ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া ইম্ফল ও কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ব্রহ্মের ইতিহাসের সঙ্গে শ্যামের ইতিহাস, শ্যামের ইতিহাসের সঙ্গে মালয়ের ইতিহাসের সংযোগ আছে। ইন্দোচীনের ইতিহাসের সঙ্গে শ্যামের ও চীনের ইতিহাসের সংযোগ আছে। সুমাত্রা হইতে নিউগিনি পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বীপমালা লইয়া গঠিত ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস আলাদা। ফিলিপাইনস্ ও অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সীমান্তবর্তী দুইটি অঞ্চল, তাহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ আলাদা ও ভারতবর্ষের সহিত এই ইতিহাসের সম্পর্ক নাই।

প্রথমে এশিয়ার ভূভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বলা হইতেছে।

আমরা যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে ভৌগোলিক পুরাণ বলা যায়। এই পুরাণ এখানে বলিবার একটু কারণ আছে। সে কারণ এই যে, কোন কোন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী পণ্ডিত দক্ষিণ-ভারতের আদিবাসী উপজাতির সহিত অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর আত্মীয়তার কথা তুলিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড (Proto-Australoid) নাম এই আত্মীয়তা-সূচক। এই নামের অর্থ এই যে, দক্ষিণ-ভারতের আদিবাসী উপজাতির পূর্বপুরুষ ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর পূর্বপুরুষ সম্ভবতঃ এক গোষ্ঠীভুক্ত। মালয়ের আদিবাসীদিগকেও এই গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয়। এই মতের সমর্থনে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার কথা পরে বলা হইবে, এখানে একটি মাত্র যুক্তির উল্লেখ করা হইতেছে। সে যুক্তি এই যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া এক কালে স্থলপথে সংযুক্ত ছিল।

ইহা নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের কথা নহে, ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের কথা। আপনাদের মতের পরিপোষক হিসাবে তাঁহারা ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানিগণের অনুমানকে কাজে লাগাইয়াছেন।

ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানিগণের মতে এক কালে (পার্মো-কারবনিফারাস আমলে) এখন যেখানে ভারত মহাসাগর দেখা যায় সেখানে ও তাহার উত্তরে দুইটি বিস্তৃত ভূভাগ ছিল। উত্তরের ভূভাগ পূর্ব হইতে পশ্চিমে পৃথিবীর উত্তরাংশ জুড়িয়া অবস্থিত ছিল। এই উত্তর মহাদেশের নাম দেওয়া হইয়াছে আঙ্গারা (Angara)। দক্ষিণে অবস্থিত ভূভাগ অষ্ট্রেলিয়া, ভারতীয় উপদ্বীপ, দক্ষিণ-আফ্রিকা জুড়িয়া বর্তমান ছিল। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে গণ্ডোয়ানা (Gondwana)। এই দুই ভাগের মধ্যে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া অবস্থিত ছিল একটি বিস্তৃত সমুদ্র। কালক্রমে দক্ষিণ মহাদেশ ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও বহু বিচ্ছিন্ন, বৃহৎ ভূভাগ জলমগ্ন হয়। ফলে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যে একটি যোজক ইহার পরেও বর্তমান ছিল। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে লেমুরিয়া। মাডাগাস্কার হইতে পূর্বে মালদ্বীপ ও লাক্ষা দ্বীপ পর্যন্ত এই যোজক অবস্থিত ছিল। ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে এই এক বৃহৎ ভূভাগ আন্দামান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এখন যেখানে বঙ্গোপসাগর রহিয়াছে তাহা এই ভূভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, মালয় দ্বীপপুঞ্জ এক কালে বোর্ণিও, সুমাত্রা, জাভা ও মালাক্কা লইয়া এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল ও পশ্চিম দিকে সেলিবিস, মোলাক্কাস (Moluccas), নিউগিনি ও সলোমন দ্বীপ লইয়া অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। পূর্বের অংশকে ইন্দো-মালয় ও পশ্চিমের অংশকে অষ্ট্রেল-মালয় নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সমগ্র অঞ্চলকে মালয়ান আর্ক (Malayan arc) নাম দেওয়া হয়। ইহা এশিয়ার আগ্নেয়গিরি-বলয়ের এক অংশ।

ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের এই পুরাণ অবলম্বন করিয়া প্রোটো অষ্ট্রালয়েড জাতির কথা উঠিয়াছে, অষ্ট্রীক ভাষাগোষ্ঠীর (Austric family of languages) কথা উঠিয়াছে, আরও অনেক কথা উঠিয়াছে। যথাস্থানে সে সকল কথার উল্লেখ করা হইবে।

এইবার অষ্ট্রেলিয়া ও ফিলিপাইনস্ এবং ইন্দোনেশিয়ার সেলিবিস, নিউগিনি প্রভৃতি সম্পূর্ণ আদিবাসী উপজাতির অঞ্চল বাদ দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সকল অঞ্চলের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সম্পর্ক রহিয়াছে, সেই সকল অঞ্চলের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল অঞ্চলের মধ্যে পড়ে ইন্দোচীন, শ্যাম বা থাই দেশ, ব্রহ্ম, মালয় ও ইন্দোনেশিয়া। সিংহল ভারতবর্ষের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র, সুতরাং সিংহলের কথা কিছু বলা বাহুল্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সকল অঞ্চলের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সম্পর্ক আছে, সেই অঞ্চলগুলির কথা বলিতে গিয়া প্রথমে যে জিনিষটি চোখে পড়ে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। ভারতবর্ষের সঙ্গে স্থলপথে যে সকল অংশ সংযুক্ত তাহার মধ্যে একমাত্র শ্যামের দক্ষিণে প্রলম্বিত মালয় উপদ্বীপ ছাড়া আর কোথাও ইসলামধর্ম ব্যাপক ভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই সকল অঞ্চলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। শুধু ইন্দোচীনের একটি ধ্বংসপ্রায় উপজাতির মধ্যে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের কিছু কিছু প্রচলিত থাকিলেও ব্রহ্ম হইতে দক্ষিণ-চীন সাগরের উপকূলবর্তী আনাম ও তাহার উত্তরে টংকিং পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে। ইন্দোনেশিয়াতে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র ক্ষুদ্র বালী দ্বীপে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের কিছু কিছু প্রচলন থাকিলেও সমগ্র ইন্দোনেশিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। শুধু হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলের স্থাপত্য-শিল্পের বিস্ময়কর উন্নতির সাক্ষ্য বহন করিয়া বহু মন্দির চারি দিকে ছড়াইয়া আছে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম কেন এই ভাবে বিপর্যস্ত হইল, কেন ইসলামধর্ম বাধা পাইল না, তাহা এ পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় নাই বা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

দ্বিতীয় যে জিনিষটি চোখে পড়ে তাহার কথা বলা হইতেছে। ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতবর্ষীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দলে দলে ভারতবাসী স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের সংখ্যা পু[ষ্ট] করিয়াছিলেন; আপনাদের ধর্ম, ধর্মশাস্ত্র, ভাষা, আচার-অনুষ্ঠা[ন] এই সকল উপনিবেশে প্রচার করিয়াছিলেন; বিস্তীর্ণ শক্তিশা[লী] রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সকল সাম্রাজ্য অনে[ক]

দিন লুপ্ত হইলেও ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের প্রচারিত ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, আচার-অনুষ্ঠানের অজস্র পরিচয় ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় এখনও রহিয়াছে, নাই শুধু ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান অধিবাসীদের চেহারায় ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের কোন ছাপ। কোন এক সময়ে, অনুমান করা যায় হিন্দু আমলের শেষের দিকে, ভারতবর্ষ হইতে নূতন জনপ্রবাহ গিয়া ঔপনিবেশিকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা বন্ধ হইয়াছিল। স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন ভারতীয়গণ আপনাদের রক্তের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, অন্য রক্তের মিশ্রণে ভারতীয় রক্তের শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় যে জিনিষটি আকর্ষণ করে তাহা ভারতবর্ষ, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে সাদৃশ্য।

এই রাজনৈতিক ইতিহাস নাটকের মত রোমাঞ্চকর। নাটক আরম্ভ হইল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায়—প্রাচ্য বাণিজ্যের দখল লইয়া।

প্রাচীন যুগে যেমন কার্থেজ মধ্যযুগে সেইরূপ ভেনিস কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, প্রাচ্যের বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের শিল্পসম্ভার পশ্চিম জগতে বণ্টন করিবার অধিকার হস্তগত করিয়া। কার্থেজের যে সমৃদ্ধি রোমের ঈর্ষা জাগাইয়া পিউনিক যুদ্ধের সূত্রপাত করে তাহার মূলে প্রাচ্য বাণিজ্য। ক্ষুদ্র সহর যে ভেনিসের খ্যাতি এখন রূপকথার মত শুনায় তাহার উন্নতির মূলে ছিল এই প্রাচ্য বাণিজ্য।

য়ুরোপ ও মিশরে তুর্ক জাতির অভ্যুদয় হইলে ভেনিসের বাণিজ্যপোত-বাহিনীর প্রাচ্য সমুদ্রে আসিবার পথ রুদ্ধ হইল। রূপকথার ঐশ্বর্যের খনি প্রাচ্য বাণিজ্য ভেনিসের হস্তচ্যুত হইল। ভেনিসের সমৃদ্ধির মূলে শেষ আঘাত হানিল পর্তুগীজ জাতি উত্তমাশা অন্তরীপের পথ আবিষ্কার করিয়া।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট দুইখানি পর্তুগীজ জাহাজ আসিয়া কালিকটের কাছে ক্যানানোরে নোঙ্গর ফেলিল। এই জাহাজ দুইখানার নায়ক ছিলেন ভাস্কো ডা গামা। প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য পর্তুগালের রাজা ডন ম্যানোয়েল এই জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য তখন আরব ব্যবসায়ীদের হাতে। আরব ব্যবসায়ীদের প্রাণপণ বিরোধিতা ও কালিকটের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, বীর জামোরিনের আজীবন শত্রুতা সত্ত্বেও পর্তুগীজরা যে ভাবে পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে, সিংহলে, বঙ্গোপসাগরের দ্বীপগুলিতে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়া চলিল সে এক বিস্ময়কর কাহিনী।

ক্ষুদ্র দেশ পর্তুগালের লোকসংখ্যা তখন দশ লক্ষ মাত্র। এই ক্ষুদ্র দেশ ও ক্ষুদ্র জাতি নৌশক্তি ও ঐশ্বর্যে ১৬শ শতাব্দীতে য়ুরোপের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিল প্রাচ্য বাণিজ্যের দৌলতে। ভাস্কো ডা গামা দেশে ফিরিলে সমগ্র য়ুরোপে হৈচৈ পড়িয়া গেল। য়ুরোপের প্রাচ্য বাণিজ্য-নীতির আমূল পরিবর্তন হইল। ক্ষুদ্র পর্তুগালের ক্ষুদ্র রাজার নূতন উপাধি হইল "Lord of the Conquest, Navigation and Commerce of Ethiopia, Arabia, Persia and China."

তার পর স্পেন ও পর্তুগালের সম্মিলিত রাজ্যের রাজা হইলেন ২য় ফিলিপস। য়ুরোপে ফিলিপসের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ, ইংরাজ ও ডাচ জাতি তাঁহার ভয়ে সন্ত্রস্ত। শক্তিশালী ডাচ রাষ্ট্র দীর্ঘকাল ফিলিপসের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া এই তথ্য আবিষ্কার করিল যে, ফিলিপসের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার পর্তুগালের প্রাচ্য বাণিজ্যে আঘাত না করিলে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। প্রাচ্য, বিশেষ করিয়া ভারতীয় বাণিজ্য হইতে পর্তুগাল যে সম্পদ আহরণ করিত তাহার সবটুকু খরচ হইত ইংরাজ ও ডাচের সঙ্গে যুদ্ধে। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে কর্ণেলিস হুটম্যানের নায়কত্বে চারখানা ডাচ জাহাজ প্রাচ্য সমুদ্রে রওনা হইল।

এক শত বৎসর প্রাচ্য বাণিজ্যে একাধিপত্য ভোগ করিবার পরে পর্তুগীজের হাত হইতে প্রাচ্য বাণিজ্য ছিনিয়া লইল ডাচ জাতি। ১৭শ শতাব্দীতে ডাচ নৌশক্তি পৃথিবীতে অজেয় হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের অধিকৃত রাজ্য ও বন্দর প্রায় সবগুলি তাহারা কাড়িয়া লইল। তাহারা ফরমোসা, মালাক্কা, সিংহলের জাফানিপত্তন অধিকার করিল, উত্তমাশা অন্তরীপে উপনিবেশ স্থাপন করিল ও সমগ্র ইন্দোনেশিয়া কবলিত করিয়া বাটাভিয়া সহর প্রতিষ্ঠা করিল। তখন হইতে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ-আধিপত্য আরম্ভ হইল।

ডাচ জাতির সফলতায় প্রলুব্ধ হইয়া ইহার পর ইংরাজ প্রাচ্য সমুদ্র পাড়ি দিল। বাণ্টাম, মোলাক্কাস, সুমাত্রা, শ্যাম, মালয় ও মসুলিপত্তনে তাহারা এজেন্সী খুলিল। কয়েক বৎসর পরে সুরাটে এজেন্সী স্থাপিত হইল। তখনকার দিনে ইংরাজ ডাচ জাতির অনুগ্রহে ব্যবসায় চালাইত, তাহাদের প্রধান ঘাঁটি ছিল ইন্দোনেশিয়ায়। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার আম্বোয়ানায় কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড ঘটিল। ডাচরা যেখানে যে ইংরাজকে পাইল নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিল। ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, মালয়, জাপান হইতে ব্যবসায় গুটাইয়া ইংরাজ ভারত অভিমুখে রওনা হইল। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচের হাতে মার খাইয়া ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিয়া ইংরাজের বরাত খুলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ফরাসীরা প্রাচ্য সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়াছিল।

১৫শ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পর্তুগীজ, ডাচ, ইংরাজ ও ফরাসীর কামড়াকামড়ি চলিয়াছিল প্রাচ্যে বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তারের জন্য। ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, সুমাত্রা, বোর্ণিও, জাভা, ইন্দোচীন, চীন, ফিলিপাইনস ও জাপান পর্যন্ত পূর্বে ও পশ্চিমে পারস্য, আরব, আফ্রিকা পর্যন্ত এই জাতিগুলির কলহ ও দস্যুবৃত্তির ক্ষেত্র হইয়াছিল। কলহ থামিলে দেখা গেল ভারতবর্ষে ইংরাজ, ইন্দোচীনে ফরাসী ও ইন্দোনেশিয়ায় ডাচরা সাম্রাজ্য কাঁদিয়া বসিয়াছে।

ভারতবর্ষ, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া য়ুরোপের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যলোভী দস্যু জাতিদিগের কবলিত হইবার পরে ব্রহ্ম তাহার স্বাধীনতা হারাইল, একমাত্র শ্যাম তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই নাটকের যেমন প্রথম অঙ্কে তেমনি শেষ অঙ্কেও বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। নির্বাপিত প্রতাপ ইংরাজ ও ডাচ জাতি একই সময়ে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও ইন্দোনেশিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, যদিও আড়াল হইতে হাত বাড়াইয়া জল ঘোলা করিবার সনাতন অভ্যাস তাহারা ত্যাগ করিতে পারে নাই। ইন্দোচীনে দেশসেবক এবং আমেরিকার সাহায্য-পুষ্ট ফরাসী শোষকদিগের লড়াই এখনও শেষ হয় নাই। ব্রিটিশ অধিকৃত মালয়েও লড়াই চলিতেছে।

[ক্রমশঃ।

কুমায়ুনের নরখাদক বাঘ

জিম করবেট অবলম্বনে

বিখ্যাত শিকারী জিম করবেট বলেন, যে কোন কারণেই হ'ক, স্বাভাবিক খাদ্য থেকে বঞ্চিত না হ'লে এবং দৈব দুর্বিপাক বশতঃ বাধ্য না হ'লে বাঘ মানুষ মারে না বা মানুষ খায় না। করবেট সাহেব লিখেছেন, "A tiger is a large hearted gentleman with boundless courage and that when he is exterminated—as exterminated he will be unless public opinion rallies to his support,—India will be the poorer by having lost the finest of her fauna."

করবেট সাহেব লিখেছেন, কুমায়ুনের দু'টি নরখাদক বাঘ পাঁচশ' পঁচিশটি মানুষ মেরেছিল এবং এর প্রধান কারণ ছিল, স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব এবং মহামারীতে অসংখ্য লোকের মৃত্যু ও মৃতদেহগুলির উপযুক্ত সংকারের অভাব। রুদ্রপ্রয়াগের এক নরখাদক চিতার কবলে একশ' পঁচিশ জন হতভাগ্যের মৃত্যু হয়। করবেট সাহেব দু'বছর ধরে অমানুষিক চেষ্টার পর বাঘটিকে শিকার করেন। এই শিকারের আগে তিনি কুমায়ুনের জঙ্গলে বাঘ শিকার করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে, কুমায়ুনের দুটি নরখাদক বাঘ পাঁচশ' পঁচিশটি মানুষের জীবন নষ্ট করেছিল। করবেট সাহেব এই বাঘ দুটি শিকার ক'রে কুমায়ুনের অধিবাসীদের জীবন রক্ষা করেন। সেই কাহিনীই এখানে আলোচিত হবে। চম্পাবতের নরখাদক বাঘটি নেপালে দুশ' লোকের প্রাণনাশ করে। তখন নেপালীরা দল বেঁধে বাঘটার পেছনে লাগে এবং সে নেপাল ত্যাগ করে এসে কুমায়ুনের জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। কুমায়ুনে এসে সে নিশ্চেষ্ট থাকে না, আরও মাত্র দুশ' চৌত্রিশ জনকে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়। তখন মিঃ বার্থাউড নৈনিতালের ডেপুটী কমিশনার; করবেট সাহেব নৈনিতালে গেলে মিঃ বার্থাউড তাঁকে খবর দেন, বাঘটি মারার জন্য। এর আগে বাঘটাকে মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সৈন্য ও বিশেষ শিকারী দল প্রেরিত হয়েছিল—কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন লাভ হয়নি। করবেট সাহেব মিঃ বার্থাউডকে জানালেন যে, তিনি রাজী আছেন দুটি সর্ত্তে। প্রথমতঃ পুরস্কার ঘোষণা বাতিল ক'রতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ বিশেষ শিকারী দল ও সৈন্যদল প্রত্যাহার করতে হবে। মিঃ বার্থাউড সর্ত্ত মেনে নিলেন এবং তার কয়েক দিনের মধ্যেই খবর এল, দবিধুরা ও ধুনাঘাটের মধ্যবর্ত্তী পালিগ্রামে জনৈকা স্ত্রীলোক নিহত হয়েছে। স্ত্রীলোকটি নিহত হবার পাঁচ দিন পরে করবেট সাহেব পালিগ্রামে উপস্থিত হলেন।

গ্রামটির অধিবাসী ব'লতে জন পঞ্চাশেক পুরুষ, নারী ও শিশু। তারা দস্তুরমত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে এবং বেশ একটু বেলা থাকতেই দরজায় খিল এঁটেছে। করবেট সাহেব গ্রামে পৌছলে তাঁর লোক জন মিলে একটা অগ্নিকুণ্ড করলে তিনি তার ধারে ব'সে চা খেতে লাগলেন। তখন এদিকে-ওদিকে দুটি-একটি দরজা অতি সন্তর্পণে খুলে দু'-এক জনকে বাইরে আসতে দেখা গেল। বাড়ীগুলির অবস্থা দেখে বোঝা গেল, গত পাঁচ দিন ধরে কেউ বাড়ী থেকে বেরোয়নি। বাঘের মুখে জীবন দেওয়ার চেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে থাকবে, সেও ভাল। বাঘটা যে তখনও কাছাকাছি রয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া গেল। প্রতি দিন রাত্রেই অতি নিকটে তার গর্জ্জন শোনা যায় এবং দিনেও সাহস করে বেরোলে তার দর্শন মেলা বিচিত্র নয়। গ্রামের মোড়ল শিকারীর জন্য একখানা ঘর ঠিক করে দিলে, কিন্তু ঘরটি ছোট ব'লে করবেট সাহেব ঘরের বাইরে রাত কাটাতে মনস্থ করলেন। তাঁর লোক-জন ঘরে রইল আর তিনি বাইরে রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় বন্দুক হাতে ক'রে বাঘের অপেক্ষায় বসে রইলেন। চাঁদের আলো থাকলেও আশে-পাশের অন্ধকার ছিল খুব গাঢ় এবং যখন বাতাসে গাছের ডাল-পালাগুলি আন্দোলিত হ'চ্ছিল, তখন তাদের ছায়াগুলি দেখে মনে হ'চ্ছিল যেন দশ-বারটা বাঘ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। এই রাস্তাটা দিয়ে বাঘটা প্রত্যহ যাতায়াত করতো, কিন্তু এদিন তার আর কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। ভোরের দিকে মিঃ করবেট গাছতলায় ব'সে ব'সেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ভোর বেলা তাঁর লোক-জন এসে তাঁকে জাগায়।

পাঁচ দিন আগে গ্রামের যে স্ত্রীলোকটিকে যেখানে মারা হয়েছিল সেখানে গ্রামের কেউ যেতে চায় না, কেবল দূর থেকে দিক নির্দ্দেশ করে দেয়। ঘটনার দিন জন কুড়িক স্ত্রীলোক ও বালিকা আধ মাইল দূরে গরু-বাছুরের জন্য গাছের পাতা কেটে আনতে গিয়েছিল। একটি মেয়ে পাতা কেটে গাছ থেকে নামার সময় বাঘটা নীচে থেকে তার পা কামড়ে ধরে। তখন মেয়েটি গাছ থেকে প'ড়ে যায়, আর বাঘটা তাকে মুখে করে তুলে নিয়ে চলে যায়। "ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন" নামক সবাক ছবিতে এই ঘটনাটি দেখান হয়েছে। অন্যান্য সকল রমণীর চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটে। বাঘটা চলে গেলে তারা উর্দ্ধশ্বাসে কোন রকমে গ্রামে ফিরে আসে। তখন ঠিক দুপুর। বাড়ীর পুরুষেরা বাড়ীতে ভাত খেতে এসেছিল। ঘটনা শুনে তারা লাঠি-সোটা, ঢোল প্রভৃতি নিয়ে ঘটনা-স্থলে যাত্রা করল। যেখানে মেয়েটিকে মারা হয়েছিল, সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা কি করবে ভাবছে, এমন সময় ত্রিশ গজ দূর থেকে বাঘটা একবার গর্জ্জন করে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে বীরপুরুষেরা যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। গ্রামে ফিরে এসে সবাই পরস্পর পরস্পরকে দোষ দিতে লাগলো। সকলেই বলে, 'ও যদি ছুটে না পালাতো তাহলে আমি কিছুতেই ছুটতাম না।' শেষে বুদ্ধিমানেরা বললেন যে, তাই যদি সত্য হয়, সকলেরই যদি সাহস থাকে, তাহলে আবার ঘটনা-স্থলে যাওয়া যাক। এই ভাবে তিন তিন বার যাওয়া এবং আসা হল। শেষ বার এক জন বন্দুকের আওয়াজ করতে বাঘটার ঘন ঘন গর্জ্জন শোনা যেতে লাগল, তার পর আর কেউ ওদিক মাড়াতে সাহস করল না। বন্দুকধারীকে যখন জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, সে বনের মধ্যে গুলী না করে শূন্যে গুলী ছুঁড়ল কেন, তখন সে বললে—বাঘটা একেই রেগেছিল, তার উপর গায়ে গুলী লাগলে আরও রেগে গিয়ে নিশ্চয়ই তার ভবলীলা সাঙ্গ করতো। সাহসী বীর বটে!

সারা সকালটা করবেট সাহেব গ্রামের চার দিক ঘুরে দেখলেন,

কিন্তু বাঘের পদচিহ্ন কোথাও পাওয়া গেল না। একটা বাদাম গাছের তলায় তিনি প্রাতরাশ সেরে নিলেন ; এমন সময় গ্রামের মোড়ল এসে তাকে বললে যে, মাঠ থেকে গম কাটা হবে, তিনি যদি পাহারা দেন তাহলে নির্ব্বিঘ্নে কাজটি সমাধা হতে পারে, নইলে কখন যে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের সম্মুখীন হ'তে হবে, তা কেউ বলতে পারে না। সাহেব রাজী হলে গম কাটা সুরু হল এবং সাহেব বন্দুক কাঁধে ক'রে পাহারা দিতে লাগলেন। সন্ধ্যার মধ্যে পাঁচটা ক্ষেতের গম কাটা হয়ে গেল। সাহেবের উপস্থিতিতে গ্রামের অধিবাসীরা সাহস ফিরে পেল এবং কতকটা স্বচ্ছন্দ ভাবে চলাফেরা আরম্ভ করল। কিন্তু তারা কিছুতেই তাঁকে বাঘের আস্তানার কাছে নিয়ে যাবে না। শেষে সাহেব তিনটি পাহাড়ে-ছাগল অব্যর্থ লক্ষ্যে শিকার করায় তাদের আস্থা জন্মে এবং তারা সাহেবকে যেখানে শেষ রমণীটি নিহত হয়েছিল, সেইখানে নিয়ে যেতে রাজী হয়। তখনো পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীলোকটির সংস্কার হয়নি। কারণ তার শরীরের কোন অংশই সংগ্রহ করা যায়নি। এখন সেই স্ত্রীলোকটির আত্মীয়রা অনুরোধ জানালেন, যদি মৃতদেহের কোন অংশ এমন কি অস্থি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তবে যেন নিয়ে আসা হয় শেষকৃত্য সমাপনের জন্য।

ঘটনা-স্থলে গিয়ে দেখা গেল, যেখানে হতভাগ্য রমণীর প্রাণবায়ু বার হয়েছিল সেই জায়গাটিতে ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন রয়েছে এবং খানিকটা রক্ত পড়ে জমে আছে। জীবনের মায়ায় সে গাছের যে ডালটি আঁকড়ে ধরেছিল, সেই ডালে তার হাতের চামড়া খানিকটা ছিঁড়ে গিয়ে আটকে ছিল। শুষ্ক রক্ত-চিহ্ন অনুসরণ ক'রে একটি ঝোপের মধ্যে গিয়ে স্ত্রীলোকটির কাপড় এবং কয়েক খণ্ড হাড় পাওয়া গেল। বাঘটা তার' শরীরের কোন অংশ বাকী রাখেনি। সেই অস্থি কয়খানি কাপড়ে জড়িয়ে এনে তার আত্মীয়দের দেওয়া হ'ল।

পালিগ্রামের কাছে আর একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটেছিল! গ্রামের পাশে সরকারী রাস্তার ওপরে কয়েক একর জমি নিয়ে এক ব্যক্তি বাস করত। লোকটির স্ত্রী ও তার দিদি এক দিন পাহাড়ের উপর ঘাস কাটতে গিয়েছিল। এমন সময় বাঘটি হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়ে বড় বোনটিকে তুলে নিয়ে চলে যায়। ছোট বোন তাই দেখে কাস্তে হাতে করে বাঘের পেছনে ছুটতে থাকে। সে চীৎকার করে বলতে থাকে, 'দিদিকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে যাও।' এই অবিশ্বাস্য দৃশ্যটি গ্রামের অধিবাসীরা প্রত্যক্ষ করেছিল। কয়েক শত গজ অগ্রসর হওয়ার পর বাঘটা তার শিকার নামিয়ে রেখে ফিরে দাঁড়ায় এবং গর্জ্জন ক'রে পশ্চাদ্ধাবনকারিণীর দিকে এক লাফ দেয়। তখন সেই বীর রমণী ছুটতে ছুটতে কোন রকমে গ্রামে এসে হাজির হয়। গ্রামের লোক-জন বাঘটার অনুসন্ধানে গিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে এসে দেখে হতভাগ্য রমণীটি তার বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

করবেট সাহেব বললেন যে, যে বাঘটা তার দিদিকে হত্যা করেছে, তিনি তাকে মারবার জন্য এসেছেন, তখন সেই রমণী হাত দুটি যুক্ত ক'রে সাহেবের পাদস্পর্শ করল।

মিঃ করবেট বাঘ মারবার সঙ্কল্প জানালেন বটে, কিন্তু বাঘের সন্ধান যে কোথায় পাওয়া যাবে, তা বলতে পারা বড়ই কঠিন। কয়েক শত বর্গ-মাইল ধ'রে এর বিচরণ-ক্ষেত্র এবং বাঘটার বিশেষত্ব এই যে, একবার সে যেখানে শিকার ধরে, সেখানে আর দ্বিতীয় বার প্রত্যাবর্ত্তন করে না। করবেট সাহেব লিখেছেন, এ যেন সেই ছুটো খড়ের গাদার মধ্য থেকে একটি সূচ বের করা।

তিনি তিন দিন ধরে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে বাঘের সম্ভাব্য অবস্থান-ক্ষেত্রগুলি ঢুঁড়ে বেড়ালেন, কিন্তু কোথাও মহাপ্রভুর দর্শন পাওয়া গেল না। তখন তিনি পালি-গ্রামের পনের মাইল পূর্ব্বে চম্পাবতে ফিরে যাবার মনস্থ করলেন। প্রত্যূষে যাত্রা করে সূর্য্যাস্তের মধ্যে তিনি চম্পাবতে পৌছলেন। তাঁর দলে প্রথমে আট জন ছিল, পরে পথিমধ্যে আরও বাইশ জন এসে যোগ দেয়। এই অঞ্চলের পথ-ঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না। সেজন্য সকলে দল বেঁধে চলাফেরা করতো। পথিমধ্যে যারা করবেট সাহেবের দলের সঙ্গে মিলিত হয়, তারা দু'মাস আগে একবার চম্পাবতে এসেছিল। তাদের মুখে এক করুণ কাহিনী শোনা গেল।

দু'মাস আগে কুড়ি জন লোকের একটি দল চম্পাবতের বাজারে যাচ্ছিল। বেলা ঠিক দুপুরের সময় তারা এক নারীর করুণ আর্ত্তনাদ শুনতে পায়। কিছুক্ষণ পরেই তারা দেখে, একটি বাঘ এক উলঙ্গ নারীকে মুখে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, আর স্ত্রীলোকটি অসহায় ভাবে করুণ আর্ত্তনাদ করছে। দেখতে দেখতে বাঘটি অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকগুলির পঞ্চাশ গজ দূর দিয়ে বাঘটা চলে গেল, আর হতভাগ্য স্ত্রীলোকটি কাতর স্বরে "রক্ষা করো" রক্ষা করো" বলে চীৎকার করা সত্ত্বেও এই কুড়িটি বীরপুরুষের এমন সাহস হল না যে, তার সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়। কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটির গ্রামের লোক-জন (প্রায় ৬০ জন) মাইল খানেক দূরে এক উপত্যকার ধারে মৃতদেহ আবিষ্কার করে। বাঘটা স্ত্রীলোকটির শরীরের সমস্ত রক্ত শুষে খেয়ে নিয়েছিল, আর কিছু করেনি।

চম্পাবতের তহশীলদারের কথা মত মিঃ করবেট কয়েক মাইল দূরে এক ডাক-বাংলোয় যাবার স্থির করলেন। সেই অঞ্চলে না কি বহু লোক নিহত হয়েছিল, সেখানে পৌছবা মাত্র দু'জন লোক এসে খবর দিলে যে, দশ মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে বাঘের আক্রমণে একটি গরু নিহত হয়েছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে করবেট সাহেব বুঝতে পারলেন যে, আক্রমণকারী একটা চিতা বাঘ, তিনি যে নরখাদকের সন্ধান করছেন, সে নয়। চিতার পেছনে ছুটে তিনি সময় নষ্ট করতে চাইলেন না, বাংলোয় ফিরে এলেন।

বাংলোটা ছিল ঠিক পাহাড়ের উপর। পরদিন পাহাড়ের অদূরবর্ত্তী গ্রাম থেকে এক জন এসে খবর দিলে, বাঘে আবার একটি তরুণীকে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে শিকারী তাঁর রাইফেল নিয়ে তার সঙ্গে সেই গ্রামে গিয়ে হাজির হলেন। গিয়ে দেখলেন, বিভিন্ন বয়সের নরনারী ও শিশুর দল জটলা করছে। সাহেবকে দেখে সবাই একসঙ্গে ঘটনা জানাতে চায়। সাহেব তখন এক জনকে পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে আসল ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। লোকটি এক ফার্লং দূরবর্ত্তী কয়েকটি ওক গাছের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে বললে, জন বারো স্ত্রী-পুরুষ ওই গাছের তলায় শুকনো কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল, এমন সময় একটা বাঘ অতর্কিতে সেখানে হানা দেয় এবং ষোল-সতের বছর বয়সের এক তরুণীকে আক্রমণ করে। তখন অবশিষ্ট লোকেরা গ্রামে ফিরে আসে এবং

সাহেবকে খবর দিতে লোক পাঠায়। মেয়েটিকে আক্রমণ করার পর যে কি হ'ল, সে দিকে আর কেউ দৃষ্টি দেয়নি।

মিঃ করবেট তখন তাদের গোলমাল করতে নিষেধ ক'রে সেই ওক গাছগুলির দিকে অগ্রসর হ'লেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, যেখানে বালিকাটি আক্রান্ত হয়েছিল, সেখানে খানিকটা রক্ত পড়ে র'য়েছে আর সেখান থেকে রক্তের দাগ পাহাড়ের দিকে চ'লে গিয়েছে। সেই দাগ ধ'রে অগ্রসর হ'য়ে মেয়েটির শাড়ীখানা পাওয়া গেল এবং আরও কিছু দূরে পাওয়া গেল তার সায়া। এবার সে একটি নগ্ন তরুণীকে নিয়ে যায়, কিন্তু এবার তরুণী আর জীবিত ছিল না। সাহেব বাঘটার অনুসরণ করে চলেছেন, তখন পেছনে শব্দ পেয়ে সাহেব ফিরে দাঁড়ালেন, দেখলেন—একটা লোক রাইফেল হাতে তাঁর দিকে আসছে। তিনি কাকেও আসতে বারণ করা সত্ত্বেও সে কেন এল, জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, তহশীলদার তাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর আদেশ অমান্য করার সাহস তার হয়নি। কি আর করা যাবে! সাহেব তাকে ভারি বুট জুতো খুলে ফেলতে বললেন। রবার সোলের জুতো না থাকলে বাঘের অনুসরণ বৃথা এবং বিপজ্জনক। কিছু দূর অগ্রসর হবার পর সাহেবের সাহায্যকারী আর যেতে চায় না। কেবলই সাহেবের হাত টেনে ধ'রে বলতে থাকে, চার দিক থেকেই বাঘের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে, আর এগিয়ে কাজ নেই। পাহাড় থেকে আর্দ্ধেক পথ নামার পর প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়া পাওয়া গেল। লোকটিকে তার উপর অপেক্ষা ক'রতে ব'লে সাহেব সেই পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আরও অগ্রসর হ'লেন। কিছুক্ষণ পরে একটা ক্ষুদ্র জলাশয় পাওয়া গেল। রক্তের দাগ জলের ধার পর্য্যন্ত গিয়েছে। বাঘটা বোধ হয় সেখানে আহারে মন দিয়েছিল, কিন্তু শিকারীর আগমনের শব্দ পেয়ে সে আর সেখানে থাকতে সাহস করেনি। জলের ধারে রয়েছে খানিকটা রক্ত এবং বাঘের থাবার দাগ। আর একটি সুন্দর পদার্থ সেখানে পড়ে ছিল, সেটি হ'চ্ছে সেই তরুণীর একখানি কোমল পা। হাঁটুর কিছু উপর থেকে পা'টিকে যেন কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। পা দিয়ে তখনো রক্ত ঝরে পড়ছে। পাখানির দিকে তাকিয়ে থাকার সময় শিকারীর বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল। জলাশয়ের পাড় প্রায় পনের ফুট উঁচু। তার উপর থেকে বাঘটা শিকারীর উপর লাফিয়ে পড়ার উপক্রম করছিল। শিকারী তা দেখতে পাননি, কিন্তু তিনি বন্দুকের নলটি উঁচু দিকে করে ট্রিগারের উপর আঙুল দিয়েছিলেন, তাই দেখে বাঘটা সরে যায়। এটা অনেকটা intuition বলেই আকস্মিক ভাবে ঘটে গিয়েছিল। নইলে এই শিকার-কাহিনী আর কাউকে শুনতে হ'ত না। বাঘটা যখন চ'লে যায়, তখন খানিকটা মাটি খসে পুকুরের জলে এসে পড়ে, শিকারী কেবল সেইটাই লক্ষ্য ক'রে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারেন।

আবার অনুসরণ সুরু হ'ল। বাঘটা এবার অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠল। এটা তার ৪৩৬তম মানুষ শিকার। এর আগে অনেক বার সে আহারের সময় উদ্ধারকারী দলের অনুসরণে বাধা পেয়েছে, কিন্তু এবারের ন্যায় এত দূর পর্য্যন্ত এসে কেউ তার পেছনে লাগেনি। কাজেই সে এবার গর্জ্জন করে প্রতিবাদ জানাল। গর্জ্জন শুনে শিকারীর ভয়ও হ'ল, আশাও হ'ল। ভয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আশা এই যে, বাঘটা যদি আক্রমণ করে, তা হলে তাকে শিকার করা সম্ভব হবে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু বাঘটা কেবল ভয় দেখাতেই চেয়েছিল। কারণ গর্জ্জন করার পরও যখন সে দেখলে যে, সাহেব নাছোড়বান্দা, তখন সে গর্জ্জন ত্যাগ করলে।

করবেট সাহেব একাদিক্রমে চার ঘণ্টা বাঘটার অনুসরণ করে এসেছেন। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, এখন না ফিরলে সন্ধ্যার মধ্যে গ্রামে ফেরা যাবে না। পাহাড়ের উপর তিনি তাঁর যে সাহায্যকারীকে রেখে গিয়েছিলেন সে ভাবছিল, সাহেব এতক্ষণ বাঘের পেটে। কিন্তু এখন সাহেবকে ফিরতে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

পরদিন বন পিটিয়ে বাঘ শিকারের আয়োজন হ'ল। তহশীলদার জানিয়ে দিলেন, লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলেও কাউকে কিছু বলা হবে না। বাঘটা স্থানীয় অধিবাসীদের মনে যে বিভীষিকা জাগিয়ে তুলেছিল, তাতে জঙ্গল ঠেঙ্গাবার জন্য লোক জোগাড় করা শক্ত ছিল। কিন্তু দুপুরের মধ্যে দু'শ' আটানব্বই জন লোক নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হাজির হ'ল।

যথাসময়ে অভিযান আরম্ভ হ'ল। বনের ভেতর থেকে বাঘটার যে খাদের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল, শিকারী তার মুখে রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা ক'রতে লাগলেন। এ দিকে জঙ্গল ঠেঙ্গান সুরু হ'ল। ভীষণ চীৎকার, ঢাক-ঢোলের শব্দ এবং বন্দুকের আওয়াজে বাঘটা বেরিয়ে এল, কিন্তু গুলী করার আগেই বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'ল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাড়া খেয়ে আবার বেরিয়ে আসতেই সাহেব পর পর দুটো গুলী চালালেন। এর আগেই একটা গুলী ছোঁড়া হ'য়েছিল। সাহেবের কাছে মোট তিনটে গুলী ছিল। শেষের গুলী দুটো বাঘের গায়ে বিদ্ধ হলেও সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটু ঘুরে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকলো। সাহেব তখন তহশীলদারের বন্দুকটা নিয়ে একটু অগ্রসর হতেই বাঘটা বেরিয়ে এসে মাথার উপর একটা পাথরের উপর হাঁ ক'রে দাঁড়াল। মনে হ'ল, এইবার শিকারীর উপর লাফিয়ে পড়বে। সাহেব সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলী ছুঁড়লেন। আগের গুলীতেই বাঘটা ঘায়েল হ'য়েছিল। এবার সে ধরাশায়ী হ'ল। বাঘটার মুখের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা গেল, তার উপরের ও নীচের দুটো কুকুরে দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। দাঁতের দোষের জন্য স্বাভাবিক ভাবে জীব-জন্তু শিকার করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে এবং তার পর থেকেই সে মানুষ খেতে আরম্ভ করে।

গ্রামবাসীদের আর আনন্দের সীমা রইল না। তাদের পরম শত্রু নিপাত হ'য়েছে। এইবার তারা নির্ভয়ে চলাফেরা ও কাজ-কর্ম্ম করতে পারবে। সাহেবের সম্মানার্থে এক ভোজের আয়োজন হ'ল। নৈনিতালে ফিরে যাবার পথে পালিগ্রামের পাশে যে স্ত্রীলোকটি বাঘ কর্ত্তৃক তার বোন নিহত হবার পর বোবা হয়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে সাহেব দেখা ক'রে বাঘের চামড়া দেখিয়ে জানালেন যে, তার বোনের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হ'য়েছে। সাহেবের কথা শুনে স্ত্রীলোকটি পিছন ফিরে ছুটতে লাগল আর তার স্বামী ও অন্যান্য লোক-জনদের ডাকতে লাগল, সাহেব কি এনেছে দেখবার জন্য। কি অসম্ভব

ব্যাপার! স্ত্রীলোকটি আকস্মিক ভাবেই তার বাক্‌শক্তি ফিরে পেল, যেমন ভাবে সে সেই শক্তি হারিয়েছিল।

এর পর মিঃ করবেট কুমায়ুনে আরও কয়েকটি নরখাদক বাঘ শিকার করেন। তার মধ্যে চৌগড়ের নরখাদক বাঘটি ত পাঁচ বছরে বিভিন্ন গ্রামের ৬৪ জনের প্রাণনাশ করেছিল। পূর্ব্ব-কুমায়ুনের—উত্তর থেকে দক্ষিণে পঞ্চাশ মাইল, পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে তিরিশ মাইল—মোট দেড় হাজার বর্গ-মাইল অঞ্চলে এই বাঘটা তার সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। শীতকালে এই অঞ্চলটি তুষারে ঢেকে যায়, আর গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্য্যের তাপে উপত্যকাগুলি ঝলসে যায়। এই অঞ্চলের ছোট ছোট গ্রামগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাবার কোন বড় রাস্তা নেই। সরু সরু পথগুলি ঘন জঙ্গল ও উপত্যকার মধ্য দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে গিয়েছে। বাঘের উপদ্রবে যখন এই পথ দিয়ে চলা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে, তখন আর যাতায়াত চলে না। তখন একটা উঁচু জায়গা থেকে কোন লোক চীৎকার ক'রে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোক-জনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সংবাদ আদান-প্রদান চলে।

খবর নিয়ে জানা গেল, কালাআগার পাহাড়ের উত্তর ও পূর্ব দিকের গ্রামগুলিতে বাঘটার উৎপাত বেশী। কালাআগার পর্ব্বতশ্রেণীটি দৈর্ঘ্যে চল্লিশ মাইল এবং উচ্চে ৮৫০০ ফুট এবং শীর্ষদেশ ঘন জঙ্গলে ভরা। এই পাহাড়ের উত্তর মুখ বরাবর একটা পথ কয়েক মাইল পর্য্যন্ত চলে গেছে। পথটা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কখনও বা বনের প্রান্তভাগ দিয়ে অগ্রসর হ'য়েছে। এই পথেরই একটা বাঁকে কালাআগার ফরেষ্ট বাংলো। শিকারী জিম করবেট চার দিন হেঁটে এপ্রিলের সন্ধ্যায় এই বাংলোয় পৌঁছলেন। এই অঞ্চলে বাঘটার শেষ শিকার হ'য়েছিল এক বাইশ বছর বয়সের যুবক। কালাআগার বাংলোয় পৌঁছবার পরদিন সকালে যুবকটির ঠাকুমা করবেট সাহেবের কাছে এসে তার একমাত্র নাতি এবং জগতে এক মাত্র আত্মীয়ের মৃত্যুকাহিনী বর্ণনা করে জানালে যে, সাহেব যদি বাঘ শিকারের জন্য টোপ হিসাবে তার তিনটি দুধোলো মোষ নেন, তাহলে সে অন্ততঃ এইটুকু তৃপ্তি পাবে—পৌত্রের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সে সাহায্য ক'রতে পেরেছে। এত বড় বড় মোষ সাহেবের কোন কাজে লাগবে না, কিন্তু তিনি বৃদ্ধাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না—তিনি বললেন, নৈনিতাল থেকে তিনি যে চারটে বাচ্ছা মোষ এনেছেন, তাদের ব্যবহারের পর তিনি বৃদ্ধার মোষগুলি নেবেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ থেকে আগত মোড়লদের কাছ থেকে জানা গেল, দশ দিন আগে বাঘটাকে কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী একটা গ্রামে শেষবার দেখা গেছে। ঐ গ্রামটি কালাআগার পাহাড়ের পূর্ব দিকের ঢালু অংশে অবস্থিত। এখানে বাঘটা এক দম্পতীকে মেরে ভোজ লাগিয়েছিল।

পরদিন সকালে জিম করবেট কালাআগার বাংলো থেকে সেই বন্য পথ দিয়ে যাত্রা ক'রলেন। পাহাড়ের প্রান্ত থেকে দু' মাইল দূরবর্ত্তী ডালকানিয়া গ্রামে যেতে হবে, কারণ সেইখানেই না কি বাঘের আড্ডা। কিন্তু পথে কয়েক জন লোক এসে খবর দিলে যে, এই দিন সকালে ডালকানিয়ার দশ মাইল উত্তরে এক গ্রামে বাঘটা এক দল স্ত্রীলোককে ফসল কাটার সময় আক্রমণ ক'রেছে। সাহেবের তাঁবুবাহী লোক-জন আট মাইল হেঁটে আসার পর আরও দশ মাইল যেতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সাহেব তাদের ডালকানিয়ায় পাঠিয়ে দিয়ে একাই যাবার স্থির করলেন। পথটা অত্যন্ত খারাপ এবং ঘন জঙ্গলে ভরা, তার উপর যে কোন সময় নরখাদক ব্যাঘ্র-পুঙ্গবের আবির্ভাব হ'তে পারে। কাজেই খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হ'তে হ'ল। ফলে নির্দ্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছতে যখন আরও কয়েক মাইল বাকী, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লেন। সাহেব একটা ওক গাছে উঠে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করলেন। কয়েক ঘণ্টা ঘুমের পর গাছের তলায় কয়েকটা জানোয়ারের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সাহেব বুঝতে পারলেন, কয়েকটা ভাল্লুক 'করফল' গাছে উঠছে। এই গাছে এক রকম জামের মত ফল হয়, ভাল্লুকের খুব প্রিয় খাদ্য। ভাল্লুক যখন খায়, তখন বড় গোলমাল করে, কাজেই আর ঘুমান সম্ভব হ'ল না।

সকালে তিনি গ্রামে গিয়ে দেখলেন, পাঁচ একর জায়গায় দুখানি কুটীর ও একটি গোয়াল—এই হ'ল গ্রাম আর তার চার দিক জঙ্গলে ঘেরা। তিন জন স্ত্রীলোক যখন ফসল কাটছিল, তখন বাঘটা আসে, কিন্তু আক্রমণের আগেই তাকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বলে তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সে আবার জঙ্গলে ফিরে যায় এবং সেখানে আর একটা বাঘ তার সঙ্গে যোগ দেয়। পরে বাঘ দুটো পাহাড়ের গা বেয়ে উপত্যকায় নেমে যায়। সারা রাত দুই কুটীরের অধিবাসীরা জেগে কাটায় এবং বাঘের গর্জ্জন শুনতে থাকে। শিকার না ধরতে পেরেই বোধ হয় বাঘটা আক্রোশে গর্জ্জন করেছিল। সাহেব আসার কিছুক্ষণ আগেও না কি তার ডাক শোনা গিয়েছিল। সাহেব আগে থেকেই জানতেন যে, বাঘটার সঙ্গে একটা বড় বাচ্ছা বাঘ আছে।

গ্রামের লোকরা খুব অতিথিপরায়ণ। সাহেব সারা রাত জঙ্গলে কাটিয়েছে জেনে তারা সাহেবের খাবারের আয়োজন করতে চাইল। কিন্তু তারা অত্যন্ত গরীব ব'লে সাহেব রাজী হলেন না। তিনি কেবল একটু চা চাইলেন, কিন্তু চা না থাকায় তাঁকে দুধ দেওয়া হ'ল। গ্রামবাসীদের অনুরোধে শিকারী বাকী ফসল কাটার সময়টা পাহারায় রইলেন এবং দুপুরের সময় যে উপত্যকা থেকে বাঘের গর্জ্জন শোনা গিয়েছিল, সেই দিকে যাত্রা করলেন।

একটা রাত সাহেব গাছেই কাটিয়ে দিলেন। পরদিন খবর পাওয়া গেল, বাঘে একটা গরু মেরেছে। ঘটনা-স্থলে যাবার পথেই অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা খাদের মধ্যে বাঘ দুটো তখন আহারে মন দিয়েছে। সাহেব একটা ভাল জায়গা বেছে নিলেন। কিন্তু মুস্কিল হল, কোন্‌টা ধাড়ী আর কোন্‌টা বাচ্ছা। ধাড়ীটাকেই আগে মারা দরকার, কারণ বাচ্ছাটা এখনো তত ভয়ঙ্কর হ'য়ে ওঠেনি। গায়ের রং একটার গাঢ় হলদে আর একটার ফিকে। তিনি ঠিক ক'রলেন, বয়স বেশী হওয়ার দরুণ গাঢ় রং ফিকে হয়ে গিয়েছে। সুতরাং যার রং ফিকে সেই ধাড়ী। তিনি সেইটাকেই গুলী করলেন, অপরটা চম্পট দিল। এক বছর পরে জিম করবেট এই বাঘটাকে শিকার করতে সমর্থ হন।

অনুবাদক—হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

পল্লী সাহিত্যে পূর্ব্বরাগ

শ্রীকামিনীকুমার রায়

আমাদের বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গসাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ্। তাহাতে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের যে বর্ণনা আছে, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই তাহার সহিত অল্প-বিস্তর পরিচিত। মানবীয় ভাব ও ভাষা লইয়া তাহা রচিত হইলেও উহার মূলে রহিয়াছে একটা আধ্যাত্মিক উপাদান, অতি মানবীয় প্রেরণা। কিন্তু পল্লীকবিদের পূর্ব্বরাগের চিত্রগুলিতে সে অতীন্দ্রিয় জগতের কোনও আভাস নাই, যাহা আছে তাহা সাধারণ মানুষের অনুরাগ-রঞ্জিত হৃদয়ের ভাষায় তাহাদের হৃদয়েরই অভিব্যক্তি। অনেক পল্লীগাথায়ই দেখা যায়, নায়ক-নায়িকারা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়া বিবাহের বহু পূর্ব্বেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তিলে-তিলে তাঁহাদের অনুরাগ গাঢ় হইয়াছে এবং সমাজের বিধান বা মাতা-পিতার মতের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহারা পরস্পরকে আত্মদান করিয়াছেন। কখন যে কি অবস্থায় কিসেব প্রেরণায় নর-নারী একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বরাগের উন্মেষ হয়, তাহার কোন সূত্র নির্দ্দেশ করা যায় না। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সর্ব্বদাই ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপানুরক্তির প্রেরণায় পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয় এবং ক্রমে তাহা গভীর অনুরাগে পরিণত হয়। চারি চক্ষুর মিলনের পর হইতে পূর্ব্বরাগ নর-নারীর চিত্তে একটা ব্যাকুলতা জাগাইয়া তোলে, পরস্পর পরস্পরকে কাছে পাইতে চায়, মিলিত হইবার জন্য তাহাদের চিন্তা, চেষ্টা ও আগ্রহের অবধি থাকে না। কিন্তু তাহাদের ঈপ্সিত মিলন প্রায়ই সহজে ঘটিয়া উঠে না, নানা দিক হইতে বাধা আসে। পিতা-মাতা বাধা দেন, অবস্থার অসমতা বাধা দেয়। এইরূপে নানা বাধার সম্মুখীন হইয়া অপ্রাপ্তির অসীম বেদনায় অনুরাগী চিত্ত আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে, গোপন অভিসারের পালা চলে; কিন্তু তাহাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি কোথায়? লজ্জা ভয় মান ত্যাগ করিয়া, কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া কয় জন আর ঘরের বাহির হইতে পারে? এই যে না-পাওয়ার ব্যাকুলতা, এই যে মিলনাকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি, এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ইহা চিরকালের মানব-হৃদয়ের।

কবে কোন্ যুগে বৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে বাজিয়াছিল বাঁশী, সেই বাঁশী আজও বাজিতে শুনি বাংলার গোঠে-মাঠে, নদীকূলে। সে বাঁশীর স্বরে রাধার সব কিছু এলোমেলো হইয়া গিয়াছিল, তিনি 'বড়ায়ি'কে বলিয়াছিলেন—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধন।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।"

*　　*　　*

যাহার বাঁশীর স্বরে আমার এই অবস্থা, জানি না সেই বংশীধারী কেমন? আমার সাধ হইতেছে তাঁহার পদে নিজকে দাসীরূপে একেবারে সমর্পণ করিয়া দিই।

বাংলার এক পল্লীবালাকেও বাঁশীর স্বরে ঠিক এইরূপই ব্যাকুল দেখিতে পাই। বলরামের কন্যা সাজুতী রোজ নদীর ঘাটে জল আনিতে যায়, বাঁশীর শব্দ শুনে, আনমনা হইয়া যায়, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কে বাঁশী বাজায় বুঝিতে পারে না। জল থাকিলেও জল ফেলিয়া ঘাটে যায়। দূরে বাজে বাঁশী। কি আকর্ষণ সে বাঁশীর!

"ভরা না কলসীর জল জমিনে ঢালিয়া।
জলের ঘাটে যায় কন্যা কলসী লইয়া।

*　　*　　*

সোতেতে ভাসায়ে কলসী শুনে বাঁশীর গান।
বাঁশীর সুরে হইরা নিল অবলার প্রাণ।

*　　*　　*

দূরে, কেয়া বনের ওপারে, ঝোপঝাড়েব আড়ালে বাঁশী বাজে। ঘন-কৃষ্ণ মেঘ অতি দ্রুতগতিতে আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়। সাজুতী ভাবে,—

—"কোন্ গহনে বাজে বাঁশী অই না মধুর স্বরে।
নিতি নিতি জলের ঘাটে বাঁশীর গান সে শুনি।
বাঁশীর সুরে মন পাগলা হইলাম উন্মাদিনী।
আজি আসি কালি আসি ফিইরা ফিইরা যাই।
যে জনে বাজাইল বাঁশী তারে দেখতে নাই সে পাই।
সাঁতার যদি জানতাম আমি দেখতাম বিচারি
মনচোরা ভ্রমর বন্ধু আন্‌তাম তারে ধরি।

*　　*　　*

সাজুতী এক দিন স্নান করিতে জলে নামিয়াছে, তন্ময় হইয়া বাঁশী শুনিতেছে। সহসা দেখে, স্রোতের টানে কলসী নাগালের বাহিরে ভাসিয়া চলিয়াছে। আশঙ্কায় তাহার বুক দুরু-দুরু করিয়া উঠিল! তাই তো, মাতা-পিতাকে সে কি বলিবে? আকাশের দেবতা পবনকে ডাকিয়া সে মিনতি করিল,—

"আসমানের দেবতা বায়ু রে উজান বহাও পানি।
সোতের কলসী মোর তুমি দেও আনি।"

বংশীধারী নিকটেই কোথায় ছিল, কন্যার মিনতি তাহার কানে পৌঁছাইল। সে সাজুতীর কাছে আসিয়া হাসিয়া বলিল,—'বাতাসকে ডাকিতেছ, বাতাস কি কথা শুনে? আমি তোমার কলস আনিয়া দিতেছি।'

"বাতাসে না শুনে কথা কন্যালো আমার কথা ধর।
আমি আন্যা দিবাম কলসী তুমি যাও ঘর।"

নিভৃত জলের ঘাটে, কেয়া বনের ধারে সহসা চারি চক্ষুর মিলন হইল। সাজুতী চিনিল, বংশীধারী আর কেহই নহে—তাহার পিতার মহিষরক্ষক (মইষাল), বাথান-বাড়ীতে থাকে। পল্লীকবি তাহাদের এই মিলন-চিত্রটি এই ভাবে আঁকিয়াছেন—

"একেলা আছিল কন্যা হইল দুই জন।
জলের ঘাটে চারি চক্ষুর হইল মিলন॥
মনে মনে কয় কন্যা মন সাক্ষী করি।
বাপের মৈষাল তুমি থাক বাথান বাড়ী॥
লাজেতে হইল কন্যার রক্তজবা মুখ।
পরথম যৌবন কন্যার এই পরথম সুখ॥"

মইষাল কলসী তুলিয়া দিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে বাথানে চলিয়া গেল, সাজুতীও বাড়ী ফিরিল; কিন্তু তাহার মন যেন আজ আর তাহার বশে নাই।

"সেই বাঁশী বাজাইয়া মইষাল গোষ্ঠে যায়।
আজি কেন সুন্দর কন্যা ফিরা ফিরা চায়॥
আজি কেন মইষাল তোমার হইল এমন।
তোমার হাতের বাঁশী হইল দুষমণ॥
নিতি নিতি হইলে দেখা এমন না হয়।
আজি কেন সুন্দর কন্যার জীবন-সংশয়॥"

'ঐ বাঁশী তো প্রতিদিনই শুনি, ভাল লাগে শুনি; মইষালকেও চিনি, দেখি। কিন্তু আজ যেন সব আর এক রকম হইয়া গিয়াছে!' পূর্ব্বরাগের এই রীতি।

"আর দিন বাজে বাঁশী না লাগে এমন।
আজিকার বাঁশীতে কেন কাড়িয়া লয় মন॥
এই বাঁশী সেই বাঁশী নয় বাজে নয়া তানে।
বিনাথ মইষাল আইজ মরিল বাথানে॥"

সাধারণ পল্লীবালার পক্ষে মাতা-পিতার শাসন, কুলমানের ভয় উপেক্ষা করা সহজ নয়। সাজুতীর এখন কেবল মন ঝুরে; ঘরে আর তাহার ভাল লাগে না, অথচ বাঞ্ছিতের উদ্দেশে বাহির হইতেও পারে না। সামান্য রাখাল সে, তাহার পিতারই ভৃত্য, আশ্রিত; তাহাদের মিলন-পথে পিতা নিশ্চয়ই বাধা দিবেন। সাজুতীর হৃদয়ে অপ্রাপ্তির একটা তীব্র ব্যাকুলতা। কিন্তু মইষাল বন্ধুকে প্রাণের কথা সে কি করিয়া জানায়! মনে মনে বলে:—

"মইষ রাখ মইষাল বন্ধুরে ক্ষীর নদীর পাড়ে।
মজিল অবোলার মন তোমার বাঁশীর সুরে॥"

রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া মহিষ রাখিতে তাহার কতই না কষ্ট হয়! সে কি বিল হইতে পদ্মের পাতা তুলিয়া আনিয়া মাথায় ধরিতে পারে না?

"রইদে কেন পুড়রে বন্ধু মেঘে কেন ভিজ।
বিলে আছে পউদের পাতা আন্যা মাথায় ধর॥
সুজন চিন্যা পিরীত করা বড় বিষম ল্যাঠা।
ভাল ফুল তুলিতে গেলে অঙ্গে লাগে কাঁটা॥
রে বন্ধু অঙ্গে লাগে কাঁটা॥"

জানি, মনের মানুষকে সহজে পাওয়া যায় না, তার জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট পোহাইতে হয়। তোমার জন্য যে আমার অন্তরে কি বেদনা, তাহা দেখাইবার উপায় কি? যদি সম্ভব হইত বুক চিরিয়া দেখাইতাম।

"লাজ বাসি মনের কথা কইতে নাহি পারি।
দেখাইতাম বুকের দুঃখু বুক মোর চিরি॥
রে বন্ধু বুক মোর চিরি॥
কইতে নাহি পারি কথা বাপ মায়ের কাছে।
লীলারী বাতাসে মোর অন্তর পুড্যা গেছে॥
* * * *
ঘরের বাহির হইতে নারি কুলমানের ভয়।
অবলা নারীর মনে আর কত বা সয়॥
মনেরে বুঝাই কত মন না মানে মানা।
এ ভরা যৌবন কলসী দিনে দিনে উনা॥"

আমার যৌবন-কলসীর জল যে দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। মনকে আর কত দিন বুঝাইয়া রাখিব। সহ্যের সীমা যে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে।

"পশু-পক্ষী-এ নাই সে জানে না জানে পবন।
মনের আমার দুঃখু কথা জানে আমার মন॥
পক্ষী যদি হইতাম রে বন্ধু উড়িয়া উড়িয়া।
তোমার মুখ দেখিতাম বন্ধু ডালেতে বসিয়া॥
ইচ্ছা হয় তোমার লাইগ্যা ছাড়ি কুলমান।
মুছাইয়া শীতল করি তোমার অঙ্গের ঘাম॥
তুমি যথা থাক রে বন্ধু আমি থাকি তথা।
রৌদ্রকালে ছায়ার লাগ্যা শিরে ধরি পাতা॥
রে বন্ধু শিরে ধরি পাতা॥
এক ত শীতল জলের হাওয়া আর ত শীতল জানি।
তা হইতে অধিক শীতল ডাবের মধ্যে পানি॥
তা হইতে অধিক শীতল যৌবনে পিরীতি।
তা হইতে অধিক শীতল মনোবাঞ্ছার পতি॥
রে বন্ধু মনোবাঞ্ছার পতি॥"

এই তো সাজুতীর অবস্থা। দেহ মাত্রই তাহার ঘরে পড়িয়া আছে, মন কেবলই গোষ্ঠে, মাঠে, নদীর কূলে বাঞ্ছিতের অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। রাখাল সে, পথে-প্রান্তরে রৌদ্রে-জলে কষ্টের তাহার অবধি থাকে না, সাজুতী সেবা করিবার এতটুকু সুযোগ পায় না! কত সাধ তাহার মনে জাগে, জাগিয়া অন্তর-কোণেই বিলীন হয়। জলের হাওয়া, ডাবের জল, যৌবনে পিরীতি, সকলই শীতল। কিন্তু যে যাহাকে কামনা করে, তাহাকে যদি পতিরূপে লাভ করিতে পারে, তবে উহাই হয় সকলের চেয়ে শীতল ও সুন্দর। কয় জনের ভাগ্যে তাহা ঘটে?

ওদিকে মইষাল-এর তন্ময়তাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। নদীর ঘাটে চারি চক্ষুর মিলন হইতে তাহার চিত্তেও পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছে; সেও আর পূর্ব্বের মত কর্ত্তব্য কার্য্যে মন দিতে পারিল না, সাজুতীর রূপের পাথারে তাহার নয়ন-মন ডুবিয়া গেল, বিশ্বজগৎ

নাতার কাছে সাজুতীময় হইয়া উঠিল। আকাশের তারা দেখিয়া কন্যার সুন্দর চোখ দুইটির কথাই তাহার মনে পড়ে, ঘন-কৃষ্ণ মেঘের ছুটাছুটি দেখিয়া ভাবে, কন্যা হয়তো এই সময়ে নীলাম্বরী পরিয়া জলে যাইতেছে! নদীর জলে তরঙ্গের লহর উঠে, সে-লহর মইযালকে সাজুতীর দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়; পাতায় ঘেরা প্রস্ফুটিত পদ্ম তাহার মানস-পটে কন্যার পদ্মমুখই জাগাইয়া তোলে।

"আসমানেতে ফুটে তারা ছিন্ন ভিন্ন দেখি।
মৈষাল ভাবে এই মত কন্যার দুইটি আঁখি।
আসমান জুড়্যা কালা মেঘ উড়্যা উড়্যা যায়।
নীলাম্বরী পর্য্যা কন্যা জলের ঘাটে যায়।
নদীতে উঠে খৈয়া ঢেউ লীলুয়াবী বাতাসে।
মৈষাল শুইয়া ভাবে কন্যার দীঘল লম্বা কেশে।
জলের উপর পউদের ফুল চারিদিকে পাতা।
মৈষাল ভাবে কন্যার মুখ পিউরী দিয়া গাঁথা।"

এই সকল চিত্র আমাদিগকে রাধাকৃষ্ণের রূপানুরক্তির চিত্রগুলিই স্মরণ করাইয়া দেয়। সেগুলি এত পরিচিত যে, এখানে তাহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় 'ধোপার পাট' পালা-গানটিতে এক রাজপুত্র ও রজককন্যার প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের পূর্ব্বরাগের চিত্রগুলিও সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যের দিক দিয়া হৃদয়েয় অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি! প্রতিদিনেব দেখাশুনা এবং রূপানুরক্তি হইতে উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়; ক্রমে দুইয়েই দুইয়ের জন্য পাগল হইয়া উঠে! কিন্তু তাহাদের মিলনের পথে প্রবল বাধা হইয়া দাঁড়ায়,—সামাজিক অসমত ও অবস্থার বৈষম্য।

রাজপুত্র অসীম আকুলতা লইয়া রজকনন্দিনীর পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, আত্মনিবেদন করে, বলে,—

"কাপড় যে ধওলো কন্যা করিয়া সোহাগ।
এই না কাপড়ে পাইছি তোমার পাঁচ আঙ্গুলের দাগ।
এই কাপড় পাইয়া আমার ঘুচিয়াছে সন্দ।
কাপড়ে পাইছি তোমার মালার গন্ধ।"

মুগ্ধা বালিকা হৃদয়-ভাব সংযত রাখিয়া রাজপুত্রকে নিবৃত্ত করে, উভয়ের সামাজিক মর্য্যাদা ও অবস্থার বৈষম্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়:—

"তোমার না বাপ মাও রাজ্যের না রাজা।
বাপের ধোপা আমার বাপ তোমার বাপের পরজা।
চান্দ হইয়া কেন জমিনে বাড়াও হাত।
লোকে যে বলিবে মন্দ শুনিয়া পরচাৎ।"

কিন্তু রাজপুত্র বাঞ্ছিতার মিনতি শুনে কই? সে তাহাকে পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসে,—

""রাজ্যধন যা আছে লো কন্যা বাপেরে কহিয়া।
সর্ব্বস্ব তোমারে দিয়া করবাম তোমারে বিয়া।"

রজকনন্দিনী তবু তাহাকে বুঝায়, বারণ করে। কিন্তু তাহার চিত্তেও কি কম ব্যাকুলতা! রাজপুত্র যে কখন তাহার হৃদয়ের সবখানি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে! মনের আগুনকে সে আর কত দিন চাপা দিয়া রাখিবে? দুইয়েই যে দুইয়ের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে! গোপন করিয়া আর লাভ কি? স্পষ্টই বলিয়া উঠে—

"আষাইঢ়া নদীরে যেমন পাগল হইয়া যায়।
মনেরে বুঝাইয়া বন্ধু রাখা নাহি যায়।
শুইলে স্বপনে দেখি তোমার চান্দ মুখ।
নিশাকালে অভাগীর এই মাত্র সুখ।"

বাঞ্ছিতকে পাওয়ার পথে তাহার কত বাধা! কুলের ভয়, মানের ভয়, ভয় গুরুজনের। প্রতিক্ষণ তাহার মন ঝুরে, অসীম আকুলতা লইয়া ঘর-বাহির করিতে থাকে। হৃদয়-তন্ত্রীতে করুণ রাগিণী বাজিয়া উঠে:—

'ঘর কইলাম বাহির রে বন্ধু পর কইলাম আপন।
অবলার কুলভয় হইল দূষমণ।'

ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে,—

"কিসের কুল কিসের মান আর না বাজাও বাঁশী।
মনপ্রাণে হইয়াছি তোমার শ্রীচরণের দাসী।

মিলনের আকুল আগ্রহ লইয়া বাঞ্ছিত আসে, আসিয়া দুর্য্যোগপূর্ণ রাত্রিতে আঙ্গিনায় ভিজে। সে এই অভাগীর জন্য কত কষ্টই না পাইল! তাহার ইচ্ছা হয় ডাকিয়া বলে,

"বৃষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর বাইরে কেন ভিজ।
ঘরের পাছে মানের পাতা কাইটা মাথায় ধর।
ভিজিল সোনার অঙ্গ রাত্রি নিশাকালে।
অভাগী নিকটে থাকলে মুছাইতাম কেশে।"

জল-ঝড় থামিয়া যায়, কিন্তু বাঁশীর ধ্বনি থামে কই? উহা যে অবিরত কানের ভিতর দিয়া মরমে আসিয়া পৌছিতেছে, উহা যে কেবলই বাহিরের দিকে আকর্ষণ করিতেছে! চারি দিক এখন নীরব নিস্তব্ধ, কিন্তু বাহির হইবার কি জো আছে, চন্দ্রের উদয় যে আবার বাদ সাধিল!

"সংসার ঘুমাইয়া আছে কেবল বাজে বাঁশী।
হইয়া ঘরের বাহির কোন্ পথে আসি।
কাট্যা গেছে কালা মেঘ চান্দের উদয়।
এই পথে যাইতে গেলে কুলমানের ভয়।"

আশ্চর্য্য এই হৃদয়ানুরাগ! ডালপালা নাই হৃদয়-বৃক্ষে ফুলের মতো ইহা ফুটিয়া থাকে, কেহ ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না। বাঞ্ছিতের জন্য ইহা সব কিছু ত্যাগ করিতে পারে।

"ডাল নাই পাল নাই ফুটিয়া না বইছে রে ফুল।
বন্ধুরে পাইলে আমার কিসের জাতি কুল।"

নায়িকা তন্ময় হইয়া ভাবিতেছে, 'জানি না এই অনুরাগের স্রোত আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে, কোথা হইতেই বা ইহা আসিল,

কি করিয়াই বা আসিল, কেনই বা আসিল? আমি যে ইহার কোন কূল-কিনারা পাইতেছি না।

বাঞ্ছিত আমার সোনার পাখী; স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া যেমন প্রভাত আসে তেমনি অপূর্ব সুন্দর বেশে তিনি আমার কাছে উড়িয়া আসিয়াছেন। ইঁহাকে কোথায় রাখিব? ইঁহাকে রাখিবার মতো উপযুক্ত স্থান আমার কোথায়?—ইনি রাজার ছেলে, আমি সামান্যা নারী, আমার ঘর-সংসার ইঁহার মোটেই উপযুক্ত নয়। "আমার স্বর্গের কল্পনার চেয়েও ইনি বড়।" ইঁহাকে খাঁচায় পূরিয়া রাখিতে পারি না, অথচ না পারিলেও বাঁচি না,—এ যে আমার প্রাণ-পাখী!

"নদীরে কোন্ দিকে যাও বইয়া।
কোখেকে আইলরে নদী কিসের লাগিয়ারে।
কোন্ দিকে যাও বইয়া।
সোনার বরণ পরভাতরে আবের ঢাকামাখা।
কোন পাখী উড়িয়া আইল সোনার বরণ পাখা।
জমীনে পড়িলে পাখী জমীনখানা বেড়ে।
আসমানে উড়িলে পাখী আসমান না জুড়ে।
এই পাখী ধরিতে গেলে খাঁচা নাই যে পাই।
কোথায় রাখি প্রাণের পাখী কোন্ বা দেশে যাই।

আবার সন্দেহ জাগে,—আমি যাহার জন্য পাগল, সে কি আমার কথা মনে করে? সে তো রাজার ছেলে—আমার পক্ষে অতি বড়। বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীতি শোভা পায় না, উহা কলঙ্কই বহন করিয়া আনে। আমার পক্ষে তাঁহাকে পাইতে যাওয়া বামনের চাঁদ ধরার মতই হাস্যকর। ইহাই আমার সান্ত্বনা।

'আমারে কি আছে মনে সেত রাজার বেটা।
বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীতি দশের মধ্যে খুটা।
বাউন হইয়া কেন চান্দে বাড়াই হাত।
পরবোধ দিতে পোড়া মনে না পাই কিছু আর।'

পল্লী-সাহিত্যে তথা পল্লীগাথাগুলিতে নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগের এইরূপ দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সঙ্কোচ ও অপ্রাপ্তির আকুলতার কত যে কথা ও চিত্র আছে, তাহা বলিয়া, দেখাইয়া শেষ করা যায় না। আমরা পল্লীকবিদের পূর্ব্বরাগের বর্ণনার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতেছি। হয়তো অমৃতে অরুচি হইবে না।

"চারি চক্ষু এক হইল রে পরাণ কাড়্যা লইল।
কোন্ দৈবে মনের মানুষরে আন্যা দেখাইল।"

নদীর ঘাটে কেয়া বনের ধারে 'মাধব' ও 'সোনাই'র চারি চক্ষুর মিলন হইতে উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয় এবং ক্রমে তাহা গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে। মাধব আর সহ্য করিতে না পারিয়া মনের ভাব খোলাখুলি জানাইয়া সোনাইকে শেষে এক পত্র লিখিয়া বসিল। তদুত্তরে সোনাই জানাইল,—

"শুন রে পরাণের বন্ধু শুন দিয়া মন।
বিয়া নাই সে হইল মোর পুরথম যৌবন।
মাও মাতুল মোর আছে আছে তারা ঘরে।
বাছিয়া নিছিয়া বিয়া দিব ভালা বরে।
ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধু রে যদি কেওয়া বনে।
নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে।
তুমি যদি হইতে রে বন্ধু আসমানের চান।
রাত্র নিশা চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ান।
তুমি যদি হইতে রে বন্ধু ঐ সে নদীর পানি।
তোমারে চাহিয়া দিতাম তাপিত পরাণি।
একে ত অবলা নারী ঘরে বন্দী রই।
দারুণ দুঃখের জ্বালা কেমনে রইয়া সই।
যেদিন দেখ্যাছি তোমায় ঐ না জলের ঘাটে।
সেই দিন হইতে পাগলা মন ফিরে বাটে বাটে।
মায়েরে না কইতে পারি আপন মনের কথা।
অবলা যে নারী আমি মনে রইল ব্যথা।"

এক বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া পূর্ব্বরাগের এইরূপ তন্ময়তার চিত্র অন্য কোথাও বড় দেখা যায় না। এখানেও অপ্রাপ্তির সেই অসীম আকুলতা, ঈপ্সিত মিলনের পথে সংসার-সমাজের বাধা। প্রকৃতির স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি ও সহজ বিকাশের মধ্যে নায়িকা আপনাকে সর্ব্বাংশে মিশাইয়া দিতে চায়! কিন্তু পারে কই? তাহার চারি দিকে কত বাধা। সে বাধা অতিক্রম করিয়া ফুলের মত ফুটিয়া ওঠা, চাঁদের মত হাসিতে পারা সহজ নয়। এই না-পারার বেদন তাহাকে পীড়া দেয়, তাহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া একটা করুণ সুর উত্থিত হয়।

পূর্ব্বরাগের উন্মেষে নায়িকার চোখে-মুখে, চাল-চলনে, কথা-বার্ত্তায় এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠে যে, অপরের দৃষ্টি এড়াইলেও, সমবয়সী এবং সখীদের দৃষ্টি তাহা এড়ায় না। নদের চাঁদের অনুরাগে মহুয়ার মন অহর্নিশ ঝুরিতেছে; পালক-পিতা হোমড়া টের না পাইলেও সখী পালঙ্ক তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছে। মহুয়া কাহারো সঙ্গে বড় মিশে না, জলের প্রয়োজন না থাকিলেও সন্ধ্যাকালে একাকী জলের ঘাটে যায়; রাত্রিতে তাহার নিদ্রা হয় না, নীরবে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়ে; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উদাস দৃষ্টিতে নদেরচাঁদের বাড়ীর দিকে সে চাহিয়া থাকে। পালঙ্ক জিজ্ঞাসা করে, 'সখি, ব্যাপার কি? মনের কথা খুলেই বল না, শুনি।' মহুয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উত্তর দেয়, 'সখি, কি আর বলিব! মনের আগুন তো কিছুতেই আর নিবাইতে পারিতেছি না। ভিন্ন দেশে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর দেখি না:—

"এই দেশ ছাড়িয়া চল ভিন দেশেতে যাই।
বুঝাইলে না বুঝে মন কি দিয়া বুঝাই।"

পালঙ্ক বলে, 'শুন সখি, আমার কথা শুন; তুমি সাত দিন জলের ঘাটে যাইও না, দেখিবে তোমার মন ফিরিয়া গিয়াছে। নদেরচাঁদ যদি খোঁজ করিতে আসে, স্পষ্ট বলিয়া দিব,—মহুয়া আর ইহজগতে নাই।' অন্য দিকে চিত্ত বিনিয়োগ করিতে পারিলে পূর্ব্বরাগের অসহায় অবস্থা হইতে কতকটা আত্মরক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু মহুয়া যে তাহার অজানিত ভাবেই অনেকখানি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে!

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বীরবরণ (১২৯০)। যৌবনে যোগিনী। সম্পাদক—ভাবী সম্রাটের ভারত ভ্রমণ (সাপ্তাহিক—১৮৭৫)।

গোপালচন্দ্র বসাক—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কৌতুকদর্পণ (১৮৭৩)।

গোপালচরণ মিত্র—সাংবাদিক। পরিচালক—সুদর্শন (১৮৭৫)।

গোপাল দাস—বৈষ্ণব পদকর্তা। ইঁহার আসল নাম—রামগোপাল চৌধুরী। ইঁহারা শ্রীখণ্ডবাসী। ইনি 'গোপাল দাস' ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থ—রসকল্পবল্লী (১৫৬৫ শক)।

গোপাল দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রসরতিমঞ্জরী, রতিশাস্ত্র।

গোপাল দাস—পদকর্তা। গ্রন্থ—ভক্তিরত্নাকর (১৫৯০ খৃঃ)।

গোপাল দাস—কবি। নামান্তর—শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণবিলাস।

গোপাল দাস চৌধুরী—গ্রন্থকার। জমিদার। অনুবাদ-গ্রন্থ—বিশুদ্ধমার্গ (অশ্বঘোষ কৃত—১৯২৩), বোধি (শান্তিদেব কৃত—১৩৪০)।

গোপালধন চূড়ামণি—অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ—মহাভারত (১৮৬৭)।

গোপাল ন্যায়ালঙ্কার—স্মার্ত পণ্ডিত। প্রকৃত নাম—রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন। জন্ম—১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্। গ্রন্থ—উদ্বাহনির্ণয়, আচারনির্ণয়, তিথিনির্ণয়, দায়নির্ণয়, সম্বন্ধনির্ণয়, শুদ্ধিনির্ণয়, প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়, দুর্গোৎসবনির্ণয়।

গোপাল ভট্ট, গোস্বামী—পদকর্তা ও ছয় গোস্বামীর অন্যতম। জন্ম—১৪৯৩ খৃঃ দাক্ষিণাত্যের কাবেরী তীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের বলগণ্ডী গ্রামে। মৃত্যু—১৫৭৮ খৃঃ। পিতা—বেঙ্কট ভট্ট। ইনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য। গ্রন্থ—হরিভক্তি-বিলাস, গোলকবস্তু বর্ণন, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা।

গোপাল ভট্ট—গ্রন্থকার। সেনবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় বল্লালসেনের শিক্ষাগুরু। গ্রন্থ—বল্লালচরিত (১৩০০ শক)।

গোপাল ভট্ট—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—গোপালরত্নাকর।

গোপাল রায়—হিন্দী গ্রন্থকার ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৬৬ খৃঃ গাজীপুর। হিন্দী গ্রন্থ—বিদ্যাবিনোদ, চিত্রাঙ্গদ, দেশদান, সুভদ্রা, দি নিউ বাবু, মাধবীকঙ্কণ (অনুবাদ), ভানুমতী, গৃহলক্ষ্মী, গুপ্তভেদ, দেববাণী-জেঠানি, বহিন, বড়া ভাই। ইনি বহু বাংলা ডিটেকটিভ বইয়ের হিন্দী তর্জমা করেন।

গোপাললাল বসু—সাহিত্যিক। সম্পাদক—ভারতবর্ষীয় আর্য পত্রিকা (১৮৭৫)।

গোপাললাল মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভারতবর্ষীয় ইতিহাস, জ্ঞানচন্দ্রিকা (১৮৩৮ খৃঃ)।

গোপাললাল মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মনোহর-দর্পণ (১৮৭৩)।

গোপাল বসু—বৈষ্ণব কবি। গ্রন্থ—চৈতন্যমঙ্গল।

গোপিকা মোহন—বৈষ্ণব কবি। গ্রন্থ—রাধিকামোহন।

গোপীকৃষ্ণ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হরিনামকবচ।

গোপীনাথ—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—ত্রিবিক্রম শতক বা জাতকের টীকা।

গোপীনাথ—টীকাকার। গ্রন্থ—উজ্জ্বলা (কেশব মিশ্র কৃত তর্কভাষার টীকা)

সা হি ত্য

(পর-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

গোপীনাথ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সিদ্ধসার।

গোপীনাথ দীক্ষিত—টীকাকার। পিতা—ভৈরব। টীকাগ্রন্থ—প্রভোদ বা তর্কনিবন্ধের টীকা।

গোপীনাথ পুরোহিত—হিন্দী গ্রন্থকার। নিবাস—জয়পুর। এম. এ. রায় বাহাদুর। জয়পুর ষ্টেট কাউন্সিলের সেক্রেটারী। গ্রন্থ—ভর্তৃহরিশতক, প্রেমলীলা, মানভবন, ভেনিস কা ব্যাপারী (হিন্দী অনুবাদ), মিত্রতা, বীরেন্দ্র, সতী চরিত্র চমৎকার, সত্যভামা সংবাদ।

গোপীনাথ বসু—কবি। নামান্তর—পুরন্দর খাঁ, বাংলার নবাব হোসেন শাহের (১৪৯৯-১৫২৬) মন্ত্রী। ইঁহারই ভ্রাতা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রণেতা মালাধর বসু। গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

গোপীনাথ মৌনী—মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত। নিবাস—কাশী ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। গ্রন্থ—শব্দালোক-রহস্য, তর্কভাষাটীকা, পদার্থবিবেকটীকা।

গোপীনাথ রাও, টি. এ.—প্রত্নতত্ত্ববিদ্। জন্ম—১৮৭২, ৩রা নবেম্বর। নিবাস—ত্রিবান্দ্রাম। ট্রাভাঙ্কোর ষ্টেটের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিনটেনডেণ্ট। গ্রন্থ—Travancore Archaeological Series (১৯১৩), The Elements of Hindu Iconography (১৯১৩)।

গোপীবন্ধু দাস—সাহিত্যিক। সম্পাদক—আঙ্গিনা (ত্রৈমাসিক—১৩৩৭)।

গোপীবল্লভ দাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা গ্রামে গোপবংশে। পিতা—রসময়। ইঁহারা সকলেই শ্যামানন্দ প্রভুর শাখা। গ্রন্থ—রসিকমঙ্গল।

গোপীমোহন ঘোষ—ইংরেজি শিক্ষাবিদ্। গ্রন্থ—বিজয়বল্লভ (১৮৬৩), জ্যোতির্বিবরণ (১৮৫৩)।

গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আনোয়ার সাহেলী (ফার্সী ভাষায়—১৮৫৫ খৃঃ)।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—সঙ্গীতজ্ঞ ও গ্রন্থকার। জন্ম—বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে। সঙ্গীতনায়ক উপাধি লাভ। ইনি দীর্ঘকাল বর্ধমানরাজের সভা-গায়ক ছিলেন। সঙ্গীত গ্রন্থ—সঙ্গীতচন্দ্রিকা, ১ম, ২য়, তানমালা, গীতমালা, সঙ্গীত-লহরী, গীতদর্পণ। সম্পাদক—সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা, (১৩৩৫—৩৯)।

গোবর্ধন আচার্য—হিন্দী কবি। গৌড়রাজ লক্ষ্মণসেনের পঞ্চরত্ন সভার অন্যতম রত্ন। গ্রন্থ—আর্যসপ্তশতী (কাব্য)।

গোবর্ধনরাম মাধবরাম ত্রিপাঠী—গুজরাতি সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৬৫ খেড়া জেলায় নদীয়াড় নামক স্থানে। আইন ব্যবসায়ী (১৮৮৩-১৮৯৮), বোম্বাই। গ্রন্থ—সারস্বতচন্দ্র (১৮৮৫)

স্নেহসমুদ্র (দার্শনিকভাষ্য), সান্ত্বনা জীবন, Conflict of law between converts & non-converts in India.

গোবিচন্দ্র রায়—সাংবাদিক। অন্যতম সম্পাদক—ঢাকা-প্রকাশ (সাপ্তাহিক, ১৮৬১-৬২ ঢাকা হইতে প্রকাশিত—প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র)।

গোবিন্দ অধিকারী—প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। জন্ম—১২০৫ (অব্দে) হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগরের জাঙ্গীপাড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৮৭২ খৃঃ। ইনি একাধারে যাত্রা, কীর্তন ও কথকতায় বিশেষ নাম করেন। পালাগ্রন্থ—শুক-সারী পালা, চূড়া-নূপুরের দ্বন্দ্ব।

গোবিন্দ আচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গোবিন্দ ভাগবত।

গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ—গ্রন্থকার। জন্ম—পাবনা সালগিয়া গ্রামে। গ্রন্থ—লঘুভারত (কাব্যেতিহাস)।

গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য—সাহিত্যিক। সম্পাদক—সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় (দৈনিক পত্র, ১৮৭১)।

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম, এ, বি, এল। গ্রন্থ—চিত্তবিনোদিনী (১৮৭৫)।

গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—বসন্ত নির্ণয় (১২৯৩)।

গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত—সাংবাদিক। সম্পাদক—সম্বাদ-সজ্জনরঞ্জন (সাপ্তাহিক—১৮৭৯ খৃঃ)।

গোবিন্দচন্দ্র দাস—স্বভাবকবি। জন্ম—১২৬১ বঙ্গ, ৪ঠা মাঘ ঢাকা জেলায় ভাওয়াল পরগণার জয়দেবপুর গ্রামে। পরে বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণগাঁয়ে বাস করেন। মৃত্যু—১৩২৫ বঙ্গ। পিতা—রামনাথ দাস। মাতা—আনন্দময়ী। শিক্ষা—ছাত্রবৃত্তি, ঢাকার নর্মাল স্কুল, ঢাকা মেডিকেল স্কুল। কর্ম—বিভিন্ন জেলায় জমিদারী কর্ম। গ্রন্থ—প্রেম ও ফুল, কুঙ্কুম, অশোক, কস্তুরী, চন্দন, ফুলরেণু, বৈজয়ন্তী, প্রসূন, শোক ও সান্ত্বনা, গীতার কাব্যানুবাদ।

গোবিন্দচন্দ্র দে—সাহিত্যিক। সম্পাদক—সত্যধর্ম-প্রকাশিকা (মাসিক—১৮৪৯ খৃঃ)।

গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। নিবাস—বারাণসী। সম্পাদক—কাশীবার্তা প্রকাশিকা।

গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—কুলীনকুলাঙ্গনা কাব্য (১৮৭১ ?)। সম্পাদক—সংবাদ বসমুদ্গার (সাপ্তাহিক—১৮৪৯ খৃঃ)।

গোবিন্দচন্দ্র রায়—কবি। জন্ম বরিশাল জেলার মীরপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে। পরে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। কাশীধামে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া আগ্রায় চিকিৎসা ব্যবসায় করেন। গ্রন্থ—গীতি-কবিতা, ১ম (১২৮৮), ২য় (১২৮৮), ৩য় ও ৪র্থ। যমুনা-লহরী, জাতীয় সঙ্গীত।

গোবিন্দ দত্ত ত্রিপাঠি—হিন্দী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিরহ-সরোবর।

গোবিন্দ দাস—কবি। জন্ম—চট্টগ্রামের দিয়াঙ্গ বা আনোয়ার গ্রামে। গ্রন্থ—কালিকামঙ্গল, মনসার গীতি।

গোবিন্দ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নিগম গ্রন্থ।

গোবিন্দ দাস—ভক্ত গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কালিকামঙ্গল, গীত-চিন্তামণি, ভক্তিরস।

গোবিন্দ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গরুড় পুরাণ, গীতাসার।

গোবিন্দ দাস কর্মকার—করচা-লেখক। জন্ম—১৫০৮ খৃঃ বর্ধমানের উপকণ্ঠে কাঞ্চননগরে। পিতা—শ্যামদাস কর্মকার। মাতা—মাধবী। ইনি মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের নিত্যদাস-রূপে সঙ্গী ছিলেন এবং করচা রচনা করেন। গ্রন্থ—করচা (বা স্মৃতিলিপি)।

গোবিন্দ দাস, সেন, কবিরাজ—পদকর্তা। জন্ম—১৫৩৮ খৃঃ বর্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে। মৃত্যু—১৬১২ খৃঃ। পিতা—চিরঞ্জীব সেন। মাতা—সুনন্দা। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের মন্ত্রশিষ্য। গ্রন্থ—সঙ্গীতমাধব (নাটক), কর্ণামৃত (কাব্য), গৌরাখ্যান, একান্নপদ, গীতামৃত।

গোবিন্দ দৈবজ্ঞ—টীকাকার। পিতা—নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ। গ্রন্থ—পীযূষ-ধারা। (মুহূর্ত চিন্তামণি গ্রন্থের টীকা)।

গোবিন্দনাথ গুহ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—লঘু রামায়ণ, সম্পাদক—দাসী (১৮৯৭ খৃঃ)।

গোবিন্দনাথ সেন—কবি। নিবাস—১৯শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে। ইনি কাটোয়ায় মুন্সেফের কার্য করিতেন। গ্রন্থ—পদচিন্তামণিমালা (সঙ্গীত-গ্রন্থ)।

গোবিন্দনারায়ণ মিশ্র—হিন্দী গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫০। গ্রন্থ—সারস্বত সর্বস্ব, প্রাকৃত বিচার, বিভক্তি বিচার।

গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। পিতা—রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি, ইনি নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রন্থ—পদার্থখণ্ডনের টীকা, ন্যায়রহস্য, ন্যায়রহস্য ব্যাখ্যান, সমাসবাদ, ন্যায়-সংক্ষেপ।

গোবিন্দপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—বন্ধুতার এই কি ফল ? (১২৭৬), মিত্রলাভ (১২৭৭)।

গোবিন্দপ্রসাদ রায়—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। সম্পাদক—ঢাকাপ্রকাশ। গ্রন্থ—ব্যাকরণ-সার।

গোবিন্দপ্রসাদ রায়, বিদ্যাবিনোদ—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৩৮ খৃঃ পাবনা জেলার গায়েনবাটী গ্রামে। মৃত্যু—১৩০৪। পিতা—রাধানাথ রায়। ইনি কাশীতে শিক্ষালাভ করেন এবং নবদ্বীপ হইতে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি প্রাপ্ত হন। কর্ম—রঙ্গপুর জেলা কাকিনার ভূম্যধিকারীদের প্রধান অমাত্য। গ্রন্থ—কৈলাস চরিত মৃন্ময়ী, হরিবাসর তত্ত্বসার ১ম, ২য় খণ্ড, অষ্টাদশ মহাবিদ্যা, লীলাবতী বঙ্গানুবাদ।

গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরত্ন, রায়সাহেব—সংস্কৃত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭০ খৃঃ ২২এ আগষ্ট হাও জেলার শাঁকরাইল (মাতুলালয়ে) গ্রামে। পিতা—যোগেন্দ্রচ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—প্রবেশিকা (হেয়ার স্কুল—১৮৮৭ খৃঃ বি, এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), কবিরত্ন উপাধি লাভ (১৮৯৫), র বাহাদুর (১৯২১)। গ্রন্থ—ভাগবত-কুসুমাঞ্জলি, শান্তিসোপান, প্রে ও পরমার্থ, সুনীতি-সুধানিধি, স্তুতিকুসুমাঞ্জলি, কল্যাণকণিকা, পাগলে প্রলাপ, প্রাণের কথা, জ্ঞানকুসুমাঞ্জলি। Arjans moral

গোবিন্দ ভট্ট গোবিন্দরাজ—স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম—১১-১ শতাব্দী। পিতা—মাধব ভট্ট। টীকাগ্রন্থ—মঞ্জরী (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃ টীকা), মনুসংহিতার টীকা, স্মৃতি-মঞ্জরী।

গোবিন্দসুন্দর গোস্বামী—কবি। গ্রন্থ—বাল্যরঞ্জন (কবি ১৮৭২)।

গোবিন্দ সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাংলার ইতিহাস (মার্শম্যান-কৃত—বঙ্গানুবাদ, ১৮৪০)।

গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশ—টীকাকার। জন্ম—১৮শ শতাব্দের প্রথম ভাগে ফরিদপুর জেলার ধানুকা গ্রামে। গ্রন্থ—ধীবরঞ্জিকা, চণ্ডীর টীকা, মহিম্নস্তোত্র টীকা।

গোবিন্দাচারী—গ্রন্থকার। কাশীবাসী। গ্রন্থ—সাধন সুবোধ, যোগিনী-দশা (১৮৫৩)।

গোবিন্দানন্দ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভাষ্যরত্নপ্রভা (শারীরক ভাষ্যের টীকা)।

গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণ—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। টীকাগ্রন্থ—অর্থরত্নপ্রভা, অর্থকৌমুদী।

গোভিল—সূত্রকার। গ্রন্থ—গৃহ্যসূত্র।

গোরক্ষনাথ—নাথ-গুরু। জন্ম—১৫শ শতাব্দী। পিতা—মৎস্যেন্দ্রনাথ। গ্রন্থ—গোরক্ষসংহিতা।

গোলোকচন্দ্র কর—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সাধন-কথা।

গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন—দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—১৮০৬ খৃঃ নবদ্বীপ। মৃত্যু ১৮৫৪ খৃঃ কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে। পিতা—হরচন্দ্র ভট্টাচার্য। গ্রন্থ—সামান্য-নিরুক্তি, সব্য-বিচার, অবচ্ছেদোক্ত নিরুক্তি, পঞ্চলক্ষণী বিবেচনী, গোলোকন্যায়রত্নীয়।

গোলাম হোসেন খাঁ তবতথা, সৈয়দ—ঐতিহাসিক। পিতা হিদায়ত আলি খাঁ। গ্রন্থ—সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণ।

গোষ্ঠবিহারী দে—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সিন্ধুবালা (১৩০১), আনন্দমঞ্জরী (১৩০২)।

গোঁসাই দাসগুপ্ত—সাংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদ দ্বিজরাজ (১৮৫৯)।

গৌড়পাদ আচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—৬-৭ম শতাব্দী। (গৌড়বাসী)। গ্রন্থ—মাণ্ডূক্যকারিকা, চিদ্‌বিলাসানন্দ (টীকাগ্রন্থ)। সাংখ্যকারিকা ভাষ্য, উত্তরগীতাভাষ্য, শ্রীবিদ্যারত্নভাষ্য।

গৌতম—ধর্মসূত্রকার। গ্রন্থ—গৌতমধর্মসূত্র।

গৌরকিশোর রায়—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর (হুগলি)। শিক্ষা—বি, এ। গ্রন্থ—লক্ষ্মীর কথা।

গৌরগুণানন্দ ঠাকুর—বঙ্গীয় কবি। জন্ম—শ্রীখণ্ড। গ্রন্থ—শ্রীচৈতন্য-সঙ্গীত।

গৌরগোবিন্দ রায়, উপাধ্যায়—ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য ও পণ্ডিত। জন্ম—পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার বাগবাটী গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৮ বঙ্গ। ইনি সংস্কৃত ভাষা ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কর্ম—পুলিশ-বিভাগে চাকুরী গ্রহণ, পরে চাকুরী ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। গ্রন্থ—গীতার সমন্বয় ভাষ্য, বেদান্তসমন্বয় ভাষ্য, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম।

গৌর ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—'পঞ্চসরা' নামক গ্রন্থের টীকা।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। কর্ম—Calcutta School Society & The School Book Societyর অধীনে শিক্ষকতা, পরে মুন্সেফ। গ্রন্থ—স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক (১৮২২), কবিতামৃত-কূপ।

গৌর-সুন্দর—পদকর্তা। পদ সংগ্রহ গ্রন্থ—কীর্তনানন্দ।

গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত—সংকলয়িতা। 'বিবাদার্ণবসেতু' গ্রন্থের অন্যতম সংকলয়িতা।

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। রঙ্গপুর আদালতের দেওয়ান। গ্রন্থ—জ্ঞানাঞ্জন (১৮২১)।

গৌরীকান্ত রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চন্দ্রকান্ত।

গৌরীদাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী।

গৌরীনাথ নিয়োগী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আশা মরীচিকা (১৮৭২ খৃঃ)।

গৌরীনাথ শাস্ত্রী—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। গ্রন্থ—ন্যায়সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী (কাশী, ১৯৪১ সংবত)।

গৌরীমোহন দাস—সংকলয়িতা। গ্রন্থ—পদকল্পলতিকা (সংকলন গ্রন্থ)।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, তর্কবাগীশ—কবি, গ্রন্থকার ও সম্পাদক। নামান্তর—গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য। জন্ম—১২০৭ (১৭৯৯ খৃঃ) শ্রীহট্টে ইটা পরগণার পাচগাও গ্রামে। মৃত্যু—১২৬৫। পিতা—জগন্নাথ ভট্টাচার্য। গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বঙ্গানুবাদ, চণ্ডী (মূল ও টীকা), পাকরাজেশ্বর (১৭৬৫ শক), ভূগোল (১৮৫৩), জ্ঞান-প্রদীপ, ১ম (১৮৪৮), ২য়, ৩য় (১৮৫৩), নীতিরত্ন মহাভারত ১ম, ২য়। সম্পাদক—সম্বাদ রসরাজ (মুর্শিদাবাদ, সাপ্তাহিক, ১৮৩৯-১৮৫৬), সংবাদ ভাস্কর (সাপ্তাহিক, ১৮৩৯), হিন্দুরত্ন কমলাকর (পত্রিকা ১৮৫৭ খৃঃ), জ্ঞানান্বেষণ (বাংলাবিভাগ)।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—ঔপন্যাসিক ও গ্রন্থকার।—মহাকল্প, নদীয়ার গৌরব, ঢাকার গৌরব ২৪ পরগনার গৌরব।

গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা—ঐতিহাসিক। নিবাস—রাজপুতানা, উদয়পুর। গ্রন্থ—কোশোৎসব-স্মারক সংগ্রহ (হিন্দী, ১৯৮৫ সং), রাজপুতানেকা ইতিহাস, ২ খণ্ড (১১২৭-৩২ খৃঃ), মধ্যকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি (প্রয়াগ, ১৯২৮), প্রাচীন লিপিমালা, (উদয়পুর, ১৮৯৪), শোলাঙ্কীয় কা ইতিহাস, নাগবংশরোঁ কী উৎপত্তি।

ঘনরাম চক্রবর্তী—প্রাচীন কবি। জন্ম—১৬৬৯ খৃঃ বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অধীন কৈয়ড় পরগনার কৃষ্ণপুর গ্রামে। পিতা—গৌরীকান্ত চক্রবর্তী। মাতা—সীতা দেবী। কবিরত্ন উপাধিলাভ। বর্ধমান-রাজ কীর্তিচন্দ্র রাজের রাজকবি। গ্রন্থ—শ্রীধর্মমঙ্গল (কাব্য—১৭০৯ খৃঃ), সত্যনারায়ণ ব্রতকথা।

ঘনশ্যাম—জ্যোতির্বিদ্। পিতা—কায়স্থ গোপাল দাস। গ্রন্থ—নৃপতিযাত্রামঙ্গলম্।

ঘনশ্যাম চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। নামান্তর—নরহরি দাস। জন্ম—নবদ্বীপ। নিবাস কাটোয়া। পিতা—জগন্নাথ চক্রবর্তী। গ্রন্থ—ভক্তিরত্নাকর, গৌরচরিত চিন্তামণি, শ্রীনিবাসচরিত, নরোত্তমবিলাস, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দসমুদ্র, প্রক্রিয়াপদ্ধতি, ব্রজপরিক্রমা, নবদ্বীপ পরিক্রমা, লীলাসমুদ্র (পদসংগ্রহ)।

ঘনশ্যাম দাস—পদকর্তা। জন্ম—বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈদ্য বংশে। পিতা—দিব্যসিংহ। গ্রন্থ—গোবিন্দরতিমঞ্জরী, কর্ণামৃত (সংকাব্য)।

ঘসীরাম—গ্রন্থকার। এম, এ, বি, এল। নিবাস—মীরাট। গ্রন্থ—দয়ারাম চরিত (হিন্দী)।

চক্রচূড়ামণি—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—চূড়ামণি (জ্যোতিষ গ্রন্থ), সিদ্ধান্ত-শিরোমণির টীকা।

চক্রপাণি দত্ত—পণ্ডিত। পিতা—নারায়ণ দাস। জন্ম—১১শ শতাব্দী বঙ্গদেশে। গ্রন্থ—চক্রদত্ত বা সর্বসারসংগ্রহ (বৈদ্যক গ্রন্থ)।

চক্রধর—জ্যোতির্বিদ। পিতা—ভদ্রজসিংহ বামন। গ্রন্থ—যন্ত্রচিন্তামণি (জ্যোতিষগ্রন্থ)।

চক্রপাণি দত্ত—গ্রন্থ—বিজয়কল্পলতা।

চণ্ড মহারাজ—বৈয়াকরণিক। গ্রন্থ—প্রাকৃতলক্ষণম্ (১৮৮০)।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৪ বঙ্গ, শ্রাবণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত বারাসতের নলকুঁড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৩ বঙ্গ। পিতা—রামকমল সার্বভৌম। গ্রন্থ—দুইখানি ছবি (১২৯৫ বঙ্গ) মনোরমার গৃহ (১২৯৯), মা ও ছেলে (১২৯৪), কমলকুমার, পাপীর নবজীবন লাভ, বিদ্যাসাগরের জীবনী সংকলন।

চণ্ডীচরণ মজুমদার—কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। মৃত্যু—১৯০৫ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর। গ্রন্থ—জুবিলী (কবিতা)।

চণ্ডীচরণ মুন্সী—ঐতিহাসিক। জন্ম—(অনু) ১৭৬০ খৃঃ। তোতা ইতিহাস (১৮০৫ খৃঃ)।

চণ্ডীচরণ সেন—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৪৫ খৃঃ বাখরগঞ্জ জেলার বামড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৯০৬ খৃঃ কলিকাতা। পিতা—নিমচাঁদ সেন। শিক্ষা—প্রবেশিকা (বরিশাল—১৮৬৩), নিম্ন ওকালতী পরীক্ষা (১৮৭৮ খৃঃ) ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ (১৮৭০), মুন্সেফ ও সবজজ (১৮৯১)। গ্রন্থ—এই কি রামের অযোধ্যা (১৮৯৫), দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১২৯৭), ঝাঁসির রাণী, টমকাকার কুটীর (১৮৮১), চল্লিশ বৎসর (অনুবাদ, ১৩১০) জীবন-গতি নির্ণয় (১৮৮৩), লঙ্কাকাণ্ড, লর্ড মেকলের জীবনী, মহারাজ নন্দকুমার, অযোধ্যার বেগম।

চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। মৃত্যু—১৯৩১ খৃঃ। পিতা—ঈশানচন্দ্র চূড়ামণি। গ্রন্থ—শ্রাদ্ধবিবেক, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব, দায়ভাগ, শুদ্ধিতত্ত্বম্, প্রায়শ্চিত্তবিবেক (শূলপাণিকৃত), দত্তকচন্দ্রিকা, আহ্নিকতত্ত্ব, কৃত্যতত্ত্বম্, শুদ্ধিদীপিকা।

চণ্ডীদাস—পদকর্তা। জন্ম—১৪১৭ খৃঃ বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুরে। মৃত্যু—১৪৭৭ খৃঃ। পিতা—ভবানীচরণ (কাহারও মতে দুর্গাদাস বাগচী) মাতা—ভৈরবী সুন্দরী। ইনি বাসুলী দেবীর পূজক ছিলেন। ইনি সুগায়ক ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিপরায়ণ ছিলেন। গ্রন্থ—পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

চণ্ডেশ্বর—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—চণ্ডেশ্বর জাতক (১৫৮৭ খৃঃ), প্রশ্নচণ্ডেশ্বর বা চণ্ডেশ্বর প্রশ্নবিদ্যা।

চণ্ডেশ্বর ঠাকুর—স্মার্ত পণ্ডিত। ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিথিলার রাজা হরি সিংহের অমাত্য। পিতা—বীরেশ্বর ঠাকুর। গ্রন্থ—কৃত্যরত্নাকর, বিবাদরত্নাকর (১৮৮৭)।

চতুর্ভুজ—বঙ্গীয় কবি। কাব্যগ্রন্থ—হরিচরিত।

চতুর্ভুজ মিশ্র—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—চতুর্ভুজমিশ্র-নির্বন্ধ।

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী—প্রাচীন কবি। গ্রন্থ—বাইস কবি মনসা।

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী—সাংবাদিক। সম্পাদক—কমলিনী (মাসিক। ১২৮৪ বঙ্গ)।

চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ—অনুবাদক। অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ। অনূদিত গ্রন্থ—রঘুবংশ (বঙ্গানুবাদ)।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায়—পণ্ডিত ও ভাষ্যকার। জন্ম—১৭৫৮ শকাব্দ ময়মনসিংহের শেরপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৬ বঙ্গ। পিতা—রাধাকান্ত তর্কবাগীশ। নবদ্বীপ হইতে তর্কালঙ্কার উপাধিলাভ। অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ (১৮৮৩), মহামহোপাধ্যায় (১৮৯৭)। গ্রন্থ—গোভিল গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য, সতীপরিণয়ম্ (ঢাকা, ১৭৭১), সত্যবতী চম্পূ (বাং), প্রবোধশতকম্ (ঢাকা, ১২৭৬ শক), যুবরাজ-প্রশস্তি, কৌমুদীসুধাকরম্, আনন্দতরঙ্গিণী, শ্রাদ্ধকল্প-ভাষ্য, ভাবপুষ্পাঞ্জলি, গৃহ্যসংগ্রহ ভাষ্য, শিক্ষা, বৈশেষিক সূত্রভাষ্য (১৮৮৭), কুসুমাঞ্জলিটীকা, তত্ত্বাবলী (সটীক)। উদ্বাহচন্দ্রালোক, কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া, চন্দ্রবংশম্।

চন্দ্রকান্ত শিকদার—কবি। গ্রন্থ—পতিত পাবনী (১২৬৭ বঙ্গ)।

চন্দ্রকিশোর বসু মজুমদার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মদমাহাত্ম্য (১৮৭৪ খৃঃ)

চন্দ্রকিশোর রায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—শ্রীমন্ত সওদাগর (পাক্ষিক, ১২৯২)।

চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সুকৌতুকচন্দ্রিকা।

চন্দ্রকুমার রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মহারাজ রাজবল্লভ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের বৃত্তান্ত।

চন্দ্রচন্দন—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—(অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের টীকা) পদার্থচন্দ্রিকা।

চন্দ্রনাথ বসু—গ্রন্থকার ও সমালোচক। জন্ম—১২৫১ বঙ্গ হুগলী জিলা কৈকালা গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৭ খৃঃ। পিতা—সীতানাথ বসু। শিক্ষা—এনট্রান্স (১৮৬০) ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, এম, এ (১৮৬৬), বি, এল (১৮৬৭), হাইকোর্টে ওকালতী ও পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। অধ্যক্ষ, জয়পুর কলেজ। লাইব্রেরীয়ান, বেঙ্গল লাইব্রেরী (১৮৭৯), পরে বাংলা সরকারের অনুবাদক। গ্রন্থ—ফুল ও ফল, শকুন্তলা-তত্ত্ব, ত্রিধারা, পশুপতি-সংবাদ, সাবিত্রীতত্ত্ব, হিন্দুতত্ত্ব, কঃ পন্থাঃ, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি, বেতালে বহু রহস্য ও হিন্দুত্ব। সম্পাদক—বঙ্গদর্শন (১২৯০)।

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—বঙ্গমিহির। (ভবানীপুর মিশন কলেজ ১২৮০ বঙ্গ)।

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Life of late Dasarathe Roy (বহরমপুর, ১৮৭৪ খৃঃ)।

চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ—রোগবিনিশ্চয় ১৮৭১)।

চন্দ্রনাথ শর্মা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—লক্ষ্মণবর্জন (শ্রীরামপুর, ১৮৭১)।

চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—ফরিদপুর। গ্রন্থ—চান্দীপাইতা (ন্যায়ের টিপ্পনী)।

চন্দ্রপ্রভ সূরী—জৈন ধর্মাচার্য। ১২শ শতাব্দী। গ্রন্থ—দর্শনশুদ্ধি, প্রমেয়রত্নকোষ, ন্যায়াবতার বিবৃতি।

চন্দ্রভারতী—অসমীয়া কবি। প্রকৃত নাম—হরিচরণ অনন্ত কন্দলী। গ্রন্থ—রামায়ণ (অসমীয়া ভাষায়)।

চন্দ্রময় লাহিড়ী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নলিনীমোহন (১২৯৭ বঙ্গ)।

চন্দ্রমোহন ঘোষ—গ্রন্থকার। নিবাস—কলিকাতা। গ্রন্থ—ছন্দঃসারসংগ্রহ (১৮৯৩)।

চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বসন্ত-পাগলিনী (১২৯২), পশুপতিসম্বাদ (১২৯২)।

চন্দ্রমোহন সেন—সাহিত্যিক। সম্পাদক—জ্ঞানভেদ (মাসিক, ঢাকা, ১২৮৪)।

চন্দ্রশেখর—বৈয়াকরণিক। গ্রন্থ—বৃত্তিমৌক্তিক, পিঙ্গলছন্দঃসূত্র (১৬৭৬ শক)।

চন্দ্রশেখর কর—ঔপন্যাসিক। বি, এ। গ্রন্থ—হৈমবতী, সুরবালা, সংকথা, ছ'আনাজ, পাপের পরিণাম, অনাথ-বালক।

চন্দ্রশেখর দাস—পালা-রচয়িতা। ইঁহার পূর্বে আর কেহ যাত্রা-পালা রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। যাত্রা-পালা—হরিবিলাস।

চন্দ্রশেখর দেব—সাহিত্যিক। নিবাস—কোন্নগর। ডেপুটী কালেক্টর। সম্পাদক—জ্ঞানোদয় (সংবাদপত্র, ১২৫৮ বঙ্গ)।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—সম্বাদ জ্ঞানোদয় (সাপ্তাহিক, ১৮৫২ খৃঃ)।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। জন্ম—১২৫৬ বঙ্গ, ১২ই কার্ত্তিক। পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলায়। মৃত্যু—১৩২৯, ২রা কার্ত্তিক, বহরমপুরে। পিতা—বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—এন্ট্রেন্স পরীক্ষা (বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল), এফ, এ, ও বি, এ (প্রেসীডেন্সী কলেজ)। শিক্ষকতা—বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, হেড মাষ্টার, পুটিয়া স্কুল। বি, এল। আইন ব্যবসায়, বহরমপুর, কলিকাতা হাইকোর্ট, কিছুকাল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এষ্টেটের ম্যানেজার, পরে বহরমপুরে বাস। গ্রন্থ—মসলাবাঁধা কাগজ, কুন্তলতার মনের কথা, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম, বস-গ্রন্থাবলী (বসুমতী সং), সম্পাদক—মাসিক সমালোচনা (শামপুর), উপাসনা (মাসিক, ১৩১১—১৩১৯)। সনাতন ধর্মোপদেশিনী (মাসিক—১২৭৭)।

চন্দ্রশেখর বসু—গ্রন্থকার। জন্ম ১৮৩৩ খৃঃ। পিতা—কালিদাস বসু। গ্রন্থ—মানবকাব্য (১২৭৩), প্রলয়তত্ত্ব, পরলোক-তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, বেদান্তদর্শন, হিন্দুধর্মের উপদেশ, অধিকারতত্ত্ব, বক্তৃতা-কুসুমাঞ্জলি।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি—স্মার্ত্ত পণ্ডিত। নিবাস নবদ্বীপ! গ্রন্থ—স্মৃতিপ্রদীপ, স্মৃতিসার-সংগ্রহ, সঙ্কল্প-দুর্গবর্ণন, ধর্মবিবেক।

চন্দ্রশেখর বাজপেয়ী—কবি। জন্ম—১৭৯৮। মৃত্যু—১৮৭৫। দ্বারভাঙ্গা, যোধপুর এবং পাতিয়ালা-রাজের সভাকবি। গ্রন্থ—হম্মির হাঠ।

চন্দ্রশেখর সেন—ভূপর্যটক। জন্ম—১৮৫১ খৃঃ মালদহে। পিতা—হরিমোহন সেন। শিক্ষকতা, চিকিৎসা ব্যবসায়, বার-এট-ল। পৃথিবী ভ্রমণ আরম্ভ (১৮৮৯ খৃঃ)। গ্রন্থ—ভূপ্রদক্ষিণ।

চন্দ্র সেন—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—রসোচন্দ্রোদয়।

চন্দ্রাট—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—যোগরত্ন-সমুচ্চয়, চন্দ্রাট সারোদ্ধার, বৈদ্যত্রিংশটীকা, সুশ্রুতপাঠশুদ্ধি।

চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ—রাজনীতিবিদ্। সম্পাদক—হিতবাদী।

চমনলাল, দেওয়ান—রাজনীতিবিদ্। জন্ম—১৮৯২ খৃঃ। ভারতবর্ষীয় ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপন (১৯২০)। গ্রন্থ—কুলি। সহ-সম্পাদক—Bombay Chronicle.

চরক—আয়ুর্বেদবিদ্। ২য় শতাব্দী পুরুষপুরে (বর্তমান পেশোয়ার)। কনিষ্কের সভা-সদস্য। গ্রন্থ—চরক-সংহিতা।

চান্দ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কালকেতুর চৌতিশ।

চাঁদ—অনুবাদক। পিতা—মধুরাম। গ্রন্থ—সিংহাসন বত্রিশী (ফার্সী অনুবাদ)।

চাঁদ কবি—হিন্দী কবি। চাঁদ বরদাই নামে প্রসিদ্ধ। মৃত্যু—১১৯২ খৃঃ। পৃথ্বিরাজের মন্ত্রী ও সভা-কবি। গ্রন্থ—পৃথ্বিরাজরাসৌ (হিন্দী কাব্য)।

চাণক্য—নামান্তর কৌটিল্য, বিষ্ণু গুপ্ত। জন্ম—তক্ষশিলা। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী। গ্রন্থ—অর্থশাস্ত্র, শ্লোক।

চামুণ্ডরায়—জৈন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চামুণ্ডরায় পুরাণ (৯৭৮ খৃঃ, অব্দ), গোম্মতসার।

চামুণ্ডা কায়স্থ—আয়ুর্বেদিক। গ্রন্থ—জ্বরতিমিরভাস্কর।

চারুচন্দ্র ঘোষ—সাহিত্যিক। মৃত্যু ১৩০৯ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক—বিভা (সাময়িক পত্র, ১২৯৪ ৯৬)।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭৭ খৃঃ মালদহ জেলার চাঁচল গ্রামে। মৃত্যু—১৯৩৮ খৃঃ। পিতা—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বি, এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ ১৮৯৯), এম, এ (ঢাকা—অনারারি), অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—পুষ্পপাত্র, সওগাত, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হাইফেন, দোটানা, মুক্তিস্নান, স্রোতের ফুল, পরগাছা, নষ্টচন্দ্র, যমুনা পুলিনের ভিখারিণী, চোরকাঁটা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনগীতিকা, আগুনের ফুলকি, আলোকলতা, মনোনাগ্নি, সর্বনাশের নেশা, ধোঁকার টাটি, পঞ্চদশী, হেরফের, জোড়-বিজোড়, নোঙর-ছেঁড়া নৌকা, রত্নাবলী, জয়শ্রী, পারস্য উপন্যাস, যাদের-ভাই, ররিনসন ক্রুশো, ঈশপের গল্প, ভাতের জন্মকথা, বেদবাণী, (প্যারীমোহন সেনগুপ্ত সহ), রবিরশ্মি ১ম, ২য় খণ্ড। সম্পাদিত গ্রন্থ—শূন্যপুরাণ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী, কাদম্বরী। সম্পাদক—ভারতী, সহ-সম্পাদক—প্রবাসী, মডার্ণ রিভিয়ু।

চারুচন্দ্র বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বৌদ্ধযুগে ভারত মহিলা (১৯০০), অশোক অনুশাসন, ধম্মপদ।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—শিক্ষাবিদ্। অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; শান্তিনিকেতন। গ্রন্থ—ব্যাধির পরাজয়, জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার (১৩৫০), বিশ্বের উপাদান (১৩৫০), প্রারম্ভ খণ্ড (বিজ্ঞান-প্রবেশ গ্রন্থমালা), পদার্থবিদ্যা, ১ম-৩য়, তড়িতের অভ্যুত্থান, আচার্য জগদীশচন্দ্র।

চারুচন্দ্র মিত্র—সাহিত্যিক। জন্ম—কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীট। পিতা—চন্দ্রনাথ মিত্র। আদি নিবাস আঁটপুর (হুগলী)। শিক্ষা এম. এ. বি. এল। আইন ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—গৌড় ও পাণ্ডুয়া। সম্পাদক—যমুনা (ফণীন্দ্রনাথ পাল সহ—১৩৩০), সঙ্কল্প (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সহ—১৩২১), সহ-সম্পাদক—মানসী ও মর্মবাণী, পঞ্চপুষ্প (১৩৩৭), বঙ্গীয় মহাকোষ।

চিৎসুখাচার্য—দার্শনিক পণ্ডিত। ১৩শ শতাব্দী। গ্রন্থ—ন্যায়মকরন্দ (প্রথম মুদ্রিত—বেনারস, ১৯০১)।

চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু—কবি ও রাজনীতিবিদ্। জন্ম—১৮৭০ খৃঃ ঢাকা জেলার তেলিরবাগ গ্রামে। মৃত্যু—১৯২৫ খৃঃ দার্জ্জিলিং ষ্টেপএসাইডে। পিতা—ভুবনমোহন দাশ। বার-এট্-ল, কলিকাতা হাইকোর্ট, সভাপতি—প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী (১৯১৭), অসহযোগ আন্দোলনে আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ ও কারাবরণ (১৯২১) গয়া কংগ্রেসের সভাপতি (১৯২২)। গ্রন্থ—সাগর-সঙ্গীত (১৯১৩), মালঞ্চ (১৮৯৫), মালা (১৯০২), অন্তর্যামী, (১৯১৫), কিশোর-কিশোরী। সম্পাদক—নারায়ণ (মাসিক পত্র ১৩২১-২৯), বাঙ্লার কথা (বাসন্তী দেবী সহ—১৩২৮-১৩২৯)।

চিত্রপতি শর্মা, মহামহোপাধ্যায়—পণ্ডিত। কোলব্রুক সাহেবের অধীনে কর্ম। গ্রন্থ—সিদ্ধান্তপীযূষ (স্মৃতিগ্রন্থ—বঙ্গভাষায়)।

চিন্তামণি—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বমল চিন্তামণি, বমনোৎকর্ষ, গ্রহগণিত চিন্তামণি।

চিন্তামণি, চিরন্তুমি যজ্ঞেশ্বর—সংবাদ ত্রসেবী। জন্ম—১৮৮০ খৃঃ। সম্পাদক—Leader (এলাহাবাদ), গ্রন্থ—Indian Social Reform, Speeches & Writings of Sir Pheroze Shah Mehta.

চিন্তামণি বিদ্যালঙ্কার, কবিরত্ন—ভাষ্যকার। গ্রন্থ—নিরুক্তভাষ্য (হিন্দী টীকা সমেত—১৯২৫-২৬)।

চিদম্বর—সংস্কৃত কবি। গ্রন্থ—রাঘব-পাণ্ডবীয় যাদবীয়।

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। নামান্তর—চিরঞ্জীব শর্মা। প্রকৃত নাম—রামদেব ভট্টাচার্য। জন্ম—১৮শ শতাব্দী বর্দ্ধমান জেলায় গুপ্তিপাড়া গ্রামে। পিতা—সিদ্ধান্তবাগীশ। ইনি বঙ্গ দেশের যশোবন্ত সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থ—বিদ্বোন্মাদ-তরঙ্গিণী, মাধবচম্পূ, কাব্যবিলাস, বৃত্তরত্নাবলী।

চিরঞ্জীব শর্ম্মা—কবি ও সঙ্গীতকার। প্রকৃত নাম—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। ইনি নববিধান সমাজভুক্ত। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। গ্রন্থ—গীতরত্নাবলী ১-৪র্থ খণ্ড, অমৃতে গরল, ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা, কেশব-চরিত (১৮৯৭), ব্রহ্মগীতা (১৩০৬) ইহকাল পরকাল। সম্পাদক—নববিধান (১৩০০-১৩১৬)।

চুনীলাল বসু, ডাঃ—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬১ খৃঃ কলিকাতা, বাগবাজার। মৃত্যু—১৯৩০ খৃঃ রাঁচী। পৈত্রিক নিবাস—২৪ পরগনা চাংড়ীপোতা। রায় বাহাদুর (১৮৯৮), সি আই, ই (১৯১৫) উপাধিলাভ। গ্রন্থ—খাদ্য, শরীর স্বাস্থ্য-বিধান।

চুনীলাল মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হীরকাঙ্গুরী, পারের নৌকা (১২৯৬), ফুলের তোড়া (১২৯৯), মাতাজী আশ্রম (১২৯৫)।

চুম্বন শর্মা—হিন্দী অনুবাদক। গ্রন্থ—পুরুষ পরীক্ষা কা অনুবাদ (বিদ্যাপতি কৃত সংস্কৃত মূল সহ দ্বারভাঙ্গা, ১৮১০ শক)।

চৈতন্যচরণ—ভক্তিশাস্ত্রবিদ। গ্রন্থ—প্রেমলহরী।

চৈতন্যচরণ অধিকারী—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—সম্বাদ জ্ঞানাঞ্জন [সাপ্তাহিক—দ্বিভাষিক (ইংরেজি ও বাংলা) পত্রিকা—১৮৪৭ খৃঃ]।

চৈতন্যদাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রসভক্তিচন্দ্রিকা, দেহ-ভেদ-তত্ত্ব।

ছমিরুদ্দিন মণ্ডল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হায় রে সেদিন কোথায় গেল (কবিতা—১৩০৫)।

জগচ্চন্দ্র দেব সরকার চৌধুরী—কবি। গ্রন্থ—অক্ষোদ্বাহ কাব্য (১৮৬৮ খৃঃ), কামিনীকদম্বম্ (১৭৮৫ শঃ), ত্রিসন্ধ্যা (১২৭৯ বঙ্গ)।

জগজ্জীবন মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। গ্রন্থ—মনঃসন্তোষিণী।

জগৎবল্লভ—বঙ্গীয় কবি। গ্রন্থ—মনসার ভাসান।

জগদানন্দ ঠাকুর—পদকর্তা। জন্ম—১৭০২ খৃঃ রাণীগঞ্জ মহকুমার অধীন আগরডিহি দক্ষিণখণ্ড গ্রামে। মৃত্যু—(অনু) ১৭৮২ খৃঃ। পিতা—নিত্যানন্দ ঠাকুর। গ্রন্থ—ভাষা শব্দার্ণব (অসম্পূর্ণ)।

জগদানন্দ রায়—বৈজ্ঞানিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—(১৮৮৯ খৃঃ) ১২৯৬ বঙ্গ কৃষ্ণনগরে। মৃত্যু—১৯৩৪। পিতা—অভয়ানন্দ রায়। বি-এ (১৮৯০), অধ্যাপক, বোলপুর বিশ্ববিদ্যালয়। রায় সাহেব উপাধি লাভ। গ্রন্থ—প্রাকৃতিকী, গ্রহনক্ষত্র, বৈজ্ঞানিকী, গাছপালা (এলাহাবাদ, ১৯২১), পোকা-মাকড়, বিজ্ঞানের গল্প, মাছ ব্যাঙ, সাপ, প্রকৃতি পরিচয়, বাঙ্গালার পাখী, শব্দ, পাখী, আলো, স্থির-বিদ্যুৎ, চল-বিদ্যুৎ, চুম্বক, আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, তাপ (এলাহাবাদ, ১৩৩৫), তৃতীয় বই, নক্ষত্র চেনা (কলি, ১৯৩১)।

জগদিন্দ্রনাথ রায়, মহারাজা—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৬৮ খৃঃ (১২৭৫ বঙ্গ) রাজশাহী জেলায়। মৃত্যু—১৯২৬ খৃঃ। নাটোরের মহারাজা গোবিন্দনাথের নিঃসন্তান বিধবা ইহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। মহারাজা উপাধি (১৮৭৮ খৃঃ), প্রবেশিকা (১৮৭৫ খৃঃ)। Bengal Land-holders Association প্রতিষ্ঠা (১৯০১), বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য (১৮৯৫ ও ১৮৯৭)। গ্রন্থ—সন্ধ্যাতারা, শ্রুতিস্মৃতি, দারার অদৃষ্ট, নূরজাহান। সম্পাদক—মর্ম্মবাণী (সাপ্তাহিক—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সহ—১৩২২), মানসী ও মর্ম্মবাণী (মাসিক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সহ—১৩২২-১৩৩৬), মানসী (১৩২০—১৩২২)।

জগদিন্দ্রনাথ লাহিড়ী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—সাহিত্য-সংঘ (১৩৩২—৩৬)।

জগদীশ গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অসাধু সিদ্ধার্থ, রূপের বাহিরে, শ্রীমতি, দুলালের দোলা, রোমন্থন, মহিষী, লঘুগুরু, বিনোদিনী।

জগদীশ চক্রবর্ত্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রেমপুষ্পাঞ্জলি (ঢাকা, ১৯০১)।

জগদীশ তর্কালঙ্কার—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। পিতা—যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। গ্রন্থ—দীধিতির টীকা, তর্কামৃত, কাব্যপ্রকাশ, বহস্যপ্রকাশ (টীকা ১৬৫৭ খৃঃ), শব্দশক্তি-প্রকাশিকা, প্রস্তাববাদ (ভাষ্য), দ্রব্যভাষ্যের টীকা, মুক্তিবিচার। *

[ক্রমশঃ।

---

* 'সাহিত্য সেবক-মঞ্জুষা' মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হওয়ায় উল্লেখিত এবং অনুল্লেখিত লেখকদিগের বিষয়ে প্রচুর পত্র পাওয়া যায়। পত্রালাপেচ্ছু ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য লেখকের ঠিকানা দেওয়া হইতেছে :—১২ বি, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা।—স

স্যার সৈয়দ আহমেদ

এল-আই-য়ুরো ভচ্

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রধান সমাজসেবক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ (১৮১৭—১৮৯৮) সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে বহু পুস্তক লেখা হয়েছে। এই সব পুস্তকে—বিশেষ করে ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তকে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ক্রিয়াকলাপের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা অল্প-বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। অতি সংকীর্ণ মুসলমান জমিদার ও মোল্লা মৌলভীদের মধ্যেই তাঁর আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল; সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতে কোন বৈশিষ্ট্য অথবা মৌলিকতাও ছিল না। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে প্রায়ই তুলনা করা হলেও স্যার সৈয়দকে কোন মতেই ধর্মসংস্কারক অথবা দার্শনিক বলা যেতে পারে না।

স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক মতামত বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি তাঁর নেক-নজর, বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে ও বৃটিশের সঙ্গে সংযোগিতা করার প্রচারে, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের লেলিয়ে দেওয়া ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব তীব্রতর করে তোলা ভারতের ইতিহাসে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সৈয়দ আহমেদের রাজনীতি ও ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেই পরবর্তী যুগের মুসলিম লীগের আদর্শ ও রাজনীতির বীজ অংকুরিত হয়।

১৮১৭ খৃঃ অব্দে দিল্লী নগরীতে সৈয়দ আহমেদ খাঁয়ের জন্ম হয়। এক বিশিষ্ট জমিদার-পরিবারেই তাঁর জন্ম হয়। এই জমিদার-বংশের বরাবরই মোগল রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এমন কি, মোগল সম্রাটদের স্বাধীনতা বিলুপ্তির পরেও এই জমিদার-বংশের মোগল রাজদরবারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল! মোগল রাজদরবারেই সৈয়দ আহমেদের শৈশব কাল অতিবাহিত হয়। আরবী ও পার্শী সাহিত্য এবং ইসলাম ধর্মে সুশিক্ষিতা মায়ের কঠোর তত্ত্বাবধানে শৈশবে সৈয়দের শিক্ষা আরম্ভ হয়। মোগল সম্রাটের শাহানশাহীর অন্তঃসারশূন্যতা সৈয়দ উপলব্ধি ক'রে দেখলেন যে, দেশের প্রকৃত শাসক বৃটিশ। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে দূর ও নিকট আত্মীয়-স্বজনের অপ্রীতিভাজন হয়ে সৈয়দ মোগল সম্রাটের রাজদরবারের সঙ্গে বংশগত সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন। তার পর বৃটিশ শাসকের অধীনে এক জন কেরাণী নিযুক্ত হন। পরে দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী ও বিজনোরে জজ সাহেবের পদ লাভ করেন।

সৈয়দ আহমেদ ও সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের জাতীয় অভ্যুত্থানের সময়ে সৈয়দ আহমেদ বৃটিশ শাসকের পক্ষ অবলম্বন করেন। শুধু তাই নয়, শঠতা করে বিজনোরের বহু বৃটিশ কর্মচারীর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। বৃটিশ রেসিডেন্সী অবরোধকারী বিদ্রোহীদের শিবিরে এসে তিনি প্রস্তাব করলেন যে, উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্মচারী গোটা জেলার কর্তৃত্ব এক সরকারী দলিলে দস্তখত করে বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিলে বিদ্রোহীরা শহর থেকে নির্বিঘ্নে বৃটিশদের চলে যেতে দিতে রাজী আছেন কি না? বিদ্রোহীরা এই প্রস্তাবে সমর্থন জানায়। সৈয়দ আহমেদ স্বয়ং পাহারা দিয়ে বৃটিশদের মীরাটে পৌঁছে দেন। ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন স্তরের জনতা যখন ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লিপ্ত, ঠিক সেই সময়েই সৈয়দ আহমেদ খাঁ নিজের জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বৃটিশ কর্মচারীদের জীবন রক্ষা করলেন।

বৃটিশ শাসক সম্প্রদায় তাঁর কাছে ঋণী থাকলেন না; বিদ্রোহ দমনের পর সরকারের কাছ থেকে পুরস্কারস্বরূপ মোটা টাকা পেলেন আর পেলেন রাজভক্তির প্রতীক "নাইট ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" (Knight Star of India) ও "স্যার" উপাধি। ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার অভাবই হ'ল ভারতীয় মুসলমান সমাজের দারিদ্র্য এবং আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ। সৈয়দ আহমেদ নির্ধারণ করলেন যে, শিক্ষাই হ'ল যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাধির একমাত্র ঔষধ।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে সৈয়দ আহমেদ ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। পাশ্চাত্যের কৃষ্টি, বিজ্ঞান এবং শিল্প-জ্ঞান তাঁকে প্রভাবান্বিত করে। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পাশ্চাত্যের সমুন্নত কৃষ্টিই হ'ল ভারতবর্ষ সহ যাবতীয় দেশের শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রধান কারণ। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করেন।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সৈয়দ আহমেদ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সরকার তাঁর এই জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করার পুরস্কার হিসাবে তাঁকে বড়লাটের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করেন।

সৈয়দ আহমেদের সাংস্কৃতিক অবদান

সৈয়দ আহমেদ "Archaeological History of Delhi", ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে "আসবাবে-বাঘাওয়াতে-হিন্দ", "Mohomedan Commentary on the Holy Bible", "Letters on a Journey to Europe" এবং "Essays on the Life of Mohammed" নামক কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে "সোস্যাল রিফর্মার" নামে একখানি রাজনীতি-সাহিত্যমূলক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর যাবতীয় রচনা উর্দু ভাষাতেই রচিত।

সৈয়দ আহমেদের সংস্কৃতিমূলক ক্রিয়া-কলাপ ও রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। তিনি বিবেচনা করে দেখেছিলেন যে, ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে ধ্বংস ও দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার করা। এই কারণেই তিনি ভারতে বৃটিশ শাসনকে মূল্যবান অবদান বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়ার অভাব ও উভয়ের মধ্যে সাধারণ আদর্শ ও স্বার্থের একতার অভাবই ছিল সরকারের প্রধান দুর্বলতা। এর মূলে ছিল ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার

অভাব। তিনি আরও ভেবেছিলেন যে, শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতীয়েরা উপলব্ধি করতে পারবে যে, ভারতের উন্নতির জন্যেই ইংল্যাণ্ড ভারত অধিকার করেছে। যখনই তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার আস্বাদ পাবে তখনই তারা শাসকদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। শিক্ষা-বিস্তারের নামে সৈয়দ আহমেদ কোন্ লক্ষ্যে উপনীত হতে চেয়েছিলেন তার বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন।

সৈয়দ আহমেদের মতানুসারে অজ্ঞানতাই হল ভারতের যাবতীয় দুঃখের মূলীভূত কারণ। ভারতীয়েরা যদি শিক্ষিত হত তা'হলে তারা উপলব্ধি করতে পারত যে, ইংল্যাণ্ড ভারতের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল করতে আসে নাই। শুধু তাই নয়, এ ধরণের শোচনীয় বিদ্রোহ ঘটত না। সৈয়দ আহমেদের নিজের কথায়: "এ সম্পর্কে কোন সন্দেহই নাই যে, ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ভারতীয়েরা যদি ইংল্যাণ্ডের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হত তা'হলে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহ দেখা দিত না।"

সৈয়দ আহমেদ বুঝেছিলেন যে, ধর্মের গোঁড়ামী ও ধর্ম-ইতিহাসের ঐতিহ্যের প্রতি অতিভক্তির ফলে ভারতীয় মুসলমান সমাজের উপরতলার মুসলমান শ্রেণী দেশের সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের অজ্ঞতার মূলেও ছিল এই। সমাজের অভিজাতেরা তাদের ভারতের উপরে প্রাচীন আধিপত্যের কথা স্মরণ করে গৌরব অনুভব করতেন। এর জন্যেই নয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল বিরূপ। এই বিরূপ মনোভাবের কারণ একটা ছিল। তাঁদের মতে নয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় শিক্ষানীতিকে আমল দেয় নাই এবং অভিজাত-পরিবারের যুবকদের হিন্দুদের পাশে বসে শিক্ষালাভ করতে বাধ্য করান হয়েছে। সৈয়দ আহমেদ মুসলমানদের ঐতিহ্য ও প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা, কোরাণের উপর অন্ধবিশ্বাস এবং তথাকথিত ধর্মনীতি-জ্ঞানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন; হিন্দু, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করার অভিযান চালালেন সত্যি, কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে ধর্মকে ব্যবহার করতে ছাড়লেন না। ইসলামের পরধর্মসহিষ্ণুতার প্রমাণ দেবার প্রচেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল উপরতলার মুসলমান সমাজের বৃটিশের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার পথ সুপ্রশস্ত করা। সৈয়দ আহমেদ যুক্তি দিয়ে করে দেখিয়েছিলেন যে, ইসলামের বাণী অব্যয় নয়—যুগের উপযোগী তাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারা যায়। সুতরাং তাঁর মতে ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য হয়েছিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

মুসলমান সমাজের উপরতলার মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্যে সৈয়দ আহমেদ বৎসরের পর বৎসর কি করেছিলেন তার আলোচনা করা যাক।

গাজীপুরের বৈজ্ঞানিক সমিতি

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে সৈয়দ আহমেদ গাজীপুরে একটি বৈজ্ঞানিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির সদস্যগণ ছিলেন মুসলমান। প্রধানতঃ সৈয়দ আহমেদের বন্ধুগণই ছিলেন এই সমিতির সদস্য। আর তাঁর মত সরকারী কর্মচারী আলীগড়ের জজ মৌলভী সমিউল্লাহ খাঁ, মৌলভী সৈয়দ মেহদী আলী খাঁ ও আরও অনেকে ছিলেন এই সমিতির সদস্য। স্থানীয় ইংরাজ কর্মচারীরাও এই সমিতির সদস্য ছিলেন। এই সমিতির সদস্যগণ ইংরাজী ইতিহাস, অর্থনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করতেন। অনুবাদ করাই এই সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না—মুসলমান ও ইংরাজদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন ও সহযোগিতা করাও ছিল উদ্দেশ্য। জেলার অভিজাত মুসলমানগণ প্রায়ই সৈয়দ আহমেদের গৃহে সভা করতেন এবং এই সভায় ইংরাজ কর্মচারিগণও যোগ দিতেন। মুসলমান সমাজের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তার করার প্রয়োজনীয়তা, ইস্‌লাম ধর্মে ইংরাজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার পথে অন্তরায় নাই, এবং কি ভাবে এক জঘন্য প্রথার ফলে উভয়ে পৃথক হয়েছে, এ সম্পর্কে সৈয়দ আহমেদ ধারাবাহিক আলোচনা করতেন। বৃটিশদের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যের কথাও আলোচনা করতেন আবার বৃটিশদেরও ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হবার উপদেশ-বাণীও বর্ষণ করতেন। ইংরাজেরাও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়তেন না। তাঁরা মুসলমান সমাজের এক শ্রেণীর লোকের ইংরাজী সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষায় প্রেরণা দিতেন এবং ভারতের বৈদেশিক শাসকের সহিত সহযোগিতা করার উপদেশ দিতেন।

সৈয়দ আহমেদের পত্রিকা

১৮৭০ খৃঃ অব্দে সৈয়দ আহমেদ উর্দু ভাষায় রাজনীতি-সাহিত্যমূলক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। আট বৎসর ধরে পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানির নাম "ইনষ্টিটিউট গেজেট"। সৈয়দ আহমেদ ও তাঁর বন্ধুরা বিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি এবং ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এই পত্রিকায় লিখতেন। মুসলমানদের ইতিহাস ও মুসলমানদের পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার আবশ্যকতার কথা এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রচার করা হত। আরও প্রচার করা হত যে, ইসলাম ধর্ম রক্ষণশীল ধর্ম নয়। যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলাই হল ধর্মের সার কথা। মুসলমান যুবকদের জন্য একটি কলেজের আবশ্যকতার কথাও পত্রিকায় প্রচার করা হত।

পত্রিকার কয়েক সংখ্যা শেষ হতে না হতেই বিভিন্ন সভা-সমিতি থেকে এবং পত্রিকায় সৈয়দের পত্রিকার, স্বয়ং সৈয়দের ও সৈয়দের প্রস্তাবিত কলেজের উপরে আক্রমণ সুরু হল। সৈয়দ ভারতে ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছেন—এই অভিযোগ করে তাঁকে আক্রমণকারীরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালে। কয়েকটি প্রবন্ধে মোল্লা মৌলভীরা লিখলেন যে, কলেজের সম্মুখে সৈয়দের এক মর্মর মূর্তি তৈরী করা হবে এবং ইস্‌লাম ধর্মের পৌত্তলিকতা বিরোধী নীতির অবমাননা করার জন্যে ছাত্রদের সৈয়দের মর্মর মূর্তিকে প্রণাম করে কলেজে ঢুকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার অনেকে ইউরোপীয় পোষাকে ছাত্রদের চলা-ফেরার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুললেন।

এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে, সৈয়দের পত্রিকা মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ এনেছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে

তাঁর প্রচার-কার্যটা সমাজের উপরতলার মুসলমানদের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গাজীপুরের বাসায় যে সব জমিদার ও সরকারী কর্মচারী সভা করতেন কেবল মাত্র তাঁদের মধ্যেই এই নয়া জাগরণ সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান জনসাধারণ তাঁর আলোচনা-সভা অথবা পত্রিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সংবাদই রাখত না। এই পত্রিকা মুসলমানদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল করে দিল যে, সমগ্র ভারতের মুসলমান মূলতঃ এক জাতি। ভারতের মুসলমানদের জাতীয় ও প্রাদেশিক বৈষম্যের কথা বিবেচনাই করা হ'ল না। সৈয়দের পত্রিকার সমসাময়িকী সহযোগী লিখেছিল: "এই পত্রিকা মুসলমানদের জাতীয় অনুভূতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল; সেই অনুভূতি পূরাপূরি তারা বিস্মৃত হয়েছিল···ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে এ কথা বলা অন্যায় হবে না যে—'জাতি' 'জাতীয়তাবাদ' 'জাতীয় ঐক্য' 'জাতীয় সম্মান' ইত্যাদি কথাগুলি মুসলমানদের উচ্চারণ করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন স্যার সৈয়দ।" এ কথা বলা ঠিক হবে যে—সৈয়দ আহমেদই "মুসলীম্ সম্প্রদায়" "মুসলীম্ জাতি" প্রভৃতি ধারণা মহিমান্বিত করতে সুরু করেছিলেন।" "মুসলীম সম্প্রদায়" এই ধারণার মধ্যে গোটা ভারতীয় মুসলমান সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মুসলমানেরা যে শুধু ধর্মের দ্বারাই ঐক্যভূত তা' নয়, জাতি হিসাবেও মুসলমানেরা এক জাতি। মুসলমানদের তিনি বিভিন্ন জাতি থেকে পৃথকীকরণ করেছিলেন।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দের মে মাসে সৈয়দ আহমেদ আলীগড়ে মুসলীম-এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের (Muslim Anglo-Oriental College) প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যক্তিগত চাঁদায় কলেজ নির্মিত হয় এবং কলেজের সঙ্গে একটি ছাত্রাবাসও সংযুক্ত ছিল। অধিকাংশ ছাত্রই এই ছাত্রাবাসে থাকত। উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হলেও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হত। কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক ও প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ইংরাজ। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সৈয়দ আহমেদ নিজেকে কলেজের প্রধান সেক্রেটারী হিসাবেই বিবেচনা করতেন। স্বভাবতই কলেজের সব ভারই তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছিল। যা' হোক, বহুলাংশে কলেজ ইংরাজী শিক্ষা-প্রণালী অনুকরণ করে ফেলে। খেলাধূলার ব্যাপারে বেশীর ভাগ সময়ই ব্যয় করা হত; খেলাধূলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত; একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল—এই ক্লাবে ছাত্রেরা বিভিন্ন বিষয়ে তর্ক করত। ছাত্রেরা প্রত্যহই মসজিদে যেত কিন্তু শিয়া ও সুন্নিরা পৃথক্ ভাবে উপাসনা করত।

আলীগড় কলেজের উদ্দেশ্য

বৃটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, ইংরাজদের সব-কিছুরই প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং ভারতবর্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করার জন্যে শাসনযন্ত্রটি চালাবার উপযোগী কেরাণী উৎপাদন করাই ছিল আলীগড় কলেজের একমাত্র উদ্দেশ্য। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে এই কলেজের স্থাপয়িতাগণ তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটনকে যে মানপত্র প্রদান করেন তাতে এই কলেজের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল: "বৃটিশের দান ও মহত্ব বুঝবার মত শক্তি আমাদের দেশবাসী যাতে অর্জন করে সেই মত দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলা; মুসলমানদের বৃটিশ-রাজের যোগ্য ও উপযুক্ত প্রজা হিসাবে সংগঠন করা; বিদেশী শাসকের নিকট বশ্যতা স্বীকার করা নয়—একটি মহান্ সরকারের মহান্ অবদানের দ্বারা মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করাই হল এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

অবশেষে ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে সৈয়দ আহমেদ "মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন" সংগঠন করেন। এই সম্মেলনটিকে শিক্ষামূলক হিসাবে প্রচার করা হলেও আসলে এটি ছিল রাজনৈতিক সংগঠন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সদ্য-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করা। ১৮৮৫ খৃঃ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় আর ঠিক পর বৎসরেই সৈয়দ আহমেদ এই সম্মেলন সংগঠন করেন। আরও লক্ষ্য করার বিষয়—জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন যে মাসে অনুষ্ঠিত হ'ত ঠিক সেই মাসেই এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান হ'ত। জাতীয় কংগ্রেসে মুসলমানেরা যাতে যোগদান করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই সৈয়দ আহমেদ এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সৈয়দ আহমেদ মুসলমানদের সর্বভারতীয় রাজনীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করেন নাই—মুসলমানদের আন্দোলনকে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক ও পৃথকীকরণ ভিত্তিতে পরিচালনা করেছিলেন সৈয়দ। এই সম্মেলনে তিনি প্রকাশ্যেই কংগ্রেস বিরোধিতার নেতৃত্ব নিয়েছিলেন।

সৈয়দের শিক্ষানীতি কি প্রগতিশীল ছিল?

সৈয়দ আহমেদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের এই ছিল ধারা। কিরূপে এর মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে? এ থেকে কি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে? যাবতীয় সাহিত্যে—সে মুসলীম লীগের হোক, কংগ্রেসেরই হোক আর ইংরাজেরই হোক সবেতেই সৈয়দ আহমেদের কাজের একটা সদর্থক (positive) মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন এক জন "মহান্ শিক্ষাবিদ্"। শুধু তাই নয়—বলা হয়েছে সৈয়দ আহমেদ ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের রামমোহন রায়।

শিক্ষা-বিস্তার যে প্রগতিশীল কাজ তাতে সন্দেহ করার কিছুই নাই, কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য অথবা এর দ্বারা যে রাজনৈতিক স্বার্থ সাধন করা হবে সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শিক্ষানীতি আলোচনা করা ঠিক হবে না। সব কিছুই একত্রে আলোচনা করে দেখতে হবে! শিক্ষাক্ষেত্রে সৈয়দ আহমেদের অবদানের মূল্য নিরূপণ করা যদি হয় তাহ'লে মাত্র একটা সিদ্ধান্তই করা যেতে পারে। আর সে সিদ্ধান্ত হচ্ছে হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের পৃথক্ করতে সৈয়দ আহমেদ সাহায্য করেছিলেন এবং ইংরাজদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের বশ্যতা স্বীকার করতে ভারতীয়দের প্রলুব্ধ করেছিলেন। এই করে তিনি ভারতে বৃটিশ শাসন সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছিলেন। ভারতীয় ও তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের মধ্যে "পারস্পরিক বুঝাপড়া" ও "সহযোগিতা" মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ-প্রীতি; ভারতের বৃটিশ শাসনযন্ত্রটি পরিচালনা করার উপযোগী রাজভক্ত কর্মচারী সৃষ্টি করার কাজে সৈয়দ আহমেদ আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বৃটিশ সংস্কৃতির কথা প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ আহমেদ

আধুনিক ষ্টাইলে ভারতীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য সৃষ্টির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। বাস্তবিক এই সময় হ'তেই উর্দ্‌ ভাষায় সাংবাদিকতার শুরু হয় এবং নয়া পথে উর্দ্‌ সাহিত্যের বিকাশ হয়। এই সময় হতেই উর্দ্‌ শব্দকোষে পার্শী ভাষার প্রভাবের অবনতি ঘটে এবং হিন্দী শব্দের আবির্ভাবের বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর কারণ একটা ছিল। উর্দ্‌ ভাষাকে ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে পৌঁছে দিতে ও তাদের বোধগম্য করার উদ্দেশ্য উর্দ্‌ সাহিত্যে হিন্দী শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, এই বিশেষ ব্যাপারটিতেও সৈয়দ আহামেদ কেবল মাত্র মুসলমান সমাজের কথাই মনের মধ্যে রেখে চলেছিলেন। তিনি জ্ঞাতসারেই মুসলমানদের মধ্যে অতি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং নিজেকে নিখিল ভারত জাতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই তাঁর সব কিছুই সীমাবদ্ধ ছিল —সমাজের নীচের তলার মুসলমানদের জন্য তিনি কিছুই করেন নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যখন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় তখন ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের অর্থ কি দাঁড়ায়? জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করাই দাঁড়ায়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে রামমোহন রায় প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ভারতের অজ্ঞতা ও স্থাণু সমাজ-বিধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেছিলেন। এই যুগে ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যাপক প্রচার অবশ্যই প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারের অর্থ হ'ল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগ্রামের বিরোধিতা করা।

সৈয়দের মৃত্যুর পরেও তাঁর কর্মক্ষেত্র আলীগড় কলেজ জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী ও ইংরাজভক্ত মুসলমান কর্মী তৈরী করেছিল।

সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক মতামত

এইবার সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ আলোচনা করা যাক। এখন পর্য্যন্ত আমরা যা আলোচনা করলাম, তাতে দেখলাম যে, সৈয়দের প্রধান আওয়াজ ছিল ইংরাজ শাসকের আনুগত্য স্বীকার ও মুসলমান সমাজের উপরতলার লোকের স্বার্থ রক্ষা করা। সৈয়দ আহমেদ বলেছিলেন যে, একটানা ভুলের জন্যে বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের শত্রুভাবাপন্ন করে তুলেছিলেন এবং ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে দিয়াছিলেন বলেই ১৮৫৭-৫৯ সালের ভারতীয় অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি একখানা গোটা পুস্তকই রচনা করেছিলেন। বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—রুশিয়া অথবা ইরাণের প্ররোচনায় অথবা মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় অথবা অযোধ্যা রাজ্য বৃটিশ কর্তৃক দখলের ফলে অথবা সেনাবাহিনীর মধ্যে নতুন বুলেট চালু করার ফলে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়, তার কোনটাই সত্যি নয়। তিনি আরও বলেছিলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহ পূর্ব-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র নয় এবং যদিও সেনাবাহিনীর মধ্যেই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল তাহলেও এটাকে কেবল মাত্র ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ ব'লে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না। তাঁর মতে এ বিদ্রোহের কারণ বেশ কিছু গভীর হলেও খুবই সাধারণ। এ পর্য্যন্ত ঠিকই বললেন, কিন্তু কারণ বিশ্লেষণ করে এক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তিনি লিখলেন: "বড়লাটের আইন পরিষদে ভারতীয়দের যোগদান না করাই হল এই অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ। এই জন্যেই ভারতের জনসাধারণ সঠিক ভাবে সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উপলব্ধি করতে পারেন নাই। এবং সরকারও জনসাধারণের মতামত জানতে পারেন নাই। ফলে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।" মুসলমান সমাজের উপরতলার লোকের প্রতিনিধিদের যে আইন পরিষদে গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল তা উল্লিখিত মন্তব্য থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে।

বৃটিশদের প্রতি সৈয়দ আহমেদের উপদেশ

সরকারের "বিষম ভুল" ও বিদ্রোহের মূল কারণ যা সৈয়দ আহমেদ দেখিয়েছেন তা'হতেও আরও ভুল ও বিদ্রোহের কারণ দেখা দিয়েছিল। সেগুলিকে সৈয়দ আহমেদ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন:—

(১) সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণ কর্তৃক ভুল ব্যাখ্যা;

(২) ভারতীয় প্রথার সহিত সম্পর্ক-বিবর্জিত আইন জারী;

(৩) ভারতীয় প্রথা, দৃষ্টিভঙ্গী ও আচার-ব্যবহারের সহিত সরকারের পরিচয় না থাকা;

(৪) ভারতীয়দের সহিত অবিবেচনা-প্রসূত ব্যবহার; এবং

(৫) সেনাবিভাগের শাসন-ব্যবস্থা।

ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কে সৈয়দ আহমেদের মতামত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন: "বৃটিশ সরকারের সেনাবাহিনীর শাসন-ব্যবস্থা সমালোচনার যোগ্য। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যেতে পারে যে, যখন নাদীর শাহ আফগানিস্তান ও ইরাণ অধিকার করেন তখন তিনি দু'টি বাহিনী গঠন করেন। একটি হল আফগান বাহিনী আর অপরটি হল ইরাণী বাহিনী। যখন ইরাণী বাহিনী তার কর্তব্যকর্ম পালন করতে অস্বীকার করত তখন আফগান বাহিনী তাকে ধ্বংস করত। তেমনি আফগান বাহিনীর ব্যাপারে ইরাণী বাহিনীদের প্রয়োগ করা হত। বৃটিশ সরকার কিন্তু ভারতবর্ষে সে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন নাই। বৃটিশ সরকার সেনাবাহিনীতে দু'টি বিরোধী সম্প্রদায়ের হিন্দু ও মুসলমান সেনা নিয়োগ করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমান সেনাদের অবাধ মেলামেশার ফলে উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকটি রেজিমেন্টের হিন্দু-মুসলমান সেনাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব। প্রত্যেকটি রেজিমেন্টের হিন্দু-মুসলমান সিপাই একে অপরকে ভাই ও বন্ধু হিসাবে দেখতে শিখেছে। প্রত্যেকটি রেজিমেন্ট যদি পুরাপুরি হিন্দু অথবা মুসলমান সিপাহী নিয়ে গঠিত হত তাহ'লে এই ধরণের একতা ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠত না।

আমি বিশ্বাস করি, তাহ'লে মুসলমান রেজিমেন্টের মধ্যে এ ধরণের অসন্তোষ দেখা দিত না অথবা নতুন বুলেট ব্যবহার করতে তারা অস্বীকারও করত না।"

এইবার স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ১৮৫৭ খৃঃ অব্দেই সৈয়দ আহমেদ বৃটিশ সরকারকে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার সুযোগ নিতে এবং হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

মুসলমান জমিদার-শ্রেণীর প্রতিনিধি

মুসলমান জমিদার-শ্রেণীর প্রতিনিধি ও বৃটিশ শাসনের স্বার্থবাহী হিসাবে সৈয়দ আহমেদ প্রতি পদে-পদে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, মুসলমানেরা বৃটিশ সরকারের একান্ত অনুগত প্রজা। তিনি আরও দেখাতে চেয়েছিলেন যে, বিদ্রোহে মুসলমানদের যোগদান স্বায়ত্তঃ এবং হিন্দুদের অপেক্ষাও মুসলমানদের যোগদানের কারণ বৃহত্তর। ঠিক একই কালে তিনি আবার বলছেন যে, মুসলমানেরা বৃটিশদের নিকট ক্রীতদাসের মত বিশ্বস্ত ছিল। এবং বলছেন যে, যে-সব মুসলমান এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন তাঁরা অতিশয় "নীচ ও জঘন্য"। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে "ভারতের রাজভক্ত মুসলমান" এই শিরোনামা দিয়ে তিনি একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় তিনি লেখেন: "সেই দুর্দিনে (অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে) যদি কোন শ্রেণী ইংরাজের পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে তাহ'লে সে হল মুসলমান। যে-সব মুসলমান এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল তাদের আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না; শুধু তাই নয়, তাদের ব্যবহার প্রত্যেকের অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক করেছে। যেহেতু তারা এই ধরণের পাশবিক হত্যাকাণ্ডে যোগ দিয়েছিল সেই হেতু তারা ক্ষমার অযোগ্য।"

ওয়াহাবী আন্দোলনের নিন্দা

ঠিক একই কারণে তিনি ভারতের ওয়াহাবী আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ইংরাজ কর্মচারী ও ইতিহাসকার হান্টার লিখিত ওয়াহাবীদের সম্পর্কে পুস্তক প্রকাশিত হয়, সৈয়দ আহমেদ হান্টার কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যাদির প্রামাণ্য সম্পর্কে প্রশ্ন ক'রে 'পাইওনিয়ার' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লেখেন। হান্টার ওয়াহাবী আন্দোলনের গতি ও বাস্তব উদ্দেশ্যের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন সৈয়দ আহমেদ তার সঙ্গে একমত হতে পারেন নাই। যদিও ওয়াহাবীরা প্রথম দিকে শিখেদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তবুও হান্টার লিখেছিলেন, এ আন্দোলন পুরাপুরি বৃটিশ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী। কিন্তু সৈয়দ আহমেদ দেখালেন যে, ওয়াহাবীরা কেবল মাত্র শিখেদের বিরুদ্ধেই লড়াই করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ওয়াহাবীদের মুসলমান সমাজের শত্রু বলে ঘোষণা করেছিলেন। ওয়াহাবীদের সম্পর্কে হান্টার যে আতংক প্রকাশ করেছিলেন—সৈয়দ আহমেদ তাকে অতিরঞ্জিত ব'লে রায় দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, মৌলভীরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াইকে পবিত্র ধর্ম বলে ঘোষণা ক'রে যে ফতোয়া জারী করেছিলেন তার মূলে মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল না—ছিল ইংরাজদের কাল্পনিক মুসলমানদের ইংরাজ শাসনের বিরোধিতা করার চিন্তা। এই ভাবে ঘটনাবলী বিকৃত করে তিনি ইংরাজদের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, মুসলমানেরা বৃটিশ সরকারের একান্ত অনুগত প্রজা।

এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সৈয়দ আহমেদ মুসলমান সম্প্রদায় বলতে সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় জমিদারদের কথাই বলেছেন। "ভারতের বিদ্রোহের কারণ" শীর্ষক পুস্তকে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা লিখেছেন, সে সম্প্রদায় কেবল মাত্র মুসলমান জমিদার নিয়ে গঠিত। নয়া প্রবর্তিত ইংরাজী আইন অনুসারে মুসলমানদের জমিদারী হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমান কৃষক ও শিল্পীর কথা অথবা গুজরাতের মুসলমান ব্যবসায়ীদের কথা তিনি আমল দেন নাই। বিরাট ওয়াহাবী আন্দোলনে যে সব মুসলমান কৃষক যোগদান করেছিল সৈয়দ আহমেদের মতে তারা ছিল মুসলমান সমাজের শত্রু। তিনি বার বার ঘোষণা করেছিলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে মুসলমানেরা বৃটিশ সরকারের বিরোধিতা করেন নাই। শুধু তাই নয়—মুসলমানেরা বহু ইংরাজ কর্মচারীর জীবন রক্ষা করেছিল। সৈয়দ আহমেদ মুষ্টিমেয় জমিদার-শ্রেণীর রাজভক্তির কথাই উল্লেখ করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জমিদারদের প্রতি ইংরাজদের প্রসন্ন করে তোলা। তিনি আরও দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, মুসলমানদের কিছু সুবিধা দিলে—বিশেষ করে তাদের হৃত জমিদারী ফিরিয়ে দিলে, শাসন বিভাগে তাদের চাকরী দিলে ও তাদের শিক্ষিত করে তুললে মুসলমানেরা আন্তরিকতার সঙ্গে ইংরাজদের হাতে হাত মেলাবে। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যটা বেশ ভাল ক'রেই দেখিয়েছিলেন। সমাজ, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম সকল দিক দিয়েই তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর মতে "হিন্দুরা কৃষক, শিল্পী, ও ব্যবসায়ী আর মুসলমানেরা জমিদার ও রাজকর্মচারী।" এই কারণে তিনি বৃটিশ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সেনাবাহিনীতেও মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের পার্থক্য রাখতে হবে। এই ভাবে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধিতার সুযোগ নেবার জন্যে বৃটিশ সরকারকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন।

গণতন্ত্রের বিরোধিতা

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক মতামত সঠিক একটা রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি বললেন, ভারতীয় মুসলমানেরা এক পৃথক্ জাতি—ভারতের অন্যান্য ধর্মের লোকের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নাই। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ আহমেদের একমাত্র কাজ হল, মুসলমানদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করতে না দেওয়া ও মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া। কারণ দেখিয়ে তিনি বললেন—মুসলমানদের স্বার্থ ও ভারতের অন্যান্য জাতির স্বার্থ এক নয়। সুতরাং মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত নয়। সৈয়দ আহমেদ জাতীয় কংগ্রেসের হু'টি মূল দাবীর বিরোধিতা করলেন: (১) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সম্প্রসারণ এবং অন্ততঃ পক্ষে অর্ধেক নির্বাচিত সদস্যের জন্যে নির্বাচন নীতির প্রবর্তন; এবং (২) ইংল্যাণ্ডের পরিবর্তে ভারতে সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

প্রথম দাবীটি সম্পর্কে সৈয়দ আহমেদ বললেন—যে নির্বাচনী প্রথায় প্রতিটি শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে সমানাধিকার দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, মুসলমানদের হিন্দুদের অপেক্ষা কমসে-কম চার গুণ বেশী ভোট পেতে হবে। তা ছাড়া মুসলমানদের জন্য যদি পৃথক্

নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় তা হলেও মুসলমানদের অবস্থার কোন উন্নতিই হতে পারে না ; কারণ, হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় অনগ্রসর। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করে মুসলমান জমিদার-শ্রেণীর স্বার্থ কায়েম করার জন্য আপ্রাণ লড়াই করেছেন। সর্ব-ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা ক'রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করলেন—"ইংল্যাণ্ডের কাছে স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানের প্রশ্ন তুলবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈপরীত্যের কথা। ইংল্যাণ্ডে কোন জাতীয় ও ধর্মীয় বৈষম্য নাই। সুতরাং সেখানে স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানের কোন বাধা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশে—যেখানে আজও জাতিগত ও ধর্মগত বৈষম্য রয়েছে, শিক্ষা-বিস্তার প্রতিটি লোকের মধ্যে সমভাবে হয় নাই, সে দেশে আমার মতে নির্বাচন-প্রথা ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ প্রবর্তন যথেষ্ট ক্ষতিকারক হবে। যত দিন এ দেশে জাতি, ধর্ম ও অন্যান্য ধরণের বৈষম্য রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিফলিত হবে, তত দিন এ দেশে নির্বাচনী নীতি কার্য্যকরী হতে পারে না।" সৈয়দ আহমেদের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেসের দাবীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়ে দুর্বল মুসলমান জমিদার-শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যে তিনি সম্প্রদায়গত বৈষম্য, আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা এবং ভারতের বিভিন্ন স্তরের লোকদের অসম বিদ্যা-বুদ্ধির দোহাই দিয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি বৃটিশ শাসক-শ্রেণীর সঙ্গে একমত হয়েছেন। বৃটিশ শাসক-শ্রেণী ভারতবর্ষকে যখনই কোন অকিঞ্চিৎকর রাজনৈতিক অধিকার দান ক'রেছে তখনই তারা ঘোষণা করেছে যে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে এখনও পারে নাই এবং স্বাধীনতা অর্জনের পথে তার প্রধান অন্তরায় হল তার ধর্মগত, জাতিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় অনৈক্য। এই গবেষণাটি বৃটিশ শাসক ভারতে তার স্বার্থরক্ষার্থে অর্থাৎ "ভাগ কর ও শাসন কর" নীতি চালু রাখার জন্যে আগেও চালু করেছিল ও আজও চালু রেখেছে। তাই বৃটিশ শাসক-শ্রেণী আজও সৈয়দ আহমেদের লেখাগুলি ব্যবহার করে আসছে ; ভারতে বৃটিশ শাসকের ও মুসলমান জমিদার-শ্রেণীর স্বার্থ অভিন্ন হয়েছে আর উভয়েরই একই শত্রু হয়েছে—জাতীয় আন্দোলন।

এখন প্রশ্ন উঠবে—সৈয়দ আহমেদ জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন কেন? সৈয়দ আহমেদই সর্বপ্রথম বুঝেছিলেন জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় বুর্জোয়াদের কুক্ষিগত এবং এদেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা এরই মারফতে প্রতিফলিত হবে। তিনি দেখেছিলেন যে কংগ্রেসের সদস্যগণ সকলেই হিন্দু আর হিন্দুরা সকলেই শিক্ষিত। মুসলমান সমাজের জমিদারদের হিন্দুরা শিক্ষা, সংস্কৃতি সকল দিক দিয়েই অতিক্রম করে গিয়েছে আর মুসলমানদের জমিদারী হিন্দুদেরই হাতে চলে যাচ্ছে। তিনি আরও দেখেছিলেন যে, অধিকাংশ কংগ্রেসীই মুসলমান জমিদারদের শত্রু এবং মুসলমানদের দাবী-দাওয়ার বিরোধিতা করবে কংগ্রেসীরাই। কংগ্রেস উদীয়মান জাতীয় বুর্জোয়ার অভিব্যক্তি মাত্র আর ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার ঘোর শত্রু—এ কথাটা তিনি অনুভব করেছিলেন।

সৈয়দ আহমেদের উপর বৃটিশ প্রভাব

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর অন্ততঃ দু'বৎসর সৈয়দ আহমেদ প্রকাশ্যে জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু প্রতিটি অধিবেশনে যখন কংগ্রেস ক্রমাগত ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার, সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস, সংরক্ষণ শুল্ক প্রবর্তন, ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণ ইত্যাদি দাবী উত্থাপন করতে লাগল তখনই সৈয়দ আহমেদ ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেসের দাবী মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী। সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক মতামত সংগঠনে ভারতে বৃটিশ সরকার ও তার ঔপনিবেশিক ক্রিয়া-কলাপ যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করেছিল। বৃটিশ সরকার তাঁকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও আলীগড় কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ বেক্ (Beck) যদিও তাঁর উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নাই, তবুও লিখলেন : "এ দেশের অনুপযোগী গণতান্ত্রিক সরকার গঠন বন্ধ করতে হলে ও আন্দোলনকারীদের স্তব্ধ করে রাখতে হলে আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইংরাজ-মুসলমানের একতা। সুতরাং আমরা আজ চাই ইঙ্গ-মুসলমান সহযোগিতা।"

মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদের তত্ত্বদর্শী

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক মতামত ও ক্রিয়া-কলাপের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম, তা থেকে আমরা নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি :—

প্রথমতঃ—সৈয়দ আহমেদ যখন মুসলমানদের কথা বলেছেন, তখন তিনি মুসলমান জমিদার ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কথাই বলেছিলেন। এই কারণেই তিনি জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর আশংকা হয়েছিল যে, কংগ্রেসের হিন্দু বুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল ও অনগ্রসর মুসলমান জমিদারদের কোণঠাসা ক'রে দেবে।

দ্বিতীয়তঃ—তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কোন বিশেষ সময়ে হিন্দু-মুসলমানের সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও মূলতঃ তিনি ভারতীয় মুসলমানদের এক স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, বৃটিশ সরকার যদি ভারতের হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে সেনাবাহিনীতে কাজে লাগাতে পারতেন তা'হলে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহ ঘটত না। এর ত্রিশ বৎসর পরে জাতীয় কংগ্রেসকে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করতে দেন নাই। জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী—এ ধারণা মুসলমানদের মধ্যে সুদৃঢ় করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এইরূপে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের ভারতবর্ষের এক পৃথক্ জাতি আর অন্য ধর্মের লোকের সঙ্গে কোন সৌসাদৃশ্য নাই—হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং ইংরাজ শাসকদের হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সুযোগ নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এ হতে আমরা এই সিদ্ধান্তই করতে পারি যে, ভারতে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদের ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের জনক ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ।

অনুবাদক—ললিত হাজরা।

বত্রিশ

পরদিন শার্লট বোনকে নিয়ে গাঁয়ে গিয়েছে কোন কাজে। সকাল বেলা একলা বসে এলিজাবেথ দিদিকে চিঠি লিখছিল। এমন সময় দরজায় ঘণ্টার শব্দে সে সচকিত হয়ে উঠল। আগন্তুক কেউ এসেছেন নিশ্চয়ই। গাড়ীর শব্দ যখন শুনতে পায়নি সে, লেডী ক্যাথারিনও হতে পারেন এবং সেই সম্ভাবনায় অর্ধসমাপ্ত চিঠিখানি সরিয়ে রেখে দিল সে যাতে না তাঁর, ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হতে হয়। দরজা খুলে দিতেই তাকে বিস্মিত করে ঘরে ঢুকল ডার্সি।

ডার্সিও বিস্মিত হল এলিজাবেথকে একলা দেখে। সে ভেবেছিল সবাই বাড়ীতে আছে। এ ভাবে হঠাৎ এসে পড়ার জন্য ক্ষমা চাইলে ডার্সি। দু'জনে আসন নিয়ে বসল। কুশল সংবাদ আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দতার বিপদ দেখা দিল। কাজেই বিষয়ান্তরের প্রসঙ্গ উত্থাপন ভিন্ন উপায় রইল না। এই সংকট-মুহূর্তে হার্টফোর্ডে শেষ দেখা হওয়ার কথা মনে পড়ায় এবং তখন তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া সম্বন্ধে ডার্সির কি বলবার আছে জানতে কৌতূহলী হয়ে এলিজাবেথ প্রশ্ন করল—'আচ্ছা, গত নভেম্বরে আপনারা সবাই হঠাৎ নেদারফিল্ড ছেড়ে চলে গেলেন যে বড়ো? তার পিঠ-পিঠ সবাই চলে আসায় মিঃ বিংলে আশ্চর্য হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। যত দূর মনে পড়ছে আপনার যাওয়ার ঠিক এক দিন আগে তিনি গিয়েছিলেন। লণ্ডন ছেড়ে আসার সময় তাঁকে এবং তাঁর বোনেদের নিশ্চয় সুস্থ দেখে এসেছেন?'

—হ্যাঁ, বহাল তবিয়তে আছে তারা।'

কিন্তু আসল প্রশ্নের কোন জবাব পেলে না দেখে সে একটু থেমে বললে—'যত দূর মনে হয়, মিঃ বিংলে বোধ হয় আর সেখানে ফিরছেন না, কি বলেন?'

—'সে রকম কিছু শুনিনি আমি। তবে ভবিষ্যতে হয়ত খুব কম সময়ই সে সেখানে কাটাতে পারবে। তার বন্ধু-সংখ্যা এত এবং এমন বয়সে সে উপনীত যখন দু'দিক বজায় রাখতে তাকে হিমসিম খেতে হচ্ছে।'

—'ওঁরা যদি নেদারফিল্ডে একদমই না থাকে, তাহ'লে জায়গাটা একেবারে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। সে ক্ষেত্রে আমরা স্থায়ী ভাবে সংসার পাততে পারি সেখানে। কিন্তু মিঃ বিংলে হয়ত পড়শীদের সুবিধার চেয়ে নিজের সুবিধার মুখ চেয়েই বাড়ীটা নিয়েছেন। আর রাখারাখিও তাঁর নিজের সুবিধার দ্বারাই বিচার্য।'

—'ভাল দাম পেলে যদি সে বাড়ীটা বিক্রী করে তাতে আমি অবাক হবো না!'

এলিজাবেথ এর কোন উত্তর দিল না, আর কথা বাড়াতেও ইচ্ছা হোল না তার। আর কথা বলার কোন প্রসঙ্গ না থাকায় সে সমস্যাটা ডার্সির ঘাড়ে ছেড়ে দিতে সংকল্প করল।

ডার্সিও ইংগিতটা বুঝতে পেরে বললে—'এ বাড়ীটা বেশ। মিঃ কলিন্স প্রথম হান্সফোর্ডে এলে, লেডী ক্যাথারিন বাড়ীটার সংস্কার করেছেন অনেক।'

—'আমারও তাই বিশ্বাস এবং দয়া দেখানোর পক্ষে কলিন্সের মত এমন কৃতজ্ঞপরায়ণ আর দু'টি মিলবে না।'

—'মিঃ কলিন্স পত্নী নির্বাচনে খুব সৌভাগ্যবান।'

—'তা সত্যি। এমন একটি বুদ্ধিমতী মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে

পাওয়ায় তার বন্ধুরা আনন্দ করতে পারেন। সে তার জীবনকে সুখময় করে তুলবে।'

—'নিজের বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার-পরিজনের কাছেই থাকতে পেরে তিনি খুব খুশীই হয়েছেন নিশ্চয়?'

—'এর নাম কাছে! কম পক্ষে পঞ্চাশ মাইল হবে।'

—'সে আর এমন কি। আধ দিনের কিছু বেশী সময় লাগে যেতে। একে অল্প দূরত্বই বলা চলে।'

ডার্সি যখন কথা বলছিল তার মুখে এমন একটা স্মিত হাসির ভাব ছিল যা দেখে এলিজাবেথের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বললে—'এ কথা আমি বলিনি যে, মেয়েদের শ্বশুর-বাড়ী বাপের বাড়ীর খুব নিকটেই হওয়া উচিত। দূরে বা কাছে কথাটা আপেক্ষিক এবং নানা অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যেখানে আসা-যাওয়ার খরচা করার মত সামর্থ্য থাকে সেখানে দূরত্ব ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এখানে অবস্থা সে রকম নয়। মিঃ ও মিসেস্ কলিন্সের সাংসারিক অবস্থা মোটামুটি ভালই—তবে হামেশাই যাওয়া-আসা করার মত নয়। আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে, আমার বন্ধু এই দূরত্বের অর্ধেক দূরে হলেও বাড়ীর খুব নিকটে শ্বশুর-বাড়ী মনে করবে না।'

ডার্সি চেয়ারটা এলিজাবেথের আর একটু কাছে টেনে নিয়ে বলল—'বাড়ীর প্রতি এ রকম টান থাকা ঠিক নয়। লংবোর্নেই তো আর চিরকাল থাকার আশা করতে পারেন না।'

এলিজাবেথ বিস্মিত হয়ে উঠল। ডার্সির মধ্যে ভাবান্তর। সে

আবার চেয়ারটা পিছনে টেনে নিয়ে টেবিল থেকে একখানা কাগজ তুলে নিল।

ইতিমধ্যে শার্ল'টি আর তার বোন ফিরে এল। ডার্সিকে এ অবস্থায় দেখে তারাও বিস্মিত হল। ডার্সি বললে যে, ভুল করে সে এখানে এসে পড়েছে। তার পর অল্প কয়েক মিনিট থাকার পর বিশেষ কোন কথাবার্তা না বলে বিদায় নিল।

ডার্সি চলে যেতেই শার্ল'টি বলল—'এর মানে কি? আমি বলছি এলিজা, ও নিশ্চয় তোর প্রেমে পড়েছে, তা না হলে ও কখনই এমন পরিচিতের মত এখানে আসত না।'

কিন্তু এলিজাবেথ যখন তার নীরবতার কারণ ব্যক্ত করল শার্ল'টির খুব বেশী মনঃপূত হোল না। তার পর এটা-ওটা কল্পনার পর তারা এই সিদ্ধান্তে এল যে, হাতে কোন কাজ না থাকায় এসেছে সে। বছরের এই সময় খেলা-ধুলার পর্ব শেষ। বাসায় লেডী ক্যাথারিন, বই আর বিলিয়ার্ড টেবিল ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু মানুষ তো আর সারা দিন ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে পারে না? কর্ণেল ফিট্জ্‌উইলিয়াম যে আসেন সে তাদের সাহচর্যের লোভে, সে ভালই লাগে এলিজাবেথের। কেন না, তিনি শুধু যে তার এক জন ভক্ত তা নন, তার প্রিয় মানুষ উইকহ্যামেরও তিনি এক জন অনুরাগী। অবশ্য উইকহ্যামের তুলনায় কর্ণেলের ব্যক্তিত্বে চমৎকারিত্ব কম কিন্তু মানুষটিকে তার প্রাজ্ঞ জন বলেই ভাল লাগে।

কিন্তু ডার্সি কেন যে হামেশাই আসা-যাওয়া করে তার হদিস নির্ণয় করা কঠিন। তাদের সাহচর্যের লোভেই যে তার এই আসা-যাওয়া তাও বলা চলে না। কেন না, কথা সে প্রায়শই বলে না। যখন বলে যেন বাধ্য হয়েই বলে। গল্প করার আনন্দে নয় ভদ্রতার তাগিদেই। কদাচিৎ তাকে উৎফুল্ল দেখা যায়। শার্ল'টি যে তাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। শার্ল'টি ভাবে যে, প্রেমের প্রভাবেই ডার্সির এই নিঃশব্দ অভিনয়। বান্ধবী এলিজাবেথের প্রেমেই সে পড়েছে নিশ্চয়। রোজিংসে থাকতে শার্ল'টি তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করেছে। যখন হান্সফোর্ডে আসত ডার্সি, তখনও সে তার পর্যবেক্ষণে বিফল হয়েছে। ডার্সি এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে দেখত কিন্তু সে দৃষ্টির ব্যঞ্জনা ধরতে পারত না শার্ল'টি। প্রদীপ-শিখার মত অচপল সে দৃষ্টি, কিন্তু তাতে অনুরাগের আলো বেশী ছিল না। আত্মমগ্নতা বলেই ভ্রম হোত তা।

দু'-এক বার সে তার প্রতি ডার্সির পক্ষপাতিত্বের কথা উল্লেখ করেছে এলিজাবেথের কাছে, কিন্তু এলিজাবেথ হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা। শার্ল'টি আর এ ব্যাপার নিয়ে অধিক দূর অগ্রসর হয়নি, কারণ আশা হয়ত শেষে নিরাশায় পরিণত হতে পারে।

বন্ধুর প্রতি মমত্ব বশতঃ শার্ল'টি কথনো কখনো কর্ণেলের সঙ্গে এলিজাবেথের মিলন ঘটানোর পরিকল্পনা করত। কর্ণেল মানুষটি ভাল। এলিজাবেথের প্রতি তার প্রীতিও কম নয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এলিজার স্বামী হবার যোগ্যতা তার পুরোপুরিই আছে।

তেত্রিশ

বাগানে এলোমেলো বেড়াতে বেড়াতে বহু বার ডার্সির সঙ্গে দেখা হোল এলিজাবেথের। যেখানে আগে কেউ আসেনি সেখানে দৈবাৎ আসার অশিষ্টতায় সচেতন হয়ে উঠল সে। ডার্সিকে স্মরণ করিয়ে দিল এলিজাবেথ যে, এ জায়গাটি তার নিজস্ব এবং অতি প্রিয়। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এর পর অনেক বার দেখা হোল ডার্সির সঙ্গে এই পথে। যেন ডার্সি স্বেচ্ছায় তার পথে ঘুরে মরছে। যত বার দেখা হচ্ছে একটু অপ্রস্তুত-ভাব দেখা দিচ্ছে তার মুখে। শেষ বার ডার্সি আর কথা না কয়ে পারলে না যেন। অসংলগ্ন কথায় আলাপ যা হোল সে মোটামুটি এমনি ধরণের:—'হান্সফোর্ড কেমন লাগছে? নির্জনে বেড়াতে ভারী ভালবাসে বুঝি সে? কলিন্স-দম্পতীর গার্হস্থ্য-সুখ সম্বন্ধেই বা তার মত কি? কেণ্টে আবার এলে এলিজাবেথ রোজিংসে উঠবে নিশ্চয়ই।' কর্ণেল সম্বন্ধে এলিজাবেথের মনের উপান্তে কোন স্নিগ্ধ কোমল রঙ ধরেছে কি না তাও আলগা ভাবে যেন জেনে নিতে চাইছিল ডার্সি। কিন্তু তার এই কৌতূহলে খুসী হোল না এলিজাবেথ।

এক দিন বেড়াতে বেড়াতে জেনের চিঠি পড়তে পড়তে এলিজাবেথ সবিস্ময়ে দেখলে যে, ডার্সির বদলে কর্ণেল তার দিকে এগিয়ে আসছে। চিঠিখানা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলে মুখে হাসি টেনে বললে এলিজাবেথ—'আপনিও যে এদিকে বেড়াতে আসেন আমার জানা ছিল না।'

—'আমি বাগানটা ঘুরে দেখছি—প্রত্যেক বছরই এ রকম করে থাকি। আপনি কি অনেক দূর যাচ্ছেন?'

—'না, এখনই ফিরতাম।'

—'সত্যিই, শনিবার চলে যাচ্ছেন কেণ্ট থেকে?'—জিজ্ঞাসা করল সে।

—'ইচ্ছা তো তাই যদি না ডার্সি বাদ সাধে। আমি তার হাতে। সে নিজের মর্জি মত সব ব্যবস্থা করে।'

—'ব্যবস্থাটা মনোমত না হলেও 'এইটুকু আনন্দ যে, পছন্দ-অপছন্দ করার ভার তার। মিঃ ডার্সির মত এমন একটিও দেখিনি, যে নিজের খেয়াল-খুশী মত কাজ করার মমতায় এত আনন্দ পায়।'

—'হ্যাঁ, ও সব সময় নিজের মর্জি মত কাজ করতে চায়'—

উত্তর দিলেন কর্ণেল—'কিন্তু আমরা সবাই তো তাই করি। পার্থক্য এই যে, ওর অনেকের চেয়ে ইচ্ছামত কাজ করার সুযোগ বেশী। কারণ ও ধনী আর অনেকে গরীব।'

অনেকক্ষণ চুপচাপের পর এলিজাবেথ আবার বললে—'আমার ধারণা, আপনার ভাই আপনাকে সঙ্গী পাবার লোভেই সঙ্গে এসেছেন। অথচ বিয়ে করে একটি পাকা সঙ্গী লাভ করছেন না কেন যে এই আশ্চর্য! অবশ্য বোনটি এখন সাথীর মত রয়েছে। আর সে যখন ভায়েরই পুরো তত্ত্বাবধানে আছে তখন ভাইয়ের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা, তাই না?'

—'না। আমি আর ডার্সি দু'জনে যৌথ ভাবে মিস্ ডার্সির অভিভাবক।'

—'তাই না কি? সে কেমনতর ব্যাপার বুঝলাম না। এ রকম দায়িত্বে কিন্তু ঝক্কি কম নয়। অল্পবয়সী মেয়েদের অভিভাবক হওয়া কখন কখন ভারী মুস্কিল। বিশেষ করে তারও যদি ডার্সির মত স্বভাব হয়, সেও যদি নিজের ইচ্ছা মত চলতে-বলতে চায়।'

তার কথাগুলি কর্ণেল যেন গিলছে দেখলে এলিজাবেথ। কথা শেষ হতেই কর্ণেল তৎক্ষণাৎ তাকে প্রতিপ্রশ্ন করে জানতে

চাইলে, কেন তার ধারণা যে মিস্ ডার্সি তার পক্ষে অস্বস্তির কারণ হবে? এলিজাবেথ স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে, তার অনুমান বাস্তব ঘেঁসেই চলেছে। সে সোজাসুজি উত্তর দিল—'ভয় পাবার কিছু নেই। আমি তার সম্বন্ধে খারাপ কিছু শুনিনি। সে যে একান্ত পোষমানা মেয়ে তা আমি হলফ করে বলতে পারি। সে আমার খুব পরিচিতা দু'টি মহিলা মিঃ বিংলের দুই বোনের খুবই প্রিয়পাত্রী। আপনিও তাদের চেনেন, এ রকম শুনেছি বোধ হয় আপনার মুখে।'

—'কিছুটা জানি! তাদের ভাইটি ভারী সজ্জন মানুষ। আমাদের ডার্সির বিশেষ বন্ধু।'

—'হ্যাঁ'—এলিজাবেথ উত্তর দিল শুষ্ক কণ্ঠে—'তার প্রতি মিঃ ডার্সির প্রীতি অনন্যসাধারণ। তার সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্নবান তিনি।'

—'যত্ন? হ্যাঁ যত্ন নেন বই কি। সে সম্বন্ধে ডার্সির যত্নের অন্ত নেই সে কথা সত্যি। এখানে আসার সময় ডার্সি আমায় যা যা বলেছে তা থেকে এ ধারণা করবার কারণ আছে যে, বিংলে তার কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। অবশ্য বিংলেকেই উদ্দেশ্য করে বলেছিল ডার্সি সে সব কথা, তা সঠিক করে ধরে নেওয়া আমার পক্ষে সুযুক্তি হবে না। সবটাই আমার অনুমান মাত্র।'

—'কি বলতে চান বুঝলাম না।'

—'সে ব্যাপার বেশী জানাজানি হয় ডার্সি তা চায় না। যদি কোন ক্রমে সেই বিশেষ মেয়েটির পরিবারে এ কথা চালু হয়, সেটা ভারী অপ্রীতিকর হবে।'

—'আমার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন—আমি বলব না কাউকে।'

—'আর ব্যাপারটা যে সত্যিই বিংলেকে ঘিরে তা ভাববারও বিশেষ কারণ নেই। ডার্সি আমাকে যা বলেছিল তা হোল এই: কিছু দিন আগে সে এক বন্ধুকে অবিবেচনা-প্রসূত বিয়ের হাত থেকে উদ্ধার করেছে, কিন্তু কে সেই বন্ধু তার নাম-ধাম কিছুই বলেনি, তবে আমি বিংলেকেই এই ধরণের জালে জড়িয়ে পড়ার মত যুবক বলে সন্দেহ করি। আর গেল গ্রীষ্মে দু'জনে এক সাথে কাটিয়েছিল। তাতে আমার অনুমান আরো গভীর হয়েছে।'

—'ডার্সি কি তার এই হস্তক্ষেপের কোন কারণ বলেছিল?'

—'আমার মনে হয়, মেয়েটির সম্বন্ধেই বিশেষ আপত্তি ছিল তার।'

—'তা, কি কৌশলে তাদের পৃথক্ করলেন তিনি?'

—'কৌশল সম্বন্ধে আমায় কিছু বলেনি সে'—হেসে বললেন কর্ণেল—'আপনাকে যা বললাম তাই সে বলেছিল আমায়। তার বেশী কিছুই নয়।'

এলিজাবেথ কোন উত্তর দিল না—রাগে তার সারা দেহ কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ তাকে লক্ষ্য করে কর্ণেল প্রশ্ন করলেন, সে হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে পড়ল কেন?

—'আপনি যা বললেন সেই সম্বন্ধেই ভাবছি আমি। আপনার ভায়ের আচরণ আদৌ আমার কাছে সুষ্ঠু মনে হয়নি। এ ব্যাপারে সে বিচারক হতে গেল কেন?'

—'তার এই মাথা-গলানোকে আপনি অনধিকারচর্চা বলে মনে করেছেন বুঝি?'

—'কোন মেয়ের প্রতি বন্ধুর অনুরাগের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে তার বলবার কি অধিকার আছে তা আমি ভেবে পাই না। আর একমাত্র নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে বন্ধু কিসে সুখী হবে না হবে, তা স্থির করা ও নির্দেশ দেওয়ারই বা তিনি কে? যাই হোক,'—নিজেকে কিছুটা সম্বরণ করে নিয়ে এলিজাবেথ যোগ করলে—'দু'জনের কেউই এ ব্যাপারের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে যখন কিছু জানি না তখন লোকটিকে নিন্দা করা উচিত হবে না। তবে এ কথা ঠিক যে, দু'জনের মধ্যে খুব বেশী প্রীতি হয়েছিল তা মনে হয় না।'

—'সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহ'লেও এতে ভাইয়ের আমার সাফল্যের সম্মান অতি করুণ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, নয় কি?'

যদিও ঠাট্টাচ্ছলেই কর্ণেল বললেন কথাটা, কিন্তু তবুও এতে ডার্সির এমন একটি নিখুঁত ছবি ধরা পড়ল যে, সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে কথার মোড় ঘুরিয়ে বিষয়ান্তরে আলোচনা করতে করতে বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত হোল। অতিথি চলে যাওয়ার পর নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে যা শুনেছে সে সম্বন্ধে নির্বিরোধ পুনরালোচনা করার অবসর পেল এলিজাবেথ। তার সঙ্গে যারা সম্পর্কিত তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে কথাটা। পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই যার উপর ডার্সির এমন অসীম প্রভাব। জেনের কাছ থেকে বিংলেকে কেড়ে নেওয়ার মধ্যে ডার্সি যে থাকতে পারে এতটা ভাবেনি সে। বিংলের বোনকেই সে এ সম্বন্ধে দায়ী করে এসেছে এত দিন—সেই কূট কৌশলের হোতা। ডার্সির অহংকার, গর্ব, ডার্সির খাম-খেয়ালিপণার জন্য জেনের এই শাস্তি—ডার্সির জন্যই জেন আজ দুঃখ পাচ্ছে! সে কিছু কালের জন্য হলেও একটি অতি স্নেহময়ী উদার হৃদয়ের সমস্ত আশা-ভরসা চুরমার করে দিয়েছে! কে জানে এই সর্বনাশ কত দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে? 'মেয়েটির সম্বন্ধেই বিশেষ করে আপত্তির কারণ আছে'—বলেছেন কর্ণেল—আর এই বিশেষ আপত্তির কারণ হোল তার এক জন মামা আছেন যিনি গ্রামের এ্যাটর্নী আর এক মামা যিনি লণ্ডনে ব্যবসা করেন।

জেন সম্বন্ধে কোন আপত্তিই উঠতে পারে না। এমন স্নিগ্ধ-মধুর স্বভাব তার। এমন চমৎকার বুদ্ধি, এমন মার্জিত মন, আচার-আচরণ এমন হৃদয়জয়কারী। আর বাবার সম্বন্ধেও বিরূপ কিছু বলা চলে না, কারণ বাবার দু'একটা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বাদ দিলেও এত গুণ আছে, ডার্সির পক্ষে যা অবজ্ঞা করা কঠিন। তাঁর মত সম্ভ্রম অর্জনের ক্ষমতাও ডার্সির নেই। অবশ্য মা'র সম্বন্ধে যখন ভাবতে লাগল সে, তার আত্মপ্রত্যয় কিছুটা শিথিল হয়ে এল। তবে এ ক্ষেত্রে মা বাধা-স্বরূপ হননি। বন্ধুর সম্পর্ক সম্ভাবনা ডার্সির অহমিকা-বোধকেই ক্ষুণ্ণ করেছে—এর আর অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত সে এই স্থির সিদ্ধান্তে এল যে, ডার্সি এ ক্ষেত্রে কিছুটা তার কুৎসিত অহমিকা-বোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে আর কিছুটা হয়েছে নিজের বোনকে বিংলের সাথে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা থেকে।

ভাবতে ভাবতে দুরন্ত ক্ষোভে এলিজাবেথের চোখে জল এল। শেষ পর্যন্ত মাথা ধরল এবং মাথা-ধরা সন্ধ্যার দিকে এমন বাড়ল যে, ডার্সির সঙ্গে দেখা না করার সংকল্প করলে—এমন কি রোজিংসে চায়ের নিমন্ত্রণে যেতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করলে। তাকে

সত্যি সত্যিই অসুস্থ দেখে শার্লটি বেশী পীড়াপীড়ি করল না এবং স্বামীকেও পীড়াপীড়ি করতে নিষেধ করল। কিন্তু এলিজাবেথ বাড়ীতে থাকলে লেডী ক্যাথারিন হয়ত রাগ করতে পারেন সে-ভয় প্রকাশ না করে পারলে না কলিন্স।

চৌত্রিশ

সবাই বিদায় নিয়ে যাবার পর যেন ডার্সির বিরুদ্ধে নিজের মনের তিক্ততাকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে এলিজাবেথ কেণ্ট থেকে লেখা দিদির চিঠিগুলি নিয়ে পড়তে বসল। জেন কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাখিল করেনি সে সব পত্রে। পুরোনো ঘটনা পুনরুল্লেখ করে বা বর্তমান দুঃখের কোন নজির দিয়ে সে অশ্রু-ভারাক্রান্ত করেনি কোন ছত্র। কিন্তু সেই পত্রগুচ্ছের প্রত্যেকটি লাইনে জেনের স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লতার অভাব যেন সুস্পষ্ট বোঝা যায়। জেনের প্রফুল্লতাই তার চিঠির আনন্দময় ষ্টাইলকে প্রেরণা দেয়, তার মনের সহজ প্রসন্নতায় কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে না, তার মনের আকাশে কদাচিৎ মেঘোদয় ঘটে। চিঠি পাওয়ার পর প্রথম যখন পড়েছিল, তখন যে অস্বস্তিকর চিন্তাভার অনুভবে আসেনি, আজ পুনরায় পড়তে বসে তাই যেন আবিষ্কার করতে লাগল এলিজাবেথ। তার দিদির দুঃখের কারণ হয়ে ডার্সি যে দম্ভ প্রকাশ করে গেল, সে কথা স্মরণ করে দিদির প্রতি একটা স্নিগ্ধ করুণায় তার নারী-হৃদয় ভরে উঠল। সান্ত্বনার মধ্যে এইটুকু যে, আর একটি দিন পরেই সে বাড়ীর দিকে রওনা হতে পারবে। দিন পনেরোর আগেই আবার দেখা হবে জেনের সঙ্গে। দিদির মনোভঙ্গের বেদনা সে প্রীতি দিয়ে মুছিয়ে দেবে নিশ্চিহ্ন করে।

ডার্সি যখন কেণ্ট ত্যাগ করবে, ভাইটিকেও সে সঙ্গে নিয়ে যাবে, এই চিন্তা বিশ্রী লাগল এলিজাবেথের। কর্ণেল তার মনোবাসনা গোপন করেননি। তার সম্বন্ধে নিজের মনে কোন আশাভঙ্গের কারণ রাখেনি এলিজাবেথ।

মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবছে যখন এলিজাবেথ, এমন সময় বাইরের ঘণ্টাধ্বনি পাওয়া গেল। আজ সন্ধ্যা বেলা কর্ণেল একবার এসেছিলেন। হয়ত বা তার খোঁজ-খবর নিতে পুনরায় এ-বাড়ীতে পদার্পণ করলেন এই ভেবে তার মন অকারণেই উল্লসিত হয়ে উঠল। কিন্তু মনের প্রফুল্লতা তার মুকুলেই ঝরে পড়ল যখন দেখলে এলিজাবেথ, ঘরে যে অতিথি প্রবেশ করলে সে কর্ণেল নয়, স্বয়ং ডার্সি। এলিজাবেথের স্বাস্থ্যের কুশলতার সংবাদ নেবার জন্যেই যে এই অসময়ে তার আসা, সে কথা পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করে ডার্সি তার শারীরিক সুস্থতার জন্য উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করলে। নম্র-শীতল ভদ্রতার সঙ্গে এলিজাবেথ তার এই সৌজন্যের সমাদর করলে। কয়েক মুহূর্ত আসন গ্রহণ করে উঠে পড়ল ডার্সি, তার পর ঘরময় পায়চারী করতে লাগল যেন অশান্ত চিত্তে। বিস্মিত হলেও এলিজাবেথ মৌন দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ডার্সির এই উত্তেজিত পদচারণা। কিছুক্ষণ যেন নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করলে ডার্সি, তার পর সুন্দরীর কাছে সরে এসে ঈষদুত্তেজিত কণ্ঠে বললে—

'নিজের সঙ্গে মিথ্যে লড়াই করলাম এত দিন। হেরেও গেলাম। হৃদয়কে আমি দাবিয়ে রাখতে পারলাম না। এ কথা আজ আমায় স্বীকার করতেই হবে যে, আপনার প্রতি আমার প্রীতির সীমা নেই। আমি আপনাকে ভালবাসি।'

এলিজাবেথের কাছে এ এক অচিন্ত্য বিস্ময়। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে কখন তার সারা মুখে রঙের জোয়ার এল। মনের সন্দেহ নিরসন হোল না। মৌনমুখী হয়ে বসে রইল সে। তার এই নির্বাণী হয়ে বসে থাকার মধ্যে ডার্সি প্রচ্ছন্ন সম্মতির ইঙ্গিত পেলে। তখন সাহসী হয়ে পুরুষ তার প্রিয় কামিনীর কাছে হৃদয়কে অবারিত করে দিলে। গুছিয়ে সুন্দর করে বললে ডার্সি তার মনের কথা। এই মেয়েটির প্রতি দিনে দিনে যে ভাবে অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে তার নিজের চিত্ত, সে কথা বিস্তারিত বর্ণনা করার সময় সে নিজের অহমিকার কথাও গোপন করে রাখলে না। সে জানে এলিজাবেথ তার তুলনায় কত নগণ্যা, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় কত গৌণ, পারিবারিক দিক থেকে কত বাধা তার এই প্রেম-নিবেদনের সার্থকতার পথে। এ সব কথা মুক্তকণ্ঠেই সে সরবে ঘোষণা করলে। তার এই প্রগল্‌ভতায় সে সব যে কত ক্ষতিকর তা সে চিন্তাই করলে না যেন।

এই মানুষটির প্রতি তার বীতরাগ মনের মৃত্তিকায় বহু পূর্বেই শিকড় গজিয়েছিল। তবু পুরুষের এতখানি স্নিগ্ধ অনুরাগের প্রতি সে নিষ্ঠুরা হতে পারলে না। যে ব্যথা পাবে ডার্সি তার প্রত্যুত্তরে, সে কথা ভেবে মুহূর্তে তার নিজের মনও যেন ক্লান্ত হয়ে এল। কিন্তু ডার্সি যে ভাবে তার হীনতাকে নিয়ে পল্লবিত করতে লাগল, তাতে মনের সকল মাধুরীই পলকে লুপ্ত হয়ে গেল, আর তার স্থান পূরণ করল একটা দুরন্ত রাগ। ডার্সির কথা ফুরুলে জবাব দেবে এই চেষ্টায় যত দূর সম্ভব আত্মসম্বরণ করতে লাগল সে। দীর্ঘ বক্তৃতার শেষে ডার্সি জানাল যে, যত চেষ্টাই সে করেছে তার এই অসম সামাজিক হৃদয়ানুরাগকে বশ করতে সবই তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন সে প্রত্যাশা করে যে, এলিজাবেথ তার পত্নী হতে সানন্দে স্বীকার করবে এবং ডার্সির প্রেম তার মর্যাদা পাবে। ডার্সির চোখে-মুখে স্বীকৃতির প্রত্যাশা যেন থর-থর করে কাঁপছে। মুখে যতই ভয়-ভাবনার কথা বলুক ডার্সি, তার ভঙ্গীতে যে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটে রয়েছে তা যেন এক নিমেষেই পড়ে নিতে পারলে এলিজাবেথ। সারা সন্ধ্যা এই মানুষটির প্রতি যে তিক্ততার প্রত্যাশা করছিল এলিজাবেথ, তার মহা সুযোগ যেন স্বেচ্ছায় তার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। হৃদয়ের আগুনে এলিজাবেথের মুখ রাঙা হয়ে উঠল কথা বলার সময়। ডার্সির কথার জবাবে বললে সে—

'চিরকাল হয়ে এসেছে যেমন, আমি তার অসম্মান করতে চাই না। যে ভাবেই জবাব দিই না কেন, তার আগে আপনার এত অজস্র প্রীতির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। কিন্তু না। আপনার ভালবাসা কোন দিন আমি প্রত্যাশা করিনি। আজ আপনি স্বেচ্ছায় তা দিতেও আসেননি। কাউকে ব্যথা দিতে আমি চাই না। যদি কিছু দিয়েও থাকি তা দিয়েছি আমার অজান্তে। তার আয়ুও শীগ্‌গির ফুরিয়ে যাবে, এ কথা নিশ্চিত। যে সব কারণে আপনার ভালবাসা এত কাল অপ্রকাশিত ছিল, সেই সব কারণেই তাকে রুদ্ধস্রোত করে দেবেন। তাতে আপনার কষ্ট হবে না।'

এই মুখরা মেয়েটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডার্সি সব কথাগুলি শুনলে। যতখানি অবাক হোল সে, তার বেশী কোধাগ্নি জ্বলে উঠল তার মনে। মুখের রঙ হালকা হয়ে এল রাগে, সর্বাঙ্গে তার পরিচয় যেন বাজতে লাগল ঝম-ঝম করে। কথা কইবার আগে মনের প্রশান্তি থিতিয়ে নেবার জন্যে সে মনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে লাগল। এলিজাবেথের কথা শেষ হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরে যেন চাপা প্রশান্তির সঙ্গে জবাব দিলে ডার্সি—'তা'হলে আপনার নিকট থেকে এই প্রত্যুত্তর নিয়েই আমি ফিরে যাব। এতখানি অসৌজন্যের সঙ্গে আমায় যে প্রত্যাখ্যান করলেন, তার কারণটুকুও আমি শুনে যেতে চাই। অবশ্য তার দাম খুব বেশী নয় আমার কাছে।'

'সে ক্ষেত্রে আমারও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।' বললে এলিজাবেথ—'আমিও জানতে চাই, কি দাবীতে এ ভাবে আমায় অপমানিতা করার চেষ্টা করলেন আপনি? নিজের বিবেক, ইচ্ছা, যুক্তি এমন কি নিজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অমিল জেনেও আপনি কেন আমাকে ভালবাসার কথা বলতে এসেছেন? আমি যদি অসৌজন্য প্রকাশ করে থাকি, আপনিই বা কোথায় শালীনতা দেখালেন? কিন্তু সে ছাড়া আপনার বিরুদ্ধে আমার অন্য আক্রোশের কারণও আছে। কেন আছে, তাও আপনি জানেন। যে লোক আমার মমতাময়ী ফুলের মত বোনের জীবন নষ্ট করে দেবার হীন চক্রান্ত করছে, তার প্রতি যত প্রীতিই থাক আমার হৃদয়ে, তাকে কি প্রশ্রয় দিতে পারি আমি? আর আপনার ক্ষেত্রে কোন হৃদয়-দৌর্বল্যের স্থান নেই, তা আপনি গোড়া থেকেই জানেন।'

শেষ কথাগুলি শুনে ডার্সির মুখের রং আবার গাঢ় হয়ে উঠল, কিন্তু কোন বাধা না দিয়ে সে এই মেয়েটিকে বলার সুযোগ দিলে।

'আপনার বিরুদ্ধে আমার হীন ধারণার হাজার কারণ আছে। আপনি যে ভাবে কাজ করেছেন তার কোন যুক্তি নেই, থাকতে পারে না। আপনি পারেন অস্বীকার করতে যে, দু'টি প্রিয় মানুষকে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন নানা কৌশলে? পারেন অস্বীকার করতে?'

ডার্সি যে তার কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি, তার জন্য এলিজাবেথের রাগ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। বরং সে চেয়ে দেখলে যে, একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠেছে তার মুখে।

'পারেন অস্বীকার করতে সে কথা? বলুন, পারেন?'

শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে ডার্সি—'আপনার বোনের কাছ থেকে আমার বন্ধুকে সরিয়ে নিয়ে গেছি—সে কথা অস্বীকার করি না আমি। বরং আমি খুসী আমার চেষ্টার সার্থকতায়। নিজের প্রতি কোন দিন অতখানি মমতা দেখাইনি আমি, যতখানি দেখিয়েছি বিংলের প্রতি এই ঘটনায়।'

কিন্তু এই প্রত্যুত্তরে এলিজাবেথ শান্ত হোল না। 'এ ছাড়াও আরো আছে। আমার দিদির ব্যাপারের আগেও আমি আপনার সম্বন্ধে আমার মত স্থির করে ফেলেছিলাম যখন আপনার স্বরূপ আমি জানতে পারি মিঃ উইকহ্যামের কথায়। সে সম্বন্ধে কি বলার আছে আপনার? কোন বন্ধুর প্রতি প্রীতিতে আপনি তার প্রতি অমন ব্যবহার করেছিলেন? কার উপর এ সবের দায়িত্ব দিয়ে আপনি নিষ্কলঙ্ক হতে চান? বলুন?'

এবার ডার্সির প্রত্যুত্তর আর পূর্বের মত প্রশান্ত রইল না। ঝাঁঝের সঙ্গেই সে বললে—'তার উপর দেখছি আপনার সম্প্রীতি খুব।'

'তাঁর দুর্দশার কথা যে-ই শুনবে, সে-ই তাঁর প্রতি দরদী হয়ে উঠবে।'

'দুর্দশা?' বিদ্রূপে ডার্সির বক্তব্য বিকৃত হয়ে উঠল—'দুর্দশা বইকি। নিশ্চয়ই—খুবই দুর্দশা।'

'সে ত আপনারই কাজ। আপনিই আজ তাঁকে দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। তাঁর যা পাওনা ছিল, তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছেন আপনিই, অন্য কেউ নয়। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলি আপনিই নষ্ট করে দিয়েছেন। আর আজ তাঁর দৈন্য-দুর্দশা নিয়ে আপনি বিদ্রূপ করছেন, পরিহাস করছেন। কেমন, এই না?'

ঘরময় পায়চারী করতে করতে ডার্সি বললে—'তা হলে আমার সম্বন্ধে এই আপনার ধারণা। এই ভাবে যে নিজেকে খুলে ধরেছেন, তার জন্যে সহস্র ধন্যবাদ। আপনার হিসাব মত আমার অপরাধ অনেক। কিন্তু তবু—' হঠাৎ এলিজাবেথের সমীপবর্তী হয়ে বললে ডার্সি,—'তবু বলছি যে সব আপনি স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতেন যদি না আমার মনের সরল কথা উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে আমি আপনার অভিমানে আঘাত দিতাম। যদি মিথ্যা ভাণ করে নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি করে আমি এইটুকুই প্রতিপন্ন করতে চাইতাম যে, আপনার প্রতি আমার হৃদয়ানুরাগে কোথাও খাদ নেই, কোন অন্তরায় নেই। কিন্তু আমি তা পারি না। নিজের সঙ্গে জুয়াচুরি করা আমার সহজাত প্রবৃত্তি নয়। যে সব কথা আপনার কাছে খুলে বলেছি তার একটি বর্ণের জন্যও আমি অনুতপ্ত নই। তার মধ্যে কোন মিথ্যা ছিল না, কোন কিছুই বানানো মনগড়া নয়। আপনার ঘর যে মধ্যবিত্ত সমাজে তার মধ্যে আমার উল্লাসের কোন কারণ থাকতে পারে না। যে ঘরে আমি পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে যাচ্ছি, তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা যে আমার তুলনায় হীন, তাতে নিজেকে ধন্য মনে করতে পারি না, সে কি আমার অপরাধ?'

এলিজাবেথের মনে যাই হোক, সে নির্বিকার কণ্ঠে বললে—'আপনি ভুল করছেন। এ কথা ভুলেও মনে স্থান দেবেন না যে, আপনার বাক্য-বিন্যাস আরো সৌজন্যসূচক হলেই আমি আমার মত ফিরিয়ে নিতাম। সে আপনার ভুল।'

এতখানি রূঢ়তা সত্ত্বেও ডার্সি নিরুত্তর রইল দেখে এলিজাবেথ পুনরায় যোগ দিলে—'যে ভাবেই আসতেন আপনি প্রস্তাব নিয়ে, আমি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতাম। আপনার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম মুহূর্ত থেকেই আপনার অহমিকা, আপনার উন্নাসিকতা, অপরের প্রতি আপনার অবজ্ঞার ভাব আমার মনে বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়েছিল। তার পর দিনে দিনে আমার সেই বিতৃষ্ণা বেড়েছে বই কমেনি। এ কথা আমি বিশ্বাস করতাম, আজও করি যে, পৃথিবীতে যদি কাউকে বিয়ে করি কোন দিন, সে আপনি হবেন না কিছুতেই।'

'আপনার মনের কথা আমি বুঝেছি,' বললে ডার্সি—'আর আমাকে লজ্জিত করবেন না! ধন্যবাদ আপনাকে। এতখানি সময় আপনার নষ্ট করে দিলাম, তার জন্য মার্জনা চাইছি আশা করি শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

আর অপেক্ষা না করে ডার্সি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। বাইরের দরজায় যখন অতিথির বিদায়ের শব্দ পাওয়া গেল তখন এলিজাবেথের মনের আকাশে দুরন্ত ঝড় উঠেছে। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। যে নাটক অভিনীত হয়ে গেল এতক্ষণ তার ঘরে, তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি মনে পড়তে লাগল একে একে। এত দিন ধরে এক প্রবল প্রেম গোপন করে রেখে এসেছে ঐ লোকটি তার সম্বন্ধে। এত সামাজিক অন্তরায় সত্ত্বেও এত দিন পরে সেই প্রেম যে প্রকাশিত হোল এ চিন্তায় বিহ্বল হয়ে গেল এলিজাবেথ। আর এত লোকের মধ্যে ঐ দাম্ভিক মানুষটি অবশেষে পাণিপ্রার্থী হল তার। আকাশ-পাতাল ভাবনায় এলিজাবেথ খেই হারিয়ে ফেললে।

এমন সময় বাইরে শার্লটির সাড়া পেয়ে সে চকিত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল। এই ভাবে প্রিয় বান্ধবীর কাছে মুখ দেখাবে সে কেমন করে?

পঁয়ত্রিশ

কাল যে ভাবনা নিয়ে শুয়েছিল, সেই ভাবনা সঙ্গে করেই আজ সকালে ঘুম ভাঙল তার। গত সন্ধ্যার বিস্ময়ের ঘোর যেন তখনো কাটেনি এলিজাবেথের। অন্য কিছু ভাবতেও পারলে না সে। আজ সারা দিন ঐ একটা অস্বস্তিকর বোধ মনের উপর চেপে বসে থাকবে, এই ভয়েই এলিজাবেথ স্থির করলে প্রাতরাশের পরই একটু বেরোবে। বাইরের খোলা হাওয়ায় মন একটু সুস্থ হবে। নিজের পরিচিত প্রিয় বাগানটিতে প্রবেশের মুখেই চকিতে মনে পড়ল তার যে, ডার্সি কখনো কখনো এই পথেই আসে। সুতরাং সে পথ এড়িয়ে অন্য দিকে চলে গেল সে। বাগানের চারি পাশে দু'-তিন বার পায়চারী করে এলিজাবেথ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পার্কের ভিতরে তাকিয়ে দেখলে। আজকের সকাল বেলাটি প্রসন্ন-মধুর। এখন দিনে দিনে প্রকৃতির রূপ বদলাচ্ছে। গাছের কচি পাতায় নূতন বর্ণের সমারোহ দিনে দিনে এগোচ্ছে। এক পা এগোবার মুখেই বাগানের ধারেই বীথির মধ্যে এক ভদ্রলোককে সে দেখতে পেল। তিনি সেই দিকেই এগিয়ে আসছিলেন। যদি ডার্সি হন, এই আতঙ্কে এলিজাবেথ পিছু হটতে সুরু করেছিল। কিন্তু কয়েক পা এগোবার আগেই যে কণ্ঠ তাকে সম্বোধন করল, পিছনে না তাকিয়েই এলিজাবেথ বুঝল সে ডার্সি। কাছে এগিয়ে এসে ডার্সি হাত বাড়িয়ে একখানি চিঠি তার হাতে দিলে, তার পর গম্ভীর মুখে বললে, 'আপনার সাক্ষাতের আশায় এইখানেই অপেক্ষা করছিলাম, কিছুক্ষণ। দয়া করে এই চিঠিখানি আপনি পড়লে বড়ই বাধিত হব।' কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই ডার্সি দ্রুত-পায়ে বাগানের মধ্যে অন্তর্হিত হল।

কোন প্রত্যাশার আনন্দ না থাকলেও গভীর কৌতূহলের সঙ্গেই এলিজাবেথ চিঠিখানি পড়তে মনস্থ করলে। দু'পাতা চিঠি ঘন করে লেখা। গলির পথে এলিজাবেথ সেখানি পড়তে আরম্ভ করলে। সকাল আটটা সময় দেওয়া শিরোনামার পাশে।

দীর্ঘ চিঠিতে ডার্সি নিজের মনের কথা কিছুমাত্র গোপন করার চেষ্টা করেনি। স্পষ্ট ভাষায় লিখেছে তার বক্তব্য। বিশেষ করে যেখানে জেনের কথা লিখেছে ডার্সি, সেখানটি ভাল করে পড়তে লাগল এলিজাবেথ:

"সেই বল-নাচের কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়বে, সেদিন আপনার সঙ্গে নাচবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেই সন্ধ্যায় স্যার লুকাসের মুখে আমি প্রথম জানতে পারলাম আপনার ভগ্নীর সঙ্গে বিংলের প্রীতি-বন্ধনের কথা। তাদের প্রেম এত দূর অগ্রসর হয়েছে যে, বিবাহের দিন ভিন্ন আর সকলই স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। সেই মুহূর্ত থেকে আমি আমার বন্ধুকে তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ্য করতে সুরু করি এবং সেই প্রথম আমি আবিষ্কার করি যে, আপনার ভগ্নীর প্রতি তার প্রীতির সীমা নেই। আপনার ভগ্নীকেও আমি আমার পর্যবেক্ষণ থেকে বাদ দিইনি। তাঁর আচারে-আচরণে-দৃষ্টিতে একটা সদা হাস্যময়তা থাকলেও এটুকু আমি দেখেছিলাম যে, আমার বন্ধুর প্রীতি ও প্রেমকে তিনি যেন অতি সহজে গ্রহণ করেছেন। তাঁর দিক থেকে সমপরিমাণ অনুরাগের লক্ষণ আমার নজরে পড়েনি। তাঁর এই নিরুত্তাপ আচরণ আমার মনকে ব্যথায় ভরে দিয়েছিল। এমন হতে পারে যে, আপনার ভগ্নীকে এই দিক থেকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আপনি সে বিষয়ে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী জানেন তাঁকে। যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তবে সে জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করতে পারি না যে, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে দেখে সেদিন তাঁর ব্যবহারে আমার বন্ধুর অনুরাগের প্রতি কোন স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ আমি দেখতে পাইনি। কিন্তু সেই কারণে আমি তাদের মিলনে অন্তরায় সৃষ্টি করিনি। ততোধিক যে কারণ সেদিন বর্তমান ছিল, আজো তার অবসান ঘটেনি।"

এই অবধি বলে ডার্সি পুনরায় ফিরে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে এই দুই পরিবারের সামাজিক প্রতিষ্ঠার অসাম্য। উইকহ্যাম সম্বন্ধে ডার্সি তার বিবৃতিতেও কোন কার্পণ্য করেনি। তাদের পরিবারে উইকহ্যামের অবস্থিতি সম্বন্ধে সে দীর্ঘ ভাষ্য দিয়েছে চিঠিতে। তার বাবা যে এই ছেলেটিকে গভীর ভাবে স্নেহ করতেন এবং মৃত্যুকালে তার জন্য কিছু আর্থিক ব্যবস্থাও পাকা করে গিয়েছিলেন সে কথা স্বীকার করেছে সে। নিজের দিক হতে উইকহ্যামকে বঞ্চিত করার কারণগুলি একে একে ধারা-বিবরণীর মত ব্যক্ত করে গেছে। কি পরিমাণ অধঃপতন তার ঘটেছিল সে কথার ইঙ্গিত দিয়েছে পত্রে এবং কত দূর অগ্রসর হবার পর কি আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায় সে তার প্রতি কঠিন ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে, সে কথা লিখে পত্র শেষ করেছে এই প্রত্যাশায় যে, কোন ভবিষ্যৎ সুখের দিকে লক্ষ্য রেখে সে আজ নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করতে চাইছে না, বরং তার সম্বন্ধে কোন এক জনের বিপরীত ভাব পোষণের অযৌক্তিকতাই সে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছে মাত্র। প্রয়োজন বোধে পুনরায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছে।

ছত্রিশ

ডার্সি যে এই পত্রের মারফৎ তার নিকট পুনরায় গত রাত্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেছে এ প্রত্যাশা ছিল না এলিজাবেথের। তবু গভীর উদ্দীপনার সঙ্গে পত্রের প্রতিটি ছত্র পাঠ করলে সে। পত্রের ছত্রে ছত্রে তার মনে নানা ভাবাবেগের সংঘর্ষ উপস্থিত হোল। জেনের জীবন বিকাশের মুখে বিনষ্ট করার দায়িত্ব নিয়েও কোন লজ্জাবোধ করেনি ডার্সি। রচনার মধ্যে এক বিন্দু অনুতাপ নেই, দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্য যেন জড়ানো সমস্ত চিঠিখানিতে।

উইকহ্যামের সম্বন্ধে ডার্সি যেখানে তার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছে, সেটুকু গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করছে এলিজাবেথ। নিজের সম্বন্ধে যে সকল কথা তার কাছে স্বীকার করেছিল উইকহ্যাম, তার সঙ্গে এই বিবরণীর এমন নিখুঁত সাদৃশ্য যে, যে সকল সত্য হলে ঐ যুবকের সম্বন্ধে কোন আশাই পোষণ করা যায় না। এইটুকু তার অনুভূতির জগতে তীব্র ভাবে পীড়াদায়ক বোধ হোল। মনের সেই বেদনাকে কি জানি কেন কোন সংজ্ঞা দিতে পারলে না এলিজাবেথ। তার মনের ভিতর বিস্ময় ও আশঙ্কা যুগপৎ কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। ডার্সির কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। 'নিশ্চয়ই মিথ্যা, পৃথিবীর জঘন্যতম মিথ্যা এই কাহিনী'—এই কথা বলে এলিজাবেথ চিঠিখানি সরিয়ে রাখলে। প্রতিজ্ঞা করলে মনে মনে যে, ঐ মিথ্যার দলিল আর সে ফিরে পড়বে না, সত্য বলে কিছুতেই মানবে না।

মনের ভিতর ওলট-পালট নিয়ে এলিজাবেথ বাড়ীর দিকে রওনা দিল। কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা মুহূর্তেই ভেঙে গেল। আবার চিঠিখানি বার করে সে প্রত্যেকটি ছত্র তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করে পড়তে লাগল, বিশেষ করে যেখানে উইকহ্যাম সম্বন্ধে লিখেছে ডার্সি।

বার বার পড়ার পর এলিজাবেথের চোখের উপর যেন এক নতুন জগতের সীমানা উদ্ঘাটিত হল। সবই যেন অন্য রকম হয়ে উঠল তার চোখের সামনে। ডার্সির বিরুদ্ধে তার যত আক্রোশ জমেছিল দিনে দিনে, সব যেন সূর্যালোকে কুয়াশার মত অন্তর্হিত হতে লাগল। বিংলের মত স্নিগ্ধ সরল মানুষও এই ব্যাপারে ডার্সির নিরপরাধচিত্ততার কথা বলেছিল, মনে পড়ল এলিজাবেথের। যদিও দীর্ঘ দিনের পরিচয় নয় তাদের, তবু ডার্সিকে সে যতটুকু জেনেছে, বিশেষ করে এখানে আসা অবধি যে পরিচয় অধিকতর ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছে, ডার্সির চরিত্রের যতটুকু সে দেখেছে তাতে দাম্ভিকতা ও উন্নাসিকতার পরিচয় থাকলেও, অধার্মিকতা ও হীনতার স্থান নেই। নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের মধ্যে ডার্সি সর্বজনের স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র। এমন কি উইকহ্যাম অবধি তার ভ্রাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা করে। নিজের বোনকে কি গভীর ভালবাসে ডার্সি, তা সে হাজার বার দেখেছে। আর উইকহ্যাম তার বিরুদ্ধে যে সকল অপবাদ জমা করে রেখেছে, তা যদি সত্য হত তবে সমস্ত পৃথিবীর ন্যায়ধর্ম ডার্সিকে কঠিন শাস্তি দিত নিঃসন্দেহে। ডার্সি যদি সত্যই অসৎ চরিত্রের মানুষ হোত, তবে বিংলের মত সজ্জনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হওয়ার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

নিজের নির্বুদ্ধিতার লজ্জায় মরে যেতে লাগল এলিজাবেথ। উইকহ্যাম আর ডার্সি, দু'জনের সম্বন্ধেই সে এত কাল অন্ধ ছিল, আত্মবঞ্চিত ছিল।

'কি লজ্জাজনক ব্যবহার করেছি আমি এত কাল'—ভাবলে সে—'নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর আমার এত বিশ্বাস! দিদি যে পৃথিবীর সব মানুষকে এত বিশ্বাস করে সরল মনে, তা নিয়ে কত ঠাট্টা করেছি তাকে। অথচ আমিই নিজের ভ্রান্ত বিচার-বুদ্ধিতে নির্বোধ প্রমাণ হয়ে গেলাম। কী অসীম লজ্জা! নিজের ভালবাসার জনকে আবিষ্কার করতে গিয়ে আমার দর্প আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। এক জনের প্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে, আরেক জনের প্রথম পরিচয়ের ক্ষণ থেকেই অবহেলিত হয়ে আমি এত কাল যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে এসেছি। এত কাল নিজেকে চিনিনি। যখন চিনতে পারলাম, জীবনের মধু-লগ্ন তখন পার হয়ে গেছে।'

নিজের কথা থেকে দিদির কথায়, তাই থেকে বিংলের কথায় তার মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল। জেনের কথা স্মরণ হতেই মনে পড়ল যে, তার বিষয়ে ডার্সির আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা সার্থক হয়নি। চিঠিখানি খুলে আর একবার পড়ে দেখল এলিজাবেথ। এবার তার বিশ্লেষণ মনকে অন্য অনুভূতিতে আপ্লুত করল। এ কথাও সে অস্বীকার করতে পারলে না যে, এক দিক থেকে ডার্সির অনুমান মিথ্যা নয়। সে নিজেও দিদির আচরণে কদাচিৎ অনুরাগের বহির্লক্ষণ দেখতে পেয়েছিল। বরং তার মধ্যে যেন এক ঔদাসীন্যই প্রকট হয়ে থাকত, যদিও নিবিড় প্রেমানুরাগে তার মন স্বতঃই প্লাবিত হয়ে থাকত।

পত্রের যে অংশে ডার্সি তাদের পরিবারের উপর নির্মম কটাক্ষ করেছে, সেটুকু পড়ে তার মন আহত পাখীর মত যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। ডার্সি যে ভাবে আক্রমণ করেছে, তার সত্যতা অস্বীকার করতে পারে না সে এবং সেদিনকার বল-নাচে তাদের পরিবার যে ভাবে আচরণ করেছিল তাতে ডার্সির মত নবীন আগন্তুক ত বটেই, সেই পরিবারের কন্যা হিসাবে সে অবধি লজ্জায় মরে গিয়েছিল।

ডার্সি তাকে এবং তার দিদিকে যে ভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে, পরে সেটুকু তার মনে সানন্দে গৃহীত হোল। ডার্সির এই প্রীতিতে তার মনের ক্ষতে সামান্য প্রলেপ লাগলেও এটুকু এলিজাবেথ ভুলতে পারলে না যে, তার পরিবারের একান্ত যারা আপনার জন তাদের সামান্য ত্রুটিতেই জেনের তরুণ প্রাণের প্রেম ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এই চিন্তায় তার মন এক অভূতপূর্ব হতাশায় ও গ্লানিতে ভরে গেল।

হাজার রকম ভাবনায় উতলা হয়ে দু'ঘণ্টা ধরে এলিজাবেথ পথে পথে ঘুরে বেড়াল। সমস্ত ঘটনাবলী মনে মনে সে আলোড়ন করলে। ঘটনার পরিণতি ও সম্ভাবনাগুলিকে কত রকম করে ভাঙাচোরা করলে সে। তার মনে যে নূতন আকস্মিক পরিবর্তন ঘটল, এই প্রসন্ন সকাল বেলা সে কথা আলোচনা করতে করতে এক সময় সে বাড়ীতে ফিরে এল। দেহে-মনে গভীর ক্লান্তি বোধ করলেও সে মুখের হাসি বজায় রেখে বাসায় এল, যাতে তার মানসিক দ্বন্দ্বের কোন প্রকাশ না পায় অন্য লোকের কাছে।

বাড়ীতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই শার্লট তাকে জানাল যে, দুই ভাই তার কাছে বিদায় নেবার জন্য এ বাড়ীতে এসেছিলেন। ডার্সি কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেই চলে গেছে কিন্তু কর্ণেল ঘণ্টা খানেকের বেশী অপেক্ষা করে বসেছিল। এমন কি বাইরে তাকে ধরবার জন্যও উৎসাহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এলিজাবেথের মন এই ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হল না। তাদের সঙ্গে যে দেখা হয়নি এতে বরং উল্লসিত হল তার মন। কর্ণেলকে নিয়ে ভাববার সময় তার আর নেই। সকালে পাওয়া চিঠিখানিই তার মনকে সম্পূর্ণ ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার বাইরে জগৎ আর কিছু নেই।

সাঁইত্রিশ

পরের দিন সকালে ভদ্রলোক ছ'টি রোজিংস ত্যাগ করলেন। কলিন্স বিদায় অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেই এই শুভ সমাচার বহন করে আনল যে, গেল ক'দিন যে বিষাদময় আবহাওয়া বয়ে গেছে তার পর বেশ সুস্থ মনে উৎফুল্ল চেহারা নিয়েই তারা বিদায় নিয়েছে। লেডী ক্যাথারিন আর তাঁর মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কলিন্স তাদের বাসায় গেল এবং সেখান থেকে মনের আনন্দে ফিরে এল এই বার্তা নিয়ে যে, লেডী ক্যাথারিন সবাইকে তাঁর বাড়ীতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন।

সেই সঙ্গে এলিজাবেথের মনে হোল, সে যদি ইচ্ছা করত এত দিনে সে তাঁর ভাবী নাতনী হয়েই আজ যেতে পারত সেখানে এবং সে ক্ষেত্রে লেডী ক্যাথারিনের রোষের কথা ভেবে না হেসে থাকতে পারল না সে। 'কি তিনি বলতেন? কেমন ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে?'—এই সমস্ত কথা চিন্তা করে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতে লাগল এলিজাবেথ মনে মনে।

অতিথিদের বিদায় নিয়ে যাওয়া নিয়েই সুরু হোল প্রাথমিক আলোচনা। 'আমি ওদের অভাব অত্যন্ত বোধ করছি—আমার মনে হয়, আমার মত বন্ধু-বান্ধবের অভাব এমন গভীর ভাবে কেউ অনুভব করে না'—বললেন লেডী ক্যাথারিন। 'বিশেষ করে এই ছেলে ছ'টিকে আমি খুবই ভালবাসি। তারাও আমার অনুরক্ত, চলে যাওয়ায় তারাও অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে। কর্ণেল শেষ অবধি মনের স্ফূর্তি অনেকটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল, কিন্তু ডার্সি একেবারেই মুষড়ে পড়েছে—গেল বছরের চেয়েও বেশী মনে হোল আমার। এখানকার আকর্ষণ তার প্রতি বৎসর বাড়ছে।'

আহারের পর লেডী ক্যাথারিন মন্তব্য করলেন যে, এলিজাবেথ যেন একটু মনমরা হয়ে পড়েছে এবং নিজেই কারণ নির্ণয় করে বললেন যে, সে হয়ত এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে চায় না।

—'তাই যদি হয় মা'কে লেখ যে, তুমি আরো কিছু দিন এখানে থাকতে চাও। মিসেস্ কলিন্স তোমায় পেয়ে খুশীই হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

—'আপনার এই আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমার সাধ্যাতীত। পরের শনিবারের মধ্যেই আমাকে সহরে পৌঁছতে হবে।'

—'সে ক্ষেত্রে এখানে তুমি মাত্র ছ'সপ্তাহ রইলে। আমি আশা করেছিলাম ছ'মাস থাকবে। তুমি আসার আগে মিসেস্ কলিন্সকে আমি সেই রকমই বলেছিলাম। এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? মা কি আর পক্ষকাল তোমায় এখানে থাকতে দিতে পারেন না?'

—'কিন্তু বাবা পারবেন না। তিনি গেল সপ্তাহেই তাড়াতাড়ি ফিরে আসার জন্য চিঠি লিখেছেন।'

—'তোমার মা যদি পারেন বাবাও পারবেন আর ক'টা দিন ছেড়ে থাকতে। বাপের কাছে মেয়েদের মূল্য তেমন নয়। যদি পরে পুরো এক মাস এখানে থাক, আমি তোমাদের এক জনকে লণ্ডনে নিয়ে যেতে পারি। জুনের গোড়ার দিকে হপ্তা খানেকের জন্য সেখানে যাচ্ছি আমি।'

—'আপনার স্নেহের শেষ নেই। কিন্তু আমাকে পূর্ব পরিকল্পনা মেনে চলতেই হবে।'

লেডী ক্যাথারিন আশা ছেড়ে দিলেন। 'মিসেস্ কলিন্স, ওদের ছ'জনের সঙ্গে এক জন চাকর দিও। ছ'জন যুবতী মেয়ে একা যাবে আমার পছন্দ নয়। এ অত্যন্ত অনুচিত। কাউকে সঙ্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। এ ধরণের ব্যাপার আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। তরুণী মেয়েদের যথোপযুক্ত রক্ষী-ব্যবস্থা থাকা ভাল। গেল গ্রীষ্মে আমার নাতনী জর্জিয়ানা যখন র‍্যামসগেট গেল আমি সঙ্গে ছ'জন চাকর দিয়েছিলাম। এ সবের প্রতি আমার কড়া নজর। মিসেস্ কলিন্স, তুমি জেনকে ওদের সঙ্গে দেবে। যাক্, সময় মত আমার মনে পড়েছে কথাটা। ওদের একা পাঠানো তোমার পক্ষে অত্যন্ত নিন্দার হোত।'

—'মামা লোক পাঠাবেন।'

—'ও তোমার মামা,—তিনি চাকর রাখেন না কি? শুনে খুব আনন্দ হোল। অন্যেরাও এ সব কথা ভাবে। কোথায় গাড়ী বদল করবে? ব্রমলীতে নিশ্চয়। সেখানে আমার নাম করো, সুবিধা হবে।'

যাওয়ার সম্বন্ধে আরো অনেক প্রশ্নই করলেন লেডী ক্যাথারিন। কিন্তু সবেরই উত্তর দিতে হোল না এলিজাবেথকে—এটা সৌভাগ্যই বলতে হবে তার পক্ষে। কিন্তু তবুও সতর্ক থাকতে হোল প্রতি মুহূর্তে—কারণ, মন বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট থাকায় ভুল হয়ে যেতে পারে যে, কোথায় সে আছে। নিরালায় বসে চিন্তা করার অনেক কিছু আছে। একলা যেই হোল পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এলিজাবেথ। এর পর এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয়নি যেদিন না সে একা বেড়িয়েছে আর অপ্রীতিকর স্মৃতির জাবর কেটেছে।

ডার্সির চিঠি তার প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি লাইন সে বার বার অনুধাবন করেছে আর লেখকের প্রতি মনোভাব ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করেছে। যখন ঠিকানা লেখার কায়দার কথা স্মরণে এসেছে, মন অসহ্য রাগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু যখনই আবার ভেবেছে অন্যায় ভাবে সে তিরস্কার করেছে ডার্সিকে, তখনই রাগটা গিয়ে পড়েছে নিজের উপরই আর হতাশ-ক্ষুব্ধ ডার্সির প্রতি মমতায় মন নরম হয়ে এসেছে, তার অনুরাগে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠেছে। তার চরিত্রে আছে সম্ভ্রম, তবুও তাকে গ্রহণ করতে পারলে না এলিজাবেথ, এমন কি প্রত্যাখ্যানের জন্যও মনে মুহূর্তের অনুশোচনা এল না। এমন কি তার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার বিন্দু মাত্র আগ্রহ বোধ করে না সে। তার অতীত আচরণই বিরক্তি ও অনুশোচনার আদি উৎস—তাদের পরিবারে এমন কতকগুলি দুঃখজনক ত্রুটি আছে যা আরো গভীরতর মর্মবেদনার কারণ হয়ে আছে। এ সমস্ত ত্রুটির প্রতিকারে আশা দুরাশা। বাবা সে সব হেসে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত—তিনি কখনও তাঁর ছোট মেয়েদের এই বল্‌গাহীন চঞ্চলতার রাশ টেনে ধরতে চেষ্টা করবেন না। মা এর সম্ভাব্য ক্ষতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এলিজাবেথ জেনের সঙ্গে বহু বার ক্যাথারিন ও লিডিয়ার নির্লজ্জতা শাসন করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু মায়ের যেখানে প্রশ্রয় রয়েছে সেখানে শোধরানোর আশা কোথায়? ক্যাথারিন দুর্বলচিত্ত, খিটখিটে

এবং সম্পূর্ণ লিডিয়ার নির্দেশে চলে। তাদের উপদেশ সে তো তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেয়! আর লিডিয়া স্বেচ্ছাচারী অসাবধানী —সে কারুর উপদেশে কর্ণপাতই করবে না। তারা যেমন মূর্খ তেমনি অলস ও দেমাকী। মেরিটনে কোন অফিসার এলেই তার সঙ্গে ফ্লার্ট করবে। আর লংবোর্ণ থেকে এক পা গেলেই মেরিটন—কাজেই সেখানেই অনবরত গতিবিধি তাদের।

তা ছাড়া জেনের জন্য দুশ্চিন্তার নিরসন হয়নি আজও। বিংলেকে আবার জেনের অনুরাগী করবার ডার্সির কৈফিয়ৎ শুনেছে সে। জেন যা হারিয়েছে আবার তা ফিরে পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিংলের ভালবাসা অকপট—তার আচরণও নির্দোষ—অবশ্য যদি তার বন্ধুর সততায় আস্থা স্থাপন করা যায়। এ কি কম দুঃখের যে, সব দিক থেকে স্পৃহণীয় সুবিধাজনক ও সুখকর বিয়ে শুধু নিজেদের পরিবারের মূর্খতা ও শালীনতা বোধের অভাবের জন্য জেন হারাতে বসেছে।

এর সঙ্গে আবার উইকহামের চরিত্র সম্পর্কিত ব্যাপার যোগ হওয়ায় এটা সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে, চির-সজীব মনের সজীবতা এতই ব্যাহত হয়েছে যে, এলিজাবেথের পক্ষে প্রফুল্লতা বজায় রাখা বেশ অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

এখানে আসার প্রথম সপ্তাহের মত শেষ সপ্তাহের ক'টা দিনও হামেশাই নিমন্ত্রণ আসতে লাগল লেডী ক্যাথারিনের ওখান থেকে। শেষ সন্ধ্যাও কাটল সেখানে। আবার লেডী ক্যাথারিন তাদের যাওয়া সম্বন্ধে প্রত্যেকটি খুটিনাটি কথা জিজ্ঞেসা করলেন এবং উপদেশ দিলেন।

তারা যখন বিদায় নিল লেডী ক্যাথারিন স্মিত মুখে তাদের শুভ প্রার্থনা করলেন, আগামী বছর হান্সফোর্ডে আসার নিমন্ত্রণ জানালেন এবং তাঁর মেয়েও তাদের সঙ্গে করমর্দন করে সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করল। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

মৃত্যুমুখে পাভলোভা

শ্রেষ্ঠতম ব্যালে নর্তকী আনা পাভলোভা পঁচিশ বছর ধ'রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-আমেরিকা, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং সমগ্র পৃথিবীকে নাচ দেখিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ ক'রে রেখেছিলেন। তখনকার খ্যাতিমান সমালোচকবৃন্দ একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন, অন্ততঃ দু'পুরুষ ধ'রে পাভলোভার মত প্রতিভাময়ী নর্তকী লোকচক্ষে দেখা যায়নি। রাশিয়ায় সেন্ট পিটার্সবার্গে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পাভলোভা জন্মগ্রহণ করেন। পাভলোভা যে নর্তকী হবেন শৈশবেই বোঝা গিয়েছিল। তখন থেকেই তিনি পাখী ও প্রজাপতির মত উড়ে যাওয়ার নকল করতেন। আট বছরের মেয়ে পাভলোভা, মা মেয়েকে দেখাতে নিয়ে গেলেন চাইকোস্কিজের নাচ। মেয়ে তো নাচ দেখে বিমুগ্ধ ও হতবাক। দেখতে দেখতে এতই পাভলোভা অবাক যে, হাতের আঙুল থেকে রক্তপাত হয়ে যাচ্ছে খেয়াল নেই। আঙুল চুষতে চুষতে নাচ দেখছিলেন পাভলোভা।

দু'বছর অতীত হয়েছে। মা পাভলোভাকে ইম্পিরিয়াল স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। স্কুলটি পিটার দি গ্রেট স্থাপিত করেন—যেখানে নিয়মানুবর্তিতা ছিল অতি প্রকট। কিন্তু পাভলোভা ভর্তি হওয়ার সময় থেকেই প্রতিভা দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছেন স্কুলকে। বাইশ বছর বয়সে পাভলোভা ব্যালে দলে সুযোগ পেলেন। তখন থেকেই তিনি যশের চরম শিখরে উঠলেন। অসুখ-বিসুখ হলেও পাভলোভা নাচ থামাতেন না। প্রতি বছর সদলে পাভলোভা নাচ দেখাতে যাত্রা করতেন কোথাও না কোথাও। লণ্ডনে তিনি অধিকতম অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তিনি বলতেন, "সর্বত্র মানুষ আমার নাচ দেখতে চায়।" মেক্সিকোতে যখন তিনি নাচতে গেলেন তখন এতই ভীড় হয় যে শেষ পর্যন্ত 'বুল রিঙে' পাভলোভার, নাচের ব্যবস্থা হয়।

পাভলোভা ট্রেনে চলেছেন; ট্রেণ-দুর্ঘটনা হ'ল। অনাক্রান্ত ছিলেন পাভলোভা, কিন্তু প্রাথমিক সাহায্যের আশায় থাকতে থাকতে রাতের বেলায় ঠাণ্ডা লাগলো। বন্ধু-বান্ধব বললেন বিশ্রাম গ্রহণ করতে। কিন্তু পাভলোভা নাচ থামালেন না। নিমোনিয়ায় ধরলো পাভলোভাকে। অস্ত্রোপচার করতে হবে বুকে, কিন্তু অস্ত্রোপচার হলে ভবিষ্যতে কখনও তিনি নাচতে পারবেন না। সে জন্য তিনি বাধা দিলেন অস্ত্রোপচারে।

অসুখের মধ্যে ভুল বকছেন পাভলোভা। কি খেয়াল হয়েছে, পাভলোভা চাইলেন একটি পোষাক। পাভলোভার শীর্ণ কটিদেশ কাঁপতে লাগলো, যেমন কাঁপতো যখন তিনি নাচতেন। কি একটা নাচ মনে পড়েছে পাভলোভার। পৃথিবীতে তখন অন্য কিছুর প্রতি পাভলোভার আকর্ষণ নেই, শুধু ঐ পোষাকটির প্রতি। পাভলোভার হাত দু'টি কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল। মুখে ফুটে উঠলো হঠাৎ যেন স্বর্গীয় হাসি। চোখ দু'টি স্তিমিত হয়ে গেল। মৃত্যু হ'ল পাভলোভার।

এ্যাটম

শ্রীযামিনীমোহন কর

দ্বিতীয় অধ্যায়

অ্যাটমের বিভিন্ন অংশ

প্রাকৃতিক বিদ্যুতের কথা বহু কাল আগে ভারতের মনীষীরা উল্লেখ করেছিলেন বটে কিন্তু তড়িৎ (electricity) সম্বন্ধীয় গবেষণা সর্বপ্রথম হয় গ্রীসে, খৃঃ পূঃ ৬০০ বছর পূর্বে। গ্রীসীয় দার্শনিকরা দেখিয়েছিলেন যে, অ্যাম্বারকে পশুচর্ম বা কাপড় দিয়ে ঘষলে, তা হাল্কা জিনিষকে, যেমন, পশম অথবা পালককে আকর্ষণ করে। অ্যাম্বারকে গ্রীক ভাষায় ইলেকট্রন বলে, তাই থেকে এই আর্ । শক্তির নাম হয়েছে ইলেকট্রিসিটি। বহু দিন এই ব্যাপার ধামা চাপা পড়ে ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের গিলবার্ট দেখালেন যে, কেবল অ্যাম্বার নয়, কাচও ঐ ভাবে ঘষলে আকর্ষণ শক্তি লাভ করে। পরবর্তী একশ' বছর ধরে এ নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য হল না। ১৭৩৩ সালে ফ্রান্সের ডুফে দেখালেন যে, কাচকে সিল্ক দিয়ে ঘষলে, কাচ ও সিল্ক উভয়ের মধ্যেই এই আকর্ষণ-শক্তি জাগে, কিন্তু তাহাদের তড়িৎ শক্তি এক ধরণের নয়। গালাকে পশুচর্ম দিয়ে ঘষলে তড়িৎ উৎপন্ন হয় কিন্তু তড়িৎযুক্ত যে পদার্থকে গালা আকর্ষণ করে, কাচ তাকে বিকর্ষণ করে অর্থাৎ দূরে ঠেলে দেয়। এদের নাম দেওয়া হল কাচজাতীয় ও রজনজাতীয় তড়িৎ। ১৭৪৭ সালে আমেরিকায় ফ্রাঙ্কলিন এই দুই ভিন্ন তড়িৎ শক্তির নামকরণ করলেন ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ। কাচে সঞ্চারিত তড়িৎ ধনাত্মক এবং গালায় সঞ্চারিত তড়িত ঋণাত্মক। ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কাচ ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত গালাকে আকর্ষণ করে কিন্তু অপর একটি ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কাচকে বিকর্ষণ করে। ফ্রাঙ্কলিনের মতে সর্বত্রই তড়িৎ সমভাবে ছড়িয়ে আছে। কোন পদার্থে তার আধিক্য হলে সেটা ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত হয়ে যায়, আর ঘাটতি হলে সেটা ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত হয়। অবশ্য এটা তাঁর নিছক কল্পনা। আধুনিক মতবাদে ইলেকট্রনের আধিক্যে ঋণাত্মক এবং হ্রাসে ধনাত্মক তড়িৎ। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। যে তড়িৎযুক্ত পদার্থ তড়িৎযুক্ত কাচকে বিকর্ষণ করে বা তার দ্বারা বিকর্ষিত হয়, এবং তড়িৎযুক্ত গালাকে আকর্ষণ করে বা তার দ্বারা আকর্ষিত হয় তাকে ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত বলা হয়। তেমনি যদি তা তড়িৎযুক্ত কাচকে আকর্ষণ করে এবং তড়িৎযুক্ত গালাকে বিকর্ষণ করে তাকে ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত বলা হয়। এই সংজ্ঞা হিসাবে কাচের ঘর্ষণ-তড়িৎ ঋণাত্মক হওয়া উচিত। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিন ঠিক তার উল্টো নামকরণ করে বসলেন। এত দিন পরে সঠিক নামকরণ করতে গেলে সুবিধার পরিবর্তে বিভ্রান্তির উৎপত্তি হবে বলে আজও সেই ভুল নামই চালাতে হচ্ছে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইতালির শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার অধ্যাপক লুইগি গ্যালভানি লক্ষ্য করলেন যে, সদ্যমৃত ব্যাঙের পেশী খুব কাছে রাখা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের স্ফুলিঙ্গে সঙ্কুচিত হয়। পরে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, দু'রকম ধাতুর তৈরী বাঁকা দণ্ডের এক দিকটা ব্যাঙের নার্ভে এবং অপর দিকটা পেশীতে ছোঁয়ালেও ঐ ধরণের সংকোচন হয়। তিনি এর কারণ-স্বরূপ বললেন যে, জান্তব তড়িতের জন্যই এরূপ হয়। ১৭৯৬ সালে ইতালির ভল্টা এই মতবাদ খণ্ডন করে দেখালেন যে, ব্যাঙের সঙ্গে তড়িতের কোন সংস্রব নেই। দু'রকমের ধাতু আর মধ্যে ভিজা কাপড় বা পিচবোর্ড দিয়েও তড়িত সৃষ্টি করা যায়। আর এই তড়িতের ফলেই ব্যাঙের পেশী সঙ্কুচিত হয়। পরে তিনি একটা কাচের পাত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানো জল ঢেলে তার মধ্যে এক দিকে তামার ও অন্য দিকে দস্তার পাত ডুবিয়ে রাখলেন। পাত দু'টির ওপরটা একটা তার দিয়ে সংযোগ করে দেখালেন তড়িত প্রবাহিত হচ্ছে। এরই নাম হল ভল্টীয় সেল।

আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, কাচ-রেশম ঘর্ষণে উৎপন্ন তড়িৎ এবং সেলের তড়িৎ ভিন্ন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয়ই এক, পার্থক্য কেবল অবস্থাতে। প্রথমটায় তড়িৎ একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকে, তাই তার নাম স্থিতীয় তড়িৎ ; এবং দ্বিতীয়টায় তড়িৎ তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাই তার নাম চল-তড়িৎ। প্রশ্ন উঠল তড়িৎ প্রবাহিত হয় কেন ?

উঁচুতে রাখা জলভরা ট্যাঙ্ক থেকে একটা নল পুকুরে নামিয়ে দিলে জল ট্যাঙ্ক থেকে পুকুরে এসে পড়ে যদিও ট্যাঙ্ক অপেক্ষা পুকুরে অনেক বেশী জল। এই প্রবাহের কারণ হল লেভেলের তারতম্য। ট্যাঙ্কের জলের লেভেল পুকুরের জলের লেভেলের চেয়ে উঁচু, তাই উঁচু লেভেল অর্থাৎ বেশী চাপের জন্য জল নীচে নেমে আসে। তা'হলেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রবাহ পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, দুই প্রান্তের চাপের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। তড়িতের ব্যাপারেও ঐ একই কথা খাটে। তড়িৎ-প্রবাহ, পরিমাণ অর্থাৎ চার্জের ওপর নির্ভর করে না, দুই প্রান্তের তড়িতের চাপের তারতম্যের ওপর অর্থাৎ পোটেনশিয়াল বা ভোল্টেজের ওপর নির্ভর করে। আবার যেমন জলপ্রপাতের শক্তি নির্ভর করে জলের পরিমাণ এবং পতনের উচ্চতা অর্থাৎ চাপের তারতম্যের গুণফলের ওপর, তেমনি বৈদ্যুতিক শক্তি নির্ভর করে চার্জ এবং চাপের গুণফলের ওপর। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে

ফ্যারাডে স্থিতীয় এবং চলতড়িতের প্রধান পার্থক্য হিসেবে দেখালেন যে, স্থিতীয় তড়িতে চাপ অধিক কিন্তু পরিমাণ কম আর চলতড়িতে চাপ কম কিন্তু পরিমাণ বেশী।

তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ ধনাত্মক চার্জ থেকে ঋণাত্মক চার্জের দিকে হলে তাকে ধনাত্মক বলা প্রথা। চার্জের চিহ্ন ফ্র্যাঙ্কলিনের সংজ্ঞা মাফিকই ঠিক করা হয়, তবে আকর্ষণ-বিকর্ষণ দিয়ে নির্ণয় করা হয় না। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে চুম্বক নড়ে যায়, রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়, তা থেকেও প্রবাহের অভিমুখ নির্ণয় করা করা যায়। প্রত্যেক তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রের সেল বা ডায়নামোর দুটো মেরু থাকে। একটা ধনাত্মক, অপরটা ঋণাত্মক। প্রবাহের অভিমুখ ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকের দিকে।

প্রবাহ একই দিকে হতে থাকলে তাকে ডি, সি (direct current) বলে; কিন্তু সাধারণ জীবনে ডায়নামো (কমিউটেটর বাদে) ইনডাকশান কয়েল ইত্যাদি থেকে যে প্রবাহের সৃষ্টি হয় তার অভিমুখে নির্দিষ্ট সময়ান্তে ক্রমাগত উল্টোতে থাকে। এর নাম এ, সি (alternating current)। এ, সি'র সুবিধা এই যে, ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে ইচ্ছামত ভোল্টেজ অর্থাৎ তড়িতের চাপের অন্তর কম-বেশী করা যায়।

১৭০৫ সালে ইংলণ্ডের হক্সবী লক্ষ্য করেন যে, বদ্ধ কাচের আধারের হাওয়ার চাপ কমিয়ে দিলে তড়িৎযুক্ত আধার থেকে আলো বার হয়। ১৭৫২ সালে ওয়াটসনও লক্ষ্য করলেন যে, স্থিতীয় তড়িতের ক্ষরণ কম চাপের গ্যাসের মধ্যে দিয়ে বায়ু অপেক্ষা দ্রুত হয় এবং সেই সঙ্গে আলো নির্গত হয়। অবশ্য ভোল্টেজ বাড়িয়ে দিলে সাধারণ বায়ুর মধ্যে দিয়েও তড়িৎ-ক্ষরণে স্ফুলিঙ্গ বার হয়, কিন্তু গ্যাসের চাপ যদি কমিয়ে দেওয়া যায় তবে কম ভোল্টেজ দিয়েও এই ধরণের তড়িৎ-ক্ষরণ স্ফুলিঙ্গ না বার করে করা যায়। কম চাপে ক্ষরণ স্ফুলিঙ্গের মত প্রচণ্ড হয় না কিন্তু তখন অনেক রকম আলোর খেলা দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের 'নিওন' সাইন এর খুব ভাল উদাহরণ।

তড়িৎ আনাগোনার জন্য তড়িৎযুক্ত কণার প্রয়োজন। এই কণাগুলিকে 'আয়ন' (ion) বলে। তড়িৎ-চাপের তারতম্য হলে কণাগুলি চলতে আরম্ভ করে। ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণাগুলি প্রবাহের অভিমুখে, আর ঋণাত্মকগুলি বিপরীত দিকে। কোন বাধা না পেলে তাদের বেগ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। চরম বেগ নির্ভর করে তড়িৎ-চাপের তারতম্যের ওপর। বায়ুতে সাধারণতঃ কিছু আয়ন থাকে সুতরাং দু'টো তড়িৎযুক্ত প্লেটের মাঝে বায়ু থাকলে, তার আয়নগুলি চিহ্নানুসারে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে। এর ফলে দুটো ব্যাপার ঘটতে পারে—আয়নের সঙ্গে গ্যাসের অণুর ধাক্কা লাগতে পারে, যাতে করে আয়নের শক্তি কমে যাবে, অথবা যুতসই ধাক্কার ফলে আরও আয়নের সৃষ্টি হতে পারে, যাকে বলে সংঘর্ষজনিত আয়ন সৃষ্টি। যদি বায়ুর অথবা গ্যাসের চাপ কমানো না হয় অর্থাৎ সাধারণ বায়বীয় চাপের সমান থাকে তবে প্রথম ব্যাপার ঘটে এবং তড়িৎ বহনের জন্য পর্য্যাপ্ত আয়ন থাকে না। কিন্তু যদি বায়ুর অথবা গ্যাসের চাপ কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দ্বিতীয় ব্যাপার ঘটে এবং সংঘর্ষজনিত আয়ন সৃষ্টির ফলে আয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য খুব সহজেই তড়িৎ-ক্ষরণ হয়। যদি চাপ খুব কমিয়ে দেওয়া হয়, তবে ধাক্কাধাক্কি কমে যায়, ফলে আয়ন সৃষ্টিও কমে যায়। তখন আর সহজে তড়িৎ-ক্ষরণ হয় না।

ভল্টার ব্যাটারীতে তড়িচ্চালক বল প্রায় ধ্রুব থাকে। ১৮৩৮ সালে এই ব্যাটারীর সাহায্যে ফ্যারাডে কম চাপের গ্যাসের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-ক্ষরণ সম্পর্কে গবেষণা করেন। কিন্তু তখনও উঁচু দরের শোষক পাম্প না থাকায় গ্যাসের চাপ খুব কমাতে পারেননি। ১৮৫৪ সালে জার্মাণীর গেইসলার খুব ভাল শোষক পাম্প তৈরী করেন এবং একটা কাচের পাত্রে ধাতব ইলেকট্রোড দিয়ে গ্যাসের চাপ কমিয়ে পাত্রটি বন্ধ (seal) করে দেন। তিনি ও জার্মাণীর অন্য এক বৈজ্ঞানিক প্লুকার, দু'জনে মিলে ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২ সাল পর্য্যন্ত এই ধরণের পাত্রের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-ক্ষরণ সম্পর্কে বহুবিধ পরীক্ষা চালান। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, ক্যাথোড অর্থাৎ ঋণাত্মক ইলেকট্রোড থেকে সবুজে রঙের আভা বা আলো বেরোয় এবং পাত্রের কাছে চুম্বক নিয়ে গেলে এই আভা স্থান পরিবর্তন করে। ১৮৭৬ সালে প্লুকারের ছাত্র গোল্ডষ্টাইন দেখালেন যে, এই আভার কারণ ক্যাথোড থেকে নির্গত আলোক-রশ্মি। তিনি এর নাম দিলেন ক্যাথোড-রশ্মি। এই রশ্মিকে চুম্বকের সাহায্যে নড়ান যায় এবং এর গতিপথে কোন বাধা দিলে ছায়ার সৃষ্টি হয়, যাতে করে প্রমাণিত হয় যে, এই রশ্মি সরল রেখা ধরে যায়। ৮৭৯ থেকে ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ক্রুক্স আরও উঁচু ধরণের বায়ুহীন ক্ষরণ-নল তৈরী করে তার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-ক্ষরণের গবেষণা করলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ক্যাথোড-রশ্মি প্রকৃত পক্ষে ক্যাথোড অর্থাৎ ঋণাত্মক ইলেকট্রোড থেকে প্রচণ্ড বেগে প্রক্ষিপ্ত ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণারাশি। ১৮৯৫ সালে ফ্রান্সের পেরাঁ ক্যাথোড-রশ্মিকে ফ্যারাডের চোঙ-এর উপর নিক্ষেপ করে তড়িৎমাপক যন্ত্রের (electrometer) সাহায্যে রশ্মির চার্জের পরিমাণ ও চিহ্ন নির্ণয়ের উপায় উদ্ভাবন করলেন। কিন্তু হার্জ (রেডিও-তরঙ্গের আবিষ্কর্তা) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা আপত্তি করলেন যে, ক্যাথোড-রশ্মি যে ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণারাশির স্রোত, তার প্রমাণ কই? এমনও তো হতে পারে যে, এই রশ্মি তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ। যদি স্বীকারও করে নেওয়া হয় যে, ক্যাথোড থেকে ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণাসমূহ নির্গত হয় কিন্তু এই কণার স্রোতই যে ক্যাথোড-রশ্মি তার তো কোন প্রমাণ নেই। ১৮৯৭ সালে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক টমসন প্রমাণ দ্বারা আপত্তি খণ্ডনের চেষ্টা করলেন। তিনি পেরাঁর পরীক্ষাটা পুনরায় করে, তার সত্যতা প্রমাণ করলেন। উপরন্তু তিনি দেখালেন যে, চুম্বক কাছে আনলে ক্যাথোড থেকে নির্গত আভা যেমন সরে যায়, অনুরূপ ভাবে কণাসমূহও সরে যায়। তার পর তড়িৎ-ক্ষেত্রের সাহায্যে ক্যাথোড-রশ্মির পথ বদলে চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। প্রথম আপত্তি দূর হ'ল বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টা রয়ে গেল।

একটু অ্যাসিড-মিশ্রিত জলের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালিত করলে জল দু'টো মৌলিক অংশে ভাগ হয়ে যায়; ক্যাথোডে হাইড্রোজেন আর ধনাত্মক ইলেকট্রোড অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাস জমা হয়। তেমনি কোন ধাতব সল্টের সলিউশানের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালিত করলে ধাতুর অংশ ক্যাথোডে এসে জমা হয়। এই ব্যাপারটাকে তড়িতজনিত বিশ্লেষণ বা ইলেকট্রোলিসিস বলে।

১৮৩১ থেকে ১৮৩৪ সাল পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে ফ্যারাডে গবেষণা চালান এবং সিদ্ধান্ত করেন যে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ-প্রবাহের ফলে বিভিন্ন বস্তুর রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক ওজন ইলেকট্রোডে এসে জমা হয়। সূত্র হিসাবে লেখা যায়—

(ক) $W = Z C T$, যেখানে W ইলেকট্রোডে জমা বস্তুর ওজন (গ্রাম) Z বস্তুর তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক, C কারেণ্ট বা প্রবাহ, (অ্যাম্পিয়ার) এবং T সময় (সেকেণ্ড);

(খ) বস্তুর তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক এবং রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক সরল ভেদে থাকে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ইলেকট্রোডে যে কোন বস্তুর তুল্যাঙ্ক ওজন (গ্রাম) পৃথক করে জমা করতে 96500 কুলম্ব তড়িতের প্রয়োজন হয়। (কুলম্ব হল চার্জ্জের একক, এক অ্যাম্পিয়ার কারেণ্ট এক সেকেণ্ড প্রবাহিত হলে যে পরিমাণ তড়িৎ পাওয়া যায় তাকে এক কুলম্ব বলে)। বৈজ্ঞানিকের সম্মানার্থে এই সংখ্যার নাম দেওয়া হয়েছে এক ফ্যারাডে।

তাহ'লে তড়িতের পরিমাণের একক পাওয়া যাবে এক ফ্যারাডেকে অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে। এক ফ্যারাডে হল $2{\cdot}89 \times 10^{14}$ স্থিতীয় তড়িৎ একক এর অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা হল $6{\cdot}02 \times 10^{23}$; অতএব তড়িতের পরিমাণের একক হল $4{\cdot}80 \times 10^{-10}$ স্থিতীয় তড়িৎ একক।

১৮৮১ সালে জার্মাণীর বিখ্যাত পদার্থবিদ্ হেল্মহোজ বললেন যে, যেমন প্রত্যেক বস্তু পরমাণুর সমষ্টি, তেমনই তড়িৎও (ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক উভয়ই) বিভক্ত হয়ে হয়ে শেষে তড়িৎপরমাণুতে দাঁড়াবে। ফ্যারাডের সূত্রই এর প্রমাণ! ১৮৯১ সালে আইরিশ বৈজ্ঞানিক ষ্টোনি তড়িৎযুক্ত একক পরমাণুর নাম দিলেন ইলেকট্রন। প্রত্যেক অণু যেমন অখণ্ড সংখ্যক (এক, দুই, তিন ইত্যাদি) পরমাণুর দ্বারা সৃষ্ট, তেমনই প্রত্যেক আয়ন অখণ্ড সংখ্যক ইলেকট্রনের সমষ্টি। আয়নের ওজনকে তার তুল্যাঙ্ক দিয়ে ভাগ করলে, তার মধ্যে কত সংখ্যক চার্জ্জের একক আছে পাওয়া যায়।

তার পর চলতে লাগল পরীক্ষামূলক ভাবে তড়িৎযুক্ত পদার্থের একক চার্জ্জের মান নির্ণয়ের চেষ্টা। ১৮৯৭ সালে ইংলণ্ডের টাউনসেণ্ড অনেকটা সফলতা লাভ করলেন। সামান্য অ্যাসিড-মিশ্রিত জলের মধ্যে দিয়ে বেশ জোরালো তড়িৎ-প্রবাহ চালান হল। দুই ইলেকট্রোডে যথাক্রমে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস কাচের পাত্রে জমা হল। গ্যাসের আয়নের সঙ্গে জলের আর্দ্রতা মিশে পাত্রের মধ্যে ঘন মেঘের সঞ্চার হল। তা হলে এই মেঘের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা তড়িৎবাহী বলা যায়। যদি সমগ্র মেঘের ওজন এবং একটি কণার আয়তন (গোলকরূপী মনে করলে ব্যাসার্দ্ধ) ও ভরাঙ্ক অর্থাৎ ওজন জানা যায়, তবে ভাগ করে কণার সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। তার পর মেঘের সমগ্র চার্জ্জ নির্ণয় করে কণার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রতি কণার গড় চার্জ্জ পাওয়া যাবে। এই উপায়ে টাউনসেণ্ড একক চার্জ্জের অর্থাৎ ইলেকট্রনের চার্জ্জের পরিমাণ নির্ণয় করলেন। অবশ্য মান একেবারে নির্ভুল হল না। ১৯০৩ সালে টমশন রেডিয়াম রশ্মি দ্বারা বায়ুকে আয়নে বিশ্লেষিত করে আয়নের গড় চার্জ্জ নির্ণয় করলেন। তাতেও খুব একটা যুতসই কিছু হল না। ১৯১১ সালে মার্কিণ দেশের মিলিকান, জলের বদলে তেল দিয়ে এই পরীক্ষা চালালেন। তিনি বললেন যে, পরীক্ষার সময় কিছুটা জল বাষ্প হয়ে যাওয়ায় নির্ভুল মান পাওয়া যেতে পারে না। তিনি একটি বদ্ধ পাত্রের হাওয়ার চাপ কমিয়ে তার মধ্যে দশ হাজার ভোল্টেজের ব্যাটারীর দু'টো তারে যুক্ত দু'টো ধাতব প্লেট অনুভূমিক ভাবে রাখলেন। প্লেটের দু'টোর ব্যাস 22 সেণ্টিমিটার আর পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব প্রায় দেড় সেণ্টিমিটার। ওপরের প্লেটের মাঝে ছোট একটা ছিদ্র। অ্যাটোমাইজার দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা তেল ওপরের প্লেটের ওপর ফেলতে থাকলেন। অ্যাটোমাইজারের মুখ থেকে তৈলবিন্দু বেরোবার সময় ঘর্ষণের ফলে তড়িৎযুক্ত হয়ে গেল। পাত্রের এক পাশে একটি ছিদ্র দিয়ে খুব জোরালো আলো ফেলা হল আর দূরবীণের সাহায্যে তৈলবিন্দুর গতি নিরীক্ষণ করা হল।

প্রথমে প্লেটগুলো ব্যাটারী থেকে অযুক্ত রেখে মাধ্যাকর্ষণের জন্য তৈলবিন্দুর অধোগতির বেগ মাপা হল। মনে কর, বেগ v_1; তা হলে, $v_1 = k m g$, যেখানে k সান্দ্রতার উপর নির্ভরশীল একটি ধ্রুবক, m তৈলবিন্দুর ভর এবং g মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ (981 সেঃ মিঃ সেকেণ্ড একক)।

তার পর প্লেটগুলো ব্যাটারীযুক্ত করে দেওয়া হল। তাতে এমন এক তড়িৎ-ক্ষেত্র তৈরী হল, যার ফলে তৈলবিন্দু মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে ওপর দিকে উঠতে লাগল। যদি তড়িৎ-ক্ষেত্রের শক্তি E হয় এবং e_n বিন্দুর চার্জ্জ হয় তবে ঊর্দ্ধাভিমুখী বল হল Ee_n; কিন্তু নিম্নাভিমুখী মাধ্যাকর্ষণের বল mg; সুতরাং লব্ধি ঊর্দ্ধমুখী বল দাঁড়াল $Ee_n - mg$. এখন যদি তৈলবিন্দুর ঊর্দ্ধমুখী বেগ v_2 হয়, তা'হলে—

$$v_2 = k(Ee_n - mg);$$

অর্থাৎ $$\frac{v_1}{v_2} = \frac{mg}{Ee_n - mg}$$

অতএব $$e_n = \frac{mg}{Ev_1}(v_1 + v_2).$$

যেহেতু v_1, v_2, E এবং g জানা আছে, সুতরাং m জানা থাকলে e_n নির্ণয় করা যায়। যদি তৈলবিন্দুকে গোলকরূপী ধরা যায় তবে তার ব্যাসার্দ্ধ r হলে, ভরাঙ্ক d এবং সান্দ্রতা y ধরলে $v_1 = \frac{2gr^2d}{9y}$

v_1 পূর্ব্বেই জানা আছে, g, y, d জানা আছে ধরা যায়, সুতরাং r পাওয়া গেল। অতএব $m = \frac{4}{3}\pi r^3 d$ সমীকরণ থেকে m নির্ণয় করা যায়। তাহলেই তৈলবিন্দুতে কত চার্জ্জ আছে অর্থাৎ e_n নির্দ্ধারিত হল। এর মান হ'ল $4{\cdot}774 \times 10^{-10}$ স্থিতীয় তড়িৎ একক।

[ক্রমশঃ।

জীবাণু-সংক্রমণ কাকে বলে ডাক্তারবাবু?

তরুণী বধূটি জিজ্ঞাসা করলেন—

ডাক্তার তখন জীবাণু-সংক্রমণের

খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন : আমাদের শরীরের কোথাও কেটে গেলে বা ছড়ে গেলে রোগবাহী জীবাণুরা এই ক্ষতস্থান দিয়ে শরীরের ভেতরে গিয়ে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রথম থেকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করলে এই বিষক্রিয়া সুরু হয়ে যায় ও সারা শরীরের রক্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে। রোগবাহী জীবাণুগুলি আকারে এত ছোট হয় যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না। এই দেখুন, একজাতীয় জীবাণুর চেহারা — স্বাভাবিক আকারের চেয়ে হাজারগুণ বড়ো ক'রে এই রকম দেখা যায়।

কেটে বা ছড়ে গেলে 'ডেটল' লাগাবেন :

ছাল উঠে গেলে, এমন কি আঁচড় লাগলেও অবহেলা করবেন না। চামড়া উঠলেই জীবাণুর প্রবেশের রাস্তা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'ডেটল' লাগানো হচ্ছে আত্মরক্ষার সর্ব্বপ্রথম উপায়।

সংক্রমণের বিরুদ্ধে সব সময় সতর্ক থাকা উচিত, বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকে যখন মহামারী দেখা দেয়। এক গ্লাস জলে কয়েক ফোঁটা 'ডেটল' মিশিয়ে কুলকুচা করলে মুখ ও গলা জীবাণুমুক্ত হয়, গলার ঘায়ের যন্ত্রণা কমে ও ঘা শুকিয়ে যায়।

'ডেটল' জীবাণুর হাত থেকে মুক্ত রাখে এবং সংক্রমণের বিপদ ঘটতে দেয় না

মাথার চুলকানিতে :

মাথার চুলকানি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ এবং তা দেখতে দেখতে পরিবারের সবার মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসা না করলে চিরদিনের মতো মাথায় টাক পড়ে যায়। এ রোগ হওয়া মাত্র 'ডেটল' ব্যবহার করবেন — ব্যবহারের নিয়ম শিশির গায়ে লেখা আছে।

এই পুস্তিকাটির জন্য লিখুন—বিনামূল্যে পাবেন :

'ডেটল'-এর ক্রিয়া মৃদু অথচ অব্যর্থ — এজন্য মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় এর তুলনা নেই। বিনামূল্যে "মডার্ণ হাইজিন ফর উইমেন" (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি) নামক পুস্তিকার জন্য লিখুন।

'DETTOL'

TRADE MARK

এ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড, পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা

D.B1-4

বাংলা সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—৬

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইং ১৮৯১

৫৬৬। রসরাজ (মাসিক): জানুয়ারি ১৮৯১।

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—লালা প্রসন্নকুমার দে।

৫৬৭। শ্রীহট্ট-মিহির (সাপ্তাহিক): ফাল্গুন (?) ১২৯৭।

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—লালা প্রসন্নকুমার দে।

৫৬৮। **শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা** (পাক্ষিক): ১ চৈত্র, ৪০৫ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

"বৈষ্ণব ধর্ম্মের চর্চা ও প্রচার এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—রাধিকানাথ গোস্বামী ও কেদারনাথ দত্ত।

৫৬৯। দারোগার দপ্তর, নং ১: চৈত্র ১২৯৭।

এই "ডিটেক্‌টিভ সিরিজে"র প্রবর্ত্তক প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। ইহার ১ম সংখ্যা—'বনমালি দাসের হত্যা'।

৫৭০। উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি (মাসিক): বৈশাখ ১২৯৮।

"উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধির প্রথম এবং প্রধান কার্য্য জাতীয় স্বভাব নির্ণয় অর্থাৎ উগ্রক্ষত্রিয় জাতির প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ।...দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কার।" সম্পাদক—শশিচন্দ্র রা।

৫৭১। বঙ্গপ্রভা (মাসিক): বৈশাখ ১২৯৮।

চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। প্রকাশক—বিপিনবিহারী কোলে।

৫৭২। আশু চিকিৎসা পদ্ধতি (মাসিক): বৈশাখ ১২৯৮।

পরিচালক—আশুতোষ রায়।

৫৭৩। **হিতবাদী** (সাপ্তাহিক)। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৩০এ মে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'হিতবাদী' প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ইহার প্রধান সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক হন; তাঁহার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত এই 'হিতবাদী'তেই, তিনি লিখিয়াছেন:—

"আমাদের হিতবাদী ব'লে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্চে। একটি বড় রকমের কম্পানি খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্চে। ২৫,০০০৲ টাকা মূলধন। ২৫০৲ টাকা ক'রে প্রত্যেক অংশ এবং এক-শ অংশ আবশ্যক।...কৃষ্ণকমল বাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীকে রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে।"

'হিতবাদী' নামটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের **সৃষ্ট**, এবং 'হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ' এই mottoটিও তিনিই বলিয়া দেন।

নানা ঝঞ্ঝাটে কৃষ্ণকমল বেশী দিন 'হিতবাদী'র সহিত যুক্ত থাকিতে পারেন নাই। কিছু দিন পরে পত্রিকাখানির অবস্থা শোচনীয় হয়। এই সময়ে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায়, উহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্পাদনায় 'হিতবাদী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—২১ মে ১৮৯৪। পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও কর্ম্মতৎপরতাগুণে কালীপ্রসন্ন 'হিতবাদী'কে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। ১৯০৭, ৪ঠা জুলাই কাব্যবিশারদের মৃত্যু হয়। ইহার পর সখারাম গণেশ দেউস্কর, জলধর সেন প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক 'হিতবাদী' পরিচালন করিয়াছেন।

৫৭৪। জমীন্দারী পঞ্চায়ত (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯৮।

জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভার মুখপত্র। সম্পাদক—যোগেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, বি-এল।

৫৭৫। প্রভাত সমীরণ (মাসিক): শ্রাবণ ১২৯৮।

পরিচালক—কৈলাসচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৫৭৬। রণবর (মাসিক): শ্রাবণ ১২৯৮।

স্যালভেশন আর্ম্মীর মুখপত্র। সম্পাদক—হীরা সিং।

৫৭৭। ভিষক্-দর্পণ (মাসিক): জুলাই ১৮৯১।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিষয়ক মাসিক পত্র। সম্পাদক—মৌলবী জহিরুদ্দীন আহ্‌মদ, এল. এম. এস., এফ. সি. ইউ.।

৫৭৮। ইস্‌লাম-প্রচারক (মাসিক): শ্রাবণ ১২৯৮।

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক মাসিক পত্র। সম্পাদক—মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহ্‌মদ। দুই বৎসর চলিবার পর ইহা কিছু কাল বন্ধ থাকে। তৃতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—৬ শ্রাবণ ১৩০৬।

৫৭৯। ছাত্রসখা (মাসিক): শ্রাবণ (?) ১২৯৮।

"কতিপয় ছাত্র প্রবর্ত্তিত। কাছাড় হাইলকান্দি ছাত্রসখা সমিতি হইতে প্রকাশিত।"

৫৮০। **প্রকৃতি** (সাপ্তাহিক): ভাদ্র ১২৯৮।

সম্পাদক—অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৫৮১। প্রকৃতি (মাসিক): ভাদ্র ১২৯৮।

"প্রাকৃতিক তত্ত্বের আলোচনা করাই এ পত্রিকার উদ্দেশ্য।... ঢাকা ইষ্টবেঙ্গল প্রেসে" মুদ্রিত ও ফরিদপুর জিলার ভূতপূর্ব্ব স্কুল ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর প্রভাতচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৫৮২। **সাহিত্য ও বিজ্ঞান** (মাসিক): সেপ্টেম্বর ১৮৯১।

সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র মিত্র। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনেক প্রাথমিক রচনা এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

৫৮৩। সেবক (মাসিক): আশ্বিন ১২৯৮।

ঢাকা "পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী"র মুখপত্র। সম্পাদক—শশিভূষণ দত্ত, এম. এ। দুই বৎসর চলিবার পর 'সেবক' কিছু দিন বন্ধ থাকে। তৃতীয় বর্ষের পত্রিকা প্রকাশিত হয়—১৩০১ সালের মাঘ মাসে, সম্পাদন করেন—পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ।

৫৮৪। চিকিৎসাতত্ত্ব (মাসিক): আশ্বিন ১২৯৮।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকা। পরিচালক—রাজেন্দ্রলাল সুর।

৫৮৫। ছাত্রমিত্র (মাসিক): আশ্বিন ১২৯৮।

দেশীয় খৃষ্টানদের মুখপত্র। পরিচালক—Rev. T. B.Gwyn.

৫৮৬। **সাধনা** (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১২৯৮।

এই সুপরিচিত মাসিক পত্রের প্রথম সম্পাদক—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র। সুধীন্দ্রনাথ ২২ বৎসর বয়সকালে 'সাধনা' প্রকাশ করেন; তিনি তিন বৎসর—১৩০১ সালের কার্ত্তিক পর্য্যন্ত পত্রিকাখানি কৃতিত্বের সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন। চতুর্থ বর্ষের 'সাধনা' সম্পাদন করেন—রবীন্দ্রনাথ; তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ:—"আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার

আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।"

৫৮৭। শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী (মাসিক) : পৌষ ১২৯৮।

বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রাধিকাপ্রসাদ ভাগবত-রত্নাকর ও শরৎচন্দ্র তপস্বী।

৫৮৮। হিতসাধিনী (মাসিক) : ১২৯৮ সাল।

চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইং ১৮৯২

৫৮৯। **বাঁকুড়া দর্পণ** (পাক্ষিক...)। ১৯ মাঘ ১২৯৮।

বাঁকুড়া নগরে ১৮৯০ সনে স্থাপিত মুখার্জ্জি প্রেস হইতে ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২, সোমবার, 'বাঁকুড়া দর্পণ' পাক্ষিক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ইং ১৮৯২ হইতে ১৯৩৭ সনের জুন পর্য্যন্ত রায় সাহেব ডাঃ রামনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক ছিলেন। পরবর্ত্তী কাল হইতে অদ্যাবধি রায় সাহেব ডাঃ রামরবি মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক আছেন।

৫৯০। আশা (মাসিক) : মাঘ ১২৯৮।

পরিচালক—মথুরামোহন গাঙ্গুলী।

৫৯১। মোহিনী (মাসিক) : মাঘ ১২৯৮।

প্রকাশক—কেদারনাথ মিত্র।

৫৯২। মিহির (মাসিক) : জানুয়ারি ১৮৯২।

বিবিধ বিষয়িণী মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—সেখ আবদর রহিম। কিছু দিন পরে ইহার সহিত 'সুধাকর' মিলিত হইয়া 'মিহির ও সুধাকর' নাম ধারণ করে।

৫৯৩। জ্ঞানবিকাশিনী (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৯৮।

পরিচালক—কৃষ্ণকুমার কাব্যরত্ন।

৫৯৪। প্রতিভা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৯।

সম্পাদক—বেণীমাধব দত্ত।

৫৯৫। সদর ও মফঃস্বল (পাক্ষিক) : বৈশাখ (?) ১২৯৯।

তাহিরপুর হইতে রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত।

৫৯৬। **দাসী** (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯৯।

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী মাসিক পত্রিকা। "বঙ্গীয় পুরুষ এবং রমণীগণের হৃদয়ে সেবার ভাব জাগাইয়া দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৫৯৭। অনুশীলন (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯৯।

৭নং রামমোহন সাহার লেন হইতে বান্ধব-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৫৯৮। **মাসিক উপন্যাস**। ১২৯৯।

'অনুসন্ধান'-কার্য্যালয় হইতে ১২৯৯ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত। ইহাতে প্রতি মাসে নূতন নূতন উপন্যাস প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। দামোদর মুখোপাধ্যায় ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ও লেখক ছিলেন।

৫৯৯। **সুচিন্তা** (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৯৯।

"সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত ব্রজধন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সহকারী সম্পাদক—শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" ইহা একখানি সুপরিচালিত মাসিকপত্র। ১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় "সংস্কার" ও ২য় বর্ষের ১ম-৩য় সংখ্যায় "বঙ্গদেশে কৃষকের অবস্থা" নামে সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি রচনা মুদ্রিত হইয়াছে।

৬০০। শ্রীহট্টবাসী (সাপ্তাহিক) : ইং ১৮৯২ (?)।

সম্পাদক—নগেন্দ্রনাথ দত্ত, বি-এল। ১৩০০ সালে—সম্ভবতঃ শ্রাবণ মাসে ইহা শ্রীহট্টের 'পরিদর্শকে'র সহিত মিলিত হইয়া 'পরিদর্শক ও শ্রীহট্টবাসী' নাম ধারণ করে।

ইং ১৮৯৩

৬০১। শিক্ষা-সমালোচনা (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৯৯।

পরিচালক—অবলাকান্ত সেন।

৬০২। **কল্প** (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০০।

সনাতন আর্য্যধর্ম্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশীয় তত্ত্বসভা [থিয়সফিক্যাল সোসাইটি] কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক—রাখালচন্দ্র সেন।

৬০৩। **মুর্শিদাবাদ হিতৈষী** (সাপ্তাহিক)। ১ বৈশাখ ১৩০০।

খাগড়া সয়দাবাদ হইতে প্রকাশিত। প্রথম সম্পাদক—বৈকুণ্ঠনাথ সেন। কিছু দিন পরে বনোওয়ারীলাল গোস্বামী সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ কাল পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়াছিলেন। 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' এখনও প্রতি বুধবার প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৬০৪। **পূর্ণিমা** (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০০।

কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উৎসাহে ও উদ্যোগে" হুগলী সাবিত্রী যন্ত্র হইতে ইহার আবির্ভাব। ইহা প্রতি পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হইত।

৬০৫। **সাথী** (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০০।

সচিত্র শিশু-পত্রিকা। সম্পাদক—ভুবনমোহন রায়। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে ইহার সহিত 'সখা' মিলিত হইয়া 'সখা ও সাথী' নাম ধারণ করে।

৬০৬। তত্ত্ববোধ (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০০।

সম্পাদক—গুরুনাথ সেন কবিরত্ন।

৬০৭। সঙ্গিনী (মাসিক) : আষাঢ় ১৩০০।

"'সজ্জনতোষণী'র অনুগামিনী, ভক্তিগ্রন্থ প্রচারিণী মাসিক পত্রিকা।"

৬০৮। পণ্ডিত (মাসিক) : আষাঢ় ১৩০০।

কামিনীকুমার কবিচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬০৯। **চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ** (সাপ্তাহিক) : ১২ আষাঢ় ১৩০০ (২৫ জুন ১৮৯৩)।

চুঁচুড়া-নিবাসী দীননাথ মুখোপাধ্যায় এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ প্রথম বৎসর হুগলী

সাবিত্রী প্রেসে ছাপা হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমেই দীননাথ স্বয়ং মুদ্রাযন্ত্র ও আবশ্যকমত অক্ষর ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ক্রয় করেন ও পিতার নামানুসারে এই প্রেসের নাম "হীরাযন্ত্র" বা "ডায়মণ্ড প্রেস" রাখেন। হুগলী জেলার অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ ও রাজনীতি সংক্রান্ত নানাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রচার ও আলোচনা করাই এই সংবাদপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

৬১০। লতিকা (মাসিক): আষাঢ় ১৩০০।

প্রকাশক—তারিণীচরণ সিংহ, যশোহর।

৬১১। **লক্ষ্মী ও সরস্বতী সৌভাগ্য পত্রিকা বা নব্যবঙ্গদর্শন** (মাসিক): আষাঢ় ১৩০০।

সঙ্গীত-সাহিত্যাদি সর্ব্ববিষয়ক সার্ব্বজনিক মাসিক পত্র। সম্পাদক—চন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

৬১২। The Bengal Academy of Literature: **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ** (মাসিক···): আগষ্ট ১৮৯৩।

১৮৯৩ সনের ২৩এ জুলাই শোভাবাজারে বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীতে The Bengal Academy of Literature গঠিত হয়। সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণের সহিত সাময়িক সাহিত্যের সমালোচনাদি এবং গবেষণার ফল প্রকাশের জন্য পরবর্ত্তী আগষ্ট মাস হইতে The Bengal Academy of Literature নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করা হইত। সভার কার্য্যবিবরণী ও অধিকাংশ প্রবন্ধাদি ইংরেজীতে মুদ্রিত হইত। সভা-সম্পাদক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী এই মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেন। ১৮৯৪, ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের অধিবেশনে উমেশচন্দ্র বটব্যাল-প্রস্তাবিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নাম গৃহীত হয় এবং পত্রিকাখানি ৮ম সংখ্যা (১৭-৩-১৮৯৪) হইতে শেষ পর্য্যন্ত (১০ম সংখ্যা, ১ জুন ১৮৯৪) "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। The Bengal Academy of Literature" এই নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪, ২৯এ এপ্রিল (১৭ বৈশাখ ১৩০১) তারিখে সভার সভ্যগণ পূর্ব্বোল্লিখিত একাডেমি অব্ লিটারেচার, বর্ত্তমান ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ নামে অভিহিত করেন। এই সময় হইতেই পরিষদের মুখপত্রস্বরূপ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' নামে বাংলা ত্রৈমাসিক পত্র রজনীকান্ত গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশের সূচনা হয়।

৬১৩। ছাত্রসহচর (মাসিক): ভাদ্র ১৩০০।

কুড়িগ্রাম, রংপুর হইতে প্রকাশিত। পরিচালক—রামচন্দ্র দেব ও মন্মথনাথ সিংহ।

৬১৪। **চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ** (মাসিক): আশ্বিন ১৩০০।

সম্পাদক—দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩০২) হইতে ইহা কেবল 'সমীরণ' নামেই প্রকাশিত হইতে থাকে।

৬১৫। ভারত বান্ধব (মাসিক): আশ্বিন ১৩০০।

"লালবর্ণের ডিমাই একখানি কাগজ। কানাইলাল দে এণ্ড কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত।···এখানি বিবিধ চুট্‌কি উদ্ধৃত কথায় পরিপূর্ণ।" ইহার ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয়—পর-বৎসর আশ্বিন মাসে।

৬১৬। হিন্দু-সুহৃদ্ (মাসিক): কার্ত্তিক ১৩০০।

বাগবাজার হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা হইতে প্রকাশিত ধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক পত্র। সম্পাদক—শ্যামলাল গোস্বামিসিদ্ধান্ত-বাচস্পতি।

৬১৭। তৃপ্তি (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১৩০০।

সম্পাদক—কালীচরণ মিত্র।

৬১৮। বিকাশ (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১৩০০।

৬১৯। শান্তি (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১৩০০।

পরিচালক—মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি।

৬২০। **পুরোহিত** (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১৩০০।

সম্পাদক—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

৬২১। **বীণাপাণি** (মাসিক): অগ্রহায়ণ ১৩০০।

সম্পাদক—রামগোপাল সেনগুপ্ত।

৬২২। **নববিধান** (মাসিক): পৌষ ১৩০০।

সম্পাদক—চিরঞ্জীব শর্ম্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল)।

ইং ১৮৯৪

৬২৩। জগদ্ধাত্রী (মাসিক): মাঘ ১৩০০।

সম্পাদক—রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

৬২৪। ঊষা (মাসিক): মাঘ ১৩০০।

ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত।

৬২৫। হীরা (মাসিক): ফাল্গুন (?) ১৩০০।

ব্রাহ্মণবেড়িয়া হইতে রজেন্দ্রচন্দ্র বর্দ্ধন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬২৬। গৃহস্থ সুহৃদ্ (ত্রৈমাসিক): ফাল্গুন ১৩০০।

পরিচালক—রামকুমার নাথ।

৬২৭। **সুহৃদ্** (মাসিক): বৈশাখ ১৩০১।

ইডেন হিন্দু হষ্টেলের সুহৃদ্-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক—রমণীমোহন ঘোষ। "দেশের যুবকদিগের হৃদয়ে সাহিত্যানুশীলনের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবার জন্যই 'সুহৃদ্' জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দীনেন্দ্রকুমার রায়, রজনীকান্ত সেন প্রভৃতির রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

'সুহৃদে' মাঝে মাঝে দু-একটি ইংরেজী প্রবন্ধও স্থান পাইত। প্রথম বর্ষের পত্রিকায় যদুনাথ সরকারের "The Fall of Tipu Sultan" (I-III) ও "The New Leaven in Bengal. [An Appreciation of Babu Robindranath Tagore's Short Stories" মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা 'সুহৃদে' যদুনাথের প্রথম বাংলা রচনা—"হরিদ্বার ও কুম্ভমেলা ৮১ বৎসর পূর্ব্বে" প্রকাশিত হয়।

৬২৮। **বিজ্ঞান** (মাসিক): বৈশাখ ১৩০১।

ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল অ্যাসোসিয়েশনের আনুকূল্যে প্রকাশিত। সম্পাদক—টি, এন্, মুখার্জ্জী (ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়)।

৬২৯। জ্যোতিঃ (মাসিক): বৈশাখ ১৩০১।

৬২৯ক। আদরিণী (মাসিক): বৈশাখ ১৩০১।

সম্পাদক—বিশ্বময় চট্টোপাধ্যায়।

৬৩০। **হিন্দু-পত্রিকা** (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০১।

যশোহর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—যদুনাথ মজুমদার, এম, এ, বি, এল। "হিন্দুপত্রিকায় হিন্দুধর্ম্ম-সমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী প্রবন্ধ থাকিবে। বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধারণকে অবগত করাইবার জন্যই হিন্দুপত্রিকা প্রকাশিত হইল।" ইহা একখানি দীর্ঘজীবী পত্রিকা।

৬৩১। **বাসনা** (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০১।

চুঁচুড়া "বাসনা সমিতি"র তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত।

৬৩২। **সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা** (ত্রৈমাসিক) : শ্রাবণ ১৩০১।

Bengal Academy of Literature প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

৬৩৩। কৌমুদী (পাক্ষিক) : ২৩ শ্রাবণ ১৩০১।

"কৌমুদী (দ্বিতীয় পক্ষ)—সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মতত্ত্ব, সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান এবং সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধীয় পাক্ষিক পত্রিকা।" ইহাতে বিপিনচন্দ্র পালের কয়েকটি রচনা মুদ্রিত হইয়াছে।

৬৩৪। অবোধবোধিনী (মাসত্রয়িক) : শ্রাবণ ১৩০১।

বেলগাছিয়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শরচ্চন্দ্র দেব।

৬৩৫। নন্দী (মাসিক) : ভাদ্র ১৩০১।

সৈদাবাদ, বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। হাস্যরসপ্রধান পত্রিকা সম্পাদক—অযোধ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬৩৬। সর্ব্বমঙ্গলা (মাসিক) : ভাদ্র ১৩০১।

সম্পাদক—দীননাথ তর্কপঞ্চানন।

৬৩৭। জ্যোৎস্না (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০১।

পরিচালক—রমণীমোহন মল্লিক।

৬৩৮। **অনুশীলন** (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০১।

তত্ত্বাবধায়ক—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। পত্রিকার প্রথম ভাগ চৈত্র-সংখ্যাতেই শেষ হয়। ইহার সহিত 'পুরোহিত' সম্মিলিত হইয়া, দ্বিতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩০২) হইতে 'অনুশীলন ও পুরোহিত' নাম ধারণ করে।

৬৩৯। প্রভা (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০১।

টালা—কাশীপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী।

৬৪০। ত্রিপুরা প্রকাশ (সাপ্তাহিক ?) : ১৩০১ সাল।

৬৪১। প্রভা (মাসিক) : পৌষ (?) ১৩০১।

নিলা, ২৪-পরগণা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

ইং ১৮৯৫

৬৪২। শিক্ষাদর্পণ (মাসিক) : পৌষ ১৩০১ (জানুয়ারি ১৮৯৫)।

সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন। প্রথম সংখ্যায় রমেশচন্দ্র দত্তের একটি রচনা মুদ্রিত হইয়াছে।

৬৪৩। চিকিৎসক ও সমালোচক (মাসিক) : মাঘ ১৩০১।

"চিকিৎসা বিষয়ক, সাহিত্য, কবিতাদি, জ্যোতিস, উপন্যাস প্রভৃতি নানা বিষয়িণী প্রবন্ধ এই পত্রিকায় আলোচিত ও প্রকাশিত হইবে বলিয়া উহা উপরোক্ত নামধেয় হইল।" সম্পাদক—ডাঃ সত্যকৃষ্ণ রায়।

৬৪৪। সচিত্র কৃষিতত্ত্ব ও ভারতবন্ধু (মাসিক): মাঘ ১৩০১।

সম্পাদক—নবীনচন্দ্র সাহা।

৬৪৫। জ্যোৎস্না-হার (মাসিক) : মাঘ ১৩০১।

চুঁচুড়া, চৌমাথা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

৬৪৬। দর্শক (সাপ্তাহিক) : মাঘ (?) ১৩০১।

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত ; 'চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ' পত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী।

৬৪৭। **ধরণী** (মাসিক) : মাঘ ১৩০১।

সম্পাদক—ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মলুটী রাজবাটী—সাঁওতাল পরগণা। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রমুখ লেখকবর্গের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত।

৬৪৮। বেদ (মাসিক) : ফাল্গুন ১৩০১।

হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—কেদারনাথ দেবশর্ম্ম-বিদ্যাবিনোদ।

৬৪৯। আয়ুর্ব্বেদ প্রচার (মাসিক) : ফাল্গুন ১৩০১।

সম্পাদক—বিনোদলাল সেন।

৬৫০। আভা (মাসিক) : ফাল্গুন ১৩০১।

বগুড়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—মহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমিদার।

৬৫১। **প্রতিধ্বনি** (মাসিক) ; বৈশাখ ১৩০২।

"সাময়িক পত্রের সারবান প্রবন্ধগুলি উদ্ধৃত করিয়া 'প্রতিধ্বনি' আপনার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।...সকল সাময়িক পত্রের পাঠের ফল যাহাতে পাঠকেরা অল্প ব্যয়ে লাভ করিতে পারেন, 'প্রতিধ্বনি' সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।" স্বত্বাধিকারী—রাধাগোবিন্দ প্রামাণিক।

৬৫২। **হিতৈষী** (সাপ্তাহিক) : ২৫ বৈশাখ ১৩০২।

সম্পাদক—কালীচরণ মিত্র। "স্বদেশের ও মাতৃভাষার হিতসাধনই 'হিতৈষী'র ধ্রুব লক্ষ্য।"

৬৫৩। মেডিক্যাল ইন্টেলিজেন্সার (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০২।

চিকিৎসা বিষয়ক বাংলা মাসিকপত্র।

৬৫৪। জননী (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০২।

সয়দাবাদ, মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত। পরিচালক—বামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

৬৫৫। সুচিন্তা (ত্রৈমাসিক) : বৈশাখ (?) ১৩০২।

"'ভারতবর্ষীয় বেদ সমিতি ও তত্ত্ববিদ্যালয়' হইতে প্রকাশিত। এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য বেদ প্রচার। পত্রিকার শেষার্দ্ধ ভাগ পুনর্মুদ্রিত ঋগ্বেদ ; প্রথমার্দ্ধ ভাগ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে পরিপূর্ণ।"

৬৫৬। **বগুড়া দর্পণ** (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১৩০২ (?)।

১৩০২ সালের গোড়াতেও এই পত্রিকার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

৬৫৭। মুকুল (মাসিক) : আষাঢ় ১৩০২।

উচ্চাঙ্গের সচিত্র শিশুপত্রিকা। সম্পাদক—শিবনাথ শাস্ত্রী।

৬৫৮। ভারতভূমি (মাসিক) : আষাঢ় ১৩০২।

পরিচালক—বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী।

৬৫৯। **সৌরভ** (মাসিক) : শ্রাবণ ১৩০২।

সম্পাদক—নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ; সহ-সম্পাদক—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। শোভাবাজার রাজবাটী হইতে প্রকাশিত। পরমায়ু—তিন মাস। ইহাতে গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল।

৬৬০। **মহিলা** (মাসিক) : শ্রাবণ ১৩০২।

সম্পাদক—ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। "স্বদেশের সতী আর্য্যনারী-দিগের উচ্চ জীবন ও সুনীতিকে আদর্শ করিয়া জাতীয়ভাবে নারীচরিত্র গঠন ও সংশোধন এবং সমুন্নত করিতে প্রথম হইতে মহিলা পরামর্শ দান ও যত্ন করিয়া আসিয়াছেন, চিরকাল সেইরূপ যত্ন করিবেন তাঁহার এই সঙ্কল্প। বঙ্গীয় নারীমণ্ডলীতে যে সকল কুসংস্কার ও অনীতি এবং দূষিত আচার ব্যবহার বদ্ধমূল হইয়া আছে এবং বিজাতীয় অন্তঃসারশূন্য বিলাসাড়ম্বর প্রবেশ করিতেছে, চিরকাল মহিলা সেই সকলের প্রতিবাদ করিবেন, ধর্ম্ম, সুনীতি ও সদাচারের এবং নারীপ্রকৃতির অনুযায়িনী সংশিক্ষায় সমর্থন করিবেন, মহিলার এই সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্য।"

৬৬১। অরুন্ধতী (মাসিক) : শ্রাবণ ১৩০২।

বরাহনগর কাশীপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ।

৬৬২। নদিয়াবাসী (মাসিক) : ভাদ্র ১৩০২।

পরিচালক—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, অনন্তপুর, নদীয়া।

৬৬৩। মোহিনী (মাসিক) : ভাদ্র ১৩০২।

সম্পাদক—বিমলাচরণ রায়চৌধুরী।

৬৬৪। সুদর্শন (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০২।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত ভৌমিক।

৬৬৫। দীপ্তিপ্রকাশিকা (মাসিক) : কার্ত্তিক ১৩০২।

সম্পাদক—বি. এম. সাহা।

৬৬৬। বঙ্গ-জীবন (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১৩০২।

সম্পাদক—তারিণীচরণ সেন।

ইং ১৮৯৬

৬৬৭। সাহিত্য-সেবক (মাসিক) : পৌষ ১৩০৩ (জানুয়ারি ১৮৯৬)।

"শিল সাহিত্য সভা" কর্ত্তৃক পরিচালিত।

৬৬৮। বাণিজ্য-দর্পণ (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন (?) ১৩০২।

"বাণিজ্য-বিষয়ক সংবাদপত্র।"

৬৬৯। শৈশবসখা (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০৩।

সম্পাদক—গুরুপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

৬৭০। আর্য্য সুহৃদ পত্রিকা (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১৩০৩।

৬৭১। পারিজাত (মাসিক) : আষাঢ় ১৩০৩।

সম্পাদক—রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।

৬৭২। তত্ত্বজ্ঞান (মাসিক) : আষাঢ় ১৩০৩।

সম্পাদক—তারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

৬৭৩। **শৈবী** (মাসিক) : আষাঢ় ১৩০৩।

কুমারখালি হইতে প্রকাশিত; তন্ত্রশাস্ত্র-বিষয়ক পত্রিকা। সম্পাদক—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

৬৭৪। **ব্রহ্মতত্ত্ব** (ত্রৈমাসিক) : ১৩০৩ সাল।

"ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।" সম্পাদক—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

৬৭৫। **অদৃষ্ট** (মাসিক) : শ্রাবণ ১৩০৩।

"জ্যোতিষ—সামুদ্রিক, শিরোবিজ্ঞান, মূর্ত্তিবিজ্ঞান সংক্রা মাসিক পত্রিকা।" সচিত্র। সম্পাদক—রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

৬৭৬। ভারতীয় যন্ত্রমন্দির (মাসিক) : শ্রাবণ ১৩০৩।

সম্পাদক—রাজঋষি সিদ্ধেশ্বর।

৬৭৭। রমণী (মাসিক)। ১৩০৩ সাল।

সম্পাদক—চারুচন্দ্র রায়। "নূতন কলিকাতা প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

৬৭৮। কৌতুকা (মাসিক) : ১৩০৩ সাল।

রঙ্গরসপূর্ণ পত্রক।

৬৭৯। **বসুমতী** (সাপ্তাহিক)। ১০ ভাদ্র ১৩০৩।

ইহা সাপ্তাহিক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়—২৫ আগষ্ট ১৮৯৬ তারিখে। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয় :—

> "প্রতি দিনই বাঙ্গলা সংবাদপত্রের গ্রাহকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়া বোধ হয়, অতৃপ্তহৃদয় পাঠকবৃন্দ যেন কোন্ পত্রে মনোমত প্রবন্ধ পাইবেন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।...এই অভাব যথাসাধ্য মোচনার্থ চেষ্টা করিবার জন্যই 'বসুমতী' প্রচারিত হইল। সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয় রাজনীতিও ইহাতে থাকিবে, দেশের অভাব-অভিযোগাদির কথাও থাকিবে। তদ্ভিন্ন ইতিহাস, দেশ-নগরাদির বিবরণ, চাষবাসের কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, হিন্দুর পুরাতন মহিমার কথা, ধর্ম্মশাস্ত্রাদির কথা, উপন্যাস, রঙ্গরহস্য প্রভৃতি সুখপাঠ্য বিষয় থাকিবে। অন্নপ্রাণ বাঙ্গালী অবসন্ন প্রাণে যাহাতে দুটা সুখের কথা, দুটা অর্থের কথা, দুটা উপায়ের কথা, দুটা আশার কথা, দুটা হাসির কথা পড়িতে পায়, বসুমতীতে প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টা করা যাইবে।"

প্রথমাবস্থায় 'বসুমতী'র কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন—জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ, ১১৮ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা। ইহা "কলিকাতা নূতন মেসিনপ্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হইত। প্রথমে ব্যোমকেশ মুস্তফী এবং পরবর্তী পৌষ হইতে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কিছু দিন 'বসুমতী' সম্পাদন করেন বলিয়া জানা যায়। গোড়া হইতেই গ্রাহকবর্গকে বিনামূল্যে "মূল্যবান পুস্তকাবলী, চিত্রাবলী, সৌভাগ্য উপহার" দানের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এ প্রথা বসুমতীই বোধ হয় প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। 'বসুমতী'র গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

৬ আগষ্ট ১৯১৪ (২১ শ্রাবণ ১৩২১) 'বসুমতীর' দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদনায় 'মাসিক বসুমতী' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। *

---

* ১৩৫৭ সালের 'শারদীয়া বসুমতী'তে (পৃ. ৪৮-৫০) আমি 'বসুমতী' সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

শেষ

বিজয়া

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শারদোৎসব—শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব। বিজয়া—শ্রীরামচন্দ্রেরই বিজয়োৎসব। বাল্মীকি রামায়ণে দেখিয়াছি—শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য রঘুবংশের আদি পুরুষ সূর্য্যদেবকে স্মরণ করিতেছেন। "আদিত্যহৃদয়" জপ করিয়া সূর্য্যদেবের প্রসন্নতা অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিক মতে রামচন্দ্র রাবণ বধে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য শরৎকালে অকাল বোধন পূর্ব্বক জগজ্জননী মহামায়াকে জাগরিত করেন। পূজায় তাঁহার তুষ্টি বিধানপূর্ব্বক রাবণ বধের বর প্রাপ্ত হন। কবি কৃত্তিবাসের কৃপায় সেকালের বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধ নরনারী রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কথা জানিত। বটতলার ছাপা রামায়ণে লেখা থাকিত—"মতান্তরে রাবণ অম্বিকাকে স্মরণ করেন"। রামচন্দ্র দেবীর অকাল-বোধন করিয়াছেন। "অবনীতে দেবীদহে নীলপদ্ম আছে" জানিয়া পবননন্দনকে এক শত আট নীলপদ্ম আনিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। হনুমান গণিয়া গণিয়া এক শত আটটি নীলপদ্ম তুলিয়া আনিয়াছেন। নবমী পূজার দিন সংকল্প করিয়া দেবীপদে অষ্টোত্তর-শত সংখ্যক নীলপদ্ম সমর্পণ করিতে গিয়া রামচন্দ্র দেখিলেন একটি পদ্ম কম পড়িতেছে। দেবীদহেও আর নীলপদ্ম নাই। সর্ব্বনাশ—সংকল্প ভঙ্গ হয় যে! রাম তখন স্থির করিলেন, কেন, লোকে তো আমায় "কমল-নয়ন" বলে। তাহা হইলে আমার একটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া মাতৃপদে দিয়া আমি সংকল্প রক্ষা করি। এই ভাবিয়া রাম যেমন ধনুর্ব্বাণ লইয়া একটি চক্ষু উৎপাটিত করিবেন, অমনই দেবী সদয়া হইয়া ধনুর্ব্বাণ শুদ্ধ রামের হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি পদ্ম লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, এই লও সংকল্প পূর্ণ কর। পূজাশেষে দেবী রাবণ বধের বর দিলেন। এ সব কথা রামায়ণ-গায়কের ও কথকগণের নিকট শুনিয়া শুনিয়া সে-কালের সকলেই প্রায় মুখস্থ বলিতে পারিত। তেমনই বলিতে পারিত এই বিজয়া,—কিসের বিজয়া, কাহার বিজয়া।

সেকালে প্রাচীনগণের মুখে শুনিতাম—"রামচন্দ্র দুর্গাপূজা করিবেন, কিন্তু লঙ্কায় পুরোহিত কোথায়? তখন নারদ আসিয়া পরামর্শ দিলেন, ঋষিগণের মধ্যে বিশ্রবা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাবণ নিশ্চয়ই সদ্ব্রাহ্মণ, অতএব তুমি তাঁহাকেই পৌরোহিত্যে বরণ কর। রামচন্দ্র শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং নিজে গিয়া রাবণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। রাবণ পুরোহিতের কার্য্য সম্পাদন করিলেন, নিজের বধের সংকল্প-মন্ত্র রচনাপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে পাঠ করাইলেন। দশমীর দিন দেবীর বিসর্জ্জনান্তে দেবীর বরে রামের হস্তে রাবণ নিহত হইলেন। কিন্তু রাবণ তো একেবারেই মরিয়া যান নাই। রামকে উপদেশ দিবার জন্য এক দিন বাঁচিয়াছিলেন। রাবণ রণক্ষেত্রে পতিত হইলে রামচন্দ্র দেবীপ্রতিমা বিসর্জ্জনের আয়োজন করিলেন। বিভীষণের দলের রাক্ষস ও রামচন্দ্রের সৈন্য বানরগণ মিলিয়া দেবীপ্রতিমা সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিলেন। রাক্ষসে বানরে মিলিয়া বিসর্জ্জনের দিন যেরূপ নৃত্যগীত করিয়াছিল, বিজয়ার দিন আজিও তাহারই অনুষ্ঠান হয়"।

কালিকা পুরাণে বিজয়ার অন্য নাম শাবরোৎসব। শবর জাতি প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিল, উৎসবে মাতিয়াছিল। বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহাই প্রাধান্য লাভ করায় হয়তো বিজয়ার নাম শাবরোৎসব হইয়াছে। কালিকা পুরাণ—আসাম-কামরূপের পুরাণ। প্রাচীন কালে আসামেরই একাংশ মহাচীন নামে অভিহিত হইত। শবর, পুলিন্দ, কবচ (কোচ) প্রভৃতি জাতি আসামের অধিবাসী ছিল। তাহাদের কোন আচার-অনুষ্ঠান বিজয়ার সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকা অসম্ভব নহে। কালিকা পুরাণে দেবীর বিসর্জ্জন সময়ে অশ্লীল শব্দোচ্চারণের সুস্পষ্ট বিধি আছে। নৃত্য গীত জলক্রীড়া আদিও উৎসবের অঙ্গ। যৌবনে বহু পল্লীগ্রামে দেখিয়াছি—কোথাও মহাষ্টমী মহানবমী সন্ধি বলিদানের পর, কোথাও নবমী পূজার দিন বলিদান শেষ হইয়া গেলে তথাকথিত ইতর-ভদ্র সকলে মিলিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট রাস্তা দিয়া বা কোন নির্দ্দিষ্ট পাড়ায় গিয়া অশ্লীল গান গাহিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। প্রকাশ্য দিবালোকেও এ জন্য কাহাকেও লজ্জিত হইতে দেখি নাই। বহু দিন হইল এ সব নাচ-গান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে দূর পল্লীগ্রামে কোথাও এখনো এই প্রথা চলিত আছে কি না জানি না।

পশ্চিমাঞ্চলে বিজয়া দশমী 'দশেরা' নামে পরিচিত। প্রায় পনের-কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে মধ্য-ভারতের তদানীন্তন করদ-মিত্ররাজ্য ছতরপুরের মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহ বাহাদুরের আমন্ত্রণে কয়েক বৎসর দুর্গাপূজা ও দোলযাত্রার সময় ছতরপুরে যাতায়াত করিয়াছিলাম। বিজয়া দশমার দিন মহারাজা শোভাযাত্রা সহ একটা নির্দ্দিষ্ট প্রান্তরে উপস্থিত হইতেন। আমি যে কয় বৎসর উপস্থিত ছিলাম দেখিয়াছি, গাড়ীতে সর্ব্বাগ্রে মহারাজা, তাহার পশ্চাতে অনুরূপ যানে মহারাজার গুরুপুত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনের পরম ভাগবত প্রভুপাদ শ্রীল গৌরগোপাল ভাগবত-ভূষণ, তাহার পর রাজ্যের দেওয়ান, সেনাপতি ও সর্দ্দারগণ স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে মোটর গাড়ীতে ও ঘোড়ার গাড়ীতে শোভাযাত্রায় যোগদান করিতেন। দুই পার্শ্বে ঘোড়সোয়ার ও চোপদারের দল; সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের অপর জনসাধারণ; জনতা মন্দ হইত না। গিয়া দেখিতাম, প্রান্তরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বৃহদাকার রাবণ-মূর্ত্তি নির্ম্মিত রহিয়াছে। দুইটি বালক রাম-লক্ষ্মণ সাজিয়া তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছে। এক জন হনুমান সাজিয়া নানারূপে লোক হাসাইয়া ফিরিতেছে। অতঃপর বারোটি তোপধ্বনি হইত, (বৃটিশের নিকট মহারাজার তের তোপের সম্মান ছিল) এবং রাবণের মূর্ত্তিতে হনুমান আগুন ধরাইয়া দিত। বাড়ী ফিরিয়া সকলে পরস্পর পরস্পরকে যথাযোগ্য নমস্কার-আলিঙ্গন করিত। বিজয়ার দিন সকালে এক দল লোক নীলকণ্ঠ পাখী হাতে লইয়া মহারাজাকে দেখাইতে আসিত। মহারাজা তাহাদের হাতে টাকা দিয়া পাখীটি ছাড়িয়া দিতে বলিতেন। ধীবর ত্রয়োদশ জাতি মাছ দেখাইয়া পয়সা লইয়া যাইত। এইরূপ উৎসব না কি উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-ভারতের সর্ব্বত্রই অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজগণ এই দিন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন।

যদিও বাঙ্গলার বিজয়া অনুষ্ঠানের সঙ্গে তথাকথিত আর্য্য-অনার্য্যের বহু আচার-অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তথাপি বাঙ্গলার বিজয়া একান্ত আনন্দোৎসব নহে। এই আনন্দের মধ্যে দুঃখের অন্তঃসলিলা একটা সূক্ষ্ম ধারা অনুস্যূত থাকে। "পূজা" বলিলে বাঙ্গলায় দুর্গাপূজা ভিন্ন অন্য কিছু বুঝায় না। দশভুজা দুর্গাপ্রতিমার

পূজা বাঙ্গালী ভিন্ন অপর কেহ করেও না। বাঙ্গালী ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পূজার চারি দিন সকল দুঃখ সকল বেদনা ভুলিবার চেষ্টা করে। অতি বড় দরিদ্রও চারি দিনের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখে, যৎসামান্য মিষ্টান্নের আয়োজন করে। নিজেরা না পারে, ছেলে-মেয়েদের জন্য নূতন বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনে। আনন্দময়ীর আগমনে বাঙ্গলা যেন আনন্দে মাতিয়া উঠে। তাই বিজয়ার দিন বাঙ্গালীর দুঃখের দিন। মা চলিয়া গেলেন, আবার সেই নিত্যকার বাস্তব সংসার, সংগ্রামময় দৈনন্দিন জীবন, অভাব-অনটন! কিন্তু দুঃখ কি শুধু এই জন্য? তাহা তো নয়। বাঙ্গালী এই জগতের জননীকে আপন তনয়ারূপে গ্রহণ করিয়াছে। কন্যার পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় কন্যা যে বয়সেরই হউক এবং শ্বশুর যত ধন-সম্পদসম্পন্নই হউন, আনন্দের মধ্যেও যে অন্তর্গূঢ় বেদনা জনকজননী, ভ্রাতা-ভগিনী, বন্ধু-প্রতিবেশীর সঙ্গে তনয়ার চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত করে, বিজয়ার দিন সেই বেদনাতেই বাঙ্গালীর হৃদয় ভাবাক্রান্ত হয়। নিকটবর্ত্তী নদী, সরোবর অথবা পুষ্করিণীতে নবপত্রিকা বিসর্জ্জনে বাহির হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার-অনুষ্ঠানগুলি দেখিলেও এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

প্রণামের প্রবাহ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। কিন্তু বিজয়ার রাত্রের সে আনন্দ হয়তো মরণের দিনেও মনে পড়িবে। অর্দ্ধ রাত্রি হইয়া গিয়াছে, প্রণাম এবং কোলাকুলি আর ফুরায় না। প্রত্যেক বাড়ীতে যাইতে হইবে, যাঁহারা প্রণম্য, ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাদের পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিতে হইবে। আর মিষ্টমুখ,—মিষ্টমুখ না করিয়া উপায় ছিল না। কত বাদ-বিসম্বাদ দলাদলি এই দিনে মিটিয়া গিয়াছে, কত পর আপন হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষানুক্রমিক বিবাদও এই একটি দিনের জন্য বন্ধ থাকিত। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে যাহার যেমন আছে সাজিয়া দলে দলে নর-নারী প্রতিমা দর্শনে বাহির হইত। সেকালে এই দিন হিন্দু-মুসলমান বলিয়া কোন পার্থক্য ছিল না। বিসর্জ্জনের পর তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর নর-নারী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বাড়ীতে প্রণাম করিয়া আঁচল ভরিয়া মুড়ি-মুড়কি ও মিঠাই লইয়া যাইত। মুসলমান বালক যুবক ও প্রবীণের দলও মিঠাই-মুড়কি লইতে লজ্জা বোধ করিত না। গ্রামে পূজা না থাকিলে নিকটবর্ত্তী তিন-চারিখানি গ্রাম হইতেও লোক আসিয়া বিসর্জ্জন দেখিয়া যাইত।

সুদিনে যে সিদ্ধি ও অপরাজয় বাঙ্গালীর করতলগত ছিল, বিজয়ার দিন বাহুতে অপরাজিতা লতার বলয় বান্ধিয়া এবং শিবের প্রসাদ সিদ্ধি খাইয়া লোকে এখন তাহার অনুবর্ত্তন করে। কবিরাজী অভিধানে সিদ্ধির অপর নাম বিজয়া।

হিন্দুর প্রতিমার্চ্চন যে পুতুল-পূজা নহে, এই বিজয়াই তাহার সুন্দর উদাহরণ। এই তিন দিন প্রতিমাকে ঘেরিয়া ভাস্কর্য্য ও অপর ললিতকলার সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। কত দিন ধরিয়া কত আয়োজন, কত উদ্বেগ! দুগ্ধে নবনীতের মত শক্তিরূপিণী যে দেবী স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বভূতে বিসর্পিত রহিয়াছেন, অয়স্কান্তে কেন্দ্রীভূত সূর্য্যকিরণের মত আপনার মর্ম্মকোষ হইতে বাহির করিয়া প্রতিমায় যাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, পুনরায় তাঁহাকে হৃদয়ে প্রত্যানয়ন পূর্ব্বক সেই প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে তো এতটুকু দ্বিধা করিলাম না। এই রহস্য বুঝিতে পারে না বলিয়াই না নিন্দুকের এমন ভেক-কোলাহল! তাই বিসর্জ্জন না বলিয়া বলি বিজয়া। জীবন-যুদ্ধে সাধন-সমরে সর্ব্বত্রই জয়দাত্রী বলিয়াই দেবীরও অপর নাম বিজয়া। জয়া-বিজয়া দেবীর সহচরী। এমন দেবীর নিকট হইতে যদি জয় অর্জ্জিত না হয় সে তোমার সাধনার দোষ, কর্ম্মের ত্রুটি, পূজায় নিষ্ঠার অভাব। যে আবাহন করিতে জানে, সে বিসর্জ্জনও দিতে পারে। বিসর্জ্জন দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাও তো করিলাম—"সম্বৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।"

কাইজার-দর্শন

তখন যুদ্ধ চলেছে। চিকাগোতে জরুরী অধিবেশনে যোগদান করতে যাবেন হেনরী কাইজার। ন্যাশানাল এয়ারপোর্টে বিমানে আরোহণ করেছেন কাইজার। বিমানে অত্যন্ত স্থানাভাব। অতি কষ্টে বসতে জায়গা পেয়েছেন। ইতিমধ্যে এক জন মেজর বিমানে উঠলেন। মেজর, তাঁর দাবী প্রথমে স্বীকৃত হবে। কাইজারকে উঠতে হ'ল জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য। বিমান ছাড়লে বিমান-রক্ষাকর্ত্রী হঠাৎ মেজরকে জানালেন যিনি মেজরের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত নাম।

মেজর শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন,—কাইজার! আমি তবে যে চিকাগোতে চলেছি কেবল কাইজারকেই দেখতে!

রূপ রচনার রুচিরাগ
রূপের কলিকে সৌন্দর্য কুসুমে বিকশিত করে তোলাই এই প্রসাধনীর সাধনা। রূপ সাধকসাধিকাদের নিকট তাই চিরকাম্য এই সৌন্দর্য্যের সুরম্য সম্ভার।
মার্গো সোপ
নিম টুথ পেষ্ট
ভৃঙ্গল
সুবাসিত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল
লাবানি স্নো ও ক্রীম
কান্তা
মনোমদ গন্ধসার
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

(Uncle Tom's Cabin গ্রন্থের লেখিকা হ্যারিয়েট বীচার ষ্টাউ লিখিত)

এ্যাণ্ডোভার

মাননীয়া ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৩

আপনার পত্রের উত্তর লিখতে বসেছি তাড়াতাড়ি। সব চেয়ে মজার কথা হোল, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় বহু দিনের এবং শৈশবে ছোটদের জন্য লেখা আপনার কবিতাগুলি হামেশাই পড়তুম।

সে সময় প্রায়ই আপনি যে আনন্দ বিতরণ করেছেন তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি লেখার খুবই লোভ হোত আমার।

আপনি জানতে চেয়েছেন আমি কেমন মেয়ে। বেশ তো, এ যদি জানবার মত এমন কিছু হয়, বিনামূল্যেই তার হিসেব পাবেন আপনি। সুরুতেই বলে রাখি আমি সামান্য মেয়েই মাত্র। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছি—দেখতে রোগা একটুকুন। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলিতেও এমন কিছু সুন্দর ছিলাম না দেখতে, আমি আর এখন চেহারা তো পুরানো আসবাবের সামিল।

পঁচিশ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয় এমন এক জন লোকের সঙ্গে যিনি গ্রীক, হিব্রু, লাটিন ও আরবী ভাষায় অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তা ছাড়া আর কোন বিষয়ে তাঁর ঐশ্বর্য ছিল না। আমার গৃহস্থালীর উদ্যোগপর্বে বসার ঘর ও রান্না-ঘরের জন্য যে চিনামাটির বাসন কিনেছিলাম, তার দাম ছিল মাত্র এগার ডলার। দু'বছর তা দিয়ে বেশ চলেছিল। তার পর এক দিন আমার ভাই বিয়ে করে তার বৌ দেখাতে নিয়ে এলে আমি আমার পুঁজির হিসেব-নিকেশ করতে গিয়ে দেখি, বাপের বাড়ীর লোক-জনদের আপ্যায়ন করবার উপযোগী কাপ-প্লেট কিছুই অবশিষ্ট নেই ঘরে। তখন ভাবলাম, দশ ডলার খরচা করে এক প্রস্থ টী-সেট কিনে গৃহস্থালীর পুঁজি বাড়ানো দরকার। আমার মনে হয়, বহু বছর ধরে এই ছিল আমার গৃহস্থালীর যা কিছু পুঁজি।

কিন্তু সে সময় আমি সম্পূর্ণ আর এক ধরণের ধনে অতুল ধনবতী ছিলাম। দু'টি যমজ মেয়ে হয়েছিল আমার প্রথম। নরম ফুলের মত মেয়ে। কোঁকড়ান তাদের রেশমের মত চুল। সন্তান ভাগ্য আমার ভালই ছিল। আমি সাতটি সন্তানের জননী হবার সৌভাগ্য লাভ করি। এদের মধ্যে সব চাইতে সুন্দর সব চাইতে প্রিয় যেটি, বাড়ীর নিকটে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। তারই মৃত্যুশয্যায় ও সমাধি-ভূমিতে বসে প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম, গরীব হতভাগিনী দাসী মাতার নিকট হতে পেটের সন্তানকে ছিনিয়ে নিলে তার প্রাণে কতখানি আঘাত লাগে। সেই অপরিমেয় দুঃখের সময় ভগবানের কাছে আমি একমাত্র মিনতি জানিয়েছি যে, এত দুঃখ ভোগ আমার যেন বৃথা না যায়। তার মৃত্যুকালে এমন বিশেষ সন্তাপ পেয়েছিলাম যাকে নির্মম যন্ত্রণাই বলা যায়। তখন ভেবেছিলাম, মন বুঝি কিছুতেই প্রবোধ মানবে না যতক্ষণ না হৃদয়ের এই নিপীড়ন মহৎ মঙ্গলময় পরম হিতকর কিছু করতে প্রবুদ্ধ করতে পারবে আমায়।

[illegible] কারণ অনেক সময় আমার মনে হয়েছে Uncle Tom's Cabin এ যা-যা লেখা আছে, সেই গ্রীষ্মের তীব্র বেদনা বহু মর্মান্তিক ঘটনাই তার মূলে। আজকে আর মনের উপর তার কোন দাগই নেই—শুধু মায়েরা যখন তাদের সন্তানের নিকট হতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তাদের প্রতি আন্তরিক করুণা ও মমতা জাগে মাত্র। দীর্ঘকাল দারিদ্র্য, রোগ-ভোগ এবং প্রাণশক্তি-ক্ষয়কারী উষ্ণ আবহাওয়ার সাথে সংগ্রাম করে আমার ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে। নার্সারী আর রান্না-ঘর এই দুইটিই ছিল আমার কর্মক্ষেত্র। আমার ভোগান্তি দেখে আমার কয়েক জন বন্ধু-বান্ধব দয়াপরবশ হয়ে আমার লেখা টুকে পাঠিয়ে দিত আমার নামে বার্ষিক সংকলনে আর সম্পাদকরা দরাজ হাতে টাকা দিতেন। এই ভাবে প্রথম পাওয়া টাকা দিয়ে আমি পালকের একটি খাট কিনেছিলাম। যেহেতু দরিদ্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে এবং বিয়েতে কোন যৌতুক পাইনি আর আমার স্বামীরও বিপুল সংখ্যক পুস্তকের বিরাট গ্রন্থাগার আর পাণ্ডিত্য ছাড়া কিছু ছিল না—শয্যা আর উপাধানে অর্থ ব্যয় করাটাই সব চেয়ে কার্যকরী মূলধন বিনিয়োগ বলে বিবেচিত হোল আমার কাছে। এর পর থেকে ভাবলুম যেন পরশ পাথর খুঁজে পেয়েছি আমি। কাজেই যখন নতুন কার্পেট বা মাদুরের প্রয়োজন হোত, অথবা বছর শেষে সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসেবে জমার অঙ্কে কিছু পড়বে না বুঝতাম—আমি তখন আমার বিশ্বস্ত বন্ধু ও আমার সুখ-দুঃখের সমভাগিনী, সর্বকর্মপটীয়সী পরিচারিকাকে বলতাম—'যদি ছেলে-মেয়েদের দেখিস আর এক দিনের জন্য সংসারের লাগাম ধরিস তাহলে কিছু লিখে এই বিপদ-বৈতরণী পার হতে চেষ্টা করি।' এই ভাবে আমি লেখিকা হলাম। গোড়ার দিকে খুব সাধারণ ভাবেই এবং বন্ধু-বান্ধবরা যারা যশের জন্য প্রত্যেক লেখার সঙ্গে আমার নাম জুড়ে দিত, তাদের কাছে প্রবল প্রতিবাদ করতুম। যুক্তরাজ্যের কোন রস-পত্রিকায় বেশ টিকোল নাক আমার কোন কাঠ-খোদাই ছবি দেখতে পান যদি, তো জানিয়ে রাখি সে আমার স্বাভাবিক বিনম্রতাকে উপেক্ষা করেই করা হয়েছে—আমার পাঁচ হাজার বন্ধু ও জনসাধারণের অপ্রতিরোধ্য আগ্রহাতিশয্যেই ঘটেছে এ রকম। প্রতীচ্যে আমার জীবন সম্বন্ধে একটা কথা আমি বলতে চাই, যা বহু ইংরেজ রমণী অপেক্ষা আপনি ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

আমি সহর থেকে দু'মাইল দূরে গ্রামে বাস করতুম। জানেন তো, ঘরকন্নার কাজের লোক সব সময় সহরে পাওয়া যায় না, আর গ্রামে পাওয়া তো এক-প্রকার অসম্ভব—এমন কি যারা খুব বেশী মাইনা দিতে ইচ্ছুক তাদের পক্ষেও। কাজেই আমার মত হত-দরিদ্র আর অধিক কি আশা করতে পারে, যার দেবার মত পার্থিব সম্পদ নেই বললেই চলে। পরম সখীস্বরূপা ইংরেজ মেয়ে আনাকে যদি না পেতুম, তাহলে এই অনিশ্চয়তা এবং সাংসারিক জোয়ালের মধ্যে পড়ে কিছুতেই বাঁচতুম না। এক দিন আনাও দুঃখ-দৈন্য তাড়িত হয়ে আমাদের তটে এসে উপনীত হয়েছিল এবং রুথ যেমন নেয়ামির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সেও তেমনি আমার সংসারে থেকে গেছে। কাজেই যখন আমাদের স্কুলের সম্পত্তি ছোট ছোট ভাগ করে কম ভাড়ায় ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হোল, তখন আর আমার আনন্দের সীমা রইল না। এইবার কয়েকটি গরীব পরিবার আমাদের বাসস্থানের আশে-পাশে বসতি নিল—এদের মধ্য হতে দরকার হলে পরিচারিকা সংগ্রহ করতুম। জন বারো মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-পরিবারও

এই দলে ছিল এবং প্রয়োজনের সময় আমি তাদের শরণাপন্ন হতুম। কৃষ্ণকায়দের যদি কেউ সুন্দর দেখতে চান তাহলে গ্রীষ্মে আমার মত রুগ্ন শিশুকে বুকে নিয়ে এবং আরো গুটিকতক দুগ্ধ-পোষ্য পরিবৃত হয়ে ক্ষীণ স্বাস্থ্যে নিপতিত হতে হবে এবং সারা বাড়ীতে ঘরকন্নার কাজ দেখবার কেউ থাকবে না। তখন ভালমানুষ আমার বুড়ী আণ্ট ফ্রাঙ্কিকে কেউ যদি দেখেন—তার কালো চেপটা মুখ, দীর্ঘ নিটোল পরিপুষ্ট বাহু, পিপের মত বড় এবং পরিপুষ্ট বুক, উচ্ছকিত প্রাণখোলা হাসি,—তবেই একমাত্র কালা আদমীর সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

হতভাগিনী এলিজা বাক—তার নাম ইংলণ্ডে পৌঁছেচে জানতে পারলে তার চোখ বিস্ফারিত হবে—সেই তোল দাস-জীবনের প্রতিমূর্তি। মোটা-সোটা শান্ত সরল মমতাময়ী—সব সময় আমাদের বাড়ীর দুয়ারে আসে—মনে করে যেন এটি একটি আবাদ-ভূমি, যেখানে সাতশো লোক খাটে। ভার্জিনিয়ার দাস-জীবনের অভিজ্ঞতা তার আছে। যৌবনে নিশ্চয়ই সে খুব সুন্দরী ছিল—নিগ্রো আর শাদা উভয়ের সঙ্গমজাত সে—মধুর কণ্ঠ, চাল-চলন মার্জিত ও শোভন। যে পরিবারে লালিত সে সেখানে দর্জি আর নার্সের কাজ করত। পরিবারটির অবস্থা যখন পড়ে এল, তারা তখন তাকে লুসিয়ানার এক আবাদে বিক্রী করে দিয়েছিল। প্রায়ই আমায় সে বলত, কেমন করে হঠাৎ এক দিন তাকে জোর করে একটি গাড়ীতে তুলে দেওয়া হয়—তার কর্ত্রী ঘরে বন্দী অবস্থায় চীৎকার করছেন—তাকে নিয়ে যেতে দেখে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আকুল ভাবে ডাকছেন। লুসিয়ানায় অভিজ্ঞতার কথা আমায় সে বলেছে। যে সব হতভাগ্য দাস চাবুকে ক্ষত-বিক্ষত হোত, ওষুধ দেবার জন্য রাত্রে সে গোপনে তাদের কাছে যেত, সেবা করত তাদের—ওষুধ দিত। কাজেই শেষ পর্যন্ত কেনটাকিতে চালান দেওয়া হোল তাকে। তার সর্বশেষ প্রভুই তার সমস্ত সন্তানের জনক। এ নিয়েও সে এমন লজ্জা ও সংযমের সঙ্গে কথা বলত যে, সত্যিই তা অসাধারণ। তাকে সেই স্বামী বলেই বলত এবং আমার সঙ্গে অনেক দিন কাটানোর পরই আমি জানতে পেরেছিলাম তাদের সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ কি! কোন দিন ভুলব না, তার জন্য সেদিন কী দুঃখ বোধ করেছিলাম এবং তার বিনীত আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়াসে যে ভাব উদয় হয়েছিল আমার মনে—"জানেন তো মিসেস ষ্টাউ, দাসী-মেয়েদের নিজের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই।" তার দু'টি সুন্দরী মেয়ে ছিল—তাদের মাথার চুল আর চোখ জোড়া এত অপরূপ—আমি তাদের আমার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। আমি যে-সমস্ত দাসদের সংস্পর্শে এসেছি তাদের কাছ থেকেই দাস-প্রথার বিচিত্র ইতিহাস দৈবাৎ জানতে পেরেছি—সময়ান্তরে হয়ত সে ইতিহাস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আপনি জানতে চেয়েছেন আমেরিকায় বই বিক্রী করে কত লাভ হয়েছে আমার। সারা জীবন দারিদ্র্যে কাটিয়ে এবং শেষ জীবনও দারিদ্র্যে কাটাতে হবে জেনে বই লিখে অর্থোপার্জ্জনের চিন্তা মাথায় আসেনি কখনো। কাজেই প্রথম তিন মাসের বিক্রয়-লব্ধ দশ হাজার ডলার হাতে পেলাম সেদিন, সেদিন কেমন একটা মনোরম বিস্ময় বোধ করেছিলাম! আমার ধারণা, আরো অত টাকাই পাওনা হয়েছে আমার এত দিনে।

যুক্তরাজ্য ও কানাডায় কৃষ্ণকায় শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য উত্তর প্রদেশে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা আছে আমার। বইয়ের অপ্রত্যাশিত বিক্রয়-লব্ধ অর্থ থেকে এদের মঙ্গলের জন্য চিরস্থায়ী কিছু করাই আমার আন্তরিক অভিপ্রায়। আমেরিকান বা ইংরেজ পুস্তক প্রকাশকদের তুলনায় আমার আয় খুবই কম। তবুও আয়ের মোটা অঙ্কই আমি এই ভাবে খরচ করতে ইচ্ছুক এবং আমার ধ্রুব বিশ্বাস, আমেরিকান ও ইংরেজ প্রকাশকগণও আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এ বিষয়ে। দাসদের মুক্তি সাধনে শিক্ষার মত আর কোন কিছুই এমন তড়িৎ-সহায়ক হবে না।

আমি এমন একটি পুস্তক রচনায় লিপ্ত যাতে Uncle Tom's Cabin এর মতই সমান মাল-মশলা থাকবে। যে তথ্য ও দলিলের উপর নির্ভর করে গল্পটি রচিত, তার সবই এতে থাকবে—তা ছাড়া অন্যান্য বহু নথিপত্র, মামলার বিবরণ, দলিল—দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীর সাক্ষ্য-প্রমাণাদিও আছে, যা Uncle Tom's Cabin এর প্রত্যেকটি বিবরণকে সমর্থন করবে।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, এই বই লেখার উদ্দেশ্যে তথ্যাদি পর্যবেক্ষণের পূর্বে আমি জানি বলে যা মনে করেছিলাম তখন, এখন দেখছি এই অন্ধকার জগতের গভীরতার একটুও পরিমাপ করতে পারিনি আমি। আদালতের মামলায় যে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে তা এতই অবিশ্বাস্য সত্য যে, যখনই সে সব কথা ভাবি, মন নিবিড় বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ে। মনে হয় বইখানি শুধু পড়লে চলবে না। হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে এবং ফলে যে অনুভূতি সঞ্জাত হবে তদনুরূপ কিছু করাও চাই।

এই সমস্ত বিষয় লিখতে বসে আমি অসহ্য বেদনা বোধ করছি সত্যি কথা বলতে কি, যেন নিজের হৃদয়ের শোণিতে লিখছি। Uncle Tom's Cabin লেখার সময় কত বার মনে হয়েছে শরী বুঝি এক দম ভেঙ্গে পড়বে, কিন্তু ভগবানের কাছে আমি রাত-দি মিনতি করেছি তিনি যেন আমায় শেষ রক্ষা করতে সাহায্য করেন শেষ পর্য্যন্ত সামর্থ্যাতীত শক্তি দিয়েছিলেন তিনি আমায়।

দুঃস্বপ্নের মত এই সব নিগ্রহ-কাহিনী! এ কি আমারই দে ঘটেছে! ভারী পাথরের মত এ আমার বুকে চেপে আছে—আমা জীবনে দুঃখের ছায়া ফেলেছে। আরো বেশী যে, নিজের ভায়ের মত দক্ষিণীদের জন্য আমি বেদনা বোধ করি—প্রতিটি অত্যাচারের ক লিখতে আমার হৃদয় ব্যথায় টন-টন করে ওঠে। যেন স্বয়ং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে পারিবারিক কলঙ্কের কথা বিবৃ করতে বাধ্য হচ্ছি। অনেক সময় মনে হয়, আমার পক্ষে মৃত্যু শ্রেয়: কিন্তু তবুও ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, এদের মঙ্গ জন্য কিছু করা হয়েছে দেখে যেন মরি।

মে'তে নিশ্চয়ই লণ্ডনে পৌঁছব। সেখানে নিশ্চয়ই দেখা হ আপনার সঙ্গে। এত লোক আমায় দেখতে চায় কি বিশ্রী ক তো—স্বপ্নের মত মনে হয়।

যদি বসন্ত অবধি জীবনের মেয়াদ থাকে—তাহলে সেক্সপীয় কবর, মিল্টনের মালবেরী গাছ আর পূর্বপুরুষের দেশের মাটি দে আশা করছি। পুরোনো ইংল্যাণ্ড! সেদিন যেন সত্যিই আসে! ইতি

আপনাদের প্রিয়
এইচ. বি. ষ্টাউ।

অনুবাদক—জয়ন্তকুমার ভা

ভক্ত কবীর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

উপেন্দ্রকুমার দাস (শান্তিনিকেতন)

ডাঃ স্যর আর জি ভাণ্ডারকারের মতে ভক্তিভাবের বীজ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেনও বলেন, "বেদে বশিষ্ঠাদির মন্ত্রে, বরুণ প্রভৃতি দেবতার স্তবে ভক্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।" উপনিষদের যুগে এই বীজ অঙ্কুরিত হয়, এই ভাব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। ডাঃ ভাণ্ডারকার বৃহদারণ্যক, মুণ্ডক, কঠ প্রভৃতি উপনিষদে পরমেশ্বরের প্রতি প্রেমের নিদর্শন পেয়েছেন। কঠোপনিষদে ত স্পষ্টই বলা হয়েছে, 'পরমাত্মার প্রতি যার ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে তার প্রতিই পরমাত্মা প্রসন্ন হন, সেই জিজ্ঞাসা আদি দ্বারা তাঁকে প্রাপ্ত হয়।' এই জন্য ভক্তেরা দাবি করেন বেদান্তে যাকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বলা হয়েছে তা আসলে ভক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, উপনিষদের গভীর অধ্যাত্মভাবের সঙ্গে প্রেমভক্তির ভাব মিশেছে।

এই ভক্তিভাব সম্ভবতঃ মনোধর্মী আর্য্যেরা হৃদয়ধর্মী অনার্য্যদের কাছ থেকে পেয়েছেন, অথবা হয়ত ভাবটি স্বাধীন ভাবেই আর্য্য-অনার্য্য উভয়ের মধ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল। তবে মনে হয়, আর্য্যদের ক্ষেত্রে জোর পেয়েছিল অনার্য্যদের সংস্পর্শ থেকে। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, "আর্য্যেরা এক দিন ভক্তি অপেক্ষা যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াতেই বা অন্য দিকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানেই বেশী অনুরক্ত ছিলেন। আর্য্যদের পূর্ববর্ত্তী দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভক্তির ভাব ছিল বেশি। আর্য্যদের জ্ঞানের সহিত এই ভক্তিবাদ মিশিয়া ভারতে ধর্ম্মভাব গভীর ও উদার হইয়া উঠিতে লাগিল।" বেদে ও উপনিষদে ভক্তির নিদর্শন থাকলেও ভক্তি কথাটা কিন্তু ব্যবহৃত হয়নি। ডাঃ ভাণ্ডারকারের মতে বাসুদেব যখন অর্জ্জুনের কাছে গীতা প্রকাশ করলেন তখনই ভক্তিধর্ম একটি সুনির্দ্দিষ্ট রূপ নিল। ভগবদ্গীতাই ভক্তিধর্ম বা একান্তিক ধর্ম প্রচারের প্রাচীনতম নিদর্শন। ভগবদ্গীতার রচনা-কাল নিয়ে মতভেদ আছে। তবে ডাঃ ভাণ্ডারকারের মতে উহা খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের প্রথম দিককার পরে নয় বলা যায়। ভক্তির জন্য চাই ভগবানকে। অর্থাৎ বৈয়ক্তিক কোনো দেবতা বা ঈশ্বর না থাকলে ভক্তি সম্ভবে না। কেন না, শুদ্ধ তত্ত্ব মাত্রের প্রতি মানুষের প্রেম জন্মে না। এর থেকেই আর একটা কথা এসে পড়ে। ভক্তির জন্য এক দিকে চাই যেমন ভগবানকে তেমনি অন্য দিকে চাই ভক্তকে। প্রেমের রাজ্য দুইয়ের রাজ্য; একাকী প্রেম হয় না। অবশ্যি আত্মরতি সম্ভবপর। কিন্তু তা সম্ভব শুধু তাত্ত্বিক মানুষের ক্ষেত্রে। এ রকম মানুষ অসাধারণ। সাধারণ মানুষের কাছে এ সব কথার বিশেষ মূল্য নেই।

বেদে দেবতারা আছেন। কিন্তু তাঁরা মানুষের কাছে আসতে পারেননি, যাগ-যজ্ঞের জটিল জালে বাঁধা পড়েছেন। তাঁদের প্রতি মানুষের ভক্তি পরিস্ফুট হয়নি; তাঁদের দ্বারা মানুষের অন্তরের তৃষ্ণা মেটেনি। উপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব মাত্র। এঁকে নিয়ে বুদ্ধিপ্রধান আর্য্য ঋষিদের তত্ত্বজিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হয়ত হয়েছিল কিন্তু সর্বসাধারণের হৃদয়কে ইনি তৃপ্ত করতে পারেননি। তার প্রমাণ আছে উপনিষদেই। উপনিষদের যুগে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ধর্মের ক্ষেত্রে বন্ধনমুক্ত আধ্যাত্মিক ভাব আত্মপ্রকাশ করে একাধিক ভাবে। তাই দেখি, উপনিষদে শুধু নির্গুণ ব্রহ্মবাদ বা অদ্বৈতবাদই প্রচারিত হয়নি। সগুণ ব্রহ্মবাদের কথাও এতে আছে। সগুণ ব্রহ্মই ভক্তের ভগবান। অবতারবাদের মূলও উপনিষদেই আছে।

উপরের আলোচনা থেকে মনে হ'তে পারে যে, অদ্বৈতভাব ভক্তির বিরোধী। নারদ ভক্তিসূত্রের সংজ্ঞা অনুসারে ভগবদ্-বিষয়ক প্রেমকেই ভক্তি বলে নির্দেশ করলে তাই হয় বটে। কিন্তু ভক্তির অন্য সংজ্ঞাও আছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, 'অন্য অভিলাষশূন্য জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা অনাবৃত এমন যে কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি।' নিরুপাধিক স্বরূপেরও এমনি অনুশীলন হ'তে পারে। কাজেই অদ্বৈতভাব ভক্তির বিরোধী বলা চলে না। তা ছাড়া, ভক্তদের মতে অদ্বৈতবেদান্তীরাও ভক্ত। জ্ঞানমার্গী হলেও তারা পরম ভগবদ্-প্রেমেরই সাধক। কেন না, বেদান্ত মতে জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ নেই। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বলে যে মনে হয়, তা ভ্রম। এই অভেদের জন্য জীব প্রতিনিয়ত ব্রহ্মের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে ব্রহ্মে বিলীন হওয়ার জন্য, স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধির জন্য। এই আকর্ষণ পরম প্রেমের আকর্ষণ; ব্রহ্মের প্রতি আত্মস্বরূপের প্রতি এই প্রেম। কাজেই, জ্ঞানমার্গী বেদান্তীরাও প্রেমিক, তাঁরাও ভক্ত।

তবে সাধারণতঃ ভক্তি দ্বৈতবাদীই বটে। সাধারণ মানুষের ভক্তি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বৈয়ক্তিক দেবতাকেই খোঁজে। সে ভক্তি এমন এক জন দেবতাকে চায় যিনি ভক্তদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন, তাদের আপদে-বিপদে রক্ষা করবেন, তাদের সুখ-সম্পদ দেবেন, তাদের দেবেন মুক্তি। এই জন্য মানুষ করেছে একাধিক দেবতার পূজা; এই সব দেবতা যে ভিন্ন নন, একই পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন রূপ, এ তত্ত্ব উপনিষদেই পাওয়া যায়। আর এই পরমাত্মার প্রতি ঋষিদের প্রেমের তথা ভক্তির পরিচয়ও আছে উপনিষদেই।

এই পরমাত্মাই ভগবান।

'নির্দেশ' নামক একখানা বৌদ্ধ-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে ভারতবর্ষে অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বলদেব, বাসুদেব প্রভৃতি নানা দেবতা, এমন কি পশুপক্ষীর পূজাও প্রচলিত ছিল। কালক্রমে সকল দেবতার পূজাকে অতিক্রম করে ভারতের একটি বৃহৎ ভূভাগে বাসুদেব-পূজা প্রবল হয়ে ওঠে। খৃষ্ট জন্মার তিন-চারশ' বছর আগে থেকেই বাসুদেব পরমেশ্বর-রূপে পূজিত হতে থাকেন। তাঁর ভক্তদের বলা হত ভাগবত। ভগবত-ধর্ম ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবল ছিল। এমন কি কোনো কোনো গ্রীসদেশবাসীও এটি গ্রহণ করেছিল। বৈদিক যাগ-যজ্ঞ বিশেষ করে সেই সব যাগযজ্ঞে পশুবধের প্রতিক্রিয়া স্বরূপই সম্ভবতঃ বেদবাহ্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়। আর বৌদ্ধ ধর্ম বৈদিকদের মধ্যে প্রচলিত উগ্র তপশ্চর্য্যারও বিরোধী ছিল। ভক্তিধর্মেরও গোড়ায় আমরা এই দু'টি লক্ষণ দেখতে পাই। মহাভারতের শান্তিপর্বের একটি অংশের নাম নারায়ণীয় উপাখ্যান। এই নারায়ণীয় উপাখ্যানে উপাখ্যান আকারে ভক্তিধর্মের আলোচনা আছে। নারায়ণীয় উপাখ্যানে ভক্তিধর্মকে বলা হয়েছে একান্ত ধর্ম আর ভক্তিকে বলা হয়েছে একান্ত ভাব। পরমাত্মার নাম নারায়ণ বা হরি। ইনিই বাসুদেব।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বৈদিক যাগ-যজ্ঞের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উপনিষদের গভীর অধ্যাত্মভাবের উদ্ভব হয়। সে ভাব অহিংসামূলক। নারায়ণীয় উপাখ্যানের আলোচনা করলে দেখা যায়, এতে এক দিকে যেমন বলা হয়েছে যারা অহিংস এবং একান্ত ভাবে পরমাত্মাকে ভক্তি করে তারাই তাঁকে পায়, আবার অন্য দিকে যাগ-যজ্ঞের ধারাটাকে একেবারে অস্বীকার না করে তার সঙ্গে ঔপনিষদিক অহিংস ভাবের সমন্বয় করা হয়েছে। এই উপাখ্যানের বসু উপরিচরের কাহিনী থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানতে পারা যায়। বসু উপরিচর যে যজ্ঞ করেছিলেন তাতে পশুবলি হয়নি। তাঁর যজ্ঞে হোম করা হয়েছিল আরণ্যকের (উপনিষদ এর অন্তর্গত) বিধি অনুসারে। যজ্ঞের প্রধান দেবতা পরমেশ্বর হরি। যাগ-যজ্ঞের দ্বারা এই হরির দর্শন পাওয়া যায় না। যেমন পাননি বৃহস্পতি; কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারাও পাওয়া যায় না, যেমন পাননি একত, দ্বিত এবং ত্রিত; শুধু ভক্তিভরে যে তাঁর পূজা করে সেই তাঁর দর্শন পায়, যেমন পেয়েছিলেন বসু উপরিচর। এর থেকে একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। একান্ত ধর্ম এক দিকে শাস্ত্রীয় ধারা মেনে চলেছে আর এক দিকে শুধু ভক্তির উপর জোর দিয়েছে। আমরা দেখতে পাব ভক্তিধর্মের এই দুই দিক—একটি শাস্ত্রানুগ আর একটি শাস্ত্র-নিরপেক্ষ—এই দুইটিই পরবর্তী কালে সুস্পষ্ট আকার নিয়ে বেড়ে উঠে। নারায়ণীয় উপাখ্যানের এই একান্ত ধর্মেরই ধারা বহন ক'রে পরবর্তী যুগের বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব হয়। ভারতীয় প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিভেদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেবতার মধ্যে পরম একের উপলব্ধি ভারতীয় সাধনার এক চরম সিদ্ধি। ভারতীয় দেবমণ্ডলে যত দেবতা আছেন সকলেই ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা ব্রহ্মের রূপবিশেষ। ভারতের এই একের সাধনাই নারায়ণ, বাসুদেব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ এই সব ভিন্ন দেবতাকে এক দেবতা করে তুললে। অবশ্যি ভারতবর্ষেও ধর্মের ক্ষেত্রে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়েছে এ কথা সত্য, কিন্তু তা কখনও ভারতের এই পরম ঐক্যবিধায়িনী মৌলিক সাধনাকে ধ্বংস করতে পারেনি। তাই দেখি, যুগে যুগে এই দেশে এমন সব সাধকের আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা সমস্ত ভেদ-বিভেদের বাইরে গিয়ে সেই একের কথা বলেছেন। আরাধ্য দেবতার বিভিন্নতা অনুসারে ভক্তিধর্মের মধ্যে কালে কালে বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য এই পাঁচটিই প্রধান। এর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রভাব বেশী। বৈষ্ণব ধর্ম প্রাচীনতমও বটে। কেন না, আমরা আগেই বলেছি, ভাগবতধর্ম বা নারায়ণীয় উপাখ্যানে ব্যাখ্যাত একান্ত ধর্মই পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ধর্মের রূপ নেয়। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার প্রমাণ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই পাওয়া যায়।

মানুষ দেখে প্রকৃতির কমনীয় রূপ, যে রূপ দেখে তার চোখ জুড়ায়, তার মন খুশিতে ভরে উঠে; দেখে প্রকৃতির এমন সব কাজ যাতে করে তার সুখ-সমৃদ্ধি বাড়ে; সংসারে এমন সব ঘটনা ঘটতে দেখে যাতে করে তার কল্যাণ হয়। মানুষ এ সব দেবতার কাজ বলে মনে করে। এমনি দেবতার প্রতি তার মন প্রীতিতে ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। এই দেবতার পূজা করে সে। তাঁকে ভালবাসে। বিষ্ণু এমনি দেবতা। তাই বৈষ্ণব ধর্ম প্রেমের ধর্ম। আর অতি প্রাচীন কালেই মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির মধ্যে এর উদ্ভব হয়েছিল অনুমান করা যায়। আবার এই প্রকৃতিরই ভয়ঙ্কর রূপও মানুষ দেখতে পায়। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত, বন্যা, মহামারী, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার মানুষের জীবন বিপন্ন করে, তার মৃত্যু ঘটায়; সংসারে এমন সব ঘটনা ঘটে যাতে করে তার জীবনের সুখ শান্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই সবও সে দেবতার কাজ বলে মনে করে। এমনি দেবতাকে মানুষ ভয় করে। তাঁর পূজা করে ভয়ের জন্যই। তাঁকে সে ভক্তি করে সেও ভয়ে ভয়ে। এমনি দেবতা রুদ্র। পরবর্তী কালে ইনিই শিবরূপে পূজিত হন। কাজেই শৈব ধর্মও বৈষ্ণব ধর্মেরই মত প্রাচীন বলা যায়। আদিতে কল্যাণময়, আনন্দময় দেবতার কল্পনা আর ভীষণ ভয়ঙ্কর ধ্বংসকারী দেবতার কল্পনা পৃথক্ হলেও পরে একই দেবতার আনন্দময় প্রিয় রূপ ও ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপের কল্পনা করা হয়েছে। তাই দেখা যায়, যিনি রুদ্র তিনিই শিব; যিনি সংহারক তিনিই রক্ষক ও পালক; যিনি কালী করালী ভয়ঙ্করী রণচণ্ডী তিনি বরাভয়দাত্রী জগজ্জননী। সূর্য্য বৈদিক দেবতা, গণপতিকেও বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু বেদে কোনো স্বতন্ত্র প্রবল স্ত্রী-দেবতার কথা পাওয়া যায় না। শাক্ত মতের উদ্ভব হয় গৃহ্যসূত্রেরও পরবর্তী যুগে। অবশ্যি গোঁড়া শাক্তেরা এ কথা মানেন না। তাঁদের মতে শক্তিপূজা বেদের চেয়েও প্রাচীন। সে যাই হোক, যে মতের যখনই উৎপত্তি হোক না কেন, এ কথা ঠিক যে, ভক্তির ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই বৈষ্ণব মতই প্রবল ছিল। অন্যান্য মত সময়-বিশেষে ও স্থান-বিশেষে প্রবল হয়ে আবার ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কিন্তু বৈষ্ণব মত বরাবরই আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রেখেছে। আজও ভক্তির ক্ষেত্রে বৈষ্ণব মতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী, তার পর শাক্ত ও শৈব মত। অন্য মতের আর পৃথক্ অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। মনে হয়, প্রথমে উত্তর-ভারতেই বৈষ্ণব মতের উদ্ভব হয়। কিন্তু দক্ষিণেই হয় এর বিশেষ পরিপুষ্টি। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী এ রকম সময় বৈষ্ণব ধর্ম তামিল দেশে প্রবেশ করে। তার পর উত্তর-ভারতে যখন হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হল তখন আবার তার প্রভাব মারাঠা দেশের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন সেখানে হল আলোয়ার বলে পরিচিত ভক্তদের আবির্ভাব এবং তখন থেকেই দক্ষিণে ভক্তিধর্মে বিশেষ জোর বাঁধল।

মোট বার জন আলোয়ারের নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে এঁদের জন্ম হয়। এঁদের সঠিক কাল-নির্ণয় কঠিন। তবে এই দ্রাবিড় ভক্তগণ যে একাদশ শতকের পূর্বে জন্মেছিলেন, এ কথা বলা যায়। আমরা পূর্বেই ভক্তিধর্মের দুটো ধারার কথা উল্লেখ করেছি। একটি শাস্ত্রানুগ, অন্যটি শাস্ত্রের ধার ধারে না, প্রেমভক্তির সহজ পথ ধরে চলে। ভক্তি-ধর্মের এই অশাস্ত্রীয় ধারাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভারতের স্বকীয় সাধনা। তিনি বলেছেন, "···ভারতবর্ষের একটি স্বকীয় সাধনা আছে; সেইটি তার অন্তরের জিনিস। সকল প্রকার রাষ্ট্রিক দশা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ

নয়, এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প, বস্তুত, এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয় এবং সমাজ-শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে বিধি-নিষেধের পাথরের বাধা ভেদ করে। যাঁদের চিত্ত-ক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।"

ভক্তদের মধ্যেও তাই দু'টি দল দেখা যায়। এক দল শাস্ত্র মানার দল আর এক দল না-মানার দল। এদের সব ভারী সুন্দর নাম আছে। প্রথম দলকে মধ্যযুগে বলা হ'ত 'লোকবেদপন্থী' অর্থাৎ যারা লোকাচার ও বেদাচার মেনে চলতেন, মুসলমানেরা এঁদের বলেন বা-শরা আর বাউলরা বলেন দীঘলডুবী। দ্বিতীয় দলকে মধ্যযুগে বলা হ'ত "অনভৌ-সাচ-পন্থী" অর্থাৎ যাঁরা অনুভব-প্রত্যক্ষ সত্য মেনে চলতেন; মুসলমানেরা এদের বলেন বে-শরা আর বাউলরা বলেন বেডুবী অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত। দক্ষিণ দেশের বৈষ্ণবদের মধ্যেও এই দুই দলই ছিল। প্রথম দলের ভক্তদের বলা হ'ত আচার্য্য আর দ্বিতীয় দলের ভক্তরা আলোয়ার নামে পরিচিত ছিলেন। আলোয়ারেরা প্রেম ও ভক্তির সহজ পথের সাধক। তাঁদের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু নারায়ণ। আলোয়ারেরা ছিলেন সত্য সত্যই 'বে-ডুবী'। তাঁরা সব দিক দিয়েই বন্ধনমুক্ত। শাস্ত্রের বন্ধন, জাতিভেদের বন্ধন, সংস্কৃত ভাষার বন্ধন সব তাঁরা ঘুচিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সমাজের অতি নিম্নস্তরের মানুষ। কিন্তু তাঁদের প্রেমভক্তি, তাঁদের সাধনা, তাঁদের জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সবার প্রণম্য করে তুলে।

আলোয়ারেরা আপনাদের ইষ্টদেবতার প্রতি প্রেমভক্তিকে প্রকাশ করেছেন দক্ষিণের জনসাধারণের ভাষা তামিলে। তাঁদের রচনার নাম প্রবন্ধ। সব রচনাই সঙ্গীত। এই সব সঙ্গীতে প্রেমভক্তি ও আধ্যাত্মতত্ত্বের এমন অপূর্ব্ব প্রকাশ হয়েছে যে, দক্ষিণে আলোয়ারদের প্রবন্ধগুলিকে বৈষ্ণব-বেদ বলা হয়।

আলোয়ারদের প্রভাবে দক্ষিণে বৈষ্ণবধর্ম্ম খুব প্রবল হয়ে উঠে। এবং সেখান থেকে আবার উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে দাক্ষিণাত্যে রামানুজ (একাদশ), মাধ্ব বা আনন্দ-তীর্থ (দ্বাদশ), নিম্বার্ক (দ্বাদশ), এই কয় জন প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। এঁরা এক একটি বিশিষ্ট মতবাদের প্রবর্ত্তন করেন। এঁদের উপর আলোয়ারদের প্রভাব সুস্পষ্ট। এঁরাও প্রধানতঃ প্রেম-ভক্তিই প্রচার করেছেন। তবে এঁরা শাস্ত্রকে অস্বীকার করেননি। স্ব স্ব মতবাদকে শাস্ত্রানুকূল দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন এবং ভক্তিধর্ম্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানমার্গী শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন। 'দীঘলডুবী' আর 'বে-ডুবী' এই দুই মতের একটা সমন্বয় চেষ্টা এঁদের মধ্যে দেখা যায়। বস্তুত, এই সময়কার দক্ষিণী বৈষ্ণবমতের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় (১) প্রেমভক্তির প্রবল ভাব। (২)—মায়াবাদের ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্বন্ধে আশঙ্কা:

কবীর প্রভৃতি পরবর্ত্তী ভক্তদের মতবাদেও এই প্রেমভক্তি ও মায়ার কথা বার বার এসেছে। ধর্ম্মের গোঁড়ামি ও জাতিভেদের কঠোরতা উত্তর-ভারতের চেয়ে দক্ষিণ-ভারতে বেশী, এ কথা মনে করবার হেতু আছে। দক্ষিণের পারিয়ার প্রতিকল্প উত্তরে নাই। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেনের মতে কঠোর জাতিভেদের উদ্ভব আর্য্যেতর সমাজে। হয়ত সেই জন্যই দক্ষিণে জাতিভেদের এত কঠোরতা। আর আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সম্ভবতঃ বেদবাহ্য ধর্ম্মের প্রতিকূলতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই বিশেষ করে রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিল। সে যাই হোক্, এই গোঁড়ামি ও কঠোরতার জন্য 'বে-ডুবী' আলোয়ারদের 'জাতপাত-বিরোধী' প্রেমভক্তির প্রবল প্রভাব সত্ত্বেও ভক্তিধর্ম্ম একেবারে গোঁড়ামি ছাড়তে পারল না। আলোয়ার শঠকোপ ও বিষ্ণুচিত্ত ছিলেন অতি নীচবংশীয়। বৈষ্ণবাচার্য্যদের অগ্রগণ্য আচার্য্য রামানুজ এঁদের উপদেশে পেয়েছেন প্রেম ও ভক্তি। কিন্তু তবু শাস্ত্রের বন্ধন তিনি একেবারে এড়াতে পারলেন না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের সঙ্গে তাঁকে আপোষ করে চলতে হ'ল। বৈষ্ণবধর্ম্ম সুরু থেকেই ছিল হিন্দুসমাজে যারা অন্ত্যজ বলে পরিচিত তাদের প্রতি সদয়। আচার্য্য রামানুজ একটা খুব বড় কাজ করলেন। তিনি এই দয়াকে কাজে রূপ দিলেন। অন্ত্যজের মধ্যে বিষ্ণুভক্তি প্রচার করে তিনি তাদের বৈষ্ণব করে তুললেন, ঘোচালেন তাদের নীচত্ব। দেশীয় ভাষায় রচিত শঠকোপের ভক্তিগ্রন্থ তিরু বায়োমোলি (Tiru Vayamoli) প্রভৃতি আলোয়ারদের গ্রন্থকে তিনি বৈষ্ণব-বেদ বলে গ্রহণ করলেন। ভক্তি দিল সবাইকে মুক্তির অধিকার। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় উচ্চবর্ণের সঙ্গে নীচ জাতীয়দের সমান অধিকার দেননি। আমরা আগেই বলেছি, আচার্য্য রামানুজকেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের সঙ্গে আপোস করে চলতে হয়েছিল বা তিনি স্বেচ্ছায়ই চলেছিলেন। তিনিও ব্রাহ্মণদের জন্য বিধিবিহিত পথ এবং অন্যদের জন্য অন্য পথের নির্দ্দেশ দেন। নীচ জাতের বৈষ্ণবদের জন্য তিনি আলাদা পঙ্‌ক্তিভোজনের ব্যবস্থা দেন।

আচার্য্য রামানুজের পর তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে দু'টি দল দাঁড়িয়ে গেল। এক দলের নাম বড়কলই, অন্য দলের নাম তেনকলই। আচার্য্য রামানুজের ব্যক্তিত্ব 'দীঘলডুবী' ও 'বে-ডুবী'দের একত্র করেছিল। কিন্তু তাঁর তিরোভাবের পর এঁরা আর একত্র থাকতে পারলেন না, কারণ, এঁদের পথ এক নয়। বড়কলইদের মোটামুটি 'দীঘল-ডুবী' বলা যায় আর তেনকলইদের বলা যায় 'বে-ডুবী'। বড়কলইরা উঁচু জাতের সঙ্গে নীচ জাতের সমান অধিকার স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণেতরদের এঁরা 'ওঁ' উচ্চারণ করতে দেন না। এঁরা তাদের শাস্ত্রপাঠেরও অধিকার দেন না; শুধু মৌখিক উপদেশ দেবার কথা বলেন। এঁরা বৈষ্ণব হ'লেও ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র-শাসিত বৈষ্ণব। এঁরা গোঁড়া। তেনকলইদের এ সব গোঁড়ামি নেই। তাঁদের মতে সকল বৈষ্ণবের সমান অধিকার। তাঁরা ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ বাচবিচার না করে সবাইকে 'ওঁ' সহ মন্ত্র দেন।

তেনকলই ও বড়কলইদের মধ্যে আর একটি বিশেষ মতভেদ আছে। তেনকলইদের মতে মুক্তিলাভের মুখ্য উপায় ভগবানের দয়া, প্রপত্তি বা শরণাগতি। অন্য উপায় গৌণ। সকলের আগে প্রপত্তি, তার পর অন্য যা কিছু। জীবের প্রয়াসকে তাঁরা কোনো মূল্য দেন না। তাঁরা দৃষ্টান্ত দেন বিড়ালছানা ও তার মায়ের। বিড়ালছানার কোনো প্রয়াস নাই; মা-ই তাকে মুখে করে

এখান থেকে ওখানে নিয়ে যায়। তেমনি জীবেরও কোনো প্রয়াস নাই। ভগবানই দয়া করে তার মুক্তির উপায় করে দেন। বড়কলইরা কিন্তু ভগবানের দয়ার সঙ্গে জীবের প্রয়াসকেও একটা বিশেষ স্থান দেন। তাঁদের মতে প্রপত্তি মুক্তিলাভের অন্যতম উপায় বটে তবে একমাত্র উপায় নয়। অন্য উপায়ে না হ'লে তখন এই উপায় অবলম্বন করতে হয়। তাঁরা দৃষ্টান্ত দেন, বানরছানা ও তার মায়ের। বানরছানার যেমন প্রয়াস করতে হয়, মাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হয়, তেমনি জীবকেও প্রয়াস করতে হয়। এই রামানুজ-সম্প্রদায় দক্ষিণাপথ থেকে ক্রমে উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কাশীতে তাঁদের একটি বড় স্থান ছিল। এখানে এক জন শক্তিশালী মহাপুরুষ এই সম্প্রদায়ে যোগ দেন। তিনি গুরু রামানন্দ। রামানন্দ রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরু রাঘবানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গুরু রামানন্দের সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। মেকলিফ সাহেবের মতে গুরু রামানন্দ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। কিন্তু অনেকেই এ মত স্বীকার করেন না। ডাঃ ভাণ্ডারকারের মতে গুরু রামানন্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন প্রয়াগের এক কনৌজীয়া ব্রাহ্মণ-পরিবারে। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন এ সম্পর্কে রামানুজ দাস হরিবর কৃত ভক্তিমাল-হরিভক্তি-প্রকাশিকার মত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আছে, 'রামানন্দ—রামানুজ থেকে পঞ্চম শিষ্য।' আচার্য্য সেন অনুমান করেন, ১৪০০ খৃঃ থেকে ১৪৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত গুরু রামানন্দের সময়। সে যা হোক, রামানন্দ রামানুজ সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন সত্য, কিন্তু সম্প্রদায়ের অনেক সব গোঁড়ামি তাঁর বরদাস্ত হ'ল না। অনুমান হয় তার গুরু ছিলেন বড়কলই দলভুক্ত। এঁরা গোঁড়া। রামানন্দ সম্প্রদায়ের অনেক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করতে লাগলেন। ফলে গুরুর সঙ্গে তাঁর মতান্তর হ'ল এবং অচিরে গুরু-শিষ্যের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। রামানন্দ নিজেই সম্প্রদায় স্থাপন করলেন। গুরু রামানন্দ তেনকলইদের মত বৈষ্ণবধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ভেদ ঘুচালেন। তিনি বললেন, দীক্ষা নিয়ে যারা বৈষ্ণব হবে তারা সবাই সমান, তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ উঁচু-নীচু কোনো ভেদ থাকবে না। কোনো রকম বাছবিচার না করে সব বৈষ্ণব একত্র পঙ্‌ক্তি-ভোজন করতে পারবে। কারণ, তিনি মনে করতেন, ভক্তেরা যখন ভগবানের আশ্রয় নেন তখন তাঁদের পূর্ব্বপরিচয় সব তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যায়। তখন তাঁদের একমাত্র পরিচয় তাঁরা ভক্ত, তাঁরা বৈষ্ণব। গুরু রামানন্দ ছিলেন অত্যন্ত উদারহৃদয় মানুষ। তাঁর মধ্যে কোনো রকম সঙ্কীর্ণতা ছিল না জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাইকে তিনি দীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে কয়েক জন ছিলেন নিম্নশ্রেণীর মানুষ; কবীর জোলা, রবিদাস মুচি, ধনা জাঠ, সেনা নাপিত।

মতবাদের দিক দিয়েও তাঁর এই উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বয়ং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বৈত-বেদান্তের পূর্ণ সমাদর রয়েছে। গুরু রামানন্দ উদার ছিলেন কিন্তু বিপ্লবী ছিলেন না। নিজের শিষ্যদের মধ্যে কোনো জাতিভেদ তিনি স্বীকার করেননি কিন্তু তিনি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা মানতেন।

মূর্ত্তিপূজার প্রতিও তাঁর কোনো আস্থা ছিল না মনে হয়। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন গ্রন্থ-সাহেবে উদ্ধৃত গুরু রামানন্দের একটি বাণীর কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর "ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারায়"। তাতে রামানন্দ বলেছেন—"কেন আর ভাই মন্দিরে যাইতে আমায় ডাক, তিনি বিশ্বব্যাপী, আমার হৃদয়-মন্দিরেই তাঁর দেখা পাইয়াছি।" তবে তিনি মূর্ত্তিপূজার বিরোধীও ছিলেন না।

গুরু রামানন্দ জীবে ব্রহ্মে ভেদ এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব স্বীকার করতেন কিন্তু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এ সব মানতেন না। গুরুর উদার শিক্ষার এটি আর একটি নিদর্শন। গুরু রামানন্দের শিক্ষা, তাঁর সাধনার প্রধান কথা হ'ল ভক্তি, মুক্তিলাভের ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি। অনন্যভাবে ভগবানের শরণাগতি, অহৈতুক প্রেম, বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ এই ভক্তির লক্ষণ। সাধনায় ক্ষেত্রে এই যে ভক্তিকে মুখ্য করে তোলা এইটিই রামানন্দের প্রধান দান। এই জন্যই বোধ হয় বলা হয়—

"ভক্তী দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ,
প্রগট কিয়া কবীরনে সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড॥"

দ্রাবিড়ে উৎপত্তি হ'ল ভক্তির, তাকে নিয়ে এলেন রামানন্দ আর কবীর তাকে সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড পৃথিবীতে প্রচার করলেন। এর মানে হ'ল, ভক্তিকেই মুক্তির উপায় বলে প্রথমে দাক্ষিণাত্যে প্রচার করা হয়। রামানন্দ সেই মতটিকে প্রথমে উত্তর-ভারতে প্রচার করলেন আর তাঁর শিষ্য কবীর তাকে সবত্র ছড়িয়ে দিলেন। গুরু রামানন্দ আর একটি বড় কাজ করেন। আলোয়ারদের মত তিনিও জনসাধারণের ভাষায় তাঁর ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। আচার্য্য রামানুজের উপাস্য নারায়ণ, বিষ্ণু ও শ্রী। তবে পরবর্ত্তী কালে রামানুজ সম্প্রদায়ে রামও উপাস্য হন। গুরু রামানন্দের উপাস্য রাম। রাম যে নারায়ণ, তিনি বিষ্ণুর অবতার, এ বিশ্বাস খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক শতকেই প্রচার লাভ করেছিল। তবে রামের উপাসনা একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত হয় বলে মনে হয়।

আমরা দেখেছি, গুরু রামানন্দের উপাস্য ছিলেন রাম। তিনি দীক্ষা দিতেন রামমন্ত্রে। যে-ভক্তি গুরু রামানন্দের প্রধান দান তা এই রামের প্রতি ভক্তি। গুরু রামানন্দের আগেও রামকে উত্তর-ভারতে বিষ্ণুর অবতার বলে মানা হ'ত। কিন্তু তাকে পরাৎপর পরব্রহ্ম বলে গণ্য করা হ'ত না। রাম যে ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম এ কথা গুরু রামানন্দই প্রচার করলেন উত্তর-ভারতে। তিনিই এই রামভক্তিকে নিয়ে এলেন দক্ষিণ থেকে। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, "রামানন্দ যদিও প্রচলিত রাম নাম ব্যবহার করিয়াছেন তবু তাঁর ঈশ্বর এক, প্রেমময়, নিরঞ্জন। তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন; তিনি মনের মানুষ প্রেমের বন্ধু।" গুরু রামানন্দের প্রধান শিষ্যদের অন্যতম কবীরদাস। তিনি গুরুর কাছ থেকে পেলেন এই রামমন্ত্রে দীক্ষা। কবীরদাসের জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে যেমন নানা গল্প প্রচলিত হয়েছে তেমনি তাঁর দীক্ষা সম্বন্ধেও একটি গল্প আছে।

কবীরদাস ছেলেবেলা থেকেই কেমন উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। সংসারের কাজ-কর্মে তাঁর মন বসে না। কাশীতে নানা সম্প্রদায়ের

বহু সাধুর বাস। কবীরদাস এই সব সাধু-সন্তদের সঙ্গ করে বেড়ান। হিন্দু সাধুদের সঙ্গ করার ফলে হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর মন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। তিনি হিন্দুধর্মে দীক্ষা নেবেন বলে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কে দেবে তাকে দীক্ষা? মুসলমান জোলার ছেলেকে কোন্ হিন্দুগুরু দীক্ষা দেবেন? কবীরদাস ভেবে আকুল হলেন। গুরু রামানন্দের তখন খুব নাম। তাঁর উদারতার কথা সবার মুখে-মুখে। কবীরদাস স্থির করলেন গুরু রামানন্দের কাছ থেকেই দীক্ষা নেবেন। কিন্তু সরাসরি গুরুর কাছে যেতে ভরসা পেলেন না। যতই উদার হোন না কেন গুরুজী, মুসলমানের ছেলেকে তিনি দীক্ষা দেবেন এ কথা ভাবতেও সাহস করলেন না কবীরদাস। অথচ, দীক্ষা নেবার জন্য তাঁর প্রাণ ছটফট করছে, দীক্ষা তাঁকে নিতেই হবে, যেমন করেই হোক্ না কেন। নৈলে তিনি বাঁচবেন না। কিন্তু উপায় কি? অনেক ভেবে-চিন্তে কবীরদাস এক উপায় স্থির করলেন। কৌশলে নিতে হবে দীক্ষা।

রাতের শেষে যখন ভোরের আলো শিউরে ওঠে পূব আকাশে তখন গুরু রামানন্দ যান গঙ্গাস্নানে। কবীরদাস গিয়ে তাঁর স্নানের ঘাটে সিঁড়ির উপর পড়ে রইলেন অন্ধকারে। গুরু রামানন্দ প্রতিদিনকার মত নিশ্চিন্ত মনে জলে নামছিলেন, হঠাৎ অন্ধকারে কিসের উপর পা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অভ্যস্ত ইষ্ট নাম—রাম রাম রাম, এ কার পায়ে পা দিলাম গো, আহা বেচারা!

হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন কবীরদাস। তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল; তিনি পেলেন দীক্ষা। গুরুজীর পায়ের কাছে মাথা রেখে বললেন—প্রভু, আমি আপনার অধম সেবক, আপনি আমার গুরু। আজ আমাকে আপনি কৃপা করে দীক্ষা দিলেন।

বিস্মিত হ'লেন গুরু। বললেন, সে কি, বাপু! কবীরদাস বললেন, গুরুজী, আমার অনেক দিনের সাধ আপনার কাছে দীক্ষা নেব। কিন্তু মুসলমানের ছেলে আমি। আমাকে আপনি দীক্ষা দেবেন এতটা আশা করতে সাহস হ'ল না। তাই আপনার স্নানের ঘাটে সিঁড়ির উপর পড়ে ছিলাম। মনে আশা ছিল অন্ধকারে আমার গায়ে পা ঠেকলেই আপনার মুখ দিয়ে ইষ্টনাম বেরিয়ে আসবে আর তা হ'লেই আমার আশা পূর্ণ হবে। আপনার পদস্পর্শে আজ আমি ধন্য হয়েছি। পেয়েছি দীক্ষা। সব শুনে পরম প্রীত হলেন গুরু। কবীরদাসকে শিষ্য বলে অঙ্গীকার করলেন। পণ্ডিতেরা অনেকেই কিন্তু এই গল্প বিশ্বাস করেন না। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন "এ সব বাজে কথা। কারণ, রামানন্দ আচার মারিয়া চলেন নাই বলিয়া তাঁর নূতন পন্থের আরম্ভ। তাঁর বহু শিষ্যই সমাজবিধি অনুসারে বর্জ্জনীয়।" গুরু রামানন্দের উদার শিক্ষার গুণে তার শিষ্যদের অনেকের মধ্যেই ধর্ম সম্বন্ধে একটি বিশেষ উদারতা দেখা যায়। অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের কোনো বিদ্বেষ ছিল না। সম্প্রদায়ের এমন কি অন্য ধর্মের সাধু-সন্তদের সঙ্গেও তাঁরা অবাধে মেলামেশা করতেন, আলাপ-আলোচনা করতেন, আবশ্যক মত উপদেশ গ্রহণ করতেন তাঁদের কাছ থেকে। এ বিষয়ে গুরু রামানন্দ স্বয়ং প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁর শিষ্যদের বিশেষ সহায়তা করেছেন। তিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট পরিব্রাজক। তাঁর প্রধান বার জন শিষ্যকে নিয়ে তিনি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতেন, সাধুসঙ্গ করতেন, মায়াবাদী, জৈন ও বৌদ্ধদের সঙ্গে শাস্ত্রার্থ করতেন এবং জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সবাইকে মন্ত্র দিতেন। কবীরদাস যে জোলাদের মধ্যে জন্মেছিলেন বা মানুষ হয়েছিলেন ধর্ম সম্বন্ধে তাদের বিশেষ কোনো গোঁড়ামি ছিল না। তা ছাড়া, ছেলেবেলা থেকেই নানা সম্প্রদায়ের সাধুসন্তদের সঙ্গ করার ফলে কবীরদাসের মন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক হয়ে গিয়েছিল। এর উপর, তিনি পেলেন গুরু রামানন্দের উদার শিক্ষা ও মহৎ সান্নিধ্য। ফলে, সকল রকমের গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী তিনি অতিক্রম করে গেলেন।

এই জন্য, এক দিকে যেমন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁকে অনাচারী ধর্মহীন পাষণ্ড বলে গালাগাল দিত, তেমনি অন্য দিকে আবার উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁকে আপন বলে দাবি করত। কবীরদাসের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নিয়ে হিন্দুরা যেমন নানা কাহিনী রচনা করেছে তেমনি করেছে মুসলমানেরা। কবীরদাসের গুরু সম্বন্ধেও হিন্দু মুসলমানের মত ভিন্ন। হিন্দুরা বলেন, কবীরদাস গুরু রামানন্দের শিষ্য আর মুসলমানেরা দাবি করেন সেক তক্কি সাহেব ছিলেন তার পীর। কোনো কোনো পণ্ডিত উভয় মতের সামঞ্জস্য করেন এই ভাবে। তাঁরা বলেন, সম্ভবত যৌবনে কবীরদাসের উপর প্রভাব পড়েছিল গুরু রামানন্দের তার পরে তিনি সেখ তক্কি সাহেবের কাছ থেকেও উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই গুরু রামানন্দকেই কবীরদাসের গুরু বলে স্বীকার করেন। আর স্বয়ং কবীরদাসের পদেই এ কথার স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অসার বাহ্যাচার সর্বস্বতা, জ্ঞানমার্গীদের শুষ্ক তর্কজাল, যোগপন্থীদের গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতা ধর্মের নানা পরস্পর-বিরোধী মতবাদ যখন কবীরদাসের সহজেই ভগবদ্‌বিশ্বাসী চিত্তকে দুঃখে দ্বন্দ্বে অভিভূত করে দিচ্ছিল, যখন পথ না পেয়ে তাঁর ভগবদ্‌মুখী হৃদয় যাতনায় ছটফট করছিল তখনই এলেন গুরু রামানন্দ। কবীর বলছে: "রামানন্দকে যেই গুরু পেলাম অমনি সদ্‌গুরুর প্রতাপে সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব মিটে গেল, মিটে গেল সব দ্বিধা।"

তবে গুরু রামানন্দের মত উদার গুরুর শিষ্য এবং স্বয়ং স্বভাব-উদার কবীরদাসের পক্ষে সেখ তক্কি সাহেবের কাছ থেকেও উপদেশ গ্রহণ করা খুবই সম্ভবপর। বস্তুতঃ, কবীরদাস যে রকম উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তাতে তিনি যে বহু সাধুসন্তের কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছিলেন তা অনুমান করতে পারা যায়। এটি নিন্দার কথা নয়, গৌরবেরই কথা। মহৎ যাঁরা তাঁরা যাঁর কাছ থেকে সামান্য কিছুও শিক্ষা করেন তাঁকেই গুরু বলে স্বীকার করেন। ভাগবতের একটি উপাখ্যানে আছে গুরু অসংখ্য। এমন কি বেশ্যা, ইষুকার, মৌমাছি এদেরও গুরু বলে ধরা হয়েছে। কবীরদাসের জীবনেও আমরা এমনি মতত্ত্বের পরিচয় পাই। কথায় আছে, 'গুরু মিলে লাখ লাখ শিষ্য না মিলে এক।' কবীরদাস ছিলেন এমনি দুর্লভ শিষ্য। অবশ্য, গুরু রামানন্দও ছিলেন দুর্লভ গুরু। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, "তিনি রামানন্দের কাছে সব চেতনা লাভ করিলেন; তাঁর কাছে ধর্ম সাধনা গ্রহণ করিলেন; জাতিভেদ, পৌত্তলিকা, তীর্থব্রত, মালা, তিলক প্রভৃতি কিছুরই ধার ধারিলেন না। সকল কুসংস্কারের মূলে তিনি প্রচণ্ড আঘাত করিলেন।"

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী

৬

সিপাহী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮৫৪-৫৫ সালে কোম্পানীর আমলাতন্ত্রের অত্যাচার ও কু-শাসনের ফলে বাংলার নিরীহ সাঁওতালগণ বিদ্রোহী হইয়া ওঠে।

ওয়াহবীদের পরাজয় হইলেও তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। ইহারা গোপনে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। সিপাহী যুদ্ধের সময় পূর্ব্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত ওয়াহবী সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট দল ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে যোগদান করে। সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই বৎসর পরেই বিপ্লবের পুণ্যভূমি বাংলা দেশেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের শঙ্খ বাজিয়া ওঠে।

১৮৫৪ সালের প্রথম ভাগ হইতেই সাঁওতালগণের মধ্যে অস্বস্তি ও অসন্তোষের ভাব দেখা দেয়। ঐ বৎসর ভাল ফসল হইলেও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায়। বীরভূমের বিটিশ ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানীয় এক উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেন। নূতন রেল নির্ম্মাণের কাজে অনেক স্থানীয় সাঁওতালগণ নিযুক্ত হইয়া বেশ সুখেই আছে বলিয়া তিনি পত্র লেখেন। কিন্তু বিদ্রোহের অগ্নিশিখা এই ভাবে চাপিয়া রাখা সম্ভব হইল না। বাগনাদিহীর সিধু ও কানু ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে সাঁওতাল দল কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের কু-শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম আবেদন-নিবেদন করে। কিন্তু ইহাদের কোন আবেদন শোনার মত সময় উদ্ধত ব্রিটিশ বণিকদের ছিল না। খাজনা আদায় করা ছাড়া আর তাহাদের অন্য কাজ ছিল না। পরে সাঁওতালগণ ইংরাজ জেলা-কমিশনারের নিকট তাহাদের অভিযোগ দূর করার জন্য বলে, অন্যথায় নিজেরাই তাহারা অন্যায়ের প্রতিকার করিবে। কিন্তু কমিশনার সাহেব অভিযোগের কোন কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কারণ তিনি দেখিলেন যে, নিরক্ষর সাঁওতালদের নিকট হইতে নিয়মিত ভাবেই খাজনা আদায় হইতেছে।

সাঁওতালদের প্রথমে কোন প্রকার সশস্ত্র সংঘর্ষের পরিকল্পনা ছিল না। কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে আবেদন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল সেই আবেদন কলিকাতায় গিয়া গভর্ণর জেনারেলের নিকট পেশ করাই উদ্দেশ্য ছিল।

অবশেষে সাঁওতালদের জাতীয় প্রতীক শাল গাছের ডাল হাতে লইয়া চর সমূহ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া ভাবী বিদ্রোহের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। প্রায় ত্রিশ সহস্র সাঁওতাল তীর-ধনুক ও বর্শায় সুসজ্জিত হইয়া ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বে সাঁওতালদের নেতাগণ ভাগলপুর ও বীরভূমের কমিশনারগণকে চরম পত্র প্রেরণ করে। ইহা ছাড়া কলিকাতা যাইবার পথে যে সকল থানা পড়ে সেই থানা সমূহের ইনস্পেক্টরদেরও ভাবী কর্ম্মপন্থার বিষয় জ্ঞাপন করে।

সমস্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের অভিযোগ পূরণের ব্যবস্থায় নিরাশ হইয়া সাঁওতালগণের কলিকাতা অভিমুখে অভিযান আরম্ভ হয়। সাঁওতালগণ তাহাদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের লইয়া বিরাট এক শোভাযাত্রা সহকারে চলিয়াছে। তাহাদের দলের সম্মুখে মাদল ও ঢাকীর দল সাঁওতালদের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু পথিমধ্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সাঁওতালদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সমগ্র রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

৭ই জুলাই ১৮৫৫ সাল। সাঁওতালদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রথম দিবস। যত দিন গ্রাম হইতে আনীত খাদ্য তাহাদের সঙ্গে ছিল তত দিন সাঁওতালগণ কোন প্রকার লুণ্ঠনের প্রয়োজন বোধ করে নাই। কিন্তু তাহাদের রসদ নিঃশেষিত হওয়ার পর তাহারা গ্রামের লোকের নিকট হইতে সাহায্য অথবা লুণ্ঠন দ্বারা তাহাদের প্রয়োজন মিটাইত।

বিদ্রোহী নেতার আদেশে সাঁওতাল সৈনিকদের খরচের জন্য প্রত্যেকটি পরিবারের উপর প্রায় সাড়ে ৭ টাকার মতন খাজনা ধার্য্য করে। এই সময় কোম্পানীর এক জন বেতনভোগী ইনস্পেকটর সাঁওতালদের অগ্রগতিতে বাধা দিবার চেষ্টা করে। বিদ্রোহী সাঁওতাল ভ্রাতৃদ্বয়কে চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া বাঁধিয়া জেলার নির্দ্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাঁওতাল দল ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে এবং ইনস্পেকটরকে তাহার দলবল সহ বাঁধিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে বিচার হওয়ার পর সিধু নিজে ইনস্পেকটরকে হত্যা করে। ইহা ছাড়া আরও নয় জন পুলিশ নিহত হয়। এই ইনস্পেক্টার ও পুলিশ-হত্যার ফলে সাঁওতালদের সুপ্ত বন্যভাব জাগ্রত হইয়া ওঠে।

এই ঘটনার পর এক পক্ষ কাল যাবৎ বিদ্রোহী সাঁওতাল দল গ্রামের পর গ্রাম নির্ব্বিচারে লুণ্ঠন করিয়া আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দেয়। হাজার হাজার গৃহপালিত পশু লুণ্ঠিত হয়। ইংরাজ সৈন্য প্রতিরোধ করিতে গিয়া কয়েক স্থানে পরাজিত হয়। বিদ্রোহীদের হস্তে দুই জন ইংরাজ মহিলা সহ কয়েক জন ইংরাজ নিহত হয়। ইংরাজদের কারখানা ও তাহাদের আবাসস্থল বিদ্রোহীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। বারো শত কোম্পানী সৈন্যের একটি দল বিদ্রোহীদের আশী মাইলের নিকটে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

২৫শে জুলাই জেনারেল লয়েডের অধীনে এক দল সৈন্য বিদ্রোহীদের দমনের জন্য প্রেরিত হইল। ইহা ছাড়া স্থানীয় জমিদারগণ ও ইংরাজ ব্যবসায়িগণও বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট সাহায্য করে। মুর্শিদাবাদের নবাব এক দল সুশিক্ষিত হস্তী ও সৈন্য পাঠাইয়া ইংরাজ কোম্পানীকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেন। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সর্ব্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী এক জন ব্রিটিশ কমিশনার নিযুক্ত হইল।

সাঁওতালদের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বলা অপেক্ষা ইংরাজ কর্ত্তৃক নিরীহ সাঁওতালদের নিছক হত্যা বলাই সঙ্গত। যখনই কোথাও জঙ্গলের মধ্যে ধূম নির্গত হইতে দেখা যাইত, তখনই ম্যাজিষ্ট্রেট সদলবলে জঙ্গল ঘিরিয়া বিদ্রোহী সাঁওতালদের আত্মসমর্পণ করিতে বলিতেন, অন্যথায় নির্ব্বিচারে হত্যা করা হইত। একবার ৪৫ জন সাঁওতাল একটি কুটীরে আশ্রয় নেয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের সকলকে আত্মসমর্পণের নির্দ্দেশ দেয়। ইহার উত্তরে এক ঝাঁক তীর কোম্পানী সেনাদের উপর আসিয়া পড়িল। এই সময় সিপাহিগণ ঐ মাটির কুটীরের দেওয়ালে গর্ত্ত করিয়া এক ঝাঁক

গুলী চালাইল। ইহারা পুনর্ব্বার সাঁওতালদের আত্মসমর্পণের কথা বলায় কুটীরের দরজা সামান্য খুলিয়া পুনরায় তাহারা এক ঝাঁক তীর নিক্ষেপ করিল। এই সময় যুদ্ধের ফলেও কয়েক জন কোম্পানী সিপাহী বিশেষ ভাবে আহত হয়, সমগ্র গ্রাম সেই সময় জ্বলিতেছিল, কতক্ষণ তীর ও গুলী বিনিময়ের পর সাঁওতালদের কুটীর নিস্তব্ধ হয়। ইহার পর কোম্পানীর সৈন্যরা কুটীরে প্রবেশ করিয়া শোণিতাপ্লুত এক বৃদ্ধকে মৃতের স্তূপের উপর কুঠার হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে। এক জন বৃদ্ধের নিকট গিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করার জন্য বলিলে সেই বৃদ্ধ শাণিত কুঠারের আঘাতে সৈনিকটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলে।

Major Jervis বিদ্রোহীদের অভিযানের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, "ইহা একেবারেই যুদ্ধ নয়। সাঁওতালরা আত্মসমর্পণ করা কাকে বলে তাহা জানে না। যতক্ষণ যুদ্ধের দামামা বাজিতে থাকিবে ততক্ষণ গুলী করিয়া হত্যা না করা পর্য্যন্ত তাহারা দাঁড়াইয়া থাকিবে। সাঁওতালদের তীর-বিদ্ধ হইয়া আমাদের সৈনিক নিহত হইত বলিয়াই আমরা গুলী চালাইতে বাধ্য হইতাম। রণ-দামামা স্তব্ধ হইলে তাহারা কিছু দূর পিছু হঠিয়া যাইত। কোম্পানীর সৈনিকগণ এই ভাবে সাঁওতালদের হত্যা করিতে বিশেষ কুণ্ঠা বোধ করিত।"

আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সাঁওতালদের কর্ম্মতৎপরতা স্তিমিত হইয়া আসিল। কোম্পানীর পক্ষ হইতে বিদ্রোহের নেতা ব্যতীত আর প্রত্যেককে মার্জ্জনার ঘোষণা করা হয়। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়া জানাইলেন যে, গত সাত সপ্তাহ ধরিয়া সমস্ত শান্ত আছে। সাঁওতালদের কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু এই নিস্তব্ধতা স্বল্পকালের জন্য বর্ত্তমান ছিল।

ইহার এক মাস পরে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, "বিদ্রোহিগণ আশীটি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। ডাক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল বিদ্রোহীদের করতলগত। বিদ্রোহী দল দুই ভাগে বিভক্ত। এক দল অপরবাঁধের নিকটবর্ত্তী রক্ষাদঙ্গলের আর এক দল সিউড়ীর নিকটবর্ত্তী তেলাবুনীর নিকট অপেক্ষা করিতেছে। "ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১২ হইতে ১৪ হাজার।"

মুচিয়া কোমনাজেলা, রামা ও সুন্দরা মাঝির নেতৃত্বে প্রায় তিন হাজার বিদ্রোহী ১৬ই ও ১৭ই সেপ্টেম্বর কয়েকটি থানা ও গ্রাম দখল করে। থানার দারোগা ও বরকন্দাজেরা বেগতিক দেখিয়া এক কাপড়ে পলায়ন করে। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বাহ্নেই থানা আক্রমণের সংবাদ অবগত হইয়া প্রয়োজনীয় দলিল সমূহ দেওঘরে স্থানান্তরিত করেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সৈন্য-সাহায্য চাহিয়া পাঠান। কিন্তু গভীর জঙ্গল ও দূরত্বের জন্য কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষ সৈন্য পাঠাইতে অস্বীকার করেন।

Mr. Wardকে এই ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিলে তিনি বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান যে, এক দল সৈন্যকে রাণীগঞ্জ হইতে জামতাড়া পাঠান হইতেছে, তাহারা বর্ষার শেষে অন্য সৈন্য না আসা পর্য্যন্ত থানা সাহনা, অপরবাঁধ এবং আফজলপুরে অপেক্ষা করিবে। বর্দ্ধমানের কমিশনারের নিকট সিউড়ীর ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্রে আরও জানা যায় যে, বিদ্রোহী সাঁওতাল দল অন্যান্য দলের সহিত যোগদান করার জন্য বিভিন্ন স্থানে জমায়েৎ হইতেছে। সৈন্যদল আসিয়া পৌঁছান মাত্র আমি থানায় পুলিশ ফেরৎ পাঠাইব এবং যাহাতে ডাক চলাচল করে তাহার ব্যবস্থা করিব। বর্ত্তমানে হলদিগড় পাহাড়ে রামা মাঝি তাহার ২ শত লোক লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। ঐ অঞ্চলের পথচারীদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে। বর্ত্তমানে দেওঘরে অসামরিক কোন অফিসার না থাকা বিশেষ দুঃখের কারণ। ইহা পূর্ব্বেই আপনাকে জানাইয়াছি।"

উক্ত পত্রে তিনি আরও বলেন যে, "সিরু মাঝির নেতৃত্বে পাঁচ হইতে সাত হাজার সাঁওতাল তিলাবুনীর অন্তর্গত মুলিয়াটাকু অধিকার করিয়া পুকুর কাটিয়া মাটির বাঁধ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের আরও শক্তিশালী করিয়াছে। তাহারা জঙ্গলের মধ্যে দুর্গা পূজার ব্যবস্থাও করিয়াছে; এবং এই জন্য নানগুলিয়া থানা লুণ্ঠন করিয়া আসার পথে গ্রাম হইতে দুই জন ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়াছে, গতকল্য আমাদের যে গুপ্তচর আসিয়াছে তাহার মুখে অবগত হইলাম যে, রক্ষাদঙ্গলের দল আসিয়া পড়িলে তাহারা সিউড়ী অভিমুখে অভিযান করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।"

এই যুদ্ধের সময়েও সাঁওতালদের শালীনতার অভাব ছিল না। জয়ের অব্যবহিত পরেও তাহারা শত্রুকে সাবধান না করিয়া আক্রমণ করিত না। ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে বীরভূমের স্থানীয় লোকেদের মধ্যে সাঁওতালদের আক্রমণের সংবাদে অত্যন্ত ভীত হইতে দেখা যায়। বিদ্রোহী দল এক জন ডাক-হরকরাকে পথিমধ্যে আটক করিয়া ডাক লুণ্ঠন করিয়া লয় এবং তাহাকে সাঁওতালদের জাতীয় শাল গাছের তিনটি পাতাযুক্ত একটি ডাল বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে বাধ্য করে। তিনটি পাতার অর্থ যে, তাহাদের ঐ স্থানে উপস্থিত হইতে আর তিন দিন বিলম্ব আছে।

অবশেষে পশ্চিম জেলা-সমূহ ৪ মাস সাঁওতালদের দখলে থাকার পর ১৩ই নভেম্বর উক্ত অঞ্চলে সামরিক আইন ঘোষণা করা হয়। ব্রিগেডিয়ার এল, এস্, বার্ড বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলে অধিনায়কের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৫-৫৬ সালের শীতকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সাঁওতালদের বাহির করিয়া দেওয়া হয়। সাঁওতালগণ দলে দলে আত্মসমর্পণ করে। ইহার পর সাঁওতাল নেতৃবৃন্দদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের প্রহসন চলে। বীরভূম জেলে এক জন সাঁওতাল নেতা বলে যে, "তোমরা আমাদের যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছ। আমরা যাহা ন্যায় তাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা কোন উত্তর দিলে না। কিন্তু যখন আমরা প্রতিকারের জন্য সর্ব্ব শক্তি প্রয়োগ করিলাম তখন জঙ্গলে নেকড়ে বাঘের ন্যায় আমাদের নির্ব্বিচারে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছ।"

সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করার পর পুরাতন অত্যাচারী পুলিশ কর্ম্মচারীদের বিদায় দেওয়া হয় এবং সাঁওতাল-প্রধান স্থানসমূহে ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। এই বিদ্রোহের পর কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষদের চৈতন্যোদয় হইল যে, এত দিন তাহারা কেবল মাত্র খাজনা আদায় করিয়াছে কিন্তু প্রতিদানে নিরীহ সাঁওতালদের কিছুই দেয় নাই। এই ছয় মাস বিদ্রোহের ফলে ইংরাজের যে ব্যয় হয় তাহা দশ বৎসর শাসন করার ব্যয় অপেক্ষাও অধিক।

[ক্রমশঃ।

রাধারাণী দেবী ও অপরাজিতা দেবী

জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই শিল্পই সার্থক যাহা শিল্পী হৃদয় দিয়া আঁকে, হাত দিয়া নহে। হৃদয় দিয়াই তাহা বুঝিতে হয়। কবি ও শিল্পী অভেদ। ভালো লাগাই হ'ল আসল কথা, ভালো লাগার অর্থ ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃতি, ইহা হইতেই তৃপ্তি, সেই তৃপ্তিই শিল্প ও কবিতার বিচারের মানদণ্ড। ইহা আবেগ বা উত্তেজনা নহে, ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতি হইলেও, ক্ষণিকের উন্মাদনা নহে—ইহা একটি শান্ত-মধুর অনুভূতি। রাধারাণী দেবীর কয়েকটি কবিতা '' প্রকার অনুভূতি জাগায়। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চারখানির বেশী নয়, এতো অল্প লিখিয়া প্রচুর কবিখ্যাতি ও সাহিত্যিক সুনাম ইদানিং আর কোন মহিলার ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। ইহার মূলে রহিয়াছে রচনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—জীবন-রহস্য সম্বন্ধে নারীর মুখে সুস্পষ্ট উক্তি, তেজোময় গভীর সংযত আবেগ, বলিষ্ঠ স্বচ্ছন্দ প্রকাশ যাহা ঈশ্বর ও সমাজের উদ্দেশে প্রচলিত কোমল কান্ত আবেদনের সুকুমার সুরের পরিপন্থী, যাহা কাব্যের আঙ্গিকে উজ্জ্বলে-মধুরে মিশাইয়া নির্ভীক আলোচনা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করে। কবিতায় তাঁহার মত বিচার অপেক্ষা রসের বিচার বাঞ্ছনীয়, যেহেতু তিনি কবি, সংস্কারক বা বক্তা নহেন।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে—কথাশিল্পে, ছোট গল্পে, রূপকথায়, সমালোচনায় তাঁহার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও সত্য-প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস "শেষের পরিচয়" রাধারাণী দেবী অর্দ্ধেকের অধিক লিখিয়া, রচনার ধারা অব্যাহত রাখিয়া উপন্যাসটি সমাপ্ত করিয়া, কথাশিল্পীর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

প্রথম পর্য্যায়

কবি নরেন্দ্র দেবের সহিত পরিণীত হইবার পূর্ব্বে নানা সাময়িক পত্রে তাঁহার রচিত কবিতা ও গল্প 'রাধারাণী দত্ত' নামে প্রকাশিত হইত। ১৩৩৬ সালের ফাল্গুনে তাঁহার প্রথম প্রচারিত কাব্যগ্রন্থ 'লীলাকমল' পূর্ব্বরচিত অনেকগুলি কবিতার সঞ্চয়ন। যে-সব মাসিক পত্রিকার স্নেহ-অঙ্কে লীলাকমলের দলগুলি প্রথম আঁখি মেলিয়াছিল, ভূমিকায় কবি মনোজ্ঞ ভাষায় তাহাদের ধন্যবাদ দিয়াছিলেন; কবিগুরুর আশীর্ব্বারি সিঞ্চনে 'লীলাকমল' পরিপূর্ণ লাবণ্যে প্রস্ফুটিত। শব্দ-চয়নের সুষমা ও কৌশল, ললিত ভঙ্গীতে ছন্দের লীলাবিলাস এবং অন্তরের অনুভূতির প্রাঞ্জল প্রকাশ কয়েকটি কবিতাকে মাধুর্য্যে ভরিয়া দিয়াছে।

'লীলাকমল'কে কবি বলিতেছেন—"জলবালা" সূর্য্যস্বয়ম্বরা, ঊর্দ্ধে তাহার মৃণাল গ্রীবাটি প্রসারিত করিয়া তরুণ দিবালোকে উজ্জ্বল ধরণীকে দেখিতে চাহিতেছে, মানব-জীবনে এ যেন যৌবনের প্রথম উন্মেষ—

> "জাগিলো যৌবনপদ্ম। টুটিল সহস্রদল কারা।
> ফুটিল গো ফুল।
> আপন-অন্তর গন্ধে আপনা-বিস্মৃত আত্মহারা
> —বিহ্বল আকুল।
>
> * * * *
>
> যৌবন জাগিলো যদি অন্ধ অন্তরের গন্ধ গানে
> উন্মীলিয়া আঁখিপুষ্প, বিস্ময়ে তাকালো বিশ্বপানে—
> কোথা সেই প্রেম সূর্য্য? তূর্য্য যাঁর ধ্বনিলো তাহার
> বক্ষের স্পন্দনে—
> তাঁরি তরে পূর্ণ পাত্র অমৃত-উচ্ছল উপহার
> দেহের নন্দনে।"

ছন্দ ও বিষয়-বৈচিত্র্যে 'লীলাকমল' সুখপাঠ্য, 'বসন্তের প্রতি বনলক্ষ্মী', 'মীরার ব্যথা', 'আসন্ন-আষাঢ়', 'বর্ষা-বিদায়' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা আবৃত্তির উপযোগী।

এই সময় আসিল কবির প্রস্তুতি ও ছদ্মনামের অন্তরালে পরীক্ষার (experiment) যুগ। "অপরাজিতা দেবী" নাম লইয়া রাধারাণী দেবী বাংলার কাব্য-সাহিত্যে মহিলাদিগের রচনায় সম্পূর্ণ নারীজনোচিত স্বকীয়তা ও নারীর অভিজ্ঞতা-সুলভ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংসারিক এমন কি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বর্ণনায় বৈশিষ্ট্য আনিয়া তাহা বজায় রাখা যায় কি না—এই নূতন ধরণের পরীক্ষায় দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ আত্মনিয়োগ করিলেন। ঐ ছদ্মনামে রচিত প্রথম বৎসরের কবিতাগুলি ১৩৩৭ সালে "বুকের বীণা" বা 'অপরাজিতা দেবীর কবিতার খাতা' নামে প্রকাশিত হয়। জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হইয়া কবি পর পর 'আঙ্গিনার ফুল', 'পুরবাসিনী' ও 'বিচিত্ররূপিণী' নামে আরও তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যাচার্য্য প্রমথ চৌধুরী শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর রচনার অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। "সহজ লেখা" যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন তাহা কবিগুরু বহু বার বলিয়াছেন। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ সরলতা। সাধারণ (চলতি) ভাষায় বাঙালীর সাধারণ জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাগুলি সহজতম ছন্দে প্রকাশের মৌলিকতার জন্য এই দুই মনীষীর আশীর্ব্বাদ লাভে কবি আত্মগোপনের অভিযান ও পরীক্ষা সার্থক করিয়াছিলেন।

বহু পূর্ব্বে (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমতী কামিনী সেনের 'আলো ও ছায়া', প্রকাশিত হয়, পুস্তকে রচয়িত্রী হিসাবে তাঁহার নাম ছিল না। পরে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ লাভ করিয়া ও পুস্তকখানির জনসমাজে সমাদর দেখিয়া কবি নিজ নাম প্রকাশ করেন। কবি রাধারাণীর আত্মগোপনে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে।

বিষয় নির্ব্বাচনে, বিশ্লেষণে ও রচনাভঙ্গীতে 'অপরাজিতা দেবী' ও শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীর এতো পার্থক্য যে প্রথমটি ছদ্মনাম বলিয়া সন্দেহ হয় না। কিন্তু নারীহৃদয়ের কমনীয় স্পর্শ, নারী-মানসিকতার বিচিত্র গতি ও একটি সরল স্বচ্ছন্দ অনুভূতি ঐ দুই নামীয় রচনার গভীরে একই ধরণের আন্তরিকতা, তীব্রতা ও Matter of fatness মিশিয়া আছে। আনন্দ লইয়াই এই কবির খেলা, বৈরাগ্য, হতাশা, স্বদেশপ্রেম, দুঃখবাদ এমন কি করুণ রসও তাঁহার উপজীব্য নহে। তথাপি অধিকাংশ কবিতাই রসোত্তীর্ণ।—"জন্মদিনে" কবিতার আরম্ভে—

"নটকানা রং কাশ্মীরি সাড়ী? না না, ওটা তুলে রাখো;
ও ভাই বৌদি! এস না লক্ষ্মী একটু এখানে থাকো!
কোন্ সাড়ী আর ব্লাউজে আমাকে সবচে' মানাবে ভালো
বলো না এদের—দাঁড়া না মালতি! বাদামি কিম্বা কালো
চেরীফুল-তোলা ফিন্‌ফিনে ঐ জর্জ্জেট স্যুট? ছি ছি!
তোমারো কি ভাই মোটে রুচি নেই? আর্ট শেখা মিছিমিছি!
কি বললি বেলা? রুপোলী জরীর লাল বেনারসী যেটা?
আরে রাম! রাম!! হাস্‌বে সবাই, ভাববে মেড়ুয়া এটা"

* * * * *

"দিনের সুরু"তে—

"কাজের সময় যত দুষ্টুমি, ঝকমারি আসা তোমার কাছে!
গুরুজন কেউ দেখে ফেলে পাছে! ভয়ে ভয়ে আসি,
কে কোথা আছে!
দিলে খোঁপা খুলে—মিছিমিছি—ছি ছি—আঁচলে মাখালে
'লাভ মি' ছাই!
তোমার জ্বালায় আলুথালু বেশ! কা কোরে ঘরের
বাইরে যাই!!
তোমার কি বলো? দেখবে সকলে, ঠায় এক মনে পড়চে ছেলে!
'যত নষ্টের গোঁড়া বউটাই', বোলবে এ ঘরে যে কেউ এলে!
চায়ের পেয়ালা দিতে এসে এত বিপদ ঘটাবে আমি কি জানি?
সকাল বেলাই দোরে দিলে খিল—লজ্জা কি নেই একটুখানি?"

হায়! এ পুরাতন বাস্তব সংসার-সুষমা শুধু কবির ছবিতেই রহিয়া গেল! সে আনন্দ, সে সংযম সে প্রীতি, সে অতিমধুর গুরুজন-ভীতি আর কি ফিরিবে?

'বর্ষায় বান্ধবীর চিঠি'—

এ' তো গেল ভাই কর্ত্তার কথা,—গিন্নির হাল শোনো;
বাজার আক্রা, তরি-তরকারী মেলে নাকো ভালো কোনো।
ভিজে ঘুঁটে দিয়ে উনুন ধরানো ব'লে বোঝাবার নয়!
তাও আজকাল কতো দাম জানো?—পয়সায় খান-ছয়!
রান্না চাপাতে দেরী হ'য়ে যায়, আপিসের ভাত 'লেট'
আধা-খাওয়া ক'রে নিত্য ছোটেন, নইলে চলে না পেট!
ফাটা ছাদ দিয়ে জল ঝরে' ঝরে' বিছানা বাক্স ভেজে;
রোদের অভাবে স্যাঁৎসেঁতে সদা শোবার ঘরের মেঝে।
নড়ে' বসি হেন ঠাঁইটুকু নেই, একতলা ছোট বাড়ী;
ঘরের ভিতরই দেয়ালের গায়ে মেলে দিই ধুতি শাড়ী।
খদ্দর দিদি আর্দ্র হ'লে যে কেচে তোলা কী কঠিন,
বর্ষায় শুধু শুকোতেই লাগে সমানে তিনটি দিন।

'খণ্ডিতা'কে দেখুন—

"বাড়ী ফিরে এলে কেন? 'ষ্টুডিও'তে থাক্‌লেই পার্‌তে!...
ভোর হয়ে গেছে আজ 'সেটে'র শেষের কাজ সার্‌তে?—
—থাক্ থাক্! জানা আছে। রাতভোর ছিল কাজ যেখানে,
দিনের বেলাও কেন কাটাও না সর্ব্বদা সেখানে?—
...না, না—সরো। সরে যাও, ছাড় হাত, ছুঁয়োনাক' আমাকে।
চা'—চাই? পারবো নাকো—বলো ডেকে খানসামা রামাকে।
চুপ, করো। সকালেই বাসিমুখে মিছে কথা কোয়ো না।
চরিত্র হারিয়েছ,—মিথ্যেবাদীও মিছে হোয়ো না। ইত্যাদি।

মনে পড়িতেছে, রবীন্দ্রনাথ শরৎকুমারী চৌধুরাণীর "শুভ-বিবাহ" পড়িয়া বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—"মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে এমন কোন পুরুষ গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না।"

'অভিসারিকা', 'উৎকণ্ঠিতা', 'বিপ্রলব্ধা', 'কলহান্তরিতা', 'স্বাধীনভর্ত্তৃকা', 'সেবিকা' প্রভৃতি এক একটি স্বয়ংপূর্ণ অনবদ্য কাব্য-চিত্র। ইহাকে Pen-picture বলিলে Gardinerএর Pillars of Society, Thackeray's English Humoristsএর রচনার ধারার সহিত তুলনীয়।

"পুরবাসিনী" কবিতা পুস্তকে 'ঠিকে ঝী'র বর্ণনা ও তাহার কার্য্যক্রম কলিকাতাবাসী বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের অতি-পরিচিত হইলেও রচনানৈপুণ্যে উপভোগ্য হইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে বাঙালীর সংসারে যাহা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়, কবি সরল ঔদার্য্যে আন্তরিকতার সহিত তাহার ছবি আঁকিয়াছেন। সরসতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে নাই, ভাষা ভাবের সহিত অধিকাংশ স্থলে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে।

দ্বিতীয় পর্য্যায়

১৩৩১ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ২১শে চৈত্রের মধ্যে কবি কয়েকটি সনেট রচনা করেন—"রচনার সময় ধারণা ছিল এগুলি অমুদ্রিত দপ্তরের মধ্যেই থাকিবে। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্থির নিশ্চিন্ত থাকাতেই রচনাগুলি একান্ত ভাবে নিজের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস হয়ে পড়েছিল। ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে খাতা-পত্রের ভিতর থেকে চৌত্রিশটি সনেট বেছে নিয়ে আমার স্বামী ক্ষুদ্র বইএর আকারে 'সীঁথিমৌর' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। আমি তখন কঠিন রোগশয্যায়। আমাকে বিস্মিত করার উদ্দেশ্যে বইখানি আমার সম্পূর্ণ অজানিতেই ছাপা হয়েছিল। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সালে আমাদের বিবাহের বার্ষিকী দিনে তিনি আমারই রচিত এই সনেট কয়েকটি মুদ্রিত পুস্তকাকারে আমার হাতে উপহার দেন।"

["সীঁথিমৌরে"র ভূমিকার অংশ]

'সীঁথিমৌর' কবির ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসময় কবিতার সমষ্টি হইলেও সাহস সারল্য ও প্রেমের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয়ে বহুজনীন হৃদয়াবেদন পাইয়া কবিকে প্রশংসার উচ্চাসনে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে। সনেটগুলির রচনায় কোমল ও কঠোরের সমন্বয় হইয়াছে। সমালোচনার ঊর্দ্ধে কবির এই সুমধুর জীবন কাব্য স্বচ্ছ আন্তরিকতা ও প্রেমের দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া আছে। সপ্তম সনেটে কবির ব্যক্তিগত জীবনের ভাবৈশ্বর্য্য-মাধুরী স্নিগ্ধ শতদলে বিকশিত হইয়াছে।

প্রেম-অভিষেকে কবি দ্বিজত্ব লাভ করিয়া বুঝাইলেন প্রেমের

পরশ সুন্দরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, হৃদয়কে স্বর্গ করিয়া দেয়; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রেমের শুচিস্পর্শেই ফুটিয়া উঠে। ঐ ভাব নূতন না হইলেও প্রকাশের মাধুর্য্যে কবির কয়েকটি রচনাকে মনোহর করিয়াছে।

"বনবিহগী" ছোট বড় কয়েকটি কবিতার সঞ্চয়ন; অধিকাংশই ১৩২৯ সাল হইতে ১৩৪০ সালের মধ্যে রচিত। নূতনগুলিকে চেনা যায়। বিষয় ও ছন্দবৈচিত্র্যে "লীলাকমলে"র মতোই সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য। প্রকৃতির বন্দনায়, আত্মজিজ্ঞাসায়, মানবতার পূজায় কয়েকটি কবিতা হীরকখণ্ডের মতো সমুজ্জ্বল। সহজ সরল ভাবে কবি শিশিরবিন্দু, কাঁচা ধান, রক্তকমল, শিউলি ফুল প্রভৃতির সার্থকতা বুঝাইয়াছেন। নীল চন্দ্রাতপতলে 'হংসবলাকা'র শ্বেত শতদলে গতিশীল মালা রচনা দেখিয়া বলিতেছেন—

* * শরতের হে সুন্দর দূত!
আকাশ-ধরণী মাঝে এ কি ছবি রচিলে অদ্ভুত!
তব পক্ষ সঞ্চালনে গতির উন্মুক্ত রূপ হেরি
লোকে লোকে যাত্রা লাগি কাঁদে চিত্ত—আরো কতো দেরী?

'বনবিহগী'র নীড় মানসলোকে ও মৃত্তিকালোকে; কবি উভয় লোকেই তাহার নীড়ের সঞ্চয় রাখিয়াছেন। মানবতার অর্চনা কবির স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়াই বোধ হয় মৃত্তিকালোকের সঞ্চয় অধিক মনোহারী লাগিল। বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দের সাহায্যে পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে। ভূমিকায় ঋণ স্বীকার করিয়া কবি বলিয়াছেন, এ কালের মনোরঞ্জনে বনবিহগীর এ গীতি যদি অক্ষম হয় সে জন্য তাঁহার অভিযোগ নাই; ইহার প্রাচীন সুরটি সে যুগের ধ্বনিরই দ্যোতক বলিয়া তাঁহার ধারণা।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ভুবনেশ্বরী' স্বর্ণপদকের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া প্রতিভার আদর করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় যে জ্ঞান-সাধনা ও মৌলিকত্বের সম্মান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা যে শুধু নিয়মিত পরীক্ষায় বিশিষ্ট ভাবে উত্তীর্ণ সুধিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, ইহা দেশের গৌরবের কথা।

রাধারাণী দেবী অনেক দিন লেখা বন্ধ রাখিয়াছেন—বাঙালীর পারিবারিক, সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে কতো রকমের পরিবর্ত্তন হইতেছে এগুলির কাব্যচিত্র তাঁহার নিকট আশা করি। হৃদয়-মুকুর যে স্বার্থের ছায়ায় ঢাকা পড়িয়া গেল!

সব চেয়ে আতঙ্কজনক সময়

শ্রীইন্দিরা দেবী

চল্লিশ বছর বয়সে নারীর জীবনে আসে এক মহা পরিবর্ত্তন এবং এই পরিবর্ত্তনের মুখে তার মনে সৃষ্টি হয় এক অজানিত আতঙ্ক। অনিশ্চিত আশঙ্কা তার মনকে পীড়িত করে, তার মনে জাগে নানা প্রকার বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন। তার সৌন্দর্য্য কি নষ্ট হয়ে যাবে, প্রেমের স্পৃহা আর থাকবে না, পুরুষের সম্বন্ধে আগ্রহ কমে যাবে, নারী তখন আত্মবিস্মৃত হবে? জীবনে পরিবর্ত্তনের অনিশ্চিত সম্ভাবনায় শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই আশঙ্কার কোন কারণ নেই। অধিকাংশ নারীই এই বয়ঃসন্ধি কাল অনায়াসে অতিক্রম করে এবং অনেকে অজানিত ভাবেই।

প্রায়ই দেখা যায়, নারীর এই আশঙ্কার প্রধান কারণ অজ্ঞতা এবং সঠিক সংবাদের দ্বারা এই আশঙ্কা দূর করা যায়। অধিকাংশ রমণীই চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণের আগেই সাহসের সঙ্গে প্রকৃত ঘটনার সম্মুখীন হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে এবং তাদের সাধারণ জ্ঞানও জন্মায় এবং একবার প্রকৃত ঘটনার সম্মুখীন হ'লে আর ভয় থাকে না। মেয়েদের জীবনে কতকগুলি বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে। যেমন আটাশ দিন অন্তর ঋতু, দশ মাস গর্ভধারণ এবং তার পর বেশী বয়সে (৪৫—৫০) ঋতু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। বালিকা বয়স থেকে যৌবনে পদার্পণের সময় নারীর জীবনে পরিবর্ত্তন আসে এবং এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে সে নিজেকে স্বাভাবিক ভাবেই খাপ খাইয়ে নেয়। কিন্তু ঋতু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হবার সময় যে পরিবর্ত্তন আসে সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে অনেক নারীই কষ্টবোধ করে। অনেক সময় নানা রকম ব্যাধিরও সৃষ্টি হয়। তাই চল্লিশের কোঠায় পা দিলে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। চল্লিশের কোঠায় পৌঁছলে মেয়েদের যে শারীরিক পরিবর্ত্তন আসে তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া প্রধানতঃ মেয়েদের নিজেদের উপরই নির্ভর করে। অবশ্য চিকিৎসক এষ্ট্রোজেন, থাইরয়েড, ভিটামিন বি প্রভৃতি ওষুধ বাংলাতে পারেন এ বিষয়ে নারীকে সাহায্যের জন্য। দরকার হলে অবশ্যই চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত। এই শারীরিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বেশী আতঙ্কগ্রস্ত শত শত নারীর চিকিৎসা করেছেন এমন এক জন চিকিৎসক বলেন,—"ঋতু বন্ধ হয়ে যাবার পর শরীরে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাকে কোন প্রকার গুরুত্ব না দেওয়াই হল এর সব চেয়ে ভাল চিকিৎসা।"

নিজের প্রতি প্রত্যেকেরই একটা আকর্ষণ আছে। নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখা অবশ্য ভাল, কিন্তু বাড়াবাড়ি ভাল নয়। সর্ব্বদাই যদি কেউ নিজের কথা ভাবে, তাহলে সে হবে ভীষণ স্বার্থপর এবং অমূল্য সময় তার বৃথাই নষ্ট হবে। এক শ্রেণীর মহিলা আছেন, তাঁরা এ বিষয়ে এত বেশী ভাবেন যে, তাঁদের জীবন দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠে। তাঁরা ভাবেন যে, স্বামী বোধ হয় আর ভালবাসবেন না। নিজের শরীরের মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে গেলে আর কি নিয়ে বেঁচে থাকা যাবে?

জীবনের এই অধ্যায়ে নারীর দৈহিক কামনা বৃদ্ধি পেতে পারে, আবার কমেও যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় স্বামী যদি ঠিক তাল রেখে চলতে না পারেন তাহলে নারীর অতৃপ্ত বাসনা বা অবাঞ্ছিত বস্তু তাকে উৎকট রোগগ্রস্ত ক'রে তোলে। কিন্তু এ কথা মাত্র অল্প কয়েক জন নারীর সম্বন্ধেই খাটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর বয়সের আধিক্যজনিত ঋতু বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দম্পতির জীবনে প্রকৃত সুখ আসে, তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় সহজ সম্পর্ক এবং সুস্থ সাহচর্য্যে জীবন হয়ে ওঠে মধুর। ঋতু চূড়ান্তরূপে বন্ধ হয়ে যাবার পর যৌন-সম্পর্কের অবসান হয়, এ ধারণা ভুল। এ সময়ে যৌন-বাসনা নষ্ট হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। প্রেমের মাধুর্য্যও নষ্ট হয়ে যায় না, বরং প্রেম হয়ে ওঠে আরও গভীর। সন্তান সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়ায় সন্তানপ্রসবজনিত শারীরিক ক্ষয় হয় না এবং তার ফলে শরীরের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। ছোট ছেলে-মেয়ে মানুষ করার ঝক্কিও থাকে না, কারণ তখন তারা

বড় হয়ে উঠে। এই সময়ে দম্পতির জীবনে চরম উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ আসে। এ সময়ে যদি তরুণ হবার সাধ যায় অথবা মনে হয় জীবনে আর কিছু রইল না, তাহ'লে সৃষ্টি হয় গোলযোগের। নইলে এ বয়সে মাথা ঘামাবার বা অনর্থক আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই।

অধিক বয়সে পুরুষের জীবনেও পরিবর্ত্তন আসে, কিন্তু তা নারীর মত বৈপ্লবিক নয়। কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি যদি চান তাঁর স্ত্রী পূর্ব্বের মতই তরুণী থাকবেন অথবা তিনি যদি অতিরিক্ত মাত্রায় বুড়ো হয়ে যান মনে, তাহ'লেই অনর্থ বাধবে। মোট কথা, সুখী জীবন যাপন করতে হলে নিজেদের মধ্যে খানিকটা সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। পরিণত বয়সে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যে সুযোগ আসে তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার দায়িত্ব উভয়েরই।

কেন আমি শিক্ষয়িত্রী আছি?

লোলা গ্রেস আর্ডম্যান

[লেখিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানিয়নের ওয়েষ্ট টেক্সাস ষ্টেট কলেজের শিক্ষয়িত্রী। "দি ইয়ার্স অফ দি লোকাষ্ট" নামে উপন্যাস লিখে তিনি পুরস্কার পান। সাহিত্যে খ্যাতি পেয়েও তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজে লিপ্ত আছেন।]

"উপন্যাস লিখে পুরস্কার পাওয়ার পরেই সংবাদপত্রের এক রিপোর্টার আমাকে প্রশ্ন করেন—'এবার আপনি নিশ্চয়ই শিক্ষয়িত্রীর কাজ ত্যাগ করবেন?'

"তৎক্ষণাৎ না ভেবেই আমি উত্তর দিলাম, 'অবশ্যই না।'

"এই উত্তর দেওয়ার পর সংবাদপত্রে সংবাদ বেরুল এবং তার শিরোনামা দেওয়া হল—'তিনি শিক্ষাদান কার্য্যে লিপ্ত থাকবেন।' যেন আমার পুরস্কার পাওয়াটা বড় খবর নয়, বড় খবর হল আমার শিক্ষাদানের কাজ ত্যাগ না করা।

"আমার এরূপ ধারণার প্রথম কারণ, তারুণ্যকে নতুন করে সঞ্জীবিত করার সুযোগ শিক্ষকের আছে। তরুণদের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা কতকটা আয়ত্ত না করলে তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করা যায় না।

"আমি মাত্র দু'বছর কলেজে শিক্ষকতা করছি। এর আগে আমি একটা জুনিয়ার হাই স্কুলে পড়াতাম, ক্লাসে ধরা-বাঁধা নিয়মে পড়ানকে শিক্ষাদান বলে না, ক্লাস-রুমের বাইরে খেলাধূলা, বেড়ান, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতিও শিক্ষার অঙ্গীভূত।

"আমি যখন প্রথম শিক্ষাদানের কাজ আরম্ভ করি, তখন আমার বয়স ছিল কম এবং আমি একটু বোকা ছিলাম। একটা বিস্তারিত কার্য্যসূচী তৈরী করেছিলাম। তাতে ছোট-ছোট বালিকাদের এমন পোষাক প'রে আসতে হত, যাতে তাদের ঠিক গোলাপের কুঁড়ির মত দেখায়। আমি বেছে বেছে সুন্দরী বালিকাদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান করতাম।

"এই দেখে এক দিন প্রিন্সিপ্যাল প্রশ্ন করিলেন, 'জিনি কার্ভারের কি হবে?' জিনি কার্ভার দেখতে মোটেই ভাল ছিল না। আমি বললাম, 'জিনি আমাকে অন্য কাজে সাহায্য করতে পারে।' প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'তাকে আপনার একটি গোলাপ ক'রে নিন না? সে ভাল গান গায় এবং তার মা ভাল সেলাই করে, কাজেই সে খুব ভাল পোষাক প'রেই আসতে পারবে।'

"আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি দেখে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'শুনুন, প্রত্যেকেরই অন্ততঃ একবারও মনে হওয়া দরকার যে, তার কাজ কেবল পর্দার আড়ালে নয়, মঞ্চের সামনেও তাকে দাঁড়াতে হবে। শিক্ষক হিসেবে সাফল্য অর্জ্জন করতে হলে আপনাকে এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেককে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দেওয়া দরকার।'

"তাঁর উপদেশ আমি গ্রহণ করলাম। ফলে জিনি কেবল গোলাপই হল না, পরবর্ত্তী জীবনে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস তাকে নারীত্বের পূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করল।

"শিক্ষকতার জন্য আমি আমার নিজের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করতে বাধ্য হই। আমার অভিমত যে অভ্রান্ত, তা সঠিক ভাবে নির্ণয়ের জন্য আমাকে আমার বিশ্বাসের ভিত্তি পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

"শিশুরা বড়দের ভীষণ ভাবে নকল করে। একবার একটা ঘটনায় আমার বেশ শিক্ষা হয়েছিল। আমি একটি ছাত্রীকে একটি কাজ করতে বলেছিলাম একটু অমনোযোগিতার সঙ্গে। তাই দেখে একটি ছোট মেয়ে ব'লে উঠলো—'কাজটা ঠিক ভাবে করবো, না, আপনি যে ভাবে দেখিয়ে দিলেন সেই ভাবে?' এ থেকে আমি বুঝলাম, ছোট ছেলে-মেয়েদের ফাঁকি দেওয়া বা তাদের প্রতি কোন রকম অবহেলা দেখান অন্যায়। তাদের শিক্ষা দেবার আগে নিজে সৎ, ঐকান্তিক ও কর্ম্মক্ষম হওয়া দরকার।

"আমি শিক্ষাদান কার্য্যে লিপ্ত থাকতে চাই, তার কারণ হৃদয়ের নোঙ্গর ফেলবার এ অতি সুন্দর বন্দর।

"ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিতে হলে তাদের ভালবাসতে শিখতে হবে। ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যাবে না। শিক্ষকতার কাজে মনের বিকাশ সাধনের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়। পড়াবার সময় ক্লাসে নিজের কোন ত্রুটি প্রকাশ পেলে ছেলে-মেয়েদের দল তাই নিয়ে হাসাহাসি করে। কিন্তু তাতে ক্ষেপে উঠলে চলবে না। শান্ত এবং সহজ ভাবেই তাকে গ্রহণ করে নিজেকে আত্মসংবরণ করতে হবে এবং ত্রুটি সংশোধন ক'রে ছেলে-মেয়েদের মন জয় ক'রতে হবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রাপ্তবয়স্কের পর্য্যায়ে ফেললে চলবে না। তাদের পক্ষে চপলতা স্বাভাবিক, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষকের ত আর চপলতা প্রকাশ করলে চলবে না। তাঁকে ধৈর্য্য ধরে আত্মসংযম ক'রে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

"আমি শিক্ষয়িত্রীর কাজে খুব আনন্দ পাই এবং সেই জন্যই এ পেশা আমি ছাড়তে চাই না।

"অর্থের সমস্যা অবশ্য একটা বড় প্রশ্ন। কিন্তু আমি এতে খু বেশী অসুবিধা বোধ করিনি, কোন রকমে চলে গেছে। আমেরিকা শিক্ষকদের বেতন অবশ্য খুবই কম এবং তার কারণ আমেরিক অধিবাসীরা এখনও শিক্ষকের মর্য্যাদা বা মূল্য উপলব্ধি করতে শেখেনি। স্কুলে যদি ভাল শিক্ষক রাখতে হয়, তা হলে তাদে উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা দরকার, নইলে শিক্ষা আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

অনুবাদিকা—কেতকী দেবী

স্বাধীন দেশে মেয়েদের কর্ত্তব্য

শ্রীনিশাপতি মাঝি

পশ্চিম-বাঙলায় ৩৫ হাজার গ্রাম এবং ১১২টি সহর। গ্রামে ও সহরের মধ্যে অধিকাংশ দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহগুলি ভগ্নপ্রায়। নবাগত পরিবারের মধ্যে অনেকের গৃহ নাই—কোন কোন পরিবারে নাম মাত্র গৃহরূপে এক-একটি চালা-ঘর নির্মিত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় গৃহের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠার কাজ কিরূপ দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছে তা সকলের ভাবা দরকার। আর্থিক উন্নতির কাজে এ দেশের মেয়েরা চিরদিন সহায় ছিলেন। কিন্তু আজ তাঁদের গৃহমন্দির শ্রীহীন হয়েছে বলেই অসহায় শিশু-পুত্রদের নিয়ে তাঁরা সকল দিকে পঙ্গু হতে চলেছেন। এ জন্য বাঙ্গালী জাতিকে ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বজনীন আয়োজন করবার কাজে সর্বশক্তি সমর্পণ করা প্রয়োজন। প্রথমত: গৃহ-প্রতিষ্ঠার কথাই আলোচনা করছি।

ঘনবসতিপূর্ণ পল্লীর তৎপর লোকসংখ্যা হ্রাস পায় না। অনেকে যেন-তেন-প্রকারে জীবন যাপন করেও বহু জনের মধ্যে নিজকে বিলিয়ে দিতে চায়। কিন্তু যদি কোন কর্মক্ষেত্র সুন্দর ভাবে প্রতিষ্ঠা করে এবং গৃহাদির ভাল ব্যবস্থা করে অনেককে তথায় বসবাসের জন্য আহ্বান জানানো যায় এবং তাদের কর্মের সংস্থানের কেহ ভার গ্রহণ করেন তা'হলে সহজ সরল উপায়ে ঘনবসতিপূর্ণ লোকালয়ের লোকসংখ্যা হ্রাস পায়। পশ্চিম-বাঙলার বড় বড় সহরের আশে-পাশে এইরূপ পল্লী ও কর্মভূমি অনেক স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু এইরূপ আরো বহু পল্লী স্থাপন করা প্রয়োজন। এই সব পল্লীর প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য একটি শয়ন-ঘর, একটি রান্না-ঘর, একটি গোয়াল-ঘর, একটি স্নানের জায়গা ও কয়েকটি পরিবারের মধ্যে কূপ, নলকূপ এবং পল্লীর মধ্যে যদি জলাশয় স্থাপিত হয়, তা'হলেই গৃহগুলি সুন্দর ও মনোরমরূপে গড়ে ওঠে নতুবা গৃহের শান্তি ও আনন্দ রক্ষা হয় না।

আমাদের দেশের মেয়েরা গৃহের চারি পাশে চারি প্রকারের আয়োজন করেছিলেন। দক্ষিণ প্রান্তে ফুলের ও নিম-বেলের গাছ বসাতেন, পশ্চিমে পশুপক্ষী পালনের গো. ও সার প্রস্তুতের জায়গাকে ভাল ভাবে প্রতি. রক্ষা করতেন। উত্তর দিকে রান্না-ঘরে আহা. ও গৃহ পরিষ্কারের যাবতীয় সরঞ্জাম নির্দি. থাকতো, পূর্ব দিকে শাকসব্জী চাষের জায়গা ও বীজ-চারা তৈরীর ব্যবস্থা হোত। গৃহের সম্মুখে মধ্যভাগে গোলাভরা ধানের গোলা রক্ষা হতো। ধানের গোলায় মেয়েরা সকালে গোময় দিয়ে প্রণাম করতেন, সন্ধ্যায় সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে গৃহলক্ষ্মীর সামনে গলায় আঁচল দিয়ে স্বামি-পুত্রের মঙ্গল কামনা করে আরাধনা করতেন।

আজ অধিকাংশ পরিবারে ধানের কোন গোলা নাই, এর হয়তো নানা কারণ আছে; কিন্তু ধানের জমিতে ধান উৎপাদন করিয়ে সে জমির ধান গোলাজাত করে রাখবার শুভবুদ্ধি যদি পরিবারের না হয় তা'হলে অন্য উপায়ে টাকা উপার্জন করবার এবং কিনে খাবার মতি-গতিই প্রবল হয়। দেশের ঘোরতর দুর্দিনে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ যদি দেশে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন করবার দিকে দৃষ্টি দিতেন, তা'হলে দেশের কৃষক ও মজুরগণ আজ এতটা অসহায় ও বিপন্ন হতো না। নানা জায়গায় জলসেচের ছোট-বড় পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু এই গুরুতর খাদ্য-সঙ্কটের মধ্যেও উপরোক্ত কারণে ধান-গম চাষের তাগিদ বিশেষ নাই বললেই চলে। অথচ এমন এক দিন ছিল যেদিন অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরাও হাসিমুখে নিজের হাতে ধান সেদ্ধ করে ধান হতে চাল তৈরী করতেন—গোয়াল পরিষ্কার করে গোবর দিয়ে জ্বালানী সমস্যার সমাধান করতেন। এই ভাবে ঘরের টাকা ঘরে থাকতো, অযথা খাদ্যের ও টাকা-পয়সার অপচয় হোত না—এমন কি মেয়েরা এই সব নানা কাজের মধ্য দিয়ে নিজেরাই পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করে পরিবারের স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতেন।

বর্ত্তমানে স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করে মেয়েরা দেশ-বিদেশের কথা ভাবতে শিখেছেন—সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে পারদর্শিনী হয়ে উঠছেন—নীতি ও সুরুচির পরিচয় দিয়ে পারিবারিক জীবনে শান্তি স্থাপন করছেন; কিন্তু এক দিন সঙ্গীতে, বাদ্যে, আলপনায়, উলুধ্বনিতে যেরূপ নর-নারীর প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো, সেই আনন্দ এখন আর নাই বললেই চলে। কারণ, এখন অন্তরের যোগাযোগ অপেক্ষা বাহ্যিক জাঁকজমক ও চাকচিক্যই সর্বত্র প্রবল হয়ে উঠেছে। পল্লীর নারী রাঙ্গা মাটির উপর আলপনা দিয়ে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে উৎসব-মঞ্চকে অপরূপ করে তুলতেন—সকলে সঙ্গীত-কীর্ত্তন দ্বারা পরস্পরের হৃদয়ে গভীর ভাবের সঞ্চার করতেন।

আজ ভাবহীন, দরদহীন আড়ম্বর ত্যাগ করে বিদ্যাভবনেই মেয়েদের সর্বাংশে উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। মেয়েদের কৃত্রিম অভিমান ও কুসংস্কার-মুক্ত হয়ে ফুল-ফলের বাগান, সবজী বাগান, গাভী পালন ও সার প্রস্তুত ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করতে হবে—কুটীর

শিল্পে অভিজ্ঞ হতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসা, রোগীর সেবা, নারী-মঙ্গল ও শিশুপালন কাজে আগ্রহ দেখাতে হবে। তবেই তাঁরা সংগঠন ও সংহতি শক্তির দ্বারা জাগ্রত হয়ে সমাজ-সেবায় নিযুক্ত হতে পারবেন। মেয়েদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে, ক্ষুদ্র শক্তির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেই এ জাতি আজ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। তাঁদের বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তির জোরেই আজ গৃহগুলি অতীব সঙ্কটের মধ্যেও টিঁকে রয়েছে। জাতি যদি এই সঙ্কটের দিনে তাঁদের সমস্যা সমাধানের জন্য যোগ্য ক'রে তুলতে পারে তবে তাঁরা পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে হেয় হবেন না। বন্ধনের নানা গণ্ডী সৃষ্টি করে এ জাতি মেয়েদের মহাশক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছিল। তাই আজ বাঙলার গৃহ, বাঙলার পল্লী, বাঙলার সমাজ জগতের নিকট ভিক্ষার্থী। ভিখারী জাতি সমাজকে—দেশকে কোন প্রকারেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। কাজেই সর্বপ্রকারে শিক্ষিতা হয়ে দেশের মায়েরা যদি দেশের যোগ্য সন্তান গড়ে তুলতে পারেন তা'হলেই এ জাতি ব্রহ্মাণ্ডপতির সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।

গৃহের অভ্যন্তরে আজ শিশু রুগ্ন—বালক-বালিকাগণ খাদ্যহীন। মেয়েরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য উন্নতির ভাব গ্রহণ করেন তা'হলে সত্যই গৃহগুলি স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকা এবং গ্রাম পরিষ্কার করার কাজে এখনও অনেকে উদাসীন। সেইরূপ রোগীর সেবা-যত্নের প্রতিও অনেকে লক্ষ্যহীন। এমন কি, খাদ্যদ্রব্য তৈরী করার প্রতিও অনেকের লক্ষ্য নাই।

গৃহস্থালী

হাসিরাশি দেবী

গৃহ আর গৃহস্থালী নিয়ে কেন আর আজকের দিনে মেয়েদের মন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না, তা একটা ভাবনার কথা বটে। পুরাতনপন্থীরা বলবেন :—"মেয়েকে কাজের কথা বলবো কখন ?—বললেই তো জবাব দেবে—বা রে, স্কুলের পড়া নেই বুঝি ?—গানের মাষ্টার তো এলেন ব'লে! জানো,—আজ আমাদের ক্লাব থেকে অমুক জায়গায় যাওয়া হচ্ছে! কাল তো 'তমুক' সিনেমা 'কন্‌সেশান' দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে। না গেলেই নয়।" ইত্যাদি।

মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলে এ ছাড়াও বলবে,—"আর কোনও কাজ নাই না কি? নিজের জামা-কাপড় জুতোর তদারক তো নিজেই করি। তাছাড়া একটু-আধটু ছেঁড়া, বোতাম টাঁকা—' ও তো নিজেই করি সব। আবার চা তৈরী, জলপান,—এ সব দেই না বুঝি চাইলে ?"

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে দেখা যায়, দশ-এগারো বছর বয়েস থেকে পনেরো-ষোলো বছর বয়স পর্য্যন্ত এ সব ক'রে যেটুকু সময় তারা পায়, তাতে একটু ছুটাছুটি, একটু-আধটু পুতুল খেলা,—সত্যিই এ সবের ইচ্ছে তাদের ফুরায় না, এবং এগুলো ফেলে সংসার-ঘর আর গৃহস্থালীর কাজে মন বসানোও তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। ফলে তারা যে গৃহস্থালীর কাজ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা হবেই, এ তো জানা কথা। অথচ ঠাকুরমা-দিদিমার দল যখন

বলেন, "অমন বয়সে আমাদের শ্বশুর-ঘর করতে হয়েছে তখন স্বভাবতঃই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের ছবি। সেদিনে ঠাকুরমা আর দিদিমারা লাল চেলী আর নোলক পরে, পায়ের মল বাজিয়ে চোখের জল ফেলে শ্বশুর-বাড়ী যেতেন সেই পরিবারের ভবিষ্যৎ মান-সম্মান, শুভ-অশুভের দায়িত্ব নিতে, সেদিন তাঁর সঙ্গে যেত সান্ত্বনাদাত্রীরূপে পরিচারিকা, প্যাঁট্রা, বাক্স, চিনেমাটির খেলনা, কালীঘাটের বেঙ্গে পুতুলের সাজানো সংসার। প'ড়ে থাকতো কেবল বাপের বাড়ীর উঠোনে, কি দালানের পেছনে ইটের পর ইট সাজানো খেলাঘরে হাঁড়ি, বেড়ী, হাতা আর খুন্তী। খেলার থেকেই যে জীবনের সুরু সেদিন ছিল, শেষ ছিল সেই খেলারই একটা বড় সংস্করণের মধ্যে।

কিন্তু এখনকার দিনের মেয়েরা বড় একটা সে খেলা খেলে না। এমন কি ঐ ধরণের খেলার যে কোনও দামই ভবিষ্যৎ দেবে না, তাও ভাবতে সুরু করেছে। অথচ আমাদের ঘর-সংসার পরিচালনা সম্বন্ধে আজও কোনও নূতন পদ্ধতির চলন হয় নাই। এই অবস্থায় যদি ছোটবেলাটা নূতনত্বের আবহাওয়ায় রেখে, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন পন্থায়, সেই গতানুগতিক ভাবে ঘর আর গৃহস্থালীর মধ্যে ফিরে যেতে হয়, তা'হলে এই দুই অবস্থার মধ্যে মীমাংসার আশা কি সব জায়গায় সমান হতে পারে?

আজকালকার শিক্ষার ধারা বহুমুখী। অথচ শিখবার সময় পাওয়া যায় এত কম যে, কেবল মাত্র ঐ রকম খেলাধূলা কিম্বা গল্প-কাহিনীর মধ্যে থেকে তা সংগ্রহ করা অসম্ভব। এই কারণেই ছাত্রাবস্থা থেকে যখন এই সব মেয়েদের এসে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়, তখন তাদের অতীত ও বর্ত্তমান নিয়ে জীবনে যে সজ্ঘর্ষ বাধে, তার ফলাফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা দেয় বিরক্তিকর, তিক্ত অবস্থায়। শিক্ষাকালীন সময়ে যাঁরা নিজেদের ব্যয়-বাহুল্যতার দিকে নজর দেবারও অবকাশ পাননি, বর্ত্তমান দিনে তাঁরাই নিজেদের আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের পরিমাণ যোগাযোগ ক'রে লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখে হন বিচলিত। স্থির ক'রে নেন, জীবনে চাকুরী ছাড়া অর্থাগমের অন্য পন্থা নাই। এ জন্য চাকুরীক্ষেত্রে আজকের দিনে যে সব মেয়েদের কাজ করতে দেখি, তাঁদের প্রায় সকলকেই ঘর ও গৃহস্থালীর বাইরে আটকে থাকতে হয় দশটা থেকে চারটে-পাঁচটা অবধি। বাকি সময়টুকুর জন্য তিনি যে ছুটি পান, সেই সময়ের মধ্যে তাঁকে দেখতে হবে তাঁর ঘর-সংসার, স্বামী এবং সন্তান। নিজের স্বাস্থ্য যদি এতেও ভালো থাকে, তা'হলে তো তিনি 'বাহবা' পাবারই উপযুক্ত, কিন্তু তা যদি না থাকে, তা'হলে উপযুক্ত পারিশ্রমিকে কাজের জন্য লোক রেখে কি তিনি লাভবান হতে পারবেন?

হয়তো এ বিষয়ে অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা জানাতে পারেন, কিন্তু আমার আশা খুবই কম। তাছাড়া আজকালকার সময় সমস্যায় পরিপূর্ণ। নিত্য নূতন অভাব আর দুর্ভাবনার সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে আমাদের সকলকেই যে ভাবে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে, তার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় কিম্বা নিশ্চয়তা নাই। সে জন্য মনে হয়, এ সব বিষয়ে বুঝে-সুঝে কাজ করাই ভালো।

গৃহস্থালী বলতে অবশ্য চেয়ার-টেবিল কি হাঁড়ি-বেড়ীই ধরা চলে না, ধরতে হয় এগুলোর সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ নিকটতর বা অবিচ্ছেদ্য তাদেরও। যেমন খাদ্য-পরিস্থিতি। এখনকার দিনে সহরে আমরা যা-ও বা রেশন পাই, সহর থেকে কিছু দূরবর্ত্তী জায়গাগুলিতে যে তা-ও পাওয়া যাচ্ছে না, তার ধারা-বিবরণী আমরা প্রায় প্রত্যেক দিনই পড়ছি দৈনিক সংবাদপত্রে। এই অবস্থায় একটি মাত্র সংসার—অবশ্য যে সংসার অধিকাংশ সহরবাসীদের মত ঘর-ভাড়া নিয়েই গুছাতে হয়, সে সংসারের আয় হিসাবে ব্যয় করাই যদিও ঠিক, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই তা হয় না। ঘর-ভাড়া, তার পর সাধারণ ভদ্র গৃহস্থের পক্ষে অপরিহার্য্য শিক্ষা ও সভ্যতার খরচ কুলিয়ে 'খাওয়ার দিকেই অভাব দেখা দেয় বেশী; এবং এই দিকের দৈন্য এত দিন যত লজ্জাতেই ঢেকে রাখা যাক, এখন এই কম রেশন পাওয়ার বাজারে তাকে ঢেকে রাখা একেবারেই যেন অসম্ভব অবস্থায় দেখা দিয়েছে; তাই রেশনের দোকানের পাওনা ছাড়াও বাজার থেকে লুকিয়ে যা দু'গুণ দাম দিয়ে ঘরে আনতে হয়, তার বিপক্ষে নীতিবাগীশদের নীতিকথার বন্যা বইতে থাকলেও পেটের ক্ষিদে তার নিষেধ মানে না। এবং এই নির্লজ্জ ক্ষুধার জ্বালায় আমাদের চোখের সামনে থেকে যদি একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শ, গুরুজনদের খাওয়ার পরে খাওয়া, অতিথি সেবা প্রভৃতি চিরাচরিত সুখ্যাতির স্বপ্নগুলি মিলিয়ে যায়, তার জন্য মেয়েরা দায়ী নন। আগেকার দিনে সকলের খাওয়ার পরে মেয়েরা ও বধূরা যখন খেতে বসতেন, তখন বেলাই তো দ্বিপ্রহর। আর এখনকার দিনের মেয়েদের বেলা সাড়ে নয়টা না বাজতেই স্নান করে নিতে হয় কলের জলে, না হলে জল পাওয়া যায় না। খাওয়া সারতে হয় পৌনে দশটায়, আর কর্ম্মস্থলে হাজিরা দিতে হয় বেলা সাড়ে দশ কি এগারটার মধ্যে। এ রকম অবস্থায় ঘরে তারা থাকতে পান কতক্ষণ? কতক্ষণ পীড়িতের সেবা করার মত ফুরসৎ পান তাঁরা—কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারেন কারো দুঃখ, কষ্ট বা মান-অভিমানের অপেক্ষায় নিজেও না খেয়ে, না উঠে, চুপচাপ ব'সে থাকতে? যুগের গতিধর্ম্মে মানব-সভ্যতা যত এগিয়ে চলেছে, মানবত্ব যদি তার আওতায় চাপা প'ড়ে যায়, তার জন্যেই বা নালিশ জানানো যাবে কার কাছে? তবু এখনও যেটুকু আশার আলো—ক্ষীণ হলেও বহু দূর থেকে চোখে পড়ে—সেটুকুর মূলমন্ত্র হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। শিক্ষা সংস্কারশূন্য হোক, কিন্তু সংস্কৃতি—যা যুগে যুগে সব সময়ে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত—তা থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই।

আত্মশুদ্ধি

"ঈশ্বরকে যদি দেখিতে চাও, তবে হৃদয়কে পবিত্র কর—অন্তরে যদি কোন গূঢ় পাপ পোষণ করিয়া থাক, তাহা দূর করিয়া দাও।"

—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

যাত্রাপথে চলচ্চিত্র

এক

কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের কোন কোন উক্তি জনসাধারণের পক্ষে গুরুপাক—বিশেষতঃ তাঁর খাদ্য সম্পর্কীয় উদ্ভট উক্তিগুলি। কিন্তু তাঁর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "অর্থ অপব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলি।"

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। নাট্যজগতে তখনও চলছে ক্লাসিক থিয়েটারের যুগ। তখন পাশ্চাত্য দেশেও চলচ্চিত্রের শৈশবকাল। সেই সময়ে ক্লাসিক থিয়েটারে নির্ব্বাক ছবি দেখাতেন রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানীর স্বর্গীয় হীরালাল সেন। এবং ষ্টার থিয়েটারেও (ও মাঝে মাঝে মিনার্ভা থিয়েটারে) যিনি ছবি দেখাতেন তাঁর নাম হচ্ছে, স্বর্গীয় শ্যামলাল শেঠ। তারও আগে শ্যাম বাবু আমার মাতুলালয়ে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করতেন। সে সব ছিল খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের চিত্র। হয়তো দেখানো হ'ল লণ্ডন সহরের একটি রাজপথের দৃশ্য। সায়েব-মেমরা ফুটপাথের উপর দিয়ে ব্যস্ত ভাবে আনাগোনা করছে, গাড়ী নিয়ে ঘোড়াগুলো যাচ্ছে এদিকে ওদিকে, ছোকরারা বেচছে খবরের কাগজ এবং একটা কুকুর ছুটে চলে গেল ল্যাজ নাড়তে নাড়তে—ব্যাস, ফুরিয়ে গেল একখানা ছবি। তার পর সুরু হ'ত ঐ রকম আর একখানা ছবি দেখানো। অর্থাৎ নূতন কোন দৃশ্য। সব ছবির আকারই একরত্তি। আজকের বালকরাও সে সব ছবিকে অকিঞ্চিৎকর ব'লেই মনে করবে। কিন্তু সে যুগের আমরা ঐ সব ছবি দেখে দস্তরমত বিস্মিত, উত্তেজিত ও অভিভূত হয়ে উঠতুম। ছবির মানুষ হেঁটে যায়, ছবির ঘোড়া ছুটে চলে এবং ছবির কুকুর করে লাঙ্গুলান্দোলন! আমাদের পক্ষে তাই-ই ছিল যথেষ্টেরও বেশী। সচল ছবি হবে আবার সবাক, কেবল তাই-ই যে কারুর কল্পনায় আসত না, তা নয়; ছবির ভিতরে পাওয়া যাবে যে একটানা গল্প ও নাট্যাভিনয়, এতটাও কেউ আশা করতে পারত না।

সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয় শেষ হ'লে পর আসত এমনি সব চুটকি ছবি দেখাবার পালা, যেন ভূরিভোজনের শেষের দিকে চাটনি। দর্শকদের আগ্রহাধিক্যে ক্রমেই এটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেল। কলকাতায় তখনও কোথাও নিয়মিত ভাবে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়নি, স্থায়ী চিত্রগৃহ ছিল তো কল্পনাতীত ব্যাপার। যে চলচ্চিত্র আজকাল রঙ্গমঞ্চের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকেই সর্ব্বপ্রথমে সাদরে আশ্রয় দিয়েছিল আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়। এ যেন যেচে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা। তবে অল্প দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি যে রকম হয়ে উঠেছিল, তার উপরে নির্ভর ক'রে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, সাধারণ রঙ্গালয়ের আমন্ত্রণ না পেলেও কুমীর নিশ্চয়ই আসত নিজের জন্যে নিজেই খাল কেটে।

ছবিতে আমি প্রথম গল্প পাই ষ্টার থিয়েটারের এক চিত্র-প্রদর্শনীতে। গল্প তো ভারি! একটা পাগলা কোন গতিকে রক্ষীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে গারদ থেকে বেরিয়ে পড়ল। রক্ষীরা যখন তা জানতে পারলে, তখন দল বেঁধে করলে তার পশ্চাদ্ধাবন। তারাও ছোটে, পাগলাও ছোটে,—এ পথে, সে পথে, এ বনে, সে বনে, কখনো উপর থেকে নীচে লাফিয়ে, কখনো পাঁচিল ডিঙিয়ে, কখনো নদী পেরিয়ে, এই ধরা পড়ে পড়ে, আবার সে হাত ছাড়িয়ে পালায়, তার পর গ্রেপ্তার হ'ল শেষ পর্য্যন্ত।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তুচ্ছ আখ্যান, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে সঞ্চারিত হ'ত প্রচুর উত্তেজনা। ও-রকম সব দৃশ্য যে কেবল সে যুগেই উদ্দীপনা সৃষ্টি করত, তা নয়; আজকালকার প্রমাণ—অর্থাৎ পুরা মাপের চিত্র-নাট্যেরও এক অংশে যখন ঐ শ্রেণীর পশ্চাদ্ধাবনের দৃশ্য দেখানো হয়, তখনও দর্শকরা সমভাবেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একটুও পরিবর্ত্তিত হয়নি জনসাধারণের প্রকৃতি।

ছবিতে গল্পের খোলতাই বেড়ে উঠতে লাগল ক্রমে ক্রমে। ছোট ছোট কাহিনীকে ক্রমে বড় ক'রে তুলে ছবিকাররা পর্দ্দার গায়ে দেখাতে লাগল বিখ্যাত সব উপন্যাস ও নাটককে। চলচ্চিত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না। পর্দ্দা তখনও মঞ্চের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না বটে, কিন্তু হয়ে উঠল সে রীতিমত লোকপ্রিয়।

পূর্ব্বোক্ত হীরালাল সেন ও শ্যামলাল শেঠ কেবল সাধারণ রঙ্গালয়েই ছবি দেখাতেন না, ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে সহরের ও মফস্বলের অনেক ধনী-বাড়ীতেও ছবি দেখাবার জন্যে আহূত হতেন। আর্থিক লাভ হ'ত তাঁদের যথেষ্ট। এই ভাবে ছবি দেখাবার হিড়িক হু-হু ক'রে বেড়ে উঠতে লাগল।

বাঙালীরা ভালো ক'রে কিছু তলিয়ে বোঝবার আগেই পাকা ব্যবসাদার ম্যাডানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল ছবির বাজারের দিকে। অনেক কিছু সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়ে তাঁরা হলেন আশান্বিত। কিন্তু তখনও তাঁরা নিজেরা চিত্র-প্রদর্শনী ব্যবসায়ের ভিতরের কথা বিশেষ কিছুই বুঝতেন না, অতএব আহ্বান করলেন শ্যামলাল শেঠকে। শ্যাম বাবুর সঙ্গে তাঁদের কি একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেল। ছবি দেখাবার জন্যে ম্যাডানরা কলকাতার ময়দানে ফেললেন তাঁবু। চিত্র প্রদর্শনী চলতে লাগল নিয়মিত ভাবে। প্রেক্ষাগারে দর্শকদের আসন বেশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। প্রতি নূতন চিত্র দেখবার জন্যে আমরা সেখানে গিয়ে জনতা সৃষ্টি করতুম। তখন কোন ছবিরই পরমায়ু এখনকার মত দীর্ঘ হ'ত না বটে, কিন্তু দুই হাতে টাকা লুটতে লাগলেন ম্যাডানরা।

প্রতি হপ্তাতেই দেখানো হ'ত একখানি বা একাধিক হাসির ছবি। চার্লি চ্যাপলিনের নাম কেউ তখনও শোনেনি। সে সময়ে হাস্যাভিনয়ে সবসেরা ছিলেন ফরাসী চিত্র-নট ম্যাক্স লিণ্ডার। আমার মতে তিনি ছিলেন চ্যাপলিনের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর অভিনেতা। শেষোক্ত শিল্পীর মত তিনি কৃত্রিম "মেকআপ" ও উদ্ভট পোষাক, টুপী, জুতো এবং ছড়ি প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করতেন না, বস সৃষ্টি করতেন কেবল স্বাভাবিক ভাবাভিনয় ও অঙ্গহার প্রভৃতির দ্বারা। চ্যাপলিনের আগেকার চিত্রনাট্যগুলির মধ্যে থাকত প্রচুর পরিমাণে "লো-কমেডি"র উপাদান এবং অভিনয়ও হ'ত তারই উপযোগী। কিন্তু ম্যাক্স লিণ্ডারের চিত্রনাট্যগুলির আখ্যান হ'ত অধিকতর সূক্ষ্ম ও উচ্চ-শ্রেণীর। যাকে বলে জোর ক'রে কাতুকুতু দিয়ে হাসানো, তিনি কোন দিনই সে ধারও মাড়াতেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ম্যা

লিণ্ডার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্থান করেন সৈনিকরূপে এবং চিত্র-জগতে প্রবেশ ক'রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন চার্লস চ্যাপলিন। শান্তি-প্রতিষ্ঠার পর ম্যাক্স লিণ্ডার আবার ছবির পর্দ্দায় দেখা দেন এবং তখনও তাঁর শক্তি ছিল অটুট। কিন্তু চ্যাপলিন তখন বাজার মাৎ ক'রে ফেলেছেন এবং অনতিকাল পরে ম্যাক্স লিণ্ডারও হন অকালে পরলোকগত। তার পর থেকে হাসির ছবির মুলুকে চ্যাপলিন হয়ে আছেন একেশ্বরের মত। হ্যারল্ড লয়েড তাঁর খানিকটা নিকটস্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সমকক্ষ হ'তে পারেননি। আমেরিকায় ম্যাক্স লিণ্ডারের সমসাময়িক এক জন প্রতিভাবান হাস্যরসাভিনেতা ছিলেন, তাঁর নাম আমার ঠিক মনে পড়ছে না—জন বুনি কি? ভাঁড়ামি ছিল না তাঁর অভিনয়েও।

ম্যাডানদের তাঁবুতে কেবল হাসির ছবিই দেখানো হ'ত না, চিত্রে রূপায়িত উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস ও নাটক প্রভৃতিরও অভাব ছিল না। আর থাকত প্যাথির গেজেটে সাময়িক খবর। প্রথম যুগে এখানে ফরাসী ছবির আবির্ভাবই ছিল বেশী, তার পর ইংরেজি ছবি, তার পর ইয়াঙ্কি ছবি। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ সমস্ত উল্টে-পাল্টে দেয়। ফরাসীরা পিছনে হটে, এগিয়ে আসে আমেরিকানরা।

সেই নির্ব্বাক যুগে চিত্রনাট্যের কুশী-লবরা সংলাপে যোগ দিত না বটে, কিন্তু অন্য উপায়ে ছবিকে মুখর করবার চেষ্টা হয়েছিল তখনই। বিজ্ঞাপিত হ'ল, আঙ্গিক অভিনয়ের সঙ্গে চিত্র-নটের মুখে শোনা যাবে গানের কথা। এই অভাবিত বিজ্ঞপ্তির ফলে প্রেক্ষাগৃহে জমে উঠল দলে দলে বিস্মিত দর্শকের ভিড়। ছবি দেখলুম। গানের কথাও শুনলুম। অঙ্গভঙ্গি সহকারে গান গাইলেন প্রখ্যাত হাস্যগীতিগায়ক স্যর হ্যারি লডার। কৌশলটা জানা গেল না বটে, কিন্তু এইটুকু বুঝলুম, ফোনোগ্রাফের রেকর্ডের সঙ্গে যে কোন উপায়ে চিত্রে প্রদর্শিত নাটকীয় ক্রিয়ার যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। খালি গান আর ছবি, ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, ব্যাপারটা নূতন হ'লেও পরীক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ হ'ল না। অল্প দিন পরেই দর্শকদের কাছে ক'মে গেল তার নূতনত্বের চাকচিক্য। যন্ত্রও ছিল না নির্দ্দোষ' প্রায়ই চিত্র-নটের ভাবভঙ্গি বা মৌখিক অভিনয়ের সঙ্গে মিলত না গানের বাণী (শব্দধরের অনবধানতায় আজও মাঝে মাঝে দেখা যায় যে ত্রুটি)। তখন এ শ্রেণীর পিক্‌চার দেখানো বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

ক্রমবর্দ্ধমান দর্শক-সংখ্যা দেখে বিচক্ষণ ম্যাডানরা নিশ্চিত ভাবেই উপলব্ধি করতে পারলেন যে, ছবির বাজার আর নামবে না, চড়তেই থাকবে। তখন সব ঝোলটুকু নিজের দিকে টানবার জন্যে দরকার হ'ল ম্যাডান-প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকে শ্যাম বাবুকে সরিয়ে দেওয়া। শ্যাম বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় রীতিমত ঘনিষ্ঠ ছিল বটে, কিন্তু ঠিক কি সর্ত্তে তিনি ম্যাডানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আমি তা জানি না। এবং ওঁদের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ির আসল কারণও আমার অজানা। কেবল এইটুকুই জানি, ম্যাডানদের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে শ্যাম বাবু নিজের সব দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। আন্দাজ বারো বৎসর আগে বৃদ্ধ শ্যাম বাবু এসেছিলেন আমার বাড়ীতে। আমি তাঁকে বলেছিলুম, "বাংলা চিত্র-জগতে আপনি আর হীরালাল বাবু পথিকৃৎ হয়েও শেষ পর্য্যন্ত পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। আর সেই পথে আপনাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ম্যাডানরা হয়েছে ধনকুবের।"

শ্যাম বাবু একটু হেসে ললাটে হস্ত স্থাপন ক'রে বলেছিলেন, "কপাল!"

কপালই বটে, বাঙালীর কপাল! কোথা রাম রাজা হবে, না রাম গেল বনবাসে।

তার পর ম্যাডানরা নিজেদের চলবার পথ পাকা ক'রে বাঁধিয়ে নিলেন। একে একে সহরের নানা জায়গায় নির্ম্মাণ করতে লাগলেন চিত্র-গৃহের পর চিত্র-গৃহ। বাংলা দেশে তাঁদের সমযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ রইল না, ছবির বাজারে তাঁরা একচেটে অধিকার বিস্তার ক'রে বসলেন। তার পর তাঁরা কেবল বিলাতী ছবি আমদানি ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না, নিজেরাও হলেন চিত্র-নির্ম্মাতা। সর্ব্বপ্রথমে তাঁরাই টালিগঞ্জে খোলেন প্রকাণ্ড ষ্টুডিয়ো। ছবির ব্যবসায়ে তাঁরা কত টাকা লাভ করেছিলেন তার হিসাব আমি জানি না। নিশ্চয়ই কোটি কোটি টাকা। কিন্তু এমন চলতি একচেটে ব্যবসায়, এমন অভাবিত সৌভাগ্য, এমন দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত বিরাট প্রতিষ্ঠান, কেমন ক'রে যে অত্যল্প কালের মধ্যেই একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেল, সে রহস্যের হদিস পাওয়া যায় না। ম্যাডানদের উত্থান এবং পতন দুই-ই হচ্ছে বিস্ময়কর। এখানেও ওঠে ঐ কপালের কথা। কপাল, ভাগ্য, ভবিতব্যতা।

আর একটা কথা বলি প্রসঙ্গক্রমে। চিত্র-জগতে দস্তুরমত কায়েম হয়ে ম্যাডানরা চেয়েছিলেন বাংলা নাট্য-জগতেরও দখলিকার হতে। কিন্তু বিলাতী ছবি আনিয়ে এবং জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের রচনা নির্ব্বাক চিত্রে রূপায়িত ক'রে অজস্র টাকা কামানো যতটা সহজ, মনীষায় এবং নাট্যপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতিকে ভোগা দেওয়া যে ততটা সহজ নয়, এ সত্যটুকু ম্যাডানরা বহু বিলম্বে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা বেশী মাহিনার লোভ দেখিয়ে সংগ্রহ করলেন বাংলার কয়েক জন নামজাদা, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর নট-নটী। পার্সী থিয়েটারে আগা হাসার নাট্যকাররূপে অত্যন্ত লোকপ্রিয়। তাঁর একখানা নাটক বাংলায় রূপান্তরিত ক'রে কর্ত্তারা ভাবলেন, দাবার এক চালেই হবে কিস্তীমাৎ। ফলে পাওয়া গেল অশ্বডিম্ব। বাঙালীরা সে নাট্যাভিনয়ের দিকে এক রকম ফিরেও তাকায়নি বললেও চলে।

তখন কর্ত্তাদের হুঁশ হ'ল। তাঁরা বুঝলেন, বাঙালীদের জন্যে চাই উচ্চশ্রেণীর নাট্যকার ও নট-নটী। তাঁরা ধর্ণা দিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরীর কাছে। যদিও তাঁদের আর্থিক অবস্থা তখন সচ্ছল ছিল না, তবু বাংলা রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে তাঁরা বেশী টাকার টোপ গিলতেও নারাজ হলেন।

কর্ত্তারা তখন নাচার হয়ে গেলেন সৌখীন নাট্য-জগতের ধুরন্ধর শিল্পী শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর কাছে। এলেন তিনি এবং তাঁর সঙ্গে এলেন নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ। সেই মণিকাঞ্চন-সংযোগের সুফল ফলতে বিলম্ব হ'ল না। কিন্তু বিদেশীদের অধীনে থেকে জাতীয় নাট্যকলার উন্নতি সম্ভবপর নয় বুঝে অল্প দিন পরেই শিশিরকুমার আবার প্রস্থান করলেন যবনিকার অন্তরালে। তবু ম্যাডানরা হাল ছাড়লেন না, নিয়ে এলেন আর এক জন প্রখ্যাত সৌখীন অভিনেতা নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীকে। কিন্তু তখন ফুটো হয়েছিল ম্যাডানদের নৌকা। একা নির্ম্মলেন্দু তাকে সামলাতে পারলেন না। হ'ল ভরাডুবি।

কিন্তু ম্যাডানেরা বাংলা নাট্য-জগতে রেখে গেলেন স্মরণীয় অবদান। তা হচ্ছে তাঁদের মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গালয়ে শিশিরকুমার ও নির্ম্মলেন্দুর আত্মপ্রকাশ। ম্যাডানরা নিজেরা ডুবলেন, তীরে তুলে রেখে দু'টি রত্ন।

[ক্রমশঃ।

ডিরোজিও

শ্রীতারানাথ রায়

কলকাতায় ১৫৫ নং লোয়ার সারকুলার রোডের মস্ত তিনতলা বাড়ী। এই বাড়ীতে ১৪৩ বছর আগে (১৮০৯, ১৮ই এপ্রিল) জন্মেছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও—বাংলার, মাত্র বাংলার নয়, গোটা ভারতের বিপ্লবের মন্ত্রগুরু। জাতে তিনি বাঙ্গালী—ইউরেশিয়ান। বাবা ফ্রান্সিস ডিরোজিও জেমস্ স্কট এণ্ড কোম্পানীর এজেন্সী হাউসের চিফ একাউন্ট্যান্ট ছিলেন। লুই তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সোফিয়া জনসনের পুত্র। ছয় বছরের শিশু মাকে হারিয়েছিলেন। তখন তাঁর ভার নিলেন সেকালের কলকাতার প্রবীণ শিক্ষাগুরু ডেভিড ড্রামণ্ড। স্কুলে আট বছর—মাষ্টারদের প্রিয়তম—সহপাঠীদের সর্দার। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে হেনরীর বয়স যখন চোদ্দ বছর, তখনই পিতার স্বার্থে তাঁকে চাকুরী নিতে হয়েছিল। খুড়ো আর্থার জনসন ছিলেন তারাপুর নীলকুঠির (ভাগলপুর) মালিক। দু'বছর কেরাণীগিরি করে লুই খুড়োর নীলকুঠিতে গিয়ে কাজ করতে লাগলেন। কলকাতার চাইতে তারাপুর তাঁর ভাল লেগেছিল। পল্লীর মনোরম দৃশ্য, পাখীর গান, উদার মাঠের খোলা হাওয়া—তাঁর ভাল লাগত। সব চাইতে ভাল লাগত গঙ্গার কুলু-কুলু গান। তরঙ্গের সে গান বালকের মনের কবি কান পেতে শুনত।

তখন থেকেই লুই কবিতা লিখে 'জুভেনিস্' ছদ্মনামে কলকাতার পত্রিকাগুলোতে পাঠাতেন। কবি 'জুভেনিসের' তখন বেশ নামডাক হয়েছিল। এক বছর ভাগলপুরে থাকা। নীলকারদের নির্মমতা তাঁর মুক্ত মনকে পীড়া দেয়। ভাল লাগে না। নিপীড়িতদের আর্তনাদ তাঁকে বিদ্রোহী করে তোলে। লুই নীলকর খুড়োর গোলামীতে ইস্তফা দিয়ে ফিরলেন কলকাতায়। যে কবিতাগুলো ছাপা হয়েছিল তাই নিয়ে একখানি কাব্য-গ্রন্থ ছাপতে ব্যস্ত রইলেন লুই। প্রথম কবিতার বই যখন বেরুল তখন তাঁর বয়স প্রায় সতেরো। এই সতেরো বছরের ছেলেই হিন্দু কলেজে—আজকের প্রেসিডেন্সী কলেজে ফোর্থ মাষ্টারের চাকরী পেলেন (১৮২৬, নভেম্বর)। বেতন মাসে ১৫০৲ টাকা। কলকাতার হিন্দু কলেজের এই খুদে ফোর্থ মাষ্টারের প্রথম কাব্য-গ্রন্থের প্রশংসা করল বিলিতি পত্রিকাগুলো পর্য্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে কলেজে তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন, তরুণ হিন্দু ছাত্ররা তাঁর চার পাশে ঘিরে দাঁড়াল।

অদ্ভুত পড়াতেন ডিরোজিও। বাইরনের কবিতার ছাঁদে তাঁর প্রধান কবিতা "ফকির অব জাঙ্গিরা" ছাত্রদের মুখে-মুখে। ছাত্রদের শেখাবার কৌশল তাঁর এমন অভিনব ছিল যে, প্রেসিডেন্সীর গুরুগম্ভীর মাষ্টাররা তাঁকে হিংসে করতে লাগল।

ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব। তারই প্রভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। বিপ্লবের প্রভাব প্রত্যেক তরুণের অন্তরে উত্তেজনা এনেছে। সেই সময় সমাজ ও রাষ্ট্রের শেকল ভাঙবার মন্ত্র দিয়েছিলেন ডিরোজিও। মন্ত্র পেলেন তাঁর তরুণ ছাত্ররা—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখুজ্জে, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী।

বাংলায় তখন ইংরেজকে দেশের সম্পদ লুণ্ঠনে সাহায্য করছে যেমন বাঙ্গালী মাতব্বররা, সমাজের অর্থনৈতিক ও ধর্ম্মের কাঠামো চূর্ণ করবার জন্যও সাহায্য করছে ইংরেজ পাদরী ও তাদের বাঙ্গালী তাঁবেদার ও বন্ধুরা। হিন্দুয়ানী নষ্ট করাই ওদের উদ্দেশ্য ছিল; বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের শায়েস্তা করবার বুদ্ধি কেউ দিচ্ছিল না। ২০ বছরের কিশোর ডিরোজিও কিন্তু বিপন্ন দেশের দিকেই নজর দিয়েছিলেন।

ডিরোজিও এ জন্যে মাণিকতলার বাগানে তাঁর ছাত্র-বন্ধুদের নিয়ে যে একাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপন করেছিলেন, তোমরা যাকে 'ডিবেটিং ক্লাব' বল, ভারতে বোধ হয় এই প্রথম ক্লাব। ডিরোজিও তাঁর বৈকালী পত্রিকা 'দি হেস্পেরাস' প্রকাশ করলেন, তাঁর ছাত্র-বন্ধুদের পত্রিকা 'দি এনকোয়ারার' প্রকাশে সাহায্য করতে লাগলেন। সেদিন ডিরোজিও টম পেনের "এজ অব রিজন", "রাইটস্ অব ম্যানে"র ভাবে বাংলার তরুণদের উদ্বুদ্ধ করা হত। পাদরীদের পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ', আর রামমোহন রায়ের 'রিফর্মার' যতই খৃষ্টান-আলোকে দেশের দুঃখ দূর করবার স্পর্দ্ধা করুক না কেন, তরুণদের মুখপত্র 'এনকোয়ারার' স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল—"যা ভাল বুঝব, মন যা বলবে সত্যি তাই করব।" তারা বলল—"We have blown the trumpet and we must continue to blow on"—আমরা তূর্য্যধ্বনি করেছি—তূর্য্যধ্বনি করেই চলব। ৮০ বছর পর মাণিকতলার বাগানে যে বোমার বজ্রনিনাদ হয়েছিল, ডিরোজিওর শিষ্যদের তূর্য্যধ্বনিতে তারই আরম্ভ।

হিন্দু কলেজে ফোর্থ মাষ্টারী করবার সঙ্গে সঙ্গে ডিরোজিও 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র সাব-এডিটারের কাজ করতেন। তাঁর বেশীর ভাগ সময় কাটত ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে। দেশের দুর্দশা এ সময় চরম। তাঁরা এ দুর্দশার প্রতিকার কি করে হবে তার কথাই ভাবতেন।

ডিরোজিওর এই 'ইয়ং বেঙ্গল' দল কলকাতা তোলপাড় করতে লাগল। ওরা হিন্দুয়ানী মানে না, খৃষ্টানী মানে না, পুরোনো কোন কিছুই মানে না—মানে মাত্র অন্তরের বিবেক আর বাইরের মাতৃভূমি।

এতে হিন্দু কলেজে অভিভাবকরা ছেলে পাঠাতে শঙ্কিত হল। কলেজের পরিচালকরা ভীত হলেন। ডিরোজিওর কৈফিয়ৎ তলব করা হল। সত্যি কথা বলবার স্পর্দ্ধা কারো নেই। অভিযোগ—তুমি সবাইকে শুনিয়ে বলেছ, ভগবান নেই।

ডিরোজিও অকাট্য জবাব দিলেন। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও কলেজের ভিজিটার জবাবে খুশী হলেন। কিন্তু কলেজের পরিচালকরা হৈ-চৈ করতে লাগল। ডিরোজিও পদত্যাগ করলেন।

তাঁর ছাত্রবন্ধুরা সেদিন কি করেছিল জানা নাই। একাডেমীর বৈঠক তার পর কিছু দিন চলেছিল। কলেজ ছাড়বার পর ডিরোজিও "দি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান" পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মাতৃভূমি তাঁর কাছে আরও অনেক আশা করেছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। মাত্র তেইশ বছর বয়সে (১৮৩১, ২৬শে ডিসেম্বর, সোমবার) কলেরায় তিনি মারা যান। বন্ধুরা তাঁকে কলকাতার সাউথ পার্ক ষ্ট্রীটের কবরখানায় সমাধি দেয়।

বুইক গাড়ীর স্রষ্টা

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

ডেভিড বুইক ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের এক অখ্যাত সহরে জন্মগ্রহণ করেন। মেকানিক হিসেবে অতি কষ্টে দিন গুজরান যখন অসম্ভব হোল, নতুন দেশে নতুন করে ভাগ্য পরীক্ষার সংকল্প নিয়ে বুইক আমেরিকায় পাড়ি জমানোর জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। সে হোল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের কথা। সেই বছরই বসন্তে তিনি খবর পেলেন ডেট্রয়টবাসী এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় তাঁর নামে কয়েক শত ডলার রেখে স্বর্গগত হয়েছেন। এই অপ্রত্যাশিত সম্পত্তির দাবী-দাওয়া জানাতেও তাঁকে যেতে হবে আমেরিকায়। সুরু হোল নতুন জগতে নতুন জীবনের গোড়া-পত্তন। কিন্তু ডেট্রয়টে যে সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন ডেভিড, তাসের ঘরের মত তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। দু'হাতে পয়সা লুঠ করার দিন বহু দিন আগেই গত হয়েছে আমেরিকায়। সে সব দিন এখন গল্পকথায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সহজে দমবার পাত্র ডেভিড ছিলেন না। ছোট-খাট একটা লোহার কারখানা কেনার সুযোগ আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাতে। কিন্তু কারখানা-জাত মাল স্থানান্তরে পাঠানোর সমস্যা ভাবিয়ে তুলল তাঁকে। কারখানার মাল বেচে দু'পয়সা যা হাতে আসে, ঘোড়ার গাড়ী করে মাল আনা-নেওয়া করতেই তা খরচা হয়ে যায়। ব্যবসায়ে লাভ করতে হলে এই মাল আনা-নেওয়ার খরচা কমাতেই হবে। ডেভিড অবসর সময়ে Combustion Engine নিয়ে গবেষণা চালাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে দীর্ঘ সাত বছর কেটে গেল। এর মধ্যে এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয়নি যেদিন তিনি আট ঘণ্টার কম খেটেছেন। এক দিনও কাজে ছুটি নেননি তিনি—এমন কি রবিবারেও নয়। এই ভাবে কঠোর পরিশ্রম এবং অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কাগজে-কলমে স্বল্প খরচায় চলাচলোপযোগী একটি 'ইণ্টারন্যাল কমবাসশান এঞ্জিনে'র (Internal Combustion Engine) খসড়া তৈরী করলেন। এবার এই খসড়া-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। আরও একটি বছর কাটল অর্থাৎ ডেভিডের 'বুইক এঞ্জিন' আবিষ্কার সম্পূর্ণ হোল। আরো এক বছর পরে ডব্লিউ, সি, ডুরাণ্ট নামক এক জন অংশীদারের সহযোগিতায় বুইক মোটর কম্পানী স্থাপিত করলেন। অদ্ভুত দ্রুতগতিতে কারখানার কাজ অগ্রসর হতে লাগল। বুইকের এত দিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

কিন্তু কথায় বলে, মানুষ ভাবে এক আর হয় আর। ঠিক যে সময় সবে লাভ হতে সুরু হয়েছে, ব্যবসায়ে এবং মূলধনের টাকা ঘরে ফিরে আসার উপক্রম হয়েছে, সেই সময় বুইক সাংঘাতিক অসুখে পড়লেন। প্রথম তিনি ডেট্রয়ট ছেড়ে যেতে রাজী হননি, কিন্তু ডাক্তারেরা তাঁকে কালিফোর্নিয়ায় স্বাস্থ্যান্বেষণে যেতে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বুইক শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলেন ডাক্তারের উপদেশ মেনে নিতে।

কালিফোর্নিয়ার স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়ায় বুইকের স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হতে লাগল—ডেট্রয়টে আবার ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে সুরু করেছেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ আবার নতুন করে আক্রমণ হোল রোগের। আবার তাঁকে শয্যা নিতে হোল। এবার কিন্তু দ্রুত উন্নতির আশাও সুদূরপরাহত হোল। রোগের খরচ চালাতে এত দিন বুইকের মূলধনে হাত পড়েনি। কিন্তু বসে খেলে কুবেরেরও ধন ফুরিয়ে যায়—জমান টাকা ক্রমশঃ তলানিতে এসে পৌঁছতে লাগল। বুইক একের পর এক কারখানার শেয়ার বিক্রী করতে বাধ্য হলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রোগের মাশুল জোগাতে কারখানার সমস্ত শেয়ার বিক্রী হয়ে গেল বুইকের! কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা হোল, স্বাস্থ্যের অবস্থাও ক্রমশঃ ভালোর দিকে যেতে লাগল—বুইক হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পেলেন আবার। কিন্তু ইতিমধ্যে পথের ধূলায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে। যে বুইক গাড়ীর সঙ্গে তাঁর নাম চিরকালের মতো অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হয়ে গেছে—সে-নাম এখন তাঁর জীবনে সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে উঠল। এমন কি পুরোনো মডেলের একখানা পুরোনো বুইক কেনার মত সঙ্গতিও নেই তাঁর।

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল বুইকের। সেই সাক্ষাৎকারের একটি মর্মস্পর্শী বিবরণী প্রকাশি[ত] হয়েছে কাগজে :

—'আমার প্রাক-জীবনের প্রায় প্রত্যেক বন্ধুর দুয়ারে দুয়া[রে] ধর্ণা দিয়েছি। তাঁরা প্রত্যেকে আজ ক্রোড়পতি। তাঁদের অনে[কে] পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভাবে আমার আবিষ্কারের দ্বারাই সেই অ[র্থ] উপায় করেছেন। আমি তাঁদের কাছে অর্থ ভিক্ষা চাইনি—চেয়ে[ছি] কাজ। কিন্তু তাঁরা আমায় দেখে দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছেন। [...] বেশী দশ ডলার দিতে রাজী হয়েছেন কেউ-কেউ। কিন্তু আ[মি] তো দয়া বা ভিক্ষার প্রত্যাশী নই। গতর খাটানোর মত আ[জও] আমার যথেষ্ট শক্তি আছে। আমার বয়সের লোকের পক্ষে ভবি[ষ্যৎ] সম্বন্ধে হতাশা অত্যন্ত করুণ নয় কি ?"

এই সাক্ষাৎকারের কথা কাগজে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কম্পানি[র] অনেকে তাঁর একটা ব্যবস্থা করার সাধু সংকল্প প্রকাশ করলে[ন]। কিন্তু সংকল্প সংকল্পই রয়ে গেল—বাস্তবে আর তা পরিণত [হয়ে] উঠল না।

অবশেষে যে লোক সহজেই ক্রোড়পতি হতে পারত, সে সওদা[গরী] অফিসে কেরাণীর চাকুরী নিতে বাধ্য হোল। বেতন খুবই কম[;] কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হয় মাত্র। অবসর সময়ে ডে[ভিড] অন্য কাজে মনোনিবেশের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি যখন চাকু[রীর] জন্য দরখাস্ত করেন, তাঁর পরিচয় জানতে পেরে এক জন বিস্ম[িত] সুরে বলেছিল—'আপনি এই সামান্য মাহিনার কাজের জন্য দর[খাস্ত] করেছেন ?'

—'কাজ তো করতেই হবে—না হলে অনাহার মৃত্যু[...]' দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই হতভাগ্য আবিষ্কারক বিদায় নি[লেন] পৃথিবী থেকে। যে দরিদ্র অবস্থায় ভাগ্য-পরিবর্তনের অ[ভিলাষে] এক দিন তিনি সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন, সেই দরিদ্র অবস্থা[য়] তাঁকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে পৃথিবীর মাটিতে। তাঁরই পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত বুইক মোটর কার কম্পানী আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান এবং তার মডেলের আজ জগদ্বিখ্যাত।

করাত

হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য
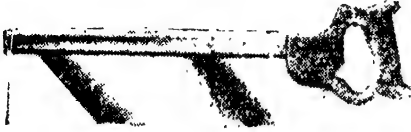
হামেসাই ব্যবহৃত হয় যে করাত

সোজা কাটতে হয় যে করাতে

গোলাকার বস্তু কাটে যে করাতে
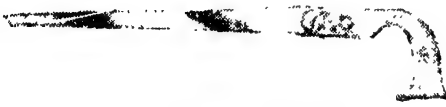
মানুষ যত রকমের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে একটি অত্যাবশ্যকীয় আবিষ্কার হল করাত। বনের বড় বড় গাছ কেটে তা থেকে নানা রকমের আসবাবপত্র, কড়ি-বরগা, দরজা-জানলা, চেয়ার-টেবিল প্রভৃতি কত জিনিষই না তৈরী হচ্ছে! এই সব জিনিষ তৈরীর মূলে আছে করাত। শুধু কাঠ কাটারই নয়, লোহা কাটবারও করাত আছে। আজ-কাল প্রধান প্রধান সহরে বৈদ্যুতিক করাতের ব্যবহার খুব বৃদ্ধি পেয়েছে।

করাতের জন্মকাল সঠিক নির্ণয় করা যায় না, তবে লৌহের আবিষ্কারের পরই যে করাত তৈরী হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবে প্রস্তর-যুগ এবং ব্রোঞ্জ-যুগেও না কি করাত ছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লৌহ-যুগেই আসল করাত তৈরী আরম্ভ হয়। গাছ কাটার প্রয়োজনে অনেক যন্ত্রের আবিষ্কার হয়, তার মধ্যে দুইটি লোকের দ্বারা পরিচালিত খাদ-করাত অন্যতম। গাছের গুঁড়িকে গর্ত্তের মধ্যে ফেলে ঠেকনো দিয়ে উঁচু করা হয়; তার পর গুঁড়ির তলায় গর্ত্তের মধ্য থেকে এক জন এবং গুঁড়ির উপর থেকে এক জন—এই দু'জনে মিলে করাত চালায়। আজ পর্য্যন্ত এই করাতের আকার বেশী বদ্‌লায়নি বটে, কিন্তু কার্য্যকারিতা অনেক বেড়ে গেছে ইস্পাতের উৎকর্ষের ফলে। আজ-কাল বাজারে হরেক রকমের করাত দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন জিনিষ তৈরীর প্রয়োজন অনুযায়ী এই সব করাত তৈরী করা হয়। সাধারণ এক জনে চালানো হাত-করাতই বেশী ব্যবহার হয়। এর অবশ্য ছোট বড় এবং পাত ও দাঁতের তারতম্য আছে। মোটা শক্ত কাঠ চেরার করাত এক রকম, পাতলা কাঠ চেরার এক রকম—বিভিন্ন জিনিষ তৈরীর জন্য বিভিন্ন রকম করাত। কাঠ গোল ক'রে কাটতে হলে তার করাত হবে এক রকম। করাতের পাত ও দাঁত প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের হয়।

শাঁখের করাত আবার দু'মুখো—যেতে-আসতে কাটে। লোহা-কাটা করাত আবার আর এক রকমের। অলঙ্কার বা অন্য ধাতব পদার্থ কাটার জন্য অনুরূপ করাত আছে। অত্যধিক ব্যবহারের ফলে করাত ভোঁতা হয়ে যায়—সে জন্য সেগুলি অতি সাবধানে শাণ দিয়ে নিতে হয়। যত্ন ক'রে রাখতে পারলে একখানা করাত সারা জীবন চলতে পারে।

আজকাল বড় বড় সহরে কাঠ চেরাইয়ের জন্য বৈদ্যুতিক করাত ব্যবহার করা হয়। এগুলি গোল চক্রাকার। বিদ্যুতের সাহায্যে সজোরে ঘুরিয়ে এর দ্বারা বড় বড় গাছের গুঁড়ি চিরে ফেলা হয়। ঠিক সুদর্শন চক্রের ন্যায় দেখতে এই করাত। সাধারণতঃ এক জনের ব্যবহারের জন্য হাত-করাতই বেশী কাজে লাগে। এর পাত হাতলের দিকে একটু মোটা এবং বেশী চওড়া থাকে। এক হাতে একবার সামনের দিকে এবং একবার পিছনের দিকে করাত ক্রমাগত চালাতে থাকলে কাঠ আপনি চিরে যায় এবং কাঠের গুঁড়াগুলি দু'দিক দিয়ে ঝরে পড়ে। হাল্কা কাজের জন্য যে সব করাত ব্যবহার হয়, তার পাত খুব পাতলা এবং দাঁতগুলিও তদনুরূপ। করাত চালান বড় কঠিন কাজ। দেখলে মনে হবে, এত সহজে কাঠ চিরে যাচ্ছে, এ অনায়াসেই করা যায়। কিন্তু করাত হাতে নিয়ে চালাতে গেলে আনাড়ী লোকে হয়ত করাত ভেঙ্গেই ফেলবে। করাত চালান একটি বিশেষ শিল্পকার্য্য, নিপুণ শিল্পী না হলে করাতের কাজ সম্ভব নয়।

কিছুক্ষণের ভ্রমণ

ঝুমুর রায়

টাইগার হিলে যাওয়া হইবে। খুব ভোরে উঠিয়া নির্জ্জন পথ দিয়া যাইয়া আমরা মোটরে চড়িলাম। একটি মোটরে বাবা, আমি এবং অন্য একটি মোটরে প্রীতি পিসী, কিরণ পিসী উঠিলেন। মাঝে মাঝে অন্য গাড়ীটি খারাপ হইতে থাকে। তখন প্রায় চারটা। ভোরের আলো দেখা দিয়াছে। পথের দুই ধারে ঘন গাছের সারি। গাড়ী ঘুম ষ্টেশন পার হইয়া অনেক উঁচুতে উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ী টাইগার হিলে পৌঁছিল। নামিয়া দেখিলাম, অনেক গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমরা সকলে ঘোরানো পথ ধরিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। উঠিতে কাহারও কাহারও কষ্ট হইতে লাগিল। আমরা টাইগার হিলের উচ্চতম জায়গায় একটি গোল ঘরের ছাদে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম, অনেকে সূর্য্যোদয় দেখিতে অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া আকাশে রামধনুর রঙ দেখিতে লাগিলাম—হঠাৎ সূর্য্যোদয় হইল। দূরবীণ দিয়া দূরে এভারেষ্টের চূড়া দেখিতে পাইলাম। টাইগার হিল হইতে শিলচল লেকে গেলাম। দু'টি বাঁধানো পুকুরের মত দেখিলাম। শিলচল হইতে দার্জ্জিলিং সহরে জল আসে। শিলচল লেক হইতে ক্যাভেণ্টার ফার্মে গেলাম। ফার্মে শূকর, গরু প্রভৃতি দেখিলাম। একটি বিলাতী ষাঁড় ছিল। ষাঁড়টিকে দেখিয়া আমার খুব ভয় করিল। ষাঁড়টি একটি মানুষকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। শিলচল হইতে আমরা ঘুম মনাষ্টারিতে গেলাম। মনাষ্টারিতে বুদ্ধদেবের একটি মূর্ত্তি আছে। আমাদের যাত্রা খুব আনন্দদায়ক হইয়াছিল।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৬

উদ্যান ভ্রমণের পর রাণী সেদিন বেশভূষা পরিবর্তন করে প্রাসাদ-কক্ষে ফিরে আসতেই মহারাজ গঙ্গাধর রাও সহাস্যে তাঁকে বললেন : অলিন্দ থেকে তোমাদের খেলা দেখছিলাম। দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল আগের যুগের মারাঠা বীরাঙ্গনাদের রণরঙ্গিনী মূর্তিতে রণযাত্রা! তাঁরাও এমনি করে সেজে-গুজে ঘোড়ায় চড়ে দেশের জন্যে লড়াই করতেন। এখন যেন সে সব স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একটা কথা বলি, ইংরেজরা যখন দেশরক্ষার ভার নিয়েছেন, আমাদের বলেছেন—তোমাদের কোন ভয় নেই, আরাম করে গদীতে বসে থাক, প্রজারা কলের পুতুলের মতন সেবা করবে; হাঙ্গামা কিছু বাধলেই আমরা আছি। কাজেই, এখন আর আগেকার মতন মারাঠা মেয়েদের রণচণ্ডী হোয়ে এ ভাবে মহলা দেওয়া কি ঠিক হবে? জানো, রেসিডেণ্ট এলিস সাহেব রাজ্যের সব খবর রাখেন—তিনি যদি শোনেন যে, তুমি আগেকার মত মেয়ে-পল্টন তৈরী করে মহলা দিচ্ছ, তা'হলে কিন্তু খুশি হবেন না—তখুনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

স্বামীর কথা শুনে রাণীর সুন্দর মুখখানা নিমেষে যেন ঘৃণায় কালো হয়ে গেল। রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকলেও তিনি রাজ-দরবারের প্রতিদিনের খবর সংগ্রহ করতেন। দরবারে কি কি কথা হয়, কে কি বলে, মহারাজের কি রকম মনোভাব—সবই তিনি সাগ্রহে শুনতেন। এর ফলে তিনি ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এক দিন দিল্লীর মোগল বাদশা এবং তার পর পুণার পেশোয়াদের যে বিপুল প্রতাপ ছিল, ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা স্বাধীন ভাবে থাকলেও, তাঁদের কাছে সর্বদাই মাথা নিচু করে থাকতেন, তাঁদের দূতকে দেবতার মতন শ্রদ্ধা করতেন; এখন সে প্রতাপ ও সম্মান কলকাতায় বসে ইংরেজ বড়লাট বাহাদুরই লাভ করছেন। ঝাঁসীর রাজ-দরবারে এলিস নামে যে ইংরেজ দূত রেসিডেণ্টরূপে উপস্থিত থাকেন, তাঁর কি দপদপা! স্বয়ং মহারাজ পর্যন্ত সিংহাসনে বসেও যেন সর্বদা শশব্যস্ত হয়ে থাকেন। অথচ তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ নৃপতি নন—স্বাধীন ও মিত্ররাজরূপে পরিগণ্য। রাণী জেনেছেন, রেসিডেণ্ট সাহেব যদি কোন কাজের জন্য অন্যায় সুপারিশও করেন, মহারাজ সেখানে অম্লানবদনে সম্মতি জানিয়ে সে কাজ সম্পন্ন করে দেন। এই সূত্রে এমন কতিপয় কাজ হয়েছে, যার জন্যে রাজ্যের তহবিল ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রজাদের অসুবিধাও ঘটেছে। কিন্তু মহারাজের সেদিকে দৃষ্টি নেই; রেসিডেণ্ট এলিস সাহেবের তুষ্টিতেই তাঁর তুষ্টি। এ সব কথা মনের মধ্যে রাণী আলোচনা করে মনে-মনেই ব্যথা বোধ করেন—মুখ ফুটে কোন দিন বলেননি মহারাজকে। কিন্তু আজ তাঁর ঘোড়ায় চড়া নিয়ে কথাপ্রসঙ্গে রাজা রেসিডেণ্ট সাহেবের কথা তুলতেই তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ যেন ঝাঁ করে কে ভেঙে দিল, আর রাণীর মনের ভিতরে রুদ্ধ কথাগুলি হুড়-হুড় করে বেরিয়ে এল। রাণী বলতে লাগলেন : আমার যখন বিবাহের কথা হয়, তখনই আমি শুনেছিলাম, এক স্বাধীন রাজ্যের রাণী হতে আমি চলেছি। বিবাহের পর মহারাজের কাছে আমি এই রাজ্যের যে সব কথা শুনিছি, তা থেকেও বুঝেছিলাম, মহারাজ স্বাধীন। কিন্তু এই মাত্র আমাকে যে সব কথা আপনি বললেন, সে ত কোন স্বাধীন রাজার মুখের কথা নয়! রেসিডেণ্ট এলিস সাহেব ইংরেজ রাজার দূত; ঝাঁসীর স্বাধীন মহারাজকেও যে তাঁর মন যুগিয়ে চলতে হবে—এ কথা যে কল্পনারও অতীত। এক রাজার দূত আর এক রাজার দরবারে থাকেন—নিজের রাজার স্বার্থ-সুবিধা দেখবার জন্য। কিন্তু জানি, মহারাজের দরবারে ইংরেজ সরকারের দূত এমন সব বাড়তি কাজ করেন যাকে অনধিকার চর্চা বলা যায়। অথচ, মহারাজ অম্লানবদনে তাঁর বেয়াদপি সহ্য করেন। হয়ত এই জন্যেই আপনি এইমাত্র আমাকে বললেন যে, রাজ্যের রাণী মেয়ে-পল্টন তৈরী করছেন, এ কথা যদি রেসিডেণ্ট জানতে পারেন, আপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবেন। তা'হলেও আমি মহারাজকে নিবেদন করছি, যদি সত্যিই তাই হয়, মহারাজ যেন রেসিডেণ্ট সাহেবকে বলেন—রাণীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি আপনাকে বলতে বলেছেন যে, আপনার দেশের মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ে বিলেতের রাজপথে বেড়িয়ে বেড়ায় রাণী শুনেছেন। রাণীর দেশের মেয়েরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছেন, এ কথা নিশ্চয়ই রেসিডেণ্ট সাহেব শুনেছেন। এ দেশের মেয়েরা ইদানীং সে পাট তুলে দিয়েছেন বলেই রাজ্যের পর রাজ্য স্বাধীনতা হারিয়েছে। ঝাঁসীর স্বাধীনতা যাতে বরাবর বজায় থাকে, সেই জন্যেই

ঝাঁসীর রাণী পুরানো পাট বজায় রেখেছেন। তিনি দেশবাসীকে জানাতে চান—ঝাঁসীর মেয়েরা প্রয়োজন হোলে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ঘোড়ায় চড়ে রণস্থলে ধাওয়া করবে—রাণী থাকবেন তাদের আগে!

কথাগুলি শুনতে শুনতে মহারাজ গঙ্গাধর অবাক বিস্ময়ে পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, কিছুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও নির্গত হলো না। যে-সব কথা তাঁর দরবারের বিচক্ষণ অমাত্যগণও মহারাজের সম্মুখে বলতে সাহস পান না, বরং প্রভুর তুষ্টি-বিধানের জন্য প্রতিবাদ করতেও কুণ্ঠিত, রাণী কি না অসঙ্কোচে অপ্রীতিকর জেনেও তাঁর মুখের উপরেই এ ভাবে বিষবর্ষণ করে গেলেন?

মহারাজকে নিরুত্তর দেখে রাণী এবার কোমল কণ্ঠে বললেন: আমার কথাগুলি হয়ত অপ্রিয়, কিন্তু অন্যায় নয়। যে সব কথার পিছনে সত্য নেই, আমি তা বলি না।

মহারাজ মৃদুস্বরে বললেন: আমি জানতাম, তুমি অন্দরমহল, পড়াশোনা আর খেলাধূলা নিয়েই থাক; দরবারের সব ব্যাপার নিয়েও তুমি যে চিন্তা কর, আমার তা জানা ছিল না।

রাণী বললেন: আমি ত শুধু গৃহিণী নই—আমি যে আপনার রাজ্যের রাণী। সহধর্মিণী বলেই আপনি আমাকে মন্ত্র পড়ে গ্রহণ করেছেন। তাই রাজ্যের কথাও আমাকে ভাবতে হয়।

মহারাজ এখন গলার স্বর গাঢ় করে বললেন: রেসিডেণ্ট সাহেবের কথা তুলে তোমাকে ও-কথা বলা হয়ত আমার উচিত হয়নি, কিন্তু তুমি যা বললে—রেসিডেণ্টের মন যোগাতে রাজ্যে এমন কাজও আমি করেছি, যার জন্যে তহবিলের ক্ষতি এবং প্রজাদের অনিষ্ট হয়েছে—এমন একটি অন্যায় কাজের কথা তুমি বলতে পার?

রাণী কিছু মাত্র চিন্তা না করেই বলে উঠলেন: হাঁ মহারাজ, সেই একটি কথা থেকেই আমার সব কথা প্রমাণ হয়ে যাবে। আমি নির্ভয়েই বলছি, শুনুন—লালা মীরচাঁদ আর শেঠ মদনলাল, এই দুই ব্যক্তিকে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। এরা দু'জনেই ইংরেজের আমদানী। রেসিডেণ্ট সাহেব আপনাকে জানালেন—মীরচাঁদ ভারি হুঁসিয়ার লোক, ঝাঁসী রাজ্যে কতকগুলো আফগান জায়গীরদার আছেন, মীরচাঁদ তাদের সবাইকে বাধ্য করবার কলকাঠি জানে। ওরা প্রায়ই রাজ্যে ঝামেলা বাধায়। তা ছাড়া, হিন্দু জায়গীরদাররাও মীরচাঁদকে মানবে। তার কারণ, মীরচাঁদের তাঁবেয় অনেক জঙ্গী লোক আছে, আর ইংরেজ সরকারেও ওর খুব খাতির। অতএব মীরচাঁদকে বাহাল করা হোক। মহারাজ এ কথা শুনেই আপ্যায়িত হয়ে গেলেন, তখনি ইংরেজের ঐ হাতের পুতুলটিকে মোটা টাকা তংখা দিয়ে বাহাল করলেন। অথচ, কোন প্রয়োজনই ওর ছিল না। বছর সালিয়ানা ছয় লাখ টাকা লালা মীরচাঁদকে ঝাঁসীর তহবিল থেকে দিতে হয়। এরই সঙ্গে সঙ্গে হাজির করলেন আপনার রেসিডেণ্ট শেঠ মদনলালজীকে। এ লোকটা যেমন টাকার কুমীর, তেমনি ইংরেজদের চাটুকার এক দালাল। নানা রকম ব্যাপারে রাজ্যের খরচ বাড়াবারই পরামর্শ দেন ঐ রেসিডেণ্ট মহারাজকে; টাকার অভাবের কথা সেরেস্তা থেকে উঠলেই তখনি রেসিডেণ্ট সাহেব ঐ শেঠ মদনলালজীকে দেখিয়ে দেন। চড়া সুদে কর্জ নিয়ে মহারাজ সেই খরচ মিটিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। কিন্তু রাজ্যের ঋণ যে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে, সে কথা মনে করেন না কোন দিন।

রাণীর আগের কথাতেই মহারাজ বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন, এখন লালা মীরচাঁদ ও শেঠ মদনলালের কথা শুনে বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। রাণীর এই স্পষ্ট কথা এবং বুদ্ধিদীপ্ত মনের বিচিত্র আভা তাঁরও মনের উপর এক অদ্ভুত আলোকপাত করল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মহারাজ বললেন: তোমার কথা শুনে আমি সত্যিই আশ্চর্য হচ্ছি রাণী! যে ঘটনার কথা লোকমুখে শুনে তুমি তা থেকে তলিয়ে তলিয়ে এত কথা ভেবেছ, আমরা সে ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে এমন করে কোন দিনই ভাবিনি। তবে, তুমি যে অনুমান করেছ, তা যে মিথ্যে নয়, অধুনা নানা সূত্রে আমি সেটা বুঝতে পেরেছি। এখন মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে তখন যদি পরামর্শ করতাম, তা'হলে হয়ত এ ঘটনা ঘটতে পেত না। কিন্তু এখন সত্যই নিরুপায় হয়ে পড়েছি। লালা মীরচাঁদ যে ভাবে রাজ্যের বুকে চেপে বসেছে, তাতে ওকে সরাবার জন্যে হাত বাড়ানো মানেই, সে হাত ইংরেজ রেসিডেণ্ট সাহেবের উপরে চালানো। তার পর, শেঠ মদনলালজীর কাছে আমাদের দেনাও কম নয়। ওকে বিদেয় করতে হলে সমস্ত দেনা-পত্র ওর চুকিয়ে দিতে হয়। কিন্তু তহবিলে এখন টাকার অভাব।

রাণী বললেন: টাকার যখন অভাব, তখন বাড়তি খরচ কমানোই আগে উচিত। অন্দরমহলে থেকেই আমি দেখতে পাই, দরবার-মহলে মহারাজের এত বাড়তি খরচ, যাকে অন্যায় বা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ও-সব দিকে কারুর লক্ষ্যই নেই। কিন্তু মহারাজ যদি অন্দরমহলের হিসাব দেখেন ত সত্যই অবাক হয়ে যাবেন। আমার আগে যে খরচ হোত, আর আমি এসে সমস্ত অন্দরমহল হাতে নেবার পর দেখবেন খরচ কত কমে গেছে। অবিশ্যি, আমার আমলে কোন কোন কাজে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু যে খরচ কমানো হয়েছে—তার তুলনায় এ খরচ কিছু নয়। আমি যে সব বাড়তি খরচ করে চলেছি—সেগুলো বাজে নয়। তাতে অনেক লোক খেতে-পরতে পাচ্ছে, আর রাজপুরীর শ্রীবৃদ্ধিও হচ্ছে।

মহারাজ বললেন: আমি আগেই সে-সব জেনেছি। আর সে কথা আমি দরবার-মহলের কর্তাদেরও বলেছি। বেশ, এখন থেকে আমি সব বিষয়েই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে চলব রাণী, তোমার মঞ্জুরী ছাড়া এর পর কোন কাজই করব না।

মনে মনে তরুণী রাণী এই কামনাই করছিলেন, তিনি যেমন নামে রাণী, তেমনি কাজেও যেন সত্যিকার রাণী—মহারাজের যোগ্যা সহধর্মিণী হতে পারেন। তাই কথাগুলি শুনেই মাথা নিচু করে মহারাজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করলেন। এই দিন থেকেই রাণী লক্ষ্মীবাঈ হলেন মহারাজ গঙ্গাধরের প্রকৃত সচিব। এখন থেকে তাঁর দায়িত্ব এবং কর্তব্যও অনেক বেড়ে গেল।

[ক্রমশঃ।

আপনার অনিন্দ্য মুখরাগ অম্লান রাখতে

এই দু'ভাবে যত্ন নেবেন

মুখখানি ফরসা ও মসৃণ রাখতে হলে **দুটি** ক্রীম আপনার চাই-ই—একটিতে ময়লা কাটবে, অপরটি মুখশ্রী নিখুঁত রাখবে। রাত্রিতে মাখবেন ত্বক্ নির্ম্মল রাখার জন্য সুমিশ্রিত তৈলাক্ত ক্রীম—পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম। আর দিনের বেলায় **রঙ্-কালো-করা** সূর্য্যালোক থেকে মুখশ্রী বাঁচানোর জন্যে মাখবেন সুশীতল হাল্কা একটি ক্রীম—পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম।

আপনার 'রূপচর্য্যায়' এই নিয়ম মেনে চলুন :

রোজ রাত্রে

ত্বক্ নির্ম্মল করার জন্য সারা মুখে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম মেখে মালিশ ক'রে বসিয়ে দিন। তাতে লোম-কূপের সমস্ত ময়লা বেরিয়ে আসবে। তারপর মুছে ফেললেই দেখবেন, মুখখানি কেমন উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

রোজ ভোরে

হাল্কা ভাবে পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে মুখশ্রী নিখুঁত রাখুন। এ মাখবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে কিন্তু অদৃশ্য একটি সূক্ষ্ম স্তর দিনভোর রঙ-কালো-করা সূর্য্যালোক থেকে মুখশ্রী অম্লান রেখে দেবে।

পণ্ড্‌স

একমাত্র কনসেশ্যনার্স :
জিওফ্রে ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ
বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ।

শাপমোচন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তখন ওরা থাকত দোতলা তেতলায়, আর ভূপেনরা ছিল ওদেরই একতলার ভাড়াটে। তনুশ্রীর বাবা হাজার টাকা মাইনে পেতেন আর ভূপেনের বাপ কোথায় কেরাণীগিরি করতেন দেড়শো টাকা বেতনে।

পদমর্যাদার তফাৎ থাকলেও তনুশ্রীর বয়েস তখন পনেরো, আর ভূপেনের বয়েস আঠারো। অর্থাৎ যে বয়সে মেয়েরা বীর-পূজা করতে শুরু করে আর যে বয়সে কিশোর তার দেহে-মনে অনুভব করতে থাকে পৌরুষের প্রথম উত্তাপ। আই এস্ সি ফেল করা ভূপেনের সেই পুরুষ মূর্তি ম্যাট্রিক পড়া তনুশ্রীর চোখে পড়ল পাড়ার সরস্বতী পূজো উপলক্ষে। গেঞ্জী আর সাদা প্যাণ্ট পরা ভূপেন জিম্‌নাষ্টিক দেখিয়ে যখন সকলের উল্লসিত করতালি কুড়িয়ে নিলে, সেই মুহূর্ত থেকে একটা নতুন গর্ব আর আবিষ্কারের আনন্দে সমস্ত চেতনা মগ্ন হয়ে গেল তনুশ্রীর। তাদেরি একতলার ভাড়াটে ভূপেন আজকের এই জনসমাবেশের মধ্যে অনন্যতার গৌরবে দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে—এই পরম বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে কখন যে ভূপেনের ওপর একটা অধিকার বোধ জন্মে গেল, টেরও পেল না তনুশ্রী।

একতলার থেকে দোতলার দুরারোহ সিঁড়িটা দেখতে দেখতে একটি মাত্র ছোট ধাপে রূপান্তরিত হল। মর্যাদার তারতম্য ভুলে গিয়ে, আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টি এড়িয়ে এক দিন বিমুগ্ধ চোখে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ালো স্বপ্নমগ্না কিশোরী আর নবজাগ্রত পুরুষ। তারও পরে একটা বৃষ্টিনামা সন্ধ্যায় প্রায়ান্ধকার সিঁড়ির নিচে ভূপেনের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে নিজের আংটিটি পরিয়ে দিয়ে তনুশ্রী বললে, আমি তোমাকে ভুলব না।

কিন্তু পনেরো বছরের কিশোরীর পৃথিবী। সে তো সূর্য ওঠার আগে আকাশে এক পোচ অস্থায়ী রঙ, সে তো হালকা কুয়াশার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি-জড়ানো ঘাসের ওপর কয়েক কণা শিশির। কতক্ষণ তার আয়ু? রঙ, কুয়াশা আর শিশিরের শূন্য রূপ একটু পরেই খর আলোয় ছিন্নছিন্ন হয়ে যায়, সাদা লাল হলদে বাড়িগুলোর কৌণিক তীক্ষ্ণতা আস্তে আস্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কালো পীচের পথে চিক-চিক করে উজ্জ্বল মসৃণ ট্রামের লাইন আর গ্যারাজের দরজা খুলে ক্লীনার যখন গাড়িটা সাফ করতে থাকে, তখন তার চকচকে শরীরটার ওপরে একটা কঠিন দীপ্তি ঝক-ঝক করতে থাকে।

ট্রামের লাইন আর ঝকঝকে গাড়ি। ভূপেনের বাবা বাড়ি বদলালেন, ট্রামটা কত পেছনে ছিটকে পড়ল কে জানে। আর গাড়িটা তনুশ্রীকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলল—আংটি পরিয়ে দেওয়া সন্ধ্যাটা কোথায় যে হারিয়ে গেল জানতেও পারল না তনুশ্রী।

তবু একটা অবচেতন ভয় লুকিয়ে আছে তনুশ্রীর মনে—লুকিয়ে আছে একটা সুগোপন আতঙ্ক। সেদিনের সেই 'কাফ-লাভের' মোহ কবে কেটে গেছে চোখ থেকে—আজ সে কথা ভাবলে কী অদ্ভুত হাস্যকর মনে হয় সে সব। মনে পড়ে যায় ভূপেনের ভুল ইংরিজিতে কথা বলার চেষ্টা, তার গায়ে বেয়াড়া রকমের ছিটের শার্ট, পায়ের ময়লা কেড্‌স জুতো আর চোখের নির্বোধ দৃষ্টি। কী ছিল সেদিনের ভূপেনের মধ্যে? কিছুই না। নিজের মনের ভেতরেই সে তাকে সৃষ্টি করে নিয়েছিল—কিছু শারীরিক শক্তির বিশেষত্বে ভরা অত্যন্ত সাধারণ একটি ছেলেকে নিজের কল্পনার সাম্রাজ্যে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিল সে।

জীবনে ওটা একটা অভিজ্ঞতার পর্ব মাত্র, তার বেশি কিছুই নয়। কিন্তু তবু ওই আংটিটা। কিছুই বলা যায় না, কোন্ দিন হয়তো প্রেতের মতো অন্ধকার ঠেলে ওই আংটির অধিকার নিয়ে ভূপেন এসে দাঁড়াবে—কোন দিন হয়তো! আংটির ওপর মিনেতে খোদাই করা তার নামের স্বাক্ষর—হয়তো ওইটে দিয়েই সেদিন ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করবে। আঠারো বছর বয়সেই আই এস্ সি ফেল করে অমন স্বাস্থ্য নিয়ে যে মাথা দাঁড়াতে পারে, তাকে বিশ্বাস নেই!

কিন্তু এ ভয়টাও ফিকে হতে হতে প্রায় মিলিয়ে এসেছিল। মিলিয়ে এসেছিল বারো বছর ধরে। কিন্তু কে জানত, বারো বছর পরে চন্দননগর থেকে কলকাতা ফেরার পথে শ্রীরামপুরে এসে গাড়িটা এমন করে বেঁকে বসবে, আর কৌতূহলী জনতার ভেতরে সকলের ওপরে নিজেকে তুলে ধরে প্রশ্ন করবে দীর্ঘকায় ভূপেন: কী—কী হয়েছে?

চন্দননগরে মামাবাড়ি। মামাতো ভাই পুলকের প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশন। সৌরাংশুরই নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অফিসের জরুরি কাজে কাল সন্ধ্যেতে আচমকা সৌরাংশুকে চলে যেতে হল দিল্লীতে।

তনুশ্রী ভেবেছিল যাবে না। কিন্তু বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আগে থেকেই পছন্দ করে একটা হার কিনে রাখা হয়েছে, হাতে করে সেটা পৌছে দেওয়া যাবে না—এই দুঃখটা তাকে আরো বেশি পীড়ন করতে লাগল। সুতরাং গাড়িটা নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়ল সে।

গোল বাধল ফেরার মুখে। শ্রীরামপুর বাজারে এসে ষ্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির।

বার কয়েক হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করে তনুশ্রী যখন ঘর্মাক্ত রক্ত-মুখে উঠে দাঁড়ালো, তখন চার পাশে বেশ ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। এই সমস্ত আধুনিকা মেয়ের গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার দুঃসাহসটা যে এমনি একটা পরিণতিতে এসেই থামতে বাধ্য—এই জাতীয় একটা তৃপ্ত গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে; জনতার চোখে দেখা যাচ্ছে বিদ্রূপ আর কৌতুকের কটাক্ষ।

তীক্ষ্ণ শীতল দৃষ্টিতে তাকালো তনুশ্রী। সামনে যে লোকগুলো সব চাইতে বেশি হাসাহাসি করছিল, তাদেরই এক জনকে কঠিন গলায় সম্ভাষণ করলে সে।

—এক জন মোটর মেকানিক ডেকে দিতে পারেন কেউ?

ব্যঙ্গে যারা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, তারা এবারে গৌরবে চরিতার্থ হয়ে গেল।

—হাঁ—হাঁ, এখুনি ডেকে দিচ্ছি—

তনুশ্রী বললে, ধন্যবাদ।

কিন্তু সে কথা শোনবার আগেই তিন-চার জন ছুটোছুটি করে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল। তনুশ্রী ক্লান্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো, তার পর ব্যাগ থেকে যখন রুমালটা বের করতে যাবে, এমন সময়ে ভিড়ের মাথার ওপরে ভূপেনের গম্ভীর গলা শুনতে পাওয়া গেল: কী—কী হয়েছে?

তনুশ্রী চমকে উঠল।

না, ভূপেনকে তখনি যে সে চিনতে পারল তা নয়। চারদিকের ক্লেদাক্ত চাপা গুঞ্জনের মধ্যে ওই কণ্ঠস্বরটা এমন গম্ভীর আর সহজ যে, না তাকিয়ে উপায়ই ছিল না। নগণ্য দীনতার ভিড়ের ভেতরে কোথা যেন পুরুষের আবির্ভাব ঘটল। যেন দেখা দিল সেই পুরুষ—যে কাপুরুষতার আক্রমণের ভেতরে নিজের শালপ্রাংশু মহাভুজ বাড়িয়ে দিয়ে উদ্ধার করে বিপন্না নারীকে।

—কী হয়েছে গাড়ির?—তেমনি গম্ভীর সবল গলায় জানতে চাইল ভূপেন।

—এই যে—এক জন মোটর মেকানিক এসে পড়েছে!—সোল্লাস অভ্যর্থনা জেগে উঠল একটা।

—মোটর মেকানিক?—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভূপেনের দিকে তাকাতেই দৃষ্টি থমকে গেল তনুশ্রীর। বিকেলের বিষণ্ণ আলোয় বারো বছর পরে আবার দুজনে দুজনের দিকে নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইল। ভূপেনের সেই চওড়া কপাল আর কোঁকড়া চুল, তনুশ্রীর পাণ্ডুবর্ণ বিষণ্ণ মুখ আর চিবুকে একটা কালো তিল—ভুল করবার অবকাশ মাত্র দিলে না।

বোবা বিস্ময়ে আর সূচীমুখ আশঙ্কার খোঁচায় যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল তনুশ্রী। আর ভূপেনের চোখের ওপর শাদা পর্দার মতো কী একটা দুলে উঠল বারকয়েক। কিন্তু ভূপেনই সামলে নিলে আগে। ময়লা হাফ শার্ট আর কালিমাখা পাজামা-পরা মোটর মেকানিক এগিয়ে এসে সহজ গলায় জানতে চাইল: কী হয়েছে আপনার গাড়ির?

আপনার গাড়ির! একবার চমকে উঠেই একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল তনুশ্রী। ভূপেন তা'হলে চিনতে পারেনি তাকে। বারো বছর! মাত্র দু'বছরের পরিচয় বারো বছরে মুছে যাওয়া এমন কি অস্বাভাবিক ঘটনা? প্রথম প্রেমের স্মৃতি মেয়েদের মনে চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে থাকে, কিন্তু পুরুষের বর্ণবিচিত্র জীবনে তা একটা পুরোনো চিঠির মতোই কোথায় চাপা পড়ে যায় যেন। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ কখনো হাতে ঠেকলে খামটা খুলে দেখারও আগ্রহ জাগে না।

বলিষ্ঠ প্র্যাক্টিক্যাল মানুষের হাতে ভূপেনই গাড়ির বনেটটা খুলে ফেলল: কী হয়েছে?

—ষ্টার্ট নিচ্ছে না।

কয়েক লহমা তাকিয়েই ভূপেনের অভ্যস্ত দৃষ্টি ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

—পেট্রল-পাইপে ময়লা জমেছে আপনার। তেল আসছে না।

—তা হলে?

—পাইপ খুলে পরিষ্কার করতে হবে।

—কতক্ষণ লাগবে?—তনুশ্রীও সহজ হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

—দু ঘণ্টা।

—দু ঘণ্টা!—তনুশ্রী আঁতকে উঠল।

—যদি বলেন, দশ-বারো মিনিটের মধ্যে কাজ চালানো গোছের করে দিতে পারি। কিন্তু তাতে ঠিক সুবিধে হবে না। পথে আবার আচমকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে—তখন হয়তো বিপদে পড়ে যাবেন।

—তাই তো!—বিব্রত মুখে তনুশ্রী তাকালো।

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে দিতে চেষ্টা করব—ভূপেন আশ্বাস দিলে: আপনি গাড়িতে উঠে বসুন, আমরা এটাকে আমার কারখানায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি।

নিরুপায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তনুশ্রী গাড়িতে উঠে বসল। সমস্ত মন আর্তকণ্ঠে বলে উঠতে চাইল, আমি অন্য মেকানিককে দিয়ে গাড়ি ঠিক করে নেব—তোমাকে আমার দরকার নেই। কিন্তু কিছুতেই বলা গেল না সে কথা। কোনো অপরাধ নেই ভূপেনের, মেকানিক হিসেবে তার যোগ্যতা-অযোগ্যতার কোনো পরিচয় এখন পর্যন্ত পায়নি তনুশ্রী। তা ছাড়া একটা প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব নিয়ে এসেছে ভূপেন। বাড়িয়ে দিয়েছে তেল-কালিমাগা পেশীবহুল হাত, অনুমতির জন্যে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করেই খুলেছে গাড়ির বনেট। সম্পূর্ণ অপরিচিতের ভূমিকায় এমন একটা সহজ শক্তিতে দেখা দিয়েছে যে, তাকে বাধা দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কোথাও।

ষ্টিয়ারিংটা আলগা ভাবে ধরে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল তনুশ্রী। আস্তে আস্তে এগিয়ে গাড়ি ভূপেনের কারখানার সামনে এসে দাঁড়ালো।

একটা পেট্রলের গন্ধ-ভরা কালো রুমালে কপাল মুছতে মুছতে ভূপেন এগিয়ে এল। হাসল অপ্রতিভ হাসি।

—দু ঘণ্টা না হোক, ঘণ্টা দেড়েক তো লাগবেই। আপনি গাড়িতে বসে থাকবেন এতক্ষণ?

তনুশ্রী হাসতে চেষ্টা করল: কী করব আর?

—কিছু যদি মনে না করেন—ভূপেন আবার লজ্জিত হাসি হাসল: আমার বাড়ি কাছেই। এই দু পা। আমার স্ত্রী রয়েছেন—ওখানে গিয়েও অপেক্ষা করতে পারেন।

স্ত্রী! তনুশ্রী আবার একটা চমক খেলো। কিন্তু আই-এস-সি ফেল করে মোটর মেকানিক হয়েছে বলেই তার ঘরে স্ত্রী জুটবে না—এমন একটা প্রশ্ন তোলাই তো অসঙ্গত। আজ পাঁচ বছর মাথায় সিঁদুর পরেছে তনুশ্রী, হয়তো তারও আগে সংসার বেঁধেছে ভূপেন। আর—আর কে বলতে পারে, তার দেওয়া সেই ছোট আংটিটি ভেঙে স্ত্রীর গলার হারের সঙ্গেই মিশিয়ে দিয়েছে কি না শেষ পর্যন্ত।

—আমি না হয় এখানেই বসি—মৃদু গলায় তনুশ্রী জবাব দিলে।

—মিথ্যে কষ্ট পাবেন। তার চাইতে আমার বাড়িতেই চলুন।

তনুশ্রী আবার চোখ তুলল। সেই গম্ভীর সবল গলা ভূপেনের। কুণ্ঠা নেই তার ভেতর, দীনতা নেই, সংশয়ের জড়তা নেই লেশমাত্রও। একটা শক্তিমান পৌরুষ—যে পৌরুষকে সে প্রথম অনুভব করেছিল সরস্বতী পূজোর প্যাণ্ডালে—ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় চিকচিক করে ওঠা ঘর্মাক্ত পেশল শরীরে।

সে আকর্ষণের আজো কি কিছু অবশিষ্ট আছে ভূপেনের মধ্যে? তনুশ্রী বুঝতে পারল না। কিন্তু রক্ত-কণিকার কেন্দ্রে কেন্দ্রে পনেরো বছরের কিশোরী অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। তনুশ্রী নেমে এল।

—চলুন—

কারখানার পেছনে কাঠা দুয়েক পোড়ো জমির পরেই ভূপেনের বাড়ি। বড় বেশি কাছে, অস্বাভাবিক রকমের কাছে। দূরত্ব এত কম যে, এর মধ্যে সম্ভব-অসম্ভব কোনো কিছু ভেবে নেওয়া যায় না, পুরুষ ভূপেনের মধ্যে কোনো বর্বরের অস্তিত্ব আছে কি না এবং কোনো একটা রহস্যময় বিভীষিকার মধ্যে টেনে নিয়ে সে চলেছে কি না, এমন কিছু ভেবেও রোমাঞ্চিত হওয়া যায় না। মাঝপথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় দুলবার সময়টুকু পর্যন্ত দিলে না ভূপেন। তার আগেই ঠক-ঠক করে একটা ইঁট-বের-করা একতলা বাড়ির সে কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে দিলে বাইশ-তেইশ বছরের একটি কালো-কোলো বধূ। তার পর তনুশ্রীকে দেখেই পিছিয়ে গেল দু'পা।

ভূপেন বললে, আসুন। গরীবের বাড়ি। কষ্ট আপনার একটু হবেই। কিন্তু গাড়িতে বসে থাকলে বিব্রত হতেন অনেক বেশি।

কালো বউটি ডাগর চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি একবার বুলিয়ে নিলে তনুশ্রীর সর্বাঙ্গে, তার পর জিজ্ঞাসু বিব্রত ভঙ্গিতে তাক'লো ভূপেনের দিকে।

সহজ ভাবেই ভূপেন ব্যাখ্যা করে দিলেঃ একা গাড়ি নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিলেন। গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, মেরামত করতে দেড় দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। মেয়েছেলে কোথায় বসে থাকবেন, তাই নিয়ে এলাম। তুমি ওঁকে একটু চা-টা খাওয়াও রমা, গল্প-টল্প করো।

রমা হাসলঃ আসুন।

ভূপেন বললে, আমি আর দেরী করব না। দেখি চট্‌পট্ আপনার গাড়িটাকে সায়েস্তা করে দিতে পারি কি না।—ব্যবসায়ীর আয়ত্ত হাসি হাসল ভূপেন, ফিতে-খোলা কাবলী চটিটাকে চটচটিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

রমা বললে, বসুন দিদি—দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?

দিদি! তাকিয়ে দেখল তনুশ্রী। না, এখানেও জিততে পারেনি ভূপেন—জিততে পারেনি তার পৌরুষের জোরে। কালো রঙের গোলগাল একটি বেঁটেখাটো মেয়ে, পানের রসে রাঙানো মুখ। আই-এস্-সি ফেল করা ভূপেন বিয়েতেও ফেল্ করেছে, সরস্বতী পূজোর প্যাণ্ডালের সেই বীরের বীরাঙ্গনা আর যেই হোক—এ নয়।

রমা আবার বললে, ঘরের ভেতরে বড্ড গরম। বারান্দার এই চেয়ারটাতেই বসুন। এখানে একটু হাওয়া খেলছে তবু।

—বেশ তো—তনুশ্রী বারান্দায় উঠে এল। খান দুই রঙ্-ওঠা ময়লা চেয়ার পড়ে আছে, বসল তারই একটাকে টেনে নিয়ে। চায়ের পেয়ালার গোল গোল দাগ ধরা একটা টিপয়ের ওপরে নামিয়ে রাখল হাতের ব্যাগটা।

—এইবার একটু চা করি আপনার জন্যে?—রমা হাসল। খুব সহজেই হাসতে পারে মেয়েটা—সেই সঙ্গে আশ্চর্য ভাবে হেসে ওঠে চোখ দুটো। এইবার মনে হল ঝর্ণার জলে জ্যোৎস্না দুলে ওঠার মতো ওই হাসিটুকুই ভূপেনের কন্‌সোলেশন প্রাইজ, কালো মেঘে ওইটুকুই যা রূপালি রেখা।

—এত তাড়া কেন? বসুন না একটু গল্প করি—তনুশ্রী অবস্থাটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করল এতক্ষণে।

—চা-টা আগে নিয়ে আসি, তার পরে গল্প হবে—চোখে-মুখে আবার এক ফালি হাসি বিকীর্ণ করে রমা সামনের ছোট উঠোনটুকু পেরিয়ে আরো ছোট রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

এই তবে ভূপেনের সংসার—এইখানেই এসে তা হলে শেষ পর্যন্ত নীড় বেঁধেছে সে। সন্দেহ কী, তাদের বাড়ির একতলার ফ্ল্যাটের চাইতে এ অনেক খারাপ। দেড়শো টাকা মাইনের বাপের চাইতে ভূপেনের রোজগার অনেক কম। তা না হলে দুখানা টালীর ঘর, দু হাত বারান্দা আর দশ হাত উঠোনের বারো আনা জোড়া একটা পুঁই মাচা নিয়ে সে খুশি হয়ে আছে কী করে?

দড়িতে গামছার সঙ্গে ঝুলছে ছেঁড়া গেঞ্জী, লুঙ্গি আর ময়লা শাড়ী, একটা ঢাকনা-খোলা বড় টিনের কৌটোয় কয়েক শো বিড়ির টুকরো আর দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি; পায়ের কাছে হিন্দী ছবির গানের বইয়ের গোটা কয়েক ছেঁড়া পাতা; একটা কুলুঙ্গিতে তোলা গোটা কয়েক আধ ছেঁড়া সিনেমা সাপ্তাহিক; উঠোনের একধারে স্তূপাকার জং-ধরা লোহা-লক্কড় আর টোল-খাওয়া গোটা দুই মাড-গার্ড—পুরোনো মোটরের পার্টস্।

এই বাইরের চেহারা—ভেতরের রূপটাও এ থেকেই কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত এইখানেই এসে থেমেছে ভূপেন, তার প্রথম পুরুষ এইখানে এসেই নিজের পুরো হিসেবটা চুকিয়ে দিয়েছে। অথচ! একটা অবাস্তব ভাবনা অকারণে বিদ্যুতের মতো চমকে গেল তনুশ্রীর মনে। সেই পনেরো বছর বয়েসের প্রতিশ্রুতি যদি আজ পালন করতে হত, পালন করতে হত এই সাতাশ বছর বয়েসে? রাত দশটায় হয়তো সর্বাঙ্গে কালি মেখে বাড়ি ঢুকত ভূপেন, ওই ইঁদারার ভাঙা বাল্‌তিটা দিয়ে ঝপ-ঝপ করে জল ঢেলে সারা

করত স্নান, লুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরে হুশহাশ শব্দে খেত আধ সের চালের ঠাণ্ডা ভাত, তার পর একটা বিড়ি ধরিয়ে হিন্দী ছবির গানের বই খুলে শুরু করত সুর ভাঁজতে। আর তনুশ্রী—

ভাবনাটা এই পর্যন্ত এসেই থেমে গেল, আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল শরীর। ভাগ্যিস, পনেরো বছরের প্রতিশ্রুতির কোনো দাম নেই—ভাগ্যিস বাড়ি বদল করার সঙ্গে সঙ্গে ভূপেনও হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! আরো ভাগ্য যে, ভূপেন আজ তাকে চিনতে পারেনি, না—কোনো মতেই না!

কিন্তু আশ্চর্য! নিজের অগোচরেই একটা বেদনা বোধ করল তনুশ্রী: আশ্চর্য! কী করে ভুলতে পারল ভূপেন, যেমন করে এত সহজেই নির্মূল করে দিতে পারল বারো বছর আগেকার সেই ঘোর-লাগা সন্ধ্যাটাকে! এত সংবেদনহীন পুরুষের মন, এমন সহজেই তার ওপরে জমে ওঠে পলিমাটির স্তর! আর একটু মননময় হওয়া উচিত ছিল ভূপেনের, নীরেট শক্ত শরীরটার ভেতরে মেলে রাখা উচিত ছিল আর একটুখানি ফাঁকা আকাশকে। মোটরের কলকব্জা নাড়াচাড়া করতে করতে কেন এমন ভাবে যান্ত্রিক হয়ে ওঠে মানুষ—নিজের একান্ত মুহূর্তগুলোর জন্যে কেন এতটুকু নির্জন জায়গা ফেলে রাখতে পারে না?

আংটিটা। কোনো এক অশুভ মুহূর্তে সেই মারাত্মক অভিজ্ঞান নিয়ে দেখা দেবে, তাকে ব্ল্যাক্‌মেল্ করতে চেষ্টা করবে ভূপেন। হঠাৎ এক একটা ঘুম-ভাঙা রাতে সৌরাংশুর পাশে শুয়ে সে দুর্ভাবনাটা পাথরের মতো তার বুকে চেপে বসেছে, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে আচমকা জমে গেছে রক্ত, পিপাসায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গলা। কিন্তু বিস্মৃতির এই নিশ্চিন্ততার চেয়ে দুঃস্মৃতির সে দুশ্চিন্তা ছিল অনেক ভালো। সে ভয়ের সঙ্গে ছিল উত্তেজনার একটা চঞ্চলতা, ছিল একটা রোমাঞ্চকর আত্মপীড়নের আনন্দ; কিন্তু নির্ভাবনার এই শীতলতা স্পন্দিত আতঙ্কের সেই প্রাণটুকুকে নিষ্ঠুর ভাবে গলা টিপে ধরেছে। নিষ্ঠুরতা বই কি! হয়তো সত্যি সত্যিই সেই ভাঙা আংটির কণাগুলো নিজের সমস্ত পরিচয় হারিয়ে, বর্ষার সেই সন্ধ্যাটিকে হারিয়ে ওই কালো বউটার ঘামে ভেজা সরু হারটার সঙ্গে সঙ্গে পেতলের মতো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে!

হঠাৎ উঠে পড়তে ইচ্ছে করল তনুশ্রীর। ছুটে যেতে ইচ্ছে করল বাড়ির বাইরে। কিন্তু তার আগেই দু হাতে দুটো চায়ের পেয়ালা নিয়ে রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে এল রমা।

উঠোনটুকু পার হয়ে রমা এগিয়ে আসতে লাগল। তনুশ্রী তাকিয়ে রইল তার চওড়া-পাড় লাল শাড়ীটার দিকে—সীমন্তিনীর স্বামি-সৌভাগ্যের প্রতীক। সৌভাগ্যই বটে! এত সহজেই যে ভুলে যেতে পারে, যার জীবনে বিস্মৃতির আবির্ভাব ঘটে এমন হৃদয়হীন অবলীলায়, তার গৃহিণী হতে পারা ভাগ্যবতীর লক্ষণ সন্দেহ কী! কিন্তু আজ যদি হঠাৎ মারা যায় রমা? পেশলদেহ স্থূল-মস্তিষ্ক মোটর মেকানিক ভূপেন কত দিন বিরহ-বিলাপ করবে তার জন্যে? ছ' মাস—এক বছর? তার পর এই রকম আর একটি কালোকোলো মেয়ের কপালে সিঁদুর পরিয়ে ভূপেন তাকে ঘরে আনবে, এই বউয়ের হার ভেঙে তার জন্যে নতুন করে চুড়ি গড়িয়ে দেবে। ভূপেনরা এই-ই করে, এই-ই ভূপেনদের নিয়ম।

টিপয়টার ওপরে সস্তার পেয়ালাটা নামিয়ে দিলে রমা। হাতলের নিচে কালো ময়লার রেখা—কালচে চায়ের রঙ। চুমুক দেবার প্রবৃত্তি হয় না।

কাঠের একটা চৌকি টেনে নিয়ে নিজের পেয়ালা হাতে রমা পাশে এসে বসল।

—চা নিন দিদি! দুখানা বিস্কুট দেব?

—না-না, কিছু দরকার নেই। অনেক খেয়ে বেরিয়েছি, এখন আর কিছুই খেতে পারব না।

রমা চুপ করে রইল। একবার ভীরু ভীরু চোখে তাকিয়ে নিলে তনুশ্রীর দামী শাড়িটার দিকে, তার প্রসাধন-মার্জিত পরিচ্ছন্নতার ওপর। যেন ব্যবধানটার পরিমাপ করে নিলে। তার পর কী বলতে গিয়েও থেমে গেল—যেন কী বলা উচিত ঠিক করতে পারল না।

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে তনুশ্রী পেয়ালাটা নামাল। কপালে মস্ত একটা জলজ্বলে সিঁদুরের টিপ মেয়েটার। সৌভাগ্য—স্বামি-সৌভাগ্য! হঠাৎ ভূপেনের ওপর অর্থহীন ক্রোধে মনটা তিক্ত হয়ে উঠল তনুশ্রীর। এর চাইতে উজ্জ্বল, এর চেয়ে তীক্ষ্ণধার কারো আবির্ভাব কি ভূপেনের জীবনে অসম্ভব ছিল? বলা যায় না—তেমন কেউ এলে হয়তো আরো একটু ঊর্ধ্বে উঠতে পারত ভূপেন, হয়তো লুঙ্গি পরে সিনেমার গান গাওয়ার চাইতে আরো একটু পরিমার্জিত, পরিশীলিত হওয়া অসাধ্য ছিল না তার পক্ষে। কিন্তু—

—আপনি কি কলকাতাতেই থাকেন?—রমার দ্বিধাজড়িত জিজ্ঞাসা।

—হুঁ।

—ও।—রমা আবার চুপ করল।

পুঁইমাচার ওপরে একজোড়া চড়ুই পাখি এতক্ষণ তনুশ্রীকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল, এবার সে রমার দিকে ফিরল।

—আপনার বাপের বাড়ি কোথায়?

বাপের বাড়ির প্রশ্নে রমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কথা বলবার মতো সহজ কিছু যেন খুঁজে পেল সে।

—দুর্গাপুরে—বর্ধমান জেলায়।—রমা সাগ্রহে জানতে চাইল: আপনি দুর্গাপুরে গেছেন কখনো?

—না।

—যাবেন একবার। ভারী সুন্দর জায়গা—রমা গ[illegible] হয়ে উঠল: নদী আছে, শালবন আছে। আর ধানের [illegible] মাঠের পর মাঠ জুড়ে ধান—তার আর শেষ নেই।

—বাঃ—খুব সুন্দর তো!

—হাঁ, খুব সুন্দর। যখন ধান পাকে, কী যে চমৎকার লাগে দেখতে! কিন্তু এখন তার অর্ধেক নষ্ট হয়ে গে[illegible]

সেই যে মিলিটারীরা এসেছিল না আমাদের দিকে? সব একেবারে শেষ করে দিয়ে গেছে। আমাদেরও দেড়শো বিঘে ধানী জমি কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল—এখনো ফেরৎ পাওয়া যায়নি। তার ওপর পড়ে আছে ওদের ভাঙাচুরো ঘর, লোহা-লক্কড়, এরোপ্লেনের টুকরো—এই সব!

—ওঃ!—তনুশ্রী হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো। এক ঘণ্টা হয়ে গেছে প্রায়! বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে নামছে উঠোনে। আর কতক্ষণ—কতক্ষণ তাকে বসিয়ে রাখবে ভুপেন? এই সংকীর্ণ টালীর ঘরের আরো সংকীর্ণ বারান্দায়—দুর্গাপুরের ধানক্ষেতের মতোই এই শ্যামল সাধারণ মেয়েটার পাশে?

ঘরের ভেতর থেকে একটা গোঁঙানির আওয়াজ এল।

—ও কি!—চমকে উঠল তনুশ্রী।

—ছেলেটা।—রমার মুখে বিসন্নতার ছায়া পড়ল: জ্বরে ভুগছে।

ছেলে! তা হলে ছেলেও হয়েছে ভুপেনের। সংসারী হওয়ার কোথাও এতটুকু বাকী রাখেনি, নিজের জন্যে এতটুকুও অবশিষ্ট রাখেনি কোথাও।

অকারণে তনুশ্রীর মনটা আবার সংকীর্ণ হয়ে এল: কী জ্বর?

—কী আর হবে? ম্যালেরিয়া।

—চলুন দেখি—তনুশ্রী উঠে দাঁড়ালো।

—কী আর দেখবেন?—রমা সংকুচিত হয়ে উঠল: প্রায়ই তো ভুগছে।

—চিকিৎসা হয় না?

—কুইনিন খায়। উনি ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এনে দেন সময় পেলে। ইনজেকশনও দেওয়া হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু জানেন তো কী পাজী রোগ। একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না।

—ওর বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে। চলুন, কাছে গিয়ে বসি।

—থাক্ না। জ্বর হলে ওই রকম পড়েই তো থাকে।

কিন্তু তনুশ্রী শুনল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পা বাড়ালো।

প্রায় অন্ধকার ঘর, বাইরে থেকে এসে ঢুকলে প্রথমটা কিছুই দেখা যায় না ভালো করে। বিস্বাদ গন্ধে ভরা কেমন একটা দম-আটকানো উত্তাপ। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে যখন ওই উত্তাপ আর গন্ধটা খানিক অভ্যস্ত হয়ে এল, তখন তনুশ্রী দেখতে পেল খাটের উপর ময়লা কাঁথা জড়িয়ে বছর ছয়েকের একটি শীর্ণ ছেলে জ্বরে ধুঁকছে। কতগুলো বাক্স-তোরঙ্গ, লক্ষ্মীর পট আর কাপড়-চোপড়ে আকীর্ণ ঘরটাকে যেন একটা রুদ্ধশ্বাস কবরের মত মনে হল।

তনুশ্রী আস্তে আস্তে ছেলেটার কপালে হাত রাখল। জ্বরের উত্তাপে ঠাণ্ডা হাতটা যেন জ্বালা করে উঠতে চাইল তার। ছেলেটা একবার চোখ মেলে তাকাতে চাইল, তার পরেই আবার নেতিয়ে পড়ল আচ্ছন্নতার মধ্যে।

—এ যে অনেক জ্বর—তনুশ্রী সভয়ে বললে, তিন-টিন হবে বোধ হয়।

—তা হবে—রমা স্বাভাবিক ভাবেই জবাব দিলে।

—একটু জলপটি দিলে হয় না?

—দরকার হবে না। বিকেলেই ছেড়ে যাবে।

খাটের একটা কোণায় তনুশ্রী বসে পড়ল। ভুপেনের ছেলে—ভুপেনের স্ত্রী—ভুপেনের সংসার। আঠারো বছরের পুরুষ একটা মোটর মেকানিকের মধ্যে এসে ফুরিয়ে গেছে চিরকালের মতো। অসহ্য ক্রোধে ভুপেনকে ধরে একটা প্রাণপণে ঝাঁকানি দিতে ইচ্ছে করল তার। সমস্ত ভয়, সমস্ত সংশয়ের পালা চুকিয়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করল: আমি—আমি সেই তনুশ্রী। ভালো করে তাকাও আমার দিকে, তাকাও আমার সেই পনেরো বছরের কালো গভীর চোখের ওপর। তার পর নতুন করে জীবনের প্যাণ্ডালে পরিপূর্ণ আলোর মধ্যে তুমি এসে দাঁড়াও। আবার পৃথিবী করতালি দিয়ে তোমাকে অভ্যর্থনা করুক, আবার তোমার সবল শরীরে শক্তিমান তারুণ্যের অসীম সম্ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, তোমার গ্রীক-শৌর্যের ওপরে অ্যাপোলোর আশীর্বাদ সৌর কণায় কণায় ঝরে পড়ুক। এই ঘর নয়, এই বুক-চাপা অন্ধকার নয়, এই স্ত্রী আর অসুস্থ সন্তানের গ্লানির মধ্যে নয়—অফুরন্ত প্রাণের উৎসবে হোক তোমার শাপমোচন!

চট্‌চটিয়ে ফিতে-খোলা কাবলী-চটির আওয়াজ পাওয়া গেল।

—উনি এলেন—রমা বললে ফিস্‌ফিস্ করে।

উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে ভুপেন। তার সবল গম্ভীর স্বর ভেসে এল সেই মৃত-আলোর দেশ থেকে।

—কোথায় গেলেন? গাড়ি তৈরী আপনার।

—তৈরী?—তনুশ্রী উঠে দাঁড়ালো বিদ্যুৎবেগে। দম-আটকানো অসুস্থ ঘরটা থেকে প্রায় এক লাফে বেরিয়ে এল বাইরে।

ভুপেন হাসল: যতটা সময় লাগবে ভেবেছিলাম, তার আগেই হয়ে গেল।

—ধন্যবাদ।

—দাঁড়ান—এক মিনিট—ভুপেন পাশের ঘরটায় ঢুকল, বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গেই।

—চলুন।

রমা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। কালো গোলগাল বউ, লাল-পাড় শাড়ী, কপালে জলজ্বলে সিঁদুরের টিপ। সীমন্তিনী ভাগ্যবতী স্ত্রী। তার দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করল তনুশ্রী: আসি ভাই তা হলে। খুব খুশি হয়েছি আলাপ করে। নমস্কার—

—নমস্কার—রমা হাসল, হয়তো বলতে চাইল আবার আসবেন। কিন্তু বলাটা এত অর্থহীন যে, সেটা বুঝতে পেরেই আর কথা খুঁজে পেল না।

—চলুন—ভূপেন আবার ডাকল।

সেই সংক্ষিপ্ত এতটুকু পথ। কিছু ভাববার আগে, কোনো একটা এলোমেলো কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠবার আগেই তনুশ্রী ভূপেনের কারখানার সামনে এসে দাঁড়ালো। ঝকঝক করছে সুন্দর গাড়িটা—মেজে-ঘসে দিব্যি পরিষ্কার করে দিয়েছে ভূপেন।

—দেখে নিন—একবার ভেতরে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে ভূপেন তনুশ্রীকে অনুরোধ জানালো।

গাড়িতে উঠল তনুশ্রী। সুইচ খুলে চাপ দিলে ষ্টার্টারে। আনন্দিত মৌমাছির মতো গুঞ্জন করে উঠল গাড়িটা—যেন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে এখনি ডানা মেলে দিতে চায়।

—কত দেব আপনাকে?—আরক্ত মুখে অবরুদ্ধ স্বরে জানতে চাইল তনুশ্রী।

ভূপেন স্বচ্ছ হাসি হাসল: কত আর দেবেন? বেশি কিছু করতে হয়নি, গোটা পাঁচেক দিলেই হবে।

কাঁপা হাতে ব্যাগ খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট ভূপেনের দিকে বাড়িয়ে দিলে সে। ভূপেন সেটা অভ্যস্ত পরীক্ষকের মতো আলোর দিকে তুলে দেখে নিলে একবার।

—ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদ—এতক্ষণে যেন মুক্তির নিশ্বাস পড়ল তনুশ্রীর। যেন পালিয়ে বাঁচল একটা অপমৃত্যুর শ্মশান থেকে। তবু—তবু! আঠারো বছরের প্রথম পুরুষ মরে গেছে তার, আশঙ্কা আর উত্তেজনায় তার নিভৃত সঞ্চয়কে আজ সে চিরকালের মতো ভূপেনের চিতাভস্মের সঙ্গে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এল!

তনুশ্রীর কান্না আসতে লাগল। আজ যেন তার একটা গোপন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেল—যেন ফাঁকা হয়ে গেল সব। চলন্ত মোটরের অপর্যাপ্ত হাওয়াতেও এখনো সে ভালো করে নিশ্বাস নিতে পারছে না, সেই বদ্ধ ঘরের রুদ্ধ উত্তাপটা এখনো তার হৃৎপিণ্ডে চেপে বসে আছে। এত দিন পরে যেন সে রিক্ত হয়ে গেছে।

হঠাৎ পায়ের কাছে নীল কাগজে মোড়া একটা ছোট জিনিস চোখে পড়ল। কী ওটা? কখন এল? তীক্ষ্ণ সন্দেহে সেটাকে তুলে নিতেই তার কোলের ওপর গড়িয়ে পড়ল একটা চকচকে ছোট জিনিস। বিবর্ণ মিনার আংটি। 'তনুশ্রী'—হরফ ক'টা এখনো স্পষ্ট পড়তে পারা যায়।

ষ্টিয়ারিঙের ওপর মুঠো শক্ত হয়ে এল—নিষ্প্রভ হয়ে এল দৃষ্টি। সবটাই তা'হলে ভূপেনের অভিনয়—আশ্চর্য নিপুণ অভিনয়। ইচ্ছে করেই ভূপেন তাকে নিয়ে গেছে তার বাড়িতে, পরিচয় করিয়ে দিয়েছে তার স্ত্রীর সঙ্গে, দেখিয়েছে মোটর মেকানিকের জীর্ণ অন্ধকার সংসারের রূপ! সেই জন্যেই পাঁচ টাকার নোটটাকে অমন ভাবে আলোয় তুলে পরীক্ষা করে করে দেখেছে সে।

আঘাত! আঘাত দিয়েছে ভূপেন। আঘাত দিয়েছে দীনতার আভিজাত্যে। আজ তনুশ্রীর আর তাকে ভয় নেই, তনুশ্রীরাই তার ভয়। আজ নিজের গণ্ডীর ভেতর থেকে তনুশ্রীদের সে নির্বাসিত করে দিতে চায়। যার কাছ থেকে সে পালাতে চাইছিল, সে-ই তার কাছে পলাতক! ওই আংটিটা ফিরিয়ে দেওয়া তনুশ্রীর ভয়মোচন নয়, তার নিজেরই দায়মোচন।

ইচ্ছে করল গাড়ি ঘুরিয়ে সে ফিরে যায়—ড্যাশ করে ভূপেনের কারখানার ওপর গাড়িটাকে চুরমার করে দেয়। কিন্তু তা করল না তনুশ্রী। আংটিটাকেই সে সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তারই গাড়ির চাকায় চেপ্টে গিয়ে ছোট আংটিটা একরাশ পিচের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

বাঁদী

অমরেন্দ্র ঘোষ

পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কিছু দেখা যাচ্ছে না—শুধু জল, বর্ষার ঘোলাটে ফোঁপানি, মাথায় ফেনার ফুল। এই আছে, এই নেই, আবার ছড়িয়ে পড়ল সহস্র সহস্র। যেমন ঝাপ্‌টা, তেমনি ঢেউ, তেমনি জন্মাচ্ছে রাশি রাশি ফুল। আকাশের দিকে স্তবকে স্তবকে ঠেলে উঠছে। বুঝি বা অভিনন্দন জানাচ্ছে মৌসুমী কালো মেঘকে।

অমাবস্যার দুর্দান্ত ভাটা। নদী তরংগ ঠেলে চলেছে দক্ষিণে, সমুদ্র-সংগমে। যে কখনও কানে শোনেনি, সে এ নদীর শব্দ, শোষানি, ঢেউয়ের মাতন দূর থেকে কল্পনাই করতে পারবে না। পূর্ব-বাঙলার মানচিত্রে যে সরু সরু নীল শিরার মত পদ্মা-মেঘনার শাখা-নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে বংগোপসাগরের দিকে, এ নদী তাদেরই একটি ভগিনী অথবা বেহায়া ননদ। নামটিও চমৎকার—ঠাকুরঝিতলার গাঙ।

পায়রা নদীর-সব চেয়ে চওড়া বাঁকটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে, যেখানে পঁচিশ ত্রিশ হাজার মণী মহাজনী ভরাগুলোকেও (বড় নৌকা) দেখায় ছোট ছোট শিশু-পারাবতের মত, সেইখানেই দেখা ঠাকুরঝির সংগে। শুধু বেহায়াপণা, কুটিল হাস্য। ভয়ে শিউরে ওঠে নৌকাপথযাত্রী। পৃথিবীতে কি কোথায়ও কূল আছে? স্থল আছে মানুষের স্বেচ্ছা বিহারের? বর্ষাকাল হলে তো কথাই নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, শুধু অবিশ্রান্ত আতংক। একটানা গর্জানি। ঠাকুরঝি যদিও বা কখনও থামে। প্রমত্তা হয়ে ওঠে পায়রা। উল্লাসে, লোভানি, লাফানি ঠেলে দেয় আকাশে। ঢেউয়ের মাথা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে হাজার হাজার আভের টুকরা। আবার তা মিলিয়ে যায় দেখতে দেখতে।

[illegible] হলে তাকে বলে 'মনোনগ'

এমনি একটা বর্ষার দিনে ঠাকুরঝিতলায় ভিতরে এক গঞ্জে একখানা আটমাল্লাই পান্‌সী বাঁধা। যাবে পায়রা নদীর একটু পাশ কাটিয়ে কোনও এক জমিদারী মহলে। জমিদার সুলেমান সাহেব নৌকার খাস-কামরায়। সংগে তার এক তরুণী বিবি। বোধ হয় সপ্তম পক্ষের। বিবি এবং সাহেবের তদ্বির তদারকের জন্য এক জন বাঁদীও এসেছে নায়ে। সেও বিবির তুলের তুল দেখতে। অবস্থা ও সাজ-সজ্জায় বৈগুণ্য না থাকলে কে যে বিবি, আর কে যে বাঁদী তা বোঝা কঠিন হত। দু'জনারই দাঁতের সুমুখের পংক্তি হীরার মত। বিবির গালে তিল আছে, বাঁদীর গালের সে অভাব পূর্ণ করেছে ছোট্ট একটি টোল। হাসি তো মুখে লেগেই আছে সারাক্ষণ। তবে বিবি ও বাঁদীর হাসিতে পার্থক্য আছে প্রচুর। এক জন হাসে খুশিতে, আর এক জন খুশি করতে। আরও বৈষম্য আছে চাল-চলনে। এক জন যখন আইনত দাবী করে শয্যা, আর এক জন তখন আশংকায় রাত্রি জাগে কখন হয় ধর্ষিতা। সুলেমান মত্তপ অসংযমী।

ঠাকুরঝিতলার গাঙের প্রায় এক বাঁক ওপরে একটা ছোট খালের মধ্যে কয়েকখানা লম্বা ধরণের ডিঙি বৈঠা পুঁতে 'পারা' করে রেখেছে একদল ডাকু। তাদের নায়ের পাটাতনের তলে সুতীক্ষ্ণ হাতীয়ারগুলো গোছান—রামদা, ল্যাজা, পাকা বাঁশের পোক্ত লাঠি। সড়কি এবং ঢালও আছে গণ্ডারের চর্মের।

মাঝিগিরি করে পেট ভরে না—এই তিন পুরুষ তো গত হল বান্দা খেটে জসিমের। সে-ই 'খোজারু' সেজে খোঁজ দিয়েছে সুলেমান সাহেবের গতিবিধির।

ডাকুরা বড্ড ফাঁপরে পড়েছে। সুলেমান সাহেব নাও খুলছেন না, ওরাও কিছু করতে পারছে না। পায়রা নদীর পাশাপাশি না হলে তো কোনও জুত করার উপায় নেই। ওরা সাধারণ ধান-কাটা কৃষাণদের মতই বেঁধে-বেড়ে খাওয়ার অভিনয় করছে। আর গালাগালি দিচ্ছে খোদাকে। বর্ষাকালে বাড়ীতেও উপোস, খাটতে নেমেও তাই। শিকার ফাঁদে পা দিচ্ছে না।

ওদের ইচ্ছা করে নদীর মাতলামি একেবারে থামিয়ে দিতে—ঠাণ্ডা করে দিতে সেই শীতের গাঙের মত। যেন শীতলপাটি বিছান। কিন্তু গরীব যতই দুঃসাহসিক কাজে নামুক—তাদের ইচ্ছা মতই তো আর অহংকারী জমিদার নাও খুলবেন না।

বাঁদীর নাম আমিনা। সে এক ফাঁকে রসুই-খোপে এসে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, 'নাও খোলবা কখন মিঞা?'

'যখন তোমার গাঙে ডুইবা মরার ইচ্ছা হইবে, কইও।'

'ও-মা কয় কি! আমি মরুম ক্যান পানিতে ডুইবা—বুড়া হইছ, তুমিই মর।'

'তয় গাঙের দিকে না চাইয়া কথা কও ক্যান? দেখ না আসমান-জমিন একাকার—ক্যাবল মাথা-ভাঙা ঢেউ।'

তা আমিনা দেখেছে। তবু ভাবছে, যত সত্বর কাছারী-বাড়ি দশ জনের ভিতর যেতে পারে, ততই তার পক্ষে মংগল। কি রাক্ষণে কি বুঝে যে তার মা এই নায়ে তাকে তুলে দিয়েছিল

আমিনা সবে মাত্র উনিশ বছরে পা দিয়েছে, এখনও কৌমার্য তার অক্ষত। সে প্রভুদেব সমস্ত মহিমাই জানে, তাই একান্ত বিব্রত হয়ে পড়েছে।

আমিনা চেয়ে দেখল, কেমন জলের চলক খেলছে মাঝ দরিয়ার। তার পর খানিকটা দূরে সে কি উন্মত্ত আস্ফালন! পায়রা নদী আর ঠাকুরঝি যেন গিলে খেয়েছে সমস্ত সবুজ তীর ও তট। অনেকক্ষণ চাইলে মাথা ঘুরে যায়। কূলহীন ঝড়ো সমুদ্র সে কখনও দেখেনি, কিন্তু এই বর্ষার কালো মেঘের পটভূমিতে যে গেরুয়া জলরাশি দেখতে পায়, তার চেয়ে যে ভয়ংকর কিছু আছে সে তা ভাবতেই পারে না।

তবু বিমূঢ়ের মত সে খানিক বাদে ফের জিজ্ঞেসা করে, 'নাও খোলবা না ?'

মাঝি বিরক্ত হয়ে বলে, 'না। তোমার মত পাগল তো দেখি নাই এ জিন্দায়!'

প্রকৃতির খেয়াল-খুশি মানুষের অনুমানের বাইরে। অনিচ্ছুক মাঝিকেও হঠাৎ গাঙের দিকে চেয়ে নাও খোলার হুকুম জারি করতে শোনে আমিনা।

'সামাল, সামাল বান আইছে ঠাকুরঝির বুক ভাইঙা। লঙর খোল, পারা তোল ইব্রাহিম, জসিম, কেরামৎ।'

সবাই মিলে লঙর-কাছি গোছায় আর ডাক ছাড়ে, বদর, বদর। সিন্নি মানত, করে পাঁচ পীরের দরগায়। খোদা ওদের যেন জান (প্রাণ) না যায়—ইজ্জৎ যেন বাঁচে বুড়ো মাঝির। সে জীবনে এমন বেকায়দায় পড়েনি কখনও।

আমিনা দেখল যে, ঠাকুরঝি পাগল হয়েছে, আর বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে বেসামাল ঢেউ। সে কি তার তড়পানি!

নৌকা মাঝ দরিয়ায় আনা সম্ভব না হলেও কয়েক রশি ভিতরের দিকে এসে অপেক্ষা করতে লাগল বানের ঢেউয়ের মুখোমুখী হওয়ার জন্য। এ-সময় না কি পারে থাকা নিতান্ত বিপজ্জনক। তোড়ের ধাক্কায়, পারের ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে ওর চেয়েও হাজার গুণ শক্ত নৌকা।

আমিনা খাস-কামরায় এসে লক্ষ্য করল যে, বিবি সাহেবা জড়িয়ে ধরল সুলেমান সাহেবকে ভয়ে। 'কই যান, বড় ডব করে আমার।'

'তা বইলা পেত্নীর মত ভর করতে পারবা না।। চুপ কইরা বইসা আল্লার নাম করো।'

আমিনা মনে মনে একটু না হেসে থাকতে পারল না। দায় ঠেকলে মাতালের মুখ দিয়েও বড় বড় কথা বের হয়। কিন্তু তাতে মন ভিজল না তো বিবি সাহেবার।

আমিনা খাস-কামরার একটা নকসি থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

বানের ডাক ক্রমে কাছে এল।

যখন ঠাকুরঝির দু'পার ছাপিয়ে একেবারে কাছে এসে পড়েছে বান, তখন কি জানি কি ভেবে মাঝি হঠাৎ ঘুরিয়ে দিল পানসীখানা। মুখোমুখী বানের ধাক্কা না নিয়ে, বানের উদ্দাম গতিকে আয়ত্তে আনল নায়ের পিছনের দিকে তুফান বাধিয়ে। ভেসে চলল পানসী—উল্কার মত এগিয়ে চলল উত্তরে। পায়রা রইল অনেক দূরে পড়ে।

নায়ের গতি মন্দীভূত হয়ে এল প্রায় সাড়ে তিন বাঁক ওপরে গিয়ে। তার মানেই হচ্ছে প্রায় চার পাঁচ ক্রোশ।

একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ যখন কথা বলে তাকে বলে 'ডায়লগ'

দুটি মেয়ে যখন কথা বলে তাকে বলে 'ক্যাটালগ'

এতখানি পথ আসতে কতটুকুই বা সময় লাগল। কিন্তু বেলা যে পড়ে এল। নিরালে কোনও মনুষ্য-বসতি নেই। থাকলেও তার বাসিন্দারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভয় আছে ডাকাতি রাহাজানীর।

'কি করবা বরমং?' মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন সুলেমান।

'হুজুর এইখানেই লঙর ফেলুম। হাজারটা হাতীতে হাওদা লাগাইয়া টানলেও এই উজানে নাও পিছাইব না। গঙ্গে যিকম ভাটা হইলে।'

'কিন্তু···।'

আমিনা বুঝল মদ ফুরিয়েছে। যাক, বেশ হয়েছে।

আমিনার বাপ ও মা তেমন সুন্দর ছিল না। তেমন কেন মোটেই নয়। কিন্তু তাদের ওরসে কি করে জন্মাল এ স্বর্ণলতা? উদাহরণ দেখাতে গেলেই বলতে হবে এ যেন বাদশাজাদী। উদাহরণ বস্তুটি কোনও সময়ই সত্য নয় তবে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য থাকে সত্যের সংগে। কিন্তু আমিনার বেলা এটা ছিল নিছক সত্য। ওর পিতা ও মাতার মধ্যে একটা আইন সম্মত সম্পর্ক ছিল স্বামি স্ত্রীর, কিন্তু তা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী মজুর-বংশ মাঝে মাঝে নদীর উঠিত্ চ'রো জমির মত জবর দখল করে ভোগ করতেন।

পুরুষটাকে খাটিয়ে নেওয়া হত যত দূর নেওয়া সম্ভব, আর মেয়ে লোকটাকে তার সারা দিনমানের খাটুনির পর করা হত অবসরে ভোগের সামগ্রী। বোর্না-পোলাদের মুখে কিছু চর-চাটনীরও তো দরকার। রুচির আর অভাব নেই বড়দের।

এমনি একটা চক-চাটনির পরিণতি আমিনা।

তা হক, তবু সে সুন্দর, মায়া হয় দেখলে। আর জ্বালা হয় সমস্ত তলিয়ে ভাবলে।

ধাক্কায় ধাক্কায়, অশিক্ষায়, অপব্যবহারে আমিনার মা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে যে চোখে দেখতে পেত না, তা নয়—অন্ধ হয়েছিল তার মনের চোখ। তাই সে সুলেমান সাহেবের খাস বাঁদী করে দিয়েছিল মেয়েকে। বলেছিল, 'নয়া (নতুন) সাদী হইলে কত মানুষ কান্দে, মায়ে বাপের ঘরের কথা ভুইলা যায়। বছর অন্তর একবার আসে কি আসে না। তুই যে আইজ কান্দিস আমিনা, কাইলই হয়ত যাবি এ বড়ী মায়েরে ভুইলা। কত দেখলাম, আমার বয়স হইল দেড় কুড়ি।' ধারাপাতের উপর সামান্য একটু অধিকার না থাকলেও বুড়ী অশ্রু বিসর্জন করে কি যেন এক সুমহান্ অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায়। এবং তা সে বাধ্য হয়ে সৃষ্টি করল নিজেই। কুড়াল দিয়ে অনেকেই কোপ মারে। কিন্তু যে নিজের পা নিজে কোন দিন আঘাত করেনি, সে বুঝতেই পারবে না আমিনার মা'র মর্মব্যথা।

আমিনা খানিকটা মন মরা হয়ে নায়ে উঠে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে মাকে ভুলবে না কিছুতেই আর এর জন্য প্রতিজ্ঞার কি ই বা প্রয়োজন? তার চারদিকে যে বিপন্না এক বুড়ী মায়ের অশ্রু-সজল মুখখানা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। যত বার সে চোখ মুছছে কেবলই দেখছে ঐ একই ছবি। নদী, জল একাকার।

সন্ধ্যার একটু পরেই ঝিমিয়ে এল হাওয়া। জলের শোঁশানি গর্জানিও সেই সঙ্গে কমে এল। বাতি জ্বলল প্রত্যেক কামরায়। রান্না-বান্নার জোগাড় হল, হাতিয়ার নিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে রইল পাইক পাঁচ জন।

'আমিনা একটু সরাব দে।'

'বোতল খালি হুজুর।'

বোতলের মালিক তা জানতেন ভাল করেই। তবু কেন যেন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোদের আর খেয়াল হইবে করে! এখন পানি ঢাল বোতলে।'

সুরাগন্ধী জল এল রূপার গ্লাসে। তাও কতকটা সুরার সামিল। বোতল ছিল অনেকগুলোই খালি। কিন্তু তেমন ক্রিয়া হল না। তবু কিছুটা বেসামাল ভাব দেখাতে লাগলেন সুলেমান সাহেব।

'যদি এখন আইসা ডাকাইতে ধরে আমাগো।'

নতুন বিবি একেবারে কাতর হয়ে পড়ে। 'খোদার কসম চুপ করেন।'

'যদি চায় তোমারে?'

'আল্লা গো।' আর্তনাদ শোনা যায় বামা-কণ্ঠের।

নয়া বিবির মুখের দিকে তাকিয়ে একটা পাশবিক আমোদ উপভোগ করেন সুলেমান।

এই সূত্রে একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে আমিনার।

সুলেমানের মা এক বাটি দুধ রেখেছিলেন এক দিন জ্বাল দিয়ে। বাড়ীর পাশের এক উদ্বাস্তু ক্ষুধার্ত বিড়াল এসে খেয়ে গেল সেই দুধ। পরদিন ওৎ পেতে রইলেন সুলেমানের মা একখানা বঁটি হাতে করে। বিশীর্ণ বিড়ালটা আর কাছে ঘেঁষল না। দূরে বসে মেঁউমেঁউ করতে লাগল। তখন বদ-মেজাজী সুলেমানের মার মাথায় একটা অদ্ভুত নেশা চাপল। তিনি ভিন্ন ঘরের জানলা গলিয়ে খানিকটা গরম ফ্যান ছিঁটকে দিলেন বিড়ালটার গায়। বিড়ালটা চকিতে সামলে নিল—কিন্তু গরম ভাপের ভয়ে সে আর্তনাদ করে পালাল।

তাঁরই তো ছেলে। আমিনা ভাবল—হবে না কেন ডাকু? শৈশবে আমিনা যা প্রত্যক্ষ করেছে, এখনও তার তা সঠিক মনে আছে।

সুলেমান আবার বলতে লাগলেন, 'চিল্লাও ক্যান? একটু রঙ-তামাসাও বোঝ না। ডাকুর হাতেই যদি দিমু, তবে সাদী করলাম ক্যান সখ কইরা?'

নয়া বিবি কথা বলে না। যেন তার বিশ্বাস ফিরে আসছে না।

'তুই কি কও আমিনা? এতগুলো বৌ থাকতে আবার সাদী করলাম ক্যান? কি, জবাব দে, ডর নাই—দিল-খোলা কথা ক'।'

আমিনা প্রভুর চোখের দিকে বারেক তাকিয়ে বলে, 'খুশি হইলে আপনারা তো হুজুর কুকুর-ছাও কেনেন।'

'কি হারামজাদী, যত বড় মুখ না তত বড় কথা। বন্দুকডা কই, আমার দোনালাডা?'

এ সুলেমান সাহেবের ঠাট্টা না সত্যি মেজাজ, বোঝা গেল না। অর্থাৎ কিনা বুঝতে সময় দিল না, সত্যিকারের ডাকুর দল। তারা 'মার-মার' করে ঘিরে ধরল পান্‌সী। মুখে তাদের মুখোসের মত কাপড় জড়ান।

বন্দুকে টোটা ভরলেন সুলেমান সাহেব। সামান্য নেশার ঘোর কিনি কাটিয়ে উঠে বাদশাহী মেজাজে খাপা হলেন।

শেখের মত পা ফেলে ফেলে বাইরে বের হলেন। কামরার ভিতর রইল বাঁদী ও নতুন বিবি। কিন্তু শেষ কেউ ব'নে গেল উপোসী ডাকুর সংখ্যা ও হিম্মত দেখে। এর মধ্যেই তারা মাঝি-মল্লাদের কাবু করেছে হাত-পা বেঁধে। খোজারু জসিমের পাত্তা নেই।

'তোমরা কি চাও?'

'টাকা।'

সুলেমান সাহেব কয়েক তাড়া নোট ছুঁড়ে দিলেন।

'আর কি?'

'গয়না।'

একটা সোনার অলংকার বোঝাই বাক্স ঠেলে দিলেন সুলেমান।

'এখন আবার কি চাও? খাড়াইয়া রইছ যে?'

'আচ্ছা গয়না পরবে কে'গা?'

সুলেমান সাহেব চিন্তিত হলেন। বলে কি এরা?

'ভাবেন কি হুজুর, আপনার কত বিবি আছে, এই নতুনডিরে মেহেরবানী কইরা খয়রাৎ (দান) দেন।'

'তা হইবে না।'

পূর্বের মতই ছোকরা সর্দার জওয়াব দেয়, 'এ তো পাঠার ইচ্ছায় ঘাড়ে কোপ না। ডাকাইতের খাতায় নাম লেখাইয়া, লুটের সেরা মাল ফেইলা যামু না। গয়না হুজুর পরবে কে? ময়না না হইলে খাঁচায় বইসা নাচবে কে?'

সুলেমান আর বাক্-বিতণ্ডা না করে ভিতরে চলে যান এবং উজ্জ্বল মশালের আলোকে যার চুলের মুঠি ধরে ঠেলে ডাকাতের হাতে তুলে দেন, তাকে দেখে হকচকিয়ে যায় ডাকুর দল। এ কি বেহেস্তের পরী?

কিন্তু নৌকায় নিয়ে গিয়ে তার মুখ বাঁধতে হয়। হাত-পা বাঁধার প্রয়োজন হয় না—চারদিকে জল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাকাতের নৌকাগুলো মিলিয়ে যায় উড়ন্ত পাখীর মত অন্ধকারে।

সুলেমান দাঁতে দাঁত ঘষেন রাগে দুঃখে অপমানে।

নৌকাগুলো চলতে চলতে এক স্থানে এসে থেমে পড়ে। নদী নয়—ঠাকুরঝির উজান বাঁক শেষ হয়েছে এই কিছুক্ষণ—নদীর সামিল খাল। যেমন নির্জন, তেমনি ঘিঞ্জি গাছপালা, লতা বেতসে দু'পার ঠাশা। বড়-ছোট সব গাছই একাকার—শুধু নিবিড় ঘন কালি। জোনাকি জ্বলছে হীরার মত। পোকা-মাকড়, বন্য জন্তু ছাড়া অন্য কিছু যে এখানে আছে, তা ভাবাই যায় না।

লুঠনের সমস্ত সামগ্রী ভাগ হয়ে গেল। শুধু কিছু টাকা গচ্ছিত রইল ছোকরা সর্দারের হাতে মামলা মকর্দমার খরচের আশকায়। অন্যত্র অনেক ঠকাঠকি হয়, কেউ গোপন করে সোনার হার, কেউ বা টাকাকড়ি—কিন্তু রমজানের দলে সে সব হওয়ার জো নেই। তাই অল্প বয়স হলেও রমজানকে ভক্তি বিশ্বাস করে বয়স্ক ডাকুরা।

একটি মাত্র বিবি, অনেক দিন পরে পাওয়া গেছে, কেউ আর সেদিকে নজর করল না। সেরা মাল সর্দারেরই ভাগে থাক। ও

নিয়ে কি ঝামেলা কম! যদি বাধা না হয় তবে অতিষ্ঠ হয়ে যেতে হবে অত্যন্ত ধৈর্যশীলকেও। কোথায় গুম করে রাখা—আবার কে দেখে, কার কাছে ফাঁস করে দেয় যত গোপন তথ্য। সেই জন্য সুন্দরী হলেও দায়িত্বের বোঝা বইল, যে বোঝা বইতে পারবে তার কাঁধে।

'মিঞা, সেলাম—দেখা হইবে পরশু বিহানে ঠাকুরঝিতলার হাটে।'

'সেলাম, থাইক সাবধানে। সুলেমান সাহেব কিন্তু সহজ মুনিষ্য না।'

আপাতত কিছু লাভ হলেও ওরা একটা অতি গুরুতর আশংকা নিয়ে যে যার বাড়ীর দিকে নাও খুলল।

জনহীন জংলা খালের পারে নিবিড় অন্ধকারে একটি অপরিচিতা নারী ও একটি পুরুষ একখানা ছোট্ট নায়ে বয়ে গেল—যাদের ভিতর কোনও প্রেম নেই, পরিচয় নেই, শুধু সাপে-নেউলে সম্বন্ধ।

ধূর্তা বিবি ভাবছে: আর কি, এখন দেবে মুরগীর মত গলায় ছুরি বসিয়ে—বিসমিল্লা বলে।

ডাকু সর্দার স্থির করেছে: ও ছাড়া পেলে দেবে ফাঁসি কাঠে যে-কোন উপায়ে লটকে।

পূবো-হাওয়া একটু কমেছিল, আবার বেড়ে এল। সংগে সংগে বর্ষা। এখন আরও নিবিড় সোঁতা খাল দরকার। এত মেহনতের পর আর এ জল সহ্য হয় না। রমজান বৈঠা তুলল। ঐ অন্ধকারেই একটা সোঁতা খালে গিয়ে ঢুকল।

এক পসলা বৃষ্টি ঝরে আকাশটা একটু পরিষ্কার হল।

কেন জানি একটু আলাপ করতে ইচ্ছা হল রমজানের।

একটা মালা দিয়ে নায়ের জল ফেলতে ফেলতে ডাকু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি বিবি?'

কি যেন জবাব এল কিন্তু বোঝা গেল না। মুখের কথা কাপড়ে জড়িয়ে গেল।

ডাকু বিবির মুখের বাঁধন খুলে দিল। ভয় কি? যাবে কোথায় এই আঁধারে এই জল-ঝড়-কাদায়?

'এক গেলাস পানি খামু।'

এত জল ঝরল তবু তৃষ্ণা! মমতা হল ডাকুর। কেন একে বেঁধে রেখেছে এতক্ষণ?

'গেলাস তো নাই।' একটু লজ্জা বোধ করল ডাকু।

'আচি ভইরাই দেন।'

ডাকু এক মালা জল দিল নদী থেকে তুলে। 'খাও।'

জল খাওয়া শেষ হলে রমজান ফের জিজ্ঞাসা করল, 'বিবি তোমার নাম?'

'আ-মি-না।' তিনটি অক্ষর একটু ভাগ করে টেনে টেনে বলল বিবি।

'তুমি না? কও কি তুমিনা?'

একটা দিয়াশলাইর কাঠি জ্বালাল ডাকু।

'আমি বিবি না, বান্দী, আমার নাম আমিনা। আপনারে ঠকাইছে মিঞা।'

'সত্য না কি?'

'দেখেন এখন নোটগুলা জাল কি না—ছাহেব বড় ধড়িবাজ।'

আরও গোটা তিনেক কাঠি জ্বেলে ভাল করে আমিনার মুখখানা দেখে রমজান বলল, 'না তা পারে নাই।'

প্রগলভা আমিনার চোখের পাতা সন্নত হয়ে এল। এ তো ডাকুর ভাষা, ডাকুর দৃষ্টি নয়। আমিনা জাত-বাঁদী। প্রেমের বেসাতি করার ওদের বড় একটা সুযোগ হয় না। কিন্তু বেসাতি করে ঠকতে জিততে এমন কি মরতেও দেখেছে অনেককে।

আবার দমকা পূবো-হাওয়া এল। এল জলের ঝাপটা যেমন আসা উচিত। রমজান উঠে নাও সামলাতে গেল। আমিনা বসে রইল খানিকটা শুকনা জায়গা খালি করে দিয়ে। রমজান তো আর বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজবে না। ছৈয়ের ভিতর এসে বসবে কোথায়?

'কিছু খাব না?'

এ কি আপ্যায়ন! গলায় তো ছুরি দিল না।'

'আছে কি?'

'পানি পান্তা।'

'সেই সকালের? ও আমাগো মুখে রোচে না।'

রমজান হাসে। 'তুমি সত্যই বান্দী। ক্যাবল বান্দী না বেহায়া। কোনও নয়া বিবির এমন মুরদ হইত না রমজান সর্দারের সাথে মসকরা করতে। তুমি তাজ্জব কইরা দিলা। কি, কিছু খাবা না কি?'

আমিনা চুপ করে থাকে।

রমজান একটা লম্ফ জ্বালায়। বাতাসের ভয়ে আড়াল করে রাখে একখানা পাটাতনের তক্তা দিয়ে। গলুই খোপ থেকে একটা মেটে বাসনে ভাত তোলে সযত্নে। 'কি, খাবা না কি চারডি—আমার কিন্তু প্যাট জ্বইলা যায়।'

ভাতের পরিমাণের দিকে একবার তাকিয়ে আমিনা বলে, 'আমি খাইছি সাঁঝের ওক্তে।'

'ভাল···আমার দোষ নাই কিন্তু···।'

'না, না—এখন তাড়াতাড়ি খাইয়া লম্ফটা নিভান গুণমন্ত।'

কথাটা ঠিক। রমজান গোগ্রাসে গিলতে থাকে ভাত।

আর আমিনাও এতক্ষণ বাদে উজ্জ্বল আলোকে সুযোগ পেয়ে কি যেন গিলতে থাকে দু'চোখ ভরে!

রমজান যত সম্ভব সত্বর খেয়ে লম্ফটা নিভিয়ে দিল এক ফুঁকে। আমিনা যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে উঠে কাপড়-চোপড় সামলে বসল। কি লোভনীয় স্বপ্ন দেখছিল তা সে-ই জানে! রামদা ও ল্যাজার সুতীক্ষ্ণ ফলার কাছে বসে এক আসন্ন মৃত্যুর কথা ছাড়া আর কি-ই বা ভাবা চলে?

তবু আমিনা ভাবছিল: এমন ডাকুর সংগে কি ভাব হয় না? কেমন বলিষ্ঠ দুর্ধর্ষ। আবার কত নরম মন। যেন কেয়া কাঁটার ভিতর বাদলা ভিজা সুগন্ধ।

'বিবিজান খাইলা না তো যেন্না কইরা, এখন শুইবা না?'

'ঘুম আইলে তো।'

'আইবে ক্যামনে? খালি প্যাটে কি নিদ্ আসে? তখন কইলাম খাইতে, অরুচি জন্মিল—এখন কেমন ঠেকে? তোমারে লক্ষে (জন্য) আমিও পারুম না শিথানে মাথা দিতে।'

'যদি মিঞা আমি ঘুমের ভান কইরা চুপচাপ থাকতাম চক্ষু বুইজা?'

'ভান করতে চাও, ভান—কার কাছে? ল্যাজা দেখছ নি?' সত্যই ল্যাজার ডগার একটা খোঁচা দেয় রমজান আমিনার গায়।

'উঃ! মা গো!' শিউরে উঠে আমিনা সরে বসে।

'বেল্লিকের মত চিল্লাইও না, অত জোরে দাগা দেই নাই। দেখি একখান হাত দাও।' আমিনার একখানা হাত জোর করে টেনে এনে রমজান পীড়ন করতে লাগল। 'আমার নিদ্ আইছে, যদি পালাও তয় মস্তিচুর কইরা ছাড়ম।'

নির্বাক্ আতংক ও বিস্ময়ে আমিনা চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ বাদেই নাকের ডাক শোনা গেল রমজানের।

বন্দিনী আমিনার বড় ইচ্ছা হল পালাবার। সে কটিতি হাত ছাড়িয়ে নেবে। ভাবল লাফিয়ে পড়বে, তার পর দুরন্ত সাঁতার।

কিন্তু কোন্ কূলে গিয়ে উঠবে সে? এক পারে মদ্যপ সুলেমান—অন্য পারে ক্রোধান্ধ রামদা হাতে এক ডাকুর সর্দার। নাম রমজান। রমজানের মধ্যে তবু সে ইতিমধ্যেই যেন দেখতে পেয়েছে এককালি কোমল উজ্জ্বল চাঁদ, কিন্তু সুলেমানের ভিতর তো শুধু অন্ধকার। দোজকের কালি। আমিনা কিছু স্থির করতে পারে না।

তার আবার লিপ্সা হয় পলায়নের। এ যেন একটা অন্ধ সংস্কার।—সত্য নয়, অথচ সুদৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কি করে পালাবে?

ঘুমিয়েই তো পড়েছে রমজান! নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে একটানা। যদি ভান হয়? আমিনা যে চাতুর্যের আশ্রয় নিতে চেয়েছিল, এ যদি তাই হয়? পরীক্ষা করে দেখতে চায় বন্দিনীকে?

পরীক্ষা নয়, সত্যই মুক্তি—দৃঢ় মুষ্টি শিথিল হয়েছে ডাকুর। আমিনা উঠবে। উঠে অন্ততঃ খাল-পারের এক জংগলা ঝাড়ে আত্মগোপন করবে?…কিন্তু সুলেমানের মূর্তি যে দেখা যায়। আমিনা তার শাড়ীতে জড়িয়ে একেবারে পড়ে গেল রমজানের গায়ের ওপর।

ছিঃ! ছিঃ! সে করল কি?

'ভাবছ কি বিবিজান—' ডাকু দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তার চঞ্চল প্রগলভা শিকার। 'চালাকি করতে চাও আমার সাথে?'

আমিনা দুরু-দুরু বুকে মিথ্যা কথা বলল গুটি কয়েক, 'আমি তো পালাই নাই মিঞা।'

'তবে চুপ কইরা থাকো।'

ভয়ে লজ্জায় চুপ করেই রইল আমিনা। অন্ধকারে, নির্জনে নীরবে সাজা খাটল একটু পূর্বের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য। কিন্তু কেন জানি ভালই লাগল—স্বাদ পেল অগাধ। আনন্দ পেল অপূর্ব।

একটা অসহ্য পুলকে ব্যথায় সারা রাত ঘুমাতে পারল না আমিনা। রমজানের চোখেও ঘুম এল না। কত দুশ্চিন্তার ভিতরও কি যেন অনাস্বাদিত সুখ পেয়েছিল সে।

দু'জনে ধীরে ধীরে কথা হল অনেক। যে ভারসাম্য নির্দেশের কাঁটাটা দোদুল দুলছিল দু'জনার মধ্যে তা একটা কেন্দ্রে এসে স্থির হয়েছে। এক জন অপরকে সাহস করছে ভরসা করতে। আমিনা যতটুকু পরিচয় পেয়েছে রমজানের, তাতে বুঝেছে যে, রমজান নিতান্তই ডাকু নয় এবং রমজানও বুঝেছে যে, আমিনাও

একান্তই বাঁদী নয়। ওরা উভয়ে যোলা জলে পড়েছে কি যেন চক্রান্তে।

'বাড়ী যাইবেন না ?'

'যামু তো— কিন্তু একটু সবুর করো।'

'ফয়জরের (ভোরের) তারা যে দেখা যায় আসমানে।'

'কইলা কি—ভোর হইছে!' রমজান উঠে বসে। আবছা আলোতে একটা আতংক-বিহ্বল ছায়া দেখা যায় তার মুখে। যে দিনের আলোর জন্য জগৎ উন্মুখ, সেই আলোর ভয়ে যেন রমজান অস্থির।

'অমন করেন ক্যান মিঞা ? কি হইছে ?'

'কিচ্ছু না। দেখলাম যে বিহানের আর কত বাকী। এখনও দেরী আছে ঘড়ি খানেক।'

'বাড়ী যাইবেন কখন ?'

'যামু তো—কিন্তু এখন আর সময় নাই যে।'

'তয় থাকবেন কই ?'

'এই খালেরই চৌদ্দ বাঁক উপরে এক জংগলে। চলো, দেইখো কোনও কষ্ট হইবে না।'

'না হইলেই ভাল। কিন্তু—'

'তা যদি গোছল (স্নান) করতে হয়, এইখানেই সাইরা লও।'

'আপনে একটু আবডালে যান।'

রমজান কূলে উঠে অদৃশ্য হয়ে রইল।

স্নান সেরে আমিনা নায়ে গিয়ে একখানা শাড়ী পড়ল বেশ দামী। এবার আর তফাৎ রইল না বিবির সংগে। রূপ তো ছিল আর অসামান্যই।

'ভাগ্যে আমি শাড়ী আনছিলাম ক'খানা। না হইলে পরতা কি ?'

'দিতেনই যা হউক জোগাড় কইরা। মাইয়া লোকের সরম আব্রুর ভার তো পুরুষ মানুষের উপর।'

'আমি কি তোমার পুরুষ মানুষ ?'

'জানি না।' একটা ঝামটা মারে আমিনা।

'কিছু জান না, কিন্তু রইল তো কাছা ধইরা।'

'এখন দেইখা শুইনা পথ চলেন—যেন উছাট (হোঁচট) খান না মধ্যে পথে। বেইল হইল যে।'

নাও ঠেলতে ঠেলতে রমজান সোঁতা খালের আগার দিকে এগিয়ে চলে। 'উছাট খাওয়া আমার তোমার হাতে না আমিনা।'

'তয় কার হাতে মিঞা ? যত মুস্কিল তত আসান। খোদার বিচার এক তরফা না।'

একটা ব্যংগ হাসি হাসে রমজান।

আমিনা দুঃখিত হয়।

কিন্তু চলন্ত নৌকা ঠিকই চলে এগিয়ে। প্রগতি অব্যাহত চিরদিন।

রমজান বার বার শাড়ী পরা আমিনার দিকে তাকায়। কি যে রমজান ভাবে, কি যে সে দেখে তা যেন বুঝেও বোঝে না আমিনা। কিন্তু গৌরব অনুভব করে মনে মনে। এত দিন জমিদার-বাড়ীর সংস্পর্শে থেকে সে যে আনন্দ না পেয়েছে, তার সহস্র গুণ আনন্দ উপভোগ করে এই ছোট্ট নায়ের ভিতর বসে। স্মরণ হয় মা'র কথা। দিন আসুক, সুযোগ আসুক, সে সমস্তই দেখাবে মাকে। কিন্তু সেদিন কি আসবে তার নসিবে ? বুড়ো মা, ক্ষমতাপন্ন জামাইর ঘরে চারটি সুখের অন্ন খেয়ে ধীরে-সুস্থে বয়স পেয়ে কি চোখ বুঁজবে ? এত আশংকার মধ্যে এ যে আকাশের চাঁদ হাত বাড়িয়ে ধরার কল্পনা !

কি ভাবছে আমিনা ? এ কি স্বপ্ন দেখছে সে দিনের বেলা। জেগে জেগে ?

'মুখখানা কালা কইরা বইসা রইছ ক্যান ? ক্ষিধা পাইছে বুঝি খুব ?'

'না।'

'ভাঁড়াও ক্যান ?'

'না গো না।'

'তয় বুঝি মনে পড়েছে মায়ের কথা ?'

এবার সজল হয়ে ওঠে আমিনার চোখের পাতা।

'বোঝলাম বোঝলাম, আমরা তোমাগো কেও না। তা মিথ্যা কি—সাচ্চাই তো মা। দশ মাস দশ দিন···তা তো সত্যই।' রমজানের প্রচ্ছন্ন হিংসাটা একেবারে এমন ভাবে প্রকাশ পায়—যেন বালকের হাত থেকে একটা কৌটার ঢাকনি খুলে পড়ে গেল খানিকটা সামগ্রী।

আমিনা অপ্রস্তত হয়ে চেয়ে থাকে।

একটা অতি-নির্জন স্থানে গাছ-পালার নীচে এসে নৌকা থামে। সোঁতা খাল এখানে একেবারেই সরু হয়ে গেছে এপার-ওপার ডিঙিয়ে পারাপার হওয়া যায় অনায়াসে। নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে মানুষ কখনও এখানে আসতেই পারে না।

কূলে উঠে কয়েকটা পাকা পেঁপে ও জামরুল নিয়ে এল রমজান। ওগুলো রেখে সে আবার গেল কূলে। এবার নিয়ে এল ঝুনো নারকেল দু'টো পেড়ে। যত তাড়াতাড়ি আসা উচিত ছিল, তার চেয়ে অনেক দ্রুত সে ফিরে এল।

'আপনে মিঞা কি বান্দর ? গাছে ওঠলেনই বা কখন আর পাইরা আনলেনই বা কখন ?'

'সে কথা শুইনো পরে—আগে খাইয়া লও।'

দু'জনে একত্র হয়ে ফলগুলো পেট ভরে খায়। আমিনা একেবারে তৃপ্ত হয়ে গেছে।

'বিবিজান আমার মুখের দিকে একটু চাও।'

এমন করে অনুরোধ করলে আমিনার মত প্রগলভারও চোখের পাতা বুজে আসে, গলার স্বর যায় বন্ধ হয়ে। সে তাকাতেও পারে না, কিম্বা কিছু বলতেও পারে না।

'কই বিবিজান চাইয়া দেখবা না ? সত্যই কি আমি বান্দরের লাখান (মত) দেখতে ? মুখটা কি আমার তোমার মতই লবণ-পোড়া ?'

আমিনা সব্রীড় কটাক্ষে তাকায়। কোনও জবাব দেয় না। কিন্তু এক সময় ধীরে ধীরে প্রতিবাদের ছলে বলে, 'লবণ-পোড়া ছালুন না চাখলেই হয়।'

যেন শুনেও শোনেনি রমজান, 'কি কইলা কি ?' আবার সে সাগ্রহে চেখে দেখে নুন-কটা ব্যঞ্জন।

'সাধে কয় ডাকাইত ? পুলিশ ডাকমু ?'

আবার জড়িয়ে ধরে রমজান। 'ডাকো না ?'

আমিনা তার গায় এলিয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কখন যাইবেন মিঞা বাড়ী ?'

'যামু তো, কিন্তু···'

আমিনা যে এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণ একেবারে বুঝতে পারে না, তা নয়। তবু তার ঔৎসুক্য হয় অত্যন্ত। কেমন ঘর, কেমন দুয়ার, কেমনই বা মিঞার পাড়া-পড়শী ? প্রিয়জনের নিকট-পরিচয় আমিনা পেয়েছে, এখন সে জানতে চায় তার পরিমণ্ডল। যে পরিমণ্ডলের মধ্যে সে শিকড় মেলে দেবে—টবের গাছের আশা হয়েছে অভিনব।

বন্যার •হাওয়া একটু থমকে ছিল, আবার তা পূব কোণ ঠেলে বইতে লাগল। সংগে সংগে দেখা দিল কালো জ'লো-মেঘ। দিনের আলো পড়ল ঢাকা। দু'জনে সারা দিনটা কাটিয়ে দিল নায়ের ভিতর।

রাত্রির আঁধারে জল-বৃষ্টি মাথায় করে করে নৌকা খুলল রমজান।

'কই যান ?'

'বাড়ী।'

তাড়াতাড়ি গলুইর দিকে ছুটে আসতে যায় আমিনা।

'তুমি জলে ভিইজো না।'

'এ তো ইলশাগুড়ি।'

'তয় বইস। মানা করলে তো শোনবা না।'

প্রায় আধ প্রহর বাদে নৌকা এসে রমজানের গাঁয়ের কাছে থামে।

'কথা কইও না আমিনা, পুলিশ থাকতে পারে ওঃ পাইন্তা ? তোমার পরনের শাড়ীখানা বদলাও। যদি ধরা পড়ো, তোমার সাহেব সনাক্ত করে।'

'ভাল কইছেন, আমিনা তার বান্দী! বিবির শাড়ীও তো অদল-বদল হইতে পারে। ভয় আপনার, আপনে হুঁশিয়ার হইয়া চলেন।'

এত বুদ্ধি আমিনার। রমজান বিস্মিত হয়ে থাকে। ইচ্ছা করে এই অন্ধকারেও মুখখানা একবার দেখতে।

হাওয়া আসে, মেঘ সরে যায়—মাঝে মাঝে তারা দেখা যায় আকাশে।

জল থৈ-থৈ করছে চার দিকে। খাল, মাঠ, গ্রাম একাকার। শুধু ব্যাং আর পোকা-মাকড়ের ডাক, মধ্যে মধ্যে গাছ-পালাকে আশ্রয় করে জ্বলছে জোনাকী।

আমিনা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, 'এ সব কু-কাম করেন ক্যান মিঞা ?'

অতি সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু জবাব দেয় না রমজান।

বাড়ীর কাছে এসে রমজান কান খাড়া করে কি যেন শোনে। তার পর খানিকটা এগিয়ে যায়।

'যদি আমারে ধরতে আসে কেও, আমি কিন্তু পানিতে ডুব

দিমু—যদি না উঠি ভাইবো না। তোমার ভয় কি, তুমি তো হইবা সাক্ষী।'

ধক করে উঠল আমিনার বুকটা। এত আগ্রহ করে বাড়ী এসে লাভ হল কি? কিন্তু তখন আর ফেরার উপায় নেই।

'এই তো আমার বাড়ী।'

'ঘর কই?'

'পোড়াইয়া গেছে। ঐ দেখো না আধপোড়া ভিজা চাল ভাইঙা-চুইরা পইরা রইছে।'

'এমন ডাকাইত কেডা—ও মিঞা এমন ডাকু কে?'

'তোমার মনিব সুলেমান সাহেব, আমারও মনিব আমিনা। বড় জমিদার, সে কিন্তু এই গরীবেরে চেনে না।'

রমজান অতি সংক্ষেপে এখানে একটি গল্প বলে। গল্প নয়, সত্য ইতিহাস।

সুলেমান সাহেবের জমিদারী অনেকগুলো ডিহিতে বিভক্ত। তারই একটা ডিহির মধ্যে রমজানদের বাস। খাজনা ঠিক সময় আদায় না দিতে পারায় কারুরই নেই এক কানি ফসলের জমি। দৈব-দুর্বিপাক কিম্বা অজন্মার দরুণ খাজনা না দিতে পারা যদি অপরাধ হয়, তবে সে অপরাধের জন্য দায়ী যারা তারা ওদের পিতা-পিতামহ। কিন্তু ষোল আনা ভোগটা ভুগছে রমজানেরা। ভূমিহীন কৃষাণ, পেশার অভাবে হয়েছে ডাকু। চুরি-চামারী করে আর পেট ভরে না।

আমিনা চুপ করে শুনল—বুঝল সব ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে। সে তার নসিব-ভরা দেখতে পেল অথৈ পানি। তার আর এক মুহূর্ত্তও থাকতে ইচ্ছা করল না ওখানে। 'মিঞা নাও খোলেন।'

'কোথায় যাবা?'

'যেদিকে দুই চক্ষু যায়—কিন্তু এখানে আর না। কলিজা আমার জ্বইলা যায়।'

'পুলিশ, পুলিশ যে আছে ওঁতে-ওঁতে।'

'তাতে হইছে কি? নাকের উপর এক হাত পানিও যা চৌদ্দ হাতও তাই। আপনারে লইয়া ভাঁটি দিমু ঠাকুরঝি-তলার একেবারে শ্যাষ সীমায়—সমুদ্দুরের চরে।'

'কি আশায়?'

অতি সাধারণ বাঁদী এক রহস্যময়ী নারীর মত হাসে।

'কি আশায় আমিনা?'

এবারও রমজান অন্ধকারে শুধু হাসি শুনতে পায়। 'তুমি যে ক্যাবল হাসো?'

'হাসি আপনার রকম-সকম দেইখা। পুরুষ মানুষ হাতে টাকা আছে, গায় হিম্মৎ আছে—নয়া চর বন্দোজ লইয়া ঘর বাঁধবেন, ধান কইবেন, ভাবনা কি?'

খুশি হয়ে রমজান জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি করবা?'

'আমি ক্যাবল কান্দুম।'

'ক্যান আমিনা, এ কথা কও ক্যান?'

'আমি তো বেহালা, আপনে তো ছড়ি, হামেসা ঘা দিলে আর কি করুম।'

'তোমাগো কি হামেসা আমরা ঘালাই? সারা দিনের হাড়ভাঙা মেহনতের পর একটু বাজাই—তা সইবা না ক্যান?'

'মিঞা এটুক আর বোঝলেন না—ক্যাবল দুঃখেই কি মানুষ কান্দে? অতি সুখেও আসে চৌক্ষে পানি।'

নৌকা সোঁতা খাল বেয়ে গাঙের মুখে আসতে আসতে ভোর হয়ে যায়। বাড়ীতে দাঁড়াবার স্থান নেই, নায়ে থাকারও উপায় নেই—এখন ওরা আশ্রয় নেবে কোথায়? যদি দিনটা গতকল্যের মতও মেঘলা থাকত। বন্যাটাও হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। সূর্য উঠছে তার সবগুলো আলোর পেখম মেলে। নদী ঠাণ্ডা, কিন্তু ওদিকে যে এগুতে সাহস হচ্ছে না। নিকটেই গঞ্জ—পুলিশ এসে নিশ্চয়ই হানা দিয়েছে আজ।

সারা দিনটা ওরা আত্মগোপন করে রইল সেই পূর্ব্বের সোঁতা খালের মাথায়। ফল-মূল খেল যেমন সংগ্রহ করা যায়।

সন্ধ্যা বেলা আমিনা এক অদ্ভুত সজ্জায় সাজল। আলুলায়িত কুন্তল বাঁধল উঁচু খোঁপা করে। একখানা কম দামী ছাপার শাড়ী পরল নতুন ঢংয়ে ফেরতা দিয়ে। গায়ের জামা খুলে ফেলে শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে নিল বুকে বেশ আঁটো-সাঁটো করে। দু'-একখানা ছোট হাতিয়ার ছাড়া বড়গুলো ফেলে দিল জলে। রমজানকে বলে নায়ের ছৈ কেটে করল অর্দ্ধেক। এক গোছা রজনীগন্ধা জোগাড় করে খোঁপায় গুঁজে দিল একটু হেলিয়ে।

রমজান বলল, 'বাঃ চেনাই তো যায় না তোমারে। তার পর—'

'আপনার ডর কি, আপনে তো সাথেই রইছেন। চুপ কইরা শুইয়া থাকেন পাটাতনের তলে।'

নৌকা যখন ছোট খাল ছাড়িয়ে বড় গাঙে এসে পড়ল, তখন এক হাতে কৃত্রিম লতা-বঁড়শির সুতো ছাড়ার ভান করতে লাগল আমিনা, অন্য হাতে তার বৈঠা।'

সমুখে গঞ্জ···বড় বড় কোষ নৌকা দেখে বোঝা গেল জেলার চুনোপুঁটি অফিসাররাই কেবল আসেনি, বড় বড় ঢাউসগুলোও জড়ো হয়েছে। একটি সামান্য বাঁদীর জন্য কত মায়া এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান সুলেমান সাহেবের।

কিন্তু কি আশ্চর্য, সে বাঁদী এ সমস্ত গুণের মর্যাদা বুঝল না। চপল ফাঁকি দিয়ে একখানা গেঁয়ো গানের গমক তুলে। ঠাকুরঝির জল-স্থল উতরোল। সপ্তর্ষি কাঁপছে যেন ঐ সুরে:—

খসম খসম আমার আইলা না
কদু (লাউ) গাছে ধরছে রে কদু
ছানুন চাইখা গেলা না···
খসম খসম আমার আইলা না।

একখানা চৌকিদারের নাও থেকে প্রশ্ন হয়, 'কে যায়?'

আমিনা জবাব দেয় নেয়ে জেলেনীদের ঢংয়ে, 'এক নাইয়া জাইলার ঝি—নাম আসমানী।' টর্চ জ্বলে দু'-তিনটা—সত্যই তো, খোঁপায় ফুল, হাতে বঁড়শি, নেয়ে বেদের মেয়েই বটে। দু'দিন বাদে সমুদ্দুরের চরে যাদের দেখা যায় তারা রমজান ও আমিনা নয়—মহব্বৎ ও মেহেদী।

জনান্তিক

[৭৪০ পৃষ্ঠার পর]

"কিছু না কী রকম? চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, চুপ করে ভাবছেন।"

"চুপ করে আছি তা দেখতে পাচ্ছেন বটে, কিন্তু ভাবছি দেখছেন কেমন করে?"

"বাঃ রে, চুপ করে আছেন বলেই মনে হচ্ছে ভাবছেন। নইলে ভাবনা কি আর চোখে দেখা যায়?"

"যায় না বুঝি? যাক, বাঁচালেন। ভাগ্যিস পুরুষ মানুষদের দৃষ্টিশক্তিটা খাটো। আমরা মেয়েরা কিন্তু আপনাদের ভাব এবং ভাবনা দুই-ই দেখতে পাই। কী, হাসছেন যে বড়? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? এঞ্জিনীয়র মানুষ, হাতে কলমে পরীক্ষা না করে কিছুই মানতে চান না। আচ্ছা, আপনি এখন কী ভাবছেন বলবো? শুনতে চান? থাক, থাক, আপনাকে অমন রাঙা হয়ে উঠতে হবে না। ভয় নেই। আমি বলছি না।"

হেমন্তে সুপক্ক ধান্যের স্বর্ণাভ ক্ষেত্রের উপরে হঠাৎ এক ঝলক রৌদ্রের মতো মলী সেনের মুখে চোখে একটি নিঃশব্দ কৌতুকোজ্জ্বল হাস্যোচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ল।

বিব্রত নিখিল কী করবেন, কী বলবেন ভেবে না পেয়ে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন। অকারণেই তাঁর ললাটে স্বেদবিন্দু সঞ্চারিত হতে থাকল।

বৈদ্যুতিক তার বা সুইচ ইত্যাদির সংস্পর্শে পাছে কারো কোন বিপদ না ঘটে সেজন্য সুইচ বোর্ডটি স্বভাবতঃই ষ্টেজের এমন একটি নিভৃত অংশে রাখা হয় যেখানে একমাত্র অভিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো উপস্থিতি বা যাতায়াতের সম্ভাবনা নেই। যেহেতু এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ব্যবহৃত বিদ্যুৎ অপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিদ্যুৎ এবং মোটর, ট্রান্সফর্মার ও অন্যান্য নানাবিধ জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ, সেজন্য নিখিল অধিকতর সতর্কতায় বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। ষ্টেজের নিভৃত কোণে কিছুটা উঁচুতে পৃথক একটি সুদৃঢ় মঞ্চ তৈরী করে তার উপরে সুইচ বোর্ড ও কন্ট্রোল গিয়ারগুলি বসিয়েছেন, যাতে অসতর্ক কেউ সেখান দিয়ে যাতায়াতের সময় হাত বাড়িয়েও তার সংস্পর্শে না আসে। মঞ্চটির চার দিক টিউবের রেলিং দিয়ে ঘেরা, ওঠা নামার জন্য আছে ক্ষুদ্রকায় একটি কাঠের সিঁড়ি। সেই রেলিংএর উপর দেহের ভার ঈষৎ ন্যস্ত করে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন মলী সেন।

অপাঙ্গ দৃষ্টিতে নিখিলের সঙ্কট লক্ষ্য করে অত্যন্ত সহজ ভাবে বললেন, "কী ভাবছিলেম, শুনবেন? ভাবছিলেম, আপনার এই পরিশ্রম, এই পরিকল্পনা, এত সাজ-সরঞ্জাম, এই সার্থক কারুকলার যোগ্য হবে কী আমাদের অভিনয়?"

হঠাৎ কেমন যেন বিচলিত বোধ করলেন নিখিল। নিজের অলক্ষিতেই বুঝি সুইচ বোর্ডের কাছ থেকে সরে মলী সেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "মিসেস সেন, আপনাদের অভিনয় এর যোগ্য কি অযোগ্য জানিনে। সে কথা আমি কখনও ভাবিনি। আমার সামনে ছিল শুধু একটি লক্ষ্য। সে আপনি। আমি যা কিছু করতে চেয়েছি, যা কিছু করেছি সবই আপনার পছন্দ হবে, আপনি খুশি হবেন, এই মনে করে।"

কথাগুলি যেমন করে বলা হলো, তেমন করে বলার কল্পনামাত্র ছিল না নিখিলের মনে। তাঁর নিজের কাছেই সেগুলি ছাপার অক্ষরে কেতাবী বক্তৃতার মতো মনে হলো। গলার স্বরটাও নিজের কানেই অতিমাত্রায় নাটকীয় শোনালো। অথচ জ্যামুক্ত তীরের মতো সদ্য উক্ত বাক্যগুলিকেও আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় কোনো মতেই। ছিঃ ছিঃ! মিসেস সেন কী জানি কী ভাবলেন। অনুশোচনা হলো নিখিলের।

মিসেস সেন সত্যি কী ভাবলেন, তা বোঝার উপায় ছিল না। বাইরে অপরাহ্ন বেলার রৌদ্রালোক ম্লান হয়ে এসেছে। ভিতরে ষ্টেজের নিভৃত অংশের এই অপরিসর মঞ্চটিতে আলোর প্রবেশপথ স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ। সেই ক্ষীণ আলোক এক্ষণে ক্ষীণতর হয়েছে। নিরুত্তর পার্শ্ববর্তিনীর মুখমণ্ডলে তাঁর মনোভাবের যদি কোন ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়েও থাকে, আসন্ন সন্ধ্যার এই স্বল্পালোকিত মুহূর্তে তা কোনক্রমেই আর দৃষ্টি-গোচর নয়। তাই আপন প্রগলভতার অসামান্য মূঢ়তা স্মরণ করে লজ্জা ও অনুতাপে কেবলি ক্লিষ্ট হতে থাকলেন নিখিল রায়।

"জানেন, আপনার সঙ্গে আমি আর কথা বলছিনে?"

কিছুটা অভিমান, কিছুটা ব্যথা এবং কিছুটা বা অনুযোগের সুর মেশানো ছিল মলী সেনের কণ্ঠে।

অপরিসীম বিস্ময়ে নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন, "মানে ?"

"মানে, আমি ভীষণ রাগ করেছি।"

নিখিলের শঙ্কা তা হলে অহেতুক নয়। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার নিদারুণ প্রতিফল প্রত্যক্ষ করে নিখিল মনে মনে নিজেকে বারম্বার ধিক্কার দিলেন। কেন বলতে গেলেন ঐ কথাগুলি ? ক্রুদ্ধ অভিভাবকের সম্মুখে অপরাধী বালকের মতো অসহায় নিখিল আপন স্পর্দ্ধিত আচরণের সমুচিত দণ্ড লাভের আশঙ্কায় নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে যেন মুহূর্ত্ত গণনা করতে লাগলেন।

"আপনি আমার কোনো কথা রাখেন না ; আপনার সঙ্গে আড়ি।"

কপট কলহের ভঙ্গিতে বললেন মলী সেন।

না, এ তো ঠিক শাস্তি বিধানের ধারা নয়! কণ্ঠে তো উদ্যত রোষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চিত হতে না পেরে সংশয়ের স্বরে নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন

"আপনার কথা রাখিনে ? কই, আমি তো মনে করতে পারিনে কবে আপনার কোন কথা অগ্রাহ্য করেছি।"

"করেননি ? আজ দুপুরে খেতে এসেছিলেন ? এতবার অনুরোধ করে লোক পাঠালেম, কান দিয়েছেন তাতে ?"

আঃ! কী অস্বস্তি !! দূর দিগন্তে যাকে অগ্নিশিখা বলে ভয় হয়েছিল, দেখা গেল, সেটা প্রত্যূষের অরুণ রঙে রঙ্গিন লঘু মেঘখণ্ড মাত্র। নিখিল আপন স্বাভাবিক স্থৈর্য্য ফিরে পেয়ে সহজ কণ্ঠে বললেন,

"ওঃ, এই ? আমি ভাবছিলেম, কী জানি সাংঘাতিক কিছু বা।"

"এটা সাংঘাতিক নয় বুঝি ?"

"না, একবেলা ভাত না খাওয়াটা আমাদের মতো মুটে মিস্ত্রীদের পক্ষে কিছুই নয়। পাওয়ার হাউসে—"

মলী সেন হাস্যচপল কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললেন, "থাক, থাক। অত বিনয় প্রকাশের প্রয়োজন নেই। আপনি যে আপিসের বড় সাহেব, সে আমরা সবাই জানি।"

নিখিল সহাস্যে বললেন, "হাঁ, বড় সাহেব বটে, তবে শুধু পাখার নীচে বসে দস্তখৎকারী নই। দরকার হলেই আস্তিন গুটিয়ে হাতুড়ি, রেঞ্চ ধরতে পারি। পাওয়ার হাউসে ব্রেকডাউন হলে কতদিন সকাল থেকে রাত অবধি একটানা কাজ করতে হয়। আর্দ্দালী চাপরাশীরা বুদ্ধি করে কখনও দু এক টুকরো রুটি বা দু একটা সিদ্ধ ডিম জোগাড় করে আনে। কখনও বা স্রেফ চা আর সিগারেট। কতবার এমন হয়েছে। আজ তো আপনার কেনা কেক, সন্দেশ, আপেল, নাসপাতিতে রীতিমতো ভূরি - ভোজন বলা চলে।"

মলী সেন যুক্ত দুই কর প্রণামের ভঙ্গিতে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "মানছি, আপনারা সব ঋষিতুল্য লোক। বশিষ্ঠ, জামদগ্নির লেটেষ্ট এডিশন। উর্দ্ধলোকে বিচরণ করেন। আপনারা শুধু ধোঁয়া নিয়েই বাঁচতে পারেন। আমরা মর্ত্ত্যলোকের ক্ষুদ্র জীব, পা দুটি ধূলো কাদার মাটিতে। আমাদের যে বস্তু না হলে চলে না।"

"বেশ তো, মর্ত্ত্যলোকের মর জীবেরা মর্ত্তমানের কাঁদি নিয়ে বসে থাক্ না। আমরা কি আপত্তি করেছি ?"

অনুপ্রাসযুক্ত উত্তরটা খুব সুচতুর হয়েছে ভেবে মনে মনে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ বোধ করলেন নিখিল।

"না করেন নি। কিন্তু তবুও আপনাদের কথা ভেবেই কলা গিলতে গেলেও গলায় আটকে আসে তাদের, সে খবর রাখেন ? জানেন, আমাকে আপনি আজ সারা দিন না খাইয়ে রেখেছেন ?" নিখিলের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন মলী সেন।

গভীর বিস্ময়ে নিখিল বললেন, "আমি না খাইয়ে—মানে—আপনি—আপনি আজ খাননি দুপুর বেলা ? সে কী ? কেন ?"

ঈষৎ হাস্য করে মলী সেন বললেন, "যোগী ঋষিদের নিয়ে বিপদই তো ঐ। মুনিঠাকুর, আপনাদের তৃতীয় নয়নটা আছে কপালের কোন্‌খানে বলতে পারেন ? জানলে সুবিধে হতো। আমাদের এত ভুগতে হতো না।"

এ সব কথার সম্পূর্ণ অর্থগ্রহণ নিখিলের সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু একথা বুঝতে কষ্ট হলো না যে, মলী সেনের এই স্বেচ্ছাকৃত অনাহারের পশ্চাতে তাঁর নিজের সম্পর্ক আছে এবং সে সম্পর্ক কেবলমাত্র পাকযন্ত্রের নয়, হৃদ্‌যন্ত্রেরও বটে।

অনুতপ্ত কণ্ঠে নিখিল বললেন, "কী করি বলুন, তখন এখানে নিজে দাঁড়িয়ে না করালে কিছুতেই মিস্ত্রীরা সন্ধ্যের আগে এসব শেষ করতে পারতো না। অভিনয়ের সময় ষ্টেজে আলোই জ্বলতো না। জানেন তো, ফাঁকি দিতে পারলে আমাদের লোকগুলি কুটোটিও নড়াতে চায় না। তা' ছাড়া এসব ব্যবস্থাগুলি জটিলও কম নয়, হাতে ধরে দেখিয়ে না দিলে ওদের পক্ষে করাও অসম্ভব। কিন্তু আমার জন্যে আপনি কেন না খেয়ে বসে রইলেন? অন্যায়, ভারি অন্যায় আপনার।"

"বসে আর রইলেম কোথায়? টেবিলে দু'জনের খাবার সাজিয়ে নিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠালেম। আপনি এলেন না। অপেক্ষা করে বেলা গড়িয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটা একটা থেকে দুটোয়, দুটো থেকে আড়াইটার কোঠায় পৌঁছল। প্লেট ধরে সমস্ত খাবার-দাবার দিয়ে দিলেম চাকর-বেয়ারাদের।"

আসলে কথাটা সত্য নয়। না খেয়ে থাকেননি মলী সেন। বরং সর্ষেবাটা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রাঁধা ঝালের মাছটা দুবার চেয়ে নিয়েছেন।

নিখিলের খাওয়ার আয়োজন তিনি যথেষ্টই করেছিলেন। টেবিলে অপেক্ষাও নেহাৎ অল্প করেননি। অবশেষে নিখিল আসবেন না নিশ্চিত জেনে বুদ্ধিমতী মেয়ে মাত্রেরই যা করা উচিত, তিনি তা-ই করেছেন।

মলী সেনের বিশ্বাস, এসব ক্ষেত্রে এমন সামান্য একটু অতিরঞ্জনে দোষের কিছুই নেই। হৃদয়ের ব্যাপারে মলী সেন নিজেকে মনে করেন একজন খাঁটি আর্টিষ্ট। তিনি বলেন, "ঘটনার সত্য আর আর্টের সত্য এক নয়। যা ঘটেছে তার চাইতে যা ঘটলে ঠিক হয় তার উপরেই আর্টিষ্টের পক্ষপাত। নীতিবাগীশেরা যাই কেন না বলুন;—সত্যম্ শিবম্ হতে পারে, কিন্তু সুন্দরম্ নয়। প্রয়োজন মতো একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে না দেখালে সত্য চিরকাল শুষ্কং কাষ্ঠং হয়ে থাকে, কোনোকালেই নীরস তরুবর হয় না।"

বিরুদ্ধবাদীরা প্রশ্ন করে, "যথা?"

"যথা, পুলিশ কোর্টের রিপোর্টে থাকে সত্যিকার ঘটনা।. বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে আছে সত্যিকার আর্ট। যেমন পত্রিকার পাতার ফটোগ্রাফে পাই অবিকৃত সত্য, শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবিতে দেখি উপভোগ্য আর্ট।" শুনে ক্লাবে, পার্টিতে তাঁর ভক্তমণ্ডলী সপ্রশংস বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে মন্তব্য করেন,—"মাই গস্। হাউ ক্লেভার।"

নিখিল ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়র। কিলো ওয়াট বোঝেন, এম্পিয়র জানেন, ভোল্টেজ চেনেন। আর্টের সরু গলি-ঘুঁজিতে তাঁর গতায়াত নেই। তিনি সহজ সরল বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝলেন, এই অতিথিপরায়ণ কোমলহৃদয়া মহিলাটি আজ তাঁরই জন্য সারাদিন অভুক্ত। অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। সহৃদয় কণ্ঠে বললেন, "কেন বলুন তো অনর্থক না খেয়ে কষ্ট পেলেন?"

মলী সেন বললেন, "দেখছি, এঞ্জিনিয়র সাহেবের নোট বইতে সবই আছে; শুধু লেখা নেই—পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাবো তায়?" কিন্তু এ কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য কী, আলোচ্য প্রসঙ্গে তাদের সম্পর্কই বা কোনখানে, তা নিখিলের কাছে স্পষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললেন, "রাগ করে আজ ভেবেছিলেম, থাকুন না আপনি উপোস করে। আমার ভারি বয়েই গেল তাতে। প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, একমাত্র অভিনয়ের ব্যাপার ছাড়া আপনার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রাখবো না। কিন্তু প্রতিজ্ঞার মুস্কিলই এই যে, সেটা না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত মনে আর স্বস্তি থাকে না। এই দেখুন না, পাঁচটা বাজতে না বাজতেই খোঁজ নিতে এলেম, বেয়ারাগুলি চা আর খাবার দিয়েছে কি না।"

নিখিল কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাকে বাধা দিয়ে মলী সেন বলতে লাগলেন, "জানেন মিষ্টার রয়, ভগবান লোকটা বড় একচোখো রেফারী। জীবনের খেলায় পুরুষেরা কেবলই ধাক্কা দিয়ে দিয়ে গোল করে, আর মেয়েরা কেবলই পড়ে গিয়ে গিয়ে গোল হারে। তিনি হুইসিল হাতে নিয়ে নির্ব্বিকার চেয়ে দেখেন,—বোধ হয় উপভোগই করেন,—ফাউল দেন না গ্যালারী থেকে জুতো আর ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারবার আশঙ্কা নেই কি না।"

মলী সেনের কণ্ঠের সূক্ষ্ম আবেদন যেন সহস্র সহস্র অদৃশ্য তরঙ্গে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। সেই কাত ব্যাকুলতা তাঁর তন্বী দেহটিকে ঘিরে এক গম্ভীর অথ বেদনাবিধুর ভাবাবেগের নিস্তব্ধ আবেষ্টন রচনা করলো

হঠাৎ দুই পদক্ষেপে সুইচ বোর্ডটার কাছে গি সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন নিখিল। ঘুম ব্যক্তিকে অকস্মাৎ সজোরে ধাক্কা দিয়ে জাগি তোলার মতো নিজেকে তিনি যেন সবল আঘাতে

দ্বারা মোহাবিষ্ট স্বপ্নরাজ্য থেকে আত্মচৈতন্যের বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনলেন।

আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চের ঠিক নীচে কার যেন দ্রুত পদধ্বনি ও গুরু পতন শব্দ শোনা গেল। চমকে উঠে "কে ওখানে?" বলে হাঁক দিলেন নিখিল। দু'জনেই রেলিং এর উপর দিয়ে ঝুঁকে নীচে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। সেখান থেকে মেজের উপরে শুধু শাড়ির একটি প্রান্ত ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। নিখিল দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন। মলী সেনও তাঁর অনুগমন করলেন।

"এ কী? এ যে নীরজা! তুমি এখানে? এমন করে শুয়ে?"—বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে নিখিল তাকালেন।

কিন্তু তার জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার পূর্ব্বেই সেখানে ঝড়ের বেগে উপস্থিত হলেন ব্যস্ত-সমস্ত সিদ্ধনাথ। কোনো দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে বললেন,

"এই যে মিসেস সেন, আপনি এখানে। আপনাকে না খুঁজেছি হেন স্থান নেই। আর একটু দেরী হলেই খবরের কাগজে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন ছাপতে হ'তো, হা হা হা (অট্টহাস্য)। উ, কম করে বার দশেক না কোন আপনার দোতলার বারান্দা আর গ্রিণরুমে ছুটেছি। হাটুতে ব্যথা ধরে গেছে। একটু বাতের ধাত আছে কি না। এটা পৈত্রিক, ঠাকুর্দ্দা মশায়েরও ছিল। মেজ শ্যালক আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রফেসর। ব্যবস্থা দিলেন,—পুরানো ঘি গরম করে সকাল সন্ধ্যা মালিসের। গিন্নীকে বললেম, শালা না হলে আর এমন ঠাট্টা কেউ করে? ঘি নতুনই মেলে না তার আবার পুরানো। দাদাকে বল, এখন থেকে দালদা মালিশের ব্যবস্থা দিতে, নইলে রোগী জুটবে না। হা হা হা।"

সিদ্ধনাথ এক নিশ্বাসে কথা বলেন। দম ফুরিয়ে নিজে না থামা পর্য্যন্ত তাকে কিছু প্রশ্ন করা বৃথা। তার অট্টহাস্য শেষ হলে, মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কী সিদ্ধনাথ বাবু? খুঁজছিলেন কেন?"

"খুঁজছিলেম কেন? অভিনয় সুরু হওয়ার আর ঘণ্টাখানেক মাত্র বাকী, দর্শকেরা আসতে সুরু করেছে। এদিকে অপর্ণার মা বলে পাঠিয়েছে,—অপর্ণার অসুখ, সে আজ পার্ট করতে পারবে না। ডোবালে দেখছি।"

"কী সর্ব্বনাশ! অপর্ণার যে প্রথম দৃশ্যেই পার্ট।" এখন উপায়? উদ্বেগে মলী সেনের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

সিদ্ধনাথ বললেন, "না, না, আপনি উতলা হবেন না। মনে উদ্বেগ থাকলে আপনার পার্ট নষ্ট হবে। আপনি এসব ভাববেন না। অপর্ণার ভার আমি নিচ্ছি।" চার পাশে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সন্তর্পণে বললেন, "অসুখ না হাতি! আসল ব্যাপার কমপ্লিমেণ্টারী। চারখানা করে সব অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেওয়া হয়েছে তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের জন্যে। অপর্ণার মার আরও চারখানা চাই। তাই নিয়ে ঝগড়া।"

তাঁর বাচনভঙ্গি দেখে মনে হয়, যেন অতি মারাত্মক এক গুপ্ত সামরিক তথ্য উদ্ঘাটিত করলেন!

মলী সেনকে আশ্বাস দিলেন, "তা সব আমি ঠিক করে দিচ্ছি। আপনাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু এদিকে ভাড়া করা চেয়ারগুলো যে এখনও এসে পৌঁছল না। যারা টিকেট কিনেছে তারা বসবে কোথায়? ডোবালে দেখছি!"

মলী সেন পুনরায় উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "আঁ, এখনও চেয়ার আসেনি? তা'হলে কী হবে?"

'আহা, আপনি চঞ্চল হচ্ছেন কেন? আমি সব ব্যবস্থা করছি। আপনি স্থির হয়ে নিজের পার্টের কথা ভাবুন তো। আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

যেরূপ ব্যস্ততার সঙ্গে এসেছিলেন ঠিক সেরূপ ব্যস্ততায়ই প্রস্থান করলেন সিদ্ধনাথ।

মলী সেন নিখিলকে বললেন, "যাই, একটু গরম কফির চেষ্টা করিগে। তা নইলে ষ্টেজ-ফ্রাইট এ ধরবে। আপনি ওয়াশ চান তো উপরের বাথরুমে চলে যান। নতুন সাবান, তোয়ালে সমস্ত ঠিক করা আছে। বেশী দেরী করবেন না যেন, আমি ড্রেসিং রুমে পেয়ালা নিয়ে বসে থাকবো কিন্তু।"

ইতিমধ্যে নীরজা উঠে দাঁড়িয়ে নিজ বসন সুবিন্যস্ত করেছেন। নিখিল দেখলেন, মলী সেনের প্রস্থানপথে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন নীরজা। নিখিল দৃষ্টিবিশারদ, কবি কিম্বা সাহিত্যিক নন। সে নেত্র শূন্যগর্ভ কি অগ্নিগর্ভ, তা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

নীরজা কৈফিয়তের সুরে বললেন, "আমার কানের একটা ইয়ারিং কোথায় হারিয়ে গেছে। তাই খুঁজে দেখছিলেম এখানটায়, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেছি।"

নিখিল বললেন, "এই অন্ধকারে খুঁজলে পাওয়া যায় কখনও? দাঁড়াও আমি একটা টর্চ্চ নিয়ে আসছি।"

নীরজা বাধা দিয়ে বললেন, "না, মিছে পরিশ্রম করবেন না। নিশ্চয়ই এখানে নয়, অন্য কোথায় হারিয়েছি।" বলে প্রস্থানোদ্যম করলেন।

নিখিল পিছন থেকে এগিয়ে এসে নীরজার বাম বাহু লক্ষ্য করে বললেন, "এ কী, এত রক্ত কিসের? পড়ে গিয়ে কোথাও কেটে যায়নি তো?" বলে আপন দক্ষিণ হস্তে নীরজার বাহুটি তুলে ধরলেন। "ইস্, অনেকটা কেটেছে যে। এখনও রক্ত বেরোচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা ব্যাণ্ডেজ করা চাই।"

নীরজা সজোরে নিখিলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "কিছু দরকার নেই। ও কিছু নয়, সামান্য কাটা। ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেললেই হবে। আপনি যান।"

"দরকার নেই মানে? এ সব ধুলো-বালির মধ্যে সেপটিক্ হতে কতক্ষণ? চল আমার সঙ্গে মিসেস সেনের কাছে। তাঁর কাছে নিশ্চয়ই ডেটল পাওয়া যাবে।" বলে পুনরায় নীরজার বাহুটি হাতে তুলে নিলেন।

'আমার কিছু হয়নি, মিষ্টার রয়। আপনি কেন অনর্থক এই নিয়ে ফাছ্ করছেন? আপনার পায়ে পড়ি। আপনি যান। আপনার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

নীরজার কণ্ঠের কঠোর তিক্ততা নিখিলকে আঘাত করল। বিস্মিতও করল। নিঃশব্দে নীরজার বাহুটি নিজের হাত থেকে মুক্ত করে দিলেন।

নীরজা নিখিলের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে সতেজ পদক্ষেপে ষ্টেজের ওপর প্রান্তের দ্বারোদ্দেশে রওনা হলেন।

সামনে তাকিয়ে চলতে চলতে—এ কী! হঠাৎ আলোগুলি কি সব নিস্তেজ হয়ে এল? চোখে ঝাপসা দেখায় কেন? বুকের কাছে জামার কাছটা ভিজে ঠেকছে যেন! জলবিন্দু ঝরলো কোত্থেকে? দুই হাত নিজের চক্ষে স্থাপন করলেন নীরজা। তাইতো, চোখে জল কেন? নিজের কাছেই নিজে আবিষ্কার করলেন নীরজা, তিনি কাঁদছেন। শ্রাবণ দিনের মেঘকজ্জল আকাশ থেকে বারি বর্ষণের মতো শ্যামাঙ্গী নীরজার ঘনকৃষ্ণ দুই নয়ন থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তার কপোলে, কণ্ঠে, বক্ষে ও বসনে। অবিরাম বেগে। অজস্র ধারায়। [ক্রমশঃ।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

রাশিয়ায় আবার পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ—

রাশিয়ায় সম্প্রতি আর একটি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হইয়াছে, ৩রা অক্টোবর (১৯৫১) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের প্রেস সেক্রেটারী মিঃ যোশেফ শর্ট সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করিবার পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মঃ ষ্ট্যালিন উল্লিখিত ঘোষণার সত্যতা স্বীকার করায় পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে বিস্ময়াকুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি না হইয়া পারে নাই। রাশিয়া যে পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা অবশ্য নূতন কথা কিছু নয়। ১৯৪৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে বিশ্ববাসী সকলেই এ কথা জানে। ঐ তারিখে বৃটিশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা গবর্ণমেণ্ট যে যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেন, তাহাতে যদিও সোভিয়েট রাশিয়ার এলাকার মধ্যে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিবার প্রমাণ পাওয়ার কথাই শুধু উল্লেখ করা হইয়াছিল, পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই, তথাপি ঐ যুক্ত বিবৃতি হইতে ইহাও বুঝা গিয়াছিল যে, রাশিয়ারও পরমাণু বোমা আছে। আজ ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী গঠন, পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করা এবং ইউরোপীয় বাহিনীতে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সৈন্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মজুত পরমাণু বোমা এবং সুদূর প্রাচ্যে জাপ শান্তি-চুক্তি, জাপ-মার্কিণ রক্ষা-চুক্তি ও আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় শান্তি-চুক্তি পশ্চিমী শক্তিবর্গের মনে যখন ভাবী তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামে রাশিয়াকে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করিবার সুদৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সময় রাশিয়ায় দ্বিতীয় দফা পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বানচাল করিয়া দিয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। মঃ ষ্ট্যালিন শুধু পরীক্ষামূলক ভাবে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের কথাই স্বীকার করেন নাই, তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, ভবিষ্যতে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন পরমাণু বোমার আরও পরীক্ষা করা হইবে। তাঁহার এই উক্তিকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিছক ফাঁকা আওয়াজ বলিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গ উপেক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ শর্ট যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে পরমাণু বোমা তৈয়ারীর জন্য রাশিয়ার উপর দোষ আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ার পরমাণু শক্তি পরিকল্পনা শুধু শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হইতেছে, রাশিয়া এইরূপ ভাণ করা সত্ত্বেও রাশিয়া পরমাণু অস্ত্রশস্ত্র-তৈয়ার করিয়া যাইতেছে, উল্লিখিত পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটাইবার ঘটনা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি করিতেছে? গত সেপ্টেম্বর (১৯৫১) মাসের শেষ সপ্তাহে মার্কিণ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ গর্ডন ডীন মার্কিণ প্রতিনিধি পরিষদের ব্যয়-বরাদ্দ নির্দ্ধারণ কমিটির গোপন বৈঠকে যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে তিনি ইহাই জানাইয়াছেন যে, পরমাণু বোমা উৎপাদনের কাজ যথেষ্ট দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বর্ত্তমানে যে পরমাণু বোমা মজুত রহিয়াছে সেগুলি বিশেষ কার্য্যকরী হইবে। তাঁহার রিপোর্ট হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, পরমাণু অস্ত্র শুধু পরমাণু বোমার মধ্যেই আর আবদ্ধ নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী পরমাণু অস্ত্র বা এটমিক আর্টিলারীও (atomic artillary) তৈয়ার করা হইতেছে। উক্ত রিপোর্টে মিঃ ডীন বলিয়াছেন যে, "পরমাণু অস্ত্রগুলি এক্ষণে সামরিক প্রয়োগের জন্যও ব্যবহৃত হইতে পারিবে এবং যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে পরমাণু অস্ত্র-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি সৈন্যদল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য বলিতে পারে যে, পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্যই তাহার এই পরমাণু বোমা তৈয়ারীর এইরূপ বিপুল আয়োজন। মঃ ষ্ট্যালিন আমেরিকার এই দাবীর যে উত্তর দিয়াছেন, এই সঙ্গে তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন, 'শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই নয়, অন্যান্য দেশও, বিশেষ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়াও পরমাণু অস্ত্র নির্ম্মাণের গোপন রহস্য অবগত আছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কেবল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই পরমাণু বোমা নির্ম্মাণের একচেটিয়া অধিকার থাকুক ইহাই তাঁহারা চান।" মঃ ষ্ট্যালিন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "ইহা কি সম্ভব যে, শান্তিকে নিরাপদ করিবার জন্য এইরূপ একচেটিয়া অধিকার থাকা প্রয়োজন? ইহার বিপরীতই কি অধিকতর সত্য নয়? প্রকৃতপক্ষে শান্তিকে নিরাপদ করিবার প্রয়োজনে এইরূপ একচেটিয়া অধিকারের বিলোপ করাই কি সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন নয় এবং তার পরই কি বিনা সর্ত্তে পরমাণু অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধ করাই কি আবশ্যক নয়?"

পরমাণু বোমা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল কেন, কাহার জন্য, এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান এখানে আমরা পাইব না। কিন্তু পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দাবী এবং রাশিয়ার দাবীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা কাহারও অজানা নয়। পরমাণু বোমা তৈয়ারীর প্রণালী প্রকাশ করা এবং তৈয়ারী পরমাণু বোমাগুলিকে অবিলম্বে বিনষ্ট করা হউক এবং ভবিষ্যতে কেহই পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতে পারিবেন না এইরূপ চুক্তি করা এবং এই চুক্তিকে কোনরূপে ভঙ্গ করা মানব জাতির বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়ার ঘোষণা করাই ছিল রাশিয়ার দাবী। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু বোমা তৈয়ারীর প্রণালী প্রকাশ করিতে রাজী নয়, কিন্তু অপর কোন রাষ্ট্রই পরমাণু বোমা সম্বন্ধে গবেষণাও করিতে পারিবে না, অথচ পরমাণু বোমা প্রস্তুত-প্রণালীতে থাকিবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যখন বুঝিতে পারিবে যে, প্রস্তাবিত আন্তর্জ্জাতিক পরমাণু উন্নয়ন কর্ত্তৃত্ব-শক্তি সন্তোষজনকরূপে কার্য্যকরী হইয়াছে, আমেরিকার জাতীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আর আশঙ্কা নাই, তখনই আমেরিকা এই কর্ত্তৃত্ব-শক্তির হাতে পরমাণু বোমা প্রস্তুত-প্রণালী অর্পণ করিবে এবং তৈয়ারী পরমাণু বোমাগুলিও ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। ইহাই ছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দাবী। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হয়ত মনে করিয়াছিল যে, অপর কোন রাষ্ট্রের পক্ষে পরমাণু বোমা তৈয়ারীর ইঞ্জিনীয়ারিং দিক আবিষ্কার করা সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জ্জাতিক পরমাণু উন্নয়ন কর্ত্তৃত্ব-শক্তিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই থাকিবে প্রাধান্য। কাজেই এই কর্ত্তৃত্ব-শক্তি কখনই সন্তোষজনকরূপে কার্য্যকরী হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে না, এইরূপ আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পরমাণু বোমা প্রস্তুত-প্রণালীকে একচেটিয়া করিয়া রাখিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ের জন্যই রাশিয়া পরমাণু বোমা তৈয়ারী সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিল কি না, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, রাশিয়া ১৯৪৩ সাল হইতেই পরমাণু বোমা নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছে। গত ৬ই অক্টোবর (১৯৫১) মঃ ষ্ট্যালিন পরমাণু অস্ত্র সম্পর্কে বৃটিশ এবং মার্কিণ নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বৃটেন এবং আমেরিকার নীতিই রাশিয়াকে পরমাণু বোমা প্রস্তুত করিতে বাধ্য করিয়াছে।

রাশিয়ার চতুর্দ্দিকস্থ দেশগুলিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, উত্তর আটলাণ্টিক-চুক্তি, পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা, জাপ শান্তি-চুক্তি প্রভৃতি এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সমর-সজ্জা এবং পরমাণু অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ প্রভৃতি হইতে ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, ভাবী তৃতীয় যুদ্ধ হইবে রাশিয়ার সহিত। এই অবস্থায় রাশিয়াও আত্মরক্ষার আয়োজন করিবে, ইহা অস্বাভাবিক কিন্তু নয়। মঃ ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, "রাশিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রান্ত হউক আক্রমণকারীদের ইহাই অবশ্য অভিপ্রায়। কিন্তু রাশিয়া ইহাতে রাজী নয় এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় সে আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইতে চায়।" পরমাণু বোমা নির্ম্মাণের দিক হইতে রাশিয়া অবশ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে, পরমাণু বোমার সংখ্যার দিক হইতে সে রাশিয়া অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী। রাশিয়াও যে এ কথাটা ভাবিয়া দেখে নাই তাহা নয়। সুইজারল্যাণ্ডের পত্রিকা 'ডি টাট' (Die Tat) সোভিয়েট রাশিয়ায় অতি শক্তিশালী অস্ত্র বা সুপার ওয়েপনস্ (super weapons) নির্ম্মাণের যে সংবাদ দিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য। উক্ত পত্রিকা জনৈক জার্ম্মাণ বিজ্ঞানীর নাম প্রকাশ না করিয়া তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন: "The production of atom bombs, large rockets and jet-fighters is being driven forward in Soviet Union with all means because, although technical parity with the West has been reached, the Kremlin still has many worries about quantity." অর্থাৎ 'সোভিয়েট ইউনিয়নে পরমাণু বোমা, বৃহৎ রকেট এবং জেট ফাইটার নির্ম্মাণের কাজ সর্ব্বপ্রযত্নে চলিতেছে। কারণ, যদিও টেকনিক্যাল দিক হইতে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত সমকক্ষতা অর্জ্জিত হইয়াছে, তথাপি পরিমাণ সম্পর্কে ক্রেমলিনের এখনও যথেষ্ট দুশ্চিন্তা রহিয়াছে।' উক্ত জার্ম্মাণ বিজ্ঞানী সম্প্রতি মস্কো হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, রুশ বিজ্ঞানীরা জার্ম্মাণ বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় এণ্টি-এয়ারক্রাফট রকেট নির্ম্মাণ করিতেছেন। যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণীতে ঐরূপ এণ্টি-এয়ারক্রাফট রকেট নির্ম্মিত হইয়াছিল। '৪৫ সালে যুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন উহার পরীক্ষা চলিতেছিল। উহারই অনুকরণে রাশিয়ায় এণ্টি-এয়ারক্রাফট রকেট নির্ম্মিত হইতেছে।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়া পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতে সমর্থ হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কয়েক মাস পর হাইড্রোজান বোমার কথা বিশেষ ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ১৯৫০ সালের ৩১শে জানুয়ারী ঘোষণা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তি কমিশনকে হাইড্রোজান বোম তৈয়ারীর কাজ চালাইয়া যাইতে তিনি নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য ইহার আগেই নবেম্বর মাসে (১৯৪৯) পরমাণু শক্তির কংগ্রেস কমিটির সদস্য ডেমোক্রাট সিনেটার এড্উইন জনসন বলিয়াছিলেন যে, পরমাণু বোমা অপেক্ষাও বহু গুণ শক্তিশালী সুপার বোমা তৈয়ারীর কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সুপার বোমা বলিতে তিনি হাইড্রোজান বোমাকেই যে বুঝাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হাইড্রোজান বোমার কথা ইহার অনেক পূর্ব্বে ১৯৪৬ সালেই অবশ্য শোনা গিয়াছিল, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী মিঃ জন ম্যাকলয় বলিয়াছিলেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দুই বৎসরের মধ্যে হাইড্রোজান বোমা তৈয়ার করিতে সমর্থ হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারীর কাজ কি ভাবে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। রাশিয়াও যে হাইড্রোজান বোমা সম্পর্কে উদাসীন নয় তাহা 'ইণ্টেলিজেন্স ডাইজেষ্ট' (Intelligence Digest) সম্পাদক মিঃ কেনেথ ডি কারসির (Mr. Kenreth de Courcy) মন্তব্য হইতে আমরা জানিতে পারি। সম্প্রতি তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে রাশিয়া পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম হাইড্রোজান বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইবে। ইহা কোন জ্যোতিষিক গণনা নহে। লৌহ-যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৯৪৯ সালে রাশিয়া যে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছিল, মিঃ কেনেথ ডি কারসি অনেক পূর্ব্বেই সে-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। হাইড্রোজান বোমা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, গত মার্চ্চ বা এপ্রিল মাসে সাফল্যের সহিত পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং অধ্যাপক পণ্টেকোর্ভোর (Prof. Pontecorvo) পরিচালনায় এই কাজ অগ্রসর হইতেছে।

পরমাণু বোমা আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া নয়। হয়ত রাশিয়া হাইড্রোজান বোমা তৈয়ার করিতেও সমর্থ হইবে। মঃ ষ্ট্যালিন তাঁহার উল্লিখিত বিবৃতিতে বলিয়াছেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগের বিরোধীই শুধু নয়, উহা নিষিদ্ধ করিবার এবং উহার উৎপাদন বন্ধ করিবারও পক্ষপাতী। পরমাণু বোমা সম্বন্ধে মঃ ষ্টালিনের এই মন্তব্যের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণে রাজী হইবে, ইহাতে ভরসা করিবার মত কিছু দেখা যায় না। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এ-পর্য্যন্ত মঃ ষ্টালিনের বিবৃতি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেন নাই। কিন্তু মার্কিণ সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটার টম কনালী বলিয়াছেন যে, পরমাণু নিয়ন্ত্রণে মার্কিণ প্রচেষ্টায় রাশিয়ার বিরোধিতার সহিত মার্শাল ষ্টালিনের উক্তির সামঞ্জস্য নাই। সামঞ্জস্য নাই কথাটা যে ভুল, পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রাশিয়ার প্রস্তাব আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মার্কিণ প্রস্তাবে পরমাণু বোমা নির্ম্মাণ কৌশল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখার দাবী ছিল। আজ রাশিয়াও পরমাণু বোমা তৈয়ার করিয়াছে বলিয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে পরমাণু শক্তি

নিয়ন্ত্রণে রাজী হইবে, সে-সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছু নাই। বরং সিনেটার এডুইন জনসন (ডেমোক্রাট) বলিয়াছেন, 'মার্শাল ষ্ট্যালিনের ঘোষণা বিবেচনা করিয়াও কোরিয়া যুদ্ধে আমাদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত বলিয়া আমি মনে করি।' কোরিয়া যুদ্ধে পরমাণু বোমা ব্যবহারের দাবী মার্কিণ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ গর্ডন ডীনও উত্থাপন করিয়াছেন। দক্ষিণ-কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, "I think when a situation arises where, in our carefully considered judgment, use of any kind of weapon is justified, we are now at the place where we should give serious consideration to the use of an atomic weapon, provided that it can be used effectively from the military stand point and that it is no more destructive than is necessary to meet the particular situation." অর্থাৎ 'এমন অবস্থার যদি উদ্ভব হয় যেখানে আমাদের সুচিন্তিত বিবেচনায় যে কোন অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত, তাহা হইলে আমরা এমন একটি অবস্থায় পৌঁছিয়াছি যেখানে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করা সম্পর্কে আমাদের বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। অবশ্য ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সামরিক দিক হইতে এই অস্ত্র কার্য্যকরী ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব এবং উহা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধ্বংসাত্মক না হয়।'

কোরিয়া যুদ্ধে পরমাণু বোমা প্রয়োগ করিবার এই একান্ত আগ্রহের মূলে কি রহিয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন না হইতে পারে, কিন্তু মিঃ ডীনের বক্তৃতা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পরমাণু বোমা লইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত প্রতিযোগিতার প্রশ্ন তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি মনে করেন, রাশিয়ার পরমাণু বোমা তৈয়ারীর পরিকল্পনার লক্ষ্য যুদ্ধে পরমাণু বোমার ব্যবহারকেই একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়া। কারণ, রাশিয়ার পরমাণু বোমা থাকিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও পরমাণু বোমা ব্যবহার করিতে চাহিবে না। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে, ভাবী যুদ্ধে রাশিয়া তাহার অতুলনীয় লোকবলের সুবিধাকেই কার্য্যকরী করিতে পারিবে বলিয়া মিঃ ডীন মনে করেন। এই জন্যই পরমাণু যুদ্ধের এমন একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যেখানে জনবলের সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। ইহাকেই তিনি শান্তির প্রকৃত আশা বলিয়া মনে করিতেছেন। কে যেন বলিয়াছিলেন: "God now a days seems to have a partiality towards those possessing greater resources and greater striking power." অর্থাৎ 'যাহাদের প্রচুর সামর্থ্য এবং আঘাত হানিবার অধিকতর শক্তি আছে ভগবান আজকাল তাহাদের দিকেই থাকেন বলিয়া মনে হয়।' মিঃ ডীন এই তত্ত্বটি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবে আর রাশিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, এ সম্বন্ধেও কোন ভরসা তিনি করিতে পারিতেছেন না। এই জন্যই আক্রমণের সুরুতে উহা তিনি বন্ধ করিতে চান। তিনি মনে করেন, ইহাতে ভবিষ্যৎ আক্রমণকারীও সাবধান হইবে। তাঁহার দৃষ্টিতে কোরিয়া যুদ্ধই বোধ হয় আক্রমণের সুরু এবং ভাবী আক্রমণকারী রাশিয়া। কিন্তু কোরিয়ায় পরমাণু বোমা বর্ষণের প্রতিক্রিয়া কি হইবে বলিয়া আমেরিকা মনে করে? কোরিয়া যুদ্ধে পরমাণু বোমা বর্ষণের দায়িত্ব রাশিয়ার উপর চাপাইবার চেষ্টা চলিতে পারে, বলা হইতে পারে, রাশিয়ার জন্যই আমেরিকা কোরিয়ায় পরমাণু বোমা বর্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। মার্কিণ তাঁবেদাররাও তাহাতে সায় দিবে। কিন্তু এশিয়ার জনসাধারণ তাহাতে বিভ্রান্ত হইবে না।

কেন্দ্রীয় আফ্রিকা ফেডারেশন—

কেন্দ্রীয় আফ্রিকা ফেডারেশন গঠন সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫১) ভিক্টোরিয়া ফলসে যে সম্মেলন আহূত হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, আফ্রিকাবাসীকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। দক্ষিণ-রোডেশিয়া, উত্তর-রোডেশিয়া এবং নাসাল্যাণ্ড এই তিনটি দেশকে একত্রিত করিয়া এই ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। দক্ষিণ-রোডেশিয়া স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্ত বৃটিশ উপনিবেশ। উত্তর-রোডেশিয়া এবং নাসাল্যাণ্ড বৃটিশ প্রটেক্টরেট অর্থাৎ বৃটেনের আশ্রিত রাজ্য। স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্ত দক্ষিণ-রোডেশিয়ায় ইউরোপীয়দেরই প্রাধান্য। ফেডারেশন গঠনের দাবী তাঁহারাই উপস্থিত করিয়াছেন। দক্ষিণ-রোডেশিয়ায় ইউরোপীয়দের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ছয় ভাগ হইলেও শাসন-শক্তি তাঁহাদের হাতে। ১৯৩৬ সালে তাঁহারা উত্তর-রোডেশিয়া এবং নাসাল্যাণ্ডকে দক্ষিণ-রোডেশিয়ার অঙ্গীভূত করিবার দাবী উত্থাপন করেন। এই দাবী সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট একটি রয়েল কমিশনও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তর-রোডেশিয়া এবং নাসাল্যাণ্ডের আফ্রিকানরা দক্ষিণ-রোডেশিয়ার অঙ্গীভূত হওয়ার প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করায় উক্ত প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। তার পরেই আরম্ভ হইল দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম। যুদ্ধের মধ্যে এ-সম্পর্কে আর কোন কথা হয় নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইউনিয়ন গঠনের আন্দোলন আরম্ভ হয়। অঙ্গীভূত করার প্রস্তাবে আফ্রিকানদের আপত্তির কথা বিবেচনা করিয়া উহাকে ফেডারেশন নাম দিবার প্রস্তাব করা হয়। তিনটি গবর্ণমেণ্টের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার এবং ফেডারেল আইন সভায় আফ্রিকানদের প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব করা হইলেও উহা আফ্রিকানদের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই।

ফেডারেশন সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভিক্টোরিয়া ফলসে একটি বেসরকারী সম্মেলন হইয়াছিল। এই সম্মেলনে উত্তর রোডেশিয়ার ইউরোপীয়দের নেতা মিঃ রয় উইলেনস্কী আফ্রিকানদিগকে অষ্টম ডোমিনিয়নের লোভ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু গণভোট গ্রহণের দাবীতে রাজী হন নাই। কিন্তু ফেডারেশন গঠনের নীতি সম্মেলনে স্বীকৃত হইয়াছিল। উত্তর-রোডেশিয়ার আইন সভায় 'কেন্দ্রীয় আফ্রিকা গঠনের ব্যবস্থা করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, দুই জন আফ্রিকান এবং দুই জন ইউরোপীয় উহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। ইউরোপীয়রা আন্দোলন চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। গত নবেম্বর (১৯৫০) মাসে বৃটিশ

গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করেন যে, ফেডারেশন গঠনের প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইবে। তদনুসারে আহূত সম্মেলনে আফ্রিকানদের জন্য রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করিয়া ফেডারেশন গঠনের সুপারিশ করা হয়। যে ফেডারেল আইন সভা গঠনের প্রস্তাব করা হয়, তাহাতে ইউরোপীয়দের একচ্ছত্র প্রাধান্য তো থাকিবেই, তাছাড়া দক্ষিণ-রোডেশিয়াকে কতগুলি বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা আছে। সম্মেলনে গৃহীত ফেডারেশন সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে আফ্রিকানদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে জনমত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে অবগত হইবার জন্য বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ জেমস গ্রিফিথস্ এবং কমনওয়েলথ সম্পর্ক সংক্রান্ত সচিব মিঃ গর্ডন ওয়াকার উক্ত রাজ্য তিনটি পরিভ্রমণ করেন। আফ্রিকানরা এইরূপ ফেডারেশনের বিরোধী তাহা বুঝিতে তাঁহাদের বাকী রহিল না। কিন্তু দক্ষিণ-রোডেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী স্যার গডফ্রে হাগিন্স দাবী করেন যে, হয় উত্তর রোডেশিয়া এবং নাসাল্যাণ্ডের সহিত ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে, না হয় তাঁহারা দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের সহিত যোগদান করিবেন। দক্ষিণ-রোডেশিয়ার আফ্রিকানারগণ কিছুদিন পূর্ব্বে ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে দক্ষিণ-আফ্রিকার ডাঃ মলানের পার্টির অনুকরণে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবেন। এই অবস্থায় ভিক্টোরিয়া ফল্‌সে অনুষ্ঠিত সম্মেলন ফলপ্রসূ হওয়ার আশা করা সম্ভবও ছিল না। সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় আফ্রিকানরা খুশী হইয়াছে এই কারণে যে, কেন্দ্রীয় আফ্রিকা ফেডারেশন আর একটি দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নে পরিণত হইত।

অষ্টম ডোমিনিয়নে আফ্রিকানদের অবস্থা যে কিরূপ হইবে, দক্ষিণ-আফ্রিকার দিকে চাহিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। দক্ষিণ রোডেশিয়ায় আফ্রিকানের সংখ্যা ২০ লক্ষ। শ্বেতাঙ্গদের অধীনে তাহারা অদ্ধ ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতেছে। উত্তর-রোডেশিয়া এবং নাসাল্যাণ্ডে আফ্রিকাবাসী এবং এশিয়াবাসীর সংখ্যা ৪১ লক্ষ ৫২ হাজার। সেই স্থলে শ্বেতকায়দের সংখ্যা ৪০ হাজারের বেশী নয়। এশিয়ার অধিবাসীদের মতই শ্বেতাঙ্গদের শোষণ, নিপীড়ন এবং আধিপত্য হইতে মুক্তিলাভ করাই আফ্রিকাবাসীদেরও সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান সমস্যা।

আর্জ্জেন্টিনায় নকল বিদ্রোহ—

লাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে চিরবিদ্রোহের দেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক-দেশে না এক-দেশে বিদ্রোহ প্রায় লাগিয়াই আছে। কিন্তু সম্প্রতি গত ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৫১) আর্জ্জেণ্টিনায় যে সামরিক বিদ্রোহ অকস্মাৎ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা কঠিন বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, প্রকৃত সংবাদ পাওয়াই দুষ্কর। যুদ্ধের সময় আর্জ্জেণ্টিনা ছিল নাৎসীবাদের অনুরাগী, যুদ্ধের পরে হইয়াছে নাৎসী-বিরোধী। রিপাবলিকান বা প্রজাতান্ত্রিক আর্জ্জেণ্টিনার অর্দ্ধ-গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের উপর যে ডিক্টেটরশিপ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বাদ দিয়া এই ব্যর্থ বিদ্রোহের স্বরূপ বুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। পেরণের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের পরিণতি সোশ্যালিজমে না হইয়া হইয়াছে ফ্যাসিজমের মধ্যে। আর্জ্জেণ্টিনার শ্রমিক প্রতিষ্ঠান 'জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার' গবর্ণমেন্টের উদ্যোগে গঠিত ও পরিচালিত। সৈন্য-বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে না পারিলে ফ্যাসিষ্ট শক্তি সুদৃঢ় হইতে পারে না। তাহা হইলে আর্জ্জেণ্টিনার এই ব্যর্থ সামরিক বিদ্রোহের স্বরূপ কি?

কেহ কেহ মনে করেন যে, পেরণ-শাসনের বিরুদ্ধে কিছু দিন ধরিয়া আর্জ্জেণ্টিনার অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করিয়া সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা গভীর অসন্তোষ প্রধূমায়িত হইতেছিল। আগামী নবেম্বর মাসে (১৯৫১) প্রেসিডেণ্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য নির্ব্বাচন হইবে। এই নির্ব্বাচনে গত আগষ্ট মাসে (১৯৫১) প্রেসিডেণ্ট সেনর জোয়ান পেরণের পত্নী সেনোরা ইভা পেরণ ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রার্থী হওয়ায় এই অসন্তোষ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। অনেকে মনে করেন, ইহাতে পেরণিষ্ট দলের মধ্যে ফাটল ধরিবার আশঙ্কাও দেখা দিয়াছিল। পর্য্যবেক্ষক মহলের ধারণা, সামরিক বিভাগের আপত্তির জন্য সেনোরা ইভা পেরণ ভাইস-প্রেসিডেণ্টশিপের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবু এই বিদ্রোহ কেন হইল? এই বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন দৃঢ়তাই যে শুধু দেখা যায় নাই তাহা নয়, বিদ্রোহের জন্য কোনরূপ প্রস্তুতি হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। কোন রকমে যেন একটা বিদ্রোহের অভিনয় করা হইয়াছে মাত্র।

এই তথাকথিত বিদ্রোহটা যে একটা কৃত্রিম, একটা বানানো ব্যাপার, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পেরণ-গবর্ণমেণ্টের বিরোধী দলগুলির মধ্যে রেডিক্যাল পার্টিই প্রধান বিরোধী দল। তাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ চাহেন নাই; প্রকাশ্যেই এ কথা তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন। নির্ব্বাচন আইন অনুসারে প্রত্যেক পার্টিকেই প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য এক জন করিয়া প্রার্থী দাঁড় করাইতে হয়। নতুবা পার্টির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইবে, ইহাই আইনের বিধান। কিন্তু নির্ব্বাচন আইনের বিধানগুলি পেরণিষ্টা দলের অনুকূল করিয়াই রচিত হইয়াছে। জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপনের কোন উপায়ই বিরোধী দলগুলিকে দেওয়া হয় নাই। বেতারযোগে প্রচার করিবার কিম্বা জনসভা আহ্বান করিবার অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত। তাহাদের কোন সংবাদপত্রও নাই। পেরণ-গবর্ণমেণ্ট কখনই কোন সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন না। কিন্তু কোন সংবাদপত্র যদি পেরণ-গবর্ণমেণ্টের কোন সমালোচনা করে, তাহা হইলে হয় উহার মালিকানা-স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া উহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়, না হয় উহাকে পত্রিকা ছাপিবার কাগজ এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কাজেই বিরোধী দলের কোন সংবাদপত্র না-থাকা মোটেই বিস্ময়ের বিষয় নয়। পেরনিষ্টা দলের পক্ষ হইতে সেনর পেরণ প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলি সম্মিলিত ভাবে যে এক জন প্রার্থী দাঁড় করাইবেন, তাহারও উপায় নাই। সেনর পেরণ অন্য দলের সহিত কোয়ালিশন করিয়াই প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। তাহার পরেই নির্ব্বাচন আইন এমন ভাবে সংশোধন করা হইয়াছে যাহাতে পেরণকে পরাজিত করিবার জন্য বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ না হইতে পারে। পেরণিষ্টা-বিরোধী ভোটগুলিকে বিভক্ত করিয়া রাখাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিবার পক্ষে সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা শুধু পেরণিষ্টা দলের একচেটিয়া থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া বিরোধী দলগুলির গলা চাপিয়া ধরিবার এই প্রয়াস কেন, এই প্রশ্ন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইতে পারে। ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ইভা পেরণের প্রার্থী হওয়া সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে আশানুরূপ জনসমাবেশ করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য লক্ষাধিক বালক-বালিকার সমাবেশ করা সম্ভব হইলেও উহা এক হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদের জন্য রেডিক্যাল পার্টির প্রার্থী মনোনয়ন উপলক্ষে প্রায় ৮০ হাজার লোকের সমাবেশই শুধু হয় নাই, এই উপলক্ষে যে-বিপুল উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে পেরণিষ্টা পার্টির জনপ্রিয়তা অনেক হ্রাস হইয়াছে ইহা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই নির্ব্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় ছিল না। নির্ব্বাচন যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে, বিনা বাধায় এবং সহজে পাড়ি পড়ে, তাহার জন্য কৃত্রিম বিদ্রোহ ঘটাইয়া বিরোধী দলগুলিকে কোণঠাসা করিয়া রাখিবার আগ্রহ হওয়া খুব স্বাভাবিক। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ হওয়ার সম্ভাবনার কথা পূর্ব্ব হইতেই তিনি জানিতেন, এ কথা প্রেসিডেন্ট পেরণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্রোহও অতি সহজেই দমিত হইয়াছে। কাজেই বিদ্রোহের তাৎপর্য্য বুঝা খুব কঠিন হওয়ার কারণ নাই। নির্ব্বাচন যাহাতে স্বাধীন ভাবে না হইতে পারে, তাহার জন্যই এই নকল বিদ্রোহের ব্যবস্থা।

অষ্ট্রেলিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি—

অষ্ট্রেলিয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করিবার উদ্দেশ্যে গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫১) যে 'রেফারেণ্ডাম' বা জনমত গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট পক্ষই পরাজিত হইয়াছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি বে-আইনী করিবার পক্ষে ১৭,৩৭,০০০ ভোট এবং বিপক্ষে ১৮,১৮,০০০ ভোট হওয়ায় ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, অষ্ট্রেলিয়ার জনগণের অধিকাংশই কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করা সমর্থন করে না। ইতিপূর্ব্বে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দিয়া যে আইন পাশ করা হইয়াছিল, অষ্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট উহাকে শান্তির সময় শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া সাব্যস্ত করেন। গত ১৮ই জুন (১৯৫১) অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি উচ্ছেদের জন্য তাঁহাকে ক্ষমতা না দেওয়া হইলে শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য তিনি গণভোট গ্রহণ করিবেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির উচ্ছেদের ক্ষমতা পাওয়ার জন্যই এই গণভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল।

যাহারা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করিবার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে তাহারা কম্যুনিজম পছন্দ করে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবু তাহারা বিরুদ্ধে ভোট দিল কেন? কেহ কেহ মনে করেন, ইহা বিরোধী দলের নেতা ডাঃ ইভাটের ব্যক্তিগত জয়। কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত জয় সম্ভব হইয়াছে যে সকল কারণে, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। প্রথমতঃ, শুধু তাহাদের দার্শনিক মতবাদের জন্যই কম্যুনিষ্টদিগকে শাস্তি দেওয়া তাহারা পছন্দ করে না। দ্বিতীয়তঃ, কম্যুনিষ্ট পার্টি বিলোপ আইনে কম্যুনিজম এবং কম্যুনিষ্টের সংজ্ঞা এত ব্যাপক করা হইয়াছে যে, উহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন যে-কোন সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রয়োগ করা চলিবে। তৃতীয়তঃ, ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতি, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সকলেরই মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কম্যুনিজমের সমস্যা অপেক্ষা এই-গুলিই তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। 'রক্ষা-ব্যবস্থা আয়োজন আইনের' প্রতিক্রিয়া দৈনন্দিন জীবনের উপর কিরূপ হইবে, তাহাও তাঁহারা অনুমান করিতে পারিতেছেন না। বিশেষতঃ ১০ হাজার সরকারী কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এবং জনকল্যাণমূলক কার্য্যগুলি যে ভাবে হ্রাস করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে বহু শ্রমিকের বেকার হওয়ার আশঙ্কা। এই সকল মিলিয়াই বিরোধী ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে।

মালয়ের সমস্যা—

মালয় ফেডারেশনের বৃটিশ হাই কমিশনার স্যার হেনরী গার্ণে গত ৬ই অক্টোবর (১৯৫১) কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীদের গুলীতে নিহত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, তিন বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া মালয়ে কম্যুনিষ্ট দমনের যে-চেষ্টা চলিতেছে, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট দমনের জন্য ব্রিগস্ পরিকল্পনাকে একটা বিরাট সামরিক অভিযান বলিলে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না। কম্যুনিষ্টদিগকে ভাতে মারিবার জন্য কোন ব্যবস্থাই বাকী রাখা হয় নাই। কম্যুনিষ্টদিগকে খাদ্য যোগাইবার অপরাধে ফাঁসী পর্য্যন্ত দেওয়া হইতেছে। অথচ যে-অঞ্চলকে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং সুরক্ষিত বলিয়া মনে করা হয়, সেইখানেই মালয়ের সর্ব্বোচ্চ বৃটিশ অফিসার কম্যুনিষ্টদের হাতে নিহত হইলেন। স্যার হেনরী গার্ণে মালয় ফেডারেল গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বময় কর্ত্তা। মালয় ফেডারেল গবর্ণমেণ্টের রাজধানী কুয়ালালামপুর হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী ফ্রেজার পাহাড়ে তাঁহার গ্রীষ্মাবাস। ১৯৪৮ সালে এক দল ইউরোপীয়ের উপর কয়েকটি গুলীবর্ষণ ব্যতীত কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ-পর্য্যন্ত এই রাস্তার উপর কোন সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্যকলাপ হয় নাই। স্যার হেনরী যখন কুয়ালালামপুর হইতে তাঁহার গ্রীষ্মাবাসে যাইতেছিলেন, সেই সময় গরিলাদের গুলীতে নিহত হন। দলের অন্যান্যদের সহ লেডী গার্ণে অন্য মোটরে ছিলেন বলিয়া গুলীর ধারাবর্ষণের মধ্যেও তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন।

স্যার হেনরী গার্ণে ছিলেন মালয়ে বৃটিশ শাসনের প্রতিভূ। তিনি নিহত হওয়ায় আর এক জন প্রতিভূ তাঁহার স্থান গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মালয়ের আসল প্রশ্ন স্বাধীনতা। মালয়কে স্বাধীনতা দিলে হয়ত সন্ত্রাসবাদ নিরোধ করা অনেক সহজ হইত। মালয়ে বৃটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থ ষোল আনা বজায় রাখিয়াও কি করিয়া মালয়কে স্বাধীনতা দেওয়া যায়, বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। মালয়ে ভারতীয় কংগ্রেসের মত কোন প্রতিষ্ঠান নাই, ইহা একটা কারণ হইতে পারে। সম্প্রতি ইউনাইটেড মালয় নেশন্যাল অর্গেনিজেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি দাতো ওন বিন জাফর উক্ত দল পরিত্যাগ করিয়া মালয় স্বাধীনতা পার্টি (Independence

for Malaya Party) গঠন করিয়াছেন। ভারতে কংগ্রেসের মতই মালয়ে এই নূতন দলকে মালয়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ দেওয়া হইয়াছে। এই পার্টি গঠিত হইয়াছে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১)। সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে মালয়ের স্বাধীনতা অর্জ্জন করাই এই নূতন দলের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

দাতো ওন নূতন দল কেন গঠন করিলেন তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "আমাদের অনেকেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, নয়টি মালয় রাষ্ট্রে নয় জন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত, নয় জন 'মন্ত্রীবেসার' বা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত এবং ফেডারেল কাউন্সিল গঠিত হইয়া মালয় ফেডারেশন গঠিত হওয়ায় আর কিছুই বাকী রহিল না। কিন্তু আমি দেখিতেছি অবস্থা অন্যরূপ। আমি বলিতে পারি যে, আমাদের রক্ষকগণ আমাদের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন নাই।" এই রক্ষকগণ যে বৃটিশ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এই উক্তি মালয়ের সকল সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের কাছেই হাস্যকর বলিয়া মনে হইবে। দাতো ওনই মালয় ইউনিয়ন গঠনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং দাবী করিয়াছিলেন মালয় রাষ্ট্রগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া শাসকদিগকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার। এই আন্দোলন চালনা করিবার জন্য তিনিই মালয়ের সামন্ত সর্দার, আভিজাত শ্রেণী এবং ব্যবসায়ীদিগকে লইয়া ইউনাইটেড মালয় নেশন্যাল অর্গেনিজেশন গঠন করেন। মালয় ফেডারেশন পরিকল্পনার তিনি অন্যতম রচয়িতা। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন ফেডারেশন গঠনে রাজী হইলেন, তখন তিনি এবং আরও কয়েক জন মালয়ী এবং বৃটিশ প্রতিনিধি মিলিত হইয়া যে ফেডারেশন পরিকল্পনা গঠন করেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকেই কার্য্যকরী করিয়াছেন। দাতো ওন ফেডারেল গবর্ণমেণ্টে স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য। পদ-মর্য্যাদায় মালয় ফেডারেশনের হাই কমিশনারের পরেই তাঁহার স্থান। তাঁহার নূতন পার্টি বৃটিশ সংবাদপত্রগুলির অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা এবং আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছে। তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৃটিশের নির্দ্দেশে এই পার্টি গঠিত হয় নাই। স্বাধীনতার আবরণে মালয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বহাল রাখিবার জন্যই যে এই নূতন দল গঠিত হইয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা হওয়াই খুব স্বাভাবিক।

মধ্য-প্রাচীতে বিক্ষোভ—

মধ্য-প্রাচীতে বিশেষ করিয়া ইরাণে এবং মিশরে বৃটিশ বিরোধিতা তথা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার যে প্রবল আগুন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া ওঠা খুব সহজ বলিয়া মনে হয় না। ৪ঠা অক্টোবরের (১৯৫১) মধ্যে ইরাণ হইতে সমস্ত বৃটিশ যন্ত্রবিদ্ বা টেকনেশিয়ানদিগকে চলিয়া যাইবার নির্দ্দেশ দেওয়ার ফলে ইরাণের তৈলখনি হইতে কার্য্যতঃ বৃটিশ অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে। গত ২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৫১) ইরাণ গবর্ণমেণ্ট যে নূতন প্রস্তাব করেন, তাহাতে বৃটিশ ম্যানেজার নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছিল। নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত 'নিউজ উইক' পত্রিকা লিখিয়াছেন যে, আরও আলোচনা চালাইবার ভিত্তিস্বরূপ ইরাণের প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য মার্কিণ রাষ্ট্রবিভাগ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করিবার পরও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কেন নূতন প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা চালাইতে অস্বীকার করিলেন, তাহা সত্যই দুর্ব্বোধ্য। বৃটেন তৈল-সমস্যা লইয়া নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হইয়াছে। কিন্তু ইরাণ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে—বৃটেনের অভিযোগ শ্রবণ করিবার অধিকার নিরাপত্তা পরিষদের নাই। কারণ, উহা ইরাণের ঘরোয়া ব্যাপার। এদিকে মিশর ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশর চুক্তি বাতিল করিবার এবং মিশরের রাজাকে সুদানের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইরাক উপস্থিত করিয়াছে ইঙ্গ-ইরাক চুক্তি পরিবর্ত্তন করিবার। এংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীর সহিত ইরাণের বিরোধে ইরাকের নীতিতে ইরাণ সন্তুষ্ট হয় নাই। পারস্য উপসাগরে পাহারা দিবার জন্য বৃটিশ রয়েল নৌবাহিনীর ইরাকের বন্দর ব্যবহারে ইরাক আপত্তি করে নাই। বৃটেন যদি সত্য ইরাণে বলপ্রয়োগ করিতে চায়, তাহা হইলে ইরাকের বিমান ঘাঁটিগুলি বৃটেন এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে, এই আশঙ্কা ইরাণ উপেক্ষা করিতে পারে নাই।

মরক্কোতে ফ্রান্স সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতিভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া মিশর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। সিরিয়ার কাছে এই ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হয় নাই। কারণ, সিরিয়া তাহার সৈন্যবাহিনীর জন্য ফ্রান্সের নিকট হইতে অনেক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার প্রত্যাশা করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লিবিয়া আগামী ১লা জানুয়ারী (১৯৫২) স্বাধীনতা লাভ করিবে। এদিকে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে যে, বৃটেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া লিবিয়াকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বস্তুতঃ, বৃটেন এবং লিবিয়ার মধ্যে একটা রক্ষা-চুক্তি করিবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। এই চুক্তি অনুযায়ী বৃটেন লিবিয়ায় সৈন্য রাখিতে পারিবে। বৃটেন আবার লিবিয়াকে আর্থিক সাহায্যও দিতে চায়।

মধ্য-প্রাচ্যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান প্রশ্ন—রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার নিরোধ করা। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সেই সঙ্গে নিজের প্রভাবও বিস্তার করিতে চায়। ফ্রান্সও সিরিয়া ও লেবাননে তাহার হৃত প্রভাব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক। সুতরাং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যে কাড়াকাড়ির ভাব একেবারেই নাই, তাহা নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা এখন আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া শক্তি ক্ষয় করিতে চায় না। মধ্য-প্রাচী রক্ষা ব্যবস্থার অজুহাতে তাহারা মধ্য-প্রাচীতে তাহাদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। মধ্যপ্রাচীর দেশগুলির শাসকশ্রেণী দাবী জনগণের দাবী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জনগণের দাবী অন্ন বস্ত্রের দাবী, জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার দাবী। কিন্তু শাসকশ্রেণী চায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়া এই দাবীকে দাবাইয়া রাখিতে এবং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর উপর চাপ দিয়া অর্থাৎ তাহাদিগকে 'ব্ল্যাক মেইলিং' করিয়া নিজেদের শাসন-ক্ষমতার স্থায়িত্ব দান করিতে। ইরাণের তৈল-সমস্যা, সুয়েজ ক্যানাল এবং সুদান সম্পর্কে মিশরের দাবীর প্রকৃত মূল এইখানেই। মিশর

যে মধ্য-প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থায় যোগদান করিতে চতুঃশক্তির আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ইহাও বড় রকমের একটা চাপ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

পশ্চিম-জার্ম্মাণী—

১০ই হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) পর্য্যন্ত ওয়াশিংটনে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের সম্মেলনে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সহিত ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সম্বন্ধে মতৈক্য হইয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় ইউরোপীয় বাহিনীতে জার্ম্মাণ সৈন্য গ্রহণ সম্পর্কেও তাঁহারা একমত হইয়াছেন। অতঃপর অটোয়াতে উত্তর-আটলান্টিক ট্রিটি কাউন্সিলের অধিবেশন ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে উত্তর-আটলান্টিক মিত্র-গোষ্ঠীতে গ্রীস ও তুরস্ককে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। পশ্চিম-জার্ম্মাণী সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে তাহা মনে করিবার যেমন কোন কারণ নাই, তেমনি পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর লোক-পরিষদের অনুমোদনানুসারে প্রধান মন্ত্রী গ্রোটেওল ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে জার্ম্মাণ সমস্যায় এক নূতন জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে। পশ্চিম-জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনেয়ুর পত্রপাঠ এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেও জার্ম্মাণ জনগণের মধ্যে উহার প্রতিক্রিয়া উপেক্ষার বিষয় হইবে না।

পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সমস্যা ব্যতীত ইটালীর শান্তি-চুক্তি পরিবর্ত্তনের সমস্যাও বড় কম জটিল নয়। ইটালী উত্তর-আটলান্টিক গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য। কিন্তু শান্তি-চুক্তি অনুযায়ী ইটালী অস্ত্রসজ্জা বাড়াইতে এবং সৈন্যসংখ্যা তিন লক্ষের বেশী করিতে পারে না। রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে ইটালীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য শান্তি-চুক্তির পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। কিন্তু সমস্যা এই যে, রাশিয়া এই চুক্তিতে অন্যতম স্বাক্ষরকারী এবং শান্তি-চুক্তির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সকলেরই সম্মতি প্রয়োজন। রাশিয়াকে বাদ দিয়া কিরূপে ইটালীর সহিত শান্তি-চুক্তির পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করাও পশ্চিমী শক্তিবর্গের আর এক সমস্যা।

কোরিয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনা—

সুদীর্ঘ অচল অবস্থার পর গত ১০ই অক্টোবর (১৯৫১) পানমুনজুনে আবার কোরিয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধবিরতি কমিটির (Armistice Committee) আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। এ পর্য্যন্ত শুধু আলোচনার স্থান সম্পর্কেই মীমাংসা হইয়াছে। এখনও নিরপেক্ষ অঞ্চলের পরিধি ও উহার রক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে মীমাংসা হওয়া বাকী রহিয়াছে। এ সম্পর্কে মীমাংসা হওয়ার পর যুদ্ধবিরতি কমিটির আলোচনা আরম্ভ হইলেই যুদ্ধবিরতি সীমারেখা নির্দ্ধারণের পুরাতন সমস্যা আবার নূতন হইয়া দেখা দিবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দাবী করে, কম্যুনিষ্টদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য হতাহত হইয়াছে। কিন্তু তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষেও হতাহত এবং ক্ষয়-ক্ষতি বড় কম হয় নাই। কম্যুনিষ্টদের 'জেট্ ফাইটার' মার্কিণ ভারী বোমারু বিমানগুলির যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্টদিগকে ঘায়েল করিবার জন্য সর্ব্বাত্মক আঘাত করা সত্ত্বেও কোরিয়া যুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের শক্তির প্রাধান্যই লক্ষিত হইতেছে। কোরিয়ায় পরমাণু বোমা বর্ষণের কথা আবার উঠিয়াছে। ১৭ই অক্টোবর (১৯৫১) পিকিং রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, পরমাণু বোমা তৈয়ারীর উপায় একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ারই জানা আছে তাহা নয়। ইহার অর্থ চীনেরও পরমাণু বোমা আছে।

বৃটিশ নির্ব্বাচন—

বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচনের তারিখ ২৫শে অক্টোবর (১৯৫১)। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত হয়ত নির্ব্বাচন শেষ হইয়া ফলাফল প্রকাশিতই হইয়া যাইবে। নির্ব্বাচনের ফলাফল যাহাই হউক, উহাতে বৃটেনের বর্ত্তমান সঙ্কটের সমাধান কতটুকু হইতে পারে, তাহাই শুধু এখানে আমরা আলোচনা করিব। বৃটেনের বিগত সাধারণ নির্ব্বাচন হয় ১৯৫০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী। এই নির্ব্বাচনে শ্রমিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাত জনে আসিয়া দাঁড়ায়। নির্ব্বাচনের পর হইতেই পুনরায় সাধারণ নির্ব্বাচনের দাবী উঠে। অবশেষে এক বৎসর আট মাস পরে পুনরায় সাধারণ নির্ব্বাচন হইতেছে। এই নির্ব্বাচন উপলক্ষে প্রধান দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল অর্থাৎ শ্রমিক দল এবং টোরী বা রক্ষণশীল দল যে-নির্ব্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায়, কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কি পররাষ্ট্র-নীতিতে এই দুই দলের মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য নাই। বৃটেনের যাহা মূল সমস্যা, তাহা সমাধানের প্রশ্ন লইয়া এই নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছে না। 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, এই মূল সমস্যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং এই সমস্যা উপাপন করিলে কোন দলেরই কোন সুবিধা হইবে না। 'সাণ্ডে অবজারভার' পত্রিকাও অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এই নির্ব্বাচনে স্বতন্ত্র দুইটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে কোন একটির পক্ষে বা বিপক্ষে বৃটিশ ভোটারগণ ভোট দিবেন না। বৃটেন কি ভাবে পরিচালিত হইবে তাহা নয়, কোন্ দল দেশ পরিচালন করিবেন, এই নির্ব্বাচনে তাহাদের ভোট দ্বারা তাহাই শুধু নির্দ্ধারিত হইবে।

বৃটিশ শ্রমিক দল এবং রক্ষণশীল দলের মধ্যে নীতিগত দিক হইতে বিশেষ কিছুই পার্থক্য আর নাই। মিঃ বেভিনের পররাষ্ট্র-নীতি গোড়া হইতেই রক্ষণশীল দলের পররাষ্ট্র-নীতির ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে আরম্ভ করে। শ্রমিক দলের পররাষ্ট্র-নীতি এবং রক্ষণশীল দলের পররাষ্ট্র-নীতি এক এবং অভিন্ন। ১৯৪৫ সালের নির্ব্বাচনের সময় আভ্যন্তরীণ নীতিতে বৃটিশ শ্রমিক দলের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল বটে, কিন্তু ১৯৫০ সালের নির্ব্বাচনের সময়ে আভ্যন্তরীণ নীতিতে বৃটিশ শ্রমিক দল এবং রক্ষণশীল দলের পার্থক্য খুবই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। উক্ত নির্ব্বাচনের পরে বৃটিশ শ্রমিক দলের নীতি শ্রমিকদিগকে সন্তুষ্ট করা অপেক্ষা বৃটিশ শিল্পপতিদিগকে অসন্তুষ্ট না করার পথেই পরিচালিত হইয়াছে।

শ্রমিক দল এবং রক্ষণশীল দল উভয় দলই ক্ষমতা পাইলে ৪৭০ কোটি পাউণ্ড ব্যয়ের অস্ত্রসজ্জা পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। একচেটিয়া শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বহাল রাখা সম্পর্কেও উভয়

দলের নির্ব্বাচন-প্রতিশ্রুতির মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। কর-নীতি সম্পর্কে রক্ষণশীল দল বলিয়াছেন যে, লাভের পরিমাণ অত্যধিক হইলে অতিরিক্ত লাভ-কর ধার্য্য করিবেন। শ্রমিক দল ঘোষণা করিয়াছেন যে, অতিরিক্ত লাভ করার পথই বন্ধ করা হইবে। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। উহাকে আরও প্রসারিত করিয়া মুষ্টিমেয় লোকের প্রচুর সম্পদ এবং অনর্জ্জিত আয়ের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইবে। কিন্তু ধনী শ্রেণীকে এই ভাবে শোষণ করিলে তাঁহারা শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন নিয়োগ না-ও করিতে পারেন। এই আশঙ্কা নিরোধের জন্য তাঁহারা জানাইয়াছেন, প্রয়োজন হইলে জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইবে। শ্রমিক দল আরও জানাইয়াছেন যে, যখনই সম্ভব হইবে মজুরি, অল্প আয় এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অল্প সম্পত্তির উপর ট্যাক্স হ্রাস করা হইবে। শ্রমিক দল নারী ও পুরুষের বেতনের পার্থক্যও দূর করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, যদিও ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা উহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপারে রক্ষণশীল দল বৎসরে তিন লক্ষ গৃহ ও শ্রমিক দল বৎসরে দুই লক্ষ গৃহ নির্ম্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। রক্ষণশীল দল সরকারী ব্যয় হ্রাস করিবার আশ্বাস দিয়াছেন, তবে জন-কল্যাণমূলক ব্যয় হ্রাস করার কথা বলিতে তাঁহারাও কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন। শ্রমিক, বেকার-সমস্যা নিরোধ এবং মূল্যহ্রাসের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। অবশ্য অস্ত্রসজ্জা যত দিন চলিবে, তত দিন বৃটেনে বেকার-সমস্যা দেখা দিবার কোন কারণ নাই। রক্ষণশীল দল লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত করণ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিবে এবং অন্য কোন শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবে না। কিন্তু লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প ব্যতীত আর যে সকল শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে সেগুলি সম্পর্কে কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনে রক্ষণশীল দলের শাসনই প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চায়, যদিও শ্রমিক গবর্ণমেণ্টও আমেরিকার আনুগত্য করিতে ত্রুটি করে নাই। বৃটিশ শ্রমিক দলে ভাঙ্গন ধরিবার যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল তাহা দূর হইয়াছে। কিন্তু বৃটিশ শ্রমিক দলের জাতীয় নির্ব্বাহক সমিতিতে মিঃ মরিসন, মিঃ ডালটন, মিঃ শিনওয়েল এবং মিঃ গ্রিফিথ্‌সের পরিবর্ত্তে মিঃ বিভান এবং তাঁহার দলভুক্ত মিসেস্ কাসল এবং মিঃ টম ড্রিবার্গ স্থান পাওয়ায় বৃটিশ শ্রমিক দল যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর বিরাগভাজন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃটিশ নির্ব্বাচনের ফলাফল যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব দ্বারা অনেক-খানি নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবারও কোন কারণ দেখা যায় না। ফ্লোটিং ভোটার অর্থাৎ যাঁহারা কোন দলভুক্ত নহেন তাঁহাদের ভোট দ্বারা শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দলের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে। ইঁহারা উচ্চবিত্ত শ্রমিক এবং নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর লোক। তাঁহারা কোন্ পক্ষে ভোট দিবেন তাহা অনুমান করা অসম্ভব।

—সাহিত্য-পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

কেতকী (স্বরবিজ্ঞান—১১)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ নং বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

MAHATMA (Life of Mohandas Karamchand Gandhi)—Vol I. (1869-1920)—D. G. Tendulkar. Distributors, The Times of India Press, Fort, Bombay 1. Rs 25/-

INTRODUCTION TO THE STUDY OF HINDUISM—Bepin Chandra Paul. Yugayatri Prakashak Limited. 41/A, Baldeopara Road. Cal—6. Rs. 4/8-

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ—জওহরলাল নেহরু। প্রকাশক—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী। কলিকাতা—৯। মূল্য বারো টাকা আট আনা।

প্রাচীন ভারতে নারী—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ নং বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গোর্খ-বিজয়—শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ নং বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

রূপাবলী (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ)—নন্দলাল বসু। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২ নং বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রতি ভাগ মূল্য এক টাকা।

অধ্যাত্ম মুক্তাবলী—স্বামী ভূমানন্দ। প্রকাশক—শ্রীসুশীল-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪৬ নং আনন্দপুরী, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য পাঁচ টাকা।

সম্বন্ধ-নির্ণয় (সপ্তম পরিশিষ্ট)—শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যা-বিনোদ সঙ্কলিত। ১৩।৪ নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

অ্যাং ব্যাং—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪ নং বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য বার আনা।

ম্যাও ম্যাও—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪ নং বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য বার আনা।

চীনের মুক্তি-সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়। সেঞ্চুরী পাবলিশার্স, ইণ্টালী মার্কেট, কলিকাতা—১৪। মূল্য এক টাকা বার আনা।

অন্তরায়—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

রৌদ্র-জ্যোৎস্না—সুশীলকুমার গুপ্ত। রাইটার্স কর্ণার। ১০৪।১৪ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা—৩৬। মূল্য এক টাকা।

শিক্ষা-প্রসঙ্গ—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী। ভারতী বুক ষ্টল. রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য উল্লেখ নাই।

গোকুলচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলিকাতা (প্রথম ভাগ)—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র। আর-কে পাবলিশিং কোং ১১এ গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা—৫। মূল্য আড়াই টাকা।

আমি তত্ত্ব—শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথ। ১২।১ নং কালিদাস পাতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা—২৬। মূল্য পাঁচ সিকা।

শুধুই ভাষণ

"গতকল্য সত্যবতী নগরে (নয়াদিল্লী) কংগ্রেসের ৫৭তম অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন সারবস্তু আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। লাহোর কংগ্রেসে এবং লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতির আসন হইতে তিনি যে চিরস্মরণীয় অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমরা বাদই দিলাম। কিন্তু কংগ্রেসের ছয়ষট্টি বৎসরের ইতিহাসে এমন অসার অভিভাষণ আর কেহ প্রদান করেন নাই। কংগ্রেস ভুল পথে পরিচালিত হওয়া, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বাঙ্গালোর অধিবেশনে সে সম্পর্কে তাঁহার সতর্কবাণী উচ্চারণ করা এবং তাহার ফলে কিছু পরিবর্ত্তন হওয়ার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। কংগ্রেস কোন্ দিকে তাকাইবে, কোন্ পথে অগ্রসর হইবে, এই জিজ্ঞাসাও তিনি তাঁহার অভিভাষণে উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এই জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিবার প্রয়াস অভিভাষণের কোথাও আমরা দেখিতে পাইলাম না। তিনি সমবেত প্রতিনিধিদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, শুধু একাডেমিক আলোচনার জন্ম তাঁহারা মিলিত হন নাই, তাঁহারা মিলিত হইয়াছেন বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইতে এবং কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণ করিতে। কিন্তু কি এই বাস্তব অবস্থার স্বরূপ, তাহার কোন ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করেন নাই। কোথাও সস্তা দার্শনিকতার আড়ালে বাস্তব অবস্থাকে তিনি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, আর যেখানে দার্শনিক সাজিবার চেষ্টা করেন নাই সেখানে তাঁহার বক্তব্য অত্যন্ত সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেস কি ভুল পথে চলিয়াছিল? নেহেরুজীর সুস্পষ্ট অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ট্যাণ্ডনজীকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করা যে ভুল পথ বলিয়াই তাঁহার কাছে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ট্যাণ্ডনজীকে সভাপতির আসন হইতে বিতাড়িত করিয়া এবং তাঁহাকে সভাপতির আসনে বসাইয়া কংগ্রেসের কর্ত্তাভজার দল সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। কংগ্রেসে ইহা যে একটা পরিবর্ত্তন তাহাতেও সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া কংগ্রেসের সত্যকার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কংগ্রেস যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে। তিনি মনে করেন, ঘটনাবলীর বিবর্ত্তনে লোকের মনে বিভ্রম সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদিগকে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে। সেই জন্ম মূলনীতি সম্পর্কে নূতন করিয়া চিন্তা করিবার ও উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভিভাষণের কোথাও স্বচ্ছ এবং সুস্পষ্ট কল্পনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল না। পররাষ্ট্র-নীতি, খাদ্য-সমস্যা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, হিন্দু কোড বিল, জমিদারী উচ্ছেদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় সম্পর্কেই তাঁহার উক্তি অত্যন্ত ভাসা-ভাসা হইয়াছে। কোথাও কোন গভীরতা নাই। মহাত্মা গান্ধীর কথা তাঁহার অভিভাষণে উল্লেখ না করিলেই নেহরুজী ভাল করিতেন। গডসে মহাত্মাজীর নশ্বর দেহকেই শুধু ধ্বংস করিতে পারিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস ধ্বংস করিয়াছে মহাত্মাজীর প্রাণশক্তিকে। মহাত্মাজীর জয়গান করিতে করিতে তাঁহার আদর্শকে একদম বিলোপ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা কংগ্রেস প্রদর্শন করিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে আর সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান নয়, উহা যে পৃথিবীর একটা অংশের মাত্র প্রতিনিধি, সে-সম্পর্কে নেহরুজীর সহিত কাহারও মতভেদ হইবে না। জনসাধারণ শান্তি চাহিলেও রাষ্ট্রনায়কগণ সমর-সজ্জা কেন করিতেছেন নেহরুজী তাহার কারণের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। তিনিও শাসক-শ্রেণীরই এক জন। তাই শাসক-শ্রেণী এবং জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধানটা তাঁহার দৃষ্টিতে ধরা না পড়াই স্বাভাবিক। ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি নিরপেক্ষ অথবা 'পেসিভ' এ কথা তিনি স্বীকার না করিয়া ভালই করিয়াছেন। নিরপেক্ষতার আবরণে গা ঢাকিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকে যোগদান করিলে আমেরিকা সন্তুষ্ট হয় না, আমেরিকা চায় নগ্ন আনুগত্য। কিন্তু নেহরুজী আবরণের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। ফলে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা নির্ব্বান্ধব। কাশ্মীর তাহার প্রমাণ। নেহরুজী মনে করেন, কম্যুনিজম প্রাণশক্তিকে বিনাশ করিয়া দেয়। কম্যুনিজম সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। কাজেই এ সম্বন্ধে কোন কথা আমরা বলিতে চাই না। কিন্তু গণতন্ত্র শক্তি এবং সন্ত্রাসবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে, স্বাধীনতার চারি বৎসরে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। এক দিকে প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং স্থিতাবস্থা এবং আর এক দিকে পরিবর্ত্তন ও প্রগতিশীলতার মধ্যে বিরোধের কথা বলিতে যাইয়া তিনি হিন্দু কোড বিলকে প্রগতিশীলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। যে-কোন পরিবর্ত্তনকেই যদি প্রগতি বলিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দু সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি অবশ্যই প্রগতি।" —দৈনিক বসুমতী।

মিশর

"মিশরীয় পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির পথে ধাবিত হইতেছে: বিরোধী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কেবল মাত্র যে সজ্ঘর্ষের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নয়, উভয় পক্ষের সামরিক তোড়জোড়ও দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে দ্রুতগতিতে। এক দিকে যেমন নূতন নূতন বৃটিশ সেনাদল সাইপ্রাস হইতে মিশর অভিমুখে ছুটিয়া সুয়েজ খাল অঞ্চলের বৃটিশ বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করিতে চলিয়াছে, অপর দিকে তেমনি আবার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে মিশরীয় সৈন্যদল ও ট্যাঙ্কবহর স্থাপিত হইতেছে। পরিখা খনন ও কাঁটা তারের বেড়া নির্ম্মাণ করিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইতেছে। ইহারই মাঝে মাঝে চলিতেছে ইতস্ততঃ ছোট-খাটো সজ্ঘর্ষ ও চোরা আক্রমণ। পরিপূর্ণ সামরিক প্রস্তুতির পশ্চাৎ হইতে যখন এই ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ পরিচালিত হয় তখন অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না যে, তাহা আসন্ন একটি বৃহত্তর সজ্ঘর্ষের সম্ভাবনাই সূচিত করে; বস্তুতঃ সে কর্মতৎপরতা অসহিষ্ণু রণদেবতারই অস্থির অঙ্গসঞ্চালন। আরও কৌতুকাবহ ঘটনা হইল এই যে, এক দিকে যখন মাঝে মাঝে এইরূপ সশস্ত্র সজ্ঘর্ষ ও সামরিক প্রস্তুতি পরিচালিত হইতেছে, অপর দিকে মিশরীয় কর্তৃপক্ষ তখন বৃটিশের বিরুদ্ধে বর্জন ও

অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, ঐ দুইটি আন্দোলনের সাধনার ও সিদ্ধির পীঠস্থান ভারত: বর্জন ও অসহযোগ নীতির মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি স্বয়ং মহাত্মাজী স্বীয় নেতৃত্বে ভারতীয় সে আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছেন ও পরিচালনা করিয়াছেন এবং তাহা করিতে গিয়া উল্লিখিত আন্দোলন দুইটিকে যে মূল নীতিটির নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়াছেন তাহার নাম নিরুপদ্রব বা অহিংস নীতি। তাই তাঁহার প্রবর্তিত ও পরিচালিত আন্দোলন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত। ভারত তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে জানে যে, বিরোধী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আন্দোলনকারী পক্ষ যেখানে সামরিক শক্তিতে ও সংহতিতে অন্য পক্ষ অপেক্ষা দুর্বল, প্রবল পক্ষ সেখানে তাহার নিজের স্বার্থেই চাহিবে—সে আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিকতার খাত হইতে সঙ্ঘর্ষ ও সংগ্রামের পথে টানিয়া আনিতে। মিশরীয় কর্তৃপক্ষেরও যে সে তত্ত্ব জানা না আছে তাহা নয়: মিশরীয় প্রেস সিণ্ডিকেট একটি বিরাট বৃটিশ দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, মিশরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বানচাল করিয়া দিবার দুরভিসন্ধি বশে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভকারী জনতাকে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হইবার জন্য প্ররোচিত করিতেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইহা সনাতন অপকৌশল এবং পর-শাসন হইতে মুক্তিকামী পক্ষ সে আন্দোলনে সাফল্য অর্জন করিবেন ঠিক সেই পরিমাণ—যে অনুপাতে সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশল তাঁহারা এড়াইয়া চলিতে সমর্থ হইবেন। মিশরীয় জনসাধারণের মনোভাব যে বৃটিশ-বিরোধী হইবে তাহা আর বিচিত্র কি, কিন্তু তথাপি মিশরের স্বার্থেই সে বিরোধিতা সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক এবং যেহেতু বিক্ষুব্ধ জনতাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার মত শক্তিশালী কোন রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোন নেতা মিশরে নাই, সেই কারণে সে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে মিশর গবর্ণমেণ্টকেই।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

রাজবন্দীদের মুক্তি চাই

"সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে প্রার্থীদের নাম দাখিলের আর একটা মাসও বাকী নাই। ১০ই নভেম্বর সরকারী নোটিশ পড়িবে। ১৯শে নভেম্বর নাম দাখিলের শেষ দিন। অথচ, আজও কয়েক শত রাজবন্দী পশ্চিমবঙ্গের কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। নির্বাচনে যোগ দিবার কোন সুযোগই তাঁহারা পাইবেন না। কংগ্রেসী সরকার সে সুযোগ দিতে রাজী ন'ন। গত ১৬ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন, নির্বাচনে যোগ দিবার জন্য রাজবন্দীদের মুক্তি দিবার কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন না। মাদ্রাজে পর্যন্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিবার কথা উঠিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহা ভাবিতেও ভয় পান। প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্তে ইহারা পতনের ভয় দেখিতেছেন। ভয় পাইবারই কথা। কংগ্রেসী কু-শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে জনমত জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, কংগ্রেসী শাসকদের তাহাতে ভয় পাইবারই কথা। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলির যে ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠিত হইয়াছে ও ইহা ব্যাপকতর হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, কংগ্রেসী শাসকরা তাহাতে শঙ্কিত। তাই তো বিরোধী পক্ষের গলা টিপিয়া ধরার জন্য

আইন-কানুন সব প্রস্তুত। শ্রেষ্ঠ দেশভক্ত ও জনপ্রিয় শ্রমিক-কৃষক নেতাদের তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে কারাগারে পরিয়া রাখা হইয়াছে। কংগ্রেসী শাসকরা জানে, এই সব আত্মত্যাগী কর্মী জনতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলে বামপন্থী ঐক্যের শক্তি শতগুণ বাড়িয়া যাইবে। কংগ্রেসী কর্তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত করিয়া তুলিবে। তাই, রাজবন্দীদের কারার লৌহ-কবাটের অন্তরালে রাখিয়াই নির্বাচন চালাইবার চক্রান্ত কংগ্রেসী সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এ চক্রান্ত ব্যর্থ করিবার দায়িত্ব বামপন্থী দলগুলির। নির্বাচনের পথ সহজ সরল নয়। কংগ্রেসী দুঃশাসনের বাধা চূর্ণ করিয়াই নির্বাচনী সংগ্রাম অগ্রসর হইবে। রাজবন্দীদের মুক্তির আন্দোলন সেই নির্বাচনী সংগ্রামেরই অংশ। প্রতিটি দলের প্রতিটি নির্বাচনী সভায় এই আওয়াজই ধ্বনিত হউক —রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। এই আওয়াজ ধ্বনিত হউক প্রতিটি জিলায়, প্রতিটি জন-সমাবেশে।"

—স্বাধীনতা।

ধোঁকাবাজি

"কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী জাতীয় করণের ধোঁকাবাজি জনতার কাছে আমাদের স্বাধীনতার স্বরূপ তুলিয়া ধরিয়াছে। বহু অর্থ শোষণ ও আমাদের দেশের সম্পদে ভাণ্ডার ভর্তি করিয়াও স্বাধীন আমলে শোষণের ক্ষেত্রে ইংরাজ একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া বসিয়া আছে, এ কথা আর একবার সত্য প্রমাণিত হইল। শুধু ট্রাম কোম্পানীই নহে, ভারতব্যাপী বহু রকমের শিল্প সংগঠন আজ ইংরাজের আয়ত্তাধীন। অথচ সবগুলিই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের দেশের সম্পদে, শ্রমে। আজও এই শোষণ চলিয়াছে অবিরাম গতিতে। অথচ স্বাধীনতা পাইয়াও ঐগুলি দেশের নিজস্ব সম্পদ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আজ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বন্দুকগুলি স্বহস্তে না রাখিয়াও ইংরাজ সমানে যে লুণ্ঠ চালাইতেছে তাহার প্রহরী আজ আমাদের নেতৃবৃন্দ তথা সরকার। জনসাধারণের স্বার্থকে ধূলায় লুটাইয়া দিয়া জাতীয় করণের মিথ্যা আশা দিয়া ইংরাজের শোষণের যন্ত্রকে আরও দৃঢ়বদ্ধ করিবার যে ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে, জনতার অজ্ঞতায় আজ তাহা চাপা থাকিলেও আগামী দিনের জাগ্রত জনতা এই সব ষড়যন্ত্র কোন দিনই ক্ষমা করিবে না।"

—বীরভূম-বার্ত্তা।

বিজ্ঞানসম্মত সেচ চাই

"পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক খাদ্য-ঘাটতি প্রায় ১'৫ লক্ষ টন চাল এবং ২'৫ লক্ষ টন গম। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণ আসার পরে এই ঘাটতির পরিমাণ অবশ্যই বাড়িয়াছে। সেই বাড়তি ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ টন চাল। পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমি পুনরুদ্ধার করার অসুবিধা অনেক, সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের পতিত জমি উদ্ধারে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার হালকা ও ছোট ট্রাক্টরের সাহায্যে যত দূর সম্ভব পতিত জমি পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বঙ্গবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে বীজ বপনের কোন ফার্মই ছিল না—সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণে ভালো বীজ সরবরাহ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। দুই শত একর করিয়া ছয়টি বীজ তৈয়ারীর ফার্ম তৈয়ারীর পরিকল্পনা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে দুইটির কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। সার উৎপাদনের জন্য সহরের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। গ্রামে কম্পোষ্ট সার প্রস্তুতের জন্য প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণের জন্যও ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপ উৎসাহ দানের ফলে কয়েকটি কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত হইয়াছে। শস্য উৎপাদন প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিদের মধ্যে আশাতীত উৎসাহ দেখা যায়। এই প্রতিযোগিতার ফলে কোনও কোনও স্থানে গড়-পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। কৃষির সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত সেচ। আমাদের দেশের মৌসুমী বড় খামখেয়ালী। কোনও বৎসরে সে আসে নির্ধারিত সময়ের আগেই, কোনও বৎসর বা নির্ধারিত সময় পরেও তার দেখা পাওয়া যায় না। কোনও বৎসর তার দান বা বড় বেশি, কোনও বৎসর সে কৃপণ। ফলে দেশে হয় অনাবৃষ্টি—নয় অতিবৃষ্টি অর্থাৎ চাষের সর্বনাশ। সেই জন্যই মৌসুমীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না—প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত সেচের।"

—অজয়।

মালদহে ভুখা-মিছিল

"যেদিন হইতে মালদহে Procurement অফিস বসিয়াছে, সেদিন হইতে মালদহবাসীর খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে, যেদিন হইতে মালদহবাসীকে প্রতিবেশী জেলা পশ্চিম-দিনাজপুর হইতে ধান্য-চাউল আনয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, সেই দিন হইতে মালদহবাসীর অদৃষ্টে উপবাস সুরু হইয়াছে, যেদিন হইতে একই জেলার হবিবপুর বামনগোলা থানার অধিবাসীদিগের শত আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া দুইটি থানাকে এক পৃথক কর্ডন এলাকাভুক্ত করা হইয়াছে, সেই দিন হইতেই সুরু হইয়াছে অপরাপর থানাগুলিতে হুহু করিয়া ধান-চাউলের দর বৃদ্ধি হইতে। ইহারই ফলে এক দিকে মালদহবাসীর ঘরে ঘরে অন্নাভাব ও হাহাকার, শত শত গরীব গাড়োয়ান বেকার হইয়াছে, অপর দিকে মুষ্টিমেয় জনকয়েক জমিদার-জোতদার শ্রেণীর লোক কনট্রোল ও কর্ডনের সুযোগে D. P. Agency লইয়া আরও ধনবান হইয়া উঠিয়াছে। মালদহে ভুখা-মিছিল বাহির হইবার ইহাই হইল অন্তর্নিহিত কারণ। কর্ডন এলাকার বাহিরে জেলার সর্ব্বত্রই আজ চাউলের মূল্য মণকরা ৫০৲ টাকার কাছাকাছি। কংগ্রেসী শাসনে মালদহবাসীর যে আজ চরম খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে, এ দুরবস্থা তাহাদের ইংরেজ রাজত্বে এমন কি ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ও ভোগ করিতে হয় নাই। পশ্চিম-দিনাজপুরেও সরকার ঠিক একই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন ৭৷০ টাকা মণ দরে লক্ষ-লক্ষ মণ ধান সংগ্রহ করিয়া জেলার বাহিরে চালান দেওয়ার ফলে সেখানকার চাষীরা আজ নিঃস্ব ও অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। ইহা আমাদের কথা নহে। পশ্চিম-দিনাজপুরের বর্ত্তমান কংগ্রেস সেক্রেটারী মহাশয়ের অনশনেই ইহার জলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে। দলে দলে লোক ভুখা-মিছিল করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ধন্না দিতেছে, মালদহে যদি স্থায়ী ভাবে ভুখা-মিছিল বন্ধ করিতে হয়, তবে আমরা বিশেষ ভাবে যে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করিলাম, তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা হওয়া উচিত।"

—উদয়ন

দুর্গোৎসব

"প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসর বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে দুর্গাপূজা সমাপ্ত হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। দুর্গাপূজা করিয়া রাবণ-ধ্বংসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজায় শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গতি নাশ হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত আমাদের যাঁহারা দুর্গাপূজা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের দুর্গতি তো নাই। দুর্গতি আছে যাহারা পূজা করিতে পারে না, যাহাদের পূজা করিবার অর্থ নাই। সেই জন্য তাহাদের দুর্গতি দূর হয় নাই। কিন্তু আজকাল সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা হইতেছে। এবার আমাদের দুর্গতদের দুর্গতি দূর হওয়ার কথা। কিন্তু সমাজের দুর্গতি যে সব আছে তাহার মধ্যে প্রধান দুর্গতি হইতেছে সমাজের অর্থ বৈষম্য। দুর্গা মাতা সকলকেই একই বর দিয়া গিয়াছেন। দুর্গতি দূর হউক। ভগবান রামচন্দ্র দুর্গার নিকট হইতে বর পাইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়াছিলেন না। রীতিমত জীবন-পণ করিয়া লড়াই করিয়াছিলেন না। সমাজের মধ্যে যাহাদের বেশী কিছু আছে তাহারা আরও বেশী করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। কিন্তু বেশী করিবে কি করিয়া? অপরের শোষণ ছাড়া হইবার পথ নাই। দেশের ধনী মহাজনরা নানা রকম কৌশল করিয়া আরও ধনোৎপাদনের চেষ্টা করিবে। কিন্তু সমাজের বেশীর ভাগ লোক যাহারা গরীব তাহাদিগকেও চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে শোষণ বন্ধ করা যায়। বসিয়া থাকিলেই শোষণ অবাধ গতিতে চলিতে থাকিবে। যদি সেই গরীব লোকদের দুর্গতি দূর করিতে হয় তবে যে পথে শোষণ আছে সে পথ তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। যে পথে পোষণ আছে সে পথে তাহাদিগকে নিষ্ঠার সহিত জীবন পণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। শুধু দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বলিলে দুর্গতি নাশ হইবে না। রীতিমত কার্য্য করিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, গ্রামে গ্রামে ধনীরা ঢেঁকিকে ধ্বংস করিবার জন্য ধান-কুটা কল আনাইয়া দেশের গরীব লোকের দুর্গতি আরও বাড়াইয়া দিতেছে। গভর্ণমেণ্ট ধান-কুটা কল চালাইতে নিষেধ করা সত্ত্বেও কল আনাইতেছে ও বানীতে ধান কুটাইতেছে। কিন্তু যেখানে গরীব লোকেরা শোষিত হইতেছে সেখানে তাহারা নীরব দর্শকের মত কেবল মাথায় হাত দিয়া দেখিতেছে। এই সব শোষণ বন্ধ করিবার জন্য তাহারা গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিতে পারে। তাহাও যদি করিতে না চায় তাহা হইলে ধনীরা দুর্গাপূজা করিয়া যে বর লাভ করিয়াছে তাহাতে তাহাদের দুর্গতি নাশ করিতে গিয়া গরীব লোকদের দুর্গতি বাড়াইয়া দিবে। এর জন্য চাই সর্ব্ব রকম দুর্গতি দূর করিবার জন্য স্বাবলম্বন চেষ্টা। সেই স্বাবলম্বন চেষ্টার মধ্য দিয়া শোষণ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে ও দুর্গতি দূর হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান যুগের যুগাবতার মহাত্মা গান্ধী সমাজের এই দুর্গতির কথা নানা ভাষায় নানা ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া সমাজের দুর্গতি দূর করিতে হইবে। এই পথ ছাড়া আর কিছু পথ নাই। সব পথেই শোষণ আছে।"

—গ্রামসেবা।

দিল্লীতে দুর্গোৎসব

জাগো দোকান কর্ম্মচারী

"দোকান কর্ম্মচারী, জাগো। তোমার আশে-পাশে কলের কুলি, কারখানার মজুর, ক্ষেতের ভূমিহীন চাষীরা আজ জেগে উঠেছে। অফিসের কেরাণী, স্কুল-কলেজের শিক্ষকের ভিতর বাঁচবার জন্য তাগিদ এসেছে। চেয়ে দেখ—তোমার শ্রমের দ্বারা যে মুনাফা হয়েছে তার দ্বারা বড় বড় বাড়ী-গাড়ী হয়েছে বটে, কিন্তু তোমার থাকবার বাসস্থান পেচকের অন্ধকারময় বাসস্থান হতেও নিকৃষ্ট। তোমার খাদ্য, অখাদ্য বললেই চলে, তোমার শিশু আজ অনাহারে শীর্ণ, তোমার পরিবারের পরনে শতছিন্ন বসন। রোগে তোমার ঔষধ নাই—পথ্য নাই। মৃত্যু ছাড়া তোমার বিশ্রাম নাই। তবুও যতক্ষণ তুমি বেঁচে আছ, ততক্ষণ তোমাকে হাসিমুখে খরিদ্দারের সামনে আসতে হবে। তোমার হৃদয়ের যন্ত্রণাকে ভুলে গিয়ে পণ্য নিয়ে তোমায় মসগুল হয়ে থাকতে হবে। নচেৎ তোমার চাকুরী নাই। অসুখে বাজ কামাই করলে চাকুরী হতে তোমার জবাব হয়। তোমার আনন্দ কোথায়? অথচ সারা দুনিয়ার লোকের মনোরঞ্জনের জন্য তোমার অক্লান্ত সাধনা। কিসে জনসমাজ সন্তুষ্ট হয়, তার জন্য তোমার চির উৎকণ্ঠা। কিসে তোমার দোকান-মালিকের দু'টি পয়সা মুনাফা বেশী আসবে, তার জন্য তোমার আপ্রাণ প্রয়াস। তোমার মূলধন মাত্র তোমার সুস্থ দেহখানি। এই মূলধন ভাঙ্গিয়ে তোমার পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করতে হয়। এই মূলধনকে যে রক্ষা করবে, তার জন্য যেরূপ খাদ্য, বাসস্থান বা আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন তার ব্যবস্থা কোথায়? বয়স বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে চাকরী হতে তোমায় জবাব দেওয়া হয়। কাজ করতে করতে কাজের অভিজ্ঞতা হয়, তখন অভিজ্ঞ লোকের দাম বৃদ্ধি হয়। আর তোমার কপালে তখন চাকুরী হতে ছাঁটাই চলে। জীবনের সম্বল যে যৌবন ও স্বাস্থ্য তা' যতক্ষণ অটুট থাকে, ততক্ষণ তোমার কদর। শেষ জীবনে তোমার অন্নবস্ত্র সংস্থানের কোন উপায় থাকে না। নিরুপায় জীবন নিয়ে তোমাকে মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। মৃত্যুর পর তোমার শ্মশান-খরচও জোগাড় হয় না। তোমার সন্তান-সন্ততির দুর্গতির আর পরপার থাকে না। তুমি তোমার স্বাস্থ্য দিয়ে, রক্ত জল করে দিয়ে, দোকান-মালিকের যে মুনাফা করে গেলে তা' তোমার ভোগে এল না। তাই সময় এসেছে তোমায় এবার জাগতে হবে। তোমার বাঁচবার দাবী নিয়ে তোমাকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। সংগ্রাম বিনা কোন কাজ হয় না। মনে রেখো জীবনটাই সংগ্রামময়। তোমায় ত' জন্ম হতেই সংগ্রাম করতে হচ্ছে—দোকানেও ত' খরিদ্দারের সাথে সাথে সংগ্রাম করতে হয়। কাজেই জীবনকে পূর্ণরূপে ভোগ করতে হলে তোমায় আজ সংঘবদ্ধ হতে হবে। তোমায় আজ জাগতে হবে।"

—দোকান কর্ম্মচারী

সমবায় সমিতি চাই

"কয়েক দিনের পূর্ব্বের একটি সংবাদ আমাদের মনকে অত্যন্ত চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। সংবাদটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অনুসন্ধান করিলে অনুরূপ ঘটনার সন্ধান প্রায় সর্ব্বত্রই মিলিবে। সংবাদটিতে প্রকাশ, কেতুগ্রাম থানার অজয় নদীর তীরবর্ত্তী একটি পল্লীর জনৈক কৃষক সকল জায়গা হইতে বিফল মনোরথ হইয়া কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীর পরামর্শ মত বর্দ্ধমান জেলা কেন্দ্রীয় সর্ব্বার্থ-সাধক সমবায় সমিতির কার্য্যালয়ে দেড় হাজার বিঘা জমির ধান রক্ষার সাহায্য চাহিতেছেন। প্রশ্নোত্তরে আরও জানা গিয়াছিল, জমির নিকটেই অজয়-সংলগ্ন বিলে প্রচুর জল আছে। কেবল মাত্র জল তুলিয়া জমিতে দিবার উপযোগী ব্যবস্থাই কৃষকের একমাত্র দাবী। কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক বিষয়টিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়া সহানুভূতির সহিত সাময়িক ভাবে পাম্প কিনিতে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এই সংবাদও আমরা পাইয়াছি। কিন্তু পাম্প ক্রয় করিতে ও সেই যন্ত্র সেখান পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে যে সময়ের প্রয়োজন হইবে, ততটুকু সময় পর্য্যন্ত ধান রক্ষা পাইবে কি না সে বিষয়ে কৃষকটি সন্দেহ প্রকাশ করায় কাজের অগ্রগতি বন্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গীতে ঘটনাটির গুরুত্ব বেশী নাই ইহা আমরা জানি। এইরূপ ঘটনা যে বর্ত্তমান কৃষি-ব্যবস্থায় অহরহ ঘটিতেছে এ সংবাদও আমাদের কাছে নূতন নয়, তবুও ভারতবর্ষের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে ও বর্ত্তমান ভারতের সংগঠন কর্মী হিসাবে আমাদের দায়িত্বকে আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। জলসংরক্ষণ ও জলসেচন ব্যবস্থাই বর্ত্তমান কৃষি-ব্যবস্থার সর্ব্বপ্রথম করণীয় কাজ। ইহার অভাবে কৃষকগণ অনিশ্চয়তার মধ্যে কৃষিকার্য্যে উৎসাহ হারাইতেছে এবং বহু ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের দ্বারা উৎপন্ন ফসল বাঁচাইবার প্রচুর সম্ভাবনা তো বাংলা দেশে আছেই, ইহা ছাড়াও উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন নলকূপ বসাইয়াও ফসল বাঁচান বহু ক্ষেত্রে সম্ভব হইতে পারে। কেবল মাত্র ব্যক্তিগত চিন্তা, সঙ্গতি ও সামর্থ্যে ইহা সম্ভব হইতেছে না। হাজার বিঘা অথবা দেড় হাজার বিঘা জমির মালিক সম্মিলিত হইয়া সমবায় সমিতি গঠনের দ্বারা এই কাজ আরম্ভ করিলে কেবল মাত্র যে ফসল বাঁচান সম্ভব হইতে পারে তাহা নহে, জেলার সম্পদ সৃষ্টির কাজেও সাহায্য করা হইবে। বর্দ্ধমান জেলার কৃষক সমাজের এই দিক দিয়া দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তনের আশু প্রয়োজন বোধ হইতেছে। জেলার সংগঠন কর্মিগণ জেলার কৃষক সমাজকে ইহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে উদ্যোগী হউন, এক্ষণে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।"

—বর্দ্ধমানের কথা।

উদ্বাস্তুদের দাবী

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার হঠাৎ এক আদেশে কেবল মাত্র সরকারী তাঁবুস্থিত উদ্বাস্তুগণ ব্যতীত কোন উদ্বাস্তুকে কোন প্রকার সাহায্য দিবেন না বলিয়া ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক ভাবে উদ্বাস্তুদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে অর্দ্ধাশন অনশন দেখা দিয়াছে এবং শীঘ্রই উদ্বাস্তুদিগকে চরম অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া আমরা আতঙ্কিত হইয়াছি। বর্দ্ধমান জেলার আগত উদ্বাস্তু-সংখ্যার শতকরা ৭৫ জন সরকারী সাহায্য ও বে-সরকারী সহায়তায় সরকারী তাঁবুর বাহিরে আসিয়া পুনর্ব্বাসন সুরু করিয়াছে এবং বহু কষ্টে নিজদিগকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত

হইয়াছে। এমন সময় মধ্যপথে সরকার তাহাদিগকে এমন ভরা-ভাদরে ডুবাইবার পরোয়ানা জারী করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা হতবাক্ হইয়াছি। ভারতের ভাগ্যাকাশে দুষ্ট গ্রহস্বরূপ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহার সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে যাহারা তিষ্ঠিতে না পারিয়া শত শত পুরুষের পূত-পবিত্র জন্মভূমি ছাড়িয়া ছন্নছাড়া হইয়া এ দেশের পথে-প্রান্তরে যাযাবরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের পুনর্ব্বাসন ও পুনঃ সংস্থানের জন্য রাষ্ট্রের যেটুকু দায়িত্ব তাহা তাঁহারা এড়াইয়া চলিতেছেন। ঐ সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের জন্য যে পরিমাণ সরকারী ঋণ দেওয়া হয় তাহা এক দিকে অপর্য্যাপ্ত এবং যাহাও দেওয়া হয় তাহাতে সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনাবিহীন ব্যবস্থায় এ-পর্য্যন্ত কোন উদ্বাস্তুই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এই অবস্থাতেই সরকার এক দিকে সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বাসন কার্যের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন, অন্য দিকে আবার প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায় করিতে উদ্যত হইয়া অর্দ্ধ-সমাপ্ত পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থার চিরসমাধি ঘটাইতে চলিয়াছেন। উদ্বাস্তুগণ পূর্ব্ববঙ্গে পরিত্যক্ত তাহাদের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ করিতে এবং তাহা হইতে দীর্ঘ মেয়াদে পুনর্ব্বসতি ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইয়া আসিতেছে। এই দাবী তাহাদের ন্যায্য দাবী—ইহা ভিক্ষা নহে। ভারত-পাক চুক্তি অনুযায়ী এই ব্যবস্থা করিবার ভার ভারত ইউনিয়ানের। আজ পর্য্যন্ত ভারত সরকার যে অজস্র অর্থ উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন খাতে ব্যয় করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের অব্যবস্থার জন্য তাহার বহু অংশ জলে গিয়াছে। এখন অর্দ্ধপথে সাহায্য বন্ধ করিয়া সরকার অবশিষ্ট সমস্ত টাকাই নষ্ট করিবেন এবং অন্য দিকে একটা জীবন্ত সুসংবদ্ধ জাতিকে ভিখারী যাযাবরে পরিণত করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবেন। আমরা সরকারকে এইরূপ আগুন লইয়া খেলা না করিবার জন্য সাবধান করিতেছি।"

—দামোদর।

পাকিস্তানে আতঙ্ক

"ভারতের সহিত পাকিস্তানের সন্ধি হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ভাষণে বলিতেছেন যে, পাকিস্তান সন্ধি-সর্ত্ত পালন করিতেছে না—অধিকন্তু ভীষণ ভাবেই রুদ্র মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সীমান্তে সীমান্তে নানা অনাচার সংঘটিত করিতেছে। ভারতের পক্ষে সে সব অত্যাচার সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তানী মন্ত্রিগণও হুমকি দেখাইয়া বলিতেছেন—যুদ্ধ অনিবার্য্য নহে। ভারত এ সমুদয় শুনিয়া এ-হেন অনাচার-অত্যাচার দেখিয়াও নিরস্ত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সীমান্তবর্ত্তী জনসমূহ যে ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে এবং অহর্নিশ কি আতঙ্ক ভোগ করিতেছে, তাহা ভগবান ভিন্ন কেহ জানেন না। ভারতেরও কর্ত্তব্য তাহার প্রজাবর্গের এ অন্তর্দাহ অচিরে নিবৃত্তি করা। ক্লৈব্য—রাজনীতি নহে। শত্রুকে শাসন করাই রাজনীতি বলিয়া সর্ব্বত্র শাস্ত্রসম্মত। শাসনের দোষ-ত্রুটি অত্যাচার-অনাচার না থাকিলে পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে সহস্র সহস্র হিন্দু পিতৃ-পিতামহের ঘর-সংসার জমি-জায়গা বেড়-বাগিচা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে কেন? ইহা যে রাজনীতিগত অত্যাচার তাহা না বলিলেও চলে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানগণের প্রতি কোন অত্যাচার হইতেছে কি? দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিবার মত তাঁহাদের কোন ঘটনা ঘটিয়াছে কি? রাজক্ষমতা তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গে ইহার সম্পূর্ণ অভাব, বরং বিপরীত আচরণ। হিন্দুগণকে উৎখাত করিয়া মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠাই কি ইহার উদ্দেশ্য নয়? ইংরাজের আমলে হিন্দু-মুসলমান সমান ভাবে প্রতিবাসীর ন্যায় সুখে বাস করিত, আজ তাহার অতিক্রম হওয়ায় রাজার অক্ষমতাই প্রতিপাদিত হইতেছে। হিন্দুকে বিতাড়িত করিয়া হিন্দুর ঘর-বাড়ী জমি-জায়গা আত্মসাৎ করিয়া বড় হইবার এ প্রচেষ্টা নিতান্ত দুর্ব্বলতা ও অত্যাচারেরই পরিচয়—ভগবদ্বিশ্বাসী মনে এ ভাবে অমঙ্গলেরই সূচনা করে।"

—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

বস্ত্র বণ্টনে অব্যবস্থা

"শিলচর সহরের কো-অপারেটিভ ষ্টোর মারফতে যে কাপড় দেওয়া হইতেছে তাহা সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে একবার আলোচনা করিয়াছি। আমাদের ভরসা ছিল, ৺পূজার পূর্ব্বে সস্তা দরের কাপড় আমদানী হইবে কিন্তু আমাদের সে আশা মোটেই ফলবতী হয় নাই। নূতন কোন চালান আসে নাই—পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাই চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে, অন্য কথায় বলিতে গেলে ক্রেতাদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অম্বিকাপুর কো-অপারেটিভ ষ্টোরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে—এখানে একখানা ধুতি

ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি ভারতবর্ষ ও আমেরিকার বন্ধুত্ব যাতে দৃঢ় হয় সেজন্য কয়েকটি গাছ মৈত্রী-নিদর্শন পাঠিয়েছেন। মিয়ামি পার্কের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বিমানপোতের দু'জন ষ্টুয়ার্ডের নিকট থেকে গাছগুলি গ্রহণ করছেন। মিয়ামি পার্কে ঐ গাছ পোঁতা হবে।

অথবা সাড়ি কিনিতে গেলে তৎসঙ্গে ২৮/০ গজ দরের ৫ গজ সার্টিং নেওয়া বাধ্যতামূলক—প্রয়োজন না থাকিলেও নিতে হইবে। একে ত চাল-ডালের খরচ জোগাইতেই প্রাণান্ত, তার উপর হয়ত এক ব্যক্তি অতি কষ্টে একখানা ধুতির টাকা জোগাড় করিল। তার শুধু ধুতিরই প্রয়োজন—সার্টিংএর প্রয়োজন নাই এবং প্রয়োজন থাকিলেও বেশী দামের সার্টিং তাহার উপযোগী নহে (যেমন মুটে-মজুর এবং দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী) কিন্তু তবুও নয় টাকা অতিরিক্ত অর্থাৎ মোট প্রায় ১৫৲ খরচ না করিলে সে ধুতি পাইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তির ৬৲ জোগাড় করিতেই গলদঘর্ম্ম হইয়া গিয়াছে, সে ১৫৲ জোগাড় করিবে কোথা হইতে? গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কো-অপারেটিভ ষ্টোর সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমানে যাহা চলিতেছে তাহা জুলুমবাজি ভিন্ন আর কিছু নহে। অম্বিকাপুর কো-অপারেটিভ ষ্টোরে ৮৶১০ সাড়ে চৌদ্দ আনা গজ দরের কিছু সার্টিং কাপড় আসিয়াছিল কিন্তু ২।০ গজের অন্ততঃ ২।৩ গজ মলমল না নিলে সাধারণ ক্রেতাদের ভাগ্যে ইহার একটি সার্টের কাপড় জুটে না। কম মূল্যের যে কোন রকম কাপড় নিতে হইলে সঙ্গে চড়া দামের সমপরিমাণ কাপড় নিতে সাধারণ ক্রেতারা বাধ্য। শীত আসিয়া পড়িয়াছে—এ সময় দরিদ্র লোকদের উপর পাতলা মলমল চাপাইয়া না দিয়া তাহা কিছু দিন আট্‌কাইয়া রাখিয়া শীতের শেষে দিলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত? ব্যবসা করিব অথচ সর্ব্বপ্রকার ঝুঁকি জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাইয়া দিব—ইহার কি অর্থ হয়? ট্রেডিং কো-অপারেটিভের পক্ষে কাপড় সরবরাহ সম্ভব না হইলে জনসাধারণকে তাদের ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে, নতুবা যা দিতে পারেন তাহা পক্ষপাতশূন্য ভাবে জনসাধারণের প্রয়োজন ও ক্ষমতানুযায়ী নিতে দেওয়াই সরকার-পৃষ্ঠপোষিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শোভন হয়। পূজার সময় ছেলে-মেয়েকে একটা জামা দিতে না পারা যে কত বেদনাদায়ক তাহা হয়ত ক্ষমতামত্ত কর্ত্তৃপক্ষ ভুলিয়া গিয়াছেন, নতুবা এ ভাবে দরিদ্র জনসাধারণের উপর জুলুম চালাইতেন না। জনসাধারণকে কেন এ ভাবে হয়রাণী করা হইতেছে, আশা করি, গবর্ণমেণ্টের টেক্সটাইল বিভাগ ও সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোর সে বিষয়ে সদুত্তর দিয়া বাধিত করিবেন। —জনশক্তি।

বর্দ্ধমান পৌরসভা

"বর্দ্ধমান পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থায় বহু দিন হইতেই নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সহরবাসী ও করদাতাগণের হিতাকাঙ্ক্ষী কমিশনারগণের নানা প্রতিবাদ সত্ত্বেও পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ গলদ দূরীকরণে কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে সহরবাসীর বিশেষ আস্থাভাজন ও অনুগত সেবক ডাঃ নন্দদুলাল গাঙ্গুলী ও শ্রীশ্রীকুমার মিত্র মহাশয় অভ্যন্তরে থাকিয়া পৌরসভার অনাচার ও দুর্নীতি দূরীকরণে শত চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হন এবং জনসাধারণের স্বার্থ ও আত্মসম্মান রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া পদত্যাগে বাধ্য হন। আশা করা গিয়াছিল যে, এই দুই জন প্রভাবশালী কমিশনারের পদত্যাগে পৌরসভার অপরাপর কর্ম্মকর্ত্তা ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের চৈতন্যোদয় হইবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, পদত্যাগকারী দুই জন কমিশনারই পৌরসভার বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য অভিযোগ দেখাইয়াছিলেন, তাহার প্রতিকারার্থেও স্বায়ত্তশাসন বিভাগ কোনরূপ তদন্তের ব্যবস্থা করে নাই। অথচ সাধারণ ভাবে তদন্তের ব্যবস্থা করিলে আজিও অভিযোগগুলি প্রমাণিত হইতে পারিত বলিয়া আমরা মনে করি। স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যে তদারক করিয়া দোষ-ত্রুটি দূর করিবার জন্য স্বায়ত্তশাসন বিভাগের যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। অথচ পৌরসভার বিরুদ্ধে পৌর সদস্যগণের দ্বারা আনীত অভিযোগগুলির কোনরূপ তদন্ত অনুসন্ধান না হওয়ায় এই বিভাগের উপর জনসাধারণ তথা বর্দ্ধমান সহরবাসীর আস্থা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ, পৌরসভার আভ্যন্তরীণ গলদ ও অনাচারের প্রতিকার করিতে হইলে পৌরসভার বর্ত্তমান পরিচালন ব্যবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া কয়েক জন সদস্য মন্ত্রিসভা ও বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আবেদন করিয়াছেন। পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থায় যে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, সদস্যগণের সভায় সাম্প্রতিক অপ্রীতিকর ঘটনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে বিরাট ষড়যন্ত্র, অপচয় ও বিশৃঙ্খলার ফলে পৌরসভা বর্ত্তমান অবস্থায় অধঃপতিত হইয়াছে তাহার নিরপেক্ষ তদন্ত অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও বিভাগীয় বড়কর্ত্তাগণ পৌরসদস্যগণের আবেদনে সাড়া দিয়া এই সেবা-প্রতিষ্ঠানটিকে সহরবাসীর প্রকৃত কল্যাণে নিয়োজিত করিবার জন্য চেষ্টা করিলে আমরা সুখী হইব"। —বর্দ্ধমান।

দারিদ্র্য

"বিদেশী শাসনে যে দারিদ্র্য ধীরে ধীরে জাতির জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতেছিল তাহা বর্ত্তমানে অতি দ্রুত জাতিকে নিঃস্ব ও নিঃসম্বল করিয়া ফেলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বাঁচিবার ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মিটাইয়া চলিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে লইয়া সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না। জনসাধারণকে লইয়াই সমাজ এবং তাহাদের মধ্য হইতেই দেশের সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। আজ জনসাধারণের যে অবস্থা তাহা বর্ণনারও অতীত। দারিদ্র্যের কঠোর ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া জাতির জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সামান্য কয়েকটি বৎসরের মধ্যে কেন এমন হইল তাহার কারণ চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, মূলের গলদ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারই ফলে দরিদ্র দ্রুত অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে ও ধনীর ধন তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থা সমাজে সঙ্গতি, শান্তি ও শৃঙ্খলা কখনও আনিতে পারে না। ইহার ফলে যে বিশৃঙ্খলা, বৈষম্য ও ব্যভিচার অনিবার্য্য হইয়া দেখা দেয়, তাহার পূর্ব্বাভাষ পূরাপূরি ভাবে দেখা দিয়াছে কিন্তু নায়কগণ এখনও কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা লইয়াই গবেষণা ও আলোচনা করিতেছেন। কঠিন দারিদ্র্যজনিত দুরবস্থার মধ্য দিয়া জনসাধারণকে কি অবস্থায় চলিতে হইতেছে তাহার সত্যিকার খবরাখবর রাখিলে এরূপ নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প মনোভাব কখনও দেখা দিতে পারিত না। আহারের সংস্থান নাই, অথবা আহার্য্য সংগ্রহের সঙ্গতি নাই বলিয়া

অনাহারে মৃত্যুকেও অনাহারে মৃত্যু নয় বলিয়া বিবৃতি প্রভৃতিতে যুক্তি দেখানোর প্রয়াসে স্তম্ভিত হইতে হয় এই মনে করিয়া যে, ইহাকে অস্বীকার করাতে রূঢ় বাস্তবের সহিত পরিচয়ের অভাব কত অধিক! দুই বেলা পেট ভরিয়া দুই মুষ্টি আহার দেশের কয় জন আজ করিতে পারিতেছে? যাহারা তাহা করিতে পারিতেছে না তাহার কারণ কি? দুর্লোভের বশে মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় আহার্য্যকে লইয়া যাহারা ছিনিমিনি খেলিতেছে এবং মূল্য ধাপে ধাপে বাড়াইয়া মানুষের ক্রয়-শক্তির বাহিরে লইয়া ফেলিতেছে, মাগ্‌গীভাতা বাড়াইয়া তাহার সম্মুখীন হওয়ার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র এবং দারুণ দুর্ব্বলতার চিহ্ন। সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-সমূহের অন্ত নাই এবং সমাজ তথা জনসাধারণকে বধের জন্য বদ্ধপরিকর প্রতিক্রিয়াশীলদের রোধ করিবার মত সাহস ও শক্তির যদি অভাব দেখা দেয়, তবে দেশ-জোড়া দারিদ্র্য ও অনটন অনিবার্য্য। আমরা এইরূপ একটা অবস্থার মধ্য দিয়া ধ্বংসের পথে চলিয়াছি।"

—ত্রিস্রোতা।

সোসালিষ্ট পার্টি চাই কেন?

"মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কিছু দিন পূর্ব্বে দেশে এসেছিলেন।", কেন, সে কথা পরিষ্কার বলা হয়নি, কারণ এ সব ভয়ানক গোপনীয় কূটনৈতিক ব্যাপার কি না? তবে ওয়াসিংটনে প্রত্যাবর্ত্তন করেই তিনি যখন হঠাৎ বিনা কারণে বিবৃতি দিলেন যে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণে 'নিরপেক্ষ' কথাটির ঠিক জুৎ হয়নি, তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে কি সলা-পরামর্শ তাঁর সঙ্গে নয়াদিল্লীতে হয়েছে। চার বছর অনেক বাগাড়ম্বরের পর এখন "নিরপেক্ষ" পররাষ্ট্রনীতি কথায়ও আর চললো না। বিজয়লক্ষ্মী বর্ণিত নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারতের নীতি 'ইউনাইটেড নেশনস'-এর স্বপক্ষে, স্বাধীন জাতিসমূহের স্বপক্ষে। মনের উদ্দেশ্য এই কয়টি কথার মধ্যেই চমৎকার বোঝা যায় কিন্তু মার্কিণীরা যদি না বোঝে? তাই আর একটু পরিষ্কার বলা দরকার—"ইউনাইটেড নেশনস"-এর সাধারণ পরিষদে ৫১ বারের মধ্যে ৩৮ বার ত তোমাদের দিকেই ভোট দিয়েছি, ১১ বার ভোট দিই নি এবং ২বার মাত্র তোমাদের বিপক্ষে ভোট দিয়েছি"। আরো একটু আছে—"আমাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতা স্বভাবতঃই আমাদের গতি নির্দ্দেশ করেছে সব রকম একনায়কত্বের বিরুদ্ধে, তা ঔপনিবেশবাদই হোক আর কমিউনিষ্ট আক্রমণই হোক।" "নিরপেক্ষ" পররাষ্ট্রনীতির সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা সম্বন্ধে এখন কি আর কোন সন্দেহ আছে?

ভারতীয় সোস্যালিষ্ট পার্টির বৈদেশিক ব্যাপার-বিশেষজ্ঞ রাম-মনোহর লোহিয়া সিঙ্গাপুরে বলেন যে, ১০,০০০ বৃটিশ ফৌজ দিয়ে "কমিউনিষ্ট সন্ত্রাসবাদ" দমন করা যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন, সোস্যালিষ্ট পার্টি। আর একবার প্রমাণ হোল যে, বুর্জোয়াদের রথে শিখণ্ডী দাঁড়িয়ে সাম্যবাদ-বিরোধী পিশাচ অভিযানকে সাহায্য করাই সোস্যালিষ্ট পার্টিগুলির লক্ষ্য।"

—জনসাধারণ।

খাদ্য-সমস্যা

"পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সমস্যা ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। এ বৎসর প্রথমটা অনাবৃষ্টির জন্য ফসলের ভবিষ্যৎ খুব খারাপ বলিয়া মনে হইয়াছিল। চাউলের দরও অনেক চড়িয়া গিয়াছিল। পরে বৃষ্টি হওয়ায় শেষ রক্ষা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু চাউলের দর কমিতে চাহিতেছে না। গত চার বৎসরে চাউলের দর ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারী গেজেটে ইহার যে সাপ্তাহিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা একত্র করিয়া দেখিলে আশঙ্কা হয় যে বাংলা দেশে খাদ্যের অবস্থা সত্যই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। এবার আর এক বিপদ হইয়াছে—বহু ধান-জমিতে পাট চাষ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষে খুব লাভ হইবার সম্ভাবনা কম, কারণ পাট পচাইবার ও ধুইবার জলের এখানে একান্ত অভাব। স্রোতের জল ছাড়া বদ্ধ পচা জলে ভাল পাট ওঠে না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী যে সকল স্থানে পাট হইয়াছে সেখানে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, পাট গাছ ভালই হইয়াছে কিন্তু জলের অভাবে ভাল পাট বাহির হইতেছে না। এবার ধানের জমিতে পাট চাষ করায় খাদ্যসমস্যা বাড়িয়াছে, তাহার সমস্যার সমাধান কতটা হইবে বলা যায় না। পাট বা তুলায় নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইয়াও যে বৃহত্তম বস্ত্রশিল্প এবং খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে চটকল চালানো যায় ব্রিটেনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, আমাদের খাদ্যের উপরেই বেশী ঝোঁক দেওয়া দরকার। খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির হিসাব গেজেট হইতে সঙ্কলন করিয়া নীচে দেওয়া হইল। ইহাতেও ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের ব্যর্থতাই সূচিত হইতেছে:

জেলা	জুলাই '৪৮	জুলাই '৪৯	জুলাই '৫০	আগষ্ট '৫১
বর্দ্ধমান (কালনা)	২০৲	২০।/০	২২৸/৪	২৯/৫
বীরভূম	১৬৲	১৭৸৫	২২/০	১৬।৶০
বাঁকুড়া	১৮৲	১৬৲	১৯৲	১৬।৶০
মেদিনীপুর	১৭।০	১৭৸৫	২[illegible]	২২৸/০
হুগলী	২৬।৶০	২৬৲	২৪৲	৩২৲
হাওড়া	২১/৪	২৯/৫	২৯/৫	৪০৲
২৪ পরগণা	২৬।৶০	৩২৲	৩২৲	৪৪৸/০
নদীয়া	২৪।/০	২২৸/৪	৩০৷৶৭	৩২৲
মুর্শিদাবাদ	২১/০	২২৸/৪	৪০৲	২২৸/০
পশ্চিম দিনাজপুর	২৪৲	২০৲	২৩৲	৩৫।/০
মালদহ	৩৩৸০	২৪৲	২৪৲	৩৩।৶০
জলপাইগুড়ি	৩০।০	২২৸/৪	৩২৲	৪২।৶৪

এই সমস্ত দর ঐ সব জেলায় সর্ব্বোচ্চ মূল্য। কতকগুলি বাড়তি কর্ডন এলাকা ছাড়া অধিকাংশ স্থলেই উহাই চাউলের মূল্য। এই ভাবে উত্তরোত্তর প্রতি বৎসর দাম বাড়িতেছে ইহা খুব আশঙ্কার কথা। খাদ্যের অপচয়ও বড় বেশী হইতেছে। গত বৎসর শ্রীরজনী প্রামাণিকের সভাপতিত্বে অপচয় তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। উহার সদস্য শ্রীমায়াতরু হালদার মফস্বলের প্রোকিউরমেণ্ট গুদাম দেখিতে চাহিলে তাঁহার সহিত কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীর মতভেদ হয়। শ্রীযুক্ত হালদার অপচয় খুব বেশী হইতেছে বলিয়া সন্দেহ করেন। তিনি অপচয় ধরিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে কমিটির কাজ বন্ধ হইয়া যায়। শ্রীদেবেন সেন খাদ্যসচিবকে প্রশ্ন করিয়া যে সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন তাহাতে অপচয় অতি সাংঘাতিক রকমের হইতেছে বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। খাদ্যমন্ত্রী চাউলের নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন:"

	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০
	মণ	মণ
বর্ষারম্ভে মজুত ধান	১৮,১২,৭৫৩	১৭,২১,২৯২
ঐ চাউল	১৫,১৭,৩৩৩	৩১,৭৩,৫৬৭
বৎসর মধ্যে ক্রীত ধান	৭১,৪০,০৩৬	১৮,৭০,০৫৪
ঐ চাউল	১,৫৩,৮৫,১৬০	১,৩৭ ২৪,৩৮৮
বৎসরের মধ্যে বিক্রীত চাউল		
এ গ্রেড	২,১২,৭১০	১,২৩,৭৮৭
বি „	১,৩২,৮৫,৪২০	১,৩৪,৪৬,৯৯৬
বৎসরান্তে মজুত ধান	১৭,২১,২৯২	৩৩,০৩,০৪২
চাউল	৩১,৭৩,৫৬৭	৩০,৪২,৮৩৫

"বৎসবান্তে মজুত ও বৎসব মধ্যে ক্রীত ধান চাউলেব পবিমাণ বৎসর মধ্যে বিক্রীত ও বৎসবান্তে মজুত ধান চাউলের সমান হইত। সামান্য অপচয় হইতে পাবে। কিন্তু হিসাব কবিয়া দেখা যাইতেছে যে ১৯৪৮-৪৯ সালে ৫০,৫১,৬৭৪ মণ চাউল ঘাটতি হইতেছে এবং ১৯৪৯-৫০ সালের ঘাটতিব মাত্রা আরও বাড়িয়া দাঁড়াইতেছে ৫৮,০৯.৮৭৫ মণ। শ্রীদেবেন সেন খাদ্যমন্ত্রীকে এই বৈষম্যের কারণ জিজ্ঞাসা কবিলে তিনি পাঁচ মিনিট সময় চাহেন। কিন্তু মিলাইতে পারেন না, কোন কৈফিয়ৎও দিতে পাবেন না, অগত্যা তখনকার মত দায় এড়াইবার জন্য তিনি নোটিশ চাহেন এবং সে নোটিশ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। আমাদেব মনে হয়, খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা এড়াইবার চেষ্টা না কবিয়া ব্যবস্থাপবিষদে ঐ আলোচনা হইতে দিলেই ভাল হইত। খাদ্যমন্ত্রী তদুপলক্ষে হিসাবেব এই মারাত্মক গলদ বুঝাইয়া দিবাব অবকাশ পাইতেন। খাদ্যসমস্যা লইয়া বিরোধী পক্ষ আলোচনা করিতে চাহিতেছেন আব সবকাব পক্ষ কেবলই উহা এড়াইয়া যাইতেছেন ইহা উচিত নহে। বাংলার খাদ্যসমস্যা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে যে, সকল দলেব সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া উহার সমাধান সুদূরপরাহত। খাদ্যসমস্যাকে রাজনীতির বাহিরে উহাব সমাধানের জন্য সকলের সমান ভাবে চেষ্টা ও যত্ন করা একান্ত আবশ্যক।" —প্রবাসী।

পণ্ডিত নেহরুর যুদ্ধযাত্রা ?

"খাদ্য নয়, বস্ত্র নয়, বেকাব সমস্যা বা অনাহার মৃত্যু নয়, চোরাকারবাব, মুনাফাবাজীও নয়, শাহানশাহ নেহরু অবশেষে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন সাম্প্রদায়িকতাব বিরুদ্ধে। সত্যবতী নগবে খুশিব রোশনাই জ্বলিল, লোকে গমগম কবিল, বাক্‌বিতণ্ডাব ঝড় বহিল; তাব পব উচ্চ ববে শাহানশাহেব রণ-হুঙ্কার সত্যবতী নগবের আকাশ-বাতাস আন্দোলিত করিল—সাম্প্রদায়িকতাবাদীবা সাবধান! অমাত্যবর্গ ঐক্যতানে শাহানশাহের প্রতিধ্বনি করিলেন—সাম্প্রদায়িকতাবাদীবা এবার সাবধান। কংগ্রেসী প্রচারেব জয়ঢাক সংবাদপত্রগুলি চীৎকারে সারা দেশ মুখর করিল—আব রক্ষা নাই, সাম্প্রদায়িকতাবাদীবা এবার খুব সাবধান। কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী, শত্রু-মিত্র, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই জানিল—নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত নেহরু, ভারত রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যুদ্ধে যাইতেছেন।" —গণবার্ত্তা।

আততায়ীর গুলীতে নিহত জনাব লিয়াকৎ

"বিগত ২১শে আশ্বিন রাওয়ালপিণ্ডিতে এক বক্তৃতাকালে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হাজরা জেলার অধিবাসী সৈয়দ আকবর নামক আততায়ীর হস্তে গুলীবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। গুলীবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিয়াকৎ পড়িয়া যান এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় কিয়ৎক্ষণের মধ্যে তিনি দেহত্যাগ করেন। উত্তেজিত জনতা আততায়ীর দেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। লিয়াকতেব মৃত্যুতে পাকিস্তানে চল্লিশ দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক পালন ঘোষিত হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে বিত্তশালী জমিদার-বংশে লিয়াকতেব জন্ম হয়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ পবীক্ষা দেন। অক্সফোর্ডে এক্সটার কলেজে আইন পড়িয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইনার টেম্পলে ওকালতি ব্যবসায় নিয়োজিত হন। কিন্তু শীঘ্র

তাঁহাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া রাজনীতিতে লিপ্ত হইতে হয় এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগে যোগদান করিতে হয়। লিয়াকৎ যুক্তপ্রদেশে পবিষদের সদস্য ছিলেন ১৯২৬ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কায়েদে আজম জিন্নার সংস্পর্শে আসেন, যখন তিনি লীগের জেনারেল সেক্রেটারী নিয়োজিত হন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে লিয়াকৎ পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের কাউন্সিলে অর্থমন্ত্রিরূপে নিয়োজিত হন। পাকিস্তান সৃষ্টি হইলে তিনি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে লিয়াকৎ কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান করিতে লণ্ডন যাত্রা করেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ ট্রুম্যান কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে 'বজ্রমুষ্টি' দেখাইয়া জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। লিয়াকতেব মৃত্যুতে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই তাহাদের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ও বন্ধুকে হারাইয়াছে, লিয়াকতের আত্মা শান্তিলাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।"

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক